কল্লোল
বর্ষ: ২ সংখ্যা: ২
সংখ্যা: ২-৩
১৩৪০-১৩৪১
1933-1934

সূচীপত্র

[আশ্বিন ১৩৪০

[illegible]	[illegible]	পৃষ্ঠা
[illegible]	বিষ্ণুশর্মা ১২৩, ২৬৪, ৪০৬, ৪৫০	
[illegible]		৮২৬
[illegible]		১৮৭
[illegible]		১৪৯
[illegible]		২৭৫
[illegible]		৫৯
[illegible]		৫০৫
[illegible]		৫১০
[illegible]		৫৫০
[illegible]		৬৯৫
উপাস (উপন্যাস)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৩৭, ২৪৪, ৩১১
[illegible]	শ্রীঅবিভূতি বিদ্যাভূষণ	৩৩৫
চার্বাক কেশবচন্দ্র ও [illegible]	শ্রীজ্যোতিলাল মজুমদার	
[illegible]		
বিশ্বাস (সচিত্র)	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২১
[illegible]	৫২, ৬৩, ১৩৭, ১৯২, ১৯৯, ৩৫৯, ৩৩১, ৪২৭, ৫১৯, ৬৯৭, ৫৫২	

আলোচনা

[illegible]	শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
[illegible]	শ্রীসুধীরঞ্জন রায়
[illegible]	শ্রীঅমরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
[illegible]	শ্রীপ্রেমেন্দ্র রায়
[illegible]	শ্রীবিশ্বেশ্বরলাল মিত্র

[illegible] হইতে জার্মানী

(সচিত্র)	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন	৬২৫
টি মিন (গল্প)	" মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৩
৬ই সন্ধ্যা (গল্প)	" মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪১, ৭৪৯
[illegible]		
[illegible] (সচিত্র)	শ্রীসজনীকান্ত দাস	
[illegible] (কবিতা)	" প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	

[illegible]	[illegible]	পৃষ্ঠা
[illegible]	[illegible]	১৬৭
[illegible]	" আশুতোষ দে	২৭৭
[illegible]	" সজনীকান্ত দাস	১৫১
[illegible]	" অনিলকুমার চক্রবর্তী	৫২০
[illegible]	" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২১
গোবিন্দ [illegible] কবিরাজের একটি [illegible]		
অপ্রকাশিত চমৎকার গল্প	শ্রীসুকুমার সেন	১৩৮
[illegible] (সচিত্র)	" কুপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১১০, ২৭৭, ৩৮৪, ৫১৩, ৬৮৯, ৭৭২,
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		১৫৮
[illegible]		৩৫৯
[illegible]		৭৫৯
[illegible]		৭৯৯
[illegible]		৮০৯
[illegible]		৮১২
[illegible]		৫১৬
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] (গল্প)		
[illegible] (সচিত্র)	শ্রীবিশ্বাস মিত্র	
চীনা চিকিৎসা		
[illegible] (গল্প)	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
[illegible] (কবিতা)	[illegible]	
[illegible] (কবিতা)	শ্রী[illegible]	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
খেলেমেয়েদের সমাজ-গঠনের কাজ	* অনাথনাথ বসু	৫২০
গজলা-ঘর (গল্প)	" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৭
জাতীয় ভাষা	" বটকৃষ্ণ ঘোষ	১২৩
জামাই-ষষ্ঠী (গল্প)	" বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৩১
টলাবেশন	" চারুচন্দ্র রায়	২৮৭
তুমি আর আমি (কবিতা)	" প্রমথনাথ বিশী	৩২২
দুই ফেরু (কবিতা)	" সজনীকান্ত দাস	২১০
দেবতা (কবিতা)	" প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
নীলদীঘি (গল্প)	" সুশীলকুমার ঘোষ	৮১২
নেপালে বাংলা গদ্য সাহিত্য	" প্রবোধচন্দ্র বাগচী	২৯১
পত্রলেখা (কবিতা)	" সুশীলকুমার দে	১০৪
পথ (কবিতা)	" সুধীন্দ্রলাল বসুরা	৫৪০
পদ্মা (উপন্যাস)	" প্রমথনাথ বিশী ৭০, ২০৭, ৩৬১, ৪৮২, ৫৬৮, ৭৮৩	
পরমাণুকোষ ও তাহার রূপ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৬৩৫
পরিচয় (কবিতা)	" শান্তি পাল	৬৫৯
পরিবর্তন (কবিতা)	" সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী	৬৩৪
পাখি কি শুধু মানে শ্রান্তি ? (কবিতা)	" সুনীলরঞ্জন ঘোষ	
পুরাণ বাঙ্গালার একটি খণ্ড	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৭
পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়	২৭১, ৪১১, ৫৫৭, ৭০৮, ৮৩৯	
পেড়োর মন্দিরের পূজারী (গল্প)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	
প্রদর্শনী (সচিত্র)		
প্রাচীন চৈনিক ভাস্কর্যে বৌদ্ধ ও গ্রীসীয় প্রভাব (সচিত্র)	শ্রীপিনাকীলাল রায়	১৮৮
প্রাথমিক শিক্ষায় আদর্শ বিদ্যালয়	* অনাথনাথ বসু	
প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ	
ফরাসীদের দেশে একখানি গ্রাম (সচিত্র)	* কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৩৪৪
বণিকের বন্ধুত্ব	" চারুচন্দ্র রায়	২৪
বর্তমান সাহিত্য-সঙ্কট	" সুশীলকুমার দে	৪২৯
বড়দিনের বাজার (গল্প)	শ্রীকিরণকুমার রায়	১৪
বাঙ্গালার কথা	নিখিলনাথ রায় ১১৮, ২৫২, ৩২৯, ৫২৪, ৬৮৯, ৭৭১	
বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা (সচিত্র)	শ্রীচারুচন্দ্র রায়	৭৬৪
বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য	" সুকুমার সেন	৭৫, ২১৪, ৩৭৫
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস	" সুকুমার সেন	৫০২, ৬৭৩, ৭৯৮
বাংলা সাহিত্যে ভাষা-বিভ্রাট	শ্রীসত্যসুন্দর দাস	৫৬৯, ৭০২
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র)	* গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৩০, ৫৮৫, ৮০৫
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)	* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৭, ২৩০, ৩৬১, ৪৭৬, ৬৪৯, ৭৩৫
সমুদ্রতলের জগৎ		
বর্তমান মানুষিরা		
ভূমিষ্ঠানের মরুদেশ		
পক্ষীমীন		
দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি গান		
কালো গিরিবর্ত্ম		
প্যারিস হইতে মুলতানে কাশীর		
মলিনিয়া বালসুমিতে পুরানো সহর		
বিজ্ঞেন-গান	ওসীমউদ্দীন	১৩০
বিশ্বভারতী সভা (লীগ অব নেশন্‌স) (সচিত্র)	শ্রীঅনাথনাথ বসু ২৭, ২৪৮, ৩০৫	
বিড়ম্বনা (গল্প)	" বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩৪
বুদ্ধকথা	* অমূল্যচন্দ্র সেন ৩৩, ১৮৩, ৩২০, ৪৮৭, ৬৩৪, ৭২৯	
বেকার	* চারুচন্দ্র রায়	২৫
ব্যাঘ্র-দেবতা (গল্প)	* সুধাময়কুমার রায় চৌধুরী	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ব্যোম-জ্যোতি	* প্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪২৯
ভারতীয় মধ্যযুগের শূন্যবাদ	* ক্ষিতিমোহন সেন	৬০৩
ভারতীয় স্থাপত্যের চতুর্মুখ (সচিত্র)	* বাদিনীকান্ত সেন	
ভারতের আর্থিক উন্নতি	* দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	
ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	* দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ	৩১৬
ভ্যালেন্টার হাবকিন		৬১৮
ভাষা ও জাতি	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ	৪৪০
ভূমিকম্প (কবিতা)	* অরবিন্দ দত্ত	২০৯
ভূমিকম্প (সচিত্র)	* গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৯৫
মধুয়া (কবিতা)	* প্রমথনাথ বিশী	৭৭১
মা (অনুবাদ-উপন্যাস)	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	২৭০, ৩২৭, ৪৭১, ৬৫৭, ৭২২
মাতৃকাক্ষেত্র ও ওড়ুয়ার	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী	
মিউনিক ও প্যারিস (সচিত্র)	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ	৮৩
মুকুলের ব্যথা (কবিতা)	শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ	৬২৪
রাজমোহনের স্ত্রী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২
রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত	* শ্রীরমেশ বসু	
রামরাম বসু ও রামমোহন রায়	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪২
রাত্রিযাপন (সচিত্র)	* নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩
রাতকী-বউ (গল্প)	* শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৯৭
শিল্পী অতুল বসু (সচিত্র)	* সজনীকান্ত দাস	১৬২
সন্ন্যাসীদের মেলা (গল্প)	* অনন্দজ মুখোপাধ্যায়	৩৪২
সত্য-শিবা (কবিতা)	* মাণিক গুপ্ত	৬১৬
সনেট (কবিতা)	* নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৩১
সভ্যতা না বড়ক?		৭৯৭
সম্পাদকীয়	১০১, ২৮১, ৫১৪, ৫৯০, ৭০২, ৮৩১	
স্বরলিপি	শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত	৫৪৮
স্বপন (সচিত্র)	* সজনীকান্ত দাস	১
সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং (সচিত্র)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সে, ৭০, ২৪০, ৭০৩	
সাধারণী		
সাত বৎসর আমেরিকার সাহিত্য ও বিবিধ সংবাদ সঙ্কলন (২)	শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার	৩৪
সাহিত্যের সাধনা ও সিদ্ধি	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	১৫৩
সাকো (সচিত্র)	* সুব্রতকুমার চৌধুরী	৫৫৩
সুধামুখী (কবিতা)	* সজনীকান্ত দাস	৪৭৫
সেকালের চোর	* যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩১৭

চিত্র-সূচী

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
অভিসারিকা	দেবলিনয়	৮২২
* আভেনল এম. জে.		২৫১
আর্থার লোপেজ্‌ (গায়েন অঙ্কিত)		৮৩
আনাতোল ফ্রাঁস		৮৭
আলো-ছায়া (ত্রিবর্ণ)	এম.বি. ইরাজাবতী প্রজ্বল—আষাঢ়	
ক্যালকিউস ও লাওদো		৫৫৫
ইউরিপিডিস		৮৫
ইটালীয় সিরিন প্রদেশে আবিষ্কৃত মার্কেল মূর্তি		১১০
ইন্দোচীন		
ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও একবাল-পত্র		
ইব্রাহিম রৌজা		
ইয়াংকাং পাহাড়ে আবিষ্কৃত প্রাসাদ		
ইয়াংকাং পাহাড়ে খোদিত বুদ্ধের মুখ		
উত্তর চীনের স্থাপত্যের কীর্তি		
উড্রো উইলসন		
একটি কথা	সুধাময়ও	
এঁড়ে	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১২৯

* আমন সংখ্যার ২৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রবন্ধের ছবি এবং ফুটনোটে দিয়ে এম. এম. বি. আভেনল ও এম. জে. আভেনলের নাম ভুল করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
এম. এ. রহিম (ত্রিবর্ণ তৈলচিত্র)	শ্রীঅতুল বসু	
	প্রচ্ছদ-ফাল্গুন	
এরিক ড্রামণ্ড		২৪৯
ভাঙনভক্সা (দ্বিবর্ণ)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রচ্ছদ—চৈত্র
কাশ্মিরাং		
কাশ্মিরাং		
পাহাড়ী ফুল		
পাংথাবাড়ী রোড		
টেবিল ল্যাণ্ড		
ডুবেরডল রোটেল		
কাশীর ঘাট (দ্বিবর্ণ)	সুজান ব্রয়েড ও সি. ব্যারি	
কারলিন হারশেল		
গ্রাঁ-কুরোপ		
সোম মাই		৩১৫
পাচলা কাগজের কারখানা		৩১৬
টলস্টয়ের কারখানা		৩১৬
গ্রামিক পল্লী		৩১৭
পল্লী-পথ		৩১৭
ইন্ডিনিয়াগ্রামের বাংলো		৩১৮
বাজার		৩১৮
পিকিনিক পার্টি		৩১৯
হুকুকে কাল্পি [illegible]স্থা		৩২০
খিড়কীর ঘাট (ত্রিবর্ণ)	শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	৩৩৪
গাঁয়ের মেলা (ত্রিবর্ণ)	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
	প্রচ্ছদ—জ্যৈষ্ঠ	
গোলগুম্বজ		৫৮৩
চতুষ্পাঠী		
চতুর্ভুজ পুঁথির জোড়ন-টেবিলে অলেখার		
মৃত্যুঞ্জয়ের অলেখার		
প্রাচীন গ্রীসে ঘোড়া কল বানানো		২৫০
ঘাতাপুত্র		২৫১
ক্রাইসাস		৩৮৫
সোলন		৩৮৫
প্রাচীন গ্রীসের ক্রীতদাস		৩৮৬
যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস		৩৮৭
এথেন্স : আগোরা		৩৮৮
এরিয়াস		৩৮৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
ঈসপের গল্প কথা		৩৯০
ডিমোস্থেনিস		৩৯৩
বালক হার্ডিক্স		৩৯৩
পরের অর্থের বিনিময়ে		৩৯৭
ক্লিওর বাল্য জীবন		৩৯৭
বালক এডিসন		৩৯৮
হাসী বাদার কুরি		৩৯৮
কলম্বাসের প্রত্যাগমন		৩৯৯
কার্টার ও কারনারভন		৪০১
টুটেন-খামেনের কাঠমূর্তি		৪০৫
	ক্রোড়	৪০৩
হাতী : ভারতীয় ও আফ্রিকান		৭৭৩
হাতীর ক্রমবিকাশ		৭৭৩
প্রাগৈতিহাসিক মানবের খোদিত হাতী		৭৭৪
লেনিনগ্রাড মিউজিয়ামের হাতী		৭৭৫
ছুটি মুখ	শ্রীঅধরী সেন	৪৪৯
ছাট্টুলাল (ত্রিবর্ণ)	„ অতুল বসু	২৪৬
জেনেভার সাধারণ দৃশ্য		৩১
জ্যোৎস্নালোক	„ কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার	৮২৪
টলস্টয় (কৃষাণ বেশে)		৭৭৭
দার্জিলিং		
ডাউহিল স্কুল		২২৩
পাহাড়ী কিমারিণী		৪০২
মেঘমালা		৪১০
কাঞ্চনজঙ্ঘা		৪০৩
বোটানিকাল গার্ডেন		৪০৪
পাহাড়ীদের মন্দির		৪০৪
ঘাল		৪০৫
দাসখতের প্রতিলিপি		৭৬৯
ধর্ম-বিরোধী বাদুঘর (Antireligious museum)		১৯৭
নটীর পূজা (ত্রিবর্ণ)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪
নটীর পূজা	শ্রীনন্দলাল বসু	৪৪৭
নারীর ভবিষ্যৎ (শ্রীমতী ইয়ং হাস্টার অঙ্কিত)		২৬৮
নিখিলনাথ রায়		১৬৯
নিগ্রো গির্জার অঙ্গনে		৪২৫
নিগ্রো গির্জার তত্ত্বাবধায়ক		৪২৪
নিগ্রো নেপথিক অর্ডার		৪২২

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
নিগ্রো ধাত্রী-সম্মেলন		৪৯৩
পাখী চাই		৮২১
পাতিয়ালার মহারাজা		৪৪৬
প্যারিসের দৃশ্য (বিমানপোত হইতে)		৮৮
প্রণাম (ত্রিবর্ণ)	শ্রীযামিনী রায়	প্রচ্ছদ - বৈশাখ
প্রদর্শনী		
আজেল-ষ্টীচ	শ্রীঅতুল বসু	১৬১
দর্পণে শিল্পী স্বয়ং	"	১৯১
তার আওতোষ		১৬২
সাথী, পাড়ি		১৬৩
অংসলগ্নের ঢাক		১৬৪
মাধবী চিত্রিত, স্মিত হাসি, বঁধুয়া		১৬৬
কঙ্কাল ও প্রাণ	"	১৬৭
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর		৪৪৫
প্রহরা (একবর্ণ)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	৩
ফকীর	চিন্তামণি মাল্লা	৪৫১
ভাব-সমাধি	এস. আমেদ	৮২৫
ভিক্টর হুগো		৬৬৭
ভুবনমোহন কর		২৮৪
ভূমিকম্প		
সানফ্রান্সিস্কোর ভূমিকম্পের দৃশ্য		
ফরাসী-চিত্রাঙ্কিত গল্প		
জাপানের বিভীষিকা পুরী (ভূমিকম্পের পর)		
শাস্তির ভূকম্প-জ্ঞাপক যন্ত্রের বিশাল কৌশল		
গ্রে-চিত্রাঙ্কিত কম্পন-জ্ঞাপক যন্ত্র		
গলিৎসিন-চিত্রাঙ্কিত যন্ত্র		
মুদ্রিত কম্পনের রেখাচিত্র		
মাকভফ-রোমার্গ-চিত্রাঙ্কিত যন্ত্র		
কম্পন-গ্রহণের যন্ত্র		
ম		
মাদাম কুরি		
মারিয়া মিচেল		
মুদ্রের		
ভূমিকম্পের পর		
খড়-ঘর		
কেদার মোজমদার বাড়ি		
মেঘচন্দ্র সরকার বাড়ি		২৭৭
আশু দে মহাশয়ের বাসা		২৭৮
পথ		
পুলিশের ঘাঁটি		
কেদার মোজমদার বাড়ির অংশ		
মুসোলিনীর প্রস্তরমূর্তি		৭০৪
মেরি কিংস্‌লি		১২৭
মেরি কিংস্‌লির নৌকাভিযান		১২৮
মেরি হাগিন্‌স্‌		৪০৯
মেরি হুইটনে		৪০৯
রবিবার (এচিং)		৪৪৮
রম্‌ণা রঁলা (প্যাস্তেল অঙ্কিত)		৮৯
রাসলীলা	বেঙ্কটনারায়ণ গাও	৮২০
রেখাচিত্র (অজন্তা হইতে)	শ্রীসুধেন্দ্র চৌধুরী	৩৬২
লীগ-আসেম্বলির মিটিং		২৬১
লীগের নূতন অট্টালিকা (অসম্পূর্ণ)		২৬
লীগের নূতন বাড়ী (সম্পূর্ণ)		২৬৩
লীগের শান্তি-বৈঠকের সদস্যবৃন্দ		২৯
লেনিন		১২৫
বঙ্গোপসাগর (মানচিত্র)—ধর্মপালের রাজ্যের সীমা		২৪৩
বনশ্রী (ত্রিবর্ণ)	শ্রীনন্দলাল বসু	প্রচ্ছদ—মাঘ
বরকুবর		৫৮১
বর্ষায়	তালিকাচলম্‌	৮২২
বাঘ আর সিংহ	এফ. বি. ইয়াল্লাবতী	৪৫০
বারাগ্রামের ভুবনেশ্বরী, বারাগ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি		২০৬
বাসুলী দেবী		২০১
বিজ্ঞান-জগৎ		
ভূমিকম্প-প্রতিরোধক গৃহ		
রোএমার-আলোর গতিবেগ		
আলোর গতিনির্ণায়ক কল		
শনিগ্রহের চন্দ্র		
ভূষক ও লৌহচূর্ণ		
শব্দের প্রবাহের ধারা		
সিকোলা ফ্লেক্সা		
ভূমির গভীরতা যন্ত্র		
ছুই ঘোড়ার মোটরগাড়ী		

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
নূতন এক চাকার গাড়ী		৫৩৪
চক্রসংযুক্ত জলযান		৫৩৪
এরোনিকা এয়ার		৫৩৫
বিচিত্র উচ্চতার ঘর		৫৩৫
জলের তলা কাজে লাগানো		৫৩৬
ঐ কাজে লাগানোর উপায়		৫৩৬
ব্যবস্থিত এরোপ্লেন		৫৮৫
সাইক্লোরাইড		৫৮৬
অভিনব সমর		৫৮৭
শাবুক সংগ্রহ		৫৮৮
অদ্ভুত জলযান		৫৮৮
অভিনব বন্দুক		৫৮৮
অভিনব বাদ্যযন্ত্র		৫৮৯
নূতন রেলের গাড়ী		৫৮৯
কামোরার প্রতিমূর্তি		৫৮৯
পেরিসের জাহাজ		৫৯০
ইলেক্ট্রিসিটির ঘর		৫৯১
ক্যাম্বোচ-রে		৫৯১
ব্যবস্থিত ফেলুন		৫৯২
সিটাট্রন রশ্মি		৮০৫
ঘূর্ণায়মান পাখা		৮০৬
মানুষের অদৃশ্য হওয়া		৮০৭
ঘূর্ণায়মান আসনের যন্ত্র		৮০৮
হাইড্রোর চাক		৮০৮
হাউই ছোড়া		৮০৯
জলে বোমা ফাটানো		৮১৪
অভিনব ইঞ্জিন		৮১০
নূতন দূরবীণ		৮১১
নেপচুন সাইক্লোন		৮১১

বিচিত্র জগৎ

খড় চিংড়ি মাছ, বাইসেলা মাছ		১৬
ড্রাগন মাছ, ড্রাগন মাছের ঝী		৯৭
খড় মাছের ঝড়		৯৮
সাপের মত দেখিতে ড্রাগন মাছ, আলোক মাছ		৯৯
আলোক মাছের আলো		১০০
এক শ্রেণীর ড্রাগন মাছ		১০১
মূল আকার স্কুইড		১০২
ট্যাং শিল, অর্গল মাছ		১০৩
মাকুন্দিয়া, কচ্ছপের খনি		২০৪
ডাইনোসর কবর		২০৪
বুকমেন		২০৪
ডাইনোসর		২০৫
উদরওয়ালা কচ্ছপ		২০৬
নদীর তলা অন্বিত মাছ		২০৬
সিমোসেটাসের খোলা		২০৭
ডিমর্ফিস ডায়েরী পরিবার		২৯৮
অমরনিয়ার মুখে উট্টবাহিনী		৩০১

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
উটকে খাওয়ানো		৩৬২
উট্টবাহিনী		৩৬৩
মুহেনৎ দি		৩৬৩
সিবিয়ন্সের সরিসৃপ		৩৬৪
কাল্পনিক বীর ও ঈগল পাখী		৩৬৪
কিন্নরিক সৈনিক		৪৬৫
সিলাবিদ্যার অনুশীলন		৩৬৫
কচ্ছপওয়ালা		৩৬৬
সাদু পাহাড়		৩৬৭
সিটুন ব্যালির		৫৭৭
হাইডুক দ্বীপের অধিবাসী		৫৭৭
ব্যাবিলোট		৫৭৮
অভিনব সিন্ধুঘোটক		৫৭৮
ঐরাবত		৫৭৯
অজন্তা-পথ		৫৭৯
কাইমান ঘাট		৮৮০
ত্রিলিয়া		৮৮০
নন্দন-কানন		৮৮১
কাম্বো গুহা		৮৮১
পারস্যের পথ		৮৮২
পত্তনীর বিজয়-স্তম্ভ		৮৮০
কালাৎ-এল-হুসেন দুর্গ		৮৮১
হারাকুসের শিলালিপি		৮৮২
পাহান শাহ সিংহাসন		৮৮২
সেকেন্দ্রার প্রাচীর		৮৮৩
পারস্য সুন্দরী		৮৮৪
গুলিস্তাঁর প্রাসাদ		৮৮৫
বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ		৮৮৫
বাসিন্দুর		৮৮৫
আরবীয় ইতিহাস		৭৬৪
ইতিহাসের কক্ষসমূহ		৭৬৬
চিত্র-রক্ষা-আকো		৭৬৭
" আলোকশেষ		৭৬৮
" দেবমূর্তি		৭৬৮
উটকাকো দুর্গ		৭৬৯
অধিকার মূর্তি		৭৭০
চিত্রাঙ্কনাকোর মূর্তিত্রয়		৭৭০
হেয়াকুরা ফোলাকুমি		৭৭৫

বিজয়-দেবী (সিবেরো আন্দ্রেয়োটি খোদিত)		১১১
বিরহ	এস. এন. মোহান্তী	৪৪২
বুকার টি. ওয়াশিংটন (কৈশোর)		৭৭১
বৈশাখ (ত্রিবর্ণ)	শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	৪২৪
শাঁজ ইলাইজি (Champs Elysees)		১০

শিলার (এ. টিসর্যাঁ অঙ্কিত)

শিলিগুড়ি

১৭ ডাকঘরের পুলি বৃক্ষ

বিষয়	শিল্পী	পৃষ্ঠা
গাছের বীজ রোপণ		২১
চা-বাগান		২১
চা-বাগান		২২
মহেশ বাবুর ছেলেমেয়ে		২২
শিল্পী নিজে	তালিকাচলম্	৮২৩
শিব-উমা	শ্রীমঙ্গলাল বসু	৪৮৪
শৈলেন্দ্রমোহন দাস		৭০৩
শ্রীরামের অভিষেক	বেঙ্কট নারায়ণ রাও	৮২১
সচকিতা	কুমারাও	৮২৪
সক্রোক্লিস		৮৪
সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরা (তাল রিলেপ অঙ্কিত)		২৬৫
সাধী	বেঙ্কট নারায়ণ রাও	৮২৩
সিংহলের নারীদের প্রাচীন পোষাক		২৬৭
সূচি-শিল্প	শ্রীকণিভূষণ সান্যাল	৪৪৯
স্নানার্থিনী (ত্রিবর্ণ)	শ্রীঈশ্বরগুপ্ত	৭৬৪
হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়		৭০৪
হলচালনা	শ্রীকালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার	৮২১
হাঙ্গুর্স		
গ্রামে নদীর দৃশ্য		
আলাঁয়ের দৃশ্য		
ডিজোঁসুর ও ডিজোঁর		
ফ্রাংকেসের পাহাড়		
জাগরাঁয়ের কোল		

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার
- সাধারণী

অনাথনাথ বসু
- প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয়
- বিবরাট সর্প (সচিত্র)

অনিলকুমার চক্রবর্তী
- রক্তপদ্ম পরে (গল্প)

অবলা দেবী
- চন্দ্র সরকার (গল্প)

অমূল্যচন্দ্র সেন
- ইটালী হইতে আর্জাণ্টী (সচিত্র) ৬২৫
- মুদ্র-কথা ৩৩, ১৮৩, ৩১৮, ৩৬৭, ৬৬৩, ৭৫৯

অরবিন্দ দত্ত
- ভূমিকম্প (কবিতা)

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
- সন্ন্যাসীর খেলা (গল্প)

আশুতোষ দে
- কল্পনাদেবীর চিঠি

কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
- ফরাসীদের দেশে একখানি গ্রাম (সচিত্র) ৩১৫

কিরণকুমার রায়
- বড়দিনের বাজার (গল্প)

ক্ষিতিমোহন সেন
- ভারতীয় মরমীদের পূর্ব্বকথা

চারুচন্দ্র রায়
- টলারেন্স
- ধর্ম্মের বন্ধুত্ব
- বাঙ্গালা গদ্য লেখার দুই একটি কথা (সচিত্র)
- বেকার

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
- বিজ্ঞান-রহস্য (সচিত্র)
- ভূমিকম্প (সচিত্র)

জসীমউদ্দীন
- বিদেশ-পথে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- জলসাঘর (গল্প)

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
- প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অর্থনীতি
- ভারতের আর্থিক উন্নতি
- ভারতে রিলীফ ও কেন্দ্রীয় বাজেট

নিখিলনাথ রায়
- মুর্শিদাবাদ কথা ১৯৬, ২৫১, ৩৯১, ৪৫৪, ৬৮১, ৭৭১

বিভানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভারিয়ার বর্ষা (সচিত্র)

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- দেবী (কবিতা)

সুরেশচন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
- চন্দ্রপাটি (সচিত্র)

শিবাকালীপদ রায়
- প্রাচীন চৈনিক ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ ও গ্রীক প্রভাব (সচিত্র)

প্রফুল্লকুমার দে
- সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং (সচিত্র)

প্রবোধচন্দ্র বাগচী
- নেপালে বাংলা গদ্য-সাহিত্য
- মাতৃকাদেবীর তত্ত্ব ও উপাসনা

প্রমথমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
- অন্বেষা (কবিতা)
- দেবতা (কবিতা)

প্রমথনাথ বিশী
- তুমি আর আমি (কবিতা)
- পদ্মা (উপন্যাস)
- বসুধা (কবিতা)

প্রমোদরঞ্জন ভড়
- আলোচনা : টলারেন্স

প্রেমসুন্দর বসু
- আলোচনা—রামমোহন রায়

ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়
আলোচনা – লেখার রূপ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রামমোহনের স্ত্রী (উপন্যাস)
বটকৃষ্ণ ঘোষ
ভাতের ভাল
সাধা ও সাতি
বিউনিক ও পাসিস
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
জামাই ষষ্ঠী (গল্প)
বিড়ম্বনা (গল্প)
বিষ্ণুপদ্ম
অন্ধকূপ
বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
আলোচনা – রামমোহন রায়ের বাংলা পুস্তক
ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
পরমাণু বোম ও তাহার রূপ ৩৩৫
যোগ-জ্যোতি ৪১
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামরাম বসু ও রামমোহন রায়
ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ
অমর পত্রক ৩৪৪
মাণিক গুপ্ত
অন্ধকূপ (এ যুগের বাণী) ৩১৫
লঙ্ক-বিজয় (কবিতা) ৩১৬
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি ডিম, একটি লঙ্কা (উপন্যাস)
মুণীন্দ্রলাল বসুয়া
পথ (কবিতা)
মোহিতলাল মজুমদার
আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ
যামিনীকান্ত সেন
অরটীর হাসপাতালের চক্ষুর্মুখ (সচিত্র)
যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
সেকালের যোড়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পগুচ্ছ
রমেশ বসু
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত
শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আমেরিকায় নিগ্রোর পরিচয়
শান্তি পাল
পরিচয় (কবিতা)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
অভিশাপ (উপন্যাস) ১০০, ২১৪, ৩১১
শাশুড়ী-বউ (গল্প)
শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ঐ বধূ (কবিতা)
সজনীকান্ত দাস
এলাহাবাদে অব ফাইন আর্টস্ (সচিত্র)
কালকূট (কবিতা)
ছুটিরেক (কবিতা)
শিল্পী অতুল বসু (সচিত্র)
সুমন (সচিত্র)
সূর্যমুখী (কবিতা)
সত্যসুন্দর দাস
বাংলা সাহিত্যে ডায়রিফোট
সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
মা (অনুবাদ-উপন্যাস)
সাহিত্যের আবহাওয়া
সরোজকুমার রায় চৌধুরী
ছায়া-দেবতা (গল্প)
সুকুমার সেন
গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি অপ্রকাশিতপূর্ব পদ
বাংলা সাহিত্যে গদ্য
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
সুকুমার দে সরকার
পেঁচোর মন্দিরের পূজারী (গল্প)
সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী
পরিবর্তন (কবিতা) ৩৪৪
সুধীন্দ্রলাল রায়
আলোচনা : বাংলার পরিচিত পাখী বুলবুল ৩৫৮
সুনীলরঞ্জন ঘোষ
পাছ কি তবু যানে আছি (কবিতা)
বুলবুলের ভাষা (কবিতা)
সুব্রতকুমার চৌধুরী
স্বপ্নে (সচিত্র)
সুশীলকুমার ঘোষ
নীলকীর্তি (গল্প)
সুশীলকুমার দে
পত্রলেখা (কবিতা)
বর্তমান সাহিত্যসঙ্কট
স্বামী ওঙ্কারানন্দ
কর্মীর-গীতা
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
পুরাণ প্রবাহের একটা খণ্ড
হরিদাস মিত্র
বাঙালী মেয়ে (সচিত্র)
হিমাংশুকুমার দত্ত
অরবিন্দ

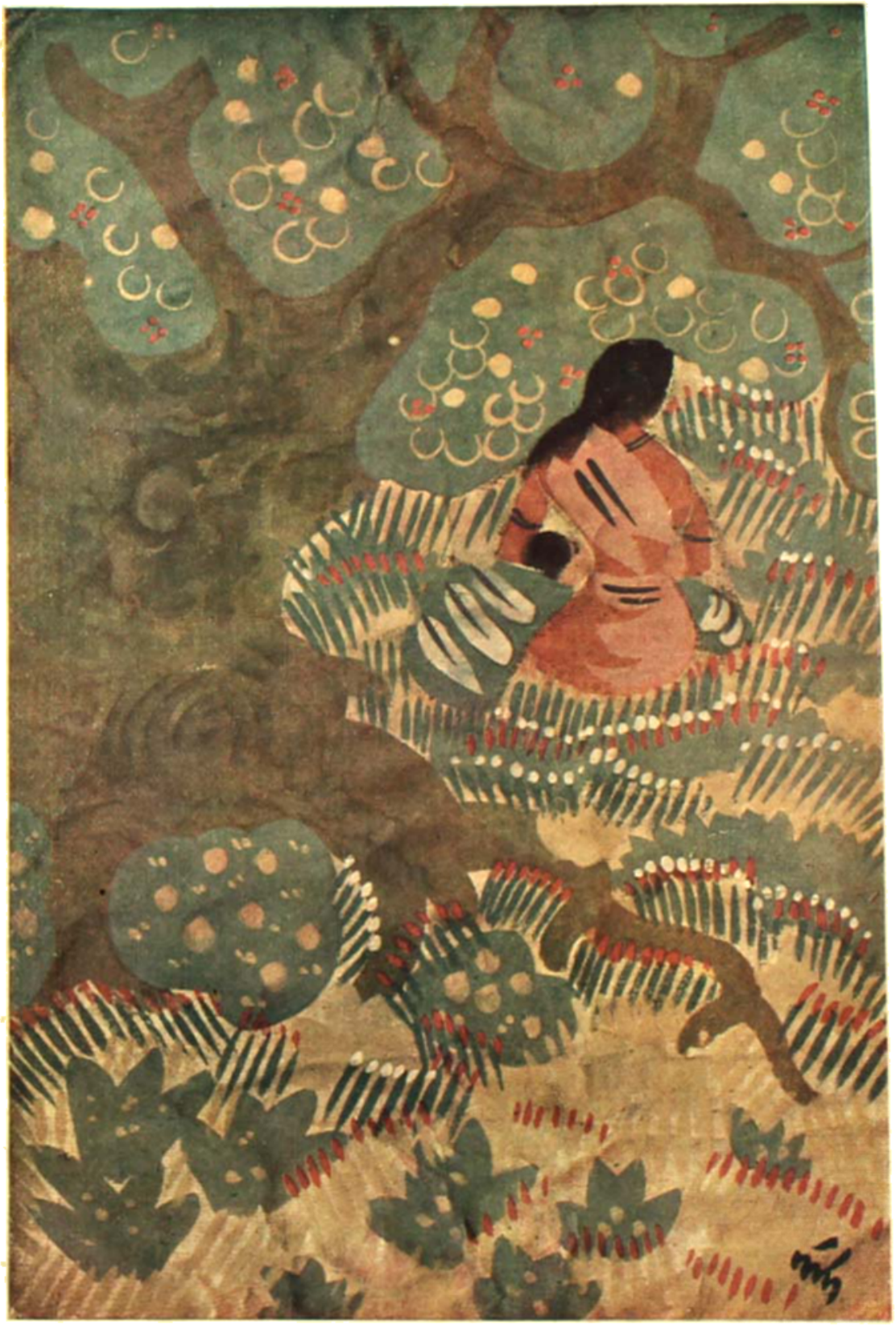

বনশ্রী
শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

রঙ্গশ্রী

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[মাঘ—১৩৪০

স্বপ্ন (সচিত্র)	শ্রীসতীকান্ত দাস
পুরাণ বাঙ্গালার একটী খণ্ড	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রেসিডেন্ট কলেজেটের অর্থনীতি	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
রায়মোহনের স্ত্রী (উপন্যাস)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়দিনের বালাই (গল্প)	শ্রীকিরণকুমার রায়
বন্দিকের বন্ধুত্ব	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ রায়
বিবাহবিভ্রাট (সচিত্র)	শ্রীঅবনীনাথ রায়
ও মধু (কবিতা)	শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
বুদ্ধ-কথা	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
পদ্মা (উপন্যাস)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
পাখি কি তবু যানে পড়ি (কবিতা)	শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ
কোন-জোতি	শ্রীবরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
ফুলনামরী (গল্প)	শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দাবাখেলা	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ সরকার
সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং (সচিত্র)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে
(কবিতা)	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প	শ্রীসুধাংশুর সেন
নিউমিক ও সাহিত্য (সচিত্র)	শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত	শ্রীব্রজেন্দ্র বসু
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরলোক	শ্রীসুশীলকুমার দে
বিজ্ঞান	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
চতুষ্পাঠী	শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার কথা	নিখিলনাথ রায়
অন্তঃপুর (সচিত্র)	শ্রীবিজুলতা
অভিশাপ (উপন্যাস)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যের আবহাওয়া	শ্রীসরোজকৃষ্ণ গুহ
পোকিন্সের কবিত্বের একটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গল্প	
সম্পাদকীয়	

উসের চা ভারতের গৌরব

ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ. উস এণ্ড সন্স

টি-মার্কেটস্—১১।১ হ্যারিসন রোড

:—২, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট ১৫৩।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট

৮।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গশ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকত্ব

বঙ্গশ্রীর বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸০ টাকা। ষাণ্মাসিক ২৷৷০ আনা। ভি: পি: খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য আনা। মূল্য—কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। প্রতি বাঙ্গালা মাসের পহেলা তারিখে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল আমাদিগকে মাসের ১০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুরণার্থ কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

৩। ঠিকানা-বদল করিতে হইলে গ্রাহককে নিজেই হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়া না পাঠাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভি: পি: করা অসুবিধাজনক, খরচও বেশী।

নূতন গ্রাহক হইবার সময় গ্রাহকসংখ্যা অনুগ্রহপূর্ব্বক মনি অর্ডার কুপনে অথবা আবেদনপত্রে 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের গ্রাহকসংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। না লিখিলে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পত্র লিখিবার সময়ও ইহারা অনুগ্রহ করিয়া এ কথা মনে রাখিবেন।

প্রবন্ধ

৪। প্রবন্ধাদি ও সংবাদাদির চিঠিপত্র সম্পাদককে পাঠাইতে হয়। উহাতে কম ডাক-টিকিট দেওয়া বা থাকিলে সকল সময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৫। লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া মূল পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

বিজ্ঞাপন

৬। বাঙ্গালা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। নূতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার। বিজ্ঞাপনের হার নীচে দেওয়া হইল।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৲, ৮৲, ৪৷৷০।

বিশেষ হারের জন্য পত্র লিখিলে জানানো হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৫৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহে—

ফোন—কলিকাতা ৪১৫

প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন -

আধুনিক জহরতের অলঙ্কার

গঠনশিল্পের চাতুর্য্য ও মিতব্যয়িতাই

—আমাদের বিশেষত্ব—

—ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড জুয়েলার—

বিনোদবিহারী দত্ত

মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস্

একমাত্র ঠিকানা—১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাঘ, ১৩৭০

২য় খণ্ড—১২ সংখ্যা,

স্মরণ

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

একখানি স্মরণ-বহি (অ্যালবাম) পাইয়াছি। একদা যিনি এই স্মরণ-বহিটি হাতে লইয়া যাঁহাদের তিনি শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহাদের সহি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং অকালে স্মরণাতীত লোকে চলিয়া যাওয়াতেই স্মরণ-বহিটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

তাঁহার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, যাঁহাদের স্মরণ-চিহ্ন সামান্য সহিরূপে সেই স্মরণ-বহিতে সেদিন সসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের সকলেই উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জাতির ইতিহাসে অমরীয় হইয়াছেন এবং একে একে তাঁহাদের জীবনযবনিকা নির্বাপিত হইয়াছে। পুরাতনের স্মৃতি বুকে করিয়া বাঁচিয়া আছেন মাত্র দুই জন। তাঁহাদের সেদিনকার লেখার প্রতিলিপি দেখিলে তাঁহাদের নিজেদের কি মনে হইবে কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিনকার সেই প্রাক্‌কৈশোরটিকে হয় তো তাঁহারা স্মরণে আনিবেন।

স্মরণ-বহির মালিকের জীবনে যিনি নিকটতম আত্মীয় ছিলেন, সুদীর্ঘ জীবন তাঁহারই স্মৃতিকে পাথেয় করিয়া যিনি আজিও পথ চলিতেছেন, ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই ক্ষুদ্র স্মৃতি-পুস্তিকাখানি তাঁহারই নিকটে রহিয়া গিয়াছে; তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অনেকগুলি লেখা ও সহি প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহারই সৌজন্যে ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার যবনিকা তুলিয়া লিখন-নিরত অনেকখানি হস্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি—তাহার অনেকটি বার্দ্ধক্যে আশীর্বাদোন্মুখর হইয়া কাঁপিতেছে, অনেকটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় দৃঢ়। এবং সব কটি হস্তই এই হতভাগ্য জাতির মুক্তির জন্য প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বড় তফাৎ আছে। কবরের উপর পাথর গাঁথিয়া তাহারা সব কিছুই মহাকালের দরবারে বাঁধাইয়া রাখিতে চায়; আমাদের পূর্ণ মুহূর্ত্তের চিন্তাস্রোত পরমুহূর্ত্তের ফুৎকারে উড়িয়া গিয়া নিঃশেষে মুছিয়া যায়; কে কি এবং কাহারা—আমাদের ইতিহাসে বড় কথা নয়। আমরা রামায়ণ মহাভারত পড়ি, বেদ-উপনিষদকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু বাল্মীকি বেদব্যাস, বেদ-উপনিষদকার ব্যক্তি হিসাবে আমাদের কাছে সত্য নন। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদিগকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। জাতির জীবনে ব্যক্তি কোথায়ও চিরবিধৃত হইয়া নাই। আমাদের সন্ন্যাসী সাধুদের গৃহস্থজীবন এমনই অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায় যে সমসাময়িক ভক্তরাই মানুষ হিসাবে তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না। মানুষের খুঁটি-নাটিকে, তা সে যত বড় মানুষই হউন, আমরা কখনই বড় করিয়া দেখি নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শে আজকাল আমাদের মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখন আমরা 'Hero lived' অমুক লিখিতে শিখিয়াছি; মহাপুরুষদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন লিখিয়া রাখিতেছেন—নখ চুল এবং দাঁতও আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতেছি, সুতরাং ভরসা হয় এই সহিগুলিকে সাধারণে সাদরে স্মরণ করিয়া লইবেন।

এই সহিগুলির সবকটিই ইংরেজী ১৮৯৭ সন হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে সংগৃহীত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ বৈশাখ ১৩২৪ সাল।

Teach us please how to make pleasure
Less the dead dust of things that decay;
But use in the living treasure
Hearts within and God overhead.

Rabindranath Tagore

সহজ করিয়া দিবারে চাও যা তা তাই তুলায়ে,
নহ তাহা তুমিও যাহা আছি তাহা ছিনু যে।

রবীন্দ্রনাথ

Let us therefore look for the
Land yield us to love — love is Faith
& Our faith leads to Christ.

N. Chandravarkar
Dec. 31st 1905

And if the heart be pure and good
The life will be just what it should
Not dew but True.

Sri Sastri
21st Sep 1898

আমাদের জীবন যদি সত্য ও পবিত্র হয়, তাহা হইলে
আমাদের জীবন যাহা হইবার তাহাই হইবে, স্বপ্নের মত
মিথ্যা হইবে না।

শ্রীশাস্ত্রী

২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে,
সবারই তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

July 26, 1897

Is there a man with soul so dead,
Who never to himself has said,
This is my own my native land?

Romesh Dutt

Benares, 30 Dec. 1905

Man's greatness to a great extent depends upon the motives of life he holds most dear from a boyhood

Lajpat Rai

২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
২৩।৩।৫২

শুনিতে পাই, এক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আছেন যাঁহারা হাতের লেখা হইতেই মানুষের চরিত্র বিচার করিতে পারেন, যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঠিকুজি-কোষ্ঠীর মত এই সহিগুলিও এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্রনির্ণয়ে আমাদের সহায়তা করিবে, সে দিক দিয়াও এগুলির মূল্য আছে।

সহিকারকদের অধিকাংশই মনস্বী, সর্ব্বজনপরিচিত মহাপুরুষ, স্বতন্ত্র পরিচয়ের অপেক্ষা কেহই রাখেন না। সময়ের দিক দিয়া এগুলির একটি বিচার আছে এবং সে বিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তিক, সকলের মনে সমানভাবের উদয় না হইতে পারে। লিপিকারক লেখার ছাঁদ দেখিবেন, লেখকদের মনের দৃঢ়তা ও চরিত্রের বল অনেকে এই অক্ষরগুলির মধ্যে দেখিতে পাইবেন; আশাআকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বও এগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই নিহিত আছে। ইঁহাদের অনেকে জীবনের দুকে তখন সবেমাত্র প্রবেশ করিতেছেন, বিজয়লক্ষ্মীর বরমালা কেহ গলায় পরিয়াছেন, কেহ পরিবার উদ্যোগ করিতেছেন; দেশ ও জাতির দুঃখেন্দশার কথা কাহারও মনকে পীড়িত করিতেছে, শাশ্বত ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া কেহ বা জাতি ও দেশের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত কবি, ক্রান্ত দেশপ্রেমিক, দৃঢ়চেতা বীর এবং শান্ত সমাহিত সাধক—সকলকেই ইহার মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা যায়; যাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেন তাঁহাদের মনের উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

সহিগুলি সম্মুখে লইয়া সহিকারকদের আমি দেখিতেছি। জীবনে অনেককে দেখিবারই সৌভাগ্য হয় নাই—সামান্য কয়েকটি অক্ষর অবলম্বন করিয়া মৃত্যুর পরপার হইতে তাঁহারা আসিতেছেন। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের নূতন রূপ দেখিতেছি। সম্পূর্ণ নূতন কাল এবং নূতন দেশে আগমন। পাশ্চাত্য সব কিছুকে অনুকরণের মোহ কাটিয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রদীপ্ত দীপ্তি তাঁহাদের মুখে চোখে। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হইল, দেশমাতাকে এবং দেশসেবকদের নমস্কার করিলাম।

দেখিতেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে, বার্দ্ধক্যভারে অবনমিত দেহ, জীর্ণ শরীর লইয়া বেডের আরামকেদারাটি ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না; দৃষ্টি অচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। ছিয়াশি বৎসর বয়স, আর একবৎসর পরেই তিনি দেহরক্ষা করিবেন। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কলম লইয়া অনুমানে তিনি সহি করিলেন। তাঁহার সেই অপ্রকাশিত ইঙ্গিত-আশীর্ব্বাদ।

তাঁহার পাশে তাঁহার দুই শিষ্য—দুই ভক্ত পুরুষ—শিবধন বিদ্যার্ণব আর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। মহর্ষির আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে নয় বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছে। সেই মহার্ঘ বস্তু বুকে করিয়া তিনি শঙ্কিত প্রহর যাপন করিতেছেন, উদ্বেগ আছে, কবে সেই বস্তু তিনি সাধারণের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তিকে সকলের সম্পত্তি করিবেন, অথচ বুকে আশা সেই সময় যেন বিলম্বিত হয়। ভক্ত শিষ্য তখন জানিতেনও না যে আর বছরখানেক পরেই তাঁহার গুরুর তিরোভাব ঘটিবে—তাঁহার মনে আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব ছিল।

দেখিতেছি দৃপ্তভেজা পাবকবহ্নি নিবেদিতাকে—বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের নিবেদিতাকে। আত্মমহিমায় মহীয়সী নারী—হৃতভাগিনী তখন জানিতেন না, আর মাত্র পঁয়ষট্টি দিন পরে তাঁহার ইহলোকের এবং পরলোকের দেবতা, তাঁহার গুরু, তাঁহার উপাস্য স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করিবেন—গলায় মালা, বৈরাগিণীর আলখাল্লা পরিহিতা সর্ব্বসমর্পিতা মার্গারেট নোবল্‌কে দেখিতেছি। তাঁহার মাতৃভূমি ইংলণ্ডের উপকূলের শ্বেতশুভ্র খড়ির পাহাড় দিগন্তের নীলিমায় ধূসর হইয়া মিলাইয়া গেছে—ভারতের হিমালয় তাঁহার নয়নসম্মুখে দেদীপ্যমান, ভারতকে তিনি মাতৃভূমি মানিয়াছেন, বলিতেছেন—

Can any voice overide the voice of
our country?
Can anything drown the cry of her need?
Can any thirst quench the sweet thirst of
those who would die for freedom?

মায়ের অকৃতী সন্তান আমরা কাঁপিয়া উঠিলাম।

বাল গঙ্গাধর তিলককে দেখিলাম—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন-সারথী কৃষ্ণ, যেন বলিতেছেন—

আমাকে অনুসরণ কর, যুদ্ধ কর।

যুদ্ধ করিবে কে? মোহনিদ্রা সবে ভাঙিতে সুরু করিয়াছে।

Can Anything trouble the Peace
of Perfect Trust?
Can Anything disarm the Cry of
Her need?
Can Anything quench the
Secret Thirst of Work who would
Her full Freedom

Ukichida PKR

April 30th 1903.

The sword and cord, evening rest,
Ebbing awake me music as before,
Be master." Empress
J. K. Ray.
21st June 1905

আমার চিত্তে আজ কাজ। তাই আমার সকল
কাজে আজ আনন্দ,—সেই আনন্দ আমার
আমার চারিদিকে— যে আনন্দ চিত্তে আজ কাজ।
আমার চারিদিকে
— ১৩০৪.

Judge yourself strictly. judge others indulgently.
Rabindranath Tagore
28-3-06

Nagpur
14th January 1916
Ritwik Kumar Dutt
Vice-chancellor,
Nagpur University

আমার নাই নাই।
Have Myself
১০-১-১৯০৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

The fearless of this world Lamata,
worthy. I Cor 2. 31.
শ্রীরবীন্দ্রনাথ।

আজ হৃদয়ে নিত্য হর্ষের না, অন্তরে নিত্য হর্ষের
না—আজ অন্তরে নিত্য নিত্যে হর্ষের না।
১০-১-১৯০৪ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Nothing elevates the soul.
as prayer
10-9-1904. Krishna Kumar Mitra

কেন তার অন্তরের আনন্দ-তরঙ্গ
নেচে নেচে উঠে তাই প্রকাশ করার
স্বপ্ন-স্বপ্ন করে লোক আজ তারি গান
প্রভুর মুখের কথা আজো আছে ধরে—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মামনুস্মর যুধ্যচ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
শ্রীলোকমান্য তিলক

পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় ভারতের মহত্ত্বের পশ্চাতে ভারতের সন্তানের জননীকে দেখিতেছেন। অক্ষম সন্তানের জননীরা কাদো।

মহারাষ্ট্র-প্রতাপ গোখ্‌লেও আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছেন। বাংলার রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত দেশের দুঃখদুর্দ্দশার কথা লইয়া তাঁহার আলোচনা চলিতেছে, ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা হইতেছে।

বোম্বাই হইতে ডক্টর তারাপুরবর, নাগপুর হইতে বিপিনকৃষ্ণ বসু, এলাহাবাদ হইতে জাষ্টিস প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার ডক্টর পি. কে. রায় এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার···আসিতে কাহারও বাকী নাই।

এবার কবি ও চিত্রকর সমাজ। সুবিখ্যাত ই. বি. হ্যাভেল এবং

He will like the dusk driven cattle
be a hero in the strife
Laafeldon
Ramesh C. Dutt

নমস্তে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ
শ্রী আদি দেবায় মহাধীমহি

Love is God -

Rabindranath Tagore
6-7-06
Himalaya

[illegible]

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হইয়াছেন, ধর্ম্মবীর শিবনাথ ধর্ম্মসংস্কারে মাতিয়া হৃদয়কে পবিত্র শুভ্র করিতে বলিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পশ্চাতে আছেন।

নববিধানের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, ডাক্তার বিধান-চন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতা প্রকাশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।

কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অমিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণগৌরবে দীপ্তিমান হইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া।

দেবতুল্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার মুখে সেই পরিচিত স্মিত হাসি। উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আসিয়াছেন।

এবার কবি ও চিত্রকর সমাজ। সুবিখ্যাত ই. বি. হ্যাভেল এবং চিত্রকর উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী একখানি অপ্রকাশিত চিত্র হাতে উপস্থিত হইয়াছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় হাফেজ হাতে 'প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম' আওড়াইতে আওড়াইতে শীর্ণ দেহ লইয়া আসিয়াছেন—কাদিনী সেন 'আলো ও ছায়া' লইয়া উপস্থিত। আর আসিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, ৩৯ বৎসরের যুবক, তখনও পত্নী-বিয়োগবিধুর নহেন। 'সাধনা' সমাপ্ত হইয়াছে, নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের স্বপ্ন তখনও সফল হয় নাই। সঙ্গে তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন।

একখানি ছোট খাতার মধ্যে অতীতের অনেকখানিই যেন দেখিতে পাইতেছি·····

পুরাণ বাঙ্গালার একটী খণ্ড

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৯২৩ সালের এপ্রেল মাসের শেষে আমি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে পুষ্করিণী ও হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুইটি পান্থশালা, মহামহিম রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠার্থ জেমোগ্রামে যাই। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় আমার আতিথ্যের ভার লন। শুক্র, শনি, রবি, সোম চারিদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকি। নিজের বাড়ী থাকিলে যতটা স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায় ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীতে তাহা অপেক্ষা অধিক বই অল্প স্বচ্ছন্দতা পাই নাই। তাঁহার চাকরটীকে কখনও ভুলিতে পারিব না। সে আমার খুব যত্ন করিয়াছিল। শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু জলধর সেন ঐ বাড়ীতে যান। পান এবং রবিবারে স্বয়ং লালগোলার রাজাও ঐ খানেই আসেন কিন্তু দুর্গাদাস বাবুর যত্ন ভাগ হইয়া গেলেও যেন আমাদের সকলেরই উপর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দারুণ রৌদ্র ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, ঘরের বাহির হওয়া যায় না। তাহাতে রাঢ়দেশ ভয়ানক টানের দেশ, তথাপি আমরা কদিন বেশ সুখেই ছিলাম। আতিথ্যের জন্য প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল, শুদ্ধ যে ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ী তাহা নহে জেমোর সকল বাড়ীতেই বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। মোটরকার সমস্ত সময়ই মোতায়েন থাকিত। যাহার যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইত।

রবিবার ৪টার সময় রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা। মুহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজা বাহাদুর, আরও অনেক অনেক স্থানীয় ও জেলার বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোক পুষ্করিণী ও পান্থনিবাসের মধ্যস্থলে মিলিত হইয়াছিলেন। স্থানটী অতি মনোরম। কাশীর স্কুলের একটু দক্ষিণে একটি ছোট খাল—খালের উপর একটী পুল—পুলের একটু দক্ষিণে পান্থশালা ও তাহার দক্ষিণে পুষ্করিণী। মাঠ তিনদিকে ধূ ধূ করিতেছে—উত্তরে স্কুল কোর্ট কাছারী ডাকবাঙ্গালা ও কয়েকজন উকীলের বাড়ী। সামিয়ানার নীচে বেঞ্চি ও চেয়ার সাজান। কিন্তু চারিপাশে বেশী লোকই দাঁড়াইয়া। রৌদ্রে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইয়াছিল, রৌদ্র পড়িল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে লাগিল। বক্তৃতা অনেকেই করিয়াছিলেন, আমি শুদ্ধ তাঁহার প্রতিষ্ঠার কথাই বলি। বক্তৃতাগুলি সবই বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবুর দেশের লোক তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। আমার এক এক বার বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। পান্থনিবাসের দোরার খোলা হইলে খানিকক্ষণ সেখানে থাকিয়া আমরা আপন আপন স্থানে গেলাম।

রামেন্দ্র বাবু জীবিত থাকিতে আমার অনেকবার কাশী যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইবার কথা বলিয়াও ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকিয়া যায়, ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি রাখিতে আমার জেমোকাশী যাইতে হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কাশীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কাশীর ইংরেজী স্কুল এ্যাংলো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কাশীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় একবৎসর কাশীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর, খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম—সব ঘাটেই যাইতাম। নানা বাগান হইতে মায়ের জন্য পূজার ফুল তুলিতাম—নানা পুষ্করিণী-স্নান করিতাম। সে সকল কথা আমার স্মৃতিপটে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই শেষ বয়সে কাশী যাবার জন্য আমার এই ঝোঁক। গিয়া দেখিলাম কাশীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আগে সাধারণতের বাড়ীর চারিদিকেই সহর ছিল—এখন আদালতের চারিদিকে সহর হইয়াছে—আগে যেখানে মাঠ ধান বন ছিল এখন সেখানে কোটাবাড়ী হইয়াছে আর যেখানে অনেক কোটাবাড়ী ছিল সেখানটায় কোটাবাড়ী আছে। কিন্তু বড় বেমেরামত আছে। পুকুরগুলি প্রায় নামে চাকিয়া গিয়াছে। রাধা-বল্লভের মন্দিরখানা পড়িয়া গিয়াছে। রাজাদের যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল তাহা পড়িয়া গিয়াছে—খানিক খানিক ঘায়ল

লইয়া নূতন বাড়ী হইয়াছে। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল তাহাতে দুইটা পুষ্করিণী ছিল জগন্নাথের মন্দির ছিল আর কত যে ফুল গাছ ছিল বলা যায় না। বাগানের পাঁচিলের কোথাও কোথাও চিহ্ন আছে, জগন্নাথ দেব কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাগান ভাঙ্গিয়া বাজার হইয়াছিল এখনও আছে। সহরটা বাগানের দক্ষিণে অনেক দূর বাড়িয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়ীটীতে ছিলাম সে বাড়ীটী ঠিক তেমনিই আছে। একজন সম্ভ্রান্ত উকীল এখন সেই বাড়ীতে থাকেন। আমরা যেদিন যাই সেদিন তাঁহার পরিবারেরা বাড়ী ছিলেন না। তিনি আমাদের অবাধে সকল ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে দিলেন, ছাতে উঠিতে দিলেন। ৬২ বৎসরের পর সেই বাড়ী সেই ভাবে আছে দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল যেন আবার সেই ছেলে বেলার সেই সুখের দিনে ফিরিয়া আসিলাম। পাশের বাড়ীগুলিও ঠিক সেই রকমই আছে।

ইস্কুলে আসিয়া এ্যাডমিসন রেজিষ্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমার ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাগ্নেরাও সেই দিনে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আমাদের এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া গেলেন—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্য গোপাল হাজরা। পরস্পর আলাপ হইল, আমরা দুজনে খুব প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পুরাণ বেড়াইবার জায়গাগুলি অনেক দেখাইলেন। তিনিও এখন পেন্সনার। কিন্তু তিনি আমার মত ভবঘুরে হন নাই। তিনি কাশীর আদালতেই চিরদিন চাকরী করিয়াছেন এবং সেইখান হইতে পেন্সন লইয়াছেন। আর দশদিন থাকিলেও বোধ হয় আমাদের সব পুরাণ জায়গাগুলি দেখা হইত না। কিন্তু সকলে যেদিন চলিয়া আসিলেন আমাদেরও সেই দিনই চলিয়া আসিতে হইল। কলিকাতা হইতে ৩১ জন সাহিত্য-সেবী রামেন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার দিয়াছিলেন। সকলেই রামেন্দ্রের আত্মীয় সুতরাং আমারও আত্মীয়। ইঁহারাও সব জেমো ছিলেন। ও কদিন জেমো যেন উৎসবময় হইয়া গিয়াছিল। সব রাজারাই বিপুল আয়োজন রাখিয়াছিলেন। সবাই বিশেষ রূপ আতিথ্য করিয়াছিলেন—আহারের সময় ৬০।৬৫টা বাটী প্রত্যেক পাতে পড়িত কিন্তু যেদিন রাধাবল্লভের প্রসাদ পাওয়া যায় সেদিন আরও বেশী—সেদিন ৭৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত বাটী ছিল—অথচ রাধাবল্লভ নিরামিষাশী লঙ্কা খান না লুচি খান না।

পুরাণ বাঙ্গলার একটা খণ্ড এখনও এখানে আছে বলিয়া মনে হইল।

এখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহার নাম সোজাসোজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটার, তিনি মুখে মুখে পদ্য লিখেন, তাঁহার কাগজও পদ্যে। তিনি এক আধারে এডিটার, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটার, ডেস্পাচার—তিনি কেবল দরদ্রাইবার নন। সেকালে তাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ক্লাসের তাঁড়। কিন্তু ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকেই হক কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার ভাঁড়ামক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।

জেমো ও কাশী হইতে ফিরিবার সময় মনটা বেশ একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

আরও এক কথা—সোমবার সকালে কাশী ইস্কুলের পারিতোষিক দান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি আমায় আহ্বান করায় আমি কৃতার্থ মনে করিলাম। কাশীর লোকে মাষ্টার মহাশয়েরা বিশেষ হেডমাষ্টার বাবু বেশ আয়োজন করিয়াছিলেন। ছেলেদের রিসাইটেশন গান পাঠ সব বেশ হইয়াছিল। হাজরা পাড়ার একটী ছেলে "ব্রজ গোপিকানন্দ" সুর ধরিয়া একটী গান গাহিল তাহা আমার কানে এখনও লাগিয়া আছে। রাবেন্দ্র বাবুর দৌহিত্র যে সতী যে সতী কাহিল পশুপতি এই গানটী গাহিল। তাহাও বেশ হইয়াছিল। মহারাজা ছেলেদের অনেক উপদেশ দিলেন। পাঁচকড়ি ও আমি ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালা পড়িতে বলিলাম। মহারাজা আমাদের প্রতিবাদ করিলেন। সকালটা বেশ কাটিয়া গেল।

[২রা জুলাই, ১৯২০]

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অর্থনীতি

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ পর্য্যন্ত বিংশ শতাব্দীর যে কয়টি ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহাদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অর্থনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। রুশিয়ার ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের মত রুজভেল্টের অর্থনীতিও এক নূতন আদর্শ এবং কর্ম্মপ্রণালী মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। চারিধারের অর্থসঙ্কট, বাণিজ্য-হ্রাস এবং বিবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যার দিনে রুজভেল্টের কর্ম্ম-পদ্ধতি যেন অনেকটা আশ্বাসবাণী আনয়ন করিয়াছে। আশা করিবার যে সাহসিকতা, চেষ্টা করিবার যে আনন্দ তাহাই রুজভেল্টের অর্থনীতির মূলসূত্র।

রুজভেল্ট তাঁহার নিজের Looking Forward বইখানিতে আমেরিকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন; "একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিতে খুব বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। যদি তাহাতে সাফল্যলাভ না হয় তবে তাহা স্বীকার করিয়া অন্য একটি কর্ম্মপদ্ধতি আরম্ভ করিবে। কিন্তু সব চেয়ে যাহা প্রয়োজনীয় তাহা হইল—কোন একটি পদ্ধতি ধরিয়া চেষ্টা করা। লক্ষ লক্ষ লোক বৈন্যে প্রপীড়িত হইয়া প্রতিকার দাবী করিতেছে তাহারা চিরদিন নীরবে সহ্য করিবে না; তাহাদের প্রতীকারের উপায় আমাদের অতি নিকটেই রহিয়াছে।.....আমরা চাই উৎসাহ ও কল্পনা, এবং বাস্তব যতই কঠোর হউক না কেন তাহার সম্মুখীন হইবার মত সাহস। আমরা যদি তরুণ হৃদয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারি তাহা হইলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা অতি সহজেই আমরা দূর করিতে সমর্থ হইব।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট শুধু কথার উপরেই তাঁহার সমস্ত কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করেন নাই। তিনি ঠিক আদর্শবাদীর মত একটি বিশাল ও বিপদ অর্থনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি আমেরিকার জনসাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্যও দৃঢ়পণ হইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজা বা সম্রাট বা জননেতা এরূপভাবে লোকের আর্থিক উন্নতি, শিল্পের উত্থান এবং বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কোনদিন চেষ্টা করেন নাই। মধ্যযুগে অনেক দেশে রাজকীয় আদেশে দ্রব্যমূল্য মাঝে মাঝে স্থিরীকৃত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার তুলনায় রুজভেল্টের কর্ম্মপদ্ধতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লবের মতই অর্থনৈতিক বিপ্লব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯১৪ সনের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মুদ্রাবিনিময়-হারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমেরিকার অর্থনীতি আরও অনেক ব্যাপক এবং তাহা জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে। কাজেই রুজভেল্টের অর্থনৈতিক প্ল্যান চিন্তা-জগতে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিবে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন।

ধনকুবের আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে অভাব ও অর্থ-সঙ্কট কেমন করিয়া এতটা বিস্তৃতি লাভ করিল, তাহা অনেকের কাছে আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্যান্য অনেক কারণ থাকিলেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করেন যে, আমেরিকার দুর্দ্দশার কারণ আর যাহাই থাকুক না কেন—প্রধান কারণ হইল, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বিশেষ একটি প্ল্যান বা কর্ম্মপদ্ধতির নিতান্ত অভাব। তিনি নিজের বইটিতে বলিয়াছেন: "আমেরিকার দুর্দ্দশা কোন প্রাকৃতিক বিপদপাতের জন্য হয় নাই; তাহার ধন-সম্পদ প্রচুর, উর্ব্বর ভূমি ও প্রতিভাশালী মস্তিষ্কেরও অভাব নাই। তথাপি তাহার অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে জাতীয় জীবনে কেবল একটি প্ল্যানের অভাবে। আমেরিকার বড় বড় ধনকুবেরগণ নিজেদের স্বার্থলাভের জন্য সমাজের ও দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়াও শিল্প-প্রগতির সহায়তা করিয়াছে। জন-সাধারণও সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদীর মতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের চিন্তাধারার মধ্যে না ছিল কোন পদ্ধতি এবং তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে না ছিল কোন প্ল্যান। সেই জন্য আজ অধিকাংশ কলকারখানা নিশ্চল ও কর্ম্মহীন হইয়া আছে, এবং লক্ষ লক্ষ সবল, সুস্থ ও বুদ্ধিমান নরনারী অভাবের তীব্র প্রেরণায় কাজের জন্য চীৎকার করিতেছে।"

এই দুরবস্থার আর একটি বিশেষ কারণ জাতীয় মূলধনের অসম বিভাগ। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবধান তাহা আমেরিকায় এতটা বাড়িয়া গিয়াছে যে আজ আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনবান হইয়াও লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মহীনতা ও দৈন্য দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রেসিডেন্ট এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কার্যে নামিয়াছেন। তিনি ধনিকের মূলধনকে কাড়িয়া লইতে চাহেন না বা তাহার কার্যকরী ক্ষমতাও নষ্ট করিতে চাহেন না; তিনি চাহেন যে জনসাধারণের হস্তে ক্রয়শক্তির প্রতীক অর্থ, উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হওয়া দরকার। জনসাধারণ যদি যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করে—বেকার-সমস্যার সমাধান যদি সম্পূর্ণ রূপে করা যায়, তবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চয়ই উন্নত হইবে; তখন তাহাদের ক্রয়শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে দ্রব্যক্রয়ের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে ব্যবসাবাণিজ্যও উজ্জীবনা লাভ করিবে। মোটের উপর, আমেরিকার অর্থনীতির সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল ইহাই। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আইন করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক টাকা নতুন করাইয়াছেন। তাহা দিয়া সরকারী রাস্তা ও পার্ক নির্মাণ, নগরের অপরিচ্ছন্ন অংশগুলির সংস্কার, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে শুধু যে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে তাহা নহে, লোকের হস্তেও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

অন্যদিক দিয়া মুমূর্ষুপ্রায় বাণিজ্যের উজ্জীবনার জন্যও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিবিধ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জাতীয় শিল্পের উজ্জীবনের জন্য যে এক ব্যাপক আইন (The National Industrial Recovery Act) প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্যের কর্মপন্থা রহিয়া গিয়াছে। তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করেন নাই। ইহার জন্য যতগুলি উপায় সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি এরূপ ভাবে কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের কুফলগুলি প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে। ১৯৩০ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্যহ্রাসের ফলে সমস্ত দেশে যে অর্থসঙ্কটের কারণ ঘটিয়াছে তাহার প্রতীকার করিবার জন্যই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একান্ত দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইয়াছেন:—আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালীর একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অভাবেই সমস্ত পৃথিবী আজ অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু, we must build toward time when a major depression can not occur again: আমাদের কর্ম-প্রণালী এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে এরূপ একটি অর্থসঙ্কট আর কখনও সংঘটিত হইতে না পারে।

অর্থনীতিবিদগণকে ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ লোকেও ভাল করিয়াই জানে যে, যদি দ্রব্যমূল্যের উত্থানপতন অত্যধিক পরিমাণে ঘটে তবে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয়। ব্যবসায়িগণ জানিতে পারে না যে বাণিজ্যের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে; আবার জনসাধারণও নিজেদের জমা ও খরচের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অসুবিধা ভোগ করে। কাজেই ব্যবসায়-জগতে এই অবাবস্থিত ভাবটির জন্য দেশে অর্থনৈতিক দুর্দশার অবধি থাকে না। একটি অনিশ্চয়তা ও লক্ষ্যহীনতা সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা আনে। বর্তমান অর্থ-সঙ্কটেও এই অবস্থাটি পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করেন যে, এই অবস্থাটি যাহাতে আর না ঘটিতে পারে সেই জন্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের সমাজজীবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের মুদ্রামান (currency standard)—যদি সম্ভব হয়—এরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার মূল্য মোটের উপর স্থিতিশীল থাকিতে পারে। আরও, এ পর্যন্ত স্বর্ণই সমস্ত দ্রব্যমূল্যের মাপকাঠি হিসাবে সম্মান পাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহাতে জগতের সমূহ ক্ষতিই ঘটিয়াছে। স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে এবং স্বর্ণের অভাব ঘটিলে অথবা অত্যধিক স্বর্ণ আমদানীর জন্য দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বা বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কাজেই সমস্ত জগতের অর্থনৈতিক মঙ্গল যদি এই একটি মাত্র ধাতুর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, তবে বর্তমান অর্থসঙ্কটের মত আরও অনেক আর্থিক বিপর্যপাত পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত

রহিয়াছে। সেই জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করেন—দ্রব্যমূল্যকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন স্বর্ণের উপর তাহার গতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর আর না করিতে হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে—অত্যধিক পরিমাণে অর্থের প্রচলন করা। কিন্তু তাহাতে বিপদের সম্ভাবনাও খুব বেশী থাকে; মুদ্রামানের ক্রয়ক্ষমতা এত দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, তাহাতে জনসাধারণের সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অসুবিধাই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের উপার্জনের হার নির্দ্দিষ্ট এবং যাহারা অল্পের বিনিময়ে টাকা পাইলে তাহাদের যথার্থ আয় তখন বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যেও বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তার জন্য দেশের প্রভূত ক্ষতি না হইয়া পারে না। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এই উপায় দ্বারা অধিকাংশ দেশেই লোকের ও গবর্ণমেণ্টের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু সকলেই জানে—তাহার পরিমাণ মোটেই শুভজনক হয় নাই। জার্ম্মেনীর মার্ক ও ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কাহিনী এখনও অর্থনৈতিক মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি না করিয়া পারে না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেই জন্য অত্যধিক মুদ্রা-প্রচলনের (inflation) উপায়টি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে বেশী পরিমাণে ঋণদান ও সেই পরিমাণে ব্যাঙ্কনোটের বেশী প্রচলন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাও বিবিধ নিয়মকানুন দ্বারা সীমাবদ্ধ। কাজেই অত্যধিক মুদ্রাপ্রচলনের কুফলগুলি তিনি এড়াইতে পারিবেন বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হইতে চলিয়াছে তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলারের বিনিময়-হার স্বর্ণমানে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই নির্দ্দিষ্ট হারের অবস্থিতিতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই—যেমন আমাদের টাকার বাট্টাহার ষ্টার্লিং (sterling)-এর সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকায় আমাদের দ্রব্য-মূল্য অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং বহির্বাণিজ্যে আমাদের লাভের পরিমাণও যথেষ্ট কমিয়া যাইতেছে। আমেরিকাতেও আমদানী রপ্তানীর চেয়ে বেশী হইতেছিল এবং তাহার ফলে সরকারী বাজেটে বৎসরের পর বৎসর ঘাটতি পড়িতেছিল। কাজেই ডলারের এই নির্দ্দিষ্ট বাট্টাহার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গত এপ্রিল মাসে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফলে ডলারের মূল্য অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে এবং দ্রব্যমূল্য গত এপ্রিলের তুলনায় নবেম্বরে শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে মিল ও কারখানার মালিকগণ যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহা নয়, কৃষক সম্প্রদায়ও তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অধিকতর অর্থ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এবং তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের পুনরুত্থান অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছে।

এখন অনেকে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন যে, ডলার যখন স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়-বাজারে ছটাছুটি করিবে, তখন তাহার অত্যধিক পতন সম্ভবপর হইতে পারে, এবং তাহাতে কি আমেরিকার বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না? ইহার উত্তরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিতেছেন যে, বাহিরের বিনিময়-হারের অস্থিরতার জন্য যতটা ক্ষতি হয়, তাহার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয় আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য যদি স্থিতিশীল না থাকে; ঘরের শৃঙ্খলা সবার আগে, তাহার পর বাহিরের শৃঙ্খলা স্বাভাবিক ভাবেই আসিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ইহা বলিলেও ডলার যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে নিম্নগতি লাভ না করে, সে জন্য তিনি বাহির হইতে স্বর্ণ ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উপায় ঠিক নূতন নয়, কেন না ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখনও আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য "বিনিময় সমতারক্ষণকারী" (Exchange Equalisation Fund) তহবিলের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমেরিকাও ডলারের বিনিময়-হার এই উপায় দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে ডলারের উত্থান পতন এ পর্য্যন্ত ভয়ানক কিছু হয় নাই। অনেকে বলিতেছেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই স্বর্ণক্রয়প্রণালীর সাহায্যে ডলারের গতিবিধি স্থিতিশীল রাখিতে প্রয়াস পাইবেন এবং অবশেষে এরূপ এক অবস্থায় আনয়ন করিবেন যেখানে ষ্টার্লিংএর বিনিময়-হারের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে।

রুজভেল্টের সমগ্র অর্থনীতি তথাকথিত গোঁড়া অর্থনীতিজ্ঞদের পরিপন্থী নহে। স্বল্প পরিসরে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে, কিন্তু তিনি জাতীয় জীবনের কত দিকে তাঁহার কর্মপদ্ধতিকে নিয়োজিত করিতে চাহেন তাহা Looking Forward বইখানির সূচী দেখিলেই সম্যক অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, তিনি অতীতের কর্মপ্রণালীর দোষত্রুটি সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, একটি জাতির পক্ষে Economic Planning বা বিশেষ একটি অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি থাকা কত দরকার। তাহার পর কৃষিকে সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা কি ভাবে উন্নততর ও সমধিক উপযোগী ব্যবহারে নিয়োজিত করা যায়, গবর্ণমেণ্টের কি কি ভাবে সংস্কার হওয়া কর্তব্য, শুল্কস্থাপন এবং জাতীয় কার্যে কতটা অর্থব্যয় প্রয়োজনীয়—সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং কর্মপদ্ধতিও নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষির উন্নতি, রেলওয়ে সংস্কার, বিদ্যুৎ, ক্ষমতা প্রভৃতি শক্তির সদ্ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,—ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কেও অনেক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন।

এক কথায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শুধু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বা বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহার অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীকে আইনের সাহায্যে কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার দৃষ্টি শুধু বর্তমানের সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; তিনি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমেরিকাকে স্থায়ী সুখসমৃদ্ধি ও সমস্ত জনসাধারণের সহজ জীবনসংগ্রামের দিকেই পরিচালিত করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যে ব্যাপক আইনসমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক জাতির শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত। এই বিংশ শতাব্দীর যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অদৃষ্টবাদের বা laissez faire policy র দিন চলিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক জাতীয়তা বা Economic Nationalism প্রত্যেক দেশে যতই বিস্তার লাভ করিতেছে, ততই জাতীয় জীবনে Planned Economyর বিশেষ ভাবে প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা ভাবিলে এইরূপ একটি উদ্দেশ্যযুক্ত কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনই সবচেয়ে আগে মনে হয়।

রাজমোহনের স্ত্রী

(পূর্বানুবৃত্তি)

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[মাধব ও তারা]

শৈশব হইতেই মাধব ও তারা পরস্পর পরিচিত। তারার পিতা ও মাধবের মাতামহ একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; শৈশবাবস্থায় মাধব ঘন ঘন সেখানে যাতায়াত করিত, তারা এই সময়ে তাহার খেলার সঙ্গিনী ছিল। দূর হইলেও তাহাদের পরস্পরের একটা সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক হেতুই অতি শিশুকাল হইতে তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া খেলা করার সুযোগ পাইয়াছিল। তারা মাধব অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বড় হওয়া সত্ত্বেও মাধব তাহাকে 'তারা' বলিয়াই ডাকিত। মথুরের সহিত তারার বিবাহ হইলেও তাহাদের পরস্পরের মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই, শৈশবের অবাধ মিলনের ফলে যে প্রীতি তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুভব করিত তাহা অক্ষুণ্ণই ছিল।* মুড়ীর সহিত মাধবের মকোদ্দমার অপরিমিত বিষয়লোলুপতাবশতঃ গোপনে গোপনে মথুর তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, একথা মাধবের অবিদিত ছিল না এবং সেই হইতেই দুই জ্ঞাতিভ্রাতার পরস্পর সৌহার্দ্যে ছেদ পড়ে, পূর্বে যে মাধব ঘন ঘন মথুরের গৃহে যাতায়াত করিত তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। মথুর অপেক্ষা মাধব বয়সে অনেক ছোট হওয়ার দরুণ জেনানা আইনে তারার সহিত মাধবের প্রাণখোলা কথাবার্তা আলাপ-আলোচনায় বাধিত না; মাধবও যথাসম্ভব এই সুযোগ লইতে ছাড়িত না। পরস্পর এইভাবে ভাবের আদান-প্রদান উভয়ের পক্ষেই প্রীতিকর ছিল, কারণ উভয়ে উভয়কেই শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু এই সপ্রীতির মধ্যে মনের কোনও কলুষ ছিল না। শৈশবের ভালবাসা পরবর্তী জীবনে প্রতিদিনকার ব্যবহারে এবং পরস্পরের নৈতিক

আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিল,ভ্রাতা ও ভগিনীর ভালবাসার সহিত যাহাকে পৃথক করা যায় না।

এতদূরেও গুদামমহলে মাধব ও তারা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন উভয়েই অবস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালের জন্য কেহই কোনও কথা বলিতে পারিল না। তারা প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল। বলিল, মাধব, তুমি এখানে ?

মাধব পালটাইয়া তারাকে প্রশ্নটা করিতে পারিল না এবং কি জবাব দিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারাও এই অদ্ভুত অবস্থাবিপর্য্যয়ে পড়িয়া বিমূঢ় হইয়াছিল কিন্তু এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা সহজেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। তাহার নিজের চরিত্রের উপর যথেষ্ট আস্থা ছিল এবং অপরপক্ষের নিকট হইতেও ভয়ের যে কোনও আশঙ্কা নাই তাহাও সে ভাল করিয়াই জানিত; তাহার প্রতি মাধবের শ্রদ্ধা যে কতখানি তারার তাহা জানিতে বাকী ছিল না। সুতরাং ব্যাপারটার একটা সুরাহা হওয়া প্রয়োজন এই বিবেচনা করিয়া তারা প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপো, প্রথমে আমাকে বল যমদূতের মত যে দুজন লোক এখনই ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা কে ? ও ধরণের লোকের সঙ্গে এখানে আমাদের বাড়ীতে তোমার কি দরকার থাকতে পারে তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আমি যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে কটমট করে চেয়ে ছিল, আমাকে পেত্নী ভেবেই বোধ হয় ভয়ে পালিয়ে গেল।

—তাহলে তুমিই ওই দরজাটা খুলে শেকলের আওয়াজ করেছিলে ?

—হ্যাঁ, দরজা আমিই খুলেছিলাম বটে, দরজা খুলে তুমি যে ঘর থেকে বের হলে সেই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ এই ছুটো যমদূতকে দেখে ভয় পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম।

—কিন্তু ওই শব্দ আসছিল কোত্থেকে ?

—শব্দ ?

—তুমি অদ্ভুত কোনও আওয়াজ শোননি ?

—শুনেছি, যন্ত্রণার চাপা আর্ত্তনাদ, আমার মনে হ'ল সেটা তোমার ঘর থেকেই আসছিল।

—না।

—না ? আমাকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাচ্ছ না ? তাহলে আমি ফিরে যাব।

—আমি এখানে কেন এসেছি না জেনেই ফিরে যাবে ?

—না না, বল তুমি এখানে কেন এসেছ, আমার এখানে আসার কারণও বলব। তাড়াতাড়ি কর।

মাধব জবাব দিল, স্বচ্ছন্দে—কিন্তু তার আগে একটু সাবধান হয়ে নি-ই। একথা কেন বলছি ক্রমশঃ বুঝতে পারবে।

মাধব একবার বাহিরে গেল এবং গুদামমহল হইতে বাহিরে যাইবার দরজার ভারী হুড়কোটি খুলিয়া দিল। তাহার পর যে ঘরে কয়েদ ছিল, সেই ঘরেই সে ফিরিয়া গেল—তারাকে সঙ্গে যাইতে বলিল। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে সে তাহার বন্দী হওয়ার ইতিহাস বলিতে সুরু করিল। সে কিছু গোপন করিল না অথবা বাড়াইয়া বলিবারও চেষ্টা করিল না। তাহার মনে ঘৃণা ও বিরক্তির লেশ ছিল না এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে তারা তাহার স্বামীকে যতই ভালবাসুক তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা কিছুতেই তাহার ঘৃণিত ব্যবহারকে সমর্থন করিতে দিবে না। তারা ঘন্ঘন ছটফট করিতে লাগিল, নৈরাশ্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

তারা বলিল, তাহলে আমি যা খুঁজতে বের হয়েছি তুমি তা নয়, তুমি সবে এই সন্ধ্যায় এখানে এসেছ, কিন্তু যে সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে আমি এখানে এসেছি, দুদিন আগে সেই সন্দেহের কারণ ঘটেছে।

তারা কেন সেখানে উপস্থিত হইয়াছে তাহা খুলিয়া বলিল। পাঠককে তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বামীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া সে নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় নিজে পীড়িত হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর চিন্তার কোনই কারণ স্থির করিতে পারে নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সে জবাব পায় নাই। সে লুকাইয়া লুকাইয়া স্বামীকে চোরের মত গুদামমহলের দিকে যাইতে দেখিয়াছে এবং তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কারণ সেখানেই নিহিত। গুদাম-মহলে যেমন করিয়া হউক, প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া সে সেই কারণ জানিবে, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘুমন্ত

স্বামীর বালিশের তলা হইতে চাবি চুরী করিয়া সে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

তারা বলিতে লাগিল, সেই চুরী-করা চাবি দিয়ে আমি যখন এই ভীষণ-দর্শন সেওয়ানের ধারে ধারে এই অন্ধকার পথে আসছিলাম তখন আমার মনে আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ও বৈরাগ্যের যে-দ্বন্দ্ব চলছিল তা তুমি অনুভবে বুঝতে পারবে, তা বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নাই। কিন্তু ফিরে যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না, কোনও অজানা অপার্থিব শক্তি যেন আমাকে টেনে আনছিল। আমার স্বামীর দুঃখ যদি আমি প্রাণ দিয়েও ঘোচাতে পারতাম, তাহলে প্রাণ দিতেও আমি দ্বিধা করতাম না। সুতরাং দেবে দেখ, তোমাকে দেখে আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল প্রথমটা। আমার স্বামীর দুশ্চিন্তার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তুমি বলছ তুমি মাত্র আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছ। তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে।

প্রত্যুত্তরে মাধব বলিল, তোমাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না—ওই যে শব্দ—তুমি কোনও শব্দ শোন নাই? রহস্যের সমাধান এখনও হয় নাই।

তারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

মাধব বলিল, ভয় পেও না, ভয় পাবার কিছু নাই। আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি তা বলছি। তুমি যদি আমাকে কথা দাও যে অনাবশ্যক ভয় তুমি পাবে না তবেই বলব। কথা দাও।

তারা বহুকষ্টে চাপা গলায় বলিল, বল। মাধব তখন ডাকাতদের সহিত কথোপকথনকালে যে সকল শব্দ শুনিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিল। সে যতদূর পারিল এমন ভাবে বলিল যাহাতে তারা ব্যাপারটিকে কৌতুক কিছু মনে না করে।

অত্যন্ত ঘনীভূত দুশ্চিন্তায় তারা পীড়িত হইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা দার্শনিক নহে, ভূতের ভয় তাহারা স্বভাবতই করিয়া থাকে। তারার মনে এই ভূতের ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও ছিল। স্বামীর দুশ্চিন্তার কারণ খুঁজিতে আসিয়া তদ্রূপ এমন কিছুর সন্ধান যে পাইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। তাহার অনুতাপও হইতেছিল। সে মাধবকে তাহাকে বাড়ীর ভিতরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল।

মাধব উত্তেজিত হইয়া বলিল, এত সহজেই হাল ছেড়ে দেবে? আমি তোমাকে শপথ করে বলছি যে ভয়ের কোনই কারণ নাই। মাধবের কৌতূহল এত অধিক পরিমাণে উদ্রিক্ত হইয়াছিল যে, সে নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা এমন কি তারার সঙ্গে এভাবে এমন স্থানে এমন সময়ে একাকী থাকা যে নিন্দনীয় তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতেই হইবে।

তারা কিয়ৎকাল নীরব রহিল। পরে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কিন্তু খুঁজবে কোথায়? ডাকাতরা কি কোনও জায়গা খুঁজতে বাকী রেখেছে?

—খুঁজেছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা জায়গা তারা দেখেনি। ওই যে দরজা দেখছ—মাধব আঙুল দিয়া একটা ছোট লোহার দরজা দেখাইল—ওটা এখনও খোলা হয় নাই।

—ওটা নিশ্চয়ই ওঘরে যাবার পথ, ডাকাতরা তো ওঘরটা দেখেছে।

এই সময়ে আবার সেই চাপা কাতর আর্তনাদ শোনা গেল। খুব স্পষ্ট, যেন অতি নিকটে কোথায়ও। শ্রোতা দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। যন্ত্রণার সেই আর্তস্বর যেন উভয়কেই পীড়া দিতেছিল।

মাধবের মাথার মধ্যে যেন কে কষাঘাত করিল—একটা অবর্ণনীয় বাথায় সেও যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল। তারার হাত হইতে সজোরে চাবির গোছা ছিনাইয়া লইয়া সে লাফ দিয়া সেই লোহার দরজার সমীপবর্তী হইয়া হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া চাবির গর্ত্তে একটি চাবি ঢুকাইয়া দিল। কিন্তু চাবি ঘুরিল না। মাধব উন্মত্তের মত পর পর আরও দুইটা চাবি প্রয়োগ করিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। মাধব পারিলে সেই ধাতুময় দরজা ভাঙিয়া ফেলিত, কিন্তু চতুর্থ চাবির প্রয়োগের পর তাহার আর প্রয়োজন হইল না। চতুর্থ চাবিটি লাগাইতেই ছিটকের দরজা এমন সজোরে খুলিয়া গেল যে মনে হইল যেন হাওয়ায় একটা পালক উড়িল।

উত্তেজিত মাধবের তখন কোনও জ্ঞান নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, তারা তারা, দেরী করো না। আমার পেছনে

পেছনে এলো। বলিয়া সে পাগলের মত দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিল, উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার গা ছড়িয়া গেল।

তাহার মনেও তখন সেই উত্তেজনা সংক্রামিত হইয়াছে, তারা আলো লইয়া অগ্রসর হইল। আনন্দ ও বিস্ময়ে নির্বাক মাধব ইটের একখাপ সিঁড়ি আবিষ্কার করিয়াছে। সিঁড়ি খুব সঙ্কীর্ণ ও খাড়া। মাকড়সার জালে ভর্তি। বাক্যব্যয় না করিয়া মাধব লাফে লাফে সেই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় তারাও দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি পার হইয়া একটি দরজা—আপাত-দৃষ্টিতে খোতলার কোনও ঘরেরই দরজা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে খোতলা নয়। ঘরটির উচ্চতা দেখিয়াই মাধব বুঝিতে পারিল যে তাহা একটি চোরা কুঠরি—অতি কৌশলে সকলের দৃষ্টিকে প্রতারিত করিবার জন্যই কুঠরিটি নির্মিত। বাড়ীর অন্য কোনও স্থান হইতে এই কুঠরি পরিলক্ষিত হয় না, কারণ একই কামরাকে উপর নীচে ভাগ করিয়া দুইখানি কামরা করা হইয়াছে; পাশের অন্যান্য কামরা ও বারান্দার উচ্চতা এই দুই কামরার সম্মিলিত উচ্চতার সমান হইলেও কোন স্থান হইতে তুলনা করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। উপরের কুঠরি একেবারে জানালাবর্জিত।

মাধব কম্পান্বিত দেহে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় এই দরজার তালা খুলিতে চেষ্টা করিল; দুই তিনবার বিফল হইয়া আকস্মিক চেষ্টায় রক্তাক্ত আঙুল লইয়া মাধব শেষে সে দরজাও খুলিয়া ফেলিল। ঝন ঝন শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনিতে কক্ষ মুখর হইল। তারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল, তাহার হাতে প্রদীপ, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাহারা একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিল। বার্নিশ-করা মেহগনির একটি খাট—ক্রেপের কাপড়ে ঢাকা, এবং খাটের উপর একটি নারী মূর্তি। তারা ও মাধব উভয়েই ছুটিয়া খাটের নিকটে গেল। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকেই শয্যোপরিষ্ঠিত মূর্তিটি প্রকট হইয়া যাহার কথা মনে করাইয়া দিল সে মাতঙ্গিনী; শীর্ণ কৃশ কিন্তু তথাপি অপার্থিব রূপ, সুন্দর।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[অনেক নারী অনেক পুরুষের সমক্ষে]

তারা ও মাধব মাতঙ্গিনীর প্রাণ-নির্জীব দেহখানি ধরাধরি করিয়া এমন একটি ঘরে লইয়া গেল যেখানে অন্য কাহারও হঠাৎ প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না, তাহার অসাধারণ দেরাদ্ব এবং বদ্ধ বায়ুতে অনেক দিন থাকার পর নির্মল মুক্ত বাতাসের স্পর্শে তাহার বিবর্ণ মুখ রক্তাভ হইল এবং উষার অরুণরাগ পূর্বগগন রঞ্জিত করিবার পূর্বেই মাতঙ্গিনী পুনর্জীবন লাভ করিল। তাহাকে আহার্য দেওয়া হইল কিন্তু মাতঙ্গিনী সামান্যই আহার করিল। কিন্তু তাহাতেই সে অনেকটা বল পাইল। তারা জানালার উপর বসিয়া ধূসর পূর্বাকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া মাতঙ্গিনীর দুঃখের ইতিহাস শুনিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সে কেমন করিয়া জীবিত অবস্থাতেই মৃতের কবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই বলিতেছিল।

সংক্ষেপে সেই অন্ধকার ইতিহাস এইরূপ। মধুর ঘোষ সুকোর মায়ের সঙ্গে যখন তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল তখন মাতঙ্গিনী ধারণা করিতেই পারে নাই যে কি সাংঘাতিক রাক্ষসের কবলে সে পতিত হইয়াছে। সুকোর মাও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিল, পথে যাইতে যাইতে সে মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর ঘরে তাহার ফিরিয়া যাইতে ভয় হইতেছে কি না।

মাতঙ্গিনী উত্তর করিয়াছিল, সুকোর মা, সত্যি কথা বলতে কি, যদি পৃথিবীতে অন্য কোথাও বাবার বাড়ী আমার থাকত তাহলে সেখানে আমি ফিরতাম না।

সে পয়তানী বলিয়াছিল, সত্যি? আমি কিন্তু তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারতাম। আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারি যেখানে কেউ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

মাতঙ্গিনী অনেক চিন্তা করিয়া বলিয়াছিল, না, আমি লুকিয়ে থাকব না; দুষ্টলোকে দুষ্টমি রটনা করতে পারে।

—তা হলে তোমার বোনের বাড়ী চল না কেন!

মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, না পারে না।

বুড়ী কৌশলী কম নহে, সে মাতঙ্গিনীর অসহায় অবস্থার সুবিধা লইয়া তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইবার ভাণ করিল এবং পরিশেষে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিল।

মাতঙ্গিনী দুঃখিতভাবে বলিল, কিন্তু যাবার খরচ তো নাই।

—ও! তা সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বড়গিন্নী নিশ্চয়ই তোমাকে নৌকো ভাড়া করে দেবেন, আমি সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সেখানে রেখে আসব।

মাতঙ্গিনী কাঁদিয়াছিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়াছিল।

—আমি গিয়ে তা হলে এ কথা বড়গিন্নীকে বলি?

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মাতঙ্গিনী বলিয়াছিল, তাই বল গিয়ে।

—তাহলে আমি তোমাকে যেখানে রেখে যাব সেখানেই চুপ করে থাক, কেউ সেখানে তোমাকে দেখতে পাবে না। এস।

সেই শয়তানীকে অনুসরণ করিয়া মাতঙ্গিনী পূর্বপরিচিত গুদাম-মহলের চোরা-কুঠরিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ভয়াবহ নির্জন সেই কক্ষে উপস্থিত হইবার পূর্বেই ভয়ে মাতঙ্গিনীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই নির্জন অন্ধকার ঘরের অপরূপ সজ্জা দেখিয়া সে বিস্মিতও হইয়াছিল। সুকোমে মাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সে আরও চমৎকৃত হইয়া দেখিয়াছিল যে বুড়ী অন্তর্ধান করিয়াছে এবং বাহির হইতে দরজাও বন্ধ।

বুদ্ধিমতী মাতঙ্গিনী অবিলম্বে বুঝিতে পারে যে সে ফাঁদে পা দিয়াছে এবং সেই অবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই।

সন্ধ্যায় মধুর ঘোষ আসিয়া আপনাকে তাহার চরণপ্রান্তে নিক্ষেপ করে, মাতঙ্গিনী তাহাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় আহত ও বাধিত মধুর মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয় যে, যেমন করিয়াই হউক সে তাহার প্রতিহিংসা ও লালসা চরিতার্থ করিবে।

মধুর বিদায় লইবার সময় পৈশাচিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলে, তোমাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, প্রাণেশ্বরী।

মাতঙ্গিনীর দৃষ্টিতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কুড়িজন পুরুষের দৃষ্টি প্রতিহত হয়। সে বলিল, কখনও না, তোমার আমি কখনই হব না।—তারপর সে মধুরের ঠিক সম্মুখে গিয়া দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর করিয়া বলিয়াছিল, দেখ, আমার দিকে চাও, আমি নারী হলেও যুবতী, গায়ের জোর তোমার চাইতে আমার কম নয়—না, তুমি বুঝি সাঙ্গোপাঙ্গ ডাকবে?

মধুর ঘোষ শক্তিপরীক্ষার এই অপরূপ আহ্বানে স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মস্থ হইয়া সে বলিয়াছিল, তোমার জন্যরাত্রি আমার সাহায্য করবে, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র অস্ত্র প্রয়োগ করি না।

মাতঙ্গিনী বলিয়াছিল, হাঁ, উপবাসই আমার একমাত্র সম্বল।

মধুর স্থির করিয়াছিল মাতঙ্গিনীকে খাইতে না দিয়া তাহার প্রস্তাবে রাজী করাইবে, মাতঙ্গিনী স্থির করিয়াছিল সে উপবাস করিয়া মরিবে।

উভয়ে উভয়ের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল। মধুর প্রত্যহ একবার দেখিয়া আসিত তাহার ওষুধ ধরিতেছে কিনা। মাধব যখন মাতঙ্গিনীকে উদ্ধার করিল তখন সে অনাহারে মৃতপ্রায়।

ভোর হইবার পূর্বেই মাধব চলিয়া গেল, দুর্বলতাবশতঃ মাতঙ্গিনী তখনই যাইতে পারিল না; মাধব ও তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাতঙ্গিনী তারার কাছেই থাকিবে, করুণা আসিয়া সন্ধ্যার পর তাহাকে লইয়া যাইবে।

মাধবকে নিরাপদে বাড়ীর বাহিরে পাঠাইয়া তারা মাতঙ্গিনীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, এবার তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পালা তাহার, এই বলিয়া সে সাবধান হইবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারা তারপর স্বামীর কক্ষে ফিরিয়া চাবির গোছা যথাস্থানে রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিল, যেন রাত্রিকালে সে বাড়ীতে একটি মুহূর্তও নড়াচড়া করে নাই, এইরূপ ভাব। শয়ন করিয়া তারা কি নিদ্রা যাইতে পারিল? না, সে স্বামীর গোপন কথাটি জানিয়াছে এবং তাহার উদার মনে সে জ্ঞান অসহ্য দুঃখ বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই রজনীর ধূসরপটে যাহার যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিশ্বস্তা এবং প্রেমময়ী পত্নীই তাহাদের মধ্যে যন্ত্রণা ভোগ করিল সর্বাপেক্ষা অধিক—স্বামীর গুপ্ত রহস্যের অবগুণ্ঠনে সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

মাতঙ্গিনী সমস্ত দিনটা তাহার নির্জন কক্ষে নিরাপদে কাটাইল। সন্ধ্যার পরে করুণা পূর্ব বন্দোবস্তমত আসিয়া

তাহাকে লইয়া গেল। বহুদিনের দুর্দশা ও দুঃখভোগের পর মাতঙ্গিনী হেমাঙ্গিনীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

মিলনের আনন্দ কতকটা প্রশমিত হইলে হেম বলিল, দিদি, তুমি বল, আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না।

মাতঙ্গিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল।

হেম অস্থির ভাবে বলিয়া উঠিল, দিদি, জবাব দিচ্ছ না কেন? হায় হায়, আবার বুঝি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে!

হতাশ হেম পুনরায় বলিল, আচ্ছা দিদি, তুমি কার হুকুমে আমাদের ছেড়ে যাবে?

মাতঙ্গিনী বলিল, বাবার কাছে যাব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[জীবন-গ্রন্থের শেষ অধ্যায়—এবং এই গ্রন্থেরও]

সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় বহিল, চারিদিক কালো হইয়া আসিল। বাতাসের গর্জন, সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রাম বৃষ্টির ধারা, বজ্রনিনাদে আকাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মথুর ঘোষ একা বসিয়া ছিল। সে যেন ঝড়ের মুহুর্মুহু বিশ্রামের মধ্যে শাঁখের ধ্বনির মত একটা শব্দ শুনিতে পাইল—তাহার মনে হইল, দুইবার সে যেন তাহা স্পষ্ট শুনিয়াছে। প্রথমটা সে ভাবিল, যাহাদের সাহায্য তাহার জীবনে কলঙ্ক ও দুর্দশা আনয়ন করিয়াছে তাহাদের আহ্বান সে আর গ্রাহ্য করিবে না—কিন্তু ইসারার শঙ্খ প্রতিবারেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল, আহ্বানের গুরুত্ব মথুর ক্রমশঃই অধিক অনুভব করিল। অবশেষে সে উঠিয়া পড়িল এবং কড় মাথায় করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল—এই স্থানেই বহু কলঙ্কিত অভিনয়ের সূচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে। একটি গাছের নীচে যে মূর্তিটি দণ্ডায়মান ছিল দস্যু-সর্দার বলিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে মথুরের বিলম্ব হইল না।

একটু ব্যঙ্গ করিয়াই মথুর বলিল, ব্যাপারখানা কি? তোমাদের সঙ্গে অনেক খেলাই হ'ল, এবার আমাকে রেহাই দাও। কলঙ্ক যথেষ্ট হয়েছে—যথেষ্ট বিশ্বাস-ঘাতকতা তোমরা করেছ।

সর্দার শান্তভাবে জবাব দিল, ছোচ্চুরির কাজ আমরা কিছু করিনি, যথাসাধ্য ভাল করতেই চেয়েছিলাম। আমাদিকে যারা সঙ্গী করে, শাস্তি তাদের শেষ পর্যন্ত ভোগ করতেই হয়।

শয়তান মহাপুরুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে সুরু করিল! পাঠককে প্রশ্ন করি, সে কি অন্যায় করিতেছিল?

মথুর রাগতভাবে বলিল, আমাদের যে আর কোনও সম্পর্ক নাই তা তুমি নিজেই ভাল জান। এই ঝড়ের রাতে আমাকে ডাকলে কেন?

বিষণ্ণ সর্দার বলিল, কারণ? কারণ এই দলের ছাড়া বাইরে বের হবার উপায় নাই। জান তো পুলিশ আমাদের পিছু নিয়েছে।

—তাহলে একেবারে রাধাগঞ্জ ছেড়ে যাও না কেন?

সর্দারের মুখে পুরান বাঁকা হাসি যেন একবার ফুটিয়া উঠিল, তুমি তো আগে এধরণের কথা বলতে না বাবু, এখন বুঝি দিন খুব খারাপ পড়েছে! যা পার তাই, কিন্তু একথা তোমাকে বললে বিশ্বাস করবে যে আমরা যাদের কাজ করি অপরা যায়। আমাদের কাজ করে সকলের সম্বন্ধেই আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি।

মথুর প্রশ্ন করিল, মানে?

বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে সর্দার বলিল, যে এতদিন ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত দেখছ সে সঙ্গে নাই।

—তা তো দেখ্‌ছি, সে লোকটা গেল কোথায়? তার নামটা কি যেন? ভিখু না?

—সে ধরা পড়েছে।

মথুর চমকাইয়া উঠিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে প্রশ্ন করিল, আরো কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

সর্দারের স্বর হতাশাপূর্ণ, তাও ঘটেছে বাবু, ভিখু সব স্বীকার করেছে।

মথুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি স্বীকার করেছে?

হতাশ সর্দার বলিল, অনেক কিছুই। যা বলেছে তাতেই তোমাকে আর আমাকে কালাপানি পার হতে হবে। আমি কিন্তু ধরা দিচ্ছি না। রাধাগঞ্জে এই আমার শেষ। তুমি আমাদের ভাল করতে চেয়েছিলে, পাছে কেউ কোনদিন বলে যে তোমার ভাল আমরা করিনি তাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দস্যু-সর্দার কোণের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মথুর বাড়ী ফিরিয়া ঘণ্টা দুয়েক ভাবিল—তাহার মনের জোর ছিল, সহজেই সে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল। সে জানিত, পুলিশ অর্থলোলুপ, অসৎ; তাহার অর্থের অভাব নাই; পুলিশকে ঘুষ দিয়া সে বশ করিবে। কিন্তু এক জায়গায় একটু গোল ছিল। সদরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনে একজন ধূর্ত অতি চতুর আইরিশম্যান অধিষ্ঠিত এবং সব কিছু ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করার বদ্ স্বভাবও তাঁহার ছিল। তিনি প্রায়শই পুলিসের অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মথুর ঘোষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল যে যেমন করিয়াই হউক সেই অনধিকার-চর্চ্চাকারী আইরিশম্যানের কাছে ভিখুকে দিয়া তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করাইবে।

কে একজন ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করাতে তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল: তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বৃষ্টির জল ঝরিতেছে, কাদায় গা মাখামাখি। আগন্তুক জিলাকোর্টে তাহারই নিযুক্ত একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

লোকটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবু পালান, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করবেন না।

বিমূঢ় মথুর বলিল, ব্যাপার কি?

—ভিখু নামের যে একজন আজ বেলা এগারটার সময় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছে যে সে কতকগুলি ডাকাতি আর রাহাজানি আপনার কথাতেই করেছে—নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলেছে হুজুর।

মথুর ধড়াচালিতের মত বলিল, কি? ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেই স্বীকার করেছে?—তাহার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

কর্ম্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, স্বীকারোক্তি লেখা হবার পরেই আমি এখানে রওয়ানা হয়েছি; সাহেব রওয়ানা হবার উদ্যোগ করছেন দেখে এসেছি: আমার মনে হচ্ছে রাতের মধ্যেই তিনি রাধানগরে পৌছবেন।

মথুর আবার ধড়ের মত উচ্চারণ করিল, রাধানগরে—রাত্রির মধ্যেই।

লোকটি আবার বলিল, পালান হুজুর, শীগ্‌গির পালান।

মথুর আবার সেই ভাবেই বলিল, হাঁ, পালাব।

লোকটি চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে সেই ব্যস্তবাগীশ আইরিশম্যান মথুর ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মথুর ঘোষকে হাতে হাতকড়ি পরাইতে। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী একদল কনষ্টেবল এবং অসংখ্য জনতা। ম্যাজিষ্ট্রেট জাতীয় জীবটি দেখিতে কেমন এবং কি ধরণের খেলা তিনি খেলিতে আসিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া গলা বাড়াইতে লাগিল। মথুর ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

শেষে মথুর ঘোষকে পাওয়া গেল, গুদাম-মহলের যে ঘরে মাধবকে এবং তাহার মত অন্যান্য অনেককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল ঠিক সেই ঘরেই স্বয়ং গৃহকর্ত্তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

সহৃদয় পাঠক, আমাদের গল্পের সমাপ্তিতে আসিয়া পৌছিয়াছি। পাছে কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলাম না বলিয়া আমাকে দোষী করেন সেইজন্য এই গল্পের অন্যান্য ব্যক্তিদের কি হইল বলিতেছি।

সর্দ্দার নির্ব্বিবাদে পলায়ন করিল কিন্তু রাজমোহন পলাইতে পারিল না—ভিখুর স্বীকারোক্তির ফলে সে জীবন ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল—ধৃতও হইয়াছিল। বেকসুর খালাস পাইবার প্রত্যাশায় সেও স্বীকার করিল কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখাইতে গিয়া পুরা স্বীকার না করায় ভিখু এবং রাজমোহন উভয়কেই দ্বীপান্তরে পাঠানো হইল।

মাধবের গৃহে মাতঙ্গিনী বাস করিতে পারিল না—উভয়েই তাহার কারণ বুঝিল; সুতরাং তাহার বাবার কাছে সংবাদ পাঠানো হইল। তিনি আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাধব তাহার জন্য সেই বৃদ্ধের মাসহারা বৃদ্ধি করিয়া দিল। তাহার জীবন কি ভাবে সমাপ্ত হইল তাহার ইতিহাস নাই তবে এইটুকু জানা যায় যে সে অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তারা তাহার অনুপযুক্ত স্বামীর অসময় জীবনান্তের কথা নীরবে আজীবন স্মরণ করিত। সে শান্তিতে সুদীর্ঘ বৈধব্য-জীবন কাটাইয়া দিল এবং যখন সে প্রাণত্যাগ করিল তখন বহুলোকে তাহার জন্য শোক করিল।

মাধব চন্দক ও অন্যান্য সকলের মধ্যে কেহ কেহ মরিয়াছে এবং বাকী সকলেই মরিবে। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে এবং অভিযানের ইতিহাসের উপরও এইটুকু আলোক-পাত করিয়া হে সহৃদয় পাঠক, আমি বিদায় লইলাম।

বড়দিনের বাজার

—শ্রীকিরণকুমার রায়

ছেলেমেয়েদের জন্য শীতের জামা-কাপড় দরকার। হাতে পয়সা নাই, মাসের বাকী কয়দিন সংসার-খরচ চলাই দায়। এমন সময়ে একদিন সকালে মনি-অর্ডার পিওন আসিয়া হাজির। ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের ডিভিডেণ্ডের টাকাটা আসিয়াছে। হীরেন সহি করিয়া টাকাটা লইল। উৎফুল্ল হইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া লতাকে কহিল,—ওগো, কটা টাকা পাওয়া গেছে। ভাবছি, ছেলেমেয়েদের জামাগুলো ক'লকাতা থেকে কিনে নিয়ে আসি, তুমি একটা ফর্দ্দ ক'রে দাওতো, ঐ সঙ্গে সংসারের জন্য যা-দরকার তাও লিখে দিয়ো।

লতার ফর্দ্দ তৈয়ারি হইল।

বারকোষ—১টি, লুচি বেলিবার জন্য বেলুন—১টি, বড় কড়াই—১টি, টিফিন-কেরিয়ার—১টি, চায়ের কাপ-সসার—৩ জোড়া, দরজা-জানালার পর্দ্দা করিবার মত কাপড় কয় গজ। ওঁর একটি গরমকোট, একটি মাফলার, এক জোড়া চটি।

চিতুন, মিতুন, তিতুন, নিতুনের জন্য গরম সুট—১টি করিয়া, পুল-ওভার—১টি করিয়া, মোজা—১ জোড়া করিয়া। হরিচরণ (চাকর)—১টি রাগ, কাদম্বিনী (ঝি)—১টি র‍্যাপার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তা প্রায় টাকা ষাট সত্তরের ব্যাপার।

হীরেন তালিকা দেখিয়া একটু হাসিল।

লতা জিজ্ঞাসা করিল, হাসলে যে বড় ?

—ওঁর আর ওঁর ছেলেদের বাবুগিরির বহর দেখে। ফর্দ্দ দেখে কিন্তু বোঝা যায়না ছেলেদের মা আছে।

—আমার তো গরম কাপড় জামা আছে। ও বছর বাবা যে র‍্যাপারখানা দিয়েছিলেন, সেটা তো বাক্সেই তোলা রইল।

—বাক্সেই থাকুক সেটা, চিতুনের বৌ এলে গায়ে দেবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। সে যা হবার তা হবে 'খন। তুমি এখন নাও তো, চান খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে ট্রেনের বেলা হ'য়ে যাবে। হ্যাঁ গা, কদিন থাকবে ক'লকাতায় ?

—দিন দু'চার। বড়দিনের বন্ধটা কাটিয়ে আসা যাবে। অনেকদিন পর ক'লকাতায় যাওয়া, এটা ওটা দেখতে একটু দেরী হবে।

বড়বাজার, লোহাপট্টি, চাঁদনি ঘুরিয়া হীরেনের জিনিষ-পত্র কিনিতে পুরা দুই দিন কাটিয়া গেল।

কলিকাতার বাজারের সহিত তেমন পরিচয় ছিলনা। এগারো বছর আগে মফস্বল হইতে বি-এ পাশ করিয়া সে একবার কলিকাতায় আইন পড়িতে আসিয়াছিল। বছর দেড়েক পরে আইন পড়া শেষ না করিয়াই তাহাকে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইয়াছিল। তারপর এই কলিকাতায় আসিতেছে।

কয় বছরে কলিকাতার চেহারা একেবারে পালটাইয়া গেছে। এক হাবড়ার পুল আর হাইকোর্ট ছাড়া বদল হয় নাই, এমন কিছুই সে দেখিতে পাইল না।

কলিকাতার সহিত তাহার প্রেম কোনও দিনই হয় নাই। যখন এখানে পড়িতে আসিয়াছিল, তখন বড়লোকের বাড়ীতে গরীব, আশ্রিত ছোকরার যে-দশা, তাহার দিন তেমন করিয়াই কাটিত।

কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলময়, ব্যস্ত জীবনের সহিত সে নিজেকে কিছুতে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। শুধু ইহার ঐশ্বর্য্য তাহার মনে মোহ আনিত। বড় বড় বাড়ী, সদর বেউড়ীতে দরোয়ান—হুস্ করিয়া একখানি বিরাট মোটর-গাড়ী বেউড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল—সঙ্গেই হীরেনকে ধাঁধা লাগাইয়া দিত।

একদিন মনে এ ইচ্ছাও ছিল যে, এই কলিকাতাতেই সে দশজনের একজন হইয়া জীবন কাটাইবে। কিন্তু সে কথা আজ ভাবিতেও লজ্জা হয়। কেনমতে জীবনের কয়টা দিন মফস্বলের ইস্কুলে মাষ্টারি করিয়া কাটিয়া গেলেই হইল। ছেলেগুলি একেবারে না খাইতে পাইয়া যেন না মরে, লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হয়। ইহাতেই সে খুসী। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন সে তাহার অজাত পুত্রকন্যাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাখিবার স্বপ্ন দেখিত। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

বড় ছেলেটার জন্য সপ্তায় দুই একখানি ছবির বই কিনিবার জন্য হীরেন মিউনিসিপাল মার্কেটে আসিয়াছিল। অল্পের মধ্যে দুই একটা খেলনা পাইলেও মন্দ হয় না। একটি ছেলেদের খেলনার দোকানে আসিয়া সে ঢুকিল।

—ছেলেদের খেলনা কি আছে?

দোকানী অনেকগুলি খেলার নাম করিয়া গেল।

একটি ওয়ার্ড-মেকিং ও টেকিং-এর বাক্স বাছিয়া হীরেন জিজ্ঞাসা করিল, কত দাম এর?

—দেড় টাকা।

দেড় টাকা! হীরেন হাসিয়া গেল। আস্তে আস্তে সে দোকান ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পিছনে দোকানীর টিটকারি শোনা গেল—দাম শুনে যে ফিরমি গেলেন মশাই।

না, আর নিউ মার্কেটে নয়, হ্যারিসন রোডের অফলেই দেখা যাইবে, ছোটখাট দোকান হইতে যাহা পাওয়া যায়।

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে হীরেন পথ চলিতেছিল। অকারণ নিজের জন্য আট আনা পয়সা খরচ করিয়া বায়োস্কোপ দেখিবার ইচ্ছা আর তাহার ছিল না। তাহার চাইতে ঐ পয়সা দিয়া ছেলেদের জন্য সে একটা-কিছু কিনিয়া লইবে। আর লতার জন্যও দু'একটা জিনিস কিনিতে হইবে।

বেচারি লতা!

পিছন হইতে কে যেন হীরেনকে ডাক দিল। ফিরিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে আবার হাঁটিতে সুরু করিয়াছিল, এমন সময় আবার ডাক শুনিল।

হীরেন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

একটি মোটর গাড়ী রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার ভিতর হইতে কে একজন ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিতেছে।

বিনোদ না? হাঁ, সে-ই তো।

বিনোদের সঙ্গে সে বি-এ পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই বিনোদ আর এই?

মোটর গাড়ীটার কাছে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া হীরেন জিজ্ঞাসা করিল—বিনোদ?

—হাঁরে। তুই এখানে কি করছিস? আয়, গাড়ীতে উঠে ব'স্। কাজের তাড়া নেই তো বিশেষ?

—না। একবার বায়োস্কোপে যাব-যাব ভাবছিলাম।

আচম্বিতে তাহার মুখ দিয়া মিথ্যা কথাটা বাহির হইয়া গেল। বায়োস্কোপ যাইবার ইচ্ছা আর তাহার মোটেই ছিল না।

—বায়োস্কোপ! তার এখনও ঢের দেরী—এখন তো মাত্র পাঁচটা তেইশ। ঘিনোদ হাতঘড়ী দেখিয়া তাহাকে বলিল।

হীরেন বিনোদের মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

নূতন ঝকঝকে টু-সীটার গাড়ী, বিনোদ নিজেই ড্রাইভার।

বিনোদকে হীরেন জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ী তোমার নাকি?

বিনোদ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

—কি কর আজকাল?

—একটা ছোট-খাট ব্যবসা আছে। চ', আমার আফিসে বসবি কিছুক্ষণ। তারপর ও'বেলায় মিলে আসা যাবে সিনেমায়। তারপর, তুই কি করিস্—ক'লকাতাতেই, না আর কোথাও আছিস্?

একে একে হীরেনের সব কথা বিনোদ শুনিয়া লইল। মাষ্টারিতে কত মাহিনা, কয়টা ছেলেমেয়ে।

হীরেন কেবল ভাবিতেছিল, এই সেই বিনোদ। কলেজে আসিত একটি হাবা-গবা ছেলে, আধ ময়লা টুইল-শার্ট পরিয়া আর ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া। একটা থ্রি-ইয়ার্ডেস্টশিপ কি করিয়া জুটিয়াছিল। কলেজ হইতে মাইল চারেক দূরে এক উকীলের বাড়ী ছেলে পড়াইত, সেখানেই থাকিত।

দীর্ঘকাল পরে আজ সে বিনোদকে দেখিতেছে, কিটফাট, কেতাদুরস্ত একটি পুরাদস্তুর সাহেব। তাহার পাশে বসিয়া হীরেনের কেমন নিজের সম্বন্ধে লজ্জা হইতেছিল। এক একবার ইচ্ছা করিতেছিল, কোন একটা অজুহাত দেখাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে।

এদিকে বিনোদের কথার আর অন্ত ছিল না। বহুদিন পরে পুরাণ বন্ধুকে পাইয়া সে ঘতরাজ্যের আজগুবি প্রশ্নের ঝড় বহাইয়া দিল।

কলেজের ভূষণ বাবু লাইব্রেরিয়ানকে মনে আছে কি না?

বর্ষে সরস্বতী পূজার সময়ে থিয়েটারে হীরেন সিপার সাজিয়াছিল আর বিনোদ মোয়াদ।

ষ্টেটসম্যান পড়িত বলিয়া প্রিন্সিপালের ক্লাস বয়কট করা। কলেজের সেই বুড়া মালী টমাজদি।

গাড়ী আসিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে থামিল। একটি বাড়ীর দরজায় সাইনবোর্ড লটকানো, বি. বি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী,

সোল-এজেন্ট্স্, তারপর কয়েকটি বিলাতী ফার্মের নাম। বেশ বড় আফিস, কেরাণীর দল সব বিনোদকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ঘরে ঢুকিয়া হীরেনকে বসাইয়া বিনোদ নিজে বলিল, বলিল—খানকয়েক চিঠি লিখতে হবে ভাই, একটু ব'স্। বিনোদ কলিং-বেল টিপিল। চাপরাশী আসিয়া দাঁড়াইল।

—কুমার-বাবু কো সেলাম দেও।

চাপরাশী চলিয়া গেল।

কুমার-বাবু বিনোদের টেনো-টাইপিষ্ট। চোখ বুজিয়া বাঁ হাতের বুড়া আঙুল আর তর্জনীতে নাকের ত্রিকুটী চাপিয়া ধরিয়া বিনোদ উঁহাকে খানকয়েক চিঠির ডিক্টেশন দিল। শেষ হইলে কুমার বাবুকে বলিল, আজ ডাকেই এ চিঠিগুলো যাওয়া দরকার।

—আচ্ছা স্যর। বলিয়া কুমার-বাবু চলিয়া গেলেন।

—তারপর হীরেন? কি বায়োস্কোপ দেখবি?

হীরেন একটু হাসিয়া বলিল, বেটা ভাল হয়।

বিনোদ টেলিফোন তুলিয়া একটা নম্বর চাহিল, তারপর গলাটা অন্য রকম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

…মিসেস্ ঘোষ?…নমস্কার।… …ভাল আছেন?…কে আমি? চিনতে পারছেন না বুঝি?… আমি, আপনার ছেলেমেয়েরা আমাকে বাবা বলে……[গলা এইবারে স্বাভাবিক]…চিনতে পেরেছ, বুদ্ধিমান লোক।…দেখ, আজ আমি একটু রাত্রে বাড়ী ফিরব, আমার একটি বন্ধু এসেছে, সে-ও যাবে আমার সঙ্গে। হীরেন আপত্তি করিতে যাইতেছিল। বিনোদ হাত নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

…হাঁ। তুমি নিজে রাঁধবে।

বিনোদ রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

—কি, আমার খাওয়ার কথা বললে বুঝি বাড়ীতে? হীরেন জিজ্ঞাসা করিল।

—চুঁ। দাঁড়া, তোর মেসে খবর পাঠিয়ে দিই, কি যেন ঠিকানা? একখানা চিঠিও লিখে দে, তোর জিনিসপত্র সব…আচ্ছা, সে আমরা বায়োস্কোপ থেকে ফিরবার সময় গাড়ীতে তুলে নেব'খন। পিওন ডাকিয়া বিনোদ হীরেন যে মেসে উঠিয়াছিল, সেখানে খবর পাঠাইয়া দিল।

• • •

ফিল্মটা ভাল। দেখিতে দেখিতে বিনোদের চোখ ভিজিয়া উঠিল। একটি উচ্চাভিলাষী ছেলে সংসারের পেষণে নষ্ট হইতেছিল, এমন সময়ে একটি মেয়ের ভালবাসা তাহার জীবনে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখাইল। কিন্তু ছেলেটি বিবাহ করিয়াছে, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে। বৌটি নিতান্ত আটপৌরে, স্বামীকে কিছু বোঝে না, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো প্রাণ। ট্রাজেডির বীজ ঐখানে। একবার, ছেলেটি সংসার ছাড়িয়া যে-মেয়েটিকে ভালবাসিয়াছিল তাহার সহিত দূরে পলাইয়া গেল। কিন্তু শেষ অবধি তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল, সঙ্গে আসিল ভালবাসার মেয়েটি। আসিয়া আটপৌরে, সংসারগ্রস্ত প্রাণ স্ত্রীলোকটির কাছে মার্জনা চাহিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'তুমিই জিতিলে। আমি উহাকে সব দিয়াছিলাম, কিন্তু ছেলে দিতে পারিলাম না।'

দেখিতে দেখিতে বিনয় কখন যে কলিকাতা ছাড়িয়া তাহার দেশে চলিয়া গিয়াছিল, সে নিজেই জানে না। সেখানকার সেই জীর্ণ বাড়ীর অন্দর হইতে কখন যে লতা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার ছেলে কটিকে লইয়া স্ক্রীনের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাও খেয়াল নাই। ঐ বায়োস্কোপের মা মুহূর্তে তাহার বহু দুঃখসুখের সঙ্গিনী লতাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল—তাহার চোখ ভিজিয়া উঠিল।

কিন্তু শেষ হইল। আলো জ্বলিয়া উঠিল। হীরেনের চোখ তখনও ভিজা। বিনোদ বুঝিল, হাসিয়া বলিল,—এখনও ছেলেমানুষই আছিস দেখছি।

বিনোদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—বেশ। বিনোদের স্ত্রীর সহিতও আলাপ হইল। বন্ধুর সুখ, ঐশ্বর্য্য দেখিয়া একদিকে হীরেনের মনে যে-আনন্দ জমিয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে নিজের কথা ভাবিয়া মনে তাহার গ্লানির অন্ত ছিল না। শুধু মনে হইতেছিল, কি অপদার্থ সে। স্ত্রীকে দুটি ভাত খাওয়াইবার পরাইবার সংস্থানও জীবনে করিয়া উঠিতে পারিল না। কি তফাৎ তাহাতে ও বিনোদে? অথচ সে আজ ষাট টাকা মাহিনার ইকুল মাষ্টারি করিয়া পচিতেছে আর বিনোদ?…কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছে, গাড়ী কিনিয়াছে। ছেলে মেয়ের জন্য বাড়ীতে একটি নার্সারি-ঘর করিয়াছে, তাহাতে দেশ-বিদেশের জানসম্ভার সাজানো। এক পাশে

P30219

আয়াসিকার জন্ম হেলিটন হইতে যাবতীয় দ্রব্য। অন্যদিকে মোর্, মানচিত্র।··· আর সে ছেলেমেয়ের জন্ম দেড় টাকা দিয়া একটি খেলা কিনিতে পারে না। তাহাদের জামা-কাপড় কিনিবার পর্য্যন্ত তাহার অর্থ জোটে না। দুইবেলা দুইটা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি পায় না।···ছিঃ ছিঃ। নিজেকে সে ধিক্কার দিল। ···আর লতা? ঐ তো বিনোদের স্ত্রী, লতা কিছু তাহার চাইতে কম সুন্দরী নয়, কিন্তু এই বয়সেই খাটিয়া-খাটিয়া সে কুজ হইয়া পড়িয়াছে। একখানি ভাল শাড়ী কিনিয়া দিবার সামর্থ্য অবধি তাহার নাই। এমন অকর্ম সে কেন হইল?

হঠাৎ তাহার মনে হইল, এসব কথা ভাবিয়া সে বন্ধুর অমঙ্গল করিতেছে। এমন নীচ সে হইল কেন?···না, এবিষয়ে সে আর কোনও চিন্তা করিবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনোদ, বিনোদের স্ত্রী সুষমা আর হীরেন, তিন জনে বসিয়া গল্প হইতেছিল।

সুষমা বলিল, তা'হলে হীরেনবাবু, লতাকে কবে দেখাচ্ছেন?

হীরেন হাসিয়া বলিল, কবে দেখছেন তাই বলুন। ক'লকাতা দেখা তার কাছে প্রায় নন্দন-কানন দেখার মত। সব লোকেরই এক একটা উচ্চাশা থাকে, লতার উচ্চাশা ক'লকাতা।

সুষমা হাসিল, কেন, ক'লকাতা বুঝি আসেনি।

—ক'লকাতা! জীবনে সে রেলগাড়ী চেপেছে দু'ছেলের মা হবার পর—তাও মাত্র একবার। কয়েকদিনের জন্ম এক-বার কৃষ্ণনগরে আমার এক জ্ঞাতিভূত ভাইয়ের বাড়ীতে ওঁর ছেলের পৈতার জন্ম যেতে হ'য়েছিল। তার আগে পর্য্যন্ত রেলগাড়ী ছিল তার বিস্ময়। কিন্তু রেলগাড়ী চড়ে সে রেলের উপর এমন খাপ্পা হ'য়ে গেল যে এখন পর্য্যন্ত সে রাগ তার যায়নি।

—কেন? বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল।

—সে এক মজার ব্যাপার। তার আগের রাত্রে ওর উৎসাহে ঘুম হয়নি। রেলে উঠবে এই আনন্দেই আত্ম-হারা। ষ্টেশনে গাড়ী আসবার আগে পর্য্যন্ত তার বুক কাঁপছে। আমি ছেলেদুটি আর তাকে মেয়েদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। কৃষ্ণনগরে গিয়ে ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বলছে, এই তোমাদের রেল, নমস্কার বাপু, জীবনে আর আমি রেলে উঠছিনে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? ··'বাপ্‌রে, গাড়ীতে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে এই ধাক্কা, টাল সামলাতে সময় পেলাম না পর্য্যন্ত, দেখ না ছোট খোকাটার কি হয়েছে, কপালটা ফুলে গেছে বাছার, ও কোলে ছিল আমার, ধাঁ করে এমন লাগল, ···ব'লে সে ছেলেকে চুমু খেলো।

সুষমা বলিল, কি মুস্কিল!

হীরেন হাসিয়া চুপ করিল।

—বাই হোক্, তিন কয়েকের ছুটি ক'রে একবার তাকে নিয়ে আসবেন এখানে।

বিনোদ বলিল, তুমিও যেমন। ওসব ওর ভাঁওতা। আমার সামনে বউকে ও আনতে নারাজ। চিরকাল দেখে আসছি, মুপুরুষ হবার ঐ এক দোষ, কেউ বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে সাহস পায় না।

—আহা! বলিয়া সুষমা হাসিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল।

হীরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, বলিল, আরে সে যে তার ছেলের মা।

—আমিও তো দুই ছেলের বাপ। আবার···বলিয়া বিনোদ সুষমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সুষমার কর্ণমূল অবধি লাল হইয়া উঠিল।

—তাই নাকি? হীরেন বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল।

তাড়াতাড়িতে সামলাইয়া লইয়া সুষমা কথার মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্ম বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা হীরেনবাবু, আপনাদের ওখানে কুল পাওয়া যায়?

—হুঁ! লতাকে ব'লব, সে আচার করে পাঠিয়ে দেবে।

সুষমা বুঝিল, নিজের কথার জালেই এবার সে ধরা পড়িয়াছে।

হাসিঠাট্টায় আরও খানিকক্ষণ কাটাইয়া, সুষমা খাইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে হীরেনের যাইবার কথা।

বেশী রাত্রি জাগা চলেনা।

আর কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর বিনোদ উপরে চলিয়া গেল।

আগের দুই রাত্রি হীরেনের ভাল ঘুম হয় নাই। আজ শুইবামাত্র ঘুমাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বহুমূল্য খাটে সুপরিপাটি বিছানা, তিনখাত উঁচু গদীর উপর পাতা, নেটের মশারি, দামী ইটালিয়ান ফ্যান—জীবনে এ রকম বিছানায় হীরেন শোয় নাই। কিন্তু ঘুম আসে না কেন?

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। হীরেন স্বপ্ন দেখিল, কি করিয়া ঘূর্ণী হাওয়ার মধ্যে সে পড়িয়া কেবলই পাক খাইতেছে। দূরে, কাছে, কোথাও কিছু নাই—এই বিরাট শূন্যভূমির মধ্যে সে কি করিয়া আসিয়া পড়িল? হঠাৎ মনে হইল, বাগোয়ানের সেই মা-টি, না, লতা বুঝি, আর তাহার নিজেরই ছেলেপিলে, —সবাই মিলিয়া পাক খাইতেছে, কিন্তু ঘূর্ণী হাওয়া তো নয়, এ যে ছুরি কাঁচি শানাইবার সেই যন্ত্র। ছোট বেলায়

গ্রামে থাকিতে সে দেখিয়াছিল, একটি লোক ঘাড়ে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, পায়ে সেই বস্ত্র চালাইয়া ভোঁতা ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর সব সে অবলীলা-ক্রমে মিনিট কয়েকের মধ্যে শানাইয়া নূতন করিয়া দিত—ঘুরঘুর করিয়া ফুলঝুরির মত বস্ত্রটা হইতে আগুনের ফুলকি বাহির হইয়া দূরে ছড়াইয়া পড়িত—। এ কি রকম হইল, সে আজ বারোস্কোপের সেই মেয়েটি আর মা-টি, না, লতা—সবাই মিলিয়া শান খাইতেছে ছুরি কাঁচির মতো, ঝিনিক ঝিনিক করিয়া তাহাদের গা হইতে মরিচা খসিয়া পড়িতেছে···শান কে দিতেছে? বাবা রে!

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে। তাহার গাড়ী সাতটায়। হীরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মুখ-হাত পা ধুইয়া বাথরুম হইতে আসিয়া দেখে বিনোদ আর সুষমা তাহার জিনিষপত্র সব গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

টেবিলের উপর গরম চা আর খাবার। চা খাইয়া হীরেন বলিল, এগারো বছর ধ'রে ক্রমাগত নিজেকে খাটো করে ছেবে ছেবে একেবারে মরে গিয়েছিলাম বৌদি। হঠাৎ আপনার এখানে এসে আবিষ্কার করলাম, আমিও সামান্য কেউ-কেটা নই। একটু মরচে হয়তো পড়েছে·····

বলিয়া সে কাল যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা সুষমা ও বিনোদকে বলিল।

সুষমা ঠাট্টা করিয়া বলিল, বারোস্কোপের মেয়েটিকে যে আর ভুলতে পারছেন না, দেখবেন লতাকে গিয়ে আবার মনে লাগলে হয়।

হীরেন বলিল, মনে-লাগা আর না-লাগার প্রশ্ন লতা সম্বন্ধে আর নেই বউদি। সে আমার জীবনের নিশ্বাসের মত স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে, যেদিন থেমে যাবে মরে যাবো। কিন্তু জানেন তো নিশ্বাসকে আমরা ভুলে থাকি। শুধু শীতের সকালে আয়না সামনে রাখলে মনে হয় নিশ্বাস বইছে। আমার এবার কলকাতা আসাটা হ'লো সেই আয়না। আপনি, বিনু, বারোস্কোপ সবাই মিলে আমার সামনে লতাকে স্পষ্ট ক'রে তুললেন।

বিনোদ গাড়ী বাহির করিয়া হীরেনের জিনিষপত্রগুলি তাহাতে রাখিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া হীরেনের দুই একটি কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, এই যে কাব্যে পেয়েছে বুঝি! ওকে জাননা সু, একবার কথা কইতে সুরু করলে আর রক্ষা নেই।

—সেই কথাই এই এগারো বছর ধরে বন্ধ ছিল বিনু। চার পাশে এমন কোথাও কিছু পাইনি যার সঙ্গে নিজেকে মনে নিজের অস্তিত্ব বুঝতে পারি।···খুব বেশি সেন্টি-মেন্টালিটি দেখাচ্ছি, না বৌদি?

—না, না। আপনি বসুন না, ওঁর কথা শুনবেন না। সুষমা কহিল।

বিনোদ জিনিসপত্র লইয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সুষমার দিকে চাহিয়া হীরেন বলিল – কাল কি ভাবছিলাম জানেন বউদি? বিনোদের সঙ্গে নিজের তুলনা ক'রে নিজের কাছে নিজের আর লজ্জার অবধি ছিলনা। নিজেকে এমন অপদার্থ মনে হচ্ছিল।···আজ ঠিক অন্য রকম মনে হচ্ছে।··· কাল গিয়েছিলাম বড় ছেলেটার জন্য একটা খেলা কিনতে নিউনিসিপাল মার্কেটে, দামের বহর শুনে আর নেওয়া হয়নি। আপনার বাড়ী এসে যখন দেখলাম ছেলেদের ঘরটা, সেই কথা মনে হ'ল। তখন খুব ক্ষোভ হ'য়েছিল, আজ কিন্তু সেজন্য আমার কোনও ক্ষোভ নেই। সব জিনিষই ছোঁয়াচে বউদি, বিনোদের কৃতিত্বের ছোঁয়াচ আমাতেও লেগেছে ব'লে মনে হ'চ্ছে। এসেছিলাম বড়দিনের বাজার করতে কলকাতায়—নীরোগ লোক; বিনোদের কাছ থেকে বাধির বীজাণু নিয়ে গেলাম।

বাহির হইতে বিনোদের ডাক শোনা গেল।

হীরেন সুষমাকে নমস্কার করিয়া পরের বাহির হইয়া গেল।

* * *

পাঁচ ছয় দিন পরে বিনোদ হীরেনের নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইল। চিঠিতে লেখা···

ভাই বিনু,

নিরাপদে এসেছি।

তুমি কিংবা বৌদি, যে-ই হোক্ আমার সুটকেসে না জানিয়ে যা রেখেছিলে তা ফেরৎ পাঠাচ্ছি। তোমার টাকা নিতে আমার লজ্জা ছিল না। সামান্য টাকার চাইতে তুমি আমাকে অনেক বড় জিনিস দিয়েছ, সে হচ্ছে কৃতিত্বের নেশা। সেই নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

শীঘ্রই দেখা হবে।

টাকাটা ইন্সিওর ক'রলাম। বউদিকে আমার নমস্কার দেবে।—হীরেন।

বণিকের বন্ধুত্ব

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

দুই বৎসর পূর্বে যখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় স্বদেশী প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তখন আমি বলিয়াছিলাম, he was carrying coals to Newcastle, আরও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার মুখে আমরা স্বদেশী প্রচারের কথা শুনিতে চাই না। যখন কলিকাতা কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশী আন্দোলনকে প্রকৃত আন্দোলনের রূপ দিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন—Swadesi movement is a movement, it must move from town to town, from province to province—তখন মালব্যজী হইতে আরম্ভ করিয়া গোখলে পর্য্যন্ত সকল অবাঙ্গালী নেতা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়াছিলেন এবং যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, "ওটা বাঙ্গালা আরম্ভ করিয়াছে, বাঙ্গালাতেই নিবদ্ধ থাকুক, অন্য প্রদেশে প্রসারিত করিতে গেলে গোলযোগের সম্ভাবনা।" এই বলিয়া বিপিনবাবুর মাথায় ঠাণ্ডাজল ঢালিবার ব্যবস্থা করিলে, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায় বিপিনবাবুকে সমর্থন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—go on, we will listen to you. ইহার পর এখন সেই মালব্যজীর মুখে "চাংমুড়ি কালী"র পরিবর্ত্তে "দেবচক্রপাণি"র কথা শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কেন না, মালব্যজীর মত লোকের কানে স্বদেশী মন্ত্রের সুর তখন যদি না বাজিয়া থাকে, আর আজ যদি হঠাৎ বাজিয়া উঠে, আমাদের মনে স্বতই সন্দেহ হয় যে ইহার মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। অবাঙ্গালী টাকাওয়ালার নিকট অর্থ-সাহায্য মালব্যজীর ইউনিভার্সিটীর প্রয়োজন সুতরাং অবাঙ্গালী ধনী ব্যবসাদারের ভিক্ষ লইয়া বাঙ্গালায় স্বদেশী প্রচার করিতে আসা কিছুই বিচিত্র নহে।

সৌভাগ্যক্রমে আজ আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি—অতি দুঃখেই বুঝিতে শিখিয়াছি—যে, বাঙ্গালীকে "স্বদেশী" বলিতে "ভারতীয়" না বুঝিয়া "বঙ্গীয়" বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালার বাহিরেই বিদেশ—এই মন্ত্র জপ করিয়া সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমরা যেদিন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে দেশীয় মোজাইট ওয়েডলব দোকানকে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া পূত করিতে দেখিলাম, সেদিন কবীন্দ্রের মিক দিয়া বিশ্বমানবতার অনুরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি "Abstract love of humanity is nearly always love of self." সুতরাং তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে "বঙ্গমানবতা"র যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না সম্পন্ন করিয়া পারা যাইবে না তাহা আমাদের বুদ্ধিতে বাকি থাকে নাই। যাহাদের বন্ধুত্বের কুটুম্বকম্ তাঁহাদের তাহাতে আসিয়া যায় না, সকলেই সেখানে কুটুম্ব. এক কুটুম্ব মারিয়া আর এক কুটুম্ব আসিলে তাঁহাদের পক্ষে সমানই কথা। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, সুতরাং বঙ্গমানবতার প্রতি আমাদের ঐকান্তিক টান একদেশদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইলেও মার্জ্জনীয়। সে দিন আরও বুঝিতে বাকী থাকে নাই যে মালব্যজীর ইউনিভার্সিটী এবং কবীন্দ্রের বিশ্বভারতীও বাঙ্গালীজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল হইয়া উঠিতে পারে।

বাঙ্গালীর স্বদেশীব্রতপালনের দিনে বোম্বাই মুখ তুলিয়া চাহে নাই—দেড় টাকা দামের "সাড়া" কাপড় ৪৷৷০ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। বাঙ্গালী তখন মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য সে সকল কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিল—অর্থকষ্টকে গ্রাহ্যও করে নাই। কিন্তু বোম্বাই সে মন্ত্র গ্রহণ করে নাই, সুতরাং বাঙ্গালীর কৃচ্ছ্রসাধনকে সে "পৌষমাস" বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং মুনাফার সঞ্চয় দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালার কয়লা বিক্রয় হয় না, বোম্বাই নেটালের কয়লা কেনে; বাঙ্গালার কয়লা ভাল নহে বলিয়া দুর্নাম রটায় এবং সুলভ নেটালের কয়লা কিনিয়া কল চালায়। যদি বাঙ্গালী মনে করে যে, যেহেতু আমাদের স্বদেশী উপাসনার ফলে বোম্বাইএর মিলগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং আজও বাঙ্গালীর জন্যই দাঁড়াইয়া আছে, সেই হেতু বোম্বাইএর আজ উচিত, বাঙ্গালার কয়লার খনিগুলি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে বলিয়া তাহাদের কাজ জোগাইবার জন্য বাঙ্গালার কয়লা কেনা—ইহার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না।

এসব ধর্ম্মের কাহিনী তোরা কখনই শুনিবে না—কৌটিল্য ব্যবসায়ীকে "অচৌরস্তোয়:" এই আখ্যা দিয়াছেন।

সার ফিরোজ সেখ্‌না কিছুদিন আগে এই কলিকাতা সহরে এক সভায় বাঙ্গালী সম্বন্ধে গোখ্‌লের চিরস্মরণীয় কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—People say, what Bengal thinks today India thinks tomorrow; but I say, what Bombay *does* today, India *does* tomorrow. আমি এই কথাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম, চিন্তা এবং কার্য্যের আপেক্ষিক মূল্য নিরূপণ আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হয় নাই, কিন্তু কথাগুলি আমার মনের ভিতর একটু অস্বস্তি উৎপাদন করিয়াছিল। সার ফিরোজ্ গোখ্‌লের কথা অস্বীকার করেন নাই—যেন এইমাত্র ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হয় বাঙ্গালা, কাজ করে বোম্বাই। এই ইঙ্গিতও মানা আমার পক্ষে কষ্টের কারণ হইয়াছিল, তবে আজ আমি সার ফিরোজের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বলিতেছি—কর্ম্মবীর বোম্বাই আজ যাহা করিতেছে আমরা তাই করিব। বোম্বাই সস্তা বলিয়া নেটালের কয়লা কিনিতেছে, আমরাও বাঙ্গালার কাপড় না পাইলে, সস্তা বলিয়া জাপানী বস্ত্র কিনিব। বাঙ্গালা একদিন বোম্বাইকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল সেকথা ভুলিয়া গিয়া বোম্বাই বাঙ্গালার কয়লা কিনিতেছে না, সুতরাং আমরা বোম্বাইএর কাপড় কিছুতেই কিনিব না।

উপকার স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রত্যুপকার প্রার্থনার মত অপকর্ম্ম আর কল্পনা করা যায় না। অপকর্ম্মও যদি না হয়, উহা ব্যবসায় নহে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। সদ্য সদ্য আদান ও প্রদানের মধ্যে একটা পরিমাণ করা যায় এমন স্পষ্ট পরস্পরের লাভ বা ক্ষতির হ্রাস—ইহাই ব্যবসায়ের মূলতত্ত্ব; ব্যবসায় philanthropy নহে; সুতরাং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বোম্বাই-বাঙ্গালায় প্রীতিস্থাপনের জন্য অতীত উপকার স্মরণ করাইয়া দিয়া সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ ও বটেই, কাঁদিয়া সোহাগের মত অপমানজনকও বটে।

সার ফিরোজ সেখ্‌না ও সার মনমোহন দাস রামজী বলিয়াছেন—বাঙ্গালার আছে বুদ্ধি আর বোম্বাইএর আছে বিত্ত, এই দুই একত্র করিয়া একযোগে কাজ করিলে বন্ধুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। ব্যবসায়-বুদ্ধি-হীন আমাদের কানে এই কথাগুলি বড় মধুর শুনাইয়াছে।

সার ফিরোজ তীক্ষ্ণধী ব্যবসাদারের মত কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার মাথা কিনিয়া টাকা দিলে—তাহার মস্তিষ্ক-প্রসূত অনুষ্ঠানগুলির কি পরিণতি হয় তাহা বাঙ্গালীর হাতে পড়া জিনিষ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অবস্থা দেখিলেই বুঝা যাইবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ অবাঙ্গালীর অংশ বাড়িয়া বাড়িয়া এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহার পর এই প্রতিষ্ঠান লইয়া বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার কারণ থাকিবে কিনা বলা কঠিন।

ব্যবসায়ে, টাকা যার সর্ব্বত্র তার—অতএব বোম্বাইএর "বেনো জল" প্রবিষ্ট করিয়া বাঙ্গালার "যোগো জল" নিষ্কাশিত হইতে দেওয়ায় বাঙ্গালার অন্তত কোন লাভ নাই। সে পথে বিপদেরই সম্ভাবনা।

২রা জানুয়ারী তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা" Bombay Bengal Entente শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

If the people of Bombay, particularly the merchants of that Presidency, come to the rescue of the struggling industries of Bengal, particularly the coal industry and constantly bear in mind that the consumers of Bengal, the majority of whom are extremely poor, ought to be treated with a little sympathetic consideration, the growing estrangement between the two provinces may to a large extent disappear.

একথা ব্যবসাদারের কথা নহে; করুণার ভিখারী যে তারই কথা—ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।

দিল্লী হইতে খবর আসিয়াছে, জাপান এতদিনে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত ভারতের তুলা কেনা ও ভারতে জাপানী কাপড় আমদানী সম্বন্ধে সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিয়া আজকালের মধ্যেই একটা চুক্তিপত্রে সহি করিবে। সঙ্গে সঙ্গে টোকিও হইতে এ সংবাদও আসিয়াছে যে তথাকার বণিকসঙ্ঘ ভারতীয় তুলাকে যে বয়কট করিয়াছিল সে বয়কট উঠাইয়া লইবে। ভারতের তুলা কেনা বন্ধ করিয়া জাপান, আমেরিকা, পারস্য, পেরু, তুর্কী প্রভৃতি দেশ হইতে তুলা আমদানী করিয়া ভারতের তুলার স্থান পূর্ণ করিতেছিল। এখন ঠিক যোগা

শত্রু কে কাহার চাপে নমিল—তুলা বয়কট্ করার চাপে ভারত গবর্ণমেণ্ট নমিলেন, না, ভারতের বাজার চাহাইবার ভয়ে জাপান নমিল; কিংবা পরস্পরের চাপে উভয়েই নমিয়া হল্কা করিল। শেষ কথাটাই বোধ হয় সত্য, অর্থাৎ জাপান বয়কট করিয়া বসিয়াছিল, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট জাপানী মালের উপর শুল্কের উপর শুল্ক চাপাইয়া ভারতের হাট বন্ধ করিবার জোগাড় করিয়াছিল—এমন "কাটে কাটে" ঠেকিয়াছিল যে একটা বোকাপড়া না হইলে উভয়েরই প্রাণ বাঁচে না।

এই উভয়ে উভয়ের প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া তুলিবার শক্তির উপরই বণিকের বন্ধুত্ব নির্ভর করে। গিরিশবাবুর "প্রফুল্ল" নাটকে, রমেশ বাঙ্গালীচরণের কতকগুলি জমী দলিল হাতে করিয়া বলিতেছে—"এ দলিলগুলি আমার কাছেই থাকবে, তুমি যখন আমার কেরাণী হবে তখন আমাকেও তোমার হাতে খানিকটা থাকতে হবে, তুমিও আমার হাতে থাকা চাই —বন্ধুত্বের নিয়মই এই।"

ব্যবসাদারের বন্ধুত্বের নিয়মও তাই। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে আমদানী রপ্তানী লইয়া একটা বিরোধ আছে। বৃটিশ পণ্যের উপর ফ্রান্সে একটা মোটারকম শুল্ক গ্রহণ করা হয়—সেইটা কমাইবার কথা জানাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সকে অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু শুধু অনুরোধ জিনিষ মাত্র, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহাতে কোনও কাজ হয় না। ষ্টেট্‌সম্যান তাই বলিতেছেন—"fortunately the British Government are no longer without the means of retaliation."

বাণিজ্যের বন্ধুত্ব এই means of retaliationএর উপর নির্ভর করে। বোম্বাইএ বাঙ্গালার সেই দিনই বন্ধুত্ব হইবে যেদিন আমাদের means of retaliation আমাদের হাতে থাকিবে এবং প্রাদেশিকতার দুর্নামে ভীত না হইয়া সেই অমোঘ উপায় নির্মমভাবে প্রয়োগ করিতে পারিব, অর্থাৎ বোম্বাই যদি বাঙ্গালার কয়লা এত শত টন্ কিনে তবেই বাঙ্গালা বোম্বাইকে এত লক্ষ গজ কাপড় রপ্তানি করিতে দিবে এই চুক্তির উপর উভয় প্রদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বুনিয়াদ গড়িব। বোম্বাই কবীন্দ্র, মিঃ সরকার, ডাঃ রায়কে সমাদর করিলেই আহ্লাদে আটখানা হইলে চলিবে না।

নীচের নূতন মন্ত্রীসভা: সম্মুখে দণ্ডায়মান কয়েকজন নীচ শ্রেণির ব্যক্তি। চেয়ার হইতে চতুর্থ—শ্রীঅম্বাপ্রসাদ মুখ। [বিশ্বরূপালয় এবং চিত্র]

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ [লীগ্ অব্ নেশন্স]

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

মহাযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পাশ্চাত্য জগৎ ধ্বংসের উপর বসিয়া নিখিল রাষ্ট্রের সম্মেলনে ও সহযোগিতায় শান্তিময় নির্দ্বন্দ্ব ভাবী জগতের কল্পনা করিয়াছিল; বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ (লীগ্ অব্ নেশনস্ *) হইয়াছিল তাহারই মূর্ত্তরূপ। সেদিন অবসন্ন পৃথিবী ব্যাকুল হইয়াছিল শান্তির জন্য, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ সেই শান্তি আনিয়া দিবে ইহাই তাহার আশা ছিল। তাই তখন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য পাশ্চাত্য জগতে উৎসাহের অন্ত ছিল না; রাষ্ট্রনীতিবিদ হইতে রাজনীতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ জনসাধারণ সকলেরই মুখে তাহার কথা শোনা যাইত। আন্তর্জাতিকতা সেদিন ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল; বিশ্বমৈত্রী হইয়াছিল পূজা। নিখিল বিশ্ব ফিলাটেলিষ্ট (ডাকটিকিট-সংগ্রাহক) সভা হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধরূপের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল। বোধ করি এখনও জেনেভায় শতাধিক এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় আছে।

কিন্তু তাহার পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের মহাযুদ্ধে অপচিত শক্তি পুনঃসঞ্চয় করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে পুনরায় পুরাতন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া উঠিল। বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতার উচ্চকণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল। যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য একদিন প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়াছিল তাহার কথা লোকে ভুলিতে লাগিল। এমন কি, আজ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে কোন কথা বলা দুঃসাহসের কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আজ তাহার অপবাদ ও লাঞ্ছনার সীমা নাই। সে অপবাদ এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, জাপানের রাষ্ট্রনীতি-বিদ্‌গণ বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, বর্ত্তমান পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে গোলমালের কারণ এই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ। অবশ্য জাপানের এ মত সাক্ষাৎভাবে অন্য কোন শক্তি সমর্থন করে নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘকে ও তাহার আদর্শকে উপেক্ষা অল্পবিস্তর সকলেই করিয়াছে এবং করিতেছে। যে আন্তর্জাতিকতা ও শান্তিবাদ একদিন ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, নাৎসী জার্ম্মানী তাহাকে আজ শান্তির বিরোধী বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। লীগের যে বার্ষিক বৈঠক একদিন সমগ্র সভ্য পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, সমগ্র জগত যাহার প্রাত্যহিক সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত, আজ সে বৈঠক কখন হইল, কি করিল, সে সংবাদে কাহারও বড় আগ্রহ দেখা যায় না। ইহা কয়েকটি আকাশকুসুমরচকের কল্পনার স্বর্গে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, বাস্তববাদী জগতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এরূপ স্বর্গ রচনার স্থান নাই। বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ যুদ্ধের বিরোধী ছিল; তাহার এই আদর্শ লীগের প্রথম অবস্থায় রণক্লান্ত পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর আজ কোন কোন দেশে শুধু যে যুদ্ধসম্ভার বর্দ্ধনের জন্য কোটি কোটি অর্থব্যয় হইতেছে তাহা নহে, যুদ্ধকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে সে সকল দেশে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। যে সকল গ্রন্থে যুদ্ধের বিভীষিকাময় স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, যে সকল লেখক এখনও আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করিতে সাহস করিতেছেন, সে সকল গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ও সে সকল লেখক লাঞ্ছিত হইতেছেন। শান্তি-বাদী আইন্‌ষ্টাইন আজ নির্ব্বাসনে, রোমাঁ রলাঁ স্বদেশত্যাগী। সেদিন কাগজে দেখিলাম, রেমার্কের বিখ্যাত গ্রন্থ অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট (All Quiet on the Western Front) নামক গ্রন্থ জার্ম্মানীর নাৎসী সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। "যুদ্ধ করিব না" এই বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধিক্কারভাজন হইয়াছে।

আমাদের দেশেও এই কিছুদিন আগেও রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া বিদ্রূপভাজন হইয়াছিলেন; বোধ করি আজও তাঁহার সে দুর্নাম ঘোচে নাই। আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে যে স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের স্থান নাই। অথচ এই আন্দোলনের যিনি নেতা, সেই গান্ধীজীর এক হিসাবে এই আদর্শের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। একথা তিনি বাক্যে ও কর্ম্মে বারবার প্রচার

* আমি এই প্রবন্ধে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ও লীগ্ অব্ নেশন্স্ (সংক্ষেপে লীগ্) উভয় শব্দই সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছি; কারণ লীগ্ অব্ নেশন্স্ এই নাম এখনো সুপরিচিত।

করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ স্বাধীনতাবাদী গান্ধী নহেন, তাঁহার উগ্র স্বাদেশিকতায় গান্ধীজীর সংযম, গভীর জ্ঞান ও বিশ্বমৈত্রীর স্থান নাই। আমাদের মুস্কিল হইয়াছে এই যে, ভারতবর্ষ এত সুবৃহৎ এবং তাহার জাতীয় সমস্যা এত প্রচুর যে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ ও সুযোগ আমাদের সকলের সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। ইহার জন্যই আমাদের কূপমণ্ডুকত্ব ঘোচে না। ভারতবর্ষ বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু বাহিরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে তাহাকে অস্বীকার করি কেমন করিয়া? অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এই সুবৃহৎ জগৎ আজ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। একদিন ছিল যখন এক দেশের সহিত অন্য দেশের দূরে থাকুক্ দেশের একাংশের সহিত অন্যাংশের যোগ ছিল ক্ষীণ, সেদিন একের মঙ্গলের উপর অপরের মঙ্গল আজ যতখানি করে ততখানি নির্ভর করিত না। আজ সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার কোন ক্ষুদ্রতম প্রদেশে যুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষে তাহার ঢেউ আসিয়া পৌঁছায়। আর্জেন্টিনে পাটের বাজারে গোলমাল ঘটিলে সুদূর বাংলার পল্লীগ্রামে পাটচাষীর মাথায় টনক্ নড়ে। প্রতিদিন এরূপ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উদাহরণ মেলে। তবুও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির উপর আমাদের দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষের সমস্যা আমাদের নিকটতম সুতরাং আমাদের বেশীর ভাগ দৃষ্টি সেদিকেই পড়িবে ইহা ও স্বাভাবিক কিন্তু একথাও সত্য, ভারতবর্ষের সমস্যা বৃহত্তর জগতের সমস্যারই অংশমাত্র সুতরাং সমস্ত জগতের সমস্যার প্রতিকার না হইলে ভারতীয় সমস্যার সম্যক সমাধান কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না। এইজন্যই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ও এই জাতীয় অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদেরই স্বার্থের খাতিরে।

একটা কথা এদেশে সর্ব্বত্রই আজ শোনা যাইতেছে। লীগের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হয় নাই সুতরাং অন্ততঃ আমাদের দিক দিয়া ইহার অস্তিত্বের কোন যুক্তি নাই। এরূপ মতবাদের পিছনে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সুগভীর অজ্ঞতা রহিয়াছে। প্রথমতঃ লীগের উপকারিতা নির্ভর করে লীগের উপর নহে, যে সকল রাষ্ট্র লইয়া লীগ গঠিত হইয়াছে তাহাদেরই উপর, সে সকল দেশের জনমতের উপর। সুতরাং লীগ্ যে আমাদের উপকার করিতে পারে নাই তাহার অপরাধ কতকটা আমাদেরই। আমি জানি ইহার উত্তরে লীগের বিপক্ষবাদী বলিবেন, কথাটা 'আমাদের' না হইয়া 'আমাদের সরকারের' হওয়া উচিত। এই উত্তরের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে একথা স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় সরকার লীগের বিরুদ্ধে নহেন সুতরাং লীগ্

ডক্টর চ্যাপলিন : লীগের প্রতিষ্ঠাতা।

সম্বন্ধে যদি জনমত গঠনের চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে তাহাতে বাধা হইবে না এবং একবার জনমত গঠিত হইলে লীগকে তথা ভারত সরকারকে দিয়া ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করান দুঃসাধ্য হইবে না। বর্ত্তমানের মাপকাঠি একমাত্র মাপকাঠি নহে। আজিকার পৃথিবী দেখিলে হয়ত' মনে হইতে পারে নৈতিক শক্তির কোন মূল্যই নাই; দেশে দেশে নৈতিক শক্তির পরাজয়ই আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাই বলিয়া কি এই শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করিব? যদি না করি তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের পিছনে যে নৈতিক শক্তি আছে তাহার পরাভব স্থায়ী হইতে পারে না। যদি জগতের আন্তর্জাতিক সমস্যা গুলির সমাধান কোনদিন করিতে হয় তবে কোন না কোন আকারে এই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘই গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

কিন্তু সত্যই কি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যর্থ হইয়াছে? খৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে একজন বলিয়াছিলেন, Christianity has not failed because it has never been tried অর্থাৎ খৃষ্টানধর্ম্মাদর্শ ব্যর্থ হয় নাই যেহেতু তাহাকে সফল করিবার চেষ্টা কোনদিন হয় নাই। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। শঙ্কাকুল মুহূর্ত্তে জগৎ সহসা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করিল, সেদিন তাহার পশ্চাতে যে সুদীর্ঘ তপস্যা সিদ্ধি-

লীগ্ অব্ নেশন্স্ : শান্তি-বৈঠকের সদস্যবৃন্দ, প্রাচীর বিলম্বিত ছবির নীচে প্রেসিডেন্ট উইলসন্ দণ্ডায়মান, তাঁহার ডাহিনে কেবারোন মাটুস। উপস্থিতির ঠিক বথাস্থানে লর্ড রবার্ট সিসিল।

লাভের একমাত্র উপায় সে তপস্যা ছিল না। তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলেই একথা বুঝা যাইবে। আমি পরে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব কিন্তু বর্ত্তমানে এইটুকুই বলিতে চাই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সার্থক করিবার যে একমাত্র উপায় বিশ্বের জনমত গঠন করা, সে জনমত গঠিত হইবার সুযোগ ও সময় হয় নাই, তাই তাহার আপাতপ্রতীয়মান ব্যর্থতা লইয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের বা তাহার আদর্শের বিচার করা চলে না। আমরা বর্ত্তমানে শুধু এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সে বিচারের পূর্ব্বে জনমত গঠন করিতে হইবে।

শুধু জনমতের কথাই বা বলি কেন? এদেশে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কয়জন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবাদ রাখেন? আমি এ দেশের দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিকদের বলিতে শুনিয়াছি, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ নয় ত' বিশ্বদস্যুসঙ্ঘ (league of robbers), 'উনপঞ্চাশী'র 'বহুজাতি (বজ্জাতি) সঙ্ঘ' বাঙ্গচ্ছলে প্রযুক্ত হইলেও একদল লোক সত্য সত্যই এই বিশ্বাস করেন। ধরিয়াই লইলাম যেন উহা 'বজ্জাতিসঙ্ঘ' তবুও কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একবার দেখা দরকার নয় কি, উহার আদর্শ (অন্ততঃ বাহিরে প্রচারিত) কি, উহা কি কাজ করিয়াছে ও করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কি করিতে পারে নাই ও কেন করিতে পারে নাই। আর যদি সাফল্যই একমাত্র বিচারের মাপকাঠি হয় তবে জগতের সকল আদর্শই ত' ব্যর্থ হইয়াছে, সত্য ক'জন মানে? উপাসকের সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যান্যূনতা বিচারের একটি মাত্র মাপকাঠি ত' নহে।

সুতরাং বিশ্বরাষ্ট্র সম্বন্ধে জানা দরকার; জানিয়া তবে বিচার করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। আমি ধীরে ধীরে এখানে ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে সেই চেষ্টাই করিব।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের এই আপাত-ব্যর্থতা বড় করিয়া দেখা দিল মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার লইয়া। মাঞ্চুরিয়া লইয়া চীন ও জাপানের মধ্যে যে বিরোধ বাধিল বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ সে বিরোধ মিটাইতে পারিল না। জগতের বৃহত্তর শক্তিগুলি নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে এ ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন ছিল; এদিকে তাহারাই আজ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ণধার, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহাদেরই সৃষ্টিগত। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘও এ ব্যাপারে যতটা করা উচিত তাহা করিল না; অনর্থক কালক্ষয় করিয়া পরোক্ষে জাপানের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা করিয়া দিল। কিন্তু ইহার জন্য কাহারা দায়ী, রাষ্ট্রসঙ্ঘ না বৃহত্তরশক্তিগুলি? আজ যদি বৃহত্তর শক্তিগুলির ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের ব্যভিচার ঘটে তবে দোষ ত' তাহাদেরই। বৃহত্তর শক্তি বলিতে সে সকল দেশের রাষ্ট্রনেতাগণকেই বুঝিতে হইবে। যদি সে সকল

দেশের জনমত গঠিত হইত, জনসাধারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত, তবে তাহারা, যে রাষ্ট্রনৈতিকগণ তাহাদের শক্তির এই বাড়াবাড়ি করিতেছে তাহাদের অপসারিত করিত এবং নববলে বলীয়ান্ সংস্কৃত রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে এরূপ একটা সমস্যার এরূপ অদ্ভুত সমাধান করিত না এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিত না। মোটের উপর শেষ পর্য্যন্ত দেখিলে দেখিব অপরাধ জনসাধারণের অজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে সুগভীর ঔদাসীন্য ও দূরদর্শিতার অভাব।

যে যুদ্ধ নিবারণ লীগের সবচেয়ে বড় কাজ, মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে লীগ সেই যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিল না। লিটন কমিটির সিদ্ধান্ত জাপান গ্রাহ্যই করিল না, বরং উল্টা রাষ্ট্রসঙ্ঘেরই উপর মাঞ্চুরিয়ার গোলমালের সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া, সমস্ত সভ্য জগতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জাপানী সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সমস্ত ব্যাপারটাতে নির্লজ্জভাবে জাপানের পক্ষ সমর্থন করিয়া অবশেষে জেনেভা পরিত্যাগ করিলেন। বহির্জগতের সম্মুখে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন হইয়া গেল! এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ম্মচারিগণ কোন দেশের অধিবাসী হইলেও সে দেশের সরকারের অধীন নহেন ও কোন এক সরকারের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া অপর কোন সরকারের স্বার্থহানি করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। উল্টা, তাঁহারা যে এরূপ কিছু করিবেন না এই মর্ম্মে অঙ্গীকার-পত্র তাঁহাদের দিতে হয়।

লীগের অধিবেশন, জেনেভার সাধারণ দৃশ্য।

তাহার পর নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠকের ব্যর্থতা। ভবিষ্যৎ যুদ্ধনিবারণের উপায়স্বরূপ শক্তিসমূহের নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন ১৯১৯ সালেই শান্তি-বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে সকলেই অনুভব করিয়াছিল। শুধু জার্ম্মানীকেই নিরস্ত্র করিলে শান্তি হইবে না, অন্যান্য শক্তিকেও যে রণসজ্জায় কমাইতে হইবে এটা সকলেই বুঝিয়াছিল; তাই যখন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইল তখন নিরস্ত্রীকরণ ইহার অন্যতম সাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। আজ নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক ব্যর্থপ্রায়; সে সাধ্য সাধনের কোন লক্ষণই এখন চোখে পড়িতেছে না। ইহারই ফলে আজ জার্ম্মাণি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছে। অন্যান্য কোন কোন বৃহৎ শক্তিও বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘকে শাসাইতেছে। জাপান এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিয়াছে যে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের যে মুখ্য উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রনীতির জগতে আন্তর্জাতিকভাবে কার্য্য করিয়া ভবিষ্যৎ শান্তি স্থাপনের চেষ্টা, সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি লইয়া যে কাজ করিতেছে তাহাই করুক। অর্থাৎ লীগকে অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের মত অন্যতম জনহিতৈষিণী সভাতে পরিণত করা হউক্।

কেন এরূপ অবস্থা হইয়াছে? আমার মনে হয়, ইহার দুইটা কারণ আছে, তাহাদের মধ্যে একটার উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পিছনে শিক্ষিত জনমত নাই। এ সম্বন্ধে আরো দু' একটা কথা পরে বলিব। দ্বিতীয় কারণ, তার্সাই সন্ধি। আজ যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গোলমাল চলিতেছে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যর্থপ্রায় হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, তাহার কারণ ভার্সাই-সন্ধি। য়ুরোপ যাইবার পূর্ব্বে সে সন্ধির সর্ত্তগুলি আমি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি নাই; (আমার মনে হয় আমাদের দেশে আমার মত লোকের সংখ্যা বহু আছে)। য়ুরোপে গিয়া প্রথম তাহা দেখিলাম। তখনই মনে হইল এ সন্ধির দ্বারা জগতের শান্তি হইতে পারে না। তখনও জার্ম্মাণীতে পূর্ণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই; নাৎসী দল শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। দুই বৎসরের মধ্যেই সেই প্রতিক্রিয়া পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল: আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র রেষারেষিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভার্সাই-সন্ধি দেখিলেই বুঝা যায়, এক বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সর্ত্তগুলি ছাড়া আর সমস্তটাই জার্ম্মাণীর প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত; তাহার মধ্যে প্রতিহিংসার পূর্ণচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট উইলসন বড় আশা করিয়া সন্ধির চতুর্দ্দশ সর্ত্ত যুদ্ধরত শক্তিগুলির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, বড় আশা করিয়া তিনি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত কূটনীতিক ক্লেমাসোঁ ভার্সাই সন্ধি নিজের ইচ্ছামত করিয়া ফরাসীদেশের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া জার্ম্মাণীর উপর শোধ তুলিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারই মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। ভার্সাই সন্ধির একাংশে শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচারিত হইলেও অন্যাংশে ঠিক তাহারই বিপরীতাচরণ করা হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর মত শক্তিশালী জাতিকে নিরস্ত্র, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া শান্তিস্থাপন অসম্ভব এবং যতদিন ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বিদ্বেষ থাকিবে, ততদিন য়ুরোপে সুতরাং জগতে শান্তি আনয়ন অসম্ভব হইবে। কারণ এই দুই শক্তি পরস্পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমাগত দলাদলি করিবার চেষ্টা করিবে এবং শক্তিসাম্য (balance of power) লইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধিবে। শক্তিসাম্যের আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের ঠিক উল্টা।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনের দুইটি উপায় আছে, এক শক্তিসাম্যের সৃষ্টি (balance of power), দুই, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বা অমনি একটা কোন প্রতিষ্ঠান গঠন, যেখানে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহযোগিতা করিতে পারে, বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারে। আর একটা উপায়ের কল্পনা এইচ্. জি. ওয়েলস্ প্রমুখ কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক ঐতিহাসিক করিয়াছেন, বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র এক রাষ্ট্রের (world state) প্রতিষ্ঠা। সেই বিশ্বরাষ্ট্র সকল জাতি ও রাষ্ট্রের ভেদ ঘুচাইয়া দিবে, তাহা বিশেষ কোন রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইবে না। ইহা ঠিক সাম্রাজ্যবাদ নহে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ও বিশ্বরাষ্ট্র এক বস্তু নহে; কারণ সাম্রাজ্য কোন এক বিশেষ রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত। সেই বিশ্বরাষ্ট্রের স্বরূপ লইয়া নানাভাবের কল্পনা জল্পনা চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ বর্ত্তমানে সেরূপ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তবে এই বিশ্বরাষ্ট্রের সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার যে, যাঁহারা এই আদর্শের পরিপন্থী তাঁহারা বলেন বিশ্বরাষ্ট্রে নিজস্ব সৈন্য থাকিবে, যে সৈন্যের সাহায্যে প্রতিকূল শক্তি দমন করা সম্ভব হইবে। এ কথাটার উল্লেখ এই জন্য করিলাম যে, অনেকে মনে করেন যে লীগের যদি এরূপ সৈন্য থাকিত তবে বোধ করি তাহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। আমি পরে প্রমাণ করিব এরূপ আন্তর্জাতিক সৈন্যের সৃষ্টি লীগের মূলগত আদর্শের বিরোধী। এই ত' শান্তিস্থাপনের এক পরিকল্পিত উপায়।

অন্য আর একটি উপায় শক্তিসাম্যের সৃষ্টি। ইংরেজীতে ইহাকে বলে balance of power করা। ইহার জন্য entente অর্থাৎ মৈত্রীর ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার ফলে জগতের শক্তিগুলি দুই বা ততোধিক দলে বিভক্ত হইয়া যায়; বিভাগের মূল কথা বিভিন্ন দলের শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা, যাহাতে একদল অপর দল হইতে শক্তিশালী হইয়া না উঠিতে পারে। ধরা যাউক ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া একটি entente-এর সৃষ্টি করিল; তখন জার্ম্মাণীর লক্ষ্য হইবে কি ভাবে তাহার নিজের স্বার্থ বজায় থাকে; তাহার জন্য সে হয়ত' হাঙ্গেরীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল, তাহার জন্য কতকটা রফাও করিতে হইল, হাঙ্গেরীও দেখিল অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাকে ফ্রান্সের বিরোধী কোন বৃহৎ শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে, ফ্রান্সের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কারণ সে হয়ত' রক্ষক হইতে গিয়া ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইবে, অষ্ট্রিয়ার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিবে। আর একটা উদাহরণ দিই; মনে করুন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপানে ও আমেরিকায় রেষারেষি চলিতেছে;

উভয়েই শত্রুর প্রতীর তুলিয়া আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত; এমন সময়ে রাশিয়া আসিয়া উপস্থিত। রাশিয়ার সহিত জাপানের বিবাদ বহু কারণে। তখনই আমেরিকা রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল; নূতন একটা entente-এর সৃষ্টি হইল; এদিকে জাপান আত্মরক্ষা করিতে গিয়া তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডের সহিত রফা করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিল এবং বিপক্ষ entente-এর সৃষ্টি হইল। এইভাবে balance of power নীতির ফলে সমস্ত জগত বিভিন্ন সপক্ষ দলে বিভক্ত হইয়া যায়; এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, অপরের শক্তি ক্ষয় করিতে বল জানাইতে চেষ্টা করে। পরস্পরের প্রতিহিংসা ও বিরোধই এই নীতির ভিত্তি এবং সেই বিরোধের শক্তিই ইহার শক্তি। ইহার ফল কোথায় গিয়া দাঁড়ায় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সেই আলোচনা করিব।

ওঁ মধু

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অনাদি রসের মধুর সরসী-নীরে,
মাধবের মধু লীলানর্ত্তন উঠে রাস ঘিরে ঘিরে।
সে মহারসের কেন্দ্রের তলে গোপন উৎস হ'তে,
মধুনির্ঝর বাহিরি' আসিল অসীম সৃষ্টি-পথে।
মধুরসে তার লুকাইয়া ছিল মাধবের দেহখানি,
তারে ঘিরে ঘিরে নৃত্যনিরতা ছিল মধুকল্যাণী।
কল্যাণী-সাথে করে সে মাধব যুগল আলিঙ্গনে,
রূপে রসে মিশে হইল বন্দী সৃষ্টির প্রাঙ্গণে।
বন্দি' দোঁহারে দুটি রসবরবধূ,
ব্যোম ঘিরে ঘিরে গাহিল ব্রহ্মা—ওঁ মধু ওঁ মধু।

মধুর মাধব এসেছিল বলে ওরে,
আদি স্রষ্টার সৃষ্টির বীণা বাজিয়া উঠিল ভোরে।
শিবের হস্ত গেঁথে দিল মালা সৃজনে গ্রন্থি দিয়া,
মহাশক্তি সে ঘুরা'ল মালা মহাকালে নন্দিয়া।
দেবদেবীদল পরাণ উতল নন্দনমধুবনে,
চিরযৌবন নিখিলের মন ভরে গেল চন্দনে।
চোখে ঘুমঘোর চাহে কৈশোর নবজীবনের দ্বারে,
মানবমানবী বন্দনা গাহি নিল তারে বারে বারে।
মাধব মাধবী নাচে দুটি বরবধূ,
মধুর পবন মধুর গগন ওঁ মধু ওঁ মধু।

মাধব-তনুর পরশ লাগিল বলি',
আদিম আলোক মধুর হইয়া বিশ্বে উঠিল জ্বলি'।
উঠিল ছন্দে মধু ঝঙ্কার—ওম্ ওম্ ওম্ ওম্,
অনাদি অন্ধকারের গর্ভে শিহরে সৃষ্টি-রোম।
মধুর স্পর্শে উজলিল তাই তপনের ছবিখানি,
চন্দ্র নাচিল মধুর কিরণে আলোর ছন্দ দানি'।
ব্যোম-প্রাঙ্গণে রসের বাসর তারকারা দীপ জ্বালে,
এল গ্রহদল মধুর অর্ঘ্য সাজায়ে ব্রহ্ম-থালে।
মাধব মাধবী নাচে দুটি বরবধূ,
ফুটিল মধুর সপ্তস্বর্গ ওঁ মধু ওঁ মধু।

বিশ্ব ভরিয়া দিবস রজনী-মাঝে,
ছন্দে কেবলে ওঠে আনন্দ মাধব যদি না রাজে।
মাধব মাধবী নাচে দিনরাতি নাচে তাই ঋতুবালা,
মধু নদীজল মধু ধরাতল মধুর ছন্দ ঢালা।
মধু ঋতুদল সিন্ধু উতল মধু দিবা মধু রাতি,
লীলাভুবনের হিন্দোলা ঘিরি' দেয় মধুমালা গাঁথি।
মাধবের চুমা পরশি হইল মধুময় দেহলীলা,
মধু-যৌবন প্রেমালিঙ্গন মধু দিয়া নন্দিলা।
মাধবমাধবী নাচে দুটি বরবধূ,
সকল ছন্দ মাধবানন্দ ওঁ মধু ওঁ মধু।

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

নারী দ্বারা বুদ্ধের লাঞ্ছন।

বুদ্ধের মত লোককেও স্ত্রীলোকের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

বুদ্ধের যখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স তখন দুইটি ঘটনা ঘটে। বুদ্ধের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য চিঞ্চা নামক তাহাদের অধীন একজন শিক্ষায়িত্রীকে (মাণবিকা) নিযুক্ত করিল। চিঞ্চা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সাজিয়া গুজিয়া জেতবনের দিকে যাইত ; জেতবন হইতে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ফিরিবার সময় লোকেরা তাহাকে দেখিতে পাইত। জেতবনের কাছে ব্রাহ্মণদের একটি আড্ডায় রাত্রি কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে সে জেতবনের দিক হইতে নগরের দিকে আসিত, প্রাতে লোকেরা বুদ্ধকে দেখিতে যাইবার সময় তাহাকে ফিরিতে দেখিতে পাইত। কোথায় যাইতেছে বা কোথা হইতে আসিতেছে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে চিঞ্চা উত্তর দিত, "সে কথায় তোমার কাজ কি ?" এইরূপ কিছুদিন নিয়মিত যাতায়াত করিয়া চিঞ্চা লোককে বলিতে লাগিল যে সে বুদ্ধের সঙ্গে জেতবনে রাত্রিবাস করে। লোকে ইহাতে কানাকানি করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সে শরীরে নকলের চুড়ালের হাড় ঘসিয়া হাত পা ফুলাইয়া এবং কাপড়ের নীচে পেটের উপর একটা কাঠের চাপ বাঁধিয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ করিল। আরও কিছুদিন পরে জেতবনে উপস্থিত হইয়া মিলিত ভক্তদের সম্মুখে বুদ্ধকে বলিল, "তুমি তো ভ্রমণ, উপদেশ দিয়া বেড়াও, কিন্তু আমার অবস্থা এখন কি হইবে ? যে ঘরে রাত্রে তোমার সঙ্গে থাকিতাম তাহা প্রসবের উপযুক্ত নয়, জিনিষপত্র টাকাকড়িও আমার কিছু নাই, তোমার তো অনেক বড়লোক ভক্ত আছে, তাদের বলিয়া আমার জন্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দাও—ইত্যাদি।" এই ভাবে চিঞ্চা অতিপরিচিতের মত অনেক কথা বলিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহার এই হীন কলঙ্কের উত্তরে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি আর আমিই জানি।" চিঞ্চা তখন বুদ্ধকে মিথ্যাবাদী ধর্ম্মধ্বজী বলিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।"—এই সময় হঠাৎ চিঞ্চার পেটে বাঁধা সুতা ছিঁড়িয়া গিয়া কাঠের চাপটা মাটিতে পড়িয়া তাহার প্রতারণা প্রকাশ করিয়া দিল (বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন দেবতারা ইঁদুর ও দমকা হাওয়া চইয়া আসিয়া সুতা কাটিয়া কাপড় উড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন—(মহাপদুম-জাতক ; ৫-কথা ৩।১৭৮)।

এক ব্রাহ্মণের মাগন্দিয়া নাম্নী অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে অনেকে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল ও ইহাতে বিবাদের সূত্রপাত হইল। বুদ্ধ একদিন ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা লইতে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে লইয়া নানা লোকের গণ্ডগোলের অবসান করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মণ ঠিক করিল যে সন্ন্যাসী বুদ্ধের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিবে। পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করিল। বুদ্ধ 'হাঁ না' কিছুই না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহে, সে ঠিক করিল আবার বুদ্ধকে ধরিবে। ব্রাহ্মণপত্নী বুদ্ধের রকম দেখিয়া অল্পেই বুঝিয়াছিল যে এ সন্ন্যাসী ভুলিবার লোক নয়, সে স্বামীকে নিষেধ করিল। পত্নীর নিষেধ না শুনিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে বসনভূষণে সাজাইয়া বুদ্ধের কাছে লইয়া গেল। বুদ্ধ বলিলেন, তাঁহার সকল রিপু জয় হইয়াছে, তিনি কামের অতীত, মাগন্দিয়া যতই সুন্দরী হউক তিনি তাহাকে পদনখের দ্বারাও স্পর্শ করার যোগ্য মনে করেন না। ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রত্যাখ্যাতা উপযাচিকার প্রতি-হিংসাবৃত্তি প্রসিদ্ধ ; মাগন্দিয়াও বুদ্ধকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে নাই।

কন্যার জন্য শ্রেষ্ঠী, রাজা ও অন্যান্য লোকের মধ্যে বিবাদের ঘটা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার ভ্রাতার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের ভ্রাতা মাগন্দিয়াকে কৌশাম্বীর (কোসম্বি) রাজা উদয়নের (উদেন) কাছে লইয়া গেল। মাগন্দিয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া উদয়ন তাহাকে বিবাহ করিলেন। উত্তরকালে

বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীতে আসিয়াছিলেন তখন মাগন্দিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য পথে নানারূপ অপমান ও লাঞ্ছনা করাইল। বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলেই এই গুণ্ডারা ও তাহাদের প্ররোচনায় নগরের অন্য লোক বুদ্ধের পিছনে পিছনে তাঁহাকে গালিগালাজ নিন্দা করিতে করিতে যাইত। কৌশাম্বীতে বাস এত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল যে আনন্দ বলিলেন, "ভন্তে আমাদের এ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে ভাল হয়।"

"আনন্দ, যেখানে যাইব সেখানকার লোকেও যদি আমাদের নির্যাতন করে?"

"তবে আমরা সে স্থানও ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব।"

"সেখানেও আমরা যদি নির্যাতিত হই তবে কি করিবে?"

"ভন্তে, তবে আমরা আবার স্থানত্যাগ করিব।"

"আনন্দ, একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলে আমরা এতগুলি পর্য্যটনের কষ্ট নিবারণ করিতে পারিব। যাহা অন্যত্র পাইব ভাবিতেছি তাহা ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে আমরা হয়ত এখানেই পাইব। আনন্দ, আমাদের যুদ্ধের হস্তীর মত অস্ত্রপ্রহারে অবিচলিত থাকিতে হইবে।" (ধ-কথা ১।১১৯ ও ৪।১)

মাগন্দিয়া রাজা উদয়নের মনেও বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। মাগন্দিয়া তাহার খুড়ার কাছ হইতে আটটি জীবন্ত মোরগ ও আটটি মায়া মোরগ আনাইয়া জীবন্ত মোরগগুলি উদয়নের হাতে দিয়া বলিল, তিনি যেন তাঁহার অন্যতমা পত্নী সামাবতীকে উহা রাঁধিতে দেন। উদয়ন ভক্তিমতী পত্নীর অঞ্চলে বাঁধা ছিলেন, তিনি মাগন্দিয়ার কথামত মোরগগুলি সামাবতীর কাছে পাঠাইলেন। সামাবতী বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রাণীহত্যা করিতে অস্বীকার করিলেন, মাগন্দিয়া তখন রাজাকে সামাবতী বুদ্ধের জন্য জীবন্ত মোরগ রাঁধে কিনা দেখিবার জন্য আবার মোরগগুলি সামাবতীর কাছে বুদ্ধের জন্য রাঁধিয়া দিতে পাঠাইতে বলিল। উদয়ন তাহাই করিলেন, কিন্তু মাগন্দিয়া এইবার জীবন্ত মোরগ গোপনে বদলাইয়া মৃত মোরগগুলি সামাবতীর কাছে পাঠাইয়া দিল। যে জীবের হত্যা আমি করি নাই তাহা খাইতে বুদ্ধের অনুমতি ছিল, কাজেই সামাবতী তাহা রাঁধিয়া রাজার কাছে পাঠাইলেন। মাগন্দিয়া তখন উদয়নকে বলিল, "দেখিলে, তোমাদের মত সাধারণ লোকের জন্য উনি উহা করিতে রাজি হন নাই! বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন, "অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে, কদর্য্যকে দান দ্বারা জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে—

অক্কোধেন জিনে কোধম্ অসাধুম্ সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ম্ দানেন সচ্চেনালিকবাদিনম্। (ধম্মপদ, ২২৩)

—এই উক্তি মাগন্দিয়া সম্বন্ধে খাটে নাই, সৈন্যের দ্বারা কৌশাম্বী জয়ের আশাও তাঁহার পূর্ণ হয় নাই—সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

নারীর বুদ্ধ-নির্য্যাতনের আরও দুইটি কাহিনী পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কখন ঘটিয়াছিল বলা যায় না।

কয়েকজন দরাজ ধুবা তাহাদের স্ত্রীদের সুশিক্ষা পাইবার জন্য বিশাখার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। শ্রাবস্তীতে একবার সাত দিনের জন্য মদ্যপান উৎসব ঘোষণা করা হইল। এই যুবকেরা তাহাদের স্ত্রীদের প্রচুর তীব্র সুরা পান করিল; উৎসবের শেষে স্ত্রীরা ভাবিল যে তাহারা ও সুরাপান করিতে পারিল না, তাই তাহারা ঠিক করিল লুকাইয়া স্বামীদের অজ্ঞাতসারে তাহারা সুরা পান করিবে। বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া তাহারা একটি আরামে বেড়াইতে গেল। বহির্বাসের ভিতরে লুকাইয়া তাহারা সঙ্গে সুরা লইয়া গিয়া পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায় আরামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে লোকনিন্দা হইবে বলিয়া বিশাখা চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীদের কাছে তাহারা কি উত্তর দিবে। স্ত্রীরা বলিল, তাহারা অসুখের ভাণ করিবে। স্বামীরা স্ত্রীদের দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল তাহাদের অসুখ হইয়াছে। সুরা পান করিয়াছে সন্দেহ করিয়া তাহারা স্ত্রীদের উত্তম-মধ্যম লাগাইল। পরে আর একটি উৎসবে স্ত্রীরা আবার সুরা পান করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু বিশাখা তাহাদের আরামে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। স্ত্রীরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, তাহারা বুদ্ধদর্শনে যাইতে চায়। বিশাখা ইহাতে রাজি হইলেন; স্ত্রীরা গন্ধমাল্য ও লুকাইয়া সুরাপাত্র সঙ্গে লইয়া চলিল। জেতবনে গিয়া স্ত্রীরা বেহুঁস এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইল ও গোপনে সুরাপান করিল। বিশাখা স্ত্রীদের উপদেশ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রীদের কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছিল; অচিরেই

তাহারা বুদ্ধের সম্মুখে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিল, তাঁহার সামনে আসিয়া নানাভঙ্গিতে হাত তালি দিয়া হাসিতে লাগিল। বর্ণনায় আছে যে বুদ্ধ চক্ষু হইতে জ্যোতিশিখা বাহির করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন—ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে তিনি তাহাদের প্রতি রোষকষায়িত ভ্রূভঙ্গ করিয়াছিলেন, কারণ অবিলম্বেই স্ত্রীদের নেশা ছুটিয়া গিয়া তাহারা শান্ত হইয়া বসিয়াছিল। (ধ-কথা ৩।১০০)

ঈর্ষ্যাপর ব্রাহ্মণেরা সুন্দরী নাম্নী একজন পরিব্রাজিকার সহায়তায় বুদ্ধকে চরিত্রহীন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুন্দরীও চিকার মত সন্ধ্যা-সকাল জেতবনের দিকে যাতায়াত করিতে লাগিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে সে বুদ্ধের সঙ্গে "গন্ধকুটি"তে রাত্রিযাপন করে। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল। চক্রান্ত পাছে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতায় পণ্ড না হইয়া যায় এজন্য ব্রাহ্মণেরা গুণ্ডা লাগাইয়া সুন্দরীকে হত্যা করাইয়া জেতবনের কাছে আবর্জ্জনাস্তূপের নীচে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়া রটনা করিয়া দিল যে, পরিব্রাজিকা সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না। রাজার কাছে গিয়া বলিল যে তাহাদের সন্দেহ হয় যে বুদ্ধের শিষ্যেরা বুদ্ধের কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা তাহাদের সুন্দরীকে অন্বেষণের অনুমতি দিলেন। তাহারা অনেক খোঁজাখুঁজির ভাণ করিয়া জেতবনের নিকটের আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে মৃতদেহ বাহির করিল। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণেরা মৃতদেহ নগরের পথে পথে লইয়া আনুষঙ্গিক ঘটনা ঘোষণা করিল। লোকে ভিক্ষুদের নিন্দা করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে ইহা জানাইলে তিনি মিথ্যাবাদীর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা হত্যা অস্বীকার করিতেছেন শুনিয়া রাজা রাজপুরুষদিগকে ব্যাপার তদন্ত করিতে বলিলেন। রাজপুরুষেরা সর্ব্বত্র চর পাঠাইলেন ; চরেরা এক শৌণ্ডিকালয়ে শুনিতে পাইল কতকগুলি লোক মাতাল হইয়া এ উহাকে "তুই সুন্দরীকে মারিয়াছিস্" বলিতেছে। লোকগুলাকে ধরিয়া রাজার সামনে হাজির করা হইলে রাজার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা স্বীকার করিল যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া তাহারা সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা ব্রাহ্মণদের ডাকাইয়া নগরে একথা ঘোষণা করিতে বলিলেন এবং গুণ্ডাদের ও অপরাধী ব্রাহ্মণদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন (ধ-কথা, ৩।১৭৪)।

শিষ্যগণ ও নারী

সংসার ত্যাগ করিলেও ভিক্ষুদিগকে মধ্যে মধ্যে নারীরূপের মোহে পড়িতে হইত ; গৃহীভক্তেরাও কেহ কেহ নারীসংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত হইয়া বুদ্ধের শরণ বা উপদেশ লইতে আসিতেন ; অন্য ব্যাপার উপলক্ষেও নারীসম্বন্ধে বুদ্ধকে কোন না কোন কথা বলিতে হইত। এগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিব।

রাজগৃহে সিরিমা নামে একজন গণিকা ছিল। কথিত আছে সিরিমাও বৈশালীবাসের মত গণিকা শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত ছিল। সিরিমা ভিক্ষুদের মুক্ত হস্তে ভিক্ষা দিত। একজন ভিক্ষুর কাছে ইহা শুনিয়া আর একজন ভিক্ষু সিরিমার গৃহে ভিক্ষা করিতে গেল। সেদিন সিরিমা অসুস্থ থাকায় দাসীরা ভিক্ষুদিগকে আহার করাইতে বসিল ও আহারান্তে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ভিক্ষুদের কাছে লইয়া যাইতে বলিল। তাহাকে যখন ভিক্ষুদের কাছে আনা হইল তখন তাহার রূপ ও যৌবনশোভা দেখিয়া এই ভিক্ষুর চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। সে আরামে ফিরিয়া আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া একান্তে পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ খবর পাইয়া তখন কিছু বলিলেন না। কয়েকদিন পরে সিরিমার মৃত্যু হইল। বুদ্ধ বিম্বিসারকে বলিয়া কয়েকদিন মৃতদেহের সৎকার স্থগিত রাখাইলেন। (মৃতা গণিকার অর্থসম্পত্তি রাজার প্রাপ্য বলিয়া তাহার সৎকারও বোধ হয় রাজার করণীয় ছিল।) কয়েকদিন পরে বুদ্ধ বিম্বিসারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ভিক্ষুদের লইয়া সিরিমার দেহ দেখিতে যাইবেন, রাজাও যেন উপস্থিত থাকেন। বুদ্ধ সেই বাসনাকাতর ভিক্ষুকেও সঙ্গে নিলেন এবং সকলকে সিরিমার গলিত কৃমিকুলসমাচ্ছন্ন শব দেখাইয়া শরীরের পরিণাম চিন্তা করিতে বলিলেন। বুদ্ধ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিরিমাকে এক রাত্রের জন্য লোকে কত দিত, বিম্বিসার বলিলেন লোকে পঞ্চাশ কার্ষাপণ দিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এই দেহের জন্য লোকে কত দিবে?" রাজা বলিলেন, কিছু দেওয়া দূরে থাক ইহার সৎকারের জন্য তিনি আদেশ না দিলে কেহ উহা স্পর্শও

করিবে না। বুদ্ধ বলিলেন, "যে-দেহের প্রতি লোকের এত লোভ ছিল তাহার এই পরিণাম! ভিক্ষুগণ, সিরিমার দেহের অবস্থা দেখিয়া বিনাশশীল শরীরের প্রতি আসক্তি যে কিরূপ মূর্খতা তাহা তোমরা শিক্ষা কর।" সিরিমার রূপমুগ্ধ ভিক্ষুর ইহাতে মোহ কাটিয়া গেল। (ধ-কথা, ৩।১০৪)। বুদ্ধ প্রায়ই ভিক্ষুদের শ্মশানক্ষেত্রে গিয়া মৃতদেহের পরিণাম দেখিয়া দেহের ও দৈহিক বিষয়ের প্রতি আসক্তির ভ্রম বুঝিতে বলিতেন।

পূর্ণ নামক একজন দরিদ্রলোক শ্রেষ্ঠী সুমনের গৃহে চাকর ছিল। পূর্ণের স্ত্রী ও উত্তরা নাম্নী কন্যাও সুমনের গৃহে কাজ করিত। পূর্ণ হঠাৎ অনেক ধনলাভ করিয়া বড়লোক হইল (বর্ণনায় আছে সারিপুত্রকে সেবা করিবার ফলে তাহার এই ভাগ্য-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল), এবং তখন সুমনের পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হইল। সুমনরা বুদ্ধের ভক্ত ছিল না, ইহাতে উত্তরার সজ্ঘসেবার অসুবিধা হইত, তাহা ছাড়া গৃহকর্মও উত্তরাকে অনেক করিতে হইত। উত্তরা পিতাকে তাহার অসুবিধার কথা জানাইলে পূর্ণ পরামর্শ দিল যে উত্তরা স্বামীকে বলিয়া গণিকা সিরিমাকে স্বামীর উপপত্নীরূপে গৃহে রাখুক, যাহা খরচ লাগে পূর্ণই তাহা দিবে। উত্তরার স্বামী ইহাতে সম্মত হইল ও সিরিমাকে গৃহে আনিয়া রাখা হইল। সিরিমা ব্যাপার জানিত না, সে ভাবিত সে-ই বুঝি গৃহের কর্ত্রী। এদিকে উত্তরা নিশ্চিন্ত হইয়া রন্ধনশালায় ভিক্ষুসঙ্ঘের খাওয়াইবার জন্য মালাবাজা করিয়া সময় কাটাইত। একদিন স্বামী উত্তরাকে দেখিয়া হাসিল, সিরিমা ইহাতে ঈর্ষ্যায় অধীর হইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া উত্তরার মাথায় গরম ঘি ঢালিয়া দিল। উত্তরার দাসী ইহাতে রাগিয়া সিরিমাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল কিন্তু উত্তরা দাসীকে ছাড়াইয়া লইল। তারপর সব শুনিয়া সিরিমা বুঝিল যে সে রক্ষিতা মাত্র এবং অনুতপ্ত হইয়া উত্তরার কাছে ক্ষমা চাহিল; উত্তরা বলিল, বুদ্ধ যদি তাহাকে ক্ষমা করেন তবে সেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। উভয়ে বুদ্ধের কাছে গেলে বুদ্ধ সিরিমাকে ভর্ৎসনা করিয়া অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ-জয়ের জন্য উত্তরার প্রশংসা করিলেন। (ধ-কথা, ৩।০৭২)।

যে শাকানারীরা মহাপ্রজাবতীর সঙ্গে আসিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বুদ্ধের ভ্রাতা নন্দের মনোনীতা স্ত্রী জনপদকল্যাণীও ছিল। জনপদকল্যাণী পরমাসুন্দরী ছিল বলিয়া তাহার "রূপনন্দা" নাম ছিল এবং তাহার মনে রূপের জন্য খুব গর্ব্ব ছিল। সে জানিত যে, বুদ্ধ নারীরূপ অসার বলিয়াছেন, বুদ্ধের কাছে গেলে পাছে বুদ্ধ তাহার রূপের নিন্দা করেন এই ভয়ে সে বুদ্ধের সামনে যাইত না, তাঁহার কাছে গেলে অন্য ভিক্ষুণীদের পিছনে বসিয়া থাকিত। বুদ্ধ ইহার মনের ভাব বুঝিলেন। বর্ণিত আছে যে ইহাকে দেখাইবার জন্য বুদ্ধ একদিন একটি অপরূপ সুন্দরী মায়ামূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন, ইহা দেখিয়া জনপদকল্যাণী মোহিত হইয়া এই সুন্দরীর তুলনায় নিজেকে কাকের মত কুৎসিত মনে করিল। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধ জনপদকল্যাণীর চোখের সামনে এই মায়াময়ী সুন্দরীকে বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী হইতে ক্রমান্বয়ে এক সন্তানের মাতা, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা ও ব্যাধিগ্রস্তা মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিলেন। রূপের এই পরিণাম দেখিয়া জনপদকল্যাণীর রূপাভিমান কাটিয়া গেল। বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী ক্ষেমা-(খেমা)-ও নাকি রূপাভিমানে বুদ্ধের কাছে যাইতে চাহেন নাই, বিম্বিসার নাকি ক্ষেমাকে ভুলাইয়া বেণুবনে লইয়া গিয়া বুদ্ধের সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।১১৩, ৪।৪৭)।

একজন ভিক্ষু স্নানের জন্য একটি জীর্ণোদ্যানে গিয়াছিল। একজন নগরশোভিনীও সেখানে অভিসারে গিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রণয়ী না আসায় সে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ভিক্ষুকে দেখিয়া ভাবিল, এই একটি লোক দেখিতেছি, ইহাকে ভুলান যা'ক। চারদিকে তাকাইয়া কেহ নাই দেখিয়া নাম্নী ভিক্ষুর সামনে দাঁড়াইয়া কয়েকবার অন্তর্বাস খুলিয়া আবার পরিল, চুল খুলিয়া আবার বাঁধিল এবং হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। ভিক্ষুর ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য হইল কিন্তু কামের বশীভূত না হওয়া সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে রক্ষা পাইল। (ধ-কথা, ২।২০১)।

দুই ভাই সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিল; বড় ভাই সত্যই সন্ন্যাসী হইল কিন্তু ছোট ভাই স্ত্রী ও গৃহের কথা ভাবিত। বুদ্ধ একবার ইহাদের গ্রামে গিয়াছিলেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীরা তাহাদের স্বামীকে বুদ্ধকে ভুলাইয়া গৃহে ফিরাইবার মতলব করিয়া বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। বুদ্ধ যাইবার আগে ছোট ভাই তাঁহার আসনাদির বন্দোবস্ত ঠিক

হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে গেল। সে যখন আসনাদি ঠিকঠাক করিতেছিল তখন তাহার স্ত্রীরা তাহাকে নানারূপে উত্যক্ত করিল, আসনগুলি উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া শেষে তাহার চীবর খুলিয়া লইয়া শ্বেত বস্ত্র পরাইয়া মাথায় ফুলের মালা জড়াইয়া দিল। সে তখনও ভ্রমণের ছিল বলিয়া এই বেশেই বুদ্ধের কাছে ফিরিয়া সংবাদ দিল। ভিক্ষুরা তাহার সংঘত্যাগের কথা আলোচনা করিয়া বলিল যে, বড় ভাইও বোধহয় গৃহে ফিরিবে কারণ তাহার স্ত্রীর সংখ্যা আরও বেশী। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, সে ভয় করিবার কারণ নাই, কারণ ছোটভাইয়ের চিন্তা নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু বড়ভাই সেরূপ নহে; সে সর্বদা আমোদের ধান্দায় থাকে সেই মায়ের হাতে পড়ে, কিন্তু যে স্থির তাহার এরূপ হয় না। (ধ-কথা, ১।৬৬)

কয়েকজন লিচ্ছবিবংশীয় যুবা আমোদের জন্য উদ্যানে যাইতেছিল, পথে একটি নগরশোভিনীকে দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইল। উদ্যানে গিয়া ইহাকে লইয়া যুবাদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইল। শেষে খুনাখুনি হইয়া কয়েকজন মারা পড়িল। ইহাদের মৃতদেহ বাঁশে বাঁধিয়া নগরে আনা হইল। ভিক্ষুরা ইহা দেখিয়া বুদ্ধকে বলিলে তিনি বলিলেন, "কাম হইতে দুঃখ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়।" (ধ-কথা, ৩।২৮০)

একজন যুবক নারীদ্বেষী ছিল, এইজন্য তাহাকে লোকে "অনিথিগন্ধ কুমার" বলিত, অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের গন্ধ সহিতে পারে না। বাপ মা অনেক বলাতেও যুবক বিবাহ করিতে চাহিত না, অবশেষে সে একটি স্বর্ণ-প্রতিমা বানাইয়া বলিল, ঐরূপ সুন্দরী কন্যা পাইলে সে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মণেরা অনেক খুঁজিয়া পরমা সুন্দরী একটি কন্যা পাইলেন ও যুবাকে দেখাইবার জন্য তাহাকে লইয়া আসিতেছিলেন। বালিকা এতসুকুমারদেহা ছিল যে গাড়ীর ঝাঁকানিতে পথে তাহার মৃত্যু হইল। যুবা সাগ্রহে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকে সন্তর্পণে এই খবর দেওয়া হইল, কিন্তু তবুও যুবা আশাভঙ্গজনিত শোকে অধীর হইয়া উঠিল। বুদ্ধ তাহাদের বাড়ীতে গিয়া যুবককে কামনাই যে দুঃখ ও ভয়ের কারণ এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।২৮১)।

একটি যুবকের পত্নী বিবাহের দিন হইতেই ব্যভিচারিণী-বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল, যুবক লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিত না। যুবক একদিন বুদ্ধের কাছে আসিল; বুদ্ধ তাহার অনেক দিন না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুবক তাহার লজ্জার কথা বলিল; বুদ্ধ বলিলেন, "সংসারের স্ত্রীলোক ঠিক যেন নদী, পথ, পাথরালা প্রভৃতির মত— উহাদের সমস্ত অসদ্ব্যবহারের কথা কেহ বলিতে পারে না।" (ধ-কথা, ৩।৩৪৮)

অনাথপিণ্ডদের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেম (খেম) বড় প্রিয়দর্শন ছিল। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইত এবং কেহ সদা পরস্ত্রীলোলুপ হইয়া বেড়াইত। একদিন রাজে রাজপুরুষেরা ক্ষেমকে ধরিয়া রাজার সামনে উপস্থিত করেন। প্রসেনজিৎ "মহাশ্রেষ্ঠীর (অর্থাৎ অনাথপিণ্ডদের) কথা ভাবিয়া আমার লজ্জা হয়" বলিয়া ক্ষেমকে ছাড়িয়া দিলেন। এরূপ দুই তিনবার ঘটিল, তখন প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে একথা জানাইলেন; বুদ্ধ বলিলেন যে, পরস্ত্রীগামী তাহার চারিটি বিপত্তি হয়, সে পাপ সঞ্চয় করে, শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে না, নিন্দাভাজন হয় ও নরক গমন করে। (ধ-কথা, ৩।৪৮১)।

এক ব্যক্তি তাহার দাসীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া হাত-পা বাঁধিয়া নাক কাটিয়া দিয়া দাসীকে ঘরে বন্ধ করিয়া স্বামীকে লইয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে গেল। ইতিমধ্যে কয়েকজন আত্মীয় তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া দাসীকে মুক্ত করিলে, দাসী গিয়া বুদ্ধের কাছে নালিশ করিল। বুদ্ধ গোপন পাপের নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, লোকে না দেখিলেও ইহাতে পরে অন্তত ভয় কিন্তু পুণ্যের দ্বারা সর্বদাই আনন্দ লাভ হয়। (ধ-কথা, ৩।৪৮১)

সুন্দরসমুদ্র নামক এক ধনী যুবক সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মাতা এজন্য কাঁদিতেন। একজন পণ্যস্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন যে, অর্থ পাইলে সে সুন্দরসমুদ্রকে সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পারে। মাতা ইহাতে সম্মত হইলেন। সে পথে সুন্দরসমুদ্র ভিক্ষায় বাহির হইত স্ত্রীলোকটি সেখানে বাড়ী ভাড়া লইয়া কয়েকদিন তাহাকে ভিক্ষা দিয়া তারপর স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। সুন্দরসমুদ্র কয়েকদিন তাহার গৃহে বারান্দায় বসিয়া আহার করিবার পর স্ত্রীলোকটি পথের কয়েকজন ছোকরাকে পয়সা দিয়া শিখাইয়া রাখিল যে ভিক্ষু আহারে বসিলে তাহারা যেন বারান্দার উপর আসিয়া

ধূলা উড়ান ও বারণ করিলেও যেন না শুনে। পরদিন সুন্দরসমুদ্র আহারে বসিলে ছোকরারা আসিয়া সেইরূপ করিল। তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, বারান্দায় অসুবিধা হয়, পরদিন হইতে ভিক্ষু যেন বাড়ীর মধ্যে বসিয়া আহার করেন। বাড়ীর মধ্যে কয়েকদিন আহারের পর স্ত্রীলোকটি ছোকরাদের বাড়ীর মধ্যে ভিক্ষুর আহারস্থানে পূর্ব্বের মত উৎপাত করিতে শিখাইয়া দিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্ত্রীলোকটি সুন্দর-সমুদ্রকে বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ উপরের তলায় লইয়া গিয়া নির্জ্জনে হাবভাব দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বর্ণিত আছে সুন্দরসমুদ্রের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল, যেন বুদ্ধ তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাতে বল পাইয়া সে রক্ষা পাইল। বোধ হয় বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে সতর্ক হইয়াছিল। (ধ-কথা, ৪।১৯৪)

বিদ্রোহ-দমনের পুরস্কারস্বরূপ রাজা প্রসেনজিৎ সন্ততি নামক একব্যক্তিকে সাতদিন রাজত্ব করিতে ও একটি নর্ত্তকী উপহার দিয়াছিলেন। সন্ততি সাতদিন ধরিয়া মদ্যপান করিল ও শেষ দিন নাচগান করিতে করিতে নর্ত্তকীটি হঠাৎ তাহার সামনে মরিয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে শোকার্ত্ত হইয়া সন্ততি বুদ্ধের শরণ লইলে তিনি তাহাকে উপদেশ দিয়া সংঘে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। (ধ-কথা, ৩।৭৮)

রাজা প্রসেনজিতের একজন দরিদ্রলোকের সুন্দরী পত্নীর উপর নজর পড়িয়াছিল এবং দরিদ্রলোকটিকে হত্যা করিয়া তাহার পত্নীকে তিনি গ্রহণ করিবেন ভাবিলেন। এই অভিপ্রায়ে রাজা লোকটিকে রাজবাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি এই ছিল যে কোন দোষ পাইলে তাহা উপলক্ষ করিয়া তাহাকে বধ করিবেন কিন্তু তাহার কোন দোষ পাইলেন না। একদিন রাজা তাহাকে কঠিন কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন তাঁহার স্নানের আগেই তাহাকে ফিরিতে হইবে। লোকটি রাজার স্নানের আগেই কার্য্যসমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, স্নানের পূর্ব্বেই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটি তখন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া লোক ডাকিয়া সকলকে সাক্ষী থাকিতে বলিয়া বলিল যে সে কার্য্যসমাধা করিয়া স্নানের পূর্ব্বেই ফিরিয়াছে। সেই রাত্রে রাজা প্রসেনজিৎ যখন শয্যায় শুইয়া স্ত্রীলোকটির কামনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন তখন তাঁহার কানে কিসের ঘোরশব্দ শুনিতে পাইলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকাইলেন, ব্রাহ্মণেরা সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে বলিল, অনেক যাগযজ্ঞ করিলে ইহার উপশম হইবে। প্রসেনজিতের মহিষী মল্লিকা রাজাকে ভয় পাইয়া সব কথায় বিশ্বাস করার জন্য নিন্দা করিয়া বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন, বুদ্ধ বলিলেন, রাজা যে শব্দ শুনিয়াছেন তাহা নরকের পাপীদের আর্ত্তনাদ। (ধ-কথা, ২।১)

বিশাখ নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অনাগামিফল লাভ করিয়াছিল। একদিন বিশাখ বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে ফিরিতেছিল, তাহার স্ত্রী ধর্ম্মদত্তা (ধম্মদিন্না) বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু বিশাখ স্ত্রীকে দেখিয়া হাসিল না ও আহারের সময় তাহাকে সঙ্গে খাইতে ডাকিল না। স্ত্রী ভাবিল, বিশাখ রাগ করিয়াছে কিন্তু বিশাখ পরে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল যে, তাহার আর সংসারে থাকিবার ইচ্ছা নাই এবং সে তাহার সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রীকে দিতে চাহিল। ধর্ম্মদত্তা বলিল, "উচ্ছিষ্ট লইয়া আমি কি করিব? আমাকেও ভিক্ষুণী হইতে অনুমতি দাও।" (উপনিষদেও বর্ণিত আছে স্বামী সম্পত্তিদানের কথা বলিল যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম কেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্?—যাহাদ্বারা আমি অমরত্ব পাইব না তাহা লইয়া আমি কি করিব?") বিশাখ ইহাতে খুশি হইয়া স্ত্রীকে ভিক্ষুণীবিহারে লইয়া গেল। ধর্ম্মদত্তা ভিক্ষুণীদের সঙ্গে নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যানাভ্যাস করিয়া অর্হৎফল লাভ করিল এবং অনুদের উপহারের জন্য বিহারে ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিয়াছে শুনিয়া বিশাখ বিস্মিত হইয়া বিহারে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল ও ধর্ম্মদত্তাকে পরীক্ষা করার জন্য ফলত্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধর্ম্মদত্তা ফলত্রয়ের কথা বুঝাইয়া বিশাখকে অর্হৎফলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, বিশাখ উত্তর দিতে আরম্ভ করিলে ধর্ম্মদত্তা দেখিলেন যে, বিশাখ তাহার সীমানার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, কারণ সে অনাগামিত্ব পর্য্যন্ত ফললাভ করিয়াছিল, অর্হৎলাভ করে নাই। ধর্ম্মদত্তা তখন হাসিয়া বিশাখকে বুদ্ধের কাছে গিয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল। (ধ-কথা, ৪।২২৯) "যোগবাসিষ্ঠে" শিখিধ্বজ নামক রাজা ও তাঁহার রাণী চূড়ালা সম্বন্ধে উপাখ্যান আছে যে, রাজা

ও রাণী একত্র সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসাধনা আরম্ভ করেন ও চূড়ালা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হইয়া পরে শিখিধ্বজকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা (ভদ্দা কুণ্ডলাকেসা) রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ছিল। একদিন একজন বন্দীকে রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, ভদ্রা বন্দীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে ভদ্রার পিতা উৎকোচদানে বন্দীকে মুক্ত করিয়া ভদ্রার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইলেন। কিছুদিন পরে ভদ্রার স্বামীর ভদ্রার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার লোভ হইল, সে ভদ্রাকে বলিল সে, বন্দীদশায় সে গৃধ্রকূটে দেবতার কাছে পূজা মানিয়াছিল, এখন সেই পূজা দিতে হইবে। ভদ্রা পূজার আয়োজন করিল ও স্বামীর সঙ্গে পূজা দিতে যাইবে বলিল। ভদ্রার সঙ্গে লোকজন আসিতেছিল কিন্তু স্বামী তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া একা ভদ্রাকে লইয়া চলিল। পথে স্বামীকে কোন আদরের কথা বলিতে না শুনিয়া ভদ্রা তাহার মতলবে সন্দেহ করিল। গৃধ্রকূটের চূড়ায় পৌঁছিয়া স্বামী ভদ্রাকে তাহার অলঙ্কারগুলি উত্তরীয়ে বাঁধিতে বলিল। ভদ্রা বলিল, "আমি কি অপরাধ করিলাম?" স্বামী বলিল, "মূর্খ, আমি তোমার অলঙ্কারগুলি লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" ভদ্রা বলিল, "প্রিয়তম, এসব অলঙ্কার কাহার? আমিই বা কাহার?" স্বামী উত্তর দিল যে সে ওসব ভাগাভাগির কথা জানে না। তখন ভদ্রা বলিল, "ভাল, তাহাই হউক, কিন্তু হে প্রিয়তম, আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর, অলঙ্কার পরা থাকিতে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিতে দাও।" স্বামী ইহাতে রাজী হইলে ভদ্রা তাহাকে সামনের দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া তারপর যেন পিছন হইতে আলিঙ্গন করিবে এই ভাণ করিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে চূড়া হইতে ফেলিয়া দিল। তারপর ভদ্রা জৈনদের দলে যোগ দিয়া শ্রমণী হইল; ভদ্রা বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিল, সে স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিত। শ্রাবস্তীতে গিয়া ভদ্রা একটি বালুকাস্তূপ বানাইয়া তাহাতে একটা আম্রশাখা পুতিয়া রাখিয়া বলিল যে, যে তাহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিতে চায় সে যেন এই আম্রশাখা উৎপাটন করে। সারিপুত্র সেখান দিয়া যাইবার সময় ব্যাপার শুনিয়া পথের ছোকরাদের শাখা তুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। সাত দিন পরে ভদ্রা আসিয়া ইহা দেখিলেন ও অনেক লোককে আনিয়া তর্কযুদ্ধ শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া সারিপুত্রের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রশ্ন করিবে ও কে উত্তর দিবে? সারিপুত্র বলিলেন, ভদ্রা প্রশ্ন করুন, তিনি উত্তর দিবেন। তর্ক আরম্ভ হইলে ভদ্রা যত প্রশ্ন করিল সারিপুত্র তাহার উত্তর দিলেন, শেষে ভদ্রার প্রশ্ন ফুরাইয়া গেল; সে আর কি জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া পাইল না। তারপর সারিপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এক কি? (একং নাম কিম্)"; জৈনরা বহুসংখ্যক আত্মা ও অগণ্য জড় পরমাণু-(পুদ্গল)র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত বলিয়া বোধ হয় সারিপুত্র এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রা ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া বলিল, সে তাঁহার শরণ লইতেছে; "আমার শরণ না লইয়া বুদ্ধের শরণ লও" এই কথা বলিয়া সারিপুত্র ভদ্রাকে বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন। (ধেরিগাথার টীকা)।

নন্দুত্তরা নাম্নী আর একজন জৈন শ্রমণী বাগ্মিত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ও তর্কযুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন। মৌদ্গল্যায়ন নন্দুত্তরাকে তর্কে হারাইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠীর উৎপলবর্ণা (উপ্পলবণ্ণা) নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। উৎপলবর্ণাকে বিবাহ-প্রার্থী অনেক লোক আসিল, কিন্তু কেহও যাতে অসন্তুষ্ট না হয় এজন্য শ্রেষ্ঠী কন্যাকে ভিক্ষুণী হইতে বলিলেন। উৎপলবর্ণা ধর্মপ্রাণা ছিল বলিয়া আনন্দে ইহাতে সম্মত হইল। উৎপল-বর্ণা বনে একটি কুটির বানাইয়া পরদা ঝুলাইয়া তাহাতে বাস করিত এবং ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইত। এক যুবক সম্বন্ধে উৎপলবর্ণার ভাই হইত ও তাহার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিল; উৎপলবর্ণার বাসস্থানের সন্ধান লইয়া যুবা তাহার অনুপস্থিতিতে কুটিরে গিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া থাকিল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষা করিয়া কুটিরে ফিরিয়া খাটের উপর বসিল, বাহিরের আলোক হইতে ভিতরে আসিয়া সে ভাল দেখিতে পাইতেছিল না, এই অবসরে যুবা খাটের নীচ হইতে বাহির হইল এবং উৎপলবর্ণার "আমার সর্বনাশ করিও না" এই ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাহার ধর্মনাশ করিয়া চলিয়া গেল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীদের কাছে এ কথা জানাইল, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের বলিল ও ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের রক্ষার জন্য নগরের মধ্যে ভিক্ষুণী-বিহার বানাইয়া দিতে রাজা প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনার পর ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করিলে অর্হতের কোন দোষ হয় কিনা; বুদ্ধ বলিলেন পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না সেইরূপ অর্হতেরও কামেচ্ছা থাকে না। (ধ-কথা, ২।৭৮; ৫।১৬১) (ক্রমশঃ)

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কলিকাতা

৭

বিনয়ের সে রাত্রে ঘুম হইল না। একটি তপ্ত আবেশে সারা কাটিয়া গেল—ভোরের আলো দিগন্ত উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। সে কলেজে গেল না, স্নানাহার কেমন যেন স্বপ্নের মধ্যে করিয়া ফেলিল। নিস্তব্ধ দুপুরে বারান্দায় বসিয়া চৈতের রৌদ্রে আকাশ ভরিয়া আকাশ-কুসুম বুনিয়া কাটাইয়া দিল। এমন কি সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ বাবুর বাড়িতেও যাওয়া স্থগিত থাকিল। সত্য কথা বলিতে কি, সেখানে যাইতে তাহার সাহসের অভাব। যে-অলৌকিক বলাবেশ তাহার মনে তাহার ধর্মই যে ক্ষণভঙ্গুরতা, কি জানি আজ যদি কোন আঘাতে তাহা ভাঙিয়া পড়ে!

বন্ধু-বান্ধবকে সে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে বারংবার মনে মনে জপমালার মত আবর্তন করিতে থাকে। প্রথম মোহ কাটিলে সে বুঝিতে পারিল, এই অভিজ্ঞতার মূলে একটা অপূর্ব্ব অধিকারের স্বাদ! সে যে একটা পূর্ণ মানুষ, তাহার যে কিছু আছে। তাহার দায়িত্ব কত বিরাট, তাহার চিন্তার কারণ কত অসামান্য। যাহা সে পাইয়াছে, কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করিবে, কি ভাবে তাহার সুখ সাধন করিবে, ইহাই ভাবিয়া তাহার দিন যায়, রাত্রি কাটে।

পারুল তাহার, জগতের আর সকলের হইতে বিশেষভাবে পৃথক ভাবে কেবল তাহারই।

পুরুষের সম্বন্ধে নারীর এই ভাবটা তাহার আদিম সংস্কারের সহিত জড়িত। আদিম মানুষ বুকের হাড় ভাঙিয়া নারীকে গড়িয়াছিল; নারী তাহার প্রাণের বস্তু। প্রাণের, কিন্তু, বস্তু! বিধাতা নিজের ভাবে মানুষ গড়িয়াছেন, মানুষ নিজের অভাবে নারীকে গড়িয়াছে। সে বিশেষভাবে পুরুষের। সেইজন্যই সে পুরুষের প্রিয়, কিন্তু পুরুষের সমান নয়। সত্য কথা বলিতে কি নারীতে বস্তুগত অধিকারের ভাব পৌরুষের একটা অঙ্গ। সেই অধিকারের অপূর্ব্ব স্বাদে বিনয় উন্মাদ। এই অদ্ভুত অধিকারের প্রেরণায় সে নিজের মূল্যবান বস্তুগুলি বারংবার মনের সহিত মেপিতে লাগিল। সোনার ঘড়িটি, কাশ্মীরি শালখানি, মলাটে-বাঁধানো পুস্তকের শ্রেণী, দামী ফাউন্টেন পেনটি! কিন্তু এইতো সব নয়, তাহার আরো কিছু আছে, আরো কিছু, সবচেয়ে মূল্যবান।

কিছুদিন এমন ভাবে যায়। হঠাৎ সে একদিন অবিনাশ বাবুর বাড়ি গেল। দুপুর বেলা; ভয় ছিল পাছে পারুলের সঙ্গে দেখা হয়, পারুল বাড়ি নাই; অবিনাশ বাবু কলেজে; সর্ব্বেশ্বরী একাকী বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলেন। বিনয়কে দেখিয়া তিনি আদর করিয়া বসাইলেন। বিনয় কি করিতে কি করিয়া ফেলিল; পারুলকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইল। সর্ব্বেশ্বরী চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে তাহার দিকে তাকাইলেন; বিনয়ের ভয় হইল, বোধ হয় কাজটা ভাল হয় নাই। সর্ব্বেশ্বরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—একটু বোস বাবা, দুটো পান এনে দি। সর্ব্বেশ্বরী উঠিয়া গেলেন—বিনয় বুঝিল প্রস্তাব মঞ্জুর। বিনয় পান খাইয়া বাড়ি ফিরিল; সর্ব্বেশ্বরী স্বামীর আগমন অপেক্ষায় কেবলি ঘর-বাহির করিয়া এক বাটা পান নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

* * *

সন্ধ্যাবেলা গৃহিণী স্বয়ং পারুলকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। একটি পান সাজিয়া পারুলকে দিতে গিয়া কি জানি কি ভাবিয়া সর্ব্বেশ্বরী বলিলেন—থাক কাজ নেই, তোর আবার পান খেলে সয় না। কিন্তু আজ সকলের অভ্যাসেরই ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। পারুল নিজেই একটা পান সাজিয়া খাইল। অবিনাশ বাবু গৃহিণীকে বলিলেন—নিতাইয়ের যখন বিয়েটারের সখ, ওকে দু'একটা ভাল জরির জামা কিনে দিয়ো। নিতাই আসিয়া পিতাকে ধরিল,—বাবা, আমাকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করে দাও।

পারুলের কি হইল জানি না, কিন্তু সে সারা রাত্রি তোরঙ্গের কাপড়-চোপড় গুছাইয়া কাটাইয়া দিল। একবার অনেক রাত্রে উঠিয়া গোলাপ গাছগুলিতে জল সেচন করিল, অবশেষে শেষ রাত্রে মমসেন রচিত রোমের ইতিহাস পড়িতে

পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, অমরাবতী-তুল্য রোম, বিশাল রঙ্গক্ষেত্র, বিরাট প্রেক্ষাগারে দর্শকের আসনশ্রেণী ধাপে ধাপে উত্থিত, মাঝে শ্বেতপাথরের কারু-শোভী সম্রাটের আসন, লরেল-কিরীটি স্বয়ং সম্রাট, উন্মত্তীন-দর্শকবৃন্দ, সম্মুখে রথের প্রতিযোগিতা! সম্রাটের সঙ্কেত-সম্মতিতে সমগ্র রঙ্গক্ষেত্র সজীব হইয়া উঠিল। রথ ছুটিতেছে; স্বর্ণাভ চাকার আবর্তনে সূর্যাকিরণ মন্থিত করিয়া, উৎকর্ণ অশ্বের কেশর নিষ্কম্প করিয়া, রথীর আলম্বিত কশাঘাতে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া, শতাধিকুরে প্রেক্ষাপ্রাকার শঙ্কিত করিয়া, রথ ছুটিতেছে। সমস্ত মিলিয়া বর্ণের, শব্দের, গতির একটা বন্যা। এক মুহূর্ত পরে, বিক্ষত রঙ্গভূমি, বিচ্যুত রথচক্র, বিদীর্ণ রথাক্ষ, বিস্তৃত রঙ্গক্ষেত্র আহতে-নিহতে, দ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বীতে একাকার। জয়োল্লাস ও মৃত্যুবিলাপ পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সন্তুষ্ট জনতা, সন্তুষ্ট সম্রাট।

সংবাদ শুনিয়া সকলেই খুশী হইল। বন্ধু-বান্ধবেরা ভোজের জন্য অগ্রিম পাইল। বেবি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল; সে আসিয়া পারুলের ঘরে আরাম-চেয়ারখানার উপরে তনুদেহলতা এলায়িত করিয়া দিয়া সুস্থ অধরোষ্ঠ ধনুকের মত বাঁকাইয়া বলিল—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ মিসেস্ চৌধুরী! পারুল বুঝিল এইবার তাহার অগ্নিপরীক্ষা সুরু। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি বিক্ষেপ করিয়া বেবি বলিতে লাগিল—'লাউট্, ক্রটাস্', তবে আর কেন, খ্রী-এস্‌এর মেম্বারশিপ ছেড়ে দাও, এখন তো তুমি বাপ্‌মায়ের ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ্!

খ্রি-এস্ ব্যাপারটা কি একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। সেল্‌ফ সিলেক্‌শন সোসাইটি নাম দিয়া কতিপয় আধুনিকতা-গ্রস্ত মিস্ একটি সভা করিয়াছেন। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ইহার সভ্যেরা নিজেদের স্বামী-নির্বাচনের ভার পিতামাতার উপর না রাখিয়া নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভাটাকে সংক্ষেপে বলা হয় খ্রি-এস্।

পারুল বলিল, কেন ভাই, পরমেশবাবুও তো তোকে—

আরাম-চেয়ারখানার হাতলির উপর একটি ক্ষুদ্র আঘাত করিয়া বেবি বলিল—ইনডীড্, আই হাই হ্যাব্ সম্ বডি! কিন্তু সে যদি আমার বাপের কাছে প্রস্তাব করতে যায়, তবে তাকে,—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নিকটের ফুলের তোড়া হইতে গোলাপের একটা কুঁড়ি লইয়া সেটা টোকা মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—আই প্রাউড নট্ থিঙ্ক আউট! থাক আশা করি তুমি খ্রি-এস্‌এর মেম্বারশিপ ছেড়ে দিচ্ছ! বেবি উঠিয়া পড়িল, বরতনু পর্দান্তে দিয়া একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ মিসেস্ চৌধুরী!

বেবি চলিয়া গেলে পারুল বিনয়ের প্রস্তাব ব্যাপারটাকে যেন নূতন ভাবে দেখিতে পাইল। বিনয়কে সে ভালবাসে সত্য; বিবাহ করিতেও সম্মত। কিন্তু বিনয় কেন এ প্রস্তাব তাহাকে না করিয়া বাপের কাছে করিল! তবে বুঝি বিনয় তাহাকে অপমান করিয়াছে; আর সত্যই তো সে তাহার সঙ্গিনীদের নিকট আজ অপমানিত হইল। বেবি যাহা বলিয়া গেল, তাহা মিথ্যাও নহে, তাহার একলার কথাও নহে।

ক্রমে বিনয়ের উপর তাহার রাগ, একটা বিতৃষ্ণার মত জমিয়া উঠিতে লাগিল। ভালবাসার বিপরীত দিকে না-ভালবাসা নহে—একটা তীব্র বিদ্বেষ। প্রেমের মধ্যে যেখানে সিংহদ্বার খুলিল না, শত্রুতার খোলা গুলি বর্ষণে দুর্গপ্রাকার সেখানে ভগ্ন হইবে। বন্ধুরূপে হউক, শত্রুরূপে হউক, দুর্গে তাহাকে প্রবেশ করিতে না দিয়া উপায় নাই।

বিনয় আসিলে সে আর দেখা করে না, সরিয়া সরিয়া থাকে। মা ভাবেন লজ্জায়, বিনয় ভাবে রোমান্টিকতার অবকাশে কল্পনায় তুলি চালাইবার এই তো সুযোগ। পারুল ভাবে, বিনয়কে দেখিয়া লইব, আমি যে বাপ্‌মায়ের ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ নই, আমি যে স্বতন্ত্র সত্তা, একটি অখণ্ড নারী, বিনয়কে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। তাহার বহু জন্মের সংস্কার বলে—এ তো ঠিক হইয়াছে, এই তো স্বাভাবিক। তাহার নবজাগ্রত আধুনিকতার বুদ্ধি ও শিক্ষা বলে—ভুল, ভুল, পারুল তুমি যে-সে নও, তুমি ইজাডোরা ডানকান্, প্যাবলোবা, ক্লিওপেট্রার সহোদরা! বিনয়কে উহার প্রতিশোধ দেওয়া চাই।

৮

সদাশঙ্করবাবু একজন নামজাদা কম্যুনিষ্ট। শহরের লোক তাঁহাকে একডাকে চেনে। কলিকাতায় তিনখানি বাড়ি, দেশে প্রকাণ্ড জমিদারি, ছোট লোহার কারখানা, ব্যাঙ্কে নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ এবং একটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা, ফলতঃ একজন ধনেশী কম্যুনিষ্টের পক্ষে

যায়। আবশ্যক, তাঁহার কোনটারই অভাব ছিল না। দেশের ধন-সাম্যবাদীদের অর্থাৎ যাহাদের ধনে ভাগ বসিলে ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই, তাহাদের একমাত্র ভরসা তিনি। ইন্দ্র-ধনুর প্রতিপ্রান্ত যেমন ৬টি বর্ণরেখার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সকলের বিশ্বাস, কম্যুনিজমের তোরণ তেমনি ৬টি লোকের উপর ভর দিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার এক প্রান্তে মার্ক্স লেনিন, অপর প্রান্তে, এই আমাদের ওবের কাছের বালিগঞ্জের সদাশঙ্কর বাবু।

বালিগঞ্জের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িতে তিনি থাকেন। বাড়ির হাতার মধ্যে এক দরজা দিয়া মোটরের প্রবেশ, অন্য দরজায় প্রস্থান: সম্মুখেই মোটর ঘুরিবার জন্য কাঁকরখচিত অর্দ্ধবৃত্তাকার একটি পথের অর্দ্ধচন্দ্র। শ্বেত-পাথরের সোপান বাহিয়া বারান্দায় উঠিলে বিরাট মৃন্ময় নাক-চাপটা একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি। লোকে বলে মূর্ত্তিটির কাঁচা অবস্থায় সদাশঙ্কর বাবুর ছোট ছেলে গুলতি বানাইবার জন্য নাসিকাগ্রভাগ ছলন করাতে, নাকের এই দুর্দ্দশা। তিনি বলেন—উহা নেপালের রাজকারিগরের তৈরী, সেইজন্য নেপালী শিল্পের আদর্শে নাকটি কল্পিত। মূর্ত্তিটির সম্মুখে একটি টেবিলের উপরে কোরেটা হইতে আনীত লতাপাতা আঁকা পিতলের একটি প্রকাণ্ড পাত্র—শূন্য। আজকালকার অধিকাংশ ধনীর বাড়ীর সম্মুখে এইরূপ একটি অর্দ্ধচন্দ্র (মোটরের পথ) ও শূন্য পাত্র দুই হয়।

বারান্দা পার হইয়া প্রকাণ্ড হল। তাহার চার দেয়ালে চারখানি ছবি, গান্ধী, মুসোলিনি, লেনিন, হিট্‌লার। একেবারে জাঁট-ঘাট বাঁধিয়া সদাশঙ্কর বাবু বসিয়া আছেন, কোন দিক দিয়া ঘুঘু ঢোকা করিবার উপায় রাখেন নাই।

সেদিন সকালে সদাশঙ্কর বাবু ও আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। সদাশঙ্কর বাবুকে দেখিতে সাধারণ বাঙালীর মত, কেবল তৈলস্পর্শহীন অসংবৃত দীর্ঘ কেশপাশে অরাজকতার একটা আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর জার্ম্মানীতে কাটাইয়াছেন, কিন্তু সে দেশ হইতে কি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পায় নাই: তিনিও সযত্নে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। লোকে বলে জার্ম্মানী নয়, কয়েক বছর তিনি পেশোয়ারে কাটাইয়া আসিয়াছেন; তাহার প্রমাণ বাগানের গুই দুটা আখরোট ও এপ্রিকটের গাছ; সেখান হইতেই ও দুটির চারা আনীত। দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল—জানিয়া রাখা ভাল অপর ব্যক্তির নাম কমরেড।

কমরেড—দেখুন আমার ট্রেনিং হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এতে আজগুবি কিছু নেই। এ'তে তিনটি অঙ্গকে শিক্ষিত করতে হবে। প্রথম হচ্ছে, চোখ আর মুখ; চোখে এমন একটি ভাব করতে হবে, যা মকরধ্বজের মত, অনুপানভেদে সব জায়গায় চলে। আপনার চোখের ভাব দেখলে—রাঘব-বাণী ভাববে, আপনি তার জন্যেই সারারাত কেঁদেছেন; সামা-বাণী ভাববে, আপনার টাকাকড়ি কালই তাকে দিয়ে ঝুলি ঝাড়ে করবেন; তাক-বাণী ভাববে আপনি চাষা। বুঝলেন কিনা?

সদাশঙ্কর বাবু—আর মুখের কাজ কি?

কমরেড—এমন ভাবে কথা বলবেন যাতে দরকার হ'লে তার অনেক অর্থ হয়, অর্থাৎ কিনা, কোনই অর্থ হয় না।

সদাশঙ্কর—বুঝলাম, কথাটা একটু ভেবে বলতে হবে—

কমরেড অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কিছু মাত্র না, কিছু মাত্র না, যা খুসি বলে ফেলবেন, বেগতিক দেখলে একজন উকীল লাগিয়ে দেবেন।

সদাশঙ্কর—আর কোন্ অঙ্গ?

কমরেড—পায়ের শিক্ষা চাই। এমন ভাবে এগোবেন যাতে সময় মত পেছোনো যায়। নবাবের দরবারে আগে লোকে কুর্ণিশ করে' চুকত—দুই পা এগোতো এক পা পিছোতো! আপনি কিন্তু দুই পা এগোবেন, তিন পা পিছোবেন—

সদাশঙ্কর—তা হলে যে ক্রমে পিছিয়েই যাব!

কমরেড—যাবেনই তো! নইলে কি এগিয়ে যারা পড়বেন! আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠি, আমাকে একবার সাহেবপাড়ায় যেতে হবে।

—কেন বলুন তো?

—ট্রেনিং দিতে।

—আপনি তো শুধু দেশীয়দের ট্রেনিং দেন।

—কে বল্লে? দেশী বিদেশী যারা আমাকে ডাকে, তাদের কাছেই যাই। দেখছেন, এক সঙ্গে উপরি উপরি আমি তিনটে পোষাক পরে আছি।

এই বলিয়া সে এক একটা করিয়া পোষাক তুলিয়া তিন রকমের তিনটি পোষাক দেখাইল।—দেখ্‌লেন, উপরেরটা খদ্দর, দেশী নেতাদের জন্য; তার নীচে হাফ প্যাণ্ট, সাহেবদের জন্য; আর সব নীচে কুস্তির পোষাক—ওটা ছাত্রদের জন্য। আজকাল বক্তৃতার দিন গেছে কিনা, সভাতেও হাতের ব্যবহার চলে, তাদের মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা দিতে হয়!

সদাশঙ্কর—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ছাত্রদের আমার দলে না টানলে তো উপায় নাই।

কমরেড—দেখুন পুরাণে বলে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে গিয়ে হাতির মাথা বসাতে হয়েছিল। সংবাদপত্রের কৃপায় ছাত্রদের সেই দশা হয়েছে। হাতির মাথার সুবিধে এই আকারে বৃহৎ হওয়াতে ভিতরে যে কিছু নেই হঠাৎ এ সন্দেহ হয় না। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে' দেব। এই বলিয়া লোকটি উঠিয়া চার বেয়ারের চার দেবতাকে নমস্কার ঠুকিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য চতুর্দ্দোলে এই চার চিত্রের আবির্ভাব এই শিক্ষা-গুরুর পরামর্শে।

এমন সময়ে একদল ছাত্র গৃহে প্রবেশ করিল। এই জাতীয় যাচক-উপযাচক প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে আসে, কাজেই সদাশঙ্কর বাবু কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে?

—আজ্ঞে আমরা ছাত্র।

—কি চাও?

—আমরা পাড়ায় একটা অতিথিশালা করেছি, তার জন্য কিছু চাঁদা।

—এই ছবিখানা কার জেন? চিত্রখানার ইতিহাস একটু জানা, আবশ্যক। সদাশঙ্কর বাবুর মাথার কাছে সুপ্রযুক্ত একটি বিদেশী পুরুষের ছবি আছে; এই একটি ছবি যারা তিনি বহু কাজ চালাইয়া থাকেন। (এ ছবিখানা কমরেডের পরামর্শে নহে, তাঁহার নিজের আবিষ্কার।)

ছাত্রেরা বলিল—আজ্ঞে না।

—কম্যুনিজমের স্রষ্টা কে?

—জহরলাল নেহেরু।

—না, কার্ল মার্কস।

—কোন্ জেলায় তাঁর বাড়ি?

—জার্মানীতে। তাঁর বই পড়ে দেখো তিনি গুণ্ডা করতে নিষেধ করেছেন।

—আমি কম্যুনিষ্ট। ছাত্রদল বিদায় হইল।

এমন সময়ে দ্বিতীয় দল ছাত্র প্রবেশ করিল।

—কি চাও?

—আজ্ঞে কুস্তির আখড়া করেছি, কিছু চাঁদা।

—এই ছবিখানা কার জেন? (সেই ছবি)

—আজ্ঞে না।

—টলষ্টয়ের নাম শুনেছ? তিনি বলেছেন বাহুবলে কিছু হবে না—আমি তাঁর শিষ্য। নিরুপায় ছাত্রেরা চলিয়া গেল।

তাহারা যাইতেই তৃতীয় দল ছাত্রের প্রবেশ।

—কি চাও?

—আজ্ঞে আমরা একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করেছি।

—বেশ।

—আপনি নিজের সব সম্পত্তি দেশের জন্য দেবেন বলেছেন—আমরা……

—কিন্তু দেশ কোথায়? তুমি কি দেশ, তুমি দেশ, তুমি দেশ?

—আমরা সবাই মিলে।

—তোমরা এই তিনজনে দেশ। দেশকে আনো এখনি দিচ্ছি। আর বিশেষত—আচ্ছা এই ছবিখানি কার জেন?

—আজ্ঞে না।

—বার্ণাড শ'র নাম শুনেছ?

—আজ্ঞে তিনি বাংলার লাট ছিলেন।

—না তিনি রোনাল্ডশ। ইনি ইংলণ্ডের একজন বড় ডাক্তার। 'দি ডক্টরস্ ডাইলেমা' বলে একখানা ডাক্তারি বই লিখেছেন, তাতে প্রমাণ করেছেন, ঔষধে রোগ সারে না। এখন যেতে পার।

ছাত্রেরা গেলে সদাশঙ্কর বাবু স্নানের জন্য উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পরমেশ সবেগে প্রবেশ করিয়াই মহোল্লাসে একটা অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার লাল প্যাণ্ট, লাল কোট, লাল জুতা এবং লাল মোজা। মাথার চুল কাটা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাও 'লাল হো যায় গা'। সে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব কিংবা ইতস্ততঃ না করিয়া বলিয়া গেল—আপনিও

কমুনিষ্ট আমিও কমুনিষ্ট, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো।

সদাশঙ্করবাবুর মত লোকও অবাক্। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা টাকা চাহিতে আসিয়াছিল তাহাদেরও কিছু বিধা ছিল, কিন্তু ইনি সে সবের অনেক উর্দ্ধে।

সদাশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কখানা বাড়ি?

পরমেশ সগর্ব্বে উত্তর দিল—একখানাও নয়।

—নগদ টাকা?

—এক পয়সাও নয়। পরমেশ নিজের উত্তরে নিজেই গৌরব বোধ করিতেছিল। সে আদর্শকে প্রায় ধরাধর করিয়া ফেলিয়াছে।

—জমি জমা?

—এক ছটাকও না।

—তবে তোমার কি আছে?

—কেউ না, কিছু না।

—তবে?

—কেবল আমি আছি, আপনি আছেন, আর আছেন ওই লেনিন। এই বলিয়া সে লেনিনের ছবিখানা দেখাইয়া খানিকটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেল।

Lenin thou shouldst be living at this hour
India hath need of thee! She is a fen
Of Private Property! Factory, Bank and Pen,
Corporation, the clique of office and bower
Have forfeited the pre-historic Indian dower
Of lawless happiness! we are selfish men:
Oh, raise us up, return to us again:
And give us strikers, voting, daughters, power!

কবিতাটেও সদাশঙ্কর বাবুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে হইল না। তিনি বলিলেন—এখন যেতে পার।

—কিন্তু মেয়ে?

—আমার কাছেই থাকবে।

—বিয়ে।

—সেটা অন্যত্র দেখ।

পরমেশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিদায় ভাঙিলে চীৎকার করিয়া উঠিল—Lenin, Lenin thou shouldst be living at this hour. সে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—আহাম্মক বাঙ্ কমুনিজম্, আমি মডারেট হ'ব! মাথায় তেল দেব, পোষাকের লাল রঙ ধুয়ে ফেলব, মনে রাখবেন এখনো পাকা রঙ করিনি! গোল্লায় যাক্ রাশিয়া, বেঁচে থাক্ ইংলণ্ড। ডাউন, ডাউন উইথ কম্যুনিজম্; আপ, আপ, ইম্পীরিয়ালিজম্! —সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল—England with all thy faults I love the still! আহা-হা, বেবি, বেবি!

৯

বিনয়ের পক্ষে পারুল ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যথাসম্ভব বিনয়কে এড়াইয়া চলে। বিনয় আসিলে সে দেখা করে না, চায়ের টেবিল হইতে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। অবিনাশ বাবু পুরুষ, তাঁহার এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কম, তিনি অত লক্ষ্য করিতেন না। সর্ব্বেশ্বরী স্ত্রীলোক, তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি অত্যধিক, তিনি ইহাকে কুমারী-সুলভ লজ্জা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হইল বিনয়ের। বিবাহের প্রস্তাবের আগে পারুল কারণে অকারণে বিনয়কে ডাকিয়া লইয়া গল্প করিত, এখন আর সে সুযোগ মিলে না। ব্যাপার দেখিয়া বিনয়ও ক্রমে গম্ভীর হইতে লাগিল—তাহার মুখের উপর যেন একটা অনুতাপের ছায়া পড়িল। পারুল ইহা লক্ষ্য করিল, এবং আশ্চর্য্য এই যে ইহাতে দুঃখিত হইবার পরিবর্ত্তে সে কেমন যেন একটা গর্ব্ব বোধ করিতে লাগিল।

পারুল সারাদিন একাকী বসিয়া ভাবে সে বিনয়কে ভুল করিবে। এক একবার তাহার সন্দেহ হয়, তবে কি সত্যই সে বিনয়কে ভালবাসে না। এই চিন্তার ছায়াপাত মাত্রে তাহার অন্তরতম আদিম নারী বিদ্রোহ করিয়া ওঠে, বিনয়কে ছাড়া তার গতি নাই। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার অস্তিত্বের উপরিতলের আধুনিক শিক্ষার আবরণ কর্কশ কণ্ঠে বলিতে থাকে, মনে রাখিও পারুল, তুমি পিতামাতার অস্থাবর সম্পত্তি নও। তাহারা যাহাকে ইচ্ছা তোমাকে দান করিতে পারেন না; তোমার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, অস্তিত্ব আছে, স্বাধীনতার অধিকার আছে।

পারুলের দিন এই দ্বন্দ্বে কাটে। কিন্তু হায়, ইচ্ছা থাকিলেও নারীর সুযোগ কত অল্প। সে নিশ্চিত জানে,

বিনয় ইচ্ছা করিলেই তাহাকে যে-কোনো সুযোগে ধূলায় লুটাইয়া দিয়া সম্পর্কে চলিয়া যাইতে পারে, তাহার সুযোগের অবধি নাই। কিন্তু পারুল আজ কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়াও সামান্য এমন একটা ছুতা পাইল না, বিনয়কে যাহাতে একটু জব্দ করিতে পারে।

অবশেষে সে-সুযোগ বিনয়ের নিকট হইতেই আসিল। সেদিন পারুল বিনয়কে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু বিনয় ছাড়িল না। বিনয় বলিল—পারুল কাল সিনেমায় যাবে? একটা ভাল ফিল্ম আছে। পারুল ভাবিবার সময় পাইল না, বলিল—যাব।

—তবে তুমি তৈরী হ'য়ে থেক। আমি সাড়ে পাঁচটায় আসব। বাড়ীতে থেক যেন, আমার শরীর ভাল নয়, কিন্তু ফিল্মটা এখন না দেখলে আর দেখা হবে না, বুঝলে?

—আচ্ছা।

পারুল বিনয়কে আর বেশি অবসর না দিয়া ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের উপর এত বিদ্বেষের পরে সে যে কেমন করিয়া এই প্রস্তাবে বিনা দ্বিধায় সম্মত হইল, ইহা ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। সে বুঝিল না, এই সম্মতি তাহার স্বভাবনিহিত আদিম নারীর ইঙ্গিতে। কিন্তু তাহার পরাজয়ের এই সুযোগটাকে বিজয়স্তম্ভে পরিণত করিবার জন্য তাহার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল, ভালই হইয়াছে, একটা সুযোগ যখন মিলিয়াছে, ইহাকে এমন ভাবে ব্যবহার করা চাই, যাহাতে বিনয়ের উচিত শিক্ষা হইয়া যায়। বিনয় অনুতপ্ত হউক, বিবাহের প্রস্তাব নূতন করিয়া তাহার কাছে করুক, তারপরে দেখা যাইবে। সে ভাবিল, বিনয়ের মনে ঈর্ষা জাগাইয়া দেখাইতে হইবে, পারুল পিতামাতার সম্পত্তি নহে, সে তাহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল; পরমেশকে তাহার সহিত যথাশীঘ্র সম্ভব দেখা করিতে অনুরোধ করিয়া একখানা চিঠি লিখিল।

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। এতদিন পরে সে মনে একটু শান্তি পাইল; এমন কি, তখন আর বিনয়ের চিন্তাও তাহার নিকট অপ্রিয় মনে হইল না। পারুল দেরাজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হঠাৎ বিনয়ের একখানা ছবি বাহির করিয়া ফেলিল। এ ছবিখানা বিনয়ের উপহার। বিবাহের প্রস্তাবের পরে সে এ ছবি আর দেখে নাই, কিন্তু তাহার পূর্বে কত অবসর সময় না এই ছবির সাহচর্য্য করিয়া কাটিয়াছে।

আজ সে আবার ছবিখানা তুলিয়া ধরিল। ছবিখানার প্রতি সে কেমন একটা জন্মান্তর ভাব অনুভব করিল। কত দিন সে ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। ছবিখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে সে একটা চুম্বন করিল। কিন্তু বিনয়কে সে উচিত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবে না। ছবিখানাকে সে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল; কাল বিনয়ের সঙ্গে তাহার একবার বোঝাপড়া হইবে; তারপরে নূতন করিয়া নূতন ভিত্তিতে দুই জনের মিলন। একবার চকিতের মত মনে হইল, বিনয় যদি তাহাকে আর গ্রহণ না করে। পারুল ছবিখানা বাহির করিয়া দেখিল সে-মুখে অবিশ্বাসের সন্দেহের কোনো কারণ নাই। ছবিটা বুকের মধ্যে গোপন করিয়া সে বাহিরে আসিল। অনেকদিন পরে সে আজ হাসিয়া মায়ের সঙ্গে আলাপ করিল। সর্ব্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন, বিনয়ের সঙ্গে তাহার একটা প্রণয়-কলহ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। পারুল কারণে অকারণে উৎফুল্ল হইয়া ঘুরিতে লাগিল, এমন সময় খবর আসিল পরমেশ আসিয়া

১০

পরদিন বিনয় বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময় পারুলদের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। সে একেবারে সোজা পারুলের ঘরে গেল। ঘর খালি। পারুল বোধহয় সাজ-গোজ করিয়া লইতেছে এই ভাবিয়া সে বসিয়া রহিল। এমন সময়ে পুরাতন চাকর রামভক্ত বিনয়কে দেখিয়া বলিল—বাবু, আজ আপনাকে একটু বসতে হবে।

—কেন রে?

—দিদিমণি বাইরে গেছেন।

—কোথায়?

—সিনেমা দেখতে।

বিনয় বুঝিল রামভক্তের ভুল হইতেছে। সে বলিল—দাদার কথা আছে বটে, আমার সঙ্গে যাবে, তুমি তাকে গিয়ে বল।

রামভক্ত বুঝিল, বিনয় ভুল করিতেছে। সে বলিল, তিনি আধঘণ্টা হ'ল গেছেন, আমি নিজে তাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

—বলিস্ কিরে? একা?

—না, সঙ্গে পরমেশ বাবু আছেন। বিনয়ের পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, এই চাকরটার সম্মুখে যেন তাহার মুখের কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে।

—কোন্ সিনেমাতে?

—অমুক জায়গায়। আপনি উঠছেন কেন বসুন।

—না, আর একদিন আসব। বিনয় উঠিয়া পড়িল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হইতে কেমনায় একটা ভুল যেন উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সে সিনেমার দিকে উড়িয়া চলিল।

সিনেমার 'শো' অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বিনয় একখানা টিকিট করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ছবি দেখিবার লোভ তাহার ছিল না, সে অন্ধকারে প্রাণপণবলে পারুল পরমেশকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কাছাকাছি কোথাও তাহারা নাই। নিশ্চয় উপরের বেশী মূল্যের আসনে বসিয়াছে। বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—সাম্নে দেখুন মশায়, উপরে নয়। এমন সময়ে চট্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল—'ইণ্টারভ্যাল'।

বিনয় চাহিয়া দেখিল, উপরে অধিক মূল্যের ৬টী আসনে পাশাপাশি পারুল ও পরমেশ। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, গা কাঁপিতেছিল, চারিদিকের শব্দ, দৃশ্য সব মরীচিকা বলিয়া মনে হইতেছিল। নিজের উপরে তাহার কেমন যেন করুণার ভাবের উদয় হইল। সে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। সে কি করিবে। এখানে বসিয়া থাকিলে কোনো ফল নাই। বাহির হইয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু বাহির হইতেও পারিতেছিল না। কেমন যেন একটা ভীতিবিজড়িত আনন্দের ভাব সে অনুভব করিতে লাগিল। এই দৃশ্যটা সে দেখিতেও পারিতেছিল না। আবার ছাড়িয়াও উঠিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। অবশেষে একটা শুষ্ক হাসির রেখা তাহার মুখে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পারুল ও পরমেশ অত্যন্ত আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া আলাপ করিতেছে। পরমেশের হাতখানা পারুলের চেয়ারের পিঠ-খানীর উপরে। পারুল পরমেশের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছে।

পারুল কেমন যেন উন্মনা হইয়া ছিল। পরমেশ মানুষের মনের এই সব সূক্ষ্ম অনুভূতির কোনো খবর রাখে না। সে যে অনাত্মীয় যুবতীর সাথে সিনেমায় আসিতে পারিয়াছে, এই আনন্দেই মত্ত। কতক্ষণে সে বাসায় ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবকে এই আশ্চর্য্য কাহিনী বলিয়া অবাক করিয়া দিবে তাহাই ভাবিতেছিল। পারুলের দৃষ্টি ছিল সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে। সে নিশ্চয় জানিত বিনয় তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া এখানে আসিবে। পাছে বিনয় তাহার সন্ধান না পায়, সেই ভয়ই অনাবশ্যক হইলেও রামভক্তকে সঙ্গে আনিয়াছিল। রাম-ভক্ত খবরটা নিঃসন্দেহে বিনয়কে দিয়াছে।

পারুল নীচের দিকে তাকাইয়া সন্ধান করিতে করিতে বিনয়কে দেখিতে পাইল। বিনয় তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পারুল বুঝিল বিনয় তাহাদিগকে নিশ্চয় দেখিয়াছে। এতক্ষণে তাহার মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিল। পারুল দেখিল, বিনয় একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, ছটফট করিতেছে। কেমন একটা অহঙ্কারে পারুলের মন পূর্ণ হইয়া গেল। দেখ বিনয়, আমি পিতামাতার সম্পত্তি নই, বিবাহের প্রস্তাব মাত্রেই তোমার সম্পত্তি হইয়া যাই নাই, স্বাধীন ব্যবহারের বলে আমার যেখানে খুসী যাহার সহিত খুসী আসিয়াছি।

বিনয়ের মত পারুলও তাহাকে না দেখিয়া পারিতেছিল না। বিনয়ের মুখে চোখে অসহায় ঈর্ষ্যার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পারুল একান্ত তৃপ্ত ভাবে তাহাই দেখিতে লাগিল। আবার আলো চট্ করিয়া নিভিয়া গেল। পারুল দেখিল অস্পষ্ট একটা মূর্ত্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। বিনয় চলিয়া যাইতেই পারুলের ছবি দেখিবার সখ চলিয়া গেল। পরমেশ একাগ্রচিত্তে ছবি দেখিতেছিল। একটা হাসির দৃশ্য ছিল। পরমেশ হাসিতে হাসিতে পারুলকে বলিল—দেখুন, দেখুন কি মজা!

পারুল হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বুঝিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছে। জগৎ-বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের কৌতুক অভিনয়ে, যখন প্রেক্ষাগৃহ অজস্র হাস্যে

প্রতিধ্বনিত, একাকী পাকলের দুই গাল বাহিয়া তখন অশ্রুর নির্ঝর ছুটিয়াছে। বিপদের কোনো চিত্র পাকিলে তাহার হয়তো এমন দশা ঘটিত না। কিন্তু কৌতুক-নাট্যে সকলের আনন্দের সহিত তাহার নিরানন্দ এমনি পৃথক ভাবে তাহার নিকট দেখা দিল, সে বুঝিতে পারিল, অত বড় ওই প্রেক্ষাগৃহে, সে নিতান্ত অসহায়, একাকী, একেবারে নিঃসঙ্গ। পাশের ওই পরমেশ বাবু তিনিও কতদূরে। তাঁহার হাসির সঙ্গে পাকলের নীরব অদৃশ্য অশ্রুর কোথায় যোগ!

১১

বিনয় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত পরিচিত পথ, সেই পথের জনতা, একেবারে মরুদ্যানের মত বোধ হইতে লাগিল। মুমূর্ষুর কাছে সংসারের আয়োজনের মত তাহার নিকটে এত বড় কলিকাতা শহর একান্ত অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। সে কোন রকমে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এতক্ষণে নিরিবিলি একটু ভাবিবার অবসর তাহার জুটিল। এখন কি তাহার কর্তব্য। পরিচিত পথে নিশ্চিন্ত ভাবে চলিতে চলিতে সে যেন অদৃষ্টপূর্ব একটা সুগভীর খাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। পিছনে ফিরিয়া দেখে সেদিকের পথও রুদ্ধ করিয়া আর একটা গভীর শূন্যতা। কোন দিকে আর এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

চরচিলমারীর বিচ্ছেদ এমন দুঃসহ হইয়া দেখা দেয় নাই, কারণ তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে হইতে একদিন ছিন্ন হইয়াছিল। আর এ যেন পূর্ণ তানের মুখে গানের অকস্মাৎ সমাপ্তি।

সে আরাম-চেয়ার খানাতে নির্জীবের মত পড়িয়া ছিল। অবশেষে পরমেশটার সঙ্গে! কই সে আগে তো কিছু লক্ষ্য করে নাই। অবশ্য পাকল তাহাকে ইদানীং এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তাহার অর্থ কি এত ভীষণ!···পাকল ও পরমেশ অত্যন্ত বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে বসিয়া ছিল। পরমেশের হাতখানা পাকলের চেয়ারের হাতলের উপর ছিল। আর তাহার শাড়ির আঁচলখানা সরিয়া আসিয়া···নীচের অংশটা রেলিঙের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল···ভাল করিয়া দেখা যায় নাই। তবে কি সব মিথ্যা! সেদিনের সেই জ্যোৎস্নার অভিষেক, আর যার-প্রান্তে জনতার চক্ষু-এড়ানো সেই সলজ্জ গোলাপ ফুলের কুঁড়িটি, সমস্তই!

সে নাটক নভেলে পড়িয়াছিল মনের এইরূপ অবস্থায় তীব্র ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার ভাব জাগে। কিন্তু সে তেমন কিছু অনুভব করিতে পারিল না। কেবল একটা গভীর নৈরাশ্য, নিদারুণ একটা ক্লান্তি। তাহার নবীন হৃদয়ের স্নেহ প্রেম আশা আকাঙ্ক্ষা অকাতরে ঢালিয়া দিয়া যে সৌন্দর্যলোক সে সৃষ্টি করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গেল। এই অমর ক্ষতির অন্ধটা একটা গভীর অন্ধকারের রূপে তাহার চারিদিকে চাপিয়া ধরিল!

এখন কি তাহার কর্তব্য। কলিকাতা সহর, কলেজের পড়াশুনা, বন্ধুবান্ধব সব অমূলক, সমস্ত মিথ্যা! কিছুক্ষণের জন্য তাহার মন হইতে সমস্ত জোড় গুণ যেন চলিয়া গেল। একটা গভীর প্রশান্ত বিষাদে তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

তাহার মনে পড়িল, রাজবাড়ীতে তাহার পড়িবার ঘরের জানালে সন্ধ্যাবেলা একটা টিক্‌টিকি পোকা শিকার করিয়া খাইত। তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্য বিনয় কাঠির আগায় একটা পোকা বাঁধিয়া খেলাইত—টিক্‌টিকিটা ছুটাছুটি করিয়া মরিত। আর মনে পড়িল, খুব বালাকালে সে একদিন একটা কুকুরকে আঘাত করিয়াছিল। কুকুরটা আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা, অতি তুচ্ছ, বিনয় তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই আহত আর্ত কুকুরটার খঞ্জ গতি অতি প্রত্যক্ষভাবে মনে জাগিয়া উঠিল। তবে কি জীবনে এই অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই সত্য! এই নগণ্য স্মৃতিগুলি বাড়ীর পুরাতন বিস্মৃত ভৃত্যের মত উৎসবের দিনের সমারোহের একান্তে অপেক্ষা করে, কেহ তাহাদের সন্ধান করে না। কিন্তু দুঃখের দুর্দিনে দীপ-নির্বাপিত শোকান্ধকারের প্রদোষে তাহারা একে একে আসিয়া হাজির হয়—উৎসবের বন্ধুরা যখন অন্য উৎসবের অনুসন্ধানে অন্যত্র ব্যস্ত। হয় তো তাই, কিন্তু তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে!

হঠাৎ ঘড়িটার একঘেয়ে ধাতব রবে তাহার ঘোর ভাঙিয়া গেল। বিনয় দেখিল, কেবল মাত্র নয়টা বাজিয়াছে। কেবল নয়টা, তবে তো রাজসাহীর গাড়ী এখনও ছাড়ে নাই। বাড়ী যাইতে হইবে!

এতক্ষণ এই কথাটা তাহার কেন যে মনে পড়ে নাই, ইহা ভাবিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। যে-কর্ত্তব্যের জন্য সে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া মরিতেছিল, সে কর্ত্তব্য যেন বহুদিন হইতে স্থির হইয়াই ছিল।

বিনয় উঠিয়া পড়িল। সামান্য জিনিষপত্র আর টাকার থলিটি লইল। পরটি ছাড়িল না, তাহার বগলেই রহিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে বিনয় যখন একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া বসিল, তখনো গাড়ি ছাড়িতে মিনিট দশেক সময় আছে। সে মনে একটি ভারি স্বস্তির ভাব অনুভব করিতেছিল। সে যেন একটিমাত্র আঘাতে অতীতটাকে বিদীর্ণ করিয়া নূতন এক লোকে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে সুখ হয় তো নাই কিন্তু আগের মত জগদ্দল দুঃখের পাষাণও সে রাজ্যে সম্ভব নয়।

বিনয়ের কেন যেন মনে হইল পারুল ও কলিকাতা একটা আর একটার প্রতীক। দু'টা কেমন করিয়া বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মত সহরে পারুলের মত মেয়েরই সম্ভাবনা। আবার পারুলের মত মেয়ে কলিকাতাতেই সম্ভব। বিনয় আজ দু'টাকেই ছাড়িয়া চলিল।

গাড়ী গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়াছে। আলোকে অন্ধকারে, শব্দে নৃত্যে, কম্পনে সঙ্গীতে, গর্জ্জনে ধ্বনিতে, গাড়ী অবিশ্রাম ছুটিয়াছে। সাঁকোর ঝম্ ঝম্ আওয়াজে; লৌহ রেলের মুখর মৃদঙ্গের গভীর মন্দ্রাক্রান্তার তানে এবং তালে, কখনো বা দ্বিগুণিত গতির শার্দ্দূলবিক্রীড়িতছন্দে আসন্ন ষ্টেশনের আভাস বহিয়া আবার কখনো অনুষ্টুভের ছোট ছোট ধাপে। গাড়ীর গতিটা ক্রমে বিনয়ের শরীরের ও মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল। বিপর্য্যয় একটা গতির নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। তাহার ইচ্ছা হইল এই লৌহ-তুরঙ্গকে যথেচ্ছ কশাঘাত করিয়া লাগাম-ছেঁড়া গতিতে ছুটাইয়া দেয়। নদী-গিরি-পুরী-দরী-কানন-কান্তার অতিক্রম করিয়া যেদিকে খুসী, যেখানে খুসী। কোথায় তাহা সে জানে না, কেন, তাহা সে জানে না! কেবল আরো দূরে, আরো আরো; আরো জোরে আরো আরো। বিনয় আজ নিজের কাছ হইতে নিজে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। (ক্রমশঃ)

পান্থ কি তবু মানে শ্রান্তি?

—শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

১

এই বন্ধুর পথে কোন্ বন্ধুর তরে আজ
কোন্ দূর দেশে তুমি যাত্রী?
ছের নির্জ্জিত সন্ধ্যার সিন্দূর-লিখিত
আসে অবগুণ্ঠিত রাত্রি।
ওই দিগন্তে লুণ্ঠিত সিন্দুর ক্রন্দন
অন্তরে অন্ত কি করিলরে বন্ধন?
তাই সন্ধানে চলেছ কি সন্ধানী সুন্দর
জাগ্রত বেগা বরদাত্রী?
এই বন্ধুর পথে কোন্ বন্ধুর তরে আজ
কোন্ দূর দেশে তুমি যাত্রী?

২

যদি মৃত্যুর মহাভয় চিত্তের তটে রয়
পান্থ কি তবু মানে শ্রান্তি?
তার দুর্গম যাত্রার দুঃসহ পরাজয়
নয় চির-জীবনের ক্ষান্তি।
সে যে বঞ্চিত বিশ্বের বক্ষের বেদনায়
স্বর্গের সুধা আনে মুক্তির মোহনায়,
সেই নন্দিত নন্দন গন্ধের সুষমায়
ভরি' ওঠে জীবনের শ্রান্তি।
যদি মৃত্যুর মহাভয় চিত্তের তটে রয়
পান্থ কি তবু মানে শ্রান্তি?

ব্যোম-জ্যোতি

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভকালে, ম্যাকলেনান, (Mclennan) প্রমুখ ক'একজন বৈজ্ঞানিক আমাদের বায়ু-মণ্ডলে একপ্রকার নূতন জ্যোতির সন্ধান পান। ইহা এক অদৃশ্য আলোক। সাধারণ দৃশ্য আলোক অস্বচ্ছ পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ নবআবিষ্কৃত জ্যোতির পদার্থ ভেদ করিয়া যাওয়ার শক্তি অসাধারণ। একথা সকলেরই জানা আছে যে, সামান্য এক-খণ্ড কাগজ দ্বারাও আমরা সূর্য্যরশ্মি হইতে মুখ বাঁচাইতে পারি। সাধারণ আলোকের তুলনায় রঞ্জন-রশ্মির উক্ত প্রকার ভেদকারী শক্তি অত্যন্ত অধিক। ইহা অনায়াসে আমাদের দেহের মাংস ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। আবার দৃঢ়তর পদার্থে প্রযুক্ত হইলে রঞ্জন-রশ্মির ভেদকারী শক্তিও সবিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সামান্য একটি লৌহমুদ্রা ভেদ করিয়াও উহা যাইতে পারে না। স্বতঃ জ্যোতি-বিকীরণশীল মৌলিক পদার্থসমূহ হইতে গামা-রশ্মী নামক একপ্রকার জ্যোতি বিকীরণ হয়। তাহার ভেদকারী শক্তি রঞ্জন-রশ্মি অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু উপরে যে নূতন জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে তাহা গামা-রশ্মি হইতেও খরতর। উহা অবলীলা-ক্রমে ক'এক গজ সীসার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। তাহাতে তাহার তেজের কোনও অপচয় হয় না। এই জ্যোতি-রশ্মির বৈজ্ঞানিক নাম Cosmic Radiation—আমরা বলিব ব্যোমজ্যোতি। এই নূতন জ্যোতির স্বরূপ অবধারণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজে বহুপ্রকার পরীক্ষা, আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব।

এই জ্যোতির তত্ত্ব বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। মাইকেল ফারাডে ও ম্যাক্সওয়েল, (Michael Faraday ও Maxwell) তড়িদ্‌বিজ্ঞানের বহুল প্রসার সাধন করেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্যবধানেও ভেদবিকাশের ক্ষমতা (action at a distance) তড়িদাক্রান্ত বস্তুর উপর আরোপ করা হইত। তাঁহাদেরই গবেষণার ফলে সে মত পরি-বর্জ্জিত হয় ও তৎস্থলে শক্তি-ক্ষেত্রের (field of force) উদ্ভব কল্পিত হয়। অর্থাৎ, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ তড়িদণু তাহার শক্তি তাহারই চতুর্দ্দিকে সীমা বেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত করে। সজারুর কাঁটার মত শক্তিধারা (lines of force) তড়িদণু হইতে বাহির হইয়া সারাদেশময় ঊর্ণনাভের জাল বুনিয়া অবস্থিত থাকে। উহারই নাম শক্তি-ক্ষেত্র। ম্যাক্স-ওয়েলের প্রস্তাবিত আলোকতত্ত্বে জ্যোতিধারার প্রবাহ-ক্ষেত্র বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক-শক্তিক্ষেত্ররূপে পরিব্যাপ্ত। কখনও কখনও অবস্থাবৈগুণ্যে তড়িদণু তাহার কাঁটার কতক ছাড়িয়া দিলে উহারা উৎসবিচ্যুত হইয়া সারাদেশময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আর আমরা পাই জ্যোতি। জ্যোতিস্তত্ত্বের উল্লিখিত ব্যাখ্যানে উহার সহিত পদার্থতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিরশ্মি জ্যোতিকণার (photon) প্রবাহ মাত্র। উহা একপ্রকার কার্য্যশক্তিও (energy)। সেই জন্য আইন্‌-ষ্টাইনের নীতিতে উহার বস্তুমান (mass) আছে। সুতরাং বস্তুমানের সংরক্ষণশীলতার আইনে (law of conservation of mass) পরমাণু হইতে জ্যোতিরশ্মি বিকীর্ণ হওয়ার ফলে উহার বস্তুমান নির্গত জ্যোতিরশ্মির বস্তু-মান অনুযায়ী হ্রাস পাইবে। উপরে সজারুকাঁটার দৃষ্টান্তে এই বলিতে হয় যে, সজারুর দেহ হইতে কতক কাঁটা বাহির হইয়া গেলে, উহার দেহের ওজন নির্গত কাঁটার ওজন অনুযায়ী কমিয়া যাইবে। কিম্বা পদার্থতত্ত্বের বস্তুমান সংরক্ষণশীলতার দৃষ্টান্তে যদি আমরা কয়লা পোড়ানোর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করি, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কেবল ছাই ও ধূম ওজন করিলে দগ্ধ কয়লার হিসাব পাওয়া যাইবে না। তাহাদের সঙ্গে দাহ্যমান কয়লা হইতে নির্গত আলো ও তাপের ওজনও (কারণ, উহারা জ্যোতিধারার রূপবিশেষ মাত্র ও সেই হিসাবে উপরের নিয়মত উহারও কার্য্যশক্তি ও উহাদের বস্তুমান আছে) ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই জমা-খরচ সমান হইবে ও সংরক্ষণশীলতার নীতি প্রমাণিত হইবে।

উপরে জ্যোতিধারার ওজনের কথা বলা হইয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেন যে, যে প্রকার

জলধারা কোনও পদার্থের উপর পতিত হইলে তাহার উপর চাপরূপে তেজপ্রয়োগের কার্য্য প্রদর্শন করে, জ্যোতিধারাও সেই প্রকার ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারে। যেহেতু কার্য্যশক্তি হিসাবে জ্যোতিধারারও বস্তুমান থাকিবে, সুতরাং উহা কোনও পদার্থের উপর পতিত হইলেই চাপ প্রয়োগ করিবেই। ক্লার্কসে কলমে তাঁহার তত্ত্বের সাহায্যে, ম্যাক্সওয়েল উক্ত চাপের হিসাবও করেন। পরে বিশেষ প্রণালীতে পরীক্ষায় চাপের যে পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা ম্যাক্সওয়েলের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, আলোকধারা এক প্রকার ক্ষিপ্র জাতীয় পদার্থের ধারা মাত্র—যাহারা সেকেণ্ডে, ১৮৬,০০০ মাইল বেগে চলিয়া থাকে। আমরা আমাদের দেহের উপর ও পৃথিবীর উপর উক্ত চাপ প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই না। তাহার কারণ জ্যোতি-রশ্মির যে চাপ আমাদের উপর বা পৃথিবীর উপর পড়ে, তাহা অতি সামান্য। ঐ চাপের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তাহার পদার্থ-বিজ্ঞান ছাড়াইয়া নভোমণ্ডলে যাইতে হইবে। সেখানে বিশাল জ্যোতিসমূহে নক্ষত্ররাজির মধ্যে এই চাপের কার্য্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাধারণ নক্ষত্র বা সূর্য্যের অভ্যন্তরে উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০,০০০ ডিগ্রী। এ প্রকারের উত্তাপ আমাদের পক্ষে কল্পনার জিনিষ মাত্র। এই প্রকার উত্তাপে যে জ্যোতিধারা নির্গত হইবে তাহার চাপের পরিমাণ নিম্নের দৃষ্টান্তটি হইতে অনুমান করিতে হইবে। একটা সাধারণ কামানের গোলার ব্যাস অর্দ্ধ ফুট। এই প্রকার একটি গোলাকে উপরের বর্ণিত উত্তাপে রাখিলে উহা হইতে যে জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইবে তাহার চাপে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী লোকও কম্পিত হইবে।

হিসাব করিয়া পাওয়া যায় যে, সূর্য্য হইতে ঠিক সোজাসুজি পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গ মাইল জমির উপর প্রায় $\frac{১}{১,০০০}$ আউন্স পরিমিত সূর্য্যালোক পতিত হয়। যেহেতু জ্যোতিকণা আলোকের গতিতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাতে হিসাব করিলে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যালোকের দ্বারা পরাপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের $\frac{১}{১০,০০০,০০০}$ অংশ পরিমিত চাপের ধাক্কা লাগে। উহা অত্যন্ত সামান্য। এত সামান্য যে, কোনও দেশের উপর শতাব্দী ব্যাপিয়া পতিত সূর্য্যালোকের চাপ ঐ দেশে $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ডের কম সময়ে বৃষ্টিধারার পতিত জলের ওজন অপেক্ষা কম হইবে। অথচ নক্ষত্র-জগতে উহার পরিমাণ কত অধিক!

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যকেই সর্ব্বজ্যোতির আধার বলা যাইতে পারে। উহা হইতে প্রতি মিনিটে জ্যোতিরূপে যে কার্য্যশক্তি বাহির হইতেছে, হিসাব করিলে তাহার ওজন প্রায় ২৫ কোটী টন বা ৭০০ কোটী মণ দাঁড়ায়। সুতরাং অন্য কোনও প্রকারে ক্ষতিপূরণ না হইলে প্রতি মিনিটে সূর্য্যের বস্তুমান এই হিসাবে কমিতেছে। কিন্তু আকাশস্থ ভ্রাম্যমান বহু প্রকারের নিরবলম্ব পদার্থ মহাবেগে (যেমন উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি) অহরহ সূর্য্য-মণ্ডলের ভিতর পড়িতেছে। হিসাবে দেখা যায় যে, এই ভাবে প্রতি মিনিটে সূর্য্যের ওজন প্রায় ৬০,০০০ মণ বর্দ্ধিত হয়। ক্ষতির তুলনায় এই আয় অতি সামান্য। সুতরাং সূর্য্য যে অনবরত জ্যোতিবিকীরণ করিয়া ক্ষয় পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই কথা অন্যান্য নক্ষত্রের বেলায়ও বলা যাইতে পারে। কোনও কোনও নক্ষত্র এত অল্পায়ু যে জন্ম হইতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতে পারে। নানা প্রমাণে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নক্ষত্রের জন্মসময়ে তাহার যে বস্তুমান থাকে তাহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। নূতন নক্ষত্র পুরাতন নক্ষত্র অপেক্ষা প্রায় ১০০ গুণ ভারী। ইহা হইতে কি হারে নক্ষত্রের বস্তুমান নাশ পাইতেছে তাহা হিসাব করা চলে। সেই হিসাব সূর্য্যের উপর প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, যদিও উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তথাপি উহার বর্ত্তমান বস্তুমান শেষ হইতে আরও কোটী কোটী বৎসর লাগিবে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে পদার্থের বস্তুমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। (১) স্থির বস্তুমান (Restmass) যাহা সকল অবস্থাতেই একরূপ থাকে ও (২) অস্থির বস্তুমান যাহা পদার্থের অবস্থাবৈগুণ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দ্বিতীয় বস্তুমান অত্যন্ত কম; সাধারণতঃ পদার্থের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে এই বস্তুমান প্রণিধানযোগ্য হয়। সূর্য্যের অভ্যন্তরে উত্তাপ প্রায় ৫০,০০০,০০০ ডিগ্রী, এই উত্তাপেও অস্থির বস্তুমান মোট বস্তুমানের প্রায় $\frac{১}{১০০০০০}$ অংশ মাত্র। সূর্য্য তাহার শৈশবে বর্ত্তমান অপেক্ষা যে অধিক উত্তপ্ত ছিল তাহা

মনে হয় না। সুতরাং জ্যোতিষ্কীয়দের দ্রব্য যে বস্তুমান হারিয়ে হইয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই স্থির বস্তুমান হইতে গিয়াছে। সুতরাং আদিম সূর্যে অধিক পরিমাণে পরমাণু, ধন ও ঋণ-তড়িদণু প্রভৃতি নিশ্চয়ই ছিল। সেই সব পরমাণু ও তড়িদণু কি প্রকারে বিলয় প্রাপ্ত হইল তাহা আলোচনা করিতে করিতে একটি উত্তর বৈজ্ঞানিক জিন্‌স্ (Jeans) বিজ্ঞান-জগতে উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সব পরমাণু ধ্বংস হইয়াছে ও তাহাদেরই বস্তুমান জ্যোতিরশ্মির বস্তুমান রূপে কোটী কোটী বৎসরে সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই মত গ্রাহ্য হইলে এই দাঁড়াইবে যে পদার্থের ধ্বংস করিয়া জ্যোতিরশ্মির উদ্ভব করা যাইবে।

দুঃখের বিষয়, জিন্‌স্ (Jeans)এর এই মত পরীক্ষাসাপেক্ষ নহে। কারণ নক্ষত্র বা সূর্য্যের ভিতর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান এ জগতে কোন পরীক্ষাগারে তাহার সন্নিবেশ করা সম্ভবপর নহে। যে অবস্থাবৈগুণ্যে কোনও পদার্থ ধ্বংস হইয়া জ্যোতিরশ্মিরূপ ধারণ করে বলিয়া মনে হয়, সেই অবস্থার পরীক্ষাকার্য্য সাধন করিতে পারিলে উক্ত মতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যাইত। কিন্তু বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে। কাজেই জিন্‌স্এর মতবাদ বৈজ্ঞানিকের আলোচনার বস্তু মাত্র। যাহা হউক, এই মতের স্বপক্ষে কতক প্রমাণ ব্যোমজ্যোতি হইতে পাওয়া যায়। অন্ততঃ সাধারণ ভাবে পদার্থের এই বিলয়প্রাপ্তির কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তড়িদশক্তির সাধারণ নিয়মে পদার্থের চরম উপাদান ধন ও ঋণ-তড়িদণুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ রহিয়াছে। যেহেতু, তাহাদের পরস্পর ব্যবধান অত্যন্ত কম ও ধন-তড়িদণুর বস্তুমান ঋণ-তড়িদণুর বস্তুমান অপেক্ষা অনেক অধিক, প্রথমোক্তটি দ্বিতীয়টিকে প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করিবে। সেই আকর্ষণের ফলে কোনও সময়ে হয়ত উভয়ে একত্র হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা তড়িদ্‌মুক্ত হইয়া যাইবে ও সমবেত কার্য্যশক্তির প্রভাবে একটি জ্যোতিকণারূপে বাহির হইয়া যাইবে। এই একটি ধন ও ঋণ-তড়িদণু সম্মিলিত হওয়ার জন্য যে বস্তুমান হইবে তাহা উদ্‌জান বাষ্পের পরমাণুর বস্তুমানের সমান হইবে। সুতরাং যদি সত্যসত্যই উপর্য্যুক্ত প্রকারে জ্যোতিরশ্মির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে আকাশে উদ্‌জান বাষ্পের পরমাণুর সমান বস্তুমানবিশিষ্ট বহু জ্যোতিকণা photon ঘুরিয়া বেড়াইবে। তাহাদের দুই একটা আমাদের পৃথিবীতেও আসিয়া পড়িবে। আবার এতদপেক্ষা বেশী ওজনের জ্যোতিকণাও হইতে পারে। কখনও বা একটি পরমাণুই ধ্বংস হইতে পারে এবং তাহা হইলে ঐ ওজনের জ্যোতিকণাও পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার জ্যোতিকণা হইতে পারে।

ঋণ ও ধন-তড়িদণুকেই আমরা পদার্থের চরম উপাদান বলিয়া থাকি। উহারা নানা প্রকার সংখ্যায় ও রীতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া সকল পদার্থের উৎপাদন করিয়া থাকে। চারটি ধন-তড়িদণু ও দুইটি ঋণ-তড়িদণুর সমবায়ে এক নূতন রকমের রচনা রেডিয়ম প্রভৃতি স্বতঃজ্যোতিষ্কীয়দ্রব্যসমূহ মৌলিক পদার্থ সমূহ হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়। উক্ত রচনার সাধারণ নাম α-particle। আমরা আল্‌ফাকণা বলিব। এই আল্‌ফাকণার সঙ্গে আর দুইটি ঋণ-তড়িদণু মিশাইলেই হিলিয়ম্ নামক মৌলিক পদার্থের পরমাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তড়িদশক্তির নিয়মে এই আল্‌ফাকণাও অপর দুইটি ঋণ-তড়িদণুকে আকর্ষণ করিবে। এই মিলনের ফলে আমরা এমন একটি জ্যোতিকণা পাইব যাহার বস্তুমান হিলিয়ম পরমাণুর বস্তুমানের সমান।

উপরে তিন প্রকারে পদার্থের ধ্বংস হইয়া জ্যোতিকণা উদ্ভবের কথা বলা হইল। এই সমস্ত জ্যোতিকণা কামানের গোলার মত আলোকধারায় আলোকের বেগে প্রধাবিত হইবে। যে গোলার ওজন অধিক, তাহার নাশকারী শক্তিও তদ্রূপ। সুতরাং যে জ্যোতিকণা বা photonএর ওজন অধিক তাহা যাহার উপর প্রতিহত হইবে তাহার সমধিক ক্ষতি করিবে ও তাহার পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার শক্তিও অধিক হইবে।

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে ব্যোমজ্যোতি বহিরাকাশে সঞ্জাত হইলেও আমাদের আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে ইহার শক্তির অপচয় হয় না। ধরাপৃষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া পাইয়াছেন যে এই জ্যোতির তেজ সর্ব্বত্র সমান। এই সমস্ত পরীক্ষার ফল আলোচনা করিলে—এই মতে আসিতে হয় যে, এই জ্যোতিতে যে-সমস্ত জ্যোতিকণা প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের বস্তুমান তাহার ভেদকারী শক্তি হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা যায় ইহাতে নানাপ্রকার বস্তুমানবিশিষ্ট জ্যোতিকণা বিদ্যমান। দুই জাতীয় জ্যোতিকণা পাওয়া যায়, যাহাদের বস্তুমান উদ্‌জান ও হিলিয়ম পরমাণুর বস্তুমানের সমান। সুতরাং জিন্‌স্‌এর মতবাদের স্বপক্ষে কতক প্রমাণ ব্যোম-জ্যোতি হইতে পাওয়া যায়। তবে যে প্রক্রিয়ায় জ্যোতি-কণার বস্তুমান নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা খুব নির্ভুল বলা যায় না ও সেই জন্য জিন্‌স্‌-এর মত এখনও বাদানুবাদসাপেক্ষ। ব্যোমজ্যোতির উদ্ভব সম্বন্ধে অন্যান্য মতও প্রচলিত আছে। মিলিকান্ বলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা এখনও সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন। অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণু হইতে যখন তিনি গুরুতর পরমাণু সৃষ্টি করিতে চান তখনই এই ব্যোমজ্যোতির উদ্ভব ও বিকীরণ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—হিলিয়ম পরমাণুতে চারটি ধন - ও চারটি ঋণ-তড়িৎকণ আছে আর উদ্‌জানে একটি ধন—ও একটি ঋণ-তড়িৎকণ আছে। সুতরাং উদ্‌জানের পরমাণুর বস্তুমান অপেক্ষা হিলিয়ম্ পরমাণুর বস্তুমান চার গুণ হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ৩.৯৭ গুণ মাত্র। সুতরাং মিলিকানের মতে চারটি উদ্‌জান পরমাণু হইতে একটি হিলিয়ম পরমাণু প্রস্তুত হওয়ার সময় উদ্‌জান পরমাণুর বস্তুমানের ·০৩ অংশ জ্যোতিরশ্মিরূপে নির্গত হইয়া যাইবে। পরিণামে এমত একটি জ্যোতিকণা পাওয়া যাইবে যাহার বস্তুমান উদ্‌জান পরমাণুর শতকরা তিন অংশ মাত্র। মিলিকানের এই মতের বিপক্ষে বহু তর্ক উত্থাপন করা যায়। বিশেষতঃ এই যে উদ্‌জান পরমাণু হইতে হিলিয়ম পরমাণুর উদ্ভব ইহা কোনও আকস্মিক ব্যাপার নহে। যদি কখনও এরূপ হয় তবে তাহা ধীরে আস্তে হইবে। ফলে উপরের হিসাবের একটি জ্যোতিকণার পরিবর্ত্তে আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্রতর জ্যোতিকণা পাইতে পারি। এইরূপে ব্যোমজ্যোতি সম্বন্ধে সাধারণ ব্যাখ্যান চলিতে পারে বটে কিন্তু যে সমস্ত বৃহত্তর জ্যোতিকণার প্রভাবে উহার অসঙ্কলাধারণ ভেদকারী শক্তি তাহার কোনই নিরাকরণ হয় না।

আকাশ হইতে পৃথিবীতে যে ব্যোমজ্যোতি পতিত হয় তাহার পরিমাণ কম নহে। মিলিকান ও কেমারুণের মতে সূর্য্যকে বাদ দিয়া আর সমস্ত জ্যোতিষ্ক হইতে পৃথিবীতে যে জ্যোতি আসে, তাহার প্রায় ½ অংশই ব্যোমজ্যোতি। দূরে অনন্ত আকাশে ছায়াপথের অপর প্রান্তে ধরতম ব্যোম-জ্যোতি সম্ভবত পৃথিবীর আশপাশেরই মত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; কিন্তু জ্যোতিষ্কের আলো পরিমাণে কম। সুতরাং গড়ে ব্যোমজ্যোতিকেই সেখানকার সাধারণ জ্যোতি বলা যাইতে পারে। ইহাদের ভেদকারী শক্তি প্রচণ্ড ও তাহারই বলে আকাশপথে ঐ সুদূর হইতে উহারা আমাদের পৃথিবীতে আসে। পথে কোনও অন্তরায় নাই। ফলে আমাদের আকাশ বাতাস ঐ জ্যোতিতে মাখান। কবে কোন্ যুগান্তর হইতে ইহাদের এই প্রবাহের আরম্ভ কে জানে? হয়ত কোনও সুদূরদেশে কোনও অতীত যুগে এক সর্ব্ববিধ্বংসী মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছে, হয়ত তাহারই ফলে এই জ্যোতির উৎপত্তি। হয়ত বা সেই অতীত যুগের কাহিনীই ইহারা আজও বহন করিয়া আনিতেছে।

উপরের আলোচনায় অনেকটা দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ও জ্যোতিরশ্মি একই জিনিষ। বর্ত্তমান বিজ্ঞান পদার্থতত্ত্বকেই উড়াইয়া দিয়া তাহার স্থলে ইথার তরঙ্গ বসাইতে চায়। এই তরঙ্গকে আমরা দুই প্রকার বৈশিষ্ট্যে কল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, শুদ্ধ তরঙ্গ—যেমন সাধারণ পদার্থ, আর উদ্দাম তরঙ্গ—যাহাকে বলি জ্যোতিরশ্মি। এই হিসাবে ধ্বংস-প্রক্রিয়াতে পদার্থই শুদ্ধ-তরঙ্গকে মুক্ত করিয়া বিশাল অনন্তে ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র। এই ভাবে ভাবিলে বিশ্বজগৎ জ্যোতির্জগৎ মাত্র ও গত ক'এক বৎসরে ইথার তরঙ্গেরই স্থান ও কালগত বৈশিষ্ট্য যে পদার্থের চরম উপাদান তড়িৎরূপে বৈজ্ঞানিকের নিকট ধরা দিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না।

আর একদিক

শ্রীযুক্ত হিরাম পার্সি ম্যাক্সিম্ গত এপ্রিল মাসে 'পপুলার মেকেনিক্স্'-এ লিখিয়াছিলেন—পৃথিবী দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্যূন শত কোটি বৎসরের মধ্যে সে পার্থিব উত্তাপের অভাবে, হিমের চাপে মারা যাইবে।

ছলনাময়ী

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমতল গিরি-মাটীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে কাল কাল পাথরের স্তূপ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে নাতিবৃহৎ পলাশের গাছে একটি শীর্ণ বনশোভার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে কতকগুলি খাপড়ার বাংলো, পলাশবনের মাথার উপর বয়লারের চিমনী—এই লইয়া কলিয়ারী।

ধনী শ্বশুরের এমনই একটি কলিয়ারীর ঠিকাদারী লইয়া অমিয় এই রুক্ষ ভৈরবী-প্রকৃতিময়ী দেশের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরের কলিয়ারীতে অভিনন্দন না হোক একটা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কুলীর কর্মচারী-বাবুরা ও আর সকলে ভিড় করিয়া আসিয়াছিলও। বেণী-পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোও জ্বালান হইয়াছিল।

অমিয় মনে মনে ম্যানেজার-বাবুকে অনুসন্ধান করিতেছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া ম্যানেজার-বাবুকে এ প্রশ্ন করিতে কেমন তাহার বাধিতেছিল। উপস্থিত বাবুদের মধ্য হইতে একজন আসিয়া তাহাকে পরিত্রাণ করিল, সে কহিল—আজ্ঞে আমি হ'লাম এখানকার হৌর-বাবু, ইনি কম্পাস, এঁরা দুজন মুন্সী, আর ইনি হ'লেন খাঁর-বাবু।

অমিয় ধাঁধায় পড়িয়া গেল। কম্পাস মানে সে জানিত যন্ত্র। মানুষ কম্পাস হইল কেমন করিয়া সে বুঝিল না। অবশেষে একান্ত ভাল মানুষের মত কহিল—কম্পাস কি বলেন?

বেমানান রকমের লম্বা শীর্ণকায় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বেশ সপ্রতিভ হাসিমুখে বলিল—আজ্ঞে আমি।

অমিয় অবাক হইয়া গেল।

কম্পাস বলিয়া গেল—একুরা থেকে পাশ ক'রেছিলম আজ্ঞে। তারপর থেকেই আশ্চয্যেই আছি। সবে তখন এক লম্বর পিট্ হইছে। আমিই তারপর দু লম্বর, তিন লম্বর, চার লম্বর সব খুঁড়াইছি। ইখানে কানাই কম্পাস না চেনে এমন কুলি কামিন আপনি পাবেন নাই।

অমিয় ভাবিল কম্পাস ইঁহার উপাধি। কিন্তু জাতি-নির্ণয়ে গোল বাধিয়া গেল। নামটা বাঙালীর কিন্তু উপাধিটা বিদেশী। সন্দেহভঞ্জনের জন্য সে প্রশ্ন করিল—আপনারা?

গলা হইতে মোটা কৃষ্ণবর্ণ একগোছা উপবীত বাহির করিয়া কম্পাস কহিল—আজ্ঞে বাম্ভন। উপাধি চক্রবর্তী, শাণ্ডিল্য গোত্র, কুলীন আমরা আজ্ঞে। রামেশ্বরের সন্তান—৺পুরুষে ভঙ্গ—

অমিয় বলিল—তবে যে বল্লেন কানাই কম্পাস! কম্পাস-কি আপনাদের কৌলীন্যসূচক উপাধি?

হৌর-বাবুটি বর্দ্ধমানের লোক, তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে উনি এখানকার সার্ভেয়ার কিনা। কলিয়ারীতে সার্ভেয়ারকে কম্পাস ব'লে থাকে। রেলওয়ের গুডস্-ক্লার্ক যেমন মাল-বাবু আর কি।

হাঁপ ছাড়িয়া অমিয় কহিল, ও।

এতক্ষণে তাহার ভদ্রতার হুঁস হইল, তাড়াতাড়ি সে কহিল—বসুন, বসুন আপনারা, দাঁড়িয়ে আছেন যে!

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল—বেশ আছি আমরা, বেশ আছি, আমরা বেশ আছি। আপনি মালিক আপনার সামনে—

ইজি-চেয়ারটার হেলান দিয়া অমিয় একটা সিগারেট ধরাইল। তারপর কহিল—কই, ম্যানেজারবাবু ত এলেন না?

কেহ উত্তর দিল না। সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল।

অমিয় আবার বলিল—কই, তিনি কোথায়?

শীর্ণ কম্পাস বলিয়া উঠিল—আঃ, সত্যি কথা তার আর ভয়টো কি রইছে? তিনি আজ্ঞে—কি রকম লোক মশয় কে জানে! সন্ধ্যে বেলায় কি সব যোগযাগ করেন, ভূত-পেরেত নিয়ে নাকি। বলে পিচাশসিদ্ধ—এই দি—এই দি ম্যানেজার বাবু আসছেন আজ্ঞে।

সম্মুখের প্রান্তরে উজ্জ্বল একটা আলো অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সেই আলোর পিছনে পিছনে একটি ঋজুকৃতি শীর্ণ মানুষ উপরে উঠিয়া কহিলেন—নমস্কার।

উজ্জ্বল বেণী-পেট্রোম্যাক্সের আলো পরিপূর্ণ রূপে আগন্তুকের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমিয় বিস্ময়ে স্তব্ধ, অভিভূত হইয়া গেল। নমস্কার করিতে গিয়া তাহার হস্ত অর্দ্ধোত্তোলিত হইয়াই রহিল। হাতের

সিগারেটটা কখন পড়িয়া গেছে। কাঁচা পাকা দীর্ঘ রুক্ষ চুল আগন্তুকের মুখখানাকে অন্ধাবৃত করিয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খল ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাড়িগোঁফে মুখের নিম্নাংশ সমাচ্ছন্ন। ললাটপ্রান্তে কেশ ঘন ভ্রূর নিম্নে অদ্ভুত দুইটি চোখ। কোটরগত অতি ক্ষুদ্র চোখের প্রদীপ্ত তারা দুইটি অচঞ্চল, স্থির—দৃষ্টি নিমেষহীন কঠিন। প্রান্তরের বুকের অদূরবর্তী ঘনান্ধকার পটভূমির সম্মুখে সে মূর্তি যেন এক অদ্ভুত-শোভন রহস্য।

অমিয় কোনরূপে নমস্কারটা সম্পূর্ণ করিল মাত্র। সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, আপনিই বাবুর জামাই?

গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া অমিয় উত্তর দিল, আজ্ঞে হাঁ।

—মহাশয়ের নাম?

—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

—আর কোথায় ঠিকেদারী ক'রেছেন?

এতক্ষণে অমিয় নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছিল, স্বচ্ছন্দ ভাবে ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল—এই আমার হাতেখড়ি। আপনাদের সাহায্যের ভরসা ক'রেই এসেছি এখানে।

ভদ্রলোকও ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন—সে পাবেন বৈ কি। আমরা সব দেখেশুনে দেব। বাবুও সে কথা লিখেছেন আমায়। কন্ট্রাক্ট বাবু ক'রেছেন—

কন্ট্রাক্ট অমনি শতমুখ হইয়া উঠিল—হুঁ, আজ্ঞে সব ঠিক ক'রে দিব আজ্ঞে। কুলিকামিন কত চাই আপনার? আপ-টোস ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ক'রে দিব। আর মেনেজার বাবু সহায় থাকলে ভয় কি? কুলিকামিন ত উনার কথায় উঠে বসে। দেখাই দেন ত মেনেজার বাবু সেই গল্পটা। জানেন জামাই বাবু, মেনেজার বাবু আমাদের সাধু লোক। সংসারে রইছেন তাই, নইলে এতদিন তৈলঙ্গ গোঁসাই হ'য়ে যেতেন।

ম্যানেজার বাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কন্ট্রাক্টের কথার অর্থ যে কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া অমিয়ও চুপ করিয়া রহিল।

কন্ট্রাক্ট কিন্তু ছাড়িল না, সে বলিল, দেন দেন মেনেজার বাবু, জামাই বাবুকে একবার দেখাই দেন সিটো। বুঝলেন জামাই বাবু, যে গল্প আপনি ইচ্ছে করবেন সেই গল্পই মেনে-জার বাবু হাত ঘরে বার ক'রে দিবেন। বিস্মিত অমিয় প্রশ্ন করিল, সত্যি ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার বাবুর চোখের তারা দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল। অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া ভদ্রলোক নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। দেহান্দোলনের গতিবেগে দীর্ঘ কেশপাশ দুলিয়া আরো বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সে মূর্তি দেখিয়া ভয় হয়। অমিয় প্রবল বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার বাবু নিজেই বলিলেন, আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন অমিয় বাবু?

কি উত্তর দিবে অমিয় খুঁজিয়া পাইল না। সত্য বলিতে কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি তাহার হইত না, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার মত জ্ঞানের গভীরতা বা চারিত্রিক দৃঢ়তা তাহার ছিল না।

সম্মুখের অন্ধকার প্রান্তরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ম্যানেজার বাবু বলিলেন, তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত ক'রতে পারে, অমিয় বাবু। অদ্ভুত সে শক্তি। আধুনিক যুগের বিশ্বাস সে শক্তি অন্ধ। কিন্তু তা নয়। সে সজ্ঞান—চঞ্চলা—ছলনাময়ী। ছলনায় সে মানুষকে প্রতারণা করে। তিনি নীরব হইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগুলিও নীরব। রাত্রির অন্ধকারঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে দূরের বয়লারের গুম্ গুম্ শব্দ অবাধে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল কন্ট্রাক্ট। সে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, দেখাই দেন গল্পটা জামাই বাবুকে।

ভদ্রলোক নিরুত্তরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, সত্যিই দেখবেন অমিয় বাবু?

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

—আচ্ছা আমার হাত শুঁকে দেখুন।···কোন গন্ধ আছে কি? হাতে গন্ধ একটা উঠিতেছিল। অমিয় বার দুই শুঁকিয়াও কিসের গন্ধ বুঝিতে পারিল না। ভদ্রলোক নিজেই বলিলেন—ওটা গাঁজার গন্ধ। কোন সুগন্ধ নেই ত? আচ্ছা দেখুন। হাতখানি সূন্যে উর্দ্ধে তুলিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন। তার পর অমিয়ের হাতের উপর ঘর্ষণ করিয়া দিয়া বলিলেন—দেখুন। অতি মিষ্ট গন্ধের ঝলক অমিয়ের নাকে ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল ঐ অদৃষ্টদর্শন ব্যক্তিটির মুখের দিকে।

ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—সামান্য শক্তি। মধ্য-জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যাধনায় একটু পেয়েছি। রাক্ষসী ছলনাময়ী মায়ার দিয়ে আমায় প্রতারণা ক'রলে।···অসীম ···অসীম শক্তিলাভ করা যায়—যা রাজার নেই, সম্রাটের নেই, জ্ঞানীর নেই, কারও নেই।

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব। প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঈক্ষুরে তখনও বাক্যধ্বনির ক্ষীণ রেশ কাঁপিতে কাঁপিতে নিঃশেষে মিলাইয়া যাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পর সচকিতের মত তিনি উঠিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন আজ। কাল দেখা হবে।

• • •

পরদিন হইতে অমিয়ের ঠিকাদারী আরম্ভ হইল। অর্থাৎ খনি হইতে কয়লা তোলা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য সে একটা নির্দ্দিষ্ট খরচের মধ্যে করিবে। খনির মালিকের তরফ হইতে ম্যানেজার ও সার্ভেয়ার সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইবেন ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

ম্যানেজার বাবু তখনও আফিসে আসেন নাই। কম্পাস ধূমপানের সহিত জামাই বাবুর হিতান্বেষণ করিতেছিল। অমিয় কিন্তু চিন্তা করিতেছিল ম্যানেজার বাবুর কথা—সে কহিল—কই, ম্যানেজার বাবু ত' এলেন না এখনও?

কম্পাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর কম্পাসের কাঁটার মত একপাক ঘুরিয়া গেল, অতি মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল—উঁ বেটা পাজীকে আপুনি বিশ্বেস ক'রবেন নাই। বেটা পয়লা নম্বরের চোর আর ভণ্ড। সব আমি ঠিক ক'রে দিব।

অমিয় অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কম্পাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন মতে সে বুঝিতে পারিল না অকস্মাৎ বিনা কারণে ম্যানেজার বাবুকে এমন ধারা গালিগালাজ কেমন করিয়া দেওয়া যায়।

কম্পাস কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল অন্যরূপ। গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে সে বলিয়া গেল—হুঁ-ত-কি? একটি আধলা উয়াকে আপুনি দিবেন নাই। পাঁড় মাতাল বেটা ভণ্ড। ঘরে আঠারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে মশয়, বিয়ে দেয় না বেটা। পরিবারকে ধ'রে মারে। কিন্তু বলি না মশয় অরে—ভূত-পেরেত দিয়ে কি ক'রে দিবে মেয়ে!

অমিয়ের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই ধূর্ত্ত কুটিল মানুষটির উপর অশ্রদ্ধার আর তাহার সীমা রহিল না।

কম্পাস বলিল—আর দয়া ক'রে যদি কিছু দেন তবে উয়ার পরিবারকে দিবেন। আহা মশয়—। ঐ-ঐ শুনুন, —পরিবার না হয় কন্যাকে ধ'রে ঠেঙাইছে বেটা। কান্না শুনতে পেছেন নাই?

সত্যই চাপা-কান্নার আর্ত্তধ্বনি ম্যানেজারের বাংলোর দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কি? শিক্ষিত ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিকের আবরণে যে একদিন অঙ্গ আবৃত করিয়াছিল, সাধনায় যে মানুষ খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছে,—তাহার এ কি ব্যবহার? কম্পাসকে সে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, ভদ্রলোকের কি মাথায় গোলমাল আছে?

অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া কম্পাস বলিয়া উঠিল—সাধের গোলমাল। পাগল। ভাল নইলে ভাত পায় না—সাধের পাগল আমার। পান থেকে চুনটি খসলেই এই কাণ্ড মশয়! ঠেঙায়ে বেচপাট ক'রে দেয় ব'লে এক একদিন।···ওইযি ওইযি বেরইচে মশয় বেটা। আমি পালাই মশয়, নইলে দিবে আমাকে একচোট। বেটা যে ক'রে আমার দিকে চায় মশয় —মনে হয় খেয়ে ফেলাবে আমাকে।

কম্পাস দ্রুতপদে বিপরীত দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল।

অমিয় দেখিল নিজের বাংলোর বারান্দায় ম্যানেজারবাবু খাদে নামিবার পোষাকে দাঁড়াইয়া আছেন। পরণে খাকী সার্ট—খাকী কামিজ—মাথায় হ্যাট—হাতে লাঠী। অমিয় হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সুপরিস্ফুট ভাঙ্গিমার সহিত অর্দ্ধ-নমস্কারে প্রত্যাভিবাদন করিয়া গম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন—এদিকে শুনে যান।

অমিয়ের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। সে অসঙ্কুচিত চিত্তেই অগ্রসর হইল। আজ স্পষ্ট দিবালোকে মানুষটির প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। রাত্রিতে প্রদীপ্ত আলোতে মুখের কুঞ্চন-রেখাগুলি দেখা যায় নাই। রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ ললাট ত্রিবেণীরেখার মত কুঞ্চন-রেখায় রেখাঙ্কিত। নাসিকার প্রান্তের বামপার্শ্ব ঈষৎ স্ফীত, তাহার কোলে কোলে গণ্ডদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি কুঞ্চন-রেখা ঈষৎ নিম্ন শ্মশ্রু-গুচ্ছের মধ্যে আবৃত হইয়া গেছে। অসন্তোষে—ক্রোধে—

প্রণাম মানুষটি যেন অতিমাত্রায় গর্ব্বের, তাহারই অভিব্যক্তি পূর্ণপ্রকটিত।

বিনা ভূমিকায় ম্যানেজার বাবু বলিলেন—কাজ কি আরম্ভ ক'রলেন আপনি?

অমিয় বলিল—না, কাজ আরম্ভ হয়নি এখনও। আপনারই অপেক্ষা ক'রছি।

ভদ্রলোক যেন ঈষৎ খুসী হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন—আপনি শিক্ষিত লোক, কাজের প্রণালী জানেন। আমার আদেশ না নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রলে সত্যিই বিরক্ত হ'তাম আমি। আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অমিয়ও তাহার অনুসরণ করিল। হাতের লাঠীটা তুলিয়া সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া ম্যানেজার বাবু বলিলেন—নদীর ধারে পাঁচ নম্বর ইনক্লাইনটায় জলের চাপ বড় বেশী। পাম্পিংএর ভাল বন্দোবস্ত করা দরকার। সেটাই আগে দেখাই চলুন।

অকস্মাৎ অমিয় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনার মনটা কি তেমন ভাল নাই?

উত্তরে অতি রুক্ষস্বরে প্রশ্ন হইল—কেন?

আর কোন প্রশ্ন করিতে অমিয়ের শঙ্কা হইল। কি জানি—উত্তরে এই ভয়ঙ্কর মানুষটি কি বলিয়া বসিবে!

অসমতল তরঙ্গায়িত শৈরিকর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে মানুষের পায়ে-রচা সরু পথখানিতে কয়লার গুঁড়ায় গুঁড়ায় কাল রং ধরিয়াছে। আশে পাশে পলাশ গাছের সারি। উপরের আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া বয়লারের কাল ধোঁয়া যেন ঘনঘন মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে।

নীরবে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ম্যানেজার বাবু বলিলেন, অমিয় বাবু।

শঙ্কিত ভাবেই অমিয় উত্তর দিল—বলুন।

—এ কাজে আপনি নতুন; আপনি জানেন কিনা জানি না, ম্যানেজারকে সন্তুষ্ট রাখতে ঠিকেদারকে কিছু দিতে হয়। সেটা আমাদের প্রাপ্য।

অমিয়ের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে নীরব হইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। ম্যানেজার বাবু বলিলেন—আমার অর্থের কিছু প্রয়োজন—বিশেষ প্রয়োজন।

অমিয় তবুও কোন উত্তর দিল না।

ভদ্রলোক বলিয়াই গেলেন—জীবনে অর্থ, ভোগ, সম্মান, প্রভুত্ব কামনা ক'রেই এই সাধনায় আমি প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম। ব্যর্থ হ'য়ে গেলাম। কিন্তু ভোগ, প্রভুত্ব এ আমার চাই—এ আমাকে পেতে হবে। রাজার, সম্রাটের—কতটুকু ভোগ, কতটুকু প্রভুত্ব? সে ছলনাময়ীকে স্ববশে আনতে পারলে—অনন্ত ভোগ—অসীম প্রভুত্ব,—সে কল্পনা ক'রতে পারবেন না। কল্পনা করা যায় না।

তিনি ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। উত্তেজনার আবেগে কণ্ঠস্বর অদূরের বয়লার-গর্ভের রুদ্ধ বাষ্পশক্তির মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপ, তন্ত্রীর বিলাস, শ্রেষ্ঠ আহার ইচ্ছামাত্রে ক্রীতদাসীর মত সে জোগাবে। আর প্রভুত্ব? কি প্রভুত্ব আছে সম্রাটের? মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রতে পারে সে? মৃত্যু যখন আসে—তখন সে সাধারণ মানুষের মত ভগবান ভগবান ব'লে নির্ম্মম প্রকৃতির পায়ে মাথা কোটে। অন্ধ মানুষ জানে না—নির্ম্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ক্রন্দনে গলে না, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত বাঙ্ক ক'রে চ'লে যায়। তাকে আয়ত্ত ক'রতে হয়, জোর ক'রে স্ববশে আনতে হয়,—নারীর মত—পৃথিবীর মত। তখনই সে হয় দাসী, মানুষের মনোরঞ্জনে বেতার চেয়েও সে তখন মিষ্টভাষী।

অমিয় বুঝিল ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ নয়, বিকৃত হইয়া গেছে। তাঁহার আবেগ কিন্তু তখনও শেষ হয় নাই, তিনি বলিলেন—এইখানে নদীর ধারে এক শ্মশান আছে। সাধনার উপযুক্ত শ্মশান। এইখানে আবার আমি সাধনা ক'রব। কিছু অর্থ আমার চাই। আপনি দেবেন সে অর্থ আমাকে?

এতক্ষণে অমিয় ধীরে ধীরে কহিল—পরে ব'লব আপনাকে। এখন কিছু ব'লতে পারলাম না।

ধীর মৃদুস্বরে ম্যানেজার বাবু বলিলেন—এবার আর ভুল ক'রব না। ছলনায় মুগ্ধ হব না। জানেন অমিয় বাবু, কত বড় সাধনায় কত হীন প্রতারণা ক'রলে আমায় ছলনাময়ী রাক্ষসী? অন্ধকার জনহীন শ্মশানে শবের বুকে ব'সে তন্ত্রমতে সাধনা ক'রছিলাম। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। শবদেহ নিয়ে হিংস্র মাংসাশী শৃগালেরা কলহ ক'রছিল, তারা কলহ ছেড়ে চীৎকার ক'রে উঠল। মাথার উপর দিয়ে

পেচারা কর্কশ স্বরে ডেকে চ'লে গেল। গাছের মাথায় ঘুম ভেঙে শকুনেরা পাখসাট মেরে তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল। সন্ সন্ শব্দে কাল-প্রবাহ ব'য়ে যাচ্ছিল। নরকপালের পাত্রে সুরা শোধন ক'রছিলাম। সে সুরা পান ক'রতে গিয়ে দেখি তাতে সুরার স্বাদ নাই—সে মধু-স্বাদী সুধা হ'য়ে উঠেছে। আনন্দে বুকটা নেচে উঠল। আবার পাত্রে সুরা পূর্ণ ক'রলাম। শোধন ক'রে চোখ বুজে ধ্যান ক'রছি, এমন সময় মনে হ'ল আমি বহ্নির মধ্যে ডুবে গেছি। তারপর অপূর্ব্ব সুগন্ধ—মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে। তার মাধুর্য্য, তার গভীরতা আমি বর্ণনা ক'রতে পারব না। সে গন্ধ যে কেমন সে আপনি অতি ক্ষীণ ভাবে অনুভব ক'রেছেন। সেই গন্ধ শতগুণে গভীর—শতগুণে মধুর—আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। আনন্দে আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে প'ড়লাম, ভাবলাম আমার সাধনা পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু প্রতারণা, ছলনা! তার ভাণ্ডারে এই মধুস্বাদ আর এই মধুগন্ধ নগণ্য তুচ্ছ। তাই দিয়ে সে আমায় ভুলিয়ে দিলে। সামান্য যাদুকরের মত পারি শুধু জলকে ইচ্ছামত সুমিষ্ট ক'রতে আর ওই গন্ধ আনতে।

—গোড় লাগি ম্যানিজর বাবা! গোড় লাগি, গোড় লাগি! বিলাসপুরী শ্রমিকের দল ম্যানেজার বাবুকে দেখিয়া কলরোল করিয়া উঠিল। পাঁচ নম্বর ইনক্লাইনে তখন তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন।

• • •

সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার বাবু আবার অমিয়ের বাঙলোয় আসিয়া উঠিলেন। অমিয়ের ছোট ভাই কাঠের একটা বল লইয়া খেলা করিতেছিল। ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—সরবৎ খাবে খোকা?

খোকার আপত্তি হইবার কথা নয়। ঘাড় দোলাইয়া তৎক্ষণাৎ সে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

—বেশ, তবে এক ঘটি জল নিয়ে এস।

জল আসিল। বেশ ভাল করিয়া হাত ধুইয়া পাত্রের মধ্যে হাত দিয়া খোকাকে বলিলেন—খাও।

খোকা জল পাইয়া লাফাইয়া উঠিল। জল সত্যই সরবৎ হইয়া গেছে।

ম্যানেজার বাবু কহিলেন—অমিয় বাবু।

—বলুন।

—কবে আমায় টাকা দিচ্ছেন?

কিয়ক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় বলিল—ব'লেছি ত চিন্তা না ক'রে কিছু ব'লতে পারব না। এত তাড়াতাড়িই বা ক'রছেন কেন আপনি?

অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—আছে আছে, তাড়া আছে। আপনি বুঝবেন না, অমিয় বাবু। ডাক সব সময় আসে না, স্থির মন, দৃঢ় সংকল্প, সুযোগের সময়য় চাইবামাত্র পাওয়া যায় না। অমিয় ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিল, কিন্তু সাধনার অর্থের কি প্রয়োজন তা ত' বুঝলাম না।

অতি মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, একান্তই শুনতে চান যখন শুনুন, শব চাই। উপযুক্ত শবসংগ্রহের জন্য চাই অর্থ। অমিয় বাবু, আমার প্রয়োজন মত উপযুক্ত শব শ্মশানে আসবে না। তাকে নিয়ে আসতে হবে। জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে।

অমিয় শিহরিয়া উঠিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, আপনি আমার বাসায় আর কখনও আসবেন না।

সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল পশ্চাৎ হইতে অদ্ভুত হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—বসুন, বসুন, ভয় নেই। শব হবার উপযুক্ত লক্ষণ আপনার দেহে নেই।

ততক্ষণে অমিয় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

•

সমস্ত রাত্রি অমিয়ের ভাল ঘুম হইল না। আতঙ্ক-নিপীড়িত মনের ছবি নিদ্রাও মুছিয়া লইতে পারিল না। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বারবার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেছিল। কতবার সে উঠিয়া মাথায় জল ঢালিল, জল পান করিয়া ঘুমের চেষ্টা করিল। কিন্তু কুঞ্চিতললাট, তীক্ষ্ণদৃষ্টি তান্ত্রিকের মুখ-ছবি মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল না। কানের পাশে অহরহ বাজিতেছিল সেই নিষ্ঠুর কঠোর কয়টি কথা—জীবন্ত মানুষকে শব প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে।

অবশেষে শেষ রাত্রে প্রকৃতি যখন স্বয়ং শীতলা হইয়া আসিল—মৃদু-বায়ুপ্রবাহে অমিয়ের বড় আরাম বোধ হইল। খোলা জানালার ধারে মাথা রাখিয়া ক্লান্তভাবে সে আপনাকে

এগাইয়া দিল। প্রভাতে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন বেলা আটটা।

চাকরটা তাহার ঘুম ভাঙাইয়া বলিল—আজ্ঞে, সেই লম্বা-মতন বাবুটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুখে হাতে জল দিয়া অমিয় বাহিরে আসিল—দেখিল দীর্ঘ কম্পাস দাঁড়াইয়া আছে।

কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই কম্পাস বলিল—আজ্ঞে জামাইবাবু, মালকাটারা সব কাজে নামছে নাই। কাজ বন্ধ হয়ে রৈছে।

শঙ্কিত করিয়া অমিয় প্রশ্ন করিল—কেন?

অত্যাসন্ন দুঃসংবাদে কম্পাস বলিল—আজ্ঞে ঐ শালার কাজ।

—কার?

—ঐ শালা ম্যানেজারের। আবার কার? ক্ষুতের রোজা ব'লে মালকাটারা উয়াকে বড্ড ভক্তি করে আজ্ঞে। ই বলছ, ঐ শালার অক্ষরটিপুনি। ই আমি কালীর কিরা খেয়ে বলতে পারি আজ্ঞে।

কথাটায় অমিয়ের অবিশ্বাস হইল না। সে বুঝিতে পারিল—গত রাত্রির প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ এ। একটু চিন্তা করিয়া সে কহিল—চলুন, যাই আমি।

চা খাইয়া অমিয় একেবারে উঠিল ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়া। সম্মুখে বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল, সে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটার চারিদিক আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। একদিকে একখানা মাদুরের উপর কতকগুলা মুড়ি ছড়ান, কোণে একটা শূন্য বোতল—মদের বলিয়াই মনে হয়—পড়াপড়ি রহিয়াছে, পাশেই পাঁজার কলিকারও সন্ধান মিলিল। ঘরজোড়া একটা দেওয়াল-আলমারীর উপর একটি নরকপালের পাশ, একটা পেরেকে ঝুলান একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। সাজা ঘরের মতো বসিবার কোন আসন নাই। অগত্যা অমিয় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ডাকিতে যাইতেছিল—ম্যানেজার বাবু। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাড়ীর ভিতরে ম্যানেজারের রুক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

—চোপরাও হারামজাদী।

সঙ্গে সঙ্গে চাপাগলায় স্ত্রীলোকের কান্নার ধ্বনি শোনা গেল।

অমিয়ের দেহের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। রুদ্ধ রুক্ষ কণ্ঠে সে ডাকিল, ম্যানেজার বাবু, ম্যানেজার বাবু।

নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি অমনি নীরব হইয়া গেল। অমিয় আবার ডাকিল, ম্যানেজার বাবু।

বাড়ীর ভিতরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ম্যানেজার-বাবু বাহিরে আসিলেন। সেই ভঙ্গী, সেই দৃষ্টি, সেই রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—কি?

উত্তেজনাবশে অমিয় প্রথমেই বলিয়া বসিল আপনি কি মেয়েদের প্রহার করেন না কি?

সে মুখভঙ্গীর একচুল পরিবর্ত্তন হইল না, ধীর ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন—করি।

অতিউত্তেজনায় অমিয় প্রশ্ন করিল—কি তাদের অপরাধ?

গম্ভীর ভাবে উত্তর হইল—সে জানবার আপনার অধিকার?

—বাঃ—আপনি নিরীহ স্ত্রীলোক পেয়ে তাদের প্রহার ক'রবেন—তাতেই বা আপনার কোন্ অধিকার শুনি?

—তারা আমার আয়ত্তাধীনে আছে। আমি একজনের স্বামী, একজনের পিতা অর্থাৎ প্রভু। বুঝলেন?

অমিয় বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তবুও সে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বাধা দিয়া ম্যানেজার বাবু বলিলেন—বসুন, বসুন, স্থির হ'য়ে বসুন। রাগে কতক-গুলো ব'কবেন না। আগে কাজের কথা সেরে নি। এত সকালে এসেছেন যে? কুলিদের হাঙ্গামা মিটল?

—না। মেটাবার দরকার বোধও করি না। আমি ঠিকেদারী ছেড়ে দিচ্ছি। ক'লকাতাতে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি। আপনাকেও জানালাম। আপনি কোম্পানীর কাজ চালাবার ব্যবস্থা করুন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ম্যানেজার কহিলেন—আপনি সন্দেহ ক'রেছেন এ কাজ আমার। হাঁা, ক'রেছিলাম আমি। কিন্তু সেও বার্গ ক'রে দিয়েছেন আপনি। ভাল—আমি কুলীদের ব'লে দিচ্ছি। কিন্তু কাল থেকে কুঠীতে নতুন ম্যানেজারের বন্দোবস্ত করুন আপনারা। আমি আর থাকব না—কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অমিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার বলিয়া গেলেন—মনে সাড়া এসেছে—তাক পেয়েছি। এ সুযোগ গেলে আর আসবে না। আজ থেকেই আরম্ভ ক'রব আমি। একুণি বেরুব একবার নদীর ধারে—কৃষ্ণসর্প চাই আমার।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় অবশেষে কহিল—কি হবে ম্যানেজার বাবু এসব ক'রে? অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—পদে পদে বিপদ—কিসের জন্যে ঘাড়ে নিতে যাচ্ছেন?

অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন—বুঝবেন না, আপনি সে বুঝবেন না অমিয় বাবু। আনন্দ-অমৃত ওই খানে আছে। ঐ শক্তি তার উৎস। এর স্বাদ আপনি পান নি, আপনি এর আকর্ষণ জানবেন না। অভিসারের আকর্ষণের মত্ততা অভিসারিকা ভিন্ন অপরে অনুভব ক'রতে পারে না অমিয় বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, কহিলেন—আমার সময় ব'য়ে যাচ্ছে। আপনি আসুন, নমস্কার।

তিনি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। অমিয় নির্বাক বিস্ময়ে সেই খানে বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই প্রাচীর অন্তরালে অতি কাতর মৃদু ক্রন্দনের শব্দ আবার ভাসিয়া উঠিল।

অমিয় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকটি মৃদু কাতর-বাক্যও তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

—তোমার পায়ে পড়িগো, মেয়েটার মুখের দিকে তাকাও। তুমি গেলে কি ক'রব আমি? কেমন ক'রে বিয়ে দেব তার?

উত্তরে কোন কথা শোনা গেল না।

আবার নারীকণ্ঠের শব্দ পাওয়া গেল—বেশ, তবে ওই কম্পাস-বাবু যেহকে বিয়ে করতে চাচ্ছে—আমাদের পাশটি ঘর—ওর সঙ্গে—

কিন্তুকণ্ঠে ম্যানেজার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—না-না-না। হবে না—হ'তে পারে না।

সব নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ম্যানেজারের কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিল। অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে কণ্ঠস্বর কাতর কাকুতিতে ভরা।

—ক'র না, ক'র না, মিনতি ক'রে বলছি—তা তুমি ক'রনা। আমার অনুরোধ তুমি রেখ।

প্রাচীর অন্তরালে আবার সব নীরব হইয়া গেল। বাহিরে শৈরিক প্রান্তরে বায়ুপ্রবাহে পলাশবনের পত্রমর্ম্মরে যেন শৈরিকসন্না সন্ন্যাসিনী প্রকৃতি অকারণে উদাস হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। দূরে এখানে-ওখানে চারিদিকে বন্যলতার চিমনীর কাল ধোঁয়া প্রকৃতির নীল চোখের কোলে যেন ব্যথার কালী মাখাইয়া দিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় পথে নামিয়া পড়িল। একটা সঙ্গীতগুঞ্জন তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

—ন মাতা ন পিতা ন ভ্রাতা নস্থতো—

ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর।

সমস্ত দিন অমিয়র মন কেমন ব্যাপাতুর হইয়া রহিল। যে আকুল কাকুতি উদ্দিষ্ট মানুষটিকে স্পর্শ করিতে পারিল না—সেই ব্যর্থ কাকুতির কাতরতা তাহার তরুণ অন্তরকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে সারাটা দিন শুধু ঐ চিন্তাই করিল।

আকাঙ্ক্ষার কি উন্মত্ত মোহ মানুষের!

অপরাহ্নে বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়া সে উদাস নেত্রে অস্তায়মান রক্তসূর্য্যের শেষ রশ্মিমালার বর্ণাঢ্যতা-দৃশ্য দেখিতেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও যেন আনন্দ ছিল না, এ যেন কোন বেদনা-আরক্ত হৃদয়ের কালের লীলাস্পর্শে মুহুর্মুহু রূপান্তর। এমন সময় দীর্ঘ কম্পাস আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

—জামাই বাবু!

চোখ না ফিরাইয়াই অমিয় উত্তর দিল—কি?

—ডাকছেন আপনাকে একবার আজ্ঞে।

—কে?

—ম্যেনেজারবাবুর পরিবার। এসেছেন তিনি আপনকার বাড়ীতে।

শশব্যস্তে উঠিয়া অমিয় বলিল—সে কি? আমাকে ডেকে পাঠালেই ত হ'ত। তোমার কোন আক্কেল নেই।

হাত কচলাইয়া কম্পাস কহিল—তাতে তিনি কিছু মনে ক'রবেন নাই আজ্ঞে। আপনকাদের আশ্চিত আমরা।

অমিয় প্রশ্ন করিল—ম্যানেজারবাবু কি সত্যিই চ'লে গেলেন?

—হঁ—আজ্ঞে—সেই সোঁকাল বেলাতেই।

—কি ব'লছেন তাঁর স্ত্রী—তুমি জান?

কম্পাস কথাটা কি বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না অবশেষে বলিল—তেনার কাছেই শুনবেন আজ্ঞে।

বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমিয় দেখিল অবগুণ্ঠিতা একটি প্রৌঢ়া আর অনবগুণ্ঠিতা একটি যুবতী—কৈশোর আজায় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে অমিয় মেয়েটির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এই সেই কঠোর গাঙ্গিকের সন্তান, সন্ধ্যাকাশের গোধূলি-তারার মত শুভ্র, প্রশান্ত, সুন্দর!

অমিয় বলিল—আমায় কিছু ব'লবেন মা?

মাতৃসম্বোধনে অবগুণ্ঠনের অন্তরালেও নারীহৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সজল উচ্ছ্বাস অপ্রকাশ রহিল না। গলার শব্দ করিয়া কম্পাস সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। মেয়েটি একটি থামের আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাসই আরম্ভ করিল—ব'লে কেলাম আপনি। জামাইবাবু সব ঠিক ক'রে দিবেন। বড়া দয়াল উনি আজ্ঞে।

বিরক্তিভরে অমিয় বলিল—আসুন আপনি।

কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে প্রৌঢ়া কহিলেন—আমার অদৃষ্টের কথা ত' সব শুনেছেন?

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমিয় মুখ নত করিয়া রহিল।

প্রৌঢ়া কহিলেন—দুটি অনুরোধ আপনার কাছে। আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন আর আমার মেয়ের বিয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

মুখ তুলিয়া একান্ত কুণ্ঠিত ভাবে অমিয় বলিল—দেশে আপনাকে পাঠিয়ে দেব বৈকি। কিন্তু মা, আপনার মেয়ের কি ব্যবস্থা আমি ক'রব? আমি বড়লোকের জামাই কিন্তু নিজে ত' বড়লোক নই।

প্রৌঢ়া বলিলেন—পাত্র আমার ঠিক আছে বাবা। কানাই দয়া ক'রে মেয়েটিকে নিতে রাজী হ'য়েছে। কি ব'লে আশীর্বাদ ক'রব আমি ওকে—।

টস্ টস্ করিয়া জল তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল—কানাই কে?

সলজ্জ হাসি মুখে অগ্রসর হইয়া কম্পাস কহিল—নামটি আমার ভুলে গেছেন আজ্ঞে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় বলিল—আপনার স্বামীর একটা মত নেওয়া—

—না তাঁর মত নেই। তা' থাকলে অনেক দিন এ শুভ কাজ হয়ে যেত বাবা।

—তবে?

—কেই বা তবে হরিতকী-পণে আমার মেয়েকে বিয়ে ক'রবে বাবা? পৃথিবীতে ঐ লোকটি ছাড়া কেউ ত আমায় দয়া ক'রলে না।

তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া কম্পাস বলিয়া উঠিল—উ-কি ব'লছেন আজ্ঞে আপনি? মা ব'লেছি আপনাকে—

অমিয় ভাবিতেছিল—কথা ত সত্য।

প্রৌঢ়া কহিলেন—এইখানে থেকেই কাজ আমি সেরে যেতে চাই। চারদিন পরে বিয়ের দিনও আছে।

অমিয় বলিল—তাই হবে।

—কিন্তু যেন গোল না হয় বাবা। তিনি এখনও এইখানেই আছেন কোথাও। জানলে শেষে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে।

কানাই বলিয়া উঠিল—তা কি হয় আজ্ঞে—চুপি চুপি কি বিয়া হয়? বাজেনা কিছু ক'রতে হবে আজ্ঞে। সেনেহ ছেলেমানুষ, দুখ হবে মনে।

অমিয়ের গাম্ভীর্য্য রাশি রাশি হইয়া রহিল।

কানাই-ই বলিল পাশের কুঠীতে বন্দোবস্ত ক'রছি আমি আজ্ঞে। কিছু জানতে পারবেন নাই শ্বশুরঠাকুর।

সেই বন্দোবস্তই হইল।

• • •

প্রথম রাত্রেই বিবাহের লগ্ন ছিল। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের আসরে কন্যার বেশভূষা দেখিয়া কম্পাসকে শ্রদ্ধা না করিয়া অমিয় পারিল না। ইতিমধ্যেই কলিকাতায় গিয়া কানাই বিবাহের বাজার করিয়া আনিয়াছে। বসনে-ভূষণে লাবণ্যময়ী মেয়েটি সুমনোরমা হইয়া উঠিয়াছে।

ভোজনের ব্যবস্থাও কানাই করিয়াছিল। বয়ের বেশে সে-ই সকলকে আদর আপ্যায়ন করিতেছিল।

অমিয় সুপ্রসন্ন মন লইয়াই বাসায় ফিরিয়া শয়ন করিল। যাক—মেয়েটি পতিভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইবে সন্দেহ নেই।

প্রভাতে একটা কোলাহলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কারণ অনুসন্ধান করিতেই একজন মুন্সীবাবু আসিয়া কহিল—আজ্ঞে প্রকাণ্ড এক সাপ।

—কোথায়?

—আজ্ঞে কম্পাসের ঘরে। ভারী বেঁচে গেছে কম্পাস। বাসরে ছিল তাই, ঘরে থাকলে নির্ঘাত মিতু হত। মেয়েটি বড় লক্ষ্মীমন্ত জামাইবাবু।

—আনরে আন—জামাইবাবুকে সাপটা দেখিয়ে নিয়ে

প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠির ডগায় রাত্রির মত কাল ভীষণ এক বিষধর মালার আকারে ঝুলিতেছিল। মরণের আক্ষেপে এখনও সে আপনার লাঙ্গুলাগ্র দংশন করিতেছে।

দ্বিপ্রহরে আপিসের চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল, ম্যানেজারবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

অমিয় চকিত হইয়া কহিল—কোথায়?

—বাহারমে খাড়া আছেন হুজুর।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অমিয় বলিল—শুনো ইধর।

আরও নিকটে তাহাকে মৃদুস্বরে বলিয়া দিল—ম্যানেজার বাবুকো বেটীকো সাদীকো বাৎ উনকো মৎ বোল না। সমঝা? আওর বাবু খব খরমে বৈঠেগা - তুমি সব কোইকো ই বাৎ বোল দেও।

ম্যানেজারবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমিয় দেখিল সৈন্যিকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ম্যানেজারবাবু বিনা ভূমিকায় বলিলেন—আমি মাইনেটার জন্যে এসেছি অমিয়বাবু।

অমিয় কহিল—বসুন।

অস্থির ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, না—না, সময় নেই আমার। টাকাটা দিয়ে দিন।

অমিয় প্রশ্ন করিল—বাড়ীর দিকে গিয়েছিলেন?

—না—না। শ্মশানের সে নিয়ম নয়। সাধনা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। আমার টাকাটা—

বাধা দিয়া অমিয় বলিল, সেটা আপনি পাবেন না ম্যানেজার বাবু।

উগ্রস্বরে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, কেন?

ধীরভাবে অমিয় বলিল, আপনার স্ত্রী কন্যা পাবেন সে টাকা।

উগ্রতর স্বরে তিনি বলিলেন—কে ব'লে তারা আমার স্ত্রী কন্যা। আর আমি ক'রেছি কাজ, সে-টাকা আমি পাব না তার অর্থ?

বাধা দিয়া অমিয় বলিল—আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্কে ফল নেই। এ সকল আমার সংকল্প। সে আপনাকে আমি জানালাম—যা খুসী আপনি ক'রতে পারেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি অমিয়ের হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন—অমিয়বাবু, ভিক্ষা—আমায় ভিক্ষা দিন।

ধীরে ধীরে হাত দুইটা টানিয়া লইয়া অমিয় বলিল—একান্ত দুঃখিত ম্যানেজারবাবু, তা আমি পারব না।

তান্ত্রিকের ক্ষুদ্র চোখ দুইটি ভীষণ হইয়া উঠিল—মাথাটা বারদুই আন্দোলিত করিয়া তিনি বলিলেন—উত্তম।

অস্থির পদক্ষেপে খর্ব্বাকৃতি অসম্ভব-প্রসারী বাহির হইয়া গেলেন।

উন্মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া অমিয় দেখিল—সম্মুখে রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরবক্ষের শেষ সীমায় চিক্ চিক্ করিয়া কাঁপিতেছে মরীচিকার প্রবাহ। দগ্ধ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অস্থির পদক্ষেপে খর্ব্বাকৃতি তান্ত্রিক চলিয়াছেন সম্মুখের পানে।

• • •

দিন কিশেক পর। অপরাহ্ণ বেলায় চার নম্বর ইনক্লাইনের মুন্সী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল—আজ্ঞে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

অমিয়ের হাত হইতে খবরের কাগজখানা পড়িয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কি হয়েছে?

—আজ্ঞে কম্পাস মারা প'ড়েছে।

—কি? অমিয়ের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

—আজ্ঞে কম্পাস চার নম্বরের ভিতরে ধ্বস চাপা প'ড়েছে।

ঘটনাস্থলে আসিয়া মুন্সী বলিল—আজ্ঞে এই সব জানে।

অমিয় দেখিল দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ বিলাসপুরিয়া এক কুলী। সে যাহা বলিল তাহা এই—

খাদের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা তাহার কাজ—মেন-ড্রাইভার সে। একটি মানুষের যাতায়াতের উপযুক্ত পথ সে কাটিয়া

যায় ; পরে সাধারণ কুলীরা সে পথকে কাটিয়া পরিসর করে। আজ খাদের একটা স্থানে কেমন চির্ চির্ শব্দ উঠায় সে কম্পাসবাবুকে সে কথা জানায়। কম্পাসবাবু সেখানে গিয়া লাঠি দিয়া মুড়ঙ্গের ছাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছেন—এমন সময় প্রচণ্ড বেগে উপর হইতে কয়লার স্তূপ তাঁহার উপর খসিয়া পড়িয়াছে।

অমিয় নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতেছিল—খর্ব্বাকৃতি মানুষটির কথা। সে কি ইহা জানিত? জানিত বৈকি। কানে তাহার বাজিতেছিল—মিনতি ক'রে ব'লছি একাজ তুমি ক'র না, ক'র না।

দূরে ম্যানেজারের বাংলো হইতে কাতর ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রৌঢ়াকে কানাই-কম্পাস যাইতে দেয় নাই। সে পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল—আমি ত' তোমার ছেলে হ'লাম মা। ছেলেকে ফেলাসে কুপা যাবে তুমি? তুমার ভার আমি নিলম।

বিষম আক্ষেপে অমিয় মনে মনে কহিল—হাস্করে মানুষের দম্ভ! নিজের ভার কি তার নিজের হাতে যে পরের ভার সে নিতে যায়?

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা হইল এই যে হতভাগ্যের মৃতদেহটা পর্য্যন্ত উদ্ধার করা গেল না, খনির অন্ধকার-গর্ভে খনির ধাতুস্তূপগুলোই সমাহিত হইয়া রহিল। শাস্ত্রের মতানুযায়ী শ্মশানে কুশপুত্তলী দাহনের ব্যবস্থা হইল।

অন্ধকার রাত্রি। নদীর প্রস্তরস্তূপময় উচ্চভূমিতে শ্মশান। অমিয় কয়েকটি বাবুর সহিত প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পিছনে পিছনে সদ্যবিধবা, স্তব্ধবাক, নবপরিণীতা বধূ আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুবিলাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল তাহার হতভাগিনী মা।

একজন বলিয়া উঠিল—একটা চিতা জ্ব'লছে।

সকলে দেখিল চারিদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার, তাহার মধ্যে শ্মশানের মধ্যস্থলে অগ্নিশিখা ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। নদীর কূলে কূলে পথ। পথপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ একটি ঘাটের ধারে একজন বলিল—এই খানেই আমাদের ব্যবস্থা করুন। যেখানে চিতা জ্ব'লছে ওখানে ঘাট নেই। নামতে, স্নান ক'রতে বড় অসুবিধা হবে।

সেই ব্যবস্থাই হইল। নববধূ বিধবার বেশে সম্মুখে দাঁড়াইতেই মা আছাড় খাইয়া পড়িলেন। চিতা সাজান হইতেছিল—কুশপুত্তলী দাহ হইবে।

অকস্মাৎ নৈশ-প্রকৃতির মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা! শব্দলক্ষ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকলে দেখিল ঈষদ্দূরে সেই জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে সদ্যবিধবার মূর্ত্তি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ছুটিয়া সকলে অগ্রসর হইয়া গেল।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শবারোহী, খর্ব্বাকৃতি তান্ত্রিক লাফ দিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—দূর, দূর, দূর হ!

মেয়েটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—কি ক'রেছ বাবা সো—ও যে আমার···!

অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখা গেল, কম্পাসের নিপুণ বিবর্ণ শবদেহ পড়িয়া আছে আর তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তান্ত্রিক।

অমিয় চীৎকার করিয়া উঠিল—পাষণ্ড!

কোথায় কে? দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া শব্দ আসিল—আঃ—ছি, ছি, ছি! আঃ—আঃ।

মানুষকয়টি নির্ব্বাক নিস্পন্দ। সদ্যবিধবার আর্ত্তধ্বনিও মূক হইয়া গেছে। আবার নৈশ অন্ধকারের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া রব উঠিল—এবার আরও দূরে,—আঃ—আঃ।

কে যেন কাহাকে নির্ম্মম কশাঘাতে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে।

*

*

দীর্ঘ দশ বৎসর পর।

অমিয় এখন ধনী ব্যবসায়ী। বালীগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ী, মোটর কিছুরই অভাব নাই। সেদিন রাত্রে সে বালীগঞ্জ পার্কে বেড়াইতেছিল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। পার্কের মধ্যে লোকসংখ্যা কমিয়া গেছে। রাস্তার পাশের একটা বেঞ্চে বসিয়া কে বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। লাইট-পোষ্টের পরিপূর্ণ আলোক তাহার উপর পড়িয়াছিল,

অমিয় দেখিল একজন ভিক্ষুক। দীর্ঘ রুক্ষ চুল, ঘন শ্মশ্রু-গুম্ফে আবৃত মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু; কুঞ্চিত ললাট।

অমিয় থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল যেন চেনা। অন্তরের স্মৃতি-মন্দিরে কত বিগত ছবি কালের বর্ণান্তরে ঢাকা পড়িয়া গেছে। অকস্মাৎ একখানা ছবি স্মৃতির সলিলে অবগাহন করিয়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। এ—সেই তান্ত্রিক।

অমিয় বলিয়া উঠিল—ম্যানেজারবাবু!

ভিক্ষুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

অমিয় বলিল—চিনতে পারছেন না আমাকে? আমার নাম—

সে বলিয়া উঠিল—আপনি অমিয়বাবু?

—হাঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার অমিয় বলিল—আপনি আজও বেঁচে আছেন?

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—আছি। বড় কষ্টেই দিন গেল। শবাসন ছেড়ে উঠে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলাম। অহরহ নিদারুণ ছবি চোখের ওপর ভাসত। আমি অস্থির হ'য়ে চীৎকার ক'রে ছুটে বেড়াতাম। এখনও কখনও কখনও হয়।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অমিয় কহিল—আচ্ছা কল্যাণকে কি আপনিই—। কথা শেষ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইল।

তান্ত্রিক কহিল—হাঁ, আমিই হত্যা করিয়েছিলাম—সেই বিলাসপুরীয়া কুলীটাকে দিয়ে। গাছের মধ্যে সে তাকে মেরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ডিনামাইটে ধ্বস ছাড়িয়ে ঐ মিথ্যে সংবাদ দেয়। পরে সে শবদেহ আমাকে এনে দিয়েছিল। কল্যাণের দেহ অতি লক্ষণযুক্ত ছিল। তার ঘরে সাপও আমি দিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার তিনি বলিলেন—রাক্ষসী কীসের প্রতিশোধ নিয়েছে মনে করেছে। কিন্তু না, আবার আমি দেখব।

অমিয় শিহরিয়া পা বাড়াইল। তিনি কহিলেন কিছু পয়সা দেবেন? ক'দিন খাই নি কিছু।

অমিয় পকেটে হাত দিয়া কিছু অর্থ বাহির করিতেছিল।

অকস্মাৎ অতি চঞ্চল ভাবে শর্দাকৃতি নাম্বুদটি বলিয়া উঠিল—আঃ ছি, ছি, ছি!

দুই হাত দিয়া সম্মুখের শূন্য পটভূমি হইতে কি যেন সে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে আপনার হাত খানা সজোরে বিপ্ত পশুর মত সে কামড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে দাঁতের পাশ দিয়া বীভৎসভাবে রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

সভয়ে অমিয় ডাকিল—ম্যানেজার বাবু, ম্যানেজার বাবু!

ক্ষতবিক্ষত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া রক্তাক্ত মুখে একান্ত শ্রান্ত ক্লান্তভাবে তিনি বলিলেন—অতি যন্ত্রণায় শব্দিত হিসে আসে—তাই। মানুষ ত আমি অমিয়বাবু।

আর একদিক

শ্রীযুক্ত জন কার্টন 'আমেরিকান মাগাজিন'-এ লিখিতেছেন—সকলে বলে পৃথিবীতে এত ধন কোথা হইতে আসিল, ইহা এক সমস্যা। কিন্তু আমার মনে হয়, অপেক্ষা বড় সমস্যা, পৃথিবী এত গান হইল কিরূপে? আমি তো বুঝিয়াই উঠি না যে, এই সংসারে এত আত্মোৎসর্গ, নিঃস্বার্থপরতা, সহৃদয়তা কি করিয়া আসিল? এই সেদিনও মাত্র কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে—মানুষ পশু ছিল,—আজ কোন্ যাদুতে সে এমন এক স্তরে উঠিল, যেখানে বসি সে পরের জন্য—বহুর জন্য,—অন্যের সাহায্যার্থে জীবন বিসর্জন দিতে পারে?

সাধারণী

ষাট বৎসর আগেকার সাহিত্য ও বিবিধ সংবাদ সঙ্কলন (২)

[১]

প্রজারঞ্জন

ইংরাজেরা বলেন, এদেশের লোক উচ্চতর রাজকার্য্যনির্ব্বাহে এখনও অক্ষম। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, এদেশ বিজিত। ইহার অধীশ্বরের প্রধান গুণ এমন গুরুতর যে নিতান্ত দুর্ব্বলতা এবং দুষ্কর্ম্মের গুণে বিশ্বস্তির অতি ভিন্ন আর কেহ এ কথা মনিতে কখনই সাহস করিত না? এ কথার দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আমরা উচ্চতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অক্ষম; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিয়া একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা কি একেবারে অনাবশ্যই অক্ষম, না শিখাইলে শিখিতে পারি? ঈশ্বরের কি এমন কোন অতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শিখাইলে শিখিতে পারে না? তাহাদের দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের দেশে প্রথমে বিজ্ঞান, দর্শন, শল্পিদ্যের উন্নতি, তাহারা পার্থিবীর অধিকাংশ, মহাসাগর, হ্রদসমূহ, স্থল, সাংঘাতিক দর্শন, নবাদি সৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে কি কেবল তাহারাই অসিধনীয়? আমরা দীর্ঘীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহারাই কলমের নিবের পিঠ লিখিতে শিখিতে পারে না?

কেহ এ কথা বলিবেন না যে, এদেশী লোক শিক্ষনীয় নয়। যদি এদেশের লোক শিক্ষনীয়, তবে তাহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা কত অবিচার তাহা বলা যায় না। আমরা মেধাপটু শিক্ষার কথা বলিতেছি না—কার্য্যের দ্বারা যে শিক্ষা সেই শিক্ষার কথা বলিতেছি। যদি দেশী লোক উচ্চ রাজকার্য্য শিখাইলে শিখিতে পারে, তবে তাহাদের শিক্ষার পথ রোধ করা কেন? আমরা শিক্ষার পথ রোধ করিয়া আমরা তাহাদিগকে অযোগ্য করা কেন?

কথাটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে। তোমরা দেশী লোককে ইংরেজি কার্য্যে নিযুক্ত কর না কেন? উত্তর তাহারা ইহার অযোগ্য? কেন অযোগ্য? উত্তর- ইহারা আদিও সেরূপ শিক্ষিত হয় নাই। শিখে নাই কেন? তোমরাই সে শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ—শিখিতে দাও না কেন? উত্তর- শিখিতে দিই না, তাহার কারণ ইহারা অযোগ্য। ইহারা অযোগ্য কিসে? উত্তর ইহারা শিখে নাই বলিয়া। এটি বড় চমৎকার। অক্ষম বলিয়া শিখিতে পায় না, এবং শিখিতে পায় না বলিয়া অক্ষম।

কোন কোন ইংরেজ বলিয়া থাকেন যে, অন্যান্য বলিয়া আমরা বাঙ্গালির উচ্চকর্ম্মনিযুক্তি প্রতিরোধ করি না—তাহারা অসৎ—অবিশ্বাসী, অধিক ক্ষমতা তাহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার প্রমাণার্থ, এই শ্রেণীর লিখিয়েরা, কোথায় কোন নরাধম চাহিয়া-কলহে, কি শিক্ষাপ্রণালী-দোষে কখনও কোন দুষ্কর্ম করিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা বাহির করিয়া, তালিকাবদ্ধ করিয়া উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করেন। ইংরেজদিগের মধ্যে কি ঐরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না? লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিনিধি বোটের কথা কি সাহেবদিগের মনে পড়ে? তখন সর্ব্বসৈন্যাধ্যক্ষ অযোধ্যার সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে অবিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালা হইতে ডাকাতের দল পর পারেকে পাঠাইয়াছিলেন কেন? কলম্ব কথার বাড়াবাড়ি না করিয়া আমরা এই বিষয়ে দুইটি কথা সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহি।

১ম। ইংরেজেরা উচ্চপদে আরূঢ়, দেশীয়েরা নীচপদে অবস্থিত। সুতরাং ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা দেশীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক। অতএব অসৎ কর্ম্মান্বিত দেশীয় কর্ম্মচারী যদিও অসৎ কর্ম্মান্বিত বিলাতীয় কর্ম্মচারীর অপেক্ষা অধিক হয়, তথাপি পড়তা করিলে অধিক হইবে না। এক শতজন দেশী কর্ম্মচারীর মধ্যে অসৎ কর্ম্মান্বিত কয় জন? এবং একশত বিলাতী কর্ম্মচারীর মধ্যে অসৎ কর্ম্মান্বিত কয় জন? সমান হউক বা না হউক, দেশীয়ের মধ্যে অসৎ কর্ম্মচারীর সংখ্যা যে অধিক ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেহ কখন হিসাব রাখে নাই; হিসাব রাখিলে আমরা জিতিব।

২য়। দেশী লোকের অল্প বেতন- সুতরাং প্রলোভন অধিক। এ জন্য প্রথমে দেশী কর্ম্মচারিশ্রেণীর মধ্যে যদি অসৎ কর্ম্ম অধিক ঘটে, তবে দেশীয় চরিত্রের দোষ নহে—তাহাদিগের বেতনের দোষ। উচ্চপদে উচ্চ বেতন ভোগী থাকিলে আর সে দোষ ঘটিবে না। কর্ণওয়ালিসের আমলে সিবিলিয়নদিগের অল্প বেতন ছিল, তখন তাঁহারা কন্দর্প অপেক্ষা ছিলেন। পুরাবৃত্তের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সে কাহিনী লেখা আছে। এ দেশীয় লোক অনেক কাল দুষ্কর্ম্ম অভ্যাস করিলেও তাঁহাদিগের তুল্য হইতে পারিবে না। সেই জাতি উচ্চ বেতন পাইয়া চরিত্রবিত্র হইয়াছে। দেশী লোকও উচ্চ বেতন পাইলে আরও বিশুদ্ধচরিত্র হইবে, সন্দেহ নাই—কেবল এখনই তাহারা বিশুদ্ধতায় প্রায় ইংরেজদিগের সমতুল্য।

৩য়। এতদ্ব্যতীত উচ্চপদস্থ উচ্চচরিত্র ইংরেজদিগের মধ্যে যে সকল কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা সকল প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় না তাহার কারণ এই যে, সে সকলের বিচার করিবার কর্ত্তা বঙ্গবিবাসের কর্ত্তা সেই ইংরেজ। তাঁহারা বাঙ্গালির দুষ্কার্য্যের অপরাধ জানিতে পারিলে চলচুল পাঁয়ান, কিন্তু জাতি ভাইয়ের সকল অপরাধ চেপেচুপে রাখেন- পাছে ইংরেজ নামে কলঙ্ক হয়। যদি সকল কথা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সুদ্ধা যাইত যে মূল দেওয়ানী ইংরেজের অপেক্ষা গড়ির দেশী কর্ম্মচারী অধিকতর সচ্চরিত্র। .....ইংরেজদিগের আর একটি উত্তর আছে। তাঁহারা বলিতে পারেন, অথবা বলিয়া থাকেন, তোমাদিগের উচ্চপদারোহণের পথ কৈ রোধ করিয়াছি?

নটীর পূজা
শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমরা বিলাত যাও, পরীক্ষা দাও, আমাদিগের ন্যায় তোমরাও উচ্চপদস্থ হইতে পারিবে। দেখ, তোমাদের দেশীয় কত ব্যক্তি বিলাত গিয়া, পরীক্ষা দিয়া সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতেছে। তবে পথ রুদ্ধ কিসে? আমাদিগের উত্তর।—পথ রুদ্ধ নয় কিসে? যদি আমরা স্বর্গ হইতে তারা পাড়িয়া বিলাত যাইতে পারি, রাজা পিতা রাজা বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ করিতে পারি, সমাজ ত্যাগ করিতে পারি, তাহার উপর আবার যদি লক্ষ্মীর কৃপা থাকে—অতি নবীন বালক বয়সে এই সকল দুঃসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারি, তবেই আমরা সে পথ খোলা পাইব—তাও পাইব কিনা বলিতে পারি না—কেননা কবিদলদিগের আবার কৌশল আছে—বয়সটি ডাঁড়াইবার জন্য হয়ত বয়সের নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হোক আছে—পরীক্ষার নিয়ম ভারতবর্ষীয়দিগের অনুপযোগী করিয়া তোলা অভ্যাস আছে—বল লইয়া অসঙ্গত টগ্ বুলিয়া বাম কাটিয়া দেওয়া রোগ আছে। যে পথে এত কাঁটা সে পথ রুদ্ধই বলিতে হয়।.....

রীপ কালিফের সময়ে ইংরেজ কর্ত্তাচারিগণ বলিত ছিলেন। তাঁহারা রীপ কালিফকে বলিয়াছিলেন, আমাদের বিক্রয় দ্রব্যের উপর মাসুল উঠাইয়া লও, দেশী বণিকের পথের উপর কঠিন মাসুল চাপাও। ইহার তাৎপর্য্য এই দেশী বণিক্ ব্যবসায়ে পরাস্ত হইয়া লোপ পাউক, বাঙ্গালার বাণিজ্য ইংরেজের একচেটিয়া হউক। রীপ কালিফ তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইংরেজেরা তাঁহাকে বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া করেন। হাতে পাইয়া সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে ঠিক তাহাই করিয়াছেন। সিবিল সার্ভিসে প্রবেশেচ্ছু দেশী বণিকের উপর কঠিন মাসুল বসিয়াছে—ইংরেজ বণিকের মাসুল নাই। সুতরাং ইংরেজের একচেটিয়া বন্দোবস্ত আছে। ইহার উপর ব্যবসায়ের ভাগ, বড় ভাল লাগে না।

ব্যবসায়ের বিষয়ের যদি রাজ-শাসন-কর্ত্তাদিগের চিত্তে স্থান পায়, তবে ডেপুটিকত্ব কয় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। পদের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারা আমাদিগের স্বত্বাধিসিদ্ধ অধিকার, তাহার জন্য কেন বিলাত যাইব? যাহা আমাদের হাত আসা, তাহা পাইবার জন্য কেন ধর্ম্মত্যাগ করিব, সমাজ ত্যাগ করিব, স্বজন বন্ধু ত্যাগ করিব, অর্থব্যয় করিব? আর যাহার অধিকার আমার অধিকারের তুল্য নহে, সে কেন, কিছু না করিয়া, অনায়াসে তাহা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবে?

আর যে সিবিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেখাও, তাহা ত রাজকার্য্যের একটি মাত্র ভাগ - আর সকল কার্য্যে দেশী লোকের প্রবেশের পথ কই?.....

সমুদায় সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, ইংরেজেরা স্বার্থপরতাপ্রযুক্ত কেবল বাহুবলে দেশীয় লোককে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন না। যে রাজা স্বার্থপর, বাহুবলে প্রজার ত্যাজ্য গ্রাহ্য হইতে প্রজাকে রক্ষিত করেন, সে রাজাকে কি বলিব? ইংরেজেরা আমাদের শাসনকর্ত্তা, অধিপতি, প্রভু, সব—সকলই বলিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু আমাদের প্রাচীন পবিত্র ভাষায় একটি প্রাচীন পবিত্র শব্দের অর্থ তাঁহাদিগের প্রতি খাটে না। যে রাজা প্রজা রঞ্জন করেন না, তাঁহার প্রতি রাজা শব্দ খাটে না। বাহুবলে স্বার্থপরতা কি প্রজারঞ্জন?

.....সম্পূর্ণ প্রজারঞ্জন কি সকল দেশে, সকল অবস্থায় হিতে? যদি তাহা না হয়, আমাদের দাবি কতদূর চলিতে পারে?

এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, যাহাতে প্রজার মঙ্গল হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য। গ্রীসের প্রজাগণ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এক শ্রেণীর সর্ব্বস্বান্তরণ করিয়া অন্য শ্রেণীকে দাও, তাহাই কি তৎকালে রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছিল? যদি ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ একত্র হইয়া কামনা করেন যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বস্বান্তরণ করিয়া, আমাদিগের মধ্যে বণ্টন কর, ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ কি প্রজারঞ্জনার্থ তাহাই করিতে যাবে? তাহা নহে। সাধারণ প্রজার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়েই অন্যায়ত এবং অসঙ্গত।.....প্রজা যাহা চাহে তাহাই পাইবে এরূপ অধিকার রাজপ্রজার নহে।.....

যাহা চাই, তাহাই পাইতে পারি না।.....অন্যান্য দেশের প্রজার যে সকলে অধিকার, আমাদেরও সেই সকলে অধিকার, সন্দেহ নাই। আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, সাধারণ প্রজার মধ্য হইতে বর্জ্জিত থাকিব? আমাদিগের অপরাধের মধ্যে রাজভক্তি। সে অপরাধের জন্য পরাধীনতা, সে জন্য ক্ষোভ করিতেছি। তাহার সঙ্গে অন্য অপরাধের সম্বন্ধ নহে।

এক্ষণে বিচার্য্য, প্রজাবর্গই কিসে অধিকারী, ও কি কি পাইতে পারে না।

১ম। যাহাতে সাধারণ প্রজার অহিত, তাহাতে তাহারা অনধিকারী। কোন প্রজার রাজার কাছে প্রার্থনা করিতে পারে না যে, আইন উঠাইয়া দাও, কিম্বা উঠাইয়া যাও, আমরা পরস্পরকে অবাধে পীড়ন করি।.....

২য়। যাহাতে রাজার বিপদ্, তাহাতে প্রজার অধিকার নাই। রাজরক্ষার্থে রাজদণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—রাজদণ্ড রক্ষা না পাইলে কে সমাজ রক্ষা করিবে? অতএব আত্মরক্ষা রাজার প্রথম কার্য্য।.....আয়র্লণ্ডে সেলার ভারতবর্ষে কবি শোষণ করিতেছে, কিন্তু আমরা এমত বলিতে পারি না যে, সেলাবিদ্রাস উঠাইয়া দাও, উঠাইয়া দিলে রাজদণ্ড বিদ্ধ হইবে। তবে, সৈনিক বিভাগে প্রজোপকারিতার লক্ষ হইলে, তাহার প্রতিবাদ করিতে অবশ্য আমরা অধিকারী।

বহুবিধির আইনের মধ্যে "হিবিয়স্কর্পস" অর্থাৎ রাজহেরিতার যারা অনেক সকলেই পরিচিত হয়, তখন আমাদের সকলে একমুখ হইয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদণ্ড রক্ষার জন্য যদি সেই আইনের কখন প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ইংরেজেরা সে আইন বিধিবদ্ধকরণ পক্ষে অবশ্য অধিকারী ছিলেন, বিধিবদ্ধকরণে আমরা অনধিকারী তবে তাদৃশ আইন রাজদণ্ড রক্ষার জন্য কখন প্রয়োজনীয় কিনা, সে বিষয়ের বিচারে আমরা অধিকারী বটি এমত নহে।

৩য়। যাহাতে প্রজার মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছুই নাই, এমত বিষয়ে প্রজার কোন অধিকারও নাই। যদি ইংলণ্ডেশ্বরী বলেন যে, আমি টাইগরকে বাস না করিয়া কাঙ্গুরোরাসেই বাস করিব, তবে সে বিষয়ে আমাদের বিধি-নিষেধের অধিকার নাই।.....

এই ত্রিবিধ নিষেধ ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রজার অধিকার। কিন্তু এই তিনটি বাদ দিলে বাকি থাকে কি? যাহাতে প্রজার হিত, রাজার বিপদ্ নাই, তাহাই বাকি থাকে। তাহাতেই প্রজার অধিকার। তাহা সিদ্ধ করিতে রাজা বাধ্য। যদি রাজা ইংলণ্ডেশ্বর পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে তিনি রাজা নহেন—বাহুবলপুষ্ট প্রজাপীড়ক।.....

প্রজাবৎসল রাজার লক্ষণ এই। ভারতবর্ষীয় একজন রাজা এমন একটি কাজ করিয়াছিলেন যে, অদ্যাপি তাঁহা ভারতবর্ষে প্রজারঞ্জনের একমেব দর্শনম্ বিবাদ। এ কাজ তিনি করুন বা না করুন, করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। দাতব্য প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী পাই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এটি কি কাজ প্রয়োজন? রাম সীতাকে ত্যাগ করুন, এমত কামনা করিতে কি আমেরিকাবিলিস অধিকারী ছিলেন আমরা যে কয়টি সত্য সংস্থাপিত করিয়াছি, এই প্রবন্ধ পাঠকের বোধ হইবে যে সত্যগুলি কতদূর সঙ্গত।

রাজা প্রজার প্রধান ও মহৎ প্রজাপতির আদর্শ। যাহা কিছু রাজা করেন তাহাই অন্যে অনুকরণ করে। যাহা রাজা গ্রহণ করেন, অন্যে তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। যেমন রাজা সাধারণ আদর্শ, তেমনি যাহা রাজকীয় তাহাও আদর্শ। রাজমহিষী রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগের আদর্শ। স্থূল সংসারের বিশ্বাস থাকে যে, রাজমহিষী কুলটা এবং রাজাও সেই কুলটা মহিষীর প্রতি বিরক্তিশূন্য, তবে কোন স্ত্রীলোকেই কুলত্যাগে ভয় থাকিবে না, কোন স্বামীরই কুলটার প্রতি অসন্তোষ থাকিবে না। ইহাতে সমাজের বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিবার সম্ভাবনা। ঐরূপ কারণে বোধহয় ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অধিকাংশে। অতএব যে মহিষীর সতীত্বে সাধারণ প্রজার বিশ্বাস নাই, তাহা ত্যাগ করায় রাজার বিলম্ব নাই। এতদ্ভিন্ন সীতা বর্জ্জন করিবার অন্যেরও প্রজাপক্ষে স্বার্থ অধিকারী ছিল। রামও সীতা ত্যাগ করিয়া স্বার্থ রাজার কার্য্য করিয়াছিলেন।

একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। রাম স্বার্থ রাজার কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনুষ্যের কাজ করেন নাই। তাঁহার উচিত ছিল, রাজা ত্যাগ করিতে হয় তাকে লইয়া থাকেন,—সীতাকে ত্যাগ করিয়া রাজা লইয়া থাকা রামের কাজ—মানুষের কাজ নয়। কিন্তু বাল্মীকির উপরে রামায়ণ রচিত করেন মনুষ্যের আদর্শ রামের তাঁহার উচিত নয়। মানুষের আদর্শ রামকে চিরকাল দেখাইয়া দেব করিয়াছিলেন। রাম রাজার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তবে মনুষ্য মুক্তাইয়া রাখিলেন। রাজা-মনুষ্য মধ্যে মনুষ্যকে লুকাইয়া দিলেন। এই জন্য, পৃথিবী মধ্যে বাল্মীকি কেবল শ্রেষ্ঠ কবি। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সম্পূর্ণ বশ হয় নাই।

[২]

অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিবেন

দুর্ভিক্ষের আলায় প্রাণ যায়। দেশে যে দুঃখ ঘটিবে তাহা ত ঘটিবে; এক্ষণে তার সূচনাতেই সংবাদপত্র পড়ায় যে সুখ, তাহা কম হইল। সংবাদপত্র খুলিলে আর কিছু দেখিতে পাই না—কেবল দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাব দ্বারা হয় পক্ষান্তর হইবে, আপাততঃ সংবাদের বড় দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া উঠিল।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আমরা কি করিয়াছি? গবর্ণমেণ্ট অনেক কাজ করিতেছেন; কিন্তু আমাদের কি কিছু করিবার আবশ্যক নাই? একটি বিশেষ কাজ আছে,—তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে হইবে না। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা চাই—গ্রামে গ্রামে, গ্রামস্থ লোকের দুঃখনিবারণের জন্য এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিলিফ কমিটি চাই। তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট দুঃখনিবারণের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা আবশ্যক,—আবশ্যকমতে তাহার প্রশংসা করিতে পারি, এমনও আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে সব হইবে না। কিছুতেই সব হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যাহা করুন, আমরা যাহাই করি—কিছুতেই সকল দিক্ রক্ষা হইবে না। অনেক বাঙ্গালী অনাহারে মরিবে। কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে, যতদূর পারি, উপায়ের জন্য যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যে দুঃখনিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা কেবল প্রধান প্রধান বন্দিদিগের জন্য। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, যাহারা হেথা অক্ষম, তাহাদিগের সাহায্যার্থ এক্ষণে কিছু করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু তাহা বিবেচনা যে, অবসরে তাহা উদ্যোগ করিবেন। অবসরে অবসরে তাহার রিলিফ কমিটি সংস্থাপিত হইবে।

অবসরে অবসরে হইবে। সে কেবল সহরের নিকটবর্ত্তীদিগের হিতকর হইবে। দূরবর্ত্তি গ্রামান্তরে, যথায় ডাকের ডাক্তার পঁহুছিতে, সেখান হইতে তাহাদের দুঃখের কোন প্রতীকার হইবে না। ...

যে খাটিয়া খাইতে পারে, সে সরকারি কর্ম্মশালায় গিয়া কর্ম্ম করিবে। যে খাটিয়া খাইতে পারে না—অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, পীড়িত, বৃদ্ধ—তাহাদিগের জন্যই রিলিফ কমিটির সংস্থাপন হইবে। কিন্তু একটি লক্ষ্যের থাকি রহিল। যে খাটিয়া খাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ গেলেও খাটিয়া খাইবে না তাহাদের কি?

মনে কর একজন জমিদার ব্রাহ্মণ,—লক্ষ্মীর বরে—কিছু চাহিয়া চিন্তিয়া, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনার দিন গুজরান করে, এবার খাজনা পাওয়া গেলনা—এদিক্ ওদিক্ হইতেও কিছু হইল না। সে প্রাণ গেলেও ভিক্ষা করিয়া খাইবে না—সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মশালা তাহার পক্ষে দূর। রিলিফ কমিটি তাহাকে কিছু দিবে না—কেননা সে অন্ধ খঞ্জাদির মধ্যে নয়। অথচ রিলিফ কমিটি সকল এমন নিয়ম করেন যে, যাহারই আবশ্যক, তাহাকেই দিব, তাহা হইলেও যে কমিটির কার্য্যালয় হইতে বহুদূরে অবস্থান করে, সে বড় পাইয়া উঠিবে না। হয় ত কমিটির কার্য্যকারক পৌঁছিবে না, নয় প্রেরিত কার্য্যকারক প্রেরিত আহার্য্য অপহরণ বা আত্মসাৎ করিবে। রামকান্ত পর্য্যন্ত বিনা সাহায্যে রিলিফ অফিসের অভ্যন্তরে থাকিবে।

যে সকল লোক প্রতিযোগিতায় বা অন্য কারণে আপনাদিগকে ভদ্রলোকের মধ্যে গণ্য করে, তাহারা মজুরের কাজ প্রাণান্তে স্বীকার করে না, অথচ অন্নাভাবে মরিবে, এ দেশে এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাহার মধ্যে অনেকে অন্নাভাবে মরিতেছে, কুলবধূ বা প্রবীণা—দূরের বাহির হইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের জন্য গ্রামে গ্রামে কমিটি চাই। ইহারা অনাহারে মরিবে, তথাপি রিলিফার্থ রিলিফ কমিটির নিকট আসিবে না। ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহাদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। ইহা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নহে, আমাদিগের কাজ, দেশীয়ের কাজ, অভিজাতের কাজ; এরূপ কাজ যেমন গবর্ণমেণ্ট কখন সাধন করিতে পারেন না।

[৩]

তারকেশ্বরের মোহান্তের মকদ্দমা

ফিরাদ—সি. ডি. পীড এণ্ডোয়ার্ড এল. এল. ডি, বারার একটি অঙ্গ। গত ফুলশয্যার * রোজ ১২টার পর আরম্ভ হইল। মহারাণীর পক্ষে বাবু

* ২০ নবেম্বর, ১৮৭৩।—অ. চ. স.

ঈশানচন্দ্র মিত্র উকীল ও আসামীর পক্ষে বাবু নীলমণি বসু ও বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল। প্রতিবাদীর পক্ষে জাস্টিস সাহেব, ইবান সাহেব কৌসলি : কাজিয়া সাহেব, বাবু রবীন্দ্রচন্দ্র বড়াল আটর্নি ; বাবু হৈলোক্যনাথ মিত্র, বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উকীল। বাবু পঞ্চুচন্দ্র ঘড়ফড়ী—চক্ষুবন্ধন ও বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক, চুঁচুড়া—আসেসর ছিল।

কিছু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জাস্টিসসাহেব আপত্তি করেন যে, নবীন বয়স্থাকারী, কারাবাসী, সে বক্তব্যের সাক্ষী হইবার উপযুক্ত নহে। জজসাহেব আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। প্রথম সাক্ষী অভিযোগকারী রবীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যে, সে এলোকেশীকে বিবাহ করিয়াছিল, একত্র বসবাস করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী পিঁড়িত থাকায় বহুবাজারে তাহাকে রাখিয়াছিল এবং কাপড় চোপড় ছাড়া মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিত। সাক্ষী এলোকেশীকে খুন করিবার পূর্ব্বে এলোকেশী তাহার যোহারের সহিত উপস্থিতি স্বীকার করিয়াছিল। এই স্থলে জাস্টিস সাহেব ও ইবান সাহেব বলেন যে, এলোকেশী কি বলিয়াছিল, তাহা এখানে গ্রহণ করা হইতে পারিবে না। বাদীর পক্ষে উত্তর দেওয়া হইল যে, এলোকেশীর স্বীকারোক্তি সে জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারিণী হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইত, সুতরাং গ্রাহ্য ; তাহা তাহাকে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তাহার উক্তি ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩২ ধারার ৩ প্রকরণ মতে গ্রাহ্য হইতে পারে। জজ সাহেব বলিলেন যে, উক্ত আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণ মতে তাহা গ্রাহ্য বটে।

২৩এ নবেম্বর—

সরকারী উকীল বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র প্রথমে বক্তৃতা করেন, জজ সাহেব তাঁহার ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে জাস্টিস সাহেব বেলা ১১॥টা পাঁচটা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অর্থ দুই তিনটি মূল কথা ছিল। তিনি বলেন যে, সাক্ষীদিগের জোবানবন্দিতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই মকদ্দমায় পুলিসের ইন্সিপেক্টর মকাইয়া যা কিছু তদ্বির করিয়াছেন : বাস্তবিক এটি একটি পুলিসের প্রস্তুত মকদ্দমা। ডাইরেক্টর মিসন সাহেবও প্রথমতঃ কিছুকাল কর্ত্তব্যে বিমুখ হইয়া উহাতে পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাহাতেই এত পাঁড়াপাঁড়ি হইতেছে। মূল মকদ্দমা সম্বন্ধে জাস্টিস সাহেব বলেন, যে যে সাক্ষী এলোকেশীকে যোহারের সহিত একত্র থাকিতে দেখিয়াছে, তাহারাই বলিয়াছিল যে, সে সময়ে তৃতীয় লোক সে ঘরে ছিল এবং জোবনবন্দিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা যোহারকে প্রণাম করিতে তাঁহার ঘরে যাইত, সুতরাং ওরূপ ঘরে পাঁচজন লোকের সহিত এলোকেশী যোহারের কাছে বসিয়াছিল বলিয়া যোহার দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে না।

জাস্টিস সাহেব অন্যান্য অনেক তর্কবিতর্ক করেন। পরে জজ সাহেব বাবু পঞ্চুচন্দ্র ঘড়ফড়ী আসেসরকে প্রথমে মত প্রকাশ করিতে বলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন যে, যোহার নির্দ্দোষী ; কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, মকদ্দমায় কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং এলোকেশীর সহিত যোহারের অবৈধ সম্বন্ধ হয় নাই, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে। দ্বিতীয় আসেসর বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহার তাহাতে বাদিবিবাদী বাবু উমেশচন্দ্র সেন যোহারের পক্ষে প্রকাণ্ড তর্কিকতাকে ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। মল্লিক মহাশয় প্রথমে বলেন যে, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে, তিনি কিছু বলিতে পারিতেছেন না, এবং জজ সাহেব বলেন, আপনি কর্ত্তা, আপনি যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করুন। পরে জজ সাহেবের বারম্বার মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়াতে বলেন যে, যোহার দোষী। জজ জজ সাহেব মত প্রকাশ করিলেন না ; বলিলেন যে বুধবার দিন বেলা ঠিক তিন টার সময় রায় দিবেন। রায় ইংরাজিতে লিখিত হইবে, সুতরাং যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেই জন্য সেরেস্তাদারকে টিকিট করিতে বলিলেন। যাহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং টিকিটে সেরেস্তাদারের সহি থাকিবে। এদিকে বালক এবং উচ্চ লোক আদালত বাড়িতে যোহারকে ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে : জাস্টিস সাহেব সেই বিষয় জজ সাহেবকে জানান, তিনি বলেন জাস্টিস সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সাহায্য প্রার্থনা করুন।

২৪এ নবেম্বর

অদ্য পুলিস যোহারকে ছিল, ৭॥০ টার সময় কনষ্টেবল পাহারার ভার লিখিত ছিল। জজ সাহেব ৭॥০টার সময় রায় পড়িতে আরম্ভ করেন, পড়িতে পাঁচটা বাজিয়া যায়। রায়টি মোট ৩০ পৃষ্ঠা অবধারী। জজ সাহেব যোহারকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি সশ্রম ভিন বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জজ সাহেব রায় প্রকাশ করিলে যোহারের জামিন লইবার অথবা তাহাকে হাজিরা দিবার জন্য জাস্টিস সাহেব বন্দোবস্ত করেন। বন্দোবস্ত না হইলে যোহারকে জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

২৭এ নবেম্বর

যোহারকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখিত হইলাম যে, এরূপ অধিক দিনের জন্য কারাবাসীদিগকে প্রথমে কখনই জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না ; যোহারের সম্বন্ধে যেন সে নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইল, বলিতে পারি না।

রাজা উপাধিধারী ব্রাহ্মকুলের যোহার, যিনি কিছুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মবিশ্বাস বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্ন তুলসীর কারাবাসে উৎপীড়নকারী মকদ্দমা পরিবর্ত্তিত হইয়া বন্দোবস্তের সহিত শেষ করিতে হইতেছে, কি ভয়ানক অবাপহার !!!

ধর্ম্মাধিকরণ সাবধান ! ধনী মহাশয় ব্যক্তিগণ সাবধান !!

সাবধান !!!

৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলম ৮ম পংক্তি ১।

[৭]

সার জর্জ কাম্পেল

তবে সত্য সত্যই জাস্টিস সাহেব আদালতকে ছাড়িয়া গেলেন। পূর্ব্বাবধিই তিনি এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিন বৎসরের

অধিক কাল তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করিতে পারিবেন না, তাহাতে মনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম হইতে একেবারে অবসর লওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে কর্তাভিপক্ষ বাঙ্গীয় তাঁহাকে ঢাকা হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে, এখন বিদেশের সময় তিনি হইবে বাঙ্গালা ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। সুতরাং সম্ভবতঃ তিনি আর চারি পাঁচ মাস বাঙ্গালায় শুভ অধিষ্ঠান করিবেন। শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সভায় প্রথমতম সভ্য মাননীয় মিষ্টার টেম্পল সাহেব আমাদের বাঙ্গালার গবর্ণর হইবেন। তাই গবর্ণর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু কারণ সাহেব চলিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে এখনে সত্য কথা বলা সকলেরই উচিত। ইতিহাসবেত্তা বকটন বলিয়াছেন যে, লুক্রেশ সমকালিক কতকগুলি লোক বলিত যে মনুষ্য যে সমস্ত দোষে দোষী হইতে পারে লুক্রেশ যে কেবল মাত্র সেইগুলিই ছিল এমত নহে, সিসেরো যে কিছু গুণ থাকিতে পারে তাহাও লুক্রেশে ছিল। তাহারবীর সকল সাকক্ষেপ্স কারণ সাহেব সম্বন্ধে সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই একথার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা অপেক্ষাও বালিকা সাধ্যায়ীর পক্ষে দুইয়া বটেই আর কিছুই নহে বটে, তথাপি দুই একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। কারণ সাহেব নানা দোষে দোষী কারণ সাহেবের মস্তকে চিরস্থায়ী কলঙ্কটুকি অঙ্কিত রহিয়াছে। কারণ সাহেব পদত্যাগের অব্যবহিত বিলম্বে, সকলে তথা স্বীকার করিয়া লইলাম। এখনে জিজ্ঞাসা করি, কারণ সাহেব চলিলেন শুনিয়া মনে মনে একটু দুঃখ হইতেছে কিনা? নিরপেক্ষ হইয়া উত্তর-প্রদানেচ্ছু হইলে বলিতে হইবে যে "হাঁ এ সময়ে তিনি থাকিলেই ভাল হয়।" কেন, মহাপাপী সহিত সংস্রব রাখিতে মনে মনে ইচ্ছা হইতেছে কেন? দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে পুলকিত হইতেছ না কেন? তবে বোধহয় কারণ সাহেব নিতান্ত নরাধম না হইবেন। আমরা দেখিতেছি, কারণ সাহেবের প্রধান দোষ তাঁহার বেদস্পৃহা ও আলস্যে ঘৃণা। আমরা যদি এই দুই মহাপাপের তত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিয়াছেন; কারণ সাহেব আর যদি কিছু না করিয়া থাকেন, আমাদের একটি মহদুপকার করিয়াছেন,—অতি বয়ঃসমাগমে তিনিই প্রথমে জীবনোপরি প্রদান করিয়াছেন, আপনি, বীডনে তাহা পারেন নাই। কেবল এই উপকারের জন্য বাঙ্গালীকে কারণ সাহেবের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

[৫]

সমালোচন

চীনের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত অম্বাপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।.....আমরা গ্রন্থের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। গ্রন্থকারের ভাষা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির উৎকর্ষ, অপকর্ষতা বুঝিয়া লইবেন।

"আরম্ভভূমিতে প্রস্তাবপক্ষ বিস্তৃতির, প্রাবাণিক-ইতিবৃত্ত সংক্ষীর্ণ, ও অর্থাৎ ভাষাদির সম্বন্ধে ইতিহাসজ্ঞানের প্রস্তুত প্রচলিত না থাকাতে, আমাদের সম্মুখে অতিই ঘটিয়াছে। পুরাকালে এই ভূমণ্ডলাবতংস অতুল মনীষা-সম্পন্ন, অলৌকিক কার্যকারিণী ও জ্ঞানবলপ্রাধিনিধিনি-গুণধান যে সকল মহীয়ান মহীপতিতে এবং সমাজার্থ পাত্রাপাত্র-নির্দিষ্ট সুশিক্ষিত-জ্ঞান-কলালোপিত বিদ্যাপাদপ-পরিভূষিত চিত্তক্ষেত্র-পরিমার্জক যে সকল জ্ঞা মহা মুবীগণ বর্ষা শুদ্ধে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সমার্থ নিরাময় সুযৌক্তিক ও বিশুদ্ধ ইতিবৃত্তালোকাভাবে তাঁহাদের স্বার্থ চর্য প্রবৃত্তিবিধানক্ষমতা কিরূপ মহিমায়ত। এইরূপ ইতিহাসের অসদ্ভাবে আমাদের ও অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রাবাণিক আত্ম বৃত্তান্ত সকল বিলক্ষণ অবিশ্বিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পাঠকবর্গ! কিজন্য বলিয়া লেখক আদ্যপূর্বিকক্রম-বিশিষ্ট ও ইতিবৃত্তবর্ণিত ইতিহাস জানা কতদূর আবশ্যকীয়।"

উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ "আরম্ভভূমি—প্রস্তাবপক্ষ বিস্তৃতির—প্রাবাণিক—ইতিবৃত্ত—সংক্ষীর্ণ—অর্থাৎ ভাষাদির" ভাষায় লিখিতে হইলে কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।...

[৬]

সংবাদ

এ বৎসর ২৫৩৬ জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে এবং ৪৩৭ জন ছাত্র আর্টস পরীক্ষা দিবে।

* * *

সুবাহার সৌলতমীর খাঁ নামক খাজানা গ্রামের একজন মুসলমান হিন্দু হইয়াছে। সে মাংস খায় না, তাহার হিন্দু স্ত্রীর সহিত সন্ধ্যাকাল দেবালয়ে যাপন করে, ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাতি বোধ করে, মুসলমানদিগকে ঘৃণা করে এবং বলে যদি ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত ভোজন করে তবে তাহাদিগকে ১০০০ টাকা দান করিবে; কিন্তু তাহারা অসম্মত হইয়াছে।

* * *

সরকার হইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটি আদেশ প্রচার করেন যে, বিজ্ঞানের সম্বন্ধীয় কর্মচারী কোন সংবাদপত্রের বা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হইতে পারিবেন না। সকলকেই ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কারণ সাহেব ১০ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এই আদেশটি পুনরায় প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ আইনানুসারে তাঁহার সেক্রেটরি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে পারেন! ইণ্ডিয়ান অবজারভারের উপর কোপ নিক্ষেপ করিবার জন্যই বুঝি এরূপ আইন পুনঃ প্রকাশিত হইল? ইতিপূর্বে না গবর্ণমেণ্ট প্রবাসে প্যারীচরণ ও ভূদেববাবুকে এডুকেশান গেজেটের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন?

* * *

পত্রপ্রেরক একটি "অতি সামান্য" বিষয়ের আলোচন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। বিষয়টি এই—"মহিলাগণ স্বভাবতঃ সর্বাগ্রে বাম পদ নিক্ষেপ করে কিনা?" পত্রপ্রেরক সাধারণী সম্পাদকের ও পাঠকবর্গের মত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ যদি এ বিষয়ে তাহার কিরূপ মত বলিতে পারি না। আমরা যতদূর জানি বলিতেছি। রসিকবর শ্রীরাধাকান্ত যখন "যেদি পদক্ষেপমুহরম্" বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী দক্ষিণ পদ বা বাম

পদ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কর্ণাট রাজমহিষী যখন কালিদাসের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, তখন "তোমং খুট্টি, নমাতি ব্যবহারং কর্ণাট-রাজপ্রিয়া" বলিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রাম্য মাতা কোন মেয়েকে-তাঁহার নিজের চাইতে বড় ঘরানায় হইলে বলিয়া থাকে যে, "মা পায়ের নাড়ি হেঁড়ে নিজের হাড়ি ভেঙ্গে দি।" সুতরাং স্বভাবতঃ মহিলারা যার পর অস্ত্র নিক্ষেপ করে কিনা বলিতে পারি না, কোন কোন অবস্থায় যে বাদশাদের চালনা অস্ত্রে বলিয়া থাকে তাহা অনুমান হয়; কিন্তু অনুমান মাত্র। পাঠকেরাও একটু ভাবে নিজে ভাব দিয়া করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তবে পাড়ার মেয়েছেলেকে দিয়ে করাইলে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গেলে কি হয় বলা যায় না। ঠেকে শেখা ভাল বটে, কিন্তু এরূপ ফলেও কি?

* * *

মাদ্রাজের একাউন্টান্ট জেনেরল একজন নিম্ন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন শত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

* * *

মাদ্রাজে যত কেরাণী কর্মবালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে সকলের শেষে লেখা হইয়াছে কর্মপ্রার্থী মুসলমান হইলে তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করা যাইবে।...

* * *

জলপাইগুড়ি প্রতিনিধি লিখেন, লক্ষ্মী নগরে মেয়েরা প্রভৃতি যুক্তা খেলায় বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। একটি মুসলমান যুবক সম্প্রতি আপনার সহিত খেলায় হারিয়া শেষে আপন বিবাহিতা স্ত্রী অবধি হারে। জেতা পত্নীসহ বাড়ীতে গিয়া সেই স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য মুসলমান যুবকের বাটীতে আইসে। স্ত্রীলোক আপনার স্বামীর দুরবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করে। মুসলমান যুবক ও জেতা উভয়েই পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। বাপরের কর্মসূত্রের সহিত কলির কর্মসূত্রগণের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে বৈকি, তা বলিলে আজও মার খেতে হয়।]

* * *

ইংলণ্ডে পড়তড়া প্রত্যেককে জলের জন্য ৭৷০ এবং বঙ্গদেশে প্রত্যেককে ৵০ আনার ডিফিং ফল শুল্ক দিতে হয়। সুতরাং ইংরেজেরা বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা ৫৮ গুণ বেশী মাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

* * *

আমরা জিহত জেলার অন্তর্গত সলপুর হিতৈষী শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র সে মহাশয়ের নিকট হইতে ২০এ অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রদ্বারা যে যে দ্রব্যের যে যে ভাও প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

৮০ সেরায় ওজন। কোম্পানির টাকা—প্রত্যেক টাকায় :—

মেঠুয়া, আধ মণ; মকাই, আঠার সের; লাল বুট, উনিশ সের; মুগ, আধ মণ; মকাই, ন এড়ুল সের; খেসারির দাল, চৌদ্দ সের; কলাই, সাড়ে আঠার সের; ভাল চাল, পৌনে তের সের—ধান পাঁচ পো; মোটা চাল, চৌদ্দ সের—ধান মেঠ সের; আতপ চাউল, সাড়ে দশ সের; বাজ, সাড়ে বাইশ সের; গম, সাবালসুরে তের সের; মসুর, এক মণ—চারি টাকা চোদ্দ আনা; উরদ মুগ, এড়ুল—ন এড়ুল; পাটনের মুগ, কুড়ি টাকা মুগ আনা অথবা সাড়ে কুড়ি।

* * *

এত কয়েকটি মোকামে আমরা পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার উত্তর পাই নাই,...

* * *

এইরূপ কোর্ট বন্ধই হাইকোর্ট দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন। মফস্বলের আদালত সকল প্রায়ই প্রথমে সমানে সমানের পক্ষে সন্ধি খেলায় যান, পরীক্ষের পক্ষে টেরেয় তৎপরেলারি ঘোড়াসি, সন্ধির পক্ষে পিলুড়ি আরও জোর করিবার আশায়, ও বড় মানুষের পক্ষে কুন্তির আখড়া বা ঘোড়ার আস্তাবল হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে জমিদারের বাড়ী গোলাপ ও পায়রার কুন্তি দেখিত, এ কালের বড় মানুষ প্রথম চাটুকেতে আদিল বাড়ুজ্জেতে বিদ্রোহ কুন্তি দেখেন। সলিসিটরকে মাসে ছয় টাকা দেন, মোক্তারদিগকে মাসে ৮৵৮ দেন। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সহরের লোককে চাবুকটা মারটা যাহেন, মোকদ্দমায় চড়িয়া বসিয়াছিল মওকেল, হালিক থেকে ছল করেন। মক্কেলের ত পতিক এইরূপ, আমার হাইকোর্টের এই দশা হইল!

* * *

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ প্রাক্ত উকিল বাবু কালীমোহন দাস ঘোষের ভবন করিয়া পুরুলায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

আগত মাঘমাসে বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য ৫১২ জন ছাত্র প্রস্তুত আছে। বি. এল. দিবার জন্য ১০৩ জন এবং এল. এল. দিবার জন্য ৬৭ জন প্রার্থী।

* * *

মহারাজ সিন্ধিয়ার স্ত্রী মহিষী সুরায় গ্রামে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহাদিগের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। ভারতচন্দ্র কাঞ্চনরায়পুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'আমার সুরায় ঘরে আমার সুরায়।'

এখানে সিন্ধিয়া মহারাজ সম্বন্ধে হইয়াছে,—

সুরায় বাজায় ঘরে আমার সুরায়।

* * *

বোম্বেতে বাবা একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কৃত্রিম চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বেড় পরনা ঘরে এক সের চিনি প্রস্তুত হইবে। তবে বোধ হয় এ দেশে আকের চাষ এবং খেজুর গাছ আর দেখিতে পাইব না! আহা আমাদিগের মুগ্ধ গৌড়াদি মনের শুভের আঘাতে একেবারে স্তম্ভিত হইল।

* * *

স্বর্গ শ্রীযুক্তাকালী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাসন আদেশ রহিতকরণার্থ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কাছে যে আবেদন হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।...*

---

* [২ অগ্রহায়ণ (১৭ নবেম্বর) হইতে ৩০ অগ্রহায়ণ, ১২৮০ (১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭৩) পর্যন্ত পাঁচ সংখ্যা 'সাধারণী' হইতে সঙ্কলিত।]

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

একটু একটু শীত করিতেছে।

শিলিগুড়ি ষ্টেশনে কলিকাতা-যাত্রী দার্জ্জিলিং মেল দাঁড়াইয়া ছিল। এদিন হইতে গার্ডের গাড়ী পর্য্যন্ত খুঁজিয়া-পাতিয়া অনেক পরিচিত লোক বাহির করিয়া ফেলিলাম। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, ইচ্ছা করিতেছিল, আর কথাটে কাজ নাই, কি হইবে সাইকেলে কলিকাতা গিয়া, তাহাতে এমনই বা কি গৌরব বাড়িবে! দেখিতেছি তো, বৎসরের পর বৎসর এভারেষ্টের সীমানা খুঁজিয়া পাইবার জন্য কত লোকে হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, দুই এক-দিন তাহাদের নাম বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে ছাপা হইতেছে, তারপর ঘাই কি তাই! — কত দুঃসাহসী আফ্রিকার বন-জঙ্গল আবিষ্কার করিয়া প্রাণ দিল, কত জন উত্তর-মেরু আর দক্ষিণ-মেরুতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইল—আট-লাণ্টিক পাড়ি দিবার জন্য কত জন সেই যে ব্যোমযানে চড়িল আর ফিরিল না—কয়জন তাহাদের নাম মনে রাখিয়াছে! মানব-সভ্যতার ইতিহাস তো এই সব অজ্ঞাত বীরত্বের ইতি-হাস। সুতরাং কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত সাইকেলে যাইবার এই সুমহান্ মর্য্যাদা অর্জ্জনের লোভ পরিত্যাগ করিয়া, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া উঠিয়া পড়ি এই গাড়ীতে, দিব্য গরমে গরমে কলিকাতা ফিরিয়া গিয়া বারোস্কোপে 'ট্রেডার হর্ণ' কি 'ব্রিং এম্ ব্যাক্ আলাইভ' দেখিয়া দুঃসাহসের ক্ষুধা মিটাইব এবং খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পড়িব – অ্যামি মলিসন্ কি নিবিড় কুয়াসা ভেদ করিয়া সুন্দর দাগরপারে বিমানপোত চালাইয়াছে!

কিন্তু মুখে সে কথা কাহাকেও বলি নাই। দলে পড়িয়া লোকে কত দুষ্কর্মই তো করে—পাঁচজনে মিলিয়া বনজঙ্গলে সাইকেল হাঁকানো তো তাহার কাছে তুচ্ছ!

কলিকাতা-যাত্রী বন্ধুদের বলিয়া দিলাম,—রয়টারে খবর দিতে, উই আর নিয়ারিং দি ডেষ্টিনেশন্। অ্যালোসিয়েটেড্ প্রেসে একটি রিপোর্ট পাঠাইতে এবং ফ্রী প্রেসকে একটি বিশেষ রিপোর্টার পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতে—! বলিতে বলিতে মেল ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকা সম্ভব, চাহিয়া থাকিলাম।

শিলিগুড়ি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের একটি টার্মিনাস। এই জন্যই ইহার যাহা কিছু সমৃদ্ধি। ১৮৮১ সালে রেল হইবার পর ইহাকে একটি মহকুমা করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল অস্বাস্থ্যকর অবশ্য এখনও,

চা-বাগানের কুলিবৃন্দ।

কিন্তু এখন ইহা শহর। এখান হইতে দুইটি দুরধিগম্য স্থানে রেললাইন যাত্রা সুরু করিয়াছে, একটি কালিম্পং, অন্যটি দার্জ্জিলিং। রেলপথে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি মাত্র ৩৪০ মাইল, চলা-পথে ইহার বেশী। শিলিগুড়ি বেশ বড় ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র, মাড়োয়ারীদের তাই ভীড় বেশী। শিলিগুড়ির অপরপারে টেরাই,—বন্য জন্তু ও যত রকম ব্যাধির নিরাপদ আশ্রয়। চারি পাশে চা-বাগান ও জঙ্গল।

সহরের রাস্তা ছাড়িয়া মহানদীর পুলের উপর উঠিলাম। পুলটি ৭০০ ফিট লম্বা—উপর দিয়া দার্জ্জিলিংএর ছোট-রেল গিয়াছে। পুল পার হইয়া দার্জ্জিলিং রোড দিয়া সোজা পকাইন ষ্টেশন অভিমুখে গাড়ী ছুটাইলাম। দুই পাশে ফাঁকা মাঠ

আর সম্মুখে হিমালয়ের বুকে আলোকমালা। তিন মাইল গিয়া পঞ্চানৈ ষ্টেশনের কিছু আগে চাপাসরাই যাইবার রাস্তা —অত্যন্ত অসমতল। এই রাস্তায় প্রায় তিন চার মাইল পথ গিয়া আমাদের গন্তব্য বাংলোতে পৌঁছিলাম। বাংলোর কর্ত্তা সতীশবাবু (সম্পর্কে আমার মামা) আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মুখ হাত পা ধুইয়া জলযোগ শেষ করিতে বিলম্ব হইল না। সতীশ-বাবু বলিলেন, 'এই পঞ্চানৈ দশ বৎসর কাটাই-লাম, কৈ, আজ পর্য্যন্ত সাইকেলে কাহাকেও রংটং-এর উপর উঠিতে তো দেখি নাই!'—তাঁহার সঙ্গে বাজী হইল,—আমরা উঠিব-ই। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত নানা কথা-বার্ত্তায় দিবা কাটিল।

শিলিগুড়ি : চায়ের বীজরোপণ।

৩১শে।—

চা-বাগান সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। শিশু-পাঠ্য ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীতে যত চা হয়, তাহার প্রায় সবই এই বাংলাদেশে জন্মায়—এই পর্য্যন্ত। এবং বড় হইয়া চা সম্বন্ধে জ্ঞানের কেবল এটুকুই উন্নতি হইয়াছে যে,

শিলিগুড়ি :

চা খাইতে শিখিয়াছি, কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ চা তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি এবং দার্জিলিং-এর চায়ের সহিত আসামের চায়ের কি পার্থক্য তাহাও জানিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে কখনও শুনিতাম, অমুক লোকটা চা-বাগানের পেয়ার কিনিয়া বড়লোক হইয়া গিয়াছে কিংবা অমুক লোকটা ঐ পেয়ার কিনিয়াই একেবারে ফতুর হইয়া গিয়াছে—ইহার বেশী চা-বাগান সম্বন্ধে আর কিছু জানিতাম না, জানিবার প্রয়োজন ছিল, ইহাও মনে করি নাই।

কিন্তু কে জানিত ইহা এক স্বতন্ত্র রাজ্য! পৃথিবীর অন্য আর কোনও স্থানের সহিত ইহার তুলনা হয় না। আমরা যেদিন চাপাসরাই-এ, সেদিন সে-বাগানে কালীপূজা কিংবা ঐ রকম একটা কিছু উপলক্ষ্যে বন্ধ ছিল। দেখিলাম, বাথানের আবালবৃদ্ধবনিতা কুলি ও কুলিরমণীরা সব দিন-রাত 'হাঁড়িয়া' খাইতেছে। দোষ তাহাদের দিতে পারি না, ঐ আবহাওয়ায় থাকিলে স্বয়ং পুলিসকুট জনসন যে কি করিতেন, তাহা জানি না। চা-বাগানের হাওয়াতে এমন একটি মন মরা ভাব যে, ওখানে লোকের সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করা দুষ্কর। সুতরাং এই হাঁড়িয়া-পানোন্মত্তদের দেখিয়া এমন কথা মনে হইল না যে, কি বীভৎস! শুধু মনে পড়িল, কি লজ্জা! সত্য সত্যই মানুষের এই সভ্যতার কি কোন অর্থ আছে! যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের জন্য বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠিকে প্রতি মুহূর্ত্তে তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে—সেখানে সভ্যতার প্রশংসা করিতে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই বাধিবে বৈ কি!

এই বাগানের মধ্য দিয়া পঞ্চানৈ নদী।

সকালে চা খাওয়া সবে শেষ হইয়াছে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, গত রাত্রে বাগানে বাঘ আসিয়া একটি গরু

শিলিগুড়ি : চা-বাগান।

মারিয়াছে। বাগানের বাসিন্দাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের এ জন্য বিন্দু মাত্র উদ্বেগ নাই, কেননা সেখানে উহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা—বরং মনে হইল, এমন একটা কিছু না ঘটিলেই যেন তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইতেন। চা-গাছের জঙ্গল ভেদ করিয়া বাঘের লীলাস্থল দেখিয়া আসিলাম। সকলে বলিলেন, আজ রাত্রেও বাঘ আসিবে। বাঘ শীকারের এমন সুযোগ হেলায় হারাইবার পাত্র আমরা কেহই নই। হয় তো বন্দুকে ছাত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দমিব কেন? সতীশবাবুর দুইটি বন্দুক ছিল। দারা দুপুর ধরিয়া সেগুলি পরিষ্কার করা গেল। এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতে বাগান ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া মাচাতে উঠিয়া বসিলাম। আমাদের মধ্যে যাঁহার বন্দুকে হাত ভাল, শ্রীমান বেবী, তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, খবর্দ্দার, তোমরা কেহ টিপ করিয়ো না, আমি ফায়ার করিব। এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল, বসার কাঁধড়ে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। খস্ খস্ শব্দ হয় আর বুক টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠে—এই বুঝি আসিল! বন্দুক তুলিয়া ধরি—মিনিট পাঁচেক কাটে, বুকের টিপ্ টিপ্ কমিয়া যায়—কিন্তু বাঘ আসে না। হায়রে, শেষ অবধি এই জঙ্গলে, 'পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে' প্রিয়তম বাঘের প্রতীক্ষায় রাত কাটাইতে হইবে! এই অবস্থাতেই আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। সঙ্গে দুইটি চৌকীদার ছিল, তাহারা বলিল,—ও ঠিক টের পাইয়াছে, আজ আর আসিবে না। অগত্যা আশা ছাড়িতে হইল। মাচা হইতে নামিয়া গম্ভীর পদক্ষেপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সকলেই জানিত, এমনই একটা কিছু ঘটিবে, সুতরাং আমরা যে দুই ঘণ্টা কাল নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম, ইহার মধ্যে কেহই বিশেষ কিছু চিন্তা করিবার ব্যাপার খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু আমারই বুক তখনও টিব্ টিব্ করিতেছিল। কল্পনায় দেখিতেছিলাম, বাঘ আসিয়াছে, বেবী বন্দুক ছুড়িয়াছে—তারপর কেবল একটি শব্দ 'হালুম্,' এবং সঙ্গে সঙ্গে··· ··বাপ্রে।

শিলিগুড়ি : সতীশ বাবুর ছেলেমেয়ে।

রাত্রির আহার শেষ করিয়া, গ্রামোফোনে একটি বিলাতী সুর বাজাইতেছিলাম—চাওয়াই দ্বীপের ইউকেলেলির বাদ্যের সহিত গান—চাঁদ উঠিয়াছে, সমুদ্রের বুক দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, তীরে পামগাছের সার, ছেলেরা জাল গুটাইয়া অনেকক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছে, আমি শুধু বাঁশী বাজাইতেছি আর ভাসিতেছি তুমি কোথায়,—কে-তোমার সোনালি চুল, নীল চোখ,—এই রকম কি একটা গান। এমন সময় খবর আসিল, কুলিরা আসিয়াছে, কলিকাতার বাবুদের নাচ দেখাইতে চায়। কি বিপদ! নিতান্ত অনিচ্ছায় বাহিরে আসিলাম।

নাচ সুরু হইল। কি আশ্চর্য্য! এই কুৎসিত দেখিতে লোকগুলি এই নৃত্য শিখিল কোথা হইতে! কোথায় গেল হাওয়াই দ্বীপের ইউকেলেলি বাদ্যের সেই সুর আর গান! এই জঙ্গলে বসিয়া, ম্যালেরিয়ায় ও কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াও ইহারা যে নৃত্য শিখিয়াছে—তাহা দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেলাম!

১লা নবেম্বর।—

ভোরে ঘুম ভাঙিল শঙ্খধ্বনিতে। কি ব্যাপার! খোঁজ লইয়া জানা গেল —আজ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, ভাই-ফোঁটার দিন। সকলেরই মনে একটু লাগিল বুঝিলাম, বাড়ীর কথা ভাবিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই সতীশবাবুর ছেলেমেয়েরা চন্দনের বাটি হাতে আসিয়া শাঁখে ফুঁ দিয়া ঘরে ঢুকিল। ছোট প্রদীপের শিখাতে ছোট আঙুলটি বাড়াইয়া ছোট খুকিটি আধ-আধ স্বরে সকলকে চন্দনের ফোঁটা দিয়া বলিল,—

ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দোরে পড়লো কাঁটা।

তাহার সে-ফোঁটাতে যমের দুয়ারে কাঁটা পড়িল কিনা জানি না, কিন্তু মন খুশী হইয়া গেল।

অবশ্য খুশী হইবার আরও কারণ ছিল—অপর্য্যাপ্ত ভোজ্যের আয়োজন।

জলযোগ শেষ করিয়া নদীর ধারে ধারে একটু বেড়াইয়া আসা গেল। বিকালের দিকে শিলিগুড়ি বেড়াইয়া আসিলাম। রাত্রে আবার কুলিদের নাচ দেখা গেল।

কাল সকালেই চাপাদরাই ছাড়িতে হইবে। (ক্রমশঃ)

দেবতা

—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতা? আমার দেবতারে আমি পাইনি খুঁজে
চক্ষু বুজে।
প্রাচীন প্রথার হেমবিগ্রহে পূজিয়াছি যারে,—দেবতা সে নহে;
সে নহে দেবতা—পূজারী যাহার রুধির খুঁজে।
বড়ো বড়ো রূপে—বড়ো বড়ো নামে
পূজা যা'রা চায় দক্ষিণে বামে,
তুষ্ট তা'দের করেছি প্রণামে—প্রসাদলোভে।
ছোটো গণ্ডীর যে মনোবিকার মানুষে করায় মানুষ শিকার
বাহিরে তাহারে করিয়া স্বীকার—জন্মেছি ক্ষোভে।
অসীম শূন্যে কোটি কোটি লোকে, অণু পরমাণু কাঁপিছে পুলকে
যুগ যুগান্ত যে মহাকবির অনাহত বীণারবে,
তারপার তাঁরে পারিনি ধরিতে জীবনে তাঁহারে পারিনি বরিতে,
ছোটো হ'য়ে ছিনু আপনার মাঝে আপন অগৌরবে।
এমনি সময় সমুখে দাঁড়াল সে—
মুখখানি তার আমার মায়ের মত!
পিছনে আঁধারে ঘনাইছে লালসে
অন্ধ আমার প্রেতপিশাচেরা যত।
রূপসী তাপসী গোধূলির গৈরিকে—
নয়নে আমার চাহিল নির্নিমিখে;
এক মুহূর্ত্তে চিনিলাম যুগপৎ—
আমার দেবতা এবং আমার পথ।

সেইক্ষণে মোরে দক্ষিণকরে বক্ষে টানি
কামনারাণী—
দিতেছিল চালি যে সকল সুরা—
ফেলিনু ছুঁড়িয়া নাহি হ'তে পুরা
রঙিন আশার সে মদির মধুপাত্রখানি।
শিশুকাল হ'তে যত সাধ মনে কুসুমি উঠেছে প্রমাদ-পবনে
স্নেহ-সুনিবিড় সুখনীড়ে শত স্বপ্ন রচি',
সহসা নিমেষে দারুণ আঘাতে ধূলা হ'য়ে গেল কোথা ধূলিসাথে;
তরল মাধুরী ছোটো অবরোধে উঠিল পচি।
এতদিন ধরি যাহা ছিল প্রেয় এক মুহূর্ত্তে মনে হ'ল হেয়,—
ছোটো অনেক ছোটো দামে ক্রেয় ভরি দুই করপুটে।
আপনার তরু আপনার বল—পরিচিত ঘরে নিশীথ দিবস,—
আর পারিল না করিতে বিবশ পথে বাহিরিনু ছুটে।
দেখিলাম আগে চলিয়াছে ধরণী,—
নিশার আকাশ কাঁপিছে জয়োল্লাসে;
কাঁটার কাঁকরে জীর্ণ দে সরণি,—
দেবতা কেবল দাঁড়ায়ে আমার আগে।
ছোট প্রাণ নিয়ে মেটে না তাহার আশা,—
ভাগ করে' তা'রে যায় নাকো ভালোবাসা—
আর কারো সাথে: অভিমানিনীর মান
রাখিবারে তাই পণ করিলাম প্রাণ।

দেউলে দেবতা ডাক দেছে মোরে ঐ সমুখে,—
ঘাটের বুকে।
প্রতিদিবসের যে দুপাশুরে নাহি বুকে কেহ,—নাহি দেখে দূরে,—
চ'লেছি তা'পরি আহত চরণে—চারুরূপে।
দুস্তর পথ,—জীর্ণ স্থবির জড়জীবনের মহা অটবীর
তরু তলে তলে তরছায়া মেথা বেঁধেছে বাসা;
কোটি কোটি নর কুটিরে কুটিরে বৈতরণীর বসি' দুটি তীরে,
বুকে নাই আশা,—দেহে নাই বল,—কণ্ঠে ভাষা।
দেবতা আমার ইহাদেরি মাঝে কতরূপে আজ কত ভাবে রাজে,
কভু চিনি তাঁ'রে, কভু চিনি না যে,—তবুও চলেছি আগে।
গহনবনের পল্লবছায় দেউলের চূড়া ঢেকে ঢেকে যায়,—
দূরে ঘোররবে অমনি পূজার আরতি শঙ্খ জাগে।
ভূমিকম্পনে সহসা শিহরি' উঠি'
বিপুল বাধারা শিকড়ে আঁকড়ে মাটি;
পুলকে আকুল আমরা সমুখে ছুটি
লতাগুল্মের মত বন কাটি'।
শিছনে টানিছে ঘরের মমতা প্রীতি,—
সমুখে জাগিছে অনিশ্চিতের ভীতি,—
আশৈশবের সংস্কার বাধে পায়
প্রতিপদে,—তবু চলি জয়যাত্রায়।

ঘরে ঘরে আজ সুখে থাকো ভাই তোমরা সবে,—
বিদায় তবে।
তোমাদেরি গেহে দেহ হ'ল পুষ্ট,
কেহ ছিলে সখা, কেহ ছিলে শত্রু,—
আজি ক্ষমা কোরো,—আসিয়াছে ডাক,—যেতেই হ'বে।
যে ক'রেছ দয়া,—যে বেসেছে ভালো,—
দেহলীতে মম যে জ্বেলেছ আলো—
প্রেমে ও প্রণয়ে যা'রা ছিলে মোর আপনতম—
তা'দের, মা'দের, ভগিনীর ছবি যে ধ'রেছ চোখে—
মনে আছে সবই,
সে স্নেহের ঋণ শুধিবারে দিন হ'লনা মম।
আজি বিজয়ার বাঁশী বাজিয়াছে,—
দয়িতের লাগি বধূ সাজিয়াছে
মরণ-বাসরে দীপ্ত-চিতায়,—এখন কি সাজে ভাষা?
এখন কি সাজে কথা দিয়ে কেনা তোমাদের চির প্রণয়ের দেনা?
এত ছোটো ঘরে মন যে মানে না,—সাজে ঘরে ভালোবাসা।
যে শ্যামা ধরণী সুন্দরী শোভনা—
কোলে ধরিয়াছে আমারে মায়ের মত
লালনা তা'র আমি হ'তে দোব না,—
বুক পেতে ল'ব তাহার আঘাত যত।
দেবতা আমারে স্বপ্নে দিয়েছে দেখা,—
রক্তসিক্ত, পথের প্রান্তে একা!
বিশ্বে আমার নিঃশেষ হ'ল স্নেহ;
বন্ধু তোমরা হাসিয়া বিদায় দেহ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ঃ রবীন্দ্রনাথ (২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

পূর্ব্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির সামান্য-ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি, এখন বিশেষ-ধর্ম্মের আলোচনা কিছু করিব। প্রথমে বাক্য-গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাহার পর পদ ও শব্দ প্রয়োগের রীতি।

দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরা অনেক সময় হ্রস্ব-বাক্য দিয়া শেষ করা হইয়াছে। অনুচ্ছেদের শেষে এইরূপ করাতে বাগ্‌ভঙ্গির আকস্মিকতা হেতু একটু বৈচিত্র্য আসিয়া যায়। যেমন—

বুদ্ধি উকীলরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের পক্ষে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। তিনি যত বড়া হউন পুলিসেতে আমার সকলই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট: যাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মবুদ্ধি সহসা যে কাপটা ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন একদিকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতায় খোলাও যেন স্বচ্ছ হইয়া গেল। তাহি আরাম পাইল। [গল্পগুচ্ছ : সমস্যাপূরণ]।

কোনো কোনো বাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কর্ত্তৃপদের পুনঃপ্রয়োগ অনেক সময় করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। আরও উদাহরণ দিতেছি।

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় পয়াসি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। [রাজর্ষি]।

সহসা শ্রবণের গভীর গহ্বর আঘাত লাগিল। অন্ধকার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। [চোখের বালি]।

অসংযুক্ত বাক্য ড্যাশচিহ্নের দ্বারা অনেক সময় যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাও বৈচিত্র্যের খাতিরে। যেমন—

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ঘরের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিল আমার মত গেল—বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল। [গল্পগুচ্ছ : বোষ্টমী]।

অনির্দ্দেশক (indefinite) সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে সমাস-পূরকের সর্ব্বনামের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখায়ই বেশী দেখা যায়। যেমন—

তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নাহিলে সে বিদ্যা, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিয়া লেখে সে সার্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিলে হয় ত বুঝিতে পারিবে—[কথা। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। (ভাদ্রপদ ও আশ্বিন, ১২৯৯ সাল)]।

বিস্ময়দ্যোতক (exclamatory) বাক্যের পরিবর্ত্তে বর্ণনাত্মক (assertive) বাক্যের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বাক্যভঙ্গি। যেমন –

আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও যে প্রতাপের পাতালের রাজবংশে বা জন্মিয়া আলোকের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং সৌভাগ্যের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আপনা করিতে পারিতেছেন না। [গল্পগুচ্ছ : মুক্তা]।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে পরস্পরিত (correlative) বাক্যের প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়। আর এই পরস্পরিত বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘ। সম্বন্ধযুক্ত বাক্য (relative clause) এবং হেতুমৎ (relative) বাক্য (sentence) প্রায়ই মূল বাক্যের পেছে আসে। যেমন—

সেই ধাঁধের পক্ষে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা অচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত আকাশব্যাপী, অথচ একটি হরিণশাবকের মত ভীরু। [গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক]।

যে দুর্ভাগ্যবশে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিতে যেমন ভালবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে ভালবাসে; যে ভালবাসায় সন্ধানে পরমেশ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—যে ভালবাসায় প্রবল আকর্ষণ সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়। [গল্পগুচ্ছ : মণিহারা]।

'কেননা', 'কারণ' প্রভৃতি হেতুবাচক শব্দ দিয়া অনেক সময় স্বাধীন (independent) বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। 'যেন' এই উপমা বা উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক শব্দেরও এই রকম প্রয়োগ আছে। যেমন—

কলের দ্বারায় মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সহীসপের গায়ের মত একটি ঘন শীতলতা এবং কলরবের শুভ্র পত্রগুলির উপরে দ্বারা আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা জীবিত সরীসপের গায়ের বিচিত্র রেখাবলী। [জীবনস্মৃতি]।

'মুস্কিল এই' অথবা 'কিন্তু মুস্কিল এই' বাক্যাংশ দিয়া অনেক সময় বাক্যের আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ইংরেজি

'(but) the difficulty is' এই বাক্যাংশের প্রয়োগ স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন—

যুক্তির এই, যে, তত্ত্ব অনেক কথিত হইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশী বলিবার যো নাই। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অল্পই। (ভারতী ও বালক ১২৯০ সাল)

'বোধ করি' এই বাক্যাংশ দিয়া আরম্ভ করিয়া অনেক সময় পর পর একাধিক বাক্যের ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন—

বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল। বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাই হইয়া বিশেষ সংসারের সুবন্দোবস্তের দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল। বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিত্য নৈবাহ্যকল্প সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিয়াছিল। [পরশুরাম : অতিথি

ক্রমবাচিকার সহিত 'তবু' বা 'তবে' পদের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটা বিশেষত্ব। যেমন—

অপরাহ্ণের শেষ পর্যন্ত বসিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করি। [কাব্য। স্পষ্ট ও অল্প]।

ভক্তির মধ্যে সেই পদকে ডুবিয়ে দিয়ে তবেই তার রস। [ঐ]।

তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। [শিক্ষার মিলন]।

এই স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার (past participle) স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। '-ইলে' প্রত্যয়ান্তের স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্তের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। সাধু ভাষার ব্যাকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা খুব শুদ্ধ প্রয়োগ নহে। তবে ইহার মূলে কথ্যভাষার রীতি আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। উদাহরণ—

প্রমথনাথকে দূর হইতে দেখিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন "প্রমথি"। [নৌকাডুবি।]।

সে ভাবিয়াছিল, কোনক্রমে সেই চিঠিটা পাঠ করিয়া তাহার এক বৎসরের ক্ষোভ বাড়িয়া যাইবে। [নৌকাডুবি]।

—প্রতিদিন খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া বলিয়াছে—, গোরা)।

সপ্তমীর '-তে' প্রত্যয়ান্ত আকারান্ত ভাববচনের (verbal noun) স্থলে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। ইহারও মূলে কথ্যভাষার রীতি। উদাহরণ—

ঘুমের আলস্য ঘুচে গেলে নিকটের জিনিষগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। [পরশুরাম : চতুরঙ্গ]।

—নৌকা ডুবি হইয়া একটা ভাঙ্গা বালক সাঁতার দিয়া তাহাদের বাসরে আসিয়া উঠিয়াছে। [ঐ : আশা]।

কমলিনী মাতৃস্নেহের চিরন্তন কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাহার হৃদয় শুষ্কতাবায়ুর শুষ্কের ভার অন্তরে অন্তরে বর্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। [ক্রোধের বালি]।

ইটের পাঁজাগুলা মজুরে মজিয়া দিয়া বাড়ী এবং সমস্ত মাঠখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে। [নৌকাডুবি]।

আবদারটির সহিত আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি গলিটার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। [গোরা]।

—আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটা পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা ছন্নছাড়া সুর করিয়া চীৎকার করিতেছে। [চতুরঙ্গ : জ্যেঠামশায়]।

অতীতকালের ক্রিয়ার সহিত অথবা স্বাধীন ভাবে অতীত কালের অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—প্রায়ই বর্ণনায়—রবীন্দ্রনাথই আধুনিক কালে বেশী চালাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যেমন—

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। [পরশুরাম : জীবিত ও মৃত]।

যে সময়কালে কন্যাকর্তার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তঃপুরে লোকসমাগম দেখিয়া বৃহদ্বাহুর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল নয়নে কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, ঘর কই বিধাতা : ঘর কই বিধাতা ! [পরশুরাম : ব্রজেশ্বরের পণ]।

সেই নিত্য ঘটিকার দিন পর যখন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহুয়ের গুরু মূর্ছিত সুবাসিত ভারের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের বাসস্থানগুলার চিরাভ্যাস হইতে একটু আধটু ভাঙা হাসি, ছিন্ন ছিন্ন কথা, ছটা একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়। [ক্রোধের বালি]।

ইটের কারবার দুখানিই অজয়বাবু হইতে বাধিয়াছিল, কোম্পানিতে যাহের-পাঁচ হাজার হইবে, বেলা শেষের দিকে আসিবার পূর্বে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। [নৌকাডুবি]।

অতীতকালের ক্রিয়াপদের সহিত অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগও কিছু কিছু দেখা যায়। ইহাও কথ্যভাষার প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে। যেমন—

অমূল্য একদিন গৃহে বাস করিত। তাহাদের যেমনই বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনরো পড়িবে। (পরশুরাম : বিরাম)।

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে অ-ব্যক্তিবাচক করণপদের ক্রিয়ার সম্প্রমে বা গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

—তখন পূষা সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন—[রাজর্ষি]।

—সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক ডিম্বের মধ্যে আপনাদিগকে নিশ্বাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। [আলোচনা (সাধনা ১৩০১-০২ সাল, পৃ: ৪৮১)]।

—ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন—[গোরা]।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি অনেক ইংরেজি বাক্যপ্রয়োগ রীতি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ঢুকিয়া আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্য রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়া যতটা হইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। ভাষার মধ্যে আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এইরূপ ইংরেজিয়ানা প্রায় অধিকাংশই এখন আর ধরিবার উপায় নাই। এখনও যাহা একটু আধটু বোঝা যায় তাহাও আর কিছুদিন পরে ধরা মুস্কিল হইবে। অতএব এইখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষার ইংরেজিয়ানা সম্বন্ধে কিছু বলিব। অলঙ্কারের মধ্য দিয়া ইংরেজিয়ানার প্রয়োগের বিষয়ে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।

গুণবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে ইংরেজী indefinite articleএর মত অনির্দ্দেশক 'একটি' 'একটা' শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। এই প্রয়োগ ইংরেজী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন ইহা বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় দেখা যায় না। উদাহরণ—

ললাট হইতে একটি পাশু কল্পনা যিরে বিকীর্ণ হইতেছে। [সমস্যাপূরণ]।

—সুহাসই একটা বিষয়ারী দিয়াছে—[ঐ : সুহাস]।

একটি বোবা অকুণ্ঠিত এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—[ঐ : ঐ]।

যেন কেরোসিন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোথা একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ার স্রোত আসিয়া—[ঐ : ঐ]।

মনে যখন একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়—[ঐ : মধ্যবর্ত্তিনী]।

তখায় মনোমধ্যে মনে একটি ভীষণ প্রতীজ্ঞায় স্থির হইয়া ছিল। [ঐ : পুরিচয়াপাশ]।

—নিজে পাঁচালাসনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে বন্ধকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদেশাবলোকন (ঐ : অধ্যাপক)।

—একটি ঘুমন্ত বাড়ীতে—[ঐ : একটা আষাঢ়ে গল্প]।

—একটি ঘুমন্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখে—[যেমন (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল)]।

তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল। [নৌকা-ডুবি]। ইত্যাদি।

বিশেষণ পদকে বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করাও বোধ হয় ইংরেজীর অনুকরণে হইয়াছে। যেমন—

—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখকে কালি করিলে? [চৌরাস্তার মোড়]।

সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে দূরের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিকটের দিকে নির্দ্দেশ করে। [যেমন (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল)]।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা নীরবতা-দ্বারা আকাশে লাগাম মারিয়া দাঁড়াইয়া লম্বিনীর বুক ঘিরিয়া রেল। [চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস]।

Appositional genitive বা সমানাধিকরণ সম্বন্ধ পদের প্রয়োগও ইংরেজীর অনুকরণে করা হইয়াছে। যেমন—

মন্দিরের পথে আমি পলায়ন করি। [রাজর্ষি]।

—হৃদয়ের বরফগিরিটা—[পয়লা নম্বর : মণিহারা

এই মানবজন্মের ধরিণিগুটিকে ভুচ্ছ কারণে কি খেলা খেলা যায়? [পয়লা নম্বর : মালদান]।

—চৌধুরীদের মহাকুলের তলে—[ঐ : প্রায়শ্চিত্ত থেকে]।

নলিনীর সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পূর্ণতর বন্ধ জন্মিয়া উঠিল। [গোরা]।

কলিকাতার এই সম্বন্ধটাই যে কৃত্রিম—[চতুরঙ্গ : শ্রীবিলাস]।

অপরাপর ইংরেজিয়ানার উদাহরণ দিতেছি। এই সকল ইংরেজিয়ানা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাকৃত মনে করিলে ভুল করা হইবে।

মা-মা! কেমন করিয়া পারিত:
[চৌরাস্তার মোড়]।

আঃ, সে কি পরিবর্ত্তন। (=what a change!) [ঐ]।

সে কি আমার ভুল! (=what a comfortable mistake!) [ঐ]।

—তখন তোমার সম্ভাবনাও (=even your possibility) তাহার মনের এক পার্শ্বে চলিত হইত না। [গল্পের কথা (ভারতী ১২৯১ সাল)]।

সহসা বলপূর্ব্বক (=forcibly) সৌন্দর্য্যবাসিকার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। [রাজর্ষি]।

তখন সৌম্যমুখ কিঞ্চিৎ পাশু হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া (=correcting himself) বলিলেন—[অত্যুক্তি : অত্যুক্তির ফল]।

তাহার নিজ পৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে (= to return to the poverty of his own home) কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না। [ঐ : প্রায়শ্চিত্ত]।

—পর্বতের প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর (many coils) মধ্যে ছাগশিশু যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়ন করিতে থাকে সেইরূপ। [ঐ : একটা আষাঢ়ে গল্প]

কিন্তু এরূপ অধিক ঘনিষ্ঠতা এখন তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল (= was improper for him [ঐ : ফিটফাট]।

তাহাকে অত্যন্ত দূরস্থ (= distant) ও পরস্ব বলে হইত। পরগুরু : অধ্যাপক

কি উদ্ধার, কি মুক্তি ! (= what a rescue, what a release !) [ঐ : অধ্যাপক

অন্ধের শয়নঘরে (= in a blindman's bedroom) যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না—[ঐ : দুইবোন]।

সে আমাকে নিরাপদে (= safely) ভালবাসিতে পারে। [চোখের বালি]।

হরেন অন্নদাবাবুর বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও (= to drink and not to drink) প্রায়ই যাইত। [নৌকাডুবি]।

—কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না (= there was or was not) যাহা দেখিয়া—[গল্প-গুচ্ছ : হালদার গোষ্ঠী]।

—যেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে (= in appearing and in not appearing at examinations) ৩৪ সাত বছর কেন কেটে। [শেষের কবিতা]।

—এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস : (even that a badly written novel !) [নৌকাডুবি]।

—অমল গল্প-বাসিটার আশায় চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎপূর্ণিত বোঝাই হইয়া থাকিত (= atmosphere was charged with electricity) [গল্প চারিটি : মালঞ্চ]।

—যে অপরাধের জন্য লিখিয়া থাকার একটু বিশেষ করিয়াই (= especially) মাথা হেঁট করিয়াছে। [শেষা]।

এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত কেন যাওয়াইয়া-যাওয়াইয়া খুন করিয়া ফাঁসিবার ভার যে লইয়াছে তখনও তাঁর সহায় হোন্ ! (= God help him !) [চতুরঙ্গ : বিলাস]।

—সেই ভালবাসার চরিদিকে অমনি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া (= a very healthy atmosphere) বহিত। [গল্প-গুচ্ছ : মৌলভী]। ইত্যাদি।

সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে, বৈচিত্র্যের খাতিরে, পরপর অনেকগুলি বিশেষণের প্রয়োগ পাওয়া যায়। (তুলনীয়—ইংরেজী অলঙ্কার Asyndeton ।) যেমন—

ঠিক যেন একটি কৃষ্ণ উজ্জ্বল দৃঢ় নিষ্ঠুর ছুরি মাজিয়া একটি কর্পিশের শরিষ এবং রাঙ্গ অধরের মাঝখানে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ রেখা টানিয়া দিয়া গেছে। [গল্পগুচ্ছ : মধ্যবর্তিনী]।

—সেই যে উচ্চত উন্নত উজ্জ্বল দৃঢ় আঘাত—[গল্পগুচ্ছ : দুইবোন]।

—সেই লজ্জিত পতিত দীন হীন অনুতপ্ত বালকের—[ঐ : মুক্তি]।

কোন লেখকই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালার সংস্কৃত পদ্ধতির সমাসের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রায় সকল রকমের সমাসেরই উদাহরণ মেলে। তবে তিনি বহুব্রীহি ও কর্মধারয় (বিশেষণে বিশেষণে) এবং তৃতীয়া-তৎপুরুষ এই তিন শ্রেণীর সমাসের প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন। উদাহরণ দিতেছি। চলিতভাষা অবলম্বনে লেখা বলিয়া শেষের দিকের রচনায় সমাসের প্রয়োগ অল্পই।

[বহুব্রীহি]—কলসকক্ষ মাতার ; ঘর্মাক্তাভার সন্তানেকে ; স্বল্পবাস্ত্র লোকের মধ্যে ; একটি হতাশার ভীত হরণ ; পর্বতের প্রকাণ্ড অজগর সর্প ; রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ ; নির্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথ ; সাদর কৌতূহলে ; কুবিতরসনা বিনোদিনী ; মৌরভ্রষ্ট টলস পিতলের ঘড় ; শুষ্কপ্রায় আহবে ; ক্ষীণালোকে আকাশতলে ; বলিরেখাঙ্কিত পুষ্টিত-কলা নারী ; ইত্যাদি।

[কর্মধারয় (বিশেষণে বিশেষণে)]—কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা ; হিংস্রক্রুর কুঞ্চকুঞ্চিত বলয়ের অপরূপপ্রবাহ ; বিরাটভীষণ রমণীয়তা ; স্নিগ্ধমিশ্র দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা ; নিভৃতনিষিক্ত বিশ্রাম ; মৃদু-বৃহৎ অবয়বশোভায় ; স্নিগ্ধিত-লোপন পদ্ধতিতে ; ইত্যাদি।

[তৃতীয়া-তৎপুরুষ]—উৎসবাগতরঞ্জিত গৌর ; কথাহীন ; উৎসাহহীন পুরুতা ; বর্ণকিরণখচিত ; কৌতুকতীব্র কটাক্ষ ; কালিমাবরণ ; ঔদাস্য-নিবিড় বিস্মিতস্বরে ; ইত্যাদি।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সহিত সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ধাঁচের সমাস সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন। যেমন—

পাকা-দিদা-ওলা ; ঠাহরাহীন ; আর-এক-জনকে ; ছাতে-বিছানা ; রৌদ্রে-দেওয়া ; সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মত ; ঘা-খুনি-ভাই ; মা-দেখতে-পাওয়াটাই ; ইত্যাদি।

কর্ম সমাসের উদাহরণ—'শরীরমন', 'হৃদয়মন', 'দেহমন' ; 'মা-খুড়ি ;' 'খ্যাতি প্রতিপত্তি সুখ সম্পদ সৌভাগ্য' ইত্যাদি।

কর্ম সমাসের প্রয়োগে এক স্থলে নূতনত্ব আছে।—

নোংরা-অক্ষর লিখিত খেল। [নৌকাডুবি]।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'এবং' পদের বিচিত্র অর্থে প্রয়োগ

আছে। ইহার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব কিছু পরিমাণ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ—

—কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং (– অথবা) গায়ে পড়িয়া তাহা দ্বারা আপনার দ্বারা করিবে না। [ভাষা। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। (ভারতী ও বালক, ১২৯০ সাল)]।

সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, এবং করিতেছে এবং (– কিন্তু) বুঝিতে পারিতেছে না। [গল্পগুচ্ছ : দৃষ্টা]

অপরাহ্নকে রাইনীতি পরিচ্ছন্ন হইয়া রহে, এবং (– উপরন্তু) অধিকতর দৃঢ়ত – [আলোচনা (সাধনা, ১৩০১-০২ সাল, পৃ: ৪৮৬)]।

—তাহা দর্শকের মত সুস্পষ্ট অনাবৃত এবং (– অতএব) কর্মক্ষেত্রবিহীন নহে। [গল্প চারিটি : কর্মফল]।

বলাবাহুল্য মহাজনের ঋণ আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং (– সেই জন্য) এ চিঠিগুলি হিসাবের লিখন পর্যন্ত পৌঁছে নাই। [জীবনস্মৃতি]।

অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, কোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং (– এমন কি) সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। [ঐ]

সচরাচর যে স্থলে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার না করিয়া স্বতন্ত্র বাক্যের প্রয়োগ হয় এমন স্থলে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় 'এবং' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—

কথামালা তাহাতে যায় শৃগাল এবং দুর্দ্ধের একটি কথাও কৌতূহল-কাতরা খালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানবস্তুটী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া সৌন্দর্য্যের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত। [গল্পগুচ্ছ : মেঘ ও রৌদ্র]।

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত-বায়ুতে কৈবল্য গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ঘুম ঝরিয়া পড়িতেছিল। [ঐ : খালিয়া]।

—যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই মধ্যকূলবর্তী খড়দহবাড়ীর একটি বিজনকক্ষে ছোট বয়সের বাসরশয্যার মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি—[ঐ : মণিহারা]।

সাধুরীতির অনিয়ম আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল : এবং অধিকাংশের ত্রুটি দূরূহ করিয়া চীৎকারে যায়া চাহে—[দৃষ্টা (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল : পৃ: ৭)]।

—মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় অপকালের জন্য কলেজে ঢোকে এবং রৌদ্র-তপ্ত নীলিমার শেষপ্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে। [চোখের বালি]।

ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে বাবার মহাশয়ের ভাগ্যে কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ দেন করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্য-লাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। [জীবনস্মৃতি]।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কালের রচনাতে 'ও' এই সংযোজক অব্যয়েরও এইরকম প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

গ্রামবাসীর মহাকাব্যের কবিরা লক্ষ্মণের লোকের উপরে উঠি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিউনি পুলিস ও কন্সল কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন [ভুবনমোহিনী প্রতিভা]।

অবশেষে আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর, একদিন ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতেছিল, চারিদিকে দখিন হাওয়া ও সেই সময়ে আমি লক্ষ্মীকে দেখিলাম। [বৌঠাকুরাণীর হাট]।

আর সেই যে বাজারওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ গিরিবাম সন্ধ্যাবেলায় ইমারে সৈঠার উপরে বসিয়া ফোলা বাজাইয়া সৌড়ী রাগিণীতে "কেল খেল বিন" গাহিত ও গানের দুই চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ কাহারও মনেও নাই। [সংগীতের প্রলাপ (ভারতী ১২৮১ সাল, পৃ: ১১৮)]।

দুই একস্থলে ইংরেজী কায়দার মত 'এবং' শব্দ দিয়া বাক্যের আরম্ভ করা হইয়াছে। যেমন—

অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিকট অত্যন্ত সংকটে সহজ উপদেশ দিয়া আপনার পথে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক ভাষায় দিয়া ও অনেক বাজুলি ভাষায় আদর করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আচাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। [গল্পগুচ্ছ : ভারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি]।

'দা' ধাতু ঘটিত কথাভাষামূলক প্রয়োগ (idiom) রবীন্দ্র-নাথের গদ্যে প্রচুরভাবে পাওয়া যায়। যেমন—

মিয়া দিয়ম : ঘাতাস দিতেছিল : বাদলের কবিতা অনুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে : তাহার বক্ষদেশের পদপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দিয়াছে : এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিলেই সে চলে এসেছে : পাড়ায় একটা কুকুর কিসনে কেন? কলের মত একটা সন্দেহবাদ দেয় : ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ প্রিয় শব্দ বা বাক্যাংশ আছে। সকল লেখকেরই এই রকম থাকে। 'বিশ্ব' কথাটি সমাসের প্রথম পদ হিসাবে প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন—

বিশ্ব-জগৎ, বিশ্ব-প্রাণ, বিশ্ব-হৃদয়, বিশ্ব-ব্যাপী, বিশ্ব-সংসার, বিশ্ব-পৃথিবী, বিশ্ব-প্রকৃতি, বিশ্ব-বিরহ, বিশ্ব-বিধাতা, বিশ্ব-বিজয়ী, বিশ্ব-সঙ্গীত, বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-পরিধি, বিশ্ব-রচনা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ইত্যাদি।

নিম্নে উদ্ধৃত শব্দগুলির প্রয়োগ কম বেশি প্রচুরভাবে পাওয়া যায়।

[কঠিন] কঠিন কোমল মিটোল পরিপূর্ণতা : বীজন কঠিন বিকাশের হাসি : কঠিন দুঃখ ইত্যাদি।

[অপরিমেয়] অপরিমেয় ক্ষিপ্রতা ব্যক্তি : অপরিমেয় বিস্ময় : অপরিমেয় বিস্ময়জনক অপরিমেয় আঘাত অপরিমেয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইত্যাদি।

[বিরচিত] বিরচিত নবীন বিরচিত অবস্থা প্রকাশপূর্বক বিরচিত বিষয় বক্তব্যের সহিত বিরচিত পারিপাট্য বিরচিত ঘটনার সহিত বিরচিত হেয় : ইত্যাদি।

[ঘুচানো] ঘুচানো আরম্ভ করা : ঘুচানো বিষয়ে ইত্যাদি।

[ধারণা] ধারণা করিলেন ধারণা প্রাণটাকে ফিট করবার বিষয় করবার লোভ পুরুষের পরীক্ষার ধারণা পাস করে বেরো : নূতন, আলোকের ছটার সাহেবের ধারণা মনে হইল ইত্যাদি।

[অমরুণ] অমরুণ গাম্ভীর্য্যে অমরুণ সৌন্দর্য্যে : ইত্যাদি।

[নিলাম] উহার বাড়িলাম : উহার আহার : ইত্যাদি।

[কেবলি] কেবলি অন্তর্হীন আড়ম্বর। বিকীর্ণ অভিনয়ে : তৎপার্শ্বে সম্মুখে দুঃখক্লিষ্টার মত কেবলি ভাসিয়া আসে : অভিমানে জলে জলে কেবলি তাহার দুইচোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল ইত্যাদি।

বহুব্যবহৃত বাক্যাংশের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়—'বোধ করি', অনুমান হয়', 'মনে হয়', 'জ্ঞানে জ্ঞানে'। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি 'মোক্ষা কথা' এই বাক্যাংশটিও একাধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে। (এই বাক্যাংশটি পরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় একটা মুদ্রাদোষের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।) যেমন—

মোক্ষা কথা, আমরা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট্ রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল [গল্পগুচ্ছ : মধ্যবর্তিনী]।

মোক্ষা কথাটা হচ্ছে—[লিপিকা : দুরোগীর সাথ]।

'দ্বারা' শব্দের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। ইহা ইংরেজী 'by' শব্দের প্রয়োগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।—'অসংখ্য মৃত্যুদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা রচস্য প্রাপ্ত', 'নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ' : 'অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন' ; ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার খুব বেশি করা হয় নাই। কিন্তু যে যে স্থানে করা হইয়াছে তাহা সর্বত্রই সুষ্ঠু ও সুপ্রযুক্ত। উদাহরণ—

এই শৈলাবলম্বিনী অতি পুরাতন গ্রামটির : বিরলা তন্ত্রী নদীটি : অবেষণকারিণী বিদ্যুল্লতার ন্যায় : একটি দৃষ্টিহীনা ট্র্যাজিডি : বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী : দৃষ্টিহীনা বনস্থলক্ষ্মী : নির্জনবাসীকুলললনারা আনন্দময়ী কালস্বরূপীর মত : চৌকলসের কারেক্টিগল দর্পিণ : পার্বত্যা নদী : কুণ্ঠিতা লেখনী : কুণ্ঠিতহস্তা কিশোরিনী বাতায়নবর্তিনী এই গল্প-সৃষ্টি : সন্নিবিষ্টচেতা বালিকার হেমলতিনী যখন পলায়নপরা হইয়াছিল। ইত্যাদি।

'বাতায়নবর্তিনী অমৃত শ্রোত্রীগণের' এই স্থলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ অনুসারে শুদ্ধ। তথাপি এইরূপ স্থলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছেন। যেমন—'কলালাপপরায়ণ নাগরী সম্প্রদায়'।

নিম্নের উদাহরণটিতে 'ভালবাসা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে। 'ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যা-বাদিনী মিথ্যাচারিণী—' [গল্পগুচ্ছ : ত্যাগ]।

বাঙ্গালার সাধুভাষায় শব্দরূপে ষষ্ঠীর একবচন এবং প্রথমার বহুবচনের '-এর,' '-এরা' এই প্রত্যয় কেবল ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্যত্র '-র' এবং '-রা'। বর্তমান সময়ে সাহিত্যের ভাষার কথা ভাষার প্রভাবে '-এর', '-এরা' পরিবর্তে ব্যঞ্জনান্ত এবং অকারান্ত শব্দে '-র' '-রা' প্রত্যয় কিছু কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার রচনায় উহা মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। যেমন—

ভক্তের [সবজান্তা] বোনের [অতিথি : রাজটীকা] পুরুষের [আপদ] : মহেন্দ্রর, পঙ্কজর, চৈত্রের [চোখের বালি] : দৈবর, বাসর [বৌঠাকুরানি] : অক্ষয়কুমার সরকার [জীবনস্মৃতি] : ইত্যাদি।

গুণবাচক, ভাববাচক ও অ-বস্তুবাচক শব্দে নির্দেশক প্রত্যয় '-টা', '-টি'র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথই বেশি চালাইয়াছেন। (প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠিক এই রকম ভাবে এবং এই অর্থে '-খানি' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল ; যেমন—"মন্দর চলনখানি আর আধ পায়।" রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রত্যয় ব্যবহার করেন নাই এমন নয়, যেমন 'চাউনি খানি।') আবোর ভাষা হইতেই এই প্রয়োগ গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ—

হাসিটি দৃষ্টিপাত কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে : বিরলিনর পারিপাট্যটা : আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল : দিনের রৌদ্রটি : রাজপুত্র রৌদ্রটি : সকালবেলাকার আলোটি : সূর্যাস্তটি : সেই গুহার অন্ধকারটা : তাকে দেখিতে-না-পাওয়াটাই : চলে' যাওয়াটাকে : তাকে মান করাটা : ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়যুক্ত শব্দের ভক্ত। সেগুলি এই—

[-ইয়া (=সংস্কৃত ইবন্) :] ভাবের জড়িয়া : নিয়তিসম কবিয়ার সহিত : ছোটতর বীনিবারে শেষ প্রাণ হইতে : সাগরের মাঝিয়া হইয়া : ইংরেজ জড়িয়া : কালিয়াবন : রাগ্যার কালির কালিয়ার অধিত : ইত্যাদি ।

[-তর :] এমনতর (এমনতরো) ; কেমনতর : কোনো সম্পূর্ণ নূতনতর (=নূতন রকমের) : অন্যতর : তেমনিতর : যেমনতর : ইত্যাদি ।

[-পনা :] এমনতরো আলালপনা : বুদ্ধিপনা : গিন্নিপনা : ছেলেপনা : ইত্যাদি ।

'-পনা' প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি এখন মেয়েদের ভাষায়ই বেশি ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রযুক্ত অনেক বিশিষ্ট-প্রয়োগ (idiom) মেয়েদের কথা হইতে নেওয়া বলিয়া মনে হয়। যেমন—

(যখন লীলাময়ের খেলা, উমাপতিকে কাবাবদ্ধ করা হইয়াছে,) তখন সে আর হাত পা আছড়াইয়া মরিতে পারে না। [বৌঠাকুরাণীর হাট]।

পুরুষমানুষের হিসাব পরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা কটু ওজন করিতে বসে। [পয়োজন : মণিহারা]।

সর্বাঙ্গে ঢাকার লজ্জা জড়াইয়া আসিয়া—[চোখের বালি]।

চিরকাল মা-পুড়ির আদর পাইয়া ও যদি কোন কাজ বিদেশের হাতে করিতে পারে ! [ঐ]।

রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নূতন শব্দসৃষ্টি প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে—কৌতুক বা সরসতার খাতিরে, অথবা প্রয়োজনের জন্য।

সরসতার (humour) জন্য সৃষ্ট শব্দের উদাহরণ—

—ছোটো মাতঙ্গিণীর (=মাতঙ্গিনীর মেয়ের) চেয়ে ভালো খেলিতে। [পয়োজন : খেলা]।

—এই ক্ষুদ্র আদুকোষটি (=আদুদুলাল বাবুর পুত্র) মাষ্টারকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে। [ঐ : খোকাবাবু]।

রমেশানী (=রমেশের স্ত্রী) [নৌকাডুবি]।

প্রয়োজন বশত সৃষ্ট শব্দের উদাহরণ—

সংস্কৃতায়িত (=Sanskritized) ভাষা : প্রাত্যহিক ছোপ : প্রাত্যহিক দশায় : বন্ধুনী (=বন্ধুর স্ত্রী) : আলাপিত (=আলাপ সহিত আলাপ হইয়াছে এমন নারী) : ইটের কলেবরওয়ালা ক'লকাতা : সিংহিনী (=সিংহের স্ত্রী) : দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা : ইত্যাদি ।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় মধ্যে ব্যাকরণদুষ্ট পদ বা পদের অপ্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তাঁহার ভাষাজ্ঞান অসাধারণ, সংস্কৃতেও যখন অল্প নহে। অল্প দুই একটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ বা পদের অপ্রয়োগ যাহা নজরে পড়িয়াছে তাহা বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সে লেখা ভারতীতে প্রকাশিত "করুণা" উপন্যাসটিতে 'সখ্যতা' এই শব্দটি পাইয়াছি। তার পর "সুভা" গল্পটিতে 'অস্তমান চন্দ্রের মত'—এই বাক্যাংশে 'অস্তমান' কথাটি পাই। 'অস্তমিত (=অস্তম্+ইত)' এই পদবন্ধকে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত একটি পদ মনে করিয়া 'শানচ্' প্রত্যয় করিয়া 'অস্তমান' পদটি গঠিত হইয়াছে। অথবা 'অস্তায়মান' এবং 'উদীয়মান' এই দুইটি কথার জোড় কলমে (contamination) এই শব্দটি কবির মনে উদিত হইয়াছিল। দুই এক স্থলে নিজন্ত ক্রিয়াপদের স্থলে অনিজন্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন—'উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া (=উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া) দেখিল' [অতিথি], 'ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে' [জীবনস্মৃতি]। কথাভাষায় নিজন্ত, অনিজন্ত উভয় স্থলেই সাধারণতঃ 'উল্টে পাল্টে' বলা হইয়া থাকে। তাহা হইতে শুদ্ধ করিতে গিয়া এই রকম হইয়া গিয়াছে। "যোগাযোগ" উপন্যাসের মধ্যে এক স্থলে 'ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ' কথাটি আছে। এই 'ভঙ্গজ' শব্দটি সম্ভবতঃ 'ভঙ্গ' আর 'বঙ্গজ' এই দুইটি শব্দের জোড়কলম (contamination) করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে।

দুই এক স্থলে তৎসম শব্দের তদ্ভব বিশেষণের প্রয়োগ ঠিক সঙ্গত হয় নাই। যেমন—'পাকা আম্র' [মধ্যবর্তিনী] ; 'ক্ষেপা যুবক' [একটি আষাঢ়ে গল্প]।

নিম্ন উদ্ধৃত স্থলে 'পিণাক' শব্দটি 'বিষাণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। —'রুদ্রের প্রলয়পিণাকের মত তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সঙ্গীত নাই।' [ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা]। এখানে যদি 'ধ্বনি' অর্থ লইতে হয় তাহা হইলে 'সুর' শব্দে 'টঙ্কারধ্বনি' বুঝিতে হইবে। 'ষ্টীমারের পিণাক-ধ্বনিও মান্দ করে না' [সরোজিনী প্রয়াণ (ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ১৮৬)]।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পূর্ববঙ্গের কথাভাষার প্রভাব বিশেষ নাই। দুই এক স্থলে যাহা লক্ষ্য হয় তাহা এই। 'করা' বা 'হওয়া' ধাতুর পরিবর্তে স্থানবিশেষে 'পাওয়া' ধাতুর প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের ভাষায় দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পাই—'চেষ্টা পাইও না' [বৌঠাকুরাণীর হাট] ; 'ক্ষোভ পাইল' [চোখের বালি]।

অস্ত্যর্থ ধাতুর নিষেধে পশ্চিমবঙ্গের কথাভাষায় এবং তাহা হইতে সাধুভাষায় একটি বিশিষ্ট ধাতুর প্রয়োগ আছে। বর্তমান কালে তাহার তিন পুরুষের রূপ কথাভাষায়—'নাই ;

নোস্, নও, ন'ন্; নয়, ন'ন্;' আর সাধুভাষায়—'নহি; নহিস্, নহ, নহেন; নহে, নহেন।' পূর্ববঙ্গের ভাষায় এইস্থলে সর্বত্র 'না' এই নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কথাভাষায়ও এই রীতি ঢুকিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ও সাধুভাষার রচনাতে পূর্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী 'না' শব্দের প্রয়োগ অনুসৃত নহে। যেমন—

'আমি তোমার ভাষা না' ('আমি তোমার কাকা নই,') 'আমরা কিছু নিয়ম দিই না।' [মাতৃভাষা]।

'এটা হয় করিব না' [খাপ ছাড়া : ভাইফোঁটা]।

'সেখানে তোমের তোয়া দেখেছি, আমাদের না।' [শিক্ষার বিনিময়]।

'আমি টুলিস্ট না।' 'কলকাতার বক্তা তেমন প্রবল নয়।' [শেষের কবিতা]। ইত্যাদি।

সাধুভাষার রচনার মধ্যে যেখানে কথোপকথনের জন্য অথবা অন্য কারণে কথা ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অল্প স্থলেই কথ্যভাষার (বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে) বিশুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ কথ্যভাষার রূপের সহিত সাধুভাষার রূপ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। অনেক সময় আবার কথ্যভাষার বিভিন্ন উপভাষার পদ মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ—

চারত্রিক লোকের কোনোরূপ সহিতে না পেরে [য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (ভারতী, ১২৮০ সাল, পৃ: ৪২)]।

তাই কি, সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে? [ঐ পত্র এক আধ ঘণ্টা পড়লেই ও চোখ হয়। [চোখের বালি]।

দিদি, আর তখন কথা বলিসনে ভাই! আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। [শুভদৃষ্টি : বালিকা]।

'তখন আমায় প্রণাম করবেন, আমি চলেম।' 'আজ্ঞে, এখানে এসে প্রণাম করেলুম।' [ঐ : মুক্তির উপায়]।

বিশ্বস্ত, ইলসাহ ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি। [ঐ : আপদ]।

একই রচনার মধ্যে কোন পাত্রপাত্রীর কোনো উক্তি সাধুভাষায় এবং কোনো উক্তি কথ্যভাষায় দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পগুলির একটি বিশিষ্ট রীতি। সাধুভাষায় লিখিত উক্তিগুলি যেন অনেকটা ইংরেজী reported speechএর মত। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বড়ো-বাড়ি যাবে?" মহৎ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্ছি!"

প্রশ্নটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—"সহজকে যাচিতাম কিন্তু কি করিব হাত যাবা।" [পয়লা নম্বর : বালুনিওয়ালা]।

এইবার রবীন্দ্রনাথের বানান-পদ্ধতির (orthography) সম্বন্ধে কিছু বলিব। 'একমাত্র'-বাচক (emphatic) অব্যয়াংশ (particle) 'ই' এবং 'অপিচ'-বাচক (inclusive) অব্যয়াংশ 'ও' যে শব্দের সহিত যুক্ত হয় সেই শব্দের পিছনে প্রত্যয়ের মত যুক্ত হয়, তবে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র থাকে। রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের রচনার মধ্যে এই অব্যয়াংশ দুইটি - বিশেষ করিয়া 'ই'—পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত সন্ধীকৃত হইয়াছে দেখা যায়। যেমন—'সকলি', 'কেবলি', 'তাহাদেরি', 'পূর্ণিমারি', 'আমারো', 'আরো', ইত্যাদি। তেমনি 'আর এক' স্থলে 'আরেক', 'এক এক' স্থলে 'একেক' এই সন্ধিরূপই দেখা যায়।

র-কারকে রেফ করা "য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা যায়। যেমন -'কর্ত্তার ভূতে।' তাহার পর পাওয়া যায় "পথে-বাইরে" এবং আর দুই একটি লেখায়। কথ্যভাষার ক্রিয়াপদে প্রত্যয়ের 'ছ' স্থানে 'চ' প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে কোথাও এক-তরতা (consistency) নাই। যেমন—'দেখেচি', 'জনেছি' [গোরা]; 'পেয়েচি', 'করেছি' [পথে বাইরে]; 'উঠেচে,' 'রেখেচে' [পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি]; 'পড়েচে,' 'দিয়েছে' [দুই বোন]।

য়েশী, বিদেশী এবং তদ্ভব অনেক শব্দের উষ্ম (sibilant) ধ্বনির বানানে রবীন্দ্রনাথ নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। তিন উষ্মধ্বনির মধ্যে ষ-কারেরই প্রাধান্য। তাহার পর শ-কারের যেমন—আকড়িয়া; কুয়াষা, কুয়াশা; বকশিষ, বখশিশ; খাষ, খাস; চসমা, চশমা; শিউগাছ, সিমুগাছ, শীষা (=সীসক); শিকি পয়সা; শাসা, সাসা; সহর, সহর; মুখোষ, মুখোস; খোলষ, খোলস; আপষ; নালিষ; একজিবিশন; আপিষ; ইষা খাঁ; বালিষ; ইত্যাদি।

খণ্ড ত [ৎ]-এর এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আকর্ষণ আছে। যেমন—কাৎ, মাৎ, জিৎ, পাৎলা, ধাৎলান, মেরামৎ, মজবুৎ, কাৎলি, সাঁৎরে, মৌতাৎ, মানৎ, আড়ৎদার, ফুরসৎ, ইত্যাদি।

উ-কার এবং অ-কারের স্থলে অনেক সময় ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—মারধোর (=মারধর), মুখোমুখি, ঘাড়মোড়, ওল্টাইতে, ইত্যাদি।

মিউনিক্ ও প্যারিস

—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

দীর্ঘ তিনটি বৎসর মিউনিকে কাটিয়াছে; প্যারিসেও এক বৎসরের উপর কাটিয়া গেল। এখন ইউরোপ হইতে বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। বিদেশে এই দুই শিক্ষানিকেতনের উপর এতটা যে আমার মায়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা আজই কেবল বুঝিতে পারিতেছি, পূর্ব্বে কোন দিন অনুভব করি নাই। আজ তাই মিউনিক্ ও প্যারিস স্মরণ করিয়া কয়েকটি কথা বলিতে চাই। কোন সুচিন্তিত মিথ্যা কথার অবতারণা না করিয়া, কেবল যাহা আপনা হইতেই মনে আসিতেছে তাহাই বলিয়া যাইব—তাহাও গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব না। বিভিন্ন শিক্ষাবিধির ও আমার নিজের পড়াশুনার কাজের কথাও ইহাতে তুলিব না, কারণ তাহা হইলে অন্য কথা বলা হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এই দুই নগরীতে কিরূপে আমার জীবন কাটিয়াছে, কিরূপে এই দুই নগরীর সাধারণ জীবনপ্রবাহ আমার জীবনের গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহাই কেবল দুই এক কথায় দেখাইতে চাই।

প্রথম মনে পড়িতেছে—সেই নিদারুণ সমুদ্রযাত্রার কথা। আমি ছিলাম ডেকের যাত্রী—সেজন্য দৈহিক ক্লেশ অপেক্ষা মানসিক লজ্জাই ছিল আমার বেশী। নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম এজন্য লজ্জা করা উচিত নয়, কিন্তু তাহাতে পুনরায় এই অপরাধজনিত লজ্জায় আমার লজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত মাত্র। ডেকের যাত্রীর সহিত কেহ আসিয়া আলাপ করিবে তাহা ভাবি নাই, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিলাম জাহাজের সহযাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গালী ছেলেরা আমারই ডেকে আসিয়া বেশ আসর জমাইয়া তুলিল। অবসরকালে গ্রীক্ ব্যাকরণ পড়িয়া সময় একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লোহিত-সাগরে একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জাহাজের দোল খাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া আছি, ইত্যবসরে আমারই ডেকের কোন বুদ্ধিমান সহযাত্রী আমার পথের সম্বল যাহা কিছু ছিল সব চুরি করিয়া লইল। যতদূর মনে পড়ে টাকা চুরি যাওয়ায় একটুও কাতর হই নাই, বরং একটু ছুট হইয়াই উঠিয়াছিলাম। ভাবিলাম, আমার বিদেশগমনের adventure বোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে টাকা চুরি গিয়াছে তাহাতেও কত দিনই বা চলিত!

মিউনিকে পৌঁছিয়া অল্প কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পর অন্ন-সংস্থানের একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল; তারপর ইউনিভার-সিটিতে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। কিন্তু তখনকার দিনে এই মিউনিক্ কি বিশ্রীই লাগিয়াছিল, যেখান হইতে দু' দিনের জন্য বাহিরে যাইলে পরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত! অক্টোবর মাস। অবিরাম হুহু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে,

সপ্তাহের পর সপ্তাহ সূর্য্যের মুখ দেখিবার উপায় নাই, পথে বাহির হওয়া মাত্র এক পশলা বৃষ্টি আসিয়া কাপড়চোপড় সব ভিজাইয়া দিয়া যায়, ইহারই মধ্যে গাছের পাতা যার আনা রকম করিয়া পড়িয়াছে, আর মিউনিকের লোকেদের চোগাড়ের মত চেহারা—চোখ মেলিয়া যেদিকেই চাই মন আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ভাবিতে লাগিলাম এদেশে মানুষ বাঁচে কি করিয়া? সকাল আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ইউনিভারসিটির লেকিনারেই কাটাইতাম, পথে বাহির হইতেও ইচ্ছা হইত না।

ক্রমে হেমন্তকাল শেষ হইয়া শীত আসিয়া পড়িল। একদিন প্রাতে চোখ মেলিয়াই দেখি যতদূর দেখা যায় বাড়ী-

গুলির ছায় সব শাদা। বুঝিলাম বরফ পড়িতেছে। সেদিন আর সেমিনারে যাওয়া হইল না; তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম—বরফের কণা গায়ে মুখে পড়িয়া আমার এতদিনের সঞ্চিত মনের উত্তাপ দিন্ন করিয়া দিল। কোন্ দিকে যাইব তাহা স্থির করিয়া বাহির হই নাই। কিন্তু আপনা হইতেই নগরীর উদ্যান Englischer Gartenএর কথা মনে পড়িয়া গেল। এতদিন এ উদ্যানের কথা অনেক শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এক দিনও সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে নাই, আজ আপনা হইতেই

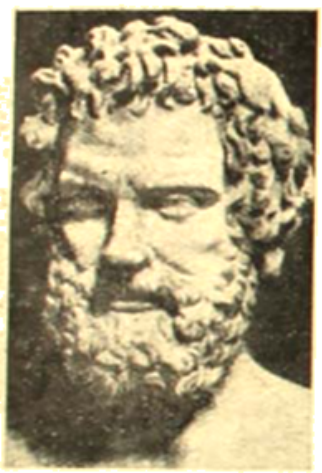

সুকেরিস [৪৭০-৪০০ খৃঃ পূঃ]

সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে লোকজন কম, কারণ ক্রমশঃই আরও জোর বরফ পড়িতেছে। প্রতি পদক্ষেপে তুষারস্তূপ বিধ্বস্ত করিয়া পথ চলিতেছি—মন আমার পুলক-চঞ্চল। উদ্যানের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তাহার তুষার-মণ্ডিত দিব্য রূপের জ্যোতিতে আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। সর্বত্র শুভ্র তুষার, কোথাও এখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নাই। উন্নত নগ্ন বৃক্ষরাজি তুষারাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ভাস্কর মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তাহাদেরই মধ্য দিয়া ক্ষীণ-কায়া স্রোতস্বিনীটি অতি সন্তর্পণে আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদু কলধ্বনি করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। মহান্ সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সেই দিনই মিউনিকের সহিত আমার পরিচয়—সেই দিনই তাহাকে ভালবাসিতে শিখিলাম।

তারপর প্রতি বৎসর কতদিন শীতের রাতে নগরীর এই যোজনব্যাপী দীর্ঘ উদ্যান এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছি। নীচে তুষারভূমির উপরে আলো-ছায়ার অপূর্ব বস্ত্রপুরী রচনা করিয়াছে, আর উপরে চন্দ্রমা মূর্তিমান্ প্রশ্নের মত উজ্জ্বল—।

আর Isar! Spree, Themes, Soine তো দেখিলাম, কিন্তু Isarএর তুলনায় কোথায় তাহারা! Isarএর দুই পাশ দিয়া সেই দীর্ঘ দুই তরুবীথিকা! তেমন আর পৃথিবীতে কোথাও আছে কি? তাহার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে কতবার মনে হইয়াছে, অনন্ত এই পথ। যুগ যুগ পূর্বে, কোন্ সুদূর অতীত কল্পান্তরে, আমি যেন ঠিক এমনি করিয়াই Isarএর এই তরুবীথিকা দিয়া ভ্রমণ করিয়া গিয়াছি। সেদিনও ঠিক এইরূপেই জলের কলধ্বনি শুনিয়াছিলাম, সেদিনও আকাশে মূর্চ্ছিত অর্দ্ধচন্দ্র এইরূপেই ম্লান জ্যোৎস্না বিকীরণ করিয়াছিল। আবার কালের বিবর্তে সমস্ত নাম ও রূপের সংজ্ঞা নিঃশেষিত হইয়া গেলে পুনরায় কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে Isarএর এই তরুবীথিকায় ফিরিয়া আসিব: সেদিনও আবার শুনিব এই মধুর কলধ্বনি, সেদিনও আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র ম্লান জ্যোৎস্না বিকীরণ করিবে।

শহরের প্রান্তে আরম্ভ হইল Isartal, মাঝে মাঝে এক দিনে ত্রিশ মাইল এই Isarএর ধার দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছি। Isar কোথাও ক্ষীণকায় কোথাও বিস্তারিত, কিন্তু সর্বত্রই অনুপম সৌন্দর্যে টলমল,—প্রতি বাঁকে তাহার অভিনব রূপ, নূতন সুষমা। জাপানী চিত্রকরেরা যেরূপ যুগের পর যুগ কেবল ফুজিয়ামার চিত্র আঁকিয়া আসিতেছে, মিউনিকের চিত্র-করেরাও সেইরূপ বহু শতাব্দী ধরিয়া Isartalএর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন চিত্র আঁকিয়াছে, তবু তাহাদের তৃপ্তি নাই। এখনও Isartalএ সর্বত্র দেখা যায় বহু শিল্পী পটবিস্তার করিয়া চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত।

মিউনিকের লোকে একটা গান প্রায়ই করিয়া থাকে, তাহার মর্ম এই যে যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠিবে, ঘাসের রং সবুজ থাকিবে, Isar বহিবে ও Hofbraeuhaus খোলা থাকিবে ততদিন মিউনিকের লোকের দুর্তির অভাব হইবে না। Hof-braeuhaus মিউনিকের প্রধান বিয়ারখানা। এখানে মাত্র একবার গিয়াছিলাম, তাও বলা হয় নাই, কারণ আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই সহপাঠী এক জেসুইট সন্ন্যাসী,—তাঁর পক্ষে বিয়ার ছোঁয়া পাপ। এই জেসুইট ফাদারটি আমার মিউ-

নিকের প্রথম বন্ধু। এই সময়ে তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন প্রায়ই মনে হয় তিনি একটি বিরাট ট্র্যাজেডি। এরূপ তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোক আর কখনও চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে নাই; তাই বিশ্বাসও করিতে পারি না যে তিনি কোনদিন ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন বা পারিবেন। অবশ্য কোনদিন তাঁহাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনি বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন কিনা যে একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট রচনাবলীর মধ্যেই জগতের সকল সমস্যার পূর্ণ সমাধান পাওয়া যাইবে? কিন্তু এই বিষয় লইয়া আমাদের যে কত তর্ক হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি প্রায় বলিতেন, জীবন সহজ করিলেই প্রশ্ন সহজ হইয়া আসিবে, তখন 'বাণী'র মধ্যেই সকলে সন্তোষজনক সমাধান খুঁজিয়া পাইবে। কিন্তু মূলেই আমার সহিত বিরোধ বাধিত, কারণ জীবনকে কোন দিক দিয়া সহজ করা বা খর্ব্ব করার আমি চিরদিন বিরোধী। আমি বলিতাম তাঁহার এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ অতি পবিত্র ও সুন্দর। ইহাতে তিনি ব্যথিত হইয়া একবার উত্তর দিয়াছিলেন, এরূপ কথায় ভগবানের অপমান করা হয়; ভক্তি শুধু সুন্দর নয়, ভক্তি সত্য। আমি ত্রস্ত হইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, আমার কাছে যাহা সুন্দর তাহা আমার সকল সত্য বা মিথ্যার উপরে। কিন্তু আমার এ মতে তিনি কোন দিন সায় দেন নাই। আমি কখনো বলিতাম, তাঁর এই ভক্তি বড় সুখের ও আরামের (যদিও বুঝিতাম তাঁহার মনে সুখ বা আরাম কিছুই নাই।) কারণ পদে পদে যদি নিজের কাছে জবাবদিহি করিয়া চলিতে না হয় তবে তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? লোকে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহশীল কিন্তু জানে না স্বাধীনতার কি দায়। আমি প্রাণ মন দিয়া অধীন হইতে চাই, পারি না বলিয়াই তো যত দুঃখ। কারণ শুধু সেই সুখ ও আরামের লোভে নত হই কিরূপে? তার চেয়ে আমার যাহা আছে তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিব, যেটুকু দেখিতে পাই তাহাই প্রাণ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, তাহারই উপর যত স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, ভালবাসা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিব। হয়তো ধরণীর হাতের বয়ই থাকিয়া যাইব চিরদিন, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, আমার জগতে আমিই হইব ধরণী। আমার এতেও আমার ফেসুইট বন্ধু কোন দিন স্পষ্ট সায় দেন নাই, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতাম আমার প্রশ্ন তাঁহার মনেও জাগিয়া আছে।

গ্রীক্ ও ল্যাটিন সাহিত্যে আমার এই বন্ধুটির অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি অনর্গল ল্যাটিনে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি মূলে প্রকাণ্ড একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন: তিনি মনে করিতেন সমস্যার চেয়েও তাহার সমাধানের মূল্য বেশী, এমন কি সমাধানের অনুরোধে প্রশ্নকেও তিনি খর্ব্ব করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই বলিতেছিলাম তিনি একটি বিরাট ট্র্যাজেডি।

আমার দ্বিতীয় বন্ধু আমার সহপাঠিনী, যে প্রকৃত পক্ষে মিউনিকে আমার একমাত্র সহপাঠী ছিল, কারণ নিছক ভাষা-তত্ত্বে সে সময় আমরা দুজন ছাড়া আর কোন ছাত্র ছিল না। প্রত্যেক বিভিন্ন বিভাগেই অনেক ছাত্র ছিল, কিন্তু সব বিভাগে কেবল আমরাই উপস্থিত থাকিতাম। আমার এই সহপাঠিনী ছিল ইউনিভারসিটির মধ্যে ডাকসাইটে সুন্দরী; তাহার উপর সে খুব ভাল মাচিতে ও বেহালা বাজাইতে পারিত। কাজেই গান-বাজনার সকল আড্ডায় তা'র কদর ছিল খুব বেশী, এবং স্তাবকবৃন্দেরও তাহার কোন অভাব ছিল না। হাস্তরসের সে ছিল অফুরন্ত ফোয়ারা। এরূপ মেয়ে পড়াশুনাতেও যে ভাল হইতে পারে তাহা কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু আমার বাল্যনীতি পড়াশুনায় শুধু ভাল নয় অসাধারণ ছিল। এই বয়সেই সে হেথিতীয় ভাষার এক authority বলিয়া পরিগণিত; অধ্যাপক Sommer তাহাকে তাঁহার Hauptbelbiterin (অর্থাৎ প্রধান হেথিতীয় বধূ) বলিয়া ডাকিতেন। এত গুণ

সত্ত্বেও সে কিন্তু সব বিষয়ে শিশুরই মত উদ্দাম, চঞ্চল, নির্বোধ ও ধর্ষিত ছিল। একদিন বলিল, শরীর ভাল না থাকায় পূর্ণদিন সে সারাদিন ধরিয়া ঘুমাইয়াছে। সন্ধ্যায় শরীর ভাল ঠেকাতে নাচিতে যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু টেলিফোন করিয়া কাহাকেও না পাওয়াতে সে হেথিটীয় ভাষার thesaurus রচনায় লাগিয়া গেল, এবং তাহাতে তাহার গেল যে সারারাত আর সে ঘুমায়

শিলায় [...] ৫ টিকটন অঙ্কিত চিত্র হইতে।

নাই। মাসখানেক পরে আবার একদিন বলিল, পূর্ণদিন সারারাত সে কাঁদিয়াছে, কেন হেথিটীয়গণ এতগুলি শিলা-লিপি রাখিয়া গিয়াছে, নহিলে তো তাহাকে thesaurus রচনায় এত কষ্ট পাইতে হইত না। আমার এই প্রথম দুই বন্ধু ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত দুই চরিত্র। জেসুইট কাদারটি সর্ব্বদাই সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান, কিন্তু মেয়েটি এরূপ কোন চিন্তা মাথায় আসিতে দেওয়াকেই নিছক বোকামি বলিয়া মনে করিত। সে চায় জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া লুটিয়া লইতে, তদুপযুক্ত সাহস ও শক্তিও তাহার আছে। তবে আর কেন? কিরূপে? এইরূপ সব অবান্তর প্রশ্নে তাহার কি প্রয়োজন?

তাহার পর মিউনিকে কত লোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে, কত জনের সহিত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহার মধ্যে লক্ষাই করি নাই কোন দিন আমার সেই প্রথম বন্ধুত্বের সহিত সকল যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মিউনিকের লোকদের তখন আর চোয়াড় লাগিত না।

প্রথম শীত কাটিতে না কাটিতেই শুনিতে পাইলাম মিউনিকের চারিপার্শ্বস্থ হ্রদ ও পাহাড়শ্রেণী না দেখিলে মিউনিকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝিলাম এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। পাহাড় ও হ্রদের বৈচিত্র্য ও সমন্বয় দেখিবার জন্য লোকে কেবল সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ছোটে; কিন্তু তাহা কেবল বিজ্ঞাপনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া। বহুবার সুইট্‌সারল্যাণ্ড গিয়াছি, তাহার প্রায় প্রত্যেক অংশ দেখিয়া লইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু কোথায় দক্ষিণ বাভেরিয়া আর কোথায় সে দেশ! তুলনাই করা যায় না। দীর্ঘ শীতঋতুর পর প্রকৃতি আবার প্রাণের সাড়া দিতেই সারা দক্ষিণ বাভেরিয়া একদিনে আনন্দউজ্জ্বল হইয়া উঠে। সপ্তাহকালের মধ্যে নগ্নবৃক্ষরাজি নবীন পত্র ধারণ করে। শহরের বাহিরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ উচ্চাবচ গতিতে চলিয়া গিয়াছে, শেষ হইয়াছে কোথাও দূর কান্তারের কোলে, কোথাও হ্রদের কিনারায়, কোথাও পাহাড়ের গায়ে। যতদূর চক্ষু যায় শুধু ফুল আর ফুল,—হাজার রংএর ঘাসের ফুল, রংএ রংএ চারিদিক অগ্নিময়। ধরণীর এত রূপ!—দেখিয়া আমার শরীর অবশ হইয়া আসিত। বসন্তের কত রৌদ্রস্নাত দিনে এই ফুলের মেলার ভিতর দিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়াছি। মোড় ফিরিতেই কতবার অতর্কিতে চোখে পড়িয়াছে কণ্টকমুকুট-ভূষিত "ইহুদিদের রাজা যেসুস্ নাজারেথে"র উর্দ্ধনেত্র তপঃক্লিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি। চলার গতি আপনা হইতেই মন্থর হইয়া আসিয়াছে, পথ ছাড়িয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি।

শ্যাম শষ্পাচ্ছাদিত অনুচ্চ পাহাড়ে ঘেরা এক একটি হ্রদ এক একটি ছবির মত। মিউনিকের চারিপাশে ছোট বড় এইরূপ অনেকগুলি, সবচেয়ে বড় Starnberg হ্রদ। মনে পড়িতেছে একবার জেদ করিয়া এই হ্রদটি সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলাম। তখন আগষ্ট মাস। ঠাণ্ডা জলে দুই মাইলের উপর সাঁতার দিয়া গিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম।

পাহাড়ের সংখ্যা হ্রদের চেয়েও অনেক বেশী—নানা উচ্চতার, ১০০০ মিটার হইতে ৩০০০ মিটার পর্য্যন্ত। ছুটি পাইলেই শীতকালে তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ে অভিযান করিতাম, আর অন্য সময় সাধারণতঃ যাইতাম হ্রদে। একটি হ্রদ হইতে আর একটি হ্রদ কতবার হাঁটিয়া গিয়াছি, মাঝে কখনও সমতল ভূমি কখনও বা পাহাড়। এইরূপে পাহাড়ে বা হ্রদে বেড়াইতে গিয়া কোন দিন নিরাশ হই নাই, যদিও অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আসিয়া মাঝে মাঝে যথেষ্ট নাকাল করিয়াছে। যাহাদের সঙ্গে গিয়াছি প্রতিবারেই তাহাদের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথায় তর্ক চাপিলে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা সব বিস্মৃত হইয়াছি। মনে পড়িতেছে একবার আমার এক আইনজীবী বন্ধুর সহিত পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ভোর চারিটায় বাহির হইয়া রাত্রি দশটায় ফিরিয়া আসিলাম এবং এই সমস্ত সময়টা জগতের প্রায় সকল বিষয় লইয়াই আমাদের এমন তুমুল তর্ক চলিয়াছিল যে কখন পাহাড়ে উঠিয়া আবার নামিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাই খেয়াল করি নাই। আমার এই বন্ধু ছিল একাধারে কবি, দার্শনিক ও আইনজ্ঞ। তাহার কৃত দান্তের জার্মান অনুবাদ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি,—দুঃখের বিষয় এ অনুবাদ সে শেষ করিবে কিনা এবং করিলেও ছাপাইবে কিনা জানি না। আমরা দু' জনেই ছিলাম Schopenhauerএর উৎকট ভক্ত; যতদূর মনে পড়ে Schopenhauerকে লইয়া কোন দিন আমাদের মতদ্বৈধ ঘটে নাই। কিন্তু আর প্রায় সকল বিষয়েই আমাদের অসম্ভব মতদ্বৈধ ঘটিত। আধুনিক জার্মান লেখকদের মধ্যে আমি Jakob Wassermannকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কিন্তু সেই কারণেই বোধ হয় আমার বন্ধুর এই লেখকটির উপর ভীষণ রোষ জন্মিয়া গিয়াছিল। আমার Fontaneএর সমসাময়িক উপন্যাস Effi Briest তাহার ভাল লাগিত বলিয়া আমার সে কথায় সায় দিতে বড়ই বাধিত। Sophoklesএর Aias আমার বড়ই প্রিয় (Aiasএর মৃত্যু পর্য্যন্ত, তাহার পরের অংশ Sophokles-

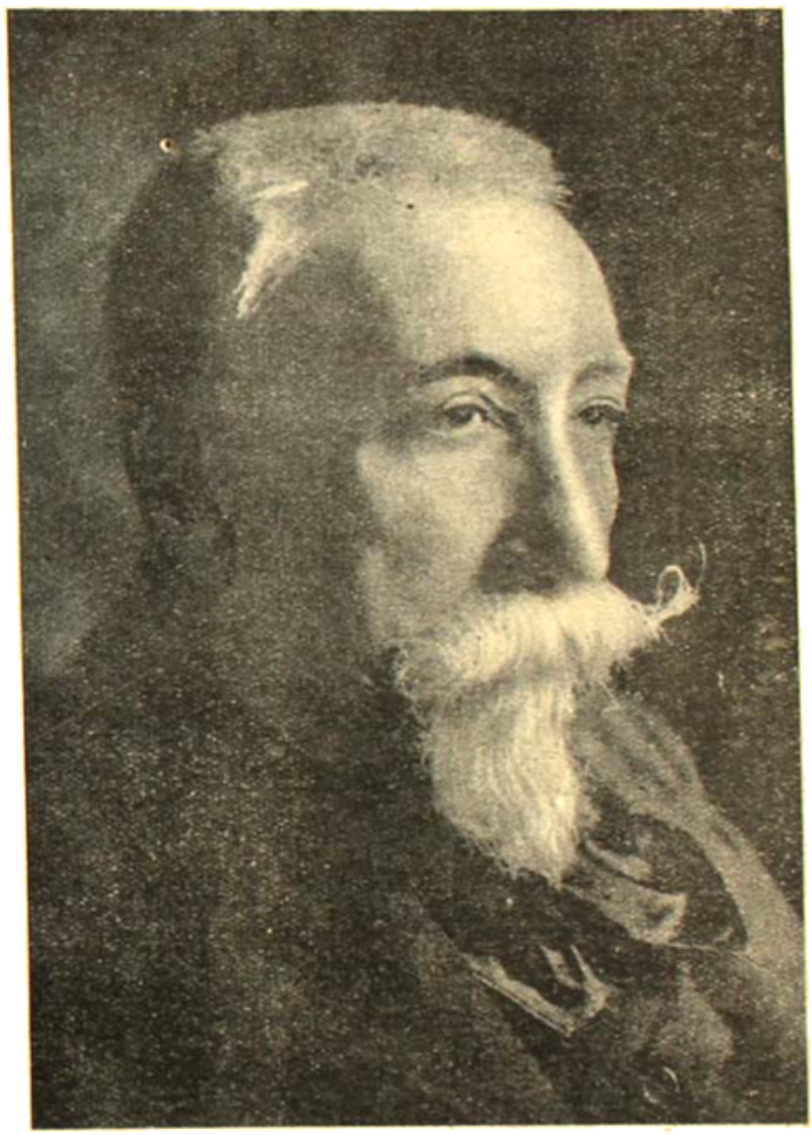

এর রচনা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না); কিন্তু গ্রীক্ সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলেই বন্ধুবর প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত যে Euripidesকে বুঝিতে পারে না বলিয়াই লোকে Sophoklesকে এত উচ্চস্থান দিয়া থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ বেচারী Schillerকে আমার হাতে বড়ই

নির্দ্ধারিত হইতে হইয়াছে, কারণ আমার বন্ধু ছিল Schiller-এর বড় ভক্ত। এই Schillerকে লইয়াই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তর্ক হইয়াছে। পরিচিত মহলে সকলে শেষে সতর্ক হইয়া থাকিত, কেহ যেন আমাদের সমক্ষে Schiller-এর নামোল্লেখ না করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমার এই বন্ধুটি ছিল আইনজীবী, আমার সহপাঠী না। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার এক সহপাঠীর কথা মনে পড়িতেছে, যাহার পাশে বসিয়া তিন বৎসর প্রায় প্রত্যহ পড়াশুনা করিয়াছি, কত বিষয়ে দুই জনে একযোগে কাজ করিয়াছি, তথাপি কোন দিন একটুও বন্ধুত্ব জন্মে নাই। তাহারই নিকট গ্রীক সাহিত্যে আমার হাতে-খড়ি; আরম্ভ করি Xenophon হইতে, তাহার পর গ্রীক-সাহিত্য আমার নেশায় মত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার সহপাঠীটির চৈনিক, তিব্বতীয়, সংস্কৃত ও রুষ ভাষায় দখল ছিল এবং গ্রীক ও লাটিনে তাহার জ্ঞান ছিল খুব পাকা। এতগুলি প্রধান প্রধান ভাষায় অধিকার থাকা সত্ত্বেও বাবাতত্ত্বের মূল কথাগুলিও সে কোন দিন আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এবং সেদিক দিয়া চিন্তা করিতেও শিখে নাই। সে অনুস্বের মত খাটিতে পারিত, কিন্তু বিন্দুমাত্র কল্পনাশক্তি কোন দিন তাহাতে দেখি নাই। আমার এক বৎসর পূর্ব্বেই সে Doctorate পাইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ইউনিভারসিটির কি শিক্ষকমহলে কি ছাত্রমহলে সে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। শেষ বৎসর তাহার নিকট বড়ই সঙ্কুচিত

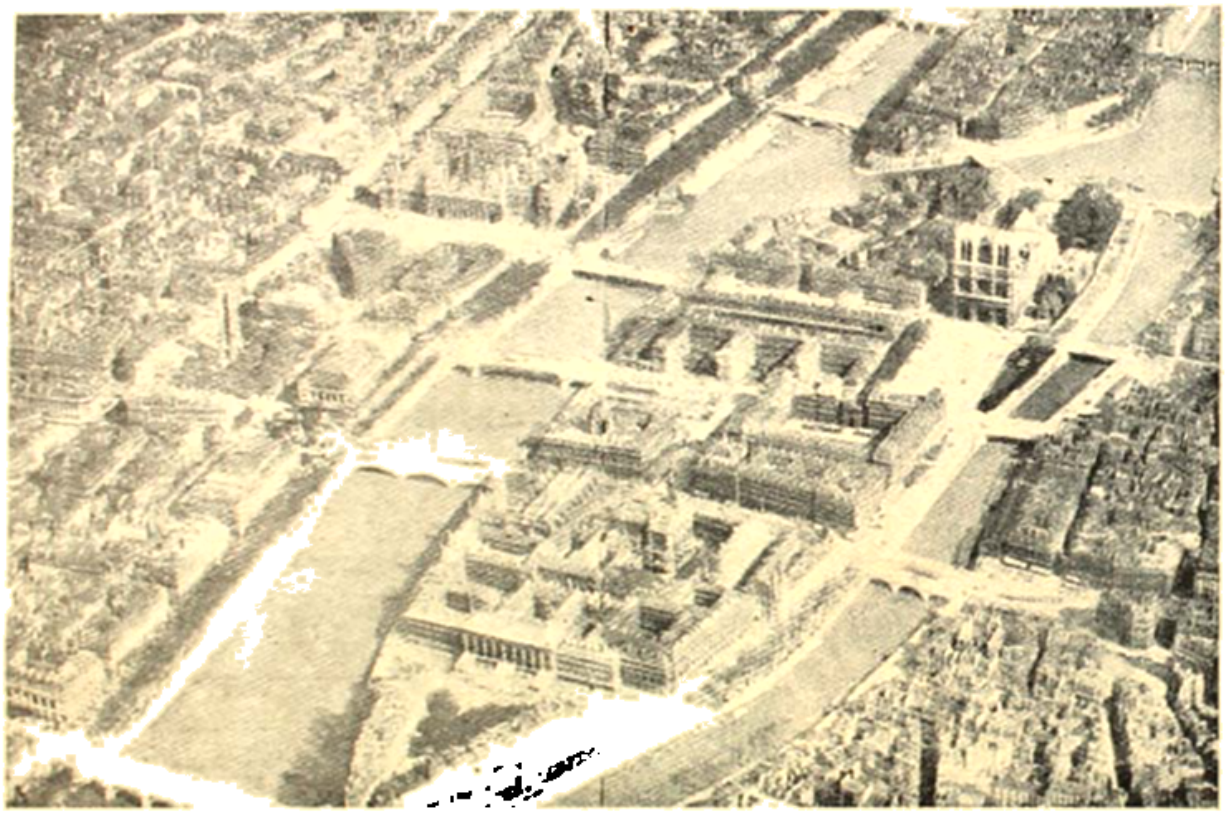

সহপাঠীর কথা মনে পড়িতেছে, যাহার পাশে বসিয়া তিন বৎসর প্রায় প্রত্যহ পড়াশুনা করিয়াছি, কত বিষয়ে দুই জনে একযোগে কাজ করিয়াছি, তথাপি কোন দিন একটুও বন্ধুত্ব জন্মে নাই। তাহারই নিকট গ্রীক সাহিত্যে আমার হাতে-খড়ি; আরম্ভ করি Xenophon হইতে, তাহার পর গ্রীক-সাহিত্য আমার নেশায় মত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার সহপাঠীটির চৈনিক, তিব্বতীয়, সংস্কৃত ও রুষ ভাষায় দখল ছিল এবং গ্রীক ও লাটিনে তাহার জ্ঞান ছিল খুব পাকা। এতগুলি প্রধান প্রধান ভাষায় অধিকার থাকা সত্ত্বেও বোধ করিতাম। মনে হইত সে সরল বলিয়া সৎ চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন করিতে পারে নাই আমি ধূর্ত্ততার সাহায্যে কৌশলে সে কাজ হাসিল করিয়াছি। আমার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, তাহার পক্ষে সৎ ও সরল হওয়া যত সহজ আমার পক্ষে তত সহজ নহে।

মিউনিকের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল। শেষ পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক Sommer আশীর্ব্বাদ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহাতে লিখিয়াছেন, তিনি যে কেবল আমার কাজে সন্তুষ্ট তাহাই নহে, তিনি

আমাকে ভাষাতত্ত্ব অথবা আরব সংস্কৃতি উপযুক্ত বলিয়া করেন। আনন্দ পাইয়াছিলাম Nommer-এর মত কড়া লোকের নিকট পাওয়ায় তার চেয়েও বেশী আনন্দ হইল। পড়িতেছে উহারা মনে করিলেন এই কথা বলিতে এমন সময় পথে হঠাৎ মনে হইল, সকলেই আমাকে অত্যন্ত উদারভাবে বলিয়া জানে; আমার এই উদারতাই ব্যক্ত হইয়াছে তাহারা মুখে আনন্দ দেখাইলেও অন্তরে পূর্ণ হইবে কি? মনের আনন্দ মুহূর্তে মিলিয়া আসিল, মনে হইল পরাজয় হইলেই ছিল ভাল। অধ্যাপকের সে চিঠির কথা কাহাকেও বলা হয় নাই।

সেই বৎসর আমি মিউনিকের আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতির সভাপতি হইয়াছিলাম। কি করিয়া হইলাম তাহা ভাবিতে এখনও বিস্ময় লাগে, কারণ মিশুক বা মজলিসি লোক আমি মোটেই নই। সকলেই সমিতির সভ্য হয় এই হিসাবে আমিও সভ্য হইয়াছিলাম। বিশেষত্বের মধ্যে আমি সমিতির কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনিয়াই যে অধিকাংশ সভ্য মুগ্ধ হইয়া আমায় ভোট দিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাই হউক সভাপতি হওয়ার পর আমায় একাধিকবার কৌতুকোদ্দীপক অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আমি নিজে কোন দিন নাচিতে শিখি নাই, অথচ আমাদের সমিতির ভদ্র সভাপতিরূপে আমাকেই অনেক বিরাট 'বল'-এর বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। সমিতির প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজা উজির অনেকের সহিত আমার আলাপ আপ্যায়ন করিতে হইত। একবার মনে আছে ব্যাভেরিয়ার শিক্ষাসচিব, ইউনিভার্সিটির রেক্টর ও ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির সহিত এক টেবিলে বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছিলাম। শিক্ষাসচিবের সহিত পূর্বের কয়েকটি অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আলাপ হইয়াছিল। কথা হইতেছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, শিক্ষাসচিব বলিতেছিলেন, ভারত-বাসিরা অহিংস, মিরামিদাশ, গুরাবজী, ইত্যাদি। রেক্টর-পত্নী এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তবে বিদায় আনাইয়াছি কেন? আমি উত্তর দিবার পূর্বেই শিক্ষাসচিব বলিয়া উঠিলেন, "ঘোষ কেবল আমাদের সঙ্গ রাখিবার জন্যই বিদায় আনাইয়াছে, নিজে উহা পান করিবে না।"

মিউনিকের চিত্রবিচিত্র বৈদগ্ধির ঐশ্বর্যের কত সুখস্মৃতির কাহিনী মনে পড়িতেছে। শেষ করা যায় না। সেখানকার মাটি, আকাশ, বাতাস এর কিছুকেই ভালবাসিতে কিছু বাকি রাখি নাই। দেখিতেছি সেই দরার উপর মেঘের ছায়ার

অবিরাম ছুটাছুটি; হুদের স্থির জলের উপর দূরে দূরে নানা ইমারতগুলি চকিত বিদ্যুতে ঝলসাইতেছে; স্পষ্ট পড়িতেছে Zugspitze-এর সেই দুইটি শিখরে নিবিড় কুয়াসা ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হঠাৎ আসিয়া আমার চক্ষু ধাঁধিয়া দিল—পলকের নীচে বহু নিম্নে তখন মেঘের আলোড়ন। এই সব মুহূর্তে যেন অনন্ত কালস্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাই এই অনুভূতিগুলি কালের পরাঘাত সত্ত্বেও স্বর্ণময় দ্বীপের মত স্থির সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

বলিতেছি তখনও আমাদের বিদায়-
এখন কিন্তু মিউনিক বর্জন

হাতে। তথাপি মিউনিকের সেই অপরূপ শ্রী অক্ষুণ্ণ আছে, নিশ্চয়ই—ভগবানের করুণা অপার।

মিউনিক ছাড়িয়া প্যারিস্ আসিতেছি, সুইটসারলাণ্ড ঘুরিয়া। সীমান্ত প্রদেশে আলসেসিয়ান্ দুইটী মেয়ে আমার কামরায় উঠিল। তাহাদের ফরাসী টান দিয়া জার্মান্ বলা শুনিয়া আমার হাসি চাপিয়া রাখাই কঠিন হইয়া উঠিল। জানালা দিয়া দেখিতেছি, কেবলই বৈচিত্র্যহীন সমতল ভূমি, একটুও ভাল লাগিল না। অবশেষে প্যারিস্ পৌঁছিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, সোজা হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

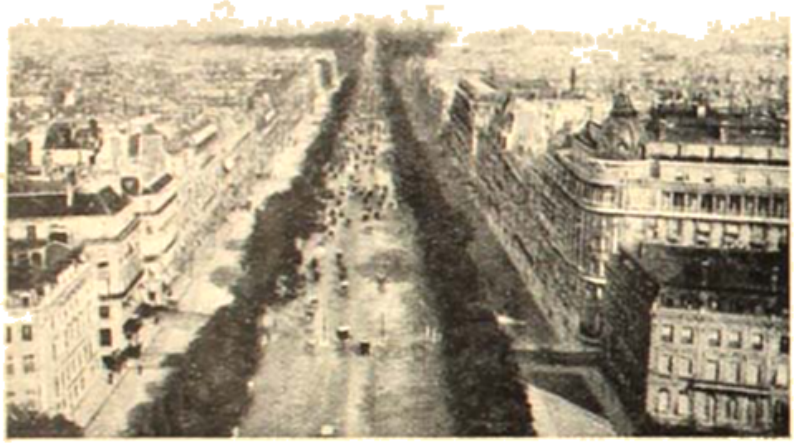

ফ্রান্সে ইলাইসি

পূর্ব্বে একবার পাঁচদিনের জন্য প্যারিস আসিয়াছিলাম, তখনই যাহা কিছু দ্রষ্টব্য দেখা হইয়া গিয়াছিল, কাজেই অধ্যাপকদের সহিত দেখা করা ছাড়া তখন আর কিছু কাজ ছিল না। সকলের সহিতই ৫।৭ মিনিটে আলাপ জমিয়া উঠিল। একজন বলিলেন, "১২০৭ সালে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তোমার সহিত হয় তো দেখাও হইয়াছিল, অথচ তোমার মনে নাই, আশ্চর্য্যের কথা!" আমি বলিলাম, "তখন আমার বয়স ছিল দেড় বৎসর, কাজেই অপরাধ কি মার্জ্জনীয় নহে?" আশ্চর্য্য এই যে, বৎসরাধিককাল পরিচয়ের পরও ইঁহাদের কাহারও সহিত আলাপ আর অগ্রসর হয় নাই।

প্যারিস্ বিদঘুটে লাগিতে লাগিল। এখানে না আছে সেমিনার, না আছে পুস্তকাগার, যেখানে বসিয়া কাজ করা যায়। মিউনিকের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের তুলনায় এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার তো কিছুই নয়। এখানকার পথঘাট নোংরা, লোকেরাও মিথ্যাবাদী, মেয়েরা কুৎসিত। প্যারিসের fast life? সেও তো বার্লিন হাম্বুর্গের তুলনায় নেহাৎ single. কাজেই বলিলে এক দিকে শুনি রুশ ভাষা, অপর দিকে জার্মান। ফরাসীরা কই? বিরক্ত হইয়া আট মিউজিয়মগুলি দেখিতে আরম্ভ করিলাম। মিউজিয়মকে আমি চিরদিন আর্টের শ্মশানভূমি বলিয়া মনে করি এবং সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইল। মিউনিক, ড্রেসডেন ও বার্লিনের চিত্রশালায় পর 'লুভ্র' নেহাৎ অসংবদ্ধ, অগোছালো বোধ হইল, যদিও কয়েকখানি ছবি মনে ছাপ রাখিয়া গেল। লোপা-মিউজিয়মে গিয়া নিজের আর্টবোধ সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। ছবিতে যেসব মূর্ত্তির এত প্রশংসা করিয়াছি সেগুলির মূল দেখিয়া একটিও ভাল লাগিল না, কয়েকটি পোর্ট্রেট্ ছাড়া। নিজের এই কলঙ্ক অপনয়নের মানসে বার বার তিন বার লোপা-মিউজিয়মে গেলাম, কিন্তু বৃথা, লোপা ভাল লাগিল না।

এইরূপে কতদিন কাটিল। ইহার মধ্যে কোন্ ফাঁকে যে প্যারিস আমার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখানকার পথ ঘাট জার্মানীর তুলনায় নোংরাই বটে, কিন্তু প্যারিসের লোকদেরও আর মিথ্যাবাদী মনে হয় না, প্যারিসের মেয়েদেরও কুৎসিত বোধ হয় না। মিউনিক ড্রেসডেন বার্লিন বা হাম্বুর্গের সহিত প্যারিসের তুলনা করিবার কথা আর মনেও আসে না। মনে হয়, শুধু প্যারিস যেন আধুনিক যুগের এথেন্স; শৈশব কাল হইতে সাহিত্যে ও ইতিহাসে যে সব মনীষীদের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল তাঁহাদেরই স্মৃতিবিজড়িত প্যারিস্, —Voltaire, Hugo, Stendhal! Mirabeau, Robespierre ও Gambettaর ইহাই কর্ম্মক্ষেত্র। Anatole Franceএর বাসার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মাথা আপনা হইতেই নত হইয়া আসিয়াছে। কারণে অকারণে Po'goyর যেখানে বইয়ের দোকান ছিল সেই পথ

দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছি। Boulevard Saint Germain দিয়া যাইতে যাইতে কেবলই মনে হইয়াছে এই পথ দিয়াই Jaures মন্ত্রিসভায় যাইতেন। এই প্যারিসেই সেই বিখ্যাত Bastille, Hotel de Ville, Tuileries!

কিন্তু যাহা সুপ্রসিদ্ধ, সুবিজ্ঞাত তাহার গুণগান করিবার প্রয়োজন নাই, আমার তাহাতে প্রবৃত্তিও নাই। যাহা অজানিত অনাখ্যাত তাহাই আমায় আকৃষ্ট করে বেশী। তাই বোধ হয় প্যারিসে সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে আমার এখানকার নয়নাভিরাম উদ্যানগুলিতে শিশুদের অন্তহীন খেলা। Champs de Mars, Tuileries, Luxembourg, Montsouris—সর্ব্বত্র দেখি সকাল হইতে শিশুদল খোন্তা বালতি হাতে সকলের চলিবার পথের মাঝখানে অতীব আগ্রহে মাটি খুঁড়িতে ব্যস্ত। বাপ মা তাহাদের কাঁকরি দিয়া যায় নাই, কাজেই নির্ব্বিকার চিত্তে তাহারা বাগানের চেয়ারগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছে, সেগুলির বসিবার জায়গা কাঁকরির মত করিয়া ছিন্ন করা। তাহারই উপর দাঁড়িয়া লইয়া শিশুরা খোঁড়া মাটির ভিতর হইতে অমূল্য প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিতেছে। কতদিন 'অলস বেলায়' রেঁস্তে গা ভাসাইয়া দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুদের এই নির্ব্বোধ খেলা লক্ষ্য করিয়াছি। কখনও চোখে পড়িয়াছে অনতিদূরে ভরাভীর্ণ কোন বৃদ্ধা রোদে বসিয়া হাঁপাইতেছে। তাহারই পাশ দিয়া একটি তন্বঙ্গিনোলের মত কোন চঞ্চলা তরুণী হাঁটিয়া গেলে ভাবিতে বসিয়াছি, কেন এমন ধারা?

যারা পৃথিবীতে প্যারিসের অনুকরণে উদ্যান পত্তন করা হইয়া থাকে। ইহাতে পৃথিবীর লজ্জিত হইবার কিছু নাই, কারণ মানুষের হাতে গড়া কোন জিনিষ যে ইহা অপেক্ষাও সুন্দর হইতে পারে তাহা কল্পনা করা শক্ত। শুনিয়াছি কলিকাতায় ইডেন্ গার্ডেন এই প্রণালীতে রচিত। কিন্তু কোন দিন ইহা আমার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই, যদিও আমার সারা জীবন কলিকাতাতেই কাটিয়াছে। মুখে-সিগারেট বাবুর দল কোঁচা দুলাইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে—দেখিলেই আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিত। বৈষয়িক এই অশোভন দৃশ্য এড়াইবার উদ্দেশ্যেই কোন দিন ইডেন্ গার্ডেনে যাই নাই, যদিও তাহাতে নিজেই ঠকিয়াছি।

প্যারিসেও দুই একটি করিয়া বন্ধু জুটিল, যদিও খুব বেশী নয়। অবশ্যেষে প্যারিসে ফরাসীদেরও আবিষ্কার করিলাম এবং তাহাদের ভাব, ভাষা ও চিন্তার ধারা বুঝিতে শিখিলাম। বুঝিলাম কেন Rolland প্যারিসকে প্রথমে হইমন্দির ও পরে বাসগৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক Le'vi প্রচার করিয়া দিয়াছেন আমি সংস্কৃত পণ্ডিত, এজন্য অনেক গৃহে বহু সমাদর পাইয়াছি যাহা আমার ঠিক প্রাপ্য ছিল না। কোথাও একবার নিমন্ত্রিত হইলে গৃহকর্ত্রী আবার ধরিলেন—আমায় সংস্কৃত শ্লোক শুনাইতে হইবে। আমার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈশবে পিতৃদেবের তাড়নায় অমরকোষ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল, এবং বড় হইয়া নিজের জেদে পাণিনিব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছিলাম, কারণ বাংলাদেশ হইতে পাণিনিচর্চ্চা উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ভিন্ন দুনিয়ায় আর কোন জিনিষ কোন দিন মুখস্থ করি নাই। কালিদাসের মেঘদূত পড়িয়া মোটেই ভাল লাগে নাই তা' আর মুখস্থ করিব কি,—অর্থ বুঝিতে না পারিলে হয়তো ভাল লাগিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখিলাম পাণিনিকে যতই শ্রদ্ধা করি পাণিনির সূত্র অপেক্ষা অমরের শ্লোকেই কাজ হইবে বেশী, কাজেই গৃহকর্ত্রীকে অমরকোষের কয়েকটি শ্লোক শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিলাম।

প্যারিসের হাওয়ার মাদকতার কথা অনেকেই বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। সর্ব্ব প্রকার বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রুচির লোক প্যারিসের এই মাদকতার মোহে একই রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই মাদকতা নিজেও উপলব্ধি করিয়াছি। এমন কি শেষে Champs Elysees-এর ভুবনবিখ্যাত আলোক-মালারও তারিফ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। লজ্জিত হইয়া নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছি এ অন্যায়। এই প্যারিসেই তো দারিদ্র্যের বিভীষিকাময় মূর্ত্তি অহরহ দেখিতে পাইতেছি। আর সেই সুদূর পল্লী, যেখানে নিজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—সেখানকার লোকদের সেই শ্রীহীন সুখহীন নৈরাশ্যভরা নিরানন্দ জীবন। নীলের এই দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যে ধনী শুধু সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ও অশোভন উল্লাসে মগ্ন তাহাকে ও' নির্ম্মমভাবে চূর্ণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহারই আলোকবিলাসের তারিফ করা—এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ! কিন্তু অমার্জ্জনীয় হইলেও এ অপরাধ বার বার করিয়া ফেলিয়াছি।

তাই বলিতেছি, প্যারিসের নিকট আমার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে,—প্যারিসকেও সত্যই ভালবাসিতে শিখিয়াছি। এখানকার অলিতে গলিতে 'গাভ্রুসে'র দল যখন গাহিতে থাকে Je t'aimerai toujours, toujours, ville d' amour, ville d' amour, তখন আমার মন নাচিয়া উঠে। অবশ্য ইহারা জানে না যে এটি আসলে ভিয়েনার গান।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র

—শ্রীরমেশ বসু

প্রায় বাইশ বছর আগে অন্যান্য কতকগুলি পুস্তকের সঙ্গে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক আমার হাতে আসে। উহার প্রথম অংশের নাম "পত্রাবলী"—তাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ৮২টি পত্র আছে। দ্বিতীয় অংশের নাম "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র"। এই অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। পুস্তকের আখ্যা পত্র (title-page) না পাওয়াতে এই পুস্তকের লেখকের নাম অথবা ছাপার তারিখ নির্দ্ধারণ করা যায় নাই। এই অতি ক্ষুদ্র পুস্তকখানার রামমোহন সম্বন্ধে এমন কয়টি কথা আছে যাহা বর্ত্তমানে আলোচনার যোগ্য মনে হইতে পারে। সেইজন্য ইহা মুদ্রিত হইল। প্রথমতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার।

এই পুস্তকের লেখক যে নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন না তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেননা তিনি রামমোহনের বাল্যকালের কথা বলিতে যাইয়া "কিন্তু যবন শিক্ষকদিগের অসদুপদেশ ও অসৎ শিক্ষায় তাঁহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি শীঘ্রই এমত ভ্রান্তির আশ্রয় করিয়া" এবং "স্বজাতীয় সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির প্রতি রামমোহনের বিরাগ ও স্বকপোলকল্পিত মতের প্রতি অনুরাগ" এইরূপ ধরণে লিখিয়াছেন। আবার, তাঁহার প্রশংসা করিয়াও তাঁহার "চরিত্র ধর্ম্মবিষয় ভিন্ন সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় ছিল" এইরূপ লেখা হইয়াছে। ইহাতে লেখক যে সনাতনপন্থী ছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে তিনি রামমোহনের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করিতেন।

কখন এই পুস্তিকাখানা লিখিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলিতে না পারিলেও লেখকের উক্তি হইতে সময় কতকটা ঠিক করা যায়। যখন এই পুস্তিকা লিখিত হয় তখন রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ (পুস্তিকায় আছে 'রাধিকাপ্রসাদ') "পরলোকগত হইয়াছেন", এবং "দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সদর দেওয়ানি আদালত নামক প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে গবর্ণমেণ্টের ওকালতি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।" রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৪২ সালের ১৯ মার্চ্চ তারিখে মারা যান। তাহা ঐ বৎসরের ১২ই মার্চ্চ তারিখের "সংবাদ প্রভাকর" হইতে জানা যায় ("প্রবাসী", ফাল্গুন, ১৩৩৮, পৃঃ ৬৪৬)। আর, রমাপ্রসাদ রায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে প্রথম ভারতীয় বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হন, কিন্তু তখন অসুস্থ ও পরে মৃত হওয়ায় তিনি উক্ত পদে যোগ দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই পুস্তিকাখানা যে ১৮৪২ ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে। খুব সম্ভব ইহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের।

কতকগুলি বাংলা ও ইংরেজি শব্দের বানান ও উচ্চারণ এই পুস্তিকায় যেরূপভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। যথা—অরঙ্গজেব, পৌত্তলিক, মেং (=Mr.), ইষুখ্রীষ্ট (=Jesus Christ), বৈরক্তি, লার্ড (=Lord), আব (=of), রিফারম (=reform), ডাক্তর (=doctor), অবেডনিক, আক্তবর (=October)। কতকগুলি শব্দ একটু বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হইত, যথা—অসুখ বোধ (=দুঃখিত হওয়া), অত্যর্থ (=অত্যন্ত), একদা (=একেবারে), তাঁহার স্থানে (=তাঁহার নিকট হইতে)। এইগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকেই ব্যবহৃত হইত বলা যায়।

পুস্তিকা খানায় কিছু কিছু ছাপার ভুল আছে, তাহার কতকগুলি মারাত্মক রকমের। কিন্তু আমরা প্রাচীন "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" নীতি অনুসরণ করিয়া পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই। পাটনার জায়গায় পাটনা দুইবার ছাপা হইয়াছে। বোধহয় গ্রন্থকারের হাতের লেখা পড়িতে না পারিয়া মুদ্রাকর এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যু এবং সমাধির বৎসর ১৮৩২ বলিয়া ছাপা হইয়াছে ইহা যে ভুল তাহা কিছু উপরে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের অসুখ হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে, সুতরাং তিনি ১৮৩২ সালে মরিতে পারেন না! এটি একটি মারাত্মক ভুল হইয়াছে।

পুস্তিকাখানা ডিমাই ষোল পেজি আকারের। ইহাতে দাড়ি চিহ্ন আছে, কিন্তু কমা বা সেমিকোলন সামান্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

কতকগুলি তারিখ প্রচলিত মতের সঙ্গে মিলে। যথা, ১৮০৩ (রামমোহনের পিতার মৃত্যু), ১৮১৪ (তৎপরে কলিকাতা নগরে আসিয়া স্থায়ী হন), ১৮১৬ (বেদান্তসারের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ)। কিন্তু তাঁহার জন্ম ১৬৯৫ শক দেওয়া হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টাব্দগণনায় ১৭৭৩ দাঁড়ায়। প্রচলিত মতে ১৭৭২ অথবা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। এই পুস্তিকার এই তারিখ প্রকার কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

প্রচলিত ধারণার মত রামমোহনের তিব্বৎ গমনের কথা এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়। তাহা সম্প্রতি অনেকে অমূলক বলিয়া মনে করেন।

এই পুস্তিকায় আছে—"রামমোহন রায়ের পিতামহ সুবে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরের নবাব সরকারের এক প্রধান পদে স্থাপিত হইয়া সম্ভ্রম ও প্রভুত্বের সহিত জীবন-শেষ করেন।" ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে যে দরখাস্ত করেন তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে (Modern Review, June, 1927)। এই পুস্তিকায় পিতামহের নাম নাই, তাঁহার নাম ছিল ব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধি ছিল রায় রায়ান্।

রামমোহন "প্রথমতঃ সর্ব্বদেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পারসী ভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন"—তাহার নাম "তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদীন।" ইহা অনেকে তাঁহার ষোল বৎসর বয়সের সময়ে রচিত বলিয়া মনে করেন, তাহা ঠিক নহে (Calcutt Review, Dec. 1933)। এই পুস্তিকায়ও আমরা পাই যে "ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি হিন্দু জাতির পৌত্তলিক ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ও সত্যতা বিষয়ক প্রশ্ন ও ঐ প্রশ্নোত্তরে তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ এক পুস্তক রচনা করিলেন।" এই পুস্তক যে পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহার কোনই উল্লেখ নাই, তবে "যবন শিক্ষকদিগের অপদেশ ও অসৎ-শিক্ষায়" কথা আছে।

রামমোহনের যে সব সংস্কৃত বা বাংলায় লিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের নহে। বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৬, ১৮১৯) অথবা উৎসবানন্দ শর্ম্মার সহিত বিচার (সংস্কৃত) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পুস্তকে আমরা এইরূপ কথা পাই—"ইং ১৮১৬ সালে তিনি বেদান্তসার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ এবং তৎপূর্ব্বেও হিন্দি ও বাংলা ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মূল বেদের কিয়দংশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও তদুপাসনা প্রকরণাদি সাধারণের গোচর করেন।" ইহাতে বোধহয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার রচিত হিন্দী ও বাংলা বই ছিল এবং তিনি বেদের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সব বই সম্বন্ধে এখনও আমরা কোন সন্ধান পাই নাই।

ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের কথায় এই পুস্তিকায় ১৮১৮ সাল ছাপা হইয়াছে। লেখার ধরণে মনে হয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইলে পর তিনি সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার লেখা ১৮১৮ এবং ১৮২০ সালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত করেন। কিন্তু এরূপ ধারণা ভুল বলিয়া মনে হয়। কারণ ১৮৩০ সনে তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে আর একখানা পুস্তিকা রচনা করেন, তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হয়।

[১] রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাধানগর গ্রামে বিশুদ্ধ বিপ্র বংশে ১৬৯৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকালাবধি বঙ্গদেশে ব্যবসায় ছিলেন কিন্তু অনুমানের বাদক ছাত্র বাদশাহের রাজত্ব সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি ক্রমশঃ অত্যাচার আরম্ভ হওয়াতে রামমোহন রায়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ রাজদ্বারে উচ্চপদ ও বিপুলবিত্ত লাভাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যবনাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারসিক ভাষা শিখিয়া রায় সংসারে উচ্চপদে অভিষিক্ত হন। রামমোহন রায়ের পিতামহ সুবে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদে নগরের নবাব সরকারের এক প্রধান পদে স্থাপিত হইয়া সম্ভ্রম ও প্রভুত্বের সহিত জীবনযাপন করেন। তৎপুত্র রামকান্ত রায় পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘ[২] কাল সাধু সম্মানের সহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বেদাধ্যয়ন কোন কারণ বশতঃ অবরুদ্ধ হওয়াতে মুর্শিদাবাদের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি স্বীয় জন্মভূমি রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। ঐখানে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়।

রামমোহন রায় কিয়দ্দিন সুবে থাকিয়া যবনাচার্য্যে ভাল শিক্ষা করিলে পর তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনা নগরের পারস্য বিদ্যালয়ে পারসি ও আরবি ভাষা শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন, কেননা তৎকালে ঐ সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ না হইলে রাজদ্বারে উচ্চপদ প্রাপ্তির বা প্রকারান্তরে সম্ভ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। রামমোহন রায় তৎকালে পাটনায় থাকিয়া অধিক

ভাষা শিক্ষা করেন সেই সময় তাঁহার আত্মীয়গণের অনুরোধক্রমে ফরাসীর সংস্কৃত ভাষাও কিছু ২ শিখিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় বাল্যকালে বেশ বিদ্বান ছিলেন যে প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত বহু পুরুষের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু যখন শিক্ষকদিগের অনুরোধে ও তর্ক শিক্ষার তাঁহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি ইংরাজী এবং ফারসীর আলোচনা করিল যে বেদান্ত বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি হিন্দু জাতির পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ও পরাত্মা বিষয়ক প্রমাণ ও ঐ প্রকারান্তর তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ এক পুস্তক রচনা করিলেন। সেই পুস্তক দেখিয়া তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া পরমার্থার্থ বহির্গত হন।

কিয়দ্দিন তিব্বত রাজধানীতে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহার দেশে গমন করেন, তথায় দুই তিন বৎসর বাস করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলানুসন্ধানোদ্যুক্ত হইয়া পুনরায় দেশে ভ্রমণ করিতে যান। এই প্রকারে নানাদেশে পর্য্যটন নিবন্ধন বহু কষ্ট অতিবাহিত করিয়া তাঁহার পিতা বিদ্যমানে হইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রত্যাগত হইতে অনুরোধ করেন। রামমোহন রায় পিতামহের পুনরায় পৃষ্ঠা-পত্র হইয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজজাতির সহিত সখ্য। কর্ম্মোপলক্ষে ও স্বভাবে করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজীতে লিখিতে ইংরাজ জাতির আচার ব্যবহার রাজনীতি ও রাজা শাসনের প্রণালী ইত্যাদি অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন ইংরাজদিগের অধীনে যদিও এদেশের লোকেরা অন্য স্বাধীনতা জনিত সম্পূর্ণ সুখ ভোগ করিতে না পারুক [৯] তথাচ অন্যান্য অধিকাংশ তাহাদিগের স্বভাব ও অন্তের সহিত ঐক্য হইয়া সুখী হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই।

ঐ প্রকারে ফরাসীর রাজত্ব বন্দোবস্তাদির প্রতি রামমোহন রায়ের বিরাগ ও ফরাসীয়া করিত অত্যাচার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া তাহার দৃষ্টির পরম ও বহু অন্তরের ইংরাজ প্রতি হতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহার পিতাও প্রকাশ্যে পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু গোপনে গোপনে আবশ্যক ব্যয় অর্থানুকূল্য করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে রামকান্ত রায় দুই পুত্র রাখিয়া ইংরাজী ১৮০৩ সালে পরলোকগত হন। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায় ইং ১৮১১ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

সাংসারিক লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম্ম লিপ্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক এই বিবেচনা রামমোহন রায় জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের অধীনে কেরাণিগিরি পদে নিযুক্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে দেওয়ান হন, কিন্তু সাহেব কর্ম্মচারির সঙ্গে তাঁহাকে বিবাদের সম্ভবে থাকিতে হইত না। এই পদে থাকা কালীন ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে লিখিতে ও ইংরাজ [৯] জাতির আচার ব্যবহারাদি বিষয়ক পরিজ্ঞাত হইয়া। দুরস্থ দুখিয়া হইয়াছিল বেলেরা অল্প বিষয়ে অধ্যে যে অল্প চিন্তির সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সহিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলন করিতেন তাহাতে উভয়েরই অল্প উপকার হইল।

পিতার মৃত্যুর পর অবধি রামমোহন রায় নির্জ্জন ও অবকাশ চিত্তে ধর্ম্ম বিষয়ে আপনার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন প্রচার করিয়া তাহার শেষ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইং ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি গ্রাম সকলে রামগড় রামগড়পুর ও রঙ্গপুর জেলায় বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে কলিকাতা নগরে আসিয়া স্থায়ী হন।

রামমোহন রায় সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের দোষপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেন। প্রথমতঃ সমস্ত বেদের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পাঠক হইবার এক পুস্তক রচনা করেন, তদনন্তর তৎকর্ত্তৃক পক্ষ উপনিষদের ভাষা ও তার মূলা সহিত [৬] প্রকাশিত হয়। তৎপরে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় অনেক পুস্তক প্রচার করাতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেরই দ্বেষ হন। তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারী বিপক্ষী পাষণ্ড ইত্যাদি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে তিনি কিছুমাত্র অসুখ ভোগ বা কোপ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জননীও ঐরূপ তাঁহাকে সকলে তিরস্কার করিতেন। তিনি সে সকল তিরস্কারকে পুরস্কার বিবেচনা করিয়া শেষ বয়ঃ ক্রমশ মাসের সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয়ক যৌক্তিক ও লিখিত কথোপকথন ও সময়ে সময়ে ঐ ঐ বিষয়ের পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন।

সকল ইংরাজী বিদ্যাবিহীন ও তদ্দেশীয় লোকের সহবাসে তদ্দেশীয় ধর্ম্মের মূলানুসন্ধান নিমিত্ত রামমোহন রায় অত্যন্ত উৎসুক হইয়া গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা পূর্ব্বক ইউরোপীয় লোকেদিগের মূল ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়নান্তে ইত্যুপায়ের উপদেশ সকল ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশ করেন।

ইং ১৮১৬ সালে তিনি কোরাণের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ এবং তৎপূর্ব্বেও তিনী ও [৭] বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনপূর্ব্বক বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মূল বেদের কিয়দংশ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উপনিষদের অধিষ্ঠেয় ও তত্ত্বপাদনা প্রকরণাদি সাধারণে প্রচার করেন।

ইং ১৮১৮ সালে কলিকাতা নগরে তৎকর্ত্তৃক বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হন। তদনন্তর সহমরণ নিবারণে তিনি প্রবৃত্তমান হন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমানেই তাঁহার মনে ঐ বিষয়ে বাসনা। বিবারিত হওনের সংকল্প উদিত হইয়াছিল। তিনি ইং ১৮১০ সালে সহমরণের প্রথা বিবারিত হওনের পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বাদানুবাদচ্ছলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ও তাহা বিতরণি পরে ঐরূপ আর এক পুস্তক প্রকাশ করেন তাহাতে সহমরণ পক্ষীয় লোকেরা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁর এবং ঐ পুস্তকানুসারে কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট সহমরণ নিবারক আইন প্রচার করেন।

সহমরণ প্রথা রাজ বিধান দ্বারা নিবারিত না হইলে পুত্র বিহীনে বিধবা স্ত্রীর পতির সম্পত্তি রামমোহন রায়ের ইচ্ছা ছিল, কারণ তিনি এবত আশঙ্কা করিতেন ইংরাজের প্রবলতা এতদেশের প্রজাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাদিগের ধর্ম্ম [৮] বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত এক বিষয়ে রাজ বিধান প্রচার করেন তাহা হইলে পরে অসমঞ্জসাদিগের রাজ বলপূর্ব্বক হিন্দুজাতীয় প্রজাদিগকে স্বকীয় ধর্ম্মাবলম্বী

করাইতেও পারেন অতএব ঐ আইন প্রচার হইলে রামমোহন রায় জাতি কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের বাধা ও বৈষয়িক আশঙ্কা বিসর্জন করিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকট সুসঙ্গতা প্রকাশ সূচক এক প্রস্তাব প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহার সকল আত্মীয় স্বজন এবং তাঁহার পিতার পরম বন্ধু বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজ মহতেজচন্দ্র বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিকূলাচারী হইয়া এক সাধারণ সূত্রে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন।

অন্যান্যাধিক রামমোহন রায়ের মনে ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা প্রবলা হইয়াছিল কিন্তু সহায়ের বিষয়ে, দেশ মধ্যে অবস্থা গতিকে ও উপরোক্ত বোকদ্দমা বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকাতে বিলম্ব হইয়াছিল। অবশেষে উপরোক্ত তিন বাধা দূরীভূত হইল অর্থাৎ সহায়ের বিবা-[৯] ক আইন প্রচার ও ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হইল এবং আপনি মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন।

অতএব ইং ১৮৩০ সালের শেষ ভাগে রামমোহন রায় বিলাত গমনের উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার এই চির মানস সফলার্থে তিনটী সুযোগ হইল। প্রথমতঃ এতদ্দেশীয় সমস্ত হিন্দু সহায়ের বিবাহক ১৮৩০ সালের প্রচারিত আইন রহিত। এস প্রার্থনায় ইংলণ্ডের রাজসভায় আপীল করিলেন অতএব যাহাতে ঐ বিধান রহিত না হয় তাহার উদ্যোগ করণার্থ রামমোহন রায়ের বিলাত গমন অত্যাবশ্যক হইল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টের সুনিয়মার্থে বিষয়ক বালমুখর পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিল তৎকালে ভারতবর্ষীয় মধ্যে রামমোহন রায়ই যোগ্যতাংশে সর্ব্ব প্রধানরূপে পরিগণিত ছিলেন, সুতরাং ঐ মহৎ বিষয়ে তিনি অবশ্য প্রয়োজন করেন ইহা রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই অভীষ্ট ছিল, সুপ্রিমকোর্ট তাঁহার ইংলণ্ড গমনের প্রয়োজন হইল। তৃতীয়তঃ দিল্লী নগরের সাম্রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের যে জায়গীর ছিল তাহার রাজস্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বয়ং আদায় করিয়া বাদশাহকে পূর্ব্ব হিসাবে তনুপযুক্ত [১০] প্রদান করিতেন কিন্তু ঐ সকল ভূমিতে তদপেক্ষা অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হইত, তাবশ্যক তাহা বন্দুবস্ত প্রাপ্তির প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন তাহাতে বোর্ড অব কণ্ট্রোল ও ডাইরেক্টর্স সভা হইতে এই আদেশ হয় যে বাদশাহ যে রাজস্ব গ্রহণের অধীকারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ঐ জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত প্রাপ্তির পাওয়া আইন ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বাদশাহ এই আজ্ঞার প্রতিকূলে ইংলণ্ডের রাজসভায় আপীল করিবার অভিপ্রায়ে রামমোহন রায়কে তথায় ইংলণ্ড প্রেরণে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া "রাজা" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ড গমনের আদেশ করেন।

উপরোক্ত কারণসমূহে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমনের আয়োজন করিলে তাঁহার বিপক্ষ লোকেরা নানা জল্পনা করিতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি ইং ১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর দিবসে "গ্রাফটন" নামক জাহাজারোহণে ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে উপনীত হইলে তত্রত্য প্রধানং লোকেরা যথা [১১] সম্মানের তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন কেননা তাঁহারা সকলেই সভাস্থ পত্রে ও কলেজীয় লোকমুখে রামমোহন রায়ের বিদ্যা বুদ্ধি মান সম্ভ্রম ভালরূপের বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন, বিশেষতঃ তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় "ব্রিটিশের বিল" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্যের সুনিয়মার্থক বিষয়ে অতিশয় আন্দোলন হইতেছিল, তদ্বারাও অধিকন্তু রাজা রামমোহন রায়ের প্রসূত্বং ভারত রাজ্যের রাজ শাসনের প্রণালী ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার কারণে তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান পূর্ব্বক নিজীর রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব ও প্রদত্ত রাজোপাধি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিলেন। যদিও ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করণার্থ রামমোহন রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন তথাচ তাঁহার অতি সুবিবেচনার সভ্যপরিচয় তাঁহার সহন করণে ত্রুটি করেন নাই, ইং ১৮৩১ সালের ৬ জুলাই দিবসে লণ্ডন "টৈমস" নামক প্রকাশ্য তখনে সম্বাদপত্রের লেখা করিয়া তাঁহাকে বিস্তারণ করিয়াছিলেন। ঐ মাসের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের ভূপতির সহিত রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হয়।

[১২] ইংলণ্ড রাজ্যের তাঁহার আগমনাদি বিষয়ক নানা প্রশ্ন রাজা রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসিয়া তাহার সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়াতে তৎপ্রতি পরম সন্তুষ্ট হন এবং অধিকন্তু তাঁহার স্থানে রাজ্য শাসন বিষয়ক নানা সৎ পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ইংলণ্ড রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া উঠিল। সম্ভ্রান্ত ভাগ্যবন্ত লোকেরা তাঁহার সহিত আলাপ করণার্থ যাত্র হইলেন। কোন বিশেষীয় লোক ইংলণ্ডে যাইয়া যাহা রামমোহন রায়ের তুল্য সম্বাদ্ত হন নাই, রাজসভা, রাজি সভা, ভিয়োলজি, বর্ণালয়, বিদ্যালয়, প্রভৃতি সকল প্রকার সমাজে তিনি গমন করিয়া তত্তৎ স্থানের রীতি নীতি ক্রিয়া আচারাদি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নানা বিদ্যার বুৎপত্তি, বিনয় চরিত্র, সরল স্বভাব, মিষ্ট ভাষা, সুন্দর সভ্যতা, ব্যক্ত পটুতা, বহু দর্শিতাদি নানা গুণ দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সৌজন্যপূর্ণীত সম্ভ্রম বোধ করিতে লাগিলেন। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরি একত্র চিত্র হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট এতদ্দেশীয় লোকের উপর ইংলণ্ডীয় লোকের যে অবজ্ঞা ছিল একথা [১৩] তথা হিতোচিত হইয়া গেল, তাঁহার গুণ গৌরব সর্ব্বত্র এত ব্যাপ্ত হইল ও বান্ধব সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে নিজার সময় ভিন্ন প্রায় তিনি বিশ্রামের ও নির্জ্জন হওনের সময় পাইতেন না।

ইং ১৮৩২ সালে শরৎকালে রাজা রামমোহন রায় ফ্রান্স রাজ্য দর্শনার্থ গমন করেন এবং তথাকার রাজ দরবারে অনেক সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হন। ফ্রেঞ্চ রাজ্যাধ্যক্ষ মুইস ফিলিপ বাহাদুর তাঁহার সহিত অনেক বার একত্র হইয়া আহার করিয়াছিলেন।

ইং ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে রাজা রামমোহন রায় কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভারতবাসি লোকের মহোপকারি বন্ধু এবং আপনার প্রিয় মিত্র মেং ডেবিড হেয়ার সাহেবের যাত্রা মেং জন হেয়ার ও মেং জোকেফ হেয়ার সাহেবের বেড় জোড় ঘোড়ার দ্বিত্ব বহন অর্থস্থিতি করেন। তিনি ইংলণ্ডে গমনাবধি উৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাবধিই তাঁহার শরীর পিত্তাধিক্য জনিত রোগের আধার

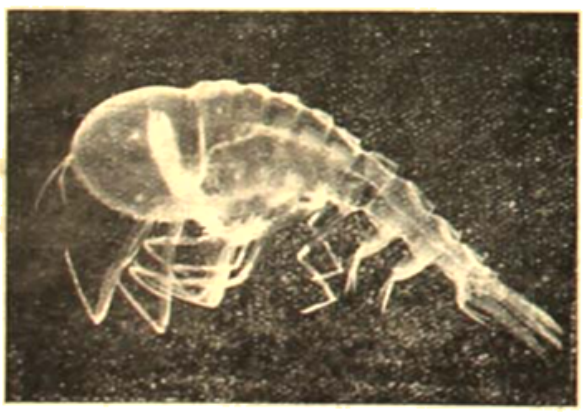

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রতলের জগৎ

উইলিয়ম বিবের নাম বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জীবকুল সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা

শিকারোদ্যত ড্রাগন মাছ।

জগদ্বিখ্যাত। প্রিন্স্ অফ্ মোনাকো ছাড়া এ সম্বন্ধে এত অনুসন্ধানও বোধ হয় বেশী লোকে করেন নাই।

১৯২৮ সালে মিঃ বিব্, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে বার্মুডা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নন্‌সাচ্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য চাহিয়া লন এবং ১৯২৯ সালে তথায় একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার জন্য একটি ছোট জাহাজও ক্রয় করা হয়। নিউইয়র্ক জীববিদ্যা-সমিতি এ বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ বিবের অধীনে এই সমিতির ডিপার্টমেণ্ট অব ট্রপিক্যাল রিসার্চ Department of Tropical Research এইখানেই স্থাপিত হয়।

মিঃ বিবের নিজের ভাষাতেই তাঁর গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এইখানে ব্যক্ত করি।

"সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের প্রাণীকুল সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি, যদি আমাকে কেউ একথা জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁকে ব'লব যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আমরা জানতে পারি নি।

ধরুন, এই নিউইয়র্ক সহরের দু' মাইল উপর দিয়ে অন্য কোন গ্রহের একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে এরোপ্লেনের আরোহীরা একটা ছোট জাল নামিয়ে সহরের রাস্তাঘাটের আশপাশ থেকে একরাশ জঞ্জাল সংগ্রহ ক'রে উপরে তুললে। এখন যদি সেই সংগৃহীত ছেঁড়া কাগজ, কাপড়ের টুকরো, ভাঙা কাঁচ, ভাঙা টিন কি বিস্কুটের বাক্স থেকে তারা এই সহরের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে তারা নিউইয়র্ক সহর ও তার অধিবাসীদের কথা কতটুকু জানতে পারবে?

আমাদের দশাও এই রকম। এ বিষয়ে অনুসন্ধান সুরু হয়েছিল ষাট বৎসর পূর্ব্বে, চ্যালেঞ্জার নামক জাহাজ যখন আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশস্থ প্রাণীকুলের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কিন্তু

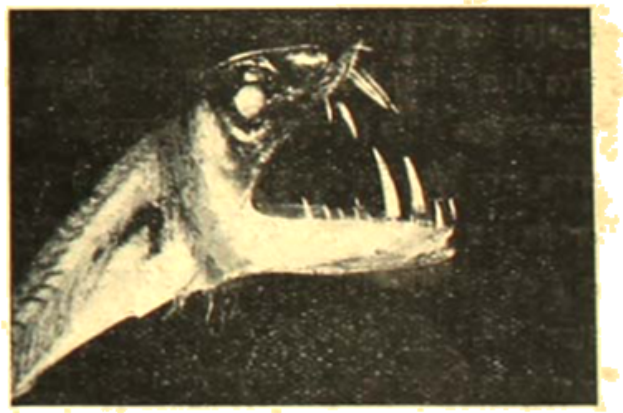

ড্রাগন মাছের ডিম।

এই ষাট বৎসরে অনুসন্ধান-রীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি—জালের আকার ও জাল টেনে জাহাজে তুলবার

গতিবেগ একই রকম আছে। এজন্য গভীর তলদেশের অনেক শ্রেণীর প্রাণিকে জীবন্ত অবস্থায় উপরে নিয়ে আসার সুবিধা হয় নি—তুলতে তুলতে তারা মারা যায়। তা ছাড়া জালের আকৃতির পরিবর্তন না হ'লে দ্রুত সন্তরণশীল অনেক প্রাণিকে জালে আটকানো সম্ভবপর হয় না।

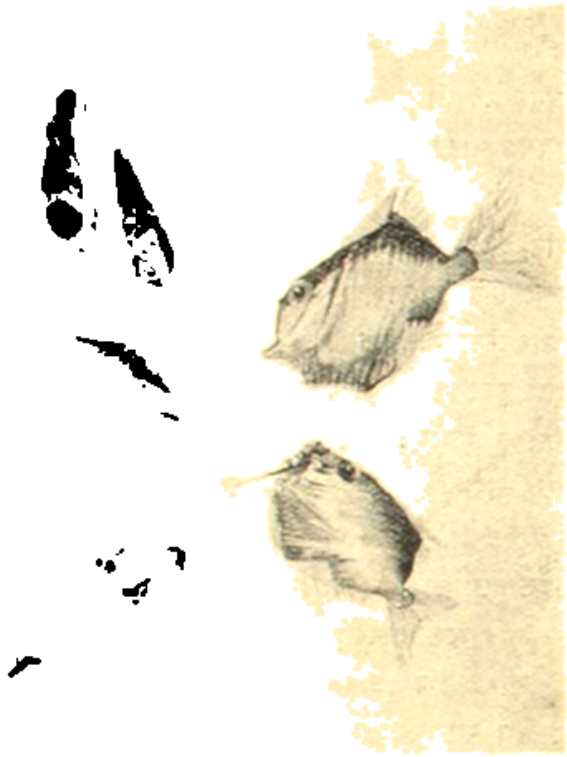

স্বচ্ছ মতো ধাড়।

আরও একটা কথা আমার মনে হ'য়েছিল এই যে, সারা দুনিয়ার সমুদ্র ঘুরে বেড়ানোর অপেক্ষা একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রলে অনুসন্ধান প্রণালীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হ'তে পারে। নন্‌সাচ্‌ দ্বীপে গবেষণাগার স্থাপন করার মূলে এই উদ্দেশ্যই আমার ছিল। পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য প্রথমে আমি একদিন নিউইয়র্ক বন্দর থেকে ছোট একটা জাহাজ ভাড়া ক'রে সারাসাত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাডসন নদীর প্রাচীন খাতের কাছে উপস্থিত হই—এবং জাহাজের চারিধারে ছ'খানা জাল চুয়াইল লম্বা তারের সঙ্গে গেঁথে নীচে নামিয়ে দিই। তাতে ফল মোটের উপর ভাল হয়।

নন্‌সাচ্‌ দ্বীপের চারিধারে আট বর্গ মাইলব্যাপী স্থান আমি চিহ্নিত ক'রে নিয়েছি এবং এরই মধ্যে আমি কাজ করি। বার্মুডা দ্বীপের দুটো বড় বড় বাতিঘর দ্বারা এই স্থান উত্তরে ও দক্ষিণে সীমাবদ্ধ, ভুল হবার কোন উপায় নেই। গত তিন বৎসরের মধ্যে আমার জাহাজ এই জায়গায় দুশো একাত্তর বার বেড়িয়ে জাল ফেলেছে এবং তার ফলে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

নন্‌সাচ্‌ দ্বীপের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী আমাদের এই রকম।

ভোর সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের জাহাজ ষ্টীম তৈরী ক'রে এসে হাজির হয়। দূরবীক্ষণ দিয়ে বাইরের সমুদ্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখি। বায়ুর গতি, ঢেউএর বেগ এবং বায়ুমাপ যন্ত্রের অবস্থা যদি অনুকূল হয়, তবেই আমরা জাহাজ ছাড়ি, কারণ সমুদ্রে ঝড় হবার আশঙ্কা থাকলে বা সমুদ্র তরঙ্গসঙ্কুল হ'লে জাল ছিঁড়ে যেতে পারে, এজন্য সে অবস্থায় দিনের কাজ বন্ধ রাখা হয়।

দিন ভাল থাকলে আমার দু'জন সহকারী জাহাজে ওঠেন এবং জাহাজ পাঁচ-মাইল ঘুরে বহির্সমুদ্রে চ'লে যায়। তারপর দুশো পাউণ্ড ওজনের ভার ঝুলিয়ে দু'মাইল লম্বা তারের সঙ্গে দু'খানা রেশমের সুতায় বোনা বড় জাল সমুদ্রে ফেলে ধীরে ধীরে টানা হ'তে থাকে। চার পাঁচ ঘণ্টা জাল-টানার কাজ চলে।

আমরা জাহাজ থেকে ছোট মোটর-বোটে নামি এবং প্রজাপতির আকারের জাল দিয়ে বিচিত্রবর্ণের উড়ন্ত মাছ শিকার করি, কখনও নতুন ধরণের সামুদ্রিক পাখী কি বড় হাঙরকে গুলি করে মারি। চার পাঁচ ঘণ্টা এইভাবে কেটে যায়, তারপর আমরা জাল টেনে জাহাজের উপর তুলে আমরা ডাঙায় ফিরে আসি। এইখানে গতির প্রয়োজন আছে, কারণ এমন সব প্রাণী আছে তারা জলের উপরে বেশীক্ষণ বাঁচে না, যদি না কৃত্রিম উপায়ে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়। যেমন, সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জল খুব ঠাণ্ডা—ওই ধরণের ঠাণ্ডাজল ভিন্ন বাঁচতেই পারে না এমন অনেক প্রাণী আছে। নন্‌সাচ্‌ দ্বীপের গবেষণাগারে তাদের জন্য বরফ ও নাইট্রেট্‌ দিয়ে ঠাণ্ডাজল তৈরী করা আছে—সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওই সব প্রাণীকে তাতে ডোবানো হয়। এই সমস্ত জলের পাত্র যাতে সামুদ্রিক প্রাণীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা হয় এভাবে নির্ম্মিত। তারপর

আমরা অণুবীক্ষণ নিয়ে ব'সে যাই বহু বিচিত্র গঠন ও আকৃতি-বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণীদের অবয়ব, ইন্দ্রিয় এবং পরস্পরের সম্বন্ধ অনুসন্ধান ক'রতে।

নাইলখানেক গভীর সমুদ্রতলের অবস্থা এত অদ্ভুত যে অন্য কথায় তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ সে সব স্থানে এত অন্ধকার, যে, পৃথিবীর উপরের মধ্যরাত্রির ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিও তার তুলনায় আলোকোজ্জ্বল। আর এত নিস্তব্ধ, শব্দহীন সে জায়গা যে পৃথিবীপৃষ্ঠের অধিবাসীদের সে বিরাট শব্দহীনতার কোন ধারণাই নেই। একমাইল গভীর তলদেশেই অনেক সময় জলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক টন—এবং শৈত্য মিষ্টজল ও লোণাজল জ'মে বরফ হ'য়ে যাওয়ার মাঝামাঝি। সমুদ্রের তলার এই অন্ধকারময় শীতের রাত্রির অবসান নেই, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সেখানে চির-রাত্রির অন্ধকার কখনও দূর হয় না।

এখন ভাবুন, এই অদ্ভুত দেশের প্রাণীকুলও কত অদ্ভুত। এই ভয়ানক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের বেঁচে থাকতে হয়—যুগ যুগ ধ'রে এই অবস্থার সঙ্গে যুঝে তাদের শরীর সেই ভাবে গ'ড়ে উঠেছে,
শৈত্য ও বিরাট জলের চাপ সহ্য ক'রতে
নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও তারা নিজেদের আহার খুঁজে নিয়ে প্রাণ ধারণ ক'রতে পারে। কারণ জীবন মানেই আহার, এবং এসব স্থানে আহার মানেই অন্য প্রাণীর প্রাণ হরণ।

কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এক-দিনের ব্যাপার নয়। এই সকল জীবের পূর্বপুরুষেরা সমুদ্র-গাত্রের শৈলমালা কিংবা মহাদেশের যে অংশ ক্রমে ক্রমে সমুদ্রে নেমে গিয়েছে—সেই বেয়ে ক্রমশঃ নেমে এসেছিল—নেমে আসতে আসতে ক্রমপরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহেরও পরিবর্তন ঘ'টে এসেছে—লক্ষ লক্ষ বৎসর এইভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে বর্তমানে তাদের দৈহিক গঠন এইরকম দাঁড়িয়েছে। আর সে কি অদ্ভুত পরিবর্তন! কল্প-কথার দানবরা কোথায় লাগে তুলনায় এইসব প্রাণীদের কাছে!

আলোক-মাছের বাচ্চা : দুরবীণে দেখা

এইভাবে নামতে নামতে যারা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থাকে জয় ক'রতে পেরেছে, আজ তাদের আমরা দেখছি

—কিন্তু যুদ্ধে অপারগ হ'য়ে যারা ধ্বংস হ'য়ে গেছে, লুপ্ত হ'য়ে গেছে—তাদের হিসাব কোথাও লেখা নেই।

তবে দৈত্যের রকম এদের দৈহিক পরিবর্ত্তন খুব বেশী হয় নি। মাথের সরু হাড়া, যে হুতোর মধ্যে তারা বাস, তাদের দেহ সেই হুতোর উত্তাপ গ্রহণ করে। জলের চাপও এদের দেহের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় নি। এদের দেহের যা কিছু পরিবর্ত্তন তা সবই হ'য়েছে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকারের জন্য।

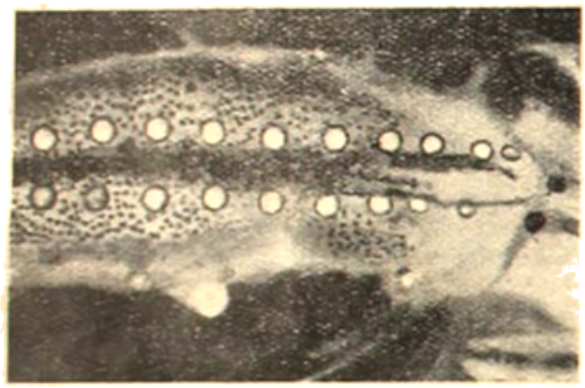

লোক-মাছের আলোর ব্যবস্থা এ চিত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে।

জলের তলার প্রাণীকুল অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকবার প্রধানতঃ দুটো উপায় বার ক'রেছে। একদল প্রাণীর মুখের সঙ্গে লম্বা হুতোর মত জিনিষ আছে, অনেক সময় প্রাণীর দেহটার চেয়ে এই হুতো অনেক গুণ বেশী। গভীর অন্ধকারের মধ্যে এই হুতোটা এদিক ওদিক চালিয়ে তারা নিজেদের শিকার ধ'রতে পারে, গতিপথ নিরূপিত ক'রতে পারে। সেই হুতোটা তাদের চোখের কাজ করে। আর এক রকমের মাছ ডানার সাহায্যে ঠিক এই কাজ করে—তবে তাদের ডানা আরও পাতলা ও আরও পাঁজকাটা। এই সব প্রাণীর চোখ ক্রমে ছোট হ'তে হ'তে নিস্তেজ হ'য়ে যায়, চোখের স্নায়ু অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে—শেষে চোখ শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। জলের তলায় এই রকমের অনেক প্রাণী আছে—তারা একেবারে অন্ধ।

কিন্তু সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় যারা আছে—অর্থাৎ যারা কিছু কিছু সূর্য্যের আলো পায়, এবং সেই অতি ক্ষীণ আলোর সাহায্য নিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে—তাদের শরীর দিয়ে লণ্ঠনের মত আলো বার হয়। গভীরতম তলদেশের প্রাণীকুলের চেয়ে এই শ্রেণীর জীব জালে ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ—সেইজন্য এদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সুবিধাও বেশী। দেখা গিয়েছে স্কুইড্, squid ও চিংড়িমাছ জাতীয় প্রাণীরা স্বয়ম্প্রভ হয়—আর বাদ্‌মাছজাতীয় প্রাণীর খুত্‌নীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সুতো গজায়। তবে সুতোজাতীয় স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণীরা আরও গভীরতর প্রদেশে বাস করে।

এই আলো যে কত রকমের ও কত রঙের! বাতির মত, দীর্ঘ আলোকদণ্ডের মত, জাহাজের পোর্ট-লাইটের মত, রঙীন্ আতসবাজির মত সবুজ, রাঙা, সাদা, নানা রঙের আলো। কোন কোন প্রাণীর ডানা দিয়ে আলো বেরোয়, কোন প্রাণীর পিঠ দিয়ে, কোন প্রাণীর গাল দিয়ে, কারুর বা কপাল দিয়ে।

আলোর ব্যবহারও নানা রকম। কোন কোন আলো খাদ্যকে আকৃষ্ট ক'রে খাদকের মুখের কাছে নিয়ে আসে—নতুবা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে শিকার খুঁজে বার করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একই রকম আলোর সাহায্যে অনেক সময় প্রাণীরা স্বশ্রেণীভুক্ত অপরাপর প্রাণীকে চিনে নেয়।

আবার এক শ্রেণীর মাছ আছে, তাদের কপালে একটি মাত্র চোখ, একচক্ষু দৈত্যের মত, কিন্তু ওই একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছোটখাটো দূরবীক্ষণের মত—বহুদূর থেকে তারা নিজেদের শিকার চিনে নিতে পারে—তবে এ শ্রেণীর একচক্ষু মাছ খুব তলায় থাকে না—মাঝামাঝি জায়গাতেই তাদের বেশী দেখা যায়।

সূর্য্যের আলো সমুদ্রের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করে, সে পর্য্যন্ত প্রাণীদের এক রকম রং, আবার যেখানে আলো একেবারেই নেই—সেখানকার প্রাণীদের আর এক রকম রং। তবে এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। সাধারণতঃ যে সব প্রাণী জলের উপরের দিকে থাকে, তাদের পিঠের রং সমুদ্রের জলের রংএর মত ও পেট ধবধবে সাদা। তারপর যত নীচে যাওয়া যায়, ততই নীল রং মিলিয়ে গিয়ে ধূসর, নয় তো একেবারে সবটাই সাদা। তারপর খানিক দূর পর্য্যন্ত প্রাণীদের দেহ একেবারে স্বচ্ছ, যেমন জেলি মাছ ও একধরণের চিংড়ি। এই শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু খুব বেশী—গভীর সমুদ্রের

মাঝামাঝি স্থানের কাঁকড়া, চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, squid, প্রবাল—এরা প্রায়ই স্বচ্ছ। আরও গভীর প্রদেশের প্রাণীরা অন্ধস্বচ্ছ, রূপোর মত চক্‌চকে লাল, বিচিত্র বর্ণ—নয় তো গোলাপী। এই পর্যন্ত সূর্যের আলোর শক্তি শেষ হ'ল।

তারপর যেখে অন্ধতমসাচ্ছন্ন চির-রাত্রির দেশ, যেখানে বেশীর ভাগ প্রাণীকুল সুতো চালিয়ে চলাফেরা করে ও শিকার ধরে, ব্যবহারের অভাবে যাদের চোখ নিষ্প্রভ, অকর্মণ্য হ'য়ে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। এখানকার প্রাণীদের রং হয় চারিপাশের গুঢ় অন্ধকারের মত কালো—নয় তো টক্‌টকে উজ্জ্বল লাল। পাঁচশো ফ্যাদমের নীচে অধিকাংশ চিংড়ি কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী টক্‌টকে লাল এবং মৎস্যজাতীয় প্রাণী ঘোর কালো।

সমুদ্রের উপরের দিক থেকে যতদূর সূর্যের আলো প্রবেশ করে, ততদূর পর্যন্ত প্রাণীকুলের প্রধান খাদ্য এক ধরণের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্। বিজ্ঞানে এই জাতীয় উদ্ভিদের নাম ডায়াটম্, diatom—এই ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ ছাড়া নানা জাতীয় সামুদ্রিক শেওলাও ওদের খাদ্য। মহাশৈলবাহির গুহার গহ্বরে কিংবা পিচ্ছিল, আর চালুতে অনেক রকম উদ্ভিদ জন্মায়—চিংড়ি জাতীয় মাছের এই উদ্ভিদ প্রধান খাদ্য।

কিন্তু যেখান থেকে অন্ধকারের রাজ্য আরম্ভ হ'ল, সেখানে ডায়াটম্, diatom আর মেলে না, সূর্যালোকের অভাবে কোন উদ্ভিদও গজায় না—সেখানকার আইন হ'চ্ছে 'আমি তোমায় খাই' 'আমাকে আরে খায়'। অন্ধকারে খাদ্য জোটাও অত্যন্ত কঠিন—জীবনযুদ্ধের নিদর প্রতিযোগিতায় যে হেরে গেল, সেই হ'ল খাদ্য, যে জিতলে সে বিজিতকে ভক্ষণ ক'রে নিজে বাঁচল।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে শরীরের আকারগত বৈষম্য খাদ্য ও খাদকের সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেখানে খাদ্য জোটানোই কঠিন সমস্যা, সেখানে সে খাদ্য ছোট কি বড় তা বাছবিচার ক'রতে গেলে খাদকের চলে না—কাজেই এক হাত লম্বা প্রাণী হয় তো তিন হাত লম্বা প্রাণীকে খাচ্ছে—যার ওজন আধসের সে হয় তো ৫'সের ওজনের জীবকে উদরসাৎ ক'রছে। জীব-বিবর্তনের কি অদ্ভুত রূপই সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে দেখা যায়! যাতে ছোট প্রাণী তার চেয়ে বড় প্রাণীকে আহার ক'রতে সমর্থ হয়, তার জন্য এই রাজ্যের অধিকাংশ প্রাণীর চোয়ালের হাড় স্থিতিস্থাপক কব্জা দিয়ে জাঁটা—দেখতে ছোট্ট হাঁ বটে কিন্তু পাঁচ গুণ বড় খাদ্য সে অনায়াসে গিলতে পারবে—তার চোয়ালের হাড় শিকার গিলবার সময়ে মোমাফুষ খুলে যাবে কিংবা বাড়বে, খাদ্য উদরসাৎ হ'য়ে গেলে আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

এক রকম চাপের মাছ : ইহারা গভীর সমুদ্রে অন্ধকার জলে বাস করে

অধিকাংশ মাছের পাকস্থলী এমন ভাবে তৈরী যে মাছটার অপেক্ষা তিনগুণ কি পাঁচগুণ বড় মাছও অনায়াসে তার মধ্যে ঢুকতে পারে। অনেক সময় আমাদের জালে এমন গোল চেহারার মাছ পড়ে, যার পেট থেকে শিকার বার ক'রে না নেওয়া পর্যন্ত মাছটার আসল চেহারা বোঝা যায় না—লম্বা মাছ ফুটবলের মত গোল হ'য়ে গিয়েছে শিকার গিলবার পরে। পাকস্থলী অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে পড়েছে এমন মাছ প্রায়ই জালে ধরা পড়ে। পাকস্থলী কেটে অনেক সময় শিকারকে অক্ষত ও অজীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—তা দেখে কোন্ মাছ কোন্ জাতীয় প্রাণী খায়, সে তথ্যও অবগত হওয়া যায়।

এই অন্ধকার রাজ্যে কোন প্রাণিরই কোন আশ্রয় স্থান কি বাসা নেই—কোথাও একটু বিশ্রাম করবার স্থান পর্যন্ত নেই। তারা নিরন্তর অবস্থায় কেবল উপরে নীচে, কিংবা পাশাপাশি, এর কোন [illegible] ছাড়া [illegible] থেকে মৃত্যু পর্যন্ত [illegible] তাদের খোলা অত্যন্ত পাৎলা, প্রায় কাগজের মত পাৎলা—আর তাদের দেহের একটা খোলের মধ্যে খানিকটা গ্যাস পোরা থাকে—এই গ্যাসের সাহায্যে তারা জলে অনায়াসে ভাসতে পারে। স্কুইড জাতীয় প্রাণী এত বিভিন্ন রকমের আছে যে এক কথায় তাদের বর্ণনা দেওয়া চলে না। তাদের দেহ সরু লতার মত, জড়ানো জড়ানো, কখনও গোলাপী রংয়ের, কখনও বা ধূসর—কিন্তু বেশীর ভাগ স্বচ্ছ সাদা। স্কুইডদের একটা বড় চোখ আছে, প্রায় হরিণ কিংবা বড় পাখীর মত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও সুগঠিত—এদের দেহ এমন ভাবে তৈরী যে গভীরতম তলদেশ থেকে—যেখানে জলের চাপ অতি ভয়ানক—এরা জলের চাপহীন উপরের স্তরে অনায়াসে আসা যাওয়া করতে পারে। খুব কম সামুদ্রিক প্রাণীর এ ক্ষমতা আছে।

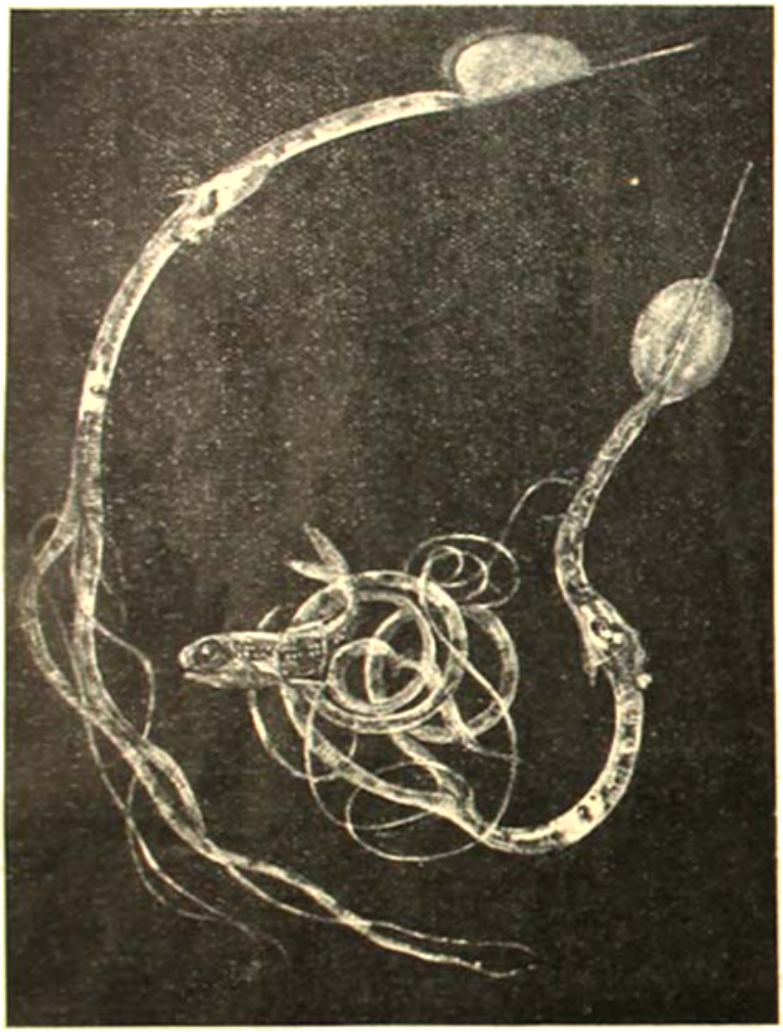

গভীর সমুদ্রতলের এক ভয়ঙ্কর স্কুইড।

আমাদের জালে একবার দুটো স্কুইড ধরা পড়ে, তাদের সরু লতার মত দেহের মাঝামাঝি একটা জলজ্বলে চোখ বসানো, সরু সরু হড়ির মত হাত পা একরাশ, নাগ-পাশের মত কঠিন বন্ধনে এরা শিকার জড়িয়ে ধরে, এই দড়াদড়ির মত অবয়বগুলির মধ্যে দুটো খুব বড়, দুটো খুব ছোট, বাকীগুলো মাঝারি। বরফজলে এরা অনেক দিন বেঁচে ছিল।

স্কুইড দেখতে অতি অদ্ভুত প্রাণী—এদের শরীর যেন দামী কোন স্বচ্ছ স্ফটিকে তৈরী, দুষ্প্রাপ্য চিনেমাটির বাসনের মত এদের সুঠাম গড়ন, মাঝে মাঝে রাঙা ও গোলাপী রংয়ের ছিট—মুখটা দেখতে গাছের পাতার মত কতকটা। কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এদের চোখ—অবিকল ইন্দ্রিয়ের চোখের মত দেখতে—নাক নেই, মুখ নেই, কান নেই, হাত পা নেই—সরু স্বচ্ছ, দীর্ঘ দড়ির মত দেহের মাঝখানে হরিণ-চোখের মত একটা সুগঠিত চোখ বসানো—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক দৃশ্য।

আরও একটা প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ ক'রছে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এখানে প্রবাল, starfish, sea urobin জাতীয় প্রাণী অর্থাৎ যারা একটা আশ্রয়স্থান ভিন্ন বাঁচতে পারে না—আলো নেই। তবে প্রবাল না থাকলেও তাদের নিকটতম আত্মীয় জেলিমাছ অজস্র দেখা যায়—জেলিমাছ সমুদ্রের উপরদিকের জলেও থাকে, সূর্য্যালোকের যেটা গোধূলি অঞ্চল অর্থাৎ নাবামাবি আয়গা সেখানেও থাকে—আবার চির অন্ধকারময় গভীরতম তলদেশেও থাকে। সে অনুসারে এদের দেহবর্ণও নানাধরণের হয়।

শামুক, গুগলি জাতীয় প্রাণী এই অঞ্চলে অজস্র—কিন্তু

সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে চিংড়ি কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীই কিন্তু বেশী—এদের যে কত বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি সমুদ্রের তলায় আছে, তার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হিসাব এখনও দেওয়া শক্ত—আমরা কতটুকুই বা দেখেছি। এদের বেগুনি বর্ণ টক্‌টকে

জেব্রাকীয় মীন-শিশু : আদি জলজ স্তন সমুদ্র-শৈবাল হইতে সমুদ্ভূত।

লাল। সমুদ্রের এই অংশে এক ধরণের পোকাজাতীয় প্রাণি আছে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদের শ্রেণীকে copepods বলে, এই পোকাই চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর খাদ্য। বড় বড় রঙীন্ পাড়ার সাহায্যে চিংড়ি মাছেরা জলে সাঁতার দেয়—এদের কারুর কারুর চোখ আছে, কেউ কেউ একেবারে অন্ধ, কারুর শরীর দিয়ে রঙীন্ আলো বার হয়, কেউ পাংলা ও স্বচ্ছ।

আমাদের জালে একরকমের মাছ পড়েছিল, অন্য কোন নামের অভাবে আমরা একে ড্রাগন মাছ বলব। ড্রাগন মাছের রং ঘোর কালো, দেহ সরু ও লম্বা, শরীরের দুধারে জাহাজের দুপাশের ঘুলঘুলির মত দুসারি আলো বসানো আছে—আবার কোন কোন ড্রাগন মাছের শরীর রূপালি আঁশে ঢাকা—প্রত্যেক আঁশখানার কেন্দ্রস্থানে একটা ক'রে ছোট পোলাপী রংয়ের আলো বসানো। এদের দাঁত তীক্ষ্ণ ছুঁচা করা মুখ দেখতে অতি নিকট, হঠকথার ড্রাগন নিছক কল্পনা ব'লে মনে হয় না এদের দেখলে। ড্রাগন মাছের শরীরের দু'পাশের দু'সারিতে সবসুদ্ধ একশো বত্রিশটা বাতি জ্বলে। সাধারণতঃ সাড়ে চারশো ফুট থেকে ছয়শো ফুটের মধ্যে এদের পাওয়া যায়—তার নীচে এরা বোধ হয় বাঁচে না।

আর এক ধরণের মাছকে আমরা বলেছি মাছ রাক্ষস। এদের চেহারা গঠন এমন অদ্ভুত যে ঘটো না দেখলে লোকে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেবে এদের কথা। এদের দেহ চার থেকে ছ' ইঞ্চি লম্বা, উঁচু নীচু দেহদণ্ড এখানে ওখানে ঠেলে ঠুঁড়ে বেরিয়েছে, বড় বড় দাঁত আছে, দাঁতগুলো ইচ্ছা মত ঠোটের ওপর দিকে ওঠানো যায় আবার নীচের দিকে নামানো যায়। এদের কপাল থেকে একটা সরু শিকলিকে, লম্বা দাঁড়ানত বেরিয়েছে, এই দাঁড়ার সঙ্গে ছোট্ট ও তিনটে বড়শির মত বাপোর আছে। এই বড়শি তিনটের সরু মুখ দিয়ে আলো বার হয়। এই ছিপ, ছোট্ট, বড়শি ও আলোর টোপ কি জন্য তা আমরা বলতে [illegible] গভীর [illegible] থেকে যখন জালে টেনে ওপরে [illegible] ত'ল, তখন

এদের মাছ : সরু শিকলিকে লম্বা দাঁড়া, ও তাহাতে বড়শি চারির

এ মাছ জীবন্ত ছিল না। কে ব'লবে যে এজাতীয় মাছ ছিপের সাধারণ শিকার সংগ্রহ করে কি না।"

পত্রলেখা

—শ্রীসুশীলকুমার দে

তুমি ত' দেখনি কত সে আপন মনের মাধুরী ঢাকিয়াছে,
যে চক্রাপীড়, তরলানিবিড় নিকষে তোমারে আঁকিয়াছে :
দাঁড়ালে কখন্ আড়ালে প্রাণের শতদলে,
দূর হ'তে তার আশা বার-বার লুটায়েছে আসি পদতলে।

দিবস-রাতির সাথীটি তাহারে করিলে যে ছিল বন্দিনী,
হ'ল আঁচল করকপুট-বাহিনী রাজার নন্দিনী ;
তবু কি অজ্ঞ অলকো করে কলহাসে ?
সুখের দুখের সঙ্গীটি, তবুও কখনো বুকের হ'ল না সে ?

ছিল উন্মনা নবযৌবনা নবমধুমাস-মঞ্জরী,
প্রাণের প্রান্তে ছিল একান্তে কত প্রীতি-গীতি সঞ্চরি ;
তন্বী-তনুর শ্লথি-বরণে নিকষিত
রেখেছ সোনাটি দেহের লীলায় লাবণ্যে ছিল বিকশিত।

ভাগ্য তোমার যেদিন তাহার মূরতি আঁখিতে দিল আঁকি,
মুখখানি তার প্রথম সেদিন প্রীতি-অমলিন ছিল না কি ?
করেনি হাসিটি, করেনি তোমারে বিস্মিত ?
কালো আঁখিতারা ছিল কথাহারা সেদিন আত্মবিস্মৃত।

কবরী-আঁধার-আবরিত তার আয়ত আঁখির আলো এসে
ধরেনি ঘেরিয়া আকুল করিয়া দেহটি তোমার ভালবেসে ?
ক্ষীণ কটিতটে কনক-মেখলা-কিঙ্কিণী
মৌন-বিলীন ছিল কি সেদিন, শোননি কি তার রিনঝিনি ?

মণি-নূপুরের রণিত সেদিন করেনি ধ্বনিত কানে-কানে
কুণ্ঠিত কলতানের অতলে যে-গীত উথলে প্রাণে-প্রাণে ?
নব মুকুলিত নিভৃত বুকের কূলে-কূলে
মুক্তার হার নিঃশ্বাসে তার ওঠেনি সেদিন দুলে-দুলে ?

তারপর সেছে কত নিশিদিন বিরামবিহীন হাসি-গানে,
তাহার কণ্ঠ-কাকলি আকুলি' বাজেনি কখনো আসি' প্রাণে ?
কাঁকনের সুর ঝরেনি মধুর ঝঙ্কারে
দিবস-রজনী মন রণরণি' মদনের ধনু-টঙ্কারে ?

অকূল হ'তে চকুল স্রোতে করেনি গন্ধভার প্রাণে ?
নয়নের কোণে অন্তমনে কি চাহনি কখনো তার পানে ?
থামেনি তোমার বাঁশীটি কখনো প্রীতিভারা ?
করেনি উদাসী অধরের হাসি বিজন-বাথার প্রীতিধারা ?

জোৎস্না-চিকণ অবগুণ্ঠন খুলে সে কখন্ মনোভুলে
নির্জন সাঁঝে নিসুজমাঝে বিনাইত বেণী বনফুলে,
সহসা সেখানে আসি' আনমনে চমকিয়া
মুখপানে তার চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়ায়েছ কভু থমকিয়া ?

চঞ্চ-মধুর মধু-রজনীর আবেশে আকুল বেশবাসে
সুরভি পবনে একা বাতায়নে বলিত স্রস্ত-কেশপাশে,
বুকে কি তখন পত্রলিখন ছিল আঁকা ?
বুঝি নিরমল যুগ্ম-কমল নীল-অঞ্চল দিল ঢাকা ?

সে ত চ'লে যেত চকিতের মত কখন্ আপনা' সঘরি'
লুণ্ঠিত বাস শুণ্ঠিত করি' কুণ্ঠিত-পদে সঞ্চরি' ;
মাধবী-মাসের মায়া-নিশীথের ছায়ালোকে
পড়েনি মুদিত প্রীতি-সমুদিত কমনীয় সেই কায়া চোখে ?

বিজয়-যাত্রা করিলে যাত্রা-সহচরী তারে সাথে করি',
প্রয়াণের পথে আপনার রথে তুলে নিলে তারে হাতে ধরি' ;
পরবী গ্রীবাটি বাঁকায়ে, হাসির রাগ মেখে
স্মিতিত মুখটি বার-বার, তার গিয়েছে কি কোনো দাগ রেখে ?

সম্মুখে যদাতে তুরগে যখন কটিতট তার ধরি' করে,
উড়িত অলক, পড়িত এলায়ে দেহটি দেহের পরিসরে ;
কেশের সুবাস করেনি উদাস মনটিরে ?
করেনি তাহার সেই দেহভার শিথিল প্রাণের গ্রন্থিরে ?

হবে নিশীথের সুপ্তি-সাগরে চাহে চরাচর লুটিবারে,
একই গৃহে দোঁহে মুদিতে নয়ন পাতিয়া শয়ন ছুটিবারে ;
কেঁদিয়া আঁধার আর নাহি তার আঁখি ভাসে ?
কোথা একপাশে লজ্জার বাসে রহে আপনারে ঢাকিয়া সে।

করিত কখন্ জ্যোৎস্নার আলো কালো কেশে বেশে বিথরিয়া,
আঁচলটি তার নিশীথ-অনিল করিত শিথিল শিহরিয়া ;
শিয়র-শিপানে কেশের কুসুম ঘুমগুলি
লুটিত, উঠিত বুকের শঙ্খ বসন বন্ধে কত ছলি' ;

দেখেছ তখন অর্দ্ধরাত্রে জাগি' সুমন্ত আঁখি দুটি ?
দেহের সুবাস ঝরেছে, পড়েছে মিনতির মত লুটিয়া কি ?
মধুর অধরে আধ-বিকশিত স্মিত-রেখা,
স্বপ্ন-লোকের খেলা কি চোখের কোরক-কিনারে দিত দেখা ?

কখনো বরষা ঘন বরষণে নামিত শ্রাবণে সারারাতি,
চপলা-চমকে মেঘের ধমকে আকাশে বাতাসে মাতামাতি,
ভয়-বিহ্বল তাহারে কাছে কি লহ ডাকি ?
কণ্ঠ তোমার আধ-ঘুমঘোরে বাঁধে বাহুডোরে সহসা কি ?

যূথী-কদম্ব-কেতকীর বাসে বাথিত বাতাসে নিশা সারা
দীপহীন ঘরে ঘুমহারা দুটি হৃদয় হয়নি দিশাহারা ?
কাঁপেনি বক্ষ মেঘ-গরজন-গৌরবে
গ্রহতারাহীন-আঁধার-বিলীন বাদল উতল সৌরভে ?

ছিল সে আপন ছায়ার মতন অচ্ছায়ে সুপ্তি-জাগরণে,
বেপথু-ব্যাকুল তবু নিরাকুল স্নিগ্ধ দেবার আবরণে ;
নিবিড় সহজ অলক্ষ্য ছলে ছিল কাঁপি',
তব অন্তর-অন্তরীক্ষ পবনের মত দিল ব্যাপি'।

যতনে তোমার কণ্ঠের হার কতদিন কত ফুল তুলি'
গেঁথেছে বিরলে সন্ধ্যার তলে বসিয়া এলায়ে চুলগুলি ;
রাজ-বালিকার ফুলমালিকার অন্তরে
যেমনি কি-গাথা ছিল বুঝি গাঁথা কামা-কামের মন্তরে ?

যে-মূরতি তার সুমারী-হৃদয়ে ছিল নিরালার কল্পনায়,
বসায়েছে যারে ধ্যানের আসনে আশা-নিরাশার আল্পনায়,
সে-মূরতি ধরি' দেহের মনের স্পন্দনে
তুমি এলে তার জীবনের মাঝে নব বেদনার বন্দনে।

বক্ষ-কারায় লক্ষ ধারায় ঝরিত যে-সুধা অঞ্জলি
ভাঙি মর্ম্মের মর্ম্মর-গিরি ওঠেনি কভু তা' চঞ্চলি' ;
সেই অনাবিল বাসনা-সলিল বুকে ভরি'
রহেছে সে মৃদু কলতানে শুধু, মুখের হাসিটি মুখে ধরি'।

অশ্রুসজল উজল আঁখিটি দেখনি, নাওনি তুলে বুকে ;
মরমী ছিল সে, তবুও সোহাগে চাওনি কখনো তুলে মুখে ,
সে রহিল শুধু স্নেহের সীমার সঙ্গিনী,
আর একজন হ'ল সে কখন তোমার অন্তরঙ্গিনী।

প্রীতির পরশ জাগাল যেদিন আপনা-বিলীন উদাসীরে,
বন্ধুটি, হায়, কোথা ভেসে যায় সেদিন সুখের সুধানীরে,
তোমারি লাগিয়া আপনার আশা দলি বুকে
তব সন্ধেশবাহিনী হ'ল সে, তব সুখতরে চলি সুখে।

উজল নব রস-পরিহাসে ক্ষণকাল তব অবকাশে
দেখেছ কি তার চোখে জলভার, বসায়েছ তারে তব পাশে
ছায়াটি পিছনে রহে, ফিরে দেখে কেই বা তা ?
আড়ালে আঁধারে কে খুঁজিবে তারে,
কে বুঝিবে তার সেই ব্যথা ?

ছিল বুকে তার ধ্যান-নিথর অমা-যামিনীর মত ভাষা,
ছিল বুকে তার অমা-যামিনীর বিজন বিপুল কত আশা ;
বাজিল প্রভাতে করুণ কণ্ঠে ভৈরবী,
আঁধারের পারে প্রাণের কিনারে উদয়-দুয়ারে কৈ রবি ?

অর্ঘ্যটি ধরি' স্বর্গের মাঝে সুধাতরে ছিল সুধালীনা,
প্রেম-মন্দিরে মন্ত্রবিহীনা ছিল উপাসিকা উদাসীনা ;
তারে ফেলে রেখে চলে গেলে তুমি কোন্ দূরে,
পড়েছে কি মনে কখনো পুরান্ জীবনে-জড়ান বন্ধুরে।

বিড়ম্বনা

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বরযাত্রী আসিয়াছে নবদ্বীপ হইতে। আর সব আখড়ার যেমন হয়,—অস্বাভাবিক রকম তাহিরে বরকর্তা; পিঠি মাছের মত কালো, চিক্‌চিকে নাপিত; ঘাড়-কামান চাংড়া, পেশাদারী বরযাত্রী ছোকরার দল—চাষে এলে না, খোসামোদে গলে না; বরও তোমার আমারই মত—নেহাৎ আটপৌরে গোছের। তবে পুরুৎ আসিয়াছে নাকি মহা এক সিদ্ধপুরুষ পণ্ডিত।

মুণ্ডিত মাথায় সুপুষ্ট শিখা, দীর্ঘ দীর্ঘ দেহ, নামাবলী গায়ে, খড়ম পায়ে অনাচার বাঁচাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এক একটা সংস্কৃত বুলিই বা কি, আর তার উচ্চারণই বা কি! নস্যতে পর্য্যন্ত যেন একটা টুলো সংস্কৃত-সংস্কৃত গন্ধ, নাকে টিপিয়া দিয়া হাতে তালি দেন—যেন বিসর্গ করিতে থাকে।

গ্রামের মাতব্বরেরা আসিয়া আলাপ করিয়া গেল। মাতব্বরদের মাতব্বর শিবনিবাস, রায়চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আগে খানিকটা চাইনে বাঁধে মাথা ঢুলাইয়া লইয়া, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বলিলেন—"না, ন্যায়ালঙ্কার মশা'র বিদেয় থই নিতে হ'লে ডুবরি নামাতে হয়।"

সকলের মুখ সম্ভ্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; শিবনিবাসের মুখেই যখন এই কথা! এক ইংরেজী কেতাবই যাহার অস্ত্র করিয়া ধরিলেও তিন চারখানা পড়া আছে। হরু চক্রবর্তী রামলোচন ভট্টাচার্য্যকে একটু ঠেলিয়া বলিল—"যাও না হে ভট্‌চায, একবার আলাপ পরিচয়টা ক'রেই এসনা, গ্রামের মুখ রাখতে তো তুমিই; অতবড় একটা বিচক্ষণ পণ্ডিত এসেছে…"

সকাল থেকে এইরকম প্রশংসা শুনিতে শুনিতে রামলোচনের মেজাজ নিতান্ত তিরিক্ষি হইয়া ছিল, হুঁকা হইতে মুখটা ছিনাইয়া খাঁক্ খাঁক্ করিয়া উঠিল—"আরে ন্যাও ন্যাও রেখো ভট্‌চায ও রকম ঢের নেড়ালঙ্কার দেখেছে; তোমরা দেখনি কখন, হাংলার মত ঘিরে ব'সে।… আমি সেধে যেতে গেলাম কেন হ্যা? বলে, আমার সিন্দুকে এক একটা উইয়ের পেটে যে বিদ্যে আছে তা রক্ষে ক'রতে ওরকম ন্যায়ালঙ্কারের দশটা জন্ম কেটে যায়, হুঃ।"

সত্যই তো, কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভাপণ্ডিত জগন্নাথ কাব্যচূড়ার বংশধর; সিন্দুক খুলিয়া যখন তালপাতার পুঁথি শুকায় তখন উইয়ের মাটিই বাহির হয় আড়াই সের করিয়া! কয়েকজন সমর্থন করিয়া বলিল—"হুঃ, ঠিকই তো; কেন গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রতে যাবে? সংস্কৃতটা ব'লে একটা জিনিস আছে তো?"

প্রসন্ন কবিরাজ রোগীর নাড়ী টিপিবার সময় প্রায়ই দু'একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায় এবং সেই সূত্রে গ্রামের পণ্ডিতির আসনটা লইয়া তাহার রামলোচনের সহিত রেষারেষি আছে। উঠিয়াই যাইতেছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তা' হ'লে বিকেলের দিকে, কথাবার্ত্তা কইতে কইতে ন্যায়ালঙ্কার মশাইকে না হয় তোমার ওখানে নিয়েই আসা যাবে'খন।"

রামলোচন একটা তির্য্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"তুমি বুঝি টের পেয়েছ আমার বৈকালে একবার কানাইদহে যেতে হবে আজ?"

"ও!…রাত্তিরে কিন্তু ফিরবে তো?"

রামলোচন কোন উত্তর দিল না, হুঁকার উপর বাঁ হাতটা আরও কষিয়া ধরিয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিল।

ইঠানের নারখানে চাঁদোয়া টাঙাইয়া তাহার নীচে বিবাহ হইতেছে। চারিদিকে লোকের ভিড়, কতক বসিয়া, কতক দাঁড়াইয়া। সব বয়সের লোক, তবে যুবকের ভাগ এখন কম; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলের চর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেছে—স্ত্রী-আচারের খবর পাইলেই তাহারা আসিবে। নেশাপত্র বন্ধ করিয়া বুড়াদের মধ্যে বসিয়া নাহক্ আ-বং শোনা পোষায় না।

পুরুৎদের মধ্যে খিটিমিটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎ হইতেই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় প্রকাণ্ড এক সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়িয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে অভিনন্দিত করেন—বোধ হয় অভিনন্দিত করেন, কেন না তাহাতে সাপ ছিল কি ব্যাং ছিল রামলোচন কিছুই ঠাহর করিতে সমর্থ হয় নাই।

শ্লোকের অর্দ্ধ পথেই হঠাৎ একটি ছোট ছেলের মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া সে মোহাড়াটা সামলাইয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া আছে এবং সেইজন্য রাগে ক্রমশ ঘরিয়া হইয়া উঠিতেছে।

"না, না, ওকি ছোল ভট্টাচার্য্য!···ওটুকু এইভাবে ক'রতে হবে যে···"

রামলোচন কখনও নীরবে মানিয়া লইয়া সংশোধন টুকু সারিয়া লইতেছে, কখনও বলিতেছে—"উভয় প্রকারই হয়" কখনও বা একটু রুখিয়াই জোর দিতেছে—"এ প্রান্তে এইটিই পদ্ধতি।"

"পদ্ধতি!"—ন্যায়ালঙ্কার সিধা হইয়া বসেন, মুখে দম্ভের শাণিত ব্যঙ্গহাস্য—"ভট্টাচার্য্য মশায়, সূর্য্য যেমন গ্রহ উপগ্রহাদি সমস্ত উদ্ভাসিত করেন, এক নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সেইরূপ আসমুদ্র হিমাচল সারা বঙ্গদেশের উপর সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় বিধানের আলোকসম্পাৎ করেন। এতদিন যদি এখানে এই অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিই চ'লে এসে থাকে তো বৈদিক আচার দূর হ'য়েছে, বেদ অবমানিত হ'য়েছেন ব'লতে হবে!"—দুই চক্ষু অনল বর্ষণ করে, নস্যের সাধারণ টিপে কুলায় না।

রামলোচনের মুখ রাঙা হইয়া উঠে, তাহার পর কালো হইয়া যায় যখন কবিরাজ বলে—"হাঁ, হাঁ, রামলোচন, আমাদের পরম ভাগ্য যে ন্যায়ালঙ্কার মশাইয়ের পায়ের ধুলো পড়েছে, ভুলভ্রান্তি গুলো সব শুধরে নাও; অবশ্য এত গলদ একদিনে যাবার নয়, তবু···"

ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল। এক কন্যাকর্ত্তা শুধু উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন, আর সকলেরই আশা আজ শেষ পর্য্যন্ত একচোট টিকি ছেঁড়াছেঁড়ি চলিবে। আপাততঃ রামলোচনের মনের সূত্র ক্রমাগতই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ন্যায়ালঙ্কার যে-পরিমাণে সাহায্য করিতে তৎপর হইতেছেন গ্রন্থিতে সেই পরিমাণে বেশী জট পাকাইয়া যাইতেছে মাত্র।

এইরূপ পুরোহিতদের স্কন্ধের মধ্য দিয়া বিবাহের মিলনের কাণ্ডটা আগাইয়া চলিল। রামলোচন খুব সাবধানে অগ্রসর হইতেছে; অর্দ্ধেকটা মন রহিয়াছে মন্ত্র পড়ান আর আত্মরক্ষার দিকে, অর্দ্ধেকটা অপর পক্ষের ছিদ্রান্বেষণের দিকে.—একটা কিছু ভুল হইলে হয়, এতটুকু স্খলন—শুদে আসলে সব তুলিয়া লইবে ভদ্রে তাহার, নাম রামলোচন ভট্টাচার্য্য!

সম্প্রদান আসিয়া পড়িল। রামলোচন আগের মন্ত্রটির অনুবাদ বিসর্গের একটা ভৈরব টঙ্কার দিয়া আসনের উপর পা দুটা গুটাইয়া লইয়া বলিল—"নাও, এইবার আসল কাজ; মেয়েটিকে খাইয়ে পরিয়ে এতদিন মানুষ ক'রলে এইবার পর ক'রে দাও হে অবিনাশচন্দ্র।·····এটা হ'ল বাপের নাড়ী কাটা—" ব্যবসায়গত এই রসিকতাটুকু করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু স্মিত হাস্য করিল।

কংবেলের নস্যাধারে দুই তিনটা টোকা মারিয়া ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন—"নিজের হাতে নিজের নাড়ী কাটা"—বলিয়া, আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের রসিকতায় প্রবল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"অতি সমীচীন কথা, অতি সমীচীন কথা, পণ্ডিতের যোগ্যই কথা" বলিয়া রামলোচনও হাসিতে লাগিল; চেষ্টা-প্রসূত বলিয়া হাসিটার জোরও হইল বেশী এবং অনেকক্ষণ স্থায়ীও হইয়া রহিল।

কংবেলটা আগাইয়া ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন—"আসুন, লস্য···"

গ্রহণ করিয়া বাঁ হাতে ঢালিতে ঢালিতে রামলোচন বলিলেন—"বাঃ, কাশীর নিশ্চয়; দেখেই চেনা গেছে।··· অমন লস্য আর কুত্রাপিতে···"

"নাঃ, এ খোদ নবদ্বীপের। আমার ও আপনার কাশীটাশীর লস্য তেমন···"

"নাঃ, বাধল না, ভাব ক'রে ফেললে" বলিয়া কতকগুলা ছোকরা নিরাশ হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল; রামলোচন বলিলেন—"মন্দ নয়, তবে কাশী-নবদ্বীপে প্রভেদ আছে বৈকি—কথায় বলে বারোশীধাম, শিবের ত্রিশূলের উপর যার স্থিতি···"

ন্যায়ালঙ্কার একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"নবদ্বীপের মহিমা অর্ব্বাচীনে কি জানবে?"

"কাশীর নিন্দা এক মুখের মুখেই শোভা পায়!"—রামলোচন গলার চাদরটা কোমরে জড়াইবার উপক্রম করিয়া ঠেলিয়া উঠিল।

"লেগে গেছে"; বলিয়া ছোকরাদের দল সানন্দে ফিরিয়া আসিতেছিল। বয়স্ক লোকেরা মিলিয়া দুইজনকে থামাইয়া দিল। ছোকরারা একটু চেঁচা করিল; দু' একজন একটু পাশে গিয়া গলা চড়াইয়া বলিল—"হ্যাঃ, রাসী তো কাশী, একটা ত্রিশূলের ডগায় উঁম্ উঁম্ ক'রছে

দু' একজন উত্তর দিল—"যা-যাঃ, রেখে দে তোর নবদ্বীপ···"ধমক-ধামক দিয়া তাহাদেরও সরাইয়া দেওয়া হইল।

রামলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"নাও, মালাটা দু'জনের হাতে একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে দাও···নবদ্বীপের নিকুচি ক'রেছে···বল—সবস্থাং সালঙ্কারাং···প্রজাপতিদেবতাকা

মন্ত্রিত···মেনাং···কন্যাং···তামহং সম্প্রদদে···ঠিপত্র আর তিল সুদ্ধ জল হাতের উপর ছিটিয়ে দাও···নিন্, আপনি বরকে বলান্ এবার।"

"বর অশুদ্ধ।"—বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার হাত পা আসনের উপর গুটাইয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

"অশুদ্ধ!"—রামলোচনের বাঁ হাতের বস্তের টিপটা আস্তে আস্তে ঘুসিতে রূপান্তরিত হইল।

"অশুদ্ধ।—স্বামহং নয়, ওটা তুচ্ছার্থে হবে: ক্ষুদ্র বিভক্তি দোষাং। 'সম্প্রদানে চতুর্থী'—একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুও এ সূত্রটা অবগত। নবদ্বীপের বর ও মন্ত্র অগ্রাহ্য ক'রলে; ও ওর বোধাতীত, ধারণাতীত।"

সমস্ত সভা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দু' একজন ছোকরা বাহিরে দৌড়াইয়া গেল,—তাহারই বা' একটু শব্দ। রামলোচনের দু'টো হাতই মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা কিছু করে করে, ঠিক এমন সময় তাহার বুকটা হঠাৎ উচ্ছল হইয়া উঠিল, মুঠা দু'টাও শিথিল হইয়া গেল। স্পষ্ট, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কম্ম দোষাং? সম্প্রদানের সময় কি ক'রতে হবে ব'ললেন?"

সংস্কৃতের বহর দেখিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আর সংস্কৃতে উত্তর দিলেন না, বলিলেন—"শুদ্ধ বিভক্তির অভাবে অমার্জ্জনীয় ভ্রম হ'য়েছে—দ্বিতীয়া হয় না"—চাপা কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ হইল—"মূর্খ!"

"বিভক্তির অভাবে ভ্রম! তাও আবার অমার্জ্জনীয়!" রামলোচন গভীর বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ন্যায়ালঙ্কারের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার দক্ষিণ হাতটা অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আপনারা এখানে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত। অর্ব্বাচীন মূর্খ এক সামান্য পুরোহিতের একটা নিবেদন দয়া ক'রে শুনতে হবে। ন্যায়ালঙ্কার ব'লে পরিচয় দিয়ে যিনি আজ পুরুতের আসন দখল ক'রে বসেছেন, তিনি এ-পর্য্যন্ত অনেক তর্কের কথাই মাঝে মাঝে তুলে গেছেন। সে-সব শাস্ত্রীয় কথা ব'লে ইতর-সাধারণের বোধগম্য নয়, তাই সে-সব কথা আর তুললাম না, এমন কি ওঁরা আমাদের অভ্যাগত ব'লে দু' একটা ছোটখাট কথা ভদ্রতার খাতিরে যে মেনেও নিয়েছি তা আপনারা প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। এতক্ষণ ধরে আমি ন্যায়ালঙ্কার মশাইয়ের বিদ্যের এমন একটা নমুনা খুঁজছিলাম যাতে আপনাদের সকলেই এক কথায় তাঁর পরিচয় পেয়ে যেতে পারেন। তা' এতক্ষণে পেয়েছি। ন্যায়ালঙ্কার ব'লছেন—মন্ত্রে বিভক্তির অভাবে ভ্রম হ'য়েছে। কথাটা খুব ভাল ক'রে শুনুন আপনারা, বি-ভ-ক্তির অভাবে ভ্রম। আচ্ছা এইবার আমি জিজ্ঞাসা করি···না, এখানে সবই বেটাছেলে—অল্পবিস্তর সবাই শিক্ষিত—বাড়ির মধ্যে থেকে কোন একজন প্রাচীনাকে ডেকে দিতে হবে। অবিনাশের মা-ই আসুন, তাঁর চেয়ে আর প্রাচীনা কে আছে?···যাও হে অন্নদাচরণ, আমার নাম ক'রে মাকে ডেকে নিয়ে এস—ব'লবে একটা সমস্যা পূরণ তাঁকে ক'রে দিতে হবে, নবদ্বীপের ন্যায়ালঙ্কার মশাই ন্যায়-অন্যায়ের এক মহা সমস্যা তুলেছেন।"

চাপে চাপে ভিড়; কিন্তু একটুও টুঁ-শব্দ নাই। ন্যায়ালঙ্কারও একবারে হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছেন। একটু পরেই অন্নদাচরণের পিছনে পিছনে একজন প্রায় অশীতিপরা বৃদ্ধা আসিয়া এক পাশটিতে দাঁড়াইলেন। পরণে খান কাপড়, কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা; কিন্তু প্রায় সকলের চেয়েই বড় বলিয়া ওরই মধ্যে বেশ লক্ষ্যভিত। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন; একটু চাপা গলায় ভিতরের ঘরেই বলিলেন,—"বলি, হ্যাঁগা রামলোচন, বিয়ে দিতে এসব কি বিধি, কথাকাটাকাটি চ'লবে শুনছি? একটা অমঙ্গল না ঘটিয়ে·····"

রামলোচন নিতান্ত বিনতির স্বরে বলিল—"আমি তো ডেকাইনি, কোন কথাই তুলিনি; মুখুয্যেদের পেয়ো পণ্ডিত,

যেমন ওবঙ্কেশের বিয়ে দিয়েছি, অন্নদার দিয়েছি, তেমনি জ্ঞান নিশ্চেই তাদের ছেলে মেয়েদের দিচ্ছি। তবে এই ন্যায়ালঙ্কার মশাই মহা এক সমস্যা তুলেছেন—সেটা মীমাংসা না ক'রে দিলে আমি আর এগুতে পারছি না—সেরস্তর মঙ্গল অমঙ্গলের কথা কিনা।"

ভীত কণ্ঠে উত্তর হইল—"ওমা, কি সর্ব্বনেশে কথা! তা আমি মেয়েমানুষ তার কি নিষ্পত্তি ক'রব বাছা; এত সব জানিয়ে-বলিয়ে পুরুষ মানুষ র'য়েছেন……"

"আছেন; তবে কথাটা এতই সাধারণ যে একজন মেয়ে মানুষও ব'লে দিতে পারে, অন্ততঃ আমাদের কোটালপুরের মেয়েতে পারে, আমি এইটিই জানাবার জন্যে তোমায় একটু কষ্ট দিলাম, জেঠাইমা: গ্রামটার বুধ্যুদের আড্ডা ব'লে একটা বদনাম আছে কিনা।" ন্যায়ালঙ্কারের পানে একটা কটাক্ষ হানিলেন; মুখের শঙ্কাকুল ভাব দেখিয়া বোঝা গেল—তিনি অনেক কাবু হইয়া আসিয়াছেন।

রামলোচন বুঝিল এবার তাহার পালা, আর ঠেকায় কাহার সাধ্য। একটা চাড়া দিয়া সিধা হইয়া বসিয়া বলিল—"খুব একটা চলতি মেয়েলী কথা নিয়ে আরম্ভ ক'রছি, আমাদের মুখ্যু গ্রাম, সবাই বুঝতে পারা চাইতো?……জেঠাই মা, তোমরা দু'টো মেয়েলী কথা ব্যবহার কর,—একটা 'ছিরি' আর একটা 'বি-ছিরি'…ব'ললে—'আহা, ন্যায়ালঙ্কার মশাইয়ের বেশ ছিরি আছে বাপু; কিন্তু এই টেকো রেখো পণ্ডিতটা কি বিচ্ছিরি রে!' '—তা' এখানে ছিরি ব'লতেই বা তুমি কি সাব্যস্ত ক'রতে চাইলে আর বিচ্ছিরি ব'লতেই বা কি সাব্যস্ত করতে চাইলে?"

ন্যায়ালঙ্কার সহজ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টায় নিজের করতলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন—"বালাই, অমন ছিরি তোমার, সভা-আলো-করা চেহারা; তুমি বিচ্ছিরি হ'তে যাবে কেন? ষাট্।"

"হাঁ, মায়ের চোখে সব ছেলেই সভা-আলো-করা। যাক, আমি কন্দর্প। তা'হলে 'ছিরি' কথাটার আগে 'বি' এই উপসর্গ লাগালে 'ছিরি'র অভাব এই অর্থ হ'ল তো, জেঠাই মা? আমাদের পাণিনিও বলেন 'বিত্ত অভাবাৎ'—কিনা 'বি' অভাব সূচিত করে…"

"কি জ্বালা! তাতো ক'রবেই; ছেরকালটা ক'রে আসছে। 'বি' কথাটা কি ভাল গা? সংসারে বলে বিমাতা—ভিন্ দেশে গিয়ে লোকে কষ্ট পায়,—বলে 'বিকুঁই'।

"হ'য়েছে হ'য়েছে; কোন টোলের দিগ্‌গজও এরকম ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে পারবে না। এখন আসল কথায় আসা যাক,—ভক্তি তো হোল ভক্তি; বি-ভক্তি আ' হ'লে কি হ'ল জেঠাইমা? শুনছি আজকাল নবদ্বীপে মন্ত্রের মধ্যে বি-ভক্তি এনে ফেলছেন সব—বোধ হয় বাপ ঠাকুরদা'র আমলের পুরানো জিনিস ব'লে অশ্রদ্ধা হ'য়ে আসছে…"

"ছি ছি, বিয়ে দিতে ব'সে অলুক্ষণে কথাগুলো মুখে এনো না রামলোচন, তোমাদের হ'ল কি? কোথায় ভক্তি ক'রে মন্ত্র পড়াবে, না…"

রামলোচন হাত দুইটা চিৎ করিয়া বিমূঢ় ন্যায়ালঙ্কারের দিকে দেখাইয়া বলিল—"ওই ওঁকে বল মা, আমি মুখ্যু, আমি অর্ব্বাচীন, আমার তো ভক্তিই সম্বল; সেইটুকু বজায় রেখে যেমন মন্ত্র পড়াতে হয়, পড়িয়ে যাচ্ছিলাম; হাঁা, স্বীকার করি তা'তে একটু বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছিল, তা ক্রমাগত—বিভক্তি—বিভক্তি—বিভক্তি—অত ভক্তিটক্তি আমাদের নবদ্বীপের আজকালকার বর বোঝে না, ধারণাই ক'রতে পারে না… আমি বলি—এ কিরে বাপ!…এই এতগুলো লোক শুনছে, আমি কিছু বানিয়ে বলছি না। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, প্রসন্ন কবিরাজ তো বুঝেছে?"

না বুঝিয়া উপায়ই ছিল না,—প্রসন্ন কবিরাজ বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইতে লাগিল; বরং, নেহাৎ সে অন্ন বুঝে নাই, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটু যুক্তিরও অবতারণা করিল—"দুজনার মধ্যে সম্প্রদান, তা'তে দ্বিতীয়া না হ'য়ে চতুর্থী হয় কোথা থেকে ন্যায়ালঙ্কার মশাই?…ঐ তো নয়!…"

রামলোচন ন্যায়ালঙ্কারের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এক বার সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল—"নিন্ এইবার বুঝলেন তো সে বিদ্যের কাঁক, না শুধু লম্বাইই কাঁক। আগে দেখলাম একটু রাশ ঢিলে দিয়ে…বলে আমার সিন্দুকের উইয়ের পেটে যা বিদ্যে আছে… হুঁ:!"

সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ালঙ্কারের পানে একটি বক্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"নিন্ মশাই, বরকে বিভক্তি অভক্তি যা পড়াবেন পড়ান, এদিকে আমাদের মধ্যে ভক্তিই পদ্ধতি—নবদ্বীপের নবপদ্ধতি চালাতে গিয়ে সেরস্ত নারাজ। শুনলেন তো?"

সমর্থনের একটা গুঞ্জরোল উঠিল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় হাতে নস্যের টিপ লইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। চারিদিকের কলরোলের মধ্যে এক তিনিই চাপা স্বর শুনিতে পাইলেন—"হাঃ, এই হাটে বিভক্তি দেখাতে এসেছেন—দ্বিতীয়া নয় চতুর্থী!—তোর চতুর্থীর নিকুচি ক'রেছে…"

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

একশ' বছর আগে একদিন পাঠশালায়

একশ' বছর আগেকার পাঠশালায় একদিন সকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

ভৈরবপুরে চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। দিনে চইবার। একবার সকাল বেলায় আর একবার বৈকালে।

ভোর বেলা। একটি ছোট্ট ছেলে, তখনও ভাল করিয়া চোখ হইতে ঘুম যায় নাই, তালের চটী, আর পাত্‌তাড়ি হাতে করিয়া উপস্থিত। পাঠশালায় কেহ নাই দেখিয়া, সে যেন আনন্দিত হইয়া উঠিল। সে আজ শূদ্রের ঘরে। কাল গায়ের ঘরে পড়িয়া সে বড় মার খাইয়াছে।

তাহাকে ডাকিয়াই ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম। যে সকলের প্রথমে আসিবে, সে অন্য সব ছেলের হাজিরা রাখিবে। যে প্রথমে আসিবে সে শূদ্রের ঘরে, যে তাহার পর আসিবে সে একের ঘরে, যে তাহার পর আসিবে সে দু'য়ের ঘরে, এইভাবে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি হিসাবে হাজিরা লেখা হয়।

দেখিতে দেখিতে পাঠশালা বসিয়া গেল। গুরুমহাশয় আসিলেন। হাজিরা গ্রহণ আরম্ভ হইল।

হাতছড়িটি হাতে লইয়া গুরুমহাশয় শূদ্রের ঘরে ছেলেটিকে ডাকিলেন। সে সকলের আগে আসিয়াছে, হয়ত তখন হাতমুখ ধোয় নাই, অতএব তাহার শাস্তি সকলের অপেক্ষা কম হইল। বেতের আগা দিয়া সামান্য একটা খোঁচা দিলেন মাত্র। তারপর সেই শূদ্রের ঘরের ছেলে চীৎকার করিয়া যথাক্রমে নাম ডাকিতে লাগিল।

পাচু একের !

পাচু আসিয়া হাত পাতিল। সপাং করিয়া এক ঘা বেত পড়িল। কাল বিকালে কুল-কাঁটা হাতে ফুটিয়া যাওয়ায় পাচুর ব্যথা হইয়াছিল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ফ'টকে দুয়ের !

ফ'টকে আসিবার আগেই কাঁদিয়া ফেলিল। হাত পাতিতে হইল। দুইবার সপাং সপাং করিয়া বেত পড়িল।

একরড়ি তিনের !

বিন্দে চারের !

খ্যাপা পাঁচের !

সপাং সপাং ছড়ি পড়িতে লাগিল। শিশুকণ্ঠের অসহায় ক্রন্দনে পাঠশালা মুখর হইয়া উঠিল।

মনে হইল ভুল হইয়াছে, জমিদারের কাছারীবাড়ীতে বোধ হয় আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, না, এ পাঠশালা-ই, বেত হাতে নায়েব নয়, গুরুমহাশয়ই !

হাজিরাগ্রহণ শেষ হইল।

কিন্তু কেষ্টা গেল কোথায় ? কাল সে গুরুমহাশয়ের দাড়ির তলায় বেলকাঁটা রাখিয়া দিয়াছিল। আজ সে পাঠশালায় আসে নাই।

শূদ্রের ঘরের ছেলে গেল কেষ্টার বাড়ীতে, খোঁজ লইতে।

কেষ্টার মা জানাইলেন, বাছা ভোরবেলাই পাত্‌তাড়ি লইয়া বাহির হইয়াছে।

খোঁজ, খোঁজ ! কেষ্টা গেল কোথায় ?

বহু অনুসন্ধানের পর কেষ্টাকে পাওয়া গেল।

মাধব ঘুণীর আটচালায় কালীয়-দমনের যাত্রা আছে। সেখানে সে নাচ শিখিতেছিল।

পাঁচ ছয়জন ছেলে মিলিয়া হাত পা ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

কলাকার কথা গুরুমহাশয় ভোলেন নাই। কেষ্টার "নাড়ু-গোপাল" হইল।

দুই পা এবং বাম হাত মাটীতে রাখিয়া ডান হাতে একটা ভারি ইট চাপাইয়া দেওয়া হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নাড়ু অপহরণ করিয়া নাড়ু-গোপাল সাজিতেন।

এক দণ্ড, দুই দণ্ড চলিয়া গেল। কেষ্টা আর পারে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছে।

তাহার পর কেষ্টার "কলাগাছ" হইল। পাঠশালার খুঁটিতে নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত বিচুটী আর আলকুষীতে জড়ানো হইল। সেই খুঁটী ধরিয়া নগ্ন দেহে কেষ্টাকে উপরে উঠিতে হইল।

যন্ত্রণায় বালক চীৎকার করিয়া উঠে আর গুরুমহাশয়ের হাতে বেতের সপাং করিয়া শব্দ হয়।

যন্ত্রণায় অজ্ঞানের মত হইয়া কেষ্টা মাটিতে পড়িয়া যায়।

রক্তচক্ষু করিয়া গুরুমহাশয় বলেন, এর পরও যদি বাঁদরামি কর তাহ'লে কপিকল!

কপিকল কি তাহা জানিবার কৌতূহল দমন করিয়া জ্বরে পলাইয়া আসিলাম।

আসিতে আসিতে শুনিলাম, গুরুমহাশয় হাঁকিতেছেন,—

পালান-পিঠে এ লেখ,

তেপুঁটুলে শ লেখ,

হলহলে ছ লেখ।

মলেয়ার

আজকে তোমাদের মলেয়ারের জীবনের গল্প ব'লব। মলেয়ার কে জান?

ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় নাটকার—ফ্রান্সের মহাপুরুষদের মধ্যে একজন মহাপুরুষ। ফ্রান্সের কেন, শেক্‌স্‌পীয়ারের মত মলেয়ার হ'লেন সকল দেশের সকল জাতির একজন শ্রেষ্ঠ নাটকার।

তোমরা জান এই মানুষের জীবনে নিত্য কত অঘটন ঘ'টছে। অতি দরিদ্র লোক অধ্যবসায়ের বলে জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী হ'য়েছেন, পথের ভিখারী অনুচরের শক্তিতে রাজার সিংহাসনে ব'সছেন, রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য তাপস-ব্রত গ্রহণ ক'রছেন, মা ছেলের জন্য মৃত্যুকে বরণ ক'রছেন, বন্ধু বন্ধুর জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রছেন—ত্যাগে, দানে, শক্তিতে, শৌর্যে, মানুষ এই পৃথিবীকে স্বর্গ ক'রে তুলছে।

কিন্তু এই যে মানুষের জীবন, এর আর একটা দিক আছে। সেখানে মানুষ অজ্ঞানতার জন্য নিত্য ভুল করে, বোকামীর জন্য নিজেকে এবং সেই সঙ্গে অপর সকলকে বিব্রত ক'রে তোলে, একটু খানি স্বার্থের মোহ বজায় রাখবার জন্য মানুষ সেখানে অবলীলায় পাপ আর অন্যায় করে, নিজেদের দোষত্রুটি লুকিয়ে রেখে লোকের সামনে সাধু সাজবার প্রাণপণ চেষ্টা করে; সেখানে সে একটুতেই ভুল করে, একটুতেই হেসে উঠে, একটুতেই আঘাত ক'রতে যায় এবং তার ফলে একটুতেই আহত হ'য়ে পড়ে—সেই যে মানুষের মনের অন্ধকার দিক, তা দেখে দেবতারা হাসেন আর দুঃখে তাঁদের চোখেও জল ফেলেন, মলেয়ার তাঁর নাটকে মানুষের মনের সেই অন্ধকার দিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের সেই সব ভুল ত্রুটি দেখে তিনি দেবতার মত হেসেছেন এবং হাসতে গিয়ে মানুষের দুর্গতি দেখে গোপনে চোখের জল মুছেছেন। মলেয়ারের নাটকগুলি যখন তোমরা বড় হ'য়ে প'ড়বে, তখন দেখবে, মানুষের যে-সব ত্রুটির কথা তিনি লিখে গিয়েছিলেন, আজও সমান ভাবে সেই সব ত্রুটি আমাদের আজকের মানুষের মধ্যে একটু ভাবে র'য়েছে। সেদিন যদি পার, মলেয়ারের নাটক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তোমাদের আশেপাশের জীবনের দিকে চেয়ে দেখ, চিনে নিও কোথায় মানুষ ভুল ক'রে চ'লেছে, আর যদি পার, মানুষের সেই সব দোষত্রুটি দেখে মলেয়ারের মত হেসে উঠ এবং সেই সঙ্গে ভুল না, যারা ভুল করে, জগতে তাদেরই সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তোমাদের সমবেদনার।

মলেয়ারের নাটক যেমন আমাদের জীবনকে নতুন ক'রে দেখতে শেখায়, মলেয়ারের নিজের জীবনও কিন্তু তাঁর নাটকের চেয়ে কম বিচিত্র নয়।

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বার বছর আগে, অর্থাৎ ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী শহরে মলেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন অবশ্য তাঁর নাম মলেয়ার ছিল না। যে নামে আজ তিনি জগতে পরিচিত সে-নাম তিনি পরে নিজেই গ্রহণ করেন এবং জন্মাবার সময় তাঁর বাপ-মা যে-নাম রেখেছিলেন তাঁর নিজের নেওয়া নামের আড়ালে সে-নাম একেবারে হারিয়ে যায়। তাঁর বাপ মা নাম রেখেছিলেন জঁা বাপ্‌তিস্তে পোকেলেঁ।

তাঁর বাবা আসবাব পত্র তৈরী ক'রতেন এবং পরে রাজ-প্রাসাদের আসবাব পত্র তদারক ক'রবার চাকরী পান। শেক্‌স্‌পীয়ারের জীবনে তোমরা দেখেছ, তাঁর বংশের মধ্যে কারুর যে থিয়েটার বা নাটক দেখার কোনও প্রীতি ছিল এমন কোন কথা জানা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ার নিজে ঘোড়া ধরবার চাকরী নিয়ে থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু মলেয়ারের জীবনে অতি বালক-কাল থেকে থিয়েটারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় হয়।

তাঁর ঠাকুরদাদার থিয়েটার দেখার বড় সখ ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁ-কে তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। সেই শিশুকালেই থিয়েটারে গিয়ে গিয়ে থিয়েটারের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ তাঁর মনে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর বাবা ছেলের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে স্কুলে পাঠালেন। স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, তিনি আইন প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু আইন পড়ায় তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল না—তাঁর বাবা চেয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে যাতে রাজপ্রাসাদের চাকরীটি পায়, এখন থেকেই তার ব্যবস্থা করা।

কিন্তু ছেলেটির মনে ছিল অন্য বাসনা।

সে-সময় ফরাসী দেশের সিংহাসনে ছিলেন চতুর্দশ লুই। নানা দিকের ঐশ্বর্যে তখন তাঁর রাজত্ব ভ'রে উঠছিল। ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন জাগরণের সময় এসেছে তখন। বড় বড় নাট্যকার, বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক তখন ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। রাজ-দরবারে তাঁদের অসীম সম্মান।

সেই সব সাহিত্যিক এবং কবিদের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান দেখে মলেয়ারের মনে তাঁর বাসনা হ'ল যে, তিনিও লিখে তাঁদের মত খ্যাতি অর্জন ক'রবেন। কাঠের আসবাব তৈরী ক'রে শুধু কোন রকম ক'রে দুমুঠো অন্নের জোগাড় হ'লেই কি জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হ'য়ে গেল?

আত্মীয়স্বজন কারুর কথা না শুনে তিনি গোপনে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটা থিয়েটারের দল তৈরী ক'রলেন। নিজে সেই দলের নাট্যকার, অভিনেতা, অধ্যক্ষ হ'লেন। এই সময়েই তিনি বাপ-মায়ের দেওয়া নাম ত্যাগ ক'রে মলেয়ার নাম গ্রহণ ক'রলেন। এবং এই নামেই জগতের অমর মানুষদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়।

চতুর্দশ লুই ও তাঁহার বেষ্টনে মলেয়ার। (বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে)

কিন্তু যশ এত শীঘ্রগির আসে না। যে-কীর্তি মৃত্যুর পরও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, জীবন দিয়েই তাকে কিনতে হয়। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, ব্যবসা-হিসাবে তেমন কিছুই সুবিধা হ'চ্ছে না। মলেয়ার ধার ক'রতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন সুবিধা হ'ল না। অবশেষে ধার এত বেশী হ'ল যে, পাওনা-দারদের তাড়নায় তাঁকে আদা-লতের কাঠগড়ায় গিয়ে উঠতে হ'ল। শোধ দিতে অপারগ হওয়ায় বিচারে কারাদণ্ড হ'ল। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের অন্তরের প্রতিভা ফুটে উঠতে লাগল।

কয়েকমাস কারাবাস ক'রে আসার পর, মলেয়ার দেখলেন তাঁর দলের লোকেরা সকলেই ঠিক আছে, তারা তাঁর সঙ্গে মিলে কষ্ট-স্বীকার করতে প্রস্তুত। মলেয়ার মনে জোর পেলেন। এবার ঠিক ক'রলেন, রাজধানীতে আর নয়—এবার সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়াবেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভিনয় ক'রবেন। সকলেই সম্মত। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দের এক দিন মলেয়ার তাঁর দলবল নিয়ে প্যারী সহর ত্যাগ ক'রলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ।

বার বছর ধ'রে তিনি তাঁর সেই দল নিয়ে সারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়ালেন। সরাইখানার সামনে, বাজারে, হাটে,

রাস্তার ধারে অভিনয় ক'রে তাঁদের দিন কাটত। কিন্তু এই বার বছর ঘুরে বেড়ানর সমস্ত ইতিহাস যখন তোমরা পড় হ'য়ে প'ড়বে, তখন তার মধ্যে দেখবে, একটা মানুষ কেমন ক'রে বার বছর ধ'রে নানা রকম দুঃখ মৈত্রের মধ্যে থেকে, মানুষকে জানতে শিখেছে, মানুষকে দেখতে শিখেছে, মানুষকে বুঝতে শিখেছে। এই বার বছর ধ'রে নানা চরিত্রের মানুষ সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেছিলেন, তাঁর নাটকে আমরা প্রতি কথায় তার পরিচয় পাই এবং তাঁর এই অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না ব'লেই, তিনি যেসব লোকের চরিত্র এঁকেছেন, মনে হয় যেন তারা জীবন্ত। তাদের মনের অলি-গলির, তাদের প্রত্যেক কথার ভঙ্গীর, তাদের চরিত্রের প্রত্যেক সামান্যতম বৈচিত্র্যটুকু তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তিনশ' বছরের পরিবর্ত্তন পার হ'য়ে মনে হয় সেই সব জীবন্ত লোকদের আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি। মানুষকে এতখানি নিবিড় ক'রে যাঁরা দেখতে পান, ভগবানের সৃজনী-শক্তির অংশ তাঁরা পান, তখন তাঁদের মনে এমন একটা শক্তি জন্মগ্রহণ করে, যার সাহায্যে তাঁরা এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেন অথবা যে-সব চরিত্র আঁকেন তাদের এমন ক'রে গ'ড়ে তোলেন যে, তারা সকল কালের, সকল জাতির সম্পত্তি হ'য়ে যায়। এই বার বছর ঘুরে বেড়ানর অভিজ্ঞতার ফলে মলেয়ার যখন আবার রাজধানীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মুখে-চোখে, প্রশস্ত ললাটে, কথার ভঙ্গীতে সেই দিব্য পরিপূর্ণতার লক্ষণ স্পষ্ট-ভাবে দেখা দিয়েছে। রাজা, রাজদরবারীগণ, ফ্রান্সের সমস্ত নাট্যকার, কবি এই নূতন লোকটির দিকে আগ্রহে দিবে-চাইল। বার বছর আগে কারাগারে কে ছিল, সে কথা সবাই গেল ভুলে!

মলেয়ারের অভিনয়ের জন্য চতুর্দ্দশ লুই একটা বিরাট হল নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। সেই হলে ফ্রান্সের রাজা, রাজদরবার,

মৃত্যুশয্যায় মলেয়ার। (বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে)

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে মলেয়ার আবার অভিনয় আরম্ভ ক'রলেন। এই হলই পরে ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার কমেদী ফ্রাঁসেয় অথবা থিয়েতার মলেয়ারে পরিণত হয়।

এই সময় তাঁর পিতা পরলোকগমন ক'রলেন এবং মৃত্যু-কালে তিনি তাঁর কৃতী পুত্রকে ডেকে নিবেদন জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর রাজদরবারের কাজটি যেন তিনি গ্রহণ করেন। পুত্র পিতার এই শেষ মিনতি রক্ষা ক'রলেন।

বার বছর সারা ফ্রান্স ঘুরে মলেয়ার সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক ভাল ক'রে দেখবার

সুবিধা পেয়েছিলেন। রাজদরবারে এই চাকরি নেওয়ার তাঁর আর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যে-সব শ্রেণীর লোক অর্থের এবং বংশমর্যাদার গৌরবে নিজেদের জনসাধারণ থেকে দূরে রাখতে চায়, এবং যারা মনে করে যে তাদের নিয়েই জাতি এবং সমাজ, সেই সব শ্রেণীর লোকদের ভাল ক'রে দেখবার সুবিধা, এই কাজ নেওয়ার ফলে অনায়াসেই ঘ'টবে। মজার ব্যাপার, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপর ভার প'ড়ল, রাজা চতুর্দশ লুইএর শয্যা প্রস্তুত করার! একজন রাজ-ভৃত্যের সাহায্যে মলেয়ার এই কাজ সম্পন্ন করাতেন।

যে রাজ-ভৃত্যটি মলেয়ারকে এই বিষয়ে সাহায্য ক'রত, সে কিন্তু নিজেকে সামাজিক হিসাবে মলেয়ারের চেয়ে বড় মনে ক'রত। একজন কমিক অভিনেতা—সে আবার ভদ্রলোক! একদিন ব্যাপার এরকম দাঁড়াল যে, সে মলেয়ারের সঙ্গে কাজ করাকে অপমানজনক মনে করে ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রল। সে রাজার ভৃত্য, সে ভদ্রশ্রেণীর লোক! আর মলেয়ার একজন কমিক অভিনেতা, নাটুকে লোক, অস্পৃশ্য! য়ুরোপেও একদিন মলেয়ারের মত নাট্যকার আর অভিনেতা সম্বন্ধে অভিজাত শ্রেণীর এই ধারণা ছিল। কিন্তু চতুর্দশ লুই, সেই সমস্ত করাসী অভিজাতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিজাত, তিনি মলেয়ারকে ভালবাসতেন।

ভার্সাই-এর বিখ্যাত রাজসভার চারিদিকে যে-সব লোক সর্ব্বদা হ'ত, তাদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে নিয়ে মলেয়ার ব্যঙ্গ ক'রে নাটক লিখতে লাগলেন। জীবনের মধ্যে যেখানে তিনি দেখতেন ফাঁকি, যেখানেই দেখতেন ত্রুটি, সেখানেই তিনি হেসে উঠতেন। সে হাসি তারা বুঝতে পারত না—তারা নিজেদের অপমানিত মনে ক'রত তারা মনে ক'রত শুধু তাদেরই বুঝি ব্যঙ্গ ক'রবার জন্য রাজার-বিছানা-করা চাকরটা এই সব লিখছে। কিন্তু মলেয়ারের কাছে তারা ছিল নায় উপলক্ষ্য—তিনি হাসতেন তাদের দেখে, যারা জীবনকে বোঝে নি—মানুষকে বোঝে নি—তারা সেকালেও ছিল—তারা একালেও আছে—যতদিন পৃথিবীর খোরা শেষ না হবে—ততদিন পর্য্যন্ত হয়ত থাকবে। এই হ'ল কবির কাজ, এই হ'ল স্রষ্টার কাজ। কিন্তু ভার্সাই-এর রাজ-সভার যারা ভিড় করেছিল তারা সেদিন এই কবিকে দেখতে পায় নি—তারা দেখেছিল, রাজার বিছানা-করা চাকরের স্পর্দ্ধা!

রাজার প্রাসাদের ভিতরে রাজ-ভৃত্যরা এই অদ্ভুত নাটুকে লোকটিকে সহ্য ক'রতে পারত না। একদিন যখন তারা সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছে, তারা সকলে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মলেয়ারের সঙ্গে একাসনে তারা খাবে না। সেইদিন থেকে মলেয়ার একলা খেতে আরম্ভ ক'রলেন। চতুর্দশ লুই-এর কানে এই কথা গিয়ে পৌছল। একদিন সকাল বেলায় যখন তিনি প্রাতরাশ করতে ব'সেছেন—সেই সময় তিনি রাজ-ভৃত্যদের সামনে মলেয়ারকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সামনে তাঁর আসনের পাশে মলেয়ারকে বসিয়ে তিনি হেসে ব'লে উঠলেন—আমি যার সঙ্গে এক টেবিলে খাই, তার সঙ্গে একাসনে আহারে ব'সতে আমার ভৃত্যরা না চাইতেও পারে! এই ঘটনার পর থেকে অভিজাত-শ্রেণীর বড় বড় লোকরা তাঁকে টেবিলে তাঁদের সঙ্গে আহার-গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাতে লাগল।

মলেয়ার তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি সমস্তই পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর বিগত জীবনে তিনি কখনো শান্তি পান নি। যখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়স তখন তিনি তাঁর দলের একটি মেয়েকে বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিবাহে তিনি একদিনের জন্যও সুখী হ'তে পারেন নি। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর তিনি জগতের কুড়িখানি শ্রেষ্ঠ নাটক লেখেন, তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে প্রত্যেক বইতে অভিনয় করেন কিন্তু এই দশ বছর কখনও রুগ্ন এবং অসুস্থ অবস্থায় তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। এই দশ বছরের মধ্যে প্রায়ই এমন দিন গিয়েছে, যখন মনে হয়েছে, যে, তাঁর শেষদিন উপস্থিত। কিন্তু এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তাঁর আশৈশবের স্বপ্নের রূপ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এই দশ বছর ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা ক'রেও কোন ফল-লাভ হয়নি। বহু ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর এই সময় পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তাঁর নাটকে ডাক্তাররা রেহাই পান নি। তাঁদের নিয়ে বিদ্রূপ করবার লোভ তিনি সম্বরণ ক'রতে পারতেন না। একবার অসুস্থ অবস্থায় চতুর্দশ লুই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন, তোমার একজন

ভাল ডাক্তার আছে শুনেছি, কিন্তু তুমি ত বিছানা ছাড় না দেখছি! ডাক্তার ওষুধ দেয় না?

মলেয়ার হেসে ব'লেছিলেন, ডাক্তার ওষুধ দেয়, যখন খাইনা তখন ভাল থাকি।

ডাক্তারদের নিয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ব্যঙ্গ করার ফলে রাজধানীর ডাক্তাররা ক্ষিপ্ত হ'য়ে চতুর্দশ লুইএর কাছে দরবারে আসেন। তাঁদের কথা শুনে লুই হেসে বলেছিলেন, দোষ কি! ডাক্তাররা প্রায়ই আমাদের কাঁদান—যদি মাঝে মাঝে তাঁরা একটু হাসাতেও পারেন, তাতে দোষ কি?

ব্যক্তিগত জীবনে মলেয়ার যেমন উদার, তেমনি দাতা এবং একান্ত সদালাপী ছিলেন। একবার বেড়াতে বেড়াতে পথে এক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চাইলে তিনি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে আসছিলেন। দরিদ্র লোকটি স্বর্ণমুদ্রা দেখে দাতার ভুল হ'য়েছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি মলেয়ারের কাছে গিয়ে জানাল, মশায়ের ভুল হ'য়েছে, এটা স্বর্ণমুদ্রা।

পকেট থেকে আর একটা স্বর্ণমুদ্রা বার ক'রে মলেয়ার ব'লেন, ভুল হয়নি। আমি ইচ্ছে ক'রেই দিয়েছি। আর তোমার সাধুতার জন্য তুমি আর একটা স্বর্ণমুদ্রা নাও।

কিন্তু শেষ দিকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। তিনি আর নিয়মিত থিয়েটারে অভিনয় ক'রতে পারতেন না। তার ফলে তাঁর দলের লোকের অসুবিধা হ'তে লাগল। সেই সময় রোগ-শয্যায় শুয়ে তিনি একখানি নাটক লেখেন। নাটকখানির যিনি নায়ক—তাঁর ধারণা যে তাঁর কঠিন পীড়া হয়েছে; অথচ আসলে তিনি বেশ সুস্থই আছেন। এই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত লোকটি নিজেকে অসুস্থ মনে করতে করতে শেষে সত্যই ম'রে যান। এই হ'ল নাটকের প্রধান বিষয়। মলেয়ার স্থির ক'রলেন যে, এই নায়কের ভূমিকা তিনি গ্রহণ ক'রবেন।

কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে, তাঁর বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁকে বারণ ক'রল। কিন্তু তিনি কারুর কথা শুনলেন না। ব'লেন, আমার উপর পঞ্চাশটি লোকের অন্ন নির্ভর ক'রছে—আমার শুয়ে থাকলে চলবে কেন?

অভিনয়ের দিন তিনি রঙ্গমঞ্চে এলেন। অভিনয়ে মাতলেন। শেষ-দৃশ্যে সেই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত লোকটি যখন মারা যাচ্ছে—তখন মলেয়ারের অভিনয় দেখে জনতা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে করতালি দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঠিক সেই সময়, শুধু নাটকের সেই কাল্পনিক রোগগ্রস্ত নায়ক নয়, সেই সঙ্গে, সেই করতালির শব্দ শুনতে শুনতে মলেয়ারও দেহত্যাগ করেন।

সামনের বারে মলেয়ারের নাটকের গল্প তোমাদের ব'লব!

হঠাৎ

[৩] স্যাকেরিন আবিষ্কার

স্যাকেরিন কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জান—চিনির চেয়ে এই পদার্থটি তিনশ' গুণ মিষ্টি। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন চিনির অভাব পড়েছিল, তখন বহু জায়গায় চিনির বদলে এই স্যাকেরিন ব্যবহার করা হ'ত। তোমরা শুনলে হয়ত অবাক হ'য়ে যাবে যে, আল-কাৎরা নিয়ে গবেষণা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ এই মধুর চেয়ে মিষ্টি জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইরা রেম্‌সেন্ ব'লে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক আল-কাৎরা নিয়ে গবেষণা ক'রছিলেন। একদিন ভয়ানক ক্ষুধার্ত হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি হোটেলে এসে খেতে বসেন। কিন্তু খেতে আরম্ভ ক'রতেই দেখেন, খাবার ভয়ানক মিষ্টি লাগছে—এত মিষ্টি যে মুখে দেওয়া যায় না। যে-খাবারই খেতে যান, সেই রকমই মিষ্টি লাগে। ডিনের সময় রান্নার এ রকম বিভ্রাট দেখে, রেগে তিনি হোটেলের কর্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে ভৎর্সনা ক'রতে লাগলেন।

সে বেচারী অবাক হ'য়ে গেল। এত অতিরিক্ত মিষ্টি তো কিছুতেই দেওয়া হয় নি। আর কটিই বা মিষ্টি লাগবে কেন? তাতে তো চিনি আদৌ দেওয়া হয় নি!

সেদিন আর খাওয়া হ'ল না। রেগে জল খেয়ে উঠবার সময় হাতের একটা আঙুল মুখে লাগায় আঙুলটা মিষ্টি লাগল! ব্যাপারখানা কি? আঙুল চুষে দেখেন, সত্যিই তো আঙুলে এত মিষ্টি এল কোথা থেকে? ভাল ক'রে হাত ধুলেন, কিন্তু তখনও মিষ্টতা যায় না!

হঠাৎ তাঁর মাথায় কি কথা মনে হ'ল। তক্ষুণি ছুটে তিনি ল্যাবরেটরী এলেন। যেসব জিনিষ নিয়ে কাজ ক'রছিলেন, প্রত্যেকটি সেই অবস্থায় তন্ন-তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন। এবং এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি স্যাকেরিনের অস্তিত্বের খবর পেলেন।

বাঙ্গালার কথা

—নিখিলনাথ রায়

সোনার বাঙ্গালা

আপন আপন দেশের কথা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে। তোমাদেরও যে সে ইচ্ছা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে নিজের দেশের কথাটা জানিতে হয়, পরে অন্য দেশের কথায় মন দেওয়া উচিত। তোমাদিগকে তোমাদের দেশের কথা ভাল করিয়াই শুনাইব। আশা করি, তোমরা তাহা মন দিয়াই শুনিবে। তোমরা যে দেশে জন্মিয়াছ তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলে। চলিত কথায় তাহাকে বাঙ্গালা বলা হয়। এই বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার অধিবাসী তোমরা সকলে বঙ্গবাসী বা বাঙ্গালী। বঙ্গবাসী বা বাঙ্গালীরা যে-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকে বঙ্গ ভাষা বা বাঙ্গালা বলে। ঐ ভাষাতে পুস্তকাদিও লিখিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশ যেমন তোমাদের জন্মভূমি, বঙ্গভাষাও সেইরূপ তোমাদের মাতৃভাষা। প্রত্যেক লোকের নিকট তাহার জন্মভূমি সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নহে, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও বড়। তোমাদের মনে করা উচিত যে "সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" সেইরূপ তাহার মাতৃভাষাও তাহার নিকট আদরের বস্তু। তোমাদের এই বাঙ্গালা দেশকে সোনার বাঙ্গালা বলা হয়। সোনার বাঙ্গালা কেন বলে জান? ইনি "সুফলা সুফলা শস্যশ্যামলা।" সেই জন্য সোনার বাঙ্গালা। অনেক নদনদী জলাশয়ের জলরাশিতে তোমাদের জন্মভূমি সকলকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিতেছেন, সেই জন্য তিনি সুফলা। নানাবিধ সুমিষ্ট ফলে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন বলিয়া তিনি সুফলা। আর সকলের ক্ষুধানিবারণের জন্য বহু প্রকার শস্যে সর্ব্বদা শ্যামবর্ণ হইয়া থাকেন, তাই তিনি শস্যশ্যামলা। যে দেশে সকল প্রকার সুখ পাওয়া যায়, তাহাকে সোনার দেশ বলে। তোমাদের বাঙ্গালায় সেই সুখ প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া তাহার সোনার বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। এই সোনার বাঙ্গালা তোমাদিগকে সকল প্রকার সুখ দান করিয়া জননীর ন্যায় পালন করিতেছেন। তাই তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বল "বন্দেমাতরম্।" আরও বল "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।"

বঙ্গ নাম হইল কেন?

তোমাদের দেশের নাম যে বঙ্গদেশ তাহা তোমরা জানিয়াছ। অবশ্য চলিত কথায় তাহাকে বাঙ্গালা বলে। তোমাদের দেশের নাম বঙ্গ কেন হইল, তাহা তোমাদের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। এখন সেই কথাই বলিব। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুইটি রাজবংশ ছিল। রামচন্দ্র প্রভৃতি সূর্য্যবংশে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই চন্দ্রবংশে বলি নামে এক রাজা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচটি পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। বলিরাজা তাঁহার এই পাঁচ পুত্রকে তাঁহার রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। সেই রাজপুত্রদিগের নামে তাঁহাদের রাজ্যেরও নাম হইল। রাজপুত্র বঙ্গের নামেই বঙ্গদেশ হয়। কিন্তু অবশেষে পুণ্ড্র ও সুহ্ম তাহার সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমানে বঙ্গদেশ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্গদেশের উত্তর ভাগকে পুণ্ড্র বলিত। এখন তাহাকে বরেন্দ্র বলা হয়। পশ্চিম ভাগকে নাম সুহ্ম ছিল, এখন তাহা রাঢ় নামে পরিচিত। আর দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগকে প্রাচীন কালে বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ ভাগের নাম বগড়ী ও পূর্ব্ব-ভাগের নাম বঙ্গ। বগড়ী কোন সময়ে সমতট ও কোন সময়ে উপবঙ্গ নামে অভিহিত হইত। আবার সুহ্ম বা রাঢ়ের পশ্চিম ভাগকে তাম্রলিপ্তও বলিত, এই সকল প্রদেশ একত্রে গৌড়দেশ নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। এক্ষণে এ সমস্ত ভূভাগেরই নাম বঙ্গদেশ।...হিন্দুদের রাজত্বের সময় বঙ্গদেশ নামই প্রচলিত ছিল। তাহার শেষভাগে বাঙ্গালা নামের প্রচলন হইলেও মুসলমান আমলে বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরেজেরা আবার তাহাকে বেঙ্গল করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালা ও বেঙ্গল যে বঙ্গ হইতেই হইয়াছে তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ। এখনও আমরা ভাল কথায় ইহাকে বঙ্গদেশই বলিয়া থাকি। কিন্তু চলিত কথায় বাঙ্গালা বলা হয়। বাঙ্গালা নামটিই আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, সেই জন্য তোমাদিগকে বাঙ্গালার কথাই শুনাইতেছি।

কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী

বঙ্গ বা বাঙ্গালার কথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারতে বঙ্গের কথা বিশেষ ভাবেই জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। কুরুপাণ্ডব বা দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজ্য লইয়া যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলে। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙ্গালীরা উপস্থিত থাকিয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।—বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তির বীরগণ প্রাণপণে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গরাজার অসংখ্য হস্তী ছিল, সেই সমস্ত হস্তী ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। বঙ্গরাজ সেই সমস্ত হস্তী লইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কৌরব অর্থাৎ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের সেনাপতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের অধীনে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজ অবশেষে সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। সমুদ্রসেন-বঙ্গদেশের আর একজন রাজা ছিলেন, তিনি এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা অনেক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন। ভীম, অর্জ্জুনের অধীনে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গরাজের ন্যায় ইঁহারাও প্রাণদান করিয়াছিলেন। বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনের ন্যায় অনেক বঙ্গ, পুণ্ড্র, ও তাম্রলিপ্তির বীর পুরুষ এই ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালীর নাম অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, তাহার সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গালী মাত্রেই যে গৌরব অনুভব করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বাসুদেব

তোমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা অবশ্যই জান। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বলা হইত। তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি পৌণ্ড্রদেশের রাজা, তিনিও বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব এক সময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মগধ বা বিহার দেশের রাজা জরাসন্ধের সহিত যোগ দিয়া তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। এবং শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষতা আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। জরাসন্ধ ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্র বাসুদেব অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা আক্রমণ করেন। ইঁহার সহিত আর একজন বীর যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম একলব্য। একলব্য নিষাদ নামে হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়েরা হীন জাতিদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতেন না। এই জন্য কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষক ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দেন নাই। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া তাহাকেই গুরুস্থানে করিয়া অস্ত্রশিক্ষা করেন। শিষ্যকে বিদ্যাশিক্ষার পর গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। একলব্য দ্রোণকে গুরু বলিয়া মানেন শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে তাঁহার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলটি গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। একলব্য তৎক্ষণাৎ গুরুর আদেশ পালন করেন। তাহাতে তাঁহার অস্ত্রচালনার ক্ষমতার হ্রাস হয়। পৌণ্ড্র বাসুদেব ও একলব্য দ্বারকা আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বংশের আর আর সকলে তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। পৌণ্ড্র বাসুদেব ও একলব্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের অনেক সৈন্য সামন্তকে নিহত করিয়াছিলেন। অবশেষে কিন্তু পৌণ্ড্র বাসুদেব বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। নিষাদপতি একলব্যও শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এইরূপে পৌণ্ড্রদেশাধিপতি বাসুদেব বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর লঙ্কাজয়

লঙ্কার কথা তোমরা অবশ্য রামায়ণে পড়িয়াছ। লঙ্কা-দ্বীপের রাজা রাবণ রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কিন্তু একজন বাঙ্গালী বীর জাহাজ ভাসাইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাহা জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালী বীরের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ বুদ্ধদেবের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধদেবের কথা পরে তোমাদিগকে বলিব। এক্ষণে বিজয়-সিংহের কথাই বলা হইতেছে। বঙ্গরাজের দৌহিত্র সিংহবাহু রাঢ় প্রদেশে সিংহপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি লোকজনের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন। প্রজারা রাজা সিংহবাহুর নিকট বিজয়ের অত্যাচারের কথা জানাইলে, সিংহবাহু বিজয়কে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। বিজয়সিংহ আপনার অনুচরগণকে লইয়া, অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে বিজয়ের জাহাজ সকল কোন কোন দ্বীপে আসিয়া লাগিল। আবার সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ মুখে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া পড়িছিল। বিজয়সিংহ ও তাহার অনুচরেরা লঙ্কাদ্বীপে নামিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। লঙ্কা-দ্বীপের তাম্রপর্ণী নগরে বিজয় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে লঙ্কাদ্বীপের অনেক উন্নতি হইতে লাগিল। বিজয়ের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বাঙ্গালা হইতে লঙ্কায় গিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। পাণ্ডু-বাসের বংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত লঙ্কায় রাজত্ব করে। এই সিংহ বংশের নামানুসারে লঙ্কার সিংহল নাম হয়। ভারত-বর্ষের মানচিত্রের দক্ষিণদিকে তোমরা ডিম্বাকার যে সিংহল দ্বীপের চিত্র দেখিতে পাইয়া থাক, উহাই সেই বিজয়সিংহের লঙ্কা দ্বীপ। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় হইতে তোমরা জানিতে পারিতেছ যে বাঙ্গালী তখন জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত ও জাহাজে চড়িয়া দেশ বিদেশেও যাইত।

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার

যে সময়ে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন, সেই সময়ে একটি নূতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতেছিল। তাহার পর তাহা দেশবিদেশেও বিস্তৃত হয়। এই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম, যিনি এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে ছিল, কিন্তু তাহা এত প্রবল হইতে পারে নাই। নেপালের দক্ষিণে কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের সিদ্ধার্থ নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিই গৌতম বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধার্থ রাজপুত্র হইয়াও সুখভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যায় রত হন। তাহার পর জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ বা জ্ঞানী হইয়া উঠেন। পাপহীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তপস্যার দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ দূর হইলে, অবশেষে নির্ব্বাণ নামে শান্তির অবস্থা আসে। বুদ্ধদেব এই কথা প্রচার করেন। একথা পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা জানিতেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে তাহার এরূপ প্রচার ছিল না। কারণ সকলে ইহা পালন করিতে পারিত না। সেই জন্য গৌতম বুদ্ধের নূতন ধর্ম্ম প্রথমে দলে দলে লোকে গ্রহণ করিলেও সকলে সে পথে চলিতে পারে নাই। ক্রমে ভারত-বর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে তাহার একরূপ চিহ্ন নাই বলিলেও হয়। বাঙ্গালাদেশে চট্টগ্রাম প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সামান্যমাত্র নিদর্শন দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিলেও, বিহার বা মগধদেশের রাজা অশোকের সময় হইতে উহা দেশ বিদেশে বিস্তৃত হয়। বঙ্গদেশেও তাহা বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ অনেকদিন হইতে মগধরাজ্যের অধীন ছিল। মহাপদ্মনন্দ নামে মগধের একজন রাজা একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তারপর মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত অনেক দেশ জয় করেন। তখন পাটলিপুত্র পাটনা মগধের রাজধানী ছিল। এই সময়ে গ্রীসদেশীয় আলেকজাণ্ডার পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। আলেকজাণ্ডার কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। গ্রীসদেশীয় লেখকগণ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মগধরাজ্যের পূর্ব্বদিকে গাঙ্গ-রিডি নামে আর একটি রাজ্য ছিল। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। গাঙ্গ-রিডিকে বাঙ্গালার পশ্চিম অংশ বলিয়াই মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। সে সময়ে তিব্বত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সুতরাং বঙ্গদেশের অনেকেই যে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। অশোকরাজা বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্তূপ বা বৌদ্ধস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম নামে আর একটি ধর্ম্ম নানা স্থানে

প্রচারিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশেও তাহা প্রচারিত হয়। জৈন-ধর্মও প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে ছিল। অহিংসা উহাদের পরম ধর্ম। জৈনদিগের শেষ প্রচারক মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। জৈনধর্ম এখনও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে রহিয়াছে। বাঙ্গালার কলিকাতা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে জৈনগণ বাস করিতেছেন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে তাহাদের দুইটি সম্প্রদায় আছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, হিন্দুধর্ম চিরদিনই এদেশে বিদ্যমান আছে।

তাম্রলিপ্ত বন্দর

তামলিপ্তি প্রদেশের কথা তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। এখানকার লোকেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল। এইদেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী। উহার প্রধান নগর তামলিপ্ত সমুদ্রের উপকূলেই অবস্থিত ছিল। উহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর নামেই অভিহিত হইত। বঙ্গদেশের মধ্যে তাম্রলিপ্তের ন্যায় আর প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল না। বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীরা যে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত ও জাহাজে চড়িয়া দেশ বিদেশে যাইত, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালীরা সেই সকল জাহাজে বাণিজ্যদ্রব্যও দেশ বিদেশে পাঠাইত ও তাহা লইয়া আসিত। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সেই সকল জাহাজ সমুদ্র-যাত্রা করিত, আবার অন্যান্য দেশের জাহাজও তাম্রলিপ্তে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহারা অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদিও বহন করিয়া আনিত এবং বাঙ্গালা হইতে অনেক দ্রব্য লইয়া যাইত। এইরূপে বাঙ্গালার সহিত অনেক দেশের বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় হইত। সিংহলের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-দ্রব্যের বিনিময় সর্ব্বদাই ঘটিত। সিংহলের ন্যায় ভারত মহাসাগরের সুমাত্রা, যব, বলী প্রভৃতি দ্বীপেও বাঙ্গালার বাণিজ্যদ্রব্য তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত। ঐ সকল স্থান হইতে তাম্রলিপ্তে মণিমুক্তাদিও আসিত। বাঙ্গালার সূক্ষ্ম কাপাস-বস্ত্র গ্রীস, রোম প্রভৃতির বণিকেরা ক্রয় করিবার জন্য আসিতেন। ইওরোপের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় নরনারীরা সেই বস্ত্র আদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। গ্রীস ও চীন দেশীয় ভ্রমণকারীরা তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত এক্ষণে আর বন্দর নহে। সমুদ্র তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাম্রলিপ্তের বর্ত্তমান নাম তমলুক, ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক

বঙ্গদেশ যে অনেকদিন হইতে মগধ বা বিহার প্রদেশের রাজাদের অধীন ছিল, সে কথা তোমরা জানিয়াছ। চন্দ্রগুপ্ত অশোক প্রভৃতি মৌর্য্যবংশীয় রাজাদের পরে আরও কোন কোন বংশের রাজারা মগধে রাজত্ব করেন। তাহার পর গুপ্তবংশীয় রাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। উঁহারা অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই বংশের চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি রাজাদের অনেক কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গুপ্তবংশীয়েরা অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল মুদ্রা দেশবিশেষে প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে গুপ্তবংশীয়দিগের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থান হইতে ঐ সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মগধ গুপ্তরাজ-গণের প্রধান স্থান হইলেও শেষে তাঁহাদের বংশের কোন কোন রাজা অন্যান্য স্থানেও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গদেশেও গুপ্তবংশের রাজ্য স্থাপিত হয়। সে সময়ে বঙ্গদেশ গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত। এই গৌড় দেশের কর্ণ-সুবর্ণ রাজ্যে শশাঙ্ক নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হইতে রাজ্যেরও সেই নাম হয়। কর্ণসুবর্ণ নগরের চলিত নাম কানসোনা, বর্ত্তমান সময়ে তাহাকে রাঙ্গামাটি বলে। রক্তমৃত্তি নামে সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের আশ্রম হইতে উহার রাঙ্গামাটি নাম হইয়াছে। রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন শশাঙ্কের নরেন্দ্রগুপ্ত বা নরেন্দ্রাদিত্য বলিয়া আর একটি নামও ছিল। শশাঙ্ক অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর নিকট থানেশ্বর প্রদেশে রাজ্যবর্দ্ধন নামে এক রাজা ছিলেন। শশাঙ্ক তাঁহাকে নিহত করেন। রাজ্যবর্দ্ধন একজন বৌদ্ধ নরপতি। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায়, শশাঙ্ক যে বোধিতরু নামে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান লাভ

ভগিয়াছিলেন, শশাঙ্ক তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যমধ্যে যে সকল বৌদ্ধ আশ্রম ছিল, তাহা তিনি নষ্ট করেন নাই। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরে রক্তমৃত্তি প্রভৃতি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। শশাঙ্ক অবশেষে রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন আবার দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ পুলকেশীর নিকট পরাস্ত হন। হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের প্রচলিত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাঙ্ককে হিন্দুশৈব বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী রাজপুত্র

বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। যেখানে ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে। আমাদের বঙ্গদেশে কলিকাতা ও ঢাকা এই দুই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেকালে মগধে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তাহার নাম নালন্দা। পাটনা হইতে অনেক ক্রোশ দূরে তাহার স্থান বাহির হইয়াছে। মাটির তলে তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ান হইত। এখানে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দায় দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। এমন কি, চীন প্রভৃতি দেশ হইতেও ছাত্র আসার কথা জানা যায়। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গদেশের সমতট রাজ্যের এক রাজপুত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া ক্রমে তাহার অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। যিনি এইরূপ গৌরবলাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শীলভদ্র। শীলভদ্র নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নালন্দায় আসিয়া তথাকার অধ্যক্ষ ধর্ম্মপালের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ছাত্র অবস্থাতেই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া সেই দেশের রাজার নিকট হইতে একটি নগর পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আয় নিজে গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য একটি আশ্রম বা সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়া সেই অর্থ তাহাতেই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ আশ্রম তাঁহার নামানুসারে শীলভদ্র সঙ্ঘারাম নামে অভিহিত হইত। শীলভদ্র ক্রমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। সে সময়ে নালন্দার নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। য়ুয়ানচুয়াং নামে একজন চীন দেশীয় ভ্রমণকারী বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র জানিবার জন্য নালন্দায় আসিয়া শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শীলভদ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদেশীর মুখে বাঙ্গালার কথা

তোমরা য়ুয়ানচুয়াংএর কথা শুনিয়াছ। তিনি চীন দেশের লোক কাজেই একজন বিদেশী। সেই বিদেশী আমাদের বাঙ্গালার কথা কি বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই কথাই তোমাদিগকে শুনাইব। য়ুয়ানচুয়াং যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের উত্তরভাগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, দক্ষিণে সমতট এবং পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ এই চারিটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। তিনি এই সকল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের ঐ নামেই রাজধানী ছিল এবং তাহাদের স্থান এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, মেদিনীপুরের তমলুক এবং মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতটের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা স্থির করা যায় না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান সুন্দরবনে অনেক নগরাদির চিহ্ন ছিল। এবং এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে কোন স্থানে সমতটের রাজধানী ছিল কিনা বলা যায় না।

য়ুয়ানচুয়াং বলিয়াছেন যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অনেক অধিবাসী ছিল। সেখানকার অনেক পুষ্করিণী ও গৃহাদির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। য়ুয়ানচুয়াং এখানকার পনস বা কাঁঠাল ফলের কথাও বলিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের জলবায়ুও ভাল ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যার আদর করিত। এখানে বিশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কয়েকশত দেবমন্দির এবং অশোক রাজার স্তূপ ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক দিগম্বর জৈনও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে দেখা যাইত।

সমতট সমুদ্রতটেই অবস্থিত ছিল। এখানকার ভূমিতে চাষ দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ফলমূল জন্মিত।

সমতটের জলবায়ু শীতল এবং অধিবাসীরা পরিশ্রমী ও বিদ্বান ছিল। এখানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। সমতটে ত্রিশটি সঙ্ঘারাম, কয়েকশত দেবমন্দির ও অশোক রাজার স্তূপের কথাও য়ুয়ানচুয়াং বলিয়াছেন। হেংজোচি নামে আর একজন চীনদেশীয় ভ্রমণকারী সমতটে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে তথায় রাজভট নামে একজন রাজা ছিলেন। ইৎসিং নামে চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ছয়কেল বা পূর্ণকলে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্তও সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। এখানকার ভূমিও উর্ব্বরা এবং তাহাতে চাষ দেওয়ার জন্য অনেক ফলমূল উৎপন্ন হইত। তাম্রলিপ্তের জলবায়ু কিছু উষ্ণ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী ও সাহসী। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। দশটি সঙ্ঘারাম, পঞ্চাশটি দেবমন্দির এবং অশোকরাজার স্তূপেরও উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্ত বন্দরে অনেক মণিরত্ন সংগৃহীত হইত। সেইজন্য এখানকার লোকেরা খুব ধনী ছিল। য়ুয়ানচুয়াংএর পূর্ব্বে ফাহিয়ান্ নামে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দরে দুই বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান্ তথা হইতে এক বণিকের জাহাজে সিংহল যাত্রা করেন। য়ুয়ানচুয়াংএর পর ইৎসিংও তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসিয়াছিলেন।

য়ুয়ানচুয়াং কর্ণসুবর্ণ নগরে অনেক অধিবাসীর বাস করার কথা বলিয়াছেন। এদেশের ভূমিও উর্ব্বরা এবং চাষ দেওয়ায় নানা প্রকার পুষ্প উৎপাদন করিত। এখানকার জলবায়ু এবং অধিবাসীদের ব্যবহারও ভাল ছিল। অধিবাসীরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিত। এখানেও হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ছিল। দশটি সঙ্ঘারাম, পঞ্চাশটি দেবমন্দির ও অশোক রাজার স্তূপের কথাও জানিতে পারা যায়। য়ুয়ানচুয়াং রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামও দেখিয়াছিলেন। ইহার গৃহাদি খুব প্রশস্ত ছিল এবং এখানে রাজ্যের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বাস করিতেন।

গৌড় বীরের প্রভুভক্তি

শশাঙ্কের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত গৌড় বা বাঙ্গালার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদেশী রাজা এদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমস্ত বঙ্গদেশকে গৌড়দেশ বলিলেও, ইহার উত্তরভাগই বিশেষরূপে ঐ নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ অনেক সময়ে মগধ রাজ্যের অধীনও ছিল। কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মগধনাথ বা গৌড়েশ্বরকে নিহত করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজও পরাজিত হইয়া যশোবর্ম্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা আবার কাশ্মীরের কায়স্থবংশীয় রাজা ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হন। ললিতাদিত্যের কলিঙ্গজয়ের সময়ে গৌড়ের সামন্ত রাজা তাঁহার নিকট অনেক হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নিজে কাশ্মীরে উপস্থিতও হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য পরিহাসকেশব নামে নারায়ণ মূর্ত্তিকে মগধে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। গৌড়েশ্বর তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া গৌড়পতির লোকেরা তীর্থযাত্রাছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া পরিহাসকেশবের মন্দির অবরোধ করে। পূজকেরা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, গৌড়-বীরগণ রামস্বামী নামে রজতনির্ম্মিত আর এক নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে পরিহাসকেশব মনে করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করে। পরিহাসকেশব তাহাদের রাজাকে রক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ জন্মিয়াছিল। দেবতার প্রতি ক্রোধ করা যে উচিত নহে প্রভুভক্ত গৌড়বীরেরা তখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা রামস্বামীকে পরিহাসকেশব মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছিল। যখন তাহারা রামস্বামীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু গৌড়বীরেরা রামস্বামীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া একে একে তাহাদের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। এইরূপে গৌড়বীরেরা প্রভুভক্তি দেখাইয়া অক্ষয় গৌরব লাভ করিয়াছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল এবং কাশ্মীরবাসীরা গৌড়বীরগণের যশোগান করিত।

কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী

ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই কাশ্মীর হইতে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া দিগ্বিজয়ে

বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বালক পুত্র কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। জয়াপীড়ের সৈন্যগণ ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। তিনি অবশেষে অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পুণ্ড্রে উপস্থিত হন। পরে সেখান হইতে ছদ্মবেশে গৌড় দেশে আগমন করেন। সেই সময়ে জয়ন্ত নামে গৌড় দেশে এক রাজা ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল। জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হইয়া গুপ্তভাবে আসিয়া এক সিংহ হত্যা করেন। তাহাতে লোকে তাঁহার পরিচয় পায়। রাজা জয়ন্ত জয়াপীড়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ প্রদান করেন। জয়াপীড় কল্যাণ দেবীকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন যেন কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী আবার ফিরিয়া পাইলেন। তিনি পঞ্চগৌড়ের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কল্যাণ দেবী যে জয়াপীড়ের পক্ষে কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী স্বরূপ হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায়। জয়াপীড় কল্যাণ দেবীকে লইয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার বালক ভ্রাতা তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হন। জয়াপীড় আবার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। কল্যাণ দেবীর জন্য জয়াপীড়ের এইরূপ কল্যাণ হওয়ায় তাঁহাকে কাশ্মীরের হারালক্ষ্মী বলা অসঙ্গত নহে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়াপীড় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথায় কল্যাণপুর নামে এক নগর স্থাপিত হয়।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন

বঙ্গদেশে শূরবংশ নামে এক রাজবংশের কথা জানা যায়। এই বংশের আদি বা প্রথম রাজা আদিশূর নামেই কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়। কেহ কেহ কল্যাণদেবীর পিতা জয়ন্তকে আদিশূর বলিতে চাহেন। কিন্তু সে কথা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমাদের দেশে এই কথা প্রচলিত আছে যে, আদিশূর রাজার সময়ে কান্যকুব্জ বা কনোজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে এদেশে ভাল ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা যাগযজ্ঞ করিতে জানিতেন না। সেইজন্য আদিশূর যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ লইয়া আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম ভট্ট-নারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভ। আবার কোন কোন মতে তাঁহাদের নাম ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি। কেহ কেহ প্রথম পাঁচজনকে শেষের পাঁচজনের পুত্র বলিয়া থাকেন। কায়স্থ পাঁচজনের নাম মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তানেরা এদেশে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। আর পাঁচজন কায়স্থের সন্তান-গণকে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বলে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা পরে এদেশে আসেন। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ভিন্ন উত্তর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও অন্যান্য কায়স্থের মধ্যে কতক পূর্ব্বে এদেশে ছিলেন এবং কতক পরে আসিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

আর একদিক

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'এর প্রকাশক গর্ডন বেনেট একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রাখিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে নিউইয়র্কবাসীদিগকে কাগজে লিখিয়া যাহা খুশী তাহাই বিশ্বাস করাইতে পারেন। প্রমাণ স্বরূপ পরদিন সকালে 'হেরাল্ড' পত্রিকায় একটি সংবাদ বাহির হইল—চিড়িয়াখানায় সমস্ত জানোয়ার কেমন করিয়া পলাইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। সিংহ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি নিউইয়র্ক শহরের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভীষণ পশুগুলিকে বাহির সাবাড় করিতেছে। সেদিন সকালে আর কোনও গাড়িই পথে বাহির হইল না। যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের কেহ সিংহের ভয়ে গুলিয়া পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ বা চিড়িয়াখানা দেখিয়া হাটমাট করিয়া ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালে সংবাদ বাহির হইল যে, কলাকার প্রকাশিত খবরটি ভুল।—ছাত্র ও মেবরফিল্ড, ফ্রান্স।

অন্তঃপুর

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

[গত ১২ই হইতে ১৫ই পৌষ কলিকাতায় ভারতীয় নারী-সম্মেলনের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন বসিয়াছিল। এই সম্মেলনে নানা প্রদেশ হইতে প্রায় ২০০ শত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনের বিবরণ নিম্নে মোটামুটি ভাবে দেওয়া হইল।

কেহ কেহ বলিতেছেন, এই সম্মেলনে মাত্র শিক্ষিত ও অভিজাত মহিলাগণ মিলিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহার সহিত নিখিল ভারতীয় নারীর কোন সম্পর্ক নাই। ভারতীয় মহাসভা অর্থাৎ কংগ্রেসও প্রথমে কয়েকজন শিক্ষিত ও অভিজাতদের মিলন-স্থল ছিল। উহা অবশেষে কি রূপ ধারণ করে, সকলেরই তাহা বিদিত আছে। সুতরাং এই নারী-সম্মেলনকে ঐ যুক্তিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইহাতে রাজনীতির আলোচনা হয় নাই বলিয়াও অনেকে দুঃখ করিয়াছেন। এ আলোচনা কেন হয় নাই, সভানেত্রীর অভিভাষণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

এই সম্মেলনের বিবরণ হইতে ভারতীয় নারীপ্রগতির একটি ধারণা হয়। সে ধারণা ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু সে তর্কে লাভ নাই। যাহা ঘটে তাহা, যাহা ঘটা উচিত, তদপেক্ষা সকল সময়েই বেশী মূল্যবান। আমরা তাই এই সম্মেলন সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশে ক্ষান্ত থাকিলাম।]

সম্মেলনের উদ্বোধনে সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সুচারু দেবী তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

'আমরা আজ বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি। গার্গী, মৈত্রী, লীলাবতী, মীরা, অহল্যা প্রভৃতি অগণিত পরে অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া আজ আমার আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন।'.....'এক সময়ে বাইকে ভোজন করা হইত, বলা হইত যে স্ত্রীলোকেরা সকল কাজের অন্তরায়। অতীতের সেই ভ্রান্ত ধারণার আলোকে ভেদ করিয়া আমরা নূতন আলোক ও নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি। আমরা গৃহকোণ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, এবার আমরা নূতন ও বৃহত্তর গৃহ-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই।'

সভানেত্রী লক্ষ্ণৌ-এর লেডি আবদুল কাদের যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কিয়দংশ দেওয়া হইল—

...অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি আমার বক্তৃতার ভাষা সম্পর্কে একটি কথা বলিতে চাই। ইংরেজী ভাষায় আমার খুব বেশী দখল নাই, আমি উর্দ্দু ভাষাই জানি। উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিতে পারিলেই আনন্দিত হইতাম কিন্তু এই সম্মেলনের অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী রাশী রাজকড়ে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, ইংরেজীতে অভিভাষণ পাঠ করিতে হইবে। কারণ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেই সকলের সুবিধার সুবিধা হইবে। আজ আমার মনে হইতেছে বাঙ্গালার সাম্য ভাষা, আপনাদের কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষা যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলেই আমি বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালার ভগিনীদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা ভাষা আমি জানি না। তাই উর্দ্দু ভাষায় লিখিত অভিভাষণের ইংরেজী অনুবাদ আমি পাঠ করিতেছি।

এইবার আমি সাধারণ ভাষা সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার মনে করি। সমগ্র ভারতে একটী সুসংবদ্ধ জাতি গঠনের জন্য একটী সাধারণ ভাষার একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য অপ্রয়োজন।...

...একটি প্রশ্ন এই যে, স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কিরূপ হইবে? আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী বালিকাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে। এই শিক্ষাপ্রণালী প্রধানতঃ পুরুষের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, বালকদের পক্ষেই ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং বালিকাদের পক্ষে যে ইহা একান্ত অনুপযুক্ত তাহা বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত বালিকা পরবর্ত্তী জীবনে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে হয়ত এই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অধিকাংশ বালিকার পক্ষেই ইহা অনুপযুক্ত নহে। পারিবারিক জীবনে, সন্তানপালনে এবং গৃহস্থালীর কাজে যাহা দরকার, সেই শিক্ষাই অধিকাংশ বালিকার পক্ষে প্রয়োজন। এই সঙ্গে সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধেও দরকার, তাহা না হইলে তাহারা দুনিয়ার খোঁজখবর রাখিতে পারিবে না।...

...আপনারা সকলেই জানেন যে, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন পুরুষশিক্ষার আন্দোলনের অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। তাই শিক্ষাবিষয়ে মহিলারা একটী পশ্চাতে রহিয়াছেন এই অভাব দূরীকরণের জন্য প্রথমে পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখনও পুরুষশিক্ষার জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতেছেন,

শ্রীশিক্ষা। তত্ত্ব তাহাদের অনেক কম অর্থ প্রদান করিতেছেন। তাই আমি প্রস্তাব করি, সর্বসাধারণের নিকট দাবী করিতে হইবে, অন্ততঃ পুরুষশিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাহা সমান অর্থ তাঁহারা প্রদান করুন। এই সঙ্গে ঢালাও করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া এ-বিষয়ে আন্দোলন করাও আমাদের কর্তব্য। মেথর বৃত্তি, ঝাড়ু, চরিত্র, বেশ, বক্তৃতা প্রভৃতির নিকট অর্থের জন্য আবেদন করা আবশ্যক। আমি মনে করি, দৃঢ়তার সহিত ক্রমাগত চেষ্টা করিলে আমাদের লক্ষ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী।

...আর একটি বিষয়ে কাজ করিতে হইবে। সংবাদপত্রের মারফতে দেশে প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। বর্তমানে সংবাদপত্র পরিচালনার সম্পূর্ণ ভারই পুরুষের হস্তে। আমি তাহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ নহি। তাঁহারা সহানুভূতির সহিত আমাদের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য করেন। আমি বলিতে চাই যে, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রেরও প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রদেশের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিবার মহিলার নিজেদের দাবী ও মতামত দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে পারেন।...

...প্রচারকার্যের সহায়তার জন্য সিনেমা করার কথা বলিতে পারি। সহরের ও গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষাপ্রদ চিত্র এবং উপদেশপূর্ণ কাহিনী সিনেমা সাহায্যে প্রদর্শন করা উচিত।

সর্বপ্রথম বিবাহ, জন্মমৃত্যুর ও অন্যান্য বিষয়ক কুসংস্কারগুলি পরিবর্তন করা আবশ্যক। অতি অজ্ঞানান্ধ লোককে বাদ দিলে অধিকাংশ স্থলেই কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য প্রবল চেষ্টা করেন, যাহাতে পরিণামে তাঁহাদের কন্যার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। বিবাহে ও শ্রাদ্ধে অযথা অপব্যয় করিয়া অনেক পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ঋণের দায়ে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মহিলারা অনেক কিছু করিতে পারেন।...

...অনেক স্থলেই মহিলারা স্বামী কিম্বা পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। মুসলমান আইনে অবশ্য স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত প্রথার ফলে এই বিধান অগ্রাহ্য করিয়া মহিলাদিগকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। হিন্দু আইনে মহিলাদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলনে রাজনীতির আলোচনা হইবে না; সুতরাং আমি রাজনীতির আলোচনা পরিহার করিলাম। এই পরিহার করার নীতি যৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার প্রসার করিতে মতবিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেরই সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে রাজনীতি-ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য প্রবল।...

...নারীর ভোটাধিকার প্রকৃত পক্ষে রাজনীতির একটি অঙ্গ এবং এই ভোটাধিকারের সংস্কার ও শিক্ষকগণের উপর অনেক প্রভাব রহিয়াছে। ভোটাধিকার এবং সম্পর্কে ইতিমধ্যে ভারতীয় কমিটির নিকট আমাদের প্রতিনিধিগণ যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে পুরুষদের ভোটাধিকারই আমাদের আদর্শ, এতদ্ব্যতীত প্রতিনিধিগণ দাবী করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের জন্যই সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে এবং নারীকে নারী বলিয়া যেন অবজ্ঞা করা না হয়।...

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ১১৮টি অধিক শাখা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ১৭টি বেঙ্গল প্রদেশে অবস্থিত। যদি আমাদের শাখার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয় এবং প্রত্যেক শাখার কর্মনীতি কাজ হয় তাহা হইলে দেশবাসীর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে অনুকরণীয় কাজ সম্পন্ন হইতে পারে।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলির কয়েকটি নীচে দেওয়া হইল। এগুলি দেশের নারীচিন্তার ধারা নির্দেশ করিবে—

জাতি এবং শ্রেষ্ঠীর কল্যাণ নির্ভর করে—নূতন করিয়া সমাজ গঠনের উপর; এই কথা বিবেচনা করিয়া—

(ক) জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাষ্ট্রগত বৈষম্য দূর করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগ ও সদ্ভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহাতে আমরা সাহায্য করিব।

(খ) আমরা পূর্বসভায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়েছি যে, যুদ্ধকে আমরা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি এবং পৃথিবীকে নিরস্ত্র করার জন্য যে সমস্ত বিধানচেষ্টা করিতেছেন এই সম্মেলন তাঁহাদের কার্যে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে।

(গ) আমাদের দেশে আমরা আমাদের চতুর্দিকে এবং আমাদের মধ্যে সহযোগের ক্ষেত্রে ও ভাবধারাকে পুষ্ট করার ব্রত গ্রহণ করিয়েছি। যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমান স্থান গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিব।...

...এই সম্মেলন পুনর্বার দাবী জানাইতেছে যে জেনেভাতে ভারত সরকার যে সমস্ত প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাঁহাদের জন্যে যেন একজন নারী থাকেন, তিনি ভারতের বিভিন্ন নারী-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

শিশু এবং অপরিণত বয়স্ক বালকবালিকাদের রক্ষার্থে এডভাইসরি কমিটিতে পাঁচ বৎসরের জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাইবার নিমিত্ত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিল ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কার্য বিশেষ করিয়া নারীদেরই। সুতরাং ভারতের কোনও ভারতীয় নারী এই প্রতিনিধি পদটি পাইতে পারে, তজ্জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হউক।

হিন্দু নারীর বিবাহবিচ্ছেদ-অধিকারসূচক আইন পাস করার এবং হিন্দু নারীদের আইনগত অসুবিধা দূর করার জন্য এই সম্মেলন বরোদার মহারাজা এবং মহীশূরের মহারাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

নিম্নলিখিত শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

(১) এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক শিশুকে বৈষয়িক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) পূর্ণ পূর্ণ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া এই সম্মেলন দাবী করিতেছে :—

(ক) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে সুশিক্ষিত লোকের দ্বারা শারীরিক শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) মিউনিসিপালিটি ও লোকাল বোর্ড সমূহের অধীনে নারী ও শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বৈধ্যতিক স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) এই সম্মেলন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সহশিক্ষার দ্বারা দূর করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং যে সমস্ত বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা নাই তথায় উহা প্রবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(৪) বিদেশ বিদেশের আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয় যে কার্য করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রশংসা করা যাইতেছে এবং অধ্যাপক কার্ভে জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন সেই আবেদন সমর্থন করিতেছে।

আরও কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রস্তাব—

(১) কন্যাকালের এই বিশ্বাস, ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষভাবে দূর করা অত্যন্ত আবশ্যক। সম্মেলন এতদুদ্দেশ্যে জনসাধারণের সাহায্যের বিশেষ উদ্যমে কর্মপ্রচেষ্টা চালাইতে অনুরোধ করিতেছেন। বিদ্যালয় বর্জনের ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্রে ভোটাধিকারের সম্পত্তি-শর্ত পারে, এরূপ স্থলে নারীসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যাবত্তা বৃদ্ধিকল্পে একান্তই আবশ্যক।

(২) কন্যাকালের বিশ্বাস এই যে, দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক এবং স্কুল ও কলেজসমূহে সৃষ্টিকার্য শিক্ষা অবিলম্বে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

(৩) দেশের যুবকদিগের কল্যাণ সম্বন্ধে এই সম্মেলন অধিকের আগ্রহ সম্পন্ন, তাঁহারা গবর্মেণ্টকে বাম্বেতের চিত্রাবলী সম্বন্ধে বিশেষ তড়াতড়ি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং একজন মহিলাকে বাম্বেতের চিত্রনিরীক্ষণ-বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৪) এই সম্মেলন পুণার নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কার্ভে ইউনিভার্সিটী) শিক্ষাপদ্ধতিকে বিদেশের বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণে গঠন করিবার জন্য বোম্বাই গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

বিবিধ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব—

প্রত্যেক প্রদেশে নারী ফাইনান্স নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইবেন এবং তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসরের কম হইবে না এবং তাঁহাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে হওয়া দরকার।

বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশের অনুসরণে ভারতের সর্বত্র প্রস্তিমঙ্গল বিষয়ক আইন প্রবর্তন করিতে হইবে।

আইনসভায় নিযুক্ত নারীদের সর্ববিষয় বয়ঃক্রম ৩ বৎসরের জন্য ১২ হইতে ১৩ এবং তৎপরে ১১ করিবার জন্য অধিক সম্পত্তিশালী হওয়া কমিশনের অধ্যক্ষগণ সমস্ত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন সম্মেলন তাহা সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছেন।

বেকার সমস্যা বৃদ্ধির জন্য এবং কতকগুলি মিল ও ফ্যাক্টরী বন্ধ হওয়াতে কোন কোন অঞ্চলে নারী এবং শিশুদিগের মধ্যে যে দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য একটী কমিটী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সম্মেলন গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

বাল-বিবাহ-নিরোধ আইন রদ করিবার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা হইয়াছে সম্মেলন তাহার নিন্দাবাদ করিতেছে। ঐ বিধান অধিকতর কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিবার জন্য এবং বাল-বিবাহ বন্ধকল্পে একমাত্র অভিভাবক হিসাবে তত্ত্বাবধায়ীদিগকে উহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত সম্মেলন গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে উৎসাহ দান করা দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য সম্মেলন জনসাধারণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বদ্ধপরিকর হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

হিন্দুকন্যাদের জন্য পরিত্র-বিবাহ সহজ প্রক্রিয়া করিবার নিমিত্ত এবং জনসাধারণের পরিচিতির স্থানসমূহে বিজ্ঞাপনী বিলিবন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন প্রণয়নের জন্য এই সম্মেলন গবর্মেণ্টকে এবং মিউনিসিপালিটি, লোকালবোর্ড প্রভৃতিকে অনুরোধ করিতেছে।

বাম্বেতের বিষয়াদিত প্রতিনিধিদল গতবার জয়েন্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর সমক্ষে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে যে সকল দাবী উপস্থিত করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহাসমূহ সমর্থন করিতেছে এবং তাঁহারা যে সব বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন সেগুলি পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতেছে।

এই সভা জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটীর সেক্রেটারী এবং ভারতসচিবের নিকট একটী তার প্রেরণ করা হউক।

জয়েন্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, ভারতীয় নারী প্রতিনিধি দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা হইলে অধিকতর কর্ম-পদ্ধতি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এই সম্মেলনের একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

বর্তমান হিন্দু আইনে নারীরা সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত। এই সম্মেলন এই প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং দাবী করিতেছে যে, বর্তমান আইনগুলি ন্যায় ও সমদর্শনের ভিত্তিতে সংশোধন

করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষার, বিশেষ এবং সন্তানদের অভিভাবকের সম্মতে নারীদের যে অসুবিধা আছে, তাহা দূর করিবার উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য একটি নিখিল-ভারত যে-সরকারী কমিশন গঠন করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষে নারী ও শিশুর কল্যাণ সাধন করিবার জন্য এযাবৎ যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে তুলিয়া এই সম্মেলন নারী সমিতি সমূহকে নির্দেশ দিতেছে—

(ক) স্ব স্ব এলাকায় আইনসভা, শিক্ষাসভা এবং উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সংশোধনের আলোচনা করিতে হইবে।

(খ) বেশ্যাবৃত্তি রোধ এবং বেশ্যাবৃত্তির জন্য নারী-সংগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ও নারী এবং শিশুদিগকে আইনের আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

(গ) অন্ধ-অক্ষমদিগকে স্বাবলম্বনের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার উপযোগিতা শিক্ষা দিতে হইবে—যেন তাহারা সন্তানসন্ততিগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে পারে এবং জীবনের মূল্যবান বলিয়া মনে করিতে পারে।

(ঘ) যেখানে এখনও উচ্চারণ আরম্ভ হয় নাই, সে সমস্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী সংগ্রহ করিয়া 'উচ্চার-আন্দোলন' পুনরায় জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে হইবে। কর্মীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নৈতিক ও দুর্নীতি দমন করিয়া যে সমস্ত নারী কার্যকুশল আছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(ঙ) সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত এই যে, নারীকল্যাণের জন্য প্রত্যেক অধিকার এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজ করিবার জন্য নারীদের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

সমাজের স্বার্থপর এবং অর্থপর দুর্বলতা দূরে এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, অনুমোদিত শিক্ষাকেন্দ্রের বয়স্ক শিশু অনাথদিগকে সন্তান-স্বল্পনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে।

[উপরোক্ত প্রস্তাবে অধিবেশনে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। দর্শক এবং বিদেশ প্রতিনিধিই বিশেষ উৎসাহসহকারে বক্তৃতা করেন। অবশেষে ভোটগ্রহণের ইহা ৫০—১৮ ভোটে গৃহীত হয়।]

সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য এই সম্মেলন ভারতের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছে এবং অনুন্নত সমাজের আইনসভা এবং সমাজগত অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে সেই সমস্ত চেষ্টা ও কর্মীর-প্রচেষ্টা বিশেষ সমর্থন করিতেছে।

মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্য মিঃ পালাপ্রসাদ সিংহের যে প্রস্তাব বর্তমানে ভারত-পরিষদের বিবেচনাধীন আছে এই সম্মেলন সেই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে।

ভারতের নারীগুলির শোচনীয় অবস্থা, বিশেষ করিয়া শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দারুণ দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া এই সম্মেলন আকুল হইয়া ভারতের সমস্ত নারী-প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা স্থানীয় কমিটী গঠন করিয়া পল্লীসংগঠনের উপায় নির্ধারণ করুন।

ভারতের শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, উহা বন্ধ করার জন্য এই সম্মেলন নার্স এবং ধাত্রীদের নাম রেজেস্ট্রারি করা এবং শিক্ষিত সুপারভাইজার। যাহা মাঝে মাঝে তত্ত্বাবধান করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করে।

সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত এই যে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা মানবজাতির মহান সম্পদ সুতরাং প্রত্যেককে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করিয়া পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

অধিবাসীর মূলধন হ্রাস পাইতেছে এবং ঋণের সুদ বৃদ্ধি করা হইতেছে দেখিয়া এই সম্মেলন বিমুক্ত। এই সম্মেলন মূলধন ঋণের দোকান খোলা বন্ধ করিতে এবং ঋণের সুদ বৃদ্ধি করিতে গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন সমগ্র নরনারীর নিকট আবেদন জানাইতেছে যে, মাদক দ্রব্য ও বিক্রয়ের অপকারিতা তাঁহারা যেন জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তাহা হইলেই অধিকাংশ কারাবরণ যেন, মদ ও মাদকদ্রব্যের বিক্রি শক্তিশালী হইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের একটি নারী

এ যুগের ইংলণ্ডের চেহারার সহিত ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংলণ্ডের চেহারার একেবারেই মিল নাই। ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়ার যুগের মেয়েরা একালের অবাধ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, বা-বাপীর শাসনের গণ্ডীর এক-পা বাহিরে যাইতেও সাহস করিত না। সব কাজই তাহাদিগকে ওরে ওপনে করিতে হইত।

ইংলণ্ডের এমনই এক যুগে, কঠিন শাসন ও নিষেধের প্রাচীরে বন্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মেরি কিংসলি জন্মাইয়াছিলেন। হাইগেটের একটি ছোট বাড়ীতে তাঁহার বাল্যকাল কাটে—মায়ের সঙ্গে। বাপ প্রায় বাহিরে বাহিরেই থাকিতেন। তাঁহার ছিল দেশভ্রমণের নেশা। বাবার একটু-আধটু লিখিবারও অভ্যাস ছিল। এই দুইটি নেশাই মেয়ের মধ্যে

সাক্রোমিত হইয়া উত্তরকালে বেহিকে আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে টানিয়া লইয়া যায়। তখনকার আফ্রিকা আফ্রিকার আফ্রিকা নয়। আফ্রিকাকে বলা হয়—কৃষ্ণ-মহাদেশ, dark continent—এই কৃষ্ণ মহাদেশের প্রত্যেক খণ্ড তখন অজ্ঞাত ছিল—ইহার অধিকাংশ নদনদী, পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল, হ্রদসরোবর তখনও পৃথিবীর মানচিত্রে পরিচিত হয় নাই। এবং ইহার কোথায় যে গণ্ডার, কোথায় যে বন্য হস্তী, কোথায় কুমীর, কোথায় পাইথন—কখন কি রকম ভাবে ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সে-যুগে এ খবর বড় কেহ জানিত না। তা ছাড়া সে দেশের আদিম অধিবাসীরা তখন বন্য জন্তু অপেক্ষাও ভীষণতর ছিল—অনেকেই ছিল তাহাদের মধ্যে নরখাদক। এই কৃষ্ণ-মহাদেশের পশ্চিম খণ্ডের আনাচে-কানাচে এই নাসী সে-যুগে একলা একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কেবল এনগের নেশায়।

তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, এ পৃথিবীতে মানুষের চাইতে আমি বেশী বুঝি, জলাভূমি আর বনজঙ্গলকে, উহারাও আমাকে যেন বুঝিয়াছে। তাই বাবা-মা মারা যাইবার পরই ইংলণ্ড আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল—আমি পশ্চিম আফ্রিকায় ছুটিয়া গেলাম। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, সেখানে মরণ-শয়ন পাতিব। কিন্তু আফ্রিকার কূলে কূলে অফুরন্ত জীবন; মৃত্যুর কথা দুদিনে আমার মন হইতে মুছিয়া গেল। আফ্রিকা আমাকে বুকে করিয়া আদরে-স্নেহে, হাসি-ঠাট্টায়, রহস্যে-শুশ্রূষায় আমার অশ্রুজল মুছাইয়া দিল—আমি আবার জীবন-রসে মাতিয়া উঠিলাম।

আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না। সে কথাও তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন,দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আফ্রিকার 'আয়-আয়' ডাকে আমার রাত্রের নিদ্রা ঘুচিয়াছে। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে, আফ্রিকার ছবি—'আততি বেলা লবণাম্বুরাশি—' দুগ্ধশুভ্র ফেনরাশি চক-চকে বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, সারি সারি দীর্ঘদেহ নারিকেল ও তাল দাঁড়াইয়া আছে; কূলছায়ায় নিকুঞ্জে স্রোতস্বিনী বহিতেছে এবং ঘন অরণ্য বিপুল বিশাল দেব-মন্দিরের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে সহরের এই জনতার কোলাহলের শব্দ আর কানে আসেনা, উদ্ভিন্নযৌবন সাগর-বৈকুণ্ঠের ভাষা শুনিতে পাই, তালি-বনরাজির পত্রে-পল্লবে বাতাস যে-গান গাহিয়া ফিরিতেছে, তাহার মূর্চ্ছনা কানে লাগে, আফ্রিকাবাসীর টম-টম গাড়ীর পথ চলার কর্কশ শব্দ শুনিতে পাই। মন নাচিয়া উঠে আফ্রিকার কূলে ছুটিয়া যাইবার জন্য। স্পষ্ট শুনিতে পাই, আফ্রিকা আমাকে ডাকিতেছে—'ফিরিয়া এস,—এই তোমার স্বদেশ'—আফ্রিকার মৃত্তিব কানে কানে এই কথা কয়টি শোনানো হয়।

মেরি কিংস্‌লি [১৮৬২-১৯০০]

বন্ধু আফ্রিকার সহিত সত্য মেরি কিংস্‌লি প্রেমে পড়িয়াছিলেন। এই প্রেম তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এই প্রেম-ই আফ্রিকার বুকে ভবিষ্যতকালের জন্য তাঁহার শত শত স্বদেশবাসীর জন্য গৃহ ও আশ্রয়নীড় রচনা করিয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকার ও পশ্চিম আফ্রিকা-বাসীর মধ্যে আফ্রিকার এই নিবিড় সম্পর্কের মূলে অনেকখানি মেরি কিংস্‌লির চেষ্টা আছে। সে দেশ ও দেশবাসীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফিরিয়া তিনি ক্রমাগত আফ্রিকার স্বপক্ষে লড়িতেন। আফ্রিকা সম্বন্ধে যাহারা কিছু খবর রাখেনা অথচ ভাগ্যক্রমে আফ্রিকার ভাগ্যকর্ত্তা হইয়া-ছিলেন, বৃটিশ সরকারের এমন বেসব ধুরন্ধর ব্যক্তি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা লড়িতে হইত।

একবার ইহাদের উপর 'হাট-ট্যাক্স' বসাইবার কথা হয় —কুটিরপিছু প্রত্যেক অধিবাসীকে পাঁচ শিলিং করিয়া দিতে হইবে। প্রথম যখন এই ট্যাক্স ঘোষণা করা হইল, তখন আদিম অধিবাসীরা বিশেষ কিছু বুঝিয়া উঠে নাই, কিন্তু যখন বুঝিল যে ভগবানের রাজ্যে, তাঁহারই দেওয়া আলো-হাওয়া পাইবার জন্য তাহাদের পয়সা দিতে হইবে—তখন এই অসভ্য বর্ব্বর জাতি ক্ষেপিয়া উঠিল, শ্বেতজাতিকে নির্ম্মূল করিয়া

তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য উহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

মেরি কিংস্‌লি গ্রেটব্রুটেনে ফিরিলেন, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বুঝাইলেন, যে-চাষিকে তোমরা ট্যাক্স দিতে বলিতেছ, মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় তাহার এক পাউণ্ড—পাঁচ শিলিং ট্যাক্স সে দিবে কোথা হইতে! বন-বাদাড় কাটিয়া গাছ ভাঙিয়া কুঁড়েঘর বানাইয়া, নিজের মাংসপেশী খাটাইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহার মণ্ডে ট্যাক্স ব্যাপারটা কি

পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো মেরি কিংস্‌লির নৌকা।

তাহাই বুঝানো কঠিন। কোনক্রমে অসভ্যজাতির রাগ সেবার পড়ে। তাহা না চটলে এতদিনে পশ্চিম আফ্রিকার কি অবস্থা হইত, কেহ বলিতে পারে না। মেরি এই সময়ে ইহাদের চইয়া যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা অমর হইয়া আছে।

বড়জল নাই, রৌদ্র নাই—ভয় তো নাই-ই, 'অবলাজাতি'র একজন, এই মেরি কিংস্‌লি, কয়েকটি লাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া চলিয়াছেন—বনবাদাড় ভাঙিয়া, নদীতে নৌকা চালাইয়া আফ্রিকার এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে সঙ্গে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা ঐ মেশনারীই, ভয়ে ভয়ে কোন রকমে রাজী হইয়াছে। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে-দেশে যাওয়া হইতেছে সেখানকার লোকেরা নরখাদক, উহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলিবে।

একটি হ্রদের উপর একখানি গ্রাম—সে-হ্রদের উল্লেখ তখনও মানচিত্রে হয় নাই। মেরি কিংস্‌লি তরণী হইতে একা নামিলেন। এই গ্রামে 'ফ্যান'রা থাকে। ফ্যানরা খবর পাইয়া দলে দলে আসিয়াছে, তাহাদের হাতে বন্দুক, কটিতে তরবারি। যুদ্ধ করিতে তাহারা প্রস্তুত। তীর হইতে ডিঙিতে মেরিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা চীৎকার সুরু করিয়াছে। মুখে তাহাদের পৈশাচিক উল্লাস—সকলে খাপ হইতে তরবারি খুলিয়াছে। তরী তীরে আসিয়া লাগিল। মেরি স্থলে নামিয়া নির্ভয়ে তাহাদের মধ্য দিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নরখাদকদের মধ্য হইতে একজনও তাঁহাকে কিছু বলিল না, বলিতে পারিল না, কেবল নিঃশব্দে তাহারা মেরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। মেরি লিখিয়াছেন,—এই কুড়ি মিনিট আমার জীবনে কেমন কাটিয়াছিল, তাহা আজ ভাবিতেও পারি না। নিশ্চয় জানিতাম, জল পাইয়াছি দেখিলে কি বুঝিতে পারিলে, ফ্যানরা আমাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। শুনিয়াছিলাম, তাহারা মনুষ্যখাদক। শুনিয়া একবার একটু কেমন-কেমন করিয়াছিল। তারপর ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ঠেকিল। এবং অতি সহজে আমি ফ্যানদিগকে আমার আত্মীয় করিয়া ফেলিলাম।

একবার একটি ক্ষেপা গরিলার হাতে মেরি পড়িয়াছিলেন, সেবার জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। অথচ অতি সামান্য কথায় সে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যেন বিশেষ কিছুই না, ভাবখানা এই রকম। লিখিতেছেন—গরিলার মত ভয়ানক জানোয়ার আর দুটি নাই। বুনো হাতী, চিতাবাঘ, পাইথন—মধ্য-আফ্রিকার বনেজঙ্গলে ইহাদের সকলের সহিতই আমার কিছু কিছু মোলাকাৎ হইয়াছে—কিন্তু গরিলার পাল্লায় পড়িয়া আমার যে দুর্ভোগ হইয়াছিল, এমন আর কাহারও পাল্লায় হয় নাই।

একটি চিত্রবাঘের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। দলবল লইয়া একটি গ্রামে সে-রাত্রের জন্য ছাউনি ফেলিয়াছেন—সেখানে মেরি আগন্তুক। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল। নিকটেই কোথাও কোন ফাঁদে একটি চিতাবাঘ পড়িয়াছে—সে কেবলই ডুকরাইতেছে। চুপ করিয়া মেরি কিছুতেই শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বুট না পরিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন। চারিদিকে মসীলিপ্ত অন্ধকার—খালি পায়ে চলিতেছেন, যে-কোন মুহূর্তে সাপের উপর পা পড়িতে পারে। ভাগ্যক্রমে বেশী দূর যাইতে হইল না, ফাঁদটা দেখিতে পাইলেন। আস্তে আস্তে তাদের খোঁটাগুলি তুলিতে লাগিলেন, চিতাবাঘটি ফাঁদের ভিতর

হইতে পোঙ্গাইতেছে, নিজেকে তাহার নিকট হইতে যতখানি সম্ভব বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, তবু কেমন করিয়া একবার তাহার লেজের বাড়ীতে তাঁহার বাট এঁকোড়-ওঁকোড় হইয়া গেল। শেষ খোঁটাটি তখনও তুলিতে বাকী, চিতাবাঘটি নিজেই তাহা হেঁচকা টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল। মেরি সতর্ক হইলেন, ভাবিলেন, বাঘটি হয় প্রাণের ভয়ে কোপেকাড়ে পলাইয়া যাইবে, নয় তাঁহাকে আক্রমণ করিবে—কিন্তু তেমন কিছুই হইল না, বাঘটি ছাড়া পাইয়া তাঁহার চারিদিকে শুধু পোষা কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মেরির হাসি পাইল—তিনি চিতাবাঘটিকে বলিলেন, 'গো হোম, ইউ ফুল—।' কি জানি কেন, বাঘটি দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিতেছেন। চারিদিক হইতে তাঁহার দাক্ষোপাঙ্গেরা আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে সুরু করিল। ব্যাপারটা এই যে, ইহাদের মধ্যে একজন তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া কাণ্ডটি দেখিয়াছিল। বাঘ তাঁহার কথা মানিয়া ফিরিয়া গেল—তিনি নিশ্চয়ই মানুষ নন্—এমনই একটা ধারণায় তাহারা দল বাঁধিয়া নাচিয়া-গাহিয়া সে-রাত্রে তাঁহাকে আর ঘুমাইতেই দিল না।

ঘটনাটি এমন যে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

১৯০০ সন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র পাঁইত্রিশ—ঝুলোরে ইংরেজে তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে। মেরি বুয়োরদের হাসপাতালে গেলেন নার্স হইয়া। সেখানে টাইফয়েড রুগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

যে-আফ্রিকা তাঁহার কাছে জীবনের উৎস ছিল, সেই আফ্রিকাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

মেরি কিংস্‌লির জীবনী পড়িয়া মনে হয় না যে, নারীজাতি কোন কিছুতে পুরুষের অপেক্ষা রাখে। যে-সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় তাঁহার আফ্রিকা-ভ্রমণের পদে পদে পাওয়া যায়, তাহা পুরুষেও দুর্লভ। আমরা কেবল অবাক হইয়া ভাবি, ভিক্টোরিয়া যুগের নারী হইয়াও এ অসম-সাহস তাঁহার কি করিয়া আসিয়াছিল। কিছুটা অবশ্য বাপের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন - কিন্তু বাকিটা? বাকিটার হেতু তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—ভয় পাইতেই তিনি ভয় পাইতেন, I was afraid to be afraid.

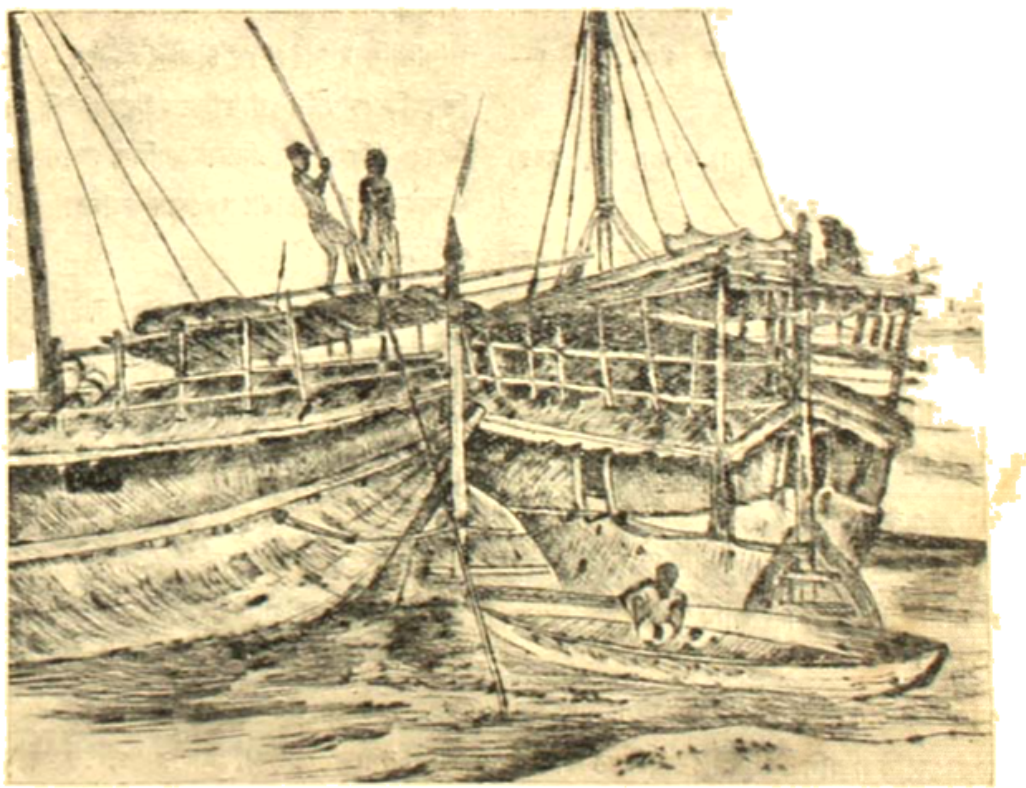

শিল্পী শ্রীঅমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এচিং হইতে

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চাঁপা তাহার দাদার পিছু পিছু সেখানে গিয়া দেখিল, বাহিরের ঘরে একটা কৌচের উপর স্বামী তাহার অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে, পায়ের জুতা তখনও খোলা হয় নাই, পরণের কাপড়টা ছিঁড়িয়াছে, গায়ের জামা ধূলায় কাদায় বিশ্রী হইয়া গেছে, কিন্তু কি যে তাহার হইয়াছে, কেন যে সে আজ এরকম অবস্থায় বাড়ী ফিরিল, কিছুই সে ভাল বুঝিতে পারিল না। তিনকড়ির দিকে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া চাঁপা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘুমোচ্ছে ; না ?'

মুখখানি তখন তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। এদিকে স্বামীর এই অবস্থা, ওদিকে কাকাবাবু মরণাপন্ন !

তিনকড়ি বলিল, 'পায়ের জুতোজুটো আগে খুলে দে।'

চাঁপা হাটু গাড়িয়া বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল, আর তিনকড়ি তাহার মাথাটা দু'হাত দিয়া তুলিয়া কৌচের উপরেই ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল।

এদিকে কাঁকানি খাইয়া শ্রীহর্ষের তখন তন্দ্রা টুটিয়াছে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া প্রথমেই তাহার নজর পড়িল—তিনকড়ির দিকে।

তিনকড়ি একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ অবস্থা হ'লো কেন আজ ? কি হয়েছে ?'

শ্রীহর্ষ হাত বাড়াইয়া তাহাকে আরও কাছে ডাকিল এবং তিনকড়ি আগাইয়া আসিতেই তাহাকে সে একেবারে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হঠাৎ ক্রন্দন শুনিয়া চাঁপা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।—সর্ব্বনাশ ! আবার এ কাঁদে কেন ?

শ্রীহর্ষ তখন জড়িতকণ্ঠে বলিতে সুরু করিয়াছে,—'সব গেল ভাই তিনু, আমারও সব গেল। আমি একেবারে পথের ভিখিরী হয়ে গেলাম।'

এতক্ষণ তিনকড়িও ভাল বুঝিতে পারে নাই। এইবার তাহার মুখের গন্ধে এবং কথা বলিবার ভঙ্গীতে বুঝিতে তাহার আর বাকি রহিল না যে, শ্রীহর্ষ আজ প্রচুর মদ্যপান করিয়াছে এবং সেজন্যই তাহার এই দশা !

শ্রীহর্ষ দুই হাত দিয়া তিনকড়িকে তখন তাহার বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। কোনরকমে তাহার সেই আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের মুখখানাকে একটুখানি ঘুরে সরাইয়া লইয়া আবার একটুখানি হাসিয়া তিনকড়ি বলিল, 'ছি, কি হয়েছে কি ? তুমি কাঁদছ কেন ? চুপ কর।'

শ্রীহর্ষ সহসা এমনভাবে তাহার কান্না থামাইয়া চুপ করিল যে, চাঁপা ও তিনকড়ি দু'জনেই তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। এবং শুধু সে চুপ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, টপ্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হাসছ ? না ? হাঁ, তা ত তোমরা হাসবেই। নিজের কাজটিত আগেই বাগিয়ে নিয়েছ, বাস্, আবার কি ! ও শালা এবার মরুক্ না ! আমাদের কি !'

তিনকড়ি একবার চাঁপার মুখের পানে তাকাইল আর চাঁপা তাকাইল তিনকড়ির মুখের পানে। দু'জনেই পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। চাঁপা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তিনকড়ি চোখ টিপিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। এবং চাঁপাকে নিষেধ করিয়া সে নিজেই বলিল, 'হাসলাম আবার কখন্ জামাইবাবু ? তোমাকে দেখে আমরা হাসি ? ছি, এই তোমার ধারণা ?'

'হুঁ।' বলিয়া মাথা নোয়াইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে শ্রীহর্ষ আবার বলিল, 'ভাখ্ তিনু, আমার কপালটা ভারি খারাপ। মাইরি বলছি—মিছে কথা নয়, ভারি খারাপ। মাইরি, ভগবানের দিব্যি করে' বলছি,—সত্যি। সত্যি কিনা এই ভাখ্ !'

বলিয়া সে সেখানেই বসিয়া বসিয়া দুলিতে দুলিতে জামার পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়া টিকিটের মত কতকগুলা টুকরা টুকরা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, 'এই ভাখ্, শালা মাষ্টার লেভার চুকলে-মাথার ঠিক থাকে কখনও ? এদিকে তাকাই ত' এশালা বলছে এঘোড়া, আবার ওদিকে তাকাই ত' ওশালা বলে ওই ঘোড়া, মাথাটা গেল গোলমাল হয়ে।—বাক্‌গে তিনকড়ি, না কি বলিস্ তিনু, এবার এই আসছে শনিবার

তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, বুঝলি? কিন্তু ছি ছি ছি, মাইরি মাইরি বলছি তিনু, শোন্!'

এই বলিয়া হাতের ইসারায় আবার তিনুকে তাহার কাছে ডাকিতে লাগিল।

বেচারা আর কি করিবে, আগাইয়া তাহাকে যাইতেও হইল এবং যাইবামাত্র শ্রীহর্ষ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে বলিল, 'কিন্তু আজ আমি মাইরি একেবারে ফতুর হয়ে গেছি। কিন্তু—কিন্তু তোর ওই বোন্‌টাকে একথা বলিসনি যেন, খবরদার!'

অথচ যাহাকে বলিতে সে নিষেধ করিল সেই বোন্ তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া।

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'বেশ।'

চাঁপা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল, এইবার কথা বলিল।

বলিল, 'ও আজ কিছু খাবে কিনা ওকে জিজ্ঞেস্ কর দাদা, রাত অনেক হয়েছে।'

কথাটা শ্রীহর্ষ নিজেই শুনিল। বলিল, 'না আজ আর আমি কিছু খাব না।'

'তবে ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে যাও। কাকাবাবু একা আছেন, আমরা যাই। চল দাদা।' বলিয়া তিনকড়িকে সঙ্গে লইয়া চাঁপা সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছিল, শ্রীহর্ষ হাত বাড়াইয়া চাঁপার কাপড়ের আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—'না না তুমি যেও না, তোমার যাওয়া হবে না, ও যাক্।'

কিন্তু কাপড়টা ধরিয়া সে এমনভাবে টানিল যে, চাঁপা একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া মনে হইল সে রাগিয়াছে। বলিল, 'মাতাল হ'লে কি তার বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু থাকে না! ছি! ছাড়ো, আমি যাই।'

বলিয়া কাপড়টা সে নিজেই টানিয়া তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া ভাল করিয়া গায়ে তাহার জড়াইয়া লইল। বলিল, 'বাকি আর কিছু রাখলে না তুমি, ছি! যাও শোওগে যাও, কাকাবাবুকে একা ফেলে এসেছি। আমরা চললাম।'

এই বলিয়া সে আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীর কটকটা পার হইয়া তিনকড়ি বলিল, 'বাবু রেস্ খেলতে গিয়া ফতুর হয়ে এসেছেন।'

চাঁপা তাহার পিছু পিছু চলিতেছিল। মুখে শুধু একবার বলিল, 'হুঁ।'

তিনকড়ি আবার বলিল, 'টাকার দুঃখু ভোলবার জন্যে মদ খেয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে—মদ আবার অমনি করে খায়! ছি!'

চাঁপা কোনও কথা বলিল না।

তিনকড়ি পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইল। রাস্তার একটা গ্যাসের আলো চাঁপার মুখে পড়িয়াছে। তাহার সেই অত সুন্দর মুখখানিও মনে হইল চিন্তায় ম্লান।

তিনকড়ি বলিল, 'হাঁরে চাঁপা, জামাইবাবুকে মদ খেতে ত' এর আগে দেখিনি। ও-সব আবার খেতে শিখলো কখন?'

চাঁপা তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'কি জানি দাদা, কখন্ যে শিখেছে তা ওই জানে।'

এইবার বাহাতি গলির মধ্যে ঢুকিতে হইবে। চাঁপা থমকিয়া দাঁড়াইল।

তিনকড়ি বলিল, 'দাঁড়ালি যে? চল্।'

চাঁপা বলিল, 'আজকার মত আমি ওইখানেই ফিরে যাই দাদা। কাকাবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন, জেগে উঠে আমায় যদি খোঁজেন ত' তুমি তক্ষুনি আমায়—'

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। না পারিলেও তিনকড়ি বুঝিল। ফিরিয়া দাঁড়াইল বলিল, 'চল্।'

চাঁপা বলিল, 'আমি একাই যেতে পারব দাদা, তুমি যাও।'

তিনকড়ি তাহার সেকথা শুনিল না। আবার সে পিছন ফিরিয়া শ্রীহর্ষর বাড়ীর দিকেই চলিতে লাগিল।

বিগত দিবসের গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পরদিন শ্রীহর্ষ অতি প্রত্যূষেই স্নান করিল। বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিবে এমন সময় তিনকড়ি ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কাকাবাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তোমাদের সেখানে একবার যাওয়া উচিত।

চাঁপা প্রস্তুত হইয়াই ছিল, যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কই, আমাকে

ত যেতে বললে না? কথা কি এখনও আমার সঙ্গে কইবে না না-কি?'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে চাঁপা জবাব দিল, 'যাবার ইচ্ছা যদি থাকে ত' যাবে।'

কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল রাত্রিটা তাহাদের নিরুপদ্রবে পার হয় নাই, তা না হোক, শ্রীহর্ষও রোগী দেখিবার জন্য চাঁপার পিছন ধরিল।

গিয়া দেখিল সতাই তাই। বৈবুণ্ঠর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না, চোখ দুইটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁচিবার আশা তাঁহার আর সত্যই নাই।

তিনকড়ি শ্রীহর্ষর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ডাক্তারকে একবার ডেকে আনি।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আন।'

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিয়া গেলেন, আশা আর নাই, তবে আজিকার দিনটা হয় ত বা না মরিলেও মরিতে পারেন।

ডাক্তার-বিদায়ের ফিস্ লইয়াই বাধিল বিপদ। শ্রীহর্ষই এতদিন তাহাদের সমস্ত খরচপত্র জোগাইয়া আসিয়াছে, তিনকড়ির দোষ নাই, আজও সে ভাবিয়াছিল, ডাক্তারের দক্ষিণার টাকাটা শ্রীহর্ষই দিবে। কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সসঙ্কোচে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। বলিল, 'আমার কাছে ত কিছু নেই তিনকড়ি, কাল ত তোমাদের আমি সব কথাই বলেছি।'

মত্ত অবস্থায় সে অনেক কথাই বলিয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীহর্ষের মত অতবড় একটা পয়সাওয়ালা লোক একদিন মাত্র রেস্ খেলিতে গিয়া যে এমন ভাবে সর্ব্বস্ব হারাইয়া আসিতে পারে সে কথা তিনকড়ি বিশ্বাস করে নাই। আজও হয় ত করিল না। কিন্তু ডাক্তারবাবু তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। সে সঙ্কটের মুহূর্ত্তে এই লইয়া শ্রীহর্ষর সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে গেলেও চলে না, কাজেই সে নিরুপায় হইয়া তাড়াতাড়ি চাঁপার কাছে ছুটিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর কাছে কিছু আছে চাঁপা?'

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না, আড়ালে দাঁড়াইয়া চাঁপা সবই শুনিয়াছে। বলিল, আমার সঙ্গে তা হ'লে একবার ও বাড়ীতে যেতে হয় দাদা। তার চেয়ে ডাক্তার-বাবুকে এখন যেতে বল না, তুমি এক সময় গিয়ে টাকা তাঁকে দিয়ে আসবে।'

'সেই ভাল।' বলিয়া তিনকড়ি ডাক্তারবাবুর সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

চিন্তিত ম্লান মুখে তিনকড়ি ফিরিয়া আসিল।

এদিকে তখন মুমূর্ষু পিতৃব্যের শয্যাপার্শ্ব হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া পাশের ঘরের দরজার কাছটিতে দাঁড়াইয়া চাঁপা ও শ্রীহর্ষ বোধ করি ঝগড়া সুরু করিয়াছে।

কি যে তাহাদের কথা হইতেছিল কে জানে। ডাক্তারের সন্ধানে তিনকড়ি তাহাদের গলির মোড় পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিল, তাই তাহার ফিরিতে একটুখানি দেরিই হইয়াছে। তবে ঝগড়াটা যে তাহাদের দুই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কিসের জন্য হইতেছে তিনকড়ির সেকথা বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। কিন্তু সে কাছে থাকিলে পাছে তাহারা লজ্জা পায় ভাবিয়া ঘরে ঢুকিবাই তিনকড়ি বলিল, 'আমি একবার দোকান থেকে আসি চাঁপা, তোরা এইখানে বোস্।'

তিনকড়িকে দেখিবাই কথা তাহারা বন্ধ করিয়াছিল। চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, 'দোকান তুমি আজ খুলবে নাকি দাদা?'

ঘাড় নাড়িয়া তিনকড়ি বলিল, 'না। মকরধ্বজের সঙ্গে মধু দিতে বলে গেলেন ডাক্তারবাবু, তাই মধু আনতে যাচ্ছি।'

চাঁপা আগাইয়া আসিল। বলিল, 'শোনো দাদা, আসবার পথে তা'হলে একবার তুমি আমাদের ও বাড়ী হয়েই এসো।'

বলিয়া সে তাহার আঁচলের খুঁট হইতে চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'এই চাবি দিয়ে আমার শোবার ঘরটা খুলবে। ঘরে ঢুকতেই বাঁহাতি সেই আর্শী দেওয়া টেবিলটা দেখেছ ত? সেই টেবিলের ডান্ দিকের ড্রয়ারটা টানবে প্রথমে, দেখবে সেখানে ছোট্ট একটি চাবি আছে, সেই চাবি দিয়ে আমার বড় আলমারিটা খুলে তার নীচের তাকে দেখবে আমার গয়নার বাক্সটি আছে, ছোট্ট হাত-বাক্স। সেই বাক্সটি তুমি হাতে করে' নিয়ে এসো দাদা। আসবার সময় আবার সব ঠিক-ঠিক বন্ধ করে' এসো যেন।'

তিনকড়ি কেমন যেন ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চাঁপা তাহার মুখের পানে এমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া তাকাইল;

যে সে আর না বলিতে পারিল না। চাবির গোছা হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীহর্ষ দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই শুনিয়াছিল, তিনকড়ি বাহির হইয়া যাইতেই সে চাঁপার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'গয়নার বাক্স কি হবে?'

চাঁপা বলিল, 'এখানে নয়, ওই ঘরের মধ্যে চল—বলছি। তোমার সঙ্গে কথায় কথায় একুনি হয় ত' চীৎকার করে' বসব।'

বলিয়া সে রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে গিয়া ওদিকের একটা জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বল কি বলছিলে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'বলছিলাম—গয়নার বাক্স কি হবে?'

চাঁপা বলিল, 'সেকথা জানবার দরকার ত' তোমার নেই।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'নিশ্চয়ই আছে। যে-সব গয়নার ওপোর তুমি করছ সে-সব তোমায় দিয়েছে কে শুনি?'

চাঁপা বলিল, 'যে-ই দিক্, দত্ত ধনে স্বত্ব থাকে না সে কথা তোমার জানা উচিত।'

এমন সব বড় বড় কথা শুনিলেই শ্রীহর্ষর মুখখানি এতটুকু হইয়া উঠে, জবাব দিবার মত কথা খুঁজিয়া পায় না। এবারও সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চাঁপার মুখের পানে মুখ তুলিয়া একবার তাকাইল। চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইল সে রাগিয়াছে। বলিল, 'কিন্তু আমার অত অত টাকা আমি খুইয়েছি কার জন্যে—জানো?'

চাঁপা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—'জানি। নিজের বোকামির দোষে।'

এত বড় আঘাত শ্রীহর্ষকে জীবনে কেহ দেয় নাই। একে ত' সে তাহার এত কষ্টের সঞ্চিত অর্থ হারাইয়া মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছে, তাহার উপর যে-স্ত্রীকে সে এত ভালবাসে, যে-স্ত্রীর জন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ সেই স্ত্রীই তাহাকে যে এমন কথা বলিতে পারে তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। কি আর করিবে, মনের দুঃখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'হুঁ, বুঝেছি। তা বেশ, তোমার যা খুশী তাই কর চাঁপা, আমার আর বলবার কিছু নেই।'

এই বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, চাঁপা তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'যাচ্ছ কোথায়? শোনো!'

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'কি শুনব?'

চাঁপার দুচোখ তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। বলিল, 'তাহলে কি আমি করব তাই বলে দিয়ে যাও! ওই যে টাকা না পেয়ে ডাক্তার ফিরে গেল, ওই যে রোগী একজন মরছে ও-ঘরে, এই যে এখানের সংসার—এ-সব চলবে কেমন করে' শুনি! তোমার আর কিছু নেই, তুমি শুধু চলেই যাচ্ছ, কিন্তু আমিও কি চুপ করে' থাকব?'

শ্রীহর্ষ কি যে বুঝিল কে জানে, বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, টাকা আমি এনে দিচ্ছি।'

বলিয়া সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পনেরো পরে তিনকড়ি ফিরিয়া আসিল খালি হাতে। চাবির গোছাটা চাঁপার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'বারণই যদি করবি ত' কেন মিছিমিছি আমায় ভোগালি বল্ ত?'

চাঁপা তাহার কথার মানেটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বলিল, 'কি হলো কি?'

তিনকড়ি বলিল, 'অনেক কষ্টে অনেক তালাচাবি খুলে গয়নার বাক্সটা বের করেছিলাম, কিন্তু জামাইবাবু গিয়ে বললেন, না আর দরকার হবে না।'

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার ঠিক সেই খানে তেম্নি করে' সেটা রেখে এলে ত'?'

তিনকড়ি বলিল, 'বা-রে, সেখানে আর রাখতে গেলাম কোথায়! বাক্সটা ত' জামাইবাবু আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন।'

'নিয়ে আর সেখানে রাখলে না?'

ঘাড় নাড়িয়া তিনকড়ি বলিল, 'না। বললে টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও।'

নীচের দিকে মুখ করিয়া দাঁত দিয়া চাঁপা তাহার রক্তাভ সুন্দর ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের আবহাওয়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

বুঝিতে পারি যে বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলাদেশে এত সেক্স সাইকলজী ছিল না। পূর্ব্বেকার চল্লিশ বৎসরের লোক যাহা জানিত না, তোমরা ইংরেজের কৃপায় ও বিজ্ঞানের কৃপায় বিশবছরের মধ্যেই তাহা শিখিয়াছ ও জানিয়াছ। ভাবিতেছ, তোমাদের মতি বুদ্ধি গতি অনেক স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু আসলে তাহা স্বাধীনতা দেয় নাই, বরং আরো বাঁধনের গণ্ডী টানিয়াছে। ভুল অনেক কারণে হইলেও, তাহারাও যেমন জীবনের সত্যকে রঙ বদলাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তোমাদের 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-ও সেই ঘুরাইয়া দেখাইবার চেষ্টা হইতে বিরত নয়। সোজাসুজি জীবনটাকে সহজ সরল সবল ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার খেলা দেখাইয়াছে বলিয়া ঠিক মনে হয় না। প্রচলিত পদ্ধতিকে না মানিতে পার, আপত্তি নাই, পার যদি ভাঙিয়া ওছনচ কর, আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি যে ধোলশেকিকী করিবার স্বপ্ন, তাহার সাহিত্যের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে গ্রহণ করিতে চাও, কিম্বা ফরাসী সাহিত্যের La Boheme হইতে চাহিতেছ, ভুলিয়া যাও কেন, যে এ মাটি ফ্রান্সের মাটি নয়, আমাদের দেশে মেয়েরা মায়ের জাত—কম্বরেড্‌এর জাত নয়। অন্ততঃ বাঙলা দেশে মাটি কালো যেদিন হইবে, সেদিন তুমি আমি দেখিব না, মহাকাল দেখিতে পারেন। জীবনের আসল সত্যকে ত্যাগ করিয়া কল্পনার বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে আর্ট হইল কি? আর্ট কি জীবন নয়? না, এ জীবনটা একটা আর্ট নয়?

লেক্ রোড, মোটর গাড়ী, চায়ের টেবিল, দার্জ্জিলিঙের ম্যাল, উটরাম ঘাট, এই খানেই সমস্ত জীবন গানা-খাবে নাই। খোলার ঘরে, বস্তিতে বা পাদাড়ে যাহারা আছে, তাহাদের জীবনের সঙ্গে তোমাদের কতটুকু পরিচয় আছে; কল-কারখানায় যাহাদের শ্রমলব্ধ ব্যাসাতি, চা-বাগানে যাহাদের জীবন, তাহাদের মুখে যে ভাষা, যে ভাব তোমরা সাজাইয়া তুলিতেছ, তাহাতে তোমাদের জীবনের সত্য অনুভূতি কোথায়?

জীবনকে অস্বীকার করিয়া, কল্পনাকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? কবে দেখিয়াছ, পানওয়ালী পড়ার খরচ জোগায়, আর তোমার টুক্‌টুকে বউয়ের কল্পনা করে? সত্যকে অস্বীকার করিয়ো না—পানওয়ালী মায়ের জাত, পড়ার খরচ জোগাইতে পারে, কিন্তু সেও স্ত্রীর জাতি, টুক্‌টুকে বউ সে তোমাকে দিবার আশা রাখে না, তার পায়ে তেল দিবে এ কল্পনাও তার হয় না। সত্যকে অস্বীকার করিলে আর্ট হয় না।

ফরাসী-বিপ্লবের আবাহন কালে এক বিপ্লবের বেদ বলিয়াছিল, সকল মানুষ সমান। ফরাসী দেশ তোলপাড় হইয়া গেল, কিন্তু দিন পরে দেখা গেল, সকল মানুষের অসমান এক মানুষ আসিয়া উদ্যত খড়্গ লইয়া দাঁড়াইল, দেশের লোক তাহাকে Vive le Roi, সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। মানুষ সমান রহিল না। মানুষ সমান নয়। সকল মানুষ যদি আদি হইতেই সমান হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বতন অসভ্যতা বর্ব্বরতা হইতে তাহাকে উঠিতে হইত না। অসমান বলিয়াই এত অগ্রসর হয়, ও হইতেছে। ফ্রয়েড, এলিস, কোয়েলের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে ফেলিয়া তাহার জাবর কাটিতে কাটিতে আর্টের সৃষ্টি হয় না।

সৃষ্টির একটা বেদনা আছে। সে বেদনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে কি? সকল সৃষ্টির আদিতে যে দুঃখ, সে দুঃখ জানিয়াছ কি? ভোগ করিয়াছ কি? 'আর্ট ফর আর্টস সেক' বলিবার মত ধৃতি, সংযম, অভ্যাসযোগে যোগযুক্ত হইয়াছ কি? যদি হইয়া থাক, তোমার সাহিত্যে তাহার প্রমাণ কোথায়?

সকল আচার-ধর্ম্ম টাকায় বেচা-কেনা হয়, সকল কাল্পনিক সাহিত্যও বাদাম তৈলে মিশ্রিত বাজারের খাবারের মত কেনা-বেচা যায়। কিন্তু সত্য-ধর্ম্ম যেমন কেনা-বেচা যায় না, সাহিত্য-সৃষ্টির ধর্ম্মও তেমনি কেনা বেচা যায় না। কোন কালে কোন দেশেই নয়। সত্য, খাঁটি মানুষ ধর্ম্মকে বেচিতে পারে না, সত্য সাহিত্যও জীবনকে বেচিতে পারে

না। আর্টের জন্য যাহারা আর্ট করিয়াছে, তাহারা 'কোউকে গোটিক'। বাঙলা সাহিত্যে, তথাকথিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সে সাধক একজন ছাড়া আর তো চোখে পড়িতেছে না।

তোমরা যাহা সাহিত্যে আর্ট বলিতেছ, তাহা জীবন নয়, তোমাদের চরিত্রসৃষ্টিও সজীব নয়। দেশ, কাল, পাত্রের মধ্যে তাহার স্থিতিও নাই, গতিও নাই। জীবনের মূল সূত্র ও তাহার রসানুভূতি যেখানে, সেইখানেই আর্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। তোমরা আর্টের দোহাই দিয়া জীবনকে পরিত্যাগ কর, জীবনকে যে পরিত্যাগ করে, সে পলাতক; জীবনের আসল সুখদুঃখের ভয়ে পলাতক, কল্পনার মোহসুখে আবদ্ধ। এই যে জীবন—যেখানে অবিরাম বাঁচিয়া থাকিবার সংঘাত, পূর্ণ হইতে পূর্ণ হইবার সংঘাত—সে যুদ্ধক্ষেত্র, তাহা হইতে করিলে পলায়ন, ক্ষতের ভয়ে, ত্যাগের ভয়ে মহাক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, আশ্রয় লইলে কল্পনায়, সে কল্পনাও তোমার নিজস্ব নহে, দেশের নহে, দেশের আদর্শ বা কল্পনার ধারার তাহার কোন যোগসূত্র নাই।

আর্টের জন্য আর্টের দোহাই দিয়া গান, নাটক, ছবি কতরকমেই প্রকাশের বাসনা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে আর কিছুই পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় শুধু একটা আঘাত দিবার চটুল বার্থতা। আঘাত দিবার আগে ভাবিতে হয়, দেখিতে হয় যে কোথায় আঘাত দিতেছি। পায়ে না মাথায়—নিজের না পরের? যাহা কিছু এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে সকলের উপরই আঘাত করিতে চাও—আভিজাত্যকে আঘাত করা ত আজিকার দিনে রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে অথচ নিজেরা সেই আভিজাত্যই ঘুরিয়া ফিরিয়া কামনা করিতেছ। রুশিয়া বুর্জোয়াকে সাহিত্যে ভাঙ-চোর করিতেছে, ইংরেজী তর্জমায় পড়িয়াছ, অতএব বাঙলার কল্পিত বুর্জোয়াকে আঘাত কর, সাহিত্য রচনা কর। রুশিয়ার দেশ, কাল, পাত্র ও জলবায়ুভেদে যাহা স্বাভাবিক তাহা কি এই বাঙলাদেশেও স্বাভাবিক? তাহা নয়—ওই বাবার মত তুকা, এখনও সে বালকত্ব ঘুচে নাই। কখনও বা লেখার মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবল বন্যা, কখনও বা কষ্টকল্পিত হাস্যরস, কখনও বা সিনেমা হইতে গৃহীত ছবির ভাবের বিরূপ রেখা। কোন জায়গায়ই সত্যের সন্ধান মিলে না।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অর্থে হয় না—সোনায় কেনা যায় না। সে সাহিত্য রচনায় জীবনের প্রতি যেমন মমত্ব বোধ, সেই মত সৃষ্টির প্রতি মরমের মমত্ব বোধ থাকা চাই, তবে সাহিত্যে সৃষ্টি আসে, তবে সেই সৃষ্টির বেদনা বুকের গতির তালে বাজিয়া উঠে, তবে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে নৃত্য জাগে, জীবন উচ্ছল হয়। যখন উচ্ছল হয়, যখন তাহা সারা দিনের অভাবের ঘাতপ্রতিঘাতকে, জীবনের সুখদুঃখকে বুকের সঙ্গে ঘনীভূত করিয়া দুঃখের মুখে সুখের বেদনা দেখে, তখন সাহিত্য সৃষ্টি হয়। তুমি সাধনা না করিয়াই সাধক হইলে, ধ্যানের বস্তুকে প্রাণের দ্বারে আহ্বান করিয়া যে তপস্যার প্রয়োজন, তাহা করিলে না, সে তাপ ভোগ করিলে না, সৃষ্টি হয় কি করিয়া? তপই সৃষ্টি, তপই যখন প্রকাশমান হয় তখন জীবনকে দ্রষ্টাভাবে দেখার উপায় আসে, তখন সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়াও তপের অগ্নিতে স্ফটিকের মত নবচন্দ্রকবর্ণ ফুটাইয়া তোলে, স্রষ্টা ও দ্রষ্টা এক হইয়া যায়। সাহিত্য রূপ লয়।

আজ এই কথাটাই বলিতে চাই, যে সাহিত্য যেমন "সহস্রগুণ উৎসর্জয়ন্তি"—সাহিত্য-স্রষ্টাও যে জীবনের রস গ্রহণ করেন তাহা সহস্র গুণ উৎসারণ করেন, পৃথিবীতে জীবনের সুখে দুঃখবোধ জ্ঞানতঃ থাকা সত্ত্বেও পরম আনন্দ দান করেন; মানুষ নিজেকে একটু নিজের আলোয় দেখিতে পায়। অবাধ স্বাধীনতা সেইখানে আর বাধা পায় না। সেই আবহাওয়াই সাহিত্যের আবহাওয়া। সেইখানেই সৃষ্টি।

সাহিত্যের মূলসূত্র তাহাই! সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার ইহাই সত্য পথ। সাধন-কালে পতন হইতে পারে, ভুল হইতে পারে, কিন্তু সেই পুরান কথা—

যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে।

জীবনই সেই মাটি, সেই ভিত্তি, সেইখান হইতেই উঠিতে হইবে—ইহাই সাহিত্য-স্রষ্টার একমাত্র সম্পত্তি, ও মূল-মশলা!

এই স্বাভাবিক গতিকে ত্যাগ করিয়া, আধুনিকেরা এমন একটা ভাষার সৃষ্টি করিতে চাহেন—যাহাকে তাঁহারা বলেন ছাঁদ, ষ্টাইল ইত্যাদি। ঝড় যখন আসে তখন গাছের রোল একরকম হয়, বায়ু যখন ঝির্ ঝির্ করিয়া বহে, তখন পাতা আর এক ভাবে নাচে, সমুদ্র যখন বায়ুর সঙ্গে খেলা করে তখন

তাহার ভঙ্গী আর এক রকমের তরঙ্গ তুলে, সে হইল তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ, কিন্তু আজ দেখিতেছি অন্য মূর্তি। সত্যতা সরলতাই হইল শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ, কিন্তু তোমরা জীবনে কর্ম্মে পথচলায় পর্য্যন্ত এমন এক ছাঁদ আনিতেছ, যাহা তোমরা নিজেরাই বিশ্বাস কর না। জীবনে চলার ভঙ্গী যেমন, লেখার ছাঁদেও সেই ভঙ্গী। ভাষা যেন পোষা কুকুরের মত, আদরই চায় আর লেজ নাড়ে। আদরে আনন্দ প্রকাশের মত একটু চটুল চাহনির ভঙ্গী, তারপরই লেজ নাড়া সুরু। সেটা সহজে বলা যায়, তাহাকে ঘুরাইয়া লেখাই নাকি বৈশিষ্ট্য। লেজ নাড়ার অর্থ যেমন আদর কাড়ান, ভাষা লেখাও অনেকটা সেই রকমই। প্রত্যেক লেখার ছাঁদ যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি পাঠক, কেমন মিষ্টি করিয়া কথাটি বলিলাম! কেবল মিষ্টি করিয়া কথা বলাই সাহিত্য নয়। সত্য বস্তু খাপখোলা তরবারির মত, সেই ধার চাই, কিন্তু তোমাদের সে ধার কোথায়? বৃষ্টি-ধারার গান বাঁধিতে গেলে, তার ছন্দে বৃষ্টির জলের ছন্দ নাই, আছে কাঠে-কাঠে ঠকঠকানি। ছন্দ বাঁধিলেই কাব্য হয় না, ভাবের সঙ্গে শুধু কথা যোজনা করিলেই ভাব প্রকাশ হয় না, ভাবের নিজস্ব একটা ছন্দ আছে তাল আছে, যখন সেই ভাব, তার সত্য রূপ লয়, তখন ভাব ভাষা ছন্দ আপনিই প্রকাশ পায়, মিছরির দানার মত স্বচ্ছ রূপ পরিগ্রহ করে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথকে ভাব ভাষা ছন্দের যেমন সাধনা করিতে হইয়াছে, সেই সাধনার অন্তরে যে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া তাহাই তাহাদের সৃষ্টিকে রূপ দান করিয়াছে—না হইলে, বাদল বাউল একতারা বাজাইল বলিয়া, তোমরা যে মাদল বাজাইতেছ সেটা বাদলের গানও নয়, মাদলের বাজনাও নয়। বাদলা রাতের 'শ্রাবণ ঘন ঘন ঘোর বরষা'র সুর যে ধরিতে পারে, তাহার বুকের ভিতর নীল ঘন অন্ধ মেঘের দোল চাই, তার অনুভূতি চাই, সে অনুভূতি তোমার গানে কোথায়, থাকিলে বিদ্যাপতির মত তাহার প্রকাশ পাইতাম, বর্ষার ঘনঘন গর্জ্জনের সঙ্গে বুকের মেঘধ্বনি শুনিতে পাইতাম। তাহা তোমাদের নাই। বুকে হাত পড়ে নাই; পড়িয়াছে কাঠের খুঁটিতে, তাই কাঠে কাঠে এত ঠক্ ঠক্। তাহাতে ছাপরা-জেলার কাঠের খঞ্জনির তালও নাই।

মূল কথা, সাহিত্যের আবহাওয়া বলিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহার সঙ্গে আরো অনেক কথা বলিবার থাকিতে পারে—কিন্তু সহজ কথাটি এই, লোকহিতায় বল, আর্টের জন্যই বল, আর যৌন-মিলনের বল ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণই বল, জীবনকে বাদ দিয়া, সত্যকে বাদ দিয়া কোন আদর্শই জন্মে না। কেননা বিশ্ব-সংসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের বাহিরে যাহা আছে তাহা তুমি কোন দিনই ভাষায় প্রকাশ করিতে পার না এবং এও সত্য, যা কিছু কল্পনা তুমি কর তাহাও পৃথিবীতে সৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারে না। আর্টের প্রকাশে সহজ দোষ এই যে তোমাদের রূপের জ্ঞান নাই, যাহা কিছু কল্পনা কর, সেটা জীবনের এক স্থান হইতে দেখিয়া, কিম্বা পরের কাছে শুনিয়া।

স্বীকার করা সঙ্গত, যে, দেশের আবহাওয়া বদলাইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সমাজ ধর্ম্ম অনেক কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কতটুকু বলিতে পার? দারিদ্র্য অভাব লালসা ও ক্ষুধার তাড়নায় আজ তোমরা ভগবান ভূত ও ভালবাসার উপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হারাও নাই, হারাইয়াছ সেই দিন যেদিন হইতে মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছ, সেই দিনই ভাব-দারিদ্র্য এদেশে দেখা দিয়াছে। সেই ভাব-দারিদ্র্যই আজ সকল অভাব, দারিদ্র্য লালসার ক্ষুধা বাড়াইয়া দিয়াছে। অর্থনৈতিক বাস্তব-সংঘাত চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে—সৃষ্টিতে এ ইতিহাস সকল জাতিরই পূর্ব্ব ও নূতন সকল সময়ই বর্ত্তিয়া আছে। ইউরোপে যাহা হইয়াছে তোমাদের এ দেশে ঠিক তাহা হয় নাই।

বাস্তব সংঘাতে সাহিত্য যে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা অতি পুরাতন কথা। দুই পৃষ্ঠা 'ক্যাপিটাল' পড়িয়া ততখানি বিদ্যা যদি অর্জ্জন করিতে তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার প্রকাশ দেখিতাম। চিরমহিমময়ী নারীকে তোমরা দেখ নাই, মুখে বইপড়া পুরাতন মহিমার কাঠাম জোড়া দিতেছ, মহিমা তোমাদের সৃষ্টিতে নাই বলিয়া শাইলকী তোমাদের এমন রোগে দাঁড়াইয়াছে।

তোমরা যাহাকে সাহিত্যে সৃষ্টি বলিয়া এত গুড়পাইতেছ, তাহা সৃষ্টি নয়। পুলিশ আদালতের খবর, যাহা খবরের কাগজে বাহির হয়, তাহার বিশ্লেষণ আর্ট নয়। খাইতে পাও না বলিয়া কবিতা যদি উঠিয়া গিয়া থাকে, যাক্—কিন্তু সে না

খাওয়ার যে জ্বালা তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীই বা কোথায় তোমাদের সাহিত্যে! অনেক ঢক গোলাইয়াছ, এইবার স্থির হইয়া অঙ্কন সাধন করিলে বুঝিবে, সৃষ্টি, সাহিত্যে সৃষ্টি কাহাকে বলে। বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করিতে শিখিলে, রবীন্দ্রনাথের "ভোঠামশায়" সৃষ্টি করিতে পারিতে, যে সৃষ্টি পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যে কৌলিক সৃষ্টি। জগৎ দিয়া রস-রচনা কাহাকে বলে, তাহা যদি শিখিতে, সাধন করিতে, তাহা হইলে দেখিতে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' তোমাদের তুলিকায় ফুটিয়াছে। তুলি টানিলেই চিত্রকর হয় না—কলম দিয়া আঁচড় কাটিলেই কিছু সৃষ্টি হয় না। অনেকখানি তলস্পর্শ প্রয়োজন হয়। ভগবান, ভূত ও ভালবাসার উপর প্রত্যেক বিশ্বাস হারাও—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি দরদ দিয়া মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে সত্য বিশ্বাস রাখিতে পারিতে, তাহা হইলে শরৎ-চন্দ্রের মত শ্মশানে ভূতের ভয়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতে, তাহার মধ্যে কতখানি সত্য আছে তাহা ধরিতে পারিতে। 'দুই আর দুয়ে চারে'র মূল অঙ্কের সত্য ভিত্তি জানিলে, তাহার অঙ্ক ভুল হইত না। তাহা তোমরা জান না, তাই তোমাদের এই আর্ট না দেবার না ধর্ম্মায়, না মানুষায় যা!

দুই আর দুইয়ে যে চার হয়, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু কেন যে দুই আর দুইয়ে চার হয় সেটা অঙ্ক-শাস্ত্রের কথা। সেটা খুব সহজে কোন বুড়াকে বুঝান শক্ত, ছেলেদের তো অসম্ভব। একথা ঠিক যে, অঙ্ক-শাস্ত্র সকল বিষয়েই প্রয়োগ করা যায়—কিন্তু যে রস-সৃষ্টি তোমরা করিতে চাও, তাহাতে অত সহজে বুঝাইতে পার নাই, তাহার প্রয়োগ যে খুব সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা মনে হয় না। বিচার দেখিলে, আমরা বন্দুকের শব্দের জন্য কান পাতি, বাতাসের গর্জ্জন-ধ্বনি যখন উঠে, আমরা সমুদ্র-তরঙ্গের দিকে চাহিয়া থাকি, বসন্তের প্রারম্ভে বন বন করিয়া পাতা ঝরিয়া পড়ে, আমরা দেখি তার পরই কচি পাতায় গাছ সাজিয়া গিল। বিজ্ঞান তাহার এই অভিজ্ঞতা হইতেই নিয়মের চলন, গতির চলন, অয়নের চলন, স্থির করে। মনুষ্য-জীবনের যে ভাব তাহা দুই আর দুয়ে চারের মতন এমন কোন বাঁধা বিজ্ঞানের নিয়মের ধারায় যে ধরা পড়ে, একথা কেহ জোর গলায় বলিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। মানুষের মন বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট দিয়া চলে বলিয়া কখন দেখা যায় নাই।

ক্ষুধার তাড়নায় দেহ বিক্রয় করিয়া নারী সন্তান পালন করে, ধনী হইবার জন্য সুবুদ্ধি খুড়া স্ত্রী বিক্রয় করে, স্ত্রীর অর্জ্জিত অন্নে স্বামী নিজের জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করে, কন্যার অর্জ্জিত অর্থে পিতা ধনী হয়, এ সকল নূতন নয়। তাহাতে যে সুখ দুঃখ, যে কোনও দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিয়া তাহা হইতেই শাশ্বত সাহিত্যরসসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। তোমরা সে দুঃখ অথবা সুখ যদি সৃষ্টি করিতে পারিতে, তাহা হইলে তাহাকে সাহিত্য-সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা হইত না। তাহা পার নাই, যাহা করিয়াছ, তাহা কামজ ক্ষুধা জাগাইবার হুঙ্কারজনক বিবৃতি। তাহাতে দার্শনিক ভিত্তি নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই, সৃষ্টিও নয়, ফোটোগ্রাফও নয়। দেশের সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ, এ আবহাওয়া, দুঃখেরই কথা—গর্ব্বের নয়ে।

রুদ্রের রৌদ্ররোষের মধ্যে দক্ষিণ মুখও থাকে, রুদ্র যেমন সত্য, দক্ষিণও ঠিক তেমনি সত্য।

আর একদিক

জীবজন্তুর মধ্যে সকলের চাইতে বেশী বাঁচে কচ্ছপ, ১০০ হইতে ৩০০ বৎসর। হস্তীর আয়ু ১০০ হইতে ২০০ শত বৎসর। বাঘসিংহ ১০২ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছে জানা যায়। এদিকে ক্ষুদ্র জীব মাছি ১০ হইতে ১৫ দিন, আরশোলা ১০ হইতে ১২, খরগোস ৭ হইতে ৮, ইঁদুর ৩ হইতে ৪ বছর। দেখা যায়, যে যত অলস, তাহার তত বেশী আয়ু।- ডল ষ্টার্লি, ব্রেকফাস্ট ট্রাইবিউন।

গোবিন্দদাস কবিরাজের
একটি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ

— শ্রীসুকুমার সেন

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে কবিরাজ গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, পরে ভ্রাতা হাজিপুরের বৈষ্ণবতা দর্শনে ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি মহান্তের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া নিদারুণ পীড়ার জীবনে হতাশ হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি রোগমুক্ত হন।

এ সকল ব্যাপার বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। গোবিন্দদাস কবিরাজের জীবনী ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। তাহা বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

গোবিন্দদাসের মাতামহ ছিলেন শ্রীখণ্ডের একজন বিখ্যাত কবি-পণ্ডিত, দামোদর সেন। গোবিন্দদাস মাতামহের কবিত্ব-শক্তি পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব হইবার পর তিনি গৌরলীলা ও ব্রজলীলাবিষয়ক অনেক চমৎকার পদ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই জানি। বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বেও তিনি পদ রচনা করিতেন, ইহার উল্লেখ প্রেমবিলাসে এবং অন্যত্র আছে। তখন তিনি শাক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই সকল পদ শক্তিবিষয়ক ছিল। গোবিন্দদাসের শক্তিবিষয়ক কোন পদ আমাদের এখন জানা নাই। কেবল প্রেমবিলাসকার এই মুখবন্ধ করিয়া এইরূপ একটি পদের শেষ ত্রিপদীটি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—

কবিরাজের পূর্ব্ববাক্য কহা নহে।
পরে যে হইবে তাহা বেদের নির্ণয়॥

পদের অংশটুকু এই—

না দেব কানুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী-শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দ দাস॥

[প্রেমবিলাস, রত্নাবলী যন্ত্র,
অম্বিকাপুর, ত্রিপুরা সংস্করণ, ১৩১৮ সাল, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮]।

সম্পূর্ণ পদটি এতদিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি আমি একটি পুঁথিতে সম্পূর্ণ পদটি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুঁথিটি একটি অসম্পূর্ণ পদসংগ্রহ গ্রন্থ, নাম রসনির্য্যাস। সংগ্রহকারের নাম বৃন্দাবনদাস। ইনি চৈতন্যভাগবতকার হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পুঁথিটি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীখণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে ও সৌজন্যে পুঁথিটি ব্যবহার করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে।

সংগ্রহকারের গুরুর নাম রাধামাধব। প্রথম শ্লোকেই তিনি গুরুকে এই বলিয়া বন্দনা করিতেছেন—

কৃষ্ণাবলিঙ্গিতবপুঃকলিতাবিলাসং
যঃ শ্রীমদ্ভক্তৈকভক্তিপ্রদাং লাবণ্যলোকনম্।
কৃষ্ণকুল (?) বিলাসি-গানন-পরং প্রেমো নিধিং সংশ্রিত
রাধাপূর্ব্বমহং নমামি সততং শ্রীমৎপ্রভুং মাধবম্।

তাহার পরবর্ত্তী এগারটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, সনাতন গোস্বামী, রূপ-গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং বৈষ্ণব মহান্তের বন্দনা আছে। ত্রয়োদশ শ্লোকে সংগ্রহকার বলিতেছেন যে তিনি কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগেরই পদ সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন।

মহাজনৈরেবাসি শ্রীতানি রচিতানি তু।
সারসংগ্রহরূপেণৈব সংগৃহ্যন্তে ময়াধুনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। যে পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রায় চল্লিশটি কবির পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুই একটি কবির নাম পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক যে পদটি লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা সেইটি তৃতীয়সংখ্যক পদ। ইহা অদ্বৈতপ্রভুর বন্দনারূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদটির বিষয়বস্তু হইতেছে শিব-শক্তির অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা। অদ্বৈতপ্রভু শিব (ও শক্তির) অবতার বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত হইতেন। সুতরাং এই সুযোগে বৃন্দাবনদাস, এই পদটির সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। সম্পূর্ণ পদটি এই—

দেখ-হিম-গিরি ধূই-তনু-ধিরি
আধ-তর আধ-নারী।
আধ উজর আধ কাজর
জিনি মোতন-বারী॥ ১
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
কনক [পুতলিক] তুলন-খচিত
তুলন মাটতি (?) অত॥
আধ কপিস আধ ধলিম
ও হুদয়ে উজর হার।
আধ আধাধর আধ পটাধর
পিঙ্গল দুহুঁ উজিয়ার।
না দেবঃ কামিনী [নাং] দেব কানুক
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী-শঙ্কর চরণ-কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস।

১ মূলে 'থারি'। ২ বন্ধনীচিহ্নিত অংশ মূলে নাই। ৩ মূলে 'আধ মণিকল হুদয়ে উজর হার।' ৪ মূলে 'দেব।'

সম্পাদকীয়

বঙ্গশ্রীর দ্বিতীয় বর্ষ

বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার সাংঘাতিক রকমে বেশী—পত্রিকান্তরে এই হার শতকরা নব্বই-এর কোঠায়। শিশু বঙ্গশ্রী এদেশে এক বৎসর টিঁকিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল এই জন্য ভগবানকে নমস্কার ও শুভানুধ্যায়ীগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সংখ্যার লেখকপরিচয়

শুভানুধ্যায়ীরা দুই দল, একদল পাঠক এবং অন্যদল লেখক ও চিত্রকর ইত্যাদি। পাঠকদের পরিচয় দিবার উপায় নাই; লেখক এবং চিত্রকরেরাও স্বনামধন্য, তথাপি এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখা এবং চিত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের কয়েকজনের সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

'রাজমোহনের স্ত্রী' বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে লেখা প্রথম উপন্যাস; বাংলা লেখা তখনও তিনি সুরু করেন নাই। কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বীজের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের অঙ্কুর যে নিহিত আছে তাহারও সন্ধান পাই। উপন্যাসটির ধরণ সম্পূর্ণ বঙ্কিমী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিবেন 'রাজমোহনের স্ত্রী'কে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী বসুমতী অফিস হইতে বাহির হইয়াছে, তথাপি এখনও তাঁহার বহু লেখা নানা খ্যাত অখ্যাত পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং বহু গ্রন্থের ভূমিকা বা মুখবন্ধরূপে আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিতেছি কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সেগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিবেন। পাণ্ডিত্য যে খাঁটি বাংলা লেখার প্রতিবন্ধক নহে, শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা পড়িলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, অত্যন্ত নীরস কঠোর এবং কটু বিষয়ও তাঁহার হাতে সরস রূপ লইয়াছে। যিনি 'বাল্মীকির জয়' লিখিয়াছিলেন তিনিই আবার 'বেণের মেয়ে'ও লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার যে অপ্রকাশিত রচনাটি প্রকাশ করিলাম, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া তাহার মূল্য সামান্যই কিন্তু সহজ সরল বর্ণনামূলক ভাষার নমুনা হিসাবে তাহার মূল্য অনেক। অনেকটা ডায়ারীর ধরণে লেখা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে দুই একটি নূতন খবর আছে এবং বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বের বাংলার একটি পল্লীর সামান্য পরিচয়ও আছে।

স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের বিস্তৃততর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। তাঁহার ন্যায় কৃতী সাহিত্যিকের যে প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল, সে প্রতিষ্ঠা তিনি পান নাই। কারা উপন্যাসের বন্যার ইতিহাস ভাসিয়া গিয়াছে। অথচ

নিখিলনাথ রায়

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দানের পরিমাণ বিপুল। ইতিহাসকে এমন সরস করিয়া লিখিতে আর কেহ পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, নিখিলনাথের ঐতিহাসিক রচনা পড়িয়াই ইতিহাস-গবেষণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এমন হয় তো অনেকে আছেন।

গত বৎসর কার্ত্তিক মাসে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই সময়ে পঞ্চপুষ্প পত্রিকায় তাঁহার যে জীবনী লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

মুকুলের ন্যায় তিনি উজ্জ্বলদর্শন, কথা ছিলেন।

* * *

দেশবাসীকে তিনি যে কিরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার জীবন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সহিত দেশের প্রকৃত ইতিহাস লইয়া, অর্থনীতি লইয়া দৈনিক কোরদিন আলোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তাঁহার ঐকান্তিক দেশপ্রীতি কত গভীর ছিল।

আমাদের মনে হয় যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন তাহা দেশ-প্রীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই লিখিয়াছেন। তাঁহার ঘরে সাহার পুরাণী বড় কথাই বেখিতে পাওয়া যায়। জুন-প্রবৃত্তি হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে ইহার করিতে তাঁহার মত লোক বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সত্য বলিয়া জেনে কিছু বাহির করিলে যতক্ষণ না তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়, ততক্ষণ তিনি তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতেন। ইতিহাস লিখিতে গেলে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকাবলী পড়া চাই। বাল্য হইতেই তিনি বিভিন্ন ভাষা শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। বাল্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অসীম নিষ্ঠা ছিল। সকলেই ছাত্রের ন্যায় তিনি শিক্ষা করিতেন। অন্যায় বিরুদ্ধতার প্রতি তাঁহার অন্তরিম অনুরাগ ছিল। তিনি সত্যের জন্য-প্রবেশ ছিলেন।

* * *

ছাত্রজীবনে বিধিনাথ সিনিয়ার ব'ম. বৃত্তি বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন। পর বৎসর আসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন। ঐ বৎসর জানের সময়, তাঁহার মাতৃদেবী অকালমৃত্যুর প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বিবরণ মেয়ের হাঁ আসিয়া থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন।...

'অভয়ার' তাঁহার মাতৃভাষা-সেবার প্রথম অর্ঘ্য।—প্রেমের কবিতা। এখানি ছাড়িয়া দিলে ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'রাজপুত মুকুর' নামে মুদ্র গাথা-কাব্য তৎকালে বঙ্গে সমাদৃত হইয়াছিল। এই পুস্তক রচনা করিয়া তিনি সিলেটী স্কুলে অবসর করিতেন। ১৩০৪ সালে 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ সালে 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৩১০ সালে 'প্রতাপাদিত্য', 'জয়ন্ত পেত্নী', 'সোনার বাঙ্গালা' প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের সময় 'সোনার বাঙ্গালা' পড়িয়া অনেকেই বাঙ্গালার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল—বাঙ্গালার মুখ গৌরবের কাহিনী জানিতে পারিয়াছিল—জানিতে পারিয়াছিল, কি করিয়া বাঙ্গালা হইতে সে সকল গৌরব নষ্ট হইয়া মুর্খতায় পর্যবসিত হইল। কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 'জয়ন্ত পেত্নী' কোন কোন অংশও বিভিন্ন বালক পুস্তক হইতে তুলিয়া দিতে আদেশ দিতে তিনি ইচ্ছুক হন নাই, কারণেই তাহারও প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। তৎপর 'ইতিকথা' ও 'সমাধান' বাহির হয়। ১৩১৭ সালে 'আমি কে?', ১৩১৮ সালে 'বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা'। ১৩২২ সালে 'কবি কথা' প্রথম খণ্ড, ১৩২৪ সালে 'চুনার', ১৩২৬ সালে 'কবি কথা' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২৫ সালে 'পৃথ্বীরাজ'। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ২য় খণ্ড কয়েক ফর্মা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুর ১২ দিন পূর্ব্বে তাঁহার 'বাঙ্গালার কথা'র পাণ্ডুলিপি তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

বাঙ্গালা দেশে ইতিহাসের জন্য কোন বিশিষ্ট পত্রিকা না থাকার বিষয়টান বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন, ১৩১০ সালে তিনি 'ঐতিহাসিক চিত্র' ঐতিহাসিক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ করিয়া পত্রিকাখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি দেন; তিনিও মাত্র এক বৎসর প্রকাশ করেন। তাহার পর নিখিলবাবু সবপ্রথমে 'ঐতিহাসিক চিত্র' কয়েক বৎসর প্রকাশ করেন। বিষ্ণুকলে ইনি সুকবি সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহযোগে "পল্লীবাসী" পত্রিকা প্রকাশ করেন ও ১৩০০ হইতে ১৩২৩ তাবি বৎসর "সাধনী" পত্রিকা বাহির করেন।...

নিখিলনাথের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয়ের সৌজন্যে মৃত্যুর ১২ দিন পূর্ব্বে সংশোধিত তাঁহার সুবৃহৎ বাঙ্গলার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি "বাঙ্গালার কথা" আমরা বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের জন্য পাইয়াছি। অনৈতিহাসিক যুগ হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস বাঙ্গালার কথায় আছে। গত এক বৎসরের গবেষণার ফলে এই ইতিহাসে যে নূতন আলোকপাত হইয়াছে তাহার সাহায্যে এই সুবৃহৎ ইতিহাসখানির পাণ্ডুলিপি ঢাকা বাদুঘরের কিউরেটর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছেন। ইহাতে ইতিহাসখানি সুসম্পূর্ণ হইবে।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের পরিচয় গতবারের বঙ্গশ্রীতেই দেওয়া হইয়াছে। লীগ অব নেশন্সের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে তিনি ভারতীয় ডেলেগেটরের কাজ করেন, সুতরাং তাঁহার লিখিত এবারকার প্রবন্ধ "বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ"এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের উৎপত্তি এবং তাহার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য বিশদ বিবরণ আমরা পাই নাই। শ্রীযুক্ত বসুর এই প্রবন্ধ সেই অভাব দূর করিবে।

"মিউনিক এবং প্যারিসে"র লেখক শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বাংলাদেশের এক প্রবাসী কৃতী সন্তান। তাঁহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিবার জন্য এই জ্ঞান-তপস্বী লোক-প্রসংসার অন্তরালে যে গভীর ও ঐকান্তিক সাধনায় আত্মমগ্ন ছিলেন, তাহার ইতিহাস হয় তো কখনও লিখিত হইবে না,কিন্তু আজও বাংলাদেশে বহু যুবক, বহু নেতা আছেন যাঁহাদের জীবন এই আদর্শ গুরুর স্পর্শে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পিতার এই স্পর্শ পুত্র পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধি নাই, কিন্তু প্রথম যৌবনেই তিনি ভারতবর্ষ হইতে Dr Jollyর বিখ্যাত Hindu Law and Customsএর অনুবাদ করেন। এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় তিনি আজ ছয় বৎসর কাল য়ুরোপে জ্ঞানানুসন্ধানে গিয়াছেন, সেখানে কৃতিত্ব দেখাইয়া মিউনিকের 'ডক্টোরেট' লাভ করিয়াছেন। যে অনুসন্ধিৎসু অন্তর লইয়া তিনি য়ুরোপকে দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যে গদ্য" বর্ত্তমান সংখ্যায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে সুনিপুণ দৃষ্টি লইয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ক্রম-বিবর্ত্তন দেখাইতেছেন এবং বিশ্লেষণ করিতেছেন, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তাহা অসাধারণ, ইহা পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক। বর্ত্তমান কালে বায়ু-মণ্ডলের অদৃশ্য আলোক লইয়া জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বৈজ্ঞানিকগণ আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই সব গবেষণাকে নিজস্ব মতামতের আলোকপাতে এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের নূতন প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়।

রামমোহন রায়

সাংসারিক মানুষের বিষয়বুদ্ধি থাকাটা দোষ নয়, গুণই; এবং অন্যের ক্ষতি না করিয়া বিষয়রক্ষার্থে কোনও রকমের চালবাজিই দূষণীয় নয়, কারণ সংসারে থাকিয়া আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘরকন্না করিতে গেলে কৌশলী না হইয়া উপায় নাই—বিষয়ের কারবার করিতে গেলে। রামমোহন রায় সংসারে থাকিয়া, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া ভাইবন্ধুদের সহিত ঘরকন্না করিতেন; তাঁহার বাড়ী ছিল, গাড়ী ছিল, বাগান-বাড়ীও ছিল; তিনি খাইতেন প্রচুর, সাজপোষাকের বহর ছিল অসাধারণ, প্রয়োজন হইলে বাইজীও নাচাইতেন। রস সের ওজন, একটা পাঁঠা তিনি বরাবর প্রত্যহ আহার করিতেন। ৪০ ঘড়া জল লইয়া স্নান করিতেন, রীতিমত তেল মাখিতেন, একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া কৌপীন পরিয়া তিনি বাহির হইয়া যান নাই। তিনি যেখানে খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে বাঁশগাড়ি করিয়া সম্পত্তিও রক্ষা করিয়াছেন। এমন যে রামমোহন, তিনি বিষয়ের জন্য মামলা মকোদ্দমা করিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিয়াছেন অথবা ঘুষ খাইতেন এরূপ প্রমাণিত হইলে আমাদের চোখে তিনি খাট হইয়া যান না, কারণ ধার্ম্মিক সাধু সন্ন্যাসী হিসাবে আমরা কখনই তাঁহাকে দেখি নাই। সাধু সন্ন্যাসীর, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের ইতিহাস ও জীবন আমাদের দেশে স্বতন্ত্র। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এই মহাপুরুষ দেশের কিসে কল্যাণ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ ধী দিয়া সুদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকেও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেশের পক্ষে যাহা ক্ষতিকর তাহা বর্জ্জন ও অন্য দেশ হইতে আনীত যাহা উপকারী তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই—তিনি লুপ্ত বেলায় বাংলার পুনরানয়ন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন। আবার ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষার মাহাত্ম্যও স্বীকার করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিতেছি, রামমোহনকে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হইয়াছে বলিয়া অনেকে ক্ষেপিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সত্যকার রামমোহনকে শতাব্দীর যবনিকা ছিঁড়িয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উপর রুষ্ট হইতেছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ইঁহারা সত্য রামমোহনকে শ্রদ্ধা করেন না, আপনাদের কল্পনায় মিথ্যা একটা রামমোহন খাড়া করিয়া তাহারই পূজা করেন। নিরাকারবাদীদের সেই

প্রতিমা পূজিত হইয়াছে তাই তাঁহারা চটিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান, এ সকল সত্ত্বেও রামমোহন বড়—বুদ্ধিতে বড়, জ্ঞানে বড়, মহিমায় বড়—তিনি বিরাট, তিনি চক্ষুষ্মান। তিনি সেই হিসাবে ঋষি কিন্তু সাধু নহেন, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী মহৎ ব্যক্তি। তাঁহার এই সকল কাজ করিয়া লজ্জা ছিল না, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগৌরবের চিহ্ন পৈতা তিনি বুকে ধারণ করিয়া ছিলেন, সেইজন্য সত্যকার রামমোহনকে যাঁহারা চিনিতেছেন তাঁহারা আমাদের উন্মাতাজন না হইয়া কৃতজ্ঞতাই দাবী করিতে পারেন। আমাদের দেশে সাধু সন্ন্যাসী অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু রামমোহনের মত রাজসিক তেজস্বিতা ও বিষয়বুদ্ধি এবং রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব অল্পই জন্মিয়াছেন। তাঁহার মত লোক আমাদের দেশে যত জন্মগ্রহণ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই হিসাবে রামমোহন শতবার্ষিকীর সার্থকতা আছে।

তিনি যে বিরাট ছিলেন তাহার প্রমাণ তিনি মানুষের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করিতেন। পাশ্চাত্য কোন একটি ভূখণ্ড স্বাধীনতা পাইয়াছিল বলিয়া তিনি উৎসব করিয়াছিলেন, আর এক জাতির স্বাধীনতা-যজ্ঞ সফল হয় নাই বলিয়া তিনি একদা সকল প্রাত্যহিক কাজকর্ম বন্ধ করিয়া, ঘরে বসিয়া শোক করিয়াছিলেন। ৫৩ বৎসরের কর্মময় জীবনে তিনি কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই—যখন যে বিষয় লইয়া লড়িয়াছেন শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছেন এবং জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই—তা সে স্বদেশেই হউক আর বিদেশেই হউক। শাস্ত্রবিচারে ন্যায়সঙ্গত তর্কের নূতন করিয়া প্রবর্তন তিনিই করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য দ্বারা প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, রাগ করিয়া অতি নগণ্য লোকেরও প্রতিবাদ বা সমালোচনা উপেক্ষা করেন নাই। একশত বৎসর পূর্বে প্রবল বাধা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী ভাষায় যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর। ইহাই রামমোহন, এবং এই রামমোহনকে খাট করিতে পারেন এমন কেহই এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

রামমোহনের বিষয়বুদ্ধি ও রাজসিকতা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া কোনও একটি নির্দিষ্ট সমাজের কয়েকজন পাণ্ডা অন্য সমাজের দুই একজন পাণ্ডাকে ধরিয়া আন্দোলন করিতেছেন দেখিতেছি—যেন রামমোহন তাঁহাদেরই সম্পত্তি! হিন্দু সমাজের একজন বলিতেছেন, রামমোহনকে হিন্দু সমাজ কখনও শ্রদ্ধা করেন নাই; ঐতিহাসিক হইয়া এতবড় মিথ্যা কথাটা তিনি কেমন করিয়া বলিলেন? পৃথিবীতে যাঁহারা বড় কাজ করেন, সমসাময়িক লোকের নিন্দা ও কুৎসা তাঁহারা মাথা পাতিয়া লন, আবার শ্রদ্ধাও তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে পান বলিয়াই কাজ করিতে পারেন। রামমোহন যখন জীবিত ছিলেন, তখন প্রতিমা-পূজক হিন্দু সমাজই তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, আবার হিন্দুয়ানি আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে গালি দিয়েছিলেন—ব্রহ্মসমাজের সূচনা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। তারপর ব্রাহ্ম এবং হিন্দু উভয় সমাজই তাঁহার সম্বন্ধে নীরব ছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল প্রমুখ দুই একজন পণ্ডিত তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের মূল দেবতা-মন্দিরে তাঁহাকে বসাইয়াছেন বলিয়া ধর্ম-প্রবর্তক হিসাবে তাঁহার নাম শুনিতেছি। কিন্তু ওই নাম পর্যন্ত, রামমোহনের গ্রন্থাবলী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা ব্রাহ্ম সমাজেই কয়জন, জানিতে ইচ্ছা হয়। তাহার পর রামমোহনকে লইয়া সত্যকার নাড়াঘাঁটা করিতেছেন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়। তাঁহাদের গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফলে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়াছে—ইঁহাদের উদ্যমেই ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরের লোক এবং আমাদের মতই ইঁহারাও কেহ রামমোহনকে ব্রাহ্ম সমাজের একচেটিয়া সম্পত্তি মনে করেন না—রামমোহন বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালার হিন্দুর দাবীই তাঁহার উপর সর্বপ্রথম। ব্রাহ্ম সমাজের একজনকেও তো দেখিলাম না সর্বস্ব পণ করিয়া রামমোহনের গ্রন্থ ও জীবনী লইয়া সাধনা করিতে! হঠাৎ এই উভয় সাধকের সাধনায় malice আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগকে বাতিল করিবার চেষ্টা কেন?

রাজা রামমোহন ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ

যে কারণেই হউক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া রাজা রামমোহনকে লইয়া পড়িয়াছেন। গালাগালি নয়—প্রশংসা, কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে অন্যকে আক্রমণ

করিতে ছাড়েন নাই। আড়াই পৃষ্ঠার পরিশ্রমে চন্দ মহাশয় রামমোহন সম্বন্ধে গবেষণা শেষ করিয়া ডিক্রী দিয়াছেন।

একটি চটি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে—হুগলী টাউন হলে রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ; প্রথমেই তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু হিন্দু সাধারণ রামমোহন রায়কে চিনিয়াছে কি?" চিনে নাই সত্য কিন্তু হিন্দু সাধারণ কাহাকে চিনিয়াছে—শ্রীচৈতন্যদেবকে চিনে নাই, বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দকে চিনে নাই। তাহার জন্য উষ্মা প্রকাশ না করিয়া দুঃখ করুন।

চন্দ মহাশয়কে লইয়া বেশী বিব্রত করিবার স্থান আমাদের বেশী নাই, তাঁহার সত্যভাষণের দুইটি নমুনা দেখাইয়া তাঁহার গবেষণার মূল্য নিরূপণ করিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন, "একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাক্তার সুশীলচন্দ্র (?) দে, ইংরেজী ভাষায় ১৮০০ হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপী যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি সুপাঠ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি ঐ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেন নাই।" কিন্তু পেন্সনভোগী প্রাক্তত্ত্বিক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একবার সেই গ্রন্থের ভূমিকাটি পাঠ করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভূমিকায় সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন—

Some of the works of Ram Mohan Ray and his colleagues belong chronologically to this period, but from the standpoint of literary history, they embody a subsidiary movement which comes into relief a little later, and are therefore deliberately reserved for later treatment.

তৃতীয় পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিত বঙ্গশ্রীর দুই সংখ্যায় প্রকাশিত রামমোহন সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া চন্দ মহাশয় বলিতেছেন, "মিথ্যাকথন চিরজীবন রামমোহন রায়ের স্বভাব-সিদ্ধ ছিল এবং তাঁহার চরিত্রে আনুষঙ্গিক দোষেরও অবশ্য অভাব ছিল না। রামমোহন রায়ের কলঙ্ক কাহিনী বিবৃতি করিয়া……" ইত্যাদি

ঐতিহাসিকের উপযুক্ত মন্তব্যই বটে। ব্রজেন্দ্রবাবু এমন কোন কথাই বলেন নাই যাহা স্বয়ং রামমোহনের জবানবন্দীতে নাই; তিনি কোনও মন্তব্য করেন নাই। সরকারী কাগজ-পত্রে যাহা পাইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যদি রামমোহনের সত্য চরিত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাতে লজ্জিত হইবার কি আছে? ইহার মধ্যে 'কলঙ্ক কাহিনী' চন্দ মহাশয় দেখিলেন কোথায়? চন্দ মহাশয়ের standard of morality কি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে লওয়া?

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের নূতন খসড়া

শ্রীযুক্ত সিবিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় এই সময়ে ৪৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী খসড়াটি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া নূতন ও পুরাতন সকল জীবনী ও প্রবন্ধ হইতে এবং বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু ও তাঁহার নিজের গবেষণা হইতে সুকৌশলে এই খসড়াটি প্রস্তুত করিয়া সত্যকার রামমোহনকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এই চটি কেতাবখানি পাঠ করিলে শুধু যে রামমোহনকে চিনিতে পারা যায় তাহা নয়, রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা ও বাঙ্গালীকেও স্পষ্ট চোখে দেখা যায়। ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। লেখক যে রামমোহনকে শুধু নমো নমঃ করিয়া পূজা করেন না, তাঁহার গ্রন্থাবলী বুঝিয়া পড়েন, এই খসড়াখানিতে তাহারও প্রমাণ আছে।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অমল হোম মহাশয়ের সম্পাদকতায় রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী গ্রন্থাবলী বাহির হইতেছে। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এই গ্রন্থাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞপ্তি-পত্রের ছাপা ও কাগজ দেখিয়া মনে হয় ইহা বাহিরে সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

কিন্তু ভিতরের বস্তু ভাল মন্দ কি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে সম্পাদক মহাশয়গণের পরিশ্রমের উপর। দেখিতেছি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত-হিন্দী-ফার্সী-উর্দু জ্ঞ নহেন, এইজন্য ইঁহারা এই কার্যে যাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের নামও বিজ্ঞাপিত হইলে ভাল হইত।

এই সংস্করণ সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে পাওয়া যাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসবে

গত ২৪শে পৌষ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কালচক্র বিবর্তনে প্রতি বৎসর ২৪শে পৌষ আসিবে, আবার চলিয়া যাইবে। যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া এই দিনকে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিব, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিব, তাঁহার চরিত্র লইয়া আলোচনা করিব। তাহার পর, তিন শত চৌষট্টি দিন প্রমাদ করিব, হে সন্ন্যাসী, আমরা গৃহ-নীড়-আশ্রিত লোভী জীব, আমাদের ক্ষমা করিও; হে তপস্বী, সাক্ষিতে পারে শুশ্রূষা দিয়া ঘুমাইয়া আমরা শপথ করিয়াছি, তোমার পথে চলিব, প্রভাতে চলিতে পারি নাই, আমাদের ক্ষমা করিও। তোমার মাতৈঃ মন্ত্র কানে শুনিয়াছি, মনে ধরিতে পারি নাই, হে শিব, আমাদের ক্ষমা করিও!

তবুও হে বীর, তোমার জন্মদিন ব্যর্থ হয় নাই। যে-কেহ আজ, একটি পদ্মকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখাইতেছে, যে-কেহ এই ভারতভূমিকে পায়ে হাঁটিয়া মাপিতেছে, যে-কেহ একলার একান্ত নির্জনতায় মনের একটি গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিতেছে, তাহারাই তোমার স্মৃতি পূজা করিতেছে।

তোমার আয়ত চক্ষু, উন্নত গ্রীবা, তোমার মাতৈঃ-বাণী, তোমার ধর্ম-চক্র-প্রবর্তনের আহ্বান তাহারই জীবনে সার্থক হইতেছে। তাহার একলার পূজায় ২৪শে পৌষ সার্থক হইতেছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

গত ২৪শে পৌষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পঞ্চাশত্তম মৃত্যু-তিথি-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জীবনে যাঁহারা নব প্রাণধারা আনিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বাগ্মী, স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক, ভগবৎ-প্রেমিক এবং সমাজ-সংস্কারক হিসাবে কেশবচন্দ্র বাঙ্গলার নব-জাগরণের ইতিহাসে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজ বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্র স্মরণে জাগে। কারণ, বর্তমান কালে বাঙ্গলা দেশে স্বাধীন চিন্তার নামে যে মানসিক শক্তিহীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কেশবচন্দ্রের জীবনী হইতেছে তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁহার ন্যায় স্বাধীন চিন্তাশীল লোক বাঙ্গলা দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা কখনও তাঁহার চারিদিকে কোনও বেষ্টনী দেয় নাই, এবং সেই স্রোতধারা সর্বত্র সমান খুশালীর। পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার মিলন বাঙ্গলার ধর্ম-জীবনের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়া আছে।

ভারতবর্ষে এম. সি. সি

প্রত্যেক বৎসর শীতকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরে বিদেশ হইতে নানা রকমের আমোদ-প্রমোদের দল আসে। বিশেষ করিয়া শীতকাল হইল সার্কাসের এবং আজকাল কার্নিভালের সময়। এই বৎসর সার্কাস ও কার্নিভালের উপর আর একটি নূতন উৎসাহ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে—এম. সি. সি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল। এই বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আগমনের বহুপূর্ব হইতে শহরে শহরে, বিশেষ করিয়া আমরা কলিকাতা শহরে দেখিয়াছি, নানা রকমের আয়োজন চলিতে লাগিল—ইডেন উদ্যানে বিকাট বসিবার মঞ্চ তৈয়ারী হইল! কিন্তু খেলার দিন আসনের উপযুক্ত ভিড় হইল না। বাঙ্গালা সরকার ছুটী ঘোষণা করিলেন! খেলার প্রতি বাঙ্গালা সরকারের এই প্রীতির উদাহরণ অনন্যসাধারণ।

বিদেশী খেলোয়াড়দের ভারতের অতিথিরূপে নাগরিক অভ্যর্থনা দেওয়া হইল। তাঁহারা তাঁহাদের খেলার কৃতিত্বে সকলকে চমৎকৃত করিয়া প্রথম পরাজয় পাইলেন—ভিজিয়ানা-গ্রামে। খেলার মাঠে জয়লাভের মধ্যেও যে জাতীয় সম্মান আছে, তাহার স্বাদ পাইয়া অনেকে তৃপ্ত হইল। এম. সি. সির আগমনে বসিবার আসন খালি থাকিলেও, তাহার প্রভাব অন্যত্র আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে, রাস্তার উপরে, বাড়ীর দরজায়, প্রবেশপথে, যেখানে এক ফালি যায়গা পাওয়া গিয়াছে, দেখি, দা-দিয়া-কাটা কাঠের ব্যাট লইয়া ইঁটের উইকেট সাজাইয়া ভবিষ্যতের এম. সি. সি-বিজয়ীর দল "রাউণ্ড হ্যাণ্ডে" বল দিতেছে। বড়দিনের কলিকাতা মন্দ লাগিল না—কার্নিভালে বুড়ারা নাগর-দোলা চড়িবার সুবিধা পায়, সার্কাসে পশুর নৃত্যের সঙ্গে বিদেশিনীর পরিপুষ্ট নগ্নপদের মাংসপেশীর নর্তন দেখিতে পায়, ছেলেরাও এবার মাতিবার জিনিষ পাইল—ইঁটের উইকেট আর কেরাসিন কাঠের ব্যাট!

ভগবান যিশু দুঃখঘরের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—দুঃখবিদ্ধ হইবার জন্য—উৎসব কর, উৎসব কর !

সফরে মহাত্মাজী

চরিজন-সেবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই ভ্রমণের রাজনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেও, যাঁহারা তাঁহার এই ভ্রমণ অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে, কেমন করিয়া তাঁহার অসামান্য চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিকীর্ণ হইতেছে। একটি রামায়ণ দীপ-শিখা হইতে অন্ধকার কুটীরের কুটীরে যেন নির্বাপিত দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই বিশেষ একটা কিছু দান চাহিতেছেন। সে দানের হয়ত বস্তুগত মূল্য তত বেশী নাই কিন্তু তিনি সেই দান চাহিতেছেন, যাহা দিলে দাতা অন্তরে ধনী হয়। তিনি বলেন, একটি তাম্র-মুদ্রার মূল্য কিছু নহে, কিন্তু আন্তরিকতার প্রতীক হিসাবে উহা অমূল্য। মাদ্রাজ-পরিভ্রমণকালে মহিলাদের মধ্য হইতে দান-সংগ্রহ ব্যাপারে এই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

মহিলাদের নিকট হইতে তিনি বিশেষভাবে অলঙ্কার প্রার্থনা করেন। মাদ্রাজের একটি তরুণী মহাত্মাজীকে পাঁচটাকার একখানা নোট দিয়া তাহার খাতায় মহাত্মাজীর নাম স্বাক্ষর চাহে।

মহাত্মাজী হাসিয়া বলেন, আমি নোট লইব না ; তোমার হাতের বালা দিতে হইবে।

তরুণী তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের দুইটি বালা খুলিয়া মহাত্মাজীকে দেয়।

তখন মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাবা অনুমতি দিয়াছেন তো ? নতুবা বালা লইব না। তাঁহার অনুমতি না থাকিলে তোমার বালা লইয়া যাও।

তরুণীটি একটি বালা তুলিয়া লয় এবং বলে, ইহাতে তাহার পিতার অনুমতি আছে। তবে স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে একটি বালা সে রাখিয়া দিতে চাহে।

হাসিয়া মহাত্মাজী বলেন, তাই লও। কিন্তু আর একটা কথা, নতুন বালা তৈয়ারী করিয়া দিতে তোমার বাবাকে অনুরোধ করিবে না তো ?

তরুণী উত্তর দিল, না।

মহাত্মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, তাহা হইলে তোমার বালা লইতে পারি।

আর একটি নববিবাহিতা নারী তাঁহাকে বলিয়াছিল, আমি আপনাকে টাকা দিতে পারি, কিন্তু অলঙ্কার দিতে পারি না। কারণ আপনাকে যে অলঙ্কার দিব, বাড়ীতে আমার সেই অলঙ্কার আমাকে গড়াইয়া দিবে। উহা নিশ্চয়ই আপনি চাহেন না।

মহাত্মাজী বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু তোমার টাকা আমি চাহি না। চাহিলেই আমি টাকা পাই। তোমার বাবার নিকট টাকা চাহিলেও আমি পাইব। তোমার কাছে আমি তোমার অলঙ্কার চাই। কিন্তু সর্ত থাকিবে যে, তুমি যে-অলঙ্কার আমাকে দিবে, তাহা আর পরিতে পারিবে না। যতদিন পর্যন্ত সেইভাবে স্বেচ্ছায় তুমি অলঙ্কার না দিতে আসিবে, ততদিন তোমার কাছে অলঙ্কারও চাহিব না।

মহেন্দ্রলাল সরকার স্মৃতি-তর্পণ

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের শতবার্ষিকী-তিথি উপলক্ষে দেশবাসীর এবং বিশেষ করিয়া স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির নিকট আমরা নিবেদন জানাইয়াছিলাম, যাহাতে এই মহাত্মার স্মৃতি অক্ষয়ভাবে রক্ষিত হয়, তাহার কোনও সুব্যবস্থা করা। ডাঃ সরকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন। এই বৎসরের উক্ত দিনে তাঁহার মৃত্যুবাসর-তিথি অনুষ্ঠিত হইবে। সম্প্রতি স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির নিকট হইতে আমরা এক আবেদন পাইয়াছি। ডাঃ সরকারের একখানি সুলিখিত জীবনী বা স্মৃতিগ্রন্থ নাই। যাহাতে এই অভাব পরিপূরিত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা দেশবাসীর নিকট এই আবেদন উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, ডাঃ সরকার সম্বন্ধে যিনি যাহা জানেন, তাহা যেন এই বৎসরের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ১নং ব্লাকোয়ার হোমার, এই ঠিকানায় জানান।

আজ বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার এক নূতন যুগ আসিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক নব-জাগরণের দিনে, ভারতবর্ষের মধ্যে বিজ্ঞান-সাধনায় যিনি পথ-প্রদর্শক ছিলেন, তাঁহার একটা সুলিখিত জীবনী জাতির হাতে নাই, ইহা কম

লক্ষ্যের কথা নয়। অথচ তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, মাত্র ত্রিশ বছর আগে। ইহা ব্যতীত ডাঃ সরকারের জীবন গত শতাব্দীর বাঙালী কালচারের সঙ্গে নানাভাবে এবং নানাদিকে বিজড়িত ছিল—তাহারও একটা ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের অগ্রসর হইয়া এই মহৎ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

জাপান ও ভারতে বাণিজ্যগত চুক্তি

গত কয়েক মাস ধরিয়া জাপান ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে লইয়া ভারতের শাসকবর্গের প্রতিনিধিদের সহিত জাপানের রাজপ্রতিনিধিদের বিচার-বিতর্ক চলিতেছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, উভয় দল মিলিত হইয়া একটি চুক্তিতে সম্মত হইয়াছেন।

উভয় পক্ষের চুক্তির মর্ম্ম এইরূপ—"জাপান ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনধিক ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানি করিতে পারিবে এবং উহার বদলে ভারতবর্ষ হইতে ১০ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিবে। যদি জাপান ভারত হইতে তুলা ক্রয়ের পরিমাণ আরও ৫ লক্ষ বেল বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ৪০ কোটি গজ কাপড় আমদানী করিতে পারিবে। আর জাপান যদি ভারতবর্ষ হইতে কোন তুলা ক্রয় না করে, তবে ভারতবর্ষ ১২৫ কোটি গজের বেশী কাপড় আমদানী করিতে পারিবে না।

চুক্তিতে কাপড় ও তুলা ছাড়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই, তবে ভারতবর্ষ যদি নিজের শিল্পসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে উহাতে জাপান আপত্তি করিবে না। কিন্তু যদি জাপানী শিল্পদ্রব্যের বিরুদ্ধে এমন কঠোরভাবে শুল্ক ধরে যাহাতে জাপানের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে এই বিষয়ে জাপান ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাইতে পারিবে।

চুক্তির আর একটি সর্ত্ত এই যে, অন্যান্য দেশের পণ্যের উপর যেভাবে শুল্ক ধরা হইবে, জাপানী পণ্যের উপরও সেইভাবে শুল্ক ধরা হইবে। এই বিষয়ে জাপানের সম্পর্কে কোন তারতম্য করা হইবে না। অবশ্য অন্যান্য দেশের সংজ্ঞার মধ্যে ইংলণ্ড ও বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলি পড়িবে না। কারণ অটোয়া চুক্তি অনুসারে এই সব দেশ বিশেষ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইয়াছে।" (আনন্দবাজার)

ল্যাঙ্কাশায়ারের উল্লাস

ম্যাঞ্চেষ্টার ৩রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত-জাপ চুক্তির কথা শুনিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকরা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

আগে বিদেশ হইতে যে পরিমাণ কাপড় আমদানী হইত, তাহার অধিকাংশই আসিত ইংলণ্ডের মিলগুলি হইতে। তাহার পর ধীরে ধীরে জাপান আসিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল এবং ভারতবর্ষে একদিকে যেমন বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল, অন্যদিকে দেশী মিলগুলিও দেশী কাপড় উৎপন্ন করিতে লাগিল। ১৯১১-১২ সালে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে কাপড় আসিয়াছে ২৩৭ কোটি ৯০ লক্ষ গজ এবং সেই বৎসর জাপান হইতে আসিয়াছিল মাত্র ১০ গজ। তাহার পর ১৯৩১-৩২ সালে, সেই যায়গায় ইংলণ্ড হইতে কাপড় আসিয়াছে মাত্র ৫৯ কোটি ৭০ লক্ষ গজ, জাপান হইতে আসিয়াছে ৫৮ কোটি গজ এবং এদিকে ভারতবর্ষে ১৯৩১-৩২ সালে কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে ২৯৯ কোটি গজ। পরবর্ত্তী বৎসরে তাহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৩১৭ কোটি গজ। সুতরাং জাপানকে চুক্তি অনুযায়ী ৪০ কোটি গজ করিয়া কাপড় আমদানী করিবার সর্ত্তে ল্যাঙ্কাশায়ারের আনন্দিত হইবারই কথা।

বেহালাবাদকরূপে আইনষ্টাইন

জার্ম্মানী হইতে হিটলার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে-সমস্ত য়িহুদী নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন হিটলার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—তিনি এই কনসার্টে বেহালা বাজাইবেন। এই কনসার্টের প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ৭৫৲ টাকা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। আইনষ্টাইন য়ুরোপের একজন বিখ্যাত বেহালা-বাদক। আপনার নির্জ্জন গৃহের উপরে বসিয়া বৈজ্ঞানিক আকাশের তারাকে বেহালা বাজাইয়া শুনাইতেন। সেই ছিল তাঁহার অবসর-বিনোদন।

নিখিল ভারত বিজ্ঞান-সম্মেলন

এবার বোম্বাই-এ অধিষ্ঠিত নিখিল ভারত বিজ্ঞান-সম্মেলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা। তাঁহার অভিভাষণের প্রথমাংশে তিনি বিশ্বজগতের একটা বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত বিবৃত করেন। দ্বিতীয়াংশে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষাংশে তিনি নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে শিক্ষা বা আলোচনার একান্ত অভাবের কথা উল্লেখ করেন।

মানব-সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগ সম্বন্ধে তিনি বলেন, সমস্ত পৃথিবী বর্ত্তমান কালে যে শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানের সাহায্যে শান্তি স্থাপন করা এখন অসম্ভব। কারণ, জগতের গতি এখন আধুনিক সভ্যতাকে ধ্বংস করিতেই চলিয়াছে। তবে বর্ত্তমান কালে সভ্যতার গতি যে দিকেই হউক, ভবিষ্যতে উন্নতি এবং জাগতিক শান্তি স্থাপনের জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং চিন্তাধারাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হইবে। সকল দেশকেই এখন আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসারের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহার পর ডাঃ সাহা বলেন যে, "আমাদের দেশে সরকারী কার্য্যের সহিত বে-সরকারী কর্ম্মচারীদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইবার কোনও পথ নাই। এই সমবেত গবেষণার অভাবে দেশের বিপুল ক্ষতি হইতেছে। এই ক্ষতির উদাহরণস্বরূপ ডাঃ সাহা দেখান যে রেলপথ-নির্ম্মাণ, সেতু-নির্ম্মাণ, পয়ঃ প্রণালী খনন ইত্যাদি ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অভিমত না লইয়া কাজ করার ফলে গভর্ণমেণ্ট কত ভুল করিয়াছেন। এমনভাবে রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে তাহাতে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। তাহার জন্য সমস্ত বাংলা দেশ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াছে। আমি ইঞ্জিনীয়ারদের দোষ দিই না। এই সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র লাইব্রেরিটির সাহায্যেই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব এবং এই সব তথ্যের অভাবে ইঞ্জিনীয়ারগণ তাঁহাদের কার্য্য ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মধারা অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ ভুল পথে চালিত হইয়াছে।"

এই সব কারণে ডাঃ সাহা বলেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সম্মিলিত হইয়া বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন এবং গবেষণার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা উচিত।

অভিধান ও জাতীয় সাহিত্য

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য ভাল অভিধান নাই। সুখের বিষয় যে বিশ্বভারতী হইতে একখানি অভিধান ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু দেশের লোকের সে-বিষয়ে কোন উৎসাহ আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে অভিধান যে কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা আমরা আজও পর্য্যন্ত বুঝি নাই। কিন্তু একটি সংবাদে দেখিলাম, গুজরাটী সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম, জাভেরী তাঁহার অভিভাষণপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, গাঁওয়ালের মহারাজা স্যর ভগবান সিংজী ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে বিস্তারিত গুজরাটি অভিধান সঙ্কলনের উদ্যোগ করিয়াছেন। ধন্য বাংলা দেশ এবং বাংলা সাহিত্য!

বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোশিয়েসন

পাঠাগারের দ্বারা দিয়া জনশিক্ষা প্রচারের জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোশিয়েসন্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান বহুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে, উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমাদের শিক্ষা-জীবনে গ্রন্থালয়ের একটা বিশেষ স্থান আছে। ইহা শুধু কতকগুলি এলোমেলো বইএর সংগ্রহ নয়। যাহাতে প্রত্যেক গ্রন্থালয় তৎতৎ পল্লীর শিক্ষা-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা দেখা প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রন্থালয়গুলি উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে শুধু একটা নিষ্ফল বইএর আলমারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি এই প্রতিষ্ঠান হইতে এই অভাব দূর হয়, তাহা খুবই সুখের বিষয়। যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড এবং য়ুনিয়ান বোর্ড হইতে গ্রন্থালয়ের সাহায্যের জন্য অর্থ ধার্য্য করা হয়, তাহারও চেষ্টা এই প্রতিষ্ঠান হইতে করা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে বার্ষিক চাঁদা এক

টাকা মাত্র, আজীবন সভ্যের চাঁদা পঁচিশ টাকা। ইহার আফিস হইল, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি, ৬ এস্‌প্লানেড ইষ্ট কলিকাতা।

আইরিশ কবির উপদেশ

বিখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লিউ বি. ইয়েটস "পেন-ক্লাব"এর (পি. ই. এন ক্লাবে) লণ্ডন শাখার এক অধিবেশনে বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষকে ইংরেজী ভাষা শিখাইয়া ইংলণ্ড ভারতীয় মনের অধঃপতন ঘটাইতেছে।

ভারতবাসীদের উচ্চতর শিক্ষা এবং সরকারী কাজ ইত্যাদি সমস্তই ইংরেজী ভাষার মারফৎ চালাইয়া ইংলণ্ড ভারতের প্রতি ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। মায়ের কোড়ে বসিয়া মানুষ যে ভাষা শিক্ষা করে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় মানুষ বলিষ্ঠভাবে চিন্তা করিতে পারে না।"

দুইজন সুপরিচিত ভারতীয় লেখক সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ডব্লিউ বি. ইয়েটস বলেন "আমি অনুরোধ করিতেছি যে, এই ভারতীয় দুইজন যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন তাঁহারা যেন ইংরেজী ভাষা বর্জন করেন এবং যুবকদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা বর্জনের আন্দোলন গড়িয়া তুলেন।"

নারীশিক্ষা সমিতি

গত ১৯১৯ সনে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কয় বৎসরে এই সমিতির অধীন স্কুল সমূহে প্রায় ৫০০০ বালিকা শিক্ষা পাইয়াছে। বর্তমানে সমিতি-পরিচালিত ২৪টি স্কুলে প্রায় ১২০০ শত নারী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। ১৯২২ সনে বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই বাণীভবনে ৬২ জন হিন্দু বিধবা থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন। আজ দশ বৎসর সময়ের মধ্যে এই সমিতি হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ৭৬ জন শিক্ষয়িত্রী, এবং অনেকে নার্স হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। মহিলা শিল্প-ভবনে বর্তমানে শতাধিক ছাত্রী শিল্পশিক্ষা পাইতেছেন।

এই সমিতির কার্যপদ্ধতির তিনটি ভাগ আছে, (১) গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (২) অসহায় হিন্দু বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাদান এবং (৩) দরিদ্র নারীদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করা।

এই সমিতির কয় বৎসরের কাজের হিসাব দেখিলে বোঝা যায় যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সমধিক প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ইহার কার্য-পরিধিকে বিস্তৃত করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সমিতি সম্প্রতি একটি নিবেদন-পত্র প্রচার করিয়াছেন। সমিতির সাহায্যার্থে কেহ কিছু দান করিতে চাহিলে নিম্নের যে-কোন ঠিকানায় উহা পাঠাইতে পারেন (১) স্যর আর. এন. মুখার্জ্জি, ১২ ছিদাম রো, কলিকাতা (২) লেডী অবলা বসু, ২৯।৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

আদর্শ বাণী-মন্দির

আমরা এই সাধ্রম বিদ্যালয়টির সপ্তম বাৎসরিক বিবরণী হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

আবশ্য ও বাধ্যতা। মন নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এদেশে, বালকবালিকাগণের সহজ মনোবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। টৌকী ও অক্ষরে, শিল্পী ও সাহিত্যিক, কবি ও বৈজ্ঞানিক সকলেরই এক ব্যবস্থা। বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়া, গতানুগতিক কঠরোধ করিয়া বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষায় অবাধিকারের স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিশুর মনোবৃত্তি জ্ঞাত হইবার কোন চেষ্টাই করা হয় না। অভিভাবকের বা শিক্ষকের ইচ্ছা অনুযায়ী শিশুকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই বলবতী। শিশুর ইচ্ছা বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোন মূল্যই সাধারণ বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না।

শিক্ষার ব্যবস্থা সামাজিক অবস্থার অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। দেশে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিধান প্রায় নিশ্চল, পরিবর্তনের কোন চেষ্টাই নাই।

ইংরেজ শাসিত ভারতের সমস্ত পল্লী হইতে পল্লীশ্রী হইয়া যাইতেছে। বহিরের প্রভাব আমাদের মনে স্থান প্রবেশ করিতেছে এবং ইহা রুদ্ধ হইবারও নয়। সুতরাং এ প্রভাবের ফলে একদিন পরিণত না হইয়া যাহাতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বহির্জগতের দান গ্রহণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুশিক্ষার ব্যবস্থার কবিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মানব-সমাজের গতি ক্রমশঃ অধিকতর দ্রুত হইয়া আসিতেছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে সমাজের অবস্থা কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, এবং সেইরূপ করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ

বৎসরের আমদের স্থান এত অসাধারণের মধ্যে পরিণত হইতে কী পারিবে না।

সাধারণতঃ এদেশে শিক্ষার মধ্যে মানবের সহজাত কর্তৃত্বপ্রবণতা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নাই। পুস্তকপাঠই শিক্ষার সর্বস্ব, হাতে কাজ করা যে প্রত্যেকের প্রয়োজন তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। ছেলের শিক্ষার প্রয়োজন মেয়ের শিক্ষার অপেক্ষা কিছু মাত্র কম নহে।

যেদিন এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, সেইদিন সমাজের ও দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই সব প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করা।

এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটুট অব এডুকেশনের সভ্য ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এবং লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

আশা করি, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পৃথিবীতে কত হিন্দু ?

পৃথিবীতে কত মুসলমান তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা কিছু দিন পূর্ব্বে করিয়াছিলাম। এক্ষণে পৃথিবীতে কত হিন্দু তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। হিন্দুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার প্রধান অন্তরায়, হিন্দুর সংজ্ঞার অভাব; কাহাকে হিন্দু বলিব আর কাহাকে হিন্দু বলিব না তাহা লইয়া। এক হিসাবে জৈনরা হিন্দু, অপর হিসাবে তাঁহারা হিন্দু নহেন। সে যাহা হউক, ভারতীয় হিন্দু মহাসভা যে ভাবে হিন্দুর সংজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ভাবে আমরা যদি কাহাকেও হিন্দু বলিয়া গণ্য করি, এবং বিদেশে বিশেষতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ হিন্দু বলিয়া গণ্য, তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে বিশেষ অন্যায় হইবে না।

সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ Encyclopædia Britannicaর ১৪শ সংস্করণে (যাহা ইংরেজী ১৯২৮-১৯২৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে) সমগ্র পৃথিবীর হিন্দুর সংখ্যা ২৩'১০ কোটি হিসাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইংরেজী ১৯৩১ সালের Whittaker's Almanacও পৃথিবীর মোট হিন্দুর সংখ্যা ২৩১,১৫০,০০০ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

Encyclopædia of Religion and Ethics নামক প্রামাণ্য কোষগ্রন্থে ইংরেজী ১৯০১ সালের আদম-সুমারীর উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর যে সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে যে—

"If the estimates of H. Zeller be accepted [i. e. 210,676,573 Hindus] Hinduism thus stands *third* amongst the religions of the world, being exceeded by Christians (531,910,000) and followers of Confucius (300,000,000)."

অর্থাৎ যদি এইচ. জেলার সাহেবের মত গ্রহণ করা হয়, (জেলার সাহেবের মতে হিন্দুর সংখ্যা পৃথিবীতে ২১০,৬৭৬, ৫৭৩) তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কেবল মাত্র ক্রিশ্চিয়ানেরা (সংখ্যা—৫৩৪,৯১০,০০০) এবং কন্‌ফুচির মতাবলম্বীরা (সংখ্যা—৩০০,০০০,০০০) ইহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক।

ইংরেজী ১৯০১ সালে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ২০'৭১ কোটি ছিল। সে মতে এইচ. জেলার সাহেবের নির্দ্ধারিত অঙ্ক অনুসারে ভারতের বাহিরে হিন্দুর সংখ্যা ২১'০৬—২০'৭১ = ৩৫ লক্ষ। Whittaker's Almanac এর মতে সমগ্র পৃথিবীর হিন্দুর সংখ্যা ২৩'০১ কোটি, এবং ১৯২১ সালে কেবল মাত্র ইংরেজ অধীন ভারতের হিন্দুর সংখ্যা ২১'৬২ কোটি যেমতে ভারতের বাহিরের হিন্দুর সংখ্যা ১'৩৯ কোটি। ঐরূপে Encyclopædia Britannicaর অঙ্ক অনুযায়ী ভারতের বাহিরের হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ১'৪৮ কোটি।

এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীর হিন্দুর সংখ্যা যতটা সম্ভব হাল আদম-সুমারীর অঙ্কানুযায়ী নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। ইংরাজী ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী কেবলমাত্র ইংরাজ অধিকৃত ভারতে হিন্দুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়:—

হিন্দু	২৩৮৩ কোটি
শিখ	০'৪৩ কোটি
প্রেত-পূজক (animists)	১'১০ কোটী

ফরাসী ও পোর্টুগাল অধিকৃত ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৮৬৬'০০০। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু; কম করিয়া এই সব স্থানের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন ধরিয়া লইলে অন্যায় হয় না—সে হিসাবে এই সব স্থানের হিন্দুর সংখ্যা ৬ লক্ষ। ১৯২০ সালের লোকগণনায় স্বাধীন নেপালের হিন্দুর সংখ্যা ৫৩ লক্ষ। লঙ্কায় বর্ত্তমানে (১৯৩১ সালে) হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। ১৯২১ সালে মালয় প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। Census of British Malaya, 1921 by J. L. Nathan M. C. S.এর মতে—

হিন্দু	৩,৯৫,৪৯৮
শিখ	১,৩১৪
সর্ব্ব প্রকারের হিন্দু	৩০৪, ৮১২

ঐ বৎসর ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যা ছিল—৩১,৩৬৩; আর ভারতীয় ক্রিশ্চিয়ানের সংখ্যা ছিল—২৩,১১৭ জন বালি ও লুম্বক দ্বীপে হিন্দুর সংখ্যা বর্ত্তমানে—১৮ লক্ষ, ইংরেজী

১৯২১ সালের ভারতবর্ষের আদম-সুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮'৬২ লক্ষ ভারতবাসী ভারতের বাহিরে ছিল। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের অধিক হিন্দু এবং বাকীর অধিক মুসলমান। এ মতে ভারতের বাহিরে ভারতবাসী হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ১৩ লক্ষ।

উপরি উক্ত অঙ্ক হইতে দৃষ্ট হইবে যে কেবলমাত্র ঐ কয়েকটি দেশেই ১'১০ কোটি হিন্দু আছে। ইহা ব্যতীত শ্যাম, আনাম, চীন, আফগানিস্থান, মাদাগাস্কার, তিব্বত, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশেও অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দু আছে। এই সব স্থানের হিন্দুর সংখ্যা আমরা নিদ্ধারণ করিতে পারি নাই। চীন, তুর্কীস্থানে রাজনৈতিক বিপ্লবে হিন্দু মহাজনগণের প্রতি অত্যাচারে আমরা ঐ স্থানে হিন্দুর অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারিলাম। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আনাম হইতে চেটি ধনপতিদিগকে নির্ব্বাসিত করিলে, আমরা ঐ স্থানের হিন্দুদের বিষয় অবগত হইতে পারিলাম। কাহারও কাহারও মতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরে শিবমন্দির ও হিন্দুর বসতি ছিল; এক্ষণে তথায় হিন্দু আছে কি না জানি না। এইরূপ বহুস্থানে হিন্দু আছে কিনা আমরা আদৌ অবগত নহি। সুমাত্রা দ্বীপে এককালে হিন্দু সভ্যতা প্রবল ছিল। বর্ত্তমানেও ঐ দ্বীপের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দু সভ্যতা প্রবল ছিল। বর্ত্তমানেও ঐ দ্বীপের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের ও সভ্যতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা Encyclopædia of Religion and Ethics হইতে নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"Traces of Indian influence however are not wanting: the religious notions of the Bataks and their astrological superstitions are largely tinged with Brahmanistic or at least non-Buddhistic ideas and practices"

অপর এক পুস্তকে লিখিত আছে যে—

"They burn the bones of their dead."

Encyclopædia Britannicaর মতে ভারতের বাহিরের হিন্দুর সংখ্যা ১'৫৮ কোটি। শিখগণকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিলে (যাহা করিবার পক্ষে প্রচুর যুক্তি আছে) পৃথিবীর হিন্দুর সংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়:—

১৯৩১ সালে ভারতের হিন্দু—	২৩৮০ কোটি
" " " শিখ—	০'৪৩ "
১৯২১ সালে ভারতের বাহিরে হিন্দু—	১'৫৮ "
১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বৃদ্ধি শতকরা ৫ হিসাবে ধরিয়া লইলে	০'০৮ "
সর্ব্ব মোট—	২৪'৯২ কোটি

The Call from the Muslim World প্রণেতা আফ্রিকা ও মালয় প্রভৃতি বহু স্থানের প্রেত-পূজক মুসলমানকে মুসলমান ধরিয়া লইয়াছেন। মালয়, ধবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বহু মুসলমান পরিবার অনুযায়ী চলেন না বা লৌকিক ব্যবহারে পরিবার মানিয়া চলেন না—যেমন উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের সময় matriarchal family law অনুযায়ী তার নির্ণয় করেন। আমাদের ঘরের কাছে ত্রিবাঙ্কুরে—

"There is a small section of (Muslim).....who follows *marumakkathayam* system of inheritance like the Nayars"—Travancore Census Report, 1931 ch XII P. 390 & 568.

তদ্রূপ আমরা যদি কেবলমাত্র ভারতের প্রেতপূজকদিগকে হিন্দুর সামিল ধরিয়া লই, তাহা হইলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। ১৯২১ সালের ভারতের আদম-সুমারীর রিপোর্টে লিখিত আছে যে—

"There is little to distinguish between the religious attitude of an aboriginal Gond or Bhil from that of a member of one of the lower Hindu castes. Both are essentially animistic....."

সুতরাং উপরোক্ত সংখ্যায় যদি আমরা বর্ত্তমানের ভারতীয় প্রেতপূজকের সংখ্যা ১'১০ কোটি যোগ করি, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭'০২ কোটি। আমাদের নানারূপ ভুলভ্রান্তি থাকা সম্ভব। কিন্তু উপস্থিতের মত হিন্দুর সংখ্যা ২৭'০২ কোটি সাব্যস্ত করিলাম। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ নূতন তথ্য কিছু জানেন তাহা সম্পাদক মহাশয় মারফৎ জানাইলে বড় ভাল হয়। ভ্রম ত্রুটী অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত বোধ করিব। আশা করি পাঠকগণ, বিশেষ করিয়া হিন্দু পাঠকগণ এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

—শ্রীবতীন্দ্রমোহন দত্ত

শ্রীশিবরাম গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

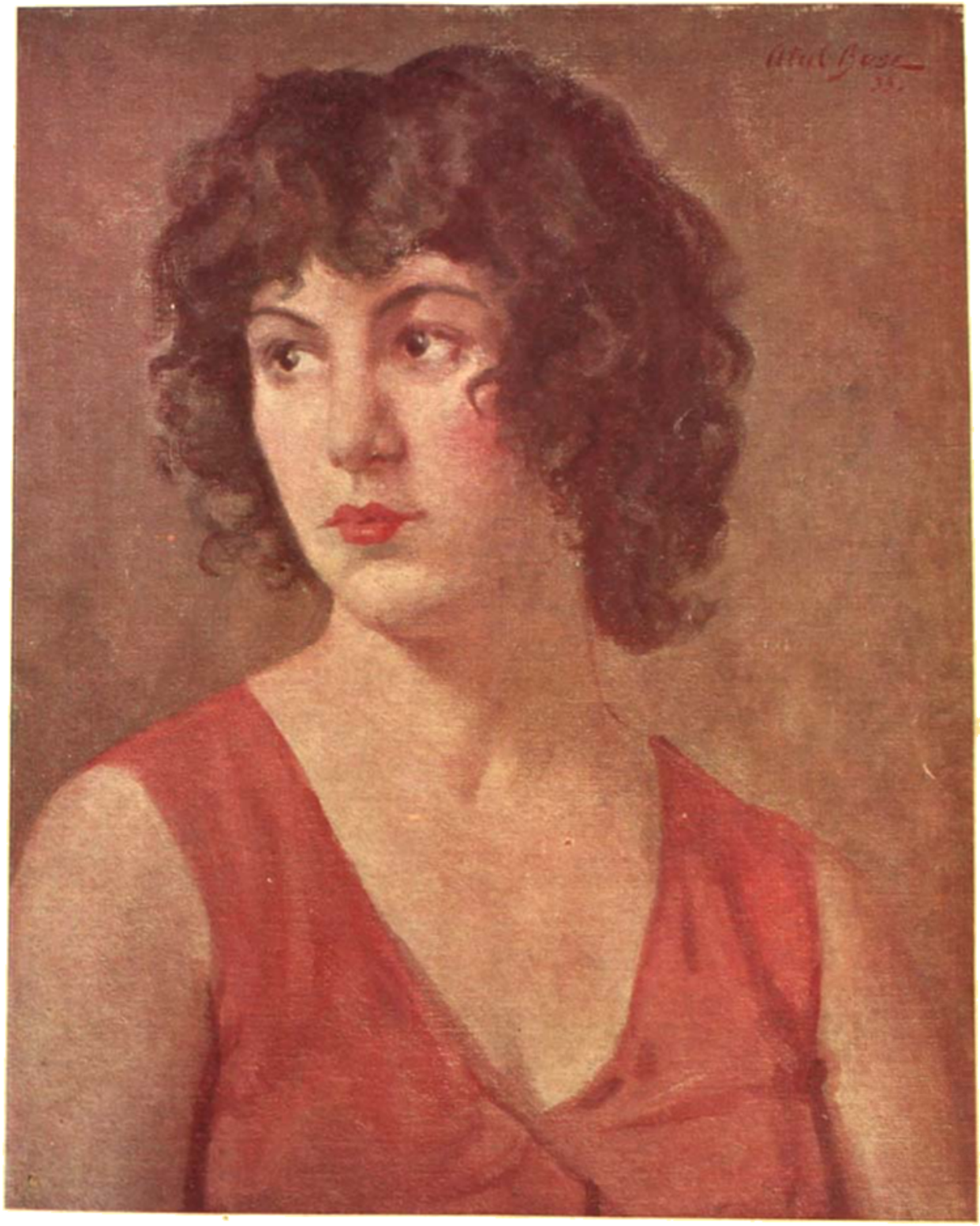

এম. এ. রহিম
শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু

তৈলচিত্র

[মিসেস ফেড. এ. রহিমের সৌজন্যে

রঙ্গশ্রী

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[ফাল্গুন—১৩৪০

বিষয়	লেখক
জলকূট (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস
আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ	শ্রীযোগেশচন্দ্র বসুবাগল
শিল্পী অতুল বসু (সচিত্র)	
কবীর-পন্থা	স্বামী ভূমানন্দ
স্টেজের মন্দিরের পুজারী (গল্প)	শ্রীসুধাময় দে সরকার
যুদ্ধ-কথা	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
প্রাচীন হৈমিক ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ ও গ্রীকীয় প্রভাব (সচিত্র)	শ্রীনিশাকান্তিলাল রায়
আর একদিক	
বাঙ্গালার ধর্ম্ম (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চণ্ডীদাস ও রামমণী দেবী (সচিত্র)	শ্রীহরিদাস মিত্র
পদ্মা (উপন্যাস)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প	শ্রীসুকুমার সেন
অন্বেষণ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
চর ডাক্তার (গল্প)	শ্রীঅনিলা দেবী
বিজ্ঞান-পরিচয়	শ্রীশচীন্দ্র উকীল
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্প (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ দত্ত
মাইকেল কলিকাতা হইতে মার্জ্জিলিং (সচিত্র)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে
অভিশাপ (উপন্যাস)	শ্রীশৈলেশকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
চতুষ্পাঠী	শ্রীসুশোভনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালার কথা (সচিত্র)	বিবিধপ্রসঙ্গ রায়
বিদ্যাসুন্দর (সচিত্র)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু
অন্ধকূপে (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিদত্ত
ডেকোনো আমায়, অভিশপ্ত দেবিন (কবিতা)	শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মা (অনুবাদ উপন্যাস)	শ্রীমতী বেলেরা
	শ্রীসন্তোষকুমার গুপ্ত
বেকার	শ্রীঠাকুরদাস রায়
কল্পনানের চিঠী (সচিত্র)	শ্রীজগদীশচন্দ্র রে
পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়	
সম্পাদকীয়	

উসের চা ভারতের গৌরব

ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ. উস এণ্ড সন্স

টি-মার্চ্চেণ্টস্—১১।১ হ্যারিসন রোড

:—২, বাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট ১৫৩।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট

৮।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

পাষাণপুরীর পাষাণের কেল্লাতের আড়ালে
ঢাকিয়া রাখিল বন্দিনী রাজকন্যা—
সে ছিল রূপকথার রাজ্যে
সহসার কাছে আজো **বন্দিনী নারী**

মনের কঠিন শিকল—বুকে বেদনার ভারী পাথর—
পুরুষের স্বার্থের বাঁশে রঙীন ধরণী ছায়ায় মিলায়।
চোখ নাই, সে অন্ধ—অন্ধের বেদনা কে বোঝে?
দুই চোখ অন্ধের চেয়ে আরো মর্ম্মান্তিক বেদনা তাহার
মন তার বাহিরে ভিতরে পাথর চইয়া গিয়াছে

আধুনিক সংসারের এই করুণ চিত্র দেখিবেন
—অদ্বিতীয় কথাশিল্পী—
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত
কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা
উপন্যাসে!
নারী-চিত্তের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনন্যসাধারণ শক্তি—
বাঙলার কথা-সাহিত্যে এ উপন্যাসের জোড়া নাই!!
কমলা পাবলিশিং হাউস
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

বিবাহে—
প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন -
আধুনিক জহরতের অলঙ্কার
গঠনশিল্পের চাতুর্য্য ও মিতব্যয়িতাই
—— আমাদের বিশেষত্ব ——
—ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড জুয়েলার—
বিনোদবিহারী দত্ত
মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস্
একমাত্র ঠিকানা—১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফাল্গুন, ১৩৩০

৩য় খণ্ড, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

কাল-কূট

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,
যাহাদের কবি, কবি হয় আকাশ-বিলাসে,
কেবলই ফুলের কথা কয়,
হয়ে না ধরার ধূলি ক্ষুদ্রতম পালঙ্কশয্যায় :
ক্ষুদ্র মন নিয়ে করে বিরাটের, ক্ষুদ্রার সাধনা :
তাদের আকাশ হ'তে কক্ষচ্যুত ধূমকেতু আমি
আনিয়াছি মৃত্যুর সাধনা।

লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
লোভে ক্ষোভে তিক্ত-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
ঘৃণ্য হতে লালাস্রাবী প্রেম,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
তুচ্ছ তাদেরে কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।

রৌদ্র নাহি ভালবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যায় আকাশের হাওয়া ;
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ—
ষ্টুডিও-ইউরের টিবি হিমালয় করিছে আঁধার।
জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার—
উঠানের টবে ঘেরে বারিধির উন্মত্ত নর্ত্তন ;
সাগরে তরীর ঢেউ আছাড়িয়া তটের কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও দুইকূল-প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের ঝরা-পাতা,
রঙে নাহে কাগজের ফুল,
নিখুঁত ভ্যামিতি-কষা বেড়ে ফোটে ফুল মঞ্জরী—
অপরূপ নাম তাহাদের ;

সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধূলায় দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনায় মৃত্যুর শতনাম।

দশধাপ সিঁড়ি উঠি, বেঞ্চ-পাতা ছলে যাহাদের
নিশিদ্ব দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গানে কোরাস ;
তপ্ত ঘর্ম্ম যত ওষ্ঠে হাই,
চর্ম্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া।
নিখুঁত জানাই-ধরা ঝাউ-পাতা বেদীর আড়ালে
নিরাকার দেবতার ফুটে ওঠে লক্ষ কোটী রূপ—
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দ্দম কঙ্কর ;
মর্ম্মর-বেদীর 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পায়ে দান করে জীবন-আসব,
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রীম-চাকা চর্ম্মে হায়, লাগে না শিহর,
কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি—
বধির করেছে কর্ণ বিলেতী ভাষার প্রেমস্তুতি,
ফাঁকা নাকী টয়াক্কির ম্যাড্।
ধর্ম্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—
প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল ভ্রুকুটি।
মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখায় মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা, লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোস পরি' কি বীভৎস কামের কদর্য্য !
সন্ধান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আমার সাধনা,
তাই ডাকে যমালয়ে ঘরে তার তরুণীর নাগরে,

ক্লীব স্বামী ঔদার্য্যের ছলে,
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে—
পর-অর্থে চালায় সংসার !

সংসার !
ঝড়ো হাওয়া আকাশে আকাশে—
ধূলিবালি ওঠে আবর্ত্তিয়া,
শাখাচ্যুত শুষ্ক পত্র শুষ্ক ফুল উড়িছে চৌদিকে,
ঝলসিছে গ্রাম কিশলয়।
ফুলের সংসার আর গাছের সংসার—
মরিয়া করিয়া পড়ে ফুরাইলে আয়ু,
মরে আর বাঁচে।
জরাগ্রস্ত বিরুদ্ধের বাঁচিবার নাহিক প্রয়াস,
পীড়নের সবুজ নাহি করে।

মানুষের ঘরে ঘরে ফুলের বাগান—
মাঠে মাঠে পথে ঘাটে গৃহের প্রাঙ্গণে
মানুষের প্রতিবেশী গাছেরা বিকৃত হয়ে আসে,
স্বভাব বীভৎস হয় ক্রমে ;
শতদল হয় দলহীন—
মৃত্যু হয় নিতান্ত মরণ।
সে মরণ-ভীত আমি, মৃত্যুরে জেনেছি মহীয়ান—
জানাইতে চাই সবে রুদ্র সেই মরণ-স্বরূপ।

শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা,
যে মরিবে সে মারিছে সে বাঁচিবে তাবে—
শুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিকৃত বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রেরে অপমানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-বাসন আর হোটেল-বিলাস—
সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।

এক-কাম-বলি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি ;
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃত্বের দিকে দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ।
বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের মুখ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায়রে সন্তান !

যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য-ফ্যাক্টরী-মদ-আফিম-কোকেন,
তাড়িখানা, বেশ্যোরাঁ, হোটেল,
পথে পণ্যরমণীর মুখার্ত্ত ইঙ্গিত,
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে
রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ,
রক্তস্রোতে কর্দ্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

দেখেছি ধর্ম্মের নামে পৈশাচিক পৌত্তলিক লীলা,
নর-দেহে গুরু-অবতার ;
জ্ঞানী গুণী ধনীর মস্তক
সশ্রীক লুটায় তার চরণের তলে।
দেখিয়াছি, আজও দেখিতেছি—
নবতর বাক্তিগার কীর্ত্তনের নামে।
নারী রাধা-ভাবে
নারীত্ব মাতৃত্ব ভুলি
দেহের গোপন কুধা পরিতৃপ্ত করি
কি আত্মপ্রসাদ লভে, পাপে ধর্ম্মজ্ঞানে !

দেখেছি দয়ার নামে লোভীদের উলঙ্গ চীৎকার—
চাঁদা-সংগ্রহের ধূম—
ভাঁড়ি আর বেশ্যাঘরে সে দয়ার শেষ পরিণতি।

দেখিয়াছি নৈষ্ঠ-চিকিৎসকে—
পীড়িতেরে সুস্থ করি মৃতেরে জীবন দিবে যারা,
স্ত্রীকন্যা পালন করে দর্শনাশা মোদক বেচিয়া,
ত্রাস্ত আতঙ্কিত জননীর
গর্ভনাশ করি।

দেখিয়াছি অক্ষম লম্পটে।
ক্লীব সাহিত্যিক, দেখে নাই বিরাট বিস্ময়ে—
দেখে নাই প্রেম।
জানে না মাতারে তার, জানে না ভগ্নীরে ;
কাম-রসায়ন-রসে বুদ্বুদ লেখনী চলে তার,
সে পণ্য ও বাজারে বিকায়—
অন্তরে যে দেখাইবে, সে দেখেনি মুক্ত নীলাকাশ,
মৃত্যুরে দেখেনি মুখামুখি।

দেখেছি আর্টের নামে রমণীর মূর্তি শুনসার,
জগতের পুরুষের একমাত্র নয় কাম-রূপ—
পুরুষের গর্ব তবু ক্লীবত্বে অক্ষম !

বিজ্ঞাপনে রমণীর দেখিয়াছি কদর্য্য গাহনা,
সে আজও মানুষ নয়,
পুরুষের ভোগপাত্রে ষোড়শের এক উপচার।
বঞ্চিত যে, বঞ্চনারে সগৌরবে তুলি লয় শিরে !
সে আরও ভীষণ !

রমণীর স্বাধীনতা, হায়, হায়, হায় নবযুগ !
কিসে তারে অন্ন দেয় জানে ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী জানে—
কি লাঞ্ছনা শুচিতা-রক্ষায় !
নিত্য নব খুলিতেছে পথ,
বীমার দালালি, রেলে টিকিট-বিক্রয়,
কাম-কণ্টকিত পথ, হায় স্বাধীনতা !

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দেখিয়াছি মানুষের চোখে
লালসার পঙ্কিল ইঙ্গিত।
মানুষের ধরস্রোত, মানুষেরে করিতে হনন—
সর্পরূপে পশুরূপে পরস্পর চলে হানাহানি।
প্রভুত্ব দাসত্বে হানে, কদর্য্যতা হানে সুন্দরেরে—
বাহিরে মোহন আবরণ।
নাট্যালয়ে অভিনয়, সিনেমায় চলচ্চিত্র ছবি,
মানুষে টানিছে নীচে, টানে টানে ঘোর উন্মাদনা—
অর্থ দিয়া করে বিষ পান।
আঁকড়িয়া ধরিবারে প্রিয়, প্রিয়তর জীবনেরে
জীবন চুঁইয়া পড়ে মুষ্টিতল দিয়া,
মৃত্যু আসে নিঃশব্দ চরণে।

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের অট্টহাস,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি।
ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গিরি-বিদারণরূপ—
সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে দিকে থৈ থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তারই মাঝে জীবন-অঙ্কুর—
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি,
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে দধীচির নিজ অস্থিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরণাগত লাগি।
ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ মোর সে মৃত্যু মহান—
অগ্নিদগ্ধ বীরাঙ্গনা রূপ,
মৃত্যুতীর্থ-স্নানে যায় বীরদল উত্তর মেরুতে,
হিংস্র শ্বাপদের মুখে অরণ্যে গহনে,
সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি।
জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আবিষ্কার
নব জীবনসাধন,
অপরূপ যন্ত্র-উদ্ভাবনা, মৃত্যুকর স্পর্শি' হাসিমুখে —
হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অনলে
আর্ত পীড়িতের সেবা-কাজে।
বন্দীর বন্ধন,
মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে লয় তুলি—
সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

দূর কর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়।
যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে,
সে জীবনে বার বার আমাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কাল-কূট।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দ্বাংসরিক স্মৃতি-সভায় আপনারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে আমি যেমন এক দিকে আমার প্রতি আপনাদের এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, তেমনই আর এক দিকে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ কেশবচন্দ্রের মত একজন ধর্ম্মবীর মহাপুরুষের সম্বন্ধে আমার মত সাধনাহীন ব্যক্তির বলিবার কিই বা থাকিতে পারে? ধর্ম্ম-সাধন বা ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুশীলন আমি কখনও করি নাই। কেশব যে সাধনমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভক্তির উৎসাহকে অগ্নিহোত্রীর মত যাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—যাঁহারা কেবলমাত্র মত বা তত্ত্ব নহে, কেশবের জীবন-বেদের সেই অপৌরুষের আর্ষ বাণীকে নিজ-জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমিই শিক্ষার্থী; কেশবের সেই নিগূঢ় ধর্ম্ম-তত্ত্বের সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই।

কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের জীবন আর এক দিক দিয়া আলোচনা করিবার যোগ্য। এই জাতির গত-যুগের ইতিহাসে যে সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল,—কেশবচন্দ্র তাহারই একটি ফুলিঙ্গ। জাতির সেই ইতিহাস বুঝিতে হইলে, কেশবচন্দ্রকেও বুঝিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির নিজস্ব, সকল সমস্যাই মূলে একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কট-রূপেই দেখা দেয়। কেশবের মধ্যে ইহা বিশেষ করিয়া সেই আকারই ধারণ করিয়াছিল। যুগ ও জাতির প্রতিনিধিরূপে কেশবজীবনের আদর্শ ও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

এ যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে যে সমস্যা বিশেষ করিয়া জড়িত ছিল, যাহার সমাধান একটা সজ্ঞান সুস্পষ্ট অভিপ্রায় রূপে সেই আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা মুখ্যতঃ, মোক্ষলাভ নয়, জাতির জীবনকে নূতন করিয়া একটা নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন-চিন্তাই তাহার মূল। সমাজরক্ষা বা লোকস্থিতির জন্য যে নীতি-মার্গ বা Law তাহাই ছিল, এ যুগের ধর্ম্মসমস্যা। এই ধর্ম্মকে নূতন করিয়া উদ্ধার করা, তাহাকে যুগোপযোগী রূপ দিয়া জাতির জীবনে সঞ্চারিত করিয়া যুগ-সঙ্কটে পরিত্রাণলাভের উপায় আবিষ্কার করাই সেকালের বাঙ্গালী মনীষিগণের একমাত্র ভাবনা ছিল। সকলের ধারণা এক ছিল না—আদর্শ পৃথক ছিল। কেশবচন্দ্র এই সমস্যার সমাধানে ভগবদ্‌ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা জাতির নৈতিক উন্নতিসাধনকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে ও কর্ম্মজীবনে এই অভিনব আদর্শের অনুপ্রেরণা আপাতদৃষ্টিতে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তিতরে দৃষ্টি করিলে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর ভাব-প্রকৃতি ও বাঙ্গালী-প্রতিভারই এক নূতন অভিব্যক্তি দেখা যায়। সে যুগের সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই বাঙ্গালিয়ানাই আমাকে মুগ্ধ করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালীর প্রতিভায় কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-নীতি একজন বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিরূপ সাড়া জাগায়, কেশবচন্দ্রের প্রতিভায় তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কেশবচন্দ্র যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন—যুগের প্রভাব ও জাতির প্রতিভা দুইই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া কেশবকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্ম-সাধন, এবং ধর্ম্ম-প্রচার এক নহে; উভয়ের প্রয়োজন স্বতন্ত্র। যে কারণে যে ধর্ম্ম প্রচারযোগ্য হয়, জগতের ইতিহাসে তাহার একাধিক বড় দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষেই সেইরূপ ধর্ম্ম ও তাহার প্রচার প্রথম প্রকটিত হয়। ধর্ম্ম যখন জাতি বা সমাজের কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের আধ্যাত্মিক সাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার সাধন-পন্থা 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' বলিয়া বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হয়, তখনই লোকস্থিতিমূলক ধর্ম্মের গঠন ও প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। শাক্যমুনি ঐতিহাসিক কালের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার ধর্ম্ম

শুধু সাধনার ধর্ম নয়—জ্ঞান-মুক্তিমূলক পুরুষকারের ধর্ম। লোকধর্মের আর এক আদর্শ আছে; প্রাচীন সেমীয় জাতির মধ্যেই তার সমধিক বিকাশ ঘটিয়াছিল। এ ধর্মও সমাজ-শাসনমূলক, লোকসংস্থিতিই ইহার মূলগত অভিপ্রায়। প্রাচীন য়িহুদীয় ধর্ম স্বজাতি বা গোষ্ঠীর জন্যই প্রণীত হইয়াছিল। রাজা বা পিতারূপে এক ঈশ্বরের ধারণা করিয়া প্রেরিত পুরুষগণ ঈশ্বরাদেশ প্রচার করিতেন; সেই আদেশপালন সর্বপ্রকার বিনাশ হইতে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। এই একেশ্বরবাদ ক্রমে কঠিন শাসনবাদ হইতে ক্রমে ঈশ্বরবাদের ভক্তি-ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং স্বজাতি বা গোষ্ঠীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে গ্রহণ করিয়াছিল। এ দেশীয় প্রাচীন আর্যগণের মনোজেও এক ধরণের ব্রহ্মবাদ প্রচলিত ছিল; তাহাও কেবল আর্যগোষ্ঠীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য বিহিত হইয়াছিল, প্রচারযোগ্য ছিল না। কিন্তু এই অতি সহজ সরল—বায়ু ও আলোকের মত জীবনীয় ব্রহ্মবাদ ভারতবর্ষের জল-মাটিতে অঙ্কুর থাকিতে পারে নাই—অদ্বৈত তত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি সেই আধ্যধর্মকে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম মিলিত হইয়া নানা সম্প্রদায়ের, নানা তত্ত্বের, সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের ছায়া সুদূর প্রসারিত হইয়া, ধর্মকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধনেই বিশেষ করিয়া নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমাজবিধি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সেকালের জনসমাজের কীদৃশ কল্যাণ কি ভাবে সাধন করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন—আজিকার আদর্শে তাহা নির্ণয় করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কিন্তু পরবর্তী কালে এই অধ্যাত্মসাধন ও সামাজিক হিতসাধনের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, এই বাংলা দেশেই, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে, যে নবধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতেও এ সমস্যার সম্যক মীমাংসা হয় নাই। মিশ্র-ধর্মের পরিবর্তে ধর্মমূলক ভক্তিরসের প্লাবনে জাতির প্রকৃতি আরও কোমল হইয়া পড়িয়াছিল, সমাজ আরও না হইয়া কতকটা আত্মহারা হইয়াছিল। সমগ্র মুসলমান-অধিকারকালে, আত্মোন্নতি অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টাই প্রবল হইতে দেখা যায়; সে কালে এই আত্মরক্ষার উপায় হইয়াছিল আত্মসঙ্কোচ। এই জন্যই চৈতন্য-প্রবর্তিত-ভক্তি-ধর্ম সামাজিক সংস্কার ও সংগঠন কর্মে দুঃসাহসী হইতে পারে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্মের যে আর এক আদর্শ আছে, লোকসংস্থিতিই যাহার মুখ্য অভিপ্রায়—ধর্মের যে নীতি ব্যবহারিক লোকসাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশে বহুদিন প্রচারিত হয় নাই। আমরা ধর্ম বলিতে ব্যক্তিগত মোক্ষসাধনার আদর্শই বুঝি; এই মোক্ষ-লাভের সাধনায়, ব্যক্তির অধিকারভেদ মানি। প্রত্যেক জীবই কর্ম অনুপাতে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, অতএব সাধন-মার্গ সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। মানুষ মাত্রেই এক ধর্ম-পরিবারভুক্ত বটে, কিন্তু তুল্যাধিকারসম্পন্ন নয়; একই গোষ্ঠীপতি ভগবানের সন্তান বলিয়া সকলেই একই সত্যের অধিকারী—এ ধারণা আমাদের নিকট নিতান্তই হাস্যকর। অধিকারভেদে একই সত্যের নানা রূপ, কোনটাই মিথ্যা নহে; মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হিসাবে যাহার যতটুকু অধিকার তাহাই তাহার পরম সত্য। এই অদ্বৈত আধ্যাত্মিক ধর্ম যতই গভীর হউক, এ আদর্শের মূলে যত গভীর সত্যই নিহিত থাক, ইহার ফলে যে সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সামাজিক নীতি-সত্যের সমাক মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। যতদিন বাহিরের সঙ্গে সংঘাত তুমুলতর হইয়া উঠে নাই—অহিন্দু সেমীয় সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ঘটে নাই, ততদিন এই বাস্তব-সম্পর্কী অধ্যাত্ম-সাধনা কতকটা নির্বিঘ্নেই চলিয়াছিল। কিন্তু পরে, বিধর্মের প্রচণ্ড আঘাতে, বিজাতির প্রবলতর রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎপাতে যখন এ জাতির দুর্বলতা প্রকাশ পাইল, তখন এই ধর্ম বাহিরের জীবন ও সামাজিক নীতি-সত্যকে পাশ কাটাইয়া শুধু তান্ত্রিক সাধনমার্গে আত্মগোপন করিল; যে-ধর্ম সমাজকে ধরিয়া রাখে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া আমরা জীবনে মিথ্যাচারী, এবং ধর্ম-সাধনায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিলাম।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সকলেই জানেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই আমরা নিজেদের দুর্গতি সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিলাম—যে-সঙ্কট সম্বন্ধে এতদিন

আমাদের কোনও চৈতন্যই ছিল না, তাহাই মর্মান্তিক রূপে উপলব্ধি করিলাম। ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সবচেয়ে বেশী করিয়া বুঝিলাম আমাদের নৈতিক হীনতা, জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় অবনতি, বৃহৎকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রের প্রতি আসক্তির জন্য আত্মার জড়তা। ইংরাজী শিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইবারও পূর্বে এ চেতনা বাঙ্গালীকে অধিকার করিয়াছে, নিজেদের হীন অবস্থার জন্য লজ্জিত হইবার মত আত্মজ্ঞান তাহার হইয়াছে। পুরাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদে, এবং নূতন বিদেশী শক্তির সহিত কর্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, বাঙ্গালী আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—এই ভাবনাই তাহার সুপ্ত মনীষা জাগাইল। কারণ, বাঙ্গালী চরিত্রবলে যতই হীন হউক, তাহার ভাবগ্রাহিতা শক্তি অসাধারণ, যুগান্তরের ভাব-সত্যকে সে অবিলম্বে জ্ঞান-গোচর করিতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙ্গালী বুঝিতে সুরু করিল, ধর্ম-প্রয়োজন কি। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর হইয়া সর্বপ্রথমে এসম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। ধর্মের যে অপর অর্থ আমি ইতিপূর্বে আপনাদের নিকটে উল্লেখ করিয়াছি সেই অর্থে রামমোহন একটা ধর্মের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে, জাতির মনোভূমি হইতে সকল অন্ধ-বিশ্বাস, এবং ধর্মসাধনার ক্ষেত্র হইতে সর্বপ্রকার রহস্যময় বা অলৌকিক অনুভূতির চর্চা দূর করিয়া, তিনি একটি যুক্তি-সঙ্গত, নীতিমূলক ধর্ম দেশবাসীর জন্য প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের এই উদ্যম ও তাহার অন্তর্গত অভিপ্রায় আজিও কেহ বুঝিতে সক্ষম বা সম্মত হয় নাই। রামমোহন যে একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, পারলৌকিক কল্যাণচিন্তাই তাহার মুখ্য কারণ নয়; সাধু-সন্ত বা ভক্ত-ভাগবৎগণ যে শ্রেণীর ধার্মিক, রামমোহন নিজে সেরূপ ধার্মিক ছিলেন না। রামমোহনের প্রতিভার প্রধান কৃতিত্বই এই যে, তিনি, রাষ্ট্রে সমাজে ও শিক্ষায় একটা নূতন যুগোপযোগী আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন—ভগবৎ-লাভের উৎকৃষ্টতর পন্থানির্দেশ, নূতন করিয়া মোক্ষপথ রচনা, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না; বলহীনকে পার্থিব জীবনে শক্তিমান করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মধ্যযুগের ধার্মিকতার আদর্শকেই সংস্কার করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চান নাই: জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, জাতিহিসাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে, প্রত্যক্ষকে স্বীকার কর, এবং তজ্জন্য সহজ মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির আরাধনা কর—ইহাই ছিল তাঁহার ধর্ম। পৌত্তলিক ধর্মের ভাবসাধনার যে বক্রকুটিল গহন-গূঢ় আরণ্যপথ মানুষকে সহজ সত্তা ও সামাজিক শক্তিসাধনা হইতে দূরে লইয়া যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব করে, তাহাকে বর্জন কর। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অতি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ "বিবেকানন্দ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী"র একস্থানে রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনায় রামমোহনের একখানি ইংরাজী পত্রের যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ, আমিও এখানে তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। সে কথা ছত্র এইরূপ—

> I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest...It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.

উক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহনের গ্রন্থ হইতে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত—

> Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other human creed.

এ সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রামমোহন কেন ধর্মসংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান সাহিত্য ও খ্রীষ্টান চরিত্র এবং খ্রীষ্টান রাজশক্তির প্রভাব একালে বাঙ্গালীর মনকে হঠাৎ একটা বড় ধাক্কা দিয়াছিল—তুলনায় নিজেদের হীনতা-বোধ বড় বেশি করিয়া বাজিয়াছিল। বাঙ্গালী নূতন করিয়া মানুষ হইতে চাহিল; এবং এক যুগের নিশান্তকালে, অরুণোদয় প্রতীক্ষায়, পশ্চিমকেই পূর্বদিক্‌প্রান্ত বলিয়া তাহার দিঙ্‌মোহ হইয়াছিল। তথাপি রামমোহন একটা ধর্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র—ধর্ম-প্রচারক ছিলেন না; তিনি কোনও পৃথক সমাজ স্থাপনের চেষ্টাও করেন নাই। রাম-মোহন চিন্তা করিয়াছিলেন, তর্ক করিয়াছিলেন, লেখালেখি করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, কোনও ভক্তি-বিশ্বাসের আবেগ তাঁহার ছিল না—তাঁহার ধর্মও আবেগের

ধর্ম্ম ছিল না। তাই তিনি নবযুগের একটা আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, জাতির জীবনে বা তাহার হৃদয়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। রামমোহন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন—অপক্ষপাত সহকারে তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে তাঁহার যে ব্যক্তিস্বরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, তিনি ভক্তমণ্ডলীর অনুকরণীয় আদর্শরূপে নিজ জীবন স্থাপন করেন নাই। সেখানেও, তিনি বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের মত অটল অবিচলিতভাবে নিজের মনের মত জীবন স্থাপন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই। এই বীরমূর্ত্তি কোন সাধু, দরবেশ বা ভক্ত সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি নহে। রামমোহনের যে অসাধারণ মনস্বিতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহাও, নব্যন্যায়ের স্রষ্টা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এই যে রামমোহন, ইঁহার পরিচয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-কোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রামমোহন বাঙ্গালীর বরণীয় বটেন, কিন্তু কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য নহ—রামমোহনই এ যুগে সর্ব্বপ্রথম জাতির জড়বুদ্ধিকে সবলে আঘাত করিয়াছিলেন, স্বাধীন জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জনগণকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, ইহাও সত্য। তাঁহার বাণীকে এ জাতি জীবনের মধ্যে পায় নাই। আজ রামমোহনকে লইয়া আমরা যে গৌরব করিতেছি, তাঁহার স্মৃতিপূজার যে সাড়ম্বর আয়োজনে মাতিয়াছি, তাহার আরও সঙ্গত কারণ থাকিলে ভাল হইত। তাঁহার জীবন বা তাঁহার আদর্শ কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে জাতিকে প্রভাবিত করে নাই, শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে আমাদের হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করে নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামমোহনের নামে যে নূতন ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার মন্ত্রও ঠিক রামমোহনের মন্ত্র নয়; সে সমাজ এক অভিজাত-জ্ঞানী সম্প্রদায় রূপে অচল হইয়া রহিল। কিন্তু নবযুগ বসিয়া ছিল না; বাঙ্গালীর চিত্ত-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার হলকর্ষণ বন্ধ হয় নাই; বরং আরও গভীরভাবে সেই খনন-কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশবচন্দ্র সেন নামে আর এক বাঙ্গালীর অভ্যুদয় হইল। কেশবের ধর্ম্ম-জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এ যুগের পক্ষে আকস্মিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেশবচন্দ্রের নব্য বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠায় আর এক দিক নবযুগের সমস্যার সাড়া দিয়াছিল। কেশব যুক্তিবাদী নহেন, ভক্তিবাদী;—কেশব যে শক্তিবলে যুগ-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে চাহিলেন, সে শক্তি আত্মিক বিশ্বাসের শক্তি, তাই কেশব রামমোহনের মত নীতিবাদী নহেন—নীতিধর্ম্মী; তিনি ধর্ম্ম-প্রণেতা নহেন—ধর্ম্ম-প্রচারক। তথাপি কেশব ও রামমোহনের লক্ষ্য এক—জাতির নৈতিক জীবনের সংস্কার-সাধন। রামমোহন যাহা বুদ্ধির সাহায্যে করাইতে চাহিয়াছিলেন, কেশব তাহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে। রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও, এবং সেদীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—বেদান্ত উপনিষদের দোহাই না দিয়া পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার 'ভাবের ঘরে চুরী' ছিল, তিনি ভিতরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে তাহা খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না। এই আভিজাত্যাভিমানের বশেই—নিজ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে যে পরধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব স্বীকার না করিয়া—তিনি অতি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেশব এই আবরণটি উড়াইয়া দিলেন, নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অকপটে স্বীকার করিলেন; কেশব বিদ্রোহী নব্যবঙ্গের এক অভিনব মূর্ত্তি। কেশবের ধর্ম্মপ্রতিভা ছিল, তাঁহার সমস্ত হৃদয়মন ভক্তির ভাবাবেশে বিকৃত হইয়া উঠিত, সে সময়ে তাঁহার মুখে দিব্যপ্রভা ও কণ্ঠে দিব্যভারতীর উদয় হইত। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ যেমন রামমোহনের প্রতিভাকে স্ফুরিত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ধর্ম্মও তেমনই কেশবকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। এই দুই অগ্নি-পরীক্ষাই বাঙ্গালীকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে; কেশবের প্রতিভা খাঁটি বাঙ্গালীর প্রতিভা, কেশবের জয় ও পরাজয় সে যুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

কেশবের প্রতিভায় তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—(১) তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপ্রেরণা; (২) ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তিনি ভক্তিযোগী মিষ্টিক; (৩) কঠিন মত-নিষ্ঠা অপেক্ষা উদার ভাবগ্রাহিতা। এই তিনটি লক্ষণে আমরা তাঁহার সাধন-জীবনের যুগোপযোগিতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কেশবের ধর্মজীবনে আমরা পর-ধর্মের প্রেরণা দেখিতে পাই। খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রবক্তাগণ—ব্যাপ্টিষ্ট্ জন (John the Baptist) সেন্ট পল ও যীশু—যে একজন ঈশ্বর-পিপাসু হিন্দুসন্তানের ধর্মগুরু হইলেন, কেশবের ধর্মজীবনে ইহা কি কেবল একটা দৈবঘটনা? ইহার মূলে কি বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং যুগপ্রভাব ও যুগ-সমস্যার একটা ইঙ্গিত ছিল না? ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রভাব ইহার মূলে ছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু বাঙ্গালীর ভাব-প্রকৃতি ইহার জন্য সমধিক দায়ী। সে যুগের ধর্মহীন নীতিহীন সমাজের পরিণাম-চিন্তা কেশবকে যে-ভাবে ব্যাকুল করিয়াছিল, তেমন আর কোনও ভাবুক বাঙ্গালীকে করে নাই। অতিশয় স্পর্শকাতর চিত্ত ও অতিশয় কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ে যদি আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত হয়, যদি তাহার সঙ্গে আন্তরিকতা, আত্মপ্রত্যয় ও চরিত্রবল থাকে, তবে সে যুগের পক্ষে যে রূপ ধর্মপ্রেরণা স্বাভাবিক কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহারই বিকাশ হইয়াছিল। যে খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতির প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি,কেশবচন্দ্রকেও সেই ধর্মনীতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহা হইতে সে যুগের বাঙ্গালীর প্রতিভা কোন্ প্রধান সমস্যার সমাধান-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আজ বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্র নয়, ইংরাজী সাহিত্যও নয়, ইংরাজের যে চরিত্রবল—বিজেতা জাতির যে পৌরুষময় প্রাণের স্ফূর্তি সেকালে সমগ্র ভারত-বাসীকে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল যাহার প্রভাবে ইংরাজ শুধুই রাজ্যজয় করে নাই, বহু শতাব্দীর অনাচার-কলুষিত নৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত জাতির হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, সে যুগের বাঙ্গালী মনীষী ও বাঙ্গালী ভাবুক তাহাকেই বরণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, জাতির জীবনে নব-আদর্শ রূপে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কেশব এদেশে ইংরাজ-অধিকারের ইতিহাস জানিতেন। তাহার কারণ যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমনই তাহার সুফললাভের আশা করিয়া-ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বলিয়াই, ইহার মূলে মঙ্গলময় বিধাতার শুভ অভিপ্রায় আছে; যে ধর্মনীতির প্রেরণায় ইংরাজ জাতি বড় হইয়াছে, ইংরাজের দৃষ্টান্তে ও সাহচর্যে তাহারই সারতত্ত্ব আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরিত্রাণ আশু ও সহজ হইবে। ইংরাজের ভারত-বিজয়ের ফলে জাতির একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে—এমন ধারণা সেকালে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছিল—বাঙ্গালী একটা বড় আশা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও আশা করিতেন। ইংরাজের প্রতি এই শ্রদ্ধা বিজাতির প্রতি মনোভাব—ভাবনা ও কল্পনাশক্তির ফলে বাঙ্গালীই সর্বাগ্রে পোষণ করিয়াছিল; ইহারই ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীই আধুনিক ভারতে যুগান্তর আনিয়াছে। কেশবের মধ্যে সেই বাঙ্গালিয়ানারই বিকাশ হইয়াছিল, ধর্ম-প্রেরণার দিক দিয়া।

কেশবের ধর্ম-প্রেরণার মূলে ছিল পাপ-বোধ। অতি অল্প বয়সেই জাতির বহুকালসঞ্চিত পাপের পরিণাম চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রকৃতিতে বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মে পাপ ও পাপমুক্তির তত্ত্ব গ্রাহ্য হইলেও, সে ধর্মের সাধনায় আর সে সরলতা ছিল না, জটিল রসতত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশব বুঝিয়াছিলেন, মানুষকে মানুষ হিসাবেই উন্নত হইতে হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যক্তি-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, সহজ স্বাভাবিক মানবীয় চেতনাকে অতিক্রম করিলে চলিবে না। সে সম্বন্ধ আপামরসাধারণের পক্ষে একই ভাবে ও একই কারণে সহজ হওয়া চাই। এই সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়—জ্ঞান নয়, ধ্যান নয়, গুরুদীক্ষাও নয়—প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই গুরু—ভগবান ও মানুষের মধ্যে সহজ যোগস্থাপনের একমাত্র সেতু। এই প্রার্থনার উপ-যোগী চিত্তের অবস্থা—পাপ-বোধ, দুর্বল অসহায় মানুষের ভয়-ব্যাকুলতা। চিত্তের এই অবস্থা ও এই প্রার্থনাতত্ত্ব কেশবের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছিল, পূর্ব হইতেই তাঁহার মনকে খ্রীষ্টীয় সাধন-পদ্ধতির অনুকূল করিয়াছিল। কেশবের নীতি-নিষ্ঠার জন্যের আত্ম-সমর্পণ ছিল, যুক্তিবাদীর অহঙ্কার ছিল না। প্রথম হইতেই এই নৈতিক চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাই খ্রীষ্টীয় সাধুর উক্তি—'Repent ye, for the Kingdom of Heaven is at hand'—তাঁহাকে এমন গভীর ভাবে বিচলিত করিয়াছিল।

কেশব রামমোহন-পন্থী ছিলেন না, ইহার পরেও তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কেশব সজ্ঞানে ভক্তি-সাধনা করিতেন বটে, প্রচারক কেশব তাঁহার নব ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তিমূলে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসাকে স্থান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে তিনি বিশ্বাসকেই সর্ব্বোচ্চ পীঠ-মণ্ডপে আসন দিয়াছিলেন; তিনি সকল জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিতেন ভাগবতী প্রেরণার সমীপে। বাঙ্গালীর সন্তান, উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগে, নূতনতর জাতীয় সমস্যার সঙ্কটে এবং এক অভিনব শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ায়, যে নূতনতর ভক্তের বেশে আবির্ভূত হইতে পারে, কেশব ছিলেন তাহাই। মরীয়ার জলমাটিতে ফুটিবার ধর্ম্মবীজ যে ফুল ফুটাইতে পারে কেশবের ধর্ম্মজীবন সেই ফুল। কিন্তু নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অবিমিশ্র ভক্তিকেও মিশ্ররূপ ধারণ করিতে হয়, কেশবের জীবনে সে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি সেই দ্বন্দ্বকে জ্ঞানতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি তাঁহার সমগ্র চরিত আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের পূর্ব্বোত্তর ধারায় ইহাই কেশব-জীবনের বিশেষত্ব। এই জন্যই সে যুগের সংস্কারপন্থীদের মধ্যে একমাত্র কেশবের প্রতিভাকেই সত্যকার ধর্ম্মপ্রতিভা বলা যাইতে পারে। কারণ, ধর্ম্ম কেবল নীতির শাসন নয়; অথবা ঈশ্বর নামক কোনও কল্পিত সত্তাকে যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরে নিজের বিবেক নামক অহংকারের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করার পন্থাও নয়। ইহারই বিরুদ্ধে কেশব তাঁহার অমল বিশ্বাসকে ভক্তি-রসধারায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্ব ছিল; না থাকিলে তাঁহার জীবন এমন কর্ম্মময় হইত না; বুঝি বা, তিনি নব ধর্ম্মনির্ম্মাণে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইতেন না। এই ভক্তি যেমন তাঁহাকে নিজ ধর্ম্মজীবনে জয়ী করিয়াছিল, তেমনই ধর্ম্মপ্রচারের স্ববিরোধী অধ্যবসায়ে তাঁহাকে ক্লান্ত শ্রান্ত ও বিফলমনোরথ করিয়াছে। কেশব জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন; প্রকৃতি জ্ঞানপ্রধান না হইলে এমন সমন্বয় হয় না। কেশবের প্রকৃতি ছিল ভক্তিপ্রধান, তাই এইরূপ সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন হইলেও, তিনি তাহা সাধন করিতে পারেন নাই। বড় ভক্ত বড় বীরও বটেন; কেশবও বীর ছিলেন—তিনি ছিলেন উৎসাহ ও কর্ম্মনীর্য্যের অবতার। কিন্তু ধর্ম্মকে যে রূপে ও উপায়ে তিনি বহিঃসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার জন্য অন্যবিধ প্রতিভার প্রয়োজন। যে আসলে বৈষ্ণব তাহার শাক্ত অভিমান চলে না; কিন্তু যে শাক্ত তাহার পক্ষে বৈষ্ণব-রীতি দুরূহ নয়। কেশব যে জ্ঞানী শাক্ত ছিলেন না, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ভক্তিই ছিল তাঁহার প্রধান সম্বল, তাই দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই। 'Am I an inspired Prophet?' নামক সুবিখ্যাত বক্তৃতায় এই অন্তর-গূঢ় দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস আছে। তিনি বলিতেছেন—

> Pantheism and mysticism are things of Asia, while positivism and all the sciences of the day belong to Europe. My Church is an Asiatic Church. I am in my very bones and blood, in the very constitution of my soul, essentially an Asiatic. As an Asiatic, I would encourage and vindicate devotion to the extent of mystic communion. But here you will probably say there is no harmonious development. It is all prayer and contemplation, and no work. I say there is harmony. If I am mystical, am I not practical too? I am practical as an Englishman. If I am Asiatic in devotion, I am a European in practical energy. My creed is not dreamy sentimentalism, not quietism, not imagination. Energy, yes, energy—I have that in a great measure in my character and in my church.

কেশবের চরিত্রে এই শিশুর মত সারলা ও আত্মপ্রত্যয় বড়ই উপভোগ্য। "Am I not practical too?" —সেদিন কেশবের এই উক্তি তাঁহার শ্রোতৃবর্গ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এতদিন পরে আজ আমরা দূর হইতে এই আকুল প্রশ্ন শুনিয়া বেদনা অনুভব করি। কেশব নিজের সম্বন্ধে যে কর্ম্মবীর্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা খুবই সত্য,—যে অমল বিশ্বাস ও নৈতিক উৎসাহ তাঁহার কর্ম্মজীবনে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতেই তিনি আমাদের দেশের নবযুগকে একটি বিশেষ দিক দিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'মিষ্টিক'—উনবিংশ শতাব্দীতেও খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের বংশধর। ইহাই তাঁহার আত্মার স্বধর্ম্ম; তিনি যদি নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি তাহা

পারেন নাই; জাতির পরিত্রাণের জন্য যুগোচিত ধর্মচিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল; ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, এই জন্যই তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠীয় পুরুষ। বর্তমান যুগ ক্রমশঃই গণতন্ত্রের দিকে চলিয়াছে,—একেশ্বরবাদ একদিন মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ঈশ্বরাদেশের কঠিন শাসন। ভক্ত কেশব এই শাসনকে স্বাধীন আত্মার সানন্দ স্বীকৃতির সহিত যুক্ত করিয়া লইলেও তিনি মানুষকে বড় করেন নাই, বরং সর্বত্র সকল কর্মে, মিষ্টিক যোগীর মত, আমলের ঈশ্বরাদেশকেই শিরোধার্য করিয়াছেন। ইহাই চিরযুগের ভক্ত সাধকগণের চরিত্রনীতি। কিন্তু এ যুগের সাধনার এই মধ্যযুগীয় ধর্মনীতি কতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারে, কেশবের আজন্ম সাধনার পরিণাম লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়।

কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের যে তৃতীয় লক্ষণটির কথা বলিয়াছি তাহা এই যে, ধর্মবিষয়ে কেশব মতবাদী না হইয়া ভাবগ্রাহী ছিলেন—নিজ হৃদয়ের বিকাশকামনায় তিনি সর্বমত ও সর্বগ্রন্থ হইতে সুপথ্য সংগ্রহ করিতেন; ভাবুক ভাবপ্রবণ কেশব ধর্মপ্রেরণার ক্ষেত্রে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে নিরন্তর একটি ভাবাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, তাহাতে তিনি কখনও কোথায়ও সাধনজীবনে স্থাণু হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার 'জীবন-বেদ' নামক গ্রন্থের এক প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

> হে আত্মন্! ধর্মজীবনের বাল্যকালে কি ভাবে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিদ্বারা। অগ্নি অগ্নিদ্বারের উপাসক, অগ্নিদ্বারেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। অগ্নিময় কি? শীতলতা পূর্ণিত হইলে উত্তাপ পূর্ণিত হয়।
>
> কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে সকলেই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। একজনের কাছে সেবা করিলাম, আর একটি দল করে হইবে; একটি দল প্রস্তুত করিলাম, আর একটি দল করে প্রস্তুত করিব, কতকগুলি লোকের সহিত আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কিসে আলাপ করিতে পারি; কতকগুলি গান সকলন করিয়া সঙ্গে সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সকলগুলি গাইয়া থাকিলে পুরাতন হইয়া পড়ে, এই জন্য অপর কতকগুলি পড়িয়া সঙ্গে সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

এই যে উত্তাপের অবস্থা, ইহাই কেশব-চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানবুদ্ধির ও ভক্তিরসের নিয়ত উচ্ছ্বাস, একই জীবনে এই দুয়ের অপূর্ব যোগ—ইহাই নবযুগের বাঙালীর নবসৃষ্টি-কামনার অবস্থা; ইহাই এ জাতির প্রতিভার নিদান। ইহা আর্য ও নয়, সেমিটিকও নয়, ইহা বাঙালীর শোণিত ও বাংলার জলমাটীর বিশিষ্ট গুণ। ইহারই বলে আমরা নব যুগের নূতন কালচার সৃষ্টি করিয়াছি—রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে, বিষম আদর্শের মিলন ঘটাইয়া, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছি। কেশবচন্দ্রে সেই সৃষ্টিশীলতার এক অপূর্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। ভাবুকতা-প্রবণ বাঙালীর নিকটে কোনও ভাব-সত্যই বর্জনীয় নহে। বাঙালীর নবজাগ্রত উচ্ছৃঙ্খল আবেগ কেশবের সত্যপিপাসা ও বলিষ্ঠ ধর্মচেতনায় সংহত ও সংযত হইয়া জাতীয় জাগরণের একটা দিক নির্ণয় করিয়া দিল। আমার মনে হয় কেশব-চরিত্রের এই দিকটি বাঙালী জাতির নবজাগৃতির ইতিহাসে বিশেষ করিয়া অনুধাবনযোগ্য।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি উপসংহারে আরও কয়েকটি কথা বলিব। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী আর কোনও চিন্তা করে নাই—নূতন যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সামঞ্জস্য সাধনই, তাহার সকল কর্ম-চিন্তা, সকল ভাবুকতার মূলে ছিল। জাতির অধঃপতনও যেমন গভীর, পরিত্রাণের আদর্শও তেমন উচ্চ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামমোহনের মনীষা সেই সমস্যাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ইহাই রামমোহনের কৃতিত্ব। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির জড়তা প্রদর্শন, যুক্তিবিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতি-পাদন ছাড়া তিনি অধিক কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল যুক্তিবিচারসিদ্ধ মতবাদের দ্বারাই একটা জাতির হৃদয় বা চরিত্রের পরিবর্তন হয় না—চাই প্রেম, চাই তপস্যা; জীবনে তাহারই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই আলোক মানুষের প্রাণে ও মনে বিকীর্ণ করা। কেশব দ্বিতীয় যুগের যুগন্ধর; তিনি নবজীবন সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; তিনি যুগের প্রথম প্রেরিত। কিন্তু কেশবের প্রেমও জাতীয় জীবন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সিদ্ধিলাভ করিল না। ধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্রের মধ্য জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কেশব নিজেও শেষে সকল বিধি, সকল বিধান উত্তীর্ণ হইয়া, নিজের প্রচার-ধর্ম ও ধর্মপ্রচারেরও

যহ উর্দ্ধে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, জাতীয় জীবনক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধ্যান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচার-কর্ম্মের অপূর্ব্ব উদ্দীপনা, নূতন ভাবচিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য্য সৃজনীশক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব—কেশব-বিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে; তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতি কত কর্ম্মীকে পথ দেখাইয়াছে। সে যুগের যে বাঙ্গালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমার মনে হয় তিনিও কেশবীয় ভাবের ভাবুক। "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান" এই মহাবাক্য প্রচারকল্পে যিনি, নূতন করিয়া, বাঙ্গালীর জন্য মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সেই কবি নবীনচন্দ্রও কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয়, কেশবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে আর এক মহা-পুরুষ এই জাতির জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও, তাঁহার প্রচারপ্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন; যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা কেশব তাঁহার জীবন-বেদে উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ, কর্ম্মোদ্দীপনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত। বিবেকানন্দ কেশবের পরবর্ত্তী হইলেও অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহার গুরুমন্ত্র ও তাঁহার বাণী স্বতন্ত্র; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আদর্শে কেশবের ছায়া কতকটা সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে। *

[কেশবের কথা এইখানেই শেষ করিলাম, কিন্তু বাংলার নবযুগের কথা এইখানেই শেষ নহে; সে যুগের সমস্যা যে বিরাট পুরুষের অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাঁহার কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। —লেখক।]

আচার্য্যদেব।

দর্পণে শিল্পী স্বয়ং।

শিল্পী—শ্রীমতুল বসু

পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

* ঢাকা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে কেশব-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

শিল্পী অতুল বসু

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্যের সহিত চিত্রশিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। দেশ-কালের আঘাত-সংঘাতে সাহিত্যিকের মনে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই যেমন লেখনীমুখে সাহিত্যরূপে প্রকাশ পায়, শিল্পীর মনে সেই একই জাতীয় ভাঙাচোরার ফলে, একই আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে তুলিকা বা পেন্সিলের সাহায্যে চিত্রশিল্পের জন্ম হয়। প্রকাশভঙ্গী পৃথক কিন্তু দেখার পদ্ধতি প্রায় এক।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাংলার বাঘ)।

দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া এক জাতীয় সাহিত্য বা শিল্প গড়িয়া উঠে প্রাচীন রীতি বা ধারাকে অনুকরণ করিয়া যাহার প্রকাশ, বর্ত্তমানের কোনও ছাপ সেই সাহিত্য বা শিল্পে থাকে না, বিংশ শতাব্দীর গুহায় বসিয়া অষ্টম শতাব্দীর অজন্তার জন্ম হয়, আধুনিক কালিদাস প্রাচীন মেঘদূত লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে অনুকরণের অক্ষমতা আছে কিন্তু সৃষ্টির উদ্বোধনা নাই—সেগুলি ঠিক শিল্প বা সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

বাংলাদেশে নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি সুরু হইয়াছে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে। তাহার পূর্ব্বেকার চল্লিশ বৎসর অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ; ইংরেজী বা সংস্কৃত পদ্ধতিতে বোধোদয়, চারুপাঠ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, অভিধান রচনার যুগ। টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহে তাহার সুরু, মাইকেল, বঙ্কিমে তাহার পুষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথে তাহার পরিণতি। বাংলা দেশে চিত্রশিল্পের অভ্যুদয় অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের। বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের মত কালীঘাটের পট অথবা বটতলার কাঠখোদাই চিত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তারপর বৈদেশিক অনুকরণে অয়েলে ল্যাণ্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট অঙ্কন, রবিবর্ম্মা ধুরন্ধর প্রবর্ত্তিত সভাপোষক চিত্রাবলী—ছবির পুতুল-নাচ, প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত অঙ্কুর নয়।

এই সময়ে বাংলা চিত্রশিল্পের রঙ্গমঞ্চে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং সেইখান হইতেই নবীন প্রাণের সুরু, অঙ্কুরের উদ্গম। অবনীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার অপরূপ কল্পনা এবং লেখনী ও তুলিকায় তাহাকে রূপ দিবার অসাধারণ ভঙ্গী যে কোন বড় কবির কাম্য হইতে পারে। এতখানি কবিত্বশক্তি ছিল বলিয়া তিনি খেয়ালী শিল্পী হইয়া রহিলেন। উপযুক্ত শিষ্য নন্দলাল বসু গুরুর পুঞ্জীভূত সৃষ্টি-খেয়ালের মধ্যে শিল্পসাধনার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন; নূতন ভারতীয় শিল্পকলা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল।

তারপর, অত্যল্পকাল মধ্যে বহু সাধক আসিয়া জুটিলেন; নূতনের আঘাতে জনসাধারণ সন্দেহাকুল, বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইবার পূর্ব্বেই হ্যাভেল সাহেব, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট, কার্জিনস্ সাহেব এবং প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা এমনই জয়নিনাদ তুলিয়া দিলেন যে, প্রকাণ্ড সভায় যাচাই হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইহার মূলে স্বাদেশিকতার দুর্দ্দমনীয় বেগও ছিল, নূতনের মোহও ছিল।

কিন্তু এই হঠাতের হুজোড়ে একটা গোল হইল এই যে, অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ শক্তিসমর্থ তেজীয়ান সাধকের প্রাপ্য

সম্মান ভিড়ের মধ্যে অক্ষম ক্লীব অনুকরণকারীদের মাথারও বর্ষিত হইতে লাগিল ; মাথা-ভারী, দেহ-লক্ষ নূতন শিল্পপদ্ধতি এতখানি পোষ্টাই সহ্য করিতে পারিল না। অবনীন্দ্রনাথ তখন শিল্প-গুরু, তিনি গুরুসুলভ স্নেহে আশীর্বাদ করিতে সুরু করিলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে ক্লীবত্ব, পঙ্গুতা ও অক্ষমতা দেখা দিল, অবনীন্দ্র-নন্দলাল-

মাঠে।

পরবর্তী শিল্পকলাপদ্ধতিতেও তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। মনস্বী টলষ্টয়ের কথায়—

Both were quite lacking in naivete, sincerity, and simplicity and both overflowed with artificiality, forced originality and selfassurance.

কিন্তু সে বিস্তৃত ও স্বতন্ত্র ইতিহাস, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখমাত্র প্রয়োজন। একথা সানন্দে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বহু প্রতিভাশালী শিল্পী এই পদ্ধতিতে শিল্প-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন ও আজিও করিতেছেন এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয়ও এই যে, অত্যল্পকাল মধ্যে বিকৃতিও দেখা দিয়াছে।

এই নূতন পদ্ধতির যখন সূত্রপাত হয় তখনই এক পক্ষের প্রতিবাদ ছিল। তাঁহারা ইতিপূর্বেই পৃথক হইয়া আর্টস্কুলের সম্মুখের ময়দানে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশী ছিলেন না, মোট পাঁচ ছয় জন এবং তাঁহাদের নেতা ছিলেন তদানীন্তন আর্ট স্কুলের বিদ্রোহী মাষ্টার রণদা গুপ্ত মহাশয়।

যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার গুণগান করিতে বসিয়া পশ্চিমের সুদূরব্যাপী সাধনাকে অবজ্ঞা করিতেন রণদাবাবু তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেন। বলিতেন, শিল্পের পূর্বপশ্চিম নাই, শিল্পের বিচার প্রাণ লইয়া, পদ্ধতি লইয়া নয়। ইতালীয় পদ্ধতিতে অথবা জাপানী পদ্ধতিতে বাংলাদেশে বসিয়া যদি কেহ সত্যকার সজীব ছবি আঁকিতে পারে সে-ই চিত্রশিল্পকে সম্মান করিল। রণদাবাবু প্রাণবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির বিকারে যে ধরণের পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তির প্রচার হইতেছে তাহাতে জাতির প্রাণশক্তির অভাব সূচিত হইতেছে এবং এই ধরণের ক্লীব ছবি দেখিতে দেখিতে জাতিও অধিকতর ক্লীবত্ব বরণ করিবে। এই বিশ্বাস তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিত। শোনা যায়, একবার বালীগঞ্জের কোনও বাড়ীর গৃহিণী তাঁহাকে ভারতীয়-চিত্র-শোভিত তাঁহার ঘরগুলি দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া বিদায়কালে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেমন দেখিলেন? রণদাবাবু বলিয়াছিলেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে পড়িয়াছি, পূর্বে রোমের অধিবাসীরা দেখিতে কদাকার ও দুর্বল ছিল। দেখিয়া শুনিয়া তদানীন্তন চিন্তা-শীল কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিল্পী চিত্রে আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সকল চিত্র অনুধ্যান করার

পাড়ি।

ফলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশে স্ত্রীপুরুষের চেহারা ফিরিয়া যায়। এই গল্পটি বলিয়া পরিশেষে তিনি বলেন, তাই ভাবিতেছি, এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের চেহারা ভবিষ্যতে কেমন হইবে! মাস কয়েক পরে পুনরায় সেই বাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া রণদাবাবু দেখিতে পান, ভারতীয় চিত্রগুলি সমুদায় অন্তর্ধান করিয়াছে।

রণদা গুপ্তের স্কুলের নাম ছিল জুবিলি আর্ট একাডেমী। শিল্পী অতুল বসুর শিল্পশিক্ষার পত্তন এইখানে এবং এইখানেই যুক্ত যোগেশ শীল ও হেমেন্দ্র মজুমদার তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

অতুল বসুর বাড়ী বিক্রমপুরে। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বংশের সন্তান তাহা শুধু কল্পনাপ্রবণতের বংশ বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইঁহাদের

অসমঞ্জের মা

কল্পনার উগ্রতা প্রতিবেশীদেরও আলোচনার বিষয় ছিল; বসু-পরিবারের উল্লেখ করিতে হইলে লোকে বলিত বসু-ভট্টাচার্য্য-পরিবার। এই বিশেষণের মধ্যে ইঁহাদের মনের গতির পরিচয় আছে। শিল্পী অতুল বসুও একজন বসু-ভট্টাচার্য্য।

রাজা সুবোধ মল্লিক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন হইতে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালে এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। এবং ১৯১১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সমাপ্ত হইতে না হইতেই চিত্র-শিল্প অনুশীলন করিবার জন্য জুবিলি আর্ট একাডেমীতে রণদা গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত ছাত্র থাকিয়া তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। পার্সি ব্রাউন সাহেব তখন আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী; এই সহকারী পদ হইতে অবনীন্দ্রনাথ তখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে তিনি তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। ক্লাসে ভাল কাজের জন্য তিনি একটি বৃত্তি লাভ করেন ও লেডী কারমাইকেল তাঁহাকে একটি প্রশংসা-পত্র দেন। ১৯১৮ সালে তিনি শেষ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। আর্টস্কুলে স্বর্গীয় যোগেশ শীল, স্বর্গীয় গোকুল নাগ ও শিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনী রায় উপরের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন।

ছাত্রাবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত কাজ করিবার স্বভাব তাঁহার ছিল না। তিনি গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াই, যে প্রতিবাদের সুর জুবিলি আর্ট একাডেমীতে তাঁহার মনে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাকেই একটা বিশিষ্ট রূপ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পক্ষের কথাও, যে-কথা তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহারা বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, জনসাধারণকে শুনাইবার জন্য একটি বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং সেই বৎসরই তাঁহার 'মেঘলা দিনের ছবি' নামক তৈলচিত্রটি অঙ্কিত করেন। প্রতিবাদই এই প্রদর্শনীগুলির উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি তখন হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের শিল্পীদের হাতের কাজ বিক্রয়ের অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের কোন চলতি বাজার নাই; 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া'-গোছ কচিৎ কাহারও এক আধটা ছবি বিক্রয় হইত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই প্রদর্শনীগুলি একটা বাজারও সৃষ্টি করিবে।

আর্টস্কুল পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিল্পী হেমেন মজুমদারের বীডন ষ্ট্রীটস্থ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব আর্ট প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী হন ও তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান আর্ট জার্নাল নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

হয়। শিল্পী যামিনী রায়ের সহিত এইখানেই তাঁহার পরিচয়। যামিনীবাবু আর্টে বর্ণসঙ্করের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং আজিও আছেন। ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে স্বদেশী বিদেশী নানা পদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। তাঁহার এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উত্তরকালে তিনি অর্থকরী শিল্প ছাড়িয়া এদেশীয় পট অঙ্কনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং চরমতম দুর্দশায় পড়িয়াও আদর্শ-বিচ্যুত হন নাই। অতুল বসুর উপর ইঁহার প্রভাব যথেষ্ট।

১৯২১ সালে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি পুনরায় আর্টস্কুলে বাৎসরিক প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন। ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী যথারীতি চলিয়াছিল। ১৯২১ সালেই তিনি তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত তৈলচিত্র 'ধ্বংসস্তূপের ডাক' ও 'আক্কেস হাত' অঙ্কিত করেন, এবং পর বৎসর (১৯২২) তিনি তাঁহার কৃতিত্বের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত বহু প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এই বৎসরেই 'চারকোলে' স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত পোর্ট্রেট 'বাংলার বাঘ' এবং তেলরঙে তদোধিক বিখ্যাত তাঁহার গুণটানার ছবি 'সাথী' অঙ্কিত হয়। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে লণ্ডন রয়্যাল একাডেমী অব আর্টস-এ চিত্র-শিল্প অনুশীলনের জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি প্রদান করেন। সেখানে তিন বৎসর স্যর চার্লস সিমন্স্, মেল্টন ফিসার, মিস ফিলপট, সিকার্ট প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে ইয়োরোপের আর্ট-গ্যালারি ও মিউজিয়মগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন, এবং রয়্যাল একাডেমী অব আর্টস্-এর (স্কুল অব পেন্টিং) প্রশংসা-পত্র ও 'আইভরি' দ্বারা সম্মানিত হন। এই সময়ে তাঁহার এমনই খ্যাতি হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ মিউজিয়মের আর্থার ওয়েলি সাহেবের অনুরোধে ১৯২৪ ২৫ সালের প্রাচ্য শিল্পকলা ও চর্য্যার বাৎসরিক পুঁথিতে (আর্লেষ্ট বেন প্রকাশিত) তিনি শিল্পবিষয়ক বহু পুস্তকের সমালোচনা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ক্লেশকর কয়েক বৎসর। ১৯২৮ সালে তাঁহার প্রিয় বাৎসরিক প্রদর্শনী উঠিয়া যায়। তিনি ১৯২৭ সালে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্-এর তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এবং ১৯২৮ সালে শ্রীযুত মুকুল দের অন্তরঙ্গতাকালে শিক্ষকতা ছাড়িয়া দেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার মন তখন পীড়িত ছিল, তিনি কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহল ছাড়িয়া মজঃফরপুরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাংলোতে কিছুকাল বাস করেন। এই অল্পকাল মধ্যে তিনি এই-বাংলো ও তাঁহার আশে-পাশের স্থানসমূহের ১২টি ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ও গবর্ণমেণ্ট আর্টস্ স্কুলের ফাইন-আর্ট বিভাগের অধ্যক্ষতা গ্রহণ। ১৯৩০ সালে নিউ দিল্লীতে ভাইসরয়েল্ হাউসের জন্য বাকিংহাম প্যালেস ও উইণ্ডসর ক্যাসেল স্থিত ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ও বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞীর পোর্ট্রেট হইতে দুইখানি পোর্ট্রেট আঁকিবার ভার নিখিল-ভারত প্রতিযোগিতায় তিনিই প্রাপ্ত হন। সেখানে থাকিতেই কমাণ্ডার-ইন-চীফের হাউসের জন্য সম্রাজ্ঞীর আর একখানি পোর্ট্রেট আঁকেন ও ১৯৩১ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। লণ্ডনে থাকিতে থাকিতেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পার্সিভাল সাহেব ও স্যর এডউইন লুটিয়েন্স্-এর দুইখানি চিত্র অঙ্কন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি পুনরায় দিল্লীতে ভাইসরয়েল্ হাউসের জন্য ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন ও লেডি উইলিংডনের পোর্ট্রেট অঙ্কনের ভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে দিল্লীর চীফ কমিশনার স্যর জন টমসনেরও পোর্ট্রেট তিনি আঁকেন।

কিন্তু শিল্প-প্রদর্শনীর কথা তিনি ইতিমধ্যে কখনও বিস্মৃত হন নাই। যত দিন যাইতেছিল বাংলার আধুনিক কলাশিল্পে পুরুষোচিত ব্যঞ্জনার অভাব ততই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। ইয়োরোপীয় চিত্র-শিল্পের ধারাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া একান্ত ভাবে ভারতীয় পদ্ধতির অনুসরণ করা যে সুফলপ্রদ হয় নাই তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে তিনি ১৯৩৩ সালে আবার প্রদর্শনী খুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের সাহায্য এইবারে তিনি পান নাই। মহারাজা স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সহায়তায় ও উৎসাহে তিনি ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে কলিকাতা মিউজিয়মে একাডেমী

অব ফাইন আর্টস নাম দিয়া এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ও বিশেষভাবে এই প্রদর্শনীর জন্য তাঁহার সুবিখ্যাত 'আমরা তিনজন' ছবিটি অঙ্কিত করেন। এই প্রদর্শনী দেখিয়া শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোথাও এমন সাফল্যমণ্ডিত প্রদর্শনী হয় নাই। এই প্রদর্শনীর বিষয়ে আমরা পরবর্ত্তী বৈশাখ সংখ্যায় লিখিব। প্রদর্শনী বসিবার ঠিক আগে তিনি দার্জ্জিলিং গিয়া সেখানকার পাহাড় ও কুয়াশার কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করেন।

সন তারিখের দিক দিয়া ইহাই শিল্পী অতুল বসুর ক্রম-বিকাশের ইতিহাস। শিল্পীর পিছনে যে অসাধারণ ব্যক্তিটি তাহার স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। এই ব্যক্তিটি চঞ্চল, মুহুর্মুহু আত্ম বিস্মরণের দ্বারা পীড়িত, কথা দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার আগ্রহে অধীর। অনুভূতিময় বৈরাগ্যের দ্বারা স্নিগ্ধ, হৃদয়বান, সকল পুরুষ। তাঁহার চিন্তা তাঁহাকে সব সময় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাঁহার দূরগামী দৃষ্টি নিকটের বাধায় প্রতিহত হইয়া তাঁহার চারিদিকে এমন একটা ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি ভাসিয়া পড়িয়াছেন, এই বিবাগী হইয়া গেলেন বুঝি! তখনই বন্ধু-হট্টাচার্য্য কণ্ঠের উগ্রতা তাঁহাকে ঠেলা মারে। তিনি উত্তেজিত হইয়া আপনার আদর্শের কথা শোনান। ছবি আঁকিতে বসেন, রঙের আবরণে আত্মগোপন করিতে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলেন।

তাঁহার আদর্শ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের আদর্শ; রাফায়েল ও ক্লীওনের তরফ হইতে তাহা বিদ্রোহের আদর্শ। এই আদর্শ অনুশীলনে তাঁহার দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন। শিল্পী যামিনী রায় ও সতীশ সিংহ মহাশয়। বন্ধু মহাশয়ের ষ্টুডিও-গৃহে এই তিনজনকে নিভৃতে বসিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে উত্তেজিত, উৎফুল্ল ও হতাশ হইতে দেখিয়াছি। শিল্পী দুইয়াও ইঁহারা দেশকে ভালবাসেন। দেশের মানুষকে সবল সুস্থ দেখিতে চান।

তাঁহার ষ্টুডিওতে পরদা-ঢাকা কাচের জানালাপথে পড়ন্ত বেলার আলোক বিমিত হইয়া আসিয়াছে, ভাবব্যাকুল কণ্ঠে নিজের সাধনার ইতিহাসের কথা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘাড় কোঁচকাইয়া বিষণ্ণ ম্লান মুখে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আর থাক্, কি হবে! পৌরুষব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর কিন্তু কান্নার মত শোনাইল, পরক্ষণেই তিনি হো-হো করিয়া শিশুর মত হাসিয়া উঠিলেন, তখনই আমার মনে পড়িল 'হুইসলার দি ম্যানে'র কথা—

For mark you! behind that quaint screen there wrought and toiled in splendid labour, the sensitive soul of one of the greatest artists of which the English race has been delivered.

He knew it.

The suffering that comes to a man of genius who is giving of his magnificence to a blind generation was his. And with the bitterness of years of hate and obloquy in his heart, and stung by the injustice of it all, he grasped that what the world would not see he could whip it into seeing—so he whipped it.

(যথার্থরূপের ডাকই বটে।)

অতুল বসুর প্রত্যেকটি ছবি লইয়া স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ আছে। আমরা দুইখানি রঙীন ও কয়েকটি রঙীন ছবির একরঙা প্রতিলিপি এইবার প্রকাশ করিলাম এবং ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি রঙীন ও একরঙা ছবির সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইব।

চিত্রগুলি দেখিবার পূর্ব্বে চিত্রকরকে আমাদের কল্পনায় দেখিতে হইবে। রঙ ও তুলি লইয়া তিনি বসিয়া আছেন, প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের দেহে যেখানে বিস্ময়কর যাহা কিছু আছে তাহাকেই সম্মুখে রাখিয়া তিনি ছবি আঁকিতেছেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না যে, সম্মুখে মূক প্রকৃতি একটা কিছু বলিবার আগ্রহে ব্যাকুল—জড় নয়; সম্মুখের অনড় মুখখানা ক্যানভাসের উপর নিতান্ত ফ্ল্যাট ভাবে পড়িলেও তাহা হাসিতে পারে, কাঁদিতে পারে, নিঃশ্বাস লয় এবং অনুভব করে, এই সংবাদ তুলির সাহায্যে শিল্পী প্রচার করিতেছেন। এবং সেই বাণী 'পাঁচ নকলে আসল খাস্তা' এই ছকে তোলা ছবিগুলিতেও আমরা শুনিতে পাইতেছি।

অতুল বাবু সম্প্রতি অত্যন্ত নরম (soft) তেলরঙ ব্যবহার করেন, এই টেকনিক তাঁহার নিজস্ব। প্রথম দৃষ্টিতেই ছবিগুলি একটু জোরে কথা বলে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ দেখিলে বিশ্বাস হয় তাহারা অনেক কথা কানে কানে বলিতেছে। সেইখানেই অতুল বসুর বিশেষত্ব।

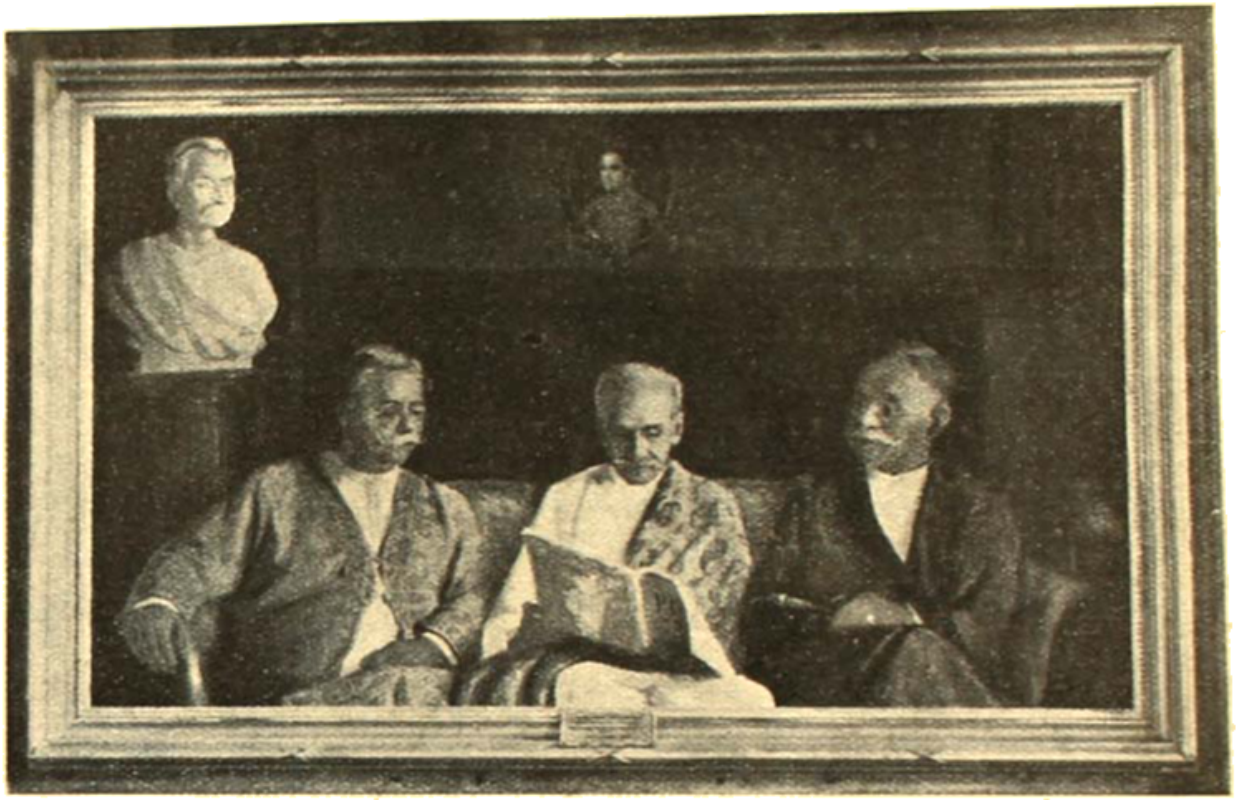

কবীর-পন্থা

—স্বামী ভূমানন্দ

মহাত্মা কবীর সাহেব একজন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে যে সাধন-প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই "কবীর-পন্থা" নামে পরিচিত এবং যে সমস্ত লোক সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগকে "কবীর-পন্থী" বলে। কেহ কেহ বলেন, কবীর মুসলমান ছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি হিন্দু ছিলেন কিন্তু বাল্যকাল হইতে এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কবীর ও তাঁহার সাধনমার্গ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিতে গেলে, একমাত্র তাঁহার স্বরচিত দোঁহাগুলিকেই আশ্রয় করিতে হয়। দোঁহাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহার যাবতীয় বাণী সাধনা সম্বন্ধেই উক্ত। কোনও দোঁহাতেই তিনি নিজের কোনও বিশেষ পরিচয় দেন নাই। কবীর আত্মজ্ঞানী ছিলেন; কাজেই জাতি কুল প্রভৃতি কাল্পনিক সংস্কার তাঁহার জ্ঞানে স্থানই পায় নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন—

কবীর সোংপরা আত্মা রামকা

অর্থাৎ কবীর আত্মা-রামের পুত্র।

তিনি হিন্দুগুরু রামানন্দের শিষ্য ছিলেন ও ৺কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এই পরিচয়মাত্র তাঁহার দোঁহাতে পাওয়া যায়—

(ক) ভক্তি দিলাওন উপজি লায়ে রামানন্দ

(খ) কাশীমে হম্ প্রগট ভয়ে হৌ, রামানন্দ চিতায়ে

কবীর হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, নিজের জ্ঞান সাধারণের মধ্যে বিস্তারের সময়, তাহা কোনও জাতিগত গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই তিনি শিষ্য করিয়াছিলেন ও উভয়কেই সমান চক্ষেই দেখিতেন। কবীর সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি দেহত্যাগ করিলে, ঐ দেহ কি ভাবে সংকার করা হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ হয়। হিন্দু শিষ্যগণ ঐ দেহ দাহ করিতে চাহেন, মুসলমান শিষ্যেরা চাহেন ঐ দেহ কবরস্থ করিতে। ক্রমে উভয়পক্ষে বিবাদ আরম্ভ হইলে, কবীরের মৃতদেহ উভয় দলকে সম্বোধন করিয়া বলে, "তোমরা কলহ করিও না, আমার দেহাবশেষের নিম্নে তোমরা যাহা পাইবে তাহা উভয়ে বণ্টন করিয়া লইও।" কিছুক্ষণ পরে বস্ত্র উত্তোলন করিয়া দেখা গেল, বস্ত্রের নিম্নে কতকগুলি মালতী (চামেলী) পুষ্প রহিয়াছে, দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক এই ভাবেরই একটি প্রবাদ নানক সাহেব সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে।

২। কেহ কেহ বলেন, কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার দোঁহাগুলি যেরূপ ললিতা ও পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ, তাহাতে তাঁহাকে নিরক্ষর বলিয়া মনে হয় না। শ্রুতিবাক্যের আলোচনা, এমন কি বেদের "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যও তাঁহার দোঁহাতে দেখা যায়—

হৎ পদ ত্বম্ পদ ঔর অসিপদ

কমলাপতি পহিচানে

অর্থাৎ একমাত্র "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যই সেই অলক্ষ্যকে প্রকাশ করিতেছে। কবীর তাঁহার সাঁই অর্থাৎ স্বামী বা আত্মাকে সত্ত্ব-রজ-তম গুণের অতীত, পঞ্চকোষাত্ম দেহাতীত, জগদ্রহস্যকপাতীত, পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত, জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অতীত, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা পরিষ্কারই বুঝা যায়, কবীর কখনও মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু তিনি শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, এ কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

পুরান কোরাণ দস্ বাত হৈ, যা পঢ়ৈ পরম্পদ পাবৈ

অর্থাৎ পুরাণ ও কোরাণের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল শব্দই আছে।

৩। কবীর কি প্রণালীতে সাধন করিয়া আত্মজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার দোঁহাতেই পাওয়া যায়, তবে অনেকস্থলে সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে ও সেই সাধন-প্রণালী জানা না থাকিলে, তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না। কবীর কোনও দেবদেবীর উপাসনা করিতেন না এবং তাঁহার উপদেশ কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দোষে কলঙ্কিত নয়। তিনি বলিয়াছেন—

(ক) হিন্দু কহত রাম হামারা, মুসলমান রহিমানা
আপস মে দো লড়ে মরত হৈ, মরম কোই না জানা

অর্থাৎ হিন্দু বলেন, আমার রামই ঈশ্বর ; মুসলমান বলেন, আমার রহিমই ঈশ্বর। ইহা লইয়া পরস্পরে মারামারি করেন অথচ মর্মকথা কেহই জানেন না।

(খ) ছবিয়া কর দূর পীতমকো ধ্যাইয়ে
আন্ দেবকী সেব্ ন চিত্ত লাগাইয়ে।
আন্ দেবকী সেব্ ভলী নহিঁ হোকরা
কহৈ কবীর কিয়ে, ন পাবৈ পীব্‌কো।

অর্থাৎ বিধাকে দূর করিয়া প্রিয়তমকে ধ্যান কর ; অন্য দেবতার সেবায় চিত্ত লাগাইও না। অন্য দেবতার সেবায় জীবের মঙ্গল নাই ; কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, তাহা হইলে প্রিয়তমকে পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন—

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ, ঔর মুলুক কেহিকেরা
তীরথ মুরত রামনিবাসী, বাহর ভিতর কো দেখা

অর্থাৎ খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন, তবে আর সব মুলুক কাহার? তীর্থে মূর্তিতে যদি রাম বাস করেন, তবে বাহির দেখে কে? অনেক দোঁহাতে দেখা যায় তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন—

হিন্দু তুর্কন্হি কিতকে, সমঝ লেহু হামারা

অর্থাৎ হে হিন্দু, হে মুসলমান, তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বচন মানিয়া লও। দোঁহাগুলির মধ্যে "রাম" শব্দের প্রয়োগবাহুল্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন কবীর রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল, তবে তিনি তাঁহার সেই ব্রহ্মকে, সাহেব, ঈশ্বর, সাঁই, রাম, হরি, পিউ (প্রিয়), পীতম্ (প্রিয়তম), মুরারী, নিরঞ্জন, অলখ (অলক্ষ্য), কর্তা প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার রাম দশরথাত্মজ নহেন, তাঁহার রাম ওঁকারস্বরূপ, বা শব্দ-স্বরূপ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

সব ঘটমেঁ রাম হায়।

তাঁহার জ্ঞানে সবই এক। তাই তিনি বলিয়াছেন—

রাম খোদা সিব শক্তি এক

ব্রহ্মজ্ঞানলাভই যে তাঁহার সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

(ক) জীবত ব্রহ্মকো কোই ন পূজৈ,
মুরদা কো মেহমাণী

(খ) জগ পতীয়া মরে কবীরা
পূজত নহি হামারে

অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় জীবন্ত ব্রহ্মকে কেহই পূজা করে না। সকলেই মৃত দেবতাকে আদর করে। গভীর রাগিণীতে কবীর বলিতেছেন, "সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত কর।" কবীর বলিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্ম স্বকীয় অনুভূতিগম্য ; দেবতাদির প্রতিমা-পূজা, তীর্থস্নান অথবা শাস্ত্রাদিপাঠে তাঁহাকে লাভ করা যায় না—

তীরথমে তো সব পানী হৈ, তোরে নাহি দূজ, অন্নাস দেখা
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ, বোলে নহিঁ বোলায় দেখা
পুরাণ কোরাণ সব বাত হৈ, যা ঘটকা পরদা খোল দেখা
অনুভূতিকা বাত কবীর কহৈ, জ্ঞান সব হৈ বুদ্ধি পোল দেখা।

অর্থাৎ তীর্থে ত কেবল জলই আছে। আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও ফল নাই। প্রতিমাগুলি ত জড় ; আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি তাহারা কোনও কথাই বলে না। পুরাণ কোরাণ ত সব কথা ; আমি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি। কবীর যাহার কথা বলিতেছে তাহা অনুভূতিগম্য ; আর সবই অন্তঃসারবিহীন তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। উপনিষদেও দেখি ব্রহ্মকে অনুভূতিময় বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে—

অনুভূতিমাত্রং তত্ত্বং সাক্ষাৎ ব্রহ্মেতি কথ্যতে।

৪। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া কবীর সেই স্বরূপকে যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত উপনিষদাদির বর্ণনার কোনও প্রভেদ নাই। কবীর বলিয়াছেন—

(ক) কবীর সাঁই মেরে এক হৈ, দুজা আওর ন কোই

অর্থাৎ একমাত্র আমার স্বামীই আছেন ; দ্বিতীয় আর কিছুই নাই।

(খ) হম তো একহী কহ জানো
যেহ কহৈ সোভি ঝুঠিকো ঝুঠি হৈ

আমি ত জানি কেবল একেরই সত্তা আছে। যে বলে দুই আছে তাহার মিথ্যা আছে।

(গ) প্রথম এক যো আপৈ আপ

প্রথমে সেই এক আপনাতেই আপনি ছিলেন। ইহাই উপনিষদের "সদেব সৌম্য ইদমগ্রমাসীৎ", "যে মহিমি প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি।

(ঘ) কবীর যো তুঁহি একল জানিয়া, তো সব দি আদ ভরান
যো তুঁহি একহি জানিয়া, তো সব অজ্ঞান ভুলান।

যিনি সেই একতত্ত্ব জানেন না, তাঁহার যাহা কিছু জানা আছে সবই অজ্ঞানতার মধ্যে, আর যিনি সেই অদ্বৈত তত্ত্ব জানেন, তাঁহার সবই জানা হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতেও দেখি—

একস্থং দর্শনং চাস্য, বদাজ্ঞানাদসম্ভবম্।

শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

যস্য জ্ঞানং নাস্তি ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ত্বেনেতরাদ্বয়াৎ।

(৬) বিনু বিদ্ জানা এক সোঁ, ভিন্ন দুখ পাবা বিন।

যাঁহার মন একতত্ত্বে বাঁধা আছে, তিনি নিত্যই আনন্দ উপভোগ করেন, জগতে যে বহুত্বের জ্ঞান জন্মে, তাহা স্বরূপতঃ বহু নহে, একই বহুরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। এই উপদেশ কবীর অতি সুন্দর ভাবে দিয়াছেন—

(ক) এক আপ সব মাহীঁ
দুজা কহন্ হৈ কুকুন, দেখা সবনহি মাহীঁ
জল তরঙ্গ জিমি জলতে উপজৈ, ফির জল মাহি সমাই।

অর্থাৎ এক আত্মাই সকলের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু ভ্রম বশতঃই পার্থক্য-জ্ঞান হইতেছে। যেমন বহুদর্পণে একেরই প্রতিবিম্ব বহু বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ একই আত্মা আধার-ভেদে ভ্রান্তিতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেমন তরঙ্গ জল হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার জলেই মিশিয়া যায়, (অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক বস্তু নয়) জগতেরও সেইরূপ ভ্রান্তিতে পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হইলেও, স্বরূপতঃ ইহার ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই।

(খ) দরিয়াকি লহর দরিয়াহ্ হৈ জী
দরিয়া ঔর লহরমেঁ ভিন্ন কোন্
ছঠে সো নীর হৈ, বৈঠে সো নীর হৈ
কহা জী ডুবা কিস্ তরহ হোন্।
টসা জা কেরকে বাদ লহর ধরা
লহর কে কহে কা নীর খোন্?

অর্থাৎ নদী ও নদীর তরঙ্গ একই; নদী ও তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তরঙ্গ উঠিলেও জল, পড়িয়া মিশিয়া গেলেও সেই জলই, ভিন্ন হইবে কেমন করিয়া? "তরঙ্গ" নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই কি নামের খাতিরে উহা জল হইতে ভিন্ন? বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদানকালে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

যঃ কশ্চো ঘট চন্দ্রিকা সো ঔচিন্তস্যেক:।
ত্ত হেমো ঘট চ লহরী তৎ জলা বারি বারিণি।

অর্থাৎ কলা, কলিকা, বীচি, তরঙ্গ, ফেন, লহরী প্রভৃতি সমস্তই যেমন জলেই জল, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বিকাশ; তবে অজ্ঞতাবশতঃ যে ভেদ বোধ হইতেছে তাহা "নামতঃ ন তু বস্তুতঃ"। রামপ্রসাদও গাহিয়া গিয়াছেন—

যেমন জলের বিম্ব জলে উঠে জল হ'য়ে সে মিশায় জলে

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

জোয়ে রবনি পুনু জোয়ে সমাহত
সোয়া লহরী সমনা।

৪। আত্মা সর্ব্বময় হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি না জন্মে, ততক্ষণ এই বিশ্বকে ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তিতে বোধ হয়, কাজেই তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা। কবীর তাই বলিয়াছেন—

জগত্ জনে বিনা জল বুঁটা

আত্মা সর্ব্বদেহেই চৈতন্যস্বরূপে বিরাজমান, কাজেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই; নিজের দেহেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। দেহ চিৎ ও জড়ের সমাবেশ। দেহ হইতে চিৎ বা চৈতন্যকে পৃথক করিয়া অনুভব করিতে পারিলেই স্বরূপজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মহর্ষি অষ্টাবক্র তাই জনককে বলিয়াছেন—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি।

উপনিষদাদিতেও দেখিতে পাই—"শাঙ্করীরাদুপলভেত এনম্" অর্থাৎ এই শরীর হইতেই সেই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে। কবীরও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন—

ঘর মেঁ বস্তু নজর নহি আবত

অর্থাৎ ঘরেই সেই বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু নজর পড়িতেছে না। উপমাচ্ছলে কবীর বলিয়াছেন—

মৃগা পাস কস্তুরী বাস্, আপ না খোজৈ, খোজৈ ঘাস

কস্তুরীর সুগন্ধ মৃগের নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, অথচ সে তাহার অনুসন্ধান করে না, ঘাস খুঁজিয়া বেড়ায়। তুলসী দাসেরও ঠিক এই ভাবের দোঁহা আছে—

সবকি ঘটমেঁ হরি রহৈ পহচান নো বেহি কোয়
বাহীকে দুখত দূর নহি জাবত চুঁড়ত ডাকুল হোয়।
চিদানন্দ ঘটমে বসৈ মুখত ঢাঁপা নিবাস
সো মুখমে মৃগনাভীমে চুঁড়ত ফিরত উদাস।

কবীর আরও বলিয়াছেন—

(ক) ঘট ঘট মে সাঁই রমতা

ঘটে ঘটে অর্থাৎ প্রতি দেহে সেই একই স্বামী আনন্দ করিতেছেন।

(খ) কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, অবর সাহব লখ ঘটমে

কবীর কহেন, শোন ভাই সাধু, লক্ষ্য করিয়া দেখ, স্বামী দেহের মধ্যেই বিরাজমান।

(গ) কহৈ কবীর তাহি পদ পরসো ঘট ঘট লহ সুখরাসী

কবীর বলিতেছেন, তাঁহারই চরণ স্পর্শ কর, তিনি ঘটে ঘটে সর্ব্ববিধ আনন্দ বিধান করিতেছেন।

(ঘ) কবীর খিজরো ঢুঁড়ে বীজকো, বীজবীচ কে পাঁহি
খিজরো ঢুঁড়ে ব্রহ্ম কো, ব্রহ্ম খিজরকে মাহি।

কবীর বলিতেছেন, বৃক্ষ বীজকে খুঁজিতেছে কিন্তু বীজ বৃক্ষেই রহিয়াছে। এইরূপ সকল জীব ব্রহ্মকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম জীবের মধ্যেই রহিয়াছে।

(ঙ) পানী মাঁহ, জিু মীন পিয়াসী, মোহি সুন্ সুন্ আবত হাসি

মৎস্য জলের ভিতর বাস করিয়া পিপাসায় কষ্ট পাইতেছে; শুনিয়া শুনিয়া আমার হাসি পায়।

৬। এখন প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে দেহস্থ আত্মার উপলব্ধি হয় অর্থাৎ আত্মদর্শন হয়। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

যথা হি কশ্চিৎ পরশুং গৃহীত্বা ঘুনং ন পশ্যেদ্বলবং চ কাষ্ঠে।
তথৈবাত্মানমাত্মস্থং হিত্বা ন পশ্যতি তত্ত্বেন যতিঃ।
তস্যৈব কাষ্ঠস্য তথা বিদ্বং ঘুনং চ পশ্যেদ্বলবং চ যোগাৎ।
তদ্বৎ সুবুদ্ধিঃ সদমিন্দ্রিয়াবৃদ্ধিঃ পশ্যং পশ্যতি তং পরাবরম্।

অর্থাৎ যদি কেহ কুঠার দ্বারা একখণ্ড কাষ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন করে, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরে ঘুন বা অগ্নি যেমন দেখিতে পায় না; সেইরূপ এই দেহ ছিন্নভিন্ন করিলেও, দেহস্থ আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আবার সেই কাষ্ঠকে কৌশলপূর্ব্বক মন্থন করিলে যেমন তাহাতেই ঘুন ও অগ্নি দেখা যায়, সেইরূপ কৌশলপূর্ব্বক এই দেহ মন্থন করিলেও, দেহস্থ আত্মার দর্শন পাওয়া যায়। এই কৌশলেরই অপর নাম যোগ। ভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" জনকও বলিয়াছেন "কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোকাতে।" উপনিষদাদিতে "তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিঃ" প্রভৃতি উদাহরণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিলে তৈল ও দধিতে ঘৃত থাকিলেও যেমন কৌশলপূর্ব্বক নিষ্পেষণ ও মন্থন না করিলে তৈল ও ঘৃত পাওয়া যায় না, সেইরূপ দেহে পরমাত্মা বর্ত্তমান থাকিলেও কৌশল অবলম্বন না করিলে, তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। কবীরও বলিয়াছেন—

পাবক রূপ রহা ঘটহি মেঁ কো যে। জানে জনায়ে

অর্থাৎ অগ্নি কাষ্ঠের সর্ব্বাঙ্গেই আছে, কেহ তাহাকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলে।

যে কৌশল অবলম্বন করিয়া কবীর নিজ দেহেই পরমাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই নাম কবীর-পন্থা। এ পন্থা নূতন নহে। উপনিষদোক্ত সাধনপ্রণালীই কবীরের পন্থা। কবীর তাঁহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত তাঁহার দোঁহাতে দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে তাহার মর্ম্ম বোধ হয় না।

৭। কবীর তাঁহার সাধনপ্রণালী বর্ণনা করিতে অনেক স্থলে "সহজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—

(ক) সাধো সহজ সমাধ ভলী

হে সাধু, সহজ সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

(খ) সহজে হোত, দুখ গ্রাম

সহজ সাধন বা সহজ ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ লাভ হয়।

(গ) কবীর সহজ হি ধুনি লাগি রহে
সো হো এ ঘট মাহি

সহজ ধ্বনি এই শরীরে লাগিয়াই রহিয়াছে।

(ঘ) কবীর গঙ্গ যমুন কে অন্তরে সহজ সুন্ন ঘাট
তাঁহা কবীর মঠ রচো মুনিবর গাবহি ঠাট।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে (ইড়া পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে) সহজ শূন্য ঘাট আছে। কবীর সেইখানেই মঠ রচনা কর। মুনিগণ সর্ব্বদা সেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন।

"সহজ" শব্দের অর্থ, যাহা সঙ্গে জন্মিয়াছে (সহ জায়তে ইতি—সহ—জন+ড)। সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যায় আমাদিগের প্রত্যেকের দেহেই একটি আকর্ষণ বিক্ষেপণাত্মক ক্রিয়া নিত্য বর্ত্তমান। এই ক্রিয়ার ফলে জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে। এই ক্রিয়া দেহের সঙ্গেই জন্মিয়াছে বলিয়া এই ক্রিয়াকে সহজ ক্রিয়া বলে এবং এই ক্রিয়া অবলম্বনে যে সাধন

তাহাকে সহজ সাধন বা সহজ আপাধাম বলে। সহজ সাধন অবলম্বনে যে চরম অবস্থা লাভ হয় কবীর তাহাকে "সহজ-ধাম" আখ্যা দিয়াছেন; ইহাই গীতার "তদ্ধাম পরমং মম"। উপনিষৎ ঐ অবস্থাকে সহজ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

ছর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা।

বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্রিয়া বা স্পন্দন (vibration) যেখানেই আছে, সেখানেই ঐ স্পন্দনানুরূপ একটা শব্দ আছেই। কাজেই আমাদিগের দেহেও যে আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতেও সেই ক্রিয়ামূলক শব্দও আছে। আকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার শব্দ আকর্ষণানুরূপ, বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার শব্দ বিকর্ষণানুরূপ। সহজ ধামে পৌঁছিতে হইলে এই দুই শব্দের মধ্যে আকর্ষণাত্মক ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াই যাইতে হইবে। এই ধ্বনিকেই কবীর "সহজ-ধুনি" বলিয়াছেন। আকর্ষণাত্মক ধ্বনিতে মনের তন্ময়তা জন্মিলে, যে অবস্থায় বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার লোপ বা নিরোধ হয়, সেই অবস্থাকেই কবীর "সহজ-সমাধি" অর্থাৎ সহজ সমাধি বলিয়াছেন। কবীর বলিয়াছেন, এই অবস্থায়ই প্রকৃত প্রেম জন্মে—

কবীর দিন পড়ে দিন উদয়ে, সোতা প্রেম না হোয়
আঠ প্রহর লাগা রহে, প্রেম কহাওয়ে সোয়।

অর্থাৎ যাহা একবার উঠে, একবার পড়ে তাহাকে প্রেম বলা যায় না। অষ্টপ্রহর লাগিয়া থাকিলে অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অভাব হইয়া নিরোধ অবস্থা হইলে, তাহাকেই প্রকৃত প্রেম কহা যায়; এই প্রেমেরই অপর নাম সমাধি। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসও সহজ-সাধন সম্বন্ধে অনেক সঙ্কেত তাঁহার পদাবলীতে দিয়াছেন এবং এই সাধন অবলম্বনে যাঁহাকে লাভ করা যায়, তাঁহাকে "সহজ মানুষ" বলিয়াছেন—

সহজ মানুষ নিজের দেশে

কিন্তু অজ্ঞানান্ধকার পার হইতে না পারিলে সেই সহজ মানুষের দর্শন পাওয়া যায় না, তাই তিনি বলিয়াছেন—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে
তিমিরান্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে।

কবীর সাহেবেরও এই ভাবের দোঁহা আছে—

প্রেম প্রেম সবই কহে, প্রেম না জানে কোই

৮। কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সাধন করিলে সহজাবস্থা লাভ হয় ও আত্মদর্শন হয় তাহার ইঙ্গিত কবীর সাহেব ও অন্যান্য সাধকগণ দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সাধন গুরুগম্য ও সেই সাধনের চরম ফল দীর্ঘ-অভ্যাসলভ্য ও স্বানুভূতিসাপেক্ষ। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বাভাবিক আকর্ষণ ক্রিয়ামূলে আমাদিগের শ্বাস ও স্বাভাবিক বিকর্ষণ ক্রিয়ামূলে প্রশ্বাস চলিতেছে। একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই শ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত আকর্ষণাত্মক ও বিকর্ষণাত্মক দুইটি পৃথক শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। কবীর অনেকস্থলে বলিয়াছেন, এই আকর্ষণাত্মক শব্দ অর্থাৎ শ্বাসের শব্দ ধরিতে পারিলেই, যাঁহা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি ও যাঁহাতে ইহার লয় হইতেছে তাঁহাকে ধরা যাইবে—

(ক) মো কো কাঁহা ঢুঁঢ়ো বন্দে, মৈতো তেরে পাসমেঁ
কহৈঁ কবীর সুন ভাই সাধো, সব শ্বাসো কি শ্বাসমেঁ।

হে সেবক, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছ; আমি ত তোমার নিকটেই আছি। আমি ত সকলের নিঃশ্বাসের মধ্যেই রহিয়াছি।

(খ) নির্মল নীর জরৈ, তেরে আগে
পিবে খাঁসো খাঁসা

নির্মল জল তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে; তুমি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পান করিয়া লও।

(গ) অনহদকার গুরু মত আঁস
খাঁস শব্দ একলাস

তিনি অন্তহীন শূন্য, আকাশস্বরূপ; তিনি শ্বাসের শব্দ; তিনিই অর্থ।

(ঘ) শ্বাস প্রশ্বাস মুখিল করো
আওর উপায় নহি কাই

প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁহার স্মরণ কর; অন্য উপায় নাই।

(ঙ) খাঁস উসাঁস কো প্রেম পত্রী লিখা

আমি শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রেমপত্র পান করিয়াছি।

৯। স্থিরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অনুসরণ করিলে পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদিগের নিশ্বাসের সহিত যখন বাহ্য বায়ু নাসিকার ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়, তাহা একটা অস্পষ্ট ওঁকারানুরূপ শব্দ হয়। কবীর এই শব্দকেই ধুনি, শব্দ, সুর, ওঁকার, হংকার, গীত, বাণী, বাজনা প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দে অভিহিত করিয়াছেন—

(ক) সাধো শব্দ সাধনা কীজে

হে সাধু শব্দের সাধনা কর।

(খ) বিনু সাদন অই মা চৌ গীত

সেখানে বিনা গানে গীত উঠিতেছে।

(গ) সার শব্দসোঁ মুরত লগাই

আমি এখন সার শব্দেতে সুর লাগাইয়াছি, অর্থাৎ একমাত্র ওঁকারে তন্ময় হইয়া আছে।

(ঘ) সংসৈই ধুনি লাগিরহে, কহৈ কবীর বিচার

কবীর বিচার করিয়া বলিতেছেন, ঐ ধ্বনি আপনা আপনিই লাগিয়া আছে।

(ঙ) শরীর মহলমেঁ বাজা বাজে

ছোত ছত্তীসোঁ রাগ

আমার শরীরমহলে সেই বাদ্য বাজিতেছে ও তাহাতে ছত্রিশ রাগিণীই ঝঙ্কৃত হইতেছে।

(চ) শংখ ঘণ্টা সুনাই ঘরে

সোভা সিন্ধ মহলমেঁ

সিদ্ধমহলে কি শোভা। সেখানে শঙ্খ, ঘণ্টা, সানাই বাজিতেছে।

(ছ) সতপুরে নৌবত বাজি

সত্যপুরে নহবত বাজিতেছে।

উপরোক্ত শব্দগুলির দ্বারা অনুমান করা যায় না, কবীর সাহেবের সাধনার প্রকৃত শব্দটি কি। কিন্তু তিনি ঐ শব্দের অপর দুইটি শাস্ত্রসম্মত নাম দিয়াছেন, যাহাদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে বুঝা যায়, তিনি কোন্ শব্দ বা মন্ত্রের সাধনা করিয়া স্বদেহেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন। শব্দ দুইটির একটি "অনহদ" (অনাহত), অপরটি "অজপা"—

(ক) এহি ঘট ভীতৈ অনহদ তুর

আমার এই দেহের মধ্যেই অনাহত তূরী বাজিতেছে।

(খ) অনহদ ঘণ্টা বাজৈ মৃদংগ

আমার মধ্যেই অনাহত ঘণ্টা ও মৃদঙ্গ বাজিতেছে।

(গ) অনহদ বাজে ঝংকৈ মধুর ধুন,

জিনু করতাল তমুরা

করতাল ও তানপুরা বাদ্যিকেকেই মধুর অনাহত ধ্বনি বাজিতেছে।

(ঘ) উঠত ধুনকার তহঁ নাদ অনহদ পূরৈ

সেখানে অনাহত ধ্বনির ঝঙ্কার উঠিতেছে।

(ঙ) কবীর অজপা সুমিরন ঘট ভীতর

দেহের মধ্যে অজপার স্মরণ (ধ্যান) কর।

(চ) কবীর অজপা সুমিরন হোৎ হাত পগ রসনা অনমান

কর জিহ্বা তাঁহা না চলে, মন পহুচ তাঁহা যান।

অজপা ধ্যানে মূলমণ্ডলে অবস্থান হয়। কর ও জিহ্বা সেখানে যাইতে পারে না। মনও পঙ্গুর ন্যায় সেখানে যাইতে পারে না। অর্থাৎ অজপা ধারণা করিতে কর ও জিহ্বার প্রয়োজন হয় না এবং ক্রমে ধারণাভ্যাসে মনের লয় হয়।

জিহ্বা, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু, দন্ত প্রভৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতিরেকে ঐ শব্দ স্বভাবতঃই হইতেছে বলিয়া উহার নাম "অনাহত", তন্ত্রবিশেষে উহাকে "অকৃতবাদ" বলা হইয়াছে; এবং কর, জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে ঐ মন্ত্র জপ করা যায় না বলিয়াই উহার নাম "অজপা"। তন্ত্র বলেন—

জানবন্তস্ত মন্ত্রস্ত জপমাত্রং ন বিদ্যতে।
অজপা তেন বিখ্যাতা বিভক্তিসমন্বিতা।

এই মন্ত্রেরই প্রাণমন্ত্র, হংসমন্ত্র, মূলমন্ত্র, আত্মমন্ত্র, ব্রহ্মমন্ত্র প্রভৃতি বহুনাম শাস্ত্রে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাসযোগে এই মন্ত্র ধারণা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাণমন্ত্র, আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক হং ও সঃ এই দুই শব্দযোগে উহার উৎপত্তি বলিয়া উহাকে হংসমন্ত্র বলে। মূলাধার হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বমন্ত্রের মূলস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম মূলমন্ত্র ও এই মন্ত্রসাধনে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া ইহার নাম আত্মমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র। উপনিষৎ তন্ত্র ও পুরাণাদিতে এই মন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়—

(ক) অনাহতস্ত যচ্ছব্দস্তস্ত শব্দস্ত যৎ পরম্।
তৎ পরং বিন্দতে যস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ।
(খ) স-কারেণ বহির্যাতি হ-কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
(গ) অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা।
অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
(ঘ) মূলাধং সর্ব্বমন্ত্রাণাং মূলাধারসমুদ্ভবাং।
মূলমন্ত্রশিরস্কাদ্যা মন্ত্র ইতি স্মৃতঃ।
(ঙ) আত্মসংজ্ঞস্তু হংসস্ত পরমাত্মস্বরূপতাং।
যোগিনঃ সঞ্চরন্ত্যাশু অজপা তত্ত উচ্যতে।

রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, নানক প্রভৃতি সাধকগণও এই অজপা মন্ত্র সাধন দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং

কবীরের ন্যায় তাঁহারাও তাঁহাদিগের পদাবলীতে এই মন্ত্রের আভাস দিয়া গিয়াছেন—

(ক) হংস বসি পুরুষে হর ম বর্ণ বেচকে কল
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে—রামপ্রসাদ

(খ) কুলের কুলকুণ্ডলী

(গ) মূল চক্র হয় হংস খেলের আজ্ঞা

(ঘ) অজপা নামেতে মন্ত্র জপয়ে সকল লোক—চণ্ডীদাস

(ঙ) অবপন ঘাসী পাইয়ে তহ খেলে হোই নিরাস
(চ) অহর্নিশি বলি প্রেম শিব লাগি, } নানক
সবদ অবাহত বাজিয়া

তন্ত্রবিশেষে এই হংসমন্ত্রকে সোঽহং মন্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কবীরের দোঁহাতেও সোঽহং শব্দের উল্লেখ আছে—

হঁ যা ঘর কা মূল হয়ে মৈঁ
আয়ে সোঽহং বাস

১১। এই অজপামন্ত্র অভ্যাসবলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক আত্মজ্যোতি দর্শন করেন। সেই জ্যোতি কেমন উপনিষদ তাহা বর্ণনা করিতে না পারিয়া কেবল মাত্র বলিয়াছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

কবীর সাহেবও সেই ব্রহ্মজ্যোতি অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

(ক) কোটিন সূর হল ছিপ মৈঁ
এক রোম উজিয়ারা

তাঁহার এক লোমের উজ্জ্বলতায় কোটি সূর্য্য চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

(খ) ঘর ঘর দীপক বরৈ, নহিঁ অন্ধ তৈ
লখত লখত লখি পরৈ, কটৈ জম ফন্দ তৈ

ঘরে ঘরে (প্রতিদেহে) দীপ জ্বলিতেছে; তুমি অন্ধ তাই দেখিতে পাইতেছ না। লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ একদিন যেই দেখিবে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর পাশ কাটিয়া যাইবে।

(গ) সুখ দুখ উঠৈ দুয়, যেহি আসৈ: দরসন আঠো যাম
সুখৈ ওঢ়ন সুখৈ আসন, সুখৈকা সিরহান।

সেখানে সুখদুঃখ কিছুই নাই, অষ্ট প্রহর সেখানে ব্রহ্মদর্শন। সেখানে জ্যোতিই বসন, জ্যোতিই আসন, জ্যোতিই পাগড়ী।

ওহি দেসমে নিত পূর্নিমা, কবহুঁ ন হোয় অন্ধে।
এক সূরজকে কোন বখানৈ, কোটিন সূরজ উজেঁ।

সেই দেশে নিত্য পূর্ণিমা, কখনও সেখানে অন্ধকার হয় না। এক সূর্য্যের কোন্ কথা, কোটি সূর্য্যের প্রভায় সেই ধাম সমুজ্জ্বল।

সাধক-প্রণীত গ্রাম্য সঙ্গীতেও ঠিক এই ভাবের কথা পাওয়া যায়—

সে যে আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবা রাতি নাই সেখানে।

১২। সাধনমার্গে যেমন জ্যোতি-দর্শন হয়, সেইরূপ নানাবিধ শব্দও শ্রুতিগোচর হয়, উহাকে "নাদ" বলে। কবীর এবম্বিধ নাদ শ্রবণ করিয়া যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার কতকগুলি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হংসমন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে যে সকল নাদ অনুভূত হয়, তাহা শাস্ত্রেও বিবৃত আছে—

নাদঃ সপ্তপ্রকারে তত্র ক্রমাদভ্যাসতঃ শৃণেৎ।
মহতস্তদ্বদেবাদ্যস্তদ্বৎ প্রথমো ধ্বনিঃ।
দীর্ঘাকাংস্তাদিলপূর্বিংশঘণ্টিনিনিতোপমঃ।
ঘণ্টাকারঃ পশ্চাদ্ঘনঘনঘোষোপমঃ।
এবমভ্যাসতঃ পুংসঃ সংসাক্ষাদ্ভবেন্নাদবান্।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্য হংসমন্ত্রপ্রবোধনম্।

১৩। সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত মার্গে এই অজপা মন্ত্র অভ্যাস করিলে প্রত্যেক সাধকেই জ্যোতিদর্শন, নাদশ্রবণ ও অবশেষে অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হইবেই হইবে। মনুষ্যমাত্রেই এই সাধনার অধিকারী। কারণ, প্রত্যেক দেহেই আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়া বর্ত্তমান, এবং এই ক্রিয়া অবলম্বনেই সাধন। কাজেই এই সাধনা কোনও সম্প্রদায়গত নহে; হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, অথবা অন্য যে কোনও জাতি হউক না কেন, সকলেই এই ক্রিয়া অবলম্বনে একই প্রকার ফল লাভ করিবে। এই জন্যই কবীর সাহেব এই সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই ইহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই সাধনার দ্বারা শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ প্রণবে লয় হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম লয়যোগ, হংসমন্ত্র অবলম্বনে এই সাধনা করিতে হয় বলিয়া উপনিষদে এই সাধনাকে "হংস-যোগ"ও বলা হইয়াছে—

একমেবং দ্বয়াকারং হংস-যোগবিধানতঃ।
ন দ্বয়াতে কর্ম্মণাচাপি পাপাকাশৈর্নরৈরপি॥

উপনিষৎ এই হংসমন্ত্রকে প্রণব হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন—"হংস-প্রণবয়োরভেদঃ"। কাজেই হংসযোগ ও প্রণবসাধনা একই। কবীরও এই শ্রেণীর সাধকদিগকে "হংসাযোগী" আখ্যা দিয়াছেন। এই সাধনা দ্বারা দেহস্থ আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে স্বতঃই নিরোধ প্রাপ্ত হয়: ইহারই নাম স্থির অবস্থা, ক্রিয়াতীত অবস্থা, লয়, বা সমাধি। কবীর লয় ও সমাধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

(ঙ) সদ্‌গুরু হমসে এহ কহা সুমিরন কর সমাধি

সদ্‌গুরু আমাকে ইহাও বলিয়াছেন যে, ধ্যান অবলম্বনে সমাধির অভ্যাস কর।

(খ) কবীর লয় ভব জানিয়ে, কবহি ছুটি না যায়
জীবৎ সোঁ লাগি রহে, মুয়ে মাহি সমায়।

তখনই জানিবে ঠিক লয় হইয়াছে, যখন আর ছাড়া যাইবে না। জীবিতকালেও লয় লাগিয়াই থাকিবে, দেহান্ত হইলেও লয় ছাড়িবে না।

(গ) লৌলহি নিরমল জ্ঞান, মেটিগা সংশয় শূল

লয় লাগিয়া আমার জ্ঞান নির্ম্মল হইয়াছে। আমার সকল সংশয় মিটিয়া গিয়াছে।

১৪। সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে সাধক এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়, যেখানে তাহার মনের চঞ্চলতা লোপ পায় ও কোনওরূপ বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অথচ অন্তরে নির্ম্মল জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই অবস্থাকে কবীর "উন্মনী" বলিয়াছেন—

(ক) কবীর হংসে ন খেলে উন্মনী, চাঁসা মৈলা আয়রী
কহ কবীর অন্তর বেধা, সদ্‌গুরুকা হাতিয়ার।

হংসযোগ অভ্যাস করিতে করিতে উন্মনী অবস্থা লাভ করিয়া আর আমার কথা বলিবার ইচ্ছা ও শক্তি নাই, সকল চঞ্চলতা দূর হইয়াছে, অর্থাৎ মন ও দেহ ক্রিয়ারহিত হইয়াছে। কবীর বলিতেছেন, সদ্‌গুরু অস্ত্র দ্বারা আমার অন্তর ভেদ করিয়াছেন, তাই আমার এই অবস্থা।

(খ) মন লাগে উনমুনী সোঁ, উনমুন কবহি বিলম্
লোন বিলগা পানিয়া, পানি লোন বিলম্।

লবণ ও জল পরস্পর পৃথক; কিন্তু উভয়ে মিশিলে যেমন এক হইয়া যায়, আমার মনও সেইরূপ 'উনমুনি' হইতে পৃথক হইলেও, এখন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমার মনের আর এখন পৃথক অস্তিত্ব নাই।

(গ) কবীর মন লাগা উনমুনী সোঁ, পবন পৌঢ়া যায়
চাঁদ বিহুনা চাঁদনা, ওহা, অলখ নিরঞ্জন রায়।

মন 'উনমুনী'তে লাগিয়া গেলে আকাশের ন্যায় নির্ম্মলধামে পৌঁছান যায়। সেখানে চন্দ্র নাই অথচ জ্যোৎস্না দেদীপ্যমান। সেইখানেই অলক্ষ্য নিরঞ্জন আত্মার অবস্থিতি।

(ঘ) কবীর উনমন লাগি রহে যে, নিসদিন রহে একতার
চন্দ্ মন্ কি কুছ সুধি নহিঁ, পায়া পদ নির্ব্বার।

উন্মনীতে লাগিয়া আমার সব (বহির্জগৎ) শূন্য হইয়া গেল। আমি দিবারাত্রি তন্ময় হইয়াই রহিলাম: দেহ ও মনের অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইল; আমি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইলাম।

(ঙ) উনমুনি যাকে বাসা

উপনিষদাদি শাস্ত্রে এই উন্মনী অবস্থার বর্ণনা আছে—

আমি এখন উন্মনী ঘরের অধিবাসী।

(ক) নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥
(খ) যো মনঃস্থৈর্য্যরূপাঢ্যে নৈবাবস্থা মনোন্মনী।
(গ) কাষ্ঠবজ্জাতে দেহে উন্মনাবস্থয়া ক্রমম্॥

শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

ক্ষেত্রে ক্ষণেক্ষবলিমেকমুদ্ধে, বাধূর্ব্বকা খর্জ্জিতরেচপুত্রে।
যেনস্য সন্ত্রস্তবিকল্পপুত্রে, মনোন্মনী সা মম সন্নিধত্তাম্॥

১৫। সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনের অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করা প্রয়োজন। কবীর এই সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

কথীয়া বাদ বিবাদ বিষ ঘনা, বোলে বহুত উপাধি
মৌনরূপ গহি হরি ভজে, যে কোই জানে সাধি।

অর্থাৎ অধিক কথাবার্ত্তায় কেবল বাদ বিবাদ হয় ও বিষয়াসক্তি ঘনীভূত হয়; যিনি সাধনের কৌশল জানিয়াছেন তিনি মৌনভাবেই হরিভজনা করেন। শাস্ত্রও বলেন—

সন্ত্যজ্য বাসনাং মৌনামৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্।

অর্থাৎ বাসনাশূন্য ও মৌন না হইলে পরম পদ লাভ করা যায় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন—

জ্ঞানকে আগল করম কমায়, মোহ জ্ঞান তব করম বিলায়
জল আগল ফুলে কমলায়, জল নাশি পর ফুল দুখায়।

অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। জ্ঞান লাভ হইলে কর্ম্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলের জন্যই ফুল উদ্গত হয়, কিন্তু ফল হইলে ফুল আপনি শুকাইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

সাধনমার্গে ভক্তি সাধকের একটি প্রধান সম্বল ও কাম-ক্রোধাদি সাধনের অন্তরায়। কবীর তাই বলিয়াছেন—

(ক) কবীর ভক্তি বিনোন মুক্তি

ভক্তি মুক্তির চিহ্ন স্বরূপ—

(খ) কবীর কামী ক্রোধী লালচী, ইনতে ভক্তি না হোয়
ভক্তি করৈ বৈকুণ্ঠ ফল, পুনরি আবৈ সোয়।

কামী ক্রোধী ও লোভী ব্যক্তির ভক্তি হয় না।

(গ) কবীর যবতক ভক্তি সকামতা, তব্ তক্ নিষ্ফল সেব
কহে কবীর ওহ ক্যোঁকিলে, বিষ্ফোকাঁ বিষ দেব।

যতক্ষণ ভক্তি সকাম থাকিবে, ততক্ষণ উহা নিষ্ফল। নিষ্কামভাবে ভক্তি করিলে নিজের দেবতাকে পাওয়া যায়। আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, ক্ষিপ্রা ও বিবেক প্রয়োজন। কবীর বলিয়াছেন—

(ক) কবীর আওনী হো আইয়া জ্ঞান ক্ষিপ্রা বিবেক
পাছে হরিজি আইয়া সব্দি সাজ সমেত।

জ্ঞান বিচারে বিবেক অগ্রে আসিলেন। পরে হরি সাজ-সজ্জা সমেত আসিলেন।

(খ) জ্ঞান বৈরাগ প্রেম মন রাখো
কহে কবীরা সিদ্ধ কি।

কবীর অন্তরের কথা বলিতেছেন—জ্ঞান বৈরাগ্য ও প্রেমকে অন্তরের মধ্যে রাখ। জীবহিংসা সাধনের প্রতিকূল, তাই যে ব্যক্তি জীবহিংসা করে তাহাকে কবীর সাধনায় অনধিকারী বলিয়া গিয়াছেন—

(ক) সাধো পাঁড়ে নিপুন কসাই
বকরী মার ভেড় কো ধাবে, কিসবে দয়া নাই।

হে সাধো, পুরোহিত বড় নিপুণ কসাই। পাঁঠা মারিয়া সে মেষের দিকে ধাবমান হয়, চিত্তে একটুও দয়া নাই।

(খ) হিন্দু কি দয়া মেহর মুসলমান কী, দোনো করদে ভাষী
বহ অর্থ ছিনৈ, বহ ঘরিকা মারৈ, আগ দৌ ঘর লাগি।

হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঘর হইতেই দয়া চলিয়া গিয়াছে; একজন বলি দেয়, একজন জবাই করে, উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়াছে।

কবীর সর্ব্বজীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

(ক) দয়া রাখি ধরমকো পালৈ, জগ সোঁ রহৈ উদাসী
আপনা সা জীব সব কো জানৈ তাহি মিলৈ অবিনাশী।

যিনি দয়া অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপালন করেন, জগতের সর্ব্ববিষয়ে যিনি উদাসী, যিনি সকল জীবকে আত্মবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই সেই অবিনাশী আত্মাকে লাভ করেন।

(খ) একাদশী নির্জ্জল রহৈ তুলসা পৈরৈ পুরান
দয়া নাহি বাস কৈ রোজন, ঐ সে চতুর সুজান।
অরে নিলজ ভগত বড়াসী অপরাধী
নিত্য দয়া অজ্ঞান কাটা, তাঁতে নহিঁ সাধী।

একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিতেছ, ভাগবত পুরাণ শুনিতেছ, অথচ ছাগ মারিয়া মাংস খাইতেছ। ওরে নিষ্ঠুর মহাপাপী অপরাধী চণ্ডাল, দয়া বিনা তুই অজ্ঞানান্ধকারে রহিয়াছিস্। তোর শরীরকে ধরার সাধনায় নিযুক্ত করিতেছিস না কেন?

(গ) আপন পুতকে মুণ্ড কটাবৈ, মুয়া লগৈ না পারৈ
অজা কৈ গিংদনা ঘর মারৈ, তাকো দয়া ন আবৈ।

আপন পুত্রের মস্তক মুণ্ডন করাইবার সময় কত দয়া, কত সাবধানতা, মাথা যেন ক্ষুরে কাটিয়া না যায়। আর ছাগশিশু ধরিয়া মারে, একটুও দয়া আসে না?

যোগশাস্ত্রাদি আলস্য ও নিদ্রাকে যোগবিঘ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কবীর সাহেবও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন—

(ক) কবীর সুতা কেয়া করে, জাগি ন জপৈ মুরারি
একদিন ভি ডোড় না, যবে পাও পসারি।

শুইয়া কি করিতেছ? জাগিয়া হরিনাম জপ কর; একদিন ত (মৃত্যুকালে) পা লম্বা করিয়া শুইতেই হইবে।

(খ) কবীর সুতা কেয়া করে, উঠি ন রোয় অঘোর
শুইয়া কি করিতেছ? শুইয়া কোনও কাজই হয় না।

(গ) কবীর নিদ্রা বিলানি নীচ কি, উঠ কহিয়া জাগি
আওর মসান ডোড়কে, তোম যাবলোক লাগি।

নিদ্রা নীচ লোকেরই চিহ্ন। কবীর জাগিয়া উঠ ও অন্য রসাস্বাদ ছাড়িয়া আত্মারামের রসাস্বাদ কর।

কবীর সাহেব বাহ্য বেশভূষা, কপটতা, ভণ্ডামি, তীর্থভ্রমণ, মূর্ত্তিপূজা, মালাজপ প্রভৃতির যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন—

(ক) মালা তেরি ভিলক লাগাযা, লম্বী ভরী বাড়তি হৈ
অন্তর তেরে কুফর কাতাগী, যোঁ বহি সাহেব মিলযা হৈ।

তুমি মালা জপ করিতেছ, তিলক লাগাইয়াছ, লম্বা জটা বাড়াইয়াছ, কিন্তু তোমার অন্তরে পাপিত খড়্গ ; এমন করিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্যের কথা মনে পড়ে—

মূর্তির্দৃষ্টি জটাচ্ছটে ন ভবতো ন মুণ্ডনে।
ন ভস্মনি ন বল্কলাং স্তিলকে ন ভবত্যসৌ ॥
ভক্তে ভেদ ন আত্মত্ত দিবে
কাহু, ভয়ে নয় কাশী জলে যে, কাহু, ঘণ্টারব শিবে।
কাহু, ভয়ে নয় জটা বাড়ায়ে, কাহু, ভস্মটীকে দিবে
কাহু, ভয়ে কণ্ঠীকে বাঁধে, কাহু, তিলকে শিবে।

যাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই তাহার কাশীবাস করিলেই বা কি, গঙ্গার জল পান করিলেই বা কি, জটা বাড়াইলেই বা কি, কন্থা সেলাই করিলেই বা কি, কণ্ঠী পড়িলেই বা কি, তিলক লাগাইলেই বা কি ?

(গ) মন না রঙ্গায়ে জগতে যোগী কপড়া
যন্ত্র ছাড়ি পুজন লগে পথরা।

মনকে না রঙ্গাইয়া যোগী কাপড় রঙ্গ করিতেছে, ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া পাথর পূজা করিতেছে।

(ঘ) কণ্ঠীয় মালা ত কহন কিয়ে হিরদা কিয়ে মুখ মাহি
মনুয়া ত চৌদিশ ফিরে, কহৈ কবীর বহি।
কহৈত মালা বাটকি হরত জন কহি ফের
মনকা ফের ন দিয়ি তাসে কহা ভয়া মুখেরা।
কবীর মালা জপ না কর জপ, মুখতে কহ না রাম
মন মেরা সুমিরণ করে, মুঝ পায়ে বিশ্রাম।

মালা করের দ্বারা ফিরিতেছে, জিহ্বা (মন্ত্রোচ্চারণে) মুখের ভিতর ফিরিতেছে, মনও চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে, ইহাতে ত ধ্যান হইতেছে না। বহুলোকে কাঠের মালা ফিরাইতেছে। কবীর তুমি শ্বাসের মালা ফিরাও (অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসে জপ কর) তাহাতে কাঠের মালার ন্যায় গ্রন্থি ও সুমেরু নাই ; অর্থাৎ কোন বাধাবিঘ্ন নাই। মালা বা কর জপ করিওনা, মুখেও রাম নাম বলিও না। আমার মন আপনা আপনি ধ্যান করিতেছে, আমি বিশ্রাম পাইয়াছি।

তুলসীদাসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

মালা ফেরত যুগ গয়া, পায় না মনকা ফের
কহা মনকা ছোড়দে, মনকা মনকা ফের।
মালা জপে শালা, কর জপে ভাই
যো মন মন জপে, উসকো মিলেগী বাই।

(ঙ) আতম্ জ্ঞান বিনা সব সূনা,
ক্যা মথুরা ক্যা কাশী

কাশীই যাও আর মথুরাই যাও, আত্মজ্ঞান না থাকিলে সবই মিথ্যা।

(চ) সাঁচে মন তে সাহব মেরে
ঝুটে মনকে ভাগা

ঈশ্বর অকপট মনের নিকটবর্ত্তী ; তিনি কপট চিত্ত হইতে দূরে চলিয়া যান।

(ছ) বাতোঁ মুক্তি ন হোই রে, ছাড় চতুরাই রো

চতুরতা ত্যাগ কর। কথা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।

মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনই সাধনার আদিস্তর। বাসনার উচ্ছেদ না করিতে পারিলে মন কখনও স্থির হইতে পারে না। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন—

ন কীর্ণা বাসনা যাবদ্ধিক্রং জ্ঞান শাশ্বতি।

কবীর সাহেবও বলিয়াছেন—

(ক) চঞ্চল মন ইত উত ফিরৈ
পিয়া কৈসে পাবৈ

তোমার চঞ্চল মন এদিক ওদিক ফিরিতেছে, তুমি প্রিয়তমকে কেমন করিয়া পাইবে ?

(খ) ইচ্ছা যাহি জীব, তৃষ্ণা বিস্তার রো
চাহকে মাহি সব রোগ আবে।

বীজের ভিতর যেমন শাখাপত্রশালী বৃক্ষ বর্ত্তমান, সেইরূপ এক চাওয়ার মধ্যেই যত রোগ।

মানুষ আশা দ্বারাই বদ্ধ। শাস্ত্রও বলেন, "আশয়া বধ্যতে জন্তুঃ।" আশা বর্ত্তমান থাকিতে মন কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সেই জন্য শাস্ত্র আশা ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন—

চিত্তং যুবিতিযুক্তং বর্ত্ততে চিত্তমাশয়া।
চিত্তত্রিবিধয়া হ্যাশাং হিত্বা নিশ্চিন্ততাং ব্রজ ॥

কবীর সাহেবও বলিয়াছেন—

আশা ডোরী লম্বা গলে বিচ
বট ফিরি কপিহি নচায়া

অর্থাৎ বালীকর যেমন বানরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নাচায়, হে মন, তোমার গলায়ও সেইরূপ আশারজ্জু বাঁধিয়া মায়া তোমাকে নাচাইতেছে। সাধু-সঙ্গ ও বিচার আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান সহায় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই বলিয়াছেন। কবীর সাহেবও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন—

যব সৌভাগ্য মিলে সাধু সংগত কবী
জায় কি দুষ্টী লীজে ফিরি।

জীবন থাকিতে থাকিতেই সাধনাদ্বারা মুক্তিলাভ করা উচিত ; কারণ মৃত্যুর পর জীবের আর কোনও প্রকার স্বাধীনতা থাকে না, সংস্কারানুরূপ দেহ আশ্রয় করিতে হয়। তাই কবীর বলিয়াছেন—

(ক) সাধো ভাই জীবতহি কর আসা,
জীবত সমঝে জীবত বুঝে জীবত মুকতি নিবাসা
জীবত করময়কী ফাঁস ন কাটী মুয়ে মুকতি কি আসা।

হে সাধো বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই মুক্তির আশা কর। জীবিত থাকিতে থাকিতেই বুঝিয়া শুনিয়া লও। কারণ জীবনের মধ্যেই মুক্তির নিবাস। জীবিত থাকিতে যদি কর্ম্মের ফাঁস না কাটে, তবে মরিলে মুক্তির আশা কি ?

(খ) জীবত মুক্ত সোই মুক্তা হো

বাঁচিয়া থাকিতে যিনি মুক্ত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত।

আত্মাদিতেও ঠিক এই ভাবের উপদেশ আছে—

(ক) ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।
অতএব ন তৈর্জিতমিতি তে পরমার্থতঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।

কবীর আরও বলিয়াছেন, জীবন থাকিতে থাকিতেই যিনি মরিতে পারেন অর্থাৎ সমাধি লাভ করিতে পারেন এমন সাধু খুব কম—

কহৈ কবীর কোই বিরলা হংসা
জীবত হী জো মরণা জানৈ

প্রাণ্য-সঙ্গীতেও এই ভাবের পদ শুনিতে পাওয়া যায়—

মরণের আগে মরে, অমরো সিরেছে জীতি

অহংজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে কখনও জ্ঞানের স্বরূপ লাভ হইতে পারে না, তাই কবীর বলিয়াছেন—

(ক) আপা মিটে সাহব মিলে

অহং জ্ঞান লোপ পাইলেই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

(খ) যব লগ নাম মেরী মেরী করে, তবলগ কাম এক্কো ন সরে
জব নেরী মিটত মর জায়, তব নাম প্রভু তুম সহজৈ আয়।

যতক্ষণ লোকে আমার আমার করে, ততক্ষণ একটি কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। যখন আমার আমার মরিয়া যায়, তখন প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

অহং ও ত্বং (অর্থাৎ জীব ও পর) এই উভয়ের পার্থক্য জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকিতে কখনও অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হয় না। হয় অহংকে ত্বংয়ে লয় করিয়া "তত্ত্বমসি" জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, না হয় ত্বংকে অহংয়ে লীন করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" হইতে হইবে। অহং ত্বংএর এই মিলনকে কবীর যুগলমিলন বলিয়াছেন—

হৌড়ু খেলু পীব সেহে, তন মন বাজী লগায়
হারি তো পিব, কি জীতৈ, জীতিহৌ পিব মোর যে,
হৌমিলাকে খেল খেঁহে, অপুন মিলন কি আস।

অর্থাৎ প্রিয়তমের সঙ্গে আজ আমার খেলা। তনু ও মন আমার বাজী। যদি হারি আমি তাঁহার সম্পত্তি, যদি জিতি তবে প্রিয়তম আমার সম্পত্তি। এই প্রেমের খেলায় যুগল-মিলন নিশ্চিত। রামপ্রসাদের গান মনে পড়ে—

তুমি যাও কি আমি যাই রণ
দুটোর একটা করে যাব।

সাধন পুরুষকারসাপেক্ষ, কাজেই সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে মন ও শরীর উভয়েরই বল প্রয়োজন। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্যঃ।"

কবীরও বলিয়াছেন—

কবীর্যান যোষ সৈঠো ঘটমেঁ
ঘাঁহি ঠৌর সোই যো

অর্থাৎ বলবান হইয়া ঘটের (দেহের) মধ্যে প্রবেশ কর, সেইখানেই তুমি স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে।

১৩। শব্দসাধনের যে প্রণালী বা পন্থা সম্বন্ধে কবীর সাহেব তাঁর শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই সাধনা অবলম্বন করিতে হইলে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুর আশ্রয় ব্যতীত সাধনা সম্ভবই নয়। তাই কবীর বলিয়াছেন। "সদ্‌গুরু শব্দ নে বাস" অর্থাৎ সদ্‌গুরু শব্দের ঘরে বাস করেন এবং তিনিই শব্দস্বরূপ বলিয়া দেন। উপনিষদেও দেখি—"তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুর নিকট যাইবে। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন "গুরূপদেশঞ্চ বিনা নাস্ত্যুত্তরণোপায়ঃ।" প্রাণ্য-সঙ্গীতেও পাওয়া যায়, "গুরু ভজনের সোঝা।"

এখন প্রশ্ন এই যে সদ্‌গুরু কে ? সদ্‌গুরুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—

স এব সদ্‌গুরুঃ প্রোক্তঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদুত্তমঃ।

কবীরও বলিয়াছেন—

গুরুকো জানা চাহিয়ে
যো ব্রহ্ম বতলায়

অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

লাখো জনম্ সুফল পারে
সো ব্রহ্মজ্ঞ পাইয়ে

অর্থাৎ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু পাইয়াছেন তাঁহার জন্ম সফল।

গুরু আত্মজ্ঞানী ও যোগ-কৌশলজ্ঞ না হইলে তাঁহা দ্বারা শিষ্যের কোনও উপকারই সম্ভব নয়, বরং অপকারই হয়। কবীর সাহেব তাই বলিয়াছেন—

(ক) অন্ধকে অন্ধ্ মিলা, পথ বাতাওত কোন্
(খ) কবীর সোই গুরু সচ্চে, জীবকা, তেরা ঘড়া নিরূপ
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়ে দুনো কূপ পরন্ত
(গ) অন্ধে যাহ অন্ধেকী, মারগ কোন্ লেখাই

উপনিষদের কথা মনে পড়ে—

অন্ধেনৈবানীয়মানা যথান্ধা।

জ্ঞানবিহীন ভণ্ড গুরু সম্বন্ধে এইরূপ কটাক্ষ কবীরের অনেক আছে। অপর পক্ষে সদ্‌গুরুর প্রশংসাসূচক বাণীও তাঁহার দোঁহাতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—

(ক) সদ্‌গুরু পারস জীবকে কিয়ো মুক্তি মেঁ লেজায়

সদ্‌গুরুই জীবের স্পর্শমণি, কারণ তিনি মুক্তিদাতা।

(খ) কবীর গুরু গোবিন্দ দো খাড়ে, কাকে লাঁগো পায়
বলিহারী গুরু আপনে, দিয়ে গোবিন্দ দেখায়।

গুরু ও গোবিন্দ উভয়েই উপস্থিত; এখন প্রথমে কাহাকে প্রণাম করি। গুরুই শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনিই গোবিন্দকে দেখাইয়াছেন। পুরাণাদিতেও দেখা যায়—

গুরুপ্রদর্শিতো যেষাং পুরাবিদ্যাবিবর্জিতঃ।
ন যেষাং গুরবস্ তীর্থমেষাং গুরুং পরং।

(গ) হরি রুষ্ট হইলে, গুরুর শরণাপন্ন হওয়া যায়, গুরু রুষ্ট হইলে আর নিস্তার নাই। তবুও ঠিক এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়—

শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
(ঘ) নিন্দ আপনি নয় গুরু দেখিয়ো সো গুরু মেরি নন্দায়ে

যে চক্ষুতে গুরু দর্শন করিব, সেই চক্ষুও গুরুই দেখাইয়া দিলেন।

(ঙ) সদ্‌গুরু সোই সত্য কহ দীন্ হা
জাতে অন্ধকি ধার মেঁ চীন্হা

সদ্‌গুরুর দয়াতেই আমি সেই অচিনাকে চিনিয়াছি।

কবীর গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করিতেন না, তাঁহার জ্ঞানে "গুরু গোবিন্দ দো এক হায়" অর্থাৎ গুরু এবং গোবিন্দ একই। এবং তিনি বলিয়াছেন—

কবীর গুরু মানুষ করি জানে, তে নর কহিয়ে অন্ধ
তে নর নরক মেঁ বাসহি

অর্থাৎ যে লোক গুরুকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে সে অন্ধ, সে নরকে যায়। তবুও ঠিক এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়—

গুরো মানুষবুদ্ধির্যস্য নারকং তস্য।

উপনিষদ বলেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ব্রহ্মই। কবীরও তাঁহার গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপই জ্ঞান করিতেন; তাই তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সতগুরু নূর তমাম" অর্থাৎ সদ্‌গুরু আগাগোড়া জ্যোতির্ময়ই। আবার সদ্‌গুরুর কৃপায় তাঁহার কাঙ্ক্ষিত পন্থায় সাধন করিয়া কবীর যখন নিজেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন নিজকেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—

আপনে রাম কি দাস, মিত্র মোহারো কাহি

এখন আমি নিজেই রাম(ব্রহ্ম) হইয়াছি; কাজেই কাহাকে প্রণাম করিব?

বশিষ্ঠদেবের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রামচন্দ্রও বলিয়াছিলেন—"অহোমহং নমাম্যহম্"। অর্থাৎ আমি এখন আমাকেই নমস্কার করি। পতঞ্জলী এই অবস্থাকে "স্বরূপেঽবস্থানম্" বলিয়াছেন। রামপ্রসাদ এই অবস্থা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—"আমি যলে না বুঝাতে পারি"। কবীর সাহেবও ঠিক এই দুই কথাই বলিয়াছেন—

রাম জানেসে আনেসে হয়ে, আর কুছ কহি না যায়

অর্থাৎ আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইয়াছি; এ অবস্থা যে কি তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার যো নাই। এই অনুভবগম্য অবস্থা কবীর একটি সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—

যোবা গুংগে গুড় খাই
কৈসে কহে উহারা যো

অর্থাৎ বোবা গুড় খাইলে যেমন মিষ্টতা অনুভব করে কিন্তু বাক্যদ্বারা বুঝাইতে পারে না, সাধক সেইরূপ সাধনার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন কিন্তু, বুঝাইতে পারেন না। উপনিষদাদিতেও ঠিক এই কথাই আছে—

যস্যা মতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।

১৭। সাধনায় এই চরম অবস্থা লাভ করিয়া কবীর বুঝিয়াছিলেন কেবলমাত্র গুরুর কৃপাবলেই তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

গুরুসে জ্ঞানী কোই নাহিঁ ত্যোলে

অর্থাৎ জগতে গুরুদেবের সমান আর জ্ঞানী নাই। দেবাদিদেব মহাদেবও বলিয়া গিয়াছেন—

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি, শ্রীগুরুং তত্ত্বমং নমঃ।

পেঁড়োর মন্দিরের পূজারী

—শ্রীসুকুমার দে সরকার

বহু পুরাতন বিস্মৃত দিনগুলি পেরিয়ে যে বাল্য ও কৈশোরের ছবি মনে জাগে, অনেকের মনে তা হয়ত সুস্পষ্ট মায়াময় স্মৃতি—বহুমূল্যের পুঞ্জিত ধন। আমার তাদের হিংসা হয়, কারণ আমার মনের সব মায়াময় স্মৃতিই, ছায়াময় আকৃতিহীন অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

কেবল একটি ঘটনা এখনও সুস্পষ্টরূপে জাগরূক।

পরীক্ষার পর তখন সুদীর্ঘ অবসর। সময় যেন তার ভারে মাথার উপর চেপে আছে, নিষ্প্রয়োজন সুদেহী আর ভাল লাগে না। মতলব মাথায় জাগল, পায়ে হেঁটে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। তখনকার তরুণ মনের উৎসাহের কথা ভাবলে আজও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বন্ধুও একজন জুটে গেল আমারই মত উৎসাহী। যাত্রা স্থির হ'ল পরদিন ভোরে; আয়োজন ত ভারী, একটা কম্বল, একটা জলের পাত্র, কিছু টাকা আর নীরব সহচর একটা লাঠি। যাত্রাকালে কিন্তু বন্ধু পেছিয়ে পড়লেন।

—বাড়ীতে বারণ করছে ভাই কি করি?

যদিও মনে গিয়েছিলাম, তবু বললাম—তাতে আর কি? আমি একাই যাব।

বন্ধুর সপ্রশংস দৃষ্টি আজও মনে পড়ে।

বেরিয়েই পড়লাম, দুর্গা নাম নিয়ে।

যাত্রা সমস্ত বর্ণনা করব না, কারণ স্মৃতি থেকে তারা মুছে গেছে বা এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা বর্ণনার অযোগ্য। শুধু যা মনে আছে তাই বলি। সেদিন সারাদিন চলার পর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকাল হয়ে এল। আমাদের দেখে গাঁয়ে গাঁয়ে একা ঘুরে বেড়ালে মন কেমন যেন উদাস বিষণ্ণতায় ভরে যায়। ধানের ক্ষেত দু'ধারে থর থর করে কাঁপছে, বহু দূরে দূরে লোকালয়। নারকেল গাছের মাথার উপর আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ। ফুটনোন্মুখ কাশের বনের উপর দিয়ে বাতাস ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। কয়েক ঘর চাষীর কুঁড়ের পাশে এসে পড়লাম। দাওয়ার দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, শীর্ণ একটা কুকুর একবার ডাকবার চেষ্টা করে থেমে গেল। অতটা কষ্টও তার সহ্য হয় না। কাছে হাতে একজন লোক যেন্ত্রো পথে আসছিল, তাকে জিগ্যেস করলাম—ও কর্ত্তা, সামনের গাঁ আর কতদূর?

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে লোকটা উত্তর দিলে—এই ত পোয়াটাক পথ বাবু, উই দাখা মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

গাঁয়ের লোকেদের কাছে সামান্য ব্যক্তিরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে হয়। নাগরিক শৈথিল্য শিখবার মত স্পষ্ট সঙ্গ তারা পায় না।

প্রশ্ন করলাম—গাঁয়ের নাম কিহে কর্ত্তা?

—আজ্ঞে পেঁড়ো।

সাদা মন্দিরের ক্ষীণ চূড়াটুকু লক্ষ্য করে অগ্রসর হ'লাম। এক পোয়া পথ আর শেষ হয় না। প্রথমে মন্দিরের চূড়া, তার পরে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার আকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। মন্দিরের চূড়ার তীরটা যখন সরু একটা কালো লাইনের মত দেখা যেতে লাগল আকাশ তখন লাল হয়ে উঠছে, সমস্ত প্রকৃতিতে একটা থমথমে স্তব্ধতা, রুগ্ন সন্তানের উপর মায়ের বিষণ্ণ দৃষ্টির মত।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই এক দীর্ঘদেহ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে এমন আকৃতি। বৃদ্ধ, কিন্তু দীর্ঘ দেহ, ঋজু, চাদরে ঢাকা। চাদরের ওলা দিয়ে উপবীতের কিয়দংশ তাঁর ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় দেয়। পায়ে এক জোড়া খড়ম। সসম্ভ্রমে জিগ্যেস করলাম—যেখুন এই গাঁয়ে একটা রাত কাটাতে পারি এমন একটা জায়গা পাওয়া যাবে না?

পরিচয় নিলেন, তারপরে বললেন—এস আমার সঙ্গে।

তাঁর সঙ্গে চললাম। গ্রাম প্রায় জনমানবহীন, তবে বোঝা যায়, এককালে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। দুধারে ভাঙ্গা ইটের দাঁত বারকরা পোড়ো বাড়ীর সার, মাঝে মাঝে দু'একটা মেটে কুঁড়েতে কেবল জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। প্রকৃতির বিষণ্ণ স্তব্ধতার মাঝে ধ্বংসের চিহ্ন মনে কেমন একটা ভয় জাগিয়ে তোলে।

—এ গাঁয়ে কি লোক থাকে না?

—মোট কয়েক ঘর; ম্যালেরিয়ায় সব উজোড় হয়ে গেল। আমি গাঁয়ের পূজুরী, তোমরা ?

—আজ্ঞে আমরা কায়স্থ।

সাধারণতঃ বৃদ্ধেরা যা করেন, পুরাতন শুকৌর্ত্তন, গ্রামের সমৃদ্ধি ও পতনের বিশদ বিবরণ—উনি কিছুই দিলেন না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। দুধারে সোড়ো বাড়ীর সারি। সমৃদ্ধিশীল শুধু গাছের দল। বড় বড় তেঁতুল গাছ কাঁকড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কাকের দল মহা কলরব লাগিয়েছে তাদের উপর। পথের দুধারে আগাছা, বেঁটু, ভেরেণ্ডার চারা, বিছুটি। একটা সোঁদা গন্ধ উঠছে।

প্রকাণ্ড একটা বটগাছের গোড়ায় উঁচু করে শান বাঁধান। মাঝে মাঝে ফাটল উঠেছে, তাঁক দিয়ে কচি ঘাস উঁকি মারছে সূর্য্যের মুখ দেখবার জন্য। হয়ত পুরাণ দিনের কোন বিখ্যাত মণ্ডপ। কত বৃদ্ধের দল এখানে বসে জটলা করেছে, কাকুকে একঘরে করেছে, কাকুকে জাতে তুলেছে, কত নারীর কলঙ্কের হৃদয়হীন কঠিন আলোচনা এখানে হয়ে গেছে। ঘর ভেঙেছে ভুড়েছে। আপন মনে ভাবছিলাম, কল্পনার স্রোতকে আমা করে নিয়ে, হঠাৎ মনে হ'ল সঙ্গী যেন ছোট একটুখানি হেসে উঠলেন—হা, হা, হা……

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখি মুখ ফেরান অন্যদিকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন—অত কাটলের ধার দিয়ে যেও না, সাপ-খোপ থাকতে পারে।

প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল। মনে বাঁধা লেগে গেল, হয়ত বা আমারই ভুল। চিন্তা আমার আবার অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ হ'ল। আমরা তখন প্রায় মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়েছি, উল্টোদিকে নজরে পড়ল প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদের মত ইমারত। ভাঙন ধরেছে, কিন্তু এখনও বিস্ময়কর। সামনে তোরণের সাদা পাথরের কাজ করা থামগুলিতে মাঝে মাঝে ইট বেরিয়ে পড়েছে। নবাবী আমলের ছোট ছোট ইট, শিশুর কচি কচি দাঁতের মত। কুষ্ঠরোগীর মত সাদা গায়ে কালো ছোপ নিয়ে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে।

—কি ছিল এটা ?

—জমীদার-বাড়ী।

—চলুন না দেখে যাই।

বৃদ্ধ একমুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালেন, আরও কয়েকটি রেখা তাঁর রেখাবহুল মুখে ফুটে উঠল। তারপরে বললেন,—চল।

দেউড়ি পার হয়ে আমরা বারমহলে ঢুকলাম। বহুদিনের অব্যবহৃত ঘরে একটা চাপা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। হাওয়ায় খট খট করে জীর্ণ জানালাগুলি কেঁপে উঠল, ফর ফর করে উড়ে এসে অতি পুরাতন জীর্ণ কয়েকটা লালচে কাগজ যেন আমার অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করে উঠল।

পূজারী বৃদ্ধ বললেন—এটা কাছারী-ঘর।

পাশাপাশি আরও কয়েকটা ঘর পেলে, মাঝে প্রশস্ত খানিকটা জমি ছেড়ে অন্দরমহলে এসে আমরা ঢুকলাম। কয়েকটা চামচিকে তাদের জীর্ণ আবাস ছেড়ে আমাদের মাথার উপর ঘুরতে লাগল।

বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

দালানের পাশ দিয়ে ঘোরান একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে, অন্ধকারে রহস্যময়। যেন কে ওখানে লুকিয়ে আছে, এখনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তারপরেই গুমঘর। চারিদিকে আবর্জ্জনা জমে আছে। অজ্ঞাত একটা ভাব মনকে আচ্ছন্ন করছিল, বললাম—চলুন, কাল দেখব।

—তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

—অন্ধকারে দেখতে পাবেন আপনি ?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন না। সিঁড়ির উপরে তাঁর খড়ম বেজে উঠল খট, খট, খট। বাইরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, বোধ হয় অল্পক্ষণই হবে। আকাশে তারা জেগে উঠছিল নিঃশব্দ অভিসারিকার মত। মন্দিরের মাথায় আকাশে তখনও একটু গোড়া লাল আভা, কাঁধে হাত পড়ায় চমকে গেলাম।

বললেন—ওপাশ দিয়ে ঘুরে এলাম, এস।

পথটুকু পার হয়েই ওধারে প্রকাণ্ড সাদা মন্দির, আকাশ ছুঁয়ে আছে যেন। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একদিকে বটের কয়েকটা ঝুরি নেমেছে। মন্দিরের গুলা থেকে একটা লম্বা ফাটল মাথা পর্য্যন্ত উঠে গেছে একটা বিরাট কালো সাপের মত। সেই দিকটায় প্রাঙ্গণের উপর থেকেই উঠেছে একটা বেল গাছ। ফলভারে গাছটা মাথা নীচু করে আছে।

বৃদ্ধ বললেন—চল, মন্দিরের প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাই।

ভেজান মন্দিরের দরজা আর্ত্তনাদ করে খুলে গেল। ভিতরে দেবতার মতই রহস্যময় অন্ধকার। বাইরে বেলগাছের মাথায় একটা পাখী কটপট করে উঠল। বিনা দ্বিধায় অত্যন্ত অন্ধকারে প্রবেশ করে বৃদ্ধ একটি প্রদীপ জ্বাললেন। অনুক্রম

আলোয় ক্ষীণ নিশার অন্ধকার যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। সামনে কালো-পাথরের বিরাট এক শিবলিঙ্গ। ভিতর সম্পূর্ণ আড়ম্বরলেশহীন। একদিকে একটা সিঁদুর-মাখা ফুলদানীতে কয়েকটা আবশ্যক দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নেই। শিবলিঙ্গের সামনে একটা বড় পুরাতন প্রদীপ।

সঙ্গী বললেন—চল, হয়ে গেছে।

দেবতার পাদমূলে প্রণাম করে বাইরে এলাম।

অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে এই লোকালয়ের ধ্বংসাবশেষের উপর। একটা পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড গাড়ীর কাঠামো কালো স্তূপের মত একদিকে পড়ে আছে। একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক নিস্তব্ধতাকে গাঢ়তর করে তুলছিল।

মন্দিরের পাশেই পূজারীর আবাস। দুখানি পাকা ঘর।

—সিঁড়িটা দেখে উঠো হে, হোঁচট খেও না। সনাতন, ও সনাতন……সিদিমটা ধরত। একজন আবৃদ্ধ দিগম্বিশে কালো লোক একটা প্রদীপ নিয়ে বাইরে এসে আমাকে দেখে যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পূজারী মহাশয়ের ঘরগুলি বেশ আরামজনক বলতেই হবে। আমার বেদে-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট আরামদায়ক। খাওয়া-দাওয়ার পর ক্লান্ত শরীরকে কম্বলের উপর লম্বমান করে দেব ভাবছিলাম। সনাতন চলে গেছে। সে বৃদ্ধের সরকারী সমস্ত কাজ করে দিয়ে ঘরে যায়। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ উদাসীন চাঁদ জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বিদ্রূপ হাসি হাসছিল। বৃদ্ধ পূজারী প্রদীপটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

—সিদিমটা তোমার কাছেই থাক, রাতে ভয়-টয় পাবে।

ভয় পাওয়া কিছুই আশ্চর্য ছিল না, কিন্তু মনটা তখন এমন একটা বিরাট উদাসীনতায় ভরে গিয়েছিল যে, বললাম—না না, নিয়ে যান আপনি, ঘরে আলো জ্বললে আমি ঘুমুতে পারি না।

বৃদ্ধ যেন শুনছিলেন না, হঠাৎ বাইরের অন্ধকারে চেয়ে বলে উঠলেন—কে ও?

—আমি দাঠাকুর।

—কে, চাটুয্যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একজন কালো, চাষা, উদরসর্বস্ব মনুষ্যমূর্তির উদয় হ'ল।

—সনাতনের কাছে শুনলাম, আপনার ঘরে নাকি অতিথ এসেছে। বলতে বলতে লোকটা সবিস্ময়ে আমাকে নিরীক্ষণ করলে।

—রাতটা এখানেই থাকবেন?

প্রশ্নটা আমার দিকে চেয়েই হয়েছিল, কিন্তু বৃদ্ধ পূজারীই উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ।

একটু থতমত খেয়ে চাটুয্যে বললে, কিন্তু দরকার হবেনা ত দাঠাকুর, তাই শুধোতে এলাম।

বৃদ্ধের উত্তর সবই সংক্ষিপ্ত, বললেন—না।

আবার অন্ধকারে চাটুয্যে মিশিয়ে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। ঘুম যখন ভাঙল তখনও রাত রয়েছে। চাঁদ পশ্চিমে হেলে গিয়েছে। গ্রামের এই শুষ্ক বিষণ্ণতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হাওয়ায় সজীব ক্ষেতের দুই গন্ধ ভেসে আসছে। সামনে দুটি আড়াল করে জমীদারদের বিরাট বাড়ী। সেউড়ি পার হয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলো কাছারী-ঘরে প্রবেশ করেছে। মনে হ'ল, কাছারী-ঘর যেন জীবন্ত। কত অস্তিত্বহীন লোকের সমাগমে ঘর যেন গমগম করছে। সেউড়িতে ঘরদুয়ের মত কালো লাঠিয়ালের দল অপেক্ষারত। কাছারীতে খাজাঞ্চির দল ঘাড় গুঁজে একমনে লিখে যাচ্ছে। সামনে মোটা মোটা লাল খাগু বাঁধান খাতা। বিস্তৃত জাজিমের উপর বসে জমিদারের গোমস্তা কানে কলম গুঁজে দরিদ্র প্রজার কাহিনী শুনছে, মুখে তার রুক্ষ বিরক্তি। দরিদ্র চাষী বিনিয়ে বিনিয়ে তার করুণ কাহিনী নিবেদন করছে। অন্ধকার কাছারী-বাড়ী যেন কর্মের অগোচর বিরাট এক আর্তনাদে পরিপূর্ণ।

কোথা থেকে একটা লক্ষ্মীপেচা ডেকে উঠল।

পাশেই মন্দির, চন্দ্রালোকে শুভ্রতর। হঠাৎ যেন মনে হ'ল, কার পায়ের শব্দ মন্দির-প্রাঙ্গণে। ঘটের ঝুরিগুলির পাশে বিশাল অন্ধকার, দৃষ্টি চলেনা। একটুখানি ছোট্ট হাসির আওয়াজ ভেসে এল—হা, হা, হা…

অর্থযুক্ত হাসি নয়, বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপ। তারপরে কিছুক্ষণ নিরেট স্তব্ধতা, যেন তাকে স্পর্শ করা যায়। আচ্ছন্নের মত মন্দিরের দিকে চেয়ে ছিলাম। যেন আমার অস্তিত্ব নাই, সমস্তই একটা বিরাট রহস্যময় স্বপ্ন……

মন্দিরের ঘুলঘুলি দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ল। না, ভ্রম নয়, কেউ বিশ্রব মন্দিরে এসেছে। জানলার কাছে উঠে দেখি, মন্দিরের আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত দেবতার পাদমূলে মাথা খুঁড়ছে আর বলছে—কিখিয়ে দিলিনে বুড়ো শিব? একটা সাপের কথায় মাকে আমার নিয়ে নিলি?…

বৃদ্ধের কথা ক্রন্দনভারে জড়িত, অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

ভোরবেলা সমস্ত পৃথিবী যখন হেসে উঠল, মনে হ'ল কালকের রাতটা স্বপ্ন। আলোয় ঢেউ ছড়িয়ে গেছে; নিস্তব্ধ প্রাণে সুন্দর প্রশান্তি। বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে কম্বলটা কাঁধে ফেলে এগোলাম, আবার পথ।

কোপের মধ্যে একটা অদৃশ্য পাখী কুক্ কুক্ করছে, খেজুর গাছের চূড়ায় দুটো পাঁচমিশালি রংয়ের পাখী ঘরকন্না ছেড়ে এসে আনন্দে গান ধরেছে। একটা সাদা বক উড়ে গেল।

পিছনে শুনলাম—ম'শাই শুনছেন।

ফিরে দেখি চাটুয্যে।

—রাতে কোন ভয়টয় পান নি ত?

—কেন বলুন ত?

—না, এমনি বলছি, গাঁয়ে এলেন দুটো কথা শুধোব না। শুনুন বলি। দা'ঠাকুর এমনি চমৎকার লোক, কিন্তু ইদানীং মধ্যে মধ্যে একটু ওঁর মাথার গোলমাল হয়ে যায়। কেমন করে যেন ভেসে ওঠেন। তাই বলছিলাম। কিছু শোনেন নি?

—আপনার দা'ঠাকুরের বয়েস কত হবে?

—ছেঃ, উনি কি একালের লোক? প্রায় আশী হতে চল্ল। ব্রহ্মচারী মানুষ, এখনও শরীর দেখলেন ত? চলুন, আমাকেও ক্ষীরপুর যেতে হবে, পথে আপনাকে সব বলি।

—সামনের গাঁয়ের নাম বুঝি ক্ষীরপুর?

—হ্যাঁ, দা'ঠাকুরকে আপনার একটু আশ্চর্য লাগেনি?

—তা লেগেছিল বৈকি, কিন্তু সে কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করি কি করে?

—তা ঠিক। ঐ যে জমীদার-বাড়ী ফেলে এলেন, এক কালে ওঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল।

—সেত বুঝতেই পারছি।

—কিন্তু সেই জমীদার তারাশঙ্কর রায়ের অবস্থা বেশ মন্দা পড়েছিল। বাপ-পিতেমো'র মুখে শুনেছি আর একটু মনেও পড়ে, তারাশঙ্কর রায় ভয়ানক রাশভারী লোক ছিলেন।

বুড়ো শিবের মন্দির দেখে এলেন ত। জাগ্রত দেবতা। দা'ঠাকুররা বংশপরম্পরায় পূজুরী। দা'ঠাকুরের সময়ে বুড়ো শিব যেন আরও জেগে উঠলেন। যে যা মানত করে পুজো দিত তাই সফল হত। দা'ঠাকুরকে সকলে দেবতার মত ভক্তি করতে লাগল। মন্দিরের আয় অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে গেল। আর সেই হ'ল কাল।

…দা'ঠাকুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের খুব বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে সমবয়সী, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছেন। জমীদারের ছেলেপুলে ছিল না, একটি মাত্র মেয়ে গৌরী। শুনেছি গৌরী ত গৌরীই, রূপে গুণে অমন মেয়ে দেখা যায় না। দা'ঠাকুর যে-পা করেন নি কিন্তু তারার মেয়ে বলতে ওঁর বুক ফুলে উঠত। যেন নিজেরই মেয়ে। দা'ঠাকুর যা তারাশঙ্কর রায় কে যে তাকে বেশী ভাল বাসতেন বলা যায় না। গৌরী ফুল-নৈবিদ্যি সাজিয়ে দিয়ে না এলে দা'ঠাকুরের পুজো হত না। কতদিন লোকে দা'ঠাকুরকে বলতে শুনছে—মায়ের আমার শিবের মত বর করে দেব।

…এদিকে জমীদারির অবস্থা তখন খারাপ। বাপপিতামোর এলাকাড়ির ফলে তারাশঙ্কর আর সামলাতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন বিষয়ী লোক। ওঁর নজর প'ড়ল, মন্দিরের আয়ের উপর। এইবার লাগল খিটিমিটি দা'ঠাকুরের সঙ্গে। দা'ঠাকুর বললেন—বুড়ো শিবকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলনে তারা, তোর ভাল হবে না।

…তারাশঙ্কর রায় জমীদার, প্রভুত্ব তাঁর শিরায় শিরায় বর্তমান, তার উপর অর্থের লোভ তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে, বললেন—কেড়ে নেব কেন? বুড়ো শিব ত গাঁয়ের লোকের। আর জমীদার গাঁয়ের লোকের কর্তা, তুমি মাসোহারা নিয়ে থাক না।

…ঠাকুরের টাকার লোভ কস্মিনকালে ছিল না, শোন, দা'ঠাকুর শুধু বলেছিলেন। তারাশঙ্কর শুনলেন না। বুড়ো শিব জমীদারীর সম্পত্তি হয়ে গেল। আইনের অভাব হল না।

…গাঁয়ের লোক বলে, সেই দিন শুধু দা'ঠাকুরের অগ্নিমূর্তি সবাই দেখেছিল।—আমার বুড়ো শিব যেমন তুই কেড়ে নিলি তারা, তোর গৌরীকেও বুড়ো শিব তোর কোলে রাখবেন না।

…উঃ কেমন করে বলেছিলেন জানি না। গৌরীকে তিনি বাপের চেয়েও ভাল বাসতেন।

…ব্রহ্মচারীর ব্রাহ্মণের শাপ না ফলে যায়? ফলেছে। গৌরী গেল, তার মা গেল। তারাশঙ্করও তারপর বেশীদিন ছিলেন না।

গৌরীকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল, দা'ঠাকুরকে কেউ দেখতে পায়নি। তারপরে আস্তে আস্তে গাঁ ভেঙ্গে গেল। বেশীর ভাগ লোক সহরে চলে গেল। যারা রইল, ম্যালেরিয়া তাদের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রাখলে না। দেখছেনই ত…বলে চাটুয্যে হঠাৎ একটু হাসলেন।

…দা'ঠাকুর যখন ফিরে এলেন কয়েক দিন বাদে, আর চেনা যায় না। অল্প ক' দিনেই যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। মাথার চুল সব সাদা। সেই থেকে আমরা ওঁকে দেখে আসছি। আজও উনি বুড়ো শিবের পুজো করেন।

চাটুয্যে মশাই থামলেন।

একটু পরে আবার বলে উঠলেন—অমন দা'ঠাকুর কেমন করে যে অত নিষ্ঠুর হতে পারলেন, আমি আজও ভেবে পাইনে। মেয়েটার জন্যে একটু দুঃখু করতেও কেউ শোনেনি ওঁকে।

আমার কাছে তখন বৃদ্ধের রাত্রের আর্তনাদ "ফিরিয়ে দিলিনে বুড়ো শিব?" অর্থময় হয়ে ভেসে উঠেছে।

সামনে পথ বিস্তৃত। পথিককে আহ্বান করে, পথিককে এগিয়ে নিয়ে চলে। পিছনে মন্দির ছোট হয়ে আসছে; দুজন পথচারী নিস্তব্ধ। ধানের ক্ষেতে সোনালী রোদের লুকোচুরী খেলা চলছে, মস্ত দীঘির পাড়ে তালবনের মাথায় হালকা টুকরো মেঘ ভেসে চলেছে।

অজানা মায়াময় এই যাত্রা।

বুদ্ধকথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ভিক্ষুণীকথা

ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘপ্রবেশের ইতিহাস আগে বলিয়াছি ; মহাপ্রজাবতী যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন তিনিই ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নেত্রী ছিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যেমন, ভিক্ষুণীদের মধ্যেও সেইরূপ নানা ঘটনার ফলে নানা নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যেও অনেক কলহবিবাদ ও অনাচার ঘটিত। পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে সর্বপ্রকারে ভিক্ষুসঙ্ঘের নীচে স্থান দিয়াছিলেন, উভয়ের সমকক্ষতায় তাঁহার প্রবল আপত্তি ছিল মনে হয়। মহাপ্রজাবতী একবার আনন্দকে দিয়া বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, বয়ঃকনিষ্ঠ ভিক্ষুদের বয়োজ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণীদের প্রতি—সম্মান দেখাইবার, দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ান, নমস্কার প্রভৃতির—নিয়ম করা হউক। এ অনুরোধের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, ইহা তিনি কখনই হইতে দিতে পারেন না। যে সব নিয়ম ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয়েরই পালনীয় তাহাদের সম্বন্ধে বুদ্ধ মহাপ্রজাবতীকে বলিয়াছিলেন যে, সেগুলি ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুদেরই মত সমান ভাবে পালনের চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে নিয়মগুলি ভিক্ষুদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, শুধু ভিক্ষুণীদেরই প্রতিপাল্য, সেগুলি ভিক্ষুণীদের মর্ম অনুসারে পালনের চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাতিমোক্ষ (বিনয়ের মূল নিয়মাবলী) শুনাইবার জন্য ভিক্ষুদের ভিক্ষুণীসংঘের কাছে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিল যে, ভিক্ষুণীসঙ্ঘে ভিক্ষুদের পত্নী, উপপত্নীরা আছে, এখন উহারা আমোদ করিবে। এই জন্য ভিক্ষুদের দ্বারা না হইয়া ভিক্ষুণীদের নিজেদের দ্বারাই প্রাতিমোক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। স্বকৃতদোষস্বীকার ও শাস্তিগ্রহণ সম্বন্ধে সঙ্ঘের নিয়ম প্রথমে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের কাছে পালন করিত, কিন্তু ভিক্ষুণীবিহারে ভিক্ষুদের যাওয়া নিষিদ্ধ হইলে ভিক্ষুণীরা পথে, বন্ধ গলিতে বা চৌরাস্তায় ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা হইলে, সেখানেই উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া মাটিতে ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া, এক কাঁধে চীবর ফেলিয়া, হাঁটু গাড়িয়া যুক্তহস্তে দোষ স্বীকার ও শাস্তি গ্রহণ করিত ; লোকে বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "ইহারা ভিক্ষুদের পত্নী বা উপপত্নী ; গতরাত্রে অনাদর করিয়াছিল, এখন ক্ষমা চাহিতেছে।" ইহাতে ভিক্ষুণীদের নিজেদের মধ্যেই দোষস্বীকার ও শাস্তিগ্রহণ করিবার নিয়ম হইল।

"ছয় ভিক্ষু"রা ভিক্ষুণীদের প্রণয় আকর্ষণের জন্য তাহাদের গায়ে জল ছিটাইত ও অন্য রকম অভদ্রতা ও অশ্লীলতা করিত। অপরাধী ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীরা নমস্কার করিবে না এই শাস্তির ব্যবস্থা হইল ; ভিক্ষুণীরা অভদ্রতা করিলে তাহাদের এই শাস্তি হইল যে, তাহারা ভিক্ষু-বিহারে প্রবেশ করিতে পারিবে না। "ছয় ভিক্ষু"দের মত ভিক্ষুণীদেরও অনেকে বস্ত্রাদি বিষয়ে অতিশয়তা করিত। মল্লবংশীয়া এক ভিক্ষুণী পথে এক কীলজীবী ভিক্ষুকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। একজন গোষিতরক্ষিকা নারীর উপপত্তির সঙ্গে মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল এবং এক ভিক্ষুণী এই নারীকে ভ্রূণহত্যায় সহায়তা করিত। গর্ভবতীর অকালে গর্ভপাত হইলে সে ভিক্ষুণীকে ভ্রূণ ভিক্ষাপাত্রে লুকাইয়া সরাইয়া ফেলিতে বলিল। ভিক্ষুণী ইহা পাত্রে রাখিয়া উত্তরীয়ে ঢাকিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে একজন ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হইল। এই ভিক্ষু তাহাকে ভিক্ষার অংশ গ্রহণ করিতে বলিল, কারণ সে অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীকে অংশ না দিয়া ভিক্ষায় গ্রহণ করিত না। ভিক্ষুণী প্রথমে সম্মত হইল না, শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর পাত্রের আচ্ছাদন খুলিলে ব্যাপার দেখিয়া ভিক্ষু বিস্মিত হইয়া অন্যদের ও বুদ্ধকে জানাইল ; ইহাতে নিয়ম হইল যে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের পাত্র খুলিয়া দেখাইবে।

অন্ধকাশী (অন্ধকাসী) নাম্নী একটি বারনারী প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। স্বয়ং বুদ্ধের কাছে উপসম্পদা লইবার জন্য সে শ্রাবস্তীতে যাইবে স্থির করিল এবং ইহা জানিয়া দুষ্টলোকেরা শ্রাবস্তীর পথে অপেক্ষা করিয়া থাকিল। অন্ধকাশী সংবাদ পাইয়া লোকমুখে বুদ্ধকে ইহা জানাইলে তিনি অন্য লোকের মুখে উপসম্পদা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দক্ষ নামক

একজন মহাসংঘীয় ভিক্ষুর উপর রাগিয়া অন্য কয়েকজন ভিক্ষু এক ভিক্ষুণীকে প্রলোভনা করিয়া বুদ্ধের কাছে নালিশ করাইয়াছিল যে, ভন্তে তাহার ধর্মনাশ করিয়াছেন। বুদ্ধ ভন্তেকে জানিতেন; ভন্তের এ বিষয়ে কিছু স্মরণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ভন্তে বলিলেন, "ভগবান আমাকে জানেন"; বুদ্ধ বলিলেন যে, শুধু আত্মসমর্থনাথার দ্বারাই আত্মসমর্থন হয় না, ভন্তেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে হইবে। তখন ভন্তে বলিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও, এমন কি স্বপ্নেও অব্রহ্মচর্য্য করেন নাই। ভন্তের কথায় বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুণীকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করিতে বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন প্ররোচক ভিক্ষুরা আসিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। (চুল্লবগ্গ, ৪।৪।৮-৯)।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘে আরও অনেক রকমের দোষ, ত্রুটী ও অপরাধ প্রকাশ পাইয়াছিল, সে সবের বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কোথাও বা অসম্ভব।

সঙ্ঘে গোলযোগ ও বুদ্ধের সঙ্ঘ ত্যাগ

নবম বর্ষার পর বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীতে ছিলেন তখন প্রত্যাখ্যাতা রাণী মাগন্দিয়া লোক লাগাইয়া বুদ্ধকে নির্যাতন করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দশম বর্ষে কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের ভিতর মহা বিসম্বাদ আরম্ভ হইল, ইহাতেও মাগন্দিয়ার প্ররোচনা ছিল কিনা জানি না।

বিবাদের আরম্ভ হয় অতি সামান্য বিষয় লইয়া। একজন ভিক্ষু শৌচাগারে জল ফেলিয়াছিল, আর একজন ভিক্ষু তাহাতে তাহাকে দোষ দিল। প্রথম ভিক্ষু বলিল যে, সে ইচ্ছা করিয়া জল ফেলে নাই, তাহাতে দ্বিতীয় ভিক্ষু বলিল, তবে তাহার কোন অপরাধ হয় নাই। তারপর দ্বিতীয় ভিক্ষু গিয়া তাহার সঙ্গীদের বলিল যে, প্রথম ভিক্ষু অপরাধ করিয়াছে কিন্তু তাহা বুঝিতেছে বা স্বীকার করিতেছে না। এ কথা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল ও প্রথম ভিক্ষুর সঙ্গীরাও শুনিতে পাইল। সঙ্গীদের মুখে ইহা শুনিয়া প্রথম ভিক্ষু বলিল যে, দ্বিতীয় ভিক্ষু মিথ্যাবাদী, কারণ একবার কোন অপরাধ হয় নাই একথা বলিয়া এখন সে উল্টা কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। প্রথম ভিক্ষুর কথাও প্রচার হইয়া দ্বিতীয় ভিক্ষুর কানে গেল। দ্বিতীয় ভিক্ষু তখন দলবল জুটাইয়া প্রথম ভিক্ষুকে সঙ্ঘচ্যুত করাইল। ইহাতে মহা বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইল, প্রথম ভিক্ষুও দলবল জুটাইয়া তাহার সঙ্ঘচ্যুতিতে আপত্তি করিল। দুই পক্ষই দল বাড়াইতে লাগিল, শেষে ভিক্ষুণীদেরও নিজ নিজ দলে টানিল। যেখানেই একাধিক ভিক্ষু জড় হইত সেখানেই তর্কাতর্কি ঝগড়া আরম্ভ হইত। বুদ্ধকে জানান হইল যে, যাহারা প্রথম ভিক্ষুকে সঙ্ঘচ্যুত করিয়াছে, তাহারা বলিতেছে উহা বিধানানুযায়ীই হইয়াছে কিন্তু প্রথম ভিক্ষুর দলের লোকরা বলিতেছে উহা অবৈধ হইয়াছে এবং যাহারা সঙ্ঘচ্যুতির অনুমতি দিয়াছে তাহাদের নিষেধবাবস্থা সত্ত্বেও তাহারা প্রথম ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করিতেছে। বুদ্ধ পর পর দুইবার তাহাদের মিটমাট করিয়া ফেলিতে বলিয়া পাঠাইলেন, ভিক্ষুরা শুনিল না, সর্ব্বত্র ঘোর কোলাহল বিসম্বাদ লাগিয়া গেল। প্রায় সব ভিক্ষুই কোন না কোন পক্ষ লইল, কিন্তু কৌশাম্বীর ভিক্ষুরাই সব চেয়ে বেশী গোলমাল করিল ও ভিক্ষুতেই বিরত হইল না। বুদ্ধ শেষে তাহাদের কাছে গিয়া অনেক উপদেশ, অনেক গল্প, উদাহরণ দিয়া একতার প্রয়োজন ও দলাদলি, বিসম্বাদের অনর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সম্মুখে ভিক্ষুরা চুপ করিয়া থাকিত, তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিবে, বিবাদে বিরত হইবে বলিত, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলেই আবার বিবাদ, বিসম্বাদ, তর্ক আরম্ভ হইত। ভিক্ষুদের ব্যবহারে ও কাণ্ডকারখানায় বহুসহনশীল বুদ্ধেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ও ভিক্ষুতেই ইহাদের সুবুদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন অজ্ঞাতসারে সঙ্ঘত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কৌশাম্বীর কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের কাছ হইতে পলাইয়া বুদ্ধ বলকলোণকার গ্রামে ভগু নামক একজন ভিক্ষুর কাছে গেলেন। সেখান হইতে তিনি প্রাচীনবংশোদ্যান (পাচীনবংস-দায়) নামক একটি বাঁশবনে—সেখানে অনুরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিল নামক তিনজন ভিক্ষু বাস করিত, তাহাদের কাছে গেলেন। এই তিনজন পূর্ব্বে ধনীসন্তান ছিল; বাঁশবনের রক্ষক বুদ্ধকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ঐ ধনীপুত্রদের বিরক্ত করিতে মানা করিল। বুদ্ধের সঙ্গে রক্ষকের কথা শুনিতে পাইয়া ভিক্ষু অনুরুদ্ধ দৌড়িয়া আসিয়া রক্ষককে নিরস্ত করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুত্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা শান্তিতে ও বিনা

ছন্দে আছে কিনা। তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাই শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া এরূপ সম্ভব হইল। তাহারা বলিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি কার্যে ও চিন্তায় বন্ধুত্ব দেখায় ও প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া অপরের ইচ্ছানুসারে কাজ করে; যে প্রথমে ভিক্ষাটন হইতে ফিরে সে অপর দুইজনের জন্য জল, গামছা ও আসন ঠিক করিয়া রাখে, যে সকলের শেষে ফিরে সে এগুলি যথাস্থানে আবার রাখিয়া দেয় এবং বাকি দুই জন খাইবার পর যাহা বাঁচে তাহা খাইয়া আহারের স্থান মুছিয়া রাখে। প্রত্যেকে সর্বদা অপরের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এইভাবে বিনা দ্বন্দ্বে থাকে। বুদ্ধ তাহাদের প্রশংসা করিলেন: কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের আচরণ মনে করিয়া ইহাদের কথায় তাঁহার একটু আশ্চর্যই বোধ হইয়াছিল বোধ হয়। এখান হইতে বিদায় লইয়া বুদ্ধ পারিলেয্যক নামক গ্রামের অনতিদূরে একটি বনে নির্জনে একটি মহাশাল গাছের তলায় "রক্ষিত" নামক কুটির বানাইয়া এক বর্ষা যাপন করিলেন। ভিক্ষুদের দ্বন্দ্ব কোলাহল ছাড়িয়া আসিয়া এখানে থাকিতে তাঁহার পরম শান্তি বোধ হইল। একটি বন্য হস্তী এখানে তাঁহার বশ হইয়াছিল; বর্ণিত আছে, হস্তীটি তাঁহাকে জল আনিয়া দিত, সর্বদা কুটিরের দ্বারে বসিয়া থাকিত ও তিনি ভিক্ষায় গ্রামে বাহির হইলে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইত। গ্রামের লোক হাতী দেখিয়া ভয় পাইলে বুদ্ধ ইহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া লোককে আশ্বস্ত করিতেন। হাতীটি অনেক সময় তাঁহার ভিক্ষাপাত্র বহন করিত ও লোকে ভিক্ষা দিতে আসিলে পাত্র বাড়াইয়া ভিক্ষা লইত। "মহাবগ্গে"র এই কাহিনীটি বাড়াইয়া "ধম্মপদট্ঠ-কথা"য় একটি বানর ভক্তের কথাও যোগ করা হইয়াছে, বানরটিও তাঁহাকে সেবা করিত ও একবার বন্ধুবর আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিল।

এদিকে বুদ্ধের পলায়নে গৃহীভক্তদের মধ্যে ভিক্ষুদের প্রতি মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কৌশাম্বীর গৃহস্থেরা ভিক্ষুদের ভিক্ষা বন্ধ করিলেন, ভৃত্যেরা তখন জব্দ হইয়া আপোষ করিয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল। গৃহস্থেরা বলিলেন, শুধু, তাহাতে হইবে না, বুদ্ধ যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে তাহারা আবার ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে; নচেৎ দিবে না। ভিক্ষুরা সত্যাগ্রহ হইয়া বুদ্ধের খোঁজে বাহির হইল। এদিকে অনাথপিণ্ডের বুদ্ধের তিরোধানে উদ্বিগ্ন হইয়া আনন্দকে ধরিয়া ধরিলেন যে, ভগবানকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আনন্দ কয়েকজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া পারিলেয্যক বনে চলিলেন ও বনে প্রবেশ করিবার আগে ভিক্ষুদের রাখিয়া একাকী বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, আনন্দ একা আসিয়াছেন না সঙ্গে অন্য ভিক্ষুরা আছে এবং আর যাহারা আসিয়াছে তাহাদেরও তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। কৌশাম্বীর দুষ্টেরা কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্যই তিনি ইহা করিয়াছিলেন, দুষ্টদের কেহ সেখানে বোধ হয় তিনি ফিরিতেন না। আনন্দ তখন তাঁহাকে অনাথপিণ্ডদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া ফিরিবার জন্য বহু মিনতি করিলেন ও বুদ্ধ অবশেষে রাজি হইলেন।

বুদ্ধ জেতবনে ফিরিয়াছেন শুনিয়া কৌশাম্বীর দুষ্টেরা সেখানে উপস্থিত হইল। ইহাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া সারিপুত্র, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা, মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন যে, ইহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। বুদ্ধ সারিপুত্রকে বলিলেন, "যাহাদের কথা তোমার ন্যায্য মনে হয় তুমি তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিও", অনাথপিণ্ডদকে বলিলেন, "উভয় দলকেই দান ও ভিক্ষা দিবে, উভয় দলের কথা শুনিবে এবং যাহারা ন্যায্য কথা বলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে", মহাপ্রজাবতীকে বলিলেন, "উভয় দলের কথা শুনিবে ও যাহারা ন্যায্য কথা বলে তাহাদের কথা গ্রহণ করিবে এবং ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তখন যাহারা ন্যায্য বলে কেবল তাহাদের কাছে যাইবে।" কৌশাম্বী-ভিক্ষুরা উপস্থিত হইলে সারিপুত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা করা হইবে; বুদ্ধ বলিলেন যে, তাহাদের পৃথক বাসস্থান দিতে হইবে কিন্তু দান, ভিক্ষা সম্বন্ধে যেন কোন তারতম্য করা না হয়। বুদ্ধের এই বিধানগুলিতে মনে হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের বুঝাইয়া দেওয়া যে তাহাদের কোন অনিষ্ট করা বা কষ্ট দেওয়া সঙ্ঘের অভিপ্রেত নয়, কিন্তু সঙ্ঘ তাহাদের "বয়কট" করিতেছেন—ইহা ছিল সেই যুগের অহিংস অসহযোগ নীতির সত্যাগ্রহ। অন্য ভিক্ষুদের বুদ্ধ মানা করিয়া দিলেন যে, কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের সঙ্গে কেহ যেন বসে বা দাঁড়ায় না। কেহ কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে

বুদ্ধ আঙুল দিয়া তাহাদের দেখাইয়া বলিতেন, "এই যে ইহারাই সেই কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণ!"—এইরূপে লজ্জা দিয়া তিনি তাহাদের চৈতন্য জন্মাইবার চেষ্টা করিলেন। ফলে যে ভিক্ষু দোষ করিয়াছিল সে তাহা স্বীকার করিল ও দলের লোককে জানাইলে তাহারাও স্বীকার করিল যে, তাহারই অপরাধ ছিল। অপর পক্ষকেও ইহা জানান হইল, তখন দুইদল বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন যে, অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে, তখন সঙ্ঘের সভা ডাকাইয়া সবলে শান্তি স্থাপন করুক। (মহাবগ্গ, ৯-কথা, ১।৫৩)।

বুদ্ধ বিনয় লইয়া বিচার করিয়া তাহাকে অতিরিক্ত দাঁড়াইয়া আসল কাজ পণ্ড করা বোধ হয় আমাদের জাতিগত স্বভাব। সঙ্ঘের ইতিহাসে দেখি, সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া অনবরত বিবাদ হইত।

বুদ্ধের সমবেদনা

আলবিতে একজন দরিদ্রলোক বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিত। একদিন উপদেশ আরম্ভের সময় এই লোকটিকে অনুপস্থিত দেখিয়া বুদ্ধ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। লোকটির একটি গরু হারাইয়া গিয়াছিল। গরু খুঁজিতে তাহার দেরী হইয়া গেল এবং গরুকে পাইবামাত্র সে অনাহারে ক্লান্ত শরীরে বুদ্ধের কাছে আসিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার্য কিছু আছে কিনা ও লোকটিকে আহার করাইতে বলিলেন। তাহার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধ উপদেশ দিলেন না। আহারের পর লোকটি অনেকটা সুস্থ হইলে বুদ্ধ উপদেশ দিলেন। কথিত আছে, এই একমাত্র ঘটনায় বুদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে আহার্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও অন্য লোককে আহার দিতে বলিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে যুগে মানুষের দুঃখকষ্ট যাহাই থাকুক অন্নের অভাব ইহাতে এমন দরিদ্র কেহ ছিল না। অন্নাভাবে লোকে কষ্ট পাইতেছে বা মারা পড়িয়াছে এরূপ ঘটনা বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রে আমার একটিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আলবি হইতে ফিরিবার পথে ভিক্ষুরা একটা সামান্য লোকের জন্য উপদেশ দান বন্ধ রাখিয়া তাহার প্রতি অত বেশি দৃষ্টি দিবার জন্য একটু লঘুভাবে বুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতেছিল। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভিক্ষুদের বলিলেন, "ক্ষুধার মত যন্ত্রণা আর নাই; আমি দেখিলাম যে, এই লোক ভোগ করিতে করিতে উপদেশ শ্রবণ তাহার বৃথা হইত, কারণ উপদেশে তাহার মন লাগিত না ও সে ঠিক বুঝিতেও পারিত না।" (৯-কথা, ১।২৬১)।

একজন ভিক্ষুর উপসম্পদা হইয়াছিল, সে মূত্রপুরীষে লিপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। বুদ্ধ আনন্দকে সঙ্গে করিয়া ভিক্ষুদের শয়নস্থান দিয়া যাইবার সময় এই পীড়িত ভিক্ষুর আবাস-স্থানে আসিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভিক্ষুর কাছে গিয়া বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

"ভন্তে, আমার পেটের অসুখ হইয়াছে।"

"তোমার শুশ্রূষার জন্য কেহ আছে কি?"

"না, ভন্তে।"

"ভিক্ষুরা তোমার শুশ্রূষা করে না কেন?"

"ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের কোন কাজ করিতে পারি না, তাই ভিক্ষুরা আমার শুশ্রূষা করে না।" একথা শুনিয়া বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, জল লইয়া এস, এই ভিক্ষুকে স্নান করাইব।" আনন্দ দৌড়াইয়া গিয়া জল লইয়া আসিলেন। বুদ্ধ জল ঢালিতে লাগিলেন ও আনন্দ তাহাকে ধোয়াইতে লাগিলেন। তারপর বুদ্ধ মাথার দিকে ও আনন্দ পায়ের দিকে ধরিয়া ভিক্ষুকে খাটের উপর তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। পরে বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক স্থানে একজন পীড়িত ভিক্ষু আছে তাহারা জানে কিনা এবং ভিক্ষুরা তাহার শুশ্রূষা করে না কেন। ভিক্ষুরা বলিল, পীড়িত ভিক্ষুর কথা তাহারা জানে বটে, কিন্তু ঐ ভিক্ষু তাহাদের কোন কাজ করে না বলিয়া কেহ তাহার শুশ্রূষা করে না। বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যাঁহারা তোমাদের শুশ্রূষা করিবেন তোমাদের সেই মাতাপিতা নাই; তোমরা যদি পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা না কর তবে আর কে তোমাদের করিবে? ভিক্ষুগণ, যে আমার সেবা করিতে চায় সে যেন পীড়িতের সেবা করে। পীড়িতের যদি উপাধ্যায় থাকে তবে উপাধ্যায়ের, যদি আচার্য্য থাকে তবে আচার্য্যের, নয় ত সার্দ্ধবিহারী, বা অন্তেবাসী বা সহ-সার্দ্ধবিহারী বা সহ-অন্তেবাসী থাকিলে তাহাদের উচিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পীড়িতের প্রাণ থাকে বা

যতদিন পর্য্যন্ত সে নীরোগ না হয় ততদিন তাহার সেবা শুশ্রূষা করা ; ইহাদের মধ্যে কেহ না থাকিলে সমগ্র সঙ্ঘের উচিত তাহার সেবা করা।" (মহাবগ্গ, ৮।২৬।৩)।

শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ ও অন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের ছেলেদের বুদ্ধভক্তদের ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে, ভিক্ষুদের নমস্কার করিতে বা জেতবনে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। একদিন ইহাদের কতকগুলি ছেলে জেতবনের কাছে খেলা করিতেছিল ; ছেলেদের খেলার সময় আত্মপর জ্ঞান থাকে না, এই দলে একটি বুদ্ধভক্তের ছেলেও ছিল। খেলিতে খেলিতে ছেলেদের জলতৃষ্ণা বোধ হইল, তাহারা বৌদ্ধ ছেলেটিকে জেতবনের মধ্যে গিয়া জল খাইয়া তাহাদের জন্য জল লইয়া আসিতে বলিল। ছেলেটি জেতবনে গিয়া সোজা গন্ধকুটিতে ঢুকিয়া বুদ্ধের কাছে জল চাহিল। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুদের বিশ্রামের সময় ; বুদ্ধ নিজে জল আনিয়া বালককে খাইতে দিলেন ও তাহার সঙ্গীদের ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। ছেলেরা আসিলে তিনি সকলকে জল খাইতে দিয়া তাহাদের ধোঁয়া বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ছেলেরা বাড়ীতে গিয়া বাপমাকে জেতবনে ঢুকিয়া বুদ্ধের হাতে জল খাওয়ার কথা বলিল। বাপমা একথা শুনিয়া আতঙ্কিত হইল। পাড়ার কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক বাপমাদের বুঝাইল ও বুদ্ধের উপদেশ শুনাইল। বাপমারা তখন বলিল, "আমরা ছেলেদের শ্রমণ গৌতমের কাছেই শিক্ষার জন্য পাঠাইব।" তাহারা বুদ্ধের কাছে গিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার ভক্ত হইল। (ধ-কথা, ৩।৪১)।

শ্রাবস্তীতে তিষ্য নামক ভিক্ষুর উৎকট চর্ম্মরোগ হইয়াছিল ; রোগ এমন বীভৎস হইল যে, কেহ তাহার কাছে না গিয়া তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাকে দেখিয়া স্নান করাইবার জন্য জল গরম করিলেন ও তাহাকে স্নানের ঘরে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইতে না দিয়া নিজেরাই লইয়া গেল। বুদ্ধ তিষ্যের বস্ত্রাদি ধোয়াইয়া শুখাইয়া রাখিলেন ও নিজ হাতে তাহাকে স্নান করাইলেন। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া যখন তাহার শরীর সুস্থ ও মন প্রসন্ন বোধ হইল, তখন বুদ্ধ তাহাকে শরীর সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। (ক্রমশঃ)

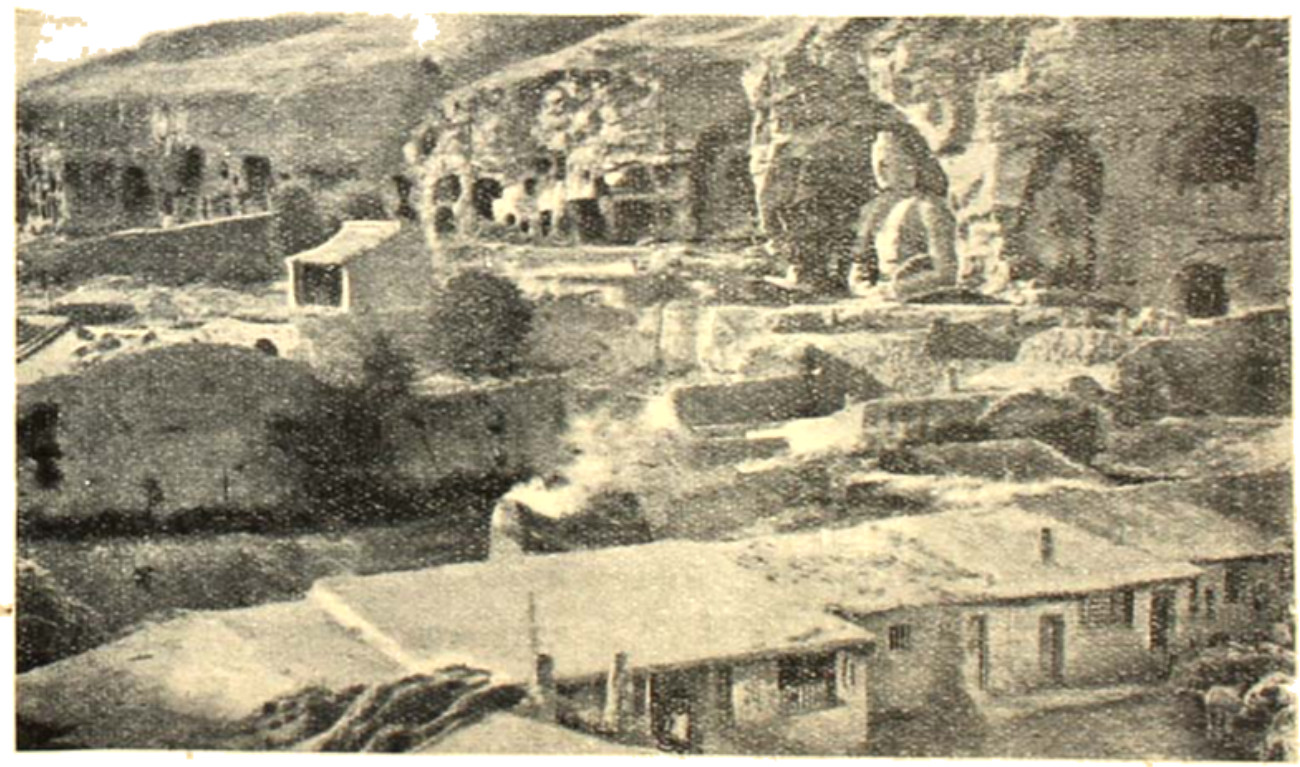

ইয়াকোর পাহাড়ে অধিষ্ঠিত প্রাসাদ। ১৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে টেন-সম্রাট মিংটাইএর আমন্ত্রণে ইহা ভারতীয় ও গ্রীসীয় স্থাপত্যের অনুকরণে গঠিত হয়। পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন চৈনিক ভাস্কর্য্যে
বৌদ্ধ ও গ্রীসীয় প্রভাব

—শ্রীপিণাকীলাল রায়

ভারতের বৌদ্ধ সভ্যারাম হইতে সর্ব্বপ্রথম একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচারার্থ চীন দেশে প্রেরিত হয়, কিন্তু এই প্রথম বারে তাহারা সফলকাম হইয়া ফিরিতে পারে

উত্তর চীনদেশে ইয়ুনকাঙের একটি কীর্ত্তি। ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পর্ব্বতগাত্রে এই ১০০ ফিট উচ্চ মূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইল ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে খোদিত কুমারজীব এবং অন্যান্য মূর্ত্তি দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে এই বৃহৎ মূর্ত্তি ও সংলগ্ন নানাবিধ ক্ষুদ্রমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের একাংশের তত্ত্বাবধানে।

নাই। কারণ, কোন প্রাচীনপন্থী অন্ধবিশ্বাসী জাতির মধ্যে নূতন কোন ধর্ম্মের ভাব জাগাইয়া তোলা যে কিরূপ আয়াস-সাপেক্ষ, জগতের জাতিসমূহের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রমুখ অসাধারণ মানবগণের জগতে সত্যধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টার মূলে যে কতরকম দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধন ও অমানুষিক ত্যাগশীলতা নিহিত আছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। প্রথম চেষ্টা বিফল হইবার কিছু দিন পরে এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তনশীল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল পুনরায় চীন সাম্রাজ্যে প্রেরিত হইল। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই অনুশাসনের বীজ তাহারা এবার চীন দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানে ছড়াইয়া আসিল এবং তাহাদের সঙ্গে আসিল, তথাকার দুইজন পুরোহিত—ভারতের এই সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে। সদ্ধর্ম্মের জন্য মহারাজা অশোকের কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল।

একদিন তাহাদের সম্মুখে অশোক তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিতেছেন—"মন্ত্রীগণ, এখন এদেশের রাজা কে?" আমাত্যগণ স্বীয় স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া করপুটে কহিলেন—"মহারাজ আপনিই এদেশের রাজা।" অশোকের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি কহিলেন—"তোমরা যাহা সত্য নয়, তাহাই বলিতেছ। দেখ, এই আমলকের অর্দ্ধ ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। সেই অকিঞ্চিৎকর প্রভুত্বকে ধিক্ যাহা তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। শত শত যুগে জন্মলাভ করিয়া —সহস্র সহস্র শত্রু দলন করিয়া—অরাজকতা বিনাশ করিয়া—ধরণীকে একচ্ছত্রে বদ্ধ করিয়া—রাজ্যচ্যুত অশোক এখন দুঃখে বাস করিতেছে। বৃন্তচ্যুত বৃক্ষচ্যুত হইলে যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, অশোক আজ সেইরূপ শ্রীহীন হইয়া বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে। রাধাগুপ্ত, তুমি 'কুক্কুট-আরামে' গিয়া এই আমলকখণ্ডটি আশ্রমকে উপহার দাও। আমার নামে আচার্য্যগণের

পদধূলি লইয়া বলিও, জম্বুদ্বীপের অধীশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ইহাই অবশিষ্ট আছে, তিনি তাহাও দিতেছেন। তাঁহারা যেন ইহা সমুদয় লক্ষমধ্যে দান করেন।"

তারপর তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চীন হইতে সমাগত ও বৌদ্ধধর্ম্মে নবদীক্ষিত ভ্রমণদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে আমার সুহৃদশ্রেষ্ঠ তথাগতের শিষ্যদ্বয়, আজ আপনাদিগকে পাইয়া আমি যে কিরূপ আনন্দিত তাহা বলিবার নয়। বৌদ্ধসঙ্ঘে আপনাদের শুভাগমন স্মরণীয় করিবার জন্য আজ আমি উক্ত লক্ষকে আমার রাজকোষ ব্যতীত এই ভারতভূমি দান করিলাম। সুনীল জলধি যে-ভূমিকে মরকত-পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছে—যে-ভূমি সর্ব্বজীবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—নগরাজ হিমাচল যাহার বক্ষে দণ্ডায়মান, আমি সেই 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' সসাগরা সর্ব্বরত্নালঙ্কৃতা আমার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ, বৌদ্ধসঙ্ঘকে অর্পণ করিলাম। আমি এই কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ, রাজ্যসুখ চাহি না, ইন্দ্রত্ব চাহি না, ব্রহ্মলোকেরও প্রার্থী নই। এ সমুদয় জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। আমি শুধু এই আশীর্ব্বাদ আপনাদের নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষা করি, যেন আত্মসংযম করিয়া নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি। কারণ, পৃথিবীর উপর যে প্রভুত্ব তাহা চিরদিন থাকে না, কিন্তু আপনার উপর প্রভুত্ব অমর, তাহার বিনাশ নাই।"

"সুহৃদগণ, আমার আর একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন:—সমগ্র চীন এখনও সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসে নাই। সেইজন্য আমি আপনাদের সঙ্গে আমার ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে কয়েক জন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসহ পুনরায় চীনদেশে পাঠাইতে চাই, এই আমার সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য। আপনারা ইহাদের সহায় হউন। সমগ্র ভারত, সিংহল, সুমাত্রা, যোগিও, বালি, যবদ্বীপ এমন কি তাতার পর্য্যন্ত এই সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, একমাত্র সমগ্র চীন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইয়া আমার কার্য্যকালের অবসান ঘটবে। কারণ, ভারত ও চীন এই দুইটি বৃহৎ ভূভাগ লইয়াই এই সসাগরা ধরিত্রীর কারবার। সমস্ত চীন সামাজ্য এই সত্য-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিলে আর যাহা বাকী থাকিবে তাহাও ক্রমে ক্রমে নবধর্ম্মে যে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী তড়াগ, খাল, বিল, হ্রদ কি নদী কতদিন অস্তিত্বের ভাবে অবস্থান করিতে পারে?—অবশেষে সেগুলিও মহাসাগরেরই সামিল হইয়া যায়।"...

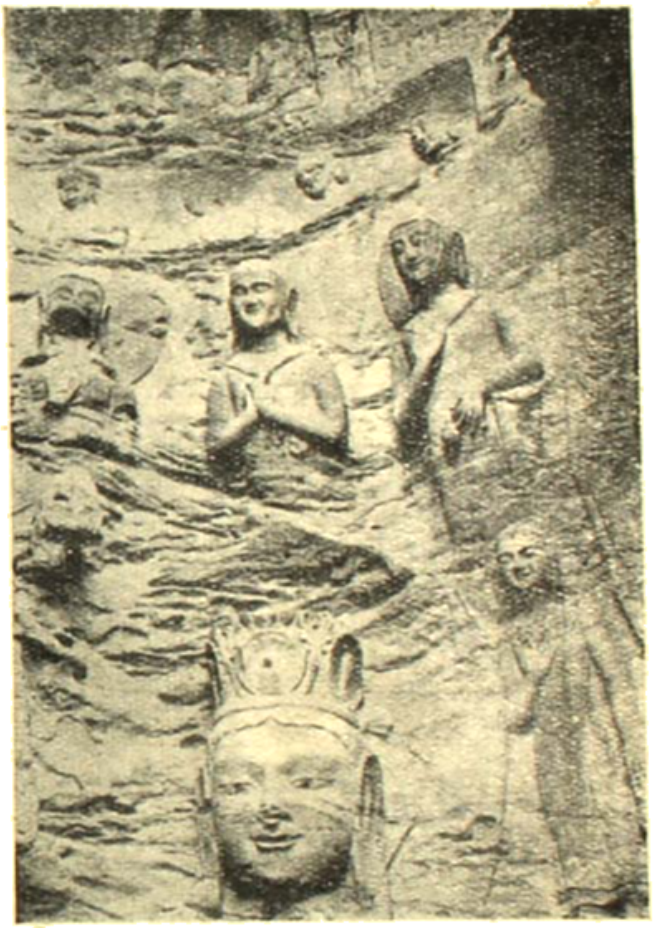

ইলোরার পাহাড়ে খোদিত বুদ্ধের মূর্ত্তি। চারি পার্শ্বে ভিক্ষুণী দৃষ্টব্য। এক জনের হাতে আমাদের ভারতীয় জলপাত্র দেখা যায়।

সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মহারাজা অশোক মনুষ্যজাতির কল্যাণকামনায় ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের মানসে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারই ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা সেই অত্যুদার ধর্ম্মের চতুরশীতি সহস্র অনুশাসন লইয়া অনতিক্রান্ত যৌবনে বোধি ও যোগিনীর বেশে চীন সম্রাটের দ্বারে উপস্থিত, এই বার্ত্তা ভারত-প্রত্যাগত ভ্রমণদ্বয় রাজদর্শনে প্রদান করিলে, চীন-সম্রাট মিংটাই মহারাজা

অশোকের ভাই ও ভগিনীকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং রাজোচিত অভিবাদনে আপ্যায়িত করিয়া পরিশেষে তাঁহাদের উপবেশনের জন্য নিজের সিংহাসনের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিলেন।

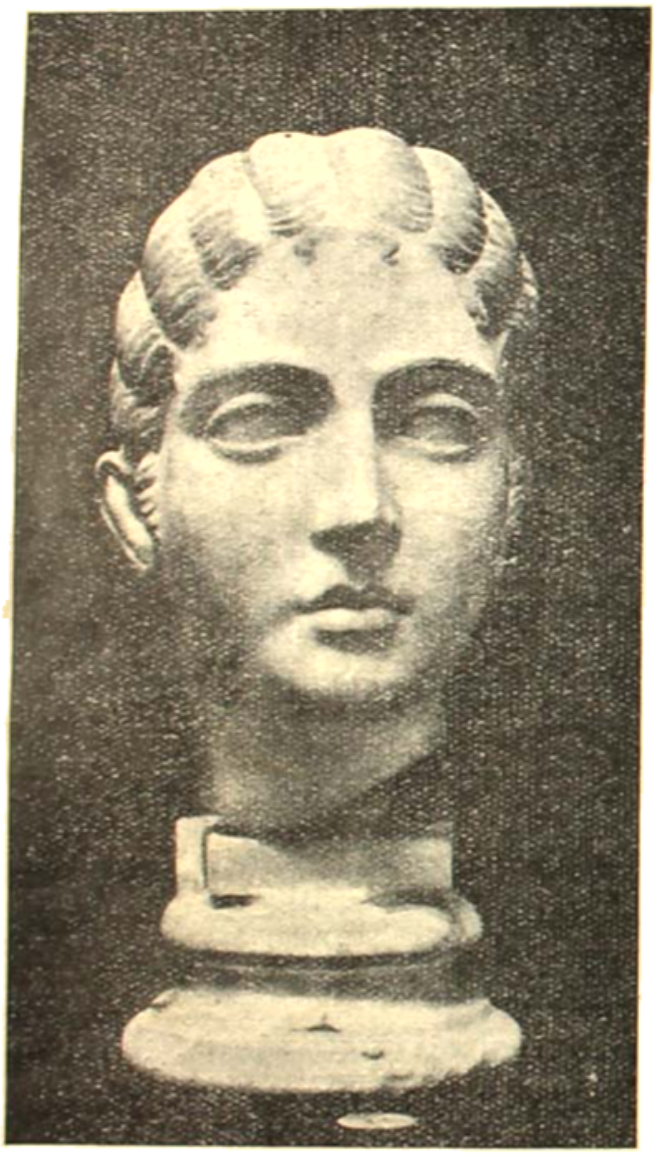

ইটালীর সিসিলি প্রদেশে আগ্রেয়া মন্দির খননকালে এই মূর্ত্তি তার মাল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহা মার্কেল পাথরে তৈয়ারি।

চীন-সম্রাট মিংটাই ইতিপূর্ব্বেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর একটা আকর্ষণের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেন। এক্ষণে পুরোহিত-দ্বয়ের মুখে উক্ত ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাবসম্পদের পরিচয় পাইয়া অশোকের নিঃস্বার্থ ত্যাগশীলতা ও তাঁহার কৃচ্ছ্র-সাধনার কথা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার উপর সঙ্ঘমিত্রাও তাঁহার ভ্রাতৃপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন—

"ভারতের রাজার ভাই ও ভগিনী ভোগসুখ, আত্মীয় স্বজন ও জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, দেবতার আদেশ বহন করিয়া আসিয়াছে—আজ এই সুদূর চীন দেশে। কে কোথায় আছ পাপী তাপী অনুতপ্ত জীব, কে কোথায় আছ ধনী দরিদ্র ইতর চণ্ডাল এস, তাঁহারা তোমাদের সকলকেই স্বর্গের সন্ধান বলিয়া দিবেন।" এই বার্ত্তা রাজা মিংটাই চীন দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল ভারতের রাজার ভাই ও ভগ্নীকে দেখিবার জন্য। রাজপ্রাসাদে মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। এই সমারোহের মধ্যে রাজা একদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

তৎকালে চীন-সম্রাট মিংটাই যে, একজন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও রাজনীতিবিশারদ রাজা ছিলেন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। যাহা হয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচেষ্টায় সংঘটিত হইত না, রাজা মিংটাই তাহা অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সম্মুখে রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় আর কেহ কোন আপত্তি করিতে সাহসী হইল না, বরং ইতর ভদ্র সকলেই ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইল।

এই রকম ভাবে রাজা মিংটাইএর সুকৌশলে সমগ্র চীন সাম্রাজ্য যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাবের বন্যায় প্লাবিত, সেই সময়ে গ্রীসীয় সভ্যতাও পাশ্চাত্য দেশ জুড়িয়া আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের জন্য উদগ্র আগ্রহে উন্মত্ত। তখন গ্রীসীয় পৌত্তলিকতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকায় প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ আলোকিত,—সেই সুদূর দেশের আলোয় আভা প্রাচ্যের আকাশপ্রান্তেও ঈষৎ লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে গ্রৈনিক ভাস্কর্য্য উন্নতির চরমোর্দ্ধে উঠিয়া সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। রাজা মিংটাই রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার মধ্যে তথাগত

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য তাৎকালিক বৌদ্ধভাবাপন্ন করিয়া ভারতীয় রুচি অনুযায়ী রচিত হইলেও তাহার মধ্যে স্বতঃই গ্রীসীয় পৌত্তলিকতার ছাপও আসিয়া পড়িয়াছিল।

এই সময়ে প্রায় একহাজার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, চীন দেশের মধ্যে ত্সাংসি (Shansi) নামক স্থানটি চৈনিক ভাস্কর্য্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে। রাজা মিংটাই এই ত্সাংসির ভাস্করদের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া এই স্থানের "ইয়াংকাং" পাহাড়ে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ উৎকীর্ণ করাইয়া ছিলেন। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই প্রাসাদটি ভারতীয় ও গ্রীসীয় স্থপতির অনুকরণে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সমস্ত প্রস্তরে বালুকাকণা মিশ্রিত থাকে, সেই প্রস্তরগুলি ভাস্কর্য্যশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ত্সাংসির ইয়াংকাং পাহাড় এই রকম ধরণের প্রস্তরে পরিপূর্ণ এবং চীনদেশে এই জাতীয় বালুপ্রস্তরময় পাহাড় যতগুলি ছিল, চীনের ভাস্করেরা সেই সকল পাহাড়ের গাত্রে, ভগবান বুদ্ধদেবের মন্দির ও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিতেন; তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি যেন প্রাণের পরশ দিয়া রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার বাহ্য রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইত।

এই সকল ভাস্কর্য্য বহু প্রাচীন কালের নিদর্শন হইলেও এবং প্রকৃতি বহু শতাব্দী যাবৎ ইহার উপর তাহার কঠোর ও ধ্বংসলীলা অব্যাহত ভাবে চালাইয়া আসিলেও, তাৎকালীন শিল্পচাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি এখনও প্রায় পূর্ব্বাদস্তর এগুলিতে বিদ্যমান আছে। এই সকল শিল্পচাতুর্য্যের আরও বিশেষত্ব এই যে, আজও পর্য্যন্ত ত্সাংসির ইয়াংকাং পাহাড়ের চতুর্দ্দিক পরিক্রমণ কালে, স্বতঃই মনে হয়, যেন সেই বৌদ্ধ যুগের আমলেই আসিয়া পড়িয়াছি।

রাজা মিংটাইএর রাজত্বের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ত্সাংসিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ফরহাদ্ ভাস্কর্য্যশিল্পে যে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ইয়াংকাং পাহাড়ের নিভৃত কন্দরে বসিয়া তিনি তাঁহার মানসী প্রতিমা শিল্পীর মূর্ত্তি খোদাই করিতে আরম্ভ করেন। কত ঝড়-জল-রৌদ্র কত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার এই কার্য্যের বিরাম ঘটাইতে পারে নাই। দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, শিল্পী তাঁহার একনিষ্ঠ একাগ্রতা ঢালিয়া দিয়া শিল্পকার্য্য করিয়াই চলিয়াছেন।

বিয়ন্ত দেবী : ইয়োলোয়ান শিল্পী লিকেং আং কোটি খোদিত মূর্ত্তি হইতে। পত্র বৎসর এপ্রিল মাসে আংগুকোটের বুদ্ধ। হইয়াছে।

কতকাল পরে মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু মূর্ত্তি তো কথা কহে না! এমন যারা জড় মানসী মূর্ত্তি লইয়া তিনি কি করিবেন?—নিশ্চয়ই শিল্পীর সাধনার কোন খুঁৎ আছে। ফরহাদ্ সেই খুঁৎটুকু ধরিবার জন্য দিবারাত্রি মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকেন—চাহিয়া চাহিয়া চোখ বুঝি ঝাপ্সা হইয়া গেল—ধারার পর ধারা নামিয়া বুঝি নদীর প্রবাহ সৃষ্টি হইল—তবুও

চাহিয়া আছেন—খুঁৎ আর ধরা পড়ে না। এই রকম ভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একদিন তিনি সম্বিৎহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন—চক্ষুটি ধ্যানস্তিমিতের মত মুদ্রিত হইয়া আসিল—বাহিরের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে, আর একটি দ্বারের আগল সহসা খুলিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া যে খুঁৎটুকু তাঁহার নজরে পড়ে নাই, এক্ষণে এই তৃতীয় নয়নটির দ্বারায় তাহা তিনি সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন। স্বর্গ হইতে মর্ত্য পর্যন্ত যে যোগসূত্রটি বিলম্বিত আছে, সেই যোগসূত্রটি ধরিয়া তিনি পাষাণের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাইলেন। তাঁহার সাধনার ধন—তাঁহার মানসী প্রতিমা জীবন্ত হইয়া উঠিল। সাধনার জগতে জন্মিয়া কত বড় বড় সাধক কত অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই ধূলি-কাদার জগতে কোন সাধক কখনও এত বড় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। এত বড় সিদ্ধিলাভ এই পার্থিব জগতে এই প্রথম ও এই শেষ।

কালে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, মালয়, কাম্বোডিয়া, ভারত-মহাসাগরস্থিত বহু দ্বীপ, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান—পশ্চিমে এবং উত্তরে হিন্দুকুশ এবং ককেশীয় পর্বতমালার অপর পার্শ্ব পর্যন্ত সমস্ত এশিয়া খণ্ড ব্যাপিয়া বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের অতুলন কীর্তি যে কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহার বহু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। সেই সকল রাজধানী শিল্প ও যেসকল অদ্ভুত কীর্তিকাহিনী—অতীত গৌরবগাথা ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া ও সেই সকল অতীতের স্মৃতি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, ভারতবাসীর চিত্ত উচ্ছ্বসিত, পুলকিত ও গৌরবোৎফুল্ল হয়।

আর একদিক

ই. এ. পাইরেল লিখিত "ইয়ঙার লাইজ অ্যাডভেঞ্চার (Yonder Lies Adventure)" হইতে একটি কাহিনী উদ্ধৃত হইল।—১৯০৫ সন: ফ্রান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া হাসপাতাল বাসিনী। ফ্রিয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন। সেবা করিতে করিতে একটি রোগীর নিকট হইতে একটি ছোট বাক্স পাইলেন। বাক্সটি খুলিয়া দেখিলেন, কি একটা কাচ জাতীয় বস্তু রহিয়াছে। ভাবিলেন কাচ ভাঙ্গিয়া গেলে রোগীকে ফিরাইয়া দিবেন। দেখা গেল, তাহা কাচ নয়, একটি হীরকখণ্ড। পরে ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরক 'গ্রেট কালিনান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ণ গোলা, একদিকে ৩ × ২ ইঞ্চি, অন্যদিকে ১।০ × ২ ইঞ্চি, ওজন ৩০২৪ ক্যারাট অর্থাৎ প্রায় তিন পোয়া। ট্রান্সভাল সরকার হীরকখণ্ড উপঢৌকন করিয়া সম্রাট এডোয়ার্ডকে উপহার পাঠাইলেন। কিন্তু কি করিয়া এত মূল্যবান হীরক পাঠানো হইল? অনেক পরামর্শের পর, কাগজ-পত্রে ইহা বিজ্ঞপ্তি করা হয়, গুরুত্ব সম্পর্কে প্রহরীর তত্ত্বাবধানে একটি চামড়ার থলিতে পুরিয়া ৩০ মাইল দূরবর্তী ইহাকে প্রিটোরিয়ায় আনা হয়। ওখান হইতে স্পেশাল ট্রেনে কেপ-টাউনে আনিয়া জাহাজে বিশেষভাবে নির্মিত একটি সিন্দুকে উহা রাখা হইল। দিবারাত্রি সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা হইল। সাদাম্পটনে আসার স্পেশাল ট্রেন। তাহার সঙ্গেও বিশেষভাবে বিশ্বস্ত পুলিশ ও ঘোড়সওয়ার প্রহরীর কঠিন তত্ত্বাবধানে চামড়ার থলি হাতে আসিল। বড় বড় সরকারী কর্মচারীর সম্মুখে থলিটা উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল—ভিতরে একখণ্ড কয়লা ছাড়া আর কিছুই নাই।

ওদিকে হীরকখণ্ডটি কার্টরাইটের হাতে সাধারণ পার্সেল-ডাকে ইংলণ্ডে আসিয়াছে। অবশ্য পোষ্টমাষ্টার জেনারেলও এসংবাদ জানেন না।

কোন্ দেশ সকলের চাইতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বেশী করিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলে বসিবে, আমেরিকা। ইহা সত্য নয়। সম্প্রতি প্রোফেসার মার্ক জেকার্সন একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ে দুইটি মহাদেশও সমপ্রধান। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, সকল দেশের বৈজ্ঞানিকের ফলে হইতে নির্বাসিত হইয়া দুইটি মহাদেশেই আশ্রয় পাইয়াছেন। তালিকার দ্বিতীয় নাম, জার্মানি। ফ্রান্সের জার্মান অপেক্ষা তিনগুণ বেশী আবিষ্কার করিয়াছেন। তৃতীয় নাম, ফ্রান্স। জার্মানরা ফরাসীদের অপেক্ষা চার গুণ বেশী আবিষ্কারের দাবী করিতে পারেন। চতুর্থ নাম, বৃটিশের। ফরাসীরা বৃটিশদের অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক আবিষ্কার করিয়াছেন। পঞ্চম নাম, আমেরিকার। বৃটিশরা আমেরিকানদের অপেক্ষা ছয় গুণ বেশী আবিষ্কারের দাবী করিতে পারেন।

রাশিয়ায় ধর্ম্ম

—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ যতকিছু অভিযোগ শোনা যায় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। রাশিয়ার আক্রোশ ধনীদের উপর যতখানি ঈশ্বরের উপরও ততখানি, দুইএর বিরুদ্ধেই সে তার সমস্ত শক্তি প্রচণ্ডভাবে নিয়োজিত করেছে। অথচ এ কাজ সহজে আলাদীনের প্রদীপের প্রভায় নিষ্পন্ন হয় নি। রাশিয়ার মুটে মজুর, চাষা, ধনী দরিদ্র, আপামর জনসাধারণ কেউই বৎসর ষোল পূর্ব্বে আজকের অবস্থা কল্পনা করতে পারত না। সেদিন তারা অন্যদেশের জনসাধারণের মতই ধর্ম্মের নামে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারত। ভারতবর্ষের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই যেমন আজো ধর্ম্মকে প্রাণের উপর স্থান দেয়, রাশিয়ার জনসাধারণও ঠিক তেমনিভাবে ধর্ম্মকে আঁকড়ে ছিল। তারা মানত, মাদুলী, হত্যা, বলি ষোড়োশোপচারে পূজা, ধ্যান সব কিছুতেই বিশ্বাস করত। পরিবারের কল্যাণ কামনায়, আগামী বৎসরের ভাল ফসলের আশায়, পুত্রের আরোগ্য উদ্দেশ্যে, বৎসর বৎসর নিয়মিত ডালি দিত স্থানীয় চার্চ্চে। উৎসব উপলক্ষে চার্চ্চগুলি যখন আলোক-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত, তার সোনাহীরার সজ্জার অঙ্গ থেকে যখন সে আলোক বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে ঠিকরে পড়ত—যাতে কলরবে, পুরোহিতদের বেশভূষায় জাঁকজমকে, ধূপের গন্ধে যখন একটা মায়াজালের সৃষ্টি করত—রাশিয়ান কৃষক দূর হ'তে দাঁড়িয়ে তা নির্নিমেষ নয়নে দেখত—ঈশ্বরের একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তি মনে মনে অনুভব করত—পুরোহিতকে দেবতার সাক্ষাৎ সজীব প্রতিনিধি ব'লে মেনে নিয়ে তাদের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে তাদের দীর্ঘ আলখাল্লার প্রান্তদেশ চুম্বন ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করত। গির্জ্জার বাইরে ঈশ্বরকে অনুভব করা তাদের কাছে অসম্ভব ছিল। পুণ্যকামনায় দীর্ঘপথ বহু আয়াসে অতিক্রম ক'রে তারা সুদূরস্থিত প্রধান প্রধান গির্জ্জায় পূজা দিতে আসত, ধর্ম্মোৎসবে যোগদান করত।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে ক্যাথলিক ধর্ম্মই রাশিয়ায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। দেশের রাজা ছিল রোমান ক্যাথলিক, কাজেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অন্য শাখা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মও ছিল অনাদৃত, লাঞ্ছিত, শক্তিহীন। বিপ্লবীরা জয়যাত্রার পরই প্রচণ্ডবেগে আঘাত করল এই ক্যাথলিক ধর্ম্মকে, কারণ তাদের মতে এই ধর্ম্ম আসলে ধনীদের ধর্ম্ম, এ ধর্ম্মে কেবল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। যে চার্চ্চে যত বেশী অর্থ দেবে সে তত ধার্ম্মিক। শুধু তাই নয় দরিদ্রকে ঠকাবার জন্য এই ধর্ম্ম ধনীদের হাতের যন্ত্র।

মস্কোর ধর্ম্মবিরোধী মিউজিয়মে দেখেছিলাম, এরা কেমন ভাবে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপায়। সেখানে গত মহাযুদ্ধের অনেকগুলি চিত্র রাখা হয়েছে—তাতে দেখিয়েছে, ধর্ম্মগুরু জারের সঙ্গে পরামর্শ করছে, কি ভাবে লড়াই জিততে হবে, পরে সন্ধ্যায় যুদ্ধশেষে রণক্ষেত্রে এসে যোদ্ধৃবৃন্দকে ঈশ্বরের নামে আশীর্ব্বাদ করছেন—বোঝাচ্ছেন এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারলে তোমাদের অক্ষয় স্বর্গ। ধর্ম্মান্ধ সৈনিকেরা তাই সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়ে স্বেচ্ছাচারী জারের জন্য অনায়াসে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। এ ছাড়া জার এবং ধর্ম্ম-গুরুর মধ্যে যে কতরকম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে তা তাদের ভিতরে যে সব পত্রাদি লেখালেখি হয়েছিল সেইগুলি সযত্নে প্রকাশ ক'রে দেখান হয়েছে। এই সব ধর্ম্মবিরোধী মিউজিয়মগুলিতে নানাভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ধর্ম্ম-গুরু ও অত্যাচারী জার চিরকালই পরস্পরের বন্ধু, কাজেই ধর্ম্ম হ'ল তাদের অর্থাৎ ধনীদের হাতের যন্ত্র। বলশেভিকরা এমন প্রমাণও হাজির করেছে যে, শেষ বিপ্লবের পূর্ব্বে যখনই জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠে কোন গোলযোগের চেষ্টা করেছে তখনই ধর্ম্মগুরু জারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাদের মনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য একটা না একটা ধর্ম্মোৎসবের আয়োজন করেছে এবং তার উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছে। বর্ত্তমান রাশিয়ার তীক্ষ্ণবুদ্ধি নেতারা সাধারণ-বুদ্ধি জনসাধারণকে বেশ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু ধর্ম্মগুরু চিরকাল তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে জারের সাহায্য ক'রে এসেছে, সেই হেতু ধর্ম্মগুরু তথা ধর্ম্মও তোমাদের শত্রু।

এই সব ধর্মবিরোধী আন্দোলনে কোথাও কিন্তু বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই নাই। ধর্মগুরু অন্যায় করেছেন ব'লে ধর্মও অপরাধী, এ কথা নিরক্ষর উত্তেজিত রাশিয়ান-দিগকে বোঝান সোজা হ'লেও অনুসন্ধিৎসুরা তা বিশ্বাস করবে না। ধর্ম বা ঈশ্বর ব'লে কেউ নাই এ যুক্তির স্বপক্ষে তারা দেখিয়েছে যে, পৃথিবীর জন্মের বহু পূর্বে সূর্য আকাশে ছিল, কাজেই Let there be light বলার সঙ্গে সঙ্গে জগত আলোকোদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে নি—বাইবেল উক্তির মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী যুক্তি আছে, কাজেই তিনি দেবতা বা সর্বশক্তিমান নন—তারা চিত্রে মডেলে দেখিয়েছে যে, পৃথিবী কিভাবে বাষ্প ও অগ্নির গোলকপিণ্ড থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ নিয়েছে; বাইবেল বলে, সূর্য পূর্বদিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যান, কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ দেয় অন্যরূপ, এতএব বাইবেল ভ্রান্ত।

ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের আরো অভিযোগ এই যে, তাদের ধর্ম বলে যে ভগবান তাঁর তিন পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, একজনকে তাঁর দিয়েছিলেন পাদরীর, অপরকে ব্যবসা বাণিজ্যের, তৃতীয়কে চাষ আবাদ করবার অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্ররূপে সকলকে কাজ ভাগ ক'রে দিয়েছেন, অতএব হে কৃষক মুটে মজুর, তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা ক'রে ক্ষত্রিয় হবার চেষ্টা ক'রো না। বলশেভিকরা বলে, এমন একচোখো যে ঈশ্বর, তাকে আমরা স্বীকার করি না, সে নেহাৎই ধনীদের কল্পনাপ্রসূত জীব। এতদিন সোনা-রূপার, হীরা-জহরতের চাকচিক্য দেখিয়ে ধর্মগুরুরা যে নিরক্ষর দরিদ্রকে ঠকিয়ে এসেছে, তার জন্যও বলশেভিকদের রাগ কম নয়। সোনার জলাটে হীরাচুণিপান্নার কাজ-করা একটা প্রকাণ্ড বাইবেল এই মিউজিয়মে রেখেছে, যেটা এক সময়ে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে কেবল মাঝে মাঝে বার করা হ'ত এবং যেটা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, যেহেতু বইটা অত দামী ও চাকচিক্যময়, সেটা বুঝি স্বয়ং যীশুরই লিখিত, কাজেই তা স্পর্শ করা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত। যে সব জিনিষ এমনি সব বুজরুকী ক'রে চালান হচ্ছিল সেগুলো যখন এখন অতি সাধারণ লোকেও অনায়াসে স্পর্শ করছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রয়েছে অথচ হাত পা খসে পড়ছে না—পুত্র কন্যা সুস্থ শরীরে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, তখন যে জনসাধারণ সমস্ত ধর্মটাকে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী মনে করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

যে বাইবেলকে রাশিয়ানরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর ব'লে মনে ক'রত—যার পঠন-পাঠনে অক্ষয় পুণ্য ব'লে ধারণা ছিল, বিদ্রোহের পর ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্যের অনটনের দিনে যখন সেই বাইবেলের পাতা পুড়িয়ে তারা সিগারেট খেল, অথচ তাতেও তাদের দৈনন্দিন সুখের বা স্বাস্থ্যের কোন হানিই ঘটল না—মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না, তখন যে এই সব অন্ধবিশ্বাসীর দল ধর্মের বুজরুকী দেখে ক্ষেপে উঠবে এ তো স্বাভাবিক। এরা ক্ষেপে গিয়ে কবরের উপরের পাথরগুলো কুড়িয়ে এনে বাড়ীর সিঁড়ি করেছে—ধোপার কাপড় কাচবার পাটা করেছে—অথচ একদিন ছিল, যেদিন তার উপর পা তুলতেও তারা থর থর ক'রে কেঁপে উঠত। পূর্বে এক একটা মঠের নীচে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধর্মগুরুদের মৃতদেহ সবাধারে রাখা হ'ত—দলে দলে লোক ভক্তিভরে সে সবাধার চুম্বন করেছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে ব'সে নীরব ধ্যান ক'রেছে, সাধ্যমত প্রণামী দিয়েছে—তারা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ক'রত যে, ঐ সব মৃত ধর্মগুরুদের আত্মাকে সাধনায় তুষ্ট করতে পারলে অক্ষয় স্বর্গ অনিবার্য। বিদ্রোহের বিপুল সংঘাতে যখন দেশের বড় বড় ধর্মমন্দির ভেঙ্গে পড়তে লাগল, তখন বিদ্রোহী বিপ্লবীরা এই সব সবাধারগুলো অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে আলোকে এনে উন্মুক্ত করলে। ধর্মাঙ্কের দল হায় হায় ক'রে উঠল—অভিশাপ দিল, কিন্তু যখন দিনের সুস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল যে, সবাধারগুলির অনেক সবই মাটির—আসল শব নয়, তখন প্রবঞ্চনার লজ্জায় ধর্মবিশ্বাসীর দল মুক হ'য়ে উঠল—ধর্মের বিরুদ্ধে তারাও ক'রল বিদ্রোহ।

রাশিয়ার ধর্ম হয়েছিল জীর্ণ, কাজেই তার মধ্যে গলদও ঢুকেছিল অসংখ্য, তাই বিপ্লবীরা সহজেই একে ধ্বংস ক'রে ফেল, তবু সহস্র বৎসরের সংস্কার ও শিক্ষায় যা মজ্জাগত হ'য়ে গেছে তার মূলোচ্ছেদ করা বড় সোজা নয়। এই রকম বুজরুকী ক'রত না এমন একটি ধর্মও রাশিয়ায় বর্তমান ছিল। তাদের বিরুদ্ধে লোককে সংঘবদ্ধ ক্ষেপান সম্ভব ছিল না—এরা প্রটেস্টান্ট। লোকে ক্রমশঃ এই ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তে লাগল। ধর্মকে এই সম্প্রদায় শুধু আচার অনুষ্ঠান-

গত ক'রে রাখে নাই—উপাসনার আসন কি রকম হবে, ধ্যানের করমুদ্রা কি রকম হবে, এসবে বেশী মাথা না ঘামিয়ে এরা ধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা ও প্রচার করত বেশী। শুধু উপাসনা ছাড়াও এই শ্রেণীর ধর্ম-মন্দিরগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, বিদ্যালয় ইত্যাদি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ক্যাথলিকদের মত এদের জনসাধারণের সঙ্গে শুধু লৌকিক সম্বন্ধ ছিল না—এরা অন্তরের যোগ সৃষ্টি করেছিল—তাই বিপ্লবী নেতারা প্রথমে এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না ক'রে বুদ্ধিমানের মত একে প্রশ্রয় দিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অভিযান আরম্ভ করলে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে। ধর্মমন্দির ধ্বংস হ'ল—যে উপাসনায় যোগ দিলে তার পিছনে খুনী আসামীর মত চর ঘুরতে লাগল, দেশের শাসনের সকল অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হ'ল—তাকেও 'বুর্জোয়া' ব'লে চিহ্নিত করা হ'ল। ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা 'বুর্জোয়া' মনোবৃত্তির পরিচায়ক ব'লে গণ্য হ'ল, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ এ অভিযোগ আনা হয়নি। অনেক সময় ষ্টেটের ষ্টেজ বা বক্তৃতামঞ্চ প্রটেষ্টাণ্টদিগকে বক্তৃতা দেবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তাদের সময় কেউ ধর্মবিরোধী কোন বক্তৃতা দিতে পারত না—বাইবেলের কোন সমালোচনা করতে পেত না—এখন সে সব অবাধভাবে চলতে লাগল। যে কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে পেত, কিন্তু তাতেও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম দিন দিন প্রসার লাভ করতে লাগল, কারণ সে ধর্মে তখনও ঘুণ ধরেনি—সে ছিল সজীব প্রাণবন্ত। কিন্তু এতে বলশেভিকরা ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। তাদের নীতিতে ধর্ম ব'লে কোন জিনিষ নাই—ধর্ম হ'ল মধ্যশ্রেণী লোকদের লুণ্ঠনের একটা উপায় মাত্র—দরিদ্রকে ঠকাবার একটা ছল বিশেষ। তাছাড়া প্রটেষ্টাণ্টদের অনেক মত বলশেভিকদের মতের বিরুদ্ধে, প্রটেষ্টাণ্টদের কাছেও বাইবেল শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ এবং জীবনের গতিনিয়ামক, কিন্তু বলশেভিকরা সেটাকে একদম বুজরুকী ঝুড়ো ভাবতে পারে না। এই ধর্মও অবাধ যৌন-মিলন, গর্ভপাত, জন্মনিরোধ ইত্যাদির ভীষণ বিপক্ষে, অথচ বলশেভিকরা এই সবই প্রয়োজনমত পুরাদমে চালাতে চায়। বলশেভিকরা চায় ইহলোকে পুরা মাত্রায় পরিপূর্ণভাবে ভোগ,—আর ধর্ম যেখায় পরলোক। ধর্ম ঈশ্বরকে মানে, তার পায়ে মাথা লোটায়, বলশেভিকরা কিছুকেই উপরে স্থান দিতে নারাজ, উপরের কিছু মানলেই নিজেদিগকে নীচের ব'লে স্বীকার করা হবে; ফলে দুটো শ্রেণী হবে।

প্রটেষ্টাণ্টরা যতই উদার হোক, তবু তারা স্বধর্মাবলম্বীকে আগে ভাই ব'লে কোল দেয়, কাজেই রাশিয়ার জনসাধারণকে

রাশিয়ার নব ধর্মের প্রবর্তক লেনিন।

যে শ্রেণীর মোহ থেকে মুক্ত ক'রবার জন্য গত বিদ্রোহ, অসংখ্যের রক্তপাত, তা পত হবে; আবার ধর্মগত শ্রেণী মাথা তুলবে। ট্রেডইউনিয়ন হ'ল শ্রমিকদের আড্ডা, এর সভ্যরা খালি শ্রমিক—প্রটেষ্টেণ্ট বা এথিষ্টই নয়। রাশিয়ার এক ধর্ম—কমিউনিজ্‌ম, সকলেই কমিউনিষ্ট, এর মধ্যে আবার যদি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম মাথা গলায় তাহ'লে বলশেভিকদের শ্রেণী-হীন জাতির স্বপ্ন মরীচিকায় মিলিয়ে যাবে, কাজেই তারা এবার প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধ'রলে। লেনিনের বিধবা পত্নী এই সময় প্রটেষ্টাণ্ট দিগকে লক্ষ্য ক'রে দেশ-বাসীকে সতর্ক করে দিলেন যে, এই ধর্ম ক্যাথলিকদের চেয়েও বিপ্লবের

পরিপন্থী। ১৯২৯ সালের এপ্রিলে এক নূতন আইনে এই ধর্ম্মকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে সমস্ত সভা সমিতি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এতদিন ধর্ম্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতা দেওয়া আইনে বাধত না, এখন খালি বিপক্ষে বক্তৃতা দেওয়া আইনানুমোদিত হ'ল। ১৮ বৎসরের কম বয়সী কোন ছেলে মেয়েকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়া রাশিয়ার অপরাধ, অবশ্য মা বাপ দিতে পারে, কিন্তু কোন চার্চ্চ বা অন্য কোন শিক্ষক দিতে পারে না।

সব চেয়ে প্রচণ্ড আঘাত এল···আর এক দিক থেকে—এই আইনে সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরকে কোন সামাজিক কাজ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ'ল, অর্থাৎ জন-সমাজের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ যোগসূত্র কেটে দেওয়া হ'ল। প্রটেষ্টাণ্টদের ক্লাব, সমবায়-সমিতি, হাসপাতাল, পাঠাগার বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, প্রকৃতপক্ষে এতে ঐ ধর্ম্মের ছদ্মপিণ্ড উপড়ে ফেলা হ'ল। এই সব প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণকে এই ধর্ম্মের দিকে বেশী আকৃষ্ট করত—তাদিকে সাক্ষাৎ সাহায্য দিয়ে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করত। এ ছাড়া এ আইনে ধর্ম্মযাজকদের উপর হুকুম হ'ল যে, তারা একাধিক ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতে পাবে না বা নিজেদের আজ্ঞা ছাড়া অন্য কোথাও ব্যাপ্টাইজ করা ইত্যাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাজে লিপ্ত হ'তে পাবে না। এই আইনে ধর্ম্মের শেষ শক্তিটুকুও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ল—ধর্ম্মমন্দিরগুলি পঙ্গু হ'ল।

তা ব'লে একথা যদি কেউ মনে করেন যে, ইচ্ছা করলেও রাশিয়ার কেউ উপাসনা করতে পায় না বা করলে পুলিসে এসে হাজতে দেয় তাহলে তার চেয়ে ভুল আর নাই। বলশেভিকদের ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা যেমন একটা নীতি তেমনি তাদের অন্যতম নীতি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা। যতদূর সম্ভব এবং যতক্ষণ না কোন রাজনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ততক্ষণ বলশেভিকরা কারুর ইচ্ছায় বাধা দেয় না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নয়। মস্কৌর মাঝে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রেড স্কোয়ারের বুকে একটি প্রধান ধর্ম্ম-বিরোধী মিউজিয়ামের পাশে আমি স্বচক্ষে চার্চ্চ দেখে এসেছি—সেখানে বুড়োবুড়ীরা আজও পরমভক্তিভরে হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছে আর বোধহয় এইসব বিকৃতমস্তিষ্ক বিপ্লবীদের সুমতির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। সেখানে আজও পুরোহিত যাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ দিচ্ছে—প্রণামী গ্রহণ করছে, কিন্তু তার অতীতের সে ঐশ্বর্য্য আর নাই, সে উৎসব-কলরোলও নাই, কোন রকমে টিঁকে আছে মাত্র। পূর্ব্বে জার-দত্ত যে সব জমিজমা চার্চ্চ ভোগ করত, এখন সে সব বাজেয়াপ্ত হ'য়েছে। গির্জ্জা-গুলি এখন ট্যাক্সের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না, বরং সে বেশ কঠিন ভাবেই তার কণ্ঠরোধ করছে। কেবল ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর উপরই এই সব চার্চ্চদের জীবন নির্ভর করে। কোন চার্চ্চ যদি ষ্টেট তুলে দিতে চায় তাহ'লে সেই চার্চ্চের মতটা সীমানা, সেখানকার সমস্ত লোকের মত নেওয়া হয়, যেদিকে ভোটাধিক্য হয় সেই মত কাজ করা হয়, জোর ক'রে কোন গির্জ্জা তুলে দেওয়া হয় না। তবুও একথা সত্য যে, ষ্টেটের সুদৃষ্টির অভাবে এবং তরুণদের বীতরাগের ফলে চার্চ্চের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হ'য়ে আসছে। যে তরুণী গাইডটি আমাকে সঙ্গে ক'রে সহর দেখাতে বেরিয়েছিল সে ঐ চার্চ্চটি দেখিয়ে বলেছিল, "দেখেলে বুড়োদের আড্ডা—তরুণরা কেউ আসে না।"

ধর্ম্মবিরোধী মিউজিয়ামে সেখানকার মহিলা গাইডটি অতি যত্ন সহকারে সমস্ত ঘুরিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে সেখানের পর পরম আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা তুমি ধর্ম্মে বিশ্বাস কর?"

আমি সহজ স্বরে বল্লাম, "হাঁা নিশ্চয়ই।" তার মুখের সে সমবদার ভাব দেখে আমি হাস্য সম্বরণ করতে পারি নাই। বেচারীর মুখের ভাবটি হয়েছিল, "বাঃ, আমার এত শ্রম সব পণ্ড, এই মূর্খ টার জন্য।"

সে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অর্দ্ধস্বগত ভাবে আবার বল্ল, "তুমি ধর্ম্মে বিশ্বাস কর? অত বড় একটা বুজরুকীতে?"

আমি উত্তর দিলাম, "ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কই? সবই ত ধর্ম্মযাজকদের বিরুদ্ধে আর তোমাদের প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে। আমার ধর্ম্ম আরও বিরাট, মহান, তোমাদের অভিযোগ তাকে আঘাত করে না। জাহাজের কাপ্তেন খারাপ ব'লে যে জাহাজও খারাপ তার কি মানে আছে? ভাল কাপ্তেনের হাতে পড়লে সে আবার নির্ব্বিঘ্নে সোজা পথে চলতে পারে।" সে বোধ হয় এত বড় একটা বেকুবের সঙ্গে আর আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করলে। ধর্ম্মভীরু, মামুলী-কবচে অনীহ আত্মা সম্পন্ন,

অন্ধ বিশ্বাসী নিরক্ষর রাশিয়ানদের যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তা বিস্ময়কর—অভূতপূর্ব। লেনিনগ্রাডের রাস্তায় এক ভিক্ষুককে দেখে আমার গাইডকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমাদের দেশে যদি কেউ বেকার নাই তবে ভিক্ষুক কেন?"

সে ঈষদুষ্ণ স্বরে উত্তর দিয়েছিল, "ওগুলো হতভাগা ধর্মযাজকের দল। চিরকাল পরের ঘাড়ে খেয়েছে এখন আর পরিশ্রম করতে অক্ষম। এত নীচ ওরা যে ভিক্ষের অপমান আলিঙ্গন করবে তবু শ্রম করতে সৃষ্টিত।"

আজ রাশিয়াবাসীরা ধর্ম নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না, তারা তাকে মৃত ব'লেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে কি আজ এত বড় একটা জাতি ধর্মহীন হ'য়ে চলেছে? আমরা অধর্ম বলতে যা বুঝি এরা কি আজ সকলেই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে? রাশিয়ার যতটুকু আমি দেখবার সুবিধা পেয়েছি, তা থেকে আমার এই মনে হয় যে, রাশিয়া একটি জীর্ণ সঙ্কীর্ণ অকেজো ধর্ম ছেড়ে এক বিরাট মহত্তর নবধর্মের দিকে এগিয়ে চলেছে। সে তার নিজস্ব একটি মহান ধর্মের সৃষ্টি ক'রে এক বিরাট আদর্শ সম্মুখে রেখে জয়-যাত্রায় পা বাড়িয়েছে। একটি বড় আদর্শ সম্মুখে ধ'রে দিতে না পারলে কোটী কোটী লোক আজ তাদের যুগ-যুগান্তের সংস্কারে গড়া ধর্মকে শুধু ভয়ে ছাড়ত না। এই ধর্মের জন্যই কত যুদ্ধ আজও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। যদি রাশিয়াবাসী তার ধর্মে আস্থা না হারাত, অতৃপ্তি বোধ না করত, যদি তাকে মনে প্রাণে অবিশ্বাস না করত এবং তার মধ্যে এত ভীষণ জাতিগত চোখের সামনে দেখতে না পেত, তা হ'লে এত বড় একটা প্রাচীন জাতিকে ধর্ম ত্যাগ করাতে গিয়ে হয়ত বিপ্লবীদিগকে আর একটি ঘরোয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হ'ত এবং তাতে যা রক্তপাত হ'ত সে রক্তের জবাবদিহি যে কে করত তা নিয়তিই জানে।

রেড স্কোয়ারের ধারে সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল, এখন ধর্মবিরোধী মিউজিয়ম (antireligious museum)।

খৃষ্টান ধর্মের মধ্যেই নানা শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও মুসলমান, য়ু, বৌদ্ধ ইত্যাদি অন্যান্য নানাজাতিতে রাশিয়া বিভক্ত ছিল। দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হ'ত, তাদিকে সহরের সীমানায় পর্যন্ত বাস করতে দেওয়া হ'ত না। কমিউনিজম এই সব ধর্মগত শ্রেণীবিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে এক বিরাট মহা জাতির সৃষ্টি করেছে, যারা কোন ধর্মই মানে না, নিজেদিকে কোন বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত ভেবে গর্ব করে না।

লেনিনগ্রাডে এক রাশিয়ান যুবকের সঙ্গে যখন ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি, "তোমরা কোন ধর্মই মান না?" সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই না।"—"তবে কি তোমরা এথিষ্ট (নিরীশ্বরবাদী)?"—"না সেও ত একটা ধর্ম ব'লে পরিগণিত, আমরা কোন ধর্মেরই নই।" বল্লাম, "লোকে ত সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কোন জাতি তখন কি বলবে?"

"রাশিয়ান।"

"কোন্ ধর্ম-মতাবলম্বী?"

"এমন কথা কোন রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করবে না।"

বল্লাম, "আমি বিদেশী, আমি জিজ্ঞাসা করছি—"

সে হেসে বল্লে, "বেশ, আমিও উত্তর দিচ্ছি, আমি কমিউনিষ্ট, কমিউনিজম্ আমার ধর্ম।"

বাস্তবিকই এ একটি ধর্ম, যদিও রাশিয়ানরা শুনলে

হাসবে, হয়ত বা আমাকে কোতল করবে, তবু আমি বলব যে এ ধর্ম প্রাচীন হিন্দু ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের মতই একটি ধর্ম। সমাজের সকলকে এমন সমমর্যাদা কোন্ ধর্ম দিয়েছে, কোন্ ধর্ম একে অধর্ম বলতে সাহস করবে? শুধু ধর্মগত, শ্রেণীগত সমানাধিকারই এ ধর্ম দেয় নাই, অর্থনৈতিক সাম্যও এর মূলনীতি। অন্য ধর্ম সামাজিক সমতার জন্য উপদেশ দিয়েছে, সহানুভূতির জন্য অনুরোধ করেছে কিন্তু এ ধর্ম জবরদস্তি ক'রে তা আদায় করেছে।

আমাদের প্রচলিত মাপকাঠিতে হয়ত কমিউনিজমের কোন কোন নীতিকে আমরা অধর্ম মনে করতে পারি, কিন্তু তাদের সুমহান আদর্শের কাছে আমাদিকে মাথা নোয়াতেই হবে। আমরা যখন শুনি, তাদের মধ্যে লৌকিক বিবাহবন্ধনের প্রয়োজন আইনমত দরকার হয় না, তখন শিউরে উঠি, যখন শুনি, এরা গর্ভপাতকে আইনানুমোদিত করেছে, তখন কল্পনার চোখে পতীর নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখি অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছতে রাশিয়ার আর কত দেরী, অথচ একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই যে, আমাদের সমাজে এবং পাশ্চাত্য সমাজে এই সব কীর্তিরই অন্ত নাই, সেগুলি হয় গোপনে বা জেনেও না-জানা ভাবে। সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন ধর্ম এবং সংস্কারও এই সব প্রয়োজনীয় পাপ সমাজ থেকে যখন দূর করতে পারে নি, তখন যদি রাশিয়ানরা একে প্রয়োজনমত প্রকাশ্যে করবার মত সংসাহস দেখায়, তাতে তাদিকে অভিসম্পাত দেবার কি আছে? অবশ্য তারা এ সব তথাকথিত পাপ করবার জন্য দেশবাসীকে কখনও উৎসাহিত করে না, বরং যাতে না করে সে জন্য শিক্ষা দেয়, প্রচারকার্য চালায়। এগুলোকে তারা অবশ্য পাপ ব'লে যে প্রশ্রয় দেয় না তা নয়, কারণ যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না, পুণ্যে যাদের আস্থা নাই, তারা পাপকে ভয় করবে কিসের জন্য? তারা সবটা ওজন করে বিজ্ঞানের এবং স্বাস্থ্যের তুলাদণ্ডে। তারা বলে, যাতে শরীরের পক্ষে অনিষ্ট করবে তা ক'রো না, কিন্তু যদি বেশী অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে তা হলে সামান্য ক্ষতি ক'রেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেওয়া উচিত। এ জন্য যদি আমরা তাদিকে দুর্নীতিপরায়ণ মূর্খ ব'লে গাল দিই তাতে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

রাশিয়া তার পুরাতন ধর্মের পরিবর্তে যে নূতন ধর্ম গ্রহণ করেছে তা শুধু মহত্তর আদর্শই তার সম্মুখে ধরে নাই, শুধু আদর্শ ছাড়াও মানবের মনের উপর ধর্মের যে সব অন্যান্য প্রভাব আছে সেগুলিও ধীরে ধীরে বিস্তার করেছে।

সারাদিনের বা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর মন্দিরে অথবা গির্জার স্বল্পালোক আবহাওয়ায় এসে স্তোত্রপাঠে বা উপাসনায় গম্ভীর মন্ত্রের মাঝে মানুষ নিজেকে যেন দিনের গ্লানি থেকে একটু হাল্কা মনে করে; একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আসে। পুরোহিতের জমকালো পোষাক এবং মন্দিরের মহার্ঘ পরিচ্ছদের মাঝে মানবের অভাবী মন বোধ হয় একটু সান্ত্বনা পায়, ঠিক যেমন ধনীর প্রাসাদ দেখতে দরিদ্রের একটা কৌতূহল থাকে। আমার মনে আছে, রোমে সেন্টপল গির্জা সম্বন্ধে কথোপকথনকালে এক বৃদ্ধা আমায় বলেছিলেন, "পোপ যখন তাঁর বিচিত্র বর্ণের পোষাক প'রে হাতে দণ্ড নিয়ে গম্ভীর ভাবে এসে ধর্মসভায় দাঁড়ান আর তাঁর জমকালো পিছনটি সোনালী সুবেশ অনুচরবর্গ ধ'রে চলে, আমার মনে কেমন একটা ঈশ্বরের অনুভূতি জাগে, পোপের মধ্যে যেন ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাই।" আসলে এই অনুভূতি একটা বিচিত্র গম্ভীর আবহাওয়ার জন্য জন্ম লাভ ক'রে, কিন্তু সাধারণে সেটাকে ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। রাশিয়া পুরাতন ধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তার এই সব আনুষঙ্গিক প্রভাবের স্থানপূরণের ব্যবস্থা করেছে। দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্যের জন্য সে প্রতি সন্ধ্যায় পার্কে পার্কে নানা উৎসব রেডিও ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছে, ক্লাব লাইব্রেরী করেছে; থিয়েটার, কনসার্ট পার্টি গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি করেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাশিয়ার পার্ক, কৃষ্টি-গৃহ (House of Culture), মিউজিয়ামগুলি সজীব হ'য়ে ওঠে। ধর্মোৎসবের বদলে দিয়েছে বিপ্লবোৎসব; তাদের নিজেদের ও প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজনের রক্ত দিয়ে পাওয়া যে বিজয়, তার উৎসবে রাশিয়াবাসী তাদের সমস্ত উৎসাহ উল্লাস প্রাণ ঢ'লে দেয়।

দেবতার ছবি, ক্রশ, আইকন ইত্যাদি সাজিয়ে মানুষ তার সৌন্দর্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আমাদের দরিদ্র ঘরে রাধাকৃষ্ণের একটা পট বা কালীঘাটের একটা মাটির পুতুল ছাড়া দেখা যায়, তারা সব সময় পূজা পায় না,

এসব সাজানো একটা খেয়াল, সৌন্দর্যানুভূতি চরিতার্থ করবার একটা উপায় মাত্র। এগুলোকে রাশিয়া আজ পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম বিপ্লবোৎসবের সময় বহু কৃষক ও শ্রমিক তাদের ঘরে, যত ক্রশ এবং ছবি ছিল সমস্ত বহ্ন্যুৎসব ক'রে তাতে অগ্নি দিয়েছে, কিন্তু তার বাইগায় স্থান দিয়েছে লেনিন ষ্টালিনের ছবিকে, বিদ্রোহের রক্তস্মৃতিকে, পঞ্চবার্ষিকী নীতির মূল-মন্ত্রকে। বাইবেলের পরিবর্তে মার্কসিজ্‌ম ও লেনিনিজ্‌মের গ্রন্থকে সাজিয়ে রেখেছে। তাই এই ধর্ম এত সহজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করতে পেরেছে। অনেকে বলশেভিজ্‌মকে খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে তুলনা করেন, তাঁরা বলেন, খৃষ্টান ধর্মের যেমন শেষ মীমাংসা বাইবেল, বলশেভিজমের তেমনি মার্ক্‌স ও লেনিনের মতবাদ, এমন কি এ দুটি যেন ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট। অন্য দেশবাসী যেমন ধর্মের মূলনীতি তাদের জীবনে অনুসরণ ক'রে জীবনকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, তেমনি রাশিয়ানরা বলশেভিজ্‌মের সূত্রগুলিকে তাদের জীবনে রূপ দিতে চেষ্টা করে। ধর্মের মধ্যে যেমন লোক পাপ ও পুণ্য দুটো দিক স্বীকার করে, বলশেভিকরা ঠিক পাপ ও পুণ্য নামে অভিহিত না করলেও নিজেদের নীতি সঠিক অনুসরণ করা এবং না করার মধ্যে ঠিক তেমনি একটা আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি অনুভব করে, এমন কি দোষস্বীকারের খ্রীষ্টীয় পন্থার প্রভাব থেকেও তারা মুক্ত হ'তে পারেনি ব'লে অনেকে অভিযোগ করে।

খ্রীষ্টানরা, এমন কি আমরাও বিশ্বাস করি পাপ ক'রে অনুতাপ করলে পাপের ক্ষয় হয়; খ্রীষ্টানরা চার্চে এসে পুরোহিতের সামনে নির্জনে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলেই ভগবান তাদের দোষ ক্ষমা করেছেন ব'লে ধরে নেয়; বলশেভিকরাও তেমনি গোকাল সভায় তাদের শ্রেণীভুক্ত অপরাধীদের দোষস্বীকার শোনে। সে সভায় শুধু কমিউনিষ্ট বা বলশেভিক নয়, আজও যারা দলী এবং "কুলক" (Kulaks) ব'লে গ্লানির চিহ্ন বহন করছে, তারাও উপস্থিত থাকতে পারে এবং অপরাধী নিজের দোষ বর্ণনা করার পর যে যেমন পুশী তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে; সে কোন অংশ গোপন ক'রে থাকলে তৎক্ষণাৎ তা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। এ স্বীকারোক্তি করলেই যে খ্রীষ্টান ধর্মের মত ক্ষমালাভ করা যায় তা নয়; সমস্ত অপরাধ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা শোনার পর যদি দলপতিরা পুনরায় তাকে সঙ্ঘশ্রেণীভুক্ত করতে রাজী হন, তবেই, নইলে সে পতিত হ'য়ে রইল। কিন্তু এসব সামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে বলশেভিজ্‌মের আকাশ-পাতাল তফাৎ। ধর্ম বলতেই আমরা মনে করে নিই, এক বিরাট অসীম দেহাতীত মনাতীত মহাশক্তিকে, যার খেয়ালে এই পৃথিবীর উপর ওলটপালট চলেছে; ধর্ম বলতে আমরা ইহ জগৎ ছাড়া অন্য আরো কাল্পনিক জগতের কথা মনে করি, যেখানে পুণ্য বা পাপের মাত্রাবিশেষে মৃত্যুর পর আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে; ধর্মের মধ্যে আমরা মনুষ্যশক্তির উপরওয়ালা এক অদৃশ্য মহাশক্তিকে স্বীকার করি, এসব বাদ দিলে আমাদের কাছে ধর্ম তার অর্থ হারায়। কিন্তু রাশিয়া এ সবকেই নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, তাদের ধর্মের মধ্যে মানুষের উপরের কোন শক্তির স্থান নেই—যদি তাদের কেউ দেবতা থাকে, তবে সে বিজ্ঞান, যদি তাদের কোন পীঠস্থান থাকে তবে তা বৈজ্ঞানিক আমেরিকা। মানবের সামাজিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানকে এবং তার প্রকৃতিকে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর ক'রে নিয়ে যাওয়াকে, পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও সাম্যের প্রচারকে রাশিয়া ধর্ম ব'লে মেনে নিয়েছে, তার বাইরের সব কাল্পনিক জিনিষকে সে বাদ দিয়েছে।

আর একদিক

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজ কোনও বই খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি নিজের লেখা বই দেখিয়া পাতা উলটাইয়া সেইটা দেখিতেছিলেন। কয়েক বৎসর আগে এক বন্ধুকে বইখানি তিনি দিয়াছিলেন—বইখানির প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের হাতে লেখা দেখিলেন,—লেখা আছে, 'বার্ণার্ড শ'র শ্রদ্ধার দান।' বইখানি তিনি কিনিয়া পুনরায় সে-বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন, এবারে লিখিলেন—"পুনশ্চ করিয়া শ্রদ্ধার দান :—বার্ণার্ড শ'।"

চণ্ডীদাস ও বাসুলীদেবী *

—শ্রীহরিদাস মিত্র

বাহুড় ভ্রমণ করিয়া চণ্ডীদাস ও বাসুলী দেবী সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সুধীবর্গের অবগতির জন্য, তৎসমুদায় নিম্নে বিবৃত করিলাম। ১৩৩০ সালের ৬ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এ সকল সম্বন্ধে স্বকীয় একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত কিছু কিছু নূতন তথ্যও আছে।

পূর্বতন স্থিতি

ইতিপূর্বে চণ্ডীদাসের ধর্মমত এবং বাসুলী দেবী সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই বাসুলী দেবীর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ব-লেখকদিগের অধিকাংশ উক্তি কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে তাহাদের আলোচনা করিতেছি।

(ক) "এক সময়ে গৌড়-বঙ্গে বৌদ্ধদিগের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বসুদত্ত নামক ধর্ম ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রবারাহেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান প্রচার-কেন্দ্রগুলিতে বসুদত্ত ও বজ্রেশ্বরী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্রসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে।"[১]

(খ) "বাসুলী ও বিশালাক্ষী দেবীর দুই পৃথক আবরণ দেবতা :—

বাসুলীর ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র।

"অত্র বাসুলিং পূজয়েৎ।

ওঁ আয়াহ্ন ভগবত্যম্বিকে ভূমণ্ডলে ভূতলে ভগবতি।
সিন্দূরারুণবর্ণা প্রবিকটদশনা ত্রিনয়না চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাড়মুণ্ড পদ্মযুগকমলে মুদ্গরং খাদয়ন্তী।
কৃষ্ণ বস্ত্রে চ পরা শিব শিব রবিরং বাসলী পাতু সা নঃ।
ওঁ বাসলৈ নমঃ।
ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং পরাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সবিত্রীং সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসমপ্রভাং।
আইতনুমহাদেবীং অর্চয়েন্মঙ্গলকারিণীং।
অসিকপালিনীং দেবীং কালাং কিঙ্কিণীধারিণীং।
আবাহয় চণ্ডিকে দেবি সন্নিধিং কুরু।
ইত্যাবাহনং। সর্বোপচারৈরভ্যর্চ্য ইত্যাদি।" [২]

(গ) "কিন্তু যে স্থানে দেবীর পূজা হয়, তাহা এই :—

"আম্রদেবীং বিশালাক্ষীং পরমকরুণাং চতুর্ভুজাং দ্বিনয়নাং চণ্ডিকাং দেবীং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং ত্রিসন্ধ্যে দ্বিনয়নে একবক্ত্রে জপাদিনী ত্রিনয়নে পদ্মাসনে পদ্মিনীপত্র শিরোপরি সকলে বিকলে পূর্ণঃ ওঁ হ্রীঃ বিশালাক্ষী দেব্যৈ নমঃ।

মূর্খ পূজকের দ্বারা ধ্যানটী বিকৃত হইয়াছে কিন্তু উপায় নাই"।"

(ঘ) "দেবীর বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। লোকে ইহাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলিয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস ধনী লোক ছিলেন না যে, তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এত বড় হইবে। আমার মনে হয় যে, ঐ স্তূপটিই বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।"

---

* আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ও ফ্রেমিক মূর্তি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ঈশানপুরের নানুর গ্রামে ১৩৩৯ সনে সাধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু ফাল্গুন ১৩২৯ সনে সরস্বতী পূজার দিনে যে ইহা পূর্ণ হইয়াছিল। ঐ বর্ষে ৮ই মাঘ সরস্বতী-পূজার দিনে, পূর্বাহ্ণ-কালে, প্রচুর পরিমাণ দেবীর পূজা ও পূজনীয় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীপ্রভাতমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমি পদব্রজে শান্তিনিকেতন হইতে নানুর যাত্রা করি এবং প্রায় মধ্যাহ্নে তথায় উপস্থিত হইয়া, বর্ষাদি সমাপন-পূর্বক, পূর্বাহ্ণ অপরাহ্ণ-কালে তথা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি প্রায়েরেলা শিউড়ি আসি।

১। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত। ৺ সং: পঃ মন্দির হইতে প্রকাশিত। ১৩২৩। ভূমিকা ৫২ পৃষ্ঠা।

২। ধ্যান ইষ্টে দেওয়া হইল। (গ) অংশে দ্রষ্টব্য।

৩। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ভূমিকা পৃঃ ২১।

'ধর্মমঙ্গলবিধান' (ঃ সাঃ পঃ) পৃঃ ১০৩। ৩১। অনুঃ।

৪। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'। শ্রীবিমলারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্তৃক সম্পাদিত। ৺ সং: পঃ মন্দির হইতে প্রকাশিত। ১৩২১।—ভূমিকা ২৪ পৃষ্ঠা।

দেবীমূর্ত্তি।—আড়াই পোয়া পরিমিত একখানি কাল পাথরে খোদিত। মহাদেব বসিয়া আছেন; তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম বাহির হইয়াছে সেই পদ্মের উপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি আসীনা। দেবীর বাম পদ পদ্মের উপর ও দক্ষিণ পদ মহাদেবের উরুদেশে স্থাপিত। দেবীর তিন হাতে বীণা ও দক্ষিণের দুইটী হাতের মধ্যে একটীতে জপমালা[১]।"

(ঙ) ধর্ম্মপূজাবিধানে বিশালাক্ষীর যে ধ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা 'তন্ত্রসারে' লিখিত ধ্যান হইতে ভিন্ন।

ওঁ বিশালাক্ষী: পুরুষ:।
ওঁ প্রাত:কালে কুমারীকুসুমকলিকা জপমালাজপন্তী।
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতকমলে চারুনেত্রা বিশালা।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতস্তনযুগা মুণ্ডমালাপতাকা।
সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবনজননী যোগিনী যোগমুদ্রা।
ওঁ বিশালাক্ষৈ নম:।
ওঁ বিশালাক্ষী দেবী বিশাল নয়নোজ্জ্বলে (ম অবোর্জ্জলে)
ভৈরবাংশ (শ) শূন্যে স্থিতে) দেবী বিশা (শা)লাক্ষী
নমঃস্তুতে।
বিশালাক্ষৈ নমঃ।" [২]

তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর ধ্যান[৩]

"বাসুদেবীং বিশালাক্ষীং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিভূজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ-খেটকধারিণীম্।
দানবানাং মহাভীমাং মহাবিঘ্নবিনাশিনীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্।
মুণ্ডমালাকলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং ভজেৎ।"

আলোচনা।

এক্ষণে পূর্ব্বমত সকলের আলোচনা করা যাইতেছে।

চণ্ডীদাস যে সহজ মতাবলম্বী ছিলেন একথা বোধ হয় প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তন্ত্রক্ত সহজ মতের সহিত বৌদ্ধ সহজ-যানের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা যথোচিতরূপে আলোচিত না হইলেও, তদুভয়ের মধ্যে কিছু না কিছু যোগ ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ও বেণ্ডাল সাহেবের চেষ্টায় অনেকগুলি সহজ-যানের গ্রন্থ সুলভ হইয়াছে। সহজ-যানের সহিত চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমতের যোগ স্বীকার করিলে বজ্র-যানের সহিত তাহার যোগ প্রমাণিত হইতে পারে না। অধিকন্তু (ক)-অংশোক্ত 'সঙ্কেতবাণী' শব্দ যে 'বাসুলী' রূপে পরিণত হওয়া সম্ভব, ইহা কোনও শব্দশাস্ত্রবিৎ (philologist) স্বীকার

বাসুলী দেবী, নান্নুর হইতে সংগৃহীত চিত্র।

করিবেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখা যাইবে এরূপ কষ্টকল্পনার প্রয়োজনও নাই।

(খ), (গ) এবং (ঙ) অংশে লিপিবদ্ধ ধ্যানগুলি পরস্পর তুলনা করিলে দেখা যাইবে, সবগুলিই শক্তিমূর্ত্তির বর্ণনা। নান্নুরস্থ দেবীমূর্ত্তির নিকটেও বলিদান করা হয়। সুতরাং এ পূজা সাত্ত্বিকী পূজা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যে ধ্যানে নান্নুরে বাসুলী মূর্ত্তির

১। চণ্ডীদাসের পদাবলী। ভূমিকা ২৪ পৃষ্ঠা।
২। 'ধর্ম্মপূজাবিধান'। ৯১ পৃষ্ঠা
৩। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'। ২৪ পৃঃ হইতে।

পূজা হয় উহার সহিত প্রতিমার যথার্থতঃ মিল নাই। অধিকন্তু ধ্যানটী বিকৃত। উহাতে চণ্ডিকাদেবী বর্ণিতা হইয়াছেন। বিশালাক্ষী শব্দ প্রথমে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলেও শেষে দেবীর নাম-বাচক রূপেই গৃহীত হইয়াছে। মূর্ত্তি ধ্যান শ্লোকগুলি সাধারণতঃ শুদ্ধ ও মধুর সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ অশুদ্ধ ধ্যান বাসুলী দেবীর আদি ধ্যান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(গ)-অংশে দেবীমূর্ত্তির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা একেবারেই ভুল। পাদপীঠে যজমান বা দানপতি (donor) ওরফে (নাম্না বা) বস্ত্রোপহার লইয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পার্শ্বে ক্ষোদিত উৎপলোপরি (পদ্ম নহে) দেবীর দক্ষিণ পদ স্থাপিত। স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রথম করদ্বয়ে বীণা, এবং দক্ষিণাধঃ করে অক্ষসূত্র বা জপমালা, আর বামাধঃ-করে পুস্তিকা গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণ এবং বাম অধঃকরদ্বয় উত্তোলিত করিয়া ধরা হইয়াছে[৮]।

বাসুলী মূর্ত্তির সহিত অন্য দুইটি সদৃশ মূর্ত্তির চিত্রও তুলনীয়[৯]।

নান্নুরের মূর্ত্তিটী ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও সুন্দর ও পুরাতন। ছোট বলিয়াই চালচিত্রাদি অঙ্কিত হয় নাই। মূর্ত্তিটীর ক্ষুদ্রাকৃতি (এবং ভূষণাদির অপ্রাচুর্য্য) দেখিয়া শিল্পশাস্ত্রোক্ত প্রামাণ্যানুসারে[১০] উহাকে গৃহে উপাসিতা চলপ্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

দেবীর বাড়ির সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ, যাহাকে লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা বলিয়া থাকে, মন্দিরবিশেষের ভগ্নাবশেষ হইলেও, ক্ষুদ্র চল (portable or movable) প্রতিমার জন্য এরূপ বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইবার প্রমাণ নাই। উপরোক্ত কারণে এ ভিটা বাসুলীদেবীর প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ হইতে পারে না।

সদৃশমূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে যাহাকে বাসুলীমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করা হয় তাহা বস্তুতঃ বাক্ বা সরস্বতী মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ চণ্ডীদাস ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট বাসুলীমূর্ত্তির যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে নাই।

নান্নুর দর্শনকালে কয়েকটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তৎসম্পর্কে কতিপয় সংশয় অনুভব করিয়াছি। নিম্নে সে সকলের আলোচনা ও সমাধান প্রদত্ত হইল।

(১ম) চণ্ডীদাসের ভিটার উপর একটি অল্প দিনের বটগাছ আছে। এই স্থানকে বল্লীতলা বলা হয়। তদ্ভিন্ন তিনটি ভগ্ন বা ঈষদ্ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে এবং কোন বৃহৎ মূর্ত্তিবিশেষের ভগ্নাংশ, সিন্দূরলিপ্ত হইয়া বল্লীদেবী বলিয়া পূজিত হইতেছে দেখিলাম। শেষোক্ত মূর্ত্তিটীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে মস্তক মাত্র সম্পূর্ণ আছে। দেখিয়া বুঝা গেল, পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তিটীর প্রমাণ প্রায় মনুষ্যতুল্য ছিল। শ্মশ্রুগুম্ফহীন কুমারোচিত মুখমণ্ডল হইতে এখনও যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মস্তকে পঞ্চচূড়া ও অন্যান্য ভূষণ শোভা পাইতেছে। বাহুর কয়েকখানি ভগ্ন অংশও দেখিলাম। উহাও ভূষণযুক্ত এবং একই মূর্ত্তির বলিয়া বোধ হইল। মূর্ত্তিটীর চারি হাত ছিল। তাহাদের আকার এবং গুরুত্বও কম ছিল না। দূর হইতে ভাঙ্গিয়া, ভিটার উপর উহাকে আনিয়া রাখার কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তবে কি ঐ মূর্ত্তিটী ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল? পঞ্চচূড়া ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিত কুমার লক্ষণাক্রান্ত ঐ প্রতিমাটি কোন্ দেবতার হইতে পারে! উহা কোনও ব্রাহ্মণ্য দেবতা মূর্ত্তির সহিত মিলিল না। কিন্তু ঠিক ঐরূপ মূর্ত্তির ছবি চিত্র পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম[১১]।

৮। চণ্ডীদাসের পদাবলী। বাসুলীমূর্ত্তির চিত্র দ্রষ্টব্য।

৯। Varendra Research Society, Rajshahi. Image No. II (i) 176. 'Modern Review', 1923 February, P. 195, Fig. 1.

১০। "দ্বিমূর্ত্তিপরিমাণং। বৃহৎপুরাণে
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাদারভ্য বিতস্তিং যাবদেব তু।
দৃশ্যতে সা প্রতিমা স্যাদ্যা নাধিকা শতেষু ঃ। ১০।
অ যোড়শাব্দ প্রমাণৈঃ কর্ত্তব্যা নাধিকা ততঃ।
মধ্যেত্তমকনিষ্ঠা তু ত্রয়ো বিন্যাসভেদাতঃ। ১১।"
'বৃহৎপুরাণম্'। বঙ্গবাসী সংস্করণ। কলিকাতা। ১৩১৩। (২২—২৩ শ্লোক) ২৫৮ অধ্যায়।
"শ্রীশ্রীচণ্ডিকাবিলাসঃ"। ১৩০০—০১। ১৮শ বিলাসঃ।
"শ্রীকল্পীশ পঞ্চবাণে।
অঙ্গানাং চলনৈশ্চৈব বিম্বিকো বিষ্ণুরাটতে।
অচলো লালিপুত্রঃ প্রাকৃষ্টাকলক্ষণঃ। ১০৪।
প্রাসাদে হচলস্তত্রস্থ স্তেন চ চলাচলঃ।
সভামধ্যে চলো মূলাধারঃ কটে চলঃ।
। ১০৫।"
'শ্রীশ্রীচণ্ডিকাবিলাসঃ'।—১৮শ বিলাসঃ।

১১। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বিমলাবিনোদন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'গৌরব-বিভব'। ২য় খণ্ড। শ্রীহট্ট অনুসন্ধান সমিতি। ১৩২৯ সাল। (ক)—২৩

(২৯) পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমরা সরস্বতী পূজার দিনে বাগ্‌মুরে গিয়াছিলাম। মুদ্রিত পুস্তকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তন্ত্রতা দেবীমূর্ত্তি সরস্বতী। হয় ত তাহা চণ্ডীদাসেরই উপাস্যা। সুতরাং অঞ্জলি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু পূজার বিলম্ব ছিল বলিয়া প্রথমে আমরা বাসুলীদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি দেখিলাম। তখন পূজক সেই পূর্ব্বোক্ত অশুদ্ধ ধ্যান-শ্লোকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন। তৎপরে আমরা স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, বাসুলীদেবীর পূজা শেষ হইয়া মন্দিরদ্বার বন্ধ হইয়াছে। মন্দিরদ্বার আর খোলা হইল না। তজ্জন্য আমরা, পার্শ্বস্থ পূজার দালানে, আবার মৃন্ময়ী সরস্বতীর পূজা হইতেছে দেখিয়া, সেখানেই অঞ্জলি দিলাম।

এবার কিন্তু পূজক আমাদিগকে এক নূতন ধ্যান-শ্লোক পড়াইলেন। যথা—

"ওঁ শুক্লাং শুক্লবিশোভিতাং শুভকরাং।
মুক্তাক্ষমালাবিভাং সস্মিতাং সিতাম্বরে।
বিদ্যাকল্পলতাস্বরূপিণীং পুস্তকীং।
সকলবিঘ্নবিনাশে পাতু বাগ্দেবতা নঃ।"

ধ্যানটি সম্পূর্ণ নূতন দেখিলাম, তজ্জন্য গৃহে আসিয়া সমস্ত নিবন্ধ খুঁজিতে লাগিলাম। পূজক এই ধ্যান কোথায় পাইলেন, বাহির করিব ভাবিলাম। কিন্তু কোনও সরস্বতী-ধ্যান ও রূপ না পাইয়া, আদ্যপৃষ্ঠা হইতে 'তন্ত্রসার' খুঁজিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে, সেই পুঁথিতে, বাগেশ্বরী প্রকরণ মধ্যে ঐ ধ্যানটি দেওয়া হইয়াছে। পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

ঐ ধ্যানটি ক্রমে ধর্ম্মপূজাবিধানেও পাইলাম[১৭] কিন্তু তথায় উহা আরও বর্দ্ধিতাকারে আছে, এবং সরস্বতীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা গেল। যথা—

"ওঁ সরস্বত্যৈ পুস্তকং।
ওঁ তদ্ধ
সন্নিধ (ধ) হি
নমঃ।"
"ওঁ বিদ্যাকল্পলতাং পুস্তকীকোপশোভিতাং
ধবলবসনধরাং বালচন্দ্রধরাং।
বরদাভয়করাং শুভ্রহারভূষণাং
জগতি জিতসরস্বতীং ভারতীং ভজে।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

ইতিপূর্ব্বে বাগীশ্বর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে[১৮]।

পূর্ব্বে[১৯] বারাগ্রামের মূর্ত্তিটিকে বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের প্রতিমা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলাম। 'সাধন' সমূহে মঞ্জুশ্রী পঞ্চ-চীর[২০] বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোষে হেমচন্দ্র এই 'চীর' শব্দে 'চূড়া' অর্থ করিয়াছেন। মঞ্জুশ্রীর অপর নাম মঞ্জুঘোষ। 'তন্ত্রসারে' মঞ্জুঘোষের এক ধ্যান পাইলাম। যথা—

"শশধরমিব শুভ্রং খড়্গ-পুস্তাক্ষপাণিং।
মুকুটবরবিভাঢ্যাং পঞ্চচূড়ং কুমারং।
পুরুতরমনুরূপং পদ্মসংস্থাভিরামং।
মুনিভিরনুনতং মঞ্জুঘোষং নমামি।"

(৩১) মঞ্জুঘোষের অপর নাম "বাগীশ্বর।" ফুসে সাহেবের মতে—সরস্বতী, বৌদ্ধগ্রন্থে বাগীশ্বরী নামে অভিহিত

সংখ্যক চিত্র। ৭৪ পৃঃ। বারাগ্রামের দুর্গাদেবী। (খ) —২৭ সংখ্যক চিত্র। ৭৭ পৃঃ। বারাগ্রামের একটি মূর্ত্তি।

'আমরা ও মর্ম্মবাণী'। প্রবাসী, ১৩২৯। পূর্ব্বোক্ত ঐতদ্বিষয়ক সমস্ত মতামত এখানে দ্রষ্টব্য।—ঐ প্রবন্ধে মূর্ত্তি দুইটির স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে।

১৭। 'ধর্ম্মপূজা বিধান'। পৃঃ ১০৩
সম্ভবতঃ দুইটি বিভিন্ন ও পৃথক ধ্যান একত্র দেওয়া হইয়াছে।

১৮। বাগীশ্বরী মূর্ত্তি। Indian Museum হইতে ডাক্তার হেরাস মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১৯ নম্বরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত।

'বাঙ্গালার ইতিহাস'। ১ম ভাগ। রমাপ্রসাদ চন্দ কৃত। ১৩২১। চিত্র ১১।

(খ)—Vagisvari. Varendra Research Society, Rajshahi. Image No. 110 A (g). Vide Catalogue, 1919.

১৯। 'আমরা ও মর্ম্মবাণী'। প্রবাসী, ১৩২৯।

২০। Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde' par A. Foucher. Part II p. 42 ff.

ফুসে সাহেব পঞ্চ-চীর শব্দের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ত্রি-চীর বা ত্রি-চীবর শব্দ বৌদ্ধগ্রন্থে পরিচিত আছে। কিন্তু সেরূপ অর্থে পঞ্চ-চীর প্রযোজ্য নহে। তজ্জন্য তাঁহাকে কোন মূল খুঁজিতে হইয়াছে। মূলে 'চীর' শব্দ, 'চূড়' শব্দ স্থানে পঠিত হইয়া থাকিবে। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানে স্পষ্টই 'চূড়' আছে।

হওয়ায়, বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর মধ্যে যে যোগ-বন্ধন রহিয়াছে তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়[১৬]।

বীণাবাদিনী সাত্ত্বিক মূর্ত্তি বাগীশ্বরীর সাধন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তবে কেবল মাত্র দুইটি বাগীশ্বরীর[১৭] রাজসিক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উভয় প্রতিমায়, দেবী সাংঘাতিকা (সাঁড়াশী) দ্বারা অসুরের (?) জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত, দশমহাবিদ্যান্তর্গত 'বগলা' মূর্ত্তির তুলনা করা যাইতে পারে। ৭ম শতাব্দীতে বলিয়াছেন যে, দুষ্টপ্রযুক্তা বাক্ প্রয়োক্তার গো-ত্ব সূচিত করে[১৮]। সুতরাং পশুবৎ অসুরের কলুষিত জিহ্বা উৎপাটনকারিণী বাগ্দেবতা ছেদন করিবেন আশ্চর্য্য কি!

সৌভাগ্যক্রমে শাক্ততন্ত্রে বাগীশ্বরীর আরও ধ্যান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর মধ্যে যোগ-বন্ধন সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয়। যথা—

তন্ত্রসারে।

"অথ বুদ্ধ্যাদি পঞ্চমূর্তিঃ

বাগীশ্বরঃ সদাশিবঃ

"বাগীশ্বরীমুমাখ্যেয়ং বাগীশ্বরবিলোচনাং। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তং ইতি বাগীশ্বরী বাচা ঈশ্বরী বাগীশ্বরঃ তেন ইতি বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ঈশ্বরীমাং পূজয়েৎ।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের টীকাকার[১৯] "বাগীশ্বরেণ ব্রহ্মণা সংযুক্তাং" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তদন্তরে[২০] বাগীশ্বরীর ধ্যান এইরূপ—

"ওঁ বাগীশ্বরীমুমাখ্যাং বাগীশ্বরবিলোচনাং।
বাগীশ্বরেণসংযুক্তাং ক্রীড়ান্তমসিতাঙ্গং।
ত্রিনয়নাকালিকাস্বরূপাং।"

এই ধ্যানে বাগীশ্বরীকে শক্তিমূর্ত্তি ভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। টীকাকার হরিহরানন্দ বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে ব্রহ্মা ও সরস্বতী বলিয়া জানিতেন। তৎপূর্ব্বে তন্ত্রসার-কর্ত্তা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দও বাগীশ্বরী এবং মহাযোগকে ইচ্ছায় অথবা না জানিয়াই হউক ব্রহ্মণ্য দেবতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

(৪র্থ) সহজ-যানে কয়েকটী যুগ-নদ্ধ বা শক্তিযুক্ত দেবতা আছে। তন্মধ্যে "হেরুক বা হেবজ্র" একটি প্রধান। তাঁহাকে সাধারণতঃ স্বীয় শক্তির সহিত কুলবন্ধনে যুক্ত রূপে কল্পনা করা হয়। তিব্বতী ভাষায় উহাকে 'ya. ba. yu. ma' বা 'পিতৃ—মাতৃ—ক' আলিঙ্গন বলে।

এই শক্তিযুক্ত হেরুকমূর্ত্তির সহিত বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীর যুগ্মমূর্ত্তি তুলনীয়[২১]।

চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমতের সহিত সহজ-যানের যোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে কি চণ্ডীদাস বাগীশ্বরীর উপাসনা করিতেন? উত্তরে বক্তব্য এই, 'বাশুলীদেবী' 'বাগীশ্বরী' ভিন্ন আর কেহ নহেন। বাগীশ্বরী শব্দ বাশুলীরূপে পরিণত হইবার বিরুদ্ধে কোন শব্দশাস্ত্রীয় বা ব্যুৎপত্তিগত আপত্তি নাই। সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত ক্রমে 'বাগীশ্বরী' শব্দ হইতে 'বাশুলী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথা—

বাগীশ্বরী>বাঙ্গীশ্বরী>বাইসোলী>বাব্‌সোলী>বাশুলী (ব-ঈষৎ স্পৃষ্টরূপে উচ্চারিত)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বাশুলী-মূর্ত্তি সরস্বতীরই প্রতিমা। এক্ষণে বলা হইল—বাগীশ্বরী শব্দ হইতে বাশুলী শব্দ হইয়াছে এবং বাশুলী দেবী বাগীশ্বরী মাত্র। অধিকন্তু উক্ত হইয়াছে, বাগীশ্বরী ধ্যান দ্বারা মৃন্ময়ী সরস্বতীর পূজা করা হইয়াছিল। এই সকল স্থলে আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধের শঙ্কা হইতে পারে।

তাহার উত্তরে বক্তব্য এই—বাগীশ্বরীর নামটি গ্রন্থে নিবদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য হইলেও বংশপরম্পরাক্রমে পূজক কর্ত্তৃক উহার ধ্যান জানার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চণ্ডীদাসের কুলদেবতা, বাশুলী (বাগীশ্বরী)। এক সময়ে বাগীশ্বরী ধ্যানই নিশ্চয় বাশুলী দেবীর প্রতিও প্রযুক্ত হইত। কারণ,

১৬। Etude—A. Foucher. Part II. p. 89

১৭। পাদটীকা ১০ দ্রষ্টব্য।

১৮। গৌণীঃ কামদুঘা সমাক্ প্রযুক্তা গৌরিতি দুষ্টঃ দুষ্টপ্রযুক্তা পুনরীহক প্রয়োক্তুঃ গৌর্ভবতি। কাত্যায়ন। প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৯। 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্'। হরিহরানন্দ আরণ্য কৃত টীকা এবং পণ্ডিত রামকুমার তর্কসিদ্ধান্ত কৃত বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত। কলিকাতা। ১৩০৮। চতুর্থ উ। শ্লোক ১০১-৩২। ২৩১-৩২ পৃঃ।

২০। পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রের ১৩০ সংখ্যক টিপ্পনী।

২১। Alice Getty—'The Gods of Northern Buddhism' Clarendon Press. 1914. Plates XLIV, a and XLV.

এই গ্রন্থোক্ত চিত্রদ্বয়ে 'ya. ba. yu. ma' আলিঙ্গনের পরিবর্ত্তে, মূর্ত্তির বামোরু শক্তি-দেবতার 'মহাসুখ' বা 'বিপরীত মহাসুখ' অবস্থা তুলনীয়।

বর্ত্তমানে বাশুলী যান কৃত্রিম, অর্ব্বাচীন ও অশুদ্ধ এবং শক্তি-মূর্ত্তি বিষয়ক।

আবার চণ্ডীদাসের ভিটায় বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্র বাগীশ্বর-বাগীশ্বরী সংযোগ বদ্ধ। মঞ্জুশ্রী, স্বীয় শক্তি বাগীশ্বরী যুক্ত হইয়া হয়ত একই বা বিভিন্ন বেদিতে বিরাজিত ছিলেন।

আদি বাশুলী মূর্ত্তি, বাগীশ্বরী ছিল বলিয়া গৃহীত হইলে সে মূর্ত্তি এখনে নাই এবং তৎস্থলে সরস্বতী প্রতিমা পূজিতা হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। সরস্বতী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সহিত বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্বন্ধও সহজেই অনুমেয়। বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি সরস্বতীমূর্ত্তিরও হয়ত অনেক পরে নিকটে কোথায়ও স্থান পাইয়াছিল।

বাগীশ্বরী এবং বাশুলী—উভয় দেবীমূর্ত্তিই, যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ইহার বলবৎ ও অন্য প্রমাণ আছে।

(ক) বঙ্গদেশের বাহিরে, উড়িষ্যার কটক জেলায় খণ্ডগিরি ও ললিতগিরিতে বাশুলী দেবীর মূর্ত্তি আছে[২১]।

ঐ স্থানসমূহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অধ্যাপক কুসে সাহেবের গ্রন্থে[২২] প্রাচীন সাধন, বৌদ্ধ তীর্থ-সকলের চিত্র ও ওপাশ্বে উট্টঙ্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি প্রদান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, উড়িষ্যার অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থের নাম ও চিত্র আছে।

(খ) কোথায়ও কোথায়ও একই স্থানে বাগীশ্বরী ও বাশুলী উভয় দেবীরই মূর্ত্তি আছে। ইহাতে তাঁহাদের যোগ-সম্বন্ধ থাকা নিঃসন্দেহ হইয়াছে। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ময়ূরভঞ্জ পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থে[২৩] এরূপ একটি দৃষ্টান্ত আছে—বাশুলীদেবী, বাগীশ্বরীদেবীরই ভেদ বিশেষ। একই স্থানে বাশুলীদেবীর পৃথক স্থিতি অসম্ভব বা বিরুদ্ধ নহে। যেমন 'গো-বলীবর্দ্দ-ন্যায়' দ্বারা গরু এবং বলীবর্দ্দের পৃথক নির্দ্দেশ সিদ্ধ হইয়াছে।

তন্ত্রসারে ধৃত "তরুণশকলনিত্যাদি" বাগীশ্বরীর একটী ধ্যান পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তন্ত্রসারে বাগীশ্বরীর অন্যতর ধ্যানও আছে—

> মৃণালকান্তিবিভাং দেবীং জোৎস্নাজলধিবাসিনীম্।
> মুক্তাহারলসদ্বক্ষাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাম্।
> বিভ্রতীং পুস্তকস্থানং ধ্যায়েৎ বাণীং বরপ্রদাং।
> অক্ষমালাং তথা পূর্ণং ঘটং বিভ্রত পুস্তকম্।
> স্মেরাং বাসরসাস্থাং পীবরস্তনভারিতাং।
> ইত্যেং ধ্যাত্বা তথা বন্দ্যাং বাণীমন্ত্রবিভূষিতাং।

প্রথমোক্ত ধ্যানটী বাগ্‌দেবতার উদ্দেশে রচিত হইলেও উক্ত গ্রন্থে বাগীশ্বরী মন্ত্র মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রন্থে, সরস্বতী, বাগীশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং শাক্ততন্ত্রে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর যোগসম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এই প্রকারে বাগীশ্বরী ও সরস্বতী অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

অন্যদিকে বাগীশ্বরীর অপর ধ্যানের সহিত চণ্ডীমূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই চণ্ডীর ধ্যান সংস্কৃতে পাওয়া যায় নাই। ইনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে 'কালকেতুবরদা' ও 'মঙ্গল-চণ্ডিকা' বলিয়া উক্তা হইয়াছেন মাত্র। তাহা চণ্ডীকাব্যে ইহাঁর পরিচয় লাভ করা যায়। চণ্ডীর বহু মূর্ত্তি, বাংলা এবং উড়িষ্যায় পাওয়া গিয়াছে[২৪]।

উপসংহার।

কোন সময়ে নান্নুরের বাগীশ্বরী মূর্ত্তি লোপ পাইয়াছে বলা দুরূহ। কঠিন কষ্টিপ্রস্তরের বৃহৎ মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তিটি সহসা খণ্ডশঃ ভগ্ন হইতে পারে নাই। নিশ্চয় এইরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটিকে কঠোর আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। সেই সময়েই মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি বাগীশ্বরীও নিস্তার পায় নাই।

তন্ত্রসার হইতে, প্রবন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, অবান্তর ভাবে, বঙ্গদেশের তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগের ধর্ম্মমত সমূহ

২১। Chandrasekhara Banerjee—'Notes on the Antiquities of the Nalki, the Assia and the Mahabinayaka Hills of Cuttack'. J. A. S. B. 1870, Part I. No III; John Beames—'The Alti Hills in Cuttack. J. A. S. B. 1875, Part I, No. V.

২০। ১৫ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৩। Nagendranath Vasu—'The Archaeological Survey of Mayurbhanja', vol. I, 1911. pp. LXXVI, and 66, 69 and 109.

২৪। ইহার কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তি, রাজসাহীতে বরেন্দ্র গবেষণা সমিতিতে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তি, চতুর্ভুজা একটি মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব এবং ভাবচিত্রিত বিবর্দ্ধন সমেত। মধ্যে প্রদত্ত স্থান লাভের যোগ্য। V. R. Society. Catalogue, 1919, Frontispiece Plate.

জানিবার পক্ষে, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ রূপে, সেগুলি বিশেষ রূপে মূল্যবান্।

তৎসকল হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া যাইতে পারে :—

(১) তখনও বঙ্গদেশে অনেক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন ;

(২) অথবা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভেদ তখন স্পষ্ট ছিল না ;

(৩) অন্য ধর্মমত হইতে গৃহীত দেবতাগুলিকে ব্রাহ্মণ্য-দেবতারূপে এবং বিশেষতঃ শক্তিমূর্ত্তি ভাবে পরিবর্ত্তিত করার ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছিল ;

(৪) এবং বৌদ্ধদিগের অপেক্ষা তাঁহাদেরই দেবমূর্ত্তি-সকলের ধ্যানসমূহ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীগণ অধিকতর শুদ্ধ ভাবে বা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতেন। শেষোক্ত বিষয়টি আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহার কারণ অজ্ঞাত এবং সেইজন্য অনুসন্ধেয়।*

পরিশিষ্ট

চণ্ডীদাসের প্রেমপাত্রী শ্রীমতী রামী বা রামমণিও এক জন উৎকৃষ্ট পদকর্ত্রী ছিলেন। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় রামীর একটি পদ প্রকাশিত করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থেও, অন্য আর কয়েকটী পদ দেওয়া আছে। শ্রীমতী রামী সম্ভবতঃ বাশুলী দেবীর মন্দিরের 'দেবাসিনী' ছিলেন। বোধ হয়, 'দেবদাসী' শব্দের উপর, আবার বিকৃত স্ত্রী প্রত্যয়ের উদাহরণ বঙ্গ ভাষায় দুর্লভ নহে। এতৎসহ চাণ্ডকী ও চাণ্ডিকিনী শব্দদ্বয় তুলনীয়। হরত কর্ত্রী হইতে করিণী শব্দ সৃষ্টির ন্যায়, ভ্রমাত্মক শব্দ-সাম্য (false analogy) দ্বারা, দেবদাসী শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে দেবাসিনী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ, রাঢ় অঞ্চলের মন্দির সকলে, পুরুষ-সেবকদিগকে 'দেবাসী' বলা হয়।

নান্নুরে রামী ধোপানীর কাপড় কাচিবার পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে রক্ষিত আছে। উহা এক খণ্ড অশ্মীভূত (petrified) বা প্রস্তরে পরিণত (fossilised) কাষ্ঠস্তূপ বা বৃক্ষকাণ্ড হইতে পারে, কিন্তু এতদঞ্চলে ঐরূপ প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ড দুষ্প্রাপ্য নহে।

---

* পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৩০০ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে 'চণ্ডীদাস ও বাশুলীদেবী' সম্বন্ধে মদীয় একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। পঠিত হওয়ার পর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা আলোচিত হয়। সে সকল আলোচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩১ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩৩১ সালে) পত্রিকায় দুই পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ আমাকে এই মত পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। তখন আমি মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেক চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা সম্ভব হয় নাই। তজ্জন্য পুনরায় ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে, অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া, একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে লইয়া, নান্নুর হইতে আলোচ্য মূর্ত্তির চিত্র সংগ্রহ করিয়া আনি। তাহাই অদ্যকার এই প্রবন্ধে মৎ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইল।

বস্তুতঃ, মদীয় মূল প্রবন্ধের প্রতিবাদকারী এবং অন্যান্য লেখক, কেহ কেহ মদীয় প্রতিপাদ্য অনেক সিদ্ধান্ত অংশতঃ বা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা আমার মতবাদগুলি সমর্থন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিক্রমপুর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারাগ্রামের ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিকে মহুয়ার (মধুমতীর ভৈরবিশের) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর 'সমস্যাটী' বিষয়কপ্রবন্ধ প্রকাশকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও মদীয় প্রবন্ধ সমর্থনার্থ চাহিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ নান্নুরের বর্ত্তমান মূর্ত্তি যে সমস্যাটী মূর্ত্তি, তাহা আমিই প্রথমে প্রমাণ করি, এবং পরিশেষক রূপে, উহা অধ্যাপক অমূল্য বাবুর সিদ্ধান্তের অনুকূল হইয়াছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তদীয় এক প্রবন্ধে বাশুলীকে বাশুলী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট, অন্যত্র স্থান পাইয়াছে বলিয়া ছাতনার বাশুলী দেবীর অন্যান্য মূর্ত্তি আছে। 'ছাতনার চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, আমি তাহা যত্নসহকারে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত সে স্থানে যাইতে সমর্থ হই নাই। ছাতনার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নিজে সে স্থান, একবার দর্শন করার বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং কোনও রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা যে যুক্তিযুক্ত দেখা যায় না।

বাঘাগ্রামের বুদ্ধমূর্তি।
'বীরভূম-বিবরণ' হইতে ২৩ সংখ্যক চিত্র।

বাঘাগ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তি।
('বীরভূম-বিবরণ' হইতে ২২ সংখ্যক চিত্র)

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চরচিলমারী পুনর্ব্বার

১

তারণদাস আঙিনার এক কোণে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া চিঠি গুছাইয়া রাখিতেছিল। চিঠি রাখিবার জন্য সে একটি পায়রাখুপি কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিয়া লইয়াছিল। তাহারই বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন নামের এবং ঠিকানার পত্রের বিন্যাস।

এই এক বছরে তাহার শরীর অনেকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি আরো বসিয়া গিয়া নীচের অংশ ঝুলিয়া উঠিয়াছে। গালের ও কপালের বলি-চিহ্ন স্পষ্টতর। তাহার সযত্নরক্ষিত পত্রগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। একই চিঠি বহু বছর ধরিয়া ব্যবহারে মলিন ও ছিন্নপ্রায়; অক্ষরগুলি আর বোধগম্য হয় না। এই গ্রামে নূতন চিঠি সে কোথায় পাইবে। কদাচিৎ এক আধখানা ভাগ্যক্রমে জুটিয়া যায়।

কল্পণ নদীতে জল আনিতে গিয়াছিল। পদ্মার চর পড়িয়া জলধারা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। জল লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিতেছিল। তাহার সত্বর হইবার কারণ ছিল। সে বাদলকে সহরের ডাকঘরে পাঠাইয়াছে। আজ বিনয়ের চিঠি আসিবার কথা। প্রথমে সে বিনয়ের চিঠি নিয়মিত পাইত, ক্রমে সেই নিয়মে ছেদ পড়িতে লাগিল। এখন কদাচিৎ পায়। কিন্তু তাহাতেও বাধা অনেক। চিঠিখানা যদি প্রথমে তাহার হাতে না পড়িয়া তারণদাসের হাতে পড়ে তবেই বিপদ। সে চিঠি তাহার ডাকবাক্সের পত্রগুচ্ছের অন্তর্গত হইয়া মালিকের হাতে আর পড়িতে চায় না। এমন আগে একবার হইয়াছে। একখানা চিঠি আদায় করিতে কল্পণের বহু কৌশল ও তিন চার দিন সময় লাগিয়াছে। তখন তাহা সহ্য হইত, কারণ বিনয়ের চিঠি সে সময় দুর্লভ ছিল না। কিন্তু আজকাল দুর্লভ মুহূর্তে বিনয়ের চিঠি পাছে তারণের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় কল্পণ ঘাট হইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত ফিরিতেছিল।

শীতের সকাল। মাঠে মাঠে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘাসের শিশির তখনো শুকায় নাই। সারা রাত্রি শিশির পড়িয়া কচি ছোলা ও মুসুরের ক্ষেত দাদা হইয়া গিয়াছে। পাতার ডগায় শিশিরের কণা ঝলমল করিতেছে। কল্পণের ব্যস্ত পায়ের সঞ্চলনে সেই জলধারা গলিয়া তাহার কোমল পা'দুটি ভিজিয়া উঠিতেছিল। আলের পথ ছাড়িয়া শস্য-ক্ষেত ভাঙিয়া সে সোজা চলিয়াছিল, তাহার পায়ের আঘাতে ঝুনো মটরের ছোট ছোট নীল ফুলগুলির পাত্র হইতে শিশির-কণা গড়াইয়া পড়ে, দু'চারটা ফুল পায়ে চাপা পড়ে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সে এই ফুলগুলি বাঁচাইয়া পা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। এই ফুলগুলি তাহার বড় প্রিয়, কারণ বিনয় এ ফুল ভাল বাসিত। ক্ষেত ছাড়িয়া সে কূল, বাবলা গাছের তলা দিয়া চলিল। গাছের পাতা হইতে সঞ্চিত শিশির ফোঁটা ফোঁটা তাহার চুলে, গালে, কপালে পড়িতে লাগিল। দু'চার ফোঁটা কাঁধের উপরে পড়িয়া গড়াইয়া বুকের ভিতরে চলিয়া গেল। এমনি করিয়া সে আঙিনার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল।

যে-আশঙ্কা সে করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। উঠানের অন্য প্রান্তে বাদল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কল্পণ ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—চিঠি কই? বাদল নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় আঙুল দিয়া ডাকমুন্সীকে দেখাইয়া দিল।

কল্পণ জলের কলসী নামাইয়া রাখিয়া নীরবে তারণদাসের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিতে পাইল, কুন্দফুলের মত শুভ্র একখানি খামে ভ্রমরের মত কালো কালিতে বিনয়ের হস্তাক্ষরে তাহার নাম। তারণদাস বহুদিন পরে একখানা নূতন চিঠি পাইয়াছে, বহু যত্নে চিঠিখানাকে সে একটি খোপের মধ্যে রাখিয়া দিয়া অন্য চিঠি বাছিতে ব্যস্ত। কল্পণের মনের অবস্থা কেবল অনুমান করাই চলে—বিনয়ের পত্র বন্ধ খামের দুর্ভেদ্য রহস্য লইয়া ওই সম্মুখেই—কিন্তু তবু কতদূরে!

কল্পণ ঘর হইতে বাটি ভরিয়া খানিকটা গরম দুধ আনিয়া বলিল—বাবা দুধটুকু খাও।

তারণদাস মুখ ফিরাইয়া বলিল—বড় ব্যস্ত মা, সরকারি কাজ।

—তা হোক, এটুকু খেয়ে নাও।

—আচ্ছা, দে। বলিয়া সে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিল। এই অনবধানতার অবসরে করুণ চট্ করিয়া চিঠিখানা সরাইবার অভিসন্ধিতে ছিল, কিন্তু ডাকমুন্সীর ক্ষিপ্র দৃষ্টিকে সে এড়াইতে পারিল না। সে হাসিয়া বলিল—সে হয় না মা। সরকারী কাজে আত্মবন্ধু নাই। করুণের প্রথম চেষ্টা বিফল হইল।

কিয়ক্ষণ পরে, তারদাস বাবলকে লইয়া পাড়ায় চিঠি বিলি করিতে চলিল—করুণের আশার আশা হইল। কিন্তু হায়, সরকারি কাজের নির্মম কর্ত্তব্য তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিল। তারদাস তাহার পাররাঝুলি চিঠির বাক্সে তালা-চাবি লাগাইতে লাগাইতে করুণের দিকে তাকাইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর ন্যায় বলিল—'অলওয়েজ আওার লক্ এণ্ড কী।' চিঠির বাক্সে তালা দিয়া, চাবিটি সঙ্গে লইয়া তারদাস পাড়ায় বাহির হইয়া গেল। বাক্সের এক ফাঁক দিয়া বিনয়ের চিঠিখানা দেখা যাইতেছিল, করুণ কাঠি দিয়া চিঠিখানা নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। খামখানা বেশ মোটা—ভিতরে বহু চিঠি আছে। বিনয়ের নিজের হাতে লেখা চিঠি—কতদিনের পরে। কিন্তু হায়, সরকারি কাজে নাকি আত্মবন্ধু নাই—'অলওয়েজ আওার লক্ এণ্ড কী।' করুণ সেই বহু চিঠির বাক্সের নিকটে মূঢ়ের ন্যায় বসিয়া রহিল।

করুণের গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে প্রচুর অবসর ও শীতের মধ্যাহ্ন। ডাকমুন্সী ঘুমাইতেছে, বাড়িতে একাকী তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পদ্মার তীর বহিয়া সে চলিতে লাগিল। শীতাভ বালুচরের একপ্রান্তে নীলাভ নদীর নিস্তরঙ্গ জলপথ—তাহাতে একটিও রেখা নাই, কোন ঢেউ নাই—যতদূর দেখা যায়, একখানিও নৌকা নাই। পরপারের উচ্চ পাড়ের স্বচ্ছ নীল, বনরাজির কাপসা নীল, আর আকাশের নির্ম্মল নীল। কেবল দুইটা শঙ্খচিল নদীর জলে বুকের পাখা ছায়া ফেলিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া মরিতেছে। করুণ সেই জলাশয়টার ধারে গিয়া বসিল, যেখানে বিনয় মাছ ধরিত। শিরীষ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। এক-পাশে আখের ক্ষেত—শুষ্ক পাতার অন্তরালে অজস্র বাবুই পাখীর অস্তিত্বের চঞ্চলতার আভাস, আর একদিকে ফুলন্ত শরিষার ক্ষেত।

শীতের মধ্যাহ্নের ফুল। মাঠের একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত এই ফীণ সবুজ আভা মিশ্রিত পীত পুষ্পের সমারোহ।

মৃদু উত্তর বায়ুতে শরিষা ফুলের মধুরভির তীব্র গন্ধ করুণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। শীতের মধ্যাহ্নে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, কোন কোলাহলের লেশ মাত্র নাই। সমগ্র প্রকৃতি যেন নিজেকে নিঃশেষে কেবলমাত্র রঙের বিচিত্রতার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ঘাসের ঝলসিত সবুজ, মুগুর ও ছোলার ম্লান সবুজ, আখের পাতার স্বচ্ছ সবুজ; বুনো মটরের একটুখানি লালের ছোপ-দেওয়া বেগুণী নীল, ঘাসের ফুলের গাঢ় নীল, পদ্মার পারার নীল, বনরাজির বাষ্পময় নীল, আকাশের পরিণত নীল; বালুচরের স্বর্ণাভ পীত, শর্ষে ক্ষেতের সবুজাভ পীত আর সমস্ত প্রকৃতিকে একখানি সোণার জরীতে মুড়িয়া দিয়া দিগন্তব্যাপী শীতের রৌদ্রের নীলোজ্জ্বল পীত। এত বিচিত্র বর্ণের বিকাশ সামান্য মানুষের জন্য নহে, একমাত্র সহস্রচক্ষু দেবরাজের ইহা যোগ্য বিলাসসামগ্রী।

করুণ অনেকক্ষণ তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিল। যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, তখন শীতের অপরাহ্ণ, বাতাস শীতল হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নের সেই নিঃশব্দ বর্ণজগতে নানা শব্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। পদ্মার স্রোতের মৃদু রব, দুই একখানা নৌকার দাঁড়ের শব্দ, পাখীদের নীড়ে ফিরিবার ডানার ধ্বনি, দূরে গোধূলির ঘণ্টার করুণ কিঙ্কিণী।

করুণকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। কিন্তু ফিরিয়া কি করিবে। বিনয় নাই। বিনয়ের চিঠি বিরল, আজ একখানা আসিয়াছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। বিনয় তিনমাসের উপর চলিয়া গিয়াছে। করুণের শরীর ইতিমধ্যে অনেক খারাপ হইয়াছে, শরীর কৃশ হইয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, কপালে পাণ্ডুরাভা জাগিয়াছে, প্রায়ই জ্বর হইয়া সে ভুগিয়া থাকে। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে; আহারে তাহার রুচি চলিয়া গিয়াছে। গৃহে কাজ অল্প, কোন রকমে সারিয়া ফেলে। গভীর আলস্য এবং বিনয়ের চিন্তা তাহার বিপুল অবসরের সঙ্গী। তাহার মনের কথা, নানা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সে কাহাকে বলিবে। এই সময়ে

যদি তাহার মা থাকিত, শৈশবে সে যাহাকে হারাইয়াছে। মায়ের কথা মনে করিতে তাহার চোখের কোণে জল আসিল। কিন্তু কাঁদিলে তাহার চলিবে না। চোখ মুছিয়া সে উঠিয়া পড়িল,—বাড়ির দিকে চলিল। আজ রাত্রে তাহার পিতা ঘুমাইলে চিঠিখানা উদ্ধার করিতে হইবে—ইহাই সে সংকল্প করিল।

২

করুণের চোখে ঘুম ছিল না। সে বারে বারে উঠিয়া তারুণের ঘরের দুয়ারে কান পাতিয়া অনুভব করিতেছিল সে ঘুমাইয়াছে কিনা! বুড়া মানুষের ঘুম আসিতে বিলম্ব হয়। করুণ একাকী শুইয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছিল। তাহার মনের চিন্তা আপাতত ওই রহস্যময় চিঠিখানাকে কেন্দ্র করিয়া জাল বিস্তার করিতেছিল। স্তিমিত মাটির প্রদীপের আলোকে ঘরের জিনিসপত্রগুলা নানারূপ অপ্রাকৃত আকার গ্রহণ করিয়াছিল। দেয়ালের মাটি-খসা বিচিত্র দাগ; টিক-টিকির পোকা ধরিবার অদ্ভুত গতি!

রাত্রি অনেক হইল। করুণ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শীতের জ্যোৎস্না, দ্বাদশীর চাঁদ। ঘরের খড়ের চাল শিশিরপাতে সাদা; ঘাসে ঘাসে সদ্যপাত নীহার-কণার উজ্জ্বলতা। পাশের নারিকেল গাছটার দীর্ঘ মসৃণ পাতায় পাতায় আলো গড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে উলু-খড়ের শাদা ভুঁই জ্যোৎস্নার আলোকপাতে একটা অলৌকিক পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে। মাঠের মধ্যে বেশী দূর দেখা যায় না—সবশুদ্ধ মিলিয়া একটা সুদূরাশার অস্পষ্টতা।

একবার রাঙাইাঁসগুলি পাখা ঝটপট করিয়া ডাকিয়া উঠিল; দূরের আম গাছে একটা হঠাৎ-জাগা পাখীর ডাক। করুণ উঠানের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই শীতের রাত্রির মায়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের কথা ভুলাইয়া দিল।

তাহার চমক ভাঙিলে তারুণের দুয়ারে কান পাতিল। তাহার নিশ্বাস বেশ তালে তালে পড়িতেছে। সে দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অস্পষ্ট দীপালোকে নিদ্রিত তারুণের চেহারাটা কেমন যেন বিভীষিকাময় বলিয়া তাহার মনে হইল—সে ভয় পাইয়া চমকিয়া গেল। অবশেষে বুঝিল, ভয়ের কোন কারণ নাই—বৃদ্ধের মাথার ছায়া এই অর্ধ আলোকে অর্ধ অন্ধকারে কিম্ভূত একটা রূপ ধরিয়াছে মাত্র।

পিতার ডাকবাক্সের চাবি কোথায় থাকিত তাহা সে জানিত। চাবি সংগ্রহ করিয়া সে বাক্স খুলিতে গেল। হঠাৎ তারুণ যেন কি বিড়বিড় করিয়া বলিল। করুণ ফিরিয়া দেখে, বৃদ্ধ ঘুমাইতেছে। তালাতে চাবি ঘুরাইল, খুট করিয়া একটু শব্দ: করুণের মনে হইল ওই শব্দটাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নিদ্রা ভাঙিয়া যাইবে। আবার তারুণলাল কি বকিতে লাগিল। করুণ কান পাতিয়া শুনিল—বৃদ্ধ বকিতেছে 'দূর লক্ষ্মিছাড়ী, পালা, পালা, দূর হ।' তবে কি বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে! কই, না, তাহার ঘুম তো অটুট। করুণ তাড়াতাড়ি বিনয়ের চিঠিখানি বাহির করিয়া লইয়া বাক্সটা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া বিনয়ের চিঠিখানা সে খুলিয়া বসিল। কিন্তু হায়, জীবনের অন্যান্য অধিকাংশ ঘটনার মতই কাব্যকালে চিঠিখানা তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়া দিল। নৈরাশ্য একটা নেতিবাচক ভাব, চিঠিখানা পড়িয়া কোথায় যেন গভীর আঘাত বাজিতে লাগিল। ইহাতে অনেক কথাই আছে, কিন্তু বিনয়ের হৃদয়ের সেই জীবন্ত স্পর্শ, চরচিলমারীতে অনেকবার সে যাহা পাইয়াছে, সেই স্পর্শ কোথায়! এ যেন শুধু কথা। কথার সমষ্টি! হায় করুণ, তুমি যদি জানিতে এত বড় এই পৃথিবীতে কয়জন লোক হৃদয়ের স্পর্শকে কলমের মুখে ফুটাইতে পারে! বিনয় পশ্চিম হইতে এ চিঠিখানা লিখিয়াছে, কবে চরচিলমারীতে ফিরিবে কিছু ঠিক নাই।

করুণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষ কেন আর একজনকে ছাড়িয়া দূরে যায়? কিসের আকর্ষণ তাহার? লেখাপড়া? তাহাতে কি সুখশান্তি বাড়ে? টাকাকড়ি? টাকাকড়ি-ওয়ালা কত লোকের এত দুঃখ কেন? বিনয় কেন দূরে গেল? এই চরচিলমারীতে, পদ্মার ধারে, নানা ঋতুর নানা শস্যক্ষেতের পাশে জীবনটা কি কাটাইয়া দেওয়া যায় না? এখানকার নীল নদীর ধারে, সবুজ ক্ষেতের পারে, স্বচ্ছ আকাশের ছায়ায়? এখানকার আকাশস্পর্শী রৌদ্রে এবং দিগন্তস্পর্শী বর্ষায়? বিনয় কেন তাহা পারে না? করুণ তো সারা জীবন এখানে কাটাইয়া দিবে। ওই অস্পষ্ট দিগন্তের পরপারে এমন কি আছে, যাহা এমন করিয়া মানুষের

অতি তুচ্ছ, কিন্তু অসাধারণ সুখশান্তিকে উন্মন করিয়া টান দেয়?

তাহার পিতার কথা মনে পড়িল। বৃদ্ধ কেমন ভুলের স্বর্গে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। কোন দিগন্তের আকর্ষণ তাহার নাই। কিন্তু পিতার কথা ভাবিতেই তাহার মনে পড়িল, স্বপ্নে-বলা ওই কয়টি কথা। এই সরল বৃদ্ধের নিদ্রাকে তাহার চরম স্মৃতি তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে? জাগরণে যে কখনো কাহাকেও কটূক্তি করে নাই, স্বপ্নের মধ্যে সে কাহাকে বারম্বার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছে! করুণ যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার বিস্ময় বাড়িয়া চলিল। এই মাত্র সে তাহার পিতাকে মানব-জীবনের সরলতার প্রতীক ভাবিতেছিল, কিন্তু সেই আপাতসরলতার তলে কোথায় একটা অতৃপ্তির আভাস রহিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগে বরফ জমিয়া কঠিন হইয়া চলাচলের পথ পড়িয়াছে, কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে অতি নিম্নে অতলস্পর্শ কলধ্বনি শোনা যাইবে। করুণের মনে হইল, জীবনের রহস্যের না আছে কোন নিয়ম, না আছে কোন অন্ত। আপাতত যাহা সহজ এবং স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে রহস্যের পরিমাপে তাহা তেমন সামান্য না হইতেও পারে! একদিকে বিনয়ের জীবনের প্রকাণ্ড রহস্য, অন্যদিকে তারণদাসের জীবনের ক্ষুদ্ররহস্য এই দুই ধারা মিলিয়া তাহার চিন্তাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিল। সে চিঠিখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিদ্রাবিহীন রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিল।

৩

বনোয়ারীলাল চরচিনবারীর বার্ষিক আগন্তুক। লোকটা পাটের দালাল। পাট বুনিবার আগে একবার আসিয়া কৃষকদের দাদন দিয়া যায়, আবার তাহা কাটিবার সময় আসিয়া বুঝিয়া লয়। বনোয়ারীলালকে সকলে চেনে, তাহারো কাহাকেও অবিদিত নাই। লোকটার বয়স চল্লিশের উপরে, যৌবনের আগুন এখন নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু উত্তাপ যায় নাই। যৌবনটা যে গত হইয়াছে, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে মন সরে না, উত্তাপকে আশ্রয় মনে করিয়া যুবক সাজিয়া বেড়াইবার একটা অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার বয়স সেটা।

চীনাতসরের কোট গায়ে, ল্যান্ডিসের ব্যাগ ও ছাতার হাতলে গামছা ঝুলিয়া সে প্রতি বৎসর এই সময়টা চরে আসিয়া দেখা দেয়। লোকটা হাসিলে দুই গালে কাটা-ফুটির মত অনেকগুলি রেখা পড়ে। চোখদুটি অকারণে সর্বদাই মিটমিট করিতেছে। যেন অদৃশ্য দালালের সহিত ব্যবসায়ের ইসারা ইঙ্গিত চলিতেছে।

এবার সে যখাসময়ে চরে আসিয়াছে, পাট কাটা হইল, পাট চালান হইয়া গেল, কিন্তু বনোয়ারীলাল গেল না। সে সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লজেন্স ও জলছবি বিতরণ করে। চরের ছোটবড় সকলের মুখে এক কথা, বনোয়ারীলাল, বনো দাদা।

বনোয়ারীলাল করুণকে দেখিয়াছে। প্রতি বছরই তাহাকে দেখে, কিন্তু এবারের দর্শনে একটু বিশেষত্ব আছে। অন্যবার করুণকে বালিকা বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু এবার হঠাৎ তাহাকে যুবতী বলিয়া বুঝিতে পারিল। মেয়েদের এই পরিবর্তন আকস্মিক, অত্যন্ত অকস্মাৎ ইহা চোখে পড়ে। যে-সরোবরকে বরাবর শুষ্ক-প্রায় দেখিয়াছি, বর্ষাকালের একটি মাত্র বর্ষণে তাহার এমনই পরিবর্তন ঘটে, ভোরবেলা তাহার পূর্ণতা আকস্মিক রূপে দেখা দেয়। মেয়েদের বয়স সম্বন্ধেও অনেকটা এই কথা বলা চলে। যাহাকে একদিন বালিকা বলিয়া মনে হইয়াছে, হঠাৎ কোথা হইতে কি ভাবে কি পরিবর্তন ঘটে, একদিন সুপ্রভাতের শুভলগ্নে তাহাকে আর চেনা যায় না—সে সম্পূর্ণ যুবতী। করুণের সেই পূর্ণ রূপটি বনোয়ারীলালের চোখে পড়িয়াছে, তাই এবার পাটের পালা শেষ হইলেও পাটোয়ারের পালা শেষ হইল না।

বনোয়ারীলাল তারণদাসকে চিনিত, সে পরিচয় কেবল মৌখিক নয়; তাহার চরিত্রের দুর্বলতাও বনোয়ারীলালের অবিদিত ছিল না। একদিন সে তারণদাসের উঠানে আসিয়া দেখা দিল। তারণ তখন ডাকঘরের সরকারী কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। বনোয়ারীলাল বলিল—এই যে মুন্সি দাদা, প্রাতঃপ্রণাম। তারপর, চিঠিপত্র কিছু আছে?

তারণদাস অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বসিতে দিল। এই পর্যন্ত সে গৃহস্বামীর ভদ্রতা করিল, কিন্তু এবার সরকারী কাজের পালা, তাহাতে ভদ্রতার অবকাশ কোথায়? সে

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল—চিঠিপত্র তো নেই তাই। চিঠি থাকা কি মুখের কথা!

—তা'তো নিশ্চয়। কিন্তু আসবার যে কথা আছে। বড্ড জরুরি। বনোয়ারীলাল বেশ জানে যে, এটা ডাকঘর নয়, কাজেই এখানে চিঠিপত্রের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও সে বেশ জানে, লোকটা করুণের পিতা এবং তাহাকে খুশী করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা।

—আচ্ছা, চিঠি পত্র এলে পাঠিয়ে দিয়ো। তারপরে গোবিন্দপুরের খবর কি?

বৃদ্ধ উৎসাহিত হইয়া গোবিন্দপুরের ডাকঘরের সেই শতজনের শতবারবিশ্রুত গল্প আরম্ভ করিল।

—সোনাবতী নদীর ধারে গোবিন্দপুর গ্রাম, গ্রামের মাঝে সব-পোষ্টাফিসের প্রকাণ্ড দালান। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন পুরাতন ভূতের মত এ গল্প পুরাতন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম দ্রুত আর্থিক উন্নতি করিতেছে। গত বৎসরের আটচালা ইতিমধ্যে অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে)।

রোষে পিঠ দিয়া, চক্ষু বুঁজিয়া তারণ গোবিন্দপুরের ক্রম-বিবর্দ্ধমান ডাকঘরের কথা বলিয়া যায়, আর বনোয়ারী অন্য-মনস্কভাবে হুঁ দিয়া তাহা শুনিতে থাকে, কিন্তু তাহার চক্ষুর ব্যস্ততা অন্যদিকে। সে গৃহকর্ম্মরতা, আঙিনায় ইতস্তত সঞ্চরমানা করুণকে যেন দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে থাকে।

এই রকম কিছু দিন ধরিয়া চলিতে থাকিল। করুণ প্রথমটা ইহা লক্ষ্য করে নাই, শেষে যখন সে বনোয়ারীর ভাবগতিক বুঝিতে পারিল, তখন হইতে সে আর পারৎপক্ষে তাহার সম্মুখে বাহির হইত না। করুণের এই ভাবান্তরে বনোয়ারীর ভোর বেলা তারণের ডাকঘরে আসা নিতান্ত অকারণ হইয়া উঠিল। তখন কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে করুণদের বাড়ীর চারিপাশে তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। করুণ ঘাট হইতে জল আনিতেছে, বনোয়ারী যেন হঠাৎ সেই পথে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে কখনো শিষ দিতে দিতে, কখনো একটি গান গাহিতে গাহিতে করুণের বাড়ির পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ভয়ে করুণের মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বিনয়কে আসিতে চিঠির পরে চিঠি লিখিল, কিন্তু একখানা চিঠিরও উত্তর আসিল না।

একদিন বনোয়ারীলাল তারণকে বলিল—হাঁ তোমার মেয়ের তো বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হয়।

তারণদাস একেবারে চমকিয়া উঠিল। অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের মাঝামাঝি তাহার ভাবটা। যেন জগতে আর কাহারো মেয়ের কখনো কোনোদিন বয়স হয় নাই—যেন এই আকস্মিক বিপদটা তাহার ঘরেই প্রথম পড়িল। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন সে একটা অভাবিত দৈববাণী শুনিতে পাইল। তারপরে কোন কথা না বলিয়া সোজা রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যেখানে করুণ কাজে ব্যস্ত ছিল। করুণ পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, কাজেই পিতাকে লক্ষ্য করিল না। সে এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ভাবে মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া আবার তেমনি নিঃশব্দে দ্রুত ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া সে একেবারে বনোয়ারীর দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল—দাদা, মেয়ের একটা বিয়ের জোগাড় করে দাও। বনোয়ারী অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেই জন্যই তো আমি আছি।

—আমি সরকারী কাজে সময় পাইনে—তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।

—তুমি কিছু ভেবো না দাদা—।

—কিন্তু আর দেরী নয়, আজই চাই।

বনোয়ারীর মত লোকও শুদ্ধ তাহার এই হাতুকর ব্যস্ততায় অবাক্ হইয়া গেল। বর কি অত সহজে, 'গাহিবা মাত্র দিবার অঙ্গীকারে' কখনো পাওয়া যায়। কিন্তু অকর্ম্মণ্য লোকের স্বভাবই এইরূপ। প্রকৃতিগত আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা সে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চায়। বনোয়ারীলাল কোন রকমে তাহার হাত এড়াইয়া, বর খুঁজিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া আসিল। এবার তাহার মনে হইল, অভীষ্টসিদ্ধির পথে সে বারো আনা অগ্রসর হইয়াছে। বর তো তাহার জানিত, এখন তাহার আবরণ মোচন করিলেই হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার করুণের সঙ্গে বোঝাপড়া আবশ্যক।

৪

করুণের অবস্থা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। একদিকে তাহার পিতার অস্বাভাবিক ব্যস্ততা, অন্যদিকে ঐ লোকটার শুষ্ক কৌতূহল। তারণদাসের এখন প্রধান কাজ, দুই বেলা

চিঠি বিলি করিবার অবকাশে এবং সুযোগে পাড়ার ঘরে ঘরে সংবাদ দিয়া বেড়ানো যে তাহার কন্যার বয়স হইয়াছে। সেদিন সকাল বেলা বাদল গোয়াল হইতে গরু বাহির করিতেছিল, পিছন হইতে তারণদাস হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওরে বাদল শুনেছিস্, তোর দিদি মণির বয়স হয়েছে। বাদল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে একটা মোক্ষ পলাইয়া গিয়া সারাদিন তাহাকে মাঠে মাঠে দৌড় করাইল। আর মনোহারীলালের সৌহার্দ্যের সীমা নাই। লোকটা এখন তারণদাসের অনুমতি পাইয়া একেবারে দুরতিক্রম্য হইয়াছে। মাঠে ঘাটে যেখানে কমলকে পায়, ধরিয়া বসে। কখনো তাহার প্রতি কৃপা, কখনো অনুকম্পা, কখনো তাহার পিতার প্রতি সহৃদয়তার ভাব প্রকাশ করে। প্রথমে সে বলিত, কমলের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। একদিন প্রস্তাব করিয়া বসিল—সে নিজেই কমলকে বিবাহ করিবে। কমল কোন উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। লোকটা নোটেই দমিল না, হেলিয়া দুলিয়া গান করিতে করিতে চলিয়া গেল—'খুলিবে দ্বার সজনী, আসিবে বাসর-রজনী—"।

আমরা, যাহারা সহরের শিক্ষার আবহাওয়ায় মানুষ তাহাদের পক্ষে গ্রামের মানুষ চরম রহস্যের আকর। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে পারি, দয়া প্রকাশ করিতে পারি, এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে পূজার অবকাশে পশ্চিমে বেড়াইতে না গিয়া গ্রামে গিয়া এক মাস বাস করিয়া গ্রামের উন্নতি সাধনও করিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্য কিছুতেই তাহাদিগকে বুঝিতে পারি না। তাহাদের হৃদয়ের গভীরতা, জীবনের অস্তিত্বের রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা যে কতখানি সে বোধ আমাদের নাই। আমাদের বিশ্বাস জীবন-রহস্যের রসাতলে প্রবেশ আমাদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু যাহারা মাটির কোলে মানুষ, মাটির সহিত সারা জীবন একাত্ম হইয়া আছে, যে-মাটিতে আদিম প্রাণের উদ্ভব, যে-মাটি সকল প্রাণের আধার, তাহাদের নিকটে মাটির রহস্য, জীবনের রহস্য যাহার নাযাজ্ঞয়, অতি সহজে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধরা দেয়। হয়তো উচ্চতম শিক্ষাপ্রণালীতেও সে রহস্য বোঝা যায়, কিন্তু আমরা অধিকাংশই অর্দ্ধশিক্ষার দ্বারা নষ্ট।

এই সরল গ্রাম্য বালিকাটির প্রতি আমাদের অনুকম্পা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার ভাবনার গভীরতা হয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য, নয় বিশ্বাসের বাহিরে। জীবনের প্রতিকূলতা—পিতার, বিনয়ের এবং মনোহারীলালের, কমলের বিক্ষিপ্ত হৃদয়বৃত্তিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া আত্মস্থ করিয়া দিল। সে মনে করিত, লোকে কিসের আকর্ষণে এমন সুন্দর এই চরাচিলনারীর দিগন্তর অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া যায়। পৃথিবীর দিগন্তর অবশ্য সে পার হইল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে-দিগন্তর আছে, একটার পরে একটা যাহা অনন্তের সুগুলিত নাগপাশে আমাদের দৃষ্টিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে, কমল একে একে সেই দিগন্তরেখা উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

তাহার অসহায় অবস্থা, মানসিক, শারীরিক, বিশেষ তাহার দেহে ক্রমস্ফুটমান মাতৃত্বের আভাস—বাহির হইতে ভিতরে তাকাইতে বাধ্য করিল। অসামাজিক এই মাতৃত্বের সূচনায় গ্রামের বা সহরের মেয়ে কি করিত জানি না। কিন্তু কমলকে ঠিক গ্রামের মেয়ে বলা চলে না—সহরের তো নয়ই। সে চিরদিন সমাজের বাহিরে পালিত, কোন পূর্বসংস্কার তাহার মনে চাপিয়া নাই। জীবনে আমরা দুইদফা সংস্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত। একদফা, আমরা রক্তের মধ্যে বহিয়া জন্মগ্রহণ করি, আর একদফা পাই জন্মিবার পরে সমাজের হাত হইতে। দ্বিতীয়টার কোন ভার কমলের মনে ছিল না। অবশ্য রক্তের মধ্যে একটা সংস্কার তাহার ছিল, কিন্তু তাহা রক্তধারার মতই সহজ এবং সচল। সমাজের সংস্কার দেহের পরিচ্ছদের মত, রক্তের সংস্কার স্নায়ু-উপশিরার জালায়িত জালের মত। জীবনধারণের পক্ষে হয়তো সেটুকু আমাদের আবশ্যক। সংস্কারবিহীন লোক বাঁচিতে পারে না—জীবনের ভিত্তির জন্য খানিকটা পূর্বসংস্কারের প্রয়োজন, যেমন একেবারে সমতল মাটিতে ঘর বাঁধা চলে না, তাহার জন্য একটু স্বতন্ত্র উচ্চ ভিত্তির দরকার। বাহিরের সংস্কার জন্মান্তরে রক্তের সংস্কার হইয়া উঠিতেছে, আর রক্তের সংস্কার বহু জন্মের রক্তধারায় ধৌত হইতে হইতে সূক্ষ্মতরী হইয়া আমাদের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের শূন্যতা যেমন লক্ষ বৎসরের পলিমৃত্তিকার স্তরে উন্নত হইয়া ভারত মহাদেশের সৃষ্টির কারণ, আদিম যুগের মানুষের শূন্য মন

তেমনি বহু লক্ষ জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কারের স্তরে আধুনিক মানবকে সৃষ্টি করিয়াছে।

অসামাজিক এই মানুষের সূচনায় করুণ লজ্জিত হইল না, ভীত একটু হইল বটে। অপর কেহ হইলে বিনয়ের এই ছলনায় বিষম ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু বিনয়ের প্রতি রাগের তার কিছুতেই তাহার মনে আসিল না। বরং কেন যেন, এই আভাস পাইবার পর হইতে বিনয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। বিনয় যে তাহাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়াছে, তাহার যে এখানে আসিবার কোন ইচ্ছাই নাই, ইহা বুঝিয়াও করুণ বিনয়ের প্রতি প্রতিকূল হইতে পারিল না।

কিন্তু তাহার সব চেয়ে বিস্ময়ের কারণ ওই বনোয়ারীলাল লোকটার আচরণ। তাহার দেহে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা তারণদাসের চোখে না পড়িতে পারে, কারণ সে সংসার সম্বন্ধে এক রকম বেহুঁশ। কিন্তু ওই লোকটা! সে তো নিশ্চয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। চোখমুখের অশ্লীল ইসারায় অনেকবার সে এই তথ্যটা করুণের সম্মুখেই প্রকাশ করিয়াছে। এমন কি একদিন ইসারা ছাড়িয়া কথায় পর্য্যন্ত আভাস দিয়াছিল। তবে ওই লোকটা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চায়! করুণের যদি সাংসারিক বুদ্ধি থাকিত, তবে বুঝিত বনোয়ারীলাল বিবাহের জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়…।

করুণ এখন আর বাড়ি ছাড়িয়া বড় বাহির হয় না। বনোয়ারীর ভয় তো আছেই, তা ছাড়া চরের অন্যান্য অধিবাসীরা তাহার পিতার মত অন্ধ নয়। ইতিমধ্যেই চারিদিকে কানাকানি হইতেছে, তাহার আভাস সে পায়, বিশেষ বনোয়ারী যখন জানিয়াছে, তখন সকলেই জানিবে। সে সারাদিন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া থাকে; বসিয়া বসিয়া দেখে, উঠানের একদিকে ফুলন্ত গাঁদা ফুলের গুচ্ছ যেন উত্তপ্ত সোনার রৌদ্রের পীতোজ্জ্বল বুদ্বুদের শ্রেণী। ঘনকৃষ্ণ কুলপাতার অবকাশে কচি সবুজ কাঁচা ফুলের স্তবক। আর সকলের শিরে ওই মাচার উপর হইতে ঝুলিয়া-পড়া সীমফুলের বেগুনী-লাল গুচ্ছগুলি, এগুলি বিনয়ের বড় প্রিয় ছিল। বিছানাতে শরৎকালে শীতের আভাস পড়িবার পূর্ব্বে কোকিল যখন তপ্ত আকাশের আহ্বানে সুদূর পথিকে চলিয়া যায়, তখন মনে মনে সীম ফুল ফুটিয়া ওঠে। করুণ বসিয়া বসিয়া ভাবে—কতদূরে সেই দেশ, শীতের পূর্ব্বে বনবনান্তর যেখানে পত্রপুষ্পের অন্তিম শিরায় এক মাসের জন্য প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে! আর সেই তালীশ্যাম সমুদ্রের সৈকত, সেহলা-ধরা পাথরের উপরে তরঙ্গদল যেখানে দিবারাত্রি মাথা কুটিতেছে! এক দিকে সমুদ্রের নীলাম্বরের প্রান্তে ফেনপুঞ্জের সাদা জরির পাড়, অন্যদিকে নধর শাদলের বিচিত্রবর্ণ নামহারা ফুল, মাঝখানের পীতবর্ণ বালুর চরে কতদিন চারি পায়ের দাগ ফেলিয়া হরিণেরা ফুলের সন্ধানে তাহারা ঘুরিয়াছে। বিনয়ের কাছে-শোনা এই সব কাহিনীর মধ্যে সে নিজের ও বিনয়ের সমাবেশে কত না অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ কল্পনালোক হইতে তাহার দৃষ্টি চরচিলমারীতে ফিরিয়া আসে। সে দেখিতে পায়, সমস্তটা শূন্য মাঠে কৃষাণেরা আগুন দিয়া পোয়াল জ্বালাইয়া দিতেছে। মাঠের মধ্যে শত শত চিতাস্তূপের মত, হেমন্তের সন্ধ্যাগগনে যেন শস্যলক্ষ্মী পুড়িয়া ছাই হইতেছেন। গোরুগাড়ি ধান ফলকের আঙিনার দিকে চলিয়াছে। সন্ধ্যালোকায় পল্লীর বাঁশবনের মাথায় মাথায় কুণ্ডলিত ধূম; ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া গিয়া গ্রামের উপরে একটা শয্যা বিছাইয়া দেয়। আর মনে পড়ে, সেই একবছর আগের বিনয়ের পৌষপার্ব্বণের পিঠা খাওয়ার কথা! সেই জলাশয়ে মাছধরার অভিনয়, তার পরে আরো কত কি! রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিতেছিল, জানকী বহুমূল্য আভরণ নিক্ষেপ করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পরিচয়ের রজ্জুসেতু বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষের জীবনও সেই রকম! মহাকাল যখন চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তখন সে প্রিয়তম স্মৃতিগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। তারপরে অনতিলব্ধ অবসরের মুহূর্ত্তে সেই রজ্জুসেতুর অবলম্বনে সে জীবনের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিতে চেষ্টা করে।

করুণ বাড়ীর বাহির হইত না বটে, কিন্তু বাহির তাহাকে ছাড়িল না। বনোয়ারীর দৌরাত্ম্য ক্রমে ভদ্রতা ও শ্লীলতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল। সেদিন রাত্রে করুণ শুইয়াছিল, ঘুম আসিতে তাহার রাত্রি অনেক হইত। হঠাৎ সে দুয়ারে সোটা কয়েক আওয়াজ পাইল। সে সমস্তই বুঝিল। শয্যা ছাড়িয়া উঠিল; প্রদীপটি হাতে লইল; ধীরপদে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া বনোয়ারীলাল। করুণকে দেখিয়া সে আবার হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু করুণের নিষ্পলক চোখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার হাসি অর্দ্ধব্যক্ত ভাবে মিলাইয়া গেল। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে দীপমাত্রোদ্ভাসিত সেই একাকিনী অসহায়া বালিকার মুখেচোখে কি ছিল, যাহাতে ওই পাষণ্ডটাকে বিপুলবং সঙ্কুচিত করিয়া দিল। সে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্রুত পলায়ন করিল। করুণ কিন্তু নড়িল না। যেখানে বনোয়ারী ছিল, সেই দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। চোখে তাহার পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, নাসিকায় নিশ্বাস পড়িতেছে না—বামহাতে সেই তৈলাধার দীপ। কতক্ষণ সে এইরূপ ছিল জানি না, যখন তাহার প্রথম নিশ্বাস পড়িল, সমস্ত অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, অমনি তাহার হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া নিভিয়া গেল; সে মূর্চ্ছিত হইয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ঃ রবীন্দ্রনাথ (৩)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

রচনাভঙ্গির ক্রমবিকাশ এবং পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। সে যুগ তিনটি এই—

'জ্ঞানাঙ্কুর-ভারতী' (বা আদি) যুগ, ১২৮০ সাল হইতে ১২৯০ সাল।

'হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী' (বা মধ্য) যুগ, ১২৯১ সাল হইতে ১৩১৯ সাল বা ১৩২০ সাল।

'সবুজপত্র' (বা তৃতীয়) যুগ, ১৩২১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি চলিতেছে।

মধ্যযুগের প্রকৃত আরম্ভ ১২৯৮ সাল হইতে। ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৭ সাল অবধি সময়টা এই যুগের অরুণোদয় বলা যাইতে পারে। মধ্যযুগ অর্থাৎ ১২৯৮ সাল হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত সময়কেও আবার তিন কালে ভাগ করা যাইতে পারে—হিতবাদী-সাধনার কাল (১২৯৮-১৩০২), ভারতী-বঙ্গদর্শনের কাল (১৩০৪-১৩১০) এবং প্রবাসীর কাল (১৩১৪-১৩১৯)।

আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গির অবিচ্ছেদ ক্রমবিকাশ বা পরিণতি লক্ষিত হয়। 'সবুজ-পত্র' বা তৃতীয় যুগে তাঁহার গদ্যভঙ্গি যেন একটা নূতন মোড় ফিরিল। ইহাকে ঠিক ক্রমবিকাশ বলা বোধ হয় শক্ত। এই যুগের প্রথমেই যে ছোট গল্পগুলি লেখা হয় তাহাতে অনেকটা পরিমাণে পুরাতন 'ভারতী বঙ্গদর্শন' কালের ভঙ্গির বেশ অনুভূত হয়। তাহার পর হইতেই রচনাভঙ্গি অন্যরকম রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। এই যুগের আদর্শ (typical) রচনা "ঘরে বাইরে"।

তৃতীয় যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য এই গুলি। কথ্যভাষার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার। প্রথম প্রথম, যথা ঘরে-বাইরেতে, পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদই মুখ্যতঃ ব্যবহার হইয়াছে, শেষের দিকের রচনায় পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষা হইতে আগত কতকগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন 'দিল')। বাক্যের মধ্যে কাব্যের ধাঁচে পদ সাজানো এই পর্ব শেষের দিকের রচনায় লক্ষিত হয়। (যেমন, 'এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মত রাঙা, তার কাঁচা সোনার রঙের ফুল, ঘন গন্ধ তারি ভরে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াসা যেন।' [মাসিক (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ সাল, পৃঃ ৫৬৯)]।) কথার ভঙ্গি অনপেক্ষিত (abrupt)। ভাষার ও ভাবের চটকে পাঠককে চমকিত করিয়া দিবার চেষ্টা প্রগত। চমকিত করিয়া দিবার এই সজ্ঞান চেষ্টা "শেষের কবিতা"-র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। সেইজন্য এই বইটি parody বা ব্যঙ্গ-রচনার পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু এই ভঙ্গি যে এই যুগের অপরাপর রচনাতে একটা কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। চেষ্টাকৃত বলিয়া অনেক সময় এই যুগের রচনায় উপমা-উৎপেক্ষার বা অনুপ্রাসে পূর্ব্বেকার সারল্য ও হৃদয়গ্রাহিতার অভাব লক্ষিত হয়। যমকের প্রয়োগ এই যুগেই আরম্ভ হয়। সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ বাক্যের শেষে আসে। ইহাই বাঙ্গালা ভাষার রীতি। কাব্যের ভাষায় এবং মুখের ভাষায় (বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জনার জন্য) কখনও কখনও এই রীতির ব্যতিক্রম হয়। এই যুগের রচনায় ক্রিয়াপদের এই রকম ব্যত্যাস খুবই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগদ্বয়ের রচনায় ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ আশ্চর্য্যরকমের অল্প। শেষের যুগের রচনায় কিন্তু ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্য অবশ্য বিষয়বস্তুই দায়ী।

এইবার রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান গদ্যরচনা লইয়া আলোচনা করিব, এবং তাঁহার রচনাভঙ্গির অভিব্যক্তিধারা তাঁহার রচনা হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট," "অবসর সরোজিনী," এবং "ভগ্নহৃদয়" নামক তিনটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা। ইহা "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব" নামক মাসিক পত্রের চতুর্থ খণ্ডে ১২৮৩ সালের

কার্তিক সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৪৬৩ হইতে ৪৫০) প্রকাশিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনেরো। এই রচনাটির উল্লেখ "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। ইহার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই, তথাপি কবির প্রথম গদ্য-রচনা হিসাবে কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের গদ্যরচনা কি রকম তাহা জানিবার কৌতূহলও সকলেরই আছে। সুতরাং এই বিস্মৃতপ্রায় রচনাটির প্রথম হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে আশা করি বৃথা বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিম্নে উদ্ধৃতাংশ যতদূর সম্ভব মূলের মত করিয়া ছাপা হইল।

মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে তাহা বাক্যে প্রকাশ না করিলে সে সুখ হয় না। যখন কোন লতা পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, অথবা সেই লতা সম্বন্ধীয় গান করিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন অবস্থা। পরস্পর বা কোন অপরের হইতে লোকে যুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের জন্য চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের জন্য চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি চিত্তের সকল ভাবের মূল উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের তার সাধন করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত যত শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বহমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির মত বালুকাময় আর করিতে পারে, ইহা শৈলদেশের শিলারাশিকে উর্বরা করিতে পারে। কিন্তু যখন অভিপ্রায়ের দ্বারা আমাদের হৃদয় বাহিরে অভিমুখে উৎসারিত হইতে থাকে, তখন সেই অভি আর কাহার ভালোমন্দ দেখে, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প বলে। কবিদিগের হৃদয় উৎস হইতে যে সকল গীত বাহির হইয়াছিল, তাহাতে চিত্তপূর্ণ গঠিত হইয়াছে এবং যেন পূর্ণ-রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়েরা পরের ভাষাতেও তাহা ভঙ্গ করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই মুখের সমস্ত ভৈরবের উদ্রেক করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব ব্যক্ত করে, বিলাসের সময় প্রেমিকের মুখে আসিয়া গান করে, দেবতুল্যের সমক্ষে ভক্তির উৎস উদ্ভূত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ভারতে বিদ্যাপতির উদ্ভবনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই ইংরাজের কবি বায়রনের বয়স করিয়া বিয়াছে; এবং এই গীতি-কাব্যই বাঙ্গালার নিজস্ব হৃদয় আমাদের মধ্য অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সঞ্চার করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। যেমনীয় পরের জন্য চিত্র করিয়া বৃদ্ধকালে অবসাদ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের জন্য চিত্র করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। যেমনি কবিগণ নিজ জন্য চিত্র অবসাদে, কিন্তু পরের জন্য চিত্র করেন। গীতিকাব্য অনুচ্চারিত যেমন ব্যক্ত আমাদের নিজের জন্য রচনার মূল, আর মহাকাব্য নিজ, যেমন ইহা পরে অনুকরণ করে। এই নিজের ভাবের অনেক, যেমন, প্রেমের, ভক্তির প্রভৃতির। গীতিকাব্যের কবিদিগের ভাব ভাষাকার দেখিতে পাইবে না, যেমন সেই গীতিকাব্যের লোকে দেখাবার আহ্লাদের জন্য প্রকাশ করিতে জানিত না, সুতরাং কবি তখন প্রকৃত কবির সেই অভাবের জন্য সকল সময়েই চিত্র করিতে পারিবেন।

উদ্ধৃত অংশ গদ্যের অনুচ্ছেদের আগে। অনুচ্ছেদগুলি এই রকমই বড় বড়। বালকের রচনা হইলেও ইহা যে কোন কবির লেখা তাহা উপমাদির ঘটায় স্পষ্টই বোঝা যায়। আর রবীন্দ্রনাথের পরের কবির আভাসও ইহাতে দেখা যায়। উপমাদির প্রয়োগ, একাধিক অলঙ্কারের দ্বারা উক্তি সমর্থন—ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাক্য-প্রয়োগরীতির পরিচয়ের অভাবও ইহাতে নাই। যেমন—'কেননা' শব্দ দিয়া সমর্থক বাক্যের প্রয়োগ; 'এবং' শব্দ দিয়া বিভিন্ন বাক্যের সংযোজন, 'হওয়াতে' এই পরের স্থলে 'হইয়া' এই অসমাপিকা পদের প্রয়োগ; ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের মাস কতক পরেই (শ্রাবণ ১২৮৪ সাল) "ভারতী" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ভারতীর মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যসাহিত্যের আসরে বীতিমত প্রবেশ করিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই মেঘনাদবধের সমালোচনা "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রবন্ধের কিয়দংশ বাহির হইল। পরবর্তী অংশ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন এই কয়মাস ধরিয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনার মধ্যে নানা কারণে এইটিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জীবন-স্মৃতিতেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশ্ববাণী হইতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কবির দ্বিতীয় গদ্যরচনা বলিয়া ইহারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সুতরাং এই প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা তুলিয়া দিলাম।

অমিত্রাক্ষর পাঠ সম্বন্ধে কবি ইতিপূর্বে নিজের মনে কোনো ধারণা করিয়াছিলেন, অপরাপর লেখকের তাহা ঠিক মিলিয়া যায় নাই। হয়, কোকিল, কদম্ব নদীর বিষয় বর্ণনা করিতে বসা হইলে তাহার ভাল না লাগুক, কবিতায় অন্য সকল দেশ ইহাদের নিজস্বতার অধিকার করিয়া ইহাদের ঠকে বসে, ইহারা অন্য হইয়া যাইবেন। ইহার ভাব-বিশেষ নিয়ে ছন্দের বিশেষ-সাধ্য বা পরাভূত

অবশ্যই তাহার শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া অধিক কিছু করিতে পারিত না, কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতই করেন। গল্পের মিষ্ট অথচ আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে, তাহার কোন তাঁহাদের চক্ষে প্রহর হইয়া পড়ে। দুই একটি ঘটি-বাটি-ঘড়ির পুরুষ পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের কল্প পরিচ্ছদের কিছুই আসে যায় না, ঐ-পরিচ্ছদ সেই দুটি ব্যক্তির কর্মকাণ্ড কিংবা পরিণামে প্রভেদ করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না। [ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪ সাল, পৃঃ ৮]।

উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথের অর্থান্তরন্যাস বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি (explanatory style)-র একটি সুন্দর উদাহরণ মিলিবে।

ভারতীর প্রথম বর্ষের তৃতীয় (আশ্বিন) সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পরবর্তী সালের ভাদ্র সংখ্যা অবধি চলে। উপন্যাসটির নাম "করুণা।" ইহা পুনর্মুদ্রিত ও হইয়াছে নাই, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও ইহার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

বইটির ভাষা স্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর। দ্রুততালে ঘটনাদির বর্ণনা চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষে গ্রন্থকারের উক্তি-বাক্য আছে। অতীতকালের সহিত অতীতকালের অর্থে বর্তমান কালের প্রয়োগ যথেষ্ট। কথোপকথনের মধ্যে সাধু ভাষার সহিত কথ্যভাষার মধ্যে মধ্যে মিশ্রণ হইয়াছে। ভাষার নমুনা হিসাবে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গায়িকা হইবার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার লজ্জিতা লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের পুঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি। বিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন। গ্রাম-বাসীন লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড় অনুকূল, কারণ তাঁহাকে সকল প্রকারের গল্প পলিসি হইতে ও বিশ্বাস করিতে পারিতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আর কেহই ছিল না। এই গুণে বর্ধিষ্ণু হইয়া বিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিদ্যার গল্প শুনাইতেন। গল্পের চলন পাতা টাঁচির ছুটির-দিনে সায় পর্ব এইরূপ দাঁড়ায়—বিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখা পড়ায় ইতি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। বিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু এমন কন্যা পৃথিবীতে নাই, যে বিধির মত মোদুর্কে আপনি পলিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অধিষ্টির চতুর বিধি শ্যালার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাকা আনাইল এবং চাপকান ও পাগড়ী পরিয়া ভট্ট কৃতক কাগজের চাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখে পাকীতে চড়িলেন। গিয়া কহিলেন "ও বিধি, আমি যে তোমাকে দেখতে এলেম।" বিধি কহিলেন "না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আসবে, তের কাজ তের দেখা পড়া আছে, আজ আর হোচ্চে না।" কন্যা-কর্তারা জানিয়া গেল যে, বিধি কাজ কর্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর সিরেট বিদায় হইয়া গেল। বিধি ইয়ার মধ্যে একটি কথা চালিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি পাড়ার একটি প্রস্টাল ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিও বিশপ্স কলেজে। দৈবক্রমে বিধি-সভায় ঐ প্রশ্ন করায় বিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল বিয়াক্ কলেজে। তাহাতে কন্যা-কর্তার বিধির মূর্খতাকে অসিকতা জ্ঞান করে তাই সে বক্তার সে মনে মনে হাস্য পায়। [ভারতী, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ১৭৮-১৭৯]।

তৃতীয় বর্ষের (১২৮৬ সালের) ভারতীতে "য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" বাহির হইতে থাকে। এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। ক্রিয়া-পদগুলি সবই কথ্যভাষার তবে বিভক্তি উপভাষার রূপগুলি অনির্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। যেমন,—উঠ্‌লেম, দেখলাম, করতেম, ভাবতুম ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের বানানেও নূতনত্ব আছে। যেমন,—পোড়লেম, বইতে, দেখাচ্চে, কোচ্চে, বোল্লেন, কর্বার, হোয়ে, বোলে, ইত্যাদি। সাধুভাষার ক্রিয়া-পদেরও মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ আছে। তবে অমার্জিত হইলেও ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ। উদাহরণ হিসাবে নিম্নে কিছু উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আমরা এখন Devon Shire এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিক হাস্য মুখ। চারিদিকে পাখী ডাকচে, ফুল ফুটচে। যখন Funbridge1 Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখানে যদি অমর থাকে, তবে সে বেচারি তার ফুল পর তৈরি করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক দূর যাবার, কোশ কোশ, কাঁটা খাব হাতড়ে হাতড়ে দুএকটে কুরো ফুল নিয়ে তার চালাতে হয়; কিন্তু Torquayতে যেন যদি স্যাটলিএর কারখানের মত এমন একটা যন্ত্র চালাবেন কোরে আছে থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে টাট্‌কা ফুল, আর সেই ফুল দিয়ে হাত যদি কাজে কম থাকে, তা হলেও ফুল পরে ফেলিয়া এখানে মেটেলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এত ফুল। [ভারতী, তৃতীয় বর্ষ, পৃঃ ১৩০-১৩১]।

তাহার পর "বৌঠাকুরাণীর হাট"-এর নাম করিতে হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহা ভারতী পত্রিকায়

১। ছাপার ভুল; Tunbridge হইবে।

১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে সমাপ্ত হয় এবং ১২৯০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের বিশেষত্ব—ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ—ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। ভাষা সহজ, সরল সাধুভাষা। ঘটনার বর্ণনা দ্রুততালে চলিয়াছে। অলঙ্কারের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্পই। অনুপ্রাসের প্রয়োগ নাই। ইংরেজিয়ানা অল্পস্বল্প আছে। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই কম। কথোপকথন সাধুভাষায়। 'ঠাহরাইবেন না', 'ইচ্ছা পূরাইতে', 'তিষ্টিতে', 'তলাইয়াছিলেন' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। ভাষার নমুনা হিসাবে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি বর্ণনাত্মক বঙ্কিমী পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি নিজস্ব অলঙ্কৃত পদ্ধতি।

রাত্রি দশটা হইল। অনেকগুলি লণ্ঠন তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি দশটার রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদ্র জনশূন্য। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে; দূরবর্তী দুর্গ, কৈবৎ দু'একটী পূর্ণাল ছাড়া একটি আলোকও নাই। উজ্জয়িনীর পান্থজনের যাত্রা বন্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। পদ্মকর দুয়ারের দুর্গল খুলিয়া দিলেন। "কেন? বিদ্যা? কি হইয়াছে! এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন!" [বিসর্জন (সংকলন, পৃঃ ৮০)]।

দেখিলেন রূপসীপাড়ু কলোল-তরঙ্গ রাজধানী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে পর্বত, অন্ধকারে নিদ্রা, রজনীগন্ধা, দুর্গলোক শীতল, আকাশের অসংখ্য পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত বারিরাশি, প্রকৃতির অনন্ত যৌবন, হৃদয়ের স্বাভাবিক যেন সমস্ত উহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। (পৃঃ ১৮১)।

১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে যুগসন্ধির আবির্ভাব হইল। ১২৯১ হইতে ১২৯৭ পর্য্যন্ত এই যুগসন্ধির কাল। তাহার পর ১২৯৮ সালে দ্বিতীয় যুগোদয়। এই সালেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত হয়, এবং তাঁহার যে নিজস্ব গদ্যভঙ্গি তাহার সমস্ত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি ছোট গল্প এই সালেই প্রকাশিত হয়, প্রথমটি ভারতীতে (কার্ত্তিক মাস), নাম "ঘাটের কথা", দ্বিতীয়টি নবজীবনে (অগ্রহায়ণ মাস), নাম "রাজপথের কথা"।

উপমা উৎপ্রেক্ষাদির (অধিক না হইলেও) সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং আত্মদৃষ্টিমূলক(subjective) এবং ব্যাখ্যাত্মক (explanatory) বর্ণনাভঙ্গি এই দুইটি রচনায় এবং এই যুগের অন্যান্য রচনায়ও দেখা দিয়াছে। ভাষা বিশেষ অলঙ্কৃত না হইয়াও হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম। ভাষার জড়তা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। পদ ও শব্দ প্রভৃতির বিসদৃশ প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। অনুপ্রাসের ব্যবহার এখনও আসে নাই, তবে শ্লেষের প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছে। যেমন, '—উপন্যাসে চার চোখে বিস্তর ছায়ামাখা হয়, আর সত্য ঘটনায় শুষ্ক তমাখরচের বহুলে চার চোখে বোল গণ্ডার বেশী হয় না।' [সরোজিনী প্রয়াণ (ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ৩৭১)]।

বিশুদ্ধ সরসতার(humour)ও পরিচয় এই সময়ের রচনার মধ্যে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। যেমন, '(আমাদের কাহাকে বরাত ঠেকিল ভবু ডুবিল না···) না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না।' [ঐ (পৃঃ ৩৭১)]।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম দুইটি গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে সহজে বোধ হইবে যে এই সময়ে তাঁহার গদ্যরচনাভঙ্গির কতদূর পরিণতি হইয়াছিল।

রোমাদের প্রতিবেশীরা যে দিন সকালে উঠিয়া এমিলির মুখে সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এখানি থোকা টাকির কাপড় তুলিয়া নদীর জলের উপরে প্রভাতের আলো আরো একটু আলোময় করিবার জন্য গঙ্গাজলের মধ্যে দিয়া গ্রামের উঁচু নিচু রাস্তার ছিপর দিয়া পথ করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন রোমাদের সম্ভ্রান্ত তাঁহাদের মনের একপাশে উদিত হইত না। [ঘাটের কথা (ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ৩০৭)]।

কি প্রখর রৌদ্র; ঝাঁ-ঝাঁ, ঠা-ঠাঁ, এক একবার নিশাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা দুইদল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। বধূ ধরিত্রী, সুখী সুন্দরী, জয়া যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সবগুলি আমার উপর দিয়া একটি বিশাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য সাথে যাইতে যাই কাহাও নাই। খুবই অট্টালিকা জন্য লোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমিষের পর সমস্ত নূতন অতীতকে লইয়াই ধন্য। এমন স্থানে নিজের পদচিহ্নের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সযত্নে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চিরকাল-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে নৈরাশ্য ফেলিয়া যাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহার তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, দূরের অভিমুখের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে! যাত্রাদের উপর যাত্রার কি ছাই হয়! না না মৃত্যু শ্রেষ্ঠ! আমি

কিছুই পড়িয়া অর্থিতে লিখি না, হাসিও না, কাঁদাও না। আমি কেবল পড়িয়া যাই। [রচনাবলীর কথা । প্রবাসীর, সাল, পৃঃ ৩০১-০২]

পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে তৃতীয় উপন্যাস "রাজর্ষি"-র অধিকাংশ "বালক" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি তাহার পর বৎসর সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। রাজর্ষি বাহির হইবার পূর্বে বালক পত্রিকায় "মুকুট" নামে একটি ছেলেদের উপযোগী বড় গল্প প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ভৌজ)। মুকুটে এবং রাজর্ষিতে বর্ণনা ঘটনাবহুল, এবং সেই ঘটনাও বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। রাজর্ষির অধিকাংশ ভাগ কথাবার্তা সাধুভাষায় লিখিত, অল্প কয়েক স্থলে চলিতভাষায়।

রাজর্ষি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এটি একটি বাহ্যদৃষ্টিমূলক (objective) দৃশ্যবর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য এইরূপ বাহ্যদৃষ্টিমূলক (objective) বর্ণনা বড় বেশি নাই।

অন্ধকার রাত্রি যে প্রকার হইল তাহা অতি অল্পের প্রভাত। পূর্বে শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। পশ্চিমদিকে মেঘ অল্প অল্প আছে ও স্নিগ্ধ। পূর্বদিকে ও পূর্বদিকের অর্ধেক আকাশ জুড়িয়া কুয়াশা করিতেছে। তর অন্ধকারের আকাশে প্রান্তের অল্প অল্প নীলিমাতে বিকশিত হেয় পড়িবার মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে তিল তারিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রিয়ের জ্যোতির নীচে নিজ অন্ধকার ক্রমে উড়িয়া চলিয়াছে। কাকিড়াগীরা গায়ে গায়ে ঘুটাঘুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু পক্ষপাল শঙ্কিতে জোড়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাদগুলির অতি দূরে পাহাড়ে টিয়ার ঝাঁক কিচিমিচি করিয়া যাইতেছে। পক্ষীগুলি আজ মনের আনন্দে মাতামাতি হড়াহড়ি পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষে মাঠের পথে চলিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। পূজা পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কলকল করে তাহারা গল্প করিতেছে—কোথা কলরবেরও বিরাম নাই। আকাশের প্রান্তরে এই জীবন্ত আনন্দরাশি বর্ণের দিকে চরিত্র দীপ্ত নিশান মেলিয়া জগতের অধিপের প্রবেশ ঘোষণা করিল। (১২৯১ সালের সংস্করণ, পৃঃ ২৫]।

ইহার পর ১২৯৭ সাল অবধি কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা নাই, কেবল কতকগুলি প্রবন্ধ। ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। তাহার পর ১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের এক নূতন প্রেরণা আসিল। এই যুগকে মোটামুটি সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শনের যুগ বলা যাইতে পারে। এই দশ বারো বৎসরের ভিতর বাঙ্গালা গদ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়রূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইল। এই যুগের সূত্রপাত ১২৯১ সালে হইলেও প্রকৃত আবির্ভাব হইল ১২৯৮ সালের গোড়ার দিকে "হিতবাদী" পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এই বৎসরের প্রথমেই এই পত্রিকার জন্ম এবং ইহারই প্রথম কতিপয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি এই—দেনা পাওনা, গিন্নী, পোষ্টমাষ্টার, তারা-প্রসন্নের কীর্তি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা।

এই ছয়টি গল্পের মধ্যে "দেনা পাওনা"ই বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির ভাষাও অপর গল্পগুলির ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বাক্যগুলি ছোট ছোট। ভাষাও অলঙ্কারবর্জিত, ঘটনার বর্ণনা দ্রুতগতি। ইহার ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড় তিনটি ছেলে বিশেষরূপে এবং তাহাদের কাহারো ব সন্তান আছে। তাহাদের আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবলরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

বাকি পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি—পোষ্টমাষ্টার, ছাড়া সবকটিই যথাসম্ভব অলঙ্কারবর্জিত ভাষায় রচিত। "পোষ্ট-মাষ্টার" গল্পটির ভাষার একটু বিশেষত্ব আছে। ভাষা এখন কিছু অলঙ্কৃত নয়, তবুও আত্মদৃষ্টিমূলক (subjective) বর্ণনার দরুণ গল্পটির ভাষা ইহার পারিপার্শ্বিকতার সহিত একীভূত হইয়া জমাট হইয়া উঠিয়াছে। এত স্বল্প আয়োজনে ভাষা ও ভাবের এমন ঘন-সন্নিবেশ রবীন্দ্রনাথেরও অন্য কোন গল্প বা অন্যত্র রচনায় পাওয়া দুষ্কর। ঘটনার বাহুল্য একেবারেই নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বড় বড় জটিল (complex) ও যুক্ত (compound) বাক্যেরই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কিন্তু রতনের মনে কোনো ভয়ের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অঞ্চলে কালিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কোন কালি তাহার মনে কীরূপ আশা জাগিতেছিল, পালঙ্কের ঘটি কিরূপ আসে,- সেই বালিকা পড়িয়া কিছুতেই বুঝে যাইতে পারিতেছিল না। হায় পৃথিবীর মানব হৃদয়! মাঝি কিছুতেই বোঝে না, মুরিপাত্রের বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসে মাথার প্রবেশ করে, প্রবল প্রবাসকেও অবিশ্বাস করিয়া নিজ আপনাকে দুই অসম্পূর্ণ বাঁধিয়া সুখের ভিতর প্রাণপণে দাঁড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত বাড়ী কাঁদিয়া তাহার হৃদয় ছিন্ন করে, তখন ফেলিয়া যায় এবং বিদেশীর মাঝিপাশে পড়িয়া তার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে "সাধনা" পত্রিকার আবির্ভাব হইল। সাধনার পত্রে পত্রে রবীন্দ্রনাথ "গদ্য পদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে" লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গিও এই সময়েই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাহা দিন দিন পুষ্টিলাভ করিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়কার প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি।

আমরা যে কয়টি লোক কলিকাতার আকাশে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের আশ্চর্য শক্তিতে এই নিত্য সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অদৃষ্টবিধি দৃষ্টিলিপির নিগূঢ়টিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, তবুও কি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা গতবারে বসিয়াছেন তাঁহারা বঙ্গ, যাঁহারা প্রথমবারে বসিয়াছেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার, —আমরা এই চৌপথিক অতীত দেশের প্রচলিত ভাষার অন্তরে দুখ দুখ ক্ষেদ-প্রকাশ করি, তাহার বড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং তাহার বড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদের অনুরূপ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন! সেও বর্তমানের অহঙ্কার নহে, ভবিষ্যতের অহঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, তাহা অনুরোধের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উদ্যোগআয়োজনগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অন্তরঙ্গলোকটিতে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজত্ব বিস্তার করিবে এবং সেই ঐশ্বর্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে। [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (সাধনা, বৈশাখ ১৩০২ সাল, পৃ: ৫৭৫)]।

সাধনা ১৩০২ সালে উঠিয়া যায়। তাহার পর ১৩০৪ সালে আবার ভারতীতে গল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩০৮ সাল হইতে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যক্ত হয়। এই সময়টাতেই অর্থাৎ ১৩০৪ হইতে ১৩১২-১৩ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি যাহা সাধনার যুগে অর্থাৎ ১২৯৮-১৩০২ সালে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অপূর্বরূপে বিকশিত ও অলঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই সময়ে লেখা গল্পে উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। গদ্য পদ্যের মত সুষমাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই, থাকিলে বলিতে পারিতাম, এইরূপ অলঙ্কৃত, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, মহীয়ান্, অনবদ্য, মধুর গদ্যরচনা অন্য কোন ভাষায় আছে কি না। এই ভারতী-বঙ্গদর্শনের যুগের রচনার নমুনা হিসাবে কতকগুলি অংশ তুলিয়া দিতেছি।

পুলিনটিতে অনেক জিনিস দেখি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কেতুনে চাঁদ নাই, ওপারে গাছের মাথা নাই—কিন্তু আমার নিজের মাঝটা আকাশের সঙ্গে আমি যে সম্পূর্ণ মিশ্রিত এবং অন্ধ বিলীন তাহা এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সম্পূর্ণ মনে করি নাই। মনে হইল আমি উর্ধ্বে নাই, চতুর্দিকের আমার অন্তঃকরণ অন্ধকারোপকূলে নাই-সৌন্দর্যের একটা বাষ্পবৃষ্টি যে গঠন করিয়া রহিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে মনে কোনরূপ লক্ষিত এবং মনে অনুভব করিতে চাপল করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর কখনো নিকটে গায়ে ছুঁয়া গায়ে আমা হাতে যা দেখিয়া ভ্রম জন্মাও করি নাই, উপমা করি নাই কিন্তু আমার সমস্ত অন্তঃকরণের অপরাজে প্রবীণ চক্ষুরিন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষিত অনন্তসুন্দরকে ইন্দ্রিয়পরিচিত রূপের এবং আলোকরেখাঙ্কিত পুষ্পপল্লবে ছুঁয়া পায়ে ছিল আমা যায় ছিল কী হাতে তাহা দুইটি তারকার আড়ালে অন্তরাল দেখা দিবে—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না। [পঞ্চভূত : অনন্ত]।

অপিচুল একখানা ঔকিয়া কলিকা তৌকির পিঠে উপর মাথা উঁচুমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল, তাকিয়েছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল ছিলিম, যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে সোনাঝরির তৃণক্ষেত্রে চিৎ হইয়া পড়িত। উপরে মাথা তাকিয়া ঐ অনন্ত কালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই বন্দীবৎসরী বন্ধুবান্ধবীর একটি বিরলকেশ ললাটের অনেকখানি অংশ সেই উদয় তারা দুখানি, তখনকার সেই বিশ্ব কি সুখময়, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের বেদনাস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র 'ভাবরাগের ঝিলিমিলাকার' রচিয়া তুলিত! আজ সেই একই তারা আজন তিমির আকাশে মোহমুদ্গরের লোক একটা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে, 'সংসারোৎসবটার বিচিত্র।'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত দূর হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এল, পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল। [ঐ : অন্ধিয়ারা]।

অনে অনে ঠক ঘরগুলো রাত্রের অন্ধকারে পরিচিত করিয়া তুলিয়া গেল, অনে অনে পৃথিবি পড়ে আকাশের মত পল্লবের মত হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্য সাথীর কথা। বলিতে বলিতে হৃদয় মাঝ হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল: বিনোদিনীর সুখ যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিকাশ করিত, অন্ধকারের ছায়া আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকহাস্যের কটাক্ষ দেখিয়া তাহাকে ভয় করিত, মনে এ পর্যন্ত বারম্বার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলজ্যোতি তখন একটি শান্ত সমুদ্রের মত হইয়া আসিল, তখন ঝিনোদিনী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিহরণের কেমন করিয়া কোন্ অন্ধকার একলা সুধাময়ের মত হইয়া আসে,—অপরিচিত অন্ধকারকৌতুকবিলাসের পরিবর্তনায় কখনো বাহ্যপ্রকৃতি শুদ্ধ হইয়া যায় নাই। [চোখের বালি]।

যেন সমস্ত পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোন হইতে সেই পরপারের পূরবৈয়া কলিকাতার যেন আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার কাছে, আমার পৃথিবীটুকুর কাছে সে আমাকে কোন অনন্তপুরীতে, কোন চিরসৌন্দর্যের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চির-মিলনের আশায়, চিরসৌন্দর্যের রোমাঞ্চটুকু পরিস্ফুটনের-উৎকণ্ঠিয়ায় আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর সেই ক্ষুদ্র সীমা সেতুর দুই প্রান্ত হইতে দূরে, দূরে চলিয়া যায়, তাহা জানিতে পারি নাই। আমার যত বড় হইব তত, তত পারিব না। যাহাকে এত নিবিড় ভাবে বেশি সত্য করিয়া হইতে দিতে পারিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, তবে দূরে তাহাকে স্পষ্ট করি নাই। [ক্রমশঃ

ইহার পরবর্তী যুগকে অর্থাৎ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ পর্যন্ত সময়কে প্রবাসীর যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ের লেখায় অলঙ্কারের বাহুল্য পরিমাণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। অনুপ্রাসের ছটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষা স্বচ্ছ, লঘুগতি, আড়ম্বরহীন, মধুর। এই সময়ের প্রধান গল্পরচনা "গোরা" এবং "জীবনস্মৃতি"।

গোরা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে বাহির হইতে থাকে এবং ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে সম্পূর্ণ হয়। গোরা রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ উপন্যাস। ইহার পূর্বে "চোখের বালি" এবং "নৌকাডুবি" বঙ্গদর্শনে যথাক্রমে ১৩০৮-০৯ এবং ১৩১০-১২ সালে প্রকাশিত হয়। গোরার মধ্যেই সর্বপ্রথম মুখের ভাষায় কথোপকথন লিখিত হইল। ইহার পূর্বে কেবলমাত্র "মুক্তির উপায়" নামক গল্পে কথোপকথনের জন্য কথ্যভাষার ব্যবহার হইয়াছিল। নিম্ন-উদ্ধৃত অংশটি গোরার ভাষার উদাহরণ রূপে দেওয়া গেল।

গোরা স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে যে উত্তর দে প্রসন্নতা করিয়া করিতেছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাস মাত্র কোথায়? তাহার মুখে দৃষ্টির একটা উজ্জ্বলতা নিজেকে প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু সরলতা ও লজ্জার ভাব তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আছে দেখা দিয়াছে! মুখের গৌরটি কি সুকুমার! অলকের উপরে ললাটটি যেন পল্লবের আকাশখণ্ডের মত নির্মল ও স্বচ্ছ! প্রান্ত দুটি চুল কপালে আছে কিন্তু অসংযত কপার মাঝখানে সেই দুটি রেখার মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে।

"জীবনস্মৃতি" ১৩১৮ সালের ভাদ্রমাস হইতে প্রবাসীতে বাহির হইতে থাকে। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার ভাষা গোরার ভাষা হইতে আরও আড়ম্বরবর্জিত এবং আমার মনে হয় আরও সুমধুর। ভাষা কোথাও অনাবশ্যক রূপে পল্লবিত হইয়া ভাব বা বিষয়বস্তুকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তুলে নাই, অথচ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সমস্ত মাধুর্য ইহাতে বর্তমান। এক হিসাবে জীবনস্মৃতিকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। উদাহরণ হিসাবে ইহা হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরি হইয়া কিনারে বাগানের বেলাভূমির ঝাঁকড়াঝাপড়া জলের উপর ঝরিয়া আসে। বর্ষাকালের পুকুরে মনের ভিতরটা কেমন ঘুমের মত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে আলিয়া সমস্ত ছয় মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া পথির মোড়ের দিকে অনেক ক্ষণ হইতে তাকাইয়া আছি। "পড়ছি পড়ছে ঝিনিক পড়ে পড়িত ভবনপানে" থাকে থাকে। এমন সময় বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। আমার বাছা "দা হতোস্মি" করিয়া পড়িয়া গেল। কৈবল্যলোকে অসংখ্য সেই কালো ছায়াটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ না, হইতেও পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিলেও পাই কিন্তু সে যে সপ্তলোকের আমাদেরি পরিচিত আমার সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অনুকূল একেবারেই অসম্ভব।

১৩২১ সালে "সবুজপত্র" প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে অনেকগুলি গল্প, একটি উপন্যাস এবং কিছু কিছু গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (কবিতার কথা বলিলাম না, কারণ তাহা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।) এই সকল গদ্যরচনার ভাষা পূর্বেকার সমুদয় রচনার ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এইটিকে তৃতীয় যুগ বা সবুজপত্রের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগের ভাষার লক্ষণ এইগুলি;

অনুপ্রাসের পুনরাবির্ভাব। যমকের ব্যবহার। শ্লেষের প্রয়োগ। অনেকটা চেষ্টাকৃত সূক্ষ্ম উক্তির (epigram) ব্যবহার। সরল অথবা অপ্রত্যাশিত বা অনপেক্ষিত উক্তির দ্বারা পাঠককে চমকিত করিয়া দিবার একটা অন্তরঙ্গগত প্রচেষ্টা এই যুগের গদ্যরচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির ভাষা অলঙ্কারমণ্ডিত; অনেকটা গল্পগুচ্ছের ধরণের। তবে আরও কাব্য-ঘেঁষা (poetic)। বর্ণনার ভাগ, বিশেষ করিয়া পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির বর্ণনা, ইহাতে নাই বলিলেই হয়। গল্পগুলি প্রায় সবই শুধু গল্পগুলি কেন উপন্যাসটিও, autobiographical অর্থাৎ পাত্রের বা পাত্রীর নিজ মনের ঘাতপ্রতিঘাত লইয়া রচিত। সেই জন্য কাব্য-ঘেঁষা ভাষা কিছুমাত্র অসঙ্গত বা

অশোভন হয় নাই। তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প হইতে কিছু-অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কিন্তু একি কাণ্ড ? একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম ? যেন শুরু আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম ? ঘরে ছিল অল্প বয়সের বৌমার যে রোগ কালো হইয়া রমিলা উহাদের তাহাকে বৈদ্যশাস্ত্রের ঘোড়ো বুদ্ধির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিল। কিন্তু না পারিলাম বাংলায় বিজ্ঞাপন ঘই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই আর না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এখন পুরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার চিত্তচকোর গল্পলহরী সন্ধ্যাটীর আকাশে আপনাকে আপনি পিঞ্জিরা রচিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কি ? তাহার যে অন্ন শুকাইয়া গেছে। কৈশোর যৌবনেই ত কৈশোর অন্নপূর্ণার মোহন। (গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয়)।

"চতুরঙ্গ" সাধুভাষায় লিখিত হইলেও ইহার ভাষার ছাঁচ কথাভাষার। সর্বনাম পদগুলির রূপ প্রায়ই সবই কথা-ভাষা হইতে গৃহীত। তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট। বাক্যগুলি ছোট ছোট। গল্পগুলির ভাষার অপেক্ষা চতুরঙ্গের ভাষা অনেক হালকা। ভাষার উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। উদ্ধৃত অংশটি ভরতের মুখের একটি সুন্দর উদাহরণ।

সে দিন সমস্ত দিন ঝুরঝুর করিয়া রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তাঁর সাহেবের খাওয়াদাওয়া খেলাধূলির একটা ঠিক আছে। সেটা নিয়মিত চলে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর কলকল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ওস্তাদে করতাল বাজাইতে লাগিল। ঘরটা অন্ধকারের মধ্যে কি যে বড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, অথচ তাঁর মানে হইবের আক্রোশে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মত জোর হিঁর হইয়া উঠিতেছে। শিশুবের মধ্যে যেন একটা ঝিমানো প্রেতিনীর কাজ, আমবাগানের মধ্যে তালপালাগুলার ঝটাপট শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হড়হড় হুড়হুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজর-গুলায় ঐকের ঝিঁঝি মিলিয়া যায় যায়,বাতাসের ঠেলা ঘুরি লাগিলে সে কেবলি একটা অন্ধ ঘর ভর করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজায় ঝিটকিমারীগুলা বন্ধ থাকে, ভিতরে বড় চুলিয়া পুড়ে, তার আলুথালুগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফরফর করিয়া কে কোন্‌দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তাঁর ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কি-সব কথা ভাবিতেছিলাম আজ এখানে লিখিয়া কি হইবে ? এই ইতিহাসে সেগুলা একটা কথা নয়। (বৈকিলাস)।

"ঘরে-বাইরে" রবীন্দ্রনাথের সপ্তম উপন্যাস। ইহা ১৩২২ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কথ্যভাষায় লেখা। চতুরঙ্গের মত ইহার রচনাভঙ্গিও আকস্মিক বা অনপেক্ষিত(abrupt style)। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য আরও বেশি। এই অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য এবং ঔজ্জ্বল্য ঘরে-বাইরের ভাষাকে অনেক পরিমাণে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। এই বইয়েই সর্ব্ব প্রথম 'সে (তা-)' এই সর্বনামের স্থলে 'ও-' এই নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক এক সম্প্রদায়ের লেখকের মধ্যে এই প্রয়োগ মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঘরে-বাইরের ভাষার কিছু উদাহরণ দিলাম।

আমি বিমল হায়ার না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড় কারবার গড়ার মাঝখানকার ফাঁক ঘোড়ো রাস্তা,—ঘরের চতুর্দোলায় যে কর্তাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাঁধা পড়েছিল, ঘরের বাইরে সেই চাঁদে সে কর্তৃত্বের ভুলছে না। অন্তরে বাইরের সঙ্গে জোড়-মেলা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা যোগেপাড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই পূর্ণ জীবনের কর্তব্যের মধ্যে কোথাও আমি আর বাকি নাইনে তাহলে মুখ এরদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল থাকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি ? কিসের জন্যে ? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে ?

প্রখর অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিতেছি—

—মনের কোণা আর নদীর সুদূর-বিস্তৃতির মধ্যে ওঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তুলিয়ে ফেলেও তাঁর কোলাহার বড় ঘরের দক্ষিণ দুয়ার অভিমান ভরে আজকে ঘরে আমাটাকে উপরে তাকিয়ে রেখেছিলেন।

"লিপিকা"-র মধ্যে যে 'কবিকা' বা গল্পের টুকরা বা গদ্য কবিতাগুলি আছে তাহার অধিকাংশের লিখনভঙ্গি অনেকটা কাব্য-ঘেঁষা। তাহাই স্বাভাবিক। কাব্যের ভাষায় লেখা বলিয়া ইহাতে থাকে সাধারণ পদবিন্যাসের বাতাস এবং কতক কতক মৌখিক ভাষার রীতি দেখা যায়। ভাষার নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সামনে এল অসীম সমুদ্র, ফেনায় ঢেউ-খেলা নীল পুঁথির মত। সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কি হল ! এ কোন জাদুকরের জাল ?

এ যে সন্ধ্যা। ট্রাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশিওয়ালা গলির ধারে রাস্তার উপর ছেলেদের লোভ দেখিয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর হরেন্দ্রপুরের ও কি রেখে? ও কি চায়? পাছে বোঝায় লোপ পায়, বুঝিতে খুব লাগে না, ভুরুকোড়া ঘর্ম। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিপ্পনি করে' যায় খুব চালায়।

হাতেকলমে কোনো
কাজ করায় পাকে পড়িতেই।

হাসা কুলের ঘর হয় নয়, হাসিতে তার মাণিক খসে না। আকাশের হাসির সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ষার মেঘের আড়ালে যে নক্ষত্রার ক্ষণ ফোটে তারি সঙ্গে। [রাজপুত্র]।

রবীন্দ্রনাথের অষ্টম উপন্যাস "তিন পুরুষ" নামে সচিত্র পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে বাহির হইতে থাকে। পরে ইহার নাম বদলাইয়া "যোগাযোগ" রাখা হয়। ইহা পুস্তকাকারে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। যোগাযোগও চলিতভাষায় লেখা, তবে ইহার ভাষা ঘরে-বাইরের ভাষা অপেক্ষা কিছু সরল। যোগাযোগের ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

কুমারসম্ভবী ছবির বাটিতে চিনি যেটে নিখিলেশ। অসম্ভব গম্ভীর, মোটা বাঁধনের যে মোহর তা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ গভীর নিজেকে যেন একটু ঢেকে রেখেছে। একখানি পাতলা সাদির ঘোমটা, ঘোর ঘোমটা নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সবখানি পরিচয় নয়। যখন যৌবনের প্রাণ আছে এসেছে, কিন্তু সে ঝিয়েরই অপরাজুর মত, খেলা যার ধরা তবু খোপুলির ছায়া পড়েনি। তার দুরন্ত বীত চঞ্চল কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, আর একটু দেখে সবখানি দেখে যেন। তার ঠোঁটের চৌটা দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। কথার সঙ্গে যেন কিছু না মেশানি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে সাধী বলেই জানে, সে কৃপণ নয়, কিন্তু তার মর্যাদা-রক্ষার ভারকে লাঘব না বলে নিজের আসনের উপর যার একটা আড়ম্বর আছে। [প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৪-১৮৯]।

"শেষের কবিতা" ১৩৩৫ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। বইটিকে উপন্যাস অথবা বড় গল্প অপেক্ষা উপন্যাস-চম্পূ বা গল্প-চম্পূ বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ ইহাতে গদ্যের সহিত কবিতাও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সে কবিতাগুলিও গদ্যাংশের সহিত অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ। গদ্যের মধ্যে কবিতার ছাঁদও সরল নহে। শেষের কবিতার লিখনভঙ্গি অনেকটা parody বা ব্যঙ্গরচনার মত, এবং সেই রকমই কৃত্রিম। ইহার ভাষার সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অমিত বলে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, আকাশে কেউ শোনে, নিরালা, সেটাকে যেন তারের লচিত টান, অর্থের দিক নয়। হঠাৎ কবি যদুনের যাদু লাগে, দিবে যায় দুই তারার মাঝে, দেখে এক হ'য়ে ওঠবার আগুন জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত হাত জ্বলে ফেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধারায় ধারায়, ঝলকে ঝলকে, ফুলের পর ফুল প্রদীপ্ত যার বিশ্বাসের নয়। তুমি আমার তান জাগিয়ে দিলে, বন্ধু, সেই তানেই ত তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

শেষের কবিতার পরও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহাদের ভাষার সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রচনাকৃতির আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল।

অজেয়

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও মেঘেছে তিমির নিবিড় নিশি—আজিকে আমারে ঘিরি,
কালবৈশাখী আঁধারে গিয়েছে মিশি—উহার অন্তর্গিরি,
দেবতা কোথাও যদ্যপি থাকে কেহ—সা'র তার জয়গাথা :
চিত্ত আমার আজিও অপরাজেয়—আজো উন্নত মাথা।

প্রতীপ দৈব হিংস্র নখর মেলি—আঁকড়িয়া ধরিয়াছে,
আমি তাই ব'লে কিরি নাই কাজ ফেলি—কাঁদি নাই কারো কাছে।
চিরদিন ধরে' যুঝিয়া হয়েছি সারা—তার মানি নাই কভু।
ললাটে আমার রক্তে লেখা রক্তধারা—লোহনিকো মাথা তবু।

এপারে জীবন অঙ্ক ভ্রূকুটিবেলা—বিদ্বেষ-হলাহলে ;
ওপারেতে করে বিভীষিকা ঘোরাফেরা—গহন ছায়ার তলে।
বন্ধুরের পর বন্ধুর বহিয়া আনে—বিপদ নিত্য নব।
তবু ভয় নাই আজিও আমার প্রাণে,—আমি নির্ভয় রব।

কিবা আসে যায়—কি কঠিন কারাগার—কাজ কি তাহি দেখিয়া?
কিবা আসে যায়—আছে কি শাস্তিতার—ডাগো আমায় তথা!
আমি প্রভু—মোর ভাগ্য তুচ্ছ মম—যা' করিব তাই হ'বে।
আমি সেনাপতি—আত্মা সেনানী মম—আমারি আদেশ ব'বে।*

---

* টেনিসন আর্লের ডেথের 'ইন্ভিক্টাস' কবিতার অনুবাদ।

চন্দ্র ডাক্তার

—শ্রীঅমলা দেবী

এতগুলা গ্রামের মধ্যে একমাত্র ডাক্তার চন্দ্র ডাক্তার। এ তল্লাটে এতবড় ডাক্তার আর নাই—পাশকরা ডাক্তার। কি পাশ করা, কোথায় পাশ করা জানিবার প্রয়োজন নাই: এই কথা জানিয়া রাখিলেই চলিবে—চন্দ্র ডাক্তার বড় ডাক্তার, যাঁহার কাছে ম'গাঁয়ের ভাক্তিনী কবিরাজ শনবুনীর বুড়া ছত্রিশ মাপিত ও কলিকা পায় না।

বুকের উপর গলাবন্ধ কোট পরিয়া, মাথায় হাট চড়াইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া চন্দ্র ডাক্তার ডাক্তারী করিয়া বেড়ান। ঘোড়া খুব শিক্ষিত ঘোড়া—মাঠের এক হাত চওড়া আলের উপরে এদিক ওদিক না পড়িয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতে পারে। ঘোড়া রাখিতে ডাক্তারের এক পয়সা খরচ হয় না। বাড়ী ফিরিয়া ডাক্তার ঘোড়া ছাড়িয়া দেন; সমস্ত রাত্রি পুকুরের ধল ও মাঠের ঘাস খাইয়া ঘোড়াটা ঠিক সকালে ঘরে ফিরে—আশ্চর্য্য ঘোড়া—শিক্ষিত ঘোড়া—।

চন্দ্র ডাক্তার অত্যন্ত বদমেজাজী লোক। রোগীরা সব সময়ে ভয়ে সন্ত্রস্ত, ধমক তো লাগিয়াই আছে—ঘোড়ার চাবুকটাও মাঝে মাঝে তাহাদের পিঠ ছুঁইয়া যায়। তাহাতে তাহারা কিছু মনে করে না। যে গাভী দুগ্ধ দেয়—তাহার চাট সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস আছে। চন্দ্র ডাক্তারের বৈঠকখানায় তাঁহার ডিস্‌পেন্সারী—দুটা কাঁচের আলমারী—তাহার ভিতরে রকমারী ঔষধ—লাল, নীল, কত রংএর। ঔষধশুদ্ধ আলমারী দুটার দাম গ্রামের লোক এখনও হিসাব করিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর কতকগুলা শিশি, একটা ওজন করিবার নিক্তি ও মেজারগ্লাস সাজান। তাহারই সামনে একটা টুলে বসিয়া বড়জুড়ির পঞ্চানন পাল কোম্পাউণ্ডারী করে। অবশ্য ডাক্তার থাকিলে তাঁহার সামনে টুলে বসিবার সাধ্য পঞ্চাননের পিতামহেরও নাই—তখন দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয়। ঘরের অন্যদিকে একটা টেবিল ও চেয়ার লইয়া চন্দ্র ডাক্তার বসেন। রোগীরা খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে—যাহারা অক্ষম তাহাদের উবু হইয়া বসিবার হুকুম আছে।

চন্দ্র ডাক্তার বিপত্নীক। আট বছর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী নারায়ণী ইহলোক ত্যাগ করেন। এই কার্য্য করিয়া নারায়ণী ভাল করিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে গ্রামের মহিলাসমাজে সকলের মত এক নহে। একদল বলে, "নারায়ণীর ঘাড় জুড়াইয়াছে—এই কাঠখোট্টা, চর্ম্মচক্ষু স্বামী লইয়া সংসার করার চেয়ে চিতায় পোড়া ঢের ভালো···।" অন্যদল বলে, "রাজার মতো স্বামী, রাজকন্যার মত মেয়ে ছাড়িয়া সোনার সংসার ভরাডুবি করিয়া যাওয়া কি সোজা মা—নারায়ণী হতভাগিনী।"

রাজকন্যার মতো মেয়ের নাম কল্যাণী। দশ বছরের মেয়ে, ফুটফুটে রং, ছিপছিপে গঠন, একমাথা ছোট ছোট কোঁকড়ান চুল, কখনও কোন দিন চিরুনী স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; পরণে ময়লা ডুরে শাড়ী, গাছকোমর বাঁধা; কচি মুখ, ওষ্ঠাধরে ভরা, চুর্দ্দান্ত মেয়ে কখনও ধীরে চলিতে জানে না—ছুটিয়াই চলে। গাঁয়ের তাহার সমবয়সী মেয়েদের সে তোয়াক্কা করে না, ছেলেরাই তাহার বন্ধু। তাহারাও তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠে না; গাছের মগডালে উঠিয়া পাখীর ছানা সংগ্রহ করায়, নদীতে সাঁতার দেওয়ায়, শৈলী মাসীর বাড়ীর দেওয়াল টপকাইয়া ভরা দুপুরে রোদে শুকাইতে দেওয়া আচারের হাঁড়ী হইতে আচার চুরী করায় সেই তাহাদের অগ্রণী। মার্ব্বেল ও গুলিডাণ্ডা খেলায় কেহ তাহার সমকক্ষ নয়; লুকোচুরী খেলায় কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। গ্রামের পিতা-মাতাদের তরফ হইতে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ প্রতিনিয়ত জমিয়া উঠে—কিন্তু ডাক্তারের কাছে কিছুই পৌঁছে না। যা চর্দ্দান্ত মানুষ—হয়তো মেয়েটাকে মারিয়া ফেলিবে। আহা, মা-হারা মেয়ে: সকলে স্নেহও করে। কখনও কোন প্রবীণা হয়তো কল্যাণীকে অনেক কষ্টে বাগ মানাইয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁরে কল্যাণী, তোর বাবা তোকে ভালবাসে?" কল্যাণী অপরিচ্ছন্ন ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা নাড়িয়া স্পষ্ট জবাব দেয়, 'না'। প্রশ্ন হয়,"তোর পিসীমা তোকে ভালবাসে না?" কল্যাণী অতোধিক ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, 'না'। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে, "বুড়ী

ভাইনী।" আবার প্রশ্ন হয়, "তোকে কেও ভালবাসে না, হাঁরে কল্যাণী?" কল্যাণী বলে, "কেন—বিশু ভালবাসে।" শিশিরাটি চন্দ্র ডাক্তারের বৃদ্ধা-কন্যা তরুণী নারায়ণীর মৃত্যুর পর ডাক্তারের সংসার-তরীর হাল ধরিয়াছেন—বিশু পুরাতন চাকর।

সত্যই চন্দ্র ডাক্তার সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। সকালে বাহির হইয়া যান, রাত্রে কখন ফেরেন তাহার ঠিক নাই—সংসারের কি হইতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, এমন কি মাতৃহীনা মেয়েকে কে দেখে, কে যত্ন আত্তি করে কিছুই লক্ষ্য রাখেন না। নিজের কাজ লইয়াই আছেন, নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার লক্ষ্য আছে নাকি? তাও নাই; আহারের ঠিক নাই, নিদ্রার ঠিক নাই, যেন একটা যন্ত্র, মায়ামমতাহীন; অনিয়মে বিরামহীন গতিতে চলিয়াছে তো চলিয়াছেই।

ভাদ্র মাসের শেষ—অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেই নিঃশব্দ চরণে, অলক্ষ্যে কখন শরৎলক্ষ্মী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আকাশ মেঘহীন, স্নিগ্ধ প্রভাতরৌদ্রে গাছের পাতাগুলি চিক্‌-চিক্‌ করিতেছে: শিশুপ্রদাহী মাঠ সবুজ শস্যে ভরিয়া গেছে; পুকুরের থই থই করা জলে অজস্র শালুক ও পদ্ম ফুটিয়াছে। গ্রামের পথঘাট জলে কাদায় ভর্ত্তি; মাটির ঘরগুলি বর্ষার দাপটে বিপর্য্যস্ত। অসংখ্য ডোবাডোলে মশকের দল বাসা বাঁধিয়াছে। সবিক্রমে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, ঘরে ঘরে রোগীর আর্ত্তনাদ। চন্দ্র ডাক্তারের ডিসপেন্সারীতে সকাল হইতে রোগীর ভিড়, দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত ডাক্তারের সময় নাই, তাঁহার শিক্ষিত ঘোড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়াছে তো চলিয়াছেই।

একদা প্রভাত। গ্রামের বুড়াশিবের মন্দিরের আট-চালাতে পাঠশালা আরম্ভ হইয়া গেছে। ছেলের দল কলরব করিয়া পড়িতেছে—বুড়া পণ্ডিত মহাশয় একটা চাটাইয়ের উপর বসিয়া মুড়াবাঁধা নিকেলের চশমা চোখে দিয়া প্রায় উপুড় হইয়া একটা পুরাণ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। হঠাৎ একটা হুঙ্কার করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সোজা হইয়া বসিলেন এবং চশমাওয়ালা মুখটাকে কোন এক বিশেষ দিকে ফিরাইয়া হাঁক দিলেন, "এই ছাড়া, ওখানে গোল হচ্ছে কেন রে?" সব নিস্তব্ধ—টুঁ করিলে শোনা যায়—ছাড়া প্যান্‌-পেনে গলায় চীৎকার করিয়া কহিল, "আমি নয় পণ্ডিত মশাই—সদা গল্প কোরছে—কলির সঙ্গে।" কলি অর্থাৎ কল্যাণী। গুরু মহাশয় গলা বাড়াইয়া ডাক ছাড়িলেন, "এই কল্যাণী—তুই এত দিন আসিস্‌ নি কেন?" কল্যাণী কহিল, "বাবা পড়তে বারণ করেছে পণ্ডিত মশাই।" পণ্ডিত কহিলেন, "বারণ করেছে তো এসেছিস্‌ কেন? যা এখান থেকে—নিজে পড়বে না তো কাউকে পড়তে দেবে না।" ছেলেদের দিকে তাকাইয়া একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ওদের পোকা বাড়ি নষ্ট করে, তোরা দেখেছিস? তেমনি আর কি···" হঠাৎ পণ্ডিত মহাশয় মাথায় হাত দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সনাতনের শ্লেটখানা সশব্দে তাহার মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরের যুদ্ধ কে বর্ণনা করিবে? ছেলেদের কলরবের সহিত পণ্ডিতের চীৎকার মিশিয়া যেন হাট বসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল কোপঝাপ বনবাদাড় ভাঙিয়া কল্যাণী ছুটিয়াছে—এবং তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছনে প্রাণপণে ছুটিতেছে কতকগুলা ছেলে।

২

সেদিন চন্দ্র ডাক্তারের ডাক্তারখানায় ভিড়ের অন্ত নাই। গ্রাম, গ্রামান্তর হইতে রোগী ও রোগীর আত্মীয়ের দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ডাক্তারখানার ভিতরে রোগী দেখা চলিতেছে। এখানের কাজ সারিয়া ডাক্তারকে এখনই বাহির হইতে হইবে। তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাদিন বোধ করি রাত্রি পর্য্যন্ত রোগী দেখিতে হইবে।

চন্দ্র ডাক্তারের বেলায় সেদিন তাল নয়—মাঝে মাঝে গর্জ্জন হইতেছে—একজন রোগী 'কি খাইব' জিজ্ঞাসা করায়, ডাক্তার যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আর যাহাই হউক রোগীর পথ্য নহে—দূর গ্রাম হইতে আগত এক ব্যক্তি লাঠি ও লণ্ঠন হাতে করিয়াই ডাক্তারখানার ভিতরে ঢুকিয়াছিল বলিয়া এমন তাড়া খাইয়াছে যে, সে লণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইয়াছে—পঞ্চানন দুইবার মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে—এক ব্যক্তি ঔষধের দাম কম দেওয়ায় ডাক্তার তাহার টাকাপয়সা ডাক্তারখানার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন—সে বেচারী তাহার না-খুঁজিয়া-পাওয়া সিকিটা এখনও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

এমন সময়ে কলরব করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় ও কতকগুলা ছেলে আসিয়া হাজির হইল। পণ্ডিতের মাথার ডান পাশটা একটুখানি কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে—ছেলেরা কেহ হাতে কেহ পায়ে আহত হইয়াছে বলিয়া জানাইল। পণ্ডিত গ্রামের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সকলেই তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সহানুভূতি ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি কহিল, "ডাক্তারবাবুর কাছে যান আপনি," ইঙ্গিতে কহিল, "ঘরের মধ্যেই আছেন।"

ডাক্তার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ষ্টেথিস্কোপ দিয়া একজন রোগীর বুক পরীক্ষা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ধমক চলিতেছিল, "ঘাড়া হয়ে দাঁড়াও—জোরে নিশ্বাস ফেল, এ পাশ কের" ইত্যাদি। পণ্ডিত মহাশয় একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। পঞ্চানন তাঁহাকে ঢুকিতে নিষেধ করিতে গিয়া তাঁহার রক্তাক্ত মস্তক দেখিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া ডাক্তার তাহাকে ধমকাইতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন ও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনার এ কী?" পণ্ডিত মহাশয় মাথায় হাত দিয়া উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বয়সে মারামারি করতে গিয়েছিলেন নাকি?" পণ্ডিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, 'না'। প্রশ্ন হইল, "জানি তো মারলে কে?" পণ্ডিত কহিলেন, "মেরেছে আপনার মেয়ে কল্যাণী।" ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার মেয়ে? কল্যাণী? এই বুড়া পণ্ডিতকে এমন করিয়া মারিবার মত তাহার বয়স হইয়াছে নাকি? প্রশ্ন করিল, "আমার মেয়ে তো নেহাৎ বাচ্চা—সে আপনাকে মারবে তা কি সম্ভব!" বলিয়া একবার পঞ্চাননের দিকে ও তারপর দুয়ারে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান রোগিগণের দিকে তাকাইলেন। তাহারা একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহারাও একবিন্দু বিশ্বাস করে না। পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ হইয়া গেল। মেয়ে মারিয়াছে, তাহার বাবা কোথায় একটু সান্ত্বনা দিবে—না, মিথ্যা নালিশ করিতে আসিয়াছে বলিয়া গালাইতেছে—যেমন মেয়ে তার তেমনি বাপ।

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সম্ভব। আপনার মেয়ে বাচ্চা হলে কি হবে, মশাই—তার স্বভাবটি তো বাচ্চার মত নয়। দুর্দ্দান্ত বদমাইস। শুধু আমাকেই মেরেছে নাকি!" বলিয়া দরজার দিকে তাকাইতেই ক্ষীরা ও নন্দ দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পণ্ডিতের দুই পাশে দাঁড়াইল। তাহাদের একজনের হাতে দাঁতের দাগ—তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত চমিয়াছে—অন্য জনের পাটা কাটিয়া গিয়াছে। পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, "পাঠশালার ছেলেগুলোকে মেরে একসা' করে দিয়েছে—এত বড় বদমাইস্ মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি মশাই—সবাইকে জখিম করে তুলেছে; আপনার খাতিরে কেউ কিছু বলে না নইলে…" গ্রামের লোকগুলাকে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এরা সবাই জানে। কিন্তু আর তো পারা যায় না মশায়। হয় এর প্রতিকার করুন নয় বলেন তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গাঁ থেকে উঠে যাই।" এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া পণ্ডিত হাঁপাইতে লাগিলেন। দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার অপরাধ কি? না, সকালে আজ একমাস ধরে পাঠশালা গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কল্যাণী এতদিন আসনি কেন না? এই কথাটি শুধু ভাল করে বলেছি তো কি তেজ মেয়ের, বলে, 'বাবা আমাকে তোমার কাছে পড়তে মানা করেছে—বলেছে বুড়ো কিছু জানে না।' বললাম, ছিঃ মা, মিথ্যে বলতে নাই—তো মশায় একখানা শ্লেট নিয়ে দড়াম্ করে মাথায় বসিয়ে দিলে—খল্‌খল্ করে রক্ত বেরুতে লাগল—কি করি ভাবছি—তখন দেখি শোঁ শোঁ করে ঢিল পড়ছে এর মাথায় তার মাথায়—উঃ কি বজ্জাত মেয়ে মশায়—ও মেয়ে আপনার ডাকাত হবে—যদি এখন হতে শাসন না করেন—"

ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল। এতগুলা রোগীর সাম্‌নে এমন অপমান! একবার মনে হইল, চাবকাইয়া এই বুড়া পণ্ডিতকে সোজা করিয়া দেন, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া রোগীগুলাকে ধমক দিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং চাবুকটা লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিলেন, "কই কোথায় সে?" পণ্ডিত মহাশয় ডাক্তারের রাগ দেখিয়া জড়কাইয়া গিয়া কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, "তা—কি করে জানব—ধরতে পাঠিয়েছি।" "কি করে জানব—আনতে পারেন নি তো নালিশ করতে এসেছেন কেন? যান ধরে আনুন…" বলিয়া বেতাবে হাতের চাবুক চালাইলেন—পণ্ডিতের

মনে হইল তাহারই গায়ে পড়ে বুঝি এক ঘা। ঠিক এই সময়ে কতকগুলা ছেলে চ্যাংদোলা করিয়া কল্যাণীকে লইয়া উঠানে নামাইল। ডাক্তার লাফ্ দিয়া কল্যাণীর কাছে আসিয়া হুকুম দিলেন,"সোজা হয়ে দাঁড়া" তিনি যেন কল্যাণীকে এই প্রথম দেখিলেন—তার মুখের মত দাঁড়া চিবুকে মুখ—অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে ধূলিমর—অপরাধিনীর মত নত মস্তকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—দহসা বিদ্যুৎ-লেখার মত সন্তান-বাৎসল্য মুহূর্ত্তের জন্য তাহার গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু পলকের জন্য, সে আলো অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিল মাত্র।

ডাক্তার ধমক দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "চুরি করেছিস?" অনুচ্চ কণ্ঠে একবার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া পরক্ষণেই মাথা নীচু করিয়া কল্যাণী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, 'না'। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ও ছেলের দল হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ডাক্তার ধমক দিলেন 'চুপ'। কল্যাণীকে কহিলেন "মুখ তোল, আমার দিকে তাকা।" কল্যাণী ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। ডাক্তার বলিলেন, "সত্যি বল্ করেছিস্ কিনা।" কল্যাণী নীরব। ডাক্তার আবার ধমক দিলেন, "বল্।" কল্যাণী তবু কোন কথা কহিল না। তারপর সপ্ করিয়া চাবুক পড়িল। কল্যাণী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "করেছি বাবা···" তারপর চাবুকের পর চাবুক পড়িতে লাগিল। কল্যাণী একবার পলাইবার চেষ্টা করিল—বার কয়েক ছিট্‌কিয়ে ছিট্‌কিয়ে করিয়া লাফাইল—তারপর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আর করবো না বাবা—ও বাবা গো—পায়ে ধরছি বাবা—ও মাগো।" তারপর উপুড় হইয়া দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দিয়া একটানা কাঁদিতে লাগিল। তখনও চাবুক পড়িতে লাগিল; দু' একজন ডাক্তারকে থামাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু দু' এক ঘা চাবুক খাইয়া নিবৃত্ত হইল। পণ্ডিত তো নির্ব্বাক। এত বেশী শাস্তি তিনি আশা করেন নাই। হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "আর থাক্ ডাক্তারবাবু, আমি ওর হয়ে মাপ্ চাচ্ছি।" ডাক্তার তাহাকে ধমকাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সরে যান।"

এমন সময় কিছুর ওদিক হইতে এক বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া কল্যাণীর উপর উপুড় হইয়া পড়িল—সে নিত্য—পুরাতন ভৃত্য—তাহার পিঠেও ঘা দুই চাবুক কষাইয়া দিয়া ডাক্তার চাবুকটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সোজা ডিস্‌পেন্সারীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী তখন নিস্পন্দ, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গেছে। নিষ্ঠুর কষাঘাতের প্রত্যেকটি চিহ্ন তাহার মুখে, পৃষ্ঠে—তাহার ফুলের মত কোমল শুভ্র সর্ব্বদেহে মোটা মোটা নীল শিরার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটিয়া উঠিতেছে।

৩

কচি সবুজ শস্যে ভরা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো গ্রামগুলি জাগিয়া আছে। মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্য অনলবর্ষণ করিতেছে। সেই রৌদ্রে ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিয়া ফিরিতেছেন। মাঠে চাষারা কাজ করিতেছে। ডাক্তারের ঘোড়া তাহারা দূর হইতে চিনিতে পারে। "পেন্নাম হই ডাক্তার বাবু" বলিয়া মাথাটা প্রায় মাটির কাছে নোয়াইয়া প্রণাম করে। ডাক্তার তাহা লক্ষ্যও করেন না—সোজা চলিয়া যান।

দিন অবসানপ্রায়। সূর্য্য দিগন্তরেখার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে ডাক্তার একটা গ্রামে প্রবেশ করিলেন। দুইধারে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে অন্ধকার সুড়ি পথ। সেই কর্দ্দমময় পিচ্ছিল পথে ডাক্তার ঘোড়ায় চড়িয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলেন—কখনও মাথা নোয়াইয়া, কখনও একহাত দিয়া মুখের সামনে আসিয়া পড়া বাঁশের ডালকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসিতে লাগিল; কখনও বা ডোবার পচা জলের গন্ধ। বাঁশঝাড়ের নীচে সাদা সাদা ছাতা উঠিয়াছে—একটা ছেলে সাপ রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশে দ্রুত বঙ্কিম গতিতে চলিয়া গেল।

বাঁশের বন পার হইয়া একটা ছোট পুকুর; কচুরীপানায় সমস্ত পুকুরটা ছাইয়া গেছে—জল পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তাহার পাড়ে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ, অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া কতকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে কে জানে। তাহার তলায় এর মধ্যেই অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। সেইখানে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের ঘোড়া দেখিয়া সেই

লোকটা আগাইয়া আসিল। গলায় কাপড় তো দেওয়াই ছিল—দুই হাত জোড় করিয়া ডাক্তারকে নমস্কার করিল। ডাক্তার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৌধুরীদের বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার?" লোকটা কহিল, "হুজুর আমি চৌধুরী বাড়ীর লোক—আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।" লোকটা পথ দেখাইয়া ডাক্তারকে লইয়া চলিল।

আঁকাবাঁকা পথ; কখনও গৃহস্থের বাড়ীর পাশ দিয়া—কখনও দেবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। গৃহবধূগণ কলসীকক্ষে জল লইয়া গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে—ডাক্তারকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া তাহারা রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইল। পাঠশালার ছুটির পর ছেলেরা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছিল। তাহারা ডাক্তারের ঘোড়া দেখিয়া আপাততঃ গৃহগমন স্থগিত রাখিয়া ঘোড়ার পাছু পাছু চলিল। একজন বিধবা প্রৌঢ়া, মাথার চুল পুরুষের মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, এবং সেই মাথার উপরে লজ্জানিবারণের জন্য একটুখানি আবরণ—একহাতে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া তিড়িং তিড়িং করিয়া এখান হইতে সেখানে লাফাইয়া অতিকষ্টে শুচিতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ছেলেগুলাকে কহিলেন, "এই ছোঁড়ারা আস্তে আস্তে চল্ না। গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে এই ভর সন্ধ্যেয় নাওয়াবি নাকি?" কে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা পিসি, চক্ষু ডাক্তার আমাদের গাঁয়ে এল যে বড়?" পিসি বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, "আর বাবা! আমাদের মহেশের নেয়েটার ভারী অসুখ—বাঁচে কি-না বাঁচে।" লোকটা কহিল, "কেন আমাদের ভূষণ?" ভূষণ গ্রামের ডাক্তার—পিসিমা কহিলেন, "ভূষণই তো দেখ্‌ছিল বাবা, তা কিছু কম্‌তে পারল কৈ?" তারপর কাছে সরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর নুয়ে করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভূষণের দোষ নেই বাবা! বিনা পয়সায় তিকিচ্ছে—অন্যের তো কিছুটি নেই—দুবেলা হাঁড়ি চড়া যায়—তবু ভূষণের আমাদের ধরা ধর্ম্ম আছে বল্‌তে হবে। দুবেলা দেখ্‌ছে, শুনছে—যতদূর সাধ্যি করছে—একটি কানা-কড়িও তো মহেশের কাছে পায়নি।" তারপর চোক গিলিয়া কণ্ঠস্বর আরও নুয়ে করিয়া কহিতে লাগিলেন, "কাল সন্ধ্যে বেলা তুলসীতলায় বসে চরকায় সুতো তুলছি—মহেশের বৌটা এসে কাঁদতে লাগল। ঘরে টাকা বার বাও। আমি বাছা কড়ুই বাঁড়ি—কোথায় পাব টাকা? শেষে নাকে হাতের কলি দুটো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমার বাছা নয়ন মন, কারও কান্না দেখতে পারিনে—বললাম, বউ চুপ কর দেখি খুঁজে পেতে; খুঁজতে খুঁজতে পেলি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে পাঁচটি টাকা—সিন্দুরে মাখান—তাইই দিলাম—আহা ভারী ভাল মেয়ে মহেশের—মা দুর্গার ইচ্ছায় বেঁচে উঠলে বাঁচি।" বলিয়া দুই হাত জোড় করিয়া যে দিকে গ্রামের দুর্গামন্দির অবস্থিত সেই মুখ হইয়া প্রণাম করিলেন।

গ্রামের এক প্রান্তে চৌধুরীদের বাড়ী। এককালে ইহারা গ্রামের মধ্যে ধনিক ছিল। কিন্তু কালক্রমে বংশবৃদ্ধির অনুপাতে আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় এবং ভূসম্পত্তি বহু অংশে বিক্রয় হওয়ায় ইহাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বাড়ী হইতে ইট ও চুণ খসিতেছে—দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—দেওয়ালের কার্নিস হইতে গাছ গজাইতেছে; গৃহলক্ষ্মী কোনদিন বিদায় লইয়াছেন—অলক্ষ্মী আসর জমাইতেছে।

চৌধুরীবাড়ীর সামনে আসিয়া ডাক্তার ঘোড়া হইতে নামিয়া, যে লোকটি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তাহাকে ঘোড়াটাকে আগলাইবার জন্য হুকুম দিলেন। চৌধুরীবাড়ীর কতকগুলি যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা আগাইয়া আসিয়া ডাক্তারকে অভিবাদন করিল। ডাক্তার মাথাটা মাত্র হেলাইয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহেশ চৌধুরী কে?" সকলে এক সঙ্গে একজন যুবককে দেখাইয়া দিল। যুবকটির বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না—দারিদ্র্যের মলিন স্পর্শে তাহার যুগের বর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে—দেহ শীর্ণ ও রুক্ষ—অনিবার্য্য নিষ্পেষের ছায়া তাহার মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে। শুষ্ক মুখে সে একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমি।" ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আপনার মেয়ে? বয়স কত?" মহেশ কহিল, "বছর দশ হবে।" ডাক্তার কহিলেন, "চলুন আপনার বাড়ী।" কে একজন কহিল, "একটুক বিশ্রাম—" ডাক্তার রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "বিশ্রাম করতে আসিনি মশাই।"

ইটের তৈয়ারী কটক কিন্তু দরজাগুলি তালি দেওয়া।

কটক পার হইলেই ছোট একটুকরা উঠান, তাহার এক দিকে একটি খড়ের চালওয়ালা রান্নাঘর—তাহারই সামনে দিয়া ঘরের বর্ষণা ফাটাফাটি করিতেছে, উঠানের আর একদিকে তুলসীমঞ্চ, এবং তাহারই কাছে একটুকরা মাটির উপরে শাক-সব্জী উৎপাদনে চেষ্টা। একটা লাউএর ডগাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া রান্নাঘরের চালে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে মনের সুখে ডাল মেলিয়া সমস্ত চালটা ভরাইয়া দিয়াছে। আর একটু গেলে ছোট একখানি খোয়াক, খোয়াকে উঠিলেই সামনে একটি লম্বা ঘর—ভিতরটা অন্ধকার, জানালার বালাই নাই, গৃহের ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য জিনিসপত্রে সমস্ত ঘরটা ঠাসাই হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে একটু স্থান কোন মতে বাঁচাইয়া সেখানে চাটাইয়ের উপরে মলিন শয্যা পাতিয়া মেঝেকে শোয়ান হইয়াছে। ডাক্তারকে দেখিয়া একটি মলিনবসনা, অবগুণ্ঠিতা রমণী পাশের দ্বার দিয়া অন্য ঘরে উঠিয়া গেল।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া নাক সিটকাইলেন। একটা ঝাপ্‌সা গন্ধ নাকে ঢুকিল। কে একজন একটা লণ্ঠন লইয়া আসিল। তাহারই আলোকে ডাক্তার রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ একটা ভাঙ্গা চেয়ার আগাইয়া দিল। ডাক্তার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন।

ছিন্ন মলিন শয্যার উপরে শুইয়া একটি দশ বছরের মেয়ে, মৃতপ্রায় পুষ্পের মত মলিন,—বিবর্ণ; লেলিহান জিহ্বা দিয়া করাল ব্যাধি যেন তাহার দেহের লাবণ্যকে লেহন করিয়া লইয়াছে: অস্থিচর্মসার দেহ বিছানার সহিত মিলিয়া আছে, জীবনপ্রদীপ নিষিক্তপ্রায়—কৃষ্ণ কেশের মধ্যে শুধু তাহার মুখখানি একটি কমল-কোরকের মত ফুটিয়া আছে। —মরণের ছায়া এখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রোগ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার খুব গম্ভীর হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, "কে দেখছে?" ইতিমধ্যে গ্রামের ডাক্তার কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। সকলে তাহাকে ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "আজ্ঞে উনি।" ডাক্তার তাঁহার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, "কি রোগের চিকিৎসা করছেন?" জবরদস্ত হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীর মত কৃষ্ণ কহিল, "ম্যালেরিয়া জ্বর, কীবার মিক্‌চার দুইনাইন দিয়েছি—বিনা পয়সায়—" ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, "এ রকম রুগী কতগুলির চিকিৎসা করেছেন আপনি?" কৃষ্ণ সম্মিলিত গ্রামবাসীগণের দিকে তাকাইয়া দম লইয়া কহিল, "আজ্ঞে বহুৎ। এই তো সে দিন রাজুদের পেত্যেয়—" ডাক্তার ধমক দিয়া কহিলেন, "তোমার রোগীর ফিরিস্তি শুনতে চাইনে আমি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়, টাইফয়েড্। নাম শুনেছ কখনও?" কৃষ্ণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাহার বাঙ্গালা চিকিৎসার বহিটিতে এই রোগের নাম লেখা আছে বলিয়া তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে যে এমন বিদ্‌ঘুটে রোগ আসিয়া জুটিবে, তাহা সে জানিবে কি করিয়া? মহেশের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। এদিকে তাহার ওষুধ ও ভিজিটের দাম এক পয়সা দিবার নাম পর্যন্ত করে না, কিন্তু চন্দ্র ডাক্তারকে ডাকিবার সময় পয়সা ছুটিয়াছে—নেমকহারাম্। যে লোকগুলা তাহার দিকে প্যাট্ প্যাট্ করিয়া তাকাইতেছিল—বুঝিবা দু-এক জন তাহার অবস্থা দেখিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিতেছিল, সে তাহাদের মনে মনে মুণ্ডপাত করিতে লাগিল, গৃহদেবতাকে স্মরণ করিয়া কহিল, "হে প্রভো! এই পাষণ্ড ডাক্তারের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। ইহার কাণ্ডজ্ঞান নাই—এতগুলা লোকের সামনে অপমান করিবে, হয় তো মারিয়া বসিবে। আর এই লোকগুলা যাহারা প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহার ডিস্‌পেন্সারীতে চা ও তামাক ধ্বংস করে, বিনা পয়সায় ঔষধ খায়, এক বিন্দু সাহায্য করিবে না বরং হাত বাহির করিয়া হাসিবে।" ডাক্তার চোখ পাকাইয়া কহিতে লাগিলেন, "এই মেয়েকে মেরে ফেলেছ তুমি—তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত।" কৃষ্ণের পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ডাক্তার মহেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মিথ্যে ডেকেছেন আমাকে—চিকিৎসা করবার কিছুই নাই—আজ রাত্রির যদি পার হয় তো কাল খবর দেবেন—" বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া পড়িলেন। মহেশ ডাক্তারের দুই হাত জড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ডাক্তার বাবু" আর বলিতে পারিল না। ডাক্তার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "কি করবো মশায়—উপায় নেই, আমার হাতের বার হোয়ে গেছে" বলিয়া ডাক্তার গট্ গট্ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে অন্ধকারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা একটি নারী-মূর্তি অন্ধকারে টলিতে টলিতে আসিয়া ডাক্তারের পায়ের নীচে পড়িয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিয়ে যান ডাক্তারবাবু।" তাঁহার জুতায় মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কহিতে লাগিল, "যাবেন না ডাক্তার বাবু—যেতে দেব না আপনাকে—আমার মেয়েকে বাঁচান—আমার মেয়ে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব গো।"

চন্দ্র ডাক্তার প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এরূপ অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। তিনি রোগীকে শাসন করিতে পারেন—রোগীর আত্মীয়স্বজনের পিঠেও চাবুক চালাইতে তাঁহার বাধে না—কিন্তু এই যে বিস্রস্তকুন্তলা—অলিতবসনা—অন্তঃপুর-চারিণী নারী সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়া আসন্নমৃত্যু সন্তানের

জীবন কামনায় তাঁহার পায়ের নীচে পড়িয়া মাথা খুঁড়িতেছে—ইহাকে লইয়া তিনি কি করিবেন? তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—সান্ত্বনা দিলেন না—তাহাকেও তাকাইয়া রমণীকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন না—চুপ করিয়া সেই বুকফাটা মর্মভেদী ক্রন্দন শুনিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন তাঁহার সমস্ত অন্তরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া ধ্বনিত, অনুধ্বনিত হইতে লাগিল; সেই ক্রন্দন তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত বিদ্ধ করিয়া করিয়া তাঁহার কোন্ তন্ত্রাগত বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে জাগ্রত করিতে লাগিল। সহসা ডাক্তারের চোখের সামনে বহুদিন পূর্বের একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল। তখনও তিনি সংসারে ভাল করিয়া প্রবেশ করেন নাই—কল্যাণী তখন ছয় মাসের—সেই সময়ে কল্যাণীর শক্ত অসুখ হইয়াছিল—ডাক্তার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল—তখন তাঁহার তরুণী পত্নী নারায়ণী ঠিক এমনি করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ঠিক এমনি বুকফাটা কান্না কাঁদিয়াছিল। সেই ছবি অন্ধকারের যবনিকার উপরে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—সেই ছবি তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল—পরিশেষে তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিল। মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার প্রিয়তমা নারায়ণী কল্যাণীর জীবন কামনায় তাঁহারই পায়ের নীচে লুণ্ঠিতা—তাঁহারই তীব্র ক্রন্দন অন্ধকার রাত্রির বুক চিরিয়া চিরিয়া ঊর্ধ্বে—বহুঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া সুদূর তারকালোককে শঙ্কিত করিতেছে।

শুধু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ডাক্তার আত্মস্থ হইলেন। মহেশকে ডাকিয়া কহিলেন, "মহেশবাবু, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যান—দেখি কি করতে পারি" বলিয়া ডাক্তার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া সেই ভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানের কেও ঘোড়ায় চড়তে পারে?" ভূষণ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। লুপ্তপ্রায় খাতিরকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমি পারি।" "আপনি পারেন? বেশ আমার ঘোড়া নিয়ে আমার ডিস্‌পেন্সারিতে যান—কম্পাউণ্ডার এখনও সেখানে আছে—" বলিয়া খচ্‌খচ্‌ করিয়া একটা কাগজে কতকগুলা ঔষধের নাম লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই ওষুধগুলি নিয়ে আসবেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই—" ভূষণ কৃতার্থ হইয়া গেল। কহিল, "আমি পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব—" বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

তারপর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু গগনস্পর্শী তরঙ্গ তুলিয়া এই অসহায় ক্ষুদ্র জীবনতরীকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তার সুদক্ষ নাবিকের মত দৃঢ় অকম্পিত হস্তে হাল ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টায় রাত্রিশেষে জীর্ণ তরীকে কূলে উত্তীর্ণ করিলেন। রোগী নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে নিদ্রা যাইতে লাগিল। ডাক্তার তখন মহেশকে কহিলেন "মহেশবাবু আর ভয় নেই, আপনার স্ত্রীকে মেয়ের কাছে আসতে বলুন—আমি আজ উঠি—কাল এসে দেখে যাব—" বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। মহেশ সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং সেই রাত্রের পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারকে দিতে গেল। ডাক্তার তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন তারপর অন্ধকারে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন।

গৃহে ফিরিয়া ডাক্তার ডিস্‌পেন্সারীর দরজায় ধাক্কা দিতেই বিশু দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। নিদারুণ ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন—তবু তাঁহার মনে হইতেছিল আজ যেন তাঁহার জীবন সার্থক হইয়া গেছে। বিশু জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে সিদিমাকে জাগাইবার জন্য চলিয়া গেল।

ডিস্পেন্সারীর পাশের ঘরেই বিশু শয়ন করে। ডাক্তার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার ক্ষীণ আলোকে ডাক্তার দেখিলেন, পাশাপাশি দুইটা খাট। একটা খাটে মলিন শয্যায় কল্যাণী নিদ্রিতা। ডাক্তার প্রদীপটা কল্যাণীর শয্যার পার্শ্বে আনিলেন, কল্যাণীর শয্যায় বসিয়া সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সকালের প্রহারের চিহ্ন এখনও মিলায় নাই—একটা তীব্র অনুশোচনা তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল; ডাক্তার পরম স্নেহের সহিত সেই দাগগুলিকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, যেন সমস্ত ব্যথা মুছিয়া লইতে চান। তারপর কল্যাণীর নরম, কোঁকড়ান চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া অতি সন্তর্পণে তাহার কপোলে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিলেন।

বাহিরে নিঃশব্দ তারকাময়ী রজনী ছাড়া ডাক্তারের এই দুর্বলতার আর কেহ সাক্ষী রহিল না।

বিচ্ছেদ-গান

—ভূসীমউদ্দীন

সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের কাহিনী লইয়া ভাটিয়াল সুরে যে সব গ্রাম্য গান গাওয়া হয় তাহাদিগকে বিচ্ছেদ-গান বলে। তবে বিচ্ছেদ গান অতিকাল গ্রাম্য নারী-মনের নানা অবস্থায় ভাবপ্রকাশের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরুর প্রতি, ভগবানের প্রতি, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তমনের সহজ আকুলতা হইতে নানা প্রকারের বিচ্ছেদ-গানের উদ্ভব হইয়াছে। সাধারণতঃ বিচ্ছেদ-গানগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—গুরু-বিচ্ছেদ, গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ ও কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদগানের সুরকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ভাটিয়াল সুর, বাউল ভাটিয়াল মিশ্রিত সুর এবং বাউল সুর। শেষোক্ত দুই প্রকারের সুর খুব কম বিচ্ছেদ-গানেই পাওয়া যায়।

বিচ্ছেদ-গান পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান সকল প্রকার গ্রাম্য গায়কেরাই গাহিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের গানকে কেহই সাম্প্রদায়িকতার চক্ষে দেখে না। বহু মুসলমান গ্রামাকবি প্রেমের গান রচনা করিতে রাধাকৃষ্ণ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আজকাল অবশ্য দেশের মনোভাব কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

ইংরেজী লিরিক বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এদেশের প্রাচীন কবিতায় বড় একটা দেখা যায় না। নিজের মনের কথাকে খোলাখুলি বলিতে এদেশের কবিরা হয় ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাই তাঁহারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য রাধাকৃষ্ণলীলা অথবা অন্য প্রকারের কাহিনী অবলম্বন করিতেন। নিজেকে অপরের অন্তরে ভরিয়া দেখা কবি-জীবনের এক প্রকারের বিলাস। রাধাকৃষ্ণের রূপক এদেশের বিরহী জনয়ের বাজাইবার বাঁশী। এই বাঁশীর সুরে নিজের সমস্ত অন্তর ভরিয়া দিয়া কত নিশীথ রাতের বংশীবাল আপনার মনের সাধনা খুঁজিয়া পায়। তাই ইহার সুরে রহে এদেশের যুগযুগান্তরের কান্না সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই রাধাকৃষ্ণের গানকে যাহারা অধর্ম কিংবা অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, তাঁহারা অতীত বাঙ্গালীর কাব্যভাণ্ডার হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিবেন। বাঙালী জাতির প্রতি যাঁহাদের মমতা আছে, বাঙালী মনের সহিত যাঁহারা সর্বতোভাবে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের গানকে অবহেলা করিতে পারিবেন না।

বিচ্ছেদ-গানগুলি সাধারণতঃ বৈরাগী ও বোষ্টমীরা বাড়ীতে বাড়ীতে গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা এই গানের সঙ্গে খোমক, গোপীযন্ত্র, মন্দিরা, একতারা, বেহালা ও সারীন্দা প্রভৃতি বাজাইয়া থাকে। মুর্শীদা গানের বৈঠকে গান যখন খুব জমিয়া উঠে তখন কোথাও কোথাও বড় বড় দলীরেরা দুই একটা বিচ্ছেদ-গান গাহিয়া থাকে।

ভাদ্র মাসে নদীতে 'বেড়-জাল' ফেলিয়া জেলেরা মাঝে মাঝে সারারাত্রি জাগিয়া বিচ্ছেদ-গান গাহে। তাহারা এই গানে কীর্তনের মত নানা প্রকারের আখর সংযোজনা করিয়া থাকে। পদ্মাতীরের গৃহে শয়ন করিয়া সুদূর জেলে-ডিঙি হইতে বহুবার আমরা এই ধরণের গান শুনিয়াছি। দুই এক বার জেলেডিঙিতে যাইয়াও তাহাদের গান শুনিয়া আসিয়াছি। জেলেরা সাধারণতঃ এই গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, খোমক ও পঞ্চরী বাজাইয়া থাকে।

বাউল অথবা বিচার-গানের প্রতিযোগিতার আসরেও কখনও কখনও বিচ্ছেদ-গান শোনা যায়। এই গানের কোন কোন আসরে শুধু বিচ্ছেদ-গানেরও প্রতিযোগিতা চলে। দুই দল গায়কের মধ্যে একদল কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে, অপর দল রাধার পক্ষ অবলম্বন করে। তারপর সারারাত্রি উভয়দলে গানে গানে বাদপ্রতিবাদ চলে।

বৈরাগীদের সাধুর বৈঠকে বিচ্ছেদ-গানের বহুল প্রচলন দেখা যায়। তাহারই একটি বৈঠকের বর্ণনা এখানে দিতেছি।

নাপিতদের বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানে একখানা নক্সী-কাঁথা বিছাইয়া বৈরাগীদের আসন দেওয়া হইয়াছে। চারি পাশে অধিকিত গ্রাম্য লোকেরা চাটাই ও মাদুরের উপর বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে তামাক খাইতেছে। এই আসরের মাঝখানে বৈরাগীদের পিছনে রাখিয়া গেরুয়া রঙের বসন পরিহিতা সুন্দরী বৈষ্ণবীটি একটি একতারা হাতে করিয়া মৃদু মৃদু টোকা দিতেছিল।

প্রথমে মহান্ত বৈরাগী গান ধরিল। গানের সুর আধুনিক ধরণের। বোষ্টমী শুধু একতারা বাজাইল, তার পরে একটা গানে বৈরাগী কেবল সুর ধরাইয়া দিল। সেই কোমল সুর কখন্ কি যাদুবলে যেন বৈরাগীর কণ্ঠ হইতে আসিয়া বৈষ্ণবীর অধরের মোলায়েম সুরের সরু সুতে বাঁধা পড়িল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিলাম। এই ভাবে আট দশটি গান গাওয়া শেষ হইল। আধুনিক সুরের গান সহরে বহু শুনিয়াছি। তাই গ্রাম্য বৈরাগীদের মুখে তাহা খুব ভাল লাগিতেছিল না। তা ছাড়া গানগুলির রচনা তেমন সুন্দর নয়। শুরুর চরণ ভজনা করিলে তবে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, পৃথিবীর সকলই মিথ্যা, এই ভাবের সকল গান। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভাবিলাম, এইবার বাড়ী যাই। এমন সময় বৈষ্ণবী একটা রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-গান ধরিল।

ওরা কেরে ধরি নাম শুনালি।
কারে আর রে কে ভুই আলি।

গানের ভাবটি এইরূপ। কৃষ্ণ অনেক দিন মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের তরুলতা আজ বহুদিন কৃষ্ণকথা শোনে না। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া যমুনার জল উজান বহে না, অভাগিনী রাধা কৃষ্ণবিরহে জীয়ন্তে মৃতপ্রায় হইয়া কাল কাটাইতেছেন। এমন সময় একদিন নারদ আসিয়া ব্রজের পথে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিল। অমনি শ্রীরাধিকার সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। বৈষ্ণবী এই গানটি এমনই প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিল যে, তার দুটি চোখ বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুপাত হইতেছিল। এমন যে করুণ ভাটিয়াল সুর তা যেন তাহারই কণ্ঠে স্থান পাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। গানের এক চরণ বৈষ্ণবী গাহিতেছিল, পিছনের দলে আর সব বৈরাগী বোষ্টমীরা তাহা আবার ঘুরাইয়া গাহিতেছিল, মেয়ে কণ্ঠের ও পুরুষ কণ্ঠের চিকণ ও মোটা গলা মিলিয়া সুরের এক অপূর্ব সুসংবদ্ধ মাধুর্য্য সৃষ্টি হইতেছিল। মনে হইতেছিল, ওই বৈষ্ণবীর রূপ ধরিয়া যেন হাজার বছর পার হইয়া সেই অভাগিনী রাধা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। একতারার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন কোন স্বপ্নলোকের বৃন্দাবনের এক একটি আবরণ খুলিয়া যাইতেছে। চারি পাশের সমস্ত লোকগুলি কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইতেছিল। বৈষ্ণবী মাঝে মাঝে গান ছাড়িয়া দিয়া মহান্ত বৈরাগীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছিল। পিছনে দোহারেরা যখন গানের পদগুলি গাহিতেছিল তখন মহান্ত বৈরাগীরও চোখ দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার দেহে পুলক, কম্পন, শিহরণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবগুলির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

এই গানটিকে নানা প্রকারের আখর দিয়া প্রায় ঘণ্টা-খানেক গাওয়া হইল। তারপর বৈষ্ণবী আর একটি গান ধরিল।

অনের মরম মানুষ নাই যে দেখে
যে দেখে বেদনে মরি
মনের দুখ মনে রেখে সই রে
লোকের মন আর কত রাখি।

কেবল লোকের মন জান না, কৃষ্ণপ্রেমের ভাব বোঝ না
কৃষ্ণধন কইতে মানা ওই দুখে মোর অঙ্গ ঝরি।
কেবল লোকের কথাই শুন, না বুঝিল প্রাণবোধিনী
কাঁদি থাকতে ঘর-বন্ধ, বিধাতা নিবাদে কান্দি
কৃষ্ণপ্রেমের আশাবিষে, মরে ঠোঁট যে গরলে লিলে:
কলঙ্ক আমার কিসে, অলি, অকলঙ্কে ডাকাতে ধরি।
কেবল বুকে আগুন দিয়ে, প্রাণ হায় সই ঘরে চুকিয়ে
গোড়া বিধি ঘাই হয়ে আমায় কাছছে শিক্ষিবার পারি।

এই গানটি প্রায় দুই ঘণ্টা চলিল।

বাউল গানে যেমন তত্ত্বকথা নিহিত থাকে, বিচ্ছেদগানে তেমন কোন প্রকারের তত্ত্বকথার বালাই নাই। কোনপ্রকার উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসার আশায় এই গানের আসরে কেহ আগমন করে না। পল্লী-কবিরা তাই এই গানের করুণ সুরের মলয় বাতাসে অন্তরের কাব্যকুঞ্জটিকে সহজেই মেলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন, কটিক্ষীণ, গজেন্দ্র-গমন, শারদ-চন্দ্রিমা প্রভৃতি সংস্কৃত উপমার ছড়াছড়ি, এই গানের ভিতর তেমন উপমার বাহুল্য দেখা যায় না। পাণ্ডিত্যাভিমানহীন গ্রাম্য কবিরা অনুপ্রাসের চমক লাগাইয়া পাঠকের মন জয় করিবার কৌশলটিও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। পদবিন্যাসের অসঙ্গতি, ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগের ভুল তাহাদের অহরহ, তবু এই সব ভাঙ্গাছন্দের ভিতর দিয়া তাদের ভগ্ন কুটীরের তলে যে-মনটি লইয়া তাহারা সুখদুঃখের দিবস-রজনীগুলি কাটাইয়া দেয় সেই মনটিকে পরিপূর্ণরূপে তাহারা এই গানের মধ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই গানের কবি মলয় বাতাসে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে না, কোকিলের ডাকে হাহুতাশ করে না—চাঁদের দিকে চাহিয়া কোন প্রিয় মুখ স্মরণ করে না, বন্ধুর বিচ্ছেদে পাগলে মাথা কুটিয়া কাঁদে, পিঞ্জরের পাখীর সাথে নিজের অসহায় অবস্থার তুলনা করে, মনের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া ভাবে, বুকের খাঁচলের তলায় অমন আর কত কাল লুকাইয়া রাখিব। আজকাল কোন কোন কবিওয়ালা বিচ্ছেদ-গান রচনা করিতেছেন। তাহাদের রচনায় সংস্কৃত ও বৈষ্ণব পদাবলীর ছাপ রহিয়াছে।

প্রায় অধিকাংশ গ্রাম্য গানের শেষেই গান-রচয়িতার একটা ভণিতা দেওয়া থাকে। প্রত্যেক বাউল গানেই এই প্রকারের ভণিতা পাওয়া যায়। রচনার মধ্যে আপন নামের চিহ্ন রাখিবার লোভ বৈষ্ণব মহাজনেরাও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অধিকাংশ বিচ্ছেদ-গানে পদকর্ত্তার কোনই ভণিতা পাওয়া যায় না। তাঁহারা যেন দুর্ভেদ্য অতীতের কোন অজানা গাঁয়ের কুয়াশা-কুটীর হইতে গানের আলোকরশ্মী

ভাসাইয়া দিয়াছেন। গানের ভিতর দিয়া তাঁহাদের অন্তরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল। কিন্তু বাহিরের চর্মচক্ষুর জগতে তাঁহারা চিরঅন্তরালেই রহিয়া গেলেন।

এই সব গানের কাল দেখিয়া ইহাদের রচনার সময় নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ গানগুলি কেহ লিখিয়া রাখে নাই। লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিতে ঘুরিতে বহুবার গানগুলিকে তাহার খোলস বদলাইতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া আজ একজন গ্রাম্য কবি তার মনের ভাব প্রকাশ করিতে যে প্রকার কলাকৌশলের অবলম্বন করিয়া থাকেন, একশত বৎসর আগের গ্রাম্য কবিরাও ভাবপ্রকাশে সেই সব কলাকৌশল অবলম্বন করিতেন।

অধিকাংশ গ্রাম্যগানই পয়ার ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন গ্রাম্যগান ত্রিপদীছন্দের রচনার উপরও দাঁড়াইয়া আছে। বিচ্ছেদ-গানগুলি যদিও এই প্রকারের ত্রিপদীছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবু এই গানের পদগুলির ছন্দে একটা নূতনত্ব আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি সহজ হইয়া আসিবে।

কৃষ্ণ তরে ওকুলের রাধে।
কথা শুনলে পরাণ ছাড়বে গো মাধা
উড়বে পাখি।
ও মোর, পাখি পড়ি লোক লজিতে
আমার বন্ধু চলল মধুপুরে।
কোথায় যাও তুমি ফাইরাই
রত্নপুরী পুরী করে।

আরও একটি গানের উদাহরণ দেই।

রাধা বলে ডাইকে সুবল
আমি, আর কত বাজাব বাঁশী।
আমার ভাঙ্গো হৃদ কি না হয়
যাই যমুনা পূর্ণ পরি।
সব রাখালে যাও রে ঘরে।
আমার মন চলে না গোচারণে
পুরে ফিরে আসি।
আমি পুরে কেরে পাই না পেয়ে
কেঁদে কালাই লারা দিনি।
আমি আর কত বাজাব বাঁশী।

প্রথম গানটিতে পাঠক দেখিবেন সুরের সহজ প্রকাশের জন্য ত্রিপদী ছন্দকে ভাঙিয়া ইচ্ছামত ছোট বড় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গানটি একেবারে রাবীন্দ্রিক যুগের গানের ছন্দের অনুরূপ। গ্রামে আর এক প্রকারের ভাটিয়াল গান আছে। এই গানগুলির সুর বিচ্ছেদ-গানের চাইতেও করুণ। এবং এত টানিয়া গাহিতে হয় যে ইহার সঙ্গে খোমক বা গোপীচন্দ্রের তাল দেওয়া চলে না। সারীন্দা বা বাঁশী এই প্রকারের গানের সংগত। এই গানগুলি পয়ার ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববঙ্গে নৌকায় মাঝিরা পয়া বদুনা বেয়নার ফলে ভাসিতে ভাসিতে নদীতরঙ্গের গতি হইতে এই সুর আবিষ্কার করিয়াছে। এখানে এই প্রকারের একটি গানের দুই এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

কালো ছেব নাকি বেটা নৌকা বাধা যায়,
বলব ঘাট বইয়া কাদে তোমার বাপমায়।

—বিবাহের গানের আসরে বসিয়া মেয়েরা দুই একটি বিচ্ছেদ-গান গাহিয়া থাকে। অধিকাংশ বিচ্ছেদ-গানই রাধা-উক্তিতে ভরা। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, গ্রাম্য মেয়েরাও কিছু কিছু বিচ্ছেদ-গান রচনা করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলায় ওড়াকান্দির এক বৈষ্ণবীকে আমরা জানি। তিনি অনেকগুলি বিচ্ছেদ-গান রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণবিচ্ছেদের গানগুলির সঙ্গে উত্তর বঙ্গের জাগগান * অথবা ময়মনসিংহের ঘাটুগানের † তুলনা করা যাইতে পারে। এই তিনপ্রকারের গানই রাধাকৃষ্ণ লীলার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাগগানের প্রত্যেকটি রাধাকৃষ্ণ লীলার এক একটি কাহিনী লইয়া রচিত। কোন কোন জাগগান এত অশ্লীল যে তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা অসম্ভব। বিচ্ছেদ-গানগুলি এই দোষ হইতে একেবারে মুক্ত। ময়মনসিংহের ঘাটুগান কতকটা বিচ্ছেদ গানের পর্যায়ভুক্ত। এই গানের সুর বিচ্ছেদ-গান হইতে পৃথক। তবে বিচ্ছেদ-গানের মত এই গানে, জন্ম-মরণ, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রভৃতি নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। ময়মনসিংহের বন্ধেরগানকে আমরা বিচ্ছেদ-গানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। কারণ বিচ্ছেদ-গানের সুর এবং ভাবের সঙ্গে বন্ধের গান প্রায় মিলিয়া যায়। তবে প্রত্যেক জেলারই গান গাহিবার নিজস্ব একটি ভঙ্গি বা ঢং আছে। আমাদের ময়মনসিংহে বিচ্ছেদ-গানকেই বন্ধের গান দেওয়া হইয়াছে। খুব সম্ভব ময়মনসিংহের বন্ধের গানে বিচ্ছেদ-গান হইতে যে সামান্য এতটুকু পার্থক্য আছে তাহা ঘাটুগানের সাহচর্যেই সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে দৌড়ের নৌকায় এক-প্রকারের ভাটিয়াল গান গাওয়া হয়। এই গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ-লীলার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা পয়ার ছন্দে রচিত। সমস্ত বিচ্ছেদ-গানকে আমরা বাউল সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি। তাহার কারণ, বাউলেরা বহুল ভাবে এই গান গাহিয়া থাকে। বাউলের বৈঠকে সকাল বেলায় সর্বত্র গোষ্ঠ-বিচ্ছেদ গাওয়ার রীতি আছে। পূর্বে আমরা বিচ্ছেদ-গানের এক শাখা গুরুবিচ্ছেদ গানের উল্লেখ করিয়াছি। বাউল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বৈঠকেই প্রথমে গায়কেরা গুরু-বিচ্ছেদের দুএকটা গান গাহিয়া তবে আর সব গান গাহে। গুরুবিচ্ছেদের গান না গাহিয়া কোন বাউল, আসরে অন্যপ্রকার গান করে না।

---

* রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের, 'জাগ গান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† ১৩৩৪ সনের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় কবি আবদুল কাদেরের 'পল্লী সঙ্গীত নীলাঘাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়া

মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব এখনও পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে—তবে অন্যান্য দেশে বর্ত্তমান সভ্যতা যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক তাহা নহে, উদাহরণ স্বরূপ কোরিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। জাপানের প্রভাবে কোরিয়া অতি দ্রুত বর্ত্তমান সভ্যতাকে আয়ত্ত করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় অত দ্রুত না হইলেও চীনের অপেক্ষা বেশী। চীন দু' হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে—অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেখানে কোন পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই।

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ। কারণ, এখনও বহির্জগতের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার আদান-প্রদান সুরু হয় নাই। এখানে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশাপাশি বর্ত্তমান—একটা আর একটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে—এবং বোধ হয় শেষেরটাই জয়ী হইবে। তবে সে বিজয়ের দিন এখনও অনেক দূরে।

গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল-পথের উভয় পার্শ্বে জাপান, ও চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের দুই পাশে রাশিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে—ইহার ফলে বর্ত্তমানে হাজার হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানে মোটরের কারখানা, ট্রাম, বিজলী বাতির কারখানা, কলের লাঙলের সাহায্যে উন্নততর প্রণালীর কৃষিকার্য্য ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার কার্য্য সুরু হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়া লইয়া ১৯২৯ সালে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল এবং ১৯৩১ সালে চীন ও জাপানের মধ্যে সেই বিবাদ আরও অধিকতর মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল। যে দেশ লইয়া এত বিবাদ, সেই দেশটি প্রকৃত পক্ষেই পূর্ব্ব-দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক বিভবে, সৌন্দর্য্যে, অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদে, বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া খুব বড় দেশ, আয়তনে ইহা ফ্রান্স ও স্পেন জড়াইয়া যত বড় হয়, তত বড়।

মাঞ্চুরিয়ায় অতি আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত নগর ও কারখানার পাশাপাশি চামড়ার তাঁবুতে যাযাবর জাতি বাস

মাঞ্চুরিয়া : মুকডেনের পুরাতনে নূতনে মিশ্রিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী।

করিতেছে। উট ও ছাগল এখনও তাদের একমাত্র পার্থিব সম্পদ। আবার দশ মাইলের মধ্যে আধুনিক ধরণের আদর্শোপযোগী সজ্জিত বালিকা-বিদ্যালয়ে বব করিয়া চুল ছাঁটা বালিকাগণ টেষ্ট টিউব হাতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে কাজ করিতেছে—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মোটরযোগে ছুটির দিনে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে, মেয়ে-পিয়ন পোষ্টাপিসের চিঠি বিলি করিতেছে।

মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বত্র আজকাল মোটরবাস চলিতেছে—আগে যে সব স্থানে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর ছিল এখন দু' একদিনে সে সব স্থানে রেল ও মোটরযোগে যাওয়া যায়। রেলপথ

মাঞ্চুরিয়া চাষীদের স্বর্গ। চাষ করিবার যথেষ্ট জমি আছে বলিয়া এখানে কোনও চাষীকে জমির জন্য খাজনা দিতে হয় না। চাষীদের অবস্থা মাঞ্চুরিয়ার চাষীদিগের চেয়ে পাশ্চাত্যদেশের চাষীদের সঙ্গেই বিশেষ এই ফটোটি তোলা হইয়াছে।

ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সমগ্র চীনদেশের সমগ্র রেলপথের অর্দ্ধেক এই মাঞ্চুরিয়াতে আছে—বৈদেশিক স্বার্থ এই রেলপথগুলির একটি প্রধান কারণ। মাঞ্চুরিয়া পৃথিবীশুদ্ধ সব সওদাগরের বাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সকলেই এখানে জিনিস বেচিবার জন্য ব্যগ্র। আমেরিকা মোটরগাড়ী ও মোটরের লাঙল বেচিতে ব্যগ্র—ইংলণ্ডের লোহালক্কড়ের জিনিসের বড় খরিদদার মাঞ্চুরিয়া, জাপানের তো ইচ্ছা ও বাজারে সে একাই বিক্রেতা হইবে। মিঃ ওয়েন্ ল্যাটিমার চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব ভালই জানেন এবং তিনি চীন ও মাঞ্চুরিয়ার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩২ সালে সস্ত্রীক মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণে যান। তাঁর লিখিত বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মাঞ্চুরিয়া দেখবার প্রয়োজন ছিল দুই কারণে। বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার দ্বন্দ্ব মাঞ্চুরিয়ায় যেমন সজীব ও বাস্তব, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশেই নয়। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, ওখানকার বিভিন্ন যাযাবর জাতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সব যাযাবর জাতির অন্যে আমরা তাদের একজন হয়ে কিছুকাল বাস ক'রব। আমাদের সে ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হয়েছিল—আমরা কিছিন প্রদেশের একটা পুরাণো মাঞ্চু গ্রামে বাস করেছিলাম প্রায় মাস তিনেক এবং এই স্থানে থাকার সময় বার্গা মালভূমির যাযাবর জাতি ও আমুর নদীর তীরবর্ত্তী তাতার-দিগকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

চীনদেশ থেকে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে বাস করতে আসছে। চীনের তিতরে নানা গোলমাল—তাছাড়া দারিদ্র্য অনেক বেশী। মাঞ্চুরিয়ার রেল-ওয়েতে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, দোকানে বা অফিসে কাজ পাওয়া যায়, চীনদেশে অত সহজে কাজ

মুকডেন : তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এটি একটি বাজারের দৃশ্য।

মেলে না। আমরা এই সব প্রবাসী চীনাদের দেখেছি, সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছি, দেব-মন্দিরে ও অপরিচ্ছন্ন সরাইয়ে সকলের সঙ্গে একত্র বসে খেয়েছি। রেলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বেড়িয়েছি এবং

রাজকর্মচারী, বণিক, কেরানী, দোকানদার, ছাত্র, শ্রমিক, সৈনিক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশেছি।

মাঞ্চুরিয়ার পুরাণো লোকসাহিত্য সংগ্রহ করবার জন্য আমরা রেলপথ থেকে অনেকদূরের গ্রামে গ্রামে বেড়িয়েছি। এই সব গ্রামের জীবনযাত্রাপ্রণালী এত অদ্ভুত যে, মনে হয় না আমরা সত্য জগতে আছি—মাঝে মাঝে মুকডেন, হারবিন্, ডাইরেন্ প্রভৃতি বড় বড় সহরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। মাঞ্চুরিয়ার এসব বড় সহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ রীতিতে তৈরী : সেখানে থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, বড় দোকান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, ট্রাম, ছাপাখানা, লাইব্রেরী, খবরের কাগজ, রেডিও—সবই আছে।

প্রথমে মুকডেনে এসেই আমরা মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্তা জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। চ্যাং শো-লিং অত্যন্ত ভাল লোক, তিনি মাঞ্চুরিয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন, তিনি মাঞ্চুরিয়াকে ভাল করেই জানেন এবং যাযাবর তাতার জাতিদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি। জেনারেল চ্যাং শো-লিং খুব ভাল ফুটবল খেলতে পারেন, টেনিস ও পোলো খেলাতেও তিনি সুদক্ষ। তিনি বেশ ইংরেজি বলেন, কিন্তু গল্প বলতে বলতে উৎসাহের মুহূর্তে অনেক সময় চট্‌পট্ চীনাভাষা বলতে সুরু করেন। চ্যাং শো-লিংএর সাহায্য না পেলে আমাদের অত ভাল করে দেশটা দেখবার সুযোগ হ'ত না।

শহরের থেকে আমি মোঙ্গোলদের দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর যাই। একটা লরি বোঝাই সৈন্যের সঙ্গে একত্র বসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল শুধু ক্যামেরা ও আমার বিছানা। আমার সঙ্গীরা যে খাবার খেত আমি সেই একটু খাবার খেতাম বটে, কিন্তু খাবারের দরুণ আমার খরচের অবধি ছিল না, শুধু মহুয়ার দেশে গেলে মাইলে কতকগুলো ঘুঘা পাকড়ে পারে : তার চেয়ে মোঙ্গোলদের বুনো পাখীর ও ভেড়ার মাংস আমি অনেক পছন্দ করতাম।

মোঙ্গোলদের দেশের প্রান্তসীমায় সোলুন নামে ছোট্ট সহর অবস্থিত। এখানে আগে আফিমের চাষ ছিল—চাষীরা সবই চীনা, তারা চড়া খাজনায় মোঙ্গোলদের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিত। চীন থেকে এরা চুপি চুপি আফিম সমুদ্রপথের বন্দর ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চালান দিয়ে দু' পয়সা উপার্জ্জন ক'রত, কিন্তু জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দিয়ে শীতকালে কাজের অভাবে অর্থের জন্যে হাহাকার ক'রত। এদের উৎপাতে সোলুন সহর থেকে আশেপাশে দিনমানেই কোথাও যাবার উপায় ছিল না। জেনারেল চ্যাং শো-লিং বহু চেষ্টার পরে

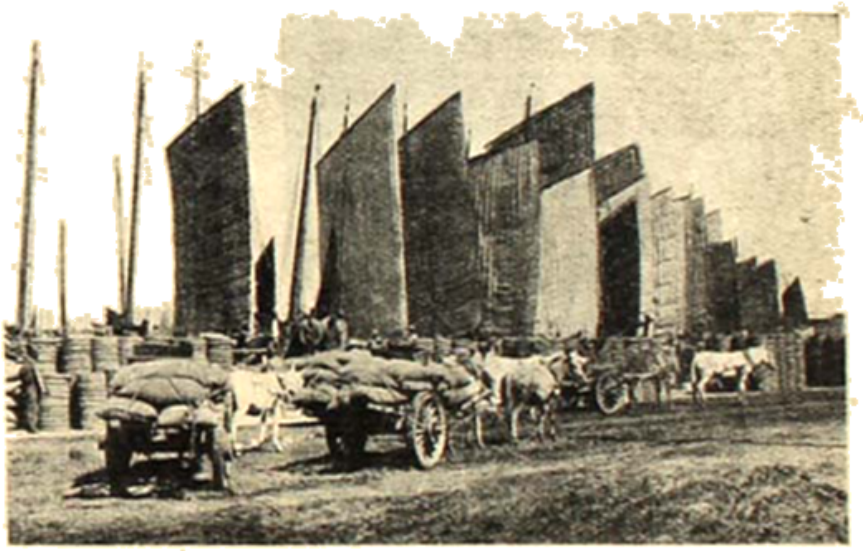

চাইকেল : মাঞ্চুরেশ্বরী নিয়ের বাঁধি কিনলে সমাইবার জন্য ঘাটে দাঁড়িয়েছে। ঘাটে নামানো জন্য সমুদ্রের পাশেল দেখা যায়।

এদের উৎপাত দমন করেন, কিন্তু অনেকে দূরের পার্ব্বত্য প্রদেশে পালিয়ে যায়—নিরীহ জীবনযাত্রাপ্রণালী তাদের ধাতে সইল না।

কেবল মোঙ্গোল যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এখানে বাস করছে—শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন আরও অনেক মোঙ্গোল আনবার্নী করে দেশটাকে মোঙ্গোলপ্রধান করে তোলা। এই দেশেই জাপানী সেনাপতি নাকামুরা চীন সৈন্যদের দ্বারা হত হন, তার ফলে জাপানীরা মুকডেন ও অন্যান্য সহর দখল করে।

উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দরুণ অনেক লোক পালিয়ে এখানে এসে বাস করেছে। হাতে পয়সা না থাকায় শীতকালে

বাস করেছিল, এদের জীবন যে

জনৈক উইগুরোলা। হস্তদ্বয় বর্ণাটির অগ্রভাগস্থিত সূতোর ঘোলানো নোড়া। লোকের বিশ্বাস যে এই বর্ণা দ্বারাই লোকটি আবিবাধি খুন করে।

কি দুঃখপূর্ণ তা কল্পনা করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট এদের কিছু কিছু জমি দেবার চেষ্টা করছে—প্রথম তিন বছর খাজনা দিতে হবে না, তিন বছর ভাল ফসল পেলে চতুর্থ বৎসর থেকে এদের অবস্থা ভাল হতে পারে।

কিন্তু শুধু জমি দিলেই হ'ল না, এদের মূলধন কাণাকড়িও নেই। কাজেই এরা চড়াসুদে মহাজনের কাছে টাকা কর্জ্জ করতে বাধ্য হয়—এবং ফসলের সমস্ত শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ সুদের জন্য দিতে হয়। বেচারা কৃষকদের থাকে কি! এর উপর আবার যদি জমির খাজনা দিতে হয়, তবে জমি চাষ করবে কেন লোকে! এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্ট মতলব করেছে যে চাষীদের জমি উঠতি হয়ে গেলে পুরস্কারস্বরূপ ঐ জমির কিছু অংশ চাষীকে একেবারে দিয়ে দেওয়া হবে, তার জন্য কোন কালেই আর খাজনা দিতে হবে না। এ ধরণের ব্যবস্থা ভিন্ন এ অঞ্চলের কৃষির উন্নতি আশা করা যায় না। জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর চেষ্টায় ফলেট এ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে।

সোলুন অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে মাঞ্চু-মোঙ্গোল জাতি বাস করে—এরা এক অদ্ভুত জাতি। জনৈক মোঙ্গোল সর্দ্দারের সঙ্গে একজন মাঞ্চু রাজকন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজ-কন্যার অনুচরগণের বংশধর হচ্ছে এই মাঞ্চু-মোঙ্গোল। টাওয়ান্ নগরে আমরা দীর্ঘকাল ছিলাম। সোলুন পর্ব্বতের পাদদেশস্থ একটা বড় প্রদেশের রাজধানী হিসাবে টাওয়ান্ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খুব উন্নতিলাভ করেছে। আমরা একটা ছোট সরাইয়ে ছিলাম—এই সরাইএর মালিক এক সময়ে বড় সেনাপতি ছিল—যুদ্ধবিগ্রহে তাদের দল হেরে যায় এবং এ লোকটা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এখানে এসে সরাই খুলেছে। মাঞ্চুরিয়ায় এ ধরণের লোক অজস্র পাওয়া যায়—দিনকতক পরের লুঠপাট করে বড়মানুষি করলে, আবার কিছুদিন পরে পথে দাঁড়ালো।

আমাদের সরাইএর মালিক খুব সকালে উঠত এবং চাকরবাকরদের উপর চেঁচামেচি করে হুকুম জারি করত। তার ভয়ে চাকরেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, কখন কি বলে বসে মালিক তার ঠিক নেই। আমাদের কামরার যে চাকর, তার নাম

মাঞ্চুরিয়ার নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। অনায়াসে তখন নদীর উপর দিয়া লোক ও পশু চলাচল করে।

আর মাঞ্চুরিয়ার একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম একই—এইজন্যই বোধহয় সরাইএর মালিক তাকে যখন তখন চীৎকার করে হুকুম করতে ভালবাসত।

টাওয়ান্ সহর সাতারাতি বড় হয়েছে। এ নগরটি মঙ্গোল জাতির মেয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই মঙ্গোল জাতি পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার অনেক প্রদেশ নিজেদের অধিকারে এনেছিল। মাঞ্চুদের সঙ্গে মিশে এরা চীনদেশ আক্রমণ করে' সেখানে মাঞ্চু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এসব অনেক দিনের কথা। এখন চীনারা আবার মোঙ্গোলদের তাড়িয়ে সমগ্র মাঞ্চুরিয়ার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছে। টাওয়ান্ সহরের বাড়ীগুলি সবই পাকা, বড় বড় কাঁচের জানালা বসানো, দোকানে রেশমী বস্ত্র, সাবান, এসেন্স ইত্যাদি পাওয়া যায়—অধিকাংশ পণ্যই বিদেশী।

টাওয়ান্ সহরের আশেপাশে দস্যুর উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। জেনারেল চ্যাং শো-লিং আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, মোটর গাড়ী ভিন্ন আমরা যেন কোথাও না যাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখনই আমরা মোটরে যাব ছ'তাম—আমাদের আগে আগে একটা মোটর সাইকেল ছুটত—তার পেছনে একটা বড় লরি বোঝাই সৈন্য, তার পেছনে আমাদের গাড়ী এবং আমাদের গাড়ীর পেছনে আবার একটা লরি বোঝাই সশস্ত্র সৈন্যদল। আমাদের অগ্রবর্ত্তী মোটর সাইকেল ও লরির ধূলো খেতে খেতে আমাদের অবস্থা হয়ে উঠত শোচনীয়, যেন বাইবেলে বর্ণিত গল্পানুযায়ী ইস্রায়েলের পুত্রগণ ঈশ্বর-প্রেরিত মেঘের স্তম্ভের অনুসরণ করে ইজিপ্টে চলেছেন।

দস্যুর উপদ্রব সত্যিই এত বেশী যে, আমরা প্রতি রাত্রেই সহরের বাইরে সৈন্যদের সঙ্গে তাদের গুলি চালাচালির শব্দ শুনতে পেতাম। দস্যুরা লুঠপাট করে সোলুন্ পর্ব্বতের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত, আর তাদের কোন সন্ধানই হ'ত না। আবার কখনো কখনো অস্ত্রারোহী সৈন্যদল দস্যুদের বন্দী করে নিয়ে নগরের মধ্যে ডেঁপু বাজাতে বাজাতে মহাসমারোহে প্রবেশ করত। দোকানদারেরা তখন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিত—কারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, বন্দী দস্যুরা যদি কোন দোকান থেকে কোন জিনিস চায়—দোকানদারকে তখনই তা দিতে হবে। না দিলে সৈন্যেরা দিতে বাধ্য করবে।

ধাকু রাজকন্যার মৃত্যুর পরে তাঁর অনুচরদের জমি দেওয়া হয়েছিল। ঐ জমি এখন তাদের বংশধরদের অধীনে আছে। তারা চাষবাস ও বস্ত্র বয়ন করে, সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন এবং যদিও সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু তারা স্বতন্ত্রপন্থ। দস্যুদল তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবেশ করতে সাহস করে না। ওদের মধ্যে যে সব চেয়ে ধনী, সে স্থায়ী তাঁবুতে বাস করে, আর সকলে নিজের নিজের গৃহপালিত পশু নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। এ অঞ্চলে পার্ব্বত্য মেষকে বাসের

মিঃ নিকি-চ'ন মিলেটোমো বক্ষে (প্রথম শ্রেণী)।

অত্যন্ত বেশী উপদ্রব—সেজন্য প্রত্যেকে বড় বড় গ্রেহাউণ্ড পোষে। সকল মেষপালকের দলেই দু' পাঁচটা গ্রেহাউণ্ড থাকে—তারা যেমন প্রভুভক্ত, তেমনি উগ্র প্রকৃতির।

গ্রেহাউণ্ড মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না—এই কুকুর এদেশে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হয়। গ্রেহাউণ্ড কেউ বিক্রী করে না, তবে উপহার দেয় বটে। গ্রেহাউণ্ড উপহার দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন বলে গণ্য হয়। ক্যাটিলিওন

নায়ক বিখ্যাত জেমুইট্ চিত্রকরের অঙ্কিত মাঞ্চু সম্রাটের প্রিয় কয়েকখানি ঘোড়ার ছবি পিপিংএর রাজপ্রাসাদে আছে।

মোঙ্গোলেরা কুকুরকে তিব্বতি পাখী শিকার করতে শেখায়। শরৎকালে বনের ফল খেয়ে তিব্বতিপাখী এমন মোটা হ'য়ে পড়ে যে, তারা বেশীদূর উড়তে পারে না। কুকুরেরা তাদের উড়ন্ত অবস্থায় পেছনে পেছনে ছুটে যায়, এবং যেমন তন্দ্রিতে বসে—অমনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে।

এদেশে পশুচারণভূমি পাবার্যিতে পুড়ে প্রায়ই অকেজো হয়ে যায়। মোঙ্গোলেরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগামী বর্ষায় ভাল ঘাস খাবার জন্য—কিন্তু যখন বাইরের লোক এসে জমি নিয়ে বাস করে, তখন জমির দখল নিয়ে দুই দলে বিবাদ হয় এবং একদল অন্য দলকে ধ্বংস করবার জন্য মাঠের শীর্ষ ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আমরা একটা ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে মোটরলরিতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা একদম ছিল না—যে দিকে চাই শুধুই বড় বড় ঘাস। আমাদের সঙ্গী সৈন্যেরা এই ঘাসে লাগিয়ে দিলে আগুন। মোটরলরি ছাড়বার আগেই বাতাসের গতি বদলে গিয়ে বিরাট আগুনের শিখা আমাদের দিকে ছুটে এল—আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! আমাদের সঙ্গে বেশী গ্যাসোলীন ছিল, তার টিন ফুটো হওয়ার দরুণ মাটিতে সর্ব্বত্র গ্যাসোলিন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল—তাতে একবার আগুন লাগলে আর কি রক্ষা ছিল!

কোন মোঙ্গোল-তাঁবুতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নিরাপদ নয়—তা হ'লে কুকুরের দল ছুটে এসে সওয়ারকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। চাবুকে মারলেও তারা ভয় পায় না বা ফেরে না—জিনের উপরে লাফিয়ে উঠতে চায়, ঘোড়ার মুখে কামড়াতে যায়। এই জন্যে নিয়ম হচ্ছে এই যে, দূর থেকে চীৎকার করে' বলতে হবে, 'আমরা যাচ্ছি, কুকুর সামলাও'। তখন তাঁবুর লোকেরা বেরিয়ে এসে কুকুর বাঁধবে। তুমি যে দস্যু বা আক্রমণকারী শত্রু নও, এ থেকে তারা তা বুঝতে পারবে।

মোঙ্গোলেরা তাদের তাঁবুকে এত ভালবাসে যে, যে সব জায়গায় তারা বাড়ীঘর বেঁধে বাস করেছে, সে সব জায়গাতেও তারা বাড়ীর সঙ্গে চামড়ার গোল তাঁবু অনেক দিন পর্য্যন্ত রেখে দেয়—যখন তাঁবু ছিঁড়ে যায়—তখন তার চারপাশে কাদা দিয়ে লেপে তাকে ঠাণ্ডার-ঘর হিসাবে ব্যবহার করে।

মোঙ্গোলদের জীবন খুব ফুর্ত্তির ব্যাপার নয় আদৌ। ডাকাতের উৎপাত, প্লেগের উৎপাত, বন্যার উৎপাত, আগুনের উৎপাত এসব তো লেগেই আছে, তা ছাড়া আছে, উকুন ও মাছির উৎপাত। আমি একবার একজন মোঙ্গোল কুলকের তাঁবুতে দিন কয়েক ছিলাম। শীতকালে সে লোকটা পশম ও রেড়ার চামড়ার ব্যবসাও চালাতো। তার হাতে ৫' পয়সা

মাঞ্চুরিয়ার দারিদ্র্যের একটি চিত্রবিচিত্র চাষাটী পরিবার।

আছে, কিন্তু সে গরম কম্বলে গ্রীষ্মকালে মাছি ও উকুনের উপদ্রবে রাত্রে ৫ দিনে ঘুম হওয়া অসম্ভব। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে শুধুই গা চুলকানো ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার নেই এর।

শীতের রাত্রে এদের বিছানায় শুয়ে ছিলাম। আগুনে তাতানো ইটের উপর কম্বল পাতা—এই হ'ল বিছানা। আমার সঙ্গে এক জন চীনা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি শোবার

আগে গাঁয়ের জামা অনুসন্ধান ক'রে তার মধ্যে কয়েকটা বড় বড় উকুন পেলেন। তারপর লম্বা আফিমের পাইপটি ধরালেন—আমায় বললেন, "বড্ড শীত, আপনি দু' এক টান দিন্ না? কি জানেন, আফিমের ধোঁয়ায় উকুনের উৎপাত কম থাকে।" অদ্ভুত বিশ্বাস বটে।

শীতকালে মাকুরিয়ার সর্বত্র মোটরবাস যাতায়াত করে। এ দেশের মোটরবাস দেখতে ভারী মজার। কাঠামোটা ফোর্ড মোটরের, কিন্তু তার উপরে এরা নিজের পছন্দ ও খুসিমত গাড়ী বানায়—মনে হয়, একটা টীনা ভাঙ্গাকে একটা ফোর্ড এঞ্জিন্ টানছে, আলো ও বাত্রীতে এক একটা বাস এমন ভর্ত্তি করে যে সকলেই না নামলে কেউ গাড়ী থেকে নামতে পারে না!

শীতের শেষে আমরা কিরিন প্রদেশে পৌঁছুলাম। সেখানকার শাসনকর্ত্তা আমাদের খুব খাতির করলেন। কারণ আমরা চাং শো-লিংএর চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার লোক অবাক হয়ে আমাদের চেয়ে দেখত। আমরা মাঞ্চুরিয়া শিখবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজলাম—প্রথমটা সকলেই আমাদের এমন সন্দেহের চোখে দেখলে যে, শুনলাম সমগ্র কিরিন প্রদেশে মাঞ্চুরিয়া শেখাবার শিক্ষক একজনও নেই—সব মারা গিয়েছে। অবশেষে শাসনকর্ত্তার বিশেষ পরোয়ানা আনিয়ে তার বলে আমরা মিঃ নি-ই-উ অর্থাৎ 'গরু' নামধারী জনৈক মাঞ্চু স্কুলমাষ্টারকে খুঁজে বার করলাম। নাম যাই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান—ও' রাত্রির মধ্যে মিঃ নি-ই-উ আমাদের তেরশো অক্ষর চিনিয়ে এবং মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের এই মাষ্টার মহাশয়ের তিন বছরের একটি ছেলে ছিল কি সিগারেট খোরই ছিল এই তিন বছরের শিশুটি। আমরা যখনই সিগারেট ধরাবো, সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা সিগারেট দিতে হবে—সে ধরিয়ে টানতে থাকবে। আর তার বাবা সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে বলবে, 'বেশ বাচ্চা, বেশ, বেশ!'

ভূমিকম্প

—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

পরম শান্তির মাঝে—
প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি হেরি অভিনব!
ধরিত্রীর বুকে
সহসা কি জাগে ব্যথা!
নিষ্ঠুর আঘাতে—
আতঙ্কব্যাকুল মাতা,
আপন গর্ভের লক্ষ শিশু-সন্তানেরে
অকস্মাৎ একসাথে
নিজবক্ষে চাপি ধরি নিষ্ঠুর আঘাতে
লাগিল কাঁপিতে—
ভ্রূণস্থ শিশুরে যথা গর্ভস্থ ব্যথায়
ত্রস্তা করে ভর্ত্তৃহীনা মাতা।
তার মনে সেই ক্ষণে জাগে বুঝি
প্রলয়-স্পন্দন!
কে জাগাল তাহা?

আমি মূঢ় শিশুসম বসে আছি অপলক চোখে
মা'র মুখ পানে চাহি উত্তর খুঁজিয়া!
কতদূরে কেবা জানে, আকাশের দিক্‌প্রান্তে কোন্
চক্রান্ত করিছে বসি কূটগ্রহদল—
বসিয়া মণ্ডপে নিষ্ঠুর সনাতনপতি হত!
বিচার-ইঙ্গিত রুদ্র
জননীর চরম লাঞ্ছনারে, লক্ষ্য দিল বুঝি।
নিষ্ঠুর মরণ—
সমাপ্ত করিল লজ্জা, অসমাপ্ত জীব-জীবনের।

মার বুকে জাগে ভয়—
হারাইল যাহারা—
চেয়ে রয় আতঙ্কিত অপলক চোখে
মার মুখ পানে।
সন্তানের স্নেহ,
অতিক্রম করিবে কি মাতার লজ্জারে!
নীরবে প্রতীক্ষা করে নির্ম্মম প্রকৃতি।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

২রা নভেম্বর।

সকাল ঠিক ৭টা ৫৫ মিনিটে টাপাসগাই ছাড়িয়া বাহির হইলাম। কথা ছিল, সতীশ বাবু আমাদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে যাইবেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় পারিলেন না। বলিয়া দিলেন, 'বিনয় বাবু দার্জ্জিলিং রোডে আছেন। তিনি-ই তোমাদের খবর করিবেন।'

দার্জ্জিলিং রোডে পঞ্চানৈ নদীর পুলের উপর ফটো করাইয়া ক্যাপ্টেন সকলকে বলিলেন, 'মনে থাকে যেন, একদিনে উঠিতে হইবে!'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কালীমায়ের নামে শপথ করিয়া লইলে হয় না?'

আইডিয়াটা ক্যাপ্টেনের ভাল লাগিল। তখন সকলে মুক্তিতলায় নতজানু হইয়া বসিয়া গেলাম। ক্যাপ্টেন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'কালীমায়ের নামে শপথ কর।'

আমরা সমস্বরে উত্তর দিলাম,—'শপথ করিতেছি।'

এমন তিনবার হইল।

অতঃপর জয়াভিযানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এমনই সব কথিক রিলিফে পথের শ্রান্তি দূর করিয়া গাড়ী ছুটাইলাম। শুধু মনে ছিল, কাশ্মীরের পথে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে মাত্র একদিনে উঠিয়াছিলাম—সে-খ্যাতি বজায় রাখিতে হইবে।

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলের প্রথম ষ্টেসন পঞ্চানৈ। সেখান হইতে সুকনা পর্য্যন্ত রাস্তা সমতল। পঞ্চানৈ ষ্টেসন পার হইয়া অনেকগুলি চা-বাগান। তারপর জঙ্গল। রাস্তার পাশে গাছের উপর লেখা—সুকনা ফিল্ড কবেট, কার্শিয়াং ডিভিসন। টেরাইয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও জঙ্গলটি বেশ বড়। মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তুদের আশ্রয়ও আছে শুনিলাম।

সুকনা শিলিগুড়ি হইতে দশ মাইল। এইখান হইতে চড়াই আরম্ভ। চড়াইয়ের পথ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া হিমালয়ের গায়ে গিয়া হেলিয়াছে। ষ্টেসন ছাড়িয়া ফরেষ্ট-অফিস ও অফিসারের বাংলো। তারপর সেই জঙ্গল, পাহাড়—ইহার একদিকে রেল লাইন, অন্যদিকে চলাচলের পথ। পথ ও রেললাইন বহুবার মিশিয়াছে, বহুবার ভিন্ন হইয়াছে।

রংটং গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট একটি ষ্টেশন। এদিকে-ওদিকে কোথাও বসতি কি চালা-ঘর নাই। লাইন

কার্শিয়াং।

ক্লিয়ার দিবার জন্য একটি মাত্র লোক। লোকটির ভাগ্যকে ঈর্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না।

রংটং ছাড়িয়া চুণভাটি।

অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। ষ্টেসনটি ছোট্ট। লোকজনের বাস আছে। জঙ্গল এখানে শেষ হইয়াছে—রংটং ও চুণভাটির মধ্যেকার জঙ্গলের নাম, কাটনা ফরেষ্ট।

চুণভাটি দেখিয়া মনে হইল, বনদেবী এখানে তাঁহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আড়চোখে একবার আকাশের

দিকে চাহিয়াছেন—তাঁহার মুখে ঔৎসুক্যের হাসি—পা দুটি আবৃত, একটি হাতে ঘোমটা ঈষৎ করিয়াছেন, অন্য হাতে খাঁচায় সামলাইতেছেন। স্বপ্নরাজ্য হইতে বনদেবীর এই অপূর্ব্ব ভঙ্গী চুপভাটিতে কে করে হরণ করিয়া দার্জ্জিলিং-

পাহাড়ী দৃশ্য।

হিমালয়ান রেলের একটি ষ্টেশনে আনিয়া বসাইয়া দিয়া গিয়াছে!

চুপভাটি হইতে তিন্‌ধরিয়া। পথ বেশী নয়, কিন্তু অনেক গুলি লুপ ও রিভার্স আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দূর উঠিয়া আবার নামিয়া চলিতে হইল। এই পথের রেল-লাইন-সংস্থান দেখিবার মত—কোথাও চাকার মত বৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও তড়িৎ-রেখার মত তির্য্যক্। তিন্‌ধরিয়া ষ্টেশনের নীচেই বাজার। একটি দোকানে জলখাবার খাইয়া লইলাম। একটি 'জোঠি'র (পাহাড়ী বয়স্ক লোক) ছবি তুলিতে চাহিলাম—আপত্তি করিল, বলিল, 'রামরু খুসি নেহি বাবু, কেলিয়ে নক্সা তোঠায়গে?' তা বটে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল যখন পেটে পড়িয়াছে!

চৌদ্দ পোনেরো বছরের একটি সুন্দরী কাফী কোথায় ছিল কে জানে। ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছবি তুলিব। হাসিয়া রাজি হইলাম। আনন্দ হইল, এমন একটি নিদর্শন আলবামে থাকিবে। কলিকাতায় ফিরিয়া তবে জানিলাম, ফ্যাসটি উঠে নাই।

তিন্‌ধরিয়ায় ডি. এচ. রেলের কারখানা, সুতরাং লোকের বসবাস বেশী। অনেক বাঙ্গালী এখানে। ঠাণ্ডা বেশী নয়, বেশী গরম নয়, জায়গাটি মনোরম। তিন হাজার ফিটের চাইতে কিছু অধিক উচ্চে।

বাঙ্গালীদের মেস ও ষ্টেশন ছাড়িয়া বাঁয়ে গ্রেভইয়ার্ড-ও পাশে পুলিশের কাঁড়ি রাখিয়া গয়াবাড়ী অভিমুখে ছুটিয়াছি। একটি পাহাড়ী নদী, খানিকটা সমতল ভূমি, খানিকটা উপত্যকা—দুই চারিটি লুপ—এমন করিয়া গয়াবাড়ী পৌঁছিলাম।

গয়াবাড়ী ৫০০০ হাজার ফিট উচ্চে। ষ্টেশন আইয়ে দেখিলাম এখানেও বাঙ্গালী। দুই একখানি দোকান ও অন্যান্য ঘরবাড়ী ষ্টেশনের এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

ক্রমেই উপরে উঠিতেছি।

গয়াবাড়ী হোতে আলোহারার আরো।

পাহাড়ীরা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, মাঝে মাঝে চলতি ট্রেন হইতে কেহ কেহ রুমাল নাড়িয়া উৎসাহিত করিতেছেন,—আমরা মহানদীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছি।

মহানদীর কিছু নীচে পাগলা-কোরা। বিশ্রামার্থ এখানে একটু বসা গেল। এই পাগলা-কোরা রেলের এঞ্জিনের জল

জোগায়। ইহার ছবি তুলিয়াছিলাম—নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গয়াবাড়ী হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি ছবিও সুবিধার জন্য ভাল উঠে নাই। মহানদীর কিছু আগে একটি ল্যাণ্ডস্লিপ

কার্শিয়াং—টেলিগ্রাফ।

দেখিলাম—মেরামত হইতেছে। মহানদীতে একটি কাফীর দোকানে নাস্তা খাওয়া গেল—চা-ও পাওয়া গেল। এখানে রাস্তা বেশী খাড়াই নয়—তিনধরিয়া পর্যন্ত রাস্তা একটু বেশী খাড়াই। পথে মাঝে মাঝে বড় সুবিধার কাজ গিয়াছে—মাঝে এমনও হইয়াছে, নিজের হাতও দেখা যায় না। মহানদী ষ্টেসনটিও ছোট। এখানেও ষ্টেসন-মাষ্টার বাঙ্গালী। পাহাড়ীই এখানে বেশীর ভাগ।

কার্শিয়াং পৌঁছাইলাম বেলা দুইটায়।

কার্শিয়াং কলিকাতা হইতে ৩১৫ মাইল। কার্শিয়াং দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা; জেল, কোর্ট, এস-ডি. ও. প্রভৃতি—মহকুমার সকল সাজ-সরঞ্জামই আছে। ৪৮৬৪ ফিট উচ্চ। পূর্বে কার্শিয়াং সিকিমের অন্তর্গত ছিল। তারপরে নেপাল ইহা কাড়িয়া লয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সাহায্যে সিকিম পুনর্বার ইহা ফিরিয়া পায়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সিকিমের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ইংরেজ কার্শিয়াংএর অধিকারী হইয়াছেন।

কার্শিয়াং হইতে পাংখাবাড়ী রোড দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একেবারে সমতল ভূমিতে নামিয়া গিয়াছে।

খৃষ্টানদের একটি বড় আড্ডা এই কার্শিয়াং। অনেকগুলি কন্‌ভেণ্ট আছে। চার্চ্চ ও মিশনও অনেক। ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনারীদের জন্য সেণ্ট হেলী গৃহ তৈয়ারী হইয়াছে। সিনেমা আছে, মিউজিয়াম আছে। ফুটবল খেলার মাঠ আছে। ডাউহিল স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল, রাজরাজেশ্বরী হল, লাবণ্য-কুটির, বাঙ্গালী এসোসিয়েশন—সব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম।

এখান হইতে পাহাড়ের গা ধরিয়া রেল ও দার্জিলিং রোড দুই-ই সোজা দার্জিলিং চলিয়া গিয়াছে। কার্টরোড দার্জিলিং হইতে লেবং পর্যন্ত গিয়াছে। বর্দ্ধমান মহারাজের প্রাসাদের পাশের ছোট পাহাড়টি হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

কার্শিয়াংএ মা-তাদের চায়ের দোকানে আড্ডা গাড়িয়া চা, ডিম ও পাউরুটি খাওয়া গেল। একটি বন্ধুর সহিত দেখা হইল, তাহার ইচ্ছা সেদিনটা কার্শিয়াংএ কাটাইয়া যাই। তাহাকে পথের কথা বলিলাম।

প্রায় ২টা ৪৫ মিনিটে কার্শিয়াং ছাড়িলাম।

কার্শিয়াং—কার্টরোডে ডায়েন্স হোটেল।

সম্মুখে টুং।

বুঝিলাম, সকলেরই একটু ক্লান্তি আসিয়াছে। যত রাস্তা চলি, ততই রাস্তা বাড়ে। সুপের পর সুপ শেষ করিয়া টুংএ পৌঁছাইলাম।

দেখি, টাপাসরাই চা-বাগানের বিনয়বাবু সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। একটি দোকান হইতে গোটাকয়েক কমলালেবু কিনিয়া তাঁহাকে দুটি দিলাম, নিজেরা কয়টা খাইলাম।

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—দেখিবেন, কথা যেন রাখিতে পারেন।

'টুং' একটি ছোট ষ্টেশন, এখানে অনেক পাহাড়ীর বাস। পাহাড়ীরা অনেকে চাকরি ও অনেকে ব্যাবসা-বাণিজ্য লইয়া আছে। এসব স্থানের পাহাড়ীরা লোক বেশ ভাল দেখিলাম। টুং ছাড়িয়া কয়েক মাইল যাইবার পর অত্যন্ত কুয়াশা পাইলাম এবং কিছু পরেই বৃষ্টি ·····তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে একটি পাহাড়ীর ঘরে আশ্রয় লওয়া গেল। এইবার আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল, ভাবিলাম, আজ আর বোধ হয় দার্জিলিং পৌঁছাইতে পারিলাম না।

আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে জল থামিল না দেখিয়া সোনাদা উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সোনাদার কিছু পূর্ব্বে জল থামিল, কিন্তু কুয়াশা কমিল না, উপরন্তু বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। যেন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও এই পাহাড়ের উপর পুঞ্জীভূত মেঘের নীচে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যখন সোনাদায় আসিয়া পৌঁছাইলাম, তখন হাত দুটি ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে, সাইকেলের হাণ্ডেলগুলি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সোনাদায় একটি কাফীর দোকানে চা-পানের আশায় প্রবেশ করিলাম। কাফীটি অত্যন্ত দয়ালু। সে আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়া আগুনের ধারে বসাইল, গরম দু' পেয়ালা করিয়া চা দিল। তার পর জামাগুলি খুলিয়া শুখাইয়া লইতে বলিল। সেই অবস্থায় কেহই ব্যাগ খুলিয়া গরম পেন্সি বা দস্তানা বাহির করিতে চাহিল না, ব্যাগ খুলিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না।

দোকানে বসিয়া কাফীর সহিত গল্পগুজব করিতেছি। বৃষ্টি আবার টিপ টিপ্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কাফী আমাদের রাত্রের জন্য তাহার অতিথি হইতে বলিল। তাহার কথা রাখিতে পারিলাম না। একটু বিশ্রামের পর সোনাদা ছাড়িলাম।

ডাইনিং রুম।

সোনাদাও একটি ছোট ষ্টেশন, এখানকার ষ্টেশন মাষ্টারও বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর বাস এখানেও বেশ আছে। বাঙ্গালীদের বড় বড় বাড়ীও আছে। এ ছাড়া পাহাড়ীর বাস ত' আছেই।

এখান হইতে ঘুমের পথে অগ্রসর হইলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আর একদিক

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও কলাবিৎ রকেনষ্টাইনের ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক বেলায়। তাঁহার ছাত্রেরা আসিয়া দারে সকাল হ'তে করিয়া বসিয়া থাকিত,—তিনি কখন্ উঠিবেন সেই প্রতীক্ষায়। একটি নূতন ছাত্র আসিয়া প্রথম দিন ব্যাপারটা বুঝিল। দ্বিতীয় দিন আসিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া পিয়ানোর চাবি খুলিয়া যাহা-খুসী বাজাইয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরেই চোখ মুছিতে মুছিতে প্রিন্স-গাউন পরিয়া রকেনষ্টাইন নামিয়া আসিলেন—'উঁহুঁ, হচ্ছে না, হচ্ছে না' বলিয়া তিনি পিয়ানোতে গিয়া বসিলেন।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বৈকুণ্ঠ মরিয়াছে। বেচারা বৈকুণ্ঠ!

তা মরিয়া সে মন্দ কিছু করে নাই। মরিবার বয়সও তাহার হইয়াছিল। জামাতৃস্থানী চাঁপার বিবাহের জন্য ছিল তাহার ভাবনা, তাহার বিবাহও সে আগেই করিয়াছে, চাঁপার জন্য আর চিন্তা নাই। জামাই শ্রীহর্ষের কল্যাণে তিনকড়িও হাতে-কলমে একটা কিছু করিয়েছে। তাহার জন্যও সে নিশ্চিন্ত। সুতরাং মরিয়াছে সে খুব নিশ্চিন্ত হইয়াই। তবে চাঁপার দুঃখ—তাকা তাহার গিয়াছিলেন শ্রীরামপুরে তাহার স্বামীর কাছে এবং সেইখান হইতে ফিরিয়াই তাহার অসুখের সূত্রপাত। এক রকম ধরিতে গেলে ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ। শ্রীহর্ষকে ফাঁকি দিয়া টাকা লইয়া যে লোকটা পলায়ন করিল বৈকুণ্ঠ তাহাকে ধরিতে পারেন নাই, এই দুঃখ তিনি মরিবার আগের দিন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। চাঁপার মন হইতে বৈকুণ্ঠের মৃত্যু সম্বন্ধে এই ধারণা কিছুতেই যেন ঘুচিতে চাহিতেছিল না। এমন কি, এই লইয়া বৈকুণ্ঠর শ্রাদ্ধের আগে স্বামীর সঙ্গে তাহার তুমুল একটা ঝগড়া পর্য্যন্ত হইয়া গেছে।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হাঁগা, শ্রাদ্ধের কি হবে বল দেখি? কিছু খরচ ত আছে।

শ্রীহর্ষ বিরক্ত হইয়া জবাব দিয়াছিল, সে সব কথা আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, আমার কিছু নেই।

চাঁপা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবার পর বলিয়াছিল, আমার গয়নার বাক্সটা সেদিন কোথায় রেখেছো, দাও, তাই দিয়েই আমি কাকাবাবুর শ্রাদ্ধ করব। আমাদের জন্য তিনি অনেক ক'রে গেছেন।

কথাটা শুনিবা মাত্র পাগলের মত শ্রীহর্ষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিল, সে কি আর এখনও আছে আমার কাছে? আমারই দেওয়া জিনিস, আমি বিক্রি করে' ফেলেছি।

কথাটা শুনিয়া চাঁপার মনের অবস্থা কি রকম যে হইয়াছিল তাহা একমাত্র সে-ই জানে। ডাকারের টাকা দিবার জন্য সে তাহার দাদা তিনকড়ির হাতে দিয়াছিল চাবির তোড়া, সেই চাবি সে তিনকড়ির হাত হইতে লইয়া বাক্সটা সেখান হইতে সরাইয়া কি যে করিয়াছে এতদিন তাহার সংবাদ লইতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিলেই শ্রীহর্ষ বলিয়াছে,—'আছে।' সেদিন কিন্তু তাহার মুখে এই সত্য কথাটা শুনিয়া চাঁপার মুখ দিয়া কিছুক্ষণের জন্য আর কথা বাহির হয় নাই।

তিনকড়ি তাহাদের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, বেস্ খেলা যে বড় ভীষণ জিনিস! ওই বাড়ীর মালিক শিবপদবাবুও বেস্ খেলেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন, আবার আপনিও দেখছি ওই করেই সর্ব্বস্বান্ত হবেন।

শ্রীহর্ষ বোধ হয় রাগ করিল। তিনকড়ির মুখের পানে কটমট করিয়া তাকাইয়া জবাব দিল, তোমাকে এ-সব কথা বলবার অধিকার কে দিল হে ছোকরা! যেমন করব, আমার নিজের জিনিস, আমি যা খুশী তাই করব, তাতে তোমাদের কি!

তিনকড়ি বলিল, আমাদের কিছু নয়, তবে কিনা ওই বোনটীর বিয়ে যখন দিয়েছি আপনার সঙ্গে, তখন—

কথাটা শ্রীহর্ষ তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, বিয়ে তোমার বোনের সঙ্গে আমার না হলেই ভাল হ'ত, বুঝলে তিনকড়ি। টাকা আমার বড় কম ছিল না, কিন্তু এই বিয়ের পরে কোন্ দিকে যে কি হ'লো, আমার অত অত টাকা একেবারে জলের মত খরচ হয়ে গেল, তা জান?

—সেটাও কি আমার বোনের দোষ?

শ্রীহর্ষ বলিল, তা দোষ বই কি! সেই একটা কথা আছে না! স্ত্রীভাগ্যে ধন। তার ভাগ্যে নেই ব'লেই ত' গেল।

এত দুঃখের দিনেও শ্রীহর্ষের কথা শুনিয়া তিনকড়ির হাসি পাইল। বলিল, টাকাগুলো দিয়ে আপনার খারাপ হয়ে গেছে।

—তা হয়ত হয়েছে, কিন্তু টাকা তোমাদের জন্যও আমি কম খরচ করিনি। এইত' এত এত টাকা খরচ করে' তোমার দোকান করে' দিলাম, আর এই সে দিন—গত শনিবার—তোমার একটু লজ্জা করে না তিনকড়ি, কথা বললেই বলতে হয়,—মাঠে যাবার আগে তোমার কাছে দুড়িটা টাকা চাইলাম, কই, দিতে ত' পারলে না! তোমরা আজ আবার কাকার শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা আমার কাছে চাইছ কোন্ লজ্জায়?

তিনকড়ি বলিল, টাকা সেদিন আমার কাছে ছিলনা, আমি এত করে' বললাম তবু আপনার বিশ্বাস হ'লো না? সত্যি বলছি, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে' বলছি—

—হাঁ হাঁ। থাক্ থাক্, পায়ে হাত দিতে হবে না। বলিয়া শ্রীহর্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঘটা করে' কাকার শ্রাদ্ধ করতে হয় বাড়ী বিক্রি করগে, দোকান তুলে দাওগে—যা খুশী করগে, আমি কিন্তু জানি নে, আমায় যেন তোমরা আর কিছু বলো না বাপু।

শ্রীহর্ষ চাঁপার মুখের পানে একবার তাকাইল। দেখিল, সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানেই থাকবে?

চাঁপা নীরব!

—কিগো, কথার জবাব দাও না!

চাঁপা মুখ তুলিয়া চাহিল। ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না, যাব না। তুমি যাও এখান থেকে।

শ্রীহর্ষ আর একটি কথাও বলিল না, পিছন ফিরিয়া মুহূর্তমাত্র সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বৈকুণ্ঠের শ্রাদ্ধও চুকিল। তিনকড়িই শ্রাদ্ধ করিল এবং করিল বেশ জমকালোই। খরচপত্রের জন্য চাঁপা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনকড়ি শেষ পর্য্যন্ত তাহার সে চিন্তা দূর করিয়াছে। কেমন করিয়া করিয়াছে প্রথমে তাহাকে সে কিছুই বলে নাই। বাড়ীও তাহাকে বিক্রি করিতে হয় নাই, দোকানটিও তাহার যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিতেছে, অথচ টাকা সে যে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল জানিবার জন্য চাঁপা সেদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা তুমি কোথায় পেলে দাদা, আমায় বল না, বলতে দোষ কি?

তিনকড়ি বলিল, আমার দোকানের অধ্যক্ষের কাছে নিয়েছি।

চাঁপা বলিল, তবে যে এত দিন আমায় বল নি?

তিনকড়ি হাসিয়া বলিল, ধার করতে বারণ করেছিলি কিনা, তাই বলিনি। তবে এ ধারের জন্য ভাবনা কিছু নেই। দোকান আমার যেমন চলছে এমনি যদি চলে ত' ছয়মাসের মধ্যে ধার আমি শোধ করে ফেলব।

শুনিয়া চাঁপা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বামীর কথা ভাবিয়া কোন প্রকারেই সে স্বস্তি পাইতেছিল না। শ্রীহর্ষ সেই যে এবাড়ী হইতে চলিয়া গেছে তাহার পর আর একটি দিনের জন্যও এ পথ মাড়ায় নাই। শ্রাদ্ধের আগের দিন তিনকড়ি নিজে কতবার যে তাহার কাছে গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, শ্রাদ্ধের দিন দুবার তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছে, ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

যাইবে না যাইবে না ভাবিয়াও শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যায় চাঁপা নিজেও একবার গিয়াছিল। গিয়া দেখে, স্বামী তাহার একা নাই, চপলা-ঠাকুরুণ মালতীকে কাছে বসাইয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

চাঁপাকে দেখিয়াই শ্রীহর্ষ বুঝিয়াছিল সে কেন আসিয়াছে। কিছুই তাহাকে বলিতে হইল না। শ্রীহর্ষ নিজেই বলিল, তুমি আবার কেন অনর্থক কষ্ট করে' এলে চাঁপা, যাবার হ'লে আমি তোমার দাদার কথাতেই যেতাম। কিন্তু যেতে আমি কিছুতেই পারব না।

রাগে দুঃখে চাঁপার গলা দিয়া কথা যেন আর বাহির হইতে চাহিতেছিল না, তবু সে অতি কষ্টে বলিল, কেন যাবে না শুনি?

কথাটার জবাব দিল চপলা-ঠাকুরুণ। বলিল, তা ওর কাছে আর শুনে কাজ নেই মা, শোনো, আমার কাছে শোনো!

দৃঢ়কণ্ঠে চাঁপা বলিয়া উঠিল, না, আপনার কাছে শুনতে আমি চাই না।

চপলা-ঠাকরুণও রাগিয়া উঠিল। বলিল, বটে! বেশ তবে যাও তোমার খোসামী তুমি কেমন করে' নিয়ে যাবে যাও বাছা! হাঁ, তা ত' বলবেই বাছা, আমি কে কোথাকার কে, আমার কথা তুমি শুনবে কেন মা!

চাঁপা আবার একবার জিজ্ঞাসা করিল, যাবে না, তুমি কিছুতেই যাবে না?

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহর্ষ বলিল, না।

—তোমায় কে কি বলেছে যে তোমার রাগ হ'লো? আমাদের এই বিপদের দিনে···দাদা একামানুষ·····বলিতে বলিতে চাঁপা কর্ কর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিজেকে চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে কোন প্রকারেই আর সম্ভব হইল না।

শ্রীহর্ষ বলিল, কেন বলবে না? তুমি নিজেই ত' আমায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছ!

সর্বনাশ! সেইজন্য তাহার এত রাগ! চাঁপার ইচ্ছা করিতেছিল সে বলে, যে, তাহার জন্য তাহার দাদার কি দোষ! এ কাজ ত' তাহার দাদার! একজনের পাপে আর একজনের শাস্তি কেন হইবে? আর দোষ যদি হইয়াই থাকে ত' সে না হয় তাহার দুটি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, এ লজ্জা হইতে তাহাকে অন্ততঃ এই একটি দিনের জন্যও বাঁচাও! কিন্তু ওই চপলা ঠাকরুণের কাছে কোনও কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। ইচ্ছা করিল, ছুটিয়া গিয়া তাহার পা দুটা সে জড়াইয়া ধরে, কিম্বা জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া রাগ ভাঙাইয়া এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ওই মেয়েটার কাছে কোনও কিছুই সে করিতে পারিল না, চপলা ঠাকরুণের উপর নিষ্ফল আক্রোশে সে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ সেইখানে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর চাঁপা কি যে ভাবিল কে জানে, ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। এবং বহুদিন পরে নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিয়া অপরিচিতা অতিথিনীর মত জানালার কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যাপার দেখিয়া ও-ঘর হইতে চপলা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিল, কিগো তা হ'লে কি তুমিও যাবে না, না কি?

পাশের ঘর হইতে জবাব আসিল,—না।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে তেমন করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। বাড়ীতে এখনও অনেকগুলি নিমন্ত্রিত অতিথি অভুক্ত রহিয়াছে, রান্নাবান্না দেখাশোনা করিবার জন্য ভাড়াটে লোকজন যদিও আসিয়াছে, তবু আপনার জন বলিতে সেখানে কেহই নাই, দাদা একা আর কতদিক সামলাইবে, অথচ এদিকে তাহার স্বামীকে লইয়া এই একটা অপ্রীতিকর বিশ্রী হাঙ্গামা!

চাঁপা হয়ত ভাবিয়াছিল, শ্রীহর্ষ অন্তত একবারের জন্যও এ-ঘরে উঁকিয়া আসিবে এবং উঁকিয়া আসিলেই তাহাকে সে যেমন করিয়াই হোক্ ওখানে লইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পরও শ্রীহর্ষ যখন আসিল না, তখন সে কি আর করে, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। স্বামীর প্রতি ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত অন্তঃকরণ তখন তাহার ভরিয়া গেছে। ছি ছি, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর কাছে কোথায় সে তাহার স্বামীর জন্য গৌরব অনুভব করিবে, তাহা না হইয়া হইল ঠিক তাহার বিপরীত! আজ তাহার বাবার শ্রাদ্ধে তাহার স্বামীরই উচিত ছিল সব-কিছু দেখা-শোনা করা। টাকা ত' সে দিলই না, উল্টা তাহারও গহনাগাঁটি, সঞ্চিত যৎসামান্য অর্থ—সবই বিক্রি করিয়া দিয়া অনর্থক একটা রাগের ভাণ করিয়া বসিয়া রহিল।

থাক্ বসিয়া, তাহার আর এখানে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না।

চাঁপাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া চপলা-ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিল, কিগো, চললে নাকি?

চাঁপা কোনও জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কথাটার জবাব না পাইয়া চপলা-ঠাকরুণ আবার বলিল, সোমত্ত মেয়ে, একা একা এমন করে' যাওয়া-আসা করা ত' ভাল নয় বাছা! কল্‌কেতা শহর, কোন্‌দিন্ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড না বাধিয়ে আর ছাড়বে না দেখছি।

চাঁপা তাহার কথাগুলা শুনিতে নিশ্চয়ই পাইল, অন্য সময় হইলে ইহার জবাবও হয়ত' সে দিতে পারিত, কিন্তু এখন আর তাহার সে স্পৃহা নাই, একাকিনী যেমন আসিয়াছিল, আবার তেমনি একাই সে ফটক পার হইয়া রাস্তার একপাশ দিয়া মুখ ঢাকিয়া তাহাদের সেই সরু গলিটার ভিতর গিয়া ঢুকিল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছট্টুলাল

চতুষ্পাঠী

কীর্ত্তি-কাহিনী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সেমেরেমিস্

আরবের দক্ষিণদিকে, আজকাল আমরা যে-রাজ্যটাকে মেসোপটেমিয়া বলি, সেইখানে প্রাচীন জগতের দু'টো খুব বড় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। একটির নাম হ'ল ব্যাবিলন, আর একটির নাম হ'ল আসিরিয়া।

তোমরা যদি বাইবেল পড়ে থাক, তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছ যে, জল-প্লাবনের পর নোয়া তাঁর নৌকা থেকে নেমে পূর্ব্বদিকে এসে একটা সমতল ভূমি দেখে সেইখানে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। এই নোয়ার বংশে নিমরড বলে একজন বিখ্যাত শিকারী জন্মগ্রহণ করেন।

সেই সময় লোকে সাধারণত শীকার করে পশু-মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। নিমরডের তীর ছোঁড়ার খ্যাতি শিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা সবাই মিলে একদিন নিমরডের কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে, তুমি হও আমাদের দলপতি, আমাদের রাজা। দুর্গম বনের পথে মৃত্যুকে শীকার করতে আমরা যাব তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

নিমরড তাদের এই বন্যতাশীকারে সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু রাজা হলে, তাঁর রাজধানী চাই তো? ইউফ্রেতিস্ নদীর তীরে, যেখানে প্রাচীনতম যুগের ব্যাবেলের টাওয়ার ছিল, সেইখানে নিমরড তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজধানীর নাম হল ব্যাবিলন—এবং তাঁর রাজ্যে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের নাম হল চাল্‌ডিয়ান্। ব্যাবিলন শহর বসবার আগে সেই জায়গাটাকে চাল্‌ডিয়া বলত এবং সেখানকার লোকদের সেইজন্যে বলত—চাল্‌ডিয়ান্।

এই চাল্‌ডিয়ান্‌দের সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আজ পর্য্যন্ত কিছু জানতে পারিনি। তবে একথা ঠিক যে, এঁদের কাছ থেকে য়ুরোপীয় লোকেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্ঞান পেয়েছিল। সেই প্রাচীনকালে এঁরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক আবিষ্কার করেছিলেন।

এঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মেষ-পালক ছিলেন। উদার আকাশের তলায় তাঁদের দিন কেটে যেত। রাত্রে ঐশ্বর্যশালীন জীবনে সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের নক্ষত্র দেখে এঁদের অন্তরে বিস্ময় জাগে। সেই বিস্ময় থেকে এল আকাশকে জানবার প্রবৃত্তি। বহু দিন ধরে, আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করে, তাঁরা এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা সমুদ্রের মধ্যে নক্ষত্র দেখে দিঙ্-নির্ণয় করতে পারতেন।

আকাশে যে-সাতটা গ্রহ সব চেয়ে বড় দেখায়—চাঁদ আর সূর্য্য—স্বভাবতই সেই দুটো তাঁদের মনকে বেশী করে টেনেছিল। তাদের গতি-বিধি দিনের পর দিন তাঁরা লক্ষ্য করতেন। চাঁদ আর সূর্য্য, আর আকাশ-ভরা সেই নক্ষত্র, সবাই হল তাঁদের দেবতা। তাদেরই পূজা সব দেশে সর্ব্ব প্রথমে হয়, অন্ধকার দূর করে যে আনে আলো—সেই মহাদ্যুতি সূর্য্যের পূজা হয় সব আগে। এই চাল্‌ডিয়ানরাও সূর্য্য-দেবতার জন্য এক বিরাট মন্দির তৈরী করেছিলেন।

নিমরড্ যখন ব্যাবিলন শহর তৈরী করছিলেন, সেই সময় আস্‌সুর বলে আর একজন লোক তার একটু দূরে টাইগ্রিস্ নদীর তীরে আর একটি শহর গড়ে তুলছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম দিলেন নিনেভা এবং রাজত্বের নাম হল, আসিরিয়া। দুই নদীর তীরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজত্ব মাথা তুলে উঠল।

নিমরডের মৃত্যুর পর আস্‌সুর ব্যাবিলন অধিকার করে নেন এবং দেখতে দেখতে আসিরিয়ার সৈন্যরা সিরিয়া, এশিয়া মাইনরের সবখানি জয় করে নিল। আরবরা পর্য্যন্ত আসিরিয়ার বশ্যতা শীকার করল। এই রাজ্য-জয় বিস্তার লাভ করে আস্‌সুরের ছেলের আমলে।

একদিন তরুণ রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেন একটি অতি অল্প বয়সের সৈনিক শত্রুর দুর্গপ্রাকারের দিকে অসীম বীরত্বে তাঁর সৈন্যদের পরিচালনা করে নিয়ে চলেছে। সেই সৈনিকের বীরত্ব দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কি বিস্ময়ের ব্যাপার! লোহার বর্ম্ম খুলে

কেলতেই দেখা গেল, সৈনিক একজন নারী। তাঁর স্বামী যুদ্ধে এসেছেন, সেই জন্যে তিনিও এই পুরুষের বর্ম্ম পরিধান করে স্বামীর সঙ্গে রণক্ষেত্রে এসেছেন। রাজা, রাজসভাসদ্ সকলেই মুগ্ধ!

এই নারীটির নাম সেমিরেমিস্।

দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে সেমিরেমিসের স্বামী শত্রুর হাতে নিহত হন। সেমিরেমিসকে স্বয়ং আসিরিয়ার রাজা বিবাহ করে তাঁর সিংহাসনের পাশে বসালেন।

বহুদিন থেকে সেমিরেমিস্-এর মনে এক প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল—তিনি সম্রাজ্ঞী হবেন, তাঁর অঙ্গুলীহেলনে হাজার হাজার লোক চলবে ফিরবে। তিনি হবেন একা একেশ্বরী। রাণী হওয়াতে তাঁর এই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা শতগুণে বেড়ে উঠল। শুধু রাজার পাশে পুতুলের মত রাণী সেজে বসে থেকে কি লাভ? সিংহাসনের পাশেই যখন আসতে পারলেন, তখন সিংহাসনের উপরেই বা বসতে পারবেন না কেন? একা তিনি ঐ সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবেন।

সেমিরেমিস্ ছিলেন সুন্দরী, অসামান্যা সুন্দরী। রাজা ছিলেন তাঁর রূপমুগ্ধ। রাণী যা আবদার করতেন তাই-ই পেতেন। অবসর বুঝে একদিন সেমিরেমিস্ বল্লেন, আমাকে পাঁচদিনের জন্য তোমার ঐ সিংহাসনে বসতে দাও।

রাজা তাতেই রাজী হলেন।

রাজ-সভাসদ্, সেনানায়ক সকলকে ডেকে রাজা আদেশ করলেন, পাঁচদিনের জন্য রাণীর আদেশমত এই রাজ্য পরিচালিত হবে। পাঁচদিনের জন্য রাণীর প্রত্যেক কথা আদেশহিসাবে তারা মানতে বাধ্য।

পাঁচদিন পরে।

ছ'দিনের দিন পাশাপাশি দুটো সিংহাসনের বদলে একটা সিংহাসন রইল রাণীর আলাদা সিংহাসন নামিয়ে নেওয়া হল। কারণ, ছ'দিনের দিন যথারীতি সেমিরেমিস্ আসিরিয়ার রাজসিংহাসনে আসীন হলেন। হতভাগ্য রাজা পঞ্চম রাত্রে অন্ধকারে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। সে গুপ্তঘাতককে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং সেমিরেমিস্।

একা সেই বিরাট রাজত্বের পরিচালক হয়ে সেমিরেমিসের অন্তরের বাসনা চরিতার্থ হল কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে নিশিদিন অনির্ব্বাণ এক জ্বালার সৃষ্টি হল। সদাসর্ব্বদাই শূন্যে তাঁর নিহত স্বামীর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ ভেসে ওঠে। রাত্রে চোখ বুঁজলেও মনের অন্ধকারে জলে-ভাসা রক্তজবার মত সেই মুখ ভেসে চলে। জগতে অতুল শক্তির অধিকারিণী হয়ে, সেমিরেমিস্ আপনার মনের সেই অহর্নিশ নিদারুণ অশান্তির তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে যাবার মত হলেন। শেষে তিনি স্থির করলেন, নির্ব্বাসায় তিনি পরিশ্রম করবেন, এই ব্যাবিলন শহরকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নগরী করে গড়ে তুলবেন। এই সুন্দর কাজের মধ্যে তিনি মনকে ডুবিয়ে দেবেন।

দেশ দেশান্তর থেকে হাজার হাজার মজুর নিয়ে এলেন—বড় বড় কারিগরদের ডেকে পাঠালেন। প্রথমেই হাত দিলেন, সূর্য্য-দেবতার মন্দিরের দিকে। আট-তালা উঁচু হল মন্দির, প্রাচীন জগতের স্থপতি-বিদ্যার এক বিস্ময়! হে সূর্য্য-দেবতা অপরাধ ক্ষমা কর।

ব্যাবিলন শহরের চারদিকে নিম্নরূপ এক বিরাট পাঁচিল তৈরী করবার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেমিরেমিস্ সেই দিকে দৃষ্টি দিলেন। সেই শহরকে ঘিরে এক বিরাট পাঁচিল তৈরী হল। পাঁচিলটা এতখানি চওড়া ছিল যে, তিনটে রথ পাশাপাশি তার উপর দিয়ে ছুটে চলে যেতে পারত। তারপর আর এক অদ্ভুত খেয়াল তাঁর মনে এল! শূন্যে এক বিরাট বাগান গড়ে তুলতে হবে। বিরাট থামের ওপর তিনি শূন্যে বিশাল এক উদ্যান তৈরী করলেন—সেটা থেকে সিঁড়ি বেয়ে সেই উদ্যানে যেতে হত। সেখানকার গাছপালার সঙ্গে এই পৃথিবীর কোন যোগ ছিল না। সেই উদ্যানেই ছিল কৃত্রিম নদী, তারই জল মূলে মূলে পরিবেশিত হত। এই উদ্যানই হল জগতের সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান।

শূন্য-উদ্যানে ফুল ফুটে উঠল, তবু রাণী সেমিরেমিসের শূন্য মনে শান্তি এল না। সিংহাসন নয়, রাজত্ব নয়, শুধু কাজ, কাজ।

ইউফ্রেতিস্ নদীর উপর দিয়ে এক বিরাট সেতু তৈরী করালেন। রাজ্যের দূর সীমান্তের নগরে পর্য্যন্ত পাথর দিয়ে মন্দির গড়ে তোলালেন। শেষে স্থির করলেন, তিনি আবার যুদ্ধ করবেন, রাজ্যের সীমানা বাড়াবার জন্য নয়, শুধু সেই সংগ্রামের মধ্যে নিজের মনকে ডুবিয়ে রাখবার জন্য।

সৈন্য নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরুলেন। তাঁর বীর-বাহিনীর সামনে শত্রুরা পরাজিত হতে লাগল। এই সময় তিনি শুনলেন যে, তাঁর রাজধানীতে তাঁর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি রাজধানীতে ফিরে এসে জানতে পারলেন যে, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর বদলে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় এগিয়ে আসছে। তিনি নিজেই সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করলেন। বাইরে বাস্ত থেকে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টার ভুল তিনি বুঝতে পারলেন।

যেখানে তাঁর স্বামীর কবর ছিল, সেইখানে গিয়ে তিনি ভিখারিণীর মত দিন-যাপন করতে লাগলেন। তিনি আর লোক-সমাজেই আসতেন না। সেইখানেই একদিন রাজার লোকে এসে দেখে যে, নিহত রাজার কবরের উপর সেমিরেমিস্-এর মৃত দেহ পড়ে আছে।

সেই কবরের পাশে তাঁর পুত্র আর একটি কবর তৈরী করালেন এবং যথারীতি সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হল। সংসার ত্যাগ করবার পূর্বে সেমিরেমিস্ স্বহস্তে একটা লেখা লিখে তাঁর পুত্রকে দিয়ে আসেন—মৃত্যুর পর সেই কটা অক্ষর যেন তাঁর কবরের উপর লেখা থাকে। মাতার বাসনা অনুযায়ী পুত্র এই ক'টি অক্ষর তাঁর কবরের উপর খোদিত করে রাখেন।

—"প্রকৃতি আমাকে নারীর দেহ দিয়েছিল। কিন্তু আমি বীর্যবলে পুরুষদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠদের সমকক্ষ হয়েছিলাম। আমার পূর্বে আসিরিয়ার কোন লোক সাগর দেখে নি। আমি তাদের চার চারটি সাগরের ঢেউ-এ দুলিয়েছি। আমার আগে কোনও নাবিক সে সমুদ্রে পাড়ি দেয় নি।"

ঘোড়া

ছেলেবেলায় স্কুলে ঘোড়া সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে,—অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু, ঘাস খায়, গাড়ী টানে ইত্যাদি। সে-সময় মনে আছে, গাড়ী টানার চেয়ে কোনও বড় কাজ করা ঘোড়ার দ্বারা সম্ভব কিনা, তা মনে জাগত না। আজ বড় হয়ে দেখছি, ছেলেবেলাকার প্রবন্ধে সামান্য গাড়ী-টানা চতুষ্পদ জন্তু বলে যাকে অবজ্ঞা করে এসেছি, আমাদের এই বিরাট মানব-সভ্যতার পিছনে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অসামান্য জীবটি। এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ বনের পশু থেকে বিশেষ কিছু গর্ব করতে পারত না। বনের পশুর মত বনে বনেই সে ঘুরে বেড়াত। সে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ সভ্য হতে লাগল। কত জ্ঞানী, কত ঋষি, কত বীর, কত কবি, কত রাজা, কত বৈজ্ঞানিক এসে মানুষের এই বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলল। এই বিরাট সভ্যতার ইতিহাসের দিকে যদি কিছুক্ষণ ভাল করে চেয়ে দেখ, তাহলে দেখবে, তার মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্ত চলেছে একটি জীব, কি অপূর্ব তার চলার ভঙ্গী, তার পিঠে করে সে নিয়ে চলেছে এই বিরাট মানব সভ্যতাকে; তারই ঘুরের শব্দ শুনবে বেজে উঠছে যুগে যুগে। হিন্দুরা কল্পনা করেছেন যে, সাত-ঘোড়ার রথ চালিয়ে সূর্যদেব আকাশ দিয়ে যাত্রা করেন, পৃথিবী আলোতে ভরে ওঠে; সূর্যদেব তা করেন কিনা, তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়, কিন্তু সাত-ঘোড়ার রথে চড়ে যে মানুষের সভ্যতার সূর্য জেগে উঠেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যখন রেল ছিল না, উড়োজাহাজ ছিল না, তখন এই ঘোড়ার চারিখানি পা-কে আশ্রয় করেই মানুষ এগিয়ে চলেছিল—তার অসাধ্য সাধন করবার কাজে একমাত্র সঙ্গী ছিল, ঘোড়া। মনে রেখ রেলগাড়ী হয়েছে মাত্র একশ' বছরের কিছু দিন আগে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে ষ্টকটন থেকে ডারলিংটন পর্যন্ত রেল-লাইন পাতা হয়। তার আগে এই চতুষ্পদ জন্তুটিই ছিল মানুষের সব চেয়ে বড় সহায়, সম্পদ, বন্ধু। সেই জন্য ইংরেজীতে ঘোড়ার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে, men rode before they wrote. মানুষ যখন লিখতে পড়তে শিখেনি তখন থেকে আজ এই বিংশ-শতাব্দী পর্যন্ত এই চতুষ্পদ জন্তুটি মানুষের সঙ্গে থেকে, তার শস্যক্ষেত্রে, তার যুদ্ধক্ষেত্রে, তার দূর দুর্গম পথে, তার ব্যবসায়, বাণিজ্যে, বিলাসে শিল্পে সকল ব্যাপারে, তার সহায় এবং সম্পদ হয়ে এসেছে। প্রাচীন কালের লোকেরা, তাই দেখতে পাই, নানা ভাবে অশ্বকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। মিশর, আসিরিয়া, গ্রীস, পারস্য, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ভাস্কর্যে কত অনবদ্য ভাবে এই প্রাণীটিকে পাথরে আঁকা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

হাজার হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম বন্যলোকেরাও নিজেদের খেয়ালে এই প্রাণীটির নানারকম চিত্র পাথরের গায়ে আঁকত। এবং সেই সব চিত্রে চলন্ত ঘোড়ার গতি এবং ভঙ্গী এত নিখুঁত ভাবে আঁকা আছে, আজকালকার চিত্রকররাও তা দেখে বিস্মিত হন। কতকগুলো চলন্ত ঘোড়ার ছবি ছিল, তাদের ভঙ্গী এমন অসম্ভব রকমের লাগত যে, য়ুরোপীয় চিত্রকররা সেগুলি অসভ্য আদিম মানুষের আঁকার ভুল হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু সিনেমা আসার পর দেখা গেল কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! খুব দ্রুত চলন্ত ঘোড়ার ঠিক অবিকল ঐরকমই ভঙ্গী হয়। মানুষের চোখে যা ধরে পড়ে নি, ক্যামেরার সূক্ষ্ম চোখে তাই ধরা পড়ল। কতখানি অন্তরঙ্গ ভাবে সেই সব আদিম মানুষেরা একদিন ঘোড়াকে দেখেছিল! কোনও ভাষা তার ছিল না। হয়ত ঐ এক একটি ঘোড়ার চিত্রের মধ্য দিয়ে সেই অখ্যাত যুগের এক একটা বড় ঘটনার ইতিহাস লেখা আছে। এমনিতর কোন গল্প হতে তাদের মধ্যে আছে,

প্রাচীন গ্রীসে রথ-টানা ঘোড়াদের কল-বাবাবে হইতেছে।

"১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, সাইবেরিয়ার ভমস্ক্ গ্রাম থেকে দুটি রাজদণ্ডে দণ্ডিত পরিবার লাটভিয়ার এসে পৌছেছে। এই তিন হাজার মাইল পথ তারা একটা স্লেজে ঘোড়ায়-টানা গাড়ী চড়ে এসেছিল।"

যেখানে নিশ্বাসের জলকণা বরফে পরিণত হয়ে যায়, সেইখান থেকে কয়েকটা ঘোড়া তিনহাজার মাইল পথ দুটি অসহায় পরিবারকে নিরাপদে টেনে নিয়ে এসেছে। অমনিতর হয়ত অনেক কাহিনী সেই সব চিত্রের আড়ালে অঙ্কিত আছে।

প্রথম যে আদিম মানুষ ঘোড়ায় চড়েছিল, সে ঘোড়ার মুখে লোহার 'নাল' দিয়ে লাগাম ধরে নি, তার পায়েও 'নাল' বসায় নি। কারণ ধাতুর ব্যবহার সে জানত না। তখন খুব সম্ভবত তাকে বিপদই হতে হত। তারপর সে শিখল লোহার ব্যবহার। ঘোড়ার মুখে লাগাল 'লাগাম', পায়ে দিল 'নাল'। সেইদিন থেকে সুরু হল তার জয়যাত্রা। এই বিশাল পৃথিবী জুড়ে, দিকে দিকে জেগে উঠল নানান্ মানুষ, নানান্ জাতি, নানান্ সভ্যতা।

কিন্তু পৃথিবীর ঘোড়ার দিকের ইতিহাসে আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই। সেদিন সে শুধু মানুষের বাহন হয় নি। সেদিন সে মানুষের খাদ্যও ছিল। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের যে সব স্মৃতিচিহ্ন মাটী খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিকেরা স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন যে, য়ুরোপ এবং এশিয়া জুড়ে সেই যুগের মাটীর সঙ্গে হাজার হাজার ঘোড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি যে রান্না করে খাওয়া হত তার প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন।

এই সমস্ত হাড় পাওয়ার ফলে, ঘোড়ার আদি ইতিহাস জানবার পক্ষে মানুষের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

ঘোড়ার আদি বংশধরেরা আজকের ঘোড়ার মত এত বড় ছিল না। আজ পর্য্যন্ত সব চেয়ে আদিম যে ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, বৈজ্ঞানিকরা তার নাম দিয়েছেন, হাই-রেকোথিরিয়াম্। তখন তার দেহের আয়তন একটা ছাগলের মত মাত্র। পায়ে তখনও খুর হয় নি। তার জায়গায় ছিল চারটে করে আঙুল। ভালুকের মত সমস্ত পায়ের চেটোর উপর ভর দিয়ে তারা চলত। তখন তারা জলা-জমিতে ঘুরে বেড়াত। জলা-জমি ছেড়ে যখন তারা কঠিন ভূমিতে আসা যাওয়া আরম্ভ করলো, তখন থেকে তাদের পায়ের গঠন বদলাতে আরম্ভ করল।

রেড ইণ্ডিয়ান্ এবং আরবের মত ঘোড়-সওয়ার জগতে আর নেই। বাল্যকাল থেকে এঁদের ঘোড়া চালানোর আশ্চর্য্য ক্ষমতা হয়ত তোমরা দেখে থাকবে। আর কোনও জাতির এরকম ক্ষমতা নেই। এ থেকে এই কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, আরব এবং রেড ইণ্ডিয়ান্দের দেশেই বোধ হয় প্রথম ঘোড়ার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, আরবরা উটকে ছেড়ে ঘোড়ায় চড়তে আরম্ভ করেছে, মাত্র দু'হাজার বছর আগে; আর রেড ইণ্ডিয়ানদের বেলায় দেখতে পাই, যে, কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করলেন তখন সমস্ত আমেরিকার মধ্যে একটিও ঘোড়া ছিল না। অথচ আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপার

হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমেরিকাই হল ঘোড়ার আদি জন্মস্থান।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত হল যে, সমগ্র অশ্ব-পরিবার অর্থাৎ ঘোড়া, জেব্রা, গাধা প্রভৃতির আদি জন্মস্থান হল আমেরিকা। সেই প্রাচীন যুগে, আলাস্কা এবং সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে স্থলপথে এশিয়া এবং আমেরিকা সংযুক্ত ছিল। এই পথ দিয়ে প্রথম ঘোড়া আমেরিকা থেকে এশিয়ায় আসে। কিন্তু যে জায়গা হল ঘোড়ার আদি জন্মস্থান, সেখান থেকে একেবারে তার বংশ লোপ হয়ে গেল কি করে?

আমেরিকার মাটী খুঁড়ে যত রকমের এবং সংখ্যায় যত বেশী ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, জগতে আর কোথাও সে রকম পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকরা এই বিস্ময়কর তিরোধানের দুটি হেতু বার করেছেন। একটি হল সেই সময় মাংসাশী "পুমা" নামক জন্তুর উদ্ভব এবং আর একটি হল, মড়ক। কিন্তু যে ভাবে আবার আমেরিকায় ঘোড়া দেখা দিল, তার কাহিনী সত্যই অপূর্ব্ব।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর, স্পেন দেশ থেকে যখন সৈন্যরা এসে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় সেই সব অশ্বারোহী সৈন্যদের দেখে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা প্রথম প্রথম মনে ক'রত, ঘোড়া-শুদ্ধ মানুষটি একটা আস্ত নতুন রকমের কোন জীব। দেবতা ছাড়া, এমন অদ্ভুত, আর অপূর্ব্ব কি হতে পারে! ক্রমশ এই বিস্ময় ভক্তিতে পরিণত হ'ল। এর আগে তারা কখনও ঘোড়া দেখে নি। তারা ধরে নিল যে, এর উপরে যে থাকে, সেও যেমন দেবতা, এও ঠিক তেমনি কিছু হবে।

সেই যুগে যে-সব লোক উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য আসত, তাদের মধ্যে একজন, অনুস্থ মনে করে একটি ঘোড়াকে পেরুভিয়ার জঙ্গলে ফেলে রেখে যায়। একদল আদিম অধিবাসী সেই পরিত্যক্ত দেবতাটিকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে তাঁকে তাদের মন্দিরে নিয়ে গেল এবং সেখানে ফুল এবং ভাল-ভাল বুনো মুরগীর মাংস পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ দিতে লাগল। কিন্তু যে-দেবতার খাদ্য ছোলা, ঘাস, দুর্ব্বি, তিনি ফুল বা মুরগী নিয়ে কি করবেন? শেষকালে অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে, একদিন দেবতাটি মাটীতে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। অনুরক্ত ভক্তরা, দেবতার একটি মূর্ত্তি সেখানে তৈরী করে রাখলেন। পরে যখন মিশনারীরা দক্ষিণ

মাতা-পুত্র।

আমেরিকায় প্রচারের জন্য যান, তখন এই মূর্ত্তির সাক্ষাৎ তাঁরা পান।

আমেরিকার বুয়েনো আয়ার্স শহরে প্রথম যে য়ুরোপীয় দল ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে অবতরণ করেন, তাঁরাই সেই সময় কতকগুলি ঘোড়া সেখানে ফেলে যান। তাঁরা সেখান থেকে বসবাস তুলে নিয়ে অন্যত্র গেলেন বটে, কিন্তু যাদের ফেলে রেখে গেলেন, তারা হাজার হাজার বছর পরে স্বদেশের অরণ্যে ফিরে এসে, সেইখানেই আবার পরিপুষ্ট হতে লাগল। এই ভাবে আমেরিকায় আবার ঘোড়া দেখা দিল।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

গৌড়ে মাৎস্য ন্যায়

বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ তাহার উত্তর ভাগ এককালে যে গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত, সে কথা বলিয়াছি। সেই জন্য তাহার রাজাকে গৌড়েশ্বর বলিত। গৌড় নামে একটি নগর বঙ্গদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল, মালদহ জেলায় এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ আছে। কিন্তু সেই গৌড় নগর কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কোন্ সময় হইতে তাহা বিখ্যাত হইয়াছিল, পরে সে কথা বলিব। সে যাহা হউক, গৌড় দেশের নামেই অনেক দিন হইতে তাহার রাজাকে গৌড়েশ্বর বলা হইত। এই গৌড় বা বঙ্গদেশে কোন একটি রাজবংশের বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করার কথা জানা যায় না। এক এক সময়ে এক এক জন পরাক্রান্ত রাজা গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশের লোকেরা আর সেরূপ প্রবল হইতে পারেন নাই। সেই জন্য বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের রাজত্বের এবং অনেক বিদেশীয় রাজার আক্রমণের কথা জানা গিয়া থাকে। এইরূপে গৌড়দেশে বা বাঙ্গালায় অনেক দিন হইতে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতাকে মাৎস্য ন্যায় বলা হইয়া থাকে।

"মাৎস্য ন্যায়"—অর্থাৎ মাছের রাজ্যের আইন। তথায় বড় মাছ ছোট মাছকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। আরও বড় মাছ আবার ঐ বড় মাছকে গ্রাস করে। সাধারণ কথায় আমরা বলি—"জোর যার, মুলুক তার" নীতি। দেশের এই অবস্থাকেই ভাল কথায় বলে অরাজকতা।

দেশের এহেন দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীরা কিন্তু একটা অসাধারণ কার্য্য করিয়া ফেলিল। এতকাল যিনি যেখানে রাজা হইতেছিলেন, দেশের লোক তাঁহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইতেছিল, তাঁহাকেই খাজানা জোগাইতেছিল। কিন্তু ইহাতে নূতন নূতন রাজার আবির্ভাবও থামিতেছিল না, আর তাহাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিও থামিতেছিল না। এই সময় গোপাল নামে একজন বীরপুরুষ নানা বীরত্ব ও মহত্বের কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের মাতব্বরগণ সকলে মিলিয়া এই গোপালকে ধরিলেন। বলিলেন—"তোমাকে সমস্ত দেশের রাজা হইতে হইবে। আমরা আজ এ রাজা, কাল ও রাজা চাহি না। আমরা সকলে তোমাকেই রাজা বলিয়া মানিব,—অন্য কাহাকেও মানিব না।" গোপাল সম্মত হইয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অশান্তি, অবিচার, অত্যাচার যে দেশে আগুনের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই দেশে শান্তি ও সুবিচার ফিরিয়া আসিল। একতার অভাবে যে দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, সমস্ত দেশ এক হইয়া গোপালের পিছনে দাঁড়াইতেই সেই বাঙ্গালা আবার সোনার বাঙ্গালা হইতে চলিল। মিলিত বাঙ্গালার বাঙ্গালী রাজার বিক্রমে সমস্ত ভারত কাঁপিয়া উঠিল। গোপাল প্রথমে গৌড় বা বঙ্গদেশের রাজা হইয়া অবশেষে মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। গোপাল হইতে বাঙ্গালার বিখ্যাত রাজবংশ পালবংশের আরম্ভ। এই পালবংশ বাঙ্গালায় দীর্ঘ চারিশত বৎসর কাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছে।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল *

বাঙ্গালী মাতব্বরগণ নিজেদের ইচ্ছায় যাঁহাকে রাজা বলিয়া বাছিয়া লইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই গোপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বা উহার কাছাকাছি কোন বছরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার নিকট হইতে ধর্ম্মপাল বাঙ্গালা ও বিহার, সম্ভবতঃ এই দুই রাজ্যই পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতে দানপত্রখানা তাম্রের পাতে খুদিয়া লিখিয়া দিতেন। এই দানপত্রগুলিকে তাম্রশাসন বলে। ধর্ম্মপালের এই রকম একখানা দানপত্রে দেখা যায়, বিহারের পাটলিপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

* এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিকতা বলিয়াকথিত বাঙ্গালী মহাশয় দ্বারা পুনর্লিখিত।

বস্তুতঃ আদিশূরের পালরাজগণকে শুধু বাঙ্গালার রাজা বলা সঙ্গত নহে। তাঁহারা মিলিত বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা ছিলেন এবং বিহার ও উত্তর ভারতের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

মানচিত্রের দিকে চাহিয়া দেখ। এই সময় কান্যকুব্জ বা কনোজে ইন্দ্রায়ুধ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। আবার বর্ত্তমান রাজপুতানার ভিন্নমাল নামক নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় নাগভট নামক একজন রাজা প্রবল প্রতাপে রাজপুতানা ও মালব দেশ শাসন করিতেছিলেন। এই সময় বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপতিগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী প্রথমে ছিল নাসিক নগরে। পরে উহা মান্যখেত নগরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বভারতের রাজা ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের (নামান্তর পরবল) কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

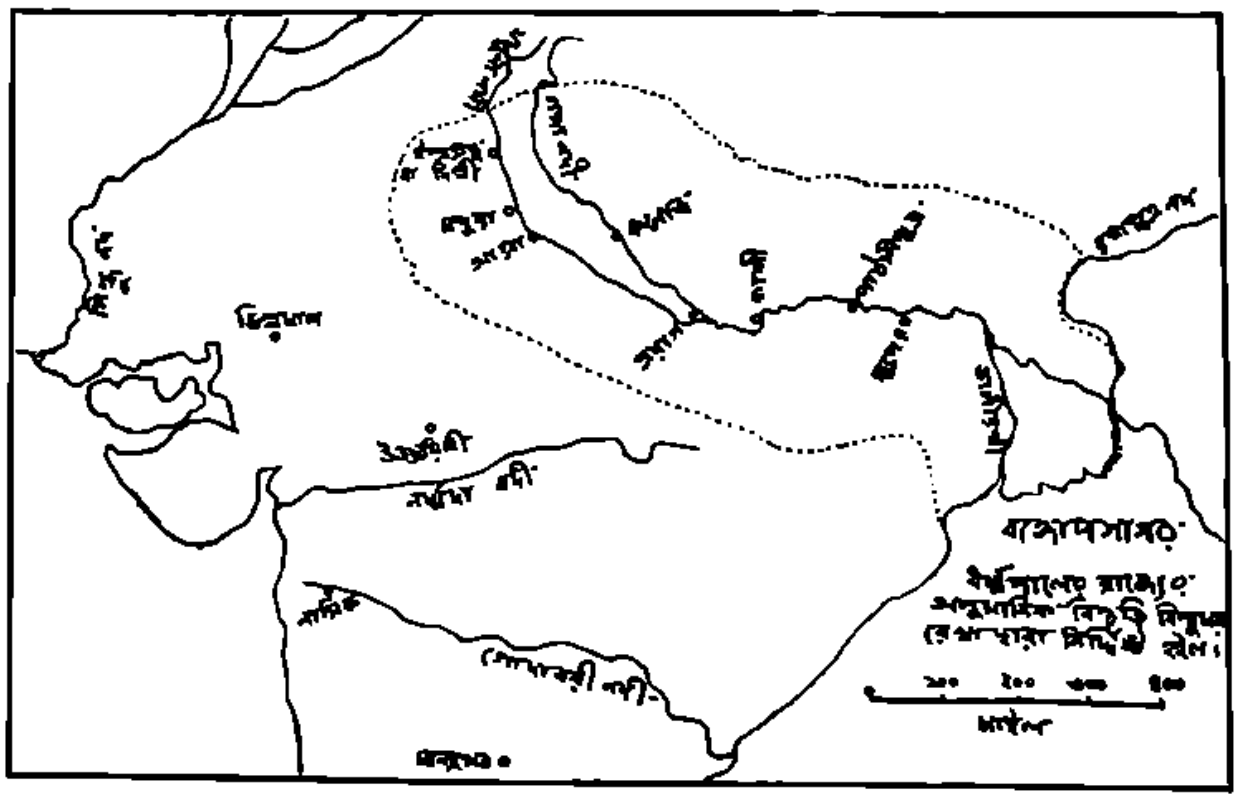

মহাবীর ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া প্রথমে নিজের বাঙ্গালা ও বিহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি বহু সৈন্য লইয়া বিদেশ জয় করিতে বাহির হইলেন। বিহারের পশ্চিমে কাশী প্রদেশ। উহা জয় করিয়া ধর্ম্মপাল গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে প্রয়াগ অধিকার করিলেন। তিনি সৈন্য লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কান্যকুব্জ-রাজ ইন্দ্রায়ুধ প্রমাদ গণিলেন। ধর্ম্মপাল সিংহের মত যাইয়া কান্যকুব্জ রাজ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপালকে কান্যকুব্জ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। মহা সমারোহে কান্যকুব্জের সিংহাসনে নবীন সম্রাট ধর্ম্মপালের অভিষেক হইল।

পরাজিত ইন্দ্রায়ুধের এক ভাই ছিল, তাহার নাম চক্রায়ুধ। চক্রায়ুধ এই সময় আসিয়া ধর্ম্মপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "সম্রাট, আমার পৈত্রিক রাজ্য আমাকে ফিরাইয়া দিন। আমি আপনার অধীন রাজারূপে এই রাজ্য শাসন করিব।" উদারহৃদয় ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের উপর প্রসন্ন হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক করাইলেন। রাজপুতানা ও পঞ্জাবের সমস্ত রাজাগণ ধর্ম্মপালের মহত্ত্ব দেখিয়া সাধু সাধু বলিয়া ধর্ম্মপালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের তেজস্বী রাজা নাগভটের কিন্তু ধর্মপালের এই গৌরব সহ্য হইল না। বাঙ্গালা দেশে যখন অরাজকতা ছিল, বাঙ্গালার রাজারা যখন দুর্বল ছিলেন, তখন নাগভটের পিতা বৎসরাজ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া তথায় রক্তস্রোত বহাইয়াছিলেন,—বাঙ্গালার ৩টী রাজছত্র কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। সেই পদদলিত বাঙ্গালার রাজা আজ সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট হইতে চলিলেন, ইহা নাগভটের সহ্য হইল না। নাগভট প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইবার নাগভটের সহিত নবীন সম্রাট ধর্মপালের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাটলিপুত্রে আত্মরক্ষার সুবিধা হইবে না বেখিয়া ধর্মপাল মুঙ্গগিরি বা মুঙ্গেরে হটিয়া আসিলেন। এই মুঙ্গেরে পাহাড় আসিয়া প্রায় গঙ্গার দক্ষিণ তীর স্পর্শ করিয়াছে—ঐ তীরের উপরের সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া বাঙ্গালা দেশের দিকে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা আটকাইয়াই মুঙ্গেরের দুর্গ নির্ম্মিত। মুঙ্গেরে ধর্মপাল নাগভটের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই যুদ্ধেও নাগভট জয়লাভ করিলেন।

ধর্মপালের শ্বশুর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই খবর পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার জামাতা পূর্ব্বভারতপতি ধর্মপাল প্রতীহার-রাজ নাগভটের আক্রমণে বিপন্ন। সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। গোবিন্দের পিতা ধ্রুব নাগভটের পিতা বৎসরাজকে একবার এমন হারাইয়া দিয়াছিলেন যে, বৎসরাজ মরুভূমিতে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই বৎসরাজের পুত্র নাগভট কিনা আজ গোবিন্দের জামাতা, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট, ধর্মপালের রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করে! নাগভটকে শিক্ষা দিবার জন্য গোবিন্দ বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া উত্তরাপথে অগ্রসর হইলেন। নাগভট তখন বড় বিপদে পড়িলেন। সম্মুখে ধর্মপালের সৈন্য। পিছনে রাষ্ট্রকূট-রাজ গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট এইবার সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন এবং এমনস্থানে যাইয়া লুকাইলেন যে, তাহার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। কৃতজ্ঞ ধর্মপাল চক্রায়ুধকে লইয়া সানন্দে যাইয়া স্বতন্ত্রের পদবন্দনা করিলেন।

এই মহাযুদ্ধে রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পালসৈন্যগণের গমনাগমনে ও সঙ্ঘর্ষে সমগ্র উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ আলোড়িত হইয়াছিল। নাগভটের পরাজয়ের পরে ভারত জুড়াইল। ধর্মপাল দীর্ঘকাল ধরিয়া উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালা ও বিহারের সমস্ত বিষয়ে অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ধর্মপাল ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে গঙ্গার তীরে একটি পাহাড় ছিল, গঙ্গার জল হইতে তাহা খাড়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। সেই পাহাড়ের মাথায় ধর্মপাল বৌদ্ধভিক্ষুগণের জন্য একটি প্রকাণ্ড বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিহারের নাম "বিক্রমশিলা মহাবিহার।" দেখিতে দেখিতে বিদ্যাচর্চ্চার স্থান হিসাবে এই বিহারের প্রতিপত্তি প্রাচীন নালন্দা বিহারকেও ছাড়াইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বিক্রমশিলা মহাবিহার বৌদ্ধপণ্ডিতগণের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। এই বিহার কোথায় ছিল তাহা আজিও ঠিক মত জানা যায় নাই।

সম্প্রতি উত্তর বঙ্গে রাজসাহী জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়পুর নামক স্থানে প্রকাণ্ড এক প্রাচীন ভগ্ন মন্দির পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পুরানা অক্ষরে লেখা কতকগুলি মাটির শীলমোহর মিলিয়াছে। ঐ শীলমোহরগুলি পড়িয়া বুঝা যায়, পাহাড়পুরের মন্দির ও বিহার এক সময়ে ধর্মপাল দেবের সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্মপাল ধর্ম্মে বৌদ্ধ হইলেও প্রকৃত রাজার মত সকল ধর্ম্মকেই তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন, যাহার যাহা ধর্ম্ম, নিষ্ঠার সহিত সে তাহাই আচরণ করুক। পালবংশের প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্ব্বে আদিশূর বাঙ্গালা দেশে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের এক জনের নাম ছিল ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওকাকে দিয়া ধর্মপাল বৈদিক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ওঝা যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ গঙ্গাতীরে ধামসার নামক একখানা গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি বরেন্দ্রী প্রদেশে অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর পাড়ে করঞ্জ নামক একখানা গ্রাম কাশ্যপ গোত্রীয় স্বর্ণরেখ নামক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। এই গ্রামের নাম হইতে স্বর্ণরেখের একশাখা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে করঞ্জাই নামে পরিচিত হইয়াছে। এই করঞ্জগ্রাম পাবনা জেলায় শাহাজাদপুরের মাইল দশেক দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। পালরাজগণের মন্ত্রী-বংশও বৌদ্ধ ছিল না,

ব্রাহ্মণাদর্শাবলম্বী এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিল। ধর্মপালের মন্ত্রীর নাম ছিল গর্গ। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেন—"দেবরাজ ইন্দ্রের মন্ত্রী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে মাত্র পূর্ব্ব দিকের রাজা করিতে পারিয়াছিলেন,—সেই রাজ্যও আবার দৈত্যেরা কাড়িয়া লইয়াছিল। আর আমি পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্মপালকে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমস্ত দিকেরই অধিপতি করিয়া দিয়াছি!"

ধর্মপাল ও তাঁহার পুত্র দেবপালদেবের রাজত্বে প্রাচীন নালন্দা মহাবিহারে ধীমান ও তাঁহার ছেলে বীতপাল নামে দুই জন সুদক্ষ শিল্পী বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা পিতা পুত্রে পাথর খুঁদিয়া এবং অষ্টধাতু গালাইয়া এমন চমৎকার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতেন যে, তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। নালন্দা মহাবিহার মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের ৬।৭ মাইল উত্তরে এবং পাটনার প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তথায় খুঁড়িয়া এখন মহাবিহারের ভাঙ্গা গালানকোঠা মাটির নীচ হইতে বাহির করা হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাথর ও ধাতুর দেবদেবীর মূর্ত্তিও বাহির হইয়াছে। পাথর কাটিয়া বা ধাতু গালাইয়া মূর্ত্তি গড়ার নাম ভাস্কর্য্য শিল্প। বাঙ্গালা ও বিহারে ভাস্কর্য্য শিল্প যে একটা কত বড় শিল্পে পরিণত হইয়াছিল, নালন্দার মূর্ত্তিগুলি এবং কলিকাতা, রাজসাহী ও ঢাকার যাদুঘরে রক্ষিত মূর্ত্তির সংগ্রহ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

দেবপাল ও সুমাত্রা দ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব *

ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র দেবপাল বিহার ও বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেবপালও পিতার মত বীর ছিলেন। দেবপালের মন্ত্রীর নাম ছিল দর্ভপাণি। দর্ভপাণির বংশধর অহঙ্কার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, দর্ভপাণি নিজের নীতিকৌশলে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি দেবপালের অধীন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং হিমালয়ের গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশ, এই দুই বংশের সহিতই লড়িয়া দেবপাল নিজের সৈন্যিক অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপালের এক ছোট ভাই ছিল, তাঁহার নাম জয়পাল। এই জয়পাল যুদ্ধ করিয়া কামরূপ (আসাম) ও উড়িষ্যার রাজাদিগকেও হারাইয়া দিয়াছিলেন।

দেবপাল প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ রাজত্বের শেষভাগে হিমালয়ের গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ ভোজ কান্যকুব্জ দখল করিয়া লইলেন এবং পালবংশের অধিকার বাঙ্গালা ও বিহারেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। মুঙ্গগিরি বা মুঙ্গেরে দেবপালের রাজধানী ছিল।

এই যুগে ভারতমহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। সুমাত্রাদ্বীপের নাম ছিল তখন সুবর্ণ দ্বীপ। এই সুবর্ণ দ্বীপ ও যবদ্বীপ বা বর্ত্তমান জাভা জুড়িয়া তখন একটি রাজ্য ছিল। রাজ্যের নাম শ্রীবিজয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজবংশের নাম ছিল শৈলেন্দ্র বংশ। দেবপাল যখন বাঙ্গালা বিহারে রাজত্ব করিতেছেন, তখন সুবর্ণ দ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশীয় বালপুত্রদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণস্থ তাম্রলিপ্ত,—বর্ত্তমান তমলুক,—তখন বাঙ্গালা বিহারের প্রধান বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ ছাড়িয়া শত শত ভারতীয় বণিক আরাকানের সহিত, ব্রহ্মদেশের সহিত, সুমাত্রা-জাভা-বলি-দ্বীপের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইত। ব্রাহ্মণগণ যাইয়া এই সমস্ত স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের প্রচার করিতেন; বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রচার করিতেন। সুমাত্রা জাভার যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধতীর্থ ও বিহারগুলি দেখিতে বাঙ্গালা ও বিহারে আগমন করিত। তমলুকে তাহারা জাহাজ হইতে নামিত। তাহার পরে কতক বা দল বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া,—কতক বা নৌকায় ভাগীরথী ও পদ্মা বাহিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইত।

শ্রীবিজয় রাজ্য হইতে দলে দলে এইরূপ তীর্থযাত্রী প্রত্যেক বছর বাঙ্গালা ও বিহারে আসিত। বাঙ্গালা দেশে একে তাহারা বিদেশী, তাহার উপর আবার বাঙ্গালা বিহারের লোক তাহাদের কথা বুঝিত না। তাই বাঙ্গালা-বিহারে তীর্থযাত্রায় আসিয়া শ্রীবিজয়ের যাত্রীরা বড় কষ্ট পাইত। শ্রীবিজয়ের রাজা বালপুত্রদেব এই অবস্থা দেখিয়া নালন্দায় এই সকল যাত্রীর জন্য এক বিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। দেবপালের

* এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক সংশোধিত। তাঁর অনুরোধে দেবপালকে সম্পূর্ণ অন্ধ দিয়াছিলেন। ঃ স

নিকট তিনি দূত প্রেরণ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। দেবপালদেব বালপুত্রদেবের অনুরোধে এক শাসনপত্র প্রস্তুত করিয়া করেকখানি গ্রামের উপস্বত্ব বালপুত্রদেবের এই বিহারের ভিক্ষু ও যাত্রীগণের ভরণপোষণের জন্য দান করিলেন। সমুদ্রের ওপারের রাজার সহিত বাঙ্গালা বিহারের রাজার বন্ধুত্বের নিদর্শন সেই শাসনপত্রখানা আজ করেক বছর হয় নালন্দার প্রাচীন কীর্ত্তি খুঁড়িয়া বাহির করিতে মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছে।

৩৯ বছরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া দেবপালদেব পরলোকে গমন করেন।

মহীপালের কীর্ত্তি

দেবপালের মৃত্যুর পরে ক্রমেই পালবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজগণ প্রবল হইয়া ক্রমশঃ মগধ ও মিথিলা,—অবশেষে এমন কি বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। রাজসাহী জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়পুরের যে বিহার এক কালে ধর্ম্মপাল মহাবিহার বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিহারের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে পর্য্যন্ত গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম মহীপালদেব যখন পাল-সিংহাসনে বসিলেন তখন উত্তর বঙ্গ আর পালরাজগণের হাতে নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং ত্রিপুরা নোয়াখালি জেলায় তখন পালরাজগণের রাজ্য সীমাবদ্ধ। প্রচুর জলপূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া মহীপাল আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু মহাবীর মহীপাল ধীরে ধীরে দুর্ভাগ্যের স্রোত ফিরাইতে সমর্থ হইলেন। মহীপালদেব আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তচ্যুত রাজ্য আবার অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি গৌড় অধিকার করিয়া মগধ, এমন কি কাশী পর্য্যন্তও, আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন গঠিত রাজ্য আবার বিদেশীয় রাজারাও সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

মহীপালদেব যে সময়ে উত্তর রাঢ়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল এসে আক্রমণ করেন। দণ্ডভুক্তি প্রদেশের (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায়) রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহার হস্তে নিহত হন। দক্ষিণ রাঢ়ের (বর্ত্তমান হাওড়া-হুগলি-বর্দ্ধমান জেলা) রণশূর, বঙ্গরাজের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ে মহীপাল রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলায় মহীপাল নামে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উহাই সে সময়ের মহীপালদেবের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। উহার নিকটে সাগরদীঘি নামে একটি বিশাল জলাশয় মহীপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দিনাজপুরের মহীপালদীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি তাঁহার নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিব ও দুর্গার মন্দির এবং তাহার নিকট সারনাথের অশোকস্তূপ বৌদ্ধ মন্দির ও অশোকস্তম্ভের সংস্কার তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় দেয়। মহীপালদেবের আদেশে কবিবর ক্ষেমীশ্বর বিশ্বামিত্র ও হরিশ্চন্দ্রের কথা লইয়া চণ্ডকৌশিক নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহীপালদেব কর্ণাটগণকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। মহীপাল ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া অনেক গীত রচিত হইয়াছিল। সে গুলি মহীপালের গীত নামে প্রসিদ্ধ—

ঘোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥

লোকে যখন তখন মহীপালের গীত গাহিত। সেই জন্য "যান ভাঙ্গিতে মহীপালের গীত" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে।

বরেন্দ্রের দেশে বাঙ্গালী পণ্ডিত

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল পাল-বংশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার রাজ্যের কোন কোন অংশ অন্য লোকে অধিকার করিয়া লয়। এই সময়ে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তাঁহার নাম দীপঙ্কর-শ্রী জ্ঞান-অতীশ। তাঁহার শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এমনি ছিল যে তিনি যেখানে যাইতেন, সেই স্থানই যেন প্রদীপের আলোকে হাসিয়া উঠিত। আর তিনি জ্ঞানেও সকলের বড় ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে জ্ঞান-অতীশ বলিত। লোকে তাঁহাকে শুধু অতীশ বলিয়াও সম্বোধন করিত। তাঁহার

পূর্ব্বনাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর তাঁহার জন্মস্থান। চন্দ্রগর্ভ বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীপঙ্কর-শ্রী জ্ঞান-অতীশ নাম লাভ করেন। ক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হইয়া উঠেন। অতীশ অনেক শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন। যেখানে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধ গয়ার মহাবোধিমঠে তিনি বহুদিন বাস করেন। তাঁহার মহাবোধিমঠে বাস করার সময় চেদিবংশের কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। নয়পালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কর্ণদেবের সৈন্যগণ নয়পালের সৈন্যের হস্তে নিহত হইতেছে দেখিয়া দীপঙ্কর-শ্রী তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। নয়পালের রাজত্বকালেই দীপঙ্কর-শ্রী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তিব্বতের রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যান। দীপঙ্কর-শ্রী বৃদ্ধ বয়সেই তিব্বতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক উন্নতি সাধন করেন। দীপঙ্কর-শ্রী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তিব্বতে গিয়া তিনি অতীশ নামেই প্রসিদ্ধ হন। আজিও তিব্বতে অতীশের গৌরব ঘোষিত হইয়া থাকে। এইরূপে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত হিমালয় পার হইয়া সেই বরফের দেশে গিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

দুইটি নূতন রাজবংশ

মহীপালদেবের পর হইতে আবার পালবংশের অবনতি ঘটে। এই সময়ে একটি নূতন রাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। এই বংশ চন্দ্ররাজবংশ নামে বিখ্যাত। এই বংশের একজন রাজাই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্য চন্দ্র। ইনি প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে বা বর্ত্তমান বরিশাল জেলার রাজা হন। ইহার পুত্র শ্রীচন্দ্র কিন্তু সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের অর্থাৎ ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা জুড়িয়া বেশ একটি মাঝারি রকমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। এই বিক্রমপুর নগরের ভগ্নাবশেষ আজিও ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে বিক্রমপুর প্রকাণ্ড নগর ছিল, তাহা উহার বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই বুঝা যায়। ঐ স্থান আজ কাল রামপাল বলিয়া পরিচিত এবং নারায়ণগঞ্জ সহরের ঠিক দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। এই চন্দ্রদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই বিক্রমপুর নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজধানীতে প্রথমে শ্রীচন্দ্র, পরে বর্ম্মরাজগণ এবং সর্ব্বশেষ সেনরাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রের সহিতই শেষ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে যাদব বংশীয় বর্ম্ম রাজগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিয়া লয়।

পশ্চিম ভারতের যাদববংশীয় বজ্রবর্ম্মা প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বর্ম্মবংশের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের হরিবর্ম্মা নামে নরপতি সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অনেক কীর্ত্তি বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। হরিবর্ম্মা প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ, বহু জলাশয় খনন, নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকে তিনি ভূমি দানও করেন। বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার সভাসভায় থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভবদেব ভট্ট উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে নারায়ণ, অনন্ত প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে একখানি শিলাখণ্ডে সে কথা লিখিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র নামে আর একজন পণ্ডিত হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

এই বংশের সামল বর্ম্মাও একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। এ দেশের তখনকার ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ ভাল করিয়া করিতে পারিতেন না। সেই জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আনিতে হইয়াছিল। হরিবর্ম্মার সময়ে এবং সামল বর্ম্মার পরও কোন কোন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমনের কথাও জানা যায়। বঙ্গদেশে এখনে এই পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অনেকস্থানে যাগযজ্ঞাদি করিয়া থাকেন। চন্দ্র ও বর্ম্ম বংশের অল্প পূর্ব্ববঙ্গে পালবংশীয়দিগের প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ [লীগ্ অব্ নেশন্স্]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

শক্তিসাম্যের (balance of power) কথা বলিতেছিলাম। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাই ছিল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য অনুসৃত একমাত্র নীতি। যাঁহারা মহাযুদ্ধের সময়কার ইতিহাস জানেন তাঁহারাই জানেন যে, সে নীতি কি ভাবে বিফল হইয়া কি অঘটন ঘটাইয়াছিল। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দাবাখেলার চালে ও জগতের শক্তিসমূহ শক্তির তারতম্য হিসাবে দাবার বলে পরিণত হইয়াছিল। অর্থাৎ এই যে, দাবাখেলার প্রথম হইতে শেষ অবধি নির্দ্দিষ্ট দুইজন খেলোয়াড় থাকে, কিন্তু রাজনীতির এই দাবাখেলায় এই জনের বেশী খেলোয়াড় খেলিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহাদেরও মধ্যে বদল হইয়াছিল দেখা যায়। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলা চলে, এক পক্ষ ছিল ফ্রান্স ও তাহার প্রতিপক্ষ ছিল জার্ম্মানী। ইংলণ্ড কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা ঠিক বোঝা যায় নাই, একবার সে জার্ম্মানীর দিকে ঝোঁক দেয়, আর একবার ফ্রান্সকে সমর্থন করে, অবস্থাটা ছিল কতকটা এইরূপ। তখন ছোট বড় নানা entente ভাঙ্গিতেছিল, গড়িতেছিল। ইহারই মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শক্তি-সাম্যনীতি যুদ্ধ রোধ করিতে পারিল না; সাম্যের অভাব ঘটিল। দলাদলি দিয়া মিলন সাধন হইল না।

দলাদলির তলাকার কথা পরস্পরের ভয় ও অবিশ্বাস। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ententeএর সৃষ্টি সেই ভয় ও অবিশ্বাস হইতে। রাজনীতির সহিত দাবাখেলার উপমা দিয়াছিলাম, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে; খেলোয়াড়গুলির মনোভাব যাহাই হ'ক না কেন দাবার বলগুলি প্রাণহীন, তাহাদের নিজস্ব কোন স্বার্থ নাই; কিন্তু যাহাদের লইয়া রাজনীতির কারবার তাহারা প্রাণবান, নানা বৃত্তি-প্রবৃত্তির সংঘাতে তাহাদের জীবনের ইতিহাস অহরহ রচিত হইতেছে। বোধ করি এই সকল বৃত্তির মধ্যে আত্মরক্ষাবৃত্তি অর্থাৎ স্বার্থবোধ সর্ব্বপ্রাথমিক। সেই স্বার্থবোধ হইতেই ভয় ও অবিশ্বাসের জন্ম। এ কথাগুলা ব্যক্তির সম্বন্ধে যতখানি সত্য, সমষ্টি অর্থাৎ রাষ্ট্রের পক্ষেও ঠিক ততখানি সত্য। রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার স্বার্থের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থই বোধ করি সর্ব্বপ্রধান। কোন রাষ্ট্রই সেই অর্থনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

আজকাল রাজনীতির সহিত অর্থনীতির একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। পৃথিবীতে একটা যুগ গিয়াছে যখন রাজনীতি নিছক রাজনীতিই ছিল; তখন অন্ন ছিল প্রচুর, লোকসংখ্যা ছিল অল্প, সুতরাং কোন রাজা যখন অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন তখন সাধারণতঃ আর যে কোন উদ্দেশ্যই তাহাতে থাকুক না কেন দেশের লোকের অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্য থাকিত না। আজ কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে। দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হইয়াছে; এদিকে গণশক্তি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে; একদিন যাহারা নির্ব্বিবাদে অনাহারে দিন কাটাইয়াও নরক্ষণী দেবতা রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করিত না, আজ তাহাদের কণ্ঠে ভাষা ফুটিয়াছে; অত্যাচার অবিচার তাহারা আর নির্ব্বিচারে নিঃশব্দে সহিতে প্রস্তুত নহে। ফলে জনবহুল রাষ্ট্রকে অর্থউপার্জ্জনের নূতন নূতন উপায় বাহির করিতে হইতেছে। দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের রক্ষার জন্য বিদেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেশের চারিদিকে অর্থ নৈতিক প্রাচীর তোলা হইতেছে। দেশের পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য বাণিজ্য উন্নতিতে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ নূতন নূতন দেশ জয় করিবার বা সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। এ প্রয়োজন বাধা মানিতে প্রস্তুত নহে, যে হেতু এ প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্য। ইহার জন্যও দল বাঁধিবার দরকার হয়।

একটা কল্পিত উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। জাপানের লোকসংখ্যা এত বেশী ও তাহার আয়তন এত ক্ষুদ্র যে তাহার পক্ষে সব বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া কঠিন। অন্নের জন্য তাহাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে। জাপান যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিলাভ করিয়াছে। দ্বারের পাশেই চীনদেশ এ বিষয়ে অনুন্নত; তাহাদের ব্যবসা যদি জাপানীদের করতলগত হয় তাহা হইলে জাপানের সুবিধা হয়; সুতরাং জাপান

সেই চেষ্টা করিবে। এদিকে মার্কিন দেশের (U. S. A.) অবস্থাও কতকটা এইরূপ; ইংলণ্ডেরও চীনের উপর দৃষ্টি আছে। ওদিকে চীনের উত্তরে রাষিয়া নূতনভাবে রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে, তাহার দৃষ্টিও যে চীনের উপর নাই একথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে যে দলাদলি বাধিবে এটা স্বাভাবিক। হয়ত রাষিয়ার সহিত আমেরিকার মিতালি হইবে, না হইলে

স্যর এরিক ড্রামণ্ড

রাষিয়ার সহিত জাপানের সন্ধি হইবে। এরূপ একটা কিছু হওয়া একেবারেই বিচিত্র নহে। ধরা যাক জাপানে ইংলণ্ড মৈত্রী হইল; তখন শক্তিসাম্যের জন্য রাষিয়ার সহিত আমেরিকার যোগদান অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এদিকে জাপানে ইংলণ্ডে মৈত্রী ঘটার ফল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইবে। ভারতবর্ষের বাজারে ইংলণ্ডে ও জাপানে সংঘর্ষ আছে; মিতালির ফলে একটা রফা করার প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। ওদিকে ফ্রান্স দেখিবে আমেরিকার সহিত যোগ রাখা নানা কারণে প্রয়োজন; সে তখন রাষিয়ার সহিত সন্ধি করিবে ও তাহার পক্ষে যোগ দিবে। তখন ফ্রান্স—ইংলণ্ডে নূতন করিয়া বোঝাপড়া করার দরকার হইয়া উঠে। এদিকে আবার জার্ম্মানীও এই দলাদলির মধ্যে গিয়া পড়ে। এমনই ভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া উঠে। দলাদলি ঘটিলে একান্ত নগণ্য, শক্তিহীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছাড়া সকলকেই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিতে হয়; কারণ বর্ত্তমান যুগে সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ এমন ঘনিষ্টভাবে যুক্ত যে, একককে ছাড়িয়া অপরের চলে না।

এইরূপে যখন রাষ্ট্রগুলি নানাদলে বিভক্ত হইয়া যায় তখন যে শান্তি সে-শান্তি কতকটা কুস্তির আখড়ায় দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষণিক বিশ্রামগ্রহণের শান্তির মত। এ যেন দুইজন খেলোয়াড় আখড়ায় দুই কোণে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে দেখিতেছে, কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা, কোনদিক হইতে আক্রমণ করা যাইতে পারে, আক্রমণের প্রশস্ততম মুহূর্ত্ত কখন আসিবে। খেলোয়াড়ের ঠিক সেই সময়টার মনোভাবকে নিরপেক্ষতা বলা চলে না; যদি বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে ইহা সশস্ত্র (armed neutrality)। ইহার উপর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

স্বার্থ অন্ধ; স্বার্থ শুধু সাধারণতঃ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে অবস্থিত অংশটুকুর দিকেই তাকাইয়া থেকে; বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাহার নাই, বাহির সম্বন্ধে তাহার ভয় ও অবিশ্বাসের অন্ত নাই। স্বার্থবোধ যখন আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধে তখন তাহার দ্বারা ভয় ও অবিশ্বাসের আশু প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু তাহার ফলে ভয় ও অবিশ্বাসের

এম. জে. আডেলম্যান

মূল নিরাকরণ হয় না। দলাদলির ফলে সঙ্কল্পে এবক্ষেত্রে কখনও মিলিতে পারে না, এবং মিলিতে পারে না বলিয়াই ভয় ও অবিশ্বাস দূর হয় না, তাহা বাড়িয়াই চলে; সে অবস্থায় ইহা বুঝিবার কোন সুযোগই পাওয়া যায় না যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা পরিণামে সমূহ ক্ষতি, সমূল বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। আজ জাপান ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে পারে কিন্তু ইহার ফলে যে, চীন ও জাপানের মধ্যে

চিরদিনের জন্য একটা কলহের সৃষ্টি হইল এবং এই কলহ ভবিষ্যতে উভয়ের, তথা সমগ্র জগতের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিবে ইহা ত অস্বীকার করিলে চলিবে না। নেপোলিয়নের প্রাসিয়া-বিজয়ের ফল আজও য়ুরোপের ইতিহাসকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের ফলও যে পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনীতিতে ভাবী কালে এইভাবে বিষাক্ত করিয়া রাখিবে না, একথা কে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারে?

কিন্তু উপায় কি? মানুষ ও রাষ্ট্র স্বার্থপর; মানুষের এই আদিমতম বৃত্তি দূর করা সহজ নহে। তাহা হইলে কি জগতের শান্তির কোন আশাই নাই? দলাদলি করিয়া শান্তি স্থাপন হইতে পারে না। দলাদলির ফলে যেখানে সকলে মিলিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করিতে পারে এমন একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। অথচ সকলে মিলিয়া খোলাখুলিভাবে সমস্যাগুলি আলোচনা করিলেই হয়ত ভবিষ্যতে একদিন উপায় মিলিতে পারে, অন্যথা নহে। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, এইরূপ একটা মিলন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি। এই ক্ষেত্রে সকলেই সমানভাবে একত্র হইয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া বৃহৎ স্বার্থের আলোচনা করিবে, কি ভাবে এই দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন করা যায় তাহারই পন্থা অনুসন্ধান করিবে এবং দল ছাড়িয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা ভুলিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে জগতে শান্তিস্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিবে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ-স্থাপন সেই মিলন-ক্ষেত্র স্থাপন-চেষ্টার প্রথম ফল।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সব চেয়ে বড় মূল্য এই যে, এখানে সর্ব্ব-রাষ্ট্রের মিলনের একটি কেন্দ্র তৈয়ারি হইয়াছে। সেই কেন্দ্রে সকলে আসিয়া সহজে মিলিতে পারে, সেখানে ছোট বড় সকল রাষ্ট্রেরই আদর্শতঃ সমান অধিকার। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক সম্মেলনী হয় নাই এমন নহে। কিন্তু এরূপ একটি সম্মেলনকে সফল করিয়া তোলা তখন নানা কারণে কঠিন ছিল। এই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ এই ছিল যে, সম্মেলনীর অধিবেশনের কোন স্থায়ী কেন্দ্র ও অধিবেশনান্তে সম্মেলনীর কার্য্য চালাইবার জন্য কোন স্থায়ী দপ্তরখানা ছিল না। এই দুইটি কারণ ও অন্যান্য নানা কারণে ১৯২০ সালের পূর্ব্বে কোন বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার ফলে যে এই অভাব দূর হইয়াছে একথা তাহার অতি-বড় শত্রুও অস্বীকার করিবে না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ বলিবেন, তাহা না হয় হইল, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ না হয় সর্ব্বরাষ্ট্রের মিলনকেন্দ্র হইল—কিন্তু তাহার দ্বারা কি ফল হইয়াছে? জগতে শান্তি স্থাপন হইয়াছে কি? বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ কি চীনকে জাপানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? আর একটা মহাযুদ্ধ আসন্নপ্রায় হয় নাই কি? দেখিতেছি ত' রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ ব্যর্থ হইয়াছে। প্রতিপক্ষ আরো বলিবেন, ইহার চেয়ে ভাল ছিল যখন সকলে কোনদিন মিলিত হইয়া বিবাদ করিবার অবকাশ পাইত না, এখন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে দেখিতেছি সকলে মিলিয়া ঝগড়া বাধাইবার সুন্দর একটি সুযোগ পাইয়াছে।

আজ চৌদ্দ বৎসর মাত্র বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে ইহার বিচার করা অন্যায় অসহিষ্ণুতার পরিচয় ছাড়া আর কিছু নহে। যাঁহারা মনে করেন, একদিনে রাষ্ট্রনীতির এই বহুদিনের সমস্যার সমাধান হইবে তাঁহাদের নৈরাশ্যের মূল্য বেশী নহে। তবুও তাঁহাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের আপাতপ্রতীয়মান এই ব্যর্থতার একটি সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। খুঁজিয়া দেখিলে দেখিব, রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মের ইতিহাসের মধ্যেই সেই কারণ রহিয়াছে।

মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনয়ের ইতিহাস কতকটা এইরূপ। যুক্তরাষ্ট্র আসিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিল, জার্ম্মানীর ভাগ্যবিপর্য্যয় নিশ্চিত হইয়া উঠিল; পরাজয়ের পর পরাজয়ে জার্ম্মানীর সেনাগণ লাঞ্ছিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া অবশেষে ক্ষণিক সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিল। তাহার পর একদিন শুভক্ষণে ক্ষণিক যুদ্ধনিবৃত্তি অর্থাৎ armistice দস্তখত হইল। উভয় পক্ষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দীর্ঘ দিন যুদ্ধের ফলে যুধ্যমান সকল দেশের লোকেই ক্লান্ত হইয়া শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। যখন আর্ম্মিষ্টিস ঘোষিত হইল তখন সকলেই আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ না ঘটে, সকলেই সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। সভায়, সমিতিপত্রে সর্ব্বত্রই সেই এক কথা,

কি ভাবে এই শোচনীয় ইতিহাসের পুনরভিনয় না ঘটে তাহারই আলাপ। নূতন ভাবে সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে, রাষ্ট্রনীতির ধারা বদল করিয়া দিয়া তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করিতে হইবে, এই ভাবের কথা চারিদিকেই শোনা যাইতে লাগিল। সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সংস্কার সম্বন্ধে আলাপ উৎসাহের অন্ত রহিল না। লীগ্ অব নেশন্সের কথা শোনা গেল। সকলেই লীগের কথা বলিতেছেন, লীগের পরিকল্পনা-কারী প্রেসিডেন্ট উইলসন বেবতারূপে সমাদর পাইতেছেন।

ছিল, কিন্তু শান্তি-বৈঠকের সঙ্গে সঙ্গেই এই মনোভাব বিদ্বেষে পরিণত হইল। ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। যাহা হারাইয়াছি তাহার কথা নূতন করিয়া মনে পড়িতে লাগিল, তাহার জন্য পূর্ণ খেসারত আদায় করিতে হইবে, তাহার পূর্বে জার্মানীকে নিষ্কৃতি দিলে চলিবে না। মিত্রশক্তির রাজনৈতিকগণও লোকমুখের এই ধুয়া রাজনীতির খেয়ে ধরিলেন। এই সময়েই একজন ইংরেজ রাজনৈতিক (স্যার এরিক্ গেডিস্)

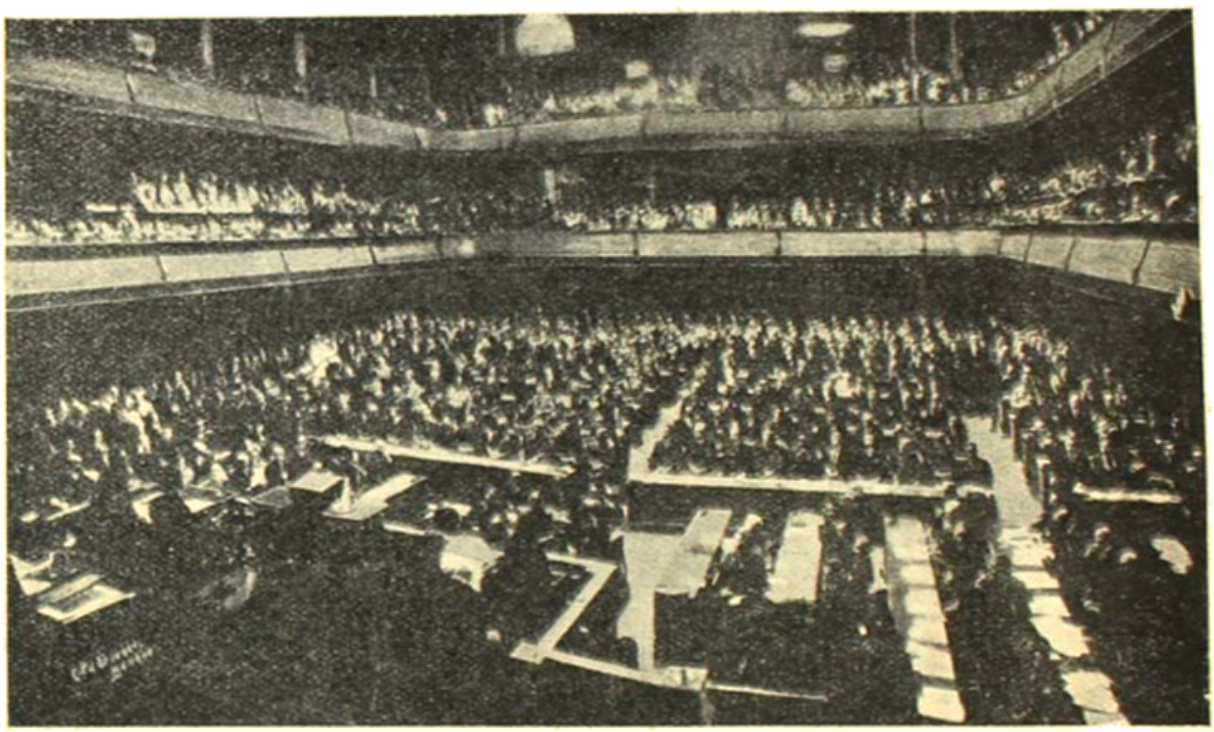

লীগ অব নেশন্সের একটি মিটিং।

ইতিমধ্যে শান্তি-বৈঠক সুরু হইল। তখন ১৯১৯ সালের আরম্ভ। ইহারই মধ্যে লোকচিত্তের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি নিশ্চিত হয় নাই ততক্ষণ সকলেই শঙ্কিত চিত্তে ক্রোধ হিংসা ভুলিয়া শান্তির জয়গান করিয়াছে। আর্মিষ্টিসে শান্তিস্থাপনের নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শান্তি-বৈঠক সুরু হইল তখনই বিজয়ী জাতির লোকের মনে পুরাতন প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। এতদিন সে বৃত্তি চাপা ছিল, ভয়ের আশঙ্কা দূর হইতেই তাহা মাথা নাড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আর্মিষ্টিসের অব্যবহিত পরে জার্মাণীর প্রতি বিজয়ী মিত্রশক্তির মনোভাব কতকটা নিরপেক্ষ

বলিয়াছিলেন, "to squeeze Germany like an orange till the very pips squeak"; অর্থাৎ কমলালেবুর মতই জার্মাণীকে এমন ভাবে নিংড়াইয়া শোষণ করিয়া লইতে হইবে যেন কমলার বীজগুলা পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ করে। এই উক্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার উপযুক্ত বটে। শান্তি-বৈঠকের পিছনে শান্তিকামীদের এই মনোভাব ছিল একথাটা ভুলিলে চলিবে না।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তি বৈঠকের অধিবেশন চলিল, ততদিনে ইহার সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছিল। আপাততঃ যে শান্তি মিলিয়াছিল, তাহারই

যেন কোনমতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ব্যস্ত থাকিয়া শান্তি-বৈঠক যে ভাবী শান্তির আলোচনা করিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার আগ্রহ বেশী লোকের আর রহিল না। ইহারই মধ্যে ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। অধিকাংশ লোকেই ইহার সম্বন্ধে ভাবনা করা দূরে থাক, সন্ধিপত্র চোখেই দেখিল না; দেখিলেও অর্থনৈতিক সমস্যাকীর্ণ সন্ধি সম্বন্ধে কাহারও হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন ব্যাপার।

১৯১৯ সালের জুন মাসে যেদিন ভার্সাই-সন্ধির স্বাক্ষর ও লীগের প্রতিষ্ঠা হইল, সেদিন আর্ম্মিষ্টিস্ দিনের মত জন-সাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের পরিচয় পাওয়া গেল না। ছুটি দেওয়া হইল বটে কিন্তু সে ছুটি কেন, কি উদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে কেহ বিশেষ চিন্তা করিল না। স্ফূর্ত্তি করার একটা চেষ্টা দেখা গেল, কিন্তু বাজি পুড়িল, রোশনাই হইল বটে, কিন্তু সব কিছুরই মধ্যে অন্তরঙ্গতার অভাব দেখা গেল। তখনকার অবস্থাটা কতকটা সেই লোকের মনোভাবের মত, যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করিয়া সারিয়া উঠিয়া দেখে জীবনের আর কোন স্বাদ নাই, বাঁচিয়া থাকাটা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিল, অন্নাভাব ঘটিল, বেকার সমস্যা দিন দিন কঠিনতর রূপে দেখা দিতে লাগিল। ইহার মধ্যে সন্ধি হইল, সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় বিজ্ঞ রচনা বাহির হইল: তাহার কতকটা লোকে বুঝিল, কতকটা বুঝিল না। কিন্তু মোটের উপর কেহই খুসী হইতে পারিল না। কোথায় নূতনভাবে সমাজগঠন, কোথায় জীবনের সকল দুঃখক্লেশের অপসারণ? লোকে যুদ্ধশান্তি দেখিল বটে কিন্তু জীবনে শান্তি-স্থাপনের কোন ব্যবস্থাই সেদিন কাহারও চোখে পড়িল না।

১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ভার্সাই-সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহারই প্রথম অংশে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তিপত্র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই দিনকে লীগেরও জন্মদিনরূপে গ্রহণ করা উচিত। জন্মদিনের পর হইতেই এই শিশু মাতৃস্নেহ হইতে অনেকখানি বঞ্চিত হইয়াছিল। কারণ যে জন-সাধারণের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহাই তাহাকে শক্তিদান করিতে পারে, ইতিমধ্যেই তাহা ইহার সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদাসীন হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ এই সঙ্ঘে নিজ নিজ গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র আবার লীগে যোগ দিলেন না। আমেরিকা প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে সম্মতি দিল না। পুরাতন জীর্ণ মনুরো-নীতির দোহাই দিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের কংগ্রেস বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইতে অস্বীকার করিল।

তবুও কেহ কেহ উৎসাহ লইয়া লীগের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল এবং তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া বাস্তবে পরিণত হইল। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের এই উৎসাহীদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির উল্লেখ করিতে হয়। তাহারা সত্যই নানা দুঃখবিপদের মধ্য দিয়া লীগের আদর্শ সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। লীগের প্রথম কর্ম্ম-সচিব স্যর এরিক ড্রামণ্ডের (Sir Eric Drummond) নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লীগের জন্মের কিছুদিন পরেই শক্তি-শালী রাষ্ট্রগণের ইহার সম্বন্ধে উৎসাহ হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল; জনসাধারণের দৃষ্টিও লীগ্ তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি হইতে সরিয়া গিয়া গৃহে, আপনার রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে তাহাদের মধ্যে লীগ্ সম্বন্ধে যে আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, সে আগ্রহ ক্ষণিক ও তাহার পিছনে সুশাসিত, সুসংযত ও সুশিক্ষিত কোন আদর্শবাদ ছিল না, জনসাধারণ এবিষয়ে কোন শিক্ষা কোনদিন পায় নাই। লীগের জন্মের পরেও তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

ইহারই মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শক্তি-শালী রাষ্ট্রগুলির যে শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিকগণ প্রথমটা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কিছু পরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বা তাহার উন্নতির দিকে ততটা মন দেন নাই, তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন যে, ইহাকে করতলগত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হইতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এতদিন চালাইতে-ছিলেন ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির আদর্শবাদী নেতৃবৃন্দ; যাঁহাদের ব্যক্তিত্বে ও আদর্শে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাঁহারা এতদিনে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সুতরাং ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির নেতৃবৃন্দকে পিছনে ফেলিয়া বৃহত্তর শক্তির রাষ্ট্রনেতাগণ হঠাৎ একদিন লীগের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ধীরে ধীরে লীগ তাঁহাদের করতলগত হইল। লীগের গঠনচুক্তি অনুযায়ী সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল শক্তিই তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ

করিতেন। এতদিন বৃহত্তর শক্তিগুলির প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহারা এক হিসাবে নিতান্ত আদর্শ-বাদী ছিলেন; স্বদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন প্রতিপত্তি সাধারণতঃ ছিল না; সুতরাং স্বদেশীয় সরকারের নীতির উপর তাঁহাদের প্রভাব ছিল না। বৃহত্তর শক্তিগুলি এইভাবের প্রতিনিধি পাঠাইয়া লীগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন, তার কতকটা এইরূপ ছিল। কিন্তু এতদিন দেখা গেল, স্বদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর পরেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী, সেই পররাষ্ট্রসচিবগণ জেনেভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে ভাবিল, এতদিনে বুঝি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাগ্য ফিরিল; যে উপেক্ষা তাহাকে এতদিন অক্ষম, দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল এইবার তাহার শেষ হইল, এতদিনে লীগ্ বৃহত্তর শক্তিগুলির যোগ্যতম রাষ্ট্রনীতি-বিদ্ প্রতিনিধিগণের মিলনে সত্যই বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরিণত হইল।

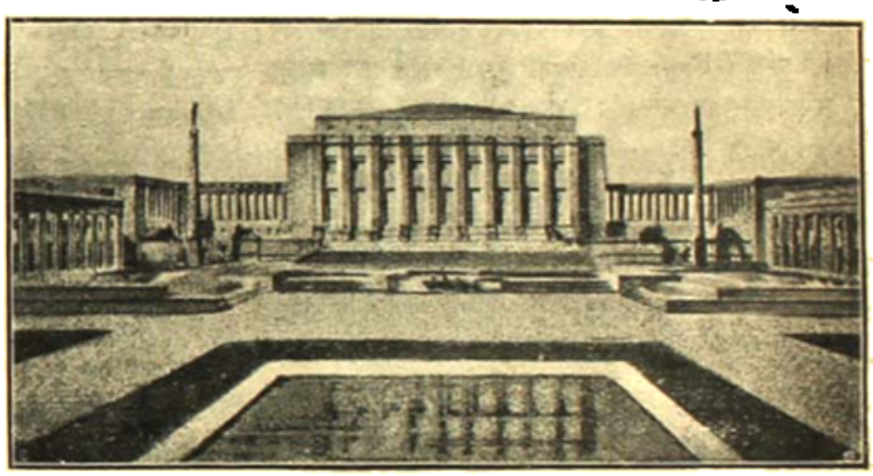

লীগের নূতন বাড়ী (গতবারের অসম্পূর্ণ অট্টালিকার ছবি দেওয়া হইয়াছিল)।

কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল বিপরীত। রাজনীতির খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে, পররাষ্ট্র-সচিবের পদ অত্যন্ত দায়িত্ব-সম্পন্ন, যুদ্ধঘোষণা ইত্যাদি ব্যাপার তাঁহারই হাতে। প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব বাস্তব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহার কাজ বিশেষ করিয়া স্বদেশের রাজনীতি লইয়া, পররাষ্ট্রসচিব আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। এইজন্য প্রকৃত পক্ষে পররাষ্ট্রসচিব প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। এই কারণেই বুনা প্রবীণ রাজনৈতিক পররাষ্ট্রসচিবের পদলাভ করেন। পররাষ্ট্রসচিবগণ তাঁহাদের দপ্তরখানার হাতে; এই দপ্তরখানার নীতির কোন পরিবর্ত্তনই গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই—সেই পুরাতন চালবাজী, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তচরসহায়, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির আসরে সেই বুদ্ধির রেষারেষি—সেই পুরাতন অস্ত্রগুলি লইয়া কারবার। কোন মহাযুদ্ধের নিদারুণ মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা, বিদ্যমানবত্তার কোন আঘাতই এই পররাষ্ট্র-আফিসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার চলিবার সনাতন ধারা বদল করিতে পারে নাই। সেখানে রাজনীতি গোপন নীতি। খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্রীয় ও অন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা আলাপ করা পুরাতন রাজনীতির পন্থা নহে। সুতরাং ফুটচক্রের কালে পররাষ্ট্রসচিব আবদ্ধ হইয়া পড়েন; ইহার উপায় নাই। আর একটা কথা এইখানে মনে রাখা দরকার যে, রাজনীতির যে বিদ্যালয়ে এই বুনা প্রবীণ, সব রাজনৈতিকগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল পুরাতন শক্তি-সাম্যবাদ। পররাষ্ট্রবিভাগগুলির ইতিহাস এই বিদ্যালয়ে সৃষ্ট হইয়াছিল। ফলে হয় এই যে, এই শ্রেণীর পররাষ্ট্রসচিব-গণ যখন জেনেভায় আসিয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বভার পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ-অনুমোদিত নূতন পথ অনুসরণ না করিয়া পুরাতন পথেই চলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ শক্তিসাম্যবাদের আদর্শের ঠিক বিপরীত। জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে সকলে সমান অধিকার লইয়া মিলিত হইয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া সর্ব্বশক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-গণের ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। এখানে পর্দ্দার আড়ালে, কাহারও অসাক্ষাতে কোন বিষয় আলোচনা হইবে না, কোন রকম দলাদলির স্থান এখানে নাই।

কিন্তু যখন শক্তিসাম্যবাদী রাজনৈতিকগণ জেনেভায় আসিয়া জুটিলেন তখন এই আদর্শবাদের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল।··· বৎসরের পর বৎসর তাঁহারা জেনেভায় বসিয়া সকলের মিলনের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন; এদিকে জেনেভাতেই ও অন্যত্র পর্দ্দার আড়ালে দলাদলি আরম্ভ করিলেন।

মঁসিও ব্রিয়াঁ (Mon Briand) য়ুরোপের রাষ্ট্রসমূহের

এক সঙ্ঘ স্থাপনের (Pan-European Union) পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন। এদিকে তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম উদ্যোক্তা। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের সহিত এরূপ একটা ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের কেমন করিয়া সামঞ্জস্য হইতে পারে তাহা বোঝা কঠিন।

তাহার পর আসিল নবশক্তি-সন্ধি, (Nine Power Treaty), কেলগ্ প্যাক্ট (Kellog Pact); কেলগ্ প্যাক্টের অর্থ বোঝা যায়; যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে, সুতরাং তাহাকে লইয়া পৃথিবীর শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কোন কাজ করাইতে হইলে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ দিয়া হইবে না। তবে এরূপ প্যাক্ট করিয়া শান্তির চেষ্টার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেওয়ান ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রকে লইয়া শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা আরো ভাল হইত। যাহা হউক কেলগ্ প্যাক্টকে না হয় বর্ত্তমান অবস্থায় স্বীকার করা গেল; কিন্তু এই সেদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইতালি মিলিয়া যে চতুঃশক্তি চুক্তি (Four Power Pact) করিলেন তাহার সঙ্গে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের মিল কোথায়? এই চারিটি শক্তিই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য। তাঁহাদের বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিরে এরূপ চুক্তি করিবার কোন যুক্তি আছে কি? যদি থাকে, বুঝিতে হইবে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ মিথ্যা; তাহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না, সুতরাং পুরাতন শক্তিসাম্যবাদের ও বৃহত্তর শক্তিগণ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির অভিভাবকত্বের আদর্শে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের চতুর্দ্দশ অ্যাসেম্বলীতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিনিধি স্যর জন সাইমনকে পর্দ্দার আড়ালে এইরূপ শক্তিসম্মেলনের সাফাই গাহিতে চেষ্টা করিতে শুনিলাম। কিন্তু তাঁহার কথায় অন্যান্য ক্ষুদ্র শক্তিগুলি বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নাই। জেনেভায় অনেকের সঙ্গেই আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, অনেকেরই ঠিক এই সম্বন্ধে অভিযোগ রহিয়াছে।

আজ দেখা যাইতেছে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাহার আদর্শের প্রতিকূলে পুরাতন রাষ্ট্রনীতির ভেদমূলক ধারায় আর একবার গা ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছে। অথচ মুখে তাহারা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ বড় জোর করিয়া প্রচার করিতেছে। কারণ এ কথা সত্য যে, জগতে নৈতিক শক্তির একটা মূল্য, মহৎ আদর্শবাদের একটা সম্মান আছে; তাহাকে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অস্বীকার করিয়া বেশী দিন চলা যায় না। বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের আদর্শের পিছনে একটি নৈতিক শক্তি আছে। এই জন্যই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কারণ সে আশ্রয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শের বাহ্য স্বীকৃতি, বর্ম্ম-স্বরূপে তাহাদের গোপন স্বার্থ নীতিকে রক্ষা করিতে পারে। ইহার আড়ালে থাকিয়া অনেক কিছু অভিসন্ধি সিদ্ধ করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত ঘটনার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক রাজনীতির একমাত্র কেন্দ্র হইতে পারে নাই। তাহার আজ বহু কেন্দ্র; লণ্ডনে, প্যারিসে, রোমে, টোকিওতে, মস্কোয় এই কেন্দ্রগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আজ কোন একটি বিশেষ পন্থা অনুসৃত হইতেছে না। টোকিওতে, মস্কোতে, লণ্ডনে কোনখানেই মিল হইতেছে না। এই জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্র আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কখন কোথায় কি ঘটিবে কেহই বলিতে পারে না।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন বৃহত্তর শক্তিগুলি পরস্পরের প্রতি সন্দেহে ভয়ে শঙ্কিত চিত্তে ট্র্যাজেডির অপেক্ষায় কাল গণিতেছিল, আজও কতকটা সেইরূপ ঘটিয়াছে। আসন্ন ভাবী বিপদের ভয়ে সকলেই আজ ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিব, পিছনে রহিয়াছে আমাদের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। রাজনীতিকে যাহারা ব্যবসায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাহাদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। এদিকে তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত পুরাতন পথে চলিতেছে। সে চলা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং তাহাতে তাহাদের স্বার্থও আছে। ফলে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ও জগতের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। যদি জনসাধারণ নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ বুঝিতে পারে, এবং রাজনীতি যে বিলীবিকার ব্যাপার নহে তাহা বুঝিয়া রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠে, ইহা যদি তাহারা বাক্যে ও কর্ম্মে স্বীকার করিয়া লইতে পারে যে, সমষ্টির মঙ্গলে ব্যষ্টির মঙ্গল সুতরাং বিশ্বের মঙ্গলে পরিণামে স্বদেশেরই মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের অন্ন যাইবে সত্য, কিন্তু শুধুমাত্র সেইভাবেই ভাবী কল্যাণ ও শান্তির সন্ধান মিলিবে, যুদ্ধের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য দূর হইবে। ইহার জন্য জনসাধারণের শিক্ষা ও দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ্য মহৎ, সুতরাং তাহা লাভের জন্য কোন দুঃখ স্বীকারই বড় নহে।

এই জন্যই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে তাহার আদর্শ ও কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে, তাহা কি করিয়াছে এবং কি করিতে চাহিয়াছে এবং কি করিতে পারে নাই সেই সম্বন্ধে আমাদের আজ জানা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

অন্তঃপুর

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

ভানুমতীর খুলি

স্যর জর্জ্জ গ্রে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একটি আশ্চর্য্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দ্রব্যটি এই যাযাবর জাতির নারীর সম্পত্তি; স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় ইহারা এই সম্পত্তি বহন করিয়া ফেরে। সম্পত্তিটি আর কিছু নয়, একটি খুলি মাত্র। এই খুলিতে তাহারা যেসব জিনিষ লইয়া পুরুষের পিছনে পিছনে দৈনিক বিশ পঁচিশ মাইল পরিভ্রমণ করে, গ্রে সাহেব সেগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন। তালিকাটি এইরূপ—একটি শিল-পাটা, ছুরি-কাঁচি, বর্শাফলক তৈয়ারী করিবার মত একটি ধাতুদ্রব্য, মুড়াল হিসাবে ব্যবহার করা যায় এমন একটি পাথর খণ্ড, এক পাত্র আঠাজাতীয় জিনিস, এই আঠায় অস্ত্র মেরামত করা যায়, কাঙ্গারুর নাড়ীভুঁড়ি—সুতা কি দড়ি হিসাবে ব্যবহার্য্য, কাঙ্গারুর হাড় হইতে প্রস্তুত সূঁচজাতীয় পদার্থ, কোমরবন্ধ করিবার জন্য বেণীর লোম, কাঙ্গারুর চামড়া—অস্ত্র শানাইবার জন্য এবং একটি মাটি খুঁড়িবার জন্য ডাণ্ডা।

পথ চলিতে চলিতে রাত্রি হইলে আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। তখন ডাণ্ডাটি দিয়া কোন বৃক্ষতলে এই বর্ব্বর রমণী আটটি গর্ত্ত করে; আটটি গর্ত্তে আটটি দণ্ড দেওয়া হয়, এবং তাহার উপর ছোট ছোট গাছের ডাল দিয়া, তৃণাস্তরণ সাজাইয়া, গাছের বাকল বিছাইয়া রাত্রের জন্য আশ্রয় নির্ম্মিত হয়—পাখীর বাসার মত, কিন্তু একটি মাত্র রজনীর জন্য।

সকাল হইলে বাসা ভাঙ্গিয়া ডাণ্ডা লইয়া বর্ব্বর নারী বন-বাদাড় চুঁড়িয়া, মৃত্তিকা খুঁড়িয়া আহারের জন্য উদ্ভিদের মূল সংগ্রহ করিয়া আনে। সেই উদ্ভিদের মূল খাইয়া পুরুষ ও ছেলেমেয়েরা আবার পথ চলিতে সুরু করে।

মানব-জীবনযাত্রার আদিমতম সম্পদ এই বর্ব্বর নারীর স্কন্ধবিলম্বিত ভানুমতীর খুলি।

পুরুষ যখন পশুর মত হিংস্র, মাত্র শিকার করিয়া ফেরে, তখন নারী তাহার সন্তানকে শীতাতপ হইতে বাঁচাইবার জন্য গৃহনির্ম্মাণশিল্প আবিষ্কার করিয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ-ব্যবস্থা সাঙ্গ হইলে নারী তাহার সন্তানের জন্য পরিধেয় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাসমেনিয়ার সেদিনও নগ্ন পুরুষের চর্ম্মনীর পরিধানে পশুচর্ম্মের আচ্ছাদন দেখা

সম্রাজ্ঞী থিওডোরা। রাভেন্না, মোজেক অঙ্কিত।

গিয়াছে। পুরুষকে শিকারে করিয়া ফিরিতে হয়, পরিধেয় তাহার কাছে অপ্রয়োজনীয়, বাধা স্বরূপ।

মানব-জীবন-ইতিহাসের দুইটি প্রধান বিভাগ - এক, যখন মানুষ বর্ব্বর ছিল; দুই, মানুষ যখন সভ্য হইল। প্রথম

যুগের যে-পরিচয় আজও পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে নারী তাহার প্রকৃতিগত সন্তান-বাৎসল্যের তাগিদে পুরুষকে হাতে ধরিয়া সভ্যতার স্তরে টানিয়া আনিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ব্বর জাতির ইতিহাস এই।

আজও বর্ব্বর জাতিদের জীবন-যাত্রাপ্রণালীতে ইহাই লক্ষ্যের বিষয়—পুরুষ আগে আগে চলিয়াছে, হাতে তাহার আত্মরক্ষার অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নাই, পিছনে নারী চলিয়াছে, তাহার স্কন্ধে ঘরকন্নার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম, ওজন প্রায় দেড় মণ, কোলে সদ্যোজাত স্তন্যপানরত শিশু। ভাবিলে মনে হয়, কি অসম্ভব কষ্ট এই স্ত্রীলোকটির; কিন্তু যিনি এই অবস্থায় সে-নারীকে দেখিয়াছেন, তিনি বর্ণনা দিয়াছেন, মুখ তাহার হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে, অতি স্বচ্ছন্দে সে তাহার এই বিপুল বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে, দুই একটি হাসির কথাও যে তাহার পুরুষ সঙ্গীর সহিত চলিতেছে না, এমন নয়। বিশপ সেলাউন লিখিয়াছেন,—মনে হয় খারাপ, কিন্তু আসলে শ্রমবিভাগের (division of labour) এমন সুন্দর নিদর্শন দুষ্প্রাপ্য দেখা যায়।

পৃথিবীর আদিম যুগের এই ছবি।

হাজার হাজার বছর ধরিয়া পুরুষে কেবল মারিবার অস্ত্র শান দিয়াছে, বাঁচিবার ব্যাপার একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েরা চালাইয়া আসিয়াছে। প্রথমে শিকারের নেশা, তারপরে আসিয়াছে যুদ্ধের যুগ—দুই যুগেই পুরুষকে দেখি জীবন-নাশের যন্ত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত, এবং নারীকে দেখি জীবন-রক্ষায় একান্ত ব্যাপৃত।

আশ্রয়ের জন্য পুরুষ যখন পাহাড়ের গুহায় গুহায় ফিরিতেছে, সেই অবসরে নারীর মাথায় গৃহনির্ম্মাণের কৌশল খেলিয়া গিয়াছে। কেন না নিত্য গুহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এদিকে কোলের শিশুকেও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাখা যায় না—তাহার মাথার উপর একটা আচ্ছাদন চাই-ই।

পৃথিবীর প্রথম দর্জ্জি ও প্রথম তন্তুবায় যে এই নারী-ই, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শিকার করিয়া পশু আনিয়া পুরুষ আহার্য্য মাংস সংগ্রহ করিয়াছে, সেই পশুচর্ম্ম হইতে নারী পরিধেয়, তাঁবু ও নৌকার আচ্ছাদন আবিষ্কার করিয়াছে। গৃহস্থালীর দ্রব্য বহিবার দায়িত্ব নারীর, সেই দায়িত্ব সুসম্পন্নে সম্পন্ন করিতে লতার সাহায্যে তাহাকে বহিবার ঝুড়ি তৈয়ারি করিতে হইয়াছে—বয়নশিল্পের জন্ম সেই প্রথম।

বহুশত বৎসর পরে এই লতাপাতার ঝুড়ির পাশে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে নারী-ই।

সুতরাং গ্রে সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া যে কুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে যদি তান্ত্রমতীর কুলি বলা হয়, তবে খুব অন্যায় হয় না। এই কুলিতেই মনুষ্য-সভ্যতার জন্ম,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই কুলি হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন জিনিষ বাহির হইয়াছে। আজ দেখি সে-ঝুড়িতে মাটি খুঁড়িয়া ঘর বাঁধিবার জন্য দও, কাল দেখি তাহার পাশে একটি তুলপুণ আসিয়া জুটিয়াছে, পরশু দিন দেখি দড়ি, এবং আরও কয়েকদিন পরে দেখি একটি মানুষও কেমন করিয়া এই কুলির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

অলক্ষ্যে যাদুকর বনমানুষের হাড় ঘুচাইয়া, এক, দো, তিন করিয়া বর্ব্বর নারীর এই তান্ত্রমতীর কুলিকে দিনের পর দিন পুরুষের কাছে আশ্চর্য্য জিনিস করিয়া তুলিয়াছে!

মানু ও তাঁত দেখিবার বিস্ময় পুরুষের তখনও কাটে নাই। একদিন শ্রান্ত ক্লান্ত পুরুষ শিকারে গিয়া শিকার না পাইয়া খালিহাতে ফিরিয়া আসিয়াছে—সারাদিন পরিশ্রমের পর খাদ্যাভাবে সে অবসন্ন, তখন কোথা হইতে কি করিয়া নারী তাহার সম্মুখে আহার্য্য তুলিয়া ধরিয়াছে—মাংস নয়, উদ্ভিদ।

মনুষ্য জীবনের ইতিহাসে কৃষিশিল্পের জন্ম সেই দিন।

সেদিন পুরুষের বিস্ময়ের অন্ত থাকে নাই—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বনে-বনে ঘুরিয়া সে যাহা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, নারী মাত্র তাহা মাটি খুঁড়িয়া আনিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সে একদিন। আজ পাঁচ হাজার বৎসরের পর এই সভ্য জগতে বসিয়া সে দিনের কল্পনা করা মুস্কিল। প্রকৃতির সহিত মানুষের সেদিন নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—প্রকৃতি সেইদিন হইতে মানুষের দুই হাত ভরিয়া রক্তপাতের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া নয়, স্বেচ্ছায় আহার্য্য তুলিয়া দিয়াছেন।

কাব্য করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, ভাববিলাসিতারও কারণ নাই, নিতান্ত ঐতিহাসিক নীরস তথ্য হিসাবে এই কথাটি তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, বন্য পশুর স্তর হইতে মানুষকে সভ্য মানবের স্তরে টানিয়া তুলিয়াছে স্ত্রীলোক।

তাহুমতীর খুলির একটি বিশেষ বস্তুর উল্লেখ পূর্বে করা হয় নাই—প্রায় এক ছাত পরিমাণ একটি প্রস্তরখণ্ড ; এই পাথর আগুনে তাতাইয়া অসভ্য মানুষ সংগৃহীত আহার্য্য চলসাইয়া লইত। সেই পাথর আর শিল-পাটা বর্ত্তমান যুগের গ্রাইণ্ড ও ক্রাশিং-মিলের আদিপুরুষ।

আমাদের দেশে আজও শিল-পাটার ব্যবহার আছে—ঢেঁকি ও জাঁতাও অপরিচিত নয়, কিন্তু ঢেঁকিকল ও জাঁতাকলের যে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে শিল-পাটা, ঢেঁকি ও জাঁতাও যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু তাহুমতীর খুলির মধ্যে গৃহস্থালী আর সংবদ্ধ থাকিল না।

শিকারী পুরুষ যেদিন কৃষক হইল, সেদিন তাহার গৃহের পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করিল। পুরুষ তখন গোপালক, নারী গৃহিতা হইয়া গোদোহন করে। অগ্নি আবিষ্কার করে পুরুষ, গৃহাগ্নি রক্ষা করে নারী। নৌকা তৈয়ারী করিয়া পুরুষ নদীতে ভাসিয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িল, নারী স্থলে ভেষজ আবিষ্কার করিল। পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম প্রভাতে নারী ও পুরুষে বহুল থাকিয়া এক পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল। এবং প্রাচীনতম সভ্যতায় দেখি, নারী কেবল গৃহকার্য্যেই ব্যাপৃত নয়, রাষ্ট্রেও তাহার আনাগোনা চলিতেছে। ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বাবিলন-রাজ খামুরাবির আইনে দেখি, নারী সুপ্রতিষ্ঠিত। মিশরে একটি সম্রাজ্ঞীও রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন,—অনেককে পৌরহিত্য ব্রত-চারিণী দেখি। বৈদিক ভারতেও তাই। সে যুগে দেবতা অপেক্ষা দেবীর প্রাধান্য বেশী। বাবিলনের ইষ্টার, মিশরের আইসিস্, আসিরিয়ার আস্টার্টি, ইহাঁরা সকলেই দেবী।

অতঃপর পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর দুর্দ্দিন সূচিত হইল। ধীরে ধীরে পুরুষ নারীর হাত হইতে একটি একটি করিয়া সমস্ত কাজ কাড়িয়া লইল। তাহার মূল হইতে তাহুমতীর খুলি বহুদিন আগেই নামিয়াছিল। অলক্ষ্যে যাদুকর তখন হইতেই পুরুষের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহার বনমানুষের হাড় পুরাইয়া তিনি এক, দো, তিন করিয়া পুরুষকে রক্ষকে আনিয়া খাড়া করিয়া নারীকে অন্ধকার নেপথ্যে সরাইয়া দিয়াছেন।

সভ্যতার প্রভাতসূর্য্য তখন আকাশে একটু উঠিয়াছে, ঈষৎ বেলা হইয়াছে।

তারপর।

গ্রীক-সভ্যতার

সিরেনার নারীরা শত্রু কর্তৃক বিজয় স্মরণের প্রাচীর মেরামত করিতেছেন (১৫১৩

উষালগ্নে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। নারী ছিল পুরুষের সহচরী, সহধর্ম্মিণী। পুরুষ নারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ইঙ্গিতে চলিত। নারী ছিল পুরুষের প্রেরণা, পুরুষের শক্তি

বারের অধীশ্বরী ছিল নারী। কিন্তু মানব-সভ্যতার পরবর্তী যুগ রক্তপাতে পিচ্ছিল, জাতিতে জাতিতে তখন হিংসা ও বিদ্বেষ, এ যুগ হইতেছে মারণের ও সামরিকের যুগ, শাণিত খড়্গের তখন স্বার্থের সংঘাত বাধিয়াছে। তখন পুরুষের পাশবিকতা আবার বন্যা ছিঁড়িয়াছে, শাণিত খড়্গের দর্শন নারীকে তাড়িয়া করিতে সুরু করিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া পুরুষ স্মৃতি করিয়া তাহার সন্তানের পথ উন্মুক্ত করিয়াই রাখিয়াছিল। এই যুগে তাহাকে সে স্রোতের মহাখানে নিক্ষেপ করিল।

নারীপ্রকৃতির যাহা চরম উৎকর্ষ হইয়া বর্বর যুগে নারীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিল, সভ্যতার যুগে দেখি, তাহার প্রকৃতির সেই দিকটাই তাহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছে। গৃহ যে নারী নির্মাণ করিয়াছিল, সে নিজের প্রয়োজনে নয়—সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য। অতি সামান্য পরিসর সে গৃহের। কৃষিশিল্পের আবিষ্কারও নারী করিয়াছিল এই বাৎসল্য হইতেই। ছেলেকে খাওয়াইবার জন্যই সে মাটি খুঁড়িয়া উদ্ভিদের মূল সংগ্রহ করিয়াছে। নারীর কৃষিও অতি বিস্তৃত নয়। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে পুরুষের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ বড় হইল, কৃষিক্ষেত্র আয়তন লাভ করিল। নারী পুরুষের বাড়াবাড়ি দেখিয়া হাসিয়া সন্তানকে লইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। পুরুষ তাহার রচিত কৃষিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল।

নারী আপত্তি করিল না, যেমন নীরবে সে কাজ করিয়াছিল, তেমনই নীরবে সে কাজের ফল হইতে দূরে গেল। পুরুষ সে ফল ভোগ করিল। নারী তখন হইল পুরুষের ভোগের সামগ্রী, বিলাসের উপকরণ মাত্র।

চীনের নারীকে এই যুগের প্রতীক হিসাবে দেখিতে পাই। চীনাদের মধ্যে দেখি এই সময়ে লেখা হইয়াছে, বধূ ঘরের ছায়ামাত্র, স্বামীর প্রতিধ্বনি ছাড়া সে আর কিছুই নহে। দশ বৎসর বয়স হইতে মেয়েরা বাড়ীর বাহির হইবে না। গৃহে বসিয়া সে সেলাই ও পশমের কাজ শিক্ষা করুক, নম্রতা শিক্ষা করুক।

মনুসংহিতাও সমসাময়িক গ্রন্থ।

এদিকে গ্রীক সভ্যতা তখন আর এক ধাপ উঠিয়াছে, নারীরা স্বাধীন হইয়াছে। সেই স্বাধীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নারীর গৌরবের নয়। ক্লিয়োপেট্রা সেই লজ্জাকর ইতিহাসের একটি নিদর্শন।

রোমক সভ্যতায় দেখি নারীর অবস্থা একটু ফিরিয়াছে। রাজ্ঞী থিয়োডোরা এই যুগের। সামান্য নর্তকী হইয়াও তিনি জাস্টিনিয়ানের মহিষীর পদের সম্মান রাখিয়াছিলেন, এবং শেষে কৃতিত্বের সহিত নিজেই সাম্রাজ্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

তার পর খ্রীষ্টান সভ্যতার যুগ। খ্রীষ্টান ধর্মের মূলসূত্র নারীর স্বপক্ষে ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা তাহার বিরুদ্ধে গিয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর আষ্টেপৃষ্ঠে তখনও এথেন্সের সভ্যতার বন্ধন—য়িহুদীদের পদচিহ্ন তখনও মোছে নাই। সেই পদচিহ্ন বাইবেলের ইকনোক্লাষ্টিকাস বহন করিতেছে, পুরুষ যদি মন্দ হয় তবু ভাল, নারী ভাল হইলেও মন্দ। সেন্টপল সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিলেন। সেই পদচিহ্নই ইংলণ্ডের ইতিহাস পর্যন্ত চলিয়াছে, মিল্‌টনের 'পারাডাইস লষ্ট' সেই ক্ষীয়মান পদচিহ্নের মধ্যেই পড়ে।

যোনান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। দলে দলে উত্তর ইউরোপ হইতে বহু জাতি আসিয়া ইউরোপের ইতিহাস রচনার সূচনা করিল। এই সব জাতি মূলতঃ কৃষিপ্রধান সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং এই জাতিদের অনুশাসনের সঙ্গে নারীর ভাগ্যাকাশেও ঈষৎ অরুণরেখা দেখা দিল।

বিশ্ব-সভ্যতায় টিউটনদের দান এই। অ্যাংলোসাক্সন জাতি বহুবৎসরের অবজ্ঞাত নারীশক্তিকে সম্মান দিয়াছে। কিন্তু এ যুগের লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, গ্রীক সভ্যতার সহিত রোমান সভ্যতা, রোমান সভ্যতার সহিত টিউটন সভ্যতা মিশিয়া এমন একটা মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার স্বরূপ ধরা কঠিন।

এই মিশ্রযুগ ফিউডাল যুগ। এই সময়েই 'শিভাল্‌রি'র জন্ম। এই 'শিভাল্‌রি'র যুগ বিশ্ব-পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কের যুগ। কিন্তু মজা এই যে, সকলেই একবাক্যে এই যুগের নারীর প্রতি সম্মান দেখাইবার রীতিকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। আসলে কিন্তু ইহা নারীর পক্ষে সম্মান নয়—পুরুষের খেয়ালপ্রসূত যে-সম্মান সে সম্মান নারীর মর্যাদাজনক নয়। শিভাল্‌রির যুগের নারীকে সম্মান পুরুষের ক্ষণিক খেয়াল মাত্র। এ সম্মান সে নারীকে দেয় নাই, দিয়াছে নিজেকে। তাহা ছাড়া আরও একটি জিনিষ দেখিবার বিষয় এই যে এ যুগের কাব্যে—ট্রুবাডুর কাব্যে কোথাও সত্যকার প্রেমের পূজা নাই, উচ্ছৃঙ্খল বাসনাকে এ কাব্য প্রেমের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে।

এ যুগ নারীর পক্ষে গৌরবের নয়।

এই যুগেরই একজন ফরাসী লেখক লিখিয়া গিয়াছেন—স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখাইয়ো না—লেখাপড়া তাহাকে মানায় না।

সে যুগও কাটিয়াছে। মধ্যযুগের মধ্য হইতেই কোথাও কাপারিন অব দিয়েনা, কোথাও জোয়ান অব আর্ক রূপে নারী বহু যুগের পুরুষ-স্বার্থপরতার নগ্নতা উন্মোচিত করিয়া দেখাইয়াছে। শিশু মাডোনা মূর্তি মধ্যযুগেরই।

দেখিতে পাই, ধীরে এই মাডোনার মূর্তি সভ্যতার পথকে আলোকিত করিতেছে। এই মূর্তিই পৃথিবীর স্বীকৃত নারী-মূর্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার পটভূমিকায় নারীর এই মাতৃমূর্তিই ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে। এ মূর্তির সহিত বর্তমান যুগের নারীমূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। পেত্রিক্লেজ, কনস্টান্টিনাস, মনুর যুগের পক্ষ এ মূর্তিকে এতটুকু ম্লান করে নাই।

মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই মূর্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

কোথায়, কবে, কোন্ অন্ধকারে মানুষমতীর কুলি-নারী ফেলিয়া আসিয়াছিল; দেখিতেছি, সেই কুলি অলক্ষ্যে যাদুকর আবার তাহার স্কন্ধে ঝুলাইয়া দিয়াছেন—নেপথ্যে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়, এক, দো, তিন···।

ডেকোনা আমায়

ডেকোনা আমায়! বিনা আহ্বানে তব
যাব আমি মন্দিরে,
মাথাটি আমার নত করে রেখে দেব
তোমার চরণে ধীরে।
শুনিব তোমার সকল আদেশ-বাণী,
সঙ্কোচে রব আদেশ-প্রতীক্ষায়,
বেঁধে রেখে দেব ক্ষণিক মিলনখানি—
কামনা করিব ফিরিয়া পাইতে তায়।
হায় মানিয়াছি প্রবল আবেগে তব,
ঘন অনুরাগ-ভারে চির দুর্বল,
কখনো বা দাসী, কখনো বা প্রিয়া তব
চিরদিন তরে বিকায়েছি সম্বল।*

* আলেকজাণ্ডার ব্লকের কবিতা হইতে।

আছিল সেদিন

—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আছিল সেদিন, শুভ্র শুক্ল মল্লিকাময় দিন,
পুষ্পেরে হেরি কেঁপেছিল ভয়ে হিয়া মোর চকলা,
হেনকালে তুমি লুটে এলে নিতে মোর প্রাণ অতি লীন,
গভীর রাত্রিবেলা।

মোর শঙ্কিত হিয়া। প্রেমে বুক ভরি এলে তুমি নীরবেতে,
ঠিক তার আগে স্বপনেতে আমি ভেবেছিনু তব কথা।
এলে তুমি যবে কাহিনীর মত স্তব্ধ মুহূর্তেকে
উঠিল বাজিয়া রাত্রির নীরবতা।*

* রাইনার মারিয়া রিল্‌কের জার্মান হইতে।

মা *

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

[এক]

আজ রাত্রেও মনে হ'ল, পল আবার বাইরে বেরুবার জোগাড় করছে।

পাশাপাশি ঘর থেকে মা বেশ শুনতে পাচ্ছেন, তার ছেলের মত চলাফেরা। হয়ত তাঁর আলো নিভিয়ে বিছানায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছে।

মা আলোটা নিভিয়ে দিলেন, কিন্তু শুতে গেলেন না।

দরজার পাশে গা ঘেঁসে, দুটো হাত খুব শক্ত করে জোর করে বসে রইলেন। চাকরাণীর কাজ করে করে হাত কড়া হয়ে গেছে। মনে সাহস পাবার জন্যে একটা বুড়ো আঙুলের উপর আর একটা বুড়ো আঙুল জোরে চেপে ধরছেন। অবশ্যি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠতে লাগল। মনে মনে যে দৃঢ় আশা হচ্ছিল, এইবার তাঁর ছেলে, শান্ত হয়ে বসে বই পড়তে আরম্ভ করবে, কিম্বা বিছানায় শুতে যাবে, সে আশা কমে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তরুণ পাদ্রীর সেই সাবধানে চলা-ফেরার শব্দ আর শোনা গেল না। মার নিজেকে বড় একলা মনে হ'ল।

বাইরে তখন সেই ছোট গির্জে-বাড়ীর পিছনে উঁচু জমির ধারে ধারে যেসব গাছ ছিল, তাদের পাতার ঝির্ ঝির্ শব্দের সঙ্গে বাতাসের শব্দ মিশতে লাগল। বাতাস যে খুব জোর তা নয়, কিন্তু তার বিরাম নেই, একঘেয়ে বয়েই চলেছে। বাড়ীটাকে ঘিরে একটা অস্বস্তিকর শব্দ উঠছে, বাড়ীটা যেন কাঁচ কাঁচ করে ডাকছে। মনে হচ্ছে যেন অশরীরী কারা সব চারধার থেকে বাড়ীটাকে চেপে আসছে, বুঝি মাটি থেকে একেবারে উপড়ে ফেলে দেয়।

অনেকক্ষণ হ'ল মা বাড়ীর দরজা বন্ধ করেছেন। দুটো কাঠের তাগাকে ক্রুশের মত করে আটকে দিয়েছেন, পাছে শয়তান এসে রাত্তিরে বাড়ীতে ঢোকে। শয়তান ঝড়ের রাতে মানুষের আত্মাদের জন্যে যে ঘুরে বেড়ায়! যদিও এসব কথায় মার খুব বেশী আস্থা ছিল না, তবুও তাঁর মনের ভেতর কেমন ভাবনা হ'তে লাগল, নিজেকে যেন খোলা মনে কল্পনা করলেন, তাঁর মনে হ'ল শয়তান নিশ্চয়ই এই ছোট বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে—পলের গেলাস থেকে জল খেয়েছে, আর পলের জানালার পাশে যে আরসীখানা আছে, তার আশেপাশে ঘুরছে আর কুঁকে কুঁকে পড়ছে।

ঠিক সেই সময়েই আবার পলের ঘোরা-ফেরার শব্দ শুনতে পেলেন। যদিও আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখা পাদ্রীদের একেবারে নিষেধ, তবুও হয়ত পল সেই আরসীর সামনেই দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে।

মার মনে পড়ে গেল, এই কিছুদিন ধরে কয়েকবার তাঁর চোখে পড়েছে, পলের ঘরে যেতে গিয়ে যে, পল সেই আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের মত হাতের নখ পরিষ্কার করছে, ঘষে চকচকে করছে, যা এতকাল ধরে বড় বড় লম্বা লম্বা ছিল। বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, চুলগুলো আগের চেয়ে সে বড় বড় রেখেছে। সেই লম্বা লম্বা চুল দিয়ে মাথার যে কামান পবিত্র দাগ, পাদ্রীর, সেটা ঘাড় ফিরিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। তার পর সে আজকাল আবার সুগন্ধ মাখছে, গন্ধ-গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজছে, এমন কি, তার ভুরু পর্যন্ত আঁচড়ে ঠিক করে মিলিয়ে নিচ্ছে।

তাঁর বোধ হ'ল ঘরের দেয়াল আর নেই। তিনি স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছেন, একটা কালো ছায়ার আকৃতি তার ঘরের সাদা চুণকাম-করা দেয়ালের গায়। দীর্ঘ, অনেকখানি দীর্ঘ; কোন দিকে দৃকপাত নেই, বালকের মত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, কেবলই হোঁচট খাচ্ছে, কেবলই পা হড়কাচ্ছে, কিন্তু সর্বক্ষণই মাথা সোজা উঁচু করে রেখেছে। সরু ঘাড়ের তুলনায় মাথাটা যেন একটু বড়। মুখখানার একটু ফ্যাকাশে, ফিকে রঙ, চওড়া কপাল তাকে ঢেকে রেখেছে এমন ভাবে, মনে হয় যেন যখন-তখনই সে ভুরু কুঞ্চিত করছে, আর বড় বড় চোখ তার ভারে আধ-বোজা হ'য়ে রয়েছে। জোরাল চোয়াল, খুঁতিটার দৃঢ়ভাব একে তাড়াবার জন্যে থেকে থেকে ঘৃণায়

* গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার The Mother হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। দেলেদ্দা ইতালিয়ান লেখিকা। ১৯২৭ সনে এই উপন্যাসখানি লিখিয়া তিনি সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

বিদ্রোহ করে উঠছে বটে, কিন্তু ভুরুর ও কোঁচকানি মুছে ফেলে দিতে ঠিক যেন সে পেরে উঠছে না।

কিন্তু এখন,—ওই ত সে আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে, আর তার মুখখানা আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠল। চোখের পাতা সবটা খুলে গেল, তার সেই কটা চোখের তারা যেন দুটো মণির মত জ্বলছে।

সত্যি সত্যি মার বুকের ভেতর, ছেলেকে অমন সুন্দর আর বলশালী দেখে আনন্দ যেন উথলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তার সেই চোরের মত পা ফেলার শব্দ শুনে, আবার মায়ের মন সেই আগের মত উৎকণ্ঠায় ভরে গেল।

সে এইবার বের হ'য়ে যাচ্ছে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। সে ঘরের দরজা খুললে, আবার চুপ করে দাঁড়াল। বোধ হয়, সেও কান-খাড়া ক'রে বাইরের শব্দ শুনছিল। কিছুই শোনা যাচ্ছে না, শুধু বাড়ীটাকে ঘিরে যে বাতাস ধাক্কা দিচ্ছিল, তারই শব্দ।

মা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, চীৎকার করে বলতে গেলেন, "বাপ আমার, তুই যে ভগবানের সন্তান, এইখানে থাক!" কিন্তু মায়ের ইচ্ছার চেয়ে, একটা জোরাল শক্তি তাঁকে বসিয়ে রেখে দিলে। তাঁর হাঁটু দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, যেন সেই নারকীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে···হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। কিন্তু তাঁর পা দুটো নড়তে চাইল না। মনে হ'ল যেন দুটো অদৃশ্য হাত তাঁকে সেখানে বসিয়ে রাখতে জোর করেই বাধা করলে।

এই রকমে পল নিঃশব্দে চোরের মতন নীচে নেমে গেল, দরজা খুললে, বেরিয়ে পড়ল। বাতাস যেন তাকে গিলে ফেলে, চকিতের মধ্যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

শুধু ঠিক তার পরই মা উঠে দাঁড়াতে পারলেন, আবার আলো জ্বাললেন। কিন্তু এও তিনি অতিকষ্টেই পেরে উঠলেন। একেবারে ফস্ করে দেশলাই জ্বালা হল না। দেয়ালে ঘসে ঘসে বেগুনী-আলোর রাগ দেয়ালময় হল। তার পর সেই পেতলের পিদীম থেকে ছোটঘরের ভেতর অস্পষ্ট আলো মিলে। খালি ঘর, গরীব চাকর-চাকরাণীর ঘরের মত, কোন জিনিষপত্র নেই। তিনি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন; তখনও তিনি কাঁপছেন। তবু আড়ষ্ট কাঠের মত হয়ে চললেন। ছোট চওড়া মেঝ, মাথাটা বড়, মোটা কাল একটা পোষাকে মেহটা ঢাকা, ঠিক যেন একটা ওক গাছের গুঁড়ি থেকে কুড়ুল দিয়ে কেটে একখানা তক্তার মত, সেই আকৃতিটা যার করা হয়েছে।

ঘরের চৌকাঠ থেকে নীচের পাথরের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দুপাশে সাদা চুণের দেয়াল, সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে, একেবারে শেষে নীচে দরজা, কব্জার আঁটা, বাতাসের ধাক্কায় বন্ বন্ করে কেঁপে উঠছে। তার পর যখন দেখতে পেলেন যে, ক্রুশের মত দেওয়া সেই কাঠের ডাণ্ডা দুটো, পল খুলে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে গেছে, তখন একেবারে রাগে আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠলেন।

আঃ—নাঃ—শয়তানকে তিনি নিশ্চয়ই হারিয়ে দেবেন। তখন আলোটা সিঁড়ির মাথার ওপরের ধাপে রেখে নেমে গেলেন; আর নিজেও লেগিয়ে পড়লেন।

ঝড়ো হাওয়ার বাতাস তাঁকে আইকে ধরলে, হাওয়ার জোরে ঘাঘরা ওড়ে, মাথার বাঁধা রুমাল ছিনিয়ে নেয়, যেন তাঁকে জোর করে বাড়ীতে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। রুমাল খানা কসে খুঁতির নীচে বেঁধে নিয়ে, সামনের দিকে মাথায় ঝোঁক দিয়ে পথের সকল বাধাকে ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ ভরে ঠেলে এগিয়ে যেতে চান। গির্জ্জেবাড়ীর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন, রান্নাঘরের বাগানের পাঁচিলের ধার পেরিয়ে গেলেন। গির্জ্জের সামনে ছাড়িয়ে গেলেন, কিন্তু পাশে এসেই একেবারে থমকে গেলেন। পল সেখানে মোড় ঘুরল, অতি তাড়াতাড়ি, একটা কাল বৃহৎ-আকার পাখীর ডানার মত তার গায়ের ফ্রোকটা শব্দ করছে। মাঠ দিয়ে যেন সে উড়ে চলে গেল। ওই যে সেই পুরোনো বাড়ী, মাঠের ওধারে, গ্রামের শেষ সীমার যেখার যাবে—ওই যে পুরোনো বাড়ীটা।

চাঁদের মুখখানা পরিষ্কার চক্‌চক্ করছে। এলো-মেলো আলোটা কখন নীল, কখন হলদে। এক একবার বড় বড় মেঘ ঢেকে দিচ্ছে। লম্বা-লম্বা সবুজ ঘাসের মাঠের ওপর আলো ঘুরে যাচ্ছে। গির্জ্জের সামনের চৌমাথায় উঁচু চাঁদনি, সোজা খাড়া রাস্তার দুধারে দুখাক কুঁড়ে-ঘরের সারি, ঘুরে ফিরে সেই উপত্যকার গাছের সারির মধ্যে মিলিয়ে গেছে, উপত্যকার বুকের উপর দিয়ে একটা ধূসর ঘোরাল পথেরই মত নদীটা এঁকেবেঁকে গিয়ে ঘুরবার পথে অন্য এক নদীর

সঙ্গে মিশে গেছে। বাতাসে তাড়া-খাওয়া মেঘ একবার করে সেই দৃশ্য ফুটিয়ে তুলছে, একবার করে তাকে ছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে, দূরে গ্রামের সেই শেষ সীমারেখার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের ভেতর কোথাও একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না, একটা ধুঁয়োর মত সোঁয়ার রেখাও না। দারিদ্র্যের চাবুক-খাওয়া কুঁড়ে-ঘরগুলোর সবাই এখন ঘুমুচ্ছে। সবুজ ঘাস ওয়া পাহাড়ের গায়ে সেই সারি সারি কুঁড়েগুলো যেন ঢালাক রেড়ার সারি, আর ওদিকে গির্জ্জের যে সরু চূড়ো, পিছনের উঁচু জমির ঘাসের সঙ্গে মিশে দেখাচ্ছে যেন একটা রাখাল তার পাঁচনবাড়ির উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে, ভেড়াদের আগলাচ্ছে।

বড় বড় গাছগুলো গির্জ্জের সামনের পাঁচিলের ধারে, জোর বাতাসের ধাক্কায় দুইয়ে দুমড়ে এধার ওধার দুলে উঠছে, যেন অন্ধকারে কাল গাঢ় আকারবিহীন দৈত্যির দল সব দুলে উঠেছে; আর তাদের সেই সর-সর চীৎকারের উত্তরে উপত্যকার ঝাউগাছ ও বাঁশঝাড়গুলো যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। আর এই সর-সর শব্দের ভেতর রাতের এই কান্না, বাতাসের এই গুমরে গুমরে ওঠা, রাগে-সর-সর মেঘের ভেতর চাঁদ ডুবে যাওয়া, সব—ছেলেকে খোঁজার জন্যে মায়ের যে দুঃখ, তার ভেতর যেন সে সব তলিয়ে যাচ্ছে।

তখনও পর্য্যন্ত মা নিজের মনকে ছলনার ভুল দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন, এই আশায় যে হয়ত তিনি দেখবেন যে, গ্রামের কোন দুঃখী রুগ্ন লোককে দেখবার জন্যে তাঁর ছেলে তাঁর সামনে দিয়েই গ্রামের পথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তা না দেখে, তিনি দেখলেন, তাঁর ছেলে দৌড়চ্ছে, যেন তাকে পিছন দিক থেকে শয়তানে তাড়া করেছে। নিম্নে যাচ্ছে, সেই পুরোনো বাড়ীর দিকে।

আর ওই উঁচু জমির ধারে যে পুরোনো বাড়ীটা ওখানে থাকে···কে, কেউ না, শুধু একটা মেয়ে, যুবতী, সুন্দর···আর? আর একলা···

সাধারণ লোকের মত সোজাসুজি ফটকের কাছে না গিয়ে, পল সোজা একেবারে বাগানের পাঁচিলের ধারে একটা খিড়কী দরজার মত দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সেই মুহূর্ত্তেই দরজা খুলে গেল, আবার তখনই বন্ধ হয়ে গেল, যেন একটা আঁধার কাল ছায়া তাকে আঁধারে তখনি মিলে মেশে।

তখন মাও মাঠ পেরিয়ে মোড়লেন। লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতরে যেখানে পল পা ফেলে ফেলে গেছে, সেই পথ দিয়ে সোজা একেবারে পুরোনো বাড়ীর সেই ছোট দরজার কাছে এসে, গায়ে যতখানি জোর আছে, তার সবটা জোর দিয়ে দরজা ঠেললেন। সে ছোট দরজা কিন্তু খুলল না। বরং মনে হ'ল যেন তারই একটা শক্তি দিয়ে মাকে ঠেলে দিচ্ছে। মা ডাকলেন ধাক্কা মারি, চীৎকার করে ডাকি। দরজার দিকে তাকালেন, কতখানি শক্ত হাত দিয়ে তা বেশ অনুভব হ'ল—শেষে হতাশ হয়ে মাথা নীচু করে কান পেতে শুনতে লাগলেন। কিছুই শোনা গেল না। শুধু বাগানের ভেতরের গাছগুলোর সর্-সর্ মর্-মর্ শব্দ; এই পাপের তারা সহকারী আর সহচরীর দল, নিজেদের এই ঘোরাল শব্দ দিয়ে বাড়ীর ভেতরকার সব শব্দকে ঢেকে রাখছে।

কিন্তু মা ত' ছেড়ে যেতে পারেন না—তাঁকে যে শুনতে হবে, জানতেই হবে—অথবা তাঁর অন্তরের অন্তরে সত্যিত' তিনি জেনেছেন, শুধু মনকে চোখ ঠারবার জন্যে একটা অছিলে খুঁজছেন।

তাঁকে দেখতে পাওয়া বা না পাওয়া, ধরা পড়া বা না পড়া একেবারে অগ্রাহ্য করে, সেই বাগানের পাঁচিলের ধারে তিনি ঘুরতে লাগলেন। বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলেন, সেটা ছাড়িয়ে আঙিনার বড় ফটক পর্য্যন্ত পেরিয়ে গেলেন। চলতে চলতে প্রত্যেক পাথরগুলো হাত দিয়ে দিয়ে দেখতে দেখতে চললেন। খুঁজে দেখতে লাগলেন যদি কোনখানা সরে যায়, আলগা হয়, একটু ফাঁক পাওয়া যায়, যার ভেতর দিয়ে তিনি কোন রকমে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু সব পাথরই অচল, অটল। আস্ত, শক্ত করে গাঁথা,—প্রকাণ্ড চোকবার ফটক, ছলঘরে চোকবার দরজা পরাণে দেওয়া জানালা, সব যেন একটা গুরুতর পাহাড়ে ঘেরার একটু আধটু ফাঁক। চোকা যায় না।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। একটা নীল হ্রদের বুকে যেন জল্‌জল্ করে ভাসছে। বাড়ীর দুমুখটার লাল ছাদকে ঝলমল করে দিলে। তাদের কোণ গুলো যেখানে কোলা ঘাসে ছেয়ে রেখেছে, সেখানটায় আলো ঢেলে দিলে। জানালার ভেতরকার খড়খড়িগুলো একেবারে বন্ধ, আর কাঁচের শার্সিগুলো যেন সবুজ আয়নীর মত চক্‌চক্

করতে লাগল। আর তার বুকের ওপর ভাসা ভাসা মেঘ, টুকরো টুকরো নীল আকাশ, গাছের ঝোলার ছায়া সব আরসীর মত দেখা যেতে লাগল।

মা তখন ফিরে দাঁড়ালেন। ঘোড়া বেঁধে রাখবার যে লোহার কড়া তার ওপর মাথা ঠুকতে লাগলেন। আবার ফিরে সদর ফটকের কাছে এলেন। সেই বড় দরজার সামনে সেই পাথরের তিনটে ধাপ, তার সেই গম্বিক খিলানের বারান্দার নীচে, তার সেই লোহার ফটক দেখে, মা হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করলেন। কাজটা না পারায় নিজের অক্ষমতায় নিজেরই লজ্জা হল। অনেক দিন আগে তিনি তখন ছোট্ট একটি মেয়ে, গ্রামের আরো অন্য গরীব মেয়েদের সঙ্গে দেখা-সেখা পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, বাড়ীর সুমুখে আশা করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কতক্ষণে বাড়ীর মালিক বেরিয়ে দু'চারটে পয়সা ছুঁড়ে দেবেন—তখনকার চেয়েও নিজেকে যেন আরো ছোট মনে হল।

বহুদিন আগের কথা, কখন কখন এমন ঘটত যে, বাড়ীর দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। ভেতে ঢোকবার অন্ধকার পথ সোজা দেখা যাচ্ছে, পাথরের বসবার জায়গা দিয়ে সাজান, পাথর-দিয়ে-মোড়া মেঝে। ছেলের দল চীৎকার করে গোলমাল করতে করতে চৌকাঠের কাছে ছুটে আসত। যেমন একটা গুহার ভেতর চেঁচালে সে শব্দটা আবার ফিরে শব্দ হয়, তেমনি ওই ছেলেদের গোলমালের শব্দে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত চমকে উঠত। তারপর একটা চাকর হয়ত বেরিয়ে এসে তাদের তাড়া দিত।

"এ্যা! তুমি এখানে, তুমিও, মারিয়া মাদালেনা! তুমি বড় মেয়ে হয়েছ, এই সব ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ো-দৌড়ি করতে তোমার একটু লজ্জা হয় না? ছিঃ!"

আর সে, সেই বড় মেয়ে, লজ্জায় মুষড়ে ফিরে আসত। কিন্তু তবুও সে, সেই অন্ধকার বাড়ীটার ভিতর দিকে অবাক হয়ে চোখ তুলে চেয়ে থাকত। এখন আবার ঠিক সেই রকম নিজেকে গুটিয়ে সেখান থেকে সরে এলেন। নিরাশায় কোলে হাতগুলো মুষড়ে মুচড়ে হাতের হাড়গুলো যেন ভেঙে ফেলতে ফেলতে সেই ছোট দরজাটার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন, যে দরজাটা ইঁদুর-কলের মতন টপ করে তাঁর পলকে একেবারে গিলে ফেললে। কিন্তু যখন তিনি বাড়ীর দিকে ফিরলেন, তখন আবার তাঁর মনের ভেতর বড় দুঃখ জেগে উঠল। কেন তিনি চীৎকার করে ডাকলেন না, কেন তিনি দরজার উপর পাথর ছুঁড়লেন না, বাড়ীর ভিতরকার লোক তাহলে বাধ্য হত দরজা খুলে দিতে, আর তাঁর ছেলে পলকে উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়ত করতে পারতেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্যে মনে অনুতাপ হল। মন এদিক-ওদিক দুলে উঠল। ফিরে গেলেন, আবার বাড়ীর দিকে ফিরলেন। যাতনা আর উৎকণ্ঠায় একবার এদিক একবার ওদিক করতে লাগলেন। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। শেষ নিজেকে বাঁচাবার যে সহজাত সংস্কার তাই জেগে উঠল। সকল চিন্তাকে এক জায়গায় জড় করে নিয়ে, সমস্ত শক্তিকে একমুখী করে, বাড়ী ফিরে এলেন। ফিরে লড়াই করবেন বলে, যেমন একটা আহত বন্য পশু তার নিজের গুহায় ফিরে আশ্রয় নেয়।

গির্জ্জেবাড়ীতে ফিরে এসে, তিনি দরজা বন্ধ করলেন, সিঁড়ির নীচের ধাপে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সিঁড়ির মাথা থেকে পিদীমের কাঁপা-আলো এসে পড়ছে, আর সেই ছোট বাড়ীর ভেতর সব ঠিকই রয়েছে, শান্ত, যেন একটা পাহাড়ের গহ্বরের ভেতর বাসা বাঁধা হয়েছে। মনে হল যেন সব এদিক ওদিকে দুলে উঠছে, পাহাড় একেবারে তার ভিৎ থেকে বুঝি উপড়ে দেয়, বাসা বুঝি মাটীতে ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে যায়।

বাইরে বাতাস গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছে, ক্রমে আরো জোরে ডাক দিচ্ছে, সয়তান বুঝি গির্জ্জেবাড়ী চূর্ণ করলে, না, গির্জ্জে যেন, বুঝি সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান ধ্বংস হয়ে গেল।

"হে ভগবান! হে ভগবান!" মা ভুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর গলার আওয়াজে মনে হল যেন মা নয়, অন্য কোন নারী। (ক্রমশঃ)

বেকার

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

বেকার সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। কেউ বলেছেন যে, ইউনিভার্সিটী থেকে পালে পাল বি-এ, এম-এ পাস-করা ছেলে বৎসর বৎসর বেরিয়ে বেকার-গোষ্ঠী বৃদ্ধি করে চলেছে, অতএব হয় পাস করা শক্ত কর, নয়, খুব কড়া রকম বাছাই করে কলেজে ছেলে ভর্ত্তি কর, নয় ত ইউনিভার্সিটীকে একেবারে তেঙ্গে আপদ নিশ্চিন্ত করে দাও।

কেউ বলেছেন, ছেলেদের "ভোকেশনাল" শিক্ষা দাও—হাতুড়ি পেটা, বাটালি চালান থেকে আরম্ভ করে চাটাই বোনা, ঘুচুনী, চুবড়ী তৈয়ারী করা পর্য্যন্ত শেখাও, যা হ'ক করে তারা দুমুঠো খেতে পাবে।

আবার কেউ বলেছেন, চাষ করতে লেগে যাও সকলে, কত অনাবাদি মাঠ পড়ে রয়েছে, চালাও লাঙ্গল, ধর কাস্তে, আমাদের শস্য-শ্যামলা দেশ, তাকে আরও ধন-ধান্যে পূর্ণ করে তোল—আর কিছু না হ'ক লাউটা ত খেতে পাবে।

মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়, বলা বাহুল্য। মরণোন্মুখ আমাদের এই সকল অদ্ভুত উদ্ভাবনা সেই চরম বুদ্ধিরই পরিচয়। কেন না এটা কেউ বুঝছেন না যে, যদি এমনই হয়, আজ যারা হাতুড়ি চালাচ্ছে বা বাটালি ঠুকছে বা ঘুচুনী চুবড়ী বুনছে, তারা ঐ ঐ পেশার দ্বারা উৎপন্ন জিনিষ দিয়ে বাজারের চাহিদা পূর্ণ করতে পারছে না এবং চাহিদা বেশী, পূরণ কম হওয়ায় তারা বেশ দুপয়সা রোজগার করে ওছিয়ে উঠছে—তা হলে না হয়, ঐ ঐ পেশায় আরও চারটে লোক ঢুকলে বড় বেশী এসে যাবে না। কিন্তু যারা ঐ পেশায় আছে তাদেরই যদি বিলাতী, জাপানী কারিগর আর কারিগরীজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় উদরান্নের সংস্থান করা দুরূহ হয়ে থাকে, তা হলে ঐ ঐ পেশায় আবার কতকগুলো লোক ঢুকলে বেকারের বংশ বৃদ্ধি হবেই হবে—তখন সামলাবে কি করে? যে-চাষী প্রাণপাত করে ধান বা পাট বোয়, প্রাণপাত করে তাকে হাজা-শুকোর কবল থেকে বাঁচিয়ে, কোন গতিকে ঘরে আনে, সে কি দেখে না যে, ধানের দাম ১।০ সিকে মণের বেশী ওঠে না, আর পাটও তার চাষের খরচা মিটিয়ে কোন গতিকে উদরান্নের সংস্থান মাত্র করে দেয়—কখনও কখনও তাও দেয় না। এর উপর যদি আবার ফাঁকা মাঠে নূতন চাষের ব্যবস্থা করা যায়—আর পুরাতন চাষী যদি নিজের চাষও চালায় (সে যাবে কোথায়?) তা হলে দুই তরফে উৎপন্ন সে ধান বাজারে এসে ঠেল মারবে তার দাম ১।০ সিকে মণের বেশী হবে, কি কম হবে?

স্কুল কলেজে না গিয়ে ছেলেরা সব চাষ করতে গেল, নয় ত হাতুড়ি পিটতে গেল—বিদ্যা-দান শূন্য করে তারা কেবল পেটের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়ায় তাদের ইতোনষ্ট ততোনষ্ট হবে কিনা? মাথা খালি করে আর আধপেটা খেয়ে তারা কুলি-মজুরের মত নির্ব্বাক হয়ে কপালে হাত দিয়ে বসলে সুবিধা হবে কার? দেশের শিক্ষাটাকে খর্ব্ব করে শুধু "ভোকেশানাল" শিক্ষা নিয়ে বেকার-সংখ্যা ত কমবেই না—শুধু নির্ব্বাকের সংখ্যাই বাড়বে—তাতে সুবিধা হবে কার? যার সুবিধা হবে সে-ই শিক্ষাকে খর্ব্ব করবার ব্যবস্থা করছে, আর কতকগুলি অদূরদর্শী সেই সুর ধরে গাওনা জুড়ে দিয়েছে।

এখন পেটে খেতে পায় না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তারা বুঝতে পারে যে কেন খেতে পায় না—এবং স্পষ্ট করে বলতে শেখে যে, তার জন্য দায়ী কে এবং ধরতে পারে গলদ কোথায়। এই বুঝতে পারা আর বলতে পারা যারা সহ্য করতে পারবে না, বেশ করে বুঝে দেখ দেখি তারাই হাতুড়ি পেটা আর চুবড়ী বোনার ধুয়া তুলেছে কিনা। দেশটাকে নির্ব্বাক করে দেবার জন্য উপর থেকে যা ব্যবস্থা করবার করেও, ফাঁক পেলেই বলতে ছাড়ছে না যারা—তারা কারা? তারা ঐ উচ্চশিক্ষিত লোকগুলো—অতএব একেবারে তার জড় মেরে দাও—জিব কেটে দেবার ব্যবস্থা আজকাল আর চলছে না, অতএব দাও শিক্ষার আদ্যশ্রাদ্ধ করে—যাতে আর কথা কইবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়।

স্বাভাবিক চোখ চেয়ে দেখ দেখি, পেট পুরে খেতে ত পারবে না অনেক লোকে, কিন্তু কথা কইছে কারা? চাষী, কামার, কুমার সকলেই বুভুক্ষাপীড়িত, কিন্তু তারা বেশ অন্ধকারে আছে—অন্ধকারের দোহাই দিয়ে শান্ত হয়ে আছে, আর শিক্ষিতগুলো চেঁচিয়ে সেরু করছে। অতএব শিক্ষাকে

খাট করে যদি তাদের চোখে আবার অজ্ঞানতার অঞ্জন লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যায়—তাহলে কার সুবিধা হয়?

মানুষ করে যে জ্ঞান তাও দেব, আবার হাতুড়ি ধরার এ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করা বড় সহজ কথা নহে।

যুদ্ধের শেষে কামান বারুদ রসদ প্রভৃতি রণপাতি, যখন সকলে মানুষ-মারার উপকরণ প্রস্তুতের কাজ ছেড়ে মানুষ-পোষণের কাজে লেগে গেল, তখন বিশ্ব জুড়ে একযোগে যে পণ্যসম্ভার তৈয়ারী হয়ে উঠল তার কাটতি হল না বলেই আজ পণ্যের বাজারে এই ছরকট এসে পড়েছে—আজ যদি চাষের মাঠে, আর কলকারখানায় "ভোকেশনালে"-শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরের পাল ঢুকে পড়ে মাল তৈয়ারী করতেই থাকে, সে-মালের দামকষে যাবে নাকি? শেষে সে মাল মাল-গুদামেই জমা হয়ে পচবে নাকি?

যে দেশে বড় বড় সহর বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে—টাটানগর, লক্ষ্ণৌ, জামালপুর, কাঁচড়াপাড়া, খাদবপুর, শিবপুর ইত্যাদি—সেই সকল কারখানায় ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত হাতুড়ি পিটে আর বাটালি চালিয়ে যে সকল ঘুঘা শিক্ষানবিস বেরিয়েছে—গণনা করে দেখা হয়েছে কি, তাদের সকলে কাজে লেগে গিয়ে উদরান্নের সংস্থান করছে কি না? আমার দেশটা তারা বহুক্ষেত্রে বেকার হয়ে বসে আছে—আবার বৎসর বৎসর এক এক পাল কারিগর তৈয়ারী করে তুলতে থাকলে তাদের গতি কি হবে? অতএব এ ধুয়া একেবারেই অজ্ঞানের চীৎকার মাত্র। কিন্তু যারা এই ধুয়াটা তুলেছে তাদের সকলকার দৃষ্টি সমান নয়; তার মধ্যে অনেকে এই সত্য কথাটা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছেন যে বি-এ, এম-এ পাস করেও ছিদের মরছে বটে—কিন্তু কথা কইছে, বুঝছে। আর কারিগরগুলো খেতে পাবে না, কথাও কইবে না, অতএব ছিদের যে মরে সে মরুক, কথা কয়ে যেন জ্বালাতন না করে, এমন কর, সব কারিগর বানাও।

এই বি-এ, এম-এ গুলোর উপর যে আক্রোশ তার মনস্তত্ত্ব এই। এ বইলে যে দেশে শতকরা ১০টা লোক লিখতে পড়তে জানে সে দেশে শতকরা একটা লোক বি-এ, এম-এ পাস করে কিনা সন্দেহ। যদি ১১ জন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা হয়ে থাকে—ঐ ১টা লোকের জন্য এত দুর্ভাবনা কেন? তার কারণ, ঐ একটা লোকই কথা কয়, যাতে লক্ষ্য-কণ্টকী হয়ে উঠে। আর আমরা, হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক থেকে আরম্ভ করে পথের লোক পর্য্যন্ত সুর ধরি, বি-এ, এম-এ পাস করে কি হয়—২০৲ টাকা মাহিনা রোজগার হয় না। কি যে হয় তা যে বুঝেছে সেই মজেছে।

ঐ বি-এ, এম এ পাস-করাদের মধ্যেই অনেকে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে ঘুঝেছিল যে, দেশের উন্নতি করতে গেলে অর্থাৎ দেশকে সমৃদ্ধ করতে গেলে রাজশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেশের সমৃদ্ধিকেই সবচেয়ে উচ্চস্থান দিতে হবে—দেশান্তরের কল্যাণে আমাদের দেশটাকে সুপলা গাই বা টাকার গাছ (Pagoda tree) করে রাখলে চলবে না। সেই কটা বুদ্ধিমের বি-এ, এম্-এ এমন কথা কইতে সুরু করেছিল, বৎসরের পর বৎসর এমন সোরগোল তুলেছিল যে, আজ হোয়াইট-পেপারের মধ্যে আমাদের দেশের সমৃদ্ধিকে বড় করে দেখা হলে এ আভাষ যার পাওয়াও সম্ভব হয়েছে।

স্পষ্ট করে এই কথাটাই আজ সকল কথার সেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দেশের রাজশক্তি যতদিন না একমাত্র দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত হয়—দেশের লোক তাদের শুভাশুভের একমাত্র নিয়ামক হয়—মধ্যবর্ত্তীর মারফৎ যেমন তেমন দর্শন হয় না—তেমনি পরের মারফত দেশের সমৃদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ লাভ ততদিনে হবে না। কাজটা নিজেদের হাতেই নিতে হবে।

কিন্তু এই সকল উচ্চ রাজনীতির ভাবনা ভাবতে ভাবতে একথাও ত ভুলে থাকা যাচ্ছে না যে, দেশের লোক বাস্তবিকই দুপেট খেতে পারছে না—তার কি উপায় করা যায়?

আমি আমার দেশ বলতে বাঙ্গলা দেশই বুঝি, বাঙ্গলার বাইরেই আমার বিদেশ। এই সোনার বাঙ্গলা দেশে যে এখনও "এক পেয়ালা সরবৎ, আর একখণ্ড রুটি"র অভাব হয় নি তার প্রমাণ এই—যার দেশে অন্ন জোটে না সে-ই বাঙ্গলায় এসে উদরান্নের সংস্থান করে নেয়—যার দেশে "ছাতু" জোটে না, যার দেশে "রোটি" জোটে না, যার দেশে "আমা" জোটে না, যার মরুভূমিতে "জনার" "বজরা" জোটে না, সে-ই বাঙ্গলার বুকে এসে পড়ে তার অফুরন্ত স্তন্য পান করে ধন্য হয়—বেহারী আসে, পাঞ্জাবী আসে, মাদ্রাজী আসে, মাড়ওয়ারী আসে, রোজগার করে দেশে চলে যায় আর

বাঙ্গলার প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করে, "বাঙ্গালী মহলি খাতা" বলে সুখ্যাতি করতে ছাড়ে না। এই সকল "বিদেশী" আমাদের দেশে যে যে স্থান জুড়ে বসে আছে, সে স্থানগুলা ত আমাদেরই প্রাপ্য, সেখানে যদি আমরা বলতে পারি আমাদের দেশের বহুত বেকারদের ত স্থান হয়ই, অন্নসংস্থানও হয়।

তারা জুড়ে যখন বসে আছে, তখন এক কথায় তাদের তাড়ান যাবে না; কিন্তু তাদের এই দেশের লোক হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিদেশী বলেই ভাবব, এবং তাদের উপর দেশের লোকের দাবী আদায় করতে ছাড়ব না। এখানে রাজশক্তি, যেটা এখনও জনশক্তিতে পরিণত হয় নি, আমাদের অন্তরায় হবে। তা বলে আমরা আমাদের শক্তি যতখানি প্রয়োগ করতে পারি তা করব না কেন!

মনে করুন, পাঞ্জাবী বাস চালায়—আমরা চাইব, প্রত্যেক বাসে যে দুজন লোক থাকে, তার মধ্যে একজন হবে বাঙ্গালী, যে বাসে দুজনই বিদেশী অর্থাৎ অবাঙ্গালী। আমরা সে বাসে উঠব না। বাস কোম্পানীর আফিসে অন্ততঃ অর্দ্ধেক হবে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী—হিন্দুই হ'ক আর মুসলমানই হ'ক, বাঙ্গালী হওয়া চাই। ট্রাম কোম্পানী বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশী, বাস কোম্পানী যেমন বিদেশী ঠিক তেমনি—সেখানেও সেই ব্যবস্থা হওয়া চাই। কোন বিদেশী অর্থাৎ অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর আফিস, সেটা ইংরাজের হ'ক, বা ভাটিয়ারই হ'ক, সেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অন্ততঃ বাঙ্গালীর হওয়া চাই এইটা আমরা যে দিক দিয়া সম্ভব আদায় করব। আমরা জানি, যে সকল বিদেশী কোম্পানীকে আমরা এতাবৎ বিদেশী বলে এসেছি অর্থাৎ ইউরোপীয় কোম্পানী সকল, সে সকল কোম্পানীতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা যত, তার সিকির সিকিও তথাকথিত দেশীয় অবাঙ্গালী কোম্পানীতে নাই—অনেক মাড়ওয়ারী বা ভাটিয়ার দোকানে বা আফিসে একটিও বাঙ্গালী নাই—এই সকল মাড়ওয়ারী বা ভাটিয়ার দোকান বিদেশী, সুতরাং সকল বিদেশীকেই একই বাঁধনে বাঁধতে হবে—হয় বাঙ্গালী পোষ, নয়ত আমরা তোমাদের ত্রিসীমানায় যাব না। বিদেশী বর্জ্জনের যদি কোন মানে থাকে ত তা এই।

ছোট স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আফিসে বা কারবারের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি বড় বড় ব্যবসায় বা ফাক্টরীর কথা ভাবা যায়, সেখানেও সেই ধরণের "স্বদেশী" আমরা না করলে আমাদের বেকারের সংখ্যা কমবেই না। আমরা চন্দননগরের লোকমতের জোরে এবং মিল কোম্পানীর সহায়তায় এই ব্যবস্থা করেছি যে, কুলি থেকে আরম্ভ করে কেরাণী বা কারিগর পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব চন্দননগরের লোককে চন্দননগরের গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত গোন্দলপাড়া মিলে স্থানীয় বাঙ্গালীকেই নিযুক্ত করতে হবে। এবং এখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে একটা স্থান খালি হলে যদি দশ খানা আবেদন পড়ে তার মধ্যে চন্দননগরবাসীকে আগে বেছে নেওয়া হয়।

শ্রীরামপুরে যে সকল মিল আছে—তার অধিকারী বাঙ্গালীই হ'ক আর অবাঙ্গালীই হ'ক—সেই সকল মিলে বাঙ্গালী কুলি বা কর্ম্মচারীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত—সবকে সব, বা দশ আনা ছয় আনা—বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করতেই হবে। এই রকম বাঙ্গালার সকল প্রতিষ্ঠানকে বাঙ্গালীর মুখ চেয়ে এই ব্যবস্থা করতে হবে—কোন প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ অবাঙ্গালীকে "উড়ে এসে জুড়ে বসতে" দেওয়া হবে না।

জাপানকে মারবার জন্য, ভারতীয় বয়নশিল্প রক্ষাকল্পে শুল্ক বসান হল—বাঙ্গালার কথাটা তখন কারও মনেই এল না। কিন্তু বাঙ্গালা যদি ঐ শুল্ক বসানর ফলে বোম্বাই বা আহমেদাবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে ওঠে, তবে বাঙ্গালা নিজের আত্মরক্ষা করবার জন্য—নিজের কারখানা বাঁচাবার জন্য, নিজের কারিগরদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য একমাত্র বাঙ্গালার বয়নশিল্পজাত দ্রব্য কিনবে এবং প্রয়োজন হলে অবাঙ্গালী যে কোন দেশ থেকে সস্তায় বা আক্রার মাল আমদানি করবে।

পাটের চাষীকে ফেতার মূল্যে পাট বিক্রয় করতে হয়—সে বেচারা যে উপায়ে তার নিজের মূল্যে তার প্রাণপাত-করা পণ্যকে বাজারে উপস্থিত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে—পাটচাষীকে ঐশ্বর্য্যশালী করতে হবে—তাহলেই সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গে সকল শ্রেণীর ব্যবসায় সমৃদ্ধ হবে—সকলে খেতে পাবে। নীলের দাদনে এককালে চাষী টাকাওয়ালার গোলাম হয়ে গিয়েছিল—আজ পাটচাষীও টাকাওয়ালার গোলাম হয়ে গিয়েছে, তার সে গোলামী ঘোচাতে হবে। সে বেচারাও বেকার—বাধ্য হয়ে টাকাওয়ালার বেগারী করা তার নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে।

এই দুর্দ্দশার অন্ত করতে গেলে অনেকখানি শাসনযন্ত্রের কর্তৃত্ব নিজের হাতে আনা চাই—সে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রকম নিজের হাতে না এলেও কেনা, না-কেনা যখন আমাদেরই হাত, তখন সে দিক দিয়ে আমরা যতখানি আত্মরক্ষা করতে পারি তা আমাদের করতেই হবে—সেটাই হবে উপস্থিত আমাদের একমাত্র স্বাদেশিকতা। এই হবে সত্যকারের মাতৃবন্দনা, মাতৃপূজা। মাতার সন্তানদের মুখ চাইলে, তবে মার মুখ চাওয়া হবে—নইলে "বঙ্গ আমার জননী আমার" বলে সুর তাল লয় বজায় রেখে হাজারই গান গাও, বেসুরো লাগবে।

কম্পমানের চিঠি

—শ্রীআশুতোষ দে

কম্পনের মধ্যে "ধরণী" পাইলাম, এবং আরোপাত্ত পড়িলাম। ...ভূমিকম্প হইয়া গেল। কম্পন যে হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়,—কিন্তু কম্পনের যে এখনও হয় নাই। ভূমিস্পন্দন ও ভূকম্পন।

ভূকম্প। ভূমিকম্পের পর। ঘরি হইতে ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করা হইতেছে।

অনেক স্থলে এ দুটির সম্যক প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে না। অধিকাংশ ভূকম্প সম্বন্ধেই Seismograph-এর চেয়ে ভাল কাজ করিতেছে। এ হিসাবে প্রতিবছর ৫০।৬০ খানা সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহাড়া, বিজ্ঞানের সাথে পরিবর্তন করিলে,—এখন কি যোগে নিখোঁজ করিলে তো কথাই নাই।

ঘড়-ভূমিকম্প জিনিষটা একটু অদ্ভুত গোছের। অন্যান্য নৈসর্গিক উপদ্রবের সহিত ইহার কিন্তু বস্তুগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। "অদ্ভুত-রাজ্যের" লিখিয়াছিলাম,—এবং এখনও তাই মনে হয়—মানুষের পাশবি

ভূকম্প। ঘড়ি-ঘর। উপরের আধখানি ঘড়ি সবেত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

প্রয়োজনের মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ বোধ হয়,—পায়ের নীচে শক্ত মাটি। পৃথিবীর স্থিরত্ব চাই,—তাহলে যা আসে, মুখোমুখী হওয়া যায়। অপরপক্ষে, পায়ের নীচে যদি পৃথিবী দোলে, তাহা হইলে মনে হয় যেন সমস্ত অস্তিত্বটাকে লইয়াই টানাটানি হইতেছে,—কিছুরই স্থিরতা নাই, সব গেল।

এ ছাড়া,—অবশ্য এর সঙ্গেই,—যেন একটা অতীন্দ্রিয় (psychic) যোগাযোগও আছে। সেটা ঠিক আয়ত্ত হয়। হাওয়াতে যেন এর ইসারা পাওয়া যায়। কেহ কেহ পূর্বাহ্নে এই ইসারা পাইয়া খবর দিয়াছেন। Illustrated Weekly:s পড়িলাম, একটি ইংরেজ মহিলা প্রত্যেক ভূমিকম্পের তিন দিন আগে হইতে সমুদ্র-পীড়া (sea-sickness), সমুদ্র যাত্রার "গা-বমি-বমি" টের পান। খবরটা অবশ্য ভূমিকম্পের পরে প্রকাশ করিয়াছেন। ঘোর করিলে বাসাবরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্মপ্রাহ ইত্যাদি

ভূকম্প। বসী কেলা। গোলেকার বাড়ীর অর্ধাংশ।

অন্যান্য উপসর্গও কাহিনীও ঘোগ-হয় পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এখন, কম্পনের পরে।

আমি এ সকল ইসারার কথা বলিতেছি না। ভূমিকম্পের সময়ের কথা বলিতেছি। জল-স্থল-আকাশ-আত্মসমন সব কটায় একটা অস্বাভাবিক, অদ্ভুতপূর্ব মাতামাতি চলে। সেটা ঠিক আয়ত্ত নয়। এবং বিশ্লেষণ নয়। জিনিষটা বোঝাইবার নয়। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, প্রায় সকলেই এই একই অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। একলোপে যেন মাটি, হাওয়া, আকাশ, মন সবার মধ্য দিয়া একটা অনুলোড়ন কেহ বহিয়া চলিয়া যায়। যদি

ভূকম্প। উপরের জিনিষপত্র সহ ঘড়ির অর্ধাংশ।

মৌচিক পাহাড় ছয় ঘণ্টায় তো একরকম বলিতে,—প্রায় ঊনত্রিশ মাইল বাড়া দিয়া চলিয়া গেল।

লেখকের বাসা।

তারপর আহারের কথা। আহারেরও বর্ণনা হয় না। একেবারে অন্ধকার হইলে এই দুঃসহ ভয়ের স্পর্শ দিয়া ঠেকে। "সব গেল," "আর কিছুই থাকিল না," "কি জানি কি হইবে," "এই তো শেষ,"—এই ধরণের চীৎকার। হুলস্থূল শিবির, মস্তিষ্ক বিকল, হৃদয় পাষাণ-ভেদের সহিতে পরমপটীয়ান।

এইভাবে আমাদের কাটিয়াছে, পুরা বত্রিশ। ১৫ই জানুয়ারী ২।১৫ মিনিট হইতে ২৭শে রাত্রি শেষ পর্যন্ত। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ অবধিতে সব কিছুই সম্ভব ছিল। ২৭শে হইতে ২৯শে পর্যন্ত একটু নিশ্বাস

যুদ্ধের পথ। বাসা যাই হইতেছে।

ফেলিবার অবকাশ পাওয়া গিয়াছিল। ৩০শে, চন্দ্রগ্রহণের দিন আর একটা ঝাঁড়া ছিল। সেদিন ও সে রাত্রিও তদ্রূপ। দেশের অর্দ্ধেক-কাঙ্ক্ষানীর লোক ঘাট বাড়িতে ছাড়িতেছে না, উঁহার ঝড়া-ঝড়া বন্ধ করে না। এমন কি, কাঠবেড়ালী ও বাঁদরে খোলার পরের চালে বসিয়া খোলা বাড়িতে ছাড়ে নাই। মনে মনে, ভূমিকম্প,—অর্থাৎ Seismographic পরিবেশও প্রবল পাওয়া যাইতেছে।

ভূমিকম্পের বর্ণনার চেষ্টা একেবারেই করিব না। বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী সব ভাষার কামুসেই প্রলয় বিষয়ে দিনের পর দিন বাহির হইয়া গেছে। যুদ্ধের দেখিলাম। ছবির মত সুন্দর ছিল। "পৌরবের সেই প্রথম যুদ্ধ," যুদ্ধি করে যুদ্ধেরে কাটাইয়াছিলাম। সে ছবি, সে কথার চিহ্ন মাত্র নাই। সব গেছে। ছাদ ফুটে দেখিল না, তাদের একটা অভাব মিটিয়া গেল। কয়েকটি কটো লইয়াছিলাম, সব উঠে নাই। দেখিলে ৯৲ টাকার ক্যামেরায় কি সম্ভব হইতে পারে, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই ক্যামেরাটেই কয়াটী-কংগ্রেসের ৩।৪০টি ছবি লইয়াছিলাম,—প্রায় সবগুলিই সার্থক হইয়াছিল এবং "ডায়মণ্ড" ছাপা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকে লইয়া খুব টানাটানি চলিতেছে। মহাত্মাজী এই ছবিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবের পাশে ঈশ্বরীয় শক্তি বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন,—এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড় বড় লোকের লড়াই, তাহার উপর কথা কহিবার স্পর্দ্ধা নাই,—ভগবানের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও নাই। তবে, ও বস্তুটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে এ যাবৎ যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বের গড়া নিয়ম-কানুন,—আইন আদালত, কুল-কলেজ, পাপের শাস্তি ইত্যাদির ধরণ ঐ ধাপ্পাবাজী বস্তুর উপর আরোপ করা কতদূর সঙ্গতীন হইবে, তাহা বিজ্ঞ। এবং আমরা কি করি না-করি, পাপ করি কি পুণ্য করি,—এবং সব চেয়ে বড় কথা,—ও লোকটিকে মানি বা না-মানি,—তা লইয়া যে তিনি খুব মাথা ঘামান,—আমার তো কিছুতেই তা বিশ্বাস হয় না। একটা magnified-

যুদ্ধের। পুলিশের বাড়ি।

school-master অথবা spiritual superintendent of police পদবীটা দিতে একটু বাধে না?

এসব বড় কথা থাক্। ছোটিয়ীর বিশ্রাম নাই। ১৫ইএর কথা বলিতেছি। তারপর অবিশ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী চলিতেছে। ১৭ই তো কাটিবার কথাই ছিল না, ১৮ই কলিকাতার বন্ধু ঝাঁড়া কাটিয়াছে। আজ ৮ই ভাবিয়,—আজও একটা ঝাঁড়া আছে,—তারপর আরও কয়েকটা। যদি বাঁচিয়া থাকি,—আবার আলাপ করিবার সুযোগ হইবে। ইতিমধ্যে ইঁদুর-

যুদ্ধের। যুদ্ধে কেবার পোস্টকার্ডার বাড়ীর এক অংশ দেখা যায়।

বাঁদর, কাঠবেড়ালী ও মানুষের উপদ্রবের বিরাম নাই। নমস্কার লইবেন।

ভাগলপুর।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ পাওয়া গিয়াছে। যথাসময়ে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮ একদালিয়া রোড, বালিগঞ্জ।

গাথার পরশ—শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৲

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ৸৹

বাংলা ব্যাকরণ—আবুল বরাকেত শামশুদ্দৌলা। ৬৭১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ।৵৹

বিস্মৃতি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। ডি এম লাইব্রেরী কলিকাতা। ॥৹

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খাইয়াম—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। ডি, এম, লাইব্রেরী কলিকাতা। ॥৹

সর্ব্বলক্ষণ-সংগ্রহ—(হিন্দী) চিন্নু গৌরীশঙ্কর সংগৃহীত। মানভারি দেবী, পুষ্টি, জামালপুর, (হাওরা) পাঞ্জাব। ।৵৹

দ্বিবেদী অভিনন্দন-গ্রন্থ—(হিন্দী) কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা। ১৫৲

পয়লা জুলাই—অরীন কলম। নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সাবেগ লেন, কলিকাতা। ১।৹

যুগের বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। ॥৹

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—শ্রীহরিদাস মজুমদার। ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

প্রাচীন আসামী হইতে—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। ৸৹

জেম্‌স আব্রাম গারফিল্ড—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। ক্যালকাটা পাব্লিশার্স। ১।৹

বরদা ডাক্তার—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ১৲

ধাঁধার উত্তর—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১।৹

জগদীশের দিগ্‌দারী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা। ॥৹।

গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাভূষণ। ১২ হরনাথ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

ল্যাম্পপোষ্টের ট্রাজেডি, লেভেল ক্রসিং প্রভৃতি—শ্রীশিশিরবিন্দু মজুমদার। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। কলিকাতা।

শান্তি-সোপান—কাজেমদীন আহমদ সিদ্দিকী, ইসলামিয়া লাইব্রেরি। ঢাকা। ২।৹

বস্তির গল্প—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা। ১৲

অধিকার—শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। সংস্কৃত পুস্তকালয়, ৫৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

কয়েকটি গল্প। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি মনোরম।

বিষের নেশা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল। প্রকাশক—ডাক্তার কে শীল, ১৮, রামচন্দ্র মৈত্রের লেন। কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রবোধ সরকার সেন মহাশয় 'বঙ্গবাণী'তে লিখিতেছেন—'বর্ষীন লেখককে উপদেশ দিতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়।' আমরা দুইয়ের কিছুই দিতে পারিলাম না। উপদেশ কটু হইবে। লেখা পুস্তিকা উৎসাহ দিবার ইচ্ছা নাই।

সরল জ্যোতিষ—জ্যোতি বাচস্পতি। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। মূল্য ২৲।

জ্যোতিষের বই লেখা সম্বন্ধে বাচস্পতি মহাশয় নূতন ব্রতী হইলেন। সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে আলোক দিয়া প্রমুখ পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা যেরূপে জ্যোতিষকে লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাচস্পতি মহাশয় বাংলা দেশের জন্য তাহাই করিতেছেন। জটিল জ্যোতিষের ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে ফুট করা; আলোচ্য গ্রন্থে দেশী ও বিলাতি উভয়বিধ পঞ্জিকা হইতেই সুস্পষ্টভাবে ফুট করা করিবার প্রণালী আলোচনা করা হইয়াছে। একখানি অসম্পূর্ণ-রঙ সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক কথায় জটিল জ্যোতিষের পরিচয়-পরিচয় নির্ণয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই।

ছিন্ন পাপড়ি—শ্রীনবগোপাল দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা। মূল্য ১।৹।

পাঁচটি গল্প :—ফুলের মালা, একটি দিনের দেখা, মিলন রিপি, মৌন ঈদ, বর্ষার-রাত। নামেই বোঝা যাইবে সবগুলিই প্রেমের গল্প। দুইটি দেশী, তিনটি বিদেশী। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমরা বাংলা ভাষা ইংরেজীতে (আর্থান ও ফরাসীও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়) বাঙ্গালী ছেলেরা বিদেশীদের প্রেমের কাহিনী লিখিতেছেন। এগুলির

গল্পগুলি পড়িলে কে-কোন্ বিষয় লিখিয়া তাঁহার পুস্তক বিক্রয় পাঠাইতে বিধা করিবেন।

কোনও কলেজ-লাইব্রেরিতে এই পুস্তক সরিবেশী গল্পগুলি প্রকাশিত হইলেই ধানাইত ভাল।

সুরা ও শোণিত—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। এক টাকা।

কবিতা-পুস্তকখানির 'সুরা ও শোণিত' নাম দিয়া এবং প্রথম কবিতার—

জগন্নাথ দিয়ে যে সে করিছে পাপ
মোর তা দিই তারি লাগ;
তাই আজ শেষ করে করে অবিরাম
প্রলয়ের কলঙ্কিত স্রোত;

বলিয়া কবি যে মানুষের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, সমগ্র কাব্য-গ্রন্থখানি তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া সুন্দর মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। কবি বিদ্রোহী মন—কবি। তাঁহার ভাষায় জোর আছে, উপমা উগ্র, বক্তব্য বিষয় তীব্র করিয়া, সুসংবদ্ধও তাঁহার কবিতা মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দোষ অনেক আছে, ছন্দে, ইংরেজি কল্পনায়, কষ্টকল্পিত বীভৎসতার পরিচয়ে—কিন্তু সেগুলির উল্লেখ করিব না। কবিতাগুলির সম্পাদনার কবিকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

আগামী বারের সমাপ্য—উপন্যাস, মোহাম্মদ কাসেম। এম্পায়ার বুক হাউস, কলিকাতা। দেড় টাকা।

অসম্ভব কল্পনা, অস্বাভাবিক চরিত্র-সৃষ্টি সত্ত্বেও লেখকের নিপুণতার সকলের পাঠককে আকর্ষণ করে। গল্প বলিবার ভঙ্গী লেখকের আয়ত্ত, ভাষা সুন্দর। লেখকের নিকট হইতে অনেক কিছুই আশা করিতে পারি।

শেফোক্লা—আশ্‌রাফ আলীখান। এম্পায়ার বুক হাউস, কলিকাতা। এক টাকা।

কবি মোহাম্মদ ইকবালের 'শেকোয়া' কাব্যের কবিতার অনুবাদ। অনুবাদ প্রাঞ্জল এবং সুন্দর। একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী কবি তাঁহার সৃষ্টিকর্তার সহিত কাব্যে বোঝাপড়া করিতেছেন ইহা শুনিতে প্রথমটা কৌতুককর মনে হইলেও পড়িতে বসিলে শ্রদ্ধায় মাথা নত না করিয়া পারা যায় না। মোহাম্মদ ইকবাল মহাকবি ছিলেন।

হালিদা হাসনুম—মকসুদ হিলালী। এম্পায়ার বুক হাউস, কলিকাতা, মূল্য ৸০।

বর্ত্তমান তুরস্কের নবজাগরণে যে দুইজন মহিলা কবি যোগদান করিয়াছেন হালিদা তন্মধ্যে তাঁহাদের একজন। এই মহীয়সী মহিলার সৌরভময় জীবন পরিচয় ও আলোচিত হইবার যোগ্য। 'নিশাচরীর বিদ্রোহীচিত্তের ক্ষেত্রে যে কারণে স্ত্রী পুরুষ আপন আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমরক্ষেত্রে সজ্ঞান করিতে পারিয়াছেন' ইনি তাঁহাদের একজন। জীবনটি সুলিখিত এবং সুপাঠ্য।

মাসিক মোহাম্মদী—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, মওলানা আকরাম খাঁ, ৭ম বর্ষ। ৯১ নং আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা ছয় আনা।

মাসিক মোহাম্মদী বঙ্গভাষাভাষী বাংলার মুসলমান-সমাজের গৌরব এবং বাংলার মাসিক সাহিত্যের আসরে ইহার আসন প্রথম শ্রেণীতেই। অন্যান্য মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মত মোহাম্মদী পরমুখ আশ্রয় করে নাই বলিয়াই আজিও বিলুপ্ত হয় নাই, সগৌরবে আপনার পায়ে আপনিই দাঁড়াইয়া আছে। মোহাম্মদী মুসলমান পত্রিকা এবং প্রত্যেক সংখ্যাতেই দেখিতে পাই, ইহার বলিবার কিছু কথা আছে। প্রবন্ধ ও চিত্রসৌষ্ঠবে মোহাম্মদী আপনার বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, বাংলা সাহিত্য-'মজ্লিসে' বেড়াজোড়ীর বিপরীত মাত্রামাত্রির দিনে ইহা প্রশংসনীয়। মোহাম্মদী সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিবার কাল হইল—অন্যান্য অনেকগুলি পত্রিকার অধঃপতন ঘটিয়াছে দেখিয়া।

শতাব্দী—শ্রীবিরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা চারি আনা।

গত মাঘ মাসে বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে 'শতাব্দী'র শুভাগমন হইয়াছে। ইহাতে একটা বিদ্রোহের সুর আছে। কিন্তু বাজাইয়া দেখিলাম, সে বিদ্রোহ মেকী। প্রথমেই সম্পাদক মহাশয়ের মনে হইয়াছিল—"বাঙলার কয় পক্ষপাতগ্রস্ত এই সাহিত্য-জীবনের অবসান হোক্, তার আমি এই মুহূর্ত্তে বাধবস্ত্রর অবতীর্ণ নিয়ে উপস্থিত হই আর এক সাহিত্য-পরম্পরা দিয়ে-যাবার।" সম্পাদক মহাশয়ের বয়স বোধ করি বিত্রাশই হবে, ইংরাজী মত, বাংলা মত, যে মতেই হউক তিনি এখনও ৬০ অথবা ৭০ বৎসর বাঁচিবার আশা করেন। কিন্তু আমরা 'শতাব্দী'তে কিন্তু শতাব্দীরই চিত্র প্রাণ দেখিতেছি। ইহাকে লোকী এবং মথুরায় মুরলীধর কৃষ্ণকে 'প্রেম ডোমার ছলনা' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করা বৃথা, কিন্তু যে ইস্ত্র অসুর-যুদ্ধে বজ্রপাণি বাসব এবং যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের নায়ক তাঁহাদের হাসিকে উপেক্ষা করিবার শক্তি থাকা চাই। রমণীর স্বর্গে বজ্র মহাল উপাদান করাই বীরত্বের চরম নয়, মোটরমুখরিত শতাব্দী এত সহজে ডুবিবে না। 'শাদা মেঘের উপর মধ্য রাত্রির মত; নিকষিক কালো সাপের মত এক একটা লাইন' শতাব্দীর বুকে অনেকেই টানিয়াছেন এবং টানিতেছেন এবং চিরদিন আরও টানা যাবে বিশ্বাস করিয়া যায় বিশ্বাসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে লাইনগুলিও মুছিয়া দিয়াছে—লিপিকারের হাতে প্রাণশক্তির অভাব ছিল বলিয়া। এই কথাটাই শতাব্দীকে স্মরণ করিতে বলি।

শতাব্দীর আরও একটা আসন্নলিপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—"শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র নরেশের কবিতার চুরা গ্রহণ করেছেন, দিয়েছেন আলিঙ্গন, এবং ফলে জন্মলাভ করেছে তাঁর 'অবয়ব'।" নরেশ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র উভয়েই আপত্তি করিতে পারে।

তবুও শতাব্দীকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি এবং অভিনন্দন জানাইয়াও মোটাকরের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার করিব, যে করেনেই হউক।

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্পের সকল ক্ষতিপূরণের চেষ্টা

ভূমিকম্পের ফলে বিহারে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিপূরণ যে কবে, কি ভাবে হইবে তাহা আজ মস্ত বড় সমস্যার বিষয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আঘাতে অকালে যে সহস্র সহস্র লোককে সহসা এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে হইয়াছে—তাঁহাদের বেদনা মৃত্যুর ধবনিরেখায় যেন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জানি না, তাঁহাদের আত্মা নীড়ছিন্ন পক্ষীশাবকের মত হারাইয়া-যাওয়া নীড়ের বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছে কি না! যদি তাই হয়, সেখানে আমাদের সমস্ত সমবেদনা পঙ্গু! আমরা শুধু প্রার্থনা করিতে পারি, জীবন-মৃত্যুর যে একমাত্র অধিনায়ক, এ তোমারই দায়িত্ব, নীড়-হারা বিহঙ্গমগণ যেন তোমাতেই তাহাদের নীড় খুঁজিয়া পায়!

ভগ্ন-নীড়ের দুই একটি কুটা লইয়া, মৃত্যুশেলদিগ্ধ হৃদয়ে যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অন্তরের ক্ষতি, সেও কেহ পরিপূরণ করিতে পারিবে না। মৃত্যু যে আসন শূন্য করে, সে-আসন শূন্যই থাকিয়া যায়। সেই একান্ত ব্যক্তিগত বেদনা, তাঁহাকেই পরিপূরণ করিতে হইবে, যাঁহার মন হইয়াছে শূন্য। নর-জীবনের ইহাই হইল চরম অসহায়তা।

কিন্তু আর এক রকম বিরাট ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পরি-পূরণ করা যায়। বিহারের যে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা যতদিন না পরিপূরিত হইবে, ততদিন বিহার জাগিতে পারিবে না এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের বহু ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা একদিনের ব্যাপার নয়, এবং এ সমস্যার সমাধান কয়েক লক্ষ টাকায় যায়ও হইবে না। এই সমস্যা এত বিরাট যে কোন ব্যক্তি বা হিতৈষী দলের দ্বারা তাহার সমাধান হইতে পারে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। একমাত্র গভর্নমেণ্ট পারেন, এই বিরাট দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে দুটি কার্যকরী প্রস্তাব হইয়াছে। একটি হইল, আমারলাণ্ডের যৌড়-যৌড় খেলার মত কোন লটারীর অনুষ্ঠান করা। বিহারের মন্ত্রী এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নীতির কথা এখন বাদ দিলেও, ইহাতে যে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা নয়। এবং ইহার দ্বারা, আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে, বিংশ-শতাব্দীর মানুষ আর্থিক উন্নতির জন্য শেষ উপায় হিসাবে ঘোড়-দৌড়ের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য দেশে, নানা কারণে, মাঝে মাঝে এই রকম ব্যাপক আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, মানুষের চেষ্টাতেই, লটারীতে নয়, তাহার আসার স্থায়ী প্রতিকার সংসাধিত হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান অর্থ-নীতি-বিজ্ঞানের সার্থকতা।

দেশপ্রিয় সুবিখ্যাত স্যর ডেনিয়েল হ্যামিল্টন এই দিক দিয়া এক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে আমরা সরকারকে নিবেদন করিতেছি। তিনি প্রস্তাব করিতেছেন, "বর্তমানে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ নোট চলতি আছে তাহা জামাইবার জামিন হিসাবে গভর্নমেণ্ট উহার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং সিকিউরিটি মজুত করিয়া রাখিয়াছেন। বিগত ১৯১৯ সালে যখন যুদ্ধের জন্য দেশের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন মোট চলতি নোটের শতকরা ৩৪ ভাগের অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের বেশী স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মজুত ছিল না। বর্তমানে পোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ এবং পেপার কারেন্সী রিজার্ভে যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সিকিউরিটি মজুত আছে, জামিন রাখিয়া যদি উহার তিনগুণ পরিমাণ নোট বাজারে বাহির করেন, তাহা হইলে গভর্নমেণ্ট আর্থিক অবস্থাকে নিরাপদ রাখিয়াও জনসাধারণকে ৩।৪ কোটী টাকা ধার দিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় বিহারের লোকদের ৩।৪ কোটী টাকা ধার দেওয়া গভর্নমেণ্টের পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয়; বিশেষত, টাকা একসঙ্গে ধার দিতে হইবে না এবং ধার দিবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট জামিন রাখিবার মত উপযুক্ত সম্পত্তিও হাতে পাইবেন।"

যেখানে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন সেখানে গভর্নমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত, ইহা আর অন্য কোনও উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে না। আশা করা যায়, বিশেষজ্ঞদের লইয়া, সরকার স্যর ডেনিয়েলের প্রস্তাবকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল

বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল সম্প্রতি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। এই আইনের মধ্যে এমন কতকগুলি বিধান আছে যাহা গৃহীত হইলে সংবাদপত্র এবং জনসাধারণের প্রাথমিক অধিকার পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে, এই বিবেচনায় গত ১৯শে মাঘ কলিকাতা এলবার্ট হলে উক্ত বিলের প্রতিবাদকল্পে এক বিশেষ জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাদের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) এই বিল আইনে পরিণত রাউলাট আইনের অপেক্ষা ঢের অনিষ্টকর হইবে।

(২) জরুরী ঘটনার জন্য যে সব সাময়িক অতিরিক্ত ফৌজদারী আইন করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা সেই সকলকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে।

(৩) উক্ত বিলে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে যে সমস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বিলটি একান্ত বিপজ্জনক হইবার সমূহ আশঙ্কা আছে।

(৪) ইহার দ্বারা জনসাধারণের এবং সংবাদপত্রের যেটুকু প্রাথমিক অধিকার এখন পর্য্যন্ত আছে, তাহাও নষ্ট হইবে।

নূতন আইন ও সংবাদ-পত্র

এই নূতন আইনের নাম হইতেছে, বিপ্লব দমন আইন। এই নামের দ্বারাই অবশ্য মুখ্যত এই আইনের উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এই আইনের খসড়ার মধ্যে এমন সব ধারা আছে, যাহাতে বিপ্লবী দল ব্যতীত অন্য বহু দলের অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সকলের চেয়ে বেশী আশঙ্কা আছে, সংবাদ-পত্র এবং সংবাদ-পত্র-পরিচালকদের। বর্ত্তমান প্রেস-আইনের বিধি-নিষেধের কণ্টকে সংবাদ-পত্র পরিচালন আজ আমাদের দেশে দুরূহতম ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর এই নূতন আইনের খসড়াতে এমন একটি ধারা আছে, যাহার মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে হইলে সংবাদ-পত্র-পরিচালন সমুদ্রের তীরে বালুকা গণনা করার চেয়ে কঠিন কাজ হইয়া উঠিবে। এই ধারায় বলা হইয়াছে, "বন্দীশালায় অবরুদ্ধ (অর্ডিন্যান্স বা রেগুলেশন) ব্যক্তিদের প্রতি অথবা আন্দামান-বন্দীদের জন্য অযৌক্তিক উদ্বেগ ও সহানুভূতি প্রকাশ, ঘটিত বিপ্লবী এবং অর্ডিন্যান্স-বন্দীদের স্মৃতি উৎসব, অন্যান্য দেশের বিপ্লব আন্দোলনের প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ ইত্যাদি আইন-বিরুদ্ধ।" এই বিধির ভাষা এত ব্যাপক এবং ইহার পরিধি এত বিস্তৃত যে কোন্ সংবাদের মধ্য দিয়া কখন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহা নিরূপণ করা খবরের কাগজের কাজের ভিড়ের মধ্যে একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহার উপর কে বিচার করিবে, কখন উদ্বেগ বা সহানুভূতি অযৌক্তিক হইতেছে কি না? কি হইলে সহানুভূতি অযৌক্তিক হয়, তাহারও কোনও পরিমাপ নাই। অপর দেশের বিপ্লব আন্দোলনের প্রশংসা বলিতেই বা কি বুঝায়? মুসোলিনী বিপ্লবী নেতা কি না? হিটলার কি বিপ্লবী নেতা নন? জগলুল পাশা বা আবদুল করিমের কার্য্যাবলী জানিবার অধিকার কি বাংলার ছেলেদের থাকিতে পারে না?

অথচ ইহার শাস্তিস্বরূপ প্রেস পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইতে পারে!

কারাসংস্কার ও অপরাধ-তত্ত্বের নব ব্যাখ্যা

যাঁহারা বর্ত্তমান কালের কারাসংস্কারের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, প্রত্যেক সভ্য দেশে বর্ত্তমান কালে কি ভাবে কারাসংস্কার করা হইতেছে। এই কারা-সংস্কারের গোড়ার কথা হইতেছে, মানুষের উন্নততর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালীর ফল, আজ মানুষ অপরাধীকে অন্যভাবে দেখিতে শিখিয়াছে। যে অপরাধ করিয়াছে, সে যে মনুষ্য-সহানুভূতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, এ কথা ভাবিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই আমাদের বারণ করিয়াছে। মহীয়সী ইংরেজ-রমণী এলিজাবেথ ফ্রাই য়ুরোপে এই নব-চিন্তা-ধারার জননী। য়ুরোপে এমন রাষ্ট্র আছে যেখানে কারাগারে বন্দীদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য প্রাচীর-সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়—কারণ, কারা-প্রাচীরের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে যাহারা তাহাদের রক্ষী, তাহারা যে সর্ব্বদাই সুবিবেচনা করিবে এমন কি কথা আছে? অথবা তাহারা যে ভুল করিতে বা অন্যায় করিতে পারে না—এমনও না হইতে পারে। সেই সময়, আমাদের দেশে যাঁহারা প্রকাশ্য আদালতে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন, তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখান পর্য্যন্ত যে ঘোরতর অপরাধজনক ব্যাপার, তাহা

মানিয়া লইতে কষ্ট হয়। য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষ আজ এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে, কাল য়ুরোপে যে চিন্তা জাগে, তার পরের দিনই তাহার তরঙ্গ ভারতভূমির তটে আসিয়া লাগে। এবং ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের মানসিকতা এমন তৈয়ারী হইয়াছে যে, য়ুরোপের গাছের ফল পাকিলেই আমাদের রসনা সজল হইয়া উঠে। কিন্তু বিপদ হয় সেখানে, যেখানে য়ুরোপের পাকা ফল দেখিয়া মন লোভী হইয়া উঠিলে, আমাদের শিক্ষক বলিয়া উঠেন, ও ফল খাইবে না, তোমাদের জন্য নয়! মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়িয়া ডাক্তার উপাধি লও, কিন্তু আশা করিও না, তোমাদের দেশের পক্ষে তাহা সত্য। রাত্রি জাগিয়া পড়িও, লিট্‌ভিনার মত দেশেও কারাবন্দী বেতার-যন্ত্রে বিশ্বের সংবাদ শুনিতেছে, সেখানে কারারক্ষে ভুল না থাকিলে রক্ষীর শাস্তি হয়, কিন্তু প্রভাতে, যদি শোন যে তোমার ভ্রাতা কারাগারে অনশনে রহিয়াছে, কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করিও না।

বার্জ্জ হত্যা মামলার রায়

১০ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারকগণ বার্জ্জ হত্যা বড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী নির্ম্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, এবং রামকৃষ্ণ রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ, সনাতন রায় এবং সুকুমার সেন, এই চার জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে। আসামী মণীন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণানন্দ সাম্যাল, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, সরোজদাস কানুনগো, এই চারজনকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

আসামীরা ইচ্ছা করিলে ১৫ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন।

শিক্ষার জন্য দান

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লালচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ছাত্রদিগকে বৃত্তিপ্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১লক্ষ ৫০হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে উন্নত বিজ্ঞান অনুশীলন প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিদেশে যাইয়া সূতা এবং কাপড় তৈয়ারী করা, রঙ প্রস্তুত করা, সাবান, মাটির বাসন, কাচ, চামড়ার পণ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করা এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙালী খৃষ্টান। বাংলাদেশের তিনি একজন কৃতী পুরুষ। এই দানের মধ্য দিয়া, শিক্ষাসংস্কারের প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রবল অনুরাগ বিশেষ ভাবে বোঝা যায়, যখন আমরা জানিতে পারি যে, অধ্যাপনা করিয়া তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান ভারতীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ছাত্রদিগের জন্য। অনেকে আপত্তি করিয়াছেন যে, এই দানের পিছনে কোন সাম্প্রদায়িকতা আছে।

তাঁহারা বলেন যে, বিদ্যামন্দিরে এই ভাবে দান চিহ্নিত করিয়া দিলে, সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই সমাজের লোকের সংখ্যা মাত্র ৮৫ হাজার এবং এই পঁচাশী হাজার লোকের মধ্যে বহু ভারতখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহা হইতে বোঝা যায় না, যে ভারতীয় খৃষ্টান প্রটেষ্টাণ্ট সমাজের সাধারণ অবস্থা কিছু উন্নত। ছাত্রের যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তির অধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায়, জাতি হইতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করিতে না চাহিয়া, আপনার অনুন্নত অবস্থার উন্নতি সাধনের কোন ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত হয় বলিতে পারি না।

এবারকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উৎসব

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উৎসব হইয়া গিয়াছে। চ্যান্সেলার স্যর জন এণ্ডারসনের অনুপস্থিতিতে ভাইসচ্যান্সেলর স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির বক্তৃতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।

(১) ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের যুবকদের ভারতের বাহিরে শিল্পবিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য ১৯৩২ সালে, দেড়লক্ষ টাকার এন্‌ডাউমেণ্ট করিয়াছিলেন। এ বৎসরেও তিনি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য তাঁহার মাতার নামে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিহারী লাল মিত্র বাঙ্গালার হিন্দুনারীদের শিক্ষার প্রসারকল্পে উইলের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসিক ৪ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় স্যর ডেনিয়াল হ্যামিল্টন সুন্দরবনস্থ গোসাবায় নিজেই একটি শিল্প-শিক্ষালয়ের উদ্বোধন করিয়াছেন।

(৪) উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য আরও ট্রেনিং কলেজের প্রয়োজন।

(৫) এখনও পর্য্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রই অ-বৃত্তিকরী বিষয়ই শিক্ষা করে। প্রথম জীবন হইতে ছাত্রদিগকে বৃত্তিকরী শিক্ষার মনোভাব জাগাইয়া ইহার প্রতিকার করা যায়।

(৬) বেকার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত, আমাদিগকেও ছাত্রের ভর্ত্তির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে কিনা জানি না, তবে উচ্চশিক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছাত্রগণকেই বাছিয়া লইবার জন্য একটা কিছু করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, তাহাদের বৃত্তিকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদেশী ভাষার পরিবর্ত্তে জাতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুকাল হইতে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় কোনও উল্লেখ করেন নাই। হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকেদন্ উপলক্ষে নবাব মেহদী ইয়ার্ জঙ্গ বলিয়াছেন, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষার মধ্য দিয়া উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে, ছাত্রদের মধ্যে নব-স্ফূর্ত্তি প্রতিভা, এবং নানাবিধ মানসিক উৎকর্ষের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

জাতীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে, কোনও শিক্ষা জাতীয় প্রতিভার প্রকৃত উন্মেষক হইতে পারে না।

পরলোকে রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার

মাদ্রাজের বিখ্যাত "হিন্দু" পত্রের সম্পাদক এবং স্বনাম-খ্যাত দেশ-নেতা শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার গত এই ফেব্রুয়ারী ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সাংবাদিক এবং পত্রিকা-পরিচালক হিসাবে যে অল্প কয়েকজন লোক আজ ভারতবর্ষে বলিষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। মস্তিষ্কহীন অন্ধ-অনুকরণ, ভীরু মন এবং রুগ্ন লেখনীর যুগে, সাংবাদিক মহলে তিনি ছিলেন একজন মানব-চিন্তা-অভিজ্ঞ, চরিত্রবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তি। তাই তাঁহার দেশ চরিত্রহীন অসংখ্য কাগজের মধ্যে তাঁহার সম্পাদিত কাগজে তিনি একটা চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে এবং তাহাকে বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। সাংবাদিকের কর্ত্তব্য যখন স্পষ্টতর এবং কঠিনতর হইয়া আসিতেছিল, তখন এই রুগ্ন লেখনীর দেশে তাঁহার মত একজন সাংবাদিকের অভাব সহজে পরিপূরিত হইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হয়।

পরলোকে উড়িষ্যার পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞান-বৃদ্ধ

উড়িষ্যার পরমশ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান-বৃদ্ধ বাবু মধুসূদন দাস গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কটকে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম-এ, বি-এল উপাধি অর্জ্জন করেন। যখন বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল তখন তিনি পরপর চারবার উড়িষ্যার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২১ সালে তিনি বিহার উড়িষ্যার স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে তাঁহার বহুক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়া সত্ত্বেও, এ কথা ঠিকই যে, তিনি ছিলেন উৎকলের জাতীয়তার জনক। উড়িষ্যা-ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ লইয়া একটা বিভিন্ন দেশ গঠন করাই ছিল তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ। স্থাপত্য এবং শিল্পকলার দেশ হিসাবে তিনি তাঁহার জন্মভূমি উৎকলকে আবার জগৎবাসীর সমক্ষে সেইরূপে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বিহারের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের তিনিই জন্মদাতা। এবং এই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে স্যর সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তাঁহার তিরোধানে উৎকল একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি হারাইল।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

মাঘ মাসের বঙ্গশ্রীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় 'বণিকের বন্ধুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ অ-বাঙ্গালীর অংশ বাড়িয়া বাড়িয়া এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহার পর এই প্রতিষ্ঠান লইয়া বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার কাল থাকিবে কি না বলা কঠিন।

আমরা নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে লেখকের আশঙ্কা একেবারেই ভিত্তিহীন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সাধারণ শেয়ার ১০ লক্ষ টাকার। ইহার মধ্যে ৮,৫৪,০০০-এর উপর বাঙালীর হাতে। প্রেফারেন্স শেয়ার ১ লক্ষ টাকার। তাহার মধ্যে ৬৪০০০০-এর উপর বাঙ্গালীর হাতে। এই শেষোক্ত শেয়ারে ভোট নাই। সুতরাং যাহার হাতেই থাকুক, কোম্পানীর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বেঙ্গল কেমিক্যালের জিনিষ বাঙলার বাহিরেও প্রচুর বিক্রয় হয়—এবং এই কোম্পানীর শুভাকাঙ্ক্ষী ভারতের সর্ব্বপ্রদেশেই অনেক আছেন। বাঙলার এই প্রতিষ্ঠানের উপর যাহাতে অন্য প্রদেশবাসীর মমত্ব থাকে সেজন্য কিছু কিছু শেয়ার অ-বাঙালীদেও দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

নিখিল ভারত কৃষি, শিল্প ও কলা প্রদর্শনী

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিড়ন উদ্যানে, বঙ্গ দেশের সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে নিখিল ভারত কৃষি, শিল্প এবং কলা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতের কৃষি, শিল্প ও কলা-বিভাগের বিভিন্ন অংশের যে-ভাবে সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান

কালে আমাদের দেশে শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির একটা পরিমাপ পাওয়া যায়। কৃষি-শিল্প-কলার বিভিন্ন দিকের এই রকম একত্র সমাবেশ লইয়া এই রকম প্রদর্শনী ইদানীং বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে আর হয় নাই। সুতার এবং সিল্কের কাপড়, সুগন্ধি দ্রব্য, কাঁচের বাসন, এনামেলের কাজ, ধাতুর উপর ওঙ করা প্রভৃতি কার্য্য কি ভাবে হয়, তাহা সাক্ষাৎভাবে দেখাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এবং এই সমস্ত স্বদেশী পণ্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, এই ধরণের প্রদর্শনীর আজ একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি।

বাংলা লিনোটাইপ মেসিন

অত্যন্ত সুখের সংবাদ যে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের বহু বর্ষের চেষ্টার ফলে লিনোটাইপের কলে বাংলা হরফ তৈয়ারী করিবার আয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী বৎসরের শেষ ভাগেই এই কল আমেরিকা হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিবে।

মহর্ষি পণ্ডিত ভুবনমোহন কর *

আমাদের মানবজীবন একটা চব্বিশ-প্রহরব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে। চলিতে হইবে, এবং জগতের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া, নিজের খেয়ালে ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—মানব-জীবনের ইহা একটা বড় কথা। যাহাদের ভাগবত বুদ্ধি জাগিয়াছে, যাহারা অন্তরে অন্তরে একটা পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছে তাহারা এই চলার মধ্যেই মুক্তি দেখিতে পায়, তাহাদের সমস্ত জীবন হইতেছে জগতের অনুবর্ত্তন, লোকের সেবা। ভক্ত জীবনের সমস্ত কর্ম্মেই সেবার মন্ত্রে জগৎ পূত করিয়া লয়, আহার-বিহার তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছু থাকে না। পণ্ডিত ভুবনমোহন প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুর সহরে সেবার যে বিশেষ ধারার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার মত। দীন দরিদ্র রোগার্ত্ত নরনারীর আকুল ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল; তাঁহাকে দিয়া তাহাদের সেবাকার্য্য করাইয়া লইলেন কোন্ অদৃশ্যশক্তি তাহা কে জানে, কে বলিবে?

জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে যৌবনে বা কৈশোরে আমরা আদর্শবাদকে মূর্ত্তি দিতে চাই কিন্তু রুচি ও শক্তির অভাবে তাহা অনেক সময়েই ব্যর্থ চেষ্টা হইয়া পড়ে। ভুবনমোহন তাঁহার শক্তি ও রুচি অনুযায়ী কর্ম্মধারা ও ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। যেদিন তিনি পীড়িতের শুশ্রূষাকেই জীবনের ব্রত করিলেন কি না ভাবিতেছিলেন সেদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে শুশ্রূষার চেয়েও বড় কাজ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, রোগীর চিকিৎসা। যেই পথনির্দ্দেশ হইয়া গেল, অমনি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চলিতে লাগিলেন, সম্বল মাত্র সাধু ইচ্ছা, তাহাতে কতদিন—জীবনের সবটাই—কাটাইয়া দিলেন।

প্রতিষ্ঠা চাহিতেন না বলিয়া এই নির্ভীক সাধক কলিকাতা হইতে দূরে সমাজের আশ্রয় ও শক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া নিজের অনুষ্ঠিত কর্ম্মচক্র চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এবং চালাইতে পারিলেনও। পল্লীসেবার ক্লান্তি তাঁহার ছিল না, কর্ম্ম তাঁহাকে নিরানন্দও করিয়া তোলে নাই, সকল কর্ম্ম মধুর করিয়া তুলিত তাঁহার আনন্দ, সকল ক্ষুদ্রতার সম্ভাবনা ডুবিয়া যাইত এক অসীম আনন্দের হিল্লোলে। জীবনের প্রভাতে যে উদার মন লইয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, অন্ধকার

মহর্ষি পণ্ডিত ভুবনমোহন কর।

রজনীতে তাহা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই। কারণ, তাঁহার দৃষ্টি কর্ম্মক্ষেত্রকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ থাকিত, মুক্ত পবনের হাওয়া তাঁহার গায়ে আসিয়া লাগিত। তাই উত্তর-বঙ্গের সামান্য নগরে থাকিয়াও তিনি বিশ্বরাজের দরবারে হাজির হইতে পারিয়াছিলেন, আবেষ্টনের কলুষকালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাঁহাকে মলিন করিতে পারে নাই, ধৌত হইয়া গিয়াছে।

ভুবনমোহন কর্ম্মী ছিলেন, এবং আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কর্ম্ম করিতে গেলে ধর্ম্ম নামক কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হয়, আধুনিক যুগের এই মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার পথ-চলার ক্লেশ দূর করিতেন অন্তরতম সঙ্গীর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া,—না'ই বা থাকিল অন্য সঙ্গী। কিন্তু এই

* দিনাজপুরের মহর্ষি ভুবনমোহনের ত্রয়োদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ কলিকাতা সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক পঠিত।

আস্তিকবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিত। দিনাজপুরের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই যত্ন ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু খৃষ্টান জানিত তিনি তাহার, মুসলমান জানিত তিনি তাহার, হিন্দু বলিত তিনি পরম হিন্দু। ধর্ম্মের প্রকৃত পরীক্ষা জীবন যাপনে; ভুবনমোহন দীর্ঘজীবন একভাবে কাটাইয়া গেছেন, ধর্ম্মের পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গেছেন, সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া তিনি দেখিলেন যে বহু নদী যেমন একই সাগরে গিয়া মিশে, বহু সম্প্রদায় তেমনি একই বিভুর সাধনা করে; গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া নীচে বহুদূরে ক্ষেতের জমির ভেদ যেমন চোখে পড়ে না, তিনিও তেমনি আমাদের অসম্পূর্ণতার কথা ভুলিয়া যাইতেন, তাঁহার চোখে যে আমরা সকলেই সমভূমিবাসী।

এই আদর্শ-কর্ম্মযোগীর নিকট ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ ছিল না। তাঁহার চোখে পড়িত শুধু মানুষ। তাই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-আন্দোলনেরও বহু পূর্ব্বে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, মেথর-পাড়ায় বিসূচিকার আবির্ভাব হইলে নিজের হাতে তাহাদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতে তাঁহার কিছু মাত্র বাধিত না, তিনি বলিতেন যে, জননী শুধু সন্তানের অসহায় বাল্যাবস্থায়ই তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করে, আর উহারা করে সারাজীবন। তাঁহার চিকিৎসাধীনে একবার চিকিৎসার্থে আগত এক মেথরানীকে দেখিয়া জনৈক সেবক তাহাকে বাহিরে যাইতে বলেন, তিনি তাহা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হন। হরিজন ছিল তাঁহার প্রিয়জন, আর তাহারাও সেকথা জানিত ও বুঝিত।

পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের আর একটা দিক আমাদের চোখে সহজে পড়ে না; তাঁহার নারীরক্ষার দিকে চেষ্টা। কত অসহায় নারী যে দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত এবং রক্ষা পাইত; কত বিপথগামিনীকে যে তিনি সৎপথে সাধুপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সে সব কথা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাহারা মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারাই জানে। তিনি আন্দোলন চাহিতেন না, চাহিতেন কর্ম্ম, জীবনে করিয়াও গিয়াছেন কর্ম্ম, আন্দোলন নয়। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মজীবনের বহু কথাই আজ পর্য্যন্ত লোকের চোখের সামনে পড়ে না; তাঁহার ঢাক বাজাইবার লোকও নাই।

আর তাহার প্রয়োজনও নাই। সমীত, স্মৃতিসভা, নগরকীর্ত্তন, প্রবন্ধপাঠ, পুরস্কারবিতরণ, নানাভাবে তাঁহার স্মৃতি আমরা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই; কিন্তু কর্ম্মের পলকে পলকে, সেবার পর্ব্বে পর্ব্বে যে একা পথিক পথ চলিয়া গিয়াছেন, জীবনের মহাযাত্রায় তাঁহার পদচিহ্ন যে একেবারে মুছিয়া যাইবারই কথা। "সৌন্দর্য্যে, সরলতায়, শুচিতায় শ্বেত শতদলের মত যাহা বিকশিত হইয়া মৃদু সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়াছিল, তাহা ঝরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার গন্ধ এখনও যায় নাই। দিনাজপুর তাহার পণ্ডিত মহাশয়কে ভোলে নাই, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার ১০৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ৬ পংক্তিতে 'আঁখি দুটির' স্থানে 'দুটি আঁখি' হইবে।

২১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ১৪ পংক্তিতে 'বিমানের' স্থানে 'ইঞ্জিনের' ও ১১ পংক্তিতে 'বিমান' স্থানে 'ইঞ্জিন' হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যায়—

১০৭ পৃষ্ঠা	২য় কলমের	১৭ লাইনে	'জগদ্বন্ধুরক্ষণাগীত'
১০৯	১ম	৩২	'খাদির'
৩	২য়	৯	'সমাগত'
	১ম	১২	'জিওগো'
	২য়	৩১	'বেরেই'
	২য়	৪৯	'প্রেমপাত্র'
	"	৫২	'হয়, হবে'
	১ম	৬	'আছি'
	"	১৯	'সজাপুরে'
	২য়	১	'অবস্থান'
	১ম	৪	'আবিশি'
	২য়	১	'নিত'
	"	২৩	'সাহকোই'
	১ম	১০	'গুমিল কর'
	"	১৩	'জীবিত কালে ত'
		৫১	'অগ্রসর হইতে হইতে'
		১৯ লাইনটি ১৪ লাইনের পরে	
		৮	'নিশেনি'
		৭	'একাদশী'
		১২	'কথা:'
		৩৭	'অচিন'
		১	'মানুষ'
		১১	'ঠিক এই কথাই'
		৩৩	'ঝুড়ো'
		৩৪	'ব্রহ্মণ্যে'
		৩৫	'অন্তর্যামী'

পড়িতে হইবে।

শ্রীবিনোদবিহারী কর্ত্তৃক বেঙ্গল্ অপ্টোপ্লেটার প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৩৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা
শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

টলারেশন

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

টলারেশন(Toleration) কথাটা আমার অসহ্য। আমাদের দেশে বহুধর্ম্মী-লোকের বাস, পরস্পরের ধর্ম্মমতকে টলারেশনের দ্বারা মানাইয়া লইয়া একত্র-বাসকে শান্তিময় করা হউক এই উপদেশ চারিদিক হইতে শুনা যায়। কথাটা খুব চতুরের কথা সন্দেহ নাই এবং সকল চতুরতার মধ্যে যে স্বার্থপরতা, দর্প ইত্যাদি পরম উপাদেয় প্রবৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে, এই টলারেশন নামধেয় চাতুর্য্যের মধ্যে সেই সকল সদ্‌গুণাবলী বর্ত্তমান আছে। সেই জন্য বলিতেছিলাম—টলারেশন কথাটা আমার অসহ্য।

টলারেশনের আভিধানিক অর্থ—যাহা অনুমোদন করা যায় না তাহাকে সহ্য করিয়া যাওয়া। হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম অনুমোদন করে না, সেই অননুমোদিত মুসলমানধর্ম্মকে সহিয়া যাওয়া :—মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম মানে না—সেই না-মানা ধর্ম্মটাকে অন্যকে মানিতে দেওয়া, বিনা আপত্তিতে, ইহারই নাম টলারেশন।

কত বড় ধড় এই টলারেশনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহা একটু স্থির হইয়া বিচার করিলেই বুঝা যায়। চলিত কথায় যাহাকে "ক্ষেমাঘেন্না" করা বলে টলারেশন ঠিক তাহাই, ঘৃণার সহিত ক্ষমা মিলিত হইলে টলারেশন হয়। পরস্পর ঘৃণার অভাব না হইলেও সেটা প্রকট না হইয়া চাপা রাখিতে পারিলেই টলারেশন। আমাদের চলিত কথায় যে বলে—"পেটে থাকলেই গুণ, বমে ফেলেই খুন"—এ ঠিক তাই। ঘৃণাটাকে মুখের কথায় প্রকাশ করিলেই যখন রক্তারক্তি হইবার আশঙ্কা থাকে—তখন পেটের ভিতর লুকাইয়া রাখাই কি গুণ নহে? চতুর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ত কথাই এই।

ঘৃণা যাহা তাহাকে স্পষ্টভাবে ঘৃণা করিলে প্রত্যবায় উপস্থিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় যদি ঘৃণাকে ক্ষমা দিয়া ঢাকিয়া রাখাই বিধি হইত, তাহা হইলে এ জগৎ-সংসার রসাতলের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিত। সকল প্রত্যবায়কে উপেক্ষা করিয়া যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অর্থাৎ ঘৃণাকে ঘৃণায়, পূজাকে পূজায় মণ্ডিত করিবার শক্তি একজনেরও না জুয়াইত তাহা হইলে মহাপুরুষের পরিবর্ত্তে যেনিয়ার স্মৃতিকেই ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, কলাবিৎ স্বস্ব লেখের মধ্যে স্ব স্ব সঙ্গীতের মধ্যে, ধন্য করিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই—সকল যেনিয়াগিরিকে—"শাক দিয়া মাছ ঢাকাকে", ক্ষমা দিয়া ঘৃণাকে অবগুণ্ঠিত করাকে স্পষ্ট ভাবে নিন্দা করিবার সামর্থ্য, যুগে যুগে একটা না একটা অ-যেনিয়া অবাবসায়ীর জুয়াইয়াছে, তাই জগৎ সংসার সেই অবাবসায়ী-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে অগ্রগতির একটা ঘাঁটি বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেছে।

ক্ষমার দ্বারা ঘৃণাকে ঢাকিয়া আপাততঃ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হয়ত এড়ান যায় কিন্তু ঘৃণা কখনও সম্মানের ভিত্তি হইতে পারে না,—যে ঘৃণা করে, প্রকাশ্যেই হউক প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, সে আপনাকে অপমানিত করে, যাহাকে ঘৃণা করে তাহাকেও অপমানিত করে। অতএব প্রকাশ্য ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ঘৃণার অর্থাৎ টলারেশনে মনুষ্যকে কল্যাণের পথে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে না।

বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—never in this world does hatred cease by hatred, hatred ceases by love.

আমরা হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কথা প্রস্তাবটি আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই বিরোধকে বাঙলাদেশ দেনাপাওনার হিসাব মিটাইয়া লইয়া প্রশমিত করিবার চেষ্টা হইতেছে—লোকসংখ্যার অনুপাতে বাঙলার উপদল আপোষে ভাগাভাগি করিয়া লইলে—হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ থাকিবে না—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই এই মিলন-প্রচেষ্টা হইতেছে। সেখানে ধর্মবিশ্বাস এবং সেই ধর্মবিশ্বাসের উপর অবস্থিত সমাজ ও সামাজিক ব্যবহারের প্রকাশ, সেখানে রাজ-দ্বারে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিটমাট হইলে মানুষে মানুষে মিলন হইবে এ আশা দুরাশা মাত্র।

হিন্দু আপনার ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসবান হইয়া মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসকে টলারেট্ করিতে পারে, কিন্তু ভালবাসিতে পারিবে না—এবং ভালবাসিতে না শিখিলে, মহাপুরুষের কথা বাকা কলিবে না, অর্থাৎ ফলপ্রসূ হইবে না।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই এই শুভফল ফলে নাই—অর্থাৎ মানুষে মানুষে প্রেম হয় নাই। খৃষ্টীয় জগৎ চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে—We are children of the same Father- কিন্তু সেই ভগবানের সন্তান মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে আপনাকে কখনও সন্তান করিয়া দেখে নাই। দাস-প্রথার স্মৃতি, ক্রিউডেলিজ্‌মের সংস্কার খৃষ্টীয় সমাজকে এমন সর্বাত্মক ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, গির্জার ভিতর Our Father which art in Heaven এই মন্ত্র পাঠ করিবার মুহূর্তেক পরে গির্জার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে আর মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাবের কোন নিদর্শন দেখা যায় নাই। যুগে যুগে খৃষ্টীয় সমাজে "আমরা এক পিতার সন্তান" এই মন্ত্রপাঠ চলিয়াছে—আবার প্রতিদিনের কার্য ও ব্যবহারে আমরা যে তাহা নহি—তাহাই প্রমাণ করিয়া প্রভু ভৃত্যকে, জমিদার প্রজাকে, ধনিক শ্রমিককে পীড়িত, উৎপীড়িত করিয়া আসিয়াছে। শেষে এই কার্যে ও কথায়, মন্ত্রপাঠে ও ব্যবহারের এই নিদারুণ অসামঞ্জস্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া একদিন ইউরোপের একটা পাগল জাতি ১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে ঘোষণা করিয়া দিল যে মানুষ শুধু গির্জার ভিতর পুস্তকের ভিতর এক পিতার সন্তান নহে, গির্জার ভিতরে, পথেঘাটে, গৃহে, সমাজে, কাউন্সিলে ধর্মা-বিকল্পে, সর্বত্র সকল সময়ে এক মাতার সন্তান—সে মা তার নাম জননী জন্মভূমি—La more Patrie এবং সেই সঙ্গে চিরদিনের উচ্চারিত ও উদ্ঘোষিত যে Trinity অর্থাৎ God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, সেই Trinityর পরিবর্তে নূতন Trinityর পরিকল্পনা করিয়া সর্বত্র প্রচারিত হইল—Liberty, Equality, Fraternity. ফরাসী জাতি এই Trinity দিয়া Holy Trinityর স্মৃতি ও আড়ম্বর মুছিয়া দিল। যে যে দেশে Holy Trinityর বিশ্বাস তখনও কায়েমী হইয়া মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল—তাহারা ফ্রান্সকে তখন সপরিষদে ঘিরিয়া অভিসম্পাতের পালায় অভিনয়ের সরঞ্জাম করিল—কিন্তু নবাবিষ্কৃত, নবপ্রচারিত Trinity আজ পর্যন্ত তাহার ত্রিবর্ণ পতাকা খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান আছে—সেই ত্রিবর্ণের প্রভাব সমগ্র জগতে আজ প্রসার লাভ করিয়াছে। মিথ্যাকে ভাঙিয়া সত্যকে প্রচারিত করিবার জন্য ফ্রান্স টলারেশনের মর্যাদা রাখে নাই—ঘৃণাকে ঘৃণায় অভিকৃত নিষ্পেষিত করিয়াছিল। ক্রিউডেলিজনের সঙ্গে আপোষ করে নাই।

আমরা বহু যুগ ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," আমরা সকলে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—বেদীতে বসিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বহু যুগ নির্বিবাদে কাটাইয়া দিয়াছি। এখনও যাহাতে কিছুদিন নির্বিবাদে কাটে তাহার জন্য কত নব নব ধুয়া তুলিয়া, নব নব গণ্ডী, নব নব বাঁধনের উদ্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু অমৃতের পুত্রগণকে বিভিন্ন পাত্রবার খোপের ভিতর পুরিয়া কত পর্যায়, কত বর্ণবিন্যাস করিয়া, কত থাক্, কত পংক্তি, কত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি—এবং সে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কত চুল চিরিয়া একের সঙ্গে অন্যের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দৈবিক পার্থক্য আরোপ করিয়া এই সংসার খেলাঘর বিরচিত করিয়াছি। কিন্তু যখন তখন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে ভুলি নাই। বস্তু এই যে যাহা এত যুগ, এত সহস্র বৎসর ধরিয়া করিয়া পার পাইয়া আসিয়াছি—আরও কয়েক সহস্র বৎসর পারিব না কেন?

না পারার কারণ যে পুঞ্জীভূত হইয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়াছে তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে। উপস্থিত আমরা একটা দেখিতেছি, এই ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জাতি

ও বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ হইয়াছে—এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। এই ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রশ্ন হয় ত ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে বহুবার উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহার সমাধানও হইয়া থাকিবে—কিন্তু সে বহুধর্ম্ম ভারতবর্ষেরই, ভারতবর্ষীয়েরই। সমুদ্র পার হইয়া যে মুসলমান-ধর্ম্ম আসিয়াছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আসিয়াছে, অগ্নিপূজার ধর্ম্ম আসিয়াছে, সে সকলের সমন্বয় করিয়া একটা বিরাট ধর্ম্ম প্রস্তুত হয় নাই—হইবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বৌদ্ধধর্ম্ম বিতাড়িত, কিন্তু সমসাময়িক জৈনধর্ম্মের সহিত হিন্দুর কি সমন্বয় হইয়াছে?

টলারেশন দ্বারা কোনরূপ অস্থায়ী বোঝাপড়ায় এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। টলারেশন দ্বারা বিরোধটাকে ধামাচাপা দেওয়া যায় মাত্র। সার্ব্বজনীন প্রেম-বিকাশের জন্য যে বুদ্ধ বা চৈতন্যের আবির্ভাব প্রয়োজন, তাহারও কোন আভাস পাওয়া যাইতেছে না, তাহা হইলে উপায় কি? বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে দুইটা দেশে মানুষ এই ধর্ম্মের বিরোধজনিত গৃহবিবাদকে বিদূরিত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। সে উপায় তাহারা বাঁচিবার জন্য অবলম্বন করিয়াছে এবং আমাদেরও যদি বাঁচিতে হয়—অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

রাশিয়া ধর্ম্মকে রাজস্থিতির মধ্যে স্থান দেয় নাই। ধর্ম্মকে বাতিলও করে নাই—বাতিল কেহ করিতে পারে না। কিন্তু রাশিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে যদি ধর্ম্মে কোন রূপ বা কোন আচার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, সেই রূপ বা আচারকে তাহারা নিশ্চয় ভাবে দাবাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাসী যে তাহাকে তাহার বিশ্বাস লইয়া আপনার জীবনটাকে গড়িয়া তুলিবার পথে কোন বিঘ্ন পাইতে হয় না—সে তাহার ধর্ম্ম, তাহার নিজের বিশ্বাস লইয়া আপনার দেবতার সঙ্গে আপনার হৃদয় মনের সম্বন্ধ অবাধে বজায় করিয়া চলিতে পারে—কিন্তু আর কেহ তাহার বিশ্বাস লইয়া চলিতেছে কিনা, যদি না চলে তাহাকে সেই বিশ্বাস গ্রহণ করাইবার জন্য কোন আয়োজন সে করিতে পারে না। তার ধর্ম্ম তাহার নিজের—সে তাহার মণিকোটার তাহার দেবতাকে লইয়া আনন্দময় থাকুক কেহ তাহাকে বাধা দিবে না। ধর্ম্ম লইয়া দল বাঁধা চলিবে না, ধর্ম্ম লইয়া প্রোপাগাণ্ডা চলিবে না।

জাপানেও সেই ব্যবস্থা—জাপানে শিণ্টো, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, টাও এই ধর্ম্ম প্রধান। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কোন জাপানী পরিবারে পুত্র খৃষ্টান, পিতা শিণ্টো, মাতা বৌদ্ধ এমন সমাবেশ নিত্য দেখা যায়; এ আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সংহতিতে তাহাদের পারিবারিক জীবন ব্যাহত হয় না—জাপানী পরিবার সুখী পরিবার। এই ব্যবস্থার মূলসূত্র এই যে, ধর্ম্ম ব্যক্তির অন্তরের ধন—তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার উত্তরাধিকার থাকিতেই হইবে এমন কিছু কথা নাই, যে ধর্ম্ম বাঁধিয়া রাখে, সে ব্যক্তিকেই বাঁধে, সমষ্টিকে বাঁধিতে গেলে সেটা একান্ত বাহ্যিক বন্ধনই হয়, কালক্রমে অন্তঃসারশূন্য বিশ্বাস আচার মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

কিন্তু রাশিয়ার ন্যায় জাপানেও ধর্ম্মের আশ্রয় দেশ, মানুষ মাত্রেরই আশ্রয় দেশ। সেই দেশ জাপানীর চক্ষে ধর্ম্মেরও উপরে। জাপানী বলে যদি বুদ্ধ স্বয়ং আসিয়া বলেন যে, দেশের উপরে ধর্ম্মকে বসাও আমরা বুদ্ধকে প্রশান্তমহাসাগরের জলে ফেলিয়া দিব।

অতএব মূলসূত্র কর দেশের কল্যাণ, দেশের সমষ্টি-শক্তি। এই দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে—দেশের কল্যাণ ও শক্তির সমৃদ্ধি লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মকে আপনার নিজ নিজ সম্পত্তি ভাব—নিজের ভগবানের সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় স্বরূপ ভাব—ধর্ম্মকে সংঘ-শক্তির উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিও না—দেশের কল্যাণই সে শক্তির একমাত্র উপকরণ ইহা মানিয়া লইয়া হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা অমৃতস্য পুত্রাঃ এই বিশ্বাসকে কার্য্যতঃ প্রয়োগ কর। ইহার প্রস্তাবার হইলে একদিন বাধ্য হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পরিবর্ত্তে, Holy Trinityর পরিবর্ত্তে যে Trinity ফ্রান্স ১৭৮৯ সালে প্রাণের জ্বালায় প্রচার করিয়াছিল—প্রাণের জ্বালা সত্যই অসহ্য হইলে সেই Trinityকে একমাত্র বরেণ্য বলিয়া পূজা করিতে হইবে—টলারেশন বা ধর্ম্মসমন্বয় পথ পাইবে না।

দুই মেরু

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর দক্ষিণ,
দুই হিম-মেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা,
জলে জলে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে যেন পাণ্ডু হাসি হেন।
প্রাণ যদি থাকে সেথা, চলমল থাকে যদি জল,
গাঢ় বরফের তলে গূঢ় হয়ে আছে—
হিম-মরু, হিম-আঁধি, বহে হিম-ঝড়।
নিঃশ্বাস নাকের কাছে জমাট বাঁধিয়া
ধোঁয়া হয়ে নয়ন ঢাকায়।
আকাশে ওড়ে না পাখী, গাছ নাই, শাখায় কুলায় –
মেলিয়া আড়ষ্ট পাখা, হেঁটে চলে স্কুইনদল ;
বরফ-শীতল-জল আলোড়িয়া তিমিনীল হিমের তিমিরে
হিমেই লুকায়ে থাকে,
মাতালের মত টলে রোমশ ভালুক।

মনের উত্তর মেরু, আলো-অন্ধকার,
মৃত্যু নাই ; মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা,
ছায়াহীন আলো !
কালের কুটিল গতি সেথা স্তব্ধ রয়।

মনের দক্ষিণ মেরু, উত্তপ্ত ফুটিছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মধুর,
পূতিগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
তাল মন্দ রমণীর, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত।

দক্ষিণ মেরুতে মোর বারিধি-গর্জন,
রৌদ্রকরে নীল জল উঠে ঝলকিয়া,
সামুদ্রিক লক্ষ জীব উত্তাল তরঙ্গে করে খেলা,
রৌদ্র-স্পর্শ দেহে মাখি জল-হীন অতলে তলায়।
ফেনা হাসি নৃত্য করে ঢেউয়ের শিখরে,
আকাশেরে ছুঁইতে প্রয়াস,
বাতাসে ছোবল মারি রহি রহি নিষ্ফল হুঙ্কার।

দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে,
আবর্ত্ত পঙ্কিল।
ভেসে আসে শবদেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরায় আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়,
আলো অন্ধকারের সন্দেশ।

পথের বন্ধুরা আসে, ঝড়ো হাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখী,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা ;
কানাকানি হাসি ও চীৎকার,
কখনও বৈতালী গান, কভু একা একতারা সাধা।

দক্ষিণে যৌবন মোর, অর্থহীন উন্মত্ত প্রলাপ,
তপ্ত রোষ, তপ্ত কান্নাহাসি—
দিবস-রজনী আসে, লোভী বাসরনিশার রূপে।
গূঢ়-ক্ষণা-কামনার লেলিহান জিহ্বার বিস্তারে
মেরুর উত্তাল জলে অরণ্যের বিভীষিকা জাগে—
সুন্দর কুৎসিত,
সব মিলি আমি অপরূপ।

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোঁহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হ'ল আমার অন্তরে ;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে ছুঁয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি,
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন,
বিষবাষ্প উঠে আবর্ত্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।

উত্তরে দক্ষিণে মিলি মোর আমি রয়েছে বাঁচিয়া,
অলক্ষিত দেবতার চরণে গোপনে লোটে মাথা,
সেই মাথা লাল হয় নিশীথিতা রমণীর সিঁথীর সিঁদুরে,
দরিদ্রে সর্ব্বস্ব দিয়ে রক্ষিতের সর্ব্বস্ব কাড়ায়।

দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার আমি একা,
পথের বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—
ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে
শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে আসি শিয়রে আমার ;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে যেথায় অশ্রুজল।
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেথায়ে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণের ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে বাঁকড়ি লোকে আমিও অনন্ত কাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।
জানি না মৃত্যুর অন্ধকারে,
উত্তর দক্ষিণ মোর মিলে গিয়ে এক হবে কি না।
হয় তো প্রতীক্ষা তারই করি।

নেপালে বাংলা গদ্যসাহিত্য

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

১

কিছুদিন থেকে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখছেন। এই প্রবন্ধগুলির জন্য আমরা সকলেই তাঁর নিকট ঋণী, তা'র কারণ এর পূর্বে আর কেউ বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োগ নিয়ে এত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন নি। তাঁর আলোচনা থেকে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে আমরা বাংলা ভাষায় যে গদ্যরচনা পাই তা' সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না। বাংলা গদ্যের প্রথম নমুনা হচ্ছে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের এক চিঠি। এ চিঠি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে অহোম রাজার নিকট লেখা হয়েছিল। এই চিঠিতে যে গদ্যের প্রয়োগ পাই তার গতি সরল নয়, তার ভাষায় স্বচ্ছতা বা শব্দপ্রয়োগে কোন সৌষ্ঠব নাই। সে গদ্যের রূপ দেখলে স্পষ্টই মনে হয় যে তা'তে কোন সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে যে গদ্যসৃষ্টি হয় তা'কে বলা হয়েছে 'খৃষ্টানী' গদ্য। তার কারণ এই যুগের যে গদ্যসাহিত্যের নমুনা পাওয়া গিয়েছে তা' পোর্তুগীজ পাদ্রিদের রচিত। তাঁদের রচিত প্রথম বাংলাব্যাকরণ ও গদ্যগ্রন্থ সম্প্রতি বাঙালী পাঠকের হস্তগত হয়েছে। এই গ্রন্থের গদ্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা গদ্যের গতিতে সরলতা এসেছে, কিন্তু বিদেশী ধর্মযাজকের রচনা বলে বাক্যপ্রয়োগে কোন সৌষ্ঠব নাই।

কিন্তু বাংলা গদ্য রচনার আর এক ধরণের নমুনা পাই। তা' সুকুমারবাবুর হস্তগত হয় নি বলে তিনি তার আলোচনা করতে পারেন নি। নেপালের পুথিশালায় অনেক প্রাচীন নাটকের পুথি সংরক্ষিত আছে। এই নাটকগুলির রচনা সুরু হয়েছিল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে। এই নাটকগুলির কিছু পরিচয় আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। এই নাটকগুলির মধ্যে 'গোপীচন্দ্রনাটক'খানি উল্লেখযোগ্য। এই নাটকখানিতে প্রাচীন বাংলা গদ্য রচনার কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

'গোপীচন্দ্র নাটকের' একখানি পুথি আমি কয়েকবৎসর পূর্বে সংগ্রহ করেছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও India Office Library থেকে এর একখানি পুথির নকল সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা এখনও প্রকাশ করেন নি। আমি যে পুথিখানির নকল এনেছি তার পুষ্পিকায় তারিখ রয়েছে—সম্বৎ ৮১০ ভাদ্রপদ শুক্ল ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বুদ্ধ(বুধ) বাসরে। লিখিত সংপূর্ণমিতি। শ্রীশ্রীজয়জিতামিত্রমল্লদেব সনধু পুস্তক দদকা।" এই পুষ্পিকা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন রাজা জয়জিতা-মিত্র মল্লদেব। পুথির তারিখ নেপাল সম্বৎ ৮১০ বা ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। জিতামিত্রমল্লদেব সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক, সুতরাং নাটকও ঐ সময়ে রচিত হয়েছিল তা' বলা চলে।

গোপীচন্দ্রনাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। গোপীচন্দ্র ছিলেন বাংলাদেশের রাজা, সেইজন্যই বোধ হয় গোপীচন্দ্র, তাঁর দুই রাণী অদুনা-পদুনা ও পার্ষদগণের কথোপ-কথন বাংলা গদ্যে রচিত হয়েছিল। এ রচনা যে বাঙালীর হাতের তা' নয়, তবে বাঙালী যে সে রচনায় সাহায্য করেছিল তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। মল্লরাজাদের পুরোহিত ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। সেই সূত্রে আরও বাঙালী যে নেপালের রাজদরবারে যাতায়াত করত একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। সুতরাং নেপালের রাজাদের ও অন্যান্য নাটকরচয়িতা-দের বাংলা ভাষা শুনবার ও শিখবার অবকাশ ঘটেছিল। মল্লরাজাদের শিক্ষার ভাষা ছিল মৈথিলী—আর সে মৈথিলী হচ্ছে মধ্যযুগের মৈথিলী, যার থেকে ব্রজবুলীর উৎপত্তি। নেপালী নাটকগুলির গান এই ব্রজবুলীর ছন্দেই লেখা। এই ব্রজবুলী যাঁরা জানতেন বাংলা লিখতে তাঁদের কোন প্রয়াস করতে হত না।

অন্যান্য নেপালী নাটকের যে সব পুথি দেখেছি তাতে শুধু গানগুলিই পাওয়া যায়। কথোপকথনের কোন উল্লেখ নাই—কারণ সে গুলি নাট্যকারেরা মুখে মুখে রচনা করতেন। যে নাটকগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় তাদের ভিতর গোপীচন্দ্র নাটকই সবচেয়ে প্রাচীন। এ নাটকের গানগুলি অন্যান্য নাটকের মত ব্রজবুলীর ছন্দেই লেখা। যেমন—

থুপুর কুম কুম চরণ সঞ্চারো
নবরস ভাব বিকারা।
নাচয় পঙ্কর পরম কুতুহলকর (?)
শিব ভকতি উদারা॥
(২) ত্রিপুরল এক মহ সমর বিলাসে
মৃগাপতি বিক্রম কিরিতি বখানে।
আইলো হে বংগকুমার জগত বখানে
মদন সদৃশরূপ বিদিত ভুবনে।

'কন্তু এ নাটকে গানের গদ্যাংশই বেশী, আর সে গদ্য পূর্বেই বলেছি বাংলা গদ্য। এ গদ্যও বিদেশীর হাতের রচনা বলে তাতে কিছু বৈদেশিক ছাপ আছে, কিন্তু সে ছাপ হিন্দীর। কখন কখনও 'আমার' পরিবর্তে 'হমার', 'তোমার' পরিবর্তে 'তুমার' ও বাক্যশেষে 'আছে' 'হএ' (হয়) প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগে হিন্দীর প্রভাব ধরা যায়।

একাধিক পুথি না পাওয়ার দরুণ সময় সঠিক পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। নেপালী পুথিলেখকের কতকগুলি ভুল সাধারণ। তাদের লেখায় র ও ল, এবং শ ও স এর কেতর একটা গোলমাল হয়। তা ছাড়া হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই ও উ-এর গোলমালেও অনেক শব্দ তাদের সঠিক রূপ হারিয়েছে। তবুও এ গদ্যে যে সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্যের গতি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে তাতে সন্দেহ নাই। এই গদ্যের কিছু কিছু নমুনা দিলেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

[১] রাজা—অহে উদনা পণ্ডমা আমার বচন সুনো।

উ. প অহে মহারাজেশ্বর আজ্ঞা করো।

রা—এতাদৃশ বঙ্গ[দে]শের অধিপতি গোপীচন্দ্ররাজা আমি আছে।

উ. প—অহে প্রভু আমার বচন অ[ব]ধান করো।

গো—অহে উদনা পণ্ডমা করো।···অহে উদনা পণ্ডমা এথা থাকিয়া কার্য্য না আছে আমার দর্শন নিমিত্ত বিস্তর লোক আসিবে সভা করিতে যাইবো চলো।

উ. প—অহে মহারাজেশ্বর বিজয় করো।···

[২] খেতুপাত্র—অহে কলিঙ্গাকোটবার [—কলিঙ্গ কোতবাল] আমার বচন সুনো।

ক—মহাপাত্র জে আজ্ঞা।

খে—মহারাজা গোপিচন্দের খেতুপাত্র নাম মুখ্য মন্ত্রী অস্তী।

ক—মহাপাত্র জথার্থ।

অহে খেতু মহাপাত্র তাপিথোর আমার এক বচন সুনো।

ত। সর্ব্বথা—অহে খেতুমহাপাত্র কলিঙ্গা কোটবার আমার এক বচন অবধান করো।

খে। সর্ব্বথা।

তা। সমস্ত লোক বান্ধিয়া দাড়িয়া লুটিয়া আনিয়া এমত এমত কর্ম্ম করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকিলো, আমার সমান তাপিথোর নাম আন না আছে।

খে। সত্য কহিলেন। অহে কলিঙ্গা কোটবার তুমার হমার রাজা গোপীচন্দ্র আছে, তার দর্শন করিতে জাইবো চলো।

ক। জে আজ্ঞা, অহে খেতুপাত্র হমী জাইবো, তুমী পশ্চাৎ আগমন করো।···

[৩] বংগকুমার। অহে আনন্দ মহথা নিরানন্দ থারী আমার বচন সুনো।

আ. নি। অহে মহারাজা আজ্ঞা···মহারাজেশ্বর ভাল আজ্ঞা হৈলেন (? কৈলেন)।

আ। অহে বংগকুমার আপনার চাকর মলো [=মরলো] সমস্ত দ্রব্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রাম বিবে [=বিবরে] সমস্ত লস্কর জিনিয়া থাকিলো, আমার সমান আনন্দ মহথা কোন আছে।

বংগ। আনন্দ মহথা সত্য কহিলেন।

নি। অহে বংগকুমার অমি···আছে। তুমার সেবক মধ্যে মহা বলিষ্ঠ হাথির সমান বল এমন মর্দ্দ নিরানন্দ থারি অস্তী আছে।

বংগ। সত্য কহিলেন। অহে আনন্দ মহথা নিরানন্দ থারী আমার পরম বৈরি গোপীচন্দ্র রাজা আছে তার রাজ্য বিবে [=বিষয়ে] উৎপাত করিতে জাইবো চলো।

আ. নি। আপনার জেমত আজ্ঞা।—

[৪] ক। অহে মহারাজেশ্বর আপনার প্রতাপতে [=প্রতাপেতে] সকল লোক সুখী আছে।

গো। অহে উদনা পণ্ডমা এখণে (=এখনে) দেবপূজা করিবো। সমস্ত সামগ্রী করো।

উ. প। জে আজ্ঞা···

অহে মহারাজেশ্বর বঙ্গরাজ্যের—

সৈন্য দিয়া খেতুপাত্র পাঠাব [-পাঠাও]।

সংগ্রাম করিবার [?] অপনে না [গবন] করো।···

খে। গোপীচন্দ্রের আজ্ঞাতে সমস্ত লোক ডাকিতে জাব, =জাও]।

[৪] জালন্ধরী। অহা বাবু ই [=এ] দেশ ভাল না হএ [=হয়], আমি ভিখারী জোগী অমার রাজার সনে কার্য্য না হএ [=হয়], অমী না আইসি বাবু।

জো। অহে মহারাজেশ্বর জোগী অনেক উপায়তে নাস্তিতে চাহিলো সর্ব্বথা আমি মারিতে না পারএ।

খে। অহে মহারাজেশ্বর অপনে গিয়া ভাল করী বিচার করো অবশ্য সিদ্ধযোগী আছএ।···

উ. প। অহে গুরাঞ্চ অমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বামীদান দিয়া অমাকে উদ্ধার করো। তুমার চরণে নমস্কার।

জো। আহা মাতা তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো, তুমার রাজাসনে আমাকে (? আমার) কার্য্য না হয়, তুমার রাজাসনে বেদা [=বিদায়] মাগিয়া অমী জাইবো। অহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র তুমি মায়া এড়িতে না পারো, তুমী উদনা পত্নমার সংগে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো, তুমার সনে আমার কার্য্য না হয়। আমাকে বিদা[য়] দেয় (=দেও)। অমী জাইবো।···

এই নমুনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে এ গদ্য বাংলা গদ্য, নেপালী নাটকারের হাতে তা'র কতটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তা বলা কঠিন, তবে সে পরিবর্ত্তন যে খুব বেশী নয় তা' নিঃসন্দেহেই বলা চলে। পোর্ত্তুগীজদের রচিত 'খৃষ্টানী' বাংলা গদ্যের চেয়ে এ গদ্যের গতি অনেক সরল, বাক্যও স্বচ্ছ। শব্দপ্রয়োগে সৌষ্ঠব আছে সুতরাং বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ গদ্যের স্থান আছে।

২

গোপীচন্দ্র নাটকের গদ্যাংশে নানা দেশের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে নেপালের লোকেরাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বহুদূর দেশের খবর রাখতো। যে সব দেশের ও স্থানের বর্ণনা আছে তার অনেক খবর আমরা হয় জানি না, না হয় ভুলে গিয়েছি। যে অংশে এই ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আছে আমি তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

জালন্ধরী গাদ। অহা পূর্ব্ব জোগী দক্ষিণ জোগী পশ্চিম জোগী তুমি শকল আপনার আপনার দিগ গিয়া থাকো।

পূর্ব্ব জোগী। অমী আপনার দিগ গিয়া থাকিবো।— এহা জালন্ধরী গুরুজী পূর্ব্বদিগের আপুর্ব্বাই সমস্ত আপনে জানিলেন। তথাপি অমী কিঞ্চিৎ কহিবো সুনো। প্রথম পূর্ব্বদিগ মধ্যে ব্রহ্মদিয়ান ক্ষেত্র সাক্ষাৎ স্বর্গপুরী সমান। তহি বিষে (বিষয়ে) গঙ্গাসাগর ঠাকুরদ্বার (ঠাকুর দ্বার) জগন্নাথ রায় কোণার্ক তীর্থ কোণার্ক সূর্য্য কতক (কটক) বারাণসী দেশ তথা ভুবনেশ্বরী দেবী, যোজ্জাদেশ বিষে (বিষয়ে) সাক্ষীগোপাল, বারীপণ্ড বিষে(বিষয়ে) রুক্মিণী দেবী, ভাজপুর বিষে বৈতরণী নদী বিরজা ভবানী, মঙ্গলকোট বিষে মঙ্গলা দেবী, ত্রিপুরানগর বিষে ত্রিপুরা দেবী আউর বড়া বড়া ক্ষেত্র কামরূপ বিষে কামরূপ ক্ষেত্র বহি বিষে কামাক্ষা দেবী নীলাচল পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র নদী বাণেশ্বর লিঙ্গ কমলাবতী,নাগদেশ বিষে জলধেশ্বর লিংগ সিদ্ধেশ্বরী দেবী,বোড়াগড় বিষে করতোয়া নদী কালিকা দেবী তার নিকটে সাম্বোদর কুণ্ড আছে, তার নিকট মহেশ্বরপুর নাম নগ্র (=নগর) গোরক্ষস্থানে গোরক্ষ নাথ পাদুকা গোরক্ষনাথ চৌরঙ্গীনাথ মহেন্দ্রনাথ ইত্যাদি পূর্ব্বদিগের আপুর্ব্বাই অমী জানিলো।

আহা পূর্ব্বজোগের ভাল কহিলেন।

আহা দক্ষিণজোগী তুমী দক্ষিণদিগের আপুর্ব্বাই আমাকে কহো। আহা জালন্ধরীপা সুনো। দক্ষিণক্ষেত্র ভোগস্থল, জোগী শকল ঘর বারী জোগী, অন্নী শকোটরাণীপকা, দমিয়া চক্র বারা-(বালা)খাটকী কজলীকা (?) রোটিতো, দহিহুধতো তিয়হুতকা, রোহুমছীতো গোরখপুরকা, ভাইসীতো বাবনকা, ভেড়াতো মাক্ষিকারাকা, কাছেরীতো ভংগলকা, কেরাবতো কোড়রৈকা, বেলতো উচ্ছেশাকা, লবংগ জাএফল জায়পত্রীতো জাবাসীপকা, মরিচপান সুপারিতো মেঘমলালকা, পদ্মিনীতো সিংহলদীপকা খীরতো মধুরামণ্ডলকা, চাউরতো চপারনকা, তমাকুতো সুরত্তকা, মদমাসুতো তিলংগাণাকা, রাজভোগতো মেবাড়িকা। গুরুজী দক্ষিণ দিকে আপুর্ব্বাই এমন আছে।

আহা দক্ষিণজোগী ভাল।

আহা পশ্চিমজোগী তুমি পশ্চিমদিগের আপুর্ব্বাই কহো।

আহা গুরু জালন্ধরী সুনো। পশ্চিমক্ষেত্র কুইলা পর্ব্বত আসাপুরী হিঙ্গুরোজ জাএ কী মায়া উত্তরতে এক সিন্ধু রহিয়া সোরভরা উজারা খংতার চপাটপটোরা খারিকা বৈরিদীপক,

করিলেন, জুনাগড় বৈষ্ণিয়ান উপাধ্যে সিদ্ধামলাদেশ বৈষ্ণিয়া ধারা ভাগিলেন, পুজাতব হামালকী শিবরাত্র, নগরকোটকী ত্রিশূল, বারাঘাতকী কেশবতো, কাশ্মীরকী বর্ষাতো, বাবন্তকী সুত্রা, হারবতীকী হোলী, গোরাংবকী মকরা, চীন মহাচীনকী চন্দ্রমন্ত, বিদ্যানগরকী ভৈরব কাশীকী তীর, দীল্লীকী পরিপক, অংগমকী পাখণ্ডী···।

অন্য পশ্চিমদেশী সভা কহিলেন।

দেশবর্ণনায় যে সব দেশের ও স্থানের উল্লেখ রয়েছে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া বর্তমানে অসম্ভব। নেপালী লেখকের হাতে অনেক নাম বিকৃত হয়েছে, অন্য পুথির সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত যে সব দেশের নাম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই যথাসম্ভব পরিচয় দিয়ে নিচে দেশগুলির উল্লেখ করছি—

পূর্ব—(১) বঙ্গিয়ান বা ওড্ডিয়ান বিষয়। এই বিষয়ের যে সব তীর্থস্থানের নাম করা হয়েছে—গঙ্গাসাগর, ঠাকুরদ্বার, জগন্নাথ, কোণার্ক, কটক, ভুবনেশ্বরী—তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওড্ডিয়ান উড়িষ্যার নামান্তর হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ওড্ডিয়ান নামের উল্লেখ তিব্বতী সাহিত্যে আছে, অথনো কখনো ওড্ডিয়ানের রূপান্তর হিসাবে ওড়িয়াণ শব্দও পাওয়া যায়। কিন্তু তিব্বতী সাহিত্যে ওড্ডিয়ান, ওড়িয়াণ (বা উড্ডীয়ান) সুবাস্তু প্রদেশের (Swat Valley) নামান্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিব্বতীতে উড়িষ্যার নাম হয় ওড়িবিস বা ওড়ীশ। এখানে ওড়িয়ান ভুলবশতঃ ওড়ীশার পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়েছে—আর সপ্তদশ শতকে ওড়িয়াণ যে প্রকৃত কোন দেশের নাম ছিল তা লোকে ভুলে গিয়েছিল।

(২) মোর্কা—খোর্দা নেপালী লিপিকরের হাতে এই রূপ ধারণ করেছে। খোর্দা বা বর্তমান খুর্দার এখানে একটী বিষয় হিসাবে উল্লেখ রয়েছে।

(৩) খারীখণ্ড বাড়খণ্ড।

(৪) জাজপুর, কটক জেলায়, জাজপুরে বৈতরণী নদী ও নাভিগয়া এখনো প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

(৫) মঙ্গলকোট? (বর্দ্ধমান জেলায়)।

(৬) ত্রিপুরা।

(৭) কামরূপ।

(৮) নাগদেশ।

(৯) বোড়াগড়? (বগুড়া)। বগুড়া জেলায় মহাস্থানের নিকটে করতোয়ার ধারে। এখনো বহু লোকে তীর্থস্নান করে।

দক্ষিণ—(১) শকোটরাণী—(Socotra)

(২) কজলী (?) (Cajori Islands)

(৩) ত্রিরহুত।

(৪) গোরখপুর।

(৫) বাবন (?)

(৬) মাভিকারা (?)

(৭) অংগল।

(৮) কোঙ্কৈর—(কোঙ্কণ—দাক্ষিণাত্য?)।

(৯) উড্ডেশ—(? উড়িষ্যা)।

(১০) জবাদীপ—যবদ্বীপ।

(১১) মেখমলাল (মলয় উপদ্বীপ)।

(১২) সিংহলদ্বীপ।

(১৩) মথুরামণ্ডল (মাদুরা, দাক্ষিণাত্য)।

(১৪) চপারণ—চম্পারণ।

(১৫) সুরত—সুরাট।

(১৬) তিলাংগাণা—তেলিংগনা।

(১৭) মেবাড়।

পশ্চিম—

(১) কুইলা পর্বত, আলাপুরী।

(২) হিমুরোজ—(হিমলাজ, বেলুচিস্থান

(৩) দ্বারিকা বৈষ্ণিদ্বীপ—বেট দ্বারকা।

(৪) জুনাগড়।

(৫) সিন্ধামলাল (?)

(৬) পুজাতব হামাল (?)

(৭) বারাঘাত—বালাঘাট।

(৮) কাশ্মীর।

(৯) বাবন্ত (? অবন্তি)

(১০) হারবতী।

(১১) গোরাংব।

(১২) চীনমহাচীন।

(১৩) বিদ্যানগর (বিজানগর?)

(১৪) কাশী।

(১৫) দীল্লী।

(১৬) অংগম।

ভূমিকম্প

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূমিকম্প-উৎপত্তির কারণ কি? বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞান-শাস্ত্র কি এই ভীষণ নৈসর্গিক উৎপাত হইতে ধনপ্রাণ রক্ষার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই?

গত ১লা মাঘ নেপাল ও বিহার অঞ্চলে এই যে ভীষণ খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়া গেল,—সহস্র সহস্র লোকের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইল—ইহাতে লোকের মনে ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ এবং প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর পাইবার আগে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল ভূমিকম্প কেন, অন্যান্য বহুবিধ ভয়াবহ নৈসর্গিক উৎপাত আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং লোকের ধনপ্রাণ, সুখশান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-শাস্ত্র উন্নতির সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ব্যাপকত্ব ও বিশালতার তুলনায় তাহার ক্ষমতা কতটুকু! বৈজ্ঞানিক ইহার প্রতিরোধে সমর্থ নহে, তবে গবেষণালব্ধ তথ্য স্থলবিশেষে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৌশলে প্রয়োগ করিয়া সাময়িক বা আংশিক প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিতে পারে মাত্র। ভূতত্ত্ববিদেরা ভূমিকম্প সম্বন্ধে এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এ প্রসঙ্গে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই—কোটী কোটী যুগ ধরিয়া ভূমিকম্প ঘটিতেছে। জলের উপর আমরা যেমন অনবরত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ দেখিতে পাই, নানা-কারণে কঠিন ভূপৃষ্ঠেও সেইরূপ অনবরত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ উঠিতেছে। কোন রকমে একটু আন্দোলন উপস্থিত হইলেই ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয়, 'রেলের ইঞ্জিনের গতি', 'সৈন্যদলের মার্চ্চ', 'জোয়ার ভাটার টান', 'হঠাৎ ঝড়কা হাওয়া' ইত্যাদি দৈনন্দিন সামান্য সামান্য ঘটনা হইতেও ভূপৃষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতেছে। এই সকল কম্পন অবশ্য খুবই মৃদু এবং মানুষের অনুভূতির মধ্যে আসে না, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে মাত্র। পুকুরের জলে বৃহৎ ঢিল নিক্ষেপ করিলে বড় বড় ঢেউ উঠিয়া তীরে আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ হঠাৎ কোন কারণে যদি ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ ধসিয়া পড়ে, তবে সেইস্থানে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং ঐ আলোড়নজনিত কম্পন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ভূপৃষ্ঠে আসিয়া ধাক্কা মারে, ইহাকেই আমরা ভূমিকম্প বলিয়া থাকি। যখন এই ধাক্কা বা ঝাঁকুনি অতিশয় প্রবল হয় তখন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে এবং কম্পনের মাত্রা বিলীন হইতে না হইতেই কেবল ভূপৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া নহে, পৃথিবীর ভিতর দিয়া সোজাসুজি চলিয়া গিয়া অপর পৃষ্ঠেও ঝাঁকুনি দিতে পারে।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্প সাধারণতঃ অতর্কিত ভাবেই আসিয়া থাকে। যদিও পশুপক্ষীর ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি বিভিন্ন বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্পের পূর্ব্বক্ষণে গৃহপালিত পশুরা ভয়ানক ভীত হইয়া উঠে এবং অস্বস্তির ভাব প্রদর্শন করিতে থাকে। ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্পের প্রারম্ভে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ উত্থিত হয় এবং মাটীর নীচে পচা গাছপালা, জীবজন্তুর মৃত দেহ হইতে উদ্ভূত বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন পশুগুলি বোধ হয় চঞ্চল হইয়া উঠে। ভূমিকম্পের প্রারম্ভে বহুদূরাগত বজ্রনির্ঘোষের মত অথবা বিশাল নগরীর কর্ম্ম-কোলাহলজনিত গুম গুম শব্দের মত এক প্রকার দিগন্ত-প্রসারী গুরু গম্ভীর আওয়াজ উত্থিত হয়, কিন্তু ভূকম্প-আগমনসূচক এই সঙ্কেত সতর্ক হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, কারণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পদতলস্থ ভূমি ঢেউয়ের মত তালে তালে চলিতে থাকে, ধরণীর বুকের উপর দিয়া অসীম শক্তি-সম্পন্ন ছোট ছোট ঢেউ ধ্বংস ও মৃত্যুর করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া অতি দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। প্রফেসর হব্‌স্ (Prof. Hobbs) ভূমিকম্পের ভীষণতার এক জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন—মানুষ, পশু সকলেই কম্পনের বেগে পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া লটান হইয়া মাটীতে শুইয়া পড়িল এবং ঝাঁকুনির চোটে মানুষের ঠিক সমুদ্রপীড়ার মত এক প্রকার মাথাঘোরা বমি-বমি ভাব হইতে লাগিল। প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে সহরের অগণিত লোকের কোলাহল, চীৎকার, অট্টালিকা-

পতনের ভীষণ শব্দে একটা ভয়াবহ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল। তাহা ইট, চূণ, সুরকীর গুঁড়া, ধূলাবালিতে সমস্ত আকাশ বাতাসাচ্ছাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ ধূসর রংয়ের অন্ধকার! স্থানে স্থানে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং বিশাল ফাটল সেই স্থানের যাবতীয় জিনিষ গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেহ যেন মন্ত্রবলে পুকুরের সমস্ত জল শুষিয়া লইল এবং তৎসঙ্গে মুহূর্ত্তেই পুকুরের চিহ্নমাত্রও রহিল না; মাটীর নীচে যে সব জীবজন্তু গাছপালা পড়িয়া দুর্গন্ধ, বিষাক্ত গ্যাস জমিয়া ছিল, হঠাৎ ধরণীর বুক চিরিয়া বাহির হইয়া তাহা আকাশ বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত করিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে বিরাট নগর চূর্ণীকৃত হইয়া গেল।

বাইবেলোক্ত সোডোম ও গোমরা (Sodom and Gomorrah) নগরী বিধ্বস্ত হইবার কাহিনী বোধ হয় ভূমিকম্পের প্রথম লিপিবদ্ধ ঘটনা। ঘটনার বর্ণনাদৃষ্টে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতজাত ভূমিকম্পই এই নগরীদ্বয়ের ধ্বংসের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই দুই নগরীতেই ধ্বংসকালীন সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অন্ততঃ দশটি ভাল লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কাজেই ক্রুদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর নাকি এই দুই নগরীর উপর প্রবল বেগে বারিবর্ষণ, গন্ধক, প্রস্তর এবং অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত স্থানের আশেপাশে অন্ততঃ দুই শত মাইলের মধ্যেও বর্ত্তমানে কোন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'নোয়া'র সময়ের জলপ্লাবনের ঘটনাও বোধ হয় সমুদ্রতলসঞ্জাত ভূমিকম্পের ফল।

গ্রীক দার্শনিকগণ ভূমিকম্পের নৈসর্গিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। লুক্রেসিয়াস্ (Lucretius 95—55 B. C.) বিশ্বাস করিতেন—পৃথিবী উপরে নীচে অসংখ্য শূন্য গহ্বরে পরিপূর্ণ। উপরে যেমন নদনদী, হ্রদ, ফাটল, শিলাখণ্ড দেখা যায়, ভিতরেও তেমনি। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ এই সকল নদনদী বিশালকায় উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ এবং স্রোতের টানে ইহারা ভীষণ বেগে গড়াগড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। কালক্রমে অভ্যন্তরস্থ গহ্বর ধ্বসিয়া পড়িলে পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পাহাড়, পর্ব্বত সবেগে স্থানচ্যুত হয় এবং পতনের বেগে পৃথিবী কম্পনক্ষ আন্দোলিত হইতে থাকে। এই অসমান চাপের ফলে গহ্বরের আবদ্ধ বায়ুরাশি অপেক্ষাকৃত চাপপ্রবণ স্তর বিদীর্ণ করিয়া মৃত্তিকা, জল, প্রস্তর প্রভৃতি সহ সবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং স্থানে স্থানে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি করে। এই মতবাদ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এরিষ্টোটল্ (Aristotle, 383—322 B. C.), ষ্ট্রাবো (Strabo, 64 B. C. 21 A. D.), সেনেকা (Seneca, 5 B. C.—65 A. D.), লিভি (Livy, 59 B. C.—17 A. D.), প্লিনি (Pliny, 23 A. D.—79 A. D.) প্রভৃতি দার্শনিকগণও ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

৭৯ খৃঃ অব্দে ভিসুভিয়াসের অভূতপূর্ব্ব ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে বিখ্যাত পম্পি নগরীর চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়। প্লিনি ভূমিকম্প ও অগ্নিস্রাবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ভিসুভিয়াসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া পর্ব্বতনিঃসৃত গন্ধকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবনদান প্লিনিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মধ্যযুগে ফোম্যাণ্ডি (Fromandi, 1527), ম্যাগি Maggio, 1571), টাভাগিনি (Travagini, 1679) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকেই তাঁহারা সাধারণতঃ ভূমিকম্পের মুখ্য কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভীষণ বেগে জল, গন্ধক, ধূম, বাষ্প, প্রস্তর ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাদের সংঘাতে ভূপৃষ্ঠ আন্দোলিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা দেখাইয়াছেন—পৃথিবীর যে স্থলে বেশী ভূমিকম্প ঘটে, সে স্থলেই আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান, যেমন ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নিয়মিত উপায়ে প্রকৃত অনুসন্ধানপ্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। 'টাগাল ভ্যালীর' পুনঃ পুনঃ ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তারপর লিস্‌বন সহরে এক ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে ৬০,০০০এর অধিক লোক বিনষ্ট হয়। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ১লা নভেম্বর লিসবন-এর অধিবাসীরা মাটীর নীচ হইতে এক

সঙ্গে সহস্র ইঞ্জিন গর্জ্জনের মত ভীষণ আওয়াজ শুনিতে পাইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে না করিতেই ভূপৃষ্ঠ ভয়ানক আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রায় ২।৩ মিনিটের মধ্যেই উপর্য্যুপরি তিনটি প্রবল ধাক্কায় এই সুদৃশ্য নগরী অগণিত অট্টালিকাশ্রেণীসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া যায়। শত শত উপাসনাকারী ভীত হইয়া গীর্জ্জার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহারা গীর্জ্জার ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবন্ত সমাহিত হইয়া গেল। দালানকোঠা চাপা পড়িয়া মৃত্যুর ভয়ে অগণিত নরনারী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভাবিয়া 'মার্ব্বেল কোয়ের' উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। বিপদের কিছুমাত্র আভাস না পাইতেই হঠাৎ ভূতল চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল এবং প্রবল বেগে বারিধারা উত্থিত হইতে লাগিল। সেই অগণিত নরনারী সমেত 'মার্ব্বেল কোয়ে' ফাটলের নীচে ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং পরমুহূর্ত্তেই সঙ্কোচনের ফলে জোড় খাইয়া ফাটল বুজিয়া গেল। তথায় কি ছিল তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। সহরের উত্তর দক্ষিণ দিকের বিরাট বেলা-ভূমি সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত ফাটিয়া, চিরিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সমূহ ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পর্ত্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা প্রভৃতি ভূভাগে প্রবল কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ফ্রান্স ও মরোক্কা প্রভৃতি দেশে স্থানে স্থানে সুবিশাল ফাটল আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১২২০ মাইল ঘুরে 'লক লমণ্ডের' জলরাশির কম্পনের তালে তালে বহু ঊর্দ্ধে উত্থান পতন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু লিসবনবাসীদের জন্য আরও বিপদ—আরও ধ্বংস অপেক্ষা করিতেছিল। প্রথম কম্পনের প্রায় আধ ঘণ্টা পর সমুদ্র পিছু হটিতে আরম্ভ করিল, বেলাভূমি হইতে সমুদ্র বহু দূরে সরিয়া গেল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ৫০।৬০ ফুট উঁচু ঢেউ তুলিয়া বিশাল জলরাশি বিপুল গর্জ্জনে তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অবশেষে সহরটিকে সম্পূর্ণ রূপে ভাসাইয়া লইয়া গেল। যাহা বাকী ছিল সব পূর্ণ হইল। এই ঢেউএর প্রকোপ আটলান্টিক পার হইয়া সুদূর এন্টিগুয়া, মার্টিনিক, বার্ব্বাডোস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং পরের দিন রাত্রি পর্য্যন্তও সমুদ্রের এই বিক্ষোভ প্রায় সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

তারপর ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে দুই ফেব্রুয়ারী ২ মিনিটের প্রবল ভূমিকম্পে দক্ষিণ ক্যালাব্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ২৮শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অতঃপর ৯ বারে প্রবল কম্পন অনুভূত হয় এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ৩০,০০০ লোক নিহত এবং ততোধিক আহত হয়। এ প্রদেশে ১৭৮৬ সালের ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত ৩৮টি ধ্বংসকারী ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল এবং সর্ব্ব সমেত ১১৮৭টি কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

১৮৯৭ সালে ১২ই জুন আসাম অঞ্চলে এক খণ্ডপ্রলয় ঘটে। ওল্ডহামের (R. D. Oldham) বর্ণনা অনুসারে সেবার ১৬০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে এই ভূমিকম্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শিলং অঞ্চলে বাড়ীঘর, দালানকোঠা, গীর্জ্জা, পুল ইত্যাদি কিছুই খাড়া ছিল না। কোন কোন স্থলে পাহাড় ফাটিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে বিরাট ফাটল আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিরাট শিলাখণ্ডসকল পাহাড় হইতে স্খলিত হইয়া তত্রত্য ভূপৃষ্ঠের বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নিশিখা, ধূম, পঙ্কক নির্গত হইয়াছিল। কোন কোন নদীর খাত, সংস্থান এবং প্রবাহের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। এই ধ্বংসলীলার পরও সাধারণ কম্পন অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। ১৭২০ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায়, ১৭৬২ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গে, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে কচ্ছ প্রদেশে এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল কাংড়া প্রদেশে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটে। হিমালয়ের স্তরস্খলনই এই ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল কাংড়া ও মুসৌরী। সমগ্র উত্তর-ভারতে এই কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। আফগানিস্থান ও সিন্ধুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরী পর্য্যন্ত ইহার ধ্বংসলীলা প্রকট হইয়াছিল। কাংড়া ও মুসৌরীই ভূমিকম্পের চরম লীলাস্থল ছিল এবং এই দুই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। ২০,০০০ লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ এবং আহতের সংখ্যা অগণিত।

১৯০৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, ভোর বেলায় স্যানফ্রান্সিসকো শহরের অধিবাসীরা অতর্কিতভাবে ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কা অনুভব করিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নরনারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল। মাত্র দুই মিনিটেরও কম সময় এই কম্পন স্থায়ী হইয়াছিল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই প্রকৃতি তাহার নিষ্ঠুর হস্তে সমস্ত চুরমার করিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্যের সূচনা করিল। গগনচুম্বী বিরাট অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। অনেক ক্ষেত্রে কেবল বিরাট অট্টালিকার কাঠামোগুলি বাকিয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্তের সাক্ষ্যদানের জন্যই যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছিল। বড় বড় বাঁধ, রাস্তা ছিঁড়িয়া, বাঁকিয়া এবং স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছিল। ট্রামের লাইনগুলি মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছিল ভূগর্ভস্থ ইলেক্‌ট্রিক লাইন ও গ্যাস-পাইপের। জলের পাইপগুলি সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জলের অভাবে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সহিত যুঝিবার কোন উপায় ছিল না। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। (১ নং চিত্র)

১৯২৩ খৃঃ অব্দে ১লা সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১১টার সময় জাপানের ইয়াকোহামা ও টোকিও সহরে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল। লোকজন নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। হঠাৎ একটু মৃদু কম্পন টের পাওয়া গেল। ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যে কম্পনের মাত্রা চরমে উঠিল। মানুষ, পশু, পাখী দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কি করিবে স্থির করিবার পূর্ব্বেই ধ্বংসলীলা প্রকট হইয়া উঠিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দুই লক্ষ নরনারী মৃত্যুর কবলে পতিত হইল—৫০ হাজার লোকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সে এক ভয়ঙ্করী দৃশ্য! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যেখানে সুদৃশ্য অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান বিরাজ করিতেছিল, চক্ষের পলকে সেক্ষাপটের মত সেখানে কেবল ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই রহিল না। বিপদের উপর বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও ঝড়ের তাণ্ডবলীলা সুরু হইল। ধ্বংসের বেটুকু অবশিষ্ট ছিল এবার তাহা পূর্ণ হইল। এই দৈবদুর্ব্বিপাকে লক্ষাধিক লোক আহত হইয়াছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ ১৩ হাজার কোটী টাকার অধিক। এই ঘটনায় জাপানের সমুদ্রের তলদেশ কোন কোন স্থলে ৩০ হইতে ১০০ ফ্যাদম পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল এবং এক মাস পরে ৩০শে সেপ্টেম্বর জরিপ করিয়া দেখা যায়, ভূমিকম্পের পূর্ব্ব অবস্থা অপেক্ষা জাপানের জমির সমতা প্রায় ৪ ফুট উঁচু হইয়া গিয়াছে। (২ নং চিত্র)

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও কেন্দ্রস্থলগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূপৃষ্ঠের ভূমিকম্পপ্রবণ দুর্ব্বল স্থানগুলি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন। ভূপৃষ্ঠে এই ভূকম্পপ্রধান স্থানগুলি দুইটি বিভিন্ন রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। একটি লাইন ভূমধ্যসাগর, আল্পাইন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে ককেসাস ও হিমালয় পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অপরটি অষ্ট্রেলেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ভূমিকম্পই এই সব লাইনে অথবা তাহাদের আশেপাশে সংঘটিত হইয়া থাকে।

এস্থলে পৃথিবীর কয়েকটি ভীষণতম ভূমিকম্পের তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

স্থান	সন	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
লিসবন	১৭৫৫	৬০,০০০	—
দক্ষিণ ক্যালাব্রিয়া	১৭৮৩	৩০,০০০	—
নেপল্‌স্	১৮৫৭	১২,৩০০	১,৪০০
জাপান	১৮৯১	১,৯৬০	২০,০০০
জাপান	১৮৯৬	২৯,০০০	৫,০০০
ভারতবর্ষ	১৯০৫	২০,০০০	—
স্যানফ্রান্সিস্‌কো	১৯০৬	—	—
মেসিনা	১৯০৮	১০০,০০০	—
মধ্য-ইটালী	১৯১৫	৩০,০০০	—
চীন	১৯২০	১০০,০০০-২০০,০০০	—
জাপান	১৯২৩	১৪২,০০০	১০৩,৭০০
ভারতবর্ষ (বিহার)	১৯৩৪	—	—

পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানোদ্ভোধিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভূমিকম্প সম্বন্ধে খুব বেশী দিন আগে কোন গবেষণা আরম্ভ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধান ও গবেষণা আরম্ভ হয়। সে সময়ের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভূমিকম্পের যে বিবরণী সংগৃহীত হয় তাহার একটা মোটামুটী আভাস দিতেছি :—

১৮৪৩ খৃঃ অব্দে পেরী (Perry) হিসাব করিয়া দেখেন যে, সমগ্র ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাতে বৎসরে গড়পড়তা ৩৩টি ভূমিকম্প হইয়াছে, ম্যালেট (Mallet) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের হিসাব করিয়া দেখান যে, পূর্বোক্ত ভূভাগে বৎসরে গড়ে ৬৪টি ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ অব্দে মন্টেসাস (Montessus) দেখাইয়াছিলেন—ক্ষুদ্র বৃহৎ কম্পন লইয়া গড়ে বৎসরে প্রায় ৩৮৩০টি ভূমিকম্প হইয়াছে। মিলনের (Milne) হিসাব মতে এই সংখ্যা ৩০,০০০ দাঁড়ায় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে গড়ে ২টি করিয়া ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। মার্কলি (G. Mercalli) গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন—১৬০১ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৮২টি ধ্বংসকারী, প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল ১০০ বছরের মধ্যে, এবং ২৭টি ঘটিয়াছিল বাকী ১৭৮ বৎসরের মধ্যে। ওমরির (Omori) হিসাব মতে এক জাপানেই ১৩০১ খৃঃ অব্দ হইতে প্রায় ১০ বৎসর বাদ দিয়া ৪১টি বিভিন্ন দলে ধ্বংসকারী ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্প ইটালী, চীন, জাপান, পেরু প্রভৃতি দেশেই বেশী ঘটিয়া থাকে। সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিকম্পের সংখ্যা বেশী হইলেও সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর হইয়া থাকে। মিশর, ব্রেজিল এবং রুশিয়ার মধ্য অঞ্চলে ভূমিকম্পের সংখ্যা খুব কম এবং হইলেও তাহারা সর্ব্বদাই খুব মৃদু-প্রকৃতির।

১৮২১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইটালীতে ৪৯৪৪টি ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল অর্থাৎ বৎসরে গড়ে প্রায় ১০৫টি, গ্রীসদেশে ১৮৯০ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩১৮৭টি, গড়ে বৎসরে ৫০১টি; ১৮৩৫-১৮৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জাপানে ৮৩৩১টি, গড়ে বৎসরে ১০৪১টি; ১৮৮০-১৯০৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডে ১১৮টি, বৎসরে গড়ে ৩৩টি; ১৮৮৯-১৯১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেনে ৩৬৩টি, গড়ে বৎসরে ১৩টি ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রেজিলে মাত্র ৩৯টি ভূমিকম্পের হিসাব রাখা হইয়াছে।

গত শতাব্দীতে চীন দেশে ৩৯টি, জাপানে ২২টি, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ২১টি, গ্রীসদেশে ১৯টি, ইটালীতে ১৬টি, চিলিতে ১১টি এবং পেরুতে ৮টি ভীষণ প্রকৃতির ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালে মানুষেরা ভূমিকম্পে উৎপীড়িত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিবিধ অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী ধরিত্রী দেবী নানা কারণে মাঝে মাঝে কুপিতা হইয়া ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি উৎপাতের সৃষ্টি করিতেন। তারপর পৌরাণিক যুগে বাসুকী নামের সহস্র ফণার উপর পৃথিবীর অবস্থানের কাহিনী শোনা যায়, পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি যখন এক ফণা হইতে আরেক ফণায় পৃথিবীকে স্থানান্তরিত করিতেন তখনই নাকি পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিত। অবশ্য এসব অলৌকিক কাহিনী ছাড়া বরাহমিহির প্রমুখ হিন্দু জ্যোতিষীগণ খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ প্রচার করেন, যথা—১। উষ্ণতাঃ বায়ুমণ্ডলের চাপের অসমতা ঘটিলে ভূমিকম্প ঘটিতে পারে। ২। কোন কারণে গ্রহাদির মাধ্যাকর্ষণের অসামঞ্জস্য ঘটিলে ভূমিকম্প হয়। ৩। ভৌতিক অগ্নি অর্থাৎ পৃথিবীস্থ মৌলিক পদার্থনিচয়ের তাপ বিকীরণ। ৪। ভূপৃষ্ঠে অত্যধিক বারিপাত। ৫। ভূগর্ভস্থ জলরাশির অবস্থান্তর প্রাপ্তি।

জাপান ভূমিকম্পের দেশ। ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে সেখানে কয়েকটি অদ্ভুত সংস্কার প্রচলিত ছিল। তাহাদের বিশ্বাস—নাকড়সার আকার এক বিরাট দৈত্য মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া এসব উৎপাত সৃষ্টি করে। আবার কাহারও বিশ্বাস—এক অতিকায় মৎস্য (Cat fish) দেশটিকে ধারণ করিয়া আছে, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হইয়া লেজের প্রবল আন্দোলনে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। জাপানে ভূমিকম্পের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত দেবালয়ে প্রার্থনা চলিত। গভর্ণমেণ্ট মনে করিতেন তাহাদের কোন দোষে ভূমিকম্প ঘটিয়াছে,

কাকেই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োর আইনগুলি তুলিয়া দিতেন। প্রাচীন ইহুদীরা (Israelites) বিশ্বাস করিতেন —ভূগর্ভে ভীষণাকৃতি দৈত্যদানব বাস করে; তাহাদের অসুখ-বিসুখে চলাফেরার ফলেই পৃথিবীতে কম্পন উপস্থিত হয়। প্রাচীন মঙ্গোলিয়ানরা ভাবিত—পৃথিবী মস্ত একটা ব্যাঙের পিঠের উপর স্থাপিত, ব্যাঙ নাড়াচাড়া করিলেই পৃথিবী কাঁপিতে থাকে। উত্তর আমেরিকানদের (রেড ইণ্ডিয়ান) বিশ্বাস—পৃথিবীকে বিরাটকায় এক কচ্ছপ পিঠে করিয়া বহন করিতেছে; কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকানরা বলে—কচ্ছপ নয়, একটা বিরাট তিমি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও লোকে ভূমিকম্প সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করিয়াছে। লিসবনের ভূমিকম্পে যেসব পর্তুগীজ রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা ভাবিল—কয়েকজন 'প্রোটেষ্টাণ্ট' খৃষ্টানকে লিসবনে বাস করিতে দেওয়ার ফলেই ভগবানের কোপ আপতিত হইয়াছে, সুতরাং জোর করিয়া তাহারা অনেককে 'ক্যাথলিক' করিল; কিন্তু ইংলণ্ডে পাদ্রীরা প্রচার করিলেন—ক্যাথলিকের স্থান বলিয়াই ভগবানের কোপে লিসবন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ জানিতে হইলে পৃথিবীর উৎপত্তি ও তাহার দেহগঠনের ইতিহাস অবগত হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত লাপ্লাস (Laplace) বলেন—সুদূর অতীত যুগে, কিন্তু ঠিক কত-কাল পূর্ব্বে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ জ্যোতিষিক ব্যাপারে কোটী কোটী সংখ্যা লইয়াই কারবার—গ্রহ, উপগ্রহাদি সমন্বিত সৌরজগৎ যে উপাদানে গঠিত তাহা এক বিরাট প্রজ্বলিত নীহারিকার আকারে মহাকাশে আবর্ত্তন করিতেছিল। কত কাল এই আবর্ত্তন চলিয়াছিল তাহারও হিসাব দেওয়া দুষ্কর। পদার্থ যতই উত্তপ্ত হউক না কেন তাপ-বিকীরণ করা এবং তদনুপাতে সঙ্কুচিত হওয়াই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমাদের পৃথিবীর জন্মদাতা নীহারিকারাশিরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল, ক্রমশঃ শীতল হইতে হইতে সঙ্কুচিত হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন-বেগও বাড়িয়া যাইতেছিল। কোন বায়বীয় বস্তু গোলকের আকারে আবর্ত্তিত হইয়া দেহ সঙ্কুচিত করিতে থাকিলেও সমস্ত বাষ্প কেন্দ্রীভূত হইয়া জমাট বাঁধিতে পারে না। আমাদের নীহারিকারাশিও ঘূর্ণন-বেগে বলয়াকারে বহিরাবরণের কিছু কিছু বায়বীয় বস্তু ছাড়িয়া আসিয়াছিল। এই বলয়াকার বাষ্পরাশি অবশেষে জমাট বাঁধিয়া গ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফয়ী (Faye) এবং ডারুইনের (Sir G. H. Darwin) মতে স্থানে স্থানে আপনা হইতেই কতকটা বাষ্প জমাট বাঁধিয়া গ্রহাদির সৃষ্টি করিয়াছিল। যারা হউক পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইতে হইতে উত্তপ্ত বাষ্পমণ্ডলে আবৃত এক জলন্ত গোলকে পরিণত হইল। অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষের পরমাণুসকল স্বভাবতঃই কেন্দ্রাভিমুখে গিয়া জমাট বাঁধিতেছিল, জলবায়ু এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা জিনিষসমূহ বাষ্পাকারে বাহিরের দিকে থাকিয়াই আবর্ত্তিত হইতেছিল। কেহ কেহ বলেন পৃথিবী যখন নীহারিকা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল তখন হয়ত বায়ুমণ্ডল ছিল না, কালক্রমে যখন 'লিথোস্ফিয়ার' বা ভূপৃষ্ঠের আবরণ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল তখনই ভূগর্ভস্থ হাইড্রোজেন, অঙ্গার বাষ্প ইত্যাদি উপরে উঠিয়া এক বাষ্পমণ্ডল সৃষ্টি করে, ইহাই হইল আমাদের প্রাথমিক আকাশ। চেম্বারলেন (Chamber-lain) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন আমাদের গ্রহগুলি যখন অতি শৈশবাবস্থায় কেন্দ্রগঠনা করিয়া ঘুরিতেছিল তখন তাহাতে জল-বায়ু, শিলামৃত্তিকা প্রভৃতির কোন উপাদান ছিল না; আশে পাশে চতুর্দ্দিক হইতে উল্কাপিণ্ড ও বিভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই সব উপাদানে দেহ পুষ্ট করিয়াছে। হিসাবে দেখা যায় আদিম অবস্থায় যখন সবেমাত্র পৃথিবী জমাট বাঁধিতেছিল তখন তাহার ব্যাসের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫০০ মাইল। ক্রমশঃ বাহিরের উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঐ ব্যাসের পরিমাণ দাঁড়াইল ৮১০০ মাইল। প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়া ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে ব্যাসের পরিমাণ বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৭৯০০ মাইল। প্রৌঢ়ত্বে ভূপৃষ্ঠ ছিল আগ্নেয়গিরির দ্রবীভূত, জলন্ত ধাতুনিঃস্রাবের মত, ঘূর্ণিবেগে ও অনবরত তাপবিকীরণে ভূপৃষ্ঠ ও তাহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থের অবস্থার অসামঞ্জস্য হেতু অনবরত ভাঙ্গা গড়া, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ চলিতে লাগিল—হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়াছিল, ফলে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাসাল্ট (basalt) জাতীয় পদার্থসকল ভূতলের সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে, আর অপেক্ষাকৃত হাল্কা গ্রানাইট (granite) জাতীয় পদার্থ উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই

উপরে ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্নদিকে প্রায় ৩০ হইতে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত শিলা মৃত্তিকা গ্রানাইট প্রভৃতির একটা কঠিন স্তর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তন্নিম্নে আরও ৫০ মাইল পর্য্যন্ত গুরুভারসম্পন্ন ধাতব শিলার স্তর বিস্তৃত রহিয়াছে। কেন্দ্রাভিমুখে প্রায় শত মাইল বিস্তৃত এই কঠিন আবরণ ভিতরের অপরিসীম তাপকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। কারণ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীরতা-বৃদ্ধির সঙ্গে উত্তাপের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ৩৪ মাইল নীচ হইতে প্রত্যেক মাইলে প্রায় ৫০ ডিগ্রি 'সেন্টিগ্রেড' হিসাবে তাপের মাত্রা বাড়িতে থাকে। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত ধাতুস্রাবের উত্তাপ ১০০০ ডিগ্রি 'সেন্টিগ্রেডে'রও বেশী, ইহা হইতেই আমরা পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অত্যধিক উত্তাপে গলিত তরল অবস্থায় রহিয়াছে; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ভূস্তরের অপরিসীম চাপের ফলে অভ্যন্তরস্থ বস্তুরাশি তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না—কতকটা জমাট অথবা দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। কারণ অত্যধিক চাপে পদার্থের অণুপরমাণুগুলি সাধারণ অবস্থা হইতে অনেক ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

যাহা হউক পৃথিবী শৈশবের জলন্ত অবস্থা হইতে যৌবনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আলো প্রদান করিয়া ক্রমে প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করিয়া তাপ বিকীরণ করিতে করিতে যখন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, তখন উপরিস্থিত বাষ্পরাশি জমিয়া বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল এবং এই অবস্থায় বহু যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর ক্রমশঃ জল জমিতে জমিতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া গেল। সর্ব্বত্রই জল, স্থলভূমির চিহ্নমাত্র নাই। আবার কিছুকাল তাপ বিকীরণ করিবার পর পৃথিবী সঙ্কুচিত হইবার ফলে ঠিক পরিশুষ্ক বেদানার মত উপরিভাগ তোবড়াইয়া গিয়া স্থানে স্থানে উঁচু নীচু হইয়া অসমতল ভূভাগের সৃষ্টি করিতে লাগিল, তখন বিশাল জলরাশি অপেক্ষাকৃত নীচু স্থানে আশ্রয় লইল এবং স্থানে স্থানে স্থলভাগ জাগিয়া উঠিল। অনবরত বারিপাতের ফলে, জলস্রোতের বেগে ভূভাগ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে পলি পড়িয়া পড়িয়া স্তর সংগঠন হইতে লাগিল। এইপ্রকার বহুকলে নিয়ত ক্ষয় [illegible] কতকগুলি ভূভাগ উঁচু রহিয়া গেল এবং কতকগুলি নিম্নভূমিতে পরিণত হইল। ক্রমশঃ পলি জমিয়া জমিয়া কোন কোন স্তর এত ভারী হইয়া পড়িতেছিল যে, মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা ভূমিকম্পের মত বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ভূপৃষ্ঠ ভারসাম্য রক্ষা করিতে লাগিল। ওয়েজেনার (Wegener) বলেন, গ্রানাইট জাতীয় পদার্থে গঠিত আমাদের মহাদেশগুলি ভাসমান বরফ-শৈলের ন্যায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বসম্পন্ন গলিত ধাতব গোলকের উপর ভাসিতেছে। বহু যুগ পূর্ব্বে বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে ভাসিতে ভাসিতে ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথবা স্থানচ্যুত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও এইরূপ ঘটিতেছে। গ্রীনল্যাণ্ড বছরে প্রায় ৫০ ফুট করিয়া ইয়োরোপ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর এই গলিত পদার্থরাশির জন্যই ভূস্তরের সর্ব্বত্র ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষিত হইতেছে। কোন কারণে এই ভারসাম্যের অসামঞ্জস্য ঘটিলে ভূস্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, উঁচু নীচু হইয়া সমতা রক্ষা করে এবং ইহার ফলেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ ডাটন (C. E. Dutton) সর্ব্বপ্রথম ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এই মতবাদ (ভূস্তরের ভার-সাম্য রক্ষা—maintenance of isostatic equilibrium) প্রচার করেন। বর্ত্তমানে এই মতবাদই ভয়াবহ ভূমিকম্প উৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি মতবাদ এত দিন প্রতিষ্ঠা পাইতেছিল। কেহ কেহ বলেন—উপরিভাগের স্তরবিন্যাস সর্ব্বত্র সমান পুরু নহে। যে স্থলে অপেক্ষাকৃত হালকা স্তর আছে, সময়ে সময়ে অভ্যন্তরস্থ অগ্নিরাশি সেই স্থল ভেদ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতরূপে দেখা দেয়। তাহার ফলে ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এমন অনেক ভূমিকম্প ঘটিয়াছে যেখানে আগ্নেয়গিরির চিহ্ন মাত্র নাই। তবে আগ্নেয়গিরির প্রভাবে স্থলবিশেষে পরিমিত স্থানে ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে ইহা সত্য। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন—পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের কারণ 'রেডিয়াম' ছাড়া আর কিছুই নহে এবং এই 'রেডিয়াম'ই ভূমিকম্প উৎপত্তির একটি গৌণ কারণ। কাহারও মতে উত্তাপের অপচয়জনিত ভূপৃষ্ঠের সঙ্কোচনের ফলেই প্রবল ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ মানিয়া লইলে এই মতবাদে বিশেষ আস্থা স্থাপন

করা যায় না। আমাদের পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল নহে এবং ভূপৃষ্ঠও সকল স্থান সমান নহে—এই কারণে অবস্থাবিশেষে মাধ্যাকর্ষণের অসামঞ্জস্য ঘটিলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইতে পারে—কেহ কেহ এই মতও পোষণ করিয়া থাকেন। অপরাপর প্রাকৃতিক আকর্ষণ পৃথিবীর ভূমিকম্পের কারণ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরেকটি মতবাদ এই—পদার্থমাত্রই অনবরত অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই প্রক্রিয়ায় তাপের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বিরাট শিলারাশি এই প্রক্রিয়ায় অপরিমিত তাপ উৎপন্ন করিতেছে। এই বিপুল তাপরাশি ভূমিকম্পের গৌণ কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রিষ্টলে (Priestley) ভূমিকম্পের সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু ভূমিকম্পের সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকবার ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়াছে। জাপানের ভূমিকম্পের পূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ডাটনের মতবাদই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ অধিকাংশ ঘটনায় ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়া যায়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ জানা থাকিলেও তাহা প্রতিরোধ করিবার উপায় মানুষের জানা নাই। তবে আমরা যেমন পদতলে ভূমি কাঁপিতে না থাকিলে ভূমিকম্প বলিয়া জানিতে পারি না, বৈজ্ঞানিক তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র সহযোগে অনেক পূর্ব্বে তাহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকেরা এই যন্ত্রের নাম দিয়াছেন Seismograph বা Seismometer অর্থাৎ ভূকম্প-পরিজ্ঞাপক যন্ত্র। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে ডেভিড মিল্‌নে (David Milne) নামে এক ভদ্র লোক সর্ব্বপ্রথম ভূমির কম্পনরেখা অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং Seismometer নাম দেন। কালক্রমে এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতি হয়। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে পামিরি (L. Palmieri) তখনকার দিনে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির স্থাপিত অনুরূপ যন্ত্রের নাম দেন—Seismograph. ১৮৪১ খৃঃ অব্দেই ফর্বেস্ (J. D. Forbes) নামে এক ভদ্রলোক অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের একপ্রকার ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্র তৈয়ারী করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে জাপানে ইংরেজ ভূকম্পবিদেরা—ইউয়িং (J. A. Ewing), গ্রে (T. Gray) এবং মিল্‌নে (J. Milne) এই যন্ত্রের বিশেষত্ব স্বীকার করেন এবং টোকিও এবং অন্যান্য সহরে ইহা স্থাপন করেন। এই যন্ত্র সাহায্যে ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছিল। ১৮৮১-১৮৮২ খৃঃ অব্দে কেম্ব্রিজে ডারুইন ব্রাতৃদ্বয় (G. H. & H. Darwin) ভূকম্পের আকর্ষণের বিশৃঙ্খলার পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে এক যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রের পরিকল্পনা লইয়া ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে এবং ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ক্রমান্বয়ে শয়ান দোলক (Rebeur-Paschwitz's horizontal pendulum) এবং লম্বমান দোলক (H. Darwin's bifilar pendulum) আবিষ্কৃত হয়। ভূমিকম্প কখন কোন্ দিকে ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ১৩২ অব্দে চাং হেং নামে চীন দেশীয় জনৈক ছাত্র এক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিবিধ উপায়ে ভূমির কম্পন লিপিবদ্ধ করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চস্থান হইতে লম্বমান তারের সঙ্গে একটি ভারী দোলক ঝুলানো থাকিত এবং তৎসংলগ্ন একটি শলাকা বালির উপর কম্পনের রেখাপাত করিত। কোন কোন যন্ত্রে দোলকটি নীচে ঝুলান না থাকিয়া একটি লম্বা সরু কাষ্ঠ দণ্ডের উপরের দিকে স্থাপিত হইত (inverted pendulum) এবং দণ্ডের মুষ্টীমুখের শেষ প্রান্ত বালির উপর রেখাপাত করিত। কোন কোন যন্ত্রে আবার শায়িত দোলকের ব্যবস্থা ছিল (horizontal pendulum)। ইউয়িং সাহেব লম্বমান এবং শয়ান উভয় প্রকার দোলক সহযোগে এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। কোন কোন যন্ত্রে বালির উপর অথবা পেন্সিল সহযোগে কাগজের উপর রেখাপাত হইত আবার কোন কোন যন্ত্রে ফটোগ্রাফের প্রণালী অবলম্বিত হইত। কিন্তু তখনকার এসব যন্ত্রে একটা মস্ত ত্রুটী রহিয়া গিয়াছিল। তাহা এই—কম্পন অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে কম্পনের নির্ভুল রেখাচিত্র অঙ্কিত হইত বটে, কারণ স্বভাবানুবর্ত্তনের (inertia) ফলে প্রথম কম্পনে দোলক আপনার ভারকেন্দ্র অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না;

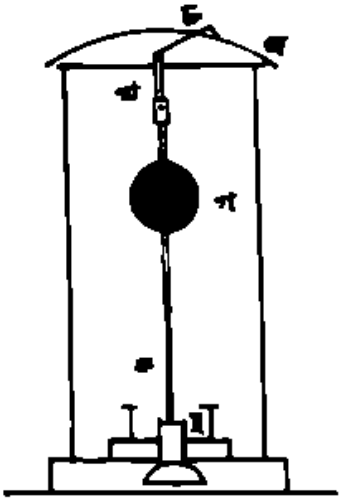

চিত্রে উল্লিখিত [illegible]
[illegible]

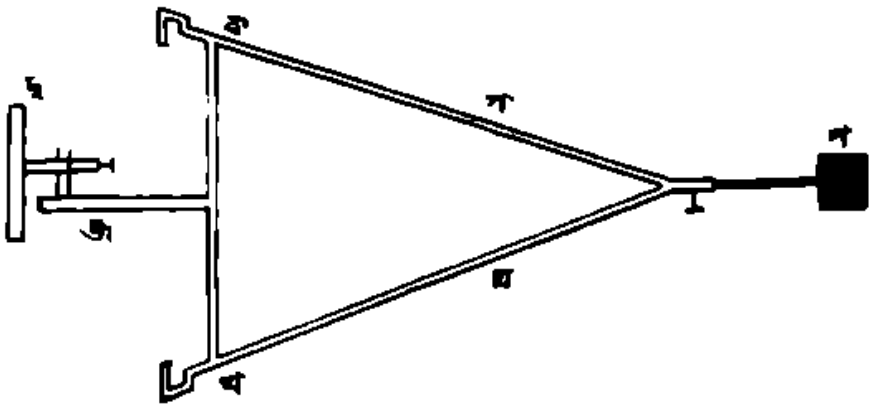

Rebeur-Paschwitz ভূমিকম্প লেখার ভূ-কম্প জ্ঞাপক যন্ত্রের নিম্নোক্তরূপ।

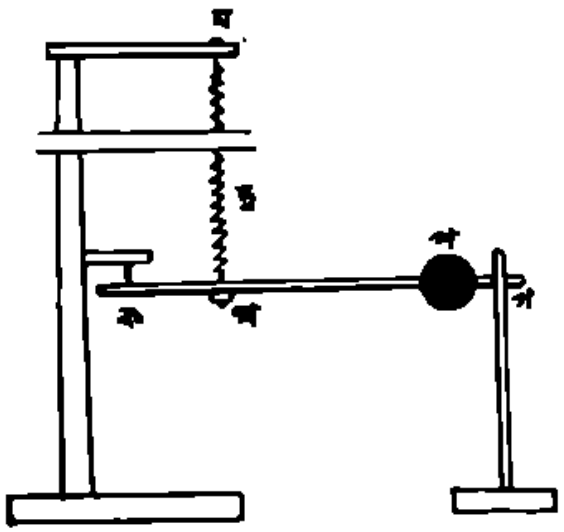

৫। যে সহজবিধ ভূমিকম্প উলম্ব রেখে ভূ-কম্প-জ্ঞাপক যন্ত্রের নিম্নোক্ত-রূপ।

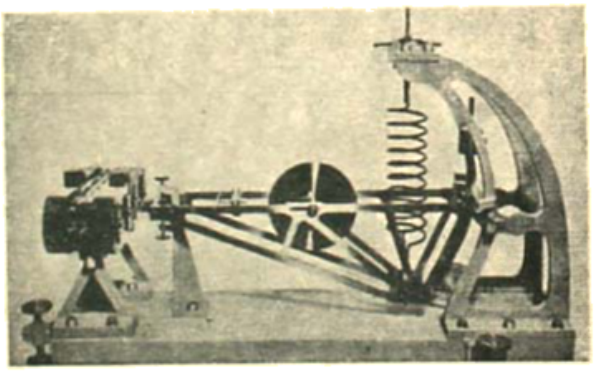

দ্বিতীয় সংলগ্নিকা উলম্ব রেখে কম্পন-জ্ঞাপক যন্ত্র।

Smithsonian Report হতে গৃহীত।

কিন্তু দোলক একবার দোল খাইলে আপন বেগে নির্দিষ্ট গতিতে দোল খাইতে থাকে—এই জন্য কম্পন একটু বেশী সময় স্থায়ী হইলে, দুই প্রকার গতি মিলিয়া রেখাচিত্র এলোমেলো হইয়া পড়িত।

১৮৪০ খৃঃ অব্দে সাধারণ পেণ্ডুলামের রীতিতে পার্থনাবাবে একটি যন্ত্র স্থাপিত হয়। ইহা প্রায় ৩৯ ইঞ্চি লম্বা ছিল এবং দোলকের নিম্নভাগে এমনভাবে একটি ক্ষুদ্রাগ্র শলাকা স্থাপিত

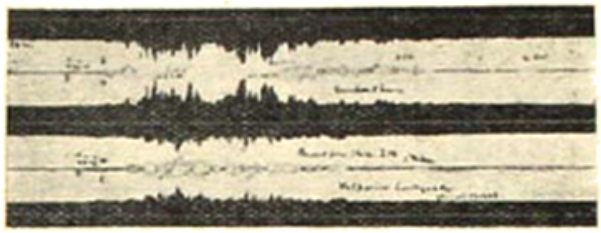

ফটোগ্রাফিক কাগজে আলোক-কিরণ সাহায্যে লিখিত কম্পনের রেখা-চিত্রের নমুনা।

[Wonders of Land and Sea হইতে গৃহীত

ছিল যে, দোলকটি নড়িলেই নিম্নে আস্তৃত খুব সূক্ষ্ম বালুকার উপর আঁচড় কাটিয়া দিত। ইটালীতে এক কালে এরূপ যন্ত্রের খুব আদর ছিল এবং ইহার সাহায্যে বহু দূরের ভূমিকম্পের রেখাচিত্র অঙ্কিত হইত।

ফরবেসের বিপরীত দিকে স্থাপিত পেণ্ডুলাম যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। গ একটি ভারী পেণ্ডুলাম ক খ দণ্ডের উপরদিকে স্থাপিত। এই পেণ্ডুলামটিকে ইচ্ছামত যে কোন উচ্চতায় আটকাইয়া রাখা যায়। ফ্রেমের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত একটি চোঙাকৃতি ইস্পাতের তারের (ছ) উপর দণ্ডটির নিম্নপ্রান্ত স্থাপিত। স্ক্রুর সাহায্যে ইস্পাত পাতকে একটু উপরে নীচে উঠাইয়া নামাইয়া দণ্ডটিকে ইচ্ছামত দৃঢ় অথবা আলগা করা যায়। ইস্পাত তারটি চোঙাকৃতি হওয়ায় পেণ্ডুলামের দণ্ডটি মাত্র এক দিকে নড়াচড়া করিতে পারে। দণ্ডের উপরের প্রান্তসংলগ্ন একটি পেন্সিল (চ) স্প্রিং-এর সাহায্যে একটি ড্রামের (ঘ) উপর আলতো ভাবে চাপিয়া থাকে। ঐ ড্রামের গায়ে কাগজ জড়াইয়া কম্পনের রেখাচিত্র পেন্সিলের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। (৩ নং চিত্র)

উইচার্ট-উদ্ভাবিত যন্ত্রে প্রায় এক টনেরও বেশী ওজনের একটি পেণ্ডুলাম একটা শক্ত লৌহদণ্ডে সংলগ্ন করিয়া তাহার নিম্ন প্রান্ত একটা স্প্রিংএর উপর স্থাপন করা হইত। ইহাতে সুবিধা ছিল এই যে, ইহা যে-কোন দিকে ঘুরিতে পারিত এবং কম্পনের ফলে স্থানচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই নিজের লম্বমান অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিত। পেণ্ডুলামের কম্পন দুইটি কাচের লিভারের সাহায্যে অনেক গুণ বর্দ্ধিত আকারে ড্রামের গায়ে জড়ানো ভূষা-কালিমাখানো কাগজে অঙ্কিত হইত। এতদ্ব্যতীত পেণ্ডুলামের নিজস্ব অতিরিক্ত দোলন বন্ধ করিবার জন্য বায়ুপূর্ণ সিলিণ্ডারের 'ড্যাম্পিং' যন্ত্র ব্যবহার করা হইত।

শায়িত পেণ্ডুলাম যন্ত্রে একটি সুদৃঢ় কাঠামোর উপর একটী দণ্ড প্রায় লম্বমান অবস্থায় স্থাপিত। সেই দণ্ডের গায়ে একটি ফ্রেম এমন শায়িত ভাবে সংলগ্ন আছে যে, ফ্রেমটি ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতে পারে। এই ফ্রেমের যে-কোন প্রান্তের কাছাকাছি অথবা মধ্যস্থলে একটি ভারী পেণ্ডুলাম থাকে। প্রত্যেক স্থলেই যন্ত্রটিকে পূর্ব্ব পশ্চিম

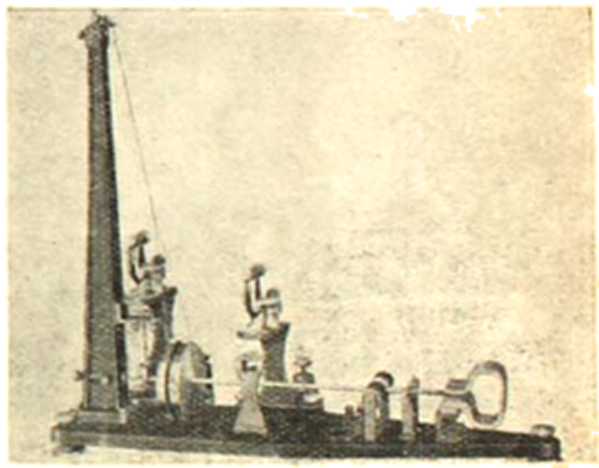

McComb-Romberg উদ্ভাবিত শায়িত পেণ্ডুলাম যন্ত্রের সমগ্রাঙ্গ-চিত্রক যন্ত্র।

[Smithsonian Report হইতে গৃহীত।

দিকে স্থাপিত করা হয়। কেবল উত্তর হইতে দক্ষিণ বা দক্ষিণ হইতে উত্তরে যে কম্পন হইবে তাহাতে এই যন্ত্র সাড়া দিতে পারে। কাজেই সাধারণতঃ দুইটি যন্ত্র পাশাপাশি সমকোণে স্থাপিত করা দরকার।

Rebeur-Pasohwitzএর শায়িত পেণ্ডুলাম—এই যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম নিখুঁতভাবে দূরস্থিত ভূমিকম্পের রেখাচিত্র

অঙ্কিত হয়। রডটিও খুব ছোট, মাত্র আউন্স ওজন, লম্বায় ৮ ইঞ্চি, তবে দমবিবার জিনিষের মত কম, গ,ঘ তিনটি হালকা পিতলের নল আছে, গ ও লম্বা বাহুদ্বয়ের সংযোগস্থল হইতে আরেকটি হাল্কা নল কিছু দূর বাহির হইয়া আছে, উহার প্রান্তভাগে ছোট একটি পেণ্ডুলাম (প) স্থাপিত। বাহু দুইটি ক ও খ প্রান্ত হইতে একটু লম্বা হইয়া ক্রমে আঁটা দুইটি ইস্পাতনির্ম্মিত সূচের সরু মুখের উপর এমনভাবে স্থাপিত আছে যে, অত্যন্ত সহজভাবে নড়াচড়া করিতে একটুও বাধা

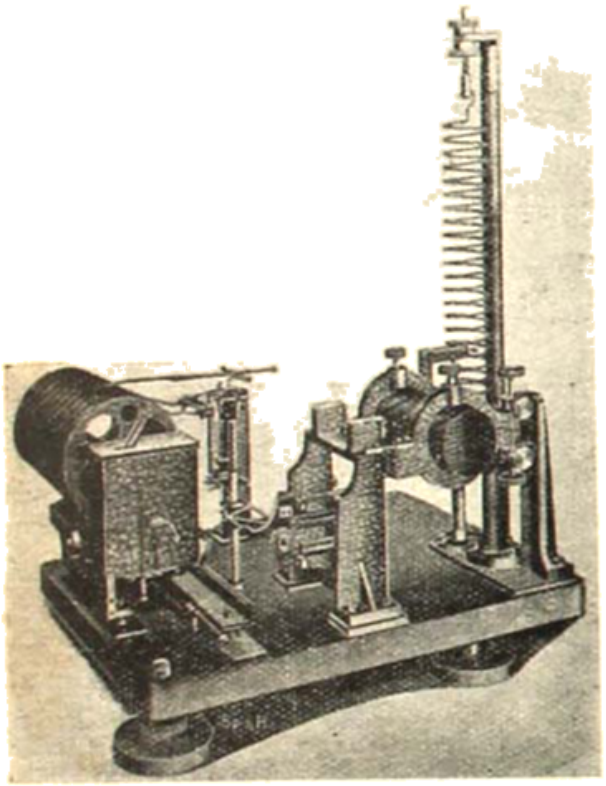

ভূমি হইতে উদ্ভেদ সমস্ত লম্বালম্বি কম্পন অঙ্কিত করিবার আধুনিক যন্ত্র। বাম পার্শ্বস্থ ঠোঙার মধ্যে চড়ানো ধূমা-মাখানো কাগজে পিতলের দণ্ডের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঘণ্টা কোনও উপরে নীচে কম্পিত হইতে পারে।

Spindler and Hoyer কোম্পানি হইতে গৃহীত।

পায় না, ঘ দণ্ডটি কখ নলের সমকোণে খানিক দূর গিয়া ছ দর্পণখানার সঙ্গে আলতোভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। একটি প্রদীপ হইতে আলোকরশ্মি ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া ফটোগ্রাফির কাগজ জড়ানো একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের বহিরাবরণের সূক্ষ্ম লম্বা ফাঁকের মধ্য দিয়া ঐ কাগজের উপর পতিত হয়। ভূমিকম্পের ফলে যন্ত্রের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিও কম্পিত হইয়া বহুগুণ বর্দ্ধিত আকারে ফটোগ্রাফির কাগজের উপর রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেয়। (৩ নং চিত্র)

উপরে যে সকল যন্ত্রের কথা বলা হইল তাহাদের দ্বারা ভূপৃষ্ঠের পাশাপাশি কম্পন—অর্থাৎ যাহা উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে পরিচালিত হয়—জানিতে পারা যায় মাত্র, কিন্তু নীচ হইতে উপরের দিকের কম্পন ধরা যায় না। সেইজন্য লম্বমান কম্পনজ্ঞাপক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক্ষণে Sir J. A. Ewing পরিকল্পিত একটি ভূকম্পজ্ঞাপক লম্বমান যন্ত্রের বর্ণনা দিতেছি :—ক গ একটি শক্ত ধাতব দণ্ড; উহার এক প্রান্তের প্রায় কাছাকাছি প পেণ্ডুলাম স্থাপিত, দণ্ডটির অপর প্রান্ত ক, ফ্রেমের সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ইস্পাতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম মুখের উপর স্থাপিত, খ চিহ্নিত স্থান ব চিহ্নিত ফ্রেম হইতে স্প্রিং ছ-এর সাহায্যে ঝুলানো। ক গ 'ফালক্রামে' ঊর্দ্ধাধঃ আন্দোলিত হয়। এই দণ্ড অপর প্রান্তের শেষভাগে নিম্নাভিমুখে আরেকটি দণ্ড বা শলাকা সংযোগে ভূমিকম্পের রেখাচিত্র বর্দ্ধিত আকারে অঙ্কিত করিয়া থাকে। (৪ নং চিত্র)

বর্ত্তমানে আরও উন্নত ধরণের ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে ঘোলকের স্বকীয় কম্পনজনিত অসুবিধা উন্নত উপায়ে 'ড্যাম্পিং প্রথা'র সাহায্যে দূরীভূত হইয়াছে, এবং তড়িৎশক্তির সহযোগে যন্ত্রের পরিবর্দ্ধন-ক্ষমতা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্যালিটজিন লম্বমান ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্র ঊর্দ্ধাধঃভাবে স্পন্দিত হইয়া গ্যালভ্যানোমিটার সহযোগে বহু গুণে পরিবর্দ্ধিত আকারে ফটোগ্রাফির কাগজে রেখাচিত্র অঙ্কিত করে। পেণ্ডুলামের আকারে খুব একটা ভারী পদার্থ শক্তিত ফ্রেমের সহিত সংযুক্ত এবং সেই ফ্রেমটি লম্বমান স্প্রিং দ্বারা প্রধান কাঠামোর সঙ্গে সংলগ্ন, ফ্রেমের বাহিরের প্রান্তভাগের সহিত কয়েকটি তাড়িৎ কুণ্ডলী স্থাপিত আছে, সেগুলি আবার ঘোরালো চুম্বকক্ষেত্রে নড়াচড়া করিতে পারে। ঊর্দ্ধাধঃ ভূমিকম্প হইলেই কাঠামোটি উপরে নীচে কাঁপিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্র নড়াচড়ার ফলে তড়িৎশক্তির উৎপাদন করিয়া তৎসংলগ্ন গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রে প্রেরণ করে, গ্যালভ্যানোমিটারের দর্পণ হইতে আলোকের রশ্মি

প্রতিফলিত হইয়া বহুগুণে বর্দ্ধিত হয় এবং ফটোগ্রাফির কাগজে ভূমিকম্পের রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। (৬নং চিত্র) এস্থলে ভূমিকম্পের রেখাচিত্রের একটি নমুনা দেওয়া হইল। (৭ চিত্র)

ম্যাকেনো রেমেবার্গ-যন্ত্র—এই যন্ত্রের পেণ্ডুলাম দণ্ডটি শয়ানভাবে আছে। পেণ্ডুলামটি উপস্থিত ফ্রেমের 'পুলী'

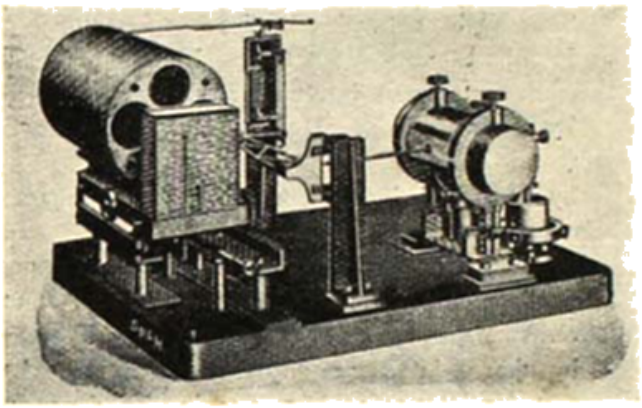

১০। ভূপৃষ্ঠের পাশাপাশি কম্পন অঙ্কিত করিবার আধুনিক যন্ত্র। বামপার্শ্বে তারের গায়ে ঝুলা-আয়নায় কাগজ জড়াইয়া উপস্থিত নিলা। সহযোগে কম্পনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে আরও ভারী লেনক দামনে পিছনে কম্পিত হইতে পারে।

[Spindler and Hoyer কাটালগ হইতে গৃহীত।

হইতে দুইটি সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা ঝুলানো আছে। পেণ্ডুলাম দণ্ডটির এক প্রান্ত ফ্রেমের গায়ে সূচিমুখে স্থাপিত। দণ্ডটির অপর প্রান্তে পূর্ব্বের মত চৌম্বক ক্ষেত্রে তারকুণ্ডলীর অবস্থানের ফলে কম্পনচিত্র বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফটোগ্রাফির কাগজে অঙ্কিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের পাশাপাশি কম্পন বুঝিতে পারা যায়। উক্ত দুইটি যন্ত্রই বহুক্ষণস্থায়ী কম্পনের ফলে পেণ্ডুলামের স্বাভাবিক দোলনবেগজনিত বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য অভিনব উপায়ে 'ড্যাম্পিং'এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৮নং চিত্র) এস্থলে আধুনিক লম্বমান এবং শায়িত আরও দুইটি যন্ত্রের চিত্র প্রদত্ত হইল। (৯ ও ১০নং চিত্র)

প্রায় সমস্ত প্রকার ভূমিকম্পের পূর্ব্বে মৃদু কম্পন আরম্ভ হয়। এই সকল যন্ত্রে তাহা প্রকৃত ভূমিকম্পের বহু পূর্ব্বেই ধরা পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যন্ত্রের এত দূর উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই অগণিত নরনারী একসঙ্গে অসহায় ভাবে প্রাণ হারাইতেছে। ভূমিকম্পে প্রকৃত ধ্বংসলীলা সাধিত হয় বড় জোর দুই তিন মিনিট সময়ের মধ্যে। কাজেই অন্ততঃ কিছু সময় পূর্ব্বে যদি মানুষ ভূমিকম্পের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারে, তবে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষার উপায় হয়। আজকাল wireless waves সহযোগে নানাবিধ অদ্ভুত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, ইহাকে কি ভূমিকম্প হইতে লোকের জীবনরক্ষার ব্যাপারে কোন রকমে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না? রাডার-আফিস ঝড় জলের signal দেয়, forecasts দেয়। কিন্তু ভূমিকম্পের সম্বন্ধে কিছুই বলে না, সেজন্য বলিতেছি যদি বড় বড় সহরের বিভিন্ন বিপজ্জনক কেন্দ্রে বিপদের আগমন-সঙ্কেতসূচক ঘণ্টা বা অন্য কিছু শব্দ উৎপাদনকারী বহু wireless receiving যন্ত্রের সহিত relayর সংযোগ থাকিত এবং self-recording seismograph অনুরূপ ব্যবস্থায় transmitterএর সহযোগে স্থাপিত হইত, তবে হয়ত ভূমিকম্পের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা হইতে অনেক জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা হইত।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ [লীগ্ অব্ নেশন্‌স্]

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

১৯১৯ সালের ২৮শে জুনকে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মদিন বলা যাইতে পারে। ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদে মিত্রশক্তির সহিত জার্মানীর যে সন্ধি এইদিন স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথমাংশে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তিপত্র (covenant) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চুক্তিপত্রের ও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনার মূলে ছিল প্রেসিডেন্ট উইলসনের বিখ্যাত চতুর্দশ নীতি। আদর্শবাদী উইলসন্ যুদ্ধশান্তির যে চতুর্দশ নীতি মিত্রপক্ষের নিকট ১৯১৮ সনের জানুয়ারি মাসে প্রস্তাব করেন, তাহার চতুর্দশতম নীতিটি এই—

"A general association of nations should be formed on the basis of covenants designed to create mutual guarantees of the political independence and territorial integrity of states, large and small equally."

অর্থাৎ, ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সীমান্তরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসমূহের একটি সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত যে, এই আদর্শ নেতিমূলক, অর্থাৎ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে বহিরাক্রমণ নিবারণের কথাই পরোক্ষভাবে ইহাতে বলা হইয়াছে। যাহা হউক, ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শান্তিবৈঠকের প্রাথমিক অধিবেশন হয় তাহাতে উইলসনের রাষ্ট্রসঙ্ঘগঠনের এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের খসড়া প্রস্তুত করিবার আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম খসড়া মূলতঃ প্রেসিডেন্ট উইলসন্, জেনারেল স্মাট্‌স্, লর্ড রবার্ট সেসিল ও কর্ণেল হাউস (আমেরিকা) কর্তৃক প্রস্তুত হয়। তাহাকেই ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ ও আমেরিকান প্রতিনিধিদলের আইনপরামর্শদাতা হার্ষ্ট ও মিলার যে খসড়া করেন, প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাবে তাহা শান্তিবৈঠক কর্তৃক ১৯১৯ সালের ১০ই জুন গৃহীত হয়। ২৮শে জুন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ও সেই সঙ্গেই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তিপত্র ভার্সাই সন্ধিপত্রেরই অঙ্গ আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্র। ভার্সাই সন্ধি যে সকল রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছে, তাহারা ইহাকে মূলতঃ স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহাকে অস্বীকার করিলে ভার্সাই সন্ধিপত্রকেই অস্বীকার করা হইবে।

ভার্সাই সন্ধিপত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ছাব্বিশটি ধারা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্বন্ধে। এই ধারাগুলির মূল বক্তব্য আমাদের জানা প্রয়োজন। চুক্তিপত্রের ভূমিকায় বলা হইয়াছে—

"The High Contracting Parties

In order to promote international cooperation and to achieve international peace and security,

by the acceptance of obligations not to resort to war,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and

by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

Agree to this Covenant of the League of Nations."

অর্থাৎ, "আন্তর্জাতিক সাহচর্য্য বিধানের জন্য ও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও বিঘ্ন মোচনের জন্য, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, রাষ্ট্রসমূহের ভিতর খোলাখুলি, ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানসূচক সম্পর্কের বিধান করিয়া আন্তর্জাতিক আইনগুলিই যে রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণের উপায় এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সম্মতি দান করিয়া, সুসংঘটিত জাতিসমূহের আদানপ্রদানে সন্ধির বাধ্যবাধকতাগুলি পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই চুক্তিপত্র গ্রহণ করিলেন।"

এই ভূমিকায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, পরবর্তী ছাব্বিশটি ধারায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিধি বিবৃত করা হইয়াছে। সেই ধারাগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূমিকাসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। উইলসনের মূল খসড়ার negative আদর্শের পরিবর্তে এখানে একটা positive আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—আন্তর্জাতিক সাহচর্যবিধান, শান্তিরক্ষা ও বিঘ্নমোচন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কথা উঠিতে পারে, negative আদর্শই ছিল ভাল, এত উঁচু একটা positive আদর্শ লইয়া গোড়াপত্তন

না করিলেই ভাল হইত। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শান্তি-বৈঠক উপলক্ষে ছোট বড় রাষ্ট্রসমূহের যে সম্মেলন হইয়াছিল সেরূপ সম্মেলন যখন তখন ঘটা কঠিন; আর একবার একটা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলে তাহা পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে চরম আদর্শ গ্রহণ করাই সমীচীন। হয়ত পদে পদে ত্রুটী ঘটিবে, হয়ত ইহার চেয়ে সরলতর আদর্শ সহজলভ্য হইতে পারিত কিন্তু তাহাতে ত ক্ষতি নাই। মানুষের আদর্শ ছোট করিয়া ধরিলে মানুষকেই ছোট করা হয়। আর একটা কথা, উইলসনের negative আদর্শবাদের পিছনে ত এই positive আদর্শ প্রচ্ছন্নরূপে রহিয়াছে। সেই প্রচ্ছন্ন আদর্শকে সুস্পষ্ট করিতে সাহস চাই এবং সে সাহস দুঃসাহস হইলেও হঠকারিতা নহে।

জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিই বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য। এখানে "রাষ্ট্র" কথাটার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। "নেশন" বলিতে "জাতি" বুঝায় না। এককালে লীগ্ অব্ নেশন্‌সের অনুবাদ স্বরূপ "জাতিসঙ্ঘ" এই শব্দটি ব্যবহার করা হইত। তাহা ভুল। "রাষ্ট্র" বলিতে সুসংগঠিত গবর্ণমেণ্ট বোঝায়, ইংরেজিতে যাহাকে State বলে তাহাই। লীগের একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়াছেন; তাঁহার মতে "League" এই শব্দটি সুষ্ঠু নহে। League of Nations-এর ফরাসী প্রতিশব্দ Societe des Nations; তিনি এই Societe অর্থাৎ Society শব্দটির পক্ষপাতী। লীগ্ বলিতে আমরা যাহা বুঝি Society বলিতে ঠিক তাহা বুঝি না। লীগ্ শব্দটার মধ্যে সহজেই চালবাজির কথা মনে হয়; অথচ বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে তাহার স্থান নাই। অবশ্য League of Nations এই নামটা এখন চলিয়া গিয়াছে। বাংলায় ইহার যে প্রতিশব্দ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অবশ্য কোন দোষ নাই, অপরাধের মধ্যে কথাটা কিছু পরিমাণ প্রতিকটু। কিছুদিন চালাইলে সে দোষও অজ্ঞানে ঢাকিয়া যাইবে।

চুক্তিপত্রের বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্যসম্বন্ধীয় প্রথম ধারায় বলা হইয়াছে—

"any fully self-governing State, Dominion or Colony...may become a member of the League, if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, provided that it shall give effective guarantees of its sincere intention to observe its international obligations, and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and airforces and armaments."

অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ (স্থলসেনা, নৌসেনা ও বিমানশক্তি) বিষয়ে সঙ্ঘের বিধান স্বীকার করিয়া আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতাগুলি মানিয়া চলিতে স্বীকার করিলে, যে কোন স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র, উপনিবেশ বা ডোমিনিয়ন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে সঙ্ঘভুক্ত হইতে পারিবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকালে এই লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল যে, কাহারা তাহার সদস্য হইবেন। কাহারও কাহারও মত ছিল যে, শুধু মিত্র শক্তিগুলিকে লইয়াই লীগ তৈয়ারি করিতে হইবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, নিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে প্রথম হইতেই লওয়া হইবে এবং পরাজিত শক্তিগণকে কিছুকাল probationer রূপে (অর্থাৎ অস্থায়ী ও পরীক্ষাধীন ভাবে) রাখিয়া লীগে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে।

ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাথমিক সদস্যগুলির অন্যতম, অথচ ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র বা উপনিবেশ নহে। এটা কেমন করিয়া হইল? একজন ভারতীয় রাজনৈতিক মনে করেন, লীগে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এবং একটা অধিক ভোট পাইবার জন্যই ভারতবর্ষকে ইহার সদস্য করা হইয়াছিল। ইহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, যুদ্ধে ভারতবর্ষের ত্যাগস্বীকারে মুগ্ধ হইয়া ও ক্ষণিক উদার-হৃদয়তার বশে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতি দেন, সেই একই কারণে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে লীগের সদস্যরূপে স্বীকার করিয়া লন্। হয়ত ইহার পিছনে কোন নিগূঢ় কূট উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার জগতের রাষ্ট্রসভায় স্বীকৃত হইয়াছে। এই ব্যাপারের রাজ-নৈতিক ফল কি হইয়াছে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহার নৈতিক মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

আমি "ভারতবর্ষ" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। তাহার পরিবর্তে "ভারত সরকার" এই শব্দটি ব্যবহার করিলে সুষ্ঠুতর হয়। কারণ দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যে যোগদান করে। কোন

কোন স্থলে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ব্যাপারে, যেখানে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের ঠিক প্রতিনিধি নহে, লীগে দেশের সত্তা মনোভাব উপস্থাপিত হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ দেশে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র এবিষয়ে দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য ও সঙ্ঘের কর্ত্তব্য কি? চুক্তিপত্রের বিভিন্ন ধারায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম:—সদস্যগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে—

তাঁহারা মিলিত ভাবে আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্যগুলি নিষ্পন্ন করিবেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করিয়া যুদ্ধোপকরণ যতদূর কমান সম্ভব তাহা তাঁহারা করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহারা লীগের মন্ত্রণা-সভার(Council) মতামতগ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি আপন আপন যুদ্ধসম্ভার সম্বন্ধীয় সংবাদ অকপট ভাবে আদান প্রদান করিবেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সঙ্ঘের সদস্যগণের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত পূর্ণতা রক্ষা করিবেন ও পরস্পর এ বিষয়ে পরস্পরের স্বাধীন অধিকার স্বীকার করিয়া লইবেন।

যে বাদানুবাদের দ্বারা বিচ্ছেদ সম্ভব সে বিষয়ে সালিশী বা ব্যবহারিক(judicial) নিষ্পত্তি মানিয়া লইবেন বা বিষয়ে মন্ত্রণা-সভার উপর অনুসন্ধানের ভার দিবেন। সাধারণ নর নারী, শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকগণের জন্য অনুকূল বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবেন। অধীন দেশসমূহে দেশবাসীগণের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবেন। স্ত্রীজাতি, শিশু ও আফিম ইত্যাদি বিপজ্জনক ভেষজের ব্যবসায় এবং অস্ত্র ও গুলি-বারুদের বাণিজ্য সম্পর্কে প্রবর্ত্তিত চুক্তি অনুযায়ী কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধানের ভার সঙ্ঘের উপর দিবেন। সঙ্ঘের সভ্যগণ যাহাতে বাণিজ্য ব্যাপারে সমান ব্যবহার পান এবং পরস্পরের আদান প্রদান ও গতিবিধি সম্বন্ধে যাহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সকলের কল্যাণের জন্য ব্যাধির প্রতিষেধ ও প্রসার রোধের উপায় স্থির করিবেন। স্বাস্থ্য, ব্যাধিনিরাকরণ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সেবক সমিতিগুলির উদ্বোধনে সাহায্য ও উৎসাহ দিবেন।

পরে কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চুক্তিপত্রের যে ধারায় সদস্য সম্বন্ধীয় নিয়ম বিবৃত হইয়াছে সেখানে কিভাবে সদস্যপদ ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। দুই বৎসরের নোটীশ দিয়া ও ইতি-মধ্যে তাহার আন্তর্জাতিক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করিয়া যে কোন রাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারেন। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে লীগের নির্দ্ধারণ জাপানের মনঃপূত না হওয়ায় জাপান পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে; কিন্তু এখন নোটীসে যে দুই বৎসর প্রয়োজন তাহা শেষ হয় নাই বলিয়া আইনতঃ জাপান এখনও বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য। জার্ম্মানীও সেদিন সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছে। তবুও তাহার আন্তর্জাতিক দায়িত্বগুলি পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানী technically লীগের সভ্য।

চুক্তিপত্রের দ্বিতীয় ধারায় বলা হইয়াছে, লীগের কার্য্য করিবার জন্য একটি Assembly অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা, Council অর্থাৎ মন্ত্রণা-সভা ও একটি স্থায়ী দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সপ্তম ধারা অনুসারে জেনেভাতেই স্থায়ী দপ্তরখানার আসন এবং জেনেভাতেই প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ অধিবেশন হয়। মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনও সাধারণতঃ জেনেভাতেই হয়; তবে অন্যত্রও হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন বাধা নাই। দপ্তর-খানার প্রধান কর্ত্তা Secretary General of the League of Nations, তিনিই সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক। প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মসচিব ছিলেন Sir Eric Drummond, স্যর এরিক্ ড্রামণ্ড। ভার্সাই সন্ধিপত্রের ভিতর একটি মাত্র নামের উল্লেখ আছে, সে তাঁহারই। তাঁহারই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে লীগ্ গড়িয়া উঠিয়াছে; সহস্র বাধা ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করাতে সহকারী কর্ম্মসচিব মঁসিয়ো আভেনল তাঁহার স্থলে প্রধান কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় ধারা ব্যবস্থাপক সভা (Assembly) সম্বন্ধে। বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। ইহার কার্য্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"The assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world."

অর্থাৎ লীগের কার্য্যের মধ্যে পড়ে এমন যে কোন বিষয় বা জগতের শান্তিসম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার লইয়া ব্যবস্থাপক

সভা আলোচনা করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্যবস্থাপক সভার অধিকার খুবই ব্যাপক। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি কোন সদস্য কোন বিষয়ে অভিযোগ করেন তাহা হইলেই না হয় এবিষয়ে ব্যবস্থাপক সভা আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে কোন সদস্যই এরূপ অভিযোগ আনিলেন না, অথচ এমন কোন ঘটনা ঘটিতেছে যাহার দ্বারা জগতের শান্তিহানির সম্ভাবনা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা কি করিতে পারেন? এক্ষেত্রে "any matter...affecting the peace of the world" এই বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিবেন সেই বিধান করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র তিন জনের অনধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একাধিক ভোট পাইবেন না। ইহার ফলে ছোট বড় সকল রাষ্ট্রেরই ভোটাধিকার সমান হইয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ ও অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলি সকলেরই অধিকার সমভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এজন্য কিঞ্চিৎ গাত্রদাহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শেরই অনুকূল। জগতে শান্তিরক্ষা ব্যাপারে ছোট বড় সকল রাষ্ট্রেরই সমান আগ্রহ, সুতরাং তাহাদের অধিকারও সমান হওয়া উচিত।

অবশ্য ব্যাপার ঘটে এই যে, শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ দল বাঁধেন, তাঁহাদের উপেক্ষা করা ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। তবুও বাস্তব বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে একজন থাকেন মুখপাত্রস্বরূপ। এবার দেখিলাম; ভারত সরকারের আইনসচিব স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিনিধি; তাঁহার সহকারীরূপে গিয়াছিলেন স্যর হোমী মেটা ও স্যর আব্বাস সমাদ খাঁ। তিন জন প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শদাতারূপে আরো কয়েকজন যান। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে উপরোক্ত তিন জন ছাড়া স্যর ডেনিস্ ব্রে উপস্থিত ছিলেন।

অবান্তর হইলেও এইখানে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে যাঁহাদের এবারকার অ্যাসেম্ব্লীতে দেখিলাম, তাঁহাদের বাহ্যাড়ম্বর অন্য কোন দেশের প্রতিনিধির চেয়ে কম নহে, হয়ত বা বেশী। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদের এই বাহ্যাড়ম্বর বিসদৃশই মনে হইতেছিল। তাহা ছাড়া, কি জানি কেন মনে হইতেছিল, যেন অন্য দেশের প্রতিনিধিগণের তুলনায় ভারতবর্ষের এই প্রতিনিধিদলের একান্তই dignityর অভাব। ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, কিন্তু একথা বলিতেই হইবে যে, তাঁহাদের দেখিয়া আমার মনে বারবার প্রশ্ন জাগিয়াছিল, জগতের মন্ত্রণা-সভায় আসন পাইবার যোগ্যতা তাঁহাদের কি? যে সভায় কূটরাজনৈতিক স্তর জন সাইমন, পল বাঁকুর, আদর্শবাদী ম্যাডারিয়াগা প্রভৃতি উপস্থিত, সেখানে আমাদের এই প্রতিনিধিগুলি সত্যই বেমানান হইয়াছিলেন: না কূটবুদ্ধিতে, না আদর্শবাদে, না শক্তিতে, না চারিত্রে কোন কিছুতেই তাঁহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে কোন উপকারই পায় না।

এবার জেনেভায় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে আরো তেরটি অধিবেশন হইয়াছে। সাধারণতঃ বৎসরে একবার করিয়াই এরূপ অধিবেশন হয়; তবে বিশেষ কারণে একাধিক অধিবেশনও হইয়াছে। জার্ম্মানীকে যেবার লীগের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল সেবার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। লীগ্ অ্যাসেম্বলীর এই চতুর্দ্দশ অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) বেলা সাড়ে দশটার সময়। প্রথমে মন্ত্রণা-সভার সভাপতি নরওয়ের মিঃ মোউইন্‌কেল অস্থায়ী সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি জগতের দুঃখবিপদের কথা উল্লেখ করেন। জগতের সর্ব্বত্র যে রণ-সজ্জার আয়োজন চলিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও বলেন যে, জেনেভায় তাঁহারা স্বদেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইলেও মূলতঃ তাঁহারা বিশ্বের কল্যাণকামনায় মিলিত হইয়াছেন এবং সেই দৃষ্টি দিয়াই যেন তাঁহারা সকল প্রশ্নের ও সমস্যার বিচার করেন। তাঁহার কোন কোন মন্তব্য কাহারও কাহারও মনঃপূত হয় নাই।

ইহার পর স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান সভাপতি মিঃ সি. টি. ডি. ওয়াটার্স ব্যবস্থাপক

সভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। এ ব্যাপার ভোটের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। সভাপতি অতঃপর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন; সে অভিভাষণে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ছিল না। ইহার পর প্রধান কর্ম্মসচিবের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠের ব্যাপার এবং সেই উপলক্ষে আলোচনা, সমালোচনা এবং সিদ্ধান্ত। মোটের উপর, ব্যবস্থাপক সভার কাজ এই। কিন্তু বাহির হইতে যে কাজ অল্প মনে হইলেও সত্যই তাহা অল্প নহে। প্রায় বছরের তিন ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক হয়, তাহাতেও সকল কাজ সারিয়া ওঠা যায় না।

প্রধান কর্ম্মসচিবের সুদীর্ঘ কার্য্য-বিবরণীতে লীগের এক বৎসরের কার্য্যকলাপ বিবৃত হয়, জগতের নানাবিধ সমস্যার অবতারণা ও আলোচনা করা হয়। শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নহে, অন্য নানা সমস্যার আলোচনা সেখানে পাওয়া যায়, কারণ লীগের কার্য্য শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা প্রকারের ব্যাপারে লীগ্ যুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে এই কার্য্য-বিবরণীকে সমগ্র জগতের সালতামামি রূপে গ্রহণ করা যায়। এত বড় জটিল ব্যাপারের আলোচনা সাধারণ সভাতে হওয়া কঠিন; সুতরাং মূল সভাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সাধারণতঃ ছয়টি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। ছয়টি সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:—

(ক) নিয়মতন্ত্র ও আইনসংক্রান্ত সমস্যাগুলি।
(খ) অর্থনৈতিক ও অন্য নানাবিধ ব্যাপার।
(গ) নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধীয়।
(ঘ) লীগের আয়ব্যয়সংক্রান্ত ব্যাপার।
(ঙ) সামাজিক প্রশ্নগুলি।
(চ) রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ।

নিরস্ত্রীকরণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে এবার আর তাহার জন্য শাখাসমিতি সৃষ্টি করা হয় নাই; ফলে এবারকার আসেম্ব্লীতে মাত্র পাঁচটি শাখাসমিতি বসিয়াছিল।

এই সমিতিগুলির অধিবেশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এইখানেই সকল আলোচনা ও নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ অধিবেশনে শাখাসমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদিত হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ অধিবেশনে যখন বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ হয়, তখন বিভিন্ন প্রতিনিধি তাহার সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনা উপলক্ষে নানা প্রয়োজনীয় ও অবান্তর কথারও অবতারণা হয়। কখনও কখনও কার্য্য-বিবরণীতে উল্লেখ নাই এমন ব্যাপারেরও আলোচনা হয়। এবার একজন প্রতিনিধি এই সম্বন্ধে, কেন মঞ্চুরিয়া-সমস্যা তাঁহাদের জানান হয় নাই সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ অনুযোগ করেন। এইরূপ অনুযোগ অভিযোগ ও পরস্পরের প্রশংসার পর শাখাসমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন সমিতির rapporteur কর্ত্তৃক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকল বাদানুবাদ শাখাসমিতিতেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া এখানে কোনরূপ তর্ক ওঠে না ও সকলের অনুমোদনে তাহা গৃহীত হয়।

এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক সভায় কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে সাধারণতঃ সকল সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই ঐকমত্যবিধি (rule of unanimity) সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা শোনা যায়। অনেকে বলেন ইহার ফলে প্রতিকূল মত দিয়া যে কোন সদস্যই সঙ্ঘের অধিকাংশের মত নাকচ করিয়া দিতে পারেন। এ সমালোচনা অনেক পরিমাণে সত্য। কিন্তু সমালোচকগণ যখন একথা বলেন, তখন তাঁহারা একটা বিষয় ভাবিয়া দেখেন না। সংখ্যাধিক্যের দ্বারা জোর করিয়া তাহাকেও তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে সুফল ফলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া যেখানে সকলের সহানুভূতি ও সানন্দ সহযোগিতা প্রয়োজন, সেখানে অনিচ্ছাকৃত সহানুভূতিহীন, সহযোগিতাহীন যোগদানে কোন উপকার হয় না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সকল রাষ্ট্র তাহার আদর্শের মহত্ত্বে শ্রদ্ধাশীল হইয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাহার কর্ম্মে সহায়তা করিবে। সুতরাং যদি কোন রাষ্ট্র সেভাবে যোগ না দেয় তাহা হইলে তাহাকে বাধ্য করিয়া যোগদান করাইলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যতদিন সেই রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ও সানন্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ম্মে সহযোগিতা না করে ততদিন অপর সকলকে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে, তাহাকে শিখাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং ঐকমত্যবিধি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল আদর্শের অনুকূল ব্যবস্থাও তাহার অঙ্গীভূত।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমি মঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইহার পর প্রায় তের-চোদ্দ বৎসর পার হইয়া গেছে।

পুরা চারটি বৎসর ধরিয়া চাঁপার সঙ্গে শ্রীহর্ষের ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায় সমানই চলিয়াছিল। চাঁপা সেই যে কাকার শ্রাদ্ধের দিন শ্রীহর্ষের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আর একটি দিনের জন্যও ও-পথ মাড়ানো দূরের কথা, স্বামীর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে নাই। মনে মনে কে কি ভাবিয়াছিল না ভাবিয়াছিল জানি না, কিন্তু ডাক যেদিন আসিল, প্রথমই সে দিন শ্রীহর্ষের দিক দিয়াই আসিল। পাশা-পাশি বাড়ী, খবর বোধ করি দু'জন দু'জনারই রাখিত। চপলা-ঠাকুরুণ বাড়ীটা তাহার ভাড়ায় বসাইয়া মাদতীকে লইয়া শ্রীহর্ষর বাড়ীতেই উঠিয়া আসিয়াছিল, আর শ্রীহর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল টাকা টাকা করিয়া। এবং সে অর্থ উপার্জ্জনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাহার ঘোড়দৌড়ের মাঠ। তাহারই নেশায় চাঁপার কথা শ্রীহর্ষ ভুলিয়া ছিল কিনা জানি না, সুদীর্ঘ চার বৎসর পরে হঠাৎ একদিন ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে প্রায় হাজার দশেক টাকা জিতিয়া আসিয়া চাঁপার কথা শ্রীহর্ষের মনে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ শ্রীহর্ষ সেই টাকার বাণ্ডিল সঙ্গে লইয়াই নিজের বাড়ী না ঢুকিয়া সরাসর হাজির হইল গিয়া চাঁপার কাছে। এতদিন পরে শ্রীহর্ষকে দেখিয়া চাঁপা ত' অবাক্! রান্নাঘরে বসিয়া তখন সে রান্না করিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া একবার সে তাকাইয়া দেখিল, দেখিয়াই সে গোপনে ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল।

শ্রীহর্ষ বলিল,'অভিমান হয়েছে বুঝি? কথা কইছ না যে?'

অভিমান হওয়া চাঁপার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু সে কথা কহিল না।

শ্রীহর্ষ তখন তাহার পকেট হইতে দশ হাজার টাকার নোটের তাড়া বাহির করিয়া চাঁপার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'মুখ ফিরিয়ে এই দিকে একবার তাকাও রাণী, তাখো তোমার রাগ ভাঙাবার জন্যে কি আমি এনেছি।'

চাঁপা তাকাইয়া একবার দেখিল মাত্র। কথা বলিল না।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'এ ত মাত্র দশ হাজার। এরকম অনেক অনেক টাকাই আমার ছিল। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যেদিন গয়নাকটা বিক্রি করে' দেলেছিলাম, সেদিন তুমি আমাকে এই বাড়ীতে বসেই বলেছিলে, তুমি চলে যাও এখান থেকে। এই বলে প্রতিজ্ঞা করে সেদিন চলে গিয়েছিলেম যে টাকা যতদিন আমি রোজগার করতে না পারি ততদিন আর এবাড়ী ঢুকব না। তাই এতদিন ঢুকিনি চাঁপা, আজ টাকা নিয়ে আবার তোমার কাছে এসেছি। এবার তুমি চল। আজ তোমায় আমি নিয়ে যাব।'

চাঁপা নীরবে শুধু একবার মাথা নাড়িল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কেন, না কেন? এখনও যাবে না?'

চাঁপা এতক্ষণে মুখ ফুটিয়া বলিল, 'না।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আচ্ছা তুমি ভেবে ভাখো। আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ গেলাম। আবার আসব।'

এই বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল, চাঁপা বলিল, 'টাকা তোমার নিয়ে যাও।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না, ও-টাকা আমার নয়, তোমার গহনার দাম।'

বলিয়াই সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তাহারই কয়েকদিন পরের ঘটনা।

শ্রীহর্ষ সেই যে আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার পর আর ফিরিয়া আসে নাই। দশ হাজার টাকা চাঁপার নামে তিনকড়ি তাহার পরের দিনই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া খাতা-খানি তাহার হাতে আনিয়া দিয়াছে।

সকাল হইতে সেদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চাঁপার মনের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। তিনকড়ি তাহার দোকান হইতে হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসিল। আসিয়াই ডাকিল, 'চাঁপা!'

জানালার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া চাঁপা কি যেন একটা বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ফিরে গেলে যে?'

তিনকড়ি বলিল, 'ভারি একটা বিপদ ঘটে গেছে, চাঁপা। ওনলুম ট্রামগাড়ীতে জামাইবাবুর পা কাটা পড়েছে। চল্, দেখে আসি।'

চাঁপা উঠিয়া দাঁড়াইল—'তুমি দেখে এলে দাদা?'

'না রে না, একজন ভদ্রলোক এসে আমায় বলে গেলেন।'

চাঁপা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ বলিল, 'চল।'

বি চাকরকে বাসায় থাকিতে বলিয়া তাহারা দুইজনে রাস্তায় আসিয়া ট্যাক্সি ধরিল। কারমাইকেল হাঁসপাতাল বাড়ী হইতে বেশী দূরে নয়। পৌঁছিতে তাহাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। গিয়া দেখিল, সত্যই তাই। হাঁটুর নীচে হইতে শ্রীহর্ষর একটা পা তখন কাটিয়া ফেলা হইয়াছে! কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, ডাক্তার বলিলেন, অবস্থা ভালই। জীবনের আশঙ্কা নাই।

চাঁপা তাহার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, আমার অপরাধ হইয়াছে, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সেই দিন হইতে চাঁপা আর তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

হাঁসপাতাল হইতে ক্রাচে ভর দিয়া শ্রীহর্ষ বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া শ্রীহর্ষ যাহা বলিল তাহা এইরূপ:

বলিল, সুবধোর একটা লোকের কাছে রেস খেলিবার জন্য একবার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া নগদ পাঁচশ' টাকা সে ধার লইয়াছিল। ধার সে লোকটা তাহাকে দিয়াছিল শুধু তাহার বাড়ী দেখিয়া। কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহার সে হ্যাণ্ডনোটে নিজের নাম লিখিয়াছিল—শ্যামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে এ চালাকি তাহার একদিন ধরা পড়িয়া গেল। শ্রীহর্ষ বলিল, 'সুদে আসলে টাকাটা তোমার ফিরিয়ে দিলেই ত' হ'লো!—তা সে শ্যামরতনই দিক্ আর শিবরতনই দিক্ ..'

সুবধোর লোকটা কিন্তু সেই দিন হইতে এমন ভাবে তাগাদা সুরু করিল যে, শ্রীহর্ষের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শ্রীহর্ষ যতই তাহাকে লুকাইয়া পালাইয়া বেড়ায়, লোকটাও ততই তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করে।

শ্রীহর্ষ সেদিন অফিস রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় ঘুরে দেখিল, লোকটা সেই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। ব্যস্, শ্রীহর্ষর অমনি হৃৎকম্প উপস্থিত! কোনদিকে ছুটিয়া পলাইবার পথ নাই। সুমুখ দিয়া একখানা ট্রামগাড়ী পার হইতেছিল, শ্রীহর্ষ ভাবিল, তাড়াতাড়ি এই ট্রামটায় উঠিয়া পড়িতে পারিলে লোকটা হয়ত তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না। এই ভাবিয়া যেই সে চলন্ত ট্রামে উঠিতে যাইবে, আর অমনি পা পিছলাইয়া একেবারে চাকার তলায়! চারিদিকে একটা হৈ হৈ গোলমাল উঠিল, আশপাশের গাড়ী ঘোড়া লোকজন পথের মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িল, ট্রামটাও দাঁড়াইল,—তখন কিন্তু যা' হইবার তা' হইয়া গেছে, শ্রীহর্ষর পা'টা কাটা পড়িয়াছে, রক্তে চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে!···

চাঁপা বলিল, 'ছি ছি, দোষ তাহ'লে তোমারই বল! আমার কাছে দশহাজার টাকা রেখে গিয়ে পাঁচশ' টাকার জন্যে পা'টা খোয়ালে।'

শ্রীহর্ষ হাসিতে লাগিল। বলিল, 'কিন্তু সে লোকটাকে দিয়েছি পথে বসিয়ে। টাকা সে আর আমার কাছে চাইতে আসবে না।'

চাঁপা বলিল, 'কেন? টাকা কি তাকে তুমি এখনও দেবে না?'

শ্রীহর্ষ আবার হাসিল। বলিল, 'পাগল! টাকা ত' আমি নিইনি। নিয়েছে শ্যামরতন বাঁড়ুজ্যে। সে সব অনেক কথা। সে সব তুমি বুঝবে না, চাঁপা।'

চাঁপা বলিল, 'তা বেশ, আমার বুঝেও কাজ নেই। কিন্তু এসব ভাল নয়।'

চপলা-ঠাকরুণের সঙ্গে কলহ-কচ্‌কচি চাঁপার প্রায় বাধিয়াই থাকে।

কলহ বাধিবার সব চেয়ে বড় কারণ—চাঁপা তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, অথচ চপলা-ঠাকরুণ শ্রীহর্ষর এই গৃহস্থালীর মধ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াই থাকিতে চায়। তাহার ইচ্ছা, বাড়ীর দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর মালিক শ্রীহর্ষ এবং তাহার স্ত্রী—তাহার কথায় উঠিবে বসিবে, তাহার পরামর্শ ছাড়া কোনও কাজই করিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি চাঁপার চোখে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে বলিয়াই বোধকরি সে ইহার প্রতিবাদ করিতে যায় এবং এই প্রতিবাদ করিতে গিয়াই বাধে ঝগড়া।

প্রতিবাদ করা দূরের কথা, চাঁপা প্রথম প্রথম তাহার সঙ্গে কোনও কথাই বলিত না। বাড়ীতে একটা চাকরাণী রহিয়াছে, রাঁধুনী রহিয়াছে, কাজেই কথা তাহার না বলিলেও চলিতেছিল। হঠাৎ সেদিন কথায় কথায় রাঁধুনী মেয়েটিকে চাঁপা নিজেই ছাড়াইয়া দিল। একলাটি সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, তাহার উপর মাত্র এই কয়টা লোকের রান্না, ইহারই জন্য যদি একটা রাঁধুনী রাখিতে হয় ত' লজ্জার কথা। চাঁপা বলিল, 'আমি নিজেই রাঁধব।'

শ্রীহর্ষ ঠিক তাহাই চাহিতেছিল, কথাটা এতদিন শুধু সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই।

কিন্তু রাঁধিতে গিয়া চাঁপা দেখিল, তাহার কোনও রান্নাই চপলা-ঠাকরুণের পছন্দই হয় না। রান্নার একটা না একটা দোষ সে ধরিবেই!

একদিন হঠাৎ তাহার রাগ বরদাস্ত করিতে না পারিয়া চাঁপা বলিয়া বসিল, 'আমি ত' কারও মাইনে-করা রাঁধুনী নই! না খেতে যাঁরা না পারবেন তাঁরা যেন নিজে রান্না করে' নেন।'

'কি বললি? যত বড় মুখ তত বড় কথা! ওরে ও শ্রীহর্ষ, শোন্ বাবা, শোন্ তোর বৌএর কথা শোন্!'

শ্রীহর্ষ কথাটা প্রথমে শুনিয়াও শুনিল না। কিন্তু চপলা-ঠাকরুণ না শুনাইয়া ছাড়িবার মেয়েই নয়। কাঁদিয়া কাটিয়া একশা করিয়া ক্রমাগত শুধু এই কথাটাই বলিতে লাগিল যে, পর কখনও আপন হয় না। পরের একটা মেয়েকে ভালবাসিয়া অনর্থক সে এই নিজের বিপদ নিজেই টানিয়া আনিল।

পরদিন চপলা-ঠাকরুণ নিজের জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করিতেছিল, শ্রীহর্ষ হাতের ইসারায় চাঁপাকে চুপি চুপি তাহার কাছে ডাকিয়া বলিল, 'যাও, তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাওগে!'

চাঁপা বাঁকিয়া বসিল, বলিল, 'তুমি চাওগে যাও, আমার ঘেন্না হয়ে গেছে।'

শ্রীহর্ষ তখন তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে বসিল। বলিল, 'কেন ওকে এত খোসামুদি করে রাখি তুমি জানো না, চাঁপা। মাসীর নগদ টাকা আছে হাজার দশেক, তার ওপর বাড়ীখানা ওর নিজের।'

চাঁপা কিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার সেই চির-পুরাতন হাসি! বলিল, 'বাবারে বাবা! খালি টাকা আর টাকা! কি হবে এসব নিয়ে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কি হবে তা একদিন বুঝবে।'

'বুঝে আর ছাই হবে আমার। হা ভগবান!'

বলিয়া চাঁপা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া চপলা-ঠাকরুণের পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'আমার কথায় তুমি যদি নিজে রান্না করে খাও না, তা'হলে এই তোমার পায়ের ওপর আমি মাথা খুঁড়ে মরব।'

ওদিকে দরজার ফাঁকে দেখা যাইতেছিল, খাটের ওপর বসিয়া শ্রীহর্ষ সেইদিকেই তাকাইয়া আছে। চাঁপাও মাথা নীচু করিয়া পা দুইটা ঠাকরুণের বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীহর্ষের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

ঠাকরুণের রাগ ভাঙিতে বিশেষ দেরী হইল না।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! আবার আর একটা ছুতা পাইবা মাত্র ঠাকরুণ ফোঁস করিয়া ওঠে। চাঁপা সহজে তাহাকে কিছুই বলিতে চায় না। একেবারে যখন অসহ্য হইয়া ওঠে তখন হয়ত বেশ করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দেয়। চপলা-ঠাকরুণ আবার খানিকটা রাগ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া চীৎকার করে। শেষ পর্যন্ত চাঁপাই আবার তাহার পায়ে ধরিয়া রাগ ভাঙায়।

এ তাহার একরকম মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলে।

আলতী মেয়েটা আজকাল বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে।

চাঁপা যে তাহার সৎ-মা এবং সৎ-মাকে কখনও ভালবাসিতে নাই—কথাটা চপলা-ঠাকরুণ তাহাকে নানারকমে শিখাইবার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও মেয়েটা কি জানি কেন, চাঁপাকে যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। চপলা-ঠাকরুণ এত করিয়া নিষেধ করে, তবু সে চাঁপার কাছ-ছাড়া হয় না, দিবারাত্রি তাহার ফাই-ফরমাস্ খাটিয়া খাটিয়া হয়রান হইয়া ওঠে।

কিন্তু বেশীদিন তাহাকে আর শিখাইতে হইল না। এমনি করিয়া বছর দুই কাটিতে না কাটিতেই একদা এক দুরন্ত শীতের রাত্রে চারদিনের জ্বরে বুড়ী মরিয়া গেল।

শ্রীহর্ষের কপাল ভাল, টাকাকড়ি চপলা-ঠকুরুণের যাহা কিছু ছিল শ্রীহর্ষ ত' পাইলই, এমন-কি বাড়ীখানাও দেখা গেল সে মালতীর নামে দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়াই মরিয়াছে।

মালতীর বয়স তখন পনেরো পার হইতে চলিয়াছে। অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে। বিবাহ তাহার আর না দিলে চলে না।

শ্রীহর্ষর চেয়ে না চেহারা, চাঁপার চেহারা তাহার চেয়ে বেশী।

চাঁপা নিজেই শেষে একটা মেয়ে-ঘটকী লাগাইল—তাহার দাদা তিনকড়ির জন্য পরমা সুন্দরী মেয়ে চাই, আর মালতীর জন্য পরম সুন্দর একটি ছেলে!

পাত্র-পাত্রীর সন্ধান আসিতে লাগিল। কিন্তু যাহারাই মালতীকে দেখিতে আসে, শ্রীহর্ষ তাহাদেরই কাছে কাঁদিতে সুরু করে। নিজের কাটা পা'টা দেখায় আর বলে, 'খোঁড়া হয়ে পড়েছি দাদা, বিয়েতে আমি একটি পয়সা খরচ করতে পারব না। তবে মেয়ে আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী, শুধু ওই নিয়েই এ গরীবের ওপর দয়া করতে হবে।'

কিন্তু বিনা পয়সায় দয়া করিবার মত লোক পাওয়া সহজে যায় না।

চাঁপা ঝগড়া করিতে থাকে—'ছি ছি, একি তোমার স্বভাব বলত! চপলা-ঠকুরুণ এতগুলো টাকা দিয়ে গেল, বাড়ী দিয়ে গেল, ও-সব কার জন্যে শুনি? ও-সব না যদি তুমি দাও ত' আমার দশহাজার টাকা আছে, ওসবই আমি মালতীকে দেবো।'

শ্রীহর্ষ ধমক্ দিয়া তাহাকে চুপ করায়। বলে, 'তুমি থামো। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলেই হয়েছে আর কি!'

ক্রাচ্ লইয়া শ্রীহর্ষ শেষে নিজেই বাহির হয়। বলে, 'দাঁড়াও আমি নিজে এর ব্যবস্থা করছি।'

ব্যবস্থা করিতে অবশ্য তাহার বেশী দিন লাগিল না। মাসখানেক ঘোরাফেরা করিয়া মালতীর জন্য কোথায় যেন সে একটি বেশ ভাল পাত্র দেখিয়া আসিল। বিবাহের দিন স্থির হইল মাস-দুই পরে।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, 'মাসদুই পরে কেন?

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ছেলেটির টাইফয়েড্ হয়েছিল। শরীরটে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই ছেড়ে গেল।'

'কেমন ছেলে? বয়েস কত?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আসুক না! চোখে ত' দেখতেই পাবে। রাজপুত্রের মতন ছেলে।'

তা বাপ দেখিয়াছে নিজের সুন্দরী কন্যার জন্য, মন্দ হইবার কথা নয়।

তবু শ্রীহর্ষকে চাঁপার বিশ্বাস কিছুতেই হয় না। বার-বার শুধু সেই এক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে।

দেখিতে দেখিতে দু' মাস পার হইয়া গেল।

ছেলেটি ফেরু হইতে ফিরিয়াছে।

বিবাহের দিন স্থির হইল। শ্রীহর্ষ বলিল, ছেলেটিকে সে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বরপক্ষের তরফ হইতে মেয়েকে কেহই আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল না।

তা আশীর্ব্বাদ করিতে কেহ না আসুক, বিবাহের রাত্রে বর আসিল একটি মোটরে চড়িয়া। বরের চেহারা দেখিতে মন্দ নয়, মালতীর সঙ্গে তাহাকে মানাইবে ভালই। কিন্তু বরের সঙ্গে বরযাত্রী আসিল মাত্র তিন চার জন।

চাঁপা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বলিল, 'একি গো, বরযাত্রী নেই কেন? বরের কি কেউ কোথাও নেই নাকি?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'থাকবে না কেন? আছে। অনর্থক ভুক্ত-ভোজন করিয়ে লাভ কি? আমার বিয়ে নিয়ে কথা, বরযাত্রী নাই-বা এলো!'

চাঁপা বলিল, 'না বাপু, কি যে কর তুমি কে জানে! নিজের একটা মাত্র মেয়ের বিয়ে, লোকজন না এলে বিয়ে বলে মনেই যে হয় না!'

'তা না হোক্। তুমি চুপ কর।' এই বলিয়া শ্রীহর্ষ তাহাকে থামাইয়া দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিল।

যতক্ষণ বিবাহ চলিল, চাঁপা শুধু বরের মুখখানির দিকে দূর হইতে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ছেলেটির বয়স খুব বেশি নয়। মুখখানিও ভাল। কিন্তু অত্যন্ত ম্লান।

মালতী শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল মাত্র তিন দিনের জন্য। তিন দিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কি রকম শ্বশুরবাড়ী, কি রকম কি, চাঁপা তাহাকে একটি একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বসিল।

মালতী যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাই বলিল। বড় এক ননদ, ননদের ছেলেমেয়ে স্বামী আর শাশুড়ী ছাড়া আর

কেহ নাই। অবস্থা তেমন ভাল বলিয়া মনে হইল না। ননদের স্বামী চাকরি করেন। তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলে। জামাইটি লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু কাজকর্ম কিছুই করে না।

চাঁপা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া ভালবাসিয়া হাসিয়া বলিল, 'আমার কাছে লজ্জা করিসনি মালতী, জামাইটি কি বললে তাই বল্।'

মালতী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিয়া রহিল।

হাত দিয়া চাঁপা তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'বল্ না, তোর লজ্জা কিসের মালতী?'

মালতী তেমনি নীচের দিকে মুখ রাখিয়াই বলিল, 'কিছু বলেনি।'

'কিছু বলেনি কি রে? দু'জনের হয়েছে ত?'

মালতী বলিল, 'সত্যি বলছি, আমার সঙ্গে একটি কথাও হয়নি। উনিই জোর করে তাঁর ভাগ্নেকে সঙ্গে দিয়ে আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন।'

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহি লাজুক্ বুঝি?'

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

কিন্তু তাহার বিবাহের একটি বছর পার হইতে না হইতেই লাজলজ্জা সরমভরম যেখানে যাহা ছিল সব কিছুই ভাসিয়া টুটিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিবাহের মাস চার পাঁচ পর হইতেই জামাইটি সেই যে অসুখে পড়িয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত সে অসুখ তাহার আর সারিল না—কোথায় কোন্ দূরদেশে 'চেঞ্জে' গিয়া সেইখানেই সে মারা পড়িল। এবং সে নিদারুণ দুঃসংবাদ চাঁপা ও মালতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

বিবাহের পর হইতে জামাইএর সমস্ত সংবাদই শ্রীহর্ষ রাখিতেছিল, মৃত্যু-সংবাদটাও তাহারই মুখ দিয়া প্রচারিত হইল।

চাঁপা কাঁদিল, মালতী কাঁদিল; সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহর্ষও যে কাঁদিল না তাহা নয়, কিন্তু এই বলিয়া সে তাহার শোকসন্তপ্তা শ্রীকন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, মেয়ের সে আবার বিবাহ দিবে।

তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে শ্রীহর্ষর চলিবে না। মালতীর নামে 'এন্‌ডোর্স' করা জামাইএর নামে কুড়ি হাজার টাকার 'লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স্' রহিয়াছে। টাকাটা আদায় করিতে হইবে।

তাহারই জন্য খোঁড়া পা লইয়াই শ্রীহর্ষ দিবারাত্রি আনাগোনা করিতেছিল, এমন দিনে হঠাৎ একদিন সংবাদ পাওয়া গেল—ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী সন্দেহ করিয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং শুধু বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মালতীর স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত করিতে গিয়া তাহারা নাকি জানিতে পারিয়াছে—ছোক্‌রাটি নাকি অনেক দিন হইতেই যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিল, শ্রীহর্ষ তাহা জানিয়া শুনিয়াই তাহার নামে কুড়ি হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়া কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছে; কুড়ি হাজার টাকার প্রিমিয়ামও দিয়াছে সে নিজেই।

বীমা-কোম্পানী সহজে ছাড়িল না, তাহাদের এজেন্ট, ডাক্তার এবং শ্রীহর্ষকে জড়াইয়া নালিশ রুজু করিল। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষও ছাড়িবার পাত্র নয় এবং কুড়ি হাজার টাকার জন্য নিজের একমাত্র কন্যার সর্ব্বনাশ যে করিতে পারে, কাজটা সে অমনি ফস্ করিয়া করে নাই, চারিদিক বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়াই করিয়াছে।

ব্যাপারটা জলের মত স্পষ্ট। তবু ওই নিরক্ষর শ্রীহর্ষর শয়তানী বুদ্ধির কাছে শিক্ষিত মানুষের সদ্‌বুদ্ধিকেও হার মানিতে হইল। বীমা-কোম্পানীর দেওয়া কুড়ি হাজার টাকা পকেটে লইয়া ক্রাচে ভর দিয়া খোঁড়া শ্রীহর্ষ হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিল।

গাড়ী যখন তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে।

ঘরে ঢুকিয়াই শ্রীহর্ষ ডাকিল, 'কই গো, কোথায় তোমরা?'

পাশের ঘর হইতে চাঁপা সাড়া দিল, 'এই যে, এখানে।'

হাসিতে হাসিতে শ্রীহর্ষ তাহার কাছে গিয়া কুড়ি হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল আবার তাহার পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও, আরও কুড়ি হাজার!'

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া চাঁপা প্রথমটা নিজেকে বেশ করিয়া সাম্‌লাইয়া লইল, তাহার পর ধীর সংযত এবং কঠোর কণ্ঠে কহিল, 'রাখো। আমার কাছেও আরও এম্‌নি দশ হাজার আছে। যেদিন মরবে সেদিন তোমার চিতের ওগুলো সাজিয়ে দেবো।'

এত বড় শক্ত কথা চাঁপার মুখ দিয়া কখনও বাহির হয় নাই। শ্রীহর্ষ স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর সেই সাময়িক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এমন বিকট ভাবে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, মনে হইল, যেন সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অসহায়া নারীর মর্ম্মমূল হইতে সুরু করিয়া পোড়ো বাড়ীটার ভিৎ পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

[শেষ]

ভারতের রিজার্ভ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল" নামে যে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা অল্প কয়দিনের মধ্যেই আইনে পরিণত হইবে এবং কয়েক মাসের পর তাহার কার্য্যও আরম্ভ হইবে। ভারতের এই নিজস্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন তাহার অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ একটি ঘটনা, কারণ, প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। ১৯২০ সনে ব্রুসেলস্ নগরে যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈঠক (International Financial Conference) বসিয়াছিল, তাহাতে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে—যে-সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে-সব দেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য হইল এই যে, যদি পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্যপ্রধান দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকে তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক আদান-প্রদানের পথে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ভারতের বাণিজ্য পৃথিবীতে প্রথম পাঁচ ছয়টি দেশের মধ্যেই স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর ভারতকে বিদেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, প্রভূত অর্থ প্রেরণ করিতে হয়। কাজেই তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না বলিয়া তাহার অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণও প্রভূত হইয়াছে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং যে আমেরিকা বিযুক্ত ব্যাঙ্ক প্রণালীর আবাস-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সেখানেও মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মোটামুটি লক্ষণ হইল তিনটি। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চী হিসাবে আয়-ব্যয়সংক্রান্ত সমস্ত হিসাবপত্র ও আদানপ্রদানের ভার গ্রহণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, নোট-প্রচলনের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তেই থাকিবে। আর দেশের টাকাকড়ির বাজারের উপর প্রভাব রাখিবার জন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির উপর এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ হাত থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা এবং সুযোগও এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই লাভ করে। এই সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রদান করিবার উদ্দেশ্য হইল—দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে সুব্যবস্থিত রাখা, আপদবিপদে তাহাদের সাহায্য করা। যদি এমন একটি প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে দেশের সমস্ত আর্থিক যৌলত সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্কই দেশের ব্যাঙ্কপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যখন আন্তর্জাতিক ঘটনাসংঘাতে দেশের বিশেষ আর্থিক দুর্দ্দৈব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন মুদ্রামান ও বিনিময়-কারবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। ১৯৩১ সনে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল তখন ষ্টার্লিংএর মূল্য যাহাতে ভয়ানকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় তাহার জন্য "বিনিময় সমতা রক্ষণকারী কণ্ড"-(Exchange Equalisation Fund)-এর সৃষ্টি হইল। তাহার সাহায্যে দেশের স্বর্ণ দেশে রাখিবার ব্যবস্থা হইল এবং বিদেশে ইংলণ্ডের ক্রেডিটও বজায় রহিল। এই সব কার্য্যে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড-এর সম্পূর্ণ সহায়তার প্রয়োজন হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাহার কেন্দ্রীয় রিজার্ভব্যাঙ্কের সাহায্যেই রক্ষিত হইতেছে। প্রতি বৎসর তাহাকে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশকে যুদ্ধঋণ ইত্যাদির জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে হয়। এই সব অর্থ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ যাহাতে একেবারে স্বর্ণশূন্য না হইতে পারে এবং দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা নষ্ট হইয়া না যায়, সেই জন্য দেশে স্বর্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ আইন করিয়া রিজার্ভব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক বিনিময়-প্রণালীকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। শুধু এই দুইটি দেশই নহে,—আর্জ্জেন্টিনা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও বিভিন্ন উপায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৯৩১ সনের শেষ হইতে ভারত হইতে যে স্বর্ণ বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে

তাহা রোধ করিবার জন্য ভারতীয় জনমত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া তাহা করিতে স্বীকার করে নাই। ভারতের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকিলে হয়ত ভারত হইতে স্বর্ণের বহির্গমন এতদিন পর্য্যন্তও চলিত না।

আমাদের দেশে যে ব্যাঙ্কের তেমন স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি নাই, আমাদের আর্থিক অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহার সব চেয়ে প্রধান কারণটি হইল এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব গ্রহণ ও রক্ষণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার আর কোনও ক্ষমতা নাই। নোট প্রচলন করিবার বা আন্তর্জাতিক বিনিময় কারবার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন অনেক দিন হইতেই এদেশে অনুভূত হইয়াছিল। এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে ১৮০৮ সনেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তাহার পর অনেকে অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন, অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন কিন্তু ভারত এখনও একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ১৯২৬ সনে গবর্ণমেণ্ট আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে তদন্ত কমিটি (Hilton Young Commission) নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব উল্লেখ করিয়া অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিল; "পৃথিবীর যতগুলি বাণিজ্যপ্রধান দেশ আছে তন্মধ্যে ভারতই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে গবর্ণমেণ্টই মুদ্রাপ্রধান ও আর্থিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কাজেই ব্যাঙ্কের মজুদ অর্থ (Bank Reserves) ও মুদ্রাপ্রধান-সহায়ক মজুদ অর্থ (Currency Reserves) পৃথকভাবে ব্যবস্থিত এবং সেই জন্য তাহারা দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ নয়। অন্যান্য দেশে এই উভয় রকমের মজুদ অর্থই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই গচ্ছিত রাখা হয়। .....এই অবস্থার দূরীকরণের একমাত্র উপায় হইল ভারতে একটি Central Bank বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা।"

এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ১৯২৭ সনে তৎকালীন রাজস্ব-মেম্বার স্যর মেরিল ব্লাকেট্ "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল" ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু এই ব্যাঙ্কের গঠনপ্রণালী, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যদের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত বিলটি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৩১ সনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও হিল্টন ইয়ং কমিটির প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিয়া সত্বর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিয়াছিল। ইতিমধ্যে আবার রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমস্যা নূতন আকার ধারণ করিল। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সনে ভারত সেক্রেটারীর কাছে যে শাসনসম্পর্কীয় বিবৃতি পাঠাইয়াছিল তাহাতে সর্ব্বপ্রথম এই দাবী জানান হইয়াছিল যে, ভারতে ফিডারেশন এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালী প্রচলন করার পূর্ব্বে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে; কারণ ভারতের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দায়িত্ব জনসাধারণের নির্ব্বাচিত আইন-সভার উপর ন্যস্ত করিতে হইলে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে ভারতীয় জনমত ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই, কারণ নূতন শাসন সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন দুইটি সম্পূর্ণরূপেই পৃথক ব্যাপার এবং প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভর করে, তবে প্রকারান্তরে ভারতীয়দের শাসনযন্ত্র পরিচালন-ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন শেষ পর্য্যন্ত যে হইতে চলিয়াছে তাহাই ভারতবাসীদের সৌভাগ্যের বিষয়।

বর্ত্তমানে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলটি কেন্দ্রীয় আইন সভার বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং সম্ভবতঃ দিন কয়েক পরেই আইনে পরিণত হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাল করিয়া প্রণিধান করিবার যোগ্য :—

[১] ব্যাঙ্কের মূলধন ও নিয়ন্ত্রণ [২] ডিরেক্টর নিয়োগ [৩] বিনিময় বাট্টা এবং [৪] ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্বন্ধ।

[১] ১৯২৭ সনে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পেশ করা হইয়াছিল তাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে শেয়ার ব্যাঙ্ক (Shareholders' Bank) করিবারই প্রস্তাব ছিল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি(১৯৩১) সরকারী ব্যাঙ্ক (State Bank) স্থাপনের পক্ষেই মত দিয়াছিল। সেই অনুসারে ব্যাঙ্কের সমস্ত মূলধন গবর্ণমেণ্ট যোগাইবে। এখন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পেয়ার ব্যাঙ্ক হইবে, না সরকারী ব্যাঙ্ক হইবে—তাহা লইয়া গত কয়েক বৎসর খুব আলোচনা ও বিতর্ক চলিয়াছিল। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, সরকারী ব্যাঙ্কে গবর্ণমেণ্টের প্রভাব বেশী থাকিবে এবং ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিবেচনায় সরকারী ব্যাঙ্ক হওয়া অনেক দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় নয়; কেননা সরকারী মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক গঠিত হইলে, সে ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টই বেশী দাবী করিবে। ফলে ভারতের জাতীয় স্বার্থ হয়ত অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। আবার পেয়ার ব্যাঙ্ক হইলে ভারতীয়দের প্রভাব অনেকটা কার্য্যকরী হইতে পারে সত্য কিন্তু সে অবস্থাতেও বিপদ আছে। কারণ যদি পেয়ার কিনিবার অধিকার ভারতীয়দের এবং বিদেশীদের সমান থাকে, তবে ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব বিদেশীর হাতে অনেকাংশে চলিয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলে এরূপ সর্ত্ত আছে—যে, কেহ ভারতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে—তাহার জন্ম যেখানেই হউক না কেন—সে-ই পেয়ার-হোল্ডার হইতে পারে। তাহার পর ভারতীয় আইন অনুসারে যে সব কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে বা ভারতে শাখাস্থাপন করিয়া ব্যবসা করিতেছে তাহারাও পেয়ার কিনিতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে—এই সব সর্ত্ত ব্যাঙ্ককে বিদেশীর বা অভারতীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই বিদেশীর হস্তে এবং এ দেশে বিদেশীরা মূলধন খাটাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় বিলটির মধ্যে বিপদের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু যদি পেয়ার হস্তান্তর করার উপর স্পষ্টই পরিমাণে বাধা ও নিষেধ সৃষ্টি করা যায়, তবে এই বিপদ হইতে ব্যাঙ্ককে অনেকটা রক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যান্য দেশে স্পষ্ট ভাবে আইন করা আছে যে, বিদেশীরা কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পেয়ার কিনিতে পারিবে না। জাপানে ও চেকোশ্লোভিয়াতে এইরূপ নিয়ম আছে এবং লিথুয়ানিয়াতেও এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের পেয়ার এক-তৃতীয়াংশের বেশী বিদেশীর হাতে যাইতে পারিবে না।

[২] ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মনোনয়ন ব্যাপারে বিলে এরূপ সর্ত্ত আছে যে, যদি শুধু ভোটে নির্ব্বাচন হয়, তাহা হইলে কৃষি প্রভৃতি কতগুলি বিষয়ের স্বার্থ দেখিবার জন্য উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত হইতে নাও পারে; কাজেই গবর্ণর জেনারেল নিজে বোর্ডের ১৪ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৪ জনকে নিযুক্ত করিবেন এবং ব্যাঙ্কের গবর্ণর ও ডিপুটি-গবর্ণরদের নিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহার হস্তেই থাকিবে। প্রথম ডিরেক্টর বোর্ড সম্পূর্ণরূপেই গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই মনোনীত ও নিযুক্ত হইবে। এখন কথা হইতেছে—গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের হাতে এরূপ মনোনয়নের ক্ষমতা থাকা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে কি না। ভারতের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত সভ্যদের বিরুদ্ধে পূর্ব্বেই সকলের মনে অবিশ্বাস ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা যে সব সময়েই দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন না তাহা সকলেই বিশ্বাস করে। কাজেই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মনোনয়নের সম্বন্ধে জনমত অনুকূল না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম ডিরেক্টর বোর্ড ৪ বৎসর জীবিত থাকিবে; কাজেই অন্ততঃ ৪ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত বোর্ডই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। ফলে যখন কেন্দ্রীয় শাসনে দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন জনসাধারণের নির্ব্বাচিত রাজস্ব-সচিব গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত ডিরেক্টর বহুলভাবে যে বাধা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৩] জনসাধারণ অবশ্যই অবগত আছে যে, টাকার বাট্টাহার ষ্টার্লিংএর সঙ্গে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্দিষ্ট। ১৯২৭ সনে যখন এই বাট্টাহার ব্যবস্থাপক সভায় স্থিরীকৃত হয়, তখন অনেক অর্থনীতিবিদ্ ও ব্যবসায়ী উহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। যদিও সে আন্দোলন এখনও শেষ হয় নাই, তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলে এই বাট্টাহারই গৃহীত হইয়াছে। এবারও ব্যবস্থাপক সভায় ও জনসাধারণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। অর্থনীতিবিদ্গণের বিবেচনায় এই বাট্টাহারের ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের লাভ অথচ পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং ভারত হইতে এই যে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে তাহাও এই জন্য। সর্ব্বোপরি,

প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে টাকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় দেশের দ্রব্যমূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেজন্য কৃষিজীবীদের দুরবস্থার অন্ত নাই। বিদেশী মুদ্রার হিসাবে আমাদের টাকার মূল্য বেশী থাকায় বিদেশীরা আমাদের রপ্তানী দ্রব্য গত কয়েক বৎসর খুব কম করিয়া লইতেছে। এরূপ রপ্তানী হ্রাস অনেক দেশেই হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা মুদ্রামান কমাইয়া দিয়া ক্রমশঃ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি করিতেছে। ফলে সে সব দেশের অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশাও হ্রাস পাইতেছে। জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার এই উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছে। কাজেই আমাদের টাকার অতিরিক্ত বাট্টাহার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যখন স্থায়িভাবে করিতে চলিল, তখন ভারতের সে বিষয়ে যে একটি বড় অসুবিধা থাকিয়া গেল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। "হোয়াইটপেপার"এ পরিকল্পিত শাসন-সংস্কারের কাঠামোর মধ্যেও এরূপ একটি বিধি আছে যে, গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত ভবিষ্যতে মুদ্রামান ও বাট্টাসম্পর্কীয় কোন আইন ব্যবস্থাপক সভা পাশ করিতে পারিবে না। ভবিষ্যতে বাট্টাহার হ্রাস করিবার পথেও এই স্থানে প্রকাণ্ড এক বাধা রহিয়া গেল।

[৪] পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক আংশিক ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করিলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রভাব ও লাভ অনেকটা কমিয়া যাইবে। এই জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি চুক্তি স্থাপন ও তাহাকে অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্ক-প্রগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যাঙ্কের অধিকাংশ সুবিধাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে এবং তাহার কার্য্যপ্রণালীর উপর বাধা জন্মিতে পারে এরূপ কোন চুক্তি অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোথাও করা হয় না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত বিশেষ সুবিধা দানমূলক কোন চুক্তি করিয়া নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে তবে তাহার কার্য্যকরী সার্থকতা অনেকটা নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক পূর্ব্ব হইতেই দেশীয় অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-প্রগতি যে অনেক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে সোল্ এজেন্সী দিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার ফল অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির উপর মঙ্গলজনক হইবে না। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার সমস্ত দেশব্যাপী শাখা-আফিসের সাহায্যে সোল্ এজেন্সীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিবে সত্য, কিন্তু যদি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ভারতীয় ব্যাঙ্ককে এজেন্সী দেওয়া হইত তবে বোধ হয় ব্যাঙ্ক-প্রগতির অনেকখানি সহায়তা হইত এবং দেশের অর্থ-নৈতিক স্বার্থও বেশী পরিমাণে রক্ষিত হইত।

মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে পরিকল্পিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ না হইলেও, ভারতের আর্থিক মঙ্গলের জন্য যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে যাইতেছে, তাহাই দেশের পক্ষে আশার কথা।

আর এক দিক

রুশী উপন্যাসিক টলস্টয়ের কটুক্তি-পূর্ণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

তাঁহাকে ক্ষমা করিতেন না, এমন লোক সে সময়ে কমই ছিল না। অবিশ্যি যাকে তাকে তাঁহার হাত হইতে যে রেহাই পাওয়া যাইত না, সেটা গল্পটি তাহারই সাক্ষ্য। এক ভদ্রলোক যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন টলস্টয় তাঁহাকে রেহাইই দেন নাই। মৃত্যুর পর এই ভদ্রলোকের বন্ধুরা টলস্টয়কে তাঁহার শোক-সভায় কিছু বলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, এইবার টলস্টয়ের মতা দেখা যাইবে, বাঁচিয়া থাকিতে যে ব্যক্তিকে তিনি এত কটূক্তি করিয়াছেন, শোক-সভায় তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে। টলস্টয় বক্তৃতা দিলেন—"ইনি মৃত মানুষ এ জগতের সব চাইতে বড় লেখক ছিলেন, ক্ষমতাশালী লেখক এবং অমায়িক বন্ধু হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল, তিনি আদর্শ স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন—অবশ্য যদি তিনি সত্য সত্যই মরিয়া থাকেন বলেই এগুলি সত্য,..."

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বুদ্ধের সৌজন্য-কুশলতা

একবার লিচ্ছবিদের অনেকে তাঁহাদের সংস্থাগারে বসিয়া বুদ্ধের প্রশংসা করিতেছিল। লিচ্ছবি সেনাপতি সিংহ(সীহ)ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি সিংহ মহাবীরের ভক্ত ছিলেন কিন্তু স্ববংশীয়দের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। তিনি মহাবীরের (বৌদ্ধশাস্ত্রে ইঁহাকে "নিগন্ঠ নাতপুত্ত" অর্থাৎ নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে : মহাবীরের পিতা জ্ঞাতৃবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন) কাছে গিয়া বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু মহাবীর বলিলেন, "সিংহ তুমি ক্রিয়াবাদী, তুমি অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন? শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদে বিশ্বাস করেন না, তিনি অক্রিয়াবাদী ও শিষ্যদের অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন।" এই কথা গুরুর মুখে শুনিয়া সিংহের বুদ্ধসন্দর্শনের ইচ্ছা নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু লিচ্ছবিদের মুখে আবার বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া সিংহের বুদ্ধকে দেখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল, তিনি মহাবীরের অনুমতি লইতে গেলেন, মহাবীর সেই একই কথা বলিলেন, "সিংহ, তুমি ক্রিয়াবাদী, তুমি অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন?" ইত্যাদি। যুদ্ধব্যবসায়ী সেনাপতির বারে বারে এরূপ বাধা ভাল লাগিল না, তিনি মনে ভাবিলেন, "নির্গ্রন্থদের জিজ্ঞাসা করি আর না করি, উহারা আমার কি করিতে পারে? আমি উহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুদ্ধের কাছে যাইব।" সিংহ একদা দিনের বেলায় প্রকাণ্ড বহু যানবাহন সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বৈশালী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই উচ্চপদস্থ, অভিজাত, প্রভাবশালী বিশেষতঃ বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বুদ্ধ যেরূপ সুকৌশলে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লোকচরিত্রজ্ঞান ও দক্ষতা দেখিয়া মনে হয় বৃথা তাঁহার রাজবংশে জন্ম হয় নাই।

বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদির পর সিংহ বলিলেন, "ভদন্ত, শুনিয়াছি লোকে বলে, শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন; যাহারা ভগবান সম্বন্ধে এরূপ বলে তাহারা কি ঠিক বলে, না মিথ্যা বলে? ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বাদানুবাদে কোন দোষ নাই—আমাদের ইচ্ছা যে ভগবান সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার না হয়।"

বুদ্ধ বলিলেন,

"সিংহ, এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্য সত্যই বলা যায় যে 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন', আবার এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায় যে আমি ক্রিয়াবাদী; এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায় যে আমি উচ্ছেদবাদী; এক অর্থে সত্যই বলা যায় যে আমি জুগুপ্সু, জুগুপ্সিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় যে আমি বৈনয়িক, বিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় যে আমি তপস্বী, তপস্যা শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় যে আমি "অপগর্ভ", এক অর্থে সত্যই বলা যায় যে আমি আশ্বস্ত। কি ভাবে কি অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই এরূপ বলা যায়?

"সিংহ, যে কাজ অসাধু তাহা কার্য্যে, চিন্তায়, বাক্যে না করা আমি শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমাকে অক্রিয়াবাদী বলা যায়; যে কাজ সাধু, কার্য্যে, বাক্যে ও চিন্তায় তাহা করিতে আমি শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমাকে ক্রিয়াবাদী বলা যায়। আমি বাসনা (রাগ) দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমি উচ্ছেদবাদী; চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে অসাধু আচরণ আমি জুগুপ্সিত মনে করি, এই অর্থে আমি জুগুপ্সু; বাসনা, দ্বেষ ও মোহের আমি বিনয়ন শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমি বৈনয়িক; মনের যে ভাবগুলি পুণ্য নয় অপুণ্য, চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে যাহা অসাধু, এ সবই আমি তপনীয় (অর্থাৎ দহনযোগ্য) মনে করি, এই অর্থে আমি তপস্বী; আমার আর ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থে আমি অপগর্ভ; আমি শ্রেষ্ঠ আশ্বাস পাইয়াছি, এই অর্থে আমি আশ্বস্ত।"

"ভদন্ত, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে যাহা আমার কাছে অপ্রকাশ ছিল তাহা প্রকাশ হইল।"

বুদ্ধের উত্তরের শেষাংশ হইতে বুঝা যাইবে যে ব্যবহৃত ধর্ম্ম-দর্শন পারিভাষিক শব্দগুলি তিনি যথার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অক্রিয়াবাদ ও উচ্ছেদবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; 'জুগুপ্সু' কথাটি গুপ্ হইতে নিষ্পন্ন, ইহাতে 'গোপন করা'ও বুঝায় 'ঘৃণা করা'ও বুঝায়, সাধারণে প্রথম অর্থে ব্যবহার করিত, বুদ্ধ দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়াছিলেন, 'বিনয়,' 'তপঃ,' ও 'আশ্বাস' কথাগুলির সাধারণ অর্থ সহজবোধ্য; 'অপগর্ভ' কথাটি সাধারণে 'অপ্রগল্ভ' ধরিত, বুদ্ধ 'অপ্রগর্ভ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

সেনাপতি সিংহ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন। তাঁহার প্রথম কথা হইতেই বুঝা যায় তিনি স্বজাতীয়দের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা ও গুরু ও নিজ সম্প্রদায়ের লোকের মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিয়া কোন্‌টা সত্য তাহা নির্ণয়ের জন্য আসিয়াছিলেন। সত্যনির্ণয়ের জন্য তাঁহার আগ্রহও যে খুব বেশী ছিল তাহা মহাবীরের পুনঃপুনঃ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধের কাছে আসাতেই প্রকাশ পায়। অন্য সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে তিনি কি অর্থে কোনটি তাহা বলিলেন, কিন্তু ক্রিয়াবাদ জৈনদের মতবাদের মূল ভিত্তি ছিল বলিয়া তাহা অস্বীকার না করিয়া যে অর্থে বুদ্ধ উহা প্রয়োগ করিলেন তাহাতে সিংহের মত চিন্তাশীল লোকের শ্রদ্ধা হইবে তাহা বুদ্ধ জানিতেন। অন্য অনেক লোককে করিলেও সিংহকে তিনি বুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, শ্রদ্ধা জাগাইয়া জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিংহের সঙ্গে তাঁহার আরও অনেক কথা হইল ও সিংহ শ্রদ্ধালু হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় করিবার জন্য মহত্ত্বের পর মহত্ত্ব দেখাইয়া এইভাবে সিংহকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়াছিলেন।

সিংহ বলিলেন, "আজ হইতে যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত আমি ভগবানের শরণ লইলাম।"

"সিংহ, বিবেচনা করিয়া কাজ করিও, তোমার মত প্রসিদ্ধ লোকের বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কাজ করা উচিত নহে।"

"ভন্তে, ভগবানের এই কথায় আমার আনন্দ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িল; অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে শিষ্য বানাইতে পারিলে সারা বৈশালীতে ঢাক পিটাইয়া বেড়াইত যে 'সেনাপতি সিংহ আমাদের শিষ্য হইয়াছেন!' আমি পুনরায় ভগবানের শরণ লইতেছি।"

"সিংহ, নিগ্রন্থেরা অনেক দিন হইতে তোমার বাড়ীতে অন্নজল পাইয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও তুমি উহাদের ভিক্ষাদান তোমার কর্ত্তব্য মনে করিও।"

"ভন্তে, শুনিয়াছিলাম শ্রমণ গৌতম বলেন যে শুধু তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকেই ভিক্ষা দিতে হইবে, অন্য কাহাকেও যেন ভিক্ষা দেওয়া না হয়, শুধু তাঁহাকেই ভিক্ষা দিলে মহাফল লাভ হয়, অন্যকে দিলে হয় না। কিন্তু আজ ভগবান আমাকে নিগ্রন্থদেরও ভিক্ষা দিতে আজ্ঞা দিতেছেন! সময় মত যথাকর্ত্তব্য করা যাইবে।" (মহাবগ্গ, ৬৩১)

তারপর বুদ্ধ সিংহকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। সিংহ বিদায় লইবার সময় বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণ লইয়া ক্রুদ্ধ নিগ্রন্থেরা বৈশালী নগরে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছিল তাহা পরে বলিব। একটি কথা শেষে বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। জৈনদের শাস্ত্রে দেখিতে পাই, "আজ হইতে আপনাদেরই ভিক্ষা দিব, আর কাহাকেও দিব না" একথা জৈনরা বহু প্রশংসার সহিত শিষ্যদের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন। কাজেই সিংহ যে বলিলেন, "সময় মত যথাকর্ত্তব্য করা যাইবে" তখন বোধহয় তাঁহার মনের ভাব এই ছিল, "ভগবান নিগ্রন্থদের ভিক্ষা দিতে বলিতেছেন, আমি প্রতিবাদ করিব না বটে, কিন্তু যেটারা আবার ভিক্ষা লইতে আসিলে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব।" তেজস্বী লোক অসত্য বুঝিতে পারিলে তাহার সঙ্গে রফা করে না।

আর একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে বুদ্ধ সৌজন্যে মুগ্ধ করিয়া বশ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ একবার কুশীনগরে(কুসিনারা) গিয়াছিলেন। কুশীনগরের মল্লসংঘীয়েরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করিল যে, যে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে না যাইবে তাহার পাঁচশত কার্ষাপণ অর্থদণ্ড হইবে। মল্লেরা বুদ্ধকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিলে আনন্দ তাহাদের মধ্যে তাঁহার বন্ধু রোজ নামক একজন মল্লকে দেখিতে পাইলেন। রোজ গিয়া আনন্দের কাছে দাঁড়াইলে আনন্দ তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি যে ভগবানকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছ ইহা বড় ভাল কথা।' রোজ বলিলেন,

"আনন্দ, আমি যে বুদ্ধকে বা তাঁহার ধর্মকে এমন বিশেষ ভক্তি করি তাহা নয়, আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে ঠিক হয় যে, যে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে না যাইবে তাহার পাঁচশত কার্ষাপণ দণ্ড হইবে। সেই দণ্ডের ভয়ে আমি আসিয়াছি।" রোজের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দ দুঃখিত হইলেন। পরে আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, "ভদন্ত, এই রোজ একজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইহার মত লোককে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিলে খুব ভাল হইবে; ভগবান এরূপ করুন, যাহাতে রোজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়।" "আনন্দ, রোজ যাহাতে ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়, এরূপ করা তথাগতের পক্ষে দুষ্কর নয়।"

বুদ্ধ রোজের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া সৌজন্য দেখাইয়া মুগ্ধ করিলেন ও যখন দেখিলেন, ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। রোজ বুদ্ধের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি "গাভীর পিছনে তরুণ বৎসের মত" আরামের এখানে ওখানে বুদ্ধকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া রোজকে বলিল যে "এইখানে তিনি থাকেন; এখন দরজা বন্ধ আছে, নিঃশব্দে যাইয়া অলিন্দ পার হইয়া দাঁড়াইয়া অর্গল নাড়ুন, ভগবান দরজা খুলিয়া দিবেন।"

রোজ ভিক্ষুকদের কথামত কাজ করিয়া বুদ্ধের দর্শন পাইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশদানে তুষ্ট করিলেন। রোজ এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বলিয়া বসিলেন, তিনিই ভিক্ষুকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিবেন, ভিক্ষুরা যেন আর কাহারও কাছে ভিক্ষা না লয়। কিন্তু বুদ্ধ ধনীর বড়লোকিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার আত্মশ্লাঘায় প্রশ্রয় দিবার বা নিজের মর্যাদা কমাইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি বলিলেন, "রোজ, শিক্ষাহীন যে কেহ তোমার মত ধর্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে সেই মনে করে যে সে একলাই ভিক্ষুদের সব জিনিষ দিবে, ভিক্ষুরা যেন অন্যত্র ভিক্ষা না লয়; কাজেই ভিক্ষুরা তোমার কাছে ভিক্ষা লইবে, তাহাদের কাছেও লইবে।" রোজের সুখ্যাতিও করা হইল, তাহার উচ্ছ্বাস দমনও করা হইল!

(মহাবগ্গ, ৬।৩৬) [ক্রমশঃ

তুমি আর আমি

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

একদিন এই পথে তুমি আর আমি!

শীতের অন্তিম রোদ দীর্ঘ ডানাতরে,
পড়েছিল অন্তহীন আলস্যের ভরে
কচি মটরের ক্ষেতে—সবুজ মখমল;
এপারে ওপারে পদ্মা—নাকে এই চরে
ঘন দুরাশার মত রাত্রি আসে নামি—
তুমি আর আমি।

একদিন এই পথে তুমি আর আমি!

শীতের নূতন চরে তব দৃষ্টি পায়
সুমুখে চলিতে পিছে ছাপ রেখে যায়;
তখনো লাগিয়া ছিল গত বরষার
ভেসে আসা খড়কুটা—স্রোত সে কোথায়!
নিঃস্ব বরষ পায়ে রাত্রি আসে নামি—
তুমি আর আমি।

একদিন এই পথে তুমি আর আমি!

এপারের গৃহরাজি ওপারের বন,
আসন্ন কুহেলিতলে হ'ল নিমগন।
পশ্চিম সীমান্ত সেবে বিস্ময়রূপ লভি
ডুবে গেল নিঃস্ব রবি—স্বপ্নের মতন
বিস্তারিয়া মায়াজাল, রাত্রি এল নামি—
তুমি আর আমি।

একদিন এই পথে তুমি আর আমি

আজি বহু দূর হতে বহু দিন পরে
একবার তাকাইনু শূন্য সেই চরে;
শূন্য মাঠ, শস্যহীন শুষ্ক বালুকায়
অতীতের স্মৃতিচিহ্ন কোথা সে প্রান্তরে!
এপারে ওপারে পদ্মা—রাত্রি আসে নামি—
তুমি আর আমি।

ব্যাঘ্র-দেবতা

—শ্রীনরোজকুমার রায় চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এদিকে কেবল মাঠের পর মাঠ ধান-জমি। মাঝে মাঝে তাল ও আমের বাগান। তাও মাঠের মধ্যে নয়, গ্রামের কোলে। কোথাও জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। শীতকাল। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে আখের ক্ষেত মাঠের শূন্যতা দূর করিতেছে। এদিকে বাঘ আসার কথা নয়। আসেও না। কেবল ক্ষেতের আখগুলিকে ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকেরা গুজব তোলে, অমুক মাঠে বাঘ আসিয়াছে। এমনি একটা গুজবের মুখে সেবারে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার কয়েকটি ছোকরা পাড়ার কয়েকটি খেজুর গাছে রস দেয়। গুড় তৈরী করিবার মতো প্রচুর রস এদিকে হয় না। শুধু নিজেদের উদরপান, পাঁচজনের মধ্যে বিতরণ এবং খানিকটা আমোদ, এই লাভ। কিন্তু তাহার জন্য কম কষ্টও করিতে হয় না। রাত্রে লোকে আসিয়া রস খাইয়া চলিয়া যায়। সকালে ইহারা গিয়া দেখে ভাণ্ডে রস নাই। সেজন্য প্রায়ই রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেও হয়। এই কয়দিন কেবল পাহারা দিতে হইতেছে না। বাঘের ভয়ে কেহ আর রাত্রে বাহির হইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে। আর রাত নাই, কিন্তু ভোর হইতেও বিলম্ব আছে। তাঁতীপাড়ার ছোকরা কয়টি বেশ করিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া ছুর ছুর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কি!

ছোকরা কথা কহিল না, শুধু আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল,—পথের ধূলায় স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ! একটি, দুটি, তিনটি, অনেকগুলি ব্যাঘ্র-পদ-চিহ্ন বাঁ দিকের ডোবার পথ ধরিয়াছে। ওইখানেই একটা খেজুর গাছে রস দেওয়া হইয়াছে যে!

সর্ব্বনাশ!

—আর রসে কাজ নেই, ভাই। চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

—যা রে যা! গিয়ে পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাক গে। বাঘ না ইয়ে!

—কিন্তু কত বড় থাবা দেখেছিস্?

—দেখিছি। আমাদের বাছা কুকুরটার থাবা ওর চেয়ে বড়।

বলিতেছিল বটে। কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর নামিয়া গিয়াছে। বাঘ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। বাঘা কুকুরটার পায়ের দাগ হওয়াও অসম্ভব নয়। সেটাও প্রকাণ্ড বড় কুকুর। দেশী জাতের অত বড় কুকুর প্রায় দেখা যায় না।

অকস্মাৎ দূরে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল,—ওরে বাঘরে, বাঘ, বাঘ!

এক সেকেণ্ডে সকল তর্কের অবসান হইল। হাতের ভাঁড় ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সকলে একসঙ্গে পাশের পাঁচীলটার উপর উঠিল। নীচে মাটির ভাণ্ড ভাঙিয়া রস গড়াইয়া পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। আর উপরে তাঁতী-পাড়ার ছোকরা কয়টি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রাচীরটি মোড়লদের খামারবাড়ীর। এক প্রান্তে তাহাদের গোয়ালঘর, আর প্রান্তে রান্নাঘর। ভয়ের আধিক্যে তাহারা দেখিতে পায় নাই, প্রাচীরের ঠিক নীচেই মোড়লদের বাড়ীর ছোট্ট মোটা গোরু বাঁধিতেছিল। অতগুলি লোক দুম্‌দাম্ করিয়া পাঁচীরের উপর উঠিতেই সে ভয় পাইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল।

শাশুড়ী বাড়ীর ভিতরে উঠান ঝাঁট দিতেছিল। ঝাঁটা হাতেই বাহিরে আসিয়া কাংস্যকণ্ঠে হাঁকিল,—কে রে মুখ-পোড়া! মরবার আর জায়গা পাস নি? আমার বাড়ীতে এসেছিস্ উপদ্রব করতে?

মুখপোড়ারা একদল তখন সরিতে সরিতে গোয়ালঘরের কাছে পৌঁছিয়াছে, আর একদল রান্নাঘরের কাছে।

বুড়ী চীৎকার করিতেই তাহারা ধমকাইয়া কহিল,—চুপ্! বাঘ!

—বাঘ! দিনের বেলায় বাঘ! আমাকে ছোট ছেলে পেয়েছিস, না রে? নাঘ্ বলছি।

পাটীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ তো এক লাফেই সব কয়টাকে সাবাড় করিয়া দিবে। তাহারা সকলেই চালের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শিশিরে খড়ের চাল এমন পিছল হইয়া উঠিয়াছে যে, উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর সেই সময়েই বুড়ী টিস্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে।

—আরে, এ মাগী করে কি? বলছি, বাঘ···

—বাঘ বার করছি দাঁড়া রে জড়া! ডাকি লসনাকে, সে এসে মেরে তোদের মুখে নুড়ো জ্বেলে। ওঠ তো রে লসনা, মহারা এসেছে সকাল বেলায় আমার বাড়ীতে বাঘ দেখাতে!

মাতার বারম্বার আহ্বানে লসন চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়াই তাহার নজর পড়িল সুমুখে রান্নাঘরের চালের উপর কয়েকটি লোক ঘেঁসাঘেসি বসিয়া আছে, আর সভয়ে বারবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

—কী রে গোরাদ!

প্রহ্লাদ একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না। যেমন অবস্থায় বসিয়া ছিল, তেমনি অবস্থায় শুধু অস্ফুট স্বরে কহিল,—বাঘ!

বাঘের গুজব কয়দিন হইতেই উঠিতেছিল। লসন সভয়ে কহিল,—কোথায় রে?

প্রহ্লাদ সাড়া দিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

লসন আবার উচ্চতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় রে? গোরাদ?

ভয়ের সময় বেশী কথা কহিতে বিরক্ত লাগে। প্রহ্লাদ কাঁকিয়া কহিল,—কোথায় তা কি দেখতে পাচ্ছি না কি? এইখানেই আছে কোথাও।

পরক্ষণেই কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু আওয়াজটা অত্যন্ত কাছেই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন কর্কশ কণ্ঠে পাড়া মাতাইয়া চীৎকার করিল,—পালারে বাঘ, বাঘ!

এবং তাহার চীৎকার বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে কি যেন একটা ভারী জন্তু যে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া লসন ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল সেই ঘরের চালের উপর হুম্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল, বোধ করি পাশের তেঁতুল গাছটা হইতে।

বাঘ!

চক্ষের নিমেষে লসন ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া খিল লাগাইয়া দিল। তাহার স্ত্রী দাওয়ার এক কোণে অন্তরালে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেও কালবিলম্ব না করিয়া পাশের ঘরে খিল লাগাইয়া দিল। কেবল লসনের বৃদ্ধা জননী ছুটিয়া দাওয়ায় উঠিতে গিয়া সিঁড়িতে হোঁচট খাইয়া আবার উঠানেই গড়াইয়া পড়িল এবং হাত-পা ছুঁড়িয়া জড়িত কণ্ঠে এমনভাবে কাৎরাইতে লাগিল যে, শুনিলে মনে হয়, বাঘটা তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

আর গোরাদ ও রান্নাঘরের উপরের লোকেরা প্রাণপণে চালের খড় আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে বড় ঘরের চালের উপর যে [illegible] বসিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে তখন খমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরের উপর হইতে প্রহ্লাদের দল স্পষ্ট দেখিতেছে, সেটা সত্যই বাঘ নয়, একটা হনুমান মাত্র। কিন্তু তথাপি যেন কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া স্খলিত কণ্ঠে কেবলই চীৎকার করিতেছে,—বাঘরে, বাঘ, বাঘ!

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। মেয়েরা স্নান, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না বন্ধ করিয়া দিয়া রুদ্ধ ঘরে ছেলেপুলে লইয়া বসিয়া রহিল। ঘাটে যাওয়ারও উপায় নাই, ঘরের বাহিরে আসিবারও উপায় নাই। বাঘটা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো স্থান হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। অথচ মুস্কিলের কথা এই যে, বাঘটা যে ঠিক কোথায় আছে তাহাও ঠাহর করিবার উপায় নাই। এই দক্ষিণপাড়া হইতে চীৎকার আসিল, বাঘ, বাঘ। পরক্ষণেই পূর্বপাড়া হইতে তেমনি চীৎকার আসিল। কোথাও খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে কি লোকে ভয়ে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

গ্রামের চৌকিদার পরাণ হাজরার বয়স হইয়াছে। তবু এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের

হুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতেছিল। ঘরে তাহার দরজা নাই, রাত্রে একটা কাঁপ বন্ধ করিয়া থাকে। তাহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া পরাণকে ঘরে আসিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছিল। সে ঘরে না আসিলে বেচারা কাঁপ বন্ধ করিতে পারিতেছিল না। আবার কাঁপ বন্ধ না করাও নিরাপদ নয়।

—মিন্‌সে নিজেও মরবে, সাতগুষ্টিকেও মারবে। ঘরে আসবি তো আয়, নইলে দিলাম কাঁপ বন্ধ করে।

এবারে পরাণ কাঁকের সঙ্গে বলিল,—সে কানে কাঁপ বন্ধ ক'রে! মানা করছে কে?

তাহার স্ত্রী মুখ ভেঙচাইয়া বলিল,—মানা করছে কে? একটা মানুষ ঘরের বাইরে ব'সে থাকলে কাঁপ দেওয়া যায়?

—তবে মর্।

বলিয়া পরাণ বিরক্ত ভাবে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের এক কোণ হইতে একটা বড় টাঙি এবং তাহার চৌকিদারী পেটিটা বাহির করিয়া উঠানে নামিল।

—আবার টাঙি নিয়ে চললি কোন্ চুলোয়?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পরাণ বাহির হইতে হইতে শুধু বলিয়া গেল,—সে এইবার কাঁপ বন্ধ ক'রে।

তাহার পরিবার হাউ মাউ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বড়রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সুমুখেই বৈঠকখানায় একটা মোড়ার উপর বসিয়া রায়েদের বড় বাবু পাটের গদি কাটিতেছিলেন। পরাণ উঠান হইতেই দড় হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিল।

বড় বাবু বিপুল শক্তি ও অসীম সাহসের জন্য বিখ্যাত। বয়স ষাটের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি হুঙ্কার দিলে বড় বড় জোয়ানেরও বুক কাঁপিয়া ওঠে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সম্মুখে লাঠি ধরে এমন লোক এ অঞ্চলে বেশী নাই।

তিনি পরাণের দিকে বঙ্কিম নেত্রে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এদিকে চল্‌লি কোথারে হারামজাদা? বাঘ এসেছে যে।

পরাণ করযোড়ে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে তাই শুনেই একবার বেরুলাম বাবু। মাগীকে বললাম, তুই কাঁপ দিয়ে ছেলেগুলোকে নিয়ে বোস, আমি বাঘের সংবাদটা একবার নিয়ে আসি।

বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—তাই যা। মাগীর হাতে খাঁড়া-খরচটা রেখে এসেছিস তো?

পরাণ একগাল হাসিয়া কোমরের পেটিটার উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। কহিল,—আজ্ঞে আমরা মহারাণীর চাকর, আমাদের ওপর তো তেনার হুকুম উঠবে না।

এমন সময়ে কাছেই বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব উঠিল,—এই যে, এই যে! মার, মার।

মনে হইল মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে।

বড় বাবু ডান হাত দিয়া মেঝে হইতে কাস্তেটা উঠাইয়া লইয়া মোড়াটিকে একেবারে দরজার গোড়ায় টানিয়া আনিলেন। যেন প্রয়োজন বোধ করিলে এক লম্ফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন অথচ বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—তা, সংবাদ নিতে হয় তো যা। নইলে ঘরের মধ্যে ঢোক! বাঘটা মনে হচ্ছে মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে ঢুকেছে।

পরাণ বাঁ হাতটা একবার পেটিতে একবার কপালে ঠেকাইয়া টাঙিটা কাঁধে ফেলিয়া কহিল,—আজ্ঞে না, ঘরে আর প্রবেশ করব না, সংবাদটাই নিয়ে আসি।

বলিয়া মুখুয্যেদের খামারের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বড় বাবু উদ্বিগ্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; এখান হইতে মুখুয্যেদের খামারবাড়ী মিনিট তিনেকের পথ। একাকী, এত কাছে একখানি মাত্র কাস্তে সম্বল করিয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ হইবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এককালে তাঁহার নিজের বন্দুক ছিল, শিকারের সখও ছিল। পরিণত বয়সেও তিনি নিজের হাতে বাঘ শিকার করিয়াছেন। তাই বাঘ যে কত হিংস্র তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইল কোনো অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁহার বন্দুক এমন কি, বহুকষ্টে সংগৃহীত কয়েকখানি গুলি এবং তরবারিও বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত অস্ত্র না লইয়া বাঘের সম্মুখীন হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া ছিলেন। অথচ, ছাড়া বাঘ দেখিবার

সপটুকুও ষোলো আনা আছে! এত কাছে বাঘ আসিয়া পড়ায় তিনি ভাবিতেছিলেন, এখানে বসিয়া থাকা সঙ্গত হইবে কি না।

এমন সময় পাচু দেখা দিয়া অভিবাদন করিল,—সেলাম বাবু।

লোকটা উৎসাহের আধিক্যে একেবারে শুধু হাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

কি রে দেখছি?

—জি, আপনাদের পাড়ায় নাকি বাঘ আসছে?

—আসছে। তাই শুধু হাতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিস্?

পাচু এক গাল হাসিয়া কহিল,—জি, আমরা জাত পাঠান। একটা নেংটে বাঘ মারতে আমাদের হাতিয়ার লাগে না। ধরব, কি কল্লা মুচড়ে দুব।

দাঁত খিঁচাইয়া বড় বাবু বলিলেন,—ভারি মরদ!

পাচু সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া মেঝের একটা চাপড় দিয়া কহিল,—জি, পাচু সেখের মর্দানি দেখার ঝিলের লড়াইয়ে তো দেখলেন। পঁচিশটা জোয়ান আমি একা ভাগিয়েছি।

পাচু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিয়া বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ওরে হতভাগা, এ তোর লেঠেলি নয়। বাঘ লাঠি মানে না।

পাচু লাঠিয়ালি ঢঙে মাথার একটা ঝাঁকি দিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কোন্‌খানে বাঘটা আছে বলুন। পাচু সেখের কেরামতি আর একবার হুজুরকে দেখিয়ে দিই।

পাচু বড় বাবুর পেয়ারের লাঠিয়াল। নিজের হাতে তাহাকে লাঠি খেলা শিখাইয়াছেন। তাঁহার বহু দুঃসাহসের বিশ্বস্ত সঙ্গী সে। তাহাকে বাঘের মুখে পাঠাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু সে যে এ ব্যাপারে নিষেধ মানিবে না, তাহাও বুঝিলেন।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন, যাবি? তা যা। বোধ করি মুখুয্যেদের খামারেই আছে। তবে শুধু হাতে যাস্ নে। এই কাস্তেখানা নিয়ে যা।

পাচু ওস্তাদের দেওয়া কাস্তেখানি পরম সমাদরে মাথায় ঠেকাইল।

বড় বাবু আবার বলিলেন, দেখিস, যার তার ঘাড়ে বসাস্ না যেন। ওতে বিষ মাখা দেওয়া আছে। রক্ত বার হলে আর নিস্তার নাই।

পাচুর উল্লাস দেখে কে! কাস্তেখানা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া পাচু বলিল, জি, তা হলে ও শালার মিত্যু নিঘাত আমার হাতে।

বলিয়া পাচু ওস্তাদকে আর একবার সেলাম করিয়া কাস্তেখানা ঊর্দ্ধে তুলিয়া লাঠিয়ালি ঢঙে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার ছেলেগুলি ঠিক দেখিয়াছিল।

বাঘের পায়ের থাবাই বটে। অনুমান হইতেছে বাঘটি সেই দিক দিয়া সোজা চাটুয্যেদের ফলবাগানে ঢোকে। চাটুয্যেদের ফলবাগান তাহাদের অন্দরেরই এক প্রান্তে। চাটুয্যেগিন্নী সেদিকে গোবরছড়া দিতে গিয়া দেখিতে পান, বাঘটি সুমুখের দুই থাবার মুখ ঢাকিয়া কোঁপের মধ্যে সম্ভবত নিদ্রা যাইতেছে। তিনি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রাণপণে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দেন। সে চীৎকারে পাড়ার লোক উঠিয়া পড়ে। যাহারা সাহসী তাহারা ছুটিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু এরূপ সাহসী লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। অধিকাংশ লোকই নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া বলিতে থাকে—বাঘ না আরও কিছু! দেখেছে হয়তো উদ্‌বেড়াল, অমনি ভয়ে চিরমি খেয়েছে। তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

ওবাপি পাড়ায় একটা সোরগোল ওঠে। এবং সে চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিতে গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাঘ্র মহাশয় পদ্মগড়ের দক্ষিণ এবং বন্দীগড়ের উত্তর দিয়া সোজা পশ্চিমমুখে হাঁটিতে থাকে। বন্দীগড়ের ঘাটে হজুদের [illegible] বৌ বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন লইয়া একরূপ [illegible]র সুমুখ দিয়াই বাড়ী ঢোকে। বাঘ হয়তো তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, কুল তো অন্য কোনো খেয়ালে ছিল, অবলা মানবীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। হজুদের সেজ বৌও অতটা খেয়াল করে নাই। করিলে সেইখানেই মূর্চ্ছা যাইত।

বলে,—দেখলাম যেন মা, কি একটা পল্লব'ড়ের পাশ দিয়ে এই দিকেই হেলে-দুলে আস্‌ছে। কে জানে মা, বাঘ! আমি তো প্রণুক দিয়েই চ'লে এলাম।

বলে আর তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে।

দত্তদের মেজ ছেলে তখনও পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল। এই শীতের রাত্রে এত ভোরে উঠিয়া স্ত্রী যে বাসন মাজিতে যায় তাহা তাহার ভালো লাগে না।

মুখের উপর হইতে লেপটা সরাইয়া তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল,—উঃ! রাত পোয়াতে না পোয়াতে নিত্যি নিত্যি বাসুন মাজায় ঘুম পড়ে যায়! নিত মাগীকে গপাং ক'রে তো বেশ হ'ত!

মাগী সভয়ে শিহরিয়া বলিল,—বাবাঃ! এত বড় মাথাটা। আমি তখুনি জানি, উনি সহজ পেরানী লয়।

—উঃ! তুই তো সবই জানিস। নিত্যি যদি অত ভোরে যাস্ না, গাঁয়ে বাঘ এসেছে। আমার কথা শেষ হয়ে না। এইবার যা।

—আবার!

বলিয়া মেজ বৌ স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিল।

এখান হইতে বাঘ বরাবর গিয়া মুখুয্যেদের খামারে ঢোকে। শীতকাল। খামারে সারি সারি অনেকগুলি ধানের পালা। পাশাপাশি দুইটি পালার মধ্যে যে সরু ফাঁক আছে সেই স্থান দিনমাপনের পক্ষে নিরাপদ হইবে মনে করিয়া বাঘটা তাহারই মধ্যে আশ্রয় লয়। লোকে আর বাঘ খুঁজিয়া পায় না। শেষে মুখুয্যেদের রাখাল আসিয়া সংবাদ দেয়, বাঘ তাহার মনিবের খড়ের পালার ফাঁকে আশ্রয় লইয়াছে। খামার পরিষ্কার করিতে আসিয়া সে ছোকরা দেখিতে পায়, বাঘের লেজের কিয়দংশ বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া লটপট্ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বহুলোক খামারবাড়ীর চারিদিকের বাড়ীগুলির চালের উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা বাড়ে, তবু বাঘের বহির্গমনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। লোকে চালের উপর বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এমন কি, কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল যে, এত সোরগোলের পরও যখন জন্তুটা বাহিরে আসে না তখন ওটা নিশ্চয় বাঘ নয়, উদ্‌বেড়াল কিম্বা অমনি একটা কিছু হইবে।

অবশেষে সরকারদের ওরুয়াপদ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া লাফ দিয়া খামারবাড়ীর মধ্যে পড়িল। ওরুয়া দেখিতে বেঁটে-খাটো, কিন্তু গায়ে অসীম জোর। প্রশস্ত বুক, সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহু এবং সাহসও যথেষ্ট। ছোকরা গায়ে ভজন খানেক জামা চড়াইয়া, মুখে-মাথায় বেশ করিয়া কম্বলটা জড়াইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস, বাঘে তাহার কিছু করিতে পারিবে না।

ওরুয়া অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, লেজটি বাঘেরই কিনা। বাঘ সে কখনও দেখে নাই। বড়বাবুর বাড়ীতে কতকগুলো বাঘের চামড়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের লেজ কিরকম ছিল ঠিক মনে পড়িল না। তবু তাহার মন বলিল, এ লেজ বাঘের না হইয়া যায় না।

উপর হইতে তখন ক্রমাগত প্রশ্ন আসিতেছে,—বাঘ বটে ত হে? না উদ্‌বেড়াল?

সাড়া দিবার উপায় নাই। ওরুয়া গাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল, বাঘই বটে।

শুনিয়া লোকগুলা চালের উপর বেশ সাবধান হইয়া বসিল।

ওরুয়ার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যদি আস্তে আস্তে খড় চাপা দিয়া ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বাঘটার নিশ্চয়ই পলাইবার পথ বন্ধ হইবে। তখন তাহাকে কায়দা করা সহজ হইবে। আগুন লাগাইয়াই হউক, আর সকলে মিলিয়া চাপ দিয়াই হউক বাঘটাকে মারিয়া ফেলিতে কষ্ট হইবে না।

সেইরূপ সংকল্প করিয়া ওরুয়া বাঘের লেজের দিকে আঁটি আঁটি খড় চাপা দিতে লাগিল। পিছনের ফাঁকটা কেবল বন্ধ হইয়াছে, অকস্মাৎ একটা ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। তেমন গর্জ্জন এ অঞ্চলের লোকে জীবনে শোনে নাই। চালের উপরের লোকগুলি পড়িতে পড়িতে কোনরূপে চালের খড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাদের কাঁপুনি আর থামে না।

ভীষণ গর্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরুয়া লক্ষ্য করিল বাঘটা দুই পা তুলিয়া সোজা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রকাণ্ড মাথা, তাহাতে চোখ দুইটা জ্বল জ্বল করিতেছে, আর হাঁ-মুখটা এতই বড় যে ওরুয়ার কম্বলটার সমেত মাথাটা অবলীলাক্রমে তাহার ভিতর চলিয়া যাইতে পারে।

পলকের মধ্যে ওরফার চক্ষুর সম্মুখ হইতে খড়ের পালা, ঘরের দেওয়াল, আকাশ, মাটি, গাছপালা মিলিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত বাহচৈতন্য লোপ পাইল। কিন্তু ভগবান মানুষের মনে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়াছেন, বোধকরি সেই প্রেরণার বশেই সে বাঘের উদ্যোগিত মুখের দুইটা পা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল।

তারপর আরম্ভ হইল মানুষে বাঘে লড়াই।

ওরফার দেহে অমিত শক্তি। বাঘটা তাহার দুই মুষ্টি হইতে মুখের পা দুইটা ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন ধস্তাধস্তি করিতেছে যে, আর বোধ হয় বেশীক্ষণ সে-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ওরফার থাকিবে না। তাহার পিঠ একটা খড়ের পালায় না ঠেকিলে এতক্ষণ বোধ হয় পড়িয়াই যাইত। পিছনের পা দিয়া বাঘটা তাহার পায়ের হাঁটু হইতে নীচে পর্যন্ত কয়েকটা স্থান চিরিয়া দিয়াছে। ক্ষত-মুখ দিয়া ঝর ঝর ধারে রক্ত পড়িতেছে। ওরফা বাঘের মুখের পা দুইটা ধরিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ফারিত চোখে সে যে কি দেখিতেছে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এক মিনিট……দুই মিনিট……

এমন সময় চৌকিদার পরাণ হালদার আসিয়া টাঙি দিয়া বাঘের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—হেট্, হেট্।

যেন তাহার দুষ্টু হাঁসা বলদটা গলাকি খুলিয়া খামারে ঢুকিয়াছে ধান খাইতে!

বাঘটা এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর এক কটকায় ওরফার মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পরাণের উপর লাফাইয়া পড়িল। এবং সরকারী পেটির মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষা না করিয়া মহারাণীর ভৃত্যের ঠোঁটের দক্ষিণ পাশ হইতে গালের খানিকটা মাংস উঠাইয়া লইয়া এক লাফে খামারবাড়ীর অনুচ্চ প্রাচীর ডিঙাইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেটা বড় রাস্তা নয়। ডান দিকে মুখুয্যেদের বাড়ী, তারপরে মহাজনের গোয়ালবাড়ী, তারপরেই একটা ছোট ডোবা। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বাহির হইয়া গ্রাম-সীমান্তে হাড়িপাড়ায় পৌঁছিয়াছে, আর একটা বাঁয়ে বেঁকিয়া রায়েদের বৈঠকখানার পাশ দিয়া তাঁতীপাড়ার দিকে গিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পাঁচু সেখ ডোবাটা পার হইয়া মহাজনের গোয়ালবাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত লাফাইতে লাফাইতে গিয়াছে। কাস্তেখানা তখনও তাহার ডান হাতে তেমনি শূন্যে নাচিতেছে—

এমন সময় চারি চক্ষে সম্মেলন!

সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাঠানের মুখ শুকাইয়া গেল। কে জানিত বাঘের চোখ এমন করিয়া জ্বল জ্বল করে! বাঘটা তাড়াইয়া আসিতেই সে কাস্তেখানা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়াই ডোবায় লাফ দিল,—সেখানা বাঘের গায়ে লাগিল কিনা, অথবা লাগিলেও ফল হইল কিনা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলও না। কেবল অনুমানে বুঝিল ঠিক তাহার পিছনে পিছনে আরও একটা কি যেন জলে লাফ দিয়া পড়িল।

পাঁচু সেখ ডুব-সাঁতার কাটিয়া ও-পারে গিয়া উঠিল। এবং দুরন্ত শীতে ভিজা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই ওপাশের পল্লগ'ড়েতে আবার লাফ দিয়া পড়িল।

বাঘটা খানিক জলে সাঁতরা-সাঁতরি করিয়া আবার এ-পারেই উঠিয়া আসিল। এবং মহাজনের গোয়ালঘর ও মুখুয্যেদের বাড়ীর মধ্যে যে সরু গলি আছে সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল বড় বড় বাবরী চুলওয়ালা কে একজন একটা রাম-দা হাতে করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বাঘটা ইচ্ছা করিলে এক নিমেষে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। শুধু মুখের বড় বড় বকবকে দাঁত দুইটা বাহির করিয়া শব্দ করিল,—গ্যাও-ও।

ব্যস্। আর দেখিতে হইল না। বাবরীওয়ালা লোকটি ছিট্‌কাইয়া প্রথমে মহাজনের গোয়ালঘরের দেওয়ালে পড়িল, সেখান হইতে আছড়াইয়া পড়িল মুখুয্যেদের ঘরের দেওয়ালে। দুইটা গাল এবং হাঁটুর চামড়া খানিকটা উঠিয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল। কিন্তু তখনও তাহার থামিবার উপায় নাই। লোকটা গড়াইতে গড়াইতে ডোবার জলে গিয়া পড়িল।

বাঘ কিন্তু আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে মহাজনের গোয়ালঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোয়ালের এক কোণে গুটি তিনেক গরু বাঁধা ছিল। বাঘ দেখিয়া সেগুলা তখন কোণে ঘেঁষাঘেষি করিয়া দড়ি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। গোকুল মহান্ত খবরটা শুনিয়া রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল,—গেল রে গেল গেল, হিন্দুখর্ম্ম রসাতলে গেল। বাঘটা এতক্ষণে গরুগুলিকে বুঝি সাবাড় করিয়া ফেলিল।

কিন্তু ডোবার জল হইতে উঠিবার পর হইতে বাঘটা যেন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গরুগুলির হাম্বারব এবং ছটোপাটিতেও তাহার রক্তলোলুপের স্পৃহা দেখা গেল না। সে আর এক কোণে স্থির হইয়া বসিয়া প্রলম্বিত জিহ্বা দিয়া পদতল লেহন করিতে লাগিল।

অনেকগুলি লোক সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের চালের উপর উঠিয়া পড়িল। একজন বুদ্ধি করিয়া চালের খড় খানিকটা ফাঁক করিয়া সেই পথে একখানা কাস্তে-বাঁধা বাঁশের লগি দিয়া গরুগুলির গলার দড়ি কাটিয়া দিল। ছাড়া পাইয়া গরুগুলি যে লাফ দিয়া কোন্ দিকে পলাইল তাহা আর দেখা গেল না।

বাঘ শুইয়া শুইয়া অপাঙ্গে চাহিয়া সব দেখিল। কিন্তু একটা গরুও ধরিবার চেষ্টা করিল না। সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া হাঁকাইতে লাগিল।

এইবারে বাঘটাকে বন্দী করা যায় কি করিয়া? গোয়াল-ঘরের শিকল সাধারণত আল্‌গাই হয়। কিন্তু নামিয়া দিবা শিকল লাগাইবে কে? আবার কয়েকজন লোক সেইখানকার চালের খানিকটা অংশের খড় সরাইয়া ফেলিল এবং বারকয়েক চেষ্টা করার পর সেই কাস্তে-বাঁধা লগিটা দিয়া অবশেষে শিকল তুলিয়া দিতে সক্ষম হইল। প্রথমে উপর হইতেই বেশ ভালো করিয়া দেখা হইল শিকল ঠিক লাগিয়াছে কি না। কিন্তু তাহাতেও যখেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া শেষে একজন সাহসী ব্যক্তি নামিয়া আসিয়া তাহার উপর একটা ভারী তালা বেশ শক্ত করিয়া লাগাইয়া দিল।

এত বড় সাফল্যে চালের উপর মহোৎসব লাগিয়া গেল। কতকগুলা ছোকরা চালের মটকার প্রায় সমস্তটারই খড় উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল।

সে খবর শুনিয়া গোকুল মহান্ত আবার চীৎকার করিতে লাগিল, ওরে বাবারে, ছোঁড়ারা মিলিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল রে। একে তাহার খড় নাই। খড়ের অভাবে বহু কাল গোয়ালঘর সংস্কার করিতে পারে নাই। তাহার উপর যে সামান্য আচ্ছাদন ছিল তাহাও পাঁচ শয়তানের পাল্লায় পড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

গোকুল শাসাইতে লাগিল, নষ্টামি দেখিয়া দেখিয়া তাহার চুল পাকিয়া গেল। সে আর নষ্টামি বোঝে না? ও সব বাঘ-মারা তো নয়, তাহার সর্ব্বনাশ করা। একবার কাছারী তো খুলুক, সে সকলের নামে এক এক নম্বর ঠুকিয়া খেসারত আদায় করিয়া ছাড়িবে, তবে তাহার নাম গোকুলচন্দ্র দাস মহান্ত।

কিন্তু গোকুলের কণ্ঠ রুদ্ধগৃহের বাহিরে এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল না। পৌঁছিলে তাহাতে কর্ণপাত করিবার মতো মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। তাহারা উপর হইতে বাঘের উপর বড় বড় ইট, পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাতে অবশেষে বাঘ যেন অত্যন্ত বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চালের উপরকার লোকদের প্রতি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লোকে মাঝে মাঝে বর্শা ছুঁড়িয়া মারে। কোনোটা গায়ে আসিয়া ঢপ্ করিয়া পড়ে, কোনোটা মেঝের বিঁধিয়া যায়। বাঘটা মাঝে মাঝে লাফ দিবার ভয় দেখায়। কিন্তু লাফ দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না জানিয়াও লোকেরা ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। হাড়াহাড়িতে পরস্পরের মাথায় মাথা ঠুকিয়া যায়, মাথা ফুলিয়া ওঠে।

অবশেষে স্থির হইল, এমন করিয়া কিছুই হইবে না। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র লোকের কাছে বন্দুক আছে। তাহাকেই ডাকিয়া আনা হউক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিল কাশী হালদারের বাড়ী। হালদার বাড়ীতেই ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর তাহার বড় ছেলে আসিয়া বলিল,—বাবা মাথার অসুখে শয্যাগত।

—তা হোক। তাকে উঠতেই হবে। বাঘটাকে মহান্তদের গোয়ালে বন্দী ক'রেছি। গুলি করে মারতে হবে।

ছেলেটি বাড়ীর ভিতরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে, কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না।

লোকগুলিও নাছোড়বান্দা, তাহারা বলিল,—উঠতে পারবে না কি রকম! এখনি থেকে আমরা তার গলা শুনতে পাচ্ছি। সে তো উঠেই আছে।

ছেলেটি আবার বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, না, তিনি কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, গুলির নিশানা হইবে না।

—তবু বন্দুকটা দিতে বল। আমরা অন্য লোক দিয়ে গুলি করাব। বড় বাবুই করতে পারবেন, কি বল হে চন্দরা?

এমন সময়ে কাশী হালদার মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টি হাসিয়া বলিলল.—বন্দুক দোব কি ক'রে রে? আমি ছাড়া আর কারও ও বন্দুক ছোঁবার 'লাইসেন্' আছে?

লোকগুলি সকাল হইতেই উত্তেজিত হইয়া ছিল। এখন চটিয়া বলিল,—তাহ'লে বাঘ মারার কি হবে?

হালদার অবলীলাক্রমে হাতের তালু উল্টাইয়া বলিল,—তা আমি কি জানি?

এ কথায় লোকগুলি চটিয়া আগুন হইল। বলিল,—তুমি জান না, বটে? তোমাকে গাঁয়ে বাস করতে হবে না? ছেলে-মেয়ের বিয়ে দৈতে দিতে হবে না? পাঁচজনকে কাজ-কর্ম্মে ডাকতে হবে না? তখন দেখে নোব জান কিনা।

এবারে হালদার যেন অনেকটা নরম হইল। কহিল,—তুমি তো বলছ বটে হে, চন্দরা। কিন্তু তিনটি বুলেটের দাম একটি টাকা। টাকাটি দেবে কে শুনি? তুমি দেবে?

—আমি কেন দোব? দরকার যদি হয়, গাঁয়ের ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে।

—ওঃ! ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে! তবেই হ'য়েছে!—হালদার ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিল।

চন্দরা অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া কহিল,—আচ্ছা, একটা টাকা তুমি আমার কাছেই নিও হে। তারপর সে চাঁদা তুলতে হয়, যা করতে হয় আমি বুঝবো।

মানুষের বিপদের সময় মোচড় দিয়া অমনি ভাবে টাকা আদায়ের অভ্যাস হালদারের চিরকালের। সে সন্দিগ্ধ ভাবে চন্দরার পানে চাহিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে বলিল,—দেখো ভাই চন্দরা? বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে কথাটা বললে। তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে। আমি আর কি বলব?

হালদারবাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেই চন্দরা পাশের লোকটির গা টিপিয়া বলিল,—তিনটি বুলেটের দাম এক টাকা। শুনেছ হে! কার্য্যতো উদ্ধার হোক তারপরে দেখা যাবে কত জলে কত মুসুরী ভেজে।

হালদারকে পরম সমাদরে গোয়ালঘরের চালের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে তিনটি বুলেট। কিন্তু নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়াও বাঘের চাল-চলন, সক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল।

উঁহুঁ, অমন করে নয়,—অমন ক'রে নয়। একটা দাবা বাঁশ চালের ফেতর দিয়ে নামিয়ে দাও। দিয়ে জন পাঁচেক বলবান লোক সেইটে বেশ বাগিয়ে ধর,—যেন নড়ে না। আর আমার মাজায় দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বাঁধ। দেখছ না, বাতের যন্ত্রণায় মাজা হিল্‌ছে।

তাহাই করা হইল। বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া হালদারকে বাঁধা হইল, যাহাতে তাহার কোমর না নড়ে। তারপরে হালদার বেশ কায়দা করিয়া বন্দুক উঁচাইতেই বাঘটা দাবা পাড়িয়া বসিয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে তাহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কোনো রকমে ঘোড়াটা টিপিতেই গুড়ুম করিয়া একটা আওয়াজ হইল। এই পর্য্যন্ত হালদারের মনে আছে। তারপরে কখন যে গুলি খাইয়া বাঘটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চালের মটকা পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিল, আর কখনই বা তাহার বন্দুকটা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল সে সকল কিছুই মনে পড়ে না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল বাঘটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ দিয়া অঝোরে রক্ত গড়াইতেছে,—সে রক্তে গোয়ালঘরের মেঝে কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। আর লোকগুলা সেই ভারী বাঁশটা দিয়া বাঘের মুখে-পেটে ক্রমাগত গুঁতাইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত দেখিয়াও সে কিছু মাত্র উৎসাহিত হইল না। শুধু বলিল,—একটু জল।

বাঘ মরিয়াছে! বাঘ মরিয়াছে!

কথাটা শুনিয়া মানুষের দেহে প্রাণ আসিল। যে যাহাকে দেখে সেই তাহাকে উৎসাহের সঙ্গে সংবাদটা দেয়, যেন সে-ই বাঘটা মারিয়াছে। মেয়েরা ত সমস্ত দিনের পর বাহিরে আসিয়া আলোয় মুখ দেখিয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন কচি-কাচা ছেলে-মেয়ে লইয়া দুরু দুরু বক্ষে ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ছেলেদের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে কেহ একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই।

অপরাহ্ণ বেলায় একখানি মহিষের গাড়ীতে বাঘের মৃতদেহ লইয়া লোকে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হইল। ছেলেরা মরা বাঘের উপর অকারণেই মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে-জন্তুটা এত লোককে জখম করিয়াছে এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সমস্তদিন একপ্রকার অনাহারে রাখিয়াছে তাহার প্রতি ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। মরার পর জানা গেল, বাঘটার বসন্ত হইয়াছিল। সেইজন্য সে বেশ কাবু হইয়াছিল। নহিলে তো গ্রামে আর লোক রাখিত না। তাহাকে যে এখন সকলে খোঁচা দিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

— মহান্তদের গোয়াল হইতে মিছিল বেণে-পাড়ার ভিতর দিয়া ঠাকুরপাড়ায় পৌঁছিল। প্রথমে হরিহর ঠাকুরের বাড়ী, তার পরেই চাটুয্যেবাড়ী। বাঘের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যেগিন্নী একটা ঘটি হাতে করিয়া আসিয়া একবার সান্ধ্য-নেত্রে বাঘটার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—কার শাপে এসেছিলি বাবা! বাঘ তো নোস্, বাঘ হয়ে ছলতে এসেছিলি! আমি যে তোকে দেখেই চিনেছি!

চাটুয্যেগিন্নী ঘটির জল দিয়া বাঘের চারিটি পা ধুইয়া দিয়া পথের উপরেই গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী এমনি মজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চাটুয্যেগিন্নীর কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনিও ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া বাঘের চরণ প্রক্ষালন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পুত্রকন্যার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

এক মুহূর্ত্তে বাঘ দেবতা হইয়া গেল। কাহার শাপে তিনি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছেন, কেনই বা এই গ্রামের নিরীহ বাঙ্গালী সন্তানকে এতক্ষণ ধরিয়া ছলনা করিলেন এবং চাটুয্যেগিন্নীইবা শকটারূঢ় মৃত ব্যাঘ্রদেহ দেখিয়া কি চিনিলেন এ সকল বিষয়ে চাটুয্যেগিন্নীকে কেহ কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও প্রয়োজন বোধ করিল না। যে পথে বাঘ যায় তাহার দু-পাশে কাতার দিয়া মেয়েরা আসিয়া দাঁড়ায় এবং বিসর্জ্জনের প্রতিমাকে যেমন মহা ভক্তিভরে গলবস্ত্রলোচনে বিদায় দেয়, তেমনি করিয়া বিদায় দিতে লাগিল। বাঘের বড় বড় থাবা সধবা মেয়ের দেওয়া সিন্দূরে রাঙা হইয়া উঠিল।

যে কয়টা ছোঁড়া এতক্ষণ খোঁচা দিতেছিল, বড়দের তাড়া খাইয়া তাহারা পিছনে হটিয়া গেল এবং বড়দের মুখ দেখিয়া মনে হইল, বাঘটাকে চালচিত্র দিয়া ঘিরিয়া প্রতিমার মতো সাজাইয়া লইয়া যাইবার উপায় থাকিলে তাহারা কাঁধে করিয়াই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত।

আর এক দিক

জোলটেয়ারের বয়স যখন যাট চল্লিশ, তখন তিনি লোকের লক্ষ টাকার অধিকারী। এ টাকা তিনি বই লিখিয়া উপার্জ্জন করেন নাই। ইয়াঙ্কি অধিকাংশই তিনি লটারী ব্যবসায়ে সংগ্রহ করেন। জোলটেয়ার বাছিয়া বাছিয়া বড়লোকের ছেলেকে টাকা ধার দিতেন। চুক্তি এই যে, যতদিন জোলটেয়ার বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন শতকরা দশটাকা বাৎসরিক সুদ দিতে হইবে, আসলের এক টাকাও শোধ করিতে হইবে না এবং জোলটেয়ারের মৃত্যুর পর আর যার শোধের কোন কথাই উঠিবে না।

জোলটেয়ার দেখিতে যমদূতের মত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাছে টাকা ধার করিবার জন্য লোকের ভীড় পড়িয়া লইত। শোনা যায়, যদি কেহ একটু ইতস্ততঃ করিত, জোলটেয়ার অমনি খুক্ খুক্ করিয়া এমন কাশিতেন যে সে-কাশীর দমকে তিনমাসের মধ্যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইত।

আলোচনা

লেখার রূপ

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র সরকার তাঁর "বাঙলা টাইপ ও কেস" [পত্র ১৩৩৩ সনের পৌষ ও মাঘের প্রবাসী দ্রষ্টব্য] নামক প্রবন্ধটি দ্বারা দেশের সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন, রাজশেখর বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রবন্ধপাঠে জানা গেল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে একটা মীমাংসায়োপনে উৎসাহী হয়েছেন। এ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক ও লেখক মাত্রেই আগ্রহ অনুভব করবেন সন্দেহ নেই; কারণ, আমাদের শৈশব থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙলা বলেন ও ভাষার বাজারে বিকে আমরা যে কী দুর্ভোগ ভুগে আসছি তার আর সীমা নেই। সুতরাং আমাদের ভাষাতত্ত্ব, বানান-সমস্যা এবং অক্ষর-বিভীষিকা নিয়ে এখন সাহিত্যালোচনার মধ্যে কিছু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতেও পূর্বোক্ত সাহিত্যাচার্যগণের অনুসরণ করে দু' একটি প্রস্তাব করতে চাই; কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে মাঝে মাঝে দু' একটে প্রচলিত সংশোধন করা বর্তমান ছাপাখানা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎভাবে কোনো অভিজ্ঞতা নেই; কাজেই হয়ত আমার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সকল দিকে উপযোগী না হতেও পারে।

প্রথমে "বাঙলা" শব্দটিকেই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ লেখেন "বাংলা"; কিন্তু শরৎচন্দ্র লেখেন "বাঙলা" তা ছাড়া "বাঙ্গালা", "বাঙ্গলা"ও কেউ কেউ লিখে থাকেন। এবিষয়ে কোনো একটি নিদেশ জারিকে পাকাপাকি রূপে গ্রহণ করে অন্যগুলো বর্জন করা সম্ভব নয় কি? বিদ্যানিধি মহাশয় একবার "বাঙলা"র বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে, ও বানানের ধ্বনি হচ্ছে "উয়া"—"ং" নয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ সেন তার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন যে ওকারের ধ্বনি 'ং'এর মতো। আমাদের কিন্তু মনে হয় এ উচ্চারণ কথাই নয়। প্রাচীন পুঁথিতে "দুআর" শব্দের বানান দেখতে পাই, সেখানে "দুঁয়ার" উচ্চারণ করে থাকি—"দুয়ার" বলিনে, আমরা "অন্ধ" ও "পদ্ম" প্রভৃতিকে "অংক" ও "পংদ"এর ন্যায় উচ্চারণ করে থাকি। তারপর "বাংলা" ও "বাঙালীতে" যে প্রকৃতি-বৈষম্য তার সম্বন্ধেও বোধ হয় দুজনার নয়। "বাঙলা" ও "বাঙালী" বানান আজ থেকে তাদের ছোটোগুলো একটু মার্জিত করে নিলে দোষ কী? "বাঙলা" ও "বাঙালী" রূপ গ্রহণ করলে মোট হয় টাইপের দিক দিয়েও অনেক সুবিধা হয়। আমার বন্ধুরা বলে থাকে, রেমিংটনের বাঙলা টাইপরাইটারে এ রূপ বানানই প্রচলিত হয়েছে। তবে যদি 'ং'কারের দাবী একেবারেই অগ্রাহ্য হয়, তা হ'লে "বাঙলা" ও "বাঙালী" লেখার আপত্তির কারণ দেখি নে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ের পরে যখন অক্ষরবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ অর্থাৎ ফলা শিখতে সুরু করি তখনকার কথা স্মরণ করলে আরও হাস্যকর উপস্থিত হয়: গুরু মহাশয়ের হাতের ঘূর্ণিত লোচন, ঘন ঘন বেত্রাস্ফালন এবং সর্বোপরি বর্ণমালার বিভীষিকাময়ী আকৃতিবিশেষ কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা শৈশবের সুকুমার মনটি যে কীরূপ নিষ্পীড়িত হয় তা কারো অজ্ঞাত নেই। ককারের সঙ্গে উকারের সংযোগে ক্+উ=কু+্='কু' হয়; কিন্তু ককারের সঙ্গে ঊকারের সংযোগে কূ+া হ'য়ে কেন যে 'কূ' হয় তা নব-বিদ্যার্থীর কল্পনার বাইরে। যে রূপ ক্র, ক্ল, ক্ত ও ক্ষ প্রভৃতি অক্ষরে বিদ্যার্থীকুলের পরিচয় দায় কি!

'ফলা'এর ব্যবহারও অনুরূপ—ক্+র (_ (=র,[1] ক্+ব=ক্ব, ক্+ষ=ক্ষ, গ্+ব=গ্ব, ন্+ব=ন্ব, ক্+ত=ক্ত, ক্+ক=ক্ক, ট্+ট=ট্ট, গ্+ধ=গ্ধ, ক্+ষ=ক্ষ। কিন্তু আমাদের ছেলেরা সব "খোপাল", তারা যা পায় তাই পড়ে ও লেখে; তা না হলে এগুলিকে ছাপাখানার সংজ্ঞায় হয়ে যেত, এবং প্রথম শিক্ষার্থীদের অনেক সময় ও উৎসাহ অযথা নষ্ট হতো না।

বিদ্যানিধি মহাশয় এবিষয়ে অধিক যাবত অগ্রসর হোন বলে আমরা বলি—কোনো সাহিত্যিকই তাঁকে এতটুকু সাহায্য করেন নি। আজকালকার ইংরেজী mail কে মেইল, train কে ট্রেইন, statesman কে স্টেট্‌সম্যান লিখে ultra-modern হচ্ছেন, কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথাকেতা "বলাবাহুল্যে" নতুন রূপ প্রচলন করে ওপনা দেখান না কেন?

যুক্তবর্ণের আকারবৈষম্যজনিত এক বিরাটের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না। আমাকে দু'বার দু'জন সাহেবকে বাঙলা শেখাতে হয়েছিল: একদিন আমার সে ছাত্রদের একজন একখানা Bengali to English অভিধান নিয়ে পড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে "মত কথা"র ইংরেজী কি? উত্তরে তাঁকে বললাম যে, বাঙলাতে ওরকম কোনো শব্দ বা কথা নেই। সাহেব উচ্চহাস্য করে টেবিল চাপড়ে বললেন, "Oh you don't know your own language! It is 'intoxicate'. আমি যখন তাঁকে বললেম যে ওটা "মত করা" নয় "মত্ত করা", তখন সাহেব মহা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "How can that be? It is 'ত'। এর পরে বাধ্য হয়ে তাঁকে বোঝাতে হলো যে "ত having a bar over it is equal to two ত"।

'ন্' এর নীচে 'ত' থাকলে তার উচ্চারণ হলো ন্+ত+উ, অর্থাৎ ক্+ত এর বেলায় সেই 'ত' হলো শুধু 'ত'এর প্রতিরূপ; আবার 'ক'এর বেলায় যে চিহ্নটি 'ক'এর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে 'র'এর বেলায় সেটিই 'র'এর লোপ দিচ্ছে। একারের উপর ওকারের একটা দাগ টেনে দিলেই হয়ে পড়লো ত্+া=ত্র এবং তাতে একটা উকার(ু) জুড়ে দিলে হয় ত্রু।

একেবারে কলে দিয়ে দাঁড়ালো 'ক্র' যেটা একটু অবস্থানবিচারেই 'ক'এর সঙ্গে ভুল হয়ে যেতে পারে। এরকম অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এসকল ব্যাপার পরিষার করা, পাঠক, লেখক এবং মুদ্রাকর সকলের পক্ষেই দরকার।

বাঙলা টাইপগুলোকে একেবারে ঢেলাই করা আবশ্যক বলে যে-সকল বর্ণগুলোকে একটার পাশে আর একটি জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এ রীতি রোমান টাইপফাউণ্ডারিতে কিছুটা প্রচলন আছে। আমাদের সাহিত্যাচার্যগণ স্থানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে একটি সংশোধিত—সর্বজনবোধ্য ও সর্বসম্মত আকার প্রচলন করতে পারেন।

অকারান্ত শব্দের পরে আমার অকারের অস্তিত্বজ্ঞাপক চিহ্ন বসানো "নিষ্প্রয়োজনে কলম টেনে বিষ বাড়ানো" মতোই পণ্ডশ্রম; তবে ধ্বনিবিশেষে ওকার (ো) লেখা করলে সমস্যা বোধগম্য হতে পারে, যেমন "কাল করো লাল দেখেছিলেম।" এসব চিহ্ন এবং অবশ্যের ।, ্,), ্ , ্ , প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত খণ্ডিত টাইপের বদলে সে চিহ্নগুলোকে পৃথকভাবে তৈরি করে অক্ষর বর্ণের সঙ্গে জুড়ে দিলে অনেকটা সুবিধে হয়। আজকাল প্রায়ই সর্বত্রই retrenchment চলছে; সে অবস্থায় বাঙালা ছাপায় ই'টো । । (আকার) রাখা বরঞ্চ যায়। ্ (একার) লোপ করা বিষয়ে বিদ্যাবিধি মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। "অমর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ক্রীত' (কৃত) 'ভারতের ইতিহাস' আনা ক্রীত (কেনা) হলেও" লিখলে অর্থবোধ হবে কি? কৃ+ক্ত—'কৃত' না হ'য়ে 'ক্রিত' হলেও অভিপ্রেত হবে না; যেমন কৃ+ক্ত—'কৃত' না হ'য়ে 'ক্রিত' হলেও অভিপ্রেত হবে না। ই'টো (ে একার) রাখা সম্বন্ধেও নানা যুক্তির নানা মত চলছে। বিশেষতঃ ছাপাখানায় ও ই'টো বিষে নানাপ্রকার গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেখানে ইংরেজী 'lamb' শব্দের মতো 'ম' ধ্বনি বোঝানো দরকার, সেখানে একার (ে)এর উপরে একটি ফুটকি (˙) ব্যবহার করা চলতে পারে। 'গাসিড' না লিখে 'এ'সিড' লিখলে 'এসেড্'এর সঙ্গে ধ্বনি-পার্থক্য বোঝানো সম্ভব হবে। আর ছাপাখানার দিক দিয়েও বোধ হয় কোনো অসুবিধা হবে না।

'করিয়া' স্থলে 'ক'রে', 'কোরে' লেখার জন্যে বিদ্যাবিধি মহাশয় একটু বক্রোক্তি করেছেন। তিনি 'করে' প্রচলন করতে চান, আমরা কিন্তু 'করে' চাইতে 'কোরে'ই পছন্দ করি। 'র'এর সঙ্গে কোনো 'ওলা'এর ঠিক ধ্বনি সম্যক পরিস্ফুটিত হয় কি?

'ম' 'ওলা'টা 'ম্' অর্থাৎ 'হল্' হ'লে বেশ পরিষার হয়। সকল অনুবাসিক বর্ণের সংযোগ সংস্কৃত অনুসারের (˙) দ্বারা দিয়ে শুরু করা সঙ্গত বলে মনে হয় না; কারণ, তার ফলে এ বিষয়ে একমাত্র 'পণ্ডিত' লোক ব্যতীত অন্য কারো 'অক্ষরস্ফূর্তি' করার কোনো উপায় থাকবে না। ং'এর পরিবর্তে 'ঙ্,' চালালে টাইপের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

ইংরেজীশব্দের বাঙালা রূপান্তরের একটা সর্বজনসম্মত নিয়ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'পট ও 'ইস্ট্রেট' বিষয়ে সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে জানা গেল। এ রকম বিলাতি ইংরেজ্যালিত 'কমুনিক' (কমিউনিক) থেকে সুরু করে ঘরাওয়ালা পালিত 'য়ুনিভার্সিপালিটি' (মিউনিসিপালিটি), এমন কি আমাদের 'য়ুনিভর্স' 'ইন্‌ষ্টিট্যুট'এর বেলা বিদেশে 'য়ুনি' ও 'ইন্‌য়ুট'এর কোনটি বর্জনীয়? 'পাল্লিস' ও 'পাল্লি'এর কোনটি যে ভালো আ 'ডুইং' অথবা 'ডাক্তর' প্রয়োগতন্ত্র বাঙালি 'ডক্টর-অ-লেজর' হয়েছে বলতে পারেন?

উপসংহারে সাহিত্যাচার্যদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, কবিগুরুর অবিসংবাদকল্পে এক সুদৃঢ় পরামর্শসূত্রক আবোল-তাবোল একটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে বহু পরামর্শবিদ গঠন করে তাঁরা সত্বর এই সংস্কারকার্যে ব্রতী হোন। দৈনিক সাপ্তাহিকপত্রগুলোর মত সাময়িকপত্রগুলোও এক বিশেষ বিভাগে সর্বদা এবিষয়ে আলোচনা ও নানাপ্রকার প্রস্তাব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করুন এবং বাঙালা ভাষানুরাগী মাত্রেই এ বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ মত ব্যক্ত করে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির এক সর্বজনগ্রাহ্য সরল ও সহজ মীমাংসার পথ উন্মুক্ত করুন।

—শ্রীকপিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলার পরিচিত পাখী বুলবুল

গত আষাঢ় সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গত কার্তিক মাসে শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে তাঁহার বক্তব্য বিবৃত করিয়া আমাকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহা বোধ হয় বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপাধিভূষিত, পক্ষিবিজ্ঞান-পটু, প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ। যদি তাহাই হয় তবে ইহা আমার পক্ষে লাঘার বিষয় যে, আমার মত সামান্য ও অখ্যাত লেখকের লেখা লইয়া এত বড় পণ্ডিত লোকও মাথা ঘামাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আমার প্রবন্ধ পণ্ডিতী প্রবন্ধ ছিল না। অভিধেয়ক পাঠকের জন্য লেখা প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-মূলক পরিভাষা আমি বর্জন করিয়াছি এবং সাধারণের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অনেক কথার অবতারণাই করি নাই। যে জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে Pycnonotidæ, Falconidæ Turdidæ, Timaliidæ, Microtarsus প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বিরাগ অসঙ্গত হইত।

আমি লিখিয়াছিলাম—"বুলবুলের মত এত বৃহৎ পক্ষী সম্প্রদায় আর জগতে নাই। বিভিন্ন প্রকারের বুলবুলের সংখ্যা হবে তিনায় ছত্রিশের।" ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনও প্রকার অপলাপ হয় নাই।

পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে একেন্দ্রবাবু আলোচনা করিতে যাইয়া Fauna of British India, Bird Volumes-এর দোহাই দিয়া লিখিতেছেন:—"Pycnonotidæ 'বংশ' মধ্যে ১৯টি 'জাতে' বিভক্ত ৮৫ "জাতির" পাখী আছে। "অন্তর্ভাতি" ধরিলে সংখ্যা মোট ৯০ হয়।"

আমি যাঁহাদের জন্য লিখিয়াছিলাম তাঁহারা অনেকেই "বংশ" "জাত," "জাতি" ইত্যাদি শব্দের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অর্থ জানা বাহুল্য। তাঁহাদের অর্থ

না বুঝাইয়া শুধুমাত্র প্রয়োগ আমার প্রবন্ধে অচল বলিয়াই ওগুলি বর্জন করিয়াছি। এবং "সম্প্রদায়," "প্রকার" এই অবৈজ্ঞানিক শব্দ দ্বারা আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার পাঠকদের কোনও অসুবিধা হইবার কথা নয়।

একেন্দ্রবাবু "Fauna of British India, Bird volumes... ...খানা কিনে করা যাইত" বলিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের দুইটি সংস্করণ হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ Oates ও Blanford কর্তৃক বিভিন্ন খণ্ডে সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে সমস্ত খণ্ডই Stuart Baker সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত। তাহাতে তিনি পূর্বতন সম্পাদকদের অনেক কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু এমন কথা আজ পর্যন্ত কেহ বলেন নাই যে Oates যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং আমার ও একেন্দ্রবাবুর নিকট এই দুই সংস্করণই সমাদরের প্রয়োগ, কতকগুলি ক্ষেত্রে বরঞ্চ পূর্বতন সংস্করণ।

Oates সাহেব বুলবুল পাখীকে বৃহৎ Timaliidæ family'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই family'র মত এত বড় পাখীর family নাই আমাই বুঝাইতে আমি "সম্প্রদায়" শব্দ যদি প্রয়োগ করিয়া থাকি তবে একেন্দ্রবাবু একথা বলিতে পারেন না যে—"লেখকের উক্তি প্রমাণক ও বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না।" যদি প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্যই প্রবন্ধ লেখা হইত তবে Stuart Bakerএর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি কোন্ কোন্ কারণে বুলবুলকে Timaliidæ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া Pycnonotidæ নামে একটি নূতন family'র রচনা করিলেন তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন হইত। সে ক্ষেত্রে আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলিত অবহিত হইতাম এবং "বংশ," "বর্গ," "জাতি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতাম।

কিন্তু "অন্তর্জাতি" শব্দটির প্রয়োগ করিতাম না।

"অন্তর্জাতি" শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ একেন্দ্রবাবু দেন নাই। আমরা ধরিয়া লইলাম যে তিনি "sub-species" অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ডারউইনপ্রমুখ বহু প্রকৃতি পক্ষি-বিজ্ঞানের পূর্বতন লেখকগণ sub-species অর্থে "উপজাতি" ব্যবহার করিতেন। "প্রকৃতি" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ও তাহাই করিতেন। Scientific nomenclatureএর যে রীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে, সে অনুসারে "উপজাতি" শব্দটিকে বর্জন করিবার কারণ বাংলায় ঘটে নাই। যতদিন তাহা না ঘটিতেছে ততদিন ইহার পরিবর্তে অন্য শব্দের প্রবর্তন করিবার অধিকার কাহারও নাই।

একেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"চালচলনে বাচনভঙ্গীর কথা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়াই গিয়াছে। পক্ষিবিজ্ঞানে ইহা স্থান পায় না।" আমি বুলবুলের সম্বন্ধে ঐ কথা বলি নাই, বলিয়াছি লেজের সম্বন্ধে (প্রবাসী ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৭১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) একেন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধটি সাধারণ দৃষ্টিতেও পড়েন নাই দেখিতেছি।

বুলবুলের মাথার ঝুঁটি থাকে এই কথাটি লইয়া একেন্দ্রবাবু এক বৈজ্ঞানিক বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া লিখিতেছেন—"উদ্ধৃতির বাকি তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের স্কন্ধে না লইয়া মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের স্কন্ধেই চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার কখনই এ কথা এরূপ ভাবে বলেন নাই।" তৎপরেই ষ্টুয়ার্ট বেকারের গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছেন। Pycnonotidæ বা বুলবুলের সম্বন্ধে Mr. Stuart Baker এইরূপ লিখিয়াছেন :—"The two principal features by which the Pycnonotidæ can be distinguished from the Timaliidæ are the comparatively short tarsus and the presence of some hairs which grow from the nape. These hairs are often long, fairly numerous and conspicuous, sometimes short, few and inconspicuous but never entirely absent. It is this latter character which separates them from the Timaliidæ—" একেন্দ্রবাবু Mr. Stuart Bakerএর প্রথম ও শেষ বাক্যটি বাদ দিয়া মাঝখান হইতে খানিকটা উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিতেছেন যে, বুলবুলের ঝুঁটি হইলেই এ কথা বলিলে—"ষ্টুয়ার্টবেকারের এমন একটি বিচিত্র উক্তি যাহা পক্ষিবিজ্ঞান কখনই অনুমোদন করে না।"

এতদ্বারা মনে হয় যে একেন্দ্রবাবু কখনই Stuart Bakerএর গ্রন্থ পড়েন নাই। Stuart Baker Pycnonotidæ কে Timaliidæ হইতে পৃথক করিবার কারণ দর্শাইতে গিয়া লিখিতেছেন যে Pycnonotidæর দুইটি বৈশিষ্ট্য বা principal features আছে,—(১) Short tarsi, (২) The presence of some hairs that grow from the nape, বাংলা ভাষায় ঝুঁটি। এই ঝাড়ের লোম হ্রস্ব হইতে পারে (short), অনেক সময় চক্ষুদ্বারা পরিদৃশ্যমান না হইতে পারে (inconspicuous), but never entirely absent. First Edition of Airfauna গ্রন্থে Oates সাহেব লিখিয়াছিলেন—"The Bulbuls may be further recognised by the presence of some hairs springing from the nape. These hairs are frequently long, sometimes short and inconspicuous but never, *I think* entirely absent (p. 252-53)." Oates সাহেবের একটু সন্দেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় লিখিয়াছেন, "never, I think, entirely absent." Stuart Baker সাহেব "I think" বাক্যটি তুলিয়া দিয়া জোরের সঙ্গে লিখিলেন—"but never entirely absent." Timaliidæ অপেক্ষা Pycnonotidæর হ্রস্বতর tarsiও ইহাদের সম্পূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক নহে, কেননা chloropsis, aegithina প্রভৃতি genusএর tarsi হ্রস্ব হয়। তাই বুলবুলের ঝুঁটির সম্বন্ধে লিখিলেন—"It is this latter character which separates them from the Timaliidæ," এবং তৎপরে অন্য পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—তাহার আলোচনা এখানে অবান্তর। সুতরাং "এদের সকলেরই মস্তকের লোমগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ" লিখিয়া আমি বিজ্ঞানের কথাই প্রচার করিয়াছি।

বুলবুলের ঝুঁটি-প্রসঙ্গের অর্থ্য কথা সম্বন্ধেও একেন্দ্রবাবুর বক্তব্যগুলি একই প্রকারের। যে 'বাংলার পরিচিত বুলবুল' সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছি সে সম্বন্ধে Oates বলিয়াছিলেন—"All the birds of this genus (Molpastes) are remarkable for the bright colour of the undertail coverts." (p. 267). Stuart Baker সাহেবের ত্রুটি আমি বর্জিত চেষ্টা করি নাই; কেন না Stuart Baker স্বয়ং বলিতেছেন—"It would be difficult to improve on Oates' key to the genera of Bulbuls which is given below practically unaltered." একেন্দ্রবাবুকে Oates ও Stuart Baker-এর বহিগুলি ভাল করিয়া পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

খিড়কীর ঘাট
শিল্পী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

অমরু-শতক

—শ্রীভবিভূতি বিদ্যাভূষণ

অবতরণিকা

অমরু-শতকের বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বে কেহ করিয়াছিলেন কি না জানি না। এই অনুবাদ দর্শনে শ্লীল-রুচি পাঠকগণ হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে—সংস্কৃত সাহিত্যিক মহলে যে কবিতার বিশেষ আদর পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—রবিচন্দ্র, আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতগণ যে কবিতার বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন,—বঙ্গভাষার মত সমৃদ্ধ ভাষায় তাহার অনুবাদ না থাকা সমীচীন নহে। কলা ও বিজ্ঞানের সকল অঙ্গের অসঙ্কোচ বিকাশ যতটা যে সাহিত্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সাহিত্য ততটা সমৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই আমাদের এই উদ্যম।

বর্ত্তমান যুগে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা হেতু—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তুল্য-আদর আমাদের সামাজিকগণ করিতে ভুলিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সমষ্টির নাম ত্রিবর্গ। এই তিনের তুলারূপ যুগপৎ-সেবা আমাদের সমাজান্তর্গত গৃহিমাত্রেরই জীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে কোনটিই সাংসারিকের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নহে। ইহার যথো একটিকে বাদ দিয়া অপর দুয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা গার্হস্থ্য-জীবনের অনিষ্টই হইয়া থাকে। মহাভারতে এ বিষয়ে বহু উপদেশের বিবৃতি আছে। সে সমস্তগুলির বিশদ আলোচনা করিবার এ ক্ষেত্র নহে। এস্থানে—এ প্রসঙ্গে মহাভারতের বাণী দু'একটি উদ্ধৃত করিব মাত্র। নানাশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন—(আদিপঃ, ১৭০ অঃ ৬৯-৭০ শ্লোক)—'ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গে ত্রিবিধ পীড়া বিদ্যমান,—যথা ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্তনিরত ব্যক্তি অর্থহানি ও কামভোগে অসুবিধা হেতু পীড়া বা কষ্ট পাইয়া থাকে। অর্থার্জ্জনে একান্ত নিরত ব্যক্তি ধর্ম্মহানি ও কামভোগের অভাবহেতু কষ্ট পায় অর্থাৎ এই দুয়ের সেবা রীতিমত না হওয়ায় ধর্ম্ম ও কামে বঞ্চিত হয়, আবার কামাচারে অত্যন্ত প্রসক্ত ব্যক্তির যতই—ধর্ম্ম ও অর্থহানি ঘটে।'—এই হেতু এই তিনের সমন্বয় করিয়া একযোগে অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রের উপদেশ।

দেশ যখন স্বাধীন ছিল,—তখন সুধী সামাজিকগণ এই তিনের তুলারূপেই অনুশীলন করিতেন। কাম বা শৃঙ্গার বিষয়ক সাহিত্য (erotic literature) তাঁহাদের নিকট অনাদর প্রাপ্ত হইত না। বর্ত্তমান যুগকর্ণিগণের মত তাঁহারা ঐরূপ সাহিত্যের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন না। সুরসিক সামাজিকগণের মজলিসে ঐরূপ কবিতার সমালোচনায় হাসির ফোয়ারা উত্থিত,—বিশুদ্ধ-আনন্দ বলিয়া তাঁহারা ঐগুলি উপভোগ করিতেন। এই অমরু-শতক খানিও তাই বিদ্বৎ-সমাজে পরম আদর লাভ করিয়াছিল। এই শতক-গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার* ভোজরাজ-বংশ-তিলক অর্জ্জুনবর্ম্মদেব—স্বীয় টীকার মুখবন্ধে অমরু-শতকের প্রশস্তি এবং তৎকালে ইহার সুধীসমাজে সমাদর নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—

অমরুক-কবির্-অমরুক-বাদ্যে ধ্বনিরুদ্ভূত ন লক্ষ্যতে।
শৃঙ্গারভণিতিব্যগ্রা যত্রান্যে কবয়ো জনাঃ।

অর্থাৎ যেমন ডমরু-নিনাদের নিকট অপর বাদ্যের ধ্বনি নিষ্ফল হয় বা ঢাকা পড়ে, তেমনই অমরুক-কবির কবিতার নিকট,—অপর কবিগণের শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা সমূহ চাপা পড়িয়াছে বা হার মানিয়াছে।

কবির পরিচয়

শতক-গ্রন্থের রচয়িতা অমরু বা অমরুক এই উভয় নামেই পরিচিত ছিলেন। কোনও টীকাকার তাঁহাকে স্বর্ণকার-বংশ জাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

* আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র কলিকাতা অবাণীনিকেতনের প্রসিদ্ধ শীল-বংশের গৌরব, বিদ্যোৎসাহী ও স্বয়ং বিদ্যানুশীলনপরায়ণ প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র শীল মহোদয়ের অনুরোধে এই উদ্যম। ভবি. বি. বি।

* এই টীকার নাম রসিকসঞ্জীবনী। টীকাকার নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

কিঞ্চাত্মতঃ সুকৃতৈকরসপ্রসূনৈ
র্যত্নেন যঃ কলিত ভোজকুলপ্রশস্তিঃ।
প্রজ্ঞানিবাসবরকক্ষকৃতঃ প্রসাদঃ।
শ্রোকাহতং বিবুধৈরর্জ্জুনবর্ম্মদেবঃ।

অনুবাদ—'ধর্ম্মকুলকথা'তে—এই কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

"কিন্তু প্রবাদ-প্রসিদ্ধি অনুসারে বিজয়ী বিদ্বান্।"*

আমার কোন কোন টীকাকার এই শতকখানিকে শঙ্করাচার্য্যের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কিম্বদন্তী এই যে—শঙ্করাচার্য্য নাস্তিক-মত-নিরসনার্থ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন। † তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান মণ্ডনমিশ্রের সহিত তিনি বিচারার্থী হইলে, তদীয় স্ত্রী সরস্বতীদেবী স্বামীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং বিচারে অগ্রসর হন, এবং পূর্ব্বপক্ষ করিয়া কামশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী আচার্য্যদেব পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া কিছু সময় চাহিয়া লইয়া তৎকালের মত বিদায় লইলেন।

চিন্তাবিষ্ট হইয়া একটি বৃক্ষতলে তিনি উপবিষ্ট আছেন, —এমন সময় তথায় মৃত অমরু নামক রাজার শবদেহ তদীয় পরিজনগণ মহাসমারোহে বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে তথায় বৃক্ষচ্ছায়ায় নামাইল। শঙ্করাচার্য্য সুবিধা বুঝিয়া যোগবলে মৃত রাজার শবদেহে প্রবেশ করিলেন। মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত হইল—দেখিয়া রাজার পরিজনগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রাজধানীতে তাঁহাকে লইয়া গেল। প্রাসাদে মহিষীগণ মাঙ্গলিকধ্বনিতে পুনরুজ্জীবিত নৃপতিকে অভ্যর্থিত করিলেন। রাজা মনোরম হইতে প্রত্যাগত মনে করিয়া উৎসব, আনন্দ এবং যথেচ্ছবিহার ও বিলাসভোগসুখে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। প্রমদাগণের সহিত অবিরত রতি-সম্ভোগে মুনি শঙ্কর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।:

এইরূপ কামশাস্ত্রে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ঐ তত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পরে নৃপতিদেহ যোগবলে পরিত্যাগ করতঃ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত স্ব-শরীরে প্রবেশ করিয়া মণ্ডন-মিশ্রের পত্নীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া পরাজয় হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

এইরূপে শৃঙ্গার-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তদ্বিষয়ক তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। * মৃত অমরু রাজার দেহ আশ্রয় করিয়া শৃঙ্গারবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করত ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া—উহা 'অমরু-শতক' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু এই কিম্বদন্তী কতদূর সত্য তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই বলিব না।

মূল ও অনুবাদ

[১]

জ্যাকৃষ্টি-বদ্ধ-খটকামুখপাণিপৃষ্ঠ
প্রেঙ্খন্নখাংশুচয়সংবলিতোঽম্বিকায়াঃ।
বাং পাতু মঞ্জরিতপল্লবকর্ণপূর-
লোভভ্রমদ্‌ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ কটাক্ষঃ।

দেবী অম্বিকা ধনুকের জ্যা চারিটি আঙুলে † ধরিয়া কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। আঙুল কয়টি হইতে নখের প্রভা নির্গত হইতেছে। মঞ্জরিত নবকিসলয় তাঁহার কর্ণভূষণ রূপে শোভা পাইতেছে। ঐ কিসলয়মঞ্জরীর উপর ভ্রমর-কৃষ্ণ চটুল চক্ষুর কটাক্ষ নিপতিত হইয়া ভ্রমরের শোভা ধারণ করিয়াছে। নবপ্রভাসমন্বিত তাঁহার সেই কটাক্ষ তোমাকে রক্ষা করুক।'

---

* পিটার্সন্ সুভাষিতাবলী ২ পৃষ্ঠা।

† 'প্রবিলয়' তাঁহার টীকার প্রারম্ভে ইহা বর্ণিত করিয়াছেন।

: মাধবাচার্য্য বিরচিত 'শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

অথাসিত-কলাকলাপকলিকা মনোজবিদ্যোতিত-
প্রকাশবিকচোৎপলাঃ সরসপুষ্পতোরাঃ।
কুচস্তনতটোল্লসৎকনকচুম্বি হারোজ্জ্বলা
বিমুক্তমণিরঞ্জনাঃ বিরলনিদ্রমন্দ্রাঃ।

* শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়কার মাধবাচার্য্যের বর্ণনা দেখুন—

যাংস্তাংশ্চক্রে প্রবিতরয়ন্ কালে
তত্তদ্ভাবাদ্ভুত নিটোলা সদ্মক।
স্বং স্বকৃত্যাভিনবার্থসর্গং
নিস্তন্দেকং নৃপকলেবরাৎ।

† ধনুর্বেদে তর্জ্জনীমধ্যমা, অনুষ্ঠ ও অনামিকা—এই চারিটি অঙ্গুলি দ্বারা বাণের পক্ষাগ্রভাগ ধারণ করিবার জন্য অঙ্গুলি চতুষ্টয় বিশেষকে 'খটকামুখ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা,

"তর্জ্জনী মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ পুঙ্খাগ্রগ্রহণে পটুঃ।
অঙ্গুলিত্রয়সংযোগঃ স হস্তঃ 'খটকামুখঃ'॥"

১। কটাক্ষ আবার সাদা, কালো—দু'রকম আছে। (১) 'সাদা' কটাক্ষের বর্ণনা শুনুন—'যত্রঃ কোঽপি মুখে ন যত্র নয়নে ব্যাপারিতঃ সাধ্বসাৎ মুগ্ধে মুগ্ধতয়াভিষেকনয়নপ্রধ্বংসিনঃ কটাক্ষচ্ছটাঃ।' অর্থাৎ হে মুগ্ধে, কোন্ ভাগ্যবান মুগ্ধক সে, যাহার মুখে ঔষধসূত্রের ন্যায় তোমার কটাক্ষচ্ছটা নিপতিত হইয়াছে? এই সাদা কটাক্ষ সরলতার প্রকৃষ্ট প্রেম বা স্নেহের নিদর্শন। স্নেহে কবি কবিকুলগুরু রামের প্রতি সীতার প্রেমবিহ্বল নয়ন-দৃষ্টি একস্থলে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—'রূপমিতি হৃদয়েন স্নেহমিশ্রেণি তে বদনং নয়নাভ্যাং মুগ্ধা দুগুদয়েন দৃষ্টিঃ'! (২) আবার কালো কটাক্ষের কথা শুনুন—'যত্র কালো ন যত্র প্রথমিনি ধবি স্নেহপূর্ণিমা কটাক্ষঃ কালিন্দীলহরিস্থিতিঃ প্রভবতি। ইন্দীবরাক্ষঃ অমৃতকবলীপুঞ্জকান্তিঃ মনো-মুগ্ধিকরং কিং বদেয়িনি মুখের কণাসি।

[২]

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতে'
ঽপ্যাদত্তানোংশুকান্তম্।
গৃহ্ণন্ কেশেষপাস্তশ্চরণনিপতিতো
নেক্ষিতঃ সংভ্রমেণ।
আলিঙ্গন্নোঽবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ
সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ।
কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু দুরিতং
শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ॥

নায়ক অপর প্রেয়সীর সম্ভোগজনিত অপরাধ করিয়া নায়িকার নিকট গিয়াছেন। তখনও চিহ্নগুলি মিলায় নাই। মানিনী নায়িকা তাহা লক্ষ্য করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। নায়ক হাত ধরিতে যাইতেছেন,—নায়িকা জোরে হাত ছিনাইয়া লইতেছেন, নায়ক আঁচল ধরিতেছেন,—নায়িকা সজোরে নিক্ষেপ করিতেছেন, নায়ক কেশপাশ ধরিয়া সোহাগ করিতে যাইতেছেন—নায়িকা 'যাও, যাও'—বলিয়া ভর্ৎসনা সহকারে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন,—নায়ক চরণে পতিত হইয়া মান ভাঙিতে যাইতেছেন, নায়িকা একবার চক্ষু চাহিয়াও দেখিতেছেন না, নায়ক আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, নায়িকা অশ্রুসিক্ত নয়নে বিরক্তির সহিত সরাইয়া দিতেছেন। ত্রিপুর-দহনকালে ত্রিপুরকামিনীগণ কর্তৃক ঐরূপ ভাবে নিবারিত বা অপসারিত ত্রিপুরদহনকারী ভগবান শম্ভুর শরাগ্নি তোমাদিগের দুরিত দগ্ধ করুক।

[৩]

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলম্
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসঃ শীকরৈঃ।
তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততাম্রনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে
তস্যাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ॥

অত্র মদলাচরণেরই বা প্রয়োজন কি? হরি-হর-ব্রহ্মাদি দেবতার বন্দনারই বা ফল কি? বিপরীতসম্ভোগজনিত শ্রমবেতু চূর্ণ কুন্তলগুলি চঞ্চলভাবে কাঁপিতেছে, কর্ণের কুণ্ডল মৃদু মন্দ দুলিতেছে—ললাট, গণ্ডস্থল ও চিবুকে সূক্ষ্ম স্বেদজাল উৎপন্ন হওয়ায় চন্দনতিলকাদি ঈষৎ সিক্ত হইয়াছে, চক্ষু দুইটি রতিশ্রমজনিত ভঙ্গিমায় আলস্যে ঢুল ঢুল করিতেছে—তথীর এহেন মুখখানি তোমাকে রক্ষা করুক।'

[৪]

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুমুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষ পরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বদন্তিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে॥

হে মুগ্ধে, কে এমন ভাগ্যবান পুরুষ—যাহাকে তুমি প্রেমালস প্রীতিস্নিগ্ধ, কখনও মুকুলিত বা সঙ্কুচিত, কখনও বিস্ফারিত, কখনও বা লজ্জাবনত, নিমেষরহিত এক দৃষ্টিতে দেখিতেছ? এই দৃষ্টিবাণে—তোমার মুখ না ফুটিলেও হৃদয়-সঞ্চিত ভাবরাশি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।'

১। কেহ ত্রিবিধ উত্তম, মধ্যম ও অধম। প্রথম শ্রেণী হইলেও যে সূক্ষ্ম ঘর্ম বিন্দুজাল ললাট, গণ্ডস্থল ও চিবুকে মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা উত্তম শ্রেণীর। যথা মদ—'প্রথমে মহতি যোষসঃ উত্তমঃ স প্রকীর্তিতঃ। ললাটে গণ্ডয়ো রাপি চিবুকে চাপি দৃশ্যতে॥' মধ্যম প্রথম, তদনুরূপ ঘাম দেখা দিলে উহাকে—মধ্যম বলা হয়।—'প্রমাণেনাল্পকো যো মধ্যমঃ স প্রকীর্তিতঃ।' অধমশ্রেণীই সর্বাপেক্ষা পরিত্যক্ত হইলে,—সেইরূপ ঘর্মকে অধম বলা হয়,—'স ললাটনিরোগ্রীবাবক্ষোদেশেষু জায়তে। অধমস্তত্র মহাকেশোঽতিবহুঃ সর্বদেহগঃ।' এখা বাহুল্য উপরের শ্লোকে নায়িকার যে স্বেদ বর্ণিত হইয়াছে, উহা উত্তম শ্রেণীর।

২।—কবি কহিয়াছেন—মুগ্ধা নায়িকা তাহাকে বলা হয়, যৌবন যাহার সর্বাঙ্গে বিকশিত,—লজ্জায় যাহার বুক ভাঙিলেও মুখ ফোটে না। অঙ্গ হাব, ভাব, ইঙ্গিত ও কটাক্ষ দ্বারা যাহার হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। লক্ষণ যথা,—'মুগ্ধা নববয়ঃপুষ্প বল্লভৈকবশংবদা'। নবালঙ্কার-লক্ষ্মী চ লজ্জাপ্রায়া ফুটস্মিতা।' ভাষা হৃদয়কে দেখিয়া শকুন্তলার এই মুগ্ধা ভাবই মহাকবি বর্ণন করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাহা উপলব্ধি করিয়া কহিতেছেন—'কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখী সা, দৃষ্টিস্তু বাচয়তি দত্তমনন্যকামম্'। অর্থাৎ যদিও আমার পানে অবিরত চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া নাই, পরন্তু অন্যদিকেও তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নাই। মুগ্ধার মত অর্থাৎ আমি অন্য দিকে চাহিলে আমাকে কেন দেখিতেছে, আমার তাহার দিকে নেই—দৃষ্টি ফিরাইতেছি অমনি আমার প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি অন্য দিকে সরাইয়া লইতেছে। বাৎস্যায়ন প্রবিষয়ে লিখিয়াছেন—'তদনুবৃত্তৌ চ বীক্ষেত, ক্রীড়াং কর্তুমন।'

[৫]

দত্তোঽস্মাঃ প্রণয়স্তয়ৈব ভবতা চেয়ং চিরং লালিতা
দৈবাদ্যদ্য কিল ত্বমেব কৃতবানস্যা বং বিপ্রিয়ং।
মন্যুর্দ্ধুঃসহ এব যাতুপশমং নো সান্ত্ববাদৈঃ ফুটং
হে নিষ্ঠুরেশ বিমুক্তকণ্ঠকরুণং তাবৎ সখী রোদিতু॥

নায়িকা একে মানিনী, তার উপর বালস্বভাবা—একটুতেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন। আবার নায়ক আসিয়াছেন—অপরাধ করিয়া, আর কি রক্ষা আছে? কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন। চতুরা সখী উভয়েরই মন-যোগান কথা কহিয়া—একদিকে নায়কের দোষ ঢাকিতেছেন,—অপর দিকে নায়িকার মান ভাঙিতেছেন।—(নায়কের প্রতি) না কাঁদিয়া কি করে বল?—তুমিই উহাকে প্রেমাস্ত্র দিয়াছ, তোমার প্রেমেই সে এতটা বাড়িয়াছে, তোমার ভালবাসাই উহার সর্ব্বস্ব। তাই বলিয়া তুমি কি আর ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ করিয়াছ—তা' কখনই নয়, কেননা যাহার প্রতি এত ভালবাসা, তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও কি আর ভালবাসা যায়? তবে সবই দৈবের হাত, তোমারই বা দোষ কি? কিন্তু দৈববশতঃই হোক, আর ইচ্ছা করিয়াই হোক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, সখী যখন জানিতে পারিয়াছে, তখন উহার হৃদয়ে কি দারুণ জ্বালা—ভাবিয়া দেখ। মিষ্ট প্রবোধবাক্যে কি উহা শান্ত হইতে পারে? এখন উহাকে গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে দাও। যদি ভাল ছাড়িয়া না কাঁদিতে পায়, তা'হইলে ভিতরের গুমরাণ চাপ ও ক্ষোভে উহার বুকখানা যে ফাটিয়া যাইবে।

[৬]

লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছূন-নয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্ব্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈঃ
তবাবস্থা চেয়ম্, বিসৃজ কঠিনে মানমধুনা।

কোনও প্রণয়িনী তাঁহার প্রণয়ীর উপর এমনি মান করিয়া আছেন যে, তাহার দাপটে গৃহজন সকলে মন-মরা হইয়া গুম হইয়া আছেন, গৃহে শান্তির নিঃশ্বাস বহিতেছে না, হাসিখুসী ত' দূরের কথা। তাই সখী—মানিনীকে মানের বহর কমাইতে কহিতেছেন, 'আহা, দেখ, তোমার প্রাণকান্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া মুখখানি নীচু করিয়া পায়ের আঙুল দিয়া মাটির উপর আঁক কাটিতেছেন,—তোমার সাম্নে আসিতে সাহস পাইতেছেন না, সখীগণ নায়কের নিরুপায় অবস্থায় কাতর হইয়া 'কি করিবে'—স্থির করিতে না পারিয়া সতত অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। পিঞ্জরের শুক সুখের দিনে কত কপ্‌চাইত, কত পড়িত—কত হাসাইত। কিন্তু এখন কেইবা উহাকে পড়ায়, কেই বা উহার পড়া শুনিয়া হাসে,—সব নিস্তব্ধ। আর মানিনীর মুখখানি মানের ফলে অন্ধকার হইয়া আছে, তার দিকে তাকায় সাধ্য কার? মনও জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, শরীরের সে শ্রী নাই, মুখে হাসি নাই, বসনভূষণের পারিপাটা নাই, মলিন বেশ, শুষ্ক মলিন মুখ। তাই সখী কহিতেছেন—'হে নিষ্ঠুরে, এমন মান কি পুষিয়া রাখিতে আছে! এখনই উহা ঝাড়িয়া ফেল।'

[৭]

নার্য্যস্তদ্বি হঠাদ্ধরন্তি রমণং তিষ্ঠন্তি নো বারিতাঃ
তৎকিং তাম্যসি কিন্তু রোদিষি মুধা তাসাং প্রিয়ং
মা কৃথাঃ।
কান্তঃ কেলিরুচির্যু বা সহৃদয়স্তাদৃক্‌পতিঃ কাতরে
কিন্নো বর্ব্বরকর্ব্বরৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে।

হে তন্বি, পুরুষের মন হরণ করাই সাধারণ রমণীর স্বভাব। বারণ বা মানা করিলে কোন ফলই হয় না। কেন মনে মনে এত কষ্ট ভোগ করিতেছ? কেনই বা বৃথা রোদন করিয়া চোখ ফুলাইতেছ, শরীর কালি করিতেছ? এইরূপ করিয়া ঐ সকল রমণীরই ত প্রিয় আচরণ করা হইতেছে। কাঁদিয়া কোঁপাইয়া যতই মান করিয়া বসিয়া থাকিবে, ততই উহাদের হাতেই প্রাণকান্তকে তুলিয়া দেওয়া হইবে। সুদর্শন, সুকান্ত বেশ, কেলিকৌতুকে সুচতুর, বয়সে তরুণ, সুরসিক—এমন কান্তকে কি আর অমনি বশে রাখা যায়? তরুণ পশুকে যেমন রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে হয়, তেমনি নানা মিষ্ট মধুর পিরীতির বাক্য দ্বারা উহাকে কেনা করিয়া বশে রাখিতে হইবে।*

* বর্ব্বরকর্ব্বরৈঃ—বর্ব্বর শব্দের অর্থ তরুণ পশু, তাহার বিশেষার্থে 'কর্ব্বর' চর্ম্মরজ্জু। তরুণ পশুকে যেমন চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বশ করা হয়,

[৮]

কোপাৎ কোমল-লোল-বাহুলতিকা-পাশেন বদ্ধা দৃঢ়ং
নীত্বা কেলিনিকেতনং দয়িতয়া সায়ং সখীনাং পুরঃ।
ভূয়োপ্যেবমিতি স্খলন্মৃদুগিরা সংসূচ্য দুশ্চেষ্টিতং
ধন্যা হন্তত এব নিহ্নুতিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্॥

অধীরা রমণীগণ প্রিয়তমের অপর রমণীর প্রতি আসক্তি দেখিলে সহ্য করিতে না পারিয়া অঙ্গবর্জন,—তর্জন ও আস্ফালন করিয়া থাকেন, এমন কি দু'এক ঘা উত্তম মধ্যম দিতেও পিছপাও হন না।* এইরূপ এক রমণীর

তেমনি নানা প্রিয় বাক্য-ছল পাশে চলল প্রিয়তমকে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। মান-অভিমান দ্বারা চতুর চলল কান্তকে বশে রাখা সম্ভব নহে। বর্ষরকর্কীয়:—লোলুঠন-নর্মবিলম্বকোপৈ: :—হাস্তপরিহাসাত্মক মানভঙ্গোপযোগী মৃদু বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ রাধার কথা অন্তরে লেখুন—'ধন্যা লপন্ত্যেব মৎপ্রাণা যদস্থ! ন্যা ত্রীতাঃ। কিন্তুপহরতি মনো যদ্যপি সা ন লপত্যেকমেতৎসং'।

* "অধীরাঽন্যস্তি সম্ভোগ দর্শিতম্"— হয়। ললনাত, নখক্ষত, অন্য অপর উদাহরণ কবি দিতেছেন। নায়কটি শঠচূড়ামণি,—অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের দোষ হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেছেন। মানিনী নায়িকা কিন্তু, ততই কোপে আগুন হইতেছেন। শেষে কোপ বশতঃ নিজের কোমল বাহুলতার দ্বারা আঁট-বাঁধনে বাঁধিয়া প্রিয়তমকে কেলিকক্ষে লইয়া গিয়া সখীগণের সম্মুখে তাঁহার দুষ্টামীর চিহ্নগুলি সনাক্ত করিতেছেন—'আর এমন কাজ (করবে?)'— ঐরূপ বাল্যস্খলিত মৃদু বাক্যে ভৎর্সনা করিতেছেন ও বাহুলতার দ্বারা প্রহার করিতেছেন, নয়নে অশ্রু দরবিগলিতধারে বহিয়া পড়িতেছে। এত কঠোর শাসন কিন্তু কান্ত হাসিতে হাসিতে সহিতেছেন। তাঁহার ভাগ্যে এরূপ শাসন ঘটে এবং যিনি হাসিমুখে তাহা সহিতে পারেন —তিনিই সুকৃতি বা ধন্য।

রমণীর সিন্দূরচিহ্ন বা টিপ লাগিয়া থাকা ইত্যাদি অপরাধ চিহ্নসমূহ—মানিনী প্রণয়িনীর দৃষ্টি বড় এড়ায় না। ইহার ফলে মান ও অভিমানের অভিনয় হয়।

(ক্রমশঃ)

সনেট

— শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

তোমারে জানার শেষ নাহি পাই খুঁজি
শতবার করে হেরি শতদিক্ হ'তে—
দু-আঁখির আশা নাহি মিটে কোনো মতে,
এখনি প্রাণের পাত্র উপচিবে বুঝি।
শত সঙ্কোচের সাথে চিত্ত মরে যুঝি,
ধূলিধূসরিত তব জীবনের পথে
তোমার সকল কর্মে চাহে সাথী হতে,
দূরে সে রবে না আর স্বপ্নে তোমা পূজি'।

দেহের সকল শোভা মাধুরী তাহার,
প্রাণের গোপনতম সুগভীর বাণী—
তোমার সহজ সুরে তারে বারবার
আমার জীবন মাঝে মুক্তি দাও আনি।
দুয়ারে অতিথি জাগে, তাহারে তোমার
দাসী নহে, নারীমূর্তি দেখাও কল্যাণী।

২

মনে জানি ফিরিবে না ফুরাল যে দিন।
সন্ধ্যার অন্তিম রাগে ম্লান হাসি হেসে
চিরতমিস্রার স্রোতে যায় যাক্ ভেসে,
ভোরের সঙ্গীত সাঁঝে হয় হোক্ ক্ষীণ।
আঁধার দুয়ারে তোর আজি, ওরে দীন,
জ্বালিলি যে-দীপশিখা—রজনীর কেশে
দীপ্ত সন্ধ্যামণিফুল—এও অবশেষে
ঊষার ধূসরলয়ে মিলাবে মলিন।

তবু অভিমান ভুলে বিদায়ের ক্ষণে
বেদনাকাতর চোখে চাহি মুখপানে,
নয়নে নিবিয়া আসে দিবসের আলো—
প্রাণের সকল কথা চেপে রাখি' প্রাণে
করে ধরি' বলি শুধু একান্ত গোপনে,
'পারো যদি রেখো মনে যে দিন ফুরাল।'

সাধারণী

ষাট বৎসর আগেকার সাহিত্য ও

বিবিধ সংবাদ-সঙ্কলন (৩)

[১]

সমাজের পরিবর্ত্তন অবস্থা

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদয় হইয়া থাকে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে? কেহ বলেন ভাল হইয়াছে, কেহ বলেন মন্দ হইয়াছে; আবার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, এখনকার সমাজ মন্দ হইতে ভালর যাইতেছে।...

এই শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তনের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং পরিবর্ত্তন অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী দোষগুণ ইহাতে অবশ্যই থাকিবে, এই বলিয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।

এটি যে পরিবর্ত্তনের অবস্থা তাহা আমরা স্বীকার করি। আনুষঙ্গিক আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সুফলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড় সন্দেহ হয়। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা কতকাল স্থায়ী হইবে? প্রায়িক পঞ্চবর্ষ ভারত এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের অবস্থায় রহিয়াছে, আর কত কাল থাকিবে? সমস্ত ভারতে দুই বিঘা বিবাদ বিসম্বাদে কিছুমাত্র বাকী, ৫০ কোটি টাকা আমদানী হইতেছে, রপ্তানী হইতেছে, বৎসরে একশত মাইল, সহস্র টন-আইন, লক্ষ লাকুলার, কোটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে, হউক—আমাদের আপত্তি নাই। আমাদিগকে এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা হইতে ভাল অবস্থাতে লইয়া যাইবার জন্য কিছু চেষ্টা করা হইতেছে—আমরা বলি প্রায় কিছুই হয় নাই।

পরিবর্ত্তন অবস্থা সমাজের একটি রোগ-বিশেষ। প্রাণিদেহে যেরূপ নানা রোগ আছে, সমাজদেহেও সেইরূপ নানা রোগ আছে। কোন কোন রোগে যেরূপ প্রাণিদেহ কণ্টক দ্বারা কণ্টকীকৃত নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করে, সেইরূপ রোগ-বিশেষে সমাজদেহ কণ্টক পত্র ভাবণ করিয়া আবার নব কলেবরে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। কিন্তু এ দুই প্রকার রোগেরই চিকিৎসা আবশ্যক। চিরস্থায়ী রোগ কখনই প্রার্থনীয় নহে।

লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ যাহাতে সে আশার পূরণ, যাহাতে সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় তাহার কোন চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখকের দিন দিন চক্ষু ফুটিতেছে, চক্ষু ফুটিয়া দেখিতেছে কি? খোসামোদ—অহঙ্কার—নৈরাশ্য। দেশের বড়লোকের মস্তিষ্কে ফারসী ইংরাজি বিদ্যুৎজনক প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহারা মনে করিতেছেন, আমরা শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ দক্ষ, অথচ তাঁহাদের দ্বারে শাসনকার্য্যের ভার প্রদত্ত হইতেছে না, তাঁহারা দুঃখ হইতেছেন।...আশা দিন দিন বাড়িতে বাড়িতে চলিল, অথচ প্রাপ্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইল। এটি একটি ভয়ঙ্কর রোগ। এ রোগের বিশেষ কিছু চিকিৎসা হইতেছে না। উচ্চশিক্ষা-ফলে আশা অনেক বাড়িতেছে, আর আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্তি কিছুমাত্র বাড়িতেছে না। সুতরাং রোগের দিন দিন বৃদ্ধিই বলিতে হইবে।

সাধারণ প্রজার মনে দেখুন—হাসির লেখ, কিন্তু মনে শুকিয়েছে যে, জমিদারের আর আগেকার মত লইতে পারিবে না, অথচ প্রজা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। তাহারা বলবন্ত হইয়া আর পাঠায়, কাল কৃষ্ণিয়া, পরশু কলাহরে ধর্ম্মঘট করিল, হয় তাহারা কতকু জমিদারের কৃপায় বা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুকম্পায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিল, না হয় তেজস্বী জমিদারের পালে সপরিবারে গ্রামশুদ্ধ উৎসন্ন গেল। কিন্তু ইহাকে সমাজদেহের চিকিৎসা বলি না। আজ যারা যাযাইলে কাল তাহা বীরভূমে বীরভূমায় হইবে না, তাহার কি কিছু চেষ্টা হইতেছে?

তবে অনেকে এ কথার বলিবেন যে, এ অবস্থায় নাম যাহাই বলেন, এখনে ধনপ্রাণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিরাপদ্ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। একথা অবশ্য স্বীকার করি। ধনসম্পত্তি বিষয়ে বড়মানুষেরা একটি লাভ করিয়াছেন, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শিক্ষার উপর মুখাবীর উপদ্রব পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে কি বাড়িয়াছে তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু উকীল, মোক্তার, পেস্কার, চাপরাশীর অত্যাচার যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

তবে সমাজের জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ হইয়াছে।—হইয়াছে, কিসা হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ হইয়াছে। তাহা হইলেই কি জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হইল! কখনই নহে। জীবনের আর একটি ভয়ানক শত্রু আছে—রোগ। সকলকে জিজ্ঞাসা করি এই শত্রুর প্রাদুর্ভাব কমিয়াছে না বাড়িয়াছে? ইহার বোধ হয় এক উত্তর হইতে পারে—বাড়িতেছে। আর গবর্ণমেণ্ট তাহা থামাইবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছেন না।...

...এই পরিবর্ত্তন অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছি যে, ইহাতে কতকগুলি দোষ অবশ্যই থাকিবে।...আমরা সমাজের যাহাতে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিয়া থাকি কিন্তু তাহা প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই কোন মূল বিষয়ানুসারে হয়, এই আমাদের ইচ্ছা। কেবল পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পরিবর্ত্তন, আমরা মনের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। রাজা-প্রজার মোকদ্দমার ভার আজ কালেক্টরের হাতে দিতেছেন, কাল সেসনজি হাকিমের হাতে দিতেছেন, আবার কালেক্টরের হাতে দিতেছেন আবার সেসনজি হাকিমের হাতে দিতেছেন, একি খেলা থাকি? খেলাতেও বিজ্ঞ থাকে, ছেলেদিগের মনে মনে একটা কল্পনা আছে: কি মনে করিয়া এক হাত হইতে অন্য হাতে দিলেন?

সকল কার্য্যেই এইরূপ নিয়মশূন্যতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। তা কি সিভিলিয়ান আইন, পোলিস বিল, জেল বিল, তামাদি আইন, শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি,- কিছুতেই বিশেষ বিজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'খেলা

বাউল যদি অন্যরূপ করিলে ইহা অপেক্ষা ভালই হয়।' এরূপ করিলে অন্ধকারে ঢিল মারিলে কখনই লক্ষ্যস্থানে পড়িবে না। কিন্তু পরিষদের আলোকে অন্যের সমালোচনা প্রস্তুত প্রকাশ হয়, এজন্যে বা হয় সেখানে অবশ্য লক্ষ্য ঠেক করিবে। যখন সামাজ কারো বিরুদ্ধ থাকা আবশ্যক, তখন সমাজনীতি, [illegible] সম্বন্ধে ইহা যে অতীব আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ [illegible]....

এইরূপ একটি তর্ক উঠিতে পারে যে, এই পরিবর্তন অথবা যখন রোগ ধরিয়া স্বীকার করিতেছ, তখন যাহাতে এ রোগের উৎপত্তি একেবারেই না হয় তাহারই করা সকলের কর্তব্য। এই জন্য অনেকে বলিবেন, ছোয়া আছে ভালই ভাল, কোন কিছুর পরিবর্তে হস্তার্পণ করিয়া পরিবর্তন করিতে যাওয়া নিতান্ত গর্হিত। আমরা এরূপ মতে মত দিতে পারি না।

একথা একটি নিয়ম আছে যে, যে সমাজ রোগগ্রস্ত না হইবে তাহা অন্যগ্রস্ত হইবেই হইবে। এইরূপ অন্যগ্রস্ত হইয়া কত প্রাচীন সমাজ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'পরিবর্তন' রূপ রোগে কখন কোন সমাজ লয় প্রাপ্ত হয় নাই। কথাশিল সমাজের যে জ্ঞানবৃদ্ধ লোককে ইংরেজীরিয়া 'ফ্রেক রিজেনিটিভস' বলিয়া থাকেন, এরূপ উৎকট রোগ আধুনিক সমাজে আর কখনই প্রবেশলাভ করে নাই। অথচ এই রোগগ্রস্ত রোগী সুচিকিৎসক ডোবাপাটির হস্তে পড়িয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যেরূপ দ্বি বাহাল করিয়াছিল, সেরূপ কোন আধুনিক সমাজ অদ্যাপি করে নাই। ইংলণ্ডে সেইরূপ, আমেরিকার সেইরূপ, ইটালিতে সেইরূপ। সেও এখন রোগগ্রস্ত, কোন না কোন সুচিকিৎসকের হস্তে ইহা অচিরাৎ রোগমুক্ত হইবে...। আমরা ইহা অপেক্ষা রোগ ভাল বলি। তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য সমাজ মৃত হইয়া যায়, কিন্তু রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলে, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু অন্যাবাধি উন্নতির সবটি কখনই প্রার্থনীয় নহে। সময় সময়ে মনে হয় যে, আমাদের বর্তমান সমাজ অন্যাবাধি উন্নতগ্রস্ত।...

সমাজের জীবন নাই অতঃ পরিবর্তন হইবেই—ইহা পরিবর্তনের অবস্থান মাত্র। পরিবর্তনের অপর নাম বিকৃতি। এই সমাজ ক্রমে বিকৃত হইয়া গলিত ঘলিত হইয়া পড়িবে।

আমার বোধ হয় এগুলি আমাদের আশঙ্কা মাত্র। আমরা একেবারে জীবনশূন্য নহি। জীবনশূন্য দেহে রোগের উৎপত্তি সম্ভবে না। ১৮৫৭ অব্দে একটি রোগের আলা প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষে কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি আছে, তাহা না থাকিলে সেরূপ আলা কখনই মৃত সমাধদেহে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিক্টোরিয়া ক্যাবিনেট অন্যোদয়ের সুচিকিৎসাধনে সে আলার নিবৃত্তি পাইয়াছে।...

সেই আলার নিবৃত্তি পাইলেও বটে, কিন্তু সে রোগের কিছু উপশম হইয়াছে কি? হয় নাই। যদি সে রোগের শান্তি হইত তাহা হইলে, বর্তমান অবস্থাকে আর কেহই পরিবর্তন অথবা বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। যে রোগের নাম পরিবর্তন অথবা, তাহার একটি লক্ষণ অন্যের। সেই অন্যেরাদের আলায় আমরা অস্থির হইয়াছিলাম। শরীর হইতে রক্ত নির্গমন করিলে সেই আলার শান্তি হইয়াছে কিন্তু তাহাতে রোগের। নিবৃত্তির উপশম হয় নাই, লাভে হইতে শরীর নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

যে যৎকিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি অবশেষ আছে, তাহা থাকিতে থাকিতে আমরা পরিবর্তন অথবা রূপ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা।—ইংরেজেরা এ রোগ আধুনিক ভারতবর্ষে আনিয়াছেন, ইংরেজেরা ইহার প্রতিকার করিবেন।

[২]

দেশীয় সিবিল সর্বিসের পরীক্ষার নিয়মাবলী

পরীক্ষার্থীদিগকে চরিত্র ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সর্বতোভাবে পরীক্ষা দিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিতে হইবে।

২। বিজ্ঞাপনীর তৌজমাটী এবং ৫০ বা তদধিক টাকা বেতনের যতগুলি যে কোন চাকরি দেশীয় সিবিল সর্বিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে দেওয়া যাইবে।

৩। নিম্নলিখিত রূপ যেকিপণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে কোন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।—

(ক) যাঁহারা ৩ বৎসর গবর্নমেণ্টের কোন কার্য করিয়াছেন।

(খ) যাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩ বৎসর গবর্নমেণ্টের কোন কার্য করিয়াছেন বা ২ বৎসর সিবিল সর্বিস ক্লাসে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

(গ) যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ঘ) যাঁহারা এল. এ. বা সেইরূপ অন্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক বৎসর সিবিল সর্বিস ক্লাসে অধ্যয়ন করিয়াছেন।

(ঙ) যাঁহারা গবর্নমেণ্টের কোন সেক্রেটারীর অনুমতি পাইবেন।

৪। বিজ্ঞাপনীর কর্মের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা অন্যূন ৩ বৎসর গবর্নমেণ্টের কোন কার্য করা এবং মাতৃভাষায় বুৎপত্তি লাভ আবশ্যক। বোম্বে, উড়িষ্যা, আসাম এবং বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে এখন হইতে ২ বৎসরের মধ্যে কোনরূপ ইংরাজি পরীক্ষা দিতে হইবে না।

৫। যাঁহারা ৩ বৎসর গবর্নমেণ্টের কোন কার্য করেন নাই, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে—মাতৃভাষা, আইন, কিমিয়া ও উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল, অঙ্ক, ভূগর্ভবিদ্যা এবং ব্যায়াম।

যাঁহারা ৩ বৎসর সরকারী কোন কার্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মাতৃভাষা, আইন, অঙ্ক এবং ভূগোলের পরীক্ষা দিলেই হইবে।...

যাঁহারা এল এ. পরীক্ষায় কিমিয়ায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর কিমিয়ার পরীক্ষা দিতে হইবে না। যাঁহারা বি. এ. পরীক্ষায় কিমিয়া বা উদ্ভিদবিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে না।

যাঁহারা সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওভারসিয়ারের কিংবা তদপেক্ষা

উচ্চতর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলা, তাঁহারা যেন ইতিমধ্যে পরীক্ষা দিতে চাহিবেন না।

যাঁহারা বি, এল, অথবা প্রথমোক্তদের কোনটাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর আইনের পরীক্ষা দিতে হইবে না।

এই সকল বিষয় ইংরাজিতে পত্রদ্বারা ৩১ মার্চ মধ্যে জানান হইবে।

৩]

১২৮০ সাল—

কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে

১৮৭৩ সালে পৃথিবীর চক্ষুস্বরূপ গ্রহ অস্তমিত হইয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং ভন হ্রুটাই মিলকে গ্রহণ করিয়াছে। দুই ঈশ্বরপাত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী হইতে ব্রাহ্মণের এবং জ্ঞানিত্বের অবসর হইয়া গিয়াছে। একজন পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছেন, অন্যজন মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়, তাহা কে বলিতে পারে। ১৮৭৩ সাল! মিল কোথায় গেলে? ইঁহাদের কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া গেলে?

দুই জনে প্রায় এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৬ সালে মিলের জন্ম, ১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের জন্ম। যখন মিলের জন্ম হয়, তখন ইঁহার পিতা জেম্‌স মিল বিলাতের একজন অদ্বিতীয় আবাদিক, ও তাঁহার পিতৃবন্ধু জেরমি তখন বিলাতের ব্যবহারশাস্ত্র এবং ধর্ম্মতত্ত্বে বিষম বিপ্লব বাধাইয়া একেবারে অধিপতি করিতেছিলেন। যখন চার্লস দুই নেপোলিয়নের ভুইসেন্সিতে জন্ম হয় তখন তাঁহার পিতা লুই নেপোলিয়ন ওলন্দাজ ভূমির শাস্তিপূর্ণ রাজা এবং তাঁহার পিতৃব্য বোনাপার্ট ইয়ুরোপে মহা ষোলযোগ বাধাইয়া পাশ্চিমে একেবারে বিরাজ করিতেছেন।

এইরূপ অবস্থায় দুই জনের জন্ম হয়। যিনি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষিতাধিকারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ফ্রান্স দেশে এডিন নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আর যিনি ফ্রান্সে জন্মপরিগ্রহ করেন,তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাসিত দেশে ৭০ সালের ৯ই জানুয়ারীতে ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুটা এইরূপ।

মিলের জন্ম পড়িলে দেখা যায়, তিনি বাঁচার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি জগতে অতুল-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না, জ্ঞানে ও গুণে জগতে অদ্বিতীয়া। সংবাদ-পত্র সকলের কথা বিচার করিলে মেপোলিয়নের গৃহিণী রূপেগুণে তুলনে অতুলা। মিলমহিলা মিলের জন্মেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহারই সমাধিমন্দির মিলের আয়ুত্বা উপাসনাগৃহ হইয়াছিল। সেই মন্দির দেখিতে দেখিতেই মিলের জীবাত্মা এই জন্মমরণ-সঙ্কুল অদ্বি-মাংসময় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নেপোলিয়নের গৃহিণী স্বামিদত্ত পুত্র-সন্তান কোলে লইয়া নির্ব্বাসনে আসেন, নির্ব্বাসনে স্বামিরত্ন হারাইয়াছেন, এখন সেই একমাত্র সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কি ভাবনা ভাবিতেছেন, বলিতে পারি না। নিদর্শনের সময় ফুরাইয়াছে, নেপোলিয়ন-গৃহিণীর এখনও আশা ভরসা কিছুকিছু আছে। আসল কথা বলিয়া পড়ি। মিল নেপোলিয়নের যে সম্পর্ক এইরূপ।

ইঁহাদিগের চরিত্র অতি বিচিত্র। উভয়েই অসাধারণ বীশক্তিসম্পন্ন, অসাধারণ লেখনী এবং ঘোর অনুষ্ঠানশীল। সংসারের উপকার-সাধন জন্য উভয়েই দৃঢ় ব্রত পালন করিয়াছেন, উভয়েই কোথুয়ের মতানুসারী হইয়া পরোপকারার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অথচ ইঁহাদের জীবন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। মিলের জীবনবাহিনী সমধরাতল শস্যক্ষেত্র-সমৃদ্ধিশালিনী নদীর ন্যায় ক্রমে লোকের অনন্ত অসীম জীবন-তরে মিশাইয়া গিয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনস্রোত জীবন সেইণ্টলরেন্স নদীর ন্যায়। পর্ব্বতে উৎপত্তি হইল, আড় ভাবিলাম বুঝি দূরে মিশাইয়া গেল, দূরের অপর দীমা হইতে তাহা তুলিয়া আবার দেখা দিল, এইরূপ কতবার। লুকাইল আবার দেখা দিল, কত পাহাড়ে উঠিল পড়িল, পর্ব্বতের পূর্ব্বের উপর দিয়া পশ্চিমে বাহিত হইল, শেষে ভীষণ নরোয়া প্রদেশে অবসাদিত হইয়া মহোর্ম্মিসঙ্কুল আটলান্টিকে মিলাইয়া গেল। ইঁহাদের জীবন এইরূপ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নেপোলিয়ন পার্থিব রাজ্যে এবং মিল মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক উভয়েই উভয় রাজ্যে অসীম ক্ষমতা ছিল। যাঁহারা উভয়ের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। মিল কেবল অধ্যাপক নহেন, তাঁহার লেখনী রাজদণ্ডের কার্য্য করিয়াছে। নেপোলিয়ন কেবল রাজা নহেন, তাঁহার লেখনীনিঃসৃত পুস্তকাবলী ইয়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে গণ্য।

নেপোলিয়নের সুরেজ খালের গুণে যে ইংলণ্ড আমাদের ছয়মাসের পথ ছিল তাহাতে এখনে একমাসে পৌঁছান যায়: আর মিলের ১৮৪৪ অব্দের ভারতবর্ষীয় শিক্ষানীতির কৌশলে অদ্য ১৮৭৪ অব্দের প্রারম্ভে বিংশতি কথার মধ্যে কেবল বঙ্গদেশে কেবল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পঞ্চাধিক ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, সংবাদ প্রকাশিত, পঠিত, চর্চ্চিত, আলোচিত হইতেছে।

মিল বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষের মত রাজা পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানীর অধীন থাকিলে ভারতবাসীদের মঙ্গল হইবে।"—আমরা একথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বলিয়াছিলেন, "অদ্রিয়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে যে কয়েক খণ্ড অতলস্পর্শ কালো মেঘ উঠিয়াছে, তাহার ঐ মেঘে বাঁধি উঠিবে, প্রবল ঝড় উত্থিত হইবে, ভূলোক গগনমণ্ডল আঁধার হইবে, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে।" এ কথার অর্থ এখনও বুঝিতে পারিলাম না। দুই জনই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, দুই জনেই ৭০ সাল বলিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালার
কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে

বাঙ্গালার কালকুলের মহারাত্রি অবসান করিয়াছে। প্রথমে পলাশ যুদ্ধের মৃত্যু হয়। তখন যখন মিলাত হয় তখন ভারতমাতার কাছ হইতে মিলার চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে—

'প্রবাসে দৈবের বশে
জীব-তারা যদি খসে
অযুতীন কাঁ না মা তব মনঃ-কোকনদে।'

প্রথমে সে জীবন-তারা বলে যাই। অনেক বেষাদবি হইয়া সে তাহাকে অন্ত দিয়াছে।

মধুসূদন স্বর্গে পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষার তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধা-সহকারে তিনি যে বাণী পাঠিয়া জগতের কল্যাণের প্রবাস করিয়াছেন তাহা চিরস্মরণে সকলকেই আমোদিত করিবে।

তাহার পরেই কিশোরী চাঁদ আসরক হইয়াছেন। কিশোরী কল্পিত, কুলেখক ও কুজন।

তাহার পর দীনবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কাশীপ্রসাদ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যে একজন প্রধান ব্রতী। ১৮৭০ সালে এইরূপ একে একে কালমুকুলিকার সকল লোপ করিয়াছে। অন্যান্য কলহের উন্নতি দেখিতে পাইত না, তাহাদেই যাইবার সময়, কালমুকুল-চূড়ামণি অনরেবল দ্বারকানাথকে উৎকট রোগ-শয্যায় শয়ান করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভদ্রের অনুসরণ করিয়া দুর্বৃত্ত কান্ত হয় নাই। সমস্ত বাঙ্গালা অন্তরঙ্গ ও জনকষ্ট দুই রাজদের করে সমর্পণ করিয়া পালাইয়া গিয়াছে। সর্বত্রই হা অন্ন, হা জল শব্দ উঠিতেছে।

আমার হইয়ার সময় একটী ভয়ানক দুঃসমাচার প্রচার করিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'মনে করিয়াছ বঙ্গবাসিন্! যে, আমি যে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দুইটি চর রাখিয়া যাইলাম, তোমাদের গবর্নর সাহেব তাহাদিগকে বীর বলে বিদূরিত করিয়া দিবেন! সে আশাকে মনে স্থানদান করিও না। আমি সমাচার দিয়া যাইতেছি যে, তার দুর্ভ কালেজ তোমাদিগকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবেন, কোন আশা করিও না।' সকলে বিমর্ষ ও নিরাশ হইল, দুর্বৃত্ত বীর সন্তান দুজনকে তার দিয়া চলিয়া গেল।

সুতরাং ১০ সাল বিবিধ প্রকারে আমাদের অনিষ্ট করিয়াছে আর কতকগুলি বিষম অনর্থের সূত্রপাত করিয়াছে।

বিদেশে রাজায় রাজায়
কি করিয়াছে

বিদেশে এই সালে নানা কাণ্ড হইয়াছে। তন্মধ্যে রুসিয়া কর্তৃক আমুরিয়া তটস্থ দেশ-বিশেষ বিনা রক্তপাতে অধিকার করাই সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। ইয়ুরোপের মধ্যে কেবল এক স্পেনই বিষম গৃহবিগ্রহে ভুগিতেছে। ফ্রান্স সবত্ত বল এই বৎসরে পরিষ্কার করিয়াছে কিন্তু এখনও কিঞ্চিন্মাত্র শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোনরূপ ভয়ানক যুদ্ধ-বিগ্রহও এখন হইতে নাই।

প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়ার সম্রাট্‌গণ বার্লেনেতে একত্র হয়েন ও ইটালির অধিরাজ পরে সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন। ইহাতে পৃথিবীর ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। আমাদের মনে আশঙ্কাই হয়। যেমন এ ঘটনাটিতে আশঙ্কা হয়, তেমনি আর একটি ঘটনাতে আমার অনেক আশা হয়। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্রের সহিত রুসিয়ার রাজকুমারীর পরিণয়-পত্র হইয়া গিয়াছে।

পাত্রের পাত্র ইয়ুরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বিলাতেও গিয়াছিলেন এবং বিলক্ষণ সমাদৃতও হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তুর্কীর সুলতান এইরূপ বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আগুয়া যাওয়ায় যত্নপত্র আমাদিগকে দিতে হইয়াছিল, এবার তাহা সেরূপ না দিতে হয় তবে এ ঘটনাটি ভাল বলিতে হইবে।

অসিয়ার যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদিগের অনুরক্তি সর্বপ্রধান। তাহারা চৈনিকদিগের ন্যায় পূর্বে কাহাকেও ঢুকিতে দিত না, এখনে তাহারা সমস্ত সভ্য রাজ্যের সহিত এরূপ সন্ধি করিয়াছে যে, তাহারাও সর্বত্র যাইতে পাইবে এবং সকলেই আপনে বাণিজ্য-বাণিজ্য করিতে পারিবে।—

এ সকল কিন্তু কলিতে ১০ সাল মন্দ নয়; কোন রাজাকেই নিরাশ করে নাই। আমার উপর অনুগ্রহ করিতে কেবল তিন আর কে পারে?

সংবাদ

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে বিবিধ স্থানীয় সমিতি বিস্তর প্রজাপীড়িদিগের উপকারার্থে গবর্নমেণ্ট ৩১শে জানুয়ারির পূর্বে ৯,৫০,০০০ মণ চাল কিনিয়া রাখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪,০০,০০০ মণ চাল কলিকাতা ও বাঙ্গালার পূর্বদিগস্থ রেলা সকল হইতে ক্রয় করা হইবে, ১,৫০,০০০ মণ ক্রয় করা হইয়াছে, ঢাকার কমিশনার বাহাদুর ও চট্টগ্রামের রেলা সমূহ হইতে ১,০০,০০০ মণ কিনিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং বাকি ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

•

•

কাবুলরাজ প্রতি বৎসর গবর্নর জেনারেলকে যে মেওয়া উপঢৌকন দিয়া থাকেন, তাহা তিনি পাঠাইয়াছেন। উপঢৌকন ২৬শে পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে। কোনটিয়া কিছু প্রসাদ পাইবেন কি?

• •

বিগত সেপ্টেম্বরে হাইকোর্টে অ্যাডমিরালের মোকদ্দমার যে রিপোর্ট হইয়া গিয়াছে। আর্চবি ও বার্ড সাহেব দুই জন বিচারপতির দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তৃতীয় সেসন্‌স জজ কিন্তু সাহেবের আসনটি হাইকোর্টে খালাস রাখিয়াছেন।

•

যেরূপ গবর্নমেণ্ট পর্বতীয় অসভ্য জাতিদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজকে সাহায্য দান করিয়াছেন। এ সাহায্য ব্রাহ্ম সমাজকে কেন প্রদত্ত হইল আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

•

মাদ্রাজে একটি বালক দুইবর্ষ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করাতে তাহার পিতা বালকটি যে কিশন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তথাকার অধ্যক্ষের নামে অভিযোগ করিয়াছে। বালকটির বয়ক্রম আরম্ভে আঠার বৎসর অধিক নয়। এই অল্পবয়স্ক বালক খাইবার প্রচারিত ধর্মের গুণাগুণ পরীক্ষা-করণে কখনই সক্ষম নহে। ডক সাহেব ও ব্রেনবার বন্ধুর কথা মনে পড়িল।

* *
*

মাদ্রাজ বর্ষিসের ছাত্র বাঙ্গালা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের নিমিত্তার্থে ৫০ হাজার টাকার চাউল দান করিয়াছেন। স্ত্রীলোক জমিদার সুদূর তবিলার অপেক্ষা কেমন চিত্তবান।

* *

মাদ্রাজ সরকারী দুর্ভিক্ষ বিষয় ১৮৭৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রথমে তাঁহার তদারক দেখাইয়াছেন। মহলের একখণ্ড সুবিস্তৃত ভূমি ঘরবাড়ি দ্বারা বিবিধ তরুতলের বাড়ি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এরূপ আশ্চর্য তামাসা গ্রহকেন্দ্রবাসিগণ-মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। দুইটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠস্তম্ভ পরস্পর ৭০০ ফিট অন্তরে ভূমে প্রোথিত করা হয়। কাষ্ঠস্তম্ভ দুইটি অনূন ৫০ হাত লম্বা। তাহাদিগের অগ্রভাগে একগাছি দড়ি বদ্ধ হয়। সেই দড়ির উপর দিয়া দ্বারা ঝোলা চালাই করিয়াছিলেন। অবলীলাক্রমে সেই দড়ির উপর দিয়া বৃত্ত করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কাষ্ঠস্তম্ভের অগ্রভাগে একটি বহুনিম্নস্থ ক্ষুদ্র মঞ্চ ছিল। দুর্ভিক্ষ অনেকবার দড়ির উপর দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ হইতে ঐ মঞ্চে আসিয়া এক বার পরিভ্রমণ ও অন্য বার পরিধান করিয়াছিলেন। দড়ির উপর তিন তারিখ খাটিয়াছিলেন এবং এক বোতল সাম্পেন মদ্য অনেকগুলীর স্বাস্থ্য-স্বরূপ পান করিয়াছিলেন। নিম্নে অন্তক, ঊর্দ্ধে পা করিয়া অনেকবার দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একখানি এক গাধার গাড়ি উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে দড়ির উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের ক্রীড়া দর্শনে কলিকাতার লোক যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার দুর্ভিক্ষে যে কিছুমাত্র ভীত, এমন বোধ হয় না।

* *

বিগত ১৩ পৌষ পরিবারে ইংলণ্ডের সাধারণ ধারণি মতে মিউনিসিপাল কমিশনর স্থির হইয়া গিয়াছে। অক্টোবর মাসের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নিয়ম দ্বারা সমস্ত মিউনিসিপালিটিতে ১৮ জন কমিশনর থাকিবে, তাহা স্থির হইয়াছিল। তন্মধ্যে সরকার হইতে ৩ জন নিযুক্ত হইবে, বাকি ১৫ জন করদাতৃগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবে। সমস্ত শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির আবাদ ২৯,০০০ লোক; তাহার মধ্যে করদাতার সংখ্যা ৩,৫০৯; তাহার মধ্যে ১,৮০৮ জন উপস্থিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোকও ছিল।...

* *
*

বঙ্গল কমিশনের সাহেবেরা গুইকুমারের সহিত ইকারে গিয়াছিলেন। এত বড় ইকারে তাঁহাদের মন উঠিল না!

*
*

চিটক অব এক্সিবরার তাবী নবাব কলিকা কুমারীকে যৌতুক দিবার জন্য সাধুচিত্ত সৈন্যদল দান হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছে। রাজবন্দীদের মধ্যে চিটকের ভারতে পদার্পণ হইয়াছিল, তাঁহার নবাবকুকে আমাদের কিছু যৌতুক দিলে হইত না? না, দুর্ভিক্ষ বৎসরে আর এসকল কথায় কাজ নাই। তবে বাকি প্রতিজ্ঞা ৫০,০০০ টাকা লইয়া গেল!

*

নবকর্তা প্রথম দিন প্রতিবারে যে কান্সি খেলায় হইয়া থাকে, এ বৎসর লেফটেনেন্ট গবর্নরের বাটিতে তাহার অধিবেশন হইয়াছিল।...গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি ও বিবি দুইস আপন আপন অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চার নায়ক চীন শ্রেষ্ঠীর সুবর্ণ পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপন মূর্তি দেখাইয়া অনূন তিন শত টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। চারিদিকে সুন্দরী মহিলারা পসরা লইয়া বসিয়াছেন। বেচিতে অপূর্ব শোভা। কাহার সাধ্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে দুই টাকার দ্রব্য দশ টাকায় না ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে! দর্শক-সংখ্যা প্রায় দুই সহস্রের অধিক হইয়াছিল।

* *
*

শ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী এ বৎসর বাগবাজার ও মুর্শিদাবাদ জমিদারীর প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা লইবেন না। অধিকন্তু তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত কলিকাতার জন্য বিনামূল্যে দশ হাজার মণ চাল কিনিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য জমিদারদিগের তাঁর উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন বলিয়া তিনি চাল ক্রয় করেন নাই, বিতরণ করিবার জন্য কিনিয়াছেন।

[৭ পৌষ (২১ ডিসেম্বর, ১৮৭৩) হইতে ২৮ পৌষ, ১২৮০ (১১ জানুয়ারি, ১৮৭৪) পর্যন্ত চার সংখ্যায় সঞ্জীবনী হইতে সঙ্কলিত।]

ফরাসীদের দেশে একখানি গ্রাম

—শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মন্থরগতি সেইন্ নদী বিশাল অজগরের মত এঁকেবেঁকে সমুদ্রের পানে চলেছে,—দু'ধারে অনতিদূরে সবুজ অরণ্যে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের কোলে কোলে চাষ্ ক্ষেত, পীত হরিৎ নানা রংএর পুষ্পে, শস্যে ভরা; জ্যামিতির চিত্রগুলির মত তাদের সমচতুষ্কোণ আকৃতি—কোন সুন্দরী বুঝি তার হাতে বোনা নানা রংএর পশমের বহুপি-কাটা বিশাল গালিচাখানি এখানে বিছিয়ে রেখেছে।

চাষ্-ক্ষেত্রগুলির মাঝে লুকোচুরি খেলে একখানি রেলপথ ওখানে ওই সুদূরে পাহাড়ের রন্ধ্রে ঢুকেছে। পিচ্ ঢাকা কালো রাস্তাগুলি বাড়ীঘর গাছপালা ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে ছুটেছে—ছোট মেয়ের গোছা গোছা চুলে উড়ন্ত ফিতার মত।

এমনিধারা বিচিত্রতার মাঝে ফরাসীদের দেশে একখানি গ্রাম···

···বিদেশীর চোখে তারী সুন্দর,—কিন্তু কি দুঃখে তার দীর্ঘশ্বাস এসে যায়! তার মনে পড়ে, শ্যামল সমতল বঙ্গদেশ—নারিকেল, সুপারি, বাঁশঝাড়, আম্রছায়ার আড়ালে কুটীরগুলি, স্নিগ্ধ দীঘি, শরতের ছাপাছাপি জলভরা নদী। বঙ্গের গ্রাম, সে কত সুন্দর! শুধু যদি তার সন্তানদের সন্ততি থাকত মাতৃ-প্রতিমা এমনি ভূষণে সাজাতে!

(১২) গ্রাঁ-কুরোণের ধারে সেইন্ নদী।—

এখায় সেইন্ নদীর কূলে কূলে কারখানা আছে, কিন্তু হুগলী তীরের জুট-ফ্যাক্টরীর মত তারা দেশের রক্তে রংশকোট হ'য়ে রক্ত শোষণ করছে না। নদীতীরের অনবদ্য শোভা হরণ করবার সাহসও তাদের নেই। অথবা সেপ্টিক্ ট্যাঙ্কের গালভরা নামের আড়ালে কুলি লাইনের ক্লেদ ঢেলে সেইনকে তারা পঙ্কিল করে' তুলতে পারে না।

গ্রাঁ-কুরোণের চরণ ধৌত করে' সেইন্ রুআঁ সহর পর্য্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে আশ্রয় দেয়।

বঙ্গদেশে যেমন কলিকাতা, রুআঁ তেমনি ফরাসীদের দেশে দেশান্তরের বন্দর। মার্সেই, লা' আবর প্রভৃতির তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট হ'লেও রুআঁর ক্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী করে, ১৯২১ খৃঃ অঃ-এর কাষ্টম রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৮ লক্ষ টন। রুআঁর নীচে মার্সেই।

সমুদ্রগামী জাহাজগুলি এই বিশালভার পণ্য নিয়ে সেইন্ বক্ষে গ্রাঁ-কুরোণের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করে—কিন্তু আষাঢ়ের ঘোলাটে মেঘের কালির ছাপ এর গায়ে পড়েনি।

সঙ্গের ফটোখানিতে (১২নং) সেইনের রূপ দেখে কে ভাবতে পারে, গ্রাঁ-কুরোণেও কারখানা আছে। ইউরোপের দ্বিতীয় প্রধান কাগজের কল এইখানে—Papeterie Sonopa, ফ্রান্সের সর্ব্ববৃহৎ কাগজ-কল।

কারখানা, পল্লীর সরল বুক জুড়ে' রক্তপায়ীর আকৃতি নিয়ে বসেনি, তার চিমনি দাম্ভিকের উদ্ধত শিরের মত চোখে ঠেকে না। ফরাসী কারখানার আশেপাশের গ্রামের লোকই কাজ করে, বাংলার মত বাইরে থেকে বিলাসপুরী আসে না।

ফরাসীদের প্রাণ আছে, বিজ্ঞান তাদের হৃদয়কে দলন করে ফেলেনি। এদের কারখানা, প্রাচীন কুম্ভকার-কামার-শালার মত পল্লীর বুকে সহজ হয়ে রয়েছে। Sonopa কাগজের কল অত্যধিক ভূমি দখল না করে স্থানের অভাব

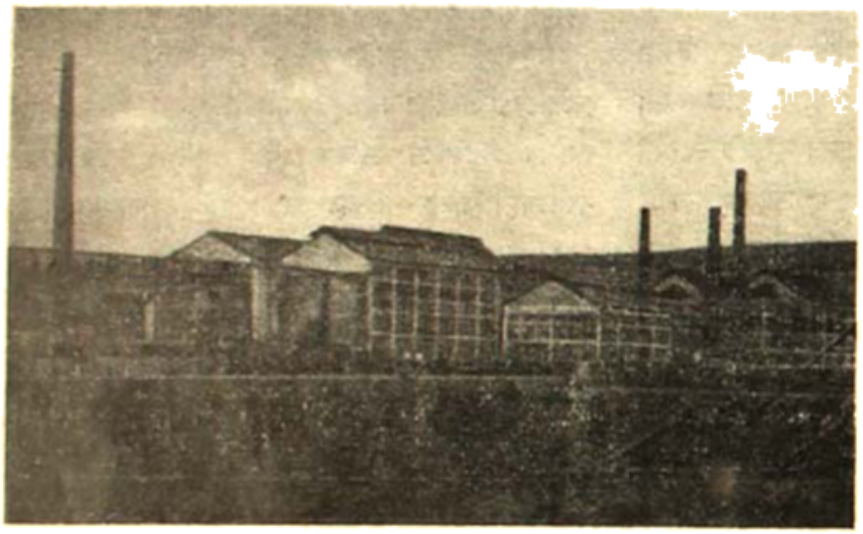

পাঁচতলা কাগজ-কারখানা।

মাথায় নেয়ে নিয়েছে—পাঁচতলা বাড়ী, প্রত্যেক তলায় ভারী ভারী যন্ত্র (২নং ছবি)। এ কারখানা একতলা হ'লে পাঁচগুণ জমির প্রয়োজন হ'ত, সেইনটও অনর্থক ঘিরে নিত। আধুনিক বিজ্ঞান রি-ইন্‌ফোর্স্ড কংক্রিটে বাস্তুশিল্পের যুগান্তর এনেছে, ভারী ভারী যন্ত্রের ঝোঁকা বিভিন্ন তলায় বহন করতে রি-ইন্‌ফোর্স্ড কংক্রিট নির্মিত কারখানা-বাড়ীর অসুবিধা হয় না।

ফ্রান্স পেট্রোল আমদানি করে' উত্তরপশ্চিম প্রান্তের জন্যে এখানকার গুদামে সংগ্রহ করে' রাখে। পেট্রোলের গুদাম গুলিও এক বৃহৎ ব্যাপার। পটাশের কারখানা, ইস্পাতের কারখানা(৩নং) প্রভৃতি কত কারখানাই এই প্রাঁ-দুরোলে রয়েছে। প্যারী থেকে সেইনের মোহানা না'আবধ্ পর্যন্ত সেইনের তটে কারখানা না করলে ফ্রান্সের চলেনা, বহিদেশের প্রতিযোগিতার আওতায় তা' না হ'লে তাকে মুষড়ে' যেতে হবে, অত্ত কারখানার আবহাওয়ায় ফরাসীদের কৃষিপ্রাণ পল্লীর সৌন্দর্যহানি হয় নি, আর পল্লীর ওপর জগদ্ব্যাপী ইকনমিক্ ডিপ্রেসনেও (economic depression) তাদের সম্মান বজায় রেখেছে। এবং এরা সামঞ্জস্য রেখে কাজ করেছে।

আমাদের দেশের জুট ফ্যাক্টরীর 'কুলি লাইন' কারখানার ঘাড়ের উপরেই স্থাপিত। সেখানকার পুতিগন্ধময় জীবন মুক্ত হাওয়ার মানুষকেও 'কুলি'তে পরিণত করে' ছাড়ে। তাদের নির্লজ্জ স্নান, প্রাতঃকৃত্যাদির ব্যবস্থা কোন্ দেশ থেকে আমদানি জানি না, তবে সে ব্যবস্থা যন্ত্রবাহী পশুর উপযোগী বটে।

(৩) ইস্পাতের কারখানা।

এরা কারখানার শ্রমিক-পল্লী(৪নং) ঘুরে পাহাড়ের কোলে খাসাবাস আলো-বাতাসে গড়েছে। শ্রমিকেরা সাইকেলে, মোটর-সাইকেলে কাজে যায়, ফিরে এসে পরিচ্ছন্ন পল্লীতে (৫নং) তাদের কর্মক্লান্তির গ্লানি দূর করে। এদের কুলি লাইন, আমাদের পরিচিত ব্যারাক নয়—সুন্দর ছোট

ছোট বাড়ী, দিল্লীর পাটনার অথবা রাঁচীর কেরাণীপাড়ার মত।

সাধারণ শ্রমিকের 'কুলি-লাইন' আর ইঞ্জিনিয়ারদের

পাহাড়ের কোলে শ্রমিক পল্লী।

বাংলো (৬ নং)—এদের অবস্থিতির মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। ৪নং ও ৯নং ছবি তুলনা করে' দেখলেই তা বোঝা যায়। অবশ্য, রুশিয়ার উদার সাম্যবাদ ফ্রান্স এখনও নিতে পারে নি, দেশের অর্থ আর ক্ষমতা এখনও অতিলোভী ধনিকদের হাতে। কিন্তু এদেশের সত্যিকারের চিন্তাশীলের দল, উদীয়মান তরুণ-তরুণী আর কর্ম্মীর দল রুশিয়ার আদর্শে মজেছে। স্বাধীনজাতি, নিজেদের কালিমা একদিন না একদিন মুছে ফেলবেই। এমনি এক প্রয়াসেই ফরাসী-বিপ্লবের প্লাবন এরা এনেছিল, আসন্ন মুহূর্ত্তে আর একবার নাড়া দিয়ে উঠতে এরা বিলম্ব করবে না।

মানুষের ন্যায়। অধিকারের কোলাহল French Revolutionএ এদেশেই উঠেছিল, তাই এ বর্ম্মাণ্ডির কৃষিক্ষেত্রের মাঝে পল্লীগুলির ঘরে ঘরে জলের কল, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাইখানা, আর ইলেক্‌ট্রিক আলো ঢুকেছে। বর্ম্মাণ্ডির গোয়ালিনী শীতের দিনে আধুনিক পদ্ধতিতে গরম-করা গোয়ালে বিজলী বাতির আলোর নধরকান্তি গাভীর দুধ দোহন করে' ফরাসী সন্তানের মুখে তুলে ধরছে। "দুধওয়ালা কোম্পানী নাজি" (Societe Laiteric Maggi) পাস্তুরাইজ করা শোধিত দুধ বোতলে ভরে' গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, প্রতিপাড়ায়, প্রতিগৃহে সরবরাহ করে—সে দুধ বিকৃত হবার ভয় নেই, সে দুধ দিয়ে সন্তার বিষ শিশু-শরীরে প্রবেশ করে না। আশ্চর্য্য এই যে, নির্জ্জলা দুধ এদেশে পল্লীর মত বড় সহরেও টাকায় পাঁচ সের!

শ্রমিক পল্লীর পরিষ্কার পথ।

তবু, সঙ্গের ফটোগুলি দেখলেও বোঝা যায়, শ্রমিকপল্লীর কুটীরগুলি আর ইঞ্জিনিয়ারদের বাংলো, এদের মধ্যে সৌধীন luxury-গত তারতম্য থাকলেও, স্বাস্থ্য বা material সুবিধার দিক দিয়ে ভেদ নেই।

ঐ-কুরোণে বর্ম্মাণ্ডি পল্লীর সকল বিশেষত্বই বজায় রয়েছে। আজও যোয়ান্ অব্ আর্কের বীরকাহিনী অধিবাসীর মন চঞ্চল করে' তোলে, গত মহাযুদ্ধের মার্শাল ফশ্ সম্রদ্ধ পূজা পাচ্ছেন। এঁদের নামে রাস্তা কর্ণা

থেকে আরম্ভ সকলে বিদেশীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবেই।

কাফি-খানার রুদ্ধ অধিকারী সকালে কাজে যাবার আগে প্রাতরাশ খেতে এসে সকলে মুখে আপ্যায়ন করবে,

(৩) ইতিমধ্যের বাজার।

"বোঁ-জুর মাশিও, সা-ভা ?—(নমস্কার মশাই, চলছে ত' ভাল ?)"

এদের মেয়ে-পুরুষের মুখে পল্লীর সরলতা মাখানো। বিদেশীর প্রতি কৌতূহল থাকলেও, মূঢ় কূপ-মণ্ডুকের অকারণ বিদ্বেষ নেই। কাফিখানায় সমবেত যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ৪টি কথা বলবার বা একটুখানি আলাপ জমাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না বটে, তবে, "মশায়ের কি করা হয়" না জানতে পারলে নাস্তা-নাবুদ করে' ছেড়ে দেয় না। দেশ-বিদেশের কথা শুনতে ভাল লাগে, সাদা চামড়া কালো চামড়ার ভেদ চোখে দেখে বিস্মিত হয়, তবে গল্পটা পাকিয়ে হাসাহাসি করে না বা অতত্র আকুল দেখায় না। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রতীরে সবাই যখন রৌদ্রে পুড়ে' চামড়ার রং একটু সরলা করে' নেবার চেষ্টায় ব্যাকুল, তখন ভারতবাসীর রং দেখে ফরাসী সুন্দরীরা সত্যসত্যই হিংসা করে—কখনও কখনও মনের কথা হেসে বলেও ফেলে।

কাফিখানা শুনলে প্রথমে মনে হয় আমাদের পল্লীগ্রামের সরাইখানার মত বুঝি একটা ব্যাপার। আসলে কাফিখানা কিন্তু একেবারে অন্য ব্যাপার। ফরাসী পল্লীর কাফিখানা বারোয়ারীতলার চণ্ডীমণ্ডপের মত পল্লীর প্রাণ। এক পেয়ালা কাফি অথবা অন্য পানীয় নিয়ে বসে' গ্রামের লোকে এখানে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করে, নিজেদের সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচনা করে। পথক্লান্ত দুই বন্ধু কাফিখানায় বসে' তৃষ্ণা আর শ্রম অপনোদন করে—বিদেশী পান্থেরও হেথা অবারিত দ্বার।

কাফিখানা বারোয়ারী নয়, তার মালিক আছে, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের অলস তামাক-পোড়ানোর দল এখানে জোটে না। পয়সা দিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যায় বটে, তবে

ফ্রাঁ-কুরোলের বাজার।

বেকারের দল লজ্জা পায়। চেয়ার ত' অন্য খদ্দেরকে ছাড়তে হবে।

ফ্রাঁ-কুরোলের উত্তরে বাজারের মাঝে তার একটি কাফি-

খানা, ছবিতে দরজায় C A F E সাইন্‌বোর্ড দেখা যাচ্ছে (৭নং)।

আমাদের দেশে পল্লীর বাজারের রাস্তা এত পরিষ্কার দেখেছে কেউ?

কাস্টিখানার সামনেই ডাকঘর, যেখানে মোটরখানি দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে থানা, আর রাস্তার অপরপ্রান্তে গাছটির আড়ালে পঞ্চায়েতী mairie। থানার চৌকিদার কনেষ্টবলের বাড়াবাড়ি নাই—মাত্র ২।৪ জন।

অবশ্য, কনেষ্টবল সাহেবেরা বোধ হয় সব দেশেই এক জাত-কেইয়া, বাগে পেলে ক্ষমতা জানাবার সুযোগ ছাড়ে না। তবু দেশের সন্তান পল্লীর লোকদের সঙ্গে তারা হেসেই আলাপ করে। আমাদের দেশের অসহায় গাড়োয়ান বা কিস্তিওয়ালার প্রতি সার্জেণ্ট পাহারাওয়ালার অবথা অত্যাচার এদেশে চোখে পড়েনা।

এ দেশের পঞ্চায়েতীর মেয়র অনেক ক্ষমতা রাখেন। গ্রামের লোকের ভোট পেলেই তাঁর আসন; সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি সরকারী অফিসার। ইনি ভোট পেলে মেয়রগিরির সঙ্গে কাউন্‌সিলের দেশার depute হ'তে পারেন। সৈন্যসংগ্রহ, কর্গাড়া-ক'াটির মোকদ্দমার মেয়রের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা, অপচ ষ্টেট রেলওয়ে গ্রামের লোকের মত না নিয়ে টাইমটেবল বদলালে গ্রামের লোককে রেলের নামে ক্ষতিপূরণের দাবী আনতে পাবলিক নোটীস বোর্ডে ইনিই 'আহ্বান' ছুড়ে দেন। আবার সরকার উপযুক্ত কারণ পেলে মেয়রকে মেয়রগিরি চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে পারে।

বুড়া ওক তলে পিকনিক পার্টি।

গ্রাঁ-কুরোণের mairieর সামনে গাছতলায় ছোট। মাঠটিতে হাট বসে। মাছ-মাংস, তরি-তরকারী, ছেলে-মেয়ের কাপড়, জামা, খেলনা সবই বিক্রি হ'তে আসে। এই বাজারেই রাস্তার ধারে কো-অপারেটিভ ষ্টোর আছে। পাশেই খবরের কাগজ আর বইয়ের দোকান। এই বাজারের রাস্তাটিই ঘুরে ফিরে কোথাও বা সেইনের ছট স্পর্শ করে' কোথাও বা পাহাড়ের কোলে কোলে রুয়াঁ থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—কাজেই গ্রাঁ-কুরোণের বাজারে পেট্রোলের দোকান না থাকলে চলে না। পল্লীপ্রান্তে দু'একটা মোটর রিপেয়ারিংএর গ্যারেজও আছে।

কৃষকেরা, ছেলেরা অথবা হাটের পসারীরা মোটরে, দরীতে অনেক দূর দূর থেকে পণ্য নিয়ে আসে। আমাদের গো-যানের স্থল এদেশে মোটর প্রায় দখল করে' ফেলেছে, ঘোড়ায় টানা ওয়াগন-গাড়ী বিরল। পল্লীর কয়লার কারবারীরা অশ্ব-যান ব্যবহার করে, কারণ লোকের বাড়ী বাড়ী কয়লা সরবরাহ বারোমাস চলে, ঘোড়াকে কোনও দিন বসে' খাওয়াতে হয় না। কিন্তু যে সব ব্যবসায়ে বারোমাস সমানে ঘোড়া খাটানো যায় না, অথবা শুধ মাছের ব্যবসায়ে যাতে দ্রুততার প্রয়োজন, সে সব ব্যবসায় পেট্রোল-যান এক-চেটিয়া করে' নিয়েছে।

পল্লীগ্রামের কৃষকের মোটর দেখলেই চেনা যায়—পুরানো নড়্‌বড়ে আর ছেলে-মেয়ে মালপত্রে বোঝাই। পাউরুটী-ওয়ালাও মোটরে করে' বাড়ী বাড়ী রুটী দিয়ে যায়। এ যুগে গ্রামা গৃহস্থও আর ঘরে রুটী তৈরী করে না।

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রেল-ষ্টেশন, রুয়াঁ সহরে যেতে হ'লে বা অপর দিকে অরলিয়াঁ, লিসিউ, কাঁন্, ইউর যাবার বাসনা থাকলে এই রেলে অথবা মোটরবাসে যাওয়া যায়।

লাইন অবশ্য এখানকার ষ্টাণ্ডার্ড লাইন, কিন্তু গাড়ীগুলির অবস্থা আর ট্রেণের গতি দেখলে আমাদের বি. এন্. ডব্লিউ রেলের ব্রাঞ্চ-লাইনের কথা মনে পড়ে। রেল ধনিকদের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল, কাজেই সাধারণের সুবিধা তাদের পয়সা আদায়ের সুবিধায় রূপান্তরিত না হ'লে তারা কিছুই গ্রাহ্য করে না।

কাজেই মোটরবাসই অধিক লোকপ্রিয়—ভাড়াও সস্তা।

মোটরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেলের প্রাণ ইউরোপে আজ ওষ্ঠাগত। আশু একটা ব্যবস্থা না হ'লে রেলের কি দশা হবে বলা যায় না।

সম্প্রতি ইনটারন্যাশন্যাল চেম্বার অফ্ কমার্স এ সম্বন্ধে ইংরেজ, ফরাসী আর জার্মাণ মহারথীর কমিশন বসিয়েছে,

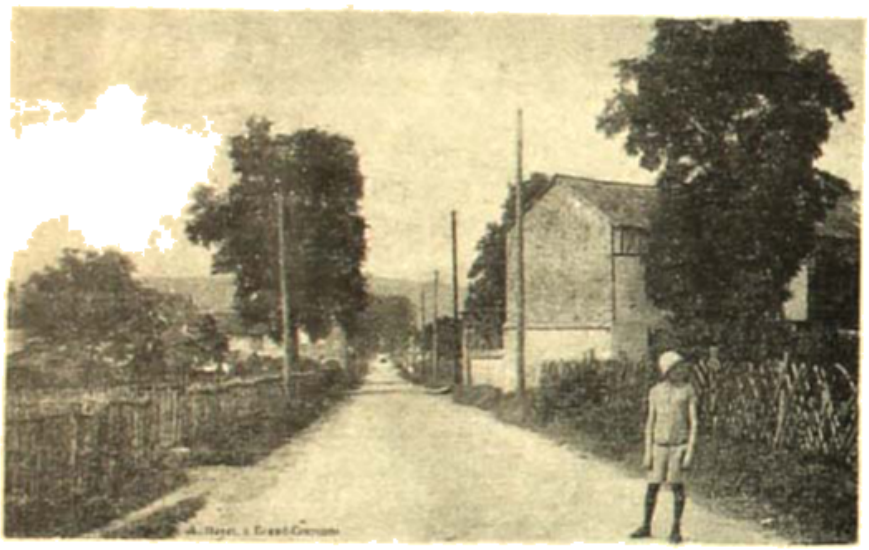

(৯) ফ্রান্সের গাঁয়ের রাস্তা।

তাদের মুখপত্র-রিপোর্ট বেরিয়েছে,—রেলে আর মোটরে জোট পাকিয়ে প্রতিযোগিতা কান্ত করুক, আর বেচারা যাত্রীদের মাথায় যদিচ্ছা কাঁঠাল ভাঙ্গুক :

ফ্রান্সের রেল অবশ্য আসলে ধনিকদের হাতে আর এদের হাতেই সরকার, সুতরাং সে দিন আবার পেট্রোলের উপরে ট্যাক্স বসল।

ফ্রান্সে মোটরবাসের ষ্টেশন আছে, ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুম আছে। বাসগুলো পথ থেকে এসে প্রকাণ্ড একটা ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে রেলের এঞ্জিনের মোড় ফিরাবার কলের মত টার্ণ-টেবিল আছে, এক একখানি বাস এলেই তাকে ঘুরিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়, ছাড়বার 'টাইম' হ'লে যথাসময়ে যে যার গন্তব্যস্থান অভিমুখে ছুটে যায়।

পল্লীগ্রামেও পথের ধারে নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, শুধু সে স্থান গুলিতেই বাস দাঁড়ায়। এদের বাসে আলাদা কণ্ডাক্টার নেই, সোফারের সামনে দিয়ে প্রবেশ-পথ, সোফারই টিকিট দিয়ে বাস চালায়।

গ্রাঁ-জুরোপের বাজারের অনতিদূরে গির্জ্জা, আর গির্জ্জার সামনেই সিনেমা। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সিনেমায় ছবি দেখানো হয়—সারা সপ্তাহ তার বিজ্ঞাপন চলে।

শনিবার সন্ধ্যায় বুড়ীরাও নাতি-নাতনির সঙ্গে ফিল্ম্ দেখতে যায়।

রবিবারে যখন পোষাক পরে' বুড়ীরা গির্জ্জায় যায়, পথে বাইবেল হাতে তাদের দেখলে গয়না-পরা বাঙ্গালী গৃহিণীর কথা মনে পড়ে। পার্থক্য কোন্‌খানে? শুধু বোধ হয় পোষাকে।

পর্ব্বোপলক্ষে সিনেমা-হলে বল-নাচেরও আয়োজন হয়। শুধু ১৪ই।১৫ই জুলাইএর জাতীয় উৎসবে mairie-র সামনে বাজারের মাঠে নৃত্য হয়—সেদিন রং-বেরংএর ইলেক্‌ট্রিক আলোয় আলোয় আর রঙিন কাগজের ফুলে জায়গাটি সাজানো হয়।

১৪ই।১৫ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের বিজয়োৎসব-বার্ষিকী। সারা ফরাসীদেশে এ দুইদিন সারা রাত্রি পথে পথে নেচেও তরুণ তরুণীর দল ক্লান্তি অনুভব করে না। এ সময়ে পারী সহরের পথেও মোড়ে মোড়ে কাফিখানার মালিকেরা বাদ্য-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করে—নৃত্যে ফরাসীরা বিজয়োৎসব মাতিয়ে তোলে। পরিচয়ের প্রয়োজন নেই—যে কোনও তরুণ-এমন কি বিদেশীও, যে কোনও তরুণীকে তার সঙ্গে নৃত্যে আহ্বান করলে বিমুখ হবেনা, আহ্বানে বিমুখ করা এদিন অভদ্রতা।

গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে ইউরোপে সর্ব্বত্র ইউনিভার্সিটির গ্রীষ্মের ছুটি। চীনা, জাপানী, তুর্কী, মিসরীয় যুবকের দল আনন্দে এ স্বাধীনতা-উৎসবে যোগ দেয়, আনন্দ-লোভাতুর পরাধীন ভারত-সন্তানেরও অভাব হয় না। কিন্তু তাদের আনন্দে প্রাণ কোথায়? বঙ্গদেশে যে বিজয়া-উৎসবের

অভিনয় হয় তাতে অতীত স্মৃতি তলিয়ে গিয়ে শুধু ধর্ম্মের নামে নামনাটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে।

এ সব বার্ষিক উৎসব ছাড়া প্রতি সপ্তাহান্তে পল্লীবাসীরা গ্রীষ্মকালে প্রান্তের বনানীমর্ম্মে ছুটে যায়—পিক্‌নিক্ করতে। স্বাধীন জাতি, কাজের দিনে অবসর এদের নেই, ছুটি ও সুযোগ পেলেই দল বেঁধে কোথাও যাওয়া তাই এদের মজ্জাগত।

৮নং ছবিখানি গ্রামান্তের বুড়া ওক-গাছের তলায় এমনি এক পিক্‌নিক পার্টীর কটো। শীতে যখন ক্রমশঃ বনের তলাশয়গুলির জলে বরফ জমতে থাকে, এই গাছেরই নিকটে, সপ্তাহ ছেলেমেয়ের দল স্লেজ দেখতে আসে। তারা আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, বরফ যখেষ্ট পুরু হ'লে "স্কেটিং"-জুতা পায়ে হুড়াহুড়ি করে।

শীতকে এদেশের ছেলেরা ভারী ভালবাসে। যে দিন সারা আকাশে কে যেন ময়দা ছড়াতে থাকে, পথ ঘাট সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে, পাকা রাস্তায় ইস্কুলের ছেলেদের কি আমোদ! তারা আর পা তুলে' তুলে' হাঁটে না, খানিকটা ছুটে যায় আর পিছ্‌লায়,—পিছ্‌লে পিছলে টাল সাম্‌লায়, একবারও কিন্তু পড়ে না।

৯নং ছবি অপেক্ষাকৃত কাঁচা রাস্তার ছবি—নদীতীরের গোচারণ-ভূমি থেকে পাহাড়ের বনানী পর্য্যন্ত চলে' গিয়েছে। গ্রামের বাড়ীগুলির সাম্নে একটু করে' বাগান, বাগানের বেড়া সযত্নে রক্ষিত। কোনও বাড়ীর দেয়াল চুণ-বালি-খসা নয়, পুরানো হলেও, সযত্নে পরিচ্ছন্ন করে' রাখা। রাস্তার ধারে নালার পাশে আগাছা বাড়তে পায় না কখনও।

বারোমাস বৃষ্টি ত' নর্ম্মাণ্ডির লেইন্ উপত্যকায় লেগেই আছে, রাস্তাগুলি এমন সুন্দর ঢাল দিয়ে তৈরী যে কোথাও জল জমে না—বিভিন্ন বাড়ীতে উঠবার সাঁকোর উপরেও নয়।

নিজের অংশটুকুতে প্রত্যেক গৃহকর্ত্তা নিজে ঘর মেরামত করে, অবসর পেলেই দেখা যাবে robe de travail (কাজের জামা লম্বা ছিটের কোট) পরে' গৃহকর্ত্তা বাগানে লেগে আছে, শোবা মুরগী খরগোসদের খাবার দিচ্ছে।

কৃষক-গৃহিণীর খাটুনি আমাদের দেশের মোড়ল-গিন্নীর চেয়ে কোনও অংশে কম না, গুছিয়ে খাটে বলে ঢের বেশী কাজ করে। এরা শুধু 'ঘর ঝাঁট' দিয়েই ঘর পরিষ্কারের কাজ শেষ করে না, কাচের সার্সি, বড় বড় আয়না, দেয়ালের কাগজ পরিষ্কার করা নিত্য কর্ম্ম।

গ্রামের সাধারণ কাপড়-চোপড় (সুতি বা রেশমের) ধোপার বাড়ী যায় না, সপ্তাহান্তে গৃহিণীদেরই সেটি করতে হয়; অথচ একটু ধব্‌ধবে বং ময়লা হ'লেই, এরা সে কাপড় আর ব্যবহার করে না।

সরকারী রাস্তা ব্যবহারোপযোগী রাখবার জন্যে সরকারী কুলি-মিস্ত্রীদের তাগাদা দিতে হয় না—শুধু খাটাবার জন্যে হেড-মিস্ত্রি, সর্দ্দার, ওভারসিয়ার এদেশে নেই। কাজের সময় কল্‌কাতার চীনা-মুটেদের মত প্রত্যেক লোক এদেশে নিজের কাজ ক'রে যায়।

গ্রাঁ-কুরোণে কতই বা লোকের বাস? শ্রমিক পল্লীর লোকসংখ্যা যোগ দিলেও চার পাঁচ হাজারের অধিক হবে না। অবশ্য এখানকার কারখানার অনেক শ্রমিক দূরের গ্রাম থেকেও আসে, আর এদেশে শ্রমিকের অনেক কাজ বন্ধই করে। অথচ এই চার পাঁচ হাজার লোকের জন্যে গ্রামে কোন্ ব্যবস্থা নেই? ফিল্‌টার-করা জল, পরিষ্কার রাস্তা, ইলেক্‌ট্রিকের আলো, প্রতি কারখানায় রেডিও। পোষ্টাফিসে টেলিফোন; ইউরোপের সর্ব্বত্র ত' কথাই নাই, সুদূর আমেরিকায় বাড়ী বাড়ী কথা বলা যায়।

ফ্রান্স বঙ্গদেশের চেয়ে আয়তনে বড়, কিন্তু তার লোক-সংখ্যা বাঙ্গালার চেয়ে কম। বঙ্গদেশের যে কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে গ্রাঁ-কুরোণের চেয়ে বেশী লোক বাস করে।

ফ্রান্সে নব্বই লাখ মোটর যে কোনও অন্তর্নিহিত পল্লীর গৃহকে সহরের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে।

মোটর-উপযোগী রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য চার লক্ষ মাইলের উপর। এ ছাড়া দশ হাজার মাইল খাল আছে, নদীগুলির সহিত যোগান দিয়ে সস্তায় ভারী মাল দেশের নানাস্থানে যায়। চল্লিশ হাজার মাইল রেলপথও মাকড়সার জালের মত দেশটাকে ছেয়ে আছে।

গত সেন্সস্-রিপোর্ট অনুযায়ী বঙ্গদেশ বর্ত্তমানের দুইগুণ লোকসংখ্যা ধারণ করতে পারে। মনে হয়, তাই ওদেশে জন্ম-নিরোধ-পন্থা প্রচলিত হওয়া উচিত। কারণ দেশে কম লোক থাকলে দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের বেশের লোকের চিরদিন বজায় থাকবে। সুতরাং বঙ্গের গ্রামবাসীদের নির্দ্দিষ্ট গ্রামখানির বাহিরে আসবার প্রয়োজন নেই, পচা খানাডোবার পাশে ম্যালেরিয়ায় মরে' বরং তারা লোকসংখ্যা কমাতে চেষ্টা করুক।

সত্যপীরের মেলা

—শ্রীঅনন্ত মুখোপাধ্যায়

১

শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত ও শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসীর একমাত্র ষোড়শী অনূঢ়া কন্যা শ্রীমতী কুহুবালা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া যে উপন্যাসখানা তন্ময় চিত্তে পড়িতেছিল তাহার নাম—'যদি জীবনে বর্ষা নামে!'

উক্ত অসমাপ্ত উপন্যাসের যে অংশটি মনে মনে নীরবে সে পাঠ করিতেছিল, তাহা সরবে পাঠ করিলে এইরূপ শোনা যাইত—

পল্লিবধূর হাত তখন চলে পড়ল তার প্রিয়ার বুকে—সমুদ্রতীরের অসমাপ্ত মায়াজালের আবরণ ছেড়ে ফেলে। দূরে—মাঠের যেখানে শেষ হয়েছে, তারি খা খেঁষে অলসভাবে উদ্দেশে ঘর চলেছিল একটা দীর্ঘকায় নদী—তার চোখ-ভরা জল—ছল্ ছল্, বুকভরা ঢেউ—কল্ কল্। বাঁকের ধারে, স্রোতের বেগবানটায় যেখানটায় বড্ড টান, ঠিক সেই জায়গাটাতে কিসের উদ্দেশে ঝুঁকে এসে পড়েছিল, পাড়ের ওপরকার একটা ডাল-করবচা গাছের প্রকাণ্ড শাখা, সবুজ-পাতায় ঘেরা—কাঁটায় কাঁটায় ভরা।

পুষ্পিত হয়ে ছিল সেই জায়গাটার, যেখানটায় তার ছায়া এসে পড়েছিল। সে ভাবছিল—ঐ তখন, ঐ নদী, এই তরু—কেউ নেই এদের বাধা দিতে; বাধাও এরা। এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশই নিরর্থ, কৈফিয়ৎ দিতে হয় না কাকেও। কিন্তু মানুষের বেলা কেন পদে পদে এত বাধা! কিসের জন্যে আজ দুঃখের জোয়ারের জল ছাপিয়ে ওঠে আমার সারাটা হৃদয়ে! সামাজিক বাধার হিমালয় মাঝে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কেন। কিন্তু মানবো না কিছুই, কিছুই শুনবো না। ভেঙে দেবো টুকরো টুকরো করে, সমুখের ঐ বাধার বিরাট অন্তরালটা পাষাণ! প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল শতদলবাসিনী যে আমারই জন্যে জলাবনের অপূর্ব সৃজন। মলিনী! ডালিম! বেলী!—

কিন্তু আর পড়া হইল না।

ঘরের একপার্শ্ব হইতে পিতা কন্যাকে দুইবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া, তিন বারের বার যখন একটু বিরক্ত হইয়া ডাকিলেন—"শুনতে পাচ্ছিস না কুহু?" তখন বইখানি বন্ধ করিয়া কুহু কহিল, "কি বলচ? ঠিক যেখানটায় ক্লাইমাক্স সেইখানটাতেই তুমি সব নষ্ট করে দিলে! কি বলচ?"

নটবরবাবু হুঁচমুতা ও একপাটা ছেঁড়াকাপড় লইয়া বসিয়া ছিলেন। কহিলেন—"সুতোটা ছুঁচে পরিয়ে দে দেখি, চশমাতেও আমি পাচ্চি না।—কি ছাইয়ের বই পড়চিস? কত সব বাজে গল্পের বই-ই ত দেখি গাদা গাদা পড়িস, নিজের পড়ার বই—এত বেলা হ'ল, মাষ্টার আজ আসে নি কেন?"

"বাজে বই কি গো! 'যদি জীবনে বর্ষা নামে!'—এরকম বই যে বাংলায় খুব কমই আছে। তোমাদের সেকালের বঙ্কিম-কঙ্কিমের লেখা এসব লেখার কাছে দাঁড়াতে—"

"দে—দে, বাজে বকিস নি, সুতোটা পরিয়ে দে। দিয়ে, বইটই নিয়ে নীচে পড়বার ঘরে যা, কিসলয় হয় ত এতক্ষণ আসবে।"

কন্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার মাতা এক পয়সার চানাচুরের প্যাকেট হইতে চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে, লঘু গতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চোখে সোনার চশমা, বুকে ব্রোচ, পায়ে সুদৃশ্য স্যাণ্ডেল। সুন্দর সুশোভন তৈল-মুক্ত কেশগুচ্ছ তাহার এলো-খোঁপায় বাঁধা পড়িয়াছিল, আর ছাপা-সাড়ীর মনোরম আঁচলখানি বক্ষ বেড়িয়া পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছিল।

তরঙ্গিণী ঘরে ঢুকিয়াই কহিল—"ওস্তাগর সাহেব, টাকা একটা দিতে হবে, সেই ছেলেটি এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েচে।"

ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিতে দিতে, মুখ না তুলিয়াই নটবর-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ছেলেটি?"

"বলচি। কিন্তু, এ তোমার হচ্চে কি শুনি? সকাল বেলায় একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে বসেচ যে, এতে তোমার কী সাশ্রয়টা হবে ওস্তাগর মশাই? দৃষ্টি-কিরণে স্বভাবটা তোমার আর কিছুতেই গেল না দেখছি।"

"বোঝ না, তরু, বোঝ না। এই পাঁচখানা কাপড় জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু সেরে রাখলে বাসন-ওলী মাগীদের কাছ থেকে এর বদলে যা'হোক কিছু পাওয়া যাবে এখন। বাইরে কে এসে দাঁড়িয়ে রয়েচে?"

ড্রেসিং-আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিজের দেহারা দেখিতে দেখিতে তরঙ্গিণী কহিল—"যাকে কিছু টাকা দেবে বলেছিলে। সেই যে গো, কোথায় জলকষ্ট হয়েচে বাঁকড়ো না বীরভূম।"

কতুয়ার পকেট হইতে একটা আনি বাহির করিয়া নটবর-বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন ও প্রায় মিনিট পনর ধরিয়া সেই জলকষ্ট-ছেলেটির সঙ্গে নানাপ্রকার তর্ক ও বিতর্ক করিয়া, হাতের আনিটা তাহার পূর্বস্থানে অর্থাৎ কতুয়ার পকেটে রাখিয়া দিয়া কহিলেন—"হবে আর কি করব বাপু—যাও তা'হ'লে।"

অগত্যা ছেলেটি হতাশ হইয়া চলিয়া গেল এবং নটবরবাবু কন্যার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অনুবাদের খাতাখানা হাতে করিয়া, কুহু মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তখন কহিতেছিল—"তোমার স্বাস্থ্য বড় খারাপ,—your hygiene is very bad,—হ'য়েচে মাষ্টার মশাই?" মাষ্টার মহাশয় কিসলয় কহিল—"ও জায়গায় কি hygiene হয়? health বলতে হবে।"

"কেন মাষ্টার মশাই? আমাদের 3rd periodএ পড়া হয়, রুটীনে লেখা আছে—hygiene।"

নটবরবাবু বাল্যকালে প্যারিচরণের ফার্ষ্টবুক কয়েকপাতা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজীর সীমা সেই পর্য্যন্তই ছিল। সুতরাং কন্যার বিদ্যার তীক্ষ্ণতা ও তৎসম্বন্ধে জেরা করিবার শক্তি দেখিয়া তিনি কহিলেন—"যাও বাবা, বুঝিয়ে দাও, ওটা কেন হবে না আর এটাই বা কেন হবে। কুহুকে আমার হটান—হিঃ হিঃ—বড় শক্ত কাজ! ওকে পড়ান যার-তার কর্ম্ম নয়। এক-একটা বড় বড় ইংরিজী কথা নিয়ে ও আপেষ মাষ্টারের মাথা ঘুরিয়ে দিত—হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

কিসলয় কুহুর খাতাখানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বল ত, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—কি হবে?"

"সেলফ্ প্রিজারভেসন্—"

"প্রিজারভেসন্ নয়—প্রিজার্ভেসন্।"

"হাঁ হাঁ ঠিক; Self-preservation is the best law of nature।"

নটবরবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন—"ওইটুকু বাংলায় এতখানি ইংরিজী! কুহু দেখছি সবই আয়ত্ত করে ফেললে।"

এমন সময় অন্দর হইতে নটবরবাবুর ডাক পড়িল। কন্যার অগাধ বিদ্যালাভে পুলকিত-অন্তর নটবরবাবু বিপুল দেহভার লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিসলয় কুহুর খাতায় পেন্সিল দিয়া জ্যামিতির একটা চিত্রের আঁকিয়া দিয়া কহিল, "—প্রুফ কর ত যে এটা এটার চেয়ে বড়।"

নটবরবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণয় দৃষ্টিতে কুহুর মুখের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার মুখের তাৎক্ষণিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তরটা শুনিয়া যাইবেন বলিয়া।

কুহু পেন্সিল হাতে লইয়া প্রুফ করিতে সুরু করিল,—"Two sides of a triangle are greater than the third and a point is that which has position but no magnitude, so that—"

নটবরবাবু বিদ্যাবত্তার কন্যার অদ্ভুত শক্তি দর্শন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সহাস্যমুখে—"বেশ—বেশ—বেশ" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কুহুর প্রুফ চলিতে লাগিল—"so that—so that—so that—and so that." তারপর যখন নটবরবাবুর চটিজুতার ফট্ ফট্ শব্দ অন্দরের ভিতর গিয়া মিলাইয়া গেল, তখন কুহু খাতার সাদা পাতায় একটা কুত্তের ছবি আঁকিয়া কহিল—"পারব না মাষ্টার মশাই।"

"পারতেই হ'বে; এ ত পুরোনো পড়া।"

"নতুন হ'লে পারতুম, পুরোনো বলে পারব না।"

"একটু ভেবে চেষ্টা কর, না পারলে—"

"না পারলে কি হ'বে?"

"বেত।"

"ক' ঘা?"

"তুমি বড্ড বেশী জ্যাঠা হ'য়েচ। তোমার বাবাকে ডেকে ব'লে দেব?"

"আচ্ছা, জ্যামিতির বদলে কবিতা মুখস্থ বলবো মাষ্টার মশাই—

আমি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু পরম প্রভাতে!
যে যাহঃ বলে, প্রাণের অন্ন
তুলিয়ে অমল শোভাতে।"

মুক্ত জানালা দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কিসলয় কহিল—

"কিন্তু তুমি কুহু দিন দিন হচ্ছ
দুষ্টু, ঘৎপরোনাস্তি।
মেকির ওপর লীল চাটন করে
লীল চাটন করে—লীল চাটন করে—লীল চাটন করে—"

কুহু কহিল—"মেলাতে পাচ্ছেন না?—

লীল চাটন করে, দেব সমুচিত শাস্তি।

আপনি পারলেন না, আমি কেমন মিলিয়ে দিলুম, দেখুন মাষ্টার মশাই।"

আজকাল কিছুদিন হইতে নিত্য নিয়মিত এইরূপভাবেই ইহাদের পড়াশুনা ও শিক্ষাদান হয়।

কিন্তু ইহার ভিতর একটি কথা আছে।

কিসলয় ছদ্মবেশ হইল কুহুকে পড়াইতেছে। কিসলয় সুন্দর, সুদর্শন, শিক্ষিত। নটবরবাবু অনুসন্ধানের দ্বারা জানিয়াছেন, সংসারে মা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই এবং মায়ের হাতে অনেক পয়সা। আরো জানিয়াছেন, কিসলয়রা তাঁহাদেরই পালটি-ঘর। কুহুকে শীঘ্রই পাত্রস্থ করিতে হইবে। এবং কিসলয়ের মত অন্য কোন সুপাত্রের হাতে দিতে গেলে, যেমন তেমন করিয়া হউক, চারি পাঁচহাজার টাকার কমে কিছুতেই এ কাজ সম্পন্ন হইবে না। তাই তিনি মাস দুই তিন হইল এই ফন্দী খাটাইয়াছেন যে, কিসলয়কে তাহার মাতার অজ্ঞাতে বুঝাইয়া-সুজাইয়া রাজী করাইয়া, কুহুকে তাহার হাতেই দিয়া দিবেন।

নটবরবাবু অত্যন্ত হিসাবী লোক। তিনি সব দিক হিসাব না করিয়া কোন কাজ করেন না। তিনি দেখিলেন যে, অন্য পাত্রে কন্যা দিতে গেলে তাঁহার যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইবে, এ ক্ষেত্রে তার তুলনায় একরূপ বিনাব্যয়েই কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে। তাহার পর, কিসলয়ের মাতার অবর্ত্তমানে, সেদিককার এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে এদিককার, এই উভয় দিককার সম্পত্তিরই কুহু অধিকারিণী হইবে। এবিষয়ে তরঙ্গিণীর সহিত পরামর্শ করিলে, তাহারও ইহাতে মত হয়। তারপর, মাস দুই তিন পূর্ব্বে নটবরবাবু ও তরঙ্গিণী একদিন গোপনে কিসলয়ের কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, বুঝাইয়া, অনুরোধ করিয়া তাহার মত করেন। এ মত পাইতে তাঁহাদের বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। সেদিন নটবরবাবু

কিসলয়কে বলিয়াছিলেন—"কিন্তু বাবাজী, এখন ঘুণাক্ষরেও যেন একথা কাকেও ব'লো না,—মুহুকেও না। সামনে ওর জন্মতিথিটা পার হ'য়ে গেলেই আমি দুএক মাসের জন্ম একটু কোথাও হাওয়া বদলাতে যাব। তারপর ফিরে এসেই চার হাত এক করে দেব।" কিসলয় আর সকলের কাছে এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেও মুহুর কাছে কিন্তু পারে নাই।

সেদিন নিভৃতে, পড়িবার ঘরে, ইতিহাস পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কিসলয়ের নিকট হইতে মুহু এই সংবাদ শুনিল, সেদিন সে বই ফেলিয়া দিয়া, লজ্জায় রাঙ্গা মুখখানাকে ঘুরাইয়া, 'ধাঃ—ন্' বলিয়া গুড়্ গুড়্ করিয়া উপরে পলাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অসুখের ভাণ করিয়া সে দুইদিন আর পড়িতে আসে নাই। তাহার পর যেদিন আসিল, সেদিন কিসলয় যখন জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় পছন্দ হয় ত?" তখন মুহু বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হঠাৎ পড়াতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়াছিল এবং অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিয়াছিল—"অমন কল্লে আমি কিন্তু পড়ব না। আপনি ভারি—"

"ভারি কি?"

"দুষ্টু।"

কিন্তু ইহা প্রথম কয়দিনের কথা। তাহার পর, যেমন হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন সুরু হইল। তাহার পর আরও পরিবর্ত্তন। বর্ত্তমানে ঘোর পরিবর্ত্তন।

২

কিসলয় বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—"মা!"

জানদা সম্মুখে আসিয়া কহিল—"রোজ এই এত বেলা পর্য্যন্ত থাকিস কোথায় রে? সকালেও ঘরে থাকবি না, সন্ধ্যাতেও ঘরে থাকবি না। বাজারটা—দোকানটাও ত করবার দরকার হয়?"

"কেন, কালীর মা?"

"কালীর মা হ'ল, কি। ওকে দিয়ে চার আনার জিনিস আনতে দিলে ও তার ভেতর থেকে দুটো পয়সা সরাবে। আমার ত কলসীর জল গড়িয়ে খাওয়া, বাবা! আমি মেয়ে, তাই বিধবা হ'য়ে এই তের বছর কাল কলের মত সংসার চালিয়ে আসছি। কতদিকে কত কিকির-কন্দি করে যে সংসার চালাই, তা তুই জানবি কোথা থেকে!"

কিসলয় যে সকাল-সন্ধ্যায় মুহুকে নিত্য পড়াইত, এ কথা পর্য্যন্ত সে মায়ের নিকট গোপন রাখিয়াছিল। কহিল—"আমিও যে কত কিকির-কন্দিতে ঘুরি, তা তুমি জানবে কি করে? এমন একখানা বাড়ী ক'লকাতা সহরে অমনি পেয়েও বুঝি হাতছাড়া হয়!"

জানদা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী? বাড়ী কে দিলে রে?"

"আমার এক মাড়োয়ারী বন্ধু আছে—হীরালাল নন্দকিশোর—তারই মা। অগাধ টাকার মালিক। কালীঘাটের কালীকে একটা হীরের ক্রস দিয়েছে, সাড়ে একুশ হাজার টাকা দাম। ধর্ম্ম-কর্ম্মে ওদের মত দান ত আর কারুর নেই। তোমার কাছে এতদিন গোপন রেখেছিলুম, কি জানি হয় কি না হয়! এখন হ'ল যদি, একশটা টাকার জন্যে অমন বাড়ীখানা বুঝি বা হারাতে হয়।"

মাতার প্রশ্নের উত্তরে কিসলয় সবিস্তারে যাহা বলিল, তাহা হইতেছে এই যে, হীরালাল নন্দকিশোর তাহাকে খুব ভালবাসেন। সেই সূত্রে তাহার বুড়া মাও তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন। সম্প্রতি ধর্ম্মাদি কার্য্যে তিনি দুই হাতে খরচ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কালীঘাটের কালীকে ২১ হাজার টাকা মূল্যের ক্রোচ দিয়াছেন। তিন লাখ টাকা ব্যয় করিয়া হরিদ্বারের ঐদিকে ধরমশালা করিয়া দিয়াছেন। এবং আরও কত কি করিয়াছেন। এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ বলিয়া কিসলয়কেও বড়বাজারে একখানি দোতালা বাড়ী দান করিয়াছেন। আগে হইতে লেখাপড়া, রেজেষ্ট্রী প্রভৃতি হইয়াছিল, গত মহালয়া অমাবস্যার দিন ঐ রেজেষ্ট্রী দলীল, স্বহস্তে, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বৃদ্ধা তাহাকে দান করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ বাড়ীর মালিক, কিসলয়। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে যে ট্যাক্স,নাম-খারিজ প্রভৃতির জন্য আজিকার মধ্যেই একশটি টাকা জমা দিতে হইবে, এবং তাহা না দিতে পারিলে বাড়ীখানি মিউনিসিপ্যালিটি নীলামে চড়াইবে।

জানদা জিজ্ঞাসা করিল—"দোতলা বাড়ী? বড়বাজারে?"

"হ্যাঁ গো, কতবার ব'লব? মুহু-দিদা।"

"মুহুবালা বুঝি নাম? তা ব্রাহ্মণকে দেবে, তুই দ্বিজির—কায়েত, তোকে দিলে কি রকম?"

"আরে মাড়োয়ারী জাত—আমাদের বামুন-কায়েত-বৈবর্ত্ত এসব ওরা কি বুঝবে ছাই! আমি বলেছি—আমরা খুব বড় বামুন—মিত্র—অর্থাৎ দুনিয়াকা দোস্ত্ হ্যায়।"

"তা এরকম হয় বৈকি। ঐ নগেন ভট্চাযিরা যে বাড়ীতে আছে, ও বাড়ী ওদের এই রকম পাওয়া। কে এক ওদের মস্ত শিষ্যি, ওদের ওই বাড়ীখানা দান করেছিল। ভূমিদান, গৃহদানে যে মস্ত পুণ্যি!"

"পুণ্যি ত বটে। কিন্তু একশ'টা টাকার জন্যে যে এদিকে সবই পুন্যি হয়ে যায়। বাড়ীটাতে একটা ভাড়াটে বসিয়ে দিলে, মাসে সেড়শোটা করে টাকা আর দেখতে হবে না।—চান করি গিয়ে, শীগ্‌গির আমাকে দুটি ভাত দাও। হাতে পেয়েও বাড়ীখানা বুঝি বা যায়।"

পরক্ষণে কিসলয় চলিয়া গেল।

জানদা তখন তাহার বাটী-প্রাপ্তির কথাটা নানাদিক দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে হর্ষ ও আনন্দই বেশী স্থান অধিকার করিল, কিন্তু একটা সন্দেহের ছায়াও তথায় মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তবে, নগেন উকীলবাবুদের কথাটাও বার বার তাহার মনে হওয়ায়, সন্দেহ ও ভয়টা তথায় স্থায়ী হইতে পারিল না।

বৈকালে কিসলয় এক জুয়েলারী দোকানে এক ছড়া সরু সোনার হারের অর্ডার দিয়া আসিল। লকেটের একদিকে লেখা থাকিবে—'কুহকে-কিসলয়', আর একদিকে থাকিবে—'জন্মদিনের উপহার'।

জানদা অত্যন্ত চতুর হইয়াও, লোভে পড়িয়া পুত্রের কথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে একশ'টি টাকা পুত্রকে দিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু দু'চার দিন পরেই যখন সে পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিল, যে, কিসলয় তাহাকে পরিষ্কার রূপে ঠকাইয়াছে, তখন সে অন্যকে ঠকাইয়া তাহার এই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, এবং এই সূত্রে একদিন মধ্যাহ্নে পাশের বাড়ীর বুড়ীর মার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল,—"কেমন আছ গো বড় গিন্নী ?"

বড় গিন্নী তখন পা ছড়াইয়া সম্মুখে পানের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া ছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কাল জানদা তাহার সঙ্গে গল্প-গাছা করিয়া কহিল—"উঠি ভাই ; আমার 'জয়-জগন্নাথে'র আসবার সময় হ'ল।"

"সে আবার কে লো ?"

"সে ভাই আমার এক মক্কেল আছে। পুরী জেলায় বাড়ী। জুয়ো খেলে বেড়ায়। একশ'টি টাকা কাল ধার করে নিয়ে গিয়েছে, তারির এক টাকা সুদ দিতে আসবে আজ।"

"টাকা নিতে না নিতেই সুদ দিয়ে যাবে ?"

"এ সেরকম সুদ নয় ভাই। এই যে একশ'টা টাকা কাল নিয়ে গেছে, তার সুদই বল আর আসলই বল, ঐ রোজ একটি করে টাকা এসে দিয়ে যাবে। এ রকম দু'মাস দেবে।"

"বলিস কি লো! দু' মাসে হ'ল গিয়ে একশ' আশী দিন, এই ১৮০ দিনে ১৮০ টাকা দেবে ?"

"তাই ত দেয়। এর আগে দু' বার এই রকম দিয়েছিলুম। কাল এসে বল্লে—'মা-ঠাকরোন, জয়-জগন্নাথ! দুশ' টাকা এবার দিতে হবে, দু-টাকা করে রোজ দিয়ে যাব।'—তা টাকা হাতে থাকলে দু'শোই দিতুম। একশোটি ছাড়া আর হাতে ছিল না। তা, একটু যেন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে, 'জয় জগন্নাথ' বলে চলে গেল। জুয়ো খেলে লোকটা অসম্ভব উপায়—"

বুড়ীর মা লুব্ধের লোভে ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। জানদার কথায় বাধা দিয়া, তাহার মাথা ধরিয়া নিজের মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া কানে কানে কি বলিল এবং তাহার পর উঠিয়া গিয়া দশ টাকার দশখানি নোট গণিয়া জানদার হাতে দিয়া কহিল—"বুড়ীর হুকুম সেই টাকাটা যে ভাই। আমার মাথার দিব্যি, কাউকে এ টাকার কথা যেন প্রকাশ করিস নি।" জানদা ঘাড় নাড়িয়া, আঁচলে নোট কয়খানি বাঁধিতে বাঁধিতে আপন গৃহের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

নোট কয়খানা লইবার সময় নীতির একটা ধাক্কা তাহার মনে লাগিয়াছিল, কিন্তু টাকা পয়সার ক্ষতির ধাক্কাই তাহার কাছে বড়। সুতরাং সে ধাক্কার ব্যথা সারাইতে এ ধাক্কাকে সে আমলই দিল না।

পাঁচ দিন ধরিয়া প্রত্যহ একটি করিয়া টাকা জানদা বুড়ীর মাকে আসিয়া দিয়া গেল। ষষ্ঠ দিবসে জানদা আসিয়া বিষাদ-মলিন মুখে কহিল—"বড় গিন্নী, তুমিও ডুবলে, আমিও ডুবলুম!" বুড়ীর মার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কহিল—"কি লো, ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! মুখপোড়া জয়-জগন্নাথ আমাদের ডোবালে আর কি!" বলিয়া, বুড়ীর মার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি সব বলিতে লাগিল। বুড়ীর মা শুনিতে শুনিতে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে দশ বছর জেল দিয়েচে!"

জানদা গালে হাত দিয়া কহিল—"সে মুখপোড়ার যাই হোক, আমাদের লোকসানের বরাতটা কি রকম, তাই তুমি বল। জল-আস্ত দু'-দু'শো টাকা। কারুর কাছে কিছু বলবার কইবারও জো নেই। জুয়া-খেলায় টাকা ধার দিলে, যে ধার দেয়, তার পর্য্যন্ত না কি জেল হয়, আইনে আছে। কি কুক্ষণেই বেটা এবার এসেছিল লো!"

জানদাও বুড়ীর মা'র পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

৩

জানদার বাতাস বুড়ীর-মা'র গায়ে আসিয়া লাগিল। অর্থাৎ বুড়ীর-মাও তাহার এই ক্ষতি সহ্য করিতে স্বীকার না হইয়া, ইহার পূরণ করিবার ইচ্ছায় মতলব খুঁজিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই মতলব স্থির হইয়া গেল।

বুড়ীর বাবা চন্দ্রবাবু আহারান্তে তাঁহার ঘরে শয্যায় শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়টা প্রত্যহ কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। একদিন রোহিণী যেমন কৃষ্ণকান্তের ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিল, আজ বুড়ীর মাও সেইরূপ সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, চন্দ্রবাবু চক্ষু বুজিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন এবং কৃষ্ণকান্তের মতই তাঁহার গুরুগম্ভীর নাসিকাধ্বনি হইতেছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, চন্দ্রবাবু অহিফেন-সেবী ছিলেন না, সুতরাং

তৎপ্রসঙ্গে সে সময় তিনি 'তস্কার বেটা বিষ্ণু' বা 'হরি ঘোষের' মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কোন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন না, এবং বুড়ীর মা তাঁহার বাক্সিদের তলা হইতে চাবি লইয়া যখন খট্ করিয়া তাঁহার আলমারী খুলিল, তখন সেই খট্ শব্দে কুম্ভকর্ণের মত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গও হইল না। চন্দ্রবাবু নাসিকাধ্বনির সহিত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ব্যাঙ্ক হইতে সদ্য আনীত সহস্র মুদ্রার নোটের মধ্য হইতে যে বেমালুম একশত টাকা চুরি হইয়া গেল এবং এ চোর যে বাহিরের কেহ নহে, তাঁহারই চিরকালের মন-চোর, এ সকলের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু সেই দিন, তখন জানিতে না পারিলেও, দুই চারিদিন পরে চন্দ্রবাবু ইহা জানিতে পারিলেন। বুড়ীর মাকে এই কথা বলাতে, বুড়ীর মা কহিল,—"বেশ হ'য়েছে, উচিত হ'য়েছে। যেমন বিশ্বাস করে টাকাকড়ি কারুর কাছে রাখ না, ঠিক তার প্রতিফল হ'য়েছে।" চন্দ্রবাবু কহিলেন,—"কিন্তু গেল কোথায়? বেয়াল্লিশ থেকে এক শ' টাকার নোট—হ'ল কি?"

"আরশোলায় খেয়েছে নিশ্চয়, তা ছাড়া আর হবে কি!"

"দশ-দশখানা নোট আরশোলায় খেলে? তোমার এ ছিষ্টিছাড়া কথা———"

"ছিষ্টিছাড়া কথা নয়, হতে পথই পারে।"

দুই দিন যাইয়া চন্দ্রবাবুর আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল। তৃতীয় দিনে, ঠোঙাচে বাতাসটা তাঁহাকেও স্পর্শ করিল। অর্থাৎ তিনিও স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, যেমন করিয়া হউক, এই ক্ষতি তাঁহাকে পূরণ করিয়া লইতেই হইবে। যতদিন না তাঁহার এই ক্ষতিপূরণ হয়, ততদিন তাঁহার খাইয়া সুখ নাই, ঘুমাইয়া সুখ নাই, বসিয়া সুখ নাই, বেড়াইয়া সুখ নাই।

চিরকালের মধ্যাহ্নের দিবানিদ্রা তাঁহার ঘুচিয়া গিয়াছে। কয় দিনেই তাঁহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত মধ্যাহ্ন তিনি পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়ান। ক্রমে পথের লোকজন ও বাতাসও তাঁহার ভাল লাগিল না। পথ ছাড়িয়া তিনি পার্ক ধরিলেন। অর্থাৎ সমস্ত মধ্যাহ্নটা তিনি নিকটের এক পার্কের বৃক্ষ-ছায়ায় বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন পার্কে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 'লনে'র ঠিক মধ্যস্থলে, ঘাসের উপর, সেই দুপুরের কড়া রৌদ্রে এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। লোকটি যেরূপ মোটা এবং কালো, সেরূপ যে জগতে আর দ্বিতীয় নাই এমন নহে। তবে এই প্রখর রৌদ্রে উন্মুক্ত 'লনে'র মধ্যস্থলে ঐ ভাবে বসিয়া থাকাটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু চন্দ্রবাবু মনে মনে ইহার কারণ বুঝিয়া লইলেন এবং এক পা এক পা করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নিশ্চয়ই বেশী; পাঁচশ—না, হাজার?"

লোকটি বিস্ময়ের চাহনিতে চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না। মশায়ের নাম?"

"শ্যামব্রহ্ম বর্দ্ধন।—ম'শায়ের?"

"নটবরচন্দ্র দত্ত।"

"দত্ত ম'শায়ের এইরকম ভাবে এই রোদে বসে থাকবার কারণ নিশ্চয়ই—"

"নিশ্চয়ই কিছু আছে বই কি। কারণ,—ডাক্তারের হুকুম। শরীরটা বড্ডই—বে-জুত্ হ'য়ে পড়েছে। তাই, ক'দিন ধরে ওষুধও খাচ্ছি আর ডাক্তারের হুকুমে, ঐ যে কি হলে, তাই লাগাচ্ছি।"

"কি লাগাচ্ছেন?"

"ঐ যে সূর্য্য থেকে কি বেরোয়? অত বড় নামটা মনেও থাকে না ছাই! ওই যে,—উল্টো ভাই—উল্টো ভাই—উল্টো ভাই লাটের—"

"ও:! আল্ট্রা-ভায়োলেট যে?"

নটবরবাবু হাসিয়া কহিলেন—"হাঁ হাঁ।—ওই বটে।"

অল্প কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তায় উভয়ের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল এবং ঘণ্টাখানেকের আলাপের ফলে উভয়ে উভয়কে বন্ধুরূপে বরণ করিলেন।

নটবরবাবু কহিলেন,—শরীরটা সারতে বাইরেই একবার যাব। এতদিন যেখানে হয় এক জায়গায় চলে যেতুম, মেয়েটার জন্মতিথি বলে যেতে পারি নি। এইবার আর দেরী করব না, দু'চারদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। গিরিডিতেই যাব মনে করছি। সুবিধেমত একখানা ভাল বাড়ী পেলেই হয়।"

শ্যামব্রহ্ম অর্থাৎ চন্দ্রবাবু কহিলেন,—গিরিডি যদি যেতে চান ত, সেখানে আমারই খানা বাড়ী রয়েছে। ৮ খানা ঘর, দালান, বারান্দা, টিনটে পায়খানা, ছটো ইঁদারা। ষ্টেশন থেকে দু'মিনিটের পথ। আপনি কখন গিরিডি গিয়েছিলেন কি?"

নটবরবাবু বলিলেন—"না।"

"তা'হলে গিরিডিতেই যান। কোন অসুখ আর আপনার থাকবে না। আমার বাড়ীর মত বাড়ী গিরিডিতে নেই। পার্ক রোডের উপরেই বাড়ী। 'শ্যাম-নিবাস' বললে, অজ্ঞতেও বাড়ী দেখিয়ে দেবে। বরাবরই ৭০৲ টাকায় ভাড়া একটা ছিল, এই একমাস হ'ল—"

"স—ত্ত—র টাকা!" নটবরবাবু একটু চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"বড্ড বেশী ভাড়া হয় তা'হলে, শ্যামবাবু। আমার মাস তিনেক অন্ততঃ থাকতে হবে কি না। ভাড়াটা কম না হ'লে—বুঝছেন ত?"

"আপনার সঙ্গে যখন বন্ধুত্বই হ'য়ে গেল, তখন ভাড়ার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলব না। আপনার যা দিলে ভাল

হয়, তাই দেবেন। তবে দু'মাসের ভাড়া আপনি আমায় দিয়ে যাবেন, আমি রসিদ আর বাড়ীর চাবি আপনাকে খুলে দেবার জন্যে দরোয়ানকে একখানা চিঠি লিখে আপনার হাত দিয়ে দেব। দরোয়ানকে আলাদা ডাকেও আমি চিঠি একখানা আজই লিখে দেব এখন।"

এই সূত্রে দুইজনে আরও অনেক কথা হইল। মোটের উপর ইহাই ঠিক হইল যে, নটবরবাবু ৫০৲ টাকা হিসাবে তিনমাসের জন্য পার্ক রোডের 'শ্যাম-নিবাস' বাড়ীটি ভাড়া লইবেন এবং অদ্যই শ্যামব্রহ্মবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দুই মাসের ভাড়াই তাঁহাকে দিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। নেহাৎ দুইমাসের বদি না হইয়া উঠে ত একমাসের দেবেন এবং বাকী টাকা পরে সময়মত দিবেন।

অতঃপর নটবরবাবু নূতন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে কহিলেন—"দরোয়ানকে আলাদা ডাকে একখানা চিঠি যা দেবেন, তা দেবেন। আমার হাত দিয়েও একখানা তাহ'লে দেবেন।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু সাতদিন পরে, আপনার শরীরের বিষয় জানিয়ে আমায় চিঠি একখানা দেওয়াই চাই। ঠিকানাটা আমার মনে আছে ত?"

"৪৬ নং কেষ্ট কাহার লেন, বাগুড়বাগান ত?"

"আজ্ঞে। রসিদখানাতেও আমার ঠিকানাটা লিখে দেব। দরোয়ানের কাছ থেকেও পেতে পারবেন। আপনার মেয়েটিও সঙ্গে যাবে ত, কি নাম—কুহু বললেন না?"

"আজ্ঞে হাঁ, কুমারী কুহুবালা।"

৪

নটবরবাবুর গৃহ। পড়িবার ঘর।

কুহু ও কিসলয়।

একজনের চোখ ছল্-ছল্, আর একজনের দীর্ঘশ্বাস। একজন দেওয়ালে দেহভার রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া, আর একজন সেই দেওয়ালের দিকে মূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। প্রায় মিনিট-দুই কাল এইভাবে কাটিবার পর কুহু বলিল—"চিঠি দিও।"

"সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিও। বইগুলো নিয়ে যাচ্ছ ত? একটু একটু পোড়ো।"

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট কণ্ঠে কুহু কহিল—"পারব না পড়তে।" চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

আবার উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নটবরবাবুর চটির শব্দ উঠিল। কুহু তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া পাশের চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া তাহার বইগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। নটবরবাবু ঘরের মধ্যে ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া কিসলয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল বাবাজী, তোমার জলখাবার সাজিয়ে যে তোমার মা অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছেন। দু'তিন মাস ত আর দেখা শুনা হবে না। এস - এস, বেলা গেল, সন্ধ্যে হ'লেই আমাদের সব তৈরী হ'য়ে নিতে হবে। আয়, মা আয়। তোর বই-টই গুলো সব গুছিয়ে নিয়েছিস ত?"

কিসলয়ের হাত ধরিয়া নটবরবাবু অন্ধরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পশ্চিমের মুক্ত বাতায়ন দিয়া যে একটুখানি ম্লান রৌদ্র ঘরের দেওয়ালে আসিয়া পড়িয়াছিল, অপরাহ্নের সূর্য্য সেটুকু সঙ্গে লইয়া পশ্চিমাকাশে লুকাইয়া পড়িল।

* * *

উক্ত বিদায়-দিনের পরবর্ত্তী প্রভাতে গিরিডি রেল-ষ্টেসনের সাহিবে পথের উপর একস্থানে বহুলোক জমিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি দলে ছিলেন—নটবরবাবু, তাঁহার স্ত্রী তরঙ্গিণী, কন্যা কুহু এবং ভৃত্য সারদা। অপর একটি দলে ছিলেন—হরিবাবু, সুশীলা দেবী, নন্টু, ভিনু, বেবা, জয়া, বিজয়, বিপিন, হাবি, গাবি, টাবি, ভাব্‌লা, কিনকু, রামকিষণ, ক্ষুতির মা এবং জ্যোৎস্নাকুমার। ইহা ভিন্ন দুইচারিজন স্থানীয় অধিবাসী, দুইচারিজন পথচারী এবং দুই চারি জন কুলি-গাড়োয়ান-ফেরিওলা-দোকানদার প্রভৃতি।

হরিবাবু কহিলেন—"একেবারে মূলে-হা-ভাত! ভাড়ার টাকা নিয়ে বাড়ী ভাড়া দিলে, একেবারে বাড়ীই নেই! সেই নেই-বাড়ী আবার দু'জনকে ভাড়া দিয়ে দু'জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েচে! আপনার কাছ থেকে ৫০৲ টাকা নিয়ে আপনাকে দিয়েচে, আবার তারপর দিন আমার কাছ থেকে ৫০৲ টাকা নিয়ে আমায় দিয়েচে! উঃ!"

নটবরবাবু কহিলেন,—"ঐ একশটা টাকাই বোধ হয় লোকটার দরকার ছিল মশাই।"

জ্যোৎস্না নামে যুবকটি তাহার মাথার একরাশ কোঁকড়া চুল হাত দিয়া সরাইয়া দিতে দিতে কহিল—"মনেও করবেন না তা। হয় ত আরও দু'চারজন মাথায় হাত দিয়ে আপনাদের পাশে এসে বা দাঁড়ায়!—আমি এই নিয়ে একটা গল্প লিখব।"

হরিবাবু কহিলেন—"উঃ, কি ভয়ানক লোক মশাই! আমায় বলেন,—'আমার বাড়ীর মত বাড়ী গিরিডিতে দ্বিতীয় পাবেন না, সব দিকেই তার ফাঁকা, অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম-বায়ু-অগ্নি-নৈঋত-ঈশান-ঊর্দ্ধ তার ফাঁকা, শুধু অধঃটা চাপা, তারি ওপর বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।'—তা' এখন দেখছি, কথাটা প্রায় সত্য বটে। ন' দিক নয়, এর দশ দিকই—অর্থাৎ, সবই ফাঁক!"

একজন ভদ্রলোক কহিলেন,—"যা ঠকবার, তা ত আপনারা বেশ্‌ভাল করেই ঠকেচেন, এখন মেয়েছেলে নিয়ে

রাস্তার ওপর ভিড় করে আর ফল কি বলুন। চলুন আপনারা, ঐ পোলের কাছে রাধানাথ বাবুর যে বাড়ী আছে, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। ৪০ টাকা ভাড়া, দুটো পার্ট, আপনাদের দুজনের বেশ সুট্ করবে এখন। অথচ কোয়াইট সেপারেট।"

জ্যোৎস্না কহিল—"গ্রাম-নিবাসের বদলে একেবারে রাধা-নিবাস, মন্দ হ'ল না; 'নাথুর বদলে টাকু পেলুম—টাক ডুমা-ডুম্ ডুম্'।"

কুহু জ্যোৎস্নার দিকে প্রফুল্ল চাহনিতে চাহিয়া দেখিল।

৫

গিরিডিতে আসিবার পর উহাদের দিন পনর কাটিয়া গিয়াছে। নটবরবাবুদের সহিত হরিবাবুদের প্রণয় দিন দিন ক্রমেই বাড়িতেছে। নূতন জায়গায় আসিয়া উভয় পরিবারের সকলেরই মন বেশ প্রফুল্ল। শুধু নটবরবাবুকে যেন কতকটা স্ফূর্তিহীন বলিয়া মনে হয়। সকাল বিকাল সকলেই উৎসাহের সহিত হেথা-হোথা-সেথা, পাহাড়ে, ঝরণার ধারে, উন্নির ধারে বেড়াইতে যায়। কেবল নটবরবাবুকে জোর জবরদস্তি করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তিনি বলেন, 'আমার একটু ফুল রেস্ট, পাহাড়-টাহাড়ে ঘোরা-ঘুরি করতে আমার একটু অসুবিধা হয়।' কিন্তু তবুও তরঙ্গিণীর পিড়াপিড়িতে, নিত্য না হউক, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার ফুল রেস্ট লইয়াই যাইতে হয়।

কুহু কিন্তু পিতার সহিত বেড়াইতে বাহির হইতে একেবারে নারাজ। সে বলে, 'বাবার সঙ্গে সঙ্গে শামুকের গতিতে বেড়ালে, বেড়ানর কোন ফলই হবে না।' তাই আজকাল সে সকাল-সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার সহিত বেড়াইতে যায়।

জ্যোৎস্না হরিবাবুর দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। ছেলেটি অতি সৎ। বি-এ, পাশ করিয়াছে। অনেক ভাল ভাল গল্প-উপন্যাসের বই লিখিয়াছে। বিয়ে না করিয়া, চিরকুমার থাকিয়া দেশের ভিতর দিয়া—দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে, এই ইচ্ছা। জ্যোৎস্নার নামটি তাহার পিতামাতা তাহার রূপের সহিত মিলাইয়া রাখিয়াছিল। এবং তাহার ভিতরের রূপটিও তাহার বাহিরের রূপের অনুরূপ ছিল। যেমন সুন্দর সুঠাম মোলায়েম তাহার আকৃতি, তেমনি ঋজু, বিনীত এবং সৎ তাহার প্রকৃতি। কুহু নিত্যই পিতার নিকট জ্যোৎস্নার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া বলে—"এমন সুন্দর লোক, বাবা, আমি দেখি নি। তুমি কি ওঁর কোন বই-টই পড় নি? উনি যে একজন নামজাদা লেখক। 'ধনি জীবনে বর্ষা নামে?' এঁরই লেখা।"

সেদিন সকালে জ্যোৎস্না ও কুহু বেড়াইয়া ফিরিয়া, জ্যোৎস্না কুহুদেরই ঘরে আসিয়া বসিল। নটবরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে রোজই একটু বিমর্ষ দেখি। কেন বলুন ত?" নটবরবাবু কহিলেন—"বিমর্ষ? না, তেমন কিছু নয়। তবে, ঐ লোকটা পঞ্চাশ—পঞ্চাশটা টাকা বড্ড ফাঁকি দিয়ে নিলে!"

"ওই নিয়ে আপনি এখনো ভাবছেন?" দেখুন, জগতে পয়সা জিনিসটাকে যত বেশী মূল্য দেবেন, ততই ওর মূল্য বেড়ে যাবে; আর যতই ওর মূল্য কমাবেন, ততই ওর দাম কমে যাবে। পরমহংস দেবের কথা আপনি ভেবে দেখুন—কামিনী আর কাঞ্চনই যত অনর্থের মূল।"

নটবরবাবু কহিলেন,—"কিন্তু, আপনার এই বয়েস, এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এমন রূপ, জ্যোছ্নাবাবু, আপনি বিয়ে-থা না ক'রে, সংসারী না হ'য়ে যে এই রকম—

"দেখুন, সংসারের মঙ্গলের জন্যেই, আমি সংসারের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। সংসারকে আমি ভালবাসি, স্বার্থশূন্য হ'য়েই ভালবাসি। সংসারের ভেতরে এসে সংসারী হ'য়ে দাঁড়ালেই তখন চারিদিক থেকে স্বার্থ এসে আমায় ঘিরে ফেলবে। তখন আমি শুধু নিজের মঙ্গল করবার জন্যেই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকব। আপনি উপনিষদ পড়েছেন?"

ছোট টাইমপিস ঘড়িটার দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল। কুহুর দিকে চাহিয়া কহিল—"দুপুর বেলা ঘুমুবেন না, আমার কাছে যাবেন, আমার নতুন লেখাটা পড়ে শোনাবো।"

কুহু কহিল—"সেটা শেষ করে ফেলেছেন? চলুন, এখনি গিয়ে সেটা শুনব। দুপুর বেলা বরঞ্চ আমার গোটাকতক অঙ্ক বুঝিয়ে দেবেন।"

সুতরাং কুহুও উঠিয়া দাঁড়াইল।

৬

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

নটবরবাবু আর গিরিডিতে থাকিতে রাজি নহেন। কারণ, এখানে তাঁহার অত্যধিক খরচ হইতেছে। কিন্তু খরচের অজুহাত দেখাইয়া কলিকাতা ফিরিবার কথা বলিলে, তরঙ্গিণী কিছুতেই তাহা শুনিবে না। তাই পাঁচ সাত দিন হইতে তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে,তাঁহার বুকের ভিতর প্রায় সব সময়ই কেমন যেন ধড়্ফড়্ করিয়া উঠে, গিরিডির জলের লোহা আর অভ্রে মিশিয়া বোধ হয় তাঁর বুকের ভিতর গিয়া জমিয়া যাইতেছে।

সেদিন সকালে তরঙ্গিণী চায়ের বাটী তাঁহার হাতে দিয়া কহিল—"আজ শরীর কেমন?"

"ভয়ানক খারাপ তরু, ভয়ানক খারাপ।" নটবরবাবুর মুখ বিষাদে ভরিয়া উঠিল, দুইচোখ ছাপাইয়া জল আসিল। —"বোধ হয়, তরু, এখানে থাকলে আর আমি—"

"আর তুমি কি ?"

"আর আমি বাঁচব না।" বলিতে বলিতেই তাঁহার হাত হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে চায়ের বাটী মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং চারিদিকে চায়ের জল গড়াইয়া একাকার হইয়া পড়িল।

সেইদিনই স্থির হইল যে, আগামী পরশ্বই তাঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন। তবে, তৎপূর্ব্বে আগামীকল্য আর একবার তরঙ্গিণীকে উর্ব্বি-প্রপাত দেখাইয়া আনিতে হইবে।

নটবরবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নিজের এই ফন্দীর জন্য মনে মনে নিজেকে সহস্র বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া সকলে উর্ব্বি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সকালে উঠানের কোথায় পড়িয়া গিয়া সুন্দর হাঁটুতে অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল, সে যাইতে পারিল না। ট্যাক্সিতে উঠিবার আগে নটবরবাবু ওদিক দিয়া ঘুরিয়া হরিবাবুদের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। এ বাড়ীটি দুইটি রাস্তার কোণে এমনভাবে নির্ম্মিত যে, এক বাড়ীর দুইটি পৃথক অংশ হইলেও, এক অংশ হইতে অপর অংশে যাইতে হইলে, পশ্চিমদিকের রাস্তার ফটক দিয়া বাহির হইয়া, উত্তর দিকের রাস্তা ঘুরিয়া তবে অপর অংশে প্রবেশ করিতে হয়।

নটবরবাবু সম্মুখেই জ্যোৎস্নাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন —"কুহু বাড়ীতে একলা থাকল, একটু দেখবেন, আমরা সন্ধ্যার পরই ফিরব। সারদাকে রেখে যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু ও ব্যাটা যাবার জন্যে না-ছোড়-বান্দা।"

জ্যোৎস্না কহিল—"কোন ভয় নেই, আপনারা নিশ্চিন্তমনে যান।"

ট্যাক্সি ষ্টেশনের পথ ধরিয়া খানিকটা অগ্রসর হইতেই নটবরবাবু বলিয়া উঠিলেন—"আরে, রোখো, রোখো,—থামাও। কি গো, বাবাজী! হঠাৎ কি রকম ?"

কিসলয় ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে, এই আমার মামার এক শালা—"

"অর্থাৎ বাপ। তা তোমার ত বাপ নেই বাবাজী। যেসো বুঝি তা'হ'লে ?"

"আজ্ঞে হাঁ। তিনি এই মধুপুরে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, বুঝিচি তিনি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বুঝি এসেচ ? তবে এখন সব পরে, এখন গাড়ীতে উঠে এস বাবা, উর্ব্বিটা দেখে আসবে চল। আমরা কালই রওনা হ'য়ে যাচ্ছি।"

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া কিসলয় কহিল—"ওঃ, তা'হ'লে—হুঁ—এই আপনারা সব ভাল আছেন ত ?"

ট্যাক্সি ছুটিতে লাগিল।

কিসলয়কে সঙ্গে লওয়াতে নটবরবাবুর একটা সুবিধা হইল। উর্ব্বির পথের সীমানায় ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, পদব্রজে বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া অনেকখানি পথ যাইয়া তবে প্রপাতের কাছে পৌঁছিতে হয়। কিসলয়কে পাওয়াতে নটবরবাবুর বিপুল দেহ এই ক্লেশ হইতে বাঁচিয়া গেল। সেই স্থানটিতে পৌঁছাইয়া যখন সকলে নামিয়া গেল, তখন তিনি ট্যাক্সির 'সিটে' তাঁহার দেহ প্রসারিত করিয়া আরাম-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকের পার্ব্বত্য ভূমি ছাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বক্ষণেই সকলে প্রপাত দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। নটবরবাবু ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"জোরে চালিয়ে নিয়ে যাও বাবা, বড্ড অন্ধকারটা হ'য়ে এল।"

কিন্তু খানিকটা পথ আসিতেই এক বিভ্রাট ঘটিল। ট্যাক্সির গতি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িয়া অনেক রকমে অনেক চেষ্টা করিল, গাড়ী চলেও না, নড়েও না,—চলিবার লক্ষণমাত্র প্রকাশ করে না। আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা করিবার পর ড্রাইভার নটবরবাবুকে কহিল—"ব্যাটারী খারাপ হ'য়ে গেছে। একটু নেবে ঠেলতে হবে।"

তখন কিসলয় ও সারদা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। এবং পশ্চাৎভাগে যাইয়া প্রাণপণে ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা। একটি ইঞ্চিও গাড়ী তাহারা সরাইতে সক্ষম হইল না। ড্রাইভার নটবরবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল—"আপনাকে একটু নামতে হবে, স্যর। তা না হ'লে গাড়ী ওরা ঠেলতেই পারবে না। আপনাকে, স্যর, নাবতেও হবে, একটু ঠেলতেও হবে, নইলে আর উপায় নেই।"

কতকটা ভয়ে এবং কতকটা বিরক্তির সহিত নটবরবাবুকে অগত্যা নামিতে হইল। নামিতে হইল এবং ঠেলিতেও হইল।

তিনি সকলকে কহিলেন—"দেখ, এই আমি যখন বলব—'হিস্ হিস্ হেঁইয়ো', ঐ 'হেঁইয়ো'র মুখে সকলে এক সঙ্গে জোর দেবে। "হিস্—হিস্—হেঁইয়ো!"

গাড়ী অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করিল। নটবরবাবু, কিসলয় ও সারদা প্রাণপণে ঠেলিতে লাগিল। নটবরবাবু হাঁফাইতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। তাঁহার পরণের কাপড় খুলে ছটিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কোন রকমে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাত দিয়াই তিনি ঠেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—'হিস্—হিস্—হেঁইয়ো!'

খানিকটা চলিতেই, 'ঘর্-র্—ঘর্-র্' শব্দ হইয়া গাড়ীর নিজের চলিবার বেগ ফিরিয়া আসিল এবং ড্রাইভারের কথায় কিসলয় ও সারদা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কিন্তু বিপদ হইল, নটবরবাবুকে লইয়া। এই চলন্ত অবস্থায় তাঁহার পক্ষে গাড়ীতে উঠিতে যাওয়া আর স্বেচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করা একই কথা। তখন ড্রাইভার খুব হুঁসিয়ারীর সহিত গাড়ীর বেগ যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিল। কারণ, আবার না গাড়ী একেবারে থামিয়া যায়। সেই অবস্থায় সকলে মিলিয়া নটবরবাবুকে এক রকম টানিয়া হিঁচড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া ফেলিল।

ফাঁকা পথ পাইয়া ট্যাক্সি অবাধে ছুটিয়া চলিল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকলে বাসায় আসিয়া পৌঁছাইল।

বাসায় পদার্পণ করিয়া কিন্তু আর এক বিভ্রাট!

"কুহু—কুহু?"

কোথাও কাহারো সাড়া নাই।

সমস্ত বাড়ী অন্ধকার। আলো জ্বালিতে দেখা গেল, সমস্ত ঘর খোলা, কাপড়-চোপড় ছড়ান এবং জনপ্রাণীশূন্য। তাড়াতাড়ি নটবরবাবু তাঁহার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ট্রাঙ্কের ডালা খোলা রহিয়াছে। কম্পিত হস্তে সমস্ত কাপড়গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, সর্ব্ব নিম্নে রক্ষিত পি. এম. বাগচীর পত্রিকাখানি খুলিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, চারি শত টাকার নোট, যাহা তিনি তন্মধ্যে রাখিয়াছিলেন, তাহা নাই। তখন হাতবাক্সটি লইয়া দেখিলেন, তাহাও খোলা এবং তাহার ভিতরকার ৫১ টাকাও অন্তর্হিত। তৎপরিবর্ত্তে জ্যোৎস্নার নামসহি যুক্ত একটুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে:—

দাদার হুকুমের জন্যেই আমি কলকেতায় ধরিয়ে এসে হাজিরা দিয়েছিলাম; আপনার উপদেশ ও অনুরোধে ফিরে আসিলাম। দুইজন কর্ম্মিষ্ঠা ও কাজের এ অবস্থায় বিশেষ দরকার। কিন্তু হবে করিবেন না। এই এক মাসের মধ্যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে অপরিসীম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং ইহা ছাড়া আর উপায় নেই। আমরা অন্যায় কিছু করিব না। অসবর্ণ বিবাহ আজকাল সমাজেও চলে হইয়াছে। যে জিনিষটি এতদিন আমার লেখার বিষয় দিয়া প্রচার করিতেছিলাম, একদিন পরে আমি নিজেই তাহার উদাহরণ-স্থল হইলাম। আমাদের দ্বারা সমাজের মধ্যে নিশ্চই আমাদের এই সব নীতির ভাল প্রচার হইবে, আপনি দুঃখ করিবেন না। যদি কখনো আপনার রাম পড়ে, আমরা দু'জনে আসিয়া আপনার পায়ে মাথা ঠেকাইব। ইতি—

নটবরবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং প্রায় মিনিট পনরকাল একই ভাবে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া থাকিবার পর, হঠাৎ সহাস্যমুখে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"ভালই হ'ল, ভক্ত, ভালই হ'ল। বরফ লাভই হ'য়ে গেল। ওর বিয়ের জন্যে হাজার এক টাকা রেখেছিলুম, সে জায়গায় আমার ৫০১ এর মধ্যেই কাজ শেষ! হাঃ—হাঃ—এই ৮৫১, আর গ্রামবন্ধের ঐ ৫০৲ মোট চল গিয়ে ৫০১৲ হাঃ—হাঃ—উল্টে বরফ লাভই হ'য়ে গেল!"

কিসলয় খাটিয়ার ধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ তাহার অন্তর হইতে যে সুদীর্ঘ নিশ্বাসটি বাহির হইল, তাহার শব্দে চমকিত হইয়া নটবরবাবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে, সে খাটিয়ার উপর মাথা গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার আবার হ'ল কি, বাবাজী?"

কিসলয় সে কথার কোনই জবাব দিল না। শুধু তাহার বক্ষ কেঁপে করিয়া, কণ্ঠ ঠেলিয়া মর্ম্মান্তিক বাথাবিজড়িত একটি মাত্র অক্ষর বাহির হইল—'উঃ!'

ঠিক সেই সময়, বহু দূরে, হাজারিবাগের পথে, একখানি ট্যাক্সি দ্রুত গতিতে ছুটিয়া যাইতেছিল। জ্যোৎস্নাধারা ও কুহুতানের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুর্কিস্থানের মরুপথ

পশ্চিম মঙ্গোলিয়া ও চীনা তুর্কিস্থান হইতে যে পথ চীনের মধ্যে গিয়াছে, সেই পথের অধিকাংশ স্থানেই এমন সব প্রদেশ আছে যেখানে বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক আজও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ওই পথের সঙ্গে বহুকালের প্রাচীন ইতিহাস জড়িত আছে। সাড়ে ছয় শত বৎসর আগে এই পথেই বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো চীনের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। উটের পিঠে চীন হইতে ব্যবসায়ীরা রেশম ও গালার জিনিষ বোঝাই দিয়া ওই পথে গ্রীস, রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদেশের সঙ্গে পুরাকালে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এই পথের কল্যাণে। আবার ধ্বংসের বিষাণ বাজাইতে বাজাইতে যাযাবর হূন, শক ও তাতার জাতি ওই পথেই আসিয়া রক্তস্রোতে ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দেয়, রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে।

মিঃ. ওয়েন্ ল্যাটিমোর একজন বিখ্যাত পর্য্যটক, তিনি ১৯২৬ ও ২৭ সালে সস্ত্রীক গোবি মরুভূমি পার হইয়া মধ্য এসিয়া ও চীনা তুর্কিস্থানের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। ১৯২৯ সালে চীনা তুর্কিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার বই বাহির হয় ও আমেরিকার পাঠকসমাজে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। মিঃ ল্যাটিমোরের লিখিত বিবরণ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"পিকিংএ সাত বছর ছিলাম, কিন্তু এই পথের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। পিকিং আজকাল অত্যন্ত হাল ফ্যাসানের সহর, সেখানে সিনেমা, ক্লাব, থিয়েটার, ভোজন-শালা ইত্যাদি হালফ্যাসানের আমেরিকান প্রথায় সাজানো, সেখানে সাত বছর থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলাম—মনে হ'ল এ তো সেই আমেরিকার সহরে জীবনই যাপন করছি, তবে এখানে কেন এলাম? শুনলাম, চীনা তুর্কিস্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে যাব। কোয়েইতিং একটা ছোট সহর, এখানকার ব্যবসায়ীরা আজও উটের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে প্রাচীন প্রথায় বাণিজ্য করে। তাদের কাছে অনেক সন্ধান পাওয়া গেল।

দুটি পথের কথা তারা আমায় জানালে। একটি পথ চীনের সেন্‌সি ও কানসু প্রদেশের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম গোবি মরুভূমির প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে চীনা তুর্কিস্থান পার হয়ে সোজা চলে গিয়েছে ভারত ও পারস্যের দিকে। আর একটি পথ উত্তর চীন ও উত্তর মঙ্গোলিয়া পার হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে চীনা তুর্কিস্থানে প্রবেশ করেছে।

মঙ্গোলিয়ার বুকে উষ্ট্রবাহিনী। দূরে বালুকাময় পাহাড় দেখা যাইতেছে।

এমন পথে যাওয়া সমীচীন মনে হ'ল না, সবাই নিষেধ করলে। ও পথে সর্ব্বত্র দস্যুর ভয়, যুদ্ধ, রক্তপাত লেগেই আছে—তা ছাড়া বিদেশীদের প্রতি সেখানকার অধিবাসীরা খুব শ্রদ্ধাবান নয়, যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে ও-পথে। দ্বিতীয় পথেও যাওয়া অসম্ভব—পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার উপজাতি-সমূহের মধ্যে আজকাল বলশেভিক রাশিয়ার প্রভাব খুব বেশী, তারা কোন বিদেশীকে তাদের দেশে প্রবেশ করতেই দেবে না।

অনেক সন্ধানের পরে অবশেষে আমি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তুর্কিস্থানে যাবার একটি পথের সংবাদ পেলাম। এ পথ ব্যবসায়ীদেরই দ্বারা আবিষ্কৃত, তারা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার

উপজাতিদের, চীনা দস্যুদের কবলেও পড়তে চায় না—সুতরাং তারা মঙ্গোলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উষর ও নির্জ্জন অঞ্চল দিয়ে তুর্কিস্থানে যাবার একটি পথ বার করেছে—এ পথ যেমনি অজ্ঞাত, তেমনি দুর্গম, খুব কম লোকেই এ পথের খবর রাখে, যাতায়াত করে আরও অনেক কম লোকে।

অবশেষে এই পথেই যাব ঠিক হ'ল। ওই অঞ্চল তখনও দেখিনি, তখনকার অধিবাসীদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করবারও একটা ইচ্ছা ছিল অনেকদিন ধরে।

মরুভূমির মধ্যে উটকে খাওয়াচ্ছে ২৪ ঘণ্টার খাদ্য এক মুঠা ছোলা কি বুট

একদিন ওই পথ ধরেই গিয়েছিল যাযাবর হূন ও শক জাতি তাদের বিরাট দিগ্বিজয়ের অভিযানে। পথের দুর্গমতা আমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুললে।

অতি কষ্টে ভ্রমণের উপযোগী উট যোগাড় হ'ল। একটি ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে রওনা হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করে সুইয়ান্ যাত্রা করলাম। সে রকম একটা দল মিলেও গেল। আমি তাদেরই একজন হয়ে তাদের মধ্যে বাস করেছি, বেশভূষায়, আহারে, ব্যবহারে আমি কখনো দেখাই নি যে আমি বিদেশী।

রাত্রে আমরা চলতাম। দিনে তাঁবু খাটিয়ে নিজেরা রান্নাবান্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, উটের দল ছেড়ে দেওয়া হ'ত ইতস্ততঃ চরে বেড়াবার জন্যে—একজন লোক সব সময় সঙ্গে থাকত—উটেরা পালিয়ে না যায় বা কেউ তাদের চুরি না করে, তাই পাহারা দিতে। বেলা পড়লে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ত, নিশীথরাত্রে আবার তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতাম—সাত আট ঘণ্টার বেশী উটেরা একাদিক্রমে চলতে পারে না—বিশেষ করে আমাদের উটদলের প্রত্যেকটার পিঠে পঁচিশ মণ করে ভারী বোঝা ছিল।

সকালে আমাদের চা হ'ত 'চায়ের ইট' থেকে। এই 'চায়ের ইট' একটি অদ্ভুত পদার্থ। এক ধরণের কড়া ও বিস্বাদ চা থেকে এই 'চায়ের ইট' তৈরী হয়—চীনের হ্যান্‌কাউ ও টিয়েন্‌সিন্‌এ 'চায়ের ইট'এর বড় কারখানা আছে। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া ও তুর্কীস্থানের অনেক স্থানে 'চায়ের ইট' মুদ্রার কাজ করে। বড় বড় ইটের ওজন বাঁধা আছে—কিন্তু অনেক সময় খুচরো খরিদ-বিক্রয়ের জন্যে বড় ইটের খণ্ড ভেঙে নিয়ে ওজন করে কমদামের জিনিষের পরিবর্ত্তে দেওয়া নেওয়া হয়ে থাকে। এই 'ইট চা' থেকে প্রস্তুত চায়ের রং ঘোর কালো, চিনি এবং উটের দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। যাদের অভ্যেস নেই, তারা এ চা মুখে দিতে পারবে না।

মরুভূমিতে জল দুষ্প্রাপ্য বলে আমরা চা খেতাম খুব বেশী। নদী বা ঝর্ণা মরুভূমিতে একেবারেই নেই, মাঝে মাঝে কূপ আছে, তাও সত্তর আশী মাইল অন্তর। অনেক সময়েই এই সব কূপের জল অধিক পরিমাণে নুন ও সোডা মিশ্রিত—সুতরাং মুখের পানীয় নয়। উটের পিঠে দু' সাত পিপে বোঝাই জল আমরা নিয়ে পথে চলতাম, কি জানি যদি কোথাও না পাওয়া যায় বা পানের উপযুক্ত না হয়। অনেক সময় এমনও হয়েছে, একশো মাইলের মধ্যে কূপ পাওয়া যায় নি। একবার একটা ছোট ঝর্ণা পাওয়া গিয়েছিল, জল দেখতে বেশ নির্ম্মল, আয়না কুইনাইনের চেয়েও তেতো। নিরুপায় অবস্থায় সেই জলই আমাদের পান করতে হয়েছিল।

পথে অন্যান্য ব্যবসায়ীদলের সঙ্গেও দেখা হয় প্রায়ই। তারা দস্যুদলের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে, তাদের মুখে কেবলই শোনা যেত অমুক স্থানে দস্যুরা ব্যবসায়ীদের মেরে ফেলেছে,

লুঠপাঠ করেছে ইত্যাদি। বেশীর ভাগ স্থলেই এগুলি গুজব মাত্র। মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পেতাম, তাদের কাজ হচ্ছে মরুপথের যাত্রীদেরকে দস্যুদের উৎপীড়ন বা তাদের সৈন্যদল! যে ব্যবসায়ীদলের সঙ্গে উপযুক্ত বন্দুক বা অস্ত্রশস্ত্র থাকে, যারা দলে পুরু থাকে, লড়তে পারে—তারা ছাড়া দস্যুদলের হাত থেকে অস্ত্র নিরীহ নিরস্ত্র

মরুপথে উষ্ট্রবাহিনী। মাঝখানের একটি উটের পিঠে লম্বা করিয়ে পতাকা দেখা যাইবে। এই পতাকা ধর্ম্মবাহিনীরা চিরকাল বহন করিয়া আসিতেছে।

থেকে রক্ষা করা। তবে কচিৎ তাদের এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হ'ত। এ বিশাল, অজানা মরুদেশে দস্যুর হাতে পড়লে কোথায় বা গবর্ণমেণ্ট, আর কোথায় ব্যবসায়ীদল বড় একটা পরিত্রাণ পায় না। এখানকার লোকে বিদেশীদের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাবান নয়। কয়েক বছর পূর্ব্বে একটি আমেরিকান্ কোম্পানী মঙ্গোলিয়া থেকে চীনা তুর্কিস্থান

তুরেন্‌পি : রেল হইতে ১০০ মাইল দূরে।

পর্যন্ত মোটরবাসের লাইন খুলবার সঙ্কল্পে একটি দল পাঠিয়েছিল রাস্তার অবস্থা বুঝবার জন্যে, এক ডজন মোটর গাড়ীও তাদের সঙ্গে ছিল। এদেশের লোকেরা ভাবলে বালি কাটিয়ে উঠল তো পাথর, পাথর কাটিয়ে উঠল তো আবার বালি। ফলে যতগুলো মোটরগাড়ী রওনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একখানা গাড়ী কাশ্গরে তুর্কীস্থানে

মরুভূমির পথে সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের পরিচয়ে

মোটরবাসের লাইন খুললে উষ্ট্রচালকদের ব্যবসা একেবারে তো মাটী হবে! তারা এমন সব দুর্গম অঞ্চল দিয়ে পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল, যে পথে শুধু পাথর আর বালি,

কাজাক জেলের হাতে শিকার পক্ষী।

পৌঁছতে পেরেছিল—কিন্তু তারপর তার আর কাজ করবার মত অবস্থা ছিল না।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে দেখা যায় উটের পিঠে শব বোঝাই হয়ে চলেছে। তুর্কিস্থান-প্রবাসী চীনা ব্যবসায়ীর মৃত্যু ঘটলে প্রবাসী বন্ধুরা তার মৃত দেহ প্রথমে দিনকতক একটা জায়গায় কবর দিয়ে রাখে, যতদিন মাংস ঝরে পড়ে শব হাল্কা না হয়। তার পরে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে দেহটাকে পাঠিয়ে দেয় সুদূর চীনে, তার স্বগ্রামে, সেখানে তার পূর্বপুরুষদের কবরের পাশে দেহটা পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়।

এক জায়গায় এসে হঠাৎ শোনা গেল যে, সামনের দিকে আর যাওয়া যাবে না, পাহাড়ের রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছে। আমরা পাহাড়ের ওদিকে না গিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলাম—তার মানে ছশো মাইলের ধেয়া! ডিসেম্বর মাসের সবে সুরু, কিন্তু এবার এত শীত পড়েছে যে খুব প্রাচীন লোকেরাও বলে, এমন শীত তারা অন্ততঃ ডিসেম্বর মাসে কখনো দেখে নি। তিন মাস অনবরত চলবার পরে আমার উটের দল একেবারে অকর্মণ্য পরে প'ড়ল, তার উপরে বিপদ এই যে বড় বড় ব্যবসায়ীদল আগেই চলে গিয়েছিল, সুতরাং আমাদের যেতে হ'ল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পথে দস্যুর হাতে পড়লে কি অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সাহায্য করবার কেউ রইল না।

পথের ধারে মাঝে মাঝে আমরা চলৎশক্তিবিহীন পরিত্যক্ত উট বহু দেখতে পেলাম। উটের নিয়ম এই, তারা দুর্বলতার একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছুলে আর নড়তেও পারে না, উঠতেও পারে না। অনেক সময় সেদিনই খাদ্য

মুসোলিনি বিমানবাহিনীর বিমানিক পাহাড় খুঁড়িয়া কূপের চাপা বাহির করিতেছে।

না পেলে এ রকম হয়, কিংবা দুর্গম পথে একটানা কয়েক মাস চলতে চলতেও উট একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসে—এ সব ক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর উপায় থাকে না। পরিত্যক্ত অবস্থাতে কোন খাদ্য না পেয়েও উট অনেক দিন বাঁচে। উষ্ট্রচালকেরা কখনো এ ধরণের অকর্মণ্য উটকে গুলি করে মারে না, তাদের মধ্যে এ প্রথা নেই—আমি এমনও দেখেছি পথের ধারে উট শুয়ে আছে—তার পিঠ ও দু পাশে একহাত পুরু কঠিন বরফের স্তর জমেছে, তবুও হতভাগ্য প্রাণীটা বেঁচে থুঁকছে। পথিকদলের প্রতি একবার উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মাত্র, ঘাড় নাড়তে পারে না, সমস্ত দেহটাই যেন জমে গিয়েছে। মরুভূমির এ দৃশ্য বড় করুণ!

মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় উঠল, আমাদের হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে গেল। সে ঝড় আর থামবার নাম নেই, দুদিন পর্যন্ত সমানভাবে চ'লে একদিন শেষরাত্রে আকাশ পরিষ্কার হ'ল। পরদিন সকালটিতে অতি পরিষ্কার সূর্যোদয় দেখে আমরা ভাবলাম আর ভাবনা নেই, বিপদ কেটেছে। দুপুরের পর সামান্য একটু হাওয়া উঠল, দশ মিনিটের মধ্যে আবার এমন ঝড় সুরু হ'ল যে গত দুদিনেও সে রকম উদ্দাম ঝড় ও বরফপাত আমরা দেখিনি। উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ তখনও নীল, মেঘের লেশও কোথাও নেই, অথচ আমাদের তাঁবুতে তখন এমন অবস্থা যে পাঁচ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, ঝড়ে চূর্ণ তুষার উড়িয়ে এনে চারিধার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

প্রায় মাইলটাক দূরে আমাদের উটগুলো চরছিল। একজন লোক তখনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে অতি কষ্টে সেগুলো

শিলাবিস্তার মরুভূমি: কে বলিবে দেড় মাইল দূরে ফেনবিস্তৃত মরুভূমি!

তাঁবুতে নিয়ে এল, যদিও এ ধরণের বরফের ঝড়ের সময় ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া অত্যন্ত বিপদজনক, পথ হারিয়ে গেলে শীতে মৃত্যু নিশ্চিত। আসবার সময় সে লোকটা

লোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আসতে পারলে না, হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে তাঁবুতে পৌঁছলো, ঝড়ের এমন বেগ যে তার সামনে দাঁড়ান যায় না। যখন সে তাঁবুতে এল, তখন তার মুখে, বুকে, গলায় বরফ কঠিন হয়ে জমে গিয়েছে। আমরা বরফের মধ্যে একটা গর্ত করে সেখানে উটগুলোকে রেখে দিলাম। দেখতে দেখতে ঝড়ে তাদের ওপর হাত দুই পুরু বরফ চাপা দিলে তবুও ভয়ানক শীতের হাত থেকে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পেলে আমাদের তাঁবুর ভরল কাপড়ের ছাদ ফুঁড়ে বরফ এসে ফুঁচের মত আমাদের গায়ে

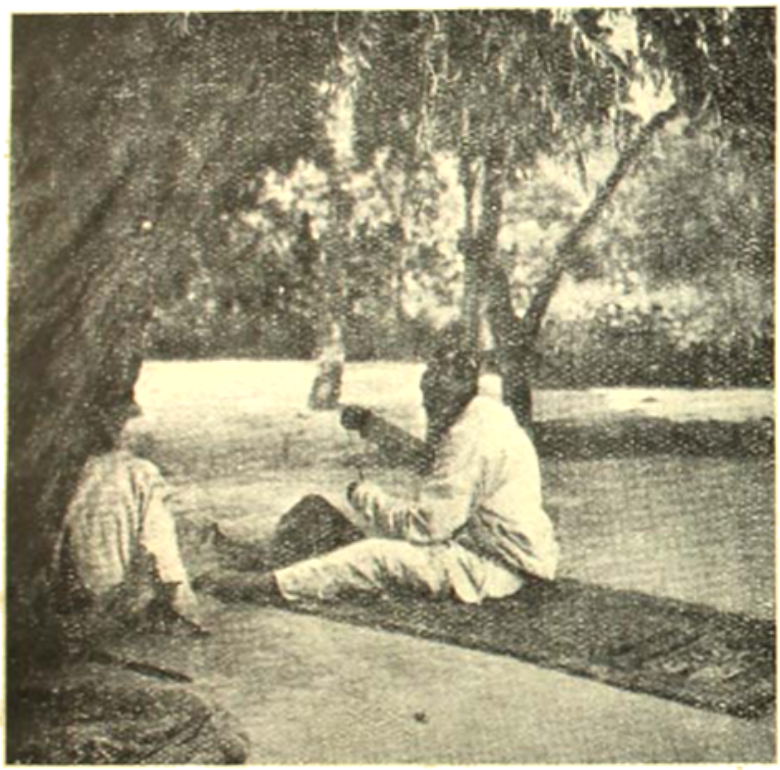

ইয়ারকান্দের কলেজগেট।

মুখে বিঁধছিল আর সে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! সন্ধ্যার কিছু পরেই ঝড়টা যেমনি হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। নির্মল আকাশে জ্যোৎস্না উঠল, চারিধারে কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সাহস করে সে রাত্রে আমরা ঘুমোতে পারলাম না। সকালে উঠে দেখি যে, তাঁবুতে বরফ জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, সেটাকে গুটিয়ে নেবার উপায় নেই, অগত্যা সেই অবস্থাতেই সেটা উটের পিঠে চাপিয়ে রওনা হওয়া গেল।

মাইল তিন চার গিয়েছি, আবার ঝড় সুরু। কিন্তু এবার ঝড়ের মূর্তি অত উগ্র নয়, আমাদের থামবার আবশ্যক হ'ল না। নিরবচ্ছিন্ন পরেই আমরা ১৮০০ মাইল ভ্রমণ শেষ করে কুচেন্‌সংসি সহরে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে উরুমুচি ১৫০ মাইল দূরে, ডাকবাহী একটা উটের গাড়ীতে দিনরাত সমানভাবে চলে সাড়ে তিন দিনে আমি সেখানে এলাম।

এ সব স্থান এত দুর্গম যে, বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান এখান থেকে হওয়া একরকম অসম্ভব। চীনা গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী জনৈক আমেরিকান কর্মচারী এখানকার ডাকবিভাগের কর্তা, কিন্তু সে বেচারী কি করবে—এখান থেকে ডাক যায় সাইবেরিয়ায়, সেখান থেকে ট্রেণে চীনে, পিকিংএ চিঠি পৌঁছুতে মাসখানেক লাগে। টেলিগ্রাফ লাইন অবিশ্যি আছে নাম মাত্র, কিন্তু প্রায়ই হয় বন্যাদল, নয় বিদ্রোহী দল লাইনের তার কেটে দিচ্ছে। চীনা তুর্কিস্থান থেকে টেলিগ্রাম পাঠালে তিন মাস থেকে ছ'মাসের মধ্যে সে টেলিগ্রাম বাইরের জগতে পৌঁছোয়।

চীনা তুর্কিস্থানের শাসনকর্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ এবং শাসনকার্যে অত্যন্ত দক্ষ। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এখানে কোন সংবাদপত্র ছাপানো হয় নি—দেশের আইন অনুসারে কেউ ছাপাখানা রাখতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের একটি মাত্র ছাপাখানা আছে। তাতে গবর্ণমেণ্টের দপ্তরের কাগজপত্র এবং নোট ছাপানো হয়। শাসনকর্তার বিশ্বাস সংবাদপত্র প্রচার হতে দিলেই দেশের মধ্যে নানা গোলমাল, অশান্তি ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে। বলশেভিক রাশিয়াও নিজের প্রভাব বিস্তার করবার সুবিধে পাবে। চীনা তুর্কিস্থান আয়তনে ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেন একত্রে যত বড়—প্রায় তত বড়—এবং বহু বিভিন্ন জাতির বাসস্থান। কিন্তু গত ১৯১১

সালের বিদ্রোহের পরে বর্তমান শাসনকর্তার রক্ষতার ভয়ে আর কোন উপদ্রব সেখানে হয় নি বা চীনের অন্যান্য প্রদেশের মত গৃহযুদ্ধ ও দস্যুদলের প্রাদুর্ভাবও এখানে নেই।

তিয়েনশান্ পর্বতমালা তুর্কিস্তানের মেরুদণ্ড স্বরূপ—পূর্ব থেকে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত এই পর্বতশ্রেণী চলে গিয়েছে। এই পর্বতমালার এপারে ওপারে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি বড় বাণিজ্যপথ বর্তমান—দুহাজার বছর ধরে এই পথে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে বাইরের জগতের আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে, মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এই দুটি বাণিজ্য-পথের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।

এই প্রদেশের অধিকাংশ মরুময়। তিয়েনশান্ পর্বতমালার দুপাশে যা কিছু সামান্য বৃষ্টি হয়—দু দশটা ছোট-খাটো পার্বত্য নদীর জল অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে মরুর মধ্যে, সেই জলে কিছু কিছু কৃষিকার্য চলে, প্রায়ই এই সব নদী মরুভূমির মধ্যে লবণাক্ত জলাভূমিতে নিজেদের নিঃশেষ করেছে—সে জায়গার জল-হাওয়া কৃষিকার্যের অনুকূল নয়। তিয়েনশান্ পর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে খুব বেশী অরণ্য নেই, কোন কোন স্থানে উট ও ভেড়া চরবার উপযোগী তৃণভূমি থাকায় দরুণ যাযাবর তাতার উপজাতিরা বাস করে। পর্বতের উত্তর দিকে ঢালুতে বৃষ্টিপাত হয় বেশী, সেদিকে শস্য ও ফলমূল বেশী জন্মায়।

বহু পাহাড়ে ঈগল পাখীর বাসা দেখা যায়

কির্ঘিজ্ ও কাজাক এই দুটি উপজাতির বাসই এ অঞ্চলে বেশী। উরুমচি যাবার পথে বহুসংখ্যক কাজাক উপনিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল। এদের ঘরবাড়ী নেই, সারা জীবনই কাটিয়ে দেয় চাদড়ার তাঁবুতে। কাজাকেরা খুব অতিথিবৎসল, অনেক জায়গায় এরা আমাদের উটের দুধ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে—দুধের দাম দিতে গেলে এরা অপমান বোধ করে। পরিচ্ছন্ন করবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। দৈহিক শক্তিতে সারা মধ্য-এশিয়ার কাজাকদের তুলনা মেলে [illegible] কথাও ছাড়া এদের মত দক্ষ ঘোড়সওয়ার বোধ হয় [illegible] ঈগল পাখীর সাহায্যে শিকারকার্য

কাজাকরা অত্যন্ত পটু। শিকারে সুদক্ষ ঈগল পাখীর আদর কাজাকদের মধ্যে এত বেশী যে শিকারী ঈগল ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা নেই এদের মধ্যে। পর্বতশিখরের দুর্গম প্রদেশে ঈগল পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছানা সংগ্রহ করা হয়। একাজে সাহস ও কৌশল দুইএরই প্রয়োজন আছে—অনেক সময়

ধাড়ী উটলে সংগ্রহকারীকে আক্রমণ করে, সে অবস্থায় অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন করা প্রায় অসম্ভব। তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখরে ধাড়ী উটল দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অতীব বিপদ্-জনক, অনেকে এ অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছে।

ছটি ভাল ঘোড়ার চেয়েও একটা ভাল শিকারী উটল মূল্যবান বলে গণ্য হয়। শিকারী উটল উপঢৌকন দেওয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মানের চিহ্ন। উটল পাখীদ্বারা সাধারণতঃ কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করা হয়—কাজাকরা বলে অনেক সময় উটলপাখীতে নেকড়ে বাঘ পর্য্যন্ত শিকার করে। নেকড়ে বাঘ শিকার করানোর সময় তিন চারদিন পাখীটাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না, এতে তার রাগ বাড়ে, সাহস দুর্জ্জয় হয়ে ওঠে। তখন সে যে কোন পশুকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। শিকারকার্য্যে সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ পাখীর নাসিক পাখীটাকে নিজের হাতে কাঁচা মাংস খেতে দেয়—এতে পাখী খুব বাধ্য থাকে।

উরুমচি অঞ্চলের ঘোড়া বিখ্যাত—আমরা দেড়শো ডলার দিয়ে ছটি ঘোড়া কিনলাম এবং এখান থেকে উটের গাড়ী ছেড়ে আমরা ঘোড়াতে তুরফান ও ইলি প্রদেশের দিকে রওনা হ'লাম। তুরফান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অতি প্রিয় স্থান, এই প্রদেশের নানাস্থানে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

এখানকার শাসনকর্ত্তা আমাদের সঙ্গে ছজন শরীররক্ষী সৈন্য দিলেন, কারণ ইলি অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা খুব দুর্দ্ধর্ষ এবং বিদেশীদের উপর অত্যাচার করতে অভ্যস্ত। এই শরীর-রক্ষী সৈন্যদুটি সঙ্গে থাকার দরুণ যেখানে আমরা গেলাম, সকলেই যথেষ্ট খাতির যত্ন করলে। যেখানে যাই, সেখানেই ভোজের নিমন্ত্রণ, ভেড়ার আধসিদ্ধ মাংস ও ঘোটকীদুগ্ধের কুমিস্ (এক প্রকার মদ্য) খেতে খেতে হায়রাণ হয়ে পড়লাম। মাংস ও দুগ্ধ এখানে প্রধান খাদ্য, কাজাকে ও টুরবাগাতাই উপজাতিরা চাষ করে না, গ্রীষ্মকালের প্রথমে তুর্কি ও চীনা ব্যবসায়ীগণ মাঝে মাঝে যব এবং গম উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে বিক্রয়ের জন্যে আনে এবং শস্যের বদলে পশম ও কুমিস্ নিয়ে যায়।

ইলি নদীর এপারে সর্ব্বত্র পপ্‌লার গাছের বন, এ অঞ্চলকে শিকারীর স্বর্গ বলা যেতে পারে। পপ্‌লার অরণ্যে দলে দলে কৃষ্ণসার হরিণ চরছে, এক এক দলে ত্রিশ চল্লিশটা থাকে। একদিন বন্দুক হাতে তাঁবু থেকে বেরুলাম, জঙ্গলের মধ্যে দশ পা যেতে না যেতে ছুটো বড় বড় হরিণের সাক্ষাৎ মিলল। মাসখানেক পরে আমরা এগারো হাজার ফুট উঁচু মুজার্ট গিরিবর্ত্ম দিয়ে তিয়েন্‌শান্ পর্ব্বতের উত্তর দিকে ঢালু থেকে দক্ষিণ সানুদেশে পৌঁছুলাম, পথের মধ্যে যেদিকে চাই চারিধারে শুধু শুভ্র তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শিখররাজি, কতকগুলো শিখর আবার আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেল পাথরের।

দক্ষিণ সানুদেশ একেবারে অনাবৃত, বৃক্ষলতাশূন্য, অনেক জায়গায় ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, দিনের উত্তাপ প্রায় অসহ্য। দিনে তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করে এবং রাত্রে ঘোড়া চালিয়ে জুলাই মাসের প্রথমে আমরা কাশগারে পৌঁছে গেলাম।"

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পোনেরখানি উপন্যাস—

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোনেরখানি উপন্যাসের একটি তালিকা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর এমেরিটাস অধ্যাপক উইলিয়ম লায়ন ফেল্‌প্‌স কোরামে দিয়াছেন। নীচে তালিকাটি উদ্ধৃত হইল।

১। ডস্টয়েভস্কি (১৮২১)—ব্রাদার্স কারামাজভ।
২। পলিডার ট্রেভেল্‌স্ (১৭২৬)—রোবাসন ক্রুসো।
৩। ক্লারিসা (১৭৪৭)—স্যামুয়েল রিচার্ডসন।
৪। টিস্ট অব টম জোন্স (১৭৪৯)—হেনরি ফিল্‌ডিং।
৫। ইউজেন গ্রাঁদে (১৮৩৩)—বালজাক।
৬। দি মাকেটিলর্স (১৮৪৪)—আলেকজাণ্ডার ডুমা।
৭। ডেভিড কপারফিল্ড (১৮৪৯)—চার্লস্ ডিকেন্স।
৮। স্কার্লেট লেটার (১৮৫০)—ন্যাথানিয়েল হথর্ণ।
৯। হেনরি এসমণ্ড (১৮৫২)—থাকারে।
১০। মাদাম বোভারি (১৮৫৭)—ফ্লবেয়ার।
১১। ফাদার্স এণ্ড চিল্‌ড্রেন (১৮৬১)—তুর্গেনেভ।
১২। লা মিজারেব্‌ল (১৮৬২)—ভিক্টর হুগো।
১৩। আনা কারানিনা (১৮৭৩-৭৬)—টলষ্টয়।
১৪। ব্রাদার্স কারামাজভ (১৮৭৯)—ডষ্টয়েভস্কি।
১৫। হাক্‌লবেরি ফিন্ (১৮৮৪)—মার্ক টোয়েন।
লেখকের মতে 'আনা কারেনিনা' এই তালিকায় শ্রেষ্ঠ বই।

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চরচিলমারী পুনর্ব্বার

৫

ব্রজবৈতা চলিয়া যাইবার সময় একটা কিছু ক্ষতি করিয়া যায়। বনোয়ারীলাল চর ছাড়িয়া যাইবার সময় এমন একটা কাণ্ড করিয়া গেল, যাহাতে কল্পদের সংসারটা ভাঙিয়া গেল, তারণদাসের মৃত্যুর কারণ ঘটিল।

নদীর স্রোতের অবিচ্ছিন্ন একটানা গতি দেখিয়া কালের ধারা তথা ইতিহাসের গতির একটানা-অবিরতির ভাবটা আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের ধারা মন্থর-গতিতে একটানা ভাবে একটা হইতে আর একটা ঘটনায় ক্রমবিকশিত হইয়া চলিয়াছে, এবিষয়ে যেন আর কোনো সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু বোধহয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ধারণা পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। ডারবিনীয় যে-ক্রমবিকাশবাদ এই ধারণার মূলে, সেই তর্কের মধ্যেই সন্দেহের বীজ নিহিত ছিল। বীজটা স্বভাবতই ক্ষুদ্র, চোখে পড়ে নাই, কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞানের নবতম গবেষণা এই অঙ্কুরের মূলে আশার বারি সেচন করিতেছে।

ইতিহাসের গতি অবিরাম তাহাতে তত সন্দেহ নাই, যত ইহার গতির একটানা মন্থরত্ব বিষয়ে। ইতিহাসের ধারা সমানভাবে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ কোথা হইতে কি কারণে তাহাতে একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব উপাদান আসিয়া পড়ে, যাহাতে পূর্ব্বের সমান গতি হঠাৎ বাড়িয়া গিয়া গতির মন্থরতা ভাঙিয়া দেয়। যে-নদীর স্রোত এপর্য্যন্ত ঘণ্টায় পাঁচ ক্রোশ বেগে চলিতেছিল, তাহাতে নূতন উপাদান আসিয়া পড়াতে, তাহার গতি ঘণ্টায় দশ ক্রোশের বেশ লাভ করিল। তর্ক উঠিতে পারে, ইহাতে অবিরতি ভঙ্গ হইল কিরূপে? সেটা তর্কের বিষয় বটে! কিন্তু পূর্ব্বের সমান গতি ও একটানা ভাবের ভঙ্গ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাহা যদি না থাকে, সৌর্ব্বাপর্য্যের মধ্যে যদি কালের ভারতম্য ঘটে, তবে আর কালস্রোতের একটানা অবিরতিকে ইতিহাসের স্বপক্ষে টানা যায় না। আর কালস্রোতের অদৃশ্য সূত্র ছাড়া ইতিহাসের ঘটনাবলীর আশ্রয় কি? কালস্রোতের অদৃশ্য সূত্রেই তো এই বিনি সুতার মালা গ্রথিত হইতেছে। যাহাকে আমরা আগে পরে, এক সময়ে, অতীত ভবিষ্যৎ বলিতেছি, তাহাতো এই কালস্রোতের মানবত অনুসারে। অতএব কালস্রোতের মধ্যে, এই বিধা ঘটিলে, ইতিহাসের ঐক্য থাকে না।

গাধা-শ্রেণীর এক জাতীয় জানোয়ার বেশ তো ছিল। কি কারণে কে বলিতে পারে, তাহাদের একদল এমন একদেশে গেল, যেখানে কণ্ঠকে যথাসাধ্য লম্বিত না করিলে উচ্চশাখার খাদ্য পাওয়া যায় না। খাদ্যাভাবে তাহাদের বহু পুরুষ মরিল, আবার বহু পুরুষ পরে তাহারা জিরাফ, গাধা আর নয়। আবার, শৃঙ্গহীন পশুর শিং গজাইল কিরূপে। কি কারণে কে বলিতে পারে, ওরই মধ্যে একটার একটুখানি শিংএর আভাস ঘটিল। তাহারি একান্ত চর্চ্চায় আজ শিং-এর কত বাহার এবং ব্যবহার। বানরের দলের কোনো চিন্তা ছিল না, হঠাৎ একদলের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, যাহার ফলে আজ মানুষ। ইহাকে আমরা দ্বিধাশূন্য ভাবে freak of nature বলি। প্রকৃতির অকারণ লীলা। লীলাতো অকারণই বটে। প্রকৃতির একটানা একঘেয়ে ছন্দ ভাল লাগে না, সে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ একটা গোলমাল ঘটাইয়া দেয়। তারপরে আবার নির্লিপ্ত ভালমানুষটির মত চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে থাকে। ঘটনাস্রোত সেই নূতন উপাদানের প্রভাবে নূতনতর দ্বিগুণতর বেগে ছুটিয়া চলে।

মানুষের ইতিহাসেও আকস্মিকতার এই লীলা আছে। মহাপুরুষ কেন যে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিভাবান্ পুরুষের জন্মের কারণ, কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। কপিলবস্তুর রাজপুত্র কেন গৃহত্যাগ করিল? আর মরুভূমির হ্রদের ধারে এত সংসার থাকিতে সূত্রধরের ঘরে কেন যীশুখৃষ্টের জন্ম? কে বলিতে পারে রুসো বা নেপোলিয়ানের জন্মের কারণ কি? তাহাদের জীবনের ঘটনাকে ইতিহাসের স্রোতের সহিত

মিলাইয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু মূল ব্যাপারটা, তাহাদের আবির্ভাবের তথ্যটা একান্তই অজ্ঞেয়। ইহারাও freak of nature, প্রকৃতির লীলা। ইহারা মানুষের ইতিহাসকে পুরাতন পথ হইতে নূতন পথে চালনা করিয়াছেন - ইহা ততটা সত্য নয়, যতটা সত্য মানুষের ইতিহাসের গতিকে ইহারা বহু যুগে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া, তাহার একটানা মন্থরতাকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রতি যুগে এই নূতন লীলার উপাদানে আন্দোলিত হইয়া পূর্ব্বতন গতির অবিরতিকে কতক পরিমাণে অস্বীকার করিতেছে।

ঐতিহাসিক জীবনের সত্য ক্ষুদ্রতর ভাবে ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়। মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের স্থানে শনি-রূপে যে আকস্মিকতা বিরাজ করিতেছে সে একদিন অকারণে বিনয়কে আনিয়া করুণের জীবনস্রোতে ফেলিয়াছিল। আবার আর একদিন বনোয়ারীলালকে আনিয়া দিল। এই দুই নূতন উপাদানের মূর্ণাচক্রে করুণের স্বচ্ছ মন্থর জীবনধারা বর্দ্ধিত-গতি হইয়া নূতন পথে ধাবিত হইল। কোন দিকে? হয় তো পদ্মার দিকে, হয় তো মৃত্যুর দিকে—হয় তো উভয় দিকেই যুগপৎ।

৬

বনোয়ারীলালের মত দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি সেদিনকার নৈশ অভিধানের পরে নিশ্চিত করিয়া বুঝিল করুণের আশা ছাড়িতে হইবে। করুণকে সে ছাড়িবে, কিন্তু একটা ক্ষতি করিয়া যাইবে। কয়েকদিন পরে সে তারণদাসের কাছে গেল। তাহাকে সে বলিল, করুণের জন্য বরের সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু বরটি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। তারণদাস সমস্ত অবস্থা কি বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। তখন বনোয়ারী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া করুণের আসন্ন মাতৃত্বের কথা শুনাইয়া দিল। তারণ লক্ষ্যহীন ভাবে অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল—বয়স হয়েছে যে, বয়স হয়েছে। বনোয়ারী বিষ উদ্গীরণ করিয়া চলিয়া গেল।

তারণ বিকাল বেলা তাহার চিঠিপত্রের সমস্ত দপ্তর লইয়া পদ্মার ধারে নির্জ্জন একটা স্থানে চলিয়া গেল। সেখানে পদ্মার তীর নদীগর্ভ হইতে প্রায় বিশ হাত উঁচু; নীচে বালির চর, জল নাই।

সেই তীরে বনবাউরের আড়ালে বসিয়া একে একে সমস্ত চিঠিপত্র, সযত্নসঞ্চিত তাহার ডাকবিভাগের খাতাপত্র, হিসাব নিকাশ আগুন জ্বালিয়া ভস্ম করিল। সবগুলি নিঃশেষে পুড়িয়া গেলে, ছাইগুলি সংগ্রহ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। তারপরে ধীরে ধীরে আসিয়া পদ্মার সেই অত্যুচ্চ তীরে দাঁড়াইল। একবার ডাহিনে, একবার বামে, একবার সম্মুখের নীলাভ পদ্মার দিকে চাহিল। আবার ফিরিয়া গিয়া যেখানে ভস্মরাশি পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আসিল। সেই উচ্চ ভূমিখণ্ডে দাঁড়াইয়া আর একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, তারপরে সেই অত্যুচ্চ তট হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা চরের একদল জেলে মাছ মারিয়া ফিরিতে-ছিল। তাহারা সে জায়গা দিয়া যাইতে একটা লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। তাহারা নিকটে গিয়া দেখিল তাহাদের ডাকমুন্সী আহত এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা ধরাধরি করিয়া তারণকে নৌকায় তুলিয়া শহরের হাসপাতালে লইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিল। তারণের ঘাড়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল—মূর্চ্ছা ভাঙে নাই, বাঁচিবার আশা নাই বলিলেই হয়।

পরদিন সকালে তাহার একবার জ্ঞানের মত হইল। ডাক্তার তারণকে চিনিত, সে মাঝে মাঝে ঔষধ লইতে হাসপাতালে আসিত। ডাক্তারকে দেখিয়া তারণ ক্ষীণস্বরে বলিল—পারলাম না ডাক্তারবাবু, আবার ঠকে গেলাম; সাথে একটা হাসি ও খানিকটা রক্ত! ডাক্তার কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—কি ডাকমুন্সী, তোমার ডাকঘরের খবর কি? তারণের মুখে একটা হাসির রেখা যেন ফুটিল, পরক্ষণেই তাহা আবার মিলাইয়া গেল। সে বলিল—খেলা, খেলা, ডাক্তার সাহেব, সব মিথ্যা। বিজ্ঞ ডাক্তার বুঝিল প্রাণের আশা আর নাই।

সংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করুণ আসিল। ডাক্তার বলিল—মুন্সী তোমার মেয়ে এসেছে। তারণ চোখ বুজিয়া ছিল একবার তাকাইল—আপন মনে বার দুই বলিল—মায়ের তো মেয়ে, মায়ের তো মেয়ে। তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। করুণ পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তারপর আর চক্ষু খুলিল না। বিকালের দিকে তাহার মৃত্যু হইল।

৭

করুণ বাড়ি ফিরিয়া সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। দীর্ঘ রাত্রিতে একফোঁটা ঘুম আসিল না। চরে বসন্ত রোগের যখন মড়ক লাগিয়াছিল, হিন্দুপল্লী হইতে শ্মশানযাত্রার হরিধ্বনি তাহার বিনিদ্র ক্লান্তির সহিত মিশিয়া একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল।

ভোর বেলা সে ঘরের দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া নীরবে বসিয়া ছিল। বিনয় আজ তাহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারিত না, কিম্বা একান্ত নিবিড়ভাবে চিনিত, সে-পরিচয় সে আগে কখনো পায় নাই। যে-নদীতে সে জোয়ার দেখিয়া গিয়াছে, আজ দুর্দ্দিনের ভাটার টানে তাহার পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত নৌকাডুবির মরিচা-ধরা নোঙর, ভাঙা হাল, আবর্জ্জনার কত অনাবশ্যক সামগ্রীর খণ্ডাবশেষ আজ নদীগর্ভে দৃশ্যমান্। করুণের চেয়ারায় সেই নদীগর্ভের দৃশ্য। দুঃখে মানুষ বড় শীঘ্র বাড়িয়া ওঠে। কিন্তু সে বৃদ্ধি বাহিরে নয়, অন্তরের দিকে। মরুভূমির গাছের বাহিরের পল্লবপ্রাচুর্য্য বেশি নয়, কিন্তু মাটির তলে শিকড়ের ঘাবলম্বী দীর্ঘতা অত্যধিক। করুণের পরিবর্ত্তন অনেকটা সেই রকমের। শরীরের দিকে তাহার কৃশতা, কিন্তু চোখের দিকে চাহিলে মনে হয়, জীবন-সরোবরের অনেকখানি তলে সে তলাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অপেক্ষা সমুদ্র উদার, সমুদ্রের অপেক্ষা আকাশ, আর আকাশের অপেক্ষা যদি কিছু উদার, অগাধ, অতলস্পর্শ থাকে তবে তাহা মানুষের চোখ, করুণের চোখ। শ্মশানের দিকে একটি মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল, করুণ বসিয়া তাই দেখিতেছিল। সে হয় তো ভাবিতেছিল, মানুষ মৃত্যুর পরে ওই পর্য্যন্ত মানুষের সাথে যাইতে পারে, তারপর সব অন্ধকার। জগতে যদি সত্যই কিছু দুঃখবেদ্য থাকে তবে তাহা মানুষের মন। সুখের দিনে তাহার চিন্তার অন্ত খানিকটা প্রবেশ করা যায়, কিন্তু দুঃখের দিনে তাহা একেবারে দুর্গম।

এমন সময়ে দেখিল বাদল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বাদলকে আনিয়া পাশে বসাইল। আজ দুইদিন তাহার সন্ধান লইতে পারে নাই বলিয়া করুণের কষ্ট হইল। তাহার মনে হইল এই ক্ষুদ্র বালকটি যতই অনাত্মীয়, যতই দূরবর্ত্তী হ'ক না কেন, আজ সেই একমাত্র তাহার সহায়। সে বাদলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে করিতে তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কারণ যাহা শুনিল, তাহাতে করুণের বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল।

বাদল পাড়ায় খেলিতে গিয়াছিল, প্রতিদিনই যায়। খেলার সাথীদের নিকটে তাহার দিদিমণির ছেলে হইবে বলিয়া সে আনন্দ করিতেছিল। ছেলেরা ঠাট্টা করে। বাদল রাগিয়া ওঠে। তারপরে দুইপক্ষে মারামারি। বাদল একা, কাজেই সে বেশী মার খাইয়াছে।

ঘটনা শুনিয়া করুণের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপারটা যে এতখানি রটিয়াছে, তাহা সে জানিত না। যেমন আগ্রহে সে এইমাত্র বাদলকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। এই আকস্মিক ও অকারণ অনাদরের আড়ষ্টতার কারণ বাদল বুঝিতে পারিল না। সে বারংবার করুণকে কত প্রশ্ন করিল, কিন্তু সুবিধামত উত্তর পাইল না, কেবলমাত্র দুই একটা হাঁ বা না।

তখন সে দিদিমণির কোল ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না, করুণ তাহাকে আটকাইল না। বাদল জানিত দিদিমণির অটল গাম্ভীর্য্য কিসে নড়িবে, সে বলিল তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। এই অস্ত্রে সে বহুদিন বহুবার করুণের রাগ জল করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহাতে কোনো ফল হইল না। করুণ নীরবে রান্নাঘরের চাবিটি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। কিন্তু বাদল ত রান্নাঘরের চাবি চাহে না, ক্ষুধাও তাহার পায় নাই, সে প্রত্যূষে উঠিয়া এক পেট খাইয়া বাহির হইয়াছিল। চাবিটি লইয়া দুই হাতে সে নাড়িতে লাগিল, কিন্তু এক পাও নড়িল না, তেমনি স্থির ভাবে সেই স্থানে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণ যখন কিছুতেই উঠিল না, বাদল আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিল। সূর্য্য মাথার উপর উঠিল। ইতিমধ্যে সে কতবার করুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই, সে যে এত বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত রহিয়াছে, এই কথাটা করুণকে না বুঝাইতে পারিয়া

তাহার মন ছটফট করিতে লাগিল। এই নিষ্ফল অভিমানের তাপে বালকের ক্ষুদ্র চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল।

এমন সময় পাড়ার একটা গরু ছুটিয়া আসিয়া উঠানের গাঁদা গাছগুলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল ভাবিয়া সে চীৎকার করিয়া গরু তাড়াইতে লাগিয়া গেল। গরুটা কিছুতেই নড়ে না, বাদলও ছাড়ে না। অবশেষে সে একটা লাঠি দিয়া গরুটাকে দুটা ঘা বসাইয়া দিল। গরুটা পলাইল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে শিংএর একটা আঘাতে বাদলের বাম বাহুতে রক্ত-পাত করিয়া দিল। বিষম আঘাতে সে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল। করুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখে বাদলের হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। সে বাদলকে উঠাইয়া লইয়া ঘরের দাওয়ায় শোওয়াইল, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। কিন্তু এই দারুণ বেদনা সত্ত্বেও বাদলের মুখে হাসি ফুটিল। তাহার হাসিতে করুণের সাহস হইল, ভাবিল, আঘাত এমন কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বাদল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু তবু সেই তৃপ্ত হাসির রেখাটি তেমনি তাহার মুখে লাগিয়া রহিল।

সে হাসির অর্থ কি! তাহার আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাহার দিদিমণির অভিমান ভাঙিয়াছে তাহা কতোধিক সত্য! আঘাতের দরুণ ওই মূর্চ্ছাটি আর ভালবাসার সার্থকতার ওই ক্ষীণ হাসির রেখাটি; মূর্চ্ছাতুর নৈশদিগন্তের অধরে যেন সকরুণ চন্দ্রকলাখানি।

৮

এতদিন তারণের যে পরম আশ্রয় ছিল তাহা আর নাই। ওই শিশুর মত সরল দুর্ব্বল নিঃসহায় নিঃস্ব লোকটি যে এত বড় আশ্রয় তাহা সে বাঁচিয়া থাকিতে বুঝা যায় নাই। সে যে কোনরূপ শারীরিক সাহায্য করিতে অসমর্থ করুণ তাহা জানিত, তবু তাহার উপস্থিতিই একটা অক্ষয়-কবচের মত ছিল।

শিশুর এমন একটি অপরাজেয় মহিমা আছে সহজে যাহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তাহাকে আঘাত করিতে গেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে অক্ষয়-কবচের মত অমোঘ হইয়া দেখা দেয়। সেই সহজ স্বচ্ছ মহিমা ছিল তারণদাসের। ইহাকে করুণা বলিতে হয় বল, কিন্তু সেইজন্যই আরো বিগুণ উহার মহিমা। এই মহিমায় শুধু শিশুকে নয়, আততায়ীকে সুদ্ধ অন্তত এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহৎ করিয়া তোলে।

পাড়ায় তারণের বাড়ীটি সবচেয়ে অরক্ষিত ছিল, কিন্তু কোনোদিন সেখানে চুরি হয় নাই, ছেলেরা কোনোদিন দৌরাত্ম্য করিয়া ফুল ফল তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে আসিত না, এমন কি কৃষাণদের গরু বাছুর পর্য্যন্ত সেদিকে বড় ঘেঁসিত না। শিশুরা তারণকে আপন ভাবিত, বৃদ্ধেরা সম্ভ্রম করিত, যুবকেরা তাহার কাছে ঘেঁসিত না।

কিন্তু এখন করুণের দুইটি বিপদ। একদিকে তারণদাসের অভাব, অন্যদিকে বনোয়ারীলালের উৎপাত। সত্য বটে, বনোয়ারী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া আসা আশ্চর্য্য নয়, তা ছাড়া সংসারে বনোয়ারীলালের তো অভাব নাই। সব চেয়ে ভয়ের কথা তো সেই।

করুণের উপরে পাড়ার যুবকদের বহুদিন হইতে নজর ছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না, তারণদাসের স্বাভাবিক মহিমারই হউক, বা করুণের অস্বাভাবিক দুরদৃষ্টে হউক, এতদিন সে নিরাপদ ছিল। কিন্তু এবার পাটের দালাল বনোয়ারী-লাল আসিয়া যুবকবৃন্দের সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, বিশেষ করুণের ক্রমপরিস্ফুটমান মাতৃত্বে সকলে তাহাকে আপন বাসনার অগ্নিতে ইন্ধন স্বরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন নির্ব্বোধ বাদল যে-কথা শুনিয়া আসিয়া করুণকে বলিয়াছিল, তাহা এই দুর্দ্দশার সূচনা মাত্র, শেষ যে কোথায় তাহা ভাবিতেও তাহার রক্ত জল হইয়া যাইত।

তারণের মৃত্যুর পরে করুণ ভয়ে ও লজ্জায় বাড়ি হইতে বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার বর্গাদার করিম সেখ আসিয়া ক্ষেতের ফসল বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়, আর বাদল কোথাও বাহিরে যাইবার দরকার হইলে যায়। করুণ সারাদিন ঘরের দাওয়ায় নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়াছিল তাহা তো বন হইতে নয়, কুটীর হইতেই। পাড়ার দুঃসাহসী দু' একজন যুবক করুণদের বাড়ীতে সময়ে অসময়ে দেখা দিতে লাগিল। ইহাতে দোষের কিছু আছে, তাহারা বুঝিতে পারিত না। তাহাদের চোখে

করুণ সামান্য একজন পতিতা মাত্র, যারনারী, তাহার প্রতি সকলেরই সমান অধিকার।

আগে করুণ এই সব উৎপাতের প্রতিবাদ করিত। এখন কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কে বাড়ীর পাশ দিয়া গেল, উঠানের মধ্যে কে আসিয়া দাঁড়াইল, অদূরে কে অশ্লীল উল্লাসে গান করিল কোনোদিকে সে মন দিত না। কেবল যখন শ্মশানযাত্রার হরিধ্বনি শুনিত, সে একদৃষ্টে বসিয়া তাহা দেখিত ও মৃত্যুর জন্য কামনা করিত। কিন্তু মৃত্যু তো কাহারো হাত ধরা নয়, যে ইঙ্গিতমাত্রে আসিয়া হাজির হইবে।

সে ভাবিত, এত লোক বসন্তে মরিতেছে, এই চরে তাহাদের পাড়ায়, তাহাদের বাড়ির পাশেই, অথচ যেখানে মৃত্যু, বিভীষিকার মত নয় মুক্তির মত কাম্য, সেখানে সে আসে না কেন? মৃত্যুর যদি একটা কোনো নিয়ম থাকিত, তবে এরকম কল্পনার সার্থকতা ছিল। জন্ম যেমন, মৃত্যুও তেমনি একটা ঝাপছাড়া আকস্মিকতা। অকূল সমুদ্রে কোটি কোটি ঢেউয়ের মধ্যে কেন যে একটা ঢেউ একটু আগে ভাঙিয়া পড়িল, তাহার যদি কোনো নিয়ম থাকে তবে মৃত্যুরও নিয়ম আছে। জন্ম, মৃত্যু, জীবন তিনই আকস্মিক; আমরা এই তিনকে একত্র করিয়া একটা শৃঙ্খলা রচনার প্রয়াস করিয়াছি। সুতরাং এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ওই তিন আকস্মিক ঘটনা নয়, এই অসম্ভবের শৃঙ্খলাপ্রয়াসী আমরা। কাজেই এত প্রয়োজনেও করুণের বসন্ত হইল না, আর পাড়ায় বিনা প্রয়োজনে, বিনা ইচ্ছায় প্রতি দিন অনেকগুলি করিয়া লোক মরিতে লাগিল।

করুণের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন হইল রাত্রে একাকী গৃহে শয়ন। রাত্রি বেলা বাড়ির আশেপাশে, উঠানে লোকের পদধ্বনি শুনা যাইত, কোনো কোনো রাত্রে কে যেন আসিয়া দরজার শিকল নাড়িত, বেড়ায় ধাক্কা দিত। বাদল ছেলে মানুষ, সে আর কি করিতে পারে! করিমকে তাহার বাড়িতে আসিয়া শুইবার জন্য করুণ অনুরোধ করিল। সে কয়েক রাত্রি করুণের ঘরের দাওয়ায় শুইয়া পাহারা দিল। কিন্তু ব্যাপারটা অশোভন মনে করিয়া তাহাকে আসিতে করুণ নিষেধ করিল। করিম আপত্তি করিল কিন্তু সে তাহাতে কান দিল না। করুণ এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল যে শিকল যার খুশি নাড়িতে পারে, কিন্তু অর্গল খোলা তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

৯

করুণ একাকী ঘুমাইতেছিল। গভীর রাত্রে সে কাহার কণ্ঠ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তারণদাস বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—অন্ধকারে সে পথ দেখিতে পাইতেছে না, করুণকে আলো ধরিতে অনুরোধ করিতেছে। করুণ ধীর পদে শয্যা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে করিয়া কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। তাহার মনে হইল, তারণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, সে পিছনে পিছনে পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া আলো দেখাইয়া চলিল।

করুণকে নিশিতে পাইয়াছে।

নিশি আর কিছু নহে, নিশীথ রাত্রির আত্মা। তখন মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু জগৎ জাগিয়া ওঠে। দিনের বেলা যে সব বস্তুকে আমরা জড় বলিয়া মনে করি, এই নিশীথ রাত্রে তাহারা সব জাগ্রত হয়। গাছপালা, নদীনির্ঝর, পাহাড়-পর্বত, আকাশের তারা এবং পৃথিবীর ধূলি-কণা কিছুকালের জন্য চৈতন্য লাভ করিয়া অবাক ভাবে তাকাইয়া থাকে।

মানুষ যখন জন্মে নাই, প্রকৃতি যখন এই জগতের একমাত্র মালিক ছিল, কিছু কালের জন্য সেই দিন ফিরিয়া আসে। প্রকৃতি বারে বারে মানুষকে ডাকে। নিশি সেই ডাক লইয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষকে ঘুমের মধ্যে জাগিতে হইবে, প্রকৃতির সেই আদিম চৈতন্যের মধ্যে। ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলে সমস্ত মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু যে ঘুমের মধ্যে জাগিতে পারে সে আশ্চর্য এক জগৎ দেখিতে পায়।

নিশীথ রাত্রিই জগতের যথার্থ পটভূমি। দিনের আলো তাহাকে ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত বেশি বোধগম্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। মানুষকে সে আলো সংশয়িত করিয়া বুদ্ধের দৃষ্টি দেয়। কিন্তু এই নিশির আহ্বানে মানুষ আবার শিশু হয়, তাহার চোখে প্রকৃতির বাধা সরিয়া যায়, জগতের রঙ্গমঞ্চে সে আর তখন দর্শক মাত্র নয়, সে-ও অভিনেতাদের অন্যতম হইয়া পড়ে।

অন্ধকার নিশীথের মত বিস্ময়কর অদ্ভুত আর কি আছে। আকাশের তারা তখন আলোকবিন্দুমাত্র নয়, শত সহস্র

ব্যাকুল দৃষ্টি। বাতাসে কার নিশ্বাস গায়ে লাগে, বনের গাছপালা শাখা-প্রশাখা নাড়িয়া নৃত্য করিতে থাকে, মাঠের উপর দিয়া কাহাদের যাতায়াত! ঘুরে ঘুঙুরের শব্দকে স্বপ্নপুরীর রথের চাকার আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হয়; নদীর তরঙ্গধ্বনিতে সেই স্বপ্নপুরীর সুন্দরীদের কলকণ্ঠ! দিনের পরিচিত সব দৃশ্য অতি-পরিচয়ের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে তাহাদের দলে যোগ দিতে ইসারা করে। সে একপা একপা করিয়া নূতন-চলিতে-শেখা শিশুর মত অগ্রসর হয়, তাহারা হাত তালি দিয়া ডাকিতে থাকে, নিশি নিশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে, পাছে নিশ্বাসের শব্দে তাহার চটকা ভাঙিয়া যায়।

করুণ পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া চলিল। এ-চলা দিনের আলোয় নয়, ইহাতে চেতনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য নাই, এ যেন কোন দৈবের হাতে যন্ত্রের চলা। ডাহিন হাতে প্রদীপটি স্থির, প্রদীপশিখাটির দিকে চোখের দৃষ্টি লগ্ন, তাহাতে পলক নাই। নিশ্চল আলোকশিখায় তাহার মুখের সম্মুখ ভাগটা, গাল, দুটি ওষ্ঠাধর, কপাল ও বিশেষভাবে নাকের ডগাটি অত্যুজ্জ্বল, আর সব অন্ধকারে লীন।

সমস্ত প্রকৃতি সজীব হইয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। উঠানের গাঁদা গাছগুলি অজস্র ফুলের চুমকড়ি দিতেছে, সীমের লতা দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া দিতেছে, ফুলগাছের অজস্র মুখর ফলের সম্ভাষণ—সবাই ডাকিতেছে, বলিতেছে, চল, চল, করুণ আমরাও আছি।

রাত্রিতে জগৎ নিদ্রিত, এত বড় মিথ্যা কথা আর কিছু নাই। কান পাতিলে শুনিবে মাটির তলে অসংখ্য কীটের উসখুস শব্দ হইতে পৃথিবীতলে অলক্ষ্য জীবনের যাতায়াত। এই সমস্ত প্রাণপ্রবাহ করুণকে সাথী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। সে শতবার পরিচিত সেই পথ, ক্ষেতের আল, খড়ের ভুঁই, আমের বাগান, শূন্য মাঠ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একেবারে পদ্মার জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে অতল রাত্রির নির্যাসের মত অকূল পদ্মার স্রোত। করুণ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, কি দেখিল জানি না, কিন্তু কি দেখিতে পারিত তাহা বলিতেছি।

সঙ্কীর্ণ গিরিপথের একটি মাত্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বর্ষার দুরন্ত স্রোতস্বিনী যেমন আপনাকে নিঃশেষে নিঃসারিত করিয়া দিবার চেষ্টাতে অজস্র ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করে, তেমনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ, উপগ্রহ চন্দ্র তারা-সূর্য্য একটি ক্ষুদ্র আকাশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া এই অলৌকিক জ্যোতিজ্জাল বিস্তার করিয়াছে। ইহার মধ্যে কত স্তরের প্রকাশ! শত যুগের, লক্ষ যুগের, কোটি যুগের, কোটি কোটি যুগের আলোকরশ্মি এক সাথে কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার দৃষ্টি এই জ্যোতিষ্ক-মেখলা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, সেখানে আর কিছু নাই, কেবল নিরঞ্জন নির্ম্মল শূন্য—বিরাট নীলাম্বরীর নীলতম প্রান্ত। আকাশের উত্তর কোণে ওই যে রাশি রাশি কার্পাসস্তূপের মত মরীচিকা পুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কের অবিরাম উদ্গারের টানা-পোড়েনে, ওই জ্যোতির্ম্ময় অলৌকিক কার্পাস হইতে ঊর্ণাতন্তুসূত্র আলোকময় সূত্র তুলিয়া, এই নীলাম্বরীর গায়ে থাকে থাকে দু' একটি কক্ষা তুলিয়া দেয়, ইহাই আমাদের চিরপরিচিত গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ। কিন্তু সেই নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনবর্তীর সহিত কোনো জন্মে আমাদের পরিচয় নাই।

করুণ আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইল! কিন্তু তাহার স্বপ্ন ভাঙিল না। এতক্ষণ সে পিতার অসহায় পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, এবার সে পদধ্বনি মিলাইয়া গেল। তখন সে নত হইয়া পদ্মার স্রোতে দীপটি ভাসাইয়া দিল। অগভীর জলতলের ঘনশ্যাম শেহলার অন্তরালে শুদ্ধ ছোট ছোট মাছগুলির চোখ আলোতে ঝক ঝক করিতে লাগিল। তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীপ ভাসিয়া চলিল—কালো অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা যেন শাদায় তালি দেওয়া। ক্রমে আলো মিলাইয়া গিয়া একটি জ্যোতিবিন্দুরূপে তাহার দীপ অকূল পদ্মাবক্ষে ভাসিয়া চলিল। করুণ যে ভাবে যে পথে আসিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সেই পথে গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত তবে দেখিতে পাইত, পাড়ার যে কয়েকটি লোক অন্ধকারে মাছ ধরিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। এই ঘটনায় তাহার জটিল জীবনজালে আকস্মিকতার আর একটা গ্রন্থি পড়িয়া গেল। [ক্রমশঃ]

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৯)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রী পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বলেন্দ্রনাথের গল্পভঙ্গির মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল। অকালে মৃত্যু না হইলে তাঁহার লেখনীর দ্বারা বঙ্গভাষা যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বলেন্দ্রনাথের ভাষা মূলতঃ সাধুভাষা হইলেও ইহাতে কথা ভাষার রীতি মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হওয়াতে সরসতার সঞ্চার হইয়াছে। ভাষার ধাঁধুনি সহজ, ঘাঁট-সাঁট অথচ ওজস্বী। দুইটি প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কবি হইতে গেলে যেন আইন প্রকরণপূর্ব্বক সাধারণ বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সাধারণ আচরণের পরিহার করিতে হইবে, সাধারণ সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, আহারে বিহারে, আচার ব্যবহারে, বাক্য ব্যয়ে, স্বাতন্ত্র্য না হইলে চলিবে না। এই তালিকা সেন্টিমেন্টালেরা কবির শরীরে না মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর হয়েন না—জানি কি, কোথায় পক্ষপাত হয়, লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা অপ্রতিষ্ঠ হইবে। (কবি ও সেন্টিমেন্টাল্ ১)।

কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা নরসিংহ কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ-প্রদেশে মুক্তেশ্বরের দেবালয় স্থাপন করিলেন। সহস্র বাস্তবালা প্রস্তরখণ্ডের স্তম্ভে পরস্পরকে চির-আবদ্ধ হইল—আবদ্ধ নারীদেহের ত্রিভঙ্গে দেহ অনুকরণে অদ্ভুত কথা পাষাণ হইয়া রহিল। পশু দেব, পশু দেবী, নরনর, নরনারী, অদ্ভুত আকারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, বৌদ্ধবিলাসকলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিজল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের দৃষ্টিকে বদ্ধ আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিশিখরকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীরা এক খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। (উড়িষ্যার কেশরীবংশ ২)।

রবীন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথও গল্প লেখায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলির ভাষা সরল, সুন্দর, অনাড়ম্বর এবং মনোরম।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-সংগ্রহের বই "নবকথা" ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি ইহার পূর্ব্বে ভারতী এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প এবং উপন্যাস বাহির হইয়াছে।

প্রভাতকুমারের ভাষার মূলে বঙ্কিমী পদ্ধতি। ভাষা সরল এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বর হওয়া সত্ত্বেও সরস-উজ্জ্বল এবং সুন্দর। অতি স্বল্প আয়োজনে ভাষাকে এইরূপ মনোহর করিয়া তোলা অল্প কৃতিত্বের কথা নহে। প্রভাতকুমারের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি।

"—আজকাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি ধুম! দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তোমার মুখস্থ থাকে, তা হলে বড় বড় লোক—চেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্ত্র নেবে। বিদ্যে পাওনা থোওনা যে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞানে একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি একটু লেখাপড়াও জানি কিনা। সন্ধ্যাসী হলেই যে মোক্ষলাভ তা নয়। ঘরে বসে পিতৃধন খাবে আমি ছাত্রবৃত্তি দেব। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে মুখস্থ করতে পারি এটুকু সাধ্য আমার ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড়লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি দাদুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান রয়েছে। বসন্ত পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞান প্রবেশ'। খাঁচা দেখা, মুখস্থ করা তাঁরা বইখানা নিয়ে ঘুলির মধ্যে পোরা। একখানি কিনে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। অন্য বাড়ীতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে পড়ে[১], বিজ্ঞানটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটির নাম লেখা ছিল, সে পাতটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমায় খুব সেবা শুশ্রূষা কর,—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সেখানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়াশুনা কতদূর হয়েছিল?"

"মোহিত বলিল, কৈশোর নয়।"

"বটে বে—তুমিকে বুঝি চুচু? বই একেবারে উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমার মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিন্তু, ছেড় না। সবাই কি আর ব্রহ্মবুরি পড়েছে? ও কথা মনে সরবে কেন? আজকালকার বাজারে ছত্র-

১ সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৮৩।

২ সাধনা, দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ ১৩০০ সাল, পৃঃ ৪৪১।

১ ছাপার ভুল, 'পড়ে সড়ে' বা 'পড়ে উড়ে' হইবে।

বৃষ্টি যেন সমানই কটা যেন
না কিছু।" [নবীন-সন্ন্যাসী ২

প্রভাতকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গল্প লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কতকগুলি গল্প ও নক্সা ছাড়া ইহার আর কোন রচনা নাই। যতদিন "সাহিত্য" পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল ততদিন সুরেন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকাতেই লিখিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের ভাষার ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। বাক্যগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং কাটা কাটা, যেন সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও গায়ে লেপ্‌টাইয়া নাই। কথ্যভাষার শব্দ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করায় ভাষা বেশ সরস। লেখকের সরসতাও (humour) বেশ উপভোগ্য। প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সকল রচনাই প্রচ্ছন্ন হাস্যের সুরে ওতপ্রোত। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি গল্প হইতে কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি।

চিত্রে ঝোলা হল পড়িয়া গেলে জল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। শুষ্ক হল দিয়া চাকিতে গেলে সেটা আরও বেড়ে হইয়া পড়ে। মানব চরিত্রে 'ওয়াশ-টোন' পড়িলে অনেকে জলে মিটাইয়া ফেলা ভাল। কখন সেটিকে দিয়া লেপা না। হল চাপিয়া রাখিবে।

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ছিন্নোলিয়া লেপ্‌গুলি ছোট দিদিকে দান করিল। একখানা সেকেলে ডুরের রেশমী শাড়ী বাহির লইল, এবং নির্জনে বসিয়া কবি ঠাকুরের সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উদাস ভাবগুলি পেন্সিলে নিম্ন চিহ্নিত করিল। [চিত্র ও চরিত্র ৩]।

বিবাহটা হইয়া গেল। বাসরঘরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। যাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিল, তাহারা নিদ্রার প্রকৃতি অনুসারে বাঁধিয়া গালমন্দ প্রভৃতি করিয়া প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট যাহারা স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্বাটীতে, নিদ্রাকাতর হইয়া শয়ন করিল।

বাসর-ঘর সূত্র।

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,—বধূ অতিশয় শান্ত ও সুশীলা। তাহার উপর, আমি যে উহার আনন্দে একেবারেই আত্মহারা, তাহা জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। আজ কথা, আমার বড় আসিতেছিল। এমন সময় আমার পূর্ব্বে কখনও ঘুম আসে নাই। এটা বোধহয় স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য। কিংবা হয় ত চাপুরের ঘুম এই সময় আসে। [সবিনয় নিবেদন ১]।

২ প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৩০১।

৩ সাহিত্য, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩০২ সাল, পৃঃ ১০০।

১ সাহিত্য, ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩০৯ সাল, পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

বাঙ্গালা চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদের বিশিষ্ট গল্প-লেখকদিগের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নাম করিতেই হয়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনায় সমাজ-পতির তুল্য লেখক খুব কমই পাওয়া যায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "উমা" একসময়ে যথেষ্ট নাম করিয়াছিল। তাঁহার রচনাভঙ্গি সহজ, সরল এবং সতেজ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ভারতী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। সাবলীল সাধুভাষায় রচিত ইঁহার পল্লীচিত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আদরের বস্তু হইয়া আছে এবং থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যের একটি বিশেষ রীতির প্রবর্ত্তক। এই রীতির অতিশয়িত রূপকে "বীরবলী" রীতি বা চঙ বলা হয়, কারণ 'বীরবল' এই ছদ্মনামে চৌধুরী মহাশয় এই চঙে অনেক সরস প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এখনও লিখিতেছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যভঙ্গির বিশেষত্ব এইগুলি। কথ্য ভাষা মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে। কথ্যভাষার শব্দ বা বাক্যাংশের সহিত তৎসম শব্দ এবং বাক্যাংশ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভাষায় রসসঞ্চার করিয়া দেয় এবং পাঠকের কৌতূহল এবং কৌতুকবোধ উদ্রিক্ত করিয়া দেয়। বাক্যগুলি অনেক সময় কাটা-কাটা এবং পরস্পর অসংযুক্ত, অনেকটা জ্যামিতির বা তর্কশাস্ত্রের ভাষার মত। গূঢ়ার্থক (epigrammatic) এবং বিরোধাভাসযুক্ত (antithetic, paradoxical) উক্তির বাহুল্য পাঠককে মুগপৎ চমকিত এবং চমৎকৃত করিয়া দেয়। "বীরবলী" চঙের এইটাই প্রধান বিশেষত্ব। কথ্যভাষার শব্দের প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের একটা বিশেষ টান আছে; সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার শব্দাদির প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং যথোচিত সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। ইংরেজি অস্ত্যর্থক ক্রিয়া (copula)-র স্থলে 'হচ্ছে' শব্দের প্রয়োগ প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাক্যপ্রয়োগ পদ্ধতি অনেকস্থলেই অনুসৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-পদ্ধতি হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যভঙ্গির উদ্ভব।

১২৯৮ সালে "সাহিত্য" পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের

দুইটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,—একটি "আদিম মানব" প্রবন্ধ, অপরটি "ফুলদানী" নামে ফরাসী হইতে অনূদিত একটি গল্প। যতদূর জানি, এই দুইটিই বোধ হয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা। "আদিম মানব" প্রবন্ধটি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় রচিত। তথাপি ইহার মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট সরস ভঙ্গি একেবারেই অস্ফুট নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও প্রতীয়মান। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আজকাল আমাদের-মুখ-বন্ধিনীর মধ্যে একটা নিত্য নূতন বিলাস ও অসম্পূর্ণতা ও যথাতথ্যিতা কিঞ্চিৎ অনাবশ্যকরূপে আলোচিত হইয়া পড়িতেছে। মনে হয়, এটা না হইলেও কাজটা অতিশয় অসম্পন্ন হইতেছে না। বিজ্ঞানের কৃপা, আমেরিকার মত সকলের হাতে কল আসিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না দিলে লোকে সংবাদ-পত্র পড়ে না। সকলেই বিশ্বাস, সমস্যার মুখে ছাই অর্পণ করা আবশ্যক, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্য কোনও উপায় নাই। কোনও বিষয়ে ইংরেজদিগের শ্রেষ্ঠ থাকার কথা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য। আমাদিগের প্রতি আর্য্য সহানুভূতির মাত্রা পাঁচ হইতে সাতি করা হয়।১

দ্বিতীয় বর্ষের সাধনায় ইতালীয় হইতে অনূদিত একটি প্রবন্ধ ("টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন") প্রকাশিত হয়। চৌধুরী মহাশয় ইহাতেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটু উদাহরণ দিতেছি।

বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তার বিষয় চিন্তা করা, এ দুইয়ের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে বেশী সুখের মনে কর?

টা। বলতে পারিনে। তবে এইটুকু জানি যে, সবকে তাকে সুখী করে' জানতুম—চোখের আড়ালে সে আমার বিকট মেজাজরূপে প্রতীয়মান।২

বীরবল ছদ্মনামে প্রবন্ধ প্রথম বাহির হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসে। এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট ভঙ্গি মূর্ত্ত হইয়া উঠে। যেমন—

আমি বাঙ্গালাভাষা জানলুম, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ পাপ বাবিনে যে, তাকে শ্রদ্ধা করি তাই শ্রাদ্ধ করতে হবে।৩

ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে যায়। উল্টোটা প্রমাণ করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

—এ যদি না পারেন তবে অন্ত সাহিত্যের কাণে শুধু পরের বোল পরান হবে।৩

বীরবলী ভঙ্গির একটি বিস্তৃততর উদাহরণ দিতেছি।

আমাদের মন সম্বন্ধে এবং শিক্ষার গুণে এটা স্বাভাবিক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের স্থিতি বজায় রাখা কঠিন হয়, তখন কথা আর কিছু থাকে না। রাস্তায় উপর চলা যত সহজ আকাশে উপর দেখাও তত সহজ। পণ্ডিত লোকে যাই বলুন সাহিত্যে শূন্যের উপর পুরু চালিয়ে কোন কথায় গুণপুরি করা যায় না। বিলিতি বাতাসে ফানুস যেমন যত সহজ, পাখা তেমন সহজ নয়। ও বিষয়ের সন্ধান পেয়েছে অনেক আগে। আসল কথা, আমরা সকলেই পক্ষীরাজ, শুধু কেউ কেউ পক্ষ দেখি।৪

বীরবলী ভঙ্গির একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে। সেটি হইতেছে বিষয়বস্তুর অপেক্ষা ভাষার চটককে প্রধান দেওয়া। সেই জন্য বিষয়বস্তু তুচ্ছ কিংবা অনুপযুক্ত হইলে রচনা কেবল বাক্‌চাতুরীতে পর্য্যবসিত হয় এবং পাঠককে ক্লান্ত করিয়া দেয়। এইরূপই ঘটিয়াছে চৌধুরী মহাশয়ের আধুনিক দুই একটি প্রবন্ধে এবং তাঁহার অনুকরণকারীদের সমস্তগুলি রচনায়। তবে রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র ভাষায় যে বীরবলী ঢঙের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে—ইহা চৌধুরী মহাশয়ের কম কৃতিত্বের কথা নহে।

চৌধুরী মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা "চার ইয়ারী কথা।" রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ"-এর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এই চারিটি ভাষা লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং স্বাতন্ত্র্যে ঝলমল করিতেছে। ভাষার চাতুর্য্য কোথাও ভাবকে চাপা দিয়া আখ্যান বস্তুকে অবান্তর বা হীন করিয়া দেয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমি যে পত্র চৌত্রেতে "ফিলীর" মতকে আমার করায়ত্ত করতে পারি নি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ কুসুমকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, অন্যের ধারণা। একদিন পোহুলিং আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্ত্তি হত, তার আমোদ ধরত, তখন সে ছোট ছেলের মত বজ্জাতি করত: আমার নাক ধরে টানত, চুল ধরে টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে' দেখাত। [পৃঃ ৪৭-৪৮]

বিশুদ্ধ কথ্যভাষা যথাসম্ভব তৎসমশব্দ-বর্জ্জিত এবং বালকবালিকা-বোধ্য করিয়া রচিত হইলেও যে কতদূর মধুর

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ১২৩।

২। সাধনা, বৈশাখ ১৩০০, পৃঃ ৪১১।

৩। অবাস্তব কথা [ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল]।

৪। ফোঁস নাগ [ভারতী, বৈশাখ ১৩১২ সাল]।

১। মূলে 'কলায়ত্ত'।

২। মূলে 'পোধূলি'।

এবং মনোগ্রাহী হইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমদিককার রচনাগুলিতে। সরল, অনাড়ম্বর কথাভাষার ছাঁদে অল্পবয়স্ক বালকবালিকা-দিগের জন্য মুখ্যতঃ লিখিত হইলেও এই আখ্যান এবং গল্পগুলি সাহিত্যের কোঠায় মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনাগুলিও এইরূপ ভঙ্গিতে লিখিত হইলেও দুই একটি মুদ্রাদোষের দরুণ সব সময় সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। অবনীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান মুদ্রাদোষ হইতেছে ক্রিয়াপদ এবং কর্ত্তা ও অন্যান্য কারকের পদের বাক্য মধ্যে সিদ্ধ প্রয়োগ স্থানের ব্যত্যাস। সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের সর্ব্বশেষে বসে, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম। অবনীন্দ্র-নাথ ক্রিয়াপদকে বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য স্থানে স্থানে অর্থগৌরব আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু পর পর ঐ রকম চলিলে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি অবনীন্দ্রনাথের এই ভঙ্গি বাঙ্গালা গদ্যে কিছু পরিমাণে গতি সঞ্চার করিয়াছে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি সাহিত্যিকের রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গির মূলে রবীন্দ্রী পদ্ধতি। শেষের দিকের রচনাগুলির ভাষা "কথিকা"-র ধরণের।

নিম্নে অবনীন্দ্রনাথের দুই রকম রচনার উদাহরণ দেওয়া গেল।

পূর্ব্বদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে যখন কুয়াশার চারিদিক অন্ধকার ছিল, পূর্ব্বদেব অল্প দেখেন, শুভ পুরোহিত সন্ধ্যায় আরতি শেষ করে তাঁদের সুকপাটাখানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বন্ধ করে বন্ধ করছেন, এমন সময় ঘোর মুখে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল; পরনে ছিন্ন বস্ত্র, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন দৈবের হাতে একটি সন্ধ্যাতারা পূর্ব্বমন্দিরে আজ চায়! [রাজকাহিনী[৩]]।

আমাদের সমাজ-সংস্কার হাতে যেমন করতে পারা শক্ত, তেমনি উৎসব-ক্ষেত্রে ঐও মানা শক্ত। নিজের ঘরে যখন নিজের লোকদের নিয়ে স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে উৎসব, তাতেও সমাজ যখন চোখ রাঙ্গিয়ে বসে আছে, পাড়ায় পাড়ায় ইট-পাটকেল ছোঁড়ে, তখন সাধারণ উৎসব-ক্ষেত্রে তার ভেতর অনাসৃষ্ট উৎপাত উপস্থিত হবে- এ কি আশ্চর্য্য, তা জানা কথা। পাপের মন লোকের মন সে ভেবে ঘর-পর বাছে না, তোমার আমার সুখ দুঃখ বাছে না, ইজ্জৎ অবিজ্জৎ বাছে না, ভেতরের বন্ধুকে দিচ্ছে এদিকে, পুলিসের বন্ধুকে দিচ্ছে এদিকে, আর মাঝে উৎসব করা আনন্দ করা ঐকতানের সঙ্গে! একা একা উৎসবের আমাদের অদ্ভুত রকম ঐকতান, সুর সুর থাকে পর্দার কোন পারে তার ঠিক নেই, তাল পড়ে জোরে জোরে এগারে উৎসাহে আহত অনাহত জনসঙ্ঘের মাঝার। [উৎসবের কনসার্ট][৪]।

"ভারতী" পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সাহিত্যিকের লেখায় রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত রীতি ও অবনীন্দ্রনাথের রীতির মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত কাব্য-ঘেঁষা গদ্য ভঙ্গির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন— মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান কালের একজন নামজাদা উপন্যাসকার। প্রথম প্রথম ইঁহারা অনুবাদ কার্য্যই বেশী করিতেন। ইঁহাদের রচনার নমুনা দিতেছি, তাহা হইতেই ইঁহাদের গদ্যভঙ্গির বিশেষত্ব জানা যাইবে।

এই সময় হইতে বিজ্ঞির হইয়া শুক ও শিষ—দুই সন্ন্যাসী মন্দিরের পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। কাহারো মুখে কথা নাই,—যেন কাহারও বিরাট আবির্ভাব নিষ্পন্দ হইয়া দেখিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রি— জ্যোৎস্নার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব মগ্ন। উদ্যানের মধ্যে বাতাসে গন্ধে একটী মাতামাতি চলিয়াছে;—আকাশের আলো, বাতাসের মর্ম্মর, পুষ্প-পল্লবের সুরভি দেবতার চরণে যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। বাতাস আসিয়া ফুলগুলি ঝরাইয়া দেবতার চরণে শুদ্ধীকৃত করিতেছে—পদ্ম সেখানে আসন পুঁজিতেছে। আরতির প্রদীপের মুখে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে। [মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; আবির্ভাব[৫]]।

সকাল বিকাল নূতন বাণীর ভঙ্গিমায় পাইবার জন্য রাজকুমারীরা যখন গোলাপ-কেয়ারীর ধারে ধারে বকুলবীথির তলে তলে বনবিহারে পথে পথে অকারণে চরণ খেলিয়া বাণীর মূর্তিরের কাছে ভিড় করিয়া জমিত, তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়া উঠিত, গাছে গাছে জলবৌবনেরা ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটিত, কলমাতে কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠ খুলিত। আর কাজ? পত্রপুটে ঝরা ফুলের বিদায়রজিমা মালায় ছেঁট আনিয়া সে আপনার সেবাবৃত্তি সার্থক করিত। [শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: অপরাজিতা][৬]।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বড় কবি ছিলেন। যেমন তাঁহার অনন্য-সাধারণ সূক্ষ্ম ছন্দবোধ ছিল, কথাভাষার শব্দকোষের উপর দখলও তাঁর তেমনি ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্যে পদ্যের মাধুর্য্য বিদ্যমান, কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। গদ্য-ভঙ্গি এইরূপ কাব্য-ঘেঁষা হওয়াতে রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে যেন

৩। কুন্তলীন সংস্করণ (১৩২১ সাল), পৃঃ ২।

১ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১০ সাল, পৃঃ ২-৩।

২ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৫৪৩।

৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ সাল, পৃঃ ২৮৩।

দৃঢ়তার অভাব অনুভূত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথমদিককার গল্প রচনার অধিক ভাগই অনুবাদ। শেষকালে তিনি একটি উপন্যাসের পত্তন করিয়াছিলেন। ইহার নাম "ডঙ্কা-নিশান"। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই চমৎকার উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রবাসীতে এই অসমাপ্ত বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ "ডঙ্কা-নিশান" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাইশ শো বছরের কথা! সুদূর স্মৃতির বাইশ কৌটার ভিতরকার জিনিষ। সাত পুরুষের বন্ধু পুরোন, তোমার আমার সতর পুরুষ আগেকার কাহিনী। আকাশে সপ্তর্ষি তখন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে; আর মর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্তে, মগধের সিংহাসনে, মৌর্য্য বৃহদ্রথ মহাপদ্ম নন্দের সন্তান, মহারাজ সপ্তসিন্ধুক নন্দ, তখন মহাসমারোহে বিরাজ করছেন। চার-নাথী পঞ্চম পাটলীপুত্র তাঁর রাজধানী। হিমাদ্রিজোড়া উত্তরাপথ থেকে চম্পারণ্যের টাপার জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য। তিনি নাথ তাঁর সৈন্য, আর দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।[১]

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং কল্পনাশক্তির ঐশ্বর্য্য, সাধুভাষার রচনাশক্তির ওজস্বিতা, সম্পূর্ণ বিস্মৃত অতীতযুগের কাহিনীকে অখণ্ড ভাবে চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া ধরে। ভাষার প্রয়োগেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন—সুদূর অতীত শক-কুষাণ যুগ অথবা গুপ্ত কিম্বা পাল-যুগের কাহিনীর বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দপূর্ণ বিশুদ্ধ সাধুভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু মোগল যুগের কাহিনীর বেলায় কথ্যভাষা মিশ্রিত লঘু সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া বিষয়বস্তুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস "ডঙ্কা-নিশান" ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে খুবই উপাদেয়, কিন্তু কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া বিষয়বস্তুর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দুইটি বিভিন্ন যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত দুইখানি উপন্যাস হইতে রাখালদাসের রচনাপদ্ধতির নমুনা দেওয়া হইল।

যখন জেরণে জেরণে শিবসেনা প্রথম প্রয়াগে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন বপ্প-প্রাসের শিবির হইতে সপ্তশতজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিল। সকলপ্রথমে যৌবেয়ের মহাপ্রতীহার পরস্তপ চলিয়াছেন, তাঁহার পরে রাজপুত সওয়ার দুইদিকে দুই ভাগে চলিয়াছে। অশ্বারোহিদের পরে যৌবেয় কনাদুক অবস্থায় পত্রবাহিত ষোড়শজন রাজপুত রাজপুত, তাঁহার পশ্চাতে যৌবেয় অশ্বপৃষ্ঠে শস্ত্রসজ্জিত রাজপুত অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে পৌড়ীয় অশ্বারোহী। মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরীর শব্দে নাগরিকদলের কর্ণ বধির হইল। বাতায়ন ও পথপার্শ্ব হইতে প্রবাসের নাগরিকার ঝাঁকে ঝাঁকে যেতপুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

সোজাবাহা যখন প্রাসাদের তোরণে পৌঁছিল, তখন অশ্বারোহীদল অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। প্রাসাদ-তোরণে মহানায়ক প্রবর্ষসিংহ ও অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। যৌবেয়পুত্র ও যুবরাজ দুইটি চন্দ্রাতপতলে দিয়া মহাপ্রতীহার ও রাজপুত রক্ষীগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মণ্ডপের তোরণে কাদম্বকুলরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রধ্বজদেব ও মহাকুমার পরম ভট্টারক মহারাজ ইন্দ্রপালদেব তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রধ্বজ ও বাকপাল যুবকে মধ্যে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহা দেখিয়া পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডপে সমবেত জনমণ্ডলী আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, সেনানী ও সৈনিকগণ অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা ও তূরী বাজিয়া উঠিল। (ধর্মপাল ২)।

বসুধ গুরুকে ক্রোড়ে টানিয়া সমাধির নিকটে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বহুক্ষণ হইতে একটি অমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া বসুধের হস্তে দিল। বসুধ তাহা বাচস্পতির হস্তে দিলেন। বাচস্পতি অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "কণ্ঠীর, তুমি সপ্তগ্রামের সেই বৈদেশ?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থনা আছে।"

"প্রাসাদে গেলে না কেন?"

"মহারাজ আমায় মন বলিয়া দিল যে ইহাই উপযুক্ত স্থান।"

"কণ্ঠীর তুমি কি চাও?"

"আমার গুরু কণ্ঠী হইয়াছেন, মহারাজ কৃপা করিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করুন।"

তখন মহতাম-ই-গ্রহল আবদুল্লা বাবু কোমের জগদ্বিখ্যাত সমাধির ভিত্তি নির্ম্মিত হইতেছিল। কতিপয় খিলিজী কণ্ঠী ভূমে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, বৃদ্ধ অঙ্গুলী চালন করিয়া তাহাদিগের একজনকে দেখাইয়া দিল। বাচস্পতির আদেশে বসুধ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। বিবসনাঙ্গ বৃদ্ধকে দেখিয়া খিলিজী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ স্মিতমুখে তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "একদিন পদ্মাবতীকে পদাঘাতন করিয়াছিলে, অতএব তুমি আমার গুরু, বাচস্পতির আদেশে মুক্ত।"

বাচস্পতি, বসুধকে ইঙ্গিত করিলেন, বসুধ খিলিজীর বন্ধন মোচন করিলেন। খিলিজী মুক্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০ সাল, পৃঃ ২৮৯।

২ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২ সাল, পৃঃ ৬২৪।

সহসা বড়দাদার হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিল, মৈকতের রাশি রাশি কাশগুচ্ছ সমাধির তৃণাচ্ছাদনের উপরে ছড়াইয়া পড়িল, বালুকার কঠিন স্তরের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া পড়িলেন। তাঁহার পক্ষতলে তৃণাঙ্কুর ও লতিকা বন্ধুভাবে হইয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া মধুও সমাধির পার্শ্বতলে স্থান লইয়া মস্তক অবনত করিলেন। এতক্ষণে বিরিঞ্চীর হৃদয়ে ধর্ম্ম দেখা দিল, সে কবরের প্রথানুসারে নতজানু হইল।

এই লিখিত কথা হইলেও পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী। [মধুর : পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ]।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা "বড় দিদি"। ইহা ১৩১৪ সালের "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর "যমুনা" পত্রিকায় কতকগুলি গল্প এবং "চরিত্রহীন" উপন্যাসের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় তাঁহার অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাসগুলি প্রায় সবই বাহির হয়। শরৎচন্দ্রের আধুনিকতম উপন্যাস "বিপ্রদাস" বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকাশের তারিখ হইতে শরৎচন্দ্রের সকল গল্প এবং উপন্যাসের রচনাকালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা চলে না। পূর্ব্বেকার অনেক লেখা পরে প্রকাশ করা হইয়াছে। রচনা-রীতি ভাল করিয়া লক্ষ করিলে ইহা ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির প্রভাব খুব স্পষ্ট নহে, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ উপন্যাসের ছাঁচ জাজ্বল্যমান।

রবীন্দ্রনাথের ধরণে উপমা ও উৎপ্রেক্ষাদির প্রয়োগ মধ্যে মধ্যে আছে; কিন্তু তাহা কখনও কখনও এলোমেলো বা সঙ্কর (mixed) ধরণের, বাঁধুনি নাই। যেমন—

মুখ বুজিয়া চলিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন - কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, আমাদের বাহিরের অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয়-সঙ্গহারা পিয়াই বাইজীর বৃক-ফাটা অভিসম্পাত আজ যেন বিশ্বকে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে। (শ্রীকান্ত : দ্বিতীয় খণ্ড)।

কিন্তু, বিশ্বকে বিদায় দিয়া একে-একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সম্বাদ, সমস্ত বর্ণালঙ্কার, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট কেবলমাত্র রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া স্থির হইয়া আছে। (ঐ)।

সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ বেদনায় যাহিদের রক্ত-মূল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একমাত্র প্রাচীন চুম্বকশলাকার মত শুধু সেই একদিকে মুখ ফিরা পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে। [আঁধারে আলো]।

—এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জলে আঘাত দিয়াই বলিয়া করিয়া বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া গেলেন। [ঐ]

কম্ম ফোর কি আর এ দেশের প্রতি অঙ্গ আমিনি গলায় দড়ি দিতে চায়। স্বামী)।

—শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম উপেক্ষার গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহাকে শুধু আপাদ দুর্নিরীক্ষ করিয়াই আনিতেছে। [বিন্দুর]।

—কিন্তু এসকল দুর্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অনাগত অভিযানের ঘায় বলিয়া বাসের পর বাস দুঃখকেশে নাবিয়া যাইতে থাকে। [নববিধান]।

অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার মন বাহিরে আড়াই যাইতে লাগিল তথাপি অনিন্দ্য আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। [ঐ]।

অন্ধ, ধাবমান মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা একসে তাহার সহিত প্রকাশ পাইল যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিরাম লোফা-লোফি খেলিতেছে। [ঐ]।

সে রজনীর এত পাপ, এত শুষ্কতার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই ওকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল! তাহার এক বিন্দু তরলও অশ্রুর বাহিরে কাহারও কানে গিয়া পৌঁছিল না [কাশীনাথ]।

পর পর দুইটি বাক্যে একই কর্তৃপদ থাকিলে, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ উহ্য করা রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই প্রয়োগের বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেমন—

—তিনি ডেকে বললেন, "আজ এত বেলা উঠলে যে?" বললুম, "ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।" বললেন "একটা কথা আমার শুনবে?" রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, বললুম, "তোমার কথা কি আমি শুনিনি?"

উষার ঠোঁটের কোণ দুটা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, "আমরা বুড়োমানুষই নিজের উচিত করে চলতে পারিনে ভাই, তোমের ত ছেলেমানুষ। [নববিধান]।

রবীন্দ্রনাথের ধরণে 'এবং' শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট আছে। যেমন—

—অতি-সভ্য সমাজের সকল উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্ত্বেও [১] সে আপনাকে সংযত [২] করিতে পারিল না। বলিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং

---

১ 'সত্ত্বেও' হইবে।

২ 'সংবরণ' হইবে।

আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আস্কারা পাবেন কম।' (বর্ষবিদায়)।

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও 'নিরতিশয়' শব্দটির বিশেষ ভক্ত। শুধু "দেবদাস" বইটিতেই এই প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়াছি—

নিরতিশয় বৈর্য্যের সহিত ; নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া ; নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না ; নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া ; নিরতিশয় সন্তর্পণে ; নিরতিশয় পরিশ্রম হইয়া।

নারীসুলভ অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্যের অবলা প্রয়োগ শরৎচন্দ্রের ভাষায় একটা বড় বিশেষত্ব। যেখানে সেখানে 'অপি'-অর্থবাচক (emphatic এবং inclusive) এই দুই প্রত্যয়স্থানীয় অব্যয়ের ব্যবহারও এই পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ—

কিন্তু কথাটা মুখে বলিতেই আমার সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিয়া গেল। (শ্রীকান্ত : দ্বিতীয় পর্ব)।

কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও সন্ধ্যায় বসিয়া যাই। (ঐ)।

—তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পারিলাম না। (ঐ)।

—একথা ভাবিলেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। (ঐ)।

অন্ধ সংসারে কে কবে যে নিজের অন্ধতাকেই চিনিতে পারিয়াছে তাহাই ত জানি না ; তবে, আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্ধলোকদিগের যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে অন্ধ জানিয়া বুদ্ধিমান্ হওয়ার চেয়ে ভাল জানিয়া নির্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর বুদ্ধির মানটা বেশীই পাওয়া যায়, সে কথা আমাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। (ঐ)।

'অবধি নাই ;' 'এখনিই বটে ;' 'সত্যকার ;' 'বোধ করি ;' 'চক্ষের পলকে ;' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বারম্বার,' 'সম্বরণ,' 'সম্বাদ' প্রভৃতি স্থলে অনুস্বারের স্থলে ম-কারের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষাতেও ভুল বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ, শরৎচন্দ্রের লেখা স্থানে স্থানে এরূপ অমার্জ্জিত যে তাহা ক্ষমা করা যায় হইয়া উঠে। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

'মূর্ত্তিমান নোংরা এক ঘোড়া কাবলি-আলা ;' 'এই মূর্ত্তিমান্ ইতরটার পাশে ;' এখানে 'মূর্ত্তিমান' পদটি কোন অবস্তুবাচক শব্দের বিশেষণ হওয়া উচিত ছিল। 'Jolly ; 'জেঠি'[১] এবং 'Medical college' শব্দের বাঙ্গালা রূপ 'ম্যাডিকেল কলেজ'[২] অমার্জ্জনীয়। 'পাড়াগ্রামে'[৩] বালকোচিত শুরুচণ্ডালী প্রয়োগ। 'বিস্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল'।[৪] 'একটা পরিত্যক্ত, পোড়া ভিটার প্রতি'।[৫] 'ধরা-চূড়া'[৬] মুদ্রাকর প্রমাদ হওয়া দুষ্কর। 'সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট দু'টা কোন মতে কাজ সারিল'।[৭] 'অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা'।[৮] 'ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না'।[৯] 'কেৎলি'[১০] বোধ হয় 'কেট্‌লি' এবং 'কাৎলি' এই দুয়ের জোড়কলমে হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, উহা স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর। ভাষা কোথাও বিষয়বস্তুকে ছাপাইয়া উঠে নাই। (শেষের দিককার কয়েকটি বই সম্বন্ধে একথা জোর করিয়া বলা চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষীণতা সত্ত্বেও শুধু লিখিবার প্রয়োজনে কথা বাড়ান হইয়াছে।)

শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি।

কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া বাধা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, "আমি কি আর যে সে লোক আছি যে, যা তা করব ?" কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, "খুঁজি পাই না—খুঁজি পাই না।" সে কতদিন মনে মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, এখন খাঁচিয়ে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উল্লাস সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্ভিত্তি-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে বড় গর্জ্জে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে,—সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গ উৎপীড়িত হইতে হইতেছিল : কিন্তু এ নির্জ্জল সরোবরে তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত, কেন এক কটাক্ষ উক্ত জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া আমার কেষ্টাকে কিনিয়া লইয়াছে : সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে খালি গা নাই, সে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থ বৃক্ষ নাই, ছাত্রবৃন্দের কোন নাই—কিছুই নাই। [কাশীনাথ)।

মধ্য ও শেষ যুগের রচনার নমুনা কিছু কিছু নিম্নে দিলাম। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রী পদ্ধতির ছাঁচ কমবেশী প্রত্যক্ষ।

অন্নদা চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটার মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে বেড়িয়া দাঁড়াইল আছে।

১ শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব। ২ বিশ্রুতি। ৩ দেবদাস। ৪ একাদশী বৈরাগী। ৫ বর্ষবিদায়।

যেমিটি নাই। দয়া যখন সহজই মানুষের মনের চারিদিকে সহজে উপস্থিত এবং তখন মনে হয়, যেন ইহারা সর্ব্বত্র; যেন ইহাদের হাত আমরা আছে; যেন ছবি চিরদিন প্রাণ আছে;—তাই বলিয়া অত্যাচার করিলে যেন ইহারা আমাকে বলিয়া বলিবে, "চুপ কর! মিথ্যা ভয় করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।" [ইংরাজ : দ্বিতীয় খণ্ড]।

আর স্বাভাবিক যখন আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ কথা যে তিনিই জানতেন, আমি তা বুঝতুম না, তা নয়। তাহলেই আমার দুঃখের সমস্ত মন দুঃখিত ভার হয়ে উঠত, তাই তাহলে এই বিশ্রী বিশ্রীটাকে আমি ঘরের টেনে রাখতুম। কিন্তু পরের কথা বলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলটি তাও তো দেখতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মানুষে একবার কড়া মন খেতে শিখেছে, জল-বেতের মনে আর তার মন ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে কলকে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার সুখ। [স্বামী]।

মেয়েদের-কথা হইলেও ব্যাপারটি বিশেষ জন্য ভাল ছিল, কিন্তু উহার মত নিছক হিন্দু-আদর্শ-ঘেঁষা স্ত্রী,—ধর্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, যে যদি তাহার একটা মনের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে পেরে, তা হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? যে এ নাটক হতে হইলার বেশি পাকামিই বা কি আছে, উহাই অনেকে উপলব্ধি করিতে তাহার ভয় ও ভাবনা বুঝিয়া নিয়া হলে পাত্রি ও শ্রীতির মত করিয়া উঠিল! এবং ঠিক ইহা না করিলেও যে উহার সঙ্গে বিদ্যার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই চারি জন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। [নববিধান]।

বিদ্যাধর চুপ করিয়া রহিল। কমলা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার কপালের অপরাধ, অন্তর পূর্ণ থাকতে চায় না হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিম্বা, এমনিই হয়ত সকল মেয়ের প্রকৃতি ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিম্বা হয়ত খুঁজে পাওয়ার নিয়ম নয় মুখুয্যে মশাই,—ওটা মরীচিকা। [বিপ্রদাস]।

খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষের দিকে আবির্ভূত গল্প-লেখকদিগের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মনাম গোপন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার সরস, মধুর, হাস্যরসাত্মক রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী লেখকদিগের মধ্যে কেবল ত্রৈলোক্যনাথের সহিত 'পরশুরাম'-এর তুলনা করা চলে। ইঁহার লেখা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত অথচ সরল-মধুর। নিম্নে কিছু কিছু উদাহরণ দিলাম।

পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে একটি লুঙ্গি মাথায় বেতের মুড়ি। গোপালা ক'রে দিবে গেল ভেদুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বললেন—এমন বাঘ ত দেখিনি, পাখার মত কান। আহা, পোষালে মানাতেন, একটু হোমিওপ্যাথিক প্রথম দি। একটু চালা ছোক, তারপর আলিপুরে দিয়ে দেও বকশিস দিলবে। [বলিন রায়]।

এই কেদার চাটুয্যেকে লোকে ভারি ভয় করেছে, কারে পেয়ে বিসেছে, ভূতে তার দেখিয়েছে, গ্রামবাসীরা ঠিক দিয়েছে, পুলিস-কোর্টেও চলিল জোর করেছে, কিন্তু যেন ভূতেরা কখনো পায়নি। মাটি কাটা বন্ধ, মাটি উদ্ধল গ্রাম ফেলা চলে না, পাঁচ দিন দেরী হয়নি, চুপ যেন কারর ভুল,—কিন্তু এই সময় রাধা ভেড়ে করে মাথা এসে আমার আকর্ণ কেদেঁ করে দিলে। বাবুরে না পেয়ে ঝুমু—যেন নাথ, কেন দেখেন? [বলবন্ত]।

তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। এদিকের বেঞ্চে কুলোর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর বিছিনিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মাথা ভরা-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী—তা ছাড়া বেতের মধ্যে আরো অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোকরে বিচিত্র তালের ঝঙ্কার মৃদঙ্গ-ধ্বনিরা আসিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাহাই শুনিতেছি। হরীন অস্ত, তবু হরীন্ অস্ত। [ঘড়ি-সংসদ]।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'পরশুরাম'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনিও সরল-রচনায় বিশেষ দক্ষ। তবে ইঁহার লেখার সহিত 'পরশুরাম'-এর লেখার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 'পরশুরাম' বিভিন্ন বাস্তব চরিত্রের (type) রচনায় অদ্বিতীয় আর কেদারনাথ দুই একটি চরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত। 'পরশুরাম'-এর সরলতা (humour) অনাবিল, সরল, এবং সহজ-বোধ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য (intellectual) দুইই,—তাঁহার সারল্যের জন্য কোথাও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে নাই। কেদার নাথের সরলতা (humour) অনেকটা পরিমাণে পাত্রপাত্রীর (idiosyncrasy) বা ব্যক্তিগত বৈকল্যের উপর নির্ভর করে। কথার ব্যাকরণাচের একমাত্র উপজীব্য হইলে সরলতা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে। এই দোষ কেদার-নাথের কোন কোন রচনায় স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান। করুণ রসের সূত্রে সরস তুলি গাঁথিয়া ইনি যে কয়টি গল্প লিখিয়াছেন, তাহা বস্তুতই পরম উপভোগ্য।

১ বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩০, পৃঃ ৬।

রেখা চিত্র (অজন্তা হইতে)
শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্র চৌধুরী

চল্লিশ পরগণার অংশবিশেষে একদালে প্রচলিত উপভাষা বা উচ্চারণ-ভঙ্গি কেদারনাথের ভাষায় সরসতার একটি প্রধান উপাদান। এই হিসাবে কেদারনাথের ভাষা "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-র ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারের বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে। অনেক সময় অর্থগ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হয়। যেমন—কেন-ঘর (=কিচেন-ঘর), মশা (=মহাশয় [মশায়, মশাই]), বেন (=বেহান), ধোঁ (=ধোঁয়া), নেম (=নিয়ম), ইত্যাদি। অনুপ্রাস এবং যমকের প্রয়োগ প্রায়ই খুব খেলো ধরণের। যেমন—'এই দস্তট ব্রজপুরের বাবুদের সম্বন্ধে রেখে আসেন নি। জালে অমন দিন্ন হস্ত কাল কলিতে জন্মায়নি।' 'বাসাটি বারোয়ারির ব্রাদারের মত হওয়া চাই।' 'কারণ, সুদে আসলে মাইনের টাকা গুল্‌জারির গর্ভে গিয়েছে, এখন তিনি যা ক্রল্ জারি করেন।' আমরা সবাই তো 'রেলওয়ে ব্রাদার্স কেডারেসনের, ডেকরেসন্ দাদা—খাস্ তালুকের পালুক।' ইত্যাদি।

অথবা slang (বা অ-সাধুভাষা), ব্যবহার করায় অনেক সময় গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটিয়াছে। যেমন—'চিনতে পারিনি, অবহেলা করে, আজ অবেলায় মুড় ঘেরে গেলুম।' 'বিশ্বের ঠোঁট দু'খানা ছিলে যাবতেই, মুখ থেকে বিড়িটা পড়ে গেল।' ইত্যাদি।

পর পর সংক্ষিপ্ত (elliptical) বাক্য প্রয়োগ করা কেদারনাথের নিজস্ব পদ্ধতি। বিষয়বস্তুর পক্ষে ইহা অনেক স্থলেই বেশ উপযোগী হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যও যে হয় নাই এমন নহে। যেমন—

"এখন আর এক-পা বাড়াও—আস্তা খোঁজ। অবশ্য তিন পা বাড়িয়ে বলিকে খোয়ে পাড়িয়েছিলেন। শক্তিপ্রতিম তো ঘোরের মাথায় হাত পৌঁছোয় না, ঘোর হয় যখন অবশ্যই হবেন। পাঁচ ঢালেই মাৎ, পাঁচ খাল্লায় পা পড়লেই দিন যায় রাত্রি আসে! তার পরেই লম্বা,—সিমারেট খাক—টেনো।"

দুই এক স্থলে তৎসম শব্দের ভুল বানান করা হইয়াছে। যেমন—'অন্তঃপুরীকা', 'সূত্রপাৎ', 'ছায়াপাৎ', 'ইঙ্গিৎ' ইত্যাদি।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশে বর্তমান কতকগুলি লেখকের অনুসরণে অস্থানে বর্তমান কালের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই বলে তিনি বাদবের হাতনোটখানা সেলাম থেকে ঘাড় ক'রে বাদবকে দেখতে দিয়ে বললেন—"এ লেখা কার, সইটে কার?"

বাদব নাড়ুকে দেখতে দিয়ে সহসা যেন থামা খায়। সাজীজপে তখনই চাহিদে মনাই সই জরেছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তারপর কেটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনোদ বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে নিজের মত মাথা নীচু করে' থাকে। বিনোদবাবু বলেন—"এখন কি বল! এ হাতেনাতে কি তোমার বল?" বাদব কাতরোক্তিমিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বলে—"না বলবার তো মো নেই হুজুরবাবু!" [পাঠক : দুরের ব্যাপার]।

কেদারনাথের নিজস্ব ভঙ্গির উদাহরণ দিতেছি।

চন্দ্র,—উচ্চারণের পদ্ধা বুঝিয়ার—খোলাই ছিল। উত্তর্ণ উপায়—এবং বেরায়। কথা কমেই ভারী! বড় রোজানেই চুকপুর। ওই মনাই কাপড়ের খুঁট থেকে আমার পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন,—"আয়া—দেশে এখনও দেবতা আছেন তা হি! নইলে আর দুনিয়া চলে,—আছেন বই কি! আমার পায় সৌভাগ্য, তাই দেখতে পেলুম। সেকালে সব এই-রকম সংসারই তো ছিল। ভেমনটি আর বড়রে পড়ে না। লেখাপড়েতে এই যা দেখলুম! এখন সব বৈতরণী—জ্ঞানমুক্তের অসুর, ভাষা-স্ত্রীর সংসার, তাও আলফল মার্কা! হরেকৃষ্ণ"

দুঃসময়ে যা ঘটে তাই,—মুখ যে সম্পর্কে বেরিয়ে গেল—"সেকি মনাই! হয় পড়ে মাথি বাঁধার পা আর কি ঠাঁই ঠাঁই"

পায়ের ধুলো repeat করে বললেন—"আয়া, এইতো কথা। —কে বলে বুদ্ধি নেই! এ রকম শতকরা দশ জন থাকলে আজ —হরেকৃষ্ণ,—"

"—কেবে উদ্ধার খাটি শান্তিপুরী খাঁটুটা বেরিয়ে—বিলিতীর সঙ্গে ঠাকাঠেকি না হয়, খবরদার—কসিস্!" [দুঃখের কেরামতি : শান্তিজল]।

বর্তমান সময়ের কতকগুলি তরুণ এবং অতরুণ বয়স্ক লেখকদিগের হাতে একপ্রকার গল্পভঙ্গির উদ্ভব হইয়াছে। এই অভিনব গল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তুও যেমন বিলাতি-গন্ধি লেখার ধাঁচও তেমনি ইংরেজি ছাঁচের। রবীন্দ্রী পদ্ধতির কাঠামোর উপর বীরবলের ভঙ্গির প্রলেপ দিয়া এবং ইংরেজি শব্দ ও বাক্যপ্রয়োগ রীতির রাংতা মুড়িয়া এই গল্পের সৃষ্টি। লোভী শিশুর এবং ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের নিকট অপথ্য বড়ই রুচিকর। সুতরাং কতকগুলি অকালপক্ক বালকের ও গুরুলাঘিত বর্ষীয়ানের মারফৎ এই সাহিত্য এবং তাহার বাহন যে বিশেষ গল্পভঙ্গি তাহা দ্রুতভাবে প্রসার লাভ করিবে তাহা জানা কথা। বাঙ্গালা ভাষার অদৃষ্টে হয়ত এই ভঙ্গিই অনতিবিলম্বে একাধিপত্য লাভ করিবে। কিন্তু বর্তমান কালে ইহা এখনও বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং ইহা যে ইতিমধ্যেই পরীক্ষাবস্থা (experimental stage) উত্তীর্ণ হইয়াছে একথাও বলা চলে না। সেই কারণে এই 'অতি-আধুনিক' গল্প ভঙ্গিকে বর্তমান আলোচনার বাহিরে রাখাই সঙ্গত মনে করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

চতুষ্পাঠী

কীর্ত্তি-কাহিনী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জগৎ চায় রোয়েনের মত লোক

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বাধে, সেই সময়কার একটা ঘটনা আজ তোমাদের বলব। সে ঘটনাটি সকলেরই জানা দরকার।

কিছুদিন যুদ্ধ চলবার পর আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির কাছ থেকে একটা বিশেষ দরকারী চিঠি কিউবার যে স্পেনীয় নেতা আছেন, তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হল। এই নেতার নাম, গার্সিয়া। গার্সিয়া কোন্ স্থলে যোগদান করবে, সে কথা স্পষ্ট করে জানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

এই যুদ্ধ উপলক্ষে তখন কিউবাতেও নানা রকমের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। গার্সিয়া বিদ্রোহী দলের নেতা হয়ে কিউবার কোন্ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অরণ্যের মধ্যে আছেন, তা কেউ-ই বলতে পারে না। মাঝে মাঝে তাঁর সৈন্যেরা রাত্রিতে অতর্কিতে দেখা দেয়—আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। যতদূর খবর পাওয়া গিয়েছিল, তাতে জানা যায় যে, কিউবা শহর থেকে বহুদূরে পর্ব্বতের উপরে এক বিরাট বনের ভিতরে কোথাও গার্সিয়া থাকেন। সেখানে কোনও পোষ্ট-আফিসের পিয়ন কোনও দিন যায় নি। এখন ব্যাপার হল, সেই অজানা জায়গায় গার্সিয়াকে খুঁজে বার করে নিউইয়র্ক থেকে কে নিয়ে যাবে যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির সেই চিঠি?

দিনের পর দিন যায়। সভাপতি নিরুপায়। কোনও রকমে গার্সিয়ার কোন খবর তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না। কোথায় পাঠাবেন চিঠি? আর নিয়ে যাবে-ই বা কে? অথচ গার্সিয়ার সাহায্য না পেলেই নয়।

একদিন হঠাৎ একজন সেনাপতি তাঁকে বল্লেন, আপনার কাছ থেকে গার্সিয়ার কাছে যে লোকটি খবর নিয়ে যাবে, তাকে খুঁজে পেয়েছি। তার নাম হল রোয়েন। একজন সৈনিক।

সভাপতি রোয়েনকে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, জান, কোথায় গার্সিয়া আছেন?

না!

খুঁজে এই চিঠি তুমি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

চেষ্টা করব।

লোকটির ভঙ্গী দেখে সভাপতির মনে হল, এ যেন পারবে! তার হাতে দিলেন চিঠি।

চিঠিটা নিয়ে রোয়েন কোমরের বেল্টের ভেতরে একটা গোপন পকেটে রাখল। বেল্টটা টেনে আরও একটু শক্ত করে নিল। তারপর অভিবাদন করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার দিন পরে এক অন্ধকার রাত্রিতে কিউবার ধার দিয়ে একটা ছোট্ট খোলা নৌকা চলেছে। এক পাহাড়ের গায়ে নৌকাটা রেখে লোকটা অন্ধকারে পাহাড়ের উপর উঠল। লোকটার নাম রোয়েন।

তিন সপ্তাহ চলে গেল, তার আর কোন খবর নেই। তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন আবার সেই অন্ধকার রাত্রিতে একটি লোককে দেখা গেল। নৌকো খুলে অন্ধকারে ঢেউয়ের মধ্যে আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটির নাম রোয়েন।

জগতের ইতিহাসে এক মুহূর্ত্তের জন্যে এই লোকটি এসেছিল, যার নাম রোয়েন; একবার অন্ধকারের মধ্যে মশালের আলোয় তার মুখটা দেখা গিয়েছিল, তারপর আবার অন্ধকারে সে কোথায় মিলিয়ে গেল, যার নাম ছিল রোয়েন। এই এক মুহূর্ত্তের বেঁচে থাকার কথা—তার একটি ছোট্ট ডায়েরীতে সে নিজেই সামান্য দু' এক কথায় লিখে রেখে গিয়েছিল—

"২০শে এপ্রিল। আদেশ পেলাম, যেমন করে হোক জন্ গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা করা। সকাল দশটার সময় একজন ইংরেজ শিকারীর বেশ ধারণ করলাম। জামাইকা পার

হলাম। পরের দিন রাত একটার সময় সেন্ট আনীর উপসাগরে এসে পৌঁছলাম।

একটি ছোট্ট নৌকা নিলাম। ভোর বেলায় ক্যারিবান্ সাগরে এসে ঢুকলাম। সেখান থেকে কিউবার উপকূলে এলাম প্রায় রাত এগারটার সময়। একটু সূর্যের আলো দেখা দিতেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

প্রাচীন গ্রীসের ধনুর্ধর ক্রীতদাস।

১লা মে। দুপুর বেলা বিদ্রোহীদের ঘাঁটীতে এসে পৌঁছলাম। গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা হল। গার্সিয়া সঙ্গে দূত পাঠাল। পথ বলে দিল।

নতুন পথ দিয়ে এই মে সূর্যাস্তের পর আবার সমুদ্রের ধারে এলাম। সামনেই স্পেনীয়দের দুর্গ। সারিসারি কামান পাতা। তারই মধ্যে দিয়ে রাত্রিবেলা অন্ধকারে পেরিয়ে এলাম। যখন ভোর হল তখন কিউবার তীর আর দেখা যায় না।"

অতি অল্প কথায়, একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে রোয়েন তার নিজের ডায়েরীতে এই ঘটনাটি এই ভাবে লিখেছিল, কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসের গোপন-খাতায় এই ঘটনাটিকে বলা হচ্ছে—জগতের ইতিহাসে এর চেয়ে দুঃসাহসিক কাজ এত ধীর স্থির ভাবে জগতের আর কোন সৈনিক করে নি। পাহাড়, পর্বত, বিপদসঙ্কুল অরণ্য, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, ভয়াবহ ব্যাধিগ্রস্ত জলা-ভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটা, সম্পূর্ণ অজানাকে এমন করে খুঁজে বার করার এই কাহিনীকে এলবার্ট হাবার্ড বলে একজন বিখ্যাত আমেরিকান্ লেখক অমর করে রেখেছেন। আমেরিকার প্রত্যেক ছাত্র এলবার্ট হাবার্ডের সেই লেখার সঙ্গে পরিচিত—জগতের প্রত্যেক ছাত্রের উচিত সেই লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাই এখানে তার অনুবাদ করে দিলাম। লেখাটির নাম তিনি দিয়েছেন, A message to Garcia —খবর দিতে হবে গার্সিয়াকে!

"কিউবার এই সময়কার সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি লোকের কথা বিশেষ করে আমার মনে জাগরূক হয়ে আছে। মধ্যদিনের সূর্য্যের মত আমার মনের আকাশে আজও তার স্মৃতি দীপ্তিমান হয়ে আছে।

যখন আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বেধে গেল, তখন কিউবার বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করা এবং তাদের দলে আনতে চেষ্টা করা প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। এবং তার জন্যে সময়ও খুব অল্প। বিদ্রোহীদের নেতা গার্সিয়া কোথায় আছে—কেউ জানে না। কিউবার পার্ব্বত্য অরণ্য-ভূমির নিবিড়তার মধ্যে কোথায় আছে গার্সিয়া। কোন পোষ্ট-অফিস, কোন টেলিগ্রাফের তার, তার কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির আজ প্রয়োজন, তার সঙ্গে দেখা করার, তাকে দলে আনার! অতএব, কি করা যায়?

গ্রীক দার্শনিক সোলোন।

কে এসে সভাপতিকে খবর দিল, একটি অল্পবয়স্ক যুবক আছে, তার নাম হল রোয়েন। জগতে যদি কেউ গার্সিয়াকে খুঁজে বার করতে পারে, সেই পারবে!

রোয়েনকে ডেকে তার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে দেওয়া হল। আর শুধু বলে দেওয়া হল, গার্সিয়ার হাতে এই চিঠি দিতে হবে!

তার পর কি অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে, কি ভয়াবহ বিপদের মধ্য দিয়ে, শত্রুর দেশের মধ্যে পায়ে হেঁটে রোয়েন

পার্সিয়ার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছিল, তার কথা এখানে বলতে চাই না। আমি আজ শুধু তোমাদের এই কথাটাই লক্ষ্য করতে বলি—মার্ক্ ফিল্‌দে রোমেনকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, পার্সিয়াকে দিতে হবে এই বলে দিয়ে! রোমেন সেই চিঠিটি হাতে নিয়ে বিহ্বল হয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা করে নি, সে কোথায় থাকে? কোথায় যাব? কখন দেখা পাব?

মহাকালকে সাক্ষী রেখে, এই ছেলেটির মৃত্যুহীন স্বর্ণমূর্তি গড়িয়ে নেবার প্রত্যেক কলেজের প্রাঙ্গণে রেখে দেওয়া উচিত। যৌবনের উচিত নয়, শুধু বইএর কথা মুখস্থ করে মেরুদণ্ডকে বেঁকিয়ে ফেলা। যৌবন চায়, তোমার মেরুদণ্ড আরও কঠিন হোক্, আরও সোজা হোক্ সবল, যে সবলতা এনে দেবে

তোমাতে ভক্ত পার্থিবকে যে-কোনও উপায়ে রক্ষা করবার অচল শক্তি, বর্ষে অসীম তৎপরতা, এবং সকল ইন্দ্রিয়, সকল মানসিক শক্তিকে সংহত কেন্দ্রীভূত করবার ক্ষমতা। সামনের যে কাজ তাকে করা চাই ই!

কেন একথা বলছি, তার প্রমাণ চাও? বস, তোমার আফিসে বসে আছ। তোমার ডাক শুনেই ছজন কেরাণী ছুটে আসে। একজন কাউকে ডেকে অনুরোধ কর, দেখুন, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া থেকে "কোরেজিয়ো"র জীবনের ঘটনার একটা তালিকা আমাকে তৈরী করে দিন্ না!

তুমি কি ভেবেছ কেরাণীটি তখুনি বলবে, আচ্ছা! এবং বলেই তখুনি সেই কাজ করতে বসবে?

আমি আমার জীবন তোমার কাছে বাঁধা রেখে বলতে পারি যে, সে তা করবে না! যেই তুমি তাকে অনুরোধ করলে অমনি সে মাথা চুলকে নিয়ে, যা হোক্ একটা না একটা প্রশ্ন করবে……

তিনি কে?

কোন্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া?

এন্‌সাইক্লোপিডিয়াটা কোথায়?

আমি কি এরই জন্যে এখানে খাটতে এসেছি?

কার কথা বল্‌লেন, বিসমার্ক নয় তো?

তিনি কি মারা গিয়েছেন?

এখনই দিতে হবে? একটু পরে দিলে হবে না?

বইটা আপনার এখানে এনে দেব?

তারপর এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যখন তাকে বুঝিয়ে দিলে যে কি ভাবে খবরটা কোথা থেকে কখন বার করতে হবে, সে তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে আর পাঁচজন কেরাণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা কোরেজিয়ো কোথায় খুঁজে পাব বলতো? তারপর কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বলবে, ও নামের কোনও লোক নেই।

তোমার যদি বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে, তুমি আর তাকে বলবে না যে, তুমি "ক" এর মধ্যে খুঁজেছ, ও নামটা "ঙ"র মধ্যে পাবে। তার বদলে একটু হেসে তোমার বলা উচিত, আচ্ছা, তাই হবে।

এবং তারপর উঠে নিজে গিয়ে দেখে আসবে।

একবার একটা খুব বড় কারখানায় গিয়েছিলাম। কারখানার প্রধান কর্মচারী আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কারখানা দেখাচ্ছিলেন।

—ঐ যে লোকটি দেখছেন, খাতা-পত্র নিয়ে হিসেব করছে—বেশ ভাল একজন এ্যাকাউন্‌টেন্ট। কিন্তু শহরে কোন দরকারে পাঠালাম, অনায়াসেই সে কাজ করে আসতে পারে বটে, কিন্তু পথে যত আড্ডাখানা পড়বে, এক একবার প্রত্যেকটাতে ঢুকবে—তারপর যখন আড্ডা দিয়ে ফিরে আসে তখন যে-কাজের জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল, তার কথা তার মনেই থাকে না।

দারিদ্র্যের মধ্যে কোন গৌরব নেই। ছেঁড়া-জামা দরার মন্দিরে প্রবেশ-পত্র নয়। সব মালিকই নিষ্ঠুর বা কঠোর নয়, সব শ্রমিকই ধার্মিক, চরিত্রশীল নয়। আমি আমার পাশে সেই লোককে এনে বসাব, যাকে জানি, আমার অসাক্ষাতেও সে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে, যেমনটি সে করে যখন আমি তার সামনে থাকি।

এবং চাই সেই লোককে, যখন তাকে চিঠি দিয়ে বলা হবে—গার্সিয়াকে দিয়ে এস, প্রত্যুত্তরে যে কোন নির্বোধ প্রশ্ন তুলবে না—যে ভাবে—তার আর গার্সিয়ার মাঝখানে দায়িত্ব সম্পাদন করা ছাড়া আর কিছু নেই।

সমস্ত সভ্যতা তারস্বরে ডাকছে তাকেই, সে নিয়ে যেতে পারবে গার্সিয়ার কাছে এই চিঠি।

সে যখনই দেখা দেবে, সে যা চাইবে, তখনই সে তা পাবে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম,—প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক আফিস, প্রত্যেক শহরের প্রত্যেক কারখানা, প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মাঠ তাকে চায়, তাকেই শুধু চায়।

জগতে আজ তার বড় অভাব, যে চিঠি নিয়ে যেতে পারে গার্সিয়ার কাছে।"

প্রাচীন জগতের তিনটি শ্রেষ্ঠ লোকের মিলন

আসিরিয়ানদের সাম্রাজ্য যখন চারিদিক থেকে ভেঙে পড়ছিল, সেই সময় আর একটি ছোট রাজত্ব ধীরে ধীরে শক্তি-সংগ্রহ করে জেগে উঠছিল। এই নতুন সাম্রাজ্যটির নাম হল, লিডিয়া। কালে এই সাম্রাজ্য সমস্ত এশিয়া মাইনর জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল।

এই সাম্রাজ্যের রাজাদের মধ্যে যিনি আজও পর্যন্ত জগতে খ্যাত হয়ে আছেন তাঁর নাম হল ক্রইসাস্। জগতে কাউকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলতে হলে আজও পর্যন্ত তাঁকে ক্রইসাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এত ধনসম্ভার জগতের আর কোনও রাজার ছিল না। তাঁর রাজ্যে প্যাক্টোলাস্ বলে একটা নদী ছিল। সেই নদীর জল-ধারার সঙ্গে স্বর্ণ-ধূলি প্রবাহিত হত। এই স্বর্ণ-ধূলি সংগ্রহ করে ক্রইসাসের অতুল ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছিল।

যে-দেশের রাজার এত ধন-সম্পদ্, সে দেশের লোকেরাও বেশ ধনী ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সময় লিডিয়ার লোকেরা বেনড্যার জাঁকজমকে, বিলাসিতায়, ভাল ভাল খাদ্য তৈরী করবার জন্যে গ্রীস, মিশর, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রইসাসের সঙ্গে সম্ভাব রাখবার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে বড় বড় রাজারা রাজদূত, উপঢৌকন প্রভৃতি পাঠাতেন। নিজের বিরাট ঐশ্বর্যের মধ্যে চাটুকারদের নিত্য প্রশংসায় তাঁর দোনা-দিয়ে-মোড়া দিনগুলি হীরে-বাঁধান পথ দিয়ে নিঃশব্দে চলে যেত।

কিন্তু একদা সহসা এই নিত্য চাটুবাদের মধ্যে একটা অঘটন ঘটল। গ্রীস থেকে সোলোন বলে একজন

বৃহৎকায়ের ক্রীতদাস।

দার্শনিক তাঁর রাজধানীতে এসেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, সোলোন হলেন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী লোক। তাঁর রাজসভায় তিনি সোলোনকে ডেকে পাঠালেন।

এখানে সোলোনের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

যীশু খৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ছ'শো চল্লিশ বছর আগে এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ সোলোন জন্মগ্রহণ করেন। শুধু গ্রীসকে তিনি তাঁর জ্ঞানসম্পদ্ দিয়ে রক্ষা করেন নি, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে তাঁর দান সাক্ষাৎভাবে বিরাজ করছে। প্রাচীন গ্রীসদের মত সভ্য জাতি জগতে খুব কমই এসেছিল—একথা বোধ হয় তোমরা জান। সেই বিরাট সভ্যতার ভিত্তিকে যাঁর প্রতিভা দৃঢ়তম

করে তুলেছিল, এখানে তাঁরই কথা বলছি। গ্রীসের শাসন-তন্ত্র, আইন-কানুনের তিনিই জন্মদাতা। শুধু গ্রীসের নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ যে-সব আইন-কানুন মেনে চলে, তার মূল-তত্ত্ব তিনিই দিদিয়ে যান।

তিনি যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন গ্রীসের আইন অন্য রকম ছিল এবং সেই আইনে পরিচালিত হলে গ্রীসের সভ্যতা এত বড় হয়ে উঠতে পারত না। প্রত্যেক বড় লোকের এক একটি স্বতন্ত্র দল ছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও সদ্ভাব ছিল না। যার স্বার্থে যেখানে বাধা লাগত সেই সেখানে প্রতিবাদ করত। সকলের কল্যাণের

এথেন্স : আক্রোপলিস পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ

জন্য একটা মত মেনে কেউ চলত না। তার ফলে অরাজকতার আশঙ্কা সর্বদাই সকলের মনকে ছেয়ে ছিল। যারা ধনী, তারা টাকা ধার দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে অতি নিকৃষ্ট ব্যবহার করত। যে একবার ধার নিল —তাকে সেই মহাজনের কথাতেই উঠতে বসতে হত। যদি কোন হতভাগা লোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ দিতে না পারত, তা হলে তাকে মহাজনের কাছে ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হত। যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন লোককে দেখা যেত যে ব্যবসায়ে উন্নতি করছে, অমনি নানারকম কর বসিয়ে তার ব্যবসায়ে লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার করে তোলা হত। এই ছিল এথেন্সের অবস্থা।

সেই অরাজকতার এবং অন্যায় আইনের কবল থেকে সোলোন এথেন্সকে মুক্তি দিলেন। তাঁর অসামান্য শক্তি, প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের ফলে, দেশের সকল শ্রেণীর লোককে সমবেত করে, তিনি নতুন করে আইন তৈরী করলেন। সমস্ত গ্রীস এবং তারপর সমস্ত জগৎ, সেই আইনের উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাঁর হাতে সমস্ত এথেন্স আত্মসমর্পণ করেছিল। তিনি ইচ্ছে করলেই নিজে এথেন্সের শাসনকর্তা হতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শুধু জ্ঞান-দাতা দার্শনিক, মানুষের কল্যাণ-কামী সংস্কারক— উচ্চপদের মোহকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই তিনি এথেন্সের একজন সামান্য নাগরিক হয়েই সন্তুষ্ট রইলেন।

সেই সোলোন একদিন ক্রইসাসের ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার রাজসভায়। রাজসভায় সেই বিলাস-বিভব দেখে সোলোন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাজা ক্রইসাস্ নিজে তাঁর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করতে লাগলেন। চাটুকাররা আবার তার শতগুণ করল।

সহসা সেই ঐশ্বর্যের দম্ভ-বাণীর মধ্যে সোলোন বলে উঠলেন, ক্রইসাস্, এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন? তুমি কি জান না, টাকাকড়িমুক্তা দিয়ে নয়, চরিত্র দিয়েই জগতে মানুষ বেঁচে থাকে?

ক্রইসাসের কান চাটুবাক্য শুনে এসেছে। এ ধরণের কথা তাঁর সামনে কেউ কখনও বলতে সাহসী হয় নি। তিনি আহত হলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন, আজ যিনি লিডিয়ার এই স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী লোক নন্?

সোলোন তাঁর কথার কোনও স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বল্লেন, একদা আমার স্বদেশে, এথেন্স প্রদেশে এক অতি দরিদ্র লোক বাস করত। নিজে দরিদ্র হলেও, তাঁর ব্রত ছিল অপরের দুঃখ মোচন করা; নিজে দুঃখী হলেও, তাঁর ব্রত ছিল অপরের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া; নিজে চিন্তায় দগ্ধ হলেও, তাঁর ব্রত ছিল অপরের দুশ্চিন্তা দূর করা। যখন সেই দরিদ্র বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন তখন দেখলেন, তাঁর আশে-পাশে যারা দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, তাদের মধ্যে মাথা তুলে অনেকে দাঁড়িয়েছে, অনেকের বংশে দুঃখহরী বীর জন্মগ্রহণ

করেছে। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ দেশের আহ্বানে সোলোন ফিরে যান। অবশ্য সেখান থেকে আর তিনি ফেরেন নি। তিনি-ই ছিলেন জগতের সব চেয়ে সুখী লোক।

সোলোনের এ কথা মনঃপূত না হলেও ক্রইসাসের শুনতে ভাল লাগছিল। তিনি ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই লোকটির পর, নিশ্চয়ই আমিই হলাম জগতে দ্বিতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখী লোক?

সোলোন মাথা নেড়ে বল্লেন, না! একবার দুটি গ্রীক ছেলেকে দেখেছিলাম। সকলেই সেই দুটি ছেলেকে বড় ভালবাসত। সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসত তাদের মা। প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত, জগতে মানুষের পক্ষে যা শ্রেয়তম, তা যেন তার ছেলে দুটি পায়। একদিন মন্দিরে দুটি ভাই ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম থেকে দেবতা আর তাদের জাগায় নি। তারা হল জগতের দ্বিতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখী লোক।

ক্রইসাস্ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বল্লেন, যে তিনটি লোকের কথা আপনি বল্লেন, তারা তো সকলেই মৃত! সুখী হতে হলে কি মরে যাওয়াই প্রথমে দরকার?

ধীর ভাবে সোলোন উত্তর দিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়ে, তুমি সুখী কিনা, সে কথা বলা বা ভাবা অবিবেচনার কাজ!

এই কথা বলে সোলন বিদায় গ্রহণ করলেন। কথা কয়টি জলন্ত কয়লার মত ক্রইসাসের মনে রয়ে গেল।

তারপর, আর একজন মহাপুরুষের সঙ্গে ক্রইসাসের দেখা হয়। তাঁর নাম তোমরা সকলেই জান। তাঁর নাম হল ঈশপ্। জগতের প্রত্যেক সভ্যদেশের ছেলেমেয়েরা এঁর নামের সঙ্গে পরিচিত। কথামালায় এঁরই লেখা পশু-পক্ষীর সব গল্প তোমরা পড়ে থাক। পশু-পক্ষীর গল্পের ছলে ইনি আমাদের জীবনের অনেক বড় বড় কথা বলে গিয়েছেন এবং এই ধরণের গল্প বলায় য়ুরোপে ঈশপ্ আর আমাদের দেশে বিষ্ণুশর্ম্মা (যিনি পঞ্চতন্ত্র লিখেছেন), জগতে এঁদের তুলনা নেই।

কিন্তু ঈশপ্ প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। জান্থাস্ বলে একজন লোক তাঁকে আইয়াড্মোনের কাছে বিক্রী করে। এই ক্রীতদাস হয়ে থাকবার সময়ই মানুষের প্রতি মানুষের নানা অবিচার, মানুষের জীবনের নানা ভুল-ভ্রান্তি তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সব অন্যায় অথবা ভুলের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করে দেবার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি ক্রীতদাস! একজন ক্রীতদাসের মুখ থেকে মনিবদের অনাচারের, অত্যাচারের কথা মনিবরা সহ্য করবে কেমন করে? তাই ঈশপ্ এক নতুন উপায় স্থির করলেন। কোন মানুষের নাম-গন্ধ থাকবে না—পশু-পক্ষীর গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের

বহুশতাব্দী খ্রীষ্টাব্দ পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত ঈশপ-চিত্রিত চিত্র হইতে)। ঈশপ্ নিজের গল্পের মধ্যে মনিবদের পরিচায়ক।

বক্তব্য বলে যাবেন। খুব সম্ভবতঃ এইভাবে এই জগৎ-খ্যাত গল্পগুলির উদ্ভব হয়েছিল। সেই সময় গ্রীসের বহু অনাচার, অত্যাচারের ইতিহাস এই সব কাক-পক্ষীর গল্পের আড়ালে আছে—একথা ভুলো না। একজন মস্ত বড় দার্শনিক, যিনি জীবনে নিজে নানা কষ্ট পেয়েছেন, তাঁর সাধনা-লব্ধ অভিজ্ঞতার কথাই, এই সব গল্পের শেষে নীতি-কথা হিসাবে আমরা দেখতে পাই।

ঈশপ্ যখন এই সব গল্প বলতেন, লোকে মজা পেয়ে তাঁর গল্প শুনত। এক বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি আছে, কল্পনায় ঈশপ্ তাঁর সব অদ্ভুত গল্প বলছেন—আর সুন্দরী গ্রীকনারীরা পরম আগ্রহে সেই সব গল্প শুনছেন। ছবিটা এখানে দেওয়া হল।

মাইগাডমোন তাঁর ক্রীতদাসটির এই সব গল্প শুনে এত খুশী হয়ে যান যে, তাঁকে তিনি মুক্ত করে দেন। প্রবাদে বলে যে, ঈশপ্ খুব কদাকার ছিলেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপের পাদ্রী তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যে তৈরী করে লিখেছিলেন যে, শুধু কদাকার নয়, ঈশপ্ কুঁজো ছিলেন। এখন আমাদের আসল গল্পে আসা যাক্।

এথেন্স থেকে কিছু দূরে স্যামস্ বলে একটা দ্বীপ ছিল সেই দ্বীপেই ঈশপ্ জন্মগ্রহণ করেন। এই স্যামস্

গল্পটি বীক মর্মরশিল্পিক ক্রীতদাস ঈশপ গল্প বলিতেছেন।

দ্বীপের শাসনকর্তার সঙ্গে ক্রইসাসের একবার বিবাদের সূত্রপাত হয়। লিডিয়ার রাজা স্থির করেন যে তিনি স্যামস্ দ্বীপের লোকদের জব্দ করবেন।

এহেন সময়ে স্যামস্ দ্বীপের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ঈশপ্ ক্রইসাসের রাজদরবারে আসেন। একে ক্রইসাস্ ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন, তার উপর ঈশপের মত একজন কদাকার লোককে দেখে এবং তারই সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করতে হবে জেনে, ক্রইসাস্ খিন্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল যে, স্যামস্ দ্বীপের লোকেরা তাঁকে অমর্যাদা করবার জন্যেই এই লোকটাকে জেনেশুনে তাঁর দরবারে পাঠিয়েছে।

অনেক চেষ্টার পর ঈশপ্ বোঝালেন যে, স্যামস্ দ্বীপের লোকেরা তাঁর বন্ধুত্বই কামনা করে, তাঁকে কোন রকমে অমর্যাদা দেখাবার কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই।

কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে রাজা ক্রইসাস্ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

—আমার নাম ঈশপ্। একদা হে মহারাজ, এক ব্যক্তি মাঠে মাঠে ঘুরে শুধু পঙ্গপাল বধ করে দিন কাটাত। একদিন তার জালে একটি হতভাগা ফড়িং ধরা পড়ে। লোকটি যখন ফড়িংটিকে বধ করতে যাচ্ছে, তখন সে বলে উঠল, আমাকে কেন বধ করতে যাচ্ছ? আমি তোমার শস্য খাই না, তোমার ক্ষেতে আমি কোন অনিষ্ট করি না। সারাদিন সারারাত আমি শুধু গান গেয়ে বেড়াই আপনার মনে। হে রাজা ক্রইসাস্, আমি সেই পতঙ্গ—নিখিদিন ওঙ্কারমান শব্দ ব্যতীত আর কিছু নই!

সেই খর্ব্ব লোকটির মুখে এহেন অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে ক্রইসাস্ আনন্দিত হয়ে বলেন, বল তোমার কি বার্ত্তা!

ঈশপ্ বলতে আরম্ভ করলেন, একদা নেকড়ে বাঘে আর মেষে আপোষে মিলিত হয়ে এক সন্ধি হয়। নেকড়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর মেষদের উত্যক্ত করবে না, যদি তারা তাদের রক্ষক শিকারী কুকুরদের তাদের কাছে সমর্পণ করে। অল্পবুদ্ধি মেষেরা তাতে রাজী হয়ে তাদের রক্ষক কুকুরদের ব্যাঘ্রের কাছে সমর্পণ করল। নেকড়েরা সবাই মিলে কুকুরগুলোকে প্রথমে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলে, তারপর নিশ্চিন্ত মনে মেষ-শাবক ধ্বংস করতে লাগল। হে রাজা ক্রইসাস্, আমি সেই মেষমেষ, আপনি সেই ব্যাঘ্র। আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে হত্যা করে, সেই স্যামস্ দেশের মেষদের ধ্বংস করতে পারেন, কেউ প্রতিবাদ করবে না।

ক্রইসাস্ লোকটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধি এবং কথা বলবার সেই বিচিত্র ধরণ দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঈশপের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঈশপ্ সেই সব পশু-পক্ষীর গল্পের ছলে তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগলেন। অবশেষে ক্রইসাস্ এতদূর সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি আর ঈশপ্‌কে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে দিলেন না, সেইখানেই জমি-জমা, ঘরবাড়ী দিয়ে তিনি ঈশপ্‌কে তাঁর রাজসভার সভ্য করে নিলেন।

একবার গ্রীসের ডেল্‌ফি শহরের লোকদের সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিডিয়ার লোকদের ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্যে ক্রইসাস্ প্রচুর স্বর্ণ দিয়ে ঈশপ্‌কে ডেল্‌ফিতে পাঠান। ডেল্‌ফিতে এসে ঈশপ্ বুঝলেন যে, ডেল্‌ফির লোকেরাই দোষী, স্বর্ণ পাবার তাদের কোনও অধিকার নাই। সেই বিবেচনায় সমস্ত স্বর্ণ তিনি ক্রইসাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ডেল্‌ফির লোকেরা ঈশপের উপর ভয়ানক রেগে গেল। এবং ষড়যন্ত্র করে তারা প্রচার করলে যে, ঈশপ্ তাদের দেবতার অপমান করেছে এবং সেই অপরাধে তাঁকে বন্দী করে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। এইভাবে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার পাঁচশো একষট্টি বছর আগে ঈশপ্ জগত থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু গ্রীকরা বুঝতে পারল তারা কি অন্যায় করেছে। ঈশপের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ডেল্‌ফি শহরে বিপদের পর বিপদ দেখা দিতে লাগল। লোকে স্থির করল যে ঈশপের প্রতি অবিচারের ফল এই শাস্তি তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। তখন তারা সমবেত ভাবে ঘোষণা করল যে, ঈশপের যে কোনও আত্মীয় তাদের কাছে যা চাইবে, সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে তাই দেওয়া হবে। সারা জগতে ঈশপের কোনও বন্ধু পাওয়া গেল না। অবশেষে তাঁর মনিব আইয়াড্‌মোনের এক নাতীকে ঈশপের আত্মীয় বলে স্থির করে, প্রচুর অর্থদান করা হল।

কিন্তু ঈশপ্‌কে প্রথমে সম্মান দিয়েছিলেন আর এক মহাপুরুষ। সভ্যের জন্যে তিনি কারাগারে আনন্দে বিষ-পান করেছিলেন। তাঁর নাম হল সক্রেটিস্। তিনি সেই কারাগারে বসে ঈশপের গল্প পড়ে দিন কাটাতেন।

এখন ক্রইসাসের জীবনে ফিরে আসা যাক্। ঐশ্বর্য্য কাউকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। পারস্যে তখন আর এক প্রবল শক্তিশালী নরপতি জাগছিলেন। তাঁর নাম হল সাইরাস্।

সাইরাস্ যুদ্ধে ক্রইসাসকে পরাজিত ও বন্দী করেন। শত্রুর বিচারে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা হল। পাক্‌টোলাস নদীর সমস্ত স্বর্ণ-ধূলি তাঁকে রক্ষা করতে পারল না। যখন তাঁকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে কাঠের স্তূপে তোলা হয়েছে, তখন সহসা তাঁর সেই গ্রীক দার্শনিক সোলোনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তো ঠিকই বলে গিয়েছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়ে, তুমি সুখী কি না, সে কথা বলা বা ভাবা অবিবেচনার কাজ!

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে ক্রইসাসের দু'চোখ দিয়ে জল-ধারা বইতে লাগল। কাতর-স্বরে তিনি সোলোনের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, সোলোন! সোলোন! সেদিন তোমার কথা বুঝতে পারিনি!

সাইরাস্ সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বন্দীর মুখে সোলোনের নাম শুনে তিনি কাঠে আগুন দিতে বারণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি সোলোনকে স্মরণ করছ?

তখন ক্রইসাস্ সোলোনের সঙ্গে তাঁর দেখার সমস্ত কাহিনী বল্লেন। বল্লেন, সেই গ্রীক তপস্বী তাঁকে বহুদিন আগে বলে গিয়েছিল, বাইরের এই শক্তিতে সুখ নেই। হতভাগ্য আমি, আমার সোনার স্তূপে বসে আমি ভাবতাম, আমিই জগতের শ্রেষ্ঠ সুখী লোক। আজ বুঝতে পারছি, কোথায় আমার ভুল হয়েছিল!

সাইরাস্ গুণগ্রাহী ছিলেন। জগতের একজন জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ বলে তিনি সোলোনকে সম্মান করতেন এবং মহাপুরুষদের নামের এমনি মহিমা যে, সাইরাস্ সোলোনকে সম্মান করবার জন্যে সেদিন ক্রইসাস্‌কে মুক্ত করে দিলেন।

আর এক দিক

ছেলে সবের মানুষ হইয়াছে। বহুদিন পরে বাড়ী বা দেশে যাইতেছেন। ছেলেকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। বিকালে নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া ছেলে ষ্টীমার দেখিয়াছে। ষ্টীমার ইতিপূর্ব্বে ছেলে দেখে নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কিসের আরোপ্লেন বাবা?

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— নিখিলনাথ রায়

ভীমের জাঙ্গাল

নয়পালের পর হইতে পালবংশের রাজগণ ক্রমে ক্ষমতা-হীন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের হস্তগত হয়। কেবল বাঙ্গলা দেশের উত্তর ভাগ গৌড় বা বরেন্দ্রী মাত্র তাঁহাদের অধিকারে ছিল। এই বরেন্দ্রী ভূমিতেই পালরাজগণ বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা বরেন্দ্রী ভূমির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হন। যে সময়ে দ্বিতীয় মহীপাল রাজত্ব আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে প্রজাগণ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহীপাল মন্ত্রিগণের কোন পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই করিতেন। এমন কি সিংহাসনচ্যুত হওয়ার ভয়ে তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে হাতে কড়া লাগাইয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৈবর্ত্ত প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার শাসন অমান্য করে। মহীপাল তাঁহাদিগকে দমন করিতে গিয়া নিহত হন। তখন কৈবর্ত্তগণের নেতা দিব্বোক বরেন্দ্রী ভূমি অধিকার করিয়া লন। দিব্বোকের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি যেমন পরাক্রমশালী, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-শালীও ছিলেন। তাঁহার শাসনে লোকে সন্তুষ্টই থাকিত। কিন্তু ভীম অনেক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের ভ্রাতা রামপাল দেব তাঁহার হস্ত হইতে বরেন্দ্রী ভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সে কথা আমরা পরে বলিতেছি। বরেন্দ্রী ভূমিতে বগুড়া সহরের উত্তরে একটি উচ্চ ও প্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উহা এখন পর্য্যন্ত ১২।১৪ হাত উঁচু আছে। এই রাস্তাকে স্থানীয় লোকে ভীমের জাঙ্গাল বলে। কেহ কেহ মনে করেন, কৈবর্ত্ত-রাজা ভীম এই রাস্তা তৈয়ার করাইয়া-ছিলেন।

সীতা-উদ্ধার

রামচন্দ্র রাবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া সীতা দেবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহা তোমরা সকলেই জান। পালবংশের রামপালও তেমনি এক সীতা-উদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ আমলের কবিগণের মধ্যে রামপালকে রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করা একটা চলতি প্রথা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা বলিতেন, রাম করিয়াছিলেন রাবণ বধ করিয়া সীতার উদ্ধার, রামপাল করিয়াছিলেন ভীমকে বধ করিয়া জনকভূর উদ্ধার। জনকভূ এক মানে সীতা, জনক হইতে যিনি হইয়াছেন। আর এক অর্থ জনকের অর্থাৎ পিতারও জন্মভূমি—অর্থাৎ পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী দেশ। এখন এই জনকভূ উদ্ধারের কাহিনী তোমাদিগকে বলিতেছি।

দ্বিতীয় মহীপালদেব নিহত হওয়ার পর রামপাল দেব কারামুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য তখন শত্রুপক্ষের হস্ত-গত। রামপাল কিরূপে কাহার উদ্ধার করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সামন্ত-রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; তাঁহারা রামপালের সাহায্য করিতে সম্মত হন। তাহার পর রামপাল গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক এই তিন-প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নদী পার হওয়ার জন্য অনেক নৌকাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সামন্ত-রাজগণ ভিন্ন রামপাল দেবের মাতুলবংশীয়েরাও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহার মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূট বংশের শিবরাজ প্রথমে গঙ্গা পার হইয়া ভীমের রাজ্যে উপস্থিত হন এবং তাঁহার লোকজনকে পরাজিত করেন। কিন্তু বরেন্দ্রী অধিকার করিতে পারেন নাই।

অবশেষে রামপাল সমস্ত সামন্ত-রাজা ও মাতুলবংশীয়-দিগকে লইয়া আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অনেক নৌকা দ্বারা সেতু বাঁধিয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভীমও নিজ পরাক্রম দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না, রামপালেরই জয় হইল। ভীম হস্তি-পৃষ্ঠে ধৃত হইলেন। তাহার পর হরি নামে ভীমের এক বন্ধু কৈবর্ত্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনিও

হত হন। ভীম ও হরি পরে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভীমের রাজধানীও ধ্বংস হইয়া যায়। রামপাল-দেব আবার বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রের জনকভূ সীতার উদ্ধারের ন্যায় রামপাল দেব নিজের জনকভূর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য অধিকারের পর রামচন্দ্র দিগ্বিজয়ে বাহির হন। উৎকল, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি তাঁহার অধীনে আসিয়াছিল। রামপাল বরেন্দ্রীতে রামাবতী নামে তাঁহার রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল যেমন বীর ছিলেন সেইরূপ সুবিচারের সহিত প্রজাপালনও করিতেন।

বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজবংশ

রামপাল দেবের পর অল্প দিনের মধ্যেই পালবংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। তাহার পর সেনবংশ বাঙ্গলায় রাজত্ব আরম্ভ করেন। সেনবংশই বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজ-বংশ। সেনবংশীয়দিগের আদি নিবাস দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ। তাঁহারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় বীরসেন নামে রাজা হইতে তাঁহাদের বংশের আরম্ভ বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা অনেক দিন হইতে রাঢ়া প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়ে তাঁহারা কর্ণাট হইতে রাঢ়া প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। এই বংশের সামন্তসেন হইতে ইঁহাদের পরিচয় ভাল করিয়া জানা গিয়া থাকে। সামন্তসেনের সহিত কর্ণাটেরও সম্বন্ধ ছিল। তিনি শত্রুগণের হস্ত হইতে কর্ণাটরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়া দেশের গঙ্গাতীরেই বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত-সেন একজন বীরপুরুষ ছিলেন। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়-সেন হইতেই সেনবংশের গৌরব আরম্ভ হয়। তিনিই বাঙ্গলা দেশে সেনবংশের রাজ্য স্থাপন করেন। সেকথা আমরা পরে বলিব। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বাঙ্গলা দেশের সকলেই বল্লালসেনের কথা জানে। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও একজন পরাক্রান্ত রাজা। তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেন। তাঁহারই বৃদ্ধ বয়সে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া পশ্চিম-বঙ্গ জয় করিয়া লন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে সেনবংশের কথা শুনাইতেছি।

বিজয়সেনের দিগ্বিজয়

সেনবংশীয়েরা যে অনেক দিন হইতে রাঢ়া প্রদেশে বাস করিতেছিলেন এবং বিজয়সেন হইতে বাঙ্গলায় তাঁহাদের রাজত্বের আরম্ভ, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সেন-বংশীয়েরা যখন রাঢ়াদেশে বাস করিতেছিলেন, তখন রাঢ়া প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পর বিজয়সেন দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তিনি প্রথমে বারেন্দ্রভূমির কতক অংশ অধিকার করিয়া লন। সে সময়ে পালবংশীয়েরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামপাল দেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালই পালবংশের শেষ রাজা বলিয়া অনুমান হয়। বিজয়সেন তাঁহারই নিকট হইতে বরেন্দ্রীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাহার পর তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতেও অগ্রসর হন। বিজয়সেন কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। এইরূপে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া বিজয়সেন অনেক রাজাকে পরাস্ত করেন। তিনি সমস্ত বাঙ্গলারই অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

রাঢ়া ও বরেন্দ্রীতে সেনবংশের দুইটি রাজধানী ছিল। বরেন্দ্রীর রাজধানীর নাম গৌড় আর রাঢ়ার রাজধানীর নাম নবদ্বীপ। গৌড় নগর কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। পালবংশের রাজত্বকালে ইহার কোন গৌরবের কথা জানা যায় না। তবে সেনবংশের সময় হইতে গৌড় বিখ্যাত হইয়া উঠে। সে সময়ে ইহার লক্ষ্মণাবতী নাম হয়। লক্ষ্মণসেনের নামেই গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম হইয়াছিল। বিজয়সেনই গৌড়ের নামে গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ার রাজধানী নবদ্বীপকে সে সময়ে বিজয়পুর বলিত। উহা যে বিজয়সেনের নামেই হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। বিজয়সেনের সময় হইতে উহা সেনবংশের রাজধানী হওয়াই সম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতিও সেনবংশীয়দের প্রধান স্থান ছিল। বিজয়-সেন অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে একটি অব্দ প্রচলিত হয়। উহা লক্ষ্মণ সম্বৎ নামে প্রসিদ্ধ। বিজয়সেন পৌত্রের নামে ঐ অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কাহারও কাহারও মতে লক্ষ্মণ সম্বৎ লক্ষ্মণ-

সেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। বিজয় সেন বরেন্দ্রীভূমিতে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে শিব স্থাপনা করিয়া তাঁহার জন্য এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ সরোবরও খনন করা হইয়াছিল। রাজশাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে সেই সরোবরের তীরে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মন্দিরে এক শিলাখণ্ডে বিজয়সেনের কীর্ত্তিকথা লিখিত হইয়াছিল।

বল্লালসেনের কৌলীন্য-মর্য্যাদা

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন আমাদের দেশের লোকের নিকট বিশেষভাবেই পরিচিত। তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি পিতার সাম্রাজ্য স্থাপনের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে লক্ষ্মণসেনও কোন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন সেনবংশের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার অভ্যন্তরভাগেরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। গৌড়, নবদ্বীপ এবং রামপালে এখনও তাঁহার অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশ অনেক দিন হইতে বৌদ্ধ পালবংশীয়দিগের অধীন থাকায় হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ প্রবল হইতে পারে নাই। সেনবংশীয়েরা আবার হিন্দুধর্ম্মকে প্রবল করিয়া তুলেন। বল্লালসেনই বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি অনিরুদ্ধ নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিষ্য হন। বল্লালসেন দানসাগর নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অদ্ভুতসাগর নামে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণসেনের সময় তাহা শেষ হয়। তখন সমাজের মধ্যে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সেজন্য বল্লালসেন ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র লোকদিগকে মর্য্যাদা দিয়া কুলীন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ এবং দান এই নয়টি গুণ ছিল, তাঁহারাই কুলীন হইয়াছিলেন। আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐ নয়গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বল্লালসেনের নিকট হইতে কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করেন। বল্লালসেন শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন। সেই জন্য বোধ হয় আদিশূর যাঁহাদিগকে এ দেশে আনাইয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহাদের সন্তানদিগকেই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যেও কৌলীন্য-মর্য্যাদা আছে। তাহা বল্লালসেনের দেওয়া নহে। বৈদ্য প্রভৃতি অন্যান্য জাতির মধ্যেও কৌলীন্য প্রথা দেখা যায়। যাঁহারা প্রথমে কুলীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশের লোকেরা এখনও কুলীন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এইরূপে বল্লালসেন সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন করায় আজিও পর্য্যন্ত সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া আছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

বল্লালসেনের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা হন। পিতা ও পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণসেনও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পিতামহের সময় হইতেই রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ যে সময়ে যুবরাজ ছিলেন, সে সময়ে কলিঙ্গ দেশ জয় করেন বলিয়া জানা যায়। তিনি কাশী এবং কামরূপও জয় করিয়াছিলেন। দক্ষিণ সাগরের তীরে পুরীধামে বারাণসী ক্ষেত্রে ও প্রয়াগ তীর্থে লক্ষ্মণসেন যজ্ঞের কাষ্ঠস্তম্ভের সহিত যুদ্ধের জয়স্তম্ভও স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এইরূপে সকল দেশের রাজাকে বশে আনিয়া লক্ষ্মণসেন বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষারই চর্চ্চা হইত। তাঁহার রাজ-সভা পণ্ডিত ও কবিতে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। হলায়ুধ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত প্রথমে তাঁহার রাজপণ্ডিত, পরে ধর্ম্মাধিকারী বা বিচারপতি হইয়াছিলেন। হলায়ুধ সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামে গ্রন্থই প্রসিদ্ধ। হলায়ুধের দুই ভ্রাতা ঈশান এবং পশুপতিও বড় পণ্ডিত ছিলেন।

পাঁচ জন সুপ্রসিদ্ধ কবি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় থাকিতেন। তাঁহাদের নাম উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ী। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতেন। বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে তাঁহার যে কীর্ত্তিকথা লিখিত হইয়াছিল,

উহা উমাপতি ধরের রচনা। গীতগোবিন্দ নামে রাধাকৃষ্ণের লীলাগানে পূর্ণ সুললিত সংস্কৃত কাব্য কবি জয়দেবকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলীগ্রামে জয়দেবের বাসস্থান ছিল। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে এখনও সেখানে তাঁহার নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে। শরণেরও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থ আছে। উহাতে সাতশত সুমিষ্ট কবিতা সংস্কৃত আর্য্যাছন্দে লিখিত হইয়াছে। ধোয়ী কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে অনেক উপহার ও কবিরাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পবনদূত নামে তাঁহার একখানি সুমধুর কবিতায় পূর্ণ সংস্কৃত কাব্য সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের মেঘদূত নামে কাব্যের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। মেঘদূতে কালিদাস মেঘকে একজন হংসের দূত করিয়া তাহার পত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আর পবনদূতে ধোয়ী কবি মলয় পর্ব্বত হইতে মলয় পবনকে কুবলয়বতী নামে একটি গন্ধর্ব্বকন্যার দূত করিয়া বিজয়পুর বা নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস প্রসিদ্ধ কবিগণের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সদুক্তি কর্ণামৃত নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সদুক্তি কর্ণামৃতের সূক্তিকর্ণামৃত নামও আছে। এইরূপে লক্ষ্মণসেনের রাজসভা পণ্ডিত ও কবিতে পরিপূর্ণই থাকিত। ইঁহারা রাজকার্য্যেও রাজাকে উপদেশ দিতেন। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় এক পুরাতন মসজিদের মালিকের নিকট একখানা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়, উহার নাম "সেক শুভোদয়া"। উহাতে এক মুসলমান পীরের জীবনকথা আছে। এই মুসলমান পীর নাকি লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বইখানিতে লক্ষ্মণসেনের সভার নানা রকম মজার গল্প আছে,—গল্পগুলি সত্য কি না বলা যায় না। উহাদেরই একটি গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি।

লক্ষ্মণসেনের এক শালা ছিল। সে ছিল ভারি দুষ্ট। লোকজনের উপর সে বড়ই পীড়ন করিত। এমন কি স্ত্রীলোকদিগকেও বাদ দিত না। এক দিন একটি বেণের মেয়ে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল। রাজার শালা তাহার কাপড় ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলে, সে ছুটিয়া আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল ও রাজার শালার নামে নালিশ করিল। রাজা শালাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। রাণীর নিকট সে সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তাড়াতাড়ি রাজসভায় আসিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহার ভাইকে শাস্তি দেয়। রাণীর কথায় সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। তখন গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার হাতের দণ্ড দেখাইয়া বলিলেন যে, যে রাজসভার বিচারে বাধা দিবে, তিনি তাহাকে সেই দণ্ডাঘাতে তাড়াইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি রাজাকে বলিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে; শীঘ্রই তাহা ধ্বংস হইবে। আচার্য্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, বলিলেন। তাহার পর তিনি সভা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাজা লক্ষ্মণসেন সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। বেণের মেয়ের নালিশের সুবিচার হইল।

বাঙ্গলার শিল্পের উন্নতি

পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলা দেশে শিল্পের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পাথরের শিল্প সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রশংসা লাভ করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ নানা দেবদেবীর ও অন্যান্য অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি পাথরে নির্ম্মিত হইয়া বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক পাথরের মন্দিরের থামে ও দেওয়ালে নানা প্রকার মূর্ত্তি ও লতাপাতা খোদাই করা হইত। তাহা শিল্পিগণের নিপুণতার পরিচয় দিত। ধাতুর মূর্ত্তিও সে সময় সূক্ষ্মকার্য্যে ভূষিত হইয়া সকলের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিত। তাহাতে শিল্পীগণ যথেষ্ট পরিমাণে আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিতেন। অনেক স্থানের শিলালিপি সুস্পষ্ট ভাবে খোদিত হইয়া শিল্পীর গুণপনা প্রকাশ করিত। আবার তাম্রশাসন সকলেও ঐরূপ অক্ষর খোদাই করা হইত। এই তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে রাজাদিগের গুণগানও লিখিত হইত। কাষ্ঠশিল্প ও চিত্রকার্য্যও সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা

হইতেই সে সময়ের শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই রূপে পালবংশ ও সেনবংশের রাজত্ব-কালে নানা প্রকার শিল্পের উন্নতি হইয়া, বাঙ্গালাদেশকে সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত করিয়াছিল।

বাঙ্গালায় মুসলমান-আগমন

আরবদেশে মহম্মদ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যাহারা সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুসলমান বলে। মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দেশ বিদেশে যাইতেন ও সেই সেই দেশ জয় করিয়াও লইতেন। সে সকল দেশে অনেক লোকে মুসলমান হইত। মুসলমানেরা অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে কাশিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধুদেশ জয় করেন। তাহার পর আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর সুলতান মামুদ প্রভৃতি অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং দেবদেবীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া, অনেক ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া যান। তাহার পর আবার গজনীর মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। পৃথ্বীরাজ প্রথম মহম্মদ ঘোরীকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে নিজে পরাজিত হইয়া নিহত হন। মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিয়া কুতবউদ্দীনকে দিল্লী রাজ্যের ভার দিয়া যান। কুতবউদ্দীনই দিল্লীর প্রথম বাদশাহ।

মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ নামে একজন যোদ্ধা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। বাদশাহ কুতব-উদ্দীন ইক্তিয়ারের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সমাদর দেখাইয়াছিলেন। ইক্তিয়ার ক্রমে মগধ বা বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন। বিহার জয় করিয়া তিনি বাঙ্গালায় আসেন। সে সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে তাঁহার কোন শত্রু না থাকায় তাঁহার সৈন্যগণও যুদ্ধকার্য্য একরূপ ছাড়িয়া-দিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহারা অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এক্ষণে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিল। রাজধানীতে তাহারা প্রায়ই থাকিত না। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে আসিত। সে সময়ে বিজয়পুর বা নবদ্বীপ লক্ষ্মণসেনের প্রধান রাজধানী। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীও তাঁহার আর একটি রাজধানী ছিল। এই দুটিই যে সেনবংশীয়দের রাজধানী সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ও সৈন্যগণের বিশ্রাম অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ইক্তিয়ার খিলিজী একেবারে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সত্তরজন মাত্র অশ্বারোহী ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সে কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সৈন্যগণ কোন স্থানে গুপ্ত ভাবে ছিল। ইক্তিয়ার কেবল সত্তরজন অশ্বারোহী লইয়া নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণ-সৈন্যেরা সে সময়ে নবদ্বীপে ছিল না বলিয়া বোধ হয়। তাহারা অন্য কোন সেনানিবাসে অথবা আপনাপন বাটীতে বিশ্রাম করিতেছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইক্তিয়ার সেই সুযোগে নবদ্বীপে আসিয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যান।

ইক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন। সেই অবধি গৌড় মুসলমানদিগের রাজধানী হইয়া উঠে। মুসলমানেরা বরেন্দ্রী এবং উত্তর রাঢ়া অধিকার করিয়া বাঙ্গলার রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজগণই রাজত্ব করিতে থাকেন। অনেকদিন পরে তাহা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। ইক্তিয়ারের নবদ্বীপ লুণ্ঠনের পর লক্ষ্মণসেন কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাহার তিন পুত্র মাধব, বিশ্বরূপ ও কেশব সেন রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণের পুত্রগণের পর সেন-বংশের আর কোন রাজার সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। মধুসেন নামে এক রাজার নাম পরে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে সেনবংশীয় বলিয়া মনে করেন। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কোন কোন পার্ব্বত্য রাজ্যের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বাঙ্গলার সেনরাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মুসলমানগণের বাঙ্গলায় আসার পর সেনবংশীয়গণ যে পূর্ব্ববঙ্গে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা কিন্তু জানিতে পারা যায়। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। সেনবংশই বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ। তাঁহাদের পরে আর কোন হিন্দু রাজবংশ প্রবল হইতে পারে নাই। মুসলমানেরাই এদেশের রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিরূপে মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা তোমাদিগকে শুনাইতেছি। (ক্রমশঃ)

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

না তারপর সিঁড়ির ধাপের পাশে দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়ার দিকে মুখ নীচু করে তাকালেন। তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। যাক্, তিনি তবে সত্যি-সত্যি একলা নন। তখন আর একজন লোক যেন তাঁর কাছে বসে রয়েছে মনে করে কথা কইতে গেলেন। শুনছেন, আর উত্তর দিচ্ছেন।

"তাকে বাঁচাবার জন্যে এখন তবে কি করি?"

"তার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর তাকে স্পষ্ট করে বল। এখনও সময় আছে মারিয়া মাদালেনা, জোর··· জোর করে তাকে বল।"

"কিন্তু সে ত' রেগে যাবে, সব হয়ত অস্বীকার করবে। তার চেয়ে ভাল হচ্ছে বিশপের কাছে গিয়ে বলা আর প্রার্থনা করা যে এই ধ্বংসের নরক থেকে আমাদের সরিয়ে দিন। বিশপ ভগবানের জ্ঞানিত লোক, তিনি এ পৃথিবীকে জানেন। আমি তাঁর চরণে হাঁটু গেড়ে পড়ব। আমি এখনও তাঁকে চোখের সামনে দেখছি, ধবধবে সাদা পোষাক, লাল রঙ করা অভ্যর্থনার ঘরে বসে আছেন, তাঁর বুকের ওপর সেই সোনার ক্রুশ ঝুলছে, আর দুটি আঙুল তুলে আশীর্ব্বাদ করছেন। তাঁকে ঠিক আমাদের প্রভু ঈশাইই মতন দেখায়, তিনি যেন নিজেই! আমি তাঁকে বলব: প্রভু! তুমি এই এলার গ্রামের কথা জান, রাজত্বের মধ্যে সব চেয়ে গরীব জায়গা বলে, এতকাল অভিশাপে ডুবে ছিল। প্রায় একশ বছর ধরে এখানে কোন পাদরী ছিল না, বাসিন্দারা একেবারে ভগবানকে ভুলে গিয়েছিল, তারপর একজন পাদরী এখানে এলেন, কিন্তু প্রভু নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি কি চরিত্রের লোক ছিলেন। সৎ আর পবিত্র ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত। তিনি এই গির্জ্জেবাড়ী, এই গির্জ্জে নতুন করে গড়ে গিয়েছেন, তাঁর নিজের খরচায় নদীর ওপর ঘাতায়াতের সাঁকো করে দিয়েছেন। শিকার করে বেড়াতেন। শিকারীদের আর রাখালদের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করে জীবন কাটাতেন। হঠাৎ সব বদলে গেল, একেবারে শয়তানের মতন শয়তান হয়ে গেলেন। তারপর শুন করিতে, যাত্ করতে সুরু করলেন। মদ খাওয়া ধরলেন, নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেন না, কামুক হয়ে পড়লেন। ভগবানের নাম নিয়ে লপস করা আর পাইপ টানা সুরু হ'ল। এই জায়গার যত পাষণ্ড বদমায়েস লোকেদের সঙ্গে তাস প্রেমারা খেলতে আরম্ভ করলেন। তারাই তাঁর সহচর হ'ল, তারাই সব তাঁকে রক্ষা করত, কাজেই অন্য লোকে তাঁকে ত্যাগ করলে। তারপর শেষ দিকে, গির্জ্জেবাড়ীতে নিজে একলাই থাকতেন, কোন চাকর-বাকর ছিল না। এক শুধু গির্জ্জের উপদেশ দিতে ছাড়া আর বাড়ী থেকে বের হতেন না। তাও খুব ভোরে আসতেন, যখন প্রায়ই কোন লোক-জন আসত না। যখন খুব মাতাল হয়ে পড়তেন, সেই সময়ে খুব উৎসব করতেন। গ্রামের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে বা আনতে ভয় পেত, কারণ লোকে বলাবলি করত যে স্বয়ং শয়তান ওঁকে রক্ষে করছে। তারপর তাঁর অসুখ হ'ল, এমন একটি মেয়েমানুষ ছিল না যে তাঁকে সেবা করে বা দেখে শোনে। কোন ভদ্রলোকের পুরুষ কি মেয়ে, তাঁর শেষ দিনে তাঁকে কোন বিষয়ে সাহায্য করতে গেল না। কিন্তু প্রত্যেক রাত্রিতেই, গির্জ্জেবাড়ীর সকল জানালা দিয়েই আলো দেখা যেত। লোক বলেছিল যে গভীর রাত্রির শয়তান মাটীর ভেতর দিয়ে একটা সুরঙ্গ কেটে নদী পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে, তাঁর শেষ হাড় কখানা নিয়ে যাবার জন্যে। আর সেই পথ দিয়ে তাঁর মারা যাবার পর সেই পাদরীর আত্মা এখানে ফিরে আসত, আর এই গির্জ্জেবাড়ীতে হানা দিত; যাতে আর কোন পাদরী এসে এখানে আর বাস না করে। অন্য গ্রাম থেকে একজন পাদরী প্রতি রবিবারে এখানে গির্জ্জার উপদেশ দিতে আসত, আর মড়ার সৎকার করাত। কিন্তু একদিন রাত্রে সেই মরা-পাদরীর আত্মা সাঁকোটাকে ভেঙে দিলে। আর তারপর থেকে দশ বছর ধরে গ্রামে আর কোন পাদরী আসে নি। তারপর এল পল, সঙ্গে এলাম আমি। আমরা এসে দেখলাম গ্রাম আর তার বাসিন্দারা সব বুনো আর অসভ্য হয়ে গেছে,

বিশ্বাস—ধর্ম্মে বিশ্বাস বলে কোন বস্তুই গ্রামে নেই। পল আসার পর থেকে আবার সব জিনিষ জেগে উঠল, যেমন বসন্তকালের সঙ্গে সঙ্গে সব নতুন রঙে ভরে যায়। কিন্তু যারা কুসংস্কারে ভরা তাদের কথাই ঠিক হ'ল, নতুন পাদরীর নিশ্চয় কোন বিপদ আপদ হবে, কেননা সেই পুরোনো মরা-পাদরীর যে আত্মা, সে যে এখনও এই গির্জ্জেবাড়ীতেই রাজত্ব করছে। কেউ কেউ বলে, সে ত' মরে নি, সে ওই মাটীর নীচে যেখান দিয়ে নদীর সঙ্গে মিলে গেছে, সেইখানে সে বাস করে। আমি নিজে কখনও সব কথা বিশ্বাস করি নি, কিম্বা আমি ত কখন কোন রকমের শব্দও শুনিনি। সাতটা বছর আমরা এইখানে বাস করলাম, পল আর আমি, যেমন একটা ছোট কলেজেটে থাকে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও পল একেবারে নিষ্পাপ ফুলের মত ছেলে ছিল। সে পড়াশুনো করত, ভগবানের নাম করত, গ্রামের লোকের ভালর জন্যই সে যেন বাস করছে এখানে। কখন কখন সে বাঁশী বাজাত। আমোদ করা তার স্বভাব নয়, কিন্তু সে বেশ শান্ত ও ধীর ছিল। বাইবেলে যেমন শান্তি আর প্রাচুর্য্যের কথা আছে, আমরা সাত বছর ধরে সেই রকম শান্তি আর প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করছি। কখন পল মদ খায় না, কখন সে শিকার করতে যায় না, সে কখন খোঁয়া টানে না, মেয়ে মানুষের মুখের পানে কোন দিন মুখ তুলে সে চায় না। যা কিছু টাকা সে বাঁচাতে পারে, সে সব ওই গ্রামের নীচের দিকে ঐ সেই সাঁকোটা নতুন করে তৈরী করবার জন্যে জমাচ্ছে। মোটে আটাশ বছর মাত্র তার বয়স, সে যে আমার পল, এখন সেই অভিশাপ তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। একটা মেয়ে মানুষ তার পেপলা জালে তাকে আটকেছে···ওঃ! প্রভু বিশপ! আমাদের এখান থেকে দূরে পাঠিয়ে দাও, আমার পলকে বাঁচাও, নইলে আগের পাদরী যেমন তার আত্মাকে শয়তানের হাতে হারিয়েছে, আমার পলও তেমনি বুঝি হারায়। হাজার হোক্ সে একটা মেয়ে-মানুষ, একলা বাস করে, সেই একলা বাড়ীতে তার অনেক প্রলোভন আছে, এই ছোট গ্রামটির নির্জ্জনে লোকজন নেই বললেই হয়; সেখানে তাকে সঙ্গ দেবার মত উপযুক্তও কেউ নেই। প্রভু বিশপ, প্রভু সে মেয়েটিকে জানেন। আপনি তার অতিথি হয়েছিলেন, আপনার সব অনুচরদের নিয়ে, যখন আপনি এই ছোট গ্রামখানি পরিদর্শন করতে আসেন। বাড়ীটায় অনেক ঘর আছে, বিলিয়ে দেবার মত তার অনেক জিনিষ আছে। আর মেয়েটির পয়সা-কড়ি আছে, স্বাধীন, একা, একেবারে নিছক একা। তার ভাইবোনেরা আছে বটে, কিন্তু তাদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। সব দূরে থাকে, আর সব অন্য দেশে বাস করে। বিষয়-আশয় আর বাড়ী-ঘর-দোর সব দেখবার জন্যে সে একলা এইখানে থাকে। কদাচিৎ সে বাইরে যেত হয়। এই কিছুদিন আগেও পল তাকে একেবারেই জানত না। তার বাপ ছিল এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, আধখানা ভদ্রলোক আধখানা চাষা। শিকারী, খৃষ্টধর্ম্ম মানত না, নাস্তিক। সে সেই বুড়ো পাদরীর বড় বন্ধু ছিল, আর বোধ হয় আমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না; সে কখনও গির্জ্জেয় যেত না। কিন্তু এই শেষবার তার অসুখের সময় আমার পলকে ডেকে পাঠাল। আমার পল সেখানে গিয়ে তার মরণ পর্য্যন্ত কাছে ছিল। পল, এর মৃত্যুতে এমন একটা শবযাত্রা করেছিল যে এদেশে কোন কালে কেউ তা চোখে দেখেনি। প্রত্যেক লোকই সে শবযাত্রায় গিয়েছিল। মায়েরা সব তাদের ছেলে বুকে করে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমার পল, সেই বাড়ীর একজন মাত্র যে বেঁচে ছিল, ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেত। আর বাপ-মা-মরা মেয়ে যত সব খারাপ চাকর-বাকরের সঙ্গে করে বাস, তারাই চালায়, তারাই উপদেশ দেয়। আমরা যদি তার সহায় না হই, তবে কে সহায় হবে?"

তার পর অন্য স্ত্রীলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "মারিয়া, তুমি ঠিক জান এ সব সত্যি। তুমি একেবারে স্থিরনিশ্চয় যে যা তুমি ভাবছ তা সবই সত্যি? তুমি, সত্যি সত্যি বিশপের কাছে গিয়ে তোমার ছেলে আর অন্য লোকের নামে এ সব বলতে পার, প্রমাণ করতে পার? ধর, যদি এ সব সত্যি না হয়?"

"হে ভগবান! হে ভগবান!"

মা দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে রইলেন। তখনি তাঁর চোখের উপর তাঁর ছেলে পল, আর মেয়েটি এক সঙ্গে,—সেই বড় বাড়ীর নীচের ঘরের ভেতর রয়েছে,—ভেসে উঠল। প্রকাণ্ড ঘর, খোলা বাগানের দিক দেখা যাচ্ছে, ভেতরের ছাদ ঘোরাল গম্বুজের মত, মেঝেতে সমুদ্দুরের শাঁক আর ঝিনুকের

খুড়ি সিমেন্টের সঙ্গে পালিশ করে পেতে দেওয়া। একদিকে একটা খুব বড় আগুন রাখার জায়গা। তার ঠিক ডাইনে ও বাঁয়ে আরাম-কেদারা, আর ঠিক সামনে একখানা সোফা। চুণকাম করা দেয়ালে নানা রকমের অস্ত্র শস্ত্র ঝোলান, হরিণের মাথা, শিঙ সব দেয়ালে লটকান। পানকতক ছবি, তার ক্যানভাস কালো হ'য়ে কেটে চৌচির হয়ে গেছে। আসলে ছবির যে কি মর্ম্ম তা বোঝাই যায় না, তবে বেশ দেখা যায় একখানা হাতের ভঙ্গী, মেঁায়াটে রঙের মধ্যে ডোবা; কোনখানায় বা একখানা শুধু মুখের একটু আদরা দেখা যাচ্ছে, কোথাও বা চুল, কোথাও হয়ত এক খোলো ফলের খানিকটা রঙ রয়েছে।

পল আর সেই মেয়েটি পরস্পর হাতে হাত দিয়ে দুজনে সেই আগুন-রাখার পাশে বসে রয়েছে।

"ওঃ ভগবান!" বলে, মা বুক-ফাটা কান্নার স্বরে দেখেন।

আবার সেই ভয়ানক মিষ্টুর ছবি মন থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে আর একটা ছবি মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন। আবার সেই ঘর। ঘরটা সবুজ আলোর আভায় ঝলমল করছে। যে পরাণে-দেওয়া জানালা দিয়ে দূরে সবুজ মাঠ দেখা যায়, তার ভেতর দিয়ে সেই আলো আসছে। যে ঘরটা দিয়ে সোজা বাগানের গাছপালা সব দেখা যায় তার ভেতর দিয়ে সেই সব সবুজ চকচকে গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে, এখনও তারা হেমন্তের শিশির-বেলা। কতকগুলো ঝরা পাতা আস্তে আস্তে উড়ে ঘরময় ছড়ে গেছে। সেকালের সেই পুরোনো পেতলের পিরীম, পেতলের শিকল দিয়ে ঝোলান, হাওয়ায় এদিক-ওদিক করে দুলছে। আর আধখানা জেগান, আর একটা দরজা দিয়ে তিনি অন্য ঘরগুলোও দেখতে পাচ্ছেন, সবই খানিক অন্ধকারে ঢাকা, আর জানালা বন্ধ করা।

হাতে ফলের ডালি নিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পল ওই বাড়ীর যে গিন্নী তাকে উপহার দেবার জন্যে পাঠিয়েছে। ধর-পদে, একটু সহজ লজ্জার হাসি হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল, কাল পোষাক পরা, অন্ধকার ঘর থেকে সে যেন বেরিয়ে এল। ছুটো কালো খোপনার সঙ্গে পেটে-পেড়ে চুল বাঁধা, মুখখানি যেন সাদা, আর তার সেই সাদা হুখানি হাত যেন ঘন ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, দেয়ালের ছবির মত।

এমন কি, যখন সে কাছাকাছি হ'ল, ঘরের পুরো আলোয় এসে দাঁড়াল, তার সেই ছোট পাতলা আকৃতিতে যেন একটা সন্দেহ মাখা, যেন সে থেকে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। কালো বড় বড় চোখ সেই ফলের ডালির ওপর পড়ল, তারপর যে নারীটি দাঁড়িয়ে ছিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল, একটা চকিতের হাসি, একটুখানি আনন্দ, একটুখানি ঘৃণা, আর সেই দুঃখমাখা অথচ লালসার রেখাটানা ঠোঁটের রেখার ওপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, যদিও তিনি জানেন না যে কেন, অথবা কি করে, মায়ের অন্তরে প্রথম সন্দেহের ঢেউকে নাড়া দিয়ে তুললে।

এর কারণ হয়ত তিনি ভেঙে বলতে পারেন না, কিন্তু মেয়েটি যে কি আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে খাতির করে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে, পলের খবর জিজ্ঞাসা করলে! যেন যেমন ভাইয়ের নাম ধরে ডাকে, তেমনি ভাবেই পলের নাম যেন বললে, কিন্তু সে ভাবে ত তাঁর সঙ্গে ব্যবহারভঙ্গী দেখালে না যে, তিনি তাঁদের দুজনেরই মা। বরং অন্য রকমই মনে হ'ল। যেমন সামনা-সামনি প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে তাকে একটু খোসামোদও করে আবার ঠকিয়েও ধরে। সে তার জন্য কফি আনবার হুকুম করে বড় রূপোর থুকেয় করে আনালে। যে মেয়েটি নিয়ে এল তার খালি পা, তার মুখখানা আরব দেশের মেয়েদের মত মুখে-মাথায় কাপড় বাঁধা। সে তার দুই ভাইয়ের গল্প করতে লাগল। দুজনেই বেশ নামজাদা লোক, অনেক দূরে তারা থাকে। এমনভাবে এ গল্পটা করলে, যেন তাতে তার বেশ একটু গোপন আনন্দ আছে, এমন ভাবে এই ছবি চোখের ওপর ধরলে, যেন দুই ভাই ছুটো ধাম তার মধ্যিখানে থাকে সে, যে তার এই একলা-থাকার জীবনের সুতোর খেই এমনি করে সে বুনে যাচ্ছে। তারপর ঘর থেকে সোজা বের হয়ে সে তার অতিথিকে একেবারে সোজা বাগানের পথে নিয়ে গেল।

বড় বড় বেগুনীরঙের ডুমুর ফল, চকচকে রূপোর ডগুসে মোড়া, ডাল ভাল রসভরা নাসপাতি। বড় বড়, খোলো খোলো সোনার রঙের আঙুর, গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ও গাছের ফাঁকে ঝুলছে। একি, যার বাগানে এত রকমের ফল, তাকে আবার পল এত ফল উপহার দেয় কেন?

এখন পর্যন্ত শিরীষের ফাঁপা-আলোয় সিঁড়ির সেই ধাপে বসে, যা সেই চোখের তারানি বেশ দেখতে পাচ্ছেন, সেই ছেলে চল চল, আবার ঘুমায় ঢাকা তারানি এক সঙ্গে। যখন সেখান থেকে বিদায় নিলেন তখন ঠিক এমনি তাকিয়ে ছিল, আর যে ভাবে তার ভারি ভারি চোখের পাতা মুড়ে নিয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল যে, সে তার নিজের মনের ভাব লুকোবার জন্যে আর কোন উপায় পায়নি, বরং লুকোতে গিয়ে আরো ধরা পড়ে গেছে। আর তার সেই চোখ দুটি, আর যে ভাবে তার অন্তরের লুকোনো-জিনিষের প্রকাশ করেছে, সবটা হঠাৎ জল্‌জলে করে ধরেছে. আবার তখনি, কি আশ্চর্য্য, ঠিক যেমন পল করে, তেমনিতর, নিজেকে নিজের ভিতরে যেন টেনে নিলে। এমন কি, তারপর যে দিনগুলো পরে এল, তার মধ্যে পলের এই ভাবভঙ্গী, তার সেই গম্ভীর ভাব দেখে তার মন সন্দেহ আর ভয় দুয়েতেই ভরে উঠল। সেই মেয়েটির ওপর তাঁর কোন ঘৃণা আসে নি, যে মেয়ে তাঁর ছেলেকে এমন পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি কেবলই এই ভাবতে লাগলেন, কি করে তিনি এই মেয়েটিকেও এই পাপের পথ থেকে সরিয়ে নেবেন, তাকে বাঁচাবেন, যেন সে মেয়েটিকে বাঁচান একেবারে তাঁর নিজের মেয়েকে বাঁচানরই মত।

[দুই]

যৌবন ও শীত কেটে গেল, তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় করে সত্যি বলে মনে করে নেবার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। কিন্তু বসন্তকাল ফিরে আসার পরেই ফাল্গুনের বাতাস বওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আবার তার কাজ হাতে নিলে।

পল রাত্রিতে আবার বেরুল, আবার সেই পুরোনো বাড়ীতে গেল।

"কি আমি করি, কেমন করে তাকে রক্ষা করি ?"

বাতাস শুধু পরিহাস করে তাঁর কথার উত্তোর কাটলে, জোর হাওয়ার গর্জ্জনের সঙ্গে বাড়ীটা কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

এখন তাঁদের এই গ্রামে আসার কথা তাঁর মনে পড়ল, পল এইখানে পাদরী নিযুক্ত হবার ঠিক পরেই। কুড়িটা বছর তিনি চাকরাণীর কাজ করে কাটিয়েছেন, প্রত্যেক পাপ প্রলোভন থেকে নিজেকে সামলে রেখেছেন। প্রত্যেক চাকলা, স্বভাবের প্রত্যেক কুধা থেকে, নিজেকে সকল রকমের মায়া, স্নেহ, প্রেম থেকে রিক্ত করে, এমন কি একটুকরো রুটী থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, যাতে তাঁর ছেলেটি, পল, সহজে ও সততার ভেতর দিয়ে মানুষ হয়, আর যা-কিছু সৎ-দৃষ্টান্ত তার চোখের সামনে এনে ধরেছেন। তারপর তাঁরা এখানে এলেন। তাঁদের এখানে আসবার পথে ঠিক এমনি ঝড়ো বাতাস, পথে তাঁদের ঘিরে ঘিরে বাধা দিয়েছিল। তখনও এমনি বসন্ত কাল ছিল, কিন্তু মনে হল, যেন সমস্ত উপত্যকাটা ফিরে শীতের মুঠোর ভেতর গিয়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে গাছের পাতা ছড়ান, ঝড়ের দাপটে বড় বড় গাছগুলো একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়ছে। যেন ভয়ে তারা সেই কাল মেঘের ঘোরাল সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। দূর আকাশের শেষ সীমারেখার প্রান্ত থেকে বড় বড় কাল ঘন মেঘের দল আকাশ ছেয়ে হু হু করে আসছে। আর ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শিলা পড়ছে, আর সেই নরম সবুজ ঘাসগুলোকে একেবারে চটকে দলে দিচ্ছে।

যেখানে রাস্তাটা ঘুরে গেছে, উপত্যকা থেকে যেন দেখতে পাওয়া যায়, সেখান থেকে পথটা যেখানে নেমে গেছে নদীর দিকে, বাতাস সেখানে হঠাৎ এমন রণমূর্ত্তি নিয়ে উঠল যে, ঘোড়া দুটো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল, কান দুটো খাড়া করে করে তারা ডাক ছাড়তে লাগল। ঝড় যেন ডাকাতের মত এসে ঘোড়া দুটোর লাগাম আটকে ধরলে, এমন ভাবে তাদের মাথা চেপে ধরলে, যেন পথিকদের সর্ব্বস্বই কেড়ে নেবে। এমন কি পল, যদিও এই দুর্দ্দাম ঘটনায় বেশ আনন্দ পাচ্ছিল, তবুও হঠাৎ চেঁচিয়ে যেন কুসংস্কারের ভয়েই বলে ফেললে—

"নিশ্চয়ই সেই বুড়ো পাদরীর শয়তান আত্মা আমাদের এখানে আসায় বাধা দিচ্ছে।"

কিন্তু তার কথাগুলো বাতাসের শোরের মধ্যে ডুবে গেল। আর যদিও সে মাথা নীচু করে একটু একটু হাসছিল, এক-পেশে হাসি, ঠোঁটের একদিকের কোণে শুধু হাসির ভঙ্গীর সঙ্গে চোখে একটা যেন ঘন নিরাশের ছায়া পড়ল, যখন এই গ্রাম তার চোখের ওপর একটুখানি দেখতে পেলে। গ্রামখানা যেন সবুজ পাহাড়ের উপত্যকার ধারে, ছবির মত ছলছে,

উপত্যকা যেখানে নাবাল গড়িয়ে গেছে, ধাক্কা খেতে খেতে যে জলস্রোত চলেছে, ঠিক তার অপর ধারেই।

যখন তারা নদীটা পার হয়ে গেল তখন বাতাস একটু কমেছে। গ্রামের সব লোকেরা নতুন পাদরীকে দল বেঁধে অভ্যর্থনা করতে এসেছে, সে যেন সত্যিই তাদের আপনকর্তা। গির্জের সামনে চৌমাথার ওপর সব জড় হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একদল ছোকরা নদীর তীরে নতুন পথিকদের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এল। পাহাড় থেকে তারা নেমে এল যেন একদল নতুন উগল পাখীর ঝাঁক আনন্দের ধ্বনি তুলে উড়ে আসছে। যখন তারা তাদের গ্রামের পাদরীর কাছে এসে পৌঁছল, তখন তারা এক সঙ্গে জড় হয়ে তাকে কাঁধে করে নিয়ে উঠল পাহাড়ে জয়ধ্বনি করতে করতে। আনন্দ জানাবার জন্যে তারা আকাশের দিকে মুখ করে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। সারাটা উপত্যকা তাদের আনন্দের চীৎকারে ধ্বনিত হয়ে উঠছে আর সেই বন্দুকের শব্দে বাতাসও যেন থেমে এল এবং মেঘ যেন তখন কেটে যেতে লাগল।

আজ এখনও এই দুঃখবাতনার সময়ে মায়ের বুক যেন গর্বে ভরে উঠতে লাগল, যখন তাঁর এই জয়ের উল্লাসের কথা মনে এল। আবার তিনি যেন স্বপ্নের রাজ্যেই বাস করতে লাগলেন। মনে হল সেই আনন্দময় ছোকরার দল তাঁদের একেবারে মেষলোকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। তাঁর পাশে পাশে তাঁর পল চলেছে, এখনও সেই ছেলে মানুষেরই মত, কি-এক স্বর্গীয় ভাব তার মুখে চোখে যেন মাখান, যাকে দেখে এই সব বলশালী লোকও শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নীচু করছে।

ক্রমে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে তারা উঠতে লাগল। পাহাড়ের ধারে খুব উঁচুতে আগুনবাতী ছুঁড়তে আরম্ভ করলে। পিছনের দিকে কালো অন্ধকার মেঘের বুকে সেই আগুনের খেলা যেন লাল নিশান উড়িয়ে দিলে, তারই আভা সেই ধূসর গ্রামের ওপর পড়েছে, পড়ছে সেই সবুজ পাহাড়ের গায়ে, ঝাউগাছের মাথায় বড় বড় গাছের চূড়ায় পথের ধারে যারা সারি দিয়ে রয়েছে।

উঁচুতে, আরো উঁচুতে তারা গেল। চৌমাথার ধারের পাদ্রিদের গায় আর এক দল মানুষের পাদ্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে। উৎসাহের আগ্রহ-মাখা মুখ, কোথাও পুরুষের দৃপ্তি, কোথাও বা মেয়ের কমনীয় ধীরা ; তাতে লম্বা কালোরঙগুলো বাতাসে উড়ছে। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার উৎসাহে ছেলেদের চোখ-মুখ আহ্লাদে যেন নৃত্য করছে। আর সেই পাহাড়ের উঁচু জমির ধারে ছেলেরা, যারা ওই আতসবাজী ছুঁড়ছে, তাদের আকৃতির ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে, দূর থেকে মনে হচ্ছে লম্বা কাল-ভূতের মত তারা লাফ চড়ে বেড়াচ্ছে।

গির্জের খোলা দরজা দিয়ে বাতির আলোর শিখা গুলো দেখাচ্ছে যেন সাদা মার্বিলের ফুল হাওয়ায় দুলে দুলে কাঁপছে। গির্জের ঘণ্টা অবিরাম জোরে বাজছে, এমন কি আকাশের রূপোলী মেঘের দল, দল-বেঁধে যেন সেই গির্জের চূড়ো ঘিরে দেখছে এসে, হয়েছে যেন কার অপেক্ষায়।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে একটা চীৎকার উঠল, "এই যে তিনি, এই যে তিনি—ঠিক যেন দেবতার মত দেখাচ্ছে।"

দেবতার মত তাকে কিছুই দেখায় নি, শুধু একেবারে স্তব্ধ শান্ত মূর্তি ছাড়া। সে কথা কয় নি, সাধারণ লোক মিলে যে, এত আদর-অভ্যর্থনা করলে, সেও একেবারেই যেন তা আমলই দিলে না, তাদের এই এত গোলমাল যেন একটুও তার কাছে কোন সাড়াই পেলে না। সে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে, শুধু ভুরু কুঁচকে মাটীর দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তার সেই ভারি ভুরু ক্লান্তির ভারে আপনিই নুইয়ে পড়েছে। তারপরই তারা যখন চৌমাথার ঘিরে পৌঁছল, আনন্দের উত্তরোলে সবাই যখন তাকে ঘিরে দাঁড়াল, মা দেখতে পেলেন যে, পল যেন আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না। একজন এসে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। পল সামলে নিলে। গির্জের দিকে ছুটে গিয়ে বেদীর কাছে হাঁটু গেড়ে, সুর করে তার সাধের প্রার্থনা আরম্ভ করলে।

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলে।

মেয়েরা যে কাঁদলে, সে তাদের ভগবানের প্রেম, এ সংসারের সুখ-দুঃখ নয়, এ সংসারের অতীত এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাদের চোখ দিয়ে এ জল ঝরল। আর আজকার এই ঘোর দুঃখের সময়েও সেই চোখের জলের যে ধারা তা যেন শান্তি ঢেলে দিতে লাগল। তাঁর পল! তাঁর প্রেম! তাঁর আশা। এই সংসারের যা কিছু আনন্দ সুখ সব আকাঙ্ক্ষাই যে পল। তাতেই যে সব মূর্তি নিয়ে আছে। সেই সুখ, সেই শান্তি, সেই পলকে আজ শয়তান এসে ছিনিয়ে নেবে মায়ের কাছ থেকে, আর তিনি সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে, যেন একটা আঁধার কুয়োর তলায় বসে,—তাকে রক্ষা করতে কোন চেষ্টাই করবেন না!

(ক্রমশঃ)

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে

চৌদ্দ পোনেরো দিন পথে পথে কাটিল। আজকালের মধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছাইব এই অনুভূতিতে মনপ্রাণ খুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের পথ, একটু অসাবধান হইলেই সাইকেল উল্‌টাইয়া কোথায় যে পড়িব তাহার ঠিক নাই। এই পথে সকলে মিলিয়া সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছাড়িয়া কি করিয়া আসিলাম ভাবিলেও অবাক হইয়া যাই।

ঘোর অন্ধকার !

রাস্তার আলোগুলি জ্বালিবার একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—বৃথা। সোনাদার পর রাস্তা বিশেষ খাড়াই নয়, কিন্তু আরামের তো কথাই নাই, চলিতে চলিতে গাড়ীগুলিরও যেন ক্লান্তি আসিয়াছিল।

৬টা ৪৫ মিনিটের সময় ঘুমে পৌঁছাই। ষ্টেশনের নীচে প্রথম বেঁকে একটি চায়ের দোকান। নামিয়া কিছু রুটি ও চা সেখানে খাওয়া গেল। পাশের দোকান হইতে গাড়ীর আলোগুলিতে তেল ভরিয়া লইলাম। আলোর অভাবে পথে বড় কষ্ট পাইয়াছি। ঘুম হইতে দার্জ্জিলিং আরও নীচে, রাস্তা ঢালু, খাড়াই নয়। খাড়াইয়ে উঠিতে ভয় নাই, গাড়ী জোরে চলে না। কিন্তু উতরাইয়ের পথে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাড়ী জোরে নামিয়া চলে, নামিবার সময় অন্ধকারে সম্মুখে কি আছে না আছে দেখিতে পাওয়ার উপায় নাই।

ষ্টেশনের সীমানা পার হইতে না হইতে আলোগুলি নিবিয়া গেল। ঠাণ্ডার চাপে আলোগুলির তেল পর্য্যন্ত জমিয়া গিয়াছিল। টর্চ্চগুলি জ্বালাইবার চেষ্টা করিলাম। তাহাদেরও ব্যাটারি ফুরাইয়াছে।

সুতরাং নিরুপায়। অন্ধকারেই গাড়ী চালাইতে বাধ্য হইলাম। একে সন্ধ্যা, তাহার উপর আধার ঘুরাসা। সেদিন বুঝিয়াছিলাম, অন্ধকার কি ঘৃণ্যসিত। বহু কবি বহু রকমে অন্ধকারের স্তবগান করিয়া গিয়াছেন। কেহ তাঁহার সত্যকবি হইতে চাহিয়াছেন, কেহ বা অন্য কিছু। ইচ্ছা করিতেছিল, ঘুম হইতে দার্জ্জিলিংএর পথে তাঁহাদের যে কাহাকেও আলো না দিয়া একটি বাইসিক্ল সমেত ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে—কেমন করিয়া অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা আর বিপুল গভীর আশার কথা তাঁহাদের মনে পড়ে।

ঘুম ৭৪৮৪ ফিট উঁচুতে। এখান হইতে অনেকগুলি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। বহু পথের টার্মিনাস, জংসন ও যেন এই ঘুম। রেলপথের মত পাহাড়ের পথের যদি কোম্পানী থাকিত, তবে ঘুম তাহাদের হেড-কোয়ার্টার্স হইত। তাগদা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রায় দশ বারো মাইল। নেপালের প্রধান গঞ্জ কোড়োকরি পর্য্যন্ত আর একটি পাকা রাস্তা। পূর্ব্বে কালিম্পংএ এই পথে যাইতে হইত। দৈনন্দিন-যাতায়াতের জন্য কার্সিয়াং পর্য্যন্ত আর একটি পথ। কার্সিয়াংএর ডাউটিলের উপর হইয়া চিমনী বনের মধ্য দিয়া এই পথটি আসিয়াছে। দৈর্ঘ্য মাত্র উনিশ মাইল।

দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি পথ। এই পথ সিকলে পৌঁছাইয়াছে। সিকল সেপিলাম। সতোন বসু মহাশয়ের সিকলে সূর্যোদয় মনে পড়িল—

কোন্ ভোর আজ ভোরে এলে রঙচঙিয়ার জলে সিঁদুর দিয়ে
মেঘ ভাঙা পথ পড়বে ঐ মৈমনসিংয়ের পাল-পুকুর দিয়ে।

দোর্জে সেং দার্জিলিং।

…সত্যই সিকলের সূর্যোদয় অপূর্ব। দেখিয়া পৃথিবীর প্রথম প্রত্যুষের কথা মনে পড়ে। মুহূর্তে মনের মধ্যে আদিঋষিদের সামগান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

আসলে পর্বতের সৌন্দর্যের জাতই স্বতন্ত্র।

ইহার কোথায় যেন পৃথিবীর আদিমতম বাক্যটি লুকাইয়া আছে। সেই যুগ, যে যুগে মানুষ সভ্য হয় নাই, সেই যুগের কথা এই পর্বতের। আরণ্যক সভ্যতা তাহার পরবর্তী কালের। মানুষ অরণ্যে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে বহু পরে। তাহার প্রথম নিবাস এই পর্বতগুহা। তাই এই পর্বতগুহায় আজও তাহার মন পড়িয়া আছে। সভ্যতার উচ্চতম অভিলাষ এই পর্বতশৃঙ্গে বন্দী। অধ্যাত্ম-সাধনার পথও এই গুহার মধ্যেই।

পার্বত্য প্রকৃতিকে সভ্য মানুষ ভয় করে। আজও সীমান্তের জাতি ক্ষেপিয়া উঠিলে, আমরা সমতল ভূমির লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি। মনে হয়, এখনই তাহারা বুঝি কি উৎপাত বাধাইবে। কিন্তু তবু পর্বত বলিতে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। কত যুগ ধরিয়া কত বিপ্লবিরাগের অগ্ন্যুৎপাত-নির্ঘাতনে মানুষ বিপর্যস্ত—আজও মানুষ তবু পর্বতের সান্নিধ্য খুঁজিয়া মরে। তাহার কাছে সে যত দুর্যোধ্য, ততই সে প্রভার বস্তু।

পর্বত মানুষের প্রথম বাক্য ও শেষ কাব্য।

পর্বত হইতে উৎসারিত সহস্র ধারায় মানুষের সেই প্রথম বাকটি দেশে দেশে নদীমাতৃক সভ্যতা রচনা করিয়াছে—সেই সভ্যতার পরিপুষ্ট মানুষ আবার ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পর্বতের দিকে চাহিয়া এবং নিম্নে সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছে—'Two voices are there; one is of the Sea, one of the Mountains'… মানুষের শেষ কাব্য।

সিকলের কাছেই দার্জিলিংএর জলের কল। পাহাড়ের গা দিয়া ঝরঝর গলিয়া যে জল পড়ে তাহা ধরিয়া খিতাইবার জন্ত অনেকগুলি সুন্দর ছোট ছোট পুষ্করণী…এইগুলিকেই সিকল লেক বলা হয়।

ঘুমকে কুয়াশা চিরকালের জন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যদি কোনদিন ঘুমের আকাশ পরিষ্কার থাকে, সেদিন টিগাড্রি এখান হইতে দেখিবার মত।

কাঞ্চনজঙ্ঘা : দার্জিলিং হইতে।

ঘুম ছাড়িয়া নামিতে সুরু করিয়াছি। কিছুদূর আসিয়া সত্যভাব বিজলী আলো জ্বালাইল। গাড়ীগুলি থামাইয়া করিয়া পা টিপিয়া অগ্রসর হইলাম

দার্জিলিং বোটানিক্যাল গার্ডেন।

খানিক নামিয়াই বাতাসিয়া লুপ।

এখানে আসার সত্যভার সাজ। পাহাড়ের উপর প্রদীপের মত বিজলী আলোর সার।

এই দার্জিলিংএর সীমানা।

৭টা ৩০ মিনিটে আমরা দার্জিলিং পৌঁছাই।

দার্জিলিং কলিকাতা হইতে প্রায় ৪২৫ মাইল। কার্সিয়াংএর মত দার্জিলিংও আগে সিকিমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৯ সালে ইংরেজ প্রথমে দার্জিলিং আসে। সাত বৎসর পরে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৬০০০৲ টাকার খাজনা কবুল করিয়া ইংরেজ সরকার সিকিম-রাজের নিকট হইতে ইহার ইজারা লয়। ইহার কিছুদিন পরে কার্সিয়াংএর নীচের পাংখাবাড়ী রোড হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত হয়। এবং তাহার কিছুদিন পরে ১৮৫১ হইতে ইংরেজ সিকিমের রাজাকে আর বাৎসরিক খাজনা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

দার্জিলিং শ্রীমাবাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

দার্জিলিং আধুনিক সহর। বাস-ট্যাক্সি-লোকের ভীড় দেখিয়া কলিকাতার সহিত ইহার যোগসূত্র নিবিড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে শুধু আপাতদৃষ্টিতে। আসলে দার্জিলিং পর্বত-দুহিতা। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস ইহাদের সমগ্র ঐশ্বর্য্য আনিয়া দার্জিলিংকে মুড়াইয়া দিলেও পর্বত-দুহিতার আঁখির ইঙ্গিত দার্জিলিংএ সর্ব্বত্র। দার্জিলিংএর পথে পথে ঘুরিয়া এই কথাই মনে হয়, নোটের উপর মনুষ্য-সভ্যতা কি কুৎসিত রাংতার সাজই না স্বভাবের উপর পরাইবার চেষ্টা করিতেছে!

দার্জিলিংএর উচ্চতম অংশ জলাপাহাড়—ইংরেজ সেনা-নিবাস। জলাপাহাড় রোড ঘুম পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় উচ্চস্থান, অবজারভেটরি হিল। সেখানে একটি বৌদ্ধ-মন্দির ও গুহা আছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধদের একটি মঠ নীচে ভুটিয়া বস্তিতে আছে। এই গুহাটা নাকি সোজা তিব্বত গিয়াছে। গুহাদ্বারে এখনও পূজা হয়।

এই পাহাড়ের চারিদিকে মাল। একটু পূর্ব্বে বার্চ্চহিল। বার্চ্চহিল আর অবজারভেটরি হিলের মধ্যেই বাংলার লাটের প্রাসাদ। হিলের উপর দিকে কোম্পানীর

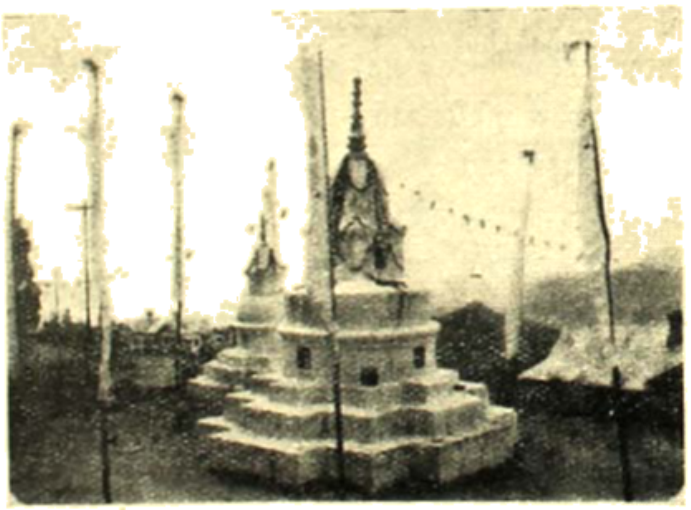

পাহাড়ীদের মন্দির।

বাগান, নীচে নূতন মিউজিয়াম। তদ্ভিন্ন শহর।

একদিক দিয়া রঙ্গীত রোড লেবংএ গিয়াছে। লেবং বৌদ্ধদের আড্ডা—একটি সেনানিবাসও আছে। শিলিগুড়ী হইতে কার্টরোড দার্জিলিং ছেড় করিয়া লেবংএ

পাওয়া যায়। বণিক্‌ত রোডেই ট্রেপ-আসাইড—চিত্তরঞ্জন সেখানে দেহত্যাগ করেন।

দার্জিলিংএর বিস্তৃত পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কেন না দার্জিলিং কলিকাতা ময়দানের মতই সুপরিচিত স্থান।

শুনিলাম, বিশ বছর আগে শহরের মধ্যেই দুই একটি প্রপাত ছিল, সেগুলি এখন মিউনিসিপালিটির কর্মদান হইয়াছে। আর তিন সংসর পরে 'ভিক্টোরিয়া প্রপাতে'র অবস্থা কি হইবে কে জানে! আজও সেখানে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের জল মেলে।

দার্জিলিং হইতে কিছু নীচুতে সিকাপুরে ইলেকট্রিক কারখানা ও জলের কলের চালান-ভূমি। বোটানিকাল, টাউন হল, স্যানিটেরিয়াম, বাজার, চাঁদমারী, টাইগার হিল, বাঙ্গালী-পাড়া, ফায়ার ব্রিগেড সবই দেখিলাম।

কিন্তু সকলের চাইতে ভাল করিয়া দেখিলাম হাসপাতাল। দার্জিলিং পৌঁছাইয়াই ক্যাপ্টেনের কলিক-পেন উঠিয়াছিল। তাঁহাকে সেই রাত্রেই হাসপাতালে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম, যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম তাহার ব্যবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মর্ফিয়া দিয়া ক্যাপ্টেনকে অজ্ঞান করিয়া রাখা হইল।

৩রা নবেম্বর এই অবস্থায় কাটিল। ৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৭ই, হাসপাতাল ডিউটি চলিল। ৮ই হইতে ক্যাপ্টেন সুস্থ হইলেন। ৯ই আমরা কার্সিয়াং নামিলাম।

আজ কলিকাতায় বসিয়া চোখের উপর দার্জিলিংএর সেই দিনগুলি ভাসিয়া উঠিতেছে। কাব্যের জন্মের হেতু শুনি, 'emotion recollected in tranquility'—ইচ্ছা করিতেছে, দুইচারি পংক্তি কবিতা লিখিতে। কিন্তু লিখিতে গেলেই কেবলি মনে পড়ে—

যে নিস্তব্ধ গিরিরাজ অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তারিল প্রান্তরে—

কিংবা—

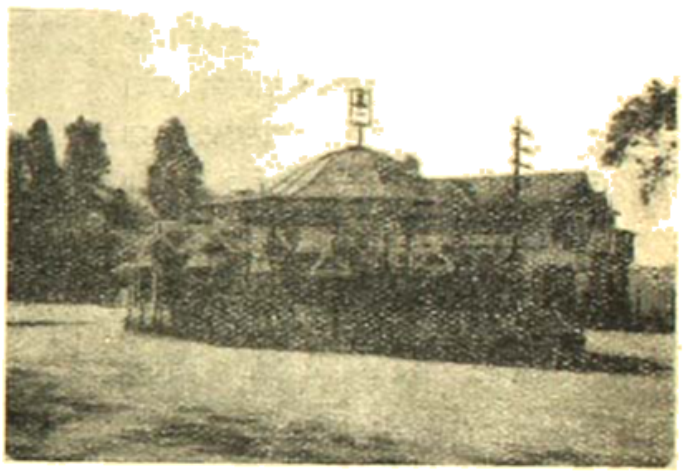

দার্জিলিং হ্যাল।

Yes it was the mountain echo,
Solitary, clear, profound,
Listen, ponder, hold them dear
For of God, of God they are.

সাইকেলে যেদিন কলিকাতা ছাড়িয়াছিলাম, সেদিন এই কথাটি এমন করিয়া বলিতে পারিতাম না, আজ বলিতে পারিতেছি। হয়ত সমস্ত পথের শেষের কথাটি ঐ। [শেষ]

আর এক দিক

ইংরেজী সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখক প্রথম জীবনে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পরে লেখনী ধরেন। কবি ভিক্টর হিউগোর বাল্যবন্ধু হাসপাতাল ও গ্রেট অর্মণ্ড ষ্ট্রীট শিশু-চিকিৎসা হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। এই সময় বসে তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। কীট্‌স ও থোমাসিনের ডাক্তারী বিদ্যার কথা সুপরিচিত। দান্তে ও কোলেরিজও কিছুদিন চিকিৎসাব্যবসায়ে যাপৃত ছিলেন। এডমাণ্ড বর্ক ও ফ্রান্সিস বেকনও কিছুদিন ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। কোনান ডয়েল তো বহুদিন ডাক্তারী করিয়াছিলেন। তাহার ফলে শার্লক হোম্‌সের সৃষ্টি হয়েছিল।—রম্য ও সওগাত ইইতে।

অন্তঃপুর

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

ভবিষ্যৎ যুগের নারী

পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ববিদরা বলিতেছেন, ভবিষ্যৎ যুগের নারী বর্ত্তমান কালের নারীর সন্তান হিসাবে এ যুগের নারীর সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার এবং দারিদ্র্যমোচন-প্রচেষ্টার ফল হইয়া জন্মাইবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ যুগের নারী একটি সমস্যার বিষয়।

এ দেশেও পাশ্চাত্যের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। এ দেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনের মূলে পাশ্চাত্যের ঢেউ। সুতরাং আমরা পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ববিদের অনুকরণে বলিতে পারি যে, এদেশের ভবিষ্যৎ নারীও একটি বিষম সমস্যার বিষয়।

সে সমস্যা কি?

প্রাচীন কালে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজের একটি স্বাভাবিক বিভাগ ছিল, অর্থনীতির ভাষায় যাহাকে বলা চলে ডিভিসন অব লেবার। এই বিভাগের ফলে সভ্যতার অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল। কিন্তু মুস্কিল বাধিল সেদিন জেম্‌স ওয়াট এঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন এবং হারগ্রীভস্ স্পিনিং-জেনির পত্তন করিলেন। সেইদিন হইতে গৃহলক্ষ্মীর কাজে বাধার সৃষ্টি হইল। সমগ্র সভ্য জগতে কাজকর্ম্মের ধারা বদলাইয়া গেল। সেদিন হইতে নারীরা আচার তৈয়ারি ছাড়িতে বাধ্য হইল, হাতে মোজা বোনা ছাড়িল, চরকা, জাঁতা সব বন্ধ হইল। ঘরের এই সব কাজ বাহিরের মিলে সুরু হইল।

নারী সেদিন বলিল, আমার সকল কাজ তোমরা পুরুষেরা কাড়িয়া লইলে, আমি এখন করিব কি? আমি চরকা কাটিতাম, কার্পেট বুনিতাম, গম ভাঙ্গিয়া ময়দা করিতাম, এখন এ সমস্ত কাজই তোমাদের কলে হইতেছে। আমি কি করি? এ প্রশ্ন দেশকালপাত্রের গণ্ডীর বাধা মানিল না। এ প্রশ্ন ঐতিহাসিক প্রশ্ন হইয়া উঠিল। ভারতের নারীও ঐ প্রশ্ন করিল।

পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ বলিতেছেন, ইহার ফলে নারীরা কিছুদিন পরেই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কারখানায় আসিয়া কাজ আরম্ভ করিল। কেহ আফিসে, কেহ দোকানে কাজ লইল। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যাহারা তাহারা বড়লোকের বাড়ীতে দাসী ও পাচিকাবৃত্তি করিতে লাগিল। যাহারা লেখাপড়া শিখিল, তাহারা ইস্কুলের মাষ্টার হইল, কেহ কেহ হাসপাতালে নার্সের কাজ লইল। ১৯২০ সনের আদমসুমারিতে আমেরিকায় দেখা গেল, প্রত্যেক পাঁচজন স্ত্রীলোকের একজন অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

বর্ত্তমানে এদেশের নারীদের এই অনুপাত লইলে ১৯২০ সনের আমেরিকার উদ্ধৃত হিসাবের কম হইবে হয়ত, কিন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর পরে, সে অনুপাত বাড়িয়া এমনই দাঁড়াইবে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু তবু নারীর চীৎকার থামিল না। সে আজও বলিল, আমার গৃহকার্য্য লইয়াছ, বাহিরে কাজ দাও। অবিলম্বে নারীরা ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার হইল। সাহিত্য ক্ষেত্রে আসার সময় হইতেই নারীরা লেখনী চালাইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দেখা গেল, ইংরেজী ভাষায় যাহারা উপন্যাস লেখে তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

কিছুদিনের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও নারীরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এবং যুদ্ধের পরে দেখা গেল, পোলাণ্ড, স্কটলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভেকিয়া, হাঙ্গারী, হলাণ্ড, বৃটিশ ভারতের কিয়দংশ, লুক্সেমবার্গ, উরুগুয়ে, আয়ার্লাণ্ড, ওয়েল্‌স্, কানাডা, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, রোডেসিয়া, আইসলাণ্ড, সুইডেন, কোষ্টারিকা—সর্ব্বত্র নারীদের ভোটাধিকার লাভ হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে এই সমান ভোটাধিকারের দাবী নারীর মনের একটি মাত্র বৃত্তির পরিচায়ক। এই বৃত্তির দ্বারা সে বলিতে চায়, নারী পুরুষের সঙ্গে জীবনের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সমান। বিগত যুদ্ধের সময় নারী পুরুষের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে কাজ করিয়া প্রমাণ করিয়াছিল যে, অর্থার্জ্জন-ক্ষেত্রে পুরুষের দাবী একক নয়। যুদ্ধের পর রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও সে-দাবী প্রমাণিত হইল।

স্থলে, প্রাচীন কালের নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগের গণ্ডী ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। ১৯০৫ হইতে ১৯১০ সনের মধ্যে জার্মানীতে নারীশ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল সমগ্রের এক-তৃতীয়াংশ। এ অবস্থা স্বাভাবিক নয়। এমন কাণ্ডও ঘটিল, অনেক স্থলে পুরুষ-শ্রমিক অপেক্ষা নারীরা সস্তায় কাজ করে বলিয়া, সেখানে পুরুষ তাড়াইয়া নারী-শ্রমিক লওয়া হইয়াছিল। আজ অবশ্য হিটলার জার্মানীর সে অবস্থা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সে চেষ্টার ফল ফলিতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং হিটলারের চেষ্টা লইয়া এখন কোন কথা উঠিতে পারে না। অনেকে বলিতেছেন, হাওয়া বদলাইয়াছে, হিটলার তাহা প্রমাণ করিলেন। কিন্তু একটি দেশের হাওয়া বদলাইলেই এমন ধরিয়া লওয়া যায় না, সমগ্র জগতের হাওয়া বদলাইল। বিশেষ করিয়া, ভারতবর্ষের এই প্রাথমিক নারী-প্রগতি আন্দোলনে হিটলারী কষ্টি-পাথর অবান্তর দ্রব্য।

আজ দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের নারী শিক্ষায় দীক্ষায়, আশায় প্রত্যাশায়, যুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপ কি আমেরিকার নারী হইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া জোর আয়োজন করিতেছে। সংখ্যায় এই কোমরবাঁধা দলে কজন, সে হিসাবের দরকার নাই—আমরা শুধু দেখিতেছি, এ দেশের নারী-আন্দোলনেরও পাশ্চাত্যের দিকে মুখ।

এখন প্রশ্ন এই যে, নারী তো চিরকালই খাটিয়া আসিতেছিল, আজ তবে তাহার খাটুনি লইয়া কথা উঠে কেন? উঠে এই জন্য যে, যে-যুগে নারী গৃহকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সে-যুগে অন্তঃপুর হইতে নারী বিচ্ছিন্ন হয় নাই। আজ দেখি, নারী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কিংবা দাঁড়াইতে চায়। প্রশ্ন তাই জটিল হইয়া দাঁড়ায়। গৃহে পুরুষ চিরকাল অনাবশ্যক সামগ্রী। গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী নারী। সে শুধু সন্তান জন্ম দেয় না, সন্তান লালন ও পালনের দায়িত্বও নারীর। গৃহের বাহিরে অর্থ-উপার্জ্জনে ছুটিতে হইলে নারীর সে-দায়িত্ব অবহেলিত হয়। গৃহের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ে। সমস্যা এই। কিন্তু কেবল গৃহপ্রাচীর নয়, বাহিরের কাজ করিতে অনভ্যস্ত-দেহ নারীর দেহও ভাঙিয়া পড়ে। সে-দেহে আর সন্তানজন্ম দানের সামর্থ্য থাকে না। তাই নারী অর্থ উপার্জ্জন করিতে বহির্জগতে আসিয়া দাঁড়াইলে, ভবিষ্যৎ যুগের দিকে চাহিয়া সমাজতত্ত্ববিদ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। সে নারীর দেহ ভাঙিয়া পড়িল, জননী হইবার দায়িত্ব তাহার যায়। আর সুসন্তান হইবার আশা থাকে না।

সমাজতত্ত্ববিদের সমস্যা এইখানে।

ভবিষ্যতের নারী তাই সমাজতত্ত্ববিদের চরম সমস্যা।

কয়েকজন নারী-বৈজ্ঞানিক

প্রায় দুইশত বৎসর হইল। জার্মানির হানোভেরিয়ান-প্রাঙ্গ রাজ্যের হানোভেরিয়ান-গার্ড রাজ্যের বারুদলের ওয়োদ্বিচের পুত্র ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেলকে রাজদরবারে একটি পদ গ্রহণ করেন। এই ওয়োদ্বিচের পুত্র উইলিয়াম হার্শেল। গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা। সার উইলিয়াম হার্শেল নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর

বয়স পর্য্যন্ত হার্শেল সৈন্যিক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কনসার্ট-ডিরেক্টরের জীবন যাপন করেন। এই কাজে ছোট বোন ক্যারলিন ছিলেন তাঁহার সহকারী। ক্যারলিনের জন্ম হয় ১৭৫০ সালের ১৬ই মার্চ্চ। ১৭৭২ সালে

বাথ সহরে উইলিয়মের সহিত আসিয়া তিনি কাজ সুরু করেন। উইলিয়মের ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্রের বাতিক। ফ্লামষ্টিডের 'আইনমি' পড়িয়া তিনি সৌরমণ্ডলী স্বচক্ষে দেখিবার জন্য উন্মাদের মত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু টেলিস্কোপ ক্রয়ের সঙ্গতি তাঁহার ছিলনা। বাড়ীতে টেলিস্কোপ তৈয়ারী করিতে তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ছুতার ডাকিয়া তক্তাগুলির ছিন্নিপত্র উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া তিনি এক রাশ বানাইয়া তুলিলেন। ক্যারলিন প্রথমটায় হাসিলেন, [illegible] হইয়া গিয়াছে। তখন

মারিয়া মিচেল। ১৮১৮-৮৯

তাঁহার নিজের ও উইলিয়মের দুই জনেরই সঙ্গীতক্ষেত্রে খ্যাতি হইয়াছে। উপার্জনও মন্দ হইতেছে না। এমন অবস্থায় হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া আকাশের তারা দেখিবার জন্য টেলিস্কোপ বানাইতে ব্যস্ত হইবার কথা নয়। কিন্তু দাদার কাজে বাধা না দিয়া, চিরকালের জন্য নারী যাহা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষেত্রে ক্যারলিনও নির্ব্বিবাদে তাহাই করিলেন। তিনি উইলিয়মের সকল মতে সায় দিয়া গেলেন। এবং একদিন যেমন ভায়ের কথায় কনসার্ট-পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন, আর একদিনও তেমনি ভায়ের পাশে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে চাহিয়া রাত কাটাইতে লাগিলেন। উইলিয়ম টেলিস্কোপে চাহিয়া বলিয়া আছেন। ক্যারলিন তাঁহার কথামত নোট টুকিতেছেন। ক্যারলিনের অক্লান্ত সাহায্য ব্যতীত উইলিয়ম যে অমূল্য গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভব হইত না।

শুধু উইলিয়মের সহকারী নয়, ক্যারলিন নিজেও গবেষণা করিয়া আটটি কমেট আবিষ্কার করেন। হ্যানোভারের রাজ-দুহিতা তাঁহার বান্ধবী ছিলেন। এবং অনেক বড় লোকই তাঁহার নিকট আসিতেন। ঐশ্বর্য্যের এত সান্নিধ্যে থাকিলেও ঐশ্বর্য্য কোন দিন তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে নাই। জীবনে তাঁহার একটি মাত্র ব্রত ছিল—ভায়ের সেবা। আজীবন তিনি তাহাই করিয়া গিয়াছেন। ভায়ের মৃত্যুর পর তিনি ২৪ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। শেষজীবনে জার্ম্মানির রয়াল আষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি ক্যারলিন হারশেলকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন।

ক্যারলিনের পর বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে-রমণী নাম লাভ করেন, তিনি আমেরিকান। এবং ক্যারলিনের মত তিনি ভায়ের হাত ধরিয়া বিজ্ঞানের রাজ্যে আসেন নাই। এ রাজ্যে তাঁহার যাত্রা একাকিনী আরম্ভ হয়। এবং শেষও হয় একাকিনী।

মারিয়া মিচেল

মাসাচুসেট্‌সের নান্‌টাকেট দ্বীপে এক কোয়েকার পরিবারে মারিয়া মিচেল জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বৎসরে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া মারিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অতঃপর নান্‌টাকেট এথেনিয়মে ২০ বৎসর কাল লাইব্রেরিয়ানের কাজ করেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে অবজারভেটরিতে তাঁহার সত্যকার কাজ সুরু হইত। ১৮৪৭ সনে তিনি একটি নূতন কমেট আবিষ্কার করিয়া ডেনমার্ক-রাজের মেডেল লাভ করেন। ১৮৫৯ হইতে আমেরিকার 'নটিকাল আলমানাক'এর গণনাকার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮৫৭-৫৮ সাল ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৬৫ সনে তাঁহার কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি সেই কলেজের আষ্ট্রনমির অধ্যাপক হন। ১৮৮৯ সনের ২৮শে জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৬৫ সনে তাঁহার কলেজ প্রতিষ্ঠার দিনেই মারিয়া

মিচেলের আষ্ট্রনমিক ক্লাসে একটি ছাত্রী ভর্ত্তি হন। ইনি মেরি হুইট্‌নে। ১৮৪৭ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর মাসাচুসেট্‌সের ওয়ালথাম

মেরি হুইট্‌নে

১৮৬৮ সনে ম্যাথমেটিক্স ও আষ্ট্রনমিতে

মেরি হুইট্‌নে (১৮১৭-১৯২০)

বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া মেরি হুইট্‌নে ভাসার কলেজ হইতে অনার্স গ্রাজুয়েট হন। তারপর কয়েক বৎসর বাড়ীতে কিছুকাল পড়াশোনা করিয়া কাটে। এ সময়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু মারিয়া মিচেলের খাতিরে এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে মেরি হুইট্‌নেকে হার্ভার্ডে বেঞ্জামিন পিয়ার্সের ক্লাস করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার পর কিছুকাল ডিয়ারবর্ণ অবজারভেটরিতে অধ্যাপক টাকের্ডের সহিত মেরি কাজ করেন। বরাবরই মন্ত্রগুরু, মারিয়া মিচেলের সহিত তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। ১৮৭৩-৭৬ সনে মেরি হুইট্‌নে জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। এবং কয়েক বৎসর পরে ১৮৮৮ সনে মারিয়া মিচেলের মৃত্যু হইলে মেরি হুইট্‌নে ভাসার কলেজে তাঁহার পদ লাভ করেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার সত্যকার গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়। সে কাজের হিসাব আষ্ট্রনমিকাল জার্ণালের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তিনি ভাসার কলেজকে ৫০০০ ডলার দান করিয়া যান। এই টাকায় সে কলেজে 'মেরি হুইট্‌নে রিসার্চ্চ ফলারশিপ ফাণ্ড' খোলা হইয়াছে।

মারিয়া মিচেলের পরপরই মেরি হুইট্‌নের এই আবির্ভাব। এবং মেরি হুইট্‌নের পরে পরেই এই ধারার শেষ নয়। মেরি হুইট্‌নেও তাঁহার অনুশিষ্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের জীবনের সাধনা দেখিয়া মনে হয়—এ একটা অব্যাহত ধারা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি নারী যে-দীপশিখা জ্বালাইয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে সেই শিখাই আর একটি নারী জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

মেরি হাগিন্‌স

ওদিকে হানোভারে-ক্যারলিন যে শিখা জ্বালাইয়াছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখি লণ্ডনে মেরি হাগিন্‌সের

মেরি হাগিন্‌স

সতর্ক তত্ত্বাবধানে সেই শিখা উজ্জ্বলতর হইতেছে। মারিয়া মিচেল ও মেরি হুইট্‌নের সাধনা পুরুষনিরপেক্ষ, নিজস্ব, স্বতন্ত্র। কিন্তু

ক্যারলিনের সাধনা পুরুষের মুখাপেক্ষী, নিভরশীল। মেরি হাগিন্সের সাধনাও এই তিনি তাঁহার সাধনায় স্বামী স্যর উইলিয়ম সাহায্যকারিণী। তার

মাদাম কুরি

উইলিয়মের স্পেক্ট্রোস্কোপি-চর্চ্চায় লেডী হাগিন্সের সহায় চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

মাদাম কুরির সাধনায় এই দুই বিভিন্ন শিখা এক হইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সাধনাকে পুরুষনির্ভর ও পুরুষনিরপেক্ষ দুই-ই বলা চলে। ১৮৬৭ সনের ৭ই নভেম্বর ওয়ারসতে মারির জন্ম। পিতার নাম স্কুডাউস্‌কি। স্কুডাউস্‌কি ওয়ারস কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। শিশু মারি ইঁহার ল্যাবরেটরিতে হামাগুড়ি দিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এবং একটু বড় হইয়াই মারি সমস্ত কেমিক্যালের নাম জানিয়া ফেলিলেন। কোন্ কেমিক্যালের কি কাজ তাহাও জানিতে বিলম্ব হইল না। প্রোফেসার স্কুডাইস্‌কির ছাত্রেরা মারির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইতেন। তাঁহারা মারির নামকরণ করিলেন, 'দি লিট্‌ল প্রোফেসার।' প্যারিসে পড়িতে আসিয়া মারির সঙ্গে পিয়েরি কুরির পরিচয়। পিয়েরি কুরি সর্ব্বনের ল্যাবরেটরিতে অধ্যাপনা করিতেন, মারি আসিলেন তাঁহার নিকট ছাত্রী হিসাবে। ইতিপূর্ব্বে পিয়েরি কুরি ছিলেন কাণা ব্যক্তি—দুই চারটি সামান্য গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি মারির স্বামী হইলেন, সেদিন তাঁহার জীবনে নূতন অরুণোদয় হইল। সামান্য বৈজ্ঞানিক হইলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

মারি ও পিয়েরির মিলন এই শতাব্দীর এবং বিজ্ঞানের সকলের চাইতে বড় রোম্যান্স। রেডিয়াম এই রোম্যান্সের সন্তান। অতি দরিদ্র দম্পতীর ঘরে পলোনিয়াম ও রেডিয়াম দুইজন আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিল। ১৯০৩ সনে পিয়েরি ও কুরি ফিজিক্সের নোবেল প্রাইজের কিয়দংশ পাইলেন।

১৯০৬ সনে পিয়েরির মৃত্যু হয়।

১৯২২ সনে মাদাম কুরি ফ্রেঞ্চ আকাডেমি অব মেডিসিনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনিই ফ্রেঞ্চ আকাডেমির প্রথম নারীসদস্য।

চিত্র-প্রদর্শনীতে মহিলার সফলতা

কলিকাতা মিউজিয়ামে গতদিনের দুইটি একাডেমী অব ফাইন আর্টসএর যে চিত্র-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে নারীর অঙ্কিত বহু চিত্র প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। ছাত্রীদের মধ্যে চিত্র-অঙ্কনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখান মিস্ মজুমদার "গুপারে কুয়ার মাটি" চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় ও বীণা আইচও পুরস্কার পাইয়াছেন। মিসেস নোরা রিচার্ডস প্রদর্শনীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। মিসেস ই. ও. থমিন ভাস্কর্য্যের জন্য রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুপমা ঘোষের অঙ্কিত "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের" তৈলচিত্র, শান্তি রায়ের "নৌকা" মিসেস বসুর "নিবীড় রাত্রি" দিবসী সরকারি লেখার "রাত্রি ও দরিদ্রী", বীণিমা ব্যানার্জ্জির "ভিক্ষুক", শান্তি ব্যানার্জ্জির "ভয় পুত্র" চিত্রগুলি উচ্চশ্রেণীর অঙ্কন-পদ্ধতির নিদর্শন।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ আমরা পাইয়াছি। আগামীতে 'মোচন' প্রকাশিত হইবে।]

Acharyya Ray Commemoration Volume—Board of Editors, Hirendranath Datta, Meghnad Saha, Jnanchandra Ghosh, Rajsekhar Bose, Charuchandra Bhattacharyya, Satyachuran Law, Satyendra Nath Sengupta. 50 Kailas Bose Street, Calcutta.

বিশ্বকোষ—২য় সংস্করণ। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও ২নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। ৩ সংখ্যা বাহির হইয়াছে, প্রতিসংখ্যা ৸০।

মুক্তিমন্ত্রে মুসলিম নারী—মোহাম্মদ মোদাব্বের, ১৪নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা, ৸০

কাদম্বরী—পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা, ১৲

যাগান—সচিত্র পত্রিকা—১৷৹, **A Homage to Lord Ganesh**—৷৹, **সপ্তস্বর**—কাব্য—১৷৹, **মুদীর দোকান**—২য় সংস্করণ—২৲—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ৩।১ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।

রিয়ালিষ্ট—১৲, **চিন্তয়সি**—১৷৹, শ্রীঋষিটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১নং রত্নময়ী ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

কবীরপন্থা—স্বামী ক্ষমানন্দ। শ্রীবিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১নং গার্ডেনার লেন, কলিকাতা।

শিশু-জগৎ—১ম খণ্ড। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত। ইউ রায় এণ্ড সন্স। ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, ১৲

গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীঋষাচরণ বিদ্যাভূষণ, ১২নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ২৲

বাংলা অক্ষরে বাংলা টীকা ও অর্থসম্বলিত অনেকগুলি গীতার সংস্করণ বাজারে আছে, তথাপিও এই সংস্করণখানি প্রকাশের সার্থকতা পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। শ্লোকগুলির ঠিক ঠিক পাঠোদ্ধার ও সঙ্কলন করিবার চেষ্টা তিনি এই গ্রন্থে করিয়াছেন তিনি স্বয়ং একজন যোগীপুরুষ। আগ্রহশীল ও যোগপিপাসু পাঠকের হস্তেও তাঁহার এই গ্রন্থ অতিরিক্ত সহায়তার পাঠ করিলে একটা সন্ধান পাইবেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভূমিকা ও উপক্রমণিকা (গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) পড়া যায়, তাঁহার বিচিত্র কর্মময় জীবনে যোগসাধনের জন্য কোনও অন্তরায়কেই তিনি অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এবং জীবনে তিনি সবকিছুর সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। ভূমিকার উপসংহারে তিনি স্বয়ং গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ব্যাখ্যা কোথাও কষ্টকল্পনার ভারে পীড়িত নয়। এই গীতার বহুল প্রচার সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

বিস্মৃতি, রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম—অনুবাদ-কাব্য। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। ৷৹ ও ৷৹।

'বিস্মৃতি' মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের স্বাধীন অনুবাদ এবং রুবাইয়াৎ ফিট্‌জেরাল্ডের ভাবানুবাদের অনুবাদ।

কালিদাস ও ওমর খৈয়ামের যতটা করিয়া যেরূপ গ্রন্থ বাঙালী কবিরা সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ করিতেছেন, তাহাতে গ্রন্থে বই দুখানি হাতে লইয়া ভয় পাইয়াছিলাম। এক্ষেত্রে 'যোগায় উপায় পাকের আঁচি' একটা কালের অনুবাদক লিখিয়াছেন—'সাধারণের তথা অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধ্য করাইবার জন্য' তাঁহার প্রয়াস। তাঁহার এই প্রয়াস সফল হইয়াছে, সেইখানেই এই অনুবাদ গ্রন্থটির সার্থকতা।

প্রাচীন আসামী হইতে—কবিতা। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৪।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা। ৸০।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী নবপ্রতিষ্ঠ কবি; তাঁহার 'সপ্তপদী' তাঁহাকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের দরবারে একটি নির্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'প্রাচীন আসামী হইতে' কাব্যখানি তাঁহাকে অধিকতর গৌরব দান করিল। বাঙালী পাঠক তাঁহার কাব্য আওড়াইয়া প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদন করিবে—সেদিন আসিতে বিলম্ব নাই।

কবির কৃতিত্ব ছন্দে নয়, ভাষায় নয়, বিষয়বস্তুতে নয়। তিনি মৃদু মিলাইয়া একটা সুরের সৃষ্টি করিতে পারেন, পাঠকের মনে একটা মোহ জাগাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই সার্থক কবি। 'প্রাচীন আসামী হইতে'

মনে সেই সুরের, সেই মোহের সঞ্চার করে। আমাদের নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার, সুখদুঃখের উর্দ্ধে এ মন্ত্রালোকে এসে একটি রাত্রে আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞাতসারে লইয়া যায়, যেখানে—

মিলিয়াছে তব অঙ্গে নিখিল পর্ব্বতী,
কেশ-বা-কেশর প্রান্তে তব মূর্ত্তি ভাবে।

যেখানে,— দুখেরা হয়ের মত স্থির মহিমায়
চির প্রশ্নচিহ্নের ; বিস্ময় পরব

যেখানে,— ঐশের দল অলৌকিক ডানা
নীরবে সঞ্চার করি' সন্ধ্যা সরোবরে
অন্ধকারে মিশে যায় শুধু অঙ্গে অঙ্গে
অরুণ বর্ণের ছাপ দিয়ে যায় হানা,
তারে নির্নিমিষ আঁখি লক্ষ্যহীন পথে,
পোহুলির ঘর-পড়া সারাক্ষ পলকে ॥

সে আসে আত্মিকে
মনিকা-মেহুল-পক্ষে জোনাকি লিপি লিখে,
অন্তরাতে উদ্ভাসাসে খিড়কি খুলিয়া
নীলাভ নীরব চাঁদে।
কনক বন্যা হয়, দুঃখ ভেসে যায়
ধরায় স্নিগ্ধ রেখা—
লিটোল বাসনা সব ও বক্ষ তোমার
প্রণয়ের চির-কেরী—
আমার লগ্ন তুমি মন্ত্রির আমার
অলোকসম্ভব তব সব ঐশ্বর্যলাভ—

সে-লোক প্রাচীন আসামে কিম্বা বলিতে পারি না, কালিদাসের প্রাচীন ইন্দ্রিয়ীর সহিত সে-লোকের খুবি মিল আছে।

মিছিল—উপন্যাস। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, দেব সাহিত্য কুটীর ১৲।

উপনায়ন—উপন্যাস। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, গুপ্ত ব্রেদার্স এণ্ড কোং কলিকাতা, ১৷৷০।

কবির পক্ষে ঔপন্যাসিক হওয়ার অনেক বিপদ আছে ; মানব-মনের যে অন্তঃপ্রতিবাতকে ঔপন্যাসিক একবার অন্যায়ে চালিয়া উপেক্ষা করিয়া যান, কবিকে তাহাকে চিরকালের করিয়া না আঁকিলে কবির তৃপ্তি হয় না। তাই দেখিতে পাই, পৃথিবীর যে সকল কবি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, উহার অন্যান্যকে অপেক্ষা 'পেজেন্ট' দিবার জন্য হয় তাঁহারা একটা সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের অথবা অন্ততঃ সুদূর পটভূমির উপর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, না হয়, মনের মতন সমাজে তুলনীয় কিম্বা একটি মানব-মনের আনুষঙ্গিক পরিচয় দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এই দুই ব্যাপারেই সাফল্যলাভ কঠিনতর, তাই পৃথিবীতে বড় কবি-ঔপন্যাসিকের সংখ্যা কম।

ঔপন্যাসিকের কাজ বড় কঠিন, উপন্যাসকারের জন্য নৃপতিরাজে সাধুবাদ লাভাই করিতে তাঁহার কাছে যা, মুখের সংসারে মুদ্রা আনিয়া হাজির দেয়, অকাজের জিনিষ বনাইয়া উঠে, শুধু moodকে, মুহূর্তকে সন্তান-কল্পনার মত লালনপালন করিলে তাঁহার চলে না। মানুষকে দুই পা দাঁড়াইয়া দেখিবার কথা, চলন্ত ট্রেণে রেখা ও রঙের ঝলক হানিয়া সে চলিয়া যায়; যাহার কথা শুনিতে প্রাণ ব্যাকুল সে মূক হইয়া থাকে ; যে সম্পূর্ণ অবান্তরক ইসারা-খেলার অছিলায় তাহাকে পাশে লইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয়, আশাভঙ্গটিতে মনে হয় এ সব নিষ্ফল। কিন্তু পরিণাম যখন ঘনাইয়া আসে তখন বুঝিতে পারি, নিয়তির মত কঠোর হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল, নেপোলিয়নকে বলপূর্ব করিয়া মেরিয়াসকে কেন লক্ষ করিলাম।

ঔপন্যাসিক হওয়ার পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিত্বের বাধা আছে, তিনি নৃপতে হইতে পারেন নাই। ঘটনা-সংস্থান তাঁহাকে পরিণতির দিকে লইয়া যায় নাই ; mood এবং মুহূর্তের খেয়ালের পরিণাম চিন্তা না করিয়া তিনি গল্পের জাল বুনিয়া গিয়াছেন। ফলে কোথাও তাঁহার উপন্যাসের মূলকথা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তিনি লাঁতার কাটেন নাই, ভাসিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাস দুইখানির ইহাই দোষ এবং ইহাই গুণ।

সুরুতেই তিনি শেষ হইতে সুরু করিয়াছেন, পরিণতিতে আসিবার জন্য উপায় পথে তাঁহাকে ধাওয়া করিতে হইয়াছে। বিষয়বস্তু ছোট, পটভূমি সঙ্কীর্ণ — ঘটনার পরপর নাই, উপন্যাসের জাদুঘোরার চাইতেও সূক্ষ্মকাজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, যাহারা খেয়ালের জালে না পড়িবে, তাহাদের ছাড়া সকলের পক্ষে উহা আকর্ষণীয় হইবে না ; উপন্যাস উপন্যাসিককে হয় তো অনাদরেই থাকিতে হইবে।

পৃথক হইলেও উপন্যাস দুইটির পিছনে লেখকের একই অনুভূতি কাজ করিয়াছে। মিছিলের রচনা ও উপনয়নের বিষয়কে চলাচল করা কঠিন। বলা হয়, বিশ্বের পরবর্তী ইতিহাস অনুষ্ঠানের ইতিহাস নয়, রচনার। সংসারের পথে ইহারা দুই জনেই অসহায়, পরপ্রত্যাশী. ছোট কাজ, হীন আচরণকে দুইজনেই ঘৃণা করে, কিন্তু উভয়কেই ছোট কাজে জড়াইয়া থাকিতে হয় এবং জীবনের গতির পরিচয়ে ইহাদের আশেপাশে থাকিয়াও ছোট কাজ যাহারা করে, তাহাদেরই মতকে বিজয়ধ্বনি করা ঘোষণা করিয়াও ইহাদের দিবা নাই।

তবু উপন্যাস দুইটি স্বতন্ত্র। মিছিলে সৈনিক 'বিরাট' আফিসের ছাপাখানা হইতে জেল, জেল হইতে মধুর বাড়ী, সেখান হইতে আবার জেল, কিন্তু, পোড়ান, পৌলইজী, ট্রেসবাস্টার, নব পাল এবং মধুর শ্বশুর-বাড়ী— চলচ্চিত্রের মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়াই যায় ; পল্লীর ডাকরা ঠকান অথবা বর্ষণমধ্যে কর্ত্তব্যরত তিনজনকে খাদি দিয়া চাকরী জোগাড়ের আহিনী রবীনের মত আমরাও সহজে হজম করিতে পারি। বুঝিতে পারি, পাঠকের দুই ঘণ্টা অবসর-বিনোদনের জন্য ইহার চাইতে বেশী আয়োজন লেখকের প্রয়োজন হয় নাই। কঠিন তত্ত্ব যে দুই একটা আছে, যথা গতি এবং ঘোল-পরিবর্তনের প্রতি কটাক্ষ, অথবা মনোভাবের সহিত পটভূমের সম্পর্ক, তাহাও গল্পতন্ত্রের কল্যাণে আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

উপন্যাসে পাত্র ফুলাইবার কথা লেখক একেবারেই মনে রাখেন নাই। নিজেকে দুই করাই তাঁহার বড় কাজ ছিল এবং এই কারণে অনাবশ্যক অধিকতর পুষ্ট হইয়াছে। হিং. টিং ছাটাল বাজে, দ্বাদিনী মেয়েটা মা, বহুরূপ গল্প এবং বাকী সবগুলি চরিত্রই নিজের নিজের কোণায় সম্পূর্ণ হইয়া স্বতন্ত্রভাবেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ভাষা এবং লিখনভঙ্গী সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। বর্তমানে বাংলা দেশে যে অল্প কয়জন উপন্যাসিক বাংলা লিখিতে পারেন, তিনি তাঁহাদের একজন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু আশা করি। সে সৃষ্টির পরিচয় পরিকল্পনা অবশ্যই লাভ করে, তাহার মধ্যে সেই সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এবং উপন্যাসে তাহার আভাসও আমরা পাইতেছি। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে একটু কঠোর, একটু সংযত হইতে হইবে, তবেই তাঁহার নিকট হইতে এমন তিনটি আমরা পাইব, যাহা কেবলমাত্র ভাল। ভালোর ভিড় জমানো বোধহয় কলম নয়, জীবন-সমুদ্রের তলদেশে যেখানে মাণিক-মুক্তার খনি।

শৃঙ্খল—শ্রীদরোজকুমার রায় চৌধুরী। প্রকাশক: রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৪।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

আকাশ ও মৃত্তিকা—শ্রীদরোজকুমার রায় চৌধুরী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বছর কয়েক পূর্বে দরোজবাবুর পুস্তক বঙ্গশ্রী যখন পড়ি, তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত নন, বোধ করি তৎপূর্বে তাঁহার দুই চারিটি গল্প সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি কেহ পড়িয়াছে, কেহ পড়ে নাই। বঙ্গশ্রী তাই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। বঙ্গশ্রী তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও, সে-বয়সে লেখকের বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল। উপন্যাস নয়, বঙ্গশ্রীকে বড় প্রেমের গল্প বলিব। তবু তাহার মধ্যে যেখানে যেন একটি উপন্যাসিক প্রচেষ্টার চিহ্ন ছিল। সেই উপন্যাসিককে কয়েক বছর পরে পুষ্পদল পাইলাম—যে-শক্তি বঙ্গশ্রীতে ভবিষ্যৎ আভাস ছিল, পুষ্পদলে তাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ১৩৩৯ সনে পুষ্পদল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে 'খেলাঘর' নামে ধারাবাহিক ভাবে ইহা উপাসনায় মুদ্রিত হয়। সেই ধারাবাহিক উপন্যাস যখন পড়ি, তখন মনে হইয়াছিল পুষ্পদল একটি প্রবন্ধ-সংকল্প, সমস্যামূলক উপন্যাস। সে-সমস্যা কয়েদী-জীবনের সমস্যা। বহু পুরাতন এই সমস্যার একটি নূতন রূপ পুষ্পদলে দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সাহায্যে সে-সমস্যা নিপুণ বিশ্লেষণে লেখক আমাদের সম্মুখে অঙ্কন করিয়াছিলেন। আজ পুস্তকাকারে পুষ্পদল পড়িয়া বুঝিতেছি, ইহাকে কেবল একটি মাত্র সমস্যার পটভূমিকাতে রচিত উপন্যাস বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। আসলে পুষ্পদলের সমস্যা ভিন্নতর। পুলিটিতে মানুষ জন্মায় আত্মঘাতী, তারপর কি করিয়া ধনঞ্জয়ঘাতে সেই আত্মঘাতের মূল ছিন্ন করিল, পুষ্পদলের নায়ক বিশ্বেশ্বর সেই শিশিরসুলভ আত্মঘাতী। জীবনে তাহার একবারই ছিল বিশ্বাস। সেই একবারকে লক্ষ করিয়া তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছিল। এমন সময় তাহার বিবাহ হইল। অমলা রোমান্টিক মেয়ে। জীবনে তাহারও আদর্শ ছিল। কিন্তু অমলার আদর্শ আর বিশ্বেশ্বরের আদর্শে সংঘর্ষ লাগিল—ট্রাজেডির বীজ উপ্ত হইল। 'উপন্যাস কোথায় যেন শুধু একটুকরা'। কিন্তু লেখিতে লেখিতে তাহাই কখন শিশিরসিক্ত আম্রের কলিকা ফেলে তাহার আর ইতিহাস নাই।'—পুষ্পদল সে-ইতিহাস পড়িলাম। অমলা আত্মহত্যা করিল। বিশ্বেশ্বরের জেল হইল। আত্মঘাতীর পারিপার্শ্বিক পরিবর্তিত হইল। একদিন সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, নিজকে অন্যের জন্য বিলোপে বিলাইয়া দিয়া মনুষ্যজীবনের কর্তব্য সাঙ্গ করিবে, সে-স্বপ্ন তাহার ভাঙিল। সে বধূ বসন্তকুমারীকে দেখিল, বি. বি. ঘোষকে চিনিল, বিলাতীর সহিত পরিচিত হইল। ধীরে ধীরে আত্মঘাতীর প্রবৃত্তিরা লক্ষ্যের অন্বেষণ হইল। আত্মঘাতীর পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে সংসার আসে। জেলে বিশ্বেশ্বরের মা আসেন তাহার লিখিত লেখা লইতে। বিশ্বেশ্বর মায়ের পানে চাহিয়া বলে,—তুমি যে বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছ মা। মা বলিয়া ওঠে। আত্মঘাতীর আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে। বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসে। সে ভাবে আমার অতীত জীবন শুধু স্বপ্ন। সত্য এই জেল, সত্য এই জেলের জীবন। পরের ধাপ বা আরম্ভবারী আসিয়া বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া চিহ্নিত হয়। আত্মঘাতী মুছিয়া যাইতেছে। কর্মা মুখরিত বন্ধু-জগৎ আত্মঘাতীর ছক লেখা করিয়া প্রাণকে নিষ্প্রয়োজনীয় ছক বলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়,—সেখানে স্থানের চিহ্নমাত্র নাই।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যতগুলি উপন্যাস বাহির হইয়াছে পুষ্পদল তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মাত্র প্রবন্ধের-কাহিনী হইলে এতখানি বলা চলিত না। পুষ্পদল সামাজিক সমস্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ইহা পাঠে মানুষের চিরন্তন হাসিকান্নার কথা মনে আসে। আর কেবলই মনে হয়, কি অসহায় জীব এই মানুষ।

আকাশ ও মৃত্তিকা লেখকের তৃতীয় পুস্তক। আরতী নামে ইহা প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ পুস্তকের নায়ক মুকুন্দ নাথ, আরতী। পৃথিবীতে সে অবতীর্ণ হইয়াছিল প্রেমহীন নারীর স্নেহ ও ঋণ লইয়া। কিন্তু জীবনভরে আরা কাজে লাগিল না, সে বাংলার অভিজাত ঘরের বাল-বিধবা। তাহা তাহাকে আভিজাত্যের মর্যাদা স্কন্ধে তুলিয়া দিল। স্নেহময় জননী সেই মর্যাদার যে-স্বরূপ, তাহাতেও তার হরিত হইল না। কিন্তু তাহার মানব প্রেমহীন মৃত্যু হইল না। কিনারা মিলিল সেইখানে। সেই বিরোধের ধাক্কা হইয়া আসিল ঐশ্বর্যতি এবং তিনকড়িবাবু। তিনকড়িবাবু কাহিনীকার, তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায়। ঐশ্বর্যতি ট্রাজেডি নায়িকার ট্রাজেডিকে ছাড়াইয়া গেল। তাহার পাপী আত্মাকালী যে বীজ বপিয়াছিল, সেই বীজ হইল উপন্যাসের বিশ্লেষণ—তাহার অন্ধকার-কালিমা মাটি আর চুন পুলিয়া বেড়াক, কলুষের

বাবু হরিহর ঘরে বসিয়া নীরবে গড়গড়া টানেন—আমাদের সন্ধানের পরে হয়। তাঁকে অবশ্যই বাড়ির ভাবনা ভাবিবার ভার তখন করিতে হয়। তবু কদাচিৎ তাঁর কুলেরকে দেখা অবশ্যই পরিবারে ভাল লাগে। বহুকিলোর বাবুর বাড়ির পরিবারে খুশী হই। তুলিয়ে পাই, লেখক হিসাবে দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, অন্যদিকে তাই তাঁহাকে জানাইতে দেখাইতে তাঁহার বেশ পাইতে হয় না। হেমকুল, কলমে—সকলে মিলিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অবস্থাকে দেখি অবনি সে-দুঃ হয় বিদ্যুটাইয়া। মনে হয়, ইহাকে আমরা জানি না। এ একটি আবাহনিক্ষুব্ধ। ছেলে-পড়াইতে যাই, পতি-বেচারার কথা স্মরণ করিলেও হাসি, নীলকুঠিতেও হাসি। হয়তো কেবলই খুব মিষ্টির আলাপ করিয়া। কাশী গেলেও সে ই আবাহনিক্ষুব্ধ। আমরা দেশের অবস্থাতেও তাহার বাহিবার উপায় নাই আমরা তাহাকে চিনি না, দেখিতে তাহার পরিচয় দিতে পারেন না।

আসলে পুথুলের সমতলভূমিতে সরোবরপুর যে পতি দেখিয়াছিলাম, আকাশ ও ধরিত্রীর চড়াই-উতরাইয়ে তাহাকে অবলম্ভ লাগিল। কিন্তু এই পুস্তকেরই সমতলভূমিতে সরোবরপুর তুলনা নাই। তবু চড়াইয়ে উঠিতে উঠিতে মনে হয়, এই বাঁকটি ঘুরিলেই এমন একটা দৃশ্য দেখিব, যাহা ভুলিবার নয়। আকাশ ও ধরিত্রীর সে দৃশ্য অবশ্যই বহিয়া গেল। কিন্তু প্রত্যাশা থাকিল, ভবিষ্যতে এ দৃশ্য সরোবরপুর দেখাইতে পারিবেন। সে সামর্থ্য তাঁহার আছে। পুথুলের উপকণ্ঠদেশের নিবিড় আম্রকাননে তাহা অনেক।

সম্পাদকীয়

বিহারের পুনর্গঠন

বিহারের পুনর্গঠন আজ ভারতবাসীর পক্ষে এক বৃহৎ সমস্যা। ধরিত্রী ভূমিকম্প হইয়াছে বিহার অঞ্চলে, কিন্তু আজ আমরা এইরূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যে, এই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আজ সমস্ত ভারতবর্ষের। বিহারের পুনর্গঠন কি প্রণালীতে পরিচালিত হইবে, তাহার জন্য দুইটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আজ চিন্তা করিতেছে—একটি হইল বেসরকারী, বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটী, অপরটি স্বয়ং ভারত সরকার। যাহাতে পুনর্গঠনের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত হয়, সেইজন্য বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৫৫জন প্রতিনিধিকে উক্ত কমিটীতে সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। সদস্যদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন মালবিয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি আছেন। মহাত্মা গান্ধী বিধ্বস্ত অঞ্চল সমস্ত নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করিতেছেন।

এই পরিদর্শনের ফলে আপাততঃ যে সমস্যাগুলি অচিরকালের মধ্যে সমাধান করিতে হইবে, তাহার মধ্যে—

(১) প্রথম হইল, বিনষ্ট কৃষি-জমিগুলির পুনরুদ্ধার। কৃষি-জমি গুলির অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে, সামনের আষাঢ় তাহাতে একেবারে অসম্ভব। কূপগুলি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় জলাভাব দেখা দিয়াছে। তাহার উপর যদি ফসল না হয়, তাহা হইলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল বলিয়া।

এই সমস্যা সমাধানের ষোল আনা দায়িত্ব সরকারের। সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, বিনষ্ট জমিগুলি সার্ভে করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সার্ভের রিপোর্ট পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত অঞ্চলের কৃষকদিগকে জমির পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষিঋণ এবং অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইবে। বিধ্বস্ত অঞ্চলের মাঝ-কিস্তীর ভূমি-রাজস্ব দিবার সময় ৭ই জুন পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানিয়া পাই না, ৭ই জুনের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্ব এবং সেস্ প্রভৃতি এক বৎসরের জন্য মকুব করিলেই সরকার বোধহয় সদ্ভবতা সুবিবেচনার অধিকতর পরিচয় দিতে পারিতেন।

(২) দ্বিতীয় হইল, গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ। সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গৃহহীনদের স্থায়ী ভাবে গৃহ-নির্মাণের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে এবং একান্ত অক্ষমদের জন্য বড়লাটের ফাণ্ড হইতে দান করা হইবে। শতকরা বার্ষিক সাড়ে চার টাকা হইতে সোয়া ছয় টাকা সুদে এবং দশ হইতে পনেরো

বৎসর পর্যন্ত মাসিক কিস্তিতে আসল টাকা পরিশোধের চুক্তিতে প্রত্যেক লোককে অনধিক ১৫শত টাকা ধার দেওয়া হইবে। মোট কত টাকা ধার দেওয়া হইবে, তাহা জানান হয় নাই। নেপাল গভর্ণমেণ্ট বিপন্ন প্রজাদিগকে ৪ বৎসরের জন্য বিনা সুদে ৫০ লক্ষ টাকা ধার দিবেন স্থির করিয়াছেন। বিনা সুদে না হউক, প্রস্তাবিত সুদের কম হারে টাকা ধার দেওয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। জাপানের ইতিহাস-খ্যাত টোকিও ভূমিকম্পের সময় প্রজার জন্য দেশের রাজা এবং রাজসরকার যে সাহায্য করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে একটি আইনের প্রস্তাব হইয়াছে যে ৩ কোটী পাউণ্ড মূল্যের কার্পাস বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হউক।

আমাদের ঘরের কাছে স্বাধীন নেপাল যে দৃষ্টান্ত দেখাইল, তাহা দেখিয়াও আমাদের এই পরাধীন দেশের বিপন্ন প্রজারা তাহাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অনুযোগ করিতে পারে, ইহা বিচিত্র নয়।

(৩) তৃতীয় হইল, বিহারের চিনির ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার। চিনির কলগুলি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য, গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের মধ্যে আখ-মাড়াই কল, বলদ প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। উৎপন্ন গুড় যাহাতে রপ্তানী হইতে পারে, তাহারও সুব্যবস্থা যাহাতে হয়, সরকার তাহা করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন।

যে-ভাবে বিহার কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ভারতের প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত পণ্যমান্য এবং দায়িত্বসম্পন্ন অধিকাংশ ব্যক্তিই সদস্যরূপে রহিয়াছেন। বিহারের পুনর্গঠন ব্যাপারে এই অনুষ্ঠান এবং সরকার পরস্পর মিলিত হইয়া এবং পরস্পর পরস্পরের পরামর্শ লইয়া কাজ করেন, ইহা আমাদের একান্ত কামনা।

পুনর্গঠনের আদর্শ

যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার ভগ্নস্তূপে বসিয়া বিলাপ করিলে কোন সুফল হয় না। সেই ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া, যাহা ধ্বংস হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা উন্নত কিছু গড়িয়া তোলাই পুনর্গঠনের আদর্শ। সেইখানেই জাতির এবং জাতির শাসক-বর্গের শক্তি পরীক্ষা। নৈসর্গিক উৎপাত মানুষের বহু ক্ষতি করে। মানুষ নিজের বুদ্ধি, সক্রিয়তা এবং বিবেচনার দ্বারা সেই সব উৎপাতের মধ্য হইতে নবতর সৃষ্টির পথ খুঁজিয়া লয়। নূতন করিয়া যখন তাহাকে গড়িয়া তুলিতেই হয়, তখন পুরাতনের ভুল সে সংশোধন করিয়া লয়। লণ্ডনের বিখ্যাত অগ্নিকাণ্ড পুরাতন অলি-গলি-ওয়ালা কুৎসিত লণ্ডনকে পুড়াইয়া দিল। যাহারা সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে নূতন শহর গড়িল, তাহারা নূতনতর আদর্শে এক শ্রেষ্ঠ নগরী গড়িয়া লইল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিহার পুনর্গঠন প্রস্তাবের অন্তরালে এই মহৎ সৃষ্টিকরী আদর্শবাদ পুরাপুরি মাত্রায় রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভগ্ন-নগরীর বদলে আমরা যে নূতন নগর গড়িয়া তুলিব, তাহারা যেন পুরাতন অস্বাস্থ্যকর নগরগুলি নব-সংস্করণ না হয়। দরিদ্র লোকদের বাসস্থান যেন আর নগরের জঘন্যতম বায়ু-আলোকহীন ভূখণ্ডের সামিল না হয়। জাতির নৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সব ভাঙ্গা জিনিষ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১৯৩৪ সালের নূতন আইন

বাঙ্গলা কাউন্সিলে অভিনব সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাস হইয়া গিয়াছে।

বিলের দুইটি ধারায় ভারতীয় অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক আইনের কোন কোন ধারার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের কোন কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী আইন সংশোধন বিলের যে যে ধারায় প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহা বাতিল করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়।

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে লোকাল গবর্ণমেণ্টের মতে যে সকল সংবাদ "বৈপ্লবিক দলে লোক জোগাড় করিবার

পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে" উহার প্রকাশ নিষেধ করিবার অধিকারও এই বিলে লোকাল গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

রাজনৈতিক সমিতিসমূহের সহিত যোগাযোগ করিতেছে এরূপ ২১ বৎসরের কম বয়স্ক যুবকদের আচরণ বা চলাফেরার উপর সংযোজক বিধান আরোপের অধিকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিলে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সংশোধিত ফৌজদারী আইনের আয়ুষ্কাল ৫ বৎসর সময় মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে।

নটশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মৃতি-রক্ষা আয়োজন

গত ১২ই মার্চ্চ শান্তিনিকেতন রঙ্গমঞ্চে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নটশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় পরলোকগত নট-শ্রেষ্ঠের স্মৃতি-রক্ষার আয়োজনের জন্য শহরের বিশিষ্ট লোকদের একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক কলা-বিদের সৃষ্টি তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহাকে তাঁহার পরবর্ত্তীগণের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখে—কবি বাঁচিয়া থাকেন তাঁহার কাব্যে; সঙ্গীত-স্রষ্টারা তাঁহার সঙ্গীতে; চিত্রকর তাঁহার চিত্রে; ভাস্কর তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তিতে। কিন্তু অভিনেতার দুর্ভাগ্য হইল যে, মানুষের রূপণ স্মৃতি ব্যতীত, নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার তাঁহার কোনও উপায় নাই। যে-কণ্ঠ সহস্র সহস্র লোককে আনন্দ দিয়াছে, উল্লসিত করিয়াছে, সে-কণ্ঠ যেদিন নীরব হইয়া গেল, সেইদিনই তাহার সকল প্রভাব চলিয়া গেল। নটের জীবনের এই চরম দুর্ভাগ্যের কথা উপলব্ধি করিয়াই গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়!" সেইজন্য যে নট-শিল্পী দুই যুগ ধরিয়া এই বাঙালী জাতিকে হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করা জাতির একান্ত কর্ত্তব্য।

জাতীয় রঙ্গালয়ের আদর্শ

উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সুরেন্দ্র-নাথের স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষ্যে আমাদের জাতীয় রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আদর্শের কথা উল্লেখ করেন, কামনা করি তাহা যেন শীঘ্রই সফল হয়। তিনি বলিয়াছেন, "কৈশোরে দানিবাবুর অভিনয় আমাকে বিস্ময়ভাবে অভিভূত করেছিল। যৌবনেও সে প্রভাব থেকে আমি ত্রাণ পাইনি এবং আজও তার কিছু কিছু আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে একত্র অভিনয়ের সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল এবং তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। রঙ্গমঞ্চকে যদি আমি নিজের ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করতে না পারি, তবে আমি নট নই। জাতির উন্নতি এবং লোক-শিক্ষার জন্যে যতগুলি উপায় আছে, তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে যেরূপ প্রচার হতে পারে অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। রুশদেশিক রাশিয়া তা বুঝতে পেরেছিল বলেই, যা কিছু পুরাতন তার উৎপাটনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে উৎপাটন করে নি। আমাদের দেশেও রঙ্গমঞ্চের দ্বারা দিয়ে প্রচার একান্ত আবশ্যক। আজ নানাদিক দিয়ে আমাদের অনেক অবনতি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের সুদিন আসবেই আসবে। সব জাতিরই একদিন না একদিন এসেছে। ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আসবেন, যিনি রঙ্গমঞ্চে নাটকের, নাট্যধারা এবং নাট্যশিল্পের ভাবধারাকে নতুন রূপ দেবেন এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে জগতের কাছে আদর্শ-স্থানীয় করে তুলবেন।"

আমরা এখানে শুধু এই টুকু বলিতে চাই, সেই-লোকটির আগমন-লগ্নকে অদূরবর্ত্তী দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে আনিতে পারেন তিনি—যিনি এই আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট জাতির এই দাবী।

কারাগারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে তিনি তিন জায়গায় রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল, মেদিনীপুরে সৈন্যদের অনাচার, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল, ভারতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

বিচারে তাঁহার দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচার এই কলিকাতা শহরেই হয়।

গতবার কারাগার হইতে তাঁহার কন্যাকে তিনি যে অমূল্য পত্রগুলি লিখিয়াছেন, তাহার শেষপত্রের শেষে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"শেষ হয়ে এলো কথা। এই চিঠিও হলো শেষ। শেষ চিঠি! কখনই না! এই রকম আরও অনেক চিঠি লিখব তোমাকে!"

যখন এলাহাবাদে পুলিসের লোক তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তোমরা আসবে বলেই আশায় ছিলাম!'

যাইবার সময় মহাত্মা গান্ধীকে একখানি টেলিগ্রাম করেন, 'বিশ্রামের জন্য আবার ফিরে চলাম। এবার ক'লকাতা। আমার প্রীতি এবং অন্তরের সমস্ত শুভ ইচ্ছা।'

তাঁহার কন্যা শুনাতে ছিলেন। সেখানে একটি টেলিগ্রাম করিলেন, 'কিছুদিনের জন্যে আমার আর একটা বাড়ী যে আছে, সেইখানে যাচ্ছি। আমার ভালবাসা আর শুভ-ইচ্ছা জেনো! চলুম!'

বিহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একটি টেলিগ্রাম করিলেন, "দুর্গতদের সেবা-কার্যে আপনাকে আর সহায়তা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনি এবং আপনার সহকর্মী-দের ব্রত সফল হোক। বিহার অগ্নি-পরীক্ষায় জয়যুক্ত হোক্। আমার অন্তরের প্রীতি।"

বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন

নয়া দিল্লীতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সমস্যাগুলির বেশ স্পষ্টভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং লর্ড উইলিংডন উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যে সমস্ত যুবক বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিক্ষার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের অন্নসংস্থান করিতে পারে না। ইহার অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হইতে পারে?"

এই বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ প্রশ্ন আমরা বরাবর আমাদের শাসক-বর্গের নিকটই করিয়া আসিয়াছি। অন্য কাহার নিকটই বা করিব? ইহার উত্তর আমরা এখনও পাই নাই।

তবে এইবার এই সম্মেলনীতে যেভাবে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত এবং গৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি সরকারের অর্থানুকূল্য পায় তাহা হইলে মনে হয়, দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলির,

(১) প্রথম, এই বেকার সমস্যা সমাধানের কার্যকরী উপায় হইল, স্কুলের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করা, এমন ভাবে এই পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে সেকেণ্ডারী এডুকেশন শেষ করিবার পর, অধিকাংশ ছাত্র কোন জীবিকা অর্জন করিতে পারে, অথবা বৃত্তিশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। অবশ্য, ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্য সুব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(২) এবং (৩) প্রয়োজনীয় প্রস্তাব দুইটি স্যর রমণ উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে "টেকনলজিক্যাল ট্রেনিং" অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ শিল্পে যাহাতে ছাত্ররা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় কারখানা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) আর একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনীতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সেকেণ্ডারী শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃ-ভাষাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রস্তাবগুলি বহুদিন হইতে দেশের বহুলোকে আলোচনা করিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। আসল ব্যাপার হইল, প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করা এবং তাহার জন্য সরকারের প্রভূত আগ্রহ এবং সহায়তা প্রয়োজন।

পরলোকে স্বামী শিবানন্দ

গত ৮ই ফাল্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দ পরলোক গমন করিয়াছেন। সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁহার নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। তাঁহার পিতা রামকানাই ঘোষাল মহাশয় রাণী রাসমণির উকিল ছিলেন, এবং সেই সূত্রেই তারকনাথের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। তারকনাথ যৌবনে কেশবচন্দ্রের উপদেশে ধর্ম-জীবনে আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন। তাহার পরে ইনি রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় আলমোড়ায় মঠ, কাশীর অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনের

সভাপতি হন। স্বামী বিবেকানন্দের অক্লান্ত চেষ্টা এবং সাধনার ফলে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বজায় রাখিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দেশে যে সকল মহৎ প্রতিষ্ঠানে মানুষই মুখ্য, কর্ম-ব্যবস্থা গৌণ, মানুষের অভাব ঘটিলে তাহাদের প্রাণ-শক্তিতে আঘাত লাগে, শিবানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রমে সেই দুর্যোগ ঘটিল। এখন যাঁহারা বর্তমান আছেন, প্রাণ দিয়া মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

ভারত-সরকারের বজেট

এবারকার ভারত-সরকারের বজেটের মূল তথ্য হইল, আনুমানিক আয় ১১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ব্যয় অপেক্ষা আয় যে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অধিক হইবে, তাহা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহার পাইবে।

বাঙ্গালা সরকারের বজেটে দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ২, ২১, ৭০, ০০০ টাকা ঘাটতি পড়িবে। বাঙ্গালার পক্ষে ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কারণ দেখান হইয়াছে, ব্যবসা মন্দা এবং সন্ত্রাসবাদের দরুণ অতিরিক্ত খরচ। শেষোক্ত ব্যাপারের জন্য ১৯৩৪-৩৫ সালে আনুমানিক ব্যয়, ৫২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বাঙ্গলার এই আর্থিক দুর্গতির আংশিক মোচনের জন্য ভারত-সরকারের বজেটে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পাটের উপর রপ্তানী-শুল্কের অর্দ্ধেক টাকা পাটপ্রসূ প্রদেশ সমূহকে দেওয়া হইবে। এই অর্দ্ধেক টাকার পরিমাণ হইবে ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে বাংলা পাইবে, ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

ভারত-সরকারের এই প্রস্তাবে আজ বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীরা এক প্রতিবাদ আন্দোলন করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বছর আগে বাংলা দেশ যখন স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ করিল, ব্যবসায়ী বোম্বাই সেদিন বাংলার দেশ-ভক্তির সুবিধা লইয়া তাহার টলমল বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিল। সেদিন বোম্বাই ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ে বিদেশী মিলের ছাপ দিয়া সেই মাল দেশী বলিয়া চালাইয়াছে। বাঙ্গালার কপালের শুল্কের জন্য কিন্তু বেশী খরচ পড়িল বলিয়া বোম্বাই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কপাস কিনিয়াছে। আজও প্রতি বৎসর কাপড়ের বাবদ ১২ হইতে ১৫ কোটী টাকা, বীমার বাবদ ২ কোটী টাকা বাঙ্গলা বোম্বাইকে দেয়। পাঞ্জাব হইতে গম, মাদ্রাজ হইতে নারিকেল, যুক্ত-প্রদেশ হইতে নানা শস্য রপ্তানী হয়। কিন্তু সে সকলের উপর রপ্তানী-শুল্ক আদায় করা হয় না। রপ্তানী-শুল্ক কেবল বাঙ্গলার পাটের উপর আদায় হয় এবং সে টাকা ভারত-সরকারই গ্রহণ করেন। এই টাকা পুরাপুরি বাংলা সরকারের প্রাপ্য এবং তাহা লইয়া বহুদিনই হইতেই আন্দোলন চলিতেছে।

পাট-শুল্কের অর্দ্ধাংশ বিভিন্ন প্রদেশকে দিয়া ভারত-সরকার এদেশে উৎপন্ন দেশলাইয়ের প্রতি গ্রোসে ২ টাকা ।০ আনা শুল্ক ধরিয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

এই বজেট এখনও ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হইতেছে। সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্তী সংখ্যায় করিব।

ভারত সরকারের বজেটে ট্যাক্স্ বৃদ্ধি

বজেটে নিম্নলিখিত ভাবে কোন কোন পণ্যদ্রব্যের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১।/০ আনা উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সিগারেটের উপর ধার্য্য শুল্কের মান হাজারকরা ১০৮/০ আনা; কিন্তু সিগারেটের শুল্ক হাজারকরা ১৫৲ টাকা হইতে ৮৷০ আনা পর্য্যন্ত। বর্ত্তমানে তামাকের উপর পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে এবং কোনও কোনও তামাকের উপর শুল্ক ১৷০ আনা। বজেটে নিম্নলিখিত রূপ শুল্ক ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

তামাক প্রতি পাউণ্ড ২।/০ আনা প্রেফারেন্সিয়েল শুল্ক ১৷৵০ আনা। সিগারেট হাজারকরা ৫৷৵০ আনা এবং তদুপরি মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা।

ব্রিটিশ ভারতে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর প্রতি গ্রোসে ২।০ আনা উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। এতদর্থে নূতন আইন প্রণীত হইবে এবং বিদেশী দিয়াশলাই ভারতবর্ষে আমদানীর বিরুদ্ধে নিয়ম প্রণীত হইবে। যে সকল কারণ

রাজ্য রিটিশ অধিকারের ন্যায় শুল্ক ধার্য্য করিতে অসম্মত হইবে, ঐ সকল রাজ্যের মালকেও বিদেশী মাল সাব্যস্ত করা হইবে।

বর্ত্তমানে পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটে আড়াই তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি যায়; বজেটে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আধ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের খাম এক আনায় যাইবে, কিন্তু আধ তোলার অধিক ওজন হইতে আড়াই তোলা পর্য্যন্ত পাঁচ পয়সাই দিতে হইবে। তৎপর প্রতি আড়াই তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা করিয়া দিতে হইবে। এন্‌ভেলাপের দাম পাঁচ পয়সা এক পাই ছিল, সেই এক পাই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাঁচ তোলা ওজন পর্য্যন্ত বুকপোষ্ট দুই পয়সায় যাইত, বজেটে স্থির হইয়াছে, তজ্জন্য তিন পয়সা লাগিবে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, লোকে বুক পোষ্টের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

বর্ত্তমানে ১২ শব্দ পর্য্যন্ত অর্ডিনারী টেলিগ্রামে ৸০ আনা লাগে এবং তৎপর প্রতি শব্দে অতিরিক্ত ৵০ আনা দিতে হয়; কিন্তু বজেটে প্রস্তাব হইয়াছে, অতঃপর ৮ শব্দ পর্য্যন্ত অর্ডিনারী টেলিগ্রামের জন্য নয় আনা দিতে হইবে। জরুরী টেলিগ্রামের মাশুল ইহার দ্বিগুণ হইবে।

বিচারবিভাগের নূতন কর্ত্তা

স্যর প্রভাসের মৃত্যুতে বাঙ্গলার শাসন-পরিষদে যে-পদ খালি হইয়াছিল, স্যর চারুচন্দ্র ঘোষকে সেই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। জেল-বিভাগ হোম-মেম্বার মিঃ রীডের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

পল্লীসংগঠনে বাঙ্গলা সরকার

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কৃষি এবং গ্রাম্য অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং কি ভাবে কৃষির এবং গ্রামবাসী-দের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন নিযুক্ত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার কৃষির উন্নতি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

পল্লীসংগঠন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন,

(১) বাঙ্গলার জলপথ আইন।

(২) আর্থিক বোর্ড গঠন।

(৩) জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন।

(৪) শিল্পসহায়ক আইন।

(৫) একজন ডেভেলপমেণ্ট-অফিসার নিয়োগ। এই কর্ম্মচারী পল্লীসংগঠন সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিভাগের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকিবেন এবং সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন।

বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত নদী, খাল বিল মজিয়া গিয়া বাঙ্গলা দেশকে ম্যালেরিয়ার আকর করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে কৃষির অবনতি ঘটাইয়াছে, সেই সমস্ত নদীনালার পুনরুদ্ধার করাই হইল জল-পথ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া আর্থিক বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

এই পাঁচটি ব্যবস্থাই দেশের প্রকৃত কল্যাণকর হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। আমাদের সন্দেহ শুধু, এই সব প্রস্তাব কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে। এমন অনেক সরকারী প্রস্তাবের উদাহরণ দেওয়া যায়, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। আশা করা যাক্, এই সমস্ত ব্যবস্থা অতিরকালের মধ্যে কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে।

তেন ত্যক্তেন

নিরঙ্কুশ লোভ ও অর্থগৃধ্নুতার ছবি নিয়ত চোখের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে আমরা যখন পীড়িত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এদেশে জীবনে যাঁহারা কোনও না কোনও দিকে সফল হইয়া যশস্বী হইয়াছেন, কাজে অকাজে সেই বড় হইয়া উঠার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া তাঁহারা যখন আমাদের অন্তরকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন, তখন পৃথিবীর এধারেই একজন যশস্বী মনীষীর ত্যাগের কথা শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইনের কথা বলিতেছি।

দি নিউইয়র্কার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আলভা জনষ্টন লিখিয়াছেন,

This easy yielding to pressure would lead another man to cheapen himself, but Einstein is saved by his esthetic sense and his unworldliness. He could not do anything sordid. He doesn't want anything; there is nothing about the man for temptation to work on. When he received the Nobel Prize in 1921, he gave it to charity. When a magazine offered him an amazing sum for an article, he rejected it contemptuously. "What?" he exclaimed. "Do they think I am a prize-fighter?" But he finally wrote the article after arguing the magazine into cutting the price in half. It is said that he declined his present post at the Institute for Advanced Study at Princeton on the ground that the salary was preposterously munificent, and was persuaded to accept only by the promise of an enormous pay cut.

Probably no man has been more plagued by offers of money for testimonials for tooth-paste, corn plasters and cigarettes. He brushed all this aside as 'corruption' and would have no compromise. Einstein regards money as something to give away; in 1927 he was aiding 50 families in Berlin.

এই 'Corruption' হইতে ভগবান পৃথিবীর সকল মনস্বীকে রক্ষা করুন।

রামমোহন রায়

বেশী দিন আগের কথা নয়, মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় একটির পর একটি রামমোহন বিষয়ক ব্রজেন্দ্র বাবুর গবেষণা-প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল। সে গুলিতে নিশ্চয়ই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় ছিল, না থাকিলে ব্রহ্মের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেগুলি পত্রস্থ করিতেন না। ছিল যে তাহার আরও প্রমাণ, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রশংসা করিতে দ্বিধা করেন নাই এবং ব্রাহ্ম সমাজের রামমোহন সম্পর্কিত দুই একটি ব্যাপারে তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল।

তাহার পর তিনি সীমা লঙ্ঘন করিলেন। প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ ছাড়িয়া তাঁহাকে বঙ্গশ্রী ও ক্যালকাটা রিভিউয়ের আশ্রয় লইতে হইল।

এখানেই ব্যাপারটা চুকিল না, আমরা যাঁহার নিকট হইতে প্রিয় বস্তু পাই, তাঁহার নিকট হইতে অপ্রিয় কিছু পাইলে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার সন্দেহও করিতে পারি। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ব্রজেন্দ্রবাবু হঠাৎ অসত্যের পূজারী বলিয়া গালি খাইতে লাগিলেন। তাঁহার মতলব খারাপ হইল, ডকুমেণ্ট জাল হইল।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফাল্গুনের বিবিধ প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্র বাবুর গবেষণাকে ছোট করিতে গিয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। বুঝিতেছি সত্যনিষ্ঠা অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

সমালোচনার সময় অসময় আছে, একথা আমরা মানি এবং মানি বলিয়াই বলিতেছি শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই রামমোহন সম্বন্ধে নূতন সত্য কিছু প্রকাশ করা সঙ্গতই হইয়াছে। রামমোহনকে ঋষি বা ধর্ম্ম-প্রচারক কল্পনা করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা হইতে নিবৃত্ত হওয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর স্বধর্ম্ম নয়—তিনি রামমোহনকে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ জ্ঞান করেন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে সত্যকথার অবতারণা করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি জানেন, সত্যকার রামমোহনকে প্রচার করিলে তাঁহার প্রতি সম্মান দেখানই হইবে। রামমোহনের পূর্ণতা অপূর্ণতা দেখানর উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। রামমোহন যাহা ছিলেন—কয়দিনকার পরিশ্রমের ফলে তিনি তাঁহার লুপ্ত জীবনীর যে কয়েকটি কথা জানিতে পারিয়াছেন তাহাই নিবেদন করিয়াছেন। কোথা হইতে কি উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা লুকাইয়া রাখেন নাই, যে কেহ তাহা স্বয়ং মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

ভ্রম-সংশোধন

'বঙ্গশ্রী' মাঘ—১৩৪০ পত্রিকায় প্রকাশিত, 'চণ্ডীদাস ও বাশুলীদেবী' প্রবন্ধে নিম্নের ভুলগুলি ছিল।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০১ পৃষ্ঠা ২য় কলম	বাশুলীদেবী, বাদুর হইতে সংগৃহীত চিত্র	বাশুলীদেবী শীট, বাদুর হইতে সংগৃহীত চিত্র। (মহুলী মূর্ত্তি?)
১ম	ঊরুল পকল	ঊরুল-পকল
	বাসেশ্বরী	বাশীশ্বরী
	বাশীশ্বর	বাশীশ্বরী
	পাছাং	পাছং
১ম ,,	মুহাম্ব পদ্ধতিঃ	মুহাম্মদ-পদ্ধতিঃ
২য় ,,	বাশুলী (ঈষৎ স্পষ্ট-রূপে চিত্রিত)	(ঈষৎ স্পষ্টরূপে চিত্রিত) বাশুলী
২০০ ২য় ,,	মহুলীর মূর্ত্তি বাশীধরীও	মহুলীর শক্তি-মূর্ত্তি বাশীধরীও

২০৩ ২য় কলমে ৮ম ও ৯ম পংক্তিতে 'দেবদাসী' শব্দের পর, বা 'দেবদাসী' শব্দ যোজনা করিতে হইবে।

ইণ্ডিয়ান ফটোপ্লেটার্স কর্ত্তৃক ফোটোপ্লেটিয়াম লিমিটেড এবং পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৩ নং বৈঠকখানা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রণাম
শিল্পী—শ্রীঅমিনী রায়

রঙ্গশালা

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[বৈশাখ—১৩৭১

বিষয়	
গল্প ১-৮	
বর্তমান রাশিয়ার পত্র	
ভাষা ও ভাষি	
মুখোমুখী (কবিতা)	
চরিত্রাঙ্কনে একাডেমি অব	
ফাইন আর্ট (সচিত্র)	শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়
একটি দিন	শ্রীমণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বৃদ্ধ-কথা	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
মা (অনুবাদ-উপন্যাস)	মাক্সিম গোর্কি
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মা (উপন্যাস)	শ্রীপ্রবোধকুমার বসু
আমেরিকার নিগ্রোর সংগ্রাম (সচিত্র)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পাওড়ী-বৌ (গল্প)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের চরিত্রহীন	শ্রীসুকুমার সেন
চড়ুইপাখী (সচিত্র)	শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পে শিল্পে	শ্রীঅনাদিকুমার বসু
হায়-পদ্য (কবিতা)	"বনফুল"
বাঙ্গালার কথা	বিধিরঞ্জন রায়
মানুষগড়ার ছয় ও	শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র	শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টা
ছবিতে (	শ্রীঅমলেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘরোয়া	শ্রীমিনাক্ষীসুন্দর দত্ত
অন্তরঙ্গ (সচিত্র)	শ্রীবিশ্বনাথ
স্মরণে (সচিত্র)	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী
সুধীজন ও পত্রিকা পরিচয়	
সম্পাদকীয়	

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যার ৬৬৭ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২৬ লাইনে 'লক্ষিত' স্থানে 'সজ্জিত' হইবে।

উসের চা ভারতের গৌরব

ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ. উস এণ্ড সন্স

টি-মার্চেন্টস্—১১।১ হ্যারিসন রোড

:—২, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট ১৪৩।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট

৮।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পাষাণপুরীর পাথরের কেওয়ালের আড়ালে
দৈত্যের করলে বন্দিনী রাজকন্যা—
সে ছিল রূপকথার যুগ!
সভ্যতার ছাদের আড়ালে দেখি বন্দিনী নারী
চারদিকে লোহার কঠিন শিকল—বুকে বেদনার ভারী পাথর—
পুরুষের স্বার্থের ধূলো রঙীন ধরণী ছায়াচ্ছন্ন!
চোখে চোখ নাই, সে অন্ধ—অন্ধের বেদনা কে বোঝে?
দৃষ্টি হারা অন্ধের চেয়ে আরো মর্ম্মান্তিক বেদনা তাহার
মন যার বাধার ভারে পাথর হইয়া গিয়াছে—
আধুনিক সংসারের এই করুণ চিত্র দেখিবেন
—অদ্বিতীয় কথাশিল্পী—
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত
কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা
উপন্যাসে!
নারী-চিত্তের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনন্যসাধারণ শক্তি—
বাঙলার কথা-সাহিত্যে এ উপন্যাসের জোড়া নাই !!
কমলা পাবলিশিং হাউস
২০, কলেজ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

বিবাহে—
ফোন—কলিকাতা ৪৮১
প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন
আধুনিক জহরতের অলঙ্কার
গঠনশিল্পের চাতুর্য্য ও মিতব্যয়িতাই
—আমাদের বিশেষত্ব—
—ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড জুয়েলার—
বিনোদবিহারী দত্ত
মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস্
একমাত্র ঠিকানা—১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৪১

বঙ্গবাণী

৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

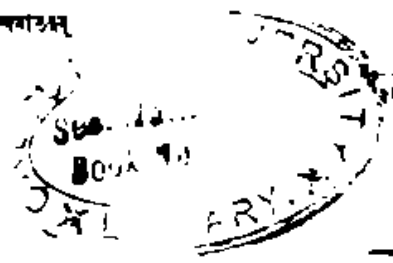

গদ্য ছন্দ *

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিষ নয়, বেদনার জিনিষ। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।

আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ, সে চলে, চালায়। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখন স্পন্দিত হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার সাধর্ম্ম্য ঘটে।

চলিত ভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে, রূপের দিকে, ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

উপনিষদে আছে আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম; ওঙ্কারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্চে বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়, এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র, অর্থাৎ সান্নিধ্য হয় সাযুজ্য হয় না। কিন্তু এমন সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। রসসাহিত্য মুখ্যত জ্ঞানের জিনিষ নয়, তা মর্ম্মের অধিগম্য। তাই সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন, কেননা ধ্বনি বেগবান। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা।

নিত্য ব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রস-প্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসঙ্কেতের নিয়মে। সমাজেই বলো ভাষাতেই বলো সাধারণ ব্যবহার-বিধির প্রয়োজন বাইরের দিকে, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতা নেই। আর একটা বিধি আছে যেটা আত্মিকতার বিধি। সমাজের দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক্।

জাপানে গিয়ে দেখা গেল জাপানী সমাজস্থিতি। সেই স্থিতি ব্যবস্থাবন্ধনে। সেখানে চোরকে ঠেকায় পুলিস, ঘুষোঘুষিকে দেয় সাজা, পরস্পরের চেনাপাওনা পরস্পরকে আইনের তাড়ায় মিটিয়ে দিতে হয়।

এই যেমন স্থিতির দিক, তেমনি গতির দিক আছে, সে চরিত্রে, যা চলে যা চালায়। এই গতি হচ্চে অন্তর থেকে উদ্গত সৃষ্টির গতি, এই গতিপ্রবাহে জাপানী মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে। জাপানী সেখানে ব্যক্তি, সর্ব্বদাই তার ব্যঞ্জনা চল্‌চে। সেখানে জাপানীর নিত্য-উদ্ভাবিত সচলসত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখতে পেলেম, স্বভাবতই জাপানী রূপকার। কেবল যে শিল্পে সে আপন সৌষম্যবোধ প্রকাশ করচে তা নয়, প্রকাশ করচে আপন ব্যবহারে। প্রতিদিনের আচরণকেও সে শিল্পসামগ্রী করে তুলেচে, সৌজন্যে তার শৈথিল্য নেই। আতিথেয়তায় তার দাক্ষিণ্য আছে, দক্ষতা আছে,—বিশেষভাবে আছে সুষমা। জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে গেলেম। মন্দিরসজ্জায় উপাসকদের আচরণে অনিন্দ্যনির্ম্মল শোভনতা, বহুনৈপুণ্যে নির্ম্মিত মন্দিরের ঘণ্টার গম্ভীর মধুর ধ্বনি মনকে আনন্দে আন্দোলিত করে।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত।

কোথাও সেখানে এমন কিছুই নেই যা মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে কদর্যতা বা অপারিপাট্যে অবমানিত করতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় পৌরুষের অভিমানে জাপানীর প্রাণপণ নির্ভীকতা। চারুতা ও বীর্যের সম্মিলনে এই যে তার আত্মপ্রকাশ, এতো ফৌজদারী দণ্ডবিধির সৃষ্টি নয়। অথচ জাপানীর ব্যক্তিস্বরূপ বন্ধনের সৃষ্টি, তার পরিপূর্ণতা সীমার মাঝারেই। নিয়ত প্রকাশমান চলমান এই তার প্রকৃতিকে শক্তিমান রূপবান করে যে আন্তরিক বন্ধন, যে সজীব সীমা তাকেই বলি ছন্দ। আইনের শাসনে সমাজস্থিতি, অন্তরের ছন্দে আত্মপ্রকাশ।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তবাসী মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
হেরিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

দেখা যাচ্ছে ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক্ :—

ভারতভূমিতে বিংশতি কোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত? কয়েকজনমাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে?

কথাগুলোর কোনো লোকসান হয় নি বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পার্সেন্ট মুনফাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে কথাগুলোকে অন্তরের দিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নি, তারি অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।

ছন্দের সঙ্গে অছন্দের তফাৎ ঐ; কথা একটাতে চলে, আরেকটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক শ্রীহীনতা ছন্দোহীন বাক্যে, অবোধজনের সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি গান কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিষ বলে অনুভব করিনে; মনে লাগে যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না, দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে-প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্ব-সৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দোবিভঙ্গিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের চৈতন্যে কেবলি এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি গান কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিবান আকৃতিবান করে তুলছে নানা প্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্যে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর, তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুসি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয় খুসি, এই খুসিটা বিচলিত চাঞ্চল্যের বিশেষ উদ্বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্পেচুয়ল মুভ্‌মেণ্ট। প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবিটা চারিদিকেই সঠিক করে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিদ্‌পেপাড়ি করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে ঘুঘুরার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর না মিলতেও পারে, মিলবে ছন্দ, যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে, হাঁ এইতো বটে, আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই।

কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" : কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই বাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছ ভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষার তেমনি একটা শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ সাজাই বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া—এইতো স্বয়ং দেখলুম। শিল্পীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হলেই ছবির নাড়ীর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা, বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে, স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল-স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাস-নৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ ক'রে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে ঘাঁট ক'রে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সম্মত পংক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শঙ্করাচার্যের নামে যে আনন্দলহরী কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত অথচ প্রাণবান গতিবান রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই :—

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণং।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী
পরীবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক্, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘন কবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।

আনন্দলহরীতে যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকৃষ্ণপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখায় সিন্দূররাগে তরুণ সূর্যকিরণ, এই অল্প কথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ অথচ কবিত্বরসের

আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

যে ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার ভঙ্গিতে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিতালচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইসারা রয়ে গেল।

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের নানাজা পড়ন হয় নেমন কলকারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি উৎপাদন সম্ভবপর হোলো তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে লকসঙ্কোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বলো, আর তাঁর ভাণ্ডারই বলো, প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী, অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কল; এক সঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসঙ্কোচে গদ্যের ভূরিভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাঙ্গীতিক গতিবেগের স্মৃতিকে রাখত সচল করে। সেদিন পদ্যছন্দের সঙ্গীন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অন্তর বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবছন্দের মুক্তি দাবী করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান গদ্য-আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে না, তাতে তালমান সুরের আভাস আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।

কদম্বী গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার ডালে ডালে ছুড়ি ছুড়ি সমান তালে পত্রবিন্যাস। কিন্তু বটগাছে সেই প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখা প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ডালপালাগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে দিয়েছে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপ। অথচ পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সে রকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানাবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে, তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, বলদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক ভাবরীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্যরূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তররূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর পালামৌ গ্রন্থে কোলনারীদের নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গী এসে পৌঁছেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রার বিভক্ত নয় কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই যে বিচিত্র মাত্রার ছন্দ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র পরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্ব্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীন কালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি পদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয় তাকে গতি দেবার জন্যে তা সমমাত্রার না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পংক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক একটি পংক্তি সম্পূর্ণ। সেই পংক্তিশেষে একটু করে বড়ো যতি। বলা বাহুল্য গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসঙ্গতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয় অর্থনির্বিচারে সেইখানে পংক্তি শেষ করে। পদ্য সব প্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পংক্তির বাইরে পদচারণা সুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় করে। তার কারণ পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব অনুপ্রাসে তাকে নানা মাপে গাঁটে গাঁটে ভাগ করা চলে, আর প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়, যথা—

ওহে পান্থ চলো পথে, পথে বন্ধু আছে,
একা বসে ম্লান মুখে সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ" এইখানে একটা থামবার ষ্টেশন মেলে। তারপর যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চলো" "ওহে পান্থ চলো পথে", "ওহে পান্থ চলো পথে পথে।" তারপর "বন্ধু আছে" এই তরাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়। যেমন "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা বসে", "বন্ধু আছে একা বসে সে যে।" কিন্তু তিন মাত্রার ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না। যেমন "নিশি দিল ডুব অরুণ সাগরে।" "নিশি দিল"র পরে থামা যায় বটে কিন্তু তাতে তিনমাত্রার ছন্দের স্বভাব নষ্ট হয়। "নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে তবেই তিনের ছন্দ একটা হাঁক ছাড়তে পারে। কিন্তু তার পরে "নিশি দিল ডুব অরুণ" বলে থামা চলে না। কেননা তিন এমন একটি মাত্রা বা আর একটা তিন পেলে তবেই দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে পড়তে চায়। এই জন্যে "অরুণ-সাগর" শব্দকে বিভক্ত করে তার মাঝখানে দাঁড়াতে গেলে রসনা কূল পায় না। তিন মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলানো। মেঘনাদবধ কাব্যের অবতারণাটি পদ্য করে দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটোবড়ো নানা ওজনের সুর বাজিয়েছেন, পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডা পেরিয়ে দৌড় করিয়েছেন। আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর ধ্বনিতে বাজল :—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু"—তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদ যেন চাকা-ভাঙা যুদ্ধরথের মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল, "চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।" তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি," তারপরে সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যে সূচনা সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জ্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্ঘোষিত হোলো :—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি।"

বলা বাহুল্য এক মাত্রা চলে না। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" যেই দুইয়ের সমাগম অমনি ছোটো চলা সুরু। থাম আছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে। জন্তুর পা, পাখীর পাখা, মাছের পাখনা দুই সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপরে যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের খেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত। আদিম-কালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার কোমর থেকে পদতল পর্য্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুৎ, কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখীও দুই পায়ে চলে, কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত। টলবার ভয় নেই তার। দুই মাত্রার অর্থাৎ জোড়মাত্রার যে পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে চলাও আছে, বেজোড় মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষমমাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে বেজোড় মাত্রার পদ্যপর্ব্বই একান্ত প্রবল। চেষ্টা করে দেখা যাক্ বেজোড় মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে—প্রথম পরীক্ষা হোক্ তিনমাত্রার মহলে।

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা ; বহিয়া তড়িৎ-চকিত

ব্যাকুল আকুতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য্য হারায়, পারেনা লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ : উদাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্ব্ব গগনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এর এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাস্তৈনৃত্যের নায়িকাদের মতো মনোলোভনে, ডাইনে বাঁয়ে ঝোঁকে ঝোঁকে হেলতে দুলতে।

এবার যে ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন দুই মাত্রার, গানের ভাষায় কাঁপতাল জাতীয়।

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের সুর
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সম্মুখেতে পান্থ মন
ক্লান্ত পদে গিয়েছে চলি
দিগন্তরে। বিরহ বেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দ বায়ে।
ছন্দে তারি সুপ্ত কুল
করিছে কত, চকিয়া
কাঁপিছে কাশ শুভ্র শিখা।

এ ছন্দ পাঁচ মাত্রার মাঝখানে ভাগ করে থামতে পারে না ; এর গতিস্থাপনার বৈচিত্র্যের জন্যেই স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক্ তিন চার মাত্রার ছন্দ।

নালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায়রে উদাসিনী
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণ সহচরী। অরুণ গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী ! শ্রাবণ বরিষণে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিশে দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া যামল রজনীতে
প্রভাত আলোকেরে করিলি, "নহে, নহে।"

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পংক্তিলক্ষণ চলে বটে কিন্তু তার এক একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমান মাপের, তাতে ছোট বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এই জন্যেই একমাত্র পয়ার ছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্যজাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে, এই সব পংক্তিলক্ষণ ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূল কথাটা এই যে কবিতার ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি তার প্রধান কারণ কবিতা এখন কেবল মাত্র শ্রাব্য নয় তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে। আজকালকার বাংলায় যে "কৃষি" শব্দের উদ্ভব হয়েছে খনার এই সমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের কৃষি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এই জন্যে ছন্দের পুঁটুলিতে ঐ বচনগুলো মাথায় ক'রে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পাল্কিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুরবাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধাছন্দের ময়ূর-পংখীটাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করবে না। পূর্ব্বেই বলেছি অমিত্রাক্ষরছন্দে সব প্রথমে পাল্কির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জ্জিত। তবুও পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে সুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিচ্ছেদ-রূপে গতির চিহ্ন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দরমহল, তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি কিন্তু আধুনিককালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার ক'রে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেয়ালগুলো বাদ দেওয়া সুরু হয়েছে। চোদ্দ অক্ষরের গতি-ভাঙা পয়ার একদিন মানসীর এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম নিষ্ফল প্রয়াস। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে

লাগল বলাকার পলাতকায়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এলো বটে, তবু মেয়ে কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও প্রকাশ পায় নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি :—

বরস জল ভমই ঘন গজ্জব
দিঅল পবন বন হরণ
কনঅ বিজরি নচই বিজুরি ফুল্লিয়া নীবা
পথর বিথর হিঅলা পিঅলা
ন আবেই।

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক্—

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জ্জন করে,
নিঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।—

বাঙালী পাঠকের কান এ'কে রীতিমতো ছন্দ বলে মান্‌তে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক্ এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে—সেটুকুও যদি কেড়ে নেওয়া যায় তা হলে কাব্যকেই কি কেড়ে নেওয়া হোলো? দেখা যাক্—

অবিরল ঝরচে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেচে,
সোনার বরণ ঝলক দিয়ে নেচে উঠচে বিদ্যুৎ, বজ্র
উঠচে গর্জ্জন করে।

নিঠুর আমার প্রিয়তম, ঘরে এলো না।

এ'কেও বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, এ'কে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেই জন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা "তেরছ চাহনি" রাখতে হয়েচে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলঙ্কারে তার প্রকাশ নয়। তাহার কক্ষেও অনতিবৃদ্ধিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চল্‌বেনা আপিসঘরের অনজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিস ঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জ্জিত, অন্তর ছন্দটা নিগূঢ় মর্ম্মগত, বাহ্য আধার নয়, অন্তরের ভাবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্‌ট হুইট্‌ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তর্জ্জমা করে দিই :—

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তালো ওক গাছ বেড়ে উঠচে :
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা
পড়চে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইতে
তার খুসি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে
আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য্য লাগল কেমন করে এ গাছ বাকি করচে খুসিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
শুটকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে :
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ঐ বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে
ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিত্রের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তালা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্ করচে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুসিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করচে
চিরজীবন ধোরে,
তবু আমার মনে হয় আমি তো পারতুম না॥—

একদিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়, আর এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করচে প্রিয়সঙ্গের জন্যে, এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন

মনোভাবের একটি ইসারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহীজনের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হোলো, এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য : এর মধ্যে ভাবসিদ্ধান্তের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন কবিতার তর্জমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই :—

স্বপ্ন দেখলুম যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায় ;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে,
ইচ্ছে হলো জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চারদিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে :
দড়ি নাই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হোলো।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনো,
কুকুরগুলো ছুটে আসে চুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুইচোখ বেয়ে, দৃষ্টি হলো অন্ধপ্রায়।
শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ীর লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সরু
ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাত দুপরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।
মনে পড়ল, যে ডাঙাটা দেখ্‌চি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারি মাটি তার, উঁচু উঁচু সব ঢিবি,
নীচে গভীর গর্ভে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি মৃত মানুষ কখনো কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল প'ড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।

এতে গদ্য ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দ-বিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ নেই তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা সুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যেপদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এককালের খাতিরে অন্য-কালকে অস্বীকার করা যায় না।

পায়ে-চলার পথ

পথ নিষ্টিষের কালো পর্দায় দিক তর্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাষা এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায় ?"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিক পর্যন্ত ইসারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত এত-দিন পুষ্পবৃষ্টির মত পড়েছিল আজ তার কি তোমাও নেই ?"

পথ কি বিশ্বের শেষকে জানে, যেখানে সমস্ত সুর চুপ আর সব গান পৌঁছল, যেখানে আলোর অনির্বাণ বেদনার মেজাজি-উৎসব হচ্ছে ?

—লিপিকা।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সঙ্কট

—শ্রীসুশীলকুমার দে

আপনাদের সম্মিলনে আমাকে সাহিত্য-শাখার সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার এই আহ্বান আমি শিরোধার্য্য করিয়াছি—সম্মান-লালসায় নহে, কর্ত্তব্য-বিবেচনায়। সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের, আমি এমন কিছু সেবা করি নাই, যে জন্য আমি আজিকার এই সভায় সমবেত সাহিত্য-রথীগণের সহিত সমান আসন বা উচ্চাসন দাবী করিতে পারি। কিন্তু আজীবন সাহিত্য লইয়াই কাটিয়াছে, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগের কিয়দংশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে; নিজের জ্ঞান, রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী কিঞ্চিৎ চর্চ্চাও করিয়া থাকি। তাহা দ্বারা এ সাহিত্যের কোনও উপকার করিতে না পারিলেও, ইহার আদর্শ ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, তাহা এইরূপ একটি সাহিত্য-অধিবেশনে বলিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। সুতরাং অযথা বিনয়ের আড়ম্বর করিয়া আপনারা আমাকে যে-সম্মান দিয়াছেন তাহার অবমাননা করিব না। সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করেন তাঁহারাই সাহিত্যিক নহেন; যাঁহারা সেই সাহিত্য উপভোগ করেন, যাঁহাদের প্রাণ ও মনকে সঞ্জীবিত করিতে পারিলেই সাহিত্যের সার্থকতা, যাঁহাদের লইয়া সাহিত্যের প্রয়োজন, এবং যাঁহাদের বাদ দিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি অলীক ও অসার, তাঁহারাও সাহিত্যিক। সেই সামাজিকবর্গের পক্ষ হইতেই আজ আমি দুচারিটি কথা বলিতে মনঃস্থির করিয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিকতম অবস্থা সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে; আমার বিশ্বাস যে, আপনাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি এ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত নহেন। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ত্রিশ বৎসরের উপর কাটিয়াছে; ইহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অপর সকল দেশের মত আমাদের দেশেও যুগান্তর ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশ একরূপ হইতে পারে না। সাহিত্যে জাতির ভাব-জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, এবং ভাব-জীবন যতই উন্নত ও বিশুদ্ধ হউক, তাহা বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেই। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজ যে বাস্তব সুখ ও অসুখের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার ফলে সেকালের ভাব-জীবনের যে-আদর্শ লইয়া আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহাকেই মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পূর্ব্বসূরির কবিগণ তাঁহাদের প্রতিভার অপূর্ব্ব আলোকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে এই বাস্তব-জীবন নানা সমস্যায় নানা দিকে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই বিক্ষোভ সাধারণ বিক্ষোভ নহে; এমন সকল শক্তি এমন ভাবে জাতীয় জীবনের উপর আঘাত করিতেছে যে, ইহাকে একটি ঐতিহাসিক যুগসন্ধি বা মহামন্বন্তরের কাল বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এমনই একটি যুগসন্ধি ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেটি ছিল মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফল। তথাপি সেই ধাক্কা সামলাইতে প্রায় এক শতাব্দী কাল লাগিয়াছিল। সকল আলোড়ন বিলোড়ন শান্ত হইবার পর, আমরা বাহিরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অন্তরে একটি আদর্শ স্থির করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম; তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর ভাব-জীবন এক অপূর্ব্ব রূপ-রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা যে বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতেছি, তাহা উত্তরোত্তর প্রবল ও গভীর হইয়া আমাদিগকে নানা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন করিয়াছে। কেবল রাষ্ট্রীয় সমস্যা নহে, সমাজের গভীরতম চেতনা ও ব্যক্তির অন্তরতম অনুভূতি আজ উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করিয়া, জাতীয় সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী আদর্শে সংশোধিত করিয়া আমরা সমাজে ও ব্যক্তি-জীবনে একটি দৃঢ়ভিত্তির আশ্বাস পাইয়াছিলাম, আজ সেই পাশ্চাত্য সভ্যতাও অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে। তাহার ফলে আমাদের আদর্শও আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না।

আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গত শতাব্দীতে যে-আদর্শ আমরা স্থির করিয়াছিলাম, তাহার মূলে গৌণভাবে পাশ্চাত্য আদর্শের উপর সীমাহীন নির্ভরতা ছিল। ইহাতে

বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্য আদর্শের মূলেও সুপ্রাচীন ও সুপরীক্ষিত মানবীয় ধর্মবোধের আরাধনা ছিল; এবং সেই আদর্শের উদারতা ও তাহার অন্তর্গত মানব-প্রেম, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের প্রাণমূলে নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। স্বধর্মের প্রত্যক্ষ সত্তা আমাদের স্বধর্মনিহিত, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন, সনাতন আদর্শটিকে উদ্ধার করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ সুবিধা সত্ত্বেও আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীন সত্তা-সাধনার শক্তি লাভ করিতে পারি নাই; যে তত্ত্বকে ভাব-কল্পনায় বরণ করিয়া, উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তাহাকে জীবনযাত্রায় ধারণ করি নাই। শক্তিমান বিজাতির আশ্রয়ে কেবল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবনযাপনের সুবিধা করিয়া লইয়াছি। জাতীয় গৌরব অথবা স্বধর্মের মহিমায় যতই উৎফুল্ল হই না কেন, পর-মুখাপেক্ষা, পরের প্রশংসা কখনও অনাবশ্যক হইয়া উঠে নাই। এই দুর্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমরা যে নূতন দেশাত্মবোধের সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলাম তাহাতে জাতির আত্মচৈতন্যের সাড়া ছিল না, জাতীয় সংস্কৃতি বা স্বধর্মের অনুপ্রাণনা তাহার কারণ নয়; তাহার মূলে ছিল বিজাতি-বিদ্বেষ। এবং শত্রুর অস্ত্রেই শত্রুকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় আমরা যে-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা বিজাতীয় রাজনীতি। কিন্তু তাহা গত শতাব্দীর সেই পাশ্চাত্য মানবীয় আদর্শ নয়, যাহার সহিত আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ও ধর্মগত আদর্শের একটি গূঢ়তর মিল ছিল। জীবন-সংগ্রামে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া, মুমূর্ষু অবস্থার শেষ উপায় হইল—সূচিকাভরণ। সনাতনের দেহে ও মনে আমরা সেই বিষ ভরিয়া লইলাম, যাহার নাম রাজনৈতিক স্বাজাতিকতার আদর্শ। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমরা ইহারই সাধনা করিতেছি; এবং বিদেশী আদর্শের এই সাধনাকে স্বদেশী আন্দোলন এই নাম দিয়া, নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে, শুধু রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়, সমাজে পরিবারে ও ব্যক্তি-জীবনেও, স্বধর্মের নামে বিধর্মের অন্ধ অনুসরণ করিতেছি।

যেদিন হইতে এই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমরা সত্যই স্বধর্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের সমগ্র মনোবৃত্তি বৈদেশিক আদর্শে আমূল পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। আহারে বিহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহারে, সাহিত্য ও কল্পনায়, যৌন-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসে আমরা যে আদর্শ বরিয়াছি, তাহার নাম দিয়াছি—জাতীয় মুক্তি-সংঘের আদর্শ। রাজনীতির অভিধানে ইহা একরূপ 'জাতীয়' বটে, কিন্তু এই আদর্শ আর যাহাই হউক, প্রকৃত অর্থে জাতীয় নহে। যুগ-সঙ্কটে আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, জাতিগত স্বধর্মকেই আশ্রয় করিয়া জাতির উপযোগী বিশিষ্ট মুক্তি-পন্থার সন্ধান না পাইয়া, আমরা এতদিন সর্বত্র, বাহ্যতঃ না হউক অন্তরে-অন্তরে, বিজাতীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীকেই কায়মনঃপ্রাণে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে এই কথাটি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিতে চাই।

এইবার আধুনিকতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। বর্তমান কালে রাষ্ট্রীয় মনোভাব ও তৎসংক্রান্ত আদর্শের উন্মাদনাই জাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু এ-যুগের সাহিত্য জাতির সাধনাক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। তথাপি সাহিত্যের নামে যাহা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা এক হিসাবে ভাবনা ও আশঙ্কার স্থল, এই জন্যই আমি এই তথাকথিত সাহিত্যের প্রতি সকল দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সাহিত্য আধুনিক নামে পরিচিত ও সেই পরিচয়-গর্বে গর্বিত; রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচন ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। ইহা সাহিত্য কি না, তাহার বিস্তৃত বিচার এক্ষণে করিব না, কিন্তু ইহা যে আধুনিক, এক অর্থে তাহা সত্য। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ভাবের ভাবুক এবং সে ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্ম উভয়বিধ সাধনাই করিতেছেন, তাঁহাদের ধর্মের নাম জাতীয়তা বা nationalism; কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে এযাবৎ দুইটি সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে। একটি অভিজাত 'কালচার'-পন্থী সম্প্রদায়, ইঁহাদের ইষ্টমন্ত্র—বিশ্বমানবতা; দ্বিতীয় 'বাস্তব'-বাদী ব্যাপক সম্প্রদায়েরও সাধন-মন্ত্র—আধুনিকতা। প্রথমোক্ত বিরাট 'বিশ্ব'-অনুশীলনকারী সম্প্রদায়কে মহাবাণী ও শেষোক্ত বস্তুহীন 'বস্তুতন্ত্রতা'র পরিপোষক সম্প্রদায়কে হীনবাণী বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, দেশ, জাতি বা সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নাকি উহাদেরই বর্জ্জনীয়। রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে বিজাতীয় আদর্শ জাতীয়তার ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের মুক্তাকাশতলে সেই ছদ্মনামের আত্ম-প্রসাদও আবশ্যক হয় না। 'বিশ্ব'-তান্ত্রিক যাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিলেও চলিবে। এই বিশ্বদ্বেষ বজ্রের বন্ধনমুক্ত কবিকুল সকলেই গণ্য ও মান্য বাকি; তাঁহাদের মন বিশ্ব-পরিক্রমণের উচ্চসুরে বাঁধা, সুতরাং আপনাদের নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহাদের যায় আসে না। আপনারা সকলেই এ আদর্শের কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। ছোট বাট্‌খারায় ইঁহাদের মাপা চলে না, সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র আলোচনায় ইঁহাদের নাগাল পাওয়া যাইবে না। তবে একটি কথা আপনাদের শুনাইয়া রাখিব, তাহা এই যে, এই বিশ্বমানবতার মূলে আছে পাশ্চাত্য আদর্শকেই বরণ করিয়া লইবার একটি অতি উদার মনোভঙ্গী। স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি যে বাঁধাতা, জাতিগত আদর্শের যে সঙ্কীর্ণতা, তাহা এই জ্ঞানমার্জ্জিত সূক্ষ্ম ভাবুকতার পীড়া-দায়ক। তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের পন্থাই এই বিশ্ব-মানবতার কল্পনা-বিলাসী আদর্শ। নিছক সাহিত্যের পক্ষে এই আদর্শ দুরূহ হইলেও হানিকর নহে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা ইহাকে হজম করিতে পারিলেও, সাধারণের পক্ষে ইহা একটি pose বা ভঙ্গীমাত্র হইয়া দাঁড়ায়; ফলে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। কারণ বিশ্বমানবতা যত উচ্চ ভাব হউক, তাহা মানবতাবর্জ্জিত হইতে পারে না। মানুষের গভীরতম অনুভূতি ও সত্যকার ভাব-প্রেরণা, যাহা হইতে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহা কখনও নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। জাতি ও দেশের বিশিষ্ট জীবনধর্ম্ম তাহাকে যে আকার, রূপ ও রঙ দেয়, তাহাতেই সাহিত্যের বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

আধুনিক সাহিত্যের এই প্রকৃতি এখনও উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠে নাই, কিন্তু সাধারণ ভাবে সাহিত্যের যে লক্ষণ একালে প্রকট হইতেছে, যে-আদর্শ বাঙ্গালার সাহিত্যকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই সর্ব্বজাতিবিহীন মনোবিলাসের মধ্যেও রহিয়াছে; এই মনোভাব সাক্ষাৎ সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে এখনও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাইলেও, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই, যাঁহারা নিজেদের চিত্তপ্রকর্ষের অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিশ্বমানবতার উদার আদর্শে আত্মহারা। এজন্য সাহিত্যে জাতীয়তার কোনও আদর্শ, এমন কি বাংলা ভাষার কোনও নিজস্ব বাণী-ভঙ্গীর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও এই বিশ্ব-পরিক্রমণকামীগণ স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, সাহিত্য-বিচারে তাঁহারা রসতত্ত্বেরও আমোল দেন না, সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কারণ বিশ্ব-সাহিত্যের বা বিশ্ব-চিন্তার নাকি কোনও ভৌগোলিক পর্দ্দা নাই, কোনও সংস্কারেরও বালাই নাই। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এইরূপ ধারণা যাঁহাদের, তাঁহাদের আর কোনও জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, সাহিত্যজ্ঞান কতখানি। ভাব, চিন্তা ও ভাষার আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করিয়া একাকার সাধন করিতে হইলে, জাতি, ধর্ম্ম ও দেশকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া অতি উদার মনোবৃত্তির নিরঙ্কুশ অনুশীলন করিতে হইলে, শিক্ষিত ব্যক্তিরও কিরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন; এবং ইহার ফলে নোঙরছেঁড়া সাহিত্যের যে কি অবস্থা হওয়া সম্ভব তাহা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দ্দশার অন্ত হওয়া যে ক্রমেই কত কঠিন হইয়া পড়িতেছে, তাহা এই সকল অতিশিক্ষিত ব্যক্তির মনোভাব হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

এইবার আধুনিকতা নামক যে নূতন তত্ত্ব, সাহিত্য-সাধনায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা বলিব। 'বিশ্ব' শব্দের একটি গুরুগম্ভীর ইংরাজী প্রতিশব্দ, cosmic humanism, সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবুকের লেখায় পাইয়াছি। এই ভাবের যাঁহারা সাধক, যাঁহাদের মহাবাণী সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা human কি না জানি না, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয়ই cosmic, তাঁহারা নির্ব্বিকল্প বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শে বিভোর। সুতরাং, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত জাতীয় সাহিত্যের সমতল ভূমিতে নামিয়া তেমন প্রকট বা উৎকট হইয়া উঠেন নাই; তাঁহারা ধ্যানী সাধক, মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু অপর হীনযানী সম্প্রদায় যাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন,

তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী এবং তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতি লোকায়ত। তাঁহাদের দেবতা ঠিক বিশ্ব-মানব নহে, ব্যক্তি-মানব। এই মানবতা একটি নির্দ্দিষ্টের উপাধি নয়, নিতান্ত নির্দ্দিষ্টের। এক হিসাবে ইঁহাদের আদর্শ বিশ্বজনীন বটে, কারণ তাহা আদিম দেহ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতিশয় প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেহের ক্ষুধাই এ দেবত্বের নিদান। ইঁহাদের ভগবান সর্ব্বদাই ক্ষুধা। এই দেহের ক্ষুধা যেমন আদিম পশুপ্রকৃতির লক্ষণ, তেমনি অতি প্রাচীনও বটে। আপনারা বলিতে পারেন, তবে ইহা আধুনিক হইল কেমন করিয়া? ইহা ত মানবীয় প্রগতির লক্ষণ নয়,বরং পশ্চাদ্গতির নিদর্শন। কথাটা ঠিক নয়, ইহা অতিশয় আধুনিকই বটে, কারণ এই নব-'মানবে'র দেহটা পশুর হইলেও মাথাটা মানুষের, এবং সে-মাথা অতি-আধুনিক মনোবৃত্তির আধার। ইঁহারা দেবত্বে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ইঁহারা ঠিক মানুষও নহেন: পুরাণবর্ণিত কিম্ভূত-কিমাকার কোনও জীবের অতি-আধুনিক প্রকাশ মাত্র।

আপনারা জানেন, এই নূতন তত্ত্ব পদ্ধতিতেও, স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ প্রভৃতি সংস্কার কুসংস্কার মাত্র। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় এ পর্য্যন্ত যে দুটি প্রধান ভাব কবি-মানসের উপজীব্য ছিল, যাহাকে মোটামুটি প্রেম ও সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে, সেই সাহিত্য-নীতিকেও অস্বীকার করিয়া বন্ধন-দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খলতাই এই আধুনিকতার আদর্শ। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা আর যাহাই হউক, সাহিত্যসৃষ্টি নয়; ভাষা ও ভাবকে লইয়া স্বেচ্ছাচারের উন্মাদনাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ। বহুকাল ধরিয়া ইতিহাসগত যুগপরম্পরায় মানুষ তাহার দেহ, মন ও প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনে যে নীতির প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা নিজেকে যতখানি গভীর করিয়া জানিতে পারিয়াছে, সেই সকল জ্ঞান ও সংস্কার আমূল উৎপাটিত করিয়া এই যে নূতন আদর্শহীনতার আদর্শ, সদ্যোজাত অবলোকিতেশ্বরের বিদ্রূপ দেহ-তত্ত্ব, তাহা মূলত মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অজস্র ধারায় প্রকাশিত পুস্তকে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, এই যে তথাকথিত সাহিত্য, ইহার কোনও রূপ নাই, ইহার কল্পনা সবল ও সুসঙ্গতি নহে, ইহার প্রকাশভঙ্গী অতিশয় শিথিল, ইহার ভাষার কোনও শুদ্ধি বা গঠন নাই। ইহার কারণ, এই সাহিত্যে জাতির জীবন-সত্য বা অন্তর্দৃষ্ট মানস-প্রকৃতির প্রেরণা নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনুকরণাত্মক, অতএব কৃত্রিম। ইহার মূলে আছে দেহ-মনের কল্পজ-প্রসূত উত্তেজনার আবেগ। দেখা যাইতেছে, এই আবেগ অতিশয় সংক্রামক, কারণ বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত ও অতিশিক্ষিত সকলেই ইহার আক্রমণ ভোগ করিতেছে। তাহা না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে এই প্রকার উপসর্গের কোন আলোচনাই করিতে হইত না। সমাজ-দেহের ও সাহিত্যের নানা বিকার নানারূপে সর্ব্বত্রই কিছু কিছু বিদ্যমান থাকে। স্বাস্থ্য ও ব্যাধি উভয়ই প্রকৃতির নিয়ম। ব্যাধিকে বড় করিয়া দেখা কখনই সঙ্গত নয়। কিন্তু আজ যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্যই অস্বাভাবিক এবং ব্যাধিই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ আমি পূর্ব্বে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি। আমাদের জীবনে য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্ক অপরিহার্য্য হওয়ায়, এবং বর্ত্তমানে জাতির সর্ব্ববিধ ভাব ও চিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব নানা কারণে আরও প্রবল হওয়ায়, য়ুরোপের মন্বন্তর সমস্যা আমাদিগকে কতক পরিমাণে বিচলিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা ভিতরে ভিতরে যে এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলাম, আমাদের ভাবধারা যে পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা এত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল, বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্কটে আমরা জাতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হইতে মোড় ফিরাইয়া ক্রমশঃ যে এত দূরে সরিয়া আসিতেছিলাম, তাহা এতকাল জানিতেও পারি নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আমরা তাহা সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিলাম—সাহিত্যের নামে প্রচারিত এই আত্মভ্রষ্টতার প্রকট লক্ষণে। এই যে সাহিত্য, ইহার প্রধান পরিচয়—ইহার কুলশীলহীনতা; এবং সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কোনও লক্ষণ ইহাতে নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে জাতির অধঃপতনের যে-চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে জাতির অতি-আধুনিক জীবনের confessions বলা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এক্ষণে যাহা লেখা হইতেছে, তাহাই নাকি এই অতি-আধুনিকতার আদর্শ। কিন্তু সে-দেশেরও আধুনিক রচনা, সর্ব্বদা সাহিত্যের দিক দিয়া না হইলেও অধিকাংশ স্থলে জীবনের দিক দিয়া সত্য; এবং এই কারণে

সে-দেশের শক্তিমান লেখকেরা এখনও কতকগুলি সত্যকার সমস্যাকে সাহিত্যের রূপে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। সেখানকার আদর্শ যেমন হউক, তাহা স্থানীয় বাস্তব-সমস্যা বা প্রকৃতিগত স্বধর্মের বিরোধী নহে; সেখানে সাহিত্যিক প্রেরণার অভাব হইলেও শক্তির অভাব এখনও একেবারে হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান কালে আমরা দেহে ও মনে নিরতিশয় শক্তিহীন হইয়াছি। কথায় বলে—শত্রুর তিন কূল যুক্ত। যুরোপে সর্বনাশের মধ্যেও মানুষের পৌরুষ বাঁচিয়া আছে, সেখানে যে আদর্শ-বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহাও স্বপ্রকৃতির বশে; আত্মবিলাসিতা অথবা দেহ মনে নিরতিশয় পঙ্গু হওয়ার জন্য নয়। বলবানের স্বেচ্ছাচারও অধর্ম নয়, কারণ, সে-বিষ হজম করিবার শক্তিও তাহার থাকে। আমাদের জীবন-ধর্মই ক্ষীণ হইয়াছে, স্বেচ্ছাচারের বল আমাদের বাহুতে বা বক্ষে নাই। দুর্বল মনোবিলাস ও বিকৃত কল্পনার যে-ধরণের স্বেচ্ছাচার সুসাধ্য, নিস্তেজ হৃদয়ের কাল্পনিক উত্তেজনায় যাত্রার আসরে নামিয়া বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহ করিবার যে কালাপাহাড়ী ঢঙ নিতান্ত অলীক ও অসার, এবং যে কাপুরুষোচিত প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয় কামে,—তাহাই দেখিতে পাই বর্ষার পঙ্কিল প্রবাহবৎ এক শ্রেণীর লিখিত বাক্যস্রোতে উত্তরোত্তর বেগবান হইতেছে। বর্তমান ক্ষীণপ্রাণ সমাজের এক সম্প্রদায়, যাঁহাদিগকে আমি মহাবাণী বলিয়াছি, তাঁহারা এই জীবন-ধর্মের নিতান্ত অভাবকে বিশ্ব-তান্ত্রিক ভাববিলাসে পূরণ করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহেন। ইঁহাদের এই ভাববিলাসের একটি কারণ, ইহা কেবল সুদূরের পিয়াসী, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ও নিরাপদ। অন্য কারণ বোধ হয় এই যে, ইঁহাদের আর যে-অভাবই থাক্, প্রকৃচন্দনবনিতার অভাব নাই, অন্নাভাব নাই। কিন্তু অপর সম্প্রদায়, যাঁহাদিগকে আমি হীনবাণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তাঁহারা অভাবগ্রস্ত। তাঁহাদের যে-ক্ষুধা জীবনে নিবৃত্তি করিবার উপায় ও সামর্থ্য নাই, তাঁহারা সেই ক্ষুধাকে একমাত্র বাস্তব সত্য ও পরম তত্ত্ব বলিয়া আধুনিকতার নামে এক অপরূপ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহারাও এই হিসাবে ভাববিলাসী, মিথ্যাচারী; কারণ ইঁহাদেরও কর্মেন্দ্রিয় দুর্বল, এবং ইঁহারা যাহা বাস্তব সত্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহা লেখনী-বিলাস মাত্র; অথবা যেখানে তাহা শিল্পোদ্যমের পরিচর্যানীতিতে পর্যবসিত, সেখানে তাহা জীবনের বাস্তব-ক্ষেত্রেই সাধনার বা ধ্যান-কল্পনার বস্তু নহে। পরিক্ষীণ শক্তি-হীন দেহে বিজাতীয় আদর্শের বিষ-বিসর্প যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই সকল তথাকথিত সাহিত্যিক যে কতদূর মিথ্যাচারী ও মিথ্যাভাষী হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝা যায়। সমাজে যাহা কখনও ঘটে নাই, তাহাকে ঘটাইবার জন্য ইঁহারা ব্যস্ত। যে-প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতি উপেক্ষা করিবার মত জ্ঞান বা বিদ্রোহশক্তি এখনও জাতির অন্তরে জন্মলাভ করে নাই, বিদেশী ভাব-কল্পনার আওতায় ও মাদকতা উপভোগের উত্তেজনায়, তাহাকে ইঁহারা সত্য বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাহাকে বর্তমান সমাজের বহুব্যাপ্ত বা প্রচ্ছন্ন মূক প্রবৃত্তির মুখর প্রকাশ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না, তাহাকেই লালসা-বিলাসিতার অবলম্বন করিয়া ইঁহারা যাহা রচনা করিতেছে তাহার মধ্যে সমগ্র জাতির প্রাণের সাড়া কোথায়? ইহা মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সত্তাকার অনুভূতিকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে-রচনার মধ্যে আন্তরিক প্রেরণা আছে, তাহার একটি গুণ এই যে, সেই প্রেরণা পাঠকের রসবোধকে জাগাইয়া তোলে, খর্ব বা আহত করে না। যদি লেখকের কল্পনা ও অনুভূতি পাঠকের রসপিপাসাকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া ক্ষুণ্ণ করে, তবে তাহার রচনা মিথ্যা। লেখকের প্রাণে সত্তাকার প্রেরণা জাগে নাই, তিনি শুধু পুঁথি-পড়া তত্ত্ব বা ধারকরা মতবাদকে আপনার বলিয়া চালাইতে উদ্যত, অথবা অতি সহজ পশুপ্রবৃত্তির নগ্নতাকে একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। যে realism গভীর অনুভূতিবিহীন জীবনে সত্য নয়, তাহাকে সত্য বলিয়া চালানো বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে সৃষ্টির আনন্দ নাই, অনা-সৃষ্টির অহঙ্কার আছে; কারণ স্বাধীনতা কথাটি ভাল, কিন্তু ইহা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর নহে। অবশ্য এসকল রচনা মুখ-রোচক হইতে পারে, তাহার কারণ, সাধারণ মানুষ, যতই শিক্ষিত হউক, উদ্ভট বা অসম্ভব কল্পনায় সুখ পায়; যাহা একান্তই মিথ্যা, তাহারও একটা আকর্ষণ আছে। অতএব এইরূপ লেখার প্রচার দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। শুধু উদ্ভট বলিয়া নহে, যাহা নিষিদ্ধ, তাহারও প্রতি মানুষের প্রবৃত্তিগত একটা লোভ আছে; এই সকল রচনায় সেই লোভেরও যথেষ্ট খাদ্য আছে।

এই সমস্ত ক্ষণজীবী রচনা যে সাহিত্য নয়, তাহার অন্য প্রমাণ এই যে, ইহার ভাষা বাঙ্গালীর সুস্থ সবল ভাষা নহে। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, আজকাল বাঙ্গালা ভাষার কি পরিমাণ দুর্দশা ঘটিতেছে। একথা আপনারা নিশ্চয় জানেন ও নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন যে, সাহিত্যের আদি ও শেষ আশ্রয়, ভাষা। আদর্শ যে যুগে যেমনই হউক, রীতি শ্লীল বা অশ্লীল হউক, ভাব ও চিন্তা যতই অভিনব হউক, তাহা যদি জাতির অন্তরস্থ হইয়া থাকে, তবে ভাষাই তাহার প্রমাণ। ভাব, চিন্তা, রীতি ও আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নূতনতর শক্তি লাভ করে। ইহার স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়া আরও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে; শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পায়, শব্দচয়ন ও গ্রন্থনরীতি নিপুণতর হইয়া উঠে; কিন্তু ভাষার দেহান্তর ঘটে না, তাহার স্বপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য লোপ পায় না। কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা আর বাঙ্গালা নহে। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী শব্দ, এমন কি ইংরাজী অক্ষরেও ইংরাজী বাক্য, বাঙ্গালা বাক্যে ইংরাজী শব্দপ্রয়োগজ্ঞতা, এবং তাহার সঙ্গে প্রাদেশিক শব্দের অনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা রসভঙ্গ প্রভৃতি ভাষা-বিকৃতির লক্ষণ ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জাতি কতখানি আত্মভ্রষ্ট হইলে তাহার ভাষা এইরূপ বিকৃত হইয়া উঠে, তাহা আপনাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এইরূপ বিকৃত হইবার অবশ্য একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, কিছুকাল ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্যের সাহিত্যিক সাধুরীতি বর্জ্জন করিবার একটা আন্দোলন জাগিয়াছে। এ আন্দোলনের সৃষ্টি ও সমর্থন করিয়াছেন সাহিত্য-মহারথীগণ। ইহার ফলে, একরূপ স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। কারণ, চলিত ভাষার নাকি মানও নাই, যে যাহা খুসী লিখিতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলের লোক যাহাদের মাতৃভাষা নয়, তাহারা এই সঙ্কটকে স্বেচ্ছাচারের সুযোগ করিয়া লইয়াছে। তার উপর, বাঙ্গালা বাক্যরীতি অপেক্ষা ইংরাজী ইহাদের অধিকতর পরিচিত ও অভ্যস্ত, সুতরাং আধুনিকতার অন্যান্য প্রবৃত্তির মত, বাঙ্গালা ভাষার অভিনব সংস্কারে ব্রতী হইয়া, ইহারা ইংরাজীকেই বাঙ্গালা অক্ষরে দেখিতে ভালবাসে। দ্বিতীয় কারণ, এই সকল লেখকের অধিকাংশই প্রাচীন সাহিত্যের বা ভাষার বহু সাধনালব্ধ প্রতিষ্ঠিত ধারা সম্বন্ধে কোনও খবরই রাখেন না, বা রাখিতে চাহেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারা বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া আত্মম্ভরিতা করিলেও, নিজেরা অজ্ঞাত-কুলশীল; পরম্পরাগত প্রাচীন সাহিত্যপ্রচেষ্টার সহিত ইঁহাদের কোনও যোগ নাই। জাতির আত্মচেতনার যে বৈশিষ্ট্য, তাহারই দৃঢ় ভিত্তিমূলে তাহার ভাষা প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা ভাষার সেই সনাতন স্বরূপটি ইঁহারা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আয়ত্ত করিবার কোনও সাধনা করেন নাই। বিংশ শতাব্দীটাই নাকি একমাত্র শতাব্দী। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে ভাষা ও সাহিত্য ছিল, ইহা তাঁহারা জানেন না এবং মানেন না, সংস্কৃতের কথা ত দূরে থাক। এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাইকেল-বঙ্কিমও ত ইঁহাদের মতে একেবারে সেকেলে ও আধুনিক সাহিত্য-দরবারে অগ্রাহ্য। কতকগুলি পচা নজীর ও মামুলী উদাহরণের দোহাই দিয়া ইঁহারা নাকি জীবনটাকে খর্ব্ব করিতে চাহেন না। কিন্তু যে ইংরাজী সাহিত্যের দোহাই ইঁহারা দিয়া থাকেন, সেই ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, যত বড় সাহিত্যিক বিদ্রোহ সেখানে হউক না কেন, তাহা কখনও অতীতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেখানে যে সাহিত্য-বিদ্রোহ ঘটে, সেই বিদ্রোহের অসমসাহসিক কালাপাহাড়েরাও প্রাচীন ইংরাজী কাব্য হজম করিয়াছিল। Keatsএর মত কবি Spenser, Shakespeare ও Miltonএর ভাষা ও ভঙ্গীকে কি ভাবে আয়ত্ত ও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, Popeএর প্রতি Byron-এর কিরূপ প্রচ্ছন্ন অনুরাগ ছিল, তাহা অবিদিত নাই। এইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-বিদ্রোহ ইংরাজীতে নব সৃষ্টির সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছিল। জাতির যে জীবন তাহার সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম-কাল হইতে বিকশিত হইয়া চিরন্তন বৈশিষ্ট্যে অমর হইয়া থাকে, ভাষা তাহারই মূলাধার। আজ আমরা দেখিতেছি, সেই ভাষা বুঝি আর বাঁচিতেছে না। আমাদের জাতীয় জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে। ভাষার ভঙ্গী হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আজিকার এই সাহিত্য জাতির অন্তর-প্রেরণা হইতে জন্মলাভ করে নাই; ইহা আসল নহে, নকল, ইহা পরোপজীবী, পরসঙ্গের উচ্ছিষ্ট কণিকের দ্বারা পুষ্ট। ইহা

কখনও সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না, ইহার রূপ নাই, ভাষা নাই।

এ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে আমি সাহিত্যের আদর্শ-বিচার বা সাহিত্য-সমালোচনার কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব উত্থাপন করি নাই; সে অভিপ্রায় আমি পূর্ব্বেই বর্জ্জন করিয়াছি। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আধুনিক সাহিত্য নামে যে সকল অপক্ক ও অকালপক্ক রচনা বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। এখানে সত্যকার আদর্শভেদের কথাই নাই, কারণ যাহা স্বেচ্ছাচার বা অনাচার, তাহা সত্য নয়, মিথ্যা। তাহা আদর্শ নহে, বিকৃতি। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যে প্রস্থানভেদ বা মার্গভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু অপমার্গে প্রস্থান করা বুদ্ধির নহে, অপবুদ্ধির লক্ষণ! তত্ত্ব বা তথ্য হিসাবে যৌন-তত্ত্বটা নূতন নহে, কিন্তু তত্ত্ব জিনিষটি সাহিত্য নয়, অথবা ক্ষুদ্র লালসার আক্ষেপ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এ কথা ভুলিলে চলিবে না; কারণ, এরূপ তত্ত্ব বা তথ্যের মধ্যে জীবনের প্রেরণা নাই, প্রপঞ্চ নাই, রূপ নাই, রস নাই। বর্ত্তমান যুগের যদি ইহাই কাম্য হয়, তবে আর যাহাই হউক, ইহা সাহিত্যের যুগ নহে; জাতীয় জীবনের এই বিপর্য্যয়ের যুগে সাহিত্যসৃষ্টি আশা করাই অন্যায়। তথাপি আমি যে এই তথাকথিত সাহিত্য লইয়া এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, ইহার সম্বন্ধে সজাগ ও সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহার আভাস মাত্র দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম, আজ তাহা জাতির রসবোধ বিচলিত না করিলেও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত রসিক, তাঁহাদের সংখ্যা যেমন সকল কালে অল্প, একালেও সেইরূপ; তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কোনও আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিই আমার নিবেদন আছে। দেশে আজ সাহিত্যের আশা নাই বলিয়া এই অপ-সাহিত্যের প্রতি উদাসীন থাকিলেই চলিবে না। জাতীয় জীবন-সঙ্কটে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত জাতির মনোজীবনের অধোগতি নিবারণের চেষ্টাও একান্ত প্রয়োজন। এ সাহিত্য সাহিত্য নয়, ইহার সম্বন্ধে কোনও চিন্তারই আবশ্যকতা নাই, এরূপ মনোভাব সঙ্গত নহে। শুধু যে রসিকের রস-পিপাসা এই প্রকার রচনা তৃপ্ত করে না, তাহা নয়, ইহা দুইটি মহা অপকারও সাধন করিতেছে। প্রথমতঃ, ইহা আমাদের ভাষার সর্ব্বনাশ করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, অতি দুর্ব্বল ও হীন মনোবিলাসের প্রশ্রয় দিয়া ইহা আমাদের পৌরুষ ও চরিত্রশক্তির হানি করিতেছে। আশা করি, সাহিত্য-উপলক্ষে চরিত্রশক্তির উল্লেখ করায় আপনাদের মধ্যে কোনও সাহিত্যরসিক আমাকে অতিশয় অরসিক ভাবিয়া মনে মনে অনুকম্পা বোধ করিবেন না। যাহা সত্যকার সাহিত্য তাহার সম্বন্ধে চরিত্রহানির কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু যাহা সাহিত্য নয়, কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা, কুকথার বিমূর্জ্জন মাত্র, তাহা মনুষ্যহৃদয়ের যে একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রসিকতা, তাহার পুষ্টি সাধন করে না, বরং নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া থাকে। এই জন্য আমি বর্ত্তমান সমস্যাকে সাহিত্য-সমস্যা মনে না করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য-হানির সমস্যা বলিয়া মনে করি।

কিন্তু বাধা অনেক। দেশে এক প্রকার শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এ যুগে শিক্ষিতসমাজে রসিকতা লোপ পাইতেছে; কেবল বিষয় বিশেষে বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যাইতেছে। একালে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য, যাঁহারা অতি উচ্চ উপাধিধারী নানাভাষাভিজ্ঞ এবং নানাবিধ মৌলিক গবেষণার জন্য প্রখ্যাতনামা হইয়াছেন, তাঁহাদেরও চিত্তপ্রকর্ষ এত অদ্ভুত যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বোধশক্তি নাই বলিলেই হয়। অথচ সে-সম্বন্ধে অভিমানের অবধি নাই। সাহিত্য বুঝি না বলিলে, তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু যে সম্বন্ধে কোনও ধারণা বা সংস্কার নাই, সে বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি, অবসর বা উপযুক্ততা নাই, সে বিষয়ে অতিশয় দায়িত্বহীন আপ্তবাক্য প্রচার করিতে তাঁহাদের মত পণ্ডিতদেরও বিবেকবুদ্ধি সঙ্কুচিত হয় না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে adventurer, amateur ও dilettante তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাহারই অভিনয় করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বে যে মহাযানী ও হীনযানী সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি, এই সকল পণ্ডিতগণ সেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থরূপে বিরাজ করেন। দুই পক্ষের কোনও পক্ষকে ইঁহারা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না, কিন্তু সাহিত্যিক স্বেচ্ছাচারকে ইঁহারা ঘৃণীয় মনে করেন না। আজ কাল সাহিত্যক্ষেত্র যে সকল সাহিত্যিক এরণ্ডের দ্বারা ছাইয়া গিয়াছে,

তাঁহাদিগকে এই সমস্ত স্বয়ংসিদ্ধ সাহিত্য-পাণ্ডারাই শিবের মাথায় বটবৃক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া, নিজেদের প্রতিপত্তি ও সরল সাধারণ পাঠকের প্রত্যাশিত ভক্তি অর্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ এরূপই থাকিয়া যাইবে, সাহিত্য-ক্রম বলিয়া পরিণামে গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহাদের গ্রাহ্য করিলে সাহিত্যেরই অবমাননা করা হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন, সেই সাহিত্যের পঠন ও পাঠন যাঁহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায়, বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের উদাসীন অজ্ঞতা সত্যই বিস্ময়কর। এক কালে এই ইংরাজী সাহিত্যে বুৎপন্ন ব্যক্তিরাই বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক ও রসগ্রাহী পাঠক উভয় পক্ষের সহায় ছিলেন। সাহিত্যের আদর্শ ও সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বুৎপত্তি ও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহাতেই পরোক্ষভাবে, এবং কখনও প্রত্যক্ষভাবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের রুচি ও রসের আদর্শ কতক পরিমাণে সংযত ও সংশোধিত হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একালের সেই সম্প্রদায়, ইংরাজী অথবা য়ুরোপীয় সাহিত্যসম্বন্ধে যতই বিশেষজ্ঞ হউন, সে-সাহিত্যের নব-নব রূপ, লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ে যতই ওয়াকিবহাল হউন, সাধারণ সাহিত্য-নীতি ও সাহিত্য-প্রীতি সম্বন্ধে তাঁহারা যতই উৎকৃষ্ট বচন ও সূক্ষ্ম চিন্তার আবৃত্তি করুন না কেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের রসাস্বাদে এবং তাহার সমালোচনাকালে তাঁহারা যে আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের রুচি ও রসবোধের সঙ্গে শিক্ষানবীশহীন অর্বাচীন ছোকরা সাহিত্যিকদের রসবোধের কোনও পার্থক্য নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে ইঁহাদের কোনও আপত্তি নাই, অথচ ইংরাজী রচনার ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের শুচিতাবোধ সর্বদা উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার কারণ ইহাই হইতে পারে যে, সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনও পরিষ্কার ধারণা বা সংস্কার নাই। অর্থাৎ, তাঁহারা সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন বিদ্বান হইবার জন্য, তাঁহাদের ধাতুতে রসিকতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-গুলিতে যে-ধরণের মেধা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন। বিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রণালীও তাঁহার অবগত আছেন; আর কিছুর প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করেন নাই। করিলে হয়ত, উচ্চ উপাধিলাভ আরও সুলভ হইত। কিন্তু ইংরাজীভাষা সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন এই জন্য যে, সে বিষয়ে তাঁহাদের অভ্যাসজনিত সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে সেই অভ্যাস সংস্কার নাই বলিয়া তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়েন। আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, লিখনে-পঠনে বাঙ্গালা বুলি অপেক্ষা ইংরাজী বুলি অধিকতর পরিচিত থাকায় বাঙ্গালা অক্ষরে বিদেশী বুলি তাঁহাদের বরং ভালই লাগে।

রসিক-সমাজের কথা বলিলাম; লেখকদের কথাও পূর্বে বলিয়াছি। এখন এই সাহিত্যের প্রচারক যাঁহারা, তাঁহাদের কথা কিছু বলিব। ব্যবসায়ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর প্রচারক আছেন—পত্রিকা-সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক। অধিকাংশ স্থলে ইঁহাদের কেহই সাহিত্যের ধার ধারেন না। পত্রিকা-সম্পাদক ও পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বা পরিচালক অনেকস্থলে একই ব্যক্তি, এবং সম্পাদনার জন্য বা তৎকার্যে সহায়তার জন্য পৃথক্ কোনও সুপণ্ডিত বা সুরসিক যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। সহকারী সম্পাদক নামে যাঁহারা সম্পাদকের বা পরিচালকের অধীনে চাকুরী করেন, তাঁহাদের প্রধান কাজ ছাপাখানার প্রুফ সংশোধন করা এবং কাগজখানিকে সময়ে ছাপাইয়া বাহির করা, হয়ত বা রচনা-সংগ্রহ করা। রচনা-নির্বাচন কার্যটি যন্ত্রচালিতবৎ নিষ্পন্ন হয়; সাধারণতঃ লেখা অপেক্ষা লেখকের নামটিই মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়, কাজেই ব্যাপারটি সোজা হইয়া পড়ে। পত্রিকাগুলিতে যেমন জুতা-সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল বিষয়ের সমাবেশ থাকে, তেমনই রচনার গুরুত্ব বা লঘুত্ব সম্বন্ধে কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শের পরিচয় প্রায়ই কোনও পত্রিকার সম্পাদনা-পদ্ধতিতে দেখা যায় না। অনেক পত্রিকাতেই গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়, কিন্তু এ পর্যন্ত যতই অল্প পত্রিকা দেখা গেল, যাহার সমালোচনার উপর নির্ভর করা যায়। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার রচনাগুলি যে ভাবে পর পর সন্নিবেশিত হয়, তাহাতেও কোনও শ্রী-ছাঁদ নাই—পৃষ্ঠাগুলি কোনও রূপে গদ্য-পদ্য, প্রবন্ধ ও সংবাদ, জীবজন্তু ও কলকব্জার ছবি, সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত, নারী ও পুরুষের স্কেটোগ্রাফ নির্বিশেষে পাইকা ও বর্জাইসে ঘরাট করিয়া

দিতে পারিলেই হইল। ইহার জন্য কতটা পাঠকবর্গের রুচি দায়ী এবং কতটা আধুনিক সম্পাদনারীতির নিরঙ্কুশ প্রণালী দায়ী, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

চিত্রকলার যে-নিদর্শনগুলি, বিবাহ-বাসরে উপহার-কবিতার মত, প্রতিসংখ্যায় থাকা চাই-ই, তাহার নির্বাচনে যে সৌন্দর্য-বোধ প্রকাশ পায়, তাহা আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই। কিছু বলিবার তো নাই, সম্পাদকের ও পাঠকের বিচার-শক্তি সমান। যদি ভাল না লাগে, এবং সেই ভাল-না-লাগার কারণ অতি সহজ হয়, তাহা হইলেও সম্পাদকের এক মহা সুবিধা এই যে, অভিজাতরুচি-সঙ্গত বলিয়া তাঁহারা যে-চিত্রপদ্ধতির সমর্থন করেন, তাহার রস বাকি এমনই গভীর ও গুহ্য যে, তাহা সাধারণের দুর্বোধ্য হইলেই মূল্য ও মর্যাদা আরও বাড়িয়া যায়। সম্পাদক যে কত বড় সমজদার তাহা অনুমান করিয়া তবে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু মজার কথা এই যে, যাহাদের জন্য চিত্রকলার এই অতি নিগূঢ় ও অত্যুন্নত আদর্শকে ধরা হইয়াছে, সেই পাঠকগণকে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যে-রস পরিবেশন করা হয়, তাহাতে অবাক হইতে হয়। অর্থাৎ, সাহিত্যের পক্ষে রুচি ও রসবোধের আদর্শ কিছুমাত্র উন্নত না হইলেও চলে, কিন্তু সেই শ্রেণীর রসিকদের জন্যই চিত্রকলার পরম গভীর ও গুহ্য রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল পত্রিকার আদর্শ-পরায়ণতা কিরূপ অদ্ভুত। চিত্রকলার অপর যে-আদর্শ অনেক পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতাই নাই; গল্পে-উপন্যাসে যে-ধরণের সুড়সুড়ি উদ্রেক করা আজকাল ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক ধরণের চিত্রও সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। বিষয়-বৈচিত্র্য যেমনই হউক, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সাহিত্য অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস-কবিতাই বাঙ্গালা পত্রিকার প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, সম্পাদকগণ যে-ভাবে চিত্র ও চিত্রকরের মাহাত্ম্য-ঘোষণা করিয়া থাকেন, অতিসহজ অপোগণ্ড চিত্রশিল্পীর এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলার ছবিশুদ্ধ পরিচয় নিজেরা যে-ভাবে প্রকাশিত করেন, সেই প্রকার সম্মান কোনও উদীয়মান বা প্রতিষ্ঠাবান্ কবি-সাহিত্যিকের ভাগ্যে ক্বচিৎ ঘটিয়া উঠে। আপনারা স্মরণ করিয়া দেখিবেন, এই সকল পত্রিকার মারফতে কত বিচিত্র ব্যক্তির সচিত্র পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন, কিন্তু কয়জন জীবিত সাহিত্যিকের সহিত এইরূপ পরিচয় আপনাদের ঘটিয়াছে? সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কেবল উহাই নহে; প্রত্যেক পত্রিকার মুখপাত্র হিসাবে সম্মানের আসন পাইয়া থাকে যে সকল রচনা, প্রায়ই দেখিবেন যে, তাহা রচনা-গৌরবের জন্য নহে; গদ্য বা পদ্য হউক, রচনা উৎকৃষ্ট বলিয়াই লেখককে সম্মান করিয়া সাহিত্যের আসর উহারা করেন না। অতিসাধারণ অপার্থ রচনাও কেবল লেখকের আভিজাত্যবলে বা নামের খাতিরে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া থাকে, ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। আবার অনেক সময় ইহাও দেখিবেন যে, কোনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনা বর্জাইস্ অক্ষরে লোকের কণ্ঠপাঠ্য রূপে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সোপালস অথবা কললীয় চাষ অথবা বেদান্ত দর্শনের অতি মামুলী বাক্যশ্রেণী পাইকা অক্ষরে সুন্দর করিয়া ছাপা হইয়াছে। সম্পাদক আজকাল সকলেই, আচার্যেরও অভাব নাই। অল্পকালস্থায়ী ডেঙ্গু-জ্বরের মত, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাতস্রক্ষ, অল্পমাত্র-কোষ্ঠভাত বালকও, ধার করিয়া হউক বা ভিক্ষা করিয়াই হউক, কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি অখাদ্য পত্রিকা মাস দুয়েক বাহির করিয়া সম্পাদকের সুলভ নাম অর্জন করিতে অগ্রসর হয়। যে-কয়খানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা আছে, সেগুলির কিরূপে সংস্কার হইতে পারে, তাহাতে কাহারও মনোযোগ নাই, নূতন পত্রিকা বাহির করিতে সকলেই উদ্যোগী। যদি সত্যই শক্তি থাকে, তবে তাহাকে দু'এক জায়গায় সঞ্চিত ও সংহত করিতে পারিলেই তাহার বৃদ্ধি হয়, বহুবিস্তারের অপচয়ে লাভ নাই। আমার সময় অল্প, আলোচনাও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, নতুবা এই সকল পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাহিত্যিক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাময়িক সাহিত্য এ যুগে স্থায়ী সাহিত্যের কর্ষণ-ভূমি, এজন্য এই পত্রিকাগুলির দায়িত্ব বোধ হয় সব চেয়ে বেশি। দুঃখের বিষয়, সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারকল্পে এই সকল পত্রিকা যথেষ্ট শক্তিসঞ্চার করিলেও যে ভাবে এগুলির সম্পাদন হইয়া থাকে তাহাতে সাহিত্যের

কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই অধিক হইবার সম্ভাবনা, এবং বর্ত্তমান সাহিত্যে যে-অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্য ইহারা কিছু কম দায়ী নহে।

গ্রন্থপ্রকাশও একটি বড় ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু এই ব্যবসায়ের রীতি ও নীতি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এখানে সাহিত্যের নামে যে-পণ্য অবাধে বিক্রয় হইতেছে, এবং শিক্ষিত ভদ্র-পরিবারেও তাহার গতি যেরূপ অপ্রতিরোধ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, রুচির যে স্বাভাবিক শুচিতা বহুকালের শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আর রক্ষা পাইবে না। এই সকল গ্রন্থের যাঁহারা প্রকাশক, অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা ভদ্র ও শিক্ষিত; সামাজিক বাধ্য-বাধকতা ও প্রভাবের দ্বারা তাঁহারা দৈনিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহাদের ব্যবসায়ের সাহায্য করিবার জন্য প্রকাশিত নিকৃষ্ট পদার্থেরও উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশিত করাইতে পারেন ও করাইয়াও থাকেন। পত্রিকাগুলির সহিত এই সকল ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎ স্বার্থের যোগও আছে। এ অবস্থায় অনাচার-প্রচারের নিবারণ দুরূহ হইয়া উঠে। অনেক গ্রন্থপ্রকাশক অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ভাল সাহিত্য বাজারে বিকায় না। বাজারই যখন মূল্যের মানদণ্ড, তখন সাহিত্যের যে কি অবস্থা হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বাজারের এই রুচির কোনও প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিরোধ তাঁহারা করেন না; লাভজনক বলিয়া ইহার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ব্যবসায়ের দিক হইতে তাঁহাদের প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে ইহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না। আবার সাহিত্য-ব্যবসায়ে লাভের অংশ গ্রন্থকারের ভাগ্যে সচরাচর পড়ে না। সাহিত্যিক মানদণ্ডের অভাবে বা বিপর্যয়ে প্রকৃত মূল্যের যখন কোনও মানদণ্ড নাই, তখন গ্রন্থকার কোনও দাবী করিতে পারেন না। দাবী করিবার মত অবস্থাও তাঁহাদের থাকে না। আধুনিক গ্রন্থকারদের অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের দুর্ভাগা রূপজীবিনীদের মত। জীবিকার তাড়নায় ও বাড়ীওয়ালীর তাগাদায় চমৎকার চাকচিক্যময় সুলভ পণ্য বাজারে সরবরাহ করিয়াও তাহাদের দুর্দশা কোনদিন ঘোচে না, কিন্তু বাড়ীওয়ালীর লাভের ভাগ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরবস্থা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে মনে হইতে পারে যে, আমি ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে একেবারেই নিরাশ হইয়াছি। তাহা যদি হইত, তবে আমি আজ আপনাদের সম্মুখে এতগুলি বাক্য বৃথা ব্যয় করিতাম না। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্য-ব্যবসায় প্রকাশ্য ক্ষেত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা অতিশয় নৈরাশ্যজনক হইলেও বাঙ্গালী সমাজ এখনও একেবারে স্বধর্মভ্রষ্ট হয় নাই। সাধারণ পাঠকের রুচি ও রসবোধ যতই ক্ষুণ্ণ হইক, কতকগুলি ব্যাধি-গ্রস্ত বাক্তি যতই কলরব করুক, এ সকলের বাহিরে একটা বৃহত্তর সমাজ আছে, যাহা মুখর না হইলেও অস্তিত্বহীন নহে, যাহার সহজ রসিকতা ও মনের স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে। ইহার প্রমাণও আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। আজও রবীন্দ্রনাথ সিংহাসনচ্যুত হন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র এখনও বহুজনের রস-পিপাসা তৃপ্ত করিতেছেন। এই সেদিনও এক নবীন সাহিত্যিক একখানি ভাল উপন্যাস রচনা করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। একজন সম্বাদসম্পদহীন অখ্যাতনামা লোকের পক্ষে একখানি বই লিখিয়া এমন সর্ব্বজনসম্মানিত হওয়া যে এখনও সম্ভব হয়, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঙ্গালীর রসবোধ এখনও লোপ পায় নাই। এক শ্রেণীর নূতন যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা মনে ভাবেন যে, চেঁচাইয়া কথা না বলিলে ও লিড্ না জমাইলে কেহ শুনিবে না, সুতরাং রাস্তায় লিড্ ও গলাবাজির বহর বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু বলিবার সত্যই কিছু না থাকিলে, অনর্থক লিড্ ও amateurish কোলাহল আপনিই থামিয়া যাইবে, কারণ, অলীক উত্তেজনার দম আপনিই ফুরাইয়া আসে। তথাপি, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গলকামী, তাঁহাদের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের বর্ত্তমান জীবনে নানা সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিতেছে, জীবন-ধারণের সমস্যা কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, অভাবের তাড়নায় দেহ ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; তাহার উপর, যদি দেহের খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, জাতির মনের খাদ্যও বিষাক্ত হইয়া উঠে, তবে পরিণামে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানসিক পথ্য-সংগ্রহের যে রীতি সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, জাতির জীবন-স্বাস্থ্য আর অধিক দিন থাকিবে না।

জীবনযুদ্ধে হতবল ও নিরুপায় হইয়া আমরা পাশ্চাত্যের বিষ-চিকিৎসার শরণাপন্ন হইয়াছি; জাতি, দেশ ও সমাজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, আমরা পরিণাম-চিন্তা পরিহার করিয়া বর্ত্তমানের উপাসনা করিতেছি। পাশ্চাত্য আদর্শের যে সনাতন সত্য একদিন আমাদের স্বধর্মকেও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছি; এখন পাশ্চাত্য ভাবকে কেবল পাশ্চাত্য বলিয়াই মোহগ্রস্ত হইয়া সেই আদর্শের বিকৃতিকে আধুনিক সত্য বলিয়া দুর্ব্বল দেহে জ্বরের মতন উদ্দীপনা

অনুভব করিতেছি। এই আশু বিনাশের পথ হইতে সমগ্র জাতিকে সাবধান হইতে হইবে। একালে হয়ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য জন্মিবে না—সে জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অন্নের অভাবে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি করিবার প্রবৃত্তি যেন না হয়। সাহিত্যের নামে আজ যাহা চলিতেছে, তাহা হয়ত চলিবেই। সমাজদেহের এক অংশে এরূপ ব্যাধির আক্রমণ অনিবার্য্য, কিন্তু অনিবার্য্য হইলেও তাহা ব্যাধি; তাহাকে লইয়া অতিরিক্ত স্বাস্থ্য বা শক্তির অভিমান করা যে বুদ্ধিনাশের লক্ষণ, সেই বুদ্ধিনাশ হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। সাহিত্যের আদর্শনির্দ্দেশ, কাব্যতত্ত্বের বিচারণা, অথবা উৎকৃষ্ট সমালোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু কেবল তাহার দ্বারা বর্ত্তমান সঙ্কটে সুরাহা হইবে না; কারণ, এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে এ ব্যাধির মূল সাহিত্যগত নয়, সাহিত্য ইহার ছদ্মবেশ মাত্র। দেবতার জন্য যে-মন্ত্র, ভূতের জন্য তাহা নয়। কেবল দেবতার নাম এক্ষেত্রে জপ করিলে চলিবে না, ভূতের তাণ্ডবও থামাইতে হইবে। এই জন্যই আমি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য যে ধরণের বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে হয়, সাহিত্যের ইতিহাস, কাব্যের আদর্শ বা সমালোচনার সুনিপুণ পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল বাঁধা গৎ ও বুলি আওড়াইতে হয়, তাহা করিলাম না। আপনারা যদি নিরাশ হইয়া থাকেন, তজ্জন্য আমিও কম দুঃখিত নই।

আজকাল চারিদিকেই সাহিত্য-সভা ও সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। এই সকল বৃহৎ মজলিসী ব্যাপারে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বা প্রবৃত্তি আমার হয় নাই; তথাপি আজ কেন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপনাদের নিকট কোনও বড় কথা বলিতে অথবা উচ্চ চিন্তার প্রচার করিতে আসি নাই; সে স্পর্দ্ধা বা নিষ্ফল অভিপ্রায় আমার নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিকতম অবস্থা, এই সাহিত্যের সাধারণ পাঠক হিসাবে, আমার নিকট যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই। বড় বড় কথার চেয়ে বর্ত্তমানের কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার জ্ঞান বুদ্ধি মত এই সকল সমস্যার কতকগুলি দিক আপনাদের সমালোচনার জন্য উপস্থিত করিলাম; সমাধান করার উদ্দেশ্য বা যোগ্যতা আমার নাই। যাঁহারা আমাদের দেশ, জাতি ও সাহিত্যকে ভালবাসেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই বর্ত্তমান সঙ্কট উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিষয়; কিন্তু যাঁহারা সাহিত্য-সংরক্ষণে দায়ভাগী, তাঁহাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের উপযুক্ত আলোচনা এ পর্য্যন্ত কোনও সাহিত্য-অধিবেশনে দেখিতে পাই না। আজকাল যে সকল সাহিত্য-বৈঠক হইয়া থাকে, সেগুলি প্রায়ই বৈঠকী ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হয়। দেখিতে পাই, এই সকল অধিবেশনে সুপণ্ডিত সভাপতি মহাশয়েরা সাহিত্য-সমাজকে নানা নীতি-বাক্য ও উচ্চ আলোচনার গুরু গম্ভীর কথা শুনাইয়া থাকেন। সাহিত্যের ধর্ম্ম কি, কি করিলে সাহিত্যচর্চ্চা বিশ্বসাহিত্যের আলোকপাতে ধন্য হইতে পারে, কোন্ কোন্ মহাকবি বা মহা-ঔপন্যাসিকের রচনার রস নিষ্কর্ষণ করিয়া পৃথক্ পাত্রে ভরিয়া তুলিলে জাতির রসবোধ তুরীয়ানন্দে উন্নত হইতে পারে,—ইত্যাকার নানা সুধীজনসম্মত উচ্চচিন্তা বা মৌলিক গবেষণার পরিচয় তাহাতে পাই। এই সকল চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা পত্রিকা হইতে পত্রিকান্তরে উদ্ধৃত ও প্রতি-উদ্ধৃত হইয়া থাকে, সাহিত্যিক পাঠক-পাঠিকাগণ তাহাতেই কৃতার্থ ও আশ্বস্ত হন। কিন্তু কেমন করিয়া যাহা চলিতেছে তাহাকে অবিলম্বে রোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে কোন ভাবনাই কাহারও নাই। ভূতের নৃত্য ও দেবতার পূজা একই মন্দিরে চলে না, এ ধারণা বোধ হয় কাহারও নাই, অথবা বাস্তব সমস্যাকে কেহ গ্রাহ্য করিতে রাজি নহেন! আমি যাহা বলিলাম, তাহা বলিবার সময় অনেক দিনই আসিয়াছে; আমার চেয়ে যোগ্যতর ও অধিকতর প্রভাবশালী শৈবস্বামীর বাক্তিদের মুখে এই বিষয় আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উচ্চ সাহিত্যের চিন্তা করিলেই চলিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে বলিবার উৎসাহ অথবা সাহস দেশের গণ্যমান্য সাহিত্যসেবীদের মধ্যে বেশী দেখা যায় না। তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের নীরবতা দ্বারা মনে মনে ইহার সমর্থন করেন? কারণ, দেখিতেছি যে-বাগানে ফুলগাছই নাই, আগাছায় জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, সে-বাগানকে ফুলবাগান মনে করিয়া, আমাদের অগ্রণী সাহিত্য-রক্ষীরা সেই সকল আগাছার সার দিয়া ফুল ফুটাইবার কথা বলেন! আগে জঙ্গল সাফ করিবার, অথবা আগাছার বৃদ্ধি নিবারণ করিবার উপায় করিতে হইবে; কেবল সাহিত্যিক রসবোধ নয়, মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাবোধ, অসত্য ও অধর্ম্মের পীড়াবোধ জাগাইতে হইবে; তারপর সাহিত্যের তত্ত্ব বা আদর্শের কথা। নতুবা কে শুনিবে; উলুবনে মুক্তা ছড়াইয়া লাভ কি? *

* গত ১৩ই চৈত্র অনুষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মেলনীর সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে পঠিত।

ভাষা ও জাতি

—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

কিরূপে যে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, এ সম্বন্ধে আলোচনা করাও আজকাল ভাষা-তাত্ত্বিকগণ পছন্দ করেন না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না শিখিলে কোনদিনই তাহার ভাষার উৎপত্তি হইত না। এই বিষয়টি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা দরকার।

শব্দের সহিত অর্থের যে প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বোধ হয় সকল শিক্ষিত লোকেই স্বীকার করিবেন, যদিও প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ ইহার বিপরীত কথাই বলিতেন। একই ভাব বা বস্তু বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে দ্যোতিত হইতেছে, ইহাই বোধ হয় এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু একটি ভাষার মধ্যেও কোন একটি বিশেষ ভাব বা বস্তুবাচক মাত্র একটি বা পরিমিতসংখ্যক কয়েকটি শব্দের প্রচলন হইল কিরূপে? একভাষাভাষী বহু ব্যক্তি একটি বিশেষ অর্থে একই শব্দ ব্যবহার করে কেন? তবে কি বুঝিতে হইবে যে, জাতির গণ্ডীর মধ্যে শব্দ ও অর্থের বাস্তবিক একটা প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে?* এ কথায় সকলেই অবশ্য প্রবল বেগে মাথা নাড়িবেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন জাতীয় ভাষায় কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থে 'একটি' বিশেষ শব্দের প্রচলন দেখিয়া মনে হয় নাকি যে সেই জাতির সকল লোকের সেই বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি একই রূপ ধারণা ছিল, তখন অবশ্য তদুত্তরে হাঁ কি না কিছুই বলা কঠিন হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে কিন্তু আগে বুঝিতে হইবে ভাষা কাহাকে বলে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতেছে, ভাষার অস্তিত্ব আছে কি? আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দার্শনিকপ্রবর Karl Vossler বলিতেন, বাস্তবিক ভাষার কোন অস্তিত্ব নাই, উহা একটি কাল্পনিক বস্তু। তিনি আরও বলিতেন, জ্যামিতিতে তো নির্খুঁত বৃত্তের সাহায্যে কত সমস্যারই 'সমাধান' করা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তব জগতে একটিও নির্খুঁত বৃত্ত মিলে কি? কত ভাষার তো ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে এক একটি বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব এখনও অপ্রমাণিতই রহিয়া গিয়াছে। সেইরূপ যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে প্রতি নিশ্বাসের সহিত আমাদের ভাষার সহিত পরিচয়, তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে তাহার বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রচণ্ড দার্শনিকের এই তীক্ষ্ণ উক্তিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি তাহাতে বিশ্বাস করি। কারণ ভাষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—যাহার দ্বারা নাটক নভেল লেখা হইয়া থাকে,—তাহা নেহাৎই মানুষের একটা মনগড়া জিনিষ। প্রকৃত অস্তিত্ব যাহার আছে তাহা বচন (speech), ভাষা নহে। এখন বচনের সহিত ভাষার সম্বন্ধ কি? অর্থদ্যোতক যাহাই উচ্চারিত হয় তাহাই বচন। একই শব্দ দুই ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে শব্দ থাকে একটি, কিন্তু বচন হয় দুই। সেইরূপ একই শব্দ দুইটি বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা দুইবার উচ্চারিত হইলেও দুইটি বিভিন্ন বচনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাষার যদি অস্তিত্বই না থাকে তবে তাহার সহিত অর্থের যোগস্থাপনের চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা; অপর দিকে বচনের সংখ্যাও যদি প্রতি শব্দোচ্চারণে বাড়িয়া চলে তবে অর্থ দাঁড়াইবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? এ প্রশ্ন তোলাই কিন্তু অজ্ঞতার পরিচায়ক, কারণ অর্থ কোনদিন দাঁড়াইয়া থাকে না,—প্রতি উক্তি বা বচনের সহিত অর্থও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বচন মানবমনের অভিব্যক্তির একটি উপায়,—মানুষ যাহা অনুভব করে তাহাই সে কথায় ব্যক্ত করে। কিন্তু অনুভূতি ও তাহার অভিব্যক্তির ব্যবধান বিরাট। এ সম্বন্ধে দার্শনিকপ্রবর Benedetto Croce একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, অনুভূতি ও অভিব্যক্তির মধ্যপথে উপলব্ধি, এবং তাঁহার মতে অভিব্যক্তিই উপলব্ধির প্রমাণ। বস্তুতঃ যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহা অনুভূতি নহে, উপলব্ধি। একই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অনুভূতি চেষ্টা সকল মানুষের একই রূপ হইতে পারে,—অনুভূতির বাহ্যবিকাশ না থাকায় সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলিবার উপায়

* এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রত্যেক ভাষা কেবল নির্দ্দিষ্ট জাতির বিশেষ সম্পত্তি।

নাই—, কিন্তু তদ্বিষয়ক উপলব্ধি প্রত্যেক ব্যক্তিতে পৃথক হইবেই। কারণ ব্যক্তিত্বের সহিত অনুভূতির সামঞ্জস্য-স্থাপনেই উপলব্ধি।

বচনের এখন একটা সংজ্ঞা দেওয়া যাউক। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে উপলব্ধির শব্দময় রূপই বচন। এখন উপলব্ধি যে কেবল মাত্র ব্যক্তিভেদেই পৃথক হইবে তাহা নহে, কালভেদেও তাহা পৃথক হইতে বাধ্য। তাহার শব্দময় রূপ, বচনও তদ্রূপ। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে প্রতি উচ্চারণে একই শব্দ নূতন অর্থ গ্রহণ করে,—সে উচ্চারণ একই ব্যক্তিতে করুক বা বিভিন্ন ব্যক্তিতে করুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এ কথায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কারণ একই শব্দের আড়ালে কত যে বিভিন্ন অর্থ লুক্কায়িত থাকে, একটু চিন্তা করিলেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। খাওয়ার কথা মনে হইলেই তো আমরা আহ্লাদিত হইয়া উঠি, কিন্তু এমন লোকও দেখিয়াছি যিনি খাইতে বসিয়া এই মনে করিয়া অশ্রুপাত করিতেন যে এখনও পৃথিবীতে বহু লোক অভুক্ত রহিয়াছে। তথাপি বলিতে পারি কি যে সেই মহাত্মা 'খাওয়া' বলিতে যাহা বুঝিতেন আমরাও ঠিক তাহাই বুঝি? মেষপালককে যিশুখৃষ্ট নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার প্রতিমূর্তি বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন; অপরদিকে কিন্তু দেখিতে পাই যে কলিকাতার ফিরিঙ্গিরা রাস্তায় ভেড়া দেখিয়া লোভের আতিশয্যে lamb কথাটাও ভুলিয়া গিয়া সোজাসুজি mutton বলিয়া ফেলিতেছে। দুই বৈবাহিকে যখন ভোজের কথা হয় তখন ছেলের বাপ বোঝেন খাওয়া, আর মেয়ের বাপ বোঝেন খাওয়ান।—এক জনের অনাবিল আনন্দ, অপরের অপরিসীম উৎকণ্ঠা। দুই জনেই যথেষ্ট ধিশালী হইলে অবশ্য অর্থবৈষম্য খুব গুরুতর হইবে না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুই বৈবাহিক একই অর্থে 'ভোজ' কথাটি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এসব গেল ব্যক্তিভেদে একই শব্দের অর্থভেদের কথা। কালভেদেও যে একই ব্যক্তির উচ্চারিত একই শব্দের বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জকতা ঘটিয়া থাকে তাহাও সুস্পষ্ট। কারণ ব্যক্তিত্ব কালসম্বন্ধে নিরপেক্ষ নহে,—উহা তদ্দ্বারাও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মেয়ের বাপও যখন ছেলের বিবাহ দেন তখন তিনিও বৈবাহিকের মাতৃত্ব উৎপাদন করেন এবং তিনিও তখন 'ভোজ' বলিতে খাওয়ান বোঝেন না, খাওয়াই বোঝেন। ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে যতগুলি লোক ততগুলি ভাষা। আসলে কিন্তু লোকের অপেক্ষা ভাষার সংখ্যা অনেক বেশী, কারণ একই শব্দ কখনই একই অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হইতে পারে না।

মানুষ কালবিবর্ত্তে যুগধর্ম্ম দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ভাষা সাক্ষাৎ যুগধর্ম্মদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া মানুষের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার উপর মানুষের বিকাশের পন্থা অনন্ত,—বিকাশের বৈচিত্র্যেই তাহার প্রাণ, ভাষা কিন্তু শব্দসমষ্টির গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ। কাজেই ভাষা কোন দিনই যুগধর্ম্মী মানুষের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। অথচ ক্রমবিবর্ত্তমান মানুষের সহিত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, শব্দ কিন্তু চিরদিনই তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সহজ ভাষায় ইহাকেই বলে যে, একই শব্দ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। মহাকবি কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ হরপার্ব্বতীর সম্বন্ধের মত। ইহার মধ্যে কোন শ্লেষোক্তি আছে কিনা এখন জানিবার উপায় নাই। তাহার আলোচনা করিলে কিন্তু মনে হয়—শব্দ অর্থের দ্যোতক মাত্র নহে, অন্তরায়ও বটে।

বচন ও ভাষার সম্বন্ধ এইবার কতকটা বুঝা যাইবে। এক কথায় বলিতে গেলে এ দুইয়ের পার্থক্য এই যে, বচনের বাহন ব্যক্তি, কিন্তু ভাষার বাহন সমষ্টিমানব। কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির বা সারা পৃথিবীর 'মানুষ' বলিতে আমরা বুঝি কি? পৃথিবীতে বাস্তব মানুষ যতগুলি আছে তাহাদের কাহাকেও বুঝিনা, বুঝি শুধু একটি সমষ্টিমানবকে যাহার প্রকৃত অস্তিত্বই কিছু নাই। এই অবাস্তব সমষ্টিমানবেরই বচনের নাম ভাষা, সেইজন্য দার্শনিক Vossler-এর মতানুযায়ী, তাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু অস্তিত্ব না থাকিলেও ভাষার সার্থকতা আছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস লেখা হইয়াছে বা হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে কিন্তু যে এই ইতিহাস বাস্তব ব্যষ্টিমানবের নহে, অবাস্তব সমষ্টিমানবের। কিন্তু সেইজন্য সমস্ত ইতিহাস অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? বাস্তবিক Bergson-পন্থীদের মতে ব্যষ্টিমানবের ইতিহাস সম্ভবই নয়, কারণ Bergson-প্রোক্ত কালধর্ম্মানুযায়ী প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তি

নিরন্তর নব নব বস্তু বা ব্যক্তিতে পরিণত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বস্তুর পরিমাণ বা ব্যক্তির ইতিহাসের কল্পনাও করা যায় না। Bergson সেইজন্য প্রকৃত কাল (tempo-qualite) ভিন্ন আর একটা সাধারণ কাল (tempo-quantite) স্বীকার করিয়াছেন। ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া যে সময়ের পরিমাণ করা হয় তাহাই হইল সাধারণ কাল। ইহা নিতান্তই বাহ্যিক, বাস্তব ব্যষ্টিমানবের ব্যক্তিত্বের আধার-স্বরূপ ইহা নহে। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া সঙ্গীতের স্বরলহরী শ্রবণ করিলে বিভিন্ন শব্দ সত্ত্বেও যেরূপ একটা অখণ্ড ঐক্য সকল সময়েই অনুভব করা যায় (Bergson), সেইরূপ সকল সত্তার নিগূঢ়তম ঐক্যের আধার এই সাধারণ কাল, যাহাতে সত্তার আয়তনের তারতম্য ঘটে মাত্র, প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। অতএব Bergson-প্রোক্ত এই সাধারণ কালের সাহায্যে, অন্ততঃ সার্ব্বজনীন ঐক্য অবলম্বন করিয়া, একটি ইতিহাসশীল মানবের কল্পনা করা যাইতে পারে। এই অবাস্তব মানবকে আমরা সোজাসুজি সমষ্টিমানব বলিব। লৌকিক পক্ষে ইতিহাসশীলতাতেই এই কাল্পনিক সমষ্টি-মানবের সার্থকতা, কারণ তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত কালধর্ম্মী মানবের কোন পরিচয়ই পাওয়া সম্ভব হইত না,—কৃত ভবিষ্যতে তো দূরের কথা, বর্ত্তমানেও নহে, কারণ Bergson-মতে বর্ত্তমান, কৃত ও ভবিষ্যৎ হইতে অভিন্ন। ভাষা ও বচনের সম্বন্ধও ঠিক তদ্রূপ। বচন প্রকৃত কালধর্ম্মী, প্রকৃত কালই তাহার আধার,তাই তাহার ইতিহাস সম্ভব নহে। তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের সেই কাল্পনিক সমষ্টিমানবের ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে, Bergson-প্রোক্ত সাধারণ কালেই যাহার ভিত্তি। এক কথায় বলা যাইতে পারে, ইতিহাসশীল বচনের নাম ভাষা। বচন যদি কালধর্ম্মী হয় তবে ভাষা ঘুণধর্ম্মী।

বচনের সহিত ভাষার সম্বন্ধ কতকটা বুঝা গেল। এখন বিবেচ্য, ভাষার দ্বারা বচন প্রভাবান্বিত হয় কিনা, এবং হইলে কিরূপে হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি প্রয়োজন। বচনের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে বচনকে চিন্তন হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব, কারণ,—Bergsonর পরিভাষায় বলা যাইতে পারে —বচনের আধার যে কাল, চিন্তন তাহারই একটি অবয়ব। অতএব যদি স্বীকার করা হয় যে বচন ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তবে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না যে চিন্তনও অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে ভাষার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে, যে জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্য দেখিয়া অপরনিরপেক্ষাবস্থায় চিন্তনের সমজাতীয়তাও অনুমান করা যায় কিনা। কারণ ভাষার প্রভাব জাতির প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাষার স্বাধীন সত্তা কিছু নাই,—তাহা কেবল সমষ্টিমানবের, অর্থাৎ জাতির, উপলব্ধ অনুভূতির একটা শব্দময় অসম্পূর্ণ বাহ্য রূপ।

দেখা গিয়াছে যে ব্যষ্টিমানবের মধ্যেও যে-সার্ব্বজনীনতার অঙ্কুর রহিয়াছে তাহাই আশ্রয় করিয়া ভাষার সহিত বচনের সম্বন্ধ। বস্তুতঃ বচনের সার্ব্বজনীনত্ব সাধনেই ভাষার সার্থকতা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সাধারণ মানুষ কি পরিমাণে এই সার্ব্বজনীনতার অধীন। এ সম্বন্ধে তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে সে ভাষারও দাস, এবং সে যাহার দাস তদ্দ্বারা যে তাহার চিন্তনও প্রভাবান্বিত হইবে তাহা প্রমাণ করিবারও বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। এখন স্থান ও কালাবৃত মানবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে প্রতীত হয় যে মানুষ সঙ্ঘধর্ম্মী। তাহার এই বিশেষত্ব বিশ্লেষণের জন্য স্থান ও কালনিরপেক্ষ কোন বিশ্বচৈতন্যের অবতারণা করার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ কালধর্ম্মের সহিত মানুষের সঙ্ঘধর্ম্মের আদৌ কোন বিরোধ নাই, Bergson-প্রোক্ত tempo-quantiteর সাহায্যে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধমান এই দুই বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সহজেই সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে। এখন মানুষের সঙ্ঘধর্ম্ম যদি সত্য হয় তবে তাহার উপর বিশ্বজনীনতার প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য নূতন কোন উদ্যমের আবশ্যকতা থাকে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যক্তির বচন জাতির ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে মানুষের চিন্তন আংশিক ভাবে অন্ততঃ তাহার ভাষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

এখন দার্শনিক পরিভাষার নিকট বিদায় লইয়া এই কথাটিরই একটু বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শব্দ যে অর্থের দাস এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু

ইহাই সম্পূর্ণ সত্য নহে,—স্বীকার করিতে হইবে যে অর্থকেও বহুল পরিমাণে শব্দের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কিরূপে অনন্তপ্রসারী অর্থের প্রতীক রূপে ক্ষুদ্র সসীম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—ইহাতে অর্থের আংশিক সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই বাহ্য। যে কোন বিশেষ শব্দের অর্থানুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, জাতীয় ভাষা অনুযায়ী কি পরিমাণে তাহার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। মনে করা যাউক পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় 'লাল' বলিতে যে যে রং বুঝায় তাহাদের একটা সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেখা যাইবে যে কোন লোকই নির্ঘণ্টের অন্তর্গত সমস্ত রংকে লাল বলিয়া নির্দেশ করিতেছে না, প্রত্যেক জাতির লোক তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি বিশেষ রং লাল বলিয়া মনোনীত করিতেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভাষার 'লাল'-অর্থক শব্দটি ঐ বিশেষ রং কয়েকটি বাছিয়া লইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় মাত্র। কোন্ কোন্ বিশেষ রং একটি নির্দ্দিষ্ট ভাষার 'লাল'-অর্থক শব্দটি দ্বারা দ্যোতিত হইবে, তাহা প্রথমতঃ জাতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু সেই বিশেষ রংগুলির সহিত শব্দটির সম্বন্ধ একবার দৃঢ়ীভূত হইয়া গেলে নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা শব্দটির অর্থনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কার্য্যকরিতা হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় যদিও সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সেই বিশেষ ভাষায় আরও কয়েকটি রং 'লাল' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, তথাপি ইতিমধ্যে শব্দটির সহিত অপর কয়েকটি বিশেষ রংয়ের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ায় ঐ রংগুলি আর কখনও সেই ভাষায় 'লাল' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। এমন কি সেই ভাষা-ভাষী লোকেরা সেই রং গুলিকে লাল বলিয়া মনেও করিতে পারিবে না। ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে নির্ঘণ্টস্থ সকল রংয়েরই প্রত্যেক ভাষায় 'লাল' বলিয়া পরিগণিত হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সে পথে প্রধান অন্তরায় এই যে প্রত্যেক ভাষায় 'নির্ঘণ্টের' একটি অংশ মাত্রের সহিত সে ভাষার 'লাল'-অর্থক শব্দটি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে শব্দপ্রতীকের দ্বারা প্রতি জাতীয় ভাষাতে 'লাল'-অর্থক শব্দের প্রকৃত অর্থটি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইতেছে। বলাই বাহুল্য, কেবল মাত্র 'লাল' এই কথাটি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রত্যেক কথা সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সুন্দর অসুন্দর প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের পরিকল্পনা ঐ রূপেই ভাষা ও শব্দভেদে বিভিন্ন হইবে। কোন ক্ষেত্রেই এ বিভিন্নতার একমাত্র কারণ ভাষা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা একটি আংশিক কারণ।

অতএব বলা যাইতে পারে, জাতীয় সভ্যতার রূপ পর্য্যন্ত জাতীয় ভাষার দ্বারা আংশিক ভাবে নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত হয়। বহুদিন ধরিয়া তর্ক চলিয়াছে, ভাষা জাতীয় চরিত্রের অনুবর্ত্তী কিনা। এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এখনও মিলে নাই। অপর দিকে একটি কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, জাতীয় চিন্তার ধারা ও সর্ব্ববিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা আংশিক ভাবে জাতীয় ভাষার উপর নির্ভর করে।

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির ধারা কখন ঝির ঝির, কখন ঝর ঝর, কখন বা ঝম ঝম শব্দ করে তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঝিকমিকে রোদে যখন অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণ তালবাগের আধারকে রঞ্জিত করে, তখন কোনরূপ ঝিক ঝিক শব্দ শুনি নাই। আঁধার ঘরে চকচক করে বিড়াল কর্তৃক দুধের বাটির দুকূলাবস্থিতা দ্যোতিত হয় বটে, কিন্তু চকচকে দুধানিকে কখন চক চক শব্দ করিতে শুনি নাই। এই শব্দগুলি নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু কোনরূপ ধ্বনি ত কখনও কর্ণগোচরা হয় না। আপাততঃ ঐ সকল ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বনিঘাত শব্দের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না, অথচ উহারা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে অর্থ কল্পনা করে! কল্পনে দীপ্ত বলিলে যেমন দীপ্তের তীব্রতা বুঝায়, চকচকে দুধানি বলিলে যেমন দুধানির উজ্জ্বলতা বুঝায়, তাহা চুকচুকে বলিলে সেই দুধের তীব্রতা যেমন চোখের উপর প্রতিফলিত পড়ে, আর কোন বিশেষণ তেমন স্পষ্টভাবে সেই সেই অর্থ একাশ করিতে পারে না। চেচকে শব্দটির অন্তর্গত ব্যঞ্জনের অর্থ 'চ' আর কণ্ঠবর্ণ 'ক' এই দুই অর্থের ধ্বনিতে এমন কি আছে, যাহাতে চকচকে জিনিষের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা বুঝাইয়া দেয়? উজ্জ্বল কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়, আর চকচকানি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হইল কি রূপে?

—রাজেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

সূর্য্যমুখী

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

অবোধ সূর্য্যমুখী—
নিত্য ফুটেছে সূর্য্যের পানে চেয়ে কাটে দিন তার,
নিশিভোর রাতি ঘুমের বিকারে কাটে।
মিথ্যা - মিথ্যা মিথ্যা তাহার নাম,
মিছা লোক-অপবাদ।
সূর্য্যমুখী সে নিজ-অন্তরমুখী;
সব স্নেহমায়া মমতা ও ভালবাসা
বিধাতার শাপে ভাগ হয়ে গেছে আলোকে-অন্ধকারে,
বিধাতার বর বলিতে তোমরা পার!

জীবনে সূর্য্য এসেছিল একদিন,
তবু সে সূর্য্য নয়—
অমাবস্যার গাঢ় তমিস্রা জমাট বাঁধিয়া কবে
ছুঁয়ে গেছে তারে রবির ছদ্মবেশে,
কালো করে গেছে আলো-ভোলা বুকখানি,
প্রথম প্রণয়-পরশ-লোলুপ শুরু দুরু বুকখানি।
কেহ দেখে নাই, কে এল—রবি না তম,
উৎসব-সুখে মগ্ন সকলে, উৎসুক-সুখে নিমীলিত আঁখি তার,
দল মেলিবার আশায় ব্যাকুল কোরক-সূর্য্যমুখী—
দেও দেখে নাই, নহে তার অপরাধ।

চ'লে গে অনেক দিন—
কালোর ছোঁয়ায় কালি হয়ে দল মেলেছে সূর্য্যমুখী,
বিষপানে জর্জ্জর।
হঠাৎ একদা নিশীথ বেলায়, হঠাৎ ভাঙিল ঘুম,
চমকি জাগিয়া দেখিল সূর্য্যমুখী—
রাজপুত্রের ঘুচেছে ছদ্মবেশ,
রবি সে আঁধার-রবি।
পাপের বিকার বুকে বসিয়াছে দেবতার রূপ ধরি,
তখন দলও নাই।

পাপ চলে গেল, কাঁদিল সূর্য্যমুখী,
অবোধ সূর্য্যমুখী।
দলগুলি মেলি নিশীথ শয়নে আজিও জাগিয়া আছে।
দিবস বিফল তার,
দিনের রৌদ্রে আবরি আঁধার হেনেছে মৃত্যুবাণ,
সে শুষ্ক আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিল ফুলের প্রাণ,
মরিল না একেবারে।

সে হ'তে সূর্য্যমুখী
আলোর লাগিয়া বাহু মেলে আছে অবোধ অন্ধকারে।

দীপ্ত সবিতা, রুদ্র বিবস্বান্—
ছদ্মবেশী সে পাপ-তমিস্রা নহে।
এক নিমিষের ভুল,
দীর্ঘ জীবন টানিয়া টানিয়া চলিতে সে নাহি পারে।
তবু হায়, হায় হায়—
সীঁথির সিঁদুর হাতের লৌহ—ডাকিছে বহ্নিশিখা;
দেহের মাংস আজও,
পুলকিত হয়, পুঞ্জিত হয়ে ধরে বাসনার রূপ,
বলে, এসো, এসো তম,
চির-জীবনের নাহি চাই রবিকর,
এই ক্ষণিকের আঁধারই সত্য বেশী।
বলিছে সূর্য্যমুখী—
হে পাপ-দেবতা, আলোর অন্তরালে,
তোমার পরশে আমার পরশ একদা স্বপ্নাবেশে
সৃজন করেছে বিপুল সম্ভাবনা—
অন্ধকারের বুক-চেরা ধন, তোমার মিথ্যাচারে
আলোকে চাহিছে প্রবেশের অধিকার।
তাহারা সত্য, তাহারা সত্য, তাহারা সত্য তবু,
তাহারা আলোর দূত।

আঁধার সূর্য্যমুখী—
আলোর কিরণ আহ্বান করি আঁধারের দীপগুলি
জ্বালিবারে চায়, জ্বলিতেছে তাই নিজে;
সূর্য্যমুখীর সূর্য্য আজিও মেঘ-আবরণে ঢাকা।

কখনও কি হায়, ছিঁড়িবে সে মায়াজাল,
ভুলে যাবে তার কোরক-দিনের আঁধারের ইতিহাস,
ভুলিবে সূর্য্যমুখী? ভুলিতে কি কভু চায়?
ঘনায় যখন নিশীথের কালো মায়া,
ঘুমায় অতল দল,
জাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া সূর্য্যমুখী
আঁধারে কামনা করে—
আঁধার ছানিয়া পাপ-দেবতার ছায়া
রূপ ধরি যেন নামে বক্ষের পাশে,
দুবাহু বাড়ায়ে ধরিতে তাহারে ধায়।
পাপের তখন পাপ বলি নাহি গণে,
সূর্য্যের চেয়ে অন্ধকার তমিস্রা ভালবাসে,
মনে মনে বলে, হে দেবতা, মোর তম যেন নাহি কাটে।

সূর্য্যমুখীর আলোহীন ইতিহাস
আঁধারে গোপন থাকে।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

[প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনী, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩—৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪]

গত ফাল্গুন সংখ্যার বঙ্গশ্রীতে শিল্পী অতুল বসুর শিল্প-সাধনার কথা বলিতে গিয়া আমরা একাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অতুল বসু প্রভৃতি কয়েক-জন শিল্পীর উদ্যোগে এবং মহা-রাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের উৎসাহ ও অর্থসাহায্যে কলিকাতা যাদুঘরের দ্বিতলের বারান্দায় এই একাডেমির প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনী, গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলার লাট বাহাদুর কর্তৃক উদ্ঘাটিত হইয়া ৭ই জানু-য়ারী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীর ইতি-হাসে ইহা এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্র-শোভায়; স্যার

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর—প্রধান উদ্যোক্তা।

এডওয়ার্ড বার্ণ জোন্স্, স্যার লরেন্স আলমা টাডেমা, জেকব হুড, লুকা জিওরদানো, ম্যাথার ব্রাউন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নবীনতম চিত্রশিল্পী-গণের চিত্রসাহায্যে; ব্রঞ্জ, প্লাষ্টার অব প্যারিস ও মৃত্তিকা-জাতীয়; অয়েল ও ওয়াটার কালার, এচিং, চারকোল ও রেখা-চিত্রের সুসমঞ্জস সমাবেশে, নক্সা, বিজ্ঞাপনী প্রাচীর-চিত্র, মানুষ, পশুপক্ষী ও নিসর্গশোভার আলেখ্যে সমস্ত প্রদর্শনী এমনই মনোহারী হইয়া উঠিয়াছিল যে, দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ বিস্ময়ে এই শিল্পমহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের কোনও একটি বিশেষ প্রদেশ বা বিশিষ্ট পদ্ধতিকে কেন্দ্র করিয়া এই একাডেমির প্রদর্শনীটি গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই সকলের সমাদর লাভ করিয়াছিল। শিল্পী অতুল বসু ও তাঁহার সঙ্গীদের শিল্প-জীবনের ইতিহাস হইতে বুঝিতে পারি যে, ইহা নির্ব্বিরোধে ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজাইয়া উঠে নাই। অনেক কলহ, অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া, সম্ভাবনার অঙ্কুরকে বহুকষ্টে রৌদ্রাতপ, ঝড়বৃষ্টি এবং গরু-ছাগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, নিভৃত ষ্টুডিও-কক্ষে অনেক দ্বিধা, শঙ্কা ও আশার দ্বন্দ্বে দোল খাইতে খাইতে বহু বৎসরের এবং বহু সাধকের সাধনায় এই প্রদর্শনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সুদূর অতীতের ঘূর্ণমান নীহারিকা-পুঞ্জের ইতিহাস জানি না বলিয়াই হঠাৎ জবাকুসুমসঙ্কাশ বালারুণ সূর্য্যের প্রদীপ্তপ্রভায় বিমূঢ় ও বিস্মিত হইয়াছি।

এই প্রদর্শনীর সমস্ত নির্ব্বাচন, মনোনয়ন ও পুরস্কার বিতরণ রসের দিক দিয়াই ঘটিয়াছে, জাতির পাঁতির কলঙ্কে ইহার সার্ব্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। বর্ত্তমান জাতি ও রাষ্ট্রাজাগত বিরোধের দিনে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। একাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর উদ্যোগী কর্ম্মীরা জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগে শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ও জাতির শিল্পকলাকে বিভিন্ন বোতলে পুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন লেবেল লাগাইয়া তাকের উপর সাজাইয়া

রাখিলে আর চলিবে না। এমন একদিন গিয়াছে, যখন শিল্প গুহাশ্রিত ছিল, লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত হইয়া লোকলোচনের বহির্ভূত থাকাতেই তাহার সার্থকতা ছিল, পর্ব্বতগাত্রের বা মন্দিরগাত্রে চিত্রশিল্প আপন মহিমায় আপনিই

মহারাজা পাটিয়ালা—প্রবাস পৃষ্ঠপোষক।

বিভোর থাকিত। তখন অজন্তা, রাজপুত, কাংড়া, মোগল, ইলোরার বিভিন্ন শিল্প-পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন খোপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, অকম অনুকারী ব্যতীত সত্যকার শিল্পস্রষ্টারা এভাবে শিল্পের জাত বাঁচাইয়া চলিতে চাহেন না। একই আলেখ্যের পটভূমিতে পাশ্চাত্য আদর্শে রঙ-তুলি বুলাইয়া, জাপানী পদ্ধতিতে মুটির রচনা করিয়া, অজন্তা হইতে একটি নারীমূর্ত্তিকে তাহার দাওয়ায় বসাইয়া দিতে শিল্পীরা দ্বিধা করিতেছেন না। ভারতীয়, জাপানী, চৈনিক, সাইজাণ্টাইন, গ্রীক, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চিশ ও ইংলিশ—শুধু তাহাই নয়, র‍্যাফেলীয়, বটিচেলীয়, লিওনার্দো অভিকীয়, হুইসলারীয় প্রভৃতি ব্যক্তিগত রীতির সংমিশ্রণেও চিত্রশিল্প দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—রসাতলে যাইতেছে না। এ যুগ মিশ্রণের যুগ, শুধু শিল্পকলার নয়, রক্তে রক্তে যে সংমিশ্রণ হইতেছে তাহাও ঠেকাইবার উপায় নাই; কোনও সাহিত্যই এখন উগ্র জাতীয়তার ছাপ গায়ে মারিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহার এরোপ্লেন ও লইতেছে, উহার ট্যাঙ্ককে এ নকল করিতেছে।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণের অনেকের বিরুদ্ধে এই পাশ্চাত্য অনুকরণ ও পদ্ধতি-সঙ্করের অপরাধ দিয়া তাঁহাদিগকে হেয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিতে হইতেছে। ডাবের জল হইয়া থাকা কোনও একটি পদ্ধতির পক্ষেই আর সম্ভব নয়, কারণ শিল্পী, যিনি শিল্প সৃষ্টি করেন, তিনি জীবন্ত, তাঁহার প্রাণ আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈঋত ঊর্দ্ধ অধঃ সকল দিকের হাওয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন; শুধু ভাত-ডালেই তিনি সন্তুষ্ট নন, রুটি-মাখনও তিনি খাইয়া থাকেন। পদ্ধতি-সঙ্করকে তিনি ভয় করিবেন কেন?

জাত বাঁচাইয়া চলিবার আর একটি দোষ এই যে, ফলে এরও ক্রম হইয়া যায়। ডোমেদের একটি ছেলে জজ হইয়াছে বলিয়া ডোমবংশ যতই গৌরবান্বিত নিজেদের মনে করুক, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য জজেদের সমাজে ইহা লইয়াই গর্ব্ব করিলে চলে না। সমস্ত পৃথিবী এখন প্রতিযোগিতায় পাগল, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিশ্বের সদর রাজপথে পা ফেলিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যদি কেহ চলিতে পারে তবে সে নিশ্চয়ই নহে—জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তো তাহার এমনিতেই থাকিবে।

স্বাজাতিকতা ও স্বদেশপ্রীতি বর্জ্জন করিয়া কাহাকেও শিল্প-সাধনা করিতে কেহ বলে না কিন্তু বহির্জগতের বিপুল সত্যতার গৈরিক জলস্রোতকে ঠেকাইবে কে? ডোবার পুঁটি-মাছ হইয়া থাকা এখন কিন্তু গৌরবের নয়। স্রোত আসিবে,

সেই স্রোতকে বাহুবলে ও বুকের জোরে ঠেকাইয়া ভাসিয়া থাকিতে হইবে, তবেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার।

নটীর পূজা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

বাংলার শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সেই পাশ্চাত্য প্রভাবকে কি বাংলা দেশ এড়াইয়া চলিয়াছে, না এড়াইয়া চলিলে, বাংলা সাহিত্য বলিয়া আজ কিছু গড়িয়া উঠিত? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় প্রভাব স্বীকার করিয়া নিজেরা বড় হইয়াছেন ও মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে গৌরব দান করিয়াছেন। এই প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই; করিলে তাঁহারা বাঁচিতেন না।

এবং শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও আজ যাঁহারা নমস্য, তাঁহারাও কি পাশ্চাত্য প্রভাব একেবারে বর্জন করিয়াছেন? ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি, এই নামের অন্তরালেই কি সব ত্রুটি চাপা পড়িয়াছে? অবনীন্দ্র, নন্দলাল, গগনেন্দ্র—কে পাশ্চাত্য পদ্ধতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া একেবারে খাঁটি ভারতীয়টি হইয়াছেন? কাহার শিল্পসৃষ্টির কোনও না কোনও ফাঁক দিয়া পাশ্চাত্য নদিরত্ব চুঁয়াইয়া পড়িতেছে না? নামমাহাত্ম্যই পৃথিবীতে এখন সব নয়।

একমাত্র শিল্পী যামিনী রায় খাঁটি দেশীর কারবার করিতেছেন, কিন্তু সে বিদেশকে অবজ্ঞা করিয়া নয়—পাশ্চাত্য শিল্পপদ্ধতির প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। সে পদ্ধতি-সমুদ্র নিজবাহুতাড়নে সন্তরণ করিয়া তবে তিনি নিজ পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

বস্তুতঃ, সকল সাধনার মত শিল্প-সাধনাতেও 'খাঁটি' হওয়াটাই বড় কথা নয়, বীর্যবান, শক্তিমান হওয়াটাই আসল কথা। মৃতুঞ্জয় শিব গরল পান করিয়াও বাঁচিয়া থাকেন। এদেশে শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ শক্তির অভাব হইতেছে বলিয়াই এই সকল কথা উঠিতেছে। সমাজে ও রাষ্ট্রে depressed class mentality লইয়া কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ও শিল্পে সে mentalityর কোনই স্থান নাই।

একাডেমি অব ফাইন আর্টস্ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণকে আর যে অপবাদই দেওয়া হউক, সঙ্কীর্ণতার অপবাদ তাঁহাদিগকে দেওয়া যায় না। তাঁহারা কাহাকেও বাদ দিয়া

কদাল ও প্রাণ—শ্রীমতুল বসু অঙ্কিত তৈলচিত্র।

চলিতে চাহেন নাই; ভারতের সকল স্থানের সকল পদ্ধতির সাধকদের শিল্পসৃষ্টিকে তাঁহারা সাদরে বরণ করিয়া সমান নিপুণতার সহিত প্রাচীরবিলম্বিত করিয়াছিলেন; যেমন

অন্তত্র দেখা যায়—তাহাকেও কোণঠাসা করিবার কোনই প্রয়াস ইঁহারা করেন নাই। তাঁহাদের মনের এই উদারতাই তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন দাবী করে।

'লোন কলেকশন' ছাড়া প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনীটি মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, বাঙালী—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান—ইণ্ডোরোপীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান—নির্ব্বিশেষে প্রায় আড়াই শত শিল্পীর সহস্রাধিক চিত্রের সমাবেশে এক অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল। কেহ বাদ যান নাই। রেখা-চিত্রকে কিম্বা ওয়াটার-কালারকে ছোট করিয়া অয়েলের ছবিকে প্রধান দিবার চেষ্টা হয় নাই। তার তীব্র পদ্ধতিকে লাবাইয়া রাখিয়া পাশ্চাত্য পদ্ধতির মহিমা প্রচারের কোনই গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পায় নাই।

অভিসন্ধি একটা ছিল এবং সেই মহৎ অভিসন্ধির জন্য এই প্রদর্শনীর শেষে আজ ভারতের সকল চিত্রশিল্পীই একাডেমির কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন—শিল্পসম্ভার বিক্রয়ের যে বাজার এখানে তাঁহারা পাইয়াছেন, চিত্র-বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও সঙ্গে সঙ্গে যে উৎসাহ তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত ভারতের কোনও প্রদর্শনীতে সকল শ্রেণীর সকল শিল্পী সে সুবিধা পান নাই। এই ১৫ দিনের মধ্যে এখান হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের ছবি বিক্রীত হইয়াছে। ইহা কম আশার কথা নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকার ছবি ক্রয় করিয়াছেন, মহারাজা পাতিয়ালা। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশীয় শিল্প-সাধকগণকে এই অযাচিত উৎসাহ-প্রদানের জন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

'লোন কলেকশন'টি এক অভিনব ব্যাপার। ইহা প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণের কার্য্য-দক্ষতা সূচিত করিয়াছে। এতগুলি বিখ্যাত চিত্রকরের এতগুলি প্রসিদ্ধ শিল্প-নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে আর ভারতবর্ষে সাধারণের গোচরে আসে নাই। স্যার এডওয়ার্ড মার্শ জোন্সের দুইখানি বিখ্যাত চিত্র, মিউজিক ও পোয়েট্রি; স্যার লরেন্স আলমা ট্যাডেমার, দি মামি ভ্যানডাইকের, মার্কুইস স্পিনলো; মাথার ব্রাউনের, পলাশী যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইব ও নবাব মিরজাফরের সাক্ষাৎ; লুকা জিওরদানোর, জেনাস কিউপিড ও সাইকি; জি, পি, জেকব হডের, দিল্লী-দরবার, ১৯১২—প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্র যে দশটি আমরা হাটিয়া দেখিতে পাইয়াছি এইজন্য প্রদর্শনীর কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগকে অকুণ্ঠের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মহিষা—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এফ, এস, টাকার অঙ্কিত এচিং।

প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনীতে যত চিত্রকরের যে সকল চিত্র পরিবিষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদের ও চিত্রগুলির নাম করা এই সঙ্কীর্ণ পরিসরে সম্ভব নয়; প্রকাশিত তালিকা হইতে যে কেহ ইহার বিবরণ উপলব্ধি করিবেন। আমরা কয়েক সংখ্যায় শিল্পী অতুল বসু প্রণীত এই প্রদর্শনীর দুইটি চিত্র ত্রিবর্ণে (মিসেস রহিম ও ছোট্ট লাল) ও দুইটি এক বর্ণে (আমরা তিনজন ও যতি দাদা) মুদ্রিত করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় একটি ত্রিবর্ণ (শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের 'প্রণাম') ও আটটি একবর্ণ চিত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের 'প্রণাম' চিত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ভাণ্ডারকরের ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবুর 'বটীর পূজা' চিত্রটি মাদ্রাজ, আদিয়ারের মিসেস এলিস ই অ্যাণ্ডেয়ারের সৌজন্যে

প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। প্রদর্শনীর আরও কয়েকটি ত্রিবর্ণ চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছি, ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।

সূচি-শিল্প—শ্রীঅবনীভূষণ সরকার অঙ্কিত রঙীন চিত্র।

এই প্রসঙ্গে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন এইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার সম্ভব হইত না—তিনি না হইলে শ্রীযুক্ত অতুল বসু প্রমুখ শিল্পীগণের স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইত। শুধু অর্থব্যয় নয়, ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও তদারক করিতে তিনি শৈথিল্য করেন নাই, সকল ঝক্কি মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন। প্রারম্ভে বোম্বাইয়ের কোনো অঞ্চল হইতে যে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বাধা অপসারণ করিয়া বাংলার লাট বাহাদুরকে দিয়া প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও লেডি ওয়েলিংডনকে দর্শকরূপে আনয়ন করা তাঁহার ও শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্থানাভাব বশত এই একাডেমি সম্পর্কে গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, অথবা বাংলার গবর্নর উদ্বোধনীতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল না।

১৪ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বক্তৃতায় স্যার প্রদ্যোৎকুমার বলিয়াছিলেন,

"এই অপরাহ্ণে আমরা সকলে একটি শিল্পকলা পরিষৎ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভায় সমবেত হইয়াছি। এই পরিষদের উদ্যোগে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের আহ্বান করিয়া বৎসরে বৎসরে এক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করাও এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। এইরূপ একটি পরিষৎ প্রতিষ্ঠা ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইলে শিল্পীদের অবোধ্যা দমন হইতে পারিবে।.....এ দুঃখ মনে মনে অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন যে এই দেশে ইয়োরোপের নানা সহরে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ চিত্রশালার মত কোনও চিত্রশালা নাই; যে কয়টি আছে, সেগুলি ব্যক্তিগত চিত্রশিক্ষাগার, জনসাধারণের প্রবেশাধিকারের সুযোগ সেখানে নাই। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের শিল্পকলার উন্নতি বিধানের জন্য এই আদর্শে একটি পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও বোম্বাইয়ের মত কলিকাতাতেও বৎসর বৎসর এক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় শিক্ষার্থীদিগকে সর্বপ্রথম শিক্ষিত করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে।"

দুটি মুখ—শ্রীযুক্তা রেণু অঙ্কিত রেখাচিত্র।

স্যার রাজেন্দ্রনাথও ওজস্বী ভাষায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। ফলে সকলের সমবেত চেষ্টায় একাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয় ও ইহার উদ্যোগে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়।

সমাপ্তিতে স্যার প্রদ্যোৎকুমারকে ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা সমবেত ভাবে সহি করিয়া যে মানপত্র দিয়াছিলেন ও তিনি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, এই একাডেমির ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চাহেন সেগুলি তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া পড়িবেন। আমরা এখান ওখান হইতে দুই একটি টুকরা তুলিয়া দিতেছি মাত্র।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিবসে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া স্যার প্রদ্যোৎকুমার বলেন,—

If we were asked what then is the meaning of this Exhibition, we might well answer, "To encourage Art of all kinds and from all Schools." I would respectfully invite people to look around and they will find the various classes of Fine Arts represented before us which is the essential significance of this happy combination of Eastern and Western Art. It is a question to which it would be presumptuous to attempt to give an exhaustive answer; anyway I think and, broadly speaking, I may affirm, that there is one thing, which above all others, this Exhibition does mean. It means that Artists and lovers of Art of all Schools will combine to promote Art and live together in a friendly atmosphere. They will be free to study Art according to their own light, freeing themselves from jealousy and hatred, which will make them to grow rich each in his own way; every one of them will be at liberty to practise Art according to his own beliefs and standards, so as to establish harmony amidst diversity. We want to break away from old stereotyped traditions and this is a task which the Academy has undertaken.

বাংলার গবর্ণর বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বলেন—

There has been a feeling that Calcutta also should endeavour to set and establish on a permanent basis the periodical exhibition of the artistic output of the year in India. It was left to my friend the Maharaja Bahadur,—the Maecenas, may I call him, of modern Bengal ?—to take the initiative in the matter and it is largely owing to his pertinacity and to his generosity that plans have now matured. The Inaugural Meeting, presided over by the Maharaja Bahadur, was held on the 15th of August of this year and I believe considerable doubts were entertained at the time as to the advisability of attempting to carry plans into effect during the present cold weather. Encouraged however by the warm responses which their proposals received, the promoters took courage in both hands and decided to hold an exhibition before Christmas. I am confident that when

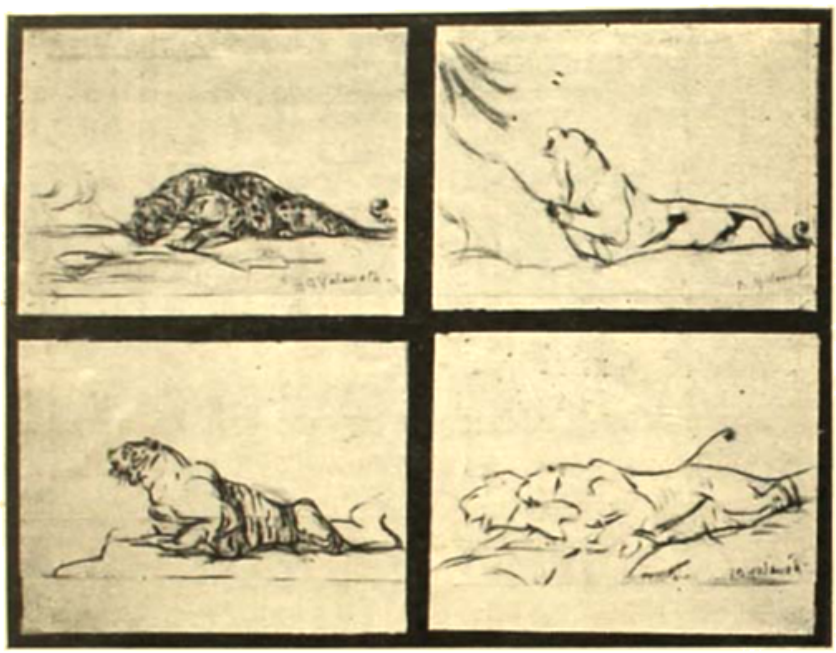

বাঘ আর সিংহ—এ, বি, ইসলাবস্কী (কলিকাতা) অঙ্কিত বোধহয়।

you have seen the exhibition which it is to be my privilege to open this morning, you will agree that a bold decision has been justified by results....

...It may be said, I think that the foundations of this project have been well and truly laid. It now behoves the promoters to do all in their power to ensure that continuity and expansion which will make our annual exhibition in Calcutta one of India's important artistic events. The venture has my warm sympathy and support, but it must depend for its success on the co-operation from year to year of a wide circle of men and women of culture.

মানপত্রের উত্তরে ৭ই জানুয়ারী তারিখে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার যে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন তাহাও স্থানে স্থানে দিয়ে উদ্ধৃত হইল—

The time has now come to abandon the prevalent personal jealousy and hatred which is based on false propaganda and ignorance. At any rate the combination of both East and West has resulted in a state of affairs about which Art teachers and Art students are now in general ageement that paintings and modellings of the finest quality can only have a deep effect in the awakening and fostering mutual interests, which will result in making beautiful what is claimed to be truly beautiful. This has been achieved, as far as one can judge, by the appreciaton of the public of high artistic culture, which the Academy of Fine Arts has been previleged to place before its Patrons and lovers of Art, and which it is the paramount duty of the promoters to establish and maintain with enthusiasm and energy.

The First Exhibition of pictures at the Opening of the Royal Academy was on the 26th April, 1767, and contained only paintings numbering 136, which only occupied two rooms in St. Martin's Lane. The rooms were crowded ; and even the streets outside were often impassable through the waiting of carriages and footmen, together with the people pressing to get in. Sir Joshua Reynolds contributed a good number of his own works, including one of his finest works, "Hope Nursing Love," which it was

ব্রঞ্জ —শ্রীচিন্তামণি দাস্ত বিখ্যাত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি।

my good fortune to see by the kindness of the late most esteemed great Marquis of Landsdowne at "Landsdowne House" in Berkeley Square, London, the metropolis of the world ; and which glowed before my eyes like a gem.

The success of the British school, as far as I have gathered from books and national biographies, is that each Artist follows the bent of his own genius ; and if for a while

one is placed as a teacher in the beginning of his career, he soon breaks loose from such teachings and throws away much of the lore he has obtained, to seek a way of his own as quickly as possible. Thus the British School, although there is a marked national style, yet

চিত্র—এম, এন মোয়াজী অঙ্কিত তৈলচিত্র।

the manner is as varied as the men of mark it includes; and the Art of each requires a separate consideration, each adding somewhat to the sum of differences that makes up the whole and each going to form the character of his School. For instance you will find a number of works by Zoffany in the Victoria Memorial Hall, who was a foreigner, descended from a Bohemian family, who came to England when about thirty years of age to learn the Art of Painting. He received very little encouragement, but during his stay in the midst of British Artists he improved in a great measure; the influence of the British School of Painting produced from [illegible] brush left little doubt that the best qualities of his Art were obtained in England; he is still recognised as one of great geniuses of the world. Two of his famous Paintings, the "Last Supper" in St. John's Church in Calcutta, another the "Embassy of Hyderbeck to Calcutta" invaluable gift of our much respected Vice-Patron, Sir Rajendranath Mukherjee, so triumphantly secured by my esteemed friend Sir Evan Cotton and the late Marquis Curzon, in England, which now adorns the wall of the Victoria Memorial Hall.

The monumental work of his life compiled by Lady Victoria Manners clearly shows how this great man improved on his art of painting from his former Bohemian School with the help of the English School of painting; so with bigotism, as you will find from Goetz and Kuhnel's book on Indian Painting that in order to improve Art the great Patron of the Art and Music, the Emperor Jehangir, freely encouraged European Art for the improvement of Indian Art wich to this day is looked upon as one of the precious gems of India.

It is not too much to say that among the best European Artists who visited India the names of the Daneills and Zoffany stand highest. Their enthusiasm for Art and their supreme effort in presenting before the British Public the poetic grandness of India's landscapes which enabled them to carry same out to perfection surmounted every difficulty in their execution. In a short time their great talents placed them in rivalship with the greatest Masters of their own period. From their biographies which give us a vivid account of their travels we are carried back to the good old days of dear John Company which clearly shows the rapidity with which they finished their compositions and immortalized their great works.

In the same way Indian Artists can amass a fortune and they will not be left alone for the want of bread.

আশা করি, একাডেমি অব ফাইন আর্টস্‌এর উদ্যোগে এই প্রদর্শনী আমরা বৎসরে বৎসরে দেখিতে পাইব এবং ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে।

এই প্রদর্শনী সম্পর্কে শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন মহাশয় ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'উদয়ন' পত্রিকায় ও এপ্রিলের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য।

একরঙা চিত্রগুলি ১৫১-বি ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ফটো-সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত ও তাঁহাদের সৌজন্যে প্রকাশিত।

একটি দিন

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল সাতটার সময় রূপাইকুড়া থানার সামনে হেরম্বের গাড়ী দাঁড়াল।

বিনুনা পর্যন্ত মোটরে আসতে তার বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু রাত বারোটা থেকে এখন পর্যন্ত গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে শরীরটাকে টান করে দাঁড়িয়ে হেরম্ব আরাম বোধ করল। এক টিপ নস্য নিয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পূব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রামের সবুজ চাপড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি দু'টি নয়, ধোঁয়ার নৈবেদ্যের মত অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধমাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতকগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। অনুমান হয় যে, ওটিই রূপাইকুড়া গ্রাম। গ্রামটির ঠিক উপরে আকাশে এখন রূপার ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি আসল রূপা নয়, মেঘ।

গাড়ী দাঁড়াতে দেখে থানার জমাদার মতিলাল বেরিয়ে এসেছিল। হেরম্বকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।

একটু অর্থহীন নিরীহ হাসি হেসে বললে, 'আজ্ঞে না, বাবু নেই। বরকাপাশীতে কাল একটা খুন হয়েছে, ভোর ভোর ঘোড়ায় চেপে বাবু তার তদারকে গেছেন। এবেলা ফিরবেন।—ঘরে গিয়ে আপনি বসুন, আমি জিনিষপত্র নামিয়ে নিচ্ছি। এ কিষণ! কিষণ! ইধার আও তো।'

আপিস ও সিপাহীদের ছোট ব্যারাকটির মধ্যে গম্ভীর লালিত্যহীন থানার বাগান। বাগানের শেষপ্রান্তে দারোগা-বাবুর কোয়ার্টার। চুণকাম-করা কাঁচা ইঁটের দেয়াল, তলার দিকটা মেঝে থেকে তিন হাত উঁচু পর্যন্ত আলকাতরা মাখানো। চাল খোলার। এ বছর বর্ষা নামার আগেই চালের খপ্‌ সমস্ত বদলে ফেলায় সকাল বেলার আলোতে বাড়ীটিকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। বাড়ীর সামনে চওড়া বারান্দা।

ভিতরে যাবার দরজার পর্দা ফাঁক করে একটি সুন্দর মুখ উঁকি দিচ্ছিল। হেরম্ব বারান্দার সামনে এগিয়ে আসতে খসে'-পড়া ঘোমটাটি মাথায় তুলে দেবার প্রয়োজনে মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য আড়ালে চলে গেল।

তারপর পর্দা সরিয়ে আস্ত মানুষটাই বেরিয়ে এল বারান্দায়।

আগ্রহ ও উত্তেজনা সংযত রেখে সহজ ভাবেই বললে, 'আসুন। রাস্তায় কষ্ট হয় নি?'

'হয়েছিল। এই মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম, সুপ্রিয়া।'

'আমায় দেখেই?' কোমল হাসিতে সুপ্রিয়ার মুখ ভরে গেল, 'বিশ্বাস করা একটু শক্ত ঠেকছে। যে রাস্তা আর যে গাড়ী, আসবার সময় আমি শুধু কাঁদতে বাকী রেখেছিলাম। পাঁচ বছর বাদ খোঁজখবর নেওয়াও দরকার মনে করেন নি, তাকে দেখে অত কষ্ট কেউ ভুলতে পারে?'

'আমি পারি। কষ্ট হলে যদি সহজে অবহেলাই করতে না পারব, পাঁচবছর তবে তোর খোঁজখবর নিলাম না কেন?'

'কত সংক্ষেপে কত বড় কৈফিয়ৎ! মেনে নিলাম ভাববেন না কিন্তু। আপনার সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভেতরে চলুন। জামা খুলে গা উদ্‌লা করে দিন, পাখা নেড়ে আমি একটু হাত ব্যথা করি! স্নান করবেন তো? আপনার জন্যে এক টব জল তুলে রেখেছি। ইঁদারা থেকে তোলা কিনা, বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নান করে আরাম পাবেন।'

সুপ্রিয়ার কথা বলার ভঙ্গীটি মনোরম। সকাল বেলাই এখন একশ' চার ডিগ্রি গরমে মানুষ সন্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সুপ্রিয়ার যেন একটি দার্জিলিঙের আবহাওয়ার আবেষ্টনী আছে। এত গরমেও তার কথার মাধুর্যের এক কণা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় নি, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাস দেখা দেয় নি। তার ইঁদারার জলের মতই সেও যেন জুড়িয়ে আছে।

বাইরের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরের বারান্দা হয়ে হেরম্বকে সে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। যেতে

বেতে হেরম্ব লক্ষ্য করে দেখল, চারিদিকে একটা অতিরিক্ত ঘরোয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাব। ও বোয়াকের ধোয়া মেঝে সবে শুকিয়ে উঠছে, দামী কালো সেগুনের কোথাও একটু ধাপ পর্যন্ত নেই। জলের বালতি, ঘটিবাটি, বসবার আসন প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিষগুলি পর্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে অবস্থান করছে। স্থানত্রষ্ট একটি চামচও বোধ হয় এ বাড়ীর কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না।

ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়া বললে, 'ওই ইজিচেয়ারটাতে বসে সবচেয়ে আরাম হয়। জামা খুলে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ুন। ভারপোকা নেই, কামড়াবে না।'

হেরম্ব জামা খুলে ইজিচেয়ারটাতে বসল। এলিয়ে পড়ার দরকার বোধ করল না।

'আমার আরামের আর কি কি ব্যবস্থা রেখেছিস বল তো?'

সুপ্রিয়া সত্যি সত্যিই পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করা সুরু করে বললে, 'আরামের ব্যবস্থার কথা আর বলবেন না, হেরম্ব দাদা। বিশ মাইলের মধ্যে চা'টি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না, এ এমন বুনো দেশ। যে কদিন থাকবেন, আপনাকে কষ্ট করেই থাকতে হবে।'—সে একটু হাসল—'তবে কষ্ট আপনারা সহজেই অবহেলা করতে পারেন, এই যা ভরসার কথা। নইলে মুস্কিলে পড়তাম।'

সুপ্রিয়ার এ ঘর সাজানো,ছবির মত সাজানো। বিছানার ধবধবে চাদরে কোথাও একটি কুঞ্চন নেই, বালিশগুলি নিটোল। দেয়ালের গায়ে পেরেক পোঁতার শেষ গর্ত্তটি চুণের তলে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকের টেবিলে সুপ্রিয়া ও তার স্বামীর প্রসাধন-সামগ্রীগুলির একটি কোনদিনই হয়ত আর একটির গায়ে ঠেকে যাবে না, সেলাইএর কলের চাকনিটি চিরদিন এমনি ধূলিহীন হয়েই থাকবে। প্রতিদিন সুপ্রিয়া কতক্ষণ ঘর সাফ করে আর ঘর গোছায় হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারছিল না। সুপ্রিয়ার পাখার বাতাসে স্নিগ্ধ হতে হতেও সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল।

একসময় একটু আচমকাই সে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'দোকানের মত ঘর সাজিয়েছিস কেন?'

সুপ্রিয়া অপ্রতিভ হয়ে গেল।

'দোকানের মত?'

'দোকানের মত না হোক, বাড়াবাড়ি আছে একটু। তোর ভাল লাগে?'

'কি জানি।'

'কি জানি! ভাল লাগে কিনা জানিসনে কি রকম?'

'অত বুঝি না। যুদ্ধাদোষের মত হয়ে গেছে। না করেই বা কি করি বলুন? সারাদিন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো মানুষের? একটা ছেলে দিয়ে ভগবান আমার কেড়ে নিলেন। বইটই পড়তে আমার ভাল লাগে না। এই সবই করি। কিন্তু—'সুপ্রিয়ার কথা বলার মধুর ভঙ্গী ফিরে এল, আমার 'কথা আগে কেন? আগে বলুন আপনার মা কেমন আছেন।'

'মা আশ্বিন মাসে স্বর্গে গেছেন।'

সুপ্রিয়া চমকে বললে, 'কি সর্ব্বনাশ!' তার দু' চোখ সজল হয়ে উঠল।

হেরম্ব বললে, 'মরবার আগে মা তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।'

সুপ্রিয়ার পাখা থেমে গিয়েছিল। আবার সেটা নাড়তে আরম্ভ করে বললে, 'আমাকে বড় ভালবাসতেন। আপনাকে হেরম্ববাবু বলার জন্য সকলের কাছে গাল খেয়েছি, উনিই শুধু হেসে বলতেন, পাগলী মেয়ে।'

হেরম্ব বললে, 'তখন তুই পাগলীই ছিলি, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিল। জবাব দিল না।

সুপ্রিয়া তারি গৃহস্থ মেয়ে।

গোয়ালা আজ কি কারণে এত বেলাতেও আসে নি। সুপ্রিয়া নিজেই চুরন্ত গরুর বাঁট টেনে হেরম্বের চায়ের দুধ বার করল। উঠানেরই একপাশে দরমার বেড়ায় ঘেরা স্নানের জায়গা। হেরম্ব সেখানে স্নান করছিল। এই সময় বাইরে এসে তার দুধ দোওয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়া বললে, 'বলুক তোলা টাটকা দুধ খাবেন একটু? ভারি উপকারী। উনি রোজ খান। দুইব বেশী করে?'

হেরম্ব বললে, 'বলুক তোলা দুধ শিশুতে খায়। অশোক বাড়ী ফিরলে তাকে খাওয়াস। কিন্তু এ কাজটা শিখলি কবে?'

'এ আবার শিখতে হয় নাকি।'

[redacted]য়। কারুর, সিথিনি বলে আমি পারব না।'

সুপ্রিয়া হেসে বললে, 'পারবেন। দুধ দেবার জন্যে তোর থেকে গরু আনায় হামলাচ্ছে, বাঁটে হাত দিলে দুধ করবে। তবে আপনাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে কিনা সন্দেহ,—ভঁতোবে হয়ত।'

'কাছে গেলেত! চাউনি দেখে কাল বোধ হচ্ছে না।'

'বড় দুরন্ত। দু'বেলা দড়ি ছিঁড়বে, ধরতে গেলে শিং নেড়ে তেড়ে আসবে। কত মোটা শেকল দিয়ে বাঁধতে হয়েছে দেখছেন না? আমি খেতে দি' বলে আমায় কিছু বলে না।'

সুপ্রিয় সন্দেহে তার গরুর গলা চুলকে দিল। বললে, 'ঘরেই আয়না চিরুণী আছে?'

গরুর সামনে কয়েক আঁটি খড় ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে গেল। কালরাত্রে ছানা কেটেছিল, তাই দিয়ে তৈরী করল সন্দেশ, সন্দেশ ভাল হল না বলে তার যে কি দুঃখ!

হেরম্বকে দিয়ে বললে, 'আপনি খাবেন কিনা, তাই আজ পরীক্ষা করেছে।'

হেরম্ব সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আহা লোক না, খাব বৈ ত নয়।'

'খাবার জন্যই তো খাবার, কিন্তু তাই বলে যা তা দেওয়া যায়? মিহি না হলে সে আবার সন্দেশ! কাল রাত্রে পড়লাম ফিট হয়ে, নইলে রাত্রেই করে রাখতাম। সারা রাত ফেলে রেখে সে ছানায় কি সন্দেশ হয়!'

হেরম্ব খাওয়া বন্ধ করে বললে, 'তোর না ফিট সেরে গিয়েছিল?'

'গিয়ে তো ছিল, এ বছর আবার হচ্ছে। কাল নিয়ে দু'বার হ'ল। রান্নাঘরে ছানা তুলছি, হঠাৎ মাথার মধ্যে এমনি ঝিমঝিম করে উঠল। তার পর আর কিছু মনে নাই। জ্ঞান হতে দেখি পাড়ে আর দাই গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছে, রান্নাঘর ভেসে একেবারে পুকুর!'

'তা আনি।' হেরম্বকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে সুপ্রিয়া রান্নাঘরে চলে গেল।

চা এনে সে অন্য কথা পাড়ল।

'হাঁটীতে ক'দিন ছিলেন?'

'চারদিন।'

'এখানে কতদিন থাকবেন?'

'একদিন।'

সুপ্রিয়া ভ্রু কুঁচকে বললে, 'রক্ষে পেলেম। গেলেই বাঁচি।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে নীচের চিবুক রেখে হেরম্ব বললে, 'আমাকে দুই ক'দিন রাখতে চাস?'

'দিন? বছর বলুন।'

একথা হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নাই। সুপ্রিয়া আকস্মিকতা পছন্দ করে না। ওর হিসাবে দিন নেই, মাস নেই, বছর দিয়ে ও জীবনকে মাপ করেছে। ওর প্রকৃতির কল্পনাভীত সহিষ্ণুতা হেরম্বের অজানা নয়।

তবু তাকে বলতে হল, 'বছর নয়, মাস নয় সপ্তাহও নয়। একদিন। শুধু আজ।'

সুপ্রিয়া কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

'ওবেলাই চলে যাবেন?'

'না, কাল সকালে।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বললে, 'আপনি মানুষ নন, হেরম্ব বাবু। মানুষের মধ্যে অন্ততঃ ছিটেফোঁটা দুর্বলতা থাকে। একদিন থাকবার জন্য এমন করে আপনার আসার দরকার কি ছিল? পাঁচ বছর খোঁজ নেন নি, আরও পাঁচ বছর নয় নিতেন না।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে কাপড়ে মুখ মুছে হেরম্ব বললে, 'তাতে লাভ কি হত রে?'

সুপ্রিয়া পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বললে, 'আপনি বাড়ীতে এলে বাইরের ঘরে বসিয়ে এককাপ চা আর একটু মুখে পাঠিয়ে দিতাম। মনে মনে বলতাম, আপদ বিদায় হলেই বাঁচি।'

হেরম্ব একটু হেসে বললে, 'আচ্ছা, এবার দশ বছর পরে আসব। মনে তোর ক্ষোভ রাখব না, সুপ্রিয়া।' সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি তা পারেন। ছেলেমানুষ পেয়ে বুদিয়ে ভাসিয়ে আমার যখন বিয়ে দিয়েছিলেন তখনি জেনেছিলাম আপনার অসাধ্য কর্ম নেই।'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বললে, 'আমি তোর বিয়ে দিইনি সুপ্রিয়া, তোর বাবা দিয়েছিলেন। হাঁরে, বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও বোধ হয় আমি দিইনি। দিয়েছিলাম?'

সুপ্রিয়া শেষ কথাটা কানে তুলল না। বললে, 'বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বৈ কি! আমাকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাজী করেছিল কে? কার মুখের বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি ভেসে গিয়েছিলাম? কি সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথা! কত কথার মানে বুঝি নি। কিন্তু শুনে গা শিউরে উঠেছিল! আচ্ছা, সে সব কথা অভিধানে আছে?'

জবাব দিতে হেরম্বকে একটু ভাবতে হল। সুপ্রিয়ার ঝগড়া করার ইচ্ছা নেই এটা সে টের পেয়েছিল। কিন্তু তার অনেক দিনের জমানো নালিশ, বলায় না করলেও নালিশগুলি ও জানিয়ে রাখবে। না জানিয়ে ওর উপায় নেই। মনের বেপথো এত অভিযোগ পুষে রাখলে মানসিক সুস্থতা কারো বজায় থাকে না। এখনকার মত কথাগুলি স্থগিত রাখলেও সুপ্রিয়ার চলবে না। সে কাল চলে যাবে, দু'চার বছরের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় সুপ্রিয়া বিশ্বাস করে না। যা বলার আছে এখুনি সব বলে নিয়ে বাকী দিনটুকু নিশ্চিন্ত মনে অতিথির পরিচর্য্যা করবার সুযোগটা সে বুঝি সৃষ্টি করে নিতে চায়। তার সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার কারণটা সে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দিতে চায়।

চোখের জলের মধ্যে সুপ্রিয়ার বক্তব্য শেষ হবে কি না ভেবে হেরম্ব মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল।

'তোর ভালর জন্য যতটুকু বলা দরকার তার বেশী আমি কিছুই বলি নি, সুপ্রিয়া।'

'না বলে আমার মন্দটা কি হত? স্কুলে পড়ছিলাম, লেখাপড়া শিখে চাকরী করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতাম। আপনি আমাকে তা করতে দেন নি কেন?'

হেরম্ব মাথা নেড়ে বললে, 'তোর সহ্য হত না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলে 'কেন হত না? পাঁচ বছর এই ঘুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, পরমাত্মীয়ের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি,—কিমিয়ে পড়েছি একেবারে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে আমার সহ্য হত না কেন?'

হেরম্ব বললে, 'দাসীবৃত্তি করছিস না কি!'

সুপ্রিয়া তার সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রেখে বললে, 'ধরতে গেলে কথাটা তাই দাঁড়ায় বৈকি।'

হেরম্ব আবার মাথা নেড়ে বললে, 'না, তা দাঁড়ায় না। দাঁড়ালেও পৃথিবীশুদ্ধ সব মেয়ে হাসিমুখে যে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে তোর নালিশ সাজে না। চাকরী করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো তুই হয়তো খুব মজার ব্যাপার মনে করিস, আসলে কিন্তু তা নয়। আর্থিক পরাধীনতা স্বীকার করবার সাহস যে মেয়ের নেই তাকে কেউ ভালবাসে না। তা ছাড়া,—'এইখানে ইজিচেয়ারের দুইদিকের পাটাতনে কনুইয়ের ভর রেখে হেরম্ব সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'তাছাড়া স্বাধীনতা তোর সইত না। কতকগুলি বিশ্রী কেলেঙ্কারি করে জীবনটা তুই মাটি করে ফেলতিস।'

সুপ্রিয়া সংক্ষেপে শুধু বললে, 'ইস্!'

'ইস্ নয়। ওই তোর প্রকৃতি। পনের বছর বয়সেই তুই একটু পেকে গিয়েছিলি, সুপ্রিয়া। বাইশ তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে, তোর মধ্যে সেটা পনের বছর বয়সে এসেছিল। তখনি তোর জীবনের দুটো পথ তুই একেবারে স্থির করে ফেলেছিলি। তার একটা হল লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হয়ে থাকা, আর একটা—' হেরম্বকে একটু থামতে হল, '—অন্যটা এক অসম্ভব কল্পনা।'

সুপ্রিয়া আবার পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'অসম্ভব কেন?'

হেরম্ব চেয়ারে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

'যা তুই, রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরে আয়গে। যা।'

হেরম্বের আদেশে নয়, আতিথ্যের প্রয়োজনেই সুপ্রিয়াকে একসময় রান্নাঘরে যেতে হল। মনে তার কঠিন আঘাত লেগেছে। সংসারে থাকতে হলে সংসারের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় এটা সুপ্রিয়া জানে এবং মানে। বিয়েই যখন তার করতে হল তখন মোটা মাইনের হাকিম অথবা অধ্যাপক অথবা পসারওয়ালা ডাক্তারের বদলে একজন ছোট দারোগার সঙ্গে তাকে সেঁধে দেওয়া হল কেন ভেবে তার কখনো আপশোষ হয়নি। বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মানুষকে যে সব হিসাব ধরতে হয় সেদিক থেকে বরলে কোন ছেলে মেয়েই সংসারে ঠকে না। এক বড় দারোগা যাচাই করতে এসে তাকে পছন্দ করেনি। তার নাকটা যে বোঁচা সে অপরাধও সেই বড় দারোগার নয়। একটি চোখা নাকের জন্য কত

বছর বড় ধারোগা হয়ে তাকে বাতিল করে দেওয়াটা সুপ্রিয়া তার অন্যায় মনে করে না। তবু তার কিশোর বয়সের কল্পনাটি অসম্ভব কেন সুপ্রিয়া তার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করতে পারে নি।

তার হতাশ বেদনা আজও তাই কেবিল হয়ে আছে। চেনা মানুষ, জানা মানুষ, একান্ত আপনার মানুষ। যে নিয়মে অচেনা অজানা ছোটদারোগা তার স্বামী হল, ওই মানুষটির বেলা সে নিয়ম খাটবে কেন? ও খাটতে দেবে কেন? একি বিস্ময়কর অকারণ অন্যায় মানুষের! কেন, ভালবাসা বলে সংসারে কিছু নেই নাকি? সংসারের নিয়মে এর হিসাবটা ক'ষবার ফাঁক নেই নাকি?

সুপ্রিয়া ভাবে। এত ভাবে যে বছরে তার দু'তিনবার ফিট হয়।

সুপ্রিয়াকে ভালভাত রাঁধতে হয় না, একজন পাকে সিপাহী বেগার খেয়। সুপ্রিয়া রাঁধে মাছ তরকারী, রাঁধে ছানার ডালনা। গৃহকর্মকে সে সত্য সত্যই এত ভালবেসেছে যে, মাছের ঝোলের আলু কুটতে বসেই তার মনের আঘাত মিলিয়ে আসে। ওবেলা গা থেকে দু'টো ঘুঁটে আনবার মতলবটাও এসময় সে মনে মনে স্থির করে ফেলে।

রান্নার ফাঁকে একসময় হেরম্বকে শুনিয়ে আসে, 'আর কেউ হ'লে রান্নাঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করত। — ওমা, ঘুমে যে চোখ চুলছে!'

'তারি ঘুম পাচ্ছে সুপ্রিয়া। সারারাত ঘুমোই নি।'

সুপ্রিয়া বলে 'তাই বলে, এখন এই সকাল বেলা ঘুমোতে পাবেন না। সারাদিন শরীর বিশ্রী হয়ে থাকবে। আরেক কাপ চা পাঠাচ্ছি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন্, তারপর দুপুর বেলাটা পড়ে পড়ে যত ইচ্ছে ঘুমোবেন।'

দুপুর বেলা হেরম্বের সঙ্গে গল্প করবে, না কয়েকটা বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরী করতে বসবে এতক্ষণ সুপ্রিয়া তা ঠিক করে উঠতে পারে নি। দুপুরে হেরম্বের ঘুমের প্রয়োজনে এ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

তবে, একা ফেলে রেখে কি আর খাবার করা যেত? পেটুক তো সহজ নয়! এ বেশ হল। ঘুমোবার সময়ের মধ্যেই হাত চালিয়ে সব করে ফেলব। তারপর গা ধুয়ে এসে আর কাজ নয়। শুধু গল্প।

গল্পীর হেরম্বের সঙ্গে সে কি গল্প করবে সে-ই জানে।

হেরম্বের জন্যে আবার চা করতে গিয়ে সে ফিরে আসে।

'একটু ব্র্যাণ্ডি খাবেন? শরীরের জড়তা কেটে যাবে।'

সে তামাসা করছে ভেবে হেরম্ব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'ব্র্যাণ্ডি! ব্র্যাণ্ডি তুই পাবি কোথায়?'

'আছে। উনি খান যে।'

হেরম্ব অবাক হয়ে বলে, 'অশোক মদ খায়?'

সুপ্রিয়া হাসে।

'নেশা করবার জন্যে কি আর খায়? শরীর ভাল নয় বলে ওষুধের মত খায়। আমিও ক'দিন খেয়েছি। খেলে এমন চনচনে লাগে শরীর যে, মনে হয় ওজন অর্ধেক হালকা হয়ে গেছে। একদিন,—রাগ করবেন না তো?—একদিন অনেকটা খেয়ে ফেলেছিলাম। নেশার শেষে অন্ধকার দেখতে লাগলাম!'

'তোর সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। নেশায় কেউ অন্ধকার দ্যাখে?'

'দ্যাখে না? আমার যেরকম ভয় হয়েছিল, আপনার হলে বুঝতেন।' চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুপ্রিয়া একটা চাবি বেছে ঠিক করে, 'বসুন, চা খাবেন, না ব্র্যাণ্ডি খাবেন। আলমারিতে দু বোতল আছে। কি রঙ! দেখলে খেতে লোভ হয়!'

মাতাল হবার জন্যে স্বামী মদ খায় না বলে এটা সুপ্রিয়ার কাছে এখনও হাসির ব্যাপার। কিন্তু হেরম্বর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার হাসি ডুবে যায়।

সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'রাগ করলেন? হেরম্বর রাত-জাগা লাল চোখ, এ প্রশ্নে তার দিকে ফিরে আসে না, স্কুলের ছেলের সামনে কড়া মাষ্টারের মত তার গাম্ভীর্য কোথাও একটু টোল খায় না। রুক্ষ নীরস কণ্ঠে সে সংক্ষেপে বলে, 'না।'

সুপ্রিয়ার কানে কথাটা ধমকের মত শোনায়। নিজেকে তার হঠাৎ অসহায়, বিপন্ন মনে হয়।

'কি হল, বলুন। আপনাকে বলতে হবে। আমি ব্র্যাণ্ডি খেয়েছি বলে? সত্যি বলছি একদিন শুধু সখ করে একটুখানি—'

হেরম্ব বলে, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলিসনে, সুপ্রিয়া। তোর অনেক বয়স হয়েছে।'

সুপ্রিয়া ৬'পা সামনে এগিয়ে যায়। হেরম্বর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, 'ছেলেমানুষের মত কথা আমি বলি নি। আপনিই আমায় ছেলেমানুষ করে রাখছেন।—এসব চলবে না, তাকান, তাকান, তাকান আমার দিকে। আমার ৬'বছর বিয়ে হয়েছে, আমি কচি খুকী নই যে, হঠাৎ কেন এত রেগে গেলেন শুনতে পাব না।'

হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল না। তেমনি ভাবে বসে তেমনি কড়া সুরে বললে, 'শুনে কি হবে? তুই কি বুঝবি? তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তুই এমন আস্তে আস্তে নিজের সর্বনাশের ব্যবস্থা করছিস কেন? আমি তোকে ভাল উপায় বলে দিচ্ছি। রাত্রে একদিন অশোককে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিস।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সুপ্রিয়া কেঁদে ফেলে রান্নাঘরে চলে গেল। তার মনে হতে লাগল, বিশেষ ভাবে তাকে আঘাত করবার জন্যই হেরম্ব এতকাল পরে তার বাড়ীতে অতিথি হয়েছে। ৩'দিনের নোটিস দিয়ে ওর আকস্মিক আবির্ভাবটা গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। পাঁচ বছরে তার মনের অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে, আগে তার একটা ধারণা করে নিয়ে তাকে আঘাত দিয়ে অপমান করে তার কল্পনা ও স্বপ্নের অবশিষ্টটুকু মুছে নেবার উদ্দেশ্যেই হেরম্ব তার বাড়ীতে পদার্পণ করেছে। তাকে ও শাসন করবে। সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত একটি বাগানে তার ফুল বিস্তার করা দরকার বলে তার সব বাহুল্য ডালপালা ছেঁটে ফেলবে, এমন একটি শাখা রেখে যাবে না, যেখানে সে দু'টি অনাবশ্যক ফুল ফোটাতে পারে।

ছোট দারোগার সঙ্গে হেরম্ব তার বিয়ে দিয়েছিল। আজ একদিনে সে তাকে ছোট দারোগারই বৌ তৈরী করে দিয়ে চলে যাবে।

এবার আর কাকে সুপ্রিয়া সহজে মন বসাতে পারে না, মাছের ঝোলে আলুর বদলে গোটা গোটা আলু ছেড়ে খুন্তি দিয়ে তরকারীর মত খুঁটে তোলে। নুন দেওয়া হয়েছে কি না মনে করতে না পেরে খুন্তিটা উঁচু করে চাখা হবার সময় না দিয়েই এক কৌটা তপ্ত ঝোল জিভে ফেলে দেয়। সমস্ত জালাটাই সে টের পায়, নুনের স্বাদ পায় না।

ডেকে বলে, 'ও পাড়ে, ভাখতো নিমক দিয়া কি নেই?' এবং মাছের ঝোল মুখে করা দূরে থাক, পাড়ে তার ছোঁয়া পর্যন্ত খায় না স্মরণ করে তার রাগ হয়।

'যাও, তুমি বাবার চলা যাও।'

ভাবে, 'হয়েছে। আজ আর আমি রেখে খাইয়েছি।'

তার মনের মধ্যে হেরম্বের কথাটা পাক খেয়ে বেড়ায়। শরীর খারাপ বলে অশোক ওষুধের মত মদ খেলে তার অপরাধটা কোনখানে হয় সে ভেবে পায় না। আজকের ওষুধ কাল অশোকের নেশায় দাঁড়িয়ে গেলেও সে ঠেকাবে কি করে? বারণ সে করতে পারে। একবার কেন দশবার বারণ করতে পারে। দরকার হলে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু চাকরীর জোরে বিয়ে-করা বৌএর কথা শুনছে কে? সংসারে সকলে যদি তার কথামতই চলত তবে আর ভাবনা ছিল কিসের! মনের আসক্তি জন্মে যাবার আশঙ্কা অশোক হেসেই উড়িয়ে দেবে। বলবে, 'ফেলেছ? আমার এটুকু মনের জোর নেই? এ বোতল দুটো শেষ হলে হয় ত আর কিনবার দরকার হবে না।' বলবে, 'কতগুলো টাকা! থাকলে পোষ্টাপিসে জমত। সাধ করে কেউ অত দামী পদার্থ ফেলে!'

সে জবাব দেবে কি? স্বামীর মনের জোরে সন্দেহ প্রকাশ করবে? তার স্বাস্থ্য ভাল করার দরকার নেই বলে আপত্তি ধরবে? অশোক দশকে উঠলে তার মুখখানা হেরম্ব যেন তখন দেখে যায়।

গরমে আগুনের তাতে সুপ্রিয়া এতক্ষণে ঘেমে উঠেছে। উঠানে চনচনে রোদ। একটু বাতাস গায়ে লাগাবার জন্য দরজার কাছে সরে গিয়ে সুপ্রিয়া দেখতে পেল, হেরম্ব শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনের মাঝে উঠানের ব্যবধান ভরে ঝাঁকালো কড়া রোদটা সুপ্রিয়ার কাছে ছলকের মত ঠেকল।

বারান্দা থেকেই হেরম্ব বললে, 'এত গরমে তোর না দাঁড়ালেও চলবে, সুপ্রিয়া। পাড়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়, যা পারে ওই করবে।'

সুপ্রিয়া কথা বললে না। আঁচলে মুখ মুছে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হেরম্ব বললে, 'আমাকে চা দিলি না যে?'

'এত গরমে একপোয়া চা খেতে হবে না।'

'এক গেলাস জল দে তবে।'

হেরম্ব তৃষ্ণার্ত জেনে সুপ্রিয়ার সেবাবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল।

'সরবৎ করে দেব? লেবুর সরবৎ?'

হেরম্ব আগ্রহ জানিয়ে বললে, 'দে, তাই দে।'

আহত, উত্তপ্ত ও ঘর্মাক্ত সুপ্রিয়ার হাত থেকে সরবতের গ্লাস নেবার সময় একমুহূর্তের জন্য হেরম্বের মনে হল হয়ত সত্য সত্যই মেয়েদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পুরুষেরা গোড়াতেই কোথাও একটা গলদ বাধিয়ে বসে আছে, যে জন্যে ওদের মনের শৈশব কোনদিনই ঘুচতে চায় না। ঘুন যদি ধরে তো একেবারে কাঁচা মনেই ধরে, নইলে ওরা আজন্ম শিশু। জীবন-সাগরের তীরে বালি খুঁড়ে পুকুর তৈরী করে ওরা খুশী থাকবে, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সে কীর্তির তুলনা কখনো করবে না। ডাবের জলে ডাবের শাঁসে জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয় চিরদিন এই থাকবে ওদের ধারণা; জগতের ক্ষুধাও ওরা বুঝবে না, তৃষ্ণার প্রকৃতিও জানবে না। এবং এই অজ্ঞানতার অন্ধকারের জন্য নিজেদের মনে করবে রহস্যময়ী, সৃষ্টির প্রহেলিকা।

সরবত পান করে হেরম্ব বললে, 'কাল ফিট হয়েছিল, আজ আবার রাঁধতে গেলি কেন?'

'বাড়ীতে অতিথি, রাঁধব না? অতিথি খাবে কি?'

'অতিথি দইচিঁড়ে দিয়ে ফলার করবে।'

'অতিথির অত দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।'

সুপ্রিয়ার মুখের মেঘ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে, হেরম্ব খেয়ালী মানুষ, মনের খেয়ালে ও যদি একটা অদ্ভুত কিছু করতে চায়, রাগ করে আর কি লাভ হবে? যে উদ্দেশ্যে যে মনোভাব নিয়েই ও এসে থাক, সে বিনা প্রতিবাদে ওকে গ্রহণ করবে। নিজের সুখ দুঃখ মান অভিমানের কথাটা একেবারেই ভাববে না। বড় ভাইএর মত ও যদি তাকে শাসন করে, ছোট বোনের মত সে নীরবে শাসিত হবে। মাতৃ কল্যাণকামীর মত ও যদি তার মনে ব্যথা দেয়, মুখ বুঁজে সে ব্যথিত হবে। ও যদি তার চোখের জল দেখতে চায়, দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে ওকে সে চোখের জল দেখাবে। স্বপ্নহীন মাধুর্য্য-হীন রুক্ষ বাস্তবতার মধ্যে তাকে যদি আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেখতে চায়, পাকা গিন্নীর মত ব্যবহার করে ওকে তাক লাগিয়ে দেবে।

হেরম্বর নিস্পন্দ প্রভাতটি অতঃপর সুপ্রিয়ার এই গোপন প্রতিজ্ঞার ফলাফলে ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সহসা সুপ্রিয়া যেন তার কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্যের আবরণ নিয়েছে। বিলাসকামী কবির কাছে বেদনাময়ীর অভিশাপের মত সুপ্রিয়ার আকস্মিক ও অভিনব সহজ হাসিখুশীর ভাবটা হেরম্বের কাছে দুর্বলের বিদ্রূপ প্রতিশোধ নেওয়ার মত ঠেকতে লাগল। মনে হল, উদারার জলের মত ঠাণ্ডা মেয়েটা হঠাৎ বরফ হয়ে গেছে। স্নিগ্ধতা দেখালে আরও জমাট বাঁধছে, রুক্ষতার উত্তাপে নিমা বাষ্পবায়ে গলতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। কিন্তু গ্রহণ করছে না কিছুই।

সুপ্রিয়ার রান্না শেষ হতে বারটা বাজল। কিট হতে মুক্ত হওয়ার পর থেকে তার চোখের তলে নিষ্প্রভ কাজলের মত একটা কালিমার ছাপ পড়ছিল। এই আবেষ্টনীর মধ্যে তার চোখ দু'টি আজকাল আরও বেশী উজ্জ্বল দেখায়। এখন, এইক্ষণ এই গরমে কাঠের উনানে রান্না করার ফলে তার সমস্ত মুখ মলিন নিরুজ্জ্বল হয়ে গেছে। হেরম্ব আর একবার স্নান করবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেরম্ব ব্যথিত হল। একবার থেকে কেবল রান্না করে খাওয়ার পাসলামী মেয়েদের কেন আসে হেরম্বের তা অজানা নয়। আরও অনেককেই সে এ নেশায় মেতে থাকতে দেখেছে। সুপ্রিয়ার মত তাদেরও এমনি রান্নার ঝোঁক চাপে, রেঁধে রেঁধে আধমরা হয়ে তারা খুশী হয়।

অথচ তাদের সঙ্গে, যারা ভাববার উপযুক্ত মন থেকে বঞ্চিত, সুপ্রিয়ার একটা অতিবড় মৌলিক পার্থক্য আছে। ওর এত রান্না করাকে হেরম্ব কোন মতেই সমর্থন করতে পারল না।

বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়ীর প্রাচীর ডিঙিয়ে বহুদূর অবধি প্রান্তর চোখে পড়ে। মাঠ থেকে এখন আগুনের হল্কা উঠছে। খানিক তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া আনমনে হেরম্বর স্বাস্থ্যের সম্পর্কীয় উপদেশ শুনলে। কিন্তু তার একটি কথাতেও সায় দিলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুমিয়ে উঠে হেরম্ব দেখলে আয়নার সামনে সুপ্রিয়া চুলবাঁধা শেষ করে এনেছে। সে টের পেলে, সুপ্রিয়ার একটি আশা সে পূর্ণ করেছে। প্রসাধন শেষ হবার আগে ঘুম ভেঙে সে তাকে দেখবে সুপ্রিয়ার এই কামনা হেরম্বকে রীতিমত বিস্মিত করে দিলে।

'চুলের জট ছাড়াতে কান্না আসছিল, হেরম্ববাবু। কপাল ভাল, তাই একটু আগে আপনার ঘুম ভাঙে নি। তখন আমার মুখ দেখলে আর এক মিনিট এ বাড়ীতে থাকতে সাধ হতেন না।'

দু'হাতের তালু একত্র করে মাথার পিছনে রেখে হেরম্ব বললে, 'ডেকে তোলা উচিত ছিল। চুলের জট ছাড়াবার সময় তোমার মুখভঙ্গী দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।'

'পরিহাস ভাল লাগা নিয়েই তো কারবার আপনার।'

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি খোঁপা বেঁধে ফেললে। আয়নায় একবার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে নিজের মুখখানা দেখে নিয়ে প্রসাধনে যবনিকা-পাত করলে।

বললে, 'আর শুয়ে কেন? বাইরে বসে চা খাবেন চলুন। এর মধ্যে চারিদিক জুড়িয়ে গিয়ে কির কির বাতাস বইছে।'

'রাত্রে এখানে ঠাণ্ডা পড়ে?'

সুপ্রিয়া হেসে মাথা নাড়লে, 'গরম কমে, ঠাণ্ডা পড়ে না। তবে খুব বাতাস বয়,—ওই যে কাউ গাছগুলি দেখছেন? সমস্ত রাত সাঁ সাঁ করে ডাকবে, শুনতে পাবেন।'

হেরম্ব ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে গেল।

'কাউ গাছের কাছ থেকে বেড়িয়ে আসি চল্, সুপ্রিয়া।'

'যাবেন?' সুপ্রিয়া এক মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল,—'তবে উঠুন, উঠে শীগগির তৈরী হয়ে নিন। আমি চট করে চা করে ফেলছি। উঠুন না!'

হেরম্ব প্রশান্তভাবে শুয়ে রইল। উঠবার তার কোন তাড়াই আর দেখা গেল না। আলস্যের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে স্তিমিত চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'আলস্যেমি লাগছে, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'যাবেন বললেন যে?'

'যাব বললাম বটে কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, কাউ গাছ দূর থেকেই ভাল দেখায়।'

'অন্যদিকে চলুন তবে? চলুন দুজনে মাঠে খানিকটা ঘেঁটে আসি। যাবেন বলেছেন যখন, আপনাকে যেতে হবেই, হেরম্ববাবু। উঠুন। দশ পোশাক মধ্যে না উঠলে হাত ধরে টেনে তুলে দেব।'

হাত ধরে টেনে তোলার উক্তিটা সুপ্রিয়ার আকস্মিক নয়। হাত ধরে টেনে তোলবার সুযোগটা হেরম্ব তাকে দেবে এ আশাও সুপ্রিয়া করছিল। কিন্তু এটুকু বুঝবার মত নিবিড় মনোযোগ সুপ্রিয়ার প্রতি হেরম্ব বজায় রাখতে পারে নি। সুপ্রিয়ার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিছানায় উঠে বসলে।

সুপ্রিয়াকে চেষ্টা করে চোখের জল নিবারণ করতে হল। তার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে পদে পদে বাধা না পেয়ে তার উপায় ছিল না। গোধূলি-লগ্নে নির্জ্জন তরঙ্গায়িত প্রান্তরে তার সঙ্গে পাশাপাশি বেড়াতে যাওয়া হেরম্বের কামা নয় সন্দেহ করে, কামা হলেও একটা তুচ্ছ খেয়ালের বশে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ সে সত্যসত্যই দমন করে ফেলেছে নিশ্চিত জেনে, সুপ্রিয়া কম আহত হয় নি। তবু, হৃদয়কে হেরম্ব জোর করে নিয়ন্ত্রিত করছে এই ধারণা সুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু সে যে ছুতো করে হেরম্বের হাত ধরে টেনে তুলতে চায় এটা হেরম্ব খেয়াল পর্য্যন্ত করতে পারল না দেখে নিজেকে তার অপমানিত ও অবহেলিত মনে হতে লাগল। সে যেন বুঝতে পারলে, হেরম্বের মন থেকে সে মিলিয়ে গেছে। একটা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির, একটা মোটা সাংসারিক প্রতিকারস্পৃহার আশ্রয় ছাড়া হেরম্বের কোন মনোবৃত্তিই আর তাকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে নেই।

মাঠে হেরম্ব তাকে বেড়াতে নিয়ে গেল। কিন্তু বেড়ানো উপভোগ করার ক্ষমতা সুপ্রিয়ার আর ছিল না। সমস্ত দুপুরটা প্রকৃতির গ্রীষ্ম আর উনানের ধোঁয়া সহ্য করে সে কল্পনার জাল বুনেছে। ভেবেছে, পথের গ্লানি কেটে গেলে বিকালে শত অনিচ্ছাতেও নিজেকে ও প্রকাশ না করে পারবে না। নিজের অজ্ঞাতেই ও কত কথা বলবে, কত ভুল করবে, কত সময় অন্যমনে আমার দিকে চাইবে। ও টেরও পাবে না

ওর কোন কথাটি কুড়িয়ে, কোন কলটি ধরে, কোন চাউনির মানে বুঝে ওকে আমি চিনে ফেলছি। সুপ্রিয়া আরও ভেবেছে, আমি এখন বড় হয়েছি। পাঁচ বছর ধরে ভেবে ভেবে আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে একটা ব্যাপার চলে না। বেশ মোটা করে ভালবাসা বুঝিয়ে না দিলে—

সারা দুপুর সুপ্রিয়া এইকথা ভেবেছে। ভেবেছে আমার এই শরীরটা এত সুন্দর নয় যে, শুধু চোখে দেখার সান্নিধ্যে কেউ খুসী হয়। ওর মনের বাজে খেয়ালটা নষ্ট করে দিতে হলে আমাকে লজ্জা একটু কমাতে হবে। ওর কি, কাল চলে গেলে মস্ত একটা ত্যাগ করার গৌরব নিয়েই বাকী জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দেবে। সর্বনাশ আমার। কাকে নিয়ে থাকলে আমার চলবে কেন? আমি যে একটা দিনের জন্য সুখ পেলাম না, সারাদিন আমার যে কিছু ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না—

কাল ও জন্মের মত চলে গেলে বেঁচে থেকে আমি কি করব? এতদিন আশায় আশায় কাটিয়েও যে কষ্টটা আমি পেয়েছি ও তার কি বুঝবে! ছাই সংসার, ছাই ভালবন্ধ! ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল। একজনের আদর সইতে না পেরে আমার যদি শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হতে থাকে, জগতে কিসে তবে আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব শুনি? পাঁচ বছর পরীক্ষা করেই তো বোঝা গেল এসব আমার পোষাবে না। ফলের মত হাত পা নেড়েছি, শুয়েছি বসেছি হেসেছি পর্যন্ত; কিন্তু আমি তো জানি কি করে এতকাল আমার কেটেছে, দিনের মধ্যে কতবার আমার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে সাধ গিয়েছে।

না বাবু, এমন করে একটা দিনও আমি আর থাকতে পারব না।

কড়াইএ ফেনার তলে অমৃতপ্রায় রসগোল্লাগুলির দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, আমি ওর সঙ্গে চলে যাব। কিছুতেই আমাকে ফেলে রেখে যেতে দেব না। বলব আপনার জন্য হোক্, আমার জন্যই আমাকে নিয়ে চলুন। না নিয়ে গেলে আমি যে জীবনে প্রথম বার ওর অবাধ্য হয়ে বিষ খেয়ে মরে যাব একথাটাও ওকে আমি জানিয়ে দেব।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হেরম্বের সঙ্গে শুকনো খালে ঢাকা ঘাটে হাঁটতে হাঁটতে সুপ্রিয়া তার এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে মূক হয়ে গিয়েছিল। এই স্তিমিত নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষটির সঙ্গে গিয়ে তার লাভ কি হবে? ওতো ভুলে গিয়েছে। ও আর না চায় সুপ্রিয়ার দেহ, না চায় তার মন। সংসারের টানে সুপ্রিয়া ওর কাছ থেকে ভেসে গিয়েছে। ওর আর ইচ্ছা নয় সাঁতরে সে ফিরে আসে।

হে ভগবান! জগতে এমন ব্যাপার ঘটে কি করে!

মাটির স্থির তরঙ্গের মত একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে সুপ্রিয়া অস্ফুট স্বরে বললে, 'একটু বসি।' তারা বসল, পানার মিটমিটে আলোটির দিকে মুখ করে।

সুপ্রিয়া বললে, 'বৌএর কথা বলতে আপনার কি কষ্ট হয়?'

হেরম্ব পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জবাব দিল, '

'বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?'

'জানি না।'

চারিদিকে অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে আসছিল। রূপাই-কুড়া গ্রামে দু'একটি আলোকবিন্দু সঞ্চরণ করছে। বছরে দুবার আকাশে তারাখসার মরসুম আসে, এখন আর শীত কালে। আকাশে অর্দ্ধেক তারা উঠবার আগেই খানার পিছনে একটা তারা খসে পড়ল।

হেরম্বের সংক্ষিপ্ত জবাবটি মনে মনে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সুপ্রিয়া বললে, 'দাদার চিঠিতে যখন জানলাম বৌ ওরকম ভাবে মরেছে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। জগতে এত লোক থাকতে আপনার বৌ গলায় দড়ি দেবে এ যেন ভাবাও যায় না।'

'আমার মত লোকের বৌএরাই গলায় দড়ি দেয়, সুপ্রিয়া। আমি হলাম জগতের সেরা পাষণ্ড। তুই ছেলেমানুষ—'

'আবার ও কথা!'

হেরম্ব আর একটু স্তব্ধ করেই হাসল।

'ছেলেমানুষ বললে তোরা রাগ করিস, এদিকে বয়স কমাবার চেষ্টার কামাই নেই। তোরা—'

'এসব বিশ্রী পচা ঠাট্টা শুনতে ভাল লাগছে না, হেরম্ব-বাবু।'

'সেটা আশ্চর্য্য নয় সুপ্রিয়া।' হেরম্ব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সুপ্রিয়া বললে, 'তারপর বলুন।'

হেরম্ব বললে, 'আমি জগতের সেরা খাবার, একথা যা করার পর আর কি বলার থাকে মানুষের? গলায় দড়ি না দিলে উমা কেপে যেত। প্রকৃত পক্ষে, একটু কেপে গিয়েই সে গলায় দড়ি দিয়েছিল।'

সুপ্রিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার কথা শুনে?'

'তোর কথা শুনে আমি কিছুই বলি নি।'

'তবে? কি জন্য তবে ও অমন কাজ করল। আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি, হেরম্ব বাবু। দাদা লিখেছিল, অমন শান্ত ভাল মেয়ে হয় না। শুধু শুধু সে অমন কাজ করবে কেন?'

'তোর দাদা জগতের সব খবর রাখে।'

'বাঃ, বেশ।' সুপ্রিয়া আর কথা খুঁজে পেল না। হেরম্বের কাছে কথার অভাব তার চিরন্তন। হেরম্বের কাছে এলে মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন তার যেন শেষ হয়ে যায়। হেরম্ব যেন তার ভাবনা শুনতে পাবে। কাছে বসে ভেবে গেলেই হল। প্রথম প্রেমে পড়া মেয়েদের এই ভ্রান্ত অহমিকাটি সুপ্রিয়া এখনো একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। হাজার প্রশ্নে মন ভারি করে সে তাই নীরবে বসে রইল।

উমা তার জন্য আত্মহত্যা করেছে এই ছিল এতকাল তার ধারণা। স্বামী মনপ্রাণ দিয়ে আর একজনকে ভালবাসে—তাকে ভালবাসে, এটা বেচারীর সহ্য হয় নি। আরেকজনের, তার, প্রেমে তলিয়ে যাওয়া স্বামীকে ছেড়ে সে তাই মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। এই ধারণা হেরম্বের কথায় ভেঙে যেতে সুপ্রিয়া বিহ্বল হয়ে গেল। হেরম্ব যে তাকে ভালবাসে উমার আত্মহত্যা ছিল তার প্রমাণ। মৃত্যুর মত অখণ্ড অপরিবর্তনীয় নিঃসংশয় প্রমাণ। এই প্রমাণের বাঁধ অপসারিত হয়ে যেতে যে সন্দেহ ও আত্মগ্লানির বন্যা এল, সুপ্রিয়া তাতে আর খই পেল না। তার মনে হ'ল, সারাদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর এতক্ষণে হেরম্ব তাকে আত্মহত্যা করে দুঃখ ও হতাশার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে। জীবনে আর তার কিছু রইল না। এতদিনের ভুল আর বাকী দিনগুলির জন্য সেই ভুলের উপলব্ধি—এই দুটি পরিচ্ছেদেই তার জীবনী। যে জীবনকে সে মহাকাব্য বলে জেনে রেখেছিল সে একটা সাধারণ কবিতাও নয়।

খানায় পৌঁছে তারা দেখল, অশোক ফিরে এসে স্নান সমাপ্ত করে বিশ্রাম করছে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলে, 'কতক্ষণ ফিরেছ, অশোক?'

'আপনারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।'

সুপ্রিয়া অনুযোগ করে বললে, 'আমায় ডেকে পাঠালে না কেন? আমরা ওই দামনের মাঠে ছিলাম। এখান থেকে দেখা যায়।'

অশোক হেসে বললে, কি বলে ডেকে পাঠাতাম? আমি বাড়ী এসেছি, তুমি চট করে বাড়ী চলে এসো? তার চেয়ে দিব্যি স্নানটান করে বিশ্রাম করছিলাম।—পা ছাড়, জানো গো, ব্যথা হয়ে গেছে।'

'আহা, তা হবে না। সারাটা দিন যে ঘোড়ার পিঠে কাটল। খাওনি কিছু? জানি খাওনি, আমি এসে না দিলে খাবে—'

অশোক অপরাধীর মত বললে, 'খেয়েছি, সুপ্রিয়া। 'এমন খিদে পেয়েছিল—'

হেরম্ব লক্ষ্য করলে, সুপ্রিয়ার মুখ প্রথমে একটু কালো হয়ে শেষে লালিমায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। চাকরি ছাড়া স্বামীকে আর সব বিষয়েই যে সে তার মুখাপেক্ষী করে রেখেছে হেরম্বের কাছে তা প্রকাশ হয়ে গেল। একদিন খুব খিদের সময় তার অপেক্ষায় বসে না থেকে পেট ভরালে অশোকের যদি অপরাধ হয়, স্ত্রীর কাছে সে অনেকটা শিশুত্বই অর্জন করেছে বলতে হবে। আগাগোড়া স্ত্রীর মন যোগানোর এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে অশোক দিন কাটায় কি করে ভেবে হেরম্ব অবাক হয়ে রইল।

সুপ্রিয়া বললে, 'কি খেলে?'

'তুমি যা যা করেছ খুঁজে খুঁজে সব একটা করে খেয়েছি।'

'তবে তো খুব খেয়েছ।' বলে সুপ্রিয়া জেরা আরম্ভ করলে, 'সন্দেশ খেয়েছ? খেয়েছ। না খেলেই ভাল হত, সন্দেশে তোমার অম্বল হয়। রসগোল্লা খেয়েছ? একটা খেলে কেন মোটে? আর দুটো খেলেই হত। আজ ঠিক পাক হয় নি? মালপো খেয়েছ? কেন খেলে? যা সয় না তা খাবার দরকার! এই জন্যেই তো তোমাকে আমি নিজের হাতে খেতে দিই। লোভে পড়ে যা-তা খাবে, শেষে বলবে সোডা দাও।...দরভাজা খাওনি?'

অশোক অবাক হয়ে বললে, 'প্লেটের ওগুলি সরভাজা নাকি? আমি মনে করলাম ব্যাসন দিয়ে মুখড়ো জেজেছিলে, বেশী হওয়ায় তুলে রেখেছ। তাই আর খেলাম না।'

সুপ্রিয়া হেসে হেরম্বের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলেন?'

হেরম্ব অশোককে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাকি স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, অশোক? শরীর ভাল করার জন্য মদ খাও?'

অশোক চমকে বললে, 'আমি মদ খাই? কই না, খাই না তো! কে বললে খাই?'

হেরম্ব বললে,'কেউ না, এমনি কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।'

সুপ্রিয়া বললে, 'নাই বা করতেন কথাটা জিজ্ঞাসা?'

কিন্তু এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তার সফল হল না। অনায়াসে প্রসঙ্গান্তর এনে হেরম্ব তার কথাটা চাপা দিয়ে দিলে। অশোককে সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুনী ধরতে গিয়েছিলে, শুনলাম? কোথায় খুন হল?'

'বরকাপাশীতে।' অশোক সংক্ষেপে জবাব দিলে।

'ধরলে?'

'ধরেছি। বড় ভুগিয়েছে ব্যাটা। এ গাঁ থেকে সে গাঁ—হয়রান করে মেরেছে। শেষে একটা কোপের মধ্যে কোনঠাসা করে ধরতে বগা দিলে।' অশোক একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। নিজের ব্যবসার কথা বলতে পেলে সকলেই খুশী হয়। 'বা নিয়ে খুন করতে উঠেছিল। জমাদার জাপ্টে না ধরলে আজ একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। ব্যাটা কি জোয়ান!'

সুপ্রিয়ার চোখের দিকে একবার স্পষ্টভাবে তাকিয়ে হেরম্ব বললে, 'কাকে খুন করেছে?' 'বৌকে। চিরকাল বা হয়ে থাকে,—অসময়ে স্বামী বাড়ী ফিরল, লাভার গেল পালিয়ে, বৌ হ'ল খুন। গলাটা একেবারে ছুঁচাক করেও ব্যাটার তৃপ্তি হয় নি। সমস্ত শরীর দা দিয়ে কুপিয়েছে।'

সুপ্রিয়া শিউরে বললে, 'মাগো!'

খুনীটা তার স্বামীকে দা নিয়ে কাটতে উঠেছে শুনে সুপ্রিয়া শব্দ করে নি স্মরণ করে হেরম্ব একটু ক্ষুব্ধ হল।

'ফাঁসি হবে?'

অশোক বললে, 'না। যথেষ্ট প্রোভোকেশন ছিল।'

সুপ্রিয়া অস্থির হয়ে বললে, 'কি আলোচনা আরম্ভ করলে? ওসব কথা থাক বাপু, ভাল লাগে না। খুন, জখম ফাঁসি—বলার কি আর কথা নেই?'

হেরম্ব হেসে বললে, 'তুই দারোগার বৌ, খুন জখম ভাল না লাগলে তোর চলবে কেন সুপ্রিয়া?'

'দারোগার বৌ হয়ে কি অপরাধ করেছি? আমি তো দারোগা নই।'

'কি জানি কি অপরাধ করেছিস। আমি বলতে পারব না। অশোককে জিজ্ঞাসা কর। খুন জখম ভাল না লাগলে পাছে অশোককেও তোর ভাল না লাগে এই ভেবে বলছিলাম সংসারের রাহাজানির ব্যাপারগুলোকে ভালবাসতে শেখ। তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন বল্‌তো, সুপ্রিয়া? অশোকের সামনে তুই দাঁড়িয়ে থাকিস নাকি? এতো ভাল কথা নয়। হেঁটে এসে তোর নিশ্চয় পা ব্যথা করছে। দাও হে অশোক, ওকে বসবার অনুমতি দাও। ভাল করে বসে একটা গল্প শোন, সুপ্রিয়া।'

'শুন না গল্প।'

'আহা শোন না। অশোক ওকে শুনতে বল ত।'

'শুনব না, শুনব না, শুনব না। হল? গল্প শুনব—আমি কচি খুকী নই।'

হেরম্ব একটা চুরুট বার করে বললে, 'তবে দেশলাই দে। চুরুট খাই।'

অশোক অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে যেন ঘুম ভেঙে উঠে বললে, 'একি কাণ্ড! আপনারা যে রীতিমত ঝগড়া করছেন!'

হেরম্ব হেসে বললে,'না। সুপ্রিয়াকে একটু রাগাচ্ছিলাম। ছেলেবেলা গল্প বলুন গল্প বলুন, বলে এত বিরক্ত করত—কোথায় যাচ্ছিস সুপ্রিয়া?'

'রান্নার ব্যবস্থাটা একটু দেখি।' বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।

হেরম্ব বললে, 'চটেছে।'

অশোক বললে, 'ঠাট্টা তামাসা একেবারে সইতে পারে না।' একটু ইতস্ততঃ করে যোগ দিল 'সেন্স অফ্ হিউমার বড় কম।'

হেরম্ব বললে, 'তাই নাকি!'

'ওকে আমি এত ভয় করি শুনলে আপনি হাসবেন।'

'ওকে কে ভয় করে না, অশোক? এমন একগুঁয়ে জেদী মেয়ে সংসারে নেই। একবার যা ধরবে শেষ না দেখে ছাড়বে

না। ওকে বোধ হয় মেরে ফেলা যায় কিন্তু ভিত ছাড়ানো যায় না।'

'ঠিক। অবিকল মিলে যাচ্ছে।'

হেরম্ব শঙ্কিত হয়ে বললে, 'মিলে যাচ্ছে কি রকম?'

'আপনি জানেন না? বিয়ের পর এক বছর ধরে চেষ্টা করেও ওকে কিছুতে এখানে আনতে পারি নি। শেষবার আনতে গেলে ওর কাকা বুঝি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, না যাস্ তো আমার বাড়ীতে থাকতে পাবি না। আমারও একটু অভ্যাস হয়েছিল—রাগারাগি আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। যাই হোক, আমার সঙ্গে সেই যে এল তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনের জন্য কাকা ওকে নিতে পারে নি। বলে, যাব না বলে এসেছি, যাব কেন?'

'প্রথমে এখানে আসতে চায় নি জানতাম। আমিও অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু আসবার সময় ফিরে যাবে না বলে এসেছিল এখবর তো পাই নি।'

'ছেলেমানুষ রাগের মাথায় কি বলেছে না বলেছে কে খেয়াল করে রেখেছিল? ওরে ফিরে যাবে না প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, ও ছাড়া আর কারুর হয়ত সেকথা এখন মনেও নেই। ওর কাকা এখনো দুঃখ করে আমাকে চিঠি লেখেন। চিঠি পড়ে কাঁদে, কিন্তু একদিনের জন্য যেতে রাজী হয় না।'

হেরম্ব একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আমার ধারণা ছিল, তুমিই ওকে পাঠাও না।'

অশোক বিষণ্ণভাবে হাসলে। বললে, 'কাকার চিঠির যে সব জবাব আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে তাতে আপনি কেন সকলেরই ওরকম ধারণা হবে। কথাটা প্রকাশ করবেন না, দাদা। ওদিকে কাকা মনে ব্যথা পাবেন, এদিকে আপনাকে বলার জন্য আমাকে টিঁকতে দেবে না। রাগের মাথায় মত বদলে, 'কাকার কাছে চললাম, তোমার কাছে আর আসব না' বলে বিদায় নিলে তো বিপদেই পড়ে যাব।'

অশোকের কাছে লুকিয়ে হেরম্ব গভীরভাবে চিন্তা করছিল। চারিদিক বিবেচনা করে ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হচ্ছে, এতদিন পরে সুপ্রিয়ার সংস্পর্শে না এলেই সে ভাল করত।

সুপ্রিয়ার কোন শিক্ষাটা বাকী আছে যে ওকে আজ নতুন কিছু শেখানো সম্ভব? জীবনের স্তরে স্তরে সুপ্রিয়া নিজেকে সফল করেছে, কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখে নি, কারো পরামর্শ নেয় নি। ওর সঙ্গে আজ পেরে উঠবে কে?

খানিক পরে সুপ্রিয়া ফিরে এল। তার একহাতে মদের বোতল অন্যহাতে কাঁচের গ্লাস।

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। সকালে খাওনি বড় ডোজ দি, কেমন?'

অশোক কথা বলতে পারে না। একবার মদের বোতলটার দিকে একবার হেরম্বর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, কি সব কাণ্ড সুপ্রিয়ার!

হেরম্ব একটু হাসে। তার একেবারেই বিস্ময় নেই। সুপ্রিয়া যে নারী তার এই প্রমাণটা সে না দিলেই আশ্চর্য হত। এটুকু বিদ্রোহ না করলে ওতো মরে গেছে!

'আমায় একটু দিস্ তো সুপ্রিয়া।'

'আপনি খাবেন? মদ কিন্তু, খেলে নেশা হয়। মদে শেষে আপনার আসক্তি জন্মে যাবে না তো?'

হেরম্ব তবু হাসে।

'আসক্তি জন্মালে কি হবে? আমার জন্য মদ যোগাড় করে রাখবে কে সুপ্রিয়া? আমার তো বৌ নেই।'

এক মিনিটের জন্য হেরম্বকে সুপ্রিয়া চলা করল বৈকি! রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেছে।

'না, আপনার বৌ নেই। আপনার বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে।'

একথা হেরম্বর জানা ছিল যে, একরকম অনায়াসে সুপ্রিয়ার জীবনে আরও একবার যদি এসে থাকে তবে এই নিয়ে দু'বার হল। এই সংখ্যাটি সুপ্রিয়ার বাকী জীবনে কখনো দুই থেকে তিনে পৌঁছবে কিনা, সে বিষয়ে বাজী রাখতে হেরম্ব রাজী হবে না। হেরে যাবার ভয় আছে। তবু সুপ্রিয়াকে মারতে পারলে হেরম্ব খুসী হ'ত।

অশোক স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'এসব তুমি কি বলছ?'

কিন্তু সুপ্রিয়ার মুখে আর কথা নেই। কাঁচের গ্লাসে অশোককে নীরবে খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে তারা যখন খেতে বসেছে, ঘুনীকে সঙ্গে করে সিপাহীরা ফিরে এল। হেরম্ব বহুক্ষণ আত্মসম্বরণ করেছে। সুপ্রিয়ার মুখ ম্লান। অশোক গম্ভীর। আকাশ ঢেকে যেন

করে এসেছে। পৃথিবী বায়ুহীন। হেরম্ব বললে, 'খুনীটার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি না, অশোক? কৌতূহল হচ্ছে।'

অশোক বললে, 'বেশ তো।'

সুপ্রিয়া চেষ্টা করে বললে, 'খুনীর সঙ্গে আলাপ করতে চান করবেন, সেজন্য তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি! খুনী পালাবে না।'

হেরম্ব হেসে বললে, 'না, খুনী পালাবে না। কোমরে দড়ি বাঁধা রয়েছে, না অশোক?'

'নিশ্চয়।'

সুপ্রিয়া অবাক হয়। হেরম্বের কথার মানে বুঝতে চেষ্টা করে। হঠাৎ তার মনে হয়, হেরম্ব নার্ভাস হয়ে পড়েছে, চাল দিচ্ছে, ওর কথার কোন মানে নেই। খুনী পালাবে না? এই কথার পুনরাবৃত্তি ও খুনী পালাবে না? সুপ্রিয়া কোমরে দড়ি-বাঁধা, পায়ে শিকল-বাঁধা দাসী বটে, কিন্তু খুনী নয়। অশোককে সে কখনও খুন করবে না। হেরম্ব সেই থেকে করছে শুধু চালাকি।

খেয়ে উঠে তারা বাইরের বারান্দায় গেল। একটা কালিপড়া লণ্ঠন জ্বলছে। থামে ঠেস দিয়ে বসে ধূলিধূসরিত খুনী বসে আছে। যুদ্ধ না করে সে যে পুলিশের কাছে হার মানে নি সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কোমরে বাঁধা দড়িটা ধরে একজন কনষ্টেবল উবু হয়ে বসে ছিল, হেরম্ব ও অশোকের আবির্ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

হেরম্ব জিজ্ঞেস করলে, 'তোর নাম কিরে?'

'বীর সা।' দুদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, বুনো জন্তুর মত; কিন্তু বুনো জন্তু সে নয়, মানুষ। প্রশ্নের জবাব দিয়ে বীর সা আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

কনেষ্টেবল বললে, 'আজ্ঞান করলে মাংতা, হুজুর।'

অশোক বললে, 'এক বালতি পানি, বাস।'

হেরম্বের চিন্তার ধারা অন্যরকম।

'এমন কাজ করলি কেন বীর সা? বৌকে তাড়িয়ে দিলেই পারতিস।'

বীর সা কিছুই বলল না। বৌএর নামোল্লেখে লাল টক-টকে চোখ মেলে হেরম্বের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ঝিমোতে সুরু করলে। অশোক শান্তভাবে বললে 'ওসব বলে লাভ কি হেরম্ববাবু?'

'লাভ? লাভ কিছু নেই।' হেরম্ব একটু ভীরু হাসি হাসলে, 'আমি শুধু জানতে চাইছিলাম কেথলেস ওয়াইফকে খুন করে মানুষের অনুতাপ হয় কিনা।'

অশোক আরও শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি জানলেন?'

'জানলাম? অনেক কিছু জানলাম, অশোক। আমার বরাবর সন্দেহ ছিল যে, ঈর্ষার বশে যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে পারে, তাতে আর যাই হোক স্বামীটির চরম ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়, এই থিয়োরি হয়ত সত্য নয়। আজ বুঝলাম আমার সন্দেহ সত্যি! ওর তাকাবার রকম দেখলে, অশোক? স্ত্রীকে খুন করে তার দাম দেবার ভয়ে ও একেবারে মরে গেছে! এটা ভালবাসার লক্ষণ নয়। ও শুধু খুনী, স্রেফ খুনী; প্রেমিক আমি ওকে বলব না। না; স্ত্রীকে ও ভালবাসত না। স্ত্রী আর একজনকে ভালবাসে বলে যে তাকে খুন করে অথবা কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না। তুমি বুঝতে পার না অশোক, ভালবাসার বাড়া-কমা নেই? ভালবাসা ধৈর্য আর তিতিক্ষা? একটা একটানা উগ্র অনুভূতি হল ভালবাসা, তুমি তাকে বাড়াতে পার না, কমাতে পার না। স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে চাও কর, কিন্তু তারপর একদিনের জন্য যদি তোমার ভালবাসায় চাঁটা পড়ে, মনে হয় খুন না করলেই হত ভাল, সেইদিন জানবে, ভালবেসে স্ত্রীকে তুমি খুন কর নি, করেছিলে অন্য-কারণে। স্ত্রীকে যে ভালবাসে সে অপেক্ষা করে। ভাবে, এখনও ছেলেমানুষ, আর একজনের স্বপ্ন দেখছে। দেখুক, যৌবনে ওর প্রেম পাব। ভাবে, যৌবন ওকে অন্ধ করে রেখেছে ও তাই অতীতের অন্ধকারটাই দেখছে। দেখুক, যৌবন চলে গেলে আমি ওকে ভালবাসব। আচ্ছা অশোক, তোমার কি কখনো মনে হয় না যে, প্রিয়া আর একজনকে ভালবাসছে এই অবস্থাটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় করে দেওয়া বোকামি? কষ্ট দিয়ে আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে,—ভালবাসাকে? যাকে কথা বলছি, এই মোহকে প্রবল স্থায়ী করে, দেওয়া মূর্খামি? একি স্ত্রীকে ভাল না বাসার প্রমাণ নয়? এর চেয়ে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রেখে, তাকে সুখী করে—'

সুপ্রিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হেরম্বের বক্তৃতার ঠিক এইখানে তার ফিট হল। গোলমাল শুনে দুজনে গিয়ে দেখে, সুপ্রিয়া বুকের নীচে দুই হাত জড়ো করে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

অশোক চেঁচিয়ে বলল 'ওকে শুনিয়ে এ সব কথা কি আমার না বললেই হত না? রাস্কেল!'

রাতদুপুরে সুপ্রিয়া হেরম্বের ঘরে এল।

'ঘুমো আছেন?'

'উঁ।'

'বিছানায় উঠব না। শরীরটা এত দুর্বল লাগছে, দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।'

'শুতে থাকলি না কেন, সুপ্রিয়া? কেন উঠে এলি?'

'সকালে চলে যাবেন, কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, হেরম্ব বাবু।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে।

'মাথা ঘুরে হয়ত আবার আমি ফিট হয়ে পড়ে যাব। সবাই উঠে আসবে। বলুন কিছু, বলুন যাহোক কিছু।'

'তুই তো চিরদিনের লক্ষ্মী মেয়ে ছিলি সুপ্রিয়া। এত অবাধ্য এত চঞ্চল কবে থেকে হলি?'

সুপ্রিয়াকে অন্ধকারেও দেখা যায়। কারণ, অন্ধকারে সে পাঁচতলা অন্ধকার হয়ে আছে।

'আমার সত্যি দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।'

হেরম্ব আবার চুপ করে থাকে।

'আপনি আমাকে ডাকলেই পারেন। আপনি বললেই বিছানায় উঠে বসতে পারি।'

হেরম্ব তবু চুপ করে থাকে। কথা বলবার আগে সুপ্রিয়া এবার অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ।

'আজ টের পেলাম, বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই এড়িয়ে যান। কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বলে বিছানায় উঠে বসতে দিচ্ছেন না। আমি দাঁড়াতে পারছি না, তবু!'

হেরম্ব বলে, 'শোন্ সুপ্রিয়া। আজ তোর শরীর ভাল নেই, তাছাড়া নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে আছিস্। ধরতে গেলে আজ তুই রোগী, অসুস্থ মানুষ। আজ তুই যা চাইবি তাই কি তোকে দেওয়া যায়? তবে আর অসুখের সময় রোগীকে কুপথ্য দিলে দোষ কি ছিল? বেশী কাল হয়েছিল বলে অশোককে তুই আজ মাছের ঝোল খেতে দিস নি মনে আছে? তুই আজ ঘুমিয়ে থাকবি যা, সুপ্রিয়া। ছ'মাসের মধ্যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে যা হয় করব।'

'আরও ছমাস!'

'ছমাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'যদি দেখা না হয়? আমি যদি মরে যাই?'

জীবনের দিগন্তে তাকে অন্তর্হিত দেখে সুপ্রিয়া মরতেও রাজী নয়। হেরম্বের দ্বিধা হয়, সংশয় হয়। জীবনকে কোনমতেই পরিপূর্ণ করবার উপায় নেই। তবু সুপ্রিয়াকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেললে হয়ত চিরদিনের জন্য জীবন এত বেশী অপূর্ণ থাকবে যে, আপশোষ করতে হবে। হেরম্বের এই আশঙ্কা কমে আসে। তার মনে হয়, আজ একদিনে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নিজের যে নব নব পরিচয় দিয়েছে হয়ত তা বহু সংযম, বহু সাবধানতা ও কার্পণ্যের বাঁধা ঠেলেই বাইরে এসেছে। হয়ত পাঁচ বছর ধরে সুপ্রিয়া যে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছে তা অতুলনীয়, কল্পনাতীত। কিন্তু তবু হেরম্ব সাহস পায় না। নিজেকে দান করার চেয়ে কঠিন কাজ জগতে কি আছে? অত বড় দাতা হবার সাহস হেরম্ব সহসা সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

বলে, 'ঘুমবি কেন, সুপ্রিয়া? লক্ষ্মী মেয়ের মত তুই বেঁচে থাকবি।'

সুপ্রিয়া চলে গেলে হেরম্ব শয্যা ত্যাগ করে। দরজা খুলে বাইরে যায়। খানার পাহারাদার বলে, 'কিধার যাতা বাবু?'

'ঘুমনে যাতা। নিদ হোতা নেহি।'

আকাশ ঢেকে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনা ঘাস-ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়ত মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ কৃশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

বুদ্ধকথা

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম

[মহাবগ্গ ৫।১-১৩, ৮।১-৩২ ; চুল্লবগ্গ ৫-৬]

সোন নামক একজন ধনীপুত্র ভিক্ষু হইয়াছিল। সে এত ঘরে লালিতপালিত হইয়াছিল যে, তাহার পদতলে নাকি রোম জন্মিয়াছিল। খালি পায়ে থাকা তাহার অভ্যাস ছিল না, সেজন্য পায়চারি করিয়া বেড়াইবার সময় তাহার পা দিয়া রক্ত বাহির হইত। বুদ্ধ তাহাকে পাদুকা ব্যবহার করিতে বলিলেন। সোন বলিল, যে, সব ভিক্ষুরা যদি পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি পায় তবে সেও ব্যবহার করিবে, নচেৎ নয়। বুদ্ধ তখন সব ভিক্ষুদের সাদাসিধা পাদুকা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। "ছব্বভিক্ষু" ও অন্য কেহ কেহ নানা রঙের নানা ঢঙের জুতা ব্যবহার করিতে লাগিল। লোকে দেখিয়া ভিক্ষুদের বিলাসী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া এগুলির ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিলেন।

একদিন বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, একজন ভিক্ষু তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছিল, তাহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল বলিয়া সে খোঁড়াইতেছিল। ভিক্ষুকে খোঁড়াইতে দেখিয়া একজন উপাসক তাহাকে নিজের দামী নরম জুতা পরিতে দিল, কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া ভিক্ষু তাহা গ্রহণ করিল না। বুদ্ধ ভিক্ষুকে উপাসকের দান গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন ও বলিলেন, যে, অন্যের পরিত্যক্ত জুতা দামী বা বাহারে হইলেও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। বুদ্ধ খালি পায়ে পায়চারি করিতেন এবং সেই জন্য স্থবির ভিক্ষুরাও তাহাই করিতেন। "ছব্বভিক্ষু"রা জুতা পায়ে দিয়া পায়চারি করিত। এই অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য বুদ্ধ তাহাদের তিরস্কার করিয়া আরামের মধ্যে জুতা ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিলেন।

এক ভিক্ষুর পায়ে মাংসবৃদ্ধির রোগ হইয়াছিল, অন্য ভিক্ষুরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া শৌচে লইয়া যাইত। ভিক্ষুদের শয়নস্থান দিয়া যাইবার সময় বুদ্ধ একদিন ইহা দেখিয়া বলিলেন, যে, রোগের বেদনা নিবারণের জন্য আরামের মধ্যে জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ভিক্ষুরা ঘুলাকাদা-মাখা পায়ে শয্যায় উঠিয়া শয্যা মলিনা করিত, অন্ধকারে সভাগৃহ বা "উপোসথ"-গৃহে যাইতে তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিত বা হোঁচট্ লাগিত ; ইহাতে ব্যবস্থা হইল, যে, শয্যায় উঠিবার আগে পরিষার জন্য আরামের মধ্যে জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে এবং অন্ধকারে প্রদীপ ও লাঠি লইতে পারা যাইবে।

"ছব্বভিক্ষু"রা প্রাতে উঠিয়া খড়ম পায়ে দিয়া সঙ্ঘে পায়চারি করিত এবং রাজার কথা, মন্ত্রীদের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, বিলাসদ্রব্যের কথা, ভোজনের কথা প্রভৃতি লইয়া উচ্চ স্বরে বাদানুবাদ করিত ; ইহাতে ভিক্ষুদের ধ্যানের ব্যাঘাত হইত, এজন্য খড়ম পায়ে দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। খড়ম নিষিদ্ধ হইলে "ছব্বভিক্ষু"রা ছোট তালগাছ ও অন্য গাছের পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে চটীজুতা বানাইল। ইহাতে অনেক গাছ মারা যাওয়ায় লোকে গাছের প্রাণনাশ করার জন্য ভিক্ষুদের নিন্দা করিতে লাগিল। লোকে গাছের প্রাণ আছে মনে করে (জীবসঞ্ঞিনো হি মনুস্সা রুক্খস্মিং) বলিয়া বুদ্ধ গাছ নষ্ট ও পাতায় চটি ব্যবহার নিষেধ করিলেন। বুদ্ধের যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইল তাহাতে মনে হয় গাছের পাতা কাটা বুদ্ধ নিজে পাপ বলিয়া মনে করিতেন না, লোকে মনে করে বলিয়াই উহা নিষেধ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর অচিরবতী নদীতে অনেক গাভী পারাপার করিত ; ভিক্ষুরা তাহাদের শিং, কান প্রভৃতি ধরিয়া উত্যক্ত করিত। লোকে এবিষয়ে বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করিলে তিনি ইহা বারণ করিয়া দিলেন।

কোশল রাজ্যের মধ্য দিয়া একজন ভিক্ষু বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার সময় পীড়িত হইয়া পথপার্শ্বের বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। লোকে তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া লইতে চাহিল, কিন্তু বুদ্ধ গাড়ীচড়া নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া ভিক্ষু সম্মত হইল না। পরে সে শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলে তাহার কাছে একথা শুনিয়া বুদ্ধ পীড়িতাবস্থায় গাড়ী চড়ার অনুমতি দিলেন।

"ছব্বভিক্ষু"রা অনেক রকম বালিশ, বিছানার চাদর প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকে এই সব দেখিয়া

বলিত, "ভিক্ষুরা সংঘের বিলাসভোগ করিতেছে"। বুদ্ধ ইহা নিষেধ করিলেন। তখন তাহারা সিংহ, বাঘ, চিতা প্রভৃতি পশুর চর্ম কাটিয়া ছাঁটিয়া শয্যায় ও আসনের উপর ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহা নিষিদ্ধ হইলে গোচর্ম ব্যবহার আরম্ভ করিল। এক উপাসকের একটি ডোরাকাটা চামড়াওয়ালা গোবৎস ছিল, ইহা দেখিয়া এক ভিক্ষুর বড় লোভ হইল, সে উপাসককে দিয়া গোবৎসটিকে বধ করাইয়া তাহার চামড়া বগলে লুকাইয়া বিহারের দিকে রওনা হইল। সন্তানবৎসল গাভীটিও ভিক্ষুর পিছন পিছন চলিল। বিহারের অন্য ভিক্ষুরা দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু কিছু জানে না বলিল, কিন্তু শেষে কাঁচা চামড়ার রক্তে তাহার চীবর ভিজিয়া উঠিলে সে ধরা পড়িয়া নিগৃহীত হইল। চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিক্ষুরা লোকের বাড়ীতে গেলে তাহারা বসিবার জন্য যে আসন দিত তাহা চামড়ামোড়া হইলে ভিক্ষুরা তাহাতে বসিতে চাইত না। বুদ্ধ বলিলেন, উপাসকদের এরূপ চামড়া-মোড়া আসনে ভিক্ষুরা বসিতে পারিবে কিন্তু শুইতে পারিবে না।

অবন্তী হইতে কাত্যায়ন সোন নামক ভিক্ষুর মুখে বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি যেন এই কয়টি বিষয়ে অনুমতি দান করেন—(১) অবন্তী ও দক্ষিণাপথে ভিক্ষুদের সংখ্যা অল্পই, তিন বৎসর চেষ্টা করিবার পর দশজন ভিক্ষু একত্র করিতে পারা গিয়াছিল: বুদ্ধ যেন এই অঞ্চলের জন্য দশজনের কম ভিক্ষু লইয়া সংগঠন করিয়া উপসম্পদা দানের অনুমতি দেন (২) এই অঞ্চলের মাটি কৃষ্ণবর্ণ, অসমান ও কণ্টকময়, এখানে যেন বুদ্ধ মোটা চামড়ার চটি ব্যবহারের অনুমতি দেন (৩) দক্ষিণাপথের লোক স্নানের ভক্ত, জলের দ্বারা শুদ্ধি সম্পাদন হয় মনে করে, বুদ্ধ যেন এখানকার জন্য বেশী স্নানের অনুমতি দেন। (৪) এই অঞ্চলের লোক শয্যায় পশুচর্ম ব্যবহার করে, বুদ্ধ যেন এখানকার জন্য এ বিষয়ে অনুমতি দেন এবং (৫) কেহ কোন ভিক্ষুকে অন্য ভিক্ষুর জন্য বস্ত্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতে বুদ্ধ যেন অনুমতি দেন। বুদ্ধ কাত্যায়নের সকল প্রার্থনাতেই সম্মতি দিয়াছিলেন।

জীবক বুদ্ধকে "সিবেয্যক" বস্ত্র দান করার পর হইতে অনেকে ভিক্ষুদের নানারূপ বস্ত্র দান করিতে লাগিল। কাশী-রাজ একবার জীবককে অষ্টসহস্র মুদ্রা দামের একখানি কম্বল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, জীবক তাহা বুদ্ধকে দান করেন। বস্ত্রদানের ফলে ভিক্ষুরা "পংসুকূল" অর্থাৎ পথে-কুড়ান ন্যাকড়ার প্রস্তুত চীবর ছাড়িয়া দিল। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, যাহার ইচ্ছা "পংসুকূল" চীবর পরিতে পারিবে। শ্মশানে "পংসুকূল" সংগ্রহ করা লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হইত, কেহ ন্যাকড়া কুড়াইতে গেল, অন্যেরা না গিয়া ভাগ চাহিল, ইত্যাদি। এ সব বিষয়েও বুদ্ধকে ব্যবস্থা দিতে হইত।

লোকে ভিক্ষুদের দিবার জন্য আরামে বস্ত্র লইয়া আসিত কিন্তু ভিক্ষুদের না পাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইত, ফলে ভিক্ষুরা একবার অল্পই বস্ত্রলাভ করিল। বুদ্ধকে ইহা জানান হইলে তিনি সঙ্ঘে জ্ঞপ্তি করিয়া একজন উপযুক্ত ভিক্ষুকে বস্ত্র গ্রহণের জন্য নির্বাচন করিতে বলিলেন। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ভিক্ষুরা কখন কখন বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া বিহারে ফেলিয়া রাখিত, ইহাতে বস্ত্রগুলি খারাপ হইত। এজন্য বস্ত্রগুলি উঠাইয়া ভাল করিয়া রাখার জন্য লোকনিয়োগের ব্যবস্থা হইল। বস্ত্র উঠাইবার জন্য নিযুক্ত ভিক্ষুরা কখন কখন গাছের তলায়, গাছের কোটরে বস্ত্র রাখিয়া নষ্ট করিত। ইহাতে বস্ত্ররক্ষার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা হইল। এই ভাণ্ডারেও ইঁদুরে কাটিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া বস্ত্র নষ্ট হইল। তখন ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। "ছয় ভিক্ষুরা" একবার ভাণ্ডার-রক্ষক ভিক্ষুকে তাড়াইয়া দিল, নিয়ম হইল, ভাণ্ডাররক্ষীকে কেহ তাড়াইতে পারিবে না। বস্ত্রবিভাগ লইয়াও অনেক গোলমাল হইত, তাহারও বুদ্ধ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা গোবর বা পাণ্ডুমৃত্তিকাদ্বারা কাপড়ে রং করিত, ইহাতে রং খারাপ হইত; বুদ্ধ জানিয়া গাছের মূল, কাণ্ড, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল দ্বারা রং করিতে বলিলেন। কাঁচা রং-এ কাপড়ে গন্ধ হইত, সেজন্য রং ফুটাইবার এবং রং মাখা ও রং ফুটানোর জন্য পাত্রেরও ব্যবস্থা হইল।

রাজগৃহ হইতে দক্ষিণগিরি যাইবার পথে মগধের আল-দেওয়া ছোট ছোট বহু অংশে বিভক্ত শস্যক্ষেত্রগুলি দেখিয়া বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, দেখিতেছ মগধের শস্যক্ষেত্র-গুলি কেমন ছোট ছোট সারিবদ্ধ ও আল-দেওয়া অংশসমূহে বিভক্ত?"

"হাঁ, ভগবন্।"

"আনন্দ, তুমি ভিক্ষুদের জন্য এরূপ চীবর বানাইতে পারিবে?"

"পারিব, ভগবন্।" দক্ষিণগিরি হইতে বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আনন্দ এই কথানুযায়ী অনেক ছোট ছোট ন্যাকড়ার টুকরা একত্র করিয়া চারিদিকে, মধ্যে, কোণে ভালরূপে সেলাই করিয়া চীবর বানাইয়া বুদ্ধকে দেখাইলেন। বুদ্ধ আনন্দকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, আনন্দ মহাপ্রাজ্ঞ! আমি যাহা সংক্ষেপে বলি আনন্দ সবিস্তারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে, আনন্দ নানারূপ সেলাইও জানে, চীবর এই রূপই হওয়া উচিত: ছিন্ন টুকরা সংগ্রহ করিয়া মোটা সেলাই করিয়া শ্রমণদের এমন চীবর তৈয়ার করা উচিত যাহাতে শত্রুরও লোভ হইবে না।" ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধ এইরূপ বেশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সকলের নীচে একখানি লুঙ্গির মত কাপড় পরা হইত, ইহাকে "অন্তরবাসক" বলিত; তাহার উপরে উর্দ্ধাঙ্গে একখানি চাদরের মত জড়ান হইত, ইহাকে "উত্তরাসঙ্গ" বলিত; তারপর একখানি বড় মোটা কাপড় ভাঁজ করিয়া কাঁধের উপর রাখা হইত, ইহাকে "সংঘাটি" বলিত, ইহা সতরঞ্চি আসন প্রভৃতির কাজ করিত। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, এই তিনটিই "সংমুখ্য" হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

রাজগৃহ হইতে বৈশালী যাইবার পথে একবার বুদ্ধ দেখিলেন যে, একদল ভিক্ষু চীবর পুঁটুলি পাকাইয়া কেহ মাথায়, কেহ পিঠে, কেহ বা কোমরে জড়াইয়া চীবরে বোঝাই হইয়া চলিয়াছে। "অচিরেই এই অপদার্থেরা চীবর বিষয়ে বাহুল্য আরম্ভ করিয়াছে" এই ভাবিয়া বুদ্ধ ঠিক করিলেন যে, তিনি চীবরের সীমা সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিয়া দিবেন। তখন শীতকাল, খুব হিমপাত হইতেছিল; বুদ্ধ বৈশালীতে পৌঁছিয়া একদিন রাত্রে একটি মাত্র চীবর পরিধান করিয়া মুক্ত স্থানে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার শীত লাগিল না। রাত্রির প্রথম যাম অতীত হইলে তাঁহার শীত বোধ হইল, তখন তিনি দ্বিতীয় একটি চীবর পরিলেন, আর শীত লাগিল না। রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে তাঁহার আবার শীত বোধ হইল তখন তিনি তৃতীয় একটি চীবর পরিলেন, আর শীত লাগিল না। রাত্রির শেষ যাম অতীত হইয়া যখন রাত্রি শেষ ও অরুণোদয় হইতেছিল, তখন তাঁহার আবার শীত বোধ হইল, তিনি চতুর্থ একটি চীবর পরিলেন, আর শীত লাগিল না। ইহাতে তাঁহার মনে হইল যে, যে ভদ্র সন্তানেরা ভিক্ষু হইয়াছে তাহাদের শীত লাগিলে বা শীতভয় হইলে তিনখানি চীবরেই চলিবে, ইহার বেশী কাপড়ের প্রয়োজন হইবে না, কারণ দরিদ্র সন্তান যাহারা ভিক্ষু হইয়াছে তাহাদের শীত নষ্ট করার অভাবে থাকায় ইহার কমেও শীত নিবারণ হইবে। পরে বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকিয়া উপদেশ-দানান্তর পথে ভিক্ষুদের চীবরবাহুল্য দেখিয়া তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সারাবাত্র বসিয়া থাকা প্রভৃতির কথা বলিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি ত্রি-চীবরের অনুমতি দিতেছেন।

বুদ্ধ ত্রি-চীবরের অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া "ধুতঙ্গভিক্ষু"রা একপ্রস্থ ত্রি-চীবর পরিয়া গ্রামে ভিক্ষায় যাইত, আর এক প্রস্থ ত্রি-চীবর পরিয়া আরামে থাকিত এবং তৃতীয় প্রস্থ ত্রি-চীবর পরিয়া স্নান করিতে যাইত। ইহাতে সংঘের ভিক্ষুরা বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে, তিনি ইহা নিষেধ করিলেন।

আনন্দের একখানি চীবর বেশী ছিল। তিনি মনে করিলেন উহা সারিপুত্রকে দিবেন। কিন্তু সারিপুত্র তখন সাকেত নগরে ছিলেন; আনন্দের সংশয় হইল, ঐ চীবরখানি লইয়া তিনি কি করিবেন, কারণ বুদ্ধ ত্রি-অতিরিক্ত চীবর নিষেধ করিয়াছেন। আনন্দ বুদ্ধকে তাঁহার সমস্যার কথা জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন, "আনন্দ, সারিপুত্র অনুমান কত দিনে এখানে আসিবেন?" আনন্দ বলিলেন, "ভগবন্, নয় দিনেও হইতে পারে, দশ দিনেও হইতে পারে।" বুদ্ধ তখন ত্রি-অতিরিক্ত চীবর দশদিন পর্য্যন্ত রাখিবার অনুমতি দিলেন। ভিক্ষুরা ত্রি-অতিরিক্ত চীবর ভিক্ষায় পাইলে সমস্যায় পড়িত, বুদ্ধ বলিলেন যে ভিক্ষুদের চীবর নাই, তাহাদের উহা দিয়া দিলে চলিবে।

কবিপত্তনে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুকে তাহার "অন্তরবাসকে" পট্টি লাগাইয়া সেলাই করিতে দেখিয়া ভিক্ষুর অনেক সাধুবাদ করিলেন ও নূতন বা নূতনের মত কাপড়ের ত্রি-চীবর ছাড়া পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রে প্রস্তুত ত্রি-অতিরিক্ত চীবর ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

স্থবির বেলট্ঠসীস আনন্দের উপাধ্যায় ছিলেন; তাঁহার চর্ম্মরোগ হইয়াছিল ও ঘা'এর রসে কাপড় গায়ে আঁটিয়া যাইত; এজন্য বুদ্ধ ঘা ঢাকিবার জন্য অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন। বিশাখা একখানি মুখ মুছিবার গামছা আনিয়া বুদ্ধকে দিয়া বলিলেন, বুদ্ধ উহা গ্রহণ করিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। বুদ্ধ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুদের মুখ মুছিবার গামছা ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। আনন্দের বন্ধু মল্লবংশীয় রোজ-নামক যে ভদ্রলোকটিকে বুদ্ধ সৌজন্যে অভিভূত করিয়াছিলেন, সেই রোজ আনন্দের কাছে একখানি বস্ত্র রাখিতে দিয়াছিলেন। আনন্দের একখানি বস্ত্রের প্রয়োজন

তখন তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ গচ্ছিত বস্ত্র লইতে পারেন কিনা; বুদ্ধ বলিলেন, যে গচ্ছিত রাখিয়াছে সে যদি অনির্দ্দিষ্ট বহু হয়, জীবিত থাকে, তাহার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হইয়া থাকে বা যাহার কাছে গচ্ছিত আছে, সে যদি জানে উহা লইলে গচ্ছিতরক্ষক তুষ্ট হইবে, তবে উহা লইতে পারা যায়।

ভিক্ষুদের জলছাঁকনি ও ঝুলির প্রয়োজন হইলে বুদ্ধ এগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক ভিক্ষু অনেকগুলি চীবর পাইয়া উহা তাহার মাতা-পিতাকে দিতে ইচ্ছা করিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে একথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "মাতাপিতাকে যখন দিতেছে তখন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু শ্রদ্ধার দত্ত জিনিসের কখনও যেন অপব্যবহার না হয়।"

এক ভিক্ষু অসম্পূর্ণ বস্ত্রে গ্রামে ভিক্ষায় গিয়াছিল বলিয়া বুদ্ধ তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আনন্দও একবার অনবধানতাপ্রযুক্ত এরূপ করিয়াছিলেন।

এক ভিক্ষু একস্থানে একাকী বর্ষাবাস করিয়াছিল; বর্ষান্তে গ্রামিকেরা তাহাকে বস্ত্রদান করিয়া বলিল, "সংঘকে ইহা দান করিলাম"। ভিক্ষু ভাবিল, বুদ্ধ বলিয়াছেন, চারজনের কম সংঘ গঠন হইবে না, সে একলা, অথচ ইহারা "সংঘকে দিলাম" বলিয়া দান করিয়াছে, অতএব সংঘের সম্পত্তি এই বস্ত্রগুলি সে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়া বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ বলিলেন, সে "কঠিন" (মিলিত সঙ্ঘের বস্ত্রাদি দানের ভাগ গ্রহণ) না চাইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এ বস্ত্র তাহারই হইবে। একভিক্ষু বর্ষা ছাড়া অন্য মাসগুলিও একস্থানেই কাটাইল। তাহাকেও লোকে "সংঘকে দিলাম" বলিয়া বস্ত্রদান করিলে তাহারও সেই সংঘের হইল। এক্ষেত্রে বুদ্ধ বলিলেন যে, সেস্থানের ভিক্ষুদের মধ্যে বস্ত্রগুলি ভাগ করিয়া দিতে হইবে। শাক্যবংশীয় ভিক্ষু উপানন্দ শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া আর একস্থানে গেল; সেখানে ভিক্ষুরা বস্ত্রভাগ করিয়া লইতেছিল ও উপানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ভাগ চায় কিনা। উপানন্দ ভাগ লইয়া অন্যত্র, সেখান হইতে আবার আর একস্থানে, এইরূপে অনেক জায়গায় গিয়া বস্ত্রের ভাগ লইল এবং অবশেষে প্রকাণ্ড এক বোঝা চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিল। ভিক্ষুরা বলিল, "উপানন্দ, তোমার পুণ্য অনেক। তুমি এত বস্ত্র পাইয়াছ!" "আমার আর পুণ্য কই" বলিয়া উপানন্দ শ্রাবস্তী হইতে রওনা হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বস্ত্রের ভাগ লওয়ার কথা বলিল। অন্য ভিক্ষুরা উপানন্দের এরূপ লোভে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে তিনি উহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কেহ একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্যত্র বস্ত্রভাগ লইতে পারিবে না। লোভী উপানন্দ তখন দুইস্থানে এক বর্ষা কাটাইয়া দুই স্থানেরই বস্ত্রভাগের অংশ চাহিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "এই অপদার্থটিকে দাও একস্থানের ভাগ দিবে।"

একজন ভিক্ষু নগ্ন হইয়া বুদ্ধের কাছে আসিয়া বলিল, "ভদন্ত, ভগবান অনেক প্রকারে যে ব্যক্তি সংযত, সন্তুষ্ট, পাপমুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, শ্রদ্ধাবান ও বীর্য্যবান তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, ভদন্ত, এই নগ্নতা হইতে অনেক প্রকার সংযম, সন্তোষ, পাপমুক্তি, ইন্দ্রিয়জয়, চিত্তপ্রসাদ, শ্রদ্ধা ও বীর্য্য আসে, ভগবান যদি ভিক্ষুদের নগ্ন থাকিবার অনুমতি দেন তবে ভাল হয়।" বুদ্ধ ভিক্ষুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ওহে অপদার্থ, ইহা অন্যায়, অনুপযুক্ত, অনুচিত, শ্রমণের অনুপযুক্ত, অপ্রিয় ও অকরণীয়, ওহে অপদার্থ, তুমি তৈর্থিকদের (অন্য সম্প্রদায়) নগ্নতা গ্রহণ করিয়াছ কেন? ইহাতে অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হইবে না, প্রসন্নদেরও সংখ্যা বাড়িবে না।" বুদ্ধ ভিক্ষুদের নগ্নতা নিষেধ করিয়া দিলেন। আরও কয়েকটি ঘটনায় কোন কোন ভিক্ষু গাছের ছাল, পাতা, পশুচর্ম্ম, কেশকম্বল, পেচকের পালক প্রভৃতি পরিয়া বুদ্ধের কাছে আসিয়া ঐরূপ কথা বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল।

"ছয় ভিক্ষু"রা নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ প্রভৃতি রংএর বিভিন্ন রকমের চীবর, কম্বল, উষ্ণীষ প্রভৃতি ব্যবহার করিত, কোনটিতে ফুলকাটা থাকিত, কোনটি সাপের ফণার মত হইত। লোকে ইহাতে নিন্দা করিল ও বুদ্ধ জানিয়া নিষেধ করিলেন।

ভিক্ষু রেবত আর একজন ভিক্ষুর হাতে সারিপুত্রকে একখানি চীবর পাঠাইয়াছিল। পথে রেবতের সম্মতি আছে মনে করিয়া দ্বিতীয় ভিক্ষু নিজেই ঐ চীবরখানি লইল। পরে সারিপুত্রের সঙ্গে দেখা হইলে রেবত জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আমি যে চীবর পাঠাইয়াছিলাম তাহা স্থবির পাইয়াছিলেন?"

"না, আয়ুষ্মন, আমি ত' সে চীবর দেখি নাই!" রেবত তখন অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিয়া বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করিল। বুদ্ধ বলিলেন, একভিক্ষু অন্যভিক্ষুর হাতে চীবর দিয়া যদি বলে "ইহা অমুককে দিও" এবং দ্বিতীয় ভিক্ষু যদি দাতার সম্মতি আছে মনে করিয়া নিজে তাহা লয় তবে দোষ হয় না, কিন্তু যদি যাহার জন্য পাঠান হইতেছে তাহার সম্মতি আছে মনে করিয়া লয় তবে দোষ হয়।

ফলতঃ ভিক্ষুদের সত্য সত্য প্রয়োজন হইলে বুদ্ধ প্রায় সব জিনিষ ব্যবহারেই অনুমতি দিতেন।

(ক্রমশঃ)

মা

(পূর্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

তাঁর মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুকটা যেন পাথরের মত ভারি হয়ে উঠল। নিঃশ্বাস সহজে ফেলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে পিদীমটা হাতে নিলেন। উঁচু করে ধরে, তাঁর সেই খালি ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানে শুধু একখানা কাঠের শোবার তক্তা পাতা আর পোকায়-কাটা কাপড়ের আলমারী, এই দুইটিই তাঁর একমাত্র আসবাব। আর ঘর, সেত শুধু চাকরাণীরা থাকবারই উপযুক্ত। ভাগ্যকে তিনি এর চেয়ে বেশী উঁচুতে নিয়ে যেতে চান নি। একমাত্র পলের যে মা হয়েছেন এই তাঁর সব চেয়ে বড় সম্পত্তি আর এতেই তিনি খুশী।

তারপর তিনি পলের ঘরে গেলেন, তার সাদা দেয়াল, সেখানে তার কুমার-জীবনের সঙ্কীর্ণ শয্যাখানি। ঘরখানি সে পরিষ্কার ও বেশ গুছিয়ে রাখত, যেমন মেয়েরা রাখে। সে শান্তি, স্তব্ধতা আর নিয়ম ভালবাসে, জানালার সামনে লেখবার টেবিলের উপর রোজ টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখে। কিন্তু কিছুদিন ধরে এ সব বিষয়ে সে আর কোন মন দেয় না। আলমারীর টানাগুলো খোলা পড়ে থাকে, পেন্সিল রাখার জায়গাটা অগোছাল, আর তার বইগুলো এখানে সেখানে মেঝেতে, চেয়ারের ওপর, ধুলোয় লুটোপুটি খায়।

যে জলে সে মুখ ধুয়ে গেছে, বেরুবার ঠিক আগে, তা থেকে গোলাপের জোর গন্ধ বের হচ্ছে, গায়ের কোটটা অন্যের ঘাটীতে ছুঁড়ে ফেলে রেখে গেছে, যেন তার নিজেরই ছায়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। গোলাপের গন্ধ আর সেই দৃশ্য, তার মনকে আগের ভাবনা থেকে জাগিয়ে দিলে। কোটটা তুললেন, ঘৃণাভরে মনে করলেন, তাঁর সেই মাটীতে গুঁড়ে-পড়া ছেলেকেও তিনি এমনি করে তুলতে পারবেন। সে বল তাঁর দেহে আছে। তারপর ঘরটা বেশ করে গুছিয়ে দিলেন, পায়ের ভারী চাপাড়ে জুতোর শব্দ না থামিয়ে খট্ খট্ করে এধার ওধার করতে লাগলেন। চামড়া-মোড়া যে চেয়ার খানায় বসে পল পড়া-শোনা করে, সেখানা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে এলেন। মেঝেতে তাকে ঠুকে বসিয়ে দিলেন, যেন তাকে বলছেন, ঠিক হয়ে এইখানে থাক, তোমার মালিক এখুনি আসবে ফিরে। তারপর জানালার পাশের ছোট আরসির দিকে পড়ল নজর…

…পাদরীর ঘরে আরসী থাকা একেবারে নিষেধ, তাকে ভুলতে হবে যে, তার দেহ মানুষের। এ বিষয়ে আগের যে বুড়ো পাদরী, তিনি আইন মেনে চলতেন। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যেত, তিনি খোলা জানালার ধারে দাড়িয়ে দাড়ী কামাচ্ছেন। জানালার আরসীর পেছনে তিনি একখানা কালকাপড় টাঙিয়ে দিতেন, তাতে ছায়াটা ফেলবার জন্যে। পল তার বিপরীত, সে আরসীর আকর্ষণের টানে আটকা পড়ে ছিল, ঠিক যেমন একটা ভুরোর তলার থেকে, হাসিমাখা মুখ চোখের টানে ডুবিয়ে নেবার জন্যে লুব্ধ করে, তেমনি। এখন কিন্তু মায়ের সেই ভরার কোঁচকান মুখ, আর সেই রাগে ভর-দেখান চোখের ছায়াই সেই ছোট আরসীতে ফুটে উঠল। রাগের একটা ঝড় উঠল ভেতরে, তাঁর ইচ্ছা হল, একেবারে দেয়াল থেকে সেটা উপড়ে ফেলে দেন। তারপর জানালা সব খুলে দিলেন, বাইরের বাতাস এসে যাতে ঘরটাকে পবিত্র করে দেয়। টেবিলের ওপরের বই ও কাগজপত্র সব জীবন্ত হয়ে উঠল। বিছানার চাদরের কালরগুলো ছাওয়ায় গুটিয়ে গোল হয়ে চলে উঠল। পিদীমের আলোটা কাঁপতে কাঁপতে প্রায় যেন নিভে এল।

বই-টই কাগজপত্র জড়ো করে আবার টেবিলের ওপর রাখলেন সাজিয়ে। দেখলেন একখানা বাইবেলের খোলা পাতা, তাতে একখানা রঙিন ছবি, চমৎকার, তাঁর সে ছবিটা বড় ভাল লাগে, তার তিনি অনেক সুখ্যাতি করেছেন, সেটা আবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বনের ভেতর একটা ঝরণার ধারে, যীশু, চিরকালের রাখাল যিনি, তাঁর—ভেড়ার পালকে জল খাওয়াচ্ছেন। গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে, পেছনে নীল আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে একটি নগরের ছবি—ধূসে ডুবে-যাওয়া সূর্যের আলোয় লাল আভাস দেয় মাথা পবিত্র নগর,—মুক্তির দেশ।

আগে পল অনেক রাত অবধি পড়া-শোনা করত, পাহাড়ের ওধার থেকে আকাশের তারারা তাই এই জানালার দিকে চেয়ে থাকত, বুলবুল তার দুঃখভরা মধুর গান শোনাত। এই গ্রামে আসবার প্রথম বছরে, পল এ গ্রামের কাজ ছেড়ে, সংসারের অন্য কাজে ঢুকতে চাইত, তারপর ক্রমে ক্রমে এই খানেই থিতু হয়ে গেল, এই গাছের মর্মরের সঙ্গে, আর পাহাড়ের নরুজ ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে খাপ খাইয়ে নিলে। এই ভাবে দশটা বছর কেটে গেল, তার মা কখনো তাকে বলেননি বা এ ভাব মনেও আনতে পেরেনি যে এখান থেকে অন্য কোথায় তাঁরা যাবেন। জগতের মধ্যে সবার চেয়ে সুন্দর এই জায়গাটুকুর ভেতর এই ছোট গ্রামে তাঁরা যে কি সুখেই আছেন! কারণ পল তাঁর ছেলে এখানকার রাজকর্তা, এখানের রাজা যে সে।

জানালা তিনি বন্ধ করে দিলেন, আরশীখানা যেখানে ছিল সেখানে আবার রাখলেন। সে আরসী তাঁকে দেখালে যে, তাঁর মুখখানা সাদা আর লম্বা হয়ে গেছে। চোখ দুটি জলের ভারে কাপসা। আবার তিনি নিজেকে নিজের মনে জিজ্ঞাসা করলেন, পাছে তিনি ভুল বুঝে থাকেন। দেয়ালে যেখানে ক্রুশ টাঙান ছিল জানু পাতবার টুলের কাছে, সেখানে গিয়ে আলোটা মাথার ওপরে ধরলেন, সেটাকে ভাল করে দেখতে। তাঁর নড়াচড়ার যে ছায়া দেয়ালে পড়ল, তার চেহারা মনে হল তিনি দেখলেন, ক্রুশ উলঙ্গ ঈশা ক্রুশের ওপর পেরেক-মারা, তাঁর প্রার্থনা শোনবার জন্যে মাথা নীচু করে রয়েছেন। চোখ ফেটে ঝর ঝর করে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ে তাঁর বুক ভিজে গেল, সে জলের ফোঁটা যেন রক্তের ফোঁটার মত ভারি।

"প্রভু আমাদের রক্ষা কর! আমাকে, আমাকে রক্ষা কর! যে-তুমি রক্তশূন্য সাদা হয়ে ওখানে ঝুলছ, তোমার ওই মাথার কাঁটার মুকুটপরা মুখখানি যেন সাদা ধবধবে পালের মত মধুর, যে-তুমি আমাদের এই আলোআঁধা কামনার অনেক ওপরে, সেই তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন। ছোট খাবার ঘর পেরিয়ে গেলেন, সেখানে অন্ধকারে ঘুমন্ত মাছিগুলো হঠাৎ আলোর চমকানিতে চমকে উঠে, ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

আর সেই গর্জনভরা বাতাস আর বাইরের গাছের দুলোনি, বৃষ্টির কাপটের মত উপরে সেই উঁচু ছোট জানালার ওপর আঘাত করতে লাগল।

সেখান থেকে তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে আগুনের সামনে গিয়ে বসলেন, রাত্রের আগুনের জন্যে সেখানে কয়লা জড়ো করা ছিল। সেখানে পর্যন্ত বাতাস প্রতি ফাটল আর ফাঁক ভেদ করে আসতে লাগল। লম্বা ছোট রান্নাঘর, ধোঁয়ায় অন্ধকার ঝুল, কড়ি বরগা দিয়ে একড়ো-সেকড়ো ছাদ, তাঁর মনে হল যেন একটা জাহাজ দুলছে, ঝোড়ো সমুদ্রের বুকের ওপর। যদিও ছেলের আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে তিনি মন স্থির করেছিলেন, তবু নিজের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল, হয় ত তাঁর সবটাই ভুল হচ্ছে।

তাঁর মনে হল এ ঘোরতর অন্যায়, ঈশ্বর কি তাঁকে এত বড় দুঃখ দেবেন! তখন নিজের জীবনের পুরোনো পুঁথির পাতা উলটে তিনি দেখতে লাগলেন, আজকের এই দুঃখের বিশেষ কারণ আগে আছে কিনা! তাঁর কাঁপা আঙুলগুলির মধ্যে তাঁর জপের মালা যেমন একটি একটি করে শক্ত ও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়, তাঁর দিন গুলোও ত ঠিক তেমনি গোণা যায়। চিন্তার ছাড়া আর কোন অন্যায়ই তিনি কাজে কচিৎ করেছেন।

আবার সেই পুরোনো আগের ছবি মনে পড়তে লাগল। বাপ-মা-মরা মেয়ে, গরীব আত্মীয়ের বাড়ী থাকেন। সেই গ্রামের সকলের কাছেই হেনস্তা, খালি পায়ে দিন-রাত খাটুনী, মাথায় ভারি বোঝা নিয়ে ঘরে বেড়ান, নদী থেকে কাপড় কেচে আনা, জলে গম মাথায় করে নিয়ে যাওয়া। একজন ভাস্ত্রিকে লোক, তাঁর দূর আত্মীয়, জলের মালিকের কারখানায় কাজ করে। যখন তিনি জলে গম নিয়ে যেতেন, সেই লোকটা পথে যদি কেউ না থাকত, অমনি জোরে ধারে এসে তাঁর পিছু নিত, কাউগাছের তলায় যেখানে চাবড়া চাবড়া ঘাস ভরা, সেখানে জোর করে ধরে তাঁকে চুমু খেত। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তাঁর গাল-গলা সুড়্ সুড়্ করত, আর শুঁড়ো ময়দায় গা ভরে যেত। যখন এ কথা তিনি তাঁর খুড়ী, যাঁর কাছে তিনি থাকতেন, তাঁকে বলে দিলেন, তখন থেকে তিনি তাঁকে আর জলে যেতে দিতেন না। তারপর একদিন

সেই বুড়ো লোকটা, সে সাধারণতঃ গ্রামে বড় আসত না, তাঁর খুড়ীর বাড়ীতে এসে একদিন বললে, আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করব। বাড়ীর লোকেরা ত হেসেই খুন, তার পিঠে কয়েকটা থাপ্পড় তারা দিয়ে দিলে, আর কাঁটার বাড়িতে তার কোটের গুঁড়ো মশলা বেড়ে দিলে। কিন্তু সে সে-ঠাট্টা গায়েই মাখল না, মেয়েটির দিকে নজর রাখলে। শেষে তিনি তাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর খুড়ীর ওখানেই রইলেন, প্রত্যেক দিন সেই কারখানায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সে রোজই কিছু কিছু আটা তাঁকে দিত তার মালিকের অজ্ঞাতে। তারপর একদিন তিনি সেই আটা নিয়ে ফিরছেন, এমন সময় তাঁর পোষাকের ভেতর কি যেন নড়ে উঠল বলে মনে হল। চমকে উঠে ঝাঘরাটা হাত থেকে ছেড়ে দিলেন, আটাগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল, তাঁর মাথাটা এমন ভাবে ঘুরতে লাগল যে, মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর মনে হল বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে, বাড়ী ঘর দোর তাঁর চোখের সামনে দুলতে লাগল, পথ যেন ওপর নীচ করতে লাগল। তখন সেই আটামাখা মাটিতে উপুড় হয়ে তিনি পড়ে গেলেন। তারপর উঠে হাসতে হাসতে দৌড়ে বাড়ী চলে গেলেন, মনে ভয়ও হল, কারণ তিনি বুঝলেন, তাঁর পেটে সন্তান এসেছে।

পলের যখন সবে একটু আধটু কথা ফুটছে, তখন তিনি বিধবা হলেন। কিন্তু তার কচি জলজলে চোখ সারাক্ষণই তাঁর পিছু নিত। স্বামীর জন্যে তিনি শোক করলেন, একটা বুড়ো লোক তাঁর প্রতি দয়া করতেন বলে, এর বেশী কিছু আর নয়। তারপর শান্ত হয়ে গেলেন। তাঁর একজন আত্মীয় তাঁকে বললেন যে, তারা দু-জনে সহরে যাবে, আর কাজ খুঁজে নেবে।

"আর তা হলে তুমি তোমার ছেলেকেও খাওয়াতে পরাতে পারবে। তারপরে চাই কি তাকে স্কুলে দিয়ে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারবে।"

এই রকম করে তিনি কাজ পেলেন, আর শুধু পলের জন্যেই বেঁচে রইলেন। আমোদ কিংবা সুখে ডুব দেবার আর তাঁর সুযোগ অবসরই হয় নি বা ইচ্ছাও হয় নি। পাপেও না পুণ্যেও না। মনিব ও চাকর, চাষা বা সহরে লোক, সেই বুড়ো আত্মীয়টা যেমন বাউণাছের তলায় ধরেছিল, তেমনি সবাই তাঁকে ধরবার জন্যে ফিরত। পুরুষ হল শিকারী, মেয়ে হল শিকার, কিন্তু তিনি এ সব খানায় পড়া থেকে বরাবর নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছেন। চিরকালই নিজেকে পবিত্র ও সৎ রেখেছেন তিনি। কেননা অনেক দিন থেকে তিনি নিজেকে পাদরীর-মা রূপে কল্পনা করে আসছেন। তবে কেন, কেন, আমার এমন সাজা হল, হে ভগবান!

ক্লান্ত মাথা কোলের কাছে নত হয়ে পড়ল, চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, কোলের কাছে যে জপের মালা ছিল তার পরও গড়িয়ে পড়ল।

ক্রমে তাঁর ঘুমের জড়তা এল, আর মনের ভেতর জড়ানো স্মৃতিগুলো ভেসে যেতে লাগল। মনে হল, তিনি যেন সেই স্কুলের বড় রান্নাঘরের ভেতর রয়েছেন, যেখানে তিনি বহু বছর চাকরাণীর কাজ করেছেন, আর যেখানে তিনি তাঁর পলকে ছাত্র হিসাবে ভর্তি করতে পেরেছিলেন। কাল-কাল মূর্তি নিঃশব্দে এদিক-ওদিক করত, বাইরের পথে ছেলের দলের চাপাগলার হাসি, কিংবা তাদের এদিক ওদিক উঁকি মেরে দেখা, যখন কেউ তাদের বকবার না থাকে—সে-সব তিনি শুনতে পাচ্ছেন। খাটুনীর ক্লান্তিতে নড়ার মত অবস্থায় অন্ধকার আগুনের ধারে জানালার কাছে বসে, কোলের ওপর একখানা থাকুন, এত ক্লান্ত যে আঙুলটা নাড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই। স্বপ্নেও তিনি যেন পলের জন্য অপেক্ষা করছেন, সে তখন চুপি চুপি স্কুল থেকে, কোথায় যাচ্ছে তা না বলে, বেরিয়ে গেছে।

"যদি তারা ধরে ফেলে, তবে নিশ্চয়ই তাকে তখুনি তাড়িয়ে দেবে।" তিনি কাতর উৎকণ্ঠায় বসে আছেন, বাড়ী যখন একেবারে নিঃসাড় নিস্তব্ধ হবে, তখন তিনি পলকে আস্তে চুপে চুপে ঢুকিয়ে নেবেন, কেউ দেখতে পাবে না।

হঠাৎ তিনি জেগে উঠে দেখলেন যে, সেই ছোট গির্জে-বাড়ীর রান্নাঘরে, সমুদ্রে জাহাজ যেমন টাল খায়, তেমনি ঝেঁপে ঝেঁপে তিনি টাল খাচ্ছেন। কিন্তু সেই স্বপ্নের ছাপ তাঁর মনে এমন জোরে আঁকড়ে ছিল যে, মনে হল কোলের কাছে সেই বাচ্চনখানা রয়েছে, এখনও যেন সেই স্কুলবাড়ীর বাইরের পথটায় ছেলেদের মাথাঠোকাঠুকি আর চাপা হাসি শুনতে পাচ্ছেন। পরমুহূর্তেই, এখনকার নিছক সত্যি আবার তাঁকে

ঘরলে ঢেপে। ভাবলেন পল বোধ হয় এতক্ষণ পরে ফিরে এসেছে, তিনি অনেক ক্ষণ ঘুমিয়েছেন। তাই নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর সত্যি-সত্যি তখনও, জোর বাতাসে সেই বড় বড় ক্যাচ ক্যাচ শব্দের ভেতর, বাড়ীর ভেতর কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন; কে যেন নীচে নেমে আসছে, নীচের ঘর পেরিয়ে, রান্নাঘরেই যেন আসছে। তাঁর মনে হল, তখনও তিনি ঘুমুচ্ছেন, এমন সময়, একজন বেঁটে, মোটা গোছের পাদরী, এক হস্তায় গজান-দাড়ী নিয়ে, তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে হাসলে। যে কম্বলটা গায় তার পড়ে না গিয়ে আছে, তা তামাকের ধোঁয়ায় একেবারে কাল হয়ে গেছে। তার সেই হালকা রঙের চোখ, ভয়ানক ভয় দেখাবার ছল করছে। তিনি নিশ্চয় বলতে পারেন, যে লোকটা সত্যি সত্যি হাসছে। আর তখুনি তিনি বুঝলেন, যে এই সেই বুড়ো পাদরীটা,—কিন্তু তাতে তিনি একটুও ভয় পেলেন না।

"এ কিছু নয়, শুধু স্বপ্ন।" নিজেকে নিজে এই কথাই বললেন। কিন্তু আসলে তিনি বেশ জানেন যে, এ শুধু নিজেকে সাহস দেবার জন্যে, আর কিছুই নয়। এ স্বপ্নের ছায়া নয়, এ একেবারে বাস্তব সত্য।

বল্লেন, "বসুন"। তাকে আগুনের কাছে জায়গা করে দেবার জন্যে নিজে টুলটা একটু সরিয়ে টেনে নিলেন। সে বসল, তার পাদরীর পোষাকটা একটু গুটিয়ে নিয়ে একজোড়া রঙ-জলে-যাওয়া পুরোনো মোজা দেখালে।

"তুমি যখন এখানে বসে বসে আর কোন কাজই করছ না, তখন মারিয়া মাদালেনা আমার মোজাজোড়াটা সেলাই করে দিতে পার? আমাকে দেখবার জন্যে কোন মেয়ে মানুষই নেই যে একটু সেবা-শুশ্রূষা করে।"

একি সেই ভয়ানক পাদরীটা নাকি? না আমি এখনো স্বপ্নই দেখছি? তারপর তিনি যাতে সে নিজে-থেকে নিজেকে ধরা দেয়, তার চেষ্টা করে বল্লেন—

"যদি তুমি মরেই গেছ, তোমার ত' আর মোজার কোন দরকার নেই।"

"কি করে তুমি জানলে যে আমি মরে গেছি? বরং উল্টো, আমি খুব বেঁচে আছি, এইখানে বসে রয়েছি। আমি অনেক আগেই তোমাকে আর তোমার ছেলেকে তাড়াব ঠিক করেছি। এখান থেকে তোমাদের তাড়াব তবে ছাড়ব। এখানে এসে তোমরা বড় অন্যায় কাজ করেছ। ওকে তার বাপের ব্যবসা শিখিয়ে বড় করা তোমার পক্ষে উচিত ছিল। তা না, তুমি একটা মহাউচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে, তুমি যেখানে একদিন চাকরাণী-বৃত্তি করে গেছ, সেইখানে মালিক হয়ে বাস করতে চাও? এখন, এখন কেমন দেখ, কি লাভ তোমার হবে এতে!"

ভয়ে কাতর হয়ে তিনি বল্লেন, "আমরা চলে যাব এখান থেকে। সত্যিই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তুমি ক্লান্ত মানুষই হও আর ভূতই হও, কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর, আমরা চলেই যাব।"

"আরে কোথায় তোমরা যাবে?" বুড়ো পাদরী বললে। যেখানেই তোমরা যাবে সেইখানেই এই রকম হবে। তার চেয়ে যে বলছে, সে সব কথা জানে, তার উপদেশ শোন, পলকে তার অদৃষ্টের পথেই চলতে দাও। তাকে ওই মেয়ে মানুষটাকে জানতে দাও, না হলে যা আমার অদৃষ্টে ঘটেছে, ওর ঘাড়েও ঠিক তেমনি ভূত নামবে। যখন আমি ছেলেমানুষ ছিলেম, আমার মেয়েমানুষ নিয়ে কোন গোলমালই হয়নি। কোন রকমের আমোদ-প্রমোদেও নয়। আমি শুধু স্বর্গকে ভয় করব এই চিন্তাই ছিল, আর আমি পোড়া চোখে এটা বুঝতেও পারিনি, ধরতেও পারিনি যে, এই পৃথিবীটাই স্বর্গ। যখন আমি সেটা বুঝলাম, তখন অনেক দিন কেটে গেছে। তখন আমার হাত আর পৌঁছয় না ওই গাছের ফল পেড়ে খেতে, আমার হাঁটুও আর ঝুমড়োয় না যে, ঝরণাতলা থেকে জল পান করব। তখন আমি শুধু মদ খুব করলাম। এই জায়গার যত হতভাগাদের সঙ্গে মিশে তাস খেলতে লাগলাম, আর পাইপ টানতে লাগলাম। তোমরা তাদের হতভাগা, পাজী নচ্ছার বলছ, আমি তাদের বলি সাদা মানুষ; খাসা মানুষ সব, জীবনটা যেমন দেখে তেমন ভাবে ভোগ করে চলেছে। তাদের সঙ্গে থাকলে, এই একটা সুবিধে হয় এই যে, তারা এতটুকু আনন্দ আর মজা সহজভাবেই ছড়িয়ে দিতে পারে·· ছুটির দিনে ছেলেরা যেমন আনন্দ ছড়িয়ে বেড়ায়। শুধু তফাৎ হচ্ছে এই যে, এই ছুটির দিন তাদের রোজই হয়। আর সেইজন্যে ছেলেদের চেয়েও এরা আমোদ-আহ্লাদ

করে, বালকদের চেয়েও সব অগ্রাহ্য করে। ছেলেরা কিন্তু ভুলতেই পারে না, যে তাদের ফিরে ফুলে যেতে হবে।"

যখন সে এই সব কথা বলে যাচ্ছে, মা ভাবলেন, "সে শুধু এ সব বলছে, আমাকে শুধু পলকে ছেড়ে যাবার জন্য যাতে সে চিরকালের জন্যে অভিশাপে অনন্ত নরক ভোগ করে। নিশ্চয়ই এ তার সেই প্রভু, শয়তান বন্ধুর কাছ থেকে আসছে, আমাকে দেখছি বেশ সাবধান হতে হবে।"

এ সব বোঝা সত্ত্বেও মা তার কথা ভাল করে শুনলেন, আর যা সে বললে সব তাতেই সায় দিয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমায় ছাড়ার চেষ্টা সত্ত্বেও পল হয়ত "ছুটি নিতে পারে", তখন স্বভাব থেকে, মায়ের সহজাত সংস্কার থেকে, তাঁর অন্তরে পলের হয়ে একটা অছিলে খুঁজতে লাগলেন।

অত্যন্ত বিনয় ও দুঃখের সঙ্গে তিনি আরো বললেন, "তুমি যা বলছো, তা সবই ঠিক",—এ কিন্তু মায়ের ছলনা বই আর কিছু নয়। "আমি মূর্খ মেয়েমানুষ বৈ ত নয়, আমিত বেশী বুঝিনি; কিন্তু একটা বিষয় আমি নিশ্চিন্তই জানি যে, এ পৃথিবীতে ভগবান আমাদের সব সহ্য করবার জন্যেই পাঠিয়েছেন।"

"কখনো না, তিনি পাঠিয়েছেন, সব ভোগ করবার জন্যে। তিনি যে এই সব দুঃখ দেন সে আমাদের শাস্তির জন্যে। তার কারণ কেমন করে যে ভোগ করতে হয় তা আমরা জানিনে। আর এই সত্য। তুমি একটা আহাম্মক বোকা মেয়েমানুষ। ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টি সব সৌন্দর্য্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষকে দিয়েছেন, সেই সুন্দরের যে আনন্দ তাই ভোগ করবার জন্যে। কিন্তু আমি মরতে কেন তোমায় এ সব কথা বলতে এলাম—আমার মনে আছে শুধু তোমাদের এ জায়গা থেকে তাড়িয়ে তবে অন্য কাজ, তুমি আর তোমার পল। আর যদি তুমি তা থামাতে চাও, বাধা দাও, তবে আরো তোমাদের খারাপই হবে।"

"আমরা চলে যাচ্ছি, কোন ভয় নেই তোমার, আমরা শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছি। এ আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর আমারও ইচ্ছে তাই।"

"এ তুমি বলছ এই জন্যে যে, আমার কথায় তুমি বড় ভয় পেয়েছ। ভয় পাওয়া তোমার পক্ষে অন্যায়। তুমি মনে করছ যে, আমিই তোমার পা বেঁধে রেখেছি, চলতে বাধা দিচ্ছি, তোমার বেশলাই আলতে বাধা হয়েছি। হয়ত তা হতে পারে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমি তোমার বা তোমার ছেলে পলের কোন অনিষ্ট কামনা করি। আমি শুধু চাই যে, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আর শোন, মনে রেখ, তুমি যদি তোমার কথা না রাখ, তোমারই দুঃখু হবে। ভাল, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। ইতিমধ্যে আমার মোজা এখানে রেখে গেলেম। এটা বেলাই করে রেখ।"

"ভাল, আমি নিশ্চয়ই বেলাই করে রাখব।"

"তবে চোখ বোজ শীগ্‌গির, তুমি যে আমার খোলা খালি পা দেখ, এটা আমি পছন্দ করি নে। হা হা হা হা।" সে হেসে উঠল। তারপর একটা পায়ের আঙুলের ডগা আর একটা পায়ের জুতো দিয়ে খুলে, আরো নীচু হয়ে মোজা খুলতে খুলতে বললে: "কোন মেয়ে মানুষ আজও পর্য্যন্ত আমার খোলা পা দেখে নি, তা যতই তারা আমায় গালাগালি করুক, তুমি যথেষ্ট বুড়ো হয়েছ, আর খুব কুৎসিত। এই একটা মোজা, এই আর একটা। আমি আবার আসব, আর এ মোজা শীগ্‌গির নিয়ে যাব।

তিনি চমকে চোখ তাকিয়ে দেখলেন। রান্নাঘরেই তিনি একলা আছেন, আর বাতাস তার চারিদিকে গর্জ্জন করে চলেছে।

"হে ভগবান! এ কি স্বপ্ন!" একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। তথাপি তিনি ঘাড় হেঁট করে মোজা খুঁজতে গেলেন। তার মনে হল, তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন—খুব আস্তে, জুতোর পা ফেলার শব্দ, যেন সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে ওই যেন মিলিয়ে গেল!

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পক্ষী-দ্বীপ

নিউজীল্যাণ্ডের অন্তর্গতী অক্‌ল্যাণ্ড্ সহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হাউরাকি উপসাগরে লিটল ব্যারিয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটি এমন পর্ব্বতসঙ্কুল যে, সমুদ্র খুব শান্ত না থাকলে এ দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঘেঁসা যায় না।

মাওরী ভাষায় এ দ্বীপকে বলে হাউতুরু। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা গল্প প্রচলিত আছে। অনেক কাল আগে একটা বড় মাওরী নৌকা এখানে ঝড়ে ডুবে পাষাণ হয়ে যায়। নৌকার নাম ছিল হাউতুরু, তাই থেকে দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। দূর সমুদ্র থেকে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় দেখতে অনেকটা নৌকার গলুইএর মত—মাওরীদের বিশ্বাস এই পাহাড় যে স্পর্শ করবে, সাত দিনের মধ্যে সে মারা যাবে।

হাউতুরু দ্বীপের সৌন্দর্য্য এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। প্রকৃতি একে সকল সৌন্দর্য্যসম্পদে ভূষিত করেছে—নীল সাগর, ঘন অরণ্যানী, প্রবালমণ্ডিত অন্তরীপ, নির্জ্জনতা—এসব তো আছেই—কিন্তু একে আরও সুন্দর করেছে এর বিচিত্রবর্ণের পক্ষিকুল। এত পাখীও আছে এর নির্জ্জন বনের ডালপালায়! বনফল প্রচুর পাওয়া যায় এবং মানুষের সমাগম নেই বলেই বোধ হয় দেশ দেশান্তর থেকে পাখীর দল এখানে এসে বাসা বেঁধেছে।

হাউতুরু দ্বীপে আসতে হলে নিউজীল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। প্রায় ত্রিশ বছর আগে এখানকার মাওরী ভূস্বামীদের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট হাউতুরু দ্বীপ কিনে নেন, এখানে বন্যপক্ষীদের আশ্রয়স্থান করবার জন্যে। কেউ এখানে পাখী মারতে পারে না। বন্দুক নিয়ে নামবার জো নেই হাউতুরু দ্বীপে—পক্ষিখাদ্যের চাষ করা হয় গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, এবং মাত্র তিনটি লোক এ দ্বীপের স্থায়ী অধিবাসী, একজন পাখীদের তদারককারী কর্ম্মচারী, তার স্ত্রী ও মেয়ে।

এ রকম শান্ত, নিরাপদ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিহঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মানুষকে তারা চায় না, এখানে তারাই মালিক, তাদেরই এখানে স্বরাজ। বনের পাখী যারা ভালবাসে, এমন কেউ কেউ মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসে বটে, এমন কি সুদূর ইউরোপ থেকেও অনেকে আসে—কিন্তু তাদের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব কম। মোটের ওপর পাখীরাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত তদারককারী কর্ম্মচারী পাখীদের কর্ত্তা মাত্র।

আগে এখানে নাগাতি ওয়াই জাতি বাস করত। মাওরীদের একটা শাখা তারা। সমগ্র নিউজীল্যাণ্ডে যখন ইংরেজদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছে—তারও অনেকদিন পর পর্য্যন্ত মাওরী সর্দ্দার টেনেটাহি ও তার স্ত্রী রাহুই এ দ্বীপে ছিল। অক্‌ল্যাণ্ড যখন ক্রমশঃ সহর হয়ে উঠছে, তখন তারা বুঝতে পারলে হাউতুরু দ্বীপের জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সহরে চালান দিলে বেশ দু'পয়সা হয়। এই ব্যবসার সূত্রে বহির্জগতের সঙ্গে এ দ্বীপের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হল।

নিউজীল্যাণ্ডের বনভূমিতে কাউরি বলে এক জাতীয় গাছ আছে—এর আঠা ও কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। কাউরি ছোট গাছ নয়—বিরাট বনস্পতি, কালিফোর্ণিয়ার রেড্‌উড্ গাছের সমান বিশালকায়। হাউতুরু দ্বীপের বনে অজস্র মূল্যবান প্রাচীন কাউরি গাছ ছিল—অক্‌ল্যাণ্ড সহর থেকে ডজনখানেক 'পাকেহা' (বর্ণসঙ্কর) মাওরী এসে এই গাছের বন জমা নিয়ে আঠা চালান দিতে লাগল—ক্রমে তারা বড় বড় কাউরি গাছ কেটে বন ধ্বংস করে ফেলবার যোগাড় করলে। সেই সময় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল এবং নামমাত্র মূল্যে দ্বীপটি রাহুই গবর্ণমেণ্টের কাছে বেচলে।

ছোট একটা মাওরী গ্রাম ছিল এখানে, তার অধিবাসীরা ওমাহা দ্বীপে চলে গেল এখানকার বাস উঠিয়ে—গবর্ণমেণ্ট এখানে একজন কর্ম্মচারী পাঠালে পাখীর তদারক করবার জন্যে। নতুন আইন পাশ হল হাউতুরু দ্বীপের পাখী কেউ মারতে পারবে না। মাওরী অধিবাসীদের অনেক তরমুজের ক্ষেত ছিল এখানে, তারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পেলে যে তরমুজ পাকবার সময় দ্বীপে এসে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে

পাবে। এ সব অনেক দিনের কথা। এখন কোন মাওরী আর হাউতুরু দ্বীপে আসে না—ভয়ঙ্করের কেউ অঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

হাউরাকি উপসাগরের প্রবেশপথ থেকে হাউতুরু দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ তীরের শৈলশ্রেণী দেখায় ঠিক যেন একটা ভাসমান তিমিমাছ। ক্রমে যত কাছে আসা যায়, তীরভূমি স্পষ্টতর হতে থাকে, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী বালুকাময়

সিটুস ম্যাক্রিয়ার : দ্বীপের একপ্রান্ত।

উপকূল নজরে আসে। ওপরে নীল পাহাড়, নীচে চকচকে সাদা বালির তীর, পাহাড়ের ঢালুতে সবুজ বনানী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা নেমে এসেছে, বনের গায়ে দেখায় যেন ঝোলা সিঁথির মত। সবটা মিলে সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

দ্বীপে নামবার ও জাহাজ বাঁধবার জায়গা এদিকটাতে একেবারেই নেই। অতি দুরারোহ শৈলমালায় এদিকটা ঘেরা। পাহাড়ের খাড়াই এক এক জায়গায় আটশো ফুটেরও বেশী। উত্তর-পশ্চিম দিকে সামান্য একটু খোলা জায়গা আছে, যেখানে নামা চলে। কিন্তু সমুদ্র শান্ত না থাকলে হাউতুরু দ্বীপের কাছেই ঘেঁসা যায় না। উপকূলের অনেক দূর পর্যন্ত বড় বড় পাথরের চাইএ ভর্তি, তাদি বোট নামিয়ে জাহাজ থেকে আসবার সময় অশান্ত সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ে যদি বোট এই পাথরের চাইয়ের ওপর আছাড় খায়, তবে যত শক্ত বোটই হোক না কেন, ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় দ্বীপে নামবার চেষ্টা না করে ষোল মাইল দূরবর্তী ওমাহা দ্বীপের উপকূলে আশ্রয় নেওয়া ভাল। ওমাহা দ্বীপে ডাকঘর আছে, ডাকবাবু পিয়ন পনেরো দিন অন্তর একবার হাউতুরু দ্বীপে গিয়ে তথাকার কর্মচারীর চিঠিপত্র ও খাবার জিনিস দিয়ে আসে। সভ্য জগতের সঙ্গে এইটুকু মাত্র সম্পর্ক হাউতুরু দ্বীপের। কোনও রকমে দ্বীপে একবার পৌঁছে গেলে চারিদিক থেকে বন-বিহঙ্গের কাকলী কানে আসবে—পাদপসঙ্কুল তটভূমিতে বড় বড় ঢেউয়ের আছড়ে পড়বার গম্ভীর ধ্বনিও তার কাছে ক্ষীণ বলে মনে হবে। যত তীরদেশের কাছে যাওয়া যাবে, পাখীর কলরব তত আরও স্পষ্টতর হবে—শেষে কলরব এত বাড়বে, যে, আর কোন শব্দ শোনা কঠিন হয়ে উঠবে। জানুয়ারী মাসের প্রথমে এই দ্বীপে যাওয়া উচিত। পাখীর সংখ্যা ওই সময়ে খুব বেশী থাকে প্রতি বৎসরই।

এ সময় একরকম ফুল দ্বীপের জঙ্গলে সর্বত্র ফুটে থাকে—মাওরী ভাষায় তাকে বলে 'পুহুটুকোহা' অর্থাৎ 'রাজা নক্ষত্র' ফুল। এই ফুলে খুব মধু। হাজার হাজার মৌটুসকি পাখী ঝোপেঝাপে 'রাজা নক্ষত্র' ফুলের ওপর বসে মধু খাচ্ছে দেখা যাবে। ঘণ্টা-পাখী, পাদ্রী-পাখী, কাকাতুয়া প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের পাখীর দল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এই দ্বীপে আসে এবং মে মাসের শেষ পর্যন্ত

হাউতুরু দ্বীপের অধিবাসী।

থাকে। ঘণ্টা-পাখী ছোট ছোট, কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর। তারা চামচিকের মত নীচু দিকে মুখ করে গাছের ডালে ঝোলে—এদের গান ঠিক যেন রুপোর ঘণ্টার ধ্বনির মত শুনতে দূর থেকে।

হাউতুরু দ্বীপের কোথাও এতটুকু সমতল-ভূমি নেই—এর সবটাই উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের ঢালু বন জঙ্গলে ভর্তি, মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা আছে বটে, কিন্তু তাতে ফার্ণ-গাছ ও বড় ক্রিম্যাটিস্ ফুলের জঙ্গল। কোন কোন

উপত্যকা বেয়ে পার্বত্য শোভাযাত্রার সমুখে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের ওপর দিকে বিশালকায় জাউরি গাছের বন, মাওরী কাঠুরেদের তৈরী সরু পথ এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওপরে চলে গিয়েছে—ওই একমাত্র পথ পাহাড়ে উঠবার।

হাউরুক : অলিভোটে এইখানে নর্ত্তিত হয়।

হাউরুক দ্বীপের পাখীর দল মানুষকে ভয় করে না। যে কেউ যাক না কেন, পাখীরা নির্ভয়ে তার কাছে আসে। প্রত্যেক দর্শকই কিছু না কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে যায় পাখীদের খাওয়াবার জন্যে। এই জন্যেই বোধহয় এই সব বন্য বিহঙ্গের লোভ বেড়ে গিয়েছে। মানুষ দেখলেই গাছ থেকে নেমে তারা চারিপাশে ভিড় করে—খাবারের প্রত্যাশায়।

এখানে যিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আছেন, তাঁর স্ত্রী শীতকালে প্রতিদিন সকালে পাখীদের খাওয়ান। সে একটা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখীর দল কোথা থেকে উড়ে এসে তাঁর কাঁধে, মাথায়, হাতে বসছে, চারিপাশে ভিড় করছে, পরস্পর যেন ঠেলাঠেলি করছে—তাঁর হাত থেকে খাবার কেড়ে খাচ্ছে—নিজের চোখে না দেখলে সে দৃশ্যের অপূর্ব্বতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তারা এত নির্ভয় যে একগাছা লাঠি এ সময় আড় করে ধরে থাকলে লাঠি-গাছটার ওপর এক ঝাঁক পাখী এসে বসে যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি স্থান

টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো আফ্রিকার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিখ্যাত বলেই হোক বা টাঙ্গানিয়াকার বিরাট সমতলভূমি ও বেলজিয়ান্ কঙ্গোর অরণ্য শিকারীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান বলেই হোক—এই দুই দেশের কথা আজকাল অধিকাংশ লোকের অজানা নেই। যা একটু আবডু থাকী ছিল, 'টেলার চন' বা 'আফ্রিকা স্পিক্‌স্' প্রভৃতি ধরণের ফিল্মের কল্যাণে তাও আর বাকী নেই—এখন মাদাইল্যাণ্ড, এবং সেখানকার গাছপালা, পশুপক্ষী, স্থলের ছেলেরাও বায়স্কোপে দেখেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও অনেকেরই অজ্ঞাত—যাঁরা মনে করেন যে, বৃটিশ-পূর্ব্ব আফ্রিকাই আফ্রিকার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর জায়গা, তাঁরা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আমরা নীচে দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েকটি স্থানের কথা বলব, কোন কোন দিকে তাদের অবস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কঙ্গো বা ইউগাণ্ডার বিখ্যাত অরণ্য, পাহাড় পর্ব্বতের চেয়েও অধিকতর জনপ্রিয়।

জর্জ্জ

বিখ্যাত লেখক এ্যাণ্টনি ট্রোলোপ্ গত শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে এসে চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, যে, পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরতম স্থান

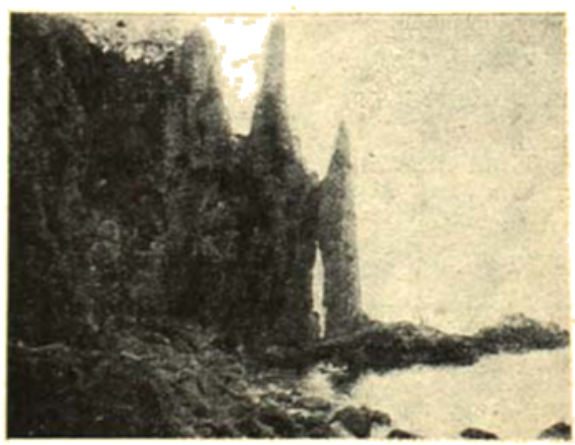

অভিনব গির্জ্জা।

এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি। সে হল ১৮৭০ সালের কথা। তারপর অনেক বছর চলে গিয়েছে, কত হাজার হাজার ভ্রমণকারী দেশ বিদেশ থেকে এসে জর্জ্জ দেখে গিয়েছে। জর্জ্জ আর এ্যাণ্টনি ট্রোলোপের আমলের সে ক্ষুদ্র গ্রাম নেই। সেখানে প্রকাণ্ড সহর গড়ে উঠেছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—কিন্তু তার সৌন্দর্য্যসম্পদ এখনও অটুট, মানুষে তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের এক কণাও হরণ করতে পারে নি, বিকৃত করতে পারে নি।

জর্জ্জ সহর বটে কিন্তু ইটপাথরের মরুভূমি নয়। এর

চারিধারে উত্তুঙ্গ শৈলমালা, নিবিড় অরণ্য, পাহাড় ও বনের মাঝে মাঝে ঝর্ণা ও ছোটখাটো পার্ব্বত্য নদী—সহরের যে কোন রাস্তা থেকে এই পর্ব্বতমালা ও বনের দৃশ্য চোখে পড়ে। সহরটিও যেন একটি বড় উপবন, রাস্তার দুধারে প্রাচীন বৃক্ষরাজি, প্রত্যেক বাড়ীর সাম্নে পিছনে বাগান। সারা সহরটি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা নেই।

জর্জ্জ।

এখানকার অবহাওয়া খুব ভাল, বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা নয়। মোজেল উপসাগরের তীর থেকে যদিও মোটে ত্রিশ মাইল দূরে, তবুও এখানে বৃষ্টিপাত মোজেল উপসাগরের তীরবর্ত্তী অন্যান্য সহরের চেয়ে তিনগুণ বেশী।

জর্জ্জ সহরের যে কোন রাস্তা শেষ হয়েছে গিয়ে দূরের বনপর্ব্বতের কোলে। সহর পেরিয়েই সব রাস্তারই দুধারে কার্পের জঙ্গল। বন্যপুষ্পে সমাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ,—বেশী মোটর-গাড়ীর ভিড় নেই বলে নিস্তব্ধ। সহর ছাড়িয়ে পায়ে হেঁটে দুটি মিনিট গেলেই একেবারে আদিম যুগের অরণ্যের মধ্যে পড়তে হবে—সে বন এত ঘন, পথ একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া দায়।

জর্জ্জ সহর উটেনিকা পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকের ঢালুর একেবারে নীচেই অবস্থিত। এদিকে গিরিসানুর অরণ্য এত ঘন যে, পাহাড়ের ওপর থেকে সহরটা প্রথম হঠাৎ চোখে পড়ে না, সহরের বাড়ীঘর গাছপালায় একেবারে ঢাকা পড়ে। উটেনিকা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম ক্র্যাডক্ পিক্, সমুদ্র থেকে ৪৫০০ ফিট উঁচু। জর্জ্জ থেকে যদি কেউ রেলে বা মোটরে পর্ব্বতের ওপরকার মন্টেগ্ গিরিবর্ত্ম দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী উড্‌ভূর্ণ সহরে যায়, তবে ভ্রমণ-পথের সে অপ্রত্যাশিত ও অপরূপ সৌন্দর্য্য চিরজীবন তার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

মোটরের পথ ও রেলপথ প্রায় পাশাপাশি পাহাড়ে উঠেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার আনন্দ থেকে কিছু মাত্র বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা নেই রেলযাত্রীর। সহর থেকে ন' মাইল গেলেই গাড়ী একেবারে মন্টেগ্ গিরিবর্ত্মের ওপর উঠে যাবে। এখানে মোটরপথ ও রেলপথ প্রায় মিশেছে, রেলগাড়ীর জানালা থেকে নজর পড়বে, প্রায় দু' হাজার ফুট নীচু দিয়ে সাদা অজগর সাপের মত মোটরের পথটা ঘন কার্ণ-জঙ্গলের নিবিড়তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ক্রমশঃ ওপরে উঠে আসছে—দূরে সুনীল মোজেল উপসাগর এবং সেন্ট্ ভেল্ অন্তরীপের প্রস্তরময় বালা—এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাহাড়ের গায়ে পাথাড়, মাঝে মাঝে শ্যামল উপত্যকা, নদী দ্রুদ, অরণ্য; পশ্চিমে ক্রিস্না নদীর তীরবর্ত্তী ছোট ছোট গ্রাম, তৃণভূমি ও কমলালেবুর বাগান।

জর্জ্জ সহরে বেড়াতে এসে অনেক ভ্রমণকারী এখানে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেছে—ফিরে যেতে তাদের মন সরেনি।

জর্জ্জ :

ক্রিস্না

এমন একদিন ছিল যখন পুট, নোয়েংডি বা ক্রিস্না প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করা সাধারণ পথিকের দুঃসাধ্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই সব দিকে বন ও পাহাড় অত্যন্ত বেশী—পঞ্চাশ বছর আগেও যাতায়াতের কোন পথ ছিল না বল্‌লেই হয়—রক্তপিপাসু আদিম অধিবাসীদের উপদ্রবের ভয়ে বিদেশী লোকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে পথ হাঁটতে সাহস করত না।

এখন আর সে দিন নেই। চক্র সহরে টিকিট করে আরামে রেলগাড়ীতে বসলে ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী এসে ক্রিস্নাতে পৌঁছবে। ইটোনিক পর্ব্বত থেকে কিছুদূর এলেই ক্রিস্না

ছবি : কাইমাস ঘাট।

নদী পড়বে—পূর্ব্বে ইমার ছাড়া নদী পার হওয়ার উপায় ছিল না, আজকাল রেলওয়ে সেতু হয়েছে। ইটোনিকা পর্ব্বতের এপাশ থেকে নদী পর্য্যন্ত গোটা পথটারই বাঁ দিকে ছোট বড় অসংখ্য হ্রদের মালা, চারিধারে বন, মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। ক্রিস্না সহর ভর্জের মত বড় নয়, আরও ছোট, আরও নিস্তব্ধ। সহরের একপাশে একটা বড় হ্রদ। এককালে এখানে সমুদ্র ছিল—এখন সমুদ্র সরে গিয়ে এই বড় হ্রদটার সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতম অংশের জল এখনও শুকিয়ে যায় নি—কিন্তু চারিপাশে পলি পড়ে উঁচু ডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। এই হ্রদের জল শান্ত অথচ নীল—এর একদিকে মাত্র অল্পউচ্চ পাহাড়, অন্য তিন দিকে বনসঙ্কুল বনানী। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে হ্রদের ব্যবধান আর চার মাইল।

ক্রিস্না থেকে ১২ মাইল ঘুরে অত্যন্ত ঘন অরণ্য। এই অরণ্যের মাঝে মাঝে পাহাড় ও অসংখ্য গুহা আছে। এখানকার একটা গুহার মধ্যে বহু প্রাচীন যুগের মানুষের করোটী পাওয়া গিয়েছে—নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে উক্ত করোটী অন্ততঃ তিনলক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। এখানে বনের সৌন্দর্য্য এমন যে, স্থানীয় লোক এ অঞ্চলের নাম দিয়েছে Garden of Eden, নন্দন-কানন। রোডেসিয়ার গবর্ণমেণ্ট এই বন পাহারা দেবার জন্যে কর্ম্মচারী রেখে দিয়েছে—তাদের অনুমতি না নিয়ে এখানে শিকার করবার উপায় নেই। একসময়ে বনে অসংখ্য বন্যহস্তী থাকত—এমন সব সুপ্রাচীন বৃক্ষগাছ এখনও আছে, যার ডালপালা হেতে হাতীর দল একদিন খেয়েছে। বহু কালের ওক্ আছে, নানা বন্যের পুষ্পিত বল্লরী আছে, গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা দেবদার গাছের একটা ডালও কাউকে কাটতে দেয় না।

ক্রিস্না : প্রবেশ-পথ।

কাঙ্গো গিরিগুহা

উচ্চ পর্ব্বত সহর থেকে চ'ধারে বনে ঘেরা পথ ঘুরে দোয়ার্ত্তবার্গ পর্ব্বতমালা উল্লঙ্ঘন করে রোডেসিয়ায় চলে গিয়েছে। রেলপথ এখান অন্যদিক দিয়ে ঘুরে গেল বলে দোয়ার্ত্তবার্গ পর্ব্বতের—বিশেষ করে কাঙ্গো গিরিগুহার

সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যে লোক এই পথে মোটরে যাতায়াত করে।

কাঙ্গো গিরিগুহা অতি অদ্ভুত জিনিষ। এখানে তিনটি গুহা আছে পর পর—একটার ভেতর দিয়ে আর একটাতে

যাওয়া যায়। কোন গুহার মধ্যে মনে হবে যেন প্রকাণ্ড একটা রাজপ্রাসাদ, বড় বড় থাম, সিংহাসন সাজানো রয়েছে। কোন গুহাতে অদ্ভুতদর্শন অনাবৃত শুররাজি, কোনটা সবুজ, কোনোটা বেগুণী রঙের। সবই প্রকৃতির হাতে গড়া স্থাপত্য। গুহার ছাদ দিয়ে জল চুঁয়ে পড়ে' যে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বোনেট সঞ্চিত হয়েছে, বহুযুগ ধরে' তারই ফলে এইসকল অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে গুহার মধ্যে। এই জায়গাটাতে বন এত ঘন যে বাইরে থেকে এ গুহার অস্তিত্ব একেবারেই জানবার উপায় নেই—গুহার মুখ বুনো লতাপাতায় ঢাকা থাকে। গুহার অবস্থান-স্থানটি যে ঠিক না জানে, সে এক ঘণ্টা ঘুরলেও গুহার মুখ খুঁজে পাবে না।

১৭৮০ সালে জ্যান ফিন নামে একজন বুয়ার-শিকারী হাতীশিকারের জন্যে এই বন জঙ্গলে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে গুহার মুখে এসে পড়ে। কৌতূহলবশতঃ গুহায় ঢুকে সে অনেক দূর চলে যায় এবং গুহার ভিতরকার অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে দেশে ফিরে সকলকে গল্প করে। সেই থেকে কাঙ্গো গুহার নাম সভ্যজগতে সুপরিচিত হয়।

গুহার মধ্যে ভাল আলোর ব্যবস্থা এতদিন ছিল না। এত অন্ধকার যে পথ হাতড়াবার আশঙ্কা পদে পদে—মধ্যে এত ঘর, বাড়ী, বারান্দা, সিঁড়ি, যে খুব বড় রাজপ্রাসাদে তার অর্দ্ধেকও নেই। একবার গোলকধাঁধার মধ্যে অন্ধকারে পথ হারালে প্রাণ নিয়ে দিনের আলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করা দুষ্কর ছিল। সকলের চেয়ে বড় হল প্রথমে পড়ে—এর নাম জ্যানফিলের হল, তারপর বোপার হল, স্নানাগার, (এখানে গুহা-তলে সব সময় নির্ম্মল জল পাওয়া যায়), রাজার কক্ষ, বাদর-

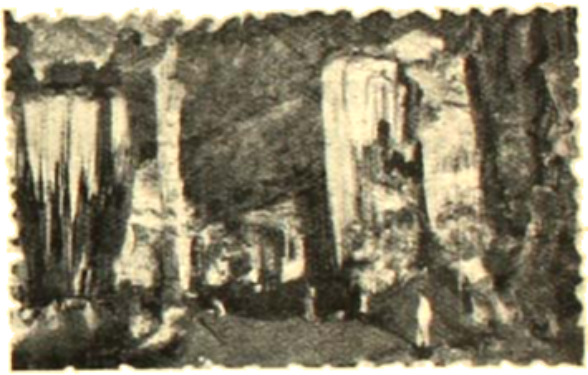

কাঙ্গো গুহা জ্যানফিলের হল।

কক্ষ, নীল কক্ষ, রাজা সলোমনের খনি—ইত্যাদি নানা ঘর, বারান্দা আছে। আজকাল গুহার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—পথিকদল নির্ভয়ে গুহার সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। কাঙ্গো গুহাতে আদিম যুগের মানুষেরা বাস করত বহু সহস্র বছর আগে—গুহার গায়ে তাদের আঁকা জন্তু-জানোয়ারের ছবি এখনও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

আর একদিক

নিউ হ্যাম্পশায়ার আইলাণ্ড বোষ্টন হইতে ট্রেনে একদিনের পথ। লোকসংখ্যা ৮৮০০০ হাজার। অধিকাংশই প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান। সমৃদ্ধি, শ্রী ও শিক্ষার অভাব নাই। আমেরিকার অন্যান্য স্থানের মতই সব সব। শুধু একটি বিষয়ে ইহার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। গত শত বৎসরে এই স্থানে মাত্র একটি বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা চালানো হইয়াছে। যে প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা বলিতেছেন—আটমাস কাল আর দুহাই পড়ে নাই। আমেরিকার চাইতে বড় আর কোন জিনিস নয়।

—আমেরিকান মাসিক

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চরচিলমারী পুনর্ব্বার

১০

পরদিন করুণের নৈশ অভিসারের কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সংবাদটা দুই পক্ষের মত ঘরের এক চাল হইতে অন্য চালে উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে করুণের বাড়িতে আসিয়া পড়িল। করুণ অবাক হইয়া গেল। ঘটনা সত্য নয় সে জানে, কিন্তু এতগুলি লোকের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপরে তাহা যে মিথ্যা ইহা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। পক্ষপক্ষের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিল, কিন্তু যখন সে শুনিল পাড়ার বৈষ্ণবেরা স্বয়ং করিমকেও ইহা সকলের সম্মুখে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন তাহার আর কোন ভরসা রহিল না। করিম নাকি বলিয়াছে, সে শেষরাত্রে মাছ ধরিতে গিয়া তারণ দাসের মেয়েকে অন্ধকারে নদীর ধারে দেখিয়াছে। ইহার পরে আর ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জগতে সত্য নির্দ্ধারণ এমনি করিয়াই হয়।

ইহার পর হইতে করুণের পক্ষনিম্ন ঘরবাহিরের প্রভেদ ঘুচিয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, তারণ দাসের মেয়ের চরিত্র ভাল নয়। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা তাহাকে পথে ঘাটে নানা রকম আকার ইঙ্গিতে অপমান করিত, এবার তাহারা বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। গ্রামে তাহার সহায় ছিল দুইজন, করিম আর বাদল। করিম এখন শত্রুপক্ষের দলে, কারণ তাহার সাক্ষ্যের উপরেই বর্ত্তমান অবস্থাটার ভিত্তি, আর বাদল তো নিতান্ত বালক।

করুণের এখন মৃত্যুই একমাত্র কাম্য। কিন্তু মরণ তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। সেদিন সে পাগলের মত পদ্মার ধারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে তারণ দাস আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জায়গায় আসিয়া কেবল যেন তার চমক ভাঙিল। তাহার মনে হইল, মৃত্যু অবশ্য ইচ্ছা করিলেই আসে না কিন্তু সেজন্য চেষ্টাও তো বেশি করিতে হয় না। এখানেই তো তার পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তখনো সেখানে ডাকবাঙ্গের ভাঙা এক খানা কাঠ পড়িয়াছিল, চিঠিপত্রের কথাবশেষ, খানিকটা জায়গা কলসিয়া গিয়াছে। না, তাহার অতটা সাহস নাই, সে অত উঁচু হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারিবে না।

সে ধীরে ধীরে পদ্মার তীর বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। মৃত্যুর কোন অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আছে কি না, এই চিন্তা তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া পদ্মা খুঁজিতে লাগিল। তীরের নীচে খানিকটা বালুর চর, তার পরেই অগভীর জল-স্রোত। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল, স্রোতে ভাসিয়া একখানা ছিন্ন কাঁথা আসিয়া পড়িয়া আছে। বোধ হয়, কোন বসন্ত রোগীর শয্যার অবশেষ। তাহার মনে হইল, এই তো চরে কত লোক বসন্তে মরিতেছে, মরিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই, অথচ তাহার এত আবশ্যক, মৃত্যু তাহার কাছেও আসে না। তখন আবার মনে পড়িল, মৃত্যুর উপায় এত অজস্র এবং সেজন্য চেষ্টাও তো বেশি আবশ্যক হয় না। সে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত নিস্তব্ধ ভাবে ঐ কাঁথাখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে কি মনে করিয়া উঠিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী খেজুরের গাছ হইতে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা ভাঙিয়া আনিল। আবার খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে পুনরায় উঠিল। কাঁথাখানার কাছে গেল। নিশ্চয় উহা বসন্ত রোগীর শয্যার অবশেষ। তখন সে এক কাজ করিয়া ফেলিল, যাহার মর্ম্ম সে ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারিল না। সেই তীক্ষ্ণকাঁটা বারংবার ঐ কাঁথাখানায় স্পর্শ করাইয়া বাম হাতের নিটোল কোমল ত্বক ভেদ করিয়া চালাইয়া দিল—কয়েক ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া আসিল। তাহার প্রথম চমক ভাঙিল রক্ত দেখিয়া, তারপরে হঠাৎ বেদনায়। কাঁটাখানা সে দূরে ফেলিয়া দিল। পদ্মার দিকে চাহিয়া দেখিল—একটা পোড়াকাঠ মন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ওপারের অতিদূরে কূলের কাছে একখানা নৌকার অস্পষ্ট আভাস।

কি সর্ব্বনাশ সে করিয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি হাত-খানা সে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিল। নিজেকে আর তাহার

বিশ্বাস নাই। ঐ জায়গাটার প্রতি কেমন একটা ভয়ের ভাব তাহার মনে জাগিল—সে ক্রত সেখানে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ির দিকে রওনা হইল।

সে রাত্রিটা তাহার ভয়ে ভয়ে কাটিল, পাছে বসন্ত হয়, পাছে জ্বর আসে। রাত্রি কাটিয়া গেল, জ্বর হইল না, ভোর বেলা তাহার মন হইতে ভীতির ভাব চলিয়া গেল। সে যে একটা মস্ত বিপদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, ইহাতে মনে এমন একটা প্রফুল্ল ভাব অনুভব করিল, যেমনটি সে অনেকদিন করে নাই।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার একটু জ্বর হইল; প্রথমটা সে মনে করিল এমন জ্বর মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। তারপরে গায়ে ব্যথা। দুইদিন পরে অজস্র বসন্তগুটিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। দিন দুই তাহার জ্ঞান ছিল। তারপরে যে কি করিয়া তাহার একমাস কাটিল তাহা সে নিজেই জানে না। একমাস পরে যখন সে কতকটা সুস্থ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল, সে যে কেমন করিয়া অচিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষার অভাবে বাঁচিয়া গেল, মরিল না, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। একমাস আগের সেই চিন্তা নূতন করিয়া তাহার মনে দেখা দিল—মৃত্যুর জন্য বেশি চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার অজস্র উপায় থাকিলেও যাহার বাঁচিবার সে বাঁচিয়াই যায়; মৃত্যু কাহারো নিকটে ইচ্ছা করিলেই আসে না।

১১

বিনয় ভোর বেলা রাজসাহী আসিয়া পৌঁছিল। চৈত্র মাসের ভোরের বেলা যাহারা অনেকদিন পরে বড় সহর হইতে গ্রাম্য সহরে আসিয়াছে, তাহারা জানে ইহাতে কেমন একটা আরামদায়ক স্বস্তি আছে। শ্যামল প্রকৃতির সংস্পর্শে চোখ, কান যেন জুড়াইয়া যায়।

বিনয় শিশুকাল হইতে যে-প্রকৃতির কোলে মানুষ, সেই পুরাতন মাতৃ-অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়া যে-শুশ্রূষা পাইল, তাহাতে কলিকাতার বিষদিগ্ধ অভিজ্ঞতার গ্লানি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মন হইতে যেন দূর হইয়া গেল। পৃথিবীর বারো আনা সমুদ্র, বাকি চারি আনার বারো আনা আবার প্রকৃতির অধিকৃত, তাহারি একান্তে কোন রকমে মানুষে বাসা বাঁধিয়াছে। প্রকৃতির অলক্ষ্য সেবার দ্বারা মানুষের জীবন যদি জড়িত না হইত, তবে সে এতদিনে পাগল হইয়া যাইত।

বিনয় বাড়িতে আসিয়া পদ্মামুখী বারোয়াটোর ঘোমটা পাতিয়া বসিল। দূরে চরচিলমারী, মাঝখানে বিশাল বালুর চর, একপাশে স্বল্প স্রোত। সকালবেলার স্নিগ্ধ বাতাসে ছোট ছোট নৌকা, আমের মুকুলের সুগন্ধ এবং দূর বনান্তের কোকিলের গান ভাসিয়া আসিতেছে।

রাত্রির গরলে বিশ্বপ্রকৃতি নিদ্রা প্রকৃতি এই মাত্র জাগিয়া উঠিয়া অলস ভাবে শয্যার উপরেই যেন বসিয়া আছে, এখনো ক্লান্ত অঙ্গল ও স্তব্ধ বেণী সামলাইয়া লইয়া গৃহকাজের জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই।

বিনয়ের বন্ধুরা সেদিন নৌকাযোগে সারাদিনব্যাপী বনভোজনে যাইতেছিল। তাহারা ঘাটে আসিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনয়কে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। বিনয়কে তাহাদের সহিত যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। বহুদিন পরে তাহাদের এই অনুরোধ বিনয় কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। বিশেষতঃ যে-পদ্মার সহিত তাহার বহুকালের ও নানা ঋতুর নাড়ির যোগ তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। বিমাতা কলিকাতার আঘাতকে মাতৃস্থানীয়া পদ্মার শুভ্র স্নিগ্ধ হস্তাবলেপের দ্বারা শান্ত করিয়া লইবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বিনয়দের নৌকা নদীর উজান বাহিয়া যাত্রা করিল। এখানকার পদ্মার একটু বিশেষত্ব আছে—নদীটা মাঝখানে চর পড়িয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে; চরটার অপরপারে বড় শাখা,—এ পারেরটা ছোট, গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। এ যেন দুই যমজ বোনের এক জনের বিবাহ হইয়াছে ধনীর বংশে, অপর জন পড়িয়াছে সাধারণ গৃহস্থের পরিবারে; একজনের ঐশ্বর্য্যের পার নাই, তল নাই,—অপরের কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

গ্রীষ্মের পদ্মা; দিগন্তবিস্তৃত সব চরে নদীর স্রোত নানা অংশে বিভক্ত হইয়া বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে: এখনো নূতন নূতন চর জাগিতেছে; যে-সব চর শীতের প্রারম্ভে জাগিয়াছিল তাহাদের ধারে জলের প্রান্তে শ্যামবর্ণ উদ্ভিদের রেখা; বালির উপরে গো মহিষের ক্ষুরের চিহ্ন; রাখাল বালকের বালখিলা দুর্গের ভগ্নাবশেষ, গরুর গাড়ীর চাকার অত্যন্ত শিথিল চিহ্ন-রেখা বাতাসে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এক জায়গায়

নৌকার একটা লোহার নোঙর। বালির চর বাঁচিয়া, স্বচ্ছ জল অবাধে চিরিয়া নৌকা স্রোতের টানে চলিতে চলিতে চরায় বাধিয়া ধাক্কা খাইতেছে, সকলে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। পাশেই বালুর স্তরে জল রেখার কি কারুকার্য; বালির স্তরগুলি কি অপূর্ব কৌশলে বিন্যস্ত, যেন কোন শিল্পী বহু মনন ধ্যান ও পরিশ্রম করিয়া এক মনে এই কাজ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার খৈরিণী নদী আপনার লক্ষ রকম লীলার চিহ্ন বালুর বুকে রাখিয়া গিয়াছে।

এক হিসাবে জলে ও বালুতে বেশ সাদৃশ্য আছে, উভয়ে পায়ে পায়ে মিলিয়া থাকে, কেহই কোন স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে পারে না; জলের উপরে দাগ কাটা যায় না, বালুর উপরে কাটিলেই বা কতক্ষণ! উভয়কেই যথেচ্ছ আকার দেওয়া যায়। উহারা দুই-ই যেমন শিশুর কল্পনার মত লঘু, স্বচ্ছ, বিচিত্র, এবং ক্ষণস্থায়ী, তেমনি সরল, সুন্দর, শুভ্র এবং সুকুমার। বিনয় জলের দিক হইতে চোখ তুলিয়া তীরের দিকে তাকাইল। উচ্চ বাঁধের তল দিয়া নৌকা চলিতেছে। জেলখানার কাছে একটা বৃহৎ অশথ গাছে লক্ষ লক্ষ রঙীন কিশলয় বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, যেন লক্ষ লক্ষ শিশুর আধো-আধো কলভাষণ। সারিবদ্ধ গুলমোহরের গাছে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে অজস্র রক্তপুষ্পের সম্ভার, ফুলের রাশিতে পাতা আচ্ছন্ন। তার পরেই একটা বৃহৎ শিমুল গাছের আপাদমস্তক ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; যেন রক্তবর্ণের তুড়ি দিয়া দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে। আরো খানিকটা দূরে পলাশের বন; কালো কালো বৃক্ষে কিংশুকের কোমল শিখা বহ্নিলীলা বিস্তার করিয়াছে। গুলমোহরে পলাশে শিমুলে যেন বনে দাবানল লাগিয়া গিয়াছে। কবি যে খাণ্ডব-দাহনের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বসন্তকালের অরণ্যেই সম্ভব।

নৌকা চলিতে লাগিল। দুপুরের বাতাসে বালু উড়িয়া আকাশ অন্ধকার; চোখ বন্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে, জলে গামছা ভিজাইয়া গায়ে দিতে হইতেছে, তবু সেদিন বিনয় যে আনন্দ পাইল, যাহা তাহার মনটাকে আজো ভিজাইয়া রাখিয়াছে, হয় তো এ আনন্দ কবিতাতে ধরিয়াই চলিবে, তাহার হিসাব হয় তো অন্য জিনিষের মত করা চলে না।

ইংরেজিতে আছে শুকনো দীলোক, ভাল বই, ও তাম্রকূটের পরে নদীর মত এমন সঙ্গী নাকি আর নাই। উপরি-উক্ত তিনটি বস্তুর মধ্যে প্রকৃতিগত টীকা আছে। এমন কি পুস্তক অপেক্ষা তামকূট-ধূমের সহিত নারীর মিল যেন কিছু বেশী। (পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন, লেখকের জন্মই মন্দ, নতুবা এমন কথা বলিয়া নারীর ক্রোধের লক্ষ্য হইল কেন? কিন্তু মনে রাখিবেন, রাগের রং ও লাল এবং অনুরাগের রংও লাল; বিশেষ অনেক সময় রাগকে অনুসরণ করিয়া যে ভাব আসে তাহা-ই অনুরাগ, কারণ ভালবাসার উল্টা দিকটায় যেঁষাযেঁষি, বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা কোন পন্থাই নয়।)

যাহা বলিতেছিলাম, নারী, নদী, পুস্তক ও তামকূটের প্রধান টীকা এই যে, নদীর যেমন উজান-ভাটা আছে, অন্য তিনটিরও সেই রকম; অর্থাৎ এ কয়টি পদার্থই নিজের ইচ্ছায় বহিয়া যায়, তবে পাঠক, তামকূটসেবী, নৌবিহারী, এবং চতুরাগা পুরুষ জাতি ইচ্ছা করিলে কৌশল দ্বারা সেই স্রোতোমধ্যেও যথেচ্ছবিহার করিতে পারে। এই চারি পদার্থের একটি বাক্তিত্ব আছে, তাহা পুরুষের বাক্তিত্বের মত কঠিন ও অনমনীয় নহে; ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে যথেচ্ছ বাঁকানো যায়; ইহারা অবসরবাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও আরামজনক।

বিনয়রা অপরাহ্ণের দিকে বদোরা নামে একটা গ্রামে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করিয়া লইল। তারপর আবার নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে-দিকে দৃষ্টি চলে, গাছে গাছে পাটলাভ আমের মুকুল এবং বহু সহস্র বৎসরের স্মৃতি বহন করিয়া তাহার উগ্র মদির গন্ধ। নদীর তীরে সজিনা গাছে শুভ্র স্তিমিত ফুলের স্তবক। যেন আকাশ-সমুদ্রের নীল-তরঙ্গ শিশুদের উপকূলে প্রহত হইয়া শুভ্রফেনপুঞ্জে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

স্রোতে আকৃষ্ট হইয়া নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, কোথা দিয়া কোথায় চলিতেছে, তাহা কেহই জানে না। তীরে গ্রাম বিরল, কেবল বর্ষার স্তূপাকার বালু, বামদিকে চৈত্রের রৌদ্রে শুষ্ক শূন্য চরে মাঝে মাঝে চর্তিক্ষক্লিষ্ট শরবনের চিহ্ন; অসমতল ভূমি বর্ষার স্রোতের তালে তালে তরঙ্গিত হইয়াছিল, এখনো তেমনি পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে দু'একখানা জেলে ডিঙি, তাহাদের

শিব-উমা
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক
কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে অঙ্কিত ও শ্রীযুক্ত মঙ্গল ভাস্কর কর্ত্তৃক খোদিত
[শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত

নিকট হইতে পণ ভাঙিয়া লইয়া বিনয়ের নৌকা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এখন আর গুণ টানা চলে না। লগি দিয়া নৌকা ঠেলা হইতেছে। আকাশের সূর্যাস্তের সব রঙটুকু জলের উপর স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। নিস্তরঙ্গ নদী অদূরবর্তী বাঁক পর্যন্ত গলিত লাক্ষার মত জ্বলিতেছে। সে রঙে যেন আরো একটু কালো ছায়া মিশিল—আরো একটু—আর এক তুলি—পর মুহূর্তেই সমস্ত জলতল একটানা একটা বেগুনী রঙের নিস্পন্দ তরঙ্গায়িত চাদর; এ যেন একটা রঙের নৃত্য চলিয়াছে—ভাল করিয়া দেখিবার পূর্বেই ঢেউয়ের ভঙ্গী নূতন আকার ধারণ করিতেছে, এবার নদীর বর্ণ কপোতের পাখার ন্যায় পাণ্ডুর—ক্রমে ঘন—আরো গাঢ়—এবার যেন বিরাট একখানা বাহুড়ের পাখা—বাদামী এবং ধূসর—কালো এবং পাটল; কত বর্ণের আভাস মাখা; এযেন বর্ণ নয়—গানের সুর—চোখে ঠিক করিয়া ধরা যায় না—তুলিতে আঁকা আরো দুরূহ; সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া ভাল খেলিতে পারিলে হয় তো ইহার খানিকটা ধরা পড়িতেও পারে। নৌকা একটা মোড় ফিরিতেই বিনয় দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড উঁচু বালুকাস্তূপের উপর দিয়া সন্ধ্যাতারাটি, তাহারই বা কত বর্ণের চাকচিক্য; যেন একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ কিমুকের খণ্ড; আসন্ন ঝড়ের মুখের জোনাকী; সকাল বেলার শুকতারা।

প্রকৃতি ও সভ্যতা দুই সপত্নী; একস্থানে থাকিলে বনে না। বিনয় লোকালয়ে প্রকৃতিকে দেখিয়াছে—কিন্তু সেখানে সে মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, অট্টালিকা দ্বারা খণ্ডিতা, মানুষের হাতের চিহ্নদ্বারা পদে পদে লাঞ্ছিতা; কিন্তু লোকালয় হইতে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে আসিয়া—সে আজ একি দেখিল! শোনা যায়, পুরাকালে কোন কোন নির্জন স্থানে দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করা যাইত—আজ সেই রকম একস্থানে সে আসিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া এক বিরাট সত্তা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা কয়জন লোক—একখানা নৌকাতে—এ যেন তাহার চোখে পড়িয়াও গ্রাহ্য হইল না—বিরাটের আনন্দে বিভোর হইয়া তাহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

আজ আর প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে চোখে পড়িল না। এই সকলের অন্তরে যে রহস্য আবৃত ছিল—আজ তাহার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী—এই নদীতীরের নির্জনতার, এই সন্ধ্যা-লোকের নিঃশব্দতার—এই অতিক্ষীণ সন্ধ্যাতারার নিস্তব্ধ প্রদোষালোকে! বিনয় ভাবিতে লাগিল—এ দৃশ্য প্রতিদিন কে দেখে! এ বিচিত্র সৌন্দর্যের গভীর গম্ভীর সুধা প্রতিদিন কাহাকে অমরত্বের স্বাদ জানাইয়া যায়—এমন অনুপলক্ষীন বিশ্বলোকের অন্তঃস্থলবর্তী উদাসিতার মধ্যে সুখ-দুঃখের অতীত লোকে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-লওয়া উদাসীনতার মধ্যে—কাহার সহিত প্রতিদিন শুভদৃষ্টি হয় প্রকৃতির! চারিদিকে অনন্ত বালুরাশি—যাহাতে মানুষের চিহ্নটুকুও নাই—আকাশেও না—জলতলেও না—এখানে কেবল আদিমতম প্রকৃতি। আজ লোকালয় হইতে দূরে সেই অত্যন্ত প্রাচীনতম অত্যন্ত সনাতন সত্তার সহিত একি অতর্কিতে একি আচম্বিতে তাহার সাক্ষাৎ। যেমন আদিমতম প্রকৃতি—তেমনি রাগদ্বেষ, হিংসাপ্রেম, বিস্ময়, ঈর্ষাবিবর্জিত চিত্তের যে ভাববৈচিত্র্য, তরঙ্গহীন নির্বিকার রূপ—তাহাই এক মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল—জীবনে এমন মুহূর্ত কয়টি আসে! সেই একটি অমূল্য সম্পদ—মহাবিরাটের পদপ্রান্তে প্রণামী রাখিয়া সে চলিয়া আসিল। কে দেখিল—কে কে না দেখিল জানি না—কাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল—অন্ধকারে কেহ বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি অন্ধকার। এখনও চাঁদ ওঠে নাই—নদীর জল অসমান—কোথাও অত্যন্ত গভীর, কোথাও পায়ের পাতাও ডোবে না। পথ চিনিয়া চলা দুষ্কর—অত্যন্ত সাবধান হইয়া লগি মারিতে হইতেছে, যেখানে একেবারেই অচল—সেখানে নামিয়া নৌকা ঠেলিতে হইতেছে, শাদা বালুর চর অস্পষ্টতার মধ্যে জল বলিয়া ভ্রম হয়, আবার জলকে বালু মনে করিয়া বিপদে পড়াও অসম্ভব নয়—অল্প পথ চলিতে বহু সময় লাগিতেছে।

মাথার উপরে অগাধ আকাশমণ্ডল অজস্র তারার ভারে, নত হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণবৈচিত্র্যহীন দিগন্তে বালুস্তূপের আড়ালে অষ্টমীর চাঁদ উঠিয়াছে—জলে আলো পড়িয়া অজগরের শরীরের মত মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। রাত্রি কত হইবে কে জানে, বোধ হয় মধ্যরাত্রির নিকটে; অতি দূর লোকালয়ের কাছে শৃগালের ধ্বনি; চরের জলাশয়ে

নিশাচর পাখীর করুণ সুর—এবং কচিৎ বাহুড়ের অলৌকিক পাখার শব্দ ও বাতাস—আর কিছু শব্দ নাই—দৃশ্য যাহা তাহাও অস্পষ্ট, থাকা-না-থাকার সীমান্তরেখে থাকিয়া কাঁপিতেছে।

বিনয়ের মনে হইল, এই মধ্যরাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া ওঠার মত এমন বিস্ময়কর ব্যাকুলতা বুঝি আর কিছু নাই। মাথার উপরে ইটপাথরের ছাদ নয়—একেবারে অনন্তরকার লীলাক্ষেত্র—তখানে স্তরে স্তরে লক্ষযুগের আলো জমাট হইয়া বিরাজ করিতেছে—বর্ত্তমান বলিয়া যে অত্যন্ত তুচ্ছ একটা মোহ আমাদের ঘরের কোণে সর্ব্বদাই মহাকালকে অবজ্ঞা করিয়া বিরাজ করে—সেই বর্ত্তমান তখানে নাই, কোটি কোটি সূর্য্য-শর্শর কিরণে ভাস্বর হইয়া—অতীতকাল তখানে প্রত্যক্ষমান: আর মহাসম্ভাবনার সূচনা বহিয়া বিপুলতর ভবিষ্যৎ তাহারই গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া; বর্ত্তমানের সেই সূচিতীক্ষ্ণ অর্থার্গল বাধা তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিদেশী করিয়া রাখে নাই। বিনয় অনেক বার মধ্যরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াই মনে মনে নূতন সম্ভাবনার একটা বিষম ধাক্কা খাইয়াছে—তাহার বিচিত্র গভীর অন্ধকারের ঢেউ সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এমন বিরাট গম্ভীর রূপ অল্পই আছে—হিমালয়ের আর মধ্যরাত্রির রূপ অনেকটা এক রকম; কিন্তু হিমালয়ের উপরে যে মধ্যরাত্রি সে না জানি কি অলৌকিক, কি অভিনব, কি আশ্চর্য্য!

বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ রাত্রি সজীব, জীবন্ত; মানুষকে ঘুম পাড়াইয়া প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে—তারায় তারায় তাহার নিঃশ্বাসের স্পন্দন। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, প্রকৃতি চলিতেছে, আকাশের তারায় এবং পৃথিবীর শিশিরে, মাটির গন্ধে এবং নক্ষত্রলোকের সঙ্গীতে, বায়ুমণ্ডলের নিস্তব্ধতায় এবং জলস্থলের স্তম্ভিত বিস্ময়ে, শৃগালের ধ্বনিতে এবং নিশাচর পাখীর অস্পষ্ট পাখার কম্পনে। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এরাত্রি চলিতেছে,—এই নদীস্রোতের নিঃশব্দ সঞ্চরণে; ওই অতিদূর নভস্থলের নক্ষত্ররাজির অলোকসম্ভব অলৌকিক রহস্যলোকযাত্রার তালে তালে, কালপুরুষের কটিবন্ধ ও তরবারি—নত হইতে হইতে একেবারে ঝুলিয়া পড়িয়া দিগন্তরেখা স্পর্শ করিল; সপ্তর্ষি ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মানস সরোবরে পূজাপদ্ম চয়নে অবতরণের জন্য উদ্যত; অন্ধকারের অনুগামীর মত বৃহস্পতি আকাশের একটা অংশ আলোকিত করিয়া জ্বলিতেছে। কে যেন তাহাকে বলিল—একবার কান পাতিয়া শ্রবণ কর—জ্যোতির্ময় অন্ধকারের আবরণের নিম্নে কি আশ্চর্য্য সঙ্গীত; ইহা শুনিবার পক্ষে শুধু কানই যথেষ্ট নহে—যদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একত্র করিয়া কর্ণকুহরে পরিণত করিতে পার—যদি নিজেকে ওই অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী আলোকের সুরে বাঁধিতে পার, তবে শুনিতে পাইবে, দেখিতে পাইবে সেখানে দর্শন ও শ্রবণে প্রভেদ নাই—সেখানে সুর দৃশ্য এবং বস্তু শ্রবণযোগ্য। তাহার মনে হইল, সে যেন কোন্ রহস্যময় অন্তর্লোকে যাত্রা করিয়াছে মাথার উপরে তারা, চারিপার্শ্বে তারা, পায়ের নীচেও লক্ষ লক্ষ তারা—জলস্থল যেন শত সহস্র তারায় কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। ওই যে দূরে দূরে দিগন্তের ধারে ধারে তারার মত, তাহার মধ্যে কোন্‌টি আকাশের তারা এবং কোন্‌টি পৃথিবীর দীপ কে বলিয়া দিবে! কে বলিয়া দিবে, উহার মধ্যে কোনটি তাহাদের ঘাটে তাহাদের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়া ইঙ্গিত করিতেছে! আজ এই দুটির মধ্যে আর ভেদ করিতে সে পারিল না, যে-সত্য মিথ্যাকে দূরে রাখিয়া, আপনার পবিত্রতা বাঁচায়—তাহাও সত্য নহে কারণ সে মিথ্যাকে ভয় পায়—যে বিরাট সত্য মিথ্যা দেবদৈত্য জীবনমৃত্যু স্বর্গমর্ত্ত্য এবং আকাশের তারা ও পৃথিবীর দীপকে আপনার মধ্যে সমন্বয় করিয়া মহত্তম—আজ খেলা করিতে বাহির হইয়া—বিনয় তাহাকে দেখিয়া ফেলিল, অতি অতর্কিতে অত্যন্ত বিনা সাধনায়। এ খেলার স্মৃতি চিরন্তন হউক, পরিবর্ত্তনকে সে ভয় করে না—যখনই রাত্রি চন্দ্রতারাখচিত অন্ধকারের মণিমঞ্জুষাটি খুলিবে তখনই সে দেখিতে পাইবে, বিরাটের এই অতি অমূল্য স্বাক্ষর-করা জহুরীটি এবং তাহার গাত্রে মোদিত তাহার এই নৌ-যাত্রার বন্ধুদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং বন্ধন, সখ্য এবং সৌহার্দ্য; মানুষের তুচ্ছতা সেখানে প্রবেশ করেনা, কালের সিঁধকাঠি সেখানে পৌঁছিতে পারে না—মহাকাল স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মণিহারের মধ্যমণিটি করিয়া গাঁথিয়া লন; এমন খেলার দিন জীবনে কয়টি আসে!

১২

সেদিন বিকালে সদ্য রোগমুক্ত করুণ ঘরের দাওয়ায় একটি খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল। রোগ তাহার সারিয়াছে এইমাত্র। শরীর তেমনি দুর্বল ও কাতর। ভীষণ ব্যাধি তাহার সর্ব্বাঙ্গে করাল ছাপা আঁকিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দুর্দিবার ব্যাধির আক্রমণ হইতে মানুষ বাঁচিয়া উঠিলে, তাহার মনে একটি অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়, একটি শৈশবের ভাব। দেহ ও মনের গ্লানি কাটিয়া গিয়া জীবনটি মেঘনির্ম্মুক্ত প্রাতঃকালের মত শিশিরে শিশিরে ঝলমল করিতে থাকে। পুরাতন জগৎ যেন হঠাৎ নূতনভাবে তাহার চোখে ধরা পড়ে। শিশুর মতই তাহার কৌতূহল,—রঙীন একখানি পাখীর পালক ইন্দ্রধনুর অসামান্যতা লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। করুণ সেই ব্যাধিবিমুক্ত শৈশবের দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে দেখিতেছিল।

এমন সময়ে বাদল ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বিনয় আসিতেছে। বিনয় আসিতেছে! আগে হইলে করুণ এ খবর কখনই বিশ্বাস করিত না, কিন্তু আজ তাহার সম্ভব-অসম্ভব-বর্জ্জিত শিশু-মনের কাছে কিছুই অপ্রত্যাশিত বোধ হইল না। বরঞ্চ তাহার মনে হইল, এইতো তিন চারিদিন আগে সে শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে সারাদিন অনাহারে ও সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছে—ইহার পরও বিনয় যে আসিবে না—ইহাই তো বিস্ময়ের। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল, দূরে চরের মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি, বিনয় বটে; দশ মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছিবে। করুণ বাদলকে খেলা করিবার জন্য পাড়ায় পাঠাইয়া দিল।

বাদল চলিয়া গেলে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল, একটু লজ্জিত হইয়া বিনয়ের সম্মুখে বাহির হওয়া আবশ্যক। হায়, এই দুঃখের মধ্যেও, এই দুর্দ্দশাতেও! ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যেদিন রামচন্দ্রের সৈন্যসমাগমে লঙ্কার উত্তর দ্বার চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, অশোকবনে একবেণীধরা সীতাদেবী কখন্ নিজের অজ্ঞাতসারে একটি পুষ্পমঞ্জরী চয়ন করিয়া অলক্ষ্যে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন—সেওতো এমনি দুঃখের দিনে—এমনি দুর্দ্দশাতেই। আর দ্রৌপদী তো জানিয়া শুনিয়াই, পঞ্চ স্বামীকে নিশ্চিত বিপদের মুখে স্বর্ণপদ্ম আহরণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন! নদীকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে নিম্নগা, ধূমকে জিজ্ঞাসা কর কেন সে ঊর্দ্ধগামী? তাহাদের স্বভাব! দুর্ঘটপ্রিয়তা নারীর তেমনি স্বভাব! নারীকে মনের মত করিয়া সাজাইবার জন্যই পুরুষের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, এত পরিশ্রম। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের মূলে পঞ্চপাণ্ডবের পৌরুষে আঘাত,—কুরুসভায় নিরাভরণা দ্রৌপদীর অসহায় চিত্র! আর রামায়ণের সাগরবন্ধন ও লঙ্কাকাণ্ডের মূলেও সেই একই কথা! জানকীর পরিত্যক্ত রত্নভূষণগুলি একে একে রামচন্দ্রের চোখে অনন্ত অন্ধকারের দীপ্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। জানকী নিশ্চয় জানিতেন—যে-শাস্তির জন্য তাঁহাকে নিরাভরণ হইতে হইল, তাঁহার বীর স্বামীর হস্তে তাহার নিষ্কৃতি নাই।

করুণ বাক্স খুলিয়া সযত্নরক্ষিত সেই বাসন্তী রংএর শাড়ী-খানি বাহির করিল, যেখানা সে গতবার দোলের দিনে পরিয়াছিল, সেই বহুস্মৃতিবিচিত্র শাড়ি। শাড়িখানি পরিয়া আরসীখানা হাতে লইল, এতকাল তাহা অনাদরে দেয়ালে টাঙানো ছিল। আরসীখানা মুখের সম্মুখে ধরিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। হাত নড়ে না, মুখ সরে না! দর্পণে এ কার ছায়া? এই কি করুণ? কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইল না, ওই ছায়াটা তার, সে দর্পণের মধ্যে ইতস্তত তাহার নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজিতে লাগিল! কিন্তু বারবারই সেই একই ছায়া!

এই প্রতিবিম্ব তাহার! ওই বসন্তের দাগে ভরা, ক্লিষ্ট, কালো শীর্ণ মুখখানা, জলকণা-বর্ষণোন্মুখ আসন্নবৃষ্টি মেঘের মত তাহার কেশজাল, সে কি ওই? ওই তাম্রশলাকার মত রুক্ষ খিন্ন চুলগুলা? কপোলে কালিমা, শুষ্ক অধর, শীর্ণ গ্রীবা—আজ তাহাকে এই রূপে বিনয়ের সম্মুখে বাহির হইতে হইবে! কেবল চোখ দুটি, হিমালয়ের উচ্চ পাহারায় আবদ্ধ নীলাভ মানস সরসীর মত তাহার চোখদুটি অতীতের আভাস দিতেছে! কিন্তু পূর্ব্ব রূপের আর কিছুই বাকি নাই। তখন দেখিতে দেখিতে সেই অতলস্পর্শ চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, চোখ ছাপাইয়া সে-অশ্রু গাল বাহিয়া, গ্রীবা বাহিয়া বুকের উপরে বিন্দু বিন্দু করিয়া, অবশেষে অবিরল ধারায় ঝরিতে লাগিল। রোগে তাহার কি সর্ব্বনাশ না করিয়া গিয়াছে!

একদিন স্বেচ্ছাকৃত এই রোগকেই সে মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাকে আমরা যেখানে আসিয়া থামিতে বলি, সে তো সেখানে থামে না। এই রোগ অবশ্য তাহাকে নানা বিপদ হইতে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু একি সর্বনাশ সে করিয়া গেল! এতখানি তো সে চাহে নাই।

করুণ পাষাণমূর্তির মত দর্পণখানা সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাষাণের যদি অশ্রু থাকে, তবে সে পাষাণমূর্তিই বটে!

না, না, এই রূপ লইয়া বিনয়ের সম্মুখে আজ সে বাহির হইতে পারিবে না। বিনয় যে-রূপের স্মৃতি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, যাহার আকর্ষণে সে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে, এই রূপ দেখিলে তাহা যে বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে, করুণের পক্ষে তাহা অসহ্য! বাস্তবে কি হইবে কে জানে, কিন্তু ইহার কল্পনামাত্রেই করুণকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

সে কিছুতেই ওই আয়নাখানার দিকে চাহিবে না, কিন্তু অনিচ্ছাতেও বারংবার তাহার ওই দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন আয়নাখানা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু চোখের জলের আর শেষ নাই, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পাইল।

বাহিরে পদশব্দ; ভয়ে তাহার শরীর হিম হইয়া গেল। একবার তাকাইয়া দেখিল, দরজার অর্গল বন্ধ আছে কিনা! বাহিরে পদশব্দ, এ পদশব্দ তাহার বহু দিনরজনীর কর্ণধ্যানে মুখস্থ। বিনয় বাড়ীতে কাহাকেও না দেখিয়া একবার বাসন্তীকে ডাকিল! কোনো সাড়া নাই। করুণ এতদিন ভয় করিত পাড়ার ওই যুবকদের, আজ ভয় তাহার সকলের বেশী চির-জীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন ওই বিনয়কে। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ দেখিয়া বিনয় বুঝিল করুণ ভিতরে। সে করুণের নাম ধরিয়া ডাকিল। সে আহ্বান করুণের মর্মে গিয়া তপ্ত স্মৃতির লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল—কিন্তু সে কিছুতেই আজ বাহির হইবে না।

বিনয় প্রথমে ঠাট্টার সুরে তাহাকে ডাকিল, তারপরে বহুদিন অনুপস্থিতির জন্য মান ভাঙাইতে লাগিল—তারপরে অভিমানের সুরে! কিন্তু না আছে সাড়া, না খোলে দুয়ার। ভিতরে শাড়ির উসখুস শব্দ, লোক আছে নিশ্চয়—কিন্তু বন্ধ দুয়ার বন্ধই রহিল।

বিনয় ক্লান্ত হইয়া দরজার কাছে দাওয়ার উপরে বসিয়া পড়িল। করুণ তাহা বুঝিল—তাহার মনে কি হইতেছিল! সে ভাবিতেছিল, মাণিক আমার, তুমি বাইরে ওই ধূলার উপরে বসিলে, আমার বুকের উপরে বসাইলেও যাহাকে যথেষ্ট সমাদর করি নাই মনে হয়—সে আজ ওই ধূলায়! একবার তাহার মনে হইল বাহির হইয়া যায়—কিন্তু তখনই আয়নায় ছায়া পড়ে। বিনয় রাগ করিয়া আজ ফিরিয়া যায় সেও ভাল, কিন্তু তাহার রূপ-মুগ্ধ চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া গেলে সে আর ফিরিবে না!

—করুণ, লক্ষ্মী, দরজা খোলো—

কোন শব্দ নাই।

—আমি দোষ করেছি, মাপ কর, ক্ষমা কর—বিনয় দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল।

করুণ আজ পাষাণ! তাহার সমস্ত স্নেহঘন প্রাণ দিয়া বিনয়ের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু ওই প্রতিবিম্ব সে পথে তীক্ষ্ণ কণ্টক। বিনয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে শুনিতে পাইত,-ঘরের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার শব্দ! এপারে বিনয়ের চোখে জল, ওপারে করুণের সর্বাঙ্গ অশ্রুসিক্ত, মাঝখানে অটল অচল অর্গলিত বন্ধ দ্বার।

উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতার কাছাকাছি আনিয়া কে এমনভাবে পক্ষমাকের নিষ্ফলতায় বিপর্যস্ত করিয়া দিল! তৃতীয়ার চাঁদের ক্ষীণ আলোতে ঘরের ছায়া উঠানে গাঁদা গাছের উপরে পড়িল, অদূরে লেবুফুলের মিষ্ট মধুর গন্ধ বাতাসে আসিতে লাগিল—আর দূর বনের কোকিলের গান লক্ষযুগের বিরহ-মিলনের স্মৃতির সুর ভেদ করিয়া অক্ষয় সুখের অঙ্কুরস্থ সাঙ্কেতের মত অবিরল ধারায় উভয়ের কানে পৌঁছিতে লাগিল। বাহিরে যখন মিলনের এমন পূর্ণ আয়োজন, তখন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাধা, না জানি সে বাধা কেমনতর দুর্লঙ্ঘ্য।

করুণ কাঁদিতেছে, বিনয় কাঁদিতেছে, দুজনের ইচ্ছা দুজনের কাছে ছুটিয়া যায়, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ! মানুষের সুখসৌভাগ্যের কোঠায় যে শশিগ্রহ চিরদিন বিরাজ করে, একি তাহারই

লীলা! মিলনের কূলে আনিয়া যে ঠেলা মারিয়া অকূলে ঠেলিয়া দেয়, আসন্ন অধর হইতে যে ছোঁ মারিয়া চুম্বন কাড়িয়া লয়, মিলনের পূর্ব পাত্রকে যে ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে থাকে, তপ্ত অশ্রুকে যে তুষারকণায় পরিবর্তিত করিয়া ছিনিমিনি খেলে, আর বহুদিনবাঞ্ছিত বরণকে দ্বারে উপনীত করিয়া দরজায় অর্গল টানিয়া দেয়। এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র তুচ্ছ পতঙ্গ-প্রাণ জীবকে আশার পাত্র দেখাইয়া, এত নিকটে আনিয়া এ কী তাহার খেলা! এই তুচ্ছ মুমূর্ষু জীবের কণ্ঠে আকস্মিকতার নির্মম পাশ কষিতে কষিতে সে হাসিতে লাগিল। সে নির্মম নিষ্পেষে যতই তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, ততই তাহার হাসি উচ্চতর হইতে থাকে! বিধাতা, তুমি না মানুষকে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছ, মন দিয়াছ, কোন্ দানব সেই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলে!

অবশেষে বিনয় উঠিয়া পড়িল, তাহার পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। করুণের কানে তাহা প্রবেশ করিল। সে ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘরের শুষ্ক ধূলি ভিজিয়া গেল, কিন্তু দয়াময় বিধাতার অবিচলিত মনস্তত্ত্বের একটু নড়চড় হইল না।

বিনয় চলিয়া গেল। করুণ পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়, উভয়ের ব্যাকুল ইচ্ছা সত্ত্বেও এত ব্যর্থতা, ইহার অপেক্ষা নির্মম করুণতা আর কি আছে!

কিছুক্ষণ পরে করুণ উঠিয়া পশ্চিমের জানালা খুলিল। দেখিল দূর দিগন্তের স্বর্ণরিক্তির বিলীয়মান পটে একটা দিবস অস্ত যাইতেছে আর সেই উজ্জ্বল পটভূমিতে একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ কৃষ্ণরেখা মাত্র মনুষ্য মূর্তি। সে-মূর্তি যেন আর পৃথিবীর নয়—ওই সূর্যাস্ত-জগতের! করুণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল!

বাহিরে তখন তৃতীয়ার চাঁদের আলো, সেবু ফুলের গন্ধ আর বহু ঘুঘুর বহু সুখদুঃখের নির্যাসের মত ওই কোকিলের কুহুস্বর! ঘরের মধ্যে সেই আয়নাখানা চাঁদের আলোয় এক বিন্দু অশ্রুর মত নিরপেক্ষ বিধাতার চক্ষুতে ছলছল করিতে লাগিল।

১৩

রাজসাহী কলেজের বিস্তীর্ণ নির্জন ছাতা শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অস্পষ্ট একখানি ছবির মত দেখাইতেছে—অনেক স্তম্ভ, অনেক সভা। কলেজের পুরাতন অট্টালিকার ছাদের উপরের নারীমূর্তিগুলি দীর্ঘছায়াসনাথ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—জ্যোৎস্নার আর একটু সঞ্জীবনী স্পর্শ পাইলেই যেন তাহারা জাগিয়া উঠিবে। বৃহৎ বাড়ির কার্নিস, আলিসার খাঁজে খাঁজে আলো-অন্ধকার। সম্মুখে বাগান-ঘেরা পুষ্করিণী। বাগানের শাদা রঙের ফুলগুলি, রজনীগন্ধা, কামিনী, চোখে পড়ে; রঙীন ফুলগুলি এখন কেবল গন্ধ-অনুমান। ইতস্তত আলোছায়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। মসৃণ নির্মল রেখানায়চীন চলতল—তাহার উপরে নিস্তব্ধ চিত্রণ চন্দ্রালোক। নিচু গাছগুলির তলদেশ শুষ্ক মঞ্জরীর ভারে আকীর্ণ। আমের বন মুকুলে আক্রান্ত। প্রশস্ত মাঠে শ্যামল ঘাস, পায়ে-চলা পথগুলি নূতন ঘাসে ঢাকিয়া গিয়াছে। সমস্ত নির্জন। কেবল মাঠের মধ্যে ইতস্তত দু'চারটি মনুষ্য-মূর্তি শ্বেতবস্ত্রের দ্বারা আভাসিত।

বিনয় চর হইতে ফিরিয়া এখানে একাকী ঘুরিতেছিল। সে নির্জনে মনের সাথে একবার বোঝাপোড়া করিয়া লইতে চায়। করুণ কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল? শুধু করুণ তো নয়, পারুলও তাহাকে অপমান করিয়াছে। পারুল ও করুণ, তবে কি সকলেই একই মাটিতে গড়া। না, তাহাদের কাহাকেও আর নয়।

শৈশব হইতে সে প্রকৃতির কোলে মানুষ। বাল্যকালে বিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ অপেক্ষা নিস্তব্ধ প্রান্তরের প্রকৃতির রূপ তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে, বেশি সন্ধান করিয়াছে। তখন কোথায় ছিল, পারুল, কোথায় ছিল করুণ। আজ তাহারা অবশ্য অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একদিন ছিল যখন নারীর সঙ্গ তাহার পক্ষে প্রয়োজন ছিল না। আবার কি সেই প্রকৃতির কোলে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়!

কে বলিল, সম্ভব নয়। এই তো গতকল্য মাত্র, সে নৌ-ভ্রমণে গিয়া প্রকৃতির কি মহার্ঘ্য রূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছে। সেই বরাভয় ইঙ্গিত তাহার মনে আশার বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল।

শৈশব হইতে সে নিঃসঙ্গ থাকায় প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখিতে শিখিয়াছিল। তারপরে জীবনের জটিলতা যত বাড়িয়াছে, নানা স্রোতের ধারা যত তাহার জীবনে

মিশিয়াছে, মানুষকে বড় বড় করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সেই বালোর সহচর মূর্তি দূরে সরিয়া গিয়া ছোট হইয়া আসিয়াছে। আগে প্রকৃতি যেখানে একাকী ছিল, সেখানে মানুষ আসিয়াছে। ক্রমে মানুষ বড় হইয়া উঠিয়া প্রকৃতিকে পটভূমিতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। ইহাতে সে কোন অতৃপ্তি বোধ করে নাই, বরঞ্চ ইহা জীবনের পরিণতি মনে করিয়া সে সন্তুষ্ট ছিল।

কিন্তু কাল লোকালয় হইতে দূরে গিয়া প্রকৃতির যে বিরাট রূপ দেখিল, যে-রূপ মানুষের সহিত অমিশ্র, তাহা একবার বিনয়কে আবালোর সেই সত্তাকে মনে করাইয়া দিয়াছিল।

যে মানুষের কাছে তাহার সবচেয়ে বেশি দাবী, সবচেয়ে বেশি আশা, তাহার কাছে আজ এই প্রত্যাখ্যান। তাহার মনে হইল, আজিকার এই প্রত্যাখ্যানের কথা প্রকৃতি যেন জানিতে পারিয়াছিল, তাই সে বিনয়কে একবার অলঙ্কারিত রূপে দেখা দিয়া সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিল। সে যেন বলিয়াছিল, ভয় নাই, মানুষ না থাকে আমি আছি। না, সে বলিয়াছিল, মানুষ নাই, আমি আছি।

আর কেহ হইলে পারুল কঙ্কণের এই যুগল প্রত্যাখ্যানের পর অদ্ভুত একটা কিছু করিয়া বসিত। কিন্তু বিনয়ের জীবনের সমগ্র ভারকেন্দ্র মানুষের দ্বার হইতে বিচলিত হইয়া প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লাভ করিল। বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল—বাঁচিয়া গেলাম, আহা বাঁচিয়া গেলাম! তাহার মনে হইতে লাগিল—মানুষকে কি ভয় প্রয়োজন। লোকে সান্ত্বনা, তাহে সুখ, নিরাপত্তার দম্ভ, পরস্পরে ভালবাসা, এই তো! প্রকৃতির হাত হইতে কি সে এ সব দান পায় নাই! বরঞ্চ আরো বেশি পাইয়াছে। প্রকৃতির প্রেমে ভয় নাই, সে ফিরিয়া আঘাত করে না—তাহার মত এমন বিশ্বস্ত প্রণয়ী আর কে আছে?

সে মনে করিল, আর একবার তাহাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এখানে লোকালয়ে মানুষ প্রকৃতি খণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধেক মাত্র, তাহার বাণী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যেখানে প্রকৃতি নিঃসপত্ন, যেখানে সে একক মাহাত্ম্যে মহীয়সী—সেইখানে গিয়া তাহার শুশ্রূষা লাভ করিতে হইবে। সে স্থান একমাত্র হিমালয়।

হিমালয়ের কথা মনে পড়িতেই বিনয়ের হৃদয় সেই বহুকাল-বাঞ্ছিতদর্শন দেবতাত্মা গিরিরাজের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, ভারত ইতিহাসের সান্ত্বনা অমৃতের ওই অফুরন্ত ভাণ্ডারীকে। ভারতবর্ষের যেখানে যে কেহ বাথিত শোকার্ত্ত হইয়াছে, সে-ই হিমালয়ে গিয়াছে। তবে কেন সে না যাইবে! হিমালয়ের চিন্তামাত্রে সন্তপ্রাপ্ত ছুটি ক্ষণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল! তাহার মনে হইল যাহার চিন্তায় মাত্র এত সান্ত্বনা, তাহাকে দর্শনে না জানি কি আনন্দ!

বিনয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কলিকাতা হইতে রাজসাহী, রাজসাহী হইতে হিমালয়। প্রকৃতি ক্রমে গাঢ়তর রূপে তাহাকে কোলে টানিয়া লইতেছে। তখনি সে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল, পরদিন সে যাত্রা করিবে। দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে পারুল ও কঙ্কণের কল্পনা এমন হাস্যকর ভাবে তুচ্ছ, যে তাহা মনে পড়িয়া বিনয়ের হাসি পাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

আর একদিক

অল্পবয়সী লোকের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক আমেরিকান' পত্রিকায় পেনলিভি(Painleve)র সম্পর্কে যে-গল্প বাহির হইয়াছে, সেটি এ বয়সের সকল সম্বন্ধে হাস্যকর। পেনলিভি ফ্রান্সের প্রিমিয়ার হইয়াছেন। অল্পবয়সেই তাঁহার খ্যাতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। সিনেট যাইতে গিয়া তিনি নিজের গাড়ী ফেলে তুলিয়া ট্যাক্সি করিয়া বাড়ী ফেরেন। ট্যাক্সিওয়ালা চিনিতে পারিলে কোন-নম্বর দেন। সেদিন তিনি এক দলা ফেলিয়াছেন। সকালে এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। কিন্তু জরুরী কাজে তাঁহাকে সেদিন সকালে ১০ মিনিটের জন্য বাহির হইতে হয়। যাইবার সময় তিনি নিজের ঘোরে পিন দিয়া একটি স্লিপ আঁটিয়া গেলেন। তাহাতে লেখা—'পেনলিভি ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরিবেন।' ১০ মিনিট পরে পেনলিভি ফিরিয়া আসিয়া ঘোরে ঐ স্লিপ দেখিয়া নিজের জন্য লিখেই বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমেরিকার নিগ্রোর পরিণাম

—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার নিগ্রোর পরিণাম যে কি, তা বলা বড় সহজ কথা নয়। প্রকৃত পক্ষে আমেরিকার জাতীয় জীবনে এ একটি গুরুতর সমস্যা। অনেকে অনেক রকম উপায় সময়-সময় দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু এ সমস্যা যেমন ছিল, তেমনি আছে। পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু এখনও দেখা যাচ্ছে না।

ডাক্তার কেলি মিলার(Kelly Miller) নিগ্রো সমস্যার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বলেছেন "The negro must either get out, get white or get along", অর্থাৎ,"আমেরিকার নিগ্রোকে হয় একেবারে আমেরিকা ছেড়ে যেতে হবে, না হয়, শাদার সঙ্গে মিশে আস্তে আস্তে শাদা হ'য়ে যেতে হবে; আর না হয়, কোনও রকমে কালো থেকেই দিন গুজরান করতে হবে।" এর কোন্ পথটা যে নিগ্রোরা নেবে এবং কোন্ পথটা শাদারা দেবে, তা বলা কঠিন। তবে একটা একটা করে দেখা যাক, এদেশের নিগ্রো-সমস্যার কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে। প্রথমতঃ, নিগ্রোদের আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার কথা। কথাটা নূতন নয়। এর আগেও এ চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ফল কিছু হয়েছে কি? আফ্রিকাতে আমেরিকান নিগ্রোর উপনিবেশ, আমেরিকান নিগ্রোর রিপাব্লিক্ (republic) সবই খোলা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা আগের মতই আছে। স্বেচ্ছায় যারা আফ্রিকাতে যেতে চেয়েছে, তারা ঐ নূতন নিগ্রো রিপাব্লিকে গেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত কম যে, তার উল্লেখ না করাই বোধ হয় ভাল।

মার্কাস্ গার্ভি (Marcus Garvey) নামক একজন নিগ্রো-নেতাও এ জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর ক্ষমতাও বেশ ছিল, তাঁর দলে বহু হাজার নিগ্রো যোগ দিয়েছিল। অনেকে আফ্রিকা যাওয়ার উৎসাহও দেখিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকার সুখসম্পদে পালিত কালো নিগ্রো, তার জন্মভূমি আমেরিকা ছেড়ে সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে শেষটা রাজী হয় না। শাদার কাঁটালাথি খেয়ে আমেরিকায় বাস করা, স্বাধীন ভাবে আফ্রিকায় বাস করার চেয়ে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় তারা মনে করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, "স্বাধীনতা" মুখে ও কাগজ-কলমে যত মিষ্ট শোনায়, কাজের বেলায়, অন্ততঃ (আমেরিকার নিগ্রোদের বেলায়) তা ঠিক ততটা মিষ্ট ও সহজ নয়।

চলে যাও বল্লেও ত হয় না। শাদা আমেরিকানরা কোন্ মুখে নিগ্রোকে বলে যে, তোমরা আজ তোমাদের "জন্ম-ভূমি" ছেড়ে স্থানান্তরে যাও। নিগ্রো কখনও এ দেশে স্বেচ্ছায় আসে নি। নিগ্রোরা বলে যে, তারা এসেছিল এ দেশে "নিমন্ত্রিত অতিথি" হয়ে। "নিমন্ত্রিত" হয়ে আসুক, বা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আসুক, তারা যে স্বেচ্ছায় বা জোর করে আসে নি, একথা অস্বীকার করা যায় না। তারপর, একবার যখন এসে পড়েছে—এবং এত দীর্ঘ কাল শাদার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হতে দেওয়া হয়েছে, তখন আজ হঠাৎ তাদের কোন্ মুখে বলা যায় যে, তোমরা তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব বেঁধে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে যাও! নিগ্রো এখন এদেশে ঘরবাড়ী করেছে, ব্যবসায় করছে, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কারবার চালাচ্ছে। একদিন দু' দিন নয়, এক বছর বা এক যুগ নয়—এ জাতির আরম্ভ থেকেই বলা যায় যে, নিগ্রো এ দেশে তার অস্তিত্ব স্থাপন করেছে। আজ নিগ্রোদের মধ্যে অনেকে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক, শিল্পী ও কবি হয়েছে, অনেকে ধনী, লক্ষপতি পর্য্যন্ত হয়েছে, তারা আজ আগেকার চেয়ে অনেক বেশী দাবী করতে শিখেছে। তারা আজ আর তাদের জন্মভূমি আমেরিকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। তা ছাড়া খরচের কথাও তোলা যায় না। এত টাকা দেবে কে? শুধু জাহাজ ভাড়া নয়, তাদের ঘরবাড়ী ত করতে হবে!

এবার দেখা যাক্, নিগ্রোর শাদা হয়ে যাওয়ার কথা। যে কেউ একবার আমেরিকায় এসেছে তাকে বোধ হয় নূতন করে বলে দিতে হবে না যে, কেন আমেরিকায় এত রকম রংএর লোক দেখা যায়। ধব্‌ধবে শাদা থেকে আরম্ভ করে, লালচে সাদা, দুধে আলতা, ফর্সা, উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ, শ্যাম-বর্ণ, ঘন-শ্যাম-বর্ণ, কালো, মসৃণ-কালো ও

মিসমিশে অমাবস্যা-কালো সব রকম আমেরিকায় পাওয়া যাবে। শাদায় কালোয় যে অবাধে এখানে মিশেছে ও এখনও মিশছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ কারও হতেই পারে না। তবু এই রকম ভাবে কখনও যে এই সমস্ত নিগ্রো শাদার দলে ভিড়ে একবার শাদা আমেরিকান হয়ে যাবে এ বলা কঠিন।

কিন্তু সমস্ত আমেরিকান নিগ্রোর আফ্রিকায় যাওয়াটা যত অসম্ভব মনে হয়, এ পথটা হয়ত অত অসম্ভব না হতে পারে। সত্য দেশেও মনে হয় যে, কাজ খানিকটা হয়েছেও। আস্তে আস্তে যাদের রং একেবারে শাদার মত শাদা হয়, চুল শাদার মত সোজা হয়, নাক, চোখ, মুখ শাদার মত গঠন হয়, তখন সেসব নিগ্রো "শাদা" হয়ে যায়। অর্থাৎ, সুযোগ বুঝে তারা তাদের গ্রাম, জেলা বা ষ্টেট ছেড়ে, দূরে কোনও জায়গায় গিয়ে বাস করে। নূতন জায়গায় কেউ তাদের নিগ্রো বলে জেনে না। সমাজে শাদার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, আত্মীয়তা হয় এবং বিবাহ-বন্ধন হয়। তার পরের পুরুষেই একেবারে নিষ্কলঙ্ক শাদা, পূর্ণমাত্রায় শাদা (এখানে বলে পেন্ট-পাকসেন্ট শাদা) বলে পরিচিত হয়। কিন্তু এ দেশের এই রক্ত-মিশ্রণের গোঁড়ামী এত বেশী যে, যদি কেউ কোনও রকমে এই রকম শাদা হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার করে দেয় তবেই মুস্কিল। তবে অপরাধীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারাও আশ্চর্য নয়। "কৌলীন্য প্রথা"র নূতন আদর্শ! রং যত শাদা হোক্, চুল যত সোজা হোক্, চেহারা যত সুন্দর হোক্, বিদ্যাবুদ্ধি যত বেশীই থাকুক না কেন, এক

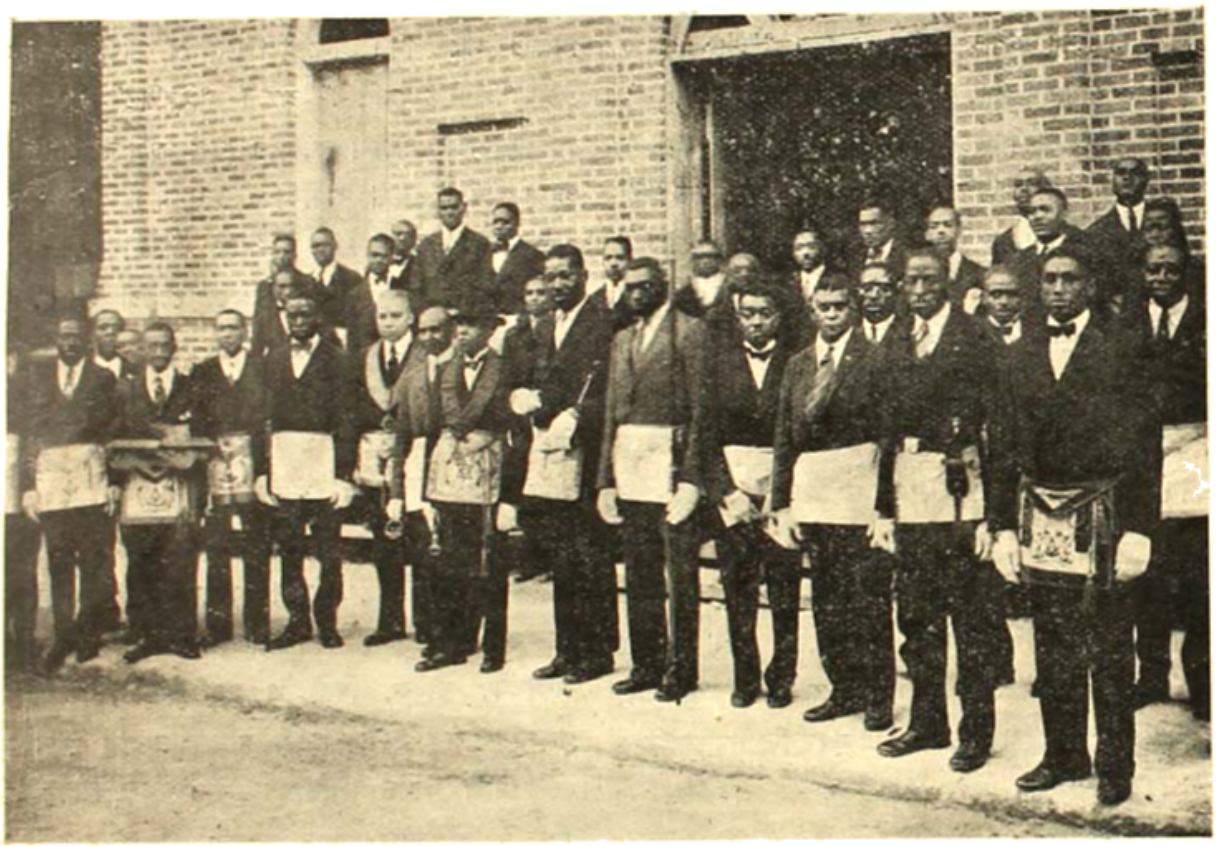

নিগ্রো মেসনিক অর্ডার (masonic order)। শাদা দলের মেসনিক অর্ডারে ইহাদের স্থান হয় না। ইহা হইতে বর্ণ-বৈষম্যের মাত্রা বুঝা যায়।

ফোঁটা কালো রক্ত ধমনীতে থাকলে, তাকে শাদা-সমাজে ঘায়গা দেওয়া হবে না।

অথচ শাদার সঙ্গে কালোর মিশ্রণ আমেরিকায় প্রচুর। অধিকাংশ যে অবৈধ রকমে হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যখন এ দেশে দাসত্ব-প্রথা ছিল, তখন শাদা মালিক নিগ্রো মেয়েদের উপর যে কোনও রকম অত্যাচার করতে পারত। কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এর থেকেই মিশ্রণ আরম্ভ হয়। দাসত্ব উঠে যাওয়ার

পরও মিশ্রণ চলতে থাকে। মিশ্রিত মেয়েদের সৌন্দর্য্য বেশী—তাদের আকর্ষণ বেশী। শাদা পুরুষ অনেক সময় সে আকর্ষণ ছাড়তে পারে না। সমাজের ভয় না থাকলে হয়ত অনেকে এই বর্ণসঙ্কর মেয়েদেরই বিয়ে করত। লোকনিন্দার ভয় না থাকলে, হয়ত সকলেই শাদা-মিশ্রিত প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেড়াত। কিন্তু তার উপায় নাই। তবু কোনও ভয়ই "গুপ্ত প্রেম"কে বাধা দিতে পারছে না। তাই বোধহয় এদেশে এত রকমের বর্ণবিদ্বেষ!

দিয়ে ঢুকতেই দেবে না। আবার কেউ কেউ আছে, যারা কালো মেয়ে বা ছেলেকে সৌজন্যের বিয়ে করতেও কুণ্ঠিত হবে না। অবশ্য মনে থাকে যেন যে, এ রকম উদারচেতার সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নয়। তবে "অবৈধ প্রেম"কে যদি উদারতার মধ্যে ধরা যায়, তাহলে আমেরিকার শাদাদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জনকে বোধ হয় "উদারচেতা" বলা যেতে পারে।

আমেরিকার বিভিন্ন অংশে নিগ্রোদের বিষয়ে বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন ব্যবহার ও বিভিন্ন রীতি দেখা যায়। কোথাও

শাদা-করা নিগ্রো-ছাত্রীদের সম্মেলন।

আমেরিকার সব শাদাদের মানসিক অবস্থা যদি একরকম হত, অর্থাৎ সবাই যদি নিগ্রোদের ঘৃণা করত কিংবা সবাই যদি তাদের সমান ভাবে ভালবাসত ও সমান অধিকার দিতে চাইত, তবে এদেশের নিগ্রো-সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য রকম হত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। অনেকে আছে, যারা কালোর সঙ্গে এক বেঞ্চে বসতে চায় না, এক গাড়ীতে চড়তে চায় না, এক বাড়ীতে ঘুরে থাকুক, এক রাস্তায় বাস করতে চায় না। অনেক হোটেলে কালোকে স্থান দেবে না, অনেকে খাবার দায়গায় কালোকে খেতে দেবে না—অনেক বাড়ীতে কালোকে সামনের দরজা কোথাও আইনতঃ সমান অধিকার আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ না থাকতে পারে। আবার কোথায়ও কোথায়ও আইন করে সমান অধিকার বন্ধ করা হয়। কোথায়ও কোথায়ও আইন-মতে নিগ্রোকে শাদা বিয়ে করতে পারে—আবার কোথায়ও কোথায়ও আইনে ঐরকম বিয়েতে বাধা দেয়। কোথায়ও কোথায়ও নিগ্রো ও শাদা এক সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে রাস্তায় যাওয়া বে-আইনি। কোথায়ও কোথায়ও নিগ্রোকে শাদাদের পল্লীতে বাড়ী ভাড়া দেওয়া বা কিন্নী করা আইনে অসঙ্গত। এইরকম নানা রকমের বিদঘুটে আইন এদেশের নানা স্থানে দেখা যায়।

নিউইয়র্ক ছোট ও তার ইংলণ্ডের ছোটগুলি বোধহয় এসব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদার। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন স্বপ্নেও না ভাবেন নিউইয়র্কে নিগ্রোরা সব বিষয়ে সমান অধিকার পায়। ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে। নিউইয়র্ক শহরে একজন নিগ্রো বিচারপতি আছেন। রং তাঁর অতি চমৎকার কালো—নাক, চোখ, মুখ, চুল সবই আফ্রিকার নিগ্রোর মত। মনে হয় না যে, এঁর পূর্বপুরুষে কখনো রক্ত-মিশ্রণে বিশ্বাস করতেন। চেহারা যাই হোক, বিচার-ভবে শুনবেন, "আমাদের ঘর একটাও তোমার জন্য খালি নাই।"

কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক শহরের একটি খাবারের দোকানে একজন কালো নিগ্রো-পাদরীকে খাবার দিতে অস্বীকার করে। পাদরী তখন তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করেন। নিউইয়র্ক বলে ঐ খাবারের দোকানের শাস্তি হয় ও নিগ্রো-পাদ্রীকে ১০০ ডলার মানহানির বাবদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি যদি নিউইয়র্কে

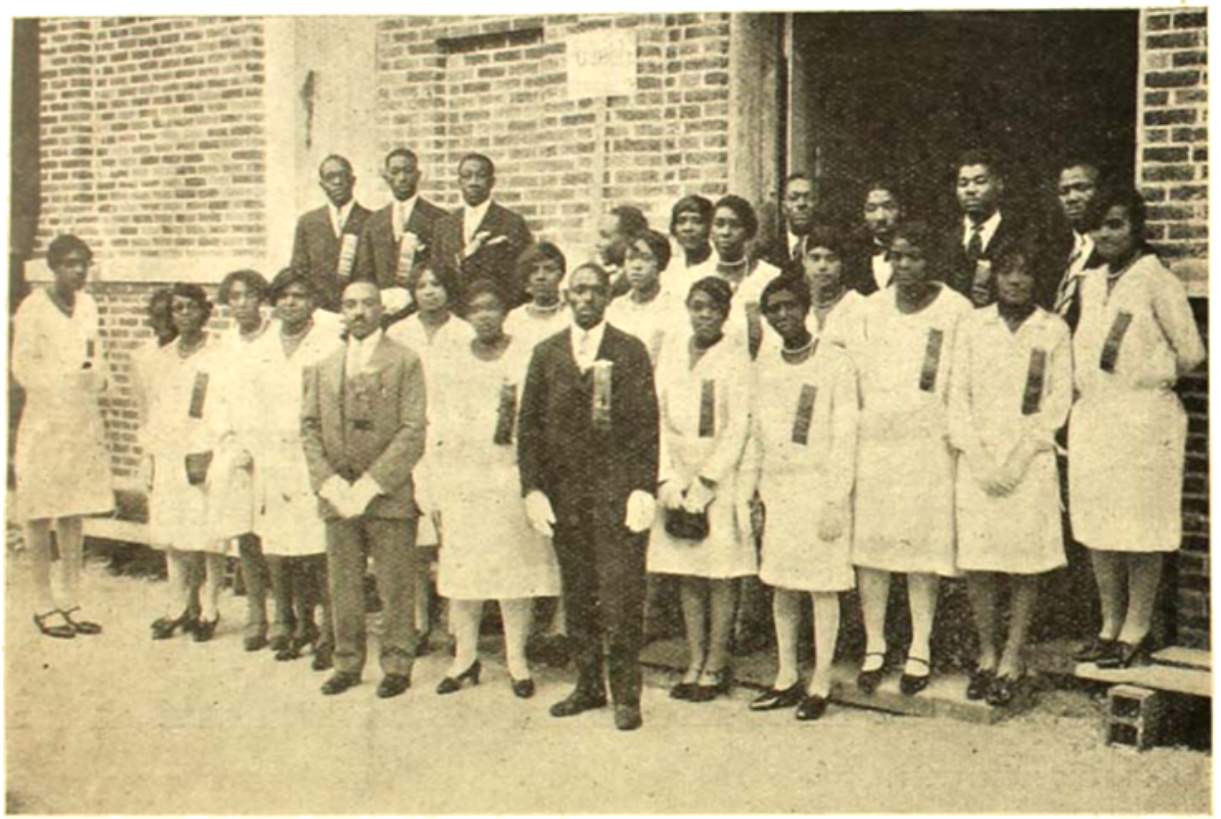

নিগ্রো গির্জার স্বয়ংসেবকবৃন্দ। (ushers) উপাসনাকালে আগন্তুকদেরকে পথ দেখানো তাঁদের কাজ।

বুদ্ধির অভাবনাই। জজ্ বলে, দৈনিক বহু শাদা পুরুষ ও স্ত্রী তাঁর কাছে বিচারের জন্য যায় এবং তাঁর বিচার মাথা পেতে নেয়। কিন্তু ঐ "জজ্ সাহেব"ই যদি তাঁর কোর্টের পর তাঁর কোন শাদা আসামী বা ফরিয়াদির একটি খালি বাড়ী ভাড়া নিতে যান, তবে বোধ হয় তিনি স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় শুনবেন, "আমরা কালোকে বাড়ী ভাড়া দিই না" অথবা যদি কোনও নাপিতের দোকানে যান, তবে শুনবেন, "আমরা নিগারের চুল কাটি না" অথবা যদি কোনও শাদা হোটেলে ঘর নিতে যান, না হয়ে, এদেশের দক্ষিণে কোথাও হত তবে মোকদ্দমা ত' দূরের কথা, তার অনেক আগে পাদরী সাহেবকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত, (সঙ্গে অবশ্য একখানা বাইবেল দেওয়া হত)। শুধু মারা নয়, যাতে এটা একটা আদর্শ হয়ে থাকে তার জন্য যত রকম ব্যবস্থা করা দরকার সবই করা হত। এ রকম ঘটনার বহুদূর থেকে বহু লোক (অনেক সময় ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে) এই অদ্ভুত মজা দেখতে আসে। "নিগার"কে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা—সার্কাস

দেখার চাইতে কম তামাসা নয়, বরং বেশী। কেন না সার্কাস দেখতে পয়সা দিতে হয়; এটা সম্পূর্ণ বিনা খরচায়। অনেক সময় এই রকম ঘটনার নিকটবর্ত্তী হোটেলের দাম বেড়ে যায়, খাবার জিনিষের দাম বেড়ে যায়—এমন কি অনেক সময় "স্পেশাল" ট্রেণ পর্য্যন্ত চালান হয়। লোকে লোকারণ্য হয়। হিন্দুর অষ্টোত্তর-যোগের মত ব্যাপার! মুসলমানের রমজানের মত ঘটনা!

এত সব অবিচার অত্যাচারের মধ্যেও এদেশের নিগ্রোকে

নিগ্রোদের ব্যবহার সম্বন্ধে এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের পার্থক্য অনেক বেশী। উত্তর ভাগে আগে এরা সংখ্যায় খুব কম ছিল, তাই উত্তর ভাগের শাদারা এদের উপর সদ্ব্যবহার অনেক করেছে। অন্ততঃ এই বলে দক্ষিণের লোকেরা উত্তরকে কটাক্ষ করে। বলে যে, তাদের দিকে অনেক যায়গায় নিগ্রোর সংখ্যা শাদার চাইতে অনেক বেশী। শাদার আধিপত্য রাখতে হলে নিগ্রো-নির্য্যাতন যাতীত চলে না। সমানাধিকার দিতে গেলেই শাদাকে দক্ষিণ ছেড়ে পালাতে

নিগ্রোগির্জ্জার অঙ্গনে সাণ্ডেস্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ।

কোনও রকমে বোঝহয় বেঁচে থাকতে হবে; চালিয়ে নিতেও হবে। আমেরিকার নিগ্রোসংখ্যা এদেশের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ১০ জন। অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০,০০০। সংখ্যায় এখন এরা এত বেড়ে পড়েছে যে, আর এদের উপেক্ষা করা চলে না। তাই আমেরিকার এ সমস্যাটি একটি বড় সমস্যা। আবার দেখা যাচ্ছে, এদের বংশবৃদ্ধি যে হারে হচ্ছে, তাতে তুলনায় শাদারা অনেক পিছনে। শাদাদের অনেকের মধ্যে এখন এজন্য একটা ভীতিও দেখা দিয়েছে। তবে কি শেষটা আমেরিকা—কালো হয়ে যাবে? যদিও এ ভীতির ভিত্তি নাই।

হবে। অথবা নিগ্রোর অধীনে বাস করতে হবে। শাদারা এ দুটোর কোনওটাতেই রাজী নয়।

যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার উত্তর ভাগের নিগ্রোসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। তার প্রথম কারণ দক্ষিণ থেকে অনেক নিগ্রো উত্তরে চলে আসছে। আসবেই বা না কেন? দক্ষিণে সে পদে পদে অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। সেখানে তার কোনও অধিকার নাই। কোনও ক্ষমতা নাই। কোনও আশাও বোধ হয় নাই। শাদা তাকে যা বলে সেখানে সে তা করতে বাধ্য। না করলে অবিচার, অত্যাচার এমন কি জ্যান্ত পুড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। অথচ সে যদি

কোনও রকমে একবার উত্তরে আসতে পারে তবে সে অনেক বিষয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তার ছেলে অন্যান্য শাদার ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে যায়, সে একই গাড়ীতে শাদার পাশে (বুকটা একটু বেশী ফুলিয়ে) বসে যাতায়াত করে। একই থিয়েটার বায়স্কোপে শাদার সঙ্গে সে উপভোগ করছে, একই রাস্তায় (ধাক্কা খেয়েও) বসে শাদার সঙ্গে সেখানে সে খাবার খায়।

একবার নিউইয়র্কে পা দিতে পারলে সে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে নিজেকে ধন্য মনে করে। যে স্বাধীনতা সে জীবনে কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই, তা ভোগ করে সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সেই রাত্রেই সে তার ঘরে ফিরে, তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে পত্র লেখে—'এমন কখনও দেখ নাই, শোন নাই, উপভোগ কর নাই। নরক থেকে চলে এস—নিউইয়র্ক হল নিগ্রোর স্বর্গ।'

দক্ষিণের নিগ্রোদের মধ্যে একথা ছড়াতে বেশী দেরী হয় না। তারা এ আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। যে পারে সে 'নরক' ছেড়ে, 'স্বর্গে' চলে আসে। বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, গরু বাছুর, যার যা কিছু আছে, বিক্রী করতে চেষ্টা করে। একবার এমন হয়েছিল যে, শেষে জমীজমা ও গরুবাছুর কেনার লোক পর্য্যন্ত আর জোটে না। জলের দামে বিক্রী করে নিউইয়র্কে আসার গাড়ীভাড়াটি পর্য্যন্ত তোলা মুস্কিল। কোনও কোনও রাজ্যের তুলাচাষের শ্রমিকের এত অভাব হয়ে পড়ে যে, শাদারা ভয় পেয়ে, আইন করে দেয় যে, কোনও কালোকে আর নিউইয়র্কের টিকিট বিক্রী করা হবে না। একটা মন্বন্তর আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কালোদের মধ্যেও একটা নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তারা যেন কোমর বেঁধে লেগেছিল যে, তারা আর দক্ষিণের শাদাদের লাথি খেতে কোনও রকমে সেখানে থাকবে না। রেলের টিকিট যখন বন্ধ হল, তখন অনেকে পুরাণ মোটরগাড়ী কিনে বল বেঁধে আসতে লাগল। পুলিশ তখন রাস্তায় মোটর চালান বন্ধ করে দেয়। তবু অনেক নিগ্রো উত্তরের দিকে চলে আসে।

দক্ষিণের নিগ্রো বেশ বুঝেছিল যে, তার দক্ষিণের শাদা মুনিব তাকে কখনও সুযোগ দেবে না। একে, বেশে কাজের অভাব, তাতে জন্মগত বর্ণবিদ্বেষ। কোথাও কোনও কাজ খালি হলে সব চেয়ে আগে পায় শাদা। তারপরে যদি কিছু বাকী থাকে, তবে কালোর কথা মনে পড়ে। কালোর চাপো কাজ জুটুক বা না জুটুক, অনাহার আছে। সাধারণতঃ তার মাইনে শাদার চেয়ে অনেক কম। এই দুঃসময়ে তা কমে ক্ষুদ্র হতে আরও ক্ষুদ্রতর হতে লাগল ও অবশেষে একেবারে শেষ হল।

এই হল দক্ষিণের দশা। উত্তরে যদিও তার অনেক অসুবিধা, অনেক বাধা, অনেক দুঃখ আছে; তবু এমন নয়। কাজ পেলে তার বেতন শাদার সমান, না পেলে অবশ্য উভয়েরই সমান—অর্থাৎ হাহাকার। এই সমান অধিকার ও সহবেদনা আমার বোধহয় নিগ্রোর উত্তরে আসার দ্বিতীয় কারণ।

মনে হয়, এত দিনের নির্য্যাতিত নিগ্রো আজ নূতন আশায় বুক বাঁধতে শিখছে। সে এতদিন পরে বুঝতে পারছে যে, তাকেও মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হবে, তাকেও তার শাদা ভাইদের মত দেশের কাজে জীবন দিতে হবে, দেশের উন্নতির জন্য ব্যবসায় করতে হবে, ডাক্তার হতে হবে, ব্যারিষ্টার হতে হবে, পুলিশ হতে হবে, সৈনিক ও নাবিক হতে হবে। উত্তরে, এখন নিগ্রো ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাটর্ণী (district attorney) পোষ্টমাষ্টার (post master) জজ (judge) প্রফেসার (professor) সবই হচ্ছে। আরও অনেক রকম জাতীয় আন্দোলনে সে তার স্থান বেছে নিতে পারছে। উত্তরে তার ভোটের মূল্য তার শাদা ভাইবোনের ভোটের মূল্যের ঠিক সমান। অনেক বিষয়ে সে অনুভব করে, সেও একজন স্বাধীন আমেরিকান।

এই নূতন আশার আর এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। নিগ্রোর শিক্ষা যত বাড়ছে—অবস্থা যত ভাল হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে তার সমান অধিকার পাওয়ার আশা তত বাড়ছে। যেখানে সে বাধা পাচ্ছে, সেখানেই সে বিদ্রোহী, নিগ্রো এখন লাথি খেয়ে আর চুপ করে থাকে না, সেও ফিরে লাথি দিতে চেষ্টা করে, লাথি দিতে না পারুক, অন্ততঃ চড়টা দেয়। তার আত্মসম্মানজ্ঞান আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে, এখন তাই, আর সে আগের মত শাদা হবার জন্য হা-হুতাশ করে না। সে তার মিসমিসে কালো রংটিকে পর্য্যন্ত "জগতের আলো" মনে করতে চায়। সে তার কোনও জিনিষকে শাদার চেয়ে হেয় মনে করে না, এমন কি তার যীশুকে পর্য্যন্ত সে তার নিজের মত কালো রং করে দেখতে চায়।

এই বিষম বিদ্রোহের বন্যায় কালো-শাদা মিশ্রণের অবস্থা যে কেমন হবে তা এখন বলা বড় কঠিন। তবু এ সমস্যা এদেশে আছে এবং এখনও যে কিছুকাল থাকবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করার কারণ এখন দেখা যাচ্ছে না।

নিউ ইয়র্ক।

শাশুড়ী-বৌ

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত মেয়ে ওই জগত্তারিণী!

বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, গায়ের রং পাকা আমের মত, মাথার চুল এখনও কাঁচা, দাঁতও ভাঙে নাই, বুড়ীও হয় নাই,—বহুদিন হইতে বহু লোকে তাঁহাকে ঠিক অমনিটিই দেখিতেছে।

পাড়ার সকলেই তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। ছেলেও ডাকে—মা, আবার ছেলের বাবাও ডাকে—মা।

তা মা হইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে নিশ্চয়ই। যোগ্যতা না থাকিলে কেহ কাহারও মা হইয়া বেশিদিন থাকিতে পারে না।

জগত্তারিণী বিধবা। নিজের সংসারের মধ্যে তাঁহার এক যোগ্য পুত্র আর যুবতী পুত্রবধূ।

বলেন: 'আমার কি আর ওই একটা ছেলে রে বাবা! পাড়ার সবাই আমার ছেলে, সবাই আমার বৌ।'

ছেলে শঙ্কর বলে: 'বলি হাঁগা, এখনও কি তোমার এমনি হৈ হৈ করে' ঘুরে বেড়ানো সাজে? বাড়ীতে দু'দণ্ড চুপ করে' বোসো না মা!'

জগত্তারিণী শঙ্করের মুখের পানে একবার তাকাইলেন। বলিলেন, 'যোগীনের বৌএর ছেলে হবে, তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম বাবা। ব্যথা উঠেছিল, ডেকে পাঠালে, হাঁরে, এ তুই বলিস কি রে শঙ্কর? যাব না?'

শঙ্কর কি যে জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল এবং সেইখান হইতেই বলিল, 'যেতে ত' আর আমি বারণ করছিনি মা, তবে কি না···'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'হুঁ'। তা আমি না হয় কাল থেকে বাড়ীতেই বসে থাকব শঙ্কর, বাড়ীতে বসে থাকলেও আমার চলবে, কিন্তু তুমি কোন্ লজ্জায় বসে আছ দিনরাত মুখে মুখ দিয়ে? বাইরে একবার বেরিয়ে গিয়ে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে, না, তোমার বাপের জমিদারী আছে, না তোমার শ্বশুর দেবে লাখ-খানেক্ টাকা?'

এক কথা হইতে আর-এক কথায় আসিয়া পড়িল। আশীর কাছে দাঁড়াইয়া বৌ চুল বাঁধিতেছিল, স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ টিপিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'শুনলে?'

কিন্তু কি এমন অন্যায় কথা মা তাহাকে বলিয়াছেন যাহার জন্য স্ত্রী তাহাকে এ-কথা বলিল শঙ্কর প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরী কিন্তু থামিল না। ঠোঁট উল্টাইয়া মুখে একরকম শব্দ করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল, 'আ মরণ! মুখে মুখ দিয়ে ছেলে-বৌ পড়ে আছে দিনরাত, বলতে লজ্জাও করে না!'

এতক্ষণে শঙ্কর তাহার মনের কথা টের পাইল। চুপি-চুপি চোখমুখের ইসারা করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'থামো!'

ঠিক এই সময়টায় সুমুখের রাস্তা দিয়া একজন ঢুলিদার দুগ্‌দুগ্ করিয়া ঢোল বাজাইয়া কি যেন বলিতে বলিতে পার হইয়া যাইতেছিল। জগত্তারিণী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বলি ও রাঙা-বৌ, ও তরুবালা, ওরে ও শান্‌কের মা! ওই শোন্!'

সুমুখের বাড়ীর দোতালার জানালার কাছে তরুবালা আসিয়া দাঁড়াইল, নীচে হইতে রাঙা-বৌ বলিল, 'কি মা?'

জগত্তারিণী বলিল, 'ওই শোন্ ঢুলি দিয়ে যাচ্ছে, আবার ভূমিকম্প হবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে শঙ্কর ছেড়ে সব পালা, নইলে মরবি।'

রাঙা-বৌএর ছোট ছোট দু'তিনটি ছেলেমেয়ে; জগত্তারিণীর নীচের তলার ভাড়াটে। তারই ভয় যেন সব চেয়ে বেশি। মুখখানি তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, 'তাহ'লে কি হবে মা, কোথায় যাব?'

শান্‌কের দোতালা হইতে তরুবালা বলিল, কোথায় যা, কপালে যা আছে তাই হবে।'

এমন সময় হাসিতে হাসিতে শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

জগত্তারিণী বলিলেন, 'কেনরে? হাসছিস কেন?'

শঙ্কর বলিল, 'ভূমিকম্পের ঢুলি নয় মা, ও অন্য-কিছু।'

'শুণ্‌না বাবা একবার এগিয়ে!'

আর কিছু বলিতে হইল না। তৎক্ষণে শঙ্কর নীচে নামিয়া গেল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিল জনকয়েক ছোকরাকে সঙ্গে লইয়া। নীচে হইতে হাঁকিয়া বলিল, 'ভূমিকম্প নয় মা, বাঁশবাজি। দেখবে?'

জগত্তারিণী ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, দেখব, দেখব। ও-সব সেই ছেলেবেলায় দেখেছি, তারপর আর দেখিনি।'

কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখা গেল, চুলি বাজাইয়া গলি রাস্তার উপরেই বাঁশবাজি দেখানো আরম্ভ হইয়া গেছে এবং তাহাদের পাড়া বলিতে রাস্তার দু'দিকের যে-কয়খানি বাড়ীকে বুঝায় সেই কয়খানি বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কতক-বা জানালার ধারে, কতক-বা বারান্দায় কতক-বা দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্য অবাক্ কাণ্ড, সকলেই আসিয়াছে, আসে নাই শুধু গৌরী,—জগত্তারিণীর পুত্রবধূ।

বাঁশবাজি দেখানো শেষ হইল। চাঁদা করিয়া পয়সা তুলিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া জগত্তারিণী বাড়ী ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঁশবাজি দেখতে গেলে না কেন বৌমা?'

চুল বাঁধা শেষ করিয়া গৌরী তখন নীচের কল-ঘরে যাইতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া গেল, 'না। ও-সব আমার ভাল লাগে না।'

দিন-দুই পরে কিসের যেন একটা যোগ ছিল। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে নাকি পুণ্য হয়। এই সব ব্যাপারে জগত্তারিণীই চিরকাল অগ্রণী হইয়া থাকেন, সেদিনও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তাহার আগের দিন রাত্রেই সকলকে বলা হইয়াছে। পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গামছা কাপড় হাতে লইয়া জগত্তারিণী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। অন্যান্য বাড়ীর মেয়েরা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ডাকিবামাত্র তাহারাও বাহির হইয়া পড়িল।

হাসিতে গল্পে পথ একেবারে মুখরিত করিয়া জগত্তারিণীর সঙ্গে তাহারা চলিয়াছিল গঙ্গাস্নানে। হঠাৎ পথের মাঝখানে একটা কথা উঠিয়া পড়িল। কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হাঁ মা, তোমার বৌকে ত' দেখছি না, কোথায় সে?'

জগত্তারিণীর মুখখানি কেমন যেন ম্লান হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'ছেলেমানুষ—ঘুমোচ্ছিল, তাই আর ডাকলাম না বাছা।'

কিন্তু সত্যই সে ঘুমায় নাই। জগত্তারিণী যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, গৌরী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে।

মেয়েদের হাসি গল্প আবার চলিতে লাগিল, কিন্তু গৌরীর না আসার সূত্র ধরিয়া জগত্তারিণীর মুখের চেহারা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেল। তাহাদের হাসিতে গল্পে তিনি যেন আর তেমন করিয়া যোগ দিতে পারিলেন না।

বাড়ী ফিরিয়াই জগত্তারিণী শঙ্করকে কাছে ডাকিলেন। চুপি চুপি বলিলেন, 'বলি হাঁরে শঙ্কর, বৌমা যদি এ রকম ধারা করে তাহ'লেত' আর কারও কাছে আমার মুখ দেখাবার যো থাকে না বাবা।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করেছে সে?'

'কি করেছে?' জগত্তারিণী একটা ঢোঁক গিলিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, 'সেদিন দেখলি ত'—দোরের গোড়ায় অমন সুন্দর বাঁশবাজি দেখানো হ'ল, তা লবাবের মেয়ে একবার বেরুলো না বাড়ী থেকে! আবার আজ সকালে যে আমরা এতগুলো মেয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম, তা কই, ও ত' গেল না আমাদের সঙ্গে!'

গঙ্গাস্নানে যাইবার কথাটা গৌরীর কাছে শঙ্কর আগেই শুনিয়াছিল। বলিল, 'ওকে তুমি ডেকেছিলে মা?'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'ও, বুঝেছি। না ডাকলে বুঝি যেতে নেই! না বাছা তা'হলে আমার অপরাধ হয়েছে, আমি ডাকি নি।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'ডাকবো কোন্ সাহসে শঙ্কর? মান ত' ও আমায় রাখে না। সেদিন বললাম ত' ও আমার মুখের উপরেই জবাব দিয়ে বসলো,—বললে, ও-সব আমার ভাল লাগে না।'

শঙ্কর বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আজ আমি ওকে বলে' দেবো ভাল করে।'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'হাঁ বাছা বলিস্, নইলে লজ্জায় আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

জগত্তারিণী মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার নড়া হওয়া স্বাভাবিক। পাড়ার যত মেয়ে সকলেই তাঁহার অনুগত; উঠিতে বলিলে ওঠে, বসিতে বলিলে বসে। অথচ নিজের বৌ যদি তাঁহার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকে না।

গৌরীকে সেদিন শঙ্কর বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বলিল, 'ছি! মায়ের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। মা যা বলবেন এবার থেকে তাই তুমি ক'রো।'

গৌরী বলিল, 'মা বুঝি আমার নামে তোমাকে কিছু লাগিয়েছে?'

শঙ্কর মুখে কিছু না বলিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—না মা কিছু বলেন নাই।

গৌরী বলিল, 'আমি ঘাস খাই না, আমি মানুষ, আমি সব বুঝতে পারি।'

শঙ্কর বলিল, 'মা কুড়ো মানুষ, আর কত দিনই বা বাঁচবেন! মা যাতে সুখে থাকে তুমি তাই করো, বুঝলে? আর তা ছাড়া মা আমার গুরুজন, ওঁর জন্যে তোমার যদি কিছু অসুবিধেও ভোগ করতে হয়, তা'হলেও তোমার কিছু অধর্ম হবে না।'

গৌরী বলিল, 'থাক্ আমায় আর বোঝাতে হবে না, মার জন্যে আমি অনেক করেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, মা আমায় দেখতে পারে না।'

শঙ্কর মৃদু একটুখানি হাসিল। বলিল, 'পাগল হয়েছ তুমি! তুমি আমার স্ত্রী, মা'র এই একটিমাত্র বৌ, আর তুমি বলছ কিনা তোমায় উনি দেখতে পারেন না, ভাল বাসেন না? তোমার একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

গৌরী বলিল, 'কেউ না করুক, ভগবান করবেন।'

শঙ্কর বড় বিপদে পড়িল। বলিল, 'আচ্ছা গৌরী, তা'হলে আমি কি করি বল ত? মা আর তুমি—বাড়ীর মধ্যে এই ত' দুটি মানুষ, তোমরা দু'জনে যদি সুখে না থাকো, তা হলে আমারই বা সুখ কোথায় বল দেখি?'

স্বামীর অবস্থাটা বোধ হয় গৌরী বুঝিল। অভ্রবংশের শিক্ষিতা মেয়ে, কেনই বা বুঝিবে না। খানিক ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা তা হ'লে এবার থেকে আমি সহ্যই করব। কিন্তু বাপু মেজাজ অসহ্য যদি কোনোদিন হয় ত' তখন তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো।'

প্রতিবেশী গগনবাবু বাড়ীতে তাঁহার একটি রেডিয়ো-সেট্ করিয়াছেন। শুক্রবার 'সতী সাবিত্রী'র পালা হইবে। পাড়ার মেয়েরা প্রায় সকলেই শুনিতে গিয়াছে। গৌরীকে সেদিন আর বেশী কিছু বলিতে হয় নাই। যাইবার আগে মাত্র জগত্তারিণী একবার ঘরের চৌকাঠের এপাশ হইতে উঁকি মারিয়া বলিয়াছিলেন, 'কিগো, ঘরে পাঁচুদের বাড়ী গান শুনতে? না ডাকলে বলবে, ডাকিনি। যাবে ত' চল এই বেলা, আর না যাবে ত' তাও বলে দাও।'

শঙ্কর বাড়ী ছিল না। থাকিলে সে মায়ের কথাগুলা তাহাকে একবার শুনাইতে পারিত। মুখে কোনও কথা না বলিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইল।

কিন্তু মেয়েদের রেডিও শোনা না ছাই! পাঁচুর বাবা গগনবাবু নিজে একবার বুঝাইয়া দিলেন যে, এই [illegible] সঙ্গে কোথাও কোনও তারের যোগ নাই, অথচ এখান হইতে বহুদূরে ঠিক যেমন যেমন গান হইবে, বক্তৃতা হইবে এখানে বসিয়াও তোমরা হুবহু ঠিক তেমনিটি শুনিতে পাইবে।

জগত্তারিণী বলিলেন, 'দিনে দিনে কতই না হবে বাবা, কতই না দেখতে পাব। কিন্তু এর দামও ত' নিশ্চয়ই অনেক। তা এই বাজারে এত টাকা খরচ কি জন্য করতে গেলি বাছা?'

গগন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাতে আর কি হয়েছে মা, তোমরা শোনো মন দিয়ে।'

গান আরম্ভ হইল। সকলেই অবাক্ হইয়া খানিকটা শুনিল, যন্ত্রটার তারিফ্ করিল, তাহার পর যে যার কথা লইয়া মশ্‌গুল হইয়া পড়িল। প্রথমে অনুচ্চ কণ্ঠেই মৃদু হইয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, একেবারে হাট বসিয়া গেছে। রাঙা-বৌ তাহার দু'হাত ভর্ত্তি সোনার চুড়ি গড়াইয়াছে,—ভাটিয়া চুড়ি। অথচ স্বামী তাহার নিতান্ত গরীবের মত নীচের তলার দু'খানি ঘর ভাড়া করিয়া অতি কষ্টে সংসার চালায়। দেখিয়া মনে হয়, ছেলে মেয়ে লইয়া

বেচারা হয়ত' দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সেই তাহারই স্ত্রী রাঙা বৌ-কিনা ঝক্‌ঝকে নূতন আটগাছ চুড়ি পরিয়া আজ গান শুনিতে আসিয়াছে! আলোচনার যোগ্য বিষয় বটে! প্রথম কথা তাহাদের ওঠে বোধ করি এই চুড়ি লইয়াই। রাঙা-বৌয়ের হাত দুইটা টানিয়া টানিয়া সকলেই একবার করিয়া চুড়ি কয় গাছা দেখিতে ছাড়িল না। তা দেখুক ক্ষতি নাই, কিন্তু দু' একজন তাহার মুখের উপরেই এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল যে, বেচারা লজ্জায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। কে-একজন বলিল, 'কি জানি মা, আমার ত' গিনিসোনা বলে' মনে হচ্ছে না।'

আর-একজন বলিল, 'গিনি সোনার চুড়ি গড়ানো আজকাল মুখের কথা কি না! সোনার দর কত! চান-টান করবার সময় খুলে রাখিস্ রাঙা-বৌ, ও রং বোধহয় বেশীদিন টিঁকবে না।'

কিন্তু সেখানে গৌরীই একমাত্র মেয়ে, যে তাহার দুঃখের কথা বুঝিল। রাঙা-বৌ তাহাদেরই নীচের তলার ভাড়াটে। মেয়েটির রূপও যেমন গুণও তেম্‌নি। তাই গরীব স্বামী অনেক দিনের চেষ্টার পর অনেক কষ্টে তাহার এই গহনা পরার সাধ মিটাইয়াছে।

জগত্তারিণী ওদিক তখন আরও দুইজন বর্ষিয়সী মহিলার সঙ্গে সতী-সাবিত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে চোখ মুছিতেছিলেন। এদিকে তাঁহার নজর ছিলনা। রাঙা-বৌকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া গৌরী তাহার কানে-কানে বলিল, 'চল আমরা পালাই এখান থেকে।'

রাঙা-বৌ তাহাই চাহিতেছিল। সেও তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ম্লান একটুখানি হাসিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, 'চল।'

গোলমাল বড় বেশি হইতেছিল বলিয়া গগনবাবু একবার নিজে আসিয়া বলিলেন, 'ওগো, তোমরা যে হাট বসিয়ে দিলে দেখছি!'

জগত্তারিণী পিছন ফিরিয়া বলিলেন, 'তাই না বটে বাছা! ভাল যাদের না লাগছে তারা উঠে গেলেই ত' পারিস্ মা।'

গোলমাল অবশ্য একটুখানির জন্য থামিল। দু' একজন উঠিয়াও গেল, আবার দু' একজন জাঁক করিয়া আগাইয়া বসিল।

এবং সেই অবসরে রাঙা-বৌ ও গৌরী কোন্ সময় যে সেখান হইতে উঠিয়া চট্ করিয়া পলায়ন করিয়াছে জগত্তারিণী কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। গান বন্ধ হইলে পর বৌমাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, বৌমা নাই। বলিলেন, 'চলে গেছে বুঝি? আবাগীর বেটির এসব কিছু ভাল লাগে না।'

রাঙা-বৌকে যে-মেয়েটা সব চেয়ে বেশি বিরক্ত করিয়াছে সে-ই বলিয়া উঠিল, 'তা এমন ঠাকুর-দেবতার কথা ভাল লাগবে কেন মা, গায়না-কাপড়ের কথা হয় ত' ভাল লাগে।'

জগত্তারিণী গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার লইয়া যে এতদূর গড়াইবে কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

গৌরী ততক্ষণে শঙ্করকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চলে এলে যে বৌমা?'

চলিয়া আসিবার আসল কারণটা গোপন করিয়া গৌরী বলিল, 'ওকে খেতে দেবার জন্যে উঠে এলাম।'

সত্য কথাটা বলাই বোধ করি তাহার উচিত ছিল, শঙ্করকে খাওয়াইবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে শুনিয়া জগত্তারিণী রাগিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'তোমার হাতে না খেলে ওর বুঝি পেট ভরে না? বলি— হাঁ রে শঙ্কর, সেকথা আমায় বললেই ত' পারতিস্!'

গৌরী চুপ করিয়াই ছিল। শঙ্কর দেখিল, এক্ষেত্রে তাহার কোনও দোষ নাই। বলিল, 'চুপ কর না মা! কি হ'য়েছে কি তাতে?'

জগত্তারিণীর গলার আওয়াজ সহসা অন্যরকম হইয়া গেল। বলিলেন, 'না বাবা হয়নি কিছুই। গর্ভধারিণী মা'র চেয়ে তোর বিয়ে-করা বৌ যে একদিন বড় হবে সেকথা জানতাম না ব'লেই কথাটা বলে' ফেলেছি। আর তা ছাড়া আমি সামনে বসে থেকে না খাওয়ালে তোর পেট ভরে না ভাবতাম। তা বেশ, কাল থেকে তুমিই ওকে খেতে-টেতে দিও বৌমা।'

এই বলিয়া জগত্তারিণী তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কি যে তাঁহার হইল কে জানে, কিয়ৎক্ষণ পরে কাহার সঙ্গে সহসা চমকিয়া উঠিয়া শঙ্কর পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মা তাহার মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া-পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছেন।

শঙ্কর বলিল, 'এ আবার তোমার কি হ'লো মা? কাঁদছো কেন?"

জগত্তারিণী তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতেই জবাব দিলেন, 'কেন যে কাঁদছি তা তুই কেমন করে' বুঝবি বাছা! যা—ঘুমোগে যা!

শঙ্কর দেখিল, রাত্রের খাবার তাঁহার ঘরের একপাশে তেমনি ঢাকা দেওয়া পড়িয়া আছে। বলিল, 'ওঠো মা ওঠো, তুমি খাও আগে, তারপর আমি যাচ্ছি।'

'না বাবা, আমি এখন খেতে পারব না, তুমি যাও।'

বলিয়া তিনি বোধ হয় আবার নূতন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছুতেই যখন তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না, তখন সে নিরুপায় হইয়া ম্লান মুখে গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ওগো, তুমি একবার ছাখো দেখি চেষ্টা করে'!'

গৌরী বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না আমি পারব না। তোমার মা, তুমি ছাখোগে চেষ্টা করে'।'

দেখা গেল, তাহারও চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

নিরুপায় শঙ্কর স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আবার সে তাহার মা'র ঘরে গিয়া দেখিল, জগত্তারিণী তখনও তেমনি শুইয়া আছেন, কান্না তাঁহার তখনও থামে নাই।

একদিকে স্ত্রী, একদিকে মা, কি যে করিবে ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পিছনে দরজার কাছে পায়ের শব্দ হইতেই শঙ্কর পিছন ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল,—তাহাদেরই পাড়ার আট-দশ বছরের একটা মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে টুনী, কি বলছিস?'

টুনী ধীরে ধীরে বলিল, 'মাকে ডাকতে এলাম।'

'কেন রে? কি হয়েছে?'

টুনী বলিল, 'বঁটি দিয়ে ঠাকুমা মা'র কপালে রক্ত বের করে' দিয়েছে।'

জগত্তারিণী বোধ করি তাহার সব কথাগুলাই শুনিয়াছিলেন, কিন্তুই তাঁহাকে বলিতে হইল না, কান্না তখন তাঁহার বন্ধ হইয়া গেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুনীর হাতে ধরিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, শঙ্কর বলিল, 'খেয়ে যাও মা।'

জগত্তারিণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কথাটা তিনি তাহার শুনিয়াও শুনিলেন না।

শঙ্কর এ-ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এসেছিল গো?'

শঙ্কর বলিল, 'টুনী।'

আর কিছু বলিতে হইল না। টুনীদের বাড়ীতেও এই একই কাণ্ড! টুনীর মা'র সঙ্গে তাহার শাশুড়ীর ঝগড়া প্রায় প্রত্যহ লাগিয়াই আছে। এবং যতবার তাহাদের ঝগড়া বাঁটি হয় এই জগত্তারিণী গিয়াই তাহা মিটাইয়া দিয়া আসেন। কাজেই টুনীর আগমনের হেতুটা গৌরী না বলিতেই বুঝিল।

ঠোঁট দুইটি টিপিয়া মুখখানির সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি গেলেন বুঝি সেখানে?'

শঙ্কর বলিল, 'হ্যাঁ গেলেন, কিছু না খেয়েই গেলেন। ফিরে এলে তুমি একবার—'

কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে হইল না। গৌরী বলিল, 'থাক্ আর কাউকে কিছু করে' কাজ নেই, তুমি শোও!' বলিয়া হন্ হন্ করিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া হড়াম্ করিয়া দু' হাত দিয়া দরজার খিলটা সে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[১]

আর্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা হইতে বিসৃষ্টি হইয়া বাঙ্গালা ভাষা আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০০ সালের দিকে নিজের বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া স্বতন্ত্র ভাষা রূপে জন্মলাভ করে। আর্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চলে কথিত প্রাকৃত ভাষাকে মোটামুটি হিসাবে 'মাগধী প্রাকৃত' বলা চলে। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ভারতীয় আর্য্যভাষা সমস্তই কোন না কোন প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার যে রূপ বিদ্যমান ছিল, তাহাকে 'অপভ্রংশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অন্ত্য-প্রাকৃত বা অপভ্রংশ যুগের অবস্থিতিকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১০০ সাল। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এক 'শৌরসেনী' অর্থাৎ মধ্যদেশে প্রচলিত প্রাকৃতের অপভ্রংশ ভিন্ন অন্য কোন অপভ্রংশে লিখিত কোন রচনা বা লিপি পাওয়া যায় নাই। তাহা না থাকার একটু কারণও যে নাই তাহা নহে। প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতি মধ্যদেশে বদ্ধমূল হওয়া অবধি মধ্যদেশের ভাষা, সাহিত্য এবং সভ্যতা বরাবরই প্রাধান্যলাভ করিয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার মূলে আছে মধ্যদেশের ভাষা। যাহা হউক অপভ্রংশ-যুগে, এমন কি তাহার পরবর্ত্তী কালেও দেখিতে পাই যে, গুর্জ্জর হইতে তীরভুক্তি পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে শৌরসেনী অপভ্রংশ সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও দেখি বিদ্যাপতি 'অবহট্ঠ' অর্থাৎ 'অপভ্রষ্ট'—শৌরসেনী অপভ্রংশের এক বিকৃত রূপ—তাহাতে বই লিখিতেছেন। এই বইটির নাম কী র্ত্তি ল তা'।

প্রাচীন বাঙ্গালা : সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত

অপভ্রংশ-যুগে বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা গান বা ছড়া ইত্যাদি অথবা ধর্ম্ম বা সাধনসংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিতেন, তাঁহারা এই দেশে প্রচলিত অপভ্রংশ, যাহাকে 'মাগধী' অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে, তাহা কিছু কিছু ব্যবহার করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু 'শৌরসেনী' অপভ্রংশের ব্যবহারই বেশী হইত। মাগধী অপভ্রংশে লিখিত কোন রচনা পাওয়া যায় নাই। তবে বাঙ্গালীর লেখা শৌরসেনী অপভ্রংশের রচনা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই রচনাগুলিতেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ব্বতর রূপের আভাস পাওয়া যায়; যদিও তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নহে। বাঙ্গালীর লেখা বলিয়া ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার ছাপ বা বিশিষ্ট রূপ কতক অংশে বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের দ্বারা শৌরসেনী অপভ্রংশে লিখিত কতকগুলি দোঁহা উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য জন্মলাভ করিবার পূর্ব্বে এদেশের সাহিত্য কি ধরণের ছিল তাহা দেখাইতেছি। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই সকল দোঁহা একত্রে সংগৃহীত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দুইখানি দোঁহার বই ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ থাকায় সেইগুলি প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া আছে। বাগচী মহাশয় সেগুলির শুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন। বাগচী মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহার সংগৃহীত এবং সম্পাদিত দোঁহাগুলি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাকে এইস্থলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মন্ত্র মন্তে সুদ্ধি ন হোই।
পড়িলা বিহি কি উট্ঠিব হোই।
তরুফল দরিসণে দুই অন্ধাই।
কেম্ব কেত্তি কি রোগ পলাই।[১]

[মন্ত্রের ধ্যান করিলে শান্তি হয় না। পণ্ডিত বিধি কি উত্থিত হয়? তরুফল দেখিলে তাহার আঘ্রাণ হয় না। বৈদ্য দেখিলে কি রোগ পালায়?]

বজ্রধরি ম আণহ বি ভেউ।
এবই পড়িবট এ ভবেউ।

১। 'ভাকেশ লিব্রেরি'-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত দোঁহা প্রকাশিত হইয়াছে। বইটির অন্য বৈশিষ্ট্যের কথাও কিছু কিছু আছে।

১। সরহপাদ বিরচিত।

কাহ্নে বিরহিঅ হউঁ জোবেঁ।
অকথি কাহিঁ কড়ুএঁ ঘুমেঁ।
ঘরী ঘরিণী থীউ জাণী।
কোণহিঁ বইসী সণ্ডা চাণী।১

[ব্রাহ্মণেরা কেহ জানেন না ; (তাঁহারা) এইরূপেই এই চতুর্বেদ পড়িয়াছেন। (তাঁহারা) কার্পা-বিরহিত, (অথচ) অগ্নির হোমে কটু ধূমে চক্ষু আলাপুক্ত করিয়াছেন। (তাঁহারা) ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালেন, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালেন।]

সহজ [নিত্য] অচ্ছিউঁ জাব।
সহজ সভাব ণ জাবেব।২

[সহজ নিত্য রূপ কাড়িয়াছে (অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে যে,) সহজস্বভাবের ভাবাভাব (অর্থাৎ স্থিতি এবং নাশ) নাই।]

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।
অবণাগবণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ।
তোবি নিলজ্জই ভণই হউঁ পণ্ডিঅ।৩

[পণ্ডিত সকল সত্য ব্যাখ্যান করে, (কিন্তু) দেহে বুদ্ধ বাস করিতেছেন (তাহা) জানে না। আনাগোনা (অর্থাৎ জন্মমৃত্যু) তাহার দ্বারা বিখণ্ডিত হয় নাই, তবুও নির্লজ্জ হইয়া বলে, 'আমি পণ্ডিত !']

এত ণ কিজই মন্ত ণ তন্ত।
নিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত।
নিঅঘর ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পরমত্থ ণ পাবই।
এ তো ছাড়ই ভুসুকু বাহিউ।৪ লোএ।
অনুদিন সহজে বাহিউ ৫ জাএ।
জো পিউ তরুণি বিরত্তা নেহে।
বোধি কি লব্भই৬ এবি বেএ।১০

[একটিও করে না, না মন্ত্র না তন্ত্র, (কেবল) নিজ ঘরণী লইয়া কেলি করে। নিজ ঘরের (অথবা নিজগৃহে) ঘরণী যতক্ষণ মগ্ন না হয়, ততক্ষণ কি করিয়া পরমার্থ লইয়া বিহার করিবে ? এই রূপ হোম (ইত্যাদি) সকল কর্ম্ম (মিথ্যা হইয়া) অনুদিন বাহ্য কর্ম্মে রহিয়াছে ! হে তরুণী, তোমার নিরন্তর-স্নেহ বিনা এই দেহে কি বোধি লাভ হয় ?]

[২]

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের এই সকল রচনা পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত। বাহ্য অর্থ ছাড়াও অন্য আর একটি গভীর অর্থ আছে ; সেই অর্থ ইঁহাদের সাধন-সঙ্কেত ছোতনা করে। সেই অন্তরঙ্গ গভীর অর্থ সকল সময়ে খুব স্পষ্ট নহে, এবং তাহা খুলিয়া বলাও সকল সময়ে শোভন এবং নিরাপদ নহে। সেই কারণেই সাধক রচয়িতারা বাহ্য-সঙ্কেত প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, বাহ্য অর্থ লইয়াই আমাদের মত বহির্ম্মুখ লোককে টানাটানি করিতে হয়।

এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পদ লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি পদলেখা একটি পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবার লাইব্রেরী ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই পদগুলি তিনটি অপভ্রংশের পুঁথির সহিত হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা[১] নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

এই পদগুলির আবিষ্কার শাস্ত্রী মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। শুধু বাঙ্গালা ভাষার নহে আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির সকলের মধ্যে যে কোনটির প্রাচীনতম নমুনা হিসাবে এই বৌদ্ধ গানগুলি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে পুঁথিতে এই পদগুলি পাইয়াছিলেন তাহাতে পঞ্চাশটি পদ ছিল, কিন্তু পুঁথির কয়েকটি পাতা হারাইয়া যাওয়াতে তিনটি সম্পূর্ণ পদ[২] এবং একটি পদের

১। সহজপাদ বিরচিত। 'কাহ্নিল' বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৯১।
২। সরহপাদ বিরচিত। 'অনাদ্যনন্ত' বৌদ্ধ গান, পৃঃ ১০৭।
৩। 'হুঁ' ঐ, পৃঃ ১০৭। ৪। সরহপাদ বিরচিত।
৫। 'পরমার্থ' বৌদ্ধ গান, পৃঃ ১৩১ ; 'পরমার্থ' ঐ, পৃঃ ২১।
৬। 'কাহ্নিল' বৌদ্ধগান, পৃঃ ১০২। টীকায় আছে 'বাহ্যকুক্কেন', সুতরাং 'বাহিউ' করা গেল।
৭। ভুলে 'লাভই'। ১০। কাহ্নপাদ বিরচিত।

১। এই আলোচনার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি 'বৌদ্ধ গান' নামে চলিতেছে।
২। পদসংখ্যা ২১, ২৫, ৮।

কিয়দংশ[১] পাওয়া যায় নাই। সর্ব্বসমেত ছেচল্লিশটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের প্রথমাংশ শাস্ত্রী মহাশয় ছাপাইয়াছেন।[২] সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই পঞ্চাশটি গানের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে এই সাড়ে চারিটি লুপ্ত পদেরও অনুবাদ আছে। আশা করা যায়, ইহা হইতে ঐ লুপ্ত পদগুলির কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে। তিব্বতী অনুবাদটির আরও একটি বিশেষ মূল্য আছে। বৌদ্ধ গানগুলির অনেক অংশ বেশ দুর্বোধ; সংস্কৃতটীকা-কারও অনেক স্থলে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই স্থলে তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইবে না আশা করা যায়।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এই বৌদ্ধ গানগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় এই পদগুলি[৩] আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা যে পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই পদগুলির মধ্যে মগধদেশীয় অর্থাৎ শৌরসেনী অপভ্রংশের ছাপ কিছু কিছু থাকায় অনেকে এই ভাষাকে বাঙ্গালা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। কেহ কেহ স্পষ্টই ইহাকে প্রাচীন হিন্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন (এবং এখনো করিতেছেন)। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার জবাব ভাল করিয়া দিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, এই ভাষার মধ্যে শৌরসেনী অপভ্রংশের পর কিছু কিছু থাকিলেও ইহা আসলে বাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু নহে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এখন দেশেবিদেশে সর্ব্ববাদিসম্মত। বৌদ্ধ গানের আলোচনায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্ব ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। প্রচণ্ড পাঠাশুদ্ধিপূর্ণ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের গানগুলির তিনি সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের বলে শুদ্ধ পাঠ স্থির করিয়া সেগুলিকে বোধগম্য করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্ধারিত পাঠ প্রায় সকল স্থলেই যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুনীতিবাবুর ইহা অসাধারণ কৃতিত্ব। তাঁহার পূর্ব্বে এই পদগুলির অধিকাংশেরই বোধগম্য অর্থ কেহই বাহির করিতে পারেন নাই। অপপাঠ ও ভ্রম-প্রমাদের ঘটা পদগুলির মধ্যে এত বেশী যে, সুনীতিবাবুও দুই এক স্থানের অর্থ ঠিক করিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় কয়েকটি স্থলে পাঠের সঙ্গতি করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপালে গিয়া চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পুঁথির পাঠ আর একবার মিলাইয়া দেখিলেন। তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠের গোলযোগ অনেকটা সংশোধিত হইল। তাহার পরে তিনি এই গানগুলির তিব্বতী অনুবাদ পাইলেন। চট্টোপাধ্যায় এবং বাগচী মহাশয়দ্বয় উভয়ে মিলিয়া বৌদ্ধ গানের শুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। নিম্নের আলোচনায় আমি তাঁহাদের নিরূপিত পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। সেই জন্য এইখানে আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শাস্ত্রী মহাশয় যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বশুদ্ধ বাইশ জন সিদ্ধাচার্য্যের লেখা। নিম্নে ইহাঁদের নাম এবং রচিত পদের সংখ্যা দিতেছি।

লুই ২; কুক্কুরী-পা ২; বিরূআ (=বিরূপ) ১; গুণ্ডরী (=গুণ্ডরী) ১; চাটিল ১; কুম্ভরু ৮, কাহ্ন ১২, কামলি ৮; ডোম্বী ১; শান্তি ২; মহিআ (=মহীধর) ১; সীআ ১, সরহ ৪; সবর (=শবর) ২; আজদেব (=আর্য্যদেব) ১; চেণ্টণ-পা ১, দারিক ১, ভাদে (=ভদ্র) ১, তাড়ক ১; কণ্ণ ১; তন্তণি (=তন্তনন্দী) ১; ধাম ১।

পদসংখ্যা, ২৩। এই পুঁথির যে আদর্শ বা মূলরূপ পুঁথি হইতে আরও অন্ততঃ একটি পদ অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয়। ১০ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যার শেষে টীকাকার লিখিতেছেন: "নাড়ীচোধী পাদনাব্ সমেতাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" [পৃঃ ৪১]।

২। বৌদ্ধ গান, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' অংশ। এই গানগুলির একটি সংস্কৃতটীকাও পুঁথিটিতে আছে। তাহাও শাস্ত্রী মহাশয় এই সঙ্গে মুদ্রিত করিয়াছেন। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ রূপ হইবে 'চর্য্যাগীতি-বিনিশ্চয়'। এই নামটি টীকাকারের একটি উক্তি হইতে শাস্ত্রী মহাশয় অনুমানে গঠন করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প হইতে টীকাকার বলিয়াছেন—"ত্রিস্কন্ধোচ্চারণাদিনিশ্চয়ক্রিয়া-যোগাদ্ধ্যানচর্য্যাসংবরে।" টীকাটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া বোধ হয় না।

৩। একটি পদে [সংখ্যা ২] এই জাতীয় পদকে 'চর্য্যা' বলা হইয়াছে।

এই সকল নাম গানের ভণিতায় ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব ইহা যে অধিকাংশ স্থলেই কবির নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দুই এক স্থলে ইহা কবির গুরুর নামও হইতে পারে। 'কুক্কুরী-পা' এবং 'চেণ্ডণ-পা' এই দুইটি নামে 'পা' অর্থাৎ 'পাদ' এই সম্ভ্রমসূচক শব্দ যুক্ত থাকায় বোধ হয় যে ইহারা কবির নাম নহে, কবির গুরুর নাম। যাহা হউক এই সিদ্ধাচার্যাদিগের সময় জানা যাইলে পদগুলি রচনারও আনুমানিক সময় জানা যায়। এখন সিদ্ধাচার্যাদিগের সময় আলোচনা করা যাউক।

সুনীতিবাবু এই সিদ্ধাচার্যাদিগের সময় মোটামুটি[১] খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ধরিয়া বৌদ্ধ গানগুলির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার পর কেহ কেহ (ইহাদের মধ্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রধান) সিদ্ধাচার্যাদিগের আবির্ভাব-কালকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবোধবাবু এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়া সুনীতিবাবুর প্রদত্ত কালই মোটামুটি ঠিক বলিয়া মনে করেন। প্রবোধবাবুর মতে আদি সিদ্ধাচার্য্য লুই বা লুইপাদ নাথপন্থীদের আদি আচার্য্য মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত অভিন্ন। ইহা অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। লুই—লোই—লোহিত, রোহিত = মীন, মৎস্যেন্দ্র। এইরূপ অর্থের দিক দিয়াও সামঞ্জস্য করা যায়। যাহা হউক মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে বৌদ্ধগানগুলি খ্রীষ্টীয় ৯৫০ হইতে ১২০০ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সিদ্ধাচার্যাদিগের সময়ের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক; কারণ ঐ শতকের প্রথম পাদে লেখা জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে (বা বর্ণরত্নাকরে) চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় যে ছিয়াত্তরটি নাম আছে তাহার মধ্যে আমাদের চর্য্যাকারদিগের অনেককেই পাইতেছি, যেমন দারিপা (=দারিক), বিরূপা (=বিরূআ), কাহ্নু, জালন্ধর, চেণ্ডণ (=চেণ্ডণ), ভাদে, কামরী (=কামলি), সবর, শান্তি, চাটিল (=চাটিল)।[২]

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পুঁথির বয়স কিন্তু এত নহে। শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতকে লেখা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পুঁথিটির বয়স চতুর্দ্দশ শতকের শেষ ভাগের পূর্ব্বে নহে। তাহাই ঠিক, নতুবা টীকাকারকেও দ্বাদশ শতকে লইয়া যাইতে হয়। তাহাতে আবার অনেক বাধা আছে।

বৌদ্ধ গানগুলি গূঢ় অর্থের ভাষায় রচিত হইয়াছিল।[৩] এই গানগুলির খুব প্রচার ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই পাঠের এত গোলমাল রহিয়াছে। এমন কি গানগুলির সংস্কৃতটীকা-কারও (তিনিও প্রাচীন লোক) সকল ক্ষেত্রে ঠিক পাঠ বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুই এক স্থলে টীকাধৃত পাঠ মূলের পাঠ হইতে পৃথক। বৌদ্ধ গানগুলির অধিকাংশই মাত্রাবৃত্ত 'পাদাকুলক' (হিন্দী চৌপাঈ) ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে ১৬ মাত্রা করিয়া। এই গানগুলির ছন্দে পয়ারের মত অষ্টম মাত্রার পর যতি পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই গান গুলির ছন্দকে পয়ারের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ বলিলে বিশেষ ভুল করা হইবে না।[৪]

গানগুলি যে যে রাগ রাগিণীতে গাওয়া হইত তাহাও প্রায়ই উল্লেখ করা আছে। এই এই রাগ রাগিণীগুলির নাম পাওয়া যায়—পটমঞ্জরী, গবড়া (=গউড়া), অরু, গুজ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, গউড়া, বরাড়ী (বঢ়ারী), শবরী (=শবরী ?) বলাড্ডি (=বরাড়ী ?), মল্লারী, দেশাখ (=দেশাখ), মালশী, মালসী গবুড়া, কহ্ন, গুজ্জরী, বঙ্গাল, শবরী।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় হইতে কয়েকটি পদ তুলিয়া দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপের উদাহরণ দিতেছি। ইহাদের মধ্যে কবিত্ব হয়ত এমন কিছুই নাই তথাপি ভাষার এবং ছন্দের মাধুর্য্য আছে।

ভাব ন হোই অভাব ন জাই।
আইস সংবোহে কো পতিআই।
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাউ খিলসই উহ লাগে ণা[৫]।
আহ্নে রাতিএ ভব ণ ভাসী।
সো কইসে আগম বেএঁ পরাশী।

১। বৌদ্ধ গান, পৃঃ [৩৬] দ্রষ্টব্য।

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ১১৭ দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, পৃঃ ২০১।

৩। আমে গা' এই অংশে কিছু ভুল আছে।

কাহ্নে রে কিস ভণি মই দিবি পুছা[১]।
উইক চীএ জিম লাঙ ন মিছা।
সুই ভবই [মইঁ] ভাইব কীস।
জা লই অহ্মি তাহের উহ ন দিস। [চর্যা ২৮]।

[ভাবও হয় না, অভাবও যায় না; এইরূপ সম্বোধে (অর্থাৎ সম্বোধনে) কে প্রত্যয় করে? সুই বলিতেছে, হে বটু, বিজ্ঞান চুলক্ষি, (যেহেতু) ত্রিধাতু (কায়বাক্‌চিত্তে) বিলাস করে। যাহার বর্ণ চিহ্ন এবং রূপ জানা নাই, তাহাকে কি করিয়া আগম এবং বেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়? কাহাকে কি বলিয়া আমি পৃচ্ছা (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) দিব? (তত্ত্ববস্তু) উদক-চন্দ্রের মত (অর্থাৎ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের মত) না সত্য না মিথ্যা। সুই বলিতেছে, আমি ভাবিব কি করিয়া? যাহাকে লইয়া আছি তাহার উদ্দেশ (ও) যে দেখিতেছি না।]

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি[২]।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজসুন্দরী।
নাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি[৩] দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাম্বোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।
গুরুবাক পুণ্ণ বিন্দ নিঅ মণে মাঝেঁ।
একে সরসন্ধানেঁ বিন্ধ বিন্ধ মা কর বিআরেঁ।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে[৪]।

[চর্যা ২৮]।

[উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত, (তাহার) গ্রীবায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, (তুমি) গোল করিও না, তোমার গোহারী (অর্থাৎ দোহাই)। (আমি) তোমার নিজ ঘরণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা (রূপে বা দিকে) তরুবর মুকুলিত হইল রে, (তাহার) ডাল গগনে (গিয়া) লাগিল; (আর) কর্ণকুণ্ডল এবং বজ্র ধারণ করিয়া শবরী একেলা এই বন চুঁড়িতেছে। ত্রৈধাতুক খাট পড়িল; শবর, (তুমি) মহাসুখে শয্যা ছাইলে। ভুজঙ্গ (অর্থাৎ নাগর) শবর, দারিকা (অর্থাৎ নাগরী) নৈরামণিকে (লইয়া) (তুমি) প্রেমে রাত্রি পোহাইলে! (অথবা, শবর ভুজঙ্গ, এবং নৈরামণি দারিকা প্রেমে রাত্রি পোহাইল।) হৃদয়-তাম্বূলে কর্পূর (দিয়া) মহাসুখে খাওয়া হইল: শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইল। গুরুবাক্যকে পুণ্য বেধ (অর্থাৎ কর), নিজ মনকে বাণ (কর); এক শরসন্ধানে পরমনির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত হইয়াছে! গিরিবর শিখর সন্ধিতে প্রবেশ করিলে শবর ফিরিবে কি করিয়া?]

কাহ্ন হরিণী মোহি মা হোহ বিমণ[১]।
মোহিল ২ হাক পড়ই ৩ চৌদীস।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খণহ ন ছাড়ই ৪ ভুসুকু অহেরি ৫।
তিণ ন চুবই ৬ হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ৭ ণ জাণী।
হরিণী বোলই ৮ সুণ হরিণা ৯ তো।
এ বণ ছাড়ী ১০ হোহু ভাংতো।
তুহ্ম ধরে ১১ হরিণার খুর ন দীসই ১২।
ভুসুকু ভণই মূঢ় ১৩ হিঅহি ণ পইসই। [চর্যা ৩]।

[কাহ্ন হরিণীকে বিষ (লিপ্ত করিয়া) ছাড়িয়া দিয়াছি (বা দিয়াছে); চারিদিক বেড়িয়া হাঁক পড়িতেছে।

১। মূলে আছে 'কাহ্নেরি তিনি মেলি অচ্ছহ কীস।' ইহা অর্থহীন। ইহাকে এই রূপও পরিবর্তিত করা যায়: 'কাহ্নেহি তিনি মেলি অচ্ছহ' তখন অর্থ হইবে 'কাহাকে লইয়া এবং ত্যাগ করিয়া আছি': এই অর্থ টীকাকার সম্মত।

২। 'মেলিল'। 'পড়অ'। ৩। 'ছাড়অ'।
৪। 'ভুসুকু হেরী'। ৫। 'অপাই'। ৬। 'খোলঅ'।
'হরিণা সুণ হরিণা তো'। ৭। 'ছাড়ী'।
'তরুবরে' টীকায় 'তরুবরে'। 'তরুবরে' এরূপ পাঠও ধরা
১১। 'পীসঅ'। ১২। 'মূঢ়া'।

১। মূলে 'পিচ্ছিআ'।
২। মূলে নাই। ছন্দের এবং অর্থের অনুরোধে পদটি অনুমিত হইয়াছে। টীকাতেও 'মম' শব্দ আছে, অতএব ইহা প্রমাদবশতঃ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।
৩। মূলে 'ণৈরামণি'। ৪। মূলে 'পইরামণি'।

আপনার মাংসে হরিণ (জগতের) বৈরী, (এক) কণও আপেটি (অর্থাৎ শিকারী) কুরুকু (অর্থাৎ হরিণরূপ কুরুকুকে) ছাড়ে না (অথবা শিকারী কুরুকু অল্পমাত্রও শিকার করা ছাড়ে না)। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না ; হরিণ হরিণীর বিলয় জানে না (অথবা হরিণ এবং হরিণীর মিলন জানা নাই)। হরিণী বলে, "হরিণ, তুই শোন ; এ বন ছাড়িয়া দূরগত) হও।" সত্বর গেলে হরিণের খুর দেখা যায় না। কুরুকু বলে, (ইহার অর্থ) মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।]

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাই ১।
আঙ্গন ২ ঘর নাহি ও শুন জো বিআতী।
কানেট চোরে ৪ নিল অবরাতী।
সুসুরা ৫ নিদ গেল বহুড়ী জাগই ৬।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগই ৭।
দিবসই বহুড়ী কা ডর ভয় ভাই ৮।
রাতি ভইলে কামরু জাই ৯।
আইস চর্যা কুরুরীপাএঁ গাইউ ১০।
কোড়ি মধ্যে এহু হিঅহি সমাইউ ১১। [চর্যা ২]।

[দুলি (অর্থাৎ বজ্রপট্টি) দুহিয়া পাত্রে (দুগ্ধ) ধরিতেছে না ; গাছের তেঁতুল কুম্ভীরে খাইতেছে। অঙ্গনকে ঘরে লইয়া আইস (?) ; ওগো বিআতী (?), (তুমি) শুন। অর্দ্ধরাত্রিতে কানেট (অর্থাৎ কর্ণপট্ট, কর্ণকুণ্ডল) চোরে লইয়া গেল। শাশুড়ী নিদ্রা গেল, বহুড়ী জাগিয়া আছে ; কানেট চোরে লইল, কোথায় গিয়া (তাহা) খুঁজিবে ? দিবসে বহুড়ী কাকের ভয় পায় (অথবা ভয়ে রা কাড়ে), (কিন্তু) রাত্রি হইলে কামরূপ যায়। এইরূপ চর্যা কুরুরীপাদের দ্বারা গীত হইল। কোটির মধ্যে একটির হৃদয়ে (টীকা, অর্থাৎ টীকার প্রকৃত অর্থ) প্রবেশ করিল।]

এই পদটির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত কতকগুলি ধাঁধা আছে, এবং চতুর্থ পদাংশে একটি গল্পের বীজও আছে। এই গল্পটির আভাস একটি উদ্ভট শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই—

দিনা কিঞ্চিতি জল্পেত্তো জাত্যা লম্বস্তনী বলীম্।
তস্যা নক্তঞ্চরঃ কান্তি স্তস্মিন্নহনি চক্ষিঃ॥

এই কবিতাটি এবং তদাশ্রিত একটি গল্প মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় আছে। এই চর্যাটিতে যে 'রুক্ষ' শব্দ হইতে উদ্ভূত 'রুখ (=রুক্ষ)' শব্দ আছে, তাহা অনেকে হিন্দী শব্দ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই শব্দের ব্যবহার যে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একবারেই পাওয়া যায় না তাহা নহে। গোবিন্দদাসের একটি ব্রজবুলি পদে 'রোখ' শব্দের প্রয়োগ আছে।[১] তাহা প্রাচীন বাঙ্গালার 'রুখ' শব্দের ষোড়শ শতকের রূপ বলিয়াই বোধ হয়।

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী[২]।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী[৩]।
বেঙ্গ ৪ সংসার বড় রিস ৬ জাইব[৭]।
দুহিল দুধ কি বেটে ঘামাইব[৮]।
অন্ধে বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিঅ এ তিনা সাঁঝে।
জো সো বুঝী সো ধনি বুঝী।
জো বো চোর ৯ সোই সাধী।
নিতি নিতি ১০ বিআলা ধিয়ে ঘস জুবই ১১।
ছেলা-পাএর গীত বিরলে বুঝই ১২। [চর্যা ৩৩]।

[টালেতে (অর্থাৎ উচ্চভূমিতে) মোর ঘর, পড়শী নাই ; হাঁড়ীতে ভাত নাই, (তথাপি আমি) নিত্যই আসি।

১। 'আজ'।　　২। টীকায় 'অঙ্গন'।

৩। মূলে 'বরণ'। অষ্টপদ পাঠটীকার উদ্ধৃত পাঠ মূলে আছে ধরিয়া বুঝিতে হইবে।　　৪। 'চৌরি'।

৫। 'সুসুরা' টীকায় 'সসুরা'।　　৬। 'জাগঅ'।　　৭। 'মাগঅ'।

৮। 'কাড়ই ডরে ভাএ'। 'ভাএ' কে 'ভাঅ, ভাই' এইরূপে সংশোধন করাও চলে। ভাহাতে অর্থ হইবে 'ডরে রা কাড়ে'।　　৯। 'জাঅ'।

১০। 'গাইড়'=গাইল। পরবর্ত্তী চরণে 'সমাইড়'=সমাইল। এই -ড় প্রত্যয় বাঙ্গালায় এখন নাই, উড়িয়ার আছে। সমাপিকা ক্রিয়ার -ড় প্রত্যয় বাঙ্গালায় একটি মাত্র পদে পাওয়া গিয়াছে—'আছড়ি' [দালানের বহুত ঠাকুর বিরাজ]।

১১। 'এহুড়ি অহি সমাইড়'। পাঠের রূপান্তর টীকায় অনুসরণ করা হইয়াছে।

১। 'তলাসক রোখে আপন তনু খাঁসলি হলহি মুখ ছাপাই' [পদকল্পতরু, পরিষৎ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৪]।

২। 'পড়বেসী'।　　৩। 'হাড়ীত'।　　৪। 'আবেসী'।

৫। 'বেঙ' : টীকায় 'বেঙ'।　　৬। 'বহুলি'।　　৭। 'জাঅ'।

৮। 'ঘামাঅ'।　　৯। 'চৌর'।　　১০। 'নিতে নিতে'।

১১। 'জুঝঅ'।　　১২। 'বুঝঅ'।

সিক্কতাঁত (অথবা বেতের মত) সংসার বড় হেলিয়া (? অর্থাৎ কুটিল গতিতে) যায় ; দোয়া দুধ কি (পাত্রের) বাটে (পুনরায়) প্রবেশ করে ? বাঁজা গাইকে বলদ বিয়াইল (অর্থাৎ প্রসব করিল) ; এই তিন সন্ধ্যা (তাহার দুধ) সিটায় (অর্থাৎ কেঁড়ে ভর্তি করিয়া) দোয়া হয়। সেই যে বুঝি, তাহাই ধন্য (অর্থাৎ যথার্থ) বুঝি ; যে সেই চোর সে-ই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। অল্প লোকেই ঢেন্ডণপা-এর (অর্থাৎ ঢেন্ডণ-পাদের) গীত (অর্থাৎ গীতের অর্থ) বুঝিতে পারে।]

নগর বাহিরেঁ ১ ডোম্বি তোহোরি ২ কুড়িআ।
ছোই ছোই ৩ যাহি ৪ ব্রাহ্মণ ৫ নাড়িআ।
আলো ডোম্বি তোএ ৬ সম করিব ৭ মো ৮ সাহ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্ঘ ৯।
এক সো পদমা চৌষট্ঠি পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচই ১০ ডোম্বি বাপুড়ী।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদ্ভাবে।
আইসসি ১১ জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ।
তান্তি বিকণঅ ১২ ডোম্বী অবর না চঙ্গেড়া ১৩।
তোহোর ১৪ অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া ১৫।
তু লো ডোম্বী হউঁ ১৬ কপালী।
তোহোর ১৭ অন্তরে মোএ ঘরিনি হাড়েরি মালী।
সরবর ভাঙীঅ ডোম্বী খাই ১৮ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ। [চর্যা ১০]।

[(ওলো) ডোম্বনী, নগরের বাহিরে তোর কুঁড়ে, (অথচ তুই) নেড়া বামুনকে (অর্থাৎ মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ বটুকে) ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা'স ! ওলো ডোম্বনী, তোর সঙ্গে আমি সাঙ্গা করিব (আমি, অর্থাৎ) নির্ঘিনে কাপালিক, উলঙ্গ যোগী কাহ্ন। একটি সেই পদ্ম, (তাহার) চৌষট্টি পাপ্‌ড়ী ; তাহার উপর চড়িয়া ডোম্বনী (এবং) বাপুড়া (অর্থাৎ কাপালিক কাহ্ন) নাচিতেছে (অথবা, বেচারী ডোম্বনী নাচিতেছে)। ওলো ডোম্বনী, আমি তোকে সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি : (ওলো) ডোম্বনী, (তুই) কার নায়ে (চড়িয়া) আ'সিস যা'স ? ডোম্বনী তাঁত বিক্রয় করে, আর চাঙ্গারি ; তোর তরে (আমি) নট-লজ্জা ছাড়িলাম। তুই লো ডোম্বনী, (আর) আমি কাপালিক ; তোর তরে আমি হাড়ের মালা লইলাম (বা ছাড়িলাম)। সরোবর (অর্থাৎ পদ্মবন) ভাঙিয়া ডোম্বনী মরম (অর্থাৎ মৃণাল) খায় : ডোম্বনীকে মারিব, (তাহার) পরাণ লইব।]

জো মণ গোআর১ আলা লালা২।
আগম পোথী ইটাসণা।
তল কইসে সহজ বোলব৩ জাই৪।
কাঅবাক্‌চিঅ জহু ন সমাই ৫।
আলে ৬ গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত তাহিব কীস।
জে তুই বোলী সে তুহি টাল।
গুরু বোব সে ৭ সীসা কাল।
ভণই কাহ্ন জিনরঅণ বি কইসা ৮।
কাণে বোব সংবোহিঅ জইসা। [চর্যা ৪০]।

[যাহা মনের গোচর (তাহা) বাক্ বা রূপা, (যেমন) আগম, পুঁথি, ইটালালা। বল দেখি, কি করিয়া সহজ (বস্তুকে) বলা যায়, যাহাতে কায়, বাক্, চিত্ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে না ? বৃথা(ই) গুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করেন : বাক্‌পথাতীতকে কি করিয়া কহা (অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া বলা) যায় ? যাহারা তবু বলে তাহারা তবু (=বড়ই ?) ভুল করে। গুরু (হইবেন) বোবা, (আর) শিষ্য (হইবে) কালা। কাহ্ন বলিতেছে, জিনরত্ন কীরূপ ? যেমন কালার দ্বারা বোবা সম্বোধিত হয় (তদ্রূপ)।]

১। 'বাহিরিরেঁ'। ২। 'তোহোরি'। ৩। 'ছাইছোই'।
৪। 'যাই সো'। ৫। 'অন্ত'। ৬। 'করিএ'।
৭। 'ম'। ৮। 'সাথ'। ৯। 'আলঙ্ঘ'। ১০। 'আইসসি'।
১১। 'বিকণঅ'। ১২। 'চঙ্গড়া'। ১৩। 'তোহোরা'।
১৪। 'এহ্নী'। ১৫। 'হউঁ'। ১৬। 'থাঙ্ঘ'।

১। 'খোএর'।

২। 'গুণা' অর্থে 'আলালালা' এই শব্দটির প্রয়োগ পুরাতন আসামীতে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত অ স মী য়া সা হি ত্যে র ই তি হা স কি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য।

৩। মূলে 'বোল অ'। বৃত্ত পাঠ টীকার অনুসরণ। 'বোল অ' পাঠ গ্রহণেও চলে, অর্থ 'বলা যা'। কিন্তু 'অ' শব্দের এরূপ প্রয়োগ তৎসমের দিকের পক্ষে একটু বিসদৃশ। ৪। 'জাঅ'। ৫। 'সমাঅ'।

৬। এই শব্দটিরও প্রয়োগ পুরাতন আসামীতে পাওয়া যায়।

৭। 'তাহাবোলে'।

৮। মূলে 'বিকণই ণা'। বৃত্ত পাঠ টীকার অনুসরণ।

চর্যা-পদগুলির মধ্যে এমন কিছু কিছু প্রবচন আছে, যাহা বিশেষভাবে বাঙ্গালা ভাষার সম্পত্তি। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'[১] এই প্রবচনটি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সব যুগের লেখাতেই দেখা যায়। শ্রী কৃ ক কী র্ত নে[২] আছে—'চারি পাশ চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী।' ইত্যাদি। মুকুন্দরামের চ ণ্ডী-ম ঙ্গ লে[৩] আছে—'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে।' 'মুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাই[৪]'; 'হাথের কাঙ্কণ বা লোড় দাপণ' [৫] [অর্থাৎ হাতের কাঁকণের জন্য দর্পণ লইও না; তুলনীয় 'হাতে পাঁজী, মঙ্গলবার']; 'দুহিল দুধু কি বেন্টে মামাই[৬]' [অর্থাৎ দোয়া দুধ কি (গরুর) বাঁটে (ফিরিয়া) প্রবেশ করে?]; 'ঘর মুণ সোহালী কিমো দুঠ্ঠ বলদে[৭]' [অর্থাৎ 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল']; ইত্যাদি প্রবচন এখনও কোনো না কোনো রূপে কথ্যভাষায় প্রচলিত আছে।

[৩]

সন্ধ্যা অর্থাৎ পারিভাষিক ভাষায় লিখিত গুহ্য সাধনসঙ্কেত-বোধক গীতি-কবিতা এই কয়টি চর্যাপদ ছাড়া আর মিলে না। পরে একবারে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে কতকগুলি বৈষ্ণব সহজিয়া পদ পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু অন্য ধাঁচের। এই দুই কালের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা একটি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছু গভীর বা স্বতন্ত্র অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়। পদটির মধ্যে পুরাতন বাঙ্গলার ছাপ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পদটি সে ক ত ভো দ য়া য়[৮] পাওয়া গিয়াছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ডাকিনীরাগেণ গীয়তে।

এক যুবতী পণ্ডিত হীন।
অন্য দিনাইবাক নাহিরে চিন।
দৈবকলিতোক্তি হৈলা আমার।
বাদু না ভাঙ্গ ছোট পার[১]॥ ধ্রু॥
ছাড়ি দেহ আদু[২] মুক্তি যাও ঘর।
নাগর মধ্যে লোয়ার পড়। ধ্রু॥
হাত যোড় করিলা যাহো লাজ।
যারেক মহাসুখ রাখ সহজ।
যড় সে বিলাক আছে উপায়।
সহিজা সেইলে যাবে না যায়॥ ১॥
পুনঃ পুনঃ পারে পড়িলা মাহো লাজ।
ঘরে ঘরে যুবতীরা পাঞ্চ।
বিধও চন্দন ছারে ছিটিল।
রাত্রি হৈলে ঘরে আবল॥ ২॥
পীন পয়োধর যাত্র আয়[৩]।
প্রাণ যায় মা দেলা বহিকা ভায়।
নগর বহিকী পড়ে মীর [নিত্তি ৩]
জীয়ে ন প্রাণী পলায়ে ন কীতি॥ ৪॥
আপণাপে যাস (?)[৪] করে উপহাস।
বিরা যহুতী ভাঙ্গে অন্যের গাহ।
ভাঙ্গিল তাল খুলিল রেখা।
চলা জাইঁ সখি পলাইল পক্ষা॥

সে ক ত ভো দ য়া য় পদটি দুইজন ডাকিনীর গান বলিয়া উল্লেখ করা আছে। ইহার সঙ্গে যে গল্পটি দেওয়া আছে তাহা পদটির সঙ্গে বেশ খাপ খায় বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পদটি যে আরও পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যে একটি গল্প আছে তাহারও সন্দেহ নাই।

[৪]

পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার ছোট দুইটি নমুনা মহারাষ্ট্র দেশে লেখা একখানি পুস্তকে পাওয়া যায়[৫]। এই সংস্কৃত বইখানি একটি বিশ্বকোষের মত। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্যবংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দেশে মা ন সো ল্লা স বা অ ভি লা ষা র্থ চি ন্তা ম ণি নামক এই বইখানি শকাব্দ

১। ৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য। ২। পৃঃ ৭৮।
৩। তৃতীয় ধনবাণী-সংস্করণ, পৃঃ ৫৫। ৪। ২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।
৫। ৩২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য। ৬। ৩৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।
৭। ৩৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।
৮। সে ক ত ভো দ য়া য় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে লেখা বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ তাহার পরে ত নয়ই। এই প্রবন্ধলেখকের সম্পাদকতায় ইহা বঙ্গ সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃঃ ১০১-০৬ দ্রষ্টব্য।

১। মূলে 'বাদু।' ২। মূলে 'আদ।'
৩। মূলে নাই, ছন্দের খাতিরে অধ্যাসিত হইল।
৪। মূলে 'যাদ।' ৫। মূলে 'আহ।'
৬। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত খ্রী ষ্টী য় দ্বা দ শ শ ত কে র বা ং লা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ত্রয়োত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৩১-১৩৬) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০৪১ (=ইং ১১২১) সালে লিখিত হয়। এই বইটির 'গীতবিনোদ' নামক সঙ্গীত ও ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতের একটু অংশ এবং বিষ্ণুর দশাবতার-স্তোত্রের একটু অংশ পুরাতন বাঙ্গালায় লেখা। অংশ দুইটি এই—

…ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলণ…নারায়ণ জগদ্ভেক গোসাঁই[১]।

[ছাড়, ছাড় আমি যাইব গোবিন্দ সহ খেলিতে… নারায়ণ জগতের গোসাঁই।]

যে ব্রাহ্মণের কুলে উপজিআঁ[২] কাত্তবীআ জেণে বাহুকরলে খণ্ডিআ পরশুরামু সেউ সে মাহর[৩] মঙ্গল করউ।

[যিনি ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্ত্তবীর্য্য যাঁহার দ্বারা বাহুস্পর্শে খণ্ডিত হইয়াছিল, সেই পরশুরাম দেব আমার মঙ্গল করুন।]

দশাবতার-স্তোত্রের অপর অংশগুলির মধ্যে যেগুলি পড়া গিয়াছে তাহার কোনটি প্রাচীন মারাঠীতে, কোনটি বা প্রাচীন হিন্দীতে লেখা বলিয়া মনে হয়। সুনীতিবাবু অনুমান করেন যে, হয়ত মৎস্য-অবতারের বন্দনা অংশটুকু মূলে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত ছিল।

[৫]

এই প্রসঙ্গে জয়দেবের কথা আসিয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে দেশী (vernacular), অপভ্রংশ এবং সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতি কবিতা এবং দশাবতার-স্তোত্র লেখা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই জাতীয় (সংস্কৃতে লেখা) রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলে জয়দেবের গী ত গো বি ন্দে। জয়দেবের পূর্ব্বে এই জাতীয় গীতিকবিতার নমুনা আমি একটি মাত্র পাইয়াছি। ইহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি গীত বা গীতের অংশ। এটি কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্রের দ শা ব তা র চ রি তে আ ছে। গান বা পদটি এই—

ললিত-বিলাস-কলা-সুখ-খেলন-
লালসা-লোচন-লোভন-লোলন-
মানিত-নব-মদনে

অলিকুল-কোকিল-কুবলয়-কজ্জল-
কাল কলিন্দ-সুতাবিল-লঞ্জন-
কালিন্দ-কুল-গহনে।
কেলি-কিলোল-মহাদুহ-ঘাত-
লঙ্ঘন-খোভন ভুবিত-ফিলিল-
গোবর্দ্ধন বহনে
কস্য ন নয়নযুগং ঘটি লজ্জে[১]
মজ্জতি মনসিজ-তাল-তরঙ্গে
হর-মনসী-রমণে।[২]

অনেকের ধারণা যে, গী ত গো বি ন্দে র গানগুলি সর্ব্বপ্রথমে পুরাতন বাঙ্গালা অথবা শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল। পরে সেগুলিকে 'সংস্কৃত' রূপ দেওয়া হয়, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক গাঁথিয়া দিয়া দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত করিয়া 'মহাকাব্য'-এর রূপ দেওয়া হয়। এই মত সর্ব্বপ্রথম লাসেন (Lassen) সাহেব প্রচার করেন, তাহার পর পিশেল (Pischel) সাহেব ইহার বিশেষ পোষকতা করেন। এই মতের পোষকতায় কতকগুলি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

জয়দেবের ভণিতাযুক্ত দুইটি অপভ্রংশ কবিতা বা পদ শিখগুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ষোড়শ শতকের শেষের দিকে সঙ্কলিত গ্র ন্থ-সা হে বে আছে। কবিতা দুইটির ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহণ দুরূহ। সাধারণের অপরিচিত বলিয়া পদ দুইটি কিছু কিছু সংশোধনের সহিত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমটি বোধ হয় মূলে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল।

পদ্মাদিপুরুষ মনোপি সংস্থিত আদিতাবরহঃ।
পায়ঃ স্রুতঃ পীয়তি পায় যদি চিত্তি সর্ব্বমতঃ।
কেবল যাব নাম মনোভবঃ যদি অমৃতস্বরূপঃ।
নবনোতি[৩] ফল-মরূপন জয়জয়াবিবরাঃ গুরুঃ।
ইন্দ্রাদি দেবাদিপালাঃ বন্দন্তি যুক্তকং কৃতঃ।
জন্মমৃত ভাব সবকুঃ পরমং প্রেমাস্পদং।

১। 'সঙ্গে' হইবে বোধ হয়। তাহা হইলে 'তরঙ্গে' শব্দের সহিত অন্ত্য-মিল হয়।

২। কাব্যমালা সংস্করণ, শ্লোক সংখ্যা ৮, ১৭৩। এইটি গোপীরা গান করিতেছিল ("গোপ্যো গায়ন্তি কিঞ্চিৎ")।

৩। 'ন দুনোতি'?

১। মূলে 'গোসাঁই'। ২। 'মোহা' হইবে।

৩। একাদশ শতকের অবহট্ঠে রচিত।

লোভাদি দুষ্টি পর দুরং যদি দুষ্টি আচরণং।
তত্রি সকল দুষ্কৃত৩ দুষ্টাহী তবু চেষ্টবং পালং।
হরি হরত বিজ বিহ কেলাদিহ কর্ণপা ঘসা।
ঘোপেন কিং ঘজ্ঞেন কিং দানেন কিং তপসা।
গোবিন্দ গোবিন্দ ভিত্তিপি নর সকল সিদ্ধিপাং।
জয়দেব আই উচিত দুটং অবদুত সর্বপতং। [১]।

দেহ-সত ভেদিয়া নাদ-সত পুরিয়া২
সুর-সত ঘোড়সাং বুলিয়া।
অবল বল তোড়িয়া অরল চলা খুদ্রিয়া
অবহ ধরিয়া৩ তহা আপি উচিয়া।
মন গারি গুল আদি বধানিয়া
তেহী দুষিয়া৪ দুষ্টী সন্ধানিয়া।
অন্তকো অন্তরিয়া সর্বদিকো নরিয়া
সকল৫ কৌশল লি সন্ধানি আয়া।
ধরতি জয়দেব কো রসিয়া ব্রহ্মনির্বাণ
লি ধনি ন পারা। [২]।

জয়দেবের অন্ততঃ একটি অপভ্রংশ পদ পাওয়া যাইতেছে, যদি অবশ্য এই জয়দেব 'কেন্দুবিল্বসম্ভব-রোহিণীরমণ' জয়দেব হন। তাহার পর প্রাকৃত পৈঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি অপভ্রংশ পদে জয়দেবের কবিতার আভাস এবং ঝঙ্কার পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, জয়দেব হয়ত অপভ্রংশে গীতগোবিন্দের পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

গীতগোবিন্দের পদগুলির মধ্যে দুই একটি স্থলে অক্ষরের বা ধ্বনির মাত্রা সংস্কৃতের অনুযায়ী না হইয়া অপভ্রংশের অনুযায়ী হইয়াছে। দুইটি এরূপ মাত্রার অসামঞ্জস্য আমার নজরে পড়িয়াছে। সে দুইটি নিম্নে দেখাইতেছি।

স্নিগ্ধকমলাকুচবসন পুরুকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।

ইত্যাদি পদটির প্রত্যেক চরণে ১২+৬+১১ মাত্রা করিয়া। পদটির শেষ চরণে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। শেষ চরণটি এই—

জয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।

এখানে প্রথম যতিতে ১২ মাত্রার স্থলে ১৩ মাত্রা এবং দ্বিতীয় যতিতে ৬ মাত্রার স্থলে ৭ মাত্রা হইতেছে। 'ইদং' এবং 'মুদং' এই পদ দুইটিকে অপভ্রংশের অনুযায়ী 'ইঅং', 'মুঅং' পড়িলে মাত্রার সংখ্যা ঠিক হইয়া যায়, ছন্দোভঙ্গ হয় না।

নবজলধরনীলনলীনতমালে।
রতিমবলোকয় সকলয় বালে।

এখানে প্রতি চরণে ৮+৮ মাত্রা। অথচ এই শ্লোকের প্রথম চরণটির প্রথম যতিতে ৮ মাত্রার স্থলে ৯ মাত্রা হইতেছে। 'নলিনী' এই শব্দটিকে অপভ্রংশের অনুযায়ী 'নলিনি' এইরূপ পাঠ ধরিলে মাত্রাসংখ্যা ঠিক হয়, ছন্দোভঙ্গ হয় না। অথবা 'নলিনী' স্থলে 'নলিন' পাঠ ধরিলেও চলে। তবে 'নলিন' এই পাঠান্তর পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই দুইটি যুক্তি বিশেষ ভারসহ বলিয়া বোধ হয় না। জয়দেবের একটি মাত্র অপভ্রংশ পদ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার রচিত পদ মাত্রেই যে মূলে অপভ্রংশে লিখিত হইয়াছিল, তাহা কোন ক্রমেই বলা চলে না। আর তবু দুইটি উদাহরণের উপর নির্ভর করিয়া গীতগোবিন্দের তাবৎ পদকে অপভ্রংশ-মূলক বলা বিবেচনা-সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি যে, জয়দেবের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে সুদূর কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্র সংস্কৃতে রাধাকৃষ্ণ-প্রীতি রচনা করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃতে এইরূপ প্রীতিকবিতা লেখা তখন সমগ্র আর্য্যাবর্তে কবিদিগের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশ্য ইহার মূলে যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আরও স্বীকার করিতে হয় যে, সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে অপভ্রংশ (বা প্রাকৃত) ভাষাতেও এইরূপ গান বা পদ বহুল পরিমাণে রচিত হইত।

যাহা হউক গীতগোবিন্দের পদের মূল বাঙ্গালা কি অপভ্রংশ ছিল এই প্রশ্নে কিছু আসিয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালীর রচিত বলিয়া এবং আজ প্রায় সাত শত বৎসর ধরিয়া বরাবর বাঙ্গালীর সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে বলিয়া গীতগোবিন্দকে বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে ফেলিতে পারা যায় না। কোন দেশের আধুনিক সাহিত্যে কোন একটি বিশেষ বই (বা রচনা) এতদিন ধরিয়া এবং এরূপ গভীর ভাবে শিকড় গাড়িয়া আছে বা ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। বড়ু চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রায় সকল বাঙ্গালী কবির

১। 'দুষ্কৃত'?　　২। 'চংদসত ভেদি ধানাহ সত পুরিয়া'।
৩। 'অবহ ধরিয়া'।　　৪। 'তেহীদুষিয়া'।　　৫। 'সলল'।

লেখায় জয়দেবের প্রভাব কিছু না কিছু পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং গী ত গো বি ন্দ, পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার নহে, পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে।

[৬]

প্রা কৃ ত পৈ ঙ্গ ল চতুর্দশ শতকের বই। ইহাতে অপভ্রংশ ও প্রাচীনতম দেশী ভাষার (vernacular) ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ আছে। উদাহরণগুলি প্রায় সবই পৌরসেনী অপভ্রংশের। কয়েকটি উদাহরণ প্রাচীন হিন্দীতে লেখা বলা যাইতে পারে।[১] ইহা দুই চারিটি কবিতা প্রথমে প্রাচীন বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালার ঠিক অব্যবহিত অপভ্রংশরূপে বর্তমান ছিল, এইরূপ ধারণা করিবার কারণ আছে। অন্ততঃ ঐগুলি যে বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালীর দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এক হিসাবে এই কবিতা বা পদগুলিকেও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনতম নিদর্শন-গুলির অন্যতম বলিয়া ধরিতে হয়। এইরূপ চারিটি পদ উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ওহে রে বাহি কাহ্ন নাব
ছোট ডঙ্গমাঝ কুসতি দেহি।
তই বইসি পইসি সঞ্চার সেই
জো চাহসি সো দেহি।২

[ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকাটি টলমল (করিয়া) বাহিতেছ। (নদীতে ডুবাইয়া আমাদিগকে) কুগতি দিও না। অতএব এই নদীতে সাঁতার দিয়া যাহা চাও তাহা লও।]

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পূর্বে সাহিত্যে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্টিঅমুট্টিঅ কেসি করে গিরি হত্থ ধরে
জমলজুণ চলিঅ পণচত্তয় গলিঅ
কালিঅ-মূল লআরে করে অস কুসল তরে।

চাণূর মিহিঅ দিসকুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহ-মহু পাণ করে জিণি ভমর-করে
সো তুহু পরাজণ বিহু-পরাজণ
চিন্তহ চিন্তিঅ দেউ বরা ভব-ভীঅ-হরা।৩

[যিনি কংসকে বিনাশ করিয়া কীর্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, যিনি মুষ্টিক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি (গোবর্দ্ধন) গিরি হস্তে ধারণ করিয়াছেন, যিনি যমলার্জুন ভঙ্গ করিয়াছেন, যিনি পরভয়ে গমনা করিয়া কালিয়কুল সংহার করিয়াছেন, এবং যাঁহার যশে ভুবন ভরিয়াছে, তিনি চানূরকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন, যিনি নিজকুল মণ্ডিত করিয়াছেন, যিনি ভ্রমরবরের ন্যায় রাধার মুখমধু পান করিয়াছেন,—সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণ চিত্তে চিন্তিত হইয়া তোমাকে ভবভয়হর বর দান করুন!]

ওগুরা চলা রত্তঅ পতা
গাইক ঘিত্তা দুধ মদুরা।
মোইলি মচ্ছা বালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা।৪

[ওগুরা চালের ভাত, রম্ভার পাত, গাইয়ের (অর্থাৎ গাওয়া) ঘী, (তাহাতে) দুগ্ধ সংযুক্ত, মোইলি (অর্থাৎ মৌরলা) মাছ, নালিচা (অর্থাৎ নালিতা) শাক—কান্তা দিতেছেন, পুণ্যবান্ খাইতেছে।]

এখানে কবির বিশেষ প্রিয় (শুনিলে আমাদেরও না কোন্ লোভ হয়!) যে খাদ্যবস্তুগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশেরই দ্রব্য। সুতরাং এই শ্লোকটি যে বাঙ্গালীর লেখা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

নব-মঞ্জরী-সজ্জিঅ চুঅ গাছে
পরিফুল্লিঅ কেসু গআ বণ আছে।
জই এথি বসন্তহ নাইবি কন্তা
কিম বন্ধব পথি কি পথি কন্তা।৫

[নব-মঞ্জরী-সজ্জিত চুত গাছে এবং পরিফুল্লিত কিংশুক (বৃক্ষে পরিপূর্ণ) নব বন আছে। যদি কান্তা এতেও দিগন্তর যায়, (তাহা হইলে) কি মন্মথ নাই, কিংবা বসন্তও নাই?]

'গাছে', এবং 'আছে' এই দুইটি পদ থাকায় এই শ্লোকটি বাঙ্গালীর কবির রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

১। Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ১২৩-১২৪ দ্রষ্টব্য।

২। Bibliotheca Indica সংস্করণ, পৃঃ ১২।

১। ঐ, পৃঃ ৩৪৭। ২। ঐ, পৃঃ ৪০৩। ৩। ঐ, পৃঃ ৪০৪।

চতুষ্পাঠী

কীর্ত্তি-কাহিনী

ফা-হিয়ান

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চীন দেশে যখন প্রথম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার হয়, তার তিনশো বছর পরে, একদিন সেখানকার এক বৌদ্ধ-মঠের দরজার সামনে কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে···

কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলে একজন ভিক্ষু বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি চান?

দলের মধ্যে যাঁর একটু বয়স হয়েছিল, তিনি এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, আমার ছেলেকে এই মঠে দিয়ে গিয়েছিলাম, ভগবানের নামে উৎসর্গ করে। জন্মাবার পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জীবনের কোনও আশা নেই দেখে, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে তাকে সেই শিশুকালেই এখানে রেখে গিয়েছি। সে আজ ছ'বছর আগেকার কথা।

ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছেলেকে আপনি দেখতে চান?

বৃদ্ধ পিতা বলে উঠলেন, আমি শুধু তাকে দেখতে আসি নি। শুনেছি সে আরোগ্য লাভ করেছে, তাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে আমরা এসেছি।

তখন ভিক্ষু বল্লেন, একটু অপেক্ষা করুন। আমি বালককে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কিছুক্ষণ পরে ভিক্ষু ফিরে এসে বল্লেন, বালক স্বয়ং বাড়ী ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। সে আপনাদের ফিরে যেতে বলেছে।

বিষণ্ণ হয়ে ফিরে এল তারা।

আরও কয়েক বছর পরে। বালকের তখন মাত্র দশ বছর বয়স। সেই দশ বছরের বালক তখন মন দিয়ে শাস্ত্র-কথা শুনে, শাস্ত্র-কথা স্মরণে রাখে, আলোচনা করে। সেই সময় সহসা তার পিতা পরলোক গমন করলেন।

আত্মীয়-স্বজনেরা আবার মঠের সামনে এসে উপস্থিত হল। উদ্দেশ্য, বালককে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এবার বালক স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে দেখা করল। বাড়ী আসবার জন্যে আত্মীয়েরা মিনতি করল।

বালক শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, আমার পিতা বা অন্য কারুর অনুমতি নিয়ে আমি গৃহ-ত্যাগ করি নি। আমার যখন জ্ঞান হয় নি, তখন আমার বাবা স্বেচ্ছায় আমাকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করেছিলেন। সেইভাবেই তিনি আমার জীবনের পথ ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন। সেই আমার ব্রত। আমি আর সংসারে ফিরব না।

সকল আশা ত্যাগ করে আত্মীয়েরা ফিরে গেল।

এই বালকই জগতের ইতিহাসে ফা-হিয়ান নামে বিখ্যাত। ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম দেখবার জন্যে ইনি পায়ে হেঁটে হিমালয় পার হয়ে, বড় বড় মরুভূমি পার হয়ে, পথে-পথে জীবনকে বিপন্ন করে একদিন আমাদের এই দেশে এসেছিলেন। এখানকার সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে আবার ফিরে গিয়ে, সেখানে ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচার করেন। চীনদেশ আর ভারতবর্ষের মিলনের তিনিই প্রথম পুরোহিত।

তাঁর প্রথম তিন ভাই দাঁত উঠবার আগেই মারা যায় বলে, ফা-হিয়ানের বাবা, যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নি, তখনই তাঁকে ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত করেন। ছেলেকে যখন ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তখন তাকে ঘরে রাখা ঠিক নয়। তাকে মঠে দিয়ে আসাই উচিত। সেই জন্যেই শিশু-কালেই ফা-হিয়ানের বাবা তাঁকে মঠে রেখে আসেন।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, মঠে গিয়েই বালকের অসুখ সেরে গেল এবং সেই শিশুর প্রতিভা এবং মেধা দেখে মঠের জ্ঞানী ভিক্ষুরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠলেন। সেই শিশুকালেই বালক পড়াশোনায় এতদূর এগিয়ে গেল যে, যখন তার মাত্র দশ বছর বয়স, তখন সে ভিক্ষুদের সঙ্গে বসে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করত।

একবার তিনি তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে বসে অন্নগ্রহণ করছেন, এমন সময় একদল ক্ষুধার্ত্ত চোর এসে তাঁদের অন্ন জোর করে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। চোর দেখেই শ্রমণরা ভয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু বালক ফা-হিয়ান বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চোরদের ডেকে বল্লেন, যদি তোমরা ক্ষুধার্ত্ত

হয়ে থাক, এই অন্ন গ্রহণ কর। কিন্তু মনে রেখ, পূর্বজন্মে তোমরা দান কর নি বলেই, এ জন্মে তোমরা এই রকম অভাব-গ্রস্ত হয়েছ। এ জন্মেও যদি এই রকম করে পরের অন্ন জোর করে গ্রহণ কর, তাহলে মনে রেখ, আজকে তোমাদের ক্ষিদে মিটলেও এর ফলে পরজন্মে তোমাদের আরও অভাব-গ্রস্ত হতে হবে।

হঠাৎ বালকের মুখে সেই নির্ভীক কথা শুনে চোরেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা কোন কথা না বলে অন্ন ত্যাগ করে চলে গেল।

যাঁরা জগৎকে টলিয়েছেন, তাঁদের অন্তরের বিশ্বাস এই রকম দৃঢ় হয়।

যখন তিনি যৌবনে পড়লেন, তখন তিনি যতিব্রত গ্রহণ করলেন এবং বৌদ্ধধর্মের সব বই সংগ্রহ করবার জন্যে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করলেন। আজকাল জ্ঞান অর্জন করা সহজসাধ্য ব্যাপার হয়েছে। টাকা খরচ করতে পারলে ঘরে বসেই আমরা দেশ দেশান্তরের যে কোনও বই পেতে পারি। আজ আমরা বুঝতে পারব না, সেকালে জ্ঞান অর্জন করা কি দুরূহ কাজ ছিল। হিমালয়ের মত পাহাড় পায়ে হেঁটে পার হয়ে, কত মরুভূমি পার হয়ে, হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করে যদি আমাদের এক একখানি বই সংগ্রহ করে পড়তে হত, তা হলে এ-যুগে আমরা ক'জন যে লেখাপড়া শিখতাম, তা বলা কঠিন। কিন্তু সে-যুগে মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করবার ব্রত যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন। তাদের সেই সাধনা, সেই নিষ্ঠা দেবতাদেরও কাম্য। ফা-হিয়ান সেই মহাব্রতধারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

ষোল বৎসর ধরে তিনি এই ভারতবর্ষের মাঠে মাঠে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ করে, জ্ঞান-অর্জন করেছিলেন, পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সেদিন পথ-প্রান্তর এত সহজগম্য, এত নিরাপদও ছিল না। কতবার পথে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে, দিনের পর দিন মরুভূমি পার হতে, পাহাড় পেরিয়ে আসতে প্রাণান্ত হয়েছে, তবুও সে নিষ্ঠা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, ভারত-বর্ষের বাইরে, তখন যেখানে যেখানে ভারতীয় সভ্যতা পৌঁছেছিল—সিংহল, চম্পা, যবদ্বীপ—পরিভ্রমণ করে ৪১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে যান।

সেখানে গিয়ে একদিকে নব-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে দেশের মধ্যে যেমন জ্ঞান-ধর্ম বিস্তার করতে লাগলেন, অন্য দিকে তাঁর ভারত-ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন। তাঁর সেই অমূল্য ভ্রমণ-কাহিনী থেকে ভারতবর্ষের সেই লুপ্ত গৌরবময় যুগের বিস্মৃতপ্রায় বহু ঘটনা আমরা আজ জানতে পেরে ধন্য হয়েছি। গান্ধার, তক্ষশীলা, বৈশালী, পাটলী-পুত্র, রাজগৃহ, নালন্দা, তাম্রলিপ্ত, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, আজ আর ভারতের মানচিত্রে দেখা যায় না; কিন্তু একদিন এই সব মহানগরীকে আশ্রয় করে যে-বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারও কথা আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যেত, যদি একদিন সেই পঞ্চম শতাব্দীর দুর-দুর্গম পথে, যৌবনের সমস্ত সুখ-সাধ বিসর্জন দিয়ে, এই চীন-পরিব্রাজক জ্ঞানের মহামণির সন্ধানে ঘুরে না বেড়াতেন। এঁরাই হলেন প্রকৃত দিগ্বিজয়ী বীর—কারণ এঁদের বিজয় এখনও থামে নি। মানবচিত্তে এঁদের প্রভাব কালের সমবয়সী। এবং এঁরা শুধু দিক্ জয় করেন নি—সময়কেও জয় করেছেন।

ষোল বছর ভারতে পরিভ্রমণ করে নানা পুঁথি এবং প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করে ফা-হিয়ান স্বদেশের দিকে ফিরলেন।

একটা বড় ব্যবসায়ী জাহাজে চড়ে তিনি ফিরছিলেন। সেই জাহাজে প্রায় দু'শো আরোহী ছিল। সমুদ্র-পথে তিন দিন যাবার পর ভীষণ ঝড় উঠল। তরঙ্গে তরী টলমল করতে লাগল। দু'দিন, তিন দিন, চারদিন বিরামবিহীন ভাবে ঝড় বইতে লাগল। সকলেই স্থির বুঝলেন যে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। বণিকেরা জাহাজের ভার কমাবার জন্যে নিজেদের পণ্য-দ্রব্য সমস্ত জলে ফেলে দিতে লাগলেন। প্রাণ যখন যায়, তখন আসবাব নিয়ে কি হবে? হঠাৎ সকলের দৃষ্টি সেই চীন-পরিব্রাজকের উপর পড়ল। এত জিনিষ সে কেন নিয়ে যাবে? আর, কি হবে, ঐ সব তালের পাতার বোঝা আর পাথরের প্রতিমূর্তিতে? দাও ফেলে সব সমুদ্রের তরঙ্গে। এতদিনের সাধনার ধন, সেই বণিকরা কি বুঝবে তার মূল্য! স্বর্গ ও মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মত করে ফা-হিয়ান তাঁর সেই সংগ্রহ আগলে বসে রইলেন। জলে

নিজের বাসস্থান যা-কিছু ছিল সব ফেলে দিলেন, মনে মনে একাগ্র চিত্তে ভগবান্ অমলোজিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তোমারই ইঙ্গিতে বহু দূর-পথে আমি এসেছিলাম, তোমারই বাণী আমি বহন করে নিয়ে চলেছি, তোমার শক্তিতে তুমিই আজ তাকে রক্ষা কর।

এই ভাবে তেরদিন অতিবাহিত হবার পর তন্ত্রী এক দ্বীপে এসে উপস্থিত হল। সেখানে জাহাজ মেরামত করে ঝড় থামলে আবার যাত্রা করা হল।

সেখান থেকে যাত্রা করে কক্কা-তাড়িত হয়ে তাঁরা চীন রাজ্যের সীমান্তে এসে পড়েন। সেখানে শাসনকর্ত্তা লিই তাঁকে মহা সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁর আতিথ্যে সেখানে কিছুকাল বসবাস করবার সময় একদিন ফা-হিয়ান গল্পচ্ছলে তাঁর সমস্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁকে শোনান। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

"যে কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হয়েছে, তা স্মরণ করলে আমার সর্ব্ব-দেহ ঘর্ম্ম-সিক্ত হয়ে উঠে। সেই সব বিপদের সম্মুখীন হতে এবং অত্যন্ত ভয়াবহ দুরধিগম্য স্থানেও যেতে যে আমি সাহসী হয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ এই যে, আমার চিত্তকে পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করেছিল একটি মাত্র স্থির উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে ছিল সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলবার জন্যে অন্তরের একাগ্র বাসনা। আমি যা ইচ্ছে করেছিলাম, তার সহস্রাংশের এক অংশ সম্পাদন করতে আমি মৃত্যুকেও ভয় করি নি।"

হিমালয়ের এপারে-ওপারে, কত লোক এল, গেল; কত বীর এল, কত রাজা এল। তাদের কথা আমরা গেলাম ভুলে। বেঁচে রইলেন ফা-হিয়ান আর তাঁর লেখা। সেই লেখাতেই আবার বেঁচে উঠল, কত বীর, কত রাজা, কত সন্ন্যাসী, যাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

একেই আমরা বলি মৃত্যু-জয়ী সাধনা।

নব কথামালা

মূষিকের অভিলাষ

একদা এক মূষিক-যুবকের মনে অভিলাষ হল যে, সে জগতের সব চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করবে। বহু চিন্তার পর, সে স্থির করল, সূর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব সূর্য্যের কাছেই আবেদন করা কর্ত্তব্য।

সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, হে সূর্য্য, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার শক্তির তুলনা নেই। আমার অন্তরের বাসনা যে, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করব। আপনি কি আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত?

সূর্য্য দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন, হে মূষিক-যুবক, তুমি ভুল করেছ। আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী নই। ঐ যে মেঘ, আমার চেয়ে ওর শক্তি ঢের বেশী। আমার আর পৃথিবীর মাঝখানে ও যদি থাকে, তা হলে ওর জন্যে আমার তেজ কমে আসে।

অগত্যা মূষিক-যুবক মেঘের কাছে উপস্থিত হয়ে তার মনের কথা জানাল।

মেঘ বল্লেন, সূর্য্য যা বলেছে, তা সত্যি বটে। তবে আমার চেয়েও শক্তিশালী একজন আছেন। তিনি হলেন, বায়ু। তাঁরই তাড়নায় আমি এক জায়গায় এক দণ্ড স্থির থাকতে পারি না। তুমি বায়ুর কাছে যাও।

বায়ুর কাছে যেতে তিনি বল্লেন, আমার চেয়েও শক্তিশালী আর একজন আছেন। ঐ যে সোজা লম্বা বাড়ীটা দেখছ, ওর শক্তি আমার চেয়ে ঢের বেশী। বছরের পর বছর চেষ্টা করছি, তবুও ওকে ভাঙতে পারছি না।

তখন মূষিক-যুবক বাড়ীটার শরণাপন্ন হল। কিন্তু সেও বলল, আমার চেয়েও শক্তিমান একজন আছে। আমার যেখানে ভিত্তি, সেখানে এক মূষিকবংশ প্রায় একশো বছর ধরে মাটী খুঁড়ছে। তাদের এই চেষ্টার ফলে আমার ভিত এত আল্‌গা হয়ে গিয়েছে যে, যে-কোনও দিন আমি পড়ে যেতে পারি। কোন্ দিন সেই সব মূষিকের শক্তির কাছে আমার শক্তি পরাভূত হয়ে যাবে। অতএব আপনি সেই মূষিকের কন্যাকেই বিবাহ করুন।

অবশেষে একদিন সেই মূষিক-যুবকের সঙ্গে মূষিকেরই কন্যার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল।

কয়েকজন জন-নায়কের শৈশব

আজকে যাঁদের নাম জগতের সকলের মুখে মুখে, ধর পঞ্চাশ বছর আগে, অর্থাৎ তাঁরা যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁরা কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, তা জানতে তোমাদের

বালক মুসোলিনি।

যে আগ্রহ আছে, এটা আমি অনায়াসে ধরে নিতে পারি। সেই রকম কয়েকজন আজকালকার জগৎ-বিখ্যাত লোকের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কাহিনী সংগ্রহ করেছি। তোমরা দেখবে, কত সামান্য অবস্থা থেকে তাঁরা জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন। যদি তোমাদের বড় হবার সত্যিকারের ইচ্ছে থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি থাকে অধ্যবসায়, যদি থাকে বার বার বিফল হয়েও এগিয়ে-চলবার সাহস আর ইচ্ছা, তা হলে তোমাদের অবস্থা যাই হক্ না কেন, তার মধ্যে থেকে তোমরা নিশ্চয়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

মুসোলিনির নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আজকালকার ইতালীর তিনি মুক্তিদাতা। ইতালীর তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। একদিন তিনি মোটরে এক দূর গ্রামে যাচ্ছিলেন। বিশেষ দরকারী কাজ। পথে এক গ্রামের মধ্যে এসে হঠাৎ তাঁর মোটরের একটা কল খারাপ হয়ে গেল। সেটা মেরামত না করে নিলে গাড়ী আর চলবে না। কিন্তু তার জন্যে দরকার একজন কর্ম্মকারের। আগুনে লোহা পুড়িয়ে সেটাকে মেরামত করতে হবে। মোটর থেকে নেমে গ্রামের কর্ম্মকারের খোঁজ নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেদিন কি একটা পর্ব্ব থাকার দরুন কামারশালা বন্ধ ছিল। বুড়ো কর্ম্মকার সেদিন আর লোহা ধরতে কিছুতেই রাজী হল না। তখন মুসোলিনি বল্লেন, আচ্ছা, আমাকে তোমার হাপর দেখিয়ে দাও, তোমাকে লোহা ছুঁতে হবে না, আমি নিজেই সব করে নেবো'খন।

ভদ্রলোকটির পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে চেয়ে বুড়ো হেসে বলে উঠল, ও পোষাকে কি লোহা তাতাতে পারবেন? অত সোজা নয়।

যা হোক্, বৃদ্ধ অগত্যা মুসোলিনিকে কামারশালায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিলেন। গায়ের জামা খুলে ইতালীর হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হাপরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করলেন। বৃদ্ধ এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিখুঁত ভাবে সব কাজ সেরে ভদ্রলোকটি ধন্যবাদ জানাবার জন্যে হাত বাড়ালেন। যাবার সময় মুসোলিনি বুড়োকে ডেকে বল্লেন, জানেন, আমি কে? আমার নাম মুসোলিনি। আপনারই মতন এক বুড়ো কর্ম্মকারের ছেলে আমি।

প্রিদাপ্পিয়ে বলে ইতালীর এক নগণ্য গ্রামে মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অনেক শহর ঘুরে শেষে তাঁদের

বালক হার্ডিঞ্জ।

গ্রামে এসে একটা কামারশালা খুলে বসেন। আশপাশের গ্রামের যা কিছু লোহার কাজ, সেই কামারশালা থেকে লোকে করিয়ে নিয়ে যেত। তাঁর মা কিছু লেখাপড়া জানতেন। তিনি সেই কামারশালার ধারে একটা একটা ছোট্ট পাঠশালা

খুলেছিলেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাঁর সেই পাঠশালায় পড়ত। আর পড়ত তাঁর সেই দুর্দান্ত ছেলে, মুসোলিনি।

পড়া ছেড়ে গেলে মুসোলিনিকে কামারশালায় গিয়ে বাপের সাহায্য করতে হত। লাল গরম লোহার ফুল্‌কি গায়ে এসে লাগত। বালক সচকিত হয়ে উঠত। নদীর ধারে ঘুঘুর

গরের অর্থের বিদ্যাশিক্ষা।

বাসা তখন তার মনকে ডাকত। তখন কি আর লোহা পিটোতে ভাল লাগে! বালক লুকিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেত। তার রীতিমত একটি দল ছিল। অমুক বাগানে আপেলে রঙ ধরেছে; সেই দল নিয়ে আপেল চুরি করতে বের হত। বাড়ী ফিরে এসে প্রচুর প্রহারও খেত। পরের দিন কামারশালায় কড়া পাহারা বসল। তার বাবা বলতেন, এই লোহার মতন করেই ছেলেকে মানুষ করে তুলতে হয়—আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়িতে পিটিয়ে,.....

তোমরা যদি মুসোলিনির কোন ছবি দেখে থাক, তাহলে লক্ষ্য করে দেখবে, পাকা ইস্পাতের মত তাঁর মুখ দৃঢ়, উজ্জ্বল এবং কঠিন।

আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের নাম বোধহয় তোমরা জান। এই যুক্ত-রাষ্ট্রের মত ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র আজ জগতে আর নেই। য়ুরোপের অনেক বড় বড় জাতির ভাগ্য এই যুক্ত-রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করছে। এই বিশাল রাজ্যের যিনি শাসনকর্ত্তা, তাঁকে প্রেসিডেন্ট বলে। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদ জগতে আর নেই। বলতে গেলে, আজকালকার জগতে সুখ-শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ঐ একটি লোকের বিবেচনার উপর যতখানি নির্ভর করে, এমন আর কারুর উপর না। বড় হয়ে তোমরা যখন যুক্ত-রাষ্ট্রের ইতিহাস পড়বে, তখন দেখবে, তার অনেক বড় বড় প্রেসিডেন্ট অতি নিম্ন-স্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু অধ্যবসায় এবং নিজের শক্তিতে তাঁরা সকল রকম বাধাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জাতির সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, মিঃ হার্ডিঙ্গ। কিন্তু যখন তিনি ছেলে-মানুষ ছিলেন, তখন তাঁর কাজ ছিল, গরু-ছাগল-চরান। তোমরা বোধহয় জান যে, নিউটনের বালককালও এইরকম ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। গরু ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে, বিভোর হয়ে একখানা পুরোনো জ্যামিতির বই নিয়ে পড়তেন, ওদিকে গরুগুলো পরমানন্দে পরের ক্ষেতে ঢুকে শস্য নষ্ট করত। তারা এসে নিউটনের মনিবের কাছে খেসারৎ দাবী করত। অবশ্য হার্ডিঙ্গের মনিবকে এ রকম দায়ে পড়তে হয় নি। সামান্য কিছু সাপ্তাহিক বেতনে বালক হার্ডিঙ্গ এক কৃষকের ক্ষেতে কাজ করতেন। সারাদিন মাঠে মাঠে কাটত; গরুর জন্যে খড় কুটতে হত, ঘাস কাটতে হত, সন্ধ্যেবেলায় খোঁয়াড়ে গরুদের রেখে তবে তিনি ছুটি পেতেন।

বালকের মন কিন্তু এই খাটুনীতেই খুসী থাকত। কাজ করতে তাঁর ছিল প্রচুর আনন্দ। অবশ্য রাত্রি-বেলায় বাড়ী ফিরে এসে বই নিয়ে বসতেন। চির-জীবন কি কেউ খড় কুটতে চায়? অন্তত, আমরা জানি হার্ডিঙ্গ চান নি! তাঁর

প্রিন্স রাজা-জীবন

মনের বাসনা ছিল যে, তিনি স্কুল-মাষ্টার হবেন। এই ভাবে নিজের অবসর সময়ে জ্ঞান অর্জ্জন করে তিনি ক্ষেতের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্কুল-মাষ্টার হলেন। স্কুল-মাষ্টারী করতে করতে, তাঁর মনে হল যে, জার্নালিজ্‌ম্ অর্থাৎ খবরের কাগজ চালানোর বিদ্যা শিখতে হবে। একেবারে তিনি গোড়া থেকে আরম্ভ

করলেন। একটা প্রেসে কম্পোজিটার হলেন। কম্পোজিটারীর কাজ শিখে ধীরে ধীরে তিনি প্রেসের অন্য সমস্ত কাজ শিখলেন। তারপর একটি খবরের কাগজ সম্পাদন করবার ভার পেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর হেঁটে সেই কাগজখানি সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। এইভাবে অগ্রসর হতে

বালক গ্ল্যাডিস্টোনের দুরন্তপনা।

হতে তিনি জগতের সমস্ত জনতাকে পিছনে ফেলে রেখে, একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যে ছেলেবেলায় খুব মেধাবী ছেলে ছিলেন, তাহা নয়। তিনি জানতেন যে, সত্যিকারের চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। যখন তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি হলেন তখন তাঁর বুড়ো বাবা বলেছিলেন, আমার হার্ডিঙ্গ যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি হবার সত্যই উপযুক্ত। জীবনে সে যা কিছু পেয়েছে, তার জন্যে আগে থাকতে সে নিজেকে যোগ্য করে তৈরী করেছে। উপযুক্ত না হয়ে কোনও অধিকার সে ভোগ করে নি। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত নেই।

সব বাপই যদি তাঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারতেন, উপযুক্ত না হয়ে, আমার ছেলে কোনও অধিকার ভোগ করে নি!

বর্ত্তমান কালের দু'জন জগৎ-বিখ্যাত রাজনৈতিক, লয়েড জর্জ্জ এবং ব্রিয়াঁ—একজন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আর এক ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী। এঁদের শৈশবও দূর গ্রামে একান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। অতি শৈশবে লয়েড জর্জ্জ পিতৃহারা হন। দরিদ্র মা অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। মাংস খেতে কি রকম, ছেলেবেলায় তাঁরা তা জানতেই পারেন নি। রবিবার দিন, আধখানা করে ডিম ছিল, তাঁদের রাজ-ভোগ! কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। পাড়ার লোকদের উদ্‌ব্যস্ত করে, হৈ হৈ করে, বালক পরমানন্দে থাকত। দুপুরবেলা ঘরে ঘরে সবাই ঘুমুচ্ছে; বালক জর্জ্জ দলবল নিয়ে টিনের কেনাস্তারা প্রবল জোরে সমবেতভাবে বাজাতে আরম্ভ করলেন। চারিদিক থেকে লোক ছুটে এল, এই মারে তো এই মারে!

তাঁর এক কাকা ছিলেন—তিনি গ্রামের লোকের জুতো তৈরী করতেন। জর্জ্জ এই কাকাটির বড় প্রিয় ছিলেন। তিনি পয়সা জমিয়ে ভাইপোটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে আইন পড়বার জন্যে সহরে পাঠিয়ে দেন। লয়েড জর্জ্জ জীবনে যে উপকারের কথা ভোলেন নি। তখন তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, রাজ-কার্য্যে ভীষণ ব্যস্ত আছেন, এমন সময় খবর পেলেন যে, তাঁর কাকা পরলোক গমন করেছেন। সমস্ত রাজ-কার্য্য ফেলে রেখে, তিনি সেই বৃদ্ধের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ব্রিয়াঁ। একজন সামান্য সরাইওয়ালার ছেলে ছিলেন। হের হিটলার মহাযুদ্ধের পর তিনি জার্ম্মান রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট হন, তিনি একজন গ্রাম্য দরজীর ছেলে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার বর্ত্তমান সভাপতি জগৎ-খ্যাত ডাঃ মাসারিক্, তিনিও মুসোলিনীর মত একজন সামান্য কর্ম্মকারের ছেলে।

ব্রিয়াঁ যখন বৃদ্ধি।

ছেলেবেলায় তিনি কোনও লেখাপড়া শেখবার কোনও সুবিধে পান নি। একেবারে সোজা কামারশালায় তিনি হাতুড়ি পিটতে আরম্ভ করেন। তাঁর বাবার কাছ ছিল, ঘোড়ার পুকুর থেকে কামারশালার জন্যে জল তুলে আনা। এক-

দিন কাঁধে করে জল নিয়ে আসছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ শিক্ষক প্রতিভা-উজ্জ্বল তাঁর মুখখানি দেখে কৌতূহলী হয়ে তাঁর নামধাম এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। বৃদ্ধ যখন শুনলেন যে, লেখাপড়া তিনি আদৌ জানেন না তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। সেই বৃদ্ধ চেষ্টা করে সামান্য বৃত্তি জোগাড় করে তাঁর লেখাপড়ার জোগাড় করে দিলেন। সেইদিন থেকে তাঁর জীবন-ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হল। তাঁদের গ্রামে মাঝে মাঝে শহর থেকে রীতিমত হোমড়া-চোমড়া সব রাজপুরুষরা আসতেন শীকার করবার জন্যে। যে-কদিন তাঁরা থাকতেন, তাঁদের স্বেচ্ছাচারে গ্রাম অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। মাসারিক যখন শিশু ছিলেন, তখন এইসব রাজপুরুষদের দেখলেই তিনি বড় ভয় পেতেন। বড় হয়ে দেশ থেকে এদেরই তাড়িয়ে আজ তিনি তাঁর জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন।

এডিসনের নাম আজ জগতের ঘরে-ঘরে। তাঁর তৈরী হাজার রকম ঘরে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা ভরে আছে। যন্ত্র তৈরী করার দিক দিয়ে জগৎ এত ঋণী আর কারুর কাছে নয়, যেমন এই একটি লোকের কাছে। সেই এডিসন এগার বছর বয়সে ট্রেণে ট্রেণে কাগজ ফিরি করে বেড়াতেন। রেলের গার্ড মালগাড়ীর এক কোণে এডিসনকে একটুখানি জায়গা অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। গার্ড সাহেব স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, সেইখানে এই ধরণের কাগজ-বিক্রী-করা ছেলে একটা ছোটখাট রাসায়নিক পরীক্ষাগার গড়ে তুলবে! যখন ফিরি করতে হত না, তখন বালক সেই কোণে বসে আপনার মনে এসিড নিয়ে নানা রকমের সমস্ত পরীক্ষা করতেন। কেউ তার কোনও খবর রাখত না। একদিন হঠাৎ এসিডের গোলমালে মালগাড়ীতে আগুন লেগে গেল। গার্ড ছুটে এসে ব্যাপার দেখে, রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ধাক্কা মেরে এডিসনকে ট্রেণের বাইরে ফেলে দিলেন। এত জোরে তিনি এডিসনকে কান মলে দিয়েছিলেন যে, সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কানে আর ভাল শুনতে পেতেন না। কিন্তু সেই ধাক্কা-খাওয়া ছেলে সেখান থেকে উঠে হাঁটতে আরম্ভ করল—সেখানে এসে পৌঁছল, সেখানে পৃথিবীর সকল জাতির শ্রেষ্ঠ লোক তাঁকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হল।

রেডিয়মের আবিষ্কর্ত্তা ম্যাদাম কুরীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। বিজ্ঞানের জন্যে তিনি দুবার নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁর স্বদেশ, পোলাণ্ড ত্যাগ করে বিজ্ঞান পড়বার জন্যে প্যারিসে এলেন, তখন তিনি অতি অল্প ভাড়ায় একটি অন্ধকার ঘরে থাকতেন। আগুন পোহাবার কাঠ পর্য্যন্ত তাঁর জুটত না। শীতকালে ঘরে এত ঠাণ্ডা পড়ত যে দুধ পর্য্যন্ত জমে যেত। আজ প্যারিসের একটা বড় রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

নেপোলিয়ান বলতেন যে, প্রত্যেক সাধারণ সৈনিকের পিঠে যে ব্যাগ থাকে, তার ভিতরে এক একজন বড় বড় সেনাপতি আছে। সৈনিকের মধ্যেই আছে সেনা-নায়ক।

এই সমস্ত জীবনী আলোচনা করে, আমরা সেই কথার সত্যতা আরও বেশী করে বুঝতে পারি। আজই যখন রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে চলে এসেছি, হয়ত তখন সেই ভিড়ের মধ্যে মলিন-বাসে, খালি-পায়ে যের দিকে ফিরেও চাইলাম না—একদিন হয়ত সেদিকে চাইব, তাকেই দেখবার জন্য।

আর একদিক

স্বনামধন্য গল্প সাহিত্যিক ষ্টিভেনসনের বিলেত-বৃদ্ধির বালাই ছিল না। টাকা পয়সায় তিনি কিছু ঝুঁকি উঠাতে পারিতেন না।

একবার সস্ত্রীক তিনি প্যারী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ইচ্ছা, কিছুদিন থাকিয়া আমোদ করিবেন। সঙ্গে ১০০ পঃ পাউণ্ডের একটী আপ টু ডেট ছিল। ইহা ছাড়াও কিছু খুচরা টাকা ছিল। টাকাটা না ফুরানো পর্য্যন্ত প্যারী-প্রবাস চলিবে। কিছুদিন বেশ কাটিল। তারপর টানাটানি। ষ্টিভেনসন বুঝিতে উঠিতে পারিলেন না, এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত টাকা ফুরাইল কি করিয়া। কিন্তু ভাবিলে কি হইবে। কেবলমাত্র টাকা অবশিষ্ট ছিল বাড়ী ফিরিয়া লণ্ডনের ইংলিশ-চ্যানেল পাড়ি দিতে বাধ্য হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া ষ্টুডেন্ট হইতে জামাকাপড় কিনিয়া দিয়াছেন দেখেন ১০০ পঃ পাউণ্ডের চেকটী ফুরাই রহিয়া গিয়াছে। দান-খয়রাতেও এখেলস হয় নাই যে, চেকটা ভাঙ্গানোই হয় নাই।

ছেলেমেয়েদের সমাজ-গঠনে কাজ

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

তুমি কি ছেলে মানুষ? বয়স তোমার খুব কম? যত কমই হোক্, তুমি ইচ্ছা করিলে এ দেশের জন্য খুব বড় কাজ করিতে পার। অন্য দেশের ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের দেশের জন্য কি করিয়াছে, তাহাই এখানে বলিব।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই রাশিয়ার নাম শুনিয়াছ। কেহ কেহ হয়ত সে দেশে নূতন করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহার কথাও শুনিয়াছ। মহাযুদ্ধের অবসানে রাশিয়ায় 'সোভিয়েট' নামে একপ্রকার নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। 'সোভিয়েট' শাসনতন্ত্রের মূল কথা, যাহারা শ্রমিক, মজুর, যাহাদের চেষ্টায় ও কর্মে দেশে নানা দ্রব্য উৎপন্ন হয়, রাষ্ট্রে তাহাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক নূতন ধরণের সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের পরীক্ষা। রাশিয়ার বাহিরে অনেকেই সোভিয়েটের আদর্শ স্বীকার করেন না। সে-আদর্শের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা মানা কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে, সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভগবান ও ধর্ম মানেন না; তাঁহারা বলেন, জগতের যত দুঃখ এই ধর্মের জন্য। এইরূপ তাঁহাদের আরো অনেক মতবাদ আছে, যাহা প্রচলিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পার, কেন অনেকে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

সোভিয়েট আদর্শ স্বীকার না করিলেও সোভিয়েটের কর্তাগণ রাশিয়ার যে অনেক কিছু সুন্দর বিধিব্যবস্থার আয়োজন করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া, দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার যে বিপুল আয়োজন ও প্রচণ্ড চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন, তাহা জগতের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। রাশিয়ার পূর্বতন শাসকদের আমলে সমগ্র রাশিয়ার শতকরা আটজনের কম লোক লেখাপড়া জানিত; বর্তমান ব্যবস্থায় ইহারই মধ্যে শতকরা প্রায় সত্তর জন লেখাপড়া শিখিয়াছে ও শিখিতেছে। দেশময় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাশিয়া আয়তনে পৃথিবীর প্রায় ছয়ভাগের একভাগ স্থান জুড়িয়া আছে এবং তাহার অধিবাসীর সংখ্যা কোটি কোটি; এটাও মনে রাখা দরকার যে, এই বিপুল দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই অত্যন্ত দরিদ্র, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাহাদের শিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। আর এ চেষ্টা মাত্র কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে; সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে মাত্র পনের বৎসর আগে। কিন্তু শুধু লোককে লেখানই সোভিয়েট আদর্শবাদীগণের একমাত্র কাজ নয় নাই; তাঁহারা জাতীয় জীবনের শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল-আবর্জনা দূর করিতে চান; অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাস্তবিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান, নূতন করিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিতে চান।

তাহার জন্য তাঁহারা ১৯২৭ সালে একটা পাঁচ বৎসরের জন্য কর্মপদ্ধতি খাড়া করেন; ইহা ইংরেজীতে Five year Plan নামে পরিচিত। পাঁচ বৎসর কোথায়, কি ভাবে কি কি কাজ করিতে হইবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়া প্রথমে এক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে পাঁচ বৎসরে কয়টা কারখানা করিতে হইবে, তাহাতে কত লোক কত ঘণ্টা খাটিয়া কি কি জিনিস তৈয়ারি করিবে, ক'টা জাহাজ, ক'টা এরোপ্লেন, কয় মাইল রেলগাড়ি তৈয়ারি করিতে হইবে, কয়টি গাছ পোঁতা হইবে, কতগুলি হাসপাতালের পত্তন হইবে, তাহাতে কত রোগীর চিকিৎসা হইবে, কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে কত ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিবে, মায় কতগুলি বাড়ি ছারপোকাশূন্য করিতে হইবে, তাহার সঠিক হিসাবপত্র দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা হয়ত ভাবিতে পার, এতখানি হিসাব করার কি মূল্য আছে? উদাহরণ দিয়া তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিই। পাঁচ বৎসরে যত মণ কয়লা খনি হইতে তোলার সংকল্প করা হইয়াছে, তাহারই উপর হিসাব করিয়া কয়টা লোহার কারখানা চলিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা ঠিক করা হইয়াছে, আবার যত পরিমাণ লোহা তৈয়ারি হইবে তাহার হিসাব ধরিয়া কটা জাহাজ কত মাইল রেলপথ ইত্যাদি তৈয়ারী হইবে তাহারও হিসাব করা হইয়াছে। এইভাবে একটি হিসাবের সহিত অন্যান্য সকল হিসাব অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত। তাহারই মধ্যে একটার গোল হইলে আর বাকি সবগুলাতেই গোল হইবে এবং সমগ্র কর্মপদ্ধতি ও কর্মচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এরূপ একটি কর্মপদ্ধতি কার্যে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র জাতির সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন; ছোট বড় সকলকে মিলিয়া কাজ করিতে হইবে, সকলেরই কর্তব্য ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

এই মিলিত চেষ্টায় শিশুদেরও যে স্থান থাকিতে পারে সোভিয়েট-কর্তাগণ সেটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাই তাহাদের জন্য তাহাদেরই শক্তি অনুযায়ী তাঁহারা ছোট আর একটি পাঁচবৎসরের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার শিশু ও বালক বালিকাগণ সেই ছোট কর্মপদ্ধতিকে সফল করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে। কোন দেশের পক্ষে ইহার চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ছোট কর্মপদ্ধতিটি এইরূপ:

(১) চুণ ও ফস্‌ফরাসের খনি আবিষ্কার করিতে হইবে।

তোমরা ভাবিতে পার ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক সত্যসত্যই চুণ ও ফস্‌ফরাসের অত্যন্ত প্রয়োজন। স্থানে স্থানে জমির উপর চাপ চাপ এই দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েরা পথে চলিতে চলিতে যদি চারিদিকে দৃষ্টি রাখে তাহা হইলে অনেক সময়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করিতে পারে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত নিজেরা ব্রতী বালক,—না হইলেও বয়-স্কাউটদের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ; তাহাদেরও এইরূপ ভাবে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। এইভাবে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে অনেক স্কাউট বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। রাশিয়ার রিবিন্স্ক নামের একটি গ্রামের বালক-বালিকারা চুণের একটি খনি আবিষ্কার করে; সে চুণ জমিতে দার দিবার অত্যন্ত উপযোগী ছিল। ফলে চাষীদের বহু উপকার তাহারা করে। নোভোসাইবিরিয়ার কম্যুনিষ্ট যুবক ও বালক সম্প্রদায় স্কাউটিং করিতে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের কয়লা ও লোহার খনি আবিষ্কার করে।

(২) প্রয়োজনীয় টাকরা-টুকরি, ছেঁড়া কাপড়চোপড়, পশম, হাড়ের টুকরা, ভাঙ্গা লোহা ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশুকে বছরে অন্ততঃ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমরা অনেক সময়ে এরূপ জিনিসের মূল্য বুঝি না। ফলে হাতের কাছে যখন ঘড়ির টুকরা বা একটা স্প্রেক আসিল, তখন তাহা ফেলিয়া দিয়া কাজের সময় সারা বাড়ি তোলপাড় করি। আমাদের দেশে একটি কথা আছে, "যাকে রাখ সে-ই রাখে।" আজ যাহা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও রাখিয়া দিলাম একদিন তাহাই অনেক কাজে লাগিবে। গত যুদ্ধের সময় ভাঙ্গা লোহা বিক্রয় করিয়া অনেকে লক্ষপতি হইয়াছেন; অথচ হয়ত এগুলা আমাদেরই ঘর হইতে সংগৃহীত।

(৩) বেতার-বার্তা-যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক লাউড-স্পীকার (অর্থাৎ শব্দ-পরিবর্দ্ধক যন্ত্র) নির্মাণ করিতে হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামে গ্রামে পঁচাত্তর হাজার বেতার-যন্ত্র ও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া শব্দ-পরিবর্দ্ধক যন্ত্র বসাইতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে বেতার-যন্ত্র গণশিক্ষার একটি বাহনরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বেতার-কেন্দ্র হইতে শিক্ষাবিষয়ক নানা আলাপ-আলোচনা বেতারযোগে দেশের সর্বত্র পাঠান হইতেছে। তাহার ফলে সুদূর পল্লীতে বসিয়াও একজন মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর নানা সংবাদ ও অন্যান্য নানা বিষয়ের পরিচয় লাভ করিতে পারিতেছে। বেতার-যন্ত্র নির্মাণ খুব কঠিন কাজ নহে, অল্প অর্থব্যয়ে সামান্য পরিশ্রমেই তাহা তৈয়ারি করা যায়। সে দেশের ছেলেমেয়েরা অনেকেই বেতারযন্ত্র তৈয়ারি করিতে ও ব্যবহার করিতে শেখে। আমাদের দেশে বেতার-যন্ত্রের এরূপ ব্যবহার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(৪) শস্য হইতে ভাল দানা বেছিয়া বীজ বাছিতে শিখিতে হইবে এবং বীজ বাছার কাজে পুরা নম্বর পাইতে হইবে।

আমরা অনেক সময়ে বুঝি না যে, খারাপ বীজের জন্য কৃষকের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায় এবং ভাল ফসল হয় না। তাহার ফলে সকলেরই ক্ষতি হয় এবং ধীরে ধীরে শস্যের ক্রম-অবনতি ঘটে। শস্যের সব দানাই ত' সমান নহে। এইজন্য বীজ বাছিতে শেখা একটি বড় কাজ। আমাদের দেশের চাষীরা তেমন ভাল করিয়া বীজ বাছে না; যদি বাছিবার

ছেলেমেয়েরা ভাল ছানা বাছিয়া বীজ সংগ্রহ করিতে শেখে তাহা হইলে পরিবারের ও দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

(৫) জমির সারের জন্য ছাই সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলকে বছরে অন্ততঃ ত্রিশমণ ছাই সংগ্রহ করিতে হইবে।

আবর্জনার মূল্য আমরা বুঝি না। গোবর, ছাই প্রভৃতি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি। অথচ এগুলি জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। সার না দিলে জমি খারাপ হইয়া যায়, তাহার উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং দেখিতে ছোট হইলেও কাজটা মোটেই ছোট নহে।

ছয় নম্বর কাজের তালিকাই শুনিতে একটু অদ্ভুত রকমের।

(৬) অঞ্চলে মারমটের (ইঁদুর জাতীয় এক প্রকার প্রাণী) অত্যাচার, সেখানে বছরে দশটা করিয়া মারমট মারিতে হইবে। এই প্রাণিগুলা শস্যের বহু ক্ষতি করে। প্রায় একবিঘা জমির পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ মারিয়া ফেলিতে হইবে। যে প্রাণী ফল-গাছের ক্ষতি করে তাহাদের মারিয়া অন্ততঃ একটি ফল-গাছ ও দশটা শাকসব্জীর গাছ রক্ষা করিতে হইবে। বছরে পাঁচটা ছুঁচো ও দশটা ইঁদুর ধরিতে বা মারিতে হইবে।

একটু ভাবিলেই এই কর্মপদ্ধতির মূল্য বুঝিতে পারিবে। ছাগল, বাঁদর, ইঁদুর বৎসর বৎসর হাজার হাজার টাকার শস্যের ক্ষতি করে এটা হয়ত আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। অথচ কথাটা অত্যন্ত সত্য।

(৭) বছরে একটি করিয়া পাখীর ঘর ও দুইটি করিয়া পাখীদের জন্য খাবার রাখিবার ঘর তৈয়ারী করিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এই রূপে পাখীর ঘরের সংখ্যা দশ লক্ষ ও খাবার রাখিবার ঘরের সংখ্যা বিশ লক্ষ করিতে হইবে।

পাখীরা আমাদের কত উপকার করে তাহা আমরা ঠিক বুঝি না। তাহারা কীটপতঙ্গ নষ্ট করিয়া শস্যরক্ষার সাহায্য করে। পাশ্চাত্য দেশের নানাস্থানে ছেলেমেয়েদের এইরূপ পাখীর বাসা তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছি। আমেরিকার যে অঞ্চলে গ্রীষ্ম আমাদেরই দেশের মত প্রখর হয়, সেখানে ছেলেমেয়েরা পাখীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ছোট ছোট জলের আধারে পাত্র রাখিয়া তাহাতে নিয়মিত ভাবে জল রাখিয়া দেয় ও মাঝে মাঝে সে পাত্রগুলি পরিষ্কার করে। আমাদের দেশে এরূপ পাখী-সেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

(৮) পাঁচ বৎসরে ছেলেমেয়েদের লইয়া পাঁচ হাজার পক্ষীসংরক্ষণী সমিতি করিতে হইবে। পাঁচহাজার পাখীদের আশ্রয়-স্থল ও পাঁচহাজার মুর্গীদের ঘর তৈয়ারী করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক চাষী-পরিবারে দুইটি ডিমপাড়া মুর্গী বাড়াইতে হইবে।

(১০) প্রতি বৎসর অন্ততঃ দশটি করিয়া গাছ রোপণ করিতে হইবে। এবং ছেলেদের দিয়া সাড়ে সাতকোটী গাছের একটি বন রচনা করিতে হইবে।

আমরা প্রায়ই গাছ কাটিয়া ফেলি। অথচ এককালে আমাদের দেশে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা একটি পুণ্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। গাছ হইতে আমাদের অনেক উপকার হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন প্রদেশ বৃক্ষশূন্য করিলে সে দেশে বৃষ্টি কমিয়া যায়। তা ছাড়া গাছ হইতে অন্য আরও উপকার পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা একাজটা সহজেই করিতে পারে। ইহার জন্য একটু ধৈর্য্য ও সমবেত চেষ্টা দরকার। অবশ্য আমাদের দেশে তাহার পূর্ব্বে আরও একটা কাজ রহিয়াছে, আগাছার জঙ্গল সাফ্ করা; সে কাজেও ছেলেমেয়েরা সাহায্য করিতে পারে।

(১১) পাঁচলক্ষ বাড়ীর ছারপোকা, আরশোলা ও মশামাছি মারিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দল অন্ততঃ দশটি বাড়ী পরিষ্কার করিবে।

এটি পড়িলে বোঝা যায় যে, বাবিয়ায় আমাদের দেশের মত মশা ছারপোকার উপদ্রব। তোমরা হয়ত জান যে, মশা মাছি ও ছারপোকা বহু রোগের বাহন; সেগুলা এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে নানা রোগ বহন করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং সেগুলাকে ধ্বংস করা যে সমাজ-সেবা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(১২) নিরক্ষরদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের দল তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত নিরক্ষরদের লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইবে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পণ্ডিতমশাই" পড়িয়াছ, তাহারা জান যে, কেমন করিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত ছেলে মেয়ে জীবনে মাত্র পাঁচজনকে লেখা পড়া শিখাইতে রাজী হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব, সে বইয়ে তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজ আমাকে এই যে শিক্ষা দিতেছে, তাহার জন্য, সে ঋণ শোধ করিবার যে দায়িত্ব আমাদের আছে তাহার একমাত্র উপায় পঙ্গুকে শিক্ষা দেওয়া। যদি আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে এক জনকেও লেখাপড়া শিখায়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই দেশে আর নিরক্ষর লোক থাকিবে না, যতক্ষণ না দেশের এই অভাব দূর হইবে ততক্ষণ দেশে কোন কাজ করা কঠিন।

ছেলেমানুষ হইয়াও দেশের সেবা যে অনেক প্রকারে করা যায়, রাধিয়ার প্রবর্ত্তিত এই ছোট কর্ম্মপদ্ধতি পড়িয়া তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচবৎসরের যে কর্ম্মপদ্ধতি করা হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম। এগুলি ছাড়াও ছোটপাট অনেক কথা ইহার মধ্যে আছে।

রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা যে ইহারই মধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছি, এখানে আরো কয়েকটি দিই।

লিপ্‌স্কেনস্কি কারখানার ছেলেমেয়েদের দল একটি বায়ুচালিত জাঁতা ও জলচালিত জাঁতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে ছোট একটি ছাইনামো চালাইয়াছে। আর একদল তাহাদের পরবাড়ি গুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে; পাশের একটি নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া তাহার সাহায্যে তাহারা একটি জলজাঁতা (water-mill) চালায়, ও সেই জলজাঁতা দিয়া একটি সিনেমার অবাবচ্ছত ডাইনামো চালাইয়া তাহারা এই বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করে। মস্কোর কাছে একদল ছেলে প্রায় সিকি মাইল এক রাস্তা তৈয়ারি করিয়া পিচ্ ঢালিয়া পিটিয়া সেটাকে সুন্দর করিয়া তাহার পাশে পাশে আপেল গাছের চারা বসাইয়াছে। আর একদল ছেলেমেয়ে বীজ সংগ্রহ করিয়া আস্ত একটা ফলের বাগান তৈয়ারি করিয়াছে।

কে বলে যে, ছোট ছেলেমেয়েদের শক্তি নাই, কে বলে তাহারা আপনাদের দেশের সমাজের সেবা করিতে পারে না? রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা দেখাইতেছে, কি ভাবে তাহারা নূতন সমাজগঠনের কর্ম্মে রতী হইতে পারে।

ছায়া-পথ

—"বনফুল"

রাত্রি দ্বিপ্রহর
সর্ব্ব অঙ্গে আবরিয়া ঘন-নীলাম্বর
দৃষ্টিখানি প্রসারিয়া সুদূর গগনে
বসে আছে আপনার মনে
কে যেন আসিবে!

নিঃশব্দ আভাসে
তারি আগমনী যেন বাজিছে আকাশে,
দিগন্ত-বিস্তৃত ওই দূর ছায়া-পথে
বারতা এসেছে যেন স্বপ্ন-লোক হ'তে
আসিবে, আসিবে!

তারি আশে চারি পাশে
আঁধারেও ফুটিছে কুসুম,
ধরণীর আঁখি 'পরে নামিতেছে ঘুম
স্বপনের মুক্তি দিতে!
অন্ধকার চাবিভিতে
স্বপন-মন্থর!
ধীরে যেন ভাসা পায় বুঝি তার শঙ্কিত অন্তর
আসিবে সে!

ছিল যারা অন্তরের তলে
গুচ্ছ গুচ্ছ খদ্যোতের দলে
মূরতি লভেছে তারা,
জ্বলে আত্মহারা
মহাশূন্যে লক্ষ কোটি তারা!
অন্ধকার জলে স্থলে
ধীরে যেন বলে
আসিবে সে!

অতন্দ্রিত প্রতীক্ষার ছন্দোময় স্তব্ধ সমারোহ
পুঞ্জীভূত অন্ধকার মোহ
উন্মুখ সে অন্তরের অন্তহীন সাগ্রহ বাসনা
সহসা হইল শেষ।—কেহ আসিল না!

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

মুসলমানগণের রাজত্ব-আরম্ভ

গৌড় লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া, মুসলমানেরা এদেশে রাজত্ব আরম্ভ করেন। প্রথমে উত্তর বাঢ় ও বরেন্দ্রীতে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনেক স্থান তাঁহারা অধিকার করিয়া লন। বখ্‌তিয়ারের পর ইক্তিয়ার তিব্বত জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার ধরিয়া তিনি গৌহাটির অপর পার হইতে উত্তরে চলিয়া দুটানের মধ্যে মাত্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে বাধা পাইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। পথে কামরূপের রাজার আক্রমণে সমস্ত সৈন্য হারাইয়া তিনি ভগ্নহৃদয়ে দেবকোটে ফিরিয়া আসেন। দেবকোট বর্ত্তমানে দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। দেবকোটে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। কেহ কেহ বলেন, আলিমর্দ্দান নামে খিলজীবংশীয় কোন ব্যক্তি ইক্তিয়ারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছিলেন। ইক্তিয়ার যে সময়ে তিব্বতভয়ে গমন করেন, সে সময়ে তাঁহার অনুপস্থিত মহম্মদ শেরান ও তাঁহার ভ্রাতাকে লাঙ্গনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইক্তিয়ারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শেরান দেবকোটে চলিয়া আসেন। তখন আলিমর্দ্দান সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। শেরান তাঁহাকে তাঁহার আবাসস্থানে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং আবার দেবকোটে ফিরিয়া আসেন। খিলজীরা শেরানকেই তাঁহাদের সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। আলিমর্দ্দান কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তিনি বাদশাহ কুতবউদ্দীনের নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইলে বাদশাহ খিলজীগণের বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে বাঙ্গালায় যাইতে আদেশ দেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে শেরান ও অন্যান্য খিলজীগণ পরাজিত হইয়া দেবকোট হইতে পলায়ন করেন। তাহার পর তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদে শেরান নিহত হন। আলিমর্দ্দান বাদশাহের অনুগ্রহে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং বাঙ্গালায় রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেন। আলিমর্দ্দান দেবকোটেই অবস্থিতি করেন।

গৌড়পতির স্বাধীনতা-ঘোষণা

বাদশাহ কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই জন্য খিলজী আমীরেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা হাসামুদ্দীনকে আপনাদের সর্দ্দার মনোনীত করেন। হাসামুদ্দীন গিয়াসউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয় এবং নমাজের সময় তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীকে নিজের রাজধানী করিয়া তুলেন। ইক্তিয়ারের মৃত্যুর পর হইতে দেবকোটই রাজধানী হইয়াছিল। এক্ষণে আবার লক্ষ্মণাবতী রাজধানী হইয়া উঠিল। গিয়াসউদ্দীনের সময় লক্ষ্মণাবতী ও দেবকোট উভয় স্থানই রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত। গিয়াসউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীকে অনেক অট্টালিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি দেবকোট হইতে লক্ষ্মণাবতী এবং তথা হইতে রাঢ় দেশ পর্য্যন্ত এক উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দীন অনেক দূর পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ, লাঙ্গনগর প্রভৃতি জয় করিতে গিয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীনের স্বাধীনতা-ঘোষণায় কুতবউদ্দীনের জামাতা বাদশাহ আল্‌তমশ্‌ লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করিতে অগ্রসর হন। গিয়াসউদ্দীন বাদশাহ অপেক্ষা আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া, বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তাহার পর আবার তিনি বিহার অধিকার করিয়া লইলে, বাদশাহের পুত্র নাসিরউদ্দীন মহম্মদ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীন তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হন।

উড়িষ্যারাজের গৌড় আক্রমণ

গৌড় ও রাঢ় জয় করিয়া মুসলমানেরা তাহার দুই দিকে কামরূপ বা আসাম ও লাঙ্গনগর বা উড়িষ্যারাজের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে

বৈশাখ
শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

পারেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতেও তাঁহাদের কতক সময় লাগিয়াছিল। ইক্তিয়ারের সময় হইতেই জাজনগর অধিকারের চেষ্টা হয়। নাসিরউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর আবার খিলজীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বাদশাহ আলতমস্ আর একবার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন। ক্রমে ক্রমে খিলজীরা নিহত হয়। কিছুকাল পরে তোগান খাঁ নামে একজন লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠেন। তিনি অবশ্য দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে জাজনগরের রাজা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। তোগান খাঁ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য জাজনগরের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহার পর তোগান খাঁ দিল্লীতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে, বাদশাহের আদেশে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তমুর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। জাজনগরের রাজা ইহার মধ্যে লক্ষ্মণাবতীর অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈন্য রাঢ়দেশের রাজনগর আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হয় এবং তাহা অবরোধ করে। তোগান খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হন। তাহার পর তমুর খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলে, উড়িষ্যা-সৈন্য লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সময়ে গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব জাজনগর বা উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। ইহার পরও মুসলমানগণ অনেকবার জাজনগর বা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা বলা যাইবে।

সিংহলে বাঙ্গালী পণ্ডিত

এই সময়ে রামচন্দ্র কবিভারতী নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাঢ়েন্দ্রী মণ্ডলের বীরাবতী নামক স্থানের অধিবাসী। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। কবিভারতী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই। রামচন্দ্র তখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিংহলে উপস্থিত হন। সে সময়ে পরাক্রমবাহু সিংহলের রাজা ছিলেন। তিনি কবিভারতীকে সম্মান করিয়া সমুদ্রাগম চক্রবর্ত্তী উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ ও কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবিভারতীর প্রণীত ভক্তিশতকম্ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সুলতান উজবক্

ইক্তিয়ার উজবক্ নামে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুগীসউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। প্রথম প্রথম তিনি মুদ্রায় বাদশাহের নামের সহিত নিজনাম অঙ্কিত করাইয়া পরে কেবল আপনার নামই অঙ্কিত করাইতেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলার মুসলমান রাজ্য, দক্ষিণে নবদ্বীপ ও উত্তরে বগুড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উজবকের মুদ্রায় নবদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। উজবকও জাজনগর আক্রমণে গমন করেন। প্রথম দুইবার জয়লাভ করিয়া তৃতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহার পর দিল্লীর বাদশাহের সাহায্যে তিনি জাজনগরের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। উজবক্ কামরূপ জয় করিতে গিয়া পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

বাঙ্গলায় দিল্লীর বাদশাহ

ইহার কিছুদিন পরে তোগ্রলখাঁ নামে এক পরাক্রান্ত ব্যক্তি লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে গিয়াসউদ্দীন বলবন্ দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তোগ্রল কামরূপ জয় করিয়া তাহার কতক অংশ অধিকার করিয়া লন। তিনি জাজনগরের রাজাকেও পরাজিত করিয়া বহু হস্তী ও ধনরত্ন লইয়া আসেন। তাহার পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান মুগীসউদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেও আরম্ভ হয়। এইরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বাদশাহ বলবন্ তাঁহার দমনের জন্য আমীরখাঁ নামে একজন সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। আমীরখাঁ তোগ্রলের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাহার পর বাদশাহ আবার আর একজন সেনাপতিকে পাঠান। তিনিও তোগ্রলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে বাদশাহ কনিষ্ঠ পুত্র বগড়াখাঁকে লইয়া নিজে বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। তিনি অনেক সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বাদশাহ আসিতেছেন শুনিয়া তোগ্রল জাজনগরের দিকে পলাইয়

যান। বাদশাহ লক্ষ্ণাবতীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে যাত্রা করেন। তোগ্রল পূর্ব্ববঙ্গে যাহাতে আশ্রয় লইতে না পারেন, তাহারই ব্যবস্থার জন্য বাদশাহ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাঁয়ে উপস্থিত হইয়া তিনি সেখানকার রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া, তাঁহাকে জলপথে তোগ্রলের গতিরোধ করিতে অনুরোধ করিয়া আসেন। তাহার পর ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি তোগ্রলের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন পরে তোগ্রলের সন্ধান পাওয়া গেলে, বাদশাহের সৈন্যগণ তোগ্রলের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করে।

পূর্ব্ববঙ্গপতি দনুজ রায়

বাদশাহ বলবন্ সুবর্ণগ্রামে যে পূর্ব্ববঙ্গাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দনুজ রায়। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেব নামে চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে, সেনবংশের পর তাঁহার রাজত্ব-কাল। এই দনুজমাধবই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দনুজমাধবই রাজা দনুজ রায় বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে তিনি স্বাধীনভাবে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ বলবন্ দনুজ রায়ের সহিত মিত্রতা করিয়া তোগ্রলের বিরুদ্ধে তাঁহাকে জলপথ সকল বন্ধ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। দনুজরায় তথায় অবস্থিতি করিতেন। সুবর্ণগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বা মসলিনের জন্য ইহা বিখ্যাত হয়। পূর্ব্ববঙ্গজয়ের পর মুসলমানেরা সুবর্ণগ্রামকে একটি প্রধান স্থান করিয়া লন। সে কথা পরে বলিব।

পিতা-পুত্রে

আমরা বলিয়াছি, দিল্লীর বাদশাহ বলবন্ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বগড়াখাঁকে লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বগড়াখাঁ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া যাওয়ার সময় বাদশাহ বগড়াখাঁকে লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি বগড়াখাঁকে দিল্লী যাইতে বলেন। বগড়াখাঁ দিল্লী গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার লক্ষ্ণাবতীতে ফিরিয়া আসেন। ওদিকে বলবনেরও মৃত্যু হয়। তখন সকলে বগড়াখাঁর পুত্র কৈকোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দেন। বগড়া নাসিরউদ্দীন মহম্মদ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। কৈকোবাদ অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বগড়াখাঁ তাঁহাকে সাবধান হইবার জন্য অনেকবার লিখিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি পিতার কথায় মনোযোগ না দেওয়ায়, বগড়াখাঁ নিজেই দিল্লী যাইবার অভিলাষ করেন। কৈকোবাদও সৈন্য লইয়া দিল্লী হইতে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হন। অযোধ্যার সরযূ নদীর উভয় তীরে উভয় পক্ষের শিবির সন্নিবেশিত হয়। বগড়াখাঁ পুত্রের সহিত দেখা করিতে চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীদের কুপরামর্শে কৈকোবাদ আদেশ করিলেন, বগড়াখাঁ আসিতে পারেন, তবে সম্রাটকে যথারীতি কুর্ণিশ করিতে করিতে সম্রাটের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে। বগড়াখাঁ এই অবস্থায়ই সম্মত হইলেন। বগড়াখাঁ কৈকোবাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট পুত্রকে ভূমিস্পর্শ করিয়া তিনবার অভিবাদন করিলেন। তাহার পর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া পিতার চরণতলে নিপতিত হইলেন। তাহার পর পিতাপুত্র পরস্পরে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণও এ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। কৈকোবাদ পিতাকে লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। পরে আবার নামিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া রহিলেন। তাহার পর পিতাপুত্রে গোপনে কথাবার্ত্তা হইলে বগড়াখাঁ নিজ শিবিরে ফিরিয়া যান। তিনি পুত্রকে অনেক সদুপদেশ দিয়া লক্ষ্ণাবতীতে চলিয়া আসেন। কৈকোবাদ কিন্তু পিতার উপদেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের বিলাসিতার জন্য আপনার জীবন ও দিল্লীর সিংহাসন হারাইতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শাসনের পর বগড়াখাঁও পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রেরাও স্বাধীনভাবে লক্ষ্ণাবতীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তাহা বলবন্ বংশীয়দিগের হস্তচ্যুত হয়।

(ক্রমশঃ)

মাতৃকাভেদতন্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

অধ্যাপক অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় মা তৃ কা-ভে দ ত ন্ত্র সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বহুদিন পূর্বে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর তন্ত্রসংগ্রহে এই বই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রসিকমোহনের গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য—তাই এ বইয়ের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করে সম্পাদক যে পণ্ডিতমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে আর বিশেষ করে বাংলাদেশে বহুকাল ধরে তন্ত্রশাস্ত্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এ দেশের নানা পুথিশালা ও যে সব পণ্ডিত পরিবার এখনও শাস্ত্রচর্চা রাখেন তাঁদের সংগ্রহ খুঁজলে যে সব সংস্কৃত পুথি পাওয়া যায় তার ভেতর বারো আনাই তন্ত্রশাস্ত্র। নেপালের রাজকীয় পুথিশালায় প্রায় ৬০ হাজার পুথি আছে—আর তার ভেতর প্রায় ৪০ হাজারই তন্ত্রের পুথি। আমাদের পূজা অর্চনা ও নানারূপ ক্রিয়াকর্মের ওপরও তন্ত্রের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

এ সব সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমরা এখন আর তন্ত্রশাস্ত্রের কোন খোঁজ রাখিনা এবং তার আলোচনা করাও অভিপ্রেত মনে করি না। এ অবহেলার মূলে রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের ওপর একটা ঘৃণা, আর সে ঘৃণার কারণ হচ্ছে আধুনিক কালের বহু তান্ত্রিক সাধকের কদাচার। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা করলে হয়ত স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, তন্ত্রে সত্যই কোন কদাচারের উল্লেখ নেই। তন্ত্রে অনেক সাঙ্কেতিক ভাষার প্রয়োগ আছে, তাই সে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করতে হলে সেই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝতে হয়। আর তার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক। সুতরাং যে সব প্রকাশকেরা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে সাহায্য করবেন তাঁরা সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন।

মা তৃ কা ভে দ ত ন্ত্র শুধু যে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, সম্পাদক নানাভাবে গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছেন। প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত চার পাঁচখানি পুথির সাহায্যে গ্রন্থের পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। সম্পাদক একটি বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করেছেন ও গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

মা তৃ কা ভে দ ত ন্ত্রে রসশোধনের কথা আছে, সেই জন্য তাকে alchemical তন্ত্র বলা হয়। পারদ বা mercury থেকে কি করে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব হয়, সেই সব উপায়ই এই তন্ত্রের নানা স্থানে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সব তন্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে পারদ, আর তাকে কি করে ফুটন্ত করে স্বর্ণে পরিণত করা যায় তার উপায় নিদ্ধারণ করাই হচ্ছে এ জাতীয় তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ জাতীয় তন্ত্রের প্রথম পত্তন হয় সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের হাতে। সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের গ্রন্থে রসঘোটনের যে সব আলোচনা আছে তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর History of Hindu Chemistry নামক গ্রন্থে তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধ নাগার্জ্জুনকে তিনি ও অন্যান্য পূর্বতন লেখকেরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক মনে করেছিলেন। সিদ্ধ নাগার্জ্জুন আর মাধ্যমিক দর্শনের প্রথম প্রচারক আর্য্য নাগার্জ্জুন যে এক ব্যক্তি নয় তা আমরা কিছুদিন থেকে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। সিদ্ধ নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বেকার লোক নয়—আর তন্ত্রে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রচলন যে সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের পূর্বে হয়েছে এ কথা এখনো কেউ নিঃসন্দেহে বলতে পারেন না।

তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের কি যোগ আছে, আর শিবসাধনার কথা বলতে গিয়ে মা তৃ কা ভে দ ত ন্ত্রে কেন পারদ ঘোটনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সে কথা কেউ স্পষ্ট করে বলেন নি। পারদকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারলেই যে অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় একথা বিশ্বাস করবেন না।

রসায়নশাস্ত্রের প্রসঙ্গ কি করে মা তৃ কা ভে দ ত ন্ত্রে এসেছে সে কথার উল্লেখ ঐ তন্ত্রেই আছে। শঙ্কর বলছেন—"মন্ত্রেজসা পারদেন কিং বয়ং ন হি লভাতে" অর্থাৎ "পারদই হচ্ছে আমার তেজ, আর এমন কোন বস্তু নেই যা' তার

---

* Calcutta Sanskrit Series, No. VII মাতৃকাভেদতন্ত্রম্—ঐচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। ৩০নং বর্ণওয়ালা ষ্ট্রীট, ক্যালকাটা সংস্কৃত সিরিজ অফিস লিমিটেড হইতে প্রকাশিত।

থেকেই লাভ না করা যায়।" ঐ তন্ত্রের অন্য স্থানে আরও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—

পারদং শিববীজং হি তাড়নং ন হি কারয়েৎ।
তাড়নাদ্বিবিধান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ মৃত্যুমেব চ।
তস্মাৎ সংশোধয়েৎ প্রাজ্ঞঃ তাড়নাদ্বারণং কুরু॥

অর্থাৎ "পারদই হচ্ছে শিববীজ, তার তাড়না করা উচিত নয়। তার তাড়না করলে নানা বিপদ উপস্থিত হয়—বিত্তনাশ, পুত্রহীনতা, রোগের আক্রমণ ও মৃত্যু"। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পারদের অন্য একটা গূঢ় অর্থ আছে, আর সে অর্থ না গ্রহণ করলে এ সব শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরা যায় না।

পারদের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে হঠযোগপ্রদীপিকায় কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

রসস্য মনসশ্চৈব চঞ্চলত্বং স্বভাবতঃ।
তস্মাৎ যত্নো মনো রুদ্ধ্বা কিমন্যৈর্বিনিযোজিতৈঃ॥
মূর্ছিতে হরতে ব্যাধীন্ মৃতো জীবয়তি ধ্রুবং।
বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে তস্মাৎ পাশুপতী পরা॥

রস আর মন উভয়েই স্বভাবচঞ্চল। রস আর মন আবদ্ধ হলে পৃথিবীতে সমস্ত কার্য্যই সম্ভব হয়। রস ও মন উভয়কে মূর্চ্ছিত করতে পারলে ব্যাধি নাশ হয় ও মৃত জীবিত হয়, এবং উভয়কে বদ্ধ করতে পারলে খেচরত্ব বা আকাশ-গমন-শক্তি লাভ করা যায়।

এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, রস ও মনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ রয়েছে। রস এখানে পারদ ও বিষ্ণু এই উভয় অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। শাস্ত্রকারের মতে বিষ্ণুও স্বভাবচঞ্চল, তাকে মূর্চ্ছিত বা তার চঞ্চলতাকে সাময়িক ভাবে ধূলীভূত করতে পারলে ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করা যায়, আর সে চঞ্চলতাকে সম্পূর্ণভাবে ও চিরকালের জন্য নষ্ট করতে পারলে সিদ্ধত্ব লাভ হয়। রসায়ন শাস্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে মূর্চ্ছিত ও আবদ্ধ বা ভস্মীভূত পারদের রোগ দূর করবার শক্তি অসীম।

সুতরাং অধ্যাত্মসাধনার বিষয়ে পারদকে যে বিষ্ণু অর্থে গ্রহণ করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যই মাতৃকা ভেদ তন্ত্রে পারদের শিবতেজস্, শিববীজ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এই শিববীজই হচ্ছে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূল। তাই পারদের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাতৃকা ভেদে অন্যত্র বলা হয়েছে—

পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্মৃতা।
রেফং শিবং হকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন সংশয়ঃ।
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥

এ শ্লোকের অন্য কোন আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সেরূপ কোন ব্যাখ্যা আছে বলেও মনে হয় না। পারদকে বিষ্ণু হিসাবে গ্রহণ করলে এ শ্লোকের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট ভাবেই ধরা যায়। বিষ্ণুকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলা হয়েছে, তার কারণ যতক্ষণ বিষ্ণুর অস্থিরতা থাকে ততক্ষণই সৃষ্টি ও স্থিতি চলে। বিষ্ণুর অস্থিরতাতেই চিত্তের অস্থিরতা। আর চিত্তের অস্থিরতা মানেই হচ্ছে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ যোগাযোগ। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এই যোগ থাকলেই সৃষ্টি ও স্থিতি চলতে থাকে, কিন্তু বিষ্ণুর ও সেই সঙ্গে চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা যখন সাধক লাভ করতে পারেন তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্মুখী হয়। সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, তাই সমস্ত ব্যবহারিক জগতও লয়প্রাপ্ত হয়। এই লয়েই সাধকের সমাধি। সেই জন্যই পারদ বা বিষ্ণুকে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক বলা হয়েছে।

বৌদ্ধতন্ত্রে অনেক স্থানে পারদ বা বিষ্ণুর স্থানে বোধিচিত্ত শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বোধিচিত্তের অবস্থা দুটি—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক অবস্থায় বোধিচিত্ত বা বিষ্ণু স্বভাবচঞ্চল, তখন ইন্দ্রিয়শক্তি বহির্মুখী, আর ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রবল। সে জ্ঞান বোধি বা বুদ্ধত্বলাভে সহায় হয় না। কিন্তু সে বোধিচিত্তকে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে শীর্ষদেশে এনে তাকে স্থির করতে পারলে তার—পারমার্থিক অবস্থা আসে। সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্মুখী হয়, চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয়। চিত্তে তখন আর প্রপঞ্চময় জগতের কোন আভাস পড়ে না। তখন যে জ্ঞানের উদয় হয় তা বুদ্ধত্বলাভের সহায় হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এবিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে হিন্দুতন্ত্রের মূলগত মিল রয়েছে। আর সাধনার দিক দিয়ে দেখলে পারদশোধনের মর্ম্মার্থ হচ্ছে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে বিষ্ণুর স্তম্ভন ও স্থিরীকরণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধরেতা হওয়া। তন্ত্রের কথায়, ঊর্দ্ধরেতা হতে পারলেই সাধক অসীম শক্তিসম্পন্ন হতে

পারেন। তখন তিনি শুধু রোগজয়ী নন তখন তিনি মৃত্যুঞ্জয়ীও হতে পারেন।

পারদ বা বিন্দু এই অবস্থায় elixir of lifeএ পরিণত হয়। আমার মনে হয়, পারদের এই অর্থ না বুঝতে পেরে নানা সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে কালক্রমে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ প্রথমে যা ছিল অধ্যাত্মসাধনার সূত্র তার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ না করে বাইরের অর্থ গ্রহণ করেই যত গোলোযোগের সৃষ্টি। যাহোক মনস্কোটনের নানা উপায় বের করতে গিয়ে এ সব সাধকদের হাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সে সাধকেরা elixir of lifeএর খোঁজ না পেলেও মানুষের দেহকে নীরোগ করবার যে অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই।

পূর্ব্বে বলেছি যে, তন্ত্রশাস্ত্রে সাঙ্কেতিক শব্দের প্রয়োগ অনেক। সুতরাং সেই সাঙ্কেতিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে না ধরতে পারলে তন্ত্রের অর্থবোধ হয় না। মা তু কা ভে দ ত ন্ত্রে অনেক স্থানেই 'কারণে'র কথা বলা হয়েছে—আর সে কারণ হচ্ছে চতুরক্ষী—"কারণ চতুরক্ষং বা।" কারণে মোক্ষলাভ হয়—"কারণেন মহামোক্ষং"। কারণ গঙ্গাজলের চেয়েও বেশী ফলপ্রদ ও পরমদুর্লভ—

গঙ্গায়াং জায়তে মোক্ষং তস্যৈব ত্রিগুণে যদি।
গঙ্গায়াস্তাধিকং নাম কারণং পরদুর্লভং।—
কারণেন বিনা দেবি মোক্ষজ্ঞানাধিকং ন হি।—
গঙ্গা তু কারণং বারি বহ্নং পাপকারণম্।
কালীপদাম্বুজোদ্ভূতা মালা: তস্যা অনন্তকি।—
কারণং দেবদেবেশি মোক্ষদং সর্ব্বজন্তুষু।
তস্মাৎ স্বর্গাদিজনকং গঙ্গাতোয়ং ন সংশয়ঃ।
কারণে নিত্যমেবাহি মহাকালী পরাকলা।
ব্রহ্মরন্ধ্রে কপালস্থে সুধায়াং পরমেশ্বরি।—
অষ্টসিদ্ধিঃ করে তস্য ন এব পশুরবাহঃ।
যোগী গঙ্গাপ্লুতা যত্র গঙ্গায়ামেব তত্র হি।—
নির্ম্মালেন ভবেৎ স্বর্গং নিত্যানন্দং সুরা ভবেৎ।

এই সব শ্লোক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে কারণকে মদ হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সে কারণ হচ্ছে স্বর্গগঙ্গা বা মন্দাকিনীর জলের ন্যায় পূত, মহাকালী বা পরাশক্তি তাঁর অধিষ্ঠাত্রী, সে কারণ যে সাধক পান করতে পারেন তাঁর অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত হয়, আর তিনি শিবতুল্য হন। সে কারণ স্পর্শমাত্রেই 'মালা' শুদ্ধ হয়। 'নির্ম্মালো' স্বর্গ আর 'সুরায়' নির্ব্বাণ লাভ হয়। বহু তন্ত্রে এ কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে—

বাহ্যমদ্যে ভবেৎ মৈথুনে মাংসভক্ষণে।
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ।

সুতরাং এই কারণবারি বা মদ বাহ্যমদ নয়। জা ন কা রি কা নামক একখানি অপ্রকাশিত তন্ত্র আমি সম্প্রতি প্রকাশ করেছি। এতে নির্ম্মালা ও মদিরার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সে তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, যোগী যখন যোগপারঙ্গম হন তখন তিনি স্বর্গীয় অমৃত পান করতে সক্ষম হন। আর এই অমৃত পান করলেই তিনি সহজানন্দে বিভোর হন—আর তাঁর সেই অবস্থাকেই সাধারণতঃ মদিরামত্ত অবস্থা বলা হয়। বর্ণরাশিকে শক্তিসূত্রে গ্রথিত করে যে মালা তৈরি সেই হচ্ছে নির্ম্মালা। এ বর্ণরাশি হচ্ছে অনাহত শব্দের নানা অভিব্যক্তি—সুতরাং তাকেও যোগের ভাষায় বুঝতে হবে। যোগের নানা গ্রন্থে ও তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সাধকের শক্তি যখন জাগ্রত হয়ে শরীরেস্থ সহস্রদল পদ্মে আরোহণ করে তখন সেই পদ্ম থেকে অমৃত বর্ষণ হয়। পারঙ্গমযোগী জিহ্বাকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রেরণ করে এই অমৃত পান করতে পারেন। এই অমৃত পান করতে সমর্থ হলে যোগী রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি জয় ও নানা সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই অমৃতই হচ্ছে কারণ-বারি। এই কারণের অন্য অর্থ আছে কিনা জানিনা, তবে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে কারণের অর্থ মদ নয়। আর মদ শোধন করে পান করলে অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় একথা তন্ত্রশাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়। আমাদেরও তা বোধগম্য নয়।

তন্ত্রের পুথি অনেক অপ্রকাশিত রয়েছে। তন্ত্রের আলোচনাও বর্ত্তমানে নাই বললেই চলে। যাঁরা হয়ত তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝেন তাঁরা সাধক লোক, নিজেদের মতামত প্রচার তাঁরা করতে চান না। এই সব কারণেই যে তন্ত্রের অনেক কদর্থ প্রচলিত হয়েছে সে কথা নির্ভয়েই বলা চলে। আর এই সব কদর্থ প্রচলিত হয়েছে বলেই তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূমিকম্প-প্রতিরোধক পুঃ

গত বছর মার্চ মাসে ভূমিকম্পের ফলে আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া সহর বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। স্কুলের সময় এই ভূমিকম্প ঘটিলে হাজার হাজার ছাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পের ভয়াবহ ফলাফল প্রতিরোধকল্পে কর্তৃপক্ষ লস্ এঞ্জেলস্ সহরের স্কুল-গৃহগুলি নূতন

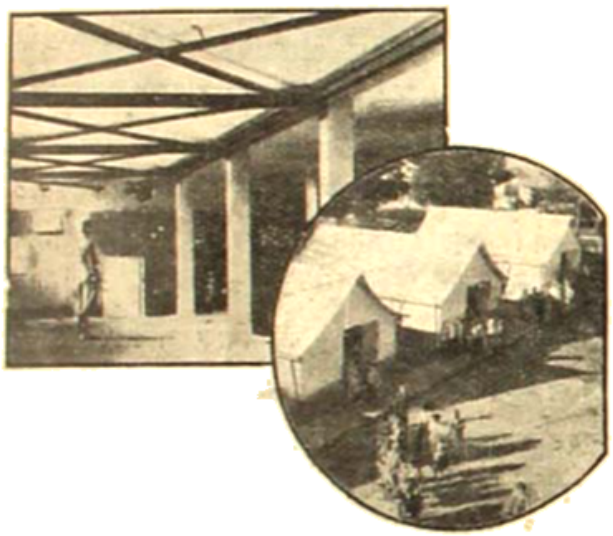

ভূমিকম্প-প্রতিরোধক পুলের কাঠামো ও ছাদের বাঁ-পুং ঃ

করিয়া নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী লোহার কাঠামোর উপর এমন ভাবে ইট সুরকির গাঁথুনি বসানো হইবে যে, প্রবল ভূমিকম্পের ধাক্কা দিলে দেওয়াল আঁকিয়া-বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিবে না। এই নূতন ধরণের গৃহনির্ম্মাণে খরচ পড়িবে প্রায় ২৫,০০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ ৭৫,০০০,০০০ টাকা। ভূমিকম্প-প্রতিরোধক গৃহনির্ম্মাণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তির উপর কাঠের ঘর-গৃহের মধ্যে ছেলেদের পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপরের চিত্রে (১নং) নূতন পরিকল্পনানুযায়ী লোহার কাঠামো এবং পশ্চিম দিকে ছাদের আচ্ছাদনের ছবি দেখা যাইতেছে।

আলোর গতিবেগের নূতন মান

আজকাল হইতেই জ্যোতির্বিদ এবং পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা আলোকতরঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কেহ কোন চরমসিদ্ধি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। গেলিলিও, রোএমার, ফ্রাঙ্কলিন, ফিজু, ফোকো প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণ আলোকতত্ত্ব বিশ্লেষণে ইহার বিভিন্ন জটিলতার মীমাংসা করিয়া গিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রোএমার আলোর গতিবেগ নির্দ্ধারণকল্পে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কয়েকটি পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। বৃহস্পতি গ্রহকে লক্ষ্য করে নিয়মিত ভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। তিনি ইহার মধ্যে একটি চন্দ্রকে নির্ব্বাচন করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। যে মুহূর্ত্তে চন্দ্রটি বৃহস্পতির ছায়া অতিক্রম করে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে তিনি আলোর গতিবেগ নির্দ্ধারণ করেন, এবং পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন তাহার কক্ষের বিপরীত দিকে উপস্থিত হয় সেই সময়ে পুনর্ব্বার উক্ত চন্দ্রের আলোকপাতের সময় নির্দ্ধারণ করেন। পৃথিবীর কক্ষের দুই প্রান্তে এই আলোকপাতের সময়ের পার্থক্য হিসাব করিয়া তিনি আলোর গতিবেগ নিরূপণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস ১৮৯,০০০,০০০ মাইল। প্রথম বার আলোকপাতের সময় পৃথিবী যে স্থানে ছিল, দ্বিতীয় বার আলোকপাতের সময় পৃথিবী তাহার বিপরীত দিকে অবস্থান করিতেছিল; কাজেই প্রথম বার হইতে দ্বিতীয় বার আলোকরশ্মিকে ১৮৯,০০০,০০০ মাইল বেশী ঘুরে আসিতে হইয়াছিল এবং এতখানি ঘুরপথ অতিক্রম করিতে উক্ত আলোকরশ্মির প্রায় ১০০০ সেকেণ্ড বা ১৬ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড সময় বেশী লাগিয়াছিল। এই পরীক্ষা হইতে তিনি স্থির করেন আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮১০০০ মাইল। (২নং চিত্র)

আলো বলিতে—অদৃশ্য আলোকতরঙ্গ, লোহিতাতীত রশ্মি, অতি-বেগুনীরা, এক্সরে, গবীলস পদার্থের বিকীরণ প্রভৃতি সকল প্রকার আলোকেই বুঝায়। আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়, অন্যান্য অনেক নূতন তথ্যের, বিশেষতঃ আইন্‌ষ্টাইনের বিখ্যাত আপেক্ষিকবাদ, জ্যোতিষিক গবেষণার নির্ভুল পন্থা, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্বালানি প্রভৃতি পরিমাপ-প্রণালী আলোর গতিবেগের অপরিবর্ত্তনীয়তার উপরই নির্ভর করে। কিন্তু এতকাল যাবৎ নির্ভুল বলিয়া অবধারিত আলোর গতিবেগের হিসাবে পার্থক্য লক্ষিত হইলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

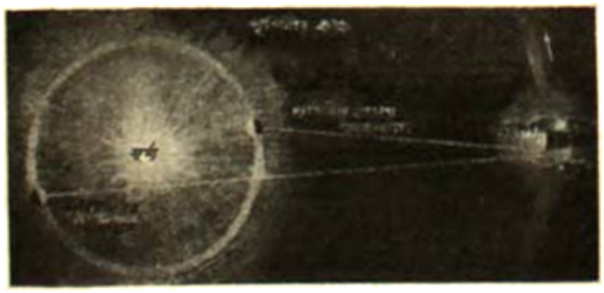

২। কক্ষের দুই বিপরীত স্থানে পৃথিবীর অবস্থিতির সময় আলোকপাতের সময়ের তারতম্য হিসাব করিয়া রোএমার আলোর গতিবেগ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

১৯২৭ খৃঃ অব্দে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকেল লবরেটরি ডাঃ মাইকেলসন ২২ মাইল দূরে পর্ব্বতের চূড়ায় স্থাপিত দর্পণে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া বিশেষ পরীক্ষা করে স্থির করিয়াছিলেন যে, আলোর গতি

সেকেণ্ডে ১৮৬২০০ মাইল। আরও বিশুদ্ধভাবে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্যাসাডেনা নামক স্থানে ছিন্ন ছুট ব্যাস পরিমিত এক মাইল লম্বা একটি নল সংযুক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। (৪নং চিত্র) কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তিনি

৩। আলোর গতি-বিশ্লেষক ব্যবস্থিত বিরাট নলের অংশ বিশেষের অঙ্কিত দৃশ্য।

অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীর ডাঃ পিজ এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেট, পিয়ারসন উভয়ে মিলিয়া এই অসমাপ্ত পরীক্ষা শেষ করেন। এই পরীক্ষার ফলে আলোর গতিবেগ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ ওয়াল্টার আডাম্স এই পরীক্ষার ফলাফল বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—পরীক্ষার সময় আলোর গতির একটা অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, কয়ের কোন ত্রুটীর জন্যই আলোর গতিবেগের এরূপ বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যখন ফলের কোন ত্রুটী দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন স্বভাবতঃই মনে হইল তবে কি আলোর গতিবেগ পরিবর্তনশীল? ঘড়ি যাহারও নিখুঁতভাবে জানা থাকে ঠিক অতটায় সময় সূর্য্যাস্ত হইবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঐ ঘড়ি মিলাইয়া দেখিতে পায় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৪ মিনিট পূর্ব্বেই সূর্য্য ডুবিয়া গেল, তখন যেমন সূর্য্যের গতিবেগের উপর সন্দেহ না হইয়া ঘড়ির উপরই সন্দেহ আরোপিত হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান পরীক্ষায়ও ফলের উপরই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল।

বর্ত্তমান পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, কোন কোন দিন আলোর গতিবেগ যেন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বেগ হইতে সেকেণ্ডে প্রায় ১৪ মাইল বাড়িয়া যায়, কখনও কখনও নির্দ্দিষ্ট বেগ হইতে কমিয়া যায়; বিভিন্ন অক্ষুতে আলোর গতি-বেগ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পরিবর্ত্তনের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ব্যাপিয়া আলোকরশ্মিকে প্রায় একই ভাবে ছোট ছোট আবর্ত্তনে ঘুরিতে দেখা যায়। পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আলো সেকেণ্ডে ১৮৬, ২৭৬ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। এই পরীক্ষা হইতে যে কেবল আলোর গতিপরিবর্ত্তনের খবরই জানা গিয়াছে তাহা নহে, ভূপৃষ্ঠে জোয়ার-ভাঁটার মত সম্পূর্ণ অজানা এক অদ্ভুত প্রবাহের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, যাহার ফলে পরীক্ষা-অনুষ্ঠানকারী যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন করে এবং স্থানে স্থিরতা আসে। অবশ্য এই স্থান-বিচ্যুতি এত সামান্য যে, এরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব।

শনি গ্রহের বলয় এবং তাহার গঠন সম্বন্ধে নূতন তথ্য

১৬১০ খৃঃ অব্দে গ্রিলিলিয়ো দুরবীক্ষণ পরিচালনের অল্পকাল পরেই শনির বলয় আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর হইতেই ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-গণের কৌতূহল ও বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। শনি গ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের বলয় দেখিতে পাওয়া যায় না। শনি গ্রহের এই বলয়োপাধি কিরূপে সম্ভবপর হইল?

'গ্যালিলিয়ো' আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে এই গ্রহের নয়টি চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল। তখন বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বলয়টিও

শনিগ্রহের চন্দ্র ভাঙিয়া বলয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

একটি চন্দ্রোদ্ভূত চন্দ্র, এখনও পূর্ণাবয়ব আকার পরিগ্রহ করে নাই। কিন্তু আধুনিক অন্বেষণায় ফলে ইহার বিপরীত তথ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। অঙ্গুরীয়কটি গঠনোন্মুখ চন্দ্র নহে, চূর্ণীকৃত উপগ্রহের পরাবশেষই মাত্র।

কিন্তু কোন পরিমাণে পৃথিবী হইতেছে এবং এই পরিমাণটি চূর্ণীকৃত হইয়াছিল? বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের খুব সরল ও সহজ উত্তর দিয়াছেন। পরিষদ অন্যান্য গ্রহকক্ষের ন্যায় তাহার বিপুল পরিমণ্ডলে চতুর্দিকস্থ ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্রগুলিকে অবলুপ্তকাল হইতেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই টানাটানির ফলে উপগ্রহগুলির স্বকক্ষের ভ্রমণ বন্ধীভূত হইয়া কেন্দ্রীয় গ্রহের অনেক নিকটে আসিয়া পড়িতেছে। পরিষদ সর্বাপেক্ষা নিকটতম চন্দ্রটিও কোন কালে পরিষদের সহিত বিপজ্জনক সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইবার নহে। তখন নিম্ন স্তরে আবর্তনশীল কেন্দ্রাতিগ শক্তি এবং পরিগ্রহের কিংবা বস্তুলিতের আকর্ষণ-শক্তি—এতদুভয়ের টানাটানি সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্র খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে কালক্রমে আরও নিকটে আসিয়া আরও উহা চূর্ণীকৃত হইল। অবশ্য এইরূপ অবস্থা পরিবর্তনে অতীতের সুবৃহৎ চন্দ্রের ভগ্নাবশেষে ধূলিরাশি বর্তমানে বলয়াকারে পরিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতে বেড়াইতেছে। (৪র্থ চিত্র)

প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রেরই স্বতন্ত্র বস্তুরাশির অনুপাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত এই বিপজ্জনক ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির পার্শ্বদেশের কাহারও এই সীমানায় উপস্থিত হইলে আর নিস্তার নাই। তাহাকে পরিগ্রহের বস্তুরাশির অবশ্যই উপজীব্য হইতেই হইবে। ফৈজানিক রচি (Roche) গাণিতিক প্রণালীতে হিসাব করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের এই বিপজ্জনক সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই সীমানার নাম হইয়াছে—রচির লিমিট। গ্রহের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার কাছাকাছি ভর দূরে এই 'রচির-লিমিট' নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই হিসাবে আমাদের পৃথিবীর চন্দ্র যখন ২০,০০০ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন উহা চূর্ণীকৃত হইয়া বলয়াকারে ঘুরিতে থাকিবে। অবশ্য নিকটতম কক্ষিতে এখন কোন চন্দ্রটির যাইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বর্তমানে পরিগ্রহের নিকটতম চন্দ্র 'মিমাস' রচির লিমিটের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ কয়েক লক্ষ বৎসরের মধ্যেই তাহার চূর্ণীকৃত পরিগ্রহের আরেকটি অঙ্গুরীয়ক গঠন করিবে।

কোন উপগ্রহ 'রচির-লিমিটে' আসিয়া পড়িলে উহার দিকের টানাটানির ফলে কেমন করিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া যায় তাহা সাধারণ একটি পরীক্ষা হইতেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। একটুকরা নরম তাপসের উপর খুব সামান্য পরিমাণ লৌহচূর্ণ গ্রহণ করে ইস্পাত ব্যবসায়ীরা যে যন্ত্রে চুম্বক তৈরি করিয়া, একখানি চুম্বক তাহার কাছে আনিলে দেখা যাইবে, লৌহচূর্ণগুলি চুম্বকের আকর্ষণে সরিয়া পড়িয়া মোট একটি লাইনের আকার ধারণ করিবে। কাগজখানিকে আস্তে আস্তে চুম্বকের দিকে সরাইতে সরাইতে দ্বিতীয় লৌহচূর্ণের খুব স্পষ্ট ঠোঁবক ক্ষেত্রে পৌঁছিবামাত্রই চূর্ণের মত ছড়াইয়া পড়িয়া একটি লাইনের সৃষ্টি করিবে। এখন এই ঠোঁবক শক্তিকে যদি গ্রহের আকর্ষণ-শক্তির মত কল্পনা করা যায় তবে অসংখ্য উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহগুলি সহজেই উপলব্ধি হইবে। (৫ম চিত্র)

আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কৌতূহলটা যেন কিছু বেশী। বিশেষতঃ উহার খালগুলি বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু। তাহার কারণ, খালগুলি সরল রেখাক্রমে যেন সমান্তরালভাবে বহিয়াছে বলিয়া অনেকে উহাদিগকে কোনরূপ আভাবিক বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু সুবিধে হইলেই যা ইচ্ছাশক্তিকে তৈয়ারী বলিয়া কে? হিমালয়ের উপরের দেশ, সমুদ্র ও বিস্তৃতি দেখিয়া বিস্ময়ে

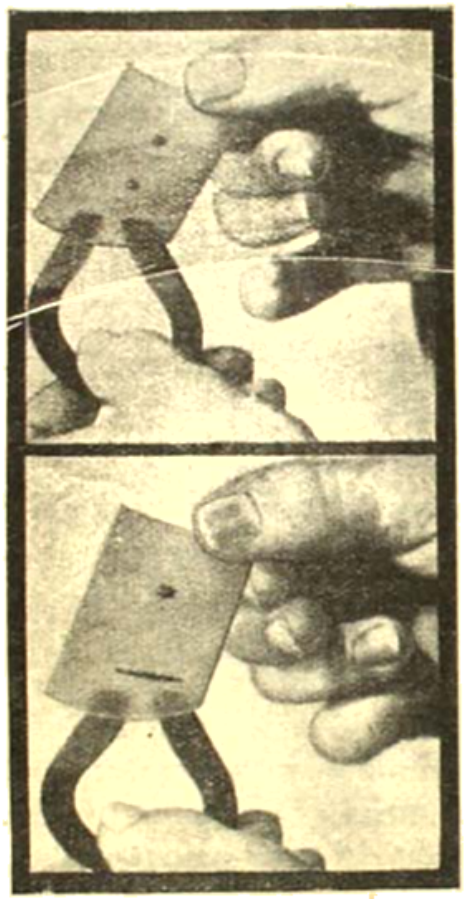

চুম্বক ও লৌহ চূর্ণের পরীক্ষা।

হতবুদ্ধি হইতে হয়। মনুষ্যশক্তি দ্বারা এইরূপ বিরাট ব্যাপার সম্ভাবনীয় নয়, কাজেই কল্পলতারা অধিবাসীদিগকে অতিমানব কল্পনা করিয়া যে তাহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত ঘটনা ও কত গল্প প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা বিবিধ পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, এতকাল যেগুলিকে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য ইতি-মানুষনির্ম্মিত কৃত্রিম খাল বলিয়া মনে করা হইত, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নয়, একটা চোখের ধাঁধা মাত্র।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইটালী দেশীয় বৈজ্ঞানিক শিয়াপারেলী মঙ্গলগ্রহের এই সরল রেখার মত দাগগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন। তৎপরে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক লাউয়েল অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ

করেন। লাইবেল প্রমাণ করিলেন যে, চোখের রেখাগুলি দৃষ্টির খাল। মঙ্গল গ্রহে জলাভাবহেতু তথাকার ইঞ্জিনিয়ারগণ কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এই সব খাল খনন করিয়াছেন।

আরো সহজ গুরুতর যে চোখের ধাঁধা ভাঙা প্রমাণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একটি সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন—একখানি লাল কাগজ টাইপ-রাইটার যন্ত্রে প্রবেশ করাইয়া তাহাতে কোন কিছু না লিখা অবস্থায় পর পর অনেক টাইপ করিলে তাহা হইতে প্রায় ৭ টি 'আদ-বিশিষ্ট একখানি গোল চাকৃতি কাটিয়া আনুন। চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে এই চাকৃতিখানিকে কালো চক্ষুকোষ একখণ্ড কাগজের উপর আঁটিয়া দিন এবং তুলির সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের ছবি অনুযায়ী লাল রংএর রেখাগুলি এবং কালো রংএর দুই একটি প্রধান প্রধান হ্রদ, সমুদ্র অঙ্কিত করুন। ইহাতেই মঙ্গল গ্রহের একটি মোটামুটি প্রতিকৃতি তৈয়ারী হইবে। এই প্রতিকৃতিখানিকে চোখের সামনে কিছু দূরে রাখিয়া আস্তে আস্তে পিছনে সরাইতে থাকুন। সরাইতে সরাইতে রেখাগুলি যখন স্পষ্ট দেখাইবে, তখন প্রতিকৃতিখানি স্থিরভাবে রাখিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকুন। দেখিবেন, চক্ষু বা সমুদ্রের স্থান হইতে টাইপের রেখাগুলির লাইনের উপর দিয়া একপ্রকার কালো রেখা ছুটিয়া বাহির হইতেছে: কখনও বা দেখা যাইবে, লাইনগুলি যেন একবার আসিতেছে, একবার যাইতেছে, কখনও বা স্পষ্ট, আবার কখনও বা অস্পষ্ট হইতেছে এবং সমগ্র আপাতঃ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া লাইনের অঙ্কিত মঙ্গলগ্রহের খালের মতই প্রতীয়মান হইবে। (৬ চিত্র)

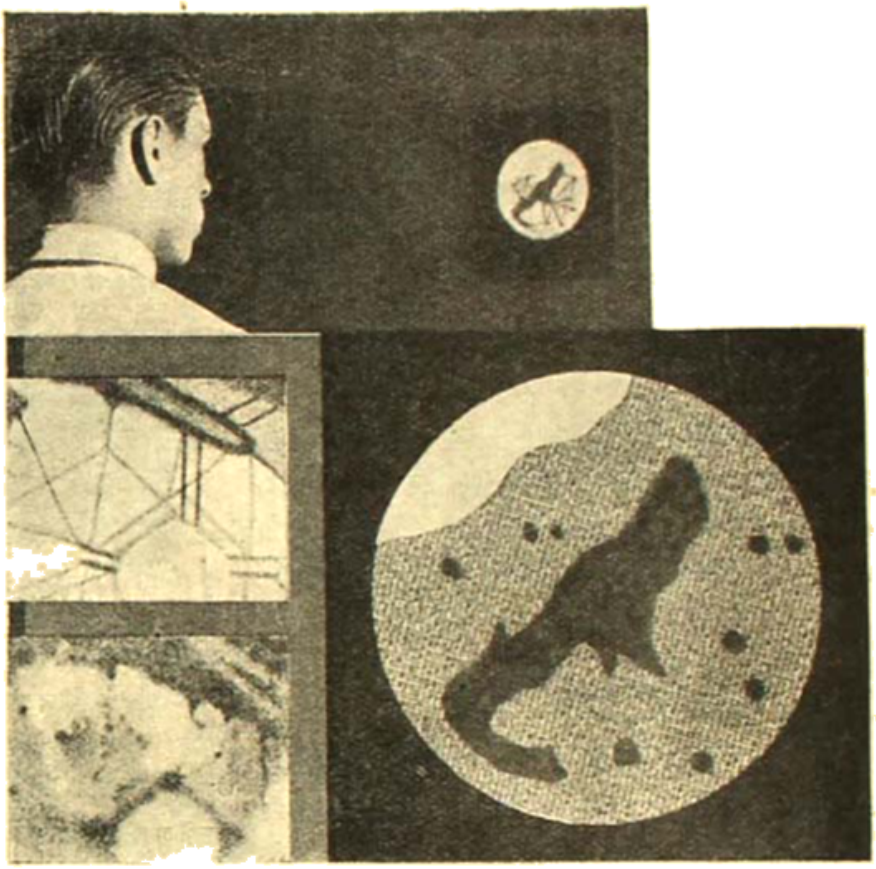

মঙ্গল গ্রহের কল্পিত খাল ও 'টাইপ' করা কাগজে তাহার চক্ষুকৃতি পরীক্ষার প্রণালী

মঙ্গলগ্রহের খালের সম্বন্ধে আজ যাহারা সন্দেহী, এই সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাহাদের সকলকেই প্রতিভা দান করিতেছে।

নিকোলা টেস্লা

নিকোলা টেস্লার নাম জানেন না বৈজ্ঞানিক জগতে এমন লোক বিরল। সম্প্রতি এই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ৭৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার অক্ষয়ী প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। কাজেই এখানে আমরা অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ১ই এবং ১০ই জুলাই-এর মধ্যবর্তী মধ্যরাত্রিতে স্মুদ্রাগালিনার শিলেমান নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ

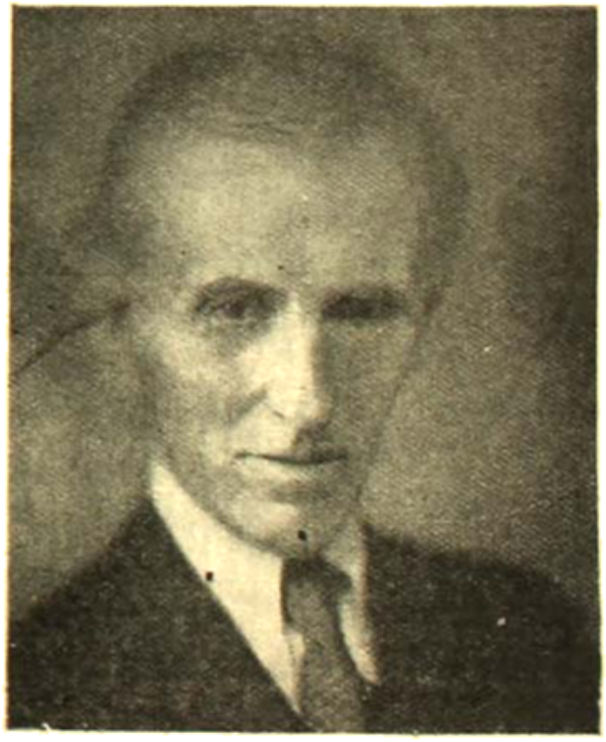

৭। নিকোলা টেস্লা।

করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক এবং মাতা অত্যন্ত মার্জিত এবং শিক্ষিতা। ৬৫ প্রকার আবিষ্কারক ওয়ারেন কলিয়াছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই টেসলার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রায় ছয়টি বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করেন এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দ হইতে তাহাই কার্যক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। এখনও পর্যন্ত তিনি আইনতঃভাবেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন এবং তিনি অনেক নূতন বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

টেসলা বলিয়াছেন, বিশেষ অসুবিধা থাকায় আজ পর্যন্তও তিনি তাঁহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে—ইস্পাত, প্লাস্টা, এলুমিনিয়াম এবং অন্যান্য ধাতু তৈয়ারী করিবার সুলভ ও সহজসাধ্য প্রণালী।

বায়ুমণ্ডলে 'আয়ন'-কণিকার সংখ্যা-নির্দ্ধারক নূতন যন্ত্র

বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অসংখ্য 'আয়ন'-কণিকা অনবরত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। মনুষ্যদেহের উপর বায়ুমণ্ডলের এই 'আয়ন'-

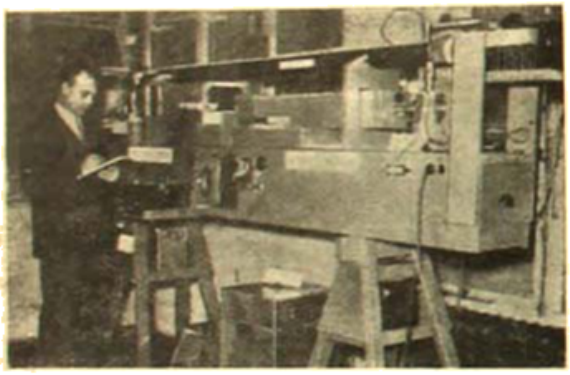

৯৮। 'আয়ন' গণনা করিবার নবোদ্ভাবিত যন্ত্র।

কণিকার প্রভাব কিরূপ সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন হইতেই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু এতদিন যাবৎ এই 'আয়ন'-কণিকার সংখ্যা নির্দ্ধারণে কতকটা আনুমানিক গাণিতিক হিসাবের উপরই নির্ভর করিতে হইত। সম্প্রতি কার্ণেগী ইনষ্টিটিউটের বিশেষজ্ঞগণ বিশিষ্ট ভাবে এক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষ পরিমাণ বায়ুতে কতগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন 'আয়ন'-কণিকা রহিয়াছে, এই যন্ত্র সাহায্যে তাহা নির্ভুল ভাবে নিরূপণ করা যাইবে। এই যন্ত্র পরীক্ষাকালে দেখা গিয়াছে—যখন বায়ুমণ্ডলে ধোঁয়া, ধুলা প্রভৃতির আধিক্য হয় তখন এই বৈদ্যুতিক শক্তি অনেক কমে হ্রাস পায়।

বিদ্যুৎ-চালিত অদ্ভুত মোটর গাড়ী

অষ্টিন মোটরকোম্পানির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ হেনরী এডওয়ার্ড মোর্টি 'হোপ-হেন' নামক এক অদ্ভুত মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। এই 'হোপ-হেনকে'

৯৯। দুই চাকায় চালিত অদ্ভুত মোটর গাড়ী।

কতকটা এরোপ্লেন এবং কতকটা মোটর গাড়ী বলা চলে। গাড়ীখানির নির্ম্মাণ-কৌশলও বিচিত্র প্রকারের। সম্মুখভাগে খুব ছোট একটি চাকা আছে। পিছনের চাকা দুইটি অপেক্ষাকৃত বড়। পিছনের এই দুইটি চাকার উপরই গাড়ী চলে। প্রথম চলিতে আরম্ভ করিবার সময় গাড়ীর তিনটি চাকারই প্রয়োজন হয়, কিন্তু ক্রমশঃ বেগবৃদ্ধি হইলে চালক পিছনের বাতাসের হালকানি গতিকৌশলে একটু উপরের দিকে ঘুরাইয়া দেয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর সামনের দিক ভূমি হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে এবং কেবল পিছনের দুই চাকার উপর অনায়াস বেগে ছুটিয়া চলে। বাতাসের হালকা লাগাতেই গাড়ীখানিকে নিয়ন্ত্রিত ঘুরান ফিরান যায়। গাড়ী থামিবার সময় সম্মুখস্থ চাকাটি আবার মাটীতে আসিয়া লাগে। উপরের চিত্র হইতে গাড়ীখানির মোটামুটি নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারা যাইবে।

১০০। নূতন ধরণের একচাকার গাড়ী।

অদ্ভুত এক চাকার গাড়ী

উপরের ছবিতে দেখা যাইতেছে, একটি বালক কিরূপ সহজভাবে একটি প্রকাণ্ড চাকার মধ্যে বসিয়া আছে। একজন অষ্ট্রীয়ান ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি এই অদ্ভুত এক চাকার গাড়ীটি নির্মাণ করিয়াছেন। বসিবার আসনটি চাকার ভিতরের দিকে এমনভাবে বসানো আছে যে ইহা মোটেই এদিক-ওদিক নড়িতে পারে না, অধিকন্তু পায়ের সাহায্যে চাকাটিকে ঘুরাইয়া ইচ্ছামত চালাইয়া লওয়া যায়। চাকার পরিধি অতিরিক্ত বড় হওয়াতে একাধিক চক্রসংযুক্ত গাড়ী অপেক্ষা ইহা দ্রুতগতিতে চলিতে পারে।

প্রবল গতি-শক্তি-বিশিষ্ট অদ্ভুত চক্রযুক্ত জলযান

একজন ইংরেজ আবিষ্কারক সম্প্রতি প্রোপেলারের বদলে এক অদ্ভুত চক্রযুক্ত জলযান নির্মাণ করিয়াছেন। বর্ষা চুরুটের আকৃতিবিশিষ্ট তিনটি নৌকা 'ভাটামারানের' ন্যায় পাশাপাশি সংলগ্ন। মধ্যের নৌকাখানিতে চালক এবং যাত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যেই শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রাদি ও উপরের দিকে বিপুল শক্তিশালী দুইখানি 'প্রোপেলার' স্থাপিত হইয়াছে। পাশের দুই দিকের জলযান নৌকাদুইটির অভ্যন্তরে চিত্রানুযায়ী কতকগুলি চোঙাকৃতি 'রোলার' জলসংলগ্ন হইয়া এমনভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, সেগুলি মধ্যবর্তী নৌকাখানির শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রসাহায্যে জীবন বেগে ঘুরিতে পারে। ধীরে ধীরে চলিবার সময় পাশের দুইখানি নৌকার সাহায্যেই জলযানটি ভাসিতে পারে; কিন্তু গতি বৃদ্ধি হইলেই 'রোলার'গুলির আবর্তনবেগে জলযানের সমুখ-ভাগ জল হইতে উপরে উঠিয়া পড়ে, কাজেই জলের প্রতিবন্ধকতা কমিয়া যায়, অতি সামান্য জল কাটিয়া চলিতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ প্রোপেলারের জীবন টানে এই জলযান অপরিসীম বেগে ছুটিতে পারে। প্রোপেলারের বদলে পিছনে অবস্থিত হালের সাহায্যে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে। উপরের ছবিতে এই অদ্ভুত জলযানের বিভিন্ন অংশের পরিচয় প্রদান করা হইল।

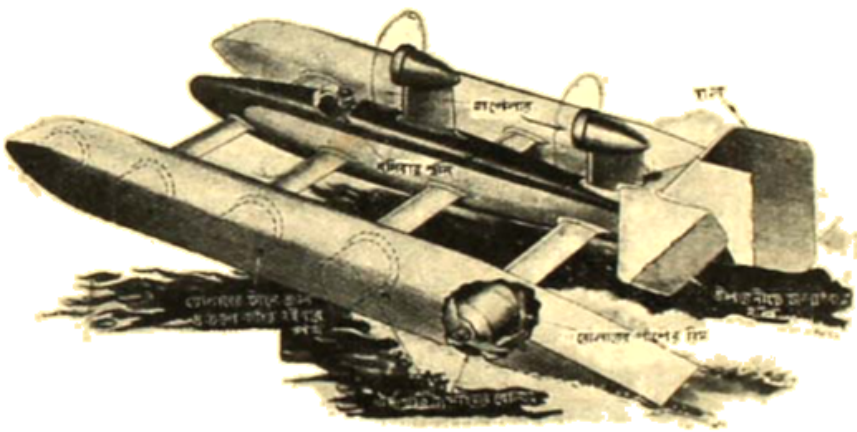

১১। চক্রসংযুক্ত অদ্ভুত জলযান।

বিশ্ব পতাকায় অদ্ভুত শক্তিশালী ইঞ্জিন

বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার পারউড, অদ্ভুত শক্তিশালী ৩৮ ফুট লম্বা একখানি ছোট মোটরবোট নির্মাণ করিয়াছেন, এই বোটের নাম রাখিয়াছেন মিস্ এমেরিকা এম্ব। মোটরখানি মিনিটে দুই মাইলের উপর ছুটিতে পারে। ইঞ্জিনের শক্তি ৬৮০০ অশ্বশক্তির সমান। এক সেকেণ্ডে এক গ্যালন বায়ু 'সাক্সিং'

৩৮ ফুট বোটে বিশ্ব পতাকায় অদ্ভুতকর্মা শক্তিশালী 'পারউড' ইঞ্জিন।

মিস্ এমেরিকা এম্ব।

হয়। ইঞ্জিনটিতে ৬৮টি সিলিণ্ডার এবং ১২২টি "ভালভ" আছে। কার্য্যকরী অবস্থায় ইঞ্জিনটি মিনিটে ২৯০০ বার ঘোরে, প্রোপেলার ঊর্দ্ধ সংখ্যায় মিনিটে ৩,২০০ বার ঘুরিতে পারে, উপরে এই মোটরবোট ৬ হাজার ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি ধরিয়া দেওয়া হইল।

হাওয়া চালিত উচ্চতর বিচিত্রযান

হংকং-নিকারাগুয়ের সুবিধার নিমিত্ত সম্প্রতি এক বিচিত্র নৌকা তৈয়ারী হইয়াছে। প্রোপেলের 'প্রোপেলার'-এর সাহায্যে এই নৌকা জলের উপর দ্রুতগতিতে ছুটিতে পারে, আবার জমির উপরও ফ্যান-টারবাইনের সাহায্যে ঠিক মোটরগাড়ির মত চলে। জলের উপর চলিবার সময় একটি কল টিপিলেই 'ফ্যান টারবাইন'গুলি উপরে উঠিয়া পড়ে। জমির উপর চলিবার সময় কল টিপিয়া আবার টারবাইনগুলিকে নামাইয়া দেওয়া হয়।

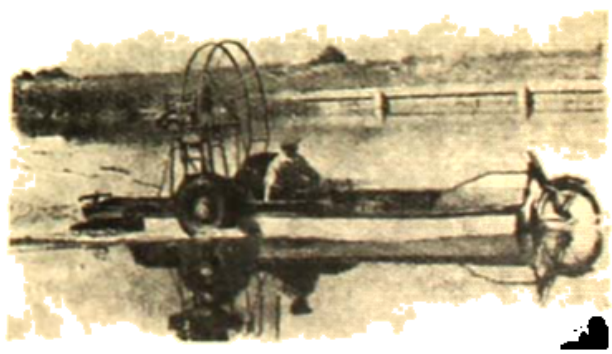

যন্ত্রচালিত ক্ষুরের ফলায় ধার দেওয়া

দাড়ি কামাইবার জন্য অনেকেই ক্ষুরের ফলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক দিন ব্যবহার করিবার পর ফলাগুলি অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে ফেলিয়া দিতে হয়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় ছবি মার্কিক নামীয় এক ব্যক্তি 'ষ্ট্রাইড্রো' নাম দিয়া ক্ষুরের ফলায় ধার দিবার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়াই ক্ষুরের ফলায় ধার দিতে পারিবেন।

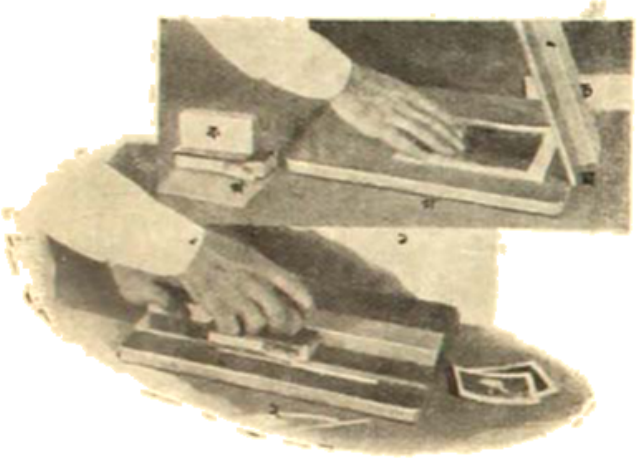

১৪। যন্ত্রচালিত ক্ষুরের ফলায় ধার দেওয়ার উপায়।

সাধারণ ছবি কাটিবার যন্ত্র ইহাকেই বলিতে পারেন। ১নং ছবিতে 'ক' একখানি কাঠের 'ব্লক'—একখানা কাঠের উপর আরেকখানা কাঠ আটিয়া তৈরী করা হইয়াছে,—তাহার একপাশে 'খ' ঠিক্‌রে 'ব্লক'খানি একটু তেরছাভাবে যুক্ত থাকে আটকানো হইয়াছে। ২নং ছবিতে কাঠের ব্লকের সঙ্গে ক্ষুরের ফলার সংযোগের ব্যবস্থা দেখান হইয়াছে। ১নং ছবিতে 'গ' আরেকখানা

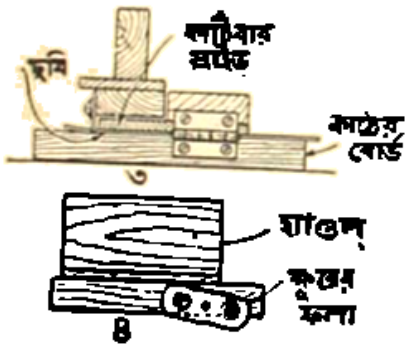

৪

যন্ত্রচালিত ক্ষুরের ফলাকে কার্যোপযোগী করিবার উপায় প্রদর্শনের জন্য অংশ বিশেষের কর্তিত চিত্র।

কাঠের বোর্ড, তাহার সঙ্গে প্রায় ৩/৪ ইঞ্চি পুরু লোহা বা ধাতুর একখণ্ড ধাতুর পাত কব্জা দিয়া আঁটা। ৩নং ছবিতে ইহা পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে। তাহার উপর 'ব্যাণ্ডেজের' সমান উঁচু একখণ্ড কাঠের 'ব্লক' 'ঙ' স্থাপিত আছে।

ছবি কাটিতে হইবে তাহা 'গ' কাঠের উপর সমানভাবে রাখিয়া 'গ' 'চ' চাপা দিয়া ২নং ছবিতে প্রদর্শিত প্রণালীতে কাটিতে হইবে

উদ্ভিদ ও প্রাণীর আয়ুষ্কাল কি নির্দ্ধারিত না ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করাও সম্ভব?

প্রাণী ও উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারিত হইলে ইচ্ছানুযায়ী জীবনের অবসান ঘটান সম্ভবপর হয় কিরূপে? যদি বাঁচিয়া থাকিবার সময় নির্দ্ধারিত না-ই হইয়া থাকে, তবে পড়পড়তা হার হইতে আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করা সম্ভবপর কিনা? কিছুদিন হইতে এ বিষয়ে বহু-বিজ্ঞান অভিজ্ঞ বিবিধ পরীক্ষা পরিচালিত হইতেছে। একঘণ্টা মোটর গাড়ীকে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চালাইলে একঘণ্টায় মাইল যাইতে ২৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট লাগিবে। আবার সেই গাড়ীখানাকেই ঘণ্টায় ২০ মাইল হিসাবে চালাইলে এক ঘণ্টায় মাইল অতিক্রম করিতে দুই মিনিটও বেশী সময় লাগিয়া যাইবে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে জীবনযাত্রার নিয়মগুলি এখনো রীতিমত করা কি অসম্ভব? কোন উপায়ে যদি উদ্ভিদ বা নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের বৃদ্ধি স্থগিত রাখিয়া কিছুকাল পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়, তবে অনেকগুলি জন্তুর পরিবর্ত্তন রক্ষিত হয়। যে সকল উদ্ভিদ সাধারণতঃ এক বছরের বেশী বাঁচে না, পূর্ণতা বা পরিপুষ্ট না হইতেই কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের বৃদ্ধি কিছুদিন বন্ধ রাখিয়া পূর্ণাবস্থায় ফিরাইয়া আনিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যেমন, Saldidae, Hebridae, এবং Nepidae শ্রেণীর বিভিন্ন পোকা মাকড়কে স্বাভাবিক শারিরীক অবস্থায় রাখিয়া বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, যদি দেহ-পরিপোষক খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া বৃদ্ধি স্থগিত রাখিয়া কিছুকাল পরে আবার বাড়িতে দেওয়া হয়, তবে অনুপাতানুসারে তাহাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এসম্বন্ধে এখনও বিশদ বিবরণ প্রকাশের সময় উপস্থিত হয় নাই, কাজেই মোটামুটি পরীক্ষার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রেডিয়ো-ষ্টেশন

আমেরিকার ওরিগন প্রদেশের কিন্‌কিনাটি পল্লীর সম্প্রতি একপ্রকার রেডিয়ো-যন্ত্র আবিষ্কার।। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এই রেডিয়ো-যন্ত্রের ব্যবহারের ২৫০০ মাইলের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি অনায়াসে সঙ্গীত ও বক্তৃতা ইত্যাদি শ্রবণ করিতে পারিবেন। বিশেষ ব্যবস্থায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই রেডিয়োর শব্দ শোনা যাইবে। ইহার আবিষ্কর্ত্তার নাম পাওয়েল ক্রসলে, জুনিয়ার। ইহার ৫০০০০ লক্ষ ওয়াট শক্তিবিশিষ্ট, সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা ১০ গুণ বেশী। ক্রসলে সাহেব বলিয়াছেন, ইহার জন্য ইহাকে এমন কিছু হইবে না, যাহাতে সাধারণ রেডিয়ো-ষ্টেশনের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।

শীঘ্রই বাস্তবক্ষেত্রে এই পরীক্ষা হইবে।

জলসা-ঘর

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর তিনটার সময় নিয়মমত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশম্ভর রায় ছাদে পায়চারী করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসী ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন কিন্তু বলিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন তেমনই করিতে থাকিলেন।

আকাশের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলী-বাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী বাতি অকল্পিত ভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং ঢং ঢং করিয়া গাঙ্গুলী-বাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্ব্বে তিনশত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়-বাবুদের বাড়ীতে। এখন আর বাজে না। এখন বিশম্ভর-বাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব সুরু হয়। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়ীতে আর আসে না। তাহার পাদ্যঅর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গেছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ, মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয় না, গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে!

ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

ফরসীর মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর।

বিশম্ভর-বাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ।

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই একটা মৃদু টান দিয়া বিশম্ভর-বাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। সবরতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে পাকে নি এখনও পাপড়িগুলো।

ওদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিস্বরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে খুন বাড়ছে নাকি? যা দেখি, নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে। ডাকছে শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়াটার নাম। রায়বাড়ীর নগণ্যতম আস্তাবলের মধ্যে ওই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশম্ভর রায়ের ঊর্দ্ধশ্বাস বাহন। সেকালে, সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্ব্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ীবাঁধা, আবক্ষ শ্মশ্রু-গুম্ফশোভিত, গৌরবর্ণ, বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, শিখ এখানে কোথা থেকে এলো হে?

লোকে বলিত, শিখ নয়, আমাদের রাজা উনি বিশম্ভর রায়। বড় ঘরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। ঘুরে উড়িতেছে শুধু ধূলার একটা ঘূর্ণী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণা বেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশাইবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিতান্তনিষিদ্ধ দুর্দ্দান্ত তুফান বিশম্ভর রায়কে লইয়া কোরে বাহির হইত। দুই বৎসর পূর্ব্বে যেদিন নবাগত গাঙ্গুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে প্রাবে চোল-সহরৎ দ্বারা দখল ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল তুফানের পিঠ সওয়ার-শূন্য, নিতাই সহিস মুখের লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল—আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশম্ভরের দৃষ্টি দেখিয়া তারাপ্রসন্ন কথা শেষ করিতে পারে নাই। রায় উত্তর দিয়াছিলেন ৩টি কথায়, ছি—তারাপ্রসন্ন!

অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশম্ভর আবার ডাকিলেন—শোন্। অনন্ত ফিরিল।

বাবু বলিলেন—নিতাই কাল বলছিল তুফান দানা নাকি পুরো পাচ্ছে না।

অনন্ত বলিল—ছোলা এবার বেশ ভাল হয় নি। নায়েব বাবু বলছেন।

—হুঁ।

আবার ফরসীতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন—তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না।

—হুঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন—দানা পুরোই দিবি, বুঝলি! নায়েবকে আমার নাম করে বলবি।—যা, তুই নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া ঊর্দ্ধ মুখে বিশ্বম্ভর-বাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিভিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্ক ভাবে বোধকরি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন···এক···দুই। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঞ্জরাখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল। সে দিনের সে কি রূপ তুফানের! সে কি দুর্দ্দান্তপনা! শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার!

বিশ্বম্ভর-বাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীতের স্মৃতি তারকা-খচিত নত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্য্যাদার ভাস্কর প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্ব্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা তুফান সে আকাশে সর্ব্বাগ্রে জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়মজোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতালায় নামিলেন। চকমিলান বাড়ীর সুপরিসর দ্বিতীয় বারান্দা রায়ের দ্বিতীয়-সম্বনের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দার সারিসারি সোল-ফুলের [illegible] খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা আলোচিকা ফুর করিয়া উড়িয়া গেল। এপাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানা-ঘর। তুলার তুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাস-ঘর। জাজিম, সতরঞ্চি, গালিচা থাকে ঘরটায়। বোধ হয় কিছু পচিয়া গিয়াছে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের শব্দের সঙ্গে ফুন-ফান শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী কাড়ের কলমগুলি বোধ হয় চলিতেছে। ইহার পরই এ পাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাস-বরদারের। এই সমস্ত জিনিষের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনীদার-মহল এটা। রায়দের দপ্তরে বিভিন্ন জেলায় বড় বড় ধনী পত্তনীদার ছিল। পাচশো হইতে পাঁচ হাজার টাকা পাওনা রাখিত এমন পত্তনীদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথম খানির ছবি নাই, কাচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয় খানার কাচ নাই। তৃতীয় খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথার পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্ব্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নীচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে···

···সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়-বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদিপুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন—মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হলে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুঁটির শেকল—ও বড় কঠিন শেকল। হিসেবনিকেশের শেকল ঠিক রেখ—চঞ্চলার আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব-দরবারের কানুনগো।

কাগজ-কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গেছেন।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল—সেটা ঘেউ ঘেউ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না—অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা সখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ।

কাছারীর দেউড়ী পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

রায় ডাকিলেন—নিতাই!

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল—হুজুর।

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতীর গর্জ্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থির ভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা।

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতীটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত মহৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতীর

নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল—হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভর-বাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল 'মতি'। কিন্তু কর্ত্তা অনেকবার বাঘ শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি ঘরের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্ত্তা বলিয়াছিলেন—সেই ভাল রায়-গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভর-বাবুর মা বলিয়াছিলেন—শুধু গিন্নী নয়, ছোট-গিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

মাহুতের কথায় বিশ্বম্ভর বাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট ব্লেংরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন—কিগো মা-লক্ষ্মী? ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাঁহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ। রায় হাতীতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন এখন নয় না।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মীমেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন,—নিতাই তুফানকে বুঝিয়ে নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল—তুফান আর যাবে না আজ, হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হলে—

রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—লক্ষ্মীমেয়ে, মা আমার লক্ষ্মীমেয়ে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রভাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিল—গাঙ্গুলীবাড়ীতে বাবুর ছেলের ভাত। অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ!

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে সুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোটগিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, রুম—রুম—রুম। রায় ডেউড়ী পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনি করিয়া নিতা নাচিত, একদিকে তুফান, অন্যদিকে ছোটগিন্নী।

দোতলায় উঠিয়া তিনি ডাকিলেন—অনন্ত!

—হুজুর।

—নায়েবকে ডেকে দে।

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—রহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্ন-প্রাশন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—নিমন্ত্রণ-পত্র করেছে সেখ হয়!

কুণ্ঠিত ভাবে তারাপ্রসন্ন বলিলেন—হাঁ।

—একখানা গিনি আর পালা একখানা—কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাটাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর।

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—ছোটগিন্নীর পিঠের গদী-আজিম, ফটা বেস করে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ী নৌকতো দিতে।

তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন লক্ষর। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিল ভোগ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ীর লক্ষ্মী সে ঋণ-সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়-বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্ব্বংশও হইয়া গেল। জেলার জজ-কোর্টে ও হাইকোর্টের বিচারের নির্দ্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন কাঁসিহাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা মাত্র প্রিভি-কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। দান-ভোজন বিলাস-ব্যসন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়ীতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাতদিনের মধ্যে রায়গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয় সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর

বাঘ দিগ্বিজয়ের অশ্বমেধ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত মত-শিকে চড়ার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল হয় নাই। চড়ার প্রতীক্ষা সেদিন হইতে করিয়াছিলেন তিনি যে জানে—কিন্তু মতলবটা সেদিনও তিনি ঠিক করেন নাই। মতলব হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি-কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল সেই দিন। মতুয়া স্ত্রী পুত্র কন্যার চড়ার পরও এবাড়ীতে একলা-ঘরে বাতি জ্বলিয়াছে। সেতার, সারেঙ্গ, মৃদঙ্গ বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথ রাত্রি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের ছাওয়া চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও মোষে মোষে লড়ালড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক্। প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব গলিয়া গেল। রহিল বাড়ী ঘর ও লাখরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ এইটুকু, কাগজের উপর কালির সিকলে এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলেন যে, সে-টুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ঐ বন্দোবস্তেই দেব-দেবা চলে, ছোট-গিন্নীর বরাদ্দ চাউল আসে, রক্ষকদের বেতন হয়, মোটকথা এখনও যেটুকু আছে সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে, রায়বাহাদুর রায়শালোগ চাল—নিত্য প্রাতে লাখরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ—ঐ বিল হইতেই জলচর পাখীর বন্দোবস্তের ফলে আসে—পাখী। এ সমস্ত অতীত কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ কাটল-ধরা রায়বাড়ীর নাম এখনও রাজবাড়ী, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।

সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের চোখের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।

নবীন গাঙ্গুলী ভাবে—মরা পাহাড়ের চূড়ো ভাঙ্গতেই হবে আমার।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘণ্টা উঠিতেই—সে গরবিণীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টাটা বাজিতে লাগিল চং—চং—চং—চং।

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভর-বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর-বাবু বসিয়া ছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তাগিন্নীদের ছবি টাঙানো। সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভর-বাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া তাকিলেন—অনন্ত, হাত-বাক্সটা দে ত।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের উপরের থাকে—রায়বাড়ীর লক্ষ্মীর ঝাঁপি সোনা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন, একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্সটি খুলিলেন। বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারের মধ্যে একটি সীঁথি রহিয়াছে। এই সীঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটি ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়খানি রাণগিন্নীর আশীর্ব্বাদের মোহর, কয়খানা দূরক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরই প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে নিঃশব্দে তিনি তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরই ছোটগিন্নীর ঘণ্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটের প্রান্তে তৈল-মসৃণতায় ঘেরিয়া সিন্দুরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়বাড়ীর ভাঙা দেউড়ীতে। গাড়ী হইতে নামিলেন মহিম গাঙ্গুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন—আসুন।

অনন্তও দোতালা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ীর পাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায়? দেখা করব যে।

গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনী করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্য্যন্ত রায়বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিয়াছে, হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল—হুজুর এখনও উঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে বলে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নাই। আপনি বরং বলে যান আমাকে, কি বলতে হবে, আমি বলব।

অদম্যিষ্ণু ভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রূপার গ্লাসে গাঙ্গুলীর সম্মুখে সরবৎ ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদা উঠেছেন যে?

—উঠেছেন। আপনার খবর দিয়েছি। আপনাকে তিনি।

সরবৎ পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ চমৎকার শরবৎটুকুত! কিসের সরবৎ রে?

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে কাশীর মদলা, আমি জানিনে ঠিক।

ঘোতালার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, এস, এস, বস ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারী দুঃখ হয়েছে, ঠাকুরদা।

তেমনি হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদাদা বলে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব, কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো নিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসী টানায় ভাণে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, সখ করে লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আনিয়েছি। তাদের গানের কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে টানিয়া নলটি দূরে রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম। বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মধ্যে মধ্যে বড় কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা তা'হলে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার। তাঁরা সব আসবেন কি না।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ করনা ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাঁড়াইয়া সহসা বলিয়া উঠিল, বাড়ীটা করে রেখেছেন কি ঠাকুরদা। মেরামত করান দরকার যে।

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

* * *

গাঙ্গুলী-বাড়ীতে নাচের আসর আলোকে ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙ্গুলীদের নিজেদের 'ডায়নামো'। ইলেকট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙীন কাগজের মালা চারিপাশ বেড়িয়া দুলিতেছে। নীচে সতরঞ্চির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। একদিকে সারি সারি চেয়ার, অন্যদিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসর।

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। হবলচী সাবেঙ্গীদার আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। ওদিক পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরের কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হাঁ, রূপ বটে!

গান আরম্ভ হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙ্গুলী বসিয়া।

দুজন নর্তকীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন কিনাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা সুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কি একটা হাস্য পরিহাস চলিতেছিল। গাঙ্গুলী-বাড়ীর চাপরাশীর দল সাধারণ শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ—চুপ।

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বাঃ। নর্তকীর নৃত্যগতি যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া এবার তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপল গতির কণ্ঠ-সঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝর্ণা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বকশিশ আসিল।

তারপর আবার—আবার—আবার। আর আসর অলস মন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল—সকলে খুব খুসী হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল—আপনাদের মেহেরবাণী।

সত্যই মহিমের মেহেরবাণীর অন্ত ছিল না। তিনদিন যাবনার স্থলে পাঁচদিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবাণী সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল—এখানে আমাদের বাগবাড়ী আছে, একবার ঘুরে যেয়ো। বিশ্বম্ভর রায় সমজদার আমীর লোক। গাওনা হয়ত হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সসম্ভ্রমে কহিল—ওসব কথা আমরা শুনেছি, হুজুর। একবার যাব বাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আমার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল এ ঐ ধূর্ত্ত মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে! সে গম্ভীর ভাবে বলিল—বাবুর ভবিষ্যৎ আচ্ছা নেহি—নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজীটি বলিল—মেহেরবাণী করতে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল—সে হয় না।

বাইজী দুঃখিত ভাবে বলিল—মেরে নসীব।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময়ে দোতালা হইতে হাঁক আসিল—তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন—কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ী ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

—হুঁ। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন—শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলে?

—সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ।—মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারী-ঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্য বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল—কসুর মাফ্ করতে হুকুম হয় মেহেরবান্। এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের দানার মত রং, সুর্মা-আঁকা টানা দুটি চোখ—মাদকতাভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত দুই ঠোঁট, ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটী, মৃত্যু যেন অঙ্গে আলস্যভরে দেহখানিতে বিরাম লইয়াছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন—বৈঠিয়ে।

দূরবর্ত্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল—বাহাদুরের দরবারে বাঈজী গান শোনবার জন্য হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন—তাঁহার ভবিষ্যৎ খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা ভওয়াইয়ের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল—সবার মুখে শুনেছি—এখানকার বড় ভারী সমঝদার হুজুর বাহাদুর। গাঙ্গুলী বাবুও বললেন, আমীর, এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মুহূ হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—হোগা মজলিস সাম্‌কো। তারপর ডাকিলেন—অনন্ত।

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সে সম্মুখে আসিতেই বলিলেন—এঁদের বাসা দিয়ে দে। নীচে তালুকদারদের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল—আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল—বহুৎ নসীব মেরে—বহুৎ মেহেরবাণী হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্ব্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ পর সে কহিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ী একশো টাকা করে রাত্রে নিয়েছে ওরা।

—হুঁ।

করবার নলে টান দিয়া রায় বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—?

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শো দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রায় উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়বংশের মাঙ্গলিক সীঁথি খানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নের হাতে দিয়া বলিলেন—দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—রাধারাণীর জন্য জড়োয়া সীঁথি খরিদ, দাম ওই দেড়শো টাকা।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ী তালাখোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসা-ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাস-ঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘরদুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ীর পুরাণো ঝি মাজিতেছিল—আদাসেঁচা, সড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপপাশ, আতর-দান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল—সদরে লোক পাঠাতে হবে, নায়েব বাবু।

নায়েব বলিল—ফর্দ্দ করেছি আমি। শোন দেখি, কিছু ভুল হ'ল কিনা।

ফর্দ্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল—সবই হয়েছে—বাদ পড়েছে দুটো জিনিষ। তরিতুই আতর আর বিলিতী বোতল একটা।

নায়েব বলিল—ছিল ত একটা।

—তাতে আর খানিকটে আছে। মাকে মাঝে একটু একটু এক এক দিন খান ত। কিন্তু আজ যদি চান তবে একটা বোতলে হবে না, নায়েব বাবু।

নায়েব বলিলেন—কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কে ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক।

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে—

নায়েব বলিল, আচ্ছা আমি বলে আসছি।

বিষম্ভর-বাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন,—তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙ্গুলীবাড়ীতে যাও, বহিমকে নিমন্ত্রণ করে এস। আর গ্রামে ভদ্রলোক যেছে বেছে নিমন্ত্রণ করেতে হবে। গাঙ্গুলী বাড়ী যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল—তাই যাব।

রায় বলিলেন—ছোটগিন্নীর পিঠে গদী দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে দিয়ে নিতাইকে পাঠান দরকার সদরে।

—হুঁ।

কিছুক্ষণ পর রায় বলিলেন—তাই থাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের ক্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাড়ীর পিছন দিয়া দেবদারু-ছায়াচ্ছন্ন রাজবের নির্জ্জন পথখানি পরিষ্কার দেখা যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বহুদিন পরে সে পথে বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দৃপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দ্দান্ত-পনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনি বাঁকান ঘাড়, তেমনি পদক্ষেপ।

আরও কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিণী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেজের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সমারোহ! রায়বাড়ীতে বহুদিন পর সমারোহ!

ওদিকের জলসা-ঘর হইতেই বোধ করি শব্দ আসিতেছিল ঠুং—ঠাং—ঠুং—ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড় দেওয়ালগিরি হুকে হুকে টাঙাইতেছিল। পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিষম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন—দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকের প্রাচীরবিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবা বয়সের প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ দুর্যোধন রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্য্যন্ত, সকলেরই বিলাস ও ব্যসনে মত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কী বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছেন গদীর উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিষম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝড়ের খেলা খেলিয়া গেছে। রায়ের মনে পড়িল কত কথা! ওই রাবণেশ্বর রায় এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচশো মোহর এক বাইজীকে একদিন বকশিশ দিয়া গেছেন। দুর্দ্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল··চন্দ্রা, চন্দ্রাবাই! আসরভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা!

অনন্তের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। সে মুখ দেখিয়া আকাশে ঝড় উঠিবার পূর্ব্বের অবস্থা অনন্তের মনে পড়িল—থমথমে, রাঙা। কোন্ রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে-মুখে উৎসের মত সহসা আজ উথলিয়া উঠিয়াছে!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনন্ত পদাতের উপর রূপার গ্লাসে সরবৎ বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তের অঙ্গে জরীদার চোপদারের উর্দ্দি, কোমরে পেটী, মাথায় পাগড়ী, বুকে রায়বাড়ীর হুকুমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচান ধুতি—শুভ্র ঝিন্‌ঝিনে মিহি মুসলমানী চংএর পাঞ্জাবী, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল। রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মুরশিদাবাদে জমিদার-বন্ধুর বাড়ী যাইবার সময় এই পোষাক তৈয়ারী হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন—সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল—বাতি জ্বালা হচ্ছে।

—লোকজন?

অনন্ত বলিল—নাখরাজদার আওয়ারীরা বাপবেটায় এসেছে। দেবোত্তরের নাখরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়ীতে আছে।

নীচে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত দ্রুত পদে নীচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙ্গুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলাফেরার শব্দ শোনা যায়। নীচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে তবলা-সুরে তাহার সহিত মৃদু সুর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল হুজুর।

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন—হুঁ।

—আসর বসতে পাচ্ছে না।

—হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বলিলেন—জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের দেরাজ খুলিয়া মোজা ও প্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া সে জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারী সুরু করিলেন। নীচে যন্ত্র-সঙ্গীতের সুর ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল—হুজুর।

রায় শুধু বলিলেন—হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন। সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন—সোডা।

•

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিনদিকে লম্বা কালির মত গদী পাতিয়া তাহার উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি ঝেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলি শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিভিয়া গেছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্বল্পস্থান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিতেছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্র-বাদ্যের ঝঙ্কার অস্ফুটের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারি পাশের আসরে বসিয়া বিশ-চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছিলেন। চার পাঁচটা গড়গড়া ফরসীতে তামাক চলিতেছে। তবুও অনেক নীরবে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে কেবল মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেটে টান দিয়া সে দ্বিতল গ্যালারির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—ক'টা বাতি নিভে গেল যে হে। কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু! তারাপ্রসন্ন রায় দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল—দেখুন, আলো বেশ খোলে নি। আমার ড্রাইভারকে বলে দিন, ৪টা পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়োজ্যেষ্ঠা নর্ত্তকীটি কেবল উর্দ্দুতে বলিল, যেন স্বগতোক্তি করিল, এ ঘরে সে আলো মানায় কি?

বাহিরে ভারী পায়ের জুতার আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পরেই অনন্তের পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে দরাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়বার ঝাড়িয়া লইয়া বিরক্তিভরে সে বলিল, বাপরে বাপ—কি ধুলো! তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া ফরসীর কলিকা বদল করিয়া অনন্ত, রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসী নামাইয়া হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্ণিস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ঐ সঙ্গে তবলচীর চর্ম্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী। গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে—দুই হাতে ঘেঘোরোঙের দুই প্রান্ত আবদ্ধ পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন—বাঃ।

সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর নৃত্যমুখর চরণ-চাপল্য স্থির হইয়া গেল। ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে না, গলা শুকিয়ে এল। ফুর্ত্তানাই সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

কৃষ্ণাবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত সরবৎ আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল। মহিম কহিল, থাক্—কখিন রাত্রি জেগে সর্দ্দি করে আছে আমার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—হুইস্কি এনে দে।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় একটা পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

রায় ইঙ্গিত করিয়া মহিমকে দেখাইয়া দিলেন। পানীয় প্রস্তুত করিয়া অনন্ত মহিমকে দিয়া দ্বিতীয় গ্লাস তুলিয়া আসরের দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভর-বাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, পিয়ারী বাই—এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি। পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি। রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল কাঁকের ঘরে বলিলেন—জেরা ধীরসে!

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফাগুন উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুত আচ্ছা!

রায়-বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি ভুলিতেছিলেন সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা—রায়বংশের শোণিতের অত্যন্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে।···পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌএর জোহ্‌রার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাইএর। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙ্গিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বক্‌শিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে, পাশে চাহিলেন। নাই—সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও নাই, আধেয়ও নাই। মাটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরঙ্গের মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফিরিতেছিল। তাহার গতি-তাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে। উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙ্গিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব্ব। রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন—বহুৎ আচ্ছা চন্দ্রা!

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল—বাঈজীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল—কৃষ্ণা বাই—থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাতকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারী বাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা বলিল, হুজুর বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি।···ওই-ওই বোধ হয় আসছেন তিনি।

রায় নয়—প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবী আদরে সে নামাইয়া দিল। রেকাবের উপর দুখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, তিনি কই?

—তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আর আসতে পারবেন না। আপনারা গান শুনুন। তিনি মাফ্ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া তাকিয়ার আলস্যভরে একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারাপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল।

• • •

ঘরের মেঝের উপর রায়গিন্নীর হাতব্যাগটা খোলা পড়িয়াছিল। গর্ভ তার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিলেন উদ্ভ্রান্ত শিরে। রায়বাড়ীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান কাল আজ সব ওলোট-পালোট হইয়া গেছে। অন্যমনস্ক ভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসা-ঘরের আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলসা-ঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়-বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া গেছে। বসন্তের বাতাসের সর্ব্বাঙ্গে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন্ গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ কাঁ-হা পিউ-কাঁ-হা! সাহেব মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া-যাওয়া চন্দ্রার মুখের বেহাগ শুধু যা শুধু যা পিয়া···। আধার উপরে চাহিয়া দেখিলেন

চাঁদ মধ্য-গগনে। পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিভাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন—থাক্।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন,—চাল্।

পয়াতের উপর খোলা বোতল পড়িয়া ছিল—রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় নিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়!

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল—নিশীথ রাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী—দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিরাজ করদিনী। নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভাণে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি। হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন,

চন্দ্রা···চন্দ্রা। তাঁহার চন্দ্রা! এ গানও যে চন্দ্রার! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল—জনাব!

রায় ব্যগ্র ভাবে ডাকিলেন—চন্দ্রা, চন্দ্রা আও, ইধার আও। দোস্ত লোক চলা গিয়া। চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলে তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে! হাসিয়া রায় তাহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন—ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আজ থাকা যায়!

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল—জনাবকে হুকুম হোয়ত বাঁদী যে সঙ্গে হেঁ। মৃদু হাসিয়া রায় বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়-বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল, হে প্রিয়, বরা ফুলে মালা আমি গাঁথি না। উচ্চ শাখায় ওই যে ফুলের স্তবক, ওই আমায় দাও। আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্য। উর্দ্ধ মুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভাণে চীৎকার করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরাসক্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী!

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গেছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয় হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাসের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া, মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সন্তর্পণে তাহার মাথার দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙ্গুলীবাড়ীর ঢিনটার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল···

ঢং—ঢং—ঢং।

···রায়বাড়ীর ঝিলানে ঝিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা, পিয়ারী। তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত পিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্য তাকিয়া পাল্টিতে। নীচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন—পাগড়ীর চাদর সওয়ারের পোষাক দে। নিতাইকে বলে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে। জলদি!

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, রায় গেঁকে চাড়া দিতেছেন।

এ মূর্ত্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল—মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল, তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরণে চোস্ত পায়জামা—গায়ে আচকান—মাথায় দাদা পাগড়ী। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদার নাগরা—হাতে চামর-দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধূলার ঘূর্ণী উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিয়াছিল। শেষরাত্রির শীতল বায়ু হু হু করিয়া রায়ের উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সুরার

উগ্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম। গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ী চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধহয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল—গাঙ্গুলী-বাবুরা কিনে থেকে···

···রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন।

তখনও গাড়ীর আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়রাজাদের আমলে···

চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠের উপর, কোথায়!—এ তিনি কোথায়!—ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীর্ত্তিহাট সম্মুখে। মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কষাঘাত করিলেন, আবার কষাঘাত,—তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন—নিতাই!

তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব করিলেন, তুফানও থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গেছে। তাহার সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, বেটা—বেটা!

তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা—তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান। ওঠ ওঠ।

নিতাই পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, বড় হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডা হলেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রায় দেখিলেন নিতাই। নিতাইএর হাতে তুফানকে দিয়া স্খলিত-পদে রায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসা-ঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভি-সারিকা চলিয়া গেছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। কাড়ে দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে লুপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মৃদু হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। বেলিংএ ভর দিয়া ভীতার্ত্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত—! অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই!—সে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন—বাতি নিভিয়ে দে, বাতি নিভিয়ে দে··· জলসা-ঘরের দরজা বন্ধ কর···জলসা-ঘরের···

···আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সম্মুখে আসিয়া জলসা-ঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

আর এক দিক

দস্তাট সক্স এডওয়ার্ডের জীবনের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। তিনি তখন ক্রমিক ব্রঙ্কাইটিসে ভুগিতেছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, চুরুট ছাড়িতে হইবে। কিন্তু তাঁহার দিবার-অন্ত প্রাণ। সেই প্রাণের অন্ত দিবার ছাড়িতে পারেন না। ডাক্তার বলিলেন, তাহা হইলে আর কি হইবে! অন্ততঃ যাহাতে ইহার সম্মুখে অপর কেহ দিবা না খাইতে পারেন, সেটা দেখিতে হইবে। তাহাতে পরার অর্দ্ধেক কম হইবে। ইহার কিছুদিন পরে লর্ড কুক বাড়ীতে একটি ভোজের নিমন্ত্রণ—রাজ-অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। অনেকেরই বাধা বাধা লোকের শুধু নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তন্মধ্যে আছেন লর্ড রোজবেরি। রোজবেরি বামলাল দিবার-খোর। নিজের দিবার ছাড়া অপর কাহারও বেওজা দিবার খান না। ভোজ সাঙ্গ হইয়াছে। কফি চলিতেছে। রাজা একদিকে দিবার ধরাইয়াছেন। রোজবেরি নিজের দিবার ধরাইলেন, লর্ড-ইন-ওয়েটিং আসিয়া বলিলেন,—হুজুর। রোজবেরি অবাক। তাঁহাকে ব্যাপারের কথা বলা হইল। শুনিয়া রোজবেরি মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন—কিং চার্লস চোদ্দোটাই কেবল ফাঁসি হ'লো। এমন অন্যায় তিনিও করেন নি।—লর্ড এলিস্যাড-এ মাস্ট লাইভ'।

স্বরলিপি

(কথা ও সুর সংগ্রহ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন)

—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

বরষে বদরিয়া সাবনকী
সাবনকী মনভাবনকী।
সাবনমে উমগো মেরো মনবা
ভনক সুনি হরি আবনকী।
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়ো
দামিন দমকে ঝড় লাবনকী।

নন্হীঁ নন্হীঁ বুঁদন মেহা বরসে
সিতল পবন সুহাবনকী।
মীরাকে প্রভু তিমির বিনাসন (বিরহ বিনাসন)
আনন্দ মংগল গাবনকী।

—মীরাবাঈ

মিশ্র পিলু (চংদেলী কজরী)—কাহ্রবা

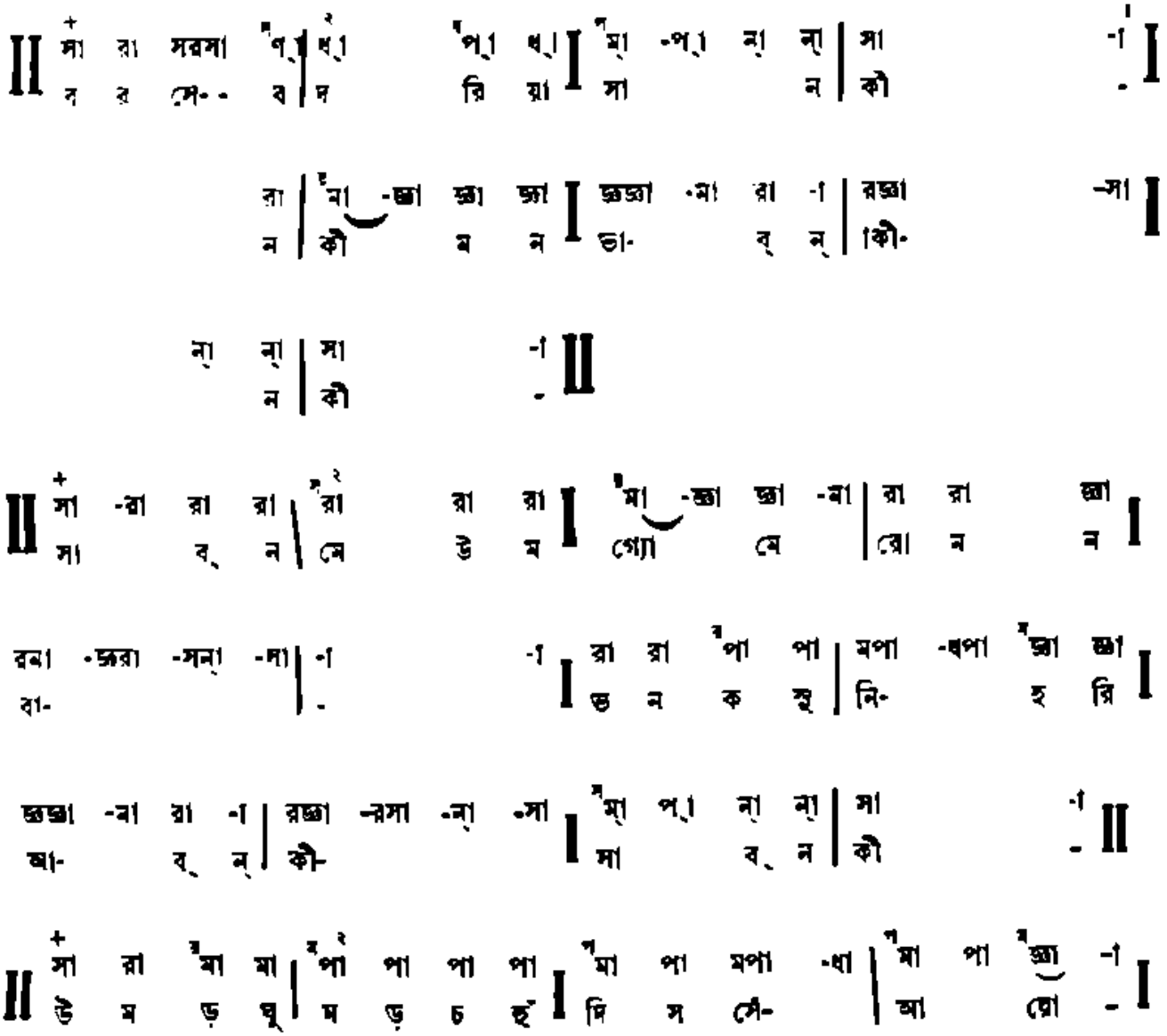

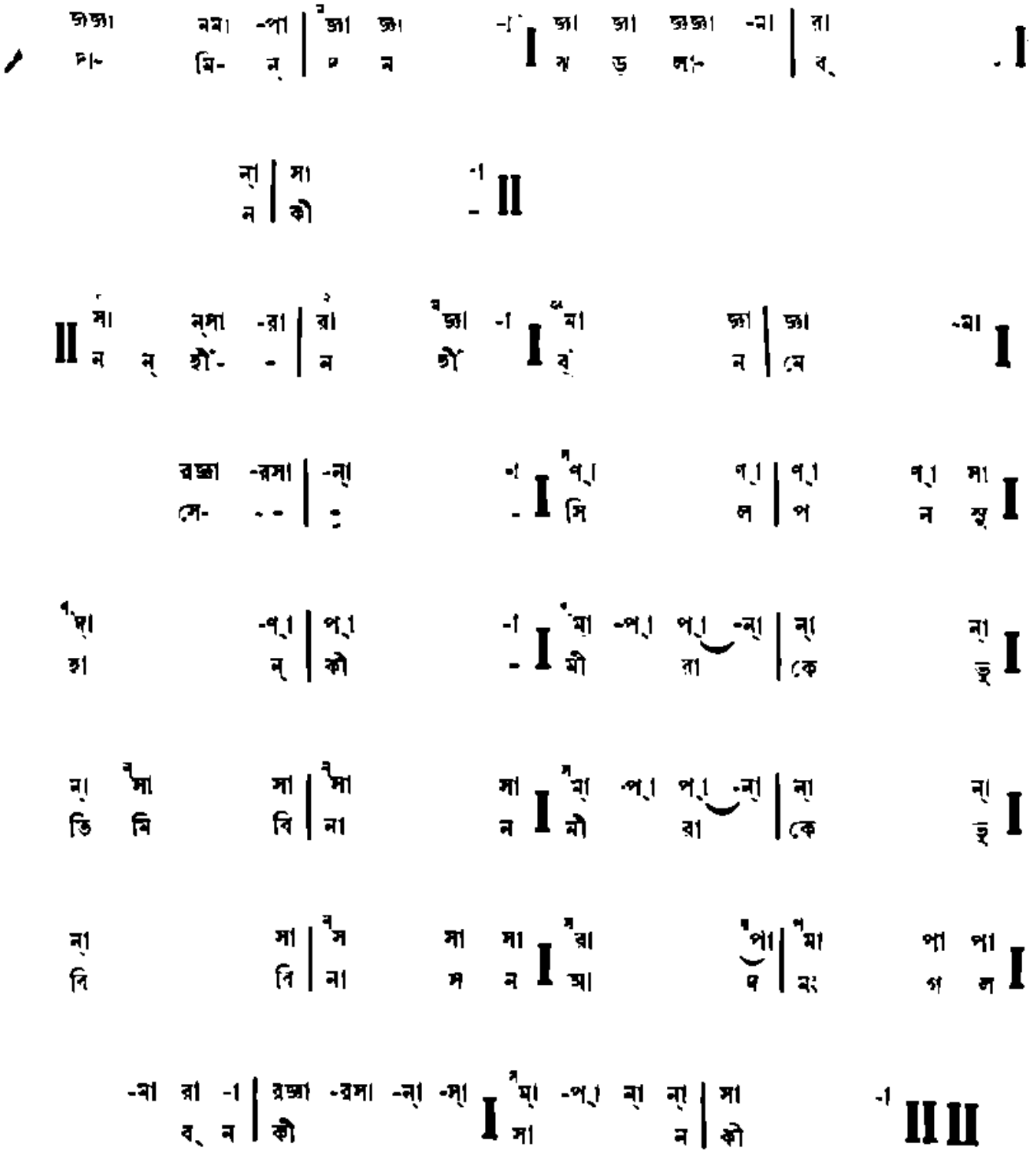

ব্ = ওম।

~~ = কট্‌কার চিহ্ন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ও স্বরলিপিতে এই অলঙ্কারের বহুল প্রচলন আছে। বাংলা স্বরলিপিতে অনুরূপ অলঙ্কার-বোধক কোন চিহ্ন নাই, তাই এই নূতন চিহ্ন প্রবর্ত্তন হইল। যে স্বরে কট্‌কা থাকিবে অতি দ্রুত আন্দোলনে সেই স্বরের অব্যবহিত চড়া স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সেই স্বর হইয়া অব্যবহিত খাদ স্বর পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় সেই স্বরে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যথা সা = রসনসা, মা = পমগমা।

অন্তঃপুর

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

নারী-প্রগতির রূপ

এদেশে আজ নারী-প্রগতির যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, একাধিকবার বলা হইয়াছে, সে রূপ যার-করা। যদি দেশ স্বাধীন হইত, তবে এই প্রগতির অন্য রূপ হইত। অবশ্য শুধু নারী-আন্দোলন নয়, দেশের সকল আন্দোলন সম্বন্ধেই একথা প্রযুজ্য। কিন্তু যাহা হইত ও হইতে পারিত, তাহার জন্য দুশ্চিন্তা করিবার হেতু দেখি না। যাহা হইয়াছে ও হইতেছে—সমস্যা তাহাই।

দেশের এই নারী-প্রগতিকে যাঁহারা সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন না, ইহাকে বিদেশী বলিয়া সন্দেহ করেন, সন্দেহ করিয়া ইহাকে লঘু করিয়া দেখিতে চান, তাঁহারা দেশের প্রতি অবিচার করেন। কেননা, বিদেশ হইতে আনীত হইলেও দেশের বুকে এই আন্দোলন তাহার স্থান বিস্তৃত ও ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছে। সুতরাং এ আন্দোলনকে উপেক্ষা করা চলে না।

যে দেশ হইতে ইহার উৎপত্তি, সেখানে ইহার বর্ত্তমান রূপটি কি দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এই প্রসঙ্গে সে আলোচনার প্রয়োজন।

নীচে তাহা করা হইল।

বর্ত্তমানে ইংরেজী সাহিত্যে যাঁহাদিগকে অতি-আধুনিক আখ্যা দেওয়া হয়, উপন্যাস-ক্ষেত্রে ডি. এচ. লরেন্সই বোধ হয় তাঁহাদের শীর্ষে। ১৯৩০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যে সব উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং সেগুলিতে নরনারীর সম্পর্কের উল্লেখে যে সব উক্তি করিয়াছেন, মোটামুটি ভাবে নরনারী বিষয়ে ইংলণ্ডের অতি-আধুনিক চিন্তাপ্রণালীর তাহা একটি বিশেষ ধারা। পুরুষের মস্তিষ্ক এই ধারার উৎস। তাঁহার দুই একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলে আমরা বুঝিব, ইংলণ্ডের অতি-আধুনিক নারীর প্রতি সে দেশের অতি-আধুনিক পুরুষদের কি মত, অন্ততঃ বিশেষ একটি শ্রেণীর কি মত।

লরেন্সের প্রায় উপন্যাসেই নরনারীর যে-দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বের হেতু—আধুনিক নারীর, পুরুষের সহিত অদম্য উৎসাহে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে পুরুষেরা পৌরুষ হইতে বঞ্চিত হইতেছে—নারী অনধিকারী হইয়াও তাহা অধিকার করিতেছে। সুতরাং পুরুষ মেয়েলি হইয়াছে, নারী পুরুষালি হইতেছে।

ইহার আর একটি দিক আছে। সে দিকটা কি? লরেন্সের একখানি উপন্যাসের* একটি চরিত্রের মুখ হইতে তাহা শুনিতে ভাল লাগিবে—

> I hate her, when she knows and when she *wills*. I hate her when she will make of me, that which serves her desire. She may love me she may be soft and kind to me, she may give her life to me. But why? Only because I am *hers*.

বাংলা করিয়া বলিলে দাঁড়ায়, মেয়েদের এই সব-কিছু-জানার ইচ্ছা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তার চাইতেও পারাপ লাগে তাহাদের এই পুরুষসুলভ ইচ্ছাশক্তি—পুরুষকে দিয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করাইবার চেষ্টা। অবশ্য, আমার জন্য তাহারা সবই করিতেছে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে তাহাদের বাধে না। কিন্তু কেন? শুধু এই জন্য যে, সে জানে আমি তাহার(সম্পত্তি?)—।

ইহার মধ্যে বিশেষ একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত শোনা যাইত, নারীরা চীৎকার করিতেছেন, 'নারী কি পুরুষের সম্পত্তি যে, পুরুষের ইচ্ছামত সব কিছু নারীকে করিতে হইবে?'—আজ পুরুষের মুখে নারীর সেই ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে।

অতি-আধুনিক পুরুষের অভিযোগ এই।

অতি-আধুনিকা নারী কি বলিতেছেন? ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ এই যুগের ইংলণ্ডের একজন নাম-করা ঔপন্যাসিক। তাঁহার একখানি উপন্যাস † হইতে নীচে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

> Women have served all these centuries as looking glases, possessing magic powers of reflecting the figure of man at twice its natural size. Without that power, probably the earth would still be swamp and jungle. The glories of

* Aaron's Rod. † Room of One's Own.

all our wars would be unknown. Supermen would never have existed. For mirrors are essential to all violent and heroic action. That is why Napoleon and Mussolini both insist so emphatically upon the inferiority of women, for otherwise they would cease to enlarge....

বাংলা করিয়া বলি। ইতিহাসের প্রথম দিন হইতে নারীরা পুরুষের দর্পণের কাজ করিয়াছে, আর সে-দর্পণের এমন গুণ যে, পুরুষ মাত্রই তাহার দিকে চাহিয়া নিজেকে দেখিয়াছে দ্বিগুণ। এই দর্পণ না থাকিলে পৃথিবীতে সভ্যতার জন্ম হইত না, পুরুষ দেশের জন্ম, ধর্মের জন্ম লড়িত না—অতি-মানুষরা ভূমিষ্ঠ হইতেন না। কেননা, মহৎ ও বৃহৎ কাজের একমাত্র প্রেরণা এই দর্পণ। তাই নেপোলিয়ান হইতে মুসোলিনি, সকলে মিলিয়া নারী যে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহা শতমুখে জাহির করিয়া গিয়াছেন। করিবেন না কেন, —না করিলে, তাঁহাদের বড় হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়!

অতি-আধুনিকা নারীর অভিযোগ এই।

দুইজনের উক্তিকে বিচার করিয়া দেখি, কোনটাই স্বাভাবিক, সহজ সত্য নয়। দুইজনেই মনোবিকারে দুইজনকে গালিগালাজ করিতেছেন।

ডেনিয়েল ডিফো* ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, (বোধ করি নারীর অধিকার বিষয়ে ইংলণ্ডে প্রথম উদ্যম তাঁহারই) নারীকে শিক্ষা দাও, শিক্ষিতা নারীকে 'a creature without comparison' বলিয়াছিলেন, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মেয়েদের কলেজ-প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন। সেদিন হইতে এই প্রায় আড়াইশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কি পার্থক্য হইয়াছে?

সেদিন ডিফো যাহা বলিয়াছিলেন, আজ লরেন্স তাহা বলেন না কেন?

মেরি ওলষ্টোনক্রাফ্‌ট† ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—

Contending for the rights of women, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to become the companion of man, she will stop the progress of knowledge and virtue,

এক কথায়, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন না করিলে, স্ত্রী পুরুষের সহযাত্রিণী হইবে কি করিয়া?—মেরি ওলষ্টোনক্রাফ্‌টের সহিত আগ্নিনিয়া উল্‌ফের এই সুর-বৈষম্য কেন?

এই মনোবিকারের ও সুর-বৈষম্যের কারণ কি? একদিন পুরুষ সহজভাবে নারীর শিক্ষার জন্য লড়িয়াছিল, নারী তাহার প্রতিবাদ করে নাই, সে পুরুষের যোগ্য সহযাত্রিণী হইবার জন্য, জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। নারীর শিক্ষা সুরু হইল, পুরুষ তাহার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বলিল, বাহবা! বেশীদিন গেল না, নারী পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় আপত্তি জানাইল, পুরুষকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিল, তাহার সকল কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং অধৈর্যে রক্তচক্ষু দেখাইল। আমেরিকায় অ্যামেলিয়া ব্লুমার, ইংলণ্ডে কষ্টাবেল প্যাঙ্কহার্ষ্ট দেখা দিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বন্দ্ব সূচিত হইল।

কিন্তু আড়াই শত বৎসরের ইউরোপের ইতিহাস শুধু এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস নয়। এই দ্বন্দ্বকে অন্তরাল করিয়া ইতিমধ্যে ওদেশে মানুষের চিন্তা নর ও নারীর সম্পর্ক বিষয়ে বহুতর হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে আধুনিক যুগের নর ও নারীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে বুঝি—গভীরতর দৃষ্টির কাছে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবরণ উন্মোচিত হইয়া একটি সামঞ্জস্য ধরা পড়ে।

সেই গভীরতর দৃষ্টির উপলব্ধি কোঁতের উক্তিতে পাই—

In the most essential attribute of the human race, the tendency to place social above personal feeling, she is undoubtedly superior to man. Morally therefore and apart from all material considerations, she merits always our loving veneration as the purest and simplest impersonation of humanity, who can never be adequately represented in any masculine form :

অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ব-প্রকাশক অধিকাংশ গুণের অধিকারিণী এই নারী। মনুষ্য-সভ্যতার যাহা পরম লক্ষ্য, পরার্থে নিজেকে উৎসর্জন করা, সে প্রবৃত্তি তাহার সহজ-কবচ। সুতরাং নৈতিক হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীকে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু পুরুষের এই উক্তির বিরুদ্ধেই আগ্নিনিয়া উল্‌ফের ঐ দর্পণের যুক্তি। এই উক্তির উত্তরেই বলা হইয়াছে—

* Essays upon Projects—An Academy for Woman.
† Vindication of the Rights of Woman.
‡ System of Positive Polity Auguste Comte.

> The looking-glass vision is of supreme importance, because it stimulates the nervous system. Take it away and men may die, like the drug-fiend deprived of his cocaine. *

অর্থাৎ নারীকে পুরুষের চাই, কোকেনখোরের যেমন কোকেন চাই। কোকেনখোর যেমন কোকেনের অভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, স্ত্রীলোক না হইলে পুরুষেরও তাহাই হয়।

কিন্তু কোকেনের নিজের সত্তা নাই, নারীর আছে। সুতরাং নিজেকে এই কোকেনের কাছে প্রযুক্ত দেখিলে স্বভাবতঃই নারীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।

অতি-আধুনিক নারীর যে অভিযান, তাহা এই আত্মমর্যাদা রক্ষার অভিযান। অতি-আধুনিক পুরুষের এই অভিযানের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তাহাও আত্মমর্যাদারক্ষার জন্য। অবলীলাক্রমে এ যুগের নারী যখন পুরুষের সকল কাজ করিতে পারে, তখন এ যুগের পুরুষের পৌরুষে আঘাত লাগে। লাগা স্বাভাবিক। না লাগিলে বুঝিতে হয়, পুরুষের পৌরুষের হানি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই জন্য পুরুষের ক্ষোভের যে প্রকাশ লরেন্সের উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে ক্ষোভ বিকৃত। এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিচারও ঠিক নহে। অথচ এই দুই মনোভাবই সবল, ইহার পশ্চাতে একপক্ষের অত্যাচার ও অন্যপক্ষের ক্রন্দন নাই, দান ও গ্রহণের প্রশ্ন নাই—অতি স্পষ্টভাবে দুই জন দুই জনকে যাচাই করিতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই কলহের অন্ত হইবে এবং এই দুই সবল প্রতিপক্ষ পরস্পরের প্রয়োজনে নিজেদের জন্য একটি বিশ্রাম-গৃহ, নীড় রচনা করিতে সমর্থ হইবে। সে বিশ্রামগৃহের জন্য যে মূল্য, তাহা উহারা দুইজনেই দিয়াছে। এবং সে মূল্য একদিনে সংগৃহীত হয় নাই, দীর্ঘ আড়াই শত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ধরিয়া সে মূল্য সংগৃহীত হইয়াছে।

এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস ওদেশে অদ্ভুত, বিচিত্র, অবিশ্বাস্য। এই সময়ের মধ্যে ওদেশের নারী ইংলিশ-চ্যানেল পাড়ি দিয়াছে, মরু-অভিযানে গিয়াছে, হিমালয়-অভিযানে আসিয়াছে এবং আরও কত কি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই দীর্ঘ সময়ের প্রত্যেকটি দিবস ও রাত্রি ওদেশের নারী সাধনা করিয়াছে—আত্মার মুক্তির জন্য।

আমাদের এই নারী-আন্দোলনের ত্রুটি হইতেছে, সেই সাধনার অভাবের ত্রুটি। অবশ্য আমাদের দেশের সকল কিছুর মূলেই সেই ত্রুটি।

ইউরোপে বসিয়া কবে ইবসেন কি নাটক লিখিয়া নিগৃহীতা নারীর মর্মবেদনা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন এবং ইংলণ্ডে কবে কুমারেল প্যাঙ্কহার্ষ্ট কি করিয়াছিলেন—এদেশে বসিয়া আমাদের তাহা ছাপার অক্ষরে জানিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু তাহাদের সেই পুঁজিকে আমরা যদি নিজেদের পুঁজি বলিয়া ধরিয়া লই—তাহা হইলেই বিপদ বাধে।

তাই এই বার-করা নারী-প্রগতির রূপ দেখিয়া ভয় হয়।

* A Room of One's Own.

আর একদিক

আমেরিকার বহু প্রেসিডেন্ট রিজোয়ের প্রসঙ্গে সম্প্রতি অনেক গল্প শোনা যায়। তাঁহার বাক্‌সংযম ছিল না, যাহাকে যেমন খুশী তাঁহাকে তেমন বলিয়া দিতেন। গল্প করিতে বসিলে তো কথাই নাই। একটা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রার পদে ইহার চাইতে খহিত কাজ আর হইতে পারে না। মর্ড এলিয়াস তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—একবার এক ডিনার-পার্টিতে রিজোয়ের প্রসঙ্গেট মহা আনন্দে সাত-পাঁচ বলিয়া যাইতেছিলেন। বিদেশ প্রসঙ্গেট তাঁহার সম্মুখে বসিয়া। প্রথমে রাজি, বিদেশ প্রসঙ্গেটের হাতে ক্যান ছিল। দেখা গেল, মাঝে মাঝে ক্যানটি তিনি সশব্দে মুখ করিতেছেন। এবং ঠিক এই সময়ে প্রেসিডেন্টের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িতেছে। পরে বোঝা গেল, স্বামী ও স্ত্রীতে আগে হইতে এই বোঝা-পড়া ছিল—স্বামীর সব শুনিলেই প্রসঙ্গেট বুঝিবেন, এ কথা বলা ঠিক হইবে না।

স্বামীর স্ত্রীর জন্য অনেক সময়ে তিনি অনেক ধরিত্রীহীন কথা বলায় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

স্যাফো

—শ্রীসুব্রতকুমার চৌধুরী

আবার ভালবাসা কালার মেয়ে
অমৃত এনেছে সে ভিক্ষে ক'রে :
দুখের নিধি-বধ পরাণ প্রিয়তম,
কেঁদেছে সে আমার ফুলের ডোরে,—
কেঁদেছে চৌখির ফুলের ডোরে।...

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ :
ধূপ-সলিল, ৯৮ পৃঃ

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে কয়েকটি নারী-কবির পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্যাফো সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। বিজ্ঞ সমালোচকগণের মতে গীতিকাব্যের রাজ্যে তাঁহার স্থান ক্যাটুলাস এবং শেলীর ন্যায় অত্যুচ্চাসনে। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই অবগত নহি। সে সম্পর্কে যে সমস্ত কিম্বদন্তী বা উপাখ্যান অদ্যাপি সাহিত্য-সমাজে প্রচলিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের কোনওটির উপরই সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। নয়টি খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর বেশীর ভাগই কালের প্রকোপে বিনষ্ট হইয়াছে ; যে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশ বর্ত্তমানে টিঁকিয়া আছে, কবি-সমাজে তাঁহার স্থাননির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মিশর দেশে যে সমুদয় papyrus পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ছত্রে ছত্রে স্যাফোর কাব্যের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ এই নবাবিষ্কৃত রত্নরাজির পাঠোদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বহুবিধ নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করিব ; এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কবির জীবন-চরিত রচিত হইতে পারিবে।

যতদূর জানা যায় খৃঃ পূঃ আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর অপরার্দ্ধে গ্রীসদেশে লেস্‌বোস্ প্রদেশের অন্তর্গত মিটিলিনি নগরে এক অভিজাত বংশে স্যাফোর জন্ম হয়। ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের মতে তাঁহার পিতার নাম ছিল স্কামাণ্ড্রিনাস, কিন্তু অনেকে এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহেন। তাঁহার মাতার নাম ক্লেইস। Suidas-এর অভিধানে তাঁহার তিন ভ্রাতা লারিক্সস্, চারাক্সস্ এবং ঘুরিগিয়ুসের উল্লেখ আছে। তিনি যে কাহার পরিণীতা পত্নী ছিলেন তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আণ্ড্রসের ধনী নাগরিক সেফোলস্ তাঁহার স্বামী এবং ক্লেইস্ তাঁহাদের একমাত্র কন্যা। অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৯৬ অব্দে অন্যান্য কতিপয় অভিজাতবংশীয়দিগের সহিত তাঁহা-দিগকেও লেস্‌বোস্ হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। তৎকালে Critias(earlier) গ্রামের শাসনকর্ত্তা(archon) ছিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘ ছয়বৎসর কাল স্যাফো সিসিলি দ্বীপস্থ সাইরাকিউজ নগরে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ জীবনের অবশিষ্ট সময় তিনি মিটিলিনি নগরেই ব্যয় করেন। তাঁহার ভ্রাতা চারাক্সস্ গিয়াছিলেন মিশর দেশে। নাওক্রাটিসে অবস্থানকালে রোডোপিস্ বা ডোরিকা নামধেয়া তরুণী গণিকাকে ক্রীতদাসীত্ব হইতে মুক্তিদান এবং তাহার সহিত অবৈধ প্রণয়ের জন্য স্যাফো ভ্রাতাকে কঠোর তিরস্কার করেন। এই প্রকার দুই একটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আভিজাত্য তাঁহার কিরূপ মজ্জাগত ছিল।

স্যাফোর গৃহ লেস্‌বির লেখক-লেখিকাগণের মিলন-কেন্দ্র ছিল। গৃহকর্ত্রী স্বীয় আবাসভূমির নাম দিয়াছিলেন 'কবিকুঞ্জ' (The Home of the Muses)। তৎকালে লেস্‌বোস্ প্রদেশ জ্ঞান-গরিমা ও সাহিত্য-প্রতিভায় অগ্রগণ্য ছিল। হেলাসের অন্যান্য স্থানে 'সমাজে নারী-জাতির স্থান' প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত সংকীর্ণ মত প্রচলিত ছিল লেস্‌বোস্ তাহা হইতে মুক্ত ছিল। বহু নারী-সাহিত্যিক নিজ নিজ অবদান দ্বারা লেস্‌বোসের কবিকুঞ্জ অলঙ্কৃত করিতেন। স্বভাবসুন্দরী লেস্‌বির রমণীগণ শিক্ষিতা, কলানুরাগিণী এবং প্রসাধননিপুণা হইতেন। তাঁহারা পুরুষ-সমাজেও মিশিতেন এবং তাঁহাদের সহিত একযোগে সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য্য একান্ত আগ্রহে সম্ভোগ করিতেন। তথাপি সর্ব্বপ্রকার রসচর্চ্চার অবাধ সুবিধার নিমিত্ত তাঁহারা বিভিন্ন যোষিত-সমাজও স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে

ভাসিয়া চলেন নাই এমন নহে। এককালে 'লেস্‌বিয়' কথাটি গ্রীসে কদর্থে ভিন্ন ব্যবহৃত হইত না।

ইজিয়ান সাগরবক্ষে অনুর্বর গ্রীসদেশের মরূদ্যানপ্রতিম এই লেসবোস্ দ্বীপ। গোলাপ ও হিয়াসিন্থ ফুলের গন্ধ-আমোদিত, বুলবুলের কূজনমুখরিত উপত্যকা; নির্ঝরের চতুর্দিকে ফলপাই-কানন;[১] পাইন শাখায় বসন্তসমীরে সাগর-বায়ুর মর্মর-ধ্বনি; জ্যোৎস্না প্লাবিত নিবিড় নিস্তব্ধ রাত্রিতে শুভ্র পর্বতগাত্রে চঞ্চল-চরণ Oreades-প্রতিমা তরুণীগণের নিশীথ নর্তন; আবার ফলের সুরভিত রসাস্বাদনে প্রমুদ্রচিত্ত রসজ্ঞগণ এই অপরূপ জনপদে জীবন যাপন করিতেন। দ্রাক্ষাক্ষেত্রসজ্জাত বিখ্যাত লেস্‌বির সুরাপানে তন্ময়চিত্ত ডাথোনিসস্-ভক্তগণ বসন্তোৎসব উপলক্ষে গীতিকাব্য রচনা করিতেন: তাঁহাদের কাব্যের উৎস ছিল উগ্র কামনা; তাঁহাদের মধ্যমণি ছিলেন স্যাফো।

The Poet বলিতে তৎকালীন গ্রীকগণ হোমারকেই বুঝিতেন; পরবর্তী যুগে The Poetess বলিতে তাঁহারা স্যাফোকে চিনিতে আরম্ভ করেন। প্লেটো লিখিলেন—"কেহ কেহ বলেন সুরের দেবী নয় জন; তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া বলা উচিত। লেসবোসের স্যাফোকে লইয়া মুজের সংখ্যা দশ।"[২] আরিষ্টটল তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সোলন তাঁহার একটি কবিতা শ্রবণান্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই কাব্য কণ্ঠস্থ হওয়ার পূর্বে যেন তাঁহার মৃত্যু না হয়।[৩] ট্রাথো ভক্তি-ভরে ভিন্ন তাঁহার নামোচ্চারণ করিতেন না। লঙ্গিনুস্ তাঁহার প্রেমের কবিতাকে কাব্যজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিতেন।[৪] ডিস্‌করাইডিস্ তাঁহাকে গীতিকাব্যের অদ্ভুত প্রতিভা বলিয়াছেন।[৫] এতদ্ভিন্ন বহুগ্রন্থে পরবর্তী লেখকগণের কেহ তাঁহাকে আফ্রোদিতি এবং ঈরসের ভগ্নী, কেহ বা রূপ-দেবতা এ্যাপোলোর সঙ্গিনী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আবার খ্যাতির বিড়ম্বনাও তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। সংস্কারান্ধ এথেন্স এবং অন্যান্য প্রদেশে মানব-মনের এতটা প্রসার হয় নাই। লেস্‌বির ললনাগণকে কটাক্ষ করিয়া তাহারা সর্বদাই কটূক্তি করিত। এই সমস্ত অযথা নিন্দাকে মূল করিয়া উত্তরকালে দুই চারিখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। কুশ্রীদের খেয়ালখুশি তাণ্ডবের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, আফ্রোদিতির অনুগ্রহে তাণ্ডবের নব কলেবর ধারণ এবং লিউকাসের পর্বতপাত্র হইতে সিন্ধুগর্ভে ঝম্পপ্রদানপূর্বক বিফলমনোরথ প্রেমিকার আত্ম-হত্যা প্রভৃতি উপন্যাস অত্যন্তকাল পূর্বেও স্যাফোর সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল। এমন কি এ্যাথিস, মেগারা প্রভৃতি সঙ্গিনী-দিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগকে এথেনিয়ানগণ অভিসুষমার সমকামিতা রূপে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। স্যাফো রচিত কোনও কাব্যাংশে কোনপ্রকার অপবিত্র ভাবের নিদর্শন না পাওয়ায় সুধীমণ্ডলী এ সমস্ত কলঙ্ক-কাহিনীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতেছেন।

স্যাফো প্রধানতঃ গীতিকাব্যের কবি। গ্রীকসাহিত্যে মহাকাব্য রচনার শেষ ক্ষীণ প্রয়াসটুকুও কবি আর্কিলোকাসের সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তি লাভ করে। আত্মধ্যানের যুগ হইতে লিরিক কবিতার আবির্ভাব। বীণাযন্ত্র সহযোগে গীত হইবার জন্যই এই কবিতার উদ্ভব, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই ইহাতে ছন্দের এত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিই আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া নূতন নূতন ছন্দ-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। স্যাফো প্রবর্তিত ছন্দের নাম স্যাফিক্। তাঁহার অনেক কবিতাই এই ছন্দে বিরচিত। তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব, নিরাড়ম্বর শব্দযোজনায় নিখুঁতরূপে ভাবকে প্রকাশ করা; উপমা নিপিচাতুর্য প্রভৃতি সাহিত্যের কোনও অলঙ্কারের সাহায্যে কবি সহজভাবকে জটিল করিয়া তুলেন নাই; তথাপি, অতি সাধারণ বাক্যও তাঁহার লেখনীমুখে অভিনব কাব্যখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কবি সমস্ত অন্তর দিয়া কবিতার বিষয়বস্তুকে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গীর অন্তরালে এই প্রগাঢ় অনুভূতিই স্যাফোর প্রতিভার মূল।

নিম্নে তাঁহার কয়েকটি কবিতার গদ্যানুবাদ দিতেছি।

[১] আফ্রোদিতির প্রতি

দেবী আফ্রোদিতি, জীয়ন-বন্দিনী ছলনাময়ী রাণী,

১। Symonds প্রণীত Studies of the Greek Poets.
হেটো—Phaedra.

৩। William Smith সম্পাদিত Classical Dictionary.
Symonds প্রণীত Studies of the Greek Poets.
Edmonds—Lyra Graeca

বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত তোমার আসনতলে এই নিবেদন করি—প্রণয়-বেদনায় আর আমার অন্তরকে জর্জরিত করিওনা। একবার যেমন দূর হইতে আমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পিতার স্বর্ণ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আকাশপথে তুমি আসিয়াছিলে, বিরাট শূন্যের মধ্য দিয়া স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যধরাতলে তোমার সুন্দর বিহগরথের শুভ্র পাখা উড়াইয়া তোমার বহিয়া আনিয়াছিল : স্মিতমুখে তুমি শুধাইয়াছিলে, কেন তোমায় ডাকিয়াছি, হৃদয়ে কি নব অভিলাষ জাগিয়াছে ; বলিয়াছিলে, কে তোমাকে কষ্ট দিয়াছে সাফো ? কাহাকে তোমার সহিত যুক্ত করিব ? এতকাল যদি সে লুকাইয়া থাকে, আজ হইতে তোমার অনুসরণ করিবে। এতদিন যদি সে তোমার দান অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, আজ নিজ হইতে তোমায় উপহার দিতে আসিবে ; যদি কখনও ভাল না বাসিয়া থাকে, আজ হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে। দেবী, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হও। এ মালার অবসান কর, আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর ; আমার সহায় হও।

[২] আনাক্টোরিয়ার প্রতি

কাহারও মতে বিশ্বের সুন্দরতম বস্তু একদল পদাতিক সৈন্য, কাহারও মতে বা বিরাট নৌবাহিনী ; আমার মতে সুন্দরতম বস্তু ভালবাসার পাত্র। একথা সকলেই বুঝিতে পারে। বহু রূপবান পুরুষের মতে হেলেন ট্রয়ের কলঙ্কস্বরূপ পারিস্‌কেই শ্রেষ্ঠ মানিয়া লইল। পিতামাতা বা সন্তানের কথা স্মরণ না করিয়া কন্দর্পের ইচ্ছায় তাহাকেই প্রেম অর্পণ করিল। নারীর পক্ষে নিকটতম আত্মীয়গণকে ভুলিয়া যাওয়া খুবই সহজ। তাই বলি আনাক্টোরিয়া দেখিও, যেন আমাদিগকে ভুলিও না ; মনে রাখিও, আমরা এমন একজনার সাহচর্য্য হারাইলাম যাহার পদধ্বনি বা মুখশোভা আমার কাছে লিডিয়ার সমস্ত রথচারী ও পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা প্রিয়তর। জানি পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষার ধন দুর্লভ, তবুও ভাবি যদিই—

[৩] হীরার প্রতি

মহাদেবী হীরা, ট্রয়-ধ্বংসের সময় এ্যাট্রিয়ুসের সন্তানদ্বয়ের (Agamemnon ও Menelaus). আহ্বানে তুমি যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়াছিলে, আমার নিবেদন, সেই স্বপ্নবেশে সজ্জিত হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হও। যতক্ষণ না তাহারা তোমার, পরাক্রান্ত জীয়ুসের এবং সাইওন নগরের (Dionysus) বন্দনারত হয়, ততক্ষণ আমাদের নদীনীর অতিক্রম করিয়া তাহাদের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রার্থনা করি, তোমার

আলকিউস ও সাফো।

অনুগ্রহে মিটিলিনি নগরে ফিরিয়া গিয়া সে দেশের তরুণীগণের সহিত—যাহাদিগকে তোমার উৎসবরীতিতে দীক্ষিত করিতে শিক্ষা দিয়াছি—তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আবার যেন আনন্দে ও পুণ্যকর্মে দিনযাপন করিতে পারি। এ্যাট্রিয়ুসের পুত্রদ্বয় যেমন তোমার ও তোমার সহচর দেবতাগণের প্রসাদে দেশে ফিরিয়াছিল আমিও যেন সেরূপ করিতে পারি।

[৪] তখন আমি উত্তর করিলাম, 'প্রিয় ভগিনীগণ, যৌবনের সুসময় আমরা কি আনন্দে একত্রে যাপন করিয়াছি আমরণকাল তোমরা তাহা স্মরণ রাখিও। সুন্দর ও সুপবিত্র কার্য্যে আমরা কাল অতিবাহিত করিয়াছি ; এখন তোমরা গমনোন্মুখ, আর বিদায়-বেদনায় আমার অন্তর গুমরিয়া কাঁদিতেছে।'

[৫] যখন তোমার দিকে তাকাই, মনে হয় হার্মিয়োনি কি কখনো এমন রূপসী ছিল, মর্ত্যমানবীর সহিত তুলনা না করিয়া হেলেনের সঙ্গেই তোমার উপমা দেওয়া উচিত।

তোমার রূপপ্রভার সম্মুখে আমার সমস্ত চিত্ত উৎসর্গ করিয়াছি ; আমার বাসনার অর্ঘ্য দিয়া তোমার অর্চনা করিতেছি।

[৬] যদি কেহ আমার কাছে আসার জন্য, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের জন্য এবং তোমার অনুগ্রহের অযোগ্য আমার প্রতি প্রণয়ের জন্য তোমাকে দোষ দেয় তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমরা ত সর্বদাই দেখা দিয়া থাকি ; কিন্তু বলত—আমার কাছে স্বীকার করত—কোনও বালিকার পক্ষে তাহার অনুরাগিণীর নিকট না আসা কি পৃথিবীতে সম্ভব ?

—যদি তুমি ফিরিয়া না আস, শপথ করিতেছি আর তোমাকে ভালবাসিব না ; ওঠ, জাগ, শয্যা হইতে শক্তিমান যেহকে মুক্তি দাও। আমাদিগকে স্নিগ্ধরশ্মি বিতরণ কর ; তারপর বসন ত্যাগ করিয়া নিষ্কলঙ্ক পদ্মকলির মতই নির্ঝর-নীরে অবগাহন কর। ক্লেইস্ তোমাকে ভাস্করাণী যত্নে রক্ষিত উত্তরীয় ও বেগুনীবর্ণ পরিধেয় বস্ত্র আনিয়া দিতেছে। বেশভূষাকে শিরোপরি মুকুলমুকুট ধারণ কর ; তারপর যে রূপ-প্রভায় আমার মন মুগ্ধ করিয়াছ সেই জ্যোতির্ময় বেশে, হে প্রিয়তম, আমাদিগকে তুমি দর্শন দাও। প্রাক্সিনোয়া, তুমি আচার্য্য সংগ্রহ কর, যাহাতে তরুণীগণকে আমি উত্তমরূপে প্রতিরাগ করাইতে পারি। কারণ, এক দেবকুমার সুসংবাদ দিয়াছে রূপসীশ্রেষ্ঠা স্যাফো প্রিয় নগরী মিটিলিনিতে প্রত্যাবর্তন করা স্থির করিয়াছেন। সন্তানসন্ততিসহ জননী আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

[৮] আর আমার সঙ্গে এ্যাথিসের সাক্ষাৎ হইবে না ; তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। বিদায়কালে সে কি করুণ সুরেই না কাঁদিয়াছে। বলিয়াছে—আমাদের কি দুর্ভাগ্য ; সত্য বলিতেছি স্যাফো, যাইতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। আমি উত্তর দিলাম—যাইতেছ, হৃষ্ট চিত্তে যাও, কিন্তু আমাকে ভুলিও না ; জান ত তোমায় কত ভাল বাসিয়াছি। যদি স্মরণ না থাকে আমি স্মরণ করাইয়া দিব, আমাদের একত্র বাস কি মধুময় ছিল। আমার পার্শ্বে বসিয়া গোলাপ ও ভায়োলেটের আকর্ষণে কতদিন তুমি কুন্তলদাম সজ্জিত করিয়াছ ; শত শত ফুলকলি দিয়া মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে পরিয়াছ ; আমার সম্মুখে বসিয়া বিচিত্র গন্ধদ্রব্যে পায়ে উষ্ণতা করিয়া দেহ মার্জনা করিয়াছ ; আমারি শয্যায় বসিয়া আলাপের রসাস্বাদন করিয়াছ।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরো কয়েকটি নাতিদীর্ঘ কাব্যাংশ Bergk-এর সংগ্রহে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তাহাদের তর্জমা প্রকাশে বিরত রহিলাম। সমালোচকদিগের মতে ক্যাটুলাস বা সুইনবার্ণের মত ওস্তাদ সাহিত্যিকও অনুবাদকালে স্যাফোর কবিতার মূলগত সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। অনুবাদের অনুরাগে সে সৌন্দর্য্য আরো পরিলক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। কৌতূহলী পাঠক বেমার্ক, বা এড্‌মণ্ডসের শরণাপন্ন হইতে পারেন।

উপরে যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছি তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে স্যাফোর রচনা প্রধানতঃ কামনাত্মক। তাঁহার অধুনালুপ্ত কাব্যসংগ্রহে অন্যান্য ভাবমূলক কবিতার সংখ্যা কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। কোনও কোনও সমালোচকের মতে অন্যান্য রসাত্মক কবিতা রচনাতেও স্যাফো পারদর্শিনী ছিলেন। * আমরা নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

১। চাঁদ ডোবে,—ডোবে কৃত্তিকা তুলন 'পরে
তারার রশ্মি লুকায় নিশার ক্রোড়ে।
দ্বিতল মধ্যরাতে বহুল যায় বয়,
কাটল লাখে লাখে, আমরা বিছরা,
শয্যায় পাতা হতে আমল বসন্তের।

৩। গায়ের মেষেরা আসীন দিয়েছে ঘরে,
জীবন-অন্তে কেহ ভুলিবে না মোরে।

৪। সুরভীময়ের মেখিকার ঘরে শোকের নাহিক ঠাঁই ;
আমার আজ্ঞা, মোর কুটিরেও ঠিক যেন ঘটে তাই।
সোনার বরণ ফুলের কুঁড়ির প্রায়
আমার ভবন। ক্লেইসের রত্নখানি
ওর কাছে কেনো তুচ্ছ সিসিলি রাজ্য !
ওর কাছে খাটো লেসবোস রাজধানী।
সত্য ভাবতা, সে কিরার গৃহপানে
যারা ফিরেছিল প্রভাতের আহ্বানে
সুখে—তাহাদের, রাগ আর মেষপালে,
জননীর কাছে শিশুরে কিরারে আনে। †

* J. W. Mackail—Lectures in Greek Poetry.
† Edmonds—Lyra Graeca ১৮৯, ১৯০, ২০৭, ২৪২ ও ২৭৭ পৃঃ

সাফো সম্বন্ধে প্রচলিত প্রায় সমস্ত কাহিনীর মূলোদ্ধার আলোচনা করিয়াছি। আর একটি তথ্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। সমসাময়িক লেস্‌বিয় কবি আল্‌কিয়ুসের সহিত সাফোর নাম অতি ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। কেহ কেহ সন্দেহ করেন আল্‌কিয়ুস সাফোর প্রণয়-প্রার্থী ছিলেন। Alcaeus wooing Sappho নামক একখানি চিত্রও Hammerton সম্পাদিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিখানি উদ্ধৃত হইল। Hephaestion সংগৃহীত আল্‌কিয়ুসের বিখ্যাত ছত্রদ্বয় "ফুলমুকুট-ধারিণী, পবিত্রাত্মা, মধুরহাসিনী সাফো, তোমার একটি কথা কহিতে চাহি, কিন্তু লজ্জোচে বলা হয় না" এবং সাফোর প্রত্যুত্তর, "যদি তোমার কামনা নিষ্কলুষ হইত এবং মুখে কুবাক্য নির্গত না হইত তবে লজ্জালজ্জা না করিয়া অকপটে মনোবাসনা ব্যক্ত করিতে পারিতে" হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি, কবিদ্বয় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধেও এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যতদিন papyrus পুঁথির পাঠোদ্ধার সমাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অধিক কিছুই জানিবার উপায় নাই।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ পাওয়া গিয়াছে। যথা সময়ে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

একখানি মুখ—শ্রীসুধীন্দু রায়। প্রকাশক : গৌর গোপাল রায়, গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল, কলিকাতা। ১৲ টাকা।

স্মৃতি-কথা—শ্রীতারকনাথ সাধু। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৷৹ টাকা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ৩৲ টাকা।

প্রেম—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এচ. চাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ৮৮ হারিসন রোড, কলিকাতা। ১৲ টাকা।

নিদ্রিত পুরী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। ২৲ টাকা।

বাঙ্গালার স্তবরত্নমালা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীতারাপদ দাস, ৮২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ।৹ আনা।

অভিমানিনী—শ্রীযদুনাথ খাস্তগীর। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ১৲ টাকা।

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৲ টাকা।

SANKHYA—Indian Journal of Statistics. Edited by P. C. Mahalanobis. Art Press, Calcutta.

পত্রিকা-পরিচয়

চৈত্রের "প্রবাসী"তে একটি প্রবন্ধ ও একটি কবিতা—অপরূপ। প্রবন্ধটি শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য'—এবং ইন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা 'সর্ব্বনাশের পথ'। দুটিতেই লিখন ভাবনা পুষ্টীকৃত হইয়া আছে। আনুপূর্ব্বিক সমস্তটা উদ্ধৃত করিলে এই দুটি ভাবার মর্য্যাদা দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়া আমরা অংশত তুলিয়া দিতেছি। কবিতার একটি স্তবক এই—

"মহাকাল মহেশের মহাস্কন্ধে আরোহণ যাত্রি,
তাঁর করে ক্ষুদ্র বল্গা কেন ?
ক্ষুদ্র এই তরণীর দু-দিনের দুখ সুখ রাত্রি
অনন্তের কিসের সমতা ?
সীমাহীন শূন্যতলে কোথা কোন্ দুর্ভিক্ষের কণা
ধ্বনিল অশিব আর্ত্তনাদে
পৃথীর বিধাতা তায়! হয় তো তোমার শুনিল না,
কী তাহারে বলিতে হয় তাতে ?"

'ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর চিন্তার খোরাক যোগাইবে। এই ভাবের স্পষ্ট কথা বলিবার দিন আসিয়াছে। যাঁহারা জাতির তথা সাহিত্যের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা বিদেশী

হইয়া থাকিলে বিশাল অবশ্যই। অতি-আধুনিক লেখকেরা এবং তাঁহাদের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথও (শেষের কবিতায়) যে ভুল করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় যুক্তিপ্রয়োগে তাহা দেখাইয়াছেন। অনেক সময়ের কথাও তুলিয়াছেন। খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

"মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবমিটানোর জন্য যে সাহিত্য আদিকাল হইতে চিরদিন নিজ নিজ ঘরে ঘরে বিরাজিত, তাহার চিরন্তন মর্যাদা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিয়া আশা করা যায় না, কিন্তু তাহাকে ঘরোয়া রূপে অর্থাৎ ভাষার একটা চিরাচরিত রীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে ত! সাহিত্যের মূলমন্ত্র যখন আপনার মনোলোভা ভাষায় আপন মেয়ে কিংবা মনোলোভা বাঈজি বাহির হয়, তখন সে ঘরে পরিচয় ও মার্জিত কেতাদুরস্ত অলিখিত আইন না মানিতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিবাসীর দ্বারে সে পা দিবে, অমনি তাহাকে আটহাত কালিয়াখা চিরবাস ছাড়িয়া ঘোমটা দিয়া হাতে শাড়ী পরিতেই হইবে। তেমনি আমার ঘোপার হিসাবের খাতায় কিংবা মুদীর লোকানের অর্ধে আমি বৈশাখীয় প্রতি ছত্রে প্রকাশ না করিলেও দলিলের আসরে আমার ভাষাকে সেলাপসুরু সজ্জাতেই বাহির হইতে হইবে। এখানে অরাজকতা দেখাইয়া আমার স্বকৃত আইন চালাইলে চলিবে না। ভাষার সাজসজ্জার আইনকর আজকাল নানা দিক দিয়া করা হয়। ইহার ফলে খুব বড় একটা উৎপাত হইতেছে, বাংলা ভাষার ঘাড়ের উপর অন্য ভাষার ভূত চাপানো।"

মোট কথা, অর্থহিত হইবার দিন আসিয়াছে।

'ভারতবর্ষে' এ সব বালাই নাই। লেখকের ঘাড় ভাঙা আছে, ভাষা তাহারাই করে। মাসে মাসে উপরে এক-একটি মাথাজোলা লোকের ছবি ছাপিয়া ভারতবর্ষ মাথাটাই সার করিয়াছে, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তাহার মাথাব্যথাই নাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল যেন, প্রেমেন্দ্র-লাল রায় এবং প্রবোধ সান্যাল আছে, বস—তার পর মুক্তি, নিকেট এবং মেয়েদের দৌড়ঝাঁপ। ভারতবর্ষ চিরজীবী হউক। ভারতবর্ষের গুণগ্রাহকের কেন অসমৃদ্ধ না হয়!

চৈত্রের ভারতবর্ষে—'অনুরাধা'।—হিমালয়ের পর ভারতবর্ষে মালমশলাটুকুই অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'বিরাজ-বৌ'এর শরৎচন্দ্রের নাম করিয়া কে এই 'অনুরাধা' লিখিয়াছেন জানি না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। শরৎচন্দ্র বঙ্গভাষাধীশ, তিনি হজমের ধরাই রাখেন না।

কিন্তু অনুরাধা যিনি লিখিয়াছেন তিনি কৌশলী সন্দেহ নাই, শরৎ-চন্দ্রের পল্লীসমাজের ছবি, মেজা পাওয়ার ঘোড়ই এবং পণ্ডিত মশাই-এর তুলনা এই তিনজনকে এক করিয়া এই অনুরাধাকে খাড়া করিয়াছেন। বিরাজ মেজো পণ্ডিত মশাই-এর একটা কষ্ট। যাদে যাদে তাহা দেখিয়া পল্লীসমাজের কথা মনে হয়। মোটের উপর, এই রকমের ব্যাপার এত্র পাইলে আসল সাহিত্যের আদর নাই।

চৈত্রের 'বিচিত্রা'র ডক্টর নরেশচন্দ্রের 'অবনীন্দ্র কথা' ও ঐযুক্তিশিরকুমার মিত্র ডি-এস্-সি লিখিত ভূমিকম্প প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বসুমতী'র পাতা উল্টাইয়া প্রথমেই যে ছবিগুলি চোখে পড়ে তাহাতে মন এমন ছবিময় হইয়া যায় যে, আর কিছুতে প্রবেশ করিবার অবকাশই পাওয়া যায় না। প্রায় রবীন্দ্রনাথের অর্ধেকের অবস্থা আর কি! চিত্রাঙ্কনের মাহিনের অপটুই যাবাবরূপ হইয়া রহিল। তবু আমাদের বিশ্বাস আছে—'ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাল, তখন প্রকাশ পায় ফল।'

ফল একদিন ফলিবেই। তাহলেও বসুমতীতে এই সকল ছবিগুলির মধ্যে আমার স্বামী বিবেকানন্দ কেন?

চৈত্রের 'উত্তরা' দুইটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'জনৈক ফরাসী স্ত্রী-কবি' এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণিমা ঘোষের 'শিশু সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত ও এবিষয়ে মহিলাদের কর্তব্য।'

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট—স্বাস্থ্য-সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমল হোম। মূল্য—।০ আনা।

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের স্বাস্থ্য-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যা লইয়া শ্রীযুক্ত হোমের সম্পাদনে গেজেটের স্বাস্থ্য-সংখ্যা বাহির হইল। গেজেটের প্রত্যেক বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনে, প্রবন্ধ-সংগ্রহে, চিত্র-নির্বাচনে যে দৃষ্টির অভাব বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছি, এ সংখ্যাতেও তাহার অতিক্রম হয় নাই। এইরূপ সুসম্পাদিত পত্রিকা বাঙ্গালী সাংবাদিকের গৌরবের বিষয়। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের যে প্রয়োজনীয় তথ্য, চিত্র-বিবরণী, এই সংখ্যাকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন। সুতরাং ইংরাজীতে লেখা এই পত্রিকা তাঁহাদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আর যাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্য-নীতির প্রচার একান্ত প্রয়োজন, তাহারা ইংরাজী ভাষা জানে না। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরণের পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত করা কলিকাতা কর্পোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য নয়।

— —

মুক্তি-মন্ত্রে মুসলিম্ নারী—মোহাম্মদ মোদাব্বের। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ১৪ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা; মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

এই সুলিখিত পুস্তকের ভূমিকায় মুসলিম সমাজে নারী-শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক পরলোকগতা বিবি জান. এম. হোসেন লিখিয়াছেন, "২৮ বৎসর পূর্বে আমি মুসলিম নারীর জন্য যাহা কিঞ্চিৎকরণ চাহিয়াছিলাম—আজ তাহার চেয়ে অনেক বেশী উন্নতির আশায় কল্পিতেছেন। আমার অবিশ্বাসী অন্তরে অন্তরে কলিকাতা দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।" লেখক আলোচ্য গ্রন্থে সমগ্র মুসলিম জগতে নারী-আন্দোলনের চিত্র সরল ভাষায় কীর্তিমতী মহিলাদের জীবনী যাচা যুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কাদম্বরী—পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত ও শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

সংস্কৃতের ভাবানুবাদ হইলেও পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত বাংলা কাদম্বরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। আমাদের এই গ্রন্থের যে কয়খানি সংস্করণ প্রচলিত আছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সেই বিষয় এই সংস্করণটি প্রকাশ করিয়া অজয়বাবু সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। ইহাতে ভূমিকা, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় ও টীকা ও টিপ্পনী আছে। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকণিকা প্রকাশিত সংস্করণের ইহা দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ। ভূমিকাটি বহুদিনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক সঙ্কলিত ও কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেওয়া নাই।

বাংলার পরিভাষার সমস্যা আজিও শেষ হয় নাই—বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। ১৩০০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশ মুস্তফী, যোগেশচন্দ্র রায়, অপূর্ব্ব বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ বিষয়ে বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং আজিও পরিভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা পরিষৎ পত্রিকায় বাহির হইতেছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস 'প্রকৃতি' পত্রিকায় ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন মনস্বী এ বিষয়ে প্রচুর সাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা অতীব মূল্যবান। পুস্তকাকারে সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পুস্তক (রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধীয় পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন) সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম। সেই জন্য ইহাতে ত্রুটিরও অবকাশ আছে। পরিভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি হইতে যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

আচার্য্য জগদীশ প্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস মজুমদার। প্রকাশক, শ্রীঅনন্তকুমার সেন, ৬নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য দেওয়া নাই।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী ইহা নহে—ইহাতে মাত্র জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবিতকালে এই মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই কাজ করিয়াছেন—তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহাকে লোকলোচনের সম্মুখে আনিলেন। এই সংগ্রহজীবনীখানি পড়িয়া এই মহাত্মার একটা সুস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখে ভাসিয়া উঠে।

শিশুজগৎ—১ম খণ্ড, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত। ইউ. রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

সৌভাগ্যের বিষয় শিশুসাহিত্যের দিকে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা জাতির সুদিনের সূচনা করিতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন শিশুসাহিত্য রচনায়ই জীবন কাটাইতেছেন, এই কারণে তিনি শিশুদের। এখন কিছুই তিনি শিশুদের সম্মুখে ধরেন না যাহা তাহাদের অপকার করিবে। তাঁহার রচিত পুস্তক নির্ভয়ে শিশুদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়। ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

সংগ্রহ হইলেও এই পুস্তকের বেশীর ভাগ প্রবন্ধ-লেখা রবীন্দ্রবাবুর লেখা। তাঁহার ভাষা মিষ্টি, সহজবোধ্য। যতে যতে তিনি শিশুমনকে তুষ্ট করিতে চাহাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার বাসনা সফলতা লাভ করুক। ছাপাই ও ছবি চমৎকার।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ও অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম. এ লিখিত ভূমিকাসম্বেত। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দির। মূল্য ৸৹।

পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত বাংলা পুথি নকল করিয়া যাঁহারা কারবার করিবেন এই বিবরণখানি তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতেই হইবে। পলাবলী ও অনুলেখকের মন্তব্যসহ পুথির বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাটি সুলিখিত।

রাজা রামমোহন—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। ইউ. এন. রয়. এণ্ড কোং ৫৮ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৵৹ আনা।

অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া যে-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যরসিক বাঙ্গালী কখনো ভুলিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছু দিতে পারিতেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার যেসব ছোট ছোট প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল আলোচ্য পুস্তকে সেইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে রামমোহন রায় সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তবু সত্ত্বেও এ পুস্তকের মূল্য কম নয়। এক দশক পূর্ব্বে রামমোহন রায় বিষয়ে জ্ঞাত তথ্যের আলোচনায়ই একজন সাহসী পুস্তকের তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, এই পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেরই এ পুস্তক পাঠ করা উচিত।

মুদীর দোকান (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—শ্রীপরেশনাথ বসু, ৬।১ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই বহু আমাদের জন্মের পূর্ব্বে বহু আমরা যখন শিশু তখন লিখিত। সুতরাং এই পুস্তক সমালোচনার অধিকার আমাদের আছে কি না, তাহাই ভাবিতেছি। পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিলাম আমরা কত কথাই জানি না, 'কমলাদেবী' ও 'জিলাই', 'সূচি-চরকারী' ও

'রাবাক' লেখকও যে জাহাজ চালা রাখিতে পারে, এই পুস্তকখানির মূল্য তাহা বুঝি নাই। পাঠিত ও প্রকাশের সাধারণতঃ একত্র লেখা হয় না। এই ছত্রগুলিতে এই দুই শক্তির সহজ সমন্বয় দেখিলাম। অতি সরল ভাষায় যে কঠিন তত্ত্বসমূহের আলোচনা করা যায়, লেখক তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। পুস্তকপরিচিতি লেখা বিষয়ের সহিত আমরা একমত নই, তাহা সম্ভব নয়। কেহ মূল বসিয়া ইহা লেখে, সে-মূলের কোনও কথাই আধুনিক বাঙ্গালী নির্বিশেষে গ্রহণ করিতে পারে না। চিন্তাধারা আমাদের অন্যরূপ হইয়াছে, পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু তবু স্বীকার করিতে হয়, এ পুস্তকে আমাদের চিন্তার খোরাক আছে। জিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠক ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

ধাঁধার উত্তর—(গল্পের বই) শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১।০ সিকা।

বরদা ডাক্তার (গল্পের বই)—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

জগদীশের দিগ্‌দারী (নাটিকা)—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

গল্প-লেখক হিসাবে অসমঞ্জবাবু বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার যে পুস্তক কয়খানি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি, সেগুলি কিছুকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এ পুস্তকগুলির সম্বন্ধে এখন কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। অসমঞ্জবাবুর লেখা হইতে বোঝা যায়, তাঁহার চরিত্র-পরিচয়শক্তিও আছে, জীবনের প্রাত্যহিক দিকটার সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। তাঁহার গল্প পড়িয়া সাধারণ পাঠক আনন্দ পাইবেন।

কবীর-পন্থা—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক : শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১ গার্ডেনার লেন, কলিকাতা। ।০ আনা।

কবীর সাহেব ভারতবর্ষের সাধকমণ্ডলীর একজন শিরোমণি। বাংলা ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তক ছাড়া বোধ করি এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন লেখক নাই। সেন মহাশয়ের পুস্তকে কবীর সাহেবের সাধন-পন্থার বিশেষ উল্লেখ নাই। এই পুস্তিকাতে কবীর-পন্থার মূল কথাটা সহজ বাঙ্গালায় আলোচিত হইয়াছে। কৌতূহলী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ্য।

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার কয়েকটি লেখা ও লেখক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে কয়েকটি রচনা পাঠ করিয়াছিলেন, এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধটি তাহারই অন্তর্গত। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের দরবারে অধুনা কয়েকজন কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি অসহ্য উৎসাহে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কবিতা নামধেয় রচনা ছাপাইয়াও কেন কবিপদবাচ্য হইতেছেন না, তাহার জবাব এই প্রবন্ধে আছে। তাঁহাদের তথাকথিত ছন্দ, ছন্দ নয় বলিয়াই গোল। তিনি বলিতেছেন :

"ছন্দের সঙ্গে অছন্দের তফাৎ এই : কথা একটানে চলে, আরেকটানে গদ্য হলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো থেমে, কখনো নেচে, কখনো দৌড়াই করে, চালে কাজে : যে ছিষ্টি ছাড়া থেকে সে আপিসচালায়, টাকা করে, হিসাব করে, হিসাব রেখে, চলা থাকায়। ব্যবসাদারি চলে প্রবীণতা ছন্দোহীন থাকে, অবসরসাধ্য সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় হতে কাজে পারে।"

প্রবন্ধটির উপসংহার ভাগও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"উপসংহারে শেষ কথা এই যে কাব্যের অধিকার প্রসর হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধতে তাদের ছন্দ দিয়ে। এখনো কাব্যের পালা সুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আর পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি অলক্ষ্যতে গদ্যে পদ্যে ঢলাঢলি চলছে। যাবার আগে তাদের হাজিরাখাতায় আমিও একটি সই দিয়েছি।"

এই রফা-নিষ্পত্তির কথা বাংলাদেশের নয়, পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের আসরেই এই রফা-নিষ্পত্তি চলিতেছে। বাংলাদেশে যদি কেহ এই বিষয়ে কোনও সাহস দেখাইয়া থাকেন তবে সে রবীন্দ্রনাথই দেখাইয়াছেন, লিপিকাতে। এই কাজে অপর কোনও বাঙ্গালী কবির এমন কোনও সাধনা নাই যাহাতে তিনি হাজিরাখাতায় রবীন্দ্রনাথের সহি দেখিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠিতে পারেন।০০

চৈত্র সংখ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি বৈশাখ সংখ্যা হইতে "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" লিখিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু কেহই মাতৃভাষার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিষয়প্রারম্ভ হইতে আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তিনি রচনা করিবেন। বহু বিষয়ে তিনি নিজের ও সহকর্ম্মীগণের গবেষণালব্ধ সম্পূর্ণ নূতন তথ্যের অবতারণা করিতেছেন।**

ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ (মিউনিক ও প্যারিস) বর্ত্তমান সংখ্যায় 'ভাষা ও জাতি' সম্বন্ধীয় নিবন্ধে এমন কতকগুলি সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, ভাষা সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই সেগুলির সমাধান, অন্ততঃ এবিষয়ে কিছু চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি পরবর্ত্তী 'জাতীয় ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। বিষয়ের উপর দখল থাকিলে একটি স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে কত কথা গুছাইয়া বলা যায় এই প্রবন্ধটি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। **

বৈশাখ সংখ্যা হইতে 'বিজ্ঞান জগৎ' বিভাগ শুরু হইল। এই বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি বিজ্ঞানের বহুবিভাগে, বিশেষ করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিভাগে, অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতেও যশস্বী হইয়াছেন। তিনি যে শুধু ইংরেজীতে গবেষণা না চালাইয়া মাতৃভাষাকেও বিজ্ঞান-রচনার উপযোগী করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা।**

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর সঙ্গীত-বিজ্ঞানক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মীরাবাঈএর কয়েকটি ভজন এবং প্রাচীন কয়েকটি দোহা ও সঙ্গীতের স্বরলিপি বঙ্গশ্রীর জন্য করিয়া দিতেছেন। এই সংখ্যায় একটি ভজনের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।**

উদীয়মান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' গল্পটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইলেও একটি বৃহৎ গল্পের প্রথম অংশ মাত্র। এই জন্য 'অভিশাপ' উপন্যাসটি চৈত্র সংখ্যায় শেষ হইলেও বৈশাখে স্বতন্ত্র উপন্যাস শুরু হইল না, 'একটি দিনে'র পরবর্ত্তী গল্পগুলিই পর পর উপন্যাসহিসাবে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলন

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৯শে, ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্টীটস্থ কুমারসিং হলে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হয়। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিনে ও পৃথক পৃথক সভাপতিত্বে সম্মেলনের অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত শাখার সভাপতিত্ব করেন—

চারুকলা ও লোকসাহিত্য শাখা—শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন।
সাহিত্য শাখা—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে।
গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা—কে এম আশ্রাফুল্লাহ্।
ইতিহাস শাখা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন।
বিজ্ঞান শাখা—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র।
ধনবিজ্ঞান শাখা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।
বৃহত্তর বঙ্গশাখা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাংলাভাষা ও মুসলিম সাহিত্য-শাখা—ডক্টর কবীর।
শিশুসাহিত্য ও মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক।

মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভারতের ইতিহাস হইতে ভারতের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, যে, ভারতবর্ষ কখনও লুণ্ঠনরাজ করিয়া রাজ্য বিস্তার করে নাই—ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহার প্রেম ও ঐক্যধর্ম্ম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়া এখনও আমরা বিশ্বসভায় আমাদের বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিতে পারি।

ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাহা বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য-সঙ্কটকে তিনি নানাদিক হইতে দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে সেই সঙ্কট হইতে ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এই সম্মেলনে পঠিত হয়—অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'ঐতিহাসিকের সাধনা' এবং শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাকের 'শিশু-সাহিত্য'। 'শিশু-সাহিত্য' প্রবন্ধটি অন্যত্র অংশত উদ্ধৃত হইল।

সম্মেলনের বিশেষ বিশেষ অধিবেশন-বিষয়ে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—যত আয়োজন করিয়াই এই সকল সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা না কেন, উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যা তাহাতে গণ্য বাড়িবে। এই সকল বিষয়ে সহরের মানুষের আদৌ কোনও উন্মাদনা নাই, কর্তব্যবোধ তো কোনো কালেই জাগ্রত হয় নাই। বরঞ্চ এই পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে মফঃস্বলের কোথাও এই আয়োজন করিলে অন্ততঃ অনুষ্ঠাতারা যে তৃপ্ত হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সহরে এই সমস্ত সভাসমিতিতে যোগদান করার অনেক হাঙ্গামা, এখানে থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, ফুটবল সুরু হইতে চলিয়াছে—মানুষের সময় কোথায়? একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলে অথবা নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত করিয়া অথবা টিকিট বেচিয়া এই আয়োজন করিলে এই সম্মেলন অধিকতর সাফল্য লাভ করিত।

স্যার আশুতোষের প্রতিমূর্তি উন্মোচন

একদিকে চৌরঙ্গী, অপরদিকে নবগঠিত কলিকাতার শ্রেষ্ঠ রাজপথ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, পিছনে আলোক-বাহী বিদ্যুৎ-ভবন, পাশে রক্ত-আলো বিমণ্ডিত ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রবেশ-তোরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে পশ্চাদ্‌ভাগ, কোর্ট উইলিয়ামের দিকে সম্মুখবর্তী স্যার আশুতোষের ব্রোঞ্জ-মূর্তির আবরণ-উন্মোচন-উৎসব গত ১১ই চৈত্র মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার যশস্বী শিল্পী মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এই মূর্তি গড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের পরিচ্ছদে, আপনার হেঁকে আপনি মশ্গুল, সেই অপূর্ব ভঙ্গীতে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, মূর্তির সর্বাঙ্গে কি কঠোর নিরন্ধ্রতা!

রাত্রে চারিদিকের তীব্র আলোর পটভূমিতে মূর্তির মুখ বড়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখায়।

বাঙ্গালার আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

বাঙ্গলার আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে আর্থিক তদন্ত-বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই আর্থিক তদন্ত-বোর্ডের সঙ্গে বাঙ্গলার পল্লী-সংস্কার সমস্যা বিশেষভাবে সংযুক্ত। এই বোর্ডের প্রাথমিক অধিবেশনে স্যার জন এণ্ডারসন যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে এই মারাত্মক সমস্যা দূরীকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার বাচনিক প্রমাণ বিশেষ ভাবে পাওয়া গিয়াছে। এই বোর্ডের সভ্যরা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনেকেই যে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। বোর্ডের প্রাথমিক অধিবেশনে স্যার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন, "দেশের শাসন-কার্য্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষিত জনমতের সমর্থন পান, তবেই তাঁহারা ভাল ভাবে কাজ করিতে পারেন, আর্থিক সমস্যা সমাধান ব্যাপারে, এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য।"

শিক্ষিত জনমতের সহযোগিতা এবং সমর্থনের উপরেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে—এ কথা বহু সহস্র বর্ষ হইতে লোকে জানে। শিক্ষিত জনমতের সহযোগিতাকে উপেক্ষা করা, বাঙ্গলার তথা ভারতের গত শতবর্ষের রাষ্ট্র-ইতিহাসে বিরল ঘটনা নহে। শিক্ষিত জনমত যে ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্তের অনুকূল হইবে, সে ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য লওয়া হইবে; আর যেখানে তাহা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হইবে, সেখানে তাহাকে বিদ্রোহাত্মক বলিয়া নিষ্পেষিত করা হইবে—এই নীতি শিক্ষিত জনমতকে সন্দিগ্ধ, উদাসীন, বৈরীভাবাপন্ন এবং অনেক সময় অলস করিয়া ফেলে। এ হেন ক্ষেত্রে অনেক সময়, প্রকৃত বিরোধের অবকাশ না থাকিলেও রাষ্ট্র এবং জনমত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে। উভয়েই ভুল করে। রাষ্ট্র অকারণ উদ্বিগ্ন হয়; জনমত অকারণ সন্দিগ্ধ হয়। ফলে জলপ্রপাতের মত পথের ধারেই পড়িয়া থাকে। বাঙ্গলার রাষ্ট্র ব্যাপারে আজ সেইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য কোন্ পক্ষ কতখানি দোষী, তাহা লইয়া বিচার বিতর্ক করিয়া ধোঁয়াকে আঁখিতে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত জনমত ও রাষ্ট্রের রক্ত-

সম্পর্কের এই বিরোধিতাকে আজ প্রকৃত কর্মচেষ্টার মধ্য দিয়া দূর করাই প্রত্যেক কল্যাণকামী লোকের প্রথম কর্ত্তব্য। আশা করি, এই নবগঠিত আর্থিক অনুসন্ধান-বোর্ডকে, তাহার প্রথম সফল উদ্যম বলিয়া দেশের লোক যেন বুঝিতে পারে।

মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা

সংবাদে প্রকাশ যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। কি ভাবে তাহা কার্য্যকরী হইবে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বৈঠক হইবে। এই বৈঠকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ৬ জন প্রতিনিধি দেওয়া হইবে। বৈঠকের স্থান এবং সময় এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চির-জয়ন্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে জয়ন্তী-কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে ১১০০৸৵০ সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ লইয়া আচার্য্য-রায়-ছাত্রভাণ্ডার নামে একটি-সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই জয়ন্তী উপলক্ষে কোনওরূপ অকারণ অর্থ-ব্যয় হয় নাই। দরিদ্র ছাত্রদের বন্ধু তাহা চাহেন নাই। সামান্য যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা সংগৃহীত চাঁদা হইতে হয় নাই। কমিটীর সদস্যগণ স্বতন্ত্র চাঁদা দিয়া সেই খরচ নির্ব্বাহ করিয়াছেন। "আচার্য্য রায় স্মারক গ্রন্থ"-প্রকাশের সমস্ত খরচ দিয়াছেন ডাক্তার সত্যচরণ লাহা মহাশয়। ঐ পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থও উক্ত ছাত্র-ভাণ্ডারে জমা হইবে। দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া, এইরূপ অনাড়ম্বর আয়োজনের দ্বারা জয়ন্তী-কমিটীর সদস্যগণ উপযুক্ত ভাবেই পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যের জীবন-আদর্শকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

নিহত ও আহত রাজকর্ম্মচারীদের সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ১৯০৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে, যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী নিহত বা আহত হইয়াছেন, তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত বিপ্লবীদের হস্তে নিহত কর্ম্মচারীর সংখ্যা—৪০; বিপ্লবীদের হস্তে আহতদের সংখ্যা—৬২; অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে নিহত কর্ম্মচারীদের সংখ্যা—৫; এই সম্পর্কে আহত কর্ম্মচারীদের সংখ্যা—১৭০।

পরলোকে ডাঃ পি. নন্দী

৫৫ বৎসর বয়সে গত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতায় স্বনাম-খ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী মহাশয় রাঁচীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া বহু গৌরব অর্জ্জন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং চিকিৎসক ছিলেন। ছাত্রদের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। ছাত্রাবাসে কেহ অসুস্থ হইলে, তিনি বাড়ী হইতে তাহার পথ্য তৈয়ারী করাইয়া লইয়া যাইতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ এবং ছাত্রমণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা

শিক্ষিত বেকার ভদ্র যুবকদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-শিক্ষা দিয়া উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা হইতেছে। ফরিদপুরে প্রথম এই ব্যাপারের পরীক্ষা হয়। সেখানকার সরকারী ফার্ম্মে এক এক দলে ৫জন করিয়া যুবককে শিক্ষা দিবার জন্য লওয়া হয়। শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে, তাহাদের প্রত্যেককে তিন বৎসরের জন্য বিনা খাজানাতে ১৫ বিঘা করিয়া জমি এবং জমি তৈয়ারী করিবার প্রাথমিক ব্যয়স্বরূপ কৃষি-ঋণ আইন অনুসারে ২০০৲ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। ইহার জন্য জেলার কলেক্টার এবং দুইজন ব্যক্তির জামীনের প্রয়োজন হয়। এই ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া ১৭ জন যুবক এখন জমি লইয়া নিজেরাই চাষবাস করিতেছেন। নোয়াখালিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ৫ বৎসরের জন্য ৫০ বিঘা করিয়া জমি দেওয়া হইবে। তাহাদের পরস্পরের সাহায্য ও উন্নতির জন্য জেলার কালেক্টরের নামে একটি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খোলা হইবে। এপর্য্যন্ত প্রায় ১৩৯০ একর জমির বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে

এবং ভবিষ্যৎ সংস্কারের জন্য ১৫৮২ একর জমি পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নূতন যক্ষ্মা-চিকিৎসাগার

ধানিবীভূষণ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ আয়োগ্য-শালায় যক্ষ্মা-বিভাগ খোলা হইয়াছে। গত ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতার কৃতকর্ম্ম নেতা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় উহার উদ্বোধন করেন। এই কাল-ব্যাধি বাঙ্গালা দেশে যে ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে এই ব্যাধির সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইলে যে জনসাধারণ উপকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাজী জার্ম্মানী

জার্ম্মাণ জাতির শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিভা জগৎ-খ্যাত। একই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যখন অন্যায় প্রতিযোগিতার বেয়ারেদি বাধিয়া যায়, তখন শিল্প বিপন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে এই বেয়ারেদি বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে।

তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য নাজী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আদর্শ-অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা এমন একটি আইন করিয়াছেন, যাহার বলে অর্থ-নৈতিক বিভাগের মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে, বাড়িয়া দিতে, অথবা সম্মিলিত করিতে পারেন। এই আইনে অর্থ-নৈতিক বিভাগের মন্ত্রীকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ-অমান্যকারীকে তাঁহার বিচার মত শাস্তি দিতে পারেন। এই ভাবে তাঁহারা অন্যায় প্রতিযোগিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে জার্ম্মাণ শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্বরাজ্য-দলের পুনর্গঠন ও মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা দিল্লীতে সম্মিলিত হইয়া স্বরাজ্য-দল পুনর্গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন,

"স্বরাজ্য-দল পুনর্গঠন এবং ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী নির্ব্বাচনে যোগদান সমর্থন করিয়া ঐ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুমোদন করিতে আমার কোনও দ্বিধা নাই;—আপনাদের কাছেই শুনিলাম যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদের অস্তিত্বকাল ফুরাইলে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আইন-সভাগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আমার কি মত, তাহা সর্ব্বসাধারণের সুপরিজ্ঞাত। ১৯২০ সালে এই বিষয়ে আমার যে মত ছিল, আজও আমার মোটামুটি সেই মতই আছে। তবে যে সকল কংগ্রেস সদস্য কোনও না কোনও কারণে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে যোগদান করিতে অসম্মত বা অক্ষম, এবং যাঁহারা আইন-সভায় প্রবেশের উপকারিতায় আস্থাবান, তাঁহাদের পক্ষে আইন-সভায় প্রবেশের চেষ্টা করা, এবং তিনি বা তাঁহারা যে কর্ম্মপন্থা দেশের পক্ষে হিতকর বিবেচনা করেন, আইন-সভায় সেই কর্ম্মপন্থা অনুসরণকল্পে দল গঠন করা কেবল যে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত তাহা নহে, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যও বটে। আমার পূর্ব্বোক্ত মত বজায় রাখিয়া যত দূর সম্ভব আমি সাধ্যানুসারে সর্ব্বদাই স্বরাজ্য-দলের সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

স্বরাজ্য-দল পুনর্গঠনের সঙ্গে আর একটি বিষয় কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। গত জুলাই মাসে ব্যাপক ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু সত্যাগ্রহের আদর্শকে বজায় রাখিয়া ব্যক্তি-গত ভাবে আইন অমান্য করিতে নির্দ্দেশ মহাত্মা দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধ সত্যাগ্রহ আদর্শ লইয়া ব্যক্তিগত ভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন করিলে, বিপ্লবীদল এবং গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করা যাইবে। দেশের অন্যান্য সকলের মত তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সেইজন্য তিনি আজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি প্রত্যাহার করিলেন। জাতীয় রাষ্ট্র-আন্দোলনের সম্মুখে এখন দুইটি সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—একটি হইল, স্বরাজ্য-দল গঠন দ্বারা শাসন-পরিষদ অধিকারের ব্যবস্থা, আর একটি হইল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতির অভাবে নূতন কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা।

একথা আজ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ব্যাপকভাবে কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং উপ-

করণ দেশের মধ্যে এখন নাই। বহু কর্ম্মী এবং নেতা অবরুদ্ধ। যাঁহারা বাহিরে আছেন, তাঁহাদের গতি-বিধি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। যে সঙ্ঘবদ্ধতা ব্যাপক-আন্দোলনের ভিত্তি, তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া অপক্কে উত্তেজিত করিয়া কোনও লাভ নাই। সেইজন্য নূতন করিয়া, নূতন পরিস্থিতি বিচার করিয়া কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা গান্ধী নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়া, নূতন কর্ম্মপদ্ধতি এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ কংগ্রেসকে দিয়া রাজনৈতিক বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন।

প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্ব

গত বৎসর বেলুনে ৮০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সাঁতার কাটিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ অবিরাম-সন্তরণ ব্যাপারে সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতিত্বে তিনি সন্তরণ বিদ্যা এবং সন্তরণ ক্রীড়ার সমগ্র ভারতে একটা নব-প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার হেদোয় পুষ্করিণীতে তিনি এক নূতন ধরণের সন্তরণে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় তিনি ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল পরমানন্দে সন্তরণ করেন। জগতে আর কেহই এইভাবে এত দীর্ঘ কাল সন্তরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় ৫০ ঘণ্টা সন্তরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বে আজ বাঙ্গলার যৌবন কৃতার্থ।

কলিকাতার নূতন মেয়র

গত ২৭শে চৈত্র কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী-মেয়র নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এ. কে. ফজলুল হক মেয়র ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী-মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ফজলুল হক জেলা কংগ্রেস কর্পোরেশন কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন এবং জেলা কংগ্রেস কর্পোরেশন এসোসিয়েশনের সভ্যগণের ও সমুদয় নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্যগণের সমর্থন পাইয়াছিলেন।

সভায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ (যাঁহারা শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সমর্থক ছিলেন) কর্পোরেশনের গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সভ্য ও ইউরোপীয় সভ্যদিগের সহিত একযোগে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

মেয়র-নির্ব্বাচন-সভায় সভাপতি-নির্ব্বাচন উদ্দেশ্যে আহূত সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত সভাপতি মৌলবী শামসুদ্দীন আহেদ, মিঃ বি. এন. ব্যানার্জ্জির এক প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্দেশ দেন যে, গত বৎসরের সরকার-মনোনীত সদস্যগণ এই সভার কার্য্যে যোগদানে অক্ষম; কেন না, সরকার একটি আর্থিক বৎসরের জন্যই সভ্য মনোনয়ন করিয়া থাকেন। গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখই আর্থিক বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা পুনরায় চলতি বৎসরের জন্য সরকার কর্ত্তৃক এখনও মনোনীত হন নাই। কাজেই এই সভার কার্য্যে যোগদানে তাঁহাদের আর কোন অধিকার নাই। পরে মেয়র-নির্ব্বাচন-সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও এই অভিমত সমর্থন করায় মেয়র পদের জন্য মিঃ হকের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত সরকারের সমর্থকগণ, শ্বেতাঙ্গ ও মনোনীত সভ্যগণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মিঃ ফজলুল হক ও অধ্যাপক এস, সি, ঘোষ তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটী-মেয়র নির্ব্বাচিত হন।

পরলোকে মিঃ কে. এন. চৌধুরী

বাংলার প্রসিদ্ধ শিকারী স্বনাম-খ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কে. এন. চৌধুরী মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে বাঘ-শিকার করিতে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াইএ কালাহাণ্ডি রাজ্যের অন্তর্গত বলরামপুরের জঙ্গলে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। চুয়ান্ন বার বাঘের সঙ্গে জঙ্গলে লড়াই করিয়া চুয়ান্ন বারই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন, পঞ্চান্ন বারের বেলায় তিনি পরাজিত হইলেন। আহত বাঘের সন্ধানে যখন মাচা হইতে নামেন, তখন পিছনের ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত ব্যাঘ্র তাঁহাকে পিছন হইতে আক্রমণ করে। তাঁহার মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল, তখনও তাঁহার হাতে টোটা-ভরা রাইফেল।

দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, এই প্রবীণ শিকারী কেরাণী-বাঙালীর সহজ মৃত্যুমুখে না পড়িয়া বীরের মৃত্যুকেই বরণ করিলেন।

দুঃস্থ কৃষকদের সাহায্যদান

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, আংশিক ভাবে ফসল না হওয়ার দরুণ বাঙ্গলার কয়েকটি জেলায় কৃষকরা যে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কয়েকটি জেলায় কৃষি-ঋণ এবং এককালীন দানের মঞ্জুরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে এইভাবে কৃষি-ঋণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মেদিনীপুর —২২৫০০৲ ; মালদহ—৩১০০০৲ ; ভাঙ্গড়-হারবার—৩২০০০৲ এবং ৩১০০৲ এককালীন ; বীরভূম—৪৭১১৲ ; যশোহর—৫৬৫০০৲—২০০০৲ এককালীন দান ; খুলনা—১৭০০০৲। বন্যার দরুণ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় যে দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য কৃষিঋণ হিসাবে ২২,০০০৲ টাকা মঞ্জুরের জন্য মঞ্জুর হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে মুসলিম মহিলা

গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীমতী আমেনা খাতুন যশোহর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া প্রথম মহিলা কমিশনার নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান মৌলবী আবদুল সালাম্ বি-এল উকীল মহোদয়ের পত্নী।

দক্ষিণ-ভারতের বৈজ্ঞানিক স্যার রামণ

সম্প্রতি স্যার সি. ভি. রামণের সভাপতিত্বে দক্ষিণ-ভারত বৈজ্ঞানিক সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আদর্শে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ, ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল ভারত সায়েন্স কংগ্রেসের কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, এই বিরাট দেশের অবস্থার পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া এবং কমিটি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়া সম্মেলনে এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের বৈজ্ঞানিক গণ বিবেচনা করেন যে, কলিকাতার কয়েকজন মাত্র বৈজ্ঞানিক লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্রদল ভারতের বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ প্রদান করিবে, ইহা পরিতাপের বিষয়। সমিতি এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাহেন, যাহাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কর্ম্মী সকলেরই স্থান থাকে।

সমিতি "বঙ্গীয় কমিটির আশ্চর্য্যজনক অতিরিক্ত ত্বরা"র নিন্দা করিয়া দাবী করিয়াছেন যে সমগ্র বিষয়টি ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস ও বিজ্ঞান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়ার পূর্ব্বে এই বিষয়ে যেন কিছু না করা হয়।

এই প্রস্তাবের কোনও সঙ্গত কারণ আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়াও বাহির করিতে পারিলাম না। এই প্রস্তাবের ভাষার মধ্যে প্রাদেশিকতা-দুষ্ট যে অকারণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিস্ফুট, তাহা স্যার রামণের মত বিশ্ববিশ্রুত একজন বৈজ্ঞানিকের অনুমোদনের উপযুক্ত নয়। গত ডিসেম্বর মাসে, বাংলা দেশে নয়, বোম্বাই শহরে, নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব হয়। "কলিকাতার কয়েকজন মাত্র বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের" বৈঠকখানায় গোপনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এবং যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এই 'বিরাট দেশের' পক্ষে কি ভাবে অনুপযুক্ত হইল তাহাও বুঝিতে পারি না। দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার প্রস্তাবে যে-সব জিনিষের জন্য অনুতাপ করা হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটি বোম্বাই কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবটির মধ্যে এমন কোনও উল্লেখ নাই যে, তাহা কলিকাতার "কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্রদলের" দ্বারা পরিচালিত হইবে। অপরাধের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে, বোম্বাই অধিবেশনে ডাঃ মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান-সভার সম্পাদকের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "যাহাতে পরামর্শ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পর বৎসরই কোন একটি স্থানে মিলিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করা এবং তাহার জন্য ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুনরধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান-পরিষদ গঠনের জন্য এখনই চেষ্টা করা যাইতে

পারে।" ইহাকেই যদি দক্ষিণ-ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ "অতিরিক্ত স্তরা" বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেরই দোষ! কলিকাতায় মাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিক লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্রদল বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ প্রদান করিবে, ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট অতি পরিতাপের বিষয়, কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা বাঙ্গলার পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে; স্যার রামণকে যেদিন কলিকাতা শহরের একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরই প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান, ল্যাবরেটরীর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, তখন বাঙ্গলা অনুতাপ করে নাই, লজ্জিতও হয় নাই। যেদিন কলিকাতার টাউন-হলে কলিকাতার অধিবাসীরা স্যার রামণকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, সেদিন বাঙ্গালী কোনও দক্ষিণ-ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে সম্বর্দ্ধিত করে নাই—একজন ভারতবাসীকেই অভিনন্দিত করিয়াছিল।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষামন্দির

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ৩১, ৩২ ও ৩৩ সনের কার্য্য-বিবরণী আলোচনার্থ পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠানটি চন্দননগরে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবরণীতে দেখিতেছি, গত বর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩৮টি, তন্মধ্যে অবৈতনিক ১৫টি, অর্দ্ধবৈতনিক ৮টি। শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৮ জন। তন্মধ্যে গ্রাজুয়েট ৩ জন। এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব সম্পর্কে লেখা হইয়াছে, "ছাত্রীরা যাহাতে আনন্দের মধ্য দিয়া সাধারণ জ্ঞান লাভ করে সেই জন্য শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।" ছাত্রীনিবাস আছে।

আমরা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ভারতবর্ষের ফিল্ম-শিল্প

বাংলা সরকারের গত বৎসরের যে শাসন-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ফিল্ম-ব্যবসায়ের বিষয়ে কতগুলি তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩২-৩৩ সালে বেঙ্গল বোর্ড অব সেন্সর মোট ২৯৬১৪৫ ফুট ফিল্ম প্রদর্শনের উপযোগী বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শতকরা ৯·৯৭ ভাগ ফিল্ম ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে।

অল্পদিন আগে ভারতবর্ষে যত ফিল্ম দেখানো হইত তাহার প্রায় সমস্তই ছিল আমেরিকান। ভারতে প্রস্তুত ফিল্মের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র এক ভাগ। বৃটিশ ফিল্ম তখন ভারতে শতকরা একভাগেরও কম আসিত। বর্ত্তমানে বৃটিশ ফিল্মের পরিমাণ বাড়িয়া শতকরা ৩২.৮৭ ভাগ হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রদর্শিত ফিল্মের মধ্যে বৃটিশ ফিল্মের পরিমাণ যে-রূপ বাড়িয়াছে ভারতীয় ফিল্ম সেরূপ বাড়ে নাই। ভারতীয় ফিল্মের প্রায় তিনগুণ বৃটিশ ফিল্ম ভারতবর্ষে দেখানো হইয়া থাকে।

ভারতের ফিল্ম-শিল্পের বয়স বৃটিশ ফিল্ম-শিল্পের বয়স অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন দেশে স্বাভাবিক নিয়মে দেশীয় ফিল্মগুলিই সাধারণকে বেশী আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিদেশী ছবির তুলনায় অনেক বিষয়ে অপকৃষ্ট হইলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। দেশীয় ফিল্ম-শিল্পের বয়স কম হইলেও ইতিমধ্যে এই শিল্পটির এতটুকু উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, যাহাতে অন্ততঃ বৃটিশ ফিল্ম যে পরিমাণ দেখানো হয়, প্রদর্শিত দেশীয় ফিল্মের পরিমাণও তাহার সমান হয়। বর্ত্তমানে প্রয়োজনা ফটোগ্রাফি প্রভৃতির উন্নতি হইয়া ভারতবর্ষে প্রস্তুত ছবিগুলি আগের চেয়ে অনেক ভাল হইতেছে। প্রদর্শিত ছবির পরিমাণও বাড়িতেছে। দেশের যেসব টাকা-ওয়ালা লোক দেশীয় ফিল্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন তাঁহাদের চোখও খুলিয়া গিয়াছে। শিল্পটির দাঁড়ানোর জন্য যে পরিমাণ তোড়-জোড় প্রয়োজন ছিল তাহাও আশাপ্রদ-ভাবে সুরু হইয়াছে। বায়ান্ন সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতায় ভিড় করিয়া চণ্ডীদাস দেখিতে গিয়া জনসাধারণ দেশীয় ছবির প্রতি তাহাদের প্রীতির পরিচয়ও দিয়াছে।

সুতরাং মনে হয়, এ বৎসরে অনুপাতে যে দেশীয় ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ কেবল দেশীয় ছবিগুলির অপকৃষ্টতা নয়। শাসন-বিবরণীতে বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ছবিই বেশী পছন্দ করে। বিদেশী প্রেমমূলক ছবিগুলির আকর্ষণ দেশের শিক্ষিত লোকেদের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রেম ও আধুনিক সমাজ-সমস্যামূলক ছবিগুলির সাফল্যের জন্য যেরূপ উচ্চাঙ্গের প্রযোজনা, আর্টিস্টিং প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও রোমাঞ্চকর ছবির জন্য তাহা দরকার হয় না। এই ধরণের দেশীয় ছবিগুলিতে এখন যেটুকু ফিল্ম-টেকনিক প্রয়োগ করা হয়, তাহাই যথেষ্ট। ফিল্ম-শিল্পের প্রথম যুগে এই ছবিগুলির আয়ের দিক হইতে বেশী সাফল্য লাভ করা উচিত ছিল।

এই সব বিবেচনা করিয়া আশঙ্কা হয়, দেশীয় ছবিগুলি যত কালই হোক কতগুলি দেশগত অসুবিধার জন্য ভারতবর্ষের ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে ভাষাগত ও রুচিগত প্রভেদটাই এই নবজাত শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ভাষাগত অসুবিধার জন্য বাংলার ফিল্মের চেয়ে হিন্দী ফিল্মের কোম্পানী গুলি-বেশী লাভবান হয়।

বর্তমানে যতটুকু হইয়াছে ভারতবর্ষের ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি অবশ্য সেইখানেই থামিয়া থাকিবে না। কিন্তু দেশীয় ছবিগুলির সাফল্য হইবে প্রাদেশিক। যে ছবিটি দেখিয়া বাঙ্গালী খুসী হইবে বিহারে সে ছবিটি দেখানো চলিলেও গুজরাটে চলিবে না।

ফিল্ম-শিল্প বিষয়ে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের এখনও কর্তব্য অনেক আছে।

শিশুসাহিত্য

শিশুসাহিত্যের অর্থ দুইটি হইতে পারে—প্রথমতঃ শিশুদের সম্বন্ধে সাহিত্য,—অর্থাৎ তাহাদের বিষয় অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য। দ্বিতীয়তঃ—শিশুদের জন্য সাহিত্য। এই দ্বিতীয়টিই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভের পূর্বে দেখা দরকার, সাহিত্যশিক্ষার উপকারিতা কি? প্রত্যেক জাতির ভাষা লইয়াই—তাহাদের সাহিত্য।...

...ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ করিতে হইলে, একদিকে শব্দের প্রকৃত অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং অপরদিকে নিজের মনোভাব উপযুক্ত শব্দদ্বারা প্রকাশ করা আবশ্যক। প্রকৃত শব্দজ্ঞান না জন্মিলে চিন্তাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না এবং অধিকসংখ্যক শব্দ আয়ত্ত না হইলে জ্ঞানের বিস্তৃতি হয় না। সৎসাহিত্য দ্বারা এই দুই অভাব দূর হয়, আমাদের শৈশবের ধারণাগুলি অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট থাকে। সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই অসম্পূর্ণতা ক্রমে ক্রমে দূর হয়। সাহিত্যশিক্ষা দ্বারা কেবল যে মনোবৃত্তি-সমূহের বিকাশ হয় তাহা নহে, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হয় ও আত্মচেষ্টায় জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা জন্মে। জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক যদি না হয় তবে সাহিত্যশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই কারণে শিশুদের সাহিত্য-শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।...

...শৈশব হইতে যাহাতে সাহিত্যের প্রতি শিশুদের অনুরাগ জন্মে, তাহা করিতে হইবে। এই অনুরাগ জন্মাইতে হইলে এবং সাহিত্য সুশৃঙ্খলরূপে শিক্ষা দিতে হইলে, দুইটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে—(১) কিরূপ সাহিত্য শিশুদের হাতে দিব, (২) কি প্রণালীতে সাহিত্য শিক্ষা দিব। দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনা করিবার স্থান এখানে নয় এবং সময়ও হইবে না। প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিব :—

কিরূপ সাহিত্য শিশুদের হাতে দিব? এই প্রশ্নের উত্তর আবার দুইদিক হইতে দিতে হয়—(১) কি উপাদান লইয়া শিশুদের সাহিত্য গঠিত হইবে; (২) কিরূপ ভাষায় শিশুদের সাহিত্য লিখিত হইবে।

প্রথমটি, অর্থাৎ কি উপাদান লইয়া শিশু-সাহিত্য রচিত হইবে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে শিশুদের মানসিক ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।—তাহাদের মানসিক বিকাশের বিষয় বিবেচনা না করিয়া কখনও তাহাদের সাহিত্যের উপাদান স্থির করা যাইতে পারে না। শিশুর মনের বিকাশের সাধারণভাবে তিনটি ভাগ করা যাইতে পারে—(১) হইতে ৬ শৈশব, (২) ৬—১২ বাল্য (৩) ১২—১৮ কৈশোর। মোটামুটি ১৭।১৮ বৎসর বয়সে আমাদের দেশে যৌবনারম্ভ হয়। শিশুদের মানসিক উন্নতির এই বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী তাহাদের জন্য সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।—বয়সভেদে শিশু-প্রকৃতি ভিন্ন হয়, এইজন্য সব অবস্থায় শিশুদের একই বিষয় পাপ খায় না।...

...শিশু-চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে তাহাদের উপযোগী সাহিত্যের একান্ত আবশ্যক। শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের এখন প্রথম-শৈশবের অবস্থা বলিলেই চলে—উৎসাহী সাহিত্যিকগণের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া হওয়া উচিত। *

—শ্রীপূর্ণিমা বসাক

* কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের—শিশুসাহিত্য ও মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর অভিভাষণ।

শ্রীনিকাশ মজুমদার কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রঙ্গশ্রী

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড— ৫ম সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[জ্যৈষ্ঠ—১৩৪১

বিষয়	লেখক	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাংলা সাহিত্যে ছাপা-বিভ্রাট	শ্রীহরসুন্দর রায়		শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভারতীয় স্থাপত্যের চতুর্দশ (সচিত্র)	শ্রীনলিনীকান্ত সেন		শ্রীশশি সান্যাল	
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র)	শ্রীযোগানন্দ ভট্টাচার্য		প্রাপ্তিস্বীকার :	
ক্রমণ:-এর পায়ে (গল্প)	শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী		শ্রীসরোজকুমার গুপ্ত	
ভারতের আর্থিক উন্নতি	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	বুধ-কথা	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন	
ভারতীয় মধ্যযুগে সুফীবাদ	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	পদ্মা (উপন্যাস)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	
সত্য-নিষ্ঠা (কবিতা)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	বাঙ্গালা সাহিত্যে	শ্রীসুকুমার সেন	৬৭৩
সেকালের ভোজ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	চতুষ্পাঠী	শ্রীবৃন্দাবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৬৮৩
মুকুলের কথা	শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ	বাঙ্গালার কথা	বিভিন্নমনা রায়	৬৮৯
ইটালী হইতে জার্মানী (সচিত্র)	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন	পাহাড় (কবিতা)	শ্রীসলিল বন্দ্যো	
পরিবর্তন (কবিতা)	শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ মিত্রালী	অন্তরঙ্গ	শ্রীনলিনী গুপ্ত	
পরমাণুবাদ ও তাহার ক্রম	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আলোচনা	শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র	
পথ (কবিতা)	শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়ুয়া	সম্পাদকীয়		
একটি সন্ধ্যা : বড় গল্প)	শ্রীনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়		

উসের চা ভারতের গৌরব

ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ. উস এণ্ড সন্স

টি-মার্চ্চেণ্টস্—১১।১ হ্যারিসন রোড

:—২, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট ১৪৩।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট

৮।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

পাষাণপুরীর পাষাণের কারাগারে আটকে
নৈরাশ্যে করলে বন্দিনী রাজকন্যা—
যে ছিল কুলবধূর মত
সওদাগরের চক্ষে আলো দেখে বন্দিনী নারী
চলে যন্ত্রের কঠিন নিকষ—বুকে বেদনার ভারী পাথর—
পুরুষের স্বার্থের বাঁশে বর্তমান ধরণী ছায়ায় মিলায়
যার চোখ নাই, সে অন্ধ—অন্ধের বেদনা কে বোঝে ?
দৃষ্টি হারা অন্ধের চেয়ে আরো মর্মান্তিক বেদনা তাহার
মন যার ব্যথার ভারে পাথর হইয়া গিয়াছে—
আধুনিক সংসারের এই করুণ চিত্র দেখিবেন
—অদ্বিতীয় কথাশিল্পী—
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত
কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা
উপন্যাসে !
নারী-চিত্তের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনন্যসাধারণ শক্তি—
বাঙলার কথা-সাহিত্যে এ উপন্যাসের জোড়া নাই !!
কমলা পাবলিশিং হাউস
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

বিবাহে—
ফোন—কলিকাতা ৪২৪
প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন -
আধুনিক জহরতের অলঙ্কার
গঠনশিল্পের চাতুর্য্য ও মিতব্যয়িতাই
—— আমাদের বিশেষত্ব ——
—ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড জুয়েলার—
বিনোদবিহারী দত্ত
মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস্
একমাত্র ঠিকানা—১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চৈত্র, ১৩৪১

কল্লোল
১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

বাংলাসাহিত্যে ভাষা-বিভ্রাট

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

বাংলাসাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে; মনে হয় এক্ষণে সব ছাড়িয়া কেবল মাত্র সেইটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়াছে। সাহিত্যিক অনাচার যত না বাড়িয়া উঠুক, ভাষার দুর্গতির আর সীমা নাই; এমন কি, কোন্ ভাষা যে বাংলা ভাষা, তাহাই যেন ক্রমে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া বাদবিতর্ক যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে উপস্থিত কোনও ফল লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর—এমন কি, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা বা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিদ্যার পরিচয় যেমনই হোক, রসবোধের মাত্রা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কিছুদিন পূর্বে একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকায় একজন সাহিত্যিক অধ্যাপক, বাংলাসাহিত্যের একশতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের যে তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে সম্পাদক মহাশয়ের সুবিবেচনা, এবং অপরদিকে, সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের রুচি, রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শনে সুস্থিত হইয়াছিলাম। সবচেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে,—রুচি ও রসবোধের কথা ছাড়িয়া দিই—এই সকল ব্যাপারে সহজ বুদ্ধিরও অভাব ধরা পড়ে—হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ও ইঁহাদের নাই। বাংলাসাহিত্য এমনই অরাজক, যে, যে কেহ যেখান-সেখান হইতে একটা সনন্দ সংগ্রহ করিয়া রাজা হইয়া বসে, লজ্জা, সঙ্কোচ বা ভয়, কোনটাই নাই, কারণ, এখানে যে যত বড় ধান্নাবাজ সেই তত প্রতিভাবান। দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত একটা নয় বহু আছে। ইহাতে সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের ধর্ম-বুদ্ধির যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাই নৈরাশ্যজনক, সাহিত্যিক বিচারশক্তি বা রসবোধের কথা উত্থাপন করাই বৃথা। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও শিক্ষিত বাঙ্গালী দিগ্-বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছে—এমন কি বর্ণজ্ঞানও লোপ পাইতেছে।

* * *

প্রায় এক শতাব্দীর কর্ষণ ও অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষার যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল, যে রূপটিকে আশ্রয় করিয়া বাংলার কবি-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ যেন তাহাকে বর্জ্জন করিবার একটা প্রবৃত্তি, সকলের বড় হইতে সকলের ছোট পর্য্যন্ত, সকলের ভিতরেই দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি?

নবতন সাহিত্যিক আদর্শ বা অভিনব স্বতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা ইহার কারণ হইতে পারে না। কারণ, ভাষার ধাতু-প্রকৃতি তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রবৃত্তি—প্রত্যেক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিধান করে; এই হিসাবে ভাষা সাহিত্যের অধীন নয়, সাহিত্যই ভাষার অধীন। ভাষার প্রকৃতি জাতির অন্তর-প্রকৃতির সহিত অভিন্ন; সাহিত্যের ভাষা জাতির ভাষা, জাতির রস-চেতনার উপরেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ভাষার সহিত সেই রসিকতার নাড়ীর যোগ আছে। ব্যক্তি-প্রতিভা যতই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হউক, একেবারে দু'ইফোড় হইতে পারে না; অতি-বড় কবি-প্রতিভারও একটা বংশক্রম আছে। ভাষার যে পটভূমিকার উপরে প্রতিভা তাহার প্রাণের রং ফলাইয়া থাকে, তাহাতে সে রং ফুটিত না, যদি সেই পটবস্ত্র-খানি সমগ্রজাতির বংশপরম্পরাগত ভাবচেতনায় নিত্য আষাতে মার্জ্জিত ও বিশদ হইয়া না উঠিত। কবির চেতনা মূলে এই জাতীয় ভাবচেতনার অনুগামী, কবিশক্তি যতই ব্যক্তিগত বলিয়া মনে হউক, তাহাতে সমগ্র জাতির মনশ্চৈতন্য স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষা জাতির প্রাণ ও মনঃপ্রকৃতির বশে একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে; তাহা কৃত্রিম নয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না - তাহার মূলে জীবনের মতই একটা সত্যাকার শক্তি সক্রিয় হইয়া আছে। এই জন্য, কোনও জাতির ভাষার যে বিশেষ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে—বচন-রচনার ভঙ্গি, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি-প্রথা, উচ্চারণ-ধ্বনিমূলক শব্দবিন্যাস, শব্দের ভাবধ্বনি বা ধ্বনিমূলক ভাব-

ভাষার বিশিষ্ট রীতি—সেই সকলই তাহার জীবনের গতিভঙ্গের অনুরূপ। এই সকল লক্ষণে ভাষার যে প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া থাকে—কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা লেখক-গোষ্ঠীর দ্বারা তাহার পরিবর্তন-চেষ্টা নিতান্তই অবলম্বনিমূলক অত্যাচার। ইংরাজীতে যাহাকে style বলে তাহা লেখকের নিজস্ব বটে; কিন্তু তাহা যদি ভাষার মূলে আঘাত করে, তবে তাহা style-ও নহে, তাহা লেখকের দুরাচার। পূর্বে বলিয়াছি, ভাষা ব্যক্তির নহে, জাতির; কেবল তাহাই নয়, জাতির আধ্যাত্মিক মিলন-ভূমি এই ভাষা। জাতির সমষ্টিগত আত্মা এই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, এই ভাষায় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহারই সাহায্যে যুগ-যুগান্তরব্যাপিত একটি অখণ্ড চৈতন্য, বহুজনের জাতিস্মরতার মত অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাষাই সাহিত্যের সৃষ্টি ও স্থিতির নিদান। আজ বাঙালী তাহার সেই ভাষার মূলোৎপাটন করিয়া ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে তাহাকে মাটি হইতে 'টবে' উঠাইয়া নব নব ভঙ্গিতে সংবর্ধন করিবার প্রয়াসী। তার কারণ, তাহার জাতীয় চৈতন্য স্তিমিত হইয়াছে, সমষ্টির যোগ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া ব্যক্তির স্বৈরাচার প্রবল হইয়াছে; যাহা অখণ্ড বলিয়া দীর্ঘজীবী, তাহা খণ্ডিত আকারে ক্ষণিক বিলাসের বস্তু হইয়াছে। সন্দেহ নাই যে, জাতির প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে; কারণ ভাষার মূলক্ষয় জাতির-ই মৃত্যু সূচনা করে।

• • •

জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়াই, জাতিধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে। বাঙালী আজ অতিশয় নির্জীব, অক্ষম ও অসহায় বলিয়া, সমাজে যেমন সে সংঘব্রষ্ট, একা, আত্মীয়তা-বিমুখ, পরশ্রীকাতর,—আপনার দেশে, আপনার ঘরে সর্বপ্রকার বিজাতির পদাঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে, তেমনই অপর দিকে, 'বিশ্বমানব', 'বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিতে সুরু করিয়াছে। ঘোর তামসিক অবস্থায় মহাসাত্ত্বিকতার ভাণ বড় সুখকর। বাংলাসাহিত্যে যে ভাষাবিভ্রাটের প্রলয় উত্থাপন করিয়াছি তাহার মূলে জাতিধর্মহীন, সর্বদায়িত্বহীন এই তামসিক স্বৈরাচার আছে—থাকিবারই কথা; কারণ ভাষাই যে জাতির আন্তর জীবনের প্রতীক। তথাপি চুপ করিয়া থাকিবার সময় এ নয়; জাতির জন্য যাঁহাদের এতটুকু দরদ আছে, ভাবনা-চিন্তার শক্তি বা প্রবৃত্তি যাঁহাদের এখনও লোপ পায় নাই; যাঁহারা উপনিষদের ব্রহ্মকে আত্মসাৎ করিয়া বিশ্ব-বিহার করিতে প্রস্তুত নহেন—পরন্তু দেশ ও জাতির গণ্ডীযুক্ত সাকার সত্তাকে প্রাণে অনুভব করিয়া সাধারণ সুস্থ মানুষের মতই জীবধর্ম পালন করিতে উৎসুক; যাঁহারা বিশ্বপ্রেমের আবরণে অতি কঠিন আত্মপ্রীতির, ব্রহ্মজ্ঞানের নামে অহংজ্ঞানের সাধনায় রত হইবেন না; যাঁহারা এই বাংলার জল-মাটি-পুষ্ট বাঙালী প্রাণেরই সংস্কারকামী—বাংলা সাহিত্যের এই ভাষাবিভ্রাট সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে সচেতন হইতে হইবে; কেবল অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা সাহিত্যের রসবিলাসে মগ্ন আছেন, অথবা যাঁহারা ভাষাতত্ত্ব বা ভাষার ইতিহাস সঙ্কলনেই ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদিগকেও বিশুদ্ধ রসচর্চা ও বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা হইতে কিঞ্চিৎ অবসর করিয়া লইয়া, এ ভাবনা ভাবিতে হইবে।

• • •

যে অতিশয় অর্বাচীন সাহিত্যকে অতি-আধুনিক নাম দেওয়া হইয়াছে—কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ লেখক, যাহাদের অধিকাংশেরই বাংলা দেশ, বাঙালী জীবন ও বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় নাই, তাহাদেরই রচিত যে সকল পদ্য ও গদ্য পুস্তক, ব্যবসায়ের তাগিদে এবং অর্ধশিক্ষিত নর নারীর কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগে, দিন দিন উপচিয়া উঠিতেছে—তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের মনোভাব কতকটা কৌতুক ও কতকটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ মনোভাব ন্যায্য হইলেও, এই সাহিত্যিক অনাচার উপেক্ষণীয় নহে। সাহিত্য হিসাবে এই সকল রচনার মূল্য বেশি দিন অগোচর থাকিবে না, কিন্তু ভাষার সর্বনাশ করিবার যে উৎকট আগ্রহ ইতিমধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে—লেখক ও পাঠক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, এমন কি, সাহিত্যজ্ঞানী রসিক বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সেই অনাচারের পক্ষপাতী হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটাই অনুধাবনযোগ্য, ব্যাধির কারণ এই খানেই সন্ধান করিতে হইবে। এ অনাচারের মাত্রা লইয়া মতভেদ হইতে পারে না, ইহার মূলে যে প্রবৃত্তি আছে তাহাই ভয়াবহ।

বাক্যরীতি বা শব্দার্থসঙ্গতির মূল নিয়ম যদি একটুও অগ্রাহ্য করা হয় তবে তাহা যে কোথায় আসিয়া থামিবে, কেহ

বলিতে পারে না। প্রশ্ন এই যে—এরূপ যথেচ্ছাচার কি সজ্ঞানে হইয়া থাকে? ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে, প্রথম, ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বাক্যরচনার অক্ষমতা; দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজ খেয়ালখুশী চরিতার্থ করিবার আগ্রহ—অতি উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবশে জাতীয় রীতি বর্জ্জন করিয়া একটা নব ধর্ম্ম-প্রচারের মত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা। ভাষায় যে অনাচার প্রবল হইয়াছে তাহার মূলে এই দুই কারণই বিদ্যমান, এবং এই দুই কারণেরও মূলে যে এক আরও গভীরতর কারণ আছে তাহার নাম জাতির আত্মভ্রষ্টতা।

• • • •

কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট, যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল—সেই সাধনার সেই পরিণতির মধ্যেই ভাষাগত আদর্শের বিনাশবীজও নিহিত ছিল, এবং আজও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে—অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। অতএব এই দুই কারণকেই এক সঙ্গে ধরিতে হয়। যাঁহারা বাংলা ভাষার বর্ত্তমান রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং নবীন লেখকদিগকেই এজন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ ব্যাধির নিদান আলোচনা করেন নাই। ব্যাধির কয়েকটি প্রধান লক্ষণ আমি এখানে উল্লেখ করিব—

১। বাংলা ভাষার 'ইডিয়ম' বা বাগ্‌ভঙ্গির উচ্ছেদ।

২। Syntax বা বাক্যগঠনের ইংরেজী আদর্শ।

৩। Phrase বা বাক্যাংশগঠনে স্বেচ্ছাচার—অদ্ভুত সমাস-রচনা।

৪। ইংরেজী উপমা-অলঙ্কারের ছড়াছড়ি—রসসৃষ্টির উপাদান স্বরূপ ইংরেজী কাব্য ও পুরাণ-ইতিহাসঘটিত শব্দের অবাধ প্রয়োগ।

৫। বাংলা ভাষার কবিতায় পর্য্যন্ত—ইংরেজী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার।

উপরে সাধারণ ভাবে যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাঠক সর্ব্বত্র পাইবেন। শেষ দুইটি লক্ষণ অনাচারের চরম—একরকম বাতুলামী বলাও চলে; এ দুইটির কথা আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু প্রথম তিনটি আধুনিক রচনারীতির গৌরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ আলোচনায় আমি এই তিনটির কথাই মনে রাখিয়া যাঁহারা বাংলা ভাষার কাঠামো বদল করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

• • •

সকলেই জানেন গত যুগের শেষ ভাগে অর্থাৎ এই অতি-আধুনিক অনাচার প্রকট হইবার অনতিপূর্ব্বে, বাংলা গদ্যরীতি লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের ঘোষণা-মন্ত্র ছিল এই যে, বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই আসল বাংলা ভাষা, সাহিত্য গড়িতে হইবে সেই ভাষায়; অপর যে ভাষা সাহিত্যে এতকাল চলিয়া আসিয়াছে তাহা পণ্ডিতী সাধুভাষা, অতএব তাহা কৃত্রিম। অর্থাৎ সাহিত্যে আজকাল যে বস্তি বা বস্তুতন্ত্র চলিয়াছে, তাহার সূত্রপাত হয় ভাষা লইয়া; ইহাই ভাষা-ঘটিত বাস্তববাদ। অলঙ্কৃত বা সুসংস্কৃত ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে উন্নত কবিকল্পনাও কৃত্রিম—ব্যক্তিতান্ত্রিক সাহিত্য যে জীবন-সত্যকে আদর্শ করিয়াছে তাহার তুলনায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন মিথ্যা, কথ্য ভাষার তুলনায় সাহিত্যিক সাধুভাষাও সেইরূপ কৃত্রিম। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, আন্দোলনকারীরা রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত অনুচর—সাহিত্যের ভাষা-পরিবর্ত্তন যে দেহের বেশ-পরিবর্ত্তন নয় এই রসিক-জনেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া, যে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকেও ধারণ করিয়া আছে, সেই সাহিত্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গদ্যরীতি সম্বন্ধে সহসা এই যে আন্দোলন, ইহারও পূর্ব্বে, বাংলাপদ্যে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি ভাষার ছন্দ বা বাংলা ছড়ার ছন্দকে আধুনিক গীতিকাব্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন—ছড়ার ছন্দকে কাব্যচ্ছন্দে উন্নীত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নূতন ধরণের গীতিকাব্যের ভাষাই চল্‌তি ভাষার সাহিত্য রচনার সঙ্কেত দিয়া থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ বাংলা গদ্যের আভ্যন্তর ঘটাইতে ও শিথিলিয়া গরীয়সী করিয়া তুলিতে নিশ্চয় যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।

অতঃপর গদ্যে চল্‌তি ভাষা বা খাঁটি বাংলার চল্‌ন লাগিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিত্য-নূতনের পিপাসা বা নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তাড়নায় এই আন্দোলনে যোগ দিলেন; কোনও বিষয়েই পূর্ব্ব-পর ভাবনা তাঁহার নাই; কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে এ চিন্তার অবসর তাঁহার নাই; তাঁহার বাউল-মন পায়ে নূপুর বাঁধিয়া পথ চলে—পথের আদি অন্তের খোঁজ রাখে না, গন্তব্যের ঠিকানা নাই—তাঁহার "পথ চলাতেই আনন্দ"। রবীন্দ্রনাথের কথা পরে বলিব।

• • •

গদ্যে বা পদ্যে, রবীন্দ্রনাথ যে নবত্বের স্পৃহা তাঁহার অধুনাতন রচনায় ব্যক্ত করেন—তাহার প্রেরণাও যেমন স্বতঃ, তাহার অভিব্যক্তিও তেমনই। অতএব এই নব আন্দোলনের নায়করূপে অথবা প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করিয়া যে বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অর্থহীন। খাঁটি সাহিত্যের ভাষা, বা উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সঙ্গ-বিগ্রহ, প্রতিভার প্রেরণায় যে নূতনতর দীপ্তিলাভ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ভাষার আদর্শ নিরূপণ বা রীতি পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ভাষাকে যাহারা জড় মৃতপিণ্ডের মত যে কোনও ছাঁচে ফেলিয়া নব নব ভঙ্গির উদ্ভাবনা করিতে চায়, তাহারা প্রতিভাহীন বলিয়া, ভাষার দিব্যমূর্ত্তির সন্ধান পায় না। পদ্যে যাহারা চল্‌তি ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল; সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে, আধো-আধো টান্যা-টানা উচ্চারণে যে ধরণের কথাবার্ত্তা হয় ইহা সেই ভাষা; ইহাতে কক্‌নি উচ্চারণযুক্ত কক্‌নিবুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনই ইহা বাঙ্গালী সন্তানের মুখের বুলিও নহে।

• • •

এই ভাষাই খাড়া করা হইল পুঁথির ভাষার বিরুদ্ধে! পুঁথির ভাষার অপরাধ—তাহা পণ্ডিতী ভাষা; অর্থাৎ পুঁথি লিখিতে হইবে মুখের বুলিতে, কারণ যাহারা পুঁথি পড়িবে তাহারা পণ্ডিতীর ধার ধারিবে না। সাহিত্যের সাধুভাষাকেও আমরা মাতৃভাষা বলিয়া থাকি—যদি সে ধারণা ভুল হয়—পণ্ডিতী সিদ্ধভাষা যদি বর্জ্জন করিতেই হয়, তবে, এ ভাষাও কি বাঙালী মেয়েদের ভাষা? বাংলাসাহিত্য কি বাংলার ব্রত-কথা-জাতীয় বস্তু? যুক্তির দিক দিয়া যেমনই হোক—দেখা গেল, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বা বাংলা ইডিয়ম ইহার আদর্শ নহে; এ ভাষা সাধুভাষাই বটে, তবে সে 'সাধু' পণ্ডিত নয় 'বাবু'; এ ভাষার বচন-ভঙ্গি, ইহার কায়দা ও প্যাঁচ পণ্ডিতকেও হার মানায়।

যে ভাষা এক দিন পদ্যে, ও পরে গদ্যে, সমস্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিক ভাষা ছিল—সর্ব্বপ্রদেশের শিক্ষিত বাঙালীর ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে যে-ভাষা বাংলা সাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছিল, সেই ভাষা বাংলা নহে, সে ভাষায় যাহা কিছু রচিত হইয়াছে তাহা কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট; এতকাল পরে বাংলা সাহিত্যের খাঁটি ভাষা আবিষ্কৃত হইল। রবীন্দ্রনাথের শে ষে র ক বি তা নামক উপন্যাসে এই ভাষার প্রৌঢ় রূপ অনেকে দেখিয়াছেন—তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, খাঁটি মাতৃভাষাভাষী বাঙ্গালী আধুনিক ভাষায় এখনও যাহার দখল তেমন হয় নাই, এবং ইংরেজীতেও যে সুপণ্ডিত নয়, তাহার পক্ষে, বঙ্কিমের কোনও উপন্যাস, না এই শে ষে র ক বি তা কোনখানি অধিকতর সুখপাঠ্য? সাধুভাষা যদি নিতান্তই বি-ভাষা হয়, তবে সে ভাষায় এতদিন এমন সকল রচনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? এখনও সকল উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস সেই ভাষাতেই রচিত হয় কেন? বাঙালীই বা সেই সকল গ্রন্থে তাহার রস-পিপাসা মিটায় কেমন করিয়া?

• • •

না, তথাপি সে ভাষা চলিবে না—তাহা বাংলা নয়! সত্যকার প্রতিভা সেই ভাষাকেই আশ্রয় করিলেও, এবং বাঙালী পাঠক সেই ভাষাতেই কাব্যরসপিপাসা মিটাইতে পারিলেও, এবং চাহিলেও,—সে সাহিত্য ঠিক হয় নাই, তাহার ভাষা কৃত্রিম। রচনা যত সুন্দরই হোক, তার ভাষা কৃত্রিম! এবং রচনা যতই নিকৃষ্ট হোক, যদি তাহা এই 'খাঁটি' ভাষায় রচিত হয় তবে তাহা উপাদেয়। বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত ভাষার যে প্রকৃতি অব্যাহত আছে, যে প্রকৃতি আকর হইতে তাহার মজ্জাগত হইয়াছে; সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া নব গদ্যরীতির উদ্ভাবনায়, সংস্কৃত ও কথা, পণ্ডিতী ও আলালী, এই দুই ভঙ্গির দুই কূলের মধ্য

দিয়া নানা তরঙ্গ-ক্ষোভের পর অবশেষে ভাষা যে সহজ প্রবাহ-তল প্রাপ্ত হইল, আপনার আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া, যে শক্তি ও দীপ্তির পরিচয় দিল—তাহাকে অস্বীকার করিয়া এই আন্দোলনের অভিপ্রায় কি, সার্থকতাই বা কি, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। সংস্কৃত, সাধু, পণ্ডিতী—যে নামই তাহাকে দেওয়া হউক, কেবল গালি দিলেই সত্য কখনও মিথ্যা হইয়া যায় না।

ভাষার এই রীতিই সহজ ও প্রশস্ত রীতি, এ রীতি পরিত্যাগ করা সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব, তার প্রমাণ এখনও দুর্লভ হয় নাই। এই নবতন ভঙ্গি যে কেবল ভঙ্গিমা মাত্র এবং তাহাও কতকগুলি প্রতিভাহীন, 'কালচার'-অভিমানী ফ্যাশান-বিলাসী ইঙ্গবঙ্গ অথবা সাহিত্যিক সংস্কার বর্জ্জিত পূর্ব্ববঙ্গের উপজীবা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

• • •

বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত বাংলার কলধ্বনি-মুখর রাজহংসটির উপর, এবং অপর চরণ সাধুভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বন্ধ, শুচি-শ্রী ও সৌরভময় সহস্রদল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যেদিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেদিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র, দুইএর ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত পদ-পদ্ধতির কাঠামোখানাই তাহার জাতি-কুল রক্ষা করিয়াছে; পণ্ডিতের ঘরে ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহার যে কি দশা হইত, তাহা আজিকার স্বেচ্ছাচারদৃষ্টে অনুমান করা দুরূহ নয়। সেই ধাগ্-বৈভব ও বাক্ পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়াই প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি ভাব-অর্থ ও রসের আধার হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সেই সাধুরীতিই উত্তরোত্তর কথ্য বাংলার বচন-রাশিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। সে গদ্য যে সাধুত্ব বর্জ্জন করে নাই তার কারণ—সাধুই হৌক আর অসাধুই হৌক, বাংলাসাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে আজও তাহাই সহজ-সুন্দর, তাহাই প্রাণবান ও গতিমান, তাহাই সংবর্দ্ধনশীল ও সর্ব্বতোমুখী।

• •

খাঁটি বাংলা বুলি ব্যবহার করার কথাই যদি হয়, তবে সে দিক দিয়াও এই নূতন ভাষার নূতনত্ব কিছুই নাই। বরং দেখা যাইতেছে, সাধুরীতির লেখকেরা যে পরিমাণে ও যেরূপ বিশুদ্ধভাবে এইসকল বুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আধুনিক ভাষার লেখকেরা তাহা করেন না, করিতে পারেন না। বাংলা বুলি না-জানাই তার একটা কারণ বটে; কিন্তু ইহাতে প্রধান হয় যে, ভঙ্গিযুক্ত হইলেই ভাষা খাঁটি হয় না, এবং ভঙ্গিমা-হীন হইলেও, অর্থাৎ পদ্ধতি 'সাধু' হইলেও, সে ভাষা খাঁটি বাংলার ছাপ বহন করিতে পারে। আধুনিক ভঙ্গিবাদীরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারবশে, কেহ বা সংস্কৃত, কেহ বা প্রকট ইংরেজীরীতির পক্ষপাতী; ইহাতে আর যাহাই হউক, কথ্যভাষার বড়াই করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এত বড় ওস্তাদের ওস্তাদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দুই একজন যাঁহারা সাধুভাষাকেই একটু উচ্চারণ বদলাইয়া 'চল্‌তি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাঁহারাই; অপর যাঁহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা বুলি তাঁহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্ব্বতা সাধনই যেমন এ-ভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই এই ছক্-পথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।

• • •

ভাষাতত্ত্ববিদ স্বীকার করিবেন—ভাষামর্ম্মবিদের ত' কথাই নাই—যে, ভাষার ধ্বনিরূপই তাহার আসল রূপ: কেবল শব্দ-অর্থের সঙ্গতি নয়, এই ধ্বনিই ভাষার আত্মা। ভাষার শব্দ-বিন্যাসে, প্রত্যেক বর্ণটির মধ্য দিয়া এক অখণ্ড ধ্বনিস্রোত বহিয়া থাকে; ইহা এমনই অখণ্ড যে, কোনও অংশে যদি এই ধ্বনি-স্বভাব আহত হয় তবে সমগ্র বাক্-প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। বাংলা গদ্যের যে বৈশিষ্ট্য তাহাও ধ্বনি-রূপের বৈশিষ্ট্য—বাক্যযোজনায় কেবল ব্যাকরণ অভিধান ঠিক থাকিলেই চলিবে না, সেই বিশিষ্ট ধ্বনিরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, ভাষায় যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এসম্বন্ধে তাহার সংস্কার জন্মিয়া উঠে। বরং এই ধ্বনিরূপকে অস্বীকার করাইতে হইলে নানা যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়; তাহাতেও একটা প্রাণহীন কৃত্রিম অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার যে ধ্বনিপ্রকৃতির উপর বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যতিচার ঘটিলে, সারাদেহ অসুস্থ হয়। সাধু বা সাহিত্যিক বাংলার সংস্কৃত শব্দ ও বাক্-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা বুলি যেভাবে মিশ্রিত হইয়াছে তাহার ধ্বনিরূপ প্রাকৃত নয়; সংস্কৃত। বাংলা পয়ার যেমন প্রাকৃত অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃতও নয়, বাংলা বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূর-সম্পর্কে সংস্কৃতেরই আত্মীয়; তেমনই বাংলাগদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন—তাহার বুলিও প্রধানতঃ সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না। লিখিব—সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা

বুলির ; এবং তাহারই খাতিরে ইচ্ছাপূর্বক ধাক্কাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক টক শব্দ করিব—এ অনাচারে ভাষার আত্মা পীড়িত হইয়া উঠে, তাহার ধ্বনি নষ্ট হয়। সেই ধ্বনি-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই বচনার বাগ্‌বন্ধনও শিথিল হয় ; তখন শব্দযোজনার রীতি বা শব্দের ন্যায়াগুণ সম্বন্ধে লেখকের কোনও সংস্কারই আর থাকে না ; যেখানে-সেখানে যে কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে, এবং শব্দযোজনাকালে ভাষার রীতি ভঙ্গ করিতে কিছুমাত্র বাধে না, কারণ, ঐ খণ্ডিত ক্রিয়াপদের আঘাতে বাক্যের ধ্বনি-গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়।

• • •

আধুনিক বাংলা গদ্যের যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, ইহাই তাহার মূল কারণ। যাহারা সাধুরীতি ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলি ভাঙিয়া দিয়া, সাধুভাষার ধ্বনি-সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে অথচ বিশুদ্ধ বাংলা বুলি যাহাদের আয়ত্ত নহে, তাহারাই সকলের অনাচারে গা ভাসাইয়াছে। এই অনাচারের তিনটি প্রধান লক্ষণ ইতিপূর্বে নির্দেশ করিয়াছি এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। (১) অতদ্ধ ইডিয়ম বা বাক্‌ভঙ্গী, (২) বাগ্‌বিন্যাসরীতির বিজাতীয় আদর্শ, (৩) Phrase বা বাক্যাংশ ও সমাসগঠনের যথেচ্ছাচার। মনে হয় ইহারা যেন বাংলাভাষা ভুলিয়া গিয়াছে ; ঠিক তাই নয়, ইহারা বাগ্‌বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা সাধুভাষার মূলোৎপাটন করিয়া কথ্যভাষা রোপণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা, সাধু বা কথা কোনও ভাষার আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই ; ভাষার ধ্বনিরূপকেই বিপর্যস্ত করিয়াছেন, ফলে স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে। এই কথ্যভাষা, সাধুভাষারই একটা বিকৃত সংস্করণ মাত্র ; ইহার ভঙ্গিমাই ইহার বিশেষত্ব, এবং সে ভঙ্গিমা কোনও কথ্যভাষার নয়। এ ভাষার সঙ্গে কোনও প্রদেশের বাঙালীর প্রাণের পরিচয় নাই, এ জন্য ইহাকে যাহারা আয়ত্ত করিতে যায়, তাহাদের পক্ষে বিদেশী ভাষাও যেমন এ ভাষাও তেমনই, বরং নানা কারণে ইংরেজীটাই আরও সহজ, তাই বাংলা লিখিতে ইংরেজীরীতি আসিয়া পড়ে। পূর্বে বলিয়াছি, যাঁহারা এ ভাষার ওস্তাদ বা প্রবর্তক, তাঁহাদের হাতে এ ভাষা একটা খেলার জিনিস—সড়কি-কিরীচের কসরৎ মাত্র ; সাধুভাষার রীতি এবং চলতি বুলি, এই দুইটাকে দুই হাতে লইয়া নানা রকমের প্যাঁচ দেখাইবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে। কিন্তু যাহাদের সে যোগ্যতা নাই, তাহারা কেবল স্বেচ্ছাচারের সুযোগটুকুই গ্রহণ করিয়াছে।

• • • •

তাই ভাষার পরিণাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাক্যার্থের সঙ্গতি নাই, শব্দপ্রয়োগ বা শব্দচয়নের কোনও নিয়ম নাই, অভিধান ব্যাকরণের বালাই নাই। তাহাতেও যথেচ্ছাচার, শিষ্ট ভাষা ও প্রাদেশিক বুলির উদ্ভট মিশ্রণ, সর্বোপরি উৎকট ইংরেজিয়ানা—এ সকল নির্বিবাদে চলিতেছে, শাসন বা সংশোধনের উপায় নাই। একখানি মাসিক পত্র খুলিলে দেখা যায়, তাহার সকল প্রকার ভুলই সমান আদরে মুদ্রিত হইয়াছে—যে গুলির সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, সেগুলিও সংশোধিত হয় নাই ; এতটুকু দায়িত্ব-জ্ঞানও সম্পাদকের নাই। এই সকল ব্যবসাদারী পত্রিকা ছাড়া সাহিত্যসংক্রান্ত কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকা নাই, সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বৎ-সমাজ নাই ; বিশ্ব-বিদ্যালয় বা তদনুরূপ কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনও পণ্ডিত-সংসদ নাই ; নিজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নায়করূপে অধিষ্ঠিত নাই ;—শাসন করিবে কে ? এদিকে সুলভ ছাপাখানার দৌলতে, এবং ব্যবসায়ের তাগিদে, এক শ্রেণীর প্রতিভাহীন, বিদ্যাহীন, এমন কি, প্রায় নিরক্ষর লেখকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া উঠিতেছে। এজন্য বর্তমানে সাহিত্য ও ভাষা উভয়ের দুর্গতি অনিবার্য, এ অনাচার কতকটা সাময়িকও বটে, যদিও তাই বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নয়। কিন্তু ভাষায় যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে তাহাই আশঙ্কার জনক নয়, ইহার নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ—ভাষার রীতি লইয়া যে আন্দোলনের কথা বলিয়াছি, তাহাই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সভাকার ভাষাবিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি আমি যে স্পষ্টতর প্রমাণ পাইয়াছি তাহারই সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সমস্যাটি নূতন করিয়া তুলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

• • •

একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতিবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—সবুজ পত্র তাহার বাহন হইয়াছিল। শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়া রীতিমত আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে একদিন যেমন নব্যসম্প্রদায় উন্নত ও বিশুদ্ধ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষার সংস্কার-কামনায় ঠিক সেই রূপ এক পৃথক আদর্শের মহিমা ঘোষিত হইল—ইহাও যেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্রের আক্রোশ। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে 'সংস্কৃত' ও 'পণ্ডিতী' ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল, ইঁহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন। সাধুভাষার মধ্যে যে শ্রী ও শক্তি রহিয়াছে তাহা বিবেচনার যোগ্য নয় ; সে রীতি রসসৃষ্টির পক্ষে যতই অনুকূল হউক—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রত্ব, চৌদ্দ আনা অংশে, সেই রীতির উপরেই নির্ভর করিলেও—পৌত্তলিক বঙ্কিম যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কুসংস্কারমুক্ত অভিজাত-সম্প্রদায়, সেই ধূপধুনাগন্ধী সংস্কৃত-মন্ত্রানুকারী ভাষা সহ্য করিবেন না। কথাটা যে এমন করিয়াই বলিতে হইল তজ্জন্য আমিও দুঃখিত ; কিন্তু সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশমূলক বলিয়া মনে

হয়, বাকি যা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

• • •

এতদিন ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করি নাই; কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল প্রেরণা বুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের বাক্তিত্ব বহুরূপী; কোনও নীতি-নিয়ম, আদর্শ বা পদ্ধতির প্রতি স্থির নিষ্ঠা তাঁহার কোনোকালেই নাই। তিনি আত্মবিলাস ও আত্মবিকাশের স্বাধীন অধিকার ছাড়া আর কিছুই মানেন না; তাঁহার বিশ্ববাদের মূলেও এই অহং-মন্ত্র আছে—সে বিষয়ে পৃথক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথকে, কেবল কবি বা সাহিত্যিক নয়—আরও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। সকলের উপরে তিনি আর্টিষ্ট্। এই কথাটি না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে কেহই বুঝিতে পারিবে না; না পারিয়া, অন্ধ ভক্তি অথবা অন্ধ বিদ্বেষের বশে প্রলাপ বকিবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে মিষ্টিক নহেন, কিন্তু আর্টিষ্ট হিসাবে মিষ্টিক; অথচ আমরা জানি, mysticism জীবনের উপলব্ধি, কায়মনঃপ্রাণে উহার সাধনা করিতে হয়; যাহারা মিষ্টিক তাহারা আর্টিষ্ট নহে, তাহাদের মনঃপ্রকৃতি, তাহাদের চিত্তের ধাতুই, স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি এত বড় আর্টিষ্ট, আর্টের উপাদান হিসাবে সকলই তাঁহার বশীভূত, কিছুই তাঁহার আর্ট-সাধনার বহির্ভূত নহে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিলাম, এ প্রসঙ্গে ইহাই যথেষ্ট। এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও, সঙ্গীতই রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। কেবল সঙ্গীতবিদ্ নয়, এমন, সঙ্গীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও স্থির মত বা বদ্ধ সংস্কার থাকিতে পারে না—অবন্ধনই তাহার স্বভাব, সঙ্গীতাত্মক সুষমা-প্রীতিই তাহার প্রাণের একমাত্র বন্ধন; আর কোনও ধর্মই তাহার নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে সূক্ষ্ম বিতর্ক বা বিশ্লেষণ শক্তি ও প্রবল ভাবুকতার পরিচয় আছে, তাহার পশ্চাতে কোনও মতবাদী ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যদি কোনও শৃঙ্খলা থাকে, তবে তাহা বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা, পরস্পরের মধ্যে যেখানে যত অসঙ্গতি সেইখানেই তাঁহার মন একটা শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য ব্যাকুল; এই জন্য বাহ্যিক ঐক্য বা সঙ্গতিরক্ষার জন্য তাঁহার কোনও উদ্বেগ নাই, বিরোধ ও বৈচিত্র্যই তাঁহার আনন্দ বিধান করে। এই জন্যই বলিয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে artist *par excellence*, রবীন্দ্রনাথ তাহাই; তাঁহার প্রতিভা মূলে সঙ্গীতপ্রধান। এ হেন ব্যক্তির কোনও বিধি-বিধান বা আদর্শ-প্রচারের প্রবৃত্তি অথবা যোগ্যতা থাকিতে পারে না; বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্যের উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সে কার্যের উপযুক্ত নহেন; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান স্রষ্টা হইলেও, তিনি এ সাহিত্যের নায়ক নহেন। আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ইদানীং বাংলা ভাষার উপরে যে নূতন নক্সা কাটিতেছেন—পুরাতন রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং নূতন ভঙ্গিমার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নূতনও নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু সহসা ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি এমন সুস্পষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করিবার পক্ষপাতী—তাঁহার এই মত যথার্থ হইলে, বিগত শতাব্দীর সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত গদ্য-পদ্যের প্রায় সমগ্র উৎকৃষ্ট অংশই বাতিল হইয়া যায়। টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধ বয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের প্রাণদণ্ড করিতে চান। আর্টিষ্টের পক্ষপাত বুদ্ধি; রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যলোভী মন ভাষারও নানা ভঙ্গী সন্ধান করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এতদিন পরে মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যেন এই ভাষার বিষয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন—তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা ও শিল্পী যদি অবশেষে বাংলা ভাষার এই গতিই নির্দ্ধারণ করেন তবে ভাষা-বিভ্রাটের আর বাকি কি?

• • •

পূর্বে বলিয়াছি, এই নূতন ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে কবিতায় আমদানী করিয়াছিলেন—ক থি কা র ভাষা ও ছন্দ বাংলা দীর্ঘিকাযে, এক নূতন সম্পদ ও সম্ভাবনা রূপে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, বাংলা গদ্যেও নূতন রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন বহুপূর্বেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে এবং ভাষার ভঙ্গি-বৈচিত্র্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-শিল্পীর সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, বরং সঙ্গত ও স্বাভাবিক। উপলক্ষ্য বা বিষয়বিশেষে এই মৌখিক বাগ্‌ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে, তা ছাড়া আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি একটা দ্বিতীয় ছন্দ থাকে মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিও এমন প্রশস্ত নহে যে তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুলা ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে এই রীতিই শ্রেষ্ঠ, ইহার জন্য পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা পরে, যাহা বলিতেছিলাম। স বু জ প ত্র একটা coterieর মুখপত্ররূপে দেখা দিল, এই coterie বাংলাভাষার রীতি পরিবর্তন করিতে চাহিল। এই coterieর সহিত রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন—যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধর্মবোধ তখনও অটুট তাঁহার সাহিত্যিক instinct তাঁহাকে বাড়াবাড়ি করিতে দিল না। স বু জ

পত্রে প্রকাশিত সেকালের গল্পগুলির ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; colerie-র এত উস্কানো ও উত্তেজনা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সেই গল্পগুলিতে ভাষার কটকাবাজী করিলেন না। রবীন্দ্রনাথ কোনও মতের মানুষ নহেন—ইহাই তাঁহার শক্তি এবং ইহাই তাঁহার অশক্তির কারণ। সবুজ পত্রের কবিতা গুলিতেও আমরা তাহাই দেখি। ক্ষণিকা রচনা-কালে ভাষা ও ছন্দের নূতন রীতি রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিয়াছিল—গীতিকাব্যের প্রেরণা-বিশেষে এই ভঙ্গির যে একটি খাঁটি সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তখনও তিনি এই ভঙ্গিকে সর্ব্বেশ্বরী করিতে চাহেন নাই। তাই সবুজ পত্রের যুগে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনায়, আকালিক বসন্ত সমাগমের মত, কবিত্বের যে অতি প্রবল ও আকস্মিক জোয়ার আসিয়াছিল, তাহার ফলে আমরা যে যে কবিতাগুলি পাইয়াছি যাহা সবুজ পত্রে প্রকাশিত ও বলাকা-য় সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যে গুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও গীতিগৌরবে শ্রেষ্ঠ সেগুলি সাধুভাষার সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কথ্যভাষার ভঙ্গিতে যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহার ভাব-প্রেরণাও তাহারই উপযোগী—কাব্যহিসাবে তাহাদের মর্য্যাদা, অপরগুলির তুলনায় অনেক কম। Colerie-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ যেমনই হৌক, তখনও তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হন নাই। কারণ তাঁহার প্রতিভা তখনও দীপ্যমান। সেদিন যদি এই মতবাদ তাঁহাকে পাইয়া বসিত, তাহা হইলে বলাকা-র সেই কবিতাগুলি জন্মলাভ করিত না।* সেই colerie-র সহিত সাক্ষাৎ থাকিয়াও, তাঁহার সেই নব আদর্শ ঘোষণার যুগে বাঙ্গালী কবি বাংলা ভাষার আসল ধ্বনিরূপকে স্বীকার করিয়াছিলেন। Colerie-র প্রভাবে কবিতার ভঙ্গি হইল এইরূপ—

শিকল কেটে ঐ যে পুরাতনী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাষাণমিথ্যে ভূই আগের চূড়ায় ভেদী!
ভাঙ্গল ভবন! বিদ্যে কেতন বেড়ে
আঙিনাতে আকাশখানা বেড়ে,
জোলাজলের জোড়াতুলি ভেড়ে
ভূলোকময় দিল আলোর ডাঙা-ডাঙা!
আয় এবার, আয়রে আমার উদাস।

ভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিই, রবীন্দ্রনাথের নামে এমন ভাষা উদ্ধৃত করিতেও প্রবৃত্তি হয় না—শব্দযোজনায় কি শ্রী! অথবা—

ওগো কে, তুমি কি তুই আপন খঞ্জনে?
মনের এই ধার ভালের বাঁধনখানা ভোরে
হবে খঞ্জিবে।

—ভাষার নবভঙ্গির তাড়নায় এমন লাইনও রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে বাহির হয়!

আমি এমন কথা বলিতেছি না, যে এই ভঙ্গি অচল; প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথই কাব্যকলার গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই বলাকা-ই অন্ত কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। উপরি উদ্ধৃত কবিতার অংশ-গুলিতে কেবল বাকাই আছে, ছন্দও আছে—সুর নাই। আমার মনে হয়, উগ্র মতবাদের প্ররোচনায় যাহা হইয়া থাকে, এখানে তাহাই হইয়াছে—বুলি ও ছন্দের জোরটাই বেশি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কথ্যভাষা কাব্যরসসিক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহাতে কবির প্রাণের সুর লাগিলে, বাংলা গীতিকবিতার যে রূপ ফুটিয়া উঠে, বাংলা সাহিত্যে তাহা নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই ভাষা ও ছন্দের যতই উন্নতি হউক, তদ্দ্বারা গুণীবর বা একতারার কাজই চলিতে পারে, বঙ্গভারতীর সপ্তস্বরার স্থান সে পূরণ করিতে পারে না। সেই সপ্তস্বরার আওয়াজ যে কিরূপ এইবার বলাকা হইতেই তাহার কিছু উদাহরণ দিব।—

যে লগ্নটি, ভাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সকলের হতে ভিন্ন
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন যাত্রীদের মুহূর্ত্তহীন অসাড় সাথে?
জোৎস্নারাতে নিভৃত অলিন্দে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কাছে-আনে ডাকা কেন গেলে এইখানে
জনতার কানে।
প্রেমের কমল কোমলতা
ফুটিল না
সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মসূত্র প্রসাদ পায়নি।

* ১৩২১ সালে বলাকা-র কবিতাগুলি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাদা গুলিস্থ সেই জলে
সন্ধ্যার পবনে
শুধের বিন্দুগুলি সুখের প্রাণের
মৃদুমৃদু ছুটিয়া খেলা ঘুমে ঘুমে ঘুমাতেছে।
হে হংস-বলাকা
ঝড়া-মরকতে মত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের আঘাতে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ শঙ্খধ্বনি,
নবধান্য-অঙ্গন-মাঝার,
যেন ধনি জননীর উলোধন করি।
উঠিল শিহরি
দিগন্তের স্নিগ্ধ-শ্যাম-বন,
শিহরিল খেতের সবুজ।

—এ যেন গৃহকোণের বদ্ধ বাতাস হইতে একেবারে সাগর-কূলের মুক্ত হাওয়ায় ছাড়া পাওয়া। এ হংস-বলাকা আর কেহ নয়—বাংলা পয়ারছন্দের সাধুভাষা; সেই ছন্দের সেই সুর কবিকে মাতাল করিয়াছে। সাধুরীতির এ ছন্দ আর কখনও এমন করিয়া কবিকে উতলা করে নাই, এই কবিতাগুলির মধ্যেই কবি বার বার সেই কথা বলিয়াছেন। যখন শুনি—

ও রে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ধরণীর বুকভরা এই যৌবন-বেদনা।
* *
ঝড়া-মরকতে মত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের আঘাতে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
* * *
এই তব হৃদয়ের রবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অনন্তের পানে—

তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ভাষা-ছন্দের কোন্ 'অপূর্ব অদ্ভুত' সঙ্গীত 'এই নব মেঘদূত' রচনা করিয়াছে। কবির জীবনে এমন বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাই শেষ বার, এমন আর পরে হয় নাই।

* *

ব লা কা হইতে অনেকগুলি লাইন উদ্ধৃত করিলাম। বাংলাভাষার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোন্ পর্যায়ে উঠিয়াছে, কানে তাহা ভালো করিয়া ধরিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। আমরা সাধুভাষা বনাম কথ্যভাষার মোকদ্দমায় রবীন্দ্রনাথের মত ও তাঁহার আচরণ, উভয়ের সাক্ষ্য মিলাইয়া দেখিতেছি। তাঁহার মতের মূল্য বুঝিবার জন্য ব লা কা হইতে আরও কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিব। এগুলি ব লা কা-র ২১ সংখ্যক কবিতার অন্তর্গত। এই কবিতাটি স্পষ্টতঃ একটি experiment; উপরি উদ্ধৃত নমুনাগুলি পয়ার-ছন্দের যে ভঙ্গিতে রচিত, এ কবিতাটি সেই ভঙ্গির অনুকরণে কথ্যভাষার ছন্দে রচিত হইয়াছে—

বুঝি, এবার বুঝি আসি
চাঁদ উঠেছে
আকাশের কটিন পারে
আমাদের গাঁয়ে ঘোরে সকল নয়র সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার চাঁদ ছুটি,
তাহলে আমার মায়ের খুঁটি,
কলস বেঁধে হাতে পায়ে:
এই যে এবার
যেবার যেবার
পদ খোলসা চাইবে বাঁরে।

—পড়িয়া মনে হয় এ দুর্ভোগ কেন? এ যেন ছড়ার ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনার চেষ্টা। খাঁটি ভাষা-প্রেরণা, ও মতলবের তাড়না—সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই দুয়ের ফল যে কত বিভিন্ন হয়, তাহার এমন প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কোথাও মিলিবে না। যাঁহার কাব্যরসবোধ আছে, এবং সেই সঙ্গে কানও আছে, আশা করি, তাঁহাকে ইহার অধিক বুঝাইতে হইবে না।

কাব্যের সাক্ষ্য উপস্থিত ইহাই যথেষ্ট। আগামী সংখ্যায় কথ্যভাষার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ওকালতীর কথা বলিব।

ভারতীয় স্থাপত্যের চতুর্ম্মুখ

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় ধর্ম্ম ও স্থাপত্যের সম্পর্ক

ভারতের মন্দিরগুলিতে ধর্ম্মের বহুমুখী তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। মন্দিরে প্রতি রেখাবর্ত্ত, প্রতি বর্ত্তনা, প্রতি গোলক, প্রতি ভঙ্গী নানা রূপবাহুল্যে এক অখণ্ড বস্তুকে প্রতিফলিত করছে। ধর্ম্মবৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নানা রকমের সৌধকীর্ত্তি মাথা তুলে ভারতকে এক্ষেত্রে অপরাজেয় করেছে।

গুজরাট হতে বঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত-পদ্ধতি, দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় ও চালুক্য-পদ্ধতি নানাভাবে মন্দিরশ্রী বর্দ্ধন করেছে। প্রত্যেক মন্দিরেরই কোন না কোন বৈচিত্র্য জগতে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বিদেশীয় পর্য্যটকগণ প্রায়ই এগুলির আংশিক সৌন্দর্য্যের অপরিসীম টানে বিচলিত হয়ে ভারতীয় রচনায় মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সমগ্রের রস উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

অধিক সৌন্দর্য্যের আলোয় কারও মনে একটা চিরস্থায়ী ভাব জাগ্রত করতে পারে না। অধিকাংশ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বিচিত্র রূপ দেখে দুর্ব্বোধ্যতায় পীড়িত হন—কেননা ভারতীয় স্থাপত্যের বহুমুখী ধর্ম্ম তাঁদের নিকট স্পষ্ট হয় না। তাঁরা এ সমস্তের ভিতর একটা ভাবের ভারকেন্দ্র স্থির করতে পারেন না। দুর্ব্বোধ্য ও জটিল ভারতীয় অধ্যাত্মলোকের উদ্‌ভ্রান্ত ছায়াপাত তাঁদের ধৈর্য্য নষ্ট করে। কেউ বলেন, এসব ভাল—আবার কেউ বলেন, এর ভিতর জটিলতার বাড়াবাড়ি বেশী, তাতে দস্তস্ফুট করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সৃষ্টিতে রূপ ও অরূপের যুগ্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। হেন্‌রি কাজিন্স পশ্চিম ভারতের স্থাপত্য অধ্যয়ন করে বলেছেন যে, ভারতীয় মন্দিরকলায় একটা স্বর্গীয় আবহাওয়া সুস্পষ্ট হয়:

"...like the mansion of another world far removed in upper air from the ordinary tread of mortals."

এই আবহাওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এর পশ্চাতে বহু শতাব্দীর মনন এবং কল্পনা কাজ করেছে। ভারতের সমগ্র স্থাপত্য-শিল্পের দৃষ্টান্তগুলি অনুধাবন করলে ভাবের ব্যাপকতা এবং গভীরতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

অধিকাংশ ভারতীয় সৌধই মন্দির, দুর্গ ও হর্ম্ম্যের সমবায়ে গঠিত। গ্রীক স্থাপত্যের ধারা এরকম কোন বিচিত্র বহুমুখীনতা প্রকাশ করতে পারেনি। তার ভিতর কোন বিস্তৃতির ধর্ম্ম, principle of growth ছিল না, এজন্য তার পরিধি

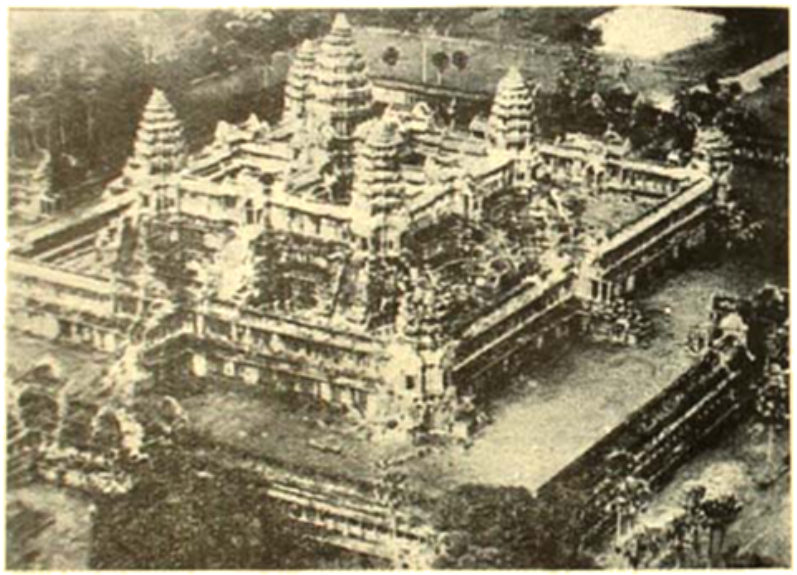

এলোরা মন্দির : ইলোরা।

বৎসামান্যই ছিল। ভারতীয় স্থাপত্য জীবন্ত সৃষ্টির উৎসকে কেন্দ্রীভূত করে অগ্রসর হয়েছে, তাতে সৃষ্ট হয়েছে হর্ম্ম্যের আরণ্য-প্রাচুর্য্য। আকাশস্পর্শী কল্পনা এবং অধ্যাত্মলোকের সূক্ষ্মতম বেপথুকে ভারতীয় সৌধকলা মর্ম্মরিত করে ধন্য হয়েছে।

হালেবিদ ও রামেশ্বরম্

বিরাটত্বের বাণীর কথা ছেড়ে দিলেও ভারতের বহু চর্য্যা এমন এক একটি ভাবস্পর্শ বা রূপব্যঞ্জনা উদ্ঘাটিত করেছে যা জগতে অতুলনীয়। হালেবিদ মন্দিরে যে মূর্ত্তি-ধারা আছে তার তুলনা জগতে কোথায়? হালেবিদের

মূর্তিফলকের (frieze) দীর্ঘতা ৭০০ ফিট। জগতের সুপরিচিত শ্রেষ্ঠতম পার্থিনেনের frieze মাত্র ৪৫০ ফিট দীর্ঘ। যে গথিক স্থাপত্য ইয়োরোপের মাথার মণি তা'ও এই হালেবিদ মন্দির মলিন করে দিয়েছে। ফার্গুসন স্বীকার করে বলেছেন :—

"The artistic combination of horizontal with vertical lines and the play of outline and light and shade far surpass anything in Gothic Art."

মানব-প্রকৃতির যে বহুমুখীনতা ভারতীয় ধর্মে স্বীকৃত হয়েছে—তার প্রতিফলন হয়েছে এই সৌধকলার বিপুল বৈচিত্র্যে এবং গৌরবসম্ভারে। হালেবিদের ন্যায় রানেশ্বরম

বিজয়ের নিদর্শন : ইলোরা।

মন্দিরের সুদীর্ঘ অলিন্দও জগতে আজিও তুলনাহীন। শুধু বৈর্ঘ্যের ব্যাপার মাত্র নয়—এর সমগ্র রচনা জগতের বহু স্থাপত্য-চেষ্টাকে ছার মানিয়ে দেয়। হালেবিদের রচনাতেও শুধু সারি সারি বিনহস্ত হস্তী বা শার্দ্দূলাদির প্রাচুর্য্য মাত্র নয়, তার সমগ্রের একটা মিলনমূলক সংহতিই বিস্ময়জনক।

দিলওয়ারা

আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির সম্বন্ধেও প্রভূত প্রশংসাবাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। Col. Erskine বলেছেন যে, শ্বেত প্রস্তরকে এই মন্দিরে যেরূপ ঈশ্বরভাবে খোদিত করা হয়েছে তা জগতে অতুলনীয়। কথিত আছে, এই মন্দিরের জন্য ১৮৪,৩০০,০০০ টাকা ব্যয়িত হয় এবং চৌদ্দ বৎসরে কাজ সমাপ্ত হয়। মন্দিরমধ্যস্থ যে পাথরের পদ্মটি ঝাড়ের মত ছাদ হতে নিম্নমুখী হয়ে শোভিত আছে তা ফার্গুসনের মতে—

"Unsurpassed by any similar example to be found anywhere else."

বৌদ্ধ স্থাপত্যেও অজন্তা ইত্যাদির অপরিসীম সৌন্দর্য্য-শক্তি স্বীকৃত হয়েছে।

যে কালে এসব রচিত হয়েছিল তার তুলনায় ইতালীয় কলা সেদিনকার ব্যাপার মনে হয়। নেপালের মহাবুদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণে একশত বৎসর প্রয়োজন হয়—এরূপ বিপুল ও বিরাট আয়োজন শুধু ভারতেই সম্ভব।

কোণারক

কোণারকের সূর্য্যমন্দিরও কোন কোন বিষয়ে জগতে অপরাজেয়। এ মন্দিরের মূর্ত্তি প্রভৃতির জন্য যে প্রস্তর সংগ্রহ করতে হয়েছিল তা বহুদূর হতে আনীত হয়। কি করে সেকালে এরূপ অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা হয় তাও একটা বিস্ময়ের বিষয়। নীলগিরি পর্ব্বতমালা হতে পাথরগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। এই দুঃসাধ্য কাজ কল্পনা করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ে।

এক একটা দিক থেকে ভারতের স্থাপত্যকলার নানা নমুনা জগতে অপরাজেয় কীর্ত্তিলাভের অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত খণ্ডকীর্ত্তি দ্বারা ভারতের রূপতত্ত্বের বহুমুখী দিক সর্ব্বথা প্রকাশিত হয় নি। কাজেই এমন কয়েকটি প্রতিমাকে উপস্থাপিত করার লোভ হয়, যাতে ভারত-শিল্প একটা চরম ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে বুঝি, চারিদিকে চারিটি ধর্ম্ম ভারতময় স্থাপত্যদেবের এক চতুর্মুখ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের শিল্প-গৌরবের চরম কীর্ত্তি এই চারিটি ধারাতেই প্রকট হয়েছে।

ভারতের চারিটি ধর্ম্মই ভারতীয় সৌধশিল্পের চতুর্মুখ রচনায় সাহায্য করেছে।

হিন্দু : এঙ্কোরভাট ও বেয়ন

ইন্দোচীনের হিন্দু-নৃপতি যখন এঙ্কোরভাট রচনা করলেন তখন তিনি ভারতের সমগ্র ধারা হতে সৌন্দর্য্যের প্রেরণা গ্রহণ করেন। তাতে করে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সমগ্র সৌন্দর্য্যের প্রাণবাণী এ মন্দিরটিতে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা হয়েছে। হিন্দু কলা অখণ্ড ও অক্ষিত, সর্ব্বত্রই এর লক্ষণ, আধার ও আধেয়ন একটা পরিপূর্ণ শ্রী গ্রহণ করে থাকে—এঙ্কোরভাটে সেই কলার সংস্কার-রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এঙ্কোরভাটকে "the longest pile on earth" বলা হয়। এত বিপুল ও বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষ জগতের কোথাও নেই। সমগ্র নগরের বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির সুশোভন সঙ্গতি ও বিপুলতার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না।

এই নগরের পরিধিই ছিল বিশ মাইল পর্য্যন্ত। সহরের চারিদিকে যে পরিখা আছে তা জগতে বৃহত্তম।

এঙ্কোর মন্দিরের কল্পনাতে ভারতের বিরাট রূপ-স্বপ্নের আভাস পাওয়া যায়। যে দেশ 'মহতো মহীয়ান্' কল্পনা না করে তৃপ্ত হয় নি এবং 'ভূমৈব সুখম্' বলে চিত্তকে আশ্বস্ত করেছে, সে দেশ বিশ্বরূপ যেমন কল্পনা করেছে—বিরাট রূপও তেমনি ভাবে কল্পনা করেছে। একটা পুরো দিনেও এঙ্কোর মন্দিরের ভিত্তির চারিদিক সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না—মন্দিরটি এত বৃহৎ ও বিপুল।

শুধু সমগ্রভাবে মাত্র নয়—এর প্রত্যেকটি অংশও অসীমের স্পর্শ পেয়েছে অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও মহত্বে। প্রতি অংশ অতি নিখুঁত ভাবে তৈরী হয়েছে—বৃহত্বের খাতিরে কোন ভাস্কর্য্যকে শীর্ণ বা দুর্ব্বল করা হয়নি। উপরকার বহু মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত কার্নিসে এমন সব খোদাই কাজ করা হয়েছে এবং এমন সব বিচিত্র ও বিভিন্ন নক্সা তৈরী হয়েছে যা দেখলে তাক্ লেগে যায়। কেলভেটের মত মসৃণ করে পাথরের উপর এমন সূক্ষ্ম মূর্ত্তি খোদিত হয়েছে যে, মনে হয় যেন সীল-মোহরের ছাপ দেওয়া চিত্র। প্রকাণ্ড ব্যাপারগুলিকেও মণিমুক্তার মত সূক্ষ্মভাবে স্পর্শ করা হয়েছে।

মাঝখানটায় পথঃ প্রায় ছশো ফিট উঁচু এবং উপরে উঠবার সিঁড়ি, ধারান্দা, এবং বিস্তীর্ণ খোদিত মূর্ত্তিসকল প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় যেন স্বর্গকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। প্রায় দুমাইল পর্য্যন্ত এ সমস্ত প্রাচীর-অলঙ্করণ বিস্তৃত এবং ২৫,০০০ ফিট খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এ মন্দিরের পরিচালক প্রভৃতির সংখ্যা শুনলেই এর বিরাটত্বের বিষয় একটা ধারণা হবে। প্রায় ৮০,০০০

অর্দ্ধচন্দ্র : এঙ্কোর মন্দির

লোক এ মন্দিরটির সহিত সংযুক্ত ছিল,—১৩,০০০ লোক মন্দিরের ভিতরেই বাস করত। প্রধান পুরোহিত ছিলেন আঠার জন—তাঁদের নিম্নে ৩০০ দ্বিতীয় শ্রেণীর পূজক ছিল এবং ২৫০০ সহায়কও ছিল। প্রায় ৩৫০ জন দেবনর্ত্তকী এই মন্দিরে সংলগ্ন ছিল। এ মন্দিরের ভিতর বহু হাসপাতালও ছিল। এ প্রসঙ্গে বেয়ন মন্দিরের নাম উল্লেখও কর্ত্তব্য—হিন্দু-মন্দির প্রায়ই নিরলঙ্ক হয় না। এ মন্দিরে পঞ্চাশটি চূড়া ছিল—প্রত্যেক চূড়াতে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ রচিত ছিল—সবকটিই সহাস্য। এ মন্দিরটির আয়তনও প্রায় পাঁচ শত গজ।

সমগ্র মন্দিরে প্রায় কুড়ি হাজার দেবমূর্তি আছে—রামায়ণাদির নানা উপাখ্যানও খোদিত আছে। হিন্দু স্থাপত্যের বহু তত্ত্বই এ মন্দিরে অবলম্বিত হয়েছে দেখা যায়। তান্ত্রিক কুণ্ডলিনীর বাণীও অস্পষ্ট হয় নি। নগর-প্রবেশের দ্বারেই এক বিরাট নাগরাজের মূর্তি ধারণ করে প্রায় পঞ্চাশটি মূর্তি-উপবিষ্ট—এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হতে হয়। অলৌকিক শক্তির দ্যোতক এই মূর্তি আজ জীর্ণ ও ভগ্ন হয়ে গেছে।

ভারতের প্রাণধারা এখানে উচ্ছ্বসিত হয়েছে বিশ্বজয়ী বৌদ্ধধর্মের রসোল্লাসে। বৌদ্ধ ধর্ম সমগ্র ভারতের প্রাণ-কোরককে এক সময় বিদারিত করে তোলে, উচ্চ নীচের প্রভেদ দূরীভূত করে সে ধর্ম জাগ্রত করে এক নূতন জাতি-ভাতা—সে আন্তর্জাতিক প্রজ্ঞার। এই ধর্মে ভগবান বুদ্ধকে জাতকে উল্লিখিত অসংখ্য জন্মে নিবিষ্ট করে অখণ্ড কালকে একটি মাত্র অবিচ্ছেদ্য ফলকে পরিণত করা হয়েছিল। সে

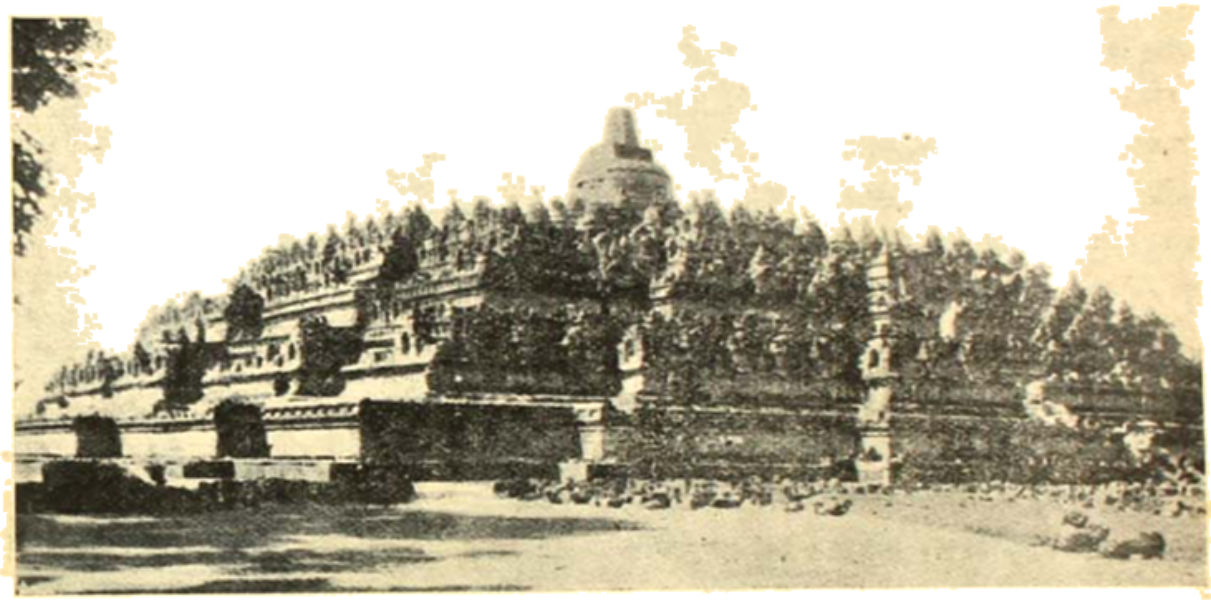

বরবুদর।

বৌদ্ধ : বরবুদর

হিন্দু স্থাপত্যের এ মন্দির যেমন একটা বহুমুখী বাণী প্রচার করছে তেমনি বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটা বিরাট শ্রী উদ্ঘাটন করেছে বরবুদরের মন্দির। এ মন্দিরে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী মূর্তি-শ্রেণী আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সমস্ত দেবতাই এ মন্দিরে স্থান পেয়েছে। সমগ্রটির আকার স্তূপের মত—বিরাটত্ব, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যে বরবুদর বিশ্বের একটা অপরাজেয় সৃষ্টি। জগতের সমগ্র মন্দিরকলা বরবুদরের সৌন্দর্যের তুলনায় মলিন হয়ে যায়। বরবুদরের মূর্তিসমুচ্চয়ে একটা বিশেষ শ্রী আছে—সমগ্র সৌধটিই ভগবান বুদ্ধের একটা রূপক—ধীর, স্থির ও ধ্যানমগ্ন, আকারও স্থিতিমূলক—pyramidal। এ মন্দিরেও সূক্ষ্ম রূপ উদ্ঘাটনে একটা অপরূপ সত্যের ব্যঞ্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

ফলক বর্তমানে তাবুকের নিকট প্রতিফলিত হচ্ছে বরবুদরের বুকে ভাবধারার স্রোতের মত—তথাগত-জীবনের জাহ্নবী-প্লাবনের মত। সমগ্র জীবপ্রবাহ ভগবান বুদ্ধের জীবনস্পর্শে যে ধন্য হয়ে গেছে তার মর্মবাণী পাওয়া যায় বরবুদরের বিরাট ক্রোড়ে, আর কোথাও নয়। বরবুদর একটা ক্ষুদ্র জগৎ। বরবুদর সমগ্র এসিয়ার প্রাণেতিহাস সযত্নে রক্ষা করছে। বরবুদরের বিরাট রূপ একটা সংহত বার্তা বহন করছে বলেই বৌদ্ধকলার সমগ্র আন্দোলনকেই আশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

জৈন : রাণপুর

জৈন স্থাপত্য সৌকুমার্যের জন্য বিখ্যাত। মন্দির-রচনায় মুক্তাকাশের যে আনন্দ তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় নানা ছলে। অসীম আলো ও ছায়াপাতের রস-নৃত্যকে অর্গলিত করতে হয়

কোন সুষমার ছন্দে। মন্দিরের এই ললিত চাপল্যও চিত্তকে কম আবিষ্ট করে না। জৈন তত্ত্বে দেখি মুক্তাকাশের আনন্দ ও গৃহকোণের স্বাচ্ছন্দ্যের বৈচিত্র্য-সমন্বয় এবং তা সার্থক হয়ে উঠেছে রাণপুরের চৌমুখী মন্দিরে। এ মন্দির যোধপুরের পোয়ারের জেলায় অবস্থিত। বাইরের বিস্তৃতি বাদ দিলে এ মন্দিরের শুধু ভিতরকার পরিমাপ হচ্ছে ১২৮ফুট ও ২০৪ ফুট। মন্দিরের মাঝে আদিনাথের মূর্তি আছে। উর্দ্ধে কুড়িটি গম্বুজ আছে এবং চারিশত কুড়িটি স্তম্ভের উপর সেগুলি স্থাপিত। মন্দিরের চিত্রগ্রহণে আধুনিক ফোটোগ্রাফির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রতিটি অঙ্গে কল্পিত আলো ও ছায়ার বিচিত্র সম্পর্ক এমনি ভাবে আলোলিত হচ্ছে যে সেগুলিকে চিত্রনিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। চিত্র থেকে সে আনন্দ উপভোগ চলবে না। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অঙ্গুলিবদ্ধ হয়ে যেতে হবে সে অপরূপ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন চয়ন করতে।

যে চারিশতাধিক স্তম্ভ আছে তাদের শ্রীও অলৌকিক এবং অপরাজেয়। গ্রীক স্তম্ভের মত একটি আর একটির অনুকরণে রচিত হয় নি—প্রত্যেকটির চেহারাই বিভিন্ন। জৈনের বহুত্ববাদ এই অসীম বৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, অথচ সমস্ত সংগ্রহ মিলে এমন একটি মধুর ঐক্য এবং অখণ্ড রূপ-শতদল তৈরী করেছে যে তা দর্শকদের বিস্ময় উৎপন্ন করে। ৪৮,০০০ বর্গফুটের উপর বিচিত্র এই ভারতীয় স্বপ্ন যে কোনও পাশ্চাত্য মধ্যযুগের গির্জ্জাকে পরাভূত করে।

রাণপুরের এই মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যের আর একটি গৌরবচূড়া উদ্ঘাটিত করেছে। ইয়োরোপের একঘেয়ে 'ঘর' 'স্তম্ভ' প্রভৃতির শুষ্ক ও জীবনহীন প্রসঙ্গের সামনে জৈন শিল্পের এই বিচিত্র কল্পনা মানব-জীবনের অসীম প্রকাশ-ধারাকে জগতের দৃষ্টিপথে নিয়ে আসে; বিধাতার সৃষ্টিতেও একঘেয়ে একত্ব নেই—প্রত্যেক নর-নারীই এক এক রকমের—প্রত্যেকটি বৃক্ষপল্লবই এক একটি বিশিষ্ট রূপের বার্ত্তা বহন করছে। রাণপুরের মন্দিরে সকল দিক থেকেই এক বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে—সেটা সমস্ত জগতবার্ত্তারই একটা রূপক। অশ্রান্ত গতির ভিতর স্থিতি, প্রলয়ের ভিতর সৃষ্টি—বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য—তাণ্ডব চঞ্চল শক্তির ভিতর শান্তি, এমনি ভাবে সৌন্দর্য্যের মায়ামন্ত্রে একটা প্রশান্ত রূপ পেয়েছে। একটা cosmic order বা ভূমীয় ধর্ম্মকে ব্যক্ত করতে জৈন ভারতের এই মর্ম্মরনীতি। এ মন্দির ভারতে তুরীয় স্থাপত্যের চতুর্থ যুগের অন্যতম।

ইস্‌লাম

ভারতের ইস্‌লামীয় সৌধ-রীতিও জগতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্ত্তমানে মোগল বাদ্‌শাহদের ভারতীয় জীবন বিশ্লেষণ করা অতি দুরূহ, কেননা আজ সর্ব্বত্র ইস্‌লাম সম্পর্কে কতকগুলি অন্ধ সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অতি আধুনিক কালে কয়েকজন রসজ্ঞ উপলব্ধি করেছেন, ইস্‌লাম স্থাপত্যে ভারতীয়ত্ব কোথায়। প্রফেসর Sattar Kheiri একটা স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হতে। তিনি বলেছেন—

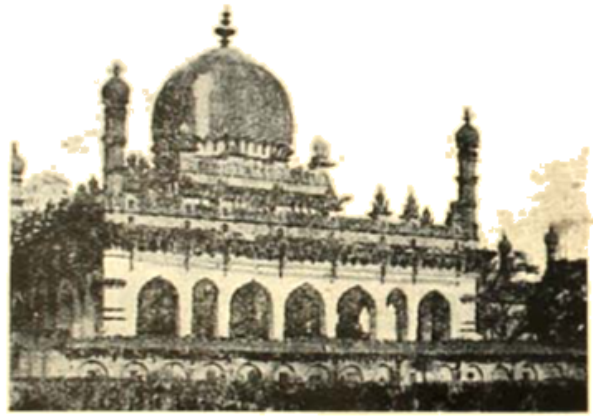

ইব্রাহিম রৌজা : বিজাপুরের তাজ।

"Islamic Architecture reached its climax in India... Islamic Indian spirit can perform wonders.....All the great monuments of Saracenic Art in India surpass those of Arabic, Turkey, Egypt and Spain."

এলাহাবাদের ইত্রজাল, কেইরোর মস্‌জিদ্‌চূড়া, দামাস্কাসের মস্‌জিদ্‌-কলা, ইস্তাম্বুলের সেণ্ট সোফিয়া ভারতের ইস্‌লামীয় বাঞ্ছনার নিকট বার বার মলিন হয়ে পড়ে।

তাজ

তাজের মহত্ত্বলালিত্যকে অগ্রাহ্য করা চলে। কোন ইয়োরোপীয় লেখক একবার বলেছিলেন যে, তাজ যদি শ্বেত মর্ম্মরের না হত তা হলে এতটা বাহবা পেত কিনা সন্দেহ। তাজের ভারতীয়ত্ব কোথায় তা কোন কোন পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। তাজ ইস্‌লামীয় অর্থের অপরী-স্থানীয়া—কিন্তু

অন্যটাই ইসলামের একমাত্র মানসী মূর্ত্তি ছিল না। ভারতের ইস্‌লাম তুমার যে স্পর্শ পেয়েছিল—অসীমের যে বিস্ময়-স্তব্ধ রচনা করেছিল তা যমুনার পুলিনে নয়। বাঁশীর আওয়াজ, কদমের ছায়া ও অমৃত যমুনা মোহিনীকে সৃষ্টি করেছিল, ভুবনেশ্বরীকে নয়।

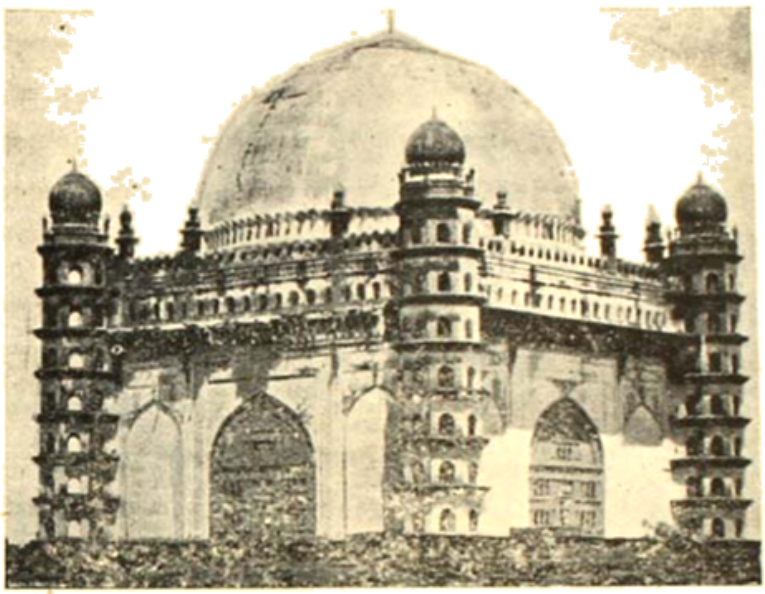

গোলগুম্বজ : পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজগুলির একটি।

ইব্রাহিম রৌজা

ইস্‌লামীয় বিশ্বভারত যে বার্ত্তা প্রকট করেছে তার সম্মুখীন হতে হবে অন্তর—বিজাপুরের বিরাট ও বিচিত্র স্থাপত্যকলায়। বিজাপুর রাজ্য দক্ষিণাত্যে ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের বিলোপের পর স্থাপিত হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজীব এ রাজ্যকে ধ্বংস করেন। এই স্বল্পকালের ভিতর বিজাপুরের কীর্ত্তি একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়।

বিজাপুরে দুটি বিরাট স্থাপত্যের নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছিল। একটা হচ্ছে ইব্রাহিম রৌজা—দ্বিতীয়টি হচ্ছে গোলগুম্বজ। ইব্রাহিম রৌজা বলতে একটি মস্‌জিদ্ ও একটি কবরের উপরকার হর্ম্ম্য বোঝায়। রৌজা শব্দের মানে হচ্ছে উদ্যান।—এ দুটি স্থাপত্যকীর্ত্তিকে এক অখণ্ড ব্যাপার বলে মনে করতে হয়। এ দুটিই ইব্রাহিমের কন্যা জোহরা সুলতানার স্মারক-হর্ম্ম্য। সৌন্দর্য্যে এ সৌধমালা অপরূপ। চারিদিকে যদি বাগান ও ফোয়ারা যোগ করে দেওয়া হয় তবে এ সৌধ সৌন্দর্য্যে তাজমহলকেও পরাজিত করবে। অলঙ্করণ ও বিলাস-সুলভ ঐশ্বর্য্যে ইব্রাহিম রৌজা একেবারে চরমে এসে পৌঁছিয়েছে। বিজাপুর এই জন্যই ভারতের একটা গৌরবজনক অধ্যায় উদ্ভূক্ত করেছে।

বিজাপুর

এ প্রসঙ্গে বিজাপুর নগরের কথাও কিছু বলা দরকার। বিজয়নগরকে ভূমিসাৎ ও লুণ্ঠিত করে বিজাপুর প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। সেকালে বিজাপুরের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কাছে দামাস্কাস্ ও কাইরোকে হার মানতে হত। বিজাপুরের বিপণি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশসমূহের সকল রকমের আসবাব ও বিলাস-দ্রব্যে পূর্ণ থাকত। পর্ত্তুগালের মদিরা, পোরার তাম্রকূট, স্ফটিকের বহুমূল্য পাত্রাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যপূর্ণ অলঙ্কার, বস্তুতঃ মানুষের উদ্ভাবিত সকল রকম সম্ভার, বিজাপুরের মায়া-নগরীতে পাওয়া যেত। এইজন্য দিল্লীর বাদ্‌শাহদেরও ঈর্ষ্যার উদ্রেক হত—এমন কি তাজমহলও এই সুদূর রাজ্যের কীর্ত্তি হতে জাগ্রত অনু-প্রেরণায় রচিত হয়েছিল।

বলা প্রয়োজন, যে অন্তর-প্রেরণা বিজাপুরে এ সমস্ত স্থাপত্যের কীর্ত্তি রচনা করেছিল তা মূলতঃ ভারতীয়। বস্তুতঃ বিজয়নগরের ধ্বংসের পর দাক্ষিণাত্যের হর্ম্ম্যকলার ধারা বিজাপুরেই মূর্ত্তিমান হয়ে উঠে। ইস্‌লাম পারিপার্শ্বিক হিন্দু নগরাদির ভিতর নিজের ধ্বজ-পতাকা সমুত্থিত করে। ইব্রাহিম আদিল সাহ (১৫৩৪-১৫৫২ খ্রীঃ) আকবরের মতই উদার ছিলেন। ভারতীয় আদর্শ ইব্রাহিম ত্যাগ করেন নি।

গোলগুম্বজ

বিজাপুরের অন্য কীর্ত্তি হচ্ছে গোলগুম্বজ। ভারতীয় চিত্তের ঔদার্য্য ও বিশালত্ব হতেই এই বিরাট হর্ম্ম্যের জন্ম

হয়েছে। মহাম্মদ আদিল শাহ উপলব্ধি করেছিলেন, কারু অলঙ্করণ ও চিত্তহারী নৈপুণ্যে ইব্রাহিম রৌজাকে হার মানান অসম্ভব, কাজেই তিনি এমন কিছু রচনা করবার কল্পনা করেছিলেন যা জগতে অদ্বিতীয় হবে। মহাম্মদ তাঁর রাজত্বের ত্রিশ বছরের ভিতর এই সৌধ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি এবং এখনও তা অনেকটা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে।

গোলগুম্বজের গম্বুজ জগতে অদ্বিতীয়—এই প্রকাণ্ড সৃষ্টি পৃথিবীর সমগ্র চেষ্টাকেই হতশ্রী করে দিয়েছে এবং একটা চিরন্তন দ্রষ্টব্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ফার্গিসন সাহেব এর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—

"The great hall below, which is covered by the dome covers an area of 18, 337. sq. ft and, if we take 22 sq. ft. for the projecting angle of the piers carrying the cross arches, which stand out from the walls into the floor, two on each side, we get a total covered area uninterrupted by supports of any kind, of 18, 109 sq. ft. This is the largest space covered by a single dome in the world—the next largest being that of Parthenon at Rome of 15, 833 sq. ft. If we add the pendentures to the actual dome to which they naturally belong as part of the superstructure, then this becomes the greatest domical roof in the world."

এত বড় গম্বুজকে স্থাপনা করা যে শিল্পগত চেষ্টা হিসাবে কত দুরূহ ব্যাপার তা স্থাপত্যশাস্ত্রে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরাই বুঝতে পারেন। জগতে যা সম্ভব হয়নি ভারতীয় ইস্‌লাম তাই সম্ভব করেছে ভারতবর্ষে। কল্পনার সীমাহীনতা, ভাবের গভীর আবেগ, অসীম ধৈর্য্য এবং সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষীয় প্রথার অপরাজেয় সত্ত্বা এই কীর্ত্তি সম্ভব করে তুলেছিল। গোলগুম্বজের বিরাট ও অলঙ্করণহীন ঔদাস্য ইস্‌লামী-তাপসের মত চিত্তহরণ করে। তাতে লঘুতা ও কৃত্রিম কুহেলি নেই—অথচ সুদূর অসীমের কণ্ঠলগ্ন আকাশদুর্গের ন্যায় এই হর্ম্যটি মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বব্যাপী ব্যাকুলতার বার্ত্তা বহন করছে। সমগ্র গম্বুজটি ধরিত্রীর বিচিত্র বৈপরীত্য ও খণ্ডত্বকে আহরণ করে নত হয়েছে একটা ব্যোমস্পর্শী ঐক্যের নীচে। মুসলমান সভ্যতা ও ধর্ম্মব্যবস্থায় মানুষের যে অনাবিল ঐক্য স্বীকৃত হয়েছে তা বিশ্বের চন্দ্রাতপতলে এমনি একটি বিরাট প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বহুদূর হতে গোলগুম্বজের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব হত—ভারতীয় ইস্‌লাম এমন কিছু রচনা করত যা সমস্ত জগৎ হতে দেখা যায়।

গোলগুম্বজের এই অলঙ্করণহীনতাই অলঙ্কারস্থানীয় হয়েছে। ইব্রাহিম রৌজার ললিত নক্সার ছন্দ এ মস্‌জিদে নেই—কিন্তু তবু স্থাপত্য এই হর্ম্যকে ইন্দ্রজাল মুক্ত করেনি। এর ভিতরকার whispering gallery অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার। অতি সহজ পদক্ষেপে অগ্রসর হলেও ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে সমগ্র স্থানটি মুখরিত হয়—একজনের পদক্ষেপেও মনে হয় বুঝি এক বিরাট জনতার পদধ্বনি শোনা গেল, অতি চুপি চুপি কথাও একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে শোনা যায়। সামান্য হাস্যও চারিদিকে যেন অট্টহাস্যের কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠে। এই বৈচিত্র্য আরবা উপন্যাসের যাদুকরের কোন মায়াসৃষ্টি অপেক্ষা কম নয়।

ইব্রাহিম রৌজার সৌন্দর্য্য নারী-প্রকৃতির—গোলগুম্বজের শ্রী কঠিনতর, দৃঢ়তর ও পৌরুষমূলক। এ দুটি মিলে ইস্‌লামীয় কলা বিজাপুরে একটা পরিপূর্ণ দ্বৈতসৃষ্টি সম্ভব করেছে। ভারতের ইস্‌লামই এই অপূর্ব্ব ব্যাপার সম্ভব করেছে। ফুরদৌসি প্রণীত একটি পদ্য আছে—"মেঘনাদ পুংস বিমান।" পুরুষস্থানীয় হর্ম্যকে মেঘনাদ বলা হয়। শিল্পীরা অনেক সময় কোন কোন স্থাপত্যে রেখা-ডেউলকে পুরুষ ও ভদ্র-ডেউলকে স্ত্রী বলিয়া ভাবেন। কাজেই এ দুটি রূপে হর্ম্য-কল্পনা ও রচনা ভারতের ধর্ম্ম রক্ষা করেই অগ্রসর হয়েছে। ধীরে ধীরে সর্ব্বত্রই এ রকমের পরিকল্পনা ভারতীয় সৌধকলার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য বাড়িয়েছে। ইস্‌লামের শুষ্ক আরবা মরুর অন্তরালে যে সুপ্তপ্ত মরুদ্যানের বার্ত্তা ছিল—তা ভারতে গঙ্গাস্রোতে পরিণত হয়ে বিচিত্র তরঙ্গে ও কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। ইস্‌লামের কঠোর ঐকাবাদ এবং ভাগবতী করুণার ইন্দ্রজাল (kismet) এখানে মরীচিকা সৃজন করে তুরীয় অনঘা লাভ করেছে—যা সকল কাল ও দেশের উপভোগ্য হয়েছে। এই রূপে ভারতী সৌধকলায় যে চতুর্ম্মুখ সৃষ্টি হয়েছে তাতে সুস্পষ্ট হয় যে, ভারতের মর্ম্মর-জীবা মানবচিত্তের সমস্ত মূর্চ্ছনাই প্রকাশ করতে পারে—জগতের সমস্ত ধর্ম্মকল্পনা সার্থক রূপ পেয়েছে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অনুপ্রেরণায়। তাই অনেক খণ্ডকাব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পেলেও বিশ্বমানব চিরকালই ভারতবর্ষে মর্ম্মরের মহাকাব্য রচনা দেখে ধন্য হবে।

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রার পরিচয়

'কসমিক্-রে' সম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বায়ুমণ্ডলের 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে' পৌঁছিবার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত বেলুনে আরোহণ করিয়া অধ্যাপক এ. পিকার্ড গত বৎসর সাড়ে দশ মাইল উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় সাত ঘণ্টা কাল উপরে থাকিয়া অবতরণ করেন। সম্প্রতি কলিকার দুইজন বিমানবীর আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবতরণকালে শোচনীয় ভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্থে পতিত হন। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে আরোহীসহ বেলুন এগার মাইলের উপরে উঠিয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধতন বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধতন প্রদেশের অবস্থা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহের পরিসীমা নাই।

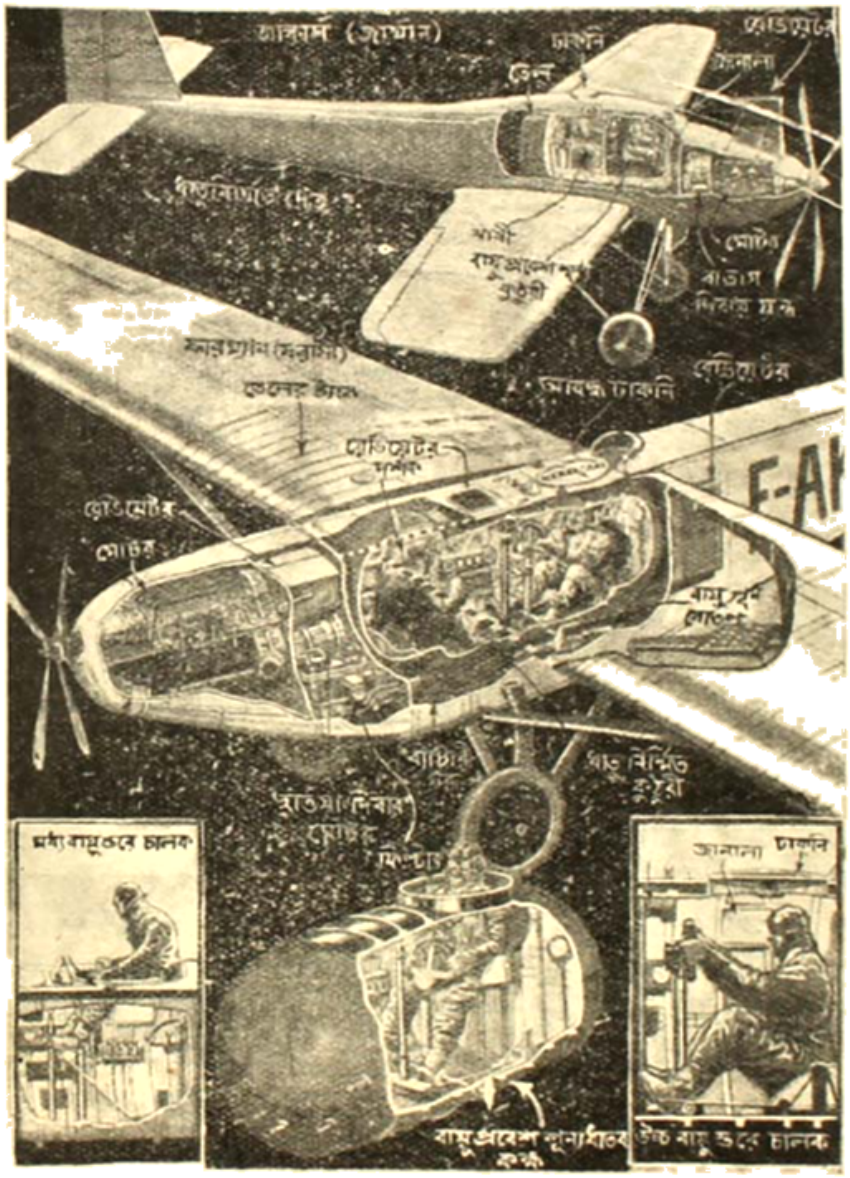
ডাইরমর (জাম্পার)
ঢাকনি
ফ্রেডমেটের
ঢাকনা
ফ্রেডমেটের
মোটর
ফ্রেডমেটের
মোটর
ফ্রেডমেটের
মোটর

নিয়া প্রথমে আকাশে অপেক্ষা ভারী এরোপ্লেনের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অবশ্য হওয়াই স্বাভাবিক। এই অভিজ্ঞতার উপর। বিশেষতঃ এই অপেক্ষাকৃত ছোট যন্ত্রের যাতায়াত প্রতিরোধকল্পে কল হওয়ার সম্ভব রহিয়াছে এই 'ছোটোখিলাড়ের' পক্ষে এরোপ্লেন চালাইতে পারিলে উহা ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশত মাইল বেগে অবলীলাক্রমে ছুটিতে পারিবে অর্থাৎ নিউইয়র্ক হইতে আকাশ পথে প্যারিসে পৌঁছিতে ছয় ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। উক্ত ফোর্ডের এই অভিনব এরোপ্লেনের ককে চালক বসিবার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট যায়গা রাখার কোন আবশ্যক নাই। ডাক্তার ফোর্ডের এই ক্ষুদ্র ককে চালককে এক ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সমাসী বিমানের এই চালক বসিবার স্থানটি বিশেষ কৌশলে নির্মিত, ইহা একটি চোঙ্গাকৃতি কেবিন। চালক প্রথমে ইহার ভিতর বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে পারে; কিন্তু যখন উর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে তখন তাহার শরীর আসন হইতে কোমর হইতে ভিতর ঢুকিয়ে থাকে, তখন তাহার মাথাটি কেবল বাহির থাকে। অবতরণ করার সময় উর্দ্ধে উঠিলে চালক সম্পূর্ণ ভাবে চোঙ্গের ভিতর ঢুকিয়া যায় এবং চোঙ্গের মুখটি এমন কৌশলে বন্ধ হয় যে, তাহার চলাচলের কোন উপায় থাকে না। এ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য ভিতরে একটি কলের মুখ খুলিয়া দিলেই একটি পরিষ্কার বায়ু ভিতর হইতে মাইল দুই উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের যত চাপ তত চাপের বায়ুমণ্ড ভিতরে প্রবেশ করাইতে থাকে। অবশ্য এত সতর্কতা সত্ত্বেও অতউঁচুতে আরও কত রকমের বিঘ্ন এবং অসুবিধা ঘটিতে পারে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তবুও খুটিনাটি বিষয়ে-কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও তেল, পেট্রোল ইত্যাদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। পেট্রোলের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল না মিশিলে তাহা ইঞ্জিন চালাইবার উপযোগী হয় না। অত উঁচুতে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বায়ুর কোনো সঙ্গে তাল মিলিয়ে পারে। এরোপ্লেনের ডানার এবং 'প্রোপেলারের' গায়ে বরফ জমিয়া গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে এরোপ্লেনের বাহ্য সংযোগ সকল ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনাও কম নয়। এই সকল সম্ভাব্য অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বহু বিজ্ঞ পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে। একরূপ বিমানযন্ত্র তৈয়ারী করা হইয়াছে যাহার উপর সহজে বরফ জমিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত হাল্কা বায়ুমণ্ডলের জন্য বিমান চলিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ 'প্রোপেলার' হইতে অনেক বড় এক প্রকার 'প্রোপেলার' তৈয়ারী করা হইয়াছে, যাহাতে অল্প বায়ুস্তরে অনায়াসেই এরোপ্লেনকে ভাসাইয়া রাখিতে পারিবে। অনেক পরীক্ষার পর এক প্রকার বায়ু আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা অতিরিক্ত শৈত্যেও বরফ হইয়া পড়িবে না। পূর্ণ পৃষ্ঠায় 'ডাক্তার' এবং 'ডাক্তারের' ছবি ও তাহাদের কলকব্জার বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হইল।

'প্রোপেলার'বিহীন এরোপ্লেন "সাইক্লোজাইরো"

উক্ত-বহ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রোহরবাক (Dr. Adolf K. Rohrbach) হামবার্গে জার্মেনীতে এই নূতন ধরণের এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়াছেন। এই নূতন উড়নযন্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে "সাইক্লোজাইরো"। সাধারণ

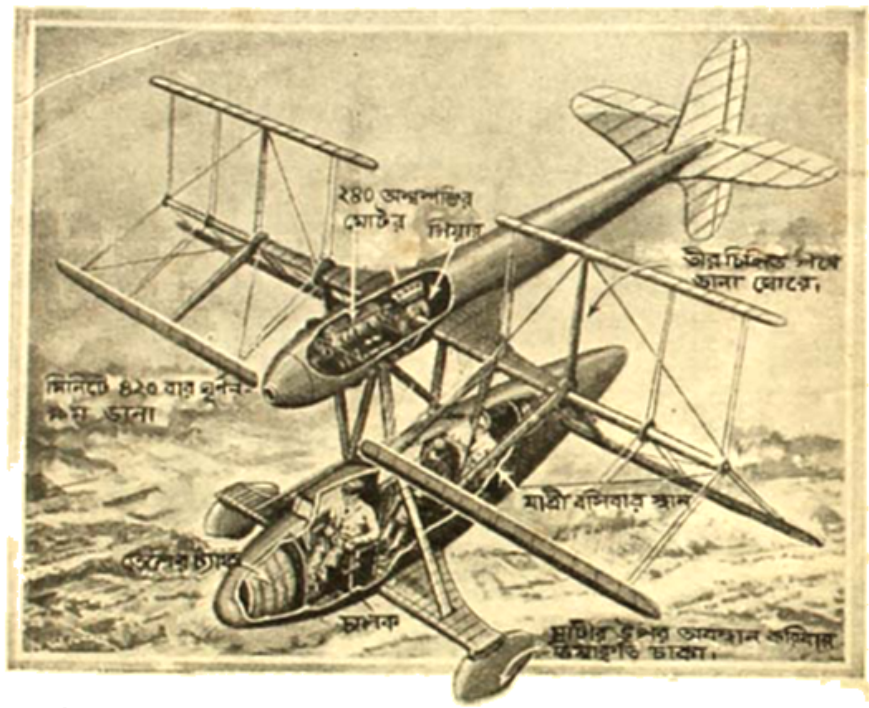

জার্মেনীর নূতন উড়োজাহাজ 'সাইক্লোজাইরো'।

এরোপ্লেনের মত ইহার জন্য ইহার কোন 'প্রোপেলার' নাই এবং ইহার ডানা দুইটিও সাধারণ এরোপ্লেনের মত নয়। সাধারণ এরোপ্লেনে দুইধারে দুইখানি বা চারখানি ডানা দৃঢ়ভাবে লাগান থাকে। কিন্তু এই অভিনব উড়ন-যন্ত্রের দুই-দিকে 'প্যাডেলের' ডানার মত তিনখানি করিয়া ঘূর্ণায়মান ডানা আছে। ২৫০ অশ্ব-শক্তিবিশিষ্ট ৮ সিলিণ্ডার এঞ্জিনের সাহায্যে এই ডানাগুলি মিনিটে ৩২০ বার ঘুরিতে পারে। উপরে নীচে খাড়া চুলটার আকৃতিবিশিষ্ট দুইটি ধাতব খোলের মধ্যস্থলে এই 'সাইক্লোজাইরো' নির্দ্মিত। উপরের খোলে এঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। নীচের খোলে অতিরিক্ত তিনজন করিয়া যাত্রী ও চালকের স্থান আছে। চালকের সম্মুখভাগে স্থাপিত একটি ছোট 'লিভার' এদিক ওদিক বাড়াইয়া এই উড়ন-যন্ত্রকে ইচ্ছামুযায়ী যে কোন ভাবে পরিচালনা করা যাইবে। এই অভিনব যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, ডানাগুলিকে কল টিপিয়া প্রয়োজন মত একটু দিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই ইহা সোজাসুজি উপরে বা নীচে, সামনে অথবা

নিম্নদেশের দিকে চলিতে পারিবে। অসুবিধার বিষয় এই যে, উড়িতে উড়িতে উহা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। মাটিতে নামিয়া সাধারণ প্যারাশুটের মতোই ভার উপর অবস্থান করে, তাহার ফলে অসমতল ভূমির উপর অবতরণ বা চলাফেরা করা অসম্ভব; কিন্তু 'সাইরো-গাইরো'তে সোজা ভাবে পরিবর্তে, সকল দিকেই ঘুরিতে ফিরিতে পারে এমন একপ্রকার ডিজাইনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে যে কোন স্থানে উড়িয়া বা অবতরণ করিবার কোনই অসুবিধা থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে ১০০০ ফুট উপর হইতে প্রপিলর বন্ধ করিয়া 'সাইরো-গাইরো' অনায়াসেই রাস্তার উপর ছাতির মতো অবতরণ করিতে পারিবে।

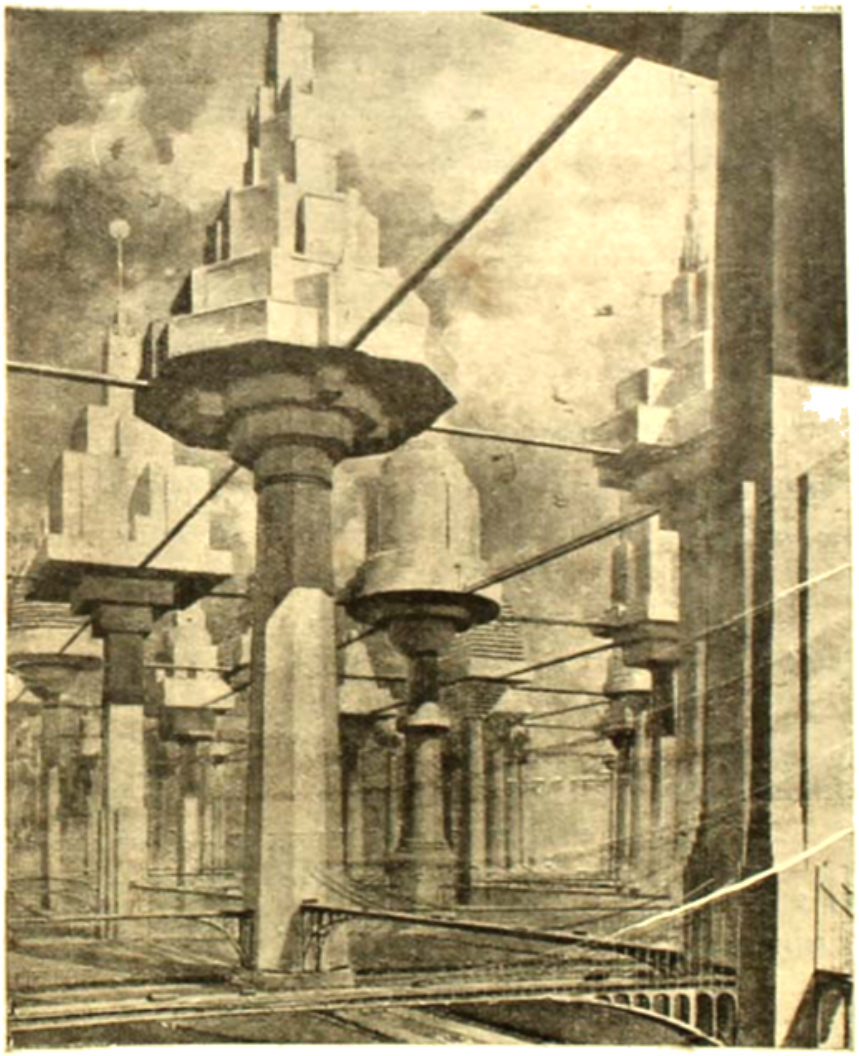

অভিনব সেতু।

সূক্ষ্ম সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম আলেকজান্দ্রিয়ার মুক্তাস্তম্ভ হয়তো খোদার জন্যই নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক অগ্রগতিপূর্ণ সভ্যজগতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ আলোকস্তম্ভ চলাচলের প্রত্যাশাতেই উপলব্ধি করিয়া ইউনেস্কো নামে একজন ইংরেজ স্থপতি সম্প্রতি এক অদ্ভুত সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। উপরের ছবি হইতে এই সেতুর গঠনপ্রণালী কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেতুর প্রত্যেকটি খাড়া থাকা বায়ুনির্মিত এক একটি বিরাট গুম্বজের উপর স্থাপিত হইবে। এই গুম্বজগুলি মাটীর নীচে খুব দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রথিত হইবে। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আকর্ষণীর সাহায্যে উহাদিগকে উপরে নীচে উঠানামার ব্যবস্থা থাকিবে। ঝুলানো সেতুর সাহায্যে এক বাড়ী হইতে আরেক বাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা চলিবে। স্কুল, লাইব্রেরী, প্রমোদভবন প্রভৃতি সমস্তই এইভাবে শূন্যের উপর নির্ম্মিত হইবে। অতি উচ্চ স্থান হইতে বিরাট বৈদ্যুতিক বাতিসমূহ রাত্রির অন্ধকার দূর করিবে। এই সেতুর সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা বিশুদ্ধ আলোকসেবনসমন্বিত উন্মুক্ত স্থানে বাস করিবার সুবিধা পাইবে।

সুখাদ্য শামুকের চাষ

ইংরেজদের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই বিস্বাদ বলিয়া অপবাদগ্রস্ত—ঠিক আমাদের দেশীয় রান্নাঘরের মত অতি উপাদেয় খাদ্যও তাহাদের রন্ধনশালায় রন্ধিত হয়। এগুলি অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া সাধারণতঃ তাহা ভক্ষণসাধ্য ইহার সম্বন্ধে কল্পনা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইংরেজদের বিভিন্ন অঞ্চলে এক প্রকার জলজ শামুকও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শামুকেরা জঙ্গলে জন্মে বা, তাহারা শালপাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। বহু দিন হইতেই ফরাসী উপনিবেশ ফরাসী দেশে প্রচুর পরিমাণে শামুক উৎপাদিত ও প্রতিপালিত হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী দেশেই অন্যান্য অঞ্চলে শামুক যোগাইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মেনীর বার্লিন সহরের পরিসরে এই শামুকচাষের এক বিরাট কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। এই খামার হইতে উৎপন্ন শামুক প্রচুর পরিমাণে জার্ম্মেনী ও ফরাসী দেশে বিক্রয়ার্থ চালান যাওয়া হইতেছে। এই শামুকেরা জমির উপর অজস্র পত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া খাদ্য জমির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট জমি হইতে যেন বাহির হইয়া যা যাইতে পারে এজন্য সমস্ত জমিগুলিকে জালের সূক্ষ্ম জাল দিয়া ঘেরিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরপৃষ্ঠায় ছবি দেওয়া হইল।

অদ্ভুত জলযান

জলযানের ইতিবৃত্তে কেহ কখনও এরূপ জলযানের কথা শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু মোটরগাড়ী বলিলে ভুল হইবে না।

শত্রুর সন্ধানে।

নদনদী ও হ্রদের উপর দ্রুতবেগে চলিবার জন্য নরওয়েজিয়ার এক প্রকার অদ্ভুত জলযানের ছবি। মি. জে. হ্যেলে নামে এক ভদ্রলোক এঞ্জিনিয়ার এই নূতন ধরণের মোটরবোট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনুমান 'টমলাটমি' হ্রদের নির্জ্জন সমুদ্রগায়ী বড় বড় জাহাজের গতিপ্রণালীর সঙ্গে ইহার অনেকটা

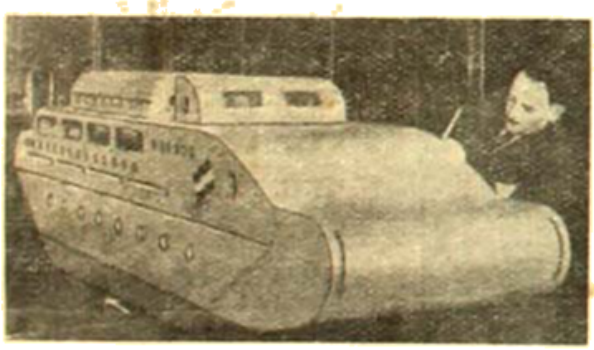

অদ্ভুত জলযান।

সাদৃশ্য আছে। জলযানটি অপূর্ণ গতিবেগে চলে ৬ মাইলের বেশী অগ্রসর হইবে। সমুদয় পূর্ণাবয়ব 'রোলারে'র সাহায্যে জলযানটি অতি সহজেই তুলিতে পারে।

আশ্চর্য্য বন্দুক

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে, জাপান নাকি এক আশ্চর্য্য ধরণের বন্দুক তৈয়ারী করিয়াছে। ইহার গঠনপ্রণালী এমনই অদ্ভুত যে, কোনক্রমেই ইহাকে বন্দুক বলা চলে না তবে গুলিবর্ষণ করা ইহার অধিকতর সহজ বলিয়া বোধ হয়। এই বন্দুক সহজেই বৈদ্যুতিক প্রণালীর সাহায্যে চালিত হয় এবং মিনিটে ১০০০ গুলি ছুঁড়িতে পারে। এই নবোদ্ভাবিত জাপানী বন্দুকের নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তবে বন্দুকের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন আমেরিকান যে বালুক বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছিলেন ইহাও সেই প্রকারই হইবে। একবারি বুলেট ভরা বা চারটি গুলির বা টোটার সাহায্যে কেন্দ্রাতিগ পদ্ধতিতে ইহা কেবল মুহূর্ত্ত মিনিটে ৩১০০০ গুলী ছুঁড়িতে

অভিনব বন্দুক বা গুলীছোড়া যন্ত্র।

পারে। একটি প্রজ্বলনযুক্ত কলের বল সহযোগে থামার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন আছে। এই কলের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে গুলী ঢালিয়া দেওয়া হয়। বল না থাকিলেও জাপানী এবং আমেরিকান উভয় যন্ত্র হইতেই ক্রমে করিয়া গুলী ছোঁড়া যায়। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এই যন্ত্র হইতে গুলী বাহির হইয়া একশত ফুট দূরে সৌসে এক ইঞ্চি মোটা কোয়ার পাথরকে অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

অভিনব যাদুযন্ত্র

গ্লাসগোহাউসের ডাঃ ডিলিপ টমাস্ নামে একজন এঞ্জিনিয়ার এক আশ্চর্য্য যাদুযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটি কতকটা সিনেমা বা প্রদর্শনযন্ত্রের মত। যাদুঘরির বা ঘিনে যন্ত্র হইতে ঘুরিটি আওয়াজ বাহির হয়। কিন্তু ডাঃ টমাস্ যাদুঘরির পরিবর্ত্তে আলোকরশ্মির সাহায্যে এই যন্ত্র যাদুযন্ত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন। যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান পর্দ্দার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ৬টি ছোট ছোট বৈদ্যুতিক চক্ষু বা photo-electric cell সংযুক্ত করিয়াছেন। এই চক্ষুগুলির সঙ্গে বৈদ্যুতিকশব্দবর্দ্ধক যন্ত্রের (amplifier) সংযোগ রহিয়াছে। দূর হইতে দুই ওয়াটের বৈদ্যুতিক ষ্টোভ হইতে এই চক্ষুগুলির উপর আলোক-রশ্মি প্রক্ষেপ করা হয়। যখন কোন চক্ষুর উপর আলোক পড়ে তখনই সেই ফটোগ্রাফ-পর্দ্দা ঘূর্ণায়মান থাকে। মোটের উপর এই যাদুযন্ত্র চাবি টিপিয়া বা যাদুঘরির বা ঘিনে যাদুযন্ত্রের

প্রয়োজন নাই, দূর হইতে বিভিন্ন কৃত্রিম চোখের উপর ইহাদের চুম্বক ফেলিলেই সেই সেই চক্ষুসংলগ্ন বিভিন্ন রঙের পর্দা আপনাআপনি খসিয়া পড়িবে।

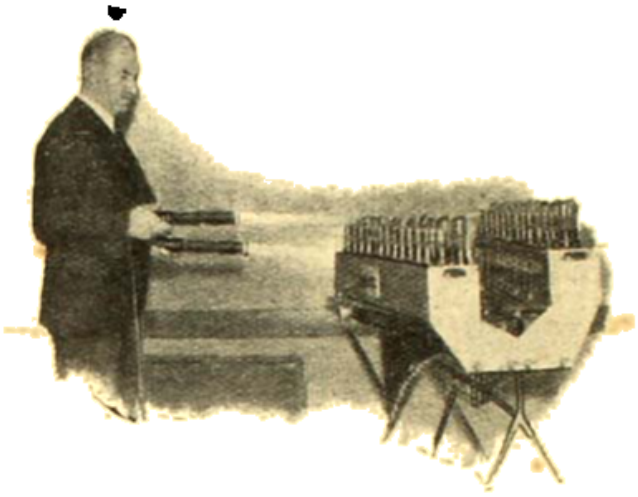

অভিনব খাড়ার।

নূতন ধরণের রেলের গাড়ী

যাতায়াত প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য আমেরিকার সকল প্রধান রেল-কোম্পানিই 'ষ্ট্রীমলাইনিং'-এর ব্যবস্থা করিতেছে। ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল

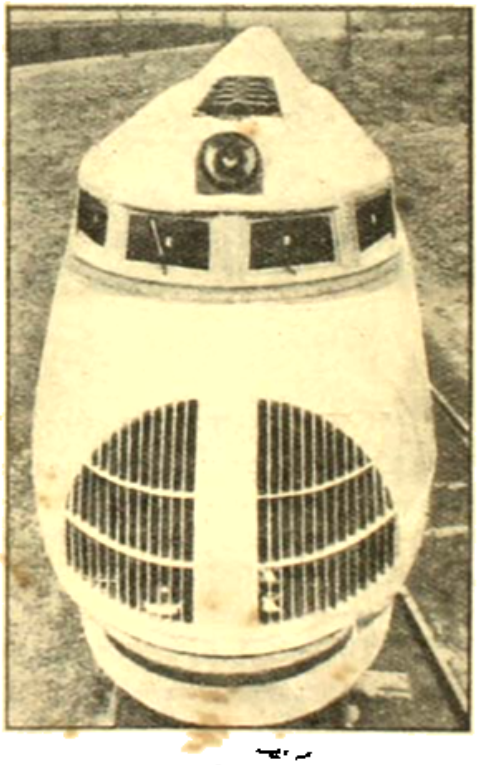

নূতন ধরণের রেলের গাড়ী।

কোম্পানি কিছুদিন হইল চিকাগো সহরে কতকগুলি অদ্ভুত গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই গাড়ীগুলি ঘণ্টায় ১১০ মাইল বেগে চলিবে। ৩০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মোটর বিমান 'প্রপেলার' চালাইয়া গাড়ী চলিবার জন্য শক্তি উৎপাদন করিবে। চিত্রে গাড়ীর সম্মুখে যে জানালা দেখা যাইতেছে, ঐ জানালা দিয়া চালক চুকিয়া মোটর নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ক্যামেরার সাহায্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ

ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এতকাল কাগজ বা তদনুরূপ জিনিষের উপরই ছায়া-চিত্র অঙ্কিত হইত, কিন্তু জাপানে সম্প্রতি ক্যামেরার সাহায্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের এই উপায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে স্কাল্পটোগ্রাফি, (sculptography)। এত দিনের অনেক কথা সময় আলোকপাতে ফোটোগ্রাফির প্লেটে অঙ্কিত

ক্যামেরার সাহায্যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কৌশল।

হইয়া থাকে কিন্তু sculptography'র প্রক্রিয়ায় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ একটু সময়সাপেক্ষ। যাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে তাহাকে ক্যামেরার সম্মুখে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বহুসংযোগে ঘূর্ণায়মান একখানি চেয়ারের উপর চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করিতে হয়। চিত্রে প্রদর্শিত একটি আলোকাধার হইতে তীব্র আলোকরশ্মি সূক্ষ্ম খাড়া লাইনের মত করিয়া বেগে পর্যায়ক্রমে ভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখের উপর পতিত হয়। ক্যামেরার সাহায্যে মুখের উপর পতিত এই আলোকরেখার ছবিই অঙ্কিত হয়। ঠিক সোজাসুজি ভাবে আলোকরেখার

ছবি তোলা হয় না, ক্যামেরাটিকে প্রায় ১০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া একপাশ হইতে ছবি লওয়া হয়। চেয়ারখানি উপস্থিত ব্যক্তিকে লইয়া চার সেকেণ্ডের মধ্যেই একবার ঘুরিয়া আসে। ইতিমধ্যে ক্যামেরা মুখের উপর ফিল্টার পাশে পতিত ঐ লক্ষাধিক আলোকরেখার ৫০০ খানি বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া লয়। এই ৫০০ খানি লক্ষাধিক রেখাচিত্রে উপস্থিত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ও মস্তকের চতুর্দিক খুব সহজভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। (১ চিত্র) অতঃপর এই ৫০০ খানা রেখাচিত্রকে পরিষ্কৃত করে সাহায্যে সমপরিমাণে ছেদিত করিয়া ছাপিয়া লইয়া সেই 'পজিটিভ' ফিল্ম বা কাচফলকটিকে একখানি পুরু মাটির পাতের উপর আলো ফিট ফুটিয়া তোলা হয়। বিশেষ কৌশলে নির্মিত এক প্রকার সূক্ষ্ম ফটোগ্রাফের (২ চিত্র) সাহায্যে এই ছবিখানা মাটির পাত-খানিকে রেখানুযায়ী ৫০০ খণ্ডে কাটিয়া পৃথক করা হয় (৩ চিত্র)। এই ৫০০ খানি মাটিপত্র 'ফটোগ্রাফ' সংযোগে একটু ফাঁক দিয়া তারের সাহায্যে ঠিক মজুত-রক্ষকের মত সাজাইয়া রাখা হয় (৪ চিত্র)। তারপর ধাতব 'প্যারাফিন' ঢালিয়া মাটির পাত্রের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি ভরাইয়া দিলেই পরিপূর্ণ মূর্তি গড়িয়া উঠে। ফোটোগ্রাফের ছবির উপর তুলি বুলাইয়া যেরূপ সূক্ষ্মরেখায় ছোটবড় নানাভাবে করা হয় সেইরূপ 'প্যারাফিনের' একটুখানিতে যেখানে একই ঢাচিয়া তুলিয়া ঠিক করিয়া প্রাইয়ার অথবা ফিল্টারের ছাঁচ তুলিয়া লওয়া হয়। এই ছাঁচ হইতেই ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়।

বিশ্বশিল্প-কৌশল, অভিনব পরীক্ষা করিয়া এক অভিনব জাহাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন। জাহাজখানি লম্বায় ১০৮৮ ফুট হইবে। জাহাজে যে যে স্থানে বায়ুপ্রবেশের পথ আছে তাহাই 'ট্রিমলাইন' করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল যে স্থান হইতে জাহাজ চালানো হয় সেই 'বেভিগেটর ব্রিজটি' জাহাজের উপর বাহির হইয়া থাকে, সে স্থানটিও মনোযোগের ডানার মত এমন ভাবে নির্মিত যে, তাহাতে বাতাসের বাধা অতি সামান্যই অনুভূত হইবে। মোটের উপর জাহাজের উপর ও নীচের দিক এমন ভাবে গঠিত হইবে যাহাতে এত বড় জাহাজের পক্ষে জল ও বাতাসের প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত কম হইতে পারে এবং এই প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ফলে গতিবেগ প্রায় ২০ ভাগ শক্তি বৃদ্ধি পাবে। বিশেষতঃ খুব জোর ঝড়ের মুখেও ইহার গতিশক্তি প্রায় অব্যাহত থাকিবে। এই জাহাজে ২০০০ জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এবং ৯০০ কর্মচারীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। সৌন্দর্য্য হইতে যাত্রীদের জন্যে বিবিধ এপার্টমেন্টের, অথবা হাল্কা কাচনির্মিত দালি এবং আসবাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রয়োজন মত এগুলিকে টানিয়া বাহির করিতে আবার ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ঝড় জলের সময় প্রবাহ প্রবাহ আলোড়ন অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ঢেক এবং অন্যান্য খোলা-স্থানের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য বাষ্পপাত্রগুলি পর্য্যন্ত জাহাজের উপরে বাহির হইয়া থাকিবে না।

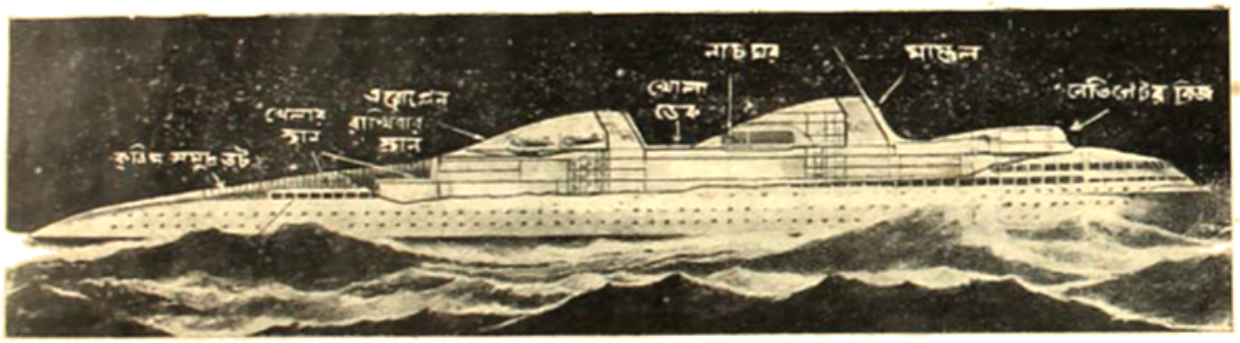

নরমান বেল গেডিস্ পরিকল্পিত বিরাট 'ট্রিমলাইনিং' জাহাজ।

নব পরিকল্পিত বিরাট জাহাজ

মোটর, এরোপ্লেন, জাহাজ প্রভৃতিকে চলিবার সময় বাতাস ও জলের বিরাট বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, ইহার ফলে বিপুল শক্তির অপব্যয় ঘটে। বাতাসের বাধা না থাকিলে যে এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে চলে, তাহা অন্ততঃ দ্বিগুণ বেগে চলিতে পারিত। মোটরগাড়ীর বেলায়ও এরূপ ঘটে। জাহাজকে চলিবার সময় উপরে বাতাস নীচে জল—এই দুই প্রকার প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া চলিতে হয়। শক্তির এই অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য অভিজ্ঞদের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বর্তমানে জাহাজ, মোটর প্রভৃতির বেলায় 'ট্রিমলাইন' করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। নরমান বেল গেডিস্ (Norman Bel Geddes) নিউইয়র্কের বিখ্যাত পরিকল্পনা প্রস্তুতকারক। ইনি ১৯২৭ খৃঃ অব্দ হইতেই বিভিন্ন যানবাহনাদির

জাহাজের জন্যেই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে অনায়াসেই ধোঁয়া ও অন্যান্য গ্যাস সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে। কারণ ধোঁয়া বাহির হইয়া থাকিলে তাহাতেও বাতাসের প্রতিবন্ধকতা বড় কম হইবে না।

টেলিভিশনের উন্নতির আর এক অধ্যায়

ফোর্ড কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন ও রেডিওভিশন কারখানার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অধ্যায়ারম্ভ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারখানার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে—সিল্কোপ টিউবের 'স্ক্যানিং-ডিস্ক'। এই স্ক্যানিং-ডিস্ক কয়েকটি ছিদ্রযুক্ত একখানি অতি সাধারণ ঝুলুনি মাত্র। কিন্তু ইহার কার্য্য প্রণালী দেখিলে মনে হয়—ইহা বস্তুবিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার, সাধারণ প্রেরিত টেলিগ্রামের প্রেরকদের একটী সারি টেলিগ্রাফ বসিলে

মুহূর্তের প্রাহক যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইবেমাত্র কাচের উপর একটি রেখা বা বিন্দু অঙ্কিত করিতে পারে। এই অবস্থায় সমস্ত কৌশল প্রয়োগে লাইনে থাকা কোন ছবি ১০।১০ মিনিটের মধ্যে অনায়াসে

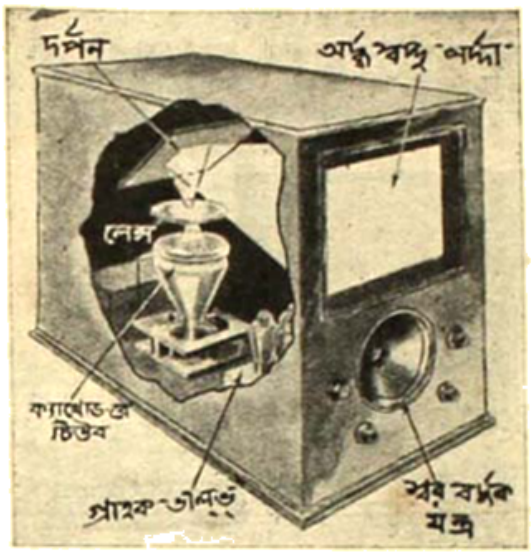

টেলিভিশন প্রাহক যন্ত্র।

রেকর্ড করা যাইতে পারে : কিন্তু সকল প্রক্রিয়াটিকে যুগপৎ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। প্রিন্টিং টেলিগ্রাফের অবস্থায় অসংখ্য রেখা বা বিন্দু যদি এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অঙ্কিত করিবার ব্যবস্থা করা যাইত, তবে যুগপৎ স্থানে কতকটা রাদ-টোন ছবির মত জীবন্ত প্রতিকৃতি অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত। বিপক্ষে কেবল 'স্ক্যানিং ডিস্ক' আবিষ্কারের পূর্ব্বে এ সমস্যা সমাধানের কোন উপায়ই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। দুই বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া দুইজন লোক যদি পরস্পরকে একই সময়ে দেখিতে ইচ্ছা করে তবে এই ঘূর্ণায়মান 'স্ক্যানিং ডিস্কের' সামনে দাঁড়াইলে তাহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পর পর মুখের উপর পড়ে। ঐ অসংখ্য আলোকবিন্দু মুখের উপর হইতে প্রতিফলিত হইয়া পর পর অতিদ্রুতবেগে 'ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের' উপর পড়িতে থাকে। সেখান হইতে বিভিন্ন কৌশলে পর্দ্দার উপর তীব্রতর আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অবিকল চোখা মুখটির উদ্ভব হয়। এতগুলি ছাপার ঘটিতে অতি সামান্য সময়ই লাগিয়া থাকে। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিকৃতিটি প্রতিফলিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন সচল বস্তুর মুখের উপর হইতে প্রতিফলিত সহস্র সহস্র আলোক বিন্দুকে মুহূর্ত্তে তড়িৎ তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রাহকযন্ত্রে প্রেরণ করিবামাত্রই সেখানে সেই বিভক্ত আলোকবিন্দুগুলিকে পুনরায় মুহূর্ত্তের মধ্যে এমন করিয়া জমা করার ব্যবস্থা করা টেলিভিশন সম্ভবপর হইয়াছে। প্রায় এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ চোখের পর্দ্দার উপর কোন বস্তুর ছাপ যতটুকু সময় থাকে ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে গ্রাহক-যন্ত্র উক্ত বিন্দুর তরঙ্গকে পুনরায় আলোকবিন্দুতে পরিণত ও একত্রিত করিয়া পর্দ্দার উপর ফেলে। ইহাই হইল সাধারণ টেলিভিশনের কার্য্যপ্রণালী। কোর্ট বিশিষ্ট মন্ত্র, উভয় প্রান্তে একত্রেগে একই গতিতে চলিত 'স্ক্যানিং-ডিস্ক' ও ঘূর্ণায়মান দর্পণের সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পারে। তৎপরে 'ইমার্জেন্সি' মূল 'ক্যাথোড-রে' বা 'ইলেকট্রন-রশ্মি' সংযোগে এই অবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 'কোনিকাল ফ্লাস্কের' আকৃতিবিশিষ্ট বড় একটি কাচ পাত্রের সম্মুখে প্রস্তুলিত ইলেকট্রিক ডিসচার্জ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইয়া চৌম্বক তার-কুণ্ডলীর দ্বারা বিভা ফ্লাস্কের চওড়া মুখে ফসফরস পদার্থের পর্দ্দার উপর পড়িয়া আলোকিত হইয়া উঠে। প্রেরক যন্ত্র হইতে আগত বৈদ্যুতিক প্রবাহের তারতম্যানুসারে চৌম্বক শক্তির পরিবর্ত্তনে ইলেকট্রন রশ্মির স্থান-বিচ্যুতি ঘটে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলিই সেকেণ্ডের ষোলভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে ঘটে বলিয়া আলোকবিন্দুগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে বা দেখিয়া আলো ছায়ার সমন্বয়ে গঠিত হক্ষ প্রতিচ্ছবিই দেখা গিয়া থাকে। টেলিভিশনে সাধারণতঃ যে ছবিরা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে স্বাভাবিক দৃষ্টি হইতে ছবি অনেক ছোট করিয়া প্রেরিত হয়, কিন্তু অপর প্রান্তে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা বর্ত্তিত করা হয়। কিন্তু 'ক্যাথোড-রে'র প্রধান অসুবিধা এই যে, 'ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রীনের' উপর প্রথমে পড়িবার সময় ছবি মোটামুটি স্পষ্ট হইলেও বড় করিয়া দেখাইবার সময়

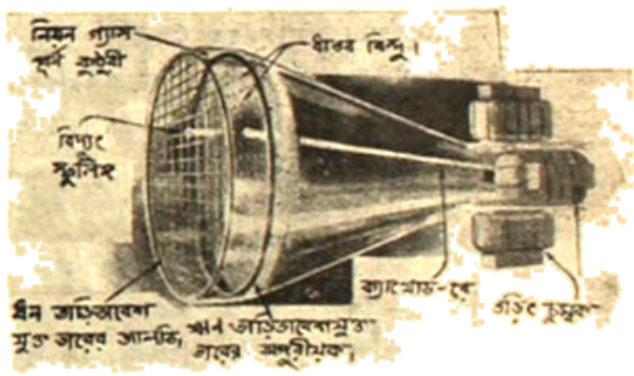

টেলিভিশনের অভিনব প্রাহক যন্ত্র বা 'ক্যাথোড-রে'।

আলোকরশ্মির তীব্রতার বহু অংশ নষ্ট হইয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিঃ টাইমের বেতিও-ফরেক্স গ্রোঃ গিল্‌বার্ট (Gilbert T. Schmidling) এক নূতন ধরণের 'ক্যাথোড-রে' টিউব উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত 'ক্যাথোড-রে' টিউবের আলোকরশ্মির উজ্জ্বলতা বাড়াইবার জন্য প্রায় তাহার সমস্ত বিভিন্ন ফসফরস পদার্থের প্রলেপ দিয়া পরীক্ষা করিয়াও কোন সন্তোষজনক ফল পান নাই। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও এই ফসফরস পদার্থ লইয়া পরীক্ষার ফলে কতকগুলি নূতন পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তিনি ভাল আলো উৎপাদনকারী অতি নিম্নচাপ বিশিষ্ট গ্যাস-পূর্ণ কুণ্ডলী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাহা হউক অবশেষে তিনি ফসফরস পদার্থের

পর্দা যন্ত্রে নিয়াই এক নূতন ধরণের 'ক্যাথোড রে' 'টিউব' তৈয়ারী করিয়াছেন। 'কোলিজান ল্যাম্প' আবিষ্কারিণী ইংলণ্ডের মোটা মুখের বক্ষিণের দিকে চোঙের মত খানিকটা বাড়াইয়া একটা আলাদা কুঠুরী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে তিন রকমের তড়িৎ প্রান্ত (electrode) স্থাপন করিয়াছেন। এই তিনটি তড়িৎপ্রান্তের একটি হইল—মোটা মুখের শেষ প্রান্তে অবস্থিত খুব সূক্ষ্ম তারের আলতি, দ্বিতীয়টি একটি পোলাকার তার এবং তৃতীয়টি, অন্যান্যরূপ কেন্দ্রস্থলের খানে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব বিন্দু। এই কুঠুরীটিকে বায়ুশূন্য করিয়া 'নিয়ন' নামক দুষ্প্রাপ্য বাষ্পে ভর্তি করিয়া ফেলা হয়। এই তিনটি তড়িৎ প্রান্তই সম্পূর্ণরূপে তড়িতাবরণযুক্ত থাকে। তারের আলতি ধনাত্মক এবং তারের অনুবীক্ষণটি ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন। 'ক্যাথোড-রে' যখ ইলেকট্রন-রশ্মি যখনই আসিয়া কোন ধাতব বিন্দুর উপর পড়ে তখনই 'নিয়ন' বাষ্পের বর্ণ দিয়া বিদ্যুৎকুলিঙ্গ নির্গত হয়। সুতরাং যন্ত্র ও জল তড়িৎ প্রান্তের অর্থ। কখন কোথায় স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইবে তাহার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় ক্যাথোড-রশ্মি। টেলিভিশনের প্রেরণযন্ত্রের সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তির মুখের উপর হইতে প্রতিফলিত আলোকবিন্দুগুলি তড়িৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া গ্রাহকযন্ত্রে তড়িৎ-চুম্বকের অর্থা উপস্থিত হয় এবং তৌহকর্ষক আলোকবিন্দুর স্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই ক্যাথোড-রশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই আমরা সব মুখ বিদ্যুৎকুলিঙ্গরাজি আলোক-বিন্দু প্রায় একই সময়ে (চোখেরও অগ্রে যেন তাহার এক ভাগ সময়ের মধ্যে) বিভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া অপর প্রান্তস্থিত উপস্থিত ব্যক্তির উজ্জ্বল ছবি ফুটাইয়া তোলে এবং লেন্সের মধ্য দিয়া দুষ্টির পর্দার উপর বড় করিয়া দেখাইতে কোনই অসুবিধা ঘটে না। ১৯২৭ খৃঃ অব্দে ফিড্‌লি ইহার এই কার্যোপযোগিতা টিউবের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন, বর্তমানে তিনি এই যন্ত্রের অধিকতর উন্নতি বিধানে ব্যাপৃত আছেন।

বায়ুমণ্ডলের 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে' পৌঁছিবার অভিনব উদ্যম

পাশ্চাত্য অভিযাত্রীদের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতর স্তরের অবস্থা জানিবার উৎসাহ ও কৌতূহল এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক বৎসরই 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে' আরোহণ করিবার নূতন নূতন পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে। অধ্যাপক পিকার্ড বায়ুচাপশূন্য বিরাট লোহকের মধ্যে অবস্থান করিয়া বেলুন সাহায্যে দুইবার দশ মাইল উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ছিলেন। ইহার পরে দুইজন রাশিয়ান বিমানবীর বেলুনের সাহায্যে ঠিক ভাবে নির্মিত গণ্ডোলায় আরোহণ করিয়া প্রায় ১২ মাইল উর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পথা অনুসরণ করিয়া আমেরিকার লেফটেনাণ্ট হার্মাণ্ডার স্টেল এবং মেয়র ষ্টার্লিং প্রায় ১২ মাইলের কিছিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া ছিলেন। তাঁহাদের এই উদ্যমের ফলে মোটামুটি ভাবে জানা গিয়াছিল যে, উপরের বায়ুমণ্ডলের অবস্থান অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলেও নীচের বায়ুস্তরের চেয়ে অভিকর্ষের পরিমাণ কম নহে। কাজেই সেখানকার বায়ুস্তর পাম্পের সাহায্যে আরও কুঠুরীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিলে আরোহীদের বায়ুস্তরের চাপ সহ্য করিতে কোনই কষ্ট হইবে না। সম্প্রতি যে তিন জন রাশিয়ান বিমানবীর ১৩ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় প্রাণ হারাইলেন—তাঁহারা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতর স্তর সম্বন্ধে এই আশাপ্রদ তথ্য জানাই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলেও কিন্তু 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার'-অভিযানকারীরা কিছুমাত্র দিলিচ হন নাই, বরং নবীন উৎসাহে, নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া এই অজ্ঞাত বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। বেলুন কেপ্সারে এবং ক্যাপ্টেন ইয়েন্স্ যাবে দুই জন সামরিক বিমানবীর বেলুনের সাহায্যে

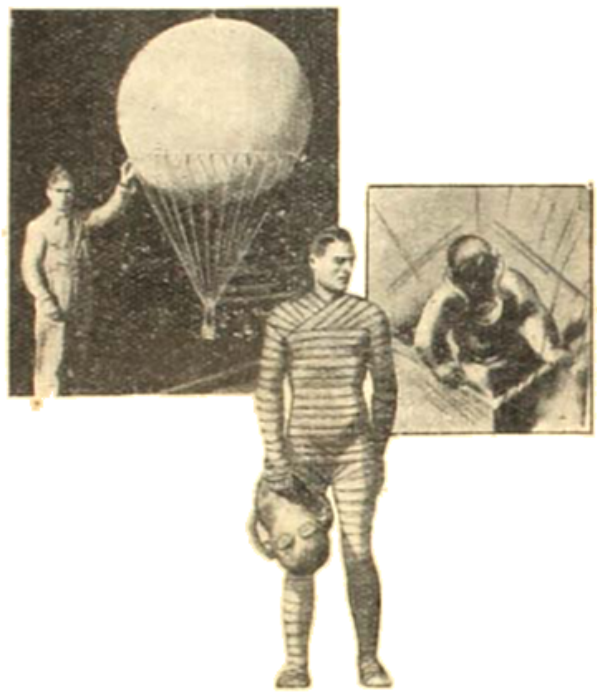

কর্ণেল এমিলিও হেরেরা ও 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার'-আরোহণকারী নব পরিকল্পিত বেলুন :

বিশেষভাবে নির্মিত বায়ুচাপশূন্য গণ্ডোলায় আরোহণ করিয়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর পরিষদ উদ্যোগ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই স্পেনিশ বিমান-বিভাগের কর্ণেল এমিলিও হেরেরা 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের' স্তরে উদ্বেগজনক এক দুঃসাহসিক অভিযানে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা-পরিমাপকারী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত বায়ুচাপশূন্য গণ্ডোলায় মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করিয়া ১২ মাইল উঁচুতে অনেক কম চাপে। বায়ুমণ্ডলে নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পা হইতে মাথা পর্যন্ত শক্ত 'আবরণ' মুড়িয়া লইবেন। তাঁহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তড়িৎশক্তিসাহায্যে উত্তপ্ত কোট ব্যবহার করিবেন। যানত্যাগে অভিজ্ঞতা প্রণ করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত শিরস্ত্রাণ বা গ্যাস-মুখোসের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। রেডিওযোগে পৃথিবীস্থ লোকের সঙ্গে কথাবার্তার যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। সঙ্গে একটি শক্তিশালী ক্যামেরা থাকিবে তদ্দ্বারা 'ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের' বিভিন্ন স্থানের নিখুঁৎ ছবি তোলা যাইবে। তাঁহার এই পরিকল্পনা অতি শীঘ্রই তিনি কার্যে পরিণত করিবেন। তাঁহার বেলুন ও অবরোহণযোগী আধার যানি নির্মাণ কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ক্রমশঃ-র পরে

—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

ইউনিভার্সিটির গণ্ডী পেরিয়ে বুদ্ধিমানের মত উমেদারী সুরু করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল একটা চাকরী—কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর সবার মত আমারও কিছু ছুটল না—এক লাইফ ইন্সিওরের দালালী ছাড়া। অগত্যা তাতেই লেগে যাওয়া গেল। খাকী শার্ট আর হাফ্‌প্যাণ্ট; মাথায় ঘাম এবং তেলের পুরু প্রলেপজমা একটি শোলার টুপী। শার্টের বুক-পকেট ৪টি নানাপ্রকার কাগজে, পেন্সিলে, নোট-বইয়ে একেবারে হয়ে উঠেছে ওয়েষ্ট-পেপারবাস্কেট। হাতে ছোট একটি ব্যাগ। পায়ে ছিল্-ছেঁড়া মোজার ওপর তালি-দেওয়া সু—ফিতের গিট দেওয়া। যাকে বলে টিপিক্যাল—তাই।

এ হেন আমিও গল্পের প্লট ভেবেছিলাম।

দিনরাত্রি সবার কাছেই বকছি কোন্ কোম্পানীর কেমন লাভ, কারা মূলধনের সংখ্যাধিক্যে আর সবাইকে টেক্কা দিয়েছে, কাদের কাছে স্বামী এবং স্ত্রীর একসঙ্গে জীবন-বীমা করার সুবিধে আছে—ইত্যাদি···

কিন্তু একদিন এই আমিও গল্পের জালে জড়িয়েছিলাম।

একটা ছোট ষ্টেশন থেকে ট্রেণ চাপলাম—সঙ্গে সব জীবন-বীমার খুঁটিপত্তর। সেগুলিকে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছি; একটা ইঁটের টুকরো ভেতরে ঢুকে বড়ই বিরক্ত করছিল। তাকে মুক্তি দিয়ে মুখ তুলতে যাব এমনি সময় বেঞ্চির তলায় দেখলাম, একখানা ধূলি-মলিন বাঙলা মাসিক। অনেক দিনের পুরোনো কাগজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাতার কোণগুলি মুড়ে দুমড়ে গোল হয়ে ছয়ে ছিঁড়েছে—ইংরিজি ভাষায় যাকে বলে dog-eared; উপরে মলাটের কোন অস্তিত্বও নেই এবং বিজ্ঞাপনের পাতাগুলোও সেই সঙ্গে কোথায় উধাও হয়েছে। কেবল প্রথম পৃষ্ঠায় একখানি ছবির ব্লক: ঘন মেঘভরা রাতে এক বিরহিণী কিংবা প্রিয়-প্রতীক্ষমানা জানালায় বসে আকাশের পানে চেয়ে আছে। প্রথম পাতায় লেখা কাগজটির নাম·· কত বছর, কত খণ্ড, কোন মাস, কোন সংখ্যা ইত্যাদি। ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বসা গেল। ঘনায়মান সন্ধ্যার সেই মিতে-আলা আলো-আঁধারিতে নামটি মনে অনেক কিছু ভাবের সঞ্চার নিয়ে এল।

অন্যমনে মাসিকখানির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা লেখায় চোখ পড়ল। নামটি বড় চমৎকার—'প্রথম ছবি।' একটি গল্প; নিঃশ্বেষে এবং নিরুদ্বেগে পাঠ করে চললাম। ট্রেনটা বেজায় দোলা খাচ্ছিল এবং গাড়ীর ভেতরের আলোটা ছিল হল্‌দেটে—যা সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে হয়ে থাকে। কিন্তু মন আমার তখন সেদিকে মোটেই ছিল না; গল্পের মেয়েটির তখন অবস্থার পর নতুন অবস্থা আসছে, আমার মনের প্রত্যেক সূক্ষ্ম স্নায়ুতে দোলা দিয়ে দিয়ে। অভিনব এক ভাবের আবেশে সারা মনপ্রাণ ছেয়ে গিয়েছিল।

অনেক দিন অনেক গল্পই ত আমরা পড়ি। কিন্তু কতকগুলোর অনেক সময় কিছুই মনে থাকে না, আবার এক একটা এমন ভাবে জল্ জল্ করতে থাকে যে মনে হয়, এই পড়লাম বুঝি—অর্থাৎ এরা মনকে ফাঁকি দেয় না। এটিও ছিল ওই ধরণের—বিনা চেষ্টাতেই আমার সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল এবং আজও পর্দার ওপর থেকে সরে যায় নি। ঘুরে ফিরেই সেই মেয়েটির কথাই মনে হয়। গল্পটি বলি এইবার। ভাষা আমার, কিন্তু ভাব সেই বহুদিন পূর্বে পড়া পথে-পাওয়া গল্পেরই :—

এম্-এ পাশ করা নেয়ে কেমন করে তার ছেলেটিকে লালন করবে, এ ছিল সকলের বিস্ময়, তাদের প্রচুর কৌতূহলের বিপুল খোরাক। আশ-পাশের মুখুয্যে, বসু, ঘে, চাটুয্যে সবগুলি পরিবারের মেয়েরা এই শুভ সংবাদটায় চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের অবসর সময়, প্রেমা-র অনুরাগত ভবিষ্যৎ কেমন বিচিত্র হবে, এই চিন্তা করতেই কেটে যেত। মুখুয্যে-গৃহিণীর মত, প্রেমা তার সন্তানটির জন্যে একটি মেম-ঝি রাখবে, কারণ এম্-এ পাশ দিতে যে মেয়ের জীবনের অর্দ্ধেকটা কেটে গেছে সে ছেলে-মানুষ-করার কী-ই বা বোঝে। নিজে সে

কেমন করে ছেলে কোলে নিতে হয় তাই-ই জানে না। হরত—নিজের পা দুখানি তিনি অদ্ভুত ভাবে ঝাঁক করে সবাইকে যখন দেখাতেন যে, প্রেমা এমনি করে ছেলেকে কোলে শোয়াবে—সবাই উচ্ছ্বসিত কলরবে হেসে উঠত।

হরত-বাবুর প্রৌঢ়া পিসিমা আরও বেশী ভয়াবহ করে তুলতেন সেই অনাগত শিশুটির ভবিষ্যৎকে। তিনি বলতেন—হরত একদিন ছেলেকে পাশে শুইয়ে দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে ওর ওই মোটা বই একখানা পড়বে, কখন সেখানা ওর হাত থেকে খসে ছেলেটার মুখের ওপর পড়বে আর বেচারী কেঁদে ককিয়ে উঠবে—তার কণ্ঠ হরত আর শোনা যাবে না।—বলে নিজের কল্পিত ছবিখানির বীভৎসতায় তিনি শিউরে উঠলেন। বাকী সবাই ভয়ে এবং কতকটা বিস্ময়ে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে—চোখের মণিগুলিকে বড় বড় করে।

প্রাত্যহিক বহুপ্রকার পরচর্চার মধ্যে এই কথাগুলির একটা নির্দিষ্ট আসন তারা ঠিক করে দিয়েছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে এত কথা সেই প্রেমা এ বিষয়ে মাথা ঘামাতো বড়ই কম—হরত মোটেই না। সে তখন নিজের অবস্থা ভেবে রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায়, কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। তবে এটা ঠিক—মনের এই অবস্থার জন্যে তাকে দোষী করা চলে না। বিবাহ বিষয়ে সে কোনদিনই কোন প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি; তার মূলে ছিল সন্তানের প্রতি তার কেমন একটা নির্লিপ্ততা, কেমনতরো বিতৃষ্ণা। সেই জন্যেই প্রথম জীবনে যতবার তার বিবাহের কথা হয়েছে সে কোনক্রমেই তাতে সম্মতি দেয় নি।—তার নজীর ছিল লেখা-পড়া করবার—কিন্তু মনের ভেতরে ছিল মাতৃত্বের প্রতি ঔদাসীন্য। মাতৃত্বের ওপর তার না ছিল মোহ, না সহানুভূতি। বরং তার চাইতে বেশী ছিল ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য। কিন্তু তাই বলে তার হৃদয়ে যে স্নেহ ছিল না এমন কথা মনে করারও সুযোগ সে দেয়নি। বাড়ীর চাকর ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকের ওপর ছিল তার স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি। হাত দুখানা তার সকলের সুখ-সুবিধার জন্যে সদা-সর্বদাই চঞ্চল। তবু প্রেমা স্বপ্নেও কোনদিন মা হতে চায় নি। তাই তার বন্ধু মালতী যখন তার নতুন খোকাটির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে বড় বড় চিঠি পাঠাত, সে ঘৃণা করে একটু হাসত শুধু। ঠিক করতে পারত না পুরুষের কাছে নারীত্বের এই চিহ্নটির জন্য হাসি এবং আনন্দ আসতে পারে কোথা থেকে? তার মনে হত মালতী অদ্ভুত, পৃথিবীর সব মা গুলিই অদ্ভুত!

—আপাততঃ তার নিজেকেই নিজের মনে হচ্ছে আরো বেশী অদ্ভুত। গেল একটি বছরের ইতিহাস যতই সে পর্যালোচনা করে দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে। কী আশ্চর্য—সত্যি কী আশ্চর্য!—কলকাতা থেকে দেওঘর কতটুকুই বা পথ—কতক্ষণই বা সময়! অথচ তাই-ই যথেষ্ট হয়েছে তার দীর্ঘ জীবনকে বিষিয়ে দেবার পক্ষে। মনে মনে ভাবে, গ্রহ-জগতে সেদিন কার ছিল রাজত্ব! যদিচ ওসবে সে বিশ্বাস করে না, তবু সংস্কার মরে নি। অজানতে মুখে দিয়ে বেরিয়ে আসে—"কী কুক্ষণেই বেরিয়েছিলাম"—আর মনে মনে, অজ্ঞাতে যত অঘটন-ঘটনকারীর নামগুলো আউড়ে যায়।

সুপ্রিয় যে কি করে প্রফেসর হয়েছে কে জানে! ওই মুখ-চোরা, নিরীহ বেচারী একা চলেছিল দেওঘরে—শরীর সারা-বার উদ্দেশে, ঠিক সারানো নয়, রিপু করার জন্যে। শরীর মানুষের আজুলে তাকে রিপুই করা হয়, নতুন করা আর যায় না। সুপ্রিয়ও তাই বেরিয়ে পড়েছিল। অবিবাহিত, তিরিশ বছর বয়স, ক্ষুদ্রকায় সুপ্রিয় দেওঘরে চলেছিল—একা। ইন্টারের কামরায় ভিড় ছিল। কম খরচে বাবুয়ানার ভাণ বেশ করা চলে এই ইন্টারে উঠে। আভিজাত্যও বাঁচে পকেটও রেহাই পায়। সবাই-ই এ সহজ কথাটা বোঝে এবং কতকটা চক্ষু-লজ্জার খাতিরে মেনেও চলে; কাজেই ছোট কামরাখানায় ভিড় যথেষ্ট হয়েছিল—যদিও "যদিবেক"-এর আগে লেখা ছিল "তের জন।" এই ভিড়ের ভেতর সুপ্রিয় আবিষ্কার করলে প্রেমা-কে—প্রেমা চাইল সুপ্রিয়র দিকে। সুপ্রিয় সুপুরুষও নয়, কিংবা ষ্টেশনের কোন কর্মচারীকে ছুটো প্রণামও ঘুষও সে মারতে পারে না, কোন অজানা যাত্রীকে অপমান করার অপরাধে; তবু প্রেমা-র সুপ্রিয়কে ভাল লাগল। তার মনের অবস্থা তখন রাধার মত—"পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।" তারপর দুজনের সুরু হল সমাজ, সাহিত্য এবং আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা,—যেটুকু করতে হলে বেশী বিদ্যের কিংবা চিন্তার প্রয়োজন হয় না,

ফ্লোরটে শোনা-কথা ফটলেই শ্রোতা এবং বক্তা সমান লাভবান হন—যা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দুটি তরুণ এবং তরুণীর মধ্যে প্রায়শঃই হয়ে থাকে। এই তাদের প্রথম পরিচয় এবং এর পর পাঞ্জী খুলে প্রথমেই যে সুভজিবুক লগটা পাওয়া গেল তাইতে সামাজিক নিয়মে হল বিবাহ।

প্রেমা খুব সহজভাবে এতে সম্মতি দেয় নি। সে বলেছিল স্বামীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সে মেনে নেবে না। তাদের মাঝে থাকবে বন্ধু এবং বান্ধবীর একটা সরল বন্ধন। কেবল মাত্র লোকলজ্জাকে চাপা দেবার জন্যেই এই বিবাহের অনুষ্ঠান করা হয়েছে; ওইটাকেই যেন সুপ্রিয় মস্তবড় একটা অধিকারের সূচনা বলে মনে না করে। এ কথা প্রেমা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল।

এ সবের পরও প্রেমা আজ যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে তার ফেরার পথ বন্ধ—সামনে চলার উপায়ও নেই। একেবারে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। এই অবস্থিতির চমৎকারিত্ব আছে হয়ত, কিন্তু স্বস্তি নেই এতটুকুও।

*

এইখানেই 'ক্রমশঃ' লেখা। আর বেশী ছাপান হয়নি; পর পর আরো কয়েকমাসের খোরাক জমিয়ে রাখা হয়েছে। ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কেন দেখে পড়লাম না। আচ্ছা কী হবে মেয়েটির? তার ওপর রাগ হতে লাগল, আবার তার অবস্থা ভেবে দুঃখও হল। মেয়েমানুষ মা হতে চায় না—বিশেষ করে বাঙলা দেশের মেয়ে, সে আবার কেমন কথা। সন্তান কামনা করেই ত এরা গাছের ডালে ঢিল বাঁধে, কোন্ দেবতার মন্দিরে গিয়ে না ধন্না দেয়! অথচ এ আবার কেমন?—এম্-এ পাশ করেছে বলে কি মায়ের বুকখানাও পরীক্ষার চাপে পিষে ফেলেছে? কি জানি। আচ্ছা, কি হল তারপর? তার সব খবর জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। তার ঠিকানা জানলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসতাম; ভয় নেই, লাইফ্ ইন্সিওর করার কথা বলতাম না—এটা ঠিক।

রাত্রে আর নামবার প্রয়োজন ছিল না—উপরেরও কোন তাগিদ আশা করছিলাম না। কিন্তু আর পড়তে ভাল লাগল না। সামনের বেঞ্চিতে পা দুখানা তুলে পিছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। গাছপালা, বনবাদাড়, খানা-ডোবা, টেলিগ্রাফের পোষ্ট ইত্যাদি সব হু-হু করে বিপরীত মুখে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে না দেখতে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। আলোর গতি অতি দ্রুত বলেই বইয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তা যে এমন কল্পনাতীত দ্রুতত্তর তা আজ অনুভব করলাম। এই জন্যেই মনে যার আলো আছে তার মনের গতিও তীব্রভাবে গতিশীল। আজ এই নির্জন গাড়ীখানিতে বসে আমার আলো-অন্ধকারসমাচ্ছন্ন মন নিয়ে তাই বড় দুঃখ হতে লাগল। উঁচু চিন্তা আমারও আছে, সুরুচি, মার্জ্জিত সংস্কার সবই আছে—অভাব কেবল অর্থের আর সেই জন্যেই আজ এই কাজে নেমেছি·····

·····নিজের প্রতি একটা ঘৃণায় মন ভরে উঠল। কি প্রয়োজন ছিল এর? স্ত্রী নেই, পুত্র নেই; তবে কার জন্যে এই কুশ্রীতার মাঝে নেমে এসেছি? পিতা, মাতা? সেজন্যে আমি কেন ভাবব? মা অথবা বাবা কেন আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন? আমাকে পৃথিবীতে তাঁরা এনেছিলেন, পৃথিবীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার ভারও ছিল তাঁদের, যখন আমি দাঁড়াতে শিখলাম তখন আর কী প্রয়োজন তাঁদের? আমিও কোন অভাব বোধ করি না—তাঁদেরও করা উচিত নয়। এটুকু ছিল তাঁদের কর্তব্য। মোহ, মায়া এসব হচ্ছে দুর্বল মনের কল্পনা। আর স্ত্রী, পুত্র যদি আমার থাকত তবে আমারও কর্তব্য ছিল—স্বামীর এবং পিতার; কারণ আমিই তাদের এনেছি। তা যখন নেই তখন আর ভাবনা কেন? তাই বলছিলাম, মনে চলেছে আলো-আঁধারের খেলা। কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে না পারলে কিছুই আর ভাল লাগে না। মনে মনে এই ত এত কথা ভাবছি কিন্তু সকাল বেলায় যখন আবার কাজে নামব এরা কেউ তখন থাকবে না, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ আমি—আমি রবিন্ সেন—লাইফ্-ইন্সিওরের দালাল। প্রত্যেক মানুষেরই রাত্রের চিন্তা দিনের আলোয় ম্লান হয়ে যায়। তাই পৃথিবী আজও চলছে। যে যে কাজই করুক না কেন এক সময়ে তাকে বলতেই হয়—"দূর, আর ভাল লাগে না; দেব সব একদিন ছেড়ে-ছুড়ে। তারপর বেরিয়ে পড়বো।" কিন্তু সেই "একদিন" আর তার আসে না; সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়াও আর হয় না।

এমনি বিধাতার ভুলে চলে পৃথিবী বেশ চলেছে, চলবেও ঠিক। পৃথিবীটা এতবড় একটা বিস্ময় যে, এই ছোট খাট আশ্চর্যের কোন দামই দেওয়া চলে না।

হ্যাঁ, কি তারপর হল প্রেমা-র? ভাবতে কেমন লাগে, একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা ওর একটি ফুটফুটে খোকা হল—আকাশের সবচেয়ে বড় তারাটির মত। বেদনায়, যন্ত্রণায়, পরাভবের গ্লানিতে প্রেমা তখন মুহ্যমান হয়ে পড়ে আছে—আর বাইরে চলেছে শাঁখের আওয়াজ আর ঘন ঘন কলকণ্ঠের উলুধ্বনি। সুপ্রিয়র বৃদ্ধা খুড়ীমা সব তদারক করছেন। আর সুপ্রিয় মিনিটে মিনিটে তাগিদ দিচ্ছে: ওষুধ আন, ডাক্তার ডাক।—নিজে সে এক পা নড়ে বসার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। প্রেমা-কে সে ভালবাসে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে নি, কোনদিন বলতে বোধ করি চেষ্টাও করে নি।

প্রতিবেশিনীরা মিষ্টির হাঁড়ী আনিয়ে আর ধাত্রীবুড়ী নগদ যেন কিছু নিয়ে এবং আরও কিছু পরে নেবার আবদার জানিয়ে বিদায় নিলে। বাড়ীখানা নিঝুম হয়ে এল। কেবল খুড়ীমা ফিস্‌ফিস্ করে ঝিটাকে, ঠাকুরকে, চাকরকে সব কাজের ফরমাস করতে লাগলেন—প্রেমা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে ছোট খোকাটা ঘুমোচ্ছে, হাত দুখানা মুঠো করা, পা দুটি একটু একটু ভাঁজ করা, টুকটুকে লাল তার তলাগুলি। নিশ্বাস নিচ্ছে খুব জোরে জোরে। সাদা পাতলা চামড়ায় ঢাকা পেটের নীলাভ শিরাগুলি দেখা যাচ্ছে। এমন ভাবে বুক ভরে নিশ্বাস টানছে যে, দেখে মনে হয় এ পৃথিবীর বাতাস ওর ভাল লেগেছে; তার অস্তিত্বকে যেন ও দেহের প্রতি অণুতে প্রতিটি পরমাণুতে ছড়িয়ে দিতে চায়।

অনেকক্ষণ বাদে ওর কান্নার শব্দে প্রেমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ওর মনে একটু মাত্র স্নেহের উদয় হল না। ও ত' কোমলতা চায়নি, চেয়েছিল কাঠিন্য। মুখখানা ওর কঠিন হ'য়ে উঠল। কান্না শুনে খুড়ীমা ছুটে এলেন; 'বৌমা, খোকাকে মাই দাও মা। আহা, বড্ড খিদে পেয়েছে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানকে স্তন দিতে হয়। খোকা আবার চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ভাবে, এত দুধ এল কোথা থেকে? আমি ত' এর একবিন্দুও ওর জন্যে সঞ্চয় করি নি। আমার শুষ্ক মনে এ সরসতা কে দিলে?

দিন কয়েক পরে প্রেমা দেখলে ছেলেটার ওপর সত্যিই তার মায়া পড়ে গেছে। তার কোল তাকে ছাড়াতে হবে। অতএব খুড়ীমা জানতে পারলেন; মাই দিতে বড় লাগে—মাইয়ে দুধ নেই। খুড়ীমা কলপড়া এবং টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। প্রেমা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে; 'ওতে আমার বিশ্বাস নেই আর ঠাণ্ডা জল এখন খেলে হাইড্রোফোবিয়া হবে।' তিনি ইংরেজী কথা শুনে পিছিয়ে গেলেন। নিজের ডাক্তারী বিদ্যের বহর দেখে প্রেমা মনে মনে হাসলে। সুপ্রিয়ও কী জানি কেন ডাক্তার আর ডাকলে না।

তবে খোকার জন্যে ছাগল এল, ফিডিং-বট্‌লও এল। প্রেমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। সুপ্রিয় অনেক ভেবেচিন্তেও এদিকে আসতে পারে না। সে যে অপরাধী এটুকু নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছে, যদিচ তার অপরাধের মাত্রাটুকু কত তা' জানে না। মনটাকে নিয়ে সে শুধু ছিনিমিনি খেলছে। একটা কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাকে সামান্য একটু সহানুভূতি জানাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার মুখের দিকে চেয়ে কিছু আর বলতে ইচ্ছে করে না—এমনই করুণ একটা ছায়া সে মুখে। সুপ্রিয় বাইরের দিকে চেয়ে থাকে; কখন যে কলেজ যাবার সময় পেরিয়ে যায় জানতেও পারে না।

প্রেমা যে ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এ সে বুঝেছে তার ইসারায় ইঙ্গিতে। প্রেমার যে দৃষ্টি সুপ্রিয়কে প্রথম দেখেছিল তাতে যে এত বিষ থাকতে পারে তা' ভেবে ওরা উভয়েই আশ্চর্য হয়েছে; মনে হয় ওদের সম্বন্ধও আর গভীর নয় আর বোধহয় ভেতরে ভেতরে তার কোন মূল্যও নেই। এই সব দেখে শুনেই সুপ্রিয় এমনভাবে হতাশ হয়ে গিয়েছে। দুজনের ভেতর সুদূর ব্যবধান। খুড়ীমা নাতির থেকে খোকাটাকে নিয়ে আবার নতুন করে জড়িয়ে পড়েছেন আর মনে মনে বেজায় চটেছেন জুতো-পায়ে-দেওয়া ইংরেজী-পড়া সব মেয়েগুলোর ওপর। নিজের কানকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেন: এতই যদি মনে ছিল তবে কেন আবার জাকাজি করে বিয়ে করা হয়েছিল, বিয়েই বা করা

হল কেন? তখন ত কই "না" বলায়ন্মুখ ছিল না! আশ্চর্য্য ওগ বাবা ওই ইংরেজী বইগুলোর!' বেশী বকতে না কি তিনি কোন কালেই পারেন না, তাই চুপ করে যান।

প্রেমা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে: যা হবার হয়ে গেছে—আর এ জালে নয়। একেবারে দূরে পাড়ি দেবে, যেখানে সুপ্রিয় নেই, ওই খোকাটা নেই। আপনার প্রয়োজন সে নিজেই মেটাতে পারবে, এটুকু আশা আছে। ডিপ্রীটার কি কোন মূল্যই নেই? কিন্তু খোকাটা ভারী মিষ্টি করে হাসে! আচ্ছা, দূরে গেলে কি তাকে, তার ওই হাসিকে মনে পড়বে না? মনে পড়লেই বা। মানুষের মনে সেই জিনিষটাই বেশী করে জেগে ওঠে যা সে ভুলতে চেষ্টা করে সব চেয়ে বেশী। কাজেই তার কথা মনে আসবেই —কিন্তু তাকে নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কবিতা সে লিখবে না, অথচ কারুর কাছে জানতেও চাইবে না কেমন সে আছে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন সব ভুলে যাবে। তখন সে আবার সেই প্রেমা, যে পুত্র কামনা করে না, যে মাতৃত্বকে দুই চোখ ভরে উপহাস করে, বিদ্রূপ করে, ঘৃণা করে সারা অন্তর দিয়ে।

প্রেমা ভাবে, উপন্যাসে যেমন একখানা পাতার পরেই হয়ত একটা নূতন পরিচ্ছেদ সুরু হয়—দশ বছর পরের ঘটনাকে বিবৃত করে, তেমনি তারও যদি আজকের দিনের সব কিছু মুছে গিয়ে কাল থেকে আবার নতুন জীবন আরম্ভ হয়ে যায় ত সে বেঁচে যায়। সে ছাদের নিভৃতে দাঁড়িয়ে ভগবানকে এই কটা কথা তাহলে বলে: উঃ! বড় বাঁচন বাঁচিয়েছ ঠাকুর! আমার এক নিমিষের বিস্মৃতি তুমি এত সহজে, এত শীঘ্রই কি করে ভুললে দেবতা। আমি যা পেয়েছি তা যে আমি চাই নি। তোমার দেওয়া জিনিষকে আমি অপমান করি এমন ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু তাকে বইবার শক্তিও আমার নেই। তুমি আমায় রক্ষা করেছ, আমায় মুক্তি দিয়েছ; আমার প্রণাম নাও ঠাকুর।—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কঠিন বাস্তব তাকে পীড়িত করে তোলে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। সুপ্রিয় এবং প্রেমা আরও বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মনে মনেও আর কেউ কারুর জন্যে ভাবে বলে মনে হয় না, অন্ততঃ বাইরে থেকে সেই রকমই বোধ হয়। সুপ্রিয় ভাবে দুঃখ পাই তাতে ক্ষতি নেই, তবু প্রেমা সুখী হোক।

প্রেমা ভেবে আশ্চর্য্য হয় আমি ত সুপ্রিয়র বন্ধুকে স্বীকার করে নিয়েছি, তবু সে সামনে আসতে ভয় পায় কেন?—যাক্, যত না আসে ততই আমার ভাল। তবে তার দাবীটুকু সে বুঝতে পারে নি বলে মনে হয়। পুরুষের বুঝি এই রকমই স্বভাব। তারা প্রকৃত অধিকারটাকে কখনও বুঝতে পারে না; অধিকারের অতিরিক্ত না হলে তারা শান্তি পায় না, অর্থাৎ স্বভাবের বাইরে যাওয়াতেই তাদের পরিতৃপ্তি। পুরুষ বোঝে না নারীর বন্ধুত্বের মূল্য। দেহাতীত বস্তু বুঝি পুরুষ গ্রহণ করতে পারে না।

সিগারেটের আগুনটা যেমন ডগা থেকে গোড়ার দিকে নেমে আসতে থাকে সবটুকুকে ছাই করে দিয়ে, ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিয়ে—তেমনি প্রেমা-র জীবনের সলতেটাও পুড়তে পুড়তে ক্রমেই নিভে যাওয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। অসুখ যে তার কি তা চিকিৎসকরা ঠিক নির্দ্দেশ করে উঠতে পাচ্ছেন না—তবে শরীরের পক্ষে এখন তার চেঞ্জ দরকার এই তাঁদের অভিমত। সুপ্রিয় খুড়ীমাকে সম্বল করে আবার সেই দেওঘরের দিকেই যাত্রা করল। পথের পাশে চেয়ে চেয়ে তারা দুজনেই দীর্ঘশ্বাস চাপা দেবার চেষ্টা করেছে।

প্রেমার যে দূরে পালাবার ইচ্ছে ছিল তা' আর কাজে হ'য়ে ওঠে নি। কেন যে পারে নি, কিসের আকর্ষণ ছিল ওর পিছনে তা' সে আজও জানে না। পুরুষ হলে হয়ত—কী জানি!

সুপ্রিয় তার সাধ্যের অতীত করে সেবা করছে। খুড়ীমাও বিশ্রাম করার সময় পাচ্ছেন না—যদিও এই নিষ্ঠুর মেয়েটির প্রতি তাঁর এতটুকুও সহানুভূতি ছিল না। এর আসল মৃত্যুকে তিনি যেন ঠিক তেমন ভাবে গ্রহণ করতে পাচ্ছেন না, যাতে নাকি তিনি ক্ষণে ক্ষণেই চোখ মোছবার প্রয়োজন বোধ করেন।

সেদিন প্রেমার বড় বেশী কষ্ট হচ্ছিল। সারারাত সে শান্তভাবে ঘুমোতে পারে নি—সকালেও সে আক্ষেপ বেশ প্রবল ছিল। সুপ্রিয় মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে,

'প্রেম! বড় কী বেশী কষ্ট হচ্ছে?—কোথায় যন্ত্রণাটা আমায় বল।'

অল্প কথা। এতে প্রেমা যেমন আশ্বস্ত হল, সুপ্রিয়ও তেমনি লজ্জা পেল।—বহুদিন পরে এই তার প্রথম প্রেমাকে সম্বোধন। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত থেকে আস্তে আস্তে প্রেম বললে, 'না গো, ব্যথাটা ত' আমার দেহে নয়। আমার মনে যে কি হচ্ছে আমি বলতে পারি নে। আচ্ছা! আমাকে আবার তোমরা বাঁচাতে পার না, প্রিয়?'

সুপ্রিয়কে ও সুও বলেছে প্রিয়ও বলেছে—সেই বিবাহের সময়। আজ সেই সম্বোধন সুপ্রিয়কে নতুন জগতে নিয়ে ফেললে। কিন্তু কথা কটা বলেই প্রেমা কেমন চমকে উঠল। নিজের দুর্বলতায় সে সত্যিই লজ্জা পেল—যেমন লজ্জা পেয়েছিল খোকার প্রথম আসার দিন, যখন বাইরে চলছিল শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বিপুল মঙ্গলাচরণ। বাঁচলেই আবার খোকা, আবার সেই আগের মত সব। ঘৃণায় তার শরীরে একটা কেমন কাঁপুনি এল। দেহ হয়ে উঠল কঠিন। সুপ্রিয় বেচারা আশার ইঙ্গিত পাচ্ছিল তা আবার মিলিয়ে গেল। সে আর কিছু বলতে পারলে না।

মৃত্যুর দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্রেমা কী যেন বলতে গিয়ে বলতে পারে না—ঠোঁট দুটি তার ঈষৎ কাঁপে, চোখের কোনে বড় বড় অশ্রুবিন্দু জমে ওঠে।

মৃত্যুর ছবি আমি ঠিক করে আঁকতে পাচ্ছি নে, কারণ সে বস্তু অনুভবের। তেমন গভীর অনুভূতি যে আমার নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। তবে প্রেমা-র মৃত্যুর সময় খোকাকে সে ছিল বুকে চেপে, দুটি পাতুর অধর ছিল তার নরম গালের ওপর একটু করে ছোঁয়ানো, আর জলভরা দুই চোখ ছিল সুপ্রিয়র দিকে নির্নিমেষে চেয়ে, সে দৃষ্টিতে ছিল মাতৃত্ব, তাতে ছিল পত্নীর সহজ সুন্দর গভীরতা।

আমার চোখ দিয়ে কত জল পড়েছে তার পরিমাণ জানতে না পারলেও আসলে যে তা অনেকটাই, বোঝা গেল আমার আর্ট শার্টে হাত দিয়ে। আমি অর্থহীন দাক্ষাল; আমার চোখে করুণার জল আসে কেন? শুধু অভাবের সময় আসবে দু ফোঁটা অশ্রু—তার বেশী নয়, আর আসবে একটা বিশ্রী রুক্ষতা, যা দেখে অতি নিকটতম অন্তরঙ্গও ভয় পেয়ে যাবে।

মাসিকখানা বাইরে ফেলে দিলাম। হাওয়ায় তার পাতাগুলো সব খুলে গিয়ে কেমন একটা আর্তনাদ করে উঠল। চোখ মুছে ভাবতে লাগলাম, প্রেমা ফিরে দাঁড়াল বড় অসময়ে আর আমি চোখের জল ফেলছি তার চেয়ে আরো বেশী অসময়ে!

ভাল্ডেমার হাফকিন (১৮৬০-১৯৩০)

পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর আগে প্লেগ ও কলেরাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দূত হিসাবে ধরা হইত। আর কলেরার মৃত্যুহার শতকরা দুই জন। কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়াছিলেন ভাল্ডেমার হাফকিন। ওডেসায় ১৮৬০ সনে ইঁহার জন্ম হয়। ওডেসা হইতে তিনি মেডিক্যাল পরীক্ষা দিয়া প্যারিসে আসিয়া পাস্তুরের অধীনে বহুবিধ গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ৫ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে তিনি কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কারে সক্ষম হন। কত বাক্তিই যে এই গবেষণায় নিজেদের দেহে ঔষধের ইন্জেক্সন করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন! হাফকিনও বহুবার কঠিন বিপদ হইতে নিজেকে উদ্ধার পাইয়াছেন। অবশেষে প্রতিষেধক আবিষ্কার হইলে ১৮৯৩ সালে হাফকিন চাকরী লইয়া ভারতবর্ষে আসেন। তারপরে কলেরা রোগের প্রকোপ হইলে তিনি তথায় গবেষণা করিয়া কলেরা-মৃত্যুর সংখ্যা কমাইয়া দেন। ঠিক এই সময়েই বোম্বাইতে প্লেগের মহামারী হয়। বোম্বাই সরকার হইতে তাঁহাকে প্লেগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাজে নিযুক্ত করা হয়। অল্প পরিশ্রমে তিনি এ কাজে সাফল্য অর্জন করেন।

কে বলিতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে হাফকিনের স্থান নেপলীয়নের উপরে বা নীচে!

ভারতের আর্থিক উন্নতি

—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাহার উন্নতির ধাপে ধাপে রহিয়াছে সে জাতির বিশেষ প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতই হউক বা সমাজগতই হউক, জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ হঠাৎ একদিনে হইতে পারে নাই। সে জাতির ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় সহস্র চেষ্টার উদ্যম রহিয়া গিয়াছে, শত উদ্যমের বিফলতার কাহিনীও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি জাতির এই যে অর্থনৈতিক জীবনপন্থী তাহা রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নহে। মার্ক্সপন্থীদের ভাষায় আমরা যদি স্বীকার নাও করি যে, অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষের জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলেও এই কথা বলা চলে যে, মানুষের সামাজিক জীবনের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব সামান্য নয়। জগতের আধুনিকতম যতগুলি সমস্যা মানবজাতিকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মূলে রহিয়াছে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ। রাজনীতি এই সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুইটির মধ্যে সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ এবং তাহাই যে বর্তমান সভ্যতার সংঘাতের জন্য অনেকাংশে দায়ী, তাহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

কাজেই, একটি জাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ মঙ্গল যে এই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, ইহা মনে করিয়া আমরা ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিতে পারি। ভারতের দৈন্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং তাহার সহস্র সহস্র নরনারীর যে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানও নাই তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটি জাতির আর্থিক উন্নতি হিসাব করিবার বিশেষ কোন মাপকাঠি নাই, তবে কতকগুলি বাহ্যিক নিদর্শন আছে, যাহার দ্বারা আমরা একটি ধারণা করিতে পারি। যদি দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনধারণের আয়ুষ্কাল পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে দুর্ভিক্ষ নাই, সাধারণ অবস্থা শান্ত এবং ব্যবসাবাণিজ্য স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে—তবে বুঝিতে হইবে যে, সে জাতির আর্থিক উন্নতি হইতেছে। এই মাপকাঠি ধরিয়া ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে আমরা অনেকটা কল্পনা করিতে পারি। প্রত্যেক উন্নত দেশেই ৫ বৎসর বা ১০ বৎসর পর পর অর্থনৈতিক সেন্সাস্ (economic census) গ্রহণ করা হয়। তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের যথার্থ চিত্রটি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যেই লিপিবদ্ধ থাকে, সে জাতির উন্নতির ধারা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশা। প্রত্যেকটি মানুষ বুঝিতে পারে, জাতীয় উন্নতি কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং সমস্ত ত্রুটি ও ভ্রান্তি সংশোধন করিবার জন্য শুধু গভর্নমেণ্ট নয়, সমস্ত জাতিই উন্মুখ ও সচেষ্ট হইয়া উঠে। এরূপ একটি সেন্সাস্ গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতা কোন জাতি অর্জন করে তখনই—যখন সে অর্থনৈতিক সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

এই সব বিষয়ে ভারতের যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার লোকসংখ্যা গণনার জন্য ১০ বৎসর পর পর সেন্সাস্ গ্রহণ করা হয় সত্য, কিন্তু তাহা জনসংখ্যাবৃদ্ধির ধারা যতটা লিপিবদ্ধ করে, অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয় ততটা করে না। তাহাতে অতি সামান্য অর্থনীতি-ঘটিত জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হয় এবং সে সব সংবাদ যে ভাবে সংগ্রহ করা হয় তাহাতে তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। তাহাতে শুধু আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই; তাহা দিয়া দেশের সমগ্র অবস্থা বুঝিবার উপায় থাকে না। এই অর্থনৈতিক সংখ্যাবিবরণের অভাবেই আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার সুযোগ হয় না এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টাও হইতে পারে না। অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ভারত গবর্নমেণ্টের একটি ডিপার্টমেণ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহার সাহায্যে আমরা একটি মোটামুটি ধারণাই শুধু পাই। এই তথ্য সংগ্রহের পন্থা ও তাহার অসম্পূর্ণতা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিব, আমাদের অর্থনৈতিক গবেষণা—যাহা জাতীয় জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়—ইহা হইতে বেশী কিছু সাহায্যের আশা করিতে পারে না।

ভারতের এই অর্থনৈতিক সংখ্যাবিবৃতি এখনও অনেক ভাবে অসংগৃহীত ও অসম্পূর্ণ। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মত একটি অর্থনৈতিক সেন্সাস্ গ্রহণ করিবার সময় ভারতেও আসিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট এরূপ কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা জানাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ একটি সেন্সাস্ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বেই ছিল। ইহার অভাবে শুধু যে জনসাধারণ নিজেদের অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হইতে পারে নাই তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টও অনেকখানি দায়িত্ব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ প্রকৃত ঘটনাগুলির দ্বারা দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টকে কোনদিন লজ্জিত করানো যায় নাই যে, ভারতের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বিশেষ একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট দেশের আয়ব্যয় সমান দেখাইয়া বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, দেশের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে এবং দেশের ঋণ করিবার ক্ষমতা (credit) সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনকই আছে। কিছুদিন পূর্বে রাজস্ব-সচিব স্যার জর্জ্জ শুষ্টার ব্যবস্থা-পরিষদে বজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিয়া একটি অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—অবশ্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সাহায্যেই—যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্র জগতের আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও এখনও সুস্থ আছে এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বেশ ভালই এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে আহার পাইতেছে। আমরা স্যার জর্জ্জের আলোচনার পুনরালোচনা করিয়া দেখিব, আমাদের অর্থ-নৈতিক ভাগ্য কোন্ দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে।

রাজস্ব-সচিব বুঝাইতে চাহেন যে, যেহেতু তিনি ভারতের বজেটে আয়ব্যয় সমান দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতেই প্রমাণ হয়, ভারতের অবস্থা অন্যান্য অনেক দেশ হইতে বেশী সন্তোষজনক। জাপানে এ বৎসরের বজেটে ৮৮ কোটি ইয়েনের ঋণ ধরা আছে। আমেরিকার বজেটেও ঘাটতি আছে এবং আরও কতগুলি দেশের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের ভাগ বেশী দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে হয়, বজেটে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়াটাই দেশের অর্থনৈতিক মঙ্গলের মাপকাঠি নয়। কি ভাবে এই সামঞ্জস্য সাধন করা হইয়াছে—তাহার উপরেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে। আমাদের দেশের বজেটের সামঞ্জস্য আমাদের অর্থনৈতিক মঙ্গলের প্রতীক হইতে পারে না, কারণ বজেটে অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র থাকে তাহাতে সমগ্র জাতির আর্থিক অবস্থার কোন স্থান নাই; তাহা শুধু গবর্ণমেণ্টের অবস্থা সূচিত করে মাত্র। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে নৈরাশ্যের ভারে দুর্ব্বহ জীবন যাপন করিতেছে, অভাবের তাড়নায় লোকের বেকার-সমস্যা দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে—তাহা দূর করিবার জন্য অতি সামান্য চেষ্টাই বজেটে রহিয়া গিয়াছে। জাপানী গবর্ণমেণ্ট যে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইবে জনসাধারণের উপকারের জন্য। রাস্তা নির্ম্মাণ, রেলওয়ে-বিস্তার প্রভৃতি সরকারী কাজে অর্থ ব্যয়িত হইলে জন-সাধারণের বেকার-সমস্যা অনেকাংশে দূর হইবে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও সমগ্র জাতির বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উজ্জীবনের জন্য যে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে টাকা দেশের লোকদিগের ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মঙ্গলই সাধন করিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বজেটে ঘাটতি না দেখাইয়া নিজেদের কৃতিত্বের জন্য আত্মপ্রসাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহা যে দেশের কতখানি ক্ষতি করিয়া করা হইয়াছে, তাহা হিসাব করিলে আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অভিনন্দিত করিতে পারি না। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঋণ করেন নাই, কিন্তু দৈন্যপীড়িত লোকদের উপর নূতন নূতন শুল্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের ঋণভার আরও বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুরাতন ঋণ শোধ করিবার জন্য যে বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল তাহা কমাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের ঋণ আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

স্যার জর্জ্জ শুষ্টার ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও তাবিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি গত এক বৎসরের দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের মধ্যে কেরোসিন তৈল, লবণ এবং পরিধেয় বস্ত্রের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয়

জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা এই বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ১৯৩৩ সনে পরিধেয় বস্ত্রাদির পরিমাণ ১৯৩২ সনের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু যে ভাবে এই হিসাব করা হইয়াছে তাহা মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে। মূল্যের দিক দিয়া তার জর্জ নিজেই দেখাইয়াছেন যে, লোকের ক্রয়ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৩৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়? প্রবল আর্থিক সঙ্কটের জন্য জনসাধারণ যে নিতেদের শেষ সম্বল পারিবারিক অলঙ্কার ইত্যাদিও বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমানের অভাব পূর্ণ করিতেছে, তাহা ভারত হইতে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণরপ্তানীর দ্বারাই প্রমাণ হয়।

শিল্পবাণিজ্যের সম্পর্কে তার সুষ্টার বলিয়াছেন যে গত বৎসরে লৌহ, মিলের কাপড় ও সিমেন্ট বেশী পরিমাণে তৈরী হইয়াছে। ১৯২৮ সনের তুলনায় লৌহের পরিমাণ নাকি শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রমাণে অর্থসচিব বলিতে চাহেন যে,জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চেয়ে ভারতের ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল উন্নতি বেশী হইয়াছে। হিসাব করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, দুই একটি শিল্পে কিছু কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ১৯২৮ সনকে ভিত্তি করিয়া কোনরূপ তুলনামূলক হিসাব নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে ১৯২৮ সন বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। সাধারণতঃ বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ১৯২৯ সনের সঙ্গেই সমস্ত তুলনামূলক হিসাব করা হয়। সে হিসাবে ভারতের ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল প্রগতি যতটা তার জর্জ দেখাইয়াছেন ঠিক ততটা মনে করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯২৮ সনে টাটা লৌহ-কারখানায় চার পাঁচ মাস ব্যাপী ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল; সুতরাং সে বৎসরের লৌহের পরিমাণ যথেষ্ট কম হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ১৯৩৩ সনে আপেক্ষিক ভাবে লৌহের পরিমাণ অনেক বেশী দেখাইতে পারা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯২৯ সনকে যদি ভিত্তি করিয়া হিসাব করা যায়, তবে দেখিতে পাই ১৯৩৩ সনের লৌহের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। কাজেই চারিদিকের বাণিজ্যমন্দা ও অর্থসঙ্কটের মধ্যে তার সুষ্টার যদি মাত্র দুই একটি শিল্পের উন্নতি খুব বড় করিয়া দেখাইয়া বলেন যে, আমরা শিল্পোন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, তবে তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের মুস্কিল হয় এবং দেশের প্রকৃত অবস্থাও সম্পূর্ণরূপে তাহা সমর্থন করে না।

বাণিজ্য সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ১৯২৯ সনের পর হইতে ১৯৩৩ সনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যে মন্দা চলিয়াছিল, উন্নতি এপ্রিল হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এই কয়মাসে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্য অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে এবং আমদানী-বাণিজ্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। তার গুষ্টার বলিতে চাহেন যে, রপ্তানী-বাণিজ্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধির কারণ হইল অটোয়ার বাণিজ্য চুক্তি। ১৯৩২ সনের শেষদিকে ভারত, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নদের সঙ্গে পরস্পর সুবিধাদানমূলক যে এক বাণিজ্যচুক্তি করিয়াছিল তাহার ফলে এরূপ বাণিজ্য প্রসার হইয়াছে—একথা স্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষ শুধু কাঁচা-মালের (raw materials) রপ্তানীকারী এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই অধুনা শিল্পকর্ম্মের বৃদ্ধির সকল কাঁচা মালের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ১৯৩৩ সনে শুধু ইংলণ্ডই আমাদের নিকট হইতে কিছু বেশী টাকার জিনিষ লইয়াছে। ইহা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, ইংলণ্ড ব্যতীত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৯৩২ সনে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের শতকরা ১৮'৪ ভাগ লইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৩ সনে শুধু লইয়াছে ১৪'৮ অংশ। অন্যপক্ষে ভারতের আমদানী-বাণিজ্যের ১৯৩২ সনে ৮'৩ অংশ লইয়াছিল, ১৯৩৩ সনে লইয়াছে ১০'০ অংশ। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে সাম্রাজ্য-দেশগুলি আমাদের নিকট হইতে সুবিধাই আদায় করিয়া লইয়াছে! অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ—যাহাদের সঙ্গে আমাদের কোনরূপ সুবিধাদানমূলক বাণিজ্যচুক্তি নাই—১৯৩২ সনে আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের লইয়াছিল ৫৯'২ অংশ, ১৯৩৩ সনে লইয়াছে ৫৫'২। ইহাতে 'অটোয়া বাণিজ্যচুক্তি যে আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কোন সুবিধাদান করে নাই তাহাই প্রমাণ হয়।

কৃষি সম্বন্ধে রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের কৃষি তত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। তাহার প্রমাণ দিয়াছেন যে, আমাদের কৃষিজাত দ্রব্য পৃথিবীর

সমদেশেই লইয়াছে, ফলাফল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে নাই এবং তাহাদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনও গবর্ণমেণ্ট অনুভব করেন নাই। প্রথমতঃ ভারতের কৃষিজীবীরা তাহাদের দ্রব্য নামমাত্র মূল্যেই বিদেশে পাঠাইয়া দিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, বিদেশে ঐ সব দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধি নহে, তাহাদের দ্রব্য ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্যের অভাব। যাহাদের দৈনন্দিন আহারের সংস্থানই অনেক সময় থাকে না তাহারা যে বেশী অর্থ পাইবার আশায় তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি কৃষিদ্রব্য লইয়া বসিয়া থাকিবে তাহা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিদ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন বেশী হইয়া পড়ায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ভীষণ ভাবে কমিয়া গিয়াছে এবং সেজন্য জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নাই—তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

একমাত্র পাটের মূল্যহ্রাসের জন্য বাঙ্গালার অর্থসঙ্কট কত গভীর হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি। কিন্তু পাটের মূল্যহ্রাসের প্রধান কারণই হইল, তাহার উৎপাদন-পরিমাণ চাহিদার অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে? আমেরিকা প্রভৃতি যে সব দেশে এরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের সহিত তুলনায় আমাদের দেশে কৃষিদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কোন রূপ বিধানই করা হয় নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যই প্রমাণিত করে। গবর্ণমেণ্ট বলিতে চাহেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রয়োজন আমাদের দেশে নাই, কারণ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাহাদের মত এতটা শোচনীয় হইয়া পড়ে নাই। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়াছেন যে, ভারতে আমেরিকার মত ব্যাঙ্ক ফেইলিয়র হয় নাই। এ কথার উত্তরে শুধু এই বলিলেই চলিবে যে বর্ত্তমানে বাঙ্গালার ৭০০।৮০০ লোন-অফিসের অবস্থা যদি ফেইলিয়র না হইয়া থাকে তবে ফেইলিয়র হওয়া আর কাহাকে বলে?

আমাদের সব চেয়ে অসুবিধা হইতেছে এই যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্যক্ বুঝাইবার জন্য আমাদের কোন সংখ্যাবিবরণই নাই। অন্য দেশে বেকারদিগের সাহায্যের জন্য নিয়ম আছে: প্রত্যেকটি বেকার লোকের হিসাব রাখা হয়। ভারতবর্ষে সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই। আমরা অজ্ঞতার রঙীন কাঁচের ঘরে বসিয়া পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া মনে করিতে পারি যে আমরা বেশ আছি। কিন্তু আমরা বেশ নাই। জগতের অধিকাংশ উন্নত জাতির সহিত তুলনায় আমরা অনেক পিছনে রহিয়াছি; আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্দশা, কৃষকদের ঋণভার এবং বিবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যা জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে যে কতখানি হানিকর, তাহা আমরা এখনও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার তিক্ত ফল একদিন আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের যে এই দিকে অনেক কিছু করিবার আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতীতের অদৃষ্টবাদ লইয়া বসিয়া থাকিলে আমরা বিংশ শতাব্দীর অর্থসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার আশা করিতে পারি না। আমাদের চেষ্টা নিজেদের করিতে হইবে এবং সে চেষ্টার শক্তি জোগাইবে গবর্ণমেণ্ট। প্রত্যেক দেশেই গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ব্যাপকভাবে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সমাধান করিবার জন্য চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে। ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান, আমেরিকা এমন কি তুরস্কের মত ছোট একটি দেশও বিপুল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। রুশিয়ার ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান, জার্ম্মানীর নাজি প্রচেষ্টা, তুরস্কের ফাইভ-ইয়ার-প্ল্যান এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম—সমস্তই সূচনা করিতেছে যে, যদি কোন জাতি নিজেদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে তবে সে জাতির অর্থনৈতিক মঙ্গলের কোন আশাই নাই। ভারতের গবর্ণমেণ্ট এ-পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যাপক কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, যাহাতে দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যার সামান্য কিছুও সমাধান হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কোন দিনই কোন ব্যাপক অর্থনৈতিক প্ল্যান ছিল না। কিন্তু একটি জাতির সর্ব্বতোমুখী প্রগতির জন্য এমন একটি প্রোগ্রামের যে কত দরকার তাহা পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ইতিহাসের ধারা দেখিলে সম্যক বুঝা যায়।

ভারতীয় মধ্যযুগে শূন্যবাদ ঃ
ইহার অর্থ ও ক্রমবিকাশের ধারা

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সকল সত্যের উপরে যে পরম সত্য তাহাকে বুঝাইতে গিয়া মানুষ কি অসাধ্য চেষ্টাই না করিয়াছে। "হাঁ" দিয়া তাহাকে বুঝাইতে গিয়াছে, "না" দিয়া তাহাকে বুঝাইতে গিয়াছে কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনের মত করিয়া বুঝাইতে পারে নাই।

"হাঁ" দিয়া বুঝাইতে গেলে পৃথিবীর ঘটপটাদি ভাবৎ বস্তুর সঙ্গে সেই সত্য হইয়া যায় একাকার, অথচ ইহা "না"ও নহে। তাই সব কিছুর অতীত, "সর্ব্ব-নেতি" মুখে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রকাশের দুঃখ কি সহজ দুঃখ?

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৯শ সূক্তে এই চেষ্টার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে ঋগ্বেদেই এই ভাবের একটু আধটু আভাস মেলে।

এই সূক্তটির ঋষি পথান্ত আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরমাত্মাকেই ঋষির স্থান দিয়াছেন। আসলে এই বেদনা সকল মানব-আত্মার নিগূঢ়তম কথা। এইখানে সেই সৃষ্টির প্রারম্ভের কথা বলিতে গিয়া ঋষি বলিলেন, তখন—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্—ইত্যাদি (ঋ, ১০, ১২৯, ১)

তখন অসৎও ছিল না সৎও ছিল না।

ন মৃত্যুরাসদমৃতং ন তর্হি—ইত্যাদি (ঋ, ১০, ১২৯, ২)

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না।

তদাত্মানং পরং কিং চনাস। (ঐ)

তাঁহাকে ছাড়া কিছুই আর তো ছিল না।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ (ঋ, ১০, ১২৯, ৬)

কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি, কোথা হইতে সব জন্মিল, তাহা কেই বা ঠিক জানে কেই বা পারে বলিতে?

তারপর উপনিষদে দেখি সেই পরম সত্য "অকায়" বলিয়াই সর্ব্বব্যাপী "পর্য্যগাৎ" (ঈশা, ৮)। তিনি অবর্ণ বলিয়াই "বর্ণানেকান্নিহিতার্থো দধাতি"। সকল বর্ণের ও কামাবস্তুর বিধান করিতে পারেন (শ্বেতাশ্বতর, ৪, ১)।

"অক্ষর প্রতিষ্ঠা" পাইতে একমাত্র সেই "অদৃশ্য, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিরুক্ত (অনির্ব্বচনীয়) অনিলয়ন (অনাধার) ওয়েট মিলিবে (তৈত্তিরীয় ২, ৭)

সেই সত্য মহান্ অস্তহীন, আত্মা, অজর, অমর, অমৃত, অভয়।

এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ। বৃ. আ. ৪, ৪, ২৫

তিনি অদ্রেশ্য (=অদৃশ্য), অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুশ্রোত্র, অপাণিপাদ, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়, সর্ব্বভূতের আদি কারণ (মুণ্ডক, ১, ১, ৬) এবং অবিনাশী বন্দনীয় সেই বস্তু অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র। (বৃহ. আ, ৩, ৮, ৮) অথচ ইহারই আজ্ঞায় বিশ্বচরাচর ধৃত হয় চক্ষু দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোক-ভূলোক, সর্ব্বকাল বিধৃত। (বৃহ আ, ৩, ৮, ৯)

সেখানে চক্ষু, বাক্, মন কিছুই পৌঁছিতে পারে না, জ্ঞাত অজ্ঞাত সর্ব্ববিধ বস্তুরই তিনি অজ্ঞাত। (কেন, ১, ৩)

আবার এই তাঁহার করণ বা কার্য্য কিছুই নাই, অথচ বিচিত্র ও বহুধা তাঁহার শক্তি, স্বাভাবিক তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ (শ্বেত, ৬, ৮)

তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য, অগন্ধবৎ, অনাদি, অনন্ত, তিনি মহতেরও পর, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি। (কঠ ১, ৩, ১৫)

এবংবিধ আত্মাকে "নেতি নেতি" ছাড়া আর কেমন করিয়া বুঝান যায়? (বৃহ, ৪, ৪, ২২)

এই "নেতি"ই ক্রমে "নিরঞ্জন," "নির্ব্বাণ" প্রভৃতি নানা ভাবে রূপান্তরিত হইল। বৌদ্ধদের তো মূল কথাই হইয়া দাঁড়াইল, অনিত্যত্ব, অনাত্মত্ব ও নির্ব্বাণে সর্ব্ব শান্তি। ইহাদের মধ্যে শূন্যভাবাদ যে কেমন করিয়া ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল সে বিষয়ে অনেকে গভীর ভাবে

আলোচনা করিয়াছেন, কাজেই এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নাই। মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি এই মতো পরিপূর্ণ। মহাকবি অশ্বঘোষ এই তত্ত্ব তাঁর কাব্যের ভাষায় চমৎকার ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং মহাজ্ঞানী নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিক দর্শনে এই "শূন্য" তত্ত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে "শূন্য" যে একটা "নাই"-বস্তুও নয়, তাহা বুঝিতে পারি যখন দেখি নাগার্জুনের শূন্য সংজ্ঞা—"অস্তি নাস্তি তদুভয়াদুভয় চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যরূপম্।" অর্থাৎ এই শূন্য না-অস্তি, না-নাস্তি, না তদুভয়, না তদনুভয়।

কাজেই দেখা যায় যে এই শূন্য একটা অভাব বস্তু নয়। বরং এই শূন্যতা আছে বলিয়াই সব কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে।

সর্বং চ যুজ্যতে তস্য শূন্যতা যস্য যুজ্যতে।
সর্বং ন যুজ্যতে তস্য শূন্যং যস্য ন যুজ্যতে।
(নাগার্জুন, মাধ্যমিক বৃত্ত, ২৪ পরিচ্ছেদ)

মহাযুগের সাধকরা এই তত্ত্বটি চমৎকার করিয়া তাঁহাদের বাণীতে বুঝাইয়া দেন :—সবই অনিত্য, সদা পরিবর্তনশীল, তাই শূন্য। এই শূন্যই সত্য, ইহাই পরমার্থ।

আর্যদেবও এই শূন্যবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যোগাচারবাদী অথবা বজ্রযানবাদী কেহই শূন্যবাদ ছাড়া কথা বলেন নাই। মৈত্রেয়নাথ অসঙ্গ প্রভৃতি যোগাচারী। অসঙ্গের পরমার্থলক্ষণ তো নাগার্জুনেরই শূন্যতা, কারণ তাহাও—

ন সৎ নাসৎ ন তথা ন চান্যথা
(মহাযান সূত্রালঙ্কার, ৬ষ্ঠ অধিকার, পারমার্থ লক্ষণ, ১)

মৈত্রেয়নাথ বলেন শূন্যতা হইল ধর্মতা; তাহা সৎও বটে অসৎও বটে। তাহার মধ্যে গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব-দৃশ্যত্ব প্রভৃতি দ্বৈত নাই। অন্য কথায় মৈত্রেয়নাথ তাঁহার কারিকায় বলেন—

অনুভবপরিকল্পোপি যদি তত্র ন বিদ্যতে।
শূন্যতা বিদ্যতে তত্র তত্ত্বাদপি ন বিদ্যতে।

স্থিরমতি বলেন, উহা সৎ অসৎ উভয়ই, "যৎ শূন্যং যেন শূন্যমসৎ।"

এখানে মহাযান সূত্রালঙ্কারের এই শ্লোকটিও দর্শনীয়।

অভাব শূন্যতাং জ্ঞাত্বা ভাবাভাবস্য শূন্যতাং।
প্রকৃত্যা শূন্যতাং জ্ঞাত্বা শূন্যজ্ঞ ইতি কথ্যতে॥ (১১, ৩৪)

একাদশ শতাব্দীতে নড়দিয়া গুরু অদ্বয়বজ্রও প্রচার করেন যে শূন্যতত্ত্ব,

ন সন্নাপি চাসন্নাপি চাসদসদাত্মকম্।

তাঁহাদের মতে এই শূন্যতাই "বজ্রমুচ্যতে"। ইহাই বজ্র, এই বজ্র—

ন সারফল্গু নৈরাত্ম্যজ্ঞানাভেদলক্ষণম্
অনাদি আদিবাদিত্ব শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে।

এই সব মতবাদ পরে নানা ভাবে তন্ত্রে, শৈবদর্শনে, শাঙ্কর বেদান্তে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এখানে তাহার আলোচনা করা সম্ভব নয়।

গায়ত্রীতন্ত্রে দেখিতে পাই—

বিনা জ্ঞাসং মহেশানি প্রাণায়ামং বিনা তথা।
শূন্যং শূন্যস্য মাত্রেণ সর্বং ত্যক্তি পবিত্রতাম্। (১ম পটল)

অর্থাৎ হে মহাদেবী, ন্যাস প্রাণায়াম কিছু না করিয়াও যদি শূন্যের পূজা মাত্র করে তবে সবই পবিত্র হইয়া যায়।

কামধেনুতন্ত্রে বলা হইয়াছে, নিরঞ্জন শূন্যরূপ সেই জ্ঞান,—

পরাৎ পরং পরঃ পরং শূন্যরূপং নিরঞ্জনম্।
কোটি সূর্যপ্রতীকাশং নির্মলং জ্ঞানমুত্তমম্। (১১শ পটল)

এই শূন্য যে একটা 'নাই'-বস্তু নয় তাহা বুঝা যায় যখন দেখি এই শূন্যকেই জপ করিতে হইবে। এই শূন্য জ্যোতির্ময়।

তচ্চত্ত্ব প্রজপেৎ শূন্যং।
শূন্যং জ্যোতির্ময়ং চ॥ (২১শ পটল)

বৃহন্নীলতন্ত্রে আছে দীপক নয় ছাড়া শূন্য অর্চনা করিতে নাই,—

বিনা দীপক যন্ত্রেণ অগ্রে শূন্যং ন চার্চয়েৎ। (৪র্থ পটল)

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন, "পরমাত্মাই হন শূন্য, মন সেখানে হয় বিলীন।"

পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যং তত্র মনো যত্র বিলীয়তে।

গন্ধর্বতন্ত্রে আছে, 'ব্রহ্মণোব মনো লয়ঃ', "ব্রহ্মের মধ্যেই মন লয় হয়, (৩৮ পটল)।" কাজেই শূন্য ব্রহ্ম সমান।

আবার শূন্য ধাতুই প্রাণ। "শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ॥" (জ্ঞান সঙ্কলিনী, ৩৩,৩৪) শূন্যতে মন ডুবিলেই তাহা ধ্যান, অন্য ধ্যান ধ্যানই নয়।

ন ধ্যানং ধ্যান মিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যতয়া ভবেৎ। (ঐ ৫২)

কাজেই দেখা যাইতেছে শূন্যই সর্ব চিরন্তন মহা আধার, মহাপ্রাণ।

মহাদেব বলেন, আদি শূন্য সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন—

অহং ব্রহ্মোস্মহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনম্। ঐ, ৮৪

গুরুগীতায় বলেন, লয় কর্ম্মে শূন্যে শূন্যের লয় করিতে হইবে—

শাম্ভবে শাম্ভবালাপ লয়ং কার্য্যং সমাধিনা।
মনস্তু চরণো লয়ং কার্য্যং শূন্যে শূন্যস্য যৌ লয়। (গুরুগীতা ৫৬ শ্লোক)

কুলার্ণবতন্ত্রে যোগ যোগীর লক্ষণ প্রকরণে দেখিতে পাই যে সমাধি হইল রূপশূন্য ধ্যান।

রূপালোক রহিতং সমাধিরভিধীয়তে। (কুলার্ণব তন্ত্র, ৯ম পটল।)

শারদাতিলকে পর-শিবকেই শূন্য বলা হইয়াছে,

চিৎকলাদিবিভেদেন পরশিবে তৈরেক মাত্রাত্মকে
শূন্যে কল্পনয়ৈব ভিন্নমখিলং নীতে বিলাসক্রমে। ইত্যাদি
(শারদাতিলক, ২য় পটল, ৮১।)

এইরূপ তন্ত্রে আরও বহু বহু স্থলে "শূন্যের" দেখা পাই।

আদি তান্ত্রিকেরা মনে করিতেন শূন্যই মন্ত্র, শূন্যই দেবতা। দেবতারা শূন্যেরই স্ফূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তি।

এই শূন্য সর্ব্বব্যাপী নিরাকার অরূপ নিরঞ্জন। বাংলা দেশে এই শূন্যপূজা ধর্ম্মপূজার সঙ্গে একেবারে গভীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। ধর্ম্মপূজা শূন্যপুরাণ প্রভৃতি তাহার সাক্ষী। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শূন্যপুরাণের উপক্রমণিকায় 'শূন্য' সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা দিয়াছেন।

শূন্যপুরাণের শূন্য হইলেন নিরাকার বিশ্বনাথ বরদাতা পরম দেবতা।

শূন্যরূপং নিরাকারং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
সর্ব্বসাক্ষী পরো দেবঃ তস্মাৎ ধর্ম্মো বরলো ভব।
(শূন্যপুরাণ, রামাই আবাহন)

হরিশ্চন্দ্র এই শূন্যের পূজা করিয়াছেন (শূন্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১১ পৃঃ, ১)। শূন্যের সরোবর ভক্তির জলে পূর্ণ হয় (ঐ, ১৭৭, ২-১০)। কবীর দাদূ প্রভৃতির মধ্যেও শূন্য সরোবরের কথা পাই তাহা পরে দেখান যাইবে। (দাদূ পরচা অঙ্গ ৬৪-৬৯)

এই শূন্যই নিরঞ্জন ও ধর্ম্মের সঙ্গে একাত্মা হইয়া গেলেন। সেই খবরটি ভাল করিয়া পাই আমরা বাংলা দেশের রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধানে। ধর্ম্মপূজাটা বিশেষভাবে বাংলা ও উৎকল দেশেরই সম্পত্তি, যদিও পশ্চিমেও যে তার কিছু সন্ধান না মেলে তা নয়।

নিরঞ্জন ধারা ধরিয়া শূন্য ক্রমে সহজের সঙ্গে একাত্মা হইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে আমরা রামানন্দ প্রবর্ত্তিত সাধনার যুগে শূন্যের দেখা পাই। কবীর, দাদূ, রজ্জব ও তাঁহার পরবর্ত্তী সব সাধকদের মধ্যে নানক ও শিখগুরুদের ভিতর এই ভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবেও শূন্যের দেখা পাই। তাঁহারা কেহই সাকার দেবতার ভজনা করেন নাই। তাঁহাদের কথা পরে হইবে।

বাংলা দেশে ধর্ম্মের সঙ্গে শূন্য গিয়া মিশিলেন। ধর্ম্মতো ক্রমে কোথাও শিব কোথাও বিষ্ণু নারায়ণ হরি হইয়া উঠিলেন। আকারও পরিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্মপূজাবিধানেই আর ভেটে প্রশ্ন দেখিতেছি—

বাড়ী কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।
কন্ মূর্ত্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ?

উত্তর হইল—

বাড়ী মোর অযুকায়। পূজি ই নৈরাকার।
শূন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি। সাকার মূর্ত্তি ভাঙি।
(ধর্ম্মপূজা বিধান, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৭)

ধর্ম্ম সন্ন্যাসীরা বলিতেছেন—

আমরা সঙ্গে (=শূন্যে) করি স্থিতি। (ঐ, ১৩১ পৃঃ)

ধর্ম্ম বলেন উল্লুক আমি সে কর্ত্তার। আমি সে কর্ম্ম।

মেরু পর্ব্বত আমি কোরিল ছিটা।
সূন্যে ফল আমার স্থিতা
সূন্যে আসি আমি সূন্যে যাই
সূন্যে ঘর কোরা আমি সূন্যতে বিয়াই।

ধ্যানটিও দেখিবার মত—

ওঁ নমোস্তে নাথিবর্ণায় নমঃ করুণায়ঃ নাথি করো বিনাদ*।
নাকারং নাহি রূপং ন চ ভয় মরণং নাহি জন্মের বন্ধ।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলসুরপতিং সর্ব্বলোকাধীনং
ভক্তৈকোপি নিরঞ্জনোমর বন্ধ। রবং) পাতু মাং পুরুষ্টিঃ।
(ঐ ৭০ পৃঃ)

আদিতে শূন্য ছাড়া আর তো কিছুই ছিল না

যেন রূপ সূর্য্য নাহি চিহ্ন আর
না ছিল কেন সঞ্চার।
যদ সুপনম্ না ছিল তখন্
নাহিক যোগ তিথি বার।

* এখানে "বিনাদ" যোগ হয় "নিনাদ" হইবে।

কোন রূপ না ছিল বসুধা
না ছিল বিশ্ব বহুধা।

সৃজন করি যাঁর সব ব্যবহার
সেই সৃজ সব মহ।
করি সৃজ যোগী হয়ে একা
সিরিজ নাহিক আর। ঐ পৃঃ ১১৯ ২০০।

তুলনীয়, অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈত্তিরীয়, ২, ৭, ১) (মৈত্রী ৫, ২ । নৈবেহ কিং চনাগ্র আসীৎ (বৃ, আ, উ, ১, ২, ১ ।। তদা তমসস্তু নিদা ন রাত্রি র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ (শ্বেতাশ্বতর, ৪, ১৮) নাস্ত নক্তং ন বা দিবা (৬২ স্মৃতি, ১)

সংস্কৃতে এই সব কথাই ধর্মপূজাবিধানের ধর্মাইকে দেখিতে পাই

ন প্রাণঃ ন মনঃ ন চন্দ্রার্কৌ
নেদং ন গগনং ন চ ধরণীঃ
সৃষ্টা ন সৃষ্টিঃ শূন্য ন মূর্তি
শূন্যে ধর্মের নিরঞ্জনে।

প্রভৃতি আটটি শ্লোকে আছে (১৬, ৩২, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬) । ঐ ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এইরূপ ভাবের কবিতা কবীর নানক প্রভৃতির মধ্যেও পাই। মালিক মহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতীতেও পাই। মধ্যযুগের বহু হিন্দী গ্রন্থেই এইরূপ বাণী মেলে।

আদিতে ছিল শূন্য আবার শূন্য হইতেই হইল সৃষ্টি। কারণ,

শূন্য ভাবি মনে আনিল বয়ানে
ছাড়িল এক হুঙ্কার।
হুঙ্কারের চোটে হৈল আদিভূতে
ত্রিশূন্য বাট সকার। ঐ, ২০০ পৃঃ।

তুলনীয়, ছান্দোগ্য ৬, ২, ৩ বৃ, আ, উ, ১, ২, ৪ ; ১, ৪, ৩ মৈত্রী ২, ৬।

যদিও শূন্যরূপী ধর্মকে নমস্কার করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—

নাস্তি স্কন্ধঃ নাস্তি বেদঃ নাস্তি কালো নিরঞ্জনঃ (নিরাকার ?)।
নাস্তি তত্র নাস্তি মূর্তি স্তত্রৈ নিরঞ্জন নমঃ। (ঐ, ৯০, ১৪৩)
সমস্তে শূন্য দেবেশ নিরঞ্জন নমোস্তুতে। (ঐ, ৮১, ৯৮)
শূন্য মূর্তি নিরঞ্জনং নিরঞ্জায় নমঃ। (ঐ, ৮৯, ৯৮)
সর্বস্বরূপিতঃ শূন্যরূপং বেদং নিরঞ্জনং। ঐ নমস্কার মন্ত্র
(ঐ, ৯১, ১৪৩)

তবু তিনি "নাই-বস্তু" নন। কারণ তিনি সর্বত্রস্থিত সত্য কারণ।

সর্বত্রস্থিতং কারণং শূন্যরূপিনিরঞ্জনং।
উদ্ধারায় নমঃ (ঐ, ১২, ১৪৭)

এমন কি শূন্যকায় হইলেও তিনি সর্বকামপ্রদ।

সর্বকামপ্রদং দেবং শূন্যকায়ং নমাম্যহং। (ঐ, ৭৪, ৫৩)

কাজেই ইহার পূজা না হইবে কেন ? তাই তাঁর রীতিমত আবাহন মন্ত্র আছে।

আগচ্ছ শূন্য দেবেশ সন্নিধিমি কুরু। (ঐ, ৭০, নিরঞ্জন পূজা ২)

ধর্মপূজাবিধানে শূন্যের আবার তিনটি স্বরূপ দেখি—

মহাশূন্যের নমঃ। পরম শূন্যায় নমঃ। নবীন শূন্যায় নমঃ। (ঐ, ৯১)

হাওড়ার পরচা অঙ্কে (৪৩) ঠিক এই কথাই দেখি।

তাহা পরে দেখান যাইবে।

ধর্মমঙ্গল গ্রন্থখানি বাংলা দেশে ধর্মপূজার একখানি প্রধান পুরাণ। ইহাতে ধর্মের বন্দনা দেখা যায়,—

শূন্য শূন্য সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন নিত্যানন্দ নিত্য বিধান।
(ইন্দ্রজিৎ, শুকলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশিত, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ২, পৃঃ ১৩৯)

সৃষ্টির আদিতে—

একএক সনাতন
নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য বিধান শূন্যময়। (ঐ, পৃঃ ৬)

তার পরে তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা হইল।

শূন্য ভরে সনাতন
মনে ভাবেন ত্রিভুবন
সৃজন পালন কতিদিন।

তাঁর স্তবে দেখি—

তুমি হে অনাদি ধর্ম
পরাৎপর পরব্রহ্ম (ঐ, ১২৩)
তুমি সে সংসারের শূন্য সত্তা নির্গুণ।
অনাদি অন্ত তুমি নিরাকার ধর্ম। (ঐ, ২৪৩)

তিনিই পরম সত্য

সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম সত্য হয় (ঐ, ১০১)

তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্বাণ লাভ হয়—

নির্বাণ পেয়েছে ঘোষ তুয়া পদ সেবি। (ঐ, ২৪২)
নির্বাণ হইল পুন প্রভুপদতলে। (ঐ, ২৪৩)

এই ধর্মই নিরঞ্জন, ইনিই হরি, ইনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর নানা অবতারের নানা লীলা দিয়া এই ধর্মেরই স্তব করা হইয়াছে। (ঐ, পৃঃ ১১২, ১২৫, ১৩৮, ১৫১, ১৫৭, ২৭৪)।

তিনি নারায়ণ, রূপ ধরিয়া ভক্তকে রক্ষা করিতে আসেন, তিনি "গোলোকবাসী", "পাতরসারথী"। (ঐ, পৃঃ ২০৩, ২০৪)

তিনিই ভক্তের অনুরোধে আত্মরূপ দেখাইলেন—

চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী।

পীতাম্বর পরিধান পদ্মদল লোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল ঝুলে কৌস্তুভ ভূষণ। (ঐ, ৩১৮)

ধর্মশিলাকে ময়ূরভট্ট তাঁর ধর্মমঙ্গলে বিষ্ণুশিলাই বলিয়াছেন।

নিরাঞ্জনে ভবে বিষ্ণু উদ্ভব ভবে।

মাণিক গাঙ্গুলী পাকা বৈষ্ণবের মতই ধর্মকে গোবিন্দ গোপীনাথ গোপাল পদাম্বরই বলিয়াছেন। লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করেন (মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল ২৭।১২) বৈকুণ্ঠে তাঁর নিবাস (ঐ ৪৪।৭৮), কৈলাসেও তিনি থাকেন।

কাজেই ধর্মের সেবক লাউসেনকে ঘনরাম বৈষ্ণবই বলিয়াছেন।

বিশেষ বৈষ্ণব বাঙ্গা মোর প্রিয় অতি। (ঘনরাম ২১৭)

বিষ্ণু ও সূর্য্য পরস্পর যুক্ত। কাজেই ধর্মপূজাবিধানে সূর্য্যের পূজা দেখিতে পাই (পৃঃ ৫১-৫৩)। তেমন তো ধর্মপূজাবিধানে তখনকার দিনে প্রচলিত সকল দেবতার পূজাই দেখিতে পাই। কিন্তু সূর্য্যকেও ধর্মপূজাবিধানে শূন্যরূপ বলা হইয়াছে।

মণ্ডলং সর্ব্বলোকায় শূন্য দেহং মহাকায়ং।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহং।
(ঐ ৫৭, পৃ ৫)

ধর্মপূজায় শিবকেও বলা হইয়াছে শূন্য নিরঞ্জন। কাজেই তাঁর স্তব দেখি—

শূন্য নিরঞ্জন উর্দ্ধমুখ
প্রণমামি সদাশিব পাশহর। (ধর্মপূজাবিধান, ৩০, ১৭)

কৈলাসেও তাঁর আবাসের কথা মাণিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গলে দেখি—

ধর্মই সকল দেবতার উপরে দেবতা। তাঁর সভায় হরি হর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বিরাজিত (ঐ, পৃঃ ১৬১) এবং হনুমান তাঁর নিত্য আজ্ঞাবহ কিঙ্কর।

এই শূন্যই নাথপন্থ নিরঞ্জনপন্থ হইতে নানা সাধক সম্প্রদায়ে ছড়াইয়া পড়িল। মধ্য যুগের মরমীরা এই শূন্যকে তাঁহাদের মত করিয়া বুঝিয়া লইলেন। শূন্য যেমন নানা প্রতিমায় ও দেবমূর্ত্তিতে পূজা পাইতে লাগিলেন তেমনি শূন্য ধ্যানী ও মরমীদেরও গভীর তত্ত্ব হইয়া উঠিলেন। এই শূন্যের সঙ্গে সহজ, সমরস, এক রস প্রভৃতি নানা তত্ত্ব তাঁহারা নিজের নিজের ভাবে গ্রহণ করিলেন।

নাথপন্থের কথা এখানে বিশেষভাবে বলিবার অবসর নাই। গোরক্ষনাথ যে শূন্য তত্ত্বের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন তাহা নাথতত্ত্ববিদেরা সকলেই জানেন। তাঁহার অপ্রকাশিত বাণী হইতে অনেক কিছু দেওয়া যাইত কিন্তু তাহা না দিয়া তাঁহার প্রকাশিত বাণীগুলিই দেখা যাউক।

গোরক্ষের নিজ কথা হইতে পরে রচনে গোরক্ষ সংহিতার অনেকখানি বেশী সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে তবু তাহা হইতে কিছু দেখা যাউক। গোরক্ষ সংহিতা বলেন, অবধূত সমরস পূর্ণ হইয়া শূন্য মন্দিরে আনন্দে বিহার করেন।

পূর্ণোদয়ং সমরসপূর্ণং।
চিদাকাশং সুখময়ং।
"এই বিশ্ব সর্ব্বশূন্য অথচ অপূর্ণ।"
সর্ব্বশূন্যমপূর্ণং—ইত্যাদি

যোগীর মুখে আত্মা বলেন,

"আমি শূন্য-রূপও নই বিশূন্য-রূপও নই।"
ন শূন্যরূপং ন বিশূন্যরূপং। ৫, ১৮৭

সেই প্রকরণেই ৫৫, ৭৮, ১২৭, ২১৮, ২৭১ শ্লোকে এই শূন্য বিশূন্যের কথা।

সেখ ফয়জুল্লা রচিত গোরক্ষবিজয়ে শূন্য মন্ত্রের কথা আছে। শূন্য মন্ত্র, শূন্য জ্ঞান সাধকদের সাধনার ধন।

শূন্যমন্ত্র জপাইয়া পালল করিব। (ঐ, গোরক্ষবিজয়, ১২৬ পৃঃ)

শূন্যজ্ঞানের কথাও এই গোরক্ষবিজয়ে পাই।

পালল করিল গোর্খ[নিজ] শূন্য জ্ঞানে (=জ্ঞানে)
(ঐ, গোরক্ষবিজয়, ১৬১ পৃঃ)

এইখানেই সাধকদের শূন্যবাদ।

আবদুল করিমের "গোরক্ষবিজয়ে" দেখি—

চক্রনা দিলেন্তা দুহ মাটীর ত বাকে।
সন্ধীতে ৭ ই লিলা ধরিক সহকে

এইখানেই তো সাধকদের সুরস্থান।

গোপীচন্দ্রের গানে অনেক স্থলেই ধর্মরাজকে শূন্যবাদ বলা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'উত্তর বঙ্গে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গান' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শূন্যাহে নিজের কুলি ঈশ্বর আনি দিল।
কুলিয়া ছিতর কড়ি শূন্যাহে নিল। (ঐ, ৭৮৫)
হেতেক বলিয়া সিদ্ধা শূন্যাহাকে ডাকিল (৭৯৭)

ধর্মকে শূন্যও বলা হইয়াছে।

শূন্যাইকে ছিল পুত্র নাম্বাতে ধাইল। (ঐ, ৪৮৭)

যেখানে যেখানে ধর্মপূজার প্রাদুর্ভাব সেখানেই শূন্যের প্রতিষ্ঠা। উড়িষ্যাতে মহাদেব দাসের ধর্মপীতা নাম গ্রন্থ। তাহাতে আছে অসীম মহাশূন্যের মধ্যে শূন্য পুরুষ ছিলেন বিরাজিত। তিনি নির্গুণ মহাশূন্য মূর্তি। তিনি সগুণ হইয়া হইলেন ধর্ম। তাঁহা হইতে হইলেন আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি হইলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের জননী।

বলরাম দাসের ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল গীতার সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায় আদিতে চন্দ্র সূর্য দিবা রাত্রি সংসার কিছুই ছিলনা। তখন পরমেশ্বরের ছিল শূন্যরূপ।

"সে কালে শূন্য মোর রূপ"
"কেহি ন ছিলে হে ধর্মরূপ
মহাশূন্য রূপ মোর তত্ত্ব।"

অর্জুনও বলিতেছেন,—

"তোহর রূপ কেহ নহী।
শূন্য পুরুষ শূন্য দেহী।"

বলরাম দাসের সারস্বত গীতার সৃষ্টিকর্তাকে "মহাশূন্য" বলা হইয়াছে।

অচ্যুত দাস কৃত শূন্যসংহিতার অনাদিসংহিতার ও অনাকারসংহিতায় দেখা যায়, পরমেশ্বর অনাকার, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজর, অনাদ্য, অক্ষয়। তিনি শূন্য।

(ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, শূন্যপুরাণ, ভূমিকা ১০৮-৯)

মধ্য যুগে-উত্তর ভারতে রামানন্দ প্রভৃতির সময়ে এই শূন্যবাদ সহজযানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আসিল। গুরুদেব রামানন্দ প্রভৃতি সহজেরই উপাসক ছিলেন। গুরুদেবের "গীতগোবিন্দই সকলে জানেন কিন্তু গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি মধ্যযুগের ভক্তদের সংগ্রহগ্রন্থ দেখিলে তাঁহার এমন একটি পরিচয় পাই যাহা একেবারে ভিন্নরূপ। সেখানে ভগবানের কথায় তিনি বলিতেছেন, রূপ নেই।

পরমাল্লিঙ্গে মনোজিবং মতি আদি জাবয়ঃ।
পরমদুঃ পরিস্থিতি পাং জদি চিংতি পরমপদং।

অনুপম সত্য আদিভাবরত পরম অপূর্ব প্রকৃতির অতীত অচিন্ত্য সর্বগত সেই পরম আদি পুরুষকে।

(রাগ গুজরী, জৈদেব ভীইকা পদ, মা ৪
গ্রন্থসাহেব, রাগ তারন (বোড় সিংহ মুদ্রিত, পৃঃ ২৮৫)

জয়দেব বলিতেছেন তোমার সঙ্গে আমার দিব্যদৃষ্টি ঘুচিয়া গিয়াছে—

তেরী মুখিমা সুধাকর দর্শনে মা—

জয়দেব বলেন, "তোমাতে মন লীন হইয়া ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করিয়াছে।"

যতি মৈ যেই...ব্রহ্মনিবন্ধনু নিব্বাণু পাইআ

(গ্রন্থ সাহেব, ঐ, পৃঃ ৪৯৮ রামকলি)

রামানন্দও দেখিতেছি বলিতেছেন,—বল্ কোথায় যে আর যাইব? ঘরেই যে লাগিল রঙ্গ। আমার চিত্ত তো আর চলে না, মন হইল নিশ্চল। একদিন মন হইল উচ্ছ্বসিত (সে দিন) চন্দন চুয়া ও বহু সুগন্ধ ঘসিয়া ব্রহ্মমন্দিরে চলিলাম তাহাকে পূজা করিতে। গুরু বাতাইয়া দিলেন সেই ব্রহ্ম আমার মনেরই মধ্যে। যেখানেই যাই সেখানেই দেখা যায় শুধু জল ও পাষাণ, কিন্তু তুমি সবই আছ সমান ভাবে পূর্ণ করিয়া। বেদ পুরাণ সবই দেখিলাম খুঁজিয়া। তিনি যদি এখানে না থাকেন তবে না হয় যাও সেখানে। হে সত্য গুরু, আমি যাই তোমার বলিহারী! তুমি আমার সকল ভ্রমবৈকল্য করিলে ছিন্ন। রামানন্দ রত আছে স্বামী ব্রহ্মতে। গুরুর শব্দ কোটি কর্মকে দিল কাটিয়া।

কত জাই ঐ রে ঘর লাগো রংগ।
যোঁ চিত্ত ন চলে মন ভই উমংগ।
এক দিবস মন ভই উমংগ।
ঘসি চংদন চোআ বহু সুগংধ।
পূজন চালী ব্রহ্ম ঠাঁই।
সো ব্রহ্ম বতাইও গুর জহী তাঁই।

তথা ভাই ঐ তত্ত্ব তল পাথান।
তু পুছি রহিও সত সমান।
কে পুরান সত দেখে সোই।
ইথা তই ভাই ঐ তই ঐথা ন হোই।
সহি গুরু মৈঁ বলিহারী তোর।
যিনি সকল বিকল ভ্রম কাটে মোর।
রামানন্দ সুখময়ী রহ সহজ।
ওহলা সবহু কাটে কোটি কলুষ।

(ঐ, প্রবন্ধাবলীর পৃঃ ৩১৬ হইতে উদ্ধৃত)

জয়দেবের ও রামানন্দের এই সব সহজ বাণী। সহজ ও শূন্য পরস্পর যুক্ত। রামানন্দের শূন্য-সম্বন্ধেও বাণী আছে। কিন্তু তাহা প্রচারিত কোনো পুস্তকে না থাকায় এখন এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। সেই শূন্য সন্ধান করিব আমরা তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য কবীরের বাণীতে।

কবীরের বাণীতে শূন্য ও সহজ পরস্পর যুক্ত। কবীরের বহু গ্রন্থ ও বহু বাণী। সাগরবৎ তাহার বিস্তার। তাহা ছাড়া সাধুদের কাছেও কবীরের অনন্ত ভাণ্ডার। কাজেই কবীরের সব শূন্য ও সহজ তত্ত্ব বলিতে গেলে একখানা বড় পুঁথী হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে কিছু দিন পূর্বে (১৯২৮) যে কবীর-গ্রন্থাবলী বাহির হইয়াছে তাহা হইতেই কয়েকটি মাত্র স্থান উদ্ধৃত করা যাউক।

একস্থানে সৃষ্টির আদিতে কি ছিল তাহাই প্রশ্ন করা হইয়াছে।

প্রথমে কথন কি পুরুষী প্রথমে প্রভু, প্রথমে পবন কি পানী
প্রথমে চন্দ কি সূর প্রথমে প্রভু প্রথমে কৌন বিনানী।
প্রথমে প্রাণ কি পাণ্ড প্রথমে প্রভু, প্রথমে হকত কি বেতং।
প্রথমে পুরিষ কি নারী প্রথমে প্রভু, প্রথমে বীজ কি বেতং।
প্রথমে দিবস কি রৈনী প্রথমে প্রভু, প্রথমে পাপ কি পুন্ন।
কহৈ কবীর জহাঁ সকল নিরংজন, তহাঁ কুছ আদি কি সুন্ন।

(কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী, পদাবলী ১৯১)

ইহার বাংলা অনুবাদ না করিয়া বাংলা দেশে যোগীদের মধ্যে যে গোপীচাঁদের গুরু পূজা আছে তাহাই বলাইয়া দেওয়া যাউক। গোপীচাঁদের কথা অতি প্রাচীন। কবীরও তাঁর লেখার মধ্যে বহু স্থানে গোপীচাঁদের নাম করিয়াছেন।

প্রথমে পবন কি ভূমি প্রথমে প্রভু, প্রথমে পবন কি পানী।
প্রথমে সূর কি চন্দ প্রথমে প্রভু, প্রথমে রাত কি পানী।
প্রথমে প্রাণ কি পিণ্ড প্রথমে প্রভু, প্রথমে রক্ত কি বেতং।
প্রথমে পুরুষ কি নারী প্রথমে প্রভু, প্রথমে বীজ কি বেতং।
প্রথমে দিবস কি রজনী প্রথমে প্রভু প্রথমে পাপ কি পুন্ন।
কে অনেক কি আদি অনাদি গুরু, তাহাত সুন্ন কি সুন্ন।

(গোপীচাঁদের গুরুপূজা)

যে শূন্য শুধু "না-বস্তু" মাত্র তাহাকে কবীর মানিতে পারেন নাই। তাই কবীর বলিতেছেন, "ভগবানকে ছাড়া শূন্যে প্রেম করিয়া আপনাকে যেন সাধক হারাইয়া।"

তুঁহি সকেরী ছাড় বিন পরম অসন সো খোই।

(কবীর, ষষ্ঠ শতী হজারী, পৃঃ ২৫১)

কবীর বলেন, জাতি আবার কিসের? "জল ও পবন সংযোগ করিয়া, করা হইল উৎপন্ন; শূন্যের মধ্যে ভরিয়া দিল শব্দ, তবে কাহাকে আবার বলিবে জাতি?"

পাঁনী পবন সংযোগ করি, কীয়া ছৈ উতপাতি।
তুঁহি মৈঁ সবদ সমাইলা, তব কবলনি কহিয়ে জাতি।

(কবীর গ্রন্থাবলী হজারী, পৃঃ ২৫৯)

দেহতত্ত্বের মতে অন্তরে যে গগনস্থান তাহাকে কবীর শূন্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেখানেই অনাহত ধ্বনিত।

"গগন গরজি মন তুঁহি লগানা। তাকে আরন তুর ন।

(কবীর গ্রন্থাবলী, পরচালী, ৭ পদ)

গঙ্গা যমুনা জলস্রোতেই মধ্যে, সহজ শূন্য ধ্যানের সেই ঘাটে।

গংগ জমুন উর অংতরৈ, সহজ সুঁনি সো ঘাট।

(ঐ, সৈ কৌ অংগ, ৩)

"সহজ শূন্য এমন এক বৃক্ষ যে ধরিত্রী জলধি সব শুকাইল টানিয়া।"

সহজ সুন্ন ইক বিরখ উপজা ধরতী জলহর সোখা।

(ঐ পরিশিষ্ট পদ, ১০৮)

"সীমার পারে যেখানে অসীম সেখানে শূন্যের স্থান।" সীমা ছাড়িয়া গেলাম অসীমে, শূন্যে করিলাম আস্তানা।"

হদ ছাড়ি বেহদ গয়া কিয়া সুন্নি অসথান

(ঐ, গরুড়া কৌ অংগ, ১১)

এখানে ছাপা আছে "অসনান" কিন্তু সাধারণতঃ পাঠ "অসথান।" "অসনান" হইলে অর্থ হইবে "শূন্যে করিলাম অবগাহন।"

শূন্য মণ্ডল দেখা যাইতেছে শূন্যময়। ইহার মধ্যেই "মনের মানুষ" বিরাজমান। "শূন্যমণ্ডলে বিরাজমান এক পুরুষ, তাহাতে রহে প্রাণ শূন্য হইয়া।"

তুমি মাতৃল মৈঁ তুমি ভাগি, তাহি ভয় নেহী লাগি।

(ঐ, গুরু শিষ্য ভেদ কৌ অংগ ৭)

"দ্বাদশ দলের কমল মধ্যে এই শূন্যমণ্ডল দীপ্যমান করিয়া শ্রীকমলাকান্ত বিরাজমান।"

ঘটকল দল অন্তরতর ঘাটে। অন্ত পৌরুষ শ্রী কমলাকান্ত।

আদ্য ইন্দ্র মুখ লগো বাস। শূন্য মাহল রহি করি পরকাশ।

(পরিশিষ্ট পদাবলী, ১০)

"এই শূন্য মণ্ডলেই যাকে মনের মানুষ, সেখানে নাচে আমার মন।"

তুঁহি মাহল মৈ মনকা বাউর, তহাঁ মেরা মন নাচৈ।

(ঐ, পদাবলী, ৭২)

এই শূন্য শুধু শীতবাতে ভরপুর নয়। সদ্‌গুরুর কাছে যদি সন্ধান মেলে তবে এই সহজ শূন্যেই মেলে পরম রসের সম্ভোগ। "যে জন রাখিয়াছে সহজ শূন্যের রস, সে সদ্‌গুরু হইতেই তাহার সন্ধান পাইয়াছে।"

সদগুরু তুঁহি মৈঁ তিনি রস চাখা। সহজৈ মৈ সুখি পাই।

(ঐ, পদাবলী, ৭৪)

"রসের সেচনে যেন সিক্ত রহা যায় তাই শূন্য মণ্ডলে করিয়াছি ঘর।"

তুঁহি মাহল মৈঁ ঘর কিয়া, ঐসে রহ্যা সিচাঁনী।

(ঐ, পদাবলী, ১০৫)

সত্যকার যোগী হইতে হইলে বাহিরের গুহায় বাস করিলে হইবে না। অন্তরের "শূন্য গুহার মধ্যে আসন বৈসন করিতে হইবে। কল্পনা বিবর্জিত সত্য পথ ধরিতে হইবে।" কাজেই শূন্য এমন একটি সত্য পথ যেখানে মিথ্যা কল্পনার স্থান নাই।

সব ভ্রমা মরি আসন বৈসন ঘর বিবর্জিত পংথ।

(ঐ পরিশিষ্ট পদাবলী, ২১০)

তখনই এই জনম সার্থক, যখন বলিতে পারি "ভ্রম মরণের ভয় গিয়াছে ভাগিয়া, ভগবানের সঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে যুক্ত। জীবন্তই শূন্যে হইয়াছি ভরপুর অনুপ্রবিষ্ট, গুরুর বাণী (সাক্ষ্য) হইয়াছে আয়ত্ত।"

ভয় মরণ ভা ভ্রম গয়া খোজিত দিং নাথী।

জীবত সুন্নি সমানিয়া গুর সাখী জাগী।

(ঐ, পরিশিষ্ট পদাবলী, ৭০)

"কবীর কহেন এমন ভাবে গুণ ব্রহ্ম যখন জাগে, তখনই মন শূন্যে হয় ভরপুর।"

কহ কবীর ঐসা গুণ ব্রহ্ম জাগা তৌ মন সুন্ন সমানা।

(ঐ, পরিশিষ্ট পদাবলী, ৮০)

সাধকের মনে চিরদিন এই বাসনা যে "সমদর্শী হইয়া শূন্যে শূন্য হইয়া মিলিয়া আমি পবনরূপ হইয়া যাইব।"

সমদরশী হুয়ি মিলা সমনী পবন রূপ হোই জাউ হিঁ সেলা।

(ঐ, পরিশিষ্ট পদ, ২৪)

কেন শূন্যে শূন্য হইয়া মিলিতে যাই? না হইলে যে সত্য শান্তি সত্য নির্ব্বাণ নাই। "বাঁচিলে মরে, মরিলে আবার বাঁচে। তাই তো শূন্যে হইলাম ভরপুর প্রবিষ্ট।"

জীবত মরৈ মরে তুমি জীবৈ, ঐসে সুন্নি সমাহা।

(ঐ, পরিশিষ্ট পদ ২১)

"হে শূন্য তুমিই দেবদেব, তোমারেই করি সন্ধ্যারতি। সমাধি করিয়াও সিদ্ধরা পান না তোমার অন্ত।

হে শূন্যম নিরঞ্জন তব আরতি।...

কবীর দাস নিরাকার নির্বাণী করিল তোমার আরতি।

শূন্য সমাধ তেরী সেব দেবা করি

সিদ্ধ সমাধি অংত নহীঁ পারা...

সেহ আরতি হো শূন্যম নিরংজন.....

কবীর দাস তেরী আরতী কীনী নিরংজন নিরবাণী।

(ঐ, পরিশিষ্ট পদাবলী, ২১০)

দাদূ হইলেন কবীরের একজন মহাশিষ্য, যদিও তিনি কবীরের বহু পরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪৪ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ তাঁর সময়। তিনি শূন্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। শূন্য যে শুধু একটা "না-বস্তু" তাহাতে তাঁহার মন কখনো সাড়া দেয় নাই। তাই তিনি বলেন, "কিছু না" বস্তু আবার কেমন নাম? ধরিতে গেলেই তাহা হইবে ঝুঠা।"

কুছ নহীঁ তা মাঁহি তা কে ধরিয়ে সো ঝুঠ

(দাদূ, সাচ অংগ, ১৪৪)

"কিছু না"র নাম ধরিয়াই ভ্রমিয়া মরিতেছে সব সংসার।

কুছ নাহীঁ কা নাঁব ধরি ভরমা সব সংসার।

(দাদূ, সাচ অঙ্গ, ১৪৬)

কিন্তু সাধকদের সাধনার ধন যে শূন্য তাহা তো এই "না-বস্তু" নয়। শূন্য সহজ নিরাকার নিরাধার পরম তত্ত্ব প্রভৃতি সহিত তিনি মানিতেন তাই বলিয়াছিলেন নিরাকার নিরাধার শূন্য সহজ লোকে পায় না দেখিতে।"

সূক্ষ্মি সহজ সো শূন্যই নিরাকার নির্ধার।

(দাদূ জেন কৌ অংগ, ৭৬)

তাই দাদূ বলেন, "যে সহজে মধ্যে রহে ও শূন্য ধ্যান করে, তাহাকে কখনো হারিতে হয় না।"

.....সহজৈঁ রহৈ অরু সূন্য ধিয়ায়ৈ।
কব হুঁ ন হারৈ।
(দাদূ, রাগ বিলাবল, পদ ৩১৯)

"সেই সহজ শূন্য সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব ঘটে সকলের মধ্যে বিরাজমান সেই খানেই তো নিরঞ্জনের চলিয়াছে বিহার, কোনো গুণই সেখানে পারে না ব্যাপিতে।"

সহজ সুনি সব ঠৌর হৈ সব ঘট দেখী মাঁহি।
তহাঁ নিরংজন চলি রহ্যা কোই লখৈ নাহিঁ।
(দাদূ, পচ্চা অংগ, ৫৩)

পরচা অংগ ৪৬ হইতে ৬৩ পর্য্যন্ত সহজ শূন্য সরোবরের কথা। তাহা পরম রসের আধার।

তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি স্থল উদ্ধৃত করা যাউক।

দাদূ তিস সরবর কে তীর চল কমল বিছলাইয়া।
তহঁ আদি নিরংজন পীব তব হমারে আইয়া।
(দাদূ, পচ্চা অংগ, ৩০)

সুখ সাগর সুভর ভরা উজল নির্মল নীর।
পীবে বিনা জীবৈ নহীঁ দাদূ দাসের তীর। (ঐ, ৩১)

"সেই সহজ শূন্য সরোবরের তীরে চরণকমলে আনিলাম চিত্ত; সেখানেই আদি নিরঞ্জন প্রিয়তম, আমার সৌভাগ্য স্বরূপ স্বামী সমাগত।"

"কী পূর্ণতায় ভরপুর সেই আনন্দ সাগর! উজ্জ্বল নির্ম্মল তার নীর; হে দাদূ, সাগরতীরে থাকিলেও বিনা পিপাসায় কেহ পারে না পান করিতে।"

সেই শূন্য সরোবরে আত্মার বিহারের কথা আছে পরচা অঙ্গে তাহার পরের ছয়টি শ্লোকে (৩৪-৩৯)। তার মধ্যে দেখি—

শূন্য সরোবর সহজকা, তহাঁ মনহীঁবা মন।
(পচ্চা অংগ, ৩৭)
শূন্য সরোবর জল ভর্যা তহাঁ কমল বিগসায়।
দাদূ পরিমল পীজিয়ে, সনমুখ সিরজনহার।
(পচ্চা অংগ, ৩৮)

"সহজের সেই শূন্য সরোবরে মনই হইল মুক্তাবেষী ডুবারী।"

"শূন্য সরোবরে মনই হইল ভ্রমর, করতার (কর্ত্তা) পরমেশ্বরই সেখানে কমল স্বরূপ; হে দাদূ, সেই পরিমল কর পান; অখিলসৃজন কর্ত্তা সেখানে তোমার সম্মুখে।"

শূন্যপুরাণেও আমরা দেখিতে পাই ভক্তির জলে পূর্ণ শূন্য সরোবর (শূন্য পুরাণ, ১২৭, ৯-১০)।

বাহ্য কোনো উপায়ে তো সেখানে পৌঁছান যায় না। তাই দাদূ বলেন, "বিনা চরণের এই পথ, কেমন করিয়া পৌঁছে তবে প্রাণ?"

দাদূ বিন পাইন কা পংথ হৈ
কেহাঁ করি পহুঁতে প্রাণ।
(দাদূ, বৈ কৌ অংগ ১০)

প্রশ্ন হইল, "কোন পথে সেখানে আসে, কোন পথে বা যায়?"

কি হিঁ মারগ হৈ আইবা কি হি মারগ হৈ জাই?
(বৈ কৌ অংগ, ১২)

উত্তর হইল, "শূন্য পথেই আসে শূন্য পথেই যায়।"

সুংনহি মারগ আইবা সুংনহি মারগ জাই।
(বৈ কৌ অংগ, ১৩)

এইরূপ প্রশ্নোত্তর বাংলা দেশের শূন্যপুরাণাদিতে আছে।

কহে আইলে কে যুক্তে যায়।
যুক্তে তার করা সন্ধানে দিয়ার।
(ধর্ম্মপূজা বিধান, ২১১ পৃঃ)

দাদূ বলেন, "সহজ প্রেমলয়ই হইল সার, পরব্রহ্ম দিলেন সেই পথ।"

পার ব্রহ্ম কৈঁ দিয়া সহজ সুরতি বৈ সার।
(বৈ কৌ অংগ, ১৭)

যোগ সমাধি ও প্রেমানন্দ এই দুইয়ের মাঝে সহজ শূন্যের মধ্যে মনকে হইবে রাখিতে।

সহজ সুনি মন রাখিবে ইন দুহুঁ কে মাঁহি।
(বৈ অংগ, ৯)

ধর্ম্মপূজাবিধানে মহাশূন্য, পরমশূন্য, অনীলশূন্যের কথা দেখি (ধর্ম্মপূজাবিধান, ৯৩ পৃষ্ঠা)। বাবুও কায়াশূন্য, আত্মশূন্য ও পরমশূন্য এই তিন শূন্যের কথা বলিয়াছেন। "কায়া শূন্যে পঞ্চের বাস, আত্মশূন্যে প্রাণ প্রকাশ, পরম শূন্যে ব্রহ্ম সহ মিলন।"

কায়া হুঁনি পাচ কা বাসা
আতম হুঁনি প্রাণ প্রকাশা
সহজ হুঁনি ব্রহ্ম সৌ জোতা।

(দাদূ পঞ্চা অংগ, ৫১)

আবার "ব্রহ্মশূন্যে নিরঞ্জন ব্রহ্মই বিরাজমান। দাদূ দেখিয়াছে, শুধু দীপ্তি তেজ ও জ্যোতি।"

ব্রহ্ম হুঁনি অই ব্রহ্ম হৈ নিরংজন নিরাকার।
নূর তেজ অই জোতি হৈ দাদূ দেখনহার।

(পঞ্চা অংগ, ১৩০)

পঞ্চা অংগ (১২৭-১৩০) চারিটি শ্লোকে বিভিন্ন শূন্যে কি থাকে দাদূ তাহার বিবরণ দিয়াছেন। এই অংগে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে দাদূ বলিতেছেন, "প্রথম তিনটি শূন্যই হইল আকার শ্লোকের, চতুর্থটি হইল নির্গুণ। সেই সহজ শূন্যে চলিতেছে আত্মার বিহার, যেখানে সেখানে সর্বত্র সব ঠাঁই সেই সহজ লোক।"

দাদূ তীনি হুঁনি আকারকী তীনী বিস্তর কহে।
সহজ হুঁনি সৌ হরি রূপ দূজা তহাঁ সব নাহিঁ।

(পঞ্চা অংগ, ৫০)

"হে দাদূ, যেখান হইতে চন্দ্র সূর্য আকাশ সব সৃষ্টিধারা উৎপন্নমান; যেখান হইতে জল পবন পাবক ধরিত্রীর হইল প্রকাশ: কাল করম জীব মায়া মন ঘট শ্বাস যেখানে হইতেছে উপস্থিত: সেখানে বিরাজমান সর্বশূন্য সর্বলীলাময় ভগবান, সেই সহজ শূন্য আছেন সবারই সঙ্গে।"

চন্দ সূরা জৈ উপজে চংদ সূর আকাস।
পাণী পবন পাবক ভিয়ে ধরতী কা পরকাস।
কাল করম জিব উপজে মায়া মন ঘট সাস।
তহঁ রহিতা রমিতা রাম হৈ সহজ সূনি সব পাস।

(পঞ্চা অংগ, ৪৪, ৪৫)

দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস ছিলেন মহাসাধক। তিনি বলিতেছেন, "এই শূন্য ধ্যানের সমান আর ধ্যান নাই, সব ধ্যানের মধ্যেই ইহাই উৎকৃষ্ট ধ্যান।"

ইহি শূন্য ধ্যান সম ঔর নাহিঁ।
উৎকৃষ্ট ধ্যান সব ধ্যান মাহিঁ।

(সুন্দরদাস, জ্ঞানসমুদ্র গ্রন্থ ৮০)

"গুরুর প্রসাদে এই শূন্যতেই আমার সমাধি।"

গুরুকে প্রসাদ শূন্য মে সমাধি লাইয়ে। (ঐ, ১২)

দাদূর শিষ্যদের মধ্যে রজ্জব যেমন গভীর সাধক তেমনি ভাবে গভীর। তিনি প্রথমেই বলিলেন, "নাস্তি তত্ত্ব হইতে" বাহির হয় উদয়, "অস্তি তত্ত্ব" হইতেই হয় সব "অস্তি-বস্তু।"

নাহিঁ সূন্যাহি উদে হৈ সো হৈ সব রোপ।

(রজ্জবজী, বিরহি অংগ, ২১)

তবে শূন্যের সার্থকতা কি? শূন্য না হইলে প্রাণের অবকাশ থাকিত না। এই যে এত বড় আকাশ শূন্য বলিয়াই ইহাতে সব জীবন্ত সৃষ্টি আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা নিরেট হইলে সবই হইত মৃত স্তূপ। তাই গুরুকে হইতে হইবে শূন্য সমান। নহিলে তাঁহার নিরেট ভার সকলকে পিষিয়া মারিবে। আত্মা, পরব্রহ্ম এই জন্যই শূন্য। বাংলার বাউল-মতও ঠিক এইরূপ। রজ্জব বলেন, "সদ্‌গুরু হইলেন শূন্য সমান, শিষ্য হইলেন তার মধ্যে (যুক্ত) মেঘস্বরূপ।"

সদগুরু শূন্য সমান হৈ শিষ রহে তিন মাহিঁ।

(রজ্জব, গুরুদেব অংগ, ৫৩)

তাই আত্মা শূন্য-সমান।

আতম শূন্য সমান হৈ। (ঐ, মধি মার্গ নিজ স্থান নির্ণয় অংগ, ২১)

তিনি "শূন্য স্বরূপ, অকল অবিনাশী পঞ্চতত্ত্বাত্মিকা, কায়া তাঁর নাই।"

শূন্য স্বরূপ অকল অবিনাশি পংচতত্ত্ব নহিঁ কায়া।

(রাঘবদাসকৃত, ৩০, ২)

"সেই শূন্য স্বরূপ পঞ্চতত্ত্বে সমাহিত, আবার পঞ্চতত্ত্ব হইতে মুক্ত।"

শূন্য সমাধী পাংচসে পুনি পংচো সু মুক্ত

(ঐ সাখীভূত অংগ, ৮)

"এক সেই স্বামী আর শূন্যের আদি অন্ত মধ্য নাই।"

ইক সাঁই অক শূন্য কৈ আদি অংত মধ্য নাহিঁ।

(ঐ, হৈরান অংগ ৩)

"স্বামী শূন্য সমীর সমান।" সমীর না দেখা গেলেও নিরন্তর প্রাণের আধার। ভগবানও তাই।

সাঁই শূন্য সমীর সম। (ঐ গুরুদেব অংগ, ৮০)

"সাধু চাহিলেন মেঘের মত। সদা শূন্যেই তাঁর বাস।"

সাধু আছৈ সারিখা সদা শূন্য মেঁ বাস।

(ঐ সাচ অংগ, ৭)

"তাঁহার সেবক ও বাদলের একই গতি, উভয়েই শূন্য হইতে লয় সুধারস।"

বাদল বংদে একগতি শূন্য সুধারস লেহি।

(ঐ সাধ অংগ, ৩)

"শূন্যের মধ্যে আছে চেতন, তাহাতে ভরপুর হইয়া আছে সহজ।"

শূন্য মাহি চেতন হৈ তা মেঁ সহজ সমাহি।

(ঐ গুরুদেব অংগ, ৮৪)

রজ্জব বলেন, "শূন্য স্বরূপ স্বামী পরমাত্মার মধ্যে আত্মার যেরূপ বিচিত্র রঙ্গ লীলা।"

রজ্জব সাঁঈ শূন্য মেঁ আত্মা আত রংগ।

(ঐ সাখীভূত অংগ, ১০)

"বিহাং, বায়ু, বাদল সবাই চঞ্চল তাই শূন্য স্থির অচঞ্চল।"

বীজ বায় বাদল চপল শূন্য ন চংচল হোয়।

(ঐ প্রতিষ্ঠ সার অংগ, ১১)

"শূন্য গগনতলে সব নক্ষত্রই ফলা, তবু তাদের মধ্যে যোগহীন অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তো কিছুই নাই। হে রজ্জব, তেমনি সেই সর্ব্বাতীত পরমাত্মার মধ্যে সব ভিন্ন ভিন্ন আত্মা (=জীব)-ও একই যোগসূত্রে বিধৃত।"

শূন্য তলেরে উড়ু কলা তাল বিন বীচত নাঁহি।

অলগ অলগ ঐ আত্মা রজ্জব অবিগতি মাহি।

(ঐ সাখীভূত অংগ, ৯)

"অগ্নিশিখার আশ্রয় যেমন শূন্যে, প্রাণেরও আশ্রয় তেমন পরমাত্মায়।"

জুঁ পাবক কলা শূন্য মেঁ তৈসা তত্ত মেঁ প্রাণ।

(ঐ, লীবন অংগ, ৩)

"মন, উনমন লইয়া রাখ সেই পরম শূন্য আশ্রয়ে।"

মন উনমন লে রাখিয়ে পরম শূন্য মহান।

(ঐ, সজীবন অংগ, ১২)

"শূন্য যদি শূন্যে পায় স্থির আশ্রয়, তবেই তো হয় আনন্দ। চেতন যদি মেলে চেতনের সঙ্গে, তবে কালের কোনো আঘাতই গিয়া লাগিতে পারেনা সেখানে।"

শূন্য ঠা হুয়ৈ শূন্য মেঁ তবহি আনংদ হোয়।

চেতনি চেতনি মুঁ মিলে কাল ন লাগৈ কোয়।

(ঐ সজীবনী অংগ, ৭)

শূন্য কেবল আনন্দময় আশ্রয়মাত্র নহে, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে ইহা ঐশ্বর্য্যময় ও জীবন্ত! "শূন্য সকল ঠাঁই সঙ্গীতময়, শক্তি সহিত স্বামী সেখানে বিরাজমান।"

শব্দ শূন্য ঠৌর শকতি সহিত সাঁঈ রহৈ।

(ঐ, আদি আসন অংগ, ২০)

"হে রজ্জব সঙ্গীতময় সেই শূন্যে আসিয়াই কর অবস্থিতি।"

রজ্জব রহবা শূন্য মেঁ শব্দ সমন মেঁ আয়।

(ঐ, মধি মার্গ নিজধাম নির্দেশ অংগ, ২৪)

সর্ব্বরসে রসময় সেই শূন্য। সেই রসই অমৃত। ইহা পান করিলে অনন্ত প্রাণ লয় করিয়া সাধক হয় ধন্য। "হে রজ্জব, সেই শূন্য হইতে অমৃতনির্য্যাস লও বাহির করিয়া, ইহা পান করিয়াই সাধক প্রাণ-প্রবীণ।"

রজ্জব কাঢো শূন্য সত পীবৈ, প্রাণ প্রবীন।

(ঐ, চন্দ্রমেল চিন্তামণি অংগ, ১৩৯)

গুরু নানকের বাণীতেও শূন্য ও সহজ বহু স্থলেই পাই। তাঁহার সহজের কথা এখন না-ই বলিলাম। শূন্যের সম্বন্ধে দুই একটি পংক্তি তুলিয়া দেখান যাউক। পণ্ডিত ব্রহ্মদাস প্রশ্ন করিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল। গুরু বলিলেন—

"তখন না ছিল দিন না ছিল রাত্রি, না ছিল সূর্য্য না ছিল চন্দ্র, শূন্যে ছিল তাঁর সমাধি যুক্ত হইয়া।"

না তিসু রৈনি নহ সূরজু সুন সমাধি লগাই।

(গ্রন্থ সাহেব, রাগ মাঝ তথা তাখেহ, মোহন সিংহের সেবাশ্রমী সংস্করণ, ৫৫৯ পৃঃ)

"তিনি শূন্য কলা, অপরংপার।"

সুংন কলা অপরংপরি ধারী।

(ঐ, মারু, ১, ৪, ১৭)

"জল আকাশ শূন্যে প্রবেশ করাইয়া মহারস করে লাভ।"

জলু আকাসী সুংনি সমাবৈ। রহু রহু কেলি মহারসু পাবৈ।

(রাগ আসা, মহলা ১ অঙ্কপদী)

"যত যোগীরা করেন শূন্যের ধ্যান, অলখনাম কবতারই যে তিনি।"

জোগী সুংনি বিআংনি কেতে অলখ নামু কবতারু।

(ঐ, আসা মহলা ১)

নানকপন্থী সম্প্রদায়ে "প্রাণসংগলী" গ্রন্থখানি খুব প্রখ্যাত। গুরু নানক সিংহলে যাইয়া রাজা শিবনাভকে উপদেশ দেন। এই উপলক্ষে তাঁর বহু যোগীর সঙ্গেও আলাপ হয়। পরে সেই সব কথা ভক্ত থেহো ও সৈদো নাকি স্মৃতি হইতে লিপিবদ্ধ করেন। অনেকেই মনে করেন প্রাণসংগলী গ্রন্থ গুরু নানকের অনেক পরে রচিত। তবে শিখদের যোগশাস্ত্র ইহাতে যে ভাল করিয়া মেলে তাহাতে

কোনো সন্দেহ নাই। সন্ত সম্পূর্ণ সিংহ দ্বারা তরণ তারণ হইতে প্রাণসংগলী গ্রন্থের একখানা মুদ্রিত হইয়াছে। তার প্রথম অধ্যায়টির নামই হইল

"সুন মণ্ডলী কথা, বিরলায়া জা থান"

ইহাতে বর্ণিত আছে, "যেমন করিয়া নানা রূপে শূন্য হইতে তিনি করিলেন প্রকাশ।"

জো কীয় প্রকাশ করতে নানা রূপ ধরায়।

(প্রাণসংগলী, সন্ত সম্পূর্ণ সিংহ, ১ম পৃঃ)

ইহাতে দ্বিতীয় অধ্যায় হইল পরমতত্ত্ব স্থানের কথা।

ইহাতে দেখি নানক শূন্যমহলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শূন্যমহলে গভীরভাবে ডুবিতে পারিলেই তো মেলে অমূল্য রতন।

নানক শূন্য মহলি কো সচ্চ নিবাসে।
সুন মহল মহি জাণ সমাবে,
তত্ত্বমোলহু হরি হী পাবে। (ঐ, পৃঃ ৮)

এই গ্রন্থের ১৬শ পৃষ্ঠার তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভে অধ্যায় বন্ধ লেখার মধ্যে আছে—"শূন্য হইতেই প্রাণ ও পিণ্ডের উৎপত্তি।"

"প্রাণ পিণ্ডকী উৎপত্তি সুন্যতে হোই।" (ঐ, ১৬)

অধ্যায় আরম্ভেই দেখি বাণী, "শূন্য শূন্যই তো সবাই বলে, সেই প্রভুও তো শূন্য স্থানে ছিলেন উপবিষ্ট। যখন তিনি শূন্যধামে ছিলেন একেলা, তখন কেই বা গুরু কাকেই বা বলিতেলা।"

সুন্যো সুন্য কহে সব কোয়। সুনি স্থান বৈঠো প্রভু সোয়।
সুন স্থান জব হুতে ইকেলা। তব কওন গুরু কওন কহী চেলা। (ঐ, ১৬)

যখন সেই "ধুংধুকারে" প্রভু একেলা ছিলেন, তখন তিনি আপনিই গুরু, তিনি আপনিই চেলা।

জব ধুংধুকারি প্রভু রহে অকেলা। আপি গুরু আপে হী চেলা।
(ঐ, ১৬)

"তখন না ছিল ধরিত্রী না ছিল আকাশ, না তখন চন্দ্র সূর্য্য পরকাশ, না সৃষ্ট হইয়াছে দিবস, না রাত্রি। না তখন আছেন ব্রহ্ম না সৃষ্ট মায়া, না তখন আছেন শিব শক্তি বা কিছু দ্বৈততত্ত্ব। না তখন আছে পাপপুণ্য না আছে পূজা।" ইত্যাদি—

না অদি ধরতী না আকাশ। না অদি চন্দ সুর পরকাস।
না অদি দিবস না কোই রাতি। না অদি ব্রহ্ম না কোয়ী জাতি।
না অদি সিরজি কয়ে মূল। না অদি পাপ পুন নহি পূজা।
(ঐ, ১৭) ইত্যাদি

এলাহাবাদ বেলবেডিয়র ছাপাখানা হইতে ছাপা প্রাণ-সংগলী গ্রন্থের প্রথমভাগে দেখি—"পরম শূন্যই হইল প্রকাশ যার।"

পরম সুন পরগাস হুয়ায়। (ঐ, ৩ পৃষ্ঠা ১১)

"গুরুর কৃপা হইলেই সেই সহজ ঘরে সাধকের আসা ঘটে।"

গুরমুখ হোয় সহজ ঘর আয়া। (ঐ, ৭ পৃঃ, ২২)

"শূন্যেই নিরন্তর সহজ সমাধি।"

সুন নিরন্তর সহজ সমাধি। (ঐ পৃঃ ৩, ৩১)

"যে শূন্য রহস্যের বেত্তা সেই তো সন্ন্যাসী।"

সন্যাসী সো জো সুনকা বেত্তা। (ঐ, পৃঃ ৫৮)

"মুল্লাকেও (অন্তরের শূন্য লোকের) অনাহত বাদ্যের বাংলা (আজব) শুনাইতে হইবে। শূন্য মসজিদে গিয়া মাথা নত করিতে হইবে।"

অনহদ বাজা বাস সুনাবে। সুন মসীত জায় সির নাবে।
(ঐ ১০ পৃঃ, ৭৪)

অন্তরের সেই "শূন্য কোঠায় বন্ধ কপাট।"

সুন কোঠরী বন্ধ কপাট। (ঐ, ১১ পৃঃ, ৮১)

এইরূপ এই গ্রন্থের বহু স্থানেই শূন্য ও সহজের কথা আছে। সহজের বাণী তো বাহুল্যভয়ে এখানে উদ্ধৃতই করা গেল না।

গুরু নানক ও রত্নাবলীর পরেও উত্তর ভারতের প্রায় দুই শত জন সাধক প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে বহু বহু কথা বলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাহা বলিবার অবসর নাই। তবে ধর্ম্ম ও সাধনাতে ভারতে যেভাবে "শূন্য" ও "সহজ" সাধকের উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার কিছুই খোঁজ না করিয়া শুধু গ্রন্থ দেখিলে এই তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

একটা কথা একটু দেখিবার। সম্পূর্ণ সিংহ সম্পাদিত এই প্রাণসংগলী গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে যোগী চর্পট, বুদ্ধু, চম্পা, গোরখ, কিংখড়, ধুর্ম, ভৈরম, ধংগর, প্রাণনাথ প্রভৃতির সঙ্গে গুরুর প্রশ্নোত্তরী আছে। এগুলি বাংলা দেশের যোগীদের প্রশ্নোত্তরীর সঙ্গে খুবই মেলে। একটা জিনিষ প্রণিধান করিবার মত। এই প্রশ্নোত্তরীর ভাষাও পূর্ব

দেশের সঙ্গে মেলে। এমন কি গুরুও সেই ভাষাতেই উত্তর দিয়েছেন। যথা—

চর্পট বলিতেছেন—

কায় ভাঙ্গলো দোষ আঙ্গলো মোহং।
অহংকার ভাঙ্গলো চারপট ছন আপারং। (ঐ, পৃঃ ১৪৬)

গুরু বলিতেছেন,

না ভাঙ্গলো কায়ং না ভাঙ্গলো বং না আঙ্গলো দোষং মোহং।
ইত্যাদি (ঐ)

ছন চারপট নাথ সংসার হুয় পার পাবলো।
একোংকার গুরু কারুয়া ঘুসর নাঁ থাকুয়া।
পাঁচ পচীস হুয় আগে কায় করিবো। ইত্যাদি (ঐ, পৃঃ ১৪৭)

পুনর্নাথ বলিতেছেন,—

গুরু ন করায় তো। চেলা পাঁচন লাগুবে।
নাদ অনহদ তরঙ্গ জনায় যো।...ধ্যান ন ধরাবো।
ইচ্ছ নিচ ন করায় যো। হিরদে প্রগাসবে।...ইত্যাদি
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

মধ্যে ও গুজরাটের ভক্তদের মধ্যযুগে শূন্য ও সহজের সঙ্গে গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবিসাহেব, ভান জীবন, মীঠো, আখো, ধীম সাহেব প্রভৃতি বহু ভক্তের মধ্যেই নানাভাবে "শূন্যের" দেখা পাই। অখাভক্ত বলিতেছেন "সেই শূন্য তত্ত্ব, না তেজ না তোয় না তাহা অবনী বা বায়ু, আকাশ হইতেও তাহা অতীত নিগম সেখানে গায়, 'নেতি' বলিয়া। সেই শূন্য ত্রিগুণও নহে, পুণ্যও সে নয় পাপও তাহাকে করে না স্পর্শ। না তাহা রক্ত পীত, না শ্বেত, না তাহা বুঝা যায় শ্যাম বা নীল। গতি অগতি সেখানে নাই, তবে বল বিচার করিয়া কি প্রকারে তাহা করা যায় বর্ণন। হে অক্রুর, অবরবং সেই ঈশকে চিনিয়া লও সদ্‌গুরুর হুয়রে।"

নহি তে জল তোয়, তোয় নহি অবনী যাও।
আকাশ বি বায়ু জেহ নিগম তাঁ নেতি গাও।
ত্রিগুণ নহি তে পুন্য, পুণ্য নহি পাপ ন ধারে।
রক্ত পীত নহি শ্বেত শ্যাম নহি নীল নিহারে।
গতি অগতি তে তা নহি, তো কহো বিচার কই পেয় হুয়ে।
অবরবং তে ঈশনে জোয় অখা সদ্‌গুরু হুয়ে।
(অখা, অনুভবিন্দু, ৭ ছন্দ)

অখা বলেন, "সাধনার পথের পথিকও শূন্য, আকাশও শূন্য, সাধক ভক্তের ছায়াও শূন্য।"

সুন পাংথী সুন আকাশ কৈ সুন সাংচরী ছায়াঁ।
(অখাকৃত ছাপা, গু, র, সো ২য় খণ্ড পৃঃ ২০২)

"হে সাধকগণ, আকাশেরও অতীত সেই তত্ত্ব, না আছে তার রূপ না আছে তার নাম। সহজ শূন্য নেহারিতে দেখিলাম পুরণ ধাম।"

সন্তো আকাশাই আগেরুঁ। তেহুঁ রূপ নহীনাম।
সহজে শূন্য নিহালীয়া, দেখুঁ। পুরণ ধাম।
(অখা, ঐ, পৃঃ ২১)

সহজ শূন্য নাস্তি বস্তু নয়, তাহা প্রেমের ধন, তাহা বরণীয়। তাই অখা বলেন, "এদিক ওদিক বলিয়া লাভ কি অখা, সহজ শূন্য যদি করিয়া থাকি বরণ?"

ইত উত কাহে কো অখা সহজ শূন্য করে বরঁ।
(অখা, ঐ, পৃঃ ১৮৭)

"সেইরূপ লীলা (দর্শন) দেখিয়া মন হইল মগন, সহজ শূন্যে গেলাম ডুবিয়া। নয়নের আগে দেখিলাম সেই জ্যোতি, তাহা না স্থূল না অণু।"

দর্শন দেখী ভয়া মন মগনা সহজে হুয় লয়লা।
নেত্র আগে নূর নিরন্তরি নহি মোটা নহি নানা।
(ধীম সাহেব, যোগ বোধ ভজন ভাণ্ডার, ৪৩, পাদ, ১)

"শূন্যের উপর বসিল রসে মত্ত যোগী, চারিদিকে চলে কি লীলা! গগনমণ্ডলে দেখিলাম চলিয়াছে লীলা, ভিতরে যাহা ছিল তাহাই দেখিলাম বাহিরে।"

ঘট ঘালা যোগী সুন পর যোগ খেল হমে তোবরা।
গগন মণ্ডল মেঁ রমতা দেখা জীবন জোতঁ ন্যা ধরা।
(ধীম সাহেব, যোগ বোধ ভজন ভাণ্ডার ৪৩, পদ ২)

বাংলা দেশের আউল বাউল নিরঞ্জনীদের মধ্যেও এই শূন্যের কথা পাই। শ্রীহট্ট বিঠকলের মঠের মতবাদে, আগ্রানী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরী বাউল সমাজে, উত্তর বঙ্গের কমল কুমারী মাধবাড়ী মধ্যযা মতে, বিক্রমপুর নরসিংদী বাউল সমাজে এবং রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে সর্বত্রই "শূন্য" ও "সহজের" খুব বড় স্থান।

আজ এখানে তাহা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিবার অবসর নাই। তবে তাঁহাদের মোট কথা, "শূন্য হইল মুক্ত আকাশ বৎ। মুক্ত আকাশ বিনা বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই আকাশে যেমন প্রাণের আশ্রয় ও অবকাশ, আকাশের মুক্তি বিনা যেমন প্রাণের স্থিতি ও গতি অসম্ভব তেমনি শূন্য ছাড়া

চিত্তের প্রাণ নিরাধার। আবার শূন্য আছে অন্তরে, তাই সেখানেও আধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্র। সেখানেই প্রেম মিলন লীলার একান্ত ধাম।

শুদ্ধ শূন্য, কাজেই তাহার ভাবে শিষ্য আধ্যাত্মিক জীবনে ঠাঁয়া পড়িয়া মারা যাবে না। "গুরু পোলে কিন্তু পেলে না।" বন্ধও শূন্য। মুক্তি এবং নির্মাণও শূন্য।

অন্তরের সেই সহজ শূন্যলোকেই ঘটে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার।

> ভৌতুবন সন্তরাযা তের নহীঁ পার।
> যে ঘরে ঘরে তেরা পানি বহতা অপার।
>
> (গঙ্গারাম)

এই পদকর্ত্তা গঙ্গারাম জাতিতে নমশূদ্র। প্রায় দুই শত বৎসর আগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর অনেক অনুবর্ত্তী আছে।

এই শূন্যকে সাধনার দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া বলরামের (বলা) শিষ্য বিশা (বিষনাথ?) জাতিতে কুড়িমালী। তাঁর বাণী দেখি—

> বলা বলে বিশা ভালকরা,
> কল অঙ্কুরে ফল মাঝে ফল,
> তার স্বরূপ পাইলা না।
> ও সেই কলের দুই ঠাঁই ঘর,
> দেখতি পক্ষ পূর্ণাকার।

এখনকার বৃদ্ধ বাউলদেরও আট পুরুষ(পীঠী) আগে বিশার সময়।

উত্তর বঙ্গের বাউল পদে দেখি শিবশক্তিকে যুক্ত করিয়া সহজ সামরস্য (balance) হইলে সেই শূন্যে আশ্রয় মেলে। সেই আশ্রয় আধ্যাত্মিক, পার্থিব অবলম্বন তার নাই।

> শিবশক্তি মনে যুক্তি হবে সমান।...
> সূর্যচন্দ্রে মেলে যুগল পাখ।
> সমান হবে সাধ্য শূন্য বিজলীর পাক।...ইত্যাদি

"চন্দ্র সূর্য্য" "সমরস" ইত্যাদি সাধনার গূঢ় কথা। এখানে তাহা বিবৃত করিয়া বলার কাজ নাই। *

সত্য-মিথ্যা

—শ্রীমানিক গুপ্ত

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
সন্ধ্যা-আকাশে স্তিমিত তারকা, তারকা ম্লান;
গাছের শাখায় পাতা ঝরে ঝ'রে পথের ধূলি,
মনের প্রেমের যমুনা কভু না বহে উজান।
আঁধার আকাশে মিটিমিটি শুধু তারকা জ্বলে,
ভুলে যাওয়া গান, ফেলে যাওয়া চেউ মৃদু উথলে।

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
অনেক দিনের হারানো গানের হারানো সুর—
নিশীথ তিমিরে ভাবিতে বসিয়া যাই যে ভুলি,
আবছা আলোর ছায়ার মায়ায় বাধাবিধুর!
আলেয়ার আলো বুকের উপর চাপিয়া বসে,
তারা রবি হয়, উষার মত সূর্য্য খসে।

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
ভুলিয়া গিয়াছি একথা মানিতে লজ্জা মানি,—
আগুন খুঁজিতে জন্মে বৃথাই আগায়ে তুলি,
খর মরুদেশে মরীচিকা-মায়া ডাকিয়া আনি।
ঝরে পড়া ফুলে বসিয়া বসিয়া মালা যে গাঁথি,
তৈলবিহীন সলিতায় জ্বালি স্মৃতির বাতি।

জীবনের পথে ছড়ানো প্রেমের কাহিনীগুলি,
এখনো যে প্রেম সত্য তাহারে করুণা করে,
মৃত জীবিতের মাঝে ও গোপন দুয়ার খুলি
নিমিষের দেরী, আলো হতে হতে আঁধার ঘরে।
মনের গগনে ওঠে অবিরাম অট্টহাসি,
তবু ভালবাসা ভুলিয়া আবার ভাল যে বাসি।

---

* ১৯৩৩ সালে পরিচালিত কড়োয়াস নিখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে এই প্রবন্ধের ইংরেজী রূপ পাঠের জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

সেকালের ভোজ

—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—আমার বয়স তখন বোধ হয় এগার কি বার হইবে—কোন প্রতিবেশীর বিবাহ উপলক্ষে ভাটপাড়ায়, সাধু ভাষায় ভট্টপল্লীতে, বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলাম। চন্দননগর হইতে ভাটপাড়ার দূরত্ব এক ক্রোশের অধিক না হইলেও প্রথমে আমার জননী আমাকে পাঠাইতে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, কারণ চন্দননগর ও ভাটপাড়ার মধ্যে "একানব্বই বিশখোশ" গঙ্গা। দাতার সম্মতি লাভ করিয়া বরযাত্রী হইয়া ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। কন্যাপক্ষের বাটী দেখিয়া মনে হইল তাঁহারা নিতান্ত নহেন, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে বিবাহ, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বিবাহ শেষ হইয়া গেল, বরযাত্রী ব্রাহ্মণদিগকে আহারের জন্য আহ্বান করা হইল। বলিয়া রাখা ভাল যে, সেকালের বিবাহের পূর্ব্বে কি বরপক্ষ আর কি কন্যাপক্ষ, কোন পক্ষেরই নিমন্ত্রিত লোকদিগের আহারের ব্যবস্থা হইত না। গোধূলিলগ্নে বিবাহ, সুতরাং রাত্রি নয়টা বা সাড়ে নয়টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ীতে ফিরিতে পারিব জানিয়াই মা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, নতুবা আমাকে ভাটপাড়ায় যাইতে দিতেন না। ভোজনের আহ্বানে, ভোজনস্থানে গিয়া দেখিলাম, কুশাসনের সম্মুখে কদলীপত্রে চারিখানা করিয়া লুচি এবং পাতের এক পার্শ্বে এক মুষ্টি করিয়া লবণ। আসনে উপবেশন করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য বরযাত্রীরা সেই লবণসংযোগেই লুচি খাইতেছে। আমিও খানিকটা লুচি ছিঁড়িয়া লবণ সংযোগে মুখে দিয়া দেখি সেটা লবণ নহে চিনি। এই লুচি ও চিনি ব্যতীত ভোজনের অন্য কোন অনুষ্ঠানই নাই। সকলেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই চিনি দিয়া লুচি খাইলেন। অগত্যা আমিও তাহাই উদরস্থ করিয়া আহার শেষ করিলাম।

ভাটপাড়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতপ্রধান স্থান, বিশেষতঃ ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অধিকাংশই গুরুগিরি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, সেইজন্য আহার বিহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নিষ্ঠা এত অধিক যে, নিমন্ত্রিত বরযাত্রীদিগের জন্যও লুচি ও চিনি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবস্থা করা তাঁহারা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই।

এত গেল ভাটপাড়ার কথা; অন্য স্থানেও বাল্যকালে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আহারের যেরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াছি তাহা একালের ছেলেরা বোধ হয় কল্পনা করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, কেবল লুচি চিনির ব্যবস্থা ভাটপাড়াতেই দেখিয়াছিলাম, অন্য কোথাও দেখি নাই। অন্যান্য স্থানে লুচির সঙ্গে তরকারি এবং দধি ও সন্দেশ থাকিত, ইহার অধিক আর কিছু থাকিত না। সেকালে লুচির সহিত কুমড়ার তরকারিই হইত, শীতকালেও কপির তরকারি বড় দেখিতে পাইতাম না। একবার আমাদের অতিবাবক স্থানীয় কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"কপিটাত আমাদের দেশের জিনিষ নহে, ওটা সাহেবেরা তাহাদের দেশ হইতে আনিয়াছে। ফেচ্ছের আনীত বলিয়া উহা দেবতার ভোগে লাগে না, সুতরাং ব্রাহ্মণের পাতেও দেওয়া যায় না।" কথাটা তখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু তখন মনে হয় নাই যে, আলুটাও ত সাহেবের আনীত বিদেশী তরকারি, কুমড়ার বাঞ্জনে আলু দেবতাব্রাহ্মণের ভোগে লাগে কিরূপে? বাঞ্জনে আলু খাইতে ত দেবতা বা ব্রাহ্মণকে আপত্তি করিতে দেখি নাই। বস্তুতঃ সেকালে গৃহস্থের বাটীতে যেরূপ ভোজনে বিলাসিতা ছিল না, ভোজেও সেইরূপ বিলাসিতা ছিল না—অবশ্য লুচি সম্বন্ধে। ভোজের প্রধান অঙ্গ অন্ন হইলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। আমরা বাল্যকালে যেখানে ভোজে লুচি খাইয়াছি, সেই খানেই লুচির নিত্যসহচর কুমড়ার ব্যঞ্জন, দধি ও সন্দেশ দেখিয়াছি। লুচির সহিত যেরূপ ভাজা, শাক ভাজা, পটল ভাজা বা চাটনি হইত না, মাছ মাংস ত দূরের কথা। প্রথম যৌবনে একবার কোন বন্ধুর বিবাহোপলক্ষে হাওড়ায় গিয়াছিলাম। সেখানে প্রথমে দেখিলাম যে, লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে এক অনর্থ ঘটিয়াছিল। একজন বয়স্ক ব্যক্তির পাতে ছোলার ডাল দিবামাত্র তিনি আহার বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন।

গৃহস্বামী মহা অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনিও নবশাখ আমিও নবশাখ, কিন্তু আপনি আমার স্বজাতি নহেন। আপনার বাটীতে যদি ডাল খাইলাম, তাহা হইলে ভাত খাইতে আপত্তি কি? ডাল ও ভাত কি ভিন্ন?" এই কথা শুনিয়া সেই গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ সেই পাতা সরাইয়া আবার নূতন পাতা করিয়া দিলেন এবং ডাল বাদ দিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। নিমন্ত্রিত বন্ধু ভদ্রলোকটি বিশেষ সতর্ক বলিয়াই সে যাত্রা তাঁহার জাতি রক্ষা হইয়াছিল।

সেকালে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কায়স্থ বা নবশাখগণের বাটীতে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেন, ভোজনস্থানে গিয়া আসনে উপবেশন করিতেন, পরিবেশকগণের নিকট হইতে বারংবার লুচি ও সন্দেশ চাহিয়াও লইতেন, কিন্তু ভোজন করিতেন না। ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের বাটীতে ভোজন-রীতিবিরুদ্ধ ছিল, তাই তাঁহারা শূদ্রের বাটীতে বসিয়া ভোজনে আপত্তি করিতেন, কিন্তু শূদ্রের বাটী হইতে লুচি সন্দেশ স্বগৃহে আনিয়া ভোজন করিতে আপত্তি করিতেন না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শূদ্রের দ্বারা নিমন্ত্রিত দূরদেশাগত ব্রাহ্মণগণ, নিমন্ত্রণকারী শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন না, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার প্রতিবেশী কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে বসিয়া নিমন্ত্রণকারী শূদ্রের বাটী হইতে প্রেরিত লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভোজন করিতেন। এখানেও সেই শূদ্রের বাটীতে ভোজনের আপত্তি। এইরূপ ব্যবস্থায় অনেক সময় অনেক কৌতুককর ব্যাপারও ঘটিত। আমাদের প্রতিবেশী কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বরযাত্রী কায়স্থের বাটীতে ভোজনে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমরা শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিব না, যদি কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে আমাদের ভোজনে আপত্তি নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের জনৈক তিলি প্রতিবেশী বলিলেন, "বেশ কথা, আমার বাটীতে ইঁহাদিগের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সেই কয়জন ব্রাহ্মণকে আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন এবং নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার বাটী হইতে ভোজ্য দ্রব্য আনাইয়া সেই সকল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইলেন। এরূপ ছলনা ও চাতুরি সেকালে মাঝে মাঝে হইত। শূদ্রের প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণে আপত্তি নাই, শূদ্রের বাটীতে বসিয়া ভোজনেই আপত্তি। এরূপ ছলনা দূরদেশ বা ভিন্নগ্রাম হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের অদৃষ্টেই ঘটিত, স্বগ্রামবাসী বা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণকে এই ভাবে ছলনা করিতে পারা যাইত না।

সেকালে ধনশালী ব্যক্তিদিগের বাটীতে ভোজে লুচির ব্যবস্থা হইলেও রাজনবাহুল্য হইত না। চন্দননগর গোন্দল-পাড়া নিবাসী ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিশেষ ধনশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা, জুড়িগাড়ী (তখন মোটর ছিল না) দ্বারদেশে তের পার্ব্বণ, কিছুরই ত্রুটী ছিল না। দুর্গোৎসব এবং পিতামাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে বিরাট ভোজ হইত, কিন্তু তাঁহার বাটীতেও আমরা সেই লুচি, কুমড়ার তরকারী, দধি ও সন্দেশ খাইয়া আসিতাম এবং "অধিকন্তু" হিসাবে প্রকাণ্ড "ছাঁদা" বাঁধিয়া আনিতাম। তাঁহার বাটীতেও আমরা রাজনবাহুল্য বা মিষ্টান্নবাহুল্য দেখি নাই।

সেকালের ভোজের কথা বলিলেই ছাঁদা-বাঁধার কথা বলিতে হয়। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা কৃপণস্বভাব কি উদারস্বভাব, তাহা, তাঁহার বাড়ীর ছাঁদা দেখিয়াই লোকে অনুমান করিতে পারিত। ছাঁদা সেকালের ভোজের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। যতই উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করা হউক না কেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ছাঁদা না বাঁধিলে নিমন্ত্রণরক্ষাই মঞ্জুর হইত না। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে একশত লোককে লুচি খাওয়াইতে হইলে পনের সের হইতে আধমণ ময়দার লুচি ভাজিলেই যথেষ্ট হয়। সাধারণতঃ "বাবু"শ্রেণীর লোকে আধ-পোয়া ময়দার লুচি খাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। সেকালে লোকের ভোজনশক্তি এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পঁচিশ ত্রিশখানা লুচি, তদনুরূপ ব্যঞ্জন, এক হাঁড়ি দধি ও পঁচিশ ত্রিশটা সন্দেশ সেকালে অনেককেই খাইতে দেখিয়াছি। সেইজন্য সেকালে নিয়ম ছিল, একশত লোক খাওয়াইতে হইলে এক মণ ময়দা, এক মণ দধি, একমণ মিষ্টান্ন এবং এই অনুপাতে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বড়ই ভোক্তা হউক, একমণ ময়দার লুচি সেকালে একশত সাধারণ লোকে খাইতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না, তবে যে

একদল দইয়ের ও একদল মিষ্টান্নের আয়োজন করিতে হইত, তাহার কারণ—ঐ ছাঁদা। আকণ্ঠ ভোজন করিলেও সেকালের নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কিন্তু ছাঁদা হাতে করিয়া বাটীতে লইয়া যাইতেই হইত। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে শিক্ষিত ভদ্রলোক অর্থাৎ—বাবুমহলে ছাঁদা বাঁধাটা অত্যন্ত ঘৃণার্হ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আমাদের সেকালে তাহা ছিল না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালে ছাঁদা বাঁধা নিমন্ত্রণের একটা অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনের পর ছাঁদা না লইলে গৃহস্বামী ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ছাঁদা লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন। এই ছাঁদা বাঁধা সম্বন্ধে আমি প্রাচীন-গণের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। চন্দননগরের দক্ষিণে তেলিনীপাড়ার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তেলিনী পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের খ্যাতি পশ্চিম বঙ্গে অনেকেরই নিকট সুবিজ্ঞাত। ৺রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যূন এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই জমিদারগোষ্ঠীর অগ্রণী বা কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাটীতে যখন কোন উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজের আয়োজন হইত, তখন রামধন-বাবু স্বয়ং দেউড়িতে বসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা করিতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পরে যখন জমিদার-বাটী হইতে বাহির হইতেন, তখন জমিদারবাবু দেখিতেন যে, সকলে ছাঁদা লইয়াছেন কি না এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, ভোজনে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হইয়াছে কি না? একবার তিনি এইরূপ একটা ভোজের সময় দেউড়িতে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি সুবেশ ধনী ভদ্র যুবক ভোজনান্তে রিক্তহস্তে বাহিরে যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র রামধনবাবু নিকটে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়া না খাইয়াই চলিয়া যাইতেছ কেন?"

যুবক সবিনয়ে বলিলেন, "আমি না খাইয়া যাই নাই, বেশ পরিতোষ সহকারেই ভোজন করিয়াছি।"

জমিদারবাবু বলিলেন, "খাওয়া হইয়াছে ত ছাঁদা কই? তুমি কি ছাঁদা পাও নাই?"

যুবক বলিলেন, "পেট ভরিয়া খাইয়াছি আবার ছাঁদা কেন?"

জমিদারবাবু বলিলেন, "ও, বুঝিয়াছি তুমি বুঝি কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজী পড়াশুনা কর? তাই ছাঁদা হাতে করিয়া লইয়া যাইতে তোমার লজ্জা হয়। তা বেশ, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।" এই বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে বলিলেন, এই বাবুটির বাড়ীতে পাঁচজন লোক আছে, একটা হাঁড়িতে করিয়া পাঁচজনের মত ছাঁদা এইখানে লইয়া এস।" আদেশমাত্র এক হাঁড়ি লুচি ও সন্দেশ তথায় আনীত হইল, রামধনবাবু নিজের এক পুত্রকে বলিলেন, "ওহে, এই ছাঁদাটা ঐ বাবুর সঙ্গে গিয়ে উঁহার বাড়ীতে দিয়া এস। উঁহার হাতে করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইতে লজ্জা করে।" জমিদার মহাশয় স্বীয় পুত্রকে ছাঁদা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন দেখিয়া সেই যুবক অগ্রসর হইয়া স্বয়ং খাবারের হাঁড়ি লইয়া বলিলেন, "আমাকে দিন, আমিই লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া ছাঁদা লইয়া প্রস্থান করিলেন। যুবক প্রস্থান করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া বড়ই স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজে খাইয়া গেলে কি বাড়ীর লোকের পেট ভরিবে? বাড়ীতে মা আছেন, ছোট বোন ভাই আছে, খাইবার সময় তাদের কথাটাও মনে করিতে হয়। বাড়ীর লোককে না খাওয়াইয়া কেবল নিজে খাইয়া কি করিয়া তৃপ্তি হয় কে জানে!"

এই ছাঁদার কথায় বর্ত্তমান কালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানা বিলাতী সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, জার্ম্মানীর রাজ্যচ্যুত সম্রাট যখন জার্ম্মানির একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন, তখন তিনি কোন ভোজ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলে, ভোজনকালে যে মিষ্টান্ন বা যে ফল ভাল লাগিত তাহার কিয়দংশ রুমালে বাঁধিয়া পকেটে পুরিয়া রাখিতেন। একবার তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সম্রাট বলিয়াছিলেন—"আমার মনে আছে, আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমার পিতা কোন স্থান হইতে আসিয়া যদি পকেট হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিতেন, তাহা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দ হইত। আমরা পিতার নিকট হইতে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইলে আনন্দে নৃত্য করিতাম। বাল্যকালে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, আমার সন্তানগণকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব কেন?"

এই ঘটনার পর হইতে জার্ম্মানিতে সম্রাটের অনুকরণে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে ছাঁদাবাঁধা একটা ফ্যাশন হইয়াছিল।

সেকালে যে ছাঁদা বাঁধা হইত তাহাতে সাধারণতঃ লুচি ও সন্দেশই থাকিত। একটা ছাঁদা অর্থাৎ এক জনের ভোজনোপযোগী ছাঁদাতে বারখানা হইতে কুড়িখানা পর্য্যন্ত লুচি এবং আটটা হইতে ষোলটা পর্য্যন্ত সন্দেশ থাকিত, সাধারণতঃ ষোলখানা লুচি ও বারটা সন্দেশই থাকিত। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা ধনবান হইলে কুড়িখানা লুচি ও ষোলটা সন্দেশ এবং দরিদ্র হইলে বারখানা লুচি ও আটটা সন্দেশ প্রত্যেক ছাঁদাতে দেওয়া হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই ভোজে যাইবার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঐ সকল অপোগণ্ড শিশু ও বালকবালিকা খাইতে যাইত না, ছাঁদা আনিতে যাইত। তাহারা অভিভাবকের নিকটে এক একখানা আসনে বসিয়া থাকিত, তাহাদের সম্মুখস্থিত কদলীপত্রে যথানির্দ্দিষ্ট লুচি ও সন্দেশ দেওয়া হইত, কিন্তু সে সকল ভোজ্য দ্রব্য তাহারা স্পর্শ করিত না, তাহাদের অভিভাবক স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে আপনার পাত হইতে একখানা লুচি বা একটা সন্দেশ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, তাহারা ইহাই খাইত। ভোজন শেষ হইলে, বালকবালিকাদের সম্মুখস্থিত খাদ্য একখানা গামোছায় বা একখানা উড়ানিতে বাঁধা হইত, কখনও বা বালকদের কোঁচায় বা বালিকাদের আঁচলে বাঁধা হইত। অনেকে পানীয় জলের মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া লইতেন। অনেককে নিজের পাতের অবশিষ্ট লুচি সন্দেশও ছাঁদার সঙ্গে বাঁধিয়া লইতে দেখিয়াছি।

কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভদ্রসমাজ হইতে এই ছাঁদা বাঁধার প্রথাটা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। ঐ প্রথার বিলোপ ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার আলোচনা পাঠকগণ করিবেন। আমার মনে হয় যে, মূলতঃ দুটি কারণে ক্রমে ক্রমে হইতে এই ছাঁদা বাঁধার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং পরিজনবর্গের প্রতি প্রীতির অভাব, দ্বিতীয় কারণ ভোজে বিলাসিতার বাহুল্য। পূর্ব্বে ভোজে যেখানে লোকে লুচি ও সন্দেশ খাইয়া ও খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইত, এখন সেখানে পঁচিশ প্রকার মিষ্টান্ন, পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সুতরাং ভোজের ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সেকালে ধনবান জমিদারগণ ভোজে যেরূপ ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেন, এখন অতি দরিদ্র ব্যক্তিও সেরূপ আয়োজন করিলে লজ্জা বোধ করেন। যেখানে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার অধিকার ফলে ভোজে জনপ্রতি তিন টাকা, চারি টাকা এমন কি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়, সেখানে নিমন্ত্রিত লোকদিগের পরিজনবর্গের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা কয়জন ভদ্রলোকের সাধ্যে কুলায়?

সেকালের ভোজে দুই প্রকারের নিমন্ত্রণ হইত, মধ্যাহ্ন-ভোজন ও মধ্যাহ্ন-জলপান। মধ্যাহ্ন-ভোজন অর্থে অন্ন-ভোজন এবং মধ্যাহ্ন-জলপান অর্থে লুচি, ও মিষ্টান্ন ভোজন। ব্রাহ্মণের বাটীতে বিবাহরাত্রির ভোজে এবং শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজেই লুচির ব্যবস্থা হইত, অন্য সকল প্রকার ভোজে অন্নের ব্যবস্থা হইত। সেকালে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা মধ্যাহ্ন কালেই হইত, এখনকার মত রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন-ভোজন চলিত না। রাত্রিতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইত একমাত্র বিবাহে। বিবাহ ব্যতীত অন্য সকল কার্য্যেই মধ্যাহ্নে খাওয়ান হইত। বড় বড় ভোজে যেখানে পাঁচ সাত শত, এমন কি হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করা হইত, সেখানেও বেলা তিনটা বা সাড়ে তিনটার মধ্যেই সকলের ভোজনকার্য্য শেষ হইত। বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যেই গৃহস্থকে অতিরিক্ত আলোকের ব্যবস্থা করিতে হইত না। অনাহুত কাঙ্গালী ভোজনও অপরাহ্নেই শেষ হইত। সেকালে স্কুলের ছেলেদের জন্য অপরাহ্নে এবং আফিসের কর্ম্মচারীদিগের জন্য সন্ধ্যার পর খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইত, কিন্তু সেরূপ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী হইলেও পনের কুড়ি জনের অধিক হইত না।

সেকালের ভোজে আর একটা প্রথা ছিল পঙ্‌ক্তি ভোজন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলে সমবেত হইলে সকলকে এক সঙ্গে ভোজন করান হইত, ইহারই নাম পঙ্‌ক্তি ভোজন। সকল বাটীতেই অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হইত, ব্রাহ্মণদিগের ভোজন শেষ হইলে পরে শূদ্রদিগের ভোজনের ব্যবস্থা হইত; ইহাতে কোন শূদ্র,—তা' তিনি যত বড় ধনবান ও পদস্থ ব্যক্তিই হউন না কোন আপত্তি করিতেন না। এমন কি অনেক স্থলে যদি ব্রাহ্মণদিগের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই

শূদ্রদিগের ভোজনের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে অনেক শূদ্র তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেন, "সে কি কথা? আগে দেবতাদিগের দেবা হউক পরে আমরা প্রসাদ পাইব।" এখনকার এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যুগে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আমলে এই ব্যবস্থায় অনেকেই বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আজকাল দেখিতে পাই, ভোজবাটীতে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে যেমন বিশ পঁচিশজন লোকের সমাগম হয়, অমনি তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। যে কক্ষে ভোজন করান হয় সেই কক্ষে বা দালানে হয়ত ষাট সত্তর জনের জন্য পাতা প্রস্তুত আছে, একদল আসিয়া ভোজনে বসিয়া গেলেন, সেই দলের ভোজন শেষ হইতে না হইতে দ্বিতীয় একদলের প্রবেশ ও ভোজনে মনোনিবেশ, কিছুক্ষণ পরে হয়ত তৃতীয় এক দলের আগমন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রথম দলের ভোজনশেষ ও প্রস্থান। আমরা সেকালে এরূপ ব্যবস্থা (বা সামাজিক হিসাবে অব্যবস্থা) কখনও দেখি নাই। বেলা সাড়ে বারটা বা একটা হইয়াছে, সমস্ত আহার্য্য প্রস্তুত, নিমন্ত্রিত অধিকাংশ লোকই উপস্থিত, কেবল একজন বা দুইজন তখনও আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই, সকলেই সেজন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। অনুপস্থিত ব্যক্তিরা না আসিলে অন্য সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সকলেই বলাবলি করিতেছেন, "বেলা একটা বাজিয়া গেল, মুখুয্যে মহাশয়ের দেখা নাই কেন?" নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা সেই অনুপস্থিত মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে (বাটী যদি নিকটে হয়) লোক পাঠাইলেন, তিনি না আসিলে উপস্থিত অন্য সকলে বসিতে পারেন না। বেলা প্রায় দুইটার সময় মুখুয্যে মহাশয়ের আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "হিঁহে, তোমার যে আর বার হয় না, আমরা এদিকে খিদের ছটফট করিতেছি।" মুখুয্যে মশাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "এই দাদা বাজারে গিয়া একটু দেরি হইয়া গিয়াছে। বাজার থেকে আসিয়া পরে সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি। বেলা এমন কি বেশী হইয়াছে?"—ইত্যাদি। এরূপ দৃশ্য প্রায় সকল ভোজবাটীতেই দেখা যাইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেকালে ভোজে লুচির ব্যবস্থা হইলে বাহুল্যবহুলা বা মিষ্টান্নবহুলা হইত না বটে, কিন্তু অন্য ভোজনের ব্যবস্থা হইলে বাহুল্যবহুলা রূপণতা দেখা যাইত না। অন্নের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণবাটীতে হইত, কারণ ব্রাহ্মণবাটীতে সকলেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কাহারও বাটীতে কর্ণকর্ত্তার স্বজাতীয় লোক ব্যতীত অন্য কেহই অন্ন ভোজন করিতেন না। ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্নভোজনের ব্যবস্থা হইলে, নিমন্ত্রণের সময় বলিতে হইত, "—অমুকের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ" আর লুচির ব্যবস্থা হইলে বলিতে হইত,—"মধ্যাহ্ন জলপানের নিমন্ত্রণ" আর শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় বলিতে হইত, "প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ।" শূদ্রের বাটী হইতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে একজন ব্রাহ্মণের উপর নিমন্ত্রণ করিবার ভার দিতে হইত; শূদ্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণের অবমাননা করা হইত। শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় "ভোজন" "আহার" "জলপান" প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়া বলিতে হইত, "—অমুকের বাটীতে মধ্যাহ্নকালে পায়ের ধূলি দিবেন।" স্বজাতীয়কে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে "ভোজন" বা "আহার" শব্দ ব্যবহার করা হইত।

সেকালে শূদ্র মাত্রেই ব্রাহ্মণের অন্নকে "প্রসাদ" বলিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে আদেশ করিলে যুবক পুত্র সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবা আপনাকে কাল মধ্যাহ্নে আমাদের বাড়ীতে আহার করিবার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" কায়স্থ ভদ্রলোকটি সেই কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, "বেশ কিন্তু কি খাওয়াইবে বল দেখি?" যুবক বলিল, "ভাত খাওয়াইব।" সেই কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন, "তোমার বাবাকে বলিও আমি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভাত খাই না।" যুবক শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহা দেখিয়া সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "একথা তুমি বুঝিতে পারিবে না, তোমার বাবাকে বলিলে তিনি বুঝাইয়া দিবেন।" যুবক গিয়া পিতাকে সেই কথা জানাইলে তাহার পিতা বলিলেন, "তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন; ব্রাহ্মণের বাটী হইতে শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বলিতে হয় প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বা প্রসাদ পাইবেন। তুমি আবার গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া এস।" যুবক গিয়া বলিল, "বাবা বলিয়া দিয়াছেন—

কাল আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবেন।" শুনিয়া কায়স্থ ভদ্রলোক বলিলেন, "এইবার ঠিক হইয়াছে। আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণের বাটীতে আমি প্রসাদ পাইতে পারি, ভাত খাইতে পারি না। ভাত খাইব আমার স্বজাতিকুটুম্বের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্রের কাছে ভাত নহে—প্রসাদ।"

একালে কলিকাতা অঞ্চলে, কি লুচি আর কি অন্ন, ভোজ মাত্রেই যেমন পেশাদার পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করাইতে হয়, সেকালে তাহা ছিল না। বড় বড় ভোজে লুচি ভাজিবার জন্য অনেক স্থলে পাচক ব্রাহ্মণ বা রসুয়ে বামুন ঠাকুরকে ডাকা হইত বটে, কিন্তু অন্নভোজে কদাপি বাজারে রসুয়ে বামুনকে ডাকা হইত না। গৃহস্বামীর পরিবারভুক্ত প্রৌঢ়া বা প্রাচীনা মহিলা এবং প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণীগণই পাকের ভার গ্রহণ করিতেন। বাজারে রসুয়ে বামুনের সৃষ্ট অন্ন কোন সামাজিক ভোজে একেবারেই অচল ছিল। সেকালে ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্নভোজ প্রায়ই হইত, সেই জন্য বাটীর মহিলারা রন্ধনে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠিতেন। আমরা বাল্যকাল ও যৌবনে দেখিয়াছি, এক এক ব্রাহ্মণবাটীর মহিলারা কোন বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিতেন। "মুখুয্যেবাড়ীর বড়গিন্নি যেরূপ নিরামিষ রন্ধন করিতে পারেন, সেরূপ আর কোন বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, চাটুয্যেদের বাসার ঠাকুরাণী যেরূপ সুন্দর পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারেন, সেরূপ আর কেহ পারে না" "বাঁড়ুয্যেদের শ্যামের মা অম্বিষরন্ধনে সিদ্ধহস্ত" এইরূপ কথা সেকালে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের মুখে সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইত। যাঁহাদের বাটীতে ভোজে অন্ন হইত, তাঁহারা রন্ধননিপুণা ব্রাহ্মণ মহিলাদিগকে অতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানসহকারে আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইতেন। ভোজনকালে ভোক্তারা কোন রন্ধনের সুখ্যাতি করিলে সেই ব্যঞ্জন-রন্ধনকারিণী মহিলার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। ভোক্তারা কোন ব্যঞ্জনের নিন্দা করিলে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ এবং দুঃখিত হইতেন। ভোক্তাদের অভিমত জানিবার জন্য তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন এবং ভোক্তারা কি বলিতেছেন, বারংবার তাহা পরিবেশকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ গৃহস্থ-মহিলাদিগের দ্বারা রন্ধন এখনও মফস্বলের কোথাও কোথাও বিদ্যমান আছে, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে আর নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে বাজারে রসুয়ে ব্রাহ্মণই এখন প্রায় সকল বাটীতেই ভোজে রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ফলে নগর অঞ্চলে নারীসমাজ হইতে চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা রন্ধন বিলুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে।

একালে দেখিতে পাই, কর্মকর্তা হয়ত কোন ভোজে এক শত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, পাছে নিজের খাইতে বিলম্ব হয়, সেই জন্য তিনি তাঁহার গৃহিণী এবং পুত্র কন্যাগণ হয়ত নিমন্ত্রিত লোকজনদের আহারের পূর্বেই আপনারা আহার করিয়া কাজ মিটাইয়া রাখিলেন। কেহ হয়ত এরূপ অগ্রে আহার করা অন্যায় মনে করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে একত্র বসিয়াই আহার করিলেন। কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না। নিমন্ত্রিত পুরুষ, নারী এমন কি অনাহূত কাঙ্গালীদিগকে ভোজন না করাইয়া সেকালে কোন গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নী জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। আহূত অনাহূত সকলের আহার শেষ হইলে পর গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী আহার করিতেন। এখনকার ভোজে এরূপ উপবাস করিয়া থাকা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, কারণ আজকাল মধ্যাহ্ন-ভোজন একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে, অধিকাংশ ভোজই রাত্রিকালে হয়, সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন এবং রাত্রি এগারটা বারটা পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকার প্রয়োজনই হয় না। সেকালে যখন মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্ন-ভোজন হইত, তখন বাটীর কর্তা ও গৃহিণী অপরাহ্ণ চারিটা পাঁচটা পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভোজের জের চলিত না।

ভোজে অন্নের ব্যবস্থা হইলে, আজকাল যেরূপ ব্যঞ্জনের আয়োজন হয় সেকালেও প্রায় সেইরূপই হইত। পাতে অন্ন পরিবেশন করিবার পর প্রথমে সুক্ত, চার পাঁচ প্রকার ভাজা, (তন্মধ্যে তিল পিটুলি বেগুন ভাজা বা বেগুনী অপরিহার্য) মাছ ভাজা, মোচার ঘণ্ট, পাকের ঘণ্ট, ছেঁচড়া, দুই তিন প্রকার ডালনা, মাছের ঝোল, নিরামিষ অম্বল, মাছের অম্বল, পায়স, দধি এবং মিষ্টান্নই প্রথমতঃ দেওয়া হইত। অম্বল সর্ষের তেলে ভুজিয়া না করিয়া জিলাপী বোঁদে এবং ছানা-

বড়া করিতেন। এই সকল মিষ্টান্ন বাটীতেই প্রস্তুত করা হইত। আজকাল অন্নভোজে সাদা ভাতের পরিবর্ত্তে অনেকে পোলাও অথবা "ঘি-ভাত" করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বাল্যকালে কোথাও সামাজিক নিমন্ত্রণে পোলাও খাই নাই। ভোজে লুচি হইলে সমস্ত ব্যঞ্জনই নিরামিষ হইত, মাছের নামগন্ধও থাকিত না, অন্নভোজেই মাছ হইত। আজকাল ভোজে মাছ না হইলে সে ভোজই মঞ্জুর হয় না, অধিকাংশ স্থলে মাংসও হয়। কোন সামাজিক ভোজে এখনও হাঁসের ডিম দেখিতে পাই নাই। তবে আশা আছে যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি তবে লুচির সহিত হাঁসের ডিম ও কেক বিস্কুটও খাইতে পাইব।

আজকাল আর একটা বিষয় দেখিতে পাই—"পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ"। সেকালে দূরস্থিত আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলেই পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইত। প্রতিবেশী বা স্বগ্রামবাসীকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা সেকালে ছিল না। যে সকল সামাজিক উৎসবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করা হইত সেই সকল উৎসবে কেবল অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে সংস্কৃত শ্লোকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আজকাল পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের প্রভাব গৃহসন্নিহিত প্রতিবেশীর বাটীতে পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেকালে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে গৃহস্বামী স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধি রূপে, পুত্র, ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শূদ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ করিবার একটা আজব কায়দা বা "এটিকেট" ছিল। নিমন্ত্রণ করিবার সময় করযোড় করিয়া বলিতে হইত, "মহাশয়, কার্য্য উপলক্ষে আগামী—আমার বাটীতে মধ্যাহ্নকালে আহার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।" নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় বলিতে হইত, "আমার বাটীতে পদধূলিদানে কৃতার্থ করিবেন।" পিতৃশ্রাদ্ধ বা মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বলিতে হইত—আমি দায়গ্রস্ত হইয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক (ব্রাহ্মণকে 'পদধূলি দানপূর্ব্বক') আমাকে দায় হইতে উদ্ধার করিবেন। সেকালে গুরুজনেরা বাটীর বালকদিগকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করিবার এটিকেট্ শিক্ষা দিতেন।

আজকাল বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন এমনকি শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্রেও দেখিতে পাই "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন" অথবা "লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়" এইরূপ কথা ফুটনোটে লেখা থাকে। আমরা সেকালের বৃদ্ধের দল এইরূপ লেখার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের সমাজে পিতা বা মাতার শ্রাদ্ধ এবং কন্যার বিবাহ "দায়" নামে পরিচিত। পিতৃদায়, মাতৃদায় বা কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভের জন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, বান্ধব এবং প্রতিবেশীর "দায়স্থ" হইবার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। নিমন্ত্রণ করিবার সময় এই দায়ের উল্লেখ করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, অথচ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি দায় উদ্ধারের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অর্থ বা বস্ত্রাদি দ্বারা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে সেই সাহায্য গ্রহণে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। "আমি দায়গ্রস্ত, আমাকে দায় হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া পরে সাহায্য "গ্রহণে অসমর্থ" বলিলে কথাটা নিতান্ত অসার হয় না কি? পুত্রের বিবাহের পর পাকস্পর্শ উপলক্ষে যদি কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কন্যার মুখদর্শন বা অন্য কিছু বলিয়া কন্যাকে অর্থ অথবা অন্য কোন দ্রব্য উপহার প্রদান করেন, তাহাতে কন্যার শ্বশুর অথবা অপর কাহারো আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই, কারণ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে যৌতুক কন্যা যে উপহার প্রাপ্ত হয়, সেইটাই তাহার প্রকৃত স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধনে স্বামী, শ্বশুর এমন কি পুত্রেরও কোন অধিকার থাকে না, একমাত্র কন্যারই তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সেই স্ত্রীধন গ্রহণে কোন পুরুষের আপত্তি করিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়নকালে, নবোপনীত ব্রাহ্মণ-কুমারকে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিতে হয়, এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণ বালককে ভিক্ষা প্রদান পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং উপনয়ন উপলক্ষে কেহ যদি ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাতে আপত্তি করিবারও কাহারও অধিকার নাই। আমার মনে হয়, একমাত্র শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই শিশুর অভিভাবক

বলিতে পারেন "লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়" অন্য কোন সামাজিক কার্য্যে একথা বলা চলে না।

আমার মনে হয়, আমরা যেরূপ আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনযাপন প্রণালী, আচার ব্যবহার সকল বিষয়েই আমাদের বিশিষ্টতা হারাইয়া পাশ্চাত্যভাবে বিলীন হইতেছি, ভোজ ব্যাপারেও সেইরূপ ধীরে ধীরে নিজেদের বিশিষ্টতা হারাইয়া পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণে, আমাদের প্রাচীন প্রথা হারাইতে বসিয়াছি। সকল সভ্য সমাজেরই, প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারে এক একটা বিশিষ্টতা থাকে। আমাদের সামাজিক ভোজে যে বিশিষ্টতা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজকাল নগরবাসীরা সেই বিশিষ্টতা হারাইতে বসিয়াছেন এবং নগরের অনুকরণে মফঃস্বল হইতেও সেই বিশিষ্টতা লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভোজ ব্যাপারকে আমরা অকারণে এত বাহুল্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি যে দরিদ্র ও দুঃখের কথা, মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ ভদ্রলোকেও ইচ্ছা করিলে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে লইয়া উৎসব করিতে পারেন না। যেখানে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইত, সেখানে পাঁচ-শত টাকা ব্যয় করিয়া অভিজাত চরিতার্থ করিতে হয়, তাই সহজে আমরা কোন আনন্দ উৎসবে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে অকারণ ব্যয়বাহুল্যও যেমন অকর্ত্তব্য, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সমাগমে ও আদর আপ্যায়নে কাল থাকিয়া উৎসবের আনন্দভোগে বঞ্চিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না।

মুকুলের ব্যথা

—শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

তোমার স্বপনে জীবন ক'রেছি ভোর
ওগো মুকুলের মরম-দুলানো দাখী!
আজি যে ফুলের টুটিল কঠিন ডোর;
ফুটিল নিবিড় আকাশে তারার রাখি।
তবু যে আমার আঁধার রহিল চোখে,
বাঁধার বেদন এখনো মিটিল কই?
প্রাণের বাঁশী যে আজিও বাজিছে শোকে,
আমার আশার বল কতকাল রই?
দখিণ বাতাস এসে কি গিয়াছে কিরে?···
শ্রবণে যে-তার চরণধ্বনিটি আ
আজ অবেলায় মরণ-সাগর-তীরে
কাঁপিবে না বোঁটা ক্লান্তি-ক্ষীণ-নিঃশ্বাসে!
দিন তো গিয়াছে; কোথায় গোধূলি আলো?
রাতের আকাশে ফোটে কি দিনের হাসি?
হাসিতে যে-সুখ লাগিল না আলো ভালো
চক্ষে কি তার ঘনাবে অশ্রুরাশি?

দখিণ বাতাস,—দখিণ বাতাস ওরে,
মধু-চৈতালি আজিকিরে হ'ল শেষ?
শিশিরে কুসুমগন্ধ রবে না ভোরে?
বনের বীণাতে ঘুমালো গানের রেশ?
সুপ্তি নামিছে ক্লান্ত গগন ভরি;
তৃপ্তি আমার আজিও হ'ল না হায়।
শীর্ণ রাতের আঙিনাতে তোমারে স্মরি
যাবে কি জীবন নীরব বন্দনায়?

আজ অবেলায় তাই এসো মোর কাছে,
হে মধু-বনের মৃদু চুম্বনচোর!
শুনিছ না হায়, কে তব পরশ যাচে
টুটাতে বাধার লৌহ-কঠিন ডোর!
পোলাশ তোমার প্রলাপ শুনেছে কত;
বকুল তোমার শুনেছে ব্যাকুল বাণী,
হে চির-আকুল, আজিকে ক্লান্ত নত
প্রাণের গানের হবে নাক জানাজানি!

দিন তো গিয়াছে; রাতের আঁধারও যায়—!
সুপ্ত উষার নিঁদ যে টুটিল ওই।
দিনের মণি যে হাসে নভ-কিনারায়,
কমলের লাগে এ আঁখি মেলিল কই!
আমি যে মুকুল—বেদনে হৃদয় ভরা;
অন্ধ রাতের অবসাদে তনু-ক্ষীণ।
নির্ব্বাণ-নত প্রদীপের মত ভরা
দীপ্তি আমার হ'য়ে আসে তনু লীন!
বোঁটা যে আমার কাঁপিছে মরণ-ঘুমে,
মৌন-দিনের নীহার-ছিজানো ভোরে;
কপোল আমার ভ'রে দাও শেষ চুমে;
তুমি যে শীতল সে-কথা জান কি ওরে?
অঙ্গ যে মোর আঁকিতে হ'য়েছে আঁকা,
দখিণ বাতাস, বারেক ফিরিয়া চাও।
'তোমার বিহনে জীবন হয় নি ফাঁকা,'
—বিদায়-বেলায় একথা বলিয়া যাও!

ইটালি হইতে জার্ম্মাণী

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সুরম্য প্রকৃতি ও আর্টের লীলাভূমি ইটালি ছাড়িয়া আসিতে কষ্টবোধ হইল। গম্ভীর বিচিত্র পুরী রোম, কান্ত-কোমল ফ্লোরেন্স,···সুশ্যামল পাহাড় ও বনে, বৃহৎ বৃহৎ হ্রদে, অজস্র আঙ্গুরক্ষেত ও জলপাই-বনে কি শোভাই ধারণ করিয়া আছে এই প্রাচীন দেশ! কিন্তু রোমের অতীত গৌরব ও ইটালির বর্ত্তমান অবস্থায় কি পার্থক্য!

পণ্ডিত ম্যাক্সমুল্লার স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, পাছে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে তিনি ভারতে বেড়াইতে যান না। কিন্তু বর্ত্তমান ইটালী যতই হীন হউক না কেন অতীতের ছবি তাহাতে ম্লান হয় না, কারণ প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইটালি দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য অনেক—স ম গ্র উত্তর-ভারতের সম্মিলিত বাহিনীর অধিনেতা সম্রাট অশোকের সঙ্গে সমানে সমানে লড়িয়াছিল যে কলিঙ্গরা তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান উড়িষ্যার যতটা পার্থক্য প্রায় ততটাই। তবে প্রাচীন রোমান জেনারেলের

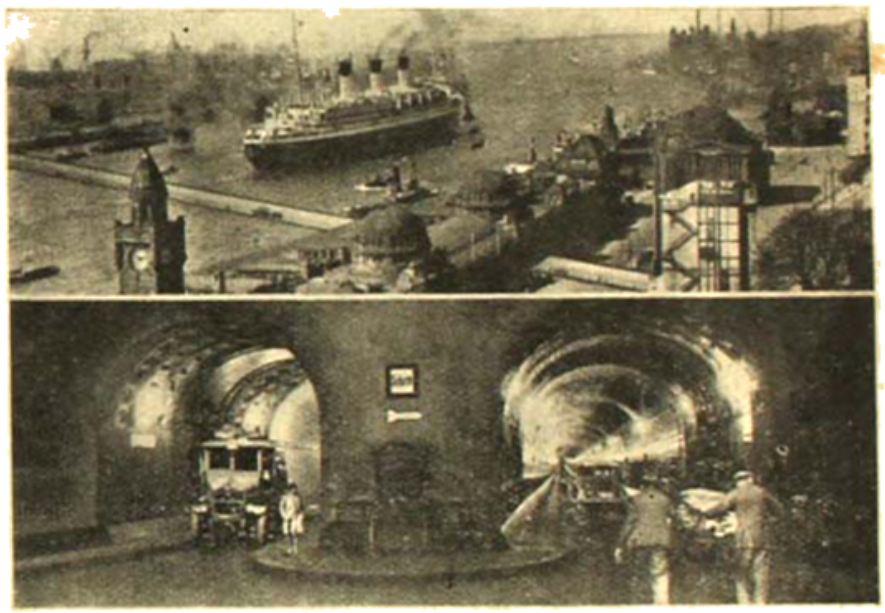

ডানদিকে : একটি নবীন যুদ্ধজাহাজ।

শৌর্য্য ও সেনেটারের বুদ্ধি লইয়া একটি লোক পরভূতের মত নবীন ইটালিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মুসোলিনি। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দুষ্কৃতদের সম্পূর্ণ বিনাশ না হইলেও সমুচিত শাসন হইয়াছে এবং তরুণ ইটালি তাঁহাকে একবাক্যে "ইল্ দুচে"—Il Duce অর্থাৎ The Leader বা নায়ক আখ্যা দিয়াছে। ইটালির যেখানে গিয়াছি সর্ব্বত্র যেন দুচের দণ্ড সমুদ্যত দেখিয়াছি। নেপ্‌ল্‌সে জাহাজ হইতে নামিবার সময় দেখিলাম লগেজ-ঘরে বন্দুকধারী ব্ল্যাক-শার্ট পাহারা বসিয়াছে। হোটেলে উঠিয়া দেখিলাম, ঘরে ঘরে দুচের হুকুমে নোটিশ ঝুলান রহিয়াছে, কোন্ ঘরের ভাড়া কত, কি কি আসবাব-পত্র আছে ইত্যাদি। পোম্পেই যাইতে সুপ্রশস্ত রাস্তা দেখাইয়া মোটর-ড্রাইভার বলিল উহা দুচের নির্ম্মিত। তাহাদের লোকে শিখাইয়া দিয়াছিল ইটালির কোনও স্থানে কোন রকম মুস্কিল, ভাবনা বা অসুবিধায় পড়িলে তৎক্ষণাৎ ব্ল্যাক-শার্ট-গার্ডদের স্মরণ লইতে। রোমের যে বাড়ীতে দুচে আপিস করেন, বাহার জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিশিষ্ট বীর্য্যময় ড্রামাটিক ভঙ্গীর সঙ্গে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করেন, তাহার সম্মুখ দিয়া লোকে সসম্ভ্রমে সভয়ে চলাফেরা করে; পেরুজার সুনীল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ইটালিয়ান্ এরোপ্লেনবাহিনীর খেলা দেখিয়াছি—যেন দুচের বজ্রমুষ্টি আকাশে প্রসারিত হইয়া দুষ্টদের সাবধান করিতেছে। উম্‌ব্রিয়ার নির্জ্জন প্রদেশে পাহাড়ের পথে ঘোড়সওয়ার ও কামানবাহী সেনার কুচ দেখিয়াছি, সেখানেও দুচের জয়ধ্বনি ফাসিষ্ট সম্মিলনীতে জনতা "দু-চে, দু-চে, দু-চে·····"নিনাদে উল্লাস প্রকাশ করে।

ইউরোপে আজ গণতন্ত্র উঠিয়া গিয়া একজনের একচ্ছত্র শাসন আরম্ভ হইয়াছে। লেনিন যে পদ্ধতিতে রুশিয়ার রাজবংশ ও আমলাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া কমিউনিজ্‌ম প্রবর্ত্তিত

করিয়াছিলেন, ইটালিতে মুসোলিনি অনেকটা সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফাশিজম প্রবর্তন করিলেন। জার্মাণীর নাট্‌সিজম ফাশিজমেরই অনুকরণ। মুসোলিনির প্রতিমূর্ত্তিতে এখন দেশে দেশে ডিক্টেটার তৈয়ার হইতেছে। কমিজার রেড-শার্টের পর হইল ইটালির ব্ল্যাক-শার্ট, তারপর জার্মাণীর ব্রাউন-শার্ট, এখন ক্রমে ইউরোপ ব্লু, গ্রীন নানা রংএর শার্টে ছাইয়া যাইতেছে।

ছিল। কমিউনিজমের প্রসার ইউরোপে যেখানেই হইয়াছে সেখানেই ইহার ভাল দিকটার ওজুহাতে একদল নিষ্কর্ম্মা ভণ্ডের হুজুগে মাতাইবার খুব সুবিধা হইয়াছিল। ইটালিতে শুনিলাম প্রায়ই এরূপ হইত যে পাদরী বা মিলিটারি-অফিসার প্যাসেঞ্জার থাকিলে কমিউনিষ্ট দলের রেলের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিতেন, বলিতেন, "আমরা ধর্ম্ম, ভগবান মানি না, ক্যাপিটালিষ্ট মিলিটারিজম মানি না, পাদরি বা মিলিটারি-

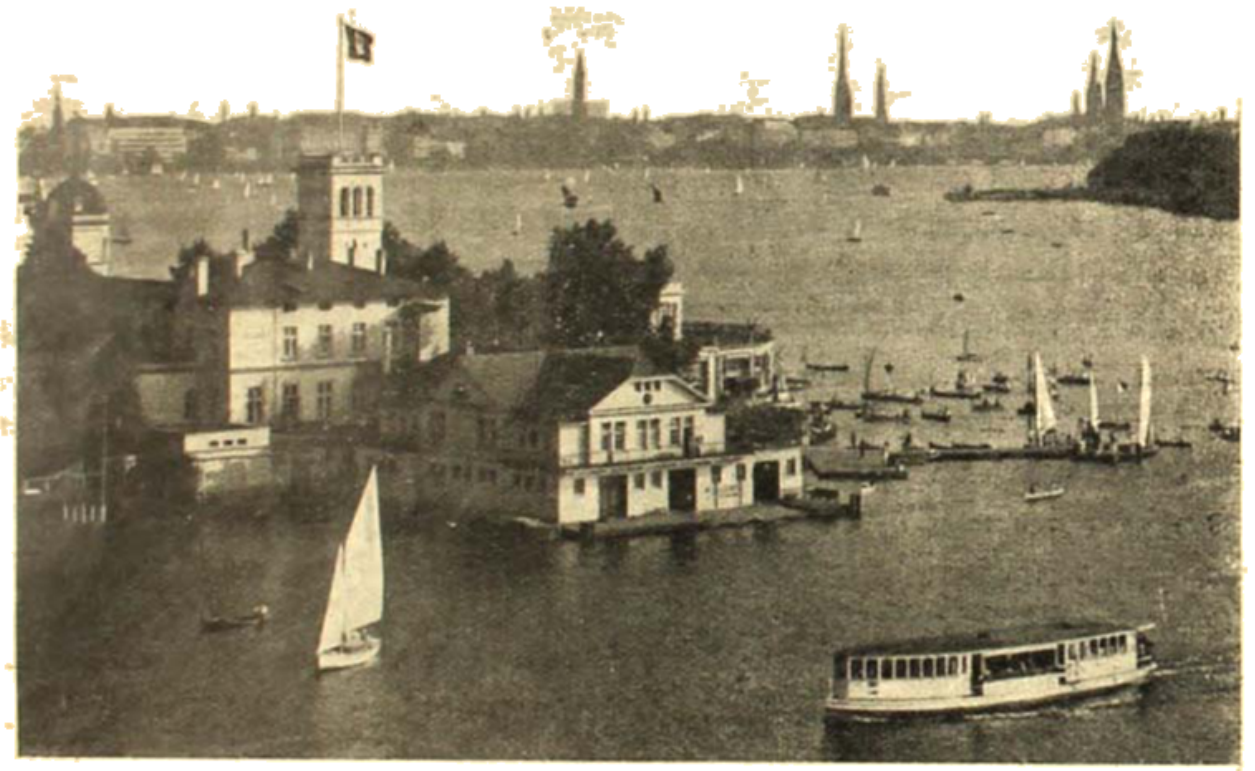

ছাদুর্গ : আলষ্টারের দৃশ্য।

ভণ্ডের দমন, পাষণ্ডদলন, 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' ইটালিতে মুসোলিনি যে ভাবে করিয়াছেন তাহাতে সে দেশের জীর্ণ-কঙ্কালে নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। দলাদলি, একটু ক্ষমতা ও সামান্য শক্তিধারী লোকদের পরস্পর পিঠ চাপড়াচাপড়ি, ঘুঁষ-বকশিষের ছড়াছড়ি, সুচতুর স্বার্থান্ধ পোলিটিশিয়ানদের সুদীর্ঘ বাক্‌জাল-বিস্তারে ইটালির অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর যুদ্ধের পর রুটা কমিউনিজমের দৌলতে দেশে অব্যবস্থা ও অরাজকতার পুরা রাজত্ব চলিয়া-

অফিসারকে লইয়া গাড়ী চালাইব না।" বাস্তবিক শত শত অন্ধ প্যাসেঞ্জারদের হাজার অনুরোধ উপরোধ অনুবিধা উপেক্ষা করিয়া গাড়ী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিত, ধর্ম্ম-ভগবান-ক্যাপিট্যালিজমের প্রতিনিধি বেচারারা দূরীভূত হইলে তবে নকল-লেনিনবীরেরা গাড়ী চালাইতেন!

অতীত ও বর্ত্তমান ইটালীর সঙ্গে প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতের অবস্থার অনেক সাদৃশ্য আছে। মুসোলিনির নেতৃত্বে নবীন ইটালিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার আসিয়াছে—প্রকৃতপক্ষে

স্থানে থুথু ফেলিলে জরিমানা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুষখোর স্বার্থপর বক্তৃতাবাজদের দমন পর্য্যন্ত—তাহা হইতে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ইংরেজের পরাধীনতাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়, তাছাড়া আমাদের আর সবই ঠিক আছে, এই মত যে কত ভ্রান্ত তাহা আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল লোকেই বলিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সকলেই বলিয়াছেন আমাদের প্রধান ব্যাধি আমরা নিজেরাই, ইংরেজ নয়। আমাদের লৌকিক ধর্ম্মের অসারতা, সমাজের পক্ষপাতদুষ্ট পঙ্গুত্ব ও ব্যবহারের দুষ্টতা যে কিরূপ ও কোথায় তাহা ইউরোপের হাওয়া লাগাইবার পরই পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করে।

রোমের হোটেলে একদিন সন্ধ্যায় বাঙ্গালীদের চা-চক্রের পর মুসোলিনির কথা ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নায়কদের দুষ্টতার কথা আলোচনা হইতেছিল। অধ্যাপক প্রমথবাবু সজোরে দাবী করিলেন যে India needs a Mussolini। দেশে বসিয়া দেশবাসীর চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, উপস্থিতদের মধ্যে কেহ কেহ গাত্রজ্বালা অনুভব করেন (ভূতদের কাছে রামনাম করিলে তাহাদের যেরূপ অবস্থা হয়)। কেহ বা ইংরেজদের দোষ দেখাইয়া নিজেদের আটনেসের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন, কেহ আবার "কেন হবে না? পোলিটিকাল পরাধীনতা বা ইকনমিক দুরবস্থা—" প্রভৃতি বাজে কথায় সত্যটিকে চাপা দিয়া নিজেদের ভুলান। ইউরোপের হাওয়ায় বসিয়া কিন্তু আমাদের চক্রের কেহই প্রমথবাবুর কথার কোনরূপ প্রতিবাদ প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বহুকাল তো বাবা বাছা বলিয়া দেখা গিয়াছে, দুষ্টামির লাঘব হয় নাই, তাই এখন দলবদ্ধ বলপ্রয়োগ, প্রহার প্রভৃতি মুসোলিনি-নীতি দ্বারা দুষ্টদের শাসন যখন প্রমথবাবু দাবী করিলেন তখন সকলের পূর্ণ সম্মতি হইল।

সমাজ যাঁহাকে ভগবান আখ্যা দিয়াছিল তাঁহার মুখে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানী গীতায় বলিয়াছেন, "যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, যখনই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি জন্মগ্রহণ করি; সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" সেকালের ধর্ম্মের জন্য সেকালের ভগবান ছলবল মুদ্ধ সবই নাকি করিয়াছিলেন। এ যুগের ধর্ম্ম সমাজের ধর্ম্ম, ওধার ধর্ম্ম নয় —সে ওধা পাহাড়েই হউক আর মনেই হউক; এ যুগের ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ধর্ম্ম; এ ধর্ম্মের স্থাপনা, বিশেষতঃ এ ধর্ম্মের পরিপন্থী অধার্ম্মিক দুষ্টদের তাড়নার জন্য সমুচিত বলপ্রয়োগ কি অন্যায়? মুসোলিনির বীর্য্যে কি ঐশীশক্তি নাই? শাস্ত্রই তো বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ ও চ্যান্সেলার হিটলার।

একটি জিনিষ ইটালিতে লক্ষ্য করিলাম যে অপেক্ষাকৃত ইউরোপীয়ান উত্তর-ইটালির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ওরিয়েন্টাল ও দুষ্ট দক্ষিণ-ইটালিতে মুসোলিনির খাতির, ভয় ও পূজা বেশী। হাতী ঘোড়ার চেয়ে জাতিতে হীন দুষ্টদের পক্ষেই মুণ্ডরের প্রয়োজন বেশী এবং মূর্খরা অন্য সব ঔষধের চেয়ে লাঠিতেই বেশী উপকার পায়, ইহা তো প্রবাদই হইয়া গিয়াছে।

ইটালির লোক ভারত সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। আমাদের দিকে লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিত, আমরা কোন্ দেশের লোক আলোচনা করিয়া যাহার যাহা মনে হইত মন্তব্য প্রকাশ করিত। কেহ বলিত ইজিপশিয়ান, কেহ বলিত নিগ্রো, কেহ বলিত আমেরিকান। যাহারা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান তাহারা আমাদের মুখে ইংরেজি দুএকটা কথা শুনিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিত আমরা ইংরেজ। আমরা বাঙ্গালীরা যখন দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম তখন রোম হেন

সহরের রাস্তার নরনারী অবাক হইয়া বিস্ময়ের মত তাকাইয়া দেখিত। ছেলেরা কখনো কখনো বিড়াল ডাকা ও হাসি ঠাট্টাও করিত। ভারত সম্বন্ধে এখনকার শিক্ষিত লোকদের ধারণা বড় জোর এই পর্য্যন্ত যে সে দেশ ধর্ম্ম দর্শন প্রভৃতির একটা রোমান্টিক লীলাভূমি।

সাধারণ লোকের ভারত সম্বন্ধে ধারণার সম্বন্ধে কয়টি কাহিনী দিতেছি। ফ্লোরেন্সের একটি দোকানদার আমাকে জিনিষ বিক্রয়ের পর সহসা নিরীক্ষণ করিয়া 'দেশ কোথায়' ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "ইয়ো সোনো ইন্দিয়ানো (io sono indiano, আমি ইণ্ডিয়ান)।"

নাম্বর : রাংকেলেকে পাহাড়।

মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথকে রাজার অধিক সম্মানের সহিত রোমে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর রবীন্দ্রনাথ জেনীভাতে গিয়া মুসোলিনি-বিদ্বেষীদের প্ররোচনায় যখন ফাসিজমের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করিলেন তখন ফাশিষ্টরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তাই ইটালির ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম করিলে আজও সকলে নিঃশব্দে গম্ভীর হইয়া থাকে এবং অন্য কথায় অবতারণা করে। রবীন্দ্রনাথ ফাশিজম্-বিরোধী অতএব তিনি এখানে অপাংক্তেয়, মুসোলিনি-বিরোধীদের চর্চ্চায় আমরা যে কারণেই হউক যোগ দিতে পারি না—এই রকম ভাবটা।

দোকানদার কিছুক্ষণ না বুঝিবার ভঙ্গিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একগাল হাসিয়া খুব মাথা ঝাঁকাইয়া "সি সি, কাপিতো কাপিতো (si si capito capito—হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি)" বলিয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া একখানা পুরান খবরের কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইলেন—এক প্রকাণ্ড রেড-ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের ছবি!

পেরুজা সহরে একটি রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেই সে পাড়ার ছেলেরা আমার পিছন লইত। আরবদলীদের সঙ্গে কথায় ভাষা-শিক্ষার সুবিধা হয় বলিয়া ছেলের দলের সঙ্গে আলাপ করিলে ছেলেরা সেই একই প্রশ্ন করিল এবং আমার

উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। হঠাৎ একটি ছেলে তীরবেগে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া অবিলম্বে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিয়া আসিল, দেখিলাম বগলে একগাদা ছেলেদের পত্রিকা; পরিশ্রমে উত্তেজনায় উৎসাহে ছেলেটির বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া খুলিয়া আমাকে দেখাইল, পাতায় পাতায় মাথায় পালকগোঁজা অর্দ্ধনগ্ন রেড-ইণ্ডিয়ানদের মূর্ত্তি! লাল ও কাল ইণ্ডিয়ানের তফাৎ অনেক কষ্টে এদের বুঝাইতে হইয়াছিল। একটি ছেলের দৃঢ় ধারণা ছিল আমার চোখ ঘোর অন্ধকারেও বিনা আলোতে দেখিতে পায় ও আর একটি ছেলে অতি সন্তর্পণে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মানুষের মাংস খাই কি না! মজাও লাগিত আবার হতভাগারা রেড-ইণ্ডিয়ানের খোঁজ রাখে আর আমাদের নামও জানে না ভাবিয়া রাগও হইত।

জ্যুর্স: আলস্টারের একটি কোণ।

আমার দেশ হইতে ইটালিতে আসিতে জাহাজে বার চৌদ্দ দিন লাগে শুনিয়া একটি হোটেল-কর্ত্রীর এত বিস্ময়বোধ ও শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, সেদিন হইতে সে আমাকে "সিনিওরে signore হে মহাশয়!" সম্বোধন ছাড়া মধ্যে মধ্যে "সেনাতোরে senatore হে সেনেটার!" বলিয়াও ডাকিত। হায়, রোমে ঘুরিলাম-ই! কোরামে দাঁড়াইয়া বাগ্মী সিসেরোর ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিবার বা সমরবিজয়ী কূটবুদ্ধি বাক্‌চতুর প্রথমরাজনবরত জুলিয়াস সীজারের প্রকাণ্ড সেনেট-সভার মধ্যে হত্যা দেখিবার বা মহামান রোমের বিপণে উদ্ভাসিত সম্রাট নীরোর সলীল বংশীবাদনও শুনিবার সৌভাগ্য হইল না! কিন্তু তবু এই সামান্য নারীর মুখে প্রাচীন রোমের সেনেটারের অভিধালাভ করিয়া কল্পনা রঙ্গীন হইয়া উঠিত।

ইটালিয়ান সীমান্ত ব্রেণেরো Brennero হইতে শরতের শোভার মধ্যে ব্যাভিরিয়ান আল্‌পস পার হইলাম। আল্‌পসের এই অংশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ চলিয়াছে, পাশের পাহাড়গুলির গা কি সুন্দর সবুজ, মাথা প্রায়ই সাদা বরফে আচ্ছন্ন। লাইনের পাশে কলস্বনে খরস্রোতা পার্ব্বত্যনদী ছুটিয়াছে, দুই পাশে কত সুন্দর সুন্দর শ্যামতৃণাচ্ছন্ন মাঠ, কত বাগান, কত ছবির মত বাড়ীঘর। পাহাড়ের গায়ে কত পাঁচ আঙ্গুল দেবদারুর বন। এমন কমনীয় শান্তশোভা পৃথিবীর বুঝি আর কোথাও নাই! আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নাই কিন্তু ট্রপিকাল দৃশ্যের চেয়ে এদেশের স্বভাবশ্রী অনেক মৃদু, অনেক কোমল ও পিক্‌চারেস্‌ক। প্রকৃতির নিসর্গশোভার উপর এখানে বিজ্ঞানের কৌশল ও মানুষের সযত্নবিপুণ হাত আটের প্রলেপ দিয়াছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত ফল বিক্রয় হইতেছে—আঙ্গুর, চীজ, গরম ও সুপুষ্ট মুর্গীর ঠ্যাং, একটু নুন, কয়েকটা দাঁতের খড়কে (এই জিনিষটির সারা ইটালিতে বড়ই প্রচলন) ও ছোট এক বোতল লাল ওয়াইন সহ লাঞ্চ-বাসকেট টাকা খানেকের মধ্যে পাওয়া যায়। ষ্টেশনগুলির কাছে কাছে টুরিষ্টদের জন্য ছোট ছোট হোটেল। চারিদিকের মনোলোভী শোভা দেখিয়া মনে ইচ্ছা হয় যে নামিয়া এখানেই চিরদিন থাকিয়া যাই।

ইন্‌সব্রুক (Innsbruck) ষ্টেশনের পর অষ্ট্রিয়ার পড়িলাম এবং অষ্ট্রিয়ার এই ক্ষুদ্র অংশটুকু অচিরে পার হইয়া

কুফষ্টাইন (Kufstein) ষ্টেশন হইতে জার্মাণীর সীমার প্রবেশ করিলাম। প্রতি সীমান্তে গাড়ী থামাইয়া একটু পুলিশ ফরম্যালিটি হয়, গাড়ীর মধ্যেই পাসপোর্ট পরীক্ষা ছাপমারা প্রভৃতি শেষ হয়। এসব বিষয় অকারণ হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। ফ্রোরেন্সের পথে কয়েকজন জার্মাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, হঠাৎ তাঁহাদের একজন আমার কামরায় আসিয়া দেখা করিলেন। পূর্ব্বপরিচিতের দর্শনে আনন্দিত হইলাম। তিনিও এই ট্রেণেই দেশে ফিরিতেছেন, বরাবর আমার ট্রেণে ঠিক পাশের কামরাতেই আসিতেছেন। কথায় কথায় বলিলেন, তাঁহার কামরায় দুটি ইংরেজীভাষিণী মহিলা যাইতেছেন, আলাপ করিতে আপত্তি আছে কি? আলাপে জানিলাম, মহিলাদ্বয় আমেরিকান, একটি যুবতী ও একটি তরুণী, হাইডেলবার্গে যাইতেছেন। আরও জানিলাম, গতবার যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন জেনীভাতে বসিয়া "রিলিজন অভ ম্যান" লেখার সময় কবিকে এই মহিলা প্রবন্ধটি পাণ্ডুলিপি হইতে সমস্তটা টাইপ করিয়া দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর মিউনিক ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইটালীর গাড়ী এইখানে শেষ। সোজা হামবুর্গ যাইব ঠিক ছিল বলিয়া এবারে আর মিউনিকে থামিলাম না। গাড়ী বদল করিয়া মিউনিক হইতে হামবুর্গ রওনা হইলাম। মিউনিক প্রকাণ্ড ষ্টেশন, হাতে তিন ঘণ্টা সময় ছিল, তাই গেপেকট্রেগারের, (gepacktrager, অর্থাৎ কুলি) সাহায্যে মালপত্র রেষ্টরাঁতে লইয়া আহার সমাধা করিয়া ষ্টেশনে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলাম। হঠাৎ দেখিলাম, প্লাটফর্ম্মে 'ব্রাউন-শার্ট'দের ভীড় জমিতেছে। খোঁজ লইয়া জানিলাম, হ্যারণবার্গে নাট্‌সি দলের বাৎসরিক মহাসম্মেলন হইবে, সমগ্র জার্ম্মানি হইতে নাট্‌সিরা সেখানে সমবেত হইতেছে। পুরা ইউনিফর্ম্ম ধারী বৃহদাকার নাট্‌সিদের সদল সমারোহ ও প্লাটফর্ম্মের উপর মিলিটারিপদ্ধতিতে কুচকাওয়াজ দেখিয়া একটু ভয় ভয় ঠেকিল। কারণ ইংরেজী কাগজে বরাবরই পড়িয়া আসিতেছিলাম যে, নাট্‌সিরা ঘোর দুরাত্মা, কারণে অকারণে দেশী বিদেশী সকলের উপর অথবা অন্যায় আক্রমণ করিয়া মারাত্মক অত্যাচার করে। দেশ হইতে আসিবার সময় ইউরোপ-অভিজ্ঞ হিতৈষীবর্গ নাট্‌সিদের সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আবার মিউনিক হইতে ষ্টেণে দুইটি ব্রাউন-শার্ট আমার কামরায় সহযাত্রী হইল। একটা আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ফৌজদারি হাঙ্গামার আশঙ্কায় অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। একটা বেঞ্চের এক কোণে আমি ও অন্য কোণে ব্রাউন-শার্ট বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম, মধ্যে সমস্তটা বেঞ্চ খালি পড়িয়া থাকিল। মধ্যরাত্রে শীত বোধ হওয়ায় কম্বল বাহির করিয়া গায়ে দিয়া বেঞ্চের কোণে কুণ্ডলীকৃতি হইয়া শুইয়া পড়িলাম, নাকখানের খালি বেঞ্চটুকু উপভোগ করিবার চিন্তা বাদ দিলাম, কি জানি ওকোণের ব্রাউন-শার্ট কি করিয়া বসে! নূতন দেশে আসিয়াছি, সাবধানের মার নাই। শেষরাত্রের দিকে পায়ে ভার বোধ হওয়ায় তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া দেখিলাম, সামনের বেঞ্চের ব্রাউন-শার্ট ঢেঁকি অবতার হইয়া নিদ্রামগ্ন, আর আমার বেঞ্চের জনও লম্বা হইয়াছে এবং তাহার একখানি পা আমার পায়ের উপর। ভাবিলাম, হইলই বা ওরা দুইজন, হইলই বা একটু মারপিট, আমারও তো গায়ে জোর আছে, তাহাতে যায় তো ছয় ঘণ্টা হইল এদেশে প্রবেশ করিয়াছি, ইতিমধ্যে কি এমন নাট্‌সি-বিরোধী কাজ করিয়াছি? দেখাই যাক না, শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া পা দিয়া ব্রাউন-শার্টের পায়ে আস্তে ধাক্কা দিলাম। ব্রাউন-শার্ট তৎক্ষণাৎ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া বাকি রাতটুকু কাটাইয়া দিল। বস্তুতপক্ষে নাট্‌সিদের বিরুদ্ধে বিদেশে যত অপবাদ রটিয়াছে তাহার বার আনা ভুল ধারণাবশতঃ ও তিন আনা মিথ্যা। সে কথা পরে বলিতেছি।

পরদিন দুপুরে হামবুর্গ পৌঁছিলাম। এদেশের গাড়ী ইটালীর চেয়ে ভাল। থার্ডক্লাসের বাথরুমে ইটালীতে সাবান তোয়ালে পাওয়া যায়, এদেশের রেলে ব্যবস্থা আরও ভাল, ছোট ছোট তোয়ালে গাদা করা থাকে, ব্যবহারের পর পাশের একটা বাক্সে ফেলিয়া দিতে হয় এবং তাই প্রত্যেকেই নূতন-ধোয়া তোয়ালে পায়, জার্ম্মাণদের পরিচ্ছন্নতা সারা ইউরোপের আদর্শ। ইটালির নোংরামিকে ইংরেজরা আদর করিয়া the picturesque dirt of Italy বলিয়াছেন, কিন্তু জার্ম্মানীর পরিচ্ছন্নতাকে হিংসা করিয়া তার নাম দিয়াছেন the scandalous cleanliness of

Germany। বাড়ীর সদরদরজার দেওয়াল মেঝে আসবাব পত্র সর্বদা ঝাড়াঝোছা হইতেছে। দরজার মাথায় কার্নিসের উপর, আলমারির মাথায়, মাথার তিন চার ফিট উপরে ঝুলন্ত লাইটের শেডের উপর দিয়ে, যেখানে ধূলাময়লা জমিবার সম্ভাবনা সেখানে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একবার ঝুলের ঝাঁটা ও সাবানজলে ফিনাল ন্যাকড়া পড়িতেছে। ঘরের মধ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, বাড়ীর বাহিরের দেওয়ালের গায়ে ও বাড়ীর সিঁড়ি হইতে রাস্তা পর্যন্ত সিমেন্ট-বাঁধান পথের উপরও বুরুশ ও সাবানজলসহ দাসীদের নিয়ত মার্জন দেখিয়াছি।

ফ্লোরেন্সের ইটালিয়ান টুরিষ্ট-এজেন্সির কাছে খু টিকিট কিনিয়াছিলাম, কিন্তু সকালবেলায় চেকার আসিয়া বলিল, আমার টিকিট ঈস্থ হইয়াছে দ্রুততর পথের উপর দিয়া এবং এ গাড়ী যদিও শ্নেল্‌ট্‌সুগ (schnellzug—অর্থাৎ এক্স্ প্রেস) কিন্তু একটু ঘোরাও পথে যাইতেছে, কাজেই আমাকে কিছু বেশী ভাড়া দিতে হইবে। আমি বলিলাম, মিউনিকে তো এই টিকিট দেখাইয়াই ট্রেণের হামবুর্গ-নির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিলাম, তখন তো কেহ আমাকে নিষেধ বা সাবধান করিল না? চেকার বিনীতভাবে বলিল যে, সে জন্য সে দায়ী নহে কিন্তু আমার টিকিটের চেয়ে এই গাড়ীর রুট একটু বেশী ঘোরাও, কাজেই...ইত্যাদি। জার্মানীতে নিয়মের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, একটু ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম—"আমি বিদেশ হইতে আসিতেছি, তোমাদের নিয়ম ঠিক বুঝিতে পারি নাই, অতএব···ইত্যাদি।" সহযাত্রীরাও কয়েকজন এই 'অতএব' সায় দিলেন। "ছাড়িয়া দিলাম" বলিলে পাছে নিয়মের মর্যাদাহানি হয় তাই চেকার মাথা নিচু করিয়া অস্ফুটস্বরে "আচ্ছা দেখি" বলিয়া চলিয়া গেল আর আসিল না।

বিদেশীত্বের দোহাই দিয়া এদেশে অনেক আপদ নিবারণ করা যায়। ইটালিতে বিদেশীকে ঠকাইতে পারিলে বা তাহার নিকট ঘুঁষ লইতে পারিলে কেহ ছাড়ে না এবং ঘুঁষ দিলেই নিয়ম বদলাইয়া দেওয়া যায়। মুসোলিনি এই দুশ্চরিত্রতা অনেকটা দমন করিয়াছেন কিন্তু সাপ মাথা গুঁজিয়া আছে, মরে নাই। পোম্পেইতে প্রবেশদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, রক্ষকরা কোন বকশিস লইতে পাবিবে না এবং যে বকশিস দিবে তাহাকে বহিষ্কার করা হইবে, অথচ পোম্পেই-র প্রত্যেকটা রক্ষককে বকশিসগ্রাহী দেখিলাম। "আউস্‌লণ্ডের" (auslander—অর্থাৎ বিদেশী) এদেশে অনেক খাতির এবং নিতান্ত প্রয়োজন হইলে একমাত্র তাহার জন্য ছাড়া আর কাহারও জন্য নিয়মের কঠোরতা শিথিল করা হয় না।

ট্রাফিক কণ্ট্রোলের নিয়ম যাহাতে সকলে ঠিকমত পালন করে সেজন্য কিছুদিন আগে জার্মানীর সব সহরে এক সপ্তাহের জন্য নিয়ম হইয়াছিল যে, একটুমাত্র নিয়মভঙ্গ হইলে অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে জরিমানা দিতে নতুবা থানায় যাইতে হইবে। ট্রাফিক এদেশে অটোম্যাটিক আলোক-সঙ্কেত দ্বারা পরিচালিত হয়, যানবাহনের মত পাদচারীকেও এই সঙ্কেতানুসারে চলিতে হয়। বহু গাড়ী মোটর, বহু পাদচারী সামান্য ত্রুটিতে ধরা পড়িল, পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে রসিদ-বই বাহির করিয়া জরিমানা লিখিল, অপরাধী ও দিয়া তবে অব্যাহতি পাইল। বড় ছোট স্ত্রীপুরুষ কেহই বাদ পড়িল না, একা হামবুর্গ সহরেই এক সপ্তাহে অনেক হাজার টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছিল। বহু সাবধানতাসত্ত্বেও একবার আমি ধরা পড়িলাম, রাস্তা পার হইতে পুলিশ মাঝরাস্তা হইতে ডাকিয়া ফিরাইল; শুনিলাম, আমার অপরাধ এই যে চৌরাস্তায় রাস্তা পার হইবার সময় রাস্তার গলার কাছে পার না হইয়া মাথার উপর দিয়া পার হইতেছিলাম। পকেট হইতে জরিমানার-খাতা বাহির হইলে আমি আমার বিদেশিত্ব ও রাস্তার গলা-মাপা সম্বন্ধীয় আইনবিষয়ে অজ্ঞতা জ্ঞাপন ও দুঃখপ্রকাশ করিলাম, পুলিশ খাতা পকেটে পুরিয়া কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে রাস্তার গলায় পার হইবার উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিল। এখানে পুলিশকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পুলিশ স্যালুট করিয়া বক্তব্য শুনে ও কাজ শেষ হইলে আবার স্যালুট করে, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যতটা সম্ভব সহজ করিয়া আগাইয়া দেয়। জার্মানদের অসাধারণ নিয়মানুগত্য ও প্রতি বিষয়ের প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রখর দৃষ্টির দরুণ ইংরেজদের বিশেষত আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ইহাদের অপেক্ষাকৃত ধীর ও কম চটপটে বলিয়া ভ্রম হয়। জ্ঞানবুদ্ধিও কার্যদক্ষতা ইংরেজ ও আমেরিকানের চেয়ে জার্মানদের কম নয়, কিন্তু এরা স্মার্ট হওয়ার চেয়ে

sore হওয়ায় বেশি বিশ্বাস করে, কোনও কাজে তুলনামাত্র বা তাকির তিলমাত্র বন্ধ রাখে না।

চিঠির ভার অনুযায়ী টিকিট আধ পয়সা কম হইলে দিঠে দেবেল আঁটিয়া চিঠি ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আসে। কলিকাতা হইতে একবার লণ্ডনের এক পণ্ডিতের কাছে বুকপোষ্টে একখানা বই পাঠাইয়াছিলাম: কত টিকিট লাগিবে ওজনের জন্য ডাকঘরের বাবুদের একজনের হাতে দিলে তিনি অনেক নাড়িয়া-চাড়িয়া, বিলাতি পণ্ডিতের নাম দেখিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া শেষে ওজন করিয়া বলিলেন দশ পয়সা লাগিবে। টিকিট আঁটিলাম, কিন্তু মনে সন্দেহ রহিল, বাড়ী আসিয়া ডাকঘরের গাইড খুলিয়া দেখিলাম বাহা ওজন তাহাতে সাড়ে ছয় আনা লাগিবার কথা এবং আরও পড়িলাম যে অপর্যাপ্ত টিকিটযুক্ত করেন্ বুকপোষ্ট পাঠান হয় না কেননা ফেরৎও দেওয়া হয় না, নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তৎক্ষণাৎ উক্ত ডাকঘরে চিঠি লিখিলাম, উত্তরে ডাকবাবুরা ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, ভি-পি-ও হইতে যখন বই ফিরিয়া আসে নাই তখন ঠিকই পৌঁছিবে আশা করা যায়। যথা সময়ে বিলাতি পণ্ডিতের কাছ হইতে এই পাওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলাম কিন্তু জার্মান ডাক-বিভাগের তীক্ষ্ণ পটুত্ব দেখিয়া আজ মনে হইতেছে ঐরূপ ডবল ফুল শুধু ভারতেই বুঝি সম্ভব। এখানকার লোকের ইংরেজদের মত খুব ব্যস্ততার ভড়ং নাই এবং মার্কিনদের মত বেগোন্মত্ততাও নাই। টহারা চার ভাল করিয়া ঠিক করিয়া পাকা করিয়া সম্পূর্ণ সুন্দর নির্ভুল করিয়া কাজ করিতে। তাড়াতাড়ির জন্য তাড়াতাড়ি করে না, যেটুকু দেরি করে তাহা কাজটির ভালর জন্য। জার্মান তাড়াতাড়ি আর আমাদের দেশের ঢিলেমিতে অনেক তফাৎ। আমাদের দেশে যাদের উপর কাজের ভার থাকে তাহারা তাড়াতাড়ি করে না অন্য কতকগুলি কারণে—যথা জড়তা, আলস্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা ও কর্ম্ম-বিমুখতা বশতঃ এবং ঢুলামি বশতঃ, অর্থাৎ এই ভাব হইতে যে তাড়াতাড়িই যদি করিলাম, ঐ লোকটিকে বসাইয়া রাখিয়া দেরি করাইয়াই যদি না দিলাম তাহা হইলে আমার বাহাদুরিটা রহিল কোথায়! চটপট কাজ শেষ করিয়া দিলে ঐ লোকটির যে সুবিধা হইয়া যাইবে এবং তাহাতে ও আমার চেয়ে বড় ও আমি ছোট হইয়া যাইব!

হামবুর্গে পৌঁছিয়া মালপত্র ষ্টেশনে রাখিয়া আকাডেমিশে আউস্‌লাণ্ড্‌ষ্টেলেতে (akademische auslandstelle) গেলাম, এইটি ইউনিভার্সিটির বিদেশী বিভাগ। বার্লিনের ডরেটশে আকাডেমির পরিচয়-পত্র ছিল। এখান হইতে ভাড়া-ঘরের ঠিকানা কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া বাসা খুঁজিয়া একটি ঘর পছন্দ করিলাম। গৃহিণী একজন ব্যারণের বিধবা, ব্যারণ এই বৎসর মারা গিয়াছেন; মৃত ব্যারণ খুব বড় একটা কার্মের মালিক ছিলেন এবং পৃথিবীর প্রায় সকলদেশের সঙ্গে তাঁর কার্মের কারবার ছিল। যুদ্ধের পর ব্যবসায়ের ক্ষতি ও ব্যারণের হঠাৎ মৃত্যুতে ব্যারণ-পত্নী পরীব হইয়া গিয়াছেন এবং বাড়ীতে "লজার" রাখেন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি রেডিওর দোকানে কাজ করে এবং অষ্টাদশী মেয়েটি সিনেমায় অভিনয় শিখিতেছে। কি চাকর নাই, ব্যারণ-পত্নী একাই বাড়ীর সব কাজ করেন, ছেলেটি সকাল সন্ধ্যা চাকরি করে। মেয়েটি প্রায়ই বৈকালে বাহির হইয়া অনেক রাত্রে বাড়ী আসে, সকালে বারটা একটার আগে বিছানা ছাড়ে না, বাকি সময়টুকু ভাবী বৃত্তি-উপযোগিতা ভ্রূ কামানো, পাউডার মাখা ও সাজসজ্জাতেই কাটায়। মাসিক চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ মার্কের মধ্যে বেশ ভাল ঘর পাওয়া যায়। মার্কের দাম আগে দশ বার আনা ছিল, এখন প্রায় এক টাকাই।

হামবুর্গ প্রকাণ্ড সহর, বার্লিনের পর জার্মানীর দ্বিতীয় নগর এবং কন্টিনেন্টের বৃহত্তম পোর্ট। সহর খুব ছড়ান, কোন পথেই গাড়ীমোটর বা লোকের হুড়াহুড়ি নাই। বাণিজ্যপ্রধান সহর হইলেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ট্রাম, বাস, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল ও পাঁচ মিনিট অন্তর সহরের মধ্য দিয়া সাবারবান লাইনের ইলেকট্রিক ট্রেন চলিতেছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের নাম এখানে "হোখ্‌বান," hochbahn অর্থাৎ "উঁচু রেল"। কারণ মাটি স্থানে স্থানে নরম বলিয়া লাইন ছয় আনা অংশ মাটির নীচ দিয়া ও দশ আনা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যে প্রচুর পার্ক ও খোলা জায়গা। শরৎকালে পৌঁছিয়া দেখিলাম পার্ক বাগান ও রাস্তার দোকানে অজস্র কত রঙের বড় বড় ফুল। সহরের পাশে প্রকাণ্ড এলবে Elbe নদী, তলা দিয়া এপার ওপার ডবল-পথ-ওয়ালা সুড়ঙ্গ আছে, নামা-ওঠাটুকু মোটর,

মানুষ সকলকেই লিফ্‌টে করিতে হয়। সহরের মধ্য দিয়া আর একটি ছোট নদী (আমাদের দেশের খাল) আছে, নাম আল্‌ষ্টার Alster। আল্‌ষ্টারের খানিকটা অংশ বাড়িয়া একটা দীঘির মত হইয়াছিল, তাহাকে কাটিয়া বাড়াইয়া প্রকাণ্ড লেক বানান হইয়াছে। ইহার চারিপাশে বাগান, তারপর রাস্তা, মধ্যে অনেক ছোট নৌকা ও ফেরি-ষ্টীমার যাতায়াত করে। লেক লম্বালম্বি পার হইতে ষ্টীমারে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগে। লেকের মধ্যে অনেক রাজহাঁস, হাঁস, সোয়ান ও সামুদ্রিক পাখী মিউনিসিপালিটির খরচে পুষিয়া লেকের শোভা বাড়ান হইয়াছে। সহরে পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন বিষয়ক মিউজিয়ম আছে, একটিতে—এটি জাতিবিজ্ঞান-বিষয়ক—বাংলাদেশের মা-কালীমূর্ত্তি দেখিলাম। সহরের মধ্যেই বোটানিকাল গার্ডেন ও একপ্রান্তে বহু মাঠ বাগান সংযুক্ত প্রকাণ্ড ষ্টাট্‌পার্ক, stadtpark বা নগরোদ্যান। সহরের খানিকটা ঘুরে এলবে নদীর পাশে ব্লাংকেনেজে Blankenese পাহাড়, এই পাহাড়ের মাথায় রেষ্টরাঁ, সেখান হইতে এলবের দৃশ্য চমৎকার দেখায়।

জার্ম্মানীতে আসিয়া বিদেশীর প্রথমে চোখে পড়ে ব্রাউন-শার্টধারী নাট্‌সিদের। জার্ম্মানীর অধিকাংশ লোক এখন নাট্‌সিবাদী। রাস্তায় রাস্তায় স্বস্তিকচিহ্নিত ধ্বজাপতাকা, দলে দলে স্বস্তিকচিহ্নধারী ব্রাউন-শার্ট তরুণ তরুণী এমন কি প্রৌঢ়দেরও প্রোসেশন। আজ এখানে সম্মিলন, কাল ওখানে প্রোসেশন, তার পর দিন রেডিওতে হিট্‌লার বা অন্য দল-নায়কদের বক্তৃতা। রবিবারে গান গাহিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া বাঁশী বাজাইয়া সারাদিন নাট্‌সিদের প্রোসেশন ও প্যারেড। ব্রাউন-শার্টরা তো বটেই, তাছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই লোকে পরস্পরকে "হাইল হিট্‌লার Heil Hitler" বলিয়া হাত লম্বা করিয়া, উঠাইয়া অভিবাদন করে। এইরূপ হাত তুলিয়া সেলাম ইটালিতেও ফাশিষ্টরা চালাইয়াছেন—ইহা প্রাচীন রোমান স্যালুট। ব্রাউন-শার্টরা খুব জমকালো, প্রকাণ্ড তাহাদের মূর্ত্তি ও চলাফেরা দর্পপ, সোৎসাহ ; ইটালিয়ান ব্ল্যাক-শার্ট বেচারাদের কিন্তু একটু মিন্‌মিনে ভীতু ভীতু মনে হইত।

জার্ম্মানীতে কিছুদিন আগে সোশাল-ডেমোক্রাট দলের প্রাধান্য ছিল। এই ইংরেজি নামটির জার্ম্মানরূপ হইতেছে সোটসিয়াল ডেমোক্রাট (sozial demokrat), তাই লোকে ইহাদের সংক্ষেপে "সোট্‌সি, sozi" বলিত। তার পর হিট্‌লারের ন্যাশানাল-সোশালিষ্ট দল হইল, এই নামের জার্ম্মান উচ্চারণ নাট্‌সিওনাল সোট্‌সিয়ালিষ্ট nazional sozialist, লোকে বলিল, "নাট্‌সি nasi।" কমিউনিষ্টদের নামের মধ্যে z-এর বালাই না থাকিলেও সোট্‌সি নাট্‌সির সাদৃশ্যে উহাদের নাম হইয়াছিল "কোট্‌সি kosi।"

নাট্‌সিবাদ ও নাট্‌সিদের সম্বন্ধে অনেক অপবাদ রটিয়াছে। ইহাদের পার্টি ও প্রোগ্রাম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার করিলে কিন্তু ইহাদের নিজের দিকটা বুঝা যায়। যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর অপমান ও দুরবস্থা লাঞ্ছনা যথেষ্টই হইয়াছিল, তার পর খুটা কমিউনিজমের নৈরাজ্য অরাজকতা অব্যবস্থা মারামারি প্রকাশ্য খুন প্রভৃতি খুবই চলিয়াছিল। নাট্‌সিরা বলিল, আমরা দেশে শান্তি ও সুরাজ চাই, আমাদের বিরুদ্ধ জাতিরা আমাদের পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমরা আবার একতাবদ্ধ জার্ম্মানীর উন্নতি ও আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাই। কমিউনিষ্টরা ইহার বিরোধী, অতএব কমউনিষ্টদের উচ্ছেদ আমাদের করা চাই। দ্বিতীয়তঃ দূর করা চাই ইহুদিদের, কারণ ইহুদিরা টাকার জোরে জার্ম্মান ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরি পেশা সবের উপর আধিপত্য করিতেছে ও নিজেদের মুঠার মধ্যে রাখিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান জাতীয়তা বা জার্ম্মান আদর্শের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ বা সহানুভূতি নাই। তাহারা শুধু চায় পয়সা, পয়সার সুবিধা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট, তাহাতে জার্ম্মানজাতির লাভই হউক আর ক্ষতিই হউক। কাজেই জার্ম্মান জাতির পুনরুত্থানের জন্য ইহুদি বিতাড়ন একান্ত আবশ্যক। তাই কমিউনিজম ও ইহুদিদিগের খুন প্রভাব অবরোধ বিতাড়ন কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হইয়া নূতন "আর্য্য"—অ-সেমেটিক—জার্ম্মানীর অভ্যুদয় হইয়াছে।

ভাল মন্দ বিচার করিতেছি না, কিন্তু দেখিতেছি বিরোধী অনেক থাকিলেও দেশের অধিকাংশ লোক নাট্‌সি। ইহুদিদের প্রতি দুর্ব্যবহারে বাহিরের লোকের অবশ্য স্বভাবতঃই ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি ও নাট্‌সিদের প্রতি বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এই ইহুদি ব্যাপার ছাড়িয়া দিলে অন্য সব বিষয়ে নবীন জার্ম্মানী আত্মোন্নতি ও আত্ম-

সম্মানের জন্য যে প্রবল ও বিপুল চেষ্টা করিতেছে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। নাট্‌সি জার্ম্মানীর এই ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে নবীন ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার কোন পার্থক্য নাই। তরুণ ভারত সহজেই জার্ম্মানীর বেদনা কোথায় বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ইউরোপের অন্য জাতিরা জার্ম্মানীর এই আগ্রহে, এই উন্নতির চেষ্টায় অসন্তুষ্ট। কারণ জার্ম্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারিলে অপর সকলের ব্যবসাবাণিজ্য সকল বিষয়েই সুবিধা হয়। তাই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে এত প্রোপাগাণ্ডা, এত দুর্নাম ও কুৎসা। নাট্‌সিদের মহা অপরাধ এই যে, তাহারা নিজেদের ভালর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাই তাহাদের এত অপবাদ।

জার্ম্মানীতে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে বহা আগ্রহ, কর্ম্ম ও ব্যবস্থা চলিতেছে, বারান্তরে অন্য প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব কিন্তু একটা কথা অতিশয় বলা প্রয়োজন। ভারত বিষয়ে জার্ম্মানীর আগ্রহের কথা সকলেই জানেন, কিন্তু মধ্যে ভারতের কোন কাগজে রটান হইয়াছে দেখিলাম যে, নাট্‌সিরা ভারত-বিরোধী ও ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এই মিথ্যার জন্য নবীন জার্ম্মানীর শত্রুরা দায়ী, বাস্তবে ইহার কোন মূলই নাই। এখানকার সাধারণ লোক ভারত সম্বন্ধে একরকম অজ্ঞ হইলেও জানিবার ও শুনিবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশী; মহাত্মা গান্ধীকে এখানকার পঠনক্ষম অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্ত মহাভক্তি করে, মহাত্মার গতিবিধির প্রত্যেক কথাটি জার্ম্মান প্রেসে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। চিন্তাশীল সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহার লেখার ছাপ জার্ম্মান চিন্তাশীলদের মনের উপর গভীর হইয়া পড়িয়াছে। নাট্‌সি অ-নাট্‌সি সকল জার্ম্মানেরই ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান অল্প কিন্তু সমান আগ্রহ ও সহানুভূতি। একটুমাত্র পরিচয় আছে এমন জার্ম্মানও আমাকে গত ভূমিকম্পের কথা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। একটি পরিচিত ভদ্রলোক—ব্যবসা করেন, এমন খুব উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তও নহেন—পথের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া আমাকে প্রায় আধঘণ্টা প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে, মহাত্মার বিরুদ্ধে যে সব দলের কথা শুনা যাইতেছে তাহা কি যথার্থই না ইংরেজ বা মুসলমানদের কারসাজি!

পরিবর্ত্তন

—শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

তোমার মনের কথা স্পষ্ট করে বুঝিলাম আজ।
আমাদের নাম করি যে কলঙ্ক গাহিছে সমাজ
তুমি তাতে লজ্জা পেলে; বিস্তারিলে ছলনার জাল,
বাগ্রকণ্ঠে প্রচারিলে 'মোর প্রেম ঘৃণিত জঞ্জাল,
তুমি তারে চাহ নাই, আমি নিত্য নানাবিধ ছলে
ঢালিয়াছি ভালবাসা অশ্রুসহ তব পদতলে।
যে প্রেমের কথা লভি পুলকে নাচিত তব প্রাণ
আজি অপবাদ ভয়ে তারে তুমি কর অপমান?

অকিঞ্চন সত্তা তব ভরিল যে নব মহিমায়
তাহারে ভুলিয়া গেলে, লাঞ্ছিত করিলে উপেক্ষায়?
কেন, কেন বল দেখি এই কথা করিলে প্রচার—
আমার চাওনি তুমি, আমি তব পাত্র অবজ্ঞার!
করেছে মূঢ়তা তব আমার প্রেমের অপমান,
এ পাপ করিতে ক্ষমা অক্ষম আপনি ভগবান!

সহজে পেয়েছ তাই বুঝিলে না হারালে কি ধন;
জেনে রেখো একদিন উহারে করিবে অন্বেষণ
সমগ্র ভুবনময়, যশের মুকুট পরি শিরে
ফিরাব পথের ধূলি অনুতাপ তীক্ষ্ণ অশ্রুনীরে।

নূতন অতিথি হবে আসিবে তোমার দ্বারে
সুপ্রসন্ন হাসি দিয়ে পারিবে কি বরিতে তাহারে?
সে দিন আমার স্মৃতি অন্তরে উদিয়া বার বার
রুদ্ধ করি দিবে যত কলোচ্ছ্বাস আনন্দ-ধারার;
হাসি সে শুকায়ে যাবে, ঝরে যাবে বিশ্বমনোলোভা
প্রভাত-পদ্মের মত চল চল আননের শোভা।
পড়িবে পাণ্ডুর ছায়া চিরকুল অরুণ কপোলে,
কালিমা উঠিবে জাগি সুস্থিহীন নয়নের কোলে,
উষর জীবনকুঞ্জে ফুটিবে না আর কোন ফুল,
মধুঋতু আসিবে না সাথে লয়ে আশার মুকুল,
বৈশাখের রুক্ষজ্বালা চিরদিন রহিবে জীবন,
কালোমেঘে ঢাকিবে না কোন দিন তোমার গগন।

অপার পিপাসা রবে, রহিবে না মিটাবার আশা—
এই দিল অভিশাপ অজ্ঞাত মোর ভালবাসা।

পরমাণুকোষ ও তাহার রূপ

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকেই বৈজ্ঞানিক জড়ের চরম উপাদান পরমাণুর অভ্যন্তরের ইতিহাস আরম্ভ করিতে প্রয়াসী হন এবং কোন কোন দিকে ফললাভও করেন। ঐ শতকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরমাণুর উপাদানস্বরূপ ঋণ-তড়িদণু (electron) ও উদ্‌জানকোষ (proton) আবিষ্কৃত হয়। জড়বিজ্ঞানের হিসাবে, নানা সংখ্যায় ও নানা সমবায়ে এই দুইটি উপাদান বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু গঠিত করে। উহার অভ্যন্তরের ছবিটি বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড (Rutherford) অবিকল সৌর-জগতের উপমায় কল্পিত করেন। উহার অভ্যন্তরে একটি কোষ (nucleus) আছে। তাহার অবস্থিতি ও ব্যবহাররীতি সূর্য্যেরই মত। সেই কোষকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাহার চারিদিকে পদার্থভেদে বিভিন্ন সংখ্যক ঋণ-তড়িদণু স্ব স্ব অয়নপথে ঘুরিয়া থাকে। প্রত্যেক তড়িদণুর অয়নপথ ভিন্ন। দুইটির পথ কখনও এক হয় না। এই কারণে তড়িৎ-পরিমাণ ও বস্তুমান এক হইলেও ঘূর্ণায়মান দুইটি তড়িদণু কখনও সর্ব্বতোভাবে এক নহে। অয়নপথের পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য হইতেই আমরা পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেকটি তড়িদণুকে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিতে পারি। যেহেতু পরমাণুর কোনও প্রকার তড়িদ্‌ধর্ম্ম নাই, সুতরাং তাহার কোষে বাহিরের ঘূর্ণায়মান ঋণ-তড়িদণুসমষ্টিপরিমিত ধনতড়িৎ থাকিবে। সেই হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা সরল মৌলিক পদার্থ উদ্‌জানের পরমাণুতে একটি ঘূর্ণায়মান ঋণ-তড়িদণু ও তাহার কোষেও সেই পরিমিত ধনতড়িৎ বিদ্যমান। উদজানের কোষের ধনতড়িৎপরিমাণকে proton কহে। আমরা "উদজানকোষ" বলিব। দুই বৎসর পূর্ব্বেও electron ও proton বিজ্ঞানে দুই প্রকার তড়িতের একক (unit) হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই দুইটি একক সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। উহারা সমপরিমিত বিপরীত ধর্ম্মের তড়িৎ বহন করিলেও উহাদের বস্তুমান অত্যন্ত বিসদৃশ। উদজানকোষ বা protonএর তুলনায় ঋণ-তড়িদণুর বস্তুমান অগ্রাহ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদজানকোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ধনতড়িৎকণা এতাবৎ কাল জানা ছিল না বলিয়া উহাকেই ধন-তড়িতের একক হিসাবে গ্রহণ করা হইত। যাহা হউক, ঋণ-তড়িদণুর বস্তুমান হিসাব না করিয়া কেবল উদজান-কোষের বস্তুমান দ্বারাই সমস্ত উদজান-পরমাণুর বস্তুমান প্রকাশ করা চলে। গুরুত্ব হিসাবে মৌলিক পদার্থের তালিকায় উদ্‌জানের পর হিলিয়মের স্থান। উহার পরমাণুর অভ্যন্তরে দুইটি ঋণ-তড়িদণু বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তড়িদ্‌ধর্ম্মশূন্য হইতে হইলে উহার কোষে দুইটি উদ্‌-জানকোষ থাকিবে তাহা হইলেই হিলিয়ম পরমাণুর ওজন উদজান পরমাণুর দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় পাওয়া যায় চারি গুণ। এ অবস্থায় এই পরমাণু-কোষে চারিটি উদজানকোষ (proton) আছে বলিয়া ধরা প্রয়োজন। মাত্র দুইটি ঘূর্ণায়মান তড়িদণু থাকাতে, পরমাণুটিকে তড়িৎ-ধর্ম্মশূন্য করিতে আরও দুইটি ঋণতড়িদণু কোষে আছে বলিয়াই ধরিতে হইবে। তাহাতে কোষটিতে উভয় প্রকার তড়িৎ অবস্থিত থাকিলেও মোটের উপর উহা ধনাত্মক তড়িৎ সম্পন্নই হইবে, ও তাহার পরিমাণও বহিঃস্থ ঋণতড়িৎ পরি-মাণের সমান হইবে। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ঘূর্ণায়মান তড়িদণু সমূহের সংখ্যা ও সংস্থিতি সম্বন্ধে রসায়নশাস্ত্র জড়বিজ্ঞানের বহুল প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে। কোনও মৌলিক পদার্থ, অপর কোনও মৌলিক পদার্থের সঙ্গে কি অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া কি ধর্ম্মবিশিষ্ট অণু গঠন করিল, তাহার অধ্যয়ন হইতে পরমাণুর অন্তরমহলের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তদ্ব্যতীত, আলোকবিজ্ঞানের বর্ণচ্ছত্র অধ্যয়ন হইতেও ঘূর্ণায়মান তড়িদণু সমূহের বহু সংবাদ জ্ঞানগোচর হয়। কারণ রাসায়নিক মিশ্রণকার্য্য ও জ্যোতিরশ্মি বিকীরণক্রিয়া, উভয়ই ঘূর্ণায়মান ঋণতড়িদণু সহযোগে সম্পাদিত হয়। প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থের অভ্যন্তরের ঘূর্ণায়মান তড়িদণু সমূহের জ্ঞান, উক্ত দুই প্রকারেই লব্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতকের প্রথম কুড়ি বৎসরের মধ্যেই পরমাণুর অন্তরমহলের বহু সংবাদ বৈজ্ঞানিক অবগত হইলেও, উহার খাসমহল বা কোষের সংবাদ বিশেষ কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। কারণ এ অঞ্চলে বন্ধন বড় সুদৃঢ়। যে প্রকার পরীক্ষা ঘূর্ণায়-

মান তড়িদণু মহলে প্রয়োগ করা চলে, দৃঢ়তর কোষের উপর তাহা দ্বারা কোন ফলই হয় না। যে শক্তিবলে সেখানে প্রবেশলাভ করা সম্ভবপর তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই।

সম্বন্ধে চেষ্টার প্রথম সূচনা হয় ইউরোপীয় মহাসমরের প্রাক্কালে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। তখন রঞ্জনরশ্মির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এই তথ্য জানা ছিল যে, উহা উৎপন্ন হয় তখনই, যখন অতি বেগে ধাবমান ঋণতড়িদণু, অকস্মাৎ কোন ধাতব পদার্থে প্রহত হয়। সুতরাং, রঞ্জনরশ্মির প্রকৃতি অনেকাংশে ঐ পদার্থটির উপর নির্ভর করে—যাহার উপর তড়িদণু প্রহত হইল। এই প্রকার বিভিন্ন পদার্থসঞ্জাত রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষা হইতে মোজ্লে (Mosley) প্রথমে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এমন এক নিয়ম আবিষ্কার করেন যাহাকে বর্তমান পরমাণুকোষ-তত্ত্বের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই নিয়মে পদার্থের পরমাণুকোষের তড়িৎ পরিমাণ সেই পদার্থসহযোগে উৎপন্ন রঞ্জনরশ্মির প্রকৃতির সম্পূর্ণ নির্ণায়ক। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে পরমাণুর বস্তুমান মুখ্যতঃ পরমাণুকোষের বস্তুমান দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। তাহা হইলেই মোজ্লের নিয়ম হইতে এই দাঁড়াইল যে রঞ্জনরশ্মির প্রকৃতি উহা যে পদার্থ সহযোগে উৎপন্ন হয় তাহার পরমাণুর ওজনের উপর নির্ভর করে। এই ভাবে পরমাণুর ওজন ও তাহার কোষের তড়িৎ পরিমাণ, এই উভয়ের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। প্রায় সেই সময়েই আরও দুইটি পরীক্ষা হইতে এ সম্বন্ধ আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে। রাদারফোর্ড (Rutherford) আল্‌ফাকণার বিক্ষেপন (scattering) হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরমাণুর কোষস্থ তড়িৎপরিমাণ-সংখ্যা উহার ওজন-পরিমাণ-সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, রসায়ন-শাস্ত্রে পরমাণুর ওজন যাহা বলা হয়, তাহা আপেক্ষিক। সাধারণতঃ অম্লজানের (oxygen) পরমাণুকে ১৬ ধরিয়া লইয়া উহার তুলনায় অন্যান্য সকল পদার্থের পরমাণুর ওজন ব্যক্ত করা হয়। যাহা হউক, এদিকে আবার বার্কলা (Barkla) রঞ্জন রশ্মিরই বিক্ষেপন হইতে দেখিতে পাইলেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ঘূর্ণায়মান তড়িদণু-সংখ্যা উহার ওজন-পরিমাণ-সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। এই ভাবে কোষের তড়িৎ-পরিমাণ-সংখ্যা অথবা ঘূর্ণায়মান তড়িদণুসংখ্যা ভৌতবিজ্ঞানে রসায়ন-শাস্ত্রের পরমাণুর ওজন-সংখ্যা অপেক্ষাও বিশিষ্টতর আসন প্রাপ্ত হইল। এই সংখ্যাটির নাম Atomic number। আমরা বলিব "পারমাণবিক সংখ্যা"। এই সংখ্যা কত জ্ঞানপ্রদ তাহা কএকটি দৃষ্টান্ত হইতে সম্যক্ ধারণা করা যাইবে। অম্লজানের পরমাণুর ওজন-পরিমাণ-সংখ্যা ১৬, পারমাণবিক সংখ্যা ৮। সুতরাং উহার অভ্যন্তরে ৮টি ঘূর্ণায়মান ঋণ-তড়িদণু আছে এবং উহার কোষস্থ ধনতড়িতের মোট পরিমাণ ৮ একক। স্বর্ণের পারমাণবিক সংখ্যা ৭৯। সুতরাং উহার পরমাণুতে ৭৯টি ঋণ তড়িদণু আছে ও কোষস্থ ধন-তড়িৎ পরিমাণ ৭৯ একক। এই প্রকার ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা ক্রমে উদ্‌জান হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরেণিয়াম নামক স্বতঃজ্যোতিবিকীরণশীল মৌলিক পদার্থ পর্য্যন্ত অধুনাজ্ঞাত সকল মৌলিক পদার্থকে পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে। এই প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র কি প্রকারে সরলতম উদজান হইতে একটি একটি করিয়া ঋণতড়িদণু ও সেই পরিমাণ ধনতড়িতের সংহতিতে এক একে সমস্ত মৌলিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস করেন।

পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ঘূর্ণায়মান ঋণতড়িদণুগুলি খুব দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নহে। শক্তি-সহযোগে কোন পরমাণু হইতে একটি বা অধিক তড়িদণু অপসারিত করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পরমাণুর ওজন বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলেও উহা তখন ধন-তড়িদ্ গুণ বিশিষ্ট হইবে। এই প্রকার বিশিষ্ট পরমাণু, আবার সুবিধা পাইলে, বাহিরের অন্য তড়িদণু দ্বারা অপসারিত তড়িদণুর স্থান পূরণ করিতে পারে। কিন্তু এই প্রকারের বিপর্য্যয় পরমাণুকোষে সংসাধিত করা সহজ-সাধ্য নহে। আবার যতক্ষণ বহিঃস্থ ঘূর্ণায়মান তড়িদণুসংখ্যা ঠিক থাকিবে, ততক্ষণ একই পদার্থের বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে কোনও প্রকার স্বাতন্ত্র্য রাসায়নিক বা জড়ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায় না, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত প্রকার পরীক্ষার ফলদানে কেবল মাত্র ঘূর্ণায়মান তড়িদণু সমূহই সহযোগিতা করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত ধনতড়িদ্ ও ঋণতড়িদণুর সমবায়ে পদার্থের পরমাণু গঠিত হইলে, উদজানের পরমাণুর ওজনের তুলনায়

সকল সজাতীয় পরমাণুর ওজন পূর্ণসংখ্যা দ্বারা জ্ঞাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু উহার ব্যতিক্রম বহু মৌলিক পদার্থে বর্ত্তমান দেখা যায়। ফলত যা পরমাণুর ওজন নির্ণয়ে কোনও প্রকার ভুলভ্রান্তি ঘটিতে পারে, সেই হেতু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, এষ্টন (Aston), যে যে উপাদের আবিষ্কৃত এক অভিনব উপায়ে অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে পরমাণুর ওজননির্ণয়ে প্রয়াসী হইলেন। প্রায় ঠিক একই সময়ে অন্য এক উপায়ে আমেরিকার ডেম্‌প্‌ষ্টার (Dempster) উক্ত কার্য্যসাধনে অবতীর্ণ হন। এই সকল পরীক্ষায় এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইল। দেখা গেল যে, অধিকাংশ মৌলিক পদার্থকে ঠিক মৌলিক বলা চলে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একই পদার্থের সকল পরমাণুর ওজন এক নহে। ইহারা ওই বা তাহোদিক বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সমবায় মাত্র। অথচ রাসায়নিক পরীক্ষায় পদার্থটিকে মৌলিক নামে অবহিত করা চলে। এই যে মৌলিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত তাহারই অন্যান্য রূপ পাওয়া গেল তাহাদের নাম দেওয়া হইল isotopes, আমরা বলিব "সমপদ" মৌলিক পদার্থ। অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের এই প্রকার "সমপদ" পাওয়া গিয়াছে। এই সেদিন সর্ব্বাপেক্ষা সরলতম উদজানেরও সমপদ বাহির হইয়াছে। ইহার পরমাণুকোষে দুইটি উদজান-কোষ (proton) ও একটি ঋণ-তড়িদণু ও বাহিরে পুরাতন উদজানের মতই একটি ঘূর্ণায়মান ঋণ-তড়িদণু আছে। ফলে এই নূতন উদজানের বস্তুমান পুরাতনের দ্বিগুণ। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে heavy hydrogen, বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে চান diplogen। আর ইহার কোষের নাম deuton। সাধারণ জলে উভয় প্রকার উদজানই আছে। আবার এমত জল করা যায় যাহাতে নূতন উদজানই অধিক পরিমাণে থাকে। এই প্রকার জলকে বলে heavy water।

যাহা হউক, "সমপদ" মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হইতে এই পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে ও রাসায়নিক পরীক্ষায় যে পদার্থ মৌলিক প্রতীয়মান হইতেছে, বিশেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাতেও স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট অন্য পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। পরমাণুর বহিরাংশ এক হইলেও অন্তরে খাসমহলে এমন কিছু সামান্য ব্যতিক্রম থাকিতে পারে যাহাতে একই পদার্থের পরমাণু এক না হইয়া বিভিন্ন হইতে পারে।

এই "সমপদ" মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারে, ইহা পাওয়া গেল যে সকল পদার্থের পরমাণুর ওজন পূর্ণসংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। এবং তাহা হইলে বস্তুমানের এই যে একক তাহা এক অদ্ভুতপূর্ব্ব সত্তা হইবে। এই এককটি কি? আমরা উদজানকোষকেই (proton) সেই একক ধরিতে পারি। ধনতড়িদ্ভাপক আর একটি একক আছে। পূর্ব্বে হিলিয়ম পরমাণুর কথায় উহার কোষের অবস্থা ও বাহিরে ঘূর্ণায়মান দুইটি তড়িদণুর কথা বলা হইয়াছে। এই পরমাণু হইতে তড়িদণু দুইটিকে অপসারিত করিয়া দিলে শুধু কোষটি থাকে। উহার মোট তড়িদ্ পরিমাণ দুই ধনতড়িদের একক বা দুইটি উদজানকোষ। স্বতঃজ্যোতি বিকীরণশীল পদার্থ হইতে যে আলফা কণা নির্গত হয় তাহাতে আর হিলিয়মকোষে কোনও পার্থক্য নাই। আর এই সত্তাটিকে এ যাবৎ কোন প্রকার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বিধ্বস্ত করা যায় নাই। উহা সকল অবস্থাতেই অবিকৃত থাকে। উদজান-কোষের মত উহা এক শাশ্বত বস্তু। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিক ধনতড়িদের এই দুই একক ও ঋণ-তড়িদণুকে লইয়া সকল পদার্থের পরমাণু-গঠন-রীতি অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অম্ল জান (oxygen) পরমাণুকোষে চারিটি আলফাকণা থাকিবে কিন্তু যবক্ষার জান (nitrogen) পরমাণুকোষে তিনটি আলফাকণা, দুইটি উদজান-কোষ ও একটি ঋণ-তড়িদণু থাকিবে। রাদার-ফোর্ডের পরীক্ষায় ইহাদের এই প্রকার গঠনের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বতঃজ্যোতি-বিকীরণশীল পদার্থ হইতে নির্গত আলফা-কণার প্রচণ্ড বেগ ও তদনুরূপ ক্ষয়কারী শক্তি। উহা দ্বারা প্রহত হইলে বহু পরমাণুকোষ ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রকারে দেখা যায় যে উদজানকোষ যবক্ষারজান পরমাণু হইতেই বাহির হয়, অম্লজান হইতে নহে।

পদার্থের "সমপদ"গুলিকে পৃথক করা যায় না। কারণ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করিতে হইবে তাহাতে সমপদ-গুলির পার্থক্য প্রতীয়মানই হয় না। সেইজন্য ইহাদের রাসায়নিক বা জড়ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। পরমাণুকোষের বস্তুমান সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে, উহার গঠনপ্রণালী অনুমান করাই সম্ভব। কিন্তু সেই অনুমানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বা পরীক্ষিত কোন ঘটনার

মিল দেখিলেই অনুমানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। এই প্রকার প্রাকৃতিক একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বেক্‌রেল (Becquerel) প্রথমে স্বতঃজ্যোতিবিকীরণশীল পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই সকল পদার্থ হইতে অহরহ অবিশ্রাম জ্যোতিবিকীরণ কার্য্য হইতেছে। এ জন্য বাহির হইতে কোনও শক্তিপ্রদানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ নির্গত জ্যোতিতে নিম্নলিখিতরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:

(১) যে জ্যোতির সাহায্যে ফটোগ্রাফবিজ্ঞান সম্ভব হয় ইহাও সেই শ্রেণীর জ্যোতি।

(২) ইহা অদৃশ্য জ্যোতি কিন্তু বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত পদার্থের উপর প্রহত হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দেখায়।

(৩) কোন প্রকার বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া বাতাসাতে ইহারা ঐ পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ঋণ-তড়িদণুকে বাহিরে অপসারিত করিয়া দেয়।

এই সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে পদার্থটির কোষে এক প্রকার বিপ্লব লাগিয়াই আছে ও উহা হইতে নানাদিকে নানাবেগে তেজধারা প্রধাবিত হয়। এই সকল তেজপ্রবাহকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) আলফা-কণা—উহাদের স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহারা হিলিয়ম কোষ ও সাধারণতঃ সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। তেজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ইহারা কএক ইঞ্চি বাতাসের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে।

(২) বিটা-রশ্মি—ইহাদের তেজকারী শক্তি আলফা-কণা অপেক্ষা অধিক। ইহারা ঋণ-তড়িদণু ও প্রায় আলোকের বেগে (সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল) প্রধাবিত হয়।

(৩) গামা-রশ্মি—ইহাদের তেজকারী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রঞ্জনরশ্মির ন্যায় ইহারা সাধারণ জ্যোতিস্তরঙ্গ। তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম।

উক্ত প্রকার রশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে পদার্থ টিতে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কালক্রমে উহা পদার্থান্তরে পরিণত হয়। হয়ত কোন না কোনও সময়ে কোনও না কোন কারণে কতকগুলি পরমাণুর অভ্যন্তরে এক প্রকার অস্থিরতার ভাব উপস্থিত হয়। তখনই তাহাদের কোষে এক প্রকার স্বতঃ-বিদারণক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফলে আলফাকণা বা ঋণ-তড়িদণু পদার্থটি হইতে বহির্গত হয়। সুতরাং কোষের পরিবর্ত্তন জন্য পদার্থটি পদার্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে জ্যোতিবিকীরণ দ্বারা পদার্থের পরিবর্ত্তন-তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম রাদারফোর্ড ও সোদি (Soddy) ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আলোচনা করেন। এই ভাবে ইউরেনিয়ম হইতে ক্রমে রেডিয়ম, ও তাহা হইতে পরিণামে সীসকের এক "সমদল" পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা স্বতঃবিদারণক্রিয়ার ফল। ইহা ব্যতীত বাহির হইতে শক্তিপ্রয়োগে কোন কোনও পদার্থের পরমাণুকোষে এক প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করা যায়। আলফাকণা দ্বারা প্রহত হইলে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের পরমাণুবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ সমূহ হইতে প্রায়শঃই অতিসত্বর বেগবান্ উদজানকোষ নির্গত হইতে দেখা যায়। সুতরাং স্বতঃবিদারণ ও কৃত্রিম উপায়ে কোষ বিদারণ দ্বারা প্রাকৃতিক ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান হইতে পরমাণুকোষে আলফা-কণা, উদজানকোষ ও ঋণ-তড়িদণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। কিন্তু কোষের অভ্যন্তরে ঋণ-তড়িদণুর স্থান করিতে গিয়া—আণবিক বর্ণচ্ছত্র বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানে ও হিসাবের জ্ঞানে নানা প্রকার বৈষম্য উপস্থিত হয়। বৈজ্ঞানিক সেই সমস্যার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপরের কৃত্রিম উপায়ে আলফাকণা দ্বারা প্রহত বহু পদার্থ হইতে উদজানকোষ নির্গত হইলেও, কতকগুলি পদার্থ (যেমন উদ্‌জান, হিলিয়ম, লিথিয়ম, বেরিলিয়ম, অক্সিজেন, অঙ্গার) ঐ প্রকার পরীক্ষায় কোনও ফলাফল প্রদান করিল না। উহাদিগকে লইয়াই নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ফলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এক অভিনব ঘটনার আবিষ্কার হইল। কোষের ভিতর এমন এক পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাকেই জড় পদার্থের শেষ কণা বলা যায়। ইহা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম এবং তাহারই মত তড়িদ্‌ধর্ম্ম-শূন্য। উদজানবাষ্পের পরমাণুকোষের বাহিরে ঘূর্ণায়মান ঋণ-তড়িদণুটি কোষের অত্যন্ত সন্নিকটে স্থির অবস্থায় থাকিলে কিন্তু কোষের অভ্যন্তরে চলিয়া যাইবে না—এই কল্পনায় যে সত্যটি পাওয়া যাইবে তাহাই তড়িদ্‌শূন্য নূতন জড়কণা।

ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে neutron। আমরা বলিব "পরমাণুকণা"। বিগত তিন বৎসরে তিনটি বিভিন্ন দেশে তিনটি ক্রমধারায় এই নূতন মিউট্রণ তত্ত্ব পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

জার্মেনীর Reichsanstadt এ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে Bothe ও Becker আলফাকণা সহযোগে নানা পদার্থের পরমাণু-কোষের নির্ণয়ের পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে পলোনিয়মপ্রজাত আলফাকণা দ্বারা প্রহৃত হইলে লিথিয়ম্, বেরিলিয়ম্ ও বোরন হইতে গামারশ্মির মত এক প্রকার অত্যন্ত ভেদকারী জ্যোতিধারা নির্গত হয়। এই জ্যোতিধারা বহু প্রকারে ব্যোমজ্যোতির (cosmic radiation) অনুরূপ। উপরের এই পরীক্ষা অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য, সেই কারণে জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ এই নব জ্যোতির স্বরূপ নির্ণয়ে অধিকতর প্রচেষ্টা করিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, ফরাসী দেশে উক্ত পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয়। Joliot ও Irene Curie পরীক্ষায় দেখিলেন যে এই সমস্ত জ্যোতি গামারশ্মি অপেক্ষাও ভেদকারী। বিশেষতঃ বোরন (Boron) হইতে নির্গত জ্যোতিধারা অনায়াসে দুই ইঞ্চি পরিমিত সীসার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। এই নবজ্যোতির আর এক ধর্ম্ম এই পাওয়া গেল যে, যে সমস্ত পদার্থে উদজান আছে তাহাদের ভিতর দিয়া উহাকে চালিত করিলে, বহু পরিমাণ দ্রুত ধাবমান উদজানকোষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই প্রকার কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ কার্য্যশক্তির প্রয়োজন, জ্ঞাত কোনও প্রকার জ্যোতিধারা হইতে সে পরিমাণ কার্য্যশক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতেই এই নব জ্যোতিধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে মহা আলোচনা আরম্ভ হইল। ইহা কি সাধারণ জ্যোতিস্তরঙ্গ, না কোন নূতন প্রকার জ্যোতিকণার প্রবাহ? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়া গেল অবশেষে ইংলণ্ডের কেভেণ্ডিস লেবরেটরী (Cavendish Laboratory) হইতে। Chadwick ও Feather ঐ জ্যোতিধারার কার্য্য কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা উহার পথিস্থিত কোনও বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর গতি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। এই প্রকার গতি পরিবর্ত্তন ও পরমাণু কর্ত্তৃক গৃহীত কার্য্যকরী শক্তির হিসাব হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে, কোনও প্রকার জ্যোতিস্তরঙ্গ হইতে এ প্রকার শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এই নবজ্যোতি তড়িদ্‌ধর্ম্মশূন্য পরমাণুকণা বা neutron এর প্রবাহ মাত্র। এই পরমাণু-কণাকে গোলাকার মনে করিলে উহার ব্যাস $১০^{-১৩}$ ইঞ্চির অধিক নহে ও বলায়নের তাপায় উহার ওজনও ন্যূনাধিক $১^{\cdot}০০৬৭$। এই neutron আবিষ্কার হওয়ার পর, উহা পরমাণু-কোষের সংবাদবহনকার্য্যে বৈজ্ঞানিকের অত্যন্ত সহায় হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, নোটের উপর কণাটি তড়িদ্‌শূন্য হওয়াতে, সাধারণ তড়িদাক্রান্ত পদার্থের মত উহার চতুষ্পার্শ্বে কোনও প্রকার শক্তিক্ষেত্র (field of force) থাকে না। সুতরাং কাহারও উপর প্রহৃত হইলে, উহা পূর্ণ বেগেই প্রহৃত হইতে পারে; নিজ শক্তিক্ষেত্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে কোনও প্রকার কার্য্যকরী শক্তির অপচয় ঘটে না।

আবার এই neutron সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে করিতে আর একটি নূতন জিনিষ জড়বিজ্ঞানে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক খুবই আশান্বিত ছিলেন। তাঁহাদের সে আশা সফল হইয়াছে। ঋণ-তড়িদণুর (electron) সমান বস্তুমান বিশিষ্ট কোনও একক ধন-তড়িতের ছিলনা। উহার একক উদজানকোষের (proton) বস্তুমান ঋণ-তড়িদণুর বস্তুমান অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে Irene Curie, Joliot, Anderson অত্যন্ত ভেদকারী গামারশ্মি, সীসক ও অন্যান্য পদার্থে প্রহৃত করিয়া ঋণতড়িদণুর সহযোগে এক প্রকার ধনতড়িদ্‌কণা নির্গত হইতে দেখিতে পান। উহা সর্ব্বপ্রকারে ঋণতড়িদণুর প্রতিরূপ। উহাই এখন ধন-তড়িতের একক হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে positron। আমরা বলিতে পারি ধন-তড়িদণু। গামারশ্মি প্রভাবে একই সময়ে উভয় প্রকার তড়িদণু উৎপন্ন হইতেছে। অধ্যাপক সাহা এই কার্য্যটিকে "তেজখণ্ডের তড়িদ্ বিকৃতি" (electrofision of a quantum into a positron and an electron) বলিতেছেন। তাঁহার মতে ধন-তড়িদ্‌কণা (যেমন আলফা-কণা, উদজানকোষ) ও নিউট্রন সহযোগে পদার্থের পরমাণু-কোষ গঠিত হয়। কোনও সময়ে তাহা হইতে আলফাকণা নির্গমন উপলক্ষে পরমাণুকোষটির অবস্থান্তরপ্রাপ্তির জন্য উহা

হইতে গামারশ্মি নির্গত হয় ও ঐ রশ্মি কোবেটেই প্রহত হইয়া তড়িদ্‌বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। পরিণামে আমরা দুই প্রকারের দুইটি তড়িৎকণা প্রাপ্ত হই। এই ব্যাপারটিকে জ্যোতিরশ্মি হইতে জড় পদার্থের উদ্ভবের দৃষ্টান্তস্বরূপ লইলে ভুল হইবে। যদিও ব্যোমজ্যোতির উদ্ভবের সহিত বিপরীত প্রক্রিয়াটি যুক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে গামারশ্মির তিরোধানে যাহা পাওয়া গেল তাহা তড়িৎকণা, জড়কণা নহে।

পরমাণু কোষের এই প্রকার ভাঙ্গাগড়া দ্বারা কোন্ প্রকার একককের সংহতিতে তাহারা গঠিত হইয়াছে তাহা ক্রমেই বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কি কৌশলে এই সমস্ত একক একত্র সংবদ্ধ আছে, কিংবা কোষের কোন প্রকার সন্নিবেশপ্রণালীর জন্য কি প্রকার কার্যকরী শক্তি হইতে পারে তাহা বিশেষ জানগম্য হইতেছে না। অধ্যাপক হাইসেনবার্গ (Heisenberg) কেবলমাত্র উদজান-কোষ ও নিউট্রণদ্বয়যোগে সকল পদার্থের পরমাণুকোষ সংগঠনের এক ব্যবস্থা দিয়াছেন। সমস্ত তেজ-তত্ত্বের (quantum theory) হিসাবে ঘূর্ণায়মান তড়িৎকণাগুলির অবস্থানরীতি ও গতিকৌশল লইয়া পরমাণুর সাধারণ ও অস্থির বা অসাধারণ অবস্থা আছে। পরমাণুকোষেও এই প্রকার অবস্থান্তর ঘটে বলিয়া মনে হয়। ঘূর্ণায়মান তড়িৎকণার হিসাবে কোন অস্থির অবস্থা হইতে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাগমন কালে পরমাণু যেমন নানাপ্রকার জ্যোতিরশ্মি প্রদান করিয়া থাকে, পরমাণুকোষ হইতেও অবস্থাবৈগুণ্যে সেই প্রকারে গামারশ্মি উৎপন্ন হয় এমত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তনে কোষের অভ্যন্তরস্থ এককগুলির সন্নিবেশপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ার জন্য পরমাণুর কার্যকরী শক্তির তারতম্য ঘটিবে।

বর্তমান জড়বিজ্ঞান যে প্রকার দ্রুত গতিতে কোষের তত্ত্বনির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় জড় পদার্থের গঠনরীতি বুঝিতে আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

পথ

—শ্রীমুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া

সুপ্তিমগ্ন সারা বিশ্ব, ঘোর অন্ধকার,
জনহীন পল্লীপথ, রুদ্ধ গৃহদ্বার।
নিভিয়া গিয়াছে তারা, দিগন্তের ভালে
মসীলিপ্ত ঘন রেখা কৃষ্ণমেঘজালে।
নিঝুম নিশীথ রাত্রি, পথিক একাকী
চলিছে সমুখ পানে দুটি আঁখি রাখি।
নাহি সাথী, নাহি বন্ধু, রুদ্ধদ্বারে তার
জ্বলিবেনা সন্ধ্যাদীপ আঁধারে আঁধার।
বিরহকাতর প্রিয়া, তাহার লাগিয়া,
রহিবেনা নিদ্রাহারা রজনী জাগিয়া।
সে যে আজ বিশ্বমাঝে একা পথচারী
গৃহহারা,—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুবারি
ঝরিবেনা তার তরে, কেহ স্নেহভরে
কহিবেনা ডাকি তারে, "যাবে ফিরে ঘরে।"

পথিক চলেছে একা, অনন্ত শর্বরী
কটিকার আর্তনাদ উঠিছে গুমরি।
এ হেন সময়ে তার পশিল শ্রবণে
কে যেন কহিছে ডাকি মধুর বচনে,
"ক্ষণেক দাঁড়াও পান্থ! কোথা যাও একা?
কাহার সন্ধান আশে, পাবে কি হে দেখা?"
বিস্ময়ে সে অন্ধকারে হেরে চারিভিতে,
পশ্চাতে সম্মুখে শুধু শঙ্কাহত চিতে।
ক্ষণকাল মৌন রহি সুমধুর স্বরে,
করুণ মিনতি মাখা, ব্যথিত অন্তরে,
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে, পথিক শুধায়
"কেবা তুমি দাও দেখা চিনিনা তোমায়।
কেহত জীবনে কভু কহে নাই কথা
হাসি মুখে, ঘুচাইতে হৃদয়ের ব্যথা।
কেহ ত আসেনি ছুটে, দিতে আলিঙ্গন
অভাগারে দুটি বাহু করি প্রসারণ।
আমি রিক্ত সর্বহারা বন্ধুবিহীন,
চলা শুধু গতি মোর, কিবা রাত্রি দিন।"
আবার উঠিল জাগি অমূর্ত্ত সে বাণী,
"আমি পথ চিরকাল নিদ্রা নাহি জানি।
সৃষ্টির প্রভাত হতে যুগ যুগান্তর,
গৃহহারা পান্থ যারা চলে নিরন্তর,
তাদের সঞ্চিত ব্যথা বক্ষতল ভরি,
একাকী জাগিয়া আছি কালের প্রহরী।"

একটি সন্ধ্যা

(একটি দিন-এর পরবর্তী)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হেরম্ব বলল 'এতকাল পরে এইখানে সমুদ্রের ধারে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে এ কথা কল্পনাও করতে পারি নি। বছর বারো আগে মধুপুরে আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল মনে আছে?'

অনাথ বলল 'আছে।'

'সেবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়ত আজ চিনতেই পারতাম না। সত্য বাবুর বাড়ী মাষ্টারি করতে করতে হঠাৎ আপনি যেদিন চলে গেলেন, আমার বয়স বারোর বেশী নয়। তার পর কুড়ি একুশ বছর কেটে গেছে। আপনার চেহারা তোলবার মত নয়, তবু মাঝখানে একবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়ত আজ চিনতে না পেরে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।'

অনাথ একটু নিস্তেজ হাসি হাসল।

'আমাকে চিনেও চিনতে না পারাই তোমার উচিত ছিল হেরম্ব।'

'আমার মধ্যে ও সব বাহুল্য নেই মাষ্টার মশায়। সত্য বাবুর মেয়ে কেমন আছে?'

'ভালই আছেন।'

হেরম্ব অবিলম্বে আগ্রহ প্রকাশ করে বলল 'চলুন, দেখা করে আসি।'

অনাথ ইতস্ততঃ করে বলল 'দেখা করে খুসী হবে না হেরম্ব।'

'কেন?'

'মালতী একটু বদলে গেছে।' অনাথ পুনরায় তার স্মিতিত হাসি হাসল।

হেরম্ব বলল 'তাতে আশ্চর্যের কি আছে? এতকাল কেটে গেছে, উনি একটু বদলাবেন বৈ কি! আপনি হয়ত জানেন না, ছেলেবেলা আপনার আর সত্য বাবুর মেয়ের কথা যে কত ভেবেছি তার ঠিক নেই। আপনাদের মনে হত রূপকথার রহস্যময় মানুষ।'

অনাথ বলল 'সেটা বিচিত্র নয়। ওসব ব্যাপারে ছোট ছেলেদের মনেই বেশী আঘাত লাগে। তারা খানিকটা সইতে পারে, খানিকটা বড়রা তাদের কাছ থেকে ঢেকে রাখে। তার ফলে ছেলেরা কল্পনা আরম্ভ করে দেয়। তাদের জীবনে এর প্রভাব কাজ করে। আচ্ছা, আমাদের তুমি কখনো ঘৃণা করনি?'

'না। সংসারের সাধারণ নিক্তিতে আপনাদের কখনো বিচার করতে পারিনি। মধুপুরে আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হল, আমি ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। হয়ত ছেলেবেলা থেকেই আপনাকে জানবার বুঝবার জন্য আমার মনে প্রবল আগ্রহ ছিল। এখনো সে নেই সে কথা জোর করে বলতে পারব না। আমার মনে গত লোকের প্রভাব পড়েছে, বিশ বছর অদৃশ্য থেকেও আপনি তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে আছেন।'

অনাথ নিশ্বাস ফেলে বলল 'ভগবান! পৃথিবীতে মানুষ একা বেঁচে থাকতে আসে নি সকলের এটা যদি সব সময় খেয়াল থাকত! মালতীকে না দেখলে তোমার চলবে না হেরম্ব?'

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল 'আপত্তি করছেন কেন?'

অনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বলল 'দুর্বলতা। মনের দুর্বলতা হেরম্ব। চলো।'

সহরে নির্জন উপকণ্ঠে সাদা বাড়ীটি পার হয়ে হেরম্বের মনে হল, এইখানে সহর শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ সমুদ্রের অর্থহীন অবিরাম কলরব শুনে হেরম্বের মস্তিষ্ক একটু ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে সমুদ্রের ডাক মৃদুভাবে শোনা যায়। হেরম্বের নিজেকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। অনাথ গভীর চিন্তামগ্ন অন্যমনস্ক অবস্থায় পথ চলছে। হেরম্ব তাকে একটাও প্রশ্ন করে জবাব পায়নি। বেলা আর বেশী অবশিষ্ট নেই। পথের দুপাশে খোলা মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে রাখালেরা গরুগুলিকে একত্র করছে। পথ সোজা এগিয়ে গিয়েছে সামনে।

আরো খানিকদূর গিয়ে হেরম্ব ডাঙ্গা প্রাচীরে ঘেরা বাগানটি দেখতে পেল। সামনে পৌঁছে হঠাৎ সচেতন হয়ে অনাথ বলল 'এই বাড়ী।'

কোথায় বাড়ী? বাড়ী হেরম্ব দেখতে পেল না। বাগানের পেছনের দিকে গাছপালার প্রায় আড়াল-করা ছোট একটি মন্দির মাত্র তার চোখে পড়ল। বাগানে গোলাপ গন্ধরাজ ফোটে কিনা বাইরে থেকে অনুমান করার উপায় ছিল না। যে গাছে ধব ত ফুল ফোটে কিন্তু গন্ধ দেয় না, যে গাছের ফল অথবা পাতা মানুষ খায়, তাই দিয়ে বাগানটিকে ঠেসে ভর্তি করা হয়েছে। সমস্ত বাগান জুড়ে গাছের নিবিড় ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি খুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ করল। তাকে অনুসরণ করে বাগানের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা পরিবর্তন, একটা অকস্মাৎ সংঘটিত বৈচিত্র্য। মানুষের অশান্ত কলরবভরা পৃথিবীতে, তাদের প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে এমন সংক্ষিপ্ত একটি স্থানে এই মৌলিক শান্ত আবহাওয়াটি অক্ষুণ্ণ থাকা হেরম্বের কাছে বিস্ময়ের মত প্রতিভাত হল।

বাগানের সরু পথটি ধরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চতুর্থ বাঁকটি ঘুরে গাছের পর্দা পার হয়ে তারা দাঁড়াল। এখানে খানিকটা স্থান একেবারে ফাঁকা। সামনে সেই পথ থেকে দেখা মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণে অল্প তফাতে পুরানো একটি ইটের বাড়ী। মন্দির আর বাড়ী দুই-ই নোনা-ধরা।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। দরজার সামনে ফাটলধরা চত্বরে গরদের সাড়ী পরা স্থূলাঙ্গী একটি রমণী বসে ছিল। যৌবন তার যাব যাব করছে। কিন্তু গায়ের রঙ এখনো অসাধারণ উজ্জ্বল। চেহারা জমকালো, গম্ভীর।

'কাকে আনলে গা? অতিথি নাকি?'

প্রেমাভেড়িত চাপা গলা। হেরম্ব একটু অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনাথ বলল 'হয়ত চিনতে পারবে মালতী। কলকাতায় তোমাদের বাড়ীর পাশে থাকত। নাম হেরম্ব। মধুপুরেও একবার দেখেছিলে।'

মালতী বলল 'চিনেছি। তা, ওকে আবার ধরে আনার কি দরকার ছিল! থাক, এনেছ যখন, কি আর হবে? বোস বাছা। আহা, সিঁড়িতেই বোস না, মন্দিরের সিঁড়ি পবিত্র। কাপড় ময়লা হবার ভয় নেই, দুবেলা সিঁড়ি ধোয়া হচ্ছে।···তুমি বুঝি গিয়েছিলে সমুদ্রে? একদিন সমুদ্রে না গেলে নয়! যদি গেলেই, বলে কি যেতে নেই?'

অনাথ বলল 'আসন থেকে উঠেই চলে গিয়েছিলাম মালতী। তোমাকে বলে যাওয়ার কথা মনে ছিল না।'

মালতী বলল 'তবু ভাল, কথার একটা জবাব পেলাম। সহর হয়ে এলে, আমার জিনিষটা আনলে না যে? কাল থেকে পই পই করে বলছি।'

অনাথ বলল 'তোমাকে কবে বলেছি ও সব আমি এনে দেব না।'

মালতী উষ্ণ হয়ে বলল 'কেন, দেবে না কেন? তোমার কি এল গেল!'

'গোল্লায় যেতে চাও তুমি নিজে নিজেই যাও। আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত নই।'

'কৃতার্থ করলে! আমাকে গোল্লায় এনেছিল কে বের করে? পরের কাছে অপমান করা হচ্ছে!'

মালতী হঠাৎ হেসে উঠল 'তুমি না এনে দিলেও আমার এনে দেবার লোক আছে, তা মনে রেখো।—চললে কোথায় শুনি?'

'স্নান করব' সংক্ষেপে এই জবাব দিয়ে অনাথ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল 'সহর থেকে কি জিনিষ আনার কথা ছিল?'

'আমার একটা ওষুধ।' বলে মালতী গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাম্ভীর্য্য হেরম্বকে বিস্মিত করতে পারল না। সে টের পেয়েছিল, মালতীর উচ্চহাসি এবং মুখরতার কোনটাই সত্য অথবা স্থায়ী নয়। যে কোনো মুহূর্তে একটা অন্তর্ধান হয়ে আর একটা দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ দেবার জন্যই যেন মালতীর মুখে হঠাৎ হাসি দেখা গেল, 'কাণ্ড দেখলে লোকটার? তোমায় ডেকে এনে স্নান করতে চলে গেল। আদিখ্যেতা মারে। জানলে? আদিখ্যেতা মারে।···তুমি কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছ!'

'আশ্চর্য্য নয়। বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে।'

'ওমা, তাই বটে! আমি কি আজকে বাড়ী ছেড়েছি! কতযুগ হয়ে গেল। দাঁড়াও, কতবছর হল যেন? কুড়ি। ষোলবছর বয়সে বেরিয়ে এসেছিলাম, আমার তবে ছত্রিশ বছর

বয়স হয়েছে! আঃ কপাল, বুড়ী হয়ে পড়লাম যে! কাও দ্যাখো।'

হেরম্বকে আগাগোড়া সে ভাল করে দেখল।

'তোমার তো বেশ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে? সাতাশ আটাশের বেশী বয়স মনে হয় না। তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে গো। তখন হেসে না মরে যদি রাজী হয়ে যেতাম! আমার তা হলে আজ দিব্যি একটি কচি সুপুরুষ বর থাকত!'

হেরম্ব হেসে বলল 'মাষ্টার মশায় তখন যে রকম সুপুরুষ ছিলেন—'

'মনে আছে?' মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল 'বলত, সেই মানুষকে এখন দেখলে চেনা যায়? আমার বরং এখনো কিছু কিছু রূপ আছে। দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছ না?'

'না। ছেলেবেলা মুগ্ধ করে যে কষ্টটাই দিয়েছিলেন—'

'তাই বলে এখন মুখের ওপর মুগ্ধ হচ্ছনা বলে প্রতিশোধ নেবে? তুমি তো লোক বড় ভয়ানক দেখতে পাচ্ছি। বিয়ে করেছ?'

'করেছিলাম। বৌটি স্বর্গে গেছে।'

'ছেলে মেয়ে?'

'একটা মেয়ে আছে, ৪'বছরের। আছে বলছি এই জন্য যে পনের দিন আগে ছিল দেখে এসেছি। এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকলে নেই।'

'বালাই ষাট, মরবে কেন! এখন তুমি কি করছ?'

'কলেজে মাষ্টারি করি।'

'বৌএর জন্য বিবাগী হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়নি ত?'

'না। সারাবছর ছেলেদের সেলি কীটস্ পড়িয়ে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়ি মালতী বৌদি। গরমের ছুটিতে তাই একবার করে বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস করেছি। এবার গিয়েছিলাম রাঁচী। সেখান থেকে বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতে এসেছি এখানে।'

'বন্ধু কে?'

'শঙ্কর রায়, ডেপুটি।'

'বেশ লোক। বৌটি ভারি গুণিনতী। এই মন্দির সংস্কারের জন্য একশ' টাকা দান করেছে।' মালতী ভাবতে ভাবতে এই কথা বলছিল, অন্যমনস্কের মত। হঠাৎ সে একটু অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি এখানে কতদিন থাকবে?'

'দশ পনের দিন। ঠিক নেই।'

'ভালই হল।'

হেরম্ব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কিসের ভাল হল?'

মালতী হাসল।

'তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তাই বললাম। ছেলেদের তুমি কি পড়াও বললে?'

হেরম্ব হেসে বলল 'কবিতা পড়াই। ভাল ভাল ইংরেজ কবির বাছা বাছা খারাপ কবিতা। বেঁচে থেকে সুখ নেই মালতী বৌদি।'

আকস্মিক দার্শনিক মন্তব্যে মালতী হাসল। গলার রেয়া সাফ করে বলল 'সুখ? নাইবা রইল সুখ! সুখ দিয়ে কি হবে? সুখ তো গুঁটকি মাছ! জিভকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেলে না। সুখ স্থান জুড়ে নেই, প্রেম দিয়ে ভরে নাও, আনন্দ দিয়ে পূর্ণ কর। সুবিধা কত! মদ নেই যদি, মদের নেশা সুধায় মেটাও! বাস্, আর কি চাই?'

হেরম্ব মালতীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল 'দিন সুধা।'

'আমি দেব?' মালতী জোরে হেসে উঠল, 'আমার কি আর সে বয়স আছে!'

'তবে একটু জল দিন। তেষ্টা পেয়েছে।'

'তা বরং দিতে পারি।' বলে মালতী ডাকল, 'আনন্দ! একবার বাইরে শুনে যাও।'

'আনন্দ কে?' হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল।

'আমার অনন্ত আনন্দ! মনে নেই? মধুপুরে দেখেছিলে। চুমু খেয়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলে।'

'ও, আপনার সেই মেয়ে। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে? তুমি অবাক মানুষ হেরম্ব! সেকি আমার ভুলবার মত মেয়ে।'

হেরম্ব বলল 'ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কথা আমার মনে থাকে না মালতী বৌদি। আপনার মেয়ে তখন খুব ছোটই ছিল নিশ্চয়।'

মালতী স্বীকার করে বলল 'নিশ্চয় ছোট ছিল। ছোট না থাকলে চুরি থেকে তাকে কাঁদাতে কি করে তুমি! তাছাড়া, তখন ছোট না থাকলে মেয়ে তো আমার এ্যাদ্দিনে বুড়ী হয়ে যেত!'

তারপর এল আনন্দ।

আনন্দকে দেখে হেরম্ব হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হেরম্বের কথা আলাদা। এই মালতীকে নয়, সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে সে আজও ভুলতে পারে নি। এই স্মৃতির সঙ্গে তার মনে বারো বছর বয়সের খানিকটা ছেলেমানুষী, খানিকটা কাঁচা ভাবপ্রবণতা আজও আটকে হয়ে গিয়েছে। আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্বশিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, ধোঁয়া পশু ও পাখীর মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শীতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ এক সময় বসন্তের বাতাস এসে যে ভাবে নাড়া দিয়ে যায়, আনন্দের আবির্ভাবও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনি ভাবে নাড়া দিল।

বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে সে আনন্দকে দেখতে লাগল। তার মনের উপর দিয়ে কুড়ি বছর ধরে যে সময়ের স্রোত বয়ে গেছে তাই যেন কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

এই উচ্ছ্বসিত আবেগ হেরম্বের মনে প্রশ্রয় পায়। আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠলেই সে যেন তৃপ্তি পেত। তার বন্দী কল্পনা দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ আজ মুক্তি পায়। তার সবগুলি ইন্দ্রিয় অদম্য উত্তেজনায় অনাস্বাদিত প্রাণ সঞ্চয় করে। চারিদিকের তরলতা তার কাছে অবিলম্বে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শেষ অপরাহ্নের ম্লান সূর্যালোককে তার মনে হয় চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া রঙীন স্পন্দমান জীবন।

বাড়ীর দরজা থেকে কাছে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত আনন্দ হেরম্বকে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিল। সে এসে দাঁড়ানো মাত্র হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল। কৌতূহল অন্তর্হিত হয়ে আনন্দের চোখে ঘনিয়ে এল ভয় ও ভক্তি। হেরম্ব এটা লক্ষ্য করেছে। সে জানে এই ভয় ভীরুতার লক্ষণ নয়, মোহের পরিচয়। আনন্দের চোখে যে প্রশ্ন ছিল, তার জবাবটা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বের যা হয়নি, এখন তাই হল। নিজের কাছে নিজের মূল্য তার অসম্ভব বেড়ে গেল। সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অশান্তাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এতবেশী পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আনন্দ আজ তাকে আর তার সৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, বিচলিত হয়ে তাকে ছেলেমানুষের মত উল্লসিত করে দিয়েছে। তার দেহমন হঠাৎ হাল্কা হয়ে গিয়েছে। তার মনে ভাষার মত স্পষ্ট হয়ে এই প্রার্থনা জেগে উঠেছে, আনন্দ যেন চলে যাবার আগে আর একবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে যায়।

'ডাকলে কেন মা?' আনন্দ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'একে এক গেলাস জল এনে দে।'

আনন্দ জল আনতে চলে গেলে হেরম্ব যেন অসুস্থ হয়ে বিমিয়ে পড়ল। অনেকদিন আগে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে একবার ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল। সে সময়কার অবর্ণনীয় অনুভূতি যেন ফিরে এসেছে।

মালতী নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল 'কি রকম দেখলে আমার আনন্দকে?

'বেশ।'

'আঠার বছর আগে ওকে কোলে পেয়েছিলাম হেরম্ব। জীবনে আমার দুটি সুদিন এসেছে। প্রথম, তোমার মাষ্টার মশায় যেদিন দাদাকে পড়াতে এলেন, অন্দরের জানালার অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আমি লোকটাকে দেখলাম, সেদিন। আর যেদিন আনন্দ কোলে এল। প্রসববেদনা কেমন জান?'

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল 'জানি।'

'জানো! পাগল নাকি! তুমি কি করে জানবে!'

'আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী বৌদি।'

'কবিতা লেখা আর প্রসববেদনা এক? মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন কথা বলে! তোমাতে আর ভগবান লক্ষ্মীছাড়াতে তা হলে আর কোন প্রভেদ থাকত না বাপু। আমরা প্রসব করি ভগবানের কবিতাকে, তার তুলনায় তোমাদের কবিতা ইয়ার্কি ছাড়া আর কি! যাই হোক, আনন্দকে দেখে আমি সেদিন প্রসববেদনা ভুলে গেলাম হেরম্ব।'

'সব মা-ই তাই যায়, মালতী বৌদি।'

মালতী রাগ করে বলল 'তুমি বড় রুক্ষ কথা বলো হেরম্ব!'

আনন্দ জল আনলে গেলাস হাতে নিয়ে হেরম্ব বলল 'বোলো আনন্দ।'

আনন্দ অনুমতির জন্ত মালতীর মুখের দিকে তাকাল।

মালতী বলল 'বোদ লো ছুঁড়ি, বোদ। এ ঘরের লোক। কেমন ঘরের লোক জানিস? আমার ছেলেবেলার ভালবাসার লোক। ওর যখন বারো বছর বয়স আমাকে বিয়ে করার জন্ত ক্ষেপে উঠেছিল। রোজ সন্দেশ টন্দেশ খাইয়ে কত কষ্টে যে ঠুলিয়ে রাখতাম সে কেবল আমিই জানি। হাসিস ক্যানো লো! একি হাসির কথা? বিশ বছর ঘরে খুঁজে খুঁজে তোর বাপকে খুন করতে এসেছে তা জানিস্!'

আনন্দ বলল 'কি সব বলছ মা? এর মধ্যেই—'

'এর মধ্যেই কি লো? বল না, এর মধ্যেই কি বলছিস্?'

'কিছু না মা। চুপ কর।'

মালতী কিন্তু ছাড়ল না।

'এর মধ্যেই গিলেছি নাকি আজ, এই তো বলছিলি? না দিলি নি। কারণ হল সাধনে বসার জন্ত, যখন তখন আমি ওসব গিলি না।'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল 'কি মালতী বৌদি? মদ?'

'মদ নয়। কারণ। ধর্মের জন্ত একটু একটু খাওয়া, এই আর কি!'

আনন্দ বলল 'মদ খাওয়া হল ধর্ম!'

মালতী বলল 'নয়? এবার বাবা এলে শুধোস্।' মালতী হেরম্বের দিকে তাকাল, 'বাবার আদেশে একটু একটু খাই হেরম্ব।'

'বাবা কে?'

'আমার গুরুদেব। শ্রীমৎ স্বামী প্রভুদানন্দ।' মালতী যুক্ত কর কপালে ঠেকাল।

আনন্দ বলল 'মদ খাওয়া যদি ধর্ম মা, আমি সেদিন একটু খেতে চাইলাম বলে মারতে উঠেছিলে কেন? কাল থেকে আমিও পেট ভরে ধর্ম করব মা।'

হেরম্ব ভাবে: আনন্দ একথা বলল কেন? সে মদ খায় না আমাকে একথা শোনাবার জন্তে?

মালতী বলল 'করেই দেখিস!'

'তুমি কর কেন?'

'আমার ধর্ম করবার বয়স হয়েছে। তুই একরত্তি মেয়ে, তোর ধর্ম আলাদা। আমার মত বয়স হলে তখন তুই এসব ধর্ম করবি, এখন কি? যে বয়সের যা। তুই নাচিস্, আমি নাচি?'

আনন্দ হেসে বলল 'নেচো, না নেচো। নাচতে তো বাপু একদিন। এখনও এক একদিন বেশী করে কারণ খেলে সে নাচটাই নাচো—'

'তোর মত বেয়াদব মেয়ে নেই আনন্দ!'

মালতীর পরিবর্তন হেরম্ব বুঝতে পারছিল না। সে মোটা হয়েছে, তার কণ্ঠ কর্কশ, তার কথার ব্যবহারে কেমন একটা একটা নির্লজ্জ রুক্ষতার ভাব। আনন্দের মধ্যস্থতা না থাকলে মালতীর মধ্যে সতা বাবুর মেয়ের কোন চিহ্নই খুঁজে না পেয়ে হেরম্ব হয়ত আজ আরও একটু বুড়ো, আরও একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরত। কুড়িবছরের পুরোনো গৃহত্যাগের ব্যাপারটার উল্লেখ মালতী নিজে থেকেই করেছিল, দ্বিধা করে নি, লজ্জা পায় নি। এটা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে দশ বছরের মধ্যে একদিনের লজ্জাভুরা নববধূ যদি সকলের সামনে স্বামীকে বাজারের ফর্দ দিতে পারে, মালতীর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা কুড়িবছর পরে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার পরিচয় পাবার পরেও মদ না এনে দেবার জন্ত অনাথকে সে তো অনুযোগ পর্যন্ত করেছিল। আনন্দের সঙ্গে তর্ক করে মদকে কারণ নাম দিয়ে ধর্মের মানে নিজেকে সমর্থন করতেও তার বাধেনি। মালতী একাবে বদলে গিয়েছে কেন? তার ছেলেবেলার রূপকথার অনাথ আজও তেমনি আছে, মালতীকে একাবে বদলে দিল কিসে?

আনন্দ আর একবারও হেরম্বের দিকে তাকায় নি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাকে না দেখে হেরম্বের উপায় ছিল না। ওর সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা তার মনে এসেছে যে, মালতীর পরিবর্তন যদি বেশী দিনের হয় আনন্দের চরিত্রে হয়ত তার ছাপ পড়েছে। আনন্দের কথা শুনে, হাসি দেখে, মালতীর দেহ দিয়ে নিজেকে অষ্টেক আড়াল করে ওর বসবার ভঙ্গী দেখে মনে হয় বটে যে, সত্য বাবুর মেয়ের মধ্যে যেটুকু অপূর্ব্ব ছিল, যতখানি গুণ ছিল, শুধু সেইটুকুই সে নকল করেছে: মালতীর অর্জ্জিত অমার্জ্জিত রুক্ষতা তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও ভোলা যায় না যে, যে আবহাওয়া মালতীকে এমন করেছে আনন্দকে তা একেবারে রেহাই দিয়েছে।

মালতীর উপর হেরম্বের রাগ হতে থাকে। এমন মেয়ে পেয়েও তার মা হয়ে থাকতে না পারার অপরাধের মার্জ্জনা নেই। মালতী আর যাই করে থাক হেরম্ব বিনা বিচারে তাকে ক্ষমা করতে রাজী আছে, মদ খেয়ে ইতিমধ্যে সে যদি নরহত্যাও করে থাকে সে চোখ কান বুজে তাও সমর্থন করবে। কিন্তু যা হয়ে আনন্দকে সে যদি মাটি করে দিয়ে থাকে হেরম্ব কোনদিন তাকে মার্জ্জনা করবে না।

খানিক পরে অনাথ বেরিয়ে এল। স্নান সমাপ্ত করে এসেছে।

'আমার আসন কোথায় রেখেছ মালতী?'

মালতী বলল 'জানি না। ইাগা, স্নান যদি করলে আহ্নিকটা আজ তুমিই করে ফেল না? আমার বড় আলস্যি লাগছে।'

অনাথ বলল 'আমি এখুনি আসনে বসব। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।'

'একজনকে বাড়ীতে ডেকে এনে আসনে বসব! স্বার্থপর আর কাকে বলে? সন্ধ্যা হতেই বা আর দেরী কত?'

অনাথ তার কথা কানে তুলল না। আনন্দকে বলল 'আমার আসন কে সরিয়েছে আনন্দ?'

'আমি জানিনে বাবা।'

অনাথ শান্তভাবেই মালতীকে বলল 'আসনটা কোথায় লুকিয়েছ বার করে দাও মালতী। আসন কখনো সরাতে নেই এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।'

মালতী বলল 'তুমি অমন কর কেন বলত? বোসোনা এখানে,—একটু গল্পগুজব কর। এতকাল পরে হেরম্ব এসেছে, ওর সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা না বললে অপমান করা হবে না?'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলতে গেল 'আমি—'

কিন্তু মালতী তাকে বাধা দিয়ে বলল 'আমাদের ঘরোয়া কথায় তুমি কথা কথা করো না হেরম্ব।' হেরম্ব আহত ও আশ্চর্য্য হয়ে চুপ করে গেল। অনাথ তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল 'আমি অপমান করব কল্পনা করে তুমি নিজেই যে অপমান করে বসলে মালতী! কিছু মনে কোরো না হেরম্ব। ওর কথাবার্ত্তা আজকাল এই রকমই দাঁড়িয়েছে।'

হেরম্ব বলল 'মনে করার কি আছে!'

মালতীর মুখ দেখে হেরম্বের মনে হল তাকে সমালোচনা করে এভাবে অতিথিকে অনাথ মান না দিলেই ভাল করত।

অনাথ বলল 'আমার চাদরটা কোথায় রে আনন্দ?'

'আলনায় আছে—মার ঘরে। এনে দেব?'

'থাক। আমিই নিজে গিয়ে।...তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ হল না বলে অনাদর মনে করে নিও না হেরম্ব। আমার মনটা আজ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। আসনে না বসলে স্বস্তি পাবনা।'

হেরম্ব বলল 'তা হোক মাষ্টার মশায়। আর একদিন কথাবার্ত্তা হবে।'

মালতী মুখ গোঁজ করে বসে ছিল। এইবার সে জিজ্ঞাসা করল 'চাদর দিয়ে কি হবে?'

অনাথ বলল 'পেতে আসন করব। আসনটা লুকিয়ে তুমি ভালই করেছ মালতী। দশ বছর ধরে ব্যবহার করে আসনটাতে কেমন একটু মায়া বসে গিয়েছে। একটা জড়বস্তুকে মায়া করা থেকে তোমার দয়াতে উদ্ধার পেলাম।'

মালতী নিশ্বাস ফেলে বলল 'যা আনন্দ, আমার বিছানার তলা থেকে আসনটা বার করে দিবি যা।'

অনাথ বলল 'থাক্, কাজ নেই। ও আসনে আমি আর বসব না।'

মালতী ক্রোধে আরক্ত মুখ তুলে বলল, 'তুমি মানুষ নও। জানলে? মানুষ তুমি নও! তুমি ডাকাত! তুমি ছোটলোক।'

'রেগো না মালতী। রাগতে নেই।'

'রাগতে নেই, রাগতে নেই! আমার খাবে পরবে, আমাকেই অপমান করবে,—রাগতে নেই!'

'মাথা গরম করা মহাপাপ মালতী।' মৃদুস্বরে এই কথা বলে অনাথ বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

খানিকক্ষণ নিরুত্তর হয়ে থেকে মালতী হঠাৎ তার লজ্জিত হাসি হেসে বলল 'দেখলে হেরম্ব? লোকটা কেমন পাগল দেখলে?'

হেরম্ব অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল 'আমি কি বলব বলুন!'

আনন্দ বলল 'বাইরের লোকের সামনেও ঝগড়া করে ছাড়লে তো মা?'

মালতী বলল 'হেরম্ব বাইরের লোক নয়।'

হেরম্বও এ কথায় সায় দিয়ে বলল 'না। আমি বাইরের লোক নই আনন্দ।'

আনন্দ বলল 'তা জানি। বাইরের লোকের সঙ্গে মা ঠাট্টা-তামাসা করে না। প্রথম থেকে মা আপনার সঙ্গে যে রকম পরিহাস করছিল, তাতে বাইরের লোক হওয়া দূরে থাক, আপনি ঘরের লোকের চেয়ে বেশী, প্রমাণ হয়ে গেছে।'

মালতী বলল 'ঘরের লোকের সঙ্গে আমি খুব ঠাট্টা তামাসা করি, নারে আনন্দ? তামাসা করার কত লোক ঘরে! একটা কথা কওয়ার লোক আছে আমার?'

আনন্দ হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ ঘষে দিতে দিতে বলল 'ঘরে নাই বা লোক রইল মা। তোমার কাছে বাইরের কত লোক আসে, সমস্ত সকালটা তুমি তাদের সঙ্গে কথা কও।'

পিঠ থেকে মেয়ের হাত সামনে এনে মালতী বলল 'তারা হল ভক্ত, লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীছাড়ীর দল। ওদের ঠকাতে ঠকাতেই প্রাণটা আমার বেরিয়ে গেল না! খাচ্ছিস্ খাচ্ছিস্, মনের সুখে আছিস্, লোককে ঠকিয়ে পয়সা করতে কেমন লাগে তুই তার কি বুঝবি! সারা সকালটা গম্ভীর হয়ে বসে বসে শুধু ভাব, কি করে কার কাছে দুটো পয়সা বেশী আদায় হবে। আমি মেয়ে মানুষ আমার কি ওসব পোষায়? তোর বাপ একটা পয়সা রোজগার করে? একবার ভাবে, দিন চলে পোড়া পেটের পিত্তি কোথা থেকে আসে? তুই ভাবিস্!'

আনন্দ অনুযোগ দিয়ে বলল 'ওঁর কাছে তুমি সব প্রকাশ করে দিচ্ছ মা।'

মালতী কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল 'তাতে কি, যা করছি জেনে শুনেই করছি। হেরম্ব লুকোচুরি ভালবাসে না।'

এই ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ৎ হেরম্বের মনে লাগল। সে বুঝতে পারল, তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে বলে নয়, শেষ পর্যন্ত তার কাছে কোন কথাই লুকানো থাকবে না বলেই মালতী কোন বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করছে না। নিজের এবং নিজেদের সঠিক পরিচয় আগেই তাকে জানিয়ে রাখছে।

এর মধ্যে আরও একটা বড় কথা ছিল, হেরম্বকে যা পুলকিত করে দিল। মালতী আশা করে আজই শেষ নয়, সে আসা-যাওয়া বজায় রাখবে। ভূমিকাতেই তার সামনে নিজের সব দুর্বলতা ধরে দিয়ে মালতী শুধু এই সম্ভাবনাই রচিত করে দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে তার যেন আবিষ্কার করার কিছুই না থাকে। হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা আশ্বাস, একটা কামা ভবিষ্যৎ। সে বারবার আসবে এবং তাদের সঙ্গে এতদূর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে তার হীনতা ও দীনতা সমস্তই সে জেনে ফেলবে, মালতীর এই প্রত্যাশা নানা সম্ভাবনায় হেরম্বের কাছে বিচিত্র ও মনোহর হয়ে উঠল। মালতীর এই মৌলিক আমন্ত্রণে তার হৃদয় কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল হয়ে রইল।

'একথা মিথ্যা নয় মালতী বৌদি। আমার কাছে কিছুই গোপন করবার দরকার নেই।'

'গোপন করার কিছু নেই-ও হেরম্ব।'

'কি থাকবে?'

'তাই বলছি। কিছুই নেই।'

একটা যেন চুক্তি হয়ে গেল। মালতী স্বীকার করল সে মদ খায়, লোকঠকানো পয়সায় জীবিকা নির্বাহ করে। হেরম্ব ঘোষণা করল, তাতে কিছু এসে যায় না।

জীবন মালতীকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। হয়ত সে শিক্ষা হৃদয়সংক্রান্ত নয়। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সন্দেহ করা চলে না।

কিন্তু আনন্দ?

আনন্দের হৃদয় কি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও মার্জনা পায়নি? ওর হৃদয়কালো বাইরের রূপ তো ওর হৃদয়কে ছাপিয়ে নেই? হেরম্ব এই কথা ভাবে। মালতী যে মেয়েকে কুশিক্ষা দেবে তার এ আশঙ্কা কমে এসেছিল। সে ভেবে দেখেছে, মালতী ও আনন্দের জীবন এক নয়। যে সব কারণ মালতীকে বেঁধেছে, আনন্দের জীবনে তার অস্তিত্ব হয়ত নেই। তাছাড়া ওদিকে আছে অনাথ। মেয়েরা মার চেয়ে পিতাকেই নকল করে বেশী, পিতার শিক্ষাই মেয়েদের জীবনে বেশী কার্যকরী হয়। অনাথের প্রভাব আনন্দের জীবনে তুচ্ছ হতে পারে না। মালতীর সঙ্গে পরিচয় করে মানুষ যে আজকাল খুসী হতে পারে না, অনাথ সমুদ্রতীরে একথা স্বীকার করেছে। অনাথের যদি এই জ্ঞান জন্মে থাকে, মেয়ের সম্বন্ধে সে কি সাবধান হয় নি?

অনাথ ওস্তাদ কারিগর, হৃদয়ের প্রতিভাবান শিল্পী। আনন্দ হয়ত তারই হাতে গড়া মেয়ে। হয়ত মালতীর বিরুদ্ধ প্রভাবকে অনাথের সাহায্যে জয় করে তার হৃদয় মনের বিকাশ আরও বিচিত্র, আরও অনুপম হয়েছে। ওরে বসে হৃদয়ের জলগুলি মেলবার উপায় মানুষের নেই, মনের সামঞ্জস্য ঘরে সঞ্চয় করা যায় না। সঙ্ঘের সম্পর্কে না এলে ভাল হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। জীবনের রুক্ষ কঠোর আঘাত না পেলে মানুষ জীবনে পঙ্গু হয়ে থাকে, তরল পদার্থের মত তার কোন নিজস্ব গঠন থাকে না। আনন্দ হয়ত মালতীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর পরিচয় পেয়ে সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। টবের নিস্তেজ অসুস্থ চারাগাছ হয়ে থাকার বদলে মালতীর সাহায্যেই হয়ত সে পৃথিবীর মাটিতে আশ্রয় নেবার সুযোগ পেয়েছে, মোটা বৃষ্টি গায়ে লাগলে আগাছার সঙ্গে লড়াই করা ও মাটির রস আকর্ষণ করে বেড়ে ওঠা তরুর মত সতেজ সজীব জীবন আহরণ করতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের জন্য তিনজনেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। অনাথের কিছু দরকার আছে কিনা দেখতে গিয়ে আনন্দ সমস্ত মুখ ভাল করে ধুয়ে এসেছে। হেরম্বের দৃষ্টিকে চোখে না দেখেও তার মুখে যে অল্প অল্প রক্তের ঝাঁজ ও রঙ সঞ্চারিত হচ্ছিল বোধ হয় সেই জন্যই। তবে আনন্দের সম্বন্ধে কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার সাহস হেরম্বের ছিল না। তার যতটুকু বোধগম্য হয় আনন্দের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের যেন তারও অতিরিক্ত অর্থ আছে। মনের এই ধারণা হৃদয়ের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেছে।

আনন্দ বলল 'আজ আরতি হবে না?'

'হবে।'

'এখনো যে মন্দিরের দরজাই খুললে না?'

'তোর বুঝি খিদে পেয়েছে? প্রসাদের অপেক্ষায় বসে না থেকে কিছু খেয়ে তো তুই নিতে পারিস আনন্দ।'

'খিদে পায় নি মা। খিদে পেলেও আজ খাচ্ছে কে?'

মালতী তার মুখের দিকে তাকাল।

'কেন খাবি না কেন? নাচবি বুঝি আজ?'

আনন্দ মৃদু হেসে বলল 'হাঁ। এখন নয়। চাঁদ উঠুক তারপর।'

'আজ আবার তোর নাচবার সাধ জাগল! তোকে নাচ শিখিয়ে ভাল করিনি আনন্দ। রোজ রোজ না খেয়ে—'

আনন্দ নিরতিশয় আগ্রহের সঙ্গে বলল 'অনেক রাত্রে আজ চন্দ্রকলা নাচটা নাচব মা।'

'তারপর রাত্রে না খেয়ে ঘুমোবি তো?'

'ঘুমোলাম বা! একরাত না খেলে কি হয়? আজ পূর্ণিমা তা জান?'

মালতী বলল 'আজ পূর্ণিমা নাকি? তাই কোমরটা টন টন করছে, গা ভারি ঠেকছে।'

হেরম্ব কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি নাচতে পার নাকি আনন্দ?'

মালতী বলল 'পারবে না? আর কিছু শিখেছে নাকি মেয়ে আমার। গুণের মধ্যে ওই এক গুণ—নাচতে শিখেছেন। দুটি লোকের রান্না করতে যাও—মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখবেন!'

আনন্দ হেসে বলল 'মিথ্যে আমার নিন্দা কোরো না মা। বাবাকে দু' বেলা কে রেঁধে দেয়?'

'যে রান্নাই রেঁধে দিস, ও তোর বাপ ছাড়া আর কেউ মুখেও করবে না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু রাঁধি ত! বসে বসে খাই আর নাচি, একথা আর বলতে হয় না।'

হেরম্ব বলল 'আমি তোমার নাচ দেখতে পারি আনন্দ?'

[ক্রমশঃ]

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর

১৯৩১ সালে ইউরোপ হইতে একদল বৈজ্ঞানিক স্থলপথে মোটরযোগে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্থান হইয়া কাশ্মীর আসেন। ডাঃ মেনার্ড উইলিয়ামস্ এই দলের রিপোর্টার ও জর্জেস্ হার্ড দলপতি ছিলেন। ইঁহারা ভ্রমণ করেন অবশ্য মোটরযোগে, মাঝে মাঝে যেখানে জল আছে, মোটরশুদ্ধ ষ্টীমারে পার হন। স্থলপথে মোটরে আসবার সুবিধা অসুবিধা কি রকম, মিঃ উইলিয়াম্স্ এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকে নীচে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"আমরা যাত্রা সুরু করি প্যারিস্ থেকে। অনেক বড় বড় খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা এসে আমাদের তুলে দিয়ে গেল Gare de Lyon- ষ্টেশনে। রুমাল ওড়াতে লাগল, গাড়ী ছাড়লে, ফটো নেওয়া হোল, বক্তৃতা হোল—সে এক হৈ চৈ ব্যাপার। ইউরোপের কথা বেশী বলবো না, ভূমধ্য সাগর পার হয়ে আমাদের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হোল বাইরুৎ থেকে। এখানে আমাদের এবারকার এই ভ্রমণের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী করা ছ'খানা সিট্রয়েন্ গাড়ী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দুখানাতে মালপত্র, তাঁবু ইত্যাদি বোঝাই। সিরিয়া ও ইরাকের মরুভূমি পার হতে হবে বলে একখানা মোটরগাড়ীতে ছিল শুধু পানীয় জলের ট্যাঙ্ক—বাকী চার খানাতে আমাদের থাকবার, রাঁধবার, শোবার ব্যবস্থা ছিল।

আমাদের দলের নায়ক মিঃ হার্ড এর আগে একবার মোটরে সাহারা মরুভূমি পার হয়ে, আফ্রিকার ঘনজঙ্গল পার হয়ে কায়রো থেকে কেপটাউনে গিয়েছিলেন ১৯২৯ সালে। এ ধরণের ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, সব বিষয়েই তিনি আমাদের নায়ক হবার উপযুক্ত।

লেবানন পর্ব্বতের উপর দিয়ে আমাদের মোটরের পথ চলেছে। পাশে কোনো কোনো স্থানে গভীর খড্, মাঝে মাঝে লেবাননের বিখ্যাত সিডার বৃক্ষের বন। পথ খুব ভাল, কেবল একটু ঘুরিল হয়ে পড়ে যখন সামনের দিক থেকে আর একখানা মোটর এসে পড়ে—সে সরু রাস্তার পাশাপাশি দুখানা মোটর যাওয়া এক রকম অসম্ভব। মাথার ওপরে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের এরোপ্লেন উড়ছিল—তারা সঙ্কেতে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে।

পারস্যের পথ : পাশাপাশি মোটর যাই ও পর্ব্বতগাত্রের শুষ্কতা লক্ষ্য করা যায়।

এন্টিলেবাননে নেমে এসে বারাডা নদীর ধারে আমরা তাঁবু ফেললাম। বারাডা নদী খুব বড় নয়, তবে স্রোত অত্যন্ত প্রখর। এখানে গরম নেই, বড় বড় ওক আর সিডার গাছের শীতল ছায়া নদীর ধারে। রাত্রে ঘুমিয়ে আরাম হল। সকালে উঠে বাজারে বেড়ালাম—যথেষ্ট তরমুজ, আঙুর বিক্রী হচ্ছে, আরও নানা ধরণের প্রাচ্যদেশীয় ফলমূল, সব চিনি নে। এখানে বিখ্যাত বীর সালেউদ্দীনের সমাধি আছে, অনেক ভেঙে চুরে গিয়েছে।

৮ই এপ্রিল আমরা আবার রওনা হলাম। স্থানীয় সৈন্যদল যুদ্ধের পোষাক পরে বাজনা বাজাতে বাজাতে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল নগরের বাইরে অনেকটা পর্য্যন্ত। ফারসী দুর্গাধ্যক্ষ আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। রাস্তায় বেরুবার ধুলো—গাধার পিঠে তরিতরকারি বোঝাই দিয়ে

কুকুরেরা ছেড়ের বাজারে বিক্রী করতে চলেছে। রঙীন্ পোষাকে সুন্দরী সারকেশীয় তরুণীরা গাধার পিঠে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের অদ্ভুতদর্শন মোটরগাড়ীর দারির দিকে। মাথার ওপর আবার একখানা এরোপ্লেন উড়ছে—সেখানে খুব নামতে সুরু করলে, মাথায় পড়ে আর কি!···এরোপ্লেন

পত্তনী : সুলতান মামুদ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভ।

থেকে একগোছা কাগজ পড়ল। এরোপ্লেনে আছেন আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধু পিয়ের পোগাদেবার, তিনি অনেক দিন থেকে এই অঞ্চলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমান প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। তাঁর বার্ত্তা আমাদের মনের আনন্দ ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তুললে।

মরুময় পথ। গাছপালা কোথাও নেই। কি রোদই উঠেছে! অনাবৃত পাহাড় চারিধারে খাঁ খাঁ করছে। সিরিয়ার মরুভূমি সুরু হল। রাস্তাও ভাল নয়, বালিতে ঢাকা বলে যাচ্ছে।

সাবিরা। পর্ব্বতবেষ্টিত সুন্দর ছোট্ট সহর, শুভ্র দীর্ঘ গম্বুজ ও মিনারেট নীল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আরবী উপন্যাসের সহরই হত যদি না হোটেল ডেমোবিয়ার সব দরজায় বেহুইন দেখেরা দামী দামী মোটর গাড়ী করে না নামত, খেজুরতলায় বসে আমেরিকান সিগারেট ও আইসক্রিম না খেত, আর যদি তাদের চোখে এক একজোড়া রঙীন্ ভারী চশমা না থাকত। নাঃ, রোমান জিনিষটা পৃথিবীতে আর কোথাও রইল না। কেবল মেয়েদের পোষাক এখনও পুরোনাকালের মতই আছে বটে। আর পথে ছাগলের চামড়ার পোষাক পরা কিস্তিদের দেখে মনে হল বাইবেলের যুগ এখনও এই সব প্রাচ্য সহরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে আছে। তবে খুঁজে না দেখলে মেলে না। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট পামিরাতে নতুন সহর তৈরী করছেন। জলকষ্ট দূর করবার জন্যে অনেক বড় বড় কূপ খনন করা হয়েছে। কিন্তু মিষ্ট জল পাওয়া দুষ্কর। অধিকাংশ কূপের জল বিকট তেতো। এখানে বহু প্রাচীন একটি মসজিদ আছে। সহরের উত্তরে একটা দুর্গ তৈরী হচ্ছে।

দুদিন পরে আমরা রুৎবা পৌঁছলাম। রুৎবাতে একটা বড় দুর্গ আছে, অনেক সৈন্য থাকে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘেরা। ইরাকী প্রাচ্যরী সৈন্য রাইফেল বাগিয়ে করে দুর্গপ্রাচীরের ওপর পাহারা দিচ্ছে। বেতারের উঁচু মাস্তুলের তলাতেই দুর্গের ফটকখানা। সামনেটা এরোপ্লেন নামবার উঠবার মাঠ। যাত্রীদের জন্যে ছোট একটা হোটেল।

তার পরে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বাগদাদের দিকে যাত্রা সুরু হল। এই মরুভূমি অত্যন্ত ভীষণ, জল কোথাও নেই, গাছপালার চিহ্ন ত নেই-ই। কোনোদিকে মাঝে মাঝে রুক্ষদর্শন পাহাড়। এই পথে তৃষ্ণায় ও রৌদ্রের উত্তাপে প্রতিবৎসর অনেক লোক মারা যায়।

মরুভূমির আবহাওয়া অতি অদ্ভুত। দিনের গরম কল্পনার অতীত, কিন্তু রাত্রে খুব শীত। শেষ রাত্রে মনে হয় যে তাঁবুর বাইরে বোধ হয় বরফ পড়ছে। দিনের উত্তাপে পাউরুটী শুকিয়ে এমন কঠিন হয়ে যায় যে ছুরি দিয়ে কাটা শক্ত। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ে। আর্দ্রতার লেশমাত্র নেই বাতাসে। আর ধুলো, ধুলো, সর্ব্বত্র ধুলো আর বালি।

দুপুর বেলা দিগন্তের রক্তরূপ দেখলে ভয় হয়।

মরুভূমি পার হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। ইউফ্রেটিসের শ্যামল তীরভূমিতে ফলের বাগানে শস্যক্ষেত্রে কেমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা আছে। ইরাকের মরুভূমি বর্ব্বর মরুদস্যু পুরুষ। ইউফ্রেটিসের উপত্যকা সুন্দরী লজ্জাবতী সাহকেশীর তরুণী। পিচের ফুল ফুটেছে, ছোট ছোট গালের দুপাশে ছোট ছোট বনফুলের গাছ, পাখীর ডাকে মুখর সকাল সন্ধ্যা।

ঝোড়ে ঝোড়ে পাড়িয়ে আছে, বেডিওতে গান হচ্ছে পূর্ণ ইউরোপের যে কোনো সহরের মত। কাজিমাই মসজিদের ধারে সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে পুরোনো কালের বাগদাদের যা একটু আভাস পাওয়া গিয়েছিল, রাত্রে ফরাসী কন্‌সালের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়ে সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। রাজা ফৈজুল আমাদের সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন, আমাদের মোটরগাড়ী দেখতে চাইলেন, মিঃ হার্ডকে আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে সাগ্রহে অনেক প্রশ্ন করলেন।

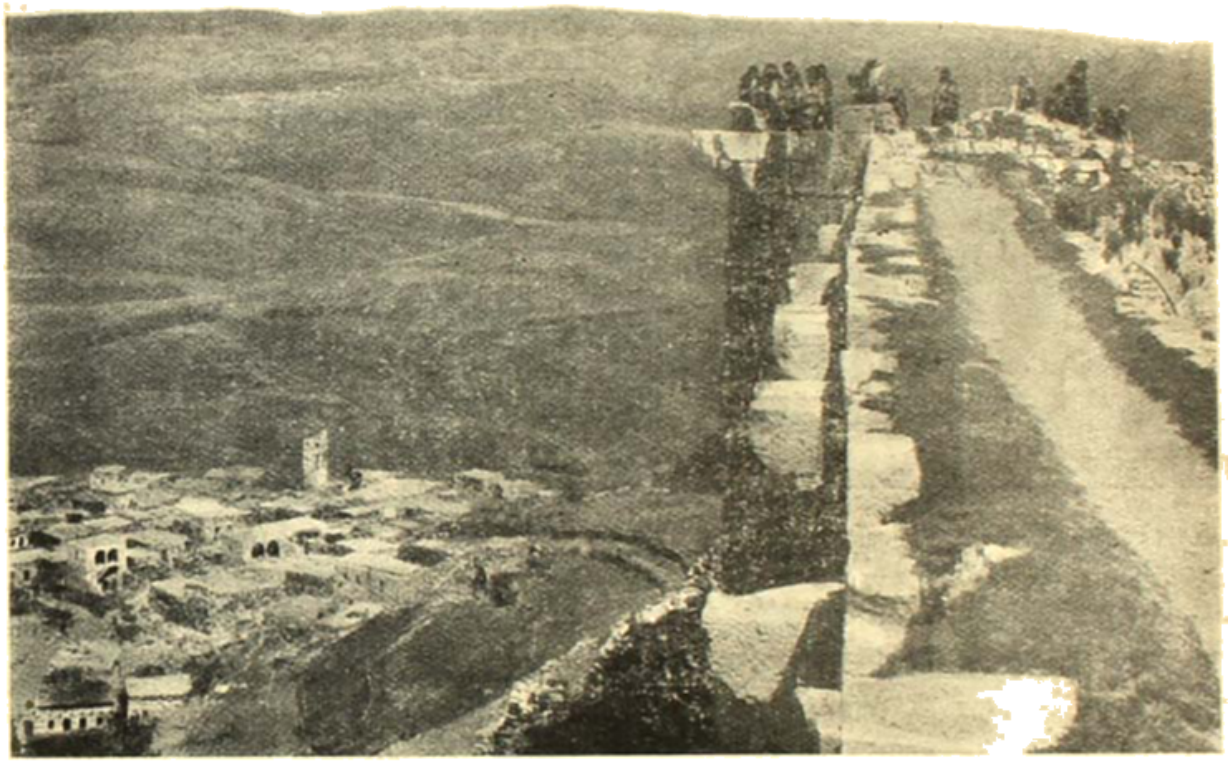

কালাৎ-এল্-হস্‌ন্ দুর্গ : মধ্যযুগের ক্রুসেড যুদ্ধের সময় এই দুর্গ অধিকার করিতে মুসলমানদের একশত বৎসর লাগিয়াছিল। প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত সমতলভূমি ইহার উপরে দেখা যাইতেছে।

১৬ই এপ্রিল ইউফ্রেটিস পার হয়ে আমরা মেসোপটেমিয়ার মাটিতে পা দিলাম। তাল খেজুরের প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্র। মেসোপোটেমিয়াতে মোটরগাড়ীর সংখ্যা বেশী। রাস্তায় মোটরের ভিড় খুব! ইরাকী বয়স্কাউট যোবাই দুখানা বাস নিশান উড়িয়ে যাচ্ছে। ভেড়াযোবাই একখানা লরী চলে গেল।

বাগদাদ দেখে হতাশ হতে হল। আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ কি এই! বড় বড় হোটেল ফরাসী ও আমেরিকান কায়দায় সাজানো। পথে মোটরের ছড়াছড়ি, ট্রাফিক পুলিশ

পারস্যের দিকে রওনা হওয়া গেল। পথে ৩' একটা নদী পার হোতে হল। ঘোলাজলে মেয়েরা কাপড় কাচছে। ছাড়দিলে পাখীর দল বসে আছে জলের ধারে, মাঝে মাঝে বাদাম গাছ। তক্ষশীলা ও কাশ্মীর! কত দূরে—অনন্ত বালির সমুদ্রের কোন্ পারে? আমাদের মনে হচ্ছিল দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের পরে আমরাই যেন প্রথম চলেছি এপথে।

পারস্য সীমান্তে পারস্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কর্ণেল এস্‌ফেনদিয়ারী আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। পারস্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাবার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে

থাকবেন। এ পথে চলার একজন তাঁর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীসৈন্য আছে।

বিহিস্তান শৈলগাত্রে খোদিত দারায়ুসের শিলালিপি। বাবিলন ও এসিরিয়ার ভাষা এই লেখ হইতে আবিষ্কৃত হয়।

পারস্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সত্যিই সুন্দর দেশ। দিগন্তের রং অপূর্ব, শৈলমালার কি শোভা! বিশেষ করে এই বসন্তকালে আকাশের রং, পাহাড়ের রং, তৃণভূমির রং সবই সুন্দর হয়েছে। এলবুর্জ পর্বতমালা থেকে ছোট ছোট নদী বেরিয়ে দেশটাকে শস্যশ্যামল করে রেখেছে—এদিকে আবার পরবর্তীদের তরফ থেকে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্যে বড় বড় খাল কাটা আরম্ভ হয়েছে। এদেশের লোকে বোধ হয় কেবল আমোদ প্রমোদ ও বনভোজন করেই দিন কাটায়। এ দেশে সর্বত্রই বনভোজনের জায়গা, সর্বত্রই শ্যামল তৃণভূমি, ছায়াতরু, পার্বত্য নদীর মৃদু কল্লোল। পথে বিহিস্তানের শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ বিখ্যাত লেখ ও মূর্তি দেখলাম।

তারপর শুধুই আফিমের ক্ষেত। পথে যথেষ্ট পেট্রোলের দোকান আছে, মোটরযাত্রীর কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। গ্যারেজ ও মোটরের কারখানাও অনেক। এক সময়ে পারস্যে তিন হাজার সরাইখানা ছিল পথিকের সুবিধার জন্য। এখন সরাইখানার সংখ্যা কমে গিয়েছে, মোটরগাড়ীতেই লোকচলাচল করে বেশী—সরাইএর বদলে এখন পথের ধারে পড়ছে মোটরের কারখানা ও পেট্রোলের দোকান। এদের ব্যবসা খুব জোর চলছে। সরাইএর মালিকেরা হোটেল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোটরবাসের সংখ্যা নেই—এক এক লাইনে বাস দু তিন শো মাইল দিয়ে তবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়। বাসের মধ্যে গোটা মানুষ বড় একটা দেখা যায় না—চোখে পড়ে কেবল কতকগুলো মানুষের মুণ্ড, হাত, পা, দাড়ি, বোঁচকা, গলের কুঁড়ো—ঠাসাঠাসি বোঝাই। মোটরবাসের ব্যবসায়ে পারস্যে উন্নতি আছে।

ওমর খৈয়ামের নিশাপুরের মধ্যে দিয়ে আমরা চলে গেলাম, থেমে দেখবার সময় ছিল না। তারপরে মেশেদ। এখানে পেট্রোলের জন্যে আমাদের দাঁড়াতে হোল। রুক্ষ

শাহনশাহ্ সিংহাসন: ১৭০৮ সনে ভারতবর্ষ হইতে নাদিরশাহ এই সিংহাসন পারস্যে লইয়া যান খলিস্ তিংহাসন আছে।

বদনা অবগুণ্ঠনবতী পারস্য মহিলারা দলে দলে চলেছে হজরৎ ইমাম রেজার মস্‌জিদে। মস্‌জিদ অবশ্য আমরা দূর থেকেই

তারপর আমরা পারস্যের বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান পণ্ডিত হাজি মালেকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর লাইব্রেরীতে ৪৬,০০০ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। এমন অনেক পুঁথি আছে, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

মাঝে ছোট বড় টিলা—টিলার ওপরে প্রাচীনকালের দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। আমরা ইস্‌মাকোলে পৌঁছলাম—এই প্রথম আফগান ঘাঁটি। এর পর থেকে সুরু হল আফগানিস্থান। এখানে শুনলাম এক বৎসরের মধ্যে এপথে পাঁচজন সাহেব গিয়েছেন মোটরে আফগানিস্থানে ও ভারতবর্ষে, তার মধ্যে দুজন আমেরিকান। এখানে দুখানা মোটরলরিযোকাই

শেবুরেগুয়ার মাটির প্রাচীর: মোটরের পথ-নির্দ্দেশক দেখা যাইতেছে। পারস্যে একদিন ৩০ হাজার উটবাহিনীর আড্ডা ছিল। এখন মোটরের প্রচলনে উটবাহিনীর সংখ্যা কমিয়াছে।

হাজি মালেক দুঃখ করে বল্লেন, "আপনাদের আমেরিকাতে ওমর খৈয়ামের খুব নাম কিন্তু হাফেজ কি সাদীর নাম অনেকে জানেই না হয়তো। অথচ এঁদেরই ঠিক পারস্যের জাতীয় কবি বলা যেতে পারে।" কথায় কথায় আমরা তাঁকে বল্লাম—আপনার লাইব্রেরীতে তো আগুন লেগে এত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এবিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

পারস্যের সীমান্ত পার হলাম। মরুভূমি চারিদিকে, ছোট ছোট নদীর ওপর লবণের পাৎলা স্তর জমেছে। খররৌদ্রে দিগন্তে মরীচিকা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার মাঝে চেয়ার টেবিল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আফগান গবর্ণমেণ্ট আমাদের ব্যবহারের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন হিরাট থেকে—কিন্তু চেয়ার টেবিল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুতরাং আমরা সেগুলো হিরাটেই ফেরৎ পাঠালাম।

আফগানদের অতিথিপরায়ণতা বাস্তবিকই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। হিরাট, কান্দাহার, গজনী, কাবুল যেখানে আমরা গিয়েছি, সর্ব্বত্রই রাজার মত খাতির পেয়েছি। নদী পারের জন্য সব জায়গাতেই আমাদের জন্যে নৌকা মজুত থাকত, আগে থেকে পথের ধারে মাঝে মাঝে তাঁবু খাটানো

হয়েছিল গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, মোটর থামিয়ে সেখানে গরম চা ও লাকড়িনি-সুবাসিত শুধু না পান করে গেলে তাঁবুর তাঁরপ্রস্ত কর্তাদের ক্ষুণ্ণ হত।

কৃষকন্যা খরচ্ছনবই পাহাড়-সুন্দরী।

দূর থেকে হিরাটের মিনার দেখা গেল কলের চিমনির মত উঁচু হয়ে আছে। হিরাটের চারিদিকে মাটীর প্রাচীর, সদর ফটক দিয়ে আমাদের মোটরের সারি সহরে ঢুকল। রাজপথের দুধারে নরনারী কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেখবার জন্যে; তাদের চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, মুখে হাসি। আমরা খুব ধীরে ধীরে মোটর চালাচ্ছিলাম, দর্শকের ভিড় এত বেশী যে জোরে চালানো অসম্ভব। আমরা যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সার্কাসের দল, হিরাট সহরে খেলা দেখাতে ঢুকছি। হিরাটের বাজার খুব বড়, সদর ফটক থেকে সহরের পেছনের ফটক পর্য্যন্ত একটা চওড়া সোজা রাজপথের দুধারে দোকান পসার, ফলের দোকান, পিতল কাঁসার বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, কফিখানা, তামাকের দোকান। আমাদের ফটোগ্রাফের যন্ত্রপাতি দেখে বাজারশুদ্ধ লোক হাঁ করে চেয়ে রইল।

বাজারে লোকের ভিড়ের ফটো নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। অবশেষে আমি মাটীর ওপর একটা দাগ টেনে তাদের দাগের ওদিকে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করলাম। হিরাটের লোক বাস্তবিক খুব ভদ্র, তারা আমাদের অনুরোধ রাখলে, আমরাও ফটো নিলাম। আমাদের ক্যামেরার মধ্যে কি আছে, দু-একজন তা জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলে। আমরা তাদের নিয়ে এসে দেখালাম। আফগানদের ভদ্রতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, যখনই যার ফটো নিতে চেয়েছি, কি পুরুষ কি নারী, কেউ কখনো আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেনি। একবার ছ' সাত বছরের একদল ছোটছেলের ফটো নেবার জন্যে বলাতে তারা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে ভালমানুষের মত সবাই ক্যামেরার সামনে এসে র‍্যাফেলের আঁকা দেবদূতের মত শান্ত অবাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতক্ষণ আমরা না বল্লাম যে তোমরা এবার যেতে পারো, ততক্ষণ তারা একটুও নড়ল না।

আফগানেরা বালকের মত সরল। এদিকে বন্দুক এবং আধ মণ ওজনের টোটার কোমরবন্ধ সঙ্গে না থাকলে তাদের মন ভাল থাকে না, পৃথিবী অন্ধকার দেখে, ওদিকে আবার হিরাট সহরের পাঁচীলের বাইরে মাঠে দীর্ঘকায় জোয়ান আফগান ঘোড়া পোষা তিত্তির পাখীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়

গুলিস্তাঁ প্রাসাদ : বর্ত্তমানে মেহেরাঁ। প্রাচীর গাত্রের ফ্রেস্কোতে সম্রাট বাসিঙ্গহিল শাহ্।

খেলছে—সে একটা দেখবার জিনিস! পাখীও ছুটছে, সেও ছুটছে, মাঝে মাঝে আবার পাথরের আড়ালে হঠাৎ লুকিয়ে

পড়ে পাখীকে কাছে আনবার জন্যে শিস্ দিয়ে ডাকছে। কেউ নেই হয়তো কোথায়, শুধু পঞ্চাশিন বছরের দীর্ঘশ্মশ্রু আফগান জোয়ান ও তার পোষা ছোট্ট পাখীটি!

বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিলে ইহাদের সহিত আমেরিকার কোনও স্কুলের ছাত্রীদের পার্থক্য বোঝা কঠিন।

হিরাট ও কান্দাহারের মধ্যে মোটরের পথে ছুটো তিনটে খরস্রোতা নদী পড়ে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য জল কম থাকার দরুন মোটর নদীতে নেমে অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। সারাদিন রৌদ্রদগ্ধ মরুপথের মধ্যে দিয়ে মোটর চালিয়ে এসে ঠাণ্ডা নদীর জলে অবগাহন করে শরীর আমাদের জুড়িয়ে গেল। আমাদের বড় গাড়ীগুলো থেকে তিনিসপত্র নামিয়ে ফেলে দড়ি বেঁধে টেনে পার করানো হল, নইলে বালিতে চাকা পুঁতে যায়। নদীর দুপারে চ'হাজার লোক জড় হয়েছে আমাদের নদী পার হওয়া দেখবার জন্যে। অনেকে আবার ঘোড়ায় চড়ে বহুদূর থেকে এসেছে।

নদীপার হয়ে ওপারে একটা এপ্রিকট বাগানের ছায়ায় আমাদের জন্যে তাঁবু পাতা হয়েছে, চা পানের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। একটি ছোট ছেলে বড় গুড়গুড়িতে তামাক সেজে আমাদের জন্যে নিয়ে এল। গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া এই আমাদের জীবনে প্রথম। প্রাদেশিক শাসনকর্তা একজন প্রৌঢ় আফগান, তিনি বড় ঘোড়ায় চেপে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। আফগানিস্থান আমরা কেমন দেখছি? পথে আমাদের অসুবিধা হয়নি তো? দশ বারো জন ভৃত্যের ভৃত্য পেতলের থালা ভরে আমাদের জন্যে নানারকম মেওয়া ফল নিয়ে এল শাসনকর্তার নিজের বাগান থেকে।

কান্দাহারে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। একটি সুন্দর এপ্রিকট বাগানের ছায়ায় বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই নীচে সভা। পুষ্তু ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করা হল, আমরা তার কিছুই বুঝলাম না। বাগানটির সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব, আমাদের মনে হচ্ছিল আরব্য উপন্যাসের দেশ আজকালকার যুগে রাগদাদ থেকে অনেক পূবদিকে সরে এসেছে। আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন আমরা সার্থক হতে দেখেছি কান্দাহারের এই অপূর্ব্ব উদ্যানে। শ্যামল তৃণরাজি পায়ের নীচে, বহুদূরবিস্তৃত ছায়াতরুশ্রেণী, পুষ্পিত এপ্রিকটের সুবাস, মাঝে মাঝে ঝরণার, জলের ধারে হরিণ চরে বেড়াচ্ছে—সবটাই যেন একটা স্বপ্ন। গজনীতে সুলতান মামুদের সমাধি আছে। বহুকালের পুরানো সমাধি-মন্দির, দীর্ঘ পপলার গাছের সারির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। সহরের প্রান্তে একটি নির্জ্জন স্থানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, চারিধারে পোলাপের বাগান।

কাশিয়ান তীরে দুই বালিকা।

সামনের উঠানে একজোড়া মার্ব্বেল পাথরের সিংহমূর্ত্তি, তার ওদিকে বিদেশীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, আমরা গোলাপ

বাগানে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। গজনীতে আসবার পথে একটা নদী পার হবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল।

আমাদের বিশ্বাস ছিল আফগানিস্থান পার্বত্য দেশ সুতরাং অনুর্বর ও রুক্ষ। গজনী থেকে কাবুলের পথে আসতে আমাদের মনে হল ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর ছাড়া এমন শস্যশ্যামলা, ফলফুলে পরিপূর্ণ দেশ আমরা আর দেখিনি। কাবুল সহর থেকে মোটরে আমরা বামিয়ান গেলাম। এখানকার অতিকায় বুদ্ধমূর্তি দেখবার জিনিস, তবে দুটি মূর্তির কোনটির মুখই অক্ষত অবস্থায় নেই। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ চলছে। বামিয়ান উপত্যকা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সমুদ্রবক্ষ থেকে এর উচ্চতা নয় হাজার ফুট, এর পেছনে বিখ্যাত বেশ-ই-বাবা পর্ব্বত, প্রায় সাতেরো হাজার ফুট উঁচু। অতিথিশালার বারান্দা থেকে পূবদিকে চেয়ে থাকলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, আমরা এই সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের মধ্যে কোথাও তা দেখিনি। বহু প্রাচীন কালের মরুযাত্রীদের চলাচলের পথ বামিয়ান উপত্যকা ভেদ করে চলে গিয়েছে, বহু পথিকের পদচিহ্ন আঁকা, আলেকজাণ্ডারের বিজয়বাহিনী এই পথে এসেছিল, হিউয়েন্‌সাং এই পথে ভারতে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন—বর্ত্তমানে বেলুচি কুচকেরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে আফগানিস্থানে বসবাস করতে আসছে এই পথে। একটা ছোট মেয়ে গাধার পিঠে চড়ে মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে।

খাইবারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম পার হয়ে আমরা ভুগে আশ্রয় নিলাম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে এখানে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। শিখ ও গুর্খা সৈন্যদল ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সামরিক কায়দায় অভিবাদনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দল ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষের মাটীতে দিয়েছি।

তারপর তক্ষশিলা ও রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়ে বাইকং থেকে রওনা হবার একাশি দিনের দিন আমরা শ্রীনগরে পৌঁছলাম।

পরিচয়

—শ্রীশান্তি পাল

সখা, নিভৃত মাধবী-কুঞ্জে
আমি আধফোটা বনফুল,
আজি অরুণ আলোকপুঞ্জে
দেখ গুলি যে দোদুল দুল,
আমি আধফোটা বনফুল।

আজি, প্রভাত-পাখীর ডাকে
ওই বন-বীথিকার ফাঁকে,
আমি নয়ন মেলিয়া দেখি
ওগো শিহরিয়া বলি, একি!
আহা হারায়ে মনের ভুল,
আমি আধফোটা বনফুল।

আমি সাঁঝের বাতাসে ফুটি
কেঁপে ঘাসের বনেতে লুটি,
কভু অলস নয়ন ঢাকি
বুকে রঙীন আখর আঁকি,
মম এলায়ে নিবিড় চুল
আমি আধফোটা বনফুল।

সখা, গভীর নিশীথে এসো,
তুমি আমারেই ভালবেসো;
রেখ যতনে তুলিয়া বুকে,
থেক ঘুমায়ে মনের সুখে—
আহা ক'রনাক যেন ভুল,
আমি আধফোটা বনফুল।

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

[তিন]

যখন পল সেই মেয়েটির বাড়ী থেকে ফিরল মাঠের মাঝে দিয়ে আসবার সময় তারও মনে হল, যেন কে জেগে উঠেছে, বাতাসে যেন তার চলাফেরা—ধরাছোঁয়া যায় না, যেন কি একটা ছুতুড়ে ব্যাপার। এই তীব্র প্রেমের মধুর স্বপ্নের পর এ যেন তাকে হাওয়ার ধাক্কায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত যেন একেবারে কাঁপিয়ে দিলে। জোর বাতাসে তার গায়ের কোট যখন বুকে চেপে ধরছিল, মুচড়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁপতে কাঁপতে তার মনে হল যেন সেই মেয়েটিই তাকে অসম্ভব উত্তেজনার সঙ্গে চেপে ধরে আলিঙ্গন করছে।

গির্জ্জের মোড় যেমনি ফিরতে যাবে, ঝড়ের ঝোড় তাকে একেবারে খানিক দাঁড় করিয়ে দিলে। ঝড়ের মুখে এক হাতে মাথার টুপী চেপে ধরে আর হাতে কোটটা জড়িয়ে মাথাটা সে নীচু করে রইল। দম ফেলতে পাচ্ছে না, গা মাথা ঘুরে গেল, অনেক দিন আগে কল থেকে ফেরবার সময় তার মার যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি হল।

একদিকে ঘৃণা অন্যদিকে উত্তেজনা, দুইয়ে মিলে, সেই মুহূর্ত্তে তার মনের ভেতর একটা ভয়ানক ও বড় রকম কিছুর যেন জন্ম দিল। এই প্রথম সে পরিষ্কার ভাবে ধারণা করলে যে সে এই পৃথিবীর সেরা দিয়েই এ্যাগনিসকে ভালবাসে আর তার সেই প্রেমের জন্যে সে গৌরব অনুভব করল।

কিছুক্ষণ আগেই সে মোহের ভুলে ছিল, কিছুক্ষণ আগেই সে নিজেকে আর এ্যাগনিসকে বোঝাচ্ছিল যে তাদের এ প্রেম অতি পবিত্র আত্মার সম্পর্ক। কিন্তু তার কাছে এটা তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে এ্যাগনিসই প্রথমে তার দিকে অমন লোলভাবে চেয়েছিল, আর প্রথম থেকেই সেই চাহনি পলের সাহায্য, পলের প্রেম ভালবাসা চাইছে। একটু একটু করে সে তার সেই আকর্ষণের ভেতর নিজেকে এলিয়ে ঢেলে দিলে। একটা ঘণার ভাব থেকেই সে তার কাছে গিয়ে পড়েছিল আর চারিদিকের যে গাঢ় নির্জ্জনতা তাই তাদের দুজনকে এক করে দিয়েছে।

চোখে-চোখের মিলন থেকে, দুজনের হাতে-হাতে মিলন হল। সেই রাত্রিতে তারা পরস্পরকে চুমু খেলে। পলের দেহে এতদিন যে রক্ত অতি শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছিল, শিরায় শিরায় আগুনের মত সেদিন তা বইতে লাগল, দুর্ব্বল দেহ বিনা বাধায় এলিয়ে পড়ল। এক সঙ্গে জয় ও পরাজয় হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটি তখন বললে, দুজনে চুপি চুপি গ্রাম ছেড়ে লুকিয়ে পালিয়ে যাবে, হয় দুজনে এক সঙ্গে বাঁচবে, নয় দুজনে এক মরণে মরবে। বস্তুতার মুহূর্ত্তে সেও সেই কথায় তখন রাজি হল। তারপর পরের রাত্রিতে এ বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য আবার দুজনে দেখা করবে বলে ঠিক করলে। কিন্তু এখন বাইরের জগতের কঠোর সত্য আর জোড়ো বাতাস, যা তাকে একেবারে খালি গা করে দেবার জন্যে এমন করছে, তা যেন তার আত্ম-প্রবঞ্চনার এই পর্দাখানাকে একেবারে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে গির্জ্জের দরজার সামনে দাঁড়াল। বয়সের মত মন স্থির হয়ে গেছে। মনে হল যেন সেই ছোট গ্রামের মাঝখানে সে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার গ্রামের এই গরীব বাসিন্দেরা অঘোর ঘুমের মধ্যেও তাদের স্বপ্নের ভেতর তাকে দেখতে পাচ্ছে এই উলঙ্গ অবস্থায়, পাপে কালিমাখা। কিন্তু সারা রাত সে কি করে সেই স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে পালাবে সেই চিন্তাই সে করতে লাগল। স্ত্রীলোকটা তাকে বলেছে যে তার অনেক টাকা আছে।—

হঠাৎ তার মনে জেগে উঠল যে সে সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে গিয়ে তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। কয়েক পা সে এগিয়ে গেল, সেই পাঁচিলের ধারে যেখানে তার মা এই কিছুক্ষণ আগে বসে ছিল, হতাশ হয়ে আবার ফিরল। গির্জ্জের দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে দরজায় মাথাটা ঠেকিয়ে চাপা কান্নায় কেঁদে উঠল, 'হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর।' তার সেই কাল ক্রোক ভোর হাওয়ায় কাঁধের কাছে পতপত্

করে উঠতে লাগল, যেন একটা জান্তব শত্রুদিকে সেখানে গেঁথে দিয়েছে, তার কাল পাখা আর ডানার শব্দ হচ্ছে।

তার সমস্ত দেহ যেন ভীষণ লড়াই করতে লাগল, উঁচু পাহাড়ের ওপর ঝড় যেমন লড়াই করছে, তার চেয়েও ভীষণ। এ সেই রক্ত-মাংসের লড়াই, আত্মার প্রাণান্ত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে রক্ত-মাংস যে লড়াই করে।

কিন্তু পরে সে উঠে দাঁড়াল, তখনও নিশ্চয় হল না যে, দুজনের কে ভরলোক করলে। কিন্তু তার মনটা অনেক পরিষ্কার হয়ে এল। সে তার মতিগতির আসল রূপ দেখতে পেলে। নিজের কাছে নিজের পাপ কবুল করে বুঝতে চাইলে কিসে তাকে এমন করে নিয়ে যাচ্ছে। ভগবানের প্রেম ও ভয়ের চেয়ে, নিজের উন্নতির আশার বা পাপের ওপর বিতৃষ্ণার চেয়ে, তার সব চেয়ে ভয় হল, এ ব্যাপার যদি খোলাখুলি জানাজানি হয়, তাহলে সে লাঞ্ছনার ফল কি হতে পারে!

এমন নির্মমভাবে যে সে নিজেকে বিচার করতে পেরেছে, এর উপলব্ধি তাকে আশা দিলে যে এখনও তবে মুক্তির উপায় আছে। কিন্তু অন্তরের গভীরতলে সে বেশ জানে যে, এখন থেকে সেই স্ত্রীলোকের জীবন সে নিজে নিজের জীবনের সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য গাঁথা, তেমনি তার সঙ্গে গেঁথে গেল। তার মূর্তি সারাক্ষণই তার সঙ্গে ফিরবে তার স্বপ্নে, দিবারাত্র তার পাশ ঘেঁসে তাকে চলতে হবে, আর রাত্রে—রাত্রে ঘুমের ভেতর তার সেই কাল কেশের অন্ধকার জালে জড়িয়ে থাকতে হবে। তার এই দুঃখ এই অনুতাপের তলায় গভীর হতে আরো গভীর একটা জিনিস রয়েছে। পৃথিবীর অন্ধকার বুকের ভেতর যেমন জলন্ত তাপ অহর্নিশি ধকধকধক জ্বলছে তেমনি এই আনন্দের ঝড়ের আগুন তার দেহ মনের অতি গভীরের তলে লকলক করে উঠতে লাগল।

যেমনি গির্জেবাড়ীর দরজা খুলে ঢুকলে অমনি সোজা দেখতে পেলে, রান্নাঘর থেকে আলোর রেখা আসছে, ছোট খাবার-ঘর দিয়ে, চৌকবার হল দিয়ে সে আলো এসে পড়েছে। দেখলে পোড়া ছাইয়ের পাশে তার মা বসেছে, যেন মড়ার কাছে আগলে বসে। একটা গভীর দুঃখের যাতনায়—যে যাতনা ইহজীবনে আর তাকে কখন ত্যাগ করবে না—সেই যাতনার ভেতর থেকে সে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারের স্বরূপটা জানলে।

খাবার-ঘরের ভেতর দিয়ে সেই আলোর দিকে গেল, রান্না-ঘরের দরজার কাছে এসে একবার থতমত খেলে। তারপর বাড়িয়ে সেই আগুন-রাখার কাছে গেল, পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলে।

"মা তুমি এখনো শুতে যাও নি?" সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে।

তার মা তার দিকে তাকাবার জন্যে ফিরলেন। স্বপ্নে হানা দেখে তাঁর মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তবুও তিনি খুব দৃঢ় ও শান্ত, একেবারে যেন বজ্রের মতন বসে আছেন। তাঁর চোখ তাঁর ছেলের চোখের ভেতর কি খুঁজে দেখতে গেল, ছেলে তাঁর দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিলে।

"তোমার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছি পল। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?" পল বেশ জানে যে প্রত্যেক কথাটা, যা একেবারে সত্য নয় তা বলা তাদের দুজনের মধ্যে তবু অন্তরঙ্গতার প্রহসনের মত শোনাবে, তবু সে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হল।

"একজন রোগীর কাছে ছিলাম বলে মা," পল তাড়াতাড়ি জবাব দিলে।

লজ্জার জন্যে তার সেই ভারি স্বর যা কিছু অসত্য চিন্তাকে যেন উড়িয়ে দিলে। তবু এক লহমার জন্য মার মুখখানি আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার পর আবার তাঁর বুকে বুকে সেই ছায়া পড়ল।

অতি শান্তভাবে তিনি বললেন, "পল!" চোখের পাতা নত করে, একটা লজ্জার ভাবে জড়িত হয়ে, তাঁর কথায় একটুও দ্বিধা ছিল না, বললেন—

"পল, আমার কাছে এস, তোমাকে কিছু বলবার আছে আমার।"

যদিও পল তাঁর বেশী কাছে সরে এল না, তিনি ধীরে ধীরে, অতি নরম সুরে, যেন কানের কাছে কথা বলছেন, এমন ভাবে বললেন—

"আমি জানি, তুমি কোথায় ছিলে। অনেক রাত্তিরই এখন তোমার বাইরে যাবার সাড়া পাই। আজ রাতে আমি তোমার পিছু নিয়ে দেখেছি যে তুমি কোথায় যাও। পল, তুমি ভেবে দেখ কি কাজ করছ।"

সে কোন জবাব দিলে না, সে যে শুনতে পেয়েছে সে ভাবও প্রকাশ করলে না। তার মা চোখ তুলে চাইলেন, দেখলেন, সোজা তাঁর মাথা ছাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাসে। তার ছায়া পিদীমের আলোর থেকে তার পেছনের দেয়ালে পড়েছে—অচল, যেন জুথে পেরেক মেরে এঁটে দিয়েছে। তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, ভাবলেন, পল চেঁচিয়ে উঠবে, তাঁকে ধমকাবে, সে যে কোন দোষে দোষী নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য জোর করবে।

সে কিন্তু মনে করছিল তখন তার আত্মার নিবিড় প্রার্থনার কথা, সেই গির্জের দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে, এখন ভগবান তাই তার প্রার্থনা শুনেছেন, সেই জন্য তার মাকে স্বয়ং পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রক্ষা করবার জন্যে। সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে চায়, ব্যগ্র ভাবে বলতে চায় যে এ গ্রাম থেকে তাকে অন্যত্র এখুনি, এখুনি, তাকে নিয়ে যাও মা; সঙ্গে সঙ্গে সে রাগে অপমানে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে—অপমান এই জন্যে যে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে, রাগ এই জন্যে যে মা তার পিছু নিয়েছিলেন, তার চলাফেরা সব লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তবু মাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্যে, তার মনে বড় ব্যথা লাগল। তখুনি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে শুধু তাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে না, বাইরের ভাবচন্দ্রীকেও বাঁচাতে হবে।

মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত ছুঁইয়ে তখন বললে, "মা, আমি বলছি, আমি একজনের কাছে বলেছিলাম তার অসুখ।"

"সে বাড়ীতে কোন লোকের অসুখ হয় নি।"

"সব রুগ্ন লোকই বিছানায় শুয়ে থাকে না।"

"তাহলে, সে ক্ষেত্রে যে রোগীকে তুমি দেখতে গিয়েছিলে, সেই স্ত্রীলোকটার চেয়ে রোগ তোমারই দেখছি বেশী। তোমারই সাবধান হওয়া উচিত। পল! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কিন্তু আমি তোমার মা, আমি তোমায় বলছি যে পাপ একটা রোগ, যা সকল রোগের চেয়ে বড় রোগ। অন্য রোগ দেহকে ধরে, এ আত্মাকে কামড়ে ধরে। আরও—" মা পলের হাত ধরে, কাছে টেনে নিয়ে বললেন, যাতে সে আরো স্পষ্ট শুনতে পায়—"আরও, এ শুধু তোমাকে তুমি রক্ষে করবে তা নয়, তুমি ভগবানের সন্তান···মনে রেখ, তুমি তার আত্মাকে নষ্ট ক'রো না...তার কোন অনিষ্ট ইহলোকে, তুমি টেনে এনো না।"

পল নীচু হয়ে মায়ের কথা শুনছিল, কিন্তু এই শেষ কথায় সে একেবারে ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মত ছিটকে সোজা হয়ে উঠল। তার মা তার ভাবনার মূলে আঘাত দিলেন। হাঁ, এ ত সত্যি, যতক্ষণ এই চাঞ্চল্য আর দ্বন্দ্ব চলছিল, সে ত সে স্ত্রীলোকটির কথা ভাবে নি, শুধু নিজের কথাই ভাবছিল।

মায়ের হাত শক্ত, স্থির। তাঁর হাতের ভেতর থেকে হাত সরিয়ে সে নিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তিনি এমন জোরে হাত ধরেছিলেন যে, তার মনে হল যেন সে ধরা পড়ে গেছে, এখন তাকে কারাগারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আবার তার চিন্তা, ভগবানের দিকে মোড় নিলে। এই ভগবানই তাকে আটক করেছেন, অতএব সে বাধ্য এখন এ শুনতে। অসহায় দোষীর মনের ভেতর যেমন বিদ্রোহ জাগে, এড়াবার আর কোন উপায় না দেখে, পলের মন তেমনি বিদ্রোহী হয়ে উঠিল।

রুক্ষভাবে পল মাকে বললে, "ছেড়ে দাও আমাকে," জোর করে তার হাত টেনে ছিনিয়ে নিলে। "আমি এখন আর কচি খোকা নই, আমার পক্ষে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা আমি জানি।"

মায়ের তখন মনে হল যেন তিনি পাথর হয়ে গেছেন। কেননা পল ত তার দোষ স্বীকারই করলে।

"না পল! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে কতখানি অন্যায় তুমি করেছ। যদি তুমি জানতে, বুঝতে তাহলে কখন এ রকম করে কথা কইতে না।"

"তা হলে কি করে আমি কথা বলতাম?"

"তুমি অমন করে চেঁচাতে না, আমাকে বোঝাতে তোমার আর সেই স্ত্রীলোকটার মধ্যে কোন অন্যায় ব্যাপার নেই। কিন্তু ঠিক সেই কথাটা তুমি আমাকে বলতে পার না, কেননা জ্ঞানতঃ বিবেক হারাতে পার না, তার চেয়ে ও সব কথা কিছু না বলাই ভাল। কোন কথা বলতে হবে না। আমি তোমার কাছে এখন কিছু জানতে চাইনে। কিন্তু ভেবে দেখো পল! তুমি কিসের জন্য ঘুরছ।"

পল আর কোন জবাব দিল না, ধীরে ধীরে তার মায়ের কাছ থেকে সরে রান্না-ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, মা আরো কি বলেন, তা শোনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

"পল, আর তোমাকে বেশী কিছু বলবার আমার নেই, আর কিছু বলবার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা কইব।"

চোখ আগুনের মত জ্বলে উঠল, লাফিয়ে মার কাছে এসে পড়ল, যেন তাঁকে মারবে। "যথেষ্ট হয়েছে" চীৎকার করে বললে, "যথেষ্ট হয়েছে, এসব কথা না কওয়াই এর পর তোমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে, আমাকেও না, আর কাউকেও না। তোমার এ সব বাজে ভাবনা নিজের ভেতরই চেপে রেখে দাও।"

মা উঠে দাঁড়ালেন। শক্ত, দৃঢ়ভাবে পলকে তিনি ধরলেন দুই হাতে, তাকে বাধ্য করালেন তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকাতে, তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন, আবার বসে পড়লেন, দুটো হাত শক্ত করে কোলের কাছে চেপে ধরলেন।

পল দরজার দিকে গেল, তারপর রান্না-ঘরটার এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল। বাইরে বাতাসের শব্দ তার সেই পোষাকের খস্‌র খস্‌র শব্দের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছিল। রেশমের বহিরাবরণ, ব্লোক্‌টাও খুব ভাল কাপড়ের, তাতে শব্দ হচ্ছিল মেয়েমানুষের পোষাকের মত। চিত্ত যখন এই রকম অবাধ্য, তখন মনে হল যেন কতগুলো নানা গোলমেলে ভাবের ঘূর্ণীতে সে পাক খাচ্ছে, এমন কি রেশমী কাপড়ের খস্‌র খস্‌রও যেন বলছে, তাকে সাবধান করে দিচ্ছে, যে এখন থেকে তোমার জীবন কেবল ভুলের পাকেই ফিরবে ছোট কাজ আর দূষিত ব্যাপারে। বাইরের বাতাস তার যৌবনের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, বাড়ীর ভেতর ঘরের সেই বাসা-ভরা মূর্তি, তার নিজের পায়ের শব্দ, মাটীতে তার নিজের ছায়া সব স্মরণ করিয়ে দিলে। এদিক ওদিক সে ঘুরতে লাগল, এদিক আর ওদিক, নিজের ছায়ার বুকের ওপর মাড়িয়ে মাড়িয়ে, সব জিনিষটাকে ঘনিয়ে দিতে পথ খুঁজছিল। অহঙ্কারের সঙ্গে ভাবলে যে এর জন্যে কোন স্বাভাবিক শক্তির বাইরের সাহায্য দরকার হবে না, যেমন সে গির্জ্জের দরজায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছিল, 'রক্ষা কর'; সে অহঙ্কার আবার তখুনি তার মনে তা নতুন করে জাগিয়ে দিলে।

"যা ওঠ, যাও শোওগে", মার কাছে ফিরে এসে বললে। দেখলে, মা একটুও নড়লেন না, তাঁর মাথা নীচু হয়ে ঝুলে পড়েছে, বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নীচু হয়ে সে দেখলে আরো কাছে গিয়ে যে মা নিঃশব্দে থর থর করে কাঁপছেন।

"মা!"

মা একটুও না নড়ে বললেন, "না,···আর কখন এ কথার উল্লেখ আর তোমার কাছে আমি করব না, তোমাকেও না, আর কার কাছেও না। কিন্তু এ জায়গা থেকে আর আমি উঠব না, এই গির্জ্জেবাড়ী আর এই গ্রাম ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত। আর আমি এখানে ফিরে আসব না, যদি না তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে ওই পুরোনো বাড়ীর ছায়া তুমি মাড়াবে না, আর কখন ও বাড়ীতে ঢুকবে না।"

সেই গুমড়ান অবস্থা থেকে পল খাড়া হয়ে উঠল, আবার তার গা-মাথা কি রকম ঘুরতে লাগল। আবার সেই পুরোনো ধর্ম্মের সংস্কার তাকে চেপে ধরে বললে, যা মা চায় তাই প্রতিজ্ঞা কর, বুঝতে পাচ্ছ না যে, ভগবান তোমার মায়ের মুখ দিয়ে এসব কথা বলাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ের মত কতকগুলো তেত কথা তার ঠোঁটের আগায় এল, তার ইচ্ছা হল চীৎকার করে মাকে সেগুলো বলে, সব দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপায়, তাকে তার নিজের গ্রাম থেকে এখানে টেনে নিয়ে আসার জন্যে বকে, যে পথে তার পা ফেলা উচিত ছিল না সেই পথে তাকে নিয়ে আসার জন্য। আর তা বলেই বা কি হবে? আজ্ঞা! আজ্ঞা! এক হাত দিয়ে সে এমন ভঙ্গী করলে, যেন সমস্ত অন্ধকার ছায়া তার চোখের কাছ থেকে সে মুছে নিতে চায়। হঠাৎ সে তার মাথার উপর হাত বাড়িয়ে দিলে, কল্পনায় দেখলে সেই ছড়ান আঙুলের ডগা থেকে জ্যোতিরেখা মায়ের মাথা ঘিরে উঠছে।

"মা! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও সে বাড়ীর চৌকাঠ বাড়াব না।"

তৎক্ষণাৎ সে রান্না-ঘর থেকে চলে গেল, এই মনে করে যে এই খানেই সব শেষ হয়ে গেল। সেও বেঁচে গেল। কিন্তু পাশের ঘর পেরিয়ে যখন গেল, তখন শুনতে পেলে যে তার মা অবিরাম ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, যেন তাঁর কে মারা গেছে।

ঘরের ভেতর ফিরে এসে সেই গোলাপের গন্ধ, নানা রকম জিনিষ চারিদিকে ছড়ান, যা তার এই কামনাকে জাগাবার সহায় হয়ে রয়েছে, যার ভেতরে ভেতরে কামনার রস ও রঙ্গে ভরা, তারা আবার নাড়া দিয়ে তাকে তাজা করে দিলে। বিনা কারণে এদিক ওদিক করতে লাগল, জানালাটা খুলে দিলে, খোলা বাতাসের দিকে মাথাটা বার করে দিলে। তার মনে হল সে কত নিঃসহায়, যেমন মহাকাশের বুকে কোটী কোটী পাতা ঘুরে ঘুরে উড়ছে, কখন অন্ধকার ছায়ায়, কখন বা চাঁদের ঝকঝকে আলোয়, বাতাস আর মেঘের খেলার খোলামকুচির মত। শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। চীৎকার করে বললে,

"আমরা যেন মানুষ হই।"

যতখানি সে লম্বা, ততখানি সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শরীরে জীবনের কোন যেন সাড়া নেই না। সমস্ত দেহটা হিম আর শক্ত, শুধু গর্ব্ব আর অহঙ্কারের সাঁজোয়া পরায় খাড়া আছে। রক্তমাংসের কোন অনুভূতির চেতনা আর সে চায় না, দুঃখও চায় না, ত্যাগের যে আনন্দ তাও চায় না, একলা থাকার যে দুঃখের অবসাদ তাও চায় না। ভগবানের কাছেও আর ভাত্ত পেতে প্রার্থনা করবার ইচ্ছা নেই, পরম ভক্তের মত, ভগবানের দাসের মত, তাঁর কাছ থেকে আদেশ পেতেও আর ইচ্ছা নেই, সে এখন চায় শুধু সামনে সোজা চলে যেতে, একলা, আশাহীন। অথচ আলো নিভিয়ে বিছানায় শুতে যেতে তার ভয় হতে লাগল। তখন বসে সেই পলের কোরিনথিয়ানদের কাছে যে চিঠি তাই খুলে পড়তে সুরু করে দিলে। ছাপার অক্ষরগুলো। কথাগুলো তার চোখের সামনে ওঠানামার সঙ্গে নাচতে লাগল। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরও মা এমন কাঁদতে লাগলেন কেন? তিনি কি সব জানতে পেরেছেন? আঃ, হাঁ সব জানতে পেরেছেন; মায়ের অন্তর, ছেলের এ রক্তমাংসের যে যাতনা তা বেশ ভাল করেই জানতে পেরেছে, জেনেছেন যে তার ছেলের এই ত্যাগ যেন জীবনত্যাগের মত।

হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্তের ঢেউ তার মুখখানায় কে মাখিয়ে দিলে, সে মাথা তুললে, কান খাড়া করে বাতাসের দিকে শুনতে লাগল।

"শপথ করবার কোন কারণই ছিল না।" সন্দেহের হাসি হাসতে হাসতে সে নিজেকে বললে, "সত্যি যারা শক্তিমান, তারা কখন শপথ করে না। যে কেউ আমার মত শপথ করে, সেই আবার শপথ ভাঙে, এই আমি যেমন শপথ ভাঙতে প্রস্তুত।"

তখনি সে বুঝতে পারলে, মনের ভেতরের যে লড়াই, এই ত সবে তার সুরু। উপস্থিত এই দুঃখ, এই ঘটনা সম্বন্ধে এমন তার মন অপরের মতন হয়ে গেছে যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেই আবলীর কাছে এসে দাঁড়াল।

"এইখানে তুমি দাঁড়িয়ে, ভগবান তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। যদি তুমি তাঁর সেই কাজে নিজেকে সকল রকমে না দান কর, তার কাজে না লাগ, তবে শয়তান তোমাকে অনন্ত কাল ধরে অধিকার করে রেখে দেবে।"

তারপর সে তার সেই সঙ্কীর্ণ বিছানার উপর, পোষাক-পরা অবস্থায় নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। অতি নিঃশব্দে সে কাঁদতে লাগল, পাছে তার মা কান্নার শব্দ শুনতে পান, নিজেও যেন না নিজের কান্না শুনতে পায়। কিন্তু পাঁজরার ভেতর তার অন্তর চীৎকার করে কাঁদছিল অন্তরের গভীর দুঃখে, তার অন্তর নিঙড়ে নিঙড়ে উঠছিল।

"হে ভগবান। আমাকে নাও, এই বিষম অবস্থা থেকে আমাকে বার করে নিয়ে যাও।" এই কথা উচ্চারণের পর তার মনে একটা শান্তি এল, যেন দুঃখের মহাসমুদ্রের দোলার মাঝে, মুক্তির একখানা ভক্তা সে ধরতে পারলে।

সেই ভয়ানক অবস্থাটা কেটে যাবার পর, সে তখন ভাবতে লাগল। এখন সব তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিলে, জানালার ভেতর দিয়ে সূর্য্যের ভরা আলোয় যেমন বাইরের ছবি ঝরঝরে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সে পাদরী, ভগবানে সে বিশ্বাস করে। ধর্ম্মের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। সৎ হয়ে থাকবার জন্য সে জীবনে প্রতিজ্ঞায় বাঁধা। ধর্ম্ম তার বিয়ে-করা বধূর মত। তার সহধর্ম্মিণীকে সে কখনও ঠকিয়ে চলতে পারে না। তবে কি জন্য সে ওই স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়ল। এখনও সে ঠিক জানে না যে সত্যি তাকে সে ভালবাসে কিনা। হয়ত সে একটা দৈহিক আক্ষেপের অবস্থায় গিয়ে পড়েছে। আজ অনেক দিন ধরে যে তৃষ্ণা তার ভেতর ঘুমিয়ে মেতিয়ে পড়েছিল, আজ সেই আটাশ বছর পরে তার যৌবন আর যৌবনের যে তৃষ্ণা তাকে সে ঘুম ভাঙিয়ে

দিয়েছে। সেই জন্যেই এ্যাগনিসের প্রতি তার মন এমন করে ছুটেছে। হয়ত তার সঙ্গে তার মনের একটা সাদৃশ্য ছিল আছে তাই। আর হয়ত, সেও খুব ছেলেমানুষ নয়। সেও হয়ত জীবনে, জীবনের স্বাদ, প্রেমের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেমন একটা কনভেন্টে স্কুলে বন্ধ থাকলে হয়।

এই রকমে একেবারে প্রথম থেকেই, সৌভাগ্যের সখা-সখী ভাব এই প্রেমকে মুখোস দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, হাসি-ঠাট্টার আলোর মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তাদের দুজনের মধ্যে যে এ ভাবে এই ভালবাসা জন্মাতে পারে, এ প্রশ্নই তাদের মনের ভেতর কখনও জাগে নি। তাদের যে এভাবে কখনও টেনে এক করে দিতে পারে, তা তাদের কোন দিন মনে আসে নি। কোন লোক কোন দিন তাদের এ সম্পর্কের মধ্যে যে এ ভাব কখনও সম্ভব হতে পারে, সন্দেহও করে নি। পরস্পর কোন ভাব নিয়ে নয়, কোন ভয় নিয়ে নয়, কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, তারা মিলল। কিন্তু একটু একটু করে সেই আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে এই প্রেম-ভালবাসার ভিতরে প্রবেশ করলে, স্বচ্ছ, পবিত্র, শান্ত জলরাশি পাচিলের নীচে এসে জমা হয়েছিল, তারপর পাচিল হঠাৎ ভেঙে পড়ে, একেবারে ধ্বসে পড়ে গেল।

এই সব জিনিষ তার মনের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল, এই ভাবে সে তার মনের ভেতর যখন খোঁচা দিয়ে দেখলে, তখন সে সত্যটাকে জানতে পারলে। সে জানত যে প্রথম চাহনি থেকেই সে স্ত্রীলোকটাকে চেয়েছে, প্রথম চাহনি থেকেই সে তার অন্তরের ভেতর এই স্ত্রীলোকটাকে জড়িয়ে ধরেছে। বাকী যা কিছু সবই মনকে ছলনা ও চোখ ঠারা, যা দিয়ে সে নিজের সব কাজকে ভাল বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

এই রকমে সত্যকে সে মেনে নিতে বাধ্য হল—মানুষের এই স্বভাবকে, সহ্য করা, ভালবাসা, সংসারে নিজের জুড়ি খুঁজে নেওয়া, তাকে পাওয়া তার জন্যে কষ্ট ভোগ করা, তার জন্যে ভাল করা আর ফিরে পাওয়া, তার জন্যে মন্দ করা আর তাও ফিরে নেওয়া—এই দেওয়া-নেওয়া মানুষের জীবনের ইতিহাস। কিন্তু এই সকল চিন্তা, যে যাতনা তার মনের ভেতর ঝুকে চেপে তার হয়েছিল, তা থেকে এক কৌটা অনুপরিমাণ যাতনাও তুলে নিতে পারলে না। এখন সে তার যাতনার খাঁটি মানে খুঁজে পেল, এ যে মরণ-যাতনার গ্লানি। এ প্রেম, এ ভালবাসাকে ত্যাগ করা, এ্যাগনিসকে যে ভাবে সে তার বুকের ভেতর টেনে জড়িয়ে নিয়েছে, তাকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া, তার জীবন, প্রাণ সব ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া। তারপর এই চিন্তা আরো গভীর তলায় গিয়ে পৌঁছল। এসব শুধু মিথ্যা, বৃথা ভাবনা নয়? যখন দেহের প্রেমের এই ক্ষণিক সুখ ফুরিয়ে যায়, তখন আত্মা তার উপর প্রভুত্ব করতে চায়। তখন আরো জোর করে, আরো দৃঢ় ভাবে সে একলা হতে চায়। একলা হতে গিয়ে, এই যে ক্ষণভঙ্গুর দেহ, যা দিয়ে এই আত্মাকে ছেয়ে রেখেছে, তাকেই বেশী করে আঁকড়ে ধরে। সেই কারাগারেই সে আশ্রয় নেয়। তবে কিসের জন্যে সে একলা থেকে এই দুঃখ এই যাতনা ভোগ করবে? এত বছর ধরে কি সে এই অবস্থা মেনে নেয় নি। জীবনের যা সব চেয়ে ভাল দিন ও বছরগুলো সে কি এমনি করে সহ্য করে আসে নি? এমনি, ধর যদি সে এ্যাগনিসকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়েই করে, তা হলেও সে কি তার নিজের মধ্যে এমনি একলা হয়েই থাকবে না?...

শুধু তার নাম উচ্চারণ করা, শুধু তার সঙ্গে বাস করার সম্ভাবনার ভাব যেমন মনে হল, সে যেন একটা ভীষণ উত্তেজনার জন্যের ধমকে লাফিয়ে উঠল। কল্পনায় সে দেখলে যে এ্যাগনিস তার পাশে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে, কল্পনায় সে হাত বাড়ালে তাকে বুকের কাছে টেনে নেবার জন্যে, পাতলা নিটোল একটা জলন্ত লতার মত স্রোতে ভাসছে। সে তার কানের ছোট ফুটোর কাছে কত মধুর মত মিঠে কথা ঢেলে দিচ্ছে, তার সেই কেশের রাশি নিজের মুখের চোখের ওপর ছড়িয়ে জড়িয়ে রেখেছে। তা থেকে একটা তাপ আসছে, বুনো জাফরান ফুলের গন্ধে যেন ভরে রেখেছে। তার মাথার বালিশটা দাঁতে কামড়ে ধরে, সে যত গানের চেয়ে গান ছিল সব কঠিন সুর ঢেলে দিতে লাগল। যখন এসব থেমে গেল, তখন বললে যে সে আবার কাল আসবে তার কাছে। সে বললে যে তার মাকে দুঃখ দিয়ে, তার ভগবানকে চটিয়ে, সে খুব আনন্দ পেয়েছে। তার খুব আনন্দ যে সে পাপ করে আবার অনুতাপ করেছে, কুসংস্কার আর ভয়ের ভেতর ডুবেছে। এখন সে সব ছিঁড়ে ফেলতে পারে, সব থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, সে তার এ্যাগনিসের কাছে ফিরে আসতে পারে। (ক্রমশঃ)

[অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত]

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ঔষধপথ্যাদি ও মাংসাহার সম্বন্ধে নিয়ম

একবার ভিক্ষুদের অনেকের গ্রীষ্মকালীন বমন রোগ হইল ও তাহাদের শরীর শুখাইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ তাহাদের ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন যে প্রয়োজনের সময় ছাড়া তাহারা এগুলি ভিক্ষা করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এক সময়ে কয়েকজন ভিক্ষু অরুচি রোগে শুখাইয়া উঠিল, তখন বুদ্ধ ঔষধরূপে ছাড়া অন্য সময়েও প্রয়োজন হইলে খাদ্যের সঙ্গে ঘৃত, মধু প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

কয়েকজন পীড়িত ভিক্ষুর ঔষধরূপে বসা ব্যবহারের প্রয়োজন হইল। বুদ্ধ বলিলেন প্রয়োজন হইলে ও সময়মত পাওয়া গেলে যথানিয়মে তৈলের সঙ্গে পাক করিয়া ভল্লুক, শূকর, গর্দ্দভ, কুম্ভীর ও মৎস্যের চর্ব্বি ব্যবহার করিতে (পরিভুঞ্জিতুম্, এমন কি খাইতেও) পারা যাইবে, কিন্তু অপ্রয়োজনে ব্যবহার করিলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে ফল, পাতা, ফুল, ছিল্ল, লবণ প্রভৃতিও ঔষধার্থে ব্যবহারের অনুমতি হইয়াছিল। আনন্দের উপাধ্যায় স্থবির বেলট্ঠসীসের সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়াছিল এবং ঘায়ের রসে চীবর গায়ে আঁটিয়া যাইত, অন্য ভিক্ষুরা তাহা জল দিয়া ছাড়াইত। বুদ্ধ একদিন রাত্রিবাসের স্থান খুঁজিতে গিয়া ইহা দেখিতে পাইলেন ও ঘা, ফোড়া, খোসপাঁচড়া, দাদ প্রভৃতিতে ও শরীরে দুর্গন্ধ হইলে চূণ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। সুস্থ অবস্থায়ও শরীরের স্নেহনাশের জন্য গোবর কাদা প্রভৃতির ব্যবহারের অনুমতি হইল। চূণের ব্যবহার আরম্ভ হইলে ছাঁকা চূণের, তারপর অতিসূক্ষ্ম ছাঁকা চূণের প্রয়োজন হইল এবং এজন্য ছাঁকনি, উদূখল, মুষল প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি হইল।

এক ভিক্ষুর অমানুষিক ব্যাধি হইয়াছিল। তাহাকে উপাধ্যায় আচার্য্য প্রভৃতি শুশ্রূষা করিয়া ভাল করিতে পারিলেন না। যেখানে শূকর বধ করা হইত সেখানে গিয়া সে কাঁচা মাংস ও তাজা রক্ত খাইল ও ইহাতে তাহার ব্যাধির উপশম হইল। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া অমানুষিক ব্যাধিতে কাঁচা রক্ত মাংস খাইবার অনুমতি দিলেন।

এক ভিক্ষুর চক্ষুরোগ হইয়াছিল, তাহার জন্য বুদ্ধ নানা প্রকারের অঞ্জন ও ক্রমে অঞ্জন প্রস্তুতের জন্য গন্ধদ্রব্য, রাখিবার জন্য কৌটা, কৌটার জন্য চাকনি, কৌটা যাহাতে পড়িয়া না যায় সেজন্য কাপড়ে তাহা সেলাই করিয়া রাখা, অঞ্জন মাখাইবার জন্য শলাকা, শলাকা রাখিবার জন্য খাপ, কৌটা রাখিবার ঝুলি, ঝুলি কাঁধে ঝুলাইবার জন্য পেটি প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। "ছয় ভিক্ষুর দল" নানা রকমের কৌটা শলাকা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে লাগিল, ইহাতে নিয়ম হইল বাঁকা নল, শিঙ্, কাঠ, ফলের খোসা প্রভৃতি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারিবে না।

ভিক্ষু পিলিন্দবচ্ছের শিরঃপীড়া হইয়াছিল, তাহার মাথায় তেল দিবার অনুমতি হইল। তেলে ফল না হওয়ায় নাক দিয়া ঔষধ টানিয়া লইবার অনুমতি হইল ও ক্রমে নাক উঁচু করিয়া ধরিবার যন্ত্র, ঔষধের ধূম নাকে টানিয়া লইবার যন্ত্র, যন্ত্রনলের মুখঢাকনি প্রভৃতিও ব্যবহারের অনুমতি হইল। পিলিন্দবচ্ছের আর একবার উদরে বায়ু হইয়াছিল, বৈদ্যেরা বলিলেন, তৈল পান করিতে হইবে; তারপর তৈলের সঙ্গে মদ্য মিশাইবার প্রয়োজন হইল, বুদ্ধ ইহাতে অনুমতি দিলেন। "ছয় ভিক্ষুর দল" তৈলপানের সময় বেশী করিয়া মদ্য সংযোগ করিয়া পান করার ফলে মাতাল হইল, তাহাতে নিয়ম হইল যে মদ্য-মিশ্রিত এই পরিমাণ মাত্র তৈল পান করিতে পারা যাইবে যাহাতে মদ্যের বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ থাকিবে না। খানিকটা তৈলে মদ্য বেশী পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় ভিক্ষুরা কি করিবে ভাবনায় পড়িল, বুদ্ধ বলিলেন, ঐ তেল মলমরূপে ব্যবহার করা যাইবে। ক্রমে তৈলের জন্য পাত্রাদি যাহা প্রয়োজন তাহাও ব্যবহারের অনুমতি হইল। ভিক্ষু পিলিন্দবচ্ছের আর একবার বাত হইয়াছিল —লোকটি বোধহয় চিররোগী ও নানারোগী ছিল—ও

তাহার বেদ নির্গম করাইবার প্রয়োজন হইলে ধূমপ্রয়োগ, বেদকারী ঔষধ সেবন, তেল মাখিয়া বেতসমিশ্রিত উত্তপ্ত বালুকা ও ছাইএর তাপ লাগান, উষ্ণ ক্ষেত্রজ-জলে স্নান প্রভৃতির অনুমতি হইল। এইরূপে পীড়া-উপশমের জন্য রক্তমোক্ষণ, সেচন নস্য ব্যবহার ও শল্য চিকিৎসা, তৈল, ঔষধ, ক্ষেত্রজ, ব্যায়াম, পুলটিশ, মাংসের যূষ (এ শব্দটি ইংরাজী হইতে বাংলায় আসে নাই, পালিতে 'যূষ' শব্দ আছে), যূষ যাহাতে মুখরোচক হয় সেজন্য তাহাতে মশলাযোগ এবং রোগের সময় পাকস্থলী যূষ হজমের জন্য গন্ধবিলেপন প্রভৃতিতে বুদ্ধ অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক ভিক্ষুকে সাপে কামড়াইয়াছিল; সেকালের চিকিৎসা প্রণালী অনুযায়ী বুদ্ধ তাহাকে বিষ্ঠা, মূত্র, ছাই ও মাটি খাওয়াইবার অনুমতি দিলেন। ভিক্ষুদের মনে সমস্যা হইল এগুলি কেহ দান না করিলে লওয়া যাইতে পারে কি না; বুদ্ধ বলিলেন, দান করিবার কেহ উপস্থিত থাকিলে এগুলি দানরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যত্র প্রেরণ করা যাইতে পারিবে। এক ভিক্ষু বিষ খাইয়াছিল, তাহাকে বমন করাইবার জন্য বিষ্ঠা খাওয়াইবার প্রয়োজন হইলে ভিক্ষুদের মনে সমস্যা হইল কেহ না দিলে ইহা লওয়া যাইতে পারে কি না; বুদ্ধ বলিলেন, না। স্বয়ং তাহা অন্যে না দিলেও লওয়া যাইতে পারিবে।

ভিক্ষুদের কেহ কেহ ঘৃত, গুড়, মধু প্রভৃতি ভিক্ষা পাইলে ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। রাজা বিম্বিসার একবার ভিক্ষুদের অনেক ঘৃত মধু ইত্যাদি দান করিলেন, ভিক্ষুরা আনিয়া হাঁড়ি করিয়া বিহারে রাখিয়া দিল। কিন্তু উৎসবে এইসব জিনিষ বিতরণের ছড়াছড়ি, লোকে দেখিয়া বলিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা মগধরাজ বিম্বিসারের মত দান দ্রব্য সামগ্রীতে ঘর বোঝাই করিতেছে।" বুদ্ধ জানিতে পারিয়া বলিয়া দিলেন যে এসব জিনিষ ভিক্ষায় পাইলে ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য সাত দিনের বেশী রাখা যাইতে পারিবে না।

ভিক্ষু কণ্ঠা-রেবত একটি গুড়ের কারখানার পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন যে গুড়ের সঙ্গে নয়না ও আখের ছিবড়া মিশান দেওয়া হইতেছে। তিনি ভাবিলেন যখন খাইবার জিনিষ গুড়ের সঙ্গে মিশান হইতেছে তখন আহারের সময় ছাড়া গুড় খাওয়া যাইবে না, সেই জন্য তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা কেহই গুড় খাইলেন না। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলিলেন, নয়না প্রভৃতি শুদ্ধকে শক্ত করিবার জন্য মিশান হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জিনিষটাকে গুড়ই বলা হয়। কাজেই ইচ্ছামত (অর্থাৎ আহারের সময় ছাড়াও) গুড় খাওয়া যাইতে পারিবে।

রাজগৃহে একবার বুদ্ধের উদরে বায়ুশূল হইয়াছিল। আগে কয়েকবার উদরশূলে কষ্ট পাইলে তিনি ত্রিকটু যাগু (সাধারণতঃ যাগু বলিতে গুড়পক্ক অন্ন বুঝায়, ত্রিকটু যাগু ভিন্ন জিনিষ) খাইয়া নিরাময় হইয়াছিলেন বলিয়া আনন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিল, তণ্ডুল ও মুগ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন নিজেই ইহাতে ত্রিকটু যাগু পাক করিয়া বুদ্ধকে খাইতে দিলেন। কোনও কারণে যোষধর বুদ্ধের সন্দেহ হইয়া থাকিবে, তিনি যাগু কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া আনন্দকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কোন জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিলে বা ঘরে পাক করিলে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাক করিলে ভিক্ষুদের পক্ষে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীচৈতন্যও শিষ্যদিগকে সঞ্চয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; একবার আহারান্তে তিনি একটু হরিতকী চাহিলে এক শিষ্য পূর্বলক্ষিত এই সামান্য মূল্যহীন জিনিষ একটু তাঁহাকে বাহির করিয়া দিল; জিনিষ সামান্য হইলেও সঞ্চয়ের অপরাধে শ্রীচৈতন্য শিষ্যকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। লোকে লবণ, তৈল, তণ্ডুলাদি আরামে দিয়া যাইত, ভিক্ষুরা ইহা ঘরে তুলিত না এবং বাহিরে পড়িয়া থাকিত বলিয়া পশুপক্ষীতে খাইত বা চোরে লইয়া যাইত। ইহাতে নিয়ম হইল যে আহার্য দ্রব্য ঘরে রাখা যাইবে। ঘরে রাখা হইলেও রান্না বাহিরেই হইতে লাগিল; রান্নার সময় উচ্ছিষ্টভোজী সন্ন্যাসীরা ভীড় করিয়া ঘিরিয়া থাকিত, তখন নিয়ম হইল যে রান্নাও ঘরে হইতে পারিবে। দুর্ভিক্ষের সময় নিমন্ত্রণকারী গৃহস্থেরা ভিক্ষুদের বাড়ীতে খাইতে বলিয়া নিজেরা বেশী খাইত, ভিক্ষুদের কম দিত, তাহাতে নিয়ম হইল যে রান্নাও ঘরে হইতে পারিবে।

কয়েকজন ভিক্ষু কাশীরাজ্যে বর্ষাবাস করিবার পর রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিল, পথে

তাহাদের ভাল ভিক্ষা মিলিল না; গাছে গাছে অনেক ফল ছিল কিন্তু দান করিবার লোক কেহ না থাকায় ভিক্ষুরা ফল না খাইয়া ক্লিষ্ট শরীরে রাজগৃহে উপস্থিত হইল। তাহাদের ক্লেশের কথা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন, দান করিবার লোক না থাকিলেও গাছের ফল লওয়া যাইবে, দান করিবার কেহ যদি উপস্থিত হয় তবে ফল মাটিতে রাখিয়া দিতে হইবে ও ভিক্ষারূপে গৃহীত হইলে তবে খাওয়া যাইবে, কিন্তু কুড়াইয়া পাওয়া ফল সব সময়ে খাওয়া যাইবে। রাজা বিম্বিসার একবার ভিক্ষুদের তাঁহার বাগানের আম খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, ভিক্ষুরা আম বাগানে ঢুকিয়া আম খাইল ও কপোট উৎপাত করিয়া সব কাঁচা আম ও অনেক গাছ পাতা নষ্ট করিল। পরে একবার আম দরকার হওয়ায় রাজা বাগানে লোক পাঠাইলে মালী একটিও আম নাই বলিল, লোকে ইহাতে ভিক্ষুদের নিন্দা করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের তিরস্কার করিয়া আম খাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। একবার এক গৃহে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, খাইতে খাইতে হঠাৎ একটা তরকারিতে আম আছে দেখিয়া ভিক্ষুরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, তরকারির আম খাওয়া যাইতে পারিবে।

বারাণসীতে সুপ্রিয় নামক গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রী সুপ্রিয়া বুদ্ধের ভক্ত ছিল। সুপ্রিয়া একদিন ভিক্ষুদের কাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে গেলে এক ভিক্ষু জোলাপ লইয়াছিল, সে বলিল, "ভগিনি, আমার একটু মাংসের যূষ চাই; "বেশ আর্য্য, আনিয়া দিব" বলিয়া সুপ্রিয়া নিজগৃহে গিয়া তাহার স্বামীর একজন ছাত্রকে বাজারে মাংস আনিতে পাঠাইল কিন্তু কোথাও মাংস পাওয়া গেল না। যূষ না পাইলে রুগ্ন ভিক্ষুর রোগবৃদ্ধি হইবে এবং দিব বলিয়া না দিতে পারিলে তাহারও অন্যায় হইবে এই ভাবিয়া সুপ্রিয়া ছুরিকা-দ্বারা নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "এই মাংসের যূষ রানাইয়া অমুক ভিক্ষুকে দিয়া আয়, আমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্ আমার অসুখ করিয়াছে।" তারপর সুপ্রিয়া আঁচলে উরু ঢাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। তাহার স্বামী বাড়ীতে আসিয়া এই খবর শুনিয়া স্ত্রীর প্রশংসা করিল ও আহ্লাদিত হইয়া বুদ্ধের কাছে গিয়া তাঁহাকে সশিষ্য নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বুদ্ধ আহার করিতে আসিয়া সুপ্রিয়ার দানের কথা শুনিলেন এবং ফিরিয়া যাইবার পর ভিক্ষুদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে সুপ্রিয়ার কাছে মাংস চাহিয়াছিল। সেই ভিক্ষু উপস্থিত হইলে বুদ্ধ বলিলেন, "ভিক্ষু, উহা কি আসিয়াছে?"

"হাঁ ভগবন, আসিয়াছে।"

"উহা কি তুমি খাইয়াছ?"

"হাঁ ভগবন, খাইয়াছি।"

"উহা কিসের মাংস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

"না ভগবন, জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"ওহে অপদার্থ, কিসের মাংস জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি কি করিয়া খাইলে? ওহে অপদার্থ, তুমি মানুষের মাংস খাইয়াছ।" তখন নিয়ম হইল যে মানুষের মাংস খাওয়া নিষেধ এবং কোন মাংস খাওয়ার সময় কিসের মাংস জিজ্ঞাসা করিয়া খাইতে হইবে।

একবার দুর্ভিক্ষের সময় রাজার অনেক হাতী ঘোড়া মারা গেল। লোকে এই মৃত পশুদের মাংস খাইতে ও ভিক্ষুদের দিতে লাগিল। লোকে বলিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা হাতী ঘোড়ার মাংস কি করিয়া খায়? হাতী ঘোড়া রাজার অঙ্গ স্বরূপ, রাজা জানিলে ইহাদের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন না।" বুদ্ধ জানিতে পারিয়া হাতী ঘোড়ার মাংস খাওয়া নিষেধ করিলেন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা আরও খারাপ হইলে লোকে কুকুর ও সাপের মাংস খাইতে ও ভিক্ষুদের দিতে লাগিল। লোকে বলিল, "কুকুর ও সাপের মত ঘৃণ্য জন্তুর মাংস ভিক্ষুরা কি করিয়া খায়?" ইহাতে এ মাংসও নিষিদ্ধ হইল। ভিক্ষুরা একবার বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় এক ব্যাধের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলে, ব্যাধ সিংহ মারিয়াছিল তাহার মাংস ভিক্ষা দিল। ইহা খাইয়া বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সিংহমাংসের গন্ধ পাইয়া ভিক্ষুদের সিংহে আক্রমণ করিল। বাঘ, চিতা, ভালুক ও হায়েনার (তরক্ষু) মাংস ভিক্ষুদের খাওয়া সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প আছে: এ সব মাংস সেজন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বুদ্ধ একবার সশিষ্য বারাণসী হইতে অন্ধকবিন্দ নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পিছনে কোন কোন যাত্রী গাড়ীতে আহার্য্য লইয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ

আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ভিক্ষুদের যাগু ও মধুগোলক (বোধ হয় একরকম লাড্ডু) খাইতে দিতে পারে কি না; আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে যাগু দিতে আসিলে তিনি উহা ভিক্ষুদের দিতে বলিলেন। বুদ্ধ যাগু ও মধুগোলক খাইবার অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া উপাসকেরা ঘর যাগু ও মধুগোলক আনিয়া প্রাতে ভিক্ষুদের খাইতে দিতে লাগিল। একজন মহামাত্য সম্প্রতি বুদ্ধের উপাসক হইয়াছিলেন, তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর ভোজ্য ও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এক থালা করিয়া মাংসের আয়োজন করিলেন। ভিক্ষুরা খাইতে বসিয়া "অন্ন দিবেন, অন্ন দিবেন" বলিতে লাগিল; মহামাত্য বলিলেন, "আমি নূতন উপাসক হইয়াছি বলিয়া আপনারা অন্ন খাইবেন না, আমি অনেক আয়োজন করিয়াছি, প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এক থালা করিয়া মাংস আছে, যত ইচ্ছা খান।" ভিক্ষুরা মহামাত্যকে বলিল, তাহাদের অন্ন খাইবার কারণ মহামাত্যের নবীন উপাসকত্ব নয়, সকালে যাগু ও মধুগোলক খাইয়া পেট ভরা থাকাই ইহার কারণ; মহামাত্য ইহাতে ভয়ানক চটিয়া বলিলেন, তিনি তাহাদের যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন তাহারা আগে অন্যত্র খাইয়া আসে কেন? তিনি কি তাহারা যত চাহে তত দিতে পারেন না? মহামাত্য ক্রোধে ভিক্ষুদের পাত্র আধার্য করিয়া দিতে দিতে বলিলেন "হয় খাও না হয় লইয়া যাও।" আহারান্তে উপদেশ দিয়া বুদ্ধ চলিয়া আসিলেন। বুদ্ধ যাইবামাত্র মহামাত্যের নিজের ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইল এবং তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, মহামাত্য যে ভিক্ষুদের আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার পুণ্য হইয়াছে এবং নিমন্ত্রণ থাকিলে পূর্বে অন্যত্র খাইয়া যাইতে ভিক্ষুদের নিষেধ করিলেন।

লিচ্ছবি সেনাপতি সিংহ বুদ্ধকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি একজন অধীনস্থ সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ত মাংস পাওয়া যায় কিনা" এবং বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের মাংস ও অন্যান্য অনেক জিনিষ খাওয়াইলেন। নির্গ্রন্থরা দলত্যাগ করার জন্য সিংহের উপর চটিয়া ছিল ও তাঁহাকে ও বুদ্ধকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। সিংহের বাড়ীতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা মাংস খাইতেছেন শুনিয়া নির্গ্রন্থ শ্রমণরা বৈশালীর পথে পথে তেমাথায় চৌমাথায় ছুটাছুটি করিয়া দুইহাত ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "আজ সেনাপতি সিংহ একটা মোটা পশু হত্যা করিয়া শ্রমণ গৌতমকে খাওয়াইয়াছে, অতএব শ্রমণ গৌতম জ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য নিহত পশুর মাংস ভোজন করেন" (অজ্জ সীহেন সেনাপতিনা থুল্লং পসুং বধিত্বা সমণস্স গোতমস্স চেব, তং অনপো গোতমো জানং উদ্দিস্সকতং মংসং পরিভুঞ্জতি)। একজন সৈন্য শুনিয়া সিংহকে ইহা জানাইলে সিংহ বলিলেন, "ইহাতে মনে করিবার কিছু নাই, উহারা অনেকদিন ধরিয়া বুদ্ধের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, ভগবান সম্বন্ধে বৃথা তুচ্ছ মিথ্যা রটাইতে উহাদের মোটেই বাধে না; প্রাণ গেলেও আমি জ্ঞাতসারে জীবহত্যা করি না।" আহারের পর উপদেশ দানান্তর আরামে ফিরিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলিলেন, "তোমরা জ্ঞাতসারে তোমাদের জন্য নিহত পশুর মাংস খাইও না; তোমরা মারিতে দেখ নাই, শোন নাই ও তোমাদের জন্য মারা হইয়াছে এরূপ সন্দেহ কর নাই—এই তিনটি সর্ত পূর্ণ হইলে তবেই তোমরা মৎস্য ও মাংস খাইতে পার।"

আসলে সিংহ বাজার হইতে মাংস আনাইয়াছিলেন। এরূপ মাংসকে "পবত্ত-মংসং" বলিত, টীকাকার বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, "মতস্স মংসং" অর্থাৎ মৃতের মাংস। দোষদুষ্ট মাংসকে "উদ্দিস্সকত মংসং" বলা হইত অর্থাৎ যারা ভোক্তার উদ্দেশ্যে বধ করা হইয়াছে। বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে প্রাচীন ভারতে মাংসভোজন অতি সাধারণ নিয়ম ছিল। ভাষার দেশের রীতিনীতি ধরা পড়ে, বৈদিক সংস্কৃতে "আমিষ্" শব্দে কাঁচা মাংস বুঝাইত, পরবর্তীকালের সংস্কৃতে "আমিষ" শব্দে মাংস ও সাধারণ খাদ্য বুঝাইত। কাজেই মাংস সাধারণ খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইত বুঝিতে হইবে। পালিতে "আমিস" শব্দের মুখ্য অর্থই খাদ্য, গৌণ অর্থে মাংস। ইহাতে দেখা যায় মাংসভোজন কত সুপ্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও সাধারণ লোকের মধ্যে মাংসাহারের প্রচলন যে খুবই বেশী ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। বুদ্ধ প্রভৃতি অহিংসা-বাদীদের প্রাণিহত্যায় আপত্তি ছিল বটে। কিন্তু মাংস নামক জিনিষটি ভোজন সম্বন্ধে কোনই আপত্তি ছিল না। মহাবীরও একবার বিড়ালের মারা একটি পাখরার মাংস

খাইয়াছিলেন এবং জৈন শ্রবণদের মেদী হাড় কাঁটা সংযুক্ত না হইলে ভিক্ষার মধ্যে মাংস গ্রহণের অনুমতি ছিল। মাংসাহারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের অভিমত পরবর্তীকালে কতকটা স্বাস্থ্যনীতির প্রয়োজনে ও কতকটা অহিংসানীতির প্রসার হইয়া প্রাণিবধের সম্পূর্ণ নিবারণের উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জীবক একবার বুদ্ধকে তিনি তাঁহার জন্য নিহত পশুর মাংস খান একথা ঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বুদ্ধ বলেন একথা ঠিক নহে, ব্রহ্মবিহারী ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইলে এরূপ ভাবে না যে গৃহস্থ বোধ হয় আমাকে খুব ভাল খাইতে দিবে বা ভবিষ্যতেও সে যেন আমাকে এরূপ ভাল খাইতে দেয়, ভিক্ষু যাহা পায় তাহা খায় এবং ইহাতে কোন দোষ হয় না (মজ্ঝিম-নিকায়, জীবনসুত্ত)।

সারিপুত্রের একবার জ্বর হইলে মৌদ্গল্যায়ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, পূর্বে পদ্মের মৃণাল খাইয়া তাঁহার জ্বর সারিয়াছিল, তাই তিনি মৃণাল আনিয়া দিলে তাহা খাইয়া সারিপুত্র সুস্থ হইলেন। ইহাতে বুদ্ধ বনে বা পুষ্করিণীতে জাত তিনিষ অগ্নের ভুক্তাবশিষ্ট না হইলে খাইবার অনুমতি দিলেন। আর একবার উদরে বায়ু হওয়ায় সারিপুত্রকে পেঁয়াজ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

বৈশালীতে একবার খুব সুভিক্ষ হইল, প্রচুর শস্য জন্মিল এবং অনেক খাদ্য পাওয়া গেল, উহার দ্বারা বা ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ সহজ হইল। বুদ্ধ ধ্যানে বসিয়া জানিলেন যে গৃহে খাদ্য রাখা, রন্ধন করা প্রভৃতিতে তিনি দুর্ভিক্ষের সময় অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুরা এখনও এগুলি করিতেছে। পরে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুমান সত্য জানিয়া তিনি এগুলি অতঃপর নিষেধ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে এক গ্রামের লোক তৈল, লবণ প্রভৃতি গাড়ী বোঝাই করিয়া আরামে ভিক্ষুদের দিতে আসিল, কিন্তু ভিক্ষুরা ভিতরে না লওয়ায় উহা বাহিরেই পড়িয়া থাকিল। একদিন ঝড় উঠিলে গ্রামের লোক আসিয়া আনন্দকে বলিল, তাহাদের আনীত দ্রব্যাদি বাহিরেই পড়িয়া আছে, ওদিকে ঝড় আসিয়াছে, এখন তাহারা কি করিবে। আনন্দ গিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিলেন, "এ অবস্থায় সঙ্ঘে বিধিমত জ্ঞপ্তি উপস্থিত করিয়া ভিক্ষুরা কোন স্থানবিশেষকে 'কপ্পিয়ভূমি' অর্থাৎ আরামের বাহিরে খাদ্যদ্রব্য রাখা বা রান্না করিবার স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। "কপ্পিয়ভূমি" নির্দ্ধারণের কিছুদিন পরে বুদ্ধ একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া কাক ডাকার মত মহা শব্দ শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে উহা "কপ্পিয়ভূমি"তে যাগু, ভাত, সূপ প্রভৃতি রন্ধন করিবার, মাংস কুটিবার ও কাঠ কাটিবার শব্দ; ইহাতে তিনি বলিলেন যে জ্ঞপ্তিদ্বারা যেখানে সেখানে "কপ্পিয়ভূমি" নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে না; গৃহস্থ-গৃহ বা যেখানে গরুবলদ থাকে (গোনিসাদিক), বা বিশেষভাবে প্রস্তুত স্বতন্ত্র স্থান ছাড়া অন্যত্র "কপ্পিয়ভূমি" হইতে পারিবে না। ভিক্ষু ঘসোজের পীড়ার সময় আনীত ভেষজাদি বাহিরে থাকায় পোকায় খাইল, ইহাতে ঔষধ রাখিবার জন্য জ্ঞপ্তিদ্বারা "কপ্পিয়ভূমি" নির্দ্ধারণের অনুমতি হইল।

ভদ্দিয় নগরে মেণ্ডক নামক এক ব্যক্তির অনেক গরু ছিল, সে ভিক্ষুদের দুধ খাইতে দিতে চাহিল, কিন্তু দোষ হইবে ভয়ে ভিক্ষুরা খাইল না। তখন বুদ্ধ দুধ, দই, মাখন, ঘোল প্রভৃতি পাইবার অনুমতি দিলেন। জনহীন স্থান দিয়া যাইবার সময় সঙ্গে আহার্য্য লইবারও অনুমতি দিলেন। আপন গ্রামের কেনিয় নামক একজন জটিল বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের দধিসহ খাইতে দিয়াছিল, তাহাতে বুদ্ধ আম, জাম, কলা, নারিকেল, মধু, আঙ্গুর, মৃণাল ও পারুষক এই ফলগুলির সরবৎ খাইবার অনুমতি দিলেন। জটিল ভিক্ষুদের আহারের নিমন্ত্রণ করায় বুদ্ধ বলিলেন, "কেনিয়, আমার সঙ্গে অনেক ভিক্ষু আছে, তুমি ব্রাহ্মণদের অনুরাগী", কিন্তু কেনিয় না ছাড়ায় বুদ্ধ সম্মতি দিলেন।

এক ভিক্ষু বুদ্ধ তাহাদের গ্রামে আসিতেছেন শুনিয়া শিষ্যদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া তিনিষ সংগ্রহ করিয়া যাগু প্রস্তুত করিয়া বুদ্ধ আসিলে তাঁহাকে খাইতে দিল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া তাহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুদের মনে এটি খাওয়া উচিত কিনা, ইহা করা উচিত কিনা, ইহাতে ভগবানের অনুমতি আছে কিনা, নানা বিষয়ে এরূপ সমস্যা হইত। এ বিষয়ে জানান হইলে বুদ্ধ বলিলেন, "যে বিষয়ে আমি 'ইহা উচিত নহে' বলিয়া নিষেধ করি নাই তাহা যদি অধর্ম্মসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তবে তাহা করিও না; আর যদি ধর্ম্মসঙ্গত ও অধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তবে তাহা করিও। যে বিষয়ে আমি 'ইহা উচিত' বলিয়া অনুমতি দিই নাই তাহা অধর্ম্মসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে তোমরা করিও না; আর যদি তাহা ধর্ম্মসঙ্গত ও অধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তবে তাহা করিও।"

এক ভিক্ষু জাবর কাটিত। ভিক্ষুরা নিন্দা করিল; বুদ্ধ বলিলেন ঐ ভিক্ষু অতিসন্ধ্রতি গোজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে জাবর কাটুক, কিন্তু যেন মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির করা খাদ্য আবার মুখে গ্রহণ না করে। [ক্রমশঃ]

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হিমালয়

১

বিনয় সন্ধ্যার সময় দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া ক্যাশনাল হোটেল নামে একটি হোটেলে উঠিল। ম্যানেজারের আদেশে যে ঘরে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাতে আর একটি ভদ্রলোক ছিল। বিনয়ের চোখে লোকটিকে অদ্ভুত মনে হইল। তাহার একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

লোকটি বিশালকায়, বিপুলোদর, প্রচুর দাড়ি পাঠানের মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই কানের সহিত জড়ানো। বিধাতা যে হাতে ম্যামথ, জলহস্তী, গণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন, লোকটিও সেই অনন্যসাধারণ শিল্পনিপুণ হাতের রচনা। তাহার অঙ্গে সাহেবী পোষাক। সে একখানা গোল টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানচিত্র দেখিতেছিল। বিনয়কে সে মুখ তুলিয়া লক্ষ্য করিল না, যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল মাথাটা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিল—গুড ইভনিং মঁসিও। বিনয় প্রত্যভিবাদন করিল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ।

বিনয় লক্ষ্য করিল, ঘরের কোণে একটি বন্দুক এবং একপ্রস্থ অশ্বারোহণের পোষাক। শিয়রের কাছে নেপোলিয়ানের একখানা চিত্র, আরকোলার যুদ্ধে নেপোলিয়ান পতাকা হাতে করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিতেছে।

বিনয় ক্লান্ত হইয়াছিল, নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল। হঠাৎ সেই লোকটি টেবিলের উপর এক বিশাল চাপড় মারিল—বিনয় চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। লোকটি বলিল—দেখুন মঁসিও দেখুন, সম্রাট উল্মের যুদ্ধে যে চাল দিয়েছিলেন, সেই রকম যদি করতেন, তবে কি ওয়েলিংটনের সাধ্য! বিনয় কিছুই বুঝিতে পারিল না। লোকটি বলিয়া চলিল—আঃ, গ্রাউচি যদি ব্লুকারকে আর এক ঘণ্টা আটকিয়ে রাখতে পারতো! ইংরেজ-লেখকরা ওয়েলিংটনকে বড় যোদ্ধা প্রমাণ করবার জন্য প্রাণপাত করেছে, কিন্তু ওয়াটারলু যুদ্ধে ওয়েলিংটন তো হেরে গিয়েছিল, এমন কি তার রিজার্ভ সৈন্যদলকে আক্রমণে উঠবার আদেশ পর্য্যন্ত দিয়েছিল। কেবল ব্লুকার এসে পড়াতেই—

হঠাৎ থামিয়া দ্বিগুণের সুরে আরম্ভ করিল—ওয়েলিংটন যে কত বড় বীর স্পেনের যুদ্ধই তার প্রমাণ। স্পেন জয় করতে মঁসিও, তার পাঁচ পাঁচটি বছর সময় লেগেছিল। তবু তো সেখানে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না—নইলে—হাঃ—

লোকটি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বিনয় এবার ভাল ভাবে লোকটির বিশালতা লক্ষ্য করিল। সে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ নেপোলিয়ানের চিত্রের সম্মুখে থামিয়া সামরিক কায়দায় সেলাম করিল, ফরাসী ভাষায় বলিয়া উঠিল—সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।

বিনয় অবাক্ হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। এইবার লোকটি তাহার কাছে আসিয়া বসিল। সে পকেট হইতে একখানা 'ভিজিটিং কার্ড' লইয়া বিনয়ের হাতে দিল। বিনয় দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—

M. VIKRAMJIT, F.R.H.S.
Fellow of the Royal Hunting Society.

বিনয় ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। লোকটি আবার উঠিয়া পড়িয়া পায়চারি সুরু করিল। পুনরায় নেপোলিয়ানের চিত্রের সম্মুখে থামিয়া পকেট হইতে একটি সোনার নস্যের কৌটা বাহির করিয়া অন্যমনস্কভাবে খানিকটা নস্য গ্রহণ করিল, তাহার অনেকটাই নাকে না গিয়া জামার উপরে পড়িয়া গেল। তারপরে একটি বিখ্যাত ফরাসী গানের সুর গাহিতে গাহিতে পায়চারী সুরু করিল। গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতেছিল—Malbrouck s'en va-t-en guerre। গান থামিলে সে বিনয়ের কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—দেখুন মঁসিও, শিকার না করেই আমাদের বেলটা গেল। যুদ্ধই যখন সভ্যতার চরম লক্ষ্য, যাদের সে সুবিধে নেই, শিকারেই তাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমার একটা থিওরি আছে, মানুষ প্রথমে শিকার দিয়ে সভ্যতা সুরু করেছিল, কিন্তু ক্রমে দেখতে পেলো জানোয়ার দ্বারা তার পক্ষে অপব্যয়ের। সে বুদ্ধিবিস্তার জানোয়ারের

চেয়ে এত শ্রেষ্ঠ যে নিতান্ত শিক্ষানবিশির ভার থেকে জানোয়ার শিকার ছেড়ে, মানুষ শিকার ধরলে, একেই বলে যুদ্ধ।

—কি বলুন ব্রিক ভিনা! সে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল।—দেখুন আমি আপনাদের মত এম-এ, বি-এ নই, কাণ্ডজ্ঞানের বলেই এ সমস্ত ভেবে বের করেছি!

লোকটির কথাবার্ত্তায় এমন একটা স্বাভাবিক আন্তরিকতার টান ছিল যে বিনয় তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

—আমি শিকারে বেরিয়েছি, হিমালয়ের উপত্যকার গভীর বনে যাবো; বেশি দেরি নেই।

ক্রমে বিনয়ে ও বিক্রমজিতের মধ্যে আলাপ জমিয়া গেল। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—কিন্তু স্বাভাবিক ঋজুতার গুণে আলাপে কোনো বাধা পড়িল না।

বিনয়ের মনে দারুণ দুঃখ, কিন্তু সেও আনন্দের সহিত আলাপে যোগ দিল। বিনয় যদি সর্ব্বজ্ঞ হইত, তবে জানিতে পারিত, এই শিকারোৎসুক মনেও আর একটা নিদারুণ বিষাদের বাসা। কিন্তু একের মনের ভার অন্যে জানিতে পারিল না—দুজনেরই মুখে হাসি। সংসারে এমনই হয়। এ যেন অনেকটা নূতন দামী জুতা পরার মত। প্রতি পদক্ষেপে পা কাটিয়া যাইতেছে, তবু মুখে হাসি বিকশিত রাখা চাই।

অনেক রাত্রে একবার বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। এই অবসরে সে বিক্রমজিতের আর একটা অপ্রত্যাশিত পরিচয় পাইল।

বিনয় দেখিল, দেয়ালে একটা টিকটিকি একটা পোকা ধরিয়াছে। বিক্রমজিৎ তাহার মুখ হইতে ওই পোকাটাকে উদ্ধার করিবার জন্য টিকটিকির পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে। ক্রমে টিকটিকিটা চাতালের কাছে গিয়া বিক্রমজিতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল। বিনয়ের মনে পড়িল, বিক্রমজিতের বিওরি। শিকারই সভ্যতার উৎপত্তি। সে মনে মনে বিক্রমজিতের উপাধিটা আবৃত্তি করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

২

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জানালা খুলিয়া বিনয় বাহিরে তাকাইল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিগন্তের কালো আকাশটাতে তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রাণীর অঙ্গসজ্জার জন্য স্বর্ণীয় সুবর্ণ কণিকা পরীক্ষা করা হইতেছে। প্রথমে দুই একটা সোনার রেশ ফুটিয়া তার পরে অকস্মাৎ এক সময়ে সমস্ত দিগন্তখানা কে যেন গলিত কাঞ্চনে মুড়িয়া দিল। কিন্তু এ বর্ণ যেন সজীব, প্রতি পলে পলে তাহাতে নূতন আভাস। সোনার রঙ, ঘন রক্ত বর্ণে, গাঢ় রক্তিমাভার গোলাপীতে, গোলাপী স্থলপদ্মের আভাস, সে আভাস বেগুনী ও পীতবর্ণের মধ্যে দিয়া কখন নিকলঙ্ক শুভ্রতায় আসিয়া পৌঁছিল। আধঘণ্টার মধ্যে একটা ইন্দ্রধনুর বিস্তার সঞ্চারিত হইয়া গেল। মন্দাকিনীর পুঞ্জীভূত শুভ্র ফেনরাশির মত বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ। একটা দিকে সূর্য্যকরোদ্ভাসিত নীহারেখা, অপর দিকটার প্রখর সূর্য্যালোকের আভায় কোমল কালো ছায়া, হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি।

বিনয় চাহিয়া দেখিল, উপত্যকায় তখনো গভীর অন্ধকার। অন্ধকারে ঘন অরণ্য পাহাড়ের গা বাহিয়া গড়াইয়া নামিয়া গিয়াছে, চক্ষু যেখানে আর তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে না। উপত্যকায় থাকে থাকে চা-এর বাগান, মাঝখান দিয়া একটি সজল সূত্ররেখা।

সে উপরে চাহিয়া দেখিল পাহাড়ের গায়ে ধূপি গাছের শ্রেণী। স্বচ্ছ, দীপ্ত আকাশের পটভূমিতে প্রত্যেকটি বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা স্বতন্ত্র সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে। আর আকাশের প্রান্তে স্বচ্ছ ক্ষীণ চন্দ্রকলাখানি মন্দাকিনীর তীরে খসা কেলি-শ্রান্ত রাজহংসের পাখার মত পড়িয়া আছে।

এ দৃশ্য বিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। সে এই পার্ব্বতীয় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য বেড়াইতে বাহির হইল। জনতাপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন ক্যালকাটা রোড ধরিয়া চলিল। ডাহিনে পাহাড়, পাহাড়ে অপর্য্যাপ্ত ফার্ণের জঙ্গল, বামে সুগভীর উপত্যকা, সেখানে বিশাল শাল সেগুনের শ্রেণী। সে উপত্যকার পরে আবার উপত্যকা, এমন ভাবে কতদূর চলিয়াছে, কে জানে। পথের পাশে মাঝে মাঝে একখানি বেঞ্চি, বৃষ্টিনিবারণের জন্য উপরে একটি কাঠের চালা। বিনয় অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়া এক স্থানে কয়েকটা সমাধিস্তম্ভের মত দেখিতে পাইল; তাহার পাশে কতকগুলি নিশান ঝুলিতেছে। সেখানে সে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া পড়িল।

তাহার সম্মুখেই, নিম্নে গভীর উপত্যকায় গভীর অরণ্য। বিনয় যেখানে বসিল, সেখান হইতে উপত্যকার তলদেশ নজরে পড়ে না, কেবল বনস্পতি শ্রেণির উচ্চতম শাখাগুলি দেখা যায়। আর মাঝে মাঝে বাতাসে দূরবনের শুষ্ক পত্রের মর্মর শ্রুত হয়, যে বনে দিন-দুপুরে ভালুক চরিয়া বেড়ায়। বিনয়ের মনে পড়িল, গত কল্য যখন সে শিলিগুড়ি হইতে ট্রেণে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিল, সেই কথা। প্রথম যখন সমতলভূমি ছাড়িয়া ট্রেণ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল, নাকখানে দক্ষ পথ, দুই ধারে গভীর খাদ, গভীর খাদে পবন অরণ্য, হাজার বছরের প্রাচীন। চারিধার নিস্তব্ধ, জন-মানব নাই, কেবল বৃহৎ বনস্পতির তলদেশে তাহাদের ট্রেণখানি একখানা খেলনার মত, খেলনার মতই তাহা নগণ্য। শ্বাপদ-সঙ্কুল তরাই প্রদেশের শুষ্ক পত্রের মর্মর তাহার কানে আসিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে দুঃসাহসী কাঠুরিয়ার অদূরে কোথাও কাঠ কাটার শব্দ। নিস্তব্ধ দুপুর, নিশ্চল পর্বত, গভীর অরণ্য, সবশুদ্ধ মিলিয়া এমন একটা অলৌকিক মায়া রচনা করিয়াছিল, যাহাতে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

আজও সে অনেকটা সেই রকম অদ্ভুত একটা অলৌকিক ভাব অনুভব করিতে লাগিল। উপত্যকায় চাহিয়া দেখে পাহাড়ের গা বাহিয়া কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জ উপরে উঠিয়াছে। নিম্নে অন্ধকার হইয়া গেল। সে উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল মেঘের পিঠে সূর্যকিরণ ইন্দ্রধনুর বল্গা করিয়া দিয়েছে। কিছুকালের মধ্যেই ঐরাবতের বংশধরের মত সেই পুরুরক্ষ মেঘপুঞ্জে পর্বতসানু বনরাজি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহারা রবিকিরণের মশালগুলিকে উপড়াইয়া লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে বিনয়ের পায়ের কাছে, চারিধারে, উচ্চে নীচে সর্বত্র মেঘান্ধকারে ডুবিয়া গেল—আর কিছু দৃষ্ট হয় না—হিমালয় পর্বত নাই। সূক্ষ্ম শীতল বাষ্পের কণা তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনয় একা। এই নিখিলগ্রাবী অন্ধকারে বসিয়া সে শুনিতে পাইল, আর কোথাও কিছু শব্দ নাই, কেবল উপত্যকার কোন্ গভীরতা হইতে বিদেশীয় কোকিলের কু-কু—কু, কু-কু—কু রব ভাসিয়া আসিতেছে।

মেঘ কাটিয়া গেল, উপত্যকায় বৃষ্টি হইয়া গেল, শাল-বনের মাথায় বড় বড় ছাঁটা পড়িতে লাগিল, সহসা বনপ্রান্তে অজ্ঞাত কোন্ নির্ঝরের কলধ্বনি ঝুলিবনের মর্মরের সহিত মিলিত হইয়া কানে আসিতে লাগিল। বিনয় সেই শিলাখণ্ড হইতে উঠিয়া পুনরায় ফিরিয়া চলিল।

সে 'মাল'এ আসিয়া পড়িল। দলে দলে স্বাস্থ্য-লিপ্সু নরনারী 'ফল' খাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। গিরিরাজের সভার এই বিদূষকের দল যদি জানিতে পারিত সপারিষদ গিরিরাজ তাহাদের অভিনয়ে কেমন কৌতুক অনুভব করিতেছেন, তবে বোধ করি তাহারা লজ্জিত হইত।

বিনয় 'মাল' ছাড়িয়া ক্রমে অবজারভেটরি গিরিশিখরের দিকে চলিল। উক্ত শৈলের চড়াই-পথে যখন সে উঠিতেছে, হঠাৎ শুনিতে পাইল—মঁসিও, মঁসিও। স্বর শুনিয়া বুঝিল বিক্রমজিৎ। কিন্তু কোথায় সে! অদূরে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। স্বরটা সেখান হইতে আসিতেছে, বিনয় সেই দিকে চলিল।

জনতার কাছে গিয়া বিনয় যাহা দেখিল তাহা দর্শনীয় ত বটেই, বর্ণনীয়ও। বিক্রমজিৎকে কেন্দ্র করিয়া একটা ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। বিনয়কে দেখিয়া বিক্রমজিৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—মঁসিও Example is better than lecture! দেখুন, দেখুন কি ব্যাপার!

ব্যাপার গুরুতর বটে। বিক্রমজিতের পরিধানে ইংরেজী ধরণের শিকারের পোষাক। কাঁধে বন্দুক, পরম খাদ্য রাখিবার ঝুলি, পিঠে একটা থলি। বিক্রমজিৎ সগর্বে একটা গাধার পিঠে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছেন, জন্তুটার মুখে লাগাম। পাছে উক্ত জানোয়ারকে কাহারো গাধা বলিয়া ভ্রম হয়, তাই তাহার গলায় একটা বৃহৎ বেবেল ঝুলিতেছে, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত—THE HORSE.

বিক্রমজিৎ বলিল—দেখেছেন আমার অশ্ব। (বিক্রমজিৎ ঘোড়া বলেন না, তাহাতে অশ্বের গৌরবের হানি হইতে পারে)। বিনয় বলিল—লেখা আছে বটে সেই রকম।

বিক্রমজিৎ বলিল—শুধু লেখা নয়, দেখবেন। এই চলো—বলিয়া তিনি লাগামে টান দিলেন। ঘি হর্স চলিতে চেষ্টা করিল। বিক্রমজিৎ শুধু অশ্বের চলৎশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া আরো দুই একটা বাহ্য ব্যবস্থার আয়োজন

করিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে একজন ভুটিয়া কুলী একটি সরস পায়স অশ্বের মুখের অদূরে ধরিল—অশ্ব লোভে এক পা তুলিল। আর একজন ভুটিয়া কুলী একটি মশাল জ্বালাইয়া অশ্বের পিছনে ধরিল, অশ্ব ভয়ে আর এক পা তুলিল। তৃতীয় একজন কুলী অশ্বের গলবিলম্বিত একটা রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল—সে বাধ্য হইয়া আর এক পা তুলিল। আর উপর হইতে বিক্রমজিৎ কখনো উৎসাহবাক্যে, কখনো অনুরোধে, কখনো অভিমানে তাহাকে চালাইতে লাগিল। বিনয়ের কেবলি মনে হইতে লাগিল—How hard it is to climb!

বিক্রমজিৎ বলিলেন—মঁসিও, পাহাড়ে ওঠা শিখছি। আমার অশ্ব একটু অভ্যস্ত হলেই একেবারে মাউন্ট এভারেস্টের দিকে রওনা হব।

বিনয়ের বিষম হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলে পাছে এমন একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্তের গুরুত্ব কমিয়া যায়, তাই সে বিক্রমজিৎকে বলিয়া ফিরিল। বিক্রমজিৎ রুমাল উড়াইয়া বলিল—au revoir! বলিয়া তখনি গান ধরিল—

Malbrouck s'en va t-en guerre.

বৃষ্টি নামিয়াছে।

বার্জ্জিলিঙের বৃষ্টি। চারিদিকে অজস্র সুপ্ত নির্ঝরিণী কিঙ্কিণীরবে দিগ্বা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিনয় একাকী ঘরে আবদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। জানালার বন্ধ শার্সির উপরে বৃষ্টির জলধারা লাগিয়া নানা রকম ছবি আঁকিতেছে, আবার মুছিয়া যাইতেছে। বাহিরের আকাশ পাণ্ডুরাভ ধূসর, দিগন্তে গিরিরাজের আসন্ন জল-যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত, কেবল উপত্যকার বনশ্রেণীর মাথায় সিক্ত শ্যামলতার আভাস।

বাহিরের দৃশ্য লুপ্ত হওয়াতে বিনয়ের মন বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া অন্তরে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে দুইটি মূর্ত্তি।

হিমালয়ে আসিয়া বিনয় অন্তরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে নাই, হয় তো সময় পাইয়া উঠে নাই। গিরিরাজের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমায় সে এত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিজের কথা মনেই ছিল না। সে যে-বেদনা ভুলিতে এখানে আসিয়াছিল নগাধিরাজের তুষারশয্যায় সেই ব্যথা কেবল সুপ্ত হইয়াছিল, মিলাইয়া যায় নাই। আজ স্বয়ং গিরিরাজ বর্ষার তিমিরবসনীর আড়ালে মুখ ঢাকিয়াছেন। বিনয় হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, দুইটি যুগল ক্ষতচিহ্ন, এক বৃন্তে দুইটি ছিন্নবিকশিত রক্তগোলাপ।

করুণ ও পাকুল। করুণ নববর্ষার পূর্ব্বৈকী বাতাস, পাকুল প্রথম ফাল্গুনের দক্ষিণের হাওয়া। একজনের অঞ্চলে স্নিগ্ধ ধানক্ষেতের কোমলতা, অপরের আছে বসন্তের বনের উগ্রমদির গন্ধ। একজন ভাবাইয়া তোলে, অন্যজন মন ভরিয়া দেয়। একজন দূরবীক্ষণের কাচ, তাহার ভিতর সুদূর জগতের রহস্য অবারিত হইয়া যায়, অন্যজন দর্পণের মত, দর্শককে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। একজন অঙ্গুলির ইঙ্গিতে পুষ্পবনে অজস্র ফুল ফোটাইয়া দেয়, আর একজন সেই ফুলে মালা গাঁথিতে থাকে। একজন প্রভাতের জাগরণ, অন্য জন জাগরণের স্বপ্ন। একজন নিজেকে ভুলাইয়া দেয়, অন্যে পরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একে জীবনের দিগন্তে অভ্র-যবনিকা টানিয়া দেয়, অপরে যৌবনের খাণ্ডবে উচ্চ হাস্যের দাবানল প্রজ্বলিত করে। একজন ধীরসঞ্চারী বর্ষার পূর্ব্বায়ু, অপরে দিগন্তের বাঁধ-ভাঙা বসন্তের উদ্দাম সমীরণ। একজন নিঃশব্দে জীবনের উপরে যবনিকা টানিয়া দেয়, আর একজন কৌতুক কৌতূহলে সেই যবনিকা উড়াইয়া দিয়া হাসিতে থাকে। একজনের সাধনা আত্ম-বিনাশে, অপরের আত্ম-প্রকাশে। একজন প্রেমিক, অপরে প্রেম। একজন দেবী, অন্যজন মানবী। করুণ ও পাকুল।

বিনয় ভাবিয়াছিল, হিমালয়ে আসিয়া সে দুই জনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ঠিক বিপরীত ঘটিল, দুই জনের যুগল মূর্ত্তি যুগপৎ তাহাকে উন্মনা করিতে লাগিল। বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বয়ং মহাদেবও এই হিমালয়েই গৌরীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উমার শোকে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, গৌরী তাঁহাকে জয় করিয়া লইল। করুণ,—উমা, সে আত্মবিলোপশীল; পাকুল,—গৌরী, প্রণয়ী-অন্বেষিণী। কে জানে সেই প্রাচীন প্রেম-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি পুনরায় এই পুরাতন হিমশৃঙ্গে হইবে কি না!

বিনয়ের চমক ভাঙিল। বৃষ্টি কখন্ থামিয়া গিয়াছে। বিনয় দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশ

নির্মল, উপত্যকার বনের মাথায় বৃষ্টির মেঘ। সে বেড়াইতে বাহিরে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ছুটিতে ছুটিতে বিক্রমজিৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—মঁসিও মঁসিও, এমন সুযোগ আর মিলবে না, লেট মি টুাই—

—ব্যাপার কি মঁসিও বিক্রমজিৎ?

বিনয় বিক্রমজিতের অনুরোধ রক্ষে তাহাকে মঁসিও বলিয়া সম্বোধন করে।

—আসুন, দেখাচ্ছি।

উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। বিক্রমজিৎ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল।

—যখন আমি শিকারে যাবো, হিমালয়ের অত্যুচ্চ সব গৃহের উপর দিয়ে, সেখানে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একেবারে নেই বল্লেই হয়, তখন কি করবো বলুন তো?

বিনয় নীরব হইয়া রহিল।

—এই তো আপনি ভেবে পাচ্ছেন না, আমার কি কর্ত্তব্য। আমিও প্রথমে ভেবে পেতাম না: তার পরে হঠাৎ একদিন মনে এল। কাল দেখছিলেন তো আমার অশ্বটা! তখন গিরিশিখরে আমি আরোহণ করা অভ্যাস করছিলাম ওই অশ্বে চড়ে! কিন্তু এমন অনেক সঙ্কীর্ণ পথ আছে যেখানে আমার অশ্বও যেতে পারে না, সেখানে কি কর্ত্তব্য বলুন তো!

বিক্রমজিৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিল। ভাবটা যেন বিনয়কে চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু অল্প পরে আবার আরম্ভ করিল—অবশ্যই সেখানে পায়ে চলে যেতে হবে, অন্য উপায় নাই।

বিনয় বলিল,—তা তো বটেই, তা ছাড়া আর উপায় কি।

বিক্রমজিৎ বাৎসল্যরসমিশ্রিত মৃদু হাসিয়া বলিল—অত সহজ নয় নয় মঁসিও। সে পথে এক পাহাড়ী ছাগ ছাড়া কোনো প্রাণীও চলতে পারে না।

বিনয়—তবে একটা মজবুত দেখে পাহাড়ী ছাগ কিনে ফেলুন।

—হাস্যের কথা নয়। সেখানে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে, তবে তার জন্য অভ্যাস চাই। এই যে বাড়ীর সোপানের কার্ণিস দেখছেন, হাতখানেক চওড়া, এর উপর দিয়ে হেঁটে অভ্যাস করে চলতে হবে।

বিনয় ভীত স্বরে বলিল—কিন্তু এটা যে বৃষ্টি হয়ে পিছল হয়ে গেছে।

—সে সব গুরুর পথে তো সর্ব্বদাই বৃষ্টি হচ্ছে।

—কিন্তু পা পিছলে পড়লে যে একেবারে ত্রিশ হাত নীচে—

বিক্রমজিৎ উৎসাহিত হইয়া বলিল—ত্রিশ হাত নয়, তিনশো হাত, তিন হাজার হাত। সে সব গিরিশিখর থেকে পড়লে একেবারে মিলটনের শয়তানের মত from what a height to what a depth—বলিয়া নিজের রসিকতাতে নিজেই হাসিতে লাগিল।

বিনয় স্তম্ভিত। বিক্রমজিৎ পিঠে একটা ভারি বোঝা বাঁধিয়া লইল, কাঁধে বন্দুক লইল, পায়ে বুট জুতা পরিল, বাড়ীর কার্ণিসের উপর হাঁটিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে থাকিল।

—আসুন, মঁসিও, দেখবেন আসুন।

উভয়ে বাহিরে গেল। বিক্রমজিৎ দোতালার সেই পিছল সঙ্কীর্ণ কার্ণিসের উপর দিয়া সগর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিল। লেফ্‌ট, রাইট, লেফ্‌ট,—বিনয় ভাবিতে লাগিল, একবার পা ফস্‌কাইলে আর কথা নাই—ত্রিশহাত নীচে একেবারে ওই পাথর গুলোর উপরে। কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল সেই সব গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িলে যে তিন হাজার হাত নীচে!

বিক্রমজিৎ সগর্ব্বে চলিতেছে—লেফ্‌ট, রাইট্‌, লেফ্‌ট। আহা মঁসিও, এই সময় যদি আমার একখানা ছবি তুলে রাখতেন—লেফ্‌ট, রাইট্‌, লেফ্‌ট।

বিক্রমজিৎ চলিতে লাগিল। আর বিনয় বলিয়া ভাবিতে লাগিল—অদ্ভুত এই লোকটা। এমনতরো মানুষ সে আগে দেখে নাই। অল্প সময় হইতে বিনয় ইহাকে ছয় পাগল নয় বিদূষক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সে যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার পরে আর কাহাকেও নির্দ্দয় সমালোচনা করিতে মন সরে না। বিনয়ের কেমন যেন মনে হইল—লোকটার জীবনে কোথায় একটা দুঃসহ ব্যথা আছে, সেটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই বীরত্বের এই ছদ্মবেশ। দুঃখ মানুষকে এক করে, বেদনার তীব্র বিদ্যুৎস্পর্শে অন্ধকার এই মানবজীবনের রহস্য চোখে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, এমন আর কিছুতে নয়।

[ক্রমশঃ]

[illegible]।

[শিল্পী—মিস্ সুলান হরেড (বর্ত্তমানে মিসেস্ গোডস্বিথ) ও মিঃ পি. এফ. ব্যাডি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৭]

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতকে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহা জানা নাই। অন্ততঃ পক্ষে এই কথা বলা যায় যে, পুরাতন বাঙ্গালা[১] সাহিত্যের প্রাচীনতম বর্ত্তমান গ্রন্থকেও পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাস তাঁহার শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য ভা গ ব তে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলের লোকের যে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও কিছু আভাস পাই।

পুরাতন বাঙ্গালা : ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী

পাল রাজাদিগের কীর্ত্তিগাথা তখনকার দিনে লোকে আগ্রহ করিয়া শুনিত।

> গোপীচাঁদ ভোপীচাঁদ মহীপালের গীত।
> ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥[২]

পালরাজাদিগের অনেকেই ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। সেই কারণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি গীতিবদ্ধ হইয়া জনসমাজে গাওয়া হইত। সে ক ত ভো দ্যা ৪০ রাজা রামপালের বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে। কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করাতে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। তাঁহার এই ন্যায়পরতা বহুদিন পর্য্যন্ত লোকসমাজে গীত হইত। সে ক ত ভো দ্যা হইতে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> পুত্র রামপালস্যৈকপুত্রস্তেন কদাচিৎ যোষিৎ ঘাতিতা। অথা স রাজা স্বপুত্রং শূলেন যোজয়ামাস। অদ্যাপি তেষাং কথা গীয়তে লোকৈ রামপালো রাজা একস্যৈব পুত্রস্যপরাধিস্যপরাধিনা শূলেন যোজয়ামাস।
>
> যস্য কীর্ত্তির্ন্যুব্জেষু পুণ্ড্রে লোকেষু গীয়তে।
> তাবৎ স পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

এইরূপ কীর্ত্তি গাথাবদ্ধ হইয়া গীত হইবার যোগ্য বটে। দুঃখের বিষয় যে এইরূপ কোন গান আমাদের হস্তগত হয় নাই।

'চণ্ডীমঙ্গল' বা মঙ্গলচণ্ডীর গান তখন জনসাধারণের আগ্রহের বস্তু ছিল। ইহাকে কটাক্ষ করিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

> ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥[৩]
> প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
> কহাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।
> গায়েন সবার ঘরে বুঝি দেখিবারে যাঙ।
> সকল আনিয়া নিব যদি যেই পাঙ॥[৪]

বিষহরি বা মনসা পূজার প্রচলনও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং মনসার গান বা 'মনসামঙ্গল'ও যে গাওয়া হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনের গীতও প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

> একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
> দর্শকের বড় হাট বিবিধ প্রকারে।
> মৃদঙ্গ বাজিয়া গীত তার মধ্য ঘোরে।
> চতুর বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চস্বরে।
> দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
> চতুর বুড়া দেখেন হইয়া এক পাশ।
> মনুষ্য শরীরে বানরাজ মত্ত বলে।
> অভিমান হইয়া নাচয়ে ঘুরঘুরে।
> কান্দিয়ে করিলেন যে নাটা ঈশ্বরে।
> সেই গীত গায়েন করুণা উচ্চস্বরে।
> শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
> পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥[৫]

তখনকার দিনে লোকসাহিত্যের বিশুদ্ধ দিক ছিল রামায়ণ-গীতি। করুণ-রস প্রধান এই গীতি-সাহিত্য তখন

১। এই প্রবন্ধে 'প্রাচীন বাঙ্গালা' 'Old Bengali' এবং 'পুরাতন বাঙ্গালা' 'Middle Bengali' এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

২। শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য ভা গ ব ত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।

৩। পৃঃ ১০-২১

৪। অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়। ৫। মধ্য খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৬। আদি খণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবরণীদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। এ বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যে গীত রামায়ণ শ্রীমুকুন্দনে।
নির্ব্বধি শুনিলে তাহা কান্দয়ে রাবণে।১
রাবণও যার কীর্ত্তি স্তব্ধ করি শুনে।
তাহা হেন রাবণেন্দ্র প্রভুরা চাহেন।২

এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের নাম উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং মনে হয় যে কৃত্তিবাসের পূর্ব্বেও রামায়ণ-গীতি বা 'শ্রীরাম-মঙ্গল'-এর অস্তিত্ব ছিল। নটেরা রামায়ণ-গীতির নৃত্যালিত বা গান করিত।

পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বারে এক নটবর।
রাম রসবাসী শুনি এড়ে কলেবর।৩

[৮]

অনুমান ছাড়িয়া এইবার বাস্তবের ক্ষেত্রে আসা যাউক। পঞ্চদশ শতক হইতেই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের (অবশ্য যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার) আরম্ভ বলা যাইতে পারে। দেখিতে পাই যে, এই শতকেই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়টি ধারার সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। 'শ্রীরাম-মঙ্গল' ধারায় কৃত্তিবাস ওঝা, 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' ধারায় মালাধর বসু, এবং 'মনসা-মঙ্গল' ধারায় বেহুলার এই যুগের আদি কবি বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের অস্তিত্ব অথবা পরিচয় জানা যায় না। চণ্ডীদাসের নাম এখানে ইচ্ছা করিয়াই করিলাম না। চণ্ডীদাস-সমস্যার বিচার পরে করা যাইবে। ব্রজবুলি এবং পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভবও এই শতকে হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকে লিখিত কোন 'চণ্ডীমঙ্গল' পাওয়া যায় নাই।

[৯]

কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের লোক। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ১৪৩২ শকের (=খ্রীষ্টীয় ১৫১০ সালের) এক পুঁথিতে আত্ম-বিবরণ অংশটুকু পাওয়া গিয়াছিল।[৪] বর্ত্তমান সময়ে এই সুপ্রাচীন পুঁথিটির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। আত্ম-বিবরণটি অকৃত্রিম মনে হইলেও ইহার মধ্যে পাঠের গোলমাল যথেষ্ট আছে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়া কৃত্তিবাস বলিয়াছেন—

মাতার পতিব্রতায় যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
তাই মৃত্যুঞ্জয় অম্বর বড় উপবাস।
সহোদর পাছি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী।
কলঙ্ক চতুর্ভুজ মাধবে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সভাই-ঠাকুর।
মালিনী মাধবে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই জন্মিলাম সংসারে গুণশালী।

এখানে ছয় ভাই বলা হইতেছে, অথচ সাতটি নাম পাওয়া যাইতেছে।

আদিকাণ্ডের একটি পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে—

পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে।
কলঙ্ক চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর।৫

ইহাতে মাতার নাম পাওয়া যাইতেছে মেনকা এবং ছয় ভ্রাতার নাম পাওয়া যাইতেছে—কলঙ্ক, চতুর্ভুজ, অনন্ত, ভাস্কর, নিত্যানন্দ এবং কৃত্তিবাস। এই বিবরণ 'আত্মবিবরণ' এর সহিত মিলিতেছে না।

আর একটি পুঁথিতে আছে—

পিতা বনমালি মাতা মালিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে।
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিয়া গায়।
জন্মা তন্মা কন্যা ঘেড়ায় বিভার উর্ব্বায়।৬

এখানেও মাতার নাম পাওয়া যাইতেছে মালিকি (=মেনকা?)।

কবির জন্মতারিখ সম্বন্ধে আত্মবিবরণে এই পয়ারটি পাওয়া যায়—

১। মধ্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়। ২। অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়। ৩। আদি খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়।

৪। রামায়ণ সম্বন্ধে এই আপেটুকু উদ্ধৃত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইহা তাঁহার বঙ্গ ভা ষা ও সা হি ত্যে প্রকাশিত করেন।

৫। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথি-শালায় সংগৃহীত), তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ: ১৭।

৬। ঐ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ: ৪১।

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণমঘ যার।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা করিয়া ইহা হইতে এই জন্মতারিখ পাইয়াছিলেন[১]—১৩৪৪ শক, ২৯ মাঘ, রবিবার (= খ্রীষ্টীয় ১৪৩৩ সাল, ২৪শে জানুয়ারি)। 'পূর্ণ' শব্দকে যদি 'পুণা' শব্দের 'শর্ট' রূপ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে এই তারিখ আরও কয়েক বৎসর পিছাইয়া যায়।

কৃত্তিবাস বলিয়াছেন—

এগার নিকড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িলেন রেলায় উত্তর দেশ।
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাটের নিমিত্ত রেলায় অনুমতি পায়।
তথায় রহিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার।

১৩৫৪ শক জন্মবৎসর ধরিলে বিদ্যালাভার্থে উত্তর দেশে যাইবার তারিখে শুক্রদিন মিলে।[২] উদ্ধৃত অংশের শেষের তিন পয়ারের সমর্থক এই পয়ার অন্য দুই একটি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—

ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিয়া[৩] পার।
যথা তথা কথা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার।[৪]
ছোটর মধ্যে বড়র মধ্যে বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার।
রাঢ়া মধ্যে[৫] অম্বিকা আচার্য্য চূড়ামণি।
তার ঠাই কিত্তিবাস পড়িলা আপুনি।[৬]

বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হইলে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশা করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তথায় তিনি যথেষ্ট পূজা পাইলেন। কবি গৌড়েশ্বরের কয়েকটি পাত্র-মিত্রের নাম করিয়াছেন। যথা—জগদানন্দ রায়, সুনন্দ, কেদার খাঁ, কেদার রায়, নারায়ণ, গন্ধর্ব্ব রায়, তরণী, শ্রীবৎস, মুকুন্দ (প্রধান পণ্ডিত)। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে[৭] 'কেদার খাঁ' কেশব খাঁ এবং 'শ্রীবৎস' শ্রীকৃষ্ণের বিকৃতি মাত্র। এই সকল পাত্রমিত্রের নাম হইতে অনুমান হয় যে, এই পঞ্চ গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

'জালালাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের অর্ব্বাচীনরূপ থাকায় অনুমান হয় যে 'আত্মবিবরণ' অংশটি মূল পুঁথি হইতে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত হয় নাই। অন্য দুই একটি শব্দের পাঠ হইতেও তাহাই মনে হয়। অন্যথায় পুঁথিটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত নহে।

কৃত্তিবাসের স্বহস্তে লিখিত বা সমসাময়িক কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ১৪৩২ শকের পুঁথিটি অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পরেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি হইতেছে উত্তর কাণ্ডের ১৫০২ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৫৮০ সালে) লিখিত এক অনুলিপি। এই পুঁথিটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরকাণ্ডের সংস্করণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। পুঁথিটি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। প্রাচীন বলিয়া পুঁথিটিতে মধ্যে মধ্যে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।[৮]

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুঁথির মধ্যে অপরের ভণিতার পদ বা কবিতা দুর্লভ নহে। এই সকল ভণিতার মধ্যে কতকগুলি যে গায়কের ভণিতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কোন কোন ভণিতা অপর রামায়ণকারের বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে সচরাচর এই ভণিতাগুলি পাওয়া যায়—

দ্বিজ মধুকণ্ঠ (মধুকণ্ঠ), সুধাকণ্ঠ দাস, বাণীকণ্ঠ, প্রসাদ দাস, রামদাস, ভক্তদাস, অনন্ত আচার্য্য, কৃষ্ণমোহন, রামানন্দ দাস, দ্বিজ রূপরাম, নিধিরাম, ষষ্ঠীবর[৯], ভবানী দাস[১০], কালিদাস।

কৃত্তিবাসের ভাষা বা কবিতা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন্ বা কতটুকু অংশ প্রকৃত কৃত্তিবাসের রচনা এবং কতটুকু বা কোনটুকু প্রক্ষিপ্ত তাহা স্থির হওয়া একান্ত আবশ্যক। এতদিন পর্য্যন্ত এই প্রয়োজনীয় কার্য্য কেহ করেন নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত

১। 'কবি কৃত্তিবাস', প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬ সাল, পৃঃ ৩৪৩।
২। ঐ। ৩। —অবজ্ঞে? ৪। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৩১। ৫। —রাঢ় মধ্যে? ৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংখ্যা ১৭১। Descriptive Catalogue of Bengali MSS., Vol I, p. ix. ৭। ঐ, পৃঃ ১১।

৮। পাহিড়া, পাঁচালী, ধয়াড়ী—কেবল এই তিনটির উল্লেখ আছে।
৯। সুন্দরবনের পুথি।

ভট্টশালী মহাশয় মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধারকার্যে হাত লাগাইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণ প্রকাশিত হইলে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা হইতে পারিবে।

[১০]

গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বসু প্রণীত শ্রী কৃ ক বি জ য় বা গো বি ন্দ বি জ য় অথবা গো বি ন্দ - ম ঙ্গ ল বাঙ্গালার সনতারিখ-যুক্ত প্রাচীনতম পুস্তক। পুস্তকটির রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ (খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩-১৪৮০ সাল)।

তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন।

শ্রী কৃ ক - বি জ য় বটতলা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পরে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন।[১] ইনি ১৪০৫ শকাব্দে দেবানন্দ বসু কর্তৃক এক অনুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন পুঁথিটি ভগ্ন বিধায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় ইহাকে বিশেষ কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহাই হউক, এই সংস্করণটি একটি প্রাচীনতম পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত বলিয়া বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রামাণিকত্বের আর একটি প্রমাণ আছে। শ্রী কৃ ক-বি জ য় শ্রী ম দ্ভা গ ব তে র দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, সুতরাং ইহার মধ্যে 'দানলীলা' এবং 'নৌকালীলা' প্রভৃতি অর্বাচীন লীলার স্থান নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সংস্করণে এই দুইটি লীলা নাই। কিন্তু শ্রী কৃ ক - বি জ য়ের কোন কোন পুঁথিতে তাহা আছে। অতএব মনে হয় যে 'দানলীলা' এবং 'নৌকা-লীলা' অংশ দুইটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে কবি নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
তাহার পুত্রে হইল মোর কুলেতে মতি।
কুল হয় সর্ব জনে করিআ বিদিত।
মালাধর বসু নাম শ্রীগুণরাজ খান। ২

তান নাহি অধম যুকতি নাহি কোন জান।
পৌরুষহ কিলা নাম গুণরাজ-খান।
গুণরাজ-খান হয় হয়ত সজ্জন।
তারে আশীর্বাদ করে যত সাধুজন।
অন্ত কুল যদি যদি সকলের শ্রেষ্ঠী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই।
কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু শ্যাম।
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
জন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন। ৩

শ্রী কৃ ক - বি জ য় বিরচিত হইলে পর গুণিব্যক্তির কাছে ইহার সমাদর অত্যল্পকালের মধ্যেই হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রী কৃ ক - বি জ য়ের উল্লেখ করিয়া মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খানকে এবং পৌত্র (?) রামানন্দ বসুকে অভি-নন্দিত করিয়াছিলেন।

কুলীনগ্রামীর কথা সম্বাদ করিআ।
প্রভুর আগিত যাত্রার পট্টডোরী লৈআ।
গুণরাজ-খান বৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাঁর এক বাক্য তাঁর আমার প্রেমময়।
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহ দূর। ৪

উদ্ধৃত চরণটি শ্রী কৃ ক - বি জ য়ের চতুর্থ চরণ। যথা—

প্রণমহোঁ ৫ নারায়ণ অবাদিবিগ্রহ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ।
একভাবে ধ্যেঁ। ৬ হরি যোড় করি হাথ।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

কবি শ্রী ম দ্ভা গ ব তে র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কেবল দশম এবং একাদশ স্কন্ধের গল্পাংশ আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। একাদশ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশেরও তাৎপর্য দিয়া-ছেন। কাব্যটি অধ্যায় পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে বিভক্ত হয় নাই। কেবল রাগ রাগিণীর বিভাগ আছে। সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে (বা একই রাগের অন্তর্গত বিভিন্ন আখ্যানের শেষে) কবির ভণিতা দেওয়া আছে। সেইখানেই কাব্যের আংশিক বিরাম।

১। বর্তমান আলোচনা এই সংস্করণ অবলম্বনে করা হইতেছে।
২। পৃঃ ২।
৩। পৃঃ ২১৩-১৭। ৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। ৫। মূলে 'প্রণময়'। ৬। মূলে 'ধ্যে'।

শ্রী কৃষ্ণ-বি জ য় প্রাচীনতম কৃষ্ণায়ণ মঙ্গলকাব্য। তখনকার সকল কাব্যের মতই ইহা গাহিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। এরূপ গীতিকাব্যকে 'পাচালী' বলা হইত। কাব্যরচনার কৈফিয়তে মালাধর বসু বলিয়াছেন—

ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক-নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত পঁথা লেখে পাই।
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাচালীর রসে লোক হইব বিস্তর।
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিলা নিষ্পাপ হব সকল সংসার।[১]

গুণরাজ-খান প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, আর যথার্থ কবিও ছিলেন। ভক্তকবির রচনা বলিয়া এই ঘটনাবহুল বর্ণনাত্মক কাব্যটির মধ্যে কোথাও কবিত্ববাহুল্য নাই। তথাপি সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়, আড়ম্বরহীন সাবলীল পয়ারছন্দের দ্রুততালের মধ্যে মধ্যে কবির ভক্তহৃদয়ের ও সহজকবিত্বের পরিচয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। যেমন—

অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।[২]

কাব্যটির পরিচয় স্বরূপ শেষের দিক হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়।
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায়।
সূক্ষ্ম রূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে যোগাকী রূপ ভজ হরি।
যোগাকীয় ভজ চিত্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব এক মনে।
সবাতে আছেন হরি এমত জানিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ।
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে।
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে জানিহ।
ইহা বুঝি পণ্ডিত জাই ছির কর মনে।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচনে।

১। পৃ: ১। ২। পৃ: ৪৯। ৩। ভুল 'জয়'।

যত বুদ্ধি যত শক্তি যত মোর চিত।
তাব যত রচিল বিস্তু কৃষ্ণের চরিত।
যত কর্ম কৈল প্রভু নরবপু ধরি।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা আদি বলিতে না পারি।
ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নরকায়।
সে তনু চিন্তিলা ভক্ত ব্রহ্মপদ পায়।
অল্প বুদ্ধি অল্প মতি অল্প মোর জ্ঞান।
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান।
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল প্রভু অবতারে।[৩]

শ্রী কৃষ্ণ-বি জ য়ে র মধ্যে পয়ারছন্দেরই আধিক্য। অল্প কয়েক স্থলে দীর্ঘ ত্রিপদী পাওয়া যায়। এই রাগ-রাগিণী গুলির উল্লেখ আছে—

শ্রী, করুণাশ্রী, ললিত, পঠমঞ্জরী, কল্যাণ, কল্যাণী, মল্লার, গৌড়ীয়া মল্লার, মেঘমল্লার, কৌ (কহু, কহুক), বেলাবলী, বিভাস, সুই (=সুহই), রামক্রীড়া, বসন্ত, কর্ণাট, বাবাড়ী (=বরাড়ী ?), বসন্ত বাবাড়ী বরাড়ী ?), তুড়ি, সারেঙ্গ, যমক ছন্দ (?), মাবাড়ী (?), ধানশ্রী, ভৈরব, ভৈরবী, পাহিড়া (?), পাহাড়ি, গৌড়, সিন্ধুড়া, আসওয়ারী, হিন্দোল, কামোদ, মাউর, গ্রামগড়া, গুর্জরী, কৃপালী, মাধুর, কেদার, গৌরী।'

[১১]

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় খেলারামের ধ র্ম ম ঙ্গ ল ই প্রাচীনতম। খেলারামের ধ র্ম ম ঙ্গ লে র পুঁথি লুপ্ত না হইলেও লুপ্ত হইবার মাঝিল হইয়াছে। খেলারামের পূর্বে যে সকল ধর্মমঙ্গল জাতীয় কাব্য ছিল তাহাদের রচয়িতার নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। যদি নিম্নোদ্ধৃত পয়ারটি যথার্থ ই খেলারামের পুঁথি হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে খেলারাম ১৪৪৯ শকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫২৭ সালে তাঁহার ধ র্ম ম ঙ্গ ল রচনার পত্তন করিয়াছিলেন।

ভুবন শক বসু মাস পক্ষের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ।[৪]

৪। পৃ: ২১৩। ৫। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [পৃ: ১৫১-১৭৬] শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম ; অদ্যাবধি। ৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২ সাল, পৃ: ৬।

রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকতায় যে পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে সেটিকে অনেকে ত্রয়োদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে করেন। খুব সম্ভব এই বইটি সপ্তদশ শতকের পূর্ব্বে রচিত নহে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

[১২]

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল বা পদ্মা-পুরাণ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হোসেন শাহের আমলে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। যে পয়ারটিতে রচনার বৎসরের উল্লেখ আছে তাহার একাধিক পাঠান্তরও পাওয়া যায়। সেগুলি এই—

বসু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক।

ইহা হইতে ১৪০৬ শক (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়।

বসু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।

ইহা হইতে ১৪১৬ শক (১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়।

রাম শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।

ইহা হইতে ১৪০০ শক (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়।

এই তিনটি তারিখের প্রথম এবং শেষটি স্পষ্টতঃই ভুল। কারণ হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় তারিখটির সম্বন্ধেও কিছু সন্দেহ আছে; হোসেন শাহের সিংহাসনপ্রাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ এমন কিছু হয় নাই যাহাতে সুদূর বরিশালের ফুলশ্রী গ্রামে বসিয়া বিজয় গুপ্ত তাঁহাকে নৃপতিতিলক বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারেন। কবির যে বংশলতিকা পাওয়া যায় তাহা হইতে তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লইয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। যাহা হউক বিজয় গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা পরে মনসামঙ্গল কবি সম্বন্ধে করা যাইবে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণে কাণা হরিদত্তকে মনসা-মঙ্গলের আদি কবি বলা হইয়াছে।

১। বিজয় গুপ্তের পদ্ম-পুরাণ বা মনসা-মঙ্গল, শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম্-এ, সম্পাদিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৩৭ সাল।

মূর্খ হরিদত্ত নীচ বড় অভাজন।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।
হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে।
খোড়া পাঁথা আছি কিছু গ্রামে গ্রামে ছলে। ২

কোন কোন মনসা-মঙ্গলের পুঁথিতে কাণা হরিদত্তের ভণিতায় দুই একটি পদ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিজ বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল ১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। ইঁহাদের বসতি ছিল নাছড়ে বটগ্রামে।[৩]

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ে সুলতান।

বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলের পুঁথি একরকম লুপ্ত হইয়াছে বলা চলে।

[১৩]

সাধারণের ধারণা আছে যে বাঙ্গালার আদি কবি হইতেছেন 'চণ্ডীদাস'। যাঁহারা এতদূর বলিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন 'চণ্ডীদাস' খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের কবি, অন্ততঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের। 'চণ্ডীদাস' যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহাও একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কথা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিক্রমাদিত্যের যাহা অবস্থা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের সেইরূপ অবস্থা। আমরা উপস্থিত এই চণ্ডীদাস-সমস্যা লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'চণ্ডীদাস' বলিতে একটিমাত্র কবিকে বুঝাইত। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কার[৪] এবং প্রকাশের[৫] পর একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা আদি এবং অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক কবি চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ কি কি এবং কোথায় কোথায় আছে।

২। ঐ, পৃঃ ৩। ৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, পৃঃ ২২। ৪। ১৩১৬ সাল। ৫। ১৩২৩ সাল।

সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী ম দ্ভা গ ব তে র দশম স্কন্ধের টীকা বৈ ষ্ণ ব তো ষ ণী-তে "চণ্ডীদাসাদি রচিত যান খণ্ড নৌকাখণ্ডাদি" লীলার উল্লেখ আছে, তাহা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের গোচরে আনেন। সনাতন গোস্বামীর টীকাটি ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার হেতু আছে। তাহার পর শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত হইতে জানিতে পারা যায় যে মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন। শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য-চ রি তা মৃ তে র রচনার তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাহা হউক আমরা মোটামুটি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া লইতে পারি। তাহার পর প্রে ম-বি লা সে উল্লিখিত হইয়াছে যে খেতরীতে এক বাৎসরিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার পদ গাওয়া হইয়াছিল।

সন্ধ্যায় গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হয়ে সবার চিত্ত।[১]

প্রে ম-বি লা স ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের রচনা বলিয়া চলিত আছে। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে বইটি জাল। সে যাহাই হউক, আমরা পরে দেখাইব যে প্রে ম-বি লা সে যে চণ্ডীদাসের কথা বলা হইতেছে তিনি পঞ্চদশ শতকের মধ্য অথবা শেষ ভাগের লোক। যাহা হউক আমরা মোটের উপর ধরিয়া লইতে পারি যে পঞ্চদশ শতকের মধ্য ভাগে এক বাঙ্গালা ? কবি 'চণ্ডীদাস' ছিলেন, যাঁহার রচিত মানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ডের পদগুলি সুবিখ্যাত ছিল।

এইবার শ্রী কৃ ষ্ণ কী র্ত্ত নে র আলোচনায় আসা যাউক। বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গোশালার মাচার উপরে এক রাশি পুঁথির সহিত অযত্নরক্ষিত অবস্থায় শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত ন পুঁথিখানি পাওয়া যায়। পুঁথিটির আবিষ্কার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। পুঁথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত, মধ্যেও কতিপয় পত্র নাই। পুঁথিটিতে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটি লেখার ছাঁদ যথেষ্ট অর্ব্বাচীন। একই পত্রে নূতন পুরাতন দুই ছাঁদের লেখা পাওয়া যায়, সুতরাং তাহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলা যাইতে পারে না।

লিপিতত্ত্বে পারদর্শী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতন ছাঁদের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পুঁথিটি ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমার্দ্ধে এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। রাখাল বাবুর অভিমতে এবং ভাষার প্রাচীনত্বানুষ্টে বোধ হইল যে শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী আদি এবং অকৃত্রিম চণ্ডীদাস বটে। অনেকে আবার শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র পদের সহিত প্রচলিত 'চণ্ডীদাস' ভণিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির ভাবগত মিল না পাইয়া বলিলেন যে, এই চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদসমূহের রচয়িতা চণ্ডীদাস নহেন, ইনি জাল চণ্ডীদাস। এই মতবিরোধ এখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবর্গের গবেষণায় শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র চণ্ডীদাসের প্রাচীনত্ব এবং অকৃত্রিমত্ব স্থাপিত হইল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় একশত বৎসর পূর্ব্বেকার লিখিত দুইটি খাতায় শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র কয়েকটি পদ আবিষ্কার করাতে শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র অকৃত্রিমত্ব সমর্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কিন্তু শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত্ত নে র চণ্ডীদাসের কাল লইয়া নূতন করিয়া আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। রাখাল-বাবু পুঁথিটির লিপিকালের শেষ সীমা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় পুঁথিটির লিপি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পুঁথিটির লিপিকালের শেষ সীমা ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছা-কাছি। ইহাতে আদি চণ্ডীদাসের কাল লইয়া নূতন করিয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুঁথিতে যখন সন তারিখ নাই, তখন পুঁথির পদগুলির ভাষা এবং ভাব লইয়া যতদূর সম্ভব একটা মোটামুটি কাল নির্ণয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পুঁথিটির ভাষা প্রাচীন বটে; এক বৌদ্ধগান পদগুলি ছাড়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের (?) এত প্রাচীন নিদর্শন আর পাওয়া যায় নাই। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার ভাষা এমন কিছু প্রাচীন নহে যাহাতে ইহাকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ অবধি আনা চলে না। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে লিখিত যে সকল গ্রন্থ

১। উনবিংশ বিলাস।

পাওয়া যায় সেগুলির ভাষা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা প্রাচীন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে সে সকল গ্রন্থগুলির শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মত সুপ্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী লিপিকারের হস্তে সে গ্রন্থগুলির ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আরও এক কথা। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন স্পষ্টতঃই বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্তের উপভাষায় লিখিত। প্রত্যন্তের ভাষা সাধারণতঃ সমসাময়িক কেন্দ্রীয় ভাষা হইতে অনেক পরিমাণে প্রাচীনত্বেঁষা (archaic) হইয়া থাকে; বিশেষতঃ তখনকার দিনে পুরই হইত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা সমসাময়িক গ্রন্থাদির ভাষা হইতে প্রাচীনতর হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষার মধ্যেই এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার রূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যেমন,—মূড় লাঅ (=সাধ), আতত (=আতথ), ইত্যাদি। এইগুলি হইতে দেখা যায় যে, তখন ঘোষবৎ মহাপ্রাণ শব্দ অল্পপ্রাণ করিয়া উচ্চারিত হইত। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে দুই একটি মৈথিল বা ব্রজবুলির পদ আছে, যেমন, 'ধরল,' 'সংহারল,' 'কহলো,' 'ভৈল', ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয় যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন রচিত হয়, তখন ব্রজবুলির চর্চা বাঙ্গালা দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মার্জিত ভাব ও রুচির অভাব দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে বইটি অসন্দিগ্ধভাবে চৈতন্যপূর্ব যুগে লিখিত। কিন্তু এ যুক্তি বিশেষ ভারসহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কৃষ্ণস্তুতি; ইহা খুব উচ্চস্বরের শ্রোতার জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যপরবর্তী এই-জাতীয় অনেক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের উচ্চভাব মোটেই লক্ষিত হয় না। শ্রীচৈতন্যের বন্দনার অভাব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। প্রথমতঃ বইটি আদ্যন্ত খণ্ডিত, সুতরাং ইহাতে শ্রীচৈতন্য বন্দনা ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। আর না থাকিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের বহু পরবর্তী অনেক বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কীয় অথবা রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্পর্কীয় গ্রন্থে বা পুঁথিতে শ্রীচৈতন্য-বন্দনার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা নিরাপদ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথিটিতে কোন শিরোনামা নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি সম্পাদক বিশ্বনাথ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রন্থটিতে প্রায় ৪২০টি পদ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি খণ্ডিত। পুঁথিখানির যতটুকু পাওয়া গিয়াছে ততটুকু ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি এই—জন্মখণ্ড, তাম্বূল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড, বাণখণ্ড,[১] বংশীখণ্ড, রাধাবিরহ।

প্রত্যেক খণ্ডগুলি কতকগুলি পদ বা গানের সমষ্টি। এই গানের মধ্যে অনেক সময় আধার উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। গানগুলির রাগ-রাগিণী[২] এবং তাল দেওয়া আছে। প্রত্যেক গানের পূর্বে দুই একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে। সেই শ্লোকগুলি সাধারণতঃ গল্পাংশে ধারাটি অব্যাহত রাখিয়া অথবা গানটিরই মর্মার্থ প্রকাশ করে। শ্লোকগুলির কবিত্ব বা ছন্দোনৈপুণ্য নেহাত তুচ্ছ নহে। দুই এক স্থলে শ্লোকের অর্থের সহিত অব্যবহিত পরবর্তী গানের মর্মার্থের বিরোধ বা অসঙ্গতি দেখা যায়। একটি উদাহরণ দিতেছি।

অন্যতীষ্বনং তস্যা মনোজ্ঞেষ্বকাতরা।
সখীমপমুখাদেবং মাধবপ্রান্তিবাঞ্ছয়া।[৩]

ইহার পরেই যে পদটি আছে তাহা বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্লোকগুলি পদকর্তার রচিত নহে। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী সংবলিত কোন ছন্দ বা লৌকিক পুরাণ হইতে শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে। ভারখণ্ডান্তর্গতছত্র খণ্ড:, যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ড:, যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড: এই শীর্ষকগুলিও সেই অনুমানকেই সমর্থিত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে এই শীর্ষকগুলি নিতান্ত বেমানান হইয়াছে। সুতরাং এগুলি যে কোন লৌকিক

১। মুদ্রিত পুস্তকে 'বালখণ্ড' আছে।

২। নিম্নলিখিত রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—কোড়া, কোড়া দেশাখ, দেশাখ, দেশ, বেশ বরাড়ী, বরাড়ী, এআল বরাড়ী, বরাল, বিভাষ, বিভাষ কহু, কহু (কহু), কহু গুজরী, গুজরী, মাদব, শ্রী, মাদবশ্রী, শ্রীরাগগিরী, রামগিরী (রামকিরী), পটমঞ্জরী, দিবোড়া, ভাটিয়ালী, বাসুলী, পাহাড়ীআ, আহের, বেলাবলী, কেদার, ললিত, মল্লার, কানড়, ধানশ্রী, গৌরী (=গৌরী ?), ভৈরবী।

৩। পৃ ৩৭০।

পুরাণ হইতে গৃহীত তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। এইরূপ লৌকিক পুরাণের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ আছে।

ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদের দিকে রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণদাস একখানি শ্রী কৃ ষ্ণ-ম ঙ্গ ল রচনা করেন। ইনি দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড অংশ লিখিবার পূর্বে এই বলিয়াছেন যে ভাগবতে এই লীলা নাই, অতএব তিনি হ রি বং শ অবলম্বন করিয়া এই লীলা দুইটির বর্ণনা করিতেছেন।

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অল্প নহি কবি কিছু হরিবংশ মতে॥১
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড॥
হরিবংশে লিখিলাম্নে করিলা বিস্তার।
এবে গোপীগণ হইল যমুনার পার॥২

প্রচলিত 'খিল' হ রি বং শে এই কাহিনী পাওয়া যায় না। অথচ কবি যেরূপ ভাবে এই উক্তিটি করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে তিনি আমাদের হ রি বং শে র নাম করিয়াছেন। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত এইরূপ লীলা সম্বলিত এক হ রি বং শ ছিল তাহা অস্বীকার করা দুরূহ হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দও এক হ রি বং শ লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ম হা ভা র তে র খিল হ রি বং শে র কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং ইহার বাস্তবও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাঙ্গালা দেশে হরিবংশ নামে এক বা একাধিক ছন্দ বা লৌকিক "পুরাণ" প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ব্র হ্ম বৈ ব র্ত-পু রা ণে র নাম করা যাইতে পারে। প্রাচীন ব্র হ্ম বৈ ব র্ত বা ব্র হ্ম বৈ ব র্ত পুরাণের সহিত এই রাঢ়ে রচিত ব্র হ্ম বৈ ব র্ত পু রা ণে র সম্পর্ক নিতান্ত অল্প।

শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত নে র পদগুলিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' অথবা 'চণ্ডীদাস' ভণিতাই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল ছয়টি পদের ভণিতায় 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' এই ভণিতা পাওয়া যায়।[৩] সুতরাং কবির নাম যে 'অনন্ত' এবং 'চণ্ডীদাস' যে তাঁহার উপাধি বা অবান্তর নাম তাহা জানা যাইতেছে। কবি শক্তি-উপাসক ছিলেন, তাহা তাঁহার ভণিতার 'বাসলী' দেবীর উল্লেখ হইতেই বুঝা যায়।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বচনে।
বাসলী শিরে বসী গাইল চণ্ডীদাসে।

শ্রী কৃ ষ্ণ - কী র্ত নে 'চন্দ্রাবলী' রাধারই নামান্তর। এইরূপ পাওয়া যায় রামচন্দ্র মল্লিকের একটি পদে এবং দুঃখী শ্যামদাসের গো বি ন্দ-ম ঙ্গ লে।[৪] যথা—

রাধে তুমি মোরে না ভাসিহ চিত।
ওহে বিরস বদনি না বলিহ চন্দ্রাবলী
আমি দুয়ার ছেদের অধীন॥৫
বড়াই বলে রাধা মোর পরাণ পুতলী।
লহ লহ রাধিব রাধিকা চন্দ্রাবলী॥৬
এত শুনি বলেন রাধা বচনানী।
মৌকায় আনিলা উঁ রাধা চন্দ্রাবলী॥৭

শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত নে রাধা ভিন্ন অন্য কোন গোপীর ব্যক্তিগত উল্লেখ নাই; প্রকৃত পক্ষে এই কাব্যটিতে পাত্র পাত্রী তিন জন মাত্র, কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। কৃষ্ণ বালিকা রাধাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, বড়াইর সাহায্যে তিনি রাধাকে নানা প্রলোভন এবং অবশেষে ভয় প্রদর্শন এবং বল প্রয়োগ করিয়া রাধাকে বশ করিলেন। তাহার পর দুই একটি তুচ্ছ কারণে রাধার উপর কৃষ্ণের সাময়িক বিরাগ উপস্থিত হইল। তিনি মথুরায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে রাধা তখন কৃষ্ণের বিরহে হা-হুতাশ করিতেছেন। বড়াইকে রাধা মথুরায় কৃষ্ণের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "রাধা আমাকে যত দুঃখ দিয়াছে, তাহাতে তাহার নাম শুনিলে আর বৃন্দাবন যাইতে আমার ইচ্ছা করে না। আমি ধন জন সকলই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু দুঃসহ বাক্যতাপ আমার সহ্য হয় না।" ইহার পর পুঁথিটি খণ্ডিত।

এইবার শ্রী কৃ ষ্ণ-কী র্ত নে র কাব্যাংশের কিছু পরিচয় দিব। গ্রন্থটি উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে, তথাপি কবি যে নিম্নশ্রেণীর তাহাও বলা চলে না। পদগুলির মধ্যে অসামান্য কবিত্বের পরিচয় কিছু নাই। তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটি চরণ বা পদাংশ বেশ মনোগ্রাহী বোধ হয়। স্ত্রীসমাজে এবং জনসাধারণে প্রচলিত ছড়া বা প্রবাদ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নের পদটি কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি সমন্বিত। এইরূপ পদ শ্রী কৃ ষ্ণ কী র্ত নে অনেকগুলি আছে।

[ক] বাহর বড়িকের মোর মাহাবল।
তুল তোহ্মে আল রাধা পাঁজী পরধান॥১॥
[খ] বিতি বহি দিকে জাওঁ যমুনার ঘাটে।
বিহাই কালোকি তোঁ আসোলসি বাটে॥২॥
[ক] আতি বিরপনী রাধা পরিধান পাট।
আহ্মকে তিলক তোর খোআএ ললাট॥৩॥
[খ] বড়ায় বৌহারী আহ্মে বড়ায় লতাএ।
আর কাঁহ আলিতে না হেওঁ মোর পাএ॥৪॥
[ক] বাহর বড়িয়ের বাস সুবর সুখী।
মোহার কলমে তোহ্মে আনি দিল বিথী॥৫॥
রাখোআল কালোকি তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একদসী পাইলেঁ বিমাবিটী॥৬॥

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ১৩৭। ২। ঐ, পৃঃ ১৪০। ৩। পৃঃ ৫৩, ৬১, ৬২, ৩২৭, ৩২৯, ৩৪১। ৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত।

৫। রামচন্দ্র মল্লিকের পদ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুঁথি হইতে। ৬। বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৪। ৭। ঐ, পৃঃ ৯৫।

[ক] রাধাখোভাল হৈলা তোর কানের খোলনি ।
ত্রিভুবনে আন নর আর বীর নাহি । ৭ ।
[খ] কাহাক দেখায় তোহে এত ঠমকাএ ।
টানএতোর আর কানে লাইব পরাণে । ৮ ।
[গ] তোর কানে মোর কিক করিতে না পারে ।
তোহারি সে রূপে মোরে আহিরারে পারে । ৯ ।
[ঘ] না বোল না বোল কানুাকি হেন পাপ বাণী ।
তোহা জানে জাণো আছে আইহনের রাণী । ১০ ।
[ঙ] আহ বড়ায়িহেকের বিহা যাহা রণে ।
পাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে । ১১ ।

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে অলঙ্কারবাহুল্য একেবারেই নাই। কিন্তু সরল ও সহজ কবিত্বে পদটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ রাধার উপর কষ্ট হইয়া কুসুমবাণ নিক্ষেপ করায় রাধা মৃতবৎ হতচেতনা হইয়া পড়িয়াছেন। পদটি কৃষ্ণের বিলাপ-উক্তি।

দূতীএ বচন কলে মারিলোঁ তোহারে ।
কিসক তিরী বধ তোঁ তিনি আহারে ।
আএর আসে যৈসি আহার খাআর ।
সব মরিবেল রাধা জিঅ একবার । ১ ।
মাহারিঅ বাসি যেহ্ন ফুল হে তোআলী ।
তিআইআঁ সমহী যেহ্ন রাধা চন্দ্রাবলী । ৫ ।
বারেক সুন্দরী রাধা মুখ মোর তোল ।
মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাআআনী তোল ।
ছাড়িলোঁ মো মাহালখ হেড়িলোঁ মো ঘরট ।
ঐ ঘরি কি নিঅঁ মথুরার হাট । ২ ।
কিবা না করিল আহে তোহার আহারে ।
আমাক হেলিলেঁ তোহে সব পরকারে ।
উপেখিল মোর মোক মাইলোঁ ফুল বাণে ।
মো কেহ্ন জালিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে । ৩ ।
দুর কুলী চাহ মোর পালাউক পাপ ।
আমর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ ।
আহার জীবন রহে তোহার জীবনে ।
আহ বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে । ৪ ।

নিম্নে উদ্ধৃত বংশীখণ্ডের পদটি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ পদ। পদটি বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বজনপরিচিত। তথাপি আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ সোঠ গোকুলে ।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন । ১ ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা । ২ ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ।
আলো বাএ মোর বসনের পাশী ।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী । ৩ ।
আকুল করিতে কিবা আমার মন ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নাএরের কানন ।
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ ।
যেথনী বিহার সেই পদিআঁ লুকাওঁ । ৪ ।
মন পোড়ে আগ বড়ায়ি জমুনার পানী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।
আহর সুখাএ মোর কাহ্ন আকিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে । ৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দুইটি পদ[৩] গীতগোবিন্দের পদের অনুবাদ। তাহা ছাড়া গীতগোবিন্দের পদের দুই এক ছত্রের অনুবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটিমাত্র পদ[৪] (ঈষৎ পরিবর্ত্তনের সহিত) পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ছন্দ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। ইহাতে পয়ার ছন্দই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পয়ার ছন্দের কিছু বিশেষত্ব আছে। তাহা এখানে আলোচনা করা সঙ্গত বোধ হয় না। বড়ু চণ্ডীদাসের ত্রিপদী রচনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ পক্ষে একথা ঠিক যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ত্রিপদীতে রচিত পদগুলির মধ্যে ছন্দের অসামঞ্জস্য অত্যধিক দেখা যায়।

পদাবলী সাহিত্যের চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিলাম না। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাস পদাবলীর এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে চণ্ডীদাস-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবার পথ সুগম হইবে আশা করা যায়। সত্য কথা বলিতে কি চণ্ডীদাসকে লইয়া আমরা আজ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল বড়াই করিয়া আসিতেছি, কিন্তু চণ্ডীদাসের বিষয়ে প্রকৃত গবেষণা এপর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। সেইজন্য আশা করিতেছি যে, চণ্ডীদাস পদাবলীর নূতন সংস্করণে চণ্ডীদাস সমস্যার জটিলতা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকটা দূরীভূত হইবে। আশাকরি বইটি প্রকাশিত হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইবে না। (ক্রমশঃ)

১। পৃঃ ৫৩-৫৪। ২। পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭।

৩। পৃঃ ২৮৯। ৪। পৃঃ ২০৫, ৩১৭। ৫। পৃঃ ৩৩৪।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

টুটেন্-খামেনের খোঁজে

টুটেন্-খামেনের নাম শুনেছ? মিশরের রাজা টুটেন্-খামেন?

সে অনেক দিন আগেকার কথা। এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে, তিনি ছিলেন মিশরের রাজা। এই তিন হাজার বছর ধরে মাটীর তলায় সকলের অগোচরে, সোনার আর হাতীর দাঁতে মোড়া কবরের মধ্যে পরমানন্দে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। হয়ত এমনিতর তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন অনাদিকাল ধরে। হঠাৎ দুটি দুরন্ত মানুষ তিন হাজার বছরের নিশুতি সেই কবরের সন্তোষন শান্তি ভেঙে ফেলল। কেন? তারই কাহিনী তোমাদের আজ বলব।

তার আগে অল্প দু'একটা কথা তোমাদের বলে নিই। ইতিহাসে তোমরা প্রাচীন মিশরের গৌরবের কথা পড়েছ। তারা পিরামিড গড়েছিল—আজকালকার এঞ্জিনীয়াররাও সেই পিরামিডের গঠন দেখে অবাক হয়ে যান। এই পিরামিডগুলো সেই প্রাচীন রাজাদের কবর। তার ভেতর মাটীর নীচে বড় বড় ঘর তৈরী করা হত, সেই ঘরে রাজার দরকারী সব আসবাবপত্র ঘরে ঘরে সাজিয়ে রাখা হত। তারপর রাজা যখন দেহত্যাগ করতেন, সেইখানে তাঁর দেহকে সযত্নে রেখে দেওয়া হত। জীবনে তাঁর যে-সব জিনিষের দরকার হত, তাঁর সিংহাসন, বই, দাসদাসী, খাদ্য, নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, মৃত্যুর পর তাঁর কবরে সবগুলই ঘরে ঘরে সাজিয়ে রেখে দেওয়া হত। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের দুটি করে আত্মা থাকে। একটির নাম হল 'কা' আর একটির নাম হল 'বাই', মৃত্যুর পর 'বাই'-আত্মা আকাশের ওপারে স্বর্গে চলে যায়। আর 'কা'-আত্মা মৃতদেহের সঙ্গে থেকে যায়। যতদিন 'কা'-আত্মা সেই দেহে তৃপ্ত হয়ে থাকে, ততদিন 'বাই'-আত্মাও স্বর্গে সুখে থাকে। 'কা'-আত্মার তৃপ্তি এবং প্রয়োজনের জন্যে সমস্ত জিনিষেরই প্রয়োজন, যে সব জিনিষ জীবিত দেহের মধ্যে থেকে সে ভোগ করেছিল।

আমরা জীবনকে সাজাই নানা অলঙ্কারে, নানা শোভায়; তারা মৃত্যুকে সাজাত, নানা অলঙ্কারে, নানা শোভায়। তাই আমাদের শ্মশান খুঁড়ে আমরা কিছু পাই না—ওদের শ্মশান খুঁড়ে ওদের সমস্ত প্রাচীন দিনের সমস্ত কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানতে পেরেছি। তারা কি বলত, কি পরত,

কবর খোঁড়ার পর আবিষ্কৃত জিনিষ নিরীক্ষণের নিমিত্ত ঘরে আনা হচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ কাটার পর জিনিষ বেরিয়ে পড়বে। এর কারণ, যত্নে অনাবশ্যকতার ফলে এই সব অমূল্য জিনিষ এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে তার আর পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না।

কি কাজ করত, কি বই লিখত, কি কি জিনিষ তৈরী করতে জানত, কি ভাবে জীবন যাপন করত তার সমস্ত খবর তারা আমাদের জন্যে যোগাড় করে রেখে গেছে মরেছিল। আজকালকার ঐতিহাসিকরা মাটী খুঁড়ে সেই সব কবর থেকে যে সব জিনিস উদ্ধার করেছেন, তাই দিয়ে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার ইতিহাস লেখা হয়েছে।

অজানা দেশ আবিষ্কারের কাহিনী তোমরা পড়েছ। এও এক রকম অজানা দেশ আবিষ্কারের কাহিনী। কোথায় মাটীর তলায় কোন্ রাজা ঘুমিয়ে আছে, হয়ত তার কবরে

এমন সব জিনিস বা লেখা পাওয়া যাবে, যাতে ইতিহাসের অনেক শূন্য পাতা ভরাট হয়ে উঠবে। তাই দেশ দেশান্তরের ঐতিহাসিকেরা যেখানে প্রাচীন মিশরের রাজাদের কবর থাকা সম্ভব মনে করেছেন, সেইখানেই অসীম পরিশ্রম করে মাটী খুঁড়েছেন। কখনও কৃতকার্য হয়েছেন, কখনও বা বিফল হয়েছেন। সাত বছর আট বছর ধরে শত শত লোক লাগিয়ে রাত্রিদিন পরিশ্রম করে যখন মাটীর নীচে কবরে পৌঁছন গেল, তখন হয়ত দেখা গেল যে কবর শূন্য,

কবরে দ্বিতীয় দরজার সামনে সাকল হাতে কার্টার ও তাঁর কারিগরগণ।

রাজার মৃতদেহও নেই, ঘরে কোনও আসবাবপত্রও নেই, এদিক ওদিক ভাঙ্গা কাঠ বা পাথর খানকতক ছড়ান আছে। ব্যাপারটা কি? ঐতিহাসিকরা আসবার আগে ডাকাতরা সব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। সাত বছরের সমস্ত শ্রম হয়ে গেল পণ্ড!

গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা, জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে কবর খোঁড়ার যে সব চেষ্টা হয়, প্রায় সবগুলিই এই ভাবে বিফল হয়ে যায়। অত গভীর মাটীর তলায় কারা এইভাবে ডাকাতি করে সব নিয়ে গিয়েছিল?

যখন মিশরের রাজাদের ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে এল, তখন নানা রকমের অনাচার দেখা দিতে লাগল। যে সব পুরোহিত-দের ওপর কবর রক্ষা করবার ভার থাকত, সোনার লোভে তাঁরাই সর্বপ্রথম কবরের জিনিষপত্র সরাতে লাগলেন। এক এক কবরে এক একটা রাজার ঐশ্বর্য জমা থাকত। সুতরাং দেশে যতই অভাব অনটন বাড়তে লাগল ততই এক দল লোকের দৃষ্টি কবরগুলোর উপর গিয়ে পড়ল। বিশেষতঃ জমাবার প্রায় হাজার বছর আগে একদল দস্যু লোভে পড়ে কবরগুলোর ওপর ডাকাতি আরম্ভ করল। এত মজুত ঐশ্বর্য আর কোথায় পাবে? এই কাজে সেই সময় বহু কবর শূন্য হয়ে যায়।

এইভাবে বহুদিন লুঠতরাজ চলতে থাকে। তার পর কয়েকজন রাজা আবার শক্তিশালী হয়ে এই দস্যুতা বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। যতদূর পারলেন তাঁরা কবরগুলো দাগিয়ে, তার দরজায় শীলমোহর দিয়ে ভেতরের গোপন প্রবেশ-পথটি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। যারা এই দস্যুতার অপরাধে ধরা পড়ত তাদের কঠিন সাজা হত। যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তাতে মাঝে মাঝে এই সব দস্যুদের বিচারের কাহিনী লেখা আছে। একটা পুঁথিতে একজন দস্যুর নিজের জবানবন্দী লেখা আছে। সে বলছে, "আমরা সকলে মিলে কবরের ভিতর দিয়ে ঢুকলাম। যত বাক্স ছিল সব ভেঙ্গে ফেললাম। যেটাতে রাজার মৃতদেহ ছিল, সেটাও ভাঙ্গা হল। তার কারণ সেটা আগাগোড়া সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। খুলতেই দেখি মহা-মহিমান্বিত সম্রাট ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর অঙ্গে দামী দামী সব গহনা। সমস্ত গহনা টেনে ছেঁড়ে খুলে নিলাম। সমস্ত জিনিষ-পত্রে আগুন ধরিয়ে দিলাম।"

এইভাবে কবরগুলো সব শূন্য হয়েছিল।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে সমস্ত আবিষ্কারক মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে যখন সবাই বিফল হলেন, তখন সকলেই আশা ত্যাগ করলেন যে, এ জায়গায় আর কোনও কবর নেই। সমস্ত ঐতিহাসিক একবাক্যে বল্লেন যে, এখানে মাটি খোঁড়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবাই যখন কোদাল-খোন্তা সরিয়ে যে যার দেশে চলে গেলেন, তখন থিওডর ডেভিস্ বলে একজন আবিষ্কারক সেই মাটী কামড়ে রয়ে গেলেন। তিনি আর ফিরলেন না। বার-বার তিনি বিফলমনোরথ হয়েছেন, কিন্তু তবুও তাঁর আশা

ছিল যে, দু'একটা কবরের দেখা এখনও পাওয়া যেতে পারে। সেটা হল ১৯০৫ সাল। বহু বছর মাটী-খোঁড়ার পর তিনি সত্যিই একটা কবরের সন্ধান পেলেন। সেটা অবশ্য কোনও রাজার নয়, তবে তাঁরা রাজ-বংশের লোক। এবং তাঁদের কবরে বহু জিনিষও পাওয়া গেল।

এই আবিষ্কারের ফলে কিছুদিন আবার একটু উৎসাহ দেখা দিল। কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। ১৯১২ সালে ডেভিস্‌ও বলেন যে, এখানকার মাটীর তলায় আর কিছুই নেই।

কবর খোঁড়বার জন্যে প্রত্যেক লোককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। ১৯১৪ সালে ডেভিসের সময় ফুরিয়ে গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে চলে এলেন এই ভেবে যে, আর কিছুই পাওয়া যেতে পারে না। ডেভিস এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরই, দুজন লোক অনুমতির জন্যে আবেদন করলেন। একজনের নাম লর্ড কারনারভন, আর একজনের নাম হাওয়ার্ড কার্টার। সকলেই বিস্মিত হলেন যে, তাঁরা কেন অকারণ এই পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছেন।

বহুদিন ধরে হাওয়ার্ড কার্টারের মনে একটা স্বপ্ন ছিল। তিনি দেখতেন যে, মিশরের রাজা টুটেন-খামেনের কবর এই মাটীর তলায় লুকিয়ে আছে। ডেভিস্ একবার একটা পাত্র পান, তাতে টুটেন-খামেনের সীল-মোহর ছিল। কিছুদিন আগেও এখানে টুটেন-খামেনের আগে যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর কিছু কিছু স্মৃতি-চিহ্ন মাটীর তলা থেকে পাওয়া গিয়েছে। যে-বিশ্বাস কলম্বাসকে শক্তি দিয়েছিল—যার ইঙ্গিতে সমস্ত উন্মাদ নাবিকদের বিপক্ষে পারাপারহীন সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, সমুদ্রের ওপারে নিশ্চয়ই আছে মাটী—সেই বিশ্বাস ছিল কার্টারের মনে। আর তোমরা জেনো, সমস্ত বড় আবিষ্কারের পেছনে আছে এই রহস্যময় বিশ্বাসের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত!

কাজ আরম্ভ করবার সমস্ত আয়োজন যখন শেষ হয়েছে, তখন হঠাৎ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। অগত্যা সমস্ত আয়োজনই বন্ধ রাখতে হল। তিন বছর পরে কাজ আবার আরম্ভ হল। একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে নিয়ে সেখান হতে খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হল। উপরের স্তূপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে, থাকের পর থাক, মাটী কেটে যাওয়া, দিনের পর দিন!

এক বছর কেটে গেল, দুবছর কেটে গেল, তিন বছর কেটে গেল, একটিও পাথরের টুকরো পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে দু'বছর শেষ হয়ে যেতে চলল। দিনের পর দিন, কোদালের প্রত্যেক কোপের সঙ্গে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, এইবার, এই মাটীর চাব্‌ড়াটা উঠালেই ঠাঁৎ ঠং করে শব্দ হবে—একটা দরজা, দরজার শীল-মোহর এখনও কেউ ভাঙ্গে নি—

গহ্বর ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হল।

টুটেন-খামেনের কায়া মূর্ত্তি।

এখানে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল। কার্টার শেষবার সমস্ত উদ্যম সংহত করলেন। সমস্ত শ্মশান-ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করে, তিনি দেখলেন যে, সেখানে ষষ্ঠ রামেসিসের কবর ছিল, তারই কাছে, প্রাচীনকালের বহু কুঁড়ে ঘরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এই কুঁড়েঘরগুলোর তলাতেই আছে, টুটেন-খামেনের কবর! নতুবা সত্যিই সে কবর এখানে নেই!

১৯২৩ সালের ১লা নভেম্বর আবার সেখানে চারিদিক থেকে লোহার শব্দ উঠতে লাগল। ৪ঠা নভেম্বর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, প্রতিদিনের নিয়ম-অনুযায়ী খনন-স্থলে আসতেই দেখেন, হঠাৎ সবাই কাজ বন্ধ করেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ। একজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানাল—প্রথম কুঁড়েঘরটার তলায় একটা পাথরের সিঁড়ি দেখা গিয়েছে।

সিঁড়ি কি একটা ধাপেই শেষ হয়?

সারাদিন অবিশ্রাম খোঁড়ার পর থাকের পর থাক বারোটি ধাপ বেরুল। পরের দিন সূর্যোদয়ের পর আবার খোঁড়া আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়ির শেষে দেখা দিল দরজা, নিশ্চয়ই কোন কবর, হয়ত সেই কবর!

টুটেনখামেনের কবরের চেয়ার। টুটেনখামেনের এবং তাঁর রাণীর প্রতিমূর্তি চেয়ারের পিঠে খোদাই করা রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে কার্টার দেখেন, দরজায় শীল-মোহর দেওয়া। নবম রামেসিসের শীল-মোহর! অন্ততঃ এই তিন হাজার বছরের মধ্যে এর ভিতর কোনও দস্যু ঢোকেনি। যদি ঢুকে থাকে তো নবম রামেসিসের রাজত্বের পূর্বে। (খ্রীঃ পূর্ব ১১২৫)

দরজায় একটা গর্ত করে ভিতরে টর্চ-লাইট ফেলে দেখলেন যে, সামনেটা বড় বড় পাথরে ঢালাই। তিনি বুঝলেন যে নবম রামেসেসের লোকেরাই কবরটিকে রক্ষা করবার জন্য সেই সব পাথর ঐ ভাবে রেখেছে। ঐ সব পাথরের ওপারে কি আছে?

বাইরে তখন রাত্রি। সমস্ত ছিদ্রটি বন্ধ করে, কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে প্রহরী গাঁড় করিয়ে রেখে তিনি বাড়ী ফিরলেন। মানব-হীন মরুভূমিতে চন্দ্রোদয় হয়েছে তখন।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরলেন। ষোল বছরের সাধনা কি সফল হল তবে?

কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে আর একটি কথার উদয় হল। কালই সূর্যোদয়ে তিনি একা এই নতুন আবিষ্কারের সমস্ত গৌরব এবং আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু লর্ড কারনারভনকে বাদ দিয়ে একা এই গৌরব অর্জন করলে তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হবে। লর্ড কার্নারভন তখন ইংলণ্ডে।

ষোল বছর অসাধ্য-সাধন করে যে রহস্য-পুরীর প্রবেশ-দ্বারের সন্ধান পাওয়া গেল, সেই দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রেখে তিনি লর্ড কার্নারভনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। টুটেন-খামেনের কবর আবিষ্কার করার গৌরবের চেয়ে এ মহত্ত্ব কম বাঞ্ছনীয় নয়।

পরের দিন ভোরবেলাই কার্টার লর্ড কারনারভনকে টেলিগ্রাম করলেন। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র লর্ড কারনারভন মিশরে চলে এলেন।

মিশরের রাজ-প্রতিনিধিদের সামনে প্রথম দরজা খোলা হল। তারপর একটির পর একটি করে সেই সব পাথর সরান হল। পাথর সরিয়ে ফেলতে আর একটি দরজা দেখা দিল, দরজায় টুটেন্-খামেনের শীল-মোহর!

উল্লাসে কর্তাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কম্পিত হস্তে দরজায় একটা গর্ত করলেন। তারপর বহু সতর্কতার সঙ্গে একটা বাতি সেই গর্তের ভিতর দিয়ে ওপারের অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল।

লর্ড কারনারভন জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কার্টার, কি দেখছ?

বিস্ময়ে তখন কার্টারের কথা বন্ধ হয়ে এসেছিল। তিনি শুধু বল্লেন, অপূর্ব সব জিনিস!

যেখান থেকে সমস্ত আবিষ্কারক বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিল, সেখান থেকে যে-কবর পাওয়া গেল, প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এত বিস্ময়কর এবং বিচিত্র উপাদান আর কোথাও পাওয়া যায় নি। এত ঐশ্বর্য, শিল্প-কলার এত সুন্দর সব নিদর্শন, প্রাচীন মিশরের মাটী ছেড়ে আর বেরোয় নি।

অতীত কালের একটা বিরাট মিউজিয়াম হঠাৎ যেন মাটীর ভেতর থেকে পাওয়া গেল। তাই টুটেন-খামেনের কবর আবিষ্কারের সঙ্গে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। জগতের এমন কোন কাগজ নেই, যেখানে এই সব জিনিষের ছবি না বেরিয়েছিল।

আসলে যাঁর কবর, তিনি খুব একজন বড় রাজা ছিলেন না। টুটেন-খামেনের আগে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি প্রাচীন মিশরের একজন বিখ্যাত নরপতি। তাঁর নাম হল আখ-এন-আটন্। তিনি মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর পূজা বন্ধ করে দিয়ে এক ঈশ্বরের পূজা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। সেই ঈশ্বরের নাম দিয়েছিলেন "আটন্"। সূর্য্য হল সেই "আটনের" শক্তির প্রকাশ। টুটেন-খামেন ছিলেন আখ-এন-আটনের জামাই। অতি অল্প বয়সে তিনি মারা যান এবং তাঁর রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, তাঁর কবরে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, মিশরের আর কোনও রাজার কবরে তা পাওয়া যায় নি।

ভিক্টর হুগোর গল্প

জগতে যত মহাজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক বা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন, ভিক্টর হুগো হলেন তাঁদের একজন। শুধু কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে নয়, তাঁর মত পণ্ডিত এবং স্বাধীনচেতা লোক জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁর বিখ্যাত বই "লা মিজারেব্‌ল্"-এর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমরা সকলে পরিচিত।

তাঁর লেখার এমনই ক্ষমতা ছিল যে, রাজারা সিংহাসনে বসে তাঁর লেখনীকে ভয় করতেন। দেশের ছেলে মেয়ে বুড়োরা তাঁর ভাষা মুখস্থ করে ধন্য হত। তোমরা হয়ত অনেকে জান না যে, সেই ভিক্টর হুগো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে একখানি গল্পের বই লিখেছিলেন। অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে লিখবেন বলেই লেখেন নি। তাঁর এক নাতনী ছিল, তার নাম জিন্, আর একটি ছোট নাতী ছিল, তার নাম জর্জ্জ। তাঁর বুড়ো বয়সের খেলার সাথী ছিল—সেই দুটি ছোট্ট ছেলে-মেয়ে। তখন তাঁর চুল হয়ে গিয়েছে সব পাকা। সমস্ত ফরাসী জাতির তখন তিনি দীক্ষা-গুরু।

একদিন একজন রাজ কর্ম্মচারী রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসে দেখেন, বুড়ো হুগো মাটীতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন, আর তাঁর নাতনী তাঁর পিঠে চড়ে তাঁকে ঘোড়া হিসেবে চালাচ্ছে। তিনি তো দেখে অবাক্।

ভিক্টর হুগো [১৮০২-১৮৮৫]।

ভিক্টর হুগো এত ভালবাসতেন তাঁর সেই ছোট নাতী আর নাতনীটিকে! শুধু তাঁর নিজের নাতী নাতনী বলে নয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি বড় ভাল বাসতেন। তাঁর বই যখন তোমরা পড়বে তখন দেখবে, কি স্নেহের সঙ্গে তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কথা সব লিখেছেন।

একদিন তাঁর নাতনী ধরে বসল, গল্প বলতে হবে।

—দাদু, তুমি অনেক বই লেখেছ—কত কি সব গল্প। আমাদের এমন গল্প বল, যা তোমার বইতে নেই। কেউ আর শোনে নি।

দাদু ছেলে বলেন, গল্প তৈরী করা কি অত সোজা ব্যাপার রে! কাল বলবো। ওদিক থেকে তখন ঘাড়ে চড়ে বসে রয়েছে—আজই এখনই বলতে হবে। ওসব কোন কথা শুনছি না।

—তবে শোন্।

এক দেশে একটা খুব দুষ্টু রাজা ছিল। রাজার যত প্রজা তার অত্যাচারে সব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারে না। রাজার অগাধ ঐশ্বর্য্য—তার ওপর আবার, রাজার মাইনে করা হাজার হাজার সৈন্য ছিল। তাদের ভয়ে কেউ কোন কথাটি পর্য্যন্ত বলে না।

এধারে যত দিন যায় রাজার অত্যাচারও তত বাড়তে থাকে। রাজে শোয় একলোক, সকাল বেলা ওঠে আর এক লোক। কাল যাকে ফেলে দিয়েছিল, আজ সকালে উঠেই তাকে দেয় ফাঁসী। এমনি করে অত্যাচারের মাত্রা নিত্যই বেড়ে চলতে লাগল।

মাছির মত একটা ছোট্ট পোকা বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই রাজত্বে এসে পড়ে। রাত্তির বেলায় যখন চারদিক নিশুতি হয়েছে, সে তখন বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগল, এ কেমন দেশ! নতুন জায়গায় এসে পড়েছে কি না!

রাত্রি নিশুতি। সেদিন আবার চাঁদ উঠতে ভুলে গিয়েছে। সে বেচারা যে-বাড়ীতেই যায়, সেইখানেই শুনতে পায়, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে মানুষ চুপি-চুপি কাঁদছে। অত্যাচারী রাজার দেশে রাত্রি-বেলায় ঘরে দরজা বন্ধ করে সব কাঁদছে। যে-যার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সব কাঁদছে—তাই কেউ কারুর কান্না শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু মাছিটা সব বাড়ী উড়ে উড়ে দেখল, সব বাড়ী থেকেই এমনি কান্না উঠছে।

ব্যাপারখানা কি?

ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে সে শুনতে পেল, সবাই কাঁদছে সেই দেশের রাজার অত্যাচারে। ভগবানের কাছে তারা প্রার্থনা করছে, এই রাজার হাত থেকে উদ্ধার করে তিনি যেন অন্য কোন ভাল রাজা তাদের জন্যে পাঠিয়ে দেন।

সেই ছোট্ট এতটুকু মাছি, লোককে কামড়ায় বটে—আর কামড়ে তার মন্দ লাগেও না—কিন্তু তার মনটি ছিল খুব ভাল। সেই রাত্তিরেই সে প্রতিজ্ঞা করল, এর একটা বিহিত সে করবেই। ওরে দরজা বন্ধ করে রাত্তির বেলা চুপি চুপি যারা কাঁদছে, তারা এর বিহিত করতে পারবে না।

তার পরের দিন রাত্তির বেলায় রাজা খেয়ে দেয়ে সোনার পালঙ্কে গিয়ে শুয়েছেন—এমন সময় কুট্ করে পিঠের দিকে কে একটি বেশ ছোট্ট কামড় দিল। রাজার বিছানায় একটি ছারপোকা থাকলে, এক একজন চাকরকে একমাস একবেলা খাইয়ে রাখা হবে এই ছিল হুকুম।

রাজা গর্জ্জন করে উঠলেন, কে হল কোটালে আমাকে?

রাজা শুনলেন মৃদুস্বরে কে যেন বলছে, একটি সামান্য মাছি, তোমাকে শোধরাতে চাই।

—বটে, দেখাচ্ছি তোমার মাছির আস্পর্দ্ধা!

আবার সেই কুট্ করে কামড়!

রেগে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে সমস্ত চাকর-বাকরকে ডাকলেন। তারা এসে তন্ন তন্ন করে বিছানা আসবাব-পত্র সমস্ত নেড়ে-চেড়ে দেখল। মাছিকে পাবে কেন? মাছি মনের আনন্দে রাজার দাড়ির ভেতর লুকিয়ে বসে ছিল।

সমস্ত ওলট-পালট করার পরে রাজা আবার শুলেন। বেই একটু তন্দ্রা এসেছে—অমনি আবার সেই কুট্—

এমনি ভাবে সারা রাত্রি কেটে গেল। একটি ফোঁটা ঘুম হল না।

সকাল বেলা উঠতেই একটা আলাদা বাড়ী বেশ করে পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হল। রাত্তিরে রাজা এই নতুন বাড়ীতে ঘুমুবেন। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের ডেকে পাঠিয়ে চারিদিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা হল। কোথাও মাছি নেই!

আগের রাত্তিরে ঘুম হয় নি বলে, রাজা সেদিন একটু সকাল সকাল শুতে গেলেন। নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়েছেন, এমন সময় আবার সেই কামড়! ছোট্ট মাছিকে কে আটকাবে?

রাজা গর্জ্জন করে উঠলেন, কে রে?

—যার সঙ্গে কাল রাত্তির বেলা কাটিয়ে ছিলে, আমি সেই মাছি!

—কি চাস্ তুই?

—আমি চাই তুমি আমার কথা শুনবে। তোমার প্রজাদের ওপর তোমার অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

রাজা গর্জ্জন করে উঠলেন, কে আছ? সেনাপতিকে খবর দাও। সৈন্যদের খবর দাও।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সেনাপতি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উপস্থিত, কিন্তু শত্রু কোথায়?

আবার তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খোঁজা হল, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

সারারাত্রি সোনার পালঙ্কে শুয়ে যন্ত্রণায় রাজা ছটফট করতে লাগলেন। যেসে মাছির কামড় লক্ষ্য করে মারতে গিয়ে রাজা নিজের গায়েই আঘাত করেন। সকাল বেলা দেখেন, তাঁর নিজের আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

এমনি করে রাতের পর রাত যায়। রাজার শরীর শীর্ণ হয়ে এল। তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন—দু' হাত দিয়ে মানুষের মাথা কেটেছেন কিন্তু একি হল, একটা ছোট্ট মাছি আজ তাঁর প্রাণান্ত করল!

অবশেষে একদিন আর সহ্য করতে না পেরে রাজা বল্লেন, আমি হেরে গিয়েছি। বল, আমি কি করব?

সগর্ব্বে তখন মাছি বলে—তোমার প্রজাদের সুখী করতে হবে।

—কেমন করে তা করা সম্ভব হবে?

—কালই সকালে তুমি এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে, আর আসবে না। লোকে সবাই মিলে যাকে উপযুক্ত মনে করবে, তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে বেছে, তাকেই তোমার সিংহাসনে বসাবে।

পরাজিত রাজা নিরুপায় হয়ে বল্লেন, আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমার দিন চলবে কি করে? আমার সব সোনা, মণি-মুক্তা—কিছুই নিয়ে যেতে পারব না!

সকাল বেলা রাজ্যসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে দেখল যে, তাদের সেই অত্যাচারী রাজা তাদেরই মতন সামান্য পোষাক পরে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

তোরা ভাবছিস, তার দিন কি করে চলবে? মাছিটার মন খুব ভাল ছিল রে! যাবার সময় সে রাজাকে বলেছিল, তোমার যত খুসী সোনা-রুপো নিয়ে যাও।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

বন্দর সপ্তগ্রাম

তোমরা তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা শুনিয়াছ, এক্ষণে তোমাদিগকে বাঙ্গালার আর একটি প্রসিদ্ধ বন্দরের কথা বলিতেছি। ইহার নাম বন্দর সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন হইলে, সপ্তগ্রাম বন্দরের প্রসিদ্ধি হয়। সাতটি গ্রাম মিলিয়া ইহার নাম হয় সপ্তগ্রাম। এইরূপ শুনা যাইত যে, এই সাতটি গ্রামে সাতজন ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের তপস্যার জন্য ইহা একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

"তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষি শাসনে বন্দর সপ্তগ্রাম।"

এই সপ্তগ্রাম কোথায় অবস্থিত ছিল, এক্ষণে সে কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। যুক্তবেণী ও যুক্তবেণীর কথা তোমরা জান কিনা বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী মিলিত হইয়াছিল, তাহার নাম যুক্তবেণী। প্রয়াগ বা এলাহাবাদই সেই যুক্তবেণী। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছিল। আর যেখানে তাহারা ছাড়া-ছাড়ি হইয়া তিন দিকে গিয়াছে, তাহাকে মুক্তবেণী বলে। বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে এরূপ হইয়াছে। এই যুক্তবেণী বা ত্রিবেণী হইতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিন-দিকে গিয়াছে। ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রাম অবস্থিত ছিল। ক্রমে তাহা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া উঠে।

"সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সেই ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥"

হিন্দুরাজগণের সময় হইতেই সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মুসলমান রাজত্বকালেও ইহার গৌরব উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল। এখানে নানা দেশের নৌকা ও জাহাজ আসিয়া নানাবিধ পণ্যদ্রব্য দেশবিদেশে লইয়া যাইত। ইউরোপীয় বণিকগণও এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চাউল, কার্পাস বস্ত্র, লাক্ষা, চিনি, কাগজ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য বাণিজ্যতরীসমূহে বোঝাই হইয়া নানাদেশে চলিয়া যাইত। এখানকার বণিকেরা নানা ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা বিদেশে যাইতেন না, ঘরে বসিয়াই বহু ধন উপার্জ্জন করিতেন।

"সপ্তগ্রামের লোকে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥"

এখানকার লোকসকল সমৃদ্ধিশালী ছিল। পুরুষেরা সুন্দরকান্তি ও রমণীরা পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহারা নানা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া থাকিতেন।

"পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী যেন
আভরণ সব স্বর্ণময়।"

বাঙ্গালার এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর, নানা অট্টালিকায় সুশোভিত হইয়া এককালে আপনার গৌরবশ্রী বিস্তার করিয়াছিল। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় ইহা ধ্বংস হয়। পরে অন্যান্য স্থান বন্দর হইয়া উঠে। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। সপ্তগ্রাম এক্ষণে ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটি সামান্য গ্রাম মাত্র। ইহা হুগলীর নিকট অবস্থিত।

সপ্তগ্রাম অধিকার

আমরা বলিয়াছি যে সপ্তগ্রাম হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল কিন্তু মুসলমানরা পরে ইহা অধিকার করিয়া লন। বগড়া খাঁর পুত্র কৈকাবাদ্ শাহের রাজত্ব সময়ে জাফর খাঁ নামে এক জন সেনাপতি হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের অধীন হয়। জাফর খাঁ হিন্দুদের নিকট হইতে অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের মন্দিরসকল চূর্ণ করিয়া একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি পাথরের দেবমন্দিরমধ্যে জাফর খাঁর সমাধি আছে। সমাধির নিকট অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগঠিত একটি মসজিদও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদটি বোধ হয় জাফর খাঁর নির্ম্মিত মসজিদের স্থানে গঠিত হইয়া থাকিবে। মুসলমান অধিকারে আসিয়াও সপ্তগ্রামের গৌরব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তোমরা সে কথা শুনিতে পাইবে।

জাফর খাঁকে সাধারণ লোকে বলিত যফ্রাক খাঁ। যফ্রাক খাঁ কর্ত্তৃক অতি সহজ সংস্কৃতে রচিত একটি গঙ্গাস্তব বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ আছে। স্তবটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

সুরধুনি! মুনিকন্যে! তারয়েঃ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্র কিং তে মহত্ত্বং॥
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তত্ত্বতস্তত্ত্ব মহত্ত্বম্॥ ইত্যাদি।

জাফর খাঁ শেষ বয়সে গঙ্গাভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

সুবর্ণগ্রাম বিজয়

এই সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গও মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লন। যে সময়ে বগড়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমসুদ্দীন ফিরোজ শাহ লক্ষ্মণাবতীতে রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে অনুমান হয়, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। দনুজ রায় সে সময় জীবিত ছিলেন কি না বলা যায় না। জীবিত থাকিলে তিনি যে তখন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ বল্‌বন্ বাদশাহের বাঙ্গালায় আগমনের সময় তাঁহার যেরূপ প্রতাপ ছিল বলিয়া জানা যায়, সেরূপ প্রতাপ থাকিলে মুসলমানেরা তাঁহার হস্ত হইতে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিতে পারিতেন না। তাই মনে হয়, হয়ত তিনি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, না হয়, সে সময়ে জীবিত ছিলেন না। সে যাহা হউক, এই সময় হইতে সুবর্ণগ্রাম মুসলমানদিগের অধিকারে আইসে।

বাঙ্গালার তিনটি বিভাগ

দিল্লীতে বলবন্ বংশীয়েরা সিংহাসনচ্যুত হইলে তোগলক বংশীয়েরা বাদশাহ হন। লক্ষ্মণাবতীর বলবন্ বংশীয়েরা আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ্যচ্যুত হন। তোগলক বাদশাহেরাও তাঁহাদিগকে দমন করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালা রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, তিনজন শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। সমস্‌উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের তৃতীয় পুত্র নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম, তোগলক বাদশাহের অনুগ্রহে লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার পাইয়াছিলেন। যিনি সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তাঁহার নাম জাতার খাঁ। আর সপ্তগ্রামেরও একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম জানিতে পারা যায় না। জাফর খাঁর পর বোধ হয় তিনি নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। এই রূপে লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামকে এক একটি রাজধানী করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। পরে এই তিন বিভাগ এক হইয়া গেলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বেশ স্বতন্ত্রভাবে বুঝা যাইত।

বাঙ্গালার স্বতন্ত্রতা অবলম্বন

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ তোগলক অত্যন্ত খামখেয়ালী রাজা ছিলেন। সেই জন্য দিল্লী সাম্রাজ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারা এই সুযোগে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফখরউদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই আলী খাঁ নামে লক্ষ্মণাবতীর সেনাপতি লক্ষ্মণাবতী হস্তগত করিয়া আলাউদ্দীন আলিশাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনিও আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করেন। আলিশাহ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর নিকট পাণ্ডুয়ায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। আলিশাহ পশ্চিম বঙ্গেরই অধিপতি হইয়াছিলেন। ফখরউদ্দীন কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। উঁহাদের দুই জনের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছিল। তাহার পর আলিশাহের ধাত্রীপুত্র হাজী ইলিয়াস তাঁহাকে নিহত করিয়া পশ্চিম বঙ্গের অধীশ্বর হন। তিনি ফখরউদ্দীনের পুত্র গাজী শাহকে নিহত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সমগ্র বাঙ্গালারই স্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন। এবং সমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন।

মিশরদেশীয় ভ্রমণকারী

ফখরউদ্দীনের রাজত্বকালে মিশরদেশীয় ভ্রমণকারী ইবন বতুতা চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের বাণিজ্যগৌরব তখন সকলকেই আকর্ষণ করিত। চট্টগ্রাম বা চাটিগ্রাম ইহার কিছুকাল পরেই ইয়োরোপীয় বণিকগণের নিকট পোর্টো গ্রাণ্ডি বা বড় বন্দর নাম লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামকে ইয়োরোপীয় বণিকগণ পোর্টো পিকোয়োলো বা ছোট বন্দর বলিত। বতুতার বিবরণ হইতে সেকালের বাঙ্গালার দ্রব্যমূল্যের কথা জানিতে পারা যায়। ইবন বতুতা রতল্ নামে এক ওজনের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান কালের প্রায় ১৪ সেরের সমান। এদেশের প্রচলিত রজত মুদ্রার নাম ছিল দীনার। তখন একটি দীনারে পঁচিশ রতল চাউল এবং আশি রতল ধান পাওয়া যাইত। দুই দীরহম্ বা এক দুয়ানিতে এক রতল তিলের তৈল ও চারি দীরহমে এক রতল গব্যঘৃত অথবা মাখন মিলিত। তিন দীনারে একটি দুগ্ধবতী গাভী কেনা যাইত। এক দীরহমে আটটি হৃষ্টপুষ্ট কবুতর এবং তাহাতে পনরটি সেইরূপ পারাবত পাওয়া যাইত। একটি বৃদ্ধাকার মেষের মূল্য ছিল দুই দীরহম। আট দীরহমে এক রতল গুড় মিলিত, চার দীরহমে এক রতল চিনি পাওয়া যাইত। দুই দীনার দিলে মিশ হাত একখানি সূক্ষ্ম মস্‌লিন বা কার্পাসবস্ত্র কিনিতে পারা যাইত। একটি সুবর্ণ দীনারে একটি সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসী ও দুইটি সুবর্ণ দীনারে একটি সুন্দর কিশোরবয়স্ক ক্রীতদাস মিলিত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তখন এদেশে কত সুলভ মূল্যে জিনিসপত্র পাওয়া যাইত। এখনকার দ্রব্যমূল্যের সহিত তখনকার যে তুলনা হয় না, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ।

সুলতানে সুলতানে

ইলিয়াস্ শাহ সমস্ত বাঙ্গালার অধিপতি হইয়া রাজ্যবিস্তার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনেন। ইলিয়াস্ শাহ ক্রমে ক্রমে

বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরোজশাহ তোগলক্ দিল্লীর সুলতান ছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের কতকস্থান হস্তচ্যুত হওয়ায় ফিরোজশাহ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সুলতানে সুলতানে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বাঙ্গালা প্রবেশের পূর্ব্বে ইলিয়াস্ শাহ ফিরোজ শাহকে বাধা দিবার জন্য গঙ্গা ও দুর্গা নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফিরোজ দুর্গা পার হইলে ইলিয়াস্ বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। তিনি পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইলিয়াস ফিরিয়া আসিলে ফিরোজ তাঁহার পশ্চাতে বাঙ্গালায় চলিয়া আসেন। তিনি একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া অনেকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। ইলিয়াস তখন একডালা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ফিরোজের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইলিয়াস শাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। ফিরোজ আবার তাঁহা অবরোধ করেন। তিনি এবারও একডালা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। কাজেই বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইলিয়াস ও ফিরোজ শাহের যুদ্ধের সময় হিন্দু জমীদারগণ দুইদিকেই যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় সুলতানের নিকট হইতে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর রাজা সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর ইলিয়াসের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অনেক সৈন্যের সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেকেন্দর শাহ বাঙ্গালার বাদশাহ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ আবার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সেকেন্দরও পিতার ন্যায় একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। ফিরোজ শাহ আবার তাহা অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফিরোজ শাহ সেকেন্দর শাহকে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং উভয়ের সীমা স্থির করিয়া লওয়া হয়।

আদিনা মসজিদ

ফিরোজ শাহের সহিত সন্ধি করিয়া সেকেন্দর শাহ নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নামে এক প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ন্যায় সুবৃহৎ মসজিদ ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে একটি বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক হিন্দু দেবমন্দিরের উপকরণ লইয়া ইহা যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতেই জানিতে পারা যায়। মসজিদের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে। তাহাতেই ইহা অনুমান হয়। মুসলমানেরা অনেক স্থানে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করিয়া যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

কাজী ও বাদশাহ্

সেকেন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্‌উদ্দীন বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেকেন্দার তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া আহত হন। গিয়াস্ উদ্দীন অবশ্য সৈন্যদিগকে পিতার অঙ্গে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যেরাও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি সেকেন্দর আহত হইয়াছিলেন। গিয়াস্‌উদ্দীন পিতার মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেকেন্দর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এ জগৎ হইতে বিদায় লন। গিয়াস্‌উদ্দীন তাহার পর বাঙ্গালার বাদশাহ হন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পর নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

গিয়াস্ উদ্দীন শরকেশ অভ্যাস করিবার সময় এক বিধবার পুত্রকে বাণবিদ্ধ করেন। বিধবা কাজী সিরাজ উদ্দীনের নিকট বাদশাহের নামে অভিযোগ করিলে, কাজী বাদশাহকে তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। বাদশাহ কাজীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বিধবাকে অর্থ দিয়া শান্ত করিতে বলেন, নতুবা তাঁহাকে মুসলমান শাস্ত্রানুসারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে বলিয়া জানান। বাদশাহ বিধবাকে যথোচিত অর্থ দিয়া শান্ত করিলে, কাজী তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বাদশাহকে অভিবাদন

করেন। বাদশাহ তাঁহার পোষাকের নিম্ন লুকায়িত একখানি ক্ষুদ্র তরবারি দেখাইয়া কাজীকে বলেন যে, যদি আপনি ন্যায় বিচার না করিতেন, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা আপনার মস্তক ছেদন করিতাম। কাজীও তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে চাবুক বাহির করিয়া বাদশাহকে দেখাইয়া বলিলেন যে, যদি আপনি আমার আদেশ পালন না করিতেন, তাহা হইলে এই চাবুকের আঘাতে আপনার পিঠের চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। বাদশাহ কাজীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তোমরা অবশ্য কাজী ও সুলতান উভয়েরই ন্যায়পরতার পরিচয় পাইয়াছ।

গিয়াস্ উদ্দীন এক সময়ে একটি কবিতার এক চরণ লিখিয়া তাহার পূরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে কাহারও দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া উঠিল না। তখন তিনি পারস্যের সিরাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজের নিকট কবিতাটি পূরণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন ও তাঁহাকে তাঁহার দরবারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। হাফেজ কবিতাটি পূরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থলালসা না থাকায় তিনি গিয়াস্ উদ্দীনের দরবারে আসেন নাই।

চীন দেশীয় ভ্রমণকারীর বিবরণ

গিয়াস উদ্দীনের পুত্র সৈফ উদ্দীন হমজাশাহের রাজত্বকালে মাহুয়ান নামে একজন ভ্রমণকারী চীন সম্রাটের দূতের সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি সুমাত্রাদ্বীপ হইয়া চট্টগ্রাম ও সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন এবং বাঙ্গালা রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। মাহুয়ান তাঁহার বিবরণে লিখিয়াছেন যে, এই দেশের নাম সমূহ প্রাচীরবেষ্টিত। অধিবাসিগণ মুসলমান এবং কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা মস্তক মুণ্ডন করে। রাজা ও রাজকর্মচারিগণ মুসলমানের পোষাক পরিয়া থাকেন। এই দেশের ভাষার নাম বাঙ্গালা, তবে ফার্সীভাষা ব্যবহারও হয়। এদেশের মুদ্রার নাম টঙ্কা, অল্প মূল্যের জন্য কড়িরও প্রচলন আছে। এ দেশ শ্রীসম্পন্ন। এখানে অনেক প্রকার ধান্য, যব, গম, সরিষা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। নারিকেল, খাজুর, তাল প্রভৃতি হইতে মদ প্রস্তুত হয়। কলা, কাঁঠাল, আম, দাড়িম্ব প্রভৃতি ফল ও ইক্ষুও জন্মিয়া থাকে। এ দেশে দুই প্রকার কার্পাসনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ার হয়। এই সকল বস্ত্র উনিশ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া। এ দেশে রেশমের কীট পালিত হয় এবং রেশমী কাপড়ও হইয়া থাকে। চিকিৎসক, জ্যোতিষী, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের বাস আছে। রাজা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে জাহাজ পাঠাইয়া থাকেন। মুক্তা ও বহুমূল্য মণি সকল চীনদেশে পাঠান হয়।

বাঙ্গালার সিংহাসনে হিন্দুরাজ

মুসলমানগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতে থাকিলেও হিন্দুরা একেবারে রাজ্যশাসনের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদলাভ করিতেন। রাজা গণেশ নামে ভাদুড়িয়া পরগণার জমীদার সুলতান গিয়াস উদ্দীনের সময়ে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের কর্ত্তা হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মুসলমান সুলতানগণ হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেও মুসলমান রাজকর্ম্মচারী ও মৌলবী মোল্লাগণ হিন্দুদিগের প্রতি সকল সময়ে সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। কর্ম্মচারীরা আপনাদের প্রভুত্ব প্রকাশের চেষ্টা করিতেন আর মৌলবী মোল্লারা হিন্দুদিগকে মুসলমান করিতে চেষ্টা করিতেন। হিন্দুদিগের অবশ্য এ সকল ভাল লাগিত না। রাজা গণেশের মনেও তাহাই হইয়াছিল। গণেশ আবার হিন্দুদিগের ক্ষমতাবিস্তারেরও ইচ্ছা করিতেছিলেন। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, গণেশেরই ষড়যন্ত্রে বাদশাহ গিয়াস উদ্দীন নিহত হইয়াছিল, তাহার পর তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে গণেশ গিয়াস উদ্দীনের পৌত্র সুলতান শিহাব্ উদ্দীনকে নিহত করিয়া পাণ্ডুয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। নরসিংহ নাড়িয়াল নামে একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি শিহাব্ উদ্দীনকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

"যেই নরসিংহ বল ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা॥"

গণেশ রাজা হওয়ায় ও অত্যাচারী মুসলমান কর্ম্মচারী ও মৌলবী মোল্লাদিগকে শাসন করায় মুসলমানেরা তাঁহাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে। তখন গণেশের পুত্র যদুকে

মুসলমান করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হয়। গণেশ কিন্তু আবার তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গণেশ দনুজমর্দ্দন দেব নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাঙ্গালা অক্ষরে পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম হইতে টাকা প্রচার করেন।* তিনি গৌড় রাজ্যের যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গণেশ বহুর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার তাহাকে হিন্দু করাইয়া লইয়াছিলেন। বহুকে কতিপয় সুবর্ণনির্ম্মিত গাভীর উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করান হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। তাহার পর গণেশ আবার মুসলমান কর্ম্মচারী ও মৌলবী মোল্লাদের শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু ধর্ম্ম এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহাকে রাজা পাইয়া যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছিল। ফলতঃ গণেশ যে দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্বের পর বাঙ্গালা দেশে একটি নূতন যুগ আনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা গণেশ কি জাতি ছিলেন তাহা আজিও ঠিক হয় নাই। গণেশের সময় পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এবং তাহাতে অনেক হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। গণেশ বিশ্বস্ত মুসলমান প্রজা, কর্ম্মচারী, সাধু ও বিদ্বানদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাহারা তাঁহাকে এরূপ ভাল বাসিত যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল বলিয়া প্রচলিত আছে। হিন্দুরা তাহা দাহ করিতে আর মুসলমানেরা কবর দিতে উদ্যত হইয়াছিল।

গণেশের পর যদু মহেন্দ্র দেব নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপিয়া ঐ নামে টাকা প্রচার করিলেন। অল্পদিন পরেই কিন্তু তিনি আবার মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এরূপ একটা কথা চলিত আছে যে তিনি আশমানতারা নামে এক মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। [ক্রমশঃ]

পাষাণ

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম দিই প্রেম নাহি লহ—
ঘৃণা দিতে চাহি—দুরন্ত দুঃসহ
দিতে নাহি পারি—
আমারি জীবন হয় ধূলিত দুর্ব্বহ।
হে দেবতা, সংশয়ী পূজারী
নাহি জানি কি কর যাচনা ;
ক্ষুদ্র মোর প্রাণ, তুচ্ছ বালুকণা
তাই চাহ বুঝি ?
হে পাষাণ, তাই লহ—কেন তা লহ না ?
আর নাই—কিছু নাই পুঁজি
নিঃস্ব আমি—তবু ব্যর্থকাম ;
দিনু বিদা বিশ্ব—চিত্ত সঁপিলাম,
হে অপ্রতিগ্রাহী,
পদপ্রান্তে পড়ে আছে লাঞ্ছিত প্রণাম।

আর কিছু দিতে নাহি চাহি—
দূরে যাব তোমারে ছাড়িয়া
ধূমকেতু সম বহ্নিদগ্ধ হিয়া ;
এই শুধু আশা,
তোমারে ভুলিতে চাহি দূরান্তরে গিয়া—
নাহি আর স্নানের পিপাসা।
কোথা যাব—নিষ্ঠুর বন্ধন !
বজ্র ধূমকেতু করে পলায়ন,
আকর্ষণ ছিঁড়ে
চিরন্তন উল্কাও হতে করে প্রাণপণ—
পুন আসে ফিরে।
প্রেম দিই প্রেম নাহি লহ
ঘৃণা দিতে চাহি—অনন্ত দুঃসহ—
ব্যর্থ সে প্রয়াস।
হে পাষাণ, মূক তুমি কথা নাহি কহ ;
ক্ষুব্ধ আমি সংশয়ে হতাশ।

---

* গণেশের দনুজমর্দ্দন দেব নামাঙ্কিত সিক্কিলাম হার মহাশয় দেখিতে পান নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের এই মত। বঃ শ্রী

অন্তঃপুর

—শ্রীমাণিক গুপ্ত

এ যুগের নারী

সম্প্রতি একখানি বাংলা পত্রিকায় 'বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি মহিলার লেখা। লেখিকা বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। যদি কোনও পুরুষ এই প্রবন্ধের লেখক হইতেন তবে ইহাকে আমরা আলোচনার যোগ্য মনে করিতাম না। কেননা তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপানো হইয়াছে, সে-রেকর্ডে কি বাজিবে তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এ রচনা পুরুষের নয়, নারীর। সুতরাং প্রবন্ধটির বিষয়ভাগ লইয়া আলোচনা করিব। তাহাতে এক দিকে যেমন আমাদের এ বিষয়ে বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে, তেমনি এই প্রবন্ধকেও সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হইবে। লেখিকা 'বর্তমান যুগে ভারত নারীর কর্তব্য কি' প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,

> 'অতীত যুগে ভারত নারীর কর্তব্য হইতে তাহা বিভিন্ন নহে। সামান্যতঃ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কর্তব্যে পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রধানতম কর্তব্য চির অপরিবর্তিতই থাকা সঙ্গত। অর্থাৎ ভারত নারীর সেই যে চিরন্তন শিক্ষা, যে-শিক্ষা তিনি তাঁর বহু বহু পূর্ব পিতামহীদের মধ্য দিয়া পাইয়া আসিয়াছেন, বৈদিক যুগের সেই চরম শিক্ষা—"পতি দেবা ভব" সেই স্বীকৃতির পরিণামে—"পতিকুলে ভূয়াসম্" সেই "অরুন্ধতি রক্ষাং অস্মি" ধ্রুবতারার মত পতিকুলে চিরস্থির থাকিব, অরুন্ধতী তুল্যা হইব।.....এই শিক্ষাই ভারত নারীর চরম শিক্ষা এবং এই শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহারা যাহা লাভ করিয়াছিলেন, কোন দেশের কোন নারীই তার চেয়ে বড় লাভ করিতে অন্ততঃ এ পর্যন্ত পারেন নাই।..... ইত্যাদি।'

প্রবন্ধের প্রশ্ন যাহা তাহার উত্তর দিতে হইলে প্রশ্নটি সম্যক বোঝা দরকার। 'বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য কি' এ প্রশ্ন এমন অস্পষ্ট যে, ইহার উত্তর সুস্পষ্ট হওয়া কঠিন। দেখা যাইতেছে, 'সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কর্তব্যকে, এ প্রবন্ধে সামান্য বলিয়া ধরা হইয়াছে, কেবল পতিসম্পর্কে মনোভাব, পাতিব্রত্যে ভারত-নারীর কতখানি নিষ্ঠা থাকা উচিত ইহাই প্রশ্নের মুখ্য বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরাও লেখিকার সহিত একমত যে 'এ পর্যন্ত কোন ভদ্র-মহিলাকে বলিতে শুনি নাই যে ভারত মহিলার পাতিব্রত্য রক্ষা আজিকার দিনে অচল হইয়া পড়িয়াছে।' কিন্তু তৎপরেই লেখিকা যে বলিতেছেন—তিনি একথাও কাহারও মুখে শুনেন নাই 'নারী-স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ নারী-পুরুষের তুল্যাধিকার সবার জন্যই একান্ত রূপে প্রয়োজনীয়,'—ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস যে নারী-স্বাতন্ত্র্যের বা নারী-পুরুষের তুল্যাধিকারের সহিত পাতিব্রত্যের কোনও বিরোধ নাই। লেখিকা অতঃপর বলিয়াছেন—'পতির সহিত স্বাতন্ত্র্য চর্চা না করিয়াও মনুষ্যত্ব রক্ষা করা যায়।' মনে হয়, লেখিকা নারী-স্বাতন্ত্র্য কথাটির উপর বিরূপ। ইহা যে নারীর মনুষ্যত্বরক্ষারই নামান্তর, অন্য কিছুই নহে, তাহা সামান্য বিবেচনা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন।

পরে লেখিকা বলিতেছেন,—'সকলেই শাস্ত্রোক্ত পতিব্রতার উপাখ্যানের সেই কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যারতা সুশীলা পত্নী—যিনি স্বামীর খেয়ালে রোগপঙ্গু স্বামীকে বহনপূর্বক লক্ষহীরার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনই অনন্যচিত্তে পতিকে নারায়ণবোধে তাঁর আদেশকে দেবাদেশ করিয়া লইয়া হিতাহিত বিচারশক্তি তাঁহাতে বিসর্জন দিবেন, এ আশা করা যায় না।' এ আশা যদি না করা যায়, তবে অতীত যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য হইতে বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য যে কেন বিভিন্ন নহে, তাহা বোঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

কেন কঠিন হয় তাহা বুঝাইতে হইলে বিষয়টির আরও বিশদভাবে আলোচনা দরকার।

বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্যের সহিত অপরাপর দেশের নারীদের কর্তব্য যে অন্যপ্রকার হইবে এমন আশা করা আমাদের মতে বাতুলতা। কেননা, আজ আর সেদিন নাই

যখন চীনের প্রাচীর-আবেষ্টনীর মধ্যে বসিয়া আমরা ক্যানিমুট রাজার ভাষায় বলিতে পারি, সমুদ্রতরঙ্গ, তুমি এই অবধি আসিয়া ফিরিয়া যাও। আজ এদেশের ঘাটে ওদেশের সমুদ্রতরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছাইতেছে, সমুদ্রপথ রুদ্ধ করিয়া দিলেও বিমানপথ প্রশস্ততর হইতেছে। সুতরাং আজ আর বিচ্ছিন্ন হইয়া ও বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের বিচার চলে না। ভারত-নারীর বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করিতে প্রতীচ্যের সভ্যতার কোন ঢেউকে নিছক হাসিয়া উড়াইয়া দিবার আজ উপায় নাই। অন্তকার পশ্চিমের আকাশের ম্লান সূর্যকে কল্য প্রভাতে প্রাচ্যের আকাশে রক্তবর্ণ হইতে দেখিব, ইহা এখন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আজ ভারত-নারীর কর্ত্তব্য অপরাপর সকল দেশের নারীর কর্ত্তব্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কর্ত্তব্য কি, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের নরনারীর সম্পর্কের পটভূমিকায় তাহার রূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর স্থান কোথায়—প্রথমে সেই আলোচনা করিব।

পৃথিবীর ইতিহাস পড়িয়া দেখি, মোটামুটি ভাবে তাহা পুরুষের ইতিহাস। রাজরাজড়ার যুদ্ধ, এ দেশ কর্ত্তৃক ও দেশ আক্রমণ এবং এ জাতির নিকট সে জাতির পরাজয়—ইহাই পৃথিবীর প্রচলিত ইতিহাস। এখানে ওখানে ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি রাণী কি কোনও সম্রাটের সুন্দরী উপপত্নী, বড়জোর জোয়ান অব আর্ক কি ক্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত কয়েকটি নারী, পুরুষের রচিত এই ইতিহাসে সামান্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কোন্ বিশেষ সময়ে কোন্ দেশে কি রকম সামাজিক অবস্থা ছিল, কূটনীতি কি ভাবে পরিচালিত হইত, দানধ্যান কেমন ছিল ইত্যাদি, ইতিহাসের ইহাই বিষয়-বস্তু। নারীদের জীবন-যাপনরীতির সন্ধান এ ইতিহাসে কদাচিৎ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসাও এ পর্য্যন্ত তেমন দেখা যায় নাই।

অনেকে বলিবেন যে, কোনও দেশের কি কোনও কালের ইতিহাস, সেই দেশ ও কালের নরনারীনির্ব্বিশেষের ইতিহাস, কেননা একই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, একই বন্যায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে,—একই সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোক তাহারা ভোগ করিয়াছে। ইহা অর্দ্ধসত্য। যেদিন হইতে মানুষ নীড় বাঁধিয়াছে, সেদিন হইতে পুরুষ ও নারীর জীবনযাপনের রীতি পৃথক হইয়াছে। প্রথম যেদিন যুদ্ধ হয়, প্রথম যেদিন রুধির কথা শোনা যায়, প্রথম যেদিন ইন্দ্রজালের সূচনা, সেই দিন হইতে নারী ও পুরুষের কাজ বিভিন্ন হইয়াছে। প্রথম জাতির, প্রথম ধর্ম্মের সূত্রপাতে প্রধান কার্য্য হইয়াছে এই নারী ও পুরুষের বিভিন্নতার সৃষ্টি। তাহার পর হইতে দুজনে মিলিয়া একই পথে চলিয়া আসিয়াছে, একথা সত্য—কিন্তু ইহাও সত্য যে সে পথে পুরুষের স্থান এক, নারীর স্থান অন্য—সৃষ্টির সেই প্রথম দিন হইতে দুই জনে দুই বিভিন্ন জগতের সৃষ্টি করিয়া, সেই দিন হইতে জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছে।

যদি এই দুই জগতের সকল ইতিহাস মিলিত, তবে অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু তাহার উপায় নাই। কেননা পুরুষ চিরকাল নারীকে নিজের বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর একটির সামিল করিয়া দেখিয়াছে। সুতরাং যেমন সে নিজের দক্ষিণ হস্তের কোনও পৃথক সত্তায় বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে নিজেরই কৃতিত্বের একটি অংশ দিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, নারী সম্বন্ধেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর ইতিহাসে ঠিক তেমনই—তাহার বেশীও নয়, কমও নয়। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিবে যে, এই পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষ মাত্র একার্দ্ধ, অপরার্দ্ধ নারী। সেই অপরার্দ্ধের ইতিহাস অবজ্ঞাত হইবার কি কোনও কারণ আছে?

হাঁ আছে, এই অবজ্ঞার হেতু আছে। প্রথমতঃ, সে হেতু শরীরগঠনগত। নারী ও পুরুষের শরীরগত পার্থক্য না থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসের চেহারা আজ অন্যরূপ হইত। কিন্তু সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। কেননা অতীতেও নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হয় তো করিতে হইবে। শুধু মজার কথা হইতেছে এই যে, সেই দায়িত্ব-বহনকে পুরুষ কোন দিন কৃতজ্ঞতার চক্ষে দেখে নাই, বরং নারীকে ইহার জন্য সে অপরাধিনী ভাবিয়া তাহাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া আসিয়াছে। কেবল মাতৃত্বের দায়িত্বের জন্য নয়, পুরুষের পেশী নারীর পেশী অপেক্ষা সবল বলিয়াও পুরুষ নারীর কাছে কম দম্ভ করিতে ছাড়ে নাই। এবং

এই দেহগত দৌর্ব্বল্য অবলম্বনে ছোঁয়াচ হিসাবে নারীকে মস্তিষ্কেও দুর্ব্বল করিয়াছে। নিজের লজ্জায় সে নিজে মরিয়া গৃহের কোণে গিয়া প্রজাপতির মত নিজেকে নানা বর্ণে, নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পুরুষের খেলনার সামগ্রী হইয়া বাহিরে আসিয়াছে, পুরুষের সম্মুখে সে হাসি ও লঘু চাপল্য দিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছে।

দ্বিতীয় হেতু, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধে রক্তপাত করিয়া ইতিহাসের পথ পুরুষ, নারীর পক্ষে চির-পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধান্তে নারীকে পুরুষ অন্যতম লুণ্ঠন-সামগ্রীর মূল্য ব্যতীত আর কিছুই দেয় নাই। কোন পুরুষ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়াছে, কেহ বা কমলা দেবী ও পদ্মিনীকে লুণ্ঠন করিয়াছে। এক দিকে ইহা নারীমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, অন্যদিকে ইহার কুশ্রীতা পুরুষের ইতিহাসকেও কালো করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের আর একটা দিকও আছে। যেদিন যুদ্ধ আর কেবল শুধু অস্ত্রশস্ত্রের দ্বন্দ্ব থাকে নাই, সেদিন নারী যুদ্ধবিগ্রহেও পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এ যুদ্ধে নারীর কৃতী পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম যায় নাই। গোলাবারুদের যুদ্ধে নারীকে তেমন কার্য্যকরী শক্তি হিসাবে না পাইলেও রসদ জোগাইবার সময়, শুশ্রূষার সময় নারীর প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রথমাংশে যুদ্ধবিগ্রহে নারীর ডাকনাম অবধি থাকে নাই।

তৃতীয় হেতু, পুরুষের অর্থার্জ্জন-সামর্থ্য এবং নারীর সম্পূর্ণ রকমের অর্থনৈতিক অধীনতা। এই সামর্থ্যের পরিচয়-দানে নারী যতদিন পশ্চাদ্‌পদ ছিল, পুরুষ ততদিন তাহাকে এই অজুহাতে নির্য্যাতন করিয়াছে। বিগত যুদ্ধের পর হইতে তাহার এই সামর্থ্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এবং সেই অবধি পৃথিবীর ইতিহাসের একাংশের পৃষ্ঠাগুলি লিখিবার উপাদানও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কিন্তু দেহগত ও অর্থনীতিগত এই সব পার্থক্যের কথা বাদ দিলে দেখিব—নারীকে আজ পুরুষের পিছনে যে অবস্থায় আমরা দেখিতেছি তাহার প্রধান হেতু ভাবগত। সাহিত্যে, সমাজে, আইনে সকল প্রকারে পুরুষ নারীকে চিরকাল জানাইয়াছে, নারীর পক্ষে পুরুষনিরপেক্ষ জীবন যাপন করা অসম্ভব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে পুরুষ নারীর হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছে, তাহার জীবনযাপনের রীতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়াছে, তাহার অভিভাবকত্ব করিয়াছে। এই অভিভাবকত্বের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত নারী-ও কোন দিন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে আবহাওয়াটা কৃত্রিম—তাই সে অভিভাবকত্বের নাগপাশে নারী জর্জ্জরিত হইয়াছে আর ভাবিয়াছে ইহাই স্বাভাবিক।

সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাসে নারী ও পুরুষের মিলিত পথ চলার বৃত্তান্ত এই। এই বৃত্তান্তের কোন পরিচ্ছেদে দেখি, নারীকে নরকের দ্বার বলা হইয়াছে, কোন পরিচ্ছেদে দেখি বীরত্বে অগ্রণী পুরুষ নারীর কমলপাদিকে স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু সকল পরিচ্ছেদেই নারীর জীবন পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহার নিজস্ব সত্তা নাই। কন্যা জন্মাইলে তাহাকে বনেজঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া কি জলে ভাসাইয়া দেওয়ার বৃত্তান্তও আছে। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়াতি যত্নতঃ' এবং 'যত্র নার্য্যা পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'কে বিশ্লেষণ করিলেও পুরুষের লজ্জার কারণই ধরা পড়ে—'অপি' কথার তাৎপর্য্য ও 'পূজ্যন্তে' কথার মর্ম্মার্থ নারীর পক্ষে মর্য্যাদাজনক নহে। অবশ্য পুরুষের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নাই; সে যুক্তির খণ্ডন কেহ করে নাই, করিবেই বা কে? ১৭৬৫ সনে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের আইনের পুস্তকে পাই—'The disabilities a woman lies under are for the most part intended for her protection and benefit, so great a favourite is female sex in England.' হায় দুর্ভাগা নারী!

এই বিস্তৃত বৃত্তান্তের একটি অধ্যায় হইতেই 'পতি দেবো ভব' ইত্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। এ অধ্যায়ের লেখক পুরুষ। সে কাবা করিয়া যে-বাক্য বলিয়া নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে চায়, তাহার মধ্যে পুরুষের আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার হয় তো কিছু থাকিতে পারে কিন্তু যখন সেই বক্তৃতা কোনও নারী তাহার কর্ত্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেন, তখন তাহার অর্থ বোঝা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা, আত্মোৎসর্গ মাত্রই মহত্ত্ব নয়, যে আত্ম-বিসর্জ্জনের মূলে একপক্ষের শক্তি এবং অপর পক্ষের অসামর্থ্য—সে আত্মসমর্পণ অর্থহীন। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক ইহাই। এমন কথা বলিতে চাহি না যে নারী পতিকে দানব বলিয়া ধরিয়া সেই হিসাবে জীবন যাপন করুক।

প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শ ছিল। সে-আদর্শের কোথায় ভুল, কোথায় তাহা নির্ভুল, তাহা নির্ধারণ করা গবেষণার কাজ। এ যুগের সাধারণ লোকের পক্ষে প্রাচীন ভারতের আদর্শ সর্বাংশীন বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব নয়। কেহ চলিতে গেলে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এ যুগের ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে। সে-পরিবর্তন আকস্মিক নয়। বহুদিন ধরিয়া সে-পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এমন নয় যে এ যুগের ধর্মে কোথায়ও গলদ নাই। কিন্তু যে-গলদ আছে, সে-গলদ দূর করিবার জন্য পিছু হটিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া বর্তমান যুগ অতীত যুগের যাহা কিছু সঞ্চয়যোগ্য তাহা ফেলিয়া আসে নাই, উপরন্তু অনেক যুগের অনেক দেশের বহু উপকরণ বর্তমান কাল সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছে। সেই সংগ্রহের ফল এই বর্তমান যুগ।

বর্তমান যুগের নারীও তাই অপূর্ব—ইহাকে কে অবজ্ঞা করিবে? এ নারী পুরুষের প্রণয়িনী নয়, এ তাহার সত্যকার সহধর্মিণী, সমধর্মিণী বলিলে আরও ভাল বোঝা যায়। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় এ যুগের নারী নিজেকে সকল-ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ প্রমাণ করিয়াছে, ইহাকে পুরাতন পুঁথি হইতে দুইটি শাস্ত্রবাণী আওড়াইয়া তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিবার সাধ্য কাহার আছে?

এ যুগের নারী সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে নিজের কলঙ্ককাহিনী নিঃশেষে মুছিয়া তাহার স্বাধিকার অর্জন করিয়াছে। এই অর্জনের সকল গৌরব নারীর এবং ইহার সমগ্র লজ্জা পুরুষের।

বর্তমান যুগের এই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখি নব্য রুষিয়ার। নব্য রুষিয়ার আধুনিক নারীর কার্যকলাপ যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ হইতে ইহাদের কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। এখানে একটি প্রবন্ধের মর্ম দেওয়া হইল। লেখক একটি ইংরেজী কাগজের সংবাদ-সংগ্রাহক হিসাবে মস্কো-এ গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন:

আমার সামনে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখিতেছি। সাদা কথায় সেগুলি বলি: রুষিয়ায় বিবাহ-আইন অনুযায়ী বিবাহিতা নারীকে তাহার কুমারী-নামই বজায় রাখিতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও স্বামীর পদবী বরং পরিবর্তিত হয়। যদি কোন স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে বাস করে, বিবাহ হইয়াছে না হইলেও তাহাদিগকে আইন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে দেখে। সুতরাং রুষিয়াতে 'অবৈধ প্রণয়' সম্ভব নয়। রুষিয়াতে গর্ভ-নিরোধের জন্য রাষ্ট্র হইতে সর্বত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং গর্ভপাতকে আইনের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তবু রুষিয়ার লোকসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি প্রায় ৩৪ লক্ষ।

সভ্যজগতের রীতিবিরুদ্ধ এই সব পদ্ধতির ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে,—প্রত্যেক রুষ মেয়েই সন্তানের জননী হওয়াকে নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করে। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর স্বামী উপার্জনে অক্ষম হইলে স্ত্রীকে নিজের উপার্জন হইতে এক বৎসর সময়ের জন্য স্বামীর ভরণপোষণ দিতে হয়—স্ত্রী তো এ অবস্থায় খোরপোষের দাবী করিতে পারেন-ই। আলেক্সান্দ্রা মিখাইলভ্না ৬০ বৎসরের রুষাণী, এই বয়সে তিনি লেখাপড়া শিখিয়া রুষক-জীবনের উপর একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন —সে-পুস্তক রুষ সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। রুষ-নৌবাহিনীতে একটি যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন স্ত্রীলোক। ইংলণ্ডের এক সাংবাদিক হিসাবে মস্কোতে গিয়াছিলাম ইংলণ্ডের কাগজের চাকুরী করিতে—চাকুরীর অবসরে এই সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, করিতে বাধ্য হইয়াছি। মস্কোতে বর্তমান যুগের আধুনিকতম নারীকে দেখিতে পাই, যে-নারী পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিতেছে। এই উন্মাদ আদর্শবাদী, সর্বত্যাগী, দুঃসাহসী নারীদিগকে যত দেখিয়াছি, ততই মনে হইয়াছে ইহারা উপন্যাসের নায়িকা হইতে পারে, সাংবাদিকের শুষ্ক লেখনী ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিবে কি করিয়া? কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলেন যে রুষিয়াতে শীঘ্রই প্রমীলার রাজা (dictatorship of woman) দেখিতে পাইব। এমন হইলে অবাক হইবার কিছু নাই।

সাধারণতঃ রুষ নারী কুশ্রী, দেখিতে পুরুষালি, কাপড়-চোপড় প্রায়ই মলিন। কিন্তু সে দোষ তাহার নয়। সুবেশ পোষাক ফ্যাশনদোরস্ত ছাট, আনকোরা ওয়াটারপ্রুফের বুটজুতা যে ইহারা দেখিতে পায় না তাহা নয়—দূর হইতে দেখে, বিদেশিনী প্রবাসিনীদের পরিধানে। রুষ নারীকে দেখিলে মনে হয় দারিদ্র্য ও কঠোর জীবনসংগ্রামে নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যাভিমানের শেষটুকুও ইহাদের মধ্যে আর নাই—স্ত্রী-সুলভ লঘু চাপল্য, আত্মরোমন্থা তো কোথাও দেখি নাই; বরং অপেক্ষাকৃত কর্কশস্বভাব, যে-কর্কশতার মূলে আছে

আদর্শানুরাগ—সর্বত্র তাহাই দেখিয়াছি। অবশ্য সারা মস্কো খুঁজিয়া বেড়াইলে দুই একটি সুন্দরী নারী যে পাওয়া যাইবে না তাহা নয় এবং তাহারা যে পুরুষের সহিত একটু চটুলতা না করিবে তাহাও নয়। কিন্তু সোভিয়েট-সরকারের ইস্তাহার-পত্রের অদ্ভুত ভাষাতেই বলি, 'মেয়েছাকড়ামি' এদেশে 'লাটে' উঠিয়াছে (sex appeal has been liquidated)

প্রথমে একটু অসুবিধা হয়, কেমন-কেমন লাগে, কিন্তু স্ত্রীলোককে জীবনের পথে সমান হইয়া চলিতে দেখা অভ্যস্ত হইয়া গেলেই তখন সব নারীদের মধ্যে নূতন এক প্রকারের সৌন্দর্য আবিষ্কার করা যায়। নীচে যে কয়েকটি নারীর পরিচয় দিব, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অদ্ভুত, মধুর ব্যক্তিত্ব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কথায় কথায় তাহাদের সহিত যখনই দেশের এই গঠনপ্রচেষ্টার আলোচনা হয় (এবং ইহা ছাড়া তাহাদের অন্য কথা কিছুই নাই) তখনই দেখি, মুখে-চোখে ইহাদের কি জ্যোতি। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাকেই তো প্রকৃত সৌন্দর্য বলিতে হয়। ইহা অন্তর-সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ, মনে যাহাকে ভাল বলিয়া জানে, জোরের সঙ্গে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া ইহারা দীপশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—শ্রোতার তখন নিজেকে পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

প্রথম, তোভারিশ আব্রামোভা। ইনি বিচারক। একদিন আদালতে গিয়া দেখি, আব্রামোভা বিচার পরিচালনা করিতেছেন, মুখে একটি সিগারেট। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল, মুখ আর কপালের চারিপাশে উড়িতেছে, বড় বড় টানা বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মুখের উপর জীবনসংগ্রামের স্পষ্ট ছাপ। একপাশে একজন পুরুষ, অপর পাশে একজন নারী তাঁহাকে সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া আছে। ইহাঁদিগকে 'জ্যুরি' বলা হয়, ছয়দিনের জন্য কারখানা হইতে বিচার-কার্যে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন, ছয়দিনের পর নিজের কাজে ফিরিয়া যাইবেন, তখন অপর দুইজন নিযুক্ত হইবেন। আদালতে আব্রামোভা ঠিকা-ঝি হিসাবে কাজ করিতে আসেন, তারপর কিছুদিন কেরাণীর কাজ করিয়া মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে বিচারক হন। চাকরির সুপারিশের মধ্যে চারমাসের বিশেষ শিক্ষা, প্রচুর অধ্যয়ন এবং স্বভাবগত ধর্মশীলতা। আমার বলিতে বাধে না যে, ইহাঁর চরিত্রে যে সব গুণ দেখিয়াছি তাহাতে ইংলণ্ডের যে কোন বিচারকের সহিত তুলনায় ইনি এই পদের সম্মান অধিক রক্ষা করিতে সমর্থ। হয় তো একদিন সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারকের পদে এই আব্রামোভাকে আসীন দেখিব, মুখে একটি সিগারেট ধরাইয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিয়া যাইবেন।

আর একজনের নাম ইউজেন বিরনবাউম। কানাডায় এক কারখানায় তিনি কাজ করিতেন। ষোল বছর বয়সে দর্শকটে মাতিয়া আদালতে অভিযুক্ত হন। তারপর সতেরো বছর বয়সে কবিয়াথে আসেন। 'তখন না জানিতাম এখানকার কোন লোককে' তিনি আমাকে বলিলেন, 'না জানিতাম রুষিয়ার ভাষা। তা ছাড়া পেটে বিদ্যাও ছিল না।' রুষিয়াতে আসিয়া একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ পান, ফ্যাক্টরি হইতে স্কুলে, স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। নারীদের মধ্যে প্রথম এই বয়সের কাজে যাঁহারা নামিয়াছিলেন বিরনবাউম তাঁহাদের একজন—একথা বলিতে তাঁহার মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এখন তাঁহার বয়স তেইশ, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুরা দস্তুর ইঞ্জিনীয়ার হইয়া 'প্ল্যানিং ব্যুরো'র কাজে লাগিবেন।

সোভিয়েটে ইঞ্জিনীয়াররাই একমাত্র অভিজাত। কিছু-দিনের মধ্যেই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সহিত একাসনে বসিয়া এই তরুণী কোন্ ফ্যাক্টরির কি আয়তন হইবে এবং কোন্ কয়লা-খনির কাজ কিরূপে পরিচালিত হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বর্তমানে রুষিয়াতে ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপে শতকরা ৫০ জন ছাত্র নারী। ১৯২৭ সনে ছিল শতকরা ২৮ জন। মেডিক্যাল কলেজে নারীছাত্রের বর্তমান সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন, শিক্ষকতা অধ্যয়ন করে শতকরা ৫১ জন, এবং অপরাপর বিভাগে নারীছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪০।

তারপর ভেরা ইন্বার—ইনি একেবারে স্বতন্ত্র জাত। কবিতা লিখিয়া খ্যাতি হইয়াছে, ছোট গল্পও লেখেন। ইনি একটি আত্মজীবনী লিখিয়াছেন—ইন দি প্লেস অব দি সান, In the Place of the Sun—ইতিমধ্যেই ছয় ভাষায় এ বই অনূদিত হইয়াছে। ইঁহাকে পুরুষালি বলা চলে না, বরং একটু রোমান্টিক-ই। পুরাতন যুগের মেয়েই ইঁহাকে বলিতে হয়।

ইচ্ছা করে ইঁহাদের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিতে। বর্তমানে ইঁহাদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিপ্রাপ্ত নারী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এ যুগে সকল দেশে সকল নারীর উপর ইঁহাদের প্রভাব কোন না কোন রকমে কাজ করিতেছে। ইঁহাদের যে সাহস, যে বুদ্ধি, যে বিরাট ও নিষ্কাম আদর্শানুরাগ দেখিয়াছি, তাহার নিকট মাথা নত করিতে ইচ্ছা হয়। আদর্শের জন্য বিগত যুগে যেখানে যেখানে যাহারা যাহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, ইঁহারা তাহাদের সমান।

এ যুগের নারী বলিতে ইহাই বোঝা যায়।

আলোচনা

রামমোহন রায়ের প্রথম বাঙলা পুস্তক

রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বাঙলা পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা, আশা করা যায়, কৌতূহলী পাঠকবর্গের নিকট নিরর্থক হইবে না। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" নির্দেশ করিয়াছেন যে রামমোহন তাঁহার বোধ করি প্রথম বয়সে অর্থাৎ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক প্রথালী" নামে একখানি বাঙলা পুস্তক লেখা করেন।[১] পুস্তকপ্রকাশে পিতাপুত্রে মনোমালিন্য হয় এবং ফলে রামমোহন পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্র মহাশয় সোজাসুজি ভুল করিয়াছেন। পুস্তকটি একেবারেই বাঙ্গলায় রচিত নহে, ইহা আরবীতে ভূমিকার কতকটা ফারসী ভাষায় লিখিত। পুস্তকটির নাম "তুহ্‌ফাৎউল মুওয়াহ্‌হিদীন।" হরপ্রসাদবাবু, রামমোহনের জীবনচরিত সম্বন্ধে যে পুস্তিকায় কয়েক ছত্রে করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে জীবন-চরিতের প্রণেতা উহার যোগবলে বলে পুস্তকরচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, "...যোগবলে বা বহুশ্রমকালে তিনি হিন্দুজাতির পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ও সত্যধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ ও ঐ গ্রন্থোদ্ধারে তাঁহার অতিশ্রমপূর্ণ এক পুস্তক রচনা করিলেন।" কিন্তু লেখক, গ্রন্থটি যে কি ভাষায় রচিত সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"It has been urged by many people that Rammohan Roy in his sixteenth year (1790 A. D.) wrote a book in Bengali prose against 'idolatry of all religions.' True he wrote a pamphlet bearing that name but it was written in Persian with an Arabic preface.[৩]

পরে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এ গ্রন্থটি তাঁহার যোলবৎ বয়ঃক্রমের রচনা নহে। গ্রন্থটির একটি অনুবাদ সংস্কৃত ভাষায় করা হয়, যার ফি-এর কপি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মিরাট হইতে প্রকাশিত হয়।[৪] রামমোহনের অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর কথা যাহা আজ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার যোগের গ্রন্থখানিই সর্ব্বপ্রাচীন এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সম্প্রতি এই পুস্তকের একটি প্রথম সংস্করণ পাওয়া যাওয়ায়, প্রথম পৃষ্ঠাদির সহিত পরিচিত হওয়া গেল। পুস্তকটিকে অনেকেই "যোগের পুস্তক," অথবা কেবল যোগের বলিয়াই জানেন, কিন্তু গ্রন্থটির পূর্ণ নামের জন্য টাইটেল পেজটি উদ্ধৃত করা গেল—

"The / Bengalee Translation / of the / Vedant / or / Resolution / of all the / Veds; / The most celebrated and revered work of / Brahminical, Theology. / Establishing the unity / of The Supreme Being / and / That He is the only obeject of worship. / Together with A Preface. / By the Translator / Calcutta, From the Press of Ferris And Co. / 1815"

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতেই গ্রন্থটি মুদ্রণের তারিখ দেখা যায়, ইহা যাহাতে ভূমিকাদেরও প্রত্যক্ষগোচর তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "১৭৩৭ শকাব্দা কলিকাতা।" ইহা হইতে মনে হয় যে রামমোহন কলিকাতায় অবস্থানকালীন গ্রন্থটি রচনা করেন। ইহার ছাপা মুদ্রণ কাগজে, কাঠের টাইপে, পরিষ্কার ছিমাই ৮। পুস্তকটিতে মোট পত্রসংখ্যা ১৮০ (১১+৮+১৬৯); মূল গ্রন্থটি ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, ইহা কতকটা এপার পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও ছয় পৃষ্ঠা অনুষ্ঠান পত্র মাত্র। গ্রন্থরচনায় উদ্দেশ্য গ্রন্থকারের স্বরচিত ভূমিকা হইতেই জানা যায়—

" তবে অনেকেই কখন পশুপক্ষিকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য করনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন যোধগম্য করা যায় না এমত করনা কেবল অজ্ঞানের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। লোকেতে কেবল শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত বার্ষপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রমাণে এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কদাচারে রত আছেন এ নিমিত্ত অধিকন্তু যোগ শাস্ত্রের মর্ম্ম ভাষাতে এক প্রকার স্বাধারণ প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে ব্যক্তিমাত্রে যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধি বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে অবতারস্থ হইলে সকল ব্রহ্মের এতদ্রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।"[৫]

গ্রন্থমধ্যে কেবল মাত্র এক অথবা দুইটি বাঁড়ি ভিন্ন অন্যথায় নাই। ভূমিকায় গ্রন্থকার, পৌত্তলিক প্রণালীর খণ্ডনে এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের খণ্ডন করিয়া প্রমাণ পাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য হওয়া উচিত। পৌত্তলিক প্রণালীর খণ্ডনে তিনি যে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, সেগুলি একে একে নির্দ্দেশ করিতেছি।—

১। "প্রথমত এই জাহাকে ব্রহ্ম জানহ কর্ত্তা কহ ভিন্ন বাক্য অথবা অযোগ্য হইয়া, তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত যোগ ছল ধ্যান বিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপবান বিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়।"[৬]

২। "দ্বিতীয় বাক্য জন্য এই যে পিতাপিতামহ এবং অন্যেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করা অতি অযোগ্য হয়।"[৭]

---

১ ব্রজেন্দ্র ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সং, ২০৮ পৃঃ।

২ প্রবাসী, মাঘ ১৩৩০।

৩ Hist. Beng Lang & Lit—D. C. Sen, p 959 Ed 1911

৪ Catalogue Rammohan Centenary Exhibition,

৫ যোগ গ্রন্থ ভূমিকা পৃঃ ৫-৩; ১৩১৫ খৃঃ প্রথম সং

৬ Ibid গ্রন্থভূমিকা পৃঃ ৩। ৭ Ibid গ্রন্থ ভূমিকা পৃঃ ৫।

৩। "তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক উন্নতির জ্ঞান এবং দুর্গতি দুর্গতি আর অস্থি ও জলের পুতক জ্ঞান থাকে না অতএব মূঢ়তায় ঈশ্বরের উপাসনা মূঢ় লোকের কিরূপে হইতে পারে।"[১]

৪। "চতুর্থ বাক্য এবম এই যে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধি সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য।"[২]

গ্রন্থকার নিজেই এই গ্রন্থগুলি উপস্থিত করিয়া, পুস্তক লিখা তাহাদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভূমিকার পরিশেষে বলিয়াছেন "ওই সকল গ্রন্থ সর্বলোক গ্রাহ্যে এ নিমিত্ত এসব অযুক্ত গ্রন্থ সকলেরো, উত্তর অবিলম্বিত হইলাও লিখা গেল।" তৎপরে তিনি অন্তিম লিখা (ইতি পর্যন্ত ১৭০৭ তালিকায়) একটি সংস্কৃত বাক্য লিখাইছেন,—

"বেদান্তবিরুদ্ধগ্রন্থস্য তত্ত্বালোচা মনাদরাৎ। কৃপয়া সুজনৈঃ লোকানুগ্রহৈকনিবন্ধনৈঃ।"[৩]

অনুষ্ঠানপত্রে তিনি সর্বপ্রথমে বাঙলা ভাষায় অনুবাদের ভূয়োভূয়ঃ ও বাঙলার সহিত সংস্কৃতের অভিপ্রেত সম্বন্ধের কথা বিবৃত করিয়া পুস্তকের বেদের অনুবাদ (ভাষায়) এবং পুস্তক কে আলোচনার অধিকার আছে কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, অনুষ্ঠানপত্রটি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল।

"ও তৎসৎ। প্রথমত বাঙলা ভাষাতে আবশ্যক দূর ভাষার নির্ণয়ের যোগ্য কেবল বহুকতিপয় শব্দ আছে এতাবা সংস্কৃতের ভেদরূপ অর্থাৎ হয় তাহা অন্যভাষায় কাহে ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসে প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া পদ হইতে অর্থবোধ করিতে হটাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কালুনের তাবদ্ভাষার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব যেসব শাস্ত্রের ভাষায় বিবাদ সামান্য আলাপের ভাষায় তাহা সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে অন্যায়াসের সুগমতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। ঈশ্বরের সংস্কৃতে যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর ঈহাঁরা যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর পুরেন তাঁহাদের আশ্রয়েই ইহাতে অধিকার অস্তিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিপন্ন তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যদ্যপি ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন নামের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে যখন কখন অনেক নাম এবং অনেক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কারার সহিত কারের অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না।"[৪] "আর যাহাদের যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা যুৎপন্ন ব্যক্তির সাহায্যতে অর্থবোধ কিঞ্চিৎকাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বোধের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বহু উত্তম পণ্ডিতেরা এম করিয়াছেন যদি দুই তিন মাস এম করিলে এপারে একপ্রকার অর্থবোধ হইতে পারে তবে অনেক যুগান্ত ভাবিয়া ইহাতে চিত্তনিবেশ করা উচিত হয়।[৫]

"...প্রথমত: একাল পর্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্ণয়ান করিয়াছি এবং অবগত করিয়েছি তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুস্থান যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেরও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ মুক্তির সাধন এবং বাসক মুক্তির সাধন আর যাদু মুক্তির সাধন এবং শিবোহাহঁ প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে তাবত পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।" "আর পূর্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই গ্রন্থকে দেখো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে কখনো বেদান্ত এই ব্রহ্ম সূত্র কি রূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিতেন এবং বাদরি ঋষিপ্রভৃতি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপাসনের প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তখনে শঙ্করাচার্য এবং তাহার টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন বস্তু আচার্য্য গুরু বাদক প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনাকে গৌণ এবং বিগ্রহের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্যন্ত প্রায় সহস্র ২ লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন তবে আমি জানা না জানি যে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করা হয় তবে ইহার উত্তর নাই।"[৬] পুস্তকখানিতে এই পর্যন্ত মোল ভূমিকা ও অনুষ্ঠানের পালা। মূলগ্রন্থটিতে গ্রন্থকার এক একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"সর্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ। ১। সর্বত্র বেদের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কেহ বলেন জীব কিম্বা ব্রহ্মের বিশেষ কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যদ্যপি বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষ ব্রহ্মের সম্ভব হয়। ১। বিবক্ষিত গুণোপপত্তেঃ। ২। যে শ্রুতি সকলের বিশেষ করিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্য সঙ্কল্পাদি বিশেষ বিধানেন এ সকলে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে। ২। অনুপপত্তেস্তুন্নাত্মাং। ৩। শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যে হেতু সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই। ৩।"[৭]

"কামাদীতরত্রতত্রচায়তনাদিভ্যঃ। ২১। বেদে কহিতেছেন যে মুক্ত জীব সকল এইরূপ আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে এবং দুঃখ হইতে রহিত হয়েন এবং যথেচ্ছাচার। তোগাদি করেন অতএব তোগাদিতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয় সৃষ্টি কর্তৃত্বে সাম্য নহে যেহেতু জগৎ করিবার সকল প্রকারে নাই আর জগতের কর্ত্তা হইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই। ২১। মুক্তিফলানিয়মের পূর্বাপরস্থিতি নাই তাহাই স্পষ্ট কহিতেছেন। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তি শব্দাৎ। ২২। বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে সূত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্র সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিধানস্যাধিকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষভাজ্য ব্রহ্ম সূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তং সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।"[৮] রামমোহনের গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় বিবৃত করিতে হইলে তাঁহার লিখিত ভূমিকা ও অনুষ্ঠানপত্রের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক, ইহাতে তাঁহার বাঙলা ভাষার বিশদ পাওয়া যায় কিন্তু মূল গ্রন্থটি হইতে তাঁহার অনুবাদ-রীতি অধিক ভাল এইজন্য তাঁহার ভূমিকা ইত্যাদি হইতেই বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করা হইল, অনুবাদের বিশদরূপে সাধারণ অংশ মূল গ্রন্থটি হইতে সন্নিবেশ করা হইল।[৯] —শ্রীবীরেশ্বরনারায়ণ মিত্র।

১ Ibid গ্রন্থ ভূমিকা পৃঃ ৬। ২ Ibid গ্রন্থ ভূমিকা পৃঃ ৭। ৩ Ibid গ্রন্থ ভূমিকা পৃঃ ১১। ৪ বেদান্তগ্রন্থ (প্রথম সং ১৮১৫ পৃঃ) অনুষ্ঠান পৃঃ ১৫-১৩। ৫ Ibid—অনুষ্ঠান পৃঃ—১৩-১৪।

৬ বেদান্তগ্রন্থ (প্রথম সং ১৮১৫) অনুষ্ঠান পৃঃ—১৩-১৭

৭ Ibid—পৃঃ ১১-১২। ৮ Ibid—পৃঃ ১৮৩।

৯ মিত্র সাহিত্যিক প্রয়াগায়ে সম্প্রতি বেদান্তগ্রন্থের একখানি প্রথম সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থাগারের বাসে এবং মূলগ্রন্থ দেখে, ফলিকাতা, পত্র লিখিয়া বিশেষ বিবরণ জানিতে পারেন।

সম্পাদকীয়

স্যার সি. ভি. রামনের স্বার্থ-বোধ

পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহ স্ব স্ব দেশে বিদেশীদিগকে অর্থ উপার্জন ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিদ্যাশিক্ষার অবারিত সুযোগ দেন না। ইহার মূলে রহিয়াছে আত্মরক্ষার সহজ নীতি বা প্রবৃত্তি। কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতি প্রতিপালিত হয় না বা এই প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায় না।

ভারতবর্ষকে যদি একটি মহাদেশ ধরা যায় তাহা হইলে দেখি, এখানেও বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলি আত্মরক্ষা বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেষ্ট। বাংলাদেশের বাহিরে বাঙালীর সহজ প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের লোকের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বার্থবিষয়ে ভারতবর্ষ যেরূপ উদাসীন—ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ সেইরূপ বা তাহার চেয়ে বেশি উদাসীন।

এই কারণেই বাংলাদেশের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য অবাঙালীর হাতে। ফলে নিজের দেশে বাঙালী অবাঙালীর কাছে হাতজোড় করিয়া কেবল প্রার্থনা করিবার বিদ্যাই শিখিল—সম্পদ অধিকারের গৌরব অর্জন করিল না। এবং যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে তাহার চরিত্রগত শৈথিল্যকে সে উদারতা বলিয়া এতদিন ভুল করিয়া আসিতেছিল এবং মনে করিতেছিল এইখানে সে দাতার পর্য্যায়ে উঠিয়াছে—সম্প্রতি নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক তাহার সে ভুলও ভাঙিয়া দিয়াছেন।

স্যার সি. ভি. রামন বাঙালীর এই উদারতার সুযোগ লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ টাকা মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স নামক তথাকথিত একটি প্রতিষ্ঠান সবান্ধবে বাঙ্গালোরে রেজেষ্টারি করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যন্ত্রাদি কিরূপে অপসারিত হইল এবং এ জন্য দায়ী কে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার বিবৃতি প্রকাশ হওয়া উচিত। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট রামনের এই কার্য্যকলাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সংস্কারসাধনের জন্য সায়েন্স কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকগণ এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতেছেন।

নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন না হইয়া কেবল মাত্র কমিটি দ্বারা আলোচনায় স্থায়ী ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীহট্টের দুরবস্থা

সর্ব্ববিষয়ে গতি-প্রগতিহীন এই দেশে দুর্গতির অন্ত হইল না। বিহারের ভূমিকম্প আজও শেষ হয় নাই, ইহারই মধ্যে ঝড়ে শ্রীহট্টের নিদারুণ ধ্বংসলীলার কাহিনী আসিয়া পৌঁছিল। পুলিস কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে দেখা যায় ৮৬ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৪৪ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। ঘূর্ণীবাত্যা ৬০ মাইল ব্যাস-বিশিষ্ট স্থানের উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ যখন ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়—অতর্কিতে এবং অভাবনীয় রূপে, এবং ইহার মূলে যদি থাকে অন্ধ প্রকৃতি তাহা হইলে মানুষ চিরদিন এমনি অসহায়ই রহিবে। কিন্তু এই অসহায়তার জন্য ক্রন্দন, মৃতের জন্য দুঃখ এবং দুঃস্থের জন্য সমবেদনা প্রকাশ বারংবার করিতে করিতে মন উপস্থিত কর্ত্তব্য বিষয়ে উদাসীন হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সচেতন থাকিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য আন্তর্জাতিক চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। য়ুরোপ হইতে প্রায় ত্রিশজন বিশেষজ্ঞ সিঙ্গাপুরে সমবেত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে লীগ অব নেশান্‌স্‌ হেল্‌থ্‌ ব্যুরোর সেক্রেটারী প্রফেসার সিউকার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দিবেন এবং পরিশেষে মালয়, নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌, ভারতবর্ষ এবং ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডো-চায়নাতে হাতে-কলমে কাজ আরম্ভ করিবেন।

বিশেষজ্ঞগণ ব্যাটাভিয়া, ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডো-চায়না, ফ্রানকি, টোকিও, নিউগিনী, ইণ্ডো-চায়না, ফুপালরাজ্য, সিয়াম,

ফরমোসা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিস্ রুথ ওয়াং নামক একজন মহিলা-প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু বাঙালী কেহ নাই।

বাঙালী পুরুষানুক্রমে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া রোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ হইয়াছে, কিন্তু মশা মারিতে হইলে কি কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে নাই। না পারিলেও ক্ষতি নাই, কেননা মশা মারিবার জন্য আর কিছু না লাগিলেও টাকা লাগিবে এবং তাহার সংখ্যা মশার সংখ্যা হইতে কম হইবে না। কাজেই ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সভায় আলোচনা হইবে, পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টাকার অভাবে মশক-বংশের আয়ু কমিবার কোনো লক্ষণই দেখা যাইবে না।

মহাত্মার উপর আক্রমণ

ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া একদল লোক বর্দ্দিতে মহাত্মা গান্ধীর উপর আক্রমণ করিয়াছিল। খবরের কাগজে ইহাদিগকে সনাতনী গুণ্ডা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোনো বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকিলে, বিরোধ হওয়া অনিবার্য্য। যে বিশ্বাসকে লোকে কল্যাণকর বলিয়া অবলম্বন করে, তাহার বিরোধী কোনো কিছু দেখিলেই যাহারা ভীত হইয়া মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া যায় তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। এই অন্ধতার বিরুদ্ধেই মহাত্মাজীর যুদ্ধ। অন্ধতা যদি না থাকিত, গোঁড়ামি যদি পূর্ব্বেই দূর হইয়া যাইত তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধীর মত মহৎ মানবকে আজ গঠনমূলক কাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উচ্ছেদমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইত না।

আমাদের দেশে কি হিন্দু কি মুসলমান সকল সমাজেই স্তরভেদে গোঁড়ামির একাধিপত্য রহিয়াছে। সুতরাং গোঁড়ামি দূর করিবার কাজেই সকল সমাজের শ্রেষ্ঠমানব-দিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। বিরোধ সংঘাত অনিবার্য্যরূপে দেখা দিবে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাজ করিতে হইবে। সুতরাং একটি মাত্র ঘটনা দেখিয়াই যদি মহাত্মাজীর আক্রমণকারীদিগকে গুণ্ডা বর্ব্বর ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া দিলাম মনে করা যায়, তাহা হইলে মহাত্মাজীকে সাহায্য করা হইবে না। বিরোধের বিরুদ্ধে তীব্রতর উষ্মাপ্রকাশ প্রশংসাযোগ্য নহে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এবার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাণিতত্ত্ব-বিজ্ঞানে ডক্টর অব সায়েন্স (D. Sc.) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন বাঙ্গালী ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করিতে পারেন নাই। শুধু সে কারণেই আমরা আনন্দিত

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দাস।

তাহা নহে। প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রই এ পর্য্যন্ত এ ডিগ্রী লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন কোন একটি সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে ১৯৩০-৩৩ পর্য্যন্ত গবেষণা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ই. এস. গুডরিচ, এফ-আর-এস এবং ম্যন্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার এন. জে. বেরিল ডি-এস-সি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডক্টর শৈলেন্দ্রমোহন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম-এস-সি পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতীয় সার্ভে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের ইনি দ্বিতীয় পুত্র। অধুনা ইঁহারা দেরাদুনের বাসিন্দা। আমরা ডক্টর শৈলেন্দ্রমোহনের উন্নতি কামনা করি।

মুসোলিনির প্রস্তর-মূর্ত্তি

নিম্নের প্রতিকৃতিটি পরফিরি-তে প্রস্তুত মুসোলিনির মস্তকের। প্রোফেসর শিল্পী ওরলান্ডিনি, প্রোফেসার গ্রাংসিরোদি কৃত পরিকল্পনা হইতে ইহা খোদিত করিয়াছেন। 'পরফিরি' অত্যন্ত কঠিন পাথর। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে-

মুসোলিনির প্রস্তর-মূর্ত্তি।

সাঁসের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল। সুপণ্ডিত লেসারির মতে তৎকালীন ভাস্করদের পক্ষে 'পরফিরি' প্রস্তরের সাহায্যে মূর্ত্তিগঠন খুব সহজসাধ্য ছিল না। তৎপরে পরফিরির প্রচলন থামিয়া যায়। দীর্ঘ তিন শতাব্দীর পর এই প্রতিকৃতিটি পরফিরিতে প্রস্তুত শিল্পের প্রথম নিদর্শন। মুসোলিনির বহু প্রস্তর মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে—এই মূর্ত্তিটি তাহাদের সকলগুলিকে হার মানাইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ইহার গঠন-কার্য্য এত সুন্দর হইয়াছে যে, ইহা রোমের সুপ্রাচীন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বাষ্ট'-গুলির সহিত একাসন পাইবার যোগ্য।

মনে হয়, পরফিরি ব্যতীত অপর কোনও প্রস্তরে মুসোলিনির সাদৃশ্য আনা কঠিন হইত। তবু বলিব, জীবনে তিনি যে কাঠিন্যের সাধনা করিয়া গেলেন, কঠিনতম প্রস্তরে তাহার কতটুকুই বা ধরা পড়িবে?

কৃতী বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্কলারশিপ লইয়া ইংলণ্ড যান। বিদেশ হইতে ষ্ট্রাক্চারাল, মেকানিকাল, সানিটারি ও মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। ইংলণ্ডে ১৯৩৩ সনের ইঞ্জিনিয়ারদিগের কংগ্রেসে প্রধান বক্তাকে কয়েকটি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিপদে ফেলিয়াছিলেন। বক্তা মিঃ হিগাউড তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর তরায় দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

হরিহরবাবু পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বর্ত্তমানে হরিহরবাবু মজঃফরপুরে আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত আছেন। বাঙ্গালীর কৃতিত্বের মূল্য বড় চাকুরী। বিদেশে বিদ্বজ্জন সমাজে স্বকীয় প্রতিভা ও মৌলিক গবেষণার শক্তিতে যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়া আসেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া অর্থার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে জীবন কাটাইয়া দেন! শুনিয়াছি পি. কে. রায় মহাশয় ইংলণ্ডে লর্ড হ্যালডেনের সহপাঠী

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিলেন এবং পরীক্ষায় রায় মহাশয় প্রথম ও হ্যালডেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বর্ত্তমানে হ্যালডেন জগৎ-

প্রসিদ্ধ, রায় মহাশয়ের খ্যাতি তাঁহার অনকয়েক ছাত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরাধীন দেশে কৃতিত্বের মূল্য এই!

হরিহরবাবুকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া বড় দুঃখেই এই কথা মনে পড়িল।

পোয়ে নৃত্য

অল্প দিনের মধ্যে নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে বাংলা দেশ মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে।—সামাজিক অনুষ্ঠানে ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনো স্বীকৃত হয় নাই, এবং যদিও শ্রেণীবিশেষের কাছে ইহা বিশুদ্ধ শিল্প হিসাবে আদরণীয় হইয়াছে—সমাজের বৃহত্তর অংশ নৃত্যের উপর এখনো খড়্গ-হস্ত হইয়াই আছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাংলাদেশের যে লুপ্ত নৃত্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন তাহা রসবোধের দিক দিয়া না হইলেও শরীরচর্চ্চার দিক দিয়া মূল্যবান। কিন্তু যে দিক দিয়াই হউক ইহা নৃত্য, এবং উদ্ধার যখন করা হইয়াছে তখন ইহা টিকিবে বলিয়া আশা করা যায়। বাংলাদেশে বা বাংলা-দেশের বাহিরে যে সব নৃত্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেমন চলিতেছে—বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যরীতি দেখিবার ইচ্ছাও তেমনি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নৃত্য দেখিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারা অল্পদিন হইল কলিকাতা শহরে ব্রহ্মদেশীয় পোয়ে নামক লোক-নৃত্যটি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া অনেকে অনেক রকম মামুলি সমালোচনাও করিয়াছেন। আমরা বাংলা দেশের শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের অভিমতটি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নৃত্যোৎসবে গিয়ে যা দেখলেম, তাতে মনের মধ্যে ভারি বিস্ময় জাগলো। নাচের কসরতে এই সব বালিকা অনেক চলে এমন আশঙ্কা পুঁথি লাভ করেছেন যে, যা দেখলে বিশ্বাসই করতেম না যে মেয়েকে এতখানি বাঁধনমুক্ত করা যায় নৃত্যশিল্পের কৌশলের জন্যে।

শীত নৃত্য এবং ঝড়—এই দুইয়ের লয়-বিলয়ের ছন্দ কেমন ক'রে এক একটি নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর দেহের ভঙ্গীতে আবর্তনে প্রসারণে আকোচনে লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে সেটা এদের নৃত্যকৌশল না দেখলে ধারণা করা যায় না, ছবি কিংবা মূর্ত্তি থেকে। ইরাবতী নদীতীরবাসিনী এরা, বলয় হাওয়ার প্রজাপতি এরা, চঞ্চল ভ্রমর মধুর মধুপী এরা—এদের নৃত্য অনায়াস পাখনিয়া দিয়ে মুখর—এক সঙ্গে এরা যেন ফুলের গাছ—ফুলকের ফুল-ফুল···এ যেন কোনো বিচিত্র লাস-জগতের দীপবর্ত্তিকা—এদিক বাতাসের-সঙ্গে ঘুরে এসে—অন্ধকারকে চমক দিয়ে পালালো।

সাঁতার

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। খণ্ড খণ্ড জিনিসকে একটি নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহার আপাতপার্থক্যকে ঘুচাইয়া দেওয়াই বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু তবু এই বিজ্ঞানেরই আর একটা দিক আছে। বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা মানুষের মনকে বিপরীত পথেও চালনা করিয়া থাকে। অখণ্ড জিনিস তখন খণ্ডিত হইতে থাকে। এই দুই ব্যাপারেরই চরমতম অবস্থা অবশ্য অভিন্ন। অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর পরমাণুবিন্দু মূলত একই।

তাই দেখি মানুষের জীবন নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। এক এক দল এক একটা খোপে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। একদল আকাশে উড়িতেছে, এক দল সমুদ্রের নীচে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, একদল ক্রীড়াজগতে বাস করিতেছে, একদল পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে, এক দল নৃত্য করিতেছে। সম্প্রতি এক দল জলে ভাসিয়া থাকিবার জন্য সাধনা করিতেছে।

এই *শেষোক্ত* কাজে শক্তির পরিচয় এবং সাহস আছে, এবং ভারতবাসীর পক্ষে ইহা সেই জন্যই গৌরবের। ভয় হয় এই শক্তি এবং সাহসের সঙ্গে উন্মাদনা আসিয়া যুক্ত না হয়। প্রতিযোগিতা যদি স্বাভাবিক হয় তাহা হইলেই তাহাতে উপকার, কিন্তু অন্যান্য জিনিসের মত ইহারও মাত্রা সহজেই বেশি হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা নাম্নী অষ্টমবর্ষীয়া একটি বালিকাকে দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণে নামানো হইয়াছে। মেয়েদের মধ্যে শরীরচর্চ্চার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মুক্ত হাতপায়ে অথবা বন্ধনমুক্ত অবস্থায় কোনো মেয়ের সাঁতার কাটিয়া প্রশংসা পাইবার মধ্যে কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। যে কোনো প্রকার দুঃসাহসিক অথবা দুঃসাধ্য খেলাধূলা পুরুষের জন্যই থাকুক। বাহ্যগঠন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যের কোনো কাজ হইতে মেয়েরা যত দূরে থাকে ততই ভাল।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

স্যার সি. ভি. রামনের পরে ডাঃ মেঘনাদ সাহা নিযুক্ত হইবেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে বাঙালা মাত্রেরই আনন্দের বিষয়। রামনের মত বাঙালী-

বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পান বলিয়াই বাঙালী বৈজ্ঞানিককে বাংলার বাহিরে যাইতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী ও হরিজন আন্দোলন

বহুদিনের প্রাচীন সংস্কার—আবেদন-নিবেদন এবং সভা-সমিতি দ্বারা দূর হইতে পারে বলিয়া আমাদের কোনও বিশ্বাস নাই। কিন্তু তথাপি মহাত্মা গান্ধী যখন অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দূর করিবার জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন তখন তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া কিংবা সমালোচনা করিয়াও কোনো লাভ হইবে না। কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, এখানে হরিজন আন্দোলনের কোনো সার্থকতা নাই। বাংলাদেশে জাতিবিভাগ অনুসারে স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা একদিন খুবই প্রবল ছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কতকটা বা শিক্ষার প্রভাবে কতকটা বা কঠোর জীবনসংগ্রামের ফলে অস্পৃশ্যতা দ্রুত লোপ পাইয়া যাইতেছে। মানুষের মন যখন স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতার বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কোনো ব্রাহ্মণের কাছে কেহ নমঃশূদ্র নামেই আসুক, বা হরিজন নামেই আসুক ব্রাহ্মণ তাহার হাতে জল খাইবে। কিন্তু যাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হয় নাই অথবা যে 'সনাতন' নীতিকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে তাহার কাছে অস্পৃশ্য অস্পৃশ্যই থাকিবে। অস্পৃশ্যকে হরিজন নামে ডাকিলেও কোনও ফল হইবে না। কারণ তখন হরিজনশ্রেণীর লোকেরাই অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে। স্পৃশ্য করিবার জন্য হয়ত আর একটা নাম খুঁজিতে হইবে।

নমঃশূদ্র নমঃশূদ্র নামেই যদি ব্রাহ্মণের স্পৃশ্য হয় তবেই অস্পৃশ্যতা দূর হইবার সার্থকতা থাকে। বাংলাদেশ হইতে অস্পৃশ্যতা যেমন স্বভাবতই লোপ পাইতেছে, জাতিভেদও তেমনি লোপ পাইবে, যদি সত্যই জাতিভেদের মধ্যে কোনো সত্য বা সার্থকতা না থাকে।

লোকের সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান

গত যুগের সংস্কৃত সাহিত্যসেবীগণের অগ্রগণ্য স্বর্গীয় স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত পুণার ভাণ্ডারকর ইন্‌স্টিটিউট্ নামক গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বহু বর্ষ যাবৎ সংস্কৃত মহাভারতের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সম্পাদিত করিবার ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি এই সংস্করণের আদিপর্ব্ব পুণার ডক্টর বিষ্ণু সুখথঙ্কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় বৃহদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই একটি পর্ব্ব নিখুঁত করিয়া সম্পাদন করিতে ছয় বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পাঠ মিলাইবার জন্য পঞ্চাশ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিরাট কাজ দুই একজনের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ বলিয়া সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্ব্বের সম্পাদন-ভার দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণের উপরন্যস্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাবের ডক্টর সুখ্‌ঠীর ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্ যথাক্রমে বিরাট ও সভাপর্ব্ব সম্পাদন করিবেন। এরূপ উদ্যম আমাদের দেশে এই প্রথম এবং ইহাকে জাতীয় অনুষ্ঠান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে বাঙ্গালা দেশ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়কে উদ্যোগপর্ব্ব সম্পাদন করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান আহ্বান করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ডক্টর দেকে আপাততঃ এক বৎসরের ছুটি দিয়াছেন। তিনি আগামী জুলাই মাসে পুণা রওয়ানা হইয়া এই বহুসম্মানিত কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আশা করি, এই আয়াস-সাধ্য কার্য্য সমাক সম্পাদন করিয়া ডক্টর দে বাঙ্গালাদেশের গৌরব রক্ষা করিবেন।

এ যুগের নারী

বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্তঃপুর বিভাগে শ্রীযুক্ত মাণিক গুপ্ত মহাশয় এ যুগের নারী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে যুগে যুগে পুরুষ কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের এমন একটা ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সন্দেহ হয়, মাণিক গুপ্ত কোনও নারীরই হয়তো ছদ্মনাম। আশার কথা এই যে, অতীত সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণাই থাকুক বর্ত্তমান সম্বন্ধে তিনি হতাশ নন এবং নারীর পক্ষে খুব সুখকর ভবিষ্যৎ তিনি কল্পনা করিয়া থাকেন। উচ্ছ্বাস বাদ দিয়াও তাঁহার বক্তব্য সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা পারি নাই—তথাপি নারী-প্রগতিবাদীদের এক শ্রেণীর মনের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। অন্য কথাও আছে।

এডুকেশন-গেজেট

গত কিছুকাল যাবৎ প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া উহাই ভাবিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান যুগ-প্রগতির ধাক্কায় ভাটমন্দ অনেক পুরাতন কীর্ত্তির মত 'এডুকেশন গেজেট'ও বিলুপ্ত হইতে চলিল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও তাহার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্যা সুযোগ্যা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যা হইতে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার সম্পাদনায় 'এডুকেশন গেজেট' পূর্ব্বগৌরব লাভ করিবে।

মুসলিম সাহিত্যসমাজ

'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' কোথায় প্রতিষ্ঠিত বলিতে পারি না। মুসলিম সাহিত্যসমাজের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (ছাপা) একখণ্ড আমাদের নিকট প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছে। অভিভাষণ ঢাকা ইসলামিক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ওসমান গণির স্বাক্ষরযুক্ত। উপাধিপত্রে মনে হয় তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। ইসলাম ধর্ম্মের তরফ হইতে তাঁহার বক্তব্য ভালই বলিতে হইবে এবং সাহিত্য রচনা করিতে হইলে রচনাকারের চরিত্র পবিত্র ও উন্নত করিতে হইবে একথাতেও আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে মৌলবী ও আলেমগণের গোঁড়ামীর ওকালতীর অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মুসলমান ধর্ম্মকে তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকিবেন, মুসলমান সাহিত্যের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্কের পরিচয় আমরা পাই নাই। সব চাইতে কৌতুককর কথা এই যে,—

"বাস্তবিক পক্ষে বাংলার মুসলমান বাংলার আরেবদিগের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। এ প্রদেশে মুসলমান শাসন অবসানের পর পাশ্চাত্যের ও রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষাদের ফলে হইতে বাংলার মুসলিম-আত্মা এই আরবদলাই রক্ষা করিয়াছিলেন।"

সম্ভবতঃ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সাহিত্য শব্দটি ছাপার ভুল।

খ্রীষ্টানী বাংলা

বাংলা গদ্যের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে, বাংলা গদ্যের প্রাদুর্ভাব-যুগে খ্রীষ্টান পাদরীরাই উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। পাদ্রী মানোএল-দা-আসসুম্পসাম এবং দোম আন্তনিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ; হ্যালহেড, কেরী, মার্সমান প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন বাঙ্গালী তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। যে শিশুর সূতিকাগারে উঁহারা ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন সে আজ বড় হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খ্রীষ্টানী বাংলা সেই আঁতুড়ের অন্ধকার কোণেই রহিয়া গিয়াছে। এই একশো দেড়শো বৎসরে সাধারণ বাংলা ভাষার রূপ এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, সেদিনকার বাংলা ছাপা বই চোখে দেখিলেও আমরা ভয় পাই। দুই একজন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছাড়া সেদিনকার ভাষা কেহ বুঝিতেই পারে না।

মজার কথা এই যে, খ্রীষ্টের মহান্ আদর্শ প্রচারের ব্রত লইয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই আদর্শ প্রচারে সহায় হইবে বলিয়া বিদেশী বাংলা ভাষা শিখিয়া যাঁহারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই প্রাচীন যুগের দুর্ব্বোধ্য ভাষাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন। যে ভাষা কেহ বুঝিতে পারে না সে ভাষায় আর যাহাই চলুক প্রচারকার্য্য যে চলে না এই সহজ সত্যটা বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টান পাদরীরা কেন বুঝিতেছেন না বলিতে পারি না। আমাদের একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা যদি বাংলা গদ্যের উন্নতির সহিত তাল রাখিয়া নিজেদের প্রচার-কার্য্য চালাইতেন তাহা হইলে বাংলা গদ্য এতদিনে অধিকতর সমৃদ্ধ হইত।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'প্রথম কাতেখিসম' নামক পুস্তিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রশ্ন করিতেছি যে এই ধরণের বাংলা বর্ত্তমানে আমাদের হাস্যোদ্রেক করা ছাড়া যে আর কিছুই করিতে পারে না ইহা প্রচারকারীরা কেন বুঝিতেছেন না।

প্রণাম যাইবা, কৃপাপূর্ণা, প্রভু যেমন সহিত আছেন। নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং ধন্য যোষণ গর্ভফল যেশু···পবিত্র কাথোলিক মণ্ডলী, বার্ষিক লোকদের সহজবিধি.

সাপের জন্য,
রাজের পুরস্কার,
অন্ধ জীবন বিসর্জন করি। আমেন।

...আমরা বলা বাহুল্য মাইকেলকে বিশেষ খরাপদন হাঁদ বলে তাঁহার আদিপাপ হয় নাই।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাইবেলের এখন পর্যন্ত সহজবোধ্য সরল অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয় নাই।

এই যেসব পুরাতন বাংলা। নূতন বাংলাও বর্তমানের খ্রীষ্টান লেখকদের হাতে যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহাও ভয়ঙ্কর। শ্রীসুরেশচন্দ্র পুরিয়ত প্রণীত ঐতিহাসিক তথ্য নামক পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

[illegible] ইংরাজ ইস্টিকীর্তা, অথবাদ্ধার কেন্দ্র একটি বক্তিয়ারে সমাট মহাশয়ে বন্ধুকের বাণিজ্য দিকার প্রমাণ করেন। ...তাঁহাদের দল কর্তৃকগণে নির্দিষ্টের- [illegible] হইল... অনুসন্ধান অবিলম্বে পর্তুগিজদের ভূমিভাগ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল...

সুখের বিষয়, কলিকাতার ক্যাথলিক চার্চের ফাদার দনাতন এবিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তিনি মাতৃভূমি বেলজিয়ম ত্যাগ করিয়া গত ১৩ বৎসর কাল বাংলাদেশে বাস করিয়া বাংলা ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত কথা বলিয়া বিশ্বিত হইতে হয়। তিনি সহজবোধ্য আধুনিক বাংলায় গ্রন্থরচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ৩নং বর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় ক্যাথলিক সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া 'ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষার প্রশ্নোত্তর মালা' প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, বাইবেলের অনুবাদও এই সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে।

ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স

১৮৩৩ সনে বাংলা সরকার এদেশে জীবনবীমার সুবিধা-প্রচারার্থে একটি সরকারী বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহা সমর্থন করেন নাই। অতঃপর ১৮৭৪ সনে লর্ড আলবার্টের নির্দেশে গ্রেটার লণ্ডনে 'ওরিয়েন্টাল'এর প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ওরিয়েন্টাল অর্থনীতিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানের ভারতবর্ষের সাহায্যের প্রমাণ দিয়া আসিতেছে। গত ২২শে বৈশাখ, ওরিয়েন্টালের হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ একটি সুদৃশ্য সুবর্ণ-জয়ন্তী পুস্তিকায় 'ওরিয়েন্টাল'এর এতদিনকার কাজের একটি মনোজ্ঞ সারাংশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই পুস্তিকাতে 'লোই মাগাজিন' হইতে ১৯৩০ সনে নূতন বাংলা দেশে যে সব কোম্পানী সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তালিকায় পৃথিবীর বীমা প্রতিষ্ঠানের হিসাব আছে। এই তালিকায় ওরিয়েন্টাল-এর নাম নাই। বাইশটি নামের মধ্যে আর কোনও ভারতীয় কোম্পানীর নাম নাই। ওরিয়েন্টাল-এ এখন ৫২০০ এজেন্ট ও ৩৪০০ ডাক্তার আছেন। ইহা ছাড়া হেড অফিস, শাখা অফিস, চীফ এজেন্সি অফিসে মিলিয়া ১১২৩ জন কর্মচারী আছেন। ওরিয়েন্টাল-এর বৈধিক ভারতীয় গ্রাহকের চিঠির সংখ্যা ৮০০০। সকল দিক দিয়া ওরিয়েন্টালের সুদৃঢ় ভারতবাসী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা ইচ্ছা করিয়াই এখানে কোম্পানীর কাজকর্মের কোন হিসাব দিলাম না। যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

গত বিহার ভূমিকম্পে ওরিয়েন্টাল ১০০০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। ভারতবাসী হিসাবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে গৌরবান্বিত বোধ করি।

স্যার শঙ্করণ নায়ার

গত ১২ই বৈশাখ ৭৭ বৎসর বয়সে স্যার শঙ্করণ নায়ারের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৫৭ সনে ১১ই জুলাই তাঁহার জন্ম। ১৮৮০ সনে মাদ্রাজ হাইকোর্টে তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। কিছুদিন অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কাজ করিয়া ১৯০৮ সনে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অভিযোগ লাভ করেন। ১৮৯৭ সনে অমরাবতীর কংগ্রেস অধিবেশনের তিনি সভাপতি ছিলেন। বহু বৎসর মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৫-১৯ সনে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। সেক্রেটারি অব ষ্টেটের কাউন্সিল এবং কাউন্সিল অব ষ্টেটেও প্রবেশ লাভ করেন। সাইমন কমিশনের সহিত তিনি কাজ করিয়াছিলেন। 'গান্ধী ও অনার্কি' পুস্তকের জন্য মাইকেল ও' ডায়ারের আনীত তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ও'ডায়ার-শাসনে পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইলে এবং আসামীদিগকে যাবজ্জীবন নির্যোগের অধিকারে বঞ্চিত করা হইলে, শঙ্করণ নায়ার প্রতিবাদার্থে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

কর্মী লোক ভারতের মাটিতে বিরল নহে। ভাবদিলাসের আবহাওয়ায় কর্মজীবনে আমাদের অকালমৃত্যু ঘটে। এই আবহাওয়ায় বঞ্চিত হইয়া শেষ জীবন অবধি কর্মে অটুট শ্রদ্ধা যাঁহাদের থাকে তাঁহারা নমস্য।

স্যার শঙ্করণ এই শ্রেণীর কর্মী ছিলেন।

প্রমথনাথ বসু

গত ১৫ই বৈশাখ রাঁচীতে প্রমথনাথ বসু ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কৃতিত্বের পুরস্কার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেন নাই। উপরন্তু তাঁহার অবসরের ইউরোপীয় কর্মচারীকে তাঁহার উপরের পদে নিযুক্ত করাতে তিনি যথাসময়ের পূর্বেই কাজ হইতে পেনসন গ্রহণ করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পরমহিষানী পার্বত্য প্রদেশে লৌহখনি আবিষ্কারহেতু ভূতত্ত্বে প্রমথনাথ চির-স্মরণীয় থাকিবেন। জেমশেদপুরস্থ টাটা-কারখানার সূচনাও তাঁহারই আবিষ্কারহেতু সম্ভব হইয়াছিল।

প্রমথনাথ বসু গত যুগের বাঙ্গালী। বর্তমান কালে তাঁহার সমান আসন পাইবার লোক বাংলাদেশে ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে।

[শিল্পী—এম. বি. ধোলাবতী (আলোয়)]

রঙ্গশালা

১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড— ৬ষ্ঠ সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[আষাঢ়—১৩৩১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাংলা সাহিত্যে ভাষা-বিভ্রাট	শ্রীসত্যসুন্দর দাস	
ভাষার ছায়া	শ্রীউমেশ ঘোষ	৭২৩
বুদ্ধ-কথা	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন	
বিচিত্র জগৎ (সচিত্র)	শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
রামধন বসু ও রাজা রামমোহন রায়	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
একটি সন্ধ্যা (বড় গল্প)	শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রাথমিক শিক্ষায় আদর্শ বিদ্যালয়	শ্রীঅনাথনাথ বসু	
বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা (সচিত্র)	শ্রীশচন্দ্র রায়	
নবনা (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	
চতুষ্পাঠী (সচিত্র)	শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	
বাঙ্গালার কথা	নিখিলনাথ রায়	
পদ্মা (উপন্যাস)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	
আলোচনা		
মা (অনুবাদ-উপন্যাস)	প্রাংশুলা ভেলেভা, শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৭৪২
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস	শ্রীসুকুমার সেন	৭৪৮
বিজ্ঞান-জগৎ (সচিত্র)	শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮০৫
নীলদীঘি (গল্প)	শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৮১২
প্রদর্শনী (সচিত্র)		৮২০
অন্ধকূপ		৮২৩
জামাইষষ্ঠী (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৮৩১
পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়		৮৩৬
সম্পাদকীয়		৮৩৯

উসের চা ভারতের গৌরব

ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ. উস এণ্ড সন্স

টি-মার্চ্চেণ্টস্—১১।১ হ্যারিসন রোড

:—২, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট ১৫৩।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট

৮।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর

এম-এ, পি-এচ-ডি সম্পাদিত।

কয়েকখানি প্রকাশিত পুস্তক

ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য—(ইংরেজী ও সংস্কৃত উপক্রমণিকা ও নয়টী ভাষ্যে সম্পূর্ণ) মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত। মূল্য—১৫৲ টাকা

নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ—(ইংরেজী উপক্রমণিকা অন্বয় ইত্যাদি সহ) শ্রীমনমোহন ঘোষ, এম এ সম্পাদিত। মূল্য—৩৲ টাকা

কৌলজ্ঞাননির্ণয়—(ইংরেজী সহ) ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট সম্পাদিত মূল্য—৯ টাকা।

মাতৃকাভেদ তন্ত্র—(ইংরেজী ও সংস্কৃত উপক্রমণিকা, টীকা সহ) শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। মূল্য—২ টাকা।

কাব্যপ্রকাশ, সপ্তপদার্থী, বেদান্তসিদ্ধান্ত, শুক্লিনপুরী, বাল্মীকির রামায়ণ, সামবেদ, গোভিলের গৃহ্যসূত্র, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, ন্যায়দর্শন, ন্যায়মত অদ্বৈতসিদ্ধি, অধ্যাত্ম রামায়ণ, দেবমূর্ত্তি প্রকরণ, বোধসিদ্ধি, অদ্বৈত-দীপিকা, সর্ব্বদর্শনসমুচ্চয়, ভাকার্ণব ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যগ্রন্থসমূহ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

বিবাহে—

ফোন—কলিকাতা ৫৯১

প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন -

আধুনিক জহরতের অলঙ্কার

গঠনশিল্পের চাতুর্য্য ও মিতব্যয়িতাই

—— আমাদের বিশেষত্ব ——

—ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্ট এণ্ড জুয়েলার—

বিনোদবিহারী দত্ত

মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস্

একমাত্র ঠিকানা—১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৫১

বাংলা সাহিত্যে ভাষাবিভ্রাট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

সবুজপত্রের যুগে, অর্থাৎ বলাকার কবিতাগুলি ও নূতন গল্পগুলি লিখিবার কালে ভাষার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন যেদিকেই ঝুঁকিয়া থাকুক, তাঁহার কবিচিত্ত বা অন্তরের বাণী-প্রেরণা সাধুভাষাকেই বরণ করিয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। সত্য বটে, তাহার পরে তাঁহার পদ্য ও বিশেষ করিয়া গদ্যরচনায় তাঁহা উত্তরোত্তর নূতনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—তাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-খুসীর স্বাধীনতা আমরা মানিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে করি। মানুষের যেমন, তেমনি কবিরও জীবনে একটা শেষ বা পরিণাম আছে—দেহে যৌবনের মত মানস-জীবনেও প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্তির একটা কাল আছে, তারপর জরার আক্রমণ অনিবার্য্য। সকল কবির জীবনেই প্রতিভার পূর্ণোদয়ের শেষে অস্তকাল উপস্থিত হয়, রবীন্দ্র-প্রতিভাও সে নিয়মের বহির্ভূত নয়। বলাকার আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার শেষ দীপ্তি দেখিয়াছি, তারপর হইতে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে আর্টিষ্টের মনস্বিতার পরিচয় আছে; যিনি আজন্ম বাণীর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহার চিরাভ্যস্ত লিপি-কুশলতা নানা ভঙ্গিমায় নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে; কিন্তু ভঙ্গীই তাহার প্রাণ, মানস-বিলাসের কারু-কলাই তাহার প্রধান উপজীব্য। তাহাতে স্রষ্টার আত্মোৎসর্গ নাই, শিল্পীর আত্ম-সচেতন বিলাস-লীলা আছে। স্রষ্টা ও কবি প্রকৃতির নিয়মে জরাগ্রস্ত হইলেও শিল্পীহিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানস-পিপাসা এখনও মরে নাই। এই অবস্থা ক্রমেই আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সত্তর বৎসর পার হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানস-চেতনা যে এখনও জাগ্রত আছে, ইহাই বিস্ময়কর; এতকাল ধরিয়া মনের এই সজীবতা একালে আমাদের দেশে অতিশয় বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-প্রতিভা হারাইয়াছেন (এ বয়সে তাহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে), তিনি বাণীর নিগূঢ় রহস্য—ভাব ও রূপের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, সৃষ্টি ও সৃষ্টির অন্তর-তত্ত্ব—কবিচিত্তের সেই পরম উপলব্ধিকে উপেক্ষা করিয়া এক্ষণে বাণীকে কেবল কেলিকলার সহচরীরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিভা যাহাদের নাই, দিব্য প্রেরণার অবস্থায় বাণীর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রসন্নমূর্ত্তি যাহাদের সম্মুখে কখনও আবির্ভূত হইবে না, খাঁটি বাংলা বুলি যাহারা বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকরূপে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার নামে একটা ভাষা—যাহা ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক কোনও হিসাবেই গ্রাহ্য নহে—তাহার জয় ঘোষণা করিতেছেন। স্রষ্টার উচ্চ আসন হইতে নিপতিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ মতবাদের লড়াইয়ে যোগ দিয়াছেন—ভাষাকে ছাড়িয়া ভাষার ভঙ্গিমাকে লইয়া মত্ত হইয়াছেন।

* * * *

১৩৩৮ সালে পরিচয় নামক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকাখানিকে সবুজপত্রের সাক্ষাৎ বংশধর বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, ইহাও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, এই পত্রিকার সাহিত্যিক আদর্শ ও ভাষার ভঙ্গী নিঃসংশয় রূপে প্রমাণ করিয়াছে—সবুজপত্রের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কতখানি হিতকর, সেই মতবাদ ও সেই আদর্শ বাংলাকে কোন্ পথে চালিত করিতে পারে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

> সবুজপত্র বাংলাভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল।.....এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু সে ছিল বিদূষকের রাস্তায় অন্দরমহলে।.....একথা যেমনি একে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সবুজ তার আসন চিরিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই: মোট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

এই উক্তির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য, যথা—'(চলতি ভাষার) সহজ প্রাণশক্তির জোরেই', 'ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন,' ইত্যাদি।

প্রথম দুইটি কথা একত্রে লওয়া যাক। খাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চলতি ভাষার সহজ প্রাণশক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন? ইহার দখল ঠেকাইয়া তো কেহ রাখে নাই! যে চলতি ভাষা লোকসাহিত্য এবং গ্রাম্য গীতিকাব্যে অষ্টাদশ শতকের রামপ্রসাদ হইতে ঊনবিংশ শতকের টপ্পা কবি পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার সহজ প্রাণশক্তি বাঙ্গালী তো অস্বীকার করে নাই! কিন্তু সেই সহজ প্রাণশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নব্য বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—শান্তরাজের ছড়া সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই উপভোগ করিতেন, নব্য সমাজের তাহা রুচিকর হয় নাই। এই সহজ প্রাণশক্তি মৌখিক ভাষা মাত্রেরই আছে; জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনমূলক ভাব ও অর্থ বহন করিবার যে ভাষা, তাহার প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই ভাষায় রচনা করিবার প্রবৃত্তি কোনও সাহিত্যিক বাঙ্গালীর কখনও হয় নাই; কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের মত বাঙ্গালীও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। সত্য বটে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গদ্য নহে, পদ্য; কিন্তু ভাষার বিচারে পদ্যসাহিত্যও এই আলোচনার বিষয়ীভূত; কারণ, কথাটা উঠিয়াছে ভাষার সাধুরীতি লইয়া; এবং যে কারণে পদ্যসাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রসার ঘটে নাই, পরবর্তী যুগে গদ্য ভাষার রীতিও সেই কারণেই স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। এখন কথা হইতেছে, এই 'প্রাণের জোর' কি কেবল পণ্ডিতগণের অত্যাচারেই সাহিত্যে আপনাকে জাহির করিতে পারে নাই? গত যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ—যিনি সাধুভাষাকেই আশ্রয় করিয়া নিজের কবিপ্রতিভাকে সার্থক করিয়াছেন—বাংলা গদ্যের সেই অন্যতম উৎকর্ষ-বিধাতা রবীন্দ্রনাথ আজ এতকাল পরে সাধু-ভাষার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন? বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া গত যুগের বাংলা সাহিত্যের সেই পুনরুজ্জীবন কাহিনী—কেমন করিয়া দৈবীপ্রতিভাশালী লেখকগণ ভাষার এক মহা সমস্যার সমাধান করিয়া বাঙ্গালীকে চিরদিনের জন্য একটি উন্নত ও উৎকৃষ্ট আদর্শে দীক্ষিত করিয়া এ জাতির সাহিত্যিক জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন—সেই কথা এবং সেই সঙ্গে নিজের কীর্তিকেও বিস্মৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আজ এই ভাষাবিভ্রাট ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? যে সত্য এত সহজ, যে তথ্য এতই সুস্পষ্ট, তাহাকে অস্বীকার করিবার অথবা তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার এই প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী সাহিত্য-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হইল কেমন করিয়া?

• • • •

ভাষা ও সাহিত্যের পরস্পর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—কেবল ইহা বলিলেই সবটা বলা হয় না, সে সম্বন্ধ যে কত নিগূঢ় তাহা সাধারণ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ভাষা আগে না চিন্তা-শক্তি আগে, মনোবিজ্ঞানের এই সমস্যা অপেক্ষা ভাব ও ভাষার অন্যোন্যনির্ভরতার রহস্য আরও দুরবগাহ। কবিকে আপন ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়; যাঁহার ভাষায় সেই সৃষ্টিলক্ষণ থাকে না তিনি কবিহিসাবেও স্রষ্টা নহেন। সাহিত্যের ইতিহাসে দুই চারি জন এমন প্রতিভাশালী কবি-লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা যেন যাদুশক্তির বলে ভাষাকে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বিকলাঙ্গ অবস্থা হইতে সহসা একটা বড় ধাপে তুলিয়া দিয়াছেন। তৎপূর্বে ভাষার যে অসংস্কৃত রূপ ছিল, এই সকল লেখক তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তিকে, ভাষার নিজস্ব প্রাণপ্রবৃত্তিকেই, প্রতিভাবলে ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া দেন। বাংলা সাহিত্যের আদি হইতে আজ পর্যন্ত সেই রূপই ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে, সর্বকালের কবি-সাহিত্যিক ভাষার যে রূপটিকে ধরিয়া আছেন তাহা প্রাকৃত বা কথারীতি নহে—ইহার কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বাঙ্গালী জাতির জীবন চিরদিনই গ্রাম্য, তাহার সহজ কৃষ্টি বা সংস্কৃতি—খুব বৃহৎ বিশাল গভীর বা উচ্চ ভাবকর্মের অনুকূল নহে; তাই তাহার ভাষাও মৎস্য-জীবীর ভাষা অপেক্ষা উন্নত বা সমৃদ্ধ হইবার অপেক্ষা রাখে না, যেখানে জীবনের সঙ্গে ভাষার যোগ, সেখানে বাঙ্গালীর ভাষা একটা অতিশয় সংকীর্ণ ভাব-গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কৃতার্থ করিয়াছে, ডাক বা খনার বচনের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ভাষার প্রয়োজন তাহার ছিল না। কিন্তু এই জীবনে যেখানেই যতটুকু আর্য সংস্কৃতির স্পর্শ ঘটিয়াছে, শাস্ত্রের উপদেশ বা পুরাণগুলির ভাবপ্রেরণা হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, সেইখানেই এই সংস্কৃতির প্রভাবে তাহার গ্রাম্যতা যতটুকু মার্জিত হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাও ততটুকু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—কথ্য ভাষা বা জীবনযাত্রার ভাষা সাহিত্যের প্রয়োজনে ভিন্নতর ভঙ্গী আশ্রয় করিয়াছে। এই প্রভাবের বশে, এই সংস্কৃতির ফলেই, বাঙ্গালী যখনই গান বন্দিতে বা গান করিতে বসিয়াছে, তখনই ভাষার গ্রাম্যতাকে কিয়ৎ পরিমাণে শোধন করিয়া লইয়াছে; এ প্রয়োজন বাংলা সাহিত্যের আদি প্রবৃত্তির যুগ হইতেই লক্ষ্য করা যায়, কথ্য ভাষার ভঙ্গীতে তাহার সাহিত্যপ্রেরণা কখনও আরাম পায় নাই। আমাদের ভাষা কোনও একটা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বটে, তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্য রচনা করিতে সুরু

করিলাম, তখনই এই অপভ্রংশকে, তাহার প্রকৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, একটা সংস্কৃত রূপে বাঁধিয়া লইয়াছি। এই ভাষা যদি এক ছন্দে বা ভঙ্গীতে, লিখি আর এক ছন্দে, আর এক ভঙ্গীতে—সংস্কৃতের শাসনে নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রয়োচনায়। এই সুর ও ছন্দের পার্থক্যে, ভাষারও এমন পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে যে, মনে হয় যেন দুইটা ভাষা; কিন্তু আসলে ইহা ভাষার পার্থক্য নয়, সুরের বা উচ্চারণভঙ্গীর পার্থক্য। এই সুর, ছন্দ বা উচ্চারণভঙ্গীর সাধুরীতি সর্ব্ব যুগের সকল কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া আছে,—সাহিত্যের বাচন-ভঙ্গী ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিয়াছে।

* * *

কিন্তু ইহা লইয়া কেহ ইতিপূর্ব্বে সমস্যায় বা সঙ্কটে পড়ে নাই, এ পার্থক্য কোন লেখককে পীড়া দেয় নাই, শব্দের সংস্কৃত ও প্রাকৃত রূপ নির্ব্বিচারে সাহিত্যের ভাষায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে, ভাষায় শব্দের জাতিভেদ কখনও স্বীকৃত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয়, লেখকেরা ইহা লইয়া অযথা দ্বন্দ্ব বোধ করেন নাই। বরং এই বিশিষ্ট সাহিত্যভঙ্গীটুকুই প্রতিভাহীন লেখককেও সাহিত্যরচনায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছিল—যে-কথা বা যে-বিষয়বস্তুর মধ্যে ভাব-অর্থের কোন শ্রী নাই, তাহাও এই ভাষায় নিবদ্ধ করিলে একটা মর্য্যাদা লাভ করে, বাচনভঙ্গীর একটু পরিবর্ত্তন করিলেই তাহা যেন এক প্রকার ধ্বনিরসে সিক্ত হইয়া উঠে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই এই ভাষার গুণে সাহিত্যপদ পাইয়াছে। যে-সকল রচনা গীতাত্মক বা ভাবপ্রধান নহে, যাহা মাত্র বিবৃতিমূলক—অর্থাৎ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু যেমনই ক্ষুদ্র তেমনই বৈচিত্র্যহীন, অথচ তাহাই সাহিত্যের উপকরণ রূপে কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ সেগুলিকে ভাষা ও ছন্দের মর্য্যাদা দান করিবার স্পৃহা। পারিবারিক জীবনের দুই একটি বাঁধা-ধরা সুখদুঃখের একই কথা, ধর্ম্ম লইয়া সামাজিক বিবাদ, অতিতুচ্ছ দাম্পত্য-কলহ, মাহাত্ম্যহীন দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন, নারীদের বেশবাস, অলঙ্কার ও নাকচোখের মামুলী বর্ণনা, পায়স-পিষ্টক ও নানাবিধ ব্যঞ্জনের তালিকা—এই ধরণের বিষয়বস্তুই এক যুগ ধরিয়া এতগুলা লেখকের কবি-প্রেরণার উপজীব্য যে কি করিয়া হয়, তাহার আর কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার মোহ যেমন অনেক পূর্ব্ববঙ্গীয় অ-সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করিয়া তুলিতেছে, এক কালে এই কথ্যভাষা বা dialectএর অমার্জ্জিত ও ধ্বনিসৌষ্ঠবহীন রীতিকে বর্জ্জন করিয়া ভাষার এই অন্যরূপের চর্চ্চা-ই বহু লেখকের সাহিত্য-সাধনার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়।

* *

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষার এই সাহিত্যিক ভঙ্গীকে তাহারা কখনও বিজাতীয় বা কৃত্রিম বলিয়া মনে করে নাই, তাছাড়া, কৃত্রিম বলিয়া অবজ্ঞা বোধ করিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষা মাত্রেই কৃত্রিম। কবি যে-ভাষায় লেখেন, অরসিক জনকে তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবেই, চিরদিনই করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠকালে—সে রচনা যে-রীতিরই হউক—হাস্যরস অনুভব করে, এমন শ্রোতার অভাব কখনই হইবে না; অথচ রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'প্রাণের জোর' যে-ভাষার প্রধান সম্পদ, ইহারা সকলেই সেই কথ্যভাষাই বলিয়া থাকে। কাজেই, কৃত্রিমতার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই সাধু-ভাষা বিজাতীয়, অর্থাৎ ইহা খাঁটি বাংলা নহে, ইহার উত্তরে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এখানে আর এইটুকু মাত্র বলিব যে, ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা, এই ভাষা যদি বাঙ্গালী খুঁজিয়া না পাইত, তবে তাহার আদিম গ্রাম্যতা এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত, ভাষার হলচালনাশক্তির মত 'প্রাণের জোর' হয়তো আরও খাঁটি থাকিত, কিন্তু তাহার মনোবৃত্তিকা অনন্যাই থাকিয়া যাইত। এই ভাষা বিজাতীয় নয়, তাহার প্রমাণ, বাঙ্গালীর সাহিত্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহার পূর্ব্ব-পর এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। যদি এই ভাষা বিজাতীয় হয়, তবে বাঙ্গালী এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহা সাহিত্যই নয়। এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুসারী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্মহিসাবে বাঙ্গালী একজাতি কিন্তু ভাব-চিন্তায় ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলা ভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রাকৃত বাংলা নয়,—বার আনা সংস্কৃত। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষার পক্ষে ওকালতি করিতেছেন, তাহা যে কি বস্তু, তাঁহার নিজের রচিত নমুনা হইতে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু সে আলোচনা পরে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ এযাবৎ-প্রচলিত গদ্যরীতির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতকে দায়ী করিয়াছেন। আজিকার এই সুসংবদ্ধ, সুনমনীয়, অনবদ্য বাংলা গদ্যভাষার মূলে আছেন সাক্ষাৎভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা—এমন কথা কোন ছাত্র পরীক্ষার খাতায় লিখিলে সে যে কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইত তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। কিন্তু হায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে আসীন রবীন্দ্রনাথও যখন বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্পর্কে এমন নির্ভুল মন্তব্য করিতে পারেন, তখন অন্যে পরে কা কথা! এই গদ্যের জন্য উক্ত পণ্ডিতগণকে দায়ী করার অর্থ অবশ্য ইহাই যে, ঐ পণ্ডিতেরাই যখন এ ভাষার জন্মদাতা তখন এ ভাষা খাঁটি বাংলা হইতেই পারে না—বরং

তাহাদের পণ্ডিতী শক্তিতার ফলে বাংলা গদ্যের স্বভাবহানি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছি। সকলেই জানেন, সমাজবিশেষের সাধু ও সত্যসন্ধ ব্যক্তিগণের মতে আধুনিক যুগে বাঙালীর যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে একজনমাত্র যুগাবতার আছেন, তিনি রামমোহন রায়; বাংলা গদ্যের স্রষ্টাও তিনি, এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিজনোচিত কল্পনা ও কুযুক্তি দ্বারা বহুবার রামমোহনের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন—তাঁহার চেলাদের ত কথাই নাই। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রোপাগাণ্ডার ফলে মিথ্যাও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সুশিক্ষিত(?) বাঙালী মাত্রেই একথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাহাই না হয় মানিলাম, কিন্তু গদ্যসৃষ্টির যাহা কিছু গৌরব তাহার ভাগী হইবেন রামমোহন, আর ইহার জন্য যত কিছু অপরাধ তাহার ভার বহিতে হইবে গদীয় পণ্ডিতগণের—এ কেমন সুবিচার? —হিন্দু পণ্ডিতেরই যত দোষ—যত আক্রোশ তাহাদের উপরে! পূর্বে বলিয়াছি, সাধুভাষার প্রতি একদলের এই যে বিরাগ, ইহার মূলে যেন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা অন্তরঙ্গ আছে।

• • •

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে গদ্যসৃষ্টির নানামুখী প্রয়াসের ইতিহাস এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। এখানে কেবল একটা কথাই বলিব—নব্য বাংলা সাহিত্যের পত্তনভূমে এই ভাষার সৃষ্টি সে যুগের সব চেয়ে বড় কীর্তি। এই সাহিত্যের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, যদি কখনও তেমন শক্তি একাজে হাত দেন, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য থিসিসরচনার উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বলিতেছি না), তবে এই বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা তাহার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইবে সন্দেহ নাই।

• • •

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে বাঙালীর মুখ প্রতিভা যখন নূতন করিয়া সাড়া দিল, ইংরেজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে বাঙালীর রসচেতনায় এক অপূর্ব ভাবজগৎ প্রকাশিত হইল, তাহার ফলে সে যখন নবসৃষ্টির আবেগে অধীর হইয়া উঠিল, তখন বাংলা ভাষার, কি গদ্যে কি পদ্যে, অপরিসীম দারিদ্র্য তাহাকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছিল। বড় কল্পনা, বড় বিষয়বস্তু বা ভাবচিন্তার উপযোগী ভাষা ইতিপূর্বে গড়িয়া উঠে নাই; তার উপর আরও বিপদ হইয়াছিল এই যে, অষ্টাদশ হইতে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও ভাব অতিশয় গ্রাম্য হইয়া পড়িয়াছিল—ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত পুরাতন কাব্যসাহিত্যের ধারা সজীব ছিল না, ভাব ও ভাষার আদর্শ কোনও নির্দিষ্ট প্রতিভার স্পর্শে অধিকতর উন্নত ও পুষ্ট না হইয়া অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই কালে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান ছাড়া সাহিত্যপদবাচ্য কোনও পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা বাংলা ভাষার যে সুমার্জিত কলা-সম্মত রসনিপুণ ভঙ্গী ও বিশুদ্ধ রীতির প্রথম পরিচয় পাই—তাহার সেই সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পাইল না, রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে সকলই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, যে নূতন সংস্কৃতি এ জাতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ধারা বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিশয় অগভীর হইয়া উঠিল—সাহিত্যে স্রোতোধারার পরিবর্তে কূপ-পল্বলের সৃষ্টি হইল। পূর্ব যুগের সাহিত্যে ভাষা ক্রমশঃ যে আদর্শে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে সরল অথচ সুমার্জিত গাঢ়বন্ধ শ্রী ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, যাহার মূলে ছিল শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বান-সুলভ বৈদগ্ধ্য,—পরবর্তী কালে ভাষার সে আদর্শ টিঁকিল না, কারণ সে সংস্কৃতিই লোপ পাইতে বসিল। বাণী আর সাধনার বস্তু রহিল না, কবি-প্রতিভা পঞ্চবক্ত্র-জাত লতাগুল্মের মত মাঠবাট ছাইয়া ফেলিল; বাংলা সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল যুগ স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। বাণীসাধনার সেই আদর্শ যদি আরও কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারিত, এবং ভারতচন্দ্রের সেই সাধনা যদি অব্যাহত থাকিয়া, আরও শক্তিশালী প্রতিভার অভ্যুদয়ে স্বাভাবিক সুপরিণতি লাভ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আমরা কবিওয়ালার গান ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পরিবর্তে এমন কিছু পাইতাম, যাহাতে নবযুগের সাহিত্যপ্রেরণা সুসম্পন্ন ভাষা ও রীতির অভাবে এমন ভাবে দিশাহারা হইত না। সে সময়ে সংস্কৃত আদর্শভ্রষ্ট খাঁটী বাংলা যে 'প্রাণের জোরে'র পরিচয় দিতেছিল, যে ভঙ্গীতে যে গান গাহিতেছিল, তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যের রসগ্রাহী বাঙালী লজ্জা পাইয়াছিল। যদি রবীন্দ্রনাথ সে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই খাঁটি বাংলাকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতেন, তবে অবশ্যই মাইকেল, বঙ্কিমের এত বড় ভুলটা তখনই ধরা পড়িত, বাংলা সাহিত্য এতগুলা আবর্জনার ভরিয়া উঠিত না। কিন্তু কেন যে তাঁহারা এই ভুল করিলেন, ইহাই আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথকেও জিজ্ঞাসা করি, শিশুকাল হইতে তিনি সাহিত্যসাধনায় রত আছেন, প্রতিভার সেই অপরিপক্ক অবস্থায় তিনিও নিশ্চয় ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধনা, বঙ্গদর্শন, এমন কি সবুজ পত্রের যুগেও তাঁহার এ ভুল ভাঙ্গিল না কেন? ভাষার সেই সংস্কৃত রীতিকেই তিনি এমন মনোহর করিয়া তুলিলেন যে প্রেরণায়, তাহা কি ভ্রান্ত? তাঁহার প্রতিভা কি তখনও আত্মবিস্মৃত? সে সৃষ্টি কি তখনও দৃষ্টিহীন? নবসাহিত্যের প্রয়োজনে ভাষার এই সাধুরীতির উদ্ভব যে কোনও অসা

চেষ্টার ফল নহে, ভ্রান্তিও যে ইহার কারণ নহে—সাধুরীতি যে আধুনিক সাহিত্যে গায়ের জোরে স্থান পায় নাই, একথা রবীন্দ্রনাথ যে কেন বিস্তৃত হইতে চাহিতেছেন, তাহার উত্তর আমরা তাঁহার নিকট হইতেই আরও খোলসা ভাবে পাইতে চাই।

• • •

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সেকালে বাঙালীর সেই নবজাগ্রত প্রতিভা সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল—সংস্কৃতের সাহায্যেই এক মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর, কবিকঙ্কণ ও অন্নদা-মঙ্গলে যে রস-কল্পনা, তাহার বাহন হইল বঙ্কিমী ভাষা—এ ভাষা সেই কাব্যপ্রেরণার প্রয়োজনেই জন্মলাভ করিয়াছিল। যে ভাষায় দেবদেবীর জবানীতে গ্রাম্য জীবনের গ্রাম্য কাহিনী রচনা করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, সে ভাষায় শেক্‌স্‌পীরিয় ট্রাজেডির মত কাব্যরস সৃষ্টি করা কোনকালের কবির পক্ষেই সম্ভব নয়; রসের আদর্শই যদি বদ্‌লাইয়া যায় তবে কোনো কথাই নাই, নতুবা, আজিকার দিনেও সেই যুগের সাহিত্য খাঁটি কথ্য বাংলার ভঙ্গীতে রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ কথা যিনি বুঝিতে চাহিবেন না তাঁহার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে, সাহিত্যের আলোচনা নিষ্ফল। মিল্‌টনের মহাকাব্যের সঙ্গীত বাঙালীর কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌঁছিয়াছে—সে সঙ্গীতের উদাত্ত উদাত্ত ধ্বনি, ঈশ্বর গুপ্ত ও কবিওয়ালার যুগের একজন বাণীবরপুত্রকে আকুল করিয়াছে। কানে যাহা বাজিতেছে ভাষায় তাহাকে ধরিবার উপায় নাই, সে যুগের সে ভাষায় তাহা কল্পনা করাও যায় না। প্রতিভা পথ দেখাইল—দৈবী প্রজ্ঞার বলে অসাধ্যসাধন হইল, এত বড় বিস্ময়কর কীর্ত্তি বোধ হয় কোনও সাহিত্যের ইতিহাসে নাই। সংস্কৃতের সাহায্যে ভাষাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল যে, কাশীদাসী পয়ারের ছাঁদে অমিত্রাক্ষরের সাগরতরঙ্গ অপূর্ব্ব কল-কল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে সঙ্গীতে বাঙালী যেন অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রোত্থিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল; বাঙালা ছন্দের, তথা বাঙালা কাব্যের, গতি ফিরিল; আজিও সে সঙ্গীত বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে বিরাজ করিতেছে। গদ্যে ও পদ্যে এই দুই মহা প্রতিভার উদয় না হইলে নব্য বাংলা সাহিত্য এত শীঘ্র এমন ভাবে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইত না।

• • •

এই নব্যসাহিত্যের ভাষা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের ভাষা তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বাংলা ভাষা যেন একটি সবল সুষমান্বিত ভঙ্গী লাভ করিয়াছে, এতদিনে যে একমাত্র পথে তাহার শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব, সেই পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ করিয়াছে। পূর্ব্ব যুগের সাহিত্যও যেমন কল্পনাহীন, ক্ষীণপ্রাণ, নিতান্তই গ্রাম্য, তাহার ভাষাও তেমনই শিথিল, অপরিচ্ছন্ন, অপ্রগাঢ় এবং ধ্বনিবৈচিত্র্যহীন; ইহারও পূর্ব্বে সংস্কৃতের প্রভাবে ভাষা যেটুকু সংস্কৃত ও গাঢ়বন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এই অধঃপতনের যুগে তাহার সে সৌষ্ঠব ছিল না; অথচ সেই যুগেই এমন এক রসপ্রেরণা বাংলা সাহিত্যে প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে যাহার জন্য ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করা প্রয়োজন। শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তেমনই শব্দযোজনারীতি বা ভাষার গাঁথনি দৃঢ় করিবার জন্য অনেক পরিমাণে সংস্কৃত আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি ভাষার ভঙ্গী সেই পুরাতন বাংলা ভঙ্গী—সেই ভঙ্গীতে শক্তি ও শ্রী সম্পাদন করিয়াছে সংস্কৃত শব্দসম্পদ ও ধ্বনিবন্ধ। মাইকেলের মেঘনাদ-বধ-র ভাষাকে একালের স্বভাব-পণ্ডিত ও বাস্তবরস-বিলাসী রসিক-সম্প্রদায় বাংলা নয় বলিয়া ফতোয়া দিয়া থাকেন, অথচ সে ভাষার ভঙ্গীর মূলে কাশীরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের রীতিই বিদ্যমান, তাহাতে বাংলা ইডিয়মের ছাঁদ যতখানি বজায় আছে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার ভাষায় তাহা নাই—একথা শুনিয়া অনেকে চমকিত হইয়া উঠিলেও, তাহা সত্য। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন—যাঁহারা ভারতচন্দ্র, দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাই মেঘনাদ-বধ-র প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন—এখনকার দিনে, যাঁহারা বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যের সহিত অধিকতর পরিচিত, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাষার ভঙ্গীই ইহার একমাত্র কারণ নয় তাহা জানি—কিন্তু সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগেই বাংলা ভাষা পীড়িত হইয়া উঠে, এবং লঘু ও সরল সুপ্রচলিত শব্দের বহুল প্রয়োগেই ভাষার খাঁটি ভঙ্গী যে অক্ষত থাকে—এ ধারণা ভুল। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আমরা বাংলা কাব্যের যে ভাষা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মূলভঙ্গী অবিকৃত রাখিয়া ভাবকল্পনা ও ধ্বনিব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে ভাষা অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মধুসূদনের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথেও অক্ষুণ্ণ আছে—ভাবকল্পনা ও ধ্বনি-বিন্যাসের তারতম্য হেতু তাহার সংস্কৃত ভঙ্গীর পার্থক্য ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কল্পনার ভাষা যতই সুললিত হউক, তাহার রীতি মধুসূদনের অপেক্ষা খাঁটি নহে, বরং তাহার উপর ইংরেজীর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট; এককালে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই—এখনও সর্ব্বসাধারণের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার কারণ, সবটা না হইলেও, কতকটা ইহাই। মাইকেলের কাব্যের সহজ-সুরুহতা

যতটা না বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনন্যান্ত ভঙ্গী তদপেক্ষা অধিক বাধা হইয়া দাড়াইয়াছিল। এক সমসাময়িক কবি একদা রঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরগোষ্ঠির ভাষা ইংরাজীতে ভাল। ড্যাফোডিল-পুষ্পে যেন মনসার পূজা।"—তাহা সর্বৈব মিথ্যা নহে। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাংলাভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা সাধু রীতির প্রতি সদয় নহেন, মাইকেল বঙ্কিমের ভাষাকে যাঁহারা খাঁটি বাংলার বিকৃতি বলিয়া মনে করেন, এবং ভাষার অতি-আধুনিক ভঙ্গী দেখিয়া যাঁহারা আশান্বিত ও উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, বাংলার ধাতুপ্রকৃতিতে, খাঁটি বাংলা ইডিয়মের উপরেই, সংস্কৃতের প্রভাব যতটা স্বাস্থ্যকর, সংস্কৃত-বর্জ্জিত কথ্যভাষার আদর্শ ততটাই অস্বাস্থ্যকর, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই সাহিত্যের ইতিহাসে বার বার পাওয়া গিয়াছে—আজ তাহাই আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। কথ্যভাষার ইডিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কৃতের সাহায্য কতখানি লওয়া যাইতে পারে নব-যুগের সাহিত্যসাধনায় তাহার পরীক্ষা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে—তাহার ফলে আমরা যে ভাষা পাইয়াছি তাহা যদি খাঁটি বাংলা নয় বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়, তবে বাংলা সাহিত্যের অপঘাত অনিবার্য্য। এই তথাকথিত পণ্ডিতী ভাষাই যে খাঁটি বাঙ্গালী প্রতিভার সৃষ্টি, এবং সেই হেতু তাহা খাঁটি বাংলা—একথা বুঝিতে হইলে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বুঝিতে হইবে; সে ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লেখে নাই বলিয়া অতিশয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রশ্রয় পাইতেছে। কথ্য ভাষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয় নাই—ইহা একটা দৈবাধীন ঘটনা নহে; কথ্যভাষার মজ্জাগত দুর্ব্বলতাই, সে সাহিত্যের আদি স্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহাদের নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল। সাহিত্যের যে আধুনিক উৎকৃষ্ট আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার উপযোগী শব্দসম্পদ বা ধ্বনিপ্রকৃতি সে ভাষার আয়ত্ত নহে বলিয়াই, তাঁহারা ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; তাহা ভদ্র বা সাধু রীতিই বটে, কিন্তু তাহা বাংলা। সে আদর্শ যে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণকর হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই—সেই সংস্কৃতির ফলে আমরা গ্রাম্য বর্ব্বরতা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।

• • •

বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভাবনায় এই নব সংস্কৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং এই গদ্যরীতির উদ্ভবই সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই গদ্যই সেই নূতন ভাষা যাহা একালের সাহিত্যকে সর্ব্বপ্রকারে ধারণ করিয়া আছে। কি গদ্যে কি পদ্যে, আমরা যে নূতন সুর ও ভঙ্গী লক্ষ্য করি তাহার মূলে আছে এই অভিনব ভাষণ-রীতি। এই গদ্যই বাংলা ভাষার গতি ফিরাইয়া দিয়াছে। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে গদ্যসৃষ্টির প্রয়াস চলিয়াছিল তাহা শুধুই গদ্যরীতির উদ্ভাবনা নহে,—বাংলা ভাষার জন্মান্তর-সাধনা। এই গদ্য যখন পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া উঠিল তখনই আমরা গীতসুরবর্জ্জিত ভাষার ছন্দকে লাভ করিলাম; ইহার পূর্ব্বে বাক্যচ্ছন্দকে আশ্রয় করিয়াই কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। এই বাক্যচ্ছন্দের আবিষ্কারই ভাষাকে অভূতপূর্ব্বভাবে রূপান্তরিত করিল। কাব্যচ্ছন্দকেও গানের প্রভাব হইতে মুক্তি দিল। মধুসূদন পয়ারকে যে নূতন গতি ও ছন্দে বাঁধিয়া দিলেন—যাহার ফলে কাব্যচ্ছন্দ চিরদিনের জন্য নূতন চালে চলিতে আরম্ভ করিল—সেই নূতন ছন্দোভঙ্গী বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; যে কালে মহাকবি এই ছন্দ ধরিতে পারিয়াছিলেন, সেই কালের মাহাত্ম্যও কম নয়। তখন গদ্যচ্ছন্দ আবিষ্কৃতপ্রায়, সেই ছন্দ হইতেই মধুসূদন তাঁহার অমর ছন্দ গড়িবার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নয়, এই ছন্দের জন্য যে ভাষা তিনি অবলম্বন করিলেন, তাহাও গদ্যসৃষ্টির প্রয়োজনে ইতিপূর্ব্বে একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহার সেই সংস্কৃত রীতি যে ধ্বনিব্যঞ্জনার অনুকূল, গদ্যে তাহা সুসমাহিত ও সুপরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই কাব্যে পূর্ণ সঙ্গীতে বাজিয়া উঠিল। মধুসূদনের পরে হেম নবীনের রচনায় এই গদ্যভঙ্গী আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—ছন্দ-সঙ্গীত ও কাব্যকলার প্রতিভা তেমন পরিপক্ক না হওয়ায়, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই গদ্যময়, গদ্যের ভাষাই ধ্বনিমাত্রায় সজ্জিত ও মিলযুক্ত হইয়া বক্তৃতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। এক কথায়, এই নবসাহিত্যের ভিত্তিমূল ভাষার গদ্যরীতির মধ্যেই গভীর ভাবে নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, গদ্য ও পদ্য এখনও এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, আজও গদ্যরচনায় কাব্যের সুর অতি সহজেই আসিয়া পড়ে; গদ্যে কাব্যের সুর না থাকিলে বাঙ্গালীর কান তৃপ্ত হয় না।

বাংলা ভাষার যে অভিনব রূপের কথা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে একটা কথা পুনরায় স্মরণ করাইতে চাই। ভাষার এই যে সংস্কৃত ভঙ্গী, ইহার মূল প্রয়োজন—যাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—ভাবসংহতিমূলক শব্দযোজনা এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য্যলাভ। উৎকৃষ্ট সুরের আধার হইতে হইলে ভাষার এ গুণ অপরিহার্য্য। বাংলা গদ্য আরও পরিণতি লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের যুগে—তখন এই rhythm বা ধ্বনিস্পন্দ বজায় রাখিয়া ভাষা বহুল পরিমাণে কথ্য ভাষার বা ইডিয়ম আত্মসাৎ করিবার সামর্থ্যলাভ করিল। বলা বাহুল্য, ভাষার এই গতি ও প্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা গদ্যের প্রাণধারাটি আবিষ্কার করিয়া, এবং সেই ধারাকে প্রবাহিত করিবার জন্য, আমরণ সাধনার দ্বারা, খাত খনন

করিয়া তিনি বাংলা গদ্যের যে রূপটির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহাই বাংলা গদ্যের আদর্শ হইয়া আছে। সংস্কৃত ও কথা এই দুই বিরোধী ভঙ্গীর সমন্বয়সাধনে তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন—বিদ্যাসাগরী ও আলালী এই উভয় ভঙ্গীর পৃথক ও বিশিষ্ট গুণ এক আধারে মিলাইয়া ভাষার সৌষ্ঠব ও সজীবতা সম্পাদন করিবার যে দিব্যদৃষ্টি তাঁহার প্রতিভার সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতেই বাংলাগদ্য সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যসৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উপযোগিতা লাভ করিল। ভাবকে ভাষার অধীন না করিয়া, ভাষাকে ভাবের অধীন করিয়া—সাহিত্যের যাহা প্রধান ধর্ম্ম, সেই প্রকাশশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া, বৈয়াকরণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের অতিরিক্ত শুচিবায়ু-রোগ পরিহার করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাগদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভাষাকে জীবধর্ম্মী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণীদেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ় সুবলয়িত ও সুনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমী ভাষার ব্যাকরণদোষ ও গুরুচণ্ডালী রীতি দেখিয়া এক কালে অনেকে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন—আজিকার দিনে যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিতেছেন, তাঁহারা যদি ইহার পরিণতি লক্ষ্য করিয়াও, সেকালের সেই পণ্ডিতী মনোভাব কাটাইয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বঙ্কিমের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল এখনও তাহার সমাধান হয় নাই—বঙ্কিমের সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে; পণ্ডিতী বাংলা ও আলালী বাংলা এখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কথাটা এ প্রসঙ্গে অবান্তর, তথাপি কোনও একস্থানে এইরূপ মনোভাবের পরিচয় পাইয়া আমি হতাশ হইয়াছি—এ যেন 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীরে'-র অবস্থা। একদিকে সাধুভাষা বলিয়া বঙ্কিমীভাষার প্রতি আক্রোশ, অপরদিকে বঙ্কিমের ভাষাও যথেষ্ট পরিমাণে সাধু নয় বলিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা। বাংলা গদ্যের প্রাণ-প্রবৃত্তি ও তাহার যথার্থ আদর্শ সম্বন্ধে উক্ত পক্ষেরই ধারণা সমান। যে রীতির উদ্ভাবনায় গুরুগম্ভীর পদযোজনা এবং অতি সহজ সরল বাক্-পদ্ধতি একই ভাষায় সুসমন্বিত হইয়া একটি অখণ্ড ধ্বনি-প্রবাহ সম্ভব হইয়াছে—যাহার ফলে বাংলাগদ্য ভাব, অর্থ ও ধ্বনিব্যঞ্জনার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে—'an instrument of many stops' হইতে পারিয়াছে, সেই রীতি 'সাধু'ও নয়, 'কথা'ও নয়, ইহার নাম আদর্শ বাংলা গদ্যরীতি—এই রীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভার ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যিনি একথা বুঝেন নাই, বাংলা গদ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা নাই বলিতে হইবে।

বঙ্কিমী যুগের এই যে গদ্য যাহাকে 'অসাধু' অপবাদ দিবার জন্যই এক্ষণে বেশি করিয়া 'সাধু' বলা হয়—এই গদ্যের ভাষা ও ধ্বনিসম্পদ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সাহিত্যপদবীতে আরূঢ় করিয়াছে; ভাষার এই গঠন ও তজ্জনিত ধ্বনি-গৌরব যদি বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ত না হইত, তবে আজ আমরা জগতের সাহিত্য-সভায় যেটুকু স্থান দাবী করিতেছি, তাহা কখনও সম্ভব হইত না। যে রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশ্বের সমক্ষে খাড়া করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, সেই রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয় এই গদ্যকে আশ্রয় করিয়া, এবং তাঁহার সমগ্র কাব্যকীর্ত্তির মহনীয় অংশ এই রীতি ও এই ধ্বনি-ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই এই গদ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—১৫ হইতে ২০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিজ শক্তির পরিচয় পাইয়া সাহিত্যসাধনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে, এমন কি তাহার অনেক পরেও, কবিতারচনায় তিনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের এই ঘটনা অর্থহীন নহে। তারপর তিনি বিহারীলালের আদর্শে যে ভাষা ও সুর লইয়া গীতিকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে সেই ভঙ্গী একরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া তিনি বাংলাকাব্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাতে সাধুভাষা ও তাহার ধ্বনি-বিন্যাস তাঁহার বাণীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল—তাঁহার কাব্যের ভাষাও কালিদাসের বাংলা সংস্করণ, এবং তাহার প্রধান ছন্দ-ভঙ্গী হইল পয়ার। মধুসূদন যেমন পয়ারকেই—অর্থাৎ বাংলা কাব্যের ধনিষাদী ক্ষুদ্র ছন্দটিকেই সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী করিয়া বিচিত্র ধ্বনিসম্পদে মণ্ডিত করিলেন, তাহাতে নাটক ও কাহিনী জাতীয় কাব্যে কবি-কল্পনা মুক্তিলাভ করিল; তেমনই রবীন্দ্রনাথও সেই পয়ারকেই গীতিকাব্যের উপযোগী সুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিবার কৌশলটি আবিষ্কার করিয়া কাব্যের অপর রূপটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন; বাংলায় এতদিন কবিতার আকারে গান রচিত হইত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আমরা বাঙ্গালা কাব্যের বহু বিচিত্র গীতি-ছন্দ লাভ করিলাম। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য, তাহা এমনই করিয়া সাধুভাষা ও সাধুভঙ্গীর সেবা দ্বারা, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিয়াছিল।

* * *

রবীন্দ্রনাথের যখন যৌবন ছিল, তাঁহার প্রতিভার সেই পূর্ণ স্ফূর্ত্তির কালে, তিনি ভাষা সম্বন্ধে কোনও উদ্ভট ধারণার বশবর্ত্তী হন নাই। ঠিক যে সময় হইতে তাঁহার প্রতিভার নিবর্ত্তন সুরু হইল, আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক সেই সময় হইতেই সুস্থ সাহিত্যিক প্রেরণার পরিবর্ত্তে তিনি এইরূপ নিরর্থক

মতবাদের পক্ষপাতী হইলেন—চিত্তের হইতে সৃষ্টি-প্রেরণা যখন ক্ষীণ হইয়া আসে, তখনই মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা মৌলিক কৃতিত্বের স্পৃহা বাড়িয়া উঠে। সত্যকার সৃষ্টিপ্রতিভা যাহাদের নাই, তাহারাই তাহাদের সেই দৈন্য ঢাকিবার জন্য 'নতুন কিছু করো'র অন্যায়তা আস্ফালন করে। অতিরিক্ত আস্ফালন হইতেই এই রূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা ঘটে, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী কবিও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই দেখা যাইতেছে। সৃষ্টিপ্রতিভা যখন বিদায় লয় তখন তাহাকে বিদায় লইতে দেওয়াই উচিত। আমার প্রতিভা এতটুকু ম্লান হয় নাই, আমার মৌলিক রচনাশক্তির শেষ নাই—আমি বিধির বিধানকেও পরাজিত করিব—এইরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা বা দুর্বল আত্মমোহের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ধরিয়া নূতন-কিছু করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সাহিত্যের মর্যাদা অপেক্ষা তাঁহার আত্মাভিমানের মূল্যই অধিক হইয়াছে, তাই বাহাত্তর বৎসর বয়সেও নূতন ভাষা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে সাহিত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন।

* * *

ভাষার সংস্কারকার্যে স বু জ প ত্রে-র গৌরব কীর্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> যাই হোক, আমাদের ভাষার হাওয়া যেই পুবদিকে মুখ ফেরাল অমনি তখন থেকে একটা নব বাস্তিবর্ষণের পালা পড়েছে। সবেতি তরুণেরা বহু সাহিত্যে অনেক নূতন কীর্তি করেছেন ব'লে গৌরব করেন কিন্তু ভাষার নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে উদ্যোগ প্রথম ক'রেছেন তার চেয়ে ইলাস্টিক (Sic) আর কি ইন্ডাস্ট্রিয়ল (Sic) আছে জানিনে।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষার এই কথাগুলি লিখিয়াছেন তার শ্রী ও শুচিতার বিচার অনাবশ্যক। বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে যাহার পরিচয় নূতন নহে, তিনিই দেখিবেন রবীন্দ্রনাথের রচনা-বুদ্ধি কাঞ্চনের বদলে কাচ কুড়াইয়াছে। একণে এই উক্তিটাই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। ইহার শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ খুব সত্য কথাই বলিয়াছেন—কারণ তরুণদের যত কিছু কৃতিত্ব, তার মূলে আছে ভাষার নবতন ভঙ্গী, তারও মূলে আছে—"ভাষার নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে উদ্যোগ প্রথম করেছেন।" প্রথমনাথ বাংলা সাহিত্যের যে কত বড় উপকার করিয়াছেন তাহা আমরাও জানি। তার ফলে যে 'নব বাস্তিবর্ষণের পালা পড়েছে' তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, তাই এই নূতন ভঙ্গীর কয়েকটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করিব, তাহাতে কথ্যভাষার শ্রীশ্রী জল জল করিয়া উঠিবে। নিম্নোদ্ধৃত নমুনাগুলি বিভিন্ন সাহিত্যরথীর রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

> (১) অতি সাই' ক'রে সন্ধ্যাদাসী সুরের ঝিয় আঁকতে গিয়ে লেখক ভুল করেন। সিনার পুর-আগমন-আশার আয়োজন উদ্যোগ, মন্দুর্চ্ছির মোহাগনি, চিন্তার-চৌকিদের ঘুমরা, সকলো বয়ের বিবির পিসলো-সিঁথি, ও Mozart এবং অন্যান্যরা "সাঁ সাঁই"-এ পারদর্শিতা—এ গুলি বিলাস অবান্তর, এ গুলি সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করায় ফলেই লেখক শুধু প্রসন্ন ও বিকার তৈরী করেছেন।

> (২) The World of Light গ্রন্থকারের মেজাজ পড়ে ফেলা যায়। এ-গ্রন্থের মূলা বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, কল্পনা শক্তি বাড়া নাটকীয় জন্য সম্পদও যথেষ্ট আছে—ধৈর্যচ্যুতির মাত্রাজ্ঞান। লেখক বাক্যালাপেও চিনটি অঙ্কের পরিচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ...ব্যাপার যেই হলো, সেই সময়েই ব্রিটিশার বেপোয়া ফুর্তিবাজ অভিজাত বন্ধু (নাটকের একমাত্র সহনীয় ও প্রীতিকর মানুষ) ব্রিটিশকে ছুটির পরে সেই দুপুর রাতেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে চলল।

> (৩) কিন্তু এই সুমিতি এলিজাবেথের উদার মুখে সর্বত্রে ভাবে সার্থক না হলেও, ক্রিস্টোফার পক্ষের উপযোগিতার সম্বন্ধে তার অনেক উপযোগিতা সর্ববাদীসম্মত। উপরন্তু এই সমাপ রাজাজ্ঞার অন্যায়েই ট্রেচির ভাষা অনুসরণ। এ ভাষায় অনন্যসাধারণ ওজঃ, অপরিমিত ঐশ্বর্য, অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য সে সমস্ত গুণই সম্পূর্ণ সুপ্রিয়াস আর আয়োজিক তুলাসাম্যের জন্য।

> (৪) ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির ওপরই বৌদ্ধ বিনয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য পালন করা, সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রতগ্রহণ করা উভয় ধর্মেরই মূল সূত্র। নির্দিষ্ট সময়ে লঘু ভিক্ষায় দেহপোষণ করা, লব্ধান্ন প্রাপ্তির ওপর সন্তুষ্টি, অবসন ও ধ্যান ধারণায় সময় অতিবাহিত ক'রে মুক্তিকামনা বৌদ্ধ-হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য।

[এই বাক্যগুলিতে 'ক'রে' এবং 'ওপর' ছাড়া সাধুভাষার অঙ্গে আর কোনও 'খাঁটি'র চিহ্ন নাই। 'ওপর' বানানটি বড়ই কৌতুককর]

> (৫) গ্রামের কাছ আসলিয়া গাছ কাকলি, ঝিই ঘুম্-ঘুমি, অনবরত দিগন্তকে ছেড়ে বর্ষিয়সীনীনী বৈরোচনী সভ্যতার বিজ্ঞানের কর্মমুখ, প্রাচ্যিকের উৎকণ্ঠা, উচ্চত সমাহোহ ও লেলিহান সূর্যতার বাহুপাশে এসে যে মানুষ তার চিরবাহিতকে পাবার পরে এক-পাও অগ্রসর হয় নি—শুধু একটা ঘরীয়মান ঘূর্ণতার মরীচিকা দ্বারা ঘূর্ণ হতে ঘূর্ণতর হয়ে.....ইত্যাদি।

> (৬) কিন্তু আমার ঐ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাত্মিকেরাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে সংখ্যাসূলক সাধারণ জ্ঞানের একটা আড়ম্বর ও বহু ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, সত্তার সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য কি সাদৃশ্য, সালোক্য কি সাযুজ্য, সারূপ্য কি সাক্ষ্য কিছু নেই, আছে শুধু সার্টি, অর্থাৎ সত্তার সমান ঐশ্বর্য ও সারল্য।

> (৭) যে সব সুবলকর রাজপুর উজ্জ্বল গুম্বের উপরে স্থাপিত, যার বিতানসমূহ মুক্তার জলকে উদ্ভাসিত, যার বুদ্ধির পক্ষ ও উজ্জ্বল কটিকে খচিত, যার কক্ষসমূহ মনোহারী সম্ভোগক ও পুষ্পপূর্ণ কুঞ্জে সজ্জিত—সেই সব রাজপুরে আমার সঙ্গীতের সুর যোগে ওঠের গান জাগাব।

নব বাস্তিবর্ষণের পালা যে কেমন, আশা করি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে এই কয়টি ধারাবিন্দুই যথেষ্ট। ইহারই নাম সাধুভাষাকে বর্জন করিয়া ভাষার হাওয়াকে 'পুবদিকে মুখ ফেরানো'—উত্তর পশ্চিমের দিক হইতে মগের মুলুকের দিকে। দেখা যাইতেছে, ইহাদের কোনটাই কথা ভাষার

দিক দিয়াও যায় নাই—সাধুভাষার প্রাঞ্জল রীতি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টায় উহা সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়াছে, প্রায় সকল গুলিই কেবল মাত্র ঠাং-ভাঙ্গা ক্রিয়াপদের জোরে কথ্যভাষা হইতে চাহিয়াছে। এ গুলি সাধুভাষার রচনাও নহে, কারণ সে ভাষা এরূপ কৃত্রিম নয়, তাহার গতি এমন রুদ্ধ-শ্বাস নহে, এমন উৎকট ইংরেজী গন্ধও তাহাতে নাই। কথা ভাষার ক্রিয়াপদ ইহার ধ্বনিসাম্য নষ্ট করিয়াছে, ইহার চলন অতি কুৎসিত, যেন হাতীর দেহে বাঘের পা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গলদ্‌ঘর্ম ভাষাই প্রমাণ করে যে, এই সকল লেখকেরা ভাষা কাহাকে বলে জানে না; তত্র পরিচ্ছন্ন সাধু-ভাষা—যাহাতে খাঁটি বাংলা ইডিয়ম অনায়াসে গ্রথিত হইতে পারে বলিয়া যে ভাষার বাচন-ভঙ্গী সুশ্রী সাবলীল ও সুনমনীয় সেই ভাষায় ইহাদের অধিকার নাই। ইহারা একটা নূতন ফ্যাশনের মোহাই দিয়া লেখক হইতে চায়। এই স্থলে আমি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের নবপরিণীতা ভাষার নমুনাও একটু দিব।

> (১) ক্রমে ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ঝঙ্কারকে অবকাশ দেয়, তার আওয়াজ জমা করে—সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হ'য়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, খুশী এবং খোশা, ফর্তি এবং ফুর্তি শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির বাহুল্য, আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই মোটা ছন্দে ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবহুল ধ্বনিসঙ্গীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসঙ্গীতে প্রভূত প্রভেদ।
>
> (২) সাধুভাষাকে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতায় অভিসারের যাত্রিকে তোলার যত বড় অন্তরায়, লোকে যেটাকে অসাধু বলে তাকে সেটিমেণ্টে। চলতিভাষা অত্যন্ত নিরলঙ্কার উচ্ছল করে তুললে অবান্তরতা তার ভেতর বেশী বই কম হয় না। অথচ লেখাকে রিয়ালিজমের মাত্রা দিয়ে একালের যৌবন আধুনিকতাকে খুশী করা অত্যন্ত সহজ। সেটা সহজ সেইজন্যে আর্টের বিপক্ষ ঘটায়। রেণ-রিয়ালিজমকে ভদ্রস্থ রূপ দিতে কালচিমেটের মোহ উৎপাদন করা সহজ, এই জন্যেই বেপরিবাবী কাজে সস্তা আর্ট জিনিষটা প্রায়ই বেকার হ'য়ে থাকে।

প্রথমটিতে যেন খাঁটি সংস্কৃত শব্দকে কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালাইবার চেষ্টা আছে, তথাপি তাহার সাধুত্ব প্রবল হইয়া আছে। রচনাগত অভিপ্রায় সত্ত্বেও লেখকের মনোগত আদর্শ যে কতখানি 'সাধু' তাহার প্রমাণ এই বাক্যটি—"স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসঙ্গীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসঙ্গীতে প্রভূত প্রভেদ", বিশেষ করিয়া ওই 'প্রভূত' শব্দটি। এইরূপ শব্দযোজনার ফলে রচনায় যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার স্বাভাবিক প্রবাহ যেন জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে, এমন স্বেচ্ছাচার কান কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। এই উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় বাক্যটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইহার অন্তর্গত 'এইটেই হোল গুটো ভাষার' এই কথাগুলি বাকি ভাষার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় নাই। সমগ্র বাক্যটি যেমন কথ্যভাষার জাতি রক্ষা করে নাই, তেমনই সাধুভাষাকেও অকারণে বিকৃত করিয়া যে বৈঠকী ভঙ্গীর চেষ্টা ইহাতে আছে—এ ধরণের সাহিত্যিক আলোচনায় তাহা আদৌ শোভন হয় নাই; অন্ততঃ, এই রচনার ভাষা তাহার উপযোগী হয় নাই।

দ্বিতীয়টির ভাষা আরও কৃত্রিম; যে সূক্ষ্ম বিচারমূলক চিন্তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কথ্যভঙ্গী পদে পদে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে; এ জন্য ইহাতে বাক্যরচনায় প্যাঁচই বেশি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—রবীন্দ্রনাথের শে ষ র ক বি তা - র ভাষায় এইরূপ প্যাঁচ কষিবার কারদা চরমে পৌঁছিয়াছে। এক কথায়, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এক্ষণে প্যাঁচ-কৌশল-সিদ্ধ কুস্তিগীর বা ভাষা-রচনায় acrobat হইয়া উঠিয়াছেন। যে সকল লক্ষণে কোনও সাহিত্যকে decadent বলা হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্যচর্চায় সেই decadence পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

• • •

অতঃপর ভাষার এই রীতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিনব আধুনিক মত যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি আবার ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহা মানিয়া লইলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূলোৎপাটন করিতে হয়। কথ্য ও সাধুভাষার আসল প্রভেদ উভয়ের ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে; এই ধ্বনিই ভাষার সর্বস্ব, বিশেষতঃ নব-যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই ধ্বনির ঐশ্বর্যবিধান। ভাবব্যঞ্জনার অতি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাষার ধ্বনিরূপের মধ্যেই নিহিত আছে। ভাষার ভাবসংহতি এবং রসাত্মক ধ্বনিবিন্যাসের প্রয়োজনে সে যুগের প্রতিভা ভাষার

সংস্কৃত আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার প্রাণ-সাহিত্যের কথাভাষা বা চলতি বুলির ধ্বনিপ্রকৃতিই হীন। বস্তুতঃ তাহাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনার উপযোগী করিয়া তোলাই সে যুগের সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানই সে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সাধনালব্ধ ফলের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়া তবে বাংলার বাণীমন্দিরে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতকাল পরে, সাহিত্যিক জীবনের অবসানে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাছন্দের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে গতযুগের সমগ্র সাহিত্য অপবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই আলোচনায় তিনি চলতি ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিয়া তাহাকে এতখানি গৌরবদান করিতে প্রস্তুত যে, অতঃপর সাহিত্যরচনায় সাধুভাষার প্রয়োজনই অস্বীকার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মত-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চলতি ভাষার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ইতিপূর্বে প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সাধুভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। ১৩৩৮ সালের পরিচয় পত্রিকায় তিনি বাংলাছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> গদ্যের রীতি ও পদ্যের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে বিস্তর গহনা পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্যাদা রক্ষার জন্যে।
>
> * * * *
>
> আমার প্রাকৃত বাংলার জন্যে সংস্কৃত বাংলার অলঙ্কার আমি চাই না। একজন 'বিচিত্রা'য় লিখেছেন যে বাঙালী কবিরা সাধুরূপ ক'রে কবিতায় কবির চলিত প্রভৃতি প্রয়োগ না ক'রে কেন কথ্য চলিত প্রয়োগ করেন না? যদি প্রশ্নটার এই অর্থ হয় যে, অন্য স্থানে কেন করিনে তবে উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন অন্য স্থানেও কেন করিনে তবে তার উত্তরে বলব অন্য স্থানে ক'রে থাকি।

ছন্দবিজ্ঞানের ধারিধারী, বাংলা কাব্যে ধ্বনিমর্যাদার ঘোর-তর বিরোধী, পয়ারজাতীয় ছন্দের সুপরীক্ষিত সঙ্গীতগুণ সম্বন্ধে নাস্তিক, প্রাণকর্ষের পরিবর্তে যন্ত্র-কর্ষের ব্যবহারে পারঙ্গমী এক তরুণ ছন্দ-শিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিষ্ফল আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, তাহা এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন—

> আমরা বাংলার সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন বিষয়েই চলি—তার অঙ্কুশ কথা অসঙ্গত। তাই বাংলাকাব্যে এই দুই ভাষার ধারার ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন ছাঁদ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে পদ্ধতির গোমড়ামোচনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি যে কর্তব্যে। কারণ ছন্দের এই বিধির চলাই আমার বলবার গোড়া।

১৩৩৮ সালে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। প্রাকৃত বা লার প্রতি পক্ষপাত থাকিলেও তখন তিনি সংস্কৃত বাংলার রাজমর্যাদা স্বীকার করিতেন, এবং বাংলাভাষার এই দুই প্রকার ধ্বনিকেই ক্ষেত্রভেদে সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, 'গুড়িশ গোমর লেপনে', অর্থাৎ চলতি ভাষার রীতিই যে বিশুদ্ধরীতি, এই অনুজ্ঞাতে, সমস্ত একাকার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

*

কিন্তু গত বৈশাখের উ ধ ব ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই দুই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ সে মত পরিত্যাগ করিয়াছেন; সাধুরীতির যে একটা বিশিষ্ট ধ্বনি-মর্যাদা আছে, যাহা কথা-রীতির আয়ত্তে নহে, তাহাও তিনি আর স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে তিনি দুর্দান্ত ছন্দ-শাস্ত্রীর পক্ষেই যোগ দিলেন। এই লেখাটি পড়িলে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথ আর সাধুরীতিকে অপরিহার্য মনে করেন না, বরং সেই রীতির তুলনায় কথ্যরীতিকেই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কথ্যরীতির পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া তিনি এমনই অসম্বৃত হইয়া পড়িয়াছেন যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাব ও ভাষার যে অঙ্গেদাত্ত্ব অতিসাধারণ কাব্যরসিক স্বীকার করেন, তাহাও বিস্মৃত হইয়াছেন। যে পয়ারছন্দে বাংলা কাব্যলক্ষ্মী অপূর্ব গৌরব ও অসীম সম্ভাবনার মহান হইয়া উঠিয়াছে, মধুসূদনের সেই অমিত্রাক্ষরকেও হঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে তিনি হুতোম হুতোম ছন্দকে বসাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ডুগডুগি ও ডম্পীযন্ত্রের সাহায্যে তিনি পাখোয়াজের বোল বাজাইতে পরামর্শ দিয়াছেন! "আমরা ভুঁই পেলেই খুসী হব, ভুঁই খেলে আর বাঁচব না"—ঈশ্বর গুপ্তের এই ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> কেবল এর হাসিটা নয়, ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গীটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়। অথচ এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য

লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোতো সে কথা স্বীকার করব না।

কাজটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

তুচ্ছ তখন লাগ্ত হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে শেষে ফেললেন যুদ্ধে সবে

('যমের বাড়ী' নয় কেন ?)

যৌবরাজ্য পায় না যেই। কত যে দুরন্ত,
অস্ত্রসহ বাক্য তোমার, সেনাবাক্ষ পরে
কোন্ বীরকে যম্ করে পাঠিয়ে দিলেন ভবে
রঘুকুলের পক্ষ তিনি, রক্ষকুলের নিধি।

—এতে গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।

এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের সমগ্র সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সেকালের লেখকেরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছিলেন, মধুসূদনের নূতন ভাষা ও ছন্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহা অপেক্ষা এই ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্য কম নয়। কিন্তু এ ভুল রবীন্দ্রনাথও করিয়াছিলেন—বাহাত্তরে পৌঁছাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি যাহা বুঝিলেন, বঙ্কিম-মধুসূদন তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ত' বাহাত্তর হয় নাই! আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীও মে ঘ না দ ব ধে র এমন পারডির মত প্যারাফ্রেজ করিতে পারিল! কোনও কাব্যের বিশিষ্ট ভঙ্গীর এতটুকু অঙ্গহানি করিলেও সে যে ভিন্ন বস্তু হইয়া দাঁড়ায়—এমন করিয়া তাহার সমগ্র ধ্বনিপ্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিলে যে শিব ভাঙিয়া বানর গড়া হয়,—এই অতি সাধারণ কথাটাও রবীন্দ্রনাথকে এমন অপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিল না! বাহাত্তর আর কাহাকে বলে?

• • •

'গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না'—এই যুক্তিই কি যথেষ্ট? এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কোনও সাহিত্যিক সন্দীপ যদি 'বলাকা' কবিতাটির রীতি বদলাইয়া দেয়, অথবা ঘটাং ঘটাং করিয়া তাল-ঠোকা ছন্দে 'পাঠান' কবিতাটি পড়িতে থাকে, তবে তাহার সেই বীরত্বব্যঞ্জনায় ব লা কা - র সেই কবিতাগুলির সুর কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ মে ঘ না দ-ব ধে - র মাত্র কয়েক ছত্র এই অপূর্ব্ব ছন্দে প্যারাফ্রেজ করিয়াছেন, সমগ্র মে ঘ না দ - ব ধ কাব্য-খানি একটানা এই ঢেক-প্রদক্ষী ছন্দে রচনা করিলে কেমন হয় তাঁহাকে লিখিয়া দেখিতে বলি না—কল্পনা করিতে বলি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'এই প্রাকৃত বাংলাতেই মেঘনাদবধ কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোতো সে কথা স্বীকার করব না'। ইহার উত্তরে বলি, বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া বড় শক্ত কাজ, তার প্রমাণ, এতদিন ধরিয়া তিনি নিজেই তাঁহার জাতিকে নানা প্রকারে লজ্জার পর লজ্জা দিতেছেন, তাহাতে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অতএব ও কথাটার কোনও অর্থ হয় না।

• • •

এই বক্তৃতাটিতে, গদ্যেও চলতি ভাষার প্রতাপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের কোনটাই বাকি রাখেন নাই। সাধুভাষার প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া এক-স্থানে তিনি বলিতেছেন—

> যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠস্বর, কেতাবের লেখনীরও নয়, ইংরেজীর মতো তাকে দূর যাত্রাবর্ণের সাগরে। আর সাধু-ভাষার ছকে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে দেখেছি, অথচ প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাবাল্য আছে বলেই যুক্ত বর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।

উপরিউদ্ধৃত উক্তিটি সাধুভাষার বিরুদ্ধে যে একটি আক্রোশমূলক অপবাদ তাহা এতখানি আলোচনার পরে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই উক্তিটির মধ্যে কয়েকটি অতিসত্য অযথার্থ কথা আছে। "অভিধান ঘেঁটে যুক্ত বর্ণের আয়োজন" —ইহা কোন্ যুগের সাধুভাষার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে?

যদি তৎসম শব্দ মাত্রেই 'অভিধান-ঘেঁটা' হয়, তবে বাংলা ভাষা দাঁড়াইবে কিসের উপর? 'অভিধান-ঘেঁটা শব্দগুলা' বাদ দিয়া যে খাঁটি গৌড়ী রীতির উদ্ভব হইবে, তাহাতে রবীন্দ্র-নাথের গদ্য ও পদ্যরচনাগুলি কল্পনা করা সম্ভব?—করিলে রবীন্দ্রনাথকে আর চেনা যাইবে? এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি যে কথা বলিয়াছেন—"বাংলায় হসন্তের প্রাবাল্য আছে ব'লেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে"—তাহা আদৌ ঠিক নহে। হসন্তের জোর আর যুক্ত বর্ণের জোর, এই দুয়ের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—এই জন্যই একই ভাষা দুইটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথই পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সে আলোচনার উল্লেখ আমি সবিস্তারে করিয়াছি। এক্ষণে হঠাৎ সেই সত্য তিনি অস্বীকার করিলেন কেন? হসন্তের জোর ও যুক্তবর্ণের জোর যদি এক হইত

তবে ভাষার এই দুই রীতি লইয়া কোন সমস্যাই থাকিত না। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই; তথাপি যাঁহাদের—কেবল ছন্দজ্ঞান নয়—ছন্দবোধ আছে, তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, হসন্ত ও যুক্তবর্ণের বিন্যাসজনিত ছন্দধ্বনি এক নহে, রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতার ধ্বনিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। একটি সাধুরীতির পয়ার জাতীয় ছন্দেরই রূপভেদ, অপরটি চলে চল্‌তি ভাষার চালে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিও যথার্থ নহে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত আদর্শ-বাংলাগদ্যের যে নমুনা দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি এমন একটি খাঁটি ভাষা চান যাহাতে হসন্তেরই প্রাধান্য থাকিবে, 'অভিধান হেঁটে যুক্ত বর্ণের আয়োজন' মোটেই থাকিবে না, অর্থাৎ কথ্যভাষার পাণ্ডারা এ পর্যন্ত যে ভাষার গৌরব করিয়াছেন তাহাও খাঁটি নহে, উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনার সংস্কৃতের গন্ধও না থাকিলে চলিবে। সেই পরম পবিত্র গদ্যরীতি এতদিন কেহই জানিত না, এই বক্তৃতাটির মধ্যেই তাহা প্রথম ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। এ গদ্য এতদিন বাংলা ভাষার চোর-কুঠরীতে গুৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া সাহিত্যের বৈঠকখানায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> (১) প্রাকৃত বাংলার গদ্যের প্রতি বিদেশীরা কান দিয়ে দেখলে খুব সাধুরীতির বাংলার থেকে তার সুরের তফাৎ চতুর্থাংশ। একটা ঝড়ের বর্ণনা করা যাক—একটু ফলাও আয়োজন দেখ, যাতে সে ফেলতে পারে। শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি না হয় এই কামনা করি।

আমরা ততটা ফলাও করিয়া উদ্ধৃত করিতে পারিব না, খানিকটা তুলিয়া দিলাম।

> (২) উত্তর দক্ষিণের আর যাবখানে লোনা ফেন সোঁ সোঁ করে হাঁপিয়ে-ওঠা একটা আক্রোশে, এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার, শুকনো ধুলোর ঘন-আটকানো তুফান। বাতাসের ঝুঁটকা আসে, চুঁড়ে চুঁড়ে চড়ায় ডালের টুকরো, শুকনো পাতা, জেগে থাকে ছিটোতে থাকে বাঁকড়াগুলো; আকাশটা যেন ছুতে পাগলা। পশ্চিম উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে, ঘন আঁধার ভিজে থেকে উঠছে বাষ্পের শ্বেতের উত্তরীয় ঢাকা, ঘুরে ঘুরে ঘাটে ঘাটে হৈ হৈ রব। ঘোলা ফেন না কোন্ দিকে ঝড়ের ঝুলাড় কোরে কি একটা তেজোচুরে পড়ল, বুক দুরদুর করছে, ভাবনা উঠছে কী হোলো কী হোলো। ঝাকগুলো মাটির উপর মুখ থুবড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে ঘাস কামড়িয়ে, ঘাসা ফেরে ঘাড়ে লেজ মেরে, কটমট করতে লাগলো। নদী সুদ্ধ ঘাসগুলো ঝড়ের তাড়ায় লুটিয়ে লুটিয়ে ধরণী বোধে চাল আছড়িয়ে মেরাই পাড়তে লাগল। ঐত হারেরা অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে, সাঁই সাঁই চালাচ্ছে পক্ষের ছুরি।—ইত্যাদি।

ইহারই নাম সর্বোৎকৃষ্ট আদি ও অকৃত্রিম বাংলা গদ্যভাষা। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না—ভয় হয়, কারণ এ গদ্য 'লুটচে গাঁসা শব্দে শুঁড় আছড়িয়ে।' ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি রচনাটির গুণ পরীক্ষা করা যায় তবে বলিতেই হয় যে, এমন কৃত্রিম রিয়ালিষ্টিক বর্ণনা কোনও সৎসাহিত্যে মিলিবে না। ভাষাও যেমন রিয়ালিষ্টিক বর্ণনাও তেমনই। যদি কোনও রচনায় রিয়ালিজম্ ও কৃত্রিমতা সমপরিমাণে মিশ্রিত হয়, তবে তাহার ফল যাহা হয় এ রচনায় তাহাই হইয়াছে—আদায় ও কাঁচকলায় মিলিয়া উপাদেয় রস উৎপাদন করিয়াছে। এই ঝড়ের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে সত্যই মনে হয়, 'বুক দুর দুর করছে, ভাবনা উঠছে কী হোল কী হোল' ('ভাবনা উঠছে'—কি চমৎকার খাঁটি বাংলা!)। সাধুভাষার দুই চার লাইনে যে ছবি ফুটিয়া উঠে এখানে সে ছবি একেবারে কদ্বরময় হইয়া উঠিয়াছে—ভাষার কারদানি করিতে গিয়া ছবিটি বর্ণহীন হইয়াছে। 'ডাক-ছাড়া জন্তু,' 'হাঁপিয়ে-ওঠা হাওয়া' 'ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক' 'আঁতকে-ওঠা দমকা হাওয়া' —সমাসগুলির যেমন শ্রী, ছবিগুলাও তেমনই মনোহারী। বর্ণনার চূড়ান্ত হইয়াছে একটা লাইনে—'ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের গায়ে গায়ে ঘপ্‌ঘস্ করছে লাল আলো—যেন ছিটকে-পড়া রক্ত'। ছবিটা খুব 'দস-দশে' হইয়াছে সন্দেহ নাই, দেখিয়া মনে হয় কবির কাবালক্ষ্মী যেন মহীয়া হইয়া উঠিয়াছেন, চীৎকার করিয়া বলিতেছেন মম যুগা হুঁ। 'শুঁড় আছড়িয়ে', 'মুখ থুবড়িয়ে', 'ডাল আছড়িয়ে', 'ঠোঁট দিয়ে ঘাস কামড়িয়ে'—কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের এই বিকৃতি দেখিয়াও মনে হয়, কাবালক্ষ্মীর চোয়াল বাঁকিয়া গিয়াছে। মোটের উপর এমন কুৎসিত ভাষা ইতিপূর্বে কখনও পড়ি নাই। 'অভিধান-হেঁটা' শব্দ বর্জন করার চেষ্টায় ভাষার কি দুর্গতি! খাঁটি বাংলা সমাসগুলার কি শ্রী! তবু খাঁটি বাংলাই চাই—সংস্কৃতের নাম কেহ করিও না।

* * *

এ হেন গদ্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরম পাণ্ডিত্যের সহকারে বলিতেছেন—

এই কবিতার ভাষাকে তার স্বভাব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাধু গদ্যের সঙ্গে জোড়ে মেলবন্ধ জেতে পারে, যে প্রণালীতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শাড়ি শোধন করলে ছিপছিপে বধূ রীতি। পাঠকার ফুল মার্ক পাবার প্রলোভনেও এ নিষ্ঠুর কাজে অগ্রসর হোতে পারব না।

কিন্তু এখানেও তিনি ভুল করিয়াছেন। বধূ যদি ভিন্ন-দেশিনী হয় তবে তাহার রীতি সংশোধন করিবার প্রয়োজন আছে; এই যে বধূটিকে তিনি বাংলা সাহিত্যের সংসারে প্রবেশ করাইতে চান, ইহার রীতি ভিন্নদেশীয় ত বটেই, এমন কি, কোন্ দেশী তাহা ঠাহর করা যায় না। অতএব শান্তড়ীকে একটু শক্ত হইতে হইবে বৈকি! এ ভাষা গদ্যের ভাষাও নয়; ইহার শব্দসজ্জা কাব্যরীতিগ্রস্ত। ইহাকে যদি একটা বিচিত্র সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করা হয়,—লেখনীকণ্ডূয়নের একটা আর্টিষ্টিক ভঙ্গী, অথবা শব্দের একটা অপরূপ বুনানী বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাই যদি খাঁটি বাংলা গদ্যের নমুনা হয়, তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যতদিন না বাঙ্গালীর লেখনীকণ্ডূয়ন-রোগে বহুইকার-ব্যাধি আসিয়া যোগ দেয়, ততদিন এই অপরূপ গদ্য বাংলায় চলিবে না। ভগবান বাঙ্গালীর প্রতি নিশ্চয়ই এত নিষ্ঠুর নহেন।

* * *

বাংলা সাহিত্যে ভাষা-বিভ্রাটের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম, প্রয়োজন হয় তো ছিল না, কারণ এ বিভ্রাট সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, যাহারা এই বিভ্রাট ঘটাইতেছে তাহাদের পক্ষে শিক্ষিত রসজ্ঞ ব্যক্তিও যোগ দিয়াছেন। এ সকলের জন্যও ভাবনা ছিল না, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এ যুগের বাঙ্গালী আর যাই হোক—সাহিত্য-প্রেমিক নহে, তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। গত পঞ্চাশ বৎসরের প্লাবন নিঃশেষ হইয়াছে; এখন কিছুকাল সে খাত শুষ্ক থাকিবে। কিন্তু ইত্যবসরে যদি এমন করিয়া তাহা কর্দমে ভরিয়া উঠে এবং তাহার উপরে স্তরে স্তরে জঞ্জাল পচিতে থাকে, তবে সেই খাত যে বন্ধ হইয়া যাইবে! ভাষাই সেই খাত; এক্ষণে এই খাতকেই নিশ্চিহ্ন করিবার এক উন্মাদ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যাইতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিরদাক্ষিণ্যহীন বিলাস-কলা-কুতূহলের বশবর্তী হইয়া এক্ষণে যাহা করিতেছেন, তাহাতে আরও হতাশ্বাস হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার যে নমুনা সর্ব্বশেষে উদ্ধৃত করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই খাঁটি বাংলা বলিয়া দাবী করিয়াছেন; আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ভাষার স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করিতেছেন। জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি আর্টের নামে যে ধরণের আত্ম-বিলাসে মগ্ন আছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতিকেও তাহার মধ্যে টানিয়া, তিনি বোধ হয় সহমরণে লইয়া যাইতে চান। কথাটা শুনিতে কঠিন হইল বটে, কিন্তু প্রথম হইতে, আচরণে ইঙ্গিতে আধুনিক তরুণদিগকে, তিনি যে ভাবে প্রশ্রয় দিয়া আসিতে-ছেন, এবং শেষে, বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ও দৃঢ়বদ্ধ রীতিকে উৎখাত করিয়া, তাহার স্থানে একটা বেরসওহীন, কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ অনাবশ্যক রীতিকে খাড়া করিবার জন্য তিনি যে সকল ফাঁকা যুক্তি ও বাঁকা দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছেন, তাহাতে এই অবতারকল্প কবির অন্তর্যালীলা সম্বন্ধে অন্য ধারণা অসম্ভব। তাঁহার ইদানীন্তন যাবতীয় অধ্যবসায় জাতির শিক্ষাদীক্ষা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, এমন কি তাহার মনোজীবনের স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার পক্ষে ফলদায়ক হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যে অপরিমিত দান তাহা, ও তৎ-পূর্ব্ববর্তী সাহিত্যসম্পদ যাহাতে ব্যর্থ হয়, বাংলা সাহিত্যের অধোগতি যাহাতে দ্রুততর হয়, তাহার জন্যই যেন তিনি ভাষার আদর্শ ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার মতে, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু আমরা উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছি তাহা খাঁটি বাংলা সাহিত্য নয়, কারণ সংস্কৃত সাধুভাষারূপিণী রজ্জাল শান্তড়ীর শাসনে, এতদিন বাংলা সাহিত্যবধূর বুদ্ধি ফুটিতে পারে নাই। সম্প্রতি কলম্বো সহরের বক্তৃতায় তিনি তাঁহার দেশবাসীর সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, ও সেই সঙ্গে তাঁহার বিদেশী ভক্তগণের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বাংলাভাষায় বাঁচিবার আশাও ত্যাগ করিয়াছেন, বিদেশী ভাষাই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এ অবস্থায় বাংলা ভাষার প্রতি মমতা না থাকিবারই কথা। বাঙ্গালী তাঁহার প্রতিভার পূজা করিল না—এ ক্রন্দন সারা জীবনেও ঘুচিল না। পূজা যে কেমন করিয়া করিতে হয় বাঙ্গালী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, নতুবা এমন করিয়া ইহকাল পরকাল

খোয়াইয়াও তাঁহার মন পাইল না কেন? রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগের কারণ যাহাই হউক, তাই বলিয়া বাঙ্গালীকে তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা নষ্ট করিবার জন্য, যাইবার সময় তাঁহার সাহিত্যের ভাষাকে এমন করিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষেও শোভন নহে। বাঙ্গালী সর্ব্ব-প্রকারে মরিতে বসিয়াছে, তাহার প্রতি আর আক্রোশ করিয়া লাভ কি?

• •

এইবার সংক্ষেপে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাকৃত বা চল্‌তি বাংলার যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহা যে সাহিত্যের প্রয়োজনে নহে, এ কথা সাহিত্যিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যে ভাষা চিরদিন সাহিত্যের ভাষা হইয়া আছে, যে রীতি-ভঙ্গী শব্দপ্রয়োগ বা ছন্দ-নির্মাণে চিরদিন অনুসৃত হইয়াছে—নবযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ভাষা ও ভঙ্গীকে আরও সুসংস্কৃত ও সুরুচি করিয়া কবিকল্পনা গভীর ভাবে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া সহসা 'খাঁটি বাংলা'র এই হুজুগ যে নিতান্তই এক সম্প্রদায়ের ছন্দ, চরিত্র ও মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। খাঁটি বাংলা যে কেবল মৌখিক কথা বাংলাই নয়—চারিশত বৎসরের বাংলাসাহিত্য তাহার নিদর্শন। তথাকথিত প্রাকৃত রীতিও যে খাঁটি বাংলা নয় তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—খাঁটি বাংলা কেহ লেখে না, এবং সম্ভবতঃ আজিকার দিনে কেহ বলেও না। যে বাংলাকে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ মহারথীগণ চলতি বাংলা বলিয়া খাড়া করিতেছেন, তাহার অপেক্ষা কৃত্রিম ভাষা কল্পনা করাই যায় না—সাধু ভাষা তাহার তুলনায় অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বাংলাভাষার যে দুইটা রীতি কি ছন্দে কি বাচনভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার না করিলেও, এবং একই ভাষার পক্ষে এই দ্বৈত-পদ্ধতি অসাধারণ বলিয়া মনে হইলেও, এই দুই রীতির মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ত রীতি, সর্ব্ববিধ ভাবব্যঞ্জনার পক্ষে এবং পূর্ণশক্তি ও সৌন্দর্য্য-গুণের আধার হিসাবে কোন্ রীতি সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে—সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র আর নাই। যাহাকে খাঁটি কথা রীতি বলা যাইতে পারে—সে ভাষা মৌখিক বক্তৃতা, উপদেশ, রূপকথা, বৈঠকী আলোচনার ভাষা হইতে পারে—বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা অনুসারে সাধু বা চলতি ভাষার ব্যবহার লেখকের রুচি অনুযায়ী হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু সাহিত্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন—সাধু-ভাষার সকল কাজই চলিতে পারে, চল্‌তি ভাষা একেবারে বর্জ্জন করিলেও ক্ষতি নাই। বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতম উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস ইহার সাক্ষী। কিন্তু চল্‌তি ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি এমনই যে, ইহাতে ভাবচিন্তা বা কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করা যায় না। স্থানাভাবে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিব এবং ইচ্ছা করিয়াই একটি কবিতার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ অনেকেই ইহার আবৃত্তিও শুনিয়াছেন। এই কবিতাটি সাধুভাষায় ও সাধুছন্দে রচিত। ইহার কথাবস্তু ও বর্ণনায়, ভাবের মত ভাষার সকল গুণ সন্নিবিষ্ট আছে; একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহে মিলিত হইয়া অতি সহজ ও সরল নাটকীয় কথাবার্ত্তা হইতে ভাব-কবিত্বময় উচ্চাঙ্গের অলঙ্কৃত বাণী এই রচনাটিকে একটি অনবদ্য কাব্য-সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে—এত সরল, এত জীবন্ত অথচ এমন রসগভীর কথাচিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে সাধু রীতি কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে নাই, বরং অন্য রীতিতে তাহার ধ্বনিব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হইত, টিলে-টালাছন্দে ও কথ্যভাষার ভঙ্গীতে উহা যে কি হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ভাষার এই সাধুরীতিই প্রশস্ত রীতি, তাহা বর্জ্জন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই—বরং সে রীতি নষ্ট করিলে সাহিত্যসৃষ্টিই বাধা পাইবে। এই সাধুরীতিকে সাধু বা পণ্ডিতী রীতি বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কোনও কারণই নাই—এই রীতিই বাঙ্গালার চিত্তপ্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিন্তা ও কল্পনাকে মার্জ্জিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত, এবং তাহার মনের মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও ঋজু করিয়াছে। ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়—ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙিতে চায় ও পারে—তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙ্গালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?

জাতীয় ভাষা

—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পূর্ব্বে একটি নিবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভাষা জাতির সম্পত্তি, কোন ব্যক্তির নহে, এবং ভাষার দ্বারা জাতীয় পরিকল্পনা সর্ব্ব বিষয়ে প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। ভাষা ও জাতি সম্বন্ধে এই দুইটি প্রস্তাব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া এখন জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। জাতীয় জীবনে ভাষার স্থান কোথায়, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। ভাষা ও বচনের যে সংজ্ঞা ও সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা অবশ্যই অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রবন্ধসৌকর্য্যের অনুরোধে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে না।

ভাষার উপাদান তিনটি,—শব্দ, বাক্য ও ছন্দ। এই তিনটি উপাদানের পরিপূর্ণ সমন্বয় ব্যতিরেকে প্রকৃত ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। অভিধানগত শব্দ সমজাতীয় কতক-গুলি পরিকল্পনার সাধারণ অংশটুকু মাত্র সূচিত করে (Bergson), কিন্তু শব্দের এই অর্থ অলীক ও অসম্পূর্ণ, কারণ কোনও একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শব্দদ্বারা শব্দোত্তর কোন বিশেষ অর্থের সূচনা না হইলে শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। বাক্যবদ্ধ হইলে শব্দের এই শব্দোত্তর অর্থ সূচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। বলাই বাহুল্য যে, বাক্যভেদে শব্দোত্তর অর্থ টুকুও পৃথক্ হইবে। কিন্তু বাক্যের সার্থকতা ইহাতেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে বাক্য শব্দসমষ্টি মাত্র, কিন্তু সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ভাবপ্রকাশে বাক্যের শব্দাতি-রিক্ত একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শব্দের সাহায্যে বহু বিভিন্ন বাক্য রচনা করা সম্ভব—ইহা দেখিয়াই এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শব্দার্থ ও বাক্যার্থ যে পরস্পরনিরপেক্ষ বা পরস্পরের পরিপন্থী হইতে পারে না তাহাও সুস্পষ্ট। বাক্যার্থ সর্ব্বতোভাবে শব্দোত্তর এবং শব্দার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর; এই সূক্ষ্মতর বাক্যার্থের আশ্রয়েই শব্দের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এখন শব্দের সহিত বাক্যের যে সম্বন্ধ বাক্যের সহিত ছন্দেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। বাক্যের শাসন মানিয়া না চলিলে শব্দ অর্থহীন ধ্বনিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়—কিন্তু বাক্যও একটি স্বাধীন সত্তা নহে। প্রতি ভাষার একটি আপন ছন্দ আছে। যে বাক্যে এই ছন্দের নিগূঢ়তম সৌরভটুকু প্রকাশ না পায় সে বাক্য প্রাণহীন, নিষ্পন্দ। সে বাক্যে যুক্তিতর্ক চলিতে পারে,—পাণ্ডিত্যও দেখান যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরের কথা কোন দিনই তাহাতে প্রকাশ পাইবে না। যে অর্থ শব্দ বা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না তাহা ধরা দেয় এই ছন্দে। শব্দ বা বাক্য ভাষার খণ্ডরূপ মাত্র। কিন্তু খণ্ডরূপে ছন্দের পরিকল্পনা অসম্ভব, সমগ্র ভাষার উপর ইহার পরিব্যাপ্তি। ভাষায় প্রকাশিত সমগ্র ভাবসমষ্টি এই ছন্দের সৌরভে সমভাবে অনুপ্রাণিত। যে ভাব এই ছন্দের গতি ও রতি মানিয়া চলে না জাতীয় ভাষায় ও জীবনে সে ভাবের স্থান নাই।

ভাষার উপাদানগুলি এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। এখন তাহাদের প্রত্যেকটির পৃথক বিবরণ প্রয়োজন।

সকল ভাষায় শব্দের ধর্ম্ম একরূপ বলিয়াই মনে হয়,—সুতরাং শব্দবিচারে বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্যমূলক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু সামান্য ভাবে আলোচনা করিলেই চলিবে, ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলির উৎপত্তি কোন্ অবস্থায় সম্ভব হইতে পারে এবং সেই শব্দদ্বারা মানব-মনেরই বা কি পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে 'লাল' কথাটিকে জাতীয় শব্দ ভাণ্ডারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা হইয়াছিল। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক, কোন্ অবস্থায় 'লাল' এই শব্দটির উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, পৃথিবীতে যদি লাল রংয়ের একটি মাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে 'লাল' কথাটির উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না। অনন্ত বিশ্বের বস্তুভাণ্ডারে একটিমাত্র পিণ্ডে সঞ্চিত হইয়া থাকিলে তাহার স্থিতি ও গতির পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়িত; সেইরূপ একটি মাত্র বস্তুতেই 'লাল' রংটি যদি নিঃশেষিত হইয়া যাইত তবে ঐ নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সংজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র কোন সংজ্ঞা 'লাল' রংটির জন্য প্রয়োজন হইত না, কারণ ঐ বস্তুটি হইতে পৃথক অবস্থাতেও লাল রংয়ের যে

একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব তাহাই সে অবস্থায় ধারণা করা সম্ভব হইত না। একাধিক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে লাল রংটিকে সাধারণ গুণ রূপে বর্তমান দেখিয়া তবে মানুষ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এই চেতনা আসিবার পূর্বে লাল রং বুঝাইবার জন্য কোন বিশেষ শব্দের প্রয়োজনীয়তা কখনই অনুভূত হয় নাই। কিন্তু একাধিক বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণ রূপে বর্তমান দেখিলেই যে মানুষ লাল রংয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে একথা মনে করা ভুল। প্রকৃত প্রস্তাবে যে মানুষ তথ্যোজনা দ্বারা তথ্যোত্তর যৌক্তিক সত্তা নির্ণয় করিতে শিখিয়াছে কেবল তাহারই পক্ষে ইহা সম্ভব। অর্থাৎ যে মানুষ আমাদের পরিচিত প্রণালীতে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে সেই কেবল ঐরূপ অবস্থায় রংটির নামকরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবে। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে সেইজন্য দেখা যায় যে, তাহাদের ভাষায় লাল পাখী, লাল পশু প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক সংজ্ঞা আছে, কিন্তু শুধু লাল রংটি বুঝাইবার জন্য কোন শব্দ নাই; এমনও দেখা যায় যে, অসভ্য জাতির ভাষায় লাল পাখী, নীল পাখী, সাদা পাখীর জন্য পৃথক্ পৃথক সংজ্ঞা আছে, কিন্তু আসলে পাখীর কোন সংজ্ঞা নাই।

এখন বিবেচ্য, 'লাল' শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা সকল শব্দ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা। "লাল" শব্দটি গুণবাচক; তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে বস্তুবাচক শব্দ সম্বন্ধেও সে কথা খাটিবে কি? এই প্রশ্নের দুইটি দিক আছে। সংজ্ঞাকরণ বিষয়ে গুণ ও বস্তুর প্রকৃত কোন পার্থক্য আছে কিনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যে চিন্তাশক্তির ফলে অপেক্ষাকৃত সভ্যভাষায় 'লাল' এই শব্দের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে, সেই চিন্তাশক্তি সভ্য ও অসভ্য মানুষের মনে একই প্রণালীতে কার্য করে কিনা। আপাতদৃষ্টিতে গুণ ও বস্তুর ব্যবধান অতি বিরাট বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতি Kantএর পরিভাষা প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রতীত হইবে এ দুইয়ের সম্বন্ধ কত নিকট। Kant গুণকে বলিয়াছেন Zustand এবং বস্তুকে বলিয়াছেন Gegenstand, অর্থাৎ বস্তুর এক একটি বিশেষ অবস্থাকেই বলে গুণ। কিন্তু গুণ ও বস্তুর প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে নাই, কারণ আমাদের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত সরল, কেবল নামকরণ ব্যাপারে ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ সেইটুকু বুঝিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এখন পূর্বনিবন্ধ হইতে স্মরণ করিতে হইবে যে গুণ বা বস্তু সম্বন্ধে ভাষায় যাহা ব্যক্ত হয়—তাহা তৎসম্বন্ধীয় অনুভূতির উপলব্ধ রূপ মাত্র। কোন বস্তুকে সমগ্রভাবে অনুভব করা কিন্তু অসম্ভব, বস্তুর এক একটি বিশেষ অবস্থা (অর্থাৎ গুণ) মাত্র এককালীন মানুষের অনুভূতি-গোচর হইয়া থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ অনুভূতি পক্ষে, বস্তু কতকগুলি বিশেষ গুণের সমন্বিত সমষ্টি মাত্র; ইহাই বস্তুর প্রকৃত সংজ্ঞা কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই আমাদের মূল প্রশ্নের প্রথমাংশের সমাধান হইল। এখন কেবল দ্বিতীয়াংশ অবশিষ্ট রহিল। আমরা দেখিয়াছি যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় সভ্য মানব আপন অনুভূতি বিশ্লেষণ করিয়া তথ্যোত্তর যৌক্তিক সত্তা নির্ণয় করিতে শিখে বলিয়াই বস্তুনিরপেক্ষ একটা অলীক লাল রংয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠে। ইহাতে মনে হইতে পারে যে 'লাল' জাতীয় শব্দগুলির উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে এই বিশ্লেষণ-শক্তির (অর্থাৎ তথাকথিত চিন্তা-শক্তির) উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, মানুষের চিন্তা-শক্তিও মূলতঃ অনুভূতি হইতে অভিন্ন, তখন কিন্তু আর একথা বলা চলিবে না। মনন বা চিন্তা কাহাকে বলে? এ প্রশ্নে পৃথিবীস্তদ্ধ সমস্ত মনস্তত্ত্ববিৎ হুঙ্কার দিয়া আপন আপন উত্তর করিবেন, কোন্ উত্তর বাছিয়া লইব তাহাই সমস্যা। Bertrand Russell চিন্তার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই আপাততঃ মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সুচিন্তিত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। তিনি বলিয়াছেন 'চিন্তাশীল' মানুষের মনে কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতি জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত দৃঢ়সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; এই সূক্ষ্ম অনুভূতিশ্রেণীর সহিত অপর অনুভূতির তুলনা করার নামই চিন্তা করা। অতএব দেখা যাইতেছে, কি বস্তুর দিক হইতে, কি ব্যক্তির দিক হইতে, নামকরণ বিষয়ে গুণ ও বস্তুর প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। সর্বত্রই যে এ বিষয়ে গুণ ও বস্তুর অনন্যতা সমভাবে সুপরিস্ফুট হইবে তাহা অবশ্য নহে।

শব্দসম্বন্ধে এইবার সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে। সভ্যজাতির ভাষার শব্দসংজ্ঞা সচেতন চিন্তার ফল। যে নৈসর্গিক নিয়মের বলে দুইটি গ্রহ পরস্পরকে আকর্ষণ করে

বা ভূমিতে বীজ পতিত হইলে আপনা হইতেই অঙ্কুর জন্মে. ভাষার শব্দসৃষ্টি সেই নৈসর্গিক নিয়মের বশে হয় না। ভাষার শব্দভাণ্ডার সমষ্টি-মানবের সচেষ্ট মনন ও চিন্তার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে।· সমষ্টি মানবের এই মনন-প্রচেষ্টার সহিত তাহার সমস্ত অতীতের স্মৃতি বিজড়িত, যে অতীত একান্তই তাহার আপনার; তাই তাহার সেই মননপ্রসূত শব্দও নিতান্তই তাহার নিজস্ব ধন, যে ধনের মর্যাদা অপর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। জাতীয় ভাষার ইহাই জাতীয় শব্দ। এ শব্দের লক্ষণ এই যে তাহাতে কেবল মাত্র বক্তব্যমাণ বস্তুরই পরিচয় পাওয়া যায় না, বক্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশের যে ব্যাকুল প্রয়াসের ফলে কবিতার সৃষ্টি, শব্দসংজ্ঞার পিছনেও সেই ব্যাকুল প্রয়াস সমভাবে বর্তমান। এক একটি শব্দ বীজাকারে এক একটি কবিতা।

সভ্যজাতির ভাষার শব্দ সম্বন্ধেই এ কথা বলিতেছি। যে সব মানুষের আপন অনুভূতি বিশ্লেষণের ক্ষমতা আদৌ জন্মায় নাই তাহাদের ভাষার শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। এখানে সাধারণতঃই প্রশ্ন উঠিবে, মানুষ তো একদিনেই সভ্য হইয়া উঠে নাই, সভ্য জাতিও তো একদিন অসভ্য ছিল! সেই আদিম অসভ্য যুগে প্রচলিত যে শব্দাবলী আধুনিক সভ্য ভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে—সেগুলিকে কোন্ পর্যায়ে ফেলিব? এ প্রশ্ন কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। Lévy-Brubl প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে ভাষা বিষয়েও আদিম মানবের কল্পনা ও চিন্তাপ্রণালী সভ্য মানুষের কল্পনা ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত সমজাতীয় নহে; অঙ্কুর ক্রমোন্নতির ফলেই যে আদিম মানব ক্রমশঃ সভ্য মানুষের অনুরূপ প্রণালীতে মননশীল হইয়া উঠিবে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। আসল কথা সভ্যমানুষ 'আদিম যুগেই 'সভ্য' ছিল। (Lévy Brubl-এর "Les fonctions mentales dans les société inférieures" ও "L' ame primitive" বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।) অতএব শব্দ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে সভ্যজাতির ভাষার সকল শব্দ সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য।

শব্দের আলোচনা একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কারণ শব্দই ভাষার মূল উপাদান,—তদুপরি শব্দের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সরল। কেবল যুক্তির সাহায্যে বাক্য বা ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, এ ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাহিত্যিক-সুরাপী হওয়া প্রয়োজন, যাহা নহিলে ভাষা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মিতে পারে না। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে: লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা আন্তরিক সহানুভূতিও এস্থলে প্রয়োজন, নহিলে একের অর্থ অপরে বুঝিতে পারিবে না। কারণ বাক্য ও ছন্দ দুইই 'শব্দোত্তর'।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শব্দার্থকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করাতেই বাক্যের সার্থকতা নিঃশেষিত হইয়া যায় না। তদ্ভিন্নও বাক্য এমন একটি সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করে, যাহা কোন অবস্থাতেই শব্দের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহাকেই বলিয়াছি 'বাক্যার্থ'। শব্দ ও বাক্য যে সমধর্মী তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে অর্থ প্রকাশের জন্য একটি বাক্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেই অর্থে 'একটি' বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিলেই তো চলে, বাক্যের প্রয়োজন কি? শিশুদের ভাষায় বাস্তবিকই সম্পূর্ণ বাক্যের পরিবর্তে একটি মাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশু কোন প্রকারে খাদ্যের নামটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে এবং সে খাইতে চায়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষায় ইহার ঠিক বিপরীত প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। ভাষাতত্ত্বে যাহাকে holophrasis বলে তাহাই এই সব ভাষার প্রধান লক্ষণ, ইহাতে সমগ্র বাক্য একটি মাত্র শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইবে, শব্দ ও বাক্য বাস্তবিকই সমজাতীয়। কিন্তু প্রতি ভাবার্থ প্রকাশের নিমিত্ত নূতন একটি শব্দ প্রয়োগ করিলেই যদি কাজ চলিয়া যায় তবে আর শব্দযোজনা দ্বারা বাক্যসৃষ্টি করার কি প্রয়োজন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভাষার শব্দসংখ্যা যাহাতে অপরিমেয় না হইয়া পড়ে এই উদ্দেশ্যে মানুষ এক নির্দিষ্ট অবস্থায় আর নূতন শব্দ সৃষ্টি না করিয়া শব্দযোজনা করিয়া বাক্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একথা কিন্তু সত্য নহে। শব্দালোচনা উপলক্ষেই দেখা গিয়াছে যে, অনুভূতি বিশ্লেষণে অসমর্থ আদিম মানব সভ্য মানুষ অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। আদিম মানবের জ্ঞানের ক্ষেত্র অবশ্য অত্যন্ত অপরিসর, এই জন্য তাহার শব্দভাণ্ডার সভ্য মানুষের বাহুল্যবর্জিত শব্দভাণ্ডার অপেক্ষা বৃহত্তর না হইতেও পারে, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, দৈনন্দিন জীবনে

আদিম মানব সভ্য মানুষ অপেক্ষা অধিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অথচ ভাষার ভাষাতত্ত্বি পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিভক্তি প্রয়োগ লুপ্ত হওয়ায় শব্দের অর্থপ্রকাশের ক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং যে পরিমাণ নূতন শব্দের প্রচলন হইয়াছে তাহা নূতন জ্ঞানের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, মানুষ যে শব্দপ্রাচুর্য্যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্য শব্দের স্থলে বাক্যের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, যে ভাব বা অর্থ শব্দে প্রকাশ করা যায় না, অথবা আংশিক ভাবে মাত্র প্রকাশ করা যায়,—তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য শব্দযোজনা করিয়া বাক্যরচনার প্রচেষ্টা। এতদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শব্দোত্তর বাক্যার্থ একটি অলীক বস্তু নহে। এখন এই বাক্যার্থের পরিচয় কোথায় পাইব? স্বভাবতঃই মনে হয়, যেখানে শব্দ ও বাক্য অথবা বাক্যাংশ আপাত-দৃষ্টিতে অভিন্ন অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানেই এই বাক্যার্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদিও স্বাচ্ছন্দ্যান্বেষী মানুষ দৃষ্টান্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যুক্তির দুরূহ পথ হইতে সহজেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তথাপি এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিতে হইবে, নতুবা শব্দার্থে বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ বুঝান যাইবে না। Alexanderকে অনেকে অনেক সময় Philip's warlike son বলিয়া থাকেন। ঐরূপে Napoleonকেও অনেক সময় Corsican ogre বলা হইয়া থাকে। এই দুইটি বাক্যাংশ Alexander ও Napoleonএর আখ্যা মাত্র নহে, এগুলি তাহাদের আসল নামের মতই অভিধান। বাক্যার্থ সম্বন্ধে আমার মত যদি সত্য হয়, তবে এই দৃষ্টান্ত হইতেই তাহার রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সহজ সরল শব্দ হাতের নিকট থাকিতে মানুষ এইরূপ অপরিস্ফুটার্থ বাক্যাংশের বশবর্ত্তী হইতে গেল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট। সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে Alexander ও Napoleonকে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই এই দুই বাক্যাংশ-প্রয়োগকারীর উদ্দেশ্য নহে, সে তদ্দ্বারা তাহাদের প্রতি নিজের মনোভাবও ব্যক্ত করিতে চায়। আরও বিবেচনার বিষয় এই যে Alexander ও Napoleon সমপর্য্যায়ের লোক, Alexander এরও আসলে Macedonian ogre নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক অধিকাংশ লোকের মনে Alexander এর প্রতি শ্রদ্ধা আর Napoleonএর প্রতি অশ্রদ্ধা। তাই লোকে আজ Alexanderকে আদর করিয়া Philip's warlike son বলিয়া তাকে এবং Napoleonকে Corsican ogre বলিয়া ঘৃণা করে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, বাক্য বা বাক্যাংশের দ্বারা বক্তার যে মনোভাব প্রকাশিত হয় তাহা কি পরিমাণে বক্তার আপন প্রকৃতিসাপেক্ষ এবং বক্ষ্যমান বস্তু নিরপেক্ষ।

বাক্যার্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইটুকুই। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বাক্য সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, যদিও তাহাতে যে সন্দেহের অবকাশ রহিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শব্দ ও বাক্য মূলতঃ সমধর্ম্মী। শব্দে যে অর্থ বীজাকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বাক্যে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। প্রকাশের প্রচেষ্টা যদি তীব্র হয় তবে শব্দে আর কুলায় না, মানুষকে তখন বাক্যের বশবর্ত্তী হইতে হয়। অতএব শব্দসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে বাক্যসম্বন্ধে তাহা আরও অধিক মাত্রায় সত্য। বাক্যরচনা দেখিয়াও শুধু বক্ষ্যমান বস্তুর নহে, বক্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তার কৃতিত্ব শব্দে সুপরিস্ফুট নহে, কিন্তু বাক্যে সুপরিস্ফুট। প্রতি ভাষায় বাক্যরচনার প্রণালী বিভিন্ন। প্রতি ভাষার বাক্যে সমষ্টি-মানব ক্রমশঃ আপনার বিশেষ একটি প্রকাশপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বত্রই কিন্তু তাহার আপনার সৃষ্ট এই বাক্যপদ্ধতি তাহারই চিন্তাশক্তিকে চিরন্তন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। সমষ্টি-মানবের চিন্তাস্রোত তাহার বাক্যপদ্ধতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভিন্ন অন্য পথে প্রবাহিত হইতে পারিবে না। মানুষের চিন্তা যদি সেই প্রণালী উল্লঙ্ঘিত করিয়া স্বাধীনভাবে ছুটিতে চায় তবে তাহা দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাই হারাইয়া ফেলিবে। পূর্ব্বনিবন্ধে শব্দের চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিবার শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাক্যসম্বন্ধেও স্মরণীয়।

বাক্যোত্তর ভাব বা অর্থ ধরা পড়ে ছন্দে। কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব বা অর্থ নহে, ভাষায় প্রকাশিত সমগ্র ভাবসমষ্টির সাধারণ প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয় এই ছন্দের দ্বারা। যে কোন ভাব ভাষায় ব্যক্ত হউক না কেন ভাষার ছন্দের সংস্পর্শে

আসিয়া সে ভাব তখনই ছন্দানুরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। এই ছন্দের সৌরভে অনুপ্রাণিত না হইলে কোন ভাবই জাতীয় ভাষায় স্থান লাভ করিতে পারে না। ইহাই আমার বিশ্বাস, যদিও এ সম্বন্ধে পাথুরে প্রমাণ দিতে পারি না এবং দেওয়া সম্ভব বলিয়াও মনে করি না। প্রতি ভাষার যে একটি নিজস্ব ছন্দ আছে তাহা বোধ হয় আর চেষ্টা করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না; কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধার আলোচনা বিশেষ কিছু হইয়াছে বলিয়া জানি না। অল্পদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক Sutherland তাঁহার The Medium of Poetry নামক পুস্তিকায় ইংরাজী ভাষার ছন্দ সম্বন্ধে (বলাই বাহুল্য, এখানে কবিতার ছন্দের কথা হইতেছে না) কিছু আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আসল প্রশ্ন উত্থাপন করিতেই তিনি সাহস করেন নাই। জার্ম্মান ভাষা সম্বন্ধে অবশ্য এবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লওয়া কঠিন। Ruta বলেন Goethe'র ছন্দ ইটালীয়, Schiller-এর ছন্দ প্রকৃত জার্ম্মান এবং Heine'র ছন্দ আসলে ফরাসী। এইরূপ সিদ্ধান্ত লেখকের আপন সাহিত্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মান ভাষার এই তিন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনার ছন্দ পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই মনে হয় যে, Goethe-এর তীব্র আবেগময়ী কবিতার মধ্যেও একটি উদাত্ত গম্ভীর ছন্দ প্রতিধ্বনিত। যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের কোন অবকাশ নাই সেখানেও যেন Schiller-এর ছন্দে তাঁহার ব্যক্তিত্বের তীব্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। লঘু ছন্দে গুরুভাব প্রকাশ করাই Heine'র বিশেষত্ব;—জার্ম্মান ভাষায় ফরাসী feuilleton রীতির প্রচলনই তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি। কিন্তু এজন্য যদি Rutaএর ভাষায় বলি, Goethe'র ছন্দ dunkel-weich, Schiller-এর ছন্দ hell-hart এবং Heine'র ছন্দ hell-weich তবে নিশ্চয়ই আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ছন্দের সম্পূর্ণ লক্ষণ নির্দ্দেশ কেবল যুক্তির ভাষায় সম্ভব হইবে না। অথচ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভাষার সকল অংশের মত ছন্দেরও ভিত্তি মানুষের মনে। জাতীয় ভাষার ছন্দ জাতীয় সভ্যতার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা যাইতে পারে সভ্যতার অনুকূলতা আশ্রয় করিয়াই ছন্দের অস্তিত্ব। অপরদিকে কিন্তু মনে হয় এই ছন্দধারাই অনেক বিষয়ে সভ্যতার রূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মনে হয় না কি, যে, ফরাসী ভাষার সর্ব্বতোমুখী শুচিতার প্রভাবেই ফরাসী জাতি moral inelegance-এর কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? এই ছন্দ যে শব্দ ও বাক্যনিরপেক্ষ তাহা Chaucer-এর সমালোচনায় Matthew Arnold স্পষ্টরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন Chaucer-এর ভাষার অতি সামান্য পরিবর্ত্তন সাধনেই যদিও তাহা আধুনিক ইংরাজিতে পরিণত হয় তথাপি কবিতার প্রাণ তাহাতেই নষ্ট হইয়া যায়। যাহারই কিছু মাত্র প্রকাশের শক্তি আছে সেই আপন প্রয়োজন মত শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ করিতে পারিবে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিও ভাষায় নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না। উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শব্দ ও বাক্য মানুষের সচেতন মননশক্তির উপর নির্ভর করে; ছন্দ কিন্তু মানুষের অচেতন অনুভূতি প্রসূত। অনুভূতি বিশ্লেষণের ফলেই সভ্য মানুষের ভাষার শব্দ ও বাক্যের উৎপত্তি, কিন্তু ছন্দ যে অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। এক্ষণে বুঝা যাইবে ভাষা ও ছন্দের সাদৃশ্য থাকিলেও সভ্যতা কেন অনেক সময় বিপরীতমুখী হইয়া থাকে। জাতীয় সভ্যতা যদি কতকগুলি মুষ্টিমেয় স্বয়ংসিদ্ধ জননায়কের কবলে আসিয়া পড়ে তখন ভাষার সহিত তাহার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। গ্রীক্ ও আধুনিক ফরাসী ভাষার একই সুর শুনিতে পাই, তথাপি এই দুই সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। সংস্কৃত ও ল্যাটিন যেন একই ছন্দে গাঁথা, কিন্তু কেহ বলিতে পারিবেন কি, যে, ভারতীয় ও ল্যাটিন সভ্যতা তুল্যরূপ? মুষ্টিমেয় কতকগুলি ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শব্দ ও বাক্য বিচলিত হইতে পারে। বহুভাষার ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে, কিন্তু জাতীয় সভ্যতার সহিত ভাষার ছন্দের সম্বন্ধ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সভ্যতা ছদ্মবেশ গ্রহণ করিলেও ভাষা আপন ছন্দ দ্বারা তাহার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া দিবে।

ভাষার তিন উপাদানের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জাতীয় জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। জাতীয় জীবনকে অস্বীকার করিয়া তাই প্রকৃত ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না, প্রকৃত ভাষা সর্ব্বত্রই জাতীয় ভাষা। ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল আধুনিক ফরাসী ভাষা। Sieburg তাঁহার

"ঈশ্বর কি ফরাসী" নামক অতুলনীয় পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন, ভাষাসম্পদে পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতি ফরাসীদের বহু শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ ফরাসীদের চিন্তা করিয়া কথা বলিতে হয় না, ভাষাই তাহাদের চিন্তা করায়। যে কেহ ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পারে সেই ফরাসী রীতিতে চিন্তা করিতে সমর্থ। চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা সকল ভাষারই আছে। যাঁহারই লেখা অভ্যাস আছে তিনিই স্বীকার করিবেন, শুধু লেখার কোঁকে লেখনীর মুখে কত কথা আসিয়া যায় যাহা প্রথমে লেখকের মনে ছিল না। নিজের প্রতি কঠোর হইতে না পারিলে লেখককে অনেকস্থলে মিথ্যাভাষী হইয়া পড়িতে হয় (অবশ্য প্রকৃত কবিতা সম্বন্ধে একথা খাটে না)। কিন্তু ফরাসী ভাষার প্রভাব এতই প্রবল যে, ফরাসীদের প্রতিপদে মিথ্যাচরণ না করিয়া উপায় নাই। ফরাসী জাতির Realismএর প্রশংসায় সারা জগৎ আজ শতমুখ; ইহার প্রধান কারণ, ফরাসী ভাষায় unreal কোন কথা বলিবারই উপায় নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা এইরূপে খর্ব্ব হওয়া নিশ্চয়ই ভাল নহে, কিন্তু যে ভাষার আশীর্ব্বাদে ফরাসী জনসাধারণ বিনা আয়াসে সুন্দরভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে সে ভাষার নিশ্চয়ই ফরাসী জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

ফরাসী ভাষা সর্ব্বতোভাবে ফরাসী সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। ফরাসী দেশে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না, সেইজন্য জনসাধারণের সকলেই সে ভাষার অনন্ত সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু যে ভাষার এই ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে সে ভাষা সম্বন্ধে মানুষের কর্ত্তব্য কি? ভাষাকে হঠাৎ কথিত বসনের আসনে টানিয়া আনিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমরা চাই ভাষার প্রকাশে সমগ্র জাতি যেন উন্নত পন্থায় চিন্তা করিতে শিখে। কিন্তু ক্রোধের বশে ভাষার সকল সম্পদ যদি আজ হঠাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয় তবে আর সে ভাষা জাতিকে সমৃদ্ধ করিবে কি দিয়া? আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দীর ইংরাজি ভাষার এই বিপত্তি ঘটিয়া গিয়াছে, তাই ইংরাজি ভাষা আজ দীন ও শ্রীহীন।

আধুনিক জার্ম্মান ভাষাকে ঠিক আধুনিক বলা চলে না, যদিও একটি আধুনিক ভাষার সমস্ত উপকরণ ইহাতে বর্ত্তমান। জার্ম্মান লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান বিরাট। জার্ম্মানগণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু তথাপি তাহারা তাহাদের প্রাচীন অভিজাত ভাষাটিকে নিরাভরণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয় নাই। তাহারা চায়, জাতিই যেন নিজের চেষ্টায় এই ভাষাকে আপন করিয়া লয়। আমাদের বাংলা ভাষা আমাদেরই চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছে, কাজেই তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক বাঙালীর সুচিন্তিত কর্ত্তব্য করিবার এখনও অবকাশ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত তথ্য যদি সত্য হয় তবে স্পষ্ট বুঝা যাইবে জাতিগঠনে ভাষা কতটা সহায়তা করে। ভাষা যদি সমৃদ্ধিশালী হয় তবে জাতিও চিন্তায় ও কল্পনায় তদনুযায়ী সমৃদ্ধি লাভ করিবে। বিনা বিচারে এই ভাষাকে হঠাৎ prololarianise করিয়া ফেলার উৎকট চেষ্টা দেখিয়া তাই শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়। ভাষার সম্পদ হরণ না করিয়া যদি তাহাকে prololarianise করা না যায়, তবে সম্যক বিচার না করিয়া একাজে অগ্রসর হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শেষ কথা—প্রকৃত ভাষাকে বলিয়াছি জাতীয় ভাষা। কিন্তু মানুষ ভাষা সম্বন্ধে চিরদিন জাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী মানিয়া চলিবে কেন? এ প্রশ্ন দুরূহ, এবং শুধু ভাষা সম্বন্ধেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু বিধাতারই ইঙ্গিত এই যে, সীমার মধ্যেই মানুষকে অসীমের সন্ধান করিতে হইবে। এ অভ্যাস যাহার জন্মায় নাই সে অসীমের মধ্যেও গণ্ডীর ক্ষুদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যাঁহার পরিপূর্ণ উপলব্ধি জন্মিয়াছে শুধু সহানুভূতির (analogy!) বলেই তিনি জগদ্ব্যাপী বৃহৎ সত্তার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলিব। বাঙালীর যদি বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে অধিগত না হইয়া থাকে তবে কোন ভাষারই গোপন রহস্য কোনদিন তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে না। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অনেক আত্মাভিমানী মানুষ আপনার এই গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা মানিয়াও মানিবে না, অসীমের প্রেরণা আসিয়া নিয়তই তাহাদের চঞ্চল করিয়া তুলিবে। হয় তো তাহারাই শ্রেষ্ঠ মানব। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহারা আপন ইচ্ছায় সৃষ্টিছাড়া। জগৎ তাহাদের শ্রদ্ধা করিবে, কিন্তু তাহাদের দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া সসম্ভ্রমে দূরে ঠেলিয়া দিবে। শ্রেষ্ঠ মানব জগতে সর্ব্বত্র অতি সাধারণ মানুষের নিকট পরাভূত ও লাঞ্ছিত হয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তো ইহারই পরিচয়, শ্রেষ্ঠতা জাগিয়া থাকে শুধু তাহার আপনার মনে।

বুদ্ধ-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বুদ্ধ ও রাজন্যবর্গ

মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধের সৌহৃদ্যের অনেক কথা বলিয়াছি। সেযুগের রাজারা সব ধর্ম্মগুরুদেরই সম্মান করিতেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে যে রাজাদের বুদ্ধকে সম্মান করিতে দেখি, জৈনশাস্ত্রে সেই রাজাদেরই আবার মহাবীরকে সম্মান দেখাইবার কথা লিখিত আছে। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে দানাদি কর্ম্মও করা হইত। সম্রাট অশোক অতবড় বুদ্ধভক্ত হইলেও আজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্যও বাসস্থান প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। তবে বিম্বিসার সম্বন্ধে মনে হয় যে, তিনি বোধ হয় বুদ্ধের প্রতিই সবচেয়ে আসক্ত ছিলেন। 'বিম্বিসার' নামটি অ-সংস্কৃত হইলেও শুদ্ধভাষায় চলিয়া গিয়াছে; আসলে নামটির সংস্কৃতরূপ 'বিম্বসার', ভিন্নবর্ণ হইতে ঐরূপ মনে হয়; 'বিম্বিসার' নামটি সংস্কৃত 'বিম্বসার'এর পালিরূপ, অর্দ্ধমাগধী জৈনপ্রাকৃতে ইহা 'বম্ভসার', ইহা ছাড়া পালিতে ইনি 'শ্রেণিক' নামেও সুপরিচিত।

বিম্বিসারের পুত্রের নাম অজাতশত্রু। এই নামের কারণ টীকাকার বুদ্ধঘোষ এইরূপ বলিয়াছেন, অজাতশত্রু মাতৃগর্ভে থাকার সময় তাঁহার মাতার এই দোহদ হইয়াছিল যে, তিনি বিম্বিসারের রক্তপান করিবেন। অমাত্যদের পরামর্শে রাজা এমন একটি জামা প্রস্তুত করাইলেন, যাহার বাহিরের দিকটা কাপড়ের ও ভিতরের দিকটা কাঁচা পশুমাংসের ছিল। এই জামা গায়ে দিয়া রাজা রাণীর দোহদতৃপ্তির জন্য তাঁহার কাছে গেলেন, রাণী রাজার পৃষ্ঠদেশে দংশন করিয়া জামার নীচের পশুমাংসকে রাজার শরীরের মাংস মনে করিয়া তাহার রক্তপান করিয়া দোহদতৃপ্তি করিলেন, রাজাও অক্ষতশরীর রহিলেন। না জন্মিতেই পিতৃরক্তপানে যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার 'অজাতশত্রু' নাম রাখা হয়। জাতকের নাম গর্ভাবস্থায় জননীর দোহদ অনুসারে রাখার অনেক গল্প জৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সে যুগে বোধ হয় ইহা অন্যতম নামকরণ বিধি ছিল। অজাতশত্রু পালিতে 'কুণিক' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। অজাতশত্রু বুদ্ধদ্বেষী ছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহাকে বুদ্ধদ্বেষী বলিবার কারণ এই মনে হয় যে, তিনি প্রথমে বৌদ্ধেতর সম্প্রদায়ের অনুরক্ত ছিলেন। জৈনশাস্ত্রে অজাতশত্রুকে খুব বড় মহাবীর-ভক্ত বলিয়া দেখান হইয়াছে। দেবদত্ত বুদ্ধের দল ছাড়িয়া অন্য দল স্থাপনায় অজাতশত্রুর পোষকতা পাইয়াছিলেন একথা বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন। ধর্ম্মগুরু, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়া রাজারা বুদ্ধকে সমাদর করিতেন। রাজাদের সঙ্গে বুদ্ধের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল কয়েকটি গল্পে তাহা বুঝা যাইবে।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কয়েকদিন ধরিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের ভিক্ষা দিয়া শেষে বুদ্ধকে প্রত্যহ তাঁহার ভবনে আহারগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ইহাতে এই জন্য স্বীকৃত হইলেন না যে, আরও অনেক লোক চায় যে বুদ্ধ তাহাদের গৃহে আসেন। বুদ্ধ নিজের পরিবর্ত্তে আনন্দকে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বলিলেন। প্রসেনজিৎ কয়েকদিন আনন্দ ও তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুদের খাওয়াইবার পর এ বিষয়ে এত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন যে, অন্য ভিক্ষুরা এক এক করিয়া ছাড়িয়া গেল, শুধু আনন্দই বাকি রহিলেন। ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া প্রসেনজিৎ বুদ্ধের কাছে অনুযোগ করিলে বুদ্ধ বলিলেন, ভিক্ষুদের কোন দোষ হয় নাই। বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় প্রসেনজিৎকে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি ভিক্ষুরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছে কারণ নিমন্ত্রণকারী যদি বিনীত, শ্রদ্ধাবান, ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু না হন তবে ভিক্ষুরা সে গৃহে যান না। ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা ফিরাইয়া পাইবার জন্য প্রসেনজিৎ ঠিক করিলেন যে, তিনি শাক্যবংশ হইতে একটি পত্নী গ্রহণ করিবেন এবং এই প্রস্তাব করিয়া শাক্যদের কাছে দূত পাঠাইলেন। শাক্যরা অহঙ্কারী ছিল, প্রসেনজিৎকে অপমানিত করার জন্য তাহারা মহানামের দাসীগর্ভজাত বাসভক্ষত্রিয়া নাম্নী কন্যাকে পাঠাইয়া দিল। প্রসেনজিৎ বাসভক্ষত্রিয়ার জন্মঘোষ জানিতেন না, তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন ও কালক্রমে বাসভক্ষত্রিয়ার একটি পুত্র জন্মিল। নবজাত পুত্রের নামকরণের জন্য প্রসেনজিৎ মাতামহীর কাছে

দূত পাঠাইলেন, মাতামহী 'বসভ' এই নাম নির্ব্বাচন করিলেন কিন্তু বধিরতাপ্রযুক্ত দূত ঠিক শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মাতামহী বালকের 'বিড়ূডভ' এই নাম রাখিয়াছেন। বিড়ূডভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শাক্যমাতুলদের দেখিবার জন্য কপিলবাস্তুতে গেল, কিন্তু কেহই তাহাকে সমাদর করিল না। তাহার পিঁড়ি ধুইবার সময় একজন দাসী তাহার হীনজন্মের কথা বলিয়া একটা মন্তব্য করিল ও একজন সৈনিক একথা শুনিতে পাইয়া সঙ্গীদের কাছে গল্প করিল। ক্রমে মুখে মুখে একথা ছড়াইয়া পড়িয়া বিড়ূডভের কানে পৌঁছিলে বিড়ূডভ প্রতিজ্ঞা করিল যে, ঐ পিঁড়ি সে শাক্যদের রক্তে ধুইবে। বিড়ূডভ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতার হীনজন্মের কথা শুনিয়া প্রসেনজিৎ দাসক্ষত্রিয়া ও বিড়ূডভকে দাসশ্রেণীভুক্ত করিলেন, কিন্তু বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন যে, পিতার বংশানুসারেই পুত্রের সামাজিক সমমর্য্যাদা হওয়া উচিত। তাহাতে প্রসেনজিৎ আবার তাহাদের পূর্ব্বমর্য্যাদা দান করিলেন।

একবার প্রসেনজিৎ বুদ্ধদর্শনে আসিয়াছিলেন। ছত্রপাণি (ছত্তপাণি) নামক একজন উপাসক তখন বুদ্ধের কাছে বসিয়া ছিলেন, তিনি রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় প্রসেনজিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। বুদ্ধ কথায় কথায় প্রসেনজিতের কাছে ছত্রপাণির গুণের সুখ্যাতি করিলেন—প্রসেনজিতের অসন্তোষ অপ্রকাশিত হইলেও রহস্যপটু বুদ্ধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিছুদিন পরে ছত্রপাণিকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া প্রসেনজিৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ছত্রপাণি ছত্রোপানহ ত্যাগ করিয়া রাজসন্নিকটে উপস্থিত হইলে প্রসেনজিৎ বলিলেন, তিনি যে রাজা একথা ছত্রপাণির এতদিন পরে স্মরণ হইল মনে হইতেছে। ছত্রপাণি বলিলেন, ইহা তাঁহার সর্ব্বদাই স্মরণ ছিল; তবে তিনি কেন রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই, প্রসেনজিৎ একথা জিজ্ঞাসা করিলে ছত্রপাণি বলিলেন, তিনি তখন রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই। প্রসেনজিতের ক্ষত্রিয়োচিত ঔদার্য্য ছিল, তিনি এই উত্তরে প্রীত হইয়া ছত্রপাণিকে রাজান্তঃপুর-মহিলাদের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ভিক্ষু নহেন বলিয়া ছত্রপাণি ইহাতে অসম্মত হইলেন।

বিম্বিসার প্রসেনজিতের কোশলদেবী নাম্নী ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাশীগ্রামের রাজস্ব এই বিবাহে কন্যার যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করিবার পর প্রসেনজিতের ভগিনী পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন এবং তখন প্রসেনজিৎ কাশীগ্রামের রাজস্ব মগধকে দান করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহা লইয়া মগধ ও কোশলরাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। প্রসেনজিৎ কয়েকবার অজাতশত্রুর কাছে হারিয়া পানাহার ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, জয়লাভ করিলে অহঙ্কার জন্মে, পরাজয়ে দুঃখ জন্মে, যে এই দুইই ত্যাগ করিয়াছে সেই সুখী। কথিত আছে, অবশেষে কয়েকজন স্থবির ভিক্ষুর পরামর্শমত সমরকৌশল অবলম্বন করিয়া প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, শেষে প্রসেনজিতের কন্যা চন্দ্রার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ হয়। এই বিবাহে কাশীগ্রামের রাজস্ব কন্যার স্থানান্তে গন্ধলেপনাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইলে এই যুদ্ধের অবসান হয়।

প্রসেনজিতের সেনাপতি বন্ধুলের প্রভাববৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া প্রসেনজিৎ বন্ধুলকে সবংশে হত্যা করিয়া বন্ধুলের ভ্রাতুষ্পুত্র দীর্ঘকারায়ণকে সেনাপতিত্ব দান করেন। দীর্ঘকারায়ণ মনে মনে প্রসেনজিতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। একবার প্রসেনজিৎ দীর্ঘকারায়ণকে সঙ্গে লইয়া শাক্যগ্রামে গিয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেই অবসরে দীর্ঘকারায়ণ প্রসেনজিতের অধিকাংশ অনুচরদের ও ছত্রদণ্ডাদি রাজচিহ্ন লইয়া সত্বর শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া বিড়ূডভকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রসেনজিৎ অবস্থা দেখিয়া অজাতশত্রুর সাহায্যপ্রার্থনার জন্য রাজগৃহের দিকে চলিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিড়ূডভ রাজা হইয়াই শাক্যদের রক্তে পিঁড়ি ধুইবার প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য শাক্যরাজ্যের দিকে ধাবিত হইলেন। বুদ্ধ মধ্যস্থ হইয়া তিনবার বিড়ূডভকে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া আটকাইয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ বারে বিড়ূডভ শাক্যদের উপর পড়িয়া শাক্যদের হুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত যাহাকে সামনে পাইলেন হত্যা করিয়াছিলেন। শাক্যেরা একবার রোহিণী নদীর জল বিষাক্ত করিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল।

বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, সেই পাপের ফল আর রোধ করা গেল না।

বুদ্ধ রাজাদের 'হক্' কথা শুনাইতে ছাড়িতেন না এবং তাঁহাদের সঙ্গে রঙ্গরহস্যও করিতেন। প্রসেনজিৎ বহুভোজী ছিলেন, বহু অন্ন, বহু ব্যঞ্জন, বহু অম্বল খাইতেন। একদিন মধ্যাহ্নে গুরুভোজনের পর অবস্থিবোধ করিয়া তিনি জেতবনে গিয়া ক্লান্ত নয়নে বুদ্ধের সামনে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বড়ই নিদ্রাবেগ হইতেছিল, কিন্তু বুদ্ধের সম্মুখে শয়নের সাহস না হওয়ায় তিনি একপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। বুদ্ধ রাজার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়াই আসিয়াছিলেন?"

"না ভদন্ত, তা নয়, তবে ভোজনের পর আমার সর্ব্বদাই অবস্থি বোধ হয়।"

"মহারাজ, অতিভোজনে ঐরূপ ফুসলই হয়; যে অলস, বহুভোজী, যে সর্ব্বদা ঘুমায় ও বিশালদেহ সুপুষ্ট শূকরের মত গড়াইয়া বেড়ায় তাহার দুঃখের আর অন্ত নাই; মহারাজ, ভোজনে মিতাচারী হওয়া উচিত, কারণ তাহাতে আরাম হয়, অল্প ক্লেশ হয়, বিলম্বে জরা উপস্থিত হয় এবং প্রাণরক্ষা হয়।" প্রসেনজিতের ভাগিনেয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন যে, সে যেন প্রত্যহ প্রসেনজিৎকে আহারের পূর্ব্বে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় এবং প্রসেনজিৎ প্রত্যহ আহারের সময় শেষ গ্রাসটি না খাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাতে যতগুলি অন্ন থাকে তাহা গণিয়া ততগুলি চাউলের অন্ন যেন পরদিনের ভোজনের সময় আহার করেন। এই উপদেশ পালনের ফলে প্রসেনজিতের মনে প্রফুল্লতা আসিল ও মেদ হ্রাস হইল। প্রসেনজিৎ বুদ্ধের কাছে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এখন আমি সুখে আছি, আবার মৃগয়ায় যাইতে পারি, ভাগিনেয়ের (অর্থাৎ অজাতশত্রু) সঙ্গে আর কলহ করি না এবং তাহার সঙ্গে আমার কন্যা বজ্রার (বজিরা) বিবাহ দিয়াছি।"

"মহারাজ, বাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ।"

পক্ষান্তে মিলিত হইয়া 'উপোসথ' পালন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করার রীতি প্রথমে শাক্যপুত্রীয়েরা পালন করিতেন না, অন্য সম্প্রদায়ের লোকে করিত। বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় একবার পিছাইয়া দিয়াছিলেন, কারণ "রাজার আদেশ পালন করা উচিত।" অনুগত ব্যক্তির অনুরোধ বুদ্ধ প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করিতেন না ও সেজন্য ছোটখাট নিয়মেরও ব্যতিক্রম করিতেন।

বুদ্ধ ও দেবদত্ত

এক শ্রেণীর বর্ণনা অনুসারে দেবদত্ত শুক্লোদনের পুত্র ছিলেন ও বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র ও শ্যালক হইতেন, কারণ এ বিবরণে রাহুল-মাতা দেবদত্তের সহোদরা ভগিনী; আর এক শ্রেণীর বর্ণনায় দেবদত্ত অমৃতোদন নামক বুদ্ধের আর এক পিতৃব্যের পুত্র। বাল্যকালে বুদ্ধের সঙ্গে দেবদত্তের বিরোধের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাও কথিত আছে যে, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত রাহুলমাতাকে (এ বিবরণে রাহুলমাতার নাম যশোধরা ও তিনি দেবদত্তের পিতৃব্য কন্যা) বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে দেবদত্ত যশোলিপ্সু হইয়া অজাতশত্রুকে প্ররোচনা করিয়া নিজদলে টানিয়াছিলেন। বুদ্ধ একথা জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, মূর্খ তাহাকে লোকে চিনিয়া ফেলিবেই, ও তিনি দেবদত্তের ক্রিয়াকলাপ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। একবার বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ছিলেন সে সময়ে দেবদত্ত আসিয়া বুদ্ধকে বলিলেন, যে বুদ্ধ বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন দেবদত্তের উপর সঙ্ঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করুন। উত্তরে বুদ্ধ একটু রুক্ষ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মত নরাধমের কথা দূরে থাকুক সারিপুত্র বা মৌদ্গল্যায়নের হাতেও তিনি সঙ্ঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন না। দেবদত্ত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ সঙ্ঘের দ্বারা ঘোষণা করাইলেন যে, দেবদত্তের কার্য্য যেন শুধু তাঁহারই বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার সহিত বুদ্ধের বা সঙ্ঘের কোন সংস্রব নাই। তারপর দেবদত্ত অজাতশত্রুর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন যে, দেবদত্ত বুদ্ধকে ও অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করিবেন ও উভয়ে সঙ্ঘ ও দেশ শাসন করিবেন। অজাতশত্রু চক্রান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া অমাত্যদের হাতে ধরা পড়িয়া সব কথা স্বীকার করিলেন। মহামাত্যরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, দেবদত্ত ও অন্য ষড়যন্ত্রকারিদের হত্যা করা হউক

কিন্তু বিম্বিসার অজাতশত্রুকে ক্ষমা করিলেন। তখন দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য অজাতশত্রুর কয়েকজন সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে পাঠাইয়া রাখিলেন, কিন্তু উহারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না। একবার বুদ্ধ গৃধ্রকূটের ছায়ায় পাদচারী করিতেছিলেন, এমন সময় দেবদত্ত পাহাড়ের উপর হইতে প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথর গড়াইয়া বুদ্ধের উপর ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পাথরটা পাহাড়ের দুইটি শৃঙ্গে আটকাইয়া লাগিয়া গেল, কিন্তু কয়েকটি খণ্ড পায়ে লাগিয়া বুদ্ধ আহত হইলেন ও এজন্য জীবকের চিকিৎসা প্রয়োজন হইয়াছিল। বুদ্ধ উপরে তাকাইয়া দেবদত্তকে দেখিয়া এই পাপকার্যের জন্য তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের শরীররক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত করার কথা বলিলে বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না, কারণ "সময় না হইলে কেহই তথাগতের প্রাণহানি করিতে পারিবে না।" আর একবার দেবদত্ত হস্তিশালার লোকদের দ্বারা বুদ্ধ যে পথ দিয়া যাইতেন সেখানে কালগিরি নামক একটা মত্তহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধকে ভিক্ষুরা সে-পথ দিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। বুদ্ধ সে-কথা শুনিলেন না। মত্ত হস্তী আক্রমণ করিলে আনন্দ 'হস্তী আগে আমাকে বধ করুক' বলিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বুদ্ধ আনন্দকে জোর করিয়া—বর্ণনায় আছে "ইদ্ধি"বলে—সম্মুখ হইতে সরাইয়া একাকী অগ্রসর হইয়া মৈত্রীশক্তিতে হস্তীকে বশীভূত করিলেন। এই ঘটনার পর দেবদত্তের অপোনাশ হইল।

দেবদত্ত এইবার আরও কয়েকজনকে লইয়া ভিন্ন দল স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সঙ্ঘের নিয়মে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হউক; যথা (১) ভিক্ষুদের চিরজীবন বনে বাস করিতে হইবে (২) নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ না করিয়া তাহাদের চিরজীবন ভিক্ষান্নভোজন করিতে হইবে (৩) গৃহদান গ্রহণ না করিয়া তাহাদের শুধু 'পাংশুকূল' পরিধান করিতে হইবে (৪) গৃহে বাস না করিয়া বৃক্ষতলে চিরজীবন বাস করিতে হইবে, এবং (৫) তাহারা জীবনে মৎস্যমাংস ভোজন করিতে পারিবে না। বুদ্ধ বলিলেন, বর্ষাকালে বৃক্ষতলে বাস ছাড়া অন্যগুলিতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু এগুলি পালনের বাধ্যতামূলক নিয়ম তিনি কিছুতেই করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ নিয়মগুলি গ্রহণ করা না করা প্রভৃতি ভিক্ষুদের ইচ্ছাধীন থাকিবে। দেবদত্ত ইহাতে সম্মত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্ঘভেদ সম্বন্ধে সাবধান করিলেন বটে, কিন্তু দেবদত্ত সদলবলে লইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, বুদ্ধ বাহুল্যভোগী এবং আনন্দকে জানাইলেন যে, তিনি বুদ্ধকে বাদ দিয়া 'উপোসথ' পালন করিবেন ও বৈশালীর কয়েকজন নবদীক্ষিত ভিক্ষুকে প্ররোচিত করিয়া দলে লইয়া গয়াশীর্ষ পাহাড়ে চলিয়া গেলেন।

আনন্দের কাছে এ সংবাদ শুনিয়া ভ্রান্ত ভিক্ষুদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে পাঠাইলেন। বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধ কোকালিক সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দেবদত্ত মনে করিয়াছিলেন, সারিপুত্রেরা তাঁহার দলে যোগ দিতে আসিয়াছেন। আমার মনে হয়, সারিপুত্রেরা এমন কায়কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকিবেন যাহাতে দেবদত্তের এরূপ মনে করিবার কারণ ঘটিয়াছিল। ইঁহারা দেবদত্তের শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত দেবদত্তের ধর্মপ্রচার শুনিলেন। তারপর দেবদত্ত ক্লান্ত হইয়া সারিপুত্রকে প্রচার করিতে বলিয়া নিজে বিশ্রাম করিতে গেলেন ও সারিপুত্রের প্রচারের ফলে ভ্রান্ত ভিক্ষুরা ফিরিয়া গেল এবং কোকালিক দেবদত্তকে জাগাইলে দেবদত্ত উঠিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন—শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। একটু তলাইয়া দেখিলে আসল ব্যাপার এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন যেন জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন এরূপ ভাণ করিয়া দেবদত্তের কথা মন দিয়া শুনিলেন ও অনেকরাত্রি পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও কিছু কিছু মতৈক্য প্রকাশ করিয়া শেষে দেবদত্ত শয়ন করিতে গেলে বৈশালীর ভিক্ষুদের বুঝাইয়া-পড়াইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তিত ভিক্ষুদের পুনরায় প্রব্রজ্যাদানের প্রয়োজন নাই, দোষস্বীকারই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট এই কথা বলিয়া বুদ্ধ তাহাদের সঙ্ঘে পুনর্গ্রহণ করিলেন—তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, বেশী বিড়াইলে সেটুকুও হইয়া যাইবে। এই ঘটনাগুলি ঘটিতে সময় লাগিয়াছিল এবং বুদ্ধের সঙ্ঘ ছাড়িয়া দেবদত্ত অল্প যে সঙ্ঘস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও যে কিছুদিন চলিয়াছিল তাহার প্রমাণ সেই গর্হিণী ভিক্ষুণীর কাহিনী হইতে বুঝা যায়।

সুপ্রবুদ্ধ—এইমতে ইনি দেবদত্ত ও বাহুলমাতার পিতা—বুদ্ধের উপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ বুদ্ধ তাঁহার কন্যাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ও পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইনি একবার সুরাপানপ্রমত্ত অবস্থায় কপিলবাস্তুর রাজপথে বুদ্ধের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনেক গালাগালি করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের সঙ্গে দেবদত্তের বিরোধের কারণ বোধহয় প্রথমতঃ তাঁহাদের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ। বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্তকে ও জৈনশাস্ত্রে গোশালকে মহাপাপী বলা হয়। মহাবীরের সঙ্গে গোশালের অতি কর্কশভাষায় গালাগালি হইয়া উভয়ে জন্মের মত পৃথক হইয়া যান। এখানেও দেখা গিয়াছে যে, এই বিরোধের মূল উভয়ের ঘোরতর মতভেদ। মহাবীরের জামিনের ও জামাতা জমালিও মহাবীরের শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া ভিন্নদল স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবদত্ত সঙ্ঘের নিয়মে যে পাঁচটি পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি কৃচ্ছ্রপ্রিয় ছিলেন ও বুদ্ধের উদার নীতিতে তাঁহার আপত্তি ছিল। আহার, বাসস্থান, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ত্যাগী হইলেও বুদ্ধ অতি কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম মানিতেন না বলিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময়ে পঞ্চভিক্ষু ও পরে দেবদত্ত তাঁহাকে বাহুল্য-বিলাসী মনে করিয়াছিলেন। দেবদত্ত একথা রটনা করিয়াও বেড়াইয়াছিলেন। এই ভ্রান্ত ধারণা যে অনেকেই পোষণ করিত এবং ইহা লইয়া বৌদ্ধদের উপর অন্যায় আক্রমণ হইত তাহা দেখাইবার জন্য পরবর্তীকালে রচিত একটি প্রাকৃত ও একটি সংস্কৃত কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিব—মনোজ্ঞ ভোজন, মনোজ্ঞ শয়নাসন ভোগ করিয়া মনোজ্ঞ গৃহে বাস করিয়া মুনি মনোজ্ঞ ধ্যান করিলেন।

মণুণ্ণং ভোয়ণং ভোচ্চা মণুণ্ণং সয়নাসনং।
মণুণ্ণংসি অগারংসি মণুণ্ণাসং ঝায়এ মুণিআ॥

মৃদু শয্যা, সকালে উঠিয়া পান, দ্বিপ্রহরে ভোজন, বৈকালে দরবৎ ও অর্দ্ধরাত্রে দ্রাক্ষাখণ্ড ও চিনি—শাক্যপুত্র বলিয়াছেন ইহা দ্বারা অন্তিমে মোক্ষলাভ হইবে।

মৃদী শয্যা প্রাতরুত্থায় পেয়া ভক্তং মধ্যে পানকং চাপরাহ্ণে।
দ্রাক্ষাখণ্ডং শর্করা চার্দ্ধরাত্রে মোক্ষশ্চান্তে শাক্যপুত্রেণ দৃষ্টঃ॥

বুদ্ধ ও মহাবীর

বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক লোক ছিলেন। মহাবীর বয়সে বুদ্ধের চেয়ে বছর দশেকের বড় ছিলেন ও বুদ্ধের উদয়ের পূর্বেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুও বুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। রাজগৃহ, নালন্দা, বৈশালী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি যে সব স্থানে বুদ্ধ প্রচার করিতেন, সে সব স্থান জৈনশাস্ত্রে মহাবীরেরও প্রচারস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে যত ধর্মপ্রচারকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধই দেশের জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাবীরের শিষ্যদের সঙ্গে বুদ্ধের ও বুদ্ধের শিষ্যদের সঙ্গে মহাবীরের দেখা হইত কিন্তু দুঃখের বিষয় গুরুদ্বয় কখনও পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেন নাই। একবার তাঁহারা উভয়েই নালন্দাগ্রামে উপস্থিত ছিলেন ও উপালিনামক মহাবীরের একজন শিষ্য দল ছাড়িয়া শাক্যপুত্রীয়দের দলে যোগ দেওয়ায় মহাবীর সদলবলে উপালির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপালিকে খুব গালাগালি দিয়াছিলেন। সেনাপতি সিংহের বুদ্ধশরণ লইবার সময়ও মহাবীর বৈশালীতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় ও সিংহের গুরু বদল লইয়া সহরে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—এই দুই সময়েও বুদ্ধ ও মহাবীরের সাক্ষাৎ হয় নাই। এই দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির যদি সাক্ষাৎ হইয়া কোন আলাপ আলোচনার বিবরণ বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রে লিখিত থাকিত, তবে ভারতের ধর্ম-ঐতিহাসিকদের কাছে তাহা মহামূল্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

সেই যুগে সকল গুরুরাই শিষ্যসংগ্রহে কৌশল অবলম্বন করিতেন। মহাবীরও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তবে বুদ্ধের মত নির্দ্দোষ কৌশলেই ক্ষান্ত না হইয়া মহাবীর বোধ হয় অন্য রকম পন্থাও অবলম্বন করিতেন বলিয়া মনে হয়। জৈন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গোশালের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময়ে মহাবীর ও গোশালের মধ্যে ঘোরতর শাপবিনিময় ও অগ্নি (তেউল্লস) বর্ষণ হইয়াছিল। এই রূপকের অর্থ বোধহয় উভয়ের বিক্রান্ত বাক্‌যুদ্ধ, বচসা ও ক্রুদ্ধ কটুভাষা প্রয়োগ। বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, উপালির বাড়ীতে চড়াও হইয়া গোলমালের সময় মহাবীর এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া গরম রক্ত বাহির হইয়াছিল; ইহার অর্থ বোধ হয় ক্রোধ ও রুক্ষভাষা ব্যবহার। রূপক বা বিরোধী দলের মন্তব্য ছাড়িয়া জৈনদের নিজেদের শাস্ত্রের কথাই ধরা যাউক,—তাঁহারা নিজেরাই বলিয়াছেন যে, গোশাল একবার যখন জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলেন, তখন মহাবীর তাঁহার শিষ্যদের শিখাইয়া দিলেন যে, তাহারা যেন গোশালের কাছে গিয়া গোশালকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করে। মহাবীরের উদ্দেশ্য বোধহয় এই ছিল যে, প্রলাপের ঘোরে গোশাল নিশ্চয় প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন না বা যা তা উত্তর দিবেন এবং তখন ইহা লইয়া লোকের কাছে তাঁহাকে অপদস্থ করা যাইবে। জৈনশাস্ত্রীয় গ্রন্থে জৈন-মতাবলম্বীদের প্রতি বহু কটূক্তি ও তীব্র নিন্দা আছে এবং অ-জৈনদের ভিক্ষা দান বা কোনও প্রকার সম্মান প্রদর্শন না করা জৈনদের পক্ষে অতি উচিত কার্য্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতা ও অনৌদার্য্য বুদ্ধের চরিত্রে একটুও দেখা যায় না। সত্যপ্রচারের চেয়ে বিরুদ্ধবাদীকে

কি করিয়া ধর্ম্ম করা যায়, তাহারই প্রতি যেন মহাবীরের দলের অধিক লক্ষ্য ছিল। ইহারই ধারা প্রণোদিত হইয়া মহাবীর-শিষ্যেরা বুদ্ধের নিমন্ত্রণকারীর গৃহে যাওয়া নিবারণ, লোককে তাঁহার কথা শুনিতে বারণ ও প্রয়োজন হইলে বলপূর্ব্বক প্রতিরোধ ও বুদ্ধের নামে পশুবধের মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিত।

বুদ্ধের সঙ্গে দেবদত্তের বিরোধের কথা এবং বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন "আপায়িকো দেবদত্তো, নেরয়িকো দেবদত্তো" অর্থাৎ "দেবদত্ত পাপের ফল ভোগ করিবে, দেবদত্তের নরক গমন হইবে" তাহা জৈনেরা জানিতেন। বিম্বিসারের পুত্র রাজকুমার অভয় রাজগৃহে জৈনদের কাছে যাতায়াত করিতেন। মহাবীর একবার কুমার অভয়কে শিখাইয়া দিলেন যে, অভয় যদি বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করুন। মহাবীর বলিলেন, "শ্রমণ গৌতমের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি অন্যের প্রতি অপ্রিয় কথা বলেন কিনা; যদি তিনি 'হাঁ' বলেন তবে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তিনি তবে সাধারণ লোকের চেয়ে কিসে বিভিন্ন, কারণ সাধারণ লোকেও অন্যের প্রতি অপ্রিয় কথা বলে; কিন্তু যদি শ্রমণ গৌতম 'না' বলেন তবে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি তবে দেবদত্ত সম্বন্ধে "আপায়িকো দেবদত্তো, নেরয়িকো দেবদত্তো" একথা কেন বলিয়াছিলেন, কারণ তাহাতে দেবদত্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রমণ গৌতম গিলিতেও পারিবেন না, উগ্‌লাইতেও পারিবেন না।"

অভয় মহাবীরের ছলনায় ভুলিয়া বুদ্ধের কাছে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া বেলা হইয়াছে বুঝিয়া তখন প্রশ্ন না করিয়া বুদ্ধকে পরদিন তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন বুদ্ধ উপস্থিত হইলে আহারান্তে অভয় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। বুদ্ধ উত্তর দিলেন যে, তিনি যে অপ্রিয় কথা একেবারেই বলেন না এমন নয়। অভয় বলিলেন "নির্গ্রন্থরা এরূপ শুনিয়াছে।" বুদ্ধ অভয়ের এরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অভয় ষড়যন্ত্রের কথা খুলিয়া বলিলেন। সেই সময় একটি শিশু অভয়ের কোলে বসিয়া ছিল। বুদ্ধ বলিলেন, "রাজকুমার, তোমার কি মনে হয়? তোমার বা রক্ষকের অসাবধানতাবশতঃ যদি এই শিশুর গলায় একটা পাথর বা কাঠি প্রবেশ করে তবে তুমি কি করিবে?"

"ভন্তে, আমি তাহা বাহির করিয়া ফেলিব এবং তৎক্ষণাৎ বাহির করিতে না পারিলে বাঁ হাতে শিশুর মাথা ধরিয়া ডান হাতের আঙুল বাঁকাইয়া রক্তপাত হইলেও তাহা বাহির করিব। কেন? কারণ এই শিশুর প্রতি আমার মমতা আছে।"

"রাজকুমার, সেইরূপ যে কথা অসত্য, মিথ্যা, নিরর্থক ও অপরের কাছে অপ্রিয় বলিয়া তিনি জানেন তাহা তথাগত বলেন না; যে কথা সত্য, যথার্থ কিন্তু নিরর্থক ও অপরের কাছে অপ্রিয় বলিয়া তিনি জানেন তাহাও তথাগত বলেন না, যে কথা সত্য, যথার্থ, সার্থক কিন্তু তাহা অপরের কাছে অপ্রিয় হইলেও তাহা বলিবার উপযুক্ত সময় তথাগত জানেন, যে কথা অসত্য, মিথ্যা, নিরর্থক এবং অন্যের কাছে প্রিয় বলিয়া তিনি জানেন তাহা তথাগত বলেন না; যে কথা সত্য, যথার্থ, কিন্তু নিরর্থক ও অন্যের কাছে প্রিয় তাহাও তথাগত বলেন না; কিন্তু যে কথা সত্য, যথার্থ, সার্থক এবং অপরের কাছে প্রিয় তাহা বলিবার উপযুক্ত সময় তথাগত জানেন।"

শ্রীগুপ্ত (সিরিগুত্ত) নামক একজন বুদ্ধভক্তের সঙ্গে গ্রহদত্ত (গরহদিন্ন) নামক একজন নির্গ্রন্থভক্তের বন্ধুতা ছিল। গ্রহদত্ত বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্য শ্রীগুপ্তের নিন্দা করিয়া তাহাকে নির্গ্রন্থ নগ্নশ্রমণদের ভক্ত হইতে বলিল, কারণ ইঁহারা সকলের মনের কথা ও ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। একথা লইয়া বন্ধুদ্বয়ের তর্ক হইল ও ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুপ্ত নগ্নশ্রমণদের নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিল ও একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতরে বিষ্ঠা ঢালিয়া গর্ত্তের উপর লম্বা-লম্বি করিয়া দড়ি বাঁধিয়া আসনগুলির সামনের পায়া মাটিতে ও পিছনের পায়া এই দড়ির উপর বসাইয়া এমনভাবে সাজাইয়া রাখিল যে, নগ্নশ্রমণরা আসিয়া বসিবামাত্র বিষ্ঠাপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে তাহারা লোকের মনের কথা বা ভবিষ্যৎ জানিতে পারে না।

মহাবীর-শিষ্যদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা ও বুদ্ধশিষ্যদের বিরুদ্ধে জৈনরা অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এসবের সত্য মিথ্যার পরিমাণ নিরূপণ করা অসম্ভব এবং একের বিরুদ্ধে অন্যের উক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণের ভ্রম যেন কেহ না করেন। নৈতিক চরিত্রে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও উচ্চবংশে জন্মে মহাবীরও তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাসী লোক এখনও ভারতে অনেক আছেন এবং মহাবীরের প্রভাবে আমাদের দেশের ধর্ম্মদর্শন বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধও হইয়াছিল। [ক্রমশঃ]

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিভিয়া মালভূমিতে পুরানো সহর

বলিভিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার একটি ছোট দেশ, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত; মিঃ ষ্টুয়ার্ট ম্যাকমিলান অনেকদিন বলিভিয়ার রাজধানী লা পাস্ সহরে আমেরিকান কনসাল ছিলেন—১৯২৬ সালে তিনি বলিভিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে উচ্চ-মালভূমিতে অবস্থিত টিয়া-হুয়া-নাকো সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। বহুশতাব্দীর ধূলাবালির তলে আমেরিকা মহাদেশের এই প্রাচীনতম নগরীটা চাপা পড়িয়া ছিল—সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কিছু কিছু খননকার্য্য চলিতেছে। মিঃ ম্যাক্‌মিলানের বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল—

"বলিভিয়ার মত এত পুরানো ধ্বংসাবশেষ অন্য কোনো দেশে নেই। এমন উচ্চতম স্থানে অবস্থিত হ্রদও কোথাও নেই। ছুটেই আমরা দেখব বলে লা পাস্ থেকে রওনা হলাম। সেপ্টেম্বর মাস, বলিভিয়ার বসন্তকাল, রেল-লাইনের দুপাশে শস্যক্ষেত্রে কর্ষণকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছে—ডিসেম্বর মাসের প্রথমে যব ও আলু বপন করা হবে। ইণ্ডিয়ান কৃষকেরা যে লাঙল ব্যবহার করে, পাঁচশো বছর আগে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ লাঙলই ব্যবহার করত—খুব হাল্‌কা কাঠের তৈরী, একজোড়া বলদে টানে, তবে তাতে জমিতে গভীর গর্ত্ত হয় বলে মনে হয় না।

লা পাস্ থেকে ছত্রিশমাইল দূরে ভিয়াচা সহরে গাড়ী থামল। ভিয়াচা এমন খুব বড় সহর নয়—গবর্ণমেণ্টের বেতারের ষ্টেসন আছে বলে কিছু-কিছু ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমেরিকান মেঠাইয়ের দোকান, চকোলেটের দোকান, ফটো তোলার দোকানে ছষ্টপুষ্ট চোলা ইণ্ডিয়ান মেয়েরা রঙীন পশমী পোষাক পরে ফটো তুলতে এসেছে। ফলের দোকানে তরমুজ, কমলালেবু ও আঙুর বিক্রি হচ্ছে।

জীর্ণপরিচ্ছদ, খালি-পা বালকেরা থলি ঘাড়ে করে ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেনের ধারে ধারে হেঁকে বেড়াচ্ছে—Lustre, senor? Lustre? জুতো পালিস করাবেন মশায়? জুতো পালিস করাবেন? আমাদের কামরার বাইরে একজন অষ্টাদশবর্ষীয়া ভিক্ষুক মলিন ছাট হাতে ভিক্ষা চাইছে। ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ঝুড়ি করে এম্পানাডা বলে একরকম মাংসের কচুরী বেচছে—চর্ব্বিতে ভাজা, কেরোসিন আলু ও মাংসের পুর—পুর করে রাঙা ঝালের গুঁড়ো ছড়ানো।

একজন আয়মারা ইণ্ডিয়ান। সাধারণতঃ আয়মারারা বিষণ্ণপ্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ করে এদের বাঁচতে হয়। ছবি দেখে বোঝা যায়, এই ব্যক্তি সাধারণ আয়মারা থেকে ভিন্ন।

ভিয়াচা সহরের বাড়ী সবই যবের খড় দিয়ে ছাওয়া, তবে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী ও গবর্ণমেণ্ট-আফিসগুলি টিনের ও গাল্‌ভানাইজ-করা লোহার পাতের। ষ্টেসনের কাছেই মেরীর মন্দির, অক্টোবর মাসে এই মন্দিরে খুব বড় মেলা হয়—অনেক দূর থেকে লোকে এখানে মেলা দেখতে ও মেরীর কাছে মানত করতে বা মানত শোধ দিতে আসে।

আমাদের ট্রেণের গার্ড হঠাৎ একটা ঘণ্টা বাজিয়ে বল্লে—

সব উঠে পড় গাড়ীতে, সমর ধরে দিয়েছে। আমরা উঠে বসলাম ট্রেণে, ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

ভিয়াত্তা ছাড়িয়ে ওধারে পাহাড়—পাহাড়ের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত চাষ হয়েছে—গাছপালা কোথাও নেই, এদেশে পাহাড়

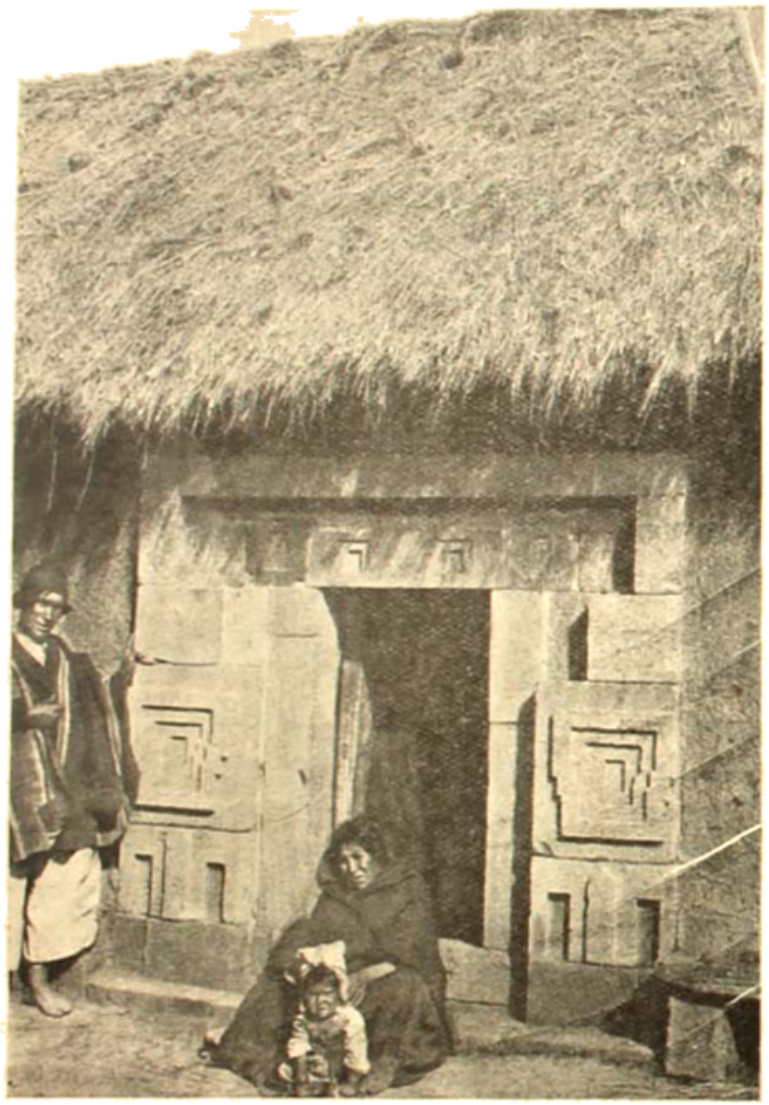

প্রাচীন সভ্যতার আলোকপাতের ব্যাপারে বর্ত্তমান ইথিওপিয়ের রচিত আলপনা। ঘড়ে ছাওয়া চালের নীচে প্রাচীন কালের কারুশিল্পের দৃষ্টান্ত বিদ্যমানরূপ প্রস্তরখণ্ড দ্রষ্টব্য।

গুলোর কেমন দীনহীন চেহারা—অবশ্য নবীন খরগাছে যখন সানুদেশ ঢেকে দেবে জানুয়ারী মাসে, তখন পাহাড়ের এ চেহারা থাকবে না। নীচের জমিতে গরু ভেড়া, গাধা চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ইথিওপিয়ানদের গ্রাম।

রেলপথের ধারে ইয়াটা কাঠের স্তূপ। এদেশে আলানি-কাঠ একেবারেই নেই, কারণ বলিভিয়ার আলকুমিতে কোনো বড় গাছ জন্মায় না। ইয়াটা একধরণের ছোট ছোট গাছ, ঝোপ বেঁধে বেড়ে ওঠে। তার সরু সরু ডাল আর শিকড় বলিভিয়ার সর্ব্বত্র আলানি-কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল-ভূমির উচ্চতম অংশে প্রায় ১৪,০০০ হাজার ফিটের ওপরে আর একরকম ছাওলার মত উদ্ভিদ জন্মায়, তাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'টোলা' বলে—এই উদ্ভিদের শুকনো পাতাও আলানির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইয়াটা ও টোলাগাছ না থাকলে এ দেশে লোকে আগুন জ্বালাতে পারত না।

আমহারা ইথিওপিয়ানরা অত্যন্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ। প্রত্যেক গ্রামে গির্জ্জার চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—পাদ্রীদের এখানে খুব পসার। এদের রান্নাঘর বাড়ীর বাইরে পথের ধারে—প্রত্যেকের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড মাটীর উনুন পাতা, অনেক সময় দু'তিন ঘর লোকের রান্না একই উনুনে হয়।

এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, পায়ে চলার পথ আছে মাত্র। ইথিওপিয়ান জাত অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী, যানবাহনের ধার বড় একটা ধারে না, একশো মাইল হেঁটে গিয়ে কোনো একটা কাজ সেরে আবার পরদিন ফিরে আসা তাদের পক্ষে কিছুই নয়। আমহারা ইথিওপিয়ানদের মুখে হাসি দেখা যায় খুব কম, তারা অত্যন্ত গম্ভীর, মুখের ভাব অনেক সময় উদাস ও বিষাদভরা। এদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন নেই, কোনো নতুন বিষয়ে এদের কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই, শুধু ফসল-ক্ষেতে খাটতে জানে। ভারবাহী পশু-মনের মত মনের অবস্থা।

পুরাকালে যেখানে টিয়া-হুয়া-নাকো শহর ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে ওই নামের একটা গ্রাম আছে। টিয়া-হুয়া-নাকো নামটিও প্রাচীন শহরের আদি নাম নয়, এমন কি স্পেনীয়গণ

যখন বলিভিয়া জয় করে তখনও ও নাম ছিল না। স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ছত্রিশশো বছর পরে নতুন নামকরণ করা হয় সহরের। নামের অর্থ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে।

টিয়া-হুয়া-নাকো নগরীর ধ্বংসস্তূপের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানকার ভাস্কর্য্য, পাথরের উপর দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব হয়। এক জাতির ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজাতি নিজেদের নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বলিভিয়া স্থাপনাল মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ রোমেরো বলেন, পুরাকালে যখন এসিয়া থাকে মোঙ্গোল জাতির কোনো শাখা বেরিং প্রণালীর পথে আমেরিকা মহাদেশে এসেছিল, তারাই টিয়া-হুয়া-নাকো সহর স্থাপন করে—এদের সভ্যতা

আমেরিকার সুসভ্যতম প্রাচীন জাতির রাজধানী টিয়া-হুয়া-নাকোর একাংশ : মুখ্য-পাদ্রী (বলভূমারী)। বিচারাধার হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়।

খোদাইয়ের কাজ, মৃৎপাত্রশিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি থেকে প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ানদের অপেক্ষা সভ্যতর জাতি এখানে রাজত্ব করত। আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা এই নগরী স্থাপিত হয়েছিল যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আয়মারা ইণ্ডিয়ানজাতি কুইচোয়া ইণ্ডিয়ানদের শাখা, স্পেনীয়গণের মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে তারা বলিভিয়াতে প্রথমে আসে। পূর্ব্বে এই নগর টিটিকাকা হ্রদের তীরেই অবস্থিত ছিল—এখন হ্রদ প্রায় তেরো মাইল দূরে সরে গিয়েছে।

টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, দুটি বিভিন্ন সভ্যতার ছাপ তার ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পে সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে গিয়েছে। প্রথমটির অনেককাল পরে ইউকাতানের মায়া-সভ্যতার সমসাময়িক। এসিয়াবাসী মোঙ্গোলদের সঙ্গে বর্ত্তমান আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। মোঙ্গোলদের মত এদের চোখ ছোট ও টেরা, গালের হাড় উঁচু, নাক বসা। এদের মুখেও দাড়ি গোঁপ খুব কমই হয়।

অনেকের মতে পুরাকালে দক্ষিণ-আমেরিকার চেহারা ছিল অন্য রকম। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড ভূমিভাগ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—কালক্রমে এই অংশ সমুদ্রের মধ্যে বসে যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বর্ত্তমানে যে সকল অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ দেখা যায়—তারা এই অন্তর্হিত মহাদেশের সর্ব্বোচ্চ

স্থান—পাহাড়, মালভূমি ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক সেতুপথে এশিয়ার অনেক প্রাচীন জাতি আমেরিকায় এসেছিল।

টিয়া-হুয়া-নাকো গ্রামের সন্নিহিত জনপদের একটি সুন্দর নিদর্শন।

বিভিন্ন স্থানে তাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট রেখে গিয়েছে।

মায়া-সভ্যতার সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসস্তূপে যে দুটি সভ্যতার ছাপ আছে, তাদের প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক উন্নত ছিল। দ্বিতীয় সভ্যতার যখন বিস্তারকাল, তখন এখানে লাল বেলে-পাথরের বড় বড় প্রতিমূর্তি তৈরী হয়—গ্রানাইটের অনেক সূক্ষ্ম খোদাই কাজও এই সময়ের। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের একটা বড় তফাৎ এই যে, প্রথম যুগে যে পাথর শিল্প-কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে, আজকাল সে পাথর বলিভিয়ায় কোথাও পাওয়া যায় না; অনেক দূর থেকে সে সব পাথর আনতে হয়েছিল—কিন্তু দ্বিতীয় যুগে ব্যবহৃত পাথর স্থানীয় পাহাড় থেকে কেটে বার করা হয়।

দ্বিতীয় যুগের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বহুসংখ্যক স্তম্ভ, মূর্তি, মন্দির আধ-তৈরী অবস্থায় পড়ে আছে—মনে হয় যেন হঠাৎ কোনো রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, যার ফলে শিল্পীরা তাদের হাতের কাজ আর শেষ করতে পারে নি—সব ফেলে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটি কি তা আজ জানবার কোনো উপায় নেই—কিন্তু এই রকম যে কিছু একটা ঘটেছিল, তা অনুমান করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যতগুলো অর্ধসমাপ্ত স্তম্ভ বা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সবগুলিই ধূসর রংয়ের আর্সেনিক পাথরের।

বর্তমান টিয়া-হুয়া-নাকো গ্রামের পূর্বে অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় পাথরে ঘেরা একটা চৌকোণ স্থান আছে। এ যে কত প্রাচীনকালের তা বলা দুষ্কর। যাঁরা ইংলণ্ডে সল্‌সবেরী প্রান্তরের Stonehenge দেখেছেন তাঁদের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত মনে হবে না—সেই একই ধরণের খাড়া বিশাল প্রস্তরখণ্ড, ডল্‌মেন্ বা বিশাল সমতল পাথরের টেবিল এখানেও বর্তমান।

সম্ভবতঃ এগুলি প্রাচীনকালের রাজা ও বীরগণের সমাধি। যখন ভাস্কর্যশিল্প জন্মলাভ করে নি, সে যুগে জাতির বরণীয় ব্যক্তিগণের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে এ আয়োজন। এটা অবশ্য আমাদের অনুমান মাত্র। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে এই ধরণের Stonehenge ও ডল্‌মেন

"প্রাচীন যুগের একটি-দেবমূর্তি এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, মূর্তির মুখ চোখ নাক কিছুই নেই"...(পরপৃষ্ঠা)।

দেখতে পাওয়া গিয়েছে—ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সব দেশেই। টিয়া-হুয়া-নাকোর Stonehenge অবিকল সেই সব দেশেরই মত।

বলিভিয়ার স্থানীয় অনুসন্ধানকারীগণ পেরুসংলগ্ন সিতির অংশের বিভিন্ন ইতিহাস নাম দিয়েছেন। হ্রদতীরের লাইনের কাছে একটা বড় পাহাড়ের নাম 'আকাপানা' অর্থাৎ দুর্গ-পর্ব্বত। পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় ১৫৫ ফুট এবং শিখরদেশ টেবিলের মত সমতল। এখানে প্রাচীন কালে বোধ হয় কোনো দুর্গ কিংবা দেবমন্দির ছিল। এই সমতল শিখর দেশের চারকোণে পাথরের পিরামিড আছে। গুপ্ত ধনের সন্ধানে লোকে এখানে অনেকদূর খুঁড়ে ও পাথরের গাঁথুনি দিকের পয়ঃপ্রণালীর পাশে একস্থানে অনেকগুলি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে—তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ এখানে নরবলি দেওয়া হত।

আকাপান পাহাড়ের উত্তরে, চারশত ফুট নীচে আর একটা স্তূপ আছে—এটির ইণ্ডিয়ান্ নাম কালা-সাসায়া অর্থাৎ সূর্য্য-মন্দির। মন্দিরের কোন বাড়ীঘর নেই—এটা একটা চতুষ্কোণ স্থান, চারিপাশে বড় বড় পাথর খাড়া করে পোতা। আয়তনে সমস্ত স্থানটি প্রায় ৩০০ বর্গ ফুট কিন্তু এই চতুষ্কোণ

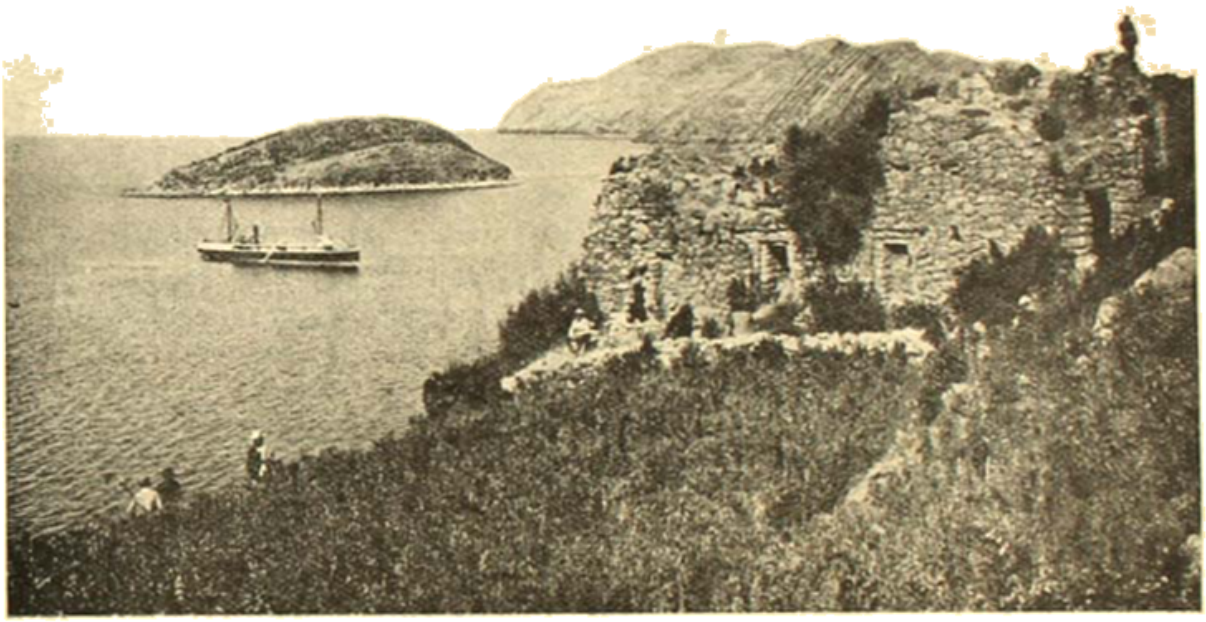

টিয়াহুনাকো দৃশ্য : এখান 'সূর্য্যদ্বার' ইহা সভ্যতার অনেক মাস্তো কালাকের জন্মভূমি।

খসিয়ে পিরামিডগুলো নষ্ট করেছে। ইজিপ্টের পিরামিড গুলির সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

পিরামিডের পাশে যে সব বড় বড় পাথরখণ্ড ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরা বাড়ীঘর করবার জন্যে সেগুলি খুলে নিয়ে গিয়েছে। এখন এগুলোকে আর পিরামিড বলে চেনা দুষ্কর। এক সময়ে তলদেশ থেকে উপরে উঠবার সিঁড়ি ছিল, বর্ত্তমানে শুধু সিঁড়ির নীচেকার কয়েকটি ধাপ মাত্র বজায় আছে। একটা পিরামিড থেকে আর একটা পিরামিডের মধ্যে পাথরে গাঁথা পয়ঃপ্রণালী ছিল, কি উদ্দেশ্যে এই পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হয়েছিল—এখন তা বুঝবার কোনো উপায়ই নেই।

কি জন্যে এই পাহাড়ের উপর এই সব পিরামিড তৈরী হয়েছিল, বা সমতল পর্ব্বতচূড়াতে দুর্গ, মন্দির, কিংবা রাজ-প্রাসাদ ছিল, তাও বর্ত্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। উত্তর স্থানটি ভূমিতল থেকে অনেকটা উঁচু—একটা প্রস্তর-বেদীর আকারে গাঁথা, এবং সমস্ত বেদীটা পাথরে বাঁধানো ছিল। উচ্চতাখানা বাদে অধিকাংশ পাথর স্থানীয় লোকে খুলে নিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ীতে লাগিয়েছে।

বড় বড় পাথরের বেদী প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এক সময়ে এগুলি স্তম্ভ বা প্রস্তরমূর্ত্তির ভিত্তি ছিল, বর্ত্তমানে স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে—প্রস্তরমূর্ত্তি অন্তর্হিত, কেবল বড় একখানা পাথর কেটে তৈরী প্রাচীন যুগের একটি দেবমূর্ত্তি এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, মূর্ত্তির মুখ, চোখ, নাক কিছুই নেই, কেবল একটি মাত্র কান অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে।

আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা টিয়া-হুয়া-নাকো নগরের কিছু রাখে নি, যতদূর নষ্ট করা সম্ভব, তারা তা করেছে। এক সময়ে এখানে বলিভিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-শিবির ছিল, তারা প্রস্তর-

মূর্তি, মন্দির, ডলমেন প্রভৃতিকে চাঁদমারী স্বরূপ ব্যবহার করে বন্দুক ছুঁড়েছে, যে কোনো উন্নততর দেশ এত বড় প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ জাতীয় সম্পদ হিসেবে সযত্নে রক্ষা করত,

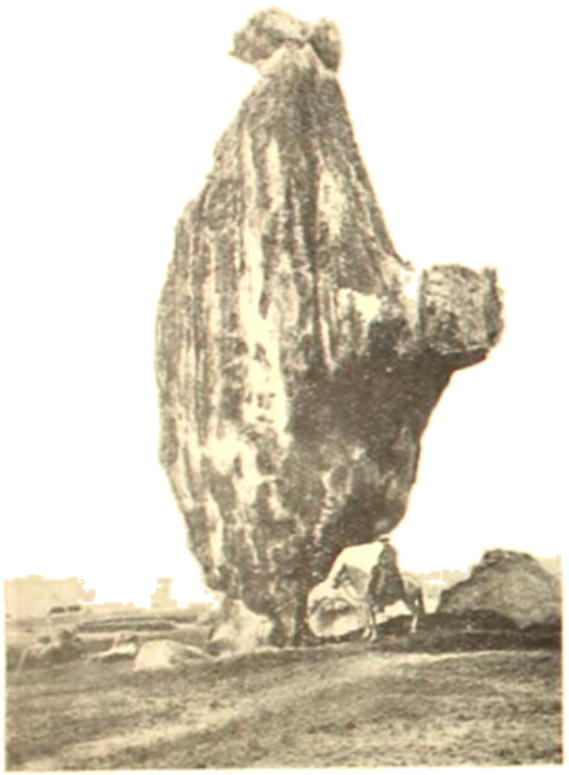

পেছন এই দেবমূর্তির কেটি প্রাগৈতিহাসিক অভিকায় মূর্তি। আঙুলে যেন ডি-পাতার হাতখানির বিরাট অবয়ব। একপার্শ্বে একটি লম্বা-পর্বের আছে, এমন ধরনে যে দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বের অন্তরালেও সংবাদ-পত্র রেখে অনায়াসে পড়া যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

প্রস্তরস্তম্ভগুলি মাটীতে গভীর করে পোঁতা। এমন ভাবে তৈরী যে তারা খুব ভারী পাথরের খিলান কি ছাদের ভার ধারণ করতে সক্ষম। একটা থাম থেকে আর একটার দূরত্ব ১৬ ফুট থেকে ২০ ফুট। দুটো থামের মধ্যে সোপানশ্রেণী গাঁথা ছিল বেদীতে উঠবার নামবার জন্যে।

সূর্য্যমন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে কোণে সুবৃহৎ তোরণদ্বার ছিল—ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় এর নাম সূর্য্যতোরণ—এর খানিকটা অংশ এখনও অটুট আছে—এই তোরণ বিরাট, যে সব পাথর দিয়ে এর খিলান গাঁথা হয়েছে, তা এত প্রকাণ্ড যে, সেগুলি স্থানান্তরিত করা স্থানীয় লোকদের সাধ্যাতীত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দশবৎসর আগে বজ্রপাতে মন্দিরের খিলান ফেটে গিয়েছে—এটাকে মেরামত করে বজায় রাখবার চেষ্টা চলছে গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে। ১৬ ইঞ্চি পুরু একখণ্ড বিশাল আয়তন প্রস্তর কেটে এর চৌকাঠ তৈরী; দরজার চৌকাঠ থেকে খিলানের উচ্চতা ২৫ ফুট।

পাথরের চৌকাঠে সাপ, অদ্ভুতমূর্ত্তি দেবদেবী, গাছপালা খোদাই করা। দরজার দুপাশে ২৯০ ফুট উঁচু ও ৪ ইঞ্চি গভীর কুলুঙ্গি। সম্ভবতঃ এগুলিতে দেবমূর্তি বসানো থাকত। খিলানের উপরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি খোদা, মূর্ত্তির মাথার চারিপাশে জ্যোতিচ্ছটা, একপাশে ভাওয়ারের মূর্ত্তি, একধারে চন্দ্রদেব। উয়া-হুয়া-নাকো নগরের অনেক স্থানেই পাথরে খোদা ভাওয়ারের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে—সম্ভবতঃ এটি প্রাচীন যিনের কোনো দেবতার মূর্ত্তি।

সূর্য্যদেবের হাতে রাজদণ্ড। তাঁর দুপাশে আটচল্লিশটি বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি, চব্বিশটা করে মূর্ত্তি এক এক পাশে। এই চব্বিশটা মূর্ত্তি তিন থাকে খোদা, আটটা করে এক এক থাকে। এদের মুখ সূর্য্যদেবের দিকে ফেরানো, শুধু ফেরানো নয়, এরা যেন দৌড়ে ছুটে চলেছে সূর্য্যদেবের দিকে। প্রাচীন শিল্পীরা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে এদের এই গতির ছন্দ পাথরে ফুটিয়ে তুলেছে। এদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা রাজদণ্ড। পাখা আছে, সকলেরই মুখ কণ্ডর পাখীর মত, (আণ্ডিজ পর্ব্বত মালার সর্ব্বোচ্চ অংশে এই সুবৃহৎ উগল জাতীয় পাখী বাসা বাঁধে) এবং সবদের মুখে ক্রোধের ভাব।

উয়া-হুয়া-নাকো: দেবতার মূর্ত্তির রক্ষক। প্রস্তর-স্তম্ভগুলি প্রায় আট ফুট দীর্ঘ, এবং এত প্রশস্ত যে দুই হাতে ধরা চলে না।

সূর্য্যমন্দিরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আরও অনেক ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান।

একস্থানে একটা প্রস্তরবেদী, বোধ হয় বলিদানকার্য্যে ব্যবহৃত হত—তার মাঝখানে মাথা ও ঘাড় রাখবার জন্যে গর্ত্ত কাটা। বেদীতল থেকে গর্ত্তের উচ্চতাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ মেষ বা ছাগশিশু বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। সূর্য্যমন্দিরে সম্ভবতঃ নরবলির প্রথা ছিল না।

জানালা নেই, আলো বাতাস খেলে না—একটি মাত্র বড় ঘরে মানুষ, পশু একত্রে বাস করে।

যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিশাল শিলাবেদী, মূর্ত্তি, সূর্য্য-মন্দির গড়েছিল, তারা আজ নিজেদের বাসের কুটীরও ভাল করে তৈরী করতে পারে না।

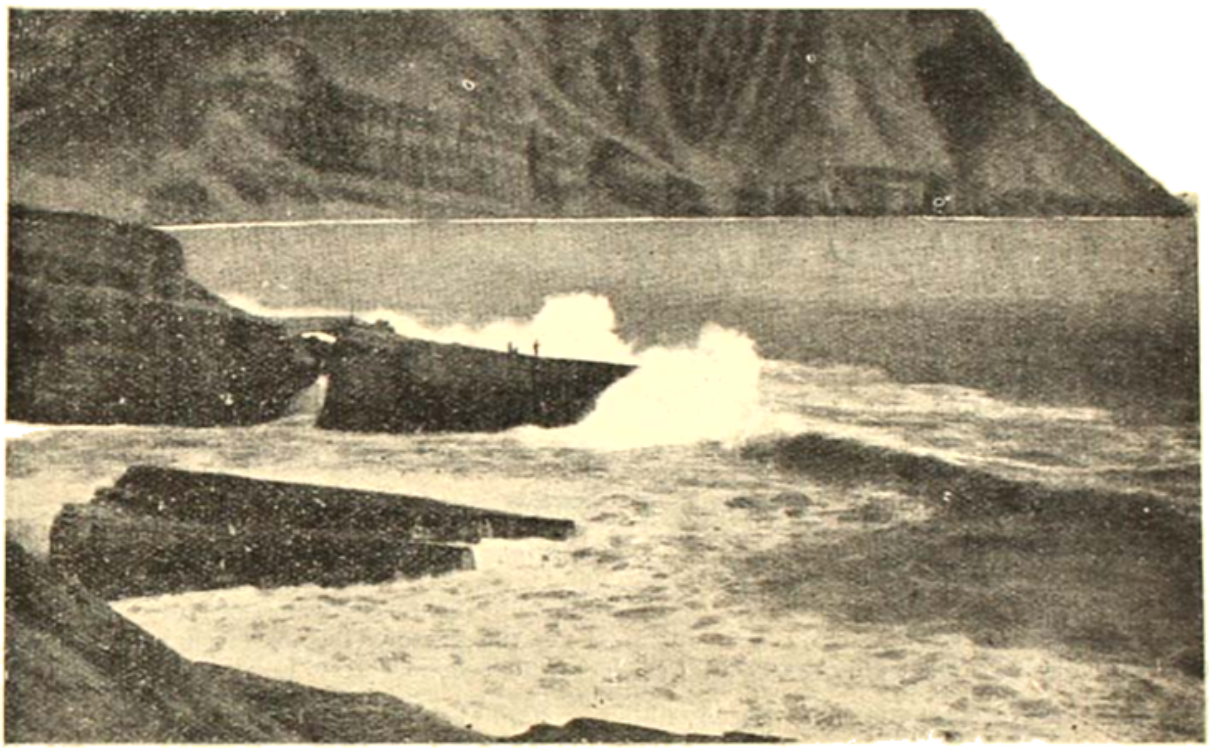

কোচুয়া বেলাভূমি : বর্ত্তমান পেরু-রাজ্যের শ্রীমাবাস।

সূর্য্যমন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত চাষ চলেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে পোয়াই-করা প্রস্তরখণ্ড তুলে অজ্ঞ অধিবাসীরা ক্ষেতের বেড়া দিয়েছে বা নিজেদের দীনহীন কুটীরের দরজা করেছে। স্পেনীয়গণ গাড়ী বোঝাই দিয়ে পাথর নিয়ে গিয়ে গির্জ্জা বানিয়েছে—মোটের উপর এতটা সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যত রকমে নষ্ট করা সম্ভব, তা এরা করেছে। টিয়া-হুয়া-নাকোর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যেত এতদিন, যদি বলিভিয়া গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামের ডাঃ পোসেবোর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হত।

যে গৌরবময় যুগে এই বিরাট সভ্যতা জন্মলাভ করেছিল, সে গৌরব বলিভিয়া থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সেই প্রাচীন সভ্যজাতিরই বর্ত্তমান বংশধর এই অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অলস, দরিদ্র আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা। এরা অতীতের সকল সম্পদই হারিয়েছে, যে দিকে চোখ যায়, পাহাড়ের গায়, সমতল ভূমিতে তাদের ঘরের খড়ে ছাওয়া কুশ্রী কুটীর, সে কুটীরে জানালা নেই, আলো বাতাস খেলে না—একটি মাত্র বড় ঘরে মানুষ, পশু একত্রে বাস করে।

একটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসস্তূপে যত মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ পাত্রের গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন রেখা যায়। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের পক্ষে এটা গভীর ভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করার ব্যাপার। অত প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকায় স্বস্তিক চিহ্নের প্রথা কোথা থেকে এসেছিল!

ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৩ মাইল দূরে বিখ্যাত টিটিকাকা হ্রদ। পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু জায়গায় অবস্থিত আর কোন হ্রদ নেই। টিটিকাকা হ্রদের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শান্ত, নিস্তরঙ্গ। বিশাল হ্রদের জলের রং কোবাল্টের মত। হ্রদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। এই রকম একটা দ্বীপে ইঙ্কা সম্রাটদের স্থাপিত সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের মন্দির আছে। কিন্তু সে সব অনেক পরের ব্যাপার। টিয়া-হুয়া-নাকো নগরের মত অত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ-আমেরিকায় কোথাও নেই।

রামরাম বসু ও রামমোহন রায়

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন তাঁহাদের নিকট রামরাম বসুর নাম অপরিচিত নহে। ছাপার অক্ষরে বাঙালীর লেখা প্রথম মূল গদ্যগ্রন্থের গৌরব রামরাম বসুরই। রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের "জনক" এ-ধারণা জনপ্রচলিত হইলেও সত্য নয়।

রামরাম বসুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নাই। তিনি জাতিতে বৈদ্য কায়স্থ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জন্ম চুঁচুড়ায় এবং ২৪-পরগণার নিম্নতে গ্রামে তিনি লেখাপড়া শেখেন। তবে তাঁহার কর্মজীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। মিশনরীদের গ্রন্থপাঠে এবং ভারত-সরকারের দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া রামরাম বসুর কর্মজীবনের ইতিহাস যেটুকু জানিতে পারিয়াছি এখানে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

জন্ টমাসের মুন্‌শী

ব্রেডলেও ডেভিড ব্রাউন (ইনি ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভোষ্ট হন) ১৭৮৭ সনে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন:—"Out of ten million natives, we know of no Christian." এদেশবাসী পৌত্তলিকদের মধ্যে খৃষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচারের আবশ্যকতা তখন কোন কোন ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান অনুভব করিতেছিলেন। ১৭৮৬ সনের জুলাই মাসে জন্ টমাস নামে একজন ব্যাপটিষ্ট মিশনরী খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে বাংলা দেশে আসেন। তিনি পূর্বে আর একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ৪-চার জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল; তাঁহারা টমাসের প্রতি সদয় হইলেন।

এদেশবাসী পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইতে হইলে আগে দেশীয় ভাষা শেখা দরকার। টমাস প্রথমে বাংলা শিখিবার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী ছিলেন উইলিয়াম চেম্বার্স। চেম্বার্সের নিকট টমাস একজন সুদক্ষ বাংলা শিক্ষকের সন্ধান পাইলেন—ইনিই আমাদের রামরাম বসু। চেম্বার্সের সুপারিশে টমাস রামরাম বসুকে তাঁহার মুন্‌শী নিযুক্ত করিলেন (১৭৮৭, মার্চ)।*

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের পরামর্শে শীঘ্রই টমাসকে ধর্মযাজক রূপে মালদহ যাইতে হইল। মালদহে তখন কোম্পানীর রেশমকুঠির কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ছিলেন—জর্জ উড্‌নী। ঠিক হইল টমাস উড্‌নী-পরিবারে বাস করিবেন; বাংলা শিখিতে থাকিবেন, এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে খৃষ্ট-মহিমা প্রচার করিবেন।

পরবর্তী জুন মাসে টমাস মালদহে পৌঁছিলেন: তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু। মুন্‌শীর নিকট টমাস বাংলা শিখিতে লাগিলেন। অল্পস্বল্প বাংলা শিখিয়া পর বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলায় বিশু-গুণগান করেন। তখন তাঁহার বাংলা-জ্ঞান কিরূপ হইয়াছিল তাহার একটু নমুনা দিতেছি:—

> "Now the wages of sin is death...But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord"

টমাস ইহার বাংলা করিয়াছিলেন:—

> যেমন পাপির মিত্ত্ব কিন্তু যেমন দিয়া চির প্রমাই জিবন কাহা হইতে। এই মিত্ত্ব এখন আমত তখন—

টমাস যখন বাংলায় খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতেন তখন রামরাম বসুকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করিতে হইত। কিছুদিন পরে টমাস লক্ষ্য করিলেন খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি রামরাম বসুর অনুরাগ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—যেদিন রামরাম বসু স্বধর্মের পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়া পবিত্র খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইবেন।

১৭৯১ সনের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি আমরা টমাসকে নদীয়ায় দেখিতে পাই। সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্যই তিনি সেখানে যান। টমাসের কথায়, নদীয়া তখন "হিন্দুস্থানী অক্সফোর্ড"। সেখানে পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কারের চেষ্টায় টমাস

---

* *Memoirs of the Rev. John Thomas the First Baptist Missionary to Bengal*: By the Rev. C. B. Lewis (1871), p. 26.

একজন ভাল পণ্ডিতের সন্ধান পান। তাঁহার নাম পঞ্চলোচন। টমাস তাঁহার অধীনে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১৭৯১ সনের ১০ই ডিসেম্বর টমাস নদীয়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পর বৎসর (১৭৯২) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি তিনি স্বদেশযাত্রা করেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রামরাম বসুও কলিকাতা আসিয়াছিলেন।

কেরীর মুন্‌শী

এদেশবাসীর মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে টমাস পুনরায় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে আসিলেন—উইলিয়াম কেরী। ১৭৯৩ সনের ১১ই নবেম্বর তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। রামরাম বসুও আসিয়া জুটিলেন। রামরাম বসুকে পাইয়া টমাস যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি একটি সংবাদে ক্ষুণ্ণও হইলেন। স্বদেশ-যাত্রাকালে টমাস রামরাম বসুকে খৃষ্টধর্মে অনুরাগী দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে কোন খৃষ্টান বন্ধু বা সাহায্যকারীর অভাবে রামরাম বসু অর্থকষ্টে পড়েন; শেষে তাঁহাকে বন্ধু ও পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং তাহাদের তুষ্টির জন্য তাঁহাকে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানও পালন করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৭৯৩, ১৪ই নবেম্বর তারিখে লেখা কেরীর একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

> Poor Ram Bosheo was waiting for us, but, to our grief, has been bowing to idols again. He was forsaken by European christians, and discarded by Hindus, and he says, 'I was very ill; nothing to support me or my family: all said Mr. T. [Thomas] would not return. I knew the roman catholics worshipped idols; I thought that I had seen but a small part of the bible; perhaps the worship of images might be commanded in some part of it; but it was for a piece of bread, and I still love christianity the best.'

যাহা হউক রামরাম বসুকে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া টমাস আশ্বস্ত হইলেন। এদেশবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইতে হইলে সর্বাগ্রে বাংলা শেখা দরকার বুঝিয়া কেরী রামরাম বসুকে মুন্‌শী নিযুক্ত করিলেন। দুইটি কারণে রামরাম বসুকে কেরীর বড় পছন্দ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার চারিত্রের মাধুর্য; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অল্পস্বল্প ইংরেজী-জ্ঞান। টমাসও তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান ঝালাইবার জন্য একজন পণ্ডিত রাখিলেন।

অর্থাভাবে কেরী ও টমাসের পক্ষে কলিকাতায় বেশী দিন থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া শেষে মালদহে গিয়া ওর্ড উড্‌নীয় দুইটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। টমাস ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে এবং কেরী পরবর্তী জুন মাসের ১৫ই তারিখে মদনাবতীর নীলকুঠিতে উপস্থিত হন। উভয় কুঠির মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ। তাঁহাদের বেতন হইল মাসিক দুই শত টাকা; এ ছাড়া কমিশন ত ছিলই। বলা বাহুল্য, রামরাম বসুও কেরীর সঙ্গে মদনাবতী গিয়াছিলেন।

অর্থসঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া মিশনরীরা তথাকার দেশীয় লোকদের মধ্যে খৃষ্টতত্ত্ব প্রচারের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। কেরী বাইবেলের বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। রামরাম বসুও তাঁহাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কেরী তাঁহার 'জর্নালে' লিখিতেছেন:—

> "21 [Jany. 1794]. .....This evening I had a very profitable conversation with Moonshi, about spiritual things; and I do hope that he may one day be a very useful and eminent man. I am so well able to understand him, and he me, that we are determined to begin correcting the translation of Genesis to-morrow."

১৭৯৬ সনে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কেরী তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মহীপালদীঘিতে টমাস একদিন লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, রামরাম বসু কিছুদিন হইতে একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত এবং এই বিধবার একটি সন্তান হওয়াতে

বিষয়টিকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা সত্য কি-না অবিলম্বে তদন্ত করিবার জন্য টমাস কেরীকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, সংবাদটি অমূলক নহে।* সঙ্গে সঙ্গে রামরাম বসুও মদনাবতী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কেরী ও টমাস উভয়েই রামরাম বসুকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহার এই পদস্খলন মিশনরীদের দারুণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। মদনাবতী হইতে ১৭৯৯ সনের ১৭ই জুন তারিখে লেখা কেরীর একখানি চিঠিতে প্রকাশ :—

> "...I have been forced, for the honour of the gospel, to discharge the Moonshi, who...was guilty of a crime which required this step, considering the profession he had made of the gospel. The discouragement arising from this circumstance is not small, as he is certainly a man of the very best natural abilities that I have ever found among the natives, and being well acquainted with the phraseology of scripture, was peculiarly fitted to assist in the translation: but I have now no hope of him."†

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও রামরাম বসু

পাঁচ বৎসরের উপর মদনাবতীর মত নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে কাটাইয়া কেরী পুত্রপরিবারসহ ১৮০০ সনের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ব্রাউন্টন প্রভৃতির সাহচর্যে তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। মিশনরীরা সোসাইটির নামে শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ি কিনিলেন, একটি মুদ্রাযন্ত্র এবং বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল।

এই বৎসরের মাঝামাঝি রামরাম বসু একদিন শ্রীরামপুরে কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাকে পাইয়া কেরী মহা আনন্দিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। রামরাম বসু খৃষ্টধর্মপ্রচারে পুনরায় মিশনরীদের সহায়ক হইলেন। অল্পদিন পরেই তিনি 'গস্‌পেল মেসেঞ্জার' নামে একখানি বাংলা পুস্তক মিশনরীদের লিখিয়া দিলেন; ইহা ১০০ পংক্তির একখানি কবিতা-পুস্তক। মিশনরীরা উহা শ্রীরামপুরে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই বৎসর (১৮০০) রামরাম বসুর রচিত আরও একখানি পুস্তিকা শ্রীরামপুরের মিশনরীরা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ।* পাদরী লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৮৪) রামরাম বসুর এই পুস্তিকাখানির নাম "জ্ঞানোদয়" এবং প্রকাশকাল "১৮০১ সন" দেওয়া আছে। ১৮০১ (?) সনে 'খৃষ্টচরিত্র' (The Immortal History of Christ) নামে তাঁহার আরও একখানি আড়াই শত পৃষ্ঠার বাংলা কবিতা-পুস্তক শ্রীরামপুর মিশনরীরা প্রকাশ করেন।† এই সকল পুস্তিকা বহুল বিতরণের ফলে হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ১৮০০ সনের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ পাল নামে এক জন ধুতুরা যখন শ্রীরামপুরের পাদরীদের চেষ্টায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইল তখন চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই কৃষ্ণদাসই সর্বপ্রথম বাঙালীদের মধ্যে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হয়।

---

* *Memoirs of the Rev. John Thomas*: By the Rev. C. B. Lewis, p. 119.

† *Memoir of William Carey, D. D.* By Eustace Carey, p. 264.

* "We have printed...a piece ['Gospel Messenger'] written by a native, Ram Boshu, to usher in the bible...We have another piece nearly ready, written by a native (Ram Boshu), exposing the folly and danger of the Hindu system. This is peculiarly pointed against Brahmunism, something like those thundering addresses against the idle, corrupt, and ignorant clergy of the church of Rome, at the commencement of the reformation..."—*Mission House, Serampur, Oct. 10, 1800.* (*Memoir of William Carey, D. D.*, p. 403, also p. 432.)

১৮০০, ২০এ নবেম্বর তারিখে লেখা কেরীর আর একখানি চিঠিতে রামরাম বসু সম্বন্ধে আছে :—"He has written two pieces: one designed to introduce the gospel, the other, a very hard-mouthed attack on the Brahmuns."

† রামরাম বসুর উপরিলিখিত তিনখানি পুস্তক সম্বন্ধে John Murdoch's *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* পুস্তকের ৪০ ও ৪৫-৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাহার 'খৃষ্টচরিত্র' ও 'গস্‌পেল মেসেঞ্জার' গুড়িয়া ভাষায়, এবং শেষোক্ত পুস্তিকাখানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।—*Ibid*, pp. 36, 44.

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতী

ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সব ইংরেজ সিবিলিয়ান এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করা যে অবশ্য প্রয়োজন— ইহা বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন গবর্নর-জেনারাল লর্ড ওয়েলেসলি। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এই কলেজে দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত মৌলভী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরী উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রাম-নাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে আরও ছয় জন পণ্ডিত নিযুক্ত হন; ইঁহাদের মধ্যে একজন রামরাম বসু। এই ছয় জন পণ্ডিতের নাম :— শ্রীপতি [মুখোপাধ্যায়], আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন [মুখো-পাধ্যায়], কাশীনাথ, পদ্মলোচন * [চূড়ামণি], রামরাম বসু। †

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, পাঠনার উপযোগী কোন পুস্তক নাই। পাঠ্যপুস্তকের অভাব কলেজের কর্তৃপক্ষেরাও অনুভব করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতদিগকে এরূপ পুস্তক রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেরী নিজেই বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিলেন এবং রামরাম বসুকে দিয়া একখানি গদ্য-গ্রন্থ লেখাইলেন—ইহার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ সালেই মুদ্রিত হইয়া শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়।‡ ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বাঙালী রচিত প্রথম মূল গদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রামরাম বসু কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোষিক পান। এই সম্পর্কে ডক্টর কেরী কলেজ কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পত্রখানি কলেজ-কাউন্সিলের ১৮০১, ১৮ই জুলাই তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়।—

To Charles Rothman Esqr.
Secretary to the Council of the College.

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit language into Classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun which is a very useful class book—and also that Ram Ram Bose has composed a History in the same language called Pritapeadytta—which is used by the students. They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy's was eleven months employed on his work and Ram Ram Bose one year, six months.

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
W. Carey.
Bengalee Teacher.

P. S. Mritoonjoy the head Pundit in the Bengalee Department translated

* ইনিই জন্ টমাসের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন। কেরী বিলাতি টমাসের সহিত কাটাইয়াছিলেন, কাজেই পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহারও পরিচয় ছিল। (*Memoirs of the Rev. John Thomas*, pp. 65, 107, 110.

† Proceedings of the College of Fort William. *Home Mis. Vol. no. 559.* p. 5.

‡ "When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assit me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing."—Mr. Carey to Dr. Ryland, Serampore, June 15, 1801. (*Memoir of William Carey*, pp. 453-54.)

the Butteesee Singhasun into the Bengalee Language, which is excellent class book. Ram Ram Bose also wrote the History of Raja Pritapaditya (the first prose work ever written in the language and an authentic history of the government of Bengal from the begining of the reign of Acbber to the end of that of Johangeer) and another book called Lippi Mala—which are also very useful class books. They have applied for rewards. I think about 400 Rupees will be a remuneration for Mritoonjoy, and about 200 for Ram Ram Bose.

Resolved that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy and 300 Sicca Rupees to Ram Ram Bose as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey. *

১৮০২ সনে 'লিপি মালা' নামে রামরাম বসুর আর একখানি বই বাহির হয়। এই পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য ও ইহার বিষয়বস্তুর আভাস পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে :—

[illegible] যাহাতে এ দেশীয় লোকেরা অনায়াসে পত্রাদি লিখিতে পারেন এই নিমিত্ত শ্রীযুত রামরাম বসু পণ্ডিত কর্ত্তৃক এই পুস্তক রচিত হইল।

এই পুস্তকে প্রথমতঃ বাঙ্গালা অক্ষর তাহার পর সংযুক্ত অক্ষর তাহার পর বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ তাহার পর পত্রাদি লিখনের রীতি তাহার পর কতক গুলিন পত্র তাহার পর কতক গুলিন দলিল তাহার পর কতক গুলিন পরওয়ানা তাহার পর কতক গুলিন কবুলিয়ত তাহার পর কতক গুলিন পাট্টা তাহার পর কতক গুলিন দানপত্র তাহার পর কতক গুলিন বিক্রয়পত্র তাহার পর কতক গুলিন বন্ধকপত্র তাহার পর কতক গুলিন হাওলাত তাহার পর কতক গুলিন মোকদ্দমার আরজী তাহার পর কতক গুলিন জবাব তাহার পর কতক গুলিন ফয়সলা তাহার পর কতক গুলিন ইস্তাহার তাহার পর কতক গুলিন সওয়াল জবাব তাহার পর কতক গুলিন মুচলিকা তাহার পর কতক গুলিন ইকরার তাহার পর কতক গুলিন রসীদ তাহার পর কতক গুলিন তমঃসুক তাহার পর কতক গুলিন খত তাহার পর কতক গুলিন হুণ্ডী তাহার পর কতক গুলিন তেজারতী তাহার পর কতক গুলিন জমাবন্দী তাহার পর কতক গুলিন মহাজনী হিসাব তাহার পর কতক গুলিন জমীদারী হিসাব তাহার পর কতক গুলিন সওদাগরী হিসাব তাহার পর কতক গুলিন নিকাশ তাহার পর কতক গুলিন তালিকা তাহার পর কতক গুলিন ফর্দ্দ তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের পত্র তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের পত্র তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের ফর্দ্দ তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের নিমন্ত্রণ তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের বিদায় তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের বিদায় তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের আশীর্ব্বাদ তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের আশীর্ব্বাদ তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের যৌতুক তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের যৌতুক তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের বরণ তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের বরণ তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের ঘটক তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের ঘটক তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের কুলীন তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের কুলীন তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের ভাট তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের ভাট তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের নাপিত তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের নাপিত তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের কাঙ্গালী তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের কাঙ্গালী তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের বাদ্য তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের বাদ্য তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের বাজনদার তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের বাজনদার তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের বেশ্যা তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের বেশ্যা তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের নাচনী তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের নাচনী তাহার পর কতক গুলিন বিবাহের ভোজন তাহার পর কতক গুলিন শ্রাদ্ধের ভোজন

(১) অনেকে বলেন, রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' লিখিয়া তাহার খসড়া রাজমোহন রায়ের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৭৮৭ সনের মার্চ্চ মাসে রামরাম বসু পাদ্রী জন্ টমাসকে বাংলা শিখাইবার জন্য তাঁহার মুনশী নিযুক্ত হন। বাংলা ও ফার্সীতে রামরাম বসুর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল; কাজ চালাইবার মত ইংরেজীর জ্ঞানও ছিল। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামরাম বসুর আরও দুইখানি পুস্তক শ্রীরামপুর হইতে ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তিনি কেরীর বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সব কারণে মনে হয়, ১৮০১ সনে রামমোহন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দেন—একথা সত্য নহে। রামমোহন নিজে ১৮১৫ সনের পূর্ব্বে বাংলায় কোন কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পরন্তু রামমোহন যখন নিতান্ত বালক—তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ-পনের—রামরাম বসু তখন ভাল বাংলা কবিতা লিখিতে পারিতেন। ১৭৮৮ সনে রচিত রামরাম বসুর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কে আঁর ত্রিতে পারে
লই জিজু জাহি বিনা গো।
নাগর ও ঘোরে লই
জিজু জাহি বিনা গো।

সেই জনার ঈশ্বর হয়
পাপির আগের হেতু।
তারে সেই জন করয়ে তরণ
পায় হবে চক্ষুসেতু।

এই পৃথিবীতে আছি কোন জন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
অন্তরের আপকর্ত্তা সেই জন
জিজু ও নাম তাহার।

ঈশ্বর আপনি অন্তিম অবনী
উদ্ধারিতে পাপি জন।
যেই পাপি হয় অন্তরে তাহার
সেই পাবে পরিত্রাণ।

আমার নিস্তার ধর্ম্ম অবতার
সেই তন্ত্রকের নাথ।
তাঁহার বিহনে অর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।

সে বচন বাণী শুন সব প্রাণি
যে কেহ তুষিত হয়।
যে মত আদিবে শুদ্ধ যাহি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।

অন্তরে যম কয় যে তখন
তাহাকে জানিয়া লয়।
তাঁহার বিহনে পাতকি জনের
কোন জন নাহি আয়।"*

(২) রামমোহন রায়ই না-কি রামরাম বসুকে খৃষ্টিয়ান হইতে দেন নাই—এমন কথাও কেহ কেহ লিখিয়াছেন।

রামরাম বসু টমাস ও কেরীর অধীনে জীবনের শেষ কয় বৎসর চাকরি করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তিনি বিশ্বাসবান এরূপ ভাবও দেখাইয়াছিলেন। এমন কি টমাস ও কেরীর এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে রামরাম বসু শেষ পর্য্যন্ত খৃষ্টিয়ান হইবেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। রামরাম বসু মিশনরীদের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন—কেরীর অনুরোধে খৃষ্টতত্ত্ব বিষয়ে, এমন কি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, পুস্তিকা লিখিয়া দিয়াছেন—কিন্তু তিনি পরিবার পরিজন ও স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম বরণ করিতে কখনই সাহসী হন নাই। মার্শম্যান তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"He had a clearer perception of the truths of Christianity than any other native at the time, and he regarded the popular superstitions of the country with philosophical contempt, but he did not possess sufficient resolution to renounce his family connections, and avow himself a Christian.... But like those who assisted in the construction of the ark, and yet obtained no asylum in it, Ram-bosoo, though he contributed largely to the introduction of Christian truth into the country, never himself sought refuge in the doctrines of the Gospel." †

টমাসের জীবনীতে কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে :—

"This man, [Ramram Bose] within the first year of Mr. Thomas's settlement at Mulda, had given him hopes that he was a believer in the Lord Jesus Christ; and, although he carefully preserved his caste, he appears to have professed a very hearty reception of the doctrines of the gospel. It may be feared that he was not sincere from the first; and that the wily Munshi combined with other natives cruelly to impose upon the missionary, when, detached from all the world besides, he was laboring in longing hope that by

* *Memoirs of the Rev. John Thomas*, p. 83.
† *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward: By John Clark Marshman* (1859), i. 132.

his means a church of Jesus Christ might be gathered amongst the natives of Bengal. Ram Basu was a clever man, with a pleasing address. He wrote Bengali hymns and, at a later date, some very effective tracts; and almost down to his death, in 1813, hopes were cherished that he might after all declare himself a disciple of Christ." *

দেখা যাইতেছে, ১৮১৩ সনে রামরাম বসুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেরী আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু তাঁহার খৃষ্টিয়ান না হইবার মূলে রামমোহন কেমন করিয়া থাকিতে পারেন বুঝা শক্ত। রামমোহন ১৮০৩ হইতে এগার বৎসর কলিকাতা হইতে দূরবর্তী স্থানে কাটাইয়াছেন। ১৮১৪ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হইবার কয়েক বৎসর পরে—১৮২১ সন হইতে তিনি মিশনরীদের প্রতি বিমুখ হন এবং তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিছুদিন ধরিয়া লেখালেখি করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহা হইতেই অনেকের ধারণা হইয়াছে যে রামরাম বসু যখন খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তখন শেষ পর্যন্ত তাঁহার খৃষ্টিয়ান না হইবার মূলে রামমোহনেরই প্রভাব বর্তমান।

রামমোহন রায়ের উপর রামরাম বসুর প্রভাব

দুইটি বিষয়ে রামরাম বসু রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন। রামমোহনের অনেক আগে তিনি পুস্তক লিখিয়া পৌত্তলিকতার জন্য হিন্দুদের তিরস্কার করেন, এবং ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। এই দুইটি বিষয়ে পরবর্তীকালে রামমোহন তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রচারিত হয়। এই 'আত্মজীবনী' তাঁহার স্বলিখিত কি-না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই আত্মকাহিনীতে প্রকাশ, ১৬ বৎসর বয়সে রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তকের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই উক্তি হইতে কেহ কেহ ধরিয়া লইয়াছেন যে রামমোহনের এই পুস্তকখানি "বাংলায়" রচিত এবং তাহার নাম "হিন্দুদের পৌত্তলিক প্রণালীর প্রতিবাদ"! রামমোহন সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ-কথা বলা চলে যে ১৬ বৎসর বয়সে বাংলায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন কিছু লেখা ত দূরের কথা—১৮১৪ সনের পূর্বে, অর্থাৎ ৪১ বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি বাংলায় কোন কিছুই রচনা করেন নাই। তাঁহার সর্বপ্রথম বাংলা পুস্তক—বেদান্ত গ্রন্থ—১৮১৫ সনে প্রকাশিত হয়। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বাংলায় রচিত নহে—ফার্সীতে (ইহার ভূমিকাটি আবার আরবীতে লেখা)। রামমোহনের এই বইখানির নাম—'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদীন', ইহা ১৮০৩-০৪ সনে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ—১৬ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার পূর্বে ১৮০০ সনে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামরাম বসুই প্রথমে বাংলায় বই লেখেন। আমার মনে হয়, হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে রামরাম বসুর বাংলা পুস্তক রচনার কথাই ভুলক্রমে রামমোহনের নামে চলিয়া আসিতেছে।

রামরাম বসু প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন; পরে ব্রহ্মোপাসক হন। রামমোহনের অনেক আগেই তিনি ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮০২ সনে প্রকাশিত তাঁহার 'দিপি মালা' পুস্তকের গোড়ায় আছে :—

"এই দিপি প্রথম কর্ত্তা জানহ দিপি দাতা পরব্রহ্ম ইহাতে নহ হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া লিখন করা যাইতেছে।"

এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও রামমোহনের পক্ষে প্রথম জীবনে রামরাম বসুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া বিচিত্র নয়। খুব সম্ভব তিনি রামরাম বসুর সহিত পরিচিত ছিলেন। রামরাম বসু ১৮০১ সনের মে মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা-বিভাগের একজন পণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন ১৮০১ হইতে ১৮০৩ সনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছেন; তাহার পর এগার বৎসর বিদেশে কাটান। এই ১৮০০ হইতে ১৮০৩ সনের মধ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভাগলপুর হইতে ১৮০৯ সনে লেখা তাঁহার একখানি চিঠিতে।†

* *Memoirs of the Rev. John Thomas*, p. 55.

† "The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the College of Fort William,..."Rammohun Roy to Lord Minto, dated 12th April 1809. (*Judicial—Criminal Proceedings*, 12th June 1809, No. 26.)

"I now beg leave to refer the Board to the Qazi-ul-Cuzzat in the Sadar Dewani Adalat, to the Head Persian Munshi (Allah Dad) of the College of Fort William, and to the other principal officers of those Departments for the character and qualifications of the man I have proposed."—Digby to the Board of Revenue, dated 31 Jany. 1810. (Modern Review, May 1930, p. 573.)

একটি সন্ধ্যা

(পূর্বানুবর্ত্তী)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'খুব। কেন পারবেন না? এতো থিয়েটারের নাচ নয় যে দেখতে পরনা লাগবে! কিন্তু আপনি কি অতক্ষণ থাকবেন?'

'থাকতে দিলেই থাকব।'

মালতী বলল 'থাকবে বৈকি। তুমি আজ এইখানেই খাবে হেরম্ব।'

আনন্দ হেসে বলল 'বেমক্কা তো করলে, ঘরের লোকটিকে খাওয়াবে কি মা?'

'আমরা যা খাই তাই খাবে।'

"তার মানে উপোস। আজ পূর্ণিমার রাত, তুমি একটু দুধ খাবে, আমি কিছুই খাব না। অতিথিকে খাওয়াবার বেশ ব্যবস্থাই করলে মা।'

মালতী বলল 'তোর কথায়, জানিস আনন্দ, ছিরিছাঁদ নেই। আমরা খাই বা না খাই একটা অতিথির পেট ভরাবার মত খাবারও ঘরে নেই নাকি!'

আনন্দ মুচকে হেসে বলল 'তাই বল! আমরা যা খাব ওঁকেও তাই খেতে হবে বললে কিনা, তাই ভাবলাম ওঁর জন্যেও বুঝি উপোসের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

হেরম্ব ভাবে, মাকে মধ্যস্থ রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করা কেন? এতক্ষণ যত কথা বলেছে সব আমাকে শোনাবার জন্য, কিন্তু নিজে থেকে সোজাসুজি আনন্দ আমাকে একটা কথাও বলে নি। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, আমার কথার পিঠে দরকারী কথাও চাপিয়েছে কিন্তু আমাকে এখন পর্য্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। আমার সম্বন্ধে ওর যে বিন্দু মাত্র কৌতূহল আছে তার নিরীহতম প্রকাশটিকেও অনায়াসে সংযত করে চলেছে। আমাকে এ ভাবে অবহেলা দেখানোর মানে কি? আমাকে একটা নিরুদ্ধ ছোট্ট প্রশ্ন ওতো অনায়াসে করতে পারে। একটা বাজে অবান্তর প্রশ্ন।

'আপনি কি ভাবছেন?'

হেরম্ব চমকে উঠে ভাবল, মনের প্রার্থনা আমি তো উচ্চারণ করে বসিনি! তাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে আনন্দ এই প্রশ্ন করেছিল, তার অপ্রকাশিত মনোভাবকে অনুমান করে নয়। এর চেয়ে বিস্ময়কর যোগাযোগও পৃথিবীতে ঘটে থাকে। কিন্তু হেরম্বের মনে হল, একটা অঘটন ঘটে গেছে, এই নিয়মচালিত জগতে একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। সে খুসী হয়ে বলল 'ভাবছি, তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে।'

আনন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল 'আপনার মনের কথা কখন জানলাম?'

'এইমাত্র।'

'কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

মালতী বলল 'হেঁয়ালি করছে দেখ, হেঁয়ালি করছে।'

'হেঁয়ালি করছেন?'

হেরম্ব অপ্রতিভ হয়ে বলল 'না। হেঁয়ালি করিনি।'

'তবে ও কথা বললেন কেন, আপনার মনের কথা জেনেছি?'

'এমনি বলেছি। রহস্য করে।'

'ও বাবা, একি দুর্বোধ্য রহস্য! আমি ভাবলাম, একটা কিছু মজার কথা বুঝি আপনার মনে হয়েছে, এটা তার ভূমিকা। শেষে ব্যাখ্যা করে আমাদের হাসিয়ে দেবেন।'

হেরম্ব ইতিমধ্যে আত্মসম্বরণ করেছে।

'তাই মনে ছিল আনন্দ। শেষে ভেবে দেখলাম, ব্যাখ্যা না করেই হাসিয়ে দেওয়া ভাল।'

'এটা এখনুনি বানিয়ে বললেন।'

'নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে না বানাতে পারলে রক্ষা আছে। হাসির কথা আধমিনিটে পচে যায়।'

'আর হাসি? হাসি কতক্ষণে পচে যায়? আপনার কথাটা শুনে এমন সব অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কখনো ভেবেছেন হাসতে হাসতে মানুষ হঠাৎ কেন থেমে যায়? সিদ্ধি খেয়ে যারা হাসে তাদের কথা বলছি না। যারা হঠাৎ খুসী হয়ে হাসে,—মজার কথায় হোক, হাসির ব্যাপারে হোক অথবা আনন্দ পেয়েই হোক। হাসতে আরম্ভ করলেই মানুষের এমন কি কথা মনে পড়ে যায় যার জন্য আস্তে আস্তে হাসি থেমে আসে? তা ছাড়া এমন মজা দেখুন, পাগল না হলে মানুষ একা একা হাসতে পারে না। হাসতে হলে কম করে দুজন লোক থাকা চাই। ঘরের কোণে বসে নিজের মনে বসিই বা কেউ কখনো হাসে, তার তখন নিশ্চয় এমন একটা কথা মনে পড়েছে যার সঙ্গে অন্য একজন লোকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। নিছক নিজের কথা নিয়ে কেউ হাসে না। হাসে?'

'না।'

'খুব আশ্চর্য্য না ব্যাপারটা? হাসির কথা পড়লে কিংবা শুনলে মানুষ হাসবে?—কেউ হাসাবে তবে! হাসবার মত কিছু হাতের কাছে না থাকলে কেউ মরলেও হাসতে পারবে না। হাসির উপলক্ষ্যটা সব সময় থাকবে বাইরে, আবার তা থেকে তার নিজেকে বাদ থাকতে হবে। এসব কথা ভাবলে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। হাসি এমন

ভাল জিনিষ, নিজের জন্য কেউ নিজে তৈরী করতে পারবে না! সাধে কি মানুষ দিনরাত মুখ গোঁজ করে থাকে। মাঝে মাঝে একটু একটু না হেসে মানুষ যদি সব সময় হাসতে পারতো!'

মালতী বলল 'তোর আজ কি হয়েছে রে আনন্দ? এত কথা কইছিস যে?'

আনন্দ বলল 'বেশী কথা বলছি? বলব না! তোমরা থাকবে যে ঘর আলো করে, চুপ করে থেকে আমার এদিকে কথা ভরে ভরে হিমালয় পাহাড়! সুযোগ পেলে বলব না বেশী কথা।'

'তুই আজ নিশ্চয় চুরি করে কারণ খেয়েছিস!'

'না গো না, চুরি করে ছাইপাঁশ খাবার মেয়ে আমি নই। মনের স্ফূর্তির জন্য আমার কারণ খেতে হয় না।'

হেরম্বের কাছে এইটুকু গর্ব প্রকাশ করেই আনন্দ বোধ হয় নিজেকে এত বেশী প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে করে যে কিছুক্ষণের জন্য মালতীর দেহের আড়ালে নিজেকে সে প্রায় সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলে। অথচ এ কাজটা সে এমন একটি ছলনার আশ্রয়ে করে যে মালতী বুঝতে পারে না, হেরম্ব বুঝতে ভরসা পায় না।

মালতী বলে 'কোমর টনটন করছে বলে তোকে আমি টিপতে বলিনি আনন্দ! এমনি টিপুনিতে যদি ব্যথা কমত তবে আর ভাবনা ছিল না।'

হেরম্ব শুধু আনন্দের পায়ের পাতা দুটি দেখতে পায়। আঙুল বাঁকিয়ে আনন্দ পায়ের নখ সিঁড়ির সিমেন্টে একটা খাঁজে আটকেছে। হেরম্বর মনে হয়, আনন্দের আঙুলে লাগছে। এভাবে নিজেকে ব্যথা দেবার কারণটা সে কোন মতেই অনুমান করতে পারে না। সিমেন্টের খাঁজ থেকে আনন্দের আঙুল কটিকে মুক্ত করে দেবার জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। একটি নিরীহ ছোট কালো শিপড়ে, যারা কখনো কামড়ায় না কিন্তু একটু ঘসা পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে প্রাণ দেয়, সেই জাতের একটি অতি ছোট শিপড়ে, আনন্দের আঙুলে উঠে হেরম্বর চেতনায় নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ঘোষণা করে দেয়। হেরম্ব তাকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে হত্যা করে ফেলে।

আনন্দ বলে 'কি?'

'একটা পোকা।'

'কি পোকা?'

'বিষশিপড়ে বোধ হয়।'

মালতী বলে 'একটা বিষশিপড়ে তাড়াতে তুমি ওর পায়ে হাত দিলে! প্রণাম কর আনন্দ।'

এরকম ফল হবে জানলে হেরম্ব আনন্দের আঙুল সভয়ে পরিহার করে যেত। অহিংস শিপড়েটির বদলে বিষাক্ত কাঠশিপড়ে উঠলেও চুপ করে থাকত। সে বলে 'থাক্, থাক্।'

মালতী বলে 'থাক কি? তুমি বয়সে বড়, গুরুজন। ওর অকল্যাণ হবে না! প্রণাম কর আনন্দ।'

আনন্দ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে। মাথাটা অল্প একটু নীচে নামিয়ে দুই করতল একত্র করে সে কপালে ঠেকায়।

মালতী ওঠে হেসে।

বলে 'ও আবার কি ঢং হল? প্রণাম করতে জানিসনে তুই, বয়সের তোর গাছপাথর নেই। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর আনন্দ। অত তোর বাহাদুরী কিসের?'

আনন্দ গোঁ ধরে বলে 'ওই তো করলাম।'

হেরম্ব বলে 'থাকনা মালতী বৌদি। ছেলেমানুষ লজ্জা পাচ্ছে।' তার আশঙ্কা হয় মেয়ের অবাধ্যতায় মালতী হয়ত রেগে আগুন হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মালতীর দুচোখই উথলে উঠল।

'আগেই জানি কথা শুনবে না! এ বাড়ীতে কেউ আমার কথা শোনে না হেরম্ব। আমি এখানে দাসী-বাঁদীরও অধম। বলত ওর বাপ, দেখতে কথা শোনার কি ঘটা মেয়ের! আমি তুচ্ছ মা বই তো নই।'

তার এই সকরুণ অভিযোগে হেরম্বর সহানুভূতি জাগে না। আনন্দ যার অবাধ্য জেনে সে খুসীই হয়ে ওঠে। আনন্দ বাপের দুলালী মেয়ে এ যেন তারই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য। আনন্দের সম্বন্ধে প্রথমে তার যে আশঙ্কা জেগেছিল এবং পরে যে আশা করে সে এই আশঙ্কা ক্ষমিয়ে এনেছিল, তাদের মধ্যে কোনটি যে বেশী জোরালো এতক্ষণ হেরম্ব তা বুঝতে পারিনি। অনাথ এবং মালতী এদের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে আনন্দ বড় হয়েছে সঠিক না জানা অবধি স্বস্তি পাওয়া হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল, এ জ্ঞান তার কাছে আজ এত বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। আনন্দের অন্তর অন্ধকার, এর ক্ষীণতম সংশয়টিও হেরম্বর সহ্য হচ্ছিল না। মালতীর আদেশেও তাকে প্রণাম করতে না চাওয়ার মধ্যে তার প্রতি আনন্দের যতটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ পেল, হেরম্ব সেটুকু তাই খেয়াল করারও সময় পেল না। আনন্দ এখন তাকে বেচে অপমান করলেও তার বোধহয় রাগ অথবা দুঃখ হত না। আনন্দের অকারণ ছেলেমানুষী ঔদ্ধত্যে তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

আনন্দকে চোখে দেখে হেরম্বর মনে যে আবেগ ও মোহ প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল এতক্ষণে তার মনের সর্বত্র তা সঞ্চারিত হয়ে তার সমস্ত মনোধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল। নিজেকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ও মুগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করায় বিস্ময় অপনোদিত হয়ে গিয়েছিল। তার মন সেই স্তরে উঠে এসেছিল যেখানে আনন্দের অনির্বচনীয় আকর্ষণ চিরন্তন

সত্য। আনন্দকে চোখে দেখা ও তার কথা শোনা হেরম্বর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নেশা জমে এলে যেমন মনে হয় এই নেশার অবস্থাটিই সহজ ও স্বাভাবিক, আনন্দের সান্নিধ্যে নিজের উত্তেজিত অবস্থাটিও হেরম্বের কাছে তেমনি অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। আনন্দ এখন তাকে আবার নতুন করে বুভুক্ষু ও বিচলিত করে দিয়েছে। বয়স্ক হেরম্বের মনেও যে লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী হয়ে আছে নিজেকে সেই অনাথের অন্তরঙ্গা বন্ধু বলে ঘোষণা করে আনন্দ তার আবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন মনের উন্মাদনা আরও তীব্র আরও গভীর করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রেমিকের কাছে প্রেমের অগ্রগতির ইতিহাস নেই। যতদূরই এগিয়ে যাক সেইখান থেকেই আরম্ভ। আগে কিছু ছিল না। ছিল অন্ধকারের সেই নিরন্ধ্র কুয়াশা, যেখানে নব জন্মলাভের প্রতীক্ষায় কঠিন আস্তরণের মধ্যে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে ছিল। হেরম্ব জানে না তার আকুল হৃদয়ের আকুলতা বেড়েছে, এ শুধু বৃদ্ধি, শুধু ঘন হওয়া। আনন্দের অস্তিত্ব এইমাত্র তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে, এতক্ষণে ওর সম্বন্ধে সে সচেতন হল। এক মুহূর্ত আগে নয়।

এক মুহূর্ত আগে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল কেবল শিরায় শিরায় রক্ত পাঠাবার প্রাত্যহিক প্রীতিহীন প্রয়োজনে। এইমাত্র আনন্দ তার স্পন্দনকে অসংযত করে দিয়েছে।

খানিক পরে মালতী উঠে দাঁড়ায়।

আনন্দ বলল 'কোথায় যাচ্ছ মা?'

'সা খুতে হবে না, আরতি করতে হবে না? সন্ধ্যা হল, সে খেয়াল আছে!'

গোধূলি লগ্নে হেরম্বর কাছে আনন্দকে ফেলে মালতী উঠে চলে গেল।

পৃথিবী জুড়ে নয়, এইখানে সন্ধ্যা নামছে। পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমগ্রভাবে বিস্তৃত চলমান অবিচ্ছিন্ন দিন। এখানে যে রাত্রি আসছে তাকে মাটির পৃথিবী নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী থেকে সূর্য যতদূর, মহাশূন্যে রাত্রির বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণে বেশী। রাত্রির অন্ত নেই। ব্যাখ্যা শোন বৈজ্ঞানিক। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূর খুশী চলে যাও, রাত্রির শেষ পাবে না। হয়ত এক সময় সূর্যকে তুমি দেখতে পাবে, পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে সূর্য তোমার চোখে তারার মত ঝিকমিক করবে। কিন্তু পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ভরা পড়ে দিন হয়েছে অসীম শূন্যের শেষ পর্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটেনি। রাত্রি, তাই যে শূন্যের শেষ নেই তার শেষে পৌঁছেছে। সেখানকার খবর তুমি রাখ না বৈজ্ঞানিক। সেখানে দিক নেই, ব্যাপ্তি নেই, সময় নেই, জড় নেই, শক্তি নেই। গোলাকার শূন্য আর মুখখোলা কাতকরা অন্ধের চার তার পরিচয় নয়। সেখানে আছে দুটি ছাপ, মাটির পৃথিবীর কালো রাত্রির ছাপ, মাটির মানুষের শেষ কল্পনার ছাপ।

মালতী চলে গেলে মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে হেরম্বর মনে যে কল্পনা দেখা দিয়েছিল উপরের কথাগুলি তারই ভাষান্তরিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আনন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এ তার ক্ষণিকের বিশ্রাম মাত্র। মালতীর অন্তরাল সরে যাওয়ায় আনন্দ যে নিজেকে অনাবৃত ও অসহায় মনে করছে হেরম্বর তা বুঝতে বাকী থাকেনি। চোখের সামনে ধূসর আকাশটি থাকায় আকাশকে উপলক্ষ্য করেই সে তাই কথা আরম্ভ করল। আকাশ থেকে কথা পৃথিবীতে নামতে নামতে আনন্দ তার লজ্জা ও সঙ্কোচকে জয় করে নেবে।

'কটা তারা উঠেছে বলতো আনন্দ?'

'কটা? একটা দেখতে পাচ্ছি। না, দুটো।'

'দুটো তারা দেখতে পেলে কি যেন হয়?'

'কি হয়? তারার মত চোখের জ্যোতি বাড়ে?'

আনন্দের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার পায়ের নখের দিকে।

অবান্তর কথা বেশীক্ষণ চলে না। আনন্দই প্রথমে আলাপকে তাদের স্তরে নামিয়ে আনল।

'বাবা বললেন, আপনি কলেজে পড়ান। আপনি খুব পড়াশোনা করেন বুঝি?'

'না। পড়া হল পরের ভাবনা ভাবা। তার চেয়ে নিজের ভাবনা ভাবতেই আমার ভাল লাগে। তুমি বুঝি বাবার কাছে আমার কথা সব জেনে নিয়েছ?'

'সব। শুধু বাবার কাছে জানিনি, মা আমাকে জল দিতে ডাকা পর্যন্ত ওই জানালায় দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে আপনার যত কথা হয়েছে সব শুনে ফেলেছি। আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন?'

আনন্দ চোখ তুলল। কিন্তু এখনো সে হেরম্বর দিকে তাকাতে পারছে না।

হেরম্ব বলল 'অনেক দিন। প্রায় দেড় বছর।'

আনন্দ হেরম্বর জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বলল 'অনেক দিন বললেন যে? দেড় বছর কি অনেক দিন?'

হেরম্ব বলল 'অনেক দিন বৈকি। দেড় বছরে কবার সূর্য ওঠে, কতলোক জন্মায়, কতলোক মরে যায় খবর রাখ?'

আনন্দ মনে মনে একটু হিসাব করে বলল 'দেড় বছরে সূর্য ওঠে পাঁচশো সাতচল্লিশ বার। লোক জন্মায় কত? কতলোক মরে যায়?'

হেরম্ব হেসে বলল 'পনের কুড়ি লাখ করে হবে।'

আনন্দও তার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল 'মোটে? আমি ভাবছিলাম এক বছরে পৃথিবীতে বুঝি কোটি কোটি

লোক জন্মায়।' চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে বুকের কাছের কাপড়কে সে টেনে আলগা করে দিল। সমুদ্র থেকে জোর বাতাস আসছিল। গায়ের কাপড় গায়ের সঙ্গে মিশে যেতে চায়।—'যার কাছে রোজ যে সব মেয়ে ভক্ত আসে তাদের প্রায় সকলেরই বুকে একটি কাঁখে একটি হাত ধরা একটি এমনি গাদা গাদা ছেলে মেয়ে দেখি কি না, তাই মনে হয় পৃথিবীতে রোজ বুঝি অজস্র ছেলে মেয়ে জন্মাচ্ছে। কিন্তু বেড়বহরে আর যাই হোক, মানুষ কি বদলাতে পারে?'

'পারে। এক মিনিটে পারে।' হেরম্ব জোর দিয়ে বলল।

আনন্দ একটু লাল হয়ে বলল 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে বলিনি। এমনি সাধারণভাবে বলেছি।'

বেড়বহরে মানুষ বদলাতে পারে কি না প্রশ্ন করে তার মনে স্ত্রীর শোকটা কতখানি বর্তমান আছে আনন্দ তাই মাপতে চেয়েছিল হেরম্ব একথা বিশ্বাস করেনি। সে জেনেছে আনন্দের হৃদয়ে মানুষের সহজ অনুভূতিগুলি সহজ হয়েই আছে। মৃতা স্ত্রীকে কেউ ভুলে গেছে শুনলে খুশী হবার মত হিংস্র আনন্দ নয়।

কিন্তু আনন্দকে মিথ্যা কথা শোনানও হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব।

'আমার স্ত্রীর কথা ভেবে বললেও দোষ হত না আনন্দ। সংসারে কত পরিচিত লোক কত আত্মীয় থাকে, যারা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বেঁচে থাকবার সময় আমাদের কাছে তাদের যতটুকু দাম ছিল, মরে যাবার পর কেবল কাছে নেই বলেই তাদের সে দাম বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। দিলে মরণকে আমরা ভয় করতে আরম্ভ করব। আমাদের জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়বে। আমরা দুর্বল অসুস্থ হয়ে পড়ব।'

'কিন্তু—' বলে আনন্দ চুপ করে গেল।

হেরম্ব বলল 'তুমি যা খুশী বলতে পার আনন্দ, কোন বাধা নেই।'

'কথাগুলির মধ্যে আপনার স্ত্রী এসে পড়েছেন বলে সঙ্কোচ হচ্ছে। যাই হোক, বলি। মনের কথা চেপে রাখতে আমার বিশ্রী লাগে। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথা ঠিক নয়। ভালবাসা থাকলে শোক হবেই। শোক মিথ্যে হলে ভালবাসাও মিথ্যে।'

হেরম্ব খুশী হল। প্রতিবাদ তার ভাল লাগে। প্রতিবাদ খণ্ডন করা যেন একটা জয়ের মত।

'ভালবাসা থাকলে শোক হয় আনন্দ। কিন্তু ভালবাসা কতদিনের? কতকাল স্থায়ী হয় ভালবাসা? প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিঁকলে মানুষকে আর টিঁকতে হত না। প্রেমের জন্য আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বেশী নয়। প্রেম যখন বেঁচে আছে তখন দুজনের মধ্যে একজন মরে গেলে শোক হয়,—অক্ষয় শোক হয়। প্রেমের অকালমৃত্যু নেই বলে শোকের মধ্যে প্রেম চিরন্তন হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম যখন মরে গেছে, যখন আছে শুধু দায়া, অভ্যাস আর আত্মপ্রবঞ্চনার খেলা, তখন যদি দুজনের একজন মরে যায়, বেশীদিন শোক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষণ। সেটা দুর্বলতা আনন্দ। তুমি রোমিও জুলিয়েটের গল্প জান?'

'জানি। বাবার কাছে শুনেছি।'

'প্রেমের মৃত্যু হবার আগেই ওরা মরে গিয়েছিল। এক সঙ্গে দুজনে মরে না গিয়ে ওদের মধ্যে একজন যদি বেঁচে থাকত, তার শোক কখনো শেষ হত না। কিন্তু কিছুকাল বেঁচে থেকে ক্রমে ক্রমে ভালবাসা মরে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে একজন যদি স্বর্গে যেত, পৃথিবীতে যে থাকত চিরকাল তার শোকাতুর হয়ে থাকার কোন কারণ থাকত না। একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করেছ আনন্দ? রোমিও জুলিয়েটের ট্রাজেডি তাদের মৃত্যুতে নয়?'

'কিসে তবে?'

'ওদের প্রেমের অসমাপ্তিতে। রোমিও জুলিয়েটের কোন দাম মানুষের কাছে নেই। জগতে লক্ষ লক্ষ রোমিও জুলিয়েট মরে যাক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু ও ভাবে ভাল বাসতে বাসতে ওরা মরল কেন ভেবেই আমাদের চোখে জল আসে।'

আনন্দ আনমনে বলল 'তাই কি? তা হবে বোধ হয়!'

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল 'হবে বোধ হয় না, তাই। ওদের অসম্পূর্ণ প্রেমকে আমরা মনে মনে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করে ব্যথা পাই—রোমিও জুলিয়েটের ট্রাজেডি তাই। নইলে, ওদের জীবনে ট্র্যাজেডি কোথায়? ওরা দুজনেই মরে গিয়ে সব কিছুরই অতীত হয়ে গেল—ওদের জীবনে দুঃখসৃষ্টি হবার সুযোগও ছিল না। আমরা সমবেদনা দেব কাকে? কিসের জোরে রোমিও জুলিয়েট আমাদের এক ফোঁটা অশ্রু দাবী করবে? ওরা তো দুঃখ পায় নি। প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় ওরা দুঃখকে এড়িয়ে চলে গেছে। আমরা ওদের প্রেমের জন্য শোক করি, ওদের জন্য নয়।'

আনন্দ বলল 'প্রেম কতদিন বাঁচে?'

হেরম্ব হেসে বলল 'কি করে বলব আনন্দ। দিন গুণে বলা যায় না। হবে বেশীদিন নয়। এক দিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস।'

শুনে আনন্দ যেন ভীতা হয়ে উঠল।

'মোটে?'

হেরম্ব আবার হেসে বলল 'ঘোটে ছয়? একমাসের বেশী প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ—একমাসের বেশী ছদণ্ড প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দুদিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তাই,—প্রেম এত তেজী নেশা।'

আনন্দ হঠাৎ কথা খুঁজে পেল না। মুখ থেকে সে চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিল। ডান হাতের ছোট আঙুলটির ডগা দাঁতে কামড়ে ধরে এক পায়ের পাতা দিয়ে অন্যপায়ের নখ থেকে ধুলো মুছে নিতে লাগল। তার মনে প্রবল আঘাত লেগেছে বুঝে হেরম্ব দুঃখ বোধ করল। কিন্তু এ আঘাত না দিয়ে তার উপায় ছিল না। আনন্দের কাছে সত্য গোপন করার ক্ষমতা তার নেই। তা ছাড়া, প্রেম চিরকাল বাঁচে কোনদিন কোন অবস্থাতে কোন মানুষকেই এ শিক্ষা দিতে নেই। হেরম্ব বিশ্বাস করে পৃথিবী থেকে যত তাড়াতাড়ি এ বিশ্বাস দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল 'প্রেম মরে গেলে কি থাকে?'

'প্রেম ছাড়া আর সব থাকে। সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করার জন্য যা যা দরকার। তা ছাড়া খোকা অথবা খুকী থাকে—আরও একটা প্রেমের সম্ভাবনা। ওরা তুচ্ছ নয়।'

'কিন্তু প্রেম তো থাকে না। আসল জিনিষটাই তো মরে যায়! তার পর মানুষের সুখ সম্ভব কি করে?'

'সুখ হল শুঁটকি মাছ—মানুষের জিভ হল, আসলে ছোটলোক। তাই কোন রকমে সুখের স্বাদ দিয়ে জীবনটা ভরে রাখা যায়। জীবন বড় নীরস আনন্দ—বড় নিরুৎসব। জীবনের গতি শ্লথ, মন্থর। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। তার মধ্যে ওই প্রেমের উত্তেজনাটুকু তার উপরি লাভ।'

'সুখ হল—? শুঁটকি মাছ! আগে যেন কার কাছে কথাটা শুনেছি।'

'তোমার মা খানিক আগে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।'

'হ্যাঁ, মা-ই বলছিল বটে। কিন্তু আপনি এমন সব কথা বলছেন যা শুনলে কান্না আসে।'

হেরম্ব একটি পা একধাপ নীচে নামিয়ে বলল 'কান্না এলে চলবে না আনন্দ, হাসতে হবে। বুক কাঁপিয়ে যে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠবে তার সবটুকু বাতাস হাসি আর গানে পরিণত করে দিতে হবে। মানুষের যদি কোন ধর্ম থাকে কোন তপস্যার প্রয়োজন থাকে, সে ধর্ম এই, সে তপস্যা এই। মানুষ কি করবে বল? পঞ্চাশ ষাট বছর তাকে বাঁচতে হবে অথচ জীবনে তার কাজ নেই।'

'কাজ নেই?'

'কোথায় কাজ? কি কাজ আছে মানুষের? অঙ্ক কষা, ইঞ্জিন বানানো, কবিতা লেখা? ওসব তো ভাণ, কাজের ছল! পৃথিবীতে কেউ ওসব চায় না। একদিন মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না, মানুষের কিছু এসে যায়নি। আজ মানুষের ওসব আছে কিন্তু তাতেও কারো কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ নিরুপায়। তার মধ্যে বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভরতেই হবে। মানুষ তাই জটিল অঙ্ক দিয়ে, কামদাদুরস্ত তাল তাল ভাব দিয়ে, ইস্পাতের টুকরা দিয়ে, আরও সব হাজার রকম জঞ্জাল দিয়ে সেই ফাঁকটা ভরতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো জীবন নিয়ে মানুষ কি হৈ চৈ করছে, কি প্রবল প্রতিযোগিতা মানুষের, কি ব্যস্ততা। কাজ! কাজ! মানুষ কাজ করছে! বৌকে কাঁদিয়ে বৈজ্ঞানিক খুঁজছে নতুন ফরমুলা, আওও খুঁজছে কালও খুঁজছে। দোকান খুলে বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে চারিদিক ছেয়ে ফেলে, উর্দ্ধশ্বাসে ব্যবসায়ী করছে টাকা। ঘরের কোণে প্রদীপ জেলে ঘরে বিদ্রোহী কবি লিখছে কবিতা, সারাদিন ছবি এঁকে আর্টিষ্ট ওদিকে মন খেয়ে ফেলাচ্ছে জীবন। কেউ অলস নয় আনন্দ, কুলিমজুর, গাড়োয়ান, তারাও প্রাণপণে কাজ করছে। কিন্তু কেন করছে আনন্দ? পাগলের মত মানুষ খালি কাজ করছে কেন? মানুষের কাজ নেই বলে! আসল কাজ নেই বলে! ছটফট করা ছাড়া আর কিছু করার নেই বলে।'

'কিন্তু আসল কাজটা কি? মানুষের যা নেই?'

'এ প্রশ্নেরও জবাব নেই আনন্দ। মানুষের কি নেই তাও মানুষের বুঝবার উপায় নেই। কাজ না পেয়ে মানুষ অকাজ করছে এটা বোঝা যায় কিন্তু তার কাজ কি হতে

পারত তার কোন সংজ্ঞা নেই। এর কারণ কি জান? মানুষ যে স্তরের, তার জীবনের উদ্দেশ্য সেই স্তরে নেই। ঈশ্বরের মত, শেষ সত্যের মত, আদিত্যের মানের মত সেও মানুষের নাগালের বাইরে। জীবনের একটা অর্থ এবং পরিণতি অবশ্যই আছে, বিশ্ব-জগতে কিছুই অকারণ হতে পারে না। সৃষ্টিতে অজস্র নিয়মের সামঞ্জস্য দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু জীবনের শেষ পরিণতি জীবনে নেই। মানুষ চিরকাল তার সার্থকতা খুঁজবে, কিন্তু কখনো তার দেখা পাবে না। যোগী ঋষি হার মানলেন, দার্শনিক হার মানলেন, কবি হার মানলেন, অনাঙ্কিত আদিমধর্মী মানুষও হার মানলে। চিরকাল এমনি হবে। কারণ, মানুষের সমগ্র সত্তাকে যা ছাড়িয়ে আছে মানুষ তাকে আয়ত্ত করবে কি করে!'

কথা বলার উত্তেজনায় হেরম্বের সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। শব্দের মোহ তার মন থেকে আনন্দের মোহকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানচ্যুত করেছিল। জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করে পুনরায় আনন্দের সান্নিধ্যকে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে সে এই ভেবে বিস্মিত হয়ে রইল যে শ্রোতা কিন্তু আনন্দ এতক্ষণ তার কাছে আর কিছুই ছিল না। আনন্দকে এতক্ষণ সে এমনি একটা সাধারণ পর্যায়ে ফেলে রেখেছিল যে শ্রবণশক্তি ছাড়া ওর আর কোন বিশেষত্বের সম্বন্ধেই সে সচেতন হয়ে থাকেনি। হেরম্ব বোঝে, বিচলিত হবার মত ত্রুটি অথবা অসঙ্গতি এটা নয়। কিন্তু ছেলেমানুষের মত তবু সে এই আনন্দের প্রতি তার এই তুচ্ছ অমনোযোগে বিস্মিত হয়ে থাকে।

হেরম্ব এটাও বুঝতে পারে, তার কাছে জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে আনন্দ ইচ্ছুক নয়। জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য আছে কি নেই, এসব তত্ত্বকথায় ওর বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। অন্য সময় বিশ্লেষণ ওর ভাল লাগে কিনা হেরম্ব জানে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার মুখের বিশ্লেষণ ওর কাছে শাস্তির মত লেগেছে। সে খেমে যেতে আনন্দ স্বস্তি লাভ করেছে। সে রোমিও জুলিয়েটের কথা বলুক, প্রেমের ব্যাখ্যা করুক, আনন্দ মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু সেইখানেই তার ধৈর্য্যের সীমা। অনুভূতির সম্বন্ধ করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না।

তাই হোক। তাই ভাল। হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল 'চন্দ্রকলা নাচটা কি আনন্দ?'

আনন্দ বলল 'ধরুন, আমি যেন মরে গেছি। অমাবস্যার চাঁদের মত আমি যেন নেই। প্রতিপদে আমার মধ্যে একটু-খানি জীবনের সঞ্চার হল। ভাল করে বোঝা যায় না এমনি একফোঁটা একটু জীবন। তারপর চাঁদ যেমন কলায় কলায় একটু একটু করে বাড়ে আমার জীবনও তেমনি করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণিমা এল, আমি পূর্ণমাত্রায় বেঁচে উঠেছি। তারপর একটু একটু করে মরে—'

'এ নাচ ভাল নয়, আনন্দ।'

'কেন?'

'একটু একটু করে মরার নাচ নেচে তোমার যদি সত্যি সত্যি মরতে ইচ্ছা হয়।'

আনন্দ একটু হাসল। 'মরতে ইচ্ছা হবে কেন? ঘুম পায়। এক মিনিটও তারপর আমি আর দাঁড়াতে পারি না। কোন রকমে বিছানায় গিয়ে ধড়াম করে আছড়ে পড়েই নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দি। মা বলে—'

'কি বলে?'

'আপনাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে।'

'চোখ বুজে আমি এখানে নেই মনে করে বল।'

'না দূর! সে বলা যায় না।'

'বল আনন্দ। লক্ষ্মী বলো।'

'লক্ষ্মী বললেন যে?'

'তোষামোদ করে বলেছি।'

'তোষামোদ না ছাই! আমাকে ছেলেমানুষ বানাচ্ছেন!'

আনন্দ হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে হেরম্বের হাঁটুতে টোকা দিয়ে বলল 'আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমাকে সম্ভ্রম করে কথা কইবেন।' হেরম্ব জানে, এসব ভূমিকা। তার নাচ সম্বন্ধে মালতী কি বলেছে আনন্দ তা শোনাতে চায়, কিন্তু পেরে উঠছে না। হেরম্ব মৃদু হেসে অবজ্ঞার সুরে বলল 'ছেলেমানুষকে আবার সম্ভ্রম করব কি?'

'ছেলেমানুষ হলাম কিসে?'

'ছেলেমানুষরাই একটা কথা বলতে দশবার লজ্জা পায়।'

আনন্দ উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলল 'লজ্জা পাচ্ছে কে? আমি? জগতে এমন কথা নেই আমি যা বলতে লজ্জা পাই। নাচার পর আমার মুখ দেখে মা বলে, তোর আর বিয়ের দরকার নেই আনন্দ। বুঝলেন এবার? হুঁ, আপনি নেহাৎ অভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে জানেন না। আপনার মত লোকের সঙ্গে কোন মেয়ের কথা বলাই উচিত নয়। আপনি যদি এ রকম করেন আপনার সঙ্গে তা হলে আমি—'

নিষ্ঠুর আনন্দের সঙ্গে হেরম্ব লজ্জাতুর অপ্রতিভ আনন্দের আত্মসংযমের ব্যাকুল প্রয়াসকে উৎসাহিত করে বলে 'বলো, বলো, থেম না আনন্দ।'

'না, বলব না। কেন বলব!'

হেরম্ব আরও নির্মম হয়ে বলল 'তুমি তা হলে বুড়ী নও আনন্দ? মিছামিছি তোমার তা হলে রাগ হয়? এতক্ষণ আমাকে তুমি ঠকাচ্ছিলে?'

'আপনি চলে যান। আপনাকে আমি নাচ দেখাব না।'

'দেখিও না। আমি তো নাচ দেখেছি।'

'তা হলে অনর্থক বসে আছেন কেন? রাত হল, বাড়ী যান না।'

'বেশ। তোমার মাকে ডাকো। বলে যাই।'

আনন্দ চুপ করে বসে রইল। হেরম্ব বুঝতে পারে, সে কি ভাবছে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিষ্ঠুরতা করেছে বলে নয়, নিজেকে সে সত্য সত্যই সম্পূর্ণ অকারণে ছেলেমানুষ করে ফেলেছে বলে। এ ব্যাপার আনন্দ বুঝতে পারছে না। নৃত্য করে সে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও অবসাদ পায় এই কথাটি সে এত বেশী লজ্জাকর মনে করে না যে হেরম্বকে শোনানো যায় না। হেরম্বকে অবাধে একথা বলতে পারার বয়স তার হয়েছে বলেই আনন্দ মনে করে। তাই অসঙ্গত লজ্জার বশে বিচলিত হয়ে ব্যাপারটাকে এ ভাবে তাল পাকিয়ে যেওয়ার জন্য নিজের উপরে সে রেগে উঠেছে। লজ্জা পেলেও চুপ করে থাকলে অথবা পাকা মেয়ের মত হাসি-তামাসার একটা অভিনয় বজায় রাখতে পারলে হেরম্বের কাছ থেকে লজ্জাটা লুকানো যেত ভেবে তার আপসোসের সীমা নেই। আঠার বছর বয়সে হেরম্বের কাছে আটাশ বছরের ধীর সপ্রতিভ ও পূর্ণ পরিণত নারী হতে চেয়ে একেবারে ছেলে বছরের মেয়ে হয়ে যাবার জন্য নিজেকে আনন্দ কোন মতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

আনন্দের অস্বস্তিতে হেরম্ব কিন্তু খুসী হল। আনন্দ রাগ করতে পারে এই ভয়কে ভয় করে তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পেরে নিজের কাছেই সে কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। যার সান্নিধ্যই আত্মবিস্মৃতির প্রবল প্রেরণা, তাকে শাসন করা কি সহজ মনের জোরের পরিচয়! হেরম্বের মনে হঠাৎ যেন শক্তি ও তেজের আবির্ভাব ঘটল।

কিন্তু সেই সঙ্গে এই জ্ঞানকেও তার আমল দিতে হল যে আনন্দকে সে আগাগোড়া ভয় করে এসেছে। আনন্দ ইচ্ছা করলেই তার জীবনের ক্ষতি করতে পারে, তার জীবনে অসহ্য দুঃখ এনে দিতে পারে, তার সর্বনাশ করতে পারে, কোন এক সময়ে এই আশঙ্কা তার মনে এসেছিল এবং এখনো তা স্থায়ী হয়ে আছে। নিজের এই ভীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।

সে বুঝতে পারে অনেক দিক থেকে নিজেকে সে আনন্দের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। অনেক বিষয়েই সে আনন্দের কাছে পরাধীন। দুঃখ না পাবার অনেকখানি স্বাধীনতাই সে স্বেচ্ছায় আনন্দের হাতে তুলে দিয়েছে। তার জীবনে ওর কর্তৃত্ব এখন সামান্য নয়, তার হৃদয়মনের নিয়ন্ত্রণে ওর প্রচুর যথেচ্ছাচার সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

ভয়কে উপভোগ করার ধৈর্য্য হেরম্বের ছিল না। সে ঘোলাটে স্বরে বলল 'রাগ করলে নাকি!'

আনন্দ খুসী হয়ে বলল 'না।'

হেরম্ব সুর বদলে ক্ষুব্ধ ভাবে বলল 'একটুও রাগ করনি?'

'না। রাগের কি আছে?'

'একটুখানি রাগ তুমি করেছ আনন্দ, কি বল?'

আনন্দ হেসে বলল 'আমি একটু রাগ করলে আপনি যদি খুসী হন তবে না হয় করেছি।'

হেরম্ব অভিমানের অভিনয় করে বলল, 'থাক্, দরকার নেই তোমার রাগ করে। কোথায় ভাগছিলাম তুমি রাগ করলে তোমার দুটি হাত ধরে আদর করে রাগ ভাঙাব—'

আনন্দের হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে ওকাতে সরে যাবার রকমে হেরম্ব থেমে গেল। আনন্দ কণ্ঠস্বর অতিরিক্ত খারাপ করে বলল 'আপনার কথাবার্তায় একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?'

হেরম্ব, যার হৃদয়ে নারী-অভিজ্ঞতার ক্ষতগুলির মধ্যে কোন কোনটি হয়ত এখনো কাঁচা আছে, একেবারে মিশে গেল। আনন্দকে ও কথা সে বলতে গেল কেন? ওকে সে ভয় করে, একবার ওর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে এই ভয়কে জয় করার তৃপ্তি সে পেয়েছে। কিন্তু তার ভীরুতা আনন্দের অপরাধ নয়। বার বার আনন্দের কাছে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবার অসঙ্গত ইচ্ছা তার অবশ হয়ে উঠছে কেন? এতে তার লাভের সম্ভাবনা কি আছে? আনন্দের কাছে তার পরাধীনতা কমবে? তাকে বাধা দেবার অব্যর্থ শক্তি আনন্দের পক্ষ হবে? আনন্দও তাকে ভয় করবে?

চাঁদকে এখনো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বাড়ীর পিছনে আকাশটা এখন লাল হয়ে উঠেছে। আলোকিত আকাশটি দেখতে দেখতে হেরম্বের মন হঠাৎ বিষাদের অন্ধকারে ভরে গেল। সে বুঝতে পারল হৃদয়ের দুর্বলতা লুকিয়ে আনন্দকে সে ঠকাতে চায়। চাঁদের আলো লেগে যার জানা করছে এই নালিশ একমাত্র যার মুখে মানায় রাগ ভাঙাবার ছলে তার হাত ধরতে চাওয়ার আর কোনো অর্থ নেই। আনন্দের কাছে সে হাল্কা বাহাদুরী করেছে মাত্র। ভাঙা ঘরে নুন দিয়ে ভাত খেয়ে যারা লম্বা কোঁচা দুলিয়ে বেড়াতে যায় হয়, তাদের চেয়ে তার মন কোন দিক থেকেই উৎকৃষ্ট নয়। তারা বরং বড়াই করে অপরিচিত পথিকের কাছে, সে ছলনা করছে আনন্দকে,—যাকে বাঁচাবার জন্য দরকার হলে সে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মুণ্ডু চেয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে পারে।

নিজেকে হেরম্বের এত ছোট মনে হয় যে সে ভাবতে থাকে আবছা আলোয় আনন্দের আধোদেখা শান্ত দেহটিকে আলিঙ্গন করতে চাওয়ার পরিবর্তে সে যে শুধু ওর হাত ধরতে চেয়েছে সেই টুকুই বিস্ময়কর।

বুকের পাঁজর ঠেলে হৃদয় যেন বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সমস্ত সাবধানতা ভুলে হেরম্ব এতক্ষণে শ্বাস গ্রহণ করল।

আনন্দ চমকে বলল 'ওকি? কি হল আপনার?'

'কিছু না আনন্দ।'

'কিছু না! আপনার নিশ্বাসের শব্দে আমার গা পর্যন্ত সির সির করে উঠল, আপনি বলছেন কিছু না।'

আনন্দ তার হাত চেপে ধরল, 'কি হল বলুন। আপনাকে বলতে হবে। আমি বকেছি বলে? সত্যি? ওমা, কোথায় যাবো! এমন ছেলেমানুষ আপনি।'

আনন্দ তার হাত ছেড়ে দিল। আপন মনে সে খানিক হেসে নিল। হেরম্বের পূর্বকৃত অপরাধকে অনুকরণ করে বলল 'তাই বলুন! আপনি তাহলে পাকা বুড়ো নন? এখনো মিছি মিছি আপনার কান্না আসে। এতক্ষণ আপনি আমাকে ঠকাচ্ছিলেন।'

আনন্দের এই অসাধারণ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে হেরম্বের বিষাদ কমে এল। আগে থেকে আনন্দকে জানা না থাকলেও তার মনে হল, প্রাত্যহিক আনন্দ থেকে আজ সে পৃথক। মনোবৃত্তিগুলি ওর আজ যেরকম তীক্ষ্ণ ও সতেজ হয়ে আছে, কোন মেয়ের পক্ষেই এটা সাধারণ অবস্থা হতে পারে না। না খেয়ে, না ভেবে, অজস্র সময় না নিয়ে, তাদের পরিচয়কে পক্ষীরাজের পাখা দিয়ে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রেরণার কাজ।

কিন্তু আনন্দ অনুপ্রাণিত হয়েছে কি দিয়ে? তার আবির্ভাবে? নুতো পরিতৃপ্ত যৌবন তার হঠাৎ এতদিনের তৃপ্তিকে কাটিয়ে উঠে নবতর সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছে বলে? অথবা শুধু আগামী নুতোর কল্পনায়?

এ প্রশ্নের জবাব পেলে হেরম্বের জীবনে সব প্রশ্নেরই যেন মীমাংসা হয়ে যেত।

বহুক্ষণ পরে দেরী করে মালতীকে এবার আসতে হল।

'তোমাদের ছুটিতে দেখছি দিবি ভাব হয়ে গেছে।'

আনন্দ বলল 'আমরা বন্ধু, মা।'

'বন্ধু!' মালতীর স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। 'বন্ধু কি গো ছুঁড়ি। হেরম্ব যে তোর গুরুজন, শ্রদ্ধার পাত্র।'

'বন্ধু বুঝি অশ্রদ্ধার পাত্র মা?' (ক্রমশঃ)

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ বিদ্যালয়

(পরিচালনার খসড়া)

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রাথমিক শিক্ষা লইয়া নানাভাবের আলোচনা আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হইয়াছে। দেশের নানাস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে; তবে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হইবে; কারণ, উদ্দেশ্য-ভেদে প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির রূপের ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটিবে।

সরকারী এবং বেসরকারী অনেক জায়গাতেই বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য literacy দান অর্থাৎ বর্ণপরিচয় বিধান। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাইমন কমিশনের অন্তর্নিয়ারী কমিটির রিপোর্ট-এ বলা হইয়াছে—

"While in a primary School in India, little can be attempted at present beyond instruction in reading, writing and elementary Arithmetic and while the need for literacy is so great that for sometime "three R's and no nonsense" must be the motto of the Schools it is essential that the instruction should be related in early stages to matters which the village child sees and knows and understands." (p. 78)

অর্থাৎ কিনা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের তাহাদের মত করিয়া লেখা পড়া শেখার প্রয়োজন হইলেও বর্তমানে বর্ণপরিচয় বিধানের প্রয়োজন এত বেশী যে, লেখাপড়া ও অঙ্ক (three R's) ছাড়া আর কিছু শিখাইবার দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। সম্প্রতি বোম্বাই মুনিসিপালিটির স্কুল-কমিটির অধ্যক্ষ মিঃ পাঙ্গলেকর Mass Education in India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Simplification of the curriculum means concentrating on the three R's and giving up all other subjects such as grammar, history, geography, object lessons, drawing, nature study etc. * * we want to concentrate on essentials only in our Primary schools leaving the nonessentials to the future or to privately managed institutions. This is the supreme need of the time and the necessary action to reduce the curriculum to the minimum must be courageously and immediately taken." (pp. 12-13)

অর্থাৎ, আর সকল কিছু ছাড়িয়া three R's—লেখা, পড়া ও অঙ্কের উপর জোর দিতে হইবে।

সাধারণতঃ যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহাদের পিছনে প্রাথমিক শিক্ষার এই নীতি রহিয়াছে। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহার ফলে আজকালকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কি রূপ হইয়াছে, তাহাদের ব্যর্থতা কতখানি সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যেখানে শিশু ও বালক-বালিকাগণ সানন্দে জীবনপথে চলিবার শিক্ষা লাভ করিবে সেখানে তাহা না করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক বিদ্যার ও জীর্ণ পুঁথির ভারে ভারাক্রান্ত করা হইতেছে। সেখানে বর্ণপরিচয় হইতেছে বটে, কিন্তু সে পরিচয় আনন্দরসে জীর্ণ না হওয়ায় তাহা জীবনে কার্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই সে পরিচয় যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। যাহার সহিত পরিচয়ে আনন্দ লাভ করি, তাহাকে আমি ভুলিতে পারি না, কিন্তু যাহার সহিত পরিচয় করিতে দুঃখ, শাস্তি ও বেত্রপ্রহার ছাড়া আর কিছু মেলে না তাহাকে ভুলিতে মন যিথা বোধ করে না। সকলেই জানেন প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত একটা খুব বড় সমস্যা, লেখাপড়া ভুলিয়া যাওয়া, relapse into illiteracy.

আর একটা কথা। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে শুধু লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখানই প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা হইলেও প্রশ্ন হয় যে তাহা শিখাইতে কত সময় লাগে?

যখন পুরা তিন বৎসর ধরিয়া শিশুরা এই বিষয়গুলিই শিখিয়া কাটায় এবং কিছুদিন পরেই তাহাদের ব্যবহার ভুলিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে গলদ শিশুদের মধ্যে নয়, অন্যত্র। আমরা সকলেই জানি এক শ্রেণীর উপকারী খাদ্য আছে যেগুলি হজমের গ্রহণ করা যায় না, অন্য খাদ্যের সহিত মিশাইয়া লইয়াই তবে সেগুলিকে শরীরপোষণের কার্যে লাগান যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত। অবশ্য আমি প্রাথমিক শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ আদর্শ স্বীকার করি না। তাহা ছাড়া, একথাও স্বীকার করা চলে না যে, তিন বৎসরের যে পাঠ্যতালিকা নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শ রূপে বর্তমানে গৃহীত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য শেষ করিতে তিন বৎসর লাগে। আমার বিশ্বাস অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে এই তিন বৎসরের মধ্যে বর্ণপরিচয় ও পাটিগণিতের মূলসূত্রগুলির সহিত পরিচয় সাধন ছাড়াও অন্য অনেক কিছু অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিশুকে শেখান যাইতে পারে।

একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে, বিদ্যাদান শিক্ষায়তনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বরং সেটাকে অন্য একটি কিছুর bye-product বা গৌণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যাদান ও লাভ ব্যাপারটি সহজ হয় এবং লব্ধ বিদ্যা জীবন-যাত্রার পক্ষে কার্যকরী হইয়া উঠে।

নিছক বিদ্যালাভ আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; বিদ্যা কিরূপে কার্যকরী করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলা যায়, 'আচার'কে সংস্কার করা যায় তাহাই সভ্যতা। বিদ্যা সাধন মাত্র, সাধ্য নহে। সুতরাং 'আচার'কে জীবনের প্রাথমিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই 'আচার'কে সংস্কৃত, সুন্দর ও সংহত করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। কথাটা পুরাতন, অতি পুরাতন, আমাদের দেশেই একদিন শিক্ষকগণ আচার্য নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু আজ আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি; তাই ইহার পুনরুক্তি করিতে হইল।

বিদ্যাকে বড় করিলে 'আচার'কে ছোট করিতে হয় অথচ বিদ্যা ত উপলক্ষ্য মাত্র, 'আচার'ই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়েও 'আচার'কে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে; বিদ্যাদান বা বর্ণপরিচয় সভ্য 'আচার'-গঠনের সহায়কমাত্র হইবে। আমাকে ঠিকভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়; সেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িয়া গেল, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আজ চারিদিকে যে সমালোচনা উঠিয়াছে, তাহার মর্ম কতকটা এই যে, এই শিক্ষা জীবনের উপর কোন প্রভাব আনিতে পারে নাই সুতরাং ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। সমালোচকগণ বলিতেছেন, বিদ্যার্জন হইতেছে বটে কিন্তু 'আচার' নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। তাঁহাদের মতে ইহার প্রতীকারস্বরূপ বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন (corporate life) গড়িয়া তুলিতে হইবে।

যদি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাই সত্য হয় যে, বিদ্যা ও জ্ঞানের চেয়ে 'আচার' বড়, তবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সত্য কেন সত্য নয় তাহা বোঝা কঠিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতার কারণও এই একই। সেখানে আমরা three Rকেই বড় করিয়া দেখিয়াছি, জীবনকে নহে।

আমি যে অর্থে 'আচার' শব্দটি ব্যবহার করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'আচার' শব্দটির সাধারণ যে সংজ্ঞা আমাদের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি শব্দটির ব্যবহার করি নাই। ইংরেজীতে যাহাকে conduct বলে সেই অর্থেই আমি শব্দটির ব্যবহার করিয়াছি। ইহার পরিবর্তে জীবনের ছন্দ বা চলিবার ভঙ্গী শব্দগুলিও প্রয়োগ করা যাইতে পারিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই আচার গঠন, সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ। 'চরিত্রগঠন' বলিতেও কতকটা ইহাই বুঝায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চরিত্রগঠন বলিলেই আমরা শাসন বুঝি; তাহার মধ্যে শাসনের ভাব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমার যে শিক্ষাবিধির পরিকল্পনা করিতেছি তাহার মধ্যে শাসন, বাহ্যশাসনের স্থান নাই। আচার শাসন করিয়া হয় না, শাসনের দ্বারা যে আচারের সৃষ্টি তাহা মিথ্যাচার। মূলতঃ শাসন বা discipline কিন্তুরের, অন্তরের ব্যাপার; তাহাকে বাহিরের ব্যাপারে পরিণত করিয়াই আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সকল গোলমাল বাধাইয়াছি। তাহার ফলে আমাদের সমূহ ক্ষতিই হইয়াছে, জ্ঞান ও জীবনের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে।

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, যেখানে ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবে, আচার গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন করিতে শিখিবে এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে তবেই সত্য আচার গঠিত হইয়া উঠিবে, জ্ঞান ও জীবনের একটা সমন্বয় ঘটিবে এবং বিদ্যা সার্থক হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের। সেই আবেষ্টনে থাকার ফলে শিশু প্রথমতঃ জীবনগঠনে সহায়তা লাভ করিবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করিয়া ভাবীকালের জীবন-যাত্রার পাথেয় ও উৎসাহ সংগ্রহ করিবে। মোটের উপর বিদ্যালয়কে বিদ্যাদানের ও বিদ্যালাভের কেন্দ্ররূপে না ভাবিয়া যদি আমরা তাহাকে শিশুর দেহ ও মনের বিকাশের অনুকূল একটি আবেষ্টনরূপে কল্পনা করি, তবেই বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

সুতরাং আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে কি করিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল একটি আবহাওয়া সেখানে সৃষ্টি করিতে পারা যায়। তাহার পর দেখিতে হইবে শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই আবেষ্টনের আছে কিনা।

সকল পিতামাতাই জানেন, জোর করিয়া খাওয়াইলে সে অন্ন শিশুকে পুষ্টিদান করে না। অথচ বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা করিয়াছি। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এমন কোন আয়োজন ত থাকেই না যাহাতে শিশু আনন্দ বোধ করে, বরং এমন নানা ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে শিশু কখন বিদ্যালয়ের ছুটি হইবে তাহারই জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। অবশ্য অনুকূল ব্যবস্থা করিলেই যে সকল সময়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এমন নহে। আমরা পুষ্টিকর আহার্য্যের আয়োজন করিতে পারি কিন্তু সে আয়োজন ব্যর্থ হইবে যদি শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম্মে সানন্দ সহযোগিতা না করে। শিক্ষাতত্ত্বের প্রাথমিক সত্য শিশুর চিত্তে আগ্রহ ও উৎসাহ সম্পাদন। এ কথাটা ভুলিলে শিক্ষাদান ব্যাপারটা বোঝা হইয়া ওঠে, শিক্ষালাভও অতোধিক হইয়া দাঁড়ায়।

এইখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য নূতন সমাজ গঠন। আমাদের এই ভাবী সমাজ সকলের সহযোগিতায় সকলের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইবে। ইহার মূল কথা সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে। আমরা আজ যে সামাজিক আবহাওয়ায় বাস করিতেছি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক ও জীববৈজ্ঞানিকগণ এই নীতিকেই জীবনের একমাত্র নীতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহা একদিন কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল; তাই অন্যত্র এমন কি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। তাহারই ফল তিরস্কার ও পুরস্কারের আয়োজন। বৎসরের শেষে পুরস্কার-বিতরণ-সভার ভিড় লাগিয়া যায়। তাহার উপর আবার বৃত্তিপরীক্ষা আছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতি কিছু ফল দেয়, কিন্তু সেটা যখন উগ্র হইয়া দেখা দেয় তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার পরিণতিও তাহাই। একালে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আমরা পরস্পরবিরোধী বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং উনবিংশ শতকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকেই সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জীবনে তাহার উগ্র প্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার সমাজের যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে কথাটা আমাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আমেরিকার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে আজ social planningএর কথা শোনা যাইতেছে; কার্য্যতঃ য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও সেই ব্যাপার চলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের মোহ এখনও কাটে নাই।

ভারতবর্ষের সম্মুখে আজ সকলের চেয়ে গুরুতর সমস্যা এই ভাবী সমাজ গঠন। তাহার শিক্ষা পত্তন করিতে হইবে প্রাথমিক-বিদ্যালয়-গৃহেই।

বিদ্যালয় একটি সমাজ, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্কৃত সংস্করণ বা প্রতিচ্ছায়া। শিক্ষাতত্ত্বের এই প্রাথমিক সত্যকে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে ব্যাপৃত কর্ম্মীদের প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিতে হইবে। শিশু যদি সহজে সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগরিকতার অধিকার গ্রহণ করিতে শেখে তবে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া সে সহজেই আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিবে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলের কল্যাণের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারে, তবে তাহার মনে যে সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত হইবে তাহাই ভবিষ্যতে একদিন ভাবী সমাজ গঠনে আমাদের সহায় হইবে। সুতরাং লেখাপড়ায়, খেলা-ধূলায় এবং বিশেষ করিয়া সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক কর্মে এই সহযোগিতা নীতির প্রবর্তন করিতে হইবে। কি করিয়া বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া চলে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যদি শিক্ষালাভের আনন্দই যথেষ্ট উৎসাহ না দিতে পারে এবং সেইজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনার সহায়তা লইতে হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শিক্ষাদানে কোথাও একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যালয়কে সমাজরূপে দেখিলে বুঝিতে পারিব ইহাতে বিদ্যাদান অন্যান্য আবশ্যক কর্মের অন্যতম। সমাজে বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে; কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে মণ্ডলী গঠিত হয় তাহার সহিত সমাজের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের বিকাশক্ষেত্র; সেখানে মানুষ শুধু বিশেষ একটি কর্তব্য লইয়াই দিন কাটায় না, কর্তব্যে, উৎসবে, স্নেহপ্রেমের প্রকাশে মানুষ সেখানে আপনার প্রকাশ খুঁজিতেছে। সেখানে যেমন কর্তব্য সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে তেমনি কর্তব্যাতীত আনন্দ-উৎসবের আয়োজনের স্থান আছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুকে তেমনই ভাবে আপনার মনের সর্ববিধ বিকাশের স্থান করিয়া দিতে হইবে। সেখানে যেমন লেখাপড়ার আয়োজন থাকিবে তেমনি খেলাধূলার ব্যবস্থা ও উৎসবের আয়োজন থাকিবে। এগুলি একান্ত প্রয়োজন।

যে সামাজিকতাবোধ জাগ্রত করা আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি তাহার বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য আরো কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনে শিশুদের কর্তব্যগুলি নির্দেশ করিলেই চলিবে না; সে কর্তব্য হাতে-কলমে কিভাবে নিষ্পন্ন করা যায় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। সমাজে, বিশেষ করিয়া পল্লীসমাজে, এমন কতকগুলি কাজ আছে যাহা শিশুরা অনায়াসে করিতে পারে। পথঘাটগুলি পরিষ্কার রাখা, নূতন পথ তৈয়ারি করা, মাঝে মাঝে পানা পরিষ্কার করা, সকলের ফলপ্রদ গাছগুলির ছাত হইতে রক্ষা করা, ছায়াদানের জন্য বৃক্ষরোপণ করা, পল্লীশ্রীবর্ধনের জন্য ফুলের বাগান করা, এরূপ অনেক কাজ আছে যেগুলি শিক্ষকগণের সহায়তায় ও সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীগণ করিতে পারে। এইরূপ কাজ করিবার সময় কর্তব্য ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের উপর যেমন জোর দিতে হইবে তেমনি তাহার মধ্যে যে স্বাভাবিক আনন্দ আছে তাহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তাড়না বা পুরস্কারের অপেক্ষা না রাখিয়াই শিশুর অলক্ষ্যে শিশু যেন ধীরে ধীরে এই শিক্ষা লাভ করে।

বিদ্যালয়-সমাজ ও বৃহত্তর সমাজ উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে হইবে। সামাজিকতাবোধের ক্রমবিকাশে শিশু প্রথমে বিদ্যালয়-সমাজের কর্তব্যে দীক্ষা লাভ করিয়া পরে ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের কর্তব্যে দীক্ষা-গ্রহণ করিবে।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই বিদ্যালয়গুলিতে পল্লীগ্রামের দরিদ্র, বঞ্চিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণই আসিবে। তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় আপনার ব্যবস্থা আপনিই করিতে পারে; সুতরাং তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আয়োজন করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে সেরূপ সম্প্রদায়ের শিশুগণও আমাদের এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিবে, কিন্তু মূলতঃ আমাদের কার্য্য হইবে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের লইয়াই।

একথা স্মরণ রাখিলে বিদ্যালয়ের কতকগুলি কর্তব্য আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি বিদ্যালয়কে একটি সমাজে পরিণত করিতে হইবে এবং তাহাতে এমন একটি আবেষ্টন, আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে শিশুগণ আপনা হইতে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্য আচার পালন করিতে শিখিবে। আচার সম্বন্ধে একথাও বলিয়াছি যে, সে আচার শিশু নিজের আনন্দে শিক্ষা করিবে। সুতরাং তাহাকে আচার পালন না বলিয়া আচার গ্রহণ বলিলেই ঠিক বলা হয়। সমাজের যে স্তর হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ আসিবে সে স্তরে কতকগুলি আচার শিক্ষা করিবার কোন আয়োজনই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা বশতঃ নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা, প্রত্যহ স্নান করা, দাঁত মাজা প্রভৃতি বাহ্য আচার শিশুকে শিখিতে হইবে। সত্য কথা বলা, সময়ানুবর্তন করিয়া চলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা,

প্রভৃতি কতকগুলি একান্ত আবশ্যক মানসিক আচার তাহাদের শেখা প্রয়োজন। এগুলির কোনটাই ত বই পড়িয়া হয় না, সুতরাং বিদ্যালয়ের সমাজে সেগুলি শিখিবার অনুকূল ক্ষেত্র গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এইখানে বিদ্যালয়কে কিছু পরিমাণে গৃহের ও পরিবারের কর্তব্য ও স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য আদর্শ ব্যবস্থা সেখানে, সেখানে পরিবারও বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে সহযোগিতা করে: আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই সহযোগিতা আশা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে একদিন আমরা এই সহযোগিতা লাভ করিতে পারি। এই প্রবন্ধের শেষে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া গণশিক্ষার আয়োজনের কথা বলিব তখন এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এতক্ষণ আমি বিদ্যালয়ে সহযোগিতার কথাই বলিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ দেওয়া হইবে না। আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কোনমতেই খর্ব করিতে চাহি না বরং কি ভাবে শিশু তাহার নিজের গতিতে নিজের ছন্দে জীবনে চলিতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। উহার জন্য সকল প্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। একথা আমরা যেন মনে রাখি যে, যে-ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাহিতেছি তাহার প্রত্যেক লোকটিকেই স্বাধীন, চিন্তাশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিরদিন পরের কথা শুনিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। ভাবী সমাজের একটি কাল্পনিক আদর্শ মনে রাখিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এমন কি, আজ যদি ভবিষ্যতের সমাজ ঠিক কি আকার ধারণ করিবে তাহা বলিতে যাই তবে স্পর্ধা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। সমাজ চিরদিনই পরিবর্তনশীল, ভাবী সমাজও ঠিক একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবে না। মানুষের সব চেয়ে কঠিন কাজ এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলা। এই চলার জন্য প্রয়োজন—জাগ্রত, বলিষ্ঠ, চলিষ্ণু মন, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি। বাহিরের বিধিনিষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত শাসিত হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। ভুল করিতে করিতেই মানুষ শেখে, ভুল করিতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে তাহার মনে জড়তা আসিয়াছে। অবশ্য যাহারা সুখের চেয়ে স্বস্তিকে বড় বলিয়া মনে করে, তাহারা ভুল করিতে, জীবন লইয়া পরীক্ষা করিতে ভয় পায়। কিন্তু সেই প্রকৃতির লোককে লইয়াও আমরা ভাবী সমাজ গড়িতে চাই না। সুতরাং শিশুকে পদে পদে বিধিনিষেধের নাগপাশে আমরা বাঁধিব না। আর একটি কথা। কি করিয়া বলিব যে, বিশ বৎসর পরে সমাজে এই গুণগুলির প্রয়োজন হইবে সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনুশীলন করিতে হইবে। সেদিন কি ভাবে একটা বিশেষ অবস্থার বিশেষ ভাবে চলিতে হইবে তাহার বিচার আমি আজ কি করিয়া করিতে পারি? তাহা যে করিবে সেই শিশুকে যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে পারি তবেই আমরা আমাদের কর্তব্য করিলাম।

শিশুকে এই স্বাধীনতা দান উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমানার্থবোধক নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্যহীন কিন্তু স্বাধীনতা তাহা নহে। উচ্ছৃঙ্খলতার পরিসমাপ্তি তাহার নিজেরই মধ্যে; কিন্তু স্বাধীনতা বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই প্রয়োজন। স্বাধীনতার ভিতর সংযমের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শিশু অপরিণত সুতরাং কিছুটা বিধিনিষেধ থাকিবেই। কিন্তু সেগুলির অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা যেন সে বোঝে। সেগুলির সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম করা দরকার এবং নূতন বিধিনিষেধের সৃষ্টিতে তাহার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের বিদ্যালয়ে অতি অল্পসংখ্যক বিধিনিষেধ থাকিবে; আর এমন করিয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যে নূতন বিধিনিষেধসৃষ্টির তাগিদ শিক্ষার্থীর ভিতর হইতেই প্রথম আসিবে।

শিশুর স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। উপস্থিত যে ভাবের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলিয়াছে তাহাতে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; প্রথমতঃ, তাহাতে মানুষের স্বভাবের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া শিক্ষার্থীগণকে সমষ্টি, অর্থাৎ মণ্ডলী হিসাবে, ব্যষ্টি হিসাবে নয়, সমষ্টি হিসাবে দেখা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেখানে শিক্ষার্থীর চেয়ে পাঠ্যকে, শিক্ষণীয় বিষয়কে বড় করিয়া গ্রহণ করা হয়।

মানুষ বিচিত্র, একজনের সহিত অপরের সম্পূর্ণ মিল নাই এবং যেখানে মিল নাই সেখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সেই

বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিলে জীবনের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করা হয়।

অবশ্য নানাস্থানে সমষ্টিকে লইয়াই হিসাব করিতে হয়, কিন্তু অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা একটি শিশুকে দশটির মধ্যে একটি রূপে দেখিব না; আমরা তাহাকে এককরূপে, প্রাণ-শক্তির একটি অখণ্ড বিশিষ্ট প্রকাশরূপে দেখিব। তাহার জীবনের বৈচিত্র্য, গতি ও গতিছন্দ লক্ষ্য করিব এবং তাহার মধ্যে যেটুকু সুন্দর, কল্যাণকর তাহার রক্ষা ও বিকাশের চেষ্টা করিব। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে।

সুতরাং শিশুর অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের পরিপুষ্টি ও বিকাশের জন্য আমাদের আয়োজনও পরিপূর্ণ ও বিচিত্র করিতে হইবে। হয়ত সকল শিশুরই বর্ণপরিচয় হইবে কিন্তু তাহার মধ্যে একজন হয়ত এই সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী। তাহার জন্য যদি সঙ্গীতশিক্ষার আয়োজন না করি তবে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিও অবিচার করা হইবে। হয়ত এই শিশু সঙ্গীতের সাহায্যেই ভাবী সমাজের সেবা করিতে পারে।

অবশ্য আমি জানি যে, সকল প্রকারের আয়োজন করা আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে কুলাইবে না; কিন্তু আমাদের এই নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব আয়োজন করিতে হইবে।

আমি জানি শিশুকে সমষ্টির অন্তর্তম, অন্য সকল শিশুর সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমান ভাবিতে পারিলে শিক্ষাদান সহজ হইয়া পড়ে এবং দায়িত্বও কমিয়া যায়। তাহার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন করা কষ্টসাধ্য ও সেরূপ ভাবে শিক্ষাদান করার দায়িত্ব অনেকখানি। কিন্তু আমাদের সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আজ যে আমাদের জাতীয়জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীই যে এক ছাঁচে ঢালা যন্ত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কতপরিমাণে দায়ী তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমানে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের চেয়ে পাঠ্যবিষয়কে বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহার কারণ আমরা পরিণতবয়স্কের দৃষ্টি লইয়াই শিক্ষাপ্রণালীর বিধান করিয়াছি। পরিণত বয়সে শিশুর কি কি বিষয়ে জ্ঞান কাজে লাগিতে পারে তাহাই ধরিয়া লইয়া আমরা কতকগুলি বিষয় ঠিক করিয়া দিয়াছি। খাদ্যের বেলায় আমরা শিশুকে পরিণতবয়স্কের দৃষ্টি লইয়া বিচার করি না, তাহার প্রয়োজন বিচার করিয়া চলি। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি।

অবশ্য বর্ণপরিচয় ও যোগবিয়োগ গুণভাগের সহিত পরিচয় অত্যধিক পরিমাণে সকল শিশুরই জ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু তাহাদের চেয়েও আরো অনেক আরো অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যেগুলি হয়ত শিশুচিত্তের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে প্রয়োজনীয়, অথচ বর্তমান পাঠ্যসূচীতে তাহাদের স্থান নাই। না হয় পাঠ্যসূচীর সংস্কার করিয়া তাহাদেরও স্থান করা গেল, কিন্তু তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না।

সমস্যা এই যে, আমরা শিশুর চেয়ে শিশুর পাঠ্যের প্রতি বেশী নজর দিই। সুতরাং পাঠ্য শেষ করার দিকে ঝোঁক বেশী পড়ে এবং শিশুর মনের বিকাশ ঠিক মত হইতেছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ থাকে না। আর পাঠ্যের প্রতি বেশী নজর দিলে ফল হয় এই যে, অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা শেষ করিবার লোভ আসে। সেই জন্যই তিরস্কার ও পুরস্কারের আয়োজন করিতে হয়।

যদি আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করিতে পারি তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের দৈন্যের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকে আমাদের চিন্তাশক্তির জড়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি অভাব অনেকেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। চলিষ্ণু মানবচিত্ত স্বভাবতই সৃজনশীল; সৃষ্টি করিবার, নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নানা কারণে আমাদের বর্তমান সমাজে সেই বৃত্তির বিকাশের আয়োজন অতি সামান্যই আছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে তাহার আয়োজন আরও কম আছে, কারণ এখনও সেখানে আমরা ইহার

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি নাই। সম্প্রতি এবিষয়ে যে সামান্য দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাই পাঠ্যসূচীতে "হস্তদম্পাদ্য" কার্য্যের তালিকায়। কিন্তু সেটা কতকটা বেগারঠেলা ভাবে স্বীকার করা। যে হেতু পাশ্চাত্য শিক্ষা-তাত্ত্বিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের অনুকরণে কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা লোকে কি বলিবে? ভাবটা কতকটা এমনই।

অথচ যে ভাবী সমাজের কল্পনা আমরা করিয়া থাকি তাহার নাগরিকগণের সবচেয়ে বড় কাজ হইবে নূতন করিয়া সমাজ ও জীবন গঠন, নূতন সমাজ সৃষ্টি। যে সৃষ্টি করিতে শিখিল না, যে কোনদিনই সৃজনের আনন্দ আস্বাদ করিল না এবং যাহাকে চিরদিনই পরের অনুকরণ করিয়া চলিতে হইল, সে কেমন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিবে? তাহার অন্তরে এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিবার কোন্ প্রেরণা আছে?

আমাদের বিদ্যালয়ে শিশুচিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছোট সৃষ্টি করিতে করিতেই মানুষ বড় সৃষ্টি করিতে শেখে। যে শিশু একটি বীজ হইতে ফুলগাছ তৈয়ারি করিতে শিখিল তাহার শিক্ষা তুচ্ছ নহে। সৃষ্টি করার চেষ্টায় সেইটুকুই প্রথম ধাপ হইতে পারে এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে।

আর একটি বিশেষ কারণে শিশুকে সৃষ্টি করিবার আনন্দের স্বাদ দিতে হইবে। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির অন্যতম বৃত্তি হইতেছে, সংগ্রহ করিবার, সঞ্চয় করিবার বৃত্তি (acquisitive instinct)। ইহারই তাড়নায় মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, পরকে বঞ্চিত করিয়া ধনের মত অর্থহীন সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের সমাজের বহু দুঃখের মূলেই এই বৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। অবশ্য এই বৃত্তির সকলটুকুই খারাপ নহে। সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যে লোক মরণকালে ভাবীকালের কল্যাণের জন্য সে অর্থ দান করিয়া গেল সে মহাপুরুষ। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই সে ভাবে সঞ্চয় করে না। যাই হোক, সমাজরক্ষার জন্য এই বৃত্তির সংযত বিকাশের প্রয়োজন। সে সংযমের একমাত্র উপায় সৃজনী-বৃত্তির বিকাশ। সঞ্চয়-বৃত্তির আত্যন্তিক বিকাশ ও তাহার ফলস্বরূপ দুঃখসৃষ্টির একমাত্র প্রতিষেধক এই সৃজনী-বৃত্তির (creative instinct) বিকাশের উপায় করা। সে সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করিবার আনন্দ-বোধে সে সঞ্চয় করিতে চাহে না, অন্ততঃ চাহিলেও তাহার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাহার বড় বেশী থাকে না। শিশুকে শিখাইতে হইবে, সঞ্চয় করা ভাল, (তাহাকে আমরা অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী করিতে চাহি না) কিন্তু তাহার চেয়েও ভাল সৃষ্টি করা। ইহার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে নানারূপ আয়োজন করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের নানাব্যাপারে সেই আয়োজন—সৃজনীবৃত্তির বিকাশের অনুকূল একটি আবেষ্টন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। শুধু হাতের কাজে নহে, অভিনয়ে, লেখাপড়ায়, ক্রীড়ার অঙ্গনে সর্ব্বত্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর হাতের কাজ বলিতে সাধারণভাবে আমরা যাহা বুঝি অর্থাৎ একটু কাঠের কাজ বা মাটির কাজ, কিছু সূচীশিল্প বা সেইরূপ একটা কিছু, শুধু তাহাদের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। মানুষের সৃজনী শক্তির বিকাশ বিচিত্ররূপ গ্রহণ করে, যতদূর সম্ভব আমাদের আয়োজনকে সেই বৈচিত্র্য দান করিতে হইবে।

এই সৃজনীবৃত্তি-পরিচালনার ফলকে আর্থিক মাপ-কাঠি দিয়া বিচার আমরা করিব না। একটি শিশু একখণ্ড বেত দিয়া একটি ছোট ঝুড়ি তৈয়ারি করিল, তাহার আর্থিক মূল্য হয়ত সামান্যই কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল্য অনেকখানি, তাহা টাকা পয়সার হিসাবে পাওয়া যায় না। সৃষ্টি করিবার আনন্দের ও আত্মপ্রসাদের আর্থিক মূল্য নির্দ্ধারণ কে করিতে পারে? তাহার ফলে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে তাহার হিসাবনিকাশই বা কে দিতে পারে?

আজকাল অনেকের মুখে vocational education অর্থাৎ অর্থকরী শিক্ষার কথা শোনা যায়। তাঁহারা বলেন, শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী অর্থ-উপার্জ্জন ব্যাপারে সহায়তা লাভ করিতে পারে। একথা আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। যে বয়সের ছাত্র-ছাত্রীগণকে লইয়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির কাজ, সে বয়সের শিশুকে অর্থ উপার্জ্জনব্যাপার হইতে দূরেই রাখিতে হইবে। Vocational education শিক্ষা-

ব্যবস্থার দ্বিতীয় ধাপের ব্যাপার। তাহার স্থান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নহে।

প্রাথমিক প্রচারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। অন্যান্য দেশে ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয় কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া এখনও ইহার চাহিদা দেশে এতটা হয় নাই যে, দেশের জনসাধারণ অর্থসাহায্য করিবে। অর্থব্যয় করিতে পারিলে যতগুলি শিক্ষক আমরা নিয়োগ করিতে পারিতাম আমরা পারিব না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন শিক্ষক-দেবকেই লইয়াই আমাদের কাজ চালাইতে হইবে। সুতরাং আমাদের আয়োজনও তদনুযায়ী সংক্ষেপ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই একজন শিক্ষককে লইয়া চলিবে। যেখানে অন্যদেশে একাধিকজন শিক্ষক কাজ করেন সেখানে আমাদের মাত্র একজনকে লইয়া কাজ চালাইতে হইবে। সুতরাং স্বভাবতই আমাদের কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে। হয়ত যেখানে পাঁচ বৎসরের শিক্ষার আয়োজন করিলে ভাল হইত সেখানে তিন বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। হয়ত গ্রামের ধনীদরিদ্র সকলের জন্য বিদ্যালয় খুলিলে ভাল হয়, কিন্তু আমাদের শক্তি পরিমিত বলিয়া শুধু দরিদ্র ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সন্তানগণেরই শিক্ষার ভার আমাদের লইতে হইবে। হয়ত সকল বয়সের শিশুর জন্য ব্যবস্থা না করিয়া ৭ হইতে ১০ বৎসরের শিশুদের জন্যই আমরা আয়োজন করিব। হয়ত যে আয়োজন, আসবাবপত্রাদি আমাদের প্রয়োজন হইত তাহার সবটাই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। আমাদের চেষ্টা সংহত ও আয়ত্ত সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শকে আমরা কোনদিন সঙ্কীর্ণ করিব না। আমাদের বিদ্যালয়কে প্রথম হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, কারণ আমরা পড়ানর চেয়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির দিকে বেশী দৃষ্টি দিব। সেই আবেষ্টন যতদিন না ক্রিয়াশীল, প্রাণবান হইয়া উঠে ততদিন বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষে তাহার ক্ষতি হইবে। সুতরাং হয়ত প্রথম বৎসর ৭।৮টি শিশুকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে।

এতক্ষণ আমি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেই বলিয়াছি, কিন্তু প্রবন্ধের আরম্ভে আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অন্য একটি কর্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, সেই কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করি।

এককালে আমাদের গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্র ছিল, চণ্ডীমণ্ডপ, দেবায়তন ও মসজিদগুলি। আজ পল্লীসমাজ ভগ্নপ্রায়, পল্লীর প্রাণকেন্দ্র কোন আশ্রয় পাইতেছে না। আজ যখন আমরা সেই ভগ্নপ্রায় পল্লীসমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছি তখন আমাদের প্রথম কাজ হইবে সেই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে কিছু পরিমাণে সেই কেন্দ্রের ভার ও আজ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া সেগুলিকে গণশিক্ষার (adult education) ভার লইতে হইবে। তাহার প্রথম কাজ হইবে বিদ্যালয়ের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ট যোগ সাধন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ধীরে ধীরে আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া তাঁহাদেরও শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। অনেক পিতামাতার মনে করেন সন্তানপালন খুব সহজ কাজ। অথচ একথা অত্যন্ত সত্য যে, সাধারণ পিতামাতা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে এবিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে হইবে। তাহাই হইবে adult educationএর প্রথম ধাপ। তাহার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। এ বিষয় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, adult educationএর জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় নহে আলাপ-আলোচনা-সভা।

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বোঝা যাইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারটা আমরা একান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করি তাহা মোটেই সেরূপ নহে। সুতরাং সেই শিক্ষাদানব্রত গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের অসীম ধৈর্য ও কঠিন সাধনার প্রয়োজন হইবে। আশা করি এই গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব আজ হইবে না।

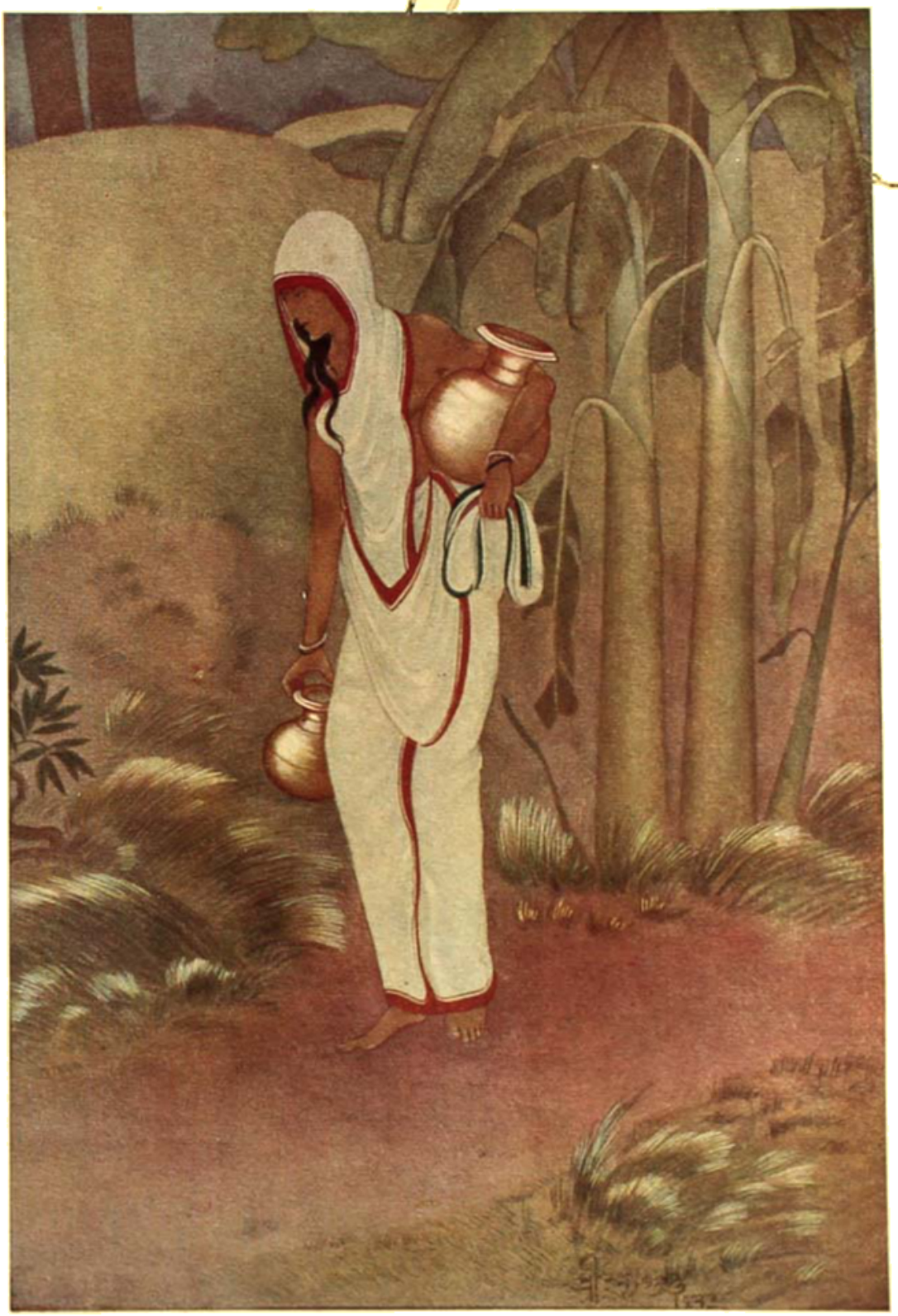

স্নানার্থিনী। [শিল্পী—শ্রীইন্দু গুপ্ত

বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

কথিত আছে অগাধ করুণার আবেগে বাল্মীকি "মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার ক্রৌঞ্চ ও ক্রুদ্ধ হৃদয়ের অভিশাপ গাঁথিয়া ব্যাধের মস্তকে বর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রত্নাকর মানুষ মারিয়া যখন অপহৃত ধন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া পুত্রকলত্রের নিকট উপস্থিত হইত তখন সে তাহার উল্লাস গদ্যেই ব্যক্ত করিত; যেদিন দারাদিন বা রাত্রি অপেক্ষার পর শীকার জুটে নাই, বুভুক্ষিত নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে যেদিন সে স্ত্রীপুত্রের সম্মুখীন হইত সেদিনও গদ্যেই তাহার অবসাদ ও নৈরাশ্যের কথা ব্যক্ত করিত।

মানুষ মাত্রেই কথা আরম্ভ করিয়াছে গদ্যে; আজন্ম মানুষ গদ্যেই কথা কহিয়াছে; কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য কি কে জানে—মানুষ সাহিত্য রচিয়াছে আগে পদ্যে বা ছন্দে। কিন্তু এই ছন্দে চিন্তার বিষয়কে ব্যক্ত করিবার আগে সে হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে—হাসাইয়াছে কাঁদাইয়াছে—গদ্যে। গদ্যে তার সুখদুঃখের কথা চিন্তা করিয়াছে, গদ্যে তার চিন্তার বিষয় বন্ধুকে, আত্মীয়কে, প্রেমাস্পদকে জানাইয়াছে, জানাইয়া, চিন্তার মধ্যে যে দুঃখ, গদ্যেই তাহাকে ব্যক্ত করিয়া দুঃখকে লঘু করিয়াছে, সুখের কথা গদ্যেই কহিয়া সুখের বৃদ্ধি করিয়াছে—একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া যেন আলোয় করিয়া তুলিয়াছে।

অনুভূতির ভিতর যখন আবেগের সৃষ্টি হয়, মানুষ সেই আবেগের প্রকাশ গদ্যের মধ্য দিয়াই করিয়াছিল—সে প্রকাশের সঙ্গে শুধু ভাষাই ছিল না, হস্ত তাহার কণ্ঠ, তাহার নয়ন, তাহার হস্তপদ, তাহার দেহযষ্টি সেই আবেগের ভরে দোল খাইয়া উঠিত এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করিত ও ব্যক্তকে আরও পরিস্ফুট করিত।

ব্যক্তির সুখদুঃখের কথা ব্যক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া যখন শুধু সুখদুঃখের কথার মাত্র পর্য্যবসিত হইত তখন হইতে সে কথা মুখে মুখে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তখন তাহার কথা ভুলিয়া গিয়া কিসের কথাই স্ফুটতর হইয়াছে—এবং কথা-সাহিত্য অর্থাৎ কথিত সাহিত্য এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু আমি বলিতে চাই, "এক যে ছিল রাজা—" এই বলিয়া যে মানুষ গল্প বলিতে আরম্ভ করিল—তাহা, "অনুরূপ বিধুর-সখঃ" প্রভৃতি লিখিত শ্লোকের কতপূর্ব্বে না জানি মানুষ রচনা করিয়াছিল। সে রচনা, না হয়, মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া যুগযুগান্তরের শিশু বা শিশুমানবের নিকেন শ্রান্তি এবং সন্ত্রাসে নিশ্রান্ত বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু সাহিত্য বলিতে আমরা আজ যাহা বুঝি তাহার কর্তৃপূর্ব্বে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা কে করিবে—কিন্তু এই প্রাথমিক কথিত সাহিত্য, গল্পের রূপ লইয়াই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ কোথায়? প্রাথমিক পদ্য, সেও গদ্যের মতই।

প্রথম গদ্যের নিদর্শন যাহা বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ভাষা একটা অস্বাভাবিক নিগড় পরিয়া আমাদের সমক্ষে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় তাহার স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া straight-jacket পরা কয়েদীর মত উপস্থিত হইয়াছে। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে যে গদ্য প্রতিদিনের সুখদুঃখের কথা বহিয়া প্রবাহিত হইত তাহার নিদর্শন খুঁজিতে গিয়া প্রথম পুঁথি বা প্রথম দলিলপত্র হাঁটকাইয়া বাহির করিলে মিলিবে না। সেই স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত ভাবধারার নিদর্শন হয়ত পাওয়া যাইবে শৈশবের কাহিনীতে, "রূপকথা"য়—এখনও দেশের কোণে কোণে যে ভাষা কথিত হয়, যে ভাষায় ঠাকুর-মায়েরা আদিকালের "রূপকথা" বলেন, তার ভিতর ছড়ার অংশ বাদ দিয়া যেটুকু গদ্য ছড়ার ধারাকে গাঁথিয়া ধরিয়া আছে—সেই গদ্যসূত্রটির খেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে তবে সে গদ্যের কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই যে গদ্যের নিদর্শনের কথা বলিলাম তাহার আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল প্রাথমিক লেখকের রচনামধ্যে। সেটা খানিকটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব হইলেও একটা সাধারণ কারণ বা আবহাওয়াও তাহার জন্য দায়ী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য-পুস্তকগুলিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরস বৈচিত্র্যময় কথাবার্ত্তার ভিতর যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাভাবিকতা ছিল—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য

হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই জানেন—যেমন তিনি লিখিতে বসিলেন, অমনি তাঁহার নিজের স্বাভাবিক ভাষাকে "বৈদ্যাসাগরী ভাষা"য় তরজমা করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ভাষায় Dr. Johnsonএর সুচতুর তরল গদ্য বাক্যভঙ্গী Boswell লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, Dr. Johnsonএর গদ্য-রচনামধ্যে তাহার রস পাওয়া যায় না। তাঁহার গদ্য তাঁহার স্বল্পজ্ঞ কথাভঙ্গীর Johnsonese সংস্করণ মাত্র।

Macaulay লিখিয়াছেন—

> All his books were written in a learned language in which nobody ever quarrells, or drives bargains, or makes love, in a language in which nobody ever thinks. It is clear that Johnson himself did not think in the dialect in which he wrote. The expressions which came first to his tongue were simple, energetic, and picturesque. When he wrote for publication, he did his sentences out of English into Johnsonese. His letters from Hebrides to Mrs. Thrale are the original of that work of which the Journey to the Hebrides is the translation and it is amusing to compare the two versions. "When we were taken upstairs" says he in one of his letters, "a dirty fellow bounced out of the bed on which one of us was to lie." This incident is recorded in the Journey as follows: "Out of one of the beds on which we were to repose started up, at our entrance, a man black as a Cyclops from the forge." Sometimes Johnson translated aloud. "The Rehearsal," he said, very unjustly, "has not wit enough to keep it sweet;" then after a pause, "it has not vitality enough to preserve it from putrefaction."

এই সমস্ত কথাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার প্রতি প্রযুজ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের Boswell নাই, তাঁহার সহিত যাঁহাদের পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল—তাঁহাদের স্মৃতির উপর ভর করিয়া বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন, প্রাথমিক গদ্যলেখক মাত্রেরই ভিতর এই অসামঞ্জস্য-জীবন্ত কথিত ভাষার সঙ্গে লেখার ভঙ্গীর বিচ্ছেদ বিদ্যমান—রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায়, রামমোহন রায়—প্রত্যেকের রচনায় এই আড়ষ্ট সাজাগোজা ভাব বিদ্যমান। এই বিকার বা রূপান্তর কেন হয় তাহার মীমাংসা জটিল হইলেও অসম্ভব নহে।

বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে এই বলা যায়—বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য-রূপ আদর্শটা লেখকের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ সকল চোখের সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল—সেই সাহিত্যের আদর্শ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশসকল অলক্ষিতে লেখকের অজ্ঞাতে তাঁহার স্ফুটনোন্মুখ রচনার পায়ে বেড়ী পরাইয়া দিল। তাঁহারা যে সহজ ভাষায় কথা কহেন, তাহাকে ঐ সকল নিগড়ে জব্দ করিয়া প্রকাশকে আভিজাত্য-বর্জ্জিত গ্রাম্যতা হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা স্বতই আসিয়া তাঁহাদের লেখনীকে আশ্রয় করিল।

যে সম্প্রদায় সংস্কৃত গ্রন্থকে আদর্শ করে নাই—মত বা পথের পার্থক্যহেতু সংস্কৃত শাস্ত্রকে বাদ দিয়াই আপনার কথা বলিতে ব্যস্ত হইয়াছিল—সেই সেই সম্প্রদায়ই—বৌদ্ধগ্রন্থে, বৈষ্ণব আচার বর্ণনায়, খৃষ্টানের লেখায়—সহজ সরল কথিত ভাষা ও ভঙ্গীকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারই নিদর্শন শূন্যপুরাণের গদ্যে, পোর্টুগীজ মিশনারীর বাঙ্গালা রচনায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সাধনপ্রণালীর ব্যাখ্যায়, শ্রীরামপুরের মিশনরীর কেরীর "কথোপকথনে" পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তীকালে ইংরেজী আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যকে আর একটি নিগড় পরাইয়াছে। কেহ বলিবেন, নিগড় নহে, গতিভঙ্গী মাত্র। কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে সেই ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার যে নিজের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও কতকটা অপচয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ভাষার ভঙ্গীর সঙ্গে চিন্তার ভঙ্গীও যে বদলাইয়া গিয়াছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। মধ্যে পারসিক ও আরবীয় ভাষার স্রোত বহিয়াছিল, কিন্তু সে স্রোত কতকগুলি কথা মাত্র বাঙ্গালা ভাষার স্রোতে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—স্রোতের গতি ফিরাইতে পারে নাই।

মিশনরী কেরী "কথোপকথনে"—দেশের নিত্যব্যবহার্য্য ভাষার যে নিদর্শন দিয়াছেন তাহা উপভোগ্য। সংস্কৃতের ভূত তাঁহার স্কন্ধে ভর করে নাই, সুতরাং তিনি প্রতিদিনের সুখদুঃখের কথা মানুষ যে ভাষায় ব্যক্ত করিত তাহাই ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

হাড়ে ভেল্কী খাইবে যদি কি না ; আমি যে কোন কোন কহিয়ে। দুই দুবারদি দুই দুবারদিস। (লিপিমালা কথা) (১৮০১)

ঘটক যাইয়া বলিবে বরকে খণ্ডিতেরদের বহুত আদর হে তোমার কন্যার লক্ষণ অমুক গ্রামে মৌরসি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য তাহারা জাত্যাংশেও বেদর আর অত্ত যেস বহুত আছে সে অতি নিকে কর্ম্মো চাহুরা। পুরুষি অতি সুরূপ লিখিতে পড়িতে মূর্খিবন্ত দৃঢ় হবা দস্তা অত্ত ধন এবন পাহ আর পাবা না ইহা বুলিয়া জবাব দেহ কিন্তু তাহারা বেশি সহিবে না এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে। (ঘটকালি) (১৮০১)

হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ হইতে। শেষোক্ত সংকলনের ভাষায় সংস্কৃত ছাপ স্পষ্ট রহিয়াছে। এখানে যুগ-বিভাগের কোন অর্থ নাই। লেখকের ধারার বিশেষত্ব মাত্র লক্ষ্যের বিষয়। সংস্কৃত অনুকারী ভাষা মৃত্যুঞ্জয়, হরপ্রসাদ, রামমোহন হইয়া বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। প্রত্যেকের ভাষা সংস্কৃতানুগ, কিন্তু নিজ নিজ বিশেষত্বই অধিকতর স্পষ্ট। ইহারই মধ্যে তারিণীচরণ মিত্র লিখিত "ঈশপস্ ফেবল্"এ (১৮০৩) কিরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

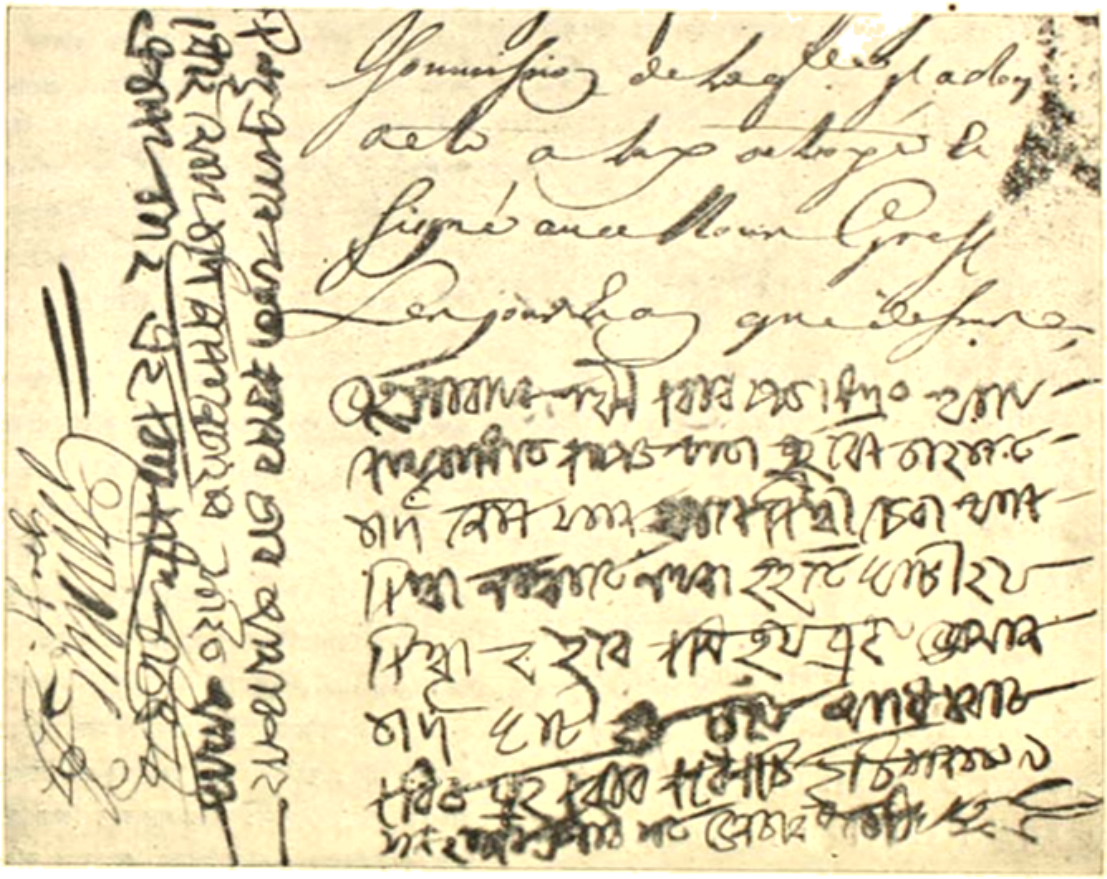

ইয়েনাথানের স্বহস্তলিখিত একরার-পত্র, ইং ১৭০২ সাল।

সপাক ভাতের ভাল কেলার প্রায় অগ্র বিধি দেখিয়া পায় তারা উদর ভর ঘটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে। যদি কোন কারায় অগ্র পাকা অন্ন তাকে কেলায় সে দেখিয়া যদি না খায় তবে কখন পাবে না অতএব যে শিক্ষা মাত্র অন্নকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভায় মধ্যে কেবল বীথি হয় যেন হংসের মধ্যে বক। (হেতোপদেশ) (১৮০১)

একই বৎসরে প্রকাশিত উপরোক্ত তিনটি লেখা। প্রথম দুইটি কেরী সাহেবের "কথোপকথন" হইতে, তৃতীয়টি

কহিলেন যে প্রিয় ভাই, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি : তোমার মুখ দৃষ্টি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতিঃ যদি নয়নাক্ষমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে নিশ্চয়ই জানিএব যে তোমার মত আর আর গুণের সমান হবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭) প্রকাশের সঙ্গে গদ্যের নব যুগের সূচনা এ কথার এই মাত্র অর্থ হইতে পারে।—বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলায় কিছু বিশেষত্ব আছে—

সেটা দুর্লক্ষণ বলিয়া না লইয়া ব্যক্তিগত লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন হানি নাই।

যে সময়ে বিদ্যাসাগর লিখিলেন—

> যে স্থানে ছেলেবেলায় অবধান, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণেরা মনে করেন বিদ্যা বাহাদুরি, মহারাজ মহারাজ কপিলা সাহায্যে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ অবধির উপর লোকালয়ের কীর্তি হেতু হেতু সমাচীন করিয়াছেন (বেতাল পঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭) ইত্যাদি।

তাহার দুই বৎসরের মধ্যেই পাওয়া যায়—

> এক হিন্দুক এক ধনির স্থানে গিয়া কিছু যাচ্ঞা করিলে কোন ধনি বাটী হইতে উত্তর করিল, দৃষ্টিশক্তি নাই। তাহাতে হিন্দুক কহিল, আমি একখণ্ড কটীর নিমিত্তে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, দৃষ্টিশক্তির আমার প্রয়োজন নাই। *Introduction to the Bengali Language*, by the Rev. W. Yates D. D. Vol I 1847

> এক ব্যক্তির এক কৃপণের সহিত বন্ধুতা ছিল, পরে সে প্রবাসে যাইবার সময় আপন কৃপণ বন্ধুকে কহিল, হে বন্ধো, তোমার অঙ্গুলীটি আমাকে দেও, আমি আপন নিকটে রাখি, তাহাতে প্রবাসে থাকিয়া ঐ অঙ্গুলীর দেখিলে সর্বদা তোমাকে মনে পড়িবে। তাহাতে কৃপণ বন্ধু উত্তর করিল, যদি আমাকে স্মরণ করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, অঙ্গুলীরো প্রয়োজন কি? তোমার সুক্ষ্ম অঙ্গুলী দেখিলেই আমাকে স্মরণ করিতে পারিবা। (ঐ)

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র ১৩০৭ সালে "লিপিসংগ্রহ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি বলেন—"এই সকল পত্র ইংরাজী ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৪ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়গণ নিতান্ত শিশু ছিলেন।"

পত্রলেখক হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বলাগড়ের নিকট চাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন (১৭৮৬, এপ্রিল)। "লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কলেক্টর সাহেবদিগের সাহায্যের নিমিত্ত দেশীয় যে সকল সুশিক্ষিত লোককে সর্বপ্রথম ডেপুটি কলেক্টর পদ প্রদত্ত হয়, দুর্গাদাস মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে একজন।"

পুস্তিকাখানিতে সর্বশুদ্ধ ১০ খানি পত্র প্রকাশিত হয়, পত্রগুলির রচনা ও চিন্তাধারা অত্যাশ্চর্য।

আমি প্রথম পত্রখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বিরামচিহ্নগুলি প্রকাশকের দেওয়া।

> শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মিত্র স্থানে তস্য শ্রীযুক্ত মধুসূদ যোষন মিত্র ধর্মাত্মা চিরজীবেষু—
>
> পরম ওভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনকরণে তোমাদিগের পরম কল্যাণে এবং সংসারে সকলে শ্রীহরিপদ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ।...(অসম্পূর্ণ)...

তোমাদিগের কিঞ্চিৎ মাত্র অশ্রদ্ধা হইলে বিদ্যা হওনের আশা বিফল হইবেক, এবং তাহা হইলে জীবনের সার্থকতা কিছু মাত্র নাই। বস্তুবাদের বিদ্যালাভ হইলে মনের সুখ এবং সংসারে সুখ্যাতি: আমরা নির্ধন, আমাদিগের ও দুই দিন অন্নাভাব জীবনার্থে উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে হইবেক। আমাদিগের যে ধনে ঈশ্বর, দিনপাতের অন্ন সংস্থান নাই। ইহাতে বিবেচনা করিব বিদ্যোপার্জনের কি পর্যন্ত আবশ্যকতা। এইক্ষণে তোমাদিগের যে বয়ঃক্রম হইয়াছে, ইহাতে এক পল বিফল গত হইলে এক বৎসর বোধ করিবা: এবং যে পল গত হইবেক তাহা আর পাইবা না, তাহার মধ্যে যে বিদ্যালাভ করিবা তাহাই থাকিবেক এবং ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মনের সুখ প্রদান করিবেক। ইহা না করিয়া বস্তুপি সময় ক্ষতি কর, তবে পশ্চাৎ নিরর্থক খেদ করিতে হইবেক। কল মাত্র আলস্য করিবা না। এমের সময় পরম, পরমের সময় শ্রম করিলে সে শ্রম কদাচ সফল হইতে পারে না: অতএব তাহার যাহা লিখিতেছি, তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিবা।

প্রত্যহ চারিও রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া পরমেশ্বরকে ভক্তিপূর্বক স্মরণ মনন করণ অনন্তর প্রাতঃকর্মে প্রবৃত্তি, অনন্তরকর্মে নিবৃত্তি প্রার্থনা করিয়া, শৌচাদি ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্বের পাঠ অভ্যাস আবৃত্তি করিবা। তদুপরে দুই জনে বিদ্যানুশীলন, অর্থাৎ উভয়ে পঠিত পাঠ উভয়ে জিজ্ঞাসা করিবা। তদনন্তর অধ্যাপকের নিকট হইতে পাঠ লইয়া আসিয়া, স্নানাহ্নিক ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবা। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে দুইজনে ভ্রমণ করিতে যাইবা সর্বক্ষণ ঐ স্থানের কথা কহিবা, ইহাতে লঙ্ঘা করিলে জীবনার্থে লঙ্ঘা পাইতে হইবেক। অনন্তরে বাটীতে আসিয়া প্রাতঃকালের দিবসের পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবা। আমার নিজ মত করিয়া পাঠাভ্যাস বিলক্ষণরূপে করিবা পুস্তকের শেষ প্রহর রাত্রি পর্যন্ত লিখিবা, ভোজনাদি করিয়া শয়নে চলিয়া যাইবা ঈশ্বর প্রণাম পূর্বক শয়ন করিবা। প্রাতে কর্ম ঈশ্বর স্মরণ পূর্বক করিবা: আপন কর্তব্যাবধান কোন দিকে নাই, এমত বুঝিয়া মনিবা চেষ্টায় তৎপর হইবা। পাঠাভ্যাস এবং পত্রাদ্যভ্যাস বিলক্ষণ রূপে করিতে হইবেক। অগ্রে গ্রামার কণ্ঠস্থ করিয়া পড়িবা, তদনন্তর অন্য পুস্তকারম্ভ। যে পাঠ যে দিবস লইবা, তাহার অংশতঃ গ্রহণ উত্তমরূপে যাবৎ না হইবেক তাবৎ নিশ্চিন্ত হইবা না। যে সকল কথা অজ্ঞান করিবা তাহার অর্থ এবং উচ্চারণ ভদ্র রূপে মনে রাখিবা। পূর্ব পাঠ আবৃত্তিকালে স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিবা। এ প্রকার করিলে যাহা পড়িবা তাহা বিলক্ষণরূপে হইবেক।

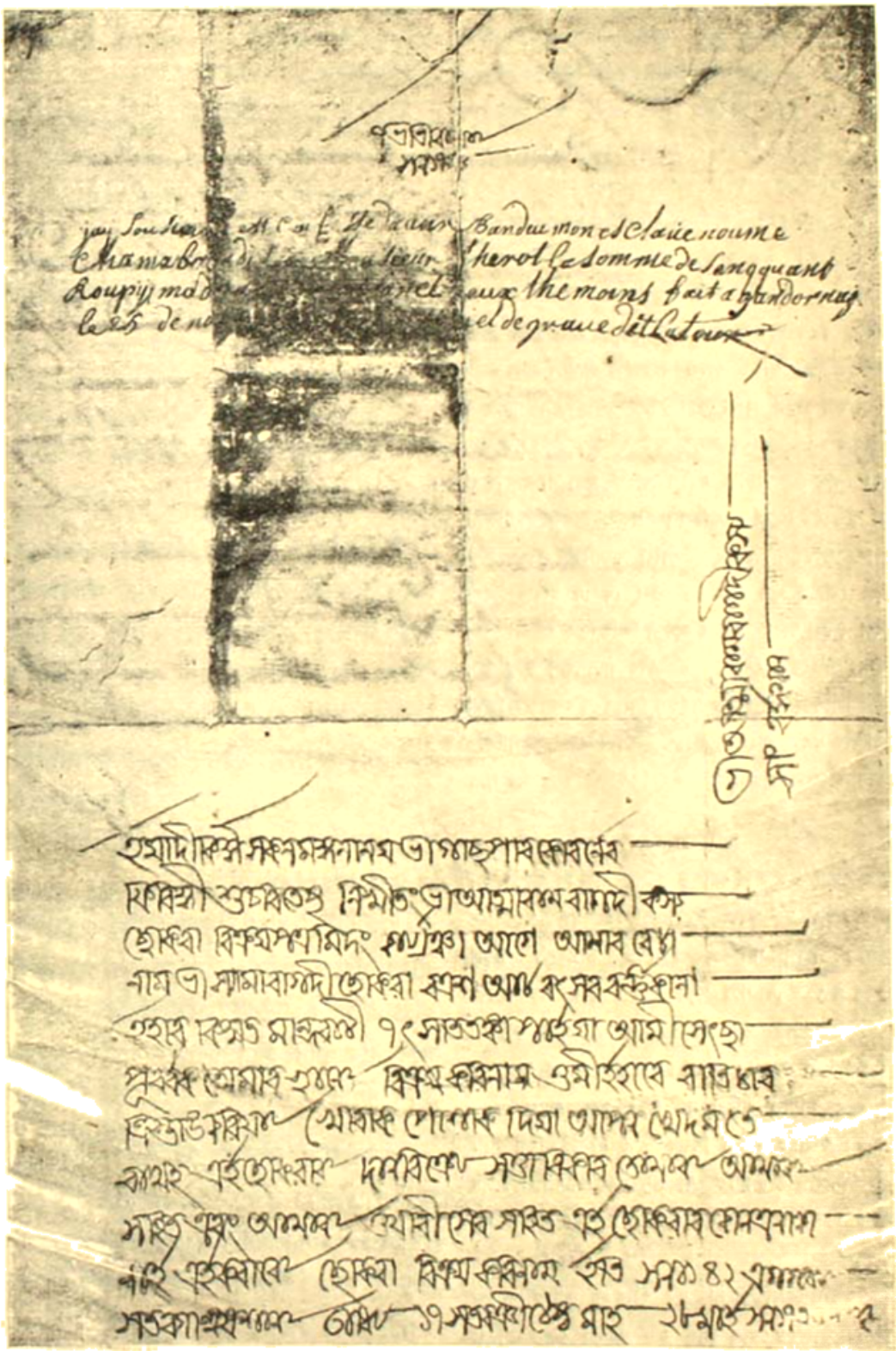

আমাদিগের দেশে অনেক দুরবস্থার আছে; তাহার মধ্যে বেহেলা অতি নিকৃষ্টের এবং তোমাদিগকে এখনে জানাইয়া তোমা তাহা লিখিতেছি। বিদ্যা কথা কদাচ কহিবা না। দুর্লাকা অর্থাৎ পাতড়া, বৌরা, কিম্ ইত্যাদি করিয়া কোন ব্যক্তিকে পরিহাস, এবং আপন কথা লাঘব জানিয়া নিমিত্ত অথবা অন্য হেতু পরিহাস করিবা না। অনেকে আমারি বিদ্যা গর্ব্বিতা করিয়া থাকে: কেহ তাহার অর্থ জানে না, কেহবা জানিয়া অন্যায় দোষ প্রযুক্ত তাপ করিতে পারে না। ইহার অর্থ—না হয়, ইহা হইতে অন্য বিদ্যা অধিক আর নাই। অতএব ইহা এবং অন্য অন্য লাঘব বিদ্যা অর্থাৎ-পালা ছেড়া ইত্যাদি, অতি যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবা। এখনে হইতে যে যে লোক স্বদেশে এবং স্বদেশ, তাহাদিগের নিকট পত্রপ্রেরণ মধ্যে মধ্যে করিবা, সর্ব্বদা করিবার এইরূপে সময় নহে। নিজে যে যে কর্ম্ম করিবা এখনে পরে কালে তাহার সবিশেষ বিবেচনা করিবে, তাহার মধ্যে যে যে অসৎ কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পত্র বিষয় করিবে না। যাহারা সমুদায় সর্ব্বদা কহিবে, তারা না জান তাহা কোন বিজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবা। একখানা ছাপায় বাঙ্গলা অভিধান ক্রয় করিবা: তাহাতে সর্ব্বদা ব্যবহারের যাবৎ কথা আছে, তাহা দেখিয়া পত্র লিখিবা; এবং যে যে ইংরাজী কথা অর্থ লিখিয়া শিক্ষা করিবা তাহার অর্থ ঐ অভিধানে দেখিয়া শুদ্ধ করিয়া কথায় ব্যবহার লিখিবা। এ প্রকার মনোযোগ কিছু দিন করিলেই অনায়াসে শুদ্ধ লিখিতে পারিবা। যে যে কথাতে স কিম্বা ষ হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত অভিধানে দেখিলে জানিতে পারিবা কোন স, কোন ষ এবং হ্রস্ব কি দীর্ঘ ইহাকে তদনুসারে পত্র লিখিবা।

বিশেষ কালে জন্ম গ্রহণ হইলেই বিশেষ লোক হয় এমত নয়: বিশেষ যারা তাহাকে অবশ্য শিক্ষা করিতে হয়, তবে সে ব্যক্তি বিশেষ। সর্ব্বদা পরিশ্রমিত, কাহারও উপরোধে পড়িয়া অধিক ভোজন এবং অসৎ পথে গমন করিবা না। সৎ পরামর্শ যে ব্যক্তি দান তাহাকে তাহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবা। গুরুজনকে ভয় এবং সম্মান করিবা। দুর্লাকা আপন মৃত্যুকেও কহিবা না এবং আঘাত করিবা না, কৃত্য অন্য হইলে তাহা সমোচিত হও। কাহারও সহিত বিবাদ এবং ঘটনা করিবা না। সংসারের মধ্যে সৌহার্দ্দ অতি দুর্লভ এবং অমূল্য বস্তু জানিয়া, সকলের সহিত সুব্যবহার করিবা। কোন লোকের অপমান করিবা না, কিন্তু সদা বিবেচনা করিয়া প্রশ্ন করিবা। স্ত্রীলোকের প্রতি ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টিপাত করিবা না, যদি হঠাৎ হয় তবে তখনি চক্ষু ফিরাইয়া লইবা। কাহারও কোন ভাল দ্রব্য দেখিয়া লোভ করিবা না, এবং লোভ যত সম্বরণ করিবা তত অধিক সুখভোগ হইবেক, ইহা নিশ্চিত জানিবা। বস্ত্র এবং পরিধান করিবা না যাহাতে কিরকম লোক কহেন অমুক অনুচিত বস্ত্র পরিধান: না এমত বস্ত্র পরিধা যাহাতে লোকে কহে অমুক বড় ধনী বাবু পরে। মলিন বস্ত্র কদাচ পরিবা না, মোটা হইলে কিছু ক্ষতি নাই, সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবা।

আমি যে যে কথা লিখিলাম, ইহা যদ্যপি প্রতিপালন কর, তবে তোমরা পরম সুখে থাকিবা, এবং আমি সুতরাং পরম সুখী হইব। যদি না কর, তবে আমি কি পর্য্যন্ত অসুখী এবং তোমাদিগের প্রতি কুপিত হইব তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করণের বিষয় নহে। মধ্যে মধ্যে ভাগি বসিবার পাইবা, সেই অবকাশে দুই জনে পৃথক পৃথক পত্র লিখিবা। প্রতি মাসে এক এক পত্র আমার নিকট পাঠাইবা, আমিও তাহার উত্তর লিখিব, এবং ঈশ্বর কৃপায় যদি ইংরাজীতে পত্র লিখিতে পার, তবে অবিশ্যি সেই ভাষায় তাহার উত্তর তখন লিখিব। সে দিন হইলে কি পর্য্যন্ত সুখ হইবে তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। যদি অবহেলা কর তবে অসুখ হইবেক। এই জন্য এই পর্য্যন্ত, বিজ্ঞাপন ইতি ১৮ মাঘ ১২২৮।

উপরি উদ্ধৃত পত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে গদ্যের রূপ কোন ব্যক্তি বিশেষের দেওয়া নহে। কাহাকেও যদি বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা বলিয়া ঘোষণা করা যায় তাহা নিরর্থক। বাঙ্গালা গদ্যের যুগবিভাগেরও এখন সময় হয় নাই। হাটে বাজারে, গৃহকার্য্যে, বাকবিতণ্ডায় যে বাঙ্গালা গদ্য কার্য্যগতিকে গঠন পরিগ্রহ করিতেছিল—তাহাই বাঙ্গালা লিখিত গদ্যের ভিত্তি; সেই ভিত্তির উপর লেখক তাঁহার রুচি ও পাণ্ডিত্যের যে ছাপ দিতেছিলেন, তাহা তাঁহারই গদ্য, কোন যুগের গদ্য নহে। যে গদ্যে মানুষ "quarrels or drives bargains, or makes love" তাহাই তাহার ভিত্তি, সেই ভিত্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে অন্বেষণ বড় সহজ নহে, কিন্তু করিতেই হইবে। সেই দিকে যদি কিছু সহায়তা হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি নিম্নে দুইখানি হস্তলিখিত দলিলের অনুলিপি দিলাম।

প্রথম খানি, চন্দননগরে ফরাসি কোম্পানীর দালাল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বহস্তলিখিত একরার পত্র। এই পত্রের তারিখ ১১০৯ সন অর্থাৎ ইংরেজী ১৭০২ সাল। পোর্টুগীজ মিশনারী লিখিত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" (১৭৪৩) পুস্তকের এগার বৎসর পূর্ব্বের কথা। দ্বিতীয় দলিলখানির তারিখ ১১৪২, অর্থাৎ ইংরেজী ১৭০৫, সেও উক্ত পুস্তকের আট বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

[১]

শ্রীশ্রী নারায়ণ পরম করুণেষুমিদং আগে কোম্পানিতে কাপড় খাওয়া হইবেক তাহাতে যদি লোকসান থাকে কিম্বা ভেরা থাকে কিম্বা বাখারে বদলা হইতে ঘাটী হয় কিম্বা ফরকে কমি হয় এবং উকসান যদি ঘাটী হয় তবে আমি জমায় করিব এই কারণ করিলাম ইতি সন ১১৪৯ সন...এগার শত উনচল্লিশ তারিখ ১২ই ...কিন্তু এখানে খাড়া করণের আর আমার নাই মিছি মোটা যদি বেকোনে তাহার সহিত আমার এলাকা নাই এই কারণ করিলাম ইতি

[২]

৺শ্রীশ্রীরাম

সন ১১৪৯

ইমারীবিষ্ণ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযাদুপায় কোম্পানি কিরিঙ্গী গুরুজিতেষু বিনীত: শ্রীমায়ারাম বাসুদীকস্য লোকমা বিক্রয় পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমার বেটা নাম শ্রীলালা বাসুদী লোকমা বয়েস আট বৎসর বর্ণ কালা উহারে কিন্তুত মাঝেরাখী ৭, সাতচল্লা পাইয়া আমি সেবা পূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমী উহারে বাটিয়ার কিম্বাতে করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই লোকমার দাম দিক্রের দস্তাবিকায় তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীশের সহিত এই লোকমার কোন এলাকা নাই এই কারণে লোকমা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগারো শত বাহান্ন পাল তারিখ ১৭ মহরকী মোট মাহ ২৮ মাই সন ১৭৩৫ সাল।

এই দাসখৎখানি সম্বন্ধে আমি "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রের ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মলুয়া

[ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড] —শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সাত ভাই টানে দাঁড় বোন ধরে হাল,
উড়ে চলে ছিপখান ; ফুলের জাঙ্গাল,
ফুলের জাঙ্গাল ভাঙ্গে, খাগড়ার বন ;
সাত ভাই দাঁড়ে বসে' হালে বসে' বোন।
হালে বসে' ফিরে চায়, 'কেন কিসে চাও ?'
সভয়ে মলুয়া বলে 'কাজিটার নাও।'
'টান্ জোরে হাঁইরো রে জোরে ফেল্ দাঁড়,
আরো জোরে হাঁইরো রে' ; বিলের বাহার,
বিলের বাহার যত কুমুদের কুঁড়ি
চাপা দিয়ে চলে নাও ; ভয়ে যায় উড়ি,
ডাহুক উড়িয়া যায় চাপা-পড়া হাঁস ;
দুধারে দুইয়া পড়ে কমলের রাশ ;
কমলের রাশি আর খাগড়ার বন,
সাত ভাই দাঁড় টানে, হালে বসে বোন।
'এই যদি মনে ছিল আরে শয়তানী,
তবে কি শিকারে আসি আগে যদি জানি।
আগে যদি জানি তোর মনে এত বিষ,
তীরের ফলার চেয়ে মনে বেশি বিঁধ।
হেসে বলেছিলি তুই, কাল হবে বিয়ে,
আজ চল, ফিরে আসি শিকারেতে গিয়ে।
বাহবা নিশানা তোর আচ্ছা ডাহুক,
এ ফোঁড় ও ফোঁড় মোর করেছিস বুক।'
এত বলি টানে কাজী বুক হ'তে তীর
ঝলকে ঝলকে পড়ে রক্তের রুধির।
'ডাহুক শিকারে এনে বলায়ের বিলে
লুটে নিয়ে গেল তোরে সাত ভাই মিলে।
গোপনে খবর দিলি আরে শয়তানী
মনে মুখে এত ভেদ আগে যদি জানি !
খাদা দাঁড়, ছাড় হাল, পলাতক ওরা,
বুক হ'তে টেনে তোল হীরখানা তোরা।'
ওপারে ডুবিছে রবি বিষ্ণুবিলীন,
এপারে হাঁসের দল হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
ধাপে ধাপে স্বর তুলে ডাকে উৎক্রোশ
পলাতক তরীখান গেছে বহু ক্রোশ।
হাতে নিয়ে বেঁধা তীর তাকায়ে ফলায়
'নিজেরে দেখিনু আজি বন-আয়নায়।
জানি জানি পাপ এটা সকলেই মানে,
নারীর হাসির দাম কয় জনে জানে।
জীবনের বাটখারা একদিকে তার
বেহস্ত ধরণী এনে রাখো আমার,
হারুণল রসিদের রাখো সব ধন,
আর দিকে রাখো শুধু যুবতীর মন।
ছিঃ ছিঃ পাপ, ডাকে যম জোহাই খোদার।
পারিনা ভুলিতে তবু হাসিখানি তার।
'হাতে ধরে নিয়ো তুমি হায় ভগবান,
আহা কি ভালিমফাটা তার হাসিখান্ !
করে যে নমাজ-মুখ'—ভাবিল সবাই
সুবুদ্ধি হয়েছে তবু আল্লা জোহাই।
'ওই পথে গিয়েছিস আরে শয়তানী
সেই পথে যাক্ প্রাণ আগে যদি জানি।'
চলিয়া পড়িল কাজী বুকে গুঁজে তীর,
পাপ ভয়ে হিম হ'ল সবার শরীর॥

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তি-কাহিনী

ফ্রান্সের উপকূল ছাড়িয়ে, কতকগুলি জলমগ্ন পাহাড়ের সামনে একটি আলোক-স্তম্ভ আছে। সেই আলোক-স্তম্ভের আলোয় সমুদ্রগামী জাহাজেরা পর্ব্বতময় উপকূল এড়িয়ে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করে।

আলোক-স্তম্ভটির কাছে গেলে দেখতে পাবে, তার পাষাণ গায়ে, শুধু দুটি নাম লেখা আছে, এণ্ড্রু ডুক্লো, ষোল বৎসর বয়স এবং মার্থা ডুক্লো, চোদ্দ বছর বয়স। আর কোথাও মানুষের স্পর্শের কোন চিহ্ন নেই। অগাধ সমুদ্রে অবিরাম শব্দ উঠছে জলের।

আলোক-স্তম্ভে কেউ থাকে না। থাকবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলো আপনা থেকেই যাতে জ্বলে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাসে শুধু একদিন নৌকা করে গিয়ে যন্ত্রটি দেখে আসতে হয়, কারবাইড ফুরিয়ে গেলে কারবাইড দিয়ে আসতে হয়। সারা বছর ধরে দিবা-রাত্র সেই আলো জ্বলে। সেই আলো জ্বলে বলে, বিস্তৃ-বিপুল সেই উপকূল এড়িয়ে জাহাজরা নির্ব্বিঘ্নপথে চলে যায়।

একদিন এক ঝড়ের রাতে সহসা আলো নিভে গেল। হয়ত ঝড়ে বা তুষারে যন্ত্র আবৃত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিনের পরিচিত আলো সহসা নিভে যাওয়া মানে, সমুদ্র-পথে আজ এই ঝড়ের রাত্রিতে যে-কোনও বিপদ হতে পারে।

যাঁর উপর সেই আলোক-স্তম্ভ পর্য্যবেক্ষণ করার ভার ছিল, তিনি সেদিন গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন। ঘরে ছিল তাঁর দুটি ছেলে-মেয়ে। ছেলেটির নাম এণ্ড্রু ডুক্লো, ষোল বছর বয়স—মেয়েটির নাম মার্থা ডুক্লো, চোদ্দ বছর বয়স। বহুবার তারা দুজনে বাবার সঙ্গে আলোক-স্তম্ভে গিয়েছে। জেনেছে, অগাধ সমুদ্রে যারা চলা-ফেরা করে এই আলোটুকুই তাদের প্রাণ।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠল। আলো আর জ্বলে না। কাউকে কিছু না বলে তারা দুই ভাই-বোন সেই ঝড়ের রাতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তীরে নাবিকরা কেউ নেই—ঝড় দেখে সবাই পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকারের মধ্যে দুই ভাই-বোন অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ীতে হঠাৎ খোঁজ পড়ায় যখন দেখা গেল যে তাদের শয্যা শূন্য, ঘাটে নৌকাও নেই, তখন লোকে আলো নিয়ে, নৌকা নিয়ে তাদের খুঁজতে বেরুল। তখন প্রবল বেগে তুফান উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে তারা দেখল যে, নিভে-যাওয়া আলোক-স্তম্ভের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল।

সারা-রাত ধরে বৃথাই তারা দুই ভাই-বোনকে খুঁজে ফিরল। ভাই-বোনের নৌকা আর তীরে ফিরল না!

হাতী

জগতে যত প্রাণী আছে, তিমি মাছ হল সকলের চেয়ে বড়। সে এত ভারী যে, মাটীর উপর বিচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতী হল সব চেয়ে বড়। আফ্রিকা দেশের একটা হাতীর ওজন প্রায় সাড়ে ছ' টন এবং উঁচুতে প্রায় বার ফুট পর্য্যন্ত হয়।

আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে, এই দুই দেশে হাতী পাওয়া যায়। কিন্তু আফ্রিকার হাতীর সঙ্গে ভারতবর্ষের হাতীর অনেক তফাৎ আছে। আফ্রিকার হাতীর কান দুটো আমাদের দেশের হাতীর কানের চেয়ে ঢের বড়। যখনই কোনও বিপদের সম্ভাবনা তারা শুনতে পায়, তখনই কান দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয় দুদিকে দুটো বড় কুলো কে যেন বেঁধে দিয়েছে। তা না হলে, কান দু'টো কাঁধের উপর ফেলে রাখে—সমস্ত কাঁধটা তাতে ঢাকা পড়ে যায়। আফ্রিকার হাতীদের মাথা আরও একটু গোল, চোখ দুটো আরও একটু বড়। হাতীর শুঁড়ের ডগায় তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, আঙুলের মত খানিকটা বেরিয়ে থাকে। আফ্রিকার হাতীর শুঁড়ের ডগায় দুদিকে এই রকম দুটো আঙুল থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের হাতী সেই জায়গায় মাত্র একটা আঙুল থাকে। তারপর, তাদের শুঁড়ের গঠনেরও তফাৎ আছে। আফ্রিকার হাতীর শুঁড়ের উপর দিকটা দেখতে খাঁজ কাটা কাটা, মনে হয় চাপ দিয়ে থাকের পর থাক

বসিয়ে দেওয়া যায়। আফ্রিকার হাতীর গায়ের রঙ আরও একটু ঘন, গজ-দাঁত আরও একটু বড় এবং পেছনের পায়ে ৎ

হাতী : আফ্রিকার ও ভারতীয়।

চারটের বদলে তিনটে নখ থাকে। বৃটীশ মিউজিয়ামে আফ্রিকা দেশের একটা হাতীর দাঁত আছে, সেটা লম্বায় ১০ ফিট ২ ইঞ্চি এবং তার ওজন হচ্ছে ২২৮ পাউণ্ড। আফ্রিকার হাতীর সব চেয়ে বড় গজ-দাঁত যা দেখা গিয়েছে সেটা লম্বায় এক ইঞ্চি কম ১২ ফিট।

আমাদের দেশে কোন লোককে বিশেষ বোকা বলতে হলে সাধারণতঃ হস্তীমূর্খ বলা হয়, কিন্তু কেন যে বোকা লোককে হাতীর সঙ্গে তুলনা করা হয় বলতে পারি না; কারণ হাতীর চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী জগতে খুব কমই আছে। এক শ্রেণীর বানর ছাড়া বন্য জীবজন্তুর মধ্যে এত বড় বুদ্ধিমান প্রাণী সমস্ত অরণ্য-জগতে নেই। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, হাতীর মস্তিষ্কের গঠন অপূর্ব। পুরাকালে জগতে বহু অতিকায় জন্তু ঘুরে বেড়াত, কিন্তু আজ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কারণ তাদের দেহের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্ক বেড়ে ওঠে নি। কিন্তু হাতীর দেহ যেমন বেড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে তার মস্তিষ্কও তেমনি বেড়ে উঠেছে। সেইজন্যে অত বড় বৃহৎ দেহ নিয়ে সে আজও টিঁকে আছে।

প্রথম হাতীর আবির্ভাব হয়েছিল কবে, সে কথা ঠিক করে বলা যায় না। তবে খুব প্রাচীন যুগে মানুষ যখন সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে আসে, তখন তার সব চেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই হাতী। হাজার হাজার বছর আগেকার জগতের আদিম অধিবাসীদের আঁকা যে-সব ছবি পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে হাতীর একটি আশ্চর্য ছবি আছে। স্পেনে পিন্‌ডাল গুহায় এই ছবিটি পাথরের গায়ে আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। আদিম চিত্রকর হরিণের টেক্কার মত একটা জিনিস এঁকে জন্তুর অবস্থান বুঝিয়েছেন। ছবিটার বিশেষত্ব হল এই যে, সেই অজন্তা আদিম চিত্রকর যে জায়গাটাকে জন্তুর অবস্থান-ক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছেন, আধুনিক দেহ-বিজ্ঞান অনুসারে ঠিক

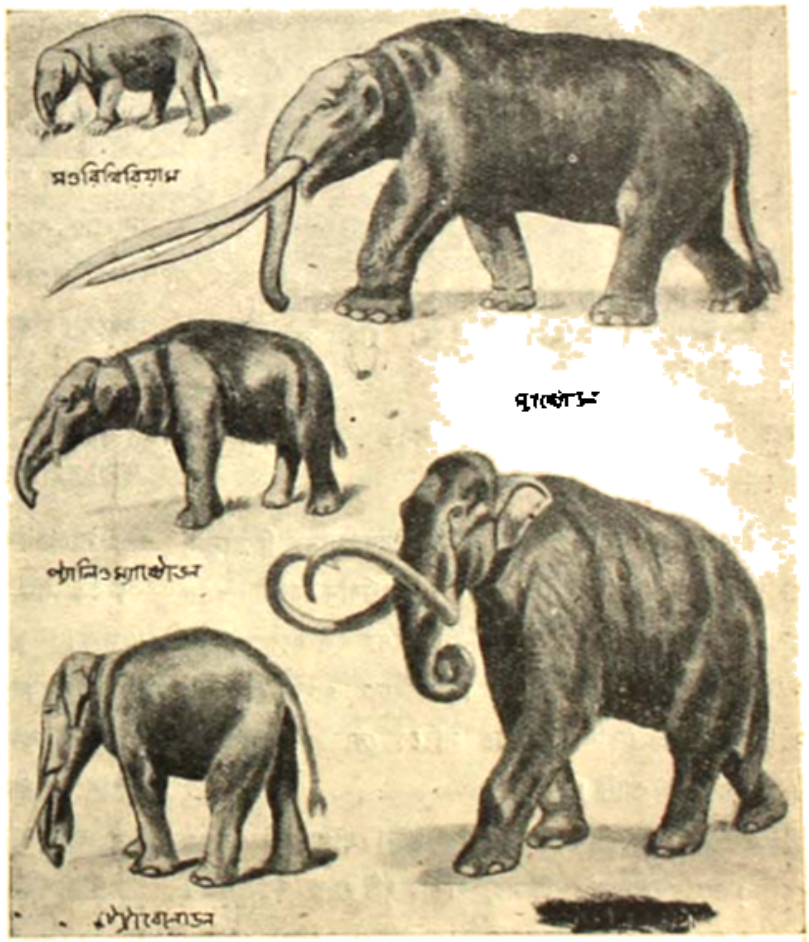

হাতীর ক্রমবিকাশ :- প্রথমে ছিল উপরে। ঐ শূকরের আকারের মত—তারপর ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপ।

সেইখানেই জন্তুদের অবস্থান হয়। আদিম মানুষকে খানি অন্তরঙ্গ ভাবে এবং প্রথম প্রাগৈতিহাসিক যুগের মিশতে

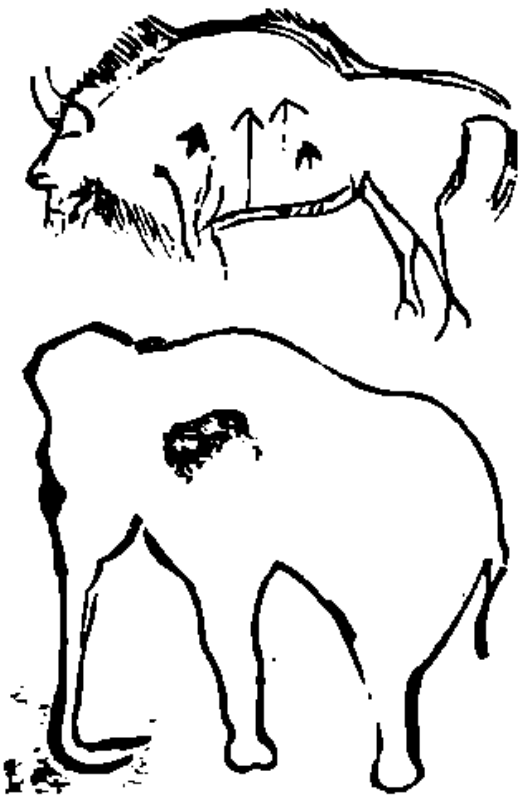

লোমের পিণ্ডাল ওয়ালা প্রাগৈতিহাসিক মানবের খোদিত হাতী। উপরে কপায় একটি ওভাল খোদিত রাইসন। হাতীর শুঁড় হয়-অবয়ব চিত্রের আকারে রূপায়িত।

হয়েছিল যে, তার নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত তার জানা হয়ে গিয়েছিল।

বৈজ্ঞানিকরা হাতীর আদিম-পুরুষদের নাম দিয়েছেন, মেরিথিরিয়াম্ (Moeritherium), বর্তমান হাতী আর মেরিথিরিয়াম্-এর মধ্যে আরও তিন রকমের জন্তু জন্মেছে এবং মরেছে—তারপর এসেছে হাতী। ছবিতে এদের চেহারার সাদৃশ্য দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, এরা সকলেই একই বংশের প্রাণী।

এত বড় জন্তু, কিন্তু তার চোখ দুটো দেখেছ কি রকম ছোট! শুধু দেখতে ছোট নয়, হাতীর দৃষ্টি-শক্তি বড় কম। পঞ্চাশ গজের ওধারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে, হাতী দেখতে পায় না—সেইজন্যে বন্য হাতীর খুব কাছে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ফটো তোলা যায়। তবে আর একটা কথা আছে। হাতীর দৃষ্টিশক্তি যেমন অদ্ভুত রকমের কম, তার শ্রবণ এবং ঘ্রাণ-শক্তি কিন্তু তেমনি অদ্ভুত রকমের বেশী। আধমাইল দূরে যদি মানুষ থাকে, তাহলে বাতাসে গন্ধ শুঁকে এরা তা বুঝতে পারে। সেইজন্যে যেদিক থেকে হাওয়া বইছে, তার উল্টো দিক থেকে কোন লোক যদি একদল হাতীর একেবারে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু যেদিক দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, সেদিক দিয়ে লুকিয়ে আসবার জো নেই। হাওয়ায় মানুষের দেহের গন্ধে তারা বুঝতে পারবে সামনে মানুষ আছে। শ্রবণ-শক্তিও এদের খুব তীক্ষ্ণ। দূরে কোথাও বিপদের সম্ভাবনা হলে, বহু পূর্বে এরা তার সংবাদ শুনতে পায়। কুলোর মত দুটো কান খাড়া করে বহুদূরের আওয়াজ এরা অনায়াসে শোনে।

হাতীর চেহারা দেখলেই মনে হয় যে, এর দ্বারা বুঝি কোন কাজ করান অসম্ভব। কিন্তু দেখতে ভারী হলে হবে কি, হাতীর অনেক গুণ। ঐ বিরাট দেহ নিয়ে হাতী অনায়াসে জলে সাঁতার দিয়ে চলে যেতে পারে; আবার থামের মত পা নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় অনায়াসে উঁচু পাহাড় বেয়ে চলে যায়। পাহাড়ের যে-সব চালু জায়গা দিয়ে মানুষও নামতে সাহস করে না, সেই সব জায়গা দিয়ে বিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারের মত মেপে মেপে পা ফেলে সে অনায়াসে চলে আসে। হাতী যখন দলবদ্ধ হয়ে এক বন থেকে আর এক বনে যাতায়াত করে, তখন তাদের দলের গতি-ছন্দের সঙ্গে সৈন্যদের যাত্রার কোনও তফাৎ থাকে না—এতখানি শৃঙ্খলা তারা বজায় রাখতে পারে।

সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় তারা জলে খেলা করতে বেরোয়। বড় বড় শিকারীরা বলেন যে, সে দৃশ্য সত্যিই দেখবার মত জিনিষ। দলবদ্ধ হয়ে তারা নিকটস্থ জলাশয়ের দিকে যাত্রা করে—একেবারে নীরবে। একশোটা হাতী আসছে কিন্তু কোথাও শব্দ নেই। এমনি নীরবে তারা চলতে পারে। জলাশয়ের কাছে একটা নিরাপদ জায়গায় প্রথমে সকলে জিরে জড় হয়, তারপর একজনকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—আশেপাশে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না দেখবার জন্যে। সে দল ছেড়ে একলা অতি সন্তর্পণে কান খাড়া করে জলাশয়ের ধারে আসে এবং যদি বোঝে যে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই, তখন চীৎকার করে আসবার জন্যে ইঙ্গিত

করে। বনের মধ্য থেকে সেই ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর আসে। তারপর তারা সকলে এসে জলে নামে।

এই চীৎকারের সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে হাতীরা বিরাট বনের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করে। বনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যান্ত ডাক পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তাদের আছে। যখন বনের সমস্ত হাতী এক জায়গায় দলবদ্ধ হতে চায়, তখন এই ডাকের ইঙ্গিতে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূরদূরান্তর থেকে ঠিক এক জায়গায় এসে জড় হয়।

শেখান হাতীকে দিয়ে মানুষ অনেক কসরৎ দেখাতে পারে। হাতীর খেলা সার্কাসের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় হাতীরা নিজেদের মধ্যে যে-সব কসরৎ করে, তাও কম অদ্ভুত নয়। স্যার এডওয়ার্ড টেনাণ্ট একবার সিংহলে হাতী শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে একটা শুণ্ডা হাতীর দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। এই শুণ্ডা হাতীর পরিচয় তোমাদের পরে বলছি। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাছ পেয়ে স্যার এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি কোন রকমে গাছে উঠে পড়ে সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন। কিন্তু দেখেন, হাতীটা অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। শুঁড় দিয়ে গাছটাকে উপড়ে ফেলবার বার বার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হল, তখন হঠাৎ দেখে, সামনে অনেকগুলো কাঠ পড়ে আছে। শুঁড়ে করে একটার পর একটা কাঠ সাজিয়ে একটা উঁচু বেদী তৈরী করে, সামনের দুটো পায়ের উপর ভর দিয়ে উপরের বড় ডালটা ধরবার জন্যে শুঁড় এগিয়ে দিল। স্যার এডওয়ার্ডের হাতে বন্দুক না থাকলে সে যাত্রা আর তাঁর রক্ষা ছিল না। গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে হাতীটা পড়ে গেল।

যদিও হাতী পোষ মানে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার আদিম শত্রুতার এখনও অবসান ঘটে নি। আফ্রিকার যে-অঞ্চলে বেশী হাতী থাকে, সে-অঞ্চলের লোকের সর্ব্বদাই আতঙ্কে দিন কাটে। শস্য-ক্ষেতে ফসল পেকে উঠেছে—এমন সময় কোথা থেকে একদল হাতী এসে সমস্ত ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে গেল। যা খাবার তা খেয়ে, অবশিষ্ট যা পড়ে রইল, তা সমস্ত নষ্ট করে দিয়ে তারা চলে যায়। সামনে যদি চাষাদের ঘর থাকে সেটিকে পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ করে দিয়ে যায়। হাতীর পায়ের তলার গঠনের জন্যে খুব নীরবে সে চলতে পারে। ক্ষেতে হয়ত আপন মনে চাষী কাজ করছে কখন নীরবে পেছন দিক থেকে এসে পিঠে গজ-দাঁত বসিয়ে দিয়েছে—বোঝবারও সময় পাওয়া যায় না। রোডেসিয়াতে জঙ্গল কেটে যখন রেল-লাইন বসান হয়, তখন এই হাতীর উৎপাতে কাজ একরকম বন্ধ

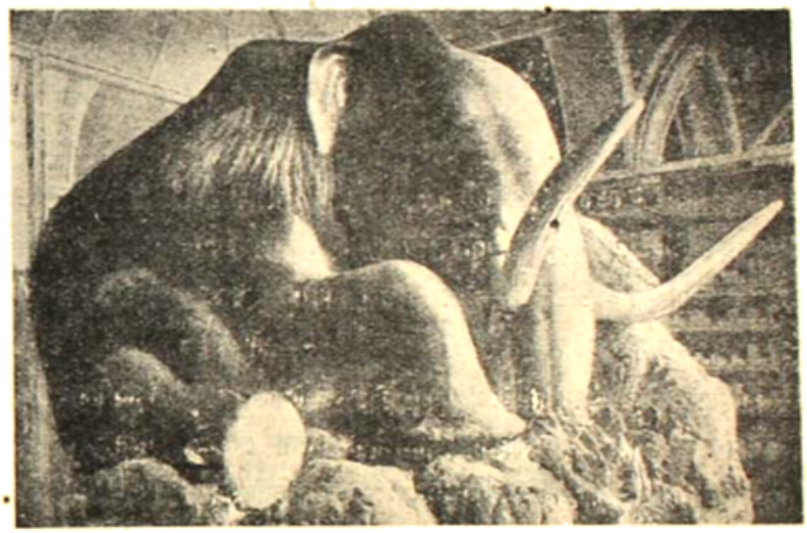

চিরুহিব সাইবেরিয়ার প্রাপ্ত অরিকার হাতী—বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে রক্ষিত।

করে দিতে হয়েছিল। সাধারণভাবে সেখানে হুকুম জারী করে দেওয়া হয় যে, হাতী দেখলেই যেন লোকে মেরে ফেলে।

সাধারণতঃ এই তো হল, এদের চরিত্র। তার উপর এদের দলে প্রায়ই একজন করে শুণ্ডা হাতী থাকে। বদমায়েস গুণ্ডাদের মত এরা প্রায়ই একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। এই শুণ্ডা হাতীর মত ভয়ঙ্কর জীব সমস্ত অরণ্য-জগতে নেই বল্লেই চলে। তার সামনে পড়লে, কি মানুষ, কি জন্তু, কারুরই রক্ষা নেই।

হাতীর অত্যাচারে অস্থির হয়ে মাঝে মাঝে আফ্রিকাতে হাতী বধ করবার জন্য রীতিমত হুকুমজারী করা হয়। কিন্তু তার ফলে দেখা গেল যে, আফ্রিকাতে হাতীর সংখ্যা ক্রমশঃ এমন ভাবে কমে আসছে যে, তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সেই জন্যে অনেকে বলছেন যে, এত বড় শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান প্রাণী যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে

সেটা মানুষের পক্ষে চরম ক্ষতিকর হবে। ঘোড়া, গরুর মত হাতীকে পোষ মানিয়ে মানুষের কাজে লাগান যায় না কি?

তোমরা হয়ত জান না যে, হাতীকে শিক্ষা দেবার জন্যে বেলজিয়ান কঙ্গোতে একটি কলেজ খোলা হয়েছে। সেখানে মানুষের নানারকম দরকারী কাজ সম্বন্ধে হাতীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বুনো হাতীকে মানুষ করতে হলে, মানুষের মত তাকে ভালবাসতে হয়। একান্ত সহজ ব্যবহার না পেলে হাতী কিছুতেই বশ মানে না। কিন্তু যখন বশ মানে, যার হাত দিয়ে সে স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা পায়, তাকে বহু বর্ষ ধরে স্মরণে রাখে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের একটা হাতী একবার বনে পালিয়ে যায়। হেষ্টিংস্ মনে করেন যে, মাহুতই বোধ হয় গোপনে হাতীটাকে খেপিয়েছে। তিনি মাহুতকে কঠোর শাস্তি দেন। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে, একদিন সেই মাহুতকে নিয়ে বনে শিকার করতে গিয়ে, দৈবক্রমে সেই পালিয়ে-যাওয়া হাতীটার সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। সঙ্কেত করতেই প্রত্যেক সঙ্কেতটির সে উত্তর দিল এবং আপনা থেকে মাহুতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বহুদিনের অদর্শনের পর অভিবাদন জানাল। পুরাকালে আমাদের বাংলা দেশে হাতীকে শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। হস্তী-চিকিৎসা বলে আমাদের দেশে একটা বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী ছিল। পালকাপ্য বলে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে বই লেখেন। সে বই এখনও প্রচলিত আছে।

হাতীর চরিত্রের একটা দিক অবিকল মানুষের মত। মানুষের মত সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ, মানুষের মত সে ঈর্ষান্বিত হয়, মানুষেরই মত মমতাশীল সেও হতে পারে। বহু মাহুতের পরিবারে শিশু-পুত্রদের সে-ই রক্ষক এবং পরিচারক। সেই অতিকায় জন্তুর কাছে মানবী মাতা নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে শিশু-সন্তানটিকে রেখে কাজ করতে যায়।

প্রাচীন রোমে সার্কাসের খুব প্রাধান্য ছিল। জন্তুদের দিয়ে নানারকমের কসরৎ দেখান তাদের উৎসবের অঙ্গ ছিল। রোমের এক প্রাচীন কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে, একবার এক সার্কাস-ওয়ালা ভাল খেলা দেখাতে না পারার ফলে তার হাতীর দলকে বেদম প্রহার করে। সেই দিন রাত্রিবেলায় সার্কাস-ওয়ালা নিশ্চিন্ত হয়ে দেখে যে, হাতীরা আপনার মনে দিনের বেলা যে সব কায়দা দেখাতে পারে নি, সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। হানিবল যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে আল্‌প্‌স্ পাহাড় পার হয়েছিলেন, সেই ঐতিহাসিক পর্বত-যাত্রায়, যেখানে মানুষ অপারগ হয়ে পড়ে গিয়েছিল, ৩৭টি হাতী সেইখানে তুষার মথন করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল।

আমাদের এই পৃথিবীতে আমার বহু পূর্ব্বে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং আজও পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সাইবেরিয়ার চির-তুহিনের মধ্যে লক্ষ বৎসর আগেকার কয়েকটি হাতীর পূর্ব্ব-পুরুষদের পাওয়া গিয়েছে। সেই চির-তুষারের মধ্যে বন্দী হয়ে, তারা লক্ষ বছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল, অবিকৃত অবস্থায় ঠিক তেমনি ভাবেই আজও রয়ে গিয়েছে। গায়ের লোমগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নি। দেহের কোন অংশে কোথাও বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটে নি। পেটের মধ্যে লক্ষ বছর আগেকার খাওয়া গাছের ডালটি পর্য্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। মাংস এত টাট্‌কা ছিল যে, অক্‌স্‌ফোর্ডের এক ভোজ-সভায় ডিন্ বাক্‌ল্যাণ্ড অতিথিদের সেই লক্ষ বৎসর আগেকার হাতীর মাংস রেঁধে পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন। অতিথিরা খাবার সময় কেউই এ ব্যাপার জানতেন না। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তাঁদের ঘটনাটি বলা হয়। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বল্লেন, তাজা মাংসের সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ ছিল না। লেনিনগ্রাড মিউজিয়ামে আজ এই রকম একটি হাতী সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে—যদি কোন রকমে আজ হঠাৎ তার প্রাণ ফিরে আসে!

ছেলেদের জ্ঞান-বুদ্ধি

তোমরা টলষ্টয়ের নাম নিশ্চয়ই জান। সৎপথে থেকে, সৎ-চিন্তা করে, মানুষ মহৎ ভাবে কি করে জীবনযাপন করতে পারে, তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে তিনি তাই-ই আলোচনা করে গিয়েছেন। ছেলেদের তিনি বড় ভাল বাসতেন। প্রত্যেক দেশে, শুধু কতকগুলো বই মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের যে লেখা-পড়া শেখানর ব্যবস্থা আছে তিনি তার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, আমরা ছেলেদের বুঝি না। তাদের বয়স্ক লোকদের মনের চেয়ে ঢের পবিত্র এবং তারা অনেক সময় অনেক বড় বড় জিনিস বেশ সহজ ভাবেই মনে গ্রহণ

করতে পারে। অনেক সত্য তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই জন্য তাদের লেখা-পড়া শেখান খুব সহজ ব্যাপার নয়। ছেলেদের সঙ্গে মিশে, ছেলেদের কথাবার্তা লক্ষ্য করে তিনি একখানা বই লিখেন। বইটির নাম হল, The Wisdom of Childreo—ছেলেদের জ্ঞান-বুদ্ধি। এই বইটিতে ধর্ম, যুদ্ধ, স্বদেশ, কর-প্রথা, বিচার, দয়া, শ্রম ও মূল্য, মদ্য-পান, ফাঁসি-দেওয়ার প্রথা, কারাগার, ধন-সম্পদ, প্রেস ও খবরের

সাধারণ কৃষকের বেশে টলষ্টয়।

কাগজ, কলা-শিল্প, বিজ্ঞান, মামলা-মোকদ্দমা, সম্পত্তি, শিশু এবং শিক্ষা সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েরা কি ভাবে এবং যাদের উপর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার আছে তাঁরাই বা কি ভাবে ছেলেদের সেই সব প্রশ্নের সমাধান করেন, সেগুলি ছোট ছোট কথোপকথনের ছলে তিনি দেখিয়েছেন। জগতে এই ধরণের বই বোধ হয় এই একখানি এবং এই বই একমাত্র টলষ্টয়ই লিখতে পারেন। আজকে তোমাদের জন্যে ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথনটি অনুবাদ করে দিলাম।

ধর্ম-সম্বন্ধে ছেলে ও মার কথোপকথন

ছেলে

মা, আজকে সবাই ভাল জামাকাপড় পরেছে কেন? আমাকে কেন এই সব ভাল জামা কাপড় পরিয়ে দিলে?

মা

আজ ছুটির দিন। আমরা সবাই এখন গির্জের যাব।

ছেলে

ছুটি কেন মা?

মা

আজ তাঁর আরোহণের দিন!

ছেলে

আরোহণের দিন কি মা?

মা

তিনি অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট আজ স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন।

ছেলে

সে আবার কি করে হয় মা?

মা

তিনি উড়ে স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন।

ছেলে

তাঁর বুঝি ডানা ছিল?

মা

না, তাঁর কোনও ডানা ছিল না। বিনা ডানাতেই তিনি বাতাস বেয়ে স্বর্গে উড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভগবান। তিনি ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন।

ছেলে

কিন্তু আকাশের ওপারে তিনি গেলেন কোথায়? বাবা বলেন, আকাশে কোথাও কিছু নেই—শুধু মাঝে মাঝে, অনেক দূরে দূরে, আছে সব নক্ষত্র, তারও ওপারে আছে আরও সব নক্ষত্র। তিনি তবে উড়ে কোথায় গিয়ে উঠলেন?

মা

(হেসে) তোর বয়স অল্প, সব জিনিস কি তুই এখন বুঝতে পারবি? যা শুনবি, তাই বিশ্বাস করে নিবি।

ছেলে

কার কথা বিশ্বাস করব?

মা

বড়রা যা বলবেন, তাই বিশ্বাস করবি।

ছেলে

তবে সেদিন যখন আমি বল্লাম যে,দিদিমা বলেছিল একটা লোক রাত্তির বেলায় গাছের পাতা ছুঁয়েছিল বলে মরে গেল, তুমি কেন আমাকে ধমকে উঠে বল্লে, ওসব যা-তা কথা বিশ্বাস করতে নেই ?

মা

ধমকাবইতো। তা বলে যা-তা বিশ্বাস করবি ?

ছেলে

কিন্তু আমি কি করে বুঝব, কোন্‌টে যা-তা, কোন্‌টে যা-তা নয় ?

মা

সত্যিকারের ধর্ম্মে যা বলে তাই বিশ্বাস করবি ; ধর্ম্মে যা বলে না, তা বিশ্বাস করবি না।

ছেলে

সত্যিকারের ধর্ম্ম আবার কাকে বলে ?

মা

আমাদের ধর্ম্মই হল সত্যিকারের ধর্ম্ম। (চুপি চুপি নিজের মনে) তাইত আমিই যা-তা বলতে আরম্ভ করে দিলাম দেখছি! (গলা জোর করে) যাও, এখন ওসব কথা থাক্, তোমার বাবার কি হল দেখ, গির্জ্জের সময় হয়ে গেল।

ছেলে

গির্জ্জে থেকে ফিরে এলে চকলেট দেবে তো ?

প্রবেশিকা-পরীক্ষা

আমি জানি, তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকে আছ, যাদের সামনে জীবনের দরজা বন্ধ। ছিন্ন-বাসে, ক্ষুধার্ত্ত উদরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, কেউ নেই তোমার সহায়, জানও না কোথায় আছে সহায়। তোমার সামনে দিয়ে দেখছ, তারা চলে গেল স্বর্গের মন্দিরে, খ্যাতির মন্দিরে, সৌভাগ্যের মন্দিরে, তারা চলে গেল—যাদের আছে সহায়, সম্পত্তি, সৌভাগ্য।

তোমার খালি পা, ছেঁড়া জামা, শূন্য উদর, কিন্তু তাই বলে তুমিও সহায়-সম্পত্তিহীন নও। যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাক যে, সেই দরজা পেরিয়ে তোমাকেও যেতে হবে স্বর্গের মন্দিরে, যদি সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে পার, তা হলে দেখবে কোথা থেকে তোমার সেই খালি পায়ে এসেছে অনন্ত পথ চলবার শক্তি, দেখবে সেই ছেঁড়া জামার তলায় তোমার বুকের মধ্যে গলান-সোনার মত কিসের আলো জ্বলছে, সে আলোতে অন্ধকার পথ আলো হয়ে যাবে। সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি হবে তোমার সহায়।

কিশোর বুকার টি. ওয়াশিংটন।

তুমিও জান না, তখন কোথা থেকে কেমন করে তোমার সামনে খুলে যাবে দরজা।

একটি ছেলের একবার ঠিক এই রকম দশা হয়েছিল। বোধ হয় জগতে তার চেয়ে হতভাগা খুব কম ছেলেই জন্মেছিল। তার নাম বুকার টি. ওয়াশিংটন। ক্রীতদাস নিগ্রোদের ঘরে সে জন্মেছিল। পথের কুকুর-বিড়ালরা মানুষের কাছে যে-টুকু সহানুভূতি পায়, তাও তারা পেত না। অথচ সেই ছেলেটির মনে বাসনা হল, সে শাদা-ছেলেদের মত লেখাপড়া

শিখবে, তাদের জাতের সকলকে লেখাপড়া শেখাবে। সে নিজে মানুষ হবে—তার সমস্ত জাতিকে মানুষ করে গড়ে তুলবে।

এক ক্রিশ্চান পরিবারে সে একটু আশ্রয় পেয়েছিল। মনিবের ছেলেমেয়েদের রোজ সে স্কুলে পৌঁছে দিত। স্কুলের ভিতরে ঢোকবার তার অধিকার ছিল না। স্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে সে ভাবত, এই চৌকাঠটুকু কি করে পার হওয়া যায়।

রাত্রিতে গোপনে সে লেখাপড়া করত। একদিন সে স্থির করল যে, শহরের হ্যাম্পটন স্কুলে সে ভর্তি হবে। কিন্তু কি করে ভর্তি হবে? তার কিছুই সে জানত না।

পায়ে হেঁটে সে যাত্রা করল। তখন তার মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স। পেটে অন্ন নেই, পথশ্রমে শ্রান্ত, সে স্কুলের দরজায় এসে বসে পড়ল। দেখল, ভর্তি হবার জন্যে অনেক ছেলে জমা হয়েছে। অপেক্ষা করবার ঘরের একপাশে গিয়ে সে চুপটি করে বসে রইল। দেখে, একে একে ছেলেদের পরীক্ষা করে স্কুলে ভর্তি করে নেওয়া হল। কিন্তু তাকে আর কেউ ডাকল না।

কিছুক্ষণ পরে একজন শিক্ষয়িত্রী বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই তোমার?

—আমি স্কুলে ভর্তি হতে চাই।

হেসে শিক্ষয়িত্রী বলেন—ঐ ঘরটাতে বড় ধুলো জমেছে। পরিষ্কার করে দিস্ তো খেতে পাবি।

তখুনি ঝাঁটা হাতে ছেলেটি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। তবুও তো চৌকাঠের এপারে!

কিছুক্ষণ পরে শিক্ষয়িত্রী ফিরে এসে দেখেন, সমস্ত ঘরটা যেন হাসছে। কোথাও একটি কণা ধূলা নেই।

অবাক হয়ে ওয়াশিংটনের দিকে চেয়ে শিক্ষয়িত্রী বলেন, তোমার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, আজ থেকে তুমি এই স্কুলে ভর্তি হলে।

বুকার ওয়াশিংটনের পরবর্তী জীবন বোধহয় তোমরা জান। তিনি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। যদি তাঁর জীবনী না পড়া থাকে—আজই সংগ্রহ করে পড়বে।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—নিখিলনাথ রায়

বঙ্গ জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করেন। পাণ্ডুয়ার একলাখী নামক সৌধে জালালউদ্দীন ও তাঁহার বেগম সমাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

সংস্কৃতচর্চ্চার সূত্রপাত

আমরা বলিয়াছি যে, রাজা গণেশের সময় হইতে সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। মুসলমান বিজয়ের পর হিন্দুরা গ্রন্থ রচনার অবকাশ বড় পান নাই। এক্ষণে হিন্দু-অভ্যুত্থানের সময়ে তাঁহারা ইহাতে মনোনিবেশ করেন। বৃহস্পতি নামে একজন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সময়ে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং 'রায় মুকুট' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি' নামে ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এবং কুলুক ভট্ট নামে বিখ্যাত পণ্ডিত হিন্দুদিগের প্রধান ব্যবস্থাশাস্ত্র মনুসংহিতার টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহারা উভয়েই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতির সহিত সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হওয়ায়, এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরাজাদের উৎসাহে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতচর্চ্চার এই সূত্রপাত হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতি হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি ছড়া ও গান প্রচলিত ছিল। এই যুগে দুইজন বৈষ্ণব কবি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম বিদ্যাপতি, আর একজনের নাম চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি উত্তর বিহার প্রদেশের মিথিলার লোক ছিলেন। তিনি মিথিলার হিন্দুরাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পদাবলী রচনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর অধিকাংশই মিথিলার ভাষাতেই রচিত। কিন্তু তাহা এদেশের লোকেও আদর করিত। আর চণ্ডীদাস বাঙ্গালা দেশেরই লোক। তাঁহার পদাবলী বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনার লোকও বলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই রচিত। বিদ্যাপতির অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুইজনেই ব্রহ্মণ। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভায় থাকিতেন, আর চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর পূজারী ছিলেন। নিজের রচনায় তিনি নিজেকে বড়ু অর্থাৎ বটু বা ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর", অথবা "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে" ইত্যাদি বলিয়া তিনি গানের ভণিতা দিয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলেন।

কৃত্তিবাস

তোমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়াছ। তাহাও এই হিন্দু-অভ্যুত্থানের সময়েই রচিত হয়। কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মপরিচয়ে যে গৌড়েশ্বরের সভায় নিজের উপস্থিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তিনি একজন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা। কৃত্তিবাস নয় দেউড়ী পার হইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হন এবং সিংহসন রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পান।

"নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসন দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥"

রাজা পাত্রমিত্র লইয়াই রাজসভায় বসিয়া ছিলেন।

"রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥"

কৃত্তিবাস এই রাজাকে পঞ্চগৌড়ের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥"

সুতরাং তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজসভায় শ্লোক পাঠ করিয়া আপনার গুণপনা দেখাইয়া কৃত্তিবাস পুষ্পমাল্যে ভূষিত ও চন্দনচর্চ্চিত হইয়া বারপ্রসাদই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রামায়ণ রচনা করিবার জন্য আদেশ দেন। রাজাদেশেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

"রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান।"

কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভাতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কৃত্তিবাস অনেক পুরাণাদি আলোচনা করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

"পঞ্চকাঁই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়া রচে শ্রীরাম পাঁচালি॥"

কৃত্তিবাস বর্ত্তমান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, মুখোপাধ্যায় বংশীয়। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গের রাজা দনুজরায়ের অমাত্য ছিলেন।

"পূর্ব্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥"

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ প্রবল হইয়া উঠিলে নরসিংহ ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। সেইখানে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কৃত্তিবাসের পর আরও অনেকে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন সকল লোকের প্রিয় হইয়াছে, সেরূপ আর কোন রামায়ণ হইতে পারে নাই। এই রামায়ণ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সকলে আদর করিয়া পাঠ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস যে ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখনকার রামায়ণের ভাষা বর্ত্তমান ভাষারই অনুরূপ।

সুন্দরবনে মুসলমান অধিকার

যদু বা জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শমসউদ্দীন আহম্মদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের জন্য তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। তাঁহার দুই জন ক্রীতদাস তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। অবশেষে তাহারাও নিহত হয়। এবং ইলিয়াস শাহের বংশধরেরা আবার গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই বংশের নাসিরউদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে জাহান আলি নামে একজন অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সুন্দরবন প্রদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহান আলি সুন্দরবনের বনজঙ্গল কাটাইয়া অনেক জমি আবাদ করার ব্যবস্থা করেন। যশোহর খুলনা অঞ্চলে তাঁহার অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। খুলনা জেলার বাগেরহাটে তিনি শেষ জীবনে অবস্থিতি করিতেন। সেখানে তাঁহার কোন কোন কীর্ত্তি অদ্যাপি রহিয়াছে। বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ নামে সুবৃহৎ মসজীদ তাঁহারই কীর্ত্তি, আর একটি উচ্চ মসজীদ মধ্যে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। মুসলমানেরা খাঁ জাহান আলিকে পীর বলিয়া মনে করে। জাহান আলি অনেক দূর পর্য্যন্ত রাস্তা করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে দীঘি খননও করাইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে নবাব খাঞ্জালি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

খাঞ্জালির সময় অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়া লওয়া হয়। একটি ব্রাহ্মণসন্তান মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহম্মদ তাহের নাম ধারণ করেন এবং নবাব খাঞ্জালির উজীর হন। তাহের পীর আলি নামে প্রসিদ্ধ। এই পীর আলি অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির লোককে মুসলমান করিয়া লইয়াছিলেন।

"খান জাহান মহামান বাদশা নফর।
যশোর সনন্দ লয়ে করিল সফর।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।
পীর আলি নাম ধরে পিরালী গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হল সর্ব্বনাশ।"

এই পীর আলির সংস্রবে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশ সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

জনপ্রিয় বাদশাহ

ইলিয়াসবংশীয়েরা আফ্রিকা হইতে হাবশী খোজাদিগকে আনিয়া প্রাসাদাদি রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহাদের হস্তে ইলিয়াস বংশের শেষ বাদশাহ জালালউদ্দীন মহেন্দ্রশাহ নিহত হন। তাহার পর তাহারা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লয়। যতদিন তাহারা গৌড়ের বাদশাহ হইয়া ছিল, ততদিন দেশে পূর্ণ মাত্রায় অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। পরে ইহাদের শেষ বাদশাহ মুজঃফর শাহ সৈয়দ হোসেন এবং অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, সৈয়দ হোসেন গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সৈয়দ হোসেন সিংহাসনে আরোহন করিয়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উপাধি ধারণ করেন। হোসেন শাহ সৈয়দ বংশে জন্মিয়াছিলেন, সৈয়দগণ নিজদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশীয় বলিয়া থাকেন। হোসেন পিতা ও ভ্রাতার সহিত এদেশে আসেন। হোসেনের অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি রাঢ় প্রদেশের চাঁদপুরে একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। হোসেন কোন ব্রাহ্মণের অধীনে কাজ করিতেন বলিয়া শুনা যায়। কোন কোন গ্রন্থে সেই ব্রাহ্মণের নাম সুবুদ্ধি বলিয়া লিখিত আছে।

"পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রাঢ় ছিলা গৌড়ে অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী।"

কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার লোকেরা তাঁহাকে চাঁদরায় বলিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের চাঁদপুর বা চাঁদপাড়ায় তাঁহার বাস ছিল। এই চাঁদপাড়া রাঢ় প্রদেশেরই অন্তর্গত। চাঁদপুরের কাজী হোসেনের পরিচয় পাইয়া নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। হোসেন শ্বশুরের চেষ্টায় গৌড়ের বাদশাহ মুজঃফর শাহের দরবারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি উজীরের পদ পাইয়াছিলেন। মুজঃফর শাহের অত্যাচারে প্রজা ও অমাত্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে মুজঃফর শাহ নিহত হন। তাহার পর সকলে মিলিয়া সৈয়দ হোসেনকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া দেয়।

হোসেন শাহ সিংহাসনে বসিয়া প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি সকলের প্রিয় হইয়া

উঠেন। প্রথমে তিনি তাঁহার পূর্বপ্রভু সুবুদ্ধি রায়ের সন্ধান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

"পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হইল।
সুবুদ্ধি রায়ের তেঁহ বহু বাড়াইল।"

মুর্শিদাবাদের লোকেরা বলে যে, হোসেন শাহ চাঁদরায়ের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের নিজগ্রাম চাঁদপুর বা চাঁদপাড়া। তাঁহাকে বিনা করে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে চাঁদরায় তাহাতে সম্মত না হওয়ায় হোসেন শাহ তাঁহার এক আনা মাত্র কর ধার্য্য করিয়া দেন। সেইজন্য ঐ গ্রামের নাম একআনী চাঁদপাড়া হয়। সুবুদ্ধি রায় ও চাঁদ রায় এক ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। হোসেন শাহ যেরূপ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন সেইরূপ প্রজাপালনও আরম্ভ করেন। প্রজার হিতের জন্য অনেক প্রশস্ত রাজপথ করিয়া দেন ও নানাস্থানে দীঘি খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ-কবিগণ হোসেন শাহের যথেষ্ট গুণগান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

"নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অনুক্ষণ সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার॥"

তাঁহার রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের কথা এইরূপ সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে।

"নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
স্বাদবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাদরান হেন দণ্ডে পালে বসুমতী॥"

হোসেন শাহের সময়ে অনেক হিন্দু রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় বসুবংশীয় কায়স্থ পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের উজীর ছিলেন। রূপ সনাতন নামে দুই ভ্রাতা তাঁহার প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন। তাঁহাদের আর এক ভ্রাতা অনুপম গৌড়ের টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান। এইরূপ অনেক হিন্দু হোসেন শাহের দরবারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হন। রূপ সনাতন দুই ভ্রাতা পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। সে কথা পরে জানিতে পারিবে। হোসেন শাহ যেরূপ প্রজাপালক ছিলেন সেইরূপ দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষও ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া লোকের মনে কষ্ট দিয়াছিল।

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক যেউল বিশেষে॥"

হোসেন শাহ আসামের কামতাপুর ও কামরূপ বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে কৃতকার্য্য হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে ত্রিপুরা জয়েরও চেষ্টা হয়। সে কথা পরে বলিতেছি। হোসেন শাহের সময় মগধ বা বিহার প্রদেশ গৌড়ের অধীনে আসে। এইরূপে হোসেন শাহ প্রজাপালন ও রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালার বাদশাহদিগের মধ্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। পরে তাহা শুনিতে পাইবে।

হোসেন শাহের পর তাঁহার পুত্র নসরত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সেই সময়ে মোগলেরা ভারতবর্ষ জয় করেন। মোগলদিগের প্রথম বাদশাহ বাবর শাহ বাঙ্গালা জয় করিতে অগ্রসর হইলে নসরত শাহ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। নসরত শাহের সময় মুসলমানেরা আবার কামরূপ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবারও পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। নসরত শাহ পিতা হোসেন শাহের ন্যায় জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার খোজা ভৃত্যগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। নসরতের পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসিলে, নসরতের ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ তাহাকে হত্যা করিয়া বাদশাহ হন। মামুদ শাহই হোসেন শাহ বংশের শেষ বাদশাহ। (ক্রমশঃ)

পদ্মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হিমালয়

৪

বিনয় দুপুরের দিকে কার্সিয়াং-এ আসিয়া নামিল। দার্জ্জিলিংয়ের নিঃসঙ্গতায় সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। একবার কার্সিয়াং ঘুরিয়া আসিলে মনটা ভাল হইতে পারে ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিল। ষ্টেসনে নামিয়া সে সহরের দিকে চলিতে সুরু করিল, কিন্তু খানিকটা গিয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। পুনরায় ষ্টেসনে আসিয়া কার্ট রোড ধরিয়া রেলপথের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। মন যখন চিন্তাভারাক্রান্ত, তখন অল্প রাস্তায় চলার চেয়ে কার্ট রোড ধরিয়া চলার এক মস্ত সুবিধা আছে—পথটা সমতল, পথের দিকে তত্তটা মনোযোগ দিতে হয় না।

বিনয়ের ধারণা হইয়াছিল, গিরিরাজের সান্নিধ্যে সে কঙ্কণ-পাঙ্কলের কথা ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে চাহিলে দেখিতে পাইত, কঙ্কণ ও পাঙ্কলের স্মৃতি টানা-পোড়েনের মত তাহার অগোচরে নিরন্তর এক সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিয়া চলিয়াছে। এই জাতীয় অধিকাংশ স্মৃতিই সেকালের গল্পে শোনা মসলিনের মত, ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে দুঃখরাত্রের অশ্রুনিশিরসম্পাতে সহসা তাহা আর চোখে পড়ে না। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বলিয়াই, হঠাৎ যখন চোখে পড়ে, মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে এমন চমকিত করিয়া দেয়।

পথ পাহাড়ের গায়ে বাধা পাইয়া নূতন নূতন বাঁকে দিগন্তের অপ্রত্যাশিত দৃশ্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের দিগন্তের অবিচলিত গিরি-দৃশ্য এই কয় দিনেই বিনয়ের কেমন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমতল পথ ত্যাগ করিয়া পাশের পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল।

অগণিত বিচিত্র ফুলে ঢাকা পাহাড়। বিনয় যে দিক দিয়া উঠিতেছিল, সে দিকে কোনো পথ ছিল না, সে অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। প্রায় যখন সে শিখরের নিকটে গিয়াছে, দেখিতে পাইল, উপরে ফুলের বনে লাল, নীল পুষ্পরাশির মধ্যে, অপূর্ব্ব আর একটি ফুল—একটি রমণী মূর্ত্তি। রমণীমূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, মাথায় তার ঘোমটা। তাহার বসিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া বিনয়ের মনে হইল, মেয়েটি পাঙ্কল ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু পাঙ্কল এখানে কেমন করিয়া আসিবে, বিশেষ এই নির্জ্জন গিরিশিখরে! আগেই বলিয়াছি, বিনয় পাহাড়ের যেই দিক দিয়া উঠিয়াছিল, সেদিকে পথ ছিল না। কিন্তু তার বিপরীত দিকে সুন্দর পথ ছিল। খুব সম্ভব রমণী সেই পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিল।

বিনয় নারীমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া উঠিতে লাগিল। পিছন হইতে নারীমূর্ত্তির মত এমন রহস্যময়ী আর কি আছে! বিশ্বের সকল রহস্যের যেন তাহা প্রতীক। পিছন হইতে নারীমূর্ত্তি অশরীরী; কেবল তাহার বসিবার ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিটি দেহলতার একটি নিশ্চল বিদ্যুৎ-রেখার মত। বিনয় নিঃশব্দে যখন তাহার পিছনে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পায়ে লাগিয়া একটা পাথর সশব্দে গড়াইয়া পড়িয়া গেল, দুজনে চমকিয়া উঠিয়া পরস্পরকে দেখিল—পাঙ্কল ও বিনয়।

বিনয় অবাক হইয়া বলিল—তুমি এখানে!

পাঙ্কল উত্তর করিল—আপনি!

বিনয় ইতিপূর্ব্বে পাঙ্কলকে কখনো 'তুমি' বলে নাই। ভবিষ্যতে তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ করিবে না ভাবিয়াছিল, আর হঠাৎ এই 'তুমি'। কিছুক্ষণ দুজনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল, কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না।

বিনয় মনে মনে পাঙ্কলের প্রতি বিমুখতার যে প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছিল, অতর্কিততার এই আকস্মিক আঘাতে এক মুহূর্ত্তে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বিনয় যদি আগে হইতে জানিয়া শুনিয়া পাঙ্কলের কাছে যাইত, তবে এ প্রাচীর কখনো ভাঙিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন সে সব চেয়ে অপ্রস্তুত ছিল, সব চেয়ে কঠিন আঘাত আসিল তখনই। পাথরের ধাঁধা ধূলার মত ভাঙিয়া পড়িল। যে-বাধার গৌরবটা তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল, সেটা যখন গেল, তখন আর বিমুখতার ছল করিয়া লাভ কি! যে-আকস্মিকতা বিনয়ের জীবনে বারবার বিস্ময়ের প্রহরী হইয়া

দেখা দিয়াছে, সে আজ মিলনের দূতীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনয় বসিয়া পড়িল।

বিনয় বলিল—পারুল তুমি এখানে?

পারুল—আমরা সবাই এসেছি।

—তোমার বাবা, মা?

—সকলেই।

—হঠাৎ, কেন?

—একজন সন্ন্যাসীর সন্ধানে।

—কে, আমি?

—হয় তো।

—এখানে যে আছি কি করে জানলে?

—সন্ন্যাসীর সন্ধান হিমালয় ছাড়া আর কোথায় করব?

পারুল এইবার হাসিল।

সেই হাসিতে বিনয় চমকিয়া উঠিল। এতো সেই পলাইয়া-থিয়েটারে-যাওয়া পারুলের হাসি নয়। বিনয় এক পলকে এই হাসির চমকে পারুলকে নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। বিনয় তাহার দিকে এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মাথার ঘোমটা দেখিয়া, এত স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও বিনয়ের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু কই, সীঁথিতে তো সিঁদুর নাই। তবে ঘোমটা কেন?

বিনয় দেখিল, পারুলের কপোল দুটিতে পাণ্ডুরাভা। যদি সে আরো ভাল করিয়া দেখিতে পারিত, তবে দেখিত, তাহাতে সদ্যস্নাত অশ্রুজলের দাগ। চোখের পাতার পদ্মগুলি অশ্রুসিক্ত। চোখের মাঝে সদ্যবর্ষণমুক্ত স্বচ্ছ নীলাম্বরের অপরিমেয় গভীরতা। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও দিগন্তের ধারে যেমন দুই একখানি জলভরা মেঘ থাকে, হঠাৎ হাওয়া পাইলে তাহা হইতে অকারণে জল ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তাহার চোখের নীচের পাতা দুটির কোলে দুএক বিন্দু জল জমিয়াছিল, একটু নত হইতেই, তাহা গড়াইয়া গাল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। বিনয় দেখিল, পারুল অনেকটা কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীষ্মক্ষীণ নদীর স্বচ্ছ জলধারা যেমন তাহার অন্তরস্থ রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে, এই কৃশতাও তেমনি করিয়া বিনয়ের চোখের সম্মুখে পারুলকে খুলিয়া ধরিয়াছিল।

বিনয় ও পারুল নীরবে বসিয়া রহিল। একথা যে বিনয় কহিবার সুযোগ পাইলে আর কিছু চাহিত না, সে আজ নির্বাক। হৃদয় যখন কানায় কানায় পূর্ণ, বাক্যের তখন অবসর কোথায়! আর যদিই তাহাদের কথোপকথন, পাঠককে শোনাইতে পারিতাম, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। প্রেমিকদের কথাবার্তা প্রজাপতির রঙীন পাখার মত: সূর্য্যালোকিত ফুলের বনে দূর হইতেই তাহার সৌন্দর্য্য। তাহা ছিঁড়িয়া আনিয়া হাতে ধরিলে একান্ত নিরর্থক—কেবল ব্যর্থতা। যদি ওই নির্জ্জন গিরিশিখরের পুষ্পবনে, হিমালয়ের নিভৃত সন্ধ্যালোকে যাইতে পারি; তবেই ওই সব নিরর্থক কথা সার্থক হইয়া দেখা দিবে। দিবালোক কলিকাতার হট্টগোলে সে চেষ্টা করিব না। তাহাদের প্রাণের গভীরতম তুচ্ছ কথাগুলিকে হাস্যকর করিয়া তুলিতে আমার ইচ্ছা নাই।

নদীর জলতলের রেখা যখন তটভূমির নিম্নে পড়িয়া থাকে, তখন কত গর্জ্জন, কত কলরব। কিন্তু যেদিন জলতল আর তটরেখা মুখে মুখে সমান হইয়া যায়, সেদিন কোথায় সে কল-গর্জ্জন!

যেখানে দুজনের মনের মিল আছে, বাকী সেখানে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অন্তরের ভাবের সহস্রাংশের একাংশও বোধ করি ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না। তাইতো মানুষে চুম্বন আলিঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু তাহাতেই বা সম্পূর্ণ প্রকাশ কোথায়! আমরা দুর্যোধনের মত স্বচ্ছ স্ফটিকদেহের চারি পার্শ্বে অনবরত মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া মরি। ভিতরটা দেখা যাইতেছে, অথচ প্রবেশের উপায় নাই। গভীরতম ভালবাসা, নিবিড়তম মিলনও দেহের ঐ চৌকাঠের উপরে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। দেহই মিলনের সেতু আবার দেহই মিলনের অন্তরায়।

বিনয় অনেকদিন পরে আজ মনে শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু পারুলের ঐ ঘোমটাখানা বার বার তাহাকে খোঁচা দিতেছিল। পারুল তাহা বুঝিল, নীরবে হাসিয়া ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেমন করিয়া স্বচ্ছ জলতলের মসৃণ উপলরাজিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি পারুলের হাসিটি স্নিগ্ধ এবং ম্লান।

বিনয় একখানি উচ্চ শিলাসনে বসিল। পারুল তাহার কোলে মাথা রাখিয়া বসিল নীচে। বিনয় তাহার হাতখানি নিজের মুঠির মধ্যে গ্রহণ করিল। পারুলের সেই হাতখানি

চুম্বনের মত মৃদু, কপোতের মত উষ্ণ, কমলের মত কোমল, নবনীর মত স্নিগ্ধ, পারুলের সেই হাত। শিশিরের মত স্বচ্ছ, মৃণালের মত দক্ষ, হৃদয়ের মত কম্পমান, অধরের যা প্রতিনিধি—পারুলের সেই হাত। মিলনের মত সর্ব্বগ্রাসী, বিরহের মত উন্মাদিনী, মধের মত, মধুর মত, স্বপ্নের সুখের মত। জাগরণের দুঃখের মত, সুখদুঃখ-জন্ম মৃত্যুসমন্বিত সমগ্র জীবনের মত—পারুলের সেই হাত। বিনয় এক হাতে সেই হাতখানি চাপিয়া ছিল, অন্য হাত দিয়া বন্য ফুল তুলিয়া পারুলের খোঁপার চুলে, কানে গুঁজিয়া দিতেছিল।

চিন্তার আদিম উষা হইতে মানুষ জীবনের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে, পারিয়াছে কি? জীবন এত বিশাল, এত জটিল, এত বিচিত্র, আর মানুষ এতই ক্ষুদ্র, তাহার পক্ষে এ অর্থবোধ কখনো সম্ভব নহে। আর যে দুঃসাহসী জীবনকে উপেক্ষা করিয়া সত্যের আলোকে তাহাকে মুখোমুখী দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে হতভাগ্য এই বিরাট ভস্মলোচনের সম্মুখে পুড়িয়া মরিয়াছে।

তবু তো জীবন দুর্ব্বহ নয়, নিরর্থক নয়, মানুষের প্রতি শত্রুভাবের নয়। তাহাকে বোধ করি খানিকটা বোঝাও যায়। কিন্তু তাহার জন্য এমনি নির্জ্জন গিরিশিখর চাই। এমনি নিভৃত পুষ্পবন। এমনি ভাবে হাতের মুঠি ধরিয়া কোলের উপর মাথাটি রাখা চাই। এমনি চরম মুহূর্ত্তে হয় তো এক আধ পলের জন্য জীবনের অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু এমন পরম লগ্ন জীবনে কতবার আসে! তপস্যা অনেক সহজ, কারণ তাহা একের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু এই পুষ্পবনের সাধনা দ্বৈতমনের সাধনা, দুইটি মন এক সময়ে এক সুরে ধ্বনিত হইয়া ওঠা জগতে সবচেয়ে কঠিন, দুষ্প্রাপ্য।

বিনয়, পারুল কি ভাবিতেছিল জানি না। যাহাদের জীবনে এমন চরম লগ্ন আসে, তাহারা আর কিছু ভাবিয়া দেখে না—একেবারে সোজাসুজি দেখিতে পায়। বিনয়ের মনের কথা জানি না—হাত দিয়া সে ফুল তুলিয়া পারুলের খোঁপা পুষ্পিত করিয়া তুলিতেছিল। পারুলের মনের কথাও জানি না—বিনয়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল।

এই মোহাবেশ ভাঙিয়া যখন তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখন পারুলের খোঁপায় অজস্র ফুল আর হিমালয়ের আকাশে অসংখ্য তারা।

৫

বিনয় অকস্মাৎ কলিকাতা ত্যাগ করিলে সর্ব্বেশ্বরীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি পারুলকে অনেক প্রশ্ন করিয়া যেটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, উভয়ের মধ্যে একটা কলহ হইয়া বিনয় চলিয়া গিয়াছে। তিনি সরোষে স্বামীর কাছে গিয়া পড়িলেন—দেখ তোমার মেয়ের কীর্ত্তি। আমি কত কষ্টে জামাই সংগ্রহ করি, তোমার মূর্ত্তিমন্ত মেয়ে……। মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া কি বিদ্যেই না করিয়াছ…একটা জমিদার জামাই…ইত্যাদি। অবিনাশ বাবু ডবল টিপ নস্য লইয়া বলিয়া উঠিলেন—আঃ…আর, তোমার নিতাই, সে পড়াশোনা না করিয়া এমন কি আবর্ণ পু……পু-ত্র হইয়াছে! সর্ব্বেশ্বরী দেখিলেন, অসম্ভব। স্বামীর সহিত কলহ করিবার সৌভাগ্যটুকুও তাঁর নাই। তিনি সরিয়া পড়িলেন।

বিনয়ের খোঁজ চলিতে লাগিল। প্রথমে রাজসাহীতে। তারপরে তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, সে দার্জ্জিলিং গিয়াছে। রায়-পরিবার দার্জ্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। সর্ব্বেশ্বরী হাঁপানির রোগী, কাজেই দার্জ্জিলিংএর অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত না গিয়া তাহারা কার্সিয়াং-এ বাসা লইল। স্থির হইল, সেখানে ডেরা করিয়া বিনয়ের খোঁজ চলিবে। এমন সময়ে অকস্মাৎ বিনয়ের সঙ্গে পারুলের সাক্ষাৎ—পাঠক সে কথা জানেন। পারুলের বহু অনুরোধেও বিনয় সেদিন তাহাদের বাসায় যাইতে সম্মত হইল না। তবে কথা দিয়া গেল, দুএক দিনের মধ্যে সে চলিয়া আসিবে। সর্ব্বেশ্বরী পারুলের নিকট হইতে বিনয়ের সংবাদ পাইবামাত্র নিতাইকে দার্জ্জিলিং পাঠাইয়া দিলেন—যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আনিতেই হইবে। নিতাইকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি স্বামীর কাছে গিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিলেন—দেখ, আগেই বলেছিলাম। অবিনাশবাবু নীরবে সমস্ত শুনিয়া আর এক টিপ নস্য লইয়া কনস্তান্তিনোপলের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বেশ্বরী

নিজের স্বামীসৌভাগ্যকে বিস্তার দিতে দিতে বিনয় ও নিতাইএর জন্য ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিতান্তই পানের বাটা অনাদরে পড়িয়া রহিল।

নিতাই বিনয়কে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কার্সিয়াং-এ আসিতে সকলের অনুরোধ জানাইল। বিনয় তাহা এড়াইতে পারিল না, তাহারও ইচ্ছা ছিল না। সে বোর্ডিংএর দেনা শুধিয়া কার্সিয়াং রওনা হইল। আসিবার সময় বিক্রমজিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাহাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া এক চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিল। তাহাকে একবার কার্সিয়াং গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইল। তারপরে দুইজনে কার্সিয়াং যাত্রা করিল।

৬

সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে একেবারে পাইয়া বসিলেন। একদণ্ড তাহাকে চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। একহাতে পানের বাটা অন্যহাতে বিনয়কে লইয়া তিনি সর্ব্বদা ঘুরিতেন। যখন তখন পান খাইয়া বেচারা বিনয়ের ঠোঁট পুরু হইয়া গেল।

অবিনাশ বাবুর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। মাঝে মাঝে তিনি পত্নীর তাগিদে কর্ত্তব্যপরায়ণতায় সজাগ হইয়া উঠিতেন। সজাগ হইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাতে এক ডজন সিবন কিংবা হিরোডোটাস তুলিয়া দিতেন। বিনয়ের পক্ষে সর্ব্বেশ্বরীর তাম্বূল অপেক্ষা অবিনাশ বাবুর নীরস সিবন অনেক সুখকর ছিল।

যাহারা নিছক প্রেমের বন্ধনের উপর বিশ্বাসী সর্ব্বেশ্বরী সে দলের নহেন। তিনি জানেন, প্রেমের মাধুর্য্যকেও আয়ত্তে রাখিতে হইলে কঠিনতর বন্ধনের আবশ্যক—যেমন আবশ্যক মিছরির দানার মধ্যে সূতাখানি। বস্তুত ঐ নীরস সূতাখানা আছে বলিয়া মিছরি দানা পাকাইয়া উঠিতে পারে। মিছরির সঙ্গে যেমন সূতাগাছা, বিবাহিত প্রেমের মাধুর্য্যে তেমনি অবহিত শাশুড়ীর সদাজাগ্রত সতর্কতা।

সর্ব্বেশ্বরীকে অবলম্বন করিয়া পারুলের প্রেম জমিয়া উঠিতে লাগিল কিনা জানি না, কিন্তু বিনয়ের মন-আসর বৈবাহিক সুখসৌভাগ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। হায়, স্বর্গেও দুঃখ আছে, গভীরতম পত্নীপ্রেমেও শাশুড়ীর খবরদারি আছে।

দিন দুই পরে সৌরচন্দ্রিকার অবান্তর অংশ একেবারে বাদ দিয়া সর্ব্বেশ্বরী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা বিনয়, তাহলে শুভকার্য্যটা কোথায় হয়, তোমার ইচ্ছা?

বিনয়ের পক্ষে সকল জায়গাই সমান, কারণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বেশ্বরীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, কাজেই সে বলিল, আপনাদের যেখানে সুবিধা। সর্ব্বেশ্বরী অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, তা তো বটে; তবে একবার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। সর্ব্বেশ্বরীর আনন্দ এতখানি হইয়াছিল যে, শাশুড়ীর এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে কর্ত্তাকে অংশীদার করিতে অসম্মত হইলেন না। অনেক যুক্তিতর্কের পরে স্থির হইল, বিবাহ কলিকাতাতে হইবে, যতশীঘ্র সম্ভব, শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগেই। আর স্থির হইল—অবশ্য ইহা সর্ব্বেশ্বরীর মনে মনে—যে, বিনয়কে বিবাহের আগে হাতছাড়া করা হইবে না। বিনয় সর্ব্বেশ্বরীর নজর-বন্দী হইল। ভাবীপত্নীর নজর-বন্দীত্বে হয় তো কিছু পুলক আছে, কিন্তু ভাবী শাশুড়ীর? —বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিও।

সেদিন সকলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বাহিরে একটা গোলমাল উঠিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকলে বাহির হইয়া আসিল। রায়-পরিবারের বাসার পাশে খানিকটা সমতল মাঠ ছিল, সেখানে কখনো কখনো ফুটবল খেলা হইত। সেইখানে ব্যাপারটা। যে-দৃশ্য নজরে পড়িল তাহাতে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘটনাটি এই রকম।

বিক্রমজিৎ বিনয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য কার্সিয়াং আসিয়া অনেক খুঁজিয়া তাহার বাসার সন্ধান পাইয়া সেখানে আসিতেছিল। সেই পাহাড়ের উপরে সে আরূঢ়, তাহার গলায় 'দি হর্স' লেখা ঝুলিতেছে, দর্শকদের প্রতি অনুরোধাত্মক সতর্ক-বাণী। বিক্রমজিতের দেহে পূর্ব্বপরিচিত সেই শিকারের পোষাক, একহাতে লাগাম, অন্যহাতে একখানা পতাকা। বাসার কাছে আসিয়া নিতাইএর সহিত তাহার সাক্ষাৎ। নিতাই এই অপূর্ব্ব-দর্শন লোকটিকে দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার দোষ নাই—এ-দৃশ্যে স্বয়ং গিরিরাজেরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন। নিতাইএর চপলতায় বিক্রমজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। নিতাই তাহাতে আরও

কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু সর্বনাশ ঘটিল নিতাইএর দৃষ্টির সূক্ষ্মতার অভাবে। সে গাধাটিকে দেখিয়া—গাধা, গাধা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তদোধিক উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল বিক্রমজিৎ—ম'সিও, অপমান করবেন না, 'ইট ইজ দি হর্স'। বিক্রমজিতের এই দৃঢ়তায় হয়তো গোলমাল মিটিয়া যাইত, হয়তো নিতাই জানোয়ারটাকে 'দি হর্স' বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া লইত। কিন্তু স্বয়ং 'দি হর্স' ইহার প্রতিবাদ করিয়া অত্যন্ত গর্দভ-সুলভ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে নিতাইএর অপেক্ষা বিক্রমজিৎ-ই যেন অধিক বিস্মিত হইল। তাহার এতদিনের সমস্ত সন্দেহ শিক্ষা ব্যর্থ হইল, গাধার ডাকের উচ্চনিনাদের মধ্যে কোথাও অশ্বের হ্রেষার আভাস মাত্র পাওয়া গেল না। সে গাধার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিল—ডিয়ারি, ডিয়ারি, 'আবসার্ড', 'আবসার্ড'। এবং 'আবসার্ড' কি দেখাইবার জন্য নিজেই ঘোড়ার স্বরের অনুকরণে চিঁ চিঁ চিঁহি করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। গাধাটি নিজের কানের কাছে কারনিক হ্রেষা শুনিয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজের স্বর ক্রমে পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিল। তখন বিক্রমজিৎ আর কোন উপায় না দেখিয়া পতাকা ও লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দুইহাতে সজোরে গাধার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—মেরে যাহা পারে নাই, শক্তিতে তাহা করিবে। দৃঢ় হাতের নিষ্পেষে দমবন্ধ-প্রায় গাধা আত্মরক্ষার জন্য পিছনের পা-দুটি খাড়া করিয়া দিল, বিক্রমজিৎ পড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গাধা ছুটিয়া মাঠের অপর প্রান্তে গিয়া বারংবার মাথা উঁচু নীচু করিতে করিতে, বোধহয় বহুদিন পরে প্রাণ খুলিয়া স্বজাতি-সুলভ ডাক ডাকিতে লাগিল।

বিক্রমজিৎ ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে নিতাই তখনো হাততালি দিয়া হাসিতেছে। বিক্রমজিৎ প্রথম কথা বলিল—আই চ্যালেঞ্জ ইউ। নিতাই সগর্বে বলিল—অ্যাই অ্যাকসেপ্ট। বিক্রমজিৎ নিতাইকে নিরস্ত্র দেখিয়া বলিল—নো আনফেয়ার গেম। এই বলিয়া সে নিজের তরোয়ালখানা (কাঠের, উপরে রাংতা জড়ানো) নিতাইকে দিল এবং নিজের নিশানের ডাণ্ডা হাতে করিয়া দুইজনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তারপরে এক বিষম ব্যাপার। যে দৃশ্য বর্ণনা করিতে সারভ্যাঁত বা সেক্সপীয়রের লেখনীর আবশ্যক, আমি তাহার চেষ্টা করিব না। হিমালয়ের উপরে এমন দুই জীবের অভিযুদ্ধ অসম্ভব না হইলেও দুঃসম্ভব বটে, নতুবা আমাদের পূর্বকবিগণ মহাদেবের কৈলাসে নন্দীভৃঙ্গির কল্পনা করিলেন কেমন করিয়া!

বিনয় ও রায়-পরিবার যখন বাহির হইয়াছে তখন দুই জনে অভিযুদ্ধ চলিতেছে। সর্বেশ্বরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও গাধা বিনয়, আমার নিতাইকে মেরে ফেলে। সর্বেশ্বরী অত্যুক্তি করেন নাই। ঠিক তখনি নিতাই চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, আর বিক্রমজিৎ তরোয়ালে চীৎকার করিয়া উঠিল—'দি হর্স, দি হর্স'। এতক্ষণে যেন তাহার বাহনের অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল। এমন বাহন-প্রীতি কে কবে দেখিয়াছে, বাহনের অপমানের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করা প্রতিজ্ঞা! গাধাটা বোধ হয় এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্তে বিক্রমজিতের পরাজয় কামনা করিতেছিল, সে বিক্রমজিতের জয়সূচক 'দি হর্স' রব শুনিয়া পুনরায় বিক্রমজিতের মর্মবিদারক স্বরে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে স্বজাতিত্বের প্রচার করিয়া দিল। বিক্রমজিৎ ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠিল—আনফেয়ার। গাধা পিটাইয়া কখনো ঘোড়া হয়। ভালবাসাতেও হয় না। হায় গাধা!

বিনয় তাড়াতাড়ি গিয়া নিতাইকে তুলিল এবং বিক্রমজিৎকে থামাইয়া উভয়ের মধ্যে পরিচয় স্থাপন করিয়া দিল। সে বিনয়কে দেখিয়া ও নিতায়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ক্ষমার সুরে নিতাইকে বলিল—ম'সিও, ক্ষমা করবেন, জানতাম না যে, আপনি ম'সিও চৌধুরীর ভাবী শ্যালক—এই বলিয়া সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। নিতাই মনে মনে বলিল—আর তুমি আমার বর্তমান ··। বিনয়ের সহিত দুইজনে বাসায় ফিরিল। সর্বেশ্বরী লোকটাকে দেখিয়া বাসা ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন, অবিনাশবাবু পাশের ঘরে গিরিনের মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, পাকল জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বিনয়, নিতাই, বিক্রমজিৎ তিনজনে টেবিলের পাশে বসিয়া আলাপ আরম্ভ করিল। পাকল জলখাবার লইয়া আসিলে নিতাই তাহার পরিচয় দিল। বিক্রমজিৎ তাহাকে সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিল। জলযোগ শেষ হইল। বিক্রমজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ, আপনারা জানেন কাল আমি

হিমালয়ের অন্যান্যে যাত্রা করব। সে বিপদসঙ্কুল দেশ থেকে নাও ফিরে আসতে পারি, নাই বা এলাম। যদি দেখেন যে, আমি একমাসের মধ্যে ফিরলাম না, তবে আপনি, মঁসিও বিনয়, খবরের কাগজে আমার একটা বিবরণ প্রকাশ করবেন।—এই বলিয়া সে নিজের শিকারীবেশের একখানা ব্লক পকেট হইতে বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিল—এই আমার ছবি; ছবির তলায় লিখে দেবেন—"Just for an Ideal he left us." আপনাদের শুভবিবাহে হয় তো আমি উপস্থিত থাকতে পারব না, কাজেই সেই উপলক্ষ্যে সামান্য যে একটি উপহার আমি দিতে চাই, তা এখনি দেব। বিনয় আগে লক্ষ্য করে নাই, এখন করিল, কথা বলিতে বলিতে বিক্রমজিতের মাঝে মাঝে দুই কাঁধ উপরের দিকে ঝাঁকানি দিবার একটা অভ্যাস ছিল। সে পকেট হইতে একটি হাতির দাঁতের কৌটা বাহির করিল। কৌটাটি সন্তর্পণে খুলিয়া একটি ছোট রূপার ঝিনুক বাহির করিয়া ফেলিল। ঝিনুকটি সযত্নে হাতে করিয়া বলিল—এই আমার উপহার। পারুল লাল হইয়া উঠিল।

—আপনারা একে সামান্য জেনে তুচ্ছ করবেন না। এর মধ্যে একজন লোকের প্রকাণ্ড অরচিত ইতিহাস আছে। সে বেচারা এই সামান্য নৌকাটি করে সংসারসমুদ্র পাড়ি দেবে ভেবেছিল। নৌকা যখন প্রস্তুত, সমুদ্রতীরে এসে দেখে সমুদ্র শুকিয়ে চড়ন্ত মরুভূমি হয়ে গেছে। তারপর থেকে সে বহুদিন এই নৌকাটি ঘাড়ে করে ফিরেছে। আজ তাকে আপনাদের হাতে সঁপে দিলাম। আপনারা এর সদ্ব্যবহার করবেন। কি বলেন মঁসিও? কিছু বুঝতে পারলেন না, তাই না! যেন একটা allegory বলে মনে হচ্ছে! হবেই তো, ছোট বেলা কবিতা লিখতাম কিনা! এই বলিয়া সে কৌটা ও ঝিনুকটি পারুলের হাতে দিল। পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিয়া বলিল—মঁসিও, এতে আমার জীবনী আছে, আমার মৃত্যুসংবাদ পেলে এটা ছাপাবেন, এতে শিল্প নেই, কিন্তু সত্য আছে। আজ এই পর্য্যন্ত। এই বলিয়া সে বসিয়া পড়িল।

বিক্রমজিতের এই হাল্কা-দীপক কথাবার্ত্তায় এমন একটা করুণাপূর্ণ সন্ত্রমের ভাব ছিল যে, নিতাই পর্য্যন্ত তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারা চারিজন নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না। বাহিরের সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া গেল। আর সেই অন্ধকারে চারিটি নিশ্বাসের স্পন্দন তালে তালে ধ্বনিত হইতে থাকিল।

৭

ক্রমে হিমালয় হইতে নামিয়া যাইবার সময় আসন্ন হইল। স্থির হইল, বিনয় রায়-পরিবারের সহিত কলিকাতায় যাইবে, তারপর যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ হইবে।

সেদিন বিকালে বিনয় ও পারুল বেড়াইতে বাহির হইল। দুজনে পাশাপাশি নীরবে চলিয়াছে। সদর পথ ছাড়িয়া তাহারা পাহাড়ের দিকে চলিল। চারিদিকে শুভ্র গিরিশিখর, নিম্নে গভীর বন। এই কয়দিনে বিনয়ের মনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের হাত এড়াইবার জন্য সে প্রকৃতির কোলে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল; প্রকৃতি আবার তাহাকে মানুষের হাতে ফিরাইয়া দিল। একদিন তাহার জীবনে প্রকৃতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া মানুষকে পটভূমিতে সরাইয়া দিয়াছিল। আবার কখন্ প্রকৃতি অলক্ষিতে পট-ভূমিতে সরিয়া গিয়াছে, মানুষ রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বয়ং গিরিরাজও মানুষকে আটকাইতে পারেন নাই। বিনয় এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতেছিল। প্রকৃতি ও মানুষ টানা-পোড়েনের মত তাহার জীবন-উত্তরীয় বুনিয়া তুলিতেছে। বিনয় তাকাইয়া দেখিল, পশ্চিমের একটি শিখরের পশ্চাতে সন্ধ্যাসূর্য্য অস্ত যাইতেছে; সেই অস্তসূর্য্যের পটভূমিতে পড়িয়া পাহাড়টা যেন অনেকটা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু সে কতদূরে। আর মানুষ! ঠিক পাশেই তাহার পারুল, যাহার দুএক গুচ্ছ শিথিল কুন্তল তখনো তাহার গালে উড়িয়া পড়িতেছিল, কবার-মধুর যাহার সৌরভ পদ-তোলা মৌমাছির মত তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল। মানুষের হাতে আজ প্রকৃতির পরাজয় ঘটিল।

যাঁহারা কার্সিয়াং-এ গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেখানকার কোনো কোনো গিরি-অবকাশ দিয়া বহুদূর দিগন্ত-প্রসারী সমতলভূমি দেখা যায়। পথের অপ্রত্যাশিত বাঁকে

মাঝে মাঝে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। সে এক বিস্ময়কর চমক। বিনয়রা এই রকম একটা গিরি-অবক্ষেপের দিকে যাইতেছিল। সে জায়গায় হিমালয় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়া যেন দুইদিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া অনন্তকে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহাকে ধরিতে পারিল না, তাহার জন্য নিষ্ফল বাহু মেলিয়া গিরিরাজ পড়িয়া আছে। তাহারা দুইজন সেখানে গিয়া বসিল। বিনয় এ দৃশ্য আগে দেখে নাই। হঠাৎ দূরবর্তী সমতলভূমি দেখিয়া কেমন যেন একটা তৃপ্তি বোধ করিল। এতদিন সে যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, এইবার তাহার কারণ বুঝিতে পারিল। সমতলবাসী জীব কিছুদিন পাহাড়ে থাকিলে মনে মনে হাঁপাইয়া উঠে, কিন্তু কিসের সে বেদনা বুঝিতে পারে না : বুঝিতে পারে তখনই যখন সে আবার মাটিতে নামিয়া আসে। আজ হঠাৎ দূরবর্তী বাংলাদেশের সমান মাটি দেখিয়া কোথায় তাহার অস্বস্তি সে বুঝিতে পারিল।

পাহাড় সেখানে ক্রমনিম্ন কয়েকটা গিরিশিখরে শেষ হইয়া গিয়াছে—তার পরে সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে সমতল মাঠ। সে এক ব্যাকুলতার চমক-লাগানো দৃশ্য। পায়ের নীচেই বিরাট বনস্পতির অরণ্য, খেলার বাগানের চারাগাছের মত। মহানন্দা নদীটি একটি রূপার রেখা। তিন দিনে অতিক্রম করা যায় না এমন সব উপত্যকা একেবারে বুষ্টিমেয়। তার পরে আর কিছু নাই কেবল একটানা মাঠ, মাঝে মাঝে কালো কালো দাগে অরণ্যের কৃত্রিম অস্তিত্ব। দিগন্তরে দৃষ্টি চলিতে চলিতে এক সময়ে ধূসর সুতায় বাধা পায়, সন্ধ্যাবেলা সেখানে জোনাকীর মত ক্ষীণ আলোর বিন্দু লাফাইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—শিলিগুড়ির বৈদ্যুতিক বাতি।

বিনয় ও পারুল দুজনেই এ দৃশ্যে চমকিত হইয়া গেল। তাহারা এতটা অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল—কেবল এক জনের হাতের উপরে অন্যের হাত উভয়ের অলক্ষিতে পড়িয়া রহিল।

এমন করিয়া বিনয় কখনো বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করে নাই। অনন্তাভিমুখী হিমালয়ের এই পাদপীঠটি, ইহাতে বসিয়া বাংলাকে দেখিবার জন্যই যেন বিশেষ ভাবে ইহা রচিত। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে হঠাৎ সে আজ এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আসিয়া যাহা সে দেখিল, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

বাংলার যে মূর্তিকে সে দর্শন করিল, তাহা রাজনীতিকের আন্দোলনক্ষুব্ধ দেশ নয়, না তাহা বিদেশী বাজার অনুমনস্ক বদনে অঙ্কিত নির্জীব মানচিত্র।

এ সেই বাংলা, অশ্রুতে যার অভিষেক, হাসে যার আয়তি, প্রত্যেক বাঙালীর জন্মকর্মের সৌরভে যার অন্তহীন বন্দনা। এ সেই ভাব, কবির বীণাকে যা অলক্ষিতে চঞ্চল করিয়া তোলে, কবির বাণীতে যা অতর্কিতে নন্দনের মর্মর আনিয়া দেয়। এ সেই ভাব, গায়কের যা কণ্ঠে, শিল্পীর তুলিতে, ভাস্করের যন্ত্রে অভাবিত আকৃতি সঞ্চার করে। ব্যথাকে যা আনন্দ, সুখকে শান্তি, মৃত্যুকে জীবন বর দেয়। এ সেই রূপ, একটি বাঙালীর চোখেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবার জন্য লক্ষ বৎসর যা মাতার ধৈর্যে সন্তানের দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এ সেই তারার আলোয় জাগিয়া থাকা, চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখা, দিন রজনীর নিমেষ গোণা, সুরুকথা বাংলাদেশ। এ সেই দেশ, আসন্ন অন্ধকারের বিশ্ন ভাটিয়ালিতে একবার মাত্র যা গোধূলির প্রান্তে দেখা দিয়া যায়, তারপরে সারা রাত্রি কী দুঃখের জাগরণ! এ সেই দেশ, নারিকেল-অরণ্যের মুহুর্মুহু স্পন্দনে একবার মাত্র যার চাপা দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হইয়া ওঠে—তারপরে যত আত্মনিলয়ের সে কী চেষ্টা!

বর্ষায় তমালী, শরতে সবুজ, হেমন্তে সঘন, শিশিরে নীল, বসন্তে পুষ্পিত, গ্রীষ্মে সফল—নানা ঋতুর বাংলা। আষাঢ়ে ব্যাকুল, আশ্বিনে মিলিত, অঘাণে খুশী, চৈত্রে চঞ্চল, নানা ভাবের বাংলা। পদ্মায় পূত, পদ্মায় দুর্দাম, মেঘনায় গম্ভীর, নদীতে কোমল, শস্যে শ্যামল, গিন্নিতে অটল বাংলা!

আর এ সেই দেশ, অবশেষে একদিন যে জন্মপলের উপরে তাণ্ডবের তাল শুনিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া ওঠে। তখন কবির কণ্ঠে দীপক বাজে, গায়ক গাহে নট-নারায়ণ, আর ভাস্করের যন্ত্রে পাথরে পায় প্রাণ! প্রেমিক ছাড়ে কোণ, প্রণয়ী ছাড়ে ঘর, ছেলেরা ছাড়ে কোল, মেয়েরা ভাঙে শাসন। নৈমিত্তিক সতর্কতার নিয়ম তুচ্ছ করিয়া বাঙালী সেদিন সুধাস্রমে বিষভাণ্ড তুলিয়া পান করে, মরে, মরে, আর হাসে। মরিতে মরিতে হাসে, হাসিতে হাসিতে মরে। বাংলা সেদিন কাঁদে, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসে।

বিনয় এই মূর্তি দেখিল, ভাবিল, এমন ভাবে সে দেশকে কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই ভাবসর্বস্ব নারীমূর্তি অতীতের রঙ্গমঞ্চে বসিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে, ললাটের একান্তে বর্তমানের একটি অতিতুচ্ছ কৃষ্ণতিল। সে অভিভূতের মত বাংলার উদ্দেশে প্রণাম করিল, তাহার সহিত যেন হিমালয়ের শিরও নত হইয়া পড়িল। পারুলেরও একটি প্রণতি বিনয়ের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করিল। উত্তরে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, রাত্রি তখন গভীর, অন্ধকারে হিমালয়ের উচ্চতা ও সমতলের নিম্নতা সব এক হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

টলারেশন

গত চৈত্র মাসের "বঙ্গশ্রী"-তে প্রকাশিত ঐতিহাসিক রায় মহাশয়ের "টলারেশন" শীর্ষক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড় আনন্দ হইল। ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্মকে সমাজগত উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, সে পক্ষে এক মাত্র উপকরণ বলা উচিত যেখানে কলাণে, সেখানে ধর্মকে মানুষের অন্তরে থাকিতে হইবে, সেখানে কল্যাণকে, ধর্মকে নয়,—ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বর্তমানে আমরা যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়াছি, ধর্মকে প্রধান করিতে গিয়া দেশের যে সর্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছি, তাহার প্রতিকার করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে রায় মহাশয় আর বসিয়া থাকিতেন না। তাহাদিগকে চালিয়াছেন তাহা আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।

কিন্তু রায় মহাশয় টলারেশন লইতে যাহা বলিয়াছেন তাহাই টলারেশনের শেষ কথা কি না একবার ফিরে করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। "যাহা অনুমোদন করা যায় না তাহা সহ্য করিয়া যাওয়া"—টলারেশন শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি বলিতে চাহেন হিন্দুর পক্ষে মুসলমান ধর্মের প্রতি টলারেশন প্রদর্শন করার অর্থ এই যে, মুসলমান ধর্মকে অনুমোদন না করিয়া হিন্দু তাহা সহিয়া যাইবে। কিন্তু টলারেশনের মনোবৃত্তির মধ্যে এই অনুমোদন না করার ভাব কি অপরিহার্য? "অনুমোদন না করিয়া সহ্য করিয়া যাওয়া" যেমন টলারেশনের আভিধানিক অর্থ, তেমনই "বাধা না দেওয়া,"—ইহাও ঐ শব্দের আভিধানিক অর্থ। ধর্মের প্রশ্নে টলারেশন শব্দ ব্যবহার করিলে উহাতে দুইটি অর্থের মধ্যে প্রথমটিকে গ্রহণ করাই কি যুক্তিসঙ্গত?

মূলতঃ ধর্ম এক হইলেও মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যভেদে ধর্মের বিভিন্ন আকার ও রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই হিন্দু ও মুসলমানের বিশিষ্ট ধর্মমত ধর্মবিষয়ে এক নয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ও হিন্দুর প্রতি মুসলমানের মনোভাব কি রূপ হইতে পারে তাহার বিচার করিতে বসিলে নিম্নোল্লিখিত উত্তরগুলি পাওয়া যায়—(১) একে অপরের ধর্ম অনুমোদন করিবে না এবং সহ্যও করিবে না, (২) একে অপরের ধর্ম অনুমোদন করিবে না, কিন্তু তথাপি (কিসের যেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য) সহ্য করিবে, (৩) একে অপরের ধর্ম অনুমোদন করিবে এবং সহ্যও করিবে, (৪) একে অপরের ধর্ম অনুমোদন করিবে, কিন্তু (নিজের অন্তরের ভাব বা অন্য কারণে) সহ্য করিবে না।

প্রথম ও চতুর্থ উত্তরে যে মনোভাবের ইঙ্গিত করিয়াছে তাহার নাম টলারেশন হইতে পারে না, তাহা সহ্য করিয়া যাওয়া টলারেশনের প্রধান অঙ্গ। রায় মহাশয় টলারেশন বলিতে তৃতীয়োক্ত দ্বিতীয় উত্তরে প্রদর্শিত মনোভাব। এই জন্যই টলারেশনের মধ্যে তিনি পার্থক্যজ্ঞান, উদ্ধত্য ও অন্যের দমন পাইয়াছেন। কিন্তু ইঙ্গিতিত তৃতীয় উত্তরে যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় টলারেশনকে তাহারই নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার মধ্যে দম্ভ বা নীচতার স্থান বোধ হয় আর থাকে না।

আমাদের মনে হয়, ধর্মের ক্ষেত্রে টলারেশন শব্দ উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Webster তাঁহার অভিধানে টলারেশনের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অবজ্ঞাবোধের কথা কিছু নাই।

আমাদের দেশের ধর্মাবলম্বী পিতা শুধু যে নিজের ধর্ম অনুমোদন করেন তাহা নয়, স্নেহ পুত্রগণ সকল ধর্মই তাঁহার অনুমোদিত। এই কারণে তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে নিজের ধর্ম গ্রহণ করাইলেও তাঁহার পুত্রের প্রকৃতি যদি তাহাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় তাহাতে তাঁহার অসম্মতি কিছু থাকে না, পুত্রের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বনে তিনি বাধা দেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আমাদের পূর্বপুরুষের টলারেশন বর্তমান।

টলারেশন আমাদের ভাষা। আমরা চাই আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টলারেশনের ভাব প্রসারিত হইয়া যাক। হিন্দু মুসলমানের বাধা টলারেশন আসিলে তাহারা পরস্পরের ধর্ম অনুমোদন করিয়া পরস্পরকে যার যার-মতানুসারে কার্য করিতে দিবে, বাধা দিবে না। টলারেশনের প্রতিষ্ঠা অন্তরের গোপন কন্দরে নিহিত ঘৃণার উপর নয়, টলারেশনের ভিত্তি প্রেমে। ঘৃণার উপর যে টলারেশন প্রতিষ্ঠিত আসলে তাহা টলারেশন নয়ে, উহা টলারেশনের নাম লইয়া বীভৎসতার পার্থিবিদ্যের প্রচেষ্টা মাত্র। টলারেশনের মোহাই দিয়া যে চক্ষুর যুক্তি হীনবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায় সে টলারেশন শব্দের অপব্যবহার করে। টলারেশনের অপব্যবহার সম্ভব বলিয়া যে টলারেশন ঘৃণ্য হইবে, টলারেশন অসহ্য হইবে,—এ কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। রায় মহাশয় দেশের কল্যাণকে সর্বাগ্রে স্থান দিবার জন্য যে বিরোধ ব্যাপারটিকে তাহা গ্রাহ্য হইবার যোগ্য, যেহেতু সার্থক হইলে উহার বিরোধ টলারেশনের ভাব আনাইয়া তুলিবে। তিনি যে পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন সে পথ ধরিলে টলারেশনের উদ্ধেশ্য সাধন হইবে,—এরূপ বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহার বিরোধ গ্রহণ করিয়া লইতে দ্বিধা করি না।

—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভদ্র

লেখার রূপ

"লেখার রূপ" শীর্ষক আমার প্রবন্ধটি আপনাদের কাগজে ছাপাবার জন্যে যে সময়ে পাঠিয়েছিলেম তখন ঐকৃতত্ত্ব উৎসবের শেষ ও সুরীর বিদ্যু মহাশয়ের সে সম্পর্কীয় প্রবন্ধ বের হয়নি; সুতরাং আপনারা যে সময়ে উহা ছাপিয়েছেন তখন তাতে আমার আরো দু' একটি কথা যোগ করা দরকার হ'য়ে পড়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঘটে উঠে নি। তা ছাড়া প্রবন্ধটিতে কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ থেকে গেছে। তাই সময় পায় হবে ফিরে পাঠালেও কয়েকজন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সে বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ

করতে চেষ্টা করছি। এখানে একথা বোধ হয় বলতে পারি যে বাঙলা লিনোটাইপ যেন হলেও সকল ছাপাখানাতে তা রাখা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না; সুতরাং বাঙলা টাইপের সংস্কারের খুবই আবশ্যকতা আছে।

আমি লিখেছিলাম "'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' বানান ছাড়া রেখে তাদের চেহারাগুলো একটু মার্জিত ক'রে নিলে বোধ কি? 'বাঙলা' ও 'বাঙালী' রূপ গ্রহণ করলে বোধ হয় টাইপের দিক দিয়েও অনেক সুবিধা হয়।" লেখাটি উক্ত সূত্রেই একই ছন্দে আবৃত্তি ছাপা হয়েছে। 'কলা'এর ব্যবহারও অনুরূপ—'ক্ + ল (্) = ক্ল', যা ছেপে 'ক + ল (্) = ক্ল' ছাপানো হয়েছে। 'ল্ + ম = ল্ম' কে ছেপে 'ল্ + ম = ল্ম' ছাপানো হয়েছে।

"কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথামতো 'কলাবানানের' নতুন রূপ প্রচলন ক'রে খুশলতা বেধাব বা কেন?" এখানেও 'রূপ' ও 'খুশলতা' ছাপানো হয়েছে। "'ঃ' 'কলাটা' 'ঃ' অথবা 'কম' লিখলে কেন পরিষার হয়" যা ছেপে 'ঃ' ও 'কম' ছাপানো হয়েছে।

'গবিজ্ঞ' 'ইন্‌ষ্টিটিউট' যা ছেপে 'ঘবিজ্ঞান' 'ইন্‌ষ্টিটিউট' ছাপানো হয়েছে।

"উপসংহারে সাহিত্যাচার্যের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে, অধিকন্তু অধিকারকল্পে এক বৃহৎ পরামর্শ সভা গঠন ক'রে.....।" এখানে 'পরামর্শ সভা' স্থলে 'পরামর্শ সভক' ছাপানো হয়েছে।

তা ছাড়া অনেকস্থলে 'ক'রে' 'ব'লে' প্রভৃতিকে 'করে' 'বলে' ছাপা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রস্তাবিত বর্ণবিন্যাসের সূত্রে 'ক্ অ র ত অ ব য অ প অ র অ র অ ণ অ' এবং 'স্ত্রী' সূত্রে, 'স্‌ত্রী' লিখার কথা মিঃ সাহেবের পরিকল্পিত রোমান অক্ষরে বাঙলা লিখার কথা মনে করিয়ে দেয়। শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্র মহাশয় হ্রস্ব ইকার (ি) ছেপে দীর্ঘ ইকার (ী) বর্জনের প্রস্তাব ক'রেও 'স্ত্রী' লিখতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার মনে হয় 'স্ত্রী' অথবা 'সত্রী' লিখলে সুবিধা হয়। সুধীরবাবু সেন মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুপযোগিতা দেখিয়েছেন।

পূর্বকালে 'সতেরই'কে 'সত্তরই' বলা ও লিখা হয়ে থাকে, সুতরাং ভাষাতত্ত্ববিদেরাই কেবল 'স ত র ই' (স্ত্রী) এবং 'সত্তরই' (১৭ই) এর প্রভেদ বুঝতে পারবেন।

—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়

রামমোহন রায়

গত মাঘ ১৩৪০ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বসু মহাশয় "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র" নামক অনুবাদপ্রধান ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই পুস্তকে আছে—"ওৎপরে মূল কেসের কিয়দংশ বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ সুলভ প্রকাশ অধিকন্তু ও তদুপলক্ষে প্রকরণাদি সাধারণের গোচর করেন।"

এই কথা উদ্ধার করিয়া ভূমিকায় বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহাতে বোধ হয়, ০ ০ ০ ০ খ্রিনি [রাজা রামমোহন] কেসের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সব কথা সম্বন্ধে এখনও আমরা কোন সন্ধান পাই নাই।"

"কেস" শব্দ সংকীর্ণ এবং ব্যাপক দুই অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। "মহারাজকেসেরেসবাবেদন্।" ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহ আমাকে; আজকের অংশ-বিশেষ উপনিষৎ। এই ব্যাপক এবং প্রকৃত অর্থে উপনিষদ ও কেস। ঈশাদি কএকখানি উপনিষৎ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া ভূমিকায় রাজা রামমোহন "ঈশরের অধিষ্ঠান ও তদুপাসনা প্রকরণাদি সাধারণের গোচর করেন" তাহা আমরা রাজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে দেখিতে পাই।

সংকীর্ণ অর্থে কথাটি সাহিত্য ছাড়া আর কিছুতে বলা যায় যে রাজা এই অংশের অনুবাদ কেন, বিশিষ্টরূপ আলোচনাই যে করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থাবলীর কিছুতে পাওয়া যায় না।

"জীবন চরিত"-লেখক "মূল কেসের কিয়দংশ" দ্বারা ঠিক উপনিষদেরই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

—শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু

চীনা চিকিৎসা

মিঃ ই. সোকোলস্কি 'দিট আর্টটস্‌ক'-এ লিখিতেছেন—চীনাদের চিকিৎসানীতি অদ্ভুত। প্রত্যেক ডাক্তারই সর্বজ্ঞাধিকারপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ডাক্তারের একটি মাত্র প্রেসক্রিপশন থাকে—সেই প্রেসক্রিপশন পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা হয়—সে ম্যেনিঞ্জাইটিসই হোক্ আর আমাশয়ই হোক্। যখন কোন লোকের অসুখ হয়, বাড়ীর লোকেরা যতগুলি সম্ভব ডাক্তারকে ডেকে পাঠায়। শরীর হইতে রক্তের একটি ফোঁটাকে বন্ধ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ধনীলোক হইলে অন্ততঃ দশ বারোজন ডাক্তার আসিবেনই। রোগীর বাড়ী দেখিয়া প্রত্যেক ডাক্তার নিজের পিতৃপিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিবেন। বাড়ীর লোক প্রেসক্রিপশনের কিছু বুঝিল না; বস্তুতঃ ডাক্তার নিজে, তাঁহার স্ত্রী, কম্পাউণ্ডার ও ডিস্পেন্সারির কয়েকজন লোক ছাড়া যে প্রেসক্রিপশনের মাথামুণ্ড কাহারও কিছু বুঝিবার সাধ্য নাই। ফলে, কোন্ প্রেসক্রিপশনের ঔষধ ব্যবহার করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আবার ওঝার কাছে ছুটিতে হয়। ওঝা আসেন, এক দাগ প্রেসক্রিপশনের কাছে বসিয়া তিনি শাঁখঘণ্টা বাজাইতে থাকেন, তাঁহার সাকরেদ দাঁড়িয়ে থাকে। এবং শেষ অবধি ওঝা যার আওয়াজে একটি প্রেসক্রিপশনে হাত দেন। বাড়ীর লোক সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ ব্যবস্থা করে। রোগী কাজেকাজেই কম লাভ করে। যদি রোগীর মৃত্যু হয়, ডাক্তার বলেন ওঝার দোষ,—ওঝা বলেন, তাঁহার কি দোষ—প্রেসক্রিপশন লিখিয়াছেন যে ডাক্তার। বাড়ীর লোক ভাবে, অদৃষ্ট।

মা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

চার

তারপর সে একটু একটু করে শান্ত হল। আবার তার চিন্তার ধারা চলল।

বোধ যেমন তার রোগের প্রকৃতি জানতে পারলে খানিকটা আশ্বস্ত হয়, সেই রকম পলও খানিকটা স্বস্তি পেত, যদি সে জানত, অন্ততঃ বুঝতে পারত, কেন এসব ঘটল। মায়ের মত সে তার অতীত জীবনের কথা ও কাহিনী আলোচনা করে দেখতে লাগল।

তার সেই শৈশবের কাপসা ও অস্পষ্ট স্মৃতির সঙ্গে বাইরের বাতাসের ওমরানি মিশে গেল। সে দেখলে, একটা বাড়ীর উঠান, কোথায় তা ঠিক জানে না। হয়ত যে বাড়ীতে তার মা দাসীবৃত্তি করত, তারই উঠান হবে, সেখানে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সে পাঁচিলে উঠছে। পাঁচিলের ওপর ছুরির মত ধারের চাঙা কাঁচ বসান, কিন্তু তা ছেলেদের একটু বাধা দিত না, ছেলেরা তারই ওপর জাঁচড়ে জাঁচড়ে বেয়ালে উঠত, উঠে বাইরের দিকে দেখত, তাতে তাদের হাত কেটে গেলেও থামত না।

এটা খানিক সত্যি, নিজেকে নিজে আহত করায় খানিকটা সুখ ও আনন্দ আছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে তাদের ক্ষত দেখাত, তাদের রক্তটা মুছে ফেলত, ভাবত, তাতে তাদের হাত কাটা অন্য লোকে আর দেখতে পাবে না, কেউ আর তা লক্ষ্য করবে না। পাঁচিলের ওপর থেকে তারা শুধু দূরের গাছ আর রাস্তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেত না। রাস্তায় চলা তাদের বারণ ছিল না। কিন্তু তারা তার চেয়ে পাঁচিলে ওঠাটাই বেশী পছন্দ করত, কেননা, সেটা বারণ আছে,—পাঁচিলে উঠতে নিষেধ আছে। রাস্তায় যে দুচারজন লোক চলাচল করছে তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়তে বেশ আমোদ হত, আর তারপর লুকিয়ে পড়া। তাদের মনের ভাব হল, একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে ষেটা বারণ সেইটা করার সাহস। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও আছে, পাছে ধরা পড়ে। একটা বোবা ও কালা মেয়ে—আবার খোঁড়াও, উঠানের নীচের দিকে যেখানে কাঠ জড় করা, সেইখানটায় বসে থাকত। সেইখান থেকে সে তার বড় বড় কাল চোখ তুলে ফটফট করে চাইত, আর যেন দয়াও প্রার্থনা করত। ছেলেরা তাকে বড় ভয় করত, কিন্তু তারা তাকে কোন রকমে উৎখাৎ করতে সাহসই পেত না। বরং তাকে দেখে তারা তাদের গলার স্বর চেপে কথা কইত, পাছে সে সব শুনতে পায়। কখন কখনও তাকে তারা খেলা করবার জন্যে ডাকত। তখন সেই খোঁড়া মেয়েটা পাগলের মত আনন্দে হাসত, কিন্তু তার সেই কোণ থেকে সে একবারও নড়তে পারত না।

কল্পনায় সে তার সেই কাল দুটো চোখ, দেখতে পেলে। চোখের গাঢ় ভাষায় ভেতর দুঃখের ও আকাঙ্ক্ষার সেই আলো জ্বলছে দেখতে পেলে, তার স্মৃতির অতল তলায়। সে সব ঠিক তেমনই দেখলে, যেমন সেই আঙনের নীচে দেখেছিল। তার মনে হল সেই কাল দুটো চোখ, ঠিক যেন এ্যাগনিসের চোখের সঙ্গে মিলে যায়।

তারপর সে দেখলে যে, সে সেই পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যে পথে তারা লোকদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারত,—একটু মোড় ফিরেই আরো খানিকটা গিয়ে রাস্তার শেষের দিকে একটা ছোট সরু গলি, খানকয়েক ভাঙা পোড়োবাড়ীর ভিড়ে গলির মুখ বন্ধ হয়ে গেছে—তাদের বাড়ীর ঠিক সেই রাস্তা আর গলিটার মাঝখানে। এই বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ীগুলিতে প্রায় সবাই স্ত্রীলোক, সব মোটা আর সবাই গম্ভীর। সন্ধ্যে হলেই তারা দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়, কোন লোককেই ভিতরে ঢুকতে দেয় না, শুধু মেয়েমানুষ আর পাদরী ছাড়া। এদেরই সঙ্গে তারা বসে গল্প-সল্প করে, কিন্তু সকল সময়ই খুব ভবিষ্যুক্ত হয়ে, আর খুব সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা কয়।

এইখানে একদিন একজন পাদরী, তার কাঁধ ধরে, শক্ত-শক্ত হাড়-ওয়ালা দুটো হাঁটু দিয়ে আটকে, তার সেই জোরাল হাত দিয়ে গলের মুখখানা উঁচুতে তুলে ধরে, জিজ্ঞাসা করেছিল—

"সত্যি তুমি পাদরী হতে চাও?"

বালক পল মাথা নেড়ে বলেছিল, হাঁ। তারপর একখানা যীশুখৃষ্টের ছবি আর একটা আদরের পাশ্বড় পেয়ে ঘরের কোণে বসে, পল সেই পাদরী আর মেজেদের সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল, তাই শুনছিল। এবার গ্রামের পাদরীর কথা নিয়ে তারা আলোচনা করছিল, কি করে সে পাইপে তামাক খায়, কি করে সে শিকার করতে যায়, কি করে তার দাড়ি বড় হচ্ছে, এ সব সত্ত্বেও যে বিশপ তার পাদরীগিরি নাকচ করবেন না, তার কারণ এই যে, কে এই দূরগ্রামে পাদরীগিরি করতে এসে নিজেকে গোর দেবে,—নতুন লোক খুঁজে পাওয়াও অনেক ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া সেই বেপরোয়া পাদরী সাহেব, যিনি গির্জ্জে গেড়ে বসে আছেন, তার মেজাজে রেখেছিলেন যে, কেউ তাকে তার এই জায়গা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, তার হাত পা বেঁধে, নদীতে ফেলে দেবেন। "সব চেয়ে খারাপ হচ্ছে এই যে, এগ্রামের বোকা লোকগুলোর তার দিকে যথেষ্ট টান, যদিও তারা তাকে ভয় করে আর তার যাদুতেও ভয়ে মরে। কেউ কেউ সত্যি সত্যি বিশ্বাসই করে যে সে ঈশার বিরোধী। আবার মেয়েরা সবাই বলে নাকি যে, তারা এর পরে যে পাদরী আসবে তার বিপক্ষে একে যথেষ্ট সাহায্য করবে, আর তাকে নদীতে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করবে।"

"পল, শুনতে পাচ্ছ সব? যদি তুমি পাদরী হতে চাও, আর তোমার মায়ের গ্রামে ফিরে যেতে চাও, তাহলে একটা ভাল দেখে সময় ঠিক কর।"

যে স্ত্রীলোকটি পলকে এই ঠাট্টা করলে, তার নাম মাদ্রিয়েলেনা। তার হাতেই পল মানুষ হচ্ছিল। সে যখন পলের চুল আঁচড়ে দেবার জন্যে তাকে কাছে টেনে নিত, তখন তার মোটা পেট আর নরম বুকের স্পর্শে পলের মনে হত যে সে গদি দিয়ে তৈরী। মাদ্রিয়েলেনাকে পলের বড় ভাল লাগত। তার সেই দেহটা খুব মোটা হলেও, তার মুখখানি বেশ সুন্দর, গালদুটিতে একটু রাঙা আভা, আর শান্ত কটা চোখ। গাছে যেমন পাকা ফল ঝোলে, পল তেমনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। হয়ত সেই তার প্রথম প্রেমিকা।

তারপরে এল তার স্কুলের জীবন। অক্টোবর মাসের এক সকালে একদিন তার মা সেখানে তাকে নিয়ে গেল। তখন আকাশ নীল আর সব জিনিষ থেকে যেন নতুন মদের গন্ধ বের হচ্ছে। পথটা খাড়াই, উপরে উঠতে হয়। পাহাড়ের একেবারে ওপরে একটা খিলান-করা পথ, সেখানে স্কুলের সঙ্গে বিশপের বাড়ীর যাতায়াতের যোগ আছে। যেন একখানা ছবি, ফ্রেমে আঁটা। রোদের আলো মাখা কুঁড়েঘরের সার, গাছপালা, পাথরের সিঁড়ির ধাপ, ছবির নীচের দিকে সেই উঁচু গির্জ্জে। বিশপের বাড়ীর সামনে যে পাথর বসান, তার ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। কতকগুলো লোক ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। ঘোড়াগুলোর পা খুব লম্বা, ঘাড়ে খুব লম্বা লম্বা চুল, চকচকে লোহার নাল পায়ে বাঁধা। সে এ সব বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে, কারণ সে তার চোখ লজ্জায় মাটীর দিকে নীচু করে রেখেছিল, খানিকটা নিজের জন্যে লজ্জা, খানিকটা তার মায়ের জন্যে। হাঁ, এটা একেবারে পরিষ্কার স্বীকারই করা না কেন? সে তার মার জন্যে সর্ব্বক্ষণই লজ্জিত হত। কারণ, তিনি যে চাকরাণীর কাজ করতেন, কতকগুলো গরীব বোকা গেঁয়োলোকের গ্রাম থেকে তিনি এসেছেন। সম্প্রতি, সেও অতি অল্প দিন হল, তার মনের এই যে ইতর ভাব, শুধু অহঙ্কার আর ইচ্ছার জোরে সেটাকে সে জয় করেছে। আর অকারণে যত সে তার এই হীন অবস্থার জন্য নিয়ে লজ্জা পেত, পরে ততই সে এর জন্যে মনে মনে নিজের কাছে গর্ব্ব বোধ করত, ভগবানের কাছেও গৌরব মনে করত যে, সে নিজে ইচ্ছা করে এই ছোট কুঁড়ের বাস করছে যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধীন করে রেখেছে, তাঁর মনের সামান্য তুচ্ছ সাধ গুলোকে শ্রদ্ধা করছে, তাঁর সকল ছোট খাট খুঁটী-নাটী ব্যাপারেও সব সময় মেনে চলছে।

কিন্তু, মা যে তার চাকরাণী ছিল, চাকরাণীও ভাল, তার চেয়েও হীন, স্কুলের রান্নাঘর ঝাঁট দেওয়া, তার যৌবনের দিনের অত্যন্ত লজ্জাকর স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনলে। তবু, তার মা, শুধু তারই জন্যে এই হীন কাজ করতেন। যে দিন সে তার অষ্টের ধর্ম্মগুরুর কাছে ধর্ম্মোপদেশ ও তার পাপ স্বীকারের জন্যে যেত, সে দিন তিনি তাকে বাধ্য করতেন তার মায়ের কাছে যেতে, তাঁর হাতে চুমু খেতে, আর যে সব দোষ সে করেছে, তার জন্যে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে। মা

যখন তাড়াতাড়ি ডিম-মোছা কাঁচনে হাত মুছে আসত, তার হাতে সাবানের মরলা কেলার গন্ধ বেরুত। হাতখানা ফাটা-ফাটা, চামড়া কুঁচকে দুমড়ে গেছে, যেন পুরোনো বালি-ঘসা বেয়ালের মত। সেই হাতে যখন বাধ্য হয়ে চুমু দিতে হত, তখন রাগে, লজ্জায় সে একেবারে জ্বলে যেত। কিন্তু তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারত না বলে ভগবানের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

এমনি করে ভগবান পলের কাছে নিজেকে জানিয়েছেন, সেই সাঁতসেঁতে অন্ধকার ধোঁয়ায় ভরা সেই মাঠের স্কুলের বারান্দার ভেতর তার মায়ের পিছনে থেকে। ভগবান—যিনি সমস্তই ঠাই নিয়ে আছেন, স্বর্গেমর্ত্যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সব তাতেই তো ভগবান রয়েছেন।

আর সেই আনন্দের, উৎসাহের মুহূর্তে, তার সেই ছোট ঘরের ভিতর শুয়ে, অন্ধকারের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে, সে আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করত—'আমি পাদরী হব, ভগবানের কাজে জীবন উৎসর্গ করব, আর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাব।" সেই সময়ে সে তার মায়ের কথাও ভাবত —তখন সে মার কাছ থেকে দূরে থাকত, তাকে দেখতে পেত না। সে তাকে খুব ভালবাসত, মনে মনে ঠিক অনুভব করত যে, এই যে তার বড় হওয়া, এই যে তার মহত্ত্ব, এ সবই তার মায়ের জন্য। কারণ তাকে ছাগল চরাতে না পাঠিয়ে, কলে গমের বস্তা মাথায় নিয়ে যেতে বাধ্য না করে, যেমন তার বাপ করত,—তা না করে তাকে তার মা এই পাদরী করে তুলছে। আর এই ভগবানের কাজে জীবন ঢেলে দিয়ে, সে সেই কাজ একেবারে ভগবানের পায়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে।

এইভাবে সে তার জীবনের আসল কাজ ঠিক করে নিয়েছিল। জগতের সে কিছুই জানত না। জীবনে যে সব ভাব তার সব চেয়ে উজ্জ্বল আর সব চেয়ে মধুর, তা হল যা কিছু ধর্মের, যা কিছু বড় বড় উৎসবের ব্যাপার। এখন সেই সব কথা ফিরে ফিরে মনে করে, বর্তমানের এই দুঃসহ যাতনার যে জ্বালা—তার মধ্যে, একটা আলো ও আনন্দভরা উল্লাসের ভাব জাগিয়ে দিলে, আর তার মনের চোখের সামনে একটা জাগ্রত জীবন্ত ছবির মত ধরে দিলে। গির্জের সেই অর্গ্যানের যে সুর, পুণ্য-সপ্তাহের মধ্যে যে-সব উৎসবের নিগূঢ় রহস্য, আজকের দুঃখের যেন ভাগ নিতে লাগল। এই জীবন-মৃত্যুর যাতনা, বিছানার শুয়ে, তার বুকের ওপর যে ভার চেপে ধরেছিল, তা যেন সেই ঈশার বুকে, তাঁর গোরের ভেতর এই পৃথিবীর মানুষের পাপের যে ভার চেপে ধরেছিল তারই মত।

এই যে জীবনের ধারা, যে সময় এই সব চরম রহস্যের চাকলোর ভেতর দিয়ে চলছিল, সেই সময় প্রথম সে এক রমণীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল। এখন যখন সে কথা মনে করে, সে যেন স্বপ্নের ছায়ার মত, ভালও নয় মন্দও নয়, সে শুধু একটা অপরূপ ব্যাপার।

প্রতি ছুটির দিনে সে সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করতে যেত, যার সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে সে বাস করে আসছে, আর তারা তাকে খুব আদর আপ্যায়ন করে কাছে বসাত, যেন সে তখন পাদরী হয়েই গেছে। খুব জানাশোনা বন্ধুর মত, খুব আনন্দের সঙ্গে—কিন্তু তাদের সে ব্যবহারের ভেতরে একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। যখন সে মারিয়েলেনার দিকে তাকাত, তার মুখ লাল হয়ে উঠত, তার জন্যে সে নিজেকে দূষিত মনে করত। কারণ সে তখন পর্যন্ত তাকে মনে মনে ভালবাসত, আর তার সেই মোটা, নরম, বেগঠন মূর্তির যে একটা স্বাভাবিক কুৎসিত ভাব তার চোখে যেই ফুটে উঠত,—সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্তি তার সেই শান্ত চোখ দুটি তার মনের ভেতর সুরের কাঁপন জাগিয়ে দিত।

ভোজের উৎসবের দিনে, মারিয়েলেনা ও তার বোনেরা, তাকে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করত। একবার এক রবিবারে, সে একটু আগে সকাল সকাল এসে পড়েছে। তখন তারা টেবিল সাজাতে ব্যস্ত ও অন্য অভ্যাগতদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই দেখে পল ছোট বাগানের ভেতর গিয়ে, এদিক ওদিক পথের ধারে পায়চারি করতে লাগল। পথটা বরাবর বাইরের পাচিলের ধার দিয়ে চলে গেছে, গাছের সোনালী ঝরাপাতায় রাস্তাটা ছেয়ে আছে। আকাশ যেন ধুয়ে ধোয়া, নীলের আভা মাখান, বাতাস মধুর; পূব দিকে পাহাড়ের গায়ের বেশ একটু তপ্ত বাতাস আসছে, আর ঘুরে ঘুরে পাখিরা ডেকে উঠছে শোনা যাচ্ছে।

ঠিক যে সময়ে সে ছেলেমানুষের মত একটা বাদাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার গা থেকে ঝাঁটার ছোঁটা হাত

দিয়ে নিতে থাচ্ছে, হঠাৎ দেখতে পেলে যে, এক জোড়া সবুজ চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে বাগানের পাচিলের বিপরীত দিকের যে গলি, সেই গলি থেকে। যেন একটা বেড়ালের চোখের মত চোখ, একটা স্ত্রীলোক—তার সমস্তটা দেখতে পেলে। গলির শেষের দিকে একটা অন্ধকার দরজার চৌকাঠের কাছে বসে আছে, যেন শিকার ধরবার জন্যে একটা বুনো বেড়াল। আজ এখনও দাদুমণির মূর্তিটা সে পড়ে নিতে পারে, এমন পরিষ্কার করে, যেন ঠিক জান্ত। এখনও তার মনে হয় যে, সে সেই গাছের নরম তুলতুলে আঁটা তার হাতের ভেলো ও বুড়ো আঙুল দিয়ে ধরছে। আর সেই চমক-লাগা চোখ, এখনও তার মুখের চোখের ওপর থেকে ফেরাতে পাচ্ছে না, দরজার ওপরে একটা ছোট জানালায় সাদা কাপড় টাঙান, তাতে একটা ছোট ক্রুশ ঝুলছে। সে সেই দরজার পথ জানে, ছেলেবেলা থেকে সে জানালাটা সে দেখে এসেছে। ক্রুশটা যে দেখানে ঝোলান ছিল, সে হল মানুষকে প্রলোভন থেকে দূরে রাখবার জন্যে, তা দেখে তার বড় আহ্লাদ হত। কেননা সেই ঘরটায় যে মেয়েটা থাকে তার নাম মারিয়া পাস্‌কা, একটা নষ্টা মেয়ে। এখনও সে তাকে তার চোখের সামনে যেন দেখছে, তার সেই কালোয়-দেওয়া কমালবাঁধা সাদা ধবধবে গলা, কানে দুটো বড় বড় পলার দুল ঝুলছে, যেন দুটো লম্বা রক্তের ফোঁটা পড়-পড় হয়ে রয়েছে। তার কনুইটাকে দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সে বসে আছে, দু-হাত দিয়ে নিজের মুখখানা তুলে ধরেছে। মারিয়া পাস্‌কা তার দিকে স্থির হয়ে দেখছে, তারপর একটুও সে না নড়ে একেবারে হেসে ফেললে। তার সাদা ছোট ছোট দাঁত, তার চোখের কি নিষ্ঠুর তাকানি, দুটো মিলিয়ে তার বুনো বেড়ালের ভাবকে যেন সব রকমে বাড়িয়ে তুলছিল। হঠাৎ সে তার হাত দুটো কোলের কাছে ফেলে দিলে, মুখখানা তুললে, একবার গম্ভীর ও বিষণ্ণ ভাবে তাকালে। একটা খুব বড়লোক মাথার টুপি নামিয়ে মুখখানা আড়াল করে, গলির মোড় থেকে খুব সাবধানে আসতে লাগল, পাচিলের ছায়ায় গা ঘেঁসে ঘেঁসে।

মারিয়া পাস্‌কা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল, সেই বড়লোকটাও তার পেছনে গেল, আর দরজা বন্ধ করে দিলে!

পল যখন সেই বাগানে পায়চারী করছিল, সেকি ভয়ানক তার মনের চাঞ্চল্য হয়েছিল, সে কথা সে এখনও ভুলতে পারে নি। সেই নোওয়া বাড়ীটার ভেতরে দরজা বন্ধ করলে কেন, এই চিন্তায় পলের মনের ভেতর একটা কি ভয়ানক অবস্থি হয়েছিল। এ যেন কি রকম একটা অস্বাভাবিক দুঃখের ভাব, একটা মহা অবস্তি হতে লাগল। তার মনে হল সে একলা থাকে, একটা পীড়িত পশুর মত নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ভোজের সময় অল্প অল্প অভ্যাগতদের বসালাপ, আমোদের কথার মাঝে সে অস্বাভাবিক ভাবে চুপ করে রইল।

খাওয়া হয়ে গেলে সে বরাবর সেই বাগানে ফিরে এল। সে মেয়েটা সেইখানেই বসে আছে, আগে যেমন ভাবে বসেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই রয়েছে, আবার তার শিকার খুঁজছে। তার ঘরের সাঁাতসেঁতে দরজায় সূর্য্য কোন দিনই পৌঁছোন না। সে দেখতে যেন অতসী ফুলের মত, অতি নরম, তার কারণ সে যে চিরটা কালই ছায়ায় অন্ধকারেই জীবন কাটালে।

সে যখন ফুলের পড়ুয়া পলকে দেখলে, নড়ল না, শুধু একটু হাসলে। তারপর তার মুখ আবার সেই বড়লোকটা আসার সময় যেমন ভারি হয়েছিল, তেমনি ভার হয়ে উঠল। পলকে সে ডাকলে, যেমন ছোট ছেলেকে লোকে ডেকে বলে।

"শুনছ, শনিবার আমার বাড়ীতে এসে, আমার বাড়ীটাকে আশীর্ব্বাদ করে যাবে? গেল বছরে যে পাদরী বাড়ী বাড়ী আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছিল সে আমার বাড়ী এল না। নরক সে নরকে পচে, সে তার যত বুজরুকী নিয়ে, থাক্ নরকে।"

পল কোন উত্তর দিলে না, তার ইচ্ছে হল সে একটা পাথর ছুঁড়ে তাকে মারে। সে সত্যি সত্যি দেয়াল থেকে একটা পাথর কুড়িয়েও নিলে, তারপর আবার রেখে দিয়ে, রুমালে হাত মুছে ফেললে।

কিন্তু সারাটা পুণ্য সপ্তাহের ভেতর যখন সে গির্জ্জের উপদেশ শুনত, কিংবা সেই উপাসনা ইত্যাদিতে যোগ দিত, অথবা জলন্ত বাতি হাতে করে, ফুলের অন্যান্য সব পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশপকে তাঁর জায়গায় পৌঁছে দিতে যেত, তার মধ্যে সারাক্ষণই তার মনে হত যে, সেই মেয়েটার দুটো চোখ অবিরাম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ক্রমে এটা তার যেন

একটা রোগের মত হয়ে উঠল। সে যেন ভূত ছাড়ানির মত তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়, যেন শয়তানে তাকে পেয়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হত যে, শয়তান বোধ হয় তাকেই পেয়ে বসেছে। যখন পা-ধোয়ানর সেই পুণ্যকার্য্য সুরু হত, যখন বিশপের পাদুটা বারজন ভিখারীতে মুছিয়ে দিত, (যাদের দেখলে মনে হত এরা যেন সেই প্রভু ঈশারই বারজন শিষ্য) তখন পলের অন্তর দুঃখে ভরে উঠত, এই ভেবে যে, কেন আগের পাদরী ইন্নোসের আগের শনিবার সেই নষ্টমেয়ের বাড়ীটাকে আশীর্ব্বাদ করতে রাজী হন নি। অথচ উপরি নিজে মেরি মডলিনকে তার পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাকে ক্ষমা করেছিলেন। হয়ত যদি সেই পাদরী ওই নষ্ট মেয়ের বাড়ীটাকে আশীর্ব্বাদ করতেন, তাহলে সে তার এই বদ চালচলন একেবারে বদলে ফেলত। এই শেষের চিন্তার ভাবনাটি তাকে ভয়ানক আঁকড়ে ধরেছিল—অন্য সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে। বহু দিন পরে আজ সে বিচার করে বুঝতে পাচ্ছে যে, তার স্বভাব এখানে তার সঙ্গে ছলনা করেছে, কারণ সে সময়ে তখন সে নিজেকে কিছুই জানতে দেয়নি। হয়ত, যদিবা সে তখন নিজেকে জানত বা বুঝতো, তাহলে সে শনিবারে সেই গলিতে ফিরে যেত, সেই নষ্ট মেয়েটাকে দেখতে।

যখন সে গলির মোড় ফিরলে তখন দেখতে পেলে যে, মারিয়া পাস্কা দরজার কাছে আর বসে নেই, দরজা খোলা পড়ে, বোঝা গেল যে, তার ওখানে এখন কোন মানুষ-জন নেই। কোন ইচ্ছা থেকে নয়, অমনি সে সেই বড়লোকের অনুকরণে পাচিলের ছায়ার পাশে পাশে গলির ভেতর ঢুকল। তার মনে ইচ্ছা হচ্ছিল, মারিয়া পাস্কা ঠিক তেমনি ভাবে শিকার খুঁজতে বসে থাকবে, তেমনি গম্ভীর ভাবে উঠবে, তার আসা দেখে তেমনি ভৎর্সনের চাউনি চাইবে। যখন গলিটার শেষে গিয়ে সে পৌঁছল, দেখতে পেলে যে, বাড়ীর পাশে একটা কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে সে জল তুলছে। তার চরণ যেন লাফ দিয়ে উঠল! ঠিক যেন ছবির মেরি মডলিনের মত দেখতে। সে যখন জলের বালতিটা তুলছে ঠিক সেই সময়ে সে পলকে দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। জীবনে সে এমন সুন্দরী আর কখনও দেখেনি। তখন তার ইচ্ছে হল যে, সে ছুটে পৌঁছে পালায়, কিন্তু তখনও সে বড় লাজুক। যখন সে জলের বালতি হাতে করে বাড়ীর ভেতর ঢুকল, সে কি যেন বললে, তার মানে পল ঠিক বুঝতে পারলে না। কিন্তু পল তার পিছু পিছু গেল, আর সে দরজাটা বন্ধ করলে। একটা কাঠের ছোট সিঁড়ি উঠে একটা ছোট দরজা, তার ভেতর দিয়ে ওপরের ঘরে যাবার পথ। সেই জানালাওয়ালা ঘরটা, যার জানালায় জুঁইটা ঝুলছে, প্রলোভন থেকে রক্ষা করবার জন্যে, সেই খানে সে পলকে নিয়ে গেল। তার মাথা থেকে টুপিটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে, ছুঁড়ে এক পাশে ফেলে দিয়ে সে হাসতে লাগল।

পল তাকে আরো কয়েকবার দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু পাদরীগিরিতে ভর্ত্তি হবার পর থেকে, যেদিন থেকে সে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত নিলে, তখন থেকে সর্ব্বথাই স্ত্রীলোকের সম্পর্কের সে বাইরে থাকত। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন, তার এই ব্রতের নিয়মের বর্ম্মের চাপে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যখন কোন পাদরীর সম্বন্ধে কোন অকথা-কুকথা শুনত তখন নিজের পবিত্রতার কথা ভেবে গর্ব্ব বোধ করত। কেবল মাঝে মাঝে এই গলির মেয়েটার সঙ্গে দেখাশোনার ব্যাপারটা তাকে রোগের মত যন্ত্রণা দিত, তবে তা থেকে সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

এই ছোট গ্রামটিতে প্রথম বছর কাটাবার পর, সে ভেবেছিল যে, জীবনকে সে সাধারণ ভাবে যাপন করেই চলেছে, জীবনের সবই তার জানা হয়ে গেছে। যা জীবন তাকে দিতে পারে, দুঃখ, অপমান, অভিমান, প্রেম, আনন্দ সুখ, পাপ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সবই তার জানা হয়েছে, বাকী আর কিছু নেই। যেন কোন খুব বুড়ো একটা সন্ন্যাসী পৃথিবী থেকে সব চেনে নিয়েছে, এখন শুধু ভগবানের কাছে গেলেই হয়। আজ আবার হঠাৎ সেই স্ত্রীলোক এ্যাগস্নিসের চোখে পৃথিবীর এই জীবনের সব স্বাদ সে অনুভব করতে লাগল। প্রথম দিকে এমন ভুল সে করেছিল যে, ভেবেছিল, এইত অনন্ত জীবনের রসধারা।

প্রেম দেওয়া আর প্রেম পাওয়া, এই কি এ পৃথিবীতে ভগবানের স্বর্গরাজ্য নয়? স্মরণ হতেই তার বুক যেন ফুলে উঠল। হে প্রভু! আমরা কি এমনই অন্ধ? কোথায় হবে আলো পাব? পল জানত যে সে অজ্ঞাত, তার জ্ঞান

শুধু কতকগুলো পুঁথির ভেতরেই বাঁধা, তাও সে যে একেবারে সব মুক্তই বুঝতে পেরেছে তাও নয়। সবার চেয়ে বাইবেল তাকে—তার মনে এমন ছাপ দিয়েছে, তার নতুন জীবনের অনুভূতি, আর তার অতীত, জাগ্রত ও জীবন্ত ছবি সব দিয়ে। তবুও সে কিন্তু নিজের ওপর কোন নির্ভর করতে পাচ্ছেনা, তার ভিতরের যে মনের খোলাখুঁজি তা দিয়েও নয়। তখন সে বুঝলে যে, তার কোন আত্ম-উপলব্ধি হয়নি। বুঝলে সে তার নিজের প্রভু নয়। এতদিন ধরে সে শুধু নিজেকে ঠকিয়ে এসেছে।

ভুল পথে সে পা ফেলে চলেছিল। সে হল সহজ স্বাভাবিক শক্ত প্রকৃতির ছেলে। তার পূর্বপুরুষদের মত, সেই সব কলকারখানার মজুর, সেই সব যন্ত্রচালক রাখালদের মত। সে যে এ কষ্টটা ভোগ করছে, শুধু তার প্রকৃতিগত সংস্কার থেকে তাকে অন্য পথে আনা হয়েছে বলে, তার সহজ ভাবে তাকে চলতে দেওয়া হয়নি বলে। এখন সে তার আসল রোগ কোনখানে, সহজ ও নির্ভুল ভাবে তার নিদান ঠিক করতে পারলে। সে যে অসুখী তার কারণ সে একটা মানুষ। তার স্বাভাবিক সুখ দুঃখ আনন্দ থেকে, তার প্রেম, তার উল্লাস, তার ভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত, তবে জীবনের সব প্রকৃতিগত যে সুধা, না মেটানর জন্যে তার এই অবান্তর যন্ত্রণা। এখন সে বুঝলে, যে-সুখ শেষ হয়ে যায়, সে তার দুঃখ যাতনা গ্লানি পেছনে রেখে যায়। তবে এ হতেই পারে না যে, রক্তমাংসই শুধু জীবনের সুযোগ খুঁজে বেড়ায়, বরং আত্মাই তার দেহকারা থেকে ছুটে মুক্তি নেবার জন্যে ছটফট করে। প্রেমের যখন চরম সুখের ভাব আসে, তখন এই আত্মাই ত্বরিতে ডানা মেলে উপরে উঠে যায়, কেবল আরো জোরে, আরও দ্রুত এই কারাগারের খাঁচায় ফিরে আসবার জন্যে। কিন্তু সেই যে স্বাধীনতার মুক্ত অবস্থার মুহূর্ত, সে জানিয়ে দেয় যে, কোথায় কোন উঁচুতে সে উঠেছে। যখন তার এই কারার বাঁধন টুটে যায়, এই রক্ত মাংসের পাঁচিল পড়ে থাকে, তখন একটা অনন্ত আনন্দ, সে যেন অনন্ত নিজে।

দুঃখে ও তার ক্লান্তিতে সে শেষে হাসলে। এ সকল কথা সে কোথায় বা পড়েছে? নিশ্চয়ই সে হয়ত কোথাও এসব পড়েছে, কেননা নিজে নতুন কোন ভাব সৃষ্টি করার মত অহঙ্কার তার ছিল না। কিন্তু এতে ত কোন ফল হল না। সত্য সকল সময়েই এক, সব মানুষের কাছেই সত্য এক, যেমন সকল মানুষের অন্তর একই রকম। সে নিজেকে অন্য মানুষ থেকে তফাৎ মনে করেছিল, ইচ্ছা করে নির্বাসন নিয়েছিল, নিজেকে ভগবানের কাছে আবার উপযুক্ত করবে বলে। হয়ত তাই ভগবান তাকে এই ভাবে শাস্তি দিচ্ছেন। তাই তাকে ফিরে আবার মানুষের ভিতর পাঠালেন, তাই এই বাসনা আর বেদনার রাজ্যে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে।

না, তাকে উঠতেই হবে, তার যে অবধারিত পথ সেই পথে তাকে চলতেই হবে। [ক্রমশঃ]

অনুবাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

সভ্যতা না মড়ক?

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষপাতী ধারারা তাঁহাদের জন্য শাইলক কাজ করিয়াছে। এপ্রিল ১৯৩১, ছাপেল মাগাজিনে আলডুস হাক্সলি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"১৯০৮ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে মস্তিষ্ক-বিকৃতদের সংখ্যা ছিল ১৫৩০০০। হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে ১৯২৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০০০০০।.....ষাট বৎসর পূর্বে যে সংখ্যা হাজারকরা ত্রিশ জনের জন্য হইত, বর্তমানে হাজারকরা ১০টি মাত্র শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে।...বর্তমান অবস্থার যদি পরিবর্তন না ঘটে, কে কি দুই শতাব্দীর মধ্যে এই ঘোষণাপত্রের সমস্ত লোক-সংখ্যার এক চতুর্থাংশ হইবে অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন (half-wits)। ...বর্তমানে বিকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রায় ২২০০০ জন কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে আছে, বাকী প্রায় সওয়া দুই লক্ষ জন এখনও মুক্ত অবস্থায় পথে-ঘাটে বিচরণ করিতেছে।...অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কর্তাব্যক্তি হয়। জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি পড়পড়তায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে স্বরাজ (self government) প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পারে না।"

দুঃখ ও অসহায়ী স্ত্রী ও পুরুষদের অধিক সন্তান পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা এই সকল দুর্ঘটনার একটি মূল কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[১৪]

ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা আসে; তাহারই প্রতিচ্ছায়া সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের পথে দাঁড় করাইয়া দেয়। ষোড়শ শতকের প্রথম অংশের কবিদের অধিকাংশই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং নিজস্থানীয় ছিলেন। পরবর্ত্তী কবিদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব মহান্তের শিষ্য ছিলেন। ইহাঁদের উপজীব্য বিষয়ও ছিল শ্রীচৈতন্য অথবা তাঁহার ভক্তদিগের জীবনী অথবা রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। এই কারণে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রধানতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য বলিলে কোনও দোষ হয় না।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধ : বৈষ্ণব গীতিকাব্য

ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যকে মূলতঃ এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) বৈষ্ণব গীতি-কাব্য, (২) শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তদিগের জীবনী-কাব্য, (৩) কৃষ্ণায়ণ বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য, এবং (৪) বিবিধ। প্রথমতঃ ষোড়শ শতকে প্রথম ভাগের বৈষ্ণব গীতিকাব্য লইয়া আলোচনা করিব।

বাঙ্গালার প্রাচীনতম নমুনা যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অর্থাৎ বৌদ্ধ চর্য্যাপদ, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে গীতি-কবিতা। তাহার পর প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ আর গীতি-কবিতা মিলে না। পরে পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে। এই তিন শতাব্দী ধরিয়া যে গীতিকাব্যের চর্চ্চা বন্ধ ছিল তাহা বলা চলে না। তবে এ কথাও ঠিক যে, পঞ্চদশ শতকের শেষে যে গীতিকাব্যের চর্চ্চা সুরু হইল তাহা প্রধানতঃ মৈথিল গীতি-সাহিত্যের প্রভাবে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির মৈথিল পদাবলীর অনুকরণে রচিত বলিয়া এই সকল পদের অধিকাংশই ব্রজবুলি অর্থাৎ মিশ্র মৈথিল এবং বাঙ্গালায় রচিত। আর এই নব্য গীতি-সাহিত্যের বিষয়বস্তুও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে শ্রীচৈতন্যের জীবনীও এই সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

এই বিষয়ে অধিক আলোচনা গ্রন্থান্তরসাপেক্ষ বলিয়া এখানে অন্য কথাতেই সারিলাম। এইবার ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধের প্রধান প্রধান গীতিকবিদিগের কিছু কিছু পরিচয় দিতেছি। ষোড়শ শতাব্দীর গীতিকবিদিগের সংখ্যা এক শতের ন্যূন হইবে না, সুতরাং সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। আর সকল কবির কাব্যও যে সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হইবে তাহাও বলা চলে না।

[১৫]

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম যে ব্রজবুলি পদটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভণিতায় 'ঘনোরাজ খান'-এর নাম আছে। ভণিতার ত্রিপদীটিতে গৌড়াধিপ 'হুসন'-এর নাম আছে। এই 'হুসন' সুলতান হোসেন শাহ ব্যতীত আর কেহ নহেন। সুতরাং পদটি হোসেন শাহের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। হোসেন শাহ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পদটিও তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।

গৌড়েশ্বরের উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, কবি গৌড়ের সুলতানের কর্ম্মচারী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত রামগোপাল-দাসের শ্রী শ্রী রা ধা কৃ ষ্ণ র স ক ল্প-ব ল্লী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ঘনোরাজ খান শ্রীখণ্ডনিবাসী বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তি ছিলেন[১]; সম্ভবতঃ ইনি গৌড়ের সরকারে কর্ম্ম করিতেন।

পদটি এই রামগোপাল-দাসের পুত্র পীতাম্বর-দাস প্রণীত র স ম ঞ্জ রী[২] গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য কোথাও পাওয়া

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩১ সাল, পৃঃ ১১৭।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

যায় নাই। মুদ্রিত রসমঞ্জরীতে যে পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে কিছু কিছু ভুল আছে। নিম্নে সংশোধিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আর পয়োধর গোর।
হিম-ধরাধর কনক-মুকুর
কোলে কিয়ল চোর।
মাধব কুচ হরল কাহে।
মাধব পদ-আধি কমল[১] মুদল
রহিয়ে কেহনী মাহে।
আহিনে লোচন কাজরে রঞ্জিত
বয়ল বহল ধায়।[২]
নীল বয়ল কমল বুঝলেও
চাঁদ পুরল কায়।[৩]
বিধু হুসব[৪] জনত-দুখল
সোই ইহ চল জান।[৫]
পক্ষ সোঙরেও[৬] রোপ পুরন্দর
ভরে ভরাস-খান।[৭]

[১৬]

রামানন্দ-রায়ের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি সুবিখ্যাত ব্রজবুলি পদটি[৮] একটি প্রাচীন ব্রজবুলি পদ। ইহার ভণিতায় নরাধিপ (প্রতাপ-) রুদ্রের উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় পদটি তাঁহাকে শোনান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় যে, এই পদটি খ্রীষ্টীয় ১৫০৪ হইতে ১৫১১ সালের মধ্যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। রামানন্দ-রায় উড়িষ্যা ছিলেন, সেই জন্য এই পদটি প্রকৃত প্রস্তাবে 'উড়িয়া' ব্রজবুলির পদ। কিন্তু মহাপ্রভু এই পদটিকে আস্বাদন করিয়া অমরতা দান করিয়া গিয়াছেন। নতুবা পদটি কোন্ কালে লুপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যে এই পদটির একটি বিশেষ স্থান আছে। পদটি সুপরিচিত বলিয়া আর এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না।

[১৭]

শ্রীচৈতন্যের একজন মুখ্য ভক্ত ছিলেন মুরারি-গুপ্ত। ইনি সংস্কৃতে মহাপ্রভুর একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। বইটির নাম শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত হইলেও ইহা মু রা রি-গু প্তে র ক ড়চা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইটিই শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক।

ইহার পূর্বে মুরারি-গুপ্ত বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলিতে কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন।* এইরূপ পদের সংখ্যা সাত আটটির বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে দুইটি পদ অত্যন্ত চমৎকার, সে দুইটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতা-গুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পদ দুইটি যদিও প দ ক ল ত রু তে সংগৃহীত আছে তথাপি কি বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক কি সাধারণ পাঠক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। নিম্নে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথম পদটি সখীদের প্রতি রাধার উক্তি, দ্বিতীয় পদটি প্রবাসস্থ কৃষ্ণের নিকট দূতীর উক্তি কিংবা রাধারই স্বগত উক্তি।

সখি হে বিহির আপন নহে যার।
পরকে কহিয়া যে আপনা খাইনু রে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইলাঁ
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মুঞি লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
গোরু-বিথার জলে এ তনু ভাসাইনু
কি করিবে কুলের কুকুরে।

১। কীর্তনগীতরত্নাবলী-ধৃত পাঠ। মূলে 'করিল'।
২। কীর্তনগীতরত্নাবলী-ধৃত পাঠ। মূলে 'হল কয় যায়'।
৩। কীর্তনগীতরত্নাবলী-ধৃত পাঠ। মূলে 'কমল দুই চাঁদ'।
৪। কীর্তনগীতরত্নাবলী-ধৃত পাঠ। মূলে 'পূরল কত কোটি কাম'।
৫। মূলে 'জনম'।
৬। কীর্তনগীতরত্নাবলী-ধৃত পাঠ। মূলে 'সোর এহন জান'।
৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৯ সংখ্যক পুথিতে 'ভরে ভয়হরণ খান'।
৮। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। পদকল্পতরু ৩৭৬ সংখ্যক পদ।

---

* তদা চ কৃতবান্ বৈদ্য গীতমধ্যাস্তরংপরম্।
ঐবিষ্ণুং ধর্ম বাঙ্গালি শ্লোকে যত্ন তে হরেঃ স্মৃতা।
তথা গীতং পরিত্রাণা দুষ্ক শ্লোকং হরেঃ পরম্।
তদ্ভুত্বা প্রাহ তং বেদঃ বিস্ময়েন বিবশঃ সুধীঃ।
মুরারি-গুপ্তের কড়চা, দ্বিতীয় প্রক্রম, চতুর্থ অধ্যায়, ২২-২৩ শ্লোক।

যাইতে উইতে ঘাটে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি-গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
হয় বা কি তিন লোকে পায়।১

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি সত্য সত্যই অপূর্ব। আমার মনে হয় অর্থ-গৌরবের জন্যই এই চমৎকার পদটি সাহিত্যরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

কি হার পিরীতি কৈলা কাঁহারে মরিয়া গেলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল তাই।
কহিলে কহিব কি সোঙাইব কত দিন
সদা ঝুরে বিছুরা বাঘাই।
দুঃ দিন এক হৈতি আলি আইলা মুরারিতে
সে কেমনে রহে অযোগানে।
জানে সে পরাণ সুখ নিজাইল বাসো বেরু
ঘাট আসি চাহে পরাণে।
বুঝিনায় উদ্দেশে সাকারে পিরীতি তোরে
ধ্যান-ধারণা বন্ধু বৈরী হয়।
হায় সাখী পদ ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়।
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে সোঢ়াইলা
করিলা দূরহ বন্ধু জাতি।৩
শুন কহে একবাসে বিলম্ব ছাড়িল দেশে
নিশানে রহিল বন্ধু-বাতি।৪,৫

[১৮]

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন। ছাড় দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ইঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। ইনি একজন ভাল পদকর্তাও ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পদ পরবর্তীকালে 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। নরহরি-সরকারের ধর্ম ও সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।৬

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি প দা মৃ ত স মু দ্রে এবং অন্যত্র একটি পুঁথিতে নরহরির ভণিতায় আছে। পদটি পরবর্তী কালের পুঁথি এবং গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় পাওয়া যায়। প দা মৃ ত - স মু দ্রে নরহরি-চক্রবর্তীর কোন পদ থাকিবার কথা নহে এবং নাইও। সুতরাং প্রাচীনতম গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে ইহা নরহরি-সরকার মহাশয়েরই রচনা বটে।

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি দুরে সুদাঁকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
খাইতে সোয়াথ নাই নিদ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে।
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু-প্রেম শেল।
নবীন পাউখের জীব মরল না জানে।
জল-অনুরাগে চিত্ত থৈরজ না মানে।
আগুনে পিরীতি মোর বিষমে ত সার।
কহে নরহরি ঘুচি পড়িনু পাথার।৮

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি সং কী র্ত না মৃ তে আছে। এই গ্রন্থে নরহরি-চক্রবর্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, সুতরাং পদটি নিঃসন্দিগ্ধরূপে সরকার-ঠাকুরের রচিত। পদটিতে 'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত একটি পদের সুর বিলক্ষণ অনুসৃত হয়।

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
যে দিনে দেখিব নাগর নয়নে
কহে কার দুখ কথা।
কোন দিবিধি কোন ছুরে মোর
ভাঙ্গিব আপন মাথা।

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৭১।
যে বাতি এক দৃষ্টে বলিয়া থাকিবে, অর্থাৎ সুদূরে প্রবাস।
৩। অর্থাৎ আমার এইরূপ মনে হইতেছে।
৪। অর্থাৎ বন্ধুবন্ধুর বিনা চন্দ্রের কথা কহিলে। চন্দ্র যেমন এক পক্ষ ধরিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার পরপক্ষেই আবার ক্ষয় পাইতে থাকে, সেইরূপ পূর্বে তুমি আমাকে (বা রাধাকে) স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া এখন বিরহে শোষাইতেছ।
৫। অর্থাৎ এক বাসের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল অর্থাৎ নিরুদ্দেশে বিদেশ হইল; আর নিশানে অর্থাৎ চোখের পরিচয়ের অবাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঁচার সঙ্কট অবস্থার অবাবস্থা পড়িলে রোগীর জীবনের আশঙ্কা থাকে। এই উৎপ্রেক্ষাটি হইতে বুঝা যায় যে কবি বৈদ্য ছিলেন।

৬। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৩৮৯।
৭। নরহরি সরকার ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ, ১৩৩০ সাল; শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩০ সাল।
৮। পদামৃতসমুদ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১৭।

যাহার লাগিঞা সব ছোড়িলুঁ[১]
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন পরাণ সব তার জন
যা বা কি আমারে সয়।
কহে বাসুদেব তার সে মুরতি
কারে বা করিহ রোষ।
কাহ গুণনিধি বিলাওল বিধি[২]
আপন করম দোষ।[৩]

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচয়িতৃদিগের মধ্যে নরহরি অন্যতম, এবং বোধ হয় প্রাচীনতম। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত পদটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

গৌরলীলা গুণগানে ইচ্ছা বড় হয় মনে
তাহার লিখিতা সব জানি।
মুঞি ছো অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
লক্ষিতে কিবা আছে বল।
তাহার জন্মিব হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
তবে যাহা পুরাবেন পঞ্চ।
গৌরলীলার-লীলা আছিল কাহারে শিলা
তার সাক্ষ করিবে বর্ণিত।
নরহরি লিখেন যদি নিজগুণ নিরবধি
আর সনাতন পরকাশ।
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে সবের দুখ
গ্রন্থ গানে বর্ত্তিবে শিলা।[৪]

[১৯]

গোবিন্দ-ঘোষ, মাধব-ঘোষ এবং বাসুদেব-ঘোষ, মহাপ্রভুর ভক্ত এই তিন ভাইই পদকর্ত্তা এবং সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে পদকর্ত্তা হিসাবে বাসুদেবই বিখ্যাত। ইঁহার প্রচলিত পদগুলির সংখ্যা আশীর কাছাকাছি। অপর দুই ভাইয়ের রচিত পদের সংখ্যা দশ বারোটির বেশী হইবে না।

বাসুদেব-ঘোষের সব পদগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদগুলিতে বাস্তব বর্ণনা থাকার জন্য সত্য সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। বাসুদেবের রচিত গানগুলির সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠপাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।[৫]

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে বাৎসল্যরসের একটি অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ধিরি ধিরি মায়ের পুথায়।
কখনে কখন ঝিনা ধরে লুকায়।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চাহে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে।
বাসুদেব-ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা।[৭]

নিম্নে উদ্ধৃত গোবিন্দ-ঘোষের পদটি অত্যন্ত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

ছেলে যে নবীনাথানী আর দুধ চাও।
বহু পসারিয়া গোয়ালিনীরে ফিরাও।
ক্ষীরসরে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে খাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।
কি খেলা খেলায় হায় কি খেলা খেলায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস।
কাদয়ে ভকতগণ ঝুরে নদীয়া।
পাষাণ গোবিন্দ-ঘোষ না যায় মিলিয়া।[৮]

[২০]

মালাধর-বসুর পৌত্র (?) কুলীনগ্রাম-বাসী মহাপ্রভুর ভক্ত রামানন্দ-বসুর লিখিত কতকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ আছে। নিম্নে রামানন্দের রচিত একটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। মূলে 'ছোড়িনাঞ'। ২। মূলে 'খায়'। ৩। মূলে 'বিধি বিলাওল'। ৪। সংকীর্ত্তনামৃত, পদসংখ্যা ৩৯১। ৫। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১-১২।

৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ।
পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১১৪১।
৮। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৩২২।

তোমারে করিতে সখি কলঙ্ক কারিনী।
সাধে লোক মাঝে মোর হত ছারখারি।
পাছে মোর মনের যে তিলি বিন্দি রহিবে
নিজে হয়ে বাহির কদম।
যে-বরণ এক পুরুষ আসিয়া মো
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।
বসি সুমধুর বোল পুন পুন সেই কোল
লাজে মুখ রহিনু মোড়াই।
আপনা করয়ে পর সব মাঝে প্রেমধন
বলে কিন মাহিক বিকাই।
ঐছি চাঁদু চারি কাঁপিছে কাঁপিছে সখি
যে দেখিনু সেই এই মতি।
সে মোর হৃদয়ে রহে মোর
কহিলে কে বুঝে পরতীতি।
কিবা সে মধুর বাঁশী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কত রস রামানন্দে আনন্দে আছিল নিশে
কেন বিধি চিরাইল তায় ॥১০

এই পদটির একটি বিস্তৃততর সংস্করণ জ্ঞানদাস[১] এবং বলরাম-দাসের[২] ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু পদ দুইটি তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, রামানন্দের ভণিতাযুক্ত রূপটিই প্রাচীনতর এবং (আমার মতে) সুন্দরতর। জ্ঞানদাস এবং বলরাম-দাসের পূর্ব্ববর্তী কবি হইতেছেন রামানন্দ-বসু। সুতরাং ইঁহার পদ যে পরবর্ত্তী কোন কবির হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

[২১]

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কুলিয়াপাহাড় গ্রামনিবাসী ছকড়ি চট্ট ও চন্দ্রকলার পুত্র বংশীবদন মহাপ্রভু অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে বংশীবদন কিছুকাল ধরিয়া (বোধ হয় বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জীবৎকাল অবধি) শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অভিভাবক হিসাবে নবদ্বীপে থাকিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি বিষগ্রামে নিজের বাস উঠাইয়া লইয়া যান।

বংশীবদন একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি বংশী এবং বংশীবদন এই দুই ভণিতাই ব্যবহার করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক শিষ্য বংশীদাসও পদকর্ত্তা ছিলেন, ইঁহার পদ কতকগুলি বংশীবদনের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দুই কবির পদ পৃথক্ করিয়া লওয়া দুষ্কর নহে। বংশীবদনের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বংশীবদনের প্রায় সব বাঙ্গালা পদগুলিই এইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। পদটি শচীদেবীর উক্তি। ইহাতে প্রত্যক্ষদর্শীর মনোভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

আর না হেরিব সুন্দর কপালে
অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন-খঞ্জন-নাচ।
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত চাতক লৈয়া।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাইয়া।
হায় কি গৌ-ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই কহিয়া ডুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই।
নিমাই কেশব ভারতী আসিয়া
আমায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে
ধরিব মহীর-মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌররায়।
শচীর-দুলাল বোলব বলিয়া
কারী পড়াপড়ি যায় ॥১১

[২২]

শ্রীখণ্ডের নরহরি-সরকারের শিষ্য লোচন বা লোচন-দাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইঁহার শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য ম ঙ্গ ল একটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। পদকর্ত্তাদের মধ্যেও ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার কবিত্বশক্তি কিরূপ উচ্চস্তরের ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে বুঝা যাইবে।

১। অর্থাৎ সত্য। ২। পাঠান্তর 'আনন্দে আছিনু নিশে কি লাগি চিরায় বিধাতায়'। ৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৮৬। ৪। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৮৬। ৫। পদকল্পতরু।

৬। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৮৫৫।

অধিয়া অধিয়া কেবা　　বরণী তুলিল গো
তাহাতে পশিল গোরা-বেশ।
জগত হাসিয়া কেবা　　জল ঝিলাড়িল গো
এক কৈল সুখার সুখেই॥
অমৃত-পীযূষ-ধারা　　কেবা আটাইল গো
সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি বান্ধিয়া কেবা　　দেখি তুলিল গো
প্রেম বাসো গোরা-অঙ্গখানি।
অনুরাগ অধিখানি　　প্রেমের সানন দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মধু　　মধু মধু কথা গো
হাসিয়া বোলয়ে মিটি মিটি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা　　গাখানি মাজিল গো
তাহে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা　　চিত্র বিচিত্রিত কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমা-চাঁদে　　বিকল হইয়া কাঁদে
মুখ-পদ্ম-পরাণের গন্ধে।
ভুরিটি নাথের ছটা　　জগত আলা কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের অন্ধ॥
এমন বিনোদ রূপ　　কোথাও না দেখি গো
অপরূপ প্রেমার বিনোদ।
পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে　　কাঁদিয়া আকুল গো
নারী কেহনে প্রাণ ধরে॥
সকল রসের সার　　বিধাতা হৃদয়খানি
কে না গড়াইল রস দিয়া।
নয়ন বাটিয়া কেবা　　নয়ন গড়িল গো
যিনি ভাবে সো প্রভু কাঁদিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক জানি　　সোনার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপ হত　　ভুলের ভাজিনী গো
সু হাথ করিতে চাহে পাখা।
রঙ্গের অধিরখানি　　নানা রস দিয়া গো
গড়াইল বড় অনুরূপে।
লীলার বিলাসকলা　　ভাবে অভিলাষী গো
নয়ন যোর ভাবি কলপে।
যা চাহে আঁখির কোণে　　সবাই সভার মনে
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি　　সুখের লালস গো
আলসল অনুরাগ গায়।

পুলকবলী তুল ঘাড়ে　　পদ্মু যায় উত-মতী
ঘন গায় অমৃত-পাথও।
ধূলায় লোটা কা কাঁচে　　কেহো খির নাহি বাঁধে
গোরা-গুণ অধিয়া অখণ্ড।
নাগরে নাগরে বলি　　প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহো নাচে অট্ট-অট্ট হাসে।
পুলকিলা ত্রিভুবন যদু　　সে রোসে সকল ঘাট
গোরা-গুণ-রসের বাটারে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র বিধা　　ধ্যান ধরে রাত্রি দিবা
গোরা-রূপে লাগি সেন ধাঁধা।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি　　ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি
সদাই গৌরবে ভোরা ভোরা।
নদিয়া-বিলাস বাড়ি　　প্রেম-অভিলাষী গো
অনুরাগে ভাসা দুটি আঁখি।
রাধার যোগনে দিয়া　　যেকত না হয় গো
এই গোরা-তনু তার সাখী।
দেখরে দেখরে লোক　　হেন প্রেমা অপরূপ
ত্রিজগতনাথ-নাথ হৈয়া।
অধিকন ধন সঙ্গে　　কি জানি কি ধন মাগে
কি না সুখে বৃন্দার নাচিয়া।
ওরূপ ওরূপ রস　　হেন প্রেমরসায়ন
ভাসি গিলাইল মোহারে।
নিজ্জীবে জীবন পাইল　　পদ্মু পিরি চিলাইল
আনন্দে লোচন-বাসে গায়॥১

লোচনের অনেকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি পদকল্পতরু প্রায় সকল পুঁথিতেই এবং পদরত্নাকর, পদরসসার প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে লোচনের ভণিতাতেই পাওয়া যায়, তথাপি দুই একটি অর্ব্বাচীন পুঁথির জোরে এবং 'চণ্ডীদাস' নামের মোহে এই পদটি 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চালানো হইতেছে। ছন্দের এবং ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা লোচনের পদ বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। লোচনের ভণিতাটিও পদটির ভাব এবং ভাষার সহিত খাপ খায়।

সজনি ও-ধনি কহ কে বটে।
গোরোচনা-গোরী　　নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু বাটে॥

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১২৯। পদটি শ্রীচৈতন্যবন্দনার অন্তর্গত আছে। ২। ইহার পর পদকল্পতরুর দুই একটি পুঁথিতে এই দুইটি অতিরিক্ত মিলনী পাওয়া যায়—

লোচন ধামালী পদের সৃষ্টিকর্তা যদিও না হন তথাপি এই ছন্দের একজন আদি কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত ধামালী পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ কথাভাষা, অনেক সময় ইহা গ্রাম্যত্বের কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। নিম্নে লোচনের একটি ধামালী পদের উদাহরণ দিতেছি।

অরুণপুরে কমলাকর
ঘরে৷ নবী বধূ।
গীত শুনিয়া চেট আসিয়া
বাখিল যোগার পায়।
যৌন-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠিল বিষম ঘাতি।
জাবকর্ণ যোগবর্ণ
তপ ছাড়িল যতি।
জনে জনে ৩ কতজনে
দিয়ে ছলে৷ সার।
সে যে জল সুধাকূপ
ঠাঁয় নাহিক পার।
জল ভাঙ্গা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
ছলের ধারা ৪ ঘটল পারা
বহিছে জগত আঁধা।
জল জলে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
পাইলে ছয় দেখিলে নয়ে
কহিলে কেবা জানে।
বিষম সেবা লইয়া যেবা
আপনা ধারে যে।
লোচন বলে অবহেলে
যৌর পাবে সে ৫০

লোচনের অনেকগুলি সাধনসঙ্কেতজ্ঞাপক পদও 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

৩। বিদ্যাবিলাস।

---

*সিনিয়া গাঁথিতে বিনোদচূড়িতে
পড়িছে চিকুর-রাশি।
কাঁকিল কাঁকা৷ কনক-চাঁপার
পরশ লইল আসি।
কিবা সে মুকুতি শঙ্খ জলমতি
সব দূর পরিহরি।
আছিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া ইন্দু বেলা।
চলে নীল শাড়ী বিথারি বিথারি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর।
এ সব লোচন কহয়ে বচন
শুন হে নাগর-চান্দা।
সে যে কুলবতী রাজার যুবিবী
নাম বিনোদিনী রাধা ৪২

শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে বলি আনিহ রা।
যমুনার তীরে যদি যায় নীরে
পাতের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করায়ে আসন
আলতা দিয়াছে কেটি।
ইত কুচযুগে প্রেমরস লোগে
সুমেরু-শিখর জানি।

প্রথমে 'লয়নি' সংশোধন করিয়া তাহার পরই 'সুবল সাঙ্গাতি'-কে সংশোধন করা অসঙ্গত বটে। বক্তব্যটি সম্ভবতঃ পৌর্ণমাসী হইবেন।

১। 'আইলাই' পাঠান্তর।

২। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১০। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বহুগুলি পুথি অবলম্বন করিয়া পরিষৎ-সংস্করণ পদকল্পতরু সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কেবল একটিতে নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতি পাওয়া গিয়াছে, অপর সব গুলিতেই লোচনের ভণিতি আছে।

"কহে চণ্ডীদাসে বাওলী আদেশে
শুন হে নাগরচান্দা।"

বিজ্ঞান-জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'নিউট্রন' রশ্মি

এতদিন আমরা 'এক্স-রে' এবং রেডিয়াম ধাতুনিঃসৃত গামা-রশ্মির সাহায্যে আলোর পথে অবরুদ্ধ পদার্থ ভেদ করিয়া চলিবার অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কিছুদিন হল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ ডাঃ লরেন্স ও ডাঃ টাল্‌বট লিভিংষ্টোন্ এক প্রকার অভিনব রশ্মির সন্ধান পাইয়াছেন। এই রশ্মি নূতন আবিষ্কৃত 'নিউট্রন' কণিকা হইতে উদ্ভূত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অভিনব রশ্মি দ্বারা অপর পাতলা ধিনিস ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু ভারী ও শক্ত ধিনিস অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা দামী গ্যাস 'হাইড্রোজেন' এই নূতন রশ্মির পক্ষে এক প্রকার অভেদ্য বা দুর্ভেদ্য, কিন্তু এক টুকরা পুরু সীসার পাত সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। জৈব-রাসায়নিক ক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগ-উপযোগিতা সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা গিয়াছে মাত্র। এই রশ্মি সেকেণ্ডে ৫০,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে।

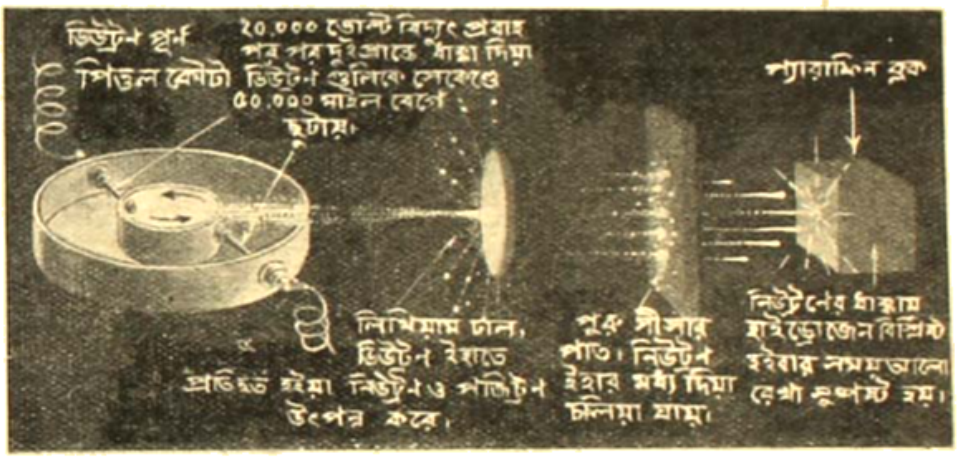

নিউট্রন রশ্মি।

প্রায় বছর দুই আগে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরীতে 'লিথিয়াম' পরমাণু ভাঙ্গিতে গিয়া 'নিউট্রন' কণিকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিউট্রন আবিষ্কারের পূর্ব্বে 'প্রোটন' ও 'ইলেকট্রনের' সমবায়ে পরমাণু গঠিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই নূতন কণা ঠিক একটি 'হাইড্রোজেন'-পরমাণুর মত 'প্রোটন' ও 'ইলেকট্রনের' সমষ্টি। ইহার ভার এক এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎবেগশূন্য। বস্তুতঃ 'হাইড্রোজেন' ও 'নিউট্রনের' উপাদান অভিন্ন। প্রথমটি জল, দ্বিতীয়টি কণা, এই মাত্র প্রভেদ। 'নিউট্রনের' সহিত অণুর তুলনা আরও এক প্রকারে কৌতূহলোদ্দীপক। দুইটি অণুকে বহুদূর ইহা কাছে আনিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈদ্যুতিক আবেশশূন্য বলিয়া দুইটি 'নিউট্রন'-কণিকা বহুদূর ইহা কাছে আসিতে পারে। ফলে এতদাকার কতকগুলি 'নিউট্রন' পাশাপাশি জোড়া হইলে তাহার ঘনত্ব হইবে জলের তুলনায় ১০১০ কোটি। এত ভারী জিনিষ ইতিপূর্ব্বে মানুষের করতলগতও আসে নাই। এতদ্ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে আরেকটি নূতন কণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এণ্ডারসন ইহার নাম দিয়াছেন—'পজিট্রন'। ইহা ধনতড়িৎযুক্ত 'ইলেকট্রন'-কণিকা। আণবিক গবেষণাক্ষেত্রে 'ইলেকট্রন' কেবল ঋণতড়িৎযুক্ত কণিকা বলিয়াই পরিচিত ছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে, 'ইলেকট্রন' ধনতড়িৎযুক্তও হইতে পারে। ইহাই 'পজিট্রন'। এক একটি পরমাণুর মধ্যে এক বা একাধিক 'প্রোটনকে' কেন্দ্র করিয়া এক বা একাধিক 'ইলেকট্রন' ঠিক যেন সৌরজগতের গ্রহাদির মত অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই এক একটি পরমাণুর সমষ্টি হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পরমাণুর মধ্য হইতেই 'নিউট্রন' রশ্মির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব রশ্মি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ক্যালিফোর্নিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ এক বিরাট চুম্বক তৈয়ারী করিয়াছেন। এত বড় চুম্বক এপর্য্যন্ত আর কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয় নাই। চুম্বকটি লম্বায় মানুষের সমান উঁচু এবং ওজনে প্রায় ৫০ খানা মোটরগাড়ীর সমান। এই বিরাট চুম্বক একটি খাড়া ধরণের উনুন দ্বারা বেষ্টিত। চুম্বকের উপরাংশ ও নিম্নাংশের মধ্যস্থলে একটি গোলাকার পিতলনির্ম্মিত বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্র প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রের মধ্যে কৃত্রিমভাবে 'নিউট্রন'-কণিকা প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রায় বছর দুই হইল বৈজ্ঞানিকেরা একপ্রকার নূতন হাইড্রোজেন-পরমাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। এই অভিনব পরমাণুর ওজন সাধারণ 'হাইড্রোজেন' পরমাণুর দ্বিগুণ। রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, হাইড্রোজেন লঘুতম পরমাণু এবং ইহার ওজন 'এক' ধরা হয়। কোনও একটি মৌলিক পদার্থের যাবতীয় পরমাণু যে সমান ওজনের হইবে এরূপ বলা চলে না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে বিভিন্ন আণবিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক পদার্থ একরূপে একই ঘর অধিকার করিয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ সীসার সহিত রেডিয়াম-বি, রেডিয়াম-ডি, এবং একটিনিয়াম-বি প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলির একত্র অবস্থিতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে—আইসোটোপস্ (Isotopes)। অক্সিজেনের সকল পরমাণুর ওজন সমান নয়—কাহারও ওজন ১৬, কাহারও বা ১৭। অক্সিজেন-

পরমাণুর তড়িৎ সাধারণ পরিচিত ওজন ১০, তথাপি ইহা ১৯, ১৭, ১৮ পর্যন্ত হইতে পারে। হাইড্রোজেন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এতদিন এই অভিমত অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এক ওজনবিশিষ্ট প্রতি চারিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি দুই ওজনবিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ইহার স্থায়ী নাম নির্দ্ধারণ করেন নাই। আবিষ্কারক ইহার নাম দিয়াছেন—Deotron অথবা Deuton. বৈজ্ঞানিক হালডেন এই নূতন পরমাণুকে Diplogen নামে অভিহিত করিতে চাহেন। এই নূতন হাইড্রোজেন-পরমাণু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবে। ভৌত জগতের হাইড্রোজেন পদার্থসমূহের অন্যতম প্রধান উপাদান, সুতরাং এই ভারী হাইড্রোজেন যে ভৌত জগতের ও অন্যান্য বিষয়ে একটা ওলটপালট ঘটাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত 'নিউট্রন'-রশ্মি উৎপাদনে এই অভিনব হাইড্রোজেন-পরমাণু ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 'ডিউট্রন'-পরমাণু প্রধানতঃ তড়িৎবেগযুক্ত নিউট্রন ও ধন-তড়িৎযুক্ত প্রোটন-কণিকায় সজ্ঞানে গঠিত। ভৌতজগতের অন্য এই 'ডিউট্রন' পরমাণুগুলিকে ১০,০০০ ভোল্ট তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে অনবরত ঘূর্ণিবেগে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বায়ুশূন্য 'নিউট্রন'-পূর্ণ সিলিণ্ডার-আধারের দুই বিপরীত দিকে ২০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ পর পর অতিদ্রুত পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিলে এই হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি যখন প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন উহাদিগকে এক বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পথে বাহিরে ছিটকাইয়া পরিচালনা করা হয়। 'ডিউট্রন'-পরমাণু ছিটকাইয়া বাহির হইবার পথে একখানি লিথিয়ম-নির্ম্মিত চাদরের উপর পতিত হয়। এই প্রবল বেগবিশিষ্ট 'ডিউট্রন'-পরমাণুর সহিত লিথিয়ম-কণিকার সংঘর্ষের ফলে পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া 'নিউট্রন'-কণিকা বাহির হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—'নিউট্রন' কণিকা তড়িৎবেগযুক্ত, কাজেই তাহারা যে কোন পদার্থের পরমাণুর ভিতর দিয়া তাহাদের তড়িৎবেগযুক্ত ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকার দ্বারা বিদ্যুতের বিকর্ষিত বা হইয়া অবলীলাক্রমে ছুটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি কোন কণিকার সহিত সোজাসুজি ধাক্কা লাগে তবে ইলেকট্রন হইতে ১৮০০ গুণ ভারী এই কণিকার কেন্দ্রীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া এদিক-সেদিক অথবা সামনে হইতে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন হইতে অনেক ভারী পদার্থ ছুটিয়া বাহির হইতে থাকে। লিথিয়ম-চাদরের মধ্য দিয়া ছিদ্র রেখে ছুটিয়া বাহির হইয়া এই কণিকাগুলি একখানি মোটা সীসার পাতের উপর পড়ে। নিউট্রন-কণিকার সহিত অন্যান্য কণিকাও ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু সীসার পাতের মধ্য দিয়া কেবল নিউট্রন কণিকাই ভেদ করিয়া যাইতে পারে, প্রোটন ইত্যাদি অন্যান্য কণিকা সীসার পর্দ্দা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। 'নিউট্রন' সীসার পর্দ্দা অতিক্রম করিয়া বিশেষভাবে বিরচিত ফুটুরীর মধ্যে স্থাপিত 'প্যারাফিন' খণ্ডের উপর পতিত হয়। 'প্যারাফিনের' মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। এই ফুটুরীর মধ্যে নিউট্রন 'প্যারাফিনের' উপর পতিত হইয়া হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয় এবং আলোকরশ্মিরূপে প্রতিভাত হয়। এতদিন পর্যন্ত অণুপরমাণু ভাঙ্গিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের আলফা-কণাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এখন অতি ক্ষুদ্রদন্তাত হাইড্রোজেন-পরমাণুর সাহায্যে অন্যান্য পরমাণু ভাঙ্গা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে। কারণ 'ডিউট্রন' অন্যান্য কণিকা অপেক্ষা অনেক ভারী এবং ঘনীয় শক্তির অনুপাতে ইহাদের ভার অপেক্ষাকৃত অধিক ভারী পাওয়া যাইতেছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নিউট্রন রশ্মি যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাইতে পারে। এই রশ্মিপাতে হাইড্রোজেনকে ভারীজলের পরিণত করা সম্ভব হইবে। এতদিন এলুমিনিয়মের উপর বিদ্যুৎকণ এই রশ্মি প্রয়োগ করিলে দেখা যায় তাহার আপেক্ষিক ওজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে 'নিউট্রন' কণিকাগুলি এলুমিনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকে বিদ্ধ না করিয়া তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়ে, কাজেই এলুমিনিয়মের ওজন বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত এই অভিনব রশ্মি চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রভূত আকর্ষণ করিবে আশা করা যায়।

কয়লার গুঁড়া হইতে গ্যাসোলিন

ভিনসেনের এক রাসায়নিক সম্প্রতি কয়লার গুঁড়া ও পচা ওক গাছপালা হইতে খুব সস্তায় 'গ্যাসোলিন' তৈয়ারী করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন। কয়লার গুঁড়া ও ওক গাছপালা (peat) হইতে 'গ্যাসোলিন' উৎপন্ন করিবার বিধির সুবিধাজনক কারখানা স্থাপন করিবার জন্য ১০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক পাখা

জার্মানি এঞ্জিনিয়র পল ওয়েলফোণ্ডার Paul Welfonder, সম্প্রতি এক ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক পাখা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা এত ক্ষুদ্র যে,

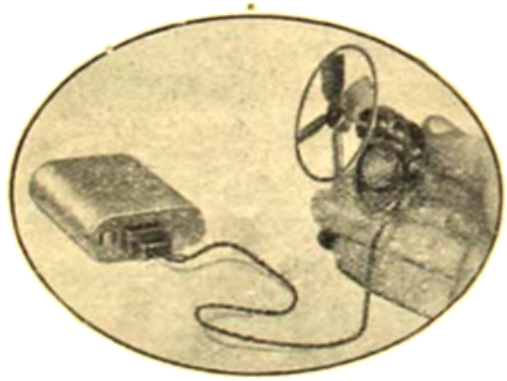

ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক পাখা।

অনায়াসেই পকেটে করিয়া যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যায় এবং সাধারণ একটী 'টর্চ-লাইটের' ব্যাটারীর সাহায্যেই চলিতে পারে। ইহা খেলনা নহে। পাখার মোটরটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত শক্তিশালী। এক মিনিটে ৯০০ ঘুরিতে থাকে। যে কোন অবস্থায়, যেখানে সেখানে এই মোটরচালিত পাখার সাহায্যে হাওয়া খাওয়া যায়।

অমৃত হইবার উপায় আবিষ্কার

অমৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কতকাল হইতে পাইয়া বসিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া দুষ্কর। হিন্দুর পুরাণগুলিতে যখন তখন অমৃত হওয়ার

কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতেও অদৃশ্য হইবার প্রসঙ্গ বিরল নহে। আলেফ লায়লা বা আরব উপন্যাসের তো কথাই নাই। এই সব কাহিনী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর অতীত হইতেই মানুষ নিজেকে অদৃশ্য হইবার একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছে। আকাশে চড়িবার আকাঙ্ক্ষার মানুষের মনে অতীত যুগ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহার ফলেই রোম এর পুনরুদ্ভব, পাখী, প্লেন,

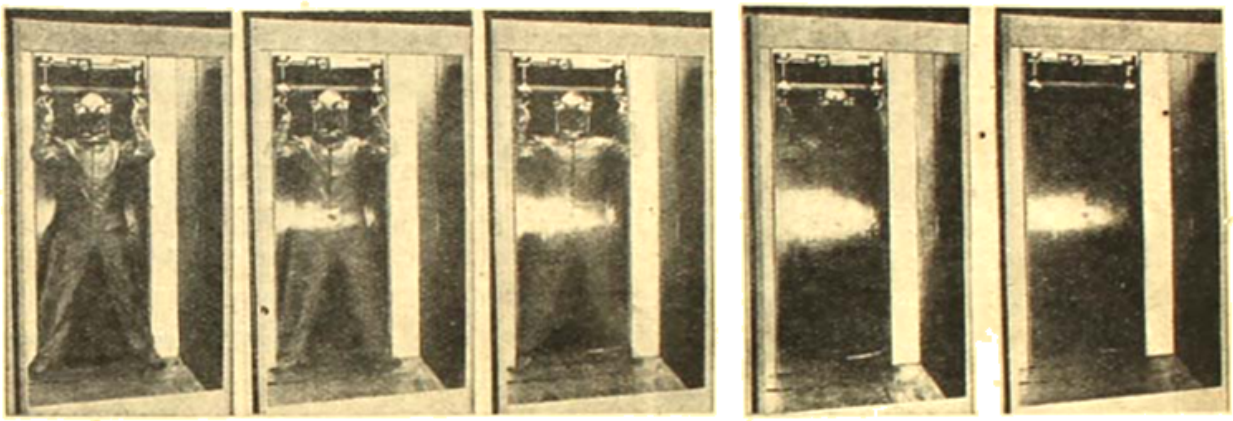

প্রথম চিত্রে অদৃশ্য পোষাক পরা মানুষটি অদৃশ্য হইবার জন্য উপরে দুইটি তড়িৎ প্রাপ্ত ধরিয়া আছে। দ্বিতীয় চিত্রে দুইটি টিপিয়া তড়িৎশক্তি প্রেরণ করা হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রে নীচের দিক হইতে মানুষটি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। চতুর্থ চিত্রে নীচের দিক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পঞ্চম চিত্রে মানুষটির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে।

হেলেকপ্টার, রেডিও প্রভৃতি কল্পনার মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে এক্সরে, ডিথিজিমল্, রাইডার প্রভৃতির আবিষ্কারে মানুষের সেই সাধ অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অদৃশ্য হইবার উপায় এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। জড়বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে প্রকৃতির এ গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে আশা করা অসঙ্গত নহে। সম্প্রতি এক ইংরেজ আবিষ্কারক বহুদিন গবেষণার ফলে অদ্ভুত এক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে অবাধেই মানুষকে অদৃশ্য করা যায়। আবিষ্কারক প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার এই অদ্ভুত যন্ত্রের পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কি উপায়ে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হয়, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই।

যে ব্যক্তি অদৃশ্য হইবে তাহাকে একটি অতিরিক্ত পোষাক পরিধান করিতে হয়। বিজ্ঞানসম্মত এই অদ্ভুত পোষাকটি পরিলে তাহাকে ঠিক একটা ডুবুরীর মত দেখায়। সম্মুখভাগ খোলা আলমারীর মত একটি বাক্সের মধ্যে এই অবস্থায় মাথার উপরে দোলনের দুইটি বৈদ্যুতিক প্রান্ত দুই হাত দিয়া সে ধরিয়া দাঁড়াইলে দুইটি টিপিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটি আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করে অর্থাৎ দর্শকের চক্ষে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকে। প্রথমে পায়ের দিক অদৃশ্য হইতে হইতে উর্দ্ধদিকে মাথা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। লোকটি দর্শকদের চক্ষুর সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে সেই অবস্থাতেই থাকে। অদৃশ্য লোকটি ঠিক সেই স্থলে সেই অবস্থায় থাকে কিনা তাহা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিবার জন্য আবিষ্কারক তখন দর্শকদিগকে আহ্বান করেন এবং লোকটিকে দেখিতে না পাইলেও হাতড়াইয়া তাহার পূর্বস্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যান। অনেক সময় মানুষের চোখ যাহা ধরিতে পারে না ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা তাহা অনায়াসেই ধরিয়া ফেলে। এই অদৃশ্য হইবার প্রক্রিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ক্যামেরার সাহায্যে পর পর অনেক ছবি তোলা হইয়াছে, কিন্তু ফটো-প্লেটে অদৃশ্য ব্যক্তির কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। এখানে এই প্রক্রিয়ার কয়েকখানি ফটোগ্রাফের অনুলিপি প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই অদৃশ্য হইবার প্রক্রিয়ার ক্রমপরিণতি উপলব্ধ হইবে।

প্রবল তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে কুয়াসানিবারণ

শীতকালে আমাদের দেশে সময় সময় প্রবল কুয়াসা হয় যে, ১৫।২০ হাত দূরের জিনিষও দৃষ্টিগোচর হয় না এবং যানবাহন, বিশেষতঃ নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি পরিচালন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যখন এই অবস্থা তখন শীতের দেশের তো কথাই নাই। সে সব দেশে অনেক সময়েই কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই সময়ে এরোপ্লেন প্রভৃতির ভূমিতে অবতরণ বা আকাশে প্রভৃতির বন্দরে আগমন অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলে উচ্চতানের বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন করিলে কুয়াসা ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে ভূমিতে পড়িয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রবল তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনা করিয়া অন্ততঃ তিন মাইল পরিমিত স্থানকে কুয়াসামুক্ত রাখিবার জন্য আমেরিকায় সম্প্রতি এক বিরাট তড়িৎ-যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ১০০ ফিট উঁচু বিরাট স্তম্ভের উপর হইতে বায়ুস্তরে ৩ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করিয়া বায়ুমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে কুয়াসামুক্ত করিয়া রাখিবে। এই স্তম্ভের উপরে

১২ ফুট চওড়া 'ট্রান্সফরমার' ইন্ডিয়ুক্টর সাহায্যে ১০০০০ ভোল্ট ইন্ডিয়েশ্বরকে ৪০০,০০০ ভোল্টে পরিণত করিয়া ধনইন্ডিয়েশ্বরে বায়ুমণ্ডলে ঊর্দ্ধে দিকে পরিচালনা করা হয়। ৬ মাইল হইতে ১২ মাইলের মধ্যে এই বিদ্যুৎ

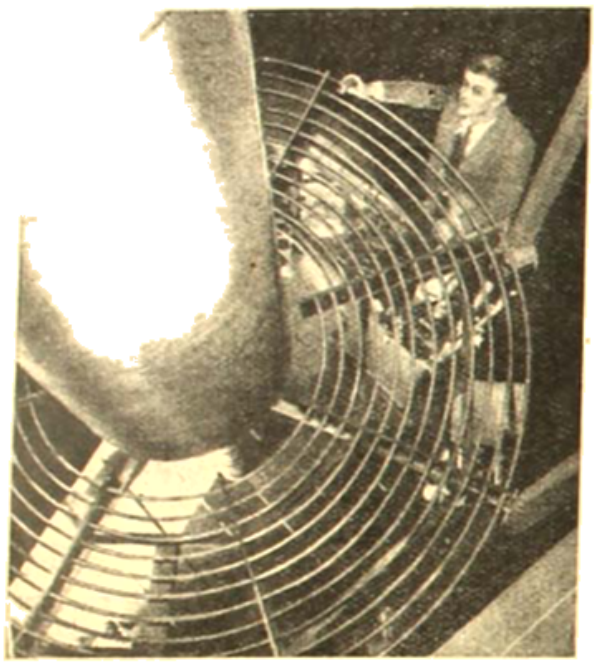

বৃষ্টিপাতকারী বিদ্যুৎচুম্বক-উৎপাদক রিয়াক্টর।

ধনইন্ডিয়েশ্বর বায়ুমণ্ডলের ধনইন্ডিয়েশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাকে তাড়িত শক্তি সরবরাহ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণিকাগুলি জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয় এবং আকাশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। এই অভিনব কল্পনার ফলে কত কৃত্রিমার সময়ের জাহাজের 'ডকে' প্রবেশ করিতে বা এরোপ্লেনের নির্দ্দিষ্ট স্থলে অবতরণ করিতে আর কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না।

বিস্ফোরক হাইই-এর সাহায্যে ডাকপ্রেরণের অভিনব কল্পনা

আইনা রয়েল অপেক্ষাকৃত কম ধুমের ধূমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাইই-এর সাহায্যে চিঠিপত্র প্রেরণের অভিনব কল্পনা অবলম্বিত হইয়াছে। এই উপায়ে সকেট নামক ষ্টেশন হইতে কুনবার্থ পার্শ্বস্থ পোষ্টাল সাভিসের ডাক নিয়মিত ভাবে প্রেরিত হইতেছে। প্রত্যেক বারে ২০০ হইতে ৩০০ চিঠি প্রেরিত হইয়া থাকে। এই ডাকের প্রত্যেক চিঠির উপরে "রকেট মেল-সার্ভিস" নামাঙ্কিত ডাকটিকিট আঁটা থাকে। চিঠিপত্রের কোন অনিষ্ট না হইতে পারে এজন্য একটি বাক্স বিশেষ ভিতরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু অভিজ্ঞতার ডাকপ্রেরণের পর দেখা গিয়াছে, এত সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, ফ্রিজ. স্মিড্‌ল্ (Fritz Schmiedl) নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার অভিন পরীক্ষার পর এই ডাকপ্রেরণকারী হাইই-এর উদ্ভাবন করিয়াছেন। হাইই-এর খোল ও অন্যান্য অংশ পিতলের পাতে নির্ম্মিত। ইহার খোল হইতে একটি লম্বা নল লেজের মত বাহির হইয়া থাকে এবং এই নলের অভ্যন্তরে—দিক পরিবর্ত্তন না করিয়া একভাবে চলিবার জন্য ডাকা সংযুক্ত আছে, তাহার পশ্চাতে বায়ুনির্ম্মিত চিঠির বাক্স ঝুলানো থাকে। (২ নং ছবি)। খোল হইতে আরম্ভ করিয়া নলটীর ভিতরের দিকে 'এস্-কেলেটরের' লাইনিং দেওয়া আছে। তাহার ফলে কিরোসিন ও অপরিহার্য্য পরিবেশের সকল অতিরিক্ত চাপকণে কোন অংশ পুড়িয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। হাইই-এর খোলে গ্রোয়েট ও বাইট্রেট পাউডার মিশ্রিত একপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। ঐ পদার্থে অগ্নিসংযোগ করিয়া ঘণ্টাখানেক হাইইটিকে প্রায় ৩০ ডিগ্রী কোণ করিয়া উপরের দিকে ঝোঁড়া হয়। আরও কেন্দ্র ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইলে এমনভাবে হিসাব করিয়া কোণ পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, যাহাতে হাইই বেশী উপরের দিকে না উঠিয়া মাটু দিয়া অনেক দূর যাইতে পারে। অগ্নিসংযোগ করিবামাত্র লম্বা নলের পিছনের দিক দিয়া প্রচণ্ডবেগে গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। বাতাসের সঙ্গে এই প্রবল ঘর্ষণ-বিশিষ্ট ক্রিয়ার ধাক্কায় হাইই কামানের গোলা অপেক্ষাও দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলে। বাক্স ছুড়িয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্যারাশুট আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং ডাকের কাগজ হাইই আপনা হতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে।

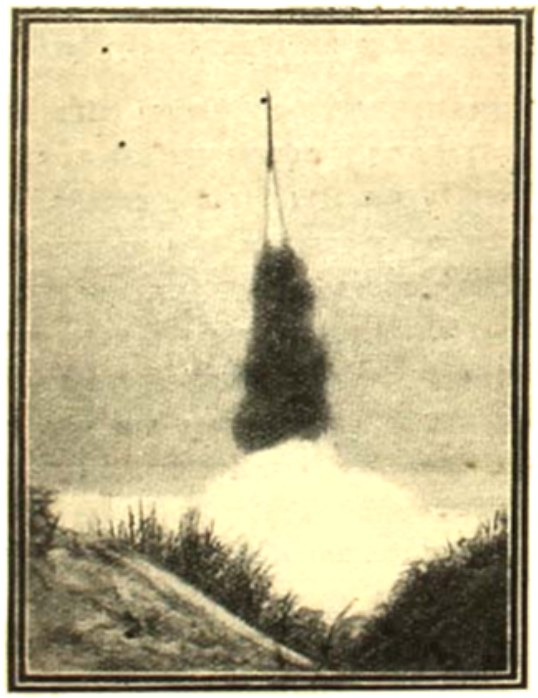

হাইই'র ডাক ছোড়া হইতেছে।

একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা এই হাইই-এর কার্য্যপ্রণালী বোঝা যাইতে পারে। একখানি পুরু কাগজকে ৩ নং চিত্র প্রদর্শিত উপায়ে কাঁচি দিয়া কতকটা ব্যাঙের আকারে কাটিতে হইবে, চওড়াদিকের মধ্যস্থলে ছোট একটি গোল ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র হইতে ধনাবর্ত্ত লেজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে একটু মোটা

করিয়া চিরিয়া দিয়া জলে ছাড়িয়া দিলে ভাসিতে থাকিবে, কিন্তু নড়িবে না। এখন ছিপের মধ্যে এক পোঁচা তেল ঢালিয়া দিলে দেখা যাইবে, তেল ঐ ডেলা

হাউই ছুড়িবার অবস্থা [ইংরেজী]

লম্বা লেজের ফাঁক দিয়া বিদ্ধ হইয়া পড়িবার দরুণ বাঁকা খাইয়া কাগজের হাউই একদিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বজ্রনাদ হাউইও এই প্রকারে বাঁকিয়া হইতে উদ্ভূত গ্যাসের ধাক্কায় বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়।

বস্তুবিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার

কেটলিতে জল গরম করিবার সময় বাষ্পের ধাক্কায় কেটলির চাকনি অতি দ্রুতগতিতে লাফ দিয়া উঠানামা করিয়া আপনাআপনি আবিষ্কারকের বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাইবার প্রেরণা জাগিয়াছিল; কিন্তু বাষ্পীয় শক্তিকে কার্যোপযোগী করা সহজসাধ্য হয় নাই। উপরে নীচে উঠানামা করিতে পারে এরূপ গতিবিশিষ্ট চোঙাকৃতি পাত্রের মধ্যে বাষ্প প্রবেশ করাইলে চাকনি উপরে উঠিয়া যাইত এবং ঐ চাকনির সঙ্গে যতখানের চাকাখানি অর্ধেক ঘুরিয়া যাইত; কিন্তু বাকী অর্ধেক ঘুরাইবার জন্য অনেক ঝঞ্ঝাটি হইতে হইত। সেই গরম বাষ্পপূর্ণ চোঙাটিকে জল ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিলে চাকনিটি আবার নীচে নামিয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকাটি বাকী অর্ধেক ঘুরিয়া আসিত। লম্বালম্বি গতিবিশিষ্টকে ঘূর্ণায়মান গতিবিশিষ্টে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা কাজ আদায় করিবার এই কথা বাহির করিতে আবিষ্কারকদিগের কম বেগ পাইতে হয় নাই। তারপর অনেক হাত ঘুরিয়া, অনেক বুদ্ধি-পরামর্শের ফলে আধুনিক উৎকেন্দ্রিক 'ক্রাঙ্ক' ও 'ক্যাম শ্যাফটের' পরিণতি হইয়াছে। আধুনিক লোহাইয়ের কল অবশ্য কাঁচে করিয়া বেড়াইবার অবশ্য ছুরি-কাঁচি শান-দেওয়া ক্ষুরের প্যাডেলসংযুক্ত খাড়া দণ্ডের সঙ্গে চাকার সংযোগের অবস্থায় আধুনিক ষ্টীম, গ্যাস, পেট্রোল, হট-এয়ার বা কম্প্রেস্ড্-এয়ার প্রভৃতি সকল প্রকার ইঞ্জিনই এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য ষ্টীম-টারবাইন বা ইলেকট্রিক মোটর প্রভৃতির ঘূর্ণন-পদ্ধতি ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু পদ্ধতি কেন অন্য কোনও যন্ত্রকে চালাইবার জন্য রিডেল টাইপের অতি সরল ও সহজসাধ্য, মাত্র দুইটি ধাক্কায় কার্য করিবার ইঞ্জিনটি এক অদ্ভুত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা মোটর অথবা ট্রেনজিনের মতন এক প্রকার 'ইন্টারন্যাল কম্বাসন্' ইঞ্জিন, কিন্তু ইহাতে আগুন ধরাইবার জন্য 'স্পার্ক-প্লাগের' দরকার হয় না। অন্য সকল প্রকার ইঞ্জিনে যেমন লম্বালম্বি গতিবিশিষ্টকে ঘূর্ণায়মান গতিবিশিষ্টে পরিবর্তিত করিয়া কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, এই ইঞ্জিনে সেসব ঝঞ্ঝাট মোটেই নাই। এমন কি ভালুভের পর্যন্ত প্রয়োজন নাই। অতি সাধারণ কারী ছেলেও সাহায্যেই ইঞ্জিন চলিতে পারে। এবং ফলে এই অদ্ভুত ইঞ্জিনের কার্য-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। 'ক' একটি পরাম ধাতব দণ্ড, এই দণ্ডটির সহিত 'ঙ' ও 'চ' চিহ্নিত দুইখানি চাকতি কাঁচ ধাতব দৃঢ়রূপে লাগান, চোঙাকৃতি আবদ্ধ কুঠরীর মধ্যে স্টিম-ইঞ্জিনের পিস্টনের মত কেবল সামনে ও পিছনে আগাইতে পারে এরূপ 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুইখোড়া বাঁকানো ছোট দণ্ডের পিছনের দিকের খাঁজের মধ্যে দিয়া 'ঙ' ও 'চ' চাকতি দুইখানি ঘুরিয়া

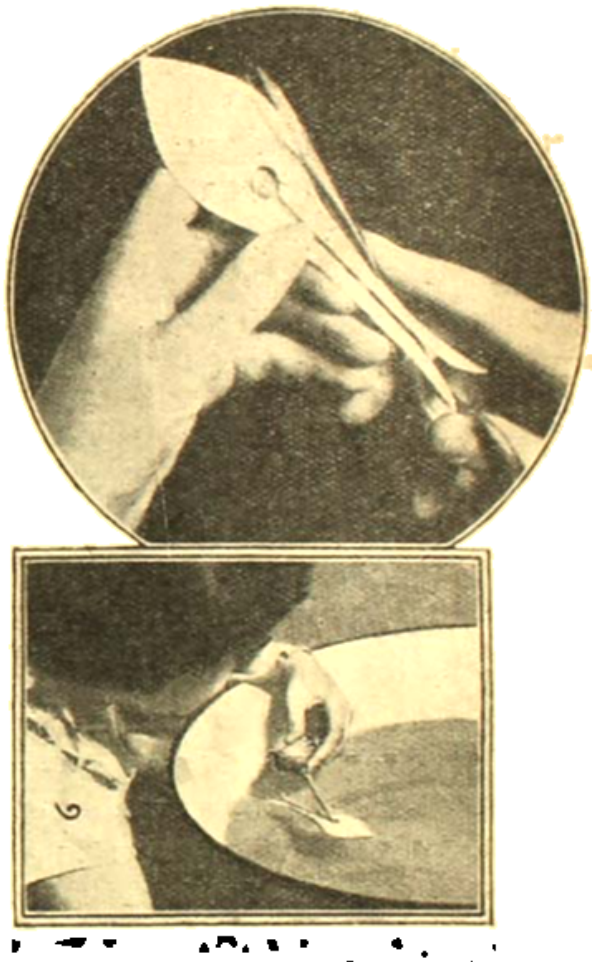

উপরের চিত্র প্রদর্শিত উপায়ে কাগজ কাটিয়া চক্র চালাইয়া নিম্ন চিত্রানুযায়ী ভেলা ভাসিয়া দিলে কাগজখানি এদিকে ঘুরিয়া চলিবে।

যাইতে পারে। 'খ' চিহ্নিত দণ্ডটি ঘুরাইলে 'ঙ' ও 'চ' চিহ্নিত চাকতি দুইখানি হেলানো ভাবে থাকায় একদিকের একজোড়া দণ্ড 'ক' চোঙের মধ্যে

পরস্পর খুব কাছে আসিয়া পড়ে এবং তন্মুহূর্তে বিদ্যুৎ দিবার 'ক' চিহ্নিত 'পিষ্টন' দুইটি পরস্পর বিপরীতমুখে ছুটিয়া যায়। যদি 'ক' দণ্ডটিকে না ঘুরাইয়া পরস্পর অতি নিকটবর্তী 'পিষ্টন' দুইটিকে দুইদিকে ঠেলিয়া রাখা বলিয়া ধরা যায়, তবে দণ্ডটি আপনা আপনিই ঘুরিয়া যাইবে। এইরূপে 'পিষ্টন' দুইটিকে ক্রমান্বয়ে পর পর ঘুরে সাহায্যের ও কাছে আসাইবার ব্যবস্থা করিয়াই ইঞ্জিন হইতে কাজ পাওয়া যায়। 'ক' দণ্ডটি একপ্রান্তে প্রোপেলার বা ঘূর্ণায়মান কোন যন্ত্রের সংযোগ করিয়া প্রোপেলার ও গাড়ী পরিচালিত হয়। 'পিষ্টন' দুইটিকে পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইবার শক্তি কোথা হইতে আসে? এই শক্তি অর্জন করিবার জন্য অতি সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সাধারণ তারের তৈরী 'ঙ' ও 'চ' চিহ্নিত দুইটি বিভিন্ন পরিমাণে চুম্বকত্ব করিবার ব্যবস্থা আছে। যখন 'পিষ্টন' দুইটি পরস্পর কাছে আসিয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে ঘুরাইবার জন্য চাপ করা হওয়ায় 'ঙ' চিহ্নিত ছিদ্রের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে তেল ও 'ঘ' চিহ্নিত রাস্তায় বাতাস প্রবেশ করিয়া, তেল ও বাতাসের এক প্রকার বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈয়ারী হয় এবং পর মুহূর্তেই দুই দিক হইতে দুইটি 'পিষ্টন' ক্রমশঃ কাছে আসিতে আসিতে উক্ত মিশ্রণকে এমন ভাবে চেপিয়া ধরে যে, অতিরিক্ত চাপে আপনা-আপনিই বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিস্ফোরণের ধাক্কায় অর্থাৎ বিস্ফোরণজনিত খরচের হ্রাস আয়তনবৃদ্ধির ফলে 'পিষ্টন' দুইটি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটিও ঘুরিয়া যায়। এইরূপে একবার এপাশে আর একবার ওপাশে, পর পর অনবরত বিস্ফোরণের ফলে ধারা বাহিয়া দণ্ডটি বিদ্যুৎ বেগে আবর্তিত হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্র প্রবর্তিত পথে ব্যবহৃত বাষ্প বাহির হইয়া যায়। বিস্ফোরক মিশ্রণের জন্য বাতাস চাপ দিয়া চুকাইবার জন্য 'ক ও ক' চিহ্নিত 'পিষ্টনের' বামদিকে 'গ' ও 'গ' চিহ্নিত আরও দুইটি 'পিষ্টন' আছে। এই দুইটিও 'ক ও ক' 'পিষ্টনের' সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া প্রয়োজনমত বাতাস চোঙের মধ্যে চুকাইবার ব্যবস্থা করে। ১নং ছবিতে এই নূতন ইঞ্জিন সংযুক্ত আধুনিক 'উইলাইনচ' মোটর এবং ২নং ছবিতে ইঞ্জিনের ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল।

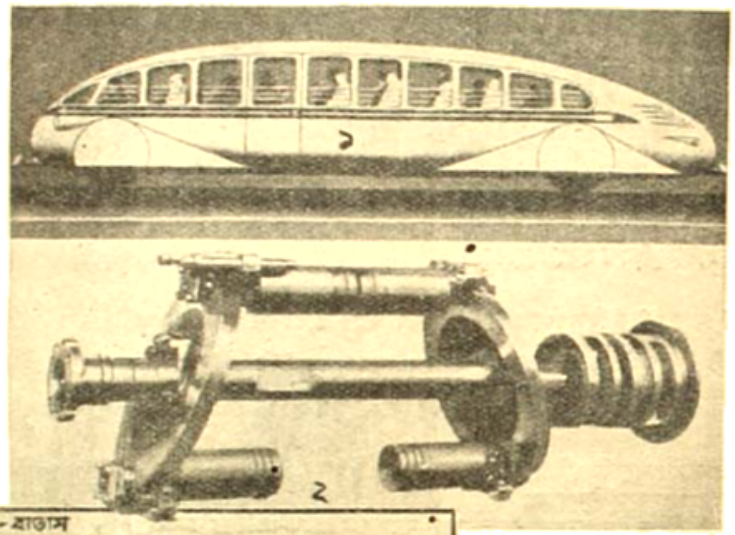

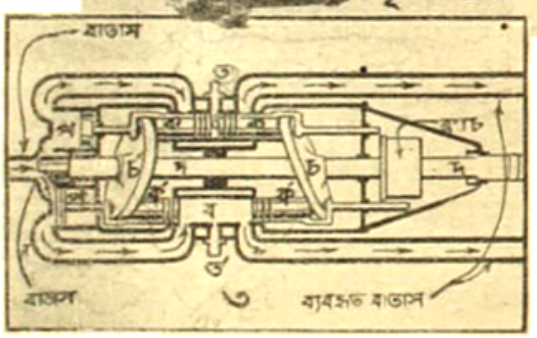

৩

ব্লাড, ক্যাম্‌শাফ্‌ট, পিষ্টনরড, স্প্রীংগুলি পরিবর্জ্জিত অতি সরল অভিনব ইঞ্জিন।

অতিকায় দূরবীণ

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান শতাব্দীর এক অত্যাশ্চর্য্য বিরাটকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। ইতিপূর্ব্বে এত বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণের কল্পনাও কেহ করেন নাই। বিজ্ঞানিদের মতেই বৈজ্ঞানিকেরা এই অদ্ভুত যন্ত্রসাহায্যে নক্ষত্র-জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং তাঁহারা আশা করেন, এই দূরবীক্ষণসাহায্যে আকাশের এত অধিকার তত্ত্ব জানা যাইবে, যাহার ফলে এই বিষয় সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ বা ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। ডাঃ হেইল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে ১০০" ইঞ্চি ব্যাসের দর্পণ সংযুক্ত টেলিস্কোপই এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠতম আকাশ-পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্র' বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমান টেলিস্কোপের কাচখানার কাচের পরিবর্ত্তে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০০" ইঞ্চি। বহু অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের বহু বৎসরের সমবেত পর্য্যবেক্ষণার ফলে ক্যালিফোর্ণিয়ার টেক্‌নোলজি ইন্‌স্টিটিউটের জন্য প্রায় ১৮০০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই বিরাট টেলিস্কোপ নির্ম্মিত হইতেছে। দর্পণখানির ওজনই হইবে প্রায় ৫০ টন, এই আলোক-সংগ্রাহক দর্পণের ক্ষমতা চক্ষু হইতে ৩৮০,০০০ গুণ বেশী। এই যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রকে ১২,০০০ গুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখা যাইবে। ২০ মাইল দূরের বড় বড় অট্টালিকা প্রভৃতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়—এই টেলিস্কোপের ভিতর দিয়া চন্দ্রকে মাত্র ২০ মাইল দূরে দেখা যাইবে। কাজেই গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে কত বিষয়কর বৃহৎ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যাইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০" ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে ৫০০০ মাইল দূরের একটি প্রজ্বলিত মোমবাতিও অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ৩০,০০০,০০০ আলোক-বর্ষের দূরের নক্ষত্রের অস্তিত্বও টের পাওয়া যায়। সেই দূরবীক্ষণ সাহায্যে ব্যাসদেবের মতে প্রায়

২,০০০,০০০ বেগুলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নবনির্মিত টেলিস্কোপের সাহায্যে ইহার তিন গুণ দূরের জিনিস দৃষ্টিগোচর হইবে এবং আকাশের যতখানি স্থানের খবর জানা গিয়াছে, তাহার প্রায় ১০ গুণ বেশী স্থানের খবর পাওয়া যাইবে।

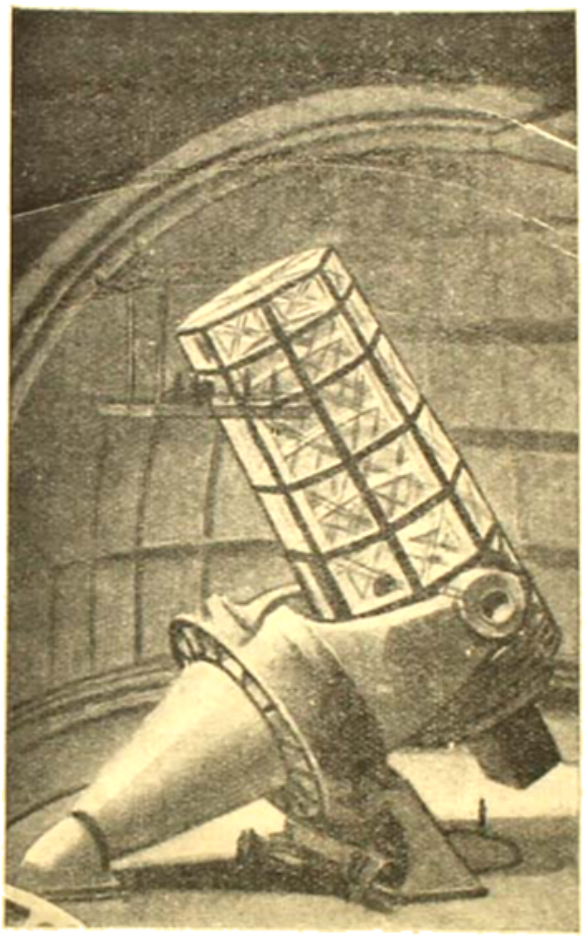

২০০ ইঞ্চি দর্পণ-সমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বৃহৎ টেলিস্কোপে সাধারণতঃ 'হেলে'র সাহায্যে আলোক কেন্দ্রীভূত বা করিয়া নিম্নস্থ দর্পণের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর আলোক সংগ্রহ করিয়া টেলিস্কোপের নলের মধ্যেই অন্যত্র কোথাও করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা থাকে, সেখান হইতে ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মিকে বাহিরে আনিবার ব্যবস্থা থাকে। আবার কোন কোন টেলিস্কোপে ত্রিকোণ কাচের পরিবর্তে সমদৃষ্ট দর্পণের সাহায্যে উক্ত সংগৃহীত আলোক নিম্নদৃষ্ট দর্পণের কেন্দ্রীয় ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরে ফেলিবার ব্যবস্থাও দেখা যায়। নবনির্মিত টেলিস্কোপের বিরাট দর্পণে দূরস্থিত গ্রহ তারকার আলোক-রশ্মি সংগৃহীত হইয়া ফোকাসের মধ্যেই একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। সেই বিরাট ফোকাসের মধ্যেই পর্যবেক্ষণকারীর বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং সেখান হইতেই পর্যবেক্ষণ ও ফটোগ্রাফে ছবি তুলিবার সমস্ত কাজ করা হইবে।

এই বিরাট টেলিস্কোপ নির্মাণে যে কত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি, কত অদ্ভুত উপায় করা হইয়াছে, তাহার বিবরণও কৌতূহলোদ্দীপক—এই সকল যন্ত্রপাতির মধ্যে দৃষ্টি হইতে তাপ সংগ্রহ করিবার যন্ত্র একটি। যন্ত্র দর্পণ সাহায্যে সূর্যকিরণ একত্রীভূত করিয়া ৩০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন একটি নির্দিষ্ট তারকার দিকে টেলিস্কোপের মুখ ঘুরাইয়া পর্যবেক্ষণ করিবার সময় পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে টেলিস্কোপ ক্রমশঃ সরিয়া যায়—এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে বিরাট মোটর এবং অতিরিক্ত গিয়ারের সাহায্যে টেলিস্কোপটিকে যে কোন প্রয়োজনের সঙ্গে সমসূত্রে রাখিবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত সাহায্যে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা হইবে না, কারণ সূর্য-কিরণের উত্তাপের ফলে বিরাট দর্পণের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। খোলা চক্ষে সোজাসুজি গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ না করিয়া ফটোগ্রাফে ছবি তোলাই এই টেলিস্কোপের প্রধান কাজ হইবে। এখনে এই অতিকায় টেলিস্কোপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সন্তানোৎপত্তি

কিছুদিন হইতেই আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকেরা বৃদ্ধির উপায়ে পুরুষ-প্রজননের পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। যে সকল নারী সন্তানের জননী হইতে চাহেন অথচ পুরুষ সহবাসে চাহেন না, সন্তানধারণার্থে তাঁ হাদিগকে দিবার এবং তাঁ হাদের ফ্রেড কোম্পানী সেই সকল স্ত্রীলোকদের উপর পরীক্ষা কার্য চালাইতেছিলেন। তাঁহাদের এই পরীক্ষা এখন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একডোজ বীর্য মাত্র ৮টি শিশুর জন্মকথা ঘোষণা করিয়াছেন। আরও ৭টি স্ত্রীলোককে বৃদ্ধির উপায়ে গর্ভবতী করা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা বাবুদের আনন্দ দান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পুরুষের ইচ্ছা বিশেষ ব্যবস্থার কাচের কলের সাহায্যে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে সঞ্চারিত করিয়া এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা সফলতা অর্জন করিয়াছেন।

চালকযুক্ত বাইসাইকল

বাইসাইকলের পরিচিত ব্যবস্থাইয়ের জন্য একজন ফরাসী সাইকেল-চালক তাহার সাইকেলে এঞ্জিনের বদলে দুইটি চাকা ও ছোট একটি প্রোপেলার সংযোগ করিয়াছেন। এঞ্জিনের মত নেজ সংযোগ করিয়া তাহাতে হাল্কা-ধরণের ডানাও সংযোজিত করিয়াছেন। ডানার দুইটি অংশ পর্দার দ্বারা 'ভ্যালাইনিং' করিয়া রিবিয়া দিয়াছেন। পা দিয়া গাড়ী চালাইলেই

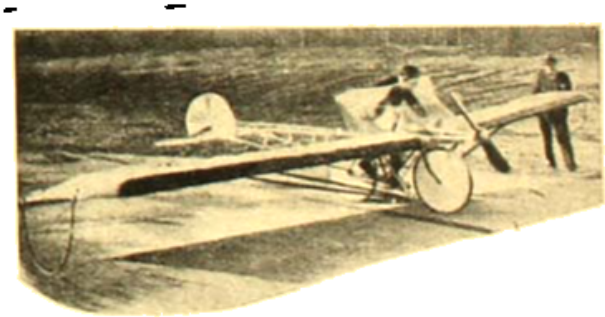

এরোপ্লেনের মত ডানা ও নেজ সংযুক্ত বাইসাইকেল।

প্রোপেলার ও চাকা একসঙ্গে ঘুরিয়া গাড়ীর বেগ বৃদ্ধি করে। এই অভিনব ব্যবস্থায় তিনি ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ছুটিতে পারেন।

নীলদীঘি

—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

ফুলতলার ডাকঘরের পিছনে যেখানে বাঁশবন, সেখানে বড় বড় গাছের জটলার মধ্যে অনেক বেইনে যে জলটা জমিয়া আছে—কাকের চোখের মত স্বচ্ছ না হইলেও তাহার কূলে বসিয়া মানুষের নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। ঐটাই নীলদীঘি। গাঁয়ের মানুষ দীঘিটাকে সাক্ষাৎ কালের মতন ভয় করে। ঠিক দুপুরে তাল-নারিকেল-আম-গাছগুলি যেখানে ছায়াকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহারি পাশ কাটিয়া একলাটি দিন আসিয়া যখন উঁকি মারে, তখন মনে হয় তাহারও দৃষ্টি বুঝি শঙ্কিত। বাঁশবাগানে হাওয়া যখন কড়মড় করিয়া হাড় চিবাইতে থাকে—তখন তো কথাই নাই। কিন্তু এগুলি তো কোনো আনা পুষ্করিণীর পক্ষে বিশেষত্ব নহে—ভয়ের কারণ শুধু সেগুলি নীলদীঘির পাড়ে বলিয়াই। নীলদীঘি শুনিলেই আত্মীয় পরিবেষ্টিত হইয়াও দুপুর বেলাতে গা-টা ছমছম করে।

জলটা নীল বলিয়া তাহার নাম নীলদীঘি নহে। নীলকর সাহেবের আমলের পুষ্করিণী কালের দৌরাত্ম্যে আজ এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তাই ইহার নাম নীলদীঘি। যখন বৈশাখের রৌদ্রে মাটী ফাটিয়া ধোঁয়া বাহির হয়, অন্য সব পুষ্করিণী কর্দমাক্ত বাষ্প করিতে থাকে, তখন আশে-পাশের প্রাণগুলির মধ্যে একা রাজত্ব করে, অগণিত নরনারীর পিপাসার জলময় স্বরূপ এই একটি মাত্র পুকুর। তবু যে কেন তাহা ভয়ের কারণ—তাহাই ভাবিবার বিষয়।

সে কবেকার কথা,—যখন এদেশে নীলের চাষ ছিল! গ্রামের লোকের দুর্ভাগ্য বৈকি,—অতবড় জাগ্রত কালী-মন্দিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চত্বরটাই নীলকর সাহেবের পছন্দ হইয়াছিল। তাই অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মন্দিরের ঠিক পাশেই চূড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিয়া গেল নীলকুঠির বিরাট বাড়ী।

গ্রামের মাতব্বরেরা বলিলেন, যাক্ বাবা, দেখিস যেন, তোদের ঐ পাখীগুলো—যা না হলে তোদের ভবেলা মুখে রুচি রোচেনা, সেগুলো এদিকপানে না আসে।

কিছুদিন সব ঠিক থাকে, তারপর ব্রেজের জাত—পাখী-গুলা যেন পাল্লা দিয়া ব্যবধানের অনুচ্চ প্রাচীর ডিঙাইয়া এদিকে আসিতে থাকে। বড় সাহেবের কাছে ক্রমাগত নালিশ হইতে থাকে। উত্তরে সাহেব বলেন, টোম্‌ড়া বড়ো বিরক্ট কস্‌লো! কী হোল্‌ছে এটে—! টোম্‌ড়া যে রাট ডিন ঘন্টা বাজাও, টাটে যে হামাডের কানের অসুবিস্‌টা হোয়্!

এমনি ঝগড়া রোজ হয়।

তারপর একদিন পূজারী অনন্ত ভট্টাচার্য সকালে আসিয়া দেখেন—বেদী ভাঙা, মূর্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। বিচারে উল্টা কয়েকজনের সাজা হয়।—সে বহুদিনের কথা। তারপর লোকে বলে, ক্রমে ক্রমে নীলকরের কুঠিগুলা মা টানিয়া টানিয়া লইতে থাকেন। এখন আর সে নীলকুঠির চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেছে।

গরমের দিনে নীলদীঘির জল যখন নীচে নামিয়া আসে, তখন কী-একটা বিরাট জিনিষের ধ্বংসাবশেষ জলের তলে আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না—তবে যে-রূপ সে প্রকটিত করে, তাহাকে আর অট্টালিকা বা প্রাসাদ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না—দেখা যায়, ভাঙলা, জলের মধ্যে ইত্যাদি জমিয়া তাহাকে শঙ্কিত মাধুর্যে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

যে প্রাসাদ এখন সলিল-সমাধিতে, তাহার যে ইতিহাস থাকিলে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কী! সাধারণ পুরাতন অট্টালিকাই কত সার্থতা, কত অবরোধের প্রচ্ছন্ন প্রতীক। কত অদৃশ্য অশ্রু, কত অশ্রুত আর্তনাদ নীলকুঠির সুনিশ্চিত হর্ম্যে যে মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছে কে জানে!

তখন এই দীঘিটা ছিল এ অঞ্চলের সুন্দরী রমণীকুল-মিলনস্থল। স্নানার্থে যত স্ত্রীলোক এখানে মিলিত তাহাদের কাহাকেও হয় তো সাহেবদের পছন্দ হইত এবং তাহাদিগকেই কিছুদিন বাদে মুসলমানে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, ইহা সুজাত রহস্য। এই ধরণের আরও নানা রকমের পাপের পুরী ছিল এই নীলকুঠি। তখন না ছিল পুলিশ, না ছিল আইন-আদালত—কাজেই সাহেবদের স্বেচ্ছাচারের শকট অবাধে দেশের বুকের উপর শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেছে

—বাধা দিবারও কেহ ছিল না। এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে তাহাদের নিজেদের কারাগার ছিল—প্রকাণ্ড মোটা শিকল দিয়া তাহার দরজা বাঁধা থাকিত। কত আত্মহত্যা, কত খেয়ালী খুন—এই অট্টালিকার ছিল নিত্যকার খোরাক। সেই বাড়ী যে-পুকুরের উপরে, তাহা যে জলের কারণ হইবে—এ-কথা বলিবার দরকার করে না। এখনও নাকি মাঝে মাঝে শোনা যায়, অব্যক্ত কোনো আর্তনাদ, জলের তলে ক্ষীয়মান বন্দী আত্মার অন্তিম আহুতি; দেখাও নাকি যায় সেই কারাগারের শুঙ্খলার শৃঙ্খল।

এ সব অত্যাচারের কথা, অনাচারের কাহিনী লোকে ভুলিয়াই যাইত, যদি না সম্প্রতি কতকগুলি ঘটনা ঘটিত। এইগুলিই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাকুন গ্রামে যখন অন্য পুকুরগুলির জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়, একমাত্র নীলদীঘিতে তখন টলটলে জলটি থাকে—এত গভীর যে, সূর্যের আতপ যখন জল মাপিতে মাপিতে নীচের দিকে যায় তার থৈ পায় না; আর ঠিক সেই সময়েই কাঁথনে বর্ষা আসিয়া আবার তাহাকে জল-ভারাক্রান্ত করিয়া চলিয়া যায়। পরমের দিনে পাশের গ্রামের ভুলতলার দিক্‌কার অস্পষ্টপ্রায় পথরেখা আষাঢ়ে সুস্পষ্ট হইয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়—তখন এ জলাশয়ে মহেশপুর, চন্দনীতলা, বিলাসপুর, আশে-পাশের অনেক গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়া আসে। অন্য গ্রামের কাছে ভুলতলা গর্বের, ভুলতলা অপবাদের—শুধু এই পুকুরটিকেই কেন্দ্র করিয়া।

এই সেদিনও পৌর মণ্ডলের বৌ জল লইয়া আসিয়া পা পিছলাইয়া সেই যে পড়িল, আর জীবন্ত উঠিতে পারে নাই। খোঁজ, খোঁজ—একা সে আসিয়াছিল, সুন্দরী সে, যুবতী সে, অনেকক্ষণ যায়—তার ফিরিবার কোনো সাড়া না দেখিয়া প্রথমে লোকে সন্দেহ করে—নীলকুঠির সাহেবরা না থাকিলেও মুসলমান তো আছে। যাও পুলিশে খবর। এক আধবার ঘাটের কাছাকাছি খুঁজিয়াও দেখা হইয়াছিল। জলে কেহ নামিতে চায় না—সেই প্রকাণ্ড শিকলে অবিকল নাকি পা ধরিয়া ডুবাইয়া মারে। যে দুএকজন নামিল তাহারা 'হদিস্' করিতে পারে নাই। দিন তিনেক পরে তাহার খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল—নিরাভরণা, একখানি গহনাও নাই; ঘাটের অন্যদিকে বিকৃত দেহ ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহাই সাব্যস্ত হইল যে,হয়তো শেষ রাত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কোনো স্বর্ণলোভাতুর পথচারী নিরলঙ্কার করিয়া শবটিকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে।

এই ঘটনা যে-শ্রীষ্মে, তাহার পরের শ্রীষ্মে ছেলেমেয়েরা যোগেদের বাড়ীতে খেলা করিতেছিল। একটি সাত আট বৎসরের মেয়ে কি খেয়ালে পুকুর-ঘাটে আসিয়াছিল তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য। সেই যে জল খাইতে নামিল, তাহার তৃষ্ণা আর মিটিল না। তাহাকে উঠানো হইয়াছিল—গলার হারটা পাওয়া যায় নাই বটে, হাতের কলী দুগাছি ঠিকই ছিল। মুখে আর নাকে প্রচুর কাদা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ডাক্তার আসিল, গাড়ীখানেক লবণ আসিল, তাহাকে লবণে কবরস্থ করা হইল, কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস আর বওয়ানো গেল না।

আর একদিনের কথা।

অনাথ মিত্র খাইতে বসিয়াছে। বৌ বলে—তুমি খেতে থাক, আমি চট্ করে ডুবটা দিয়ে আসি। ব্যস্, সেও আর ফেরে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অধীর হইয়া অনাথ উঠিয়া পড়ে। তাহাকে বিস্তর খোঁজা হয়, কিন্তুতেই পাওয়া যায় না। অবশেষে দুইদিন বাদে—নীলকুঠির সেই কারাগার হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, বিকৃতদেহ, বিচ্যুত-অলঙ্কার সে ভাসিয়া ওঠে। শুধু হাতের আঙুটিটা ছিল।

লোকে বলাবলি করিল, আজ্ঞা অত খোঁজা হল পাওয়া গেল না—পরে যখন ভেসে উঠল, তখন নিশ্চয়ই নীলকুঠিতে আটকে রেখেছিল।

—বাঃ, তার কোনো মানে নেই, পাওয়া যায় নি—অত গভীর পুকুর, ভালো করে খোঁজা কি সহজ কথা? হুঁঃ, সেই নীলকুঠি—এতদিনে ইটগুলো খসে দীঘির তলায় জলদেবতার বাড়ীটাড়ী হচ্ছে বোধ হয়!

—না ভাই, অত পাপের ভার—

এমনি রহস্যঘন অপমৃত্যু পুকুরটার পূর্ব-ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে।

এই প্রশংসা ও আশঙ্কার নীলদীঘির পূর্বদিকের পাড়ে ছোট একটু কুঁড়েঘরে একদিন সন্ধ্যাবেলা সর্বাঙ্গ অন্ধকারের পিরাণে আবৃত করিয়া বংশীধর সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বংশী জাতিতে কৈবর্ত। এ ঘরে থাকেন সতীশ

ঠাকুর—কালীমন্দিরের সাবেক পূজারী অনন্ত ভট্টাচার্যের বংশধর। সতীশ পূজা-আচ্চা করেন। নগ্ন গাত্র, ছোট সাত হাত লাল পেড়ে পরিধেয়, মোটা উপবীত বিলম্বিত,—ঠাকুরকে দেখিলে ভক্তি হয়।

সতীশ পূজায় বসিয়াছেন, বংশী আসিয়া তাই চুপ করিয়া রহিল। ছোট পিতলের একটা চৌকিতে কোন্ ঠাকুরের কি একটা পট—আধো অন্ধকারে ভাল বোঝা যায় না।

পূজা শেষ হইলে বংশীধরও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

পূজার ফুল কানে গুঁজিতে গুঁজিতে সতীশ বলিলেন, কি খবর ভাই, আজ জোগাড় হল?

গায়ের চাদরের প্রান্ত হইতে কি-একটা খুলিতে খুলিতে বংশী বলিল, বংশী কখনো রিক্ত না নিয়ে এসেছে দাদা, তবে তেমন বেশী নেই আজ।

সতীশ পুনরায় দেবতার উদ্দেশ্যে জোড় কর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন,অপরাধ নিওনা মা, আমার মনের ভাব তোমার অজানা নেই, কালী, কালী। দাও ভাই,—বলিয়া হাত বাড়াইলেন।

ছোট একটা কাগজের মোড়ক তাঁহার হাতে দিতে দিতে বংশী কহিল, বাঁচলাম বাবা, ঠাকুর-দেবতার জিনিষ, পুরুত-বামুনের কাছেই শোভা পায়। বলিয়া অতিদীর্ঘ একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

সতীশের চোখে জল আসিল, হাত বাড়াইয়া মোড়কটা লইলেন। ঘরের কোণে বিছানাটা অনাবৃত করিয়া, কোমরের সুতায় বাঁধা চাবি দিয়া, বড় রকমের জটিল একটা তালা খুলিয়া, মোড়কটাকে সিন্দুকবন্দী করিয়া রাখিলেন। বিছানাটিকে আবার যথাস্থানে চাপাইয়া দেওয়া হইল।

বংশীধর শুধায়—আর কত দেরী দাদাঠাকুর, কবে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আশাজ করতে পার?

উহুঃ—মাথা নাড়িয়া সতীশ সংক্ষিপ্ত জবাব দেন—বাবা, অতটা সোনা!

কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ বংশী বলিয়া ওঠে—সোনা সোনা করে জীবনটা আমাদের এই যে মেতে চলেছে, এতে শেষ জীবনে হয়তো সুখ আমরা কেউই পাব না। আমার আশঙ্কা হয় কি জান,—আমার কথা ভাবিনে, আমি তো মহাপাতকে আছিই—শেষে দাদাঠাকুরের বুঝি কঠিন কোনো ব্যামোতেই ধরে!

—তা হোক্, কিন্তু কাজটা তার পূর্ব্বে যেন শাঙ্গ করতে পারি। তা হলেই নিশ্চিন্ত আরামে আমি চোখ বুজতে পারি। আমার একটা জীবন মার রাঙা পায়ে উৎসর্গ করে যদি গাঁয়ের সবাইকার উপকার হয়, সেও কি কম! যাগো, গরীবের ইচ্ছে কি পুরবে—তুমিই জান—। ঠোঁটের কোণে একটু ফ্যাকাসে হাসি মুমূর্ষু বিদ্যুতের মত মুখের কালিমায় চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই কথার পর যেন ঘরের গাম্ভীর্য্য বাহিরের অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িতে থাকে। হঠাৎ ঘরের বাঁপের বাঁশটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠাতে দুজনের দৃষ্টিই আগন্তুকের হাতের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে আটকাইয়া গেল। কেহই উঠিলেন না।

ঘরে ঢুকিল শ্রীরাম।

সতীশ বলিলেন, ও তুমি। আজকে তোমার আসবার কথা ছিল—না?

শ্রীরাম জাতিতে এবং ব্যবসায়ে কারুরা। উত্তরে বলিল, হাঁ। আজকে মাসের দশ তারিখ না?

—এখনও তো সব জোগাড় হয়নি শ্রীরাম। সতীশ বলিলেন—এক-আধটু নয়, একেবারে অতখানির আদেশ হল!

শ্রীরাম বলিল, আপনি বললে ঢের কমেই আমি পড়ে দিতে পারি।

যুক্ত পাণি কপালে ঠেকাইয়া সতীশ বলিলেন, আমার কি, মার নিজের কাজ নিজেই করাবেন; আমরা তো সেবাইত মাত্র। যা আদেশ করছেন, রদ্ করি আমার সাধ্যি কি?

তারপর দুএক কথার পর বংশীও ওঠে, শ্রীরামও উঠিয়া পড়ে।

উঠিতে উঠিতে বংশী শ্রীরামকে বলিল, তুমি লণ্ঠন এনেছ না? আমার একবারটি এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবে না?

—খুব, খুব—চলনা—। দুইজনে সেই তরঙ্গবিস্তৃত বনপথ দিয়া অগ্রসর হইল।

শ্রীরাম প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দাদা, ঠাকুরের মনটা কেমন বোঝ—কি, মেরে-কেটে দেবে না তো?

বংশী আমূল জিভ্‌টা বাহির করিয়া উত্তর দিল, ছি ছি, তুমি পাগল ছিদাম—ও আর যাই হোক ঠাকুর-দেবতার নামেই অন্ধ। তাঁদের নাম করে তুপটিও এদিক ওদিক করবে না। দেখে নিও না?—কোনদিন—

বাঁ-দিকে শুক্‌নো পাতাগুলি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া ওঠাতে দুইজনেই সোৎসুক নয়নে সেই দিকে তাকাইল। ও-পাড়ার কানাই সরকার বিনা-আলোয় কোথায় যাইতেছে যেন।

বংশী কথা পাল্টাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, কালকে বাজারে বা মাছ সস্তা গেছে; তুমি কালকে কি এনেছিলে?

—আমি তো বাজারে যাইনে, পাঁচুই বাজারঘাট করে। তা—

কানাই সরকার তখন অনেক দূর চলিয়া গেছে।

শ্রীরাম বলিল, দাদা, কানাই-ব্যাটা সব শুনে ফেললে তো। তোমার গণ্ডা যা জোর—বাপ্‌।

—তুমিও যেমন, কিছু কি বুঝ্‌তে পারা যায়?

—নাঃ, তবু, কে কখন কোন্ দিক থেকে শুনে বিপদে ফেলবে—এই আর কি!

সেই রাত্রে।

রাত্রি যখন আরো ঘন আরো কালো হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়াছে, আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় মুহ্যমান ধরণী রজনী জাগিতেছে, অন্ধকারের কোলে মাথা রাখিয়া বসুমতীর অর্দ্ধেক প্রাণী নিদ্রিত—তখন এ অঞ্চলে শুধু একটি লোক ক্ষীণ একটি লণ্ঠনের আলোতে সর্পসঙ্কুল নিবিড় বনে একাকী চলিয়াছে। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত—পূব দিকের পাড় হইতে ঘন বনের বিরল ফাঁকে আলোর রশ্মির উত্তর পাড় অতিক্রম করিয়া পশ্চিমের পানে চলিল। তারপর ক্ষণকাল থামিল। কোন তস্কর তার গুপ্ত ধন আনিতে যাইতেছে বোধ হয়!

ইনি স্বয়ং সতীশ ঠাকুর।

গভীর অরণ্যের অন্তরালে একটি নিভৃত কোণ। সেইখানে ঘাস ও তৃণের মুখোস সরাইয়া একটি শিলার শুরুভার উন্মোচন করিলে বহুজীর্ণ পিতলের একটি পাত্র বাহির হয়। আজিকার পাওয়া সোনাটুকু সিন্দুক হইতে অপসারিত করা হইতেছে এই অরণ্য-ভাণ্ডারে।

ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে এইরূপ।

সতীশের পিতা মহিম মৃত্যুকালে ছেলেকে বলিয়া যান—আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি—মা আছেন এই নীলদীঘিতে। তিনিই জানিয়েছেন যে, সোনা দিয়ে তাঁকে গড়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবে গাঁয়ের লোকের সুখশান্তি ফিরবে, অকালমৃত্যু, অনাচার, ব্যভিচার বন্ধ হবে। নইলে নিষ্কৃতি নাই। আমি আমার আজন্মসঞ্চিত অর্থে যতটা পেরেছি কিনেছি। তুমি যদি আমার পুত্র হও তাহলে এরই জন্যে প্রাণপাত করবে। মনে রেখ, অনন্ত ভট্টাচার্যের বংশধর তুমি, এটা তোমার বংশের সহজ কর্ত্তব্য। পূজো-আচ্চা করবে আর বিশিষ্ট লোকদের বিশ্বাস উৎপন্ন করে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে সোনা জমাবে। হিসেব করে দেখা গেছে, আর তেতাল্লিশ ভরি হলে তবে ঠিক সেই আকৃতির মূর্ত্তি তৈরী করা সম্ভব। আমাদের পাটের ঠাকুরের যেমন গড়ন, মা ছিল গাঁয়ের শৈলমূর্ত্তি; সুবর্ণরূপ লাভ করে মার আকৃতি যেন না বদ্‌লায়।

কিন্তু তবু সতীশ তেমন গা করেন নাই। তারপর এক দিন মা তাঁহাকেই স্বপ্নে আদেশ করেন—তোর বাবা এত খেটে গেল, আর তুই কিনা আমাকে উদ্ধার কচ্ছিস্ না!

সতীশ একা অর্থে পাথারে কূল না পাইয়া, এ খবরটা তাঁর পড়শী এবং বন্ধু বংশীকে বলিলেন। আর বলিলেন শ্রীরামকে—তাহাকে দিয়াই মূর্ত্তি গড়াইবেন বলিয়া।

তারপর, একই রাত্রে শ্রীরাম আর বংশীও নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়। তাহারা সব সময়েই সত্য কথা বলে না, বরঞ্চ বেশীর ভাগই অসত্যের আশ্রয় নেয় বলিয়া, তাহাদের কথায় আর কাহারও আস্থা নাই। কিন্তু সরলবিশ্বাস সতীশের সে-আস্থা ছিল।

স্বর্ণ-সংগ্রহের এই ইতিহাস।

শ্রীরাম মাপে ঠকায়।

বংশী জোগাড় করে।

সতীশ ভিক্ষা করেন।

শ্রীরাম বলে, মাপে যেটুকু ঠকাব বড়লোকদের, সেটুকুই আমার সামর্থ্য। দশ বারো দিন পরে পরে সে সোনা আনে, আর ওরিটাক কি তারো কম। কিন্তু তার উৎসাহ আছে, সহানুভূতি আছে।

সতীশ বলেন, কিন্তু ঠকানো সোনার মার মূর্তি—?

শ্রীদাম জবাব দেয়, মার বলেই সাহস করছি দাদা-ঠাকুর। বড়লোকেরা চাইলে কখনও দেবে না, পুঁজি করবে। দাদাঠাকুরের কথাকে হয়তো বিশেষও করবে না। গাঁয়ের সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে এ চুরিতে যা কিছু মনে করবেন না—এ তুমি স্থির জেনো।

অনাগত অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশে ঊর্ধ্বদিকে ইঙ্গিত করিয়া সতীশ বলেন, আখো ভাই, তোমার বিবেককে জিগ্যেস কর। কী জানি—অনাচারের সোনা—! আমার কিন্তু মন সরছে

বংশীর সঙ্গে কথা—সে আনিবে স্বজাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া। তাহাদেরই লোক অমুখে-বিসুখে বেশী মারা যায়, সুতরাং দেয় তাহাদেরই বেশী। মায়ের পুনরুদ্ভাবনের শুভ সংবাদে কিংবা কখনো তাহাদের ধর্মবুদ্ধিতে আঘাত করিয়া সে সোনা জোগাড় করে।

সতীশ সম্রান্ত ঘরের পুরোহিত, তাঁহাকে বেশী বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু বংশীই মাঝে মাঝে বেশী দেয়। কোথা হইতে দেয়—সতীশের এখন সন্দেহ হয়। তাহাদের স্বজাতির ঘরে এত সোনা! যাই হোক—তাহাদের তো আর ভিন্ন উদ্দেশ্য নয়।

শ্রীদাম দাওয়ায় তাহার ছোট্ট হাপর-নেহাইয়ের সুমুখে বসিয়া দিবাস্বপ্ন দেখে। একটা অনাড়ম্বর মর্মর-মন্দির, রান্নাঘাটা সাদা আর কালো চৌকো পাথর দিয়া সাজানো। উপরে ঠিক মাঝখানে ঘণ্টা, দুই পাশে দুই বাতির ঝাড়। বারান্দা কাঠের রেলিঙে ঘেরা। কত লোকজন, দক্ষিণার থালা—তাহার রূপার অপরূপ! তার এক ভাগ শ্রীদামের, আর এক ভাগ বংশীর, বাকীটা দাদাঠাকুরের। বংশীরই বেশী পাওয়া উচিত। গ্রাম শান্তিতে আর ধান ধানে ভরিয়া গেছে। অকালমৃত্যু নাই। গ্রঃ—শ্রীদামের চোখ দুইটা আনন্দে, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আশায় চক্‌চকে হইয়া ওঠে।

সে সৌরভীকে ডাকে, ওগো দেখ, আমার দুই হাত কেমন সোনার রঙে গেছে!

স্ত্রী বলে, কই নাতো!

—নাঃ, এখনো আসেনি, তবে শীগ্‌গীরই আসছে।

—কোত্থেকে গো? এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় সৌরভীর চোখে জল আসিয়া পড়ে।

সৌরভী বলে, আচ্ছা, লোককে ঠকিয়ে তো সোনা জমাচ্ছ, আর গচ্ছিত রাখছ ঐ দাদাঠাকুরের কাছে—তাতে তোমার লাভ?

—লাভ পুণ্য, লাভ সোনা। গড়াব তো আদিই—বলিয়া শ্রীদাম একটু হাসে।

—কিন্তু ঠাকুরকে ভাল রকম জান তো, যদি—

এই কথায় দাদাঠাকুরের খাঁটি-থাকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, সরল-বিশ্বাস শ্রীদাম যেন মারমূর্তি হইয়া ওঠে। এই জন্যই তো মেয়েমানুষকে কিছু বলিতে নাই, তাহাদের না আছে কাণ্ডজ্ঞান, না আছে স্থানপাত্রের বিচার।

সে শুধু সৌরভীকে বলে, যাও নিজের কাজ আখো গে—

যাইতে যাইতে সৌরভী শুধু এইটুকু বলে, একদিন হঠাৎ চোখ বুজতেও তো পারেন।

শ্রীদাম ভাবে, তাই তো, তবে!

বংশীর সন্তানাদি নাই, স্ত্রীকে বহুকাল ভবতরীতে উঠাইয়া দিয়াছে। তবু অর্থের প্রতি তার প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ, সুবর্ণের প্রতি অহেতুক মায়া। কেন যে সে তবু এত সোনা জোগাড় করে আর ঠাকুরের কাছে গচ্ছিত রাখে ইহাই আশ্চর্য। সে ভাবে—জমুক, জমুক। তাহার চোখ দুইটা হিংস্র দীপ্তিতে, যেন স্বর্ণের আভা লাগিয়া জ্বল জ্বল করিয়া ওঠে। ভাবিতে ভাবিতে যখন আর পারে না, তখন উঠিয়া পড়ে।

সতীশ কায়মনে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বপাকে একবেলা খান, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। জমীদারবাড়ীর পূজা হইতে ফিরিয়া সতীশ সেদিন চঞ্চল হইতেছিলেন। নিজের বাড়ীর ঠাকুরের পূজা সারিয়া রান্না করিয়া খাইয়া উঠিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল।

শ্রীদাম আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পদক্ষেপ একটু দ্রুত। চোখে তার কিসের যেন অস্বাভাবিকতা—খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা ভয়, আর খানিকটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

সতীশ শুধাইলেন, কি হে ছিদাম ভাই, কী খবর? খবরটা যেন সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীদাম বলিল, আপনি পুজো সেরে উঠুন, বলছি।

—একটা উদ্বেগ নিয়ে কি পুজো হবে ছিদাম ভাই, তুমি বল, আমি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অজানা আশঙ্কায় তাঁর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীদাম বলিতে থাকে—আজকে এইমাত্র নানা রকম কথা শুনে ছুটে এসেছি আপনাকে নিবেদন করতে। বড় বিপদের কথা, কি যে—।

বাধা দিয়া সতীশ বলিলেন, বলেই ফ্যালো না, কি হয়েছে।

—না, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে কিনা ভাই। বলতেই এসেছি যখন, তবে—খানিকটা থামিয়া, ঢোক গিলিয়া শ্রীদাম বলে, কানাই দীনু ওরা বলা-কওয়া করছিল, আমি শুনে ফেললুম। সেদিন নাকি ঐ অনাথ মিত্তিরের বৌ যেদিন জলে পড়ে মারা গেল,……আচ্ছা সেদিন বংশীধর আপনার কাছে এসেছিল, মনে আছে আপনার?

—নাঃ। সে কবেকার কথা? তবে……তবে, হাঁ যতদূর মনে পড়ে—চোখ বুজিয়া সতীশ মনে করিতে চেষ্টা করেন—তারই দিনকতক পরে বোধ হয়, বংশী আমাকে খানিকটা মাল দিয়ে গেল……অনন্ত একজোড়া, হার এক-গাছা, এমনি সব কী কী যেন।

—তা হলেই হয়েছে বাবাঠাকুর, লোকে তাকে সেদিন দুপুর বেলা দীঘির পাড়ের বাঁশবাগান থেকে ভিজে কাপড়ে বেরোতে দেখেছে। বলুন তো কী করছিল সে ওখানে?

—হাঁা, আমাকে এসে তো বলেছিল—অনাথের বৌ দাদা, ছোট্ট বেলা থেকে এক পাড়াতেই মানুষ, তাদের ঘরের দেখি, ভরভন্ন ভাগ করে নাবলুম জলে, কিন্তু কোথায় কে?

—তাহলে ঠিকই বলছে লোকে—আমারও খুব বিশ্বাস হয় তাই। তখন লাসটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে পরে খুঁজে বার করে গা-থেকে গহনাগুলো খুলে নিয়ে আবার ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যেয় তাহলে আবার ভিজে কাপড়ে ওকে ঘাট থেকে উঠতে দেখা গেছে কেন?—বলুন, আপনিই বলুন।

—সে তো শুনেছি আমার বাড়ী থেকে যাবার বেলা—আজকাল ওর নাকি চরিশ চলছে, তাই রাত্তিরে দেখতে পায় না ভালো—বেড়ালা গেছে পড়ে দীঘির জলে।

—না দাদা, লোকে খুব ভাল প্রমাণই পেয়েছে। যত লোক ডুবেছে, তাদের অলঙ্কার ওরই হাতে গেছে, বুঝলেন! খানিকটা থামিয়া শ্রীদাম বলে, কর্তন এখন কি করবেন, এই অনাচারের এই চুরী-করা সোনা দিয়ে! এই দিয়ে ঠাকুর পড়বেন?

—আমার ধারণা ছিল, তোমারই বুঝি ঠকের সোনা, তা দেখছি বংশী ধার তোমার ওপরে।"

সেই যে সতীশ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, পূজাও করিলেন না, রান্না করিয়া খাইলেনও না। ধীরে ধীরে বেলা গড়াইয়া গেল।

তার পর কখন আসিয়া অতর্কিতে সতীশ বিছানা লইয়াছেন, নিজেরই জানা নাই। কিন্তু বাহিরটা আরো গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। বেড়ার ফাঁক দিয়া বনের অন্ধকার আসিয়া ঘরটা ভরিয়া ফেলিয়াছে। চোখ খুলিলে শুধু দেখা যায়—কালী আর কালো।

সতীশ ভাবিতেছেন—এ তুমি কি করলে ঠাকুর, কামিনীর মোহ যার নেই তাকে কি শেষে কাঞ্চনে ডুবিয়ে মারবে! সোনা আর সোনা, অশুচি সোনা, মানুষের খুনে নোনা-ধরা সোনা।…পাপ,…উঃ, রক্তাক্ত পাপ।—রাত্রি নেই দিন নেই, সোনার পেছনে ছুটেছি, সোনার পেছনে তুমি বোধ হয় আড়াল হয়ে গিয়েছিলে, না মা! মূর্তির পেছনে তোমাকে বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছিলাম! উঃ। বংশী লোকটার কি অন্ধ ভক্তি!—

দুপুর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া খিল আঁটিয়া এমনই কি সব ভাবিতে ভাবিতে সতীশ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন সকালে বংশী আসিয়া দেখিল ঠাকুরের ভয়ানক জ্বর। আর কেমন শূন্যদৃষ্টিতে ঠাকুর তাহার পানে তাকাইয়া আছেন। বংশী ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—কি দাদা, জ্বর হল কখন?

সতীশ নিরুত্তর।

পুনর্বার বংশী বলিল, আমি এসেছিলাম, আর অল্পখানিক মাল নিয়ে।

সতীশ কেবল বলিলেন, আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমার আজ ভাল লাগছে না।

বংশী তবু জোর করিয়াই সেদিন সোনা দিয়া গেল। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বাকী?

সতীশ কিছুই বলিলেন না।

ক্রমে সতীশের জ্বর বাড়িতেই থাকে। বংশীর দেওয়া সেই মালটা সিন্দুকে পড়িয়া আছে। জ্বরের ঘোরে বনের ভিতর যাওয়া হয় নাই, রাধিয়াও আসিতে পারেন নাই।

পরের দিন প্রায় বেহুঁসের মতই সারাদিন সতীশ পড়িয়া থাকিলেন। এত পাপের ফলে এইবার বুঝি তাঁহাকে কঠিন ব্যাধিতে ধরিল।

রাত্রে শ্রীদাম আসিল। প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা ক্ষীণশিখা প্রদীপের আলোতে কিছুই বোঝা গেল না। বিপর্যস্ত বিছানায় নিশ্চেতন সতীশ শুইয়া আছেন। কাছে গিয়া শ্রীদাম দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিল। গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া আঙুলের ডগায় কী যেন তাহার ঠিকা ঠিকা ঠেকিল—যার গায়ে সে হাত দিয়াছিল, সে আর সতীশ ঠাকুর নাই, একটা নিষ্প্রাণ শব। তখনও ভাল করিয়া রক্তটা জমাট বাঁধে নাই।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ শ্রীদাম ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

• • • •

শিউলিপাত্রের শীতল গর্ভে আজও সেই নিবিড় বনে শিউঠাকুর জন্ম লইতেছেন কিনা—কে জানে!

ছিন্নমস্তা

—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

নগরীর শত সৌধচূড়ে, যে রুদ্ধ প্রশ্বাস আজ ভারাক্রান্ত নীরব ভাষায়,
আকাশের কাছে তার করে অভিযোগ—
মুখর কল্লোল মাঝে নিস্তব্ধ তটিনীর স্তব্ধতার মত—
তাহার অস্ফুট বাথা ঘনায়িত সন্ধ্যার আঁধারে,
আলোকিত অসংখ্যার কৃত্রিম সজ্জায়
উদ্ভাসিয়া ওঠে মোর চোখে;
সীমাহীন জনস্রোতে শতলক্ষ সৌধ ও মিনার—
মনে হয়—মানবের বাথাতুর প্রত্যেক তন্ত্রীর
বহি আনে সমাচার—শিখরে শিখরে—
অব্যক্ত বিক্ষোভ লয়ে অনন্তেরে জানাতে বারতা।
আমি যেন শুনি কানে কানে,
দৃঢ়ভিত্তি, সুসজ্জিত ইট আর প্রস্তর কঠিন
অবিশ্রাম আর্তস্বরে কহি ওঠে কথা—
পীড়িত মানব আর পারেনাক সহিতে পেষণ;
মেশিন-মুখর-দিন প্রতিদিন উদ্গারে যে কালি,
যে কলঙ্ক কালো মেঘে করিয়াছে অটল, ঘোরালো—
তার সাথে মিশে গেছে তাহাদের বুকভাঙা অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাস।

• •

তাই নিতি বহমান জনপ্রবাহের
তীরে তীরে আমি ফিরি—দুই আঁখি লয়ে,
তরঙ্গের অন্তরালে অশ্রুরুদ্ধ যেই হাহাকার
ফেনিল উদ্দাম হয়ে অপেক্ষিছে প্রকাশের দুর্বার আগ্রহে
পুঞ্জীকৃত রুদ্ধশ্বাস; বাহিরের অশান্ত স্পন্দন
যাহারে ঢাকিয়া রাখি ছুটে চলে করিতে মিছিল
জীবনের রাজপথে, আপনারে দেয় বিকাইয়া
পণ্য হতে পণ্য-বীথিকায়—সুধার্ত রসনা লয়ে গভীর ক্ষোভের
শোচনীয় পরিণতি করিবারে অনুভব চক্রে পিষ্ট আহত অন্তরে।

হেথায় লভি না হায় প্রান্তরের প্রশান্ত স্তব্ধতা,
বৃক্ষছায়া অসীমের উদার আবাস,
অনাবিল বায়ুস্তরে মধুর মাধুরী,
আকাশ আবিল হেথা, বিজলীর প্রখর আলোকে
কোটি কোটি তারাদের ম্লান মনে হয়,
তাদের ঘেরিয়া রহে গাঢ় ধূম ধূম্রেলির মত;
চারিদিক ভরি শুধু কলকথা, অশ্রান্ত গুঞ্জন
মর্মরিত ধ্বনি যত যানবাহনের।

শবের প্রবাহ বহে সীমাহীন উন্মাদতা লয়ে
জীবাত্মার ক্রন্দনের সম ; সেই ধ্বনি নিরন্তর
তারস্বরে ত্রস্ত করে মোরে।
প্রচণ্ড ঘূর্ণীতে যেন তরণীর ভেঙে গেছে হাল,
মগ্নপ্রায় জীর্ণ তরী তটিনীর সর্পিল স্রোতেতে
মরণের আলিঙ্গিতে দুলিছে দোদুল ;
যে ধারে চাহিয়া দেখি—কূলহীন সুনীল সলিল
থরথরি কেঁপে চলে নেচে নেচে জীবনের অমমা তৃষায়,
নিঃসহায় সেই তরী তীব্র আশঙ্কায়
মৃত্যুর স্বপন দেখে ভয়াল হৃদয়ে ;
শপথহীন শীতলতা নেমে আসে ধমনীর উষ্ণ রক্তস্রোতে।
জীবন খুঁজিয়া ফেরে সমাপ্তির সংজ্ঞাহীন নিষ্ঠুরতা হতে
অন্তিম পরিত্রাণ শুধু।

কীটদষ্ট কাব্য মোর এ মহানগরী !
এর প্রতি পরমাণু সাথে আমি হেরি প্রতিদিন
সমারোহ সহকারে জীবনের অপচয় চলে ;
কোটি কোটি জীবাণুর পলে পলে ফুটিবার আগে
ক্ষুধায় ধূসর হয়ে ঝরে গেছে ধূসরিত পথে ;
অপমিত মানবাত্মা করিয়াছে বিকাশের বিফল প্রার্থনা।
বর্তমান শতাব্দীর ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার রক্তের প্রতীক
রক্তরিত শিরা লয়ে মেলিয়েছে অসংখ্য প্রশাখা,
সুবিশাল বনস্পতি যেন !
ধ্বংসের নিষ্ঠুর বাণী ধ্বনিতেছে এর প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।
ভয়াল করাল ছন্দে ধ্বংসোন্মুখ কবিতা আমার
বাদ করি নৃত্যরতা অজস্র উন্মাদে ;
নটীর তাণ্ডব নৃত্য যেন আত্মাহুতি
বরাঙ্গের ললিত ভঙ্গীতে।
আমি হেরি মোহিত দর্শক—
ভৈরবিণী প্রলয়ের ভীষণ লীলায়
উচ্ছ্বসিত আনন্দেতে আপনার রক্ত করে পান
সর্বনাশী ছিন্নমস্তা যেন—
লকলকি লোলজিহ্বা করিয়া বিস্তার ;
অসীম বিস্তৃত তার বদনগহ্বর,
সংখ্যাহীন জীব সেথা অপহারী বুদ্বুদের প্রায়
গমামান স্রোত-বেগে জেগে উঠি নিমেষে ঘুমায় ;
আপনার টুঁটি টিপে আপনারে হত্যা করে তারা
রুদ্ধ করি নিশ্বাস প্রশ্বাস।

তবু, তবু ভালবাসি আমি
জনগণ পরিবৃত কলোলিত এ মহানগরী।
ভালবাসি মেশিনের নিয়ত ঘূর্ণন,
ইহার আকাশ ছেয়ি যে আবিল বায়ু
বয়ে যায় দিবানিশি ভালবাসি তারে ;
আর ভালবাসি আমি ঘনকৃষ্ণ চিমনীর ধূম
ঊর্ধ্বফণা অজগর সম, এঁকে বেঁকে উড়ে চলে যায়
মেঘলোকে মধুর প্রাসাদে—
কোটি কোটি মানবের উদ্বস্ত কবিরে
পরিণত করি কালিমায় ;
ভালবাসি মর্মাহত জীবাত্মার এই অপব্যয়।

অসহ্য যন্ত্রণাভারে নিষ্পীড়িত জর্জরিত মোর
রচিয়াছে অঙ্গদিক্ত যেই ভালবাসা—
বীভৎস আনন্দ মোর—
মৃত্যুমুখ মুহূর্তের গতির আবেগে
এক কোটা অশ্রু দিয়ে মৌন দুখে বিদায়ের সম্ভাষণ করা—
ইহাদেও দিই আমি—জগতের ঐকান্তিক অপরূপ ডালি।
জানি আমি, মৃত্যুজয়ী মহাকাল যুগে যুগে করেছে নির্দেশ
সৃজনের আদি হতে আজো,
মানবের সাধনার মর্মভেদী শত পরিণাম—
ব্যর্থতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা !
তবু এই নগরীর উদ্ধত গরিমা
বিফল প্রয়াস করে মহাকালে করিতে বিদ্রূপ
মাথায় লইয়া তুলি সভ্যতার পঙ্কিল পসরা,
ইহার সুন্দর বক্ষে আমি দিনু মোর
অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, ছিন্নমস্তা পরিতৃপ্ত হোক।

প্রদর্শনী

মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টস্

১৮২৯ সালের স্কুল মাদ্রাজের এই শিল্পবিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রথম ও দ্বিতীয়ের ইতিহাস। ১৮২৯ সাল হইতে যে সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ভিত্তিস্থাপনা-দিন হইতে এই ঐতিহাসিক স্কুলের সার্থকতা ঘটিয়াছে কিন্তু তাহা পুরাতন, লোকলোচনের অন্তরালের ইতিহাস। ১৮৫৯ সালে মাদ্রাজের ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তখনও মাদ্রাজ আর্টস স্কুলে সেটিং ক্লাস খোলা হয় নি। ক্লাস টেবিলের কেবল রায় আঁকিবার এবং মডেলের নকল করা হইত ও কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র উভয় পক্ষই ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে বলাবাহুল্য ইউরোপীয় শিল্পী দেবীপ্রসাদের আবির্ভাবে শান্ত সমাহিত বিদ্যায় উপস্থিত হইল। ছাত্রমণ্ডলী তখন দুইটিমের, তিনি তাহাদের চক্ষের বি ভাস্কর্যকে লইয়া মাটির আর্টস বিভাগ সুরু করিলেন এবং বর্তমানে মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টস্ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সূত্রপাত হইল। সুতরাং এই শিল্পবিদ্যালয়ের ইতিহাস এক হিসাবে শিল্পী দেবীপ্রসাদেরই শিল্প সাধনার ইতিহাস।

সেই দুইটির ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া এখন একশত ত্রিশজনে দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার অধিক ছাত্রগণেরও স্থান হইবার উপায় নাই। স্কুলের কর্তৃপক্ষ পাঁচ বিভাগ হইয়াছে, প্রতি বৎসর তাহা পাঁচশত শিক্ষার্থী-বিদ্যার্থীকে বিমুখ করিতে হয়, পাঁচ বৎসরের ইতিহাসে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। বোম্বাই, বাঙ্গালা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনেক ছাত্রই শিক্ষালাভের জন্য এখানে আগমন করিতেছে। ছাত্রীও আছে।

১৯০১ সালে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় এই স্কুলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন এবং ১৯০১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি স্কুলের ভার হইতে বৎসরে বৎসরে একটি শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রদর্শনী তৃতীয় বৎসর পদার্পণ করিয়াছে। স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রাদির বর্ণনা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, এই তিন বৎসরেই এই প্রদর্শনী অসম্ভব উন্নতি করিয়াছে: চিত্র-শিল্প (অয়েল, ওয়াটার কালার), ভাস্কর্য, কাষ্ঠ খোদাই, কাষ্ঠের, পালার এবং এনামেলের কারুশিল্পের ক্ষেত্র—সকল বিভাগেই, প্রদর্শনী দ্রুত উন্নতি করিয়াছে। এই প্রদর্শনী বলিতে মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌টস্‌কেই বুঝায়, কারণ স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও তাঁহার ছাত্রদের শিল্পকলাই এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদের চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্পের নমুনা প্রকাশ করিয়াছি। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় (১৯০৩) ও তৃতীয় (১৯০৪) মাদ্রাজ শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত স্কুলের ছাত্রদের শিল্প-কলার অবশিষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করিতেছি।

একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্টস স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ছাত্রদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই সমান উৎসাহের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহার যেদিকে যেরূপ আগ্রহ সে সেই ভাবেই নিজের শিল্পসাধনা নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলে। প্রকাশিত চিত্রগুলিতে এই উভয় পদ্ধতির নমুনাই দৃষ্ট হইবে।

গোপীলীলা (প্রোঢ়)।

[শিল্পী—বেঙ্কটনারায়ণ রাও

[শিল্পী—শ্রীকালিকিঙ্কর ঘোষ, লক্ষ্ণৌ

'পাখী চাই'। [শিল্পী—বেঙ্কটনায়ু

শ্রীরামের অভিষেক। [শিল্পী—বেঙ্কটনারায়ণ রাও

[শিল্পী—ষ্টানিস্লাসেন

অভিসারিকা। [শিল্পী—বেঞ্জামিন্

সাথী। [শিল্পী—বেচারাম্বাল সাও

শিল্পী নিজে (বয়স ১৭)। [শিল্পী—অলিকাচরণ

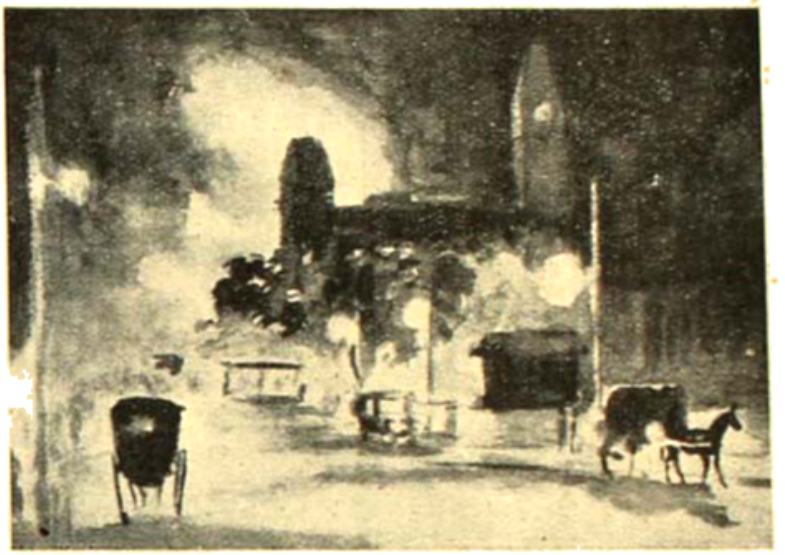

[শিল্পী— ওলিভিয়ের মেসন দম্পতিরে

ভাব-সমাধি। [শিল্পী—এস. আমেদ

অন্তঃপুর

[বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা লইয়া বাঙ্গালার সকল মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকে নানা দিক দিয়া নানা ভাবের আলোচনা চলিতেছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও এমন শিক্ষিত ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী নহেন, অথচ এই আন্দোলন যে নূতন তাহাও বলা চলে না। এই আন্দোলন যে অন্ততঃপক্ষে একশত বাহান্ন বৎসরের পুরাতন সম্প্রতি তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (প্রথম খণ্ড) নামক পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় 'স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামক একটি পুস্তকের উল্লেখ দেখিতেছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের একটি সমালোচনা ১৮২২ সালের ৩১ এপ্রিলের 'সমাচার দর্পণ' হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

"লেখক—কলিকাতা স্কুল বোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৪ সনে প্রকাশিত এর সংস্করণের একখণ্ড পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশকের নাম নাই। পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—স্ত্রীলোকের কথোপকথন। দ্বিতীয় ভাগ—স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে আমরা পুস্তকটি দেখিয়াছি এবং নানা দিক দিয়া এই পুস্তকের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের অন্তঃপুর বিভাগে পুস্তকটি আনুপূর্বিক মুদ্রিত করিতেছি।

পুস্তকটি যে অন্ততঃ ১৮২২ সালের পূর্বের রচনা 'সমাচার দর্পণে'র সমালোচনা দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হয়। লেখক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ আছে। সেই সময়ে রচিত বাঙ্গালা গদ্যের যে সকল নমুনা ভাষাবিদ্‌রা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন—যথা রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য রচিত, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের প্রবোধ চন্দ্রিকা, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা অথবা রামমোহন রায়ের প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রচিত এই পুস্তকখানির রচনার তুলনায় সে গুলিকে কুণ্ঠিত রচনাও বলিতে পারা যায়। যাঁহারা রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের জনক বলিয়া খুশী হইতে চান তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। রামমোহনের প্রথম বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ (বেদান্ত-সূত্র) ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং তিনি ১৮৩৩ সালে পরলোক গমন করেন। ১৮২২ হইতে ১৮৩৩ সালের মধ্যে তিনি অনেক বাঙ্গালা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, বেগুলির ভাষা 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের ভাষার সহিত তুলনীয়ই হইতে পারে না। অথচ এই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামও আজ কেহ করে না। কালের গতি কুটিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথম খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ৪ হইতে ৬ পৃষ্ঠায় এই গৌরমোহন পণ্ডিতের সামান্য পরিচয় দেওয়া আছে। আশা করি, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা এই প্রতিভাবান পুরুষের বিস্তৃততর পরিচয় অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া সাধারণের গোচরে আনিবেন।

এই পুস্তকের দুই ভাগের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম ভাগ কথোপকথনের ভঙ্গীতে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় রচিত, এখানে সেখানে দুই একটি শব্দ বদলাইয়া ইহাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাষা বলিয়াও চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। একশত বারো বৎসর পূর্বে হুবহু বাংলার গৃহস্থ মেয়েদের ভাষায় কোনও কিছু রচনা করা যে কতটা কৃতিত্বের পরিচায়ক, ভাষা লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিবেন। রামরাম, মৃত্যুঞ্জয়, হরপ্রসাদ, রামমোহন প্রভৃতি যাহা পারেন নাই, এই অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতটি তাহাই করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এই পুস্তকের প্রথমাংশের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এই সকল কথোপকথনের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত বহু প্রবাদ-বাক্য সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—এবং এমন কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আমরা আজিও মুখে বলিলেও লেখায় ব্যবহার করি না।

দ্বিতীয় অংশ লেখ্যভাষায় লিখিত অথচ তৎকালের অন্যান্য লেখকের লেখার তুলনায় তাহা কত প্রাঞ্জল। একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলে পাপকর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মে মতি হয় এবং অবকাশ মতন মানুষ যদিকে ভাল বই ছাপান দিয়া নিজের কাছে ও ছাত্রিতে থাকিয় নিজিয়ে তাহাদের কালযাপন হইতে পারে।"

তাহার বিচার ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও এই পুস্তিকার গুরুত্ব আছে। প্রাচীন ও তাৎকালিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে যেভাবে এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার সম্বন্ধে একমত বারো বৎসর পরেও আমাদের জ্ঞান জন্মে।

এই পুস্তিকার প্রথমভাগে কলিকাতার 'নন্দনবাগানের যুবনাইল পাঠশাল' নামক এক বালিকা-বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। ১৮২০ সালে সর্ব্বপ্রথমে এইখানেই স্ত্রীশিক্ষার পত্তন হয়। এই 'যুবনাইল পাঠশাল' সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই। এই পাঠশালার ইতিহাস সম্বন্ধেও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমাজ ও ধর্ম্মের বাধাসত্ত্বেও দেখিতেছি, দুই বৎসরের মধ্যে (১৮২০-১৮২২) কলিকাতায় ৪০টি স্ত্রীপাঠশালা স্থাপিত হয় ও অন্যূন আটশত বালিকা এই পঞ্চাশটি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে থাকে। সেদাই শিক্ষার পত্তনও তখনই হয়। এই বিষয়ে কেহ কোনও বিশদ সংবাদ দিতে পারিলে আমরা 'বঙ্গশ্রী'তে তাহা সাদরে মুদ্রিত করিব। নিম্নে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকাটির প্রথম উনিশ পৃষ্ঠা হুবহু মুদ্রিত হইল। শেষাংশ আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে। —সম্পাদক, বঙ্গশ্রী]

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

প্রথম ভাগ

দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন।

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়া মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। ভালে ২ কতই হচ্চেইয়া তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। ওবে মন কিসা শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে আপায় আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমাদের ভারি ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশে স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল পরদারের কায কর্ম্ম বলিয়া কাল কাটায়।

প্র। জ্ঞান। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কাযকর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের পরদারের কায ছাঁদা বাড়া রেজাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়ারে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাযকর্ম্ম বাদিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার পশুও ঘুচিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু যে কালের স্ত্রীলোকেরা করেন, যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিদ্যা হয় এটি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে কেন আমি পড়িব না, কি জানি তাহা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কাল আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির চাঁই শুনিয়াছি যে কোন দেশে এমত লেখা নাই, যে লেখা মানুষ পড়িলে চাঁড় হয়। কেবল পত্তর লেখা বাদিয়া এ কথার সৃষ্টি করিয়া দিলে ভাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা শুনিতে পাইতাম, ও বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এত শুনিতে পাই। সম্প্রতি সাহেবে দেখনা কেন, খ্রিষ্টিয়ান সাহেবের মত লেখা পড়া জানে তাহারা কেন চাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দেখে নাই তবে এইদিন এ দেশের লেখা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা হয়ের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধুলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখা পড়ায় কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম শিখা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর করা কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেখা শোনা শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। বহুরা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। বাপ মায়ের কেমন দুঃখের কথা দিদি। জ্ঞান প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বালককাল থাকে কোনখানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেসে কেন দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোটর কন্যারা যদিও অন্যের লেখাপড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শিখে ও পাঠশালে যাইতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ জোড় হয়। সকলে কয়ে যে এই কন্যা ছেঁড়ি ছুঁড়ি যেটা ছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।

প্র। তবে আমাদের শিক্ষা বুঝি হবে না দিদি।

উ। হবে না কেন। আমরা তো জানোয়ারের বক্সা পাঠশালায় গেলে তাই বসে গালি দিবে। সাহেব লোকের পাঠশালায় কোন শিক্ষিত্রী বক্সা আনিয়া তবে তবেই শিখিবে।

প্র। আমরা তো বড় মানুষ নই যে তাহাদিগকে আনিয়া দিয়া শিখিবে। তবে আমাদের এ জন্মে এই পর্য্যন্ত বুঝি।

উ। যদি দাদার লোকেরা রাজা করিয়া যথার্থে ভাল মানুষের বাড়ীতে এক ২ জন বসিয়া পাঠান তবে বুঝি হয়।

প্র। আহা গায়ে কাঁটাল পেঁপের তৈল দিলে কি হবে; আমাদের কথা তাহাদের সাক্ষাতেই বা কে কবে, আর তাহাদের বা অবসরই কেন হইবে।

উ। তাদের তাহারা বলিবেন না এজন্য সত্য বটে, কেননা আমরা তাহাদের সাক্ষাতে পরীক্ষা দিতেও পারিব না, ও বাহিরে পাঠিব না।

প্র। আহা কেবল পাড়া পড়শির মেয়া ছেলে দেখে ঝাঁকাঝাঁকা করিলে কি হবে। এমন কি হবে যে আমাদের কপাল ফিরিবে।

উ। ওলো, ব্যস্ত হইয়াছিস্ কেন। বীর পানী পাহত দিবে। হেথে কেহ আমাদের পাড়ায় ভঙ্গী, মঙ্গী, হীরা, তঙ্গী, ইহারা তো পাঠশালায় যায়, ও গুলিতে পাই যে ভাল শিখিয়াছে। আমাদের তো সঙ্গতি নাই যে তাহাদের টাকা দিয়া আনি। তবে দুইটী মিষ্ট কথায় তাহাদের ভুলিয়া এক ২ জনকে এক ২ দিন আনিলে ও আমরা আধা গুলা শিখিতে পারি।

প্র। বড় কথা বলিয়াছিস্ দিদি। আমার প্রাণ এমন করে যে একদিন তাই করি।

উ। ভাল, আমরা লেখাপড়ায় সাধ্যসাধ্য করি। হেথে কেহ ধনীর মেয়েকে ডাকিয়া কাণে ২ বলিয়া চারি ২ পয়সা করিয়া পাত দেওয়ার কথন কিনিতে দেই। তবে তাহারা একজন না একজন চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া অবশ্য আসিবে।

প্র। ওলো যদি কেউ টের পায় তবে বড় লজ্জার কথা। বলিবে কি এ দুই বোয়া দুঁড়ী চুপে ২ কি করিতেছে। এক পাতড়ি নষ্টে ও গঞ্জনা দিবে। তবে তো লজ্জায় মুখ তোলা যাবে না।

উ। এতো দুষ্কর্ম্ম নয়। কত লোক কত করে পার পায়। ওলো আমরা যখন ঘরের কাজ করিয়া অবসর পাব তখন এক জায়গায় চুপ করিয়া দুই চারি আখর শিখিব। যে খেলে সে কাল কড়িরও দেখিতে পায়।

প্র। ঘরের পাইট ফাইট ফুটনা ঘাটনা ঘাঁটা ঘাড়া দেওয়া ধোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন শিখিব।

উ। ওলো যে যাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। অতএব উহারই মধ্যে মাঝের অবসর কাল থাকলে তার একটু ২ শিখিলেই হয়া যেই।

প্র। ভাল দিদি, আমরা পড়িয়া শুনিয়া টাকা রোজ এমন আশা তো করি না, কেবল জান হইলে আমাদের বাড়ীর মেয়া ছেলের বিদকে ২ বসিয়া শিখাইব, তবে তাহাদেরও বিদ্যা হবে।

উ। ওলো গাছে নাই উঠিতেই এক কাঁদি। আগে আপনি শিখ, তবে পরকে শিখাইস্। তুই বুড়ি তো বড় আকাশ পাতাল।

প্র। ভাল বলিলিস্ দিদি। আমি যদি কি যে সবাই একত্র হইয়া ঘরের কথা শিখিলে রাধে ২ সকলেই শিখিবে। তবে কেউ কাহাকে বিদ্যা বাহা করিতে পারিবে না। কেননা পাতেক বাঁড় এক আরে ধারে দেখা হেথে সেই বলে আমার মত হইত।

উ। না বইন্ এমন হুকুম করিলে কিছুই হবে না। চুলে চাপে আগে আখরগুলি চিনি, পরে যারা করিব তাহাই সাজিবে। তুই মা এখন হীরাকে ডাকিয়া আন দিয়া।

প্র। ও হীরা, আমরা পাতরাড়ি সকল কিনিয়াছি ও খড়িও কিনিয়াছি। তোরা যদি এক ২ দিন এক ২ জন চুপে ২ রাত থাকে করিয়া আমাদিগকে আখরগুলা জানাইয়া দিস্ তবে বড় উপকার হয়। কেমন, যাইবি।

উ। তাই আমি যাইতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু আমার ঘরটীর ঘর হইয়াছে এই জন্যে আমি বড় ব্যস্ত। আজিকার দিন কোন মতেই যাইতে পারি না, আমাকে ক্ষমা করিয়া আজি তুমিকে নিয়া যা ভাই।

প্র। ও তুমরতি হীরার ছোটদিদির আজি ঘর হইয়াছে, সে বলিল কি যে তুমরটীকে ডাকিয়া আজি আহক কর, কালি অবধি আমি না ডাকিতেই যাব, এখন তুই কি যাইবি।

উ। যে রোদ্র এইমাত্র পাঠশালা হইতে আসিয়া ঘরের কাযকর্ম্ম সাজিয়া দুইটী খাইয়া বসিয়াছি, একটু কি থাক, পরে যাইব।

প্র। ওলো, তুই ভুলের ঘরে মূর্খা যাইস্। কিন্তু শিখিয়াছিস বলিয়া কি ঠেকারে মাটীতে পা পড়ে না। আমরা ভাল মানুষের কি যৌ এই অল্পে পাঠশালায় যাইতে পারি না, ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস্ না।

উ। চল ভাই, তুমি যে রাগ করিলায় তাহাতে না গেলে আরও কত বলিবে। আমরা দুঃখি মেয়া আমাদের ঠেকায় অবলায় তোদের কাছে কি, ভাই।

প্র। না ভাই, আমরা দুই বইন অনেক দিন বুদ্ধি করিয়া ধনীর মেয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া তাড়িপাত সকল জোগাড় করিয়াছি। এখন তোরা কেহ না কেহ আইলেই আখরগুলা শিখিতে পারি। কিন্তু আমাদিগের মাতা খাইল যদি কোন খানে আগে এ কথা প্রকাশ করিস্, তাহা হইলে ঘরে যাইব গঞ্জনা।

উ। এত ছাক ২ গুড় ২ কেন। ইহাতে পাপও নাই। ঘরিয়ে ও যাইব না কেবল আপন ঘরে বসিয়া ১০ মেয়া নিয়া বকাবকি না করিয়া নিশা পড়াই করিব, ইহাতে কার বাবা দুয়ার খোল চালা যায়।

প্র। ওলো দিদি, আমরা তো বুদ্ধিশূন্য নই যে যা করিব তাই সাজিবে, আমরা কোথায় যৌবি সকলেরই পায়ের কাছা।

উ। ভাল। এবারের শিখি, পারে যা হয় তাই হবে। কারণ যৌ কালে পুথিপত্রী ইহা সকল ঠাঁই আছে।

প্র। ভাল দিদি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সাহেব লোকের পাঠশালায় মিয়া লেখা পড়া শিখিতে কি ছোঁয় হয়।

উ। না তাহাতে কোন দোষ নাই। কেবল আমাদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্ধতি আগে ছিল না, এই জন্য কিছুদিন বেশ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮১০ সালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় বসন বাগানে বুথলাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই জন্যে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পাঠশালায় মূল সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা গণনা করিলে ও ৮০০ কন্যায় শিক্ষা হইতেছে, ইহাতে তাহারও কিছু অতি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।

প্র। এই ৮০০ কন্যার মধ্যে কোন ভালমানুষের মেয়ে আছে কিম্বা। এবং তাহাদিগের জাতি কুটুম্বেরা কি বলে।

উ। কি সে নাই কি পাড়া তাতে বি। এতো লেখা পড়া বই নয়, ইহাতে জাতি কুটুম্ব কি বলিবে। বরং তাহারা আরও আহ্লাদ করে। যে এই মেয়াটি ভাল লিখিয়াছে। কিন্তু ভাল মানুষের মেয়া সাপট অন্যায় করে না, কিন্তু লুকিয়া চুরিয়া শিখে।

প্র। ওলো বড় বৌ। তোরা ঘরের মধ্যে বসিয়া নিয়ত চুপ২ কি করিস্।

উ। কল বালো। আমরা মেয়া ব্যবহারের ঘরের মধ্যে দুই চারিটা কথিয়া আখর শিখি।

প্র। ভাল ২। যে যাহকরা কোথল না করিয়া একটা ভাবে থাকিস্ তাহাতে বড় ভুই হইলাম, দেখে দেখি মা কেমন লিখিয়াছ। তোমাদের ঘরকে দেখাইব।

উ। আই ২ কি সর্ব্বনাশ, একি মাগী ভাটা পুরুষ মানুষে দেখিলেতো বড় অখ্যাতি।

প্র। না না এত জন্য কর্ম্ম নয়। ভাল ভাল লিখিয়ে অতি কি, ইহা দেখিলে তোমার বসুর বড় ভুই হবেন। লিখ২ যাহা ভাল করিয়া লিখ। ওলো ভগি, ভুই নিয়া আসিয়া আমার এই দুইটি বৌকে যদি লিখাইতে পারিস্, তবে তোকে ভাল বরাং সন্দেশ একখান ভুলিয়া কিনিয়া দিব। আর বাড়ী হইতে প্রসন্ন তোর খাইবার উপযুক্ত চাল্ দিব।

উ। ওলো ভাল। ঠাকুরাণী তো দেখিয়া ভুই হইলেন, কি জানি ঠাকুরজী বা কি বলেন।

প্র। সেকালে ঠাকুরাণী তোর করেন নাই সেকালে ঠাকুরও কিছু বলিতেন না, ও দুইটার এক দর ইহা আমি ভাল জানি।

প্র। ওলো বড় বৌ। ভাল লেখাপড়া তো একপ্রকার শিখিলা, এখন কিছু সেলাইর কায শিখিলে আরও ভাল হয়ে। ছেলে পিলার কাপড় খান চোপড়খান ও টুপিটা আংরাখাটা সিলাইলেও অনেক উপকার হয়। কর্ত্তা যদি পারে তবে আজি অবধি তাহাও আরম্ভ কর।

উ। ঠাকুরাণীকে বল। একি হাসলের পায় জল ঘাড়া। ওলো পিসী বলবারের পরনা বরনার বই নয়। পরিবারি সে সৈলব পাঠশালায় গাড়ি এসে একজন সেলাই ভাল শিখিয়াছে। কিন্তু সে বড় ঠেকারী। যদি তাহাকেই পাই, তবে আমরা দুই সেলাই শিখিতে পারি।

প্র। ওলো বাছা যদিলে তো হয় না। ঘরের বাইরা অনেক যদিন করে তাড়াইবে। তবে যে তাহার ঠেকার কম, সে যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাব ছাড়ে না, তেমনই জানিবা।

উ। ওলো বড় দিদি, আমরা আগে ভাবিয়াছিলাম যে এ কর্ম্ম বুঝি আমাদের সিদ্ধি হবে না। খোদাইর আশির্ব্বাদে লেখা পড়া তো হইল, এখন সেলাই শিখিতে পারিলে হয়।

প্র। সেলাই তো বড় টেক্ টুকে কায, টপ্রোয় যারে চলে না। তবে আমাদের কিরূপে হবে। ঠাকুরাণীকে বলিয়া ঠাকুরকে জানাইলে বুঝি হইতে পারিবে।

উ। আহা মাগো বড় সাঁচা কথা তার কাকে ফেলে যাই। সংসারের তো প্রভুল এই, তাহাতে আবার কর্ত্তাটির আক্কেলের বাঁশ দিয়া জল গলে না। ইহারে কেমন করিয়া হয়।

প্র। যায় হউক যেমে, ঠাকুরাণীকে একবার কহিতেই হবে। অতএব তুমি কহিতে পারিবা কিম্বা।

উ। কহিতে পারিব না কেন, তবে যাই যা থাকে ভাগ্যে।

প্র। ওলো ঠাকুরাণি। কথায় কথা নয় না কহিলেও নয়। তবে বলি যাওয়া। তোমার উপর পাক-বাটীর ভার ঐ দুটিকে আনিয়া কিছু২ সেলাই শিখিতে দাও করি। আগে তুমি কহিয়াছিলা যে তোরা সেলাই শিখ এইজন্য বাই ও পাল্কির সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি, যে তাহারা ও কিছু২ আনিয়া দিবে। অতএব কথার বড়ি একো বোঝা। আর সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ। ইহাতে তুমি কি বল।

উ। ও যারা যদিলেতো হয় না, সংসারের টানাটানি দেখিতে পাইতেছ। তবে রামকমলের চাকরি হইয়াছে সে মাহিনা পাইলেই টাকা দুই টাকা দিয়া যাবিব।

প্র। ওলো তবে কি এখন আমরা শিখিব না। যদি এখন কামাই নেই, তবে যে কিছু শিখিয়াছি তাহাও ভুলিব।

উ। কামাই দিবে কেন, আপনা আপনি ঘরে বসে দুই কাযে ধীরে২ শিখ। ওলো যারা ধীরে২ ভুলে সকল রীতি জিনে।

প্র। কায়ের শুরু কামাই। আমাদের তো চুল বান্ধিবার অবসর নাই, এতো লেখার মত নয়, এ বড় শক্ত কায, তবে কখন শিখিব।

উ। দুই ঘণ্টে পালা করিয়া কায কর্ম্ম করিলে অবসর পাইবা। এত ভাব কর্ম্মই বা কি। কর্ম্মের মধ্যে দুই খাই আর শুই।

প্র। ও বইন তুমি যে বেলে তাহাতে ঠাকুরাণী কি বলিলেন।

উ। তুমি ঠেলা ঠেলি করিয়া পাঠাইয়া দিলে আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে ঠাকুরাণী মুখে যৌ বলেন, হৃদয়ে বিপক্ষ হবেন।

প্র। ওলো, এত ঠাট্টাতামাসেই বা কাজ কি, আপনাদের ঘরে যে মেয়ে বরযাত্রের দুই চারি কড়া আছে, তাই ডাকিয়া কেন সিধি না। তখন বড় ঠাকুরের কাছ হইতে ঘরে সন্দ আইলে আমাদের আর পুঁথি ছাড়া যাইবে না, এবং এটাকেও পাওয়া যাবে এমনি কেমন দিদি।

হক কথিয়াছেন কেটা পাকিলে থাকেন ভেটা। আহা অমন দুটি মেয়ে ঘরে করিবি তারা না কি আর পাওয়া যায়।

প্র। রাখ বেন বাঁদর মেকরা। যে দশ টাকা বাড়ি চাড়ি দেওয়া এই সাতের হইতেই পাইতেছি। ঘরে করিলেও এই খানেই পাইব। তবে এত কথা হলে কি কাজ চলে।

উ। তোমার যারা ইচ্ছা আমিও তাহাই করিব। অতএব পাজিকে ডাকিয়া একটী বিবাহ করিয়া দুই দুতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।

প্র। ও মরণের মা, তাই বলিতেও লজ্জা করে, কিন্তু দুই আমাদের হাত কাটারি, মানুষ থাকিলে অবশ্য সময়ে বলিতেই হয়। একবার ঈশান পাঠশালে হইতে ডাকিয়া দিতে পারিস্।

উ। তাই ভাই, তোমাদের মন রাখিতেই হয়। কেন না রাত অবশ্যে তোদের কাছে হাত পাতিলেই মুখ খুলিবা : এই জন্যে খুসিতে হয়।

প্র। ও পারি, ও বাড়ির দুই বৌ তোর ঠাই সেলাই শিখিতে চায়। সেইজন্যে আমাকে তোর কাছে পাঠাইল, চুকিয়া ঐ কর্ম করিস্, অতএব সেখানে গেলেও কিছু২ পাবি, মিছা ঘর বসে বাসি আবালে কি হবে।

উ। হেসে কথা কওয়া যা, কথায় কথা লোকে বলে। যে হেসে কথা নাই বলো কথা নাই। তুই কিছু তোমাদের বলিতে বাকি যা। এই যে ভগী দুটি এক সঙ্গের বিদ্যাধরী সেই দুই বৌকে লেখাপড়া শিখাইতেছে, কখন বাকি তাহাকে উপড় হাত করেন নাই। তবে আমরা তো গরিব দুখিয়া মেয়া। কথায় কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে, ও পেটে খাইলে পিটে সয়। যদি কিছু না পায়, তবে আমার ছেলেপিলা গুলি কি খাইয়া বাঁচিবে। আমি ঘরে বসিয়া দুই খান চাদর সেলাই করিলেও চারি আনা পাইতে পারি।

প্র। ওলো দুই বুঝিস্ না। বড় বাড়ির আমানি ভাল। এখন চাকরের বাজারে বড় চাকরী হইয়াছে, অতএব এখন গেলে তোর সঙ্গে লেগে যাব। আমি তো এই বুঝি, তুই কি বলিস্।

উ। হইক যেন তাই। যে ছেলে তাঁটা খায় তার বাটা যেন চক্ষু। আর মানুষ বড় যার তার বেঁড়া দুইটা কান। দুই বলিতেছিস্ যেই যাই নইলে যেন যাইতাম না * * = আমি দুইয়া আসিয়াছি। এখন পর্যন্ত আমার ঘরের বাসী পাইট পড়িয়া আছে, তবে যাই ভাই।

উ। যা ভাই এখন আমরা পাড়ির সঙ্গে কথা আর্ত্তা কই।

প্র। ও পারি। তুই তো সেলাই কর্ম বড় ভাল শিখিয়াছিস্, তাহা তবিলা আমরাও শিখিতে ইচ্ছা করি। যদি দুই একদিন আসিয়া আমাদিকে শিখাইস্, তবে আমাদের উপকার তোরও কিছু২ লাভ হয়।

উ। আমার কাম ঐ। আমার পাঁচটা কাজা বাচ্চা আছে, তাহাদের খাওয়া পরা ও আপন পেটটা চলিলেই তোমাদের শিখাইতে পারি। আমরা তো গরিব লোক, সদা সর্বদা পেটের ধান্দায় ঘিরি।

প্র। আমরা কি তাহা বুঝি না, অতএব তোর হাতে পোষায় তাহাই করিব। মিছা বাক্য না করিয়া বুঝিয়া যার বেলে তের হইলে ক্ষতি কি।

উ। আহা ঠাকুরাণী। কিন্তু পেটে খুধা মুখে লাজ সে পিটিতে কিবা যায়। আমাকে যদি কিবেক তাহা কিন্তু করিয়া কহ।

প্র। ও পারি। এমন লাক পাজী কথা কহিলে আমরা তো পারি না। যাহা হয় সব তাহাই বল। আমরা যদি ৩ চারি টাকা করিয়া দিতে পারি, ইহার বাড়া আর পারি না। যদি ইহাতে হয় তবে কালি অবধি আইস ভাই।

উ। আমি সকল কথাই তোমাদের সাক্ষাতে কহিলাম। যদি আর একটি টাকা দেও তবে আমার কোন দুখ থাকে না, নিশ্চিন্ত হইয়া শিখাইতে পারি।

প্র। ওলো। তোর আপন কথাই পাঁচ কাহন। আর পাঁয়ে মাথেন আপনি মরণ। এমন দোঁড়ায় আরম্ভ করিলে কি আর চলে। ভাল এক টাকা কি মিছা আদিবে। আগে তুলা দিয়া সবাই পাছে লোহা দিয়া আই। অতএব এমনি সকলই হইতে পারে।

উ। তবে এই কথা নিশ্চয় হইল, কালি অবধি আসিয়া শিখাইতে আরম্ভ কর।

প্র। আমি তোমরা সেলাইর সব ইজারির আয়োজন করে, কালি আসিব, কিন্তু কোন সময় তোমাদের অবকাশ তাহা বল।

উ। আমরা প্রাতে কালে ঘর কন্নার কাম ও হাঁড়ি বাড়া করিয়া বকালে ২ অবসর হইব, তবে বেড় প্রহরের সময় আসিয়া ইহাতে যেন অন্য মত না হয়।

প্র। আমরা যে২ সেলাই করিলাম তাহা ঠাকুরাণীকে দেখাইব, যেমি তিনি কি বলেন।

উ। ওলো আবার দুঁড়ি। ইহা জানিস্ না যে পিঁড়ায় ঘিলিলে পেঁড়ায় জিবা যায়। আগে আমাদের সেলাই পারিকে দেখাই, পাছে ঠাকুরাণীকে দেখাইস্।

জামাইষষ্ঠী

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ বিজলিবাতি নিভিয়া গিয়া গাড়িটা অন্ধকার হইয়া গেল।

এ-লাইনে এরকম হইয়াই থাকে।—গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া, বইখানি খুলিয়া নিশ্চিন্তমনে পড়িতে বসিলে—দপ্ করিয়া আলোটা নিভিয়া গেল। 'দুত্তোর' বলিয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলে, তেমনি হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! এ এক রকম ফ্যাসাদ আর কি! রেলবিভাগের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি: হিন্দুস্থানী হইলে হাতটা চিতাইয়া নির্লিপ্তভাবে বলে—"জানে হনুমান্‌জি", বাঙ্গালী হইলে উল্টাইয়া প্রশ্ন করে—"এ লাইনের কোন্ জিনিসটা ঠিক চালে চলছে দেখেছেন মশায়?"

কোনটাই ঠিকভাবে চলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

প্যাসেঞ্জাররা নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প। থার্ডক্লাসে বসিলে প্রায় শোনা যায়, কয়র সাজিতে সাজিতে কিংবা খৈনিতে তালি দিতে দিতে এখানকার অনভুকরণীয় গ্রাম্য হিন্দিতে কেহ বলিতেছে—আদ্‌মানকে বিজলি বাত্ত?...ইত্যাদি, অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ—ও তো এমনি দপ্ করিয়া নিভিবেই, দপ্ করিয়া জ্বলিবেই,—এ আর কি নতুনটা দেখিলে সবাই!

তড়িৎ-বিজ্ঞানের এমন বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতার দল তুষ্ট হইয়া বলে—"ওয়াজিব ওয়াজিব" অর্থাৎ—হাঁ, ঠিকই তো···।

দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা। নৃপেন বলিতেছিল —"হো য়্যাড্! তারপর, খবর কি? শুনেছিলাম কার মুখে যেন যে এই কলেজেই ভর্ত্তি হ'য়েছিস্। কাছেই থাকি, কিন্তু একবার এসে যে···"

এই সময় আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। ওদিকে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; লাঠি পাগড়ি সমেত এক দল এসেন্সী লোক সাজোপাঙ্গদের হাঁক দিতে দিতে, এবং তারই অবো দু'একজন তারস্বরে মকাইয়ের বাজারদর আলোচনা করিতে করিতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই—"ই ডেব্বা বা হো!" বলিয়া জটলা বাঁধিয়া নামিয়া গেল। থানায় আটকান বন্যার জলের মত মাত্র ৩টি লোক অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—"বিলকুল রেহাই দিলে না,—গেল দু'টোকে ছেড়ে।"

ইন্টার ক্লাসের গাড়িটা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার কাছাকাছি প্ল্যাটফরমে আলো নাই, তার আকাশে মেঘ, তবু আন্দাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেবেশ বলিল—"না, এরা ভদ্রলোক ব'লে বোধ হচ্ছে, ভেড়ার দল সবই নেমে গেছে।"

কামরায় তিনটি বেঞ্চ। একটিতে গদি নাই, একটিতে একখানি বিশাল বপু কম্বল নিদ্রায় সতর্ক ভাবে নাক ডাকাইতেছে। আগন্তুক দু'টি অন্ধকারে একটু এদিক-ওদিক করিয়া দেবেশের বেঞ্চির এক কোণেই বসিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল—"সে যাই হোক্, যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি, ছাড়ছি নে। আমার বাড়ি তিনটে ষ্টেশন পরেই, নেমে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। ভালকথা,—যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় তাওতো জিগ্যেস করিনি। পেটে এত কথা হুড়োহুড়ি ক'রছে যে, কোনটে রেখে কোনটে জিগ্যেস করব···"

দেবেশ বলিল—"ভাই, যেখানে যাচ্ছি তা যদি তোমায় জানাই তো ভয় হয় নিষ্করুণ কেটে উল্টে সঙ্গ না নিয়ে ব'স।"

"কি রকম, কি রকম?"

"যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, পুশালোড ষ্টেশনে; তোমার আগেই নেমে যাব। আশা আছে নিজে অনভিজ্ঞ হলেও···"

"শ্বশুরবাড়ি!"—বলিয়া নৃপেন বিস্ময়ে এক রকম চীৎকার করিয়াই উঠিল। "বিয়ে ক'রলে কবে? কৈ, ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি!"

"ঠাকুরমার অনুগ্রহের কল্যাণে ব্যাপারটা একেবারে হঠাৎ হ'য়ে গেল। তবু অপরাধ স্বীকার ক'রছি; দণ্ডাদেশ কর।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক আছে বটে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় বেহারী, তাহার উপর অন্ধকারে

তাঁহাদের মুখ দেখা না যাওয়ায় চক্ষুলজ্জার বালাই নাই। বিশ্রম্ভালাপ খুব জমিয়া উঠিল। বাষ্পচালিত গলা গাড়ির আওয়াজেরও দুই পর্দা উপর দিয়া চলিল—শ্বশুর-বাড়ির কথায় হৃদয়ের দুয়ার একেবারে হাট আহুড় করিয়া দেয় কিনা!

নৃপেন হাসিয়া বলিল—"কি সাজা দোব? তোমার কাছে এখন রাজার রাজ্যও অকিঞ্চিৎকর।" একটু ভাবিয়া বলিল—"বেশ দিচ্ছি দণ্ড,—এক একটি মুহূর্ত এখন তোমার কাছে অমূল্য, তাই থেকেই তোমায় মোটারকম কিছু বঞ্চিত করলাম,—অর্থাৎ আমার ওখানেই তোমায় আপাতত যেতে হচ্ছে"—বলিয়া আরও জোরে হাসিয়া উঠিল।

দেবেশ জানালার পাতলা আলোর সামনে হাতজোড় করিয়া বলিল—"এই তো হোল দণ্ড? এখন আমার স্বপক্ষে একটু আপীল করতে চাই, ভরসা আছে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় নিজে মর্শ্মজ্ঞ না হ'লেও যুক্তির সারবত্তা দেখে তাঁর কঠিন মন টলবে। তা'হলে ধর্ম্মাবতার, প্রণিধান ক'রতে আজ্ঞা হোক।—এই সামান্য দোষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্বশুর-বাড়ি থেকে বঞ্চিত করা লঘু পাপে গুরু দণ্ড হ'য়ে পড়ে, কেননা ধরার তাপদগ্ধ মানবের একমাত্র চরম সান্ত্বনা এই শ্বশুরবাড়ি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে গেছেন—ভ্রমর জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত। সব গোবিন্দলালের আপন আপন ভ্রমর সম্বন্ধে একথাটা সমান ভাবে খাটলেও, তাঁদের নিজের নিজের পিতৃগৃহে সব ভ্রমরই আর অনেকানেকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত খেলো, কেননা তাঁদের চেয়েও এমন সব মধুরতর মধুরতম জীব সেখানে বিহার করেন, যাঁদের মহিমাবর্ণনায় ভাষাও মৌন হয়ে পড়ে। সেখানে থাকেন শালী—তিনি ধরার স্বর্গ, স্বর্গে অপ্সরা, অপ্সরার উর্ব্বশী; সেখানে থাকেন শালাজ—তিনি আবার শালীর চেয়েও শক্তিশালী। ধরার আদেখলা জীব আমরা, হৃদ স্বর্গ আর উর্ব্বশী পর্য্যন্ত কাল্পনিক ধারণা করতে পারি, সুতরাং এঁদের বর্ণনার চেষ্টা করে কল্পনাশক্তিকে আর অপদস্থ করব না।

"শ্বশুরবাড়ির মর্ম্ম যে শুধু আমরাই বুঝেছি তা নয়; দেবতারাও বাদ যান না। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের জাল দিয়ে ক্ষীর ক'রলে তিনটি বড় বড়তে এসে ঠেকেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা আগে কি রকম ছিলেন বলা যায় না, তবে বাঙ্ময়ে এসে পিতামহ হওয়া পর্য্যন্ত, চরাচরে শ্বশুরবাড়ি সৃষ্টি করা নিয়ে মেতে আছেন। বাকী রইলেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর; এঁদের শ্বশুরবাড়ি-প্রীতি ব্যাখ্যান ক'রে কবি কি মন্তব্য দিচ্ছেন শুনুন—

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরি শেতে পয়োনিধৌ
অস্মাকে ধন্য সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।

হর, অর্থাৎ মহেশ্বরের শ্বশুরবাড়ি হ'ল হিমালয়ে, তিনি সারা জীবনটা সেইখানেই কাটিয়ে দিলেন। হরির, কিনা বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়ি হ'ল পয়োনিধি অর্থাৎ সমুদ্র, কেন না বিষ্ণুদ্বারা লক্ষ্মীর উদ্ভব সেইখানেই, তাই তিনি সেই খানেই শয়ন ক'রে কাটালেন। এই সব দেখে শুনে কবি ব'লছেন, এই অসার সংসারে 'শ্বশুর মন্দিরম্'ই হ'চ্ছে সার বস্তু। সুতরাং ধর্ম্মাবতার যদি অধমকে এ-হেন শ্বশুর-মন্দির থেকে বঞ্চিত করেন তো···"

পাশের ভদ্রলোকটি বেশ একটু জোরে গলা-খাঁকারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দেবেশ নৃপেনের গাটা টিপিয়া গলা নামাইয়া বলিল—"বোধ হয় মাঙ্গলা বোকেরে!"

কথাগুলো নৃপেনের লাগিতেছিল ভাল এবং ক্রমে খোদ বন্ধুপত্নীর সরলতর প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলিবার বাগ খুঁজিতেছিল। আস্তে বলিল—"বোকে তো মাথা কেটে নেবে, হাঃ।" তাহার পর জোরেই বলিল—"এ যুক্তির ওপর তোমায় মার্জ্জনা করা যায় না; বৈকুণ্ঠিক ভাষায় বলতে গেলে এই বাহ্য, আরও কিছু থাকে তো বল।"

পাশের সহযাত্রীটির গলায় আওয়াজে যে একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িতেছিল তাহা আর জমিতে পারিল না। তা' ভিন্ন শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছার চেয়ে বক্তার বলিবার ইচ্ছা কম বলবতী ছিল না। দেবেশ বলিয়া চলিল—"একে তো এ-হেন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, তাতে আবার যাত্রার উপলক্ষটা গুরুতর,—কাল জামাই-ষষ্ঠী। এই দিনটার দিকে সাধারণ জামাতা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও সারাটি বছর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, যদি বঞ্চিত হই তো আবুকর হবে, আবার একটা বছর বেঁচে থাকবার উৎসাহ হারাব। তিনশ' পয়ষট্টি দিনের মধ্যে ভগবান প্রজাপতি এই দিনটি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে আমাদের জন্য আলাদা করে দিয়েছেন। এদেশটা নীরস।

এই গাড়ি যদি বাঙ্গালাদেশের গাড়ি হ'ত তো আদমসুমারী ক'রলে দেখা যেত, এর শতকরা নব্বইজন জামাই। —হরেক রকমের জামাই—সিদে জামাই, কুঁদো জামাই; চেঙা জামাই, বেঁটে জামাই; মানুষো আর গুঁগো জামাই; আনকোরা, দোজবরে জামাই—মোটকথা যতরকমের জামাই আজ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। বাকী দশজন হচ্ছেন শ্বশুর কিংবা সম্বন্ধী জাতীয়—সহর থেকে জামাই-ষষ্ঠীর বাজার ক'রে ফিরছেন। আহা চিন্তারও সুখ,—বাড়ীতে কিংবা হোটেলে থাকে দিনান্তেও কেউ একবার ফিরেও দেখে না, আছি কি নেই—সেই নগণ্য জীবার জন্যে শাশুড়ী এতক্ষণ বোধ হয় চর্ব্বাচোষ্যলেহ্যপেয় তোয়ের করতে ঘর্ম্মাক্ত: শালীমহল নূতন নূতন উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। ছোট সহরে, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায় না, শ্বশুর মশাই আজ সারাটা দিন বোধ হয় রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে আমারই রসনা-তৃপ্তির জন্যে সারা মজঃফরপুর ঘেঁটে বেড়িয়েছেন—কে জানে বোধ হয় এই গাড়ীতেই কোথাও ব'সে হৃষ্টচিত্তে ভাবছেন—যাক্, বিবি আমগুলো পাওয়া গেছে, দেবেশ আমার ল্যাঙড়া যেমন ভালবাসে। সে-বেচারির এইতেই ফুর্ত্তি; দেবেশ ভালবাসে এইতেই তিনি কৃতার্থ—হাত্তোর বোকারাম রে!

"এই জন্যেই তো গিন্নিকে শাসিয়ে রেখেছি—দেখ, যদি মেয়ে হয় তো তোমায় ডাইভোর্স ক'রব কিন্তু, আমি করব উপার্জ্জন, তা'র ওপর আবার বাজার ক'রতে পারে ঘাঁটি পড়াব, আর সে ব্যাটা জামাই—নবাব খাজা খাঁ আমার, বিবি পায়ের ওপর পা দিয়ে……"

শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুজনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পাশের লোক দু'টিও অর্দ্ধস্ফুট হাসিতে কাঁপিতে লাগিল। মুখ দেখা না গেলেও দেবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল—"আপলোক বাঙ্গালা সমঝতেহেঁ—মালুম পড়তা; ঠিক হ্যায় কি নেহি কহিয়ে না—হাম মরে কামা করতে, আওর……"

নৃপেন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"আর যদি জামাই হয়ই তোমার দুর্ভাগ্যবশত?"

দেবেশ বলিল—"তাহ'লে আমার চেয়ে তাঁরই দুর্ভাগ্য বেশী। বাবাজী যেমনি পাঞ্জাবী দুলিয়ে, কোঁচা লুটতে লুটতে, জামাইমার্কা মৃদু হাস্য ক'রতে ক'রতে লটবহর চালে গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রণাম ক'রবেন, অমনি পলাটি টিপে ধ'রে, রাস্তার দিকে মুখটি ফিরিয়ে দিয়ে বলব—"যাও, সিনে উল্টো-মুখো; মেরে দিয়েছি, হ'য়ে গেছে, আবার এখানে কি মনে ক'রে সোনার চাঁদ?…"

হাসি চলিতে লাগিল। পাশে দুইটি অপরিচিত লোক এই চিন্তায় যা যা একটু সঙ্কোচ ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ এ-দুজনের চক্ষে তাহারা রসিক ও সমঝদার হিসাবে যেন দলভুক্তই হইয়া পড়িল। অন্ধকারে বয়সও ভাল বোঝা যায় না, এবং সেইজন্যই সম-বয়সী বা কাছাকাছি ঐরকম বলিয়া ধরিয়া লইতেও আটকাইল না। দেবেশ মাঝে মাঝে তাহাদের সাক্ষী মানিতে লাগিল—"ঠিক হ্যায় কি নেহি, সাহেব,—কহিয়ে—"

অন্ধকার ভেদ করিয়া এবং নিবিড়তর অন্ধকার গর্ভে পুঞ্জী-ভূত করিয়া গাড়ি ঠায় চলিয়াছে। এই রহস্যময় আবেষ্টনীকে নবা জামাতার কৌতুকময় শ্বশুরালয়-রহস্য যেন একটি অদ্ভুত রসে আর্দ্র করিয়া তুলিল।

নৃপেন বলিল—"আপীলের যুক্তি খুব সারবান বটে! এইরকম একজন ভাবী শ্বশুরকে তার নিজের শ্বশুর-মন্দিরে যেতে দেওয়া তবেই চলে, যদি তা'র নিজের শ্বশুর সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য লগুড়হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হন। তা' তোমার শ্বশুরের মতামত যখন এখানে পাচ্ছি না…"

কণ্ঠস্বরে ভয়ের অভিনয় করিয়া দেবেশ তাড়াতাড়ি বলিল —"না, ধর্ম্মাবতার, মাফ্ করা হোক, ওটা সাক্ষীর temporary insanity, সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকার—আপনার মূল দণ্ডের আদেশ শুনে অবধি তার মাথার ঠিক নেই কিনা……আর একটা কথা তোমায় আগে বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই,—প্রফেসার গুপ্তার কল্যাণে তোমার ব্যাপ আমি আগে থাকতেই ভোগ ক'রে ব'সে আছি, আর বল কেন,; না হ'লে বেলা দেড়টার গাড়িতে কোথায় আলোয় আলোয় আলো ক'রে যাব, না, অন্ধকার রাত্রে এই যমালয়-যাত্রার দুর্ভোগ!… লোকটা দিলে না ছুটি কোন মতে হে!"

নৃপেন একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"ওটার কথা আর ব'ল না; একটা বেরসিক ভূত…শ্বশুরবাড়ির নামে অত

খেপচুরিয়াস্ কৈন রে বাপু! নিজে বিয়ে ক'রলিনি ক'রলিনি, কপালে নেই; তা' ব'লে···"

বাধা দিয়া দেবেশ বলিল—"বিয়ে ক'রলে না! তুমি তা'হলে লেটেষ্ট মাল্পত্য-বুলেটিন্ অবগত নও দেখছি:—আরে গুপ্তা সাহেব যে মুড়িয়েছেন মাথা শেষ পর্য্যন্ত, তুমি আছ কোথায়? আর দুর্ভাগ্যক্রমে পুণাই হ'য়েছে তাঁর প্রয়াগ-ক্ষেত্র; তাই তো নেহাৎ শিষ্ট-সমভিব্যাহারে যেতে হবে ব'লে···"

"থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসার গুপ্তা—হুর্রে!" অন্ধকারেই হাতটা তুলিয়া নৃপেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

ও বেঞ্চের গুলকায় লোকটি সশব্দ কপট-নিদ্রার মধ্য দিয়া কখন অনাড়ম্বর অকপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; হড়মুড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে জিতে ও?" পরক্ষণে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

দেবেশ হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয় মাড়োয়ারী, আজ ক্লাবে ম্যাচে কিছু টাকা ধরে থাকবে····· নাও, আর থ্রি চিয়ার্সে কাজ নেই, বেজায় চটেছি লোকটার ওপর। ওর লাবজেক্টে পার্সেন্টেজটা কম আছে, ভাবলাম, কাজ কি—হাজিরিটা একটু দিয়েই সোজা ওই দিকে দিয়েই চলে যাব। ·····কমন্ রুমে গিয়ে অক্ষয়ের কাছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদরটা রেখে তার কোটটা খুলে গায়ে দিলাম; প্রফেসার্স রুম থেকে গুপ্তা সাহেব বেরুচ্ছে—যথাসম্ভব বিনত হ'য়ে, মাথা নীচু ক'রে বললাম—"স্যার, বাবা খবর পাঠিয়েছেন—পিসীমা খুব অসুস্থ—যদি এটেণ্ডেন্স নিয়ে ছুটি দেন তো ভালো হয় ·····অবস্থা নাকি বড়ই সঙ্কটাপন্ন—ডিলিরিয়ামে খালি আমার নাম ক'রে···"

"টপ্ ক'রে কি ব'লতে জানো? বলতে—'তাই তাড়াতাড়ি এসেছে বোকাই হ'য়ে চলেছে বুঝি ছুটে?'

"কমন্‌রুমে পাঞ্জাবীটা খোলবার সময় বুক পকেট থেকে রুমালটা পড়ে গেল, তুলে কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি গুঁজে নি—তত কি মনে থাকে?···সব তো বুঝিস্ বাপু—কে সঙ্কটাপন্ন—কা'র ডিলিরিয়াম্ বকবার অবস্থা—তার নতুন বিয়ে করেছিস্, ভাল ক'রেই বুঝিস্, দিলেই পারতিস্ একটু ছুটি, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত? সেখানে সে ঘোড়ার ডিম-পিণ্ডেশ ক'রে ব'সে আছে···"

নৃপেন চক্ষের ভাণ করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে হাতটা বাড়াইয়া বলিল—"আর ব'ল না, আমি হঠাৎ কবি-বাল্মিকী হ'য়ে যুদি শাপ দিয়ে বসি—মা গুপ্তা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা···ওঃ, লোকটা কি নৃশংস হে। তোমায় এই রকম উৎকট আঘাত দিয়ে কোন মুখে আবার নিজে শ্বশুর বাড়ি যাবে?"

বেঞ্চটা থেকে আর হাত আটেক পর্য্যন্ত এই যে বিরহ, তাহার আলোচনায় দেবেশের মনটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটু ভারী হইয়া পড়িল, ওদিককার বিরহবিধুর মুখখানি বোধ হয় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিল; বলিল—"চুলোয় যাক্, তুমিও যেমন। পকেটে দেশলাই রাখ? একটু ধোঁয়া খেতে হবে, দেশলাইটা আনা হয়নি।"

নৃপেন বলিল—"না, আমার ও হাঙ্গাম নেই, তুমিই বা ধ'রলে কবে থেকে?—আগে তো খেতে না।"

সিগরেটের বাক্সটা বাহির করিতে করিতে দেবেশ পাশের লোক দু'টির দিকে চাহিয়া বলিল—"আপলোগ দিয়াশলাই রাখতে হ্যাঁয়?"

একজন খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশিল মাত্র, অপর লোকটি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিককার গদিবিহীন বেঞ্চের উপর গিয়া বাহিরের দিকে মুখটা বাড়াইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার গতিবিধিটা এতই আকস্মিক এবং অসঙ্গত যে দুই বন্ধুতেই যথাসম্ভব চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল। দেবেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল—"একেবারে স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ! তা' যাক্, বাঁচা গেছে।" একটু চাপা গলায় বলিল—"এখন ইনি গেলে আরও একটু প্রাণ খুলে কথা কই।···হ্যাঁ, সিগরেট ধরবার কথা জিগ্যেস করছিলে? ভাই শ্বশুর মশাই দেখে শুনে, অনেক খোঁজখবর নিয়ে বিদ্যি একটি অতীব শান্তশিষ্ট, সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,—পানটি পর্য্যন্ত খায় না, মাটি থেকে চোখ তুলে কথাটি কয় না, নিরীহ, গোবেচারি, এক কথায় বলতে গেলে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তাঁর মেয়ে কিন্তু এ হেন আধাভা-

মন্ত্রটিকে একেবারে বিগড়ে দিলে—চারি দিক দিয়ে—মন্ত্রটি চর্ব্বণ করে দিলে আর কি, অবস্থা ক্রমশ ..

"একদিন, কি যে বলে বেশ একটা ইঙ্গিতের জন্যে খোসামোদ করছি—গিন্নী হঠাৎ থেকে ব'সলেন—'অত লক্ষ্মী, ভাল মানুষ, তোমার আবার এসব সখ কেন? এদিকে তো চুলটি পর্য্যন্ত আঁচড়াতে জানো না, পানটি খেতে জানো না।'

"সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দায়ে, শ্রীহস্তের একটি পান খেয়ে সে-ধোঁকাটা সামলান গেল।—অধোগতির প্রথম ধাপ।

"পরের বারে শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে, সেলুনে ঢুকে সিঁথি দশ আনা ছ'আনা করে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। মাথায় প্রথম টেড়ী উঠল।

"দেবী প্রথম দিকটা বেশ প্রসন্নই রইলেন। উৎসাহ পেয়ে যখন আবদার দুই বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ পরিবর্ত্তন!

"অপরাধ?

"'ছোট পিসেমশাই যখন আসেন, সিগেরেটের গন্ধে বেশ মনে হয়—হাঁা, বাড়ীতে জামাই এসেছে বটে। আমার সে সাধ মেটবার নয়, আমিও কারুর এ-সব বিদঘুটে সাধ মেটাতে চাই না…'

"কি করব বল, ধরলাম।—পিসশ্বশুরের টিন থেকে চুরি-করা চারটে গোল্ডফ্লেক ব্রতভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপরে গোঁফজোড়াটির উপর শুভদৃষ্টি প'ড়ল। তোমায় গা ছুঁয়ে বলছি নৃপেন, আমার অমন ধনু ক'রে পোষা নিরীহ গোঁফ জোড়াটির ল্যাজ কেটে তাকে এরকম উগ্র আর তেজী ক'রে তোলবার আমার কখনই ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি রকম বেকায়দায় আমায় ফেলে যে…তা যদি শোন…"

"নিশ্চয় শুনব" বলিয়া নৃপেন বন্ধুর দিকে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল; তাহার পর যেন বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এইভাবে বলিল—"কিন্তু তুমি যে ভয় পাইয়ে দিলে যে—ওঁদের মন পাওয়া তো নেহাৎ চাট্টিখানি কথা নয় দেখছি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্রীপাদপদ্মে তালছেলে ব'লে যে এতদিনকার সুনাম তা জলাঞ্জলি দিতে হ'য়েছে, মাথার চুল, গোঁফের মূল বলিদান দিতে হ'য়েছে—অথচ এখনও আইবুড়োর গন্ধ ভাল ক'রে যায় নি।…আচ্ছা, প্রফেসর গুপ্তা তা'হলে কি দিয়ে দেবী-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রলেন? সে-বেচারির তো গোঁফ-দম্পদও ছিল না, আর সিগারেট তো তাঁর একটা অবিশ্যেষই ছিল ব'ললেই চলে…?"

দেবেশ বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি বুঝি গুপ্তা সাহেবকে দেখনি এদিকে?—তাঁকে বাবরী রাখতে হ'য়েছে, চাপদাড়ি আর গোঁফ কালচার ক'রতে হ'য়েছে—যেন মাখনবয়সের রবিবাবুটি; সিগারেটের পাটই উঠিয়ে দিতে হ'য়েছে, তার জায়গা নিয়েছে শুদ্ধ, সনাতন পান আর দোক্তা—ভিরকুটিটি শ্রীলোকাঃ…এখন যদি সামনে গুপ্তা সাহেবকে দেখ তো আর চিনতে পারবে না,—সে স্মার্টনেস্ কোথায় গেছে—এখন দেখবে দিব্যি নাদুস্নুদুস্ গেরস্ত—"

"বটে!"

"তবে আর বলছি কি?—তুমি এস না একবার কলেজে, একবার নব কলেবরটি দেখে যাও,—চলে এস একবার…"

অতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।—

এই সময় গাড়িটি পূর্ণা রোড ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিয়া পরিবেশ জমাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে, কি নিগূঢ় কারণে তা' হনুমান্‌জিই জানেন, বিজলি বাতি দুটি সমস্ত কামরাটি অনুচ্ছল আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিতের মত যেন একেবারে তাজা হইয়া!

দুই বন্ধুতেই দেখিল—পাশেই, দাড়িগোঁফে আবৃত মুখ, বাবরীর মাঝখানে সিঁথে কাটা, নাদুস্নুদুস্ গেরস্ত গোছের একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়া আছে; মুখের পান চিবান হঠাৎ বন্ধ করায় গালদুটি ঈষৎ ফোলা, গায়ে শ্বশুরবাড়ির উপযুক্তই বেশভূষা…

চিনিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

পানটা চিবাইতে আরম্ভ করিয়া জড়িত রসনায় কহিলেন,—"এই যে দেবেশ দেখছি…ইয়ে, তোমার পিসিমা…মানে, এই গাড়িতেই যাচ্ছে বুঝি?…"

উত্তর দরকার হয় না,—এই গাড়িতে তো যাইতেছেই, এক সঙ্গে আসিতে হইল এতটা; তবুও সম্মোহিতের মত দেবেশ মাথা নীচু করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁা,—মাসীমার ভাগী…ইয়ে, পিসীমার ভাগ্নে…আপনি বুঝি এই গাড়িতেই?…"

ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াইল।

গদিহীন বেঞ্চ হইতে অপর ভদ্রলোকটি তৎক্ষণ উঠিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া দরজামুখো হইয়াছেন।—সামনে কুলীর মাথায় একটা বড় চাঙাড়ি, ওপরে বাছা বাছা কটা ল্যাঙড়া আম দেখা যায় যেন। দেবেশ ঘুরিতেই চোখাচোখি হইয়া গেল।—

"এই যে বাবাজি…এই গাড়ীতেই বুঝি আসা হ'ল?… আমি ভাবছিলাম বুঝি…থাক্ থাক্, দীর্ঘজীবী হও…প্রণাম হয়েছে—ওঠ…"

ভক্তিমান জামাইয়ের তখন মাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কি ঘোর সমস্যা শ্বশুর বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

পুস্তক ও পত্রিকা-পরিচয়

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা এই মাসে সমালোচনার্থ পাইয়াছি, সময়ে সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।]

Russia To-day—by Nityanarayan Banerjee. Published by K. N. Chatterjee, 120-2 Upper Circular Road, Calcutta. Price Rs 3/-

মেঘদূত পণ্ডিত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য অনূদিত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প—শ্রীসুকুমার সেন। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

বিদ্যাসুন্দর—কাব্য। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ৸৹।

পুতুলের বিয়ে—কবিতা। নজরুল ইসলাম। ডি. এন. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ।৵০।

অজ্ঞাত-বাস
প্রকৃতির পরিহাস
পুতুল নিয়ে খেলা
} উপন্যাস ও গল্প। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এন. লাইব্রেরী। মূল্য যথাক্রমে ২৷০, ১৷০, ২৲।

জেজুরের মিত্রবংশ—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র বর্ম্মা। বঙ্গবেণীয় কায়স্থ সভা, ৩নং ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ।৵০।

মনের খেলা—শ্রীবিমলাদাস চট্টোপাধ্যায়। গুপ্ত কেতুস এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ১৲।

The Bangabasi College Magazine—G. C. Bose Birthday Commemoration Volume.

শিশু-ভারতী—সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ হইতে ১৩শ সংখ্যা। প্রতি সংখ্যা মূল্য ৸৹।

মন্দির—কবিতা। শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ। অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া। মূল্য দুই টাকা।

জপজী—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ। বিশ্বরূপ মঠ, আউধ গর্ব্বী, শিবালয়, বারাণসী। মূল্য আট আনা।

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক—১ম খণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য ৪৲।

কীর্ত্তন-কলিকা, শ্রীশিবকৃষ্ণ রায় বি-এ, বিরচিত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ৪১নং রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা। এবং শ্রীমণি-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৪৩নং রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর কলিকাতা। পৃঃ ১০৬।

নিমাইসন্ন্যাস, অনুরাগ, রাসলীলা ও মাথুর এই চারিটি বিষয়ক কতকগুলি মনোজ্ঞ সময়ের অনুকরণে লিখিত কীর্ত্তন গানের বই। অনেকটি পদ ভাষা ব্রজবুলিতে লিখিত। কতকগুলি পদে 'খীন পাই' এই ভণিতা দেওয়া আছে। পদগুলি ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য।

নিদ্রিত পুরী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

এখানি সৌরীন্দ্র বাবুর অষ্টত্রিংশতম উপন্যাস। উপন্যাস ছাড়া তিনি চারিটি ছোট গল্পের বই, একটি নাটিকার এবং ছেলেমেয়েদের আটখানি বই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে আশ্চর্য্যজনক মনে হয়, তবু মনে হয়, এতগুলি ভাল, মন্দ, মা-ভাল, মা-মন্দ বই না লিখিয়া তিনি যদি অন্ততঃ দুই একখানি ভাল বই লিখিতেন—তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য হয়তো তাঁহাকে মনে রাখিত। কিন্তু তাঁহার দোষ কি? পাব্লিশার যারে ধরিয়া (?), পত্রিকা-সম্পাদকেরও অভাব নাই, একদিকে অর্থেরও প্রয়োজন, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে ক্ষতি কি! মোটামুটি ভাবে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যিকদের অধিকাংশের পক্ষেই এই কথা বলা চলে। হায় দুর্ভাগা দেশ!

সৌরীন্দ্র বাবুর এই বইখানি পড়িয়া বহু দুঃখেই এই সকল কথা মনে পড়িল। এ বই-ও লিখিতে এবং ছাপিতে হইবে! না আছে আখ্যানে বৈচিত্র্য, না আছে চরিত্রসৃষ্টির লাবণ্য শক্তি, না আছে ভিন্ন খোরাক। তাহার কথা বাদ দিয়া বলিলাম, মনে হয় পঁচিশও রিপোর্টারের নোট-বই পড়িতেছি। এসব বই পড়িলে সত্যই অসহায় হয়ে বলিতে ইচ্ছা করে,—'যে সব কথা এখন ছাপার অক্ষরে বেরুচ্ছে, সেগুলো লিখবার উচিত। তার চেয়ে, মিছে এসব লেখা পড়তে পড়তে হয় তো একদিন মনের শান্তি হারাবে, নয় তো রসজ্ঞানও লোপ পাবে।—"

অভিমানিনী—শ্রীবটকনাথ খাস্তগীর। প্রকাশক, শ্রীগুরু লাইব্রেরি। ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

একখানি চতুর্থাঙ্ক নাটক। মণিপুর রাজপরিবারের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইংরেজী-গন্ধী ভাষা ও চরিত্রচিত্রণ সত্ত্বেও বইখানিকে সুপাঠ্য বলিতেই হইবে। লেখকের শক্তি আছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

ভুল-ত্রুটি সবস্থলে আছে কিন্তু তবু এ বইয়ের প্রশংসা করিতে হয়। বেহুলা সিংহের চরিত্র সুন্দর হইয়াছে; সহসা হইয়া যাওয়ার জন্য, কোথায় কোন দুর্বিপাকে তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহার সমাধান হয় বিবাহে—কিন্তু আমার মনে হয় সে সমাধান সিদ্ধির জন্য নয়। অনিবার্য, এ নাটক অভিনয়ের জন্য নয়। অসম্ভব নয়, পুলিনবিহারী পুস্তকের এ জাতীয় বাংলা নাটক কিংবা নাটিকা এই প্রথম ও শেষ নয়। আমরা লেখকের দ্বিতীয় নাটকের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। গান গুলি সিলিয়াবাবুর হওয়া—গ্রন্থকারের এই উক্তির প্রতিবাদ সিলিয়াবাবুর করা উচিত, কেননা গানগুলির অধিকাংশ তাঁহারই। বোধ করি সুরে সুন্দর লাগে।

বিশ্বকোষ—Encyclopaedia Indica, চতুর্থ খণ্ড সংস্করণ। বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি তত্ত্বচিন্তামণি কর্তৃক সঙ্কলিত ও ৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্তৃক, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ।৷০।

দুটকি ও টাকার যে বাঙ্গালীর খাতি ও সহজ অনুরাগ, তাহাতে পাইলে অসিতেও তাহাদের কষ্ট হয় সেই বাঙ্গালীরই একজন অধ্যবসায়ী পুরুষ তাঁহার যৌবনকালে (১২৯৫ সাল) 'বিশ্বকোষ' নামে এক বিরাট এন্সাইক্লোপিডিয়া বাংলায় গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার বিরাট গত চল্লিশ বৎসরে ভাঙিয়া উঠিতে না উঠিতেই সেই দুর্বহ অধ্যবসায়ী পুরুষকে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় কোলাহাড় দেহে সেই পুস্তকেরই সুবৃহৎ সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে দেখিয়া, আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের আর অবধি নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৩১৮ সালে ২৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে। পল্লিকবিবিলাসী বাঙ্গালী এই বিরাট গ্রন্থখানি কিনিয়াছে এবং সত্যসত্যই বাড়াচড়াও করিয়াছে। হতভাগ্য অন্যদেশে ইহাতে আশার সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে: বর্তমান পাতার অর্থাৎ চার কর্মার এক একটি খণ্ড, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷০ আনা। ইহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধা এই যে সাধারণ গরীব গৃহস্থও প্রতিমাসে একখণ্ড বিশ্বকোষ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, অসুবিধা এই যে, একসঙ্গে হয় তো মূল্য একটু বেশী দিতে হইবে। তাহা ছাড়া অপেক্ষা করিয়া থাকার একটা অসুবিধা আছেই।

এ সব সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বকোষকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। বাংলার ঘরে ঘরে এই অমূল্য গ্রন্থ বিরাজ করুক, ইহাই আমাদের কামনা। এতগুলি বিদ্যাবিশারদ মহাশয় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া এই অভিধানখানিকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি-বিষয় মানুষের জ্ঞানের পরিধি গত কয়েক বৎসরে যতখানি বিস্তৃত হইয়াছে তাহার পুরাপুরি সাহায্য লইয়া সংস্কৃত করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের প্রবন্ধ লিখাইয়াছেন এবং যত বহুমূল্য পুস্তক থাকিলে যা স্থান পাইয়াছে তাহার সংশোধনে ব্যস্ত আছেন। তাঁহার পরিশ্রম সফল হয় ও পাঠক সাধারণ, তথা দেশের কল্যাণ কামনা করি এই বিরাট কার্য সম্পূর্ণ করিয়া তিনি যেন যাইতে পারেন।

চিত্রগুলির এই সংস্করণের বিশেষত্ব।

শান্তি-সোপান—অনুবাদক ও প্রকাশক খান-বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী। বালিয়াদী, ঢাকা। মূল্য ২।০।

এই পুস্তকখানি হজরত এমাম গাজালী প্রণীত বেদায়াতুল আবেদিন ও হেদা মোয়াল্লেমিন নামক গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদ। বর্তমানে তরুণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মে অনাস্থা ও ধর্মহীনতা দেখিয়া লেখক বৃদ্ধ বয়সে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহা বলিয়াছেন। ধর্মহীন মুসলমান সমাজকে যথার্থ মুসলমান করিবার জন্য এই পুস্তকে কতকগুলি নীতি গল্প ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, গ্রন্থখানি মুসলমান সমাজে উপকারে আসিবে।

প্রেম—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এইচ, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ৮৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

গ্রন্থখানি ১১টি প্রেমের কবিতায় সমাপ্ত। ছন্দ ও ভাষার উপর কবির যথেষ্ট অধিকার আছে, ভাবও মনকে মধুর প্রেমে ভরিয়া দেয়। কবি উচ্চপ্রেমের উপাসক বলেন, যদিও তিনি তাঁহার 'তোমাকে' খুঁজিতে বিশ্বের সিন্ধুবিন্দু, নিঝর নদীর তীর, তিমিরের গভীরতা, মর্ম-এর গুহা, আলপুসের শিখর, ভেদেরাণ তাহার, ইরাণ অবধি খুঁজিয়া আসিয়াছেন, 'তোমাকে' খুঁজিয়া পাইয়াছেন কিন্তু ঘরেই, নিজেরই আঙিনার তলে। সুতরাং আমরা খুশীই আছি।

প্রেম ও প্রতিমা—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কলিকাতা। দাম এক টাকা।

এই কবিতাগ্রন্থখানি প্রথম হইতে শেষ অবধি পড়িয়া খুশী হইয়া উঠিতে-ছিলাম, মনে হইতেছিল লেখক তরুণ, এবং এই তরুণ বয়সেই তিনি ছন্দবিল-ভাবের সামঞ্জস্য রাখিয়া যে রস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন হাত পাকিলে ইনি একদা নিখুঁত কাব্যরস পরিবেশন করিতে পারিবেন। তাঁহার হাতের লেখা কবিতা এখনও মনে আছে ছন্দপতন, উৎকট উপমা ও কল্পনা এবং কচিৎ বিভ্রান্ত উগ্র ও হাস্যকর রোমান্সের প্রকট হইয়াছে—বিচারিয়া আসিলে তাহারা শুধ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু হঠাৎ উৎসর্গপত্রে 'সুকবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু' এবং 'আমার প্রিয়ার পত্রের' কবিতাটি দেখিয়া বুঝিলাম, ভুল হইয়াছিল। কবি করুণানিধান পক্ষপাতদুষ্ট নিশ্চয়ই, তাঁহার বন্ধুত্বের রস নিশ্চয়ই পক্ষপাতের কাছাকাছি হইবে; প্রিয়ার পত্রের ফল, প্রিয়া প্রাক্তনী হইলেও অনেক আশঙ্কার কথা। এ ফলের দোষ আর দোষাইবার উপায় নাই। সুতরাং—

"তোর এই চিত্রখানি রাখিবো কোথা।
ঐ যে শুষ্ক শুষ্ক প্রতিটি বরষ মোরে"
"রাখিবারি স্থান মম কত শত ঘরে
দুঃখের দৌরাত্ম্যেরম। কত পুণ্য মম—
সবা হতে তোমা পেয়েছি নিকটতম।"

অথবা "বেশই টানো বুকের আঁচল,
বুক যে তোমার সত্যই উঁচল" ইত্যাদি

ক্ষমার্হ নয়। 'কবি-সাধী' কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। ৩০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷০।

যে জাতি সহজেই আত্মবিস্মৃত হয়, পরকে তুলিতে তাহার বেশীক্ষণ লাগে না। এই জাতির মধ্যে আমাদের অতীত মহৎ এবং মহীয়ান আদর্শ আমাদিগকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আদর্শপ্রিয় দুই একজন ব্যক্তির আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় সেইরূপ একজন আদর্শপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার দেবেন্দ্র, কালী প্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুস্তকে তিনি যে সকল পুরাতন তথ্য ও সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই সূত্রে ইতিহাস লইয়া যাঁহারা কাজ করিবেন তাহা তাঁহাদের প্রয়োজনে লাগিবে। তখনই এই পুস্তকগুলি সার্থক হইবে। লেখক যাদুর নিজস্ব মন্তব্যগুলি বাদ দিয়া লইলেও তাহার কীর্তির হানি হইবে না। বর্তমান পুস্তকখানি সুরচিত ও সুললিত।

একখানি মুখ—শ্রীসুধীরেন্দু রায়। প্রকাশক: শ্রীগৌরগোপাল রায়। ৪৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

কয়েকটি সুন্দর কবিতা। পড়িয়া আনন্দ হইল। লেখকের প্রতি-মন ও শিল্প-জ্ঞান আছে। রসিক মাত্রেই এই কবিতাগুলি উপভোগ করিবেন।

পয়লা জুলাই—অরীন কলম। প্রকাশক: নূর লাইব্রেরী, ১২।১ পারেং লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ সিকা।

কৃষাণ-জীবনের কাহিনী। লেখক বাংলায় লিখিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে 'সেরেফ্-কায়েম', 'বাহেরা', 'কবরদুনি', 'ইন্‌লিস' ইত্যাদি কথা কেন বড় বাহুল্য। ৪৭ পৃষ্ঠায় লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, মুসলমান আমলটা বেশুমার 'শব্দনি রায়ের মত শত শত পরগণা বাংলার মুসলমানকে জাতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে'—ইত্যাদি কথা পীড়াদায়ক লাগে। বস্তুনিষ্ঠা ভাল, কিন্তু তাহার তীব্র ঘোর ও বিষোদ্গার যে-কোন শিল্পসৃষ্টির উপভোগকে ব্যর্থ করে।

মুগের বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। জাতক গল্প পরিপূর্ণ। কিশোর মনের উপযোগী বই।

পত্রিকা

মাসিক পত্রিকার সমালোচনা করিতে বসিয়া গত বৈশাখ মাসের ৷০ ও ৷০' ফাল্গুনের 'অমৃতবাজার' মাসিক পত্র পাঁচখানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলাম—দেখিয়া লজ্জা এবং ভয় হইল। এই লজ্জা ও ভয়ের অন্তরালে সমালোচক হিসাবে কোনও প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ নাই। সমবাবসায়ী বলিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচই হয়, তথাপি কথাটা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। বর্তমানে বাংলা দেশে যাঁহারা লেখক-সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহারা যাহা রচনা করেন এই সকল মাসিক পত্রিকার মারফৎই আমরা সেগুলি দেখিতে পাই। আধুনিক লেখকবিদের রচনা যদি এই সকল মাসিক পত্রিকায় ছড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহারা বিরাট দুর্দিনগ্রস্ত হইয়াছেন। হয়, অল্পে জিনিষ বাজারে চলে না দেখিয়া 'চুক্তায়' বলিয়া তাঁহারা যা-তা রচনা করিতেছেন, না হয়, তাঁহারা ভাল লিখিতেই পারেন না। দুই অবস্থাই ভয়াবহ। অনেকে বলিবেন, মাসিকের সম্পাদকেরা ভাল জিনিষ ছাপেন না বলিয়া যদি মান চালাইতে হয়। এ কথা বিবেচনাযোগ্য নয়, কারণ অপরাধ রচনা ছাপাইলে পত্রিকারও যেমন অপবাদ লেখকেরও তেমনি। অনেকে যাঁহারা লেখা ছাপেন তাঁহারা যে জানিয়া শুনিয়া নিজেদের নাম কলঙ্কিত করেন, এরূপ বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া অনেক মাসিকপত্রই বিচার করিয়া লেখা ছাপেন না, লেখকদের নাম দেখিয়া লেখা ছাপিয়া তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বমুক্ত হয়েন।

পত্রিকাগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, পত্রিকা-সম্পাদকদের দোষ কিছু নাই—তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি সব সময় জাগ্রত থাকে না সত্য, কিন্তু দুর্দিনের আসল কারণ ভাল লেখার অভাবটাই স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িতেছে।

এই পাঁচখানি পত্রিকার যে দুই চারিটি গল্প বা কবিতা দেখিতে পাইতেছি তাহার প্রায় সকল গুলিই মৃত বা মুমূর্ষু সাহিত্যিকদের রচনা। বাকী অধিকাংশই অপরা গল্পউপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী অথবা নভেলির সচিত্র প্রবন্ধ। ভাবিতে পারি, লেখা ও পড়া দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় কোথায়? যাঁহারা ভাল লেখেন তাঁহারা লেখা ছাপেন কোথায়? অথবা দেশে দুর্দিন আসার মত সাহিত্য ক্ষেত্রেও বর্তমানে দুর্দিন আসিয়াছে। বাংলা সাহিত্য কি অকুরোদ্গমেই বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে!

বৃদ্ধ মৃত-প্রায় রবীন্দ্রনাথ একা এখনও তিনখানি ভাষার আসর নিজের জরাজীর্ণ একতারা বাজাইয়া সরগরম রাখিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহাকে বাদ দিলে সেগুলিতে আর কিছু কিছুই থাকে না। প্রবাসীতে মৃত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীণ বিমুখের পাখী মহাশয় কিছু খাদ্য পরিবেশন করিয়াছেন। বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের ইতিহাসে এমন দুর্দিন বোধ হয় কখনই আসে নাই।

দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথকেই ধরা যাক। জৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে এখনই তাঁহার কবিতা 'প্রথম চাঁদ'—'প্রথম খনা'ও বলা চলে। তিনি আমা

ও হলে তাক ও খনার বচনে কিরিয়া যাইবারই পক্ষপাতী, এরূপ বোধ হইতেছে। 'প্রাণের ডাকে'—প্রাণ ছাড়া সব আছে। কিন্তু এ বচনে তাঁহারাই বা দোষ দিব কি! রবীন্দ্রনাথের ১৯৭২ সালের পরের কোনও রচনা যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে যদি বলি—

"উতল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে দিবে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিবে বেজিয়ে"

তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মারিতে আসিবেন জানি, কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা একথা সত্য।

বৈশাখের 'উদয়নে'র প্রথম প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়ের মায়া'—হৃদয়ের কথাটিকে প্রবন্ধের ভূমিকায় টেনিতে পারিতেছি—

"সেদিনকার সেই শাসন-পরাধীন প্রভাতের দিনে এই সকল তত্ত্বকথার সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না। বন্ধুজনের ভুল কথা ও কাঁচা কথা বলিবার সেই ছিল সত্যযুগ। হঠাৎ দেখি জলাঞ্জলীর আয়োজন দিন ফেরে। এখন নিজের খোরাকে কোনো একটা মত যদি খাড়া করি সেই মুহূর্তে লেখনীও চালনার আগে ভূমিসাৎ করিবার মতো নির্মম লোকের অভাব আজ আর নেই। ইতিমধ্যে শৈথিল্যের অজ্ঞাত পাকা হয়ে গেছে। তাই হয়তো ভক্তালোচনার অসময়ে নিজের অপোচরেই কোনো ফাঁক দিয়ে ভুল বেরিয়ে পড়ে।"

পড়িয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, প্রভু, তুমি আর যেটা বুঝিতে পারিলাম, তোমার হৃদয়ের সেই কথাটা বুঝাইয়া যাও, তাহাতে তোমাকে বিশ্বাস করুক। তত্ত্বকথাকে বলিতে ইচ্ছা হয়, যে হৃদয়ের, পাকা কথা আমরা শুনিতে চাহি না, রবীন্দ্রনাথকে দিয়া আমার ভুল কথা এবং কাঁচা কথা বলাও। আমরা তাহাই শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব বাণী'—

"এ পারের হৃদয় বাতা ফেলে যারে
কলহাস্য পশ্চাতে বিদায় দেয় যত সমস্বরে
ধ্বনিয়া করিয়া যায় এ জন্মের অধিদেবতারে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজেরই বহুপ্রচারিত মনে হয় 'পশ্চাতে' (Proud Europe !)। শব্দটি এই 'পশ্চাৎ' হইতে আসিয়াছে এবং তাঁহার এ জন্মের অধিদেবতা সম্প্রতি ইউরোপ প্রবাসে যাহির হইয়াছেন।

বৈশাখের বিচিত্রার প্রথম প্রবন্ধ 'ইংরেজি পাঠালী'—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের (১৯১৩ সালের) একটি পত্র। ৭১ বৎসর পূর্বেকার চিঠি, তবু সেই সিলেটের সুর।

"আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ-উপুড়-করে-ঢালা আলোর জন্য হৃদয় নিশাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিদ্বেষ-বিষের, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছুদিন থাক, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি।"

ইহার পর একুশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্রোত ঠেলিয়াই চলিতেছেন!

সম্পাদকীয়

ভাষা-সমস্যা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি সাহিত্যে 'প্রাণের জোরে'র ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। গদ্য ও পদ্যে এই 'প্রাণের জোরে'র ভাষার কিছু নিদর্শনও তিনি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেখিতেছি রবীন্দ্রনাথ আমাদের গ্রন্থনাথ পরিচালিত গজলিকা-প্রবাহে নিজেও ভাসিতে মনস্থ করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপস্থিত, নামে ও যশে সুপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের ইহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—কিন্তু আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে। দেড়শত বৎসরের বহু মনীষীর প্রাণপণ সাধনায় যে বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে, কয়েকজনের খামখেয়ালে তাহাকে নষ্ট হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। জাতিকে এবং জাতির ভাষা ও সাহিত্যকে যাঁহারা ভালবাসেন এবিষয়ে তাঁহাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্রাট্ হইয়া যখন অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন তখন ভাষারাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের উচিত সমবেত হইয়া তিনি এবং তাঁহার মত অন্য অনাচারীরা যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তাহার ব্যবস্থা করা। ইউরোপের কোনও দেশেই সহসা এই ধরণের অনাচার প্রশ্রয় পায় না। যতই কেন শক্তিশালী লেখক হউন, তাঁহাকে ভাষা সম্বন্ধীয় আইন মানিয়া চলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথায় থাকুন, বাংলাভাষা আমাদের অধিকতর প্রিয়। ভাষাকে—মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই মতে রবীন্দ্রনাথের অর্দ্ধেক যদি ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে।

বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুত সত্যসুন্দর দাস মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষা-সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধ শেষ হইল। আশা করি, চিন্তা-

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন এবং চিন্তার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে সকল প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের 'জাতীয় ভাষা' বিষয়ক প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরলোকে

গতমাসে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের খ্যাতনামা বীর অ্যাডমিরাল টোগো তাঁহাদের অন্যতম। গত ২০শে মে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ হইয়াছিল।

কাউণ্ট টোগো জাপানী নৌবহরের অ্যাডমিরাল, বোর্ড অব মার্শালস্ ও ফ্লীট অ্যাডমিরালস্-এর সদস্য ছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা তিনি অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা হইতে উচ্চতম পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা লর্ড কাগোশিমার সামান্য একজন পরিচারক ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি সামান্য নাবিকের জীবন সুরু করেন এবং ২১ বৎসর বয়সে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পান। তাঁহার খ্যাতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে ১৯০৪-৫ সালে বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধের পর। ১৯০৫ সালের ২৭শে মে তারিখে জাপান-সমুদ্রের বিখ্যাত জলযুদ্ধে তিনি রুষিয়ার প্রসিদ্ধ বল্টিক নৌবহর ধ্বংস করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়েন। বাংলা দেশেও তখন অ্যাডমিরাল টোগোর নাম সসম্মানে উচ্চারিত হইত।

এই মাসে বঙ্গমাতা কয়েকজন কৃতী সন্তান হারাইয়াছেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্যার বিপিনবিহারী ঘোষ, স্বদেশী যুগের নেতা হরিদাস হালদার; স্বদেশ-প্রেমিক চারণ-কবি মুকুন্দ দাস, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই ধরণের ক্ষতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণও হয়, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ক্ষতিপূরণের কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। যে কয়জন বিখ্যাত বাঙ্গালী গত মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন, অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদের স্থানে কেহ গ্রহণ করিবেন এরূপ মনে হইতেছে না।

স্যার বিপিনবিহারী ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন, পরে তিনি হাইকোর্টের জজ হন। বাংলা দেশে শিক্ষাসম্পর্কিত নানা কাজে তিনি আজীবন লিপ্ত ছিলেন।

হরিদাস হালদার মহাশয় কালীঘাটের কালীমন্দিরের অন্যতম প্রধান সেবাইত ছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি, এই সময়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরূপে কাজ করিয়াছিলেন। 'গোবর গণেশের গবেষণা' ইঁহারই রচনা। মৃত্যুকালে ইঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বরিশালের মুকুন্দদাস মহাশয় দেশে দেশে যাত্রাগান করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। স্বরচিত নানা উদ্দীপক গানের সাহায্যে তিনি দেশের লোকের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে তিনি স্বদেশপ্রেমিক মুকুন্দদাস নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁহার গুরু স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাকে মুকুন্দদাস এই নাম দিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি 'মাতৃপূজা' নামে একটি যাত্রা গান রচনা করেন। এই পুস্তক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় ও তিনি তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি পরে 'সমাজ', 'আদর্শ', 'ব্রহ্মচারী', 'কর্মক্ষেত্র', 'পথ' 'পল্লীসেবা' প্রভৃতি কয়েকখানি যাত্রাগানের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ হইয়াছিল।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৯। অপরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ও বাংলা নাট্য সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইল। অপরেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস বিচিত্র। তাঁহার পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 'ক্ষত্রিয়' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনিই বিখ্যাত 'পাকপ্রণালী'র বিপ্রদাসবাবু। অপরেশচন্দ্র

নিতান্ত বালক বয়স হইতেই সাহিত্যরচনায় মন্ত্র করিতে থাকেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'প্রভাকরে' তিনি প্রথম লিখিতে সুরু করেন। তখন ঈশ্বর গুপ্তের প্রাতার পৌত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় একটি সখের থিয়েটারের দল গড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন—অপরেশচন্দ্র তাঁহার সহিত যোগ দেন। নাট্যবিষয়ে এই মণীন্দ্রনাথই তাঁহার দীক্ষাগুরু। ১৩১১ সালে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করেন। তখন গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভার আসর জমকাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অপরেশচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১৩২১ সালে তাঁহার রচিত 'রঙ্গিলা' নাটক মিনার্ভায় অভিনীত হয়। পরে তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করেন ও বহু উপন্যাসকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেন। অপরেশচন্দ্র বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে অনেক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি নিজে সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয় সম্বন্ধে নিক্ষাদান করিতে পারিতেন চমৎকার। তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা নাই।

স্মৃতি-উৎসব

গতমাসে কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী মনীষীর স্মৃতিবার্ষিকী-উৎসব বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং মহাভারতকার কাশীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি সভার অধিবেশন তাঁহার জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামে হইয়া গিয়াছে। মৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে। এই সকল উৎসব যাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহারা প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গি গ্রাম। সেখানে গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রামের নানাস্থানে দ্বারের উপর তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে অনেক সাহিত্যিক এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন: "আমরা সেই পুণ্যশ্লোক কাশীরাম দাসের স্মৃতিকে বর্ত্তমান জীবনের সহিত মিলাইতে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানটি আমাদের দেশের যুবকগণ মাথায় করিয়া লইয়াছেন; তাঁহাদের ইচ্ছা কাশীরাম দাসের স্মৃতিকে প্রাণবন্ত করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র একটি মন্দির-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলেই হইবে না—ইহার সহিত চাই প্রাণের সংযোগ।"

এই কাজ সহজসাধ্য করিবার জন্য সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ২৬শে মে চুচুড়ায় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও অনেকে প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। এতদিন পরেও যে মনস্বী ভূদেবের স্মৃতিকে এ ভাবে জাগরিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইল এইজন্য অনুষ্ঠাতাগণ ধন্যবাদের পাত্র। পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সভাপতির অভিভাষণটি ও ডক্টর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ মহাশয়ের অভিভাষণ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইবে।

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণ ৩॥ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চতুর্দ্দশ মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষার যে দুর্দ্দশা ঘটিতে বসিয়াছে, তাহাতে এই সময় রামেন্দ্রসুন্দরের কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি যে অপূর্ব্ব ভাষায় অত্যন্ত নীরস বিষয়কেও সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ে লিখিতে গিয়া ইংরাজী পরিভাষা পরিহার করিয়াও যেভাবে বিষয়গুলি সরল বাংলাতে বুঝাইয়া গিয়াছেন তাহাতে আজিও বিস্মিত হইতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ভাষার বর্ণসঙ্করের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'প্রাণের জোরে'র ভাষা না লিখিলেও তাঁহার ভাষার জোর ছিল।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাঙ্গালার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দশম মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতিপূজা হইয়া গিয়াছে। কথিত হইয়া থাকে, মাতৃভাষাকে বাণীমন্দিরে বরণ করিয়া তোলাই আশুতোষের মহত্তম কীর্ত্তি। বর্ত্তমানে তাঁহার সেই মাতৃভাষার, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতেই কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে আশুতোষের স্মৃতিপূজাকারীরা কি সে সম্বন্ধে

সন্তান ? অত্যন্ত অপদার্থ ব্যক্তিরা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়া কি বীভৎস কীর্তি করিতেছেন, নিতান্ত চক্ষুহীন না হইলে যে কেহ তাহা দেখিতে পাইবেন। অন্তত্রোষের মাতৃভাষাকে অপমান করিয়া তাঁহার স্মৃতিবার্ষিকী-উৎসবের কোনই সার্থকতা নাই।

কলিকাতার মেয়র-সমস্যা

কলিকাতার মেয়র নির্বাচন সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। ইহা লইয়া অনেক রসিকতা ও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এই ধরণের লজ্জাকর ঘটনা বাংলাদেশে ফিরিয়া ফিরিয়া কতবার ঘটিবে জানি না। বাঙ্গালীর মাথা থাকিলে এতদিনে তাহা মাটিতে মিশাইত। আনন্দের বিষয় এই যে, সুদূর পশ্চিম হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নামের সহিত এই লজ্জাকর ব্যাপারটাকে না জড়াইতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন। ইহাই হইল বিদেশে থাকার সুফল।

রোম নগরীতে প্রাচ্য ছাত্র-সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে রোম নগরে সিনর মুসোলিনীর আহ্বানে একটি প্রাচ্যদেশীয় ছাত্র-সম্মিলনী হইয়াছিল। সম্মিলনীর মুখপত্র 'ইয়ং এসিয়া'য় সম্প্রতি সেই সম্মিলনীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মিলনীতে আফগানিস্থান, আরব, চীন, জাপান, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, ইরাক, পালেষ্টাইন, পারস্য, শ্যাম ও সিরিয়াদেশ হইতে মোট ৪৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের ছিলেন ১১৩ জন। রোমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"প্রাচ্যের যে সমস্ত দায়ী তরুণ এখন পৃথিবীর এই অন্ধকার ঠেলিয়া ফেলিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই সমস্ত বীর তরুণদের তরুণ ইতালী সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে ও বন্ধুত্বের জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে।"

মুসোলিনী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হইতে পারে না; প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে ও পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই রহিয়া চলিবে—এই যে ধারণা ইহা অতীব হাস্যকর। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এরূপ অনৈতিহাসিক ও মিথ্যা ধারণা আর নাই। প্রায় বিশ শতাব্দী পূর্বে যুগযুগান্তরের উপকূলে যেদিন এইরূপ মিলন সম্ভব করিয়াছিল। সেদিনই আমরা তাহা সম্ভব করিবার সাধনা গ্রহণ করিয়াছি, আমিই ইতালী কামনা করে। সেদিন আন্তিয়ে অগাষ্টাসের প্রধান পুরোহিত হিসাবে আমি আজ প্রাচ্যের তরুণদিগকে রোমে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। আজ প্রাণহীন ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তে প্রাণবন্ত আত্মিক কলে ধরণীতে নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রাচ্যের সহযোগিতা কামনা করি। রোমের এ আহ্বান সার্থক হোক।"

সুখের বিষয় এই যে, তরুণ ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা শুধু কথায় চিঁড়া ভিজাইতে কখনও চাহেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই প্রাণের মিলনের জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। বহু ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া ইটালীতে লইয়া যাইতেছেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার জন্য সকল রকম সুবিধা দান করিতেছেন। ইহার ফল একদিন অবশ্যই ফলিবে।

স্যার সি. ভি. রামন ও ডক্টর মেঘনাদ সাহা

যে এক লক্ষ টাকার বরপাত্তি লইয়া গত কিছুকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে আন্দোলন চলিতেছে, শুনা যাইতেছে আগামী ২০শে জুন স্যার সি. ভি. রামন সেই সকল বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইয়া দিবেন। ডক্টর ডি. এম. বসু ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এগুলি বুঝিয়া লইবেন। অনেকদিনের অভ্যাসবশত এই বরগুলির বিষয়ে স্যার সি. ভি. নিশ্চয়ই কিছুকাল কাতর থাকিবেন।

স্যার সি. ভি. রামনের স্থলে ডক্টর মেঘনাদ সাহার নিয়োগ সম্বন্ধে যে গুজব উঠিয়াছে তাহা সত্য নহে, তিনি বরখাস্তও হন নাই।

কচুরীপানা ধ্বংসের উপায়

এই উপায় নাকি অবশেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, আবিষ্কার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুবিমল বসু। তিনি পি-২০৩নং রসাগোডস্থিত নিজের লেবরেটরীতে বহুকাল গবেষণা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের সম্মুখে তাহা হাতে কলমে দেখাইয়াছেন।

বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সমস্যা ম্যালেরিয়া এবং কচুরিপানা; বেকার সমস্যা তাহার পরে। কচুরিপানা সমস্যার সমাধান যদি সত্যসত্যই হইয়া যায়, তাহা হইলে

গালীর এখনও বাঁচিবার আশা আছে। আশা করি, এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র পরীক্ষাগারেই নিবদ্ধ থাকিবে না, ইহাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করিয়া তোলাও হইবে। এ বিষয়ে বসু মহাশয় নিশ্চয়ই বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্যের দাবী করিতে পারেন।

যুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের দান

এ যুগ স্বার্থান্ধতার যুগ—নিজেকে লইয়া মানুষ এত ব্যস্ত যে, পরের কথা সে ভাবিতেই পারে না। এ যুগে যদি দেখিতে পাই, একজন মানুষ আর দশজন মানুষের উপকার করিবার জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, তখন প্রাণ আমাদের মাথা নত হয়। অখিল মিস্ত্রী লেনের শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ অকাতর দানের দ্বারা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দশ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে তাঁহার ও পুত্র শ্রীমান কানু চট্টোপাধ্যায়ের নামে দুইটি বৃত্তি দেওয়া হইবে।

এতদ্ব্যতীত, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীরামপুরস্থিত ওয়ার্ড্স হাসপাতালে পিতৃদেব-পরমেশ্বরী ওয়ার্ড নামে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাঁহার মাতার নামে তিন হাজার টাকা দিয়া তিনি পরমেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হিটলার-মুসোলিনী

ইতালীর মুসোলিনী ও জার্ম্মানীর হিটলার স্ব স্ব বুদ্ধি বিদ্যা ও বাহুবলে নিজ নিজ দেশে যে অঘটন ঘটাইয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত হইয়া তাহা দেখিতেছে। মানুষের শক্তি অপরিসীম, ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন। এই দুই মহাশক্তি এতদিন পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন। দুই জুনের রোমের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, শীঘ্র এই দুই বীরপুরুষ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা ও বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এই আলোচনায় কি হইবে, সমস্ত পৃথিবী ব্যগ্রভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

ডি ভ্যালেরার ঘোষণা

আইরিশ পার্লামেণ্টে ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করিয়াছেন (৮ই জুন), যে, ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম ভোগ করিবার জন্য আইরিশ জাতি প্রস্তুত। যখন পরীক্ষা উপস্থিত হইবে তখন আয়ার্ল্যাণ্ড স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

একটি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা যেমন কাজ নহে, বিশেষ করিয়া যে জাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া পরের হাত ধরিয়াই চলিতেছে, সেই জাতিকে 'একলা চলরে' মন্ত্র যিনি শিখাইয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে চাহেন, তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। ডি ভ্যালেরা জোর গলায় বলিতেছেন, "আমরা শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবই।" আয়ার্ল্যাণ্ডের সেই শুভ দিন যদি আসে তবেই এই মহাপুরুষের সাধনা সার্থক হইবে। তাহাতে শেষাশেষি ইংলণ্ডও লাভবান হইবে, সন্দেহ নাই।

সিংহলে রবীন্দ্রনাথ

পরের কাপজেস রিপোর্ট যদি হইলে বলিতে হইবে, সিংহলে রবীন্দ্রনাথ করিতে হয়, তাহা তাহাই দেখাইতেছেন। বাঙ্গালার কথা 'লীলা' বলে অর্থের প্রয়োজন হইলে যে কোনও উপায়েই হউক না, করিতে হইবে; সিংহলের সহিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতিরই পুনঃ সংস্থাপিত হইতেছে, এ ওজুহাতও কম নয়। তা-সিংহলে নানা দুর্বল ও সবল মুহূর্ত্তে নিজের সম্বন্ধে যে কতক-গুলি চমকপ্রদ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একত্র করিয়া দেখাইলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মঘোষণা করিতেছেন।

ভারতবর্ষ কখনই তাঁহাকে সম্মান করে নাই, অথচ গর্ব্বিত ইয়োরোপ তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিয়াছে—একথা শুনিতে যতই কটু হউক আসলে সত্য নয়। অথচ এই ধরণের কথা তিনি দেশে বিদেশে বারবার বলিতে দ্বিধা বোধ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যদি আর একবারও সুস্থ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে নিজেই এই সকল উক্তির জন্য লজ্জিত হইবেন, ইহা আমরা জানি।

কাউন্সিল বক্তৃতাটিও নানারূপক। ২৬শে জৈষ্ঠের 'আনন্দবাজারে' এই বক্তৃতাটি যেভাবে বাহির হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ আছে। তিনি বলিতেছেন—

"আমি বহুদিন পূর্বিবীকে ভারতের আত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে ও তাহাকে ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় লাভে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছি। সুখের বিষয় আমার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে। আমি যে কাজ করিয়াছি, পূর্বিবীর নানা দেশের লোক আসিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতের আত্মার বাণী বহন করিবার ভার আমি বহুদিন যাবৎ বহন করিতেছি। এজন্যই সহজে আমি ভারতবর্ষের পরিচয় দান করিতে, সুতরাং আমি সাহায্য চাহিতে পারি।"

সাহায্য তিনি সকল সময়েই দাবী করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের নাম করিয়া কেন?

ইউনাইটেড প্রেস গত ২রা জৈষ্ঠ তারিখে কলম্বোর রোটারী ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে সম্মানিত অধ্যাপক কলিকাতা হইতে দূরে গিয়া তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাসের বশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বক্তৃতাটি আসলে তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একটি প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন। অন্যান্য কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র সংগ্রহের কাজে লাগিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"তাহাতে বিদ্যার্থীদের নাম লাগবতী; বসন্তের সময়ে যেমন তাহার আগমন, তিনি মানুষের সহজে জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। আমরা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত তাহা যান্ত্রিকতাহীন। তাহার ধর্ম্ম যেন হইতে পারে, কিন্তু সেই যেতধর্ম্ম হাস-বৃদ্ধির দ্বারা কখনও কখনও প্রাচীরের বন্ধনের মধ্যেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার বক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, বালককে পরিপূর্ণ পুষ্টির সুযোগ না দিয়া তাহাকে যেন করিয়া তুলিবার প্যাকিং-বাক্স প্রস্তুত করিলে যে অবস্থা হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেও বালক-মনের সেই অবস্থা হয়,.....তাহাকে শিক্ষাবিভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেরানীগিরি করে, পুলিশ ইন্সপেক্টর হয় এবং ধর্ম্মবুদ্ধি মানসিক শক্তি লইয়া অকালে মারা যায়।.... শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একত্র বাস, একই বয়সের জীবনযাপন করা আবশ্যক, একে অন্যের প্রভু, এই দুরোহতি সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে.....তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে জীবনের সাহায্যে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন, যে প্রতিষ্ঠানে বাহুবলাধিক্য আত্মবলের অভাব হয়, এবং যে প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির মনস্বীরা মিলিত হইয়া শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে।"

ইহার পরের কতকগুলি কথা ইউনাইটেড প্রেসের রিপোর্টে নাই। এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ সেগুলি মুখে বলেন নাই। কথাগুলি এই—এতক্ষণ, যে কলম্বোবাসী, তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়িয়া দাও, দলে দলে আমার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়া ভর্ত্তি হও।

রবীন্দ্রনাথের লজ্জা না থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ত্তমান যে অবস্থা আমরা দেখিতেছি, তাহাতে বাংলার বাহিরে এই প্রতিষ্ঠান লইয়া বড়াই করিতে দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়। এখানে ব্রাতৃত্বের উদ্মেষ হয় কি না জানিনা তবে ইহা যে বিভিন্ন জাতির নর নারীর মিলিত হইবার একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র, তাহা আমরা প্রতিদিনই বুঝিতে পারিতেছি।

কলিকাতায় যক্ষ্মা-রোগ

বাংলার যক্ষ্মারোগ-সমিতির (Tuberculosis Association of Bengal) সদ্যপ্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা গেল যে, কেবল মাত্র কলিকাতা সহরেই প্রায় ত্রিশ হাজার লোক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং এবং এখানে বৎসরে তিন হাজার লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাদবপুরে একটি যক্ষ্মা-আবাসনিবাস আছে বটে কিন্তু ইহার রোগী-গ্রহণ-ক্ষমতা (capacity) সীমাবদ্ধ। আশার কথা এই যে সম্প্রতি স্যার যদুনাথ মিত্র ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি যথাক্রমে ১২০০০ ও ৫১৫ টাকা বাংলার যক্ষ্মারোগ-সমিতির হাতে অর্পণ করিয়াছেন। বাংলার ধনী বাহাদুরও শীঘ্রই আর একটি ফণ্ড খুলিবেন। এই সংঘে ইতিমধ্যেই কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, বাংলাসরকার এবং এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি কমিটি বাংলার যক্ষ্মারোগ সমিতিকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

বাংলাদেশে এই সাংঘাতিক রোগের প্রতিদিন প্রসার হইতেছে। কোনও রোগীকে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইলে যে ভাবে দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে হয় তাহাতে অবিলম্বে এই রোগের সহিত লড়াই করিবার জন্য বিস্তৃততর আয়োজন প্রয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আশা করি এ বিষয়ে জনসাধারণও এই সমিতিকে সাহায্য করিবেন।

শ্রীবিনোদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।